সৌদি আরবের মহামান্য শাসক খাদেমুল হারামাইন আশ্-শারীফাইন বাদশাহ সালমান ইবন আব্দুল আযীয আলে সাউদ-এর নির্দেশে ও পৃষ্ঠপোষকতায় পবিত্র কুরআনের এ তরজমা ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর মুদ্রিত হলো।

تشرف بالأمر بطباعة هذا المصحف الشريف وترجمة معانيه
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية

وقف لله تعالى من خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
ولا يجوز بيعه

يوزع مجانا

المجلد الثاني

من بداية سورة بني إسرائيل إلى نهاية سورة الناس

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

খাদেমুল হারামাইন আশ-শারীফাইন বাদশাহ সালমান ইবন আব্দুল আজীজ আ'লে সাউদ- এর
পক্ষ থেকে আল্লাহর জন্য ওয়াক্‌ফ স্বরুপ প্রদত্ত
বিনামূল্যে বিতরণের জন্য
বিক্রয় নিষিদ্ধ

কুরআনুল কারীম
(বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর)

দ্বিতীয় খণ্ড

সূরা বনী-ইসরাঈল থেকে সূরা আন-নাস এর শেষ পর্যন্ত

বাদশাহ্‌ ফাহ্‌দ কুরআন মুদ্রণ কমপ্লেক্স
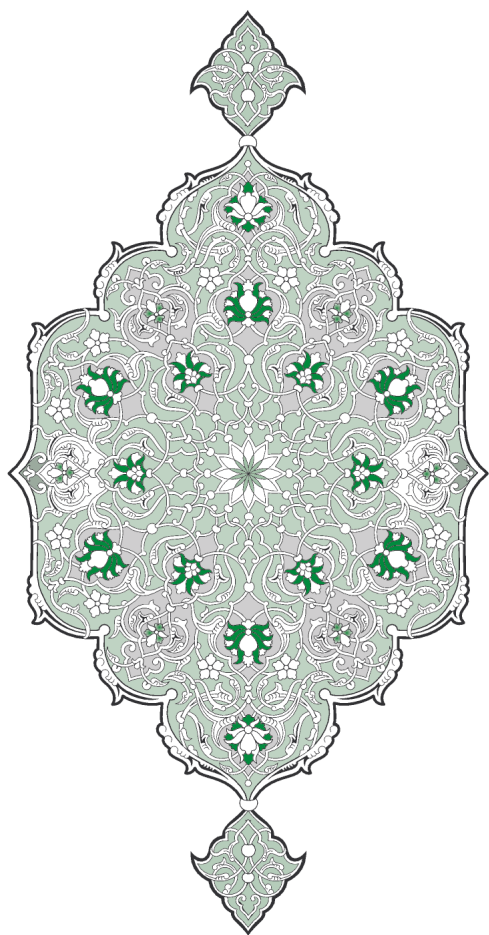
১৭- সূরা বনী-ইসরাঈল

সূরা সংক্রান্ত আলোচনাঃ

নামকরণঃ এ সূরার নাম সূরা আল-ইস্‌রা। কারণ সূরার প্রথমেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইসরা সংক্রান্ত বর্ণনা স্থান পেয়েছে। তাছাড়া সূরাটি সূরা বনী ইসরাঈল নামেও প্রসিদ্ধ। এ নামটি হাদীসেও এসেছে। [দেখুন, তিরমিযী: ২৯২০] কারণ এতে বনী ইসরাঈলদের উত্থান-পতনের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

আয়াত সংখ্যাঃ ১১১।

নাযিল হওয়ার স্থানঃ সূরা আল-ইসরা মক্কায় নাযিল হয়েছে। [কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] কারও কারও মতে এর তিনটি আয়াত মাদানী। [কুরতুবী]

সূরার কিছু বৈশিষ্ট্যঃ

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন, বনী ইসরাইল, আল-কাহফ, মারইয়াম, ত্বা-হা এবং আম্বিয়া এগুলো আমার সবচেয়ে প্রাচীন সম্পদ বা সর্বপ্রথম পুঁজি। [বুখারীঃ ৪৭৩৯] এর অর্থ, প্রাচীন সূরা সমূহের মধ্যে এগুলো অন্যতম। এগুলোর বিশেষ বিশেষত্ব রয়েছে। কারণ এগুলো অনেক কাহিনী এবং নবী-রাসূলদের কিস্‌সা সমৃদ্ধ। অন্য বর্ণনায় এসেছে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিরাত্রে সূরা বনী ইসরাঈল ও আয-যুমার পড়তেন। [মুসনাদে আহমাদঃ ৬/১৮৯, তিরমিযীঃ ২৯২০]

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

১. পবিত্র মহিমাময় তিনি[১], যিনি তাঁর বান্দাকে রাতের বেলায় ভ্রমণ করালেন[২]

---

(১) سبحان শব্দটি মূলধাতু। এর অর্থ, যাবতীয় ত্রুটি ও দোষ থেকে পবিত্র ও মুক্ত। আয়াতে এর ব্যবহারিক অর্থ হচ্ছে, আমি তাঁকে পবিত্র ও মুক্ত ঘোষণা করছি। [ফাতহুল কাদীর]

(২) মূলে أسرى শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। যার আভিধানিক অর্থ রাত্রে নিয়ে যাওয়া। এরপর ليلاً শব্দটি স্পষ্টতঃ এ অর্থ ফুটিয়ে তুলেছে। ليلاً শব্দটি نكره ব্যবহার করে এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সমগ্র ঘটনায় সম্পূর্ণ রাত্রি নয়; বরং রাত্রির একটা অংশ ব্যয়িত হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর] আয়াতে উল্লেখিত মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত সফরকে 'ইসরা' বলা হয় এবং সেখান থেকে আসমান পর্যন্ত যে সফর হয়েছে, তার নাম মে'রাজ। ইসরা অকাট্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। আর মে'রাজ সূরা নাজমে উল্লেখিত রয়েছে এবং অনেক মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। সম্মান ও গৌরবের স্তরে بعبده শব্দটি একটি বিশেষ ভালবাসার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে।

আল-মসজিদুল হারাম[১] থেকে আল-মসজিদুল আকসা পর্যন্ত[২], যার

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي

কেননা, আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং কাউকে 'আমার বান্দা' বললে এর চাইতে বড় সম্মান মানুষের জন্যে আর হতে পারে না। [ইবন তাইমিয়্যাহ, আল-উবুদিয়্যাহঃ ৪৭]

(১) আবু যর গেফারী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলামঃ বিশ্বের সর্বপ্রথম মসজিদ কোনটি? তিনি বললেনঃ মসজিদে-হারাম। অতঃপর আমি আরয করলামঃ এরপর কোনটি? তিনি বললেনঃ মসজিদে আকসা। আমি জিজ্ঞেস করলামঃ এতদুভয়ের নির্মাণের মধ্যে কতদিনের ব্যবধান রয়েছে? তিনি বললেনঃ চল্লিশ বছর। তিনি আরও বললেনঃ এ তো হচ্ছে মসজিদদ্বয়ের নির্মাণক্রম। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা আমাদের জন্য সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠকেই মসজিদ করে দিয়েছেন। যেখানে নামাযের সময় হয়, সেখানেই সালাত পড়ে নাও। [মুসলিমঃ ৫২০]

(২) ইসরা ও মে'রাজের সমগ্র সফর যে শুধু আত্মিক ছিল না, বরং সাধারণ মানুষের সফরের মত দৈহিক ও আত্মিক ছিল, একথা কুরআনের বক্তব্য ও অনেক মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আলোচ্য আয়াতের প্রথম سبحان শব্দের মধ্যে এদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা, এ শব্দটি আশ্চর্যজনক ও বিরাট বিষয়ের জন্যে ব্যবহৃত হয়। [ইবন কাসীর; মাজুম' ফাতাওয়া: ১৬/১২৫] মে'রাজ যদি শুধু আত্মিক অর্থাৎ স্বপ্নজগতে সংঘটিত হত, তবে তাতে আশ্চর্যের বিষয় কি আছে? স্বপ্নে তো প্রত্যেক মুসলিম, বরং প্রত্যেক মানুষ দেখতে পারে যে, সে আকাশে উঠেছে, অবিশ্বাস্য বহু কাজ করেছে। عبد শব্দ দ্বারা এদিকেই দ্বিতীয় ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ, শুধু আত্মাকে দাস বলে না; বরং আত্মা ও দেহ উভয়ের সমষ্টিকেই দাস বলা হয়। [ইবন কাসীর] তারপর "এক রাতে নিজের বান্দাকে নিয়ে যান" এ শব্দাবলীও দৈহিক সফরের কথাই সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে। স্বপ্নযোগে সফরের জন্য নিয়ে যাওয়া শব্দাবলী কোনক্রমেই উপযোগী হতে পারে না। তাছাড়া আয়াতে দেখানোর কথা বলা হয়েছে সেটাও শরীর ছাড়া সম্ভব হয় না। অনুরূপভাবে বুরাকে উঠাও প্রমাণ করে যে, ইসরা ও মি'রাজ দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে সংঘটিত হয়েছিল। [দেখুন, ইবন কাসীর] এছাড়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মে'রাজের ঘটনা উম্মে হানী রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে বর্ণনা করলেন, তখন তিনি পরামর্শ দিলেন যে, আপনি কারও কাছে একথা প্রকাশ করবেন না; প্রকাশ করলে কাফেররা আপনার প্রতি আরও বেশী মিথ্যারোপ করবে। ব্যাপারটি যদি নিছক স্বপ্নই হত, তবে মিথ্যারোপ করার কি কারণ ছিল? তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘটনা প্রকাশ করলেন, তখন কাফেররা মিথ্যারোপ করল এবং ঠাট্টা বিদ্রুপ করল। এমনকি, অনেকের ঈমান টলায়মান হয়েছিল। ব্যাপারটি স্বপ্নের হলে এতসব তুলকালাম কান্ড ঘটার সম্ভাবনা ছিল কি? সুতরাং আমাদের জন্য একথা মেনে নেয়া ছাড়া উপায় নেই যে,

بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ اٰيٰتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ①

আশপাশে আমরা দিয়েছি বরকত, যেন আমরা তাকে আমাদের নিদর্শন দেখাতে পারি(১); তিনিই সর্বশ্রোতা,

এটি নিছক একটি রূহানী তথা আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা ছিল না । বরং এটি ছিল পুরোদস্তুর একটি দৈহিক সফর এবং চাক্ষুষ পর্যবেক্ষণ । আল্লাহ নিজেই তাঁর নবীকে এ সফর ও পর্যবেক্ষণ করান । তাফসীর কুরতুবীতে আছে, ইসরার হাদীসসমূহ সব মুতাওয়াতির । নাক্কাশ এ সম্পর্কে বিশ জন সাহাবীর রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন এবং কাযী ইয়াদ শেফা গ্রন্থে আরও বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন । ইমাম ইবনে কাসীর তার তাফসীর গ্রন্থে এসব রেওয়ায়েত পূর্ণরূপে যাচাই-বাছাই করে বর্ণনা করেছেন এবং পঁচিশ জন সাহাবীর নাম উল্লেখ করেছেন, যাদের কাছ থেকে এসব রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে । যেমন, ওমর ইবনে খাত্তাব, আলী, ইবনে মাসউদ, আবু যর গিফারী, মালেক ইবনে ছা'ছা, আবু হোরায়রা, আবু সায়ীদ আল-খুদরী, ইবনে আব্বাস, শাদ্দাদ ইবনে আউস, উবাই ইবনে কা'ব, আবদুর রহমান ইবনে কুর্ত, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ, হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান, বুরাইদাহ, আবু আইউব আল-আনসারী, আবু উমামাহ, সামুরা ইবনে জুনদুব, সোহাইব রুমী, উম্মে হানী, আয়েশা, আসমা বিনতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুম । এরপর ইবনে-কাসীর বলেন, ইসরা সম্পর্কে সব মুসলমানের ঐকমত্য রয়েছে । শুধু দ্বীনদ্রোহী যিন্দীকরা একে মানেনি । মে'রাজের তারিখ সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে । মুসা ইবনে ওকবার রেওয়ায়েত এই যে, ঘটনাটি হিজরতের ছয়মাস পূর্বে খাদীজা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার মৃত্যুর পর সংঘটিত হয় । আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেনঃ খাদীজা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার ওফাত সালাত ফরয হওয়ার পূর্বেই হয়েছিল । ইমাম যুহরী বলেনঃ খাদীজার ওফাত নবুওয়াত প্রাপ্তির সাত বছর পরে হয়েছিল । কোন কোন রেওয়ায়েত রয়েছে, মে'রাজের ঘটনা নবুওয়ত প্রাপ্তির পাঁচ বছর পরে ঘটেছে । ইবনে ইসহাক বলেনঃ মে'রাজের ঘটনা তখন ঘটেছিল, যখন ইসলাম আরবের সাধারণ গোত্রসমূহে বিস্তৃতি লাভ করেছিল । এসব রেওয়ায়েতের সারমর্ম এই যে, মে'রাজের ঘটনাটি হিজরতের কয়েক বছর পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল । কোন কোন ঐতিহাসিক বলেনঃ ইসরা ও মে'রাজের ঘটনা রবিউসসানী মাসের ২৭তম রাত্রিতে হিজরতের এক বছর পূর্বে ঘটেছে । আবার কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, নবুওয়ত প্রাপ্তির আঠার মাস পর এ ঘটনা ঘটেছে । কারও কারও মতে হিজরতের এক বছর আগে সংঘটিত হয়েছিল । মুহাদ্দেসগণ বিভিন্ন রেওয়ায়েত উল্লেখ করার পরে কোন সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করেননি । [বিস্তারিত দেখুন, আশ-শাইখ সফিউর রহমান আল-মুবারকপূরী: আর-রাহীকুল মাখতূম]

(১) মে'রাজের সংক্ষিপ্ত ঘটনাঃ ইমাম ইবনে কাসীর তার তাফসীর গ্রন্থে আলোচ্য আয়াতের তাফসীর এবং সংশ্লিষ্ট হাদীসসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করার পর বলেনঃ সত্য কথা এই যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসরা সফর জাগ্রত অবস্থায় করেন;

স্বপ্নে নয়। মক্কা মোকাররমা থেকে বাইতুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত এ সফর বোরাকযোগে করেন। তারপরের সংক্ষিপ্ত ঘটনা হলো, বায়তুল-মোকাদ্দাসের দ্বারে উপনীত হয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বোরাকটি অদূরে বেঁধে দেন এবং বায়তুল-মোকাদ্দাসের মসজিদে প্রবেশ করেন এবং কেবলার দিকে মুখ করে দু'রাক'আত সালাত আদায় করেন। অতঃপর সিঁড়ি আনা হয়, যাতে নীচ থেকে উপরে যাওয়ার জন্য ধাপ বানানো ছিল। তিনি সিঁড়ির সাহায্যে প্রথমে প্রথম আসমানে, তারপর অবশিষ্ট আসমানসমূহে গমন করেন। এ সিঁড়িটি কি এবং কিরূপ ছিল, তার প্রকৃতস্বরূপ আল্লাহ্ তাআলাই জানেন। প্রত্যেক আসমানে সেখানকার ফেরেশতারা তাকে অভ্যর্থনা জানায় এবং প্রত্যেক আসমানে সে সমস্ত নবী-রাসূলদের সাথে সাক্ষাত হয়, যাদের অবস্থান কোন নির্দিষ্ট আসমানে রয়েছে। যেমন, ষষ্ঠ আসমানে মূসা আলাইহিসসালাম এবং সপ্তম আসমানে ইবরাহীম আলাইহিসসালামের সাথে সাক্ষাৎ হয়। তারপর তিনি পয়গম্বরগণের স্থানসমূহও অতিক্রম করে এবং এক ময়দানে পৌঁছেন, যেখানে তাকদীর লেখার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। তিনি 'সিদরাতুল-মুন্তাহা' দেখেন, যেখানে আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশে স্বর্ণের প্রজাপতি এবং বিভিন্ন রঙ এর প্রজাপতি ইতস্ততঃ ছোটাছুটি করছিল। ফেরেশতারা স্থানটিকে ঘিরে রেখেছিল। এখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরাঈলকে তাঁর স্বরূপে দেখেন। তাঁর ছয়শত পাখা ছিল। তিনি বায়তুল-মা'মুরও দেখেন। বায়তুল-মা'মুরের নিকটেই কা'বার প্রতিষ্ঠাতা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম প্রাচীরের সাথে হেলান দিয়ে উপবিষ্ট ছিলেন। এই বায়তুল মা'মুরে দৈনিক সত্তর হাজার ফেরেশতা প্রবেশ করে। কেয়ামত পর্যন্ত তাদের পুর্নবার প্রবেশ করার পালা আসবে না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বচক্ষে জান্নাত ও জাহান্নাম পরিদর্শন করেন। সে সময় তার উম্মতের জন্য প্রথমে পঞ্চাশ ওয়াক্তের সালাত ফরয হওয়ার নির্দেশ হয়। তারপর তা হ্রাস করে পাঁচ ওয়াক্ত করে দেয়া হয়। এ দ্বারা ইবাদতের মধ্যে সালাতের বিশেষ গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। এরপর তিনি বায়তুল-মোকাদ্দাসে ফিরে আসেন এবং বিভিন্ন আসমানে যেসব পয়গম্বরের সাথে সাক্ষাত হয়েছিল তারাও তাকে বিদায় সম্বর্ধনা জানাবার জন্য বায়তুল-মোকাদ্দাস পর্যন্ত আগমন করেন। তখন নামাযের সময় হয়ে যায় এবং তিনি পয়গম্বরগণের সাথে সালাত আদায় করেন। সেটা সেদিনকার ফজরের সালাতও হতে পারে। ইবনে-কাসীর বলেনঃ নামাযে পয়গম্বরগণের ইমাম হওয়ার এ ঘটনাটি কারও মতে আসমানে যাওয়ার পূর্বে সংঘটিত হয়। কিন্তু বাহ্যতঃ এ ঘটনাটি প্রত্যাবর্তনের পর ঘটে। কেননা, আসমানে নবী-রাসূলগণের সাথে সাক্ষাতের ঘটনায় একথাও বর্ণিত রয়েছে যে, জিব্রাঈল সব পয়গম্বরগণের সাথে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেন। ইমামতির ঘটনা প্রথমে হয়ে থাকলে এখানে পরিচয় করিয়ে দেয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। এছাড়া সফরের আসল উদ্দেশ্য ছিল ঊর্ধ্ব জগতে গমন করা। কাজেই একাজটি প্রথমে সেরে নেয়াই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। আসল কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর সব পয়গম্বর বিদায় দানের জন্যে তার সাথে বায়তুল-মোকাদ্দাস

সর্বদ্রষ্টা[১]।

وَاٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَلَّا تَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِيْ وَكِيْلًا ۝٢

২. আর আমরা মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম ও তাকে করেছিলাম বনী ইস্রাঈলের জন্য পথনির্দেশক[২]। যাতে 'তোমরা আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে কর্মবিধায়করূপে গ্রহণ না করো[৩];

ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ ۭ اِنَّهٗ كَانَ عَبْدًا

৩. 'তাদের বংশধর[৪]! যাদেরকে আমরা

পর্যন্ত আসেন এবং জিব্রাঈলের ইঙ্গিতে তাকে সবাই ইমাম বানিয়ে কার্যতঃ তার নেতৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দেয়া হয়। এরপর তিনি বায়তুল মোকাদ্দেস থেকে বিদায় নেন এবং বোরাক সওয়ার হয়ে অন্ধকার থাকতেই মক্কা মোকাররমা পৌঁছে যান।

(১) জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, মি'রাজের ব্যাপারে কুরাইশরা যখন আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করল তখন আমি কা'বার হিজর অংশে দাঁড়ালাম। আর আল্লাহ্ বাইতুল মাকদিসকে আমার সামনে উদ্ভাসিত করলেন। ফলে আমি তার দিকে তাকিয়ে তার চিহ্ন ও নিদর্শনগুলো তাদেরকে বলে দিতে থাকলাম। [বুখারীঃ৩৮৮৬]

(২) মাত্র একটি আয়াতে মি'রাজের কথা আলোচনা করে তারপর হঠাৎ বনী ইস্রাঈলের আলোচনা শুরু করে দেয়া হয়েছে। এটি মূলতঃ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে আল্লাহ্‌র নবী মূসা আলাইহিস সালামের কথা উল্লেখ করা। কারণ হচ্ছে, সাধারণত কুরআনের বহু স্থানে মূসা ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বর্ণনা, তাওরাত ও কুরআনের আলোচনা একসাথে থাকে। [ইবন কাসীর]

(৩) কর্মবিধায়ক তথা অভিভাবক অর্থাৎ বিশ্বস্ততা, বিশ্বাসযোগ্যতা ও ভরসার ভিত্তিস্বরূপ যার উপর নির্ভর করা যায়। নিজের যাবতীয় বিষয় হাতে সোপর্দ করে দেয়া যায়। পথনির্দেশনা ও সাহায্য লাভ করার জন্য যার দিকে রুজু করা যায়। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর] আর তিনি হচ্ছেন আল্লাহ্ তা'আলা। তাঁকে ব্যতীত আর কাউকে অভিভাবক, বন্ধু, সাহায্যকারী, ইলাহ যেন না মানা হয়। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক নবীর কাছেই এই বলে পাঠিয়েছেন যে, তাঁকে ছাড়া যেন আর কারও ইবাদাত করা না হয়। [ইবন কাসীর]

(৪) এ আয়াতাংশের কয়েকটি অনুবাদ হতে পারে। এক. মূসা ছিলেন তাদের বংশধর, যাদেরকে আমরা নূহের কিশতিতে আরোহন করিয়েছিলাম। [আন-নুকাত ওয়াল 'উয়ূন; ফাতহুল কাদীর] দুই. হে তাদের বংশধর, যাদেরকে আমরা নূহের সাথে কিশতিতে আরোহন করিয়েছিলাম। তোমাদেরকেই বিশেষ করে এ নির্দেশ দিচ্ছি। [বাগভী; ইবন কাসীর; আদওয়াউল বায়ান] তিন. তোমরা আমাকে ব্যতীত আর

شَكُوْرًا ③

নূহের সাথে আরোহণ করিয়েছিলাম[১]; তিনি তো ছিলেন পরম কৃতজ্ঞ বান্দা[২]।'

وَقَضَيْنَآ إِلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ فِي ٱلْكِتَٰبِ لَتُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ④

৪. আর আমরা কিতাবে বনী ইস্‌রাঈলকে জানিয়েছিলাম[৩] যে, 'অবশ্যই তোমরা পৃথিবীতে দুবার বিপর্যয় সৃষ্টি করবে

কাউকে কর্মবিধায়ক বানিওনা। কারণ তারা তোমাদেরই মত মানুষ। যাদেরকে আমরা নূহের কিশতিতে আরোহন করিয়েছিলাম [ফাতহুল কাদীর]

(১) মুজাহিদ রাহেমাহুল্লাহ বলেনঃ 'তারা হলো, নূহের সন্তানসমূহ ও তাদের স্ত্রীগণ এবং নূহ। তার স্ত্রী তাদের সাথে ছিল না। [তাবারী]

(২) অর্থাৎ নূহ ও তাঁর সাথীদের বংশধর হবার কারণে একমাত্র আল্লাহকেই অভিভাবক করা তোমাদের জন্য শোভা পায়। কারণ তোমরা যার বংশধর তিনি আল্লাহকে নিজের অভিভাবক করার বদৌলতেই প্লাবনের ধ্বংসকারিতার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। বিভিন্ন হাদীসেও নূহ আলাইহিসসালামকে কৃতজ্ঞ বান্দা হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। শাফা'আতের বৃহৎ হাদীসে এসেছে যে, 'লোকজন হাশরের মাঠে নূহ আলাইহিসসালামের কাছে এসে বলবে, হে নূহ! আপনি যমীনের অধিবাসীদের কাছে প্রথম রাসূল আর আল্লাহ্ আপনাকে কৃতজ্ঞ বান্দা হিসেবে ঘোষণা করেছে।' [বুখারীঃ ৪৭১২] নূহ আলাইহিসসালামকে কৃতজ্ঞ বান্দা হিসেবে বলার পিছনে আরো একটি কারণ কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, নূহ আলাইহিসসালাম যখনই কোন কাপড় পরতেন বা কোন খাবার খেতেন তখনই আল্লাহ্‌র দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। সে জন্য তাকে কৃতজ্ঞ বান্দা হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে। [মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ২/৬৩০]

(৩) কোন কোন মুফাসসির বলেন, এখানে কিতাব বলতে এমন কিতাব বুঝানো হয়েছে যার মাধ্যমে বনী ইসরাঈলকে এ বিষয়ে আগাম জানিয়ে দেয়া হয়েছিল। এখানে قضينا শব্দের অর্থ হবে, ফয়সালা জানিয়ে দেয়া, খবর দেয়া। [আত-তাফসীরুস সহীহ] এ অর্থে কুরআনের অন্যান্য স্থানেও এ শব্দটি ব্যবহার হয়েছে। বলা হয়েছে, ﴿وَقَضَيْنَآ إِلَيْهِ ذَٰلِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰٓؤُلَآءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ﴾ "আমি তাঁকে এ বিষয়ে ফয়সালা জানিয়ে দিলাম যে, ভোরে ওদেরকে সমূলে বিনাশ করা হবে।" [সূরা আল-হিজরঃ৬৬] কারও কারও মতে, এখানে قَضَيْنَا শব্দটির অর্থ أَوْحَيْنَا বা আমরা ওহী প্রেরণ করেছি। এর কারণ এখানে শব্দটির পরে إلى এসেছে। যদি জানানো বা খবর দেয়ার অর্থ হতো, তবে এর পরে إلى ব্যবহৃত হতো না। আর যদি ফয়সালা করা বা বিচার করা অর্থ হতো, তবে শব্দটির পরে على আসতো। আর যদি পূর্ণ করার অর্থ হতো, তবে শব্দটির পরে ل আসত। সুতরাং এখানে قَضَيْنَا শব্দের অর্থ, أَوْحَيْنَا বা আমরা ওহী প্রেরণ করেছি হওয়াই বেশী যুক্তিযুক্ত। [ফাতহুল কাদীর]

এবং তোমরা অতিশয় অহংকারস্ফীত হবে।’

فَإِذَا جَآءَ وَعۡدُ أُولَىٰهُمَا بَعَثۡنَا عَلَيۡكُمۡ عِبَادًا لَّنَآ أُوْلِي بَأۡسٖ شَدِيدٖ فَجَاسُواْ خِلَٰلَ ٱلدِّيَارِۚ وَكَانَ وَعۡدٗا مَّفۡعُولٗا ٥

৫. অতঃপর এ দুটির প্রথমটির নির্ধারিত সময় যখন উপস্থিত হল তখন আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে পাঠিয়েছিলাম, যুদ্ধে অত্যন্ত শক্তিশালী আমাদের বান্দাদেরকে; অতঃপর তারা ঘরে ঘরে প্রবেশ করে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছিল। আর এটা ছিল এমন প্রতিশ্রুতি যা কার্যকর হওয়ারই ছিল।

ثُمَّ رَدَدۡنَا لَكُمُ ٱلۡكَرَّةَ عَلَيۡهِمۡ وَأَمۡدَدۡنَٰكُم بِأَمۡوَٰلٖ وَبَنِينَ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ أَكۡثَرَ نَفِيرًا ٦

৬. তারপর আমরা তোমাদেরকে আবার তাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করলাম, তোমাদেরকে ধন ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা সাহায্য করলাম এবং সংখ্যায় গরিষ্ঠ করলাম।

إِنۡ أَحۡسَنتُمۡ أَحۡسَنتُمۡ لِأَنفُسِكُمۡۖ وَإِنۡ أَسَأۡتُمۡ فَلَهَاۚ فَإِذَا جَآءَ وَعۡدُ ٱلۡأٓخِرَةِ لِيَسُـُٔواْ وُجُوهَكُمۡ وَلِيَدۡخُلُواْ ٱلۡمَسۡجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٖ وَلِيُتَبِّرُواْ مَا عَلَوۡاْ تَتۡبِيرًا ٧

৭. তোমরা সৎকাজ করলে সৎকাজ নিজেদের জন্য করবে এবং মন্দকাজ করলে তাও করবে নিজেদের জন্য। তারপর পরবর্তী নির্ধারিত সময় উপস্থিত হলে (আমি আমার বান্দাদের পাঠালাম) তোমাদের মুখমন্ডল কালিমাচ্ছন্ন করার জন্য, প্রথমবার তারা যেভাবে মসজিদে প্রবেশ করেছিল আবার সেভাবেই তাতে প্রবেশ করার জন্য এবং তারা যা অধিকার করেছিল তা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করার জন্য[১]।

---

(১) কাদেরকে বনী ইসরাঈলের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল এবং কারা তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিল মুফাসসিরগণ এ ব্যাপারে বিভিন্ন মতে বিভক্ত হয়েছেন। ইবন আব্বাস ও কাতাদা বলেন, তারা ছিল জালূত ও তার সৈন্যবাহিনী। তারা প্রথমে বনী ইসরাঈলের

৮. সম্ভবত তোমাদের রব তোমাদের প্রতি দয়া করবেন, কিন্তু তোমরা যদি তোমাদের আগের আচরণের পুনরাবৃত্তি কর তবে আমরাও পুনরাবৃত্তি করব[১]। আর জাহান্নামকে আমরা করেছি কাফিরদের জন্য কারাগার।

عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يَّرْحَمَكُمْ ۚ وَاِنْ عُدْتُّمْ عُدْنَا ۘ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ حَصِيْرًا ﴿٨﴾

৯. নিশ্চয় এ কুরআন হিদায়াত করে সে পথের দিকে যা আকওয়াম[২]

اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِيْ لِلَّتِيْ هِيَ اَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ

উপর প্রাধান্য বিস্তার করলেও পরে সেটা উল্টো হয়ে যায়, কারণ, দাঊদ জালুতকে হত্যা করেছিল। সাঈদ ইবন জুবাইর বলেন, এখানে যার কথা বলা হয়েছে সে ইরাকের মুওসিলের রাজা ও তার সেনাবাহিনী। অন্যরা বলেন যে, এখানে ব্যবিলনের বাদশাহ বুখতনাসরের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এছাড়াও এখানে অনেক বড় বড় কাহিনী আলোচিত হয়েছে সেগুলো বর্ণনা করার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। [ইবন কাসীর]

(১) অর্থাৎ তোমরা পুনরায় নাফরমানীর দিকে প্রত্যাবর্তন করলে আমিও পুনরায় এমনি ধরনের শাস্তি ও আযাব চাপিয়ে দেব। বর্ণিত এ বিধিটি কেয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। এতে বনী-ইসরাঈলের সেসব লোককে সম্বোধন করা হয়েছে, যারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর আমলে বিদ্যমান ছিল। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রথমবার মুসা আলাইহিস সালাম-এর শরী'আতের বিরুদ্ধাচরণের কারণে এবং দ্বিতীয়বার ঈসা আলাইহিস সালাম-এর শরী'আতের বিরুদ্ধাচরণের কারণে যেভাবে তোমরা শাস্তি ও আযাবে পতিত হয়েছিলে, এখন তৃতীয় যুগ হচ্ছে শরী'আতে মুহাম্মদীয় যুগ যা কেয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। এর বিরুদ্ধাচরণ করলেও তোমাদেরকে পূর্বের পরিণতিই ভোগ করতে হবে। আসলে তাই হয়েছে। তারা শরী'আতে-মুহাম্মদী ও ইসলামের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হলে মুসলিমদের হাতে নির্বাসিত, লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়েছে।

(২) কুরআন যে পথনির্দেশ করে, তাকে 'আকওয়াম' বলা হয়েছে। 'আকওয়াম' সে পথ, যা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে নিকটবর্তী, সহজ এবং বিপদাপদমুক্তও। সুতরাং কুরআনের প্রদর্শিত পথটি সহজ, সরল, সঠিক, কল্যাণকর, ইনসাফপূর্ণ [আদওয়াউল বায়ান] এ থেকে বোঝা গেল যে, কুরআন মানুষের জীবনের জন্যে যেসব বিধি-বিধান দান করে, সেগুলোতে এ উপরোক্ত গুণগুলো বিদ্যমান রয়েছে। তাতে রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ। যদিও মুলহিদ ও আল্লাহ্‌বিরোধী মানুষ স্বল্পবুদ্ধির কারণে মাঝে মাঝে এ পথকে দুর্গম ও বিপদসংকুল মনে করতে থাকে এবং দ্বীনে ইসলামে বিভিন্নভাবে বদনামী করে থাকে। তারা মূলত আল্লাহ্‌র বিধানসমূহের হিকমত ও রহস্য সম্পর্কে অজ্ঞ ও জানতে অপারগ। [আদওয়াউল বায়ান] কিন্তু রাব্বুল আলামীন

الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا كَبِيْرًا ⁹

(সরল, সুদৃঢ়) এবং সৎকর্মপরায়ণ মুমিনদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।

وَّاَنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ¹⁰

১০. আর যারা আখিরাতে ঈমান আনে না আমরা তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

দ্বিতীয় রুকূ'

وَيَدْعُ الْاِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَآءَهٗ بِالْخَيْرِ ۭ وَكَانَ

১১. আর মানুষ অকল্যাণ কামনা করে[১];

সৃষ্টি জগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন এবং ভূত ও ভবিষ্যৎ তাঁর কাছে সমান। একমাত্র তিনিই এ সত্য জানতে পারেন যে, মানুষের উপকার কোন কাজে ও কিভাবে বেশী। স্বয়ং মানুষ যেহেতু সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত নয়, তাই সে নিজের ভালমন্দও পুরোপুরি জানতে পারে না। কুরআন যে উত্তম পথের পথনির্দেশ করে তার উদাহরণ হলো, কুরআন তাওহীদের দিকে পথ নির্দেশ করে, যা মানবজীবনের সবচেয়ে চরম ও পরম পাওয়া। কুরআন তাওহীদের তিনটি অংশ অর্থাৎ প্রভুত্বে, নাম ও গুণে এবং ইবাদতে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ দেয় যা মানুষের জীবনকে এক সুন্দর ও সাবলীল গতিতে নিয়ে যায়। কুরআন তালাকের ক্ষমতা পুরুষের হাতে দিয়েছে। কারণ, ক্ষেতের মালিকই জানেন কিভাবে তিনি সেটা পরিচালনা করবেন। কুরআন মিরাসের ক্ষেত্রে ছেলেকে মেয়ের দ্বিগুণ দিয়েছে। এটা তাঁর প্রাজ্ঞতার প্রমাণ। অনুরূপভাবে কুরআন কিসাসের প্রতি পথনির্দেশ করে যা মানুষের জানের নিরাপত্তা বিধান করে। তদ্রূপ কুরআন মানুষকে চুরির শাস্তি হিসেবে হাত কাটার নির্দেশ দেয় যা মানুষের মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। তেমনিভাবে কুরআন মানুষকে ব্যভিচারের শাস্তি হিসেবে পাথর মেরে হত্যা এবং বেত্রাগাতের প্রতি দিকনির্দেশনা দেয় যা মানুষের সম্মানের হেফাজতের গ্যারান্টি দেয়। সুতরাং কুরআন সত্যিকার অর্থেই এমন পথের দিকনির্দেশনা দেয় যা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে নিকটবর্তী, সহজ ও বিপদমুক্ত। [আদওয়াউল বায়ান; সংক্ষেপিত]

(১) মানুষ কিভাবে অকল্যাণ কামনা করে তার উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, মানুষ যখন নিজের কোন কাজের উপর রাগ হয় বা সন্তান-সন্ততির উপর বিরক্ত হয় তখন তাদের জন্য বদ-দো'আ করতে থাকে। বলতে থাকে, আমার ধ্বংস হোক, আমার পরিবার নাশ হোক ইত্যাদি। এ জাতীয় দো'আ করলেও তার মন কিন্তু সে দো'আ কবুল হওয়া চায় না। আবার যখন নিজে খুব ভালো অবস্থায় থাকে, বা সন্তান-সন্ততির উপর খুশী হয়ে যায় তখন বড় বড় নেক দো'আ করতে থাকে। সে তখন এটা কবুল হওয়া মন-প্রাণ থেকেই চায়। [আদওয়াউল বায়ান] কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর রহমতের কারণে মানুষের নেক-দো'আ সমূহকে কবুল করে থাকেন আর বদ-দো'আর জন্য সময় দেন।

الْإِنْسَانُ عَجُولًا ﴿١١﴾

যেভাবে কল্যাণ কামনা করে; মানুষ তো প্রকৃতিগতভাবে খুব বেশী তাড়াহুড়াকারী।

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ﴿١٢﴾

১২. আর আমরা রাত ও দিনকে করেছি দুটি নিদর্শন[১] তারপর রাতের নিদর্শনকে মুছে দিয়েছি এবং দিনের নিদর্শনকে আলোকপ্রদ করেছি; যাতে তোমরা তোমাদের রবের অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং যাতে তোমরা বর্ষ-সংখ্যা ও হিসাব জানতে পার; আর আমরা সবকিছু বিশদভাবে বর্ণনা করেছি[২]।

মানুষের এ তাড়াহুড়াকারী চরিত্রের কারণে যদি তিনি তাদের শাস্তি দিতেন তবে অনেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হতো। তাই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকে তার নিজের ও সন্তান সন্ততির উপর বদ-দো'আ করতে নিষেধ করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা তোমাদের নিজের এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততি ও তোমাদের কর্মচারীদের উপর বদ-দো'আ করো না। অনুরূপভাবে তোমাদের সম্পদ নাশের জন্যও বদ-দো'আ করো না কারণ এমন হতে পারে যে, আল্লাহ্‌র দো'আ কবুলের সময় তোমাদের এ বদ-দো'আগুলো সংঘটিত হয়ে যাবে আর তা কবুল হয়ে যাবে।" [আবুদাউদঃ ১৫৩২] অন্য এক হাদীসে আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ কষ্ট ও যাতনায় পড়ে কখনো মৃত্যু কামনা করবে না। আর যদি তাকে মৃত্যু কামনা করতেই হয়, তবে সে যেন বলেঃ "আয় আল্লাহ্! যতদিন বেঁচে থাকাটা আমার জন্য মঙ্গলজনক হয় ততদিন আমাকে জীবিত রাখেন এবং যখন মৃত্যু আমার জন্য উত্তম হয়, তখন আমার মৃত্যু দেন।" [বুখারীঃ৬৩৫১]

(১) আমার একত্ববাদ ও আমার অপার ক্ষমতার উপর প্রমাণ। [এ ধরনের আয়াত আরো দেখুন, সূরা ফুসসিলাতঃ ৩৭, ইয়াসীনঃ ৩৭, ইউনুসঃ ৬, আল-মু'মিনূনঃ ৮০, আল-বাকারাহঃ ১৬৪, আলে ইমরানঃ ১৯০, আন-নূরঃ ৪৪, আল-ফুরকানঃ ৬২, আল-কাসাসঃ ৭৩, জাসিয়াঃ ৫]

(২) আলোচ্য আয়াতে দিবারাত্রির পরিবর্তনকে আল্লাহ্ তাআলার অপার শক্তির নিদর্শন সাব্যস্ত করা হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে যে, রাত্রিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং দিনকে উজ্জ্বল করার মধ্যে বহুবিধ তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। রাত্রিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করার তাৎপর্য এখানে বর্ণনা করা হয়নি। অন্যান্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, রাত্রির অন্ধকার নিদ্রা ও আরামের জন্যে উপযুক্ত। আল্লাহ্ তাআলা এমন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছেন

১৩. আর প্রত্যেক মানুষের কাজ আমরা তার গ্রীবালগ্ন করেছি এবং কিয়ামতের দিন আমরা তার জন্য বের করব এক কিতাব, যা সে পাবে উন্মুক্ত(১) ।

وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ﴿١٣﴾

যে, রাত্রির অন্ধকারেই প্রত্যেক মানুষ ও জন্তুর ঘুম আসে। সমগ্র জগত একই সময়ে ঘুমায়। যদি বিভিন্ন লোকের ঘুমের জন্যে বিভিন্ন সময় নির্ধারিত থাকত, তবে জাগ্রতদের হট্টগোলে ঘুমন্তদের ঘুমেও ব্যাঘাত সৃষ্টি হত। এ আয়াতে দিনকে ঔজ্জ্বল্যময় করার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, দিনের আলোতে মানুষ রুযী অন্বেষণ করতে পারে। মেহনত, মজুরী, শিল্প ও কারিগরী সব কিছুর জন্যে আলো অত্যাবশ্যক। আয়াতে দ্বিতীয় আরেকটি কথা বলা হয়েছে তাহলো, দিবারাত্রির গমনাগমনের দ্বারা সন-বছরের সংখ্যা নির্ণয় করা যায়। এটা মূলতঃ দিন-রাত্রি উভয়টিরই উপকারিতা। উদাহরণতঃ ৩৬০ দিন পূর্ণ হলে একটি সন পূর্ণতা লাভ করে। এমনিভাবে অন্যান্য হিসাব-নিকাশও দিবারাত্রির গমনাগমনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। দিবারাত্রির এই পরিবর্তন না হলে মজুরের মজুরী, চাকুরের চাকুরি এবং লেন-দেনের মেয়াদ নির্দিষ্ট করা সুকঠিন হয়ে যাবে। তাছাড়া দিন-রাত্রি পরিবর্তন না হলে মানুষের পক্ষে তাদের ইবাদতসমূহের হিসাব রাখাও সম্ভব হতো না। তারা হজ্জের, সাওমের, মেয়েদের ইদ্দতের, জুম'আ ইত্যাদির হিসাব পেত না। [আদওয়াউল বায়ান থেকে সংক্ষেপিত]

(১) আয়াতে উল্লেখিত طائر শব্দটির অর্থ করা হয়েছে, কাজ। মূলতঃ এ শব্দটির দু'টি অর্থ হতে পারে। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

এক, মানুষের তাকদীর বা তার জন্য আল্লাহ্‌র পূর্বলিখিত সিদ্ধান্ত। মানুষ দুনিয়াতে যা-ই করুক না কেন সে অবশ্যই তার তাকদীর অনুসারেই করবে। কিন্তু মানুষ যেহেতু জানে না তার তাকদীরে কি লিখা আছে তাই তার উচিত ভালো কাজ করতে সচেষ্ট থাকা। কারণ, যাকে যে কাজের জন্য তৈরী করা হয়েছে এবং যাকে যেখানে যাওয়ার জন্য নির্ধারন করা হয়েছে সে সমস্ত কাজ করা তার জন্য সহজ করে দেয়া হবে। সুতরাং তাকদীরের বাইরে যাওয়ার কোন সুযোগ কারো নেই কিন্তু মানুষের উচিত নিজেকে ভালো ও সৎকাজের জন্য সদাপ্রস্তুত রাখা তাহলে বুঝা যাবে যে, তার তাকদীরে ভালো আছে এবং সেটা করতে সে সমর্থও হবে। পক্ষান্তরে যারা দুর্ভাগা তারা ভালো কাজ করার পরিবর্তে তাকদীরে কি আছে সেটা খোঁজার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে এবং সেটার পিছনে দৌড়াতে থাকে ফলে সে ভালো কাজ করার সুযোগ পায় না। তাই যারা ভালো কাজ করে এবং ভালো কাজ করার প্রয়াসে থাকে তাদের কর্মকাণ্ড আল্লাহ্‌র কাছে এমন প্রশংসিত হয়ে থাকে যে, যদি কোন কারণে সে ভালো কাজ করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সেটা করতে সমর্থ না হয় তবুও আল্লাহ্ তার জন্য সেটার সওয়াব লিখে দেন। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "প্রতিদিনের সুনির্দিষ্ট কাজের উপরই আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার শেষ লিখেন তারপর যখন সে অসুস্থ হয়ে পড়ে

اِقۡرَاۡ كِتٰبَكَ ؕ كَفٰى بِنَفۡسِكَ الۡيَوۡمَ عَلَيۡكَ حَسِيۡبًا ؕ﴿۱۴﴾

১৪. 'তুমি তোমার কিতাব পাঠ কর, আজ তুমি নিজেই তোমার হিসেব-নিকেশের জন্য যথেষ্ট[১]।'

مَنِ اهۡتَدٰى فَاِنَّمَا يَهۡتَدِىۡ لِنَفۡسِهٖ ۚ وَمَنۡ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيۡهَا ؕ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزۡرَ اُخۡرٰى ؕ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيۡنَ حَتّٰى نَبۡعَثَ رَسُوۡلًا ﴿۱۵﴾

১৫. যে সৎপথ অবলম্বন করবে সে তো নিজেরই মঙ্গলের জন্য সৎপথ অবলম্বন করে এবং যে পথভ্রষ্ট হবে সে তো পথভ্রষ্ট হবে নিজেরই ধ্বংসের জন্য[২]। আর কোন বহনকারী অন্য

তখন ফেরেশ্‌তাগণ বলে, হে আমাদের প্রভূ! আপনার অমুক বান্দাকে তো আপনি (ভালো কাজ করা থেকে) বাধা দিলেন। তখন মহান আল্লাহ্ বলেনঃ তাকে তার পূর্ব কাজের অনুরূপ শেষ পরিণতি লিখ, যতক্ষন সে সুস্থ না হবে বা মারা না যাবে।" [মুসনাদে আহমাদঃ ৪/৬৪১]

দুই, মানুষের কাজ বা তার আমলনামা। অর্থাৎ মানুষ যে কোন জায়গায় যে কোন অবস্থায় থাকুক, তার আমলনামা তার সাথে থাকে এবং তার আমল লিপিবদ্ধ হতে থাকে। মৃত্যুর পর তা বন্ধ করে রেখে দেয়া হয়। কেয়ামতের দিন এ আমলনামা প্রত্যেকের হাতে হাতে দিয়ে দেয়া হবে, যাতে নিজে পড়ে নিজেই মনে মনে ফয়সালা করে নিতে পারে যে, সে পুরস্কারের যোগ্য, না আযাবের যোগ্য। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(১) হাসান বসরী রাহেমাহুল্লাহ বলেনঃ 'আল্লাহর শপথ করে বলছি, যিনি তোমার হিসাবের ভার তোমার কাছেই অর্পণ করেছেন তিনি অবশ্যই তোমার সাথে সবচেয়ে বড় ইনসাফের কাজ করেছেন।' [ইবন কাসীর] কাতাদা রাহেমাহুল্লাহ বলেনঃ সেদিন সবাই তাদের আমলনামা পড়তে পারবে যদিও সে দুনিয়াতে নিরক্ষর ছিল। [তাবারী]

(২) অর্থাৎ সৎ ও সত্য-সঠিক পথ অবলম্বন করে কোন ব্যক্তি আল্লাহ, রসূল বা সংশোধন প্রচেষ্টা পরিচালনাকারীদের প্রতি কোন অনুগ্রহ করে না বরং সে তার নিজেরই কল্যাণ করে। অনুরূপভাবে ভুল পথ অবলম্বন করে অথবা তার উপর অনড় থেকে কোন ব্যক্তি অন্যের ক্ষতি করে না, নিজেরই ক্ষতি করে। [আদওয়াউল বায়ান] আল্লাহর রাসূল ও সত্যের আহবায়কগণ মানুষকে ভুল পথ থেকে বাঁচাবার এবং সঠিক পথ দেখাবার জন্য যে প্রচেষ্টা চালান তা নিজের কোন স্বার্থে নয় বরং মানবতার কল্যাণার্থেই চালান। কুরআনের অন্যত্রও আল্লাহ্ তা'আলা তা বলেছেন, যেমন, "যে সৎকাজ করে সে তার নিজের কল্যাণের জন্যই তা করে এবং কেউ মন্দ কাজ করলে তার প্রতিফল সে-ই ভোগ করবে। আপনার রব তাঁর বান্দাদের প্রতি মোটেই যুলুমকারী নন।" [সূরা ফুসসিলাত: ৪৬; সূরা আল-জাসিয়াহ: ১৫] আরও বলেন, "যে কুফরী

কারো ভার বহন করবে না[১]। আর আমরা রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত শাস্তি প্রদানকারী নই[২]।

করে কুফরীর শাস্তি তারই প্রাপ্য; আর যারা সৎকাজ করে তারা নিজেদেরই জন্য রচনা করে সুখশয্যা।" [সূরা আর-রূমঃ ৪৪] আরও বলেন, "অবশ্যই তোমাদের রব-এর কাছ থেকে তোমাদের কাছে চাক্ষুষ প্রমাণাদি এসেছে। অতঃপর কেউ চক্ষুষ্মান হলে সেটা দ্বারা সে নিজেই লাভবান হবে, আর কেউ অন্ধ সাজলে তাতে সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে । আর আমি তোমাদের উপর সংরক্ষক নই।" [সূরা আল-আন'আমঃ ১০৪] আরও বলেন, "যে সৎপথ অবলম্বন করে সে তা করে নিজেরই কল্যাণের জন্য এবং যে বিপথগামী হয় সে তো বিপথগামী হয় নিজেরই ধ্বংসের জন্য আর আপনি তাদের তত্ত্বাবধায়ক নন।" [সুরা আয-যুমারঃ ৪১]

(১) এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক সত্য। কুরআন মজীদে বিভিন্ন স্থানে এ সত্যটি বুঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। কারণ এটি না বুঝা পর্যন্ত মানুষের কার্যধারা কখনো সঠিক নিয়মে চলতে পারে না। এ বাক্যের অর্থ হচ্ছে, প্রত্যেক ব্যক্তির একটি স্বতন্ত্র নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে। নিজের ব্যক্তিগত পর্যায়ে আল্লাহর সামনে এ জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে। এ ব্যক্তিগত দায়িত্বের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি তার সাথে শরীক নেই। তবে অন্যত্র যে বলা হয়েছে, "ওরা নিজেদের ভার বহন করবে এবং নিজেদের বোঝার সাথে আরো কিছু বোঝা" [সূরা আল-আনকাবূতঃ ১৩] এবং আরও যে এসেছে, "ফলে কিয়ামতের দিন তারা বহন করবে তাদের পাপের বোঝা পূর্ণ মাত্রায় এবং তাদেরও পাপের বোঝা যাদেরকে তারা অজ্ঞতাবশত বিভ্রান্ত করেছে"। [সূরা আন-নাহলঃ ২৫] আয়াতদ্বয় এ আয়াতে বর্ণিত মৌলিক সত্যের বিরোধী নয়। কারণ তারা খারাপ কাজের প্রতি মানুষকে আহ্বান করে তাদের নিজেদেরকেই কলুষিত করেছে। তাই তারা অন্যের বোঝাকে নিজেদের বোঝা হিসেবে বহন করবে। অন্যের বোঝা হিসেবে বহন করবে না। এটা বান্দাদের সাথে আল্লাহ্‌র রহমত ও ইনসাফেরই বহিঃপ্রকাশ [দেখুন, ইবন কাসীর]

(২) তবে এ ধরনের আয়াত পড়ে যাদের কাছে কোন নবীর পয়গাম পৌঁছেনি তাদের অবস্থান কোথায় হবে, এ প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামানোর চেয়ে একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তির চিন্তা করা উচিত, তার নিজের কাছে তো পয়গাম পৌঁছে গেছে, এখন তার অবস্থা কি হবে? আর অন্যের ব্যাপারে বলা যায়, কার কাছে, কবে, কিভাবে এবং কি পরিমাণ আল্লাহর পয়গাম পৌঁছেছে এবং সে তার সাথে কি আচরণ করেছে এবং কেন করেছে তা আল্লাহই ভালো জানেন। আলেমুল গায়েব ছাড়া কেউ বলতে পারেন না কার উপর আল্লাহর প্রমাণ পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং কার উপর হয়নি। এ ব্যাপারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাস'আলা হলো, নাবালক বাচ্চাদের নিয়ে। তাদের কি হুকুম হবে? এ ব্যাপারে স্পষ্ট কথা হলো এই যে, মুমিনদের সন্তানগণ জান্নাতি হবে। কিন্তু

১৬. আর আমরা যখন কোন জনপদ ধ্বংস করতে চাই তখন সেখানকার সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিদেরকে আদেশ করি[১], ফলে তারা সেখানে অসৎকাজ

وَإِذَآ أَرَدْنَآ أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا۟ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَٰهَا تَدْمِيرًا ﴿١٦﴾

কাফের মুশরিকদের সন্তানদের ব্যাপারে আলেমগণ বিভিন্ন হাদীসের কারণে সর্বমোট চারটি মতে বিভক্ত হয়েছেঃ

১) তারা জান্নাতে যাবে। এ মতের সপক্ষে তারা এ আয়াত এবং সহীহ্ বুখারীর এক হাদীস [৪০৪৭] দ্বারা দলীল পেশ করে থাকেন। অনুরূপ কিছু হাদীস মুসনাদে আহমাদ [৫/৫৮] ও মাজমাউয-যাওয়ায়েদ [৭/২১৯] ও এসেছে।

২) তাদের সম্পর্কে কোন কিছু বলা যাবে না। এ মতের সপক্ষেও সহীহ্ বুখারীর এক হাদীস [৩৮৩১, ৪৮৩১] থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়।

৩) তারা তাদের পিতাদের অনুগমণ করবে। মুসনাদে আহমাদে [৬/৪৮] বর্ণিত হাদীস থেকে এ মতের সমর্থন পাওয়া যায়।

৪) তাদেরকে হাশরের মাঠে পরীক্ষা করা হবে। সে পরীক্ষায় যারা পাশ করবে তারা হবে জান্নাতি। আর পাশ না করলে হবে জাহান্নামি। এ মতটি সবচেয়ে বেশী গ্রহণযোগ্য মত। এ ব্যাপারে মুসনাদে আহমাদের [৪/২৪] এক হাদীস থেকে প্রমাণ পাই। সত্যান্বেষী আলেমগণ এ মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। ইবন কাসীর এ ব্যাপারে আরও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। [ইবন কাসীর]

(১) এ আয়াতে ব্যবহৃত أمرنا শব্দটির অর্থ ও উদ্দেশ্য নিয়ে আলেমদের মধ্যে বিভিন্ন মত রয়েছেঃ

১) এখানে أمرنا শব্দের অর্থ, 'নির্দেশ'। সে হিসেবে আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়, "সেখানকার সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিদেরকে আদেশ করি ফলে তারা সেখানে অসৎকাজ করে" কিন্তু প্রশ্ন হলো, আল্লাহ্ তা'আলা কিভাবে খারাপ কাজের নির্দেশ করেন? তাই এ অর্থ নেয়া হলে যে সমস্যা সৃষ্টি হয় তার সমাধানে আলেমগণ কয়েকটি দিকনির্দেশ করেছেনঃ এক, এখানে 'নির্দেশ' মানে প্রকৃতিগত নির্দেশ ও প্রাকৃতিক বিধান। অর্থাৎ প্রকৃতিগত ভাবে সবসময় এমনটিই হয়ে থাকে। যখন কোন জাতির ধ্বংস হবার সময় এসে যায়, তার সমৃদ্ধিশালী লোকেরা ফাসেক হয়ে যায়। আর ধ্বংস করার সংকল্প মানে এ নয় যে, আল্লাহ এমনিতেই বিনা কারণে কোন নিরপরাধ জনবসতি ধ্বংস করার সংকল্প করে নেন, বরং এর মানে হচ্ছে, যখন কোন জনবসতি অসৎকাজের পথে এগিয়ে যেতে থাকে এবং আল্লাহ তাকে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন তখন এ সিদ্ধান্তের প্রকাশ এ পথেই হয়ে থাকে। দুই, এখানে নির্দেশ দেয়ার অর্থ অসৎকাজের নির্দেশ নয়। বরং এখানে একটি বাক্য উহ্য আছে। তাহলো, "সেখানকার সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিদেরকে সৎকাজের নির্দেশ করি কিন্তু তারা অসৎকাজে লিপ্ত হলে আমি তাদেরকে ধ্বংস করি।" তখন এ নির্দেশটি

করে[১]; অতঃপর সেখানকার প্রতি দণ্ডাজ্ঞা ন্যায়সংগত হয়ে যায় এবং আমরা তা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করি[২] ।

শর'য়ী নির্দেশ বলে বিবেচিত হবে । [ইবন কাসীর]

২) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি أمرنا শব্দের অর্থ করেছেন سلطنا তখন অর্থ হবে, 'যখন আমি কোন জনপদকে ধ্বংস করতে চাই তখন তাদের উপর খারাপ লোকদের ক্ষমতায়ন করি ফলে তারা সেখানে আমার নাফরমানী করার কারণে তাদেরকে আমি ধ্বংস করি । [ইবন কাসীর]

৩) হাসান, কাতাদা সহ আরও অনেকে বলেন, أمرنا অর্থ بعثنا অর্থাৎ তাদের উপর এমন খারাপ লোকদের চড়াও করি যাতে তারা ধ্বংস হওয়ার কাজ করে । ফলে তাদের আমি ধ্বংস করি । [ফাতহুল কাদীর]

৪) ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ও কাতাদা রাহেমাহুল্লাহ বলেন, এখানে أمرنا অর্থ أكثرنا অর্থাৎ তাদের মধ্যে আমি আধিক্য দান করি । ফলে আল্লাহকে ভুলে যায় এবং নাফরমানী করতে থাকে যাতে তাদের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়ে । জাহেলিয়াতের যুগে যখন কোন গোত্রের লোক বেড়ে যেত এবং শক্তি বৃদ্ধি পেত তখন বলা হতো, أَمِرَ بَنُوْ فُلَانٍ সে হিসেবে এখানেও একই অর্থ নেয়া হবে । [বুখারীঃ ৪৭১১]

(১) আয়াতে বিশেষভাবে অবস্থাপন্ন ধনীদের কথা উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জনসাধারণ স্বাভাবিকভাবেই বিত্তশালী ও শাসক-শ্রেণীর চরিত্র ও কর্মের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় । এরা কুকর্মপরায়ণ হলে সমগ্র জাতি কুকর্মপরায়ণ হয়ে যায় । তাই আল্লাহ্ তাআলা যাদেরকে ধন-দৌলত দান করেন, কর্ম ও চরিত্রের সংশোধনের প্রতি তাদের অধিকতর যত্নবান হওয়া উচিত । এমন হওয়া উচিত নয় যে, তারা বিলাসিতায় পড়ে কর্তব্য ভুলে যাবে এবং তাদের কারণে সমগ্র জাতি ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হবে । এমতাবস্থায় সমগ্র জাতির কুকর্মের শাস্তিও তাদেরকে ভোগ করতে হবে । তাছাড়া যখন কোন জাতির লোকেরা খারাপ কাজ করে এবং অন্যান্যরা সেটাতে বাধা না দেয় তখন তারা হয় সেটায় রাজি আছে হিসেবে অথবা তার বিরোধিতা না করার কারণে শাস্তি লাভ করে । এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'আমাদের মধ্যে সৎ লোকগণ থাকা অবস্থায়ও আমরা কি ধ্বংসপ্রাপ্ত হবো?' তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বলেছিলেন, "হ্যাঁ, যখন খারাপের পরিমান বৃদ্ধি পায়" । [মুসলিমঃ ২৮৮০]

(২) আয়াতের বাহ্যিক অর্থ থেকে এরূপ সন্দেহের অবকাশ ছিল যে, তাদেরকে ধ্বংস করাই ছিল আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশ্য । তাই প্রথমে তাদেরকে নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে ঈমান ও আনুগত্যের আদেশ দেয়া অতঃপর তাদের পাপাচারকে আযাবের

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ ۗ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿١٧﴾

১৭. আর নূহের পর আমরা বহু প্রজন্মকে ধ্বংস করেছি এবং আপনার রবই তাঁর বান্দাদের পাপাচরণের সংবাদ রাখা ও পর্যবেক্ষণের জন্য যথেষ্ট[১]।

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا ﴿١٨﴾

১৮. কেউ আশু সুখ-সম্ভোগ কামনা করলে আমরা যাকে যা ইচ্ছে এখানেই সত্বর দিয়ে থাকি[২]; পরে তার জন্য

কারণ বানানো এসব তো আল্লাহ্ তাআলারই পক্ষ থেকে হয়। এমতাবস্থায় বেচারাদের দোষ কি? তারা তো অপারগ ও বাধ্য। এর জওয়াব হলো, আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে বিবেক-বুদ্ধি ও ইচ্ছা শক্তি দান করেছেন এবং আযাব ও সওয়াবের পথ সুস্পষ্টভাবে বাতলে দিয়েছেন। কেউ যদি স্বেচ্ছায় আযাবের পথে চলারই ইচ্ছা ও সংকল্প গ্রহণ করে, তবে আল্লাহ্র রীতি এই যে, তিনি তাকে সেই আযাবের উপায়-উপকরণাদি সরবরাহ করে দেন। কাজেই আযাবের আসল কারণ স্বয়ং তাদের কুফরী ও গোনাহ্রে সংকল্প। তাই তারা ক্ষমার যোগ্য হতে পারে না। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, গোনাহ যদি সমৃদ্ধশালীরা করে থাকে, তবে তার জন্য সাধারণ জনসাধারণ কেন শাস্তি ভোগ করবে? এর দু'টি উত্তর হতে পারে। এক. যারা সমৃদ্ধশালী নয় তারা সমৃদ্ধশালীদেরই অনুগামী থাকে। সেজন্য তারা তাদের মতই শাস্তি ভোগ করবে। এখানে সমৃদ্ধশালীদের উল্লেখ এজন্যে করা হয়েছে যে, সাধারণতঃ এরাই নেতা গোছের লোক হয়ে থাকে। দুই. তাদের কেউ যেহেতু অন্যায় করেছিল অন্যরা তাতে বাধা দেয়ার দরকার ছিল। কিন্তু তারা যেহেতু তা করেনি। সুতরাং তারাও সমান দোষে দোষী। [আদওয়াউল বায়ান; সংক্ষেপিত]

(১) আয়াত থেকে স্পষ্ট হচ্ছে যে, এখানে মক্কার কাফের মুশরিক এবং তাদের মত অন্যান্যদেরকে কঠোর সতর্কবাণী শোনানো হচ্ছে, তাদেরকে ভয় দেখানো হচ্ছে যে, যেভাবে নূহ ও অন্যান্য জাতির অবাধ্যতার কারণে আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করেছেন তেমনিভাবে এদেরকেও সে পরিণতির সম্মুখিন হতে হবে। আয়াতের শেষে এমন এক সতর্কবাণী উচ্চারন করা হয়েছে যা চিন্তা করলে যে কোন খারাপ লোক তার যাবতীয় কুকর্ম থেকে বিরত হতে বাধ্য হবে। সেখানে বলা হয়েছে যে, আপনার প্রতিপালকই তাঁর বান্দাদের পাপাচরণের সংবাদ রাখা ও পর্যবেক্ষণের জন্য যথেষ্ট। কেউ যদি আল্লাহকে সদা সর্বদা এ বিশ্বাসের সাথে খেয়াল রাখে যে, তিনি তাকে দেখছেন, জানছেন, তাহলে অবশ্যই খারাপ কাজ করার আগে অনেক চিন্তা-ভাবনা করবে। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

(২) অর্থাৎ যারা শুধু দুনিয়াতেই নগদ পেতে চায়, আমি তাদেরকে নগদই দান করি। তবে সেজন্য দুটি শর্ত রয়েছে। একটি শর্ত হচ্ছে, আমি যতটুকু ইচ্ছা করি, ততটুকুই দান

জাহান্নাম নির্ধারিত করি যেখানে সে শাস্তিতে দগ্ধ হবে নিন্দিত ও অনুগ্রহ হতে দূরীকৃত অবস্থায়[১]।

১৯. আর যারা মুমিন হয়ে আখিরাত কামনা করে এবং তার জন্য যথাযথ চেষ্টা করে তাদের প্রচেষ্টা পুরস্কারযোগ্য[২]।

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا ﴿١٩﴾

২০. আপনার রবের দান থেকে আমরা এদের ও ওদের প্রত্যেককে সাহায্য করি এবং আপনার রবের দান

كُلًّا نُّمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ ۚ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴿٢٠﴾

করি, তাদের চেষ্টা বা চাহিদা মোতাবেক দান করা আবশ্যক নয়। দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে, আমার হেকমত অনুসারে যাকে সমীচীন মনে করি, শুধু তাকেই নগদ দান করি। সবাইকে দিতে হবে, এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই। এ আয়াতটি এ জাতীয় যত আয়াতে শর্তহীনভাবে দেয়ার কথা আছে সবগুলোর জন্য শর্ত আরোপ করে দিয়েছে। [দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(১) এর অর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তি আখেরাতে বিশ্বাস করে না অথবা আখেরাত পর্যন্ত সবর করতে প্রস্তুত নয় এবং শুধুমাত্র দুনিয়া এবং দুনিয়াবী সাফল্য ও সমৃদ্ধিকেই নিজের যাবতীয় প্রচেষ্টার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করে, সে যা কিছু পাবে এ দুনিয়াতেই পাবে। আখেরাতে সে কিছুই পেতে পারে না। কারণ সে দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দিয়েছে, সুতরাং সে আখেরাতের জন্য কিছুই করেনি। সুতরাং সে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। [ইবন কাসীর]

(২) মুমিন যখনই যে কাজে আখেরাতের ইচ্ছা ও নিয়ত করবে, তার সেই কাজ গ্রহণযোগ্য হবে; যদিও তার কোন কোন কাজের নিয়তে মন্দ মিশ্রিত হয়ে যায়। এ অবস্থাটি হচ্ছে মুমিনের। তার যে কর্ম খাঁটি নিয়ত সহকারে অন্যান্য শর্তানুযায়ী হবে, তা গ্রহণযোগ্য হবে এবং যে কর্ম এরূপ হবে না, তা গ্রহণযোগ্য হবে না। এ আয়াতে চেষ্টা ও কর্মের সাথে سعيها শব্দযোগ করে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক কর্ম ও চেষ্টা কল্যাণকর ও আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না; বরং সেটিই ধর্তব্য হয়, যা আখেরাতের লক্ষ্যের উপযোগী। উপযোগী হওয়া না হওয়া শুধু আল্লাহ্ ও রাসূলের বর্ণনা দ্বারাই জানা যেতে পারে। তাই তাকে সে কাজটি সুন্নাত অনুযায়ীই করতে হবে। কাজেই যে সৎকর্ম মনগড়া পন্থায় করা হয়- সাধারণ বেদআতী পন্থাও এর অন্তর্ভূক্ত, তা দৃশ্যতঃ যতই সুন্দর ও উপকারী হোক না কেন- আখেরাতের জন্যে উপযোগী নয়। তাই সেটা আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য নয় এবং আখেরাতেও কল্যাণকর নয়। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

অবারিত[১]।

২১. লক্ষ্য করুন, আমরা কিভাবে তাদের একদলকে অন্যের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি, আখিরাত তো অবশ্যই মর্যাদায় মহত্তর ও শ্রেষ্ঠত্বে বৃহত্তর[২]!

اُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَلَلْاٰخِرَةُ اَكْبَرُ دَرَجٰتٍ وَّاَكْبَرُ تَفْضِيْلًا ﴿٢١﴾

২২. আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন ইলাহ্ সাব্যস্ত করো না; করলে নিন্দিত ও লাঞ্ছিত হয়ে বসে পড়বে[৩]।

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوْمًا مَّخْذُوْلًا ﴿٢٢﴾

---

(১) অর্থাৎ দুনিয়ায় জীবিকা ও জীবন উপকরণ দুনিয়াদাররাও পাচ্ছে এবং আখেরাতের প্রত্যাশীরাও পাচ্ছে। এসব অন্য কেউ নয়, আল্লাহই দান করছেন। আখেরাতের প্রত্যাশীদেরকে জীবিকা থেকে বঞ্চিত করার ক্ষমতা দুনিয়া পূজারীদের নেই এবং দুনিয়া পূজারীদের কাছে আল্লাহর নিয়ামত পৌঁছার পথে বাধা দেবার ক্ষমতা আখেরাত প্রত্যাশীদেরও নেই। তিনি সর্বময় কর্তৃত্ববান, তিনি কোন যুলুম করেন না। তিনি প্রত্যেককে তার সৌভাগ্য বা দূর্ভাগ্য সবই প্রদান করেন। তাঁর হুকুমকে কেউ রদ করতে পারে না, তিনি যা দিয়েছেন তা কেউ নিষেধ করতে পারে না। তিনি যা ইচ্ছা করেছেন তা কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ দেখুন, কিভাবে আমরা দুনিয়াতে মানুষকে একে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। তাদের মধ্যে কেউ ধনী, কেউ গরীব আবার কেউ মাঝামাঝি। অন্যদিকে কেউ সুন্দর কেউ কুৎসিত, আবার কেউ মাঝামাঝি। কেউ শক্তিশালী, কেউ দূর্বল। কেউ সুস্থ, কেউ অসুস্থ, কেউ আহমক, কেউ বুদ্ধিমান। দুনিয়াতে এ পার্থক্য মানুষের মধ্যে আছেই। এটা আল্লাহ্‌ই করে দিয়েছেন। এর রহস্য মানুষের বুঝার বাইরে। [ফাতহুল কাদীর] কিন্তু আখেরাতের শ্রেষ্ঠত্ব ঈমানদারদেরই থাকবে। সেখানকার পার্থক্য দুনিয়ার পার্থক্যের চেয়ে বড় হয়ে দেখা দিবে। সেখানে কেউ থাকবে জাহান্নামের নীচের স্তরে, জাহান্নামের জিঞ্জির ও লোহার বেড়ির মধ্যে আবদ্ধ। আর কেউ থাকবে জান্নাতের উঁচু স্তরে, নেয়ামতের মধ্যে, খুশির মধ্যে। তারপর আবার জাহান্নামের লোকদেরও ভিন্ন ভিন্ন স্তর হবে। আর জান্নাতের লোকদের স্তরও বিভিন্ন হবে। তাদের কারও মর্যাদা অপরের মর্যাদার চেয়ে আসমান ও যমীনের মধ্যকার পার্থক্যের মত হবে। বরং উঁচু স্তরে যে সমস্ত জান্নাতীরা থাকবে তারা ইল্লিয়্যীনবাসীদের দেখবে, যেমন দূরের কোন নক্ষত্রকে আকাশের প্রান্তে কেউ দেখতে পায়। [ইবন কাসীর]

(৩) সাধারণত যারা আল্লাহ্‌র সাথে শির্ক করে তাদের বেশিরভাগেই বিপদাপদে আল্লাহকে ভুলে বিভিন্ন পীর-ফকীর, অলী, দরগাহ ইত্যাদিকে ডাকে এবং তাদের কাছে নিজের অভাব গোছানো বা বিপদমুক্তির আহ্বান জানাতে থাকে। এতে তারা শির্ক করার কারণে আখেরাতে নিন্দিত ও লাঞ্ছিত হবে। কারণ, আল্লাহ্‌র সাথে কেউ শরীক

তৃতীয় রুকূ'

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۭ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ۝

২৩. আর আপনার রব আদেশ দিয়েছেন তিনি ছাড়া অন্য কারো 'ইবাদাত না করতে[১] ও পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে[২]। তারা একজন

করলে আল্লাহ্ তাকে আর সাহায্য করবেন না। বরং তাকে সে শরীকের কাছে ন্যস্ত করে দেন যাকে সে আল্লাহ্র সাথে শরীক করেছে। অথচ সে তার কোন ক্ষতি কিংবা উপকারের মালিক নয়। কারণ, ক্ষতি বা উপকারের মালিক তো আল্লাহ্ তা'আলাই। সুতরাং আল্লাহ্র সাথে শরীক করার কারণে তাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়েই থাকতে হবে। [ইবন কাসীর] এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,"অভাব ও সমস্যাগ্রস্ত কেউ যখন তার অভাব ও সমস্যা মানুষের কাছে ব্যক্ত করে তখন তার সে অভাব পূর্ণ হয় না, পক্ষান্তরে যে আল্লাহ্র দরবারে পেশ করে অচিরেই আল্লাহ্ তাকে অমুখাপেক্ষী করে দেয়। দ্রুত মৃত্যুর মাধ্যমে অথবা দ্রুত ধনী করার মাধ্যমে।" [আবু দাউদঃ ১৬৪৫, তিরমিযীঃ ২৩২৬, মুসনাদে আহমাদঃ ১/৪০৭]

(১) আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এখানে قضى শব্দের অর্থ أمر বা নির্দেশ দিয়েছেন। মুজাহিদ বলেন, এখানে قضى অর্থ وصى বা অসিয়ত করেছেন। [ইবন কাসীর] অন্য কোন কোন মুফাসসির বলেছেন, এখানে قضى শব্দটি قضاء شرعي বা শরী'আতগত ফয়সালা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। [সা'দী]

(২) এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা পিতা-মাতার আদব, সম্মান এবং তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহার করাকে নিজের ইবাদতের সাথে একত্রিত করে ফরয করেছেন। যেমন, অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা নিজের শোকরের সাথে পিতা-মাতার শোকরকে একত্রিত করে অপরিহার্য করেছেন। বলা হয়েছেঃ "আমার শোকর কর এবং পিতা-মাতারও" [সূরা লুকমানঃ ১৪]। এতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতের পর পিতা-মাতার আনুগত্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার ন্যায় পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়াও ওয়াজিব। হাদীসে রয়েছে, কোন এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করলঃ আল্লাহ্র কাছে সর্বাধিক প্রিয় কাজ কোনটি? তিনি বললেনঃ সময় হলে সালাত পড়া। সে আবার প্রশ্ন করলঃ এরপর কোন কাজটি সর্বাধিক প্রিয়? তিনি বললেনঃ পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার। [মুসলিমঃ ৮৫] তাছাড়া বিভিন্ন হাদীসে পিতা-মাতার আনুগত্য ও সেবাযত্ন করার অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে, যেমনঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "পিতা জান্নাতের মধ্যবর্তী দরজা। এখন তোমাদের ইচ্ছা, এর হেফাযত

বা উভয়ই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে

কর অথবা একে বিনষ্ট করে দাও"[তিরমিযীঃ ১৯০১]। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেনঃ "আল্লাহ্র সন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টির মধ্যে এবং আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যে নিহিত"[তিরমিযীঃ ১৮৯৯]। অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "সে ব্যক্তির নাক ধুলিমলিন হোক, তারপর ধুলিমলিন হোক, তারপর ধুলিমলিন হোক", সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! সে কে? রাসূল বললেনঃ "যে পিতা-মাতার একজন বা উভয়কে তাদের বৃদ্ধাবস্থায় পেল তারপর জান্নাতে যেতে পারল না"। [মুসলিমঃ ২৫৫১] আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করেন, কোন আমল মহান আল্লাহ্র কাছে বেশী প্রিয়? রাসূল বললেনঃ সময়মত সালাত আদায় করা। তিনি বললেন, তারপর কোন কাজ? তিনি বললেন, পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা। তিনি বললেন, তারপর? তিনি বললেন, আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা। [বুখারীঃ ৫৯৭০] তবে সৃষ্টিকর্তার নাফরমানীর কাজে কোন সৃষ্ট-জীবের আনুগত্য জায়েয নয়। সে হিসেবে কোন কোন বিষয়ে পিতা-মাতার আনুগত্য ওয়াজিব তো নয়ই; বরং জায়েযও নয়। কিন্তু পিতা-মাতার সেবাযত্ন ও সদ্ব্যবহারের জন্য তাঁদের মুসলিম হওয়া জরুরী নয়, আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেনঃ আমার জননী মুশরিকা। তিনি আমার সাথে দেখা করতে আসেন। তাঁকে আদর-আপ্যায়ন করা জায়েয হবে কি? তিনি বললেন "তোমার জননীকে আদর-আপ্যায়ন কর।" [মুসলিমঃ ১০০৩] কাফের পিতা-মাতা সম্পর্কে অন্যত্র আল্লাহ্ বলেছেনঃ " আমি মানুষকে নির্দেশ দিচ্ছি তার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তবে ওরা যদি তোমার উপর বল প্রয়োগ করে আমার সাথে এমন কিছু শরীক করতে যার সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তুমি তাদেরকে মেনো না। [সূরা আল-আনকাবূতঃ ৮] আল্লাহ্ আরেক জায়গায় বলেনঃ "তোমার পিতা-মাতা যদি তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার সমকক্ষ দাঁড় করাতে যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তুমি তাদের কথা মেনো না, তবে পৃথিবীতে তাদের সাথে বসবাস করবে সদ্‌ভাবে"। [সূরা লুকমানঃ ১৫] অর্থাৎ যার পিতা-মাতা কাফের এবং তাকেও কাফের হওয়ার আদেশ করে এ ব্যাপারে তাদের আদেশ পালন করা জায়েয নয়, কিন্তু দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাব বজায় রেখে চলতে হবে। বলাবাহুল্য, 'আয়াতে মারূফ' বলে তাদের সাথে আদর-আপ্যায়নমূলক ব্যবহার বোঝানো হয়েছে। ইসলাম পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের এমনই গুরুত্ব দিয়েছে যে, যদি জিহাদ ফরযে আইন না হয়, ফরযে কেফায়ার স্তরে থাকে, তখন পিতা-মাতার অনুমতি ছাড়া সন্তানের জন্যে জেহাদে যোগদান করা জায়েয নেই। আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, "একলোক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে জিহাদের যাওয়ার অনুমতি চাইল। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

উপনীত হলে তাদেরকে ‘উফ্’ বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না(১); তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বল(২) ।

তাকে বললেন, তোমার পিতামাতা কি জীবিত? সে বললঃ হ্যাঁ । রাসূল বললেন, “তাহলে তুমি তাদের খেদমতে জিহাদ করো” । [মুসলিমঃ ২৫৪৯] অনুরূপভাবে পিতামাতার মৃত্যুর পরে তাদের বন্ধুদের সাথে সদ্ব্যবহার করারও নির্দেশ রয়েছে । রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ “কোন লোকের জন্য সবচেয়ে উত্তম নেককাজ হলো, পিতার মৃত্যুর পরে তার বন্ধুদের সাথে সদ্ব্যবহার করা ।” [মুসলিমঃ ২৫৫২]

(১) পিতা-মাতার সেবাযত্ন ও আনুগত্য পিতা-মাতা হওয়ার দিক দিয়ে কোন সময়ও বয়সের গন্ডিতে সীমাবদ্ধ নয় । সর্বাবস্থায় এবং সব বয়সেই পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা ওয়াজিব । কিন্তু বার্ধক্যে উপনীত হয়ে পিতা-মাতা সন্তানের সেবাযত্নের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে এবং তাদের জীবন সন্তানদের দয়া ও কৃপার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে । তখন যদি সন্তানের পক্ষ থেকে সামান্যও বিমুখতা প্রকাশ পায়, তবে তাঁদের অন্তরে তা ক্ষত হয়ে দেখা দেয় । অপরদিকে বার্ধক্যের উপসর্গসমূহ স্বভাবগতভাবে মানুষকে খিটখিটে করে দেয় । তদুপরি বার্ধক্যের শেষ প্রান্তে যখন বুদ্ধি-বিবেচনাও অকেজো হয়ে পড়ে, তখন পিতা-মাতার বাসনা এবং দাবীদাওয়াও এমনি ধরনের হয়ে যায়, যা পূর্ণ করা সন্তানের পক্ষে কঠিন হয় । আল্লাহ্ তা‘আলা এসব অবস্থায় পিতা-মাতার মনোতুষ্টি ও সুখ-শান্তি বিধানের আদেশ দেয়ার সাথে সাথে সন্তানকে তার শৈশবকাল স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, আজ পিতা-মাতা তোমার যতটুকু মুখাপেক্ষী, এক সময় তুমিও তদপেক্ষা বেশী তাদের মুখাপেক্ষী ছিল । তখন তাঁরা যেমন নিজেদের আরাম-আয়েশ ও কামনা-বাসনা তোমার জন্যে কোরবান করেছিলেন এবং তোমার অবুঝ কথাবার্তাকে স্নেহ-মমতার আবরণ দ্বারা ঢেকে নিয়েছিলেন, তেমনি মুখাপেক্ষিতার এই দুঃসময়ে বিবেক ও সৌজন্যবোধের তাগিদ এই যে, তাঁদের পূর্ব ঋণ শোধ করা কর্তব্য । أُف বাক্যে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে, যদ্দারা বিরক্তি প্রকাশ পায় । এমনকি, তাঁদের কথা শুনে বিরক্তিবোধক দীর্ঘশ্বাস ছাড়াও এর অন্তর্ভুক্ত । মোটকথা, যে কথায় পিতা-মাতার সামান্য কষ্ট হয়, তাও নিষিদ্ধ । এরপর বলা হয়েছে, ﴿وَلَا تَنْهَرْهُمَا﴾ এখানে نهر শব্দের অর্থ ধমক দেয়া । এটা যে কষ্টের কারণ তা বলাই বাহুল্য ।

(২) প্রথমোক্ত দু’টি আদেশ ছিল নেতিবাচক তাতে পিতা-মাতার সামান্যতম কষ্ট হতে পারে, এমনসব কাজেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে ।[ইবন কাসীর] তৃতীয় আদেশে ইতিবাচক ভঙ্গিতে পিতা-মাতার সাথে কথা বলার আদব শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, তাঁদের সাথে সম্প্রীতি ও ভালবাসার সাথে নম্র স্বরে কথা বলতে হবে । [ফাতহুল কাদীর]

২৪. আর মমতাবশে তাদের প্রতি নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত কর[১] এবং বল, 'হে আমার রব! তাঁদের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তাঁরা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন[২] ।'

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾

২৫. তোমাদের রব তোমাদের অন্তরে যা আছে তা ভাল জানেন; যদি তোমরা সৎকর্মপরায়ণ হও তবেই তো তিনি আল্লাহ্-অভিমুখীদের প্রতি খুবই ক্ষমাশীল[৩] ।

رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ۚ إِنْ تَكُونُوا صٰلِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوّٰبِينَ غَفُورًا ﴿٢٥﴾

---

(১) পাখি যেভাবে তার সন্তানদেরকে লালন পালন করার সময় তার দু' ডানা নত করে আগলে রাখে তেমনি পিতা-মাতাকে আগলে রাখতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাছাড়া পাখি যখন উড়ে তখন ডানা মেলে ধরে তারপর যখন অবতরণ করতে চায় তখন ডানা গুটিয়ে নেয়, তেমনি পিতামাতার প্রতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে পাখি যেভাবে নিচে নামার জন্য গুটিয়ে নিয়ে নিজেকে নিচে নামায় তেমনি তুমি নিজেকে গর্ব-অহংকার মুক্ত হয়ে পিতা-মাতার সাথে ব্যবহার করবে। [ফাতহুল কাদীর] উরওয়া ইবনে যুবাইর বলেন এর অর্থ, তাদের নির্দেশ মান্য করা এবং তাদের কাংখিত কোন বস্তু দিতে নিষেধ না করা। [ফাতহুল কাদীর]

(২) এর সারমর্ম এই যে, পিতা-মাতার ষোল আনা সুখ-শান্তি বিধান মানুষের সাধ্যাতীত। কাজেই সাধ্যানুযায়ী চেষ্টার সাথে সাথে তাদের জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দো'আ করবে যে, তিনি যেন করুণাবশতঃ তাদের সব মুশকিল আসান করেন এবং কষ্ট দূর করেন। বৃদ্ধ অবস্থা ও মৃত্যুর সময় তাদেরকে রহমত করেন। [ইবন কাসীর] সর্বশেষ আদেশটি অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। পিতা-মাতার মৃত্যুর পরও দো'আর মাধ্যমে সর্বদা পিতা-মাতার খেদমত করা যায়। পিতা-মাতা মুসলিম হলেই তাদের জন্য রহমতের দো'আ করতে হবে, কিন্তু মুসলিম না হলে তাদের জীবদ্দশায় পার্থিব কষ্ট থেকে মুক্ত থাকা ও ঈমানের তওফীক লাভের জন্য করা যাবে। মৃত্যুর পর তাদের জন্যে রহমতের দো'আ করা জায়েয নেই।

(৩) আয়াতটি নতুন কথাও হতে পারে, তখন অর্থ হবে, তোমাদের অন্তরে ইখলাস আছে কি না, আনুগত্যের অবস্থা কি, গোনাহ থেকে তাওবাহ করার প্রস্তুতি কেমন আছে এসব আল্লাহ্ খুব ভাল করেই জানেন। [ফাতহুল কাদীর] আবার পূর্বকথার রেশ ধরে পিতার আদব ও সম্মান সম্পর্কিত আদেশসমূহের কারণে সন্তানদের মনে এমন একটা আশঙ্কা দেখা দিতে পারে যে, পিতা-মাতার সাথে সদাসর্বদা থাকতে হবে। তাঁদের এবং নিজেদের অবস্থাও সবসময় সমান যায় না। কোন সময় মুখ দিয়ে এমন

২৬. আর আত্মীয়-স্বজনকে দাও তার প্রাপ্য এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরদেরকেও[১] এবং কিছুতেই অপব্যয় কর না[২]।

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ﴿٢٦﴾

২৭. নিশ্চয় যারা অপব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই এবং শয়তান তার রবের প্রতি খুবই অকৃতজ্ঞ[৩]।

اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ؕ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ﴿٢٧﴾

কথাও বের হয়ে যেতে পারে, যা উপরোক্ত আদবের পরিপন্থী। তাই বলা হয়েছে যে, বেআদবীর ইচ্ছা ব্যতিরেকে কোন সময় কোন পেরেশানী অথবা অসাবধানতার কারণে কোন কথা বের হয়ে গেলে এবং এজন্যে তওবা করলে আল্লাহ্ তা'আলা মনের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন যে, কথাটি বেআদবী অথবা কষ্টদানের জন্যে বলা হয়নি। সুতরাং তিনি আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তনকারীদেরকে ক্ষমা করবেন। [দেখুন, ইবন কাসীর] আওয়াবীন শব্দের অর্থ নিয়ে বেশ মতভেদ থাকলেও এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, প্রত্যাবর্তনকারী। সে হিসেবে এর অর্থ দাঁড়ায়, যারা গোনাহ থেকে তাওবাহ করে আল্লাহ্র দিকে ফিরে আসে তাদেরকে তিনি ক্ষমা করে দিবেন। যারাই ইখলাসহীন অবস্থা থেকে ইখলাসের দিকে ফিরে আসে তাদেরকেও তিনি পূর্বে কথা, কাজ ও বিশ্বাসে যে ভুল-ত্রুটি হয়ে গেছে সেগুলো ক্ষমা করে দিবেন। মূলত: যে তাওবা করে আল্লাহ্ তার তাওবা কবুল করেন। যে আল্লাহ্র দিকে ফিরে আসে আল্লাহ্ও তার দিকে ফিরে আসেন। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(১) আলোচ্য আয়াতে সকল আত্মীয়দের হক বর্ণিত হয়েছে যে, প্রত্যেক আত্মীয়ের হক আদায় করতে হবে। অর্থাৎ কমপক্ষে তাদের সাথে সুন্দরভাবে জীবনযাপন ও সদ্ব্যবহার করতে হবে। যদি তারা অভাবগ্রস্ত হয়, তবে সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের আর্থিক সাহায্যও এর অন্তর্ভূক্ত। [ফাতহুল কাদীর]

(২) আয়াতে বর্ণিত আত্মীয়দের হক, মিসকিনের হক এবং মুসাফিরের হক, এ তিনটির উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষ নিজের উপার্জন ও ধন-দৌলত শুধুমাত্র নিজের জন্যই নির্ধারিত করে নেবে না বরং ন্যায়সংগতভাবে ও ভারসাম্য সহকারে নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করার পর নিজের আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও অন্যান্য অভাবী লোকদের অধিকারও আদায় করবে।

(৩) ব্যয়ের ক্ষেত্রে অপচয় করতে নিষেধ করা হয়েছে। মধ্যপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "এবং যখন তারা ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না, কৃপনতাও করে না, আর তাদের পন্থা হয় এতদুভয়ের মধ্যবর্তী" [সূরা আল-ফুরকান: ৬৭] ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, অপচয় হচ্ছে, অন্যায় পথে ব্যয় করা। মুজাহিদ বলেন, যদি কোন লোক তার সমস্ত সম্পত্তি হক পথে ব্যয় করে তারপরও সেটা অপচয় হবে না। আর যদি অন্যায়ভাবে এক

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ﴿٢٨﴾

২৮. আর যদি তাদের থেকে তোমার মুখ ফিরাতেই হয়, যখন তোমার রবের কাছ থেকে অনুগ্রহ লাভের প্রত্যাশায়, তখন তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বল(১);

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿٢٩﴾

২৯. আর তুমি তোমার হাত গলায় বেঁধে রেখো না এবং তা সম্পূর্ণরূপে মেলেও দিও না, তাহলে তুমি তিরস্কৃত ও আফসোসকৃত হয়ে বসে পড়বে(২)।

মুদ পরিমাণও ব্যয় করে তবুও সেটা অপচয় হবে। কাতাদাহ বলেন, অপচয় হচ্ছে আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা, অন্যায় ও ফাসাদ-সৃষ্টিতে ব্যয় করা। [ইবন কাসীর]

(১) এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর মাধ্যমে সমগ্র উম্মতকে অভূতপূর্ব নৈতিক চরিত্র শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, কোন সময় যদি অভাবগস্ত লোকেরা সাহায্য চায় এবং আপনার কাছে দেয়ার মত কিছু না থাকার দরুন আপনি তাদের তরফ থেকে মুখ ফিরাতে বাধ্য হন, তবে এ মুখ ফিরানো আত্মম্ভরিতাযুক্ত অথবা প্রতিপক্ষের জন্যে অপমানজনক না হওয়া উচিত, বরং তা অপারগতা ও অক্ষমতা প্রকাশ সহকারে হওয়া কর্তব্য। কাতাদা বলেন, প্রয়োজনে তাদেরকে ভালো কিছু দেয়ার ওয়াদা কর। [ইবন কাসীর]

(২) "হাত বাঁধা" কৃপণতা অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর "হাত খোলা ছেড়ে দেয়া"র মানে হচ্ছে, বাজে খরচ করা। [ইবন কাসীর] আয়াতে সরাসরি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এবং তার মধ্যস্থতায় সমগ্র উম্মতকে সম্বোধন করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এমন মিতাচার শিক্ষা দেয়া, যা অপরের সাহায্যে প্রতিবন্ধকও না হয় এবং নিজের জন্যেও বিপদ ডেকে না আনে। যখনই তুমি তোমার সামর্থ্যের বাইরে হাত প্রশস্ত করবে, তখনই তুমি খরচ করার কিছু না পেয়ে বসে পড়বে। তখন তুমি 'হাসীর' হবে। হাসীর বলা হয় সে বাহনকে যে দুর্বল ও অপারগতার কারণে চলতে অপারগ হয়ে গেছে। [ইবন কাসীর] হাসীর এর আরেক অর্থ তিরস্কৃত হওয়া। [ফাতহুল কাদীর] মোটকথা: কৃপণতা যেমন খারাপ গুণ, অপচয়ও তেমনি খারাপ গুণ। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কৃপণ ও খরচকারীর উদাহরণ হচ্ছে সে দু'জন লোকের মত। যাদের উপর লোহার দু'টি বর্ম রয়েছে। যা তার দু'স্তন থেকে কণ্ঠাস্থি পর্যন্ত ব্যাপ্ত। খরচকারী যখনই খরচ করে তখনই তা প্রশস্ত হতে থাকে এমনকি তার পায়ের আঙ্গুলের মাথা পর্যন্ত প্রলম্বিত হয় এবং তার পদচিহ্ন মিটিয়ে দেয়। আর কৃপণ সে যখনই কোন খরচ করতে চায় তখনি তা সে বর্মের এক কড়া আরেক কড়ার সাথে লেগে যায়, সে যতই সেটাকে প্রশস্ত করতে চায় তা আর প্রশস্ত হয় না।'

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُۥ كَانَ بِعِبَادِهِۦ خَبِيرًۢا بَصِيرًا ۝٣٠

৩০. নিশ্চয় তোমার রব যার জন্য ইচ্ছে তার রিয্‌ক বাড়িয়ে দেন এবং যার জন্য ইচ্ছে তা সীমিত করেন; নিশ্চয় তিনি তাঁর বান্দাদের সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত, সর্বদ্রষ্টা(১) ।

চতুর্থ রুকূ'

وَلَا تَقْتُلُوٓا أَوْلَٰدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَٰقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا كَبِيرًا ۝٣١

৩১. আর তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে দারিদ্র-ভয়ে হত্যা করো না। তাদেরকেও আমিই রিয্‌ক দেই এবং তোমাদেরকেও। নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ(২) ।

[বুখারীঃ ২৯১৭] অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘প্রতিদিন সকালবেলা দু’জন ফেরেশতা নাযিল হয়। তাদের একজন বলতে থাকে, আল্লাহ্! আপনি খরচকারীকে বাকী থাকার মত সম্পদ দান করুন, অপরজন বলে, আল্লাহ্! আপনি কৃপনকে নিঃশেষ করে দিন।’ [বুখারীঃ ১৪৪২; মুসলিমঃ ১০১০]

(১) সুতরাং কাউকে রিযক বেশী ও কম দেয়ার মধ্যে তাঁর বিরাট হেকমত রয়েছে। তিনি জানেন কাকে বেশী দিলে সে আরো বেশী পেতে চাইবে বা গর্বে সীমালজ্ঞন করবে অথবা কুফরীর কারণ হবে। আবার কাকে বেশী না দিলে তার জন্য তা কুফরীর কারণ হবে। আর কাকে কম দিলেও সে ধৈর্যশীল প্রমাণিত হবে। আর কাকে সম্পদ কুফরীর পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দেবে। সুতরাং যিনি সবকিছুর খবর রাখেন তিনি প্রত্যেককে তার জন্য যা উপযোগী সে অনুসারে রিয্‌ক দান করেন। [দেখুন, ইবন কাসীর] অথবা, আয়াতের আল্লাহ্‌র নাম দু'টোর উদ্দেশ্য, তিনি জানেন যা তারা গোপন রাখে এবং যা প্রকাশ করে। তার কাছে কোন কিছুই গোপন নেই। তিনি বান্দাদের অবস্থা সম্পর্কে অধিক অবহিত, তাদের রিযক বণ্টনের ব্যাপারে সর্বদ্রষ্টা। এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, তিনিই বান্দাদের রিযিকের ব্যবস্থা করেন। তাই পরবর্তী আয়াতে মানুষের রিযিকের আলোচনা করা হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর]

(২) আলোচ্য আয়াতে এই নির্দেশটি জাহেলিয়াত যুগের একটি নিপীড়নমূলক অভ্যাস সংশোধনের নিমিত্ত উল্লেখিত হয়েছে। জাহেলিয়াত যুগে কেউ কেউ জন্মের পরপরই সন্তানদেরকে বিশেষ করে কন্যা সন্তানদেরকে হত্যা করত, যাতে তাদের ভরণ-পোষণের বোঝা বহন করতে না হয়। এক হাদীসে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনে মাস‘উদ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, “সবচেয়ে বড় গুনাহ কোনটি? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করা অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি বললাম, এটা অবশ্যই বড় কিন্তু তারপর কি? তিনি

৩২. আর যিনার ধারে-কাছেও যেও না, নিশ্চয় তা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ[১]।

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰٓ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

বললেন, এবং তোমার সাথে খাবে এ ভয়ে তোমার সন্তানকে হত্যা করা"। [বুখারীঃ ৪৪৭৭] আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা তাদের এই কর্মপন্থাটি যে অত্যন্ত জঘন্য ও ভ্রান্ত তাই সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। অনুধাবন করতে বলেছেন যে, রিযিকদানের তোমরা কে? এটা তো একান্তভাবে আল্লাহ্ তাআলার কাজ। তোমাদেরকেও তো তিনিই রিযিক দিয়ে থাকেন। যিনি তোমাদেরকে দেন, তিনিই তাদেরকেও দেবেন। তোমরা এ চিন্তায় কেন সন্তান হত্যার অপরাধে অপরাধী হচ্ছ?

(১) "যিনার কাছেও যেয়ো না" এ হুকুম ব্যক্তির জন্য এবং সামগ্রিকভাবে সমগ্র সমাজের জন্যও। আয়াতে ব্যভিচার হারাম হওয়ার দু'টি কারণ উল্লেখ করা হয়েছেঃ এক, এটি একটি অশ্লীল কাজ। মানুষের মধ্যে লজ্জা-শরম না থাকলে সে মনুষ্যত্ব থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। অতঃপর তার দৃষ্টিতে ভালমন্দের পার্থক্য লোপ পায়। কিন্তু যাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের সামান্যতম অংশও বাকী আছে তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিলে তারা ব্যভিচারকে অন্যায় বলে স্বীকৃতি দিতে দ্বিধা করে না। আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, এক যুবক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে ব্যভিচার করার অনুমতি দিন। এটা শুনে চতুর্দিক থেকে লোকেরা তার দিকে তেড়ে এসে ধমক দিল এবং চুপ করতে বলল। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কাছে ডেকে নিয়ে বললেন, বস। যুবকটি বসলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি কি এটা তোমার মায়ের জন্য পছন্দ কর? যুবক উত্তর করলঃ আল্লাহ্ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন, আল্লাহ্‌র শপথ, তা কখনো পছন্দ করি না। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তেমনিভাবে মানুষও তাদের মায়েদের জন্য সেটা পছন্দ করে না। তারপর রাসূল বললেন, তুমি কি তোমার মেয়ের জন্য তা পছন্দ কর? যুবক উত্তর করলঃ আল্লাহ্ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন, আল্লাহ্‌র শপথ, তা কখনো পছন্দ করি না। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ অনুরূপভাবে মানুষ তাদের মেয়েদের জন্য সেটা পছন্দ করে না। তারপর রাসূল বললেন, তুমি কি তোমার বোনের জন্য সেটা পছন্দ কর? যুবক উত্তর করলঃ আল্লাহ্ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন, আল্লাহ্‌র শপথ, তা কখনো পছন্দ করি না। তখন রাসূল বললেনঃ তদ্রূপ লোকেরাও তাদের বোনের জন্য তা পছন্দ করে না। (এভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ফুফু ও খালা সম্পর্কেও অনুরূপ কথা বললেন আর যুবকটি একই উত্তর দিল) এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উপর হাত রাখলেন এবং বললেন, "হে আল্লাহ! তার গুনাহ ক্ষমা করে দিন, তার মনকে পবিত্র করুন এবং তার লজ্জাস্থানের হেফাযত করুন"

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفْ

৩৩. আর আল্লাহ্ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করো না[১]! কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হলে

বর্ণনাকারী সাহাবী বলেন, এরপর এ যুবককে কারো প্রতি তাকাতে দেখা যেত না। [মুসনাদে আহমাদঃ ৫/২৫৬, ২৫৭] দ্বিতীয় কারণ সামাজিক অনাসৃষ্টি। ব্যভিচারের কারণে এটা এত প্রসার লাভ করে যে, এর কোন সীমা-পরিসীমা থাকে না। এর অশুভ পরিণাম অনেক সময় সমগ্র গোত্র ও সম্প্রদায়কে বরবাদ করে দেয়। এ কারণেই ইসলাম এ অপরাধটিকে সব অপরাধের চাইতে গুরুতর বলে সাব্যস্ত করেছে এবং এর শাস্তি ও সব অপরাধের শাস্তির চাইতে কঠোর বিধান করেছে। কেননা, এই একটি অপরাধ অন্যান্য শত শত অপরাধকে নিজের মধ্যে সন্নিবেশিত করেছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যিনাকার ব্যক্তি যিনা করার সময় মুমিন থাকে না। চোর চুরি করার সময় মুমিন থাকে না। মদ্যপায়ী মদ্যপান করার সময় মুমিন থাকে না। [মুসলিমঃ ৫৭]

(১) অন্যায় হত্যার অবৈধতা বর্ণনা প্রসঙ্গে এটা আরেক নির্দেশ। অন্যায় হত্যা যে মহা অপরাধ, তা বিশ্বের দলমত ও ধর্মাধর্ম নির্বিশেষে সবার কাছে স্বীকৃত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ একজন মুমিনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার চাইতে আল্লাহ্র কাছে সমগ্র বিশ্বকে ধ্বংস করে দেয়া লঘু অপরাধ।[তিরমিযীঃ ১৩৯৫, ইবনে মাজাহঃ ২৬১৯] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেনঃ প্রত্যেক গোনাহ্ আল্লাহ্ তাআলা ক্ষমা করবেন বলে আশা করা যায়, কিন্তু যে ব্যক্তি কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে অথবা যে ব্যক্তি জেনে-শুনে ইচ্ছাপূর্বক কোন মুসলিমকে হত্যা করে, তার গোনাহ্ ক্ষমা করা হবে না।[নাসায়ীঃ ৭/৮১] সুতরাং কোন মু'মিনকে হত্যা করা অন্যায়। শুধুমাত্র তিনটি কারণে অন্যায় হত্যা ন্যায়ে পরিণত হয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে মুসলিম আল্লাহ্ একমাত্র সত্যিকার মাবুদ এবং মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল বলে সাক্ষ্য দেয়, তার রক্ত হালাল নয়; কিন্তু তিনটি কারণে তা হালাল হয়ে যায়। (এক) বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও সে যদি যিনা করে, তবে প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করাই তার শরী'আতসম্মত শাস্তি। (দুই) সে যদি অন্যায়ভাবে কোন মানুষকে হত্যা করে, তবে তার শাস্তি এই যে, নিহত ব্যক্তির ওলী তাকে কেসাস হিসেবে হত্যা করতে পারে। (তিন) যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে, তার শাস্তিও হত্যা। [মুসলিমঃ ১৬৭৬] এ তিনটি শাস্তির দাবী করার অধিকার প্রতিটি মু'মিনের তবে এগুলো বাস্তবায়নের ক্ষমতা কেউ যেন নিজ হাতে নিয়ে না নেয়। বরং একমাত্র ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার প্রধান এ অধিকার পাবে।

দাহহাক বলেন, এটি মক্কায় নাযিল হয়েছে। আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলিমরা তখন মক্কায় ছিল। এটি হত্যা সংক্রান্ত নাযিল হওয়া প্রথম আয়াত। তখন মুসলিমদেরকে কাফেররা গোপনে বা প্রকাশ্যে হত্যা করছিল।

فِّي الْقَتْلِ ۖ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

তার উত্তরাধিকারীকে তো আমরা তার প্রতিকারের অধিকার দিয়েছি[১]; কিন্তু হত্যা ব্যাপারে সে যেন বাড়াবাড়ি না করে[২]; সে তো সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছেই ।

তাই আল্লাহ্ তা'আলা এ নির্দেশ দিচ্ছেন যে, মুশরিকদের কেউ তোমাদের হত্যা করছে বলে তোমরা তাদের পিতা, ভাই, অথবা তাদের গোত্রীয় কাউকে হত্যা করো না । যদিও তারা মুশরিক হয় । তোমাদের হত্যাকারী ছাড়া কাউকে হত্যা করো না । [ফাতহুল কাদীর]

(১) মূল শব্দ হচ্ছে, "তার অভিভাবককে আমি সুলতান দান করেছি ।" এখানে সুলতান অর্থ হচ্ছে "প্রমাণ" যার ভিত্তিতে সে হত্যাকারীর উপর কিসাস দাবী করতে পারে । এ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি বের হয় যে, হত্যা মোকদ্দমায় নিহত ব্যক্তির অভিভাবকগণই এর মূল বাদীপক্ষ । তারা হত্যাকারীকে মাফ করে দিতে এবং কিসাসের পরিবর্তে রক্তপণ গ্রহণ করতে সম্মত হতে পারে । [ইবন কাসীর] তবে যদি মূল অভিভাবক না থাকে, তখন দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি এ কাজের দায়িত্ব নিতে পারে । [ফাতহুল কাদীর]

(২) এর সারমর্ম এই যে, অন্যায়ের প্রতিশোধ অন্যায়ের মাধ্যমে নেয়া জায়েয নয় । প্রতিশোধের বেলায়ও ইনসাফের প্রতি লক্ষ্য রাখা অপরিহার্য । হত্যার ব্যাপারে বিভিন্নভাবে সীমা অতিক্রম করা যেতে পারে । এগুলো সবই নিষিদ্ধ । যেমন প্রতিশোধ গ্রহণ করতে গিয়ে উন্মত্তের মতো অপরাধী ছাড়া অন্যদেরকেও হত্যা করা । অথবা অপরাধীকে কষ্ট দিয়ে দিয়ে মেরে ফেলা । কিংবা মেরে ফেলার পর তার লাশের উপর মনের ঝাল মেটানো । অথবা রক্তপণ নেবার পর আবার তাকে হত্যা করা ইত্যাদি । [ইবন কাসীর] যে পর্যন্ত নিহত ব্যক্তির ওলী ইনসাফ সহকারে নিহতের প্রতিশোধ কেসাস নিতে চাইবে, সেই পর্যন্ত শরী'আতের আইন তার পক্ষে থাকবে । আল্লাহ্ তাআলা তার সাহায্যকারী হবেন । পক্ষান্তরে সে যদি প্রতিশোধ স্পৃহায় উন্মত্ত হয়ে কেসাসের সীমালঙ্ঘন করে, তবে সে মযলুম না হয়ে যালেম হয়ে যাবে । আল্লাহ্ তাআলা এবং তাঁর আইন এখন তার সাহায্য করার পরিবর্তে প্রতিপক্ষের সাহায্য করবে এবং তাকে যুলুম থেকে বাঁচাবে ।

যায়েদ ইবন আসলাম এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, জাহেলিয়াত যুগের আরবে সাধারণতঃ এক ব্যক্তির হত্যার পরিবর্তে হত্যাকারীর পরিবার অথবা সঙ্গী-সাথীদের মধ্য থেকে যাকেই পাওয়া যেত, তাকেই হত্যা করা হত । কোন কোন ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তি গোত্রের সরদার অথবা বড়লোক হলে তার পরিবর্তে শুধু এক ব্যক্তিকে কেসাস হিসেবে হত্যা করা যথেষ্ট মনে করা হত না; বরং এক খুনের পরিবর্তে দু-তিন কিংবা আরও বেশী মানুষের প্রাণ সংহার করা হত । কেউ কেউ প্রতিশোধ স্পৃহায় উন্মত্ত হয়ে হত্যাকারীকে শুধু হত্যা করেই ক্ষান্ত হত না, বরং

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

৩৪. আর ইয়াতীম বয়োপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুপায়ে ছাড়া তার সম্পত্তির ধারে-কাছেও যেও না এবং প্রতিশ্রুতি পালন করো; নিশ্চয় প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে।

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

৩৫. আর মেপে দেয়ার সময় পূর্ণ মাপে দাও এবং ওজন কর সঠিক দাঁড়িপাল্লায়(১), এটাই উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্ট(২)।

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ

৩৬. আর যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই তার অনুসরণ করো না(৩); কান, চোখ,

---

তার নাক, কান ইত্যাদি কেটে অঙ্গ বিকৃত করা হত। আয়াতে মুসলিমদেরকে এরকম কিছু না করতে উপদেশ দেয়া হচ্ছে। [ফাতহুল কাদীর]

(১) আয়াতে মাপ ও ওজন সম্পর্কে যে নির্দেশ আছে, লেন-দেনের ক্ষেত্রে মাপ ও ওজন পূর্ণ করার আদেশ এবং কম মাপার নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। তার সারমর্ম এই যে, যার যতটুকু হক, তার চাইতে কম দেয়া হারাম। [ইবন কাসীর]

(২) এতে মাপ ও ওজন করা সম্পর্কে দু'টি বিষয় বলা হয়েছে। (এক) এর উত্তম হওয়া। অর্থাৎ দুনিয়াতে এটি উত্তম হওয়া যুক্তি ও বিবেকের দাবী। (দুই) এর পরিণতি শুভ। এতে আখেরাতের পরিণতি তথা সওয়াব ও জান্নাত ছাড়াও দুনিয়ার উত্তম পরিণতির দিকেও ইঙ্গিত আছে। অর্থাৎ দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানেই এর পরিণতি শুভ। [ইবন কাসীর] দুনিয়ায় এর শুভ পরিণামের কারণ হচ্ছে এই যে, এর ফলে পারস্পরিক আস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। কোন ব্যবসা ততক্ষণ পর্যন্ত উন্নতি করতে পারে না, যে পর্যন্ত জনগণের বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন করতে না পারে। বিশ্বাস ও আস্থা উপরোক্ত বাণিজ্যিক সততা ব্যতীত অর্জিত হতে পারে না। ক্রেতা ও বিক্রেতা দু'জন দু'জনের উপর ভরসা করে, এর ফলে ব্যবসায়ে উন্নতি আসে এবং ব্যাপক সমৃদ্ধি দেখা দেয়। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর] অন্যদিকে আখেরাতে এর শুভ পরিণাম পুরোপুরি নির্ভর করে ঈমান ও আল্লাহ ভীতির উপর।

(৩) আয়াতে উল্লেখিত ﴿وَلَا تَقْفُ﴾ শব্দটির সঠিক অর্থ, পিছু নেয়া, অনুসরণ করা। [ফাতহুল কাদীর] সে অনুসারে আয়াতের অর্থ হবে যে বিষয়ে তুমি জাননা সে বিষয়ের পিছু নিওনা। [ফাতহুল কাদীর] ইবন আব্বাস বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, বলো না। অপর বর্ণনায় তিনি বলেছেন, যে বিষয় সম্পর্কে তোমার জ্ঞান নেই সে বিষয়ে কাউকে অভিযুক্ত করো না। কাতাদাহ্ বলেন, যা দেখনি তা বলো না। মুহাম্মাদ ইবনুল

وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾

হৃদয়- এদের প্রত্যেকটি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে[১]।

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ﴿٣٧﴾

৩৭. আর যমীনে দম্ভভরে বিচরণ করো না; তুমি তো কখনই পদভরে ভূপৃষ্ঠ বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনই পর্বত প্রমাণ হতে পারবে না[২]।

হানাফিয়া বলেন, মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না। [ইবন কাসীর] মোটকথা: যে বিষয় জ্ঞান নেই সে বিষয়ে কথা বলাকে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে সবচেয়ে বড় গুনাহের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে। বলা হয়েছে, "নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক হারাম করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা আর পাপ এবং অসংগত বিরোধিতা এবং কোন কিছুকে আল্লাহ্‌র শরীক করা---যার কোন সনদ তিনি পাঠাননি, এবং আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা যা তোমরা জান না।" [আল-আ'রাফঃ ৩৩] অনুরূপভাবে ধারণা করে কথা বলাও এর অন্তর্ভুক্ত। কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনায় ধারনা করে কথা বলা সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। মহান আল্লাহ্ বলেন, "তোমরা বিবিধ ধারনা করা থেকে বেঁচে থাক; কেননা কোন কোন ধারনা করা গুনাহের পর্যায়ে পড়ে।"[সূরা আল-হুজুরাতঃ১২] হাদীসে এসেছে, "তোমরা ধারনা করা থেকে বেঁচে থাক; কেননা ধারনা করে কথা বলা মিথ্যা কথা বলা।" [বুখারীঃ ৫১৪৩, মুসলিমঃ ২৫৬৩]

(১) এ আয়াতের দু'টি অর্থ করা হয়ে থাকেঃ
এক, কেয়ামতের দিন কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণ সম্পর্কে তার মালিককে প্রশ্ন করা হবেঃ প্রশ্ন করা হবেঃ তুমি সারা জীবন কি কি শুনেছ? প্রশ্ন করা হবেঃ তুমি সারা জীবন কি কি দেখেছ? প্রশ্ন করা হবেঃ সারা জীবনে মনে কি কি কল্পনা করেছ এবং কি কি বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করেছ? যদি শরী'আত বিরোধী কাজ কর্ম করে থাকে, তবে এর জন্য সে ব্যক্তিকে আযাব ভোগ করতে হবে। [ফাতহুল কাদীর]
দুই, কেয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এ ব্যাপারে স্বয়ং সাক্ষ্য দেবে। কারণ আল্লাহ্ সেগুলোকে প্রশ্ন করবেন। এটা হাশরের ময়দানে গুনাহগারদের জন্য অত্যন্ত লাঞ্ছনার কারণ হবে। সূরা ইয়াসীনে বলা হয়েছেঃ "আজ (কেয়ামতের দিন) আমি এদের (অপরাধীদের) মুখ মোহর করে দেব। ফলে, তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের চরণসমূহ সাক্ষ্য দেবে তাদের কৃতকর্মের" [৬৫]। অনুরূপভাবে সূরা আন-নূরে এসেছে, "যেদিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে তাদের জিহবা, তাদের হাত ও তাদের পা তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে[২৪]।

(২) অহংকারের অর্থ হচ্ছে নিজেকে অন্যের চাইতে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ এবং অন্যকে নিজের তুলনায় হেয় ও ঘৃণ্য মনে করা। হাদীসে এর জন্যে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'আল্লাহ্ তাআলা ওহীর

كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهٗ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوْهًا ۝٣٨

৩৮. এ সবের মধ্যে যা মন্দ তা আপনার রবের কাছে ঘৃণ্য[১]।

ذٰلِكَ مِمَّآ اَوْحٰٓى اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ؕ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتُلْقٰى فِىْ جَهَنَّمَ مَلُوْمًا مَّدْحُوْرًا ۝٣٩

৩৯. আপনার রব ওহীর দ্বারা আপনাকে যে হিকমত দান করেছেন এগুলো তার অন্তর্ভুক্ত। আর আল্লাহ্‌র সাথে অন্য ইলাহ্ স্থির করো না, করলে নিন্দিত ও বিতাড়িত অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে[২]।

মাধ্যমে আমার কাছে নির্দেশ পাঠিয়েছেন যে, নম্রতা অবলম্বন কর। কেউ যেন অন্যের উপর গর্ব ও অহংকারের পথ অবলম্বন না করে এবং কেউ যেন কারও উপর যুলুম না করে।' [মুসলিমঃ ২৮৬৫] অন্য হাদীসে এসেছে, তোমাদের পূর্বেকার জাতিদের মধ্যে কোন এক লোক দু'খানি চাদর নিয়ে গর্বভরে চলছিল। এমতাবস্থায় যমীন তাকে নিয়ে ধ্বসে গেল, সে এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত এর মধ্যে ঢুকতে থাকবে। [বুখারীঃ ৫৭৮৯, মুসলিমঃ ২০৮৮]

(১) অর্থাৎ উল্লেখিত সব মন্দ কাজ আল্লাহ্‌র কাছে মকরূহ ও অপছন্দনীয়। উল্লেখিত নির্দেশাবলীর মধ্যে যেগুলো হারাম ও নিষিদ্ধ, সেগুলো যে মন্দ ও অপছন্দনীয়, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু এগুলোর মধ্যে কিছু করণীয় আদেশও আছে; যেমন- পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের হক আদায় করা, অঙ্গীকার পূর্ণ করা ইত্যাদি। যেহেতু এগুলোর মধ্যেও উদ্দেশ্য এদের বিপরীত কর্ম থেকে বেঁচে থাকা; অর্থাৎ পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়া থেকে, আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা থেকে বেঁচে থাকা, তাই এসবগুলোও হারাম ও অপছন্দনীয়। অথবা অন্য কথায় বলা যায়, আল্লাহর যে কোন হুকুম অমান্য করা অপছন্দনীয় কাজ। [ফাতহুল কাদীর] আয়াতে উল্লেখিত سَيِّئُهٗ বাক্য অন্য কেরা'আতে سيئة পড়া হয়েছে। তখন আয়াতের অর্থ হবে, এ সবগুলোই মন্দ কাজ। আল্লাহ এগুলো অপছন্দ করেন। [ইবন কাসীর]

(২) এখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হলেও উদ্দেশ্য হলো তার উম্মত। কারণ তিনি শির্ক করার অনেক ঊর্ধ্বে। লক্ষণীয় যে, এ আদেশ, নিষেধ ও অসিয়তের শুরু হয়েছিল শির্কের নিষেধাজ্ঞা দিয়ে। শেষ করা হলো আবার সেই শির্কের নিষেধাজ্ঞা দিয়েই। এর দ্বারা এটাই বোঝানো ও এ বিষয়ে তাকীদ দেয়া উদ্দেশ্য যে, দ্বীনের মূলই হচ্ছে শির্ক থেকে দূরে থাকা। তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা। কেউ কেউ বলেন, প্রথম যখন শির্ক থেকে নিষেধ করা হয়েছিল তখন তার শাস্তি বলা হয়েছে যে, লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে বসে পড়বে, অর্থাৎ দুনিয়াতে তারা এভাবে সাহায্যহীন হয়ে থাকবে। তারপর সবশেষে যখন শির্ক থেকে নিষেধ করা হয়েছে তখন তার শাস্তি হিসেবে বলা হয়েছে যে, তাহলে জাহান্নামে নিন্দিত ও বিতাড়িত হয়ে নিক্ষিপ্ত হবে। এটা নিঃসন্দেহে আখেরাতে হবে। [ফাতহুল কাদীর]

أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا ۚ إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ﴿٤٠﴾

৪০. তোমাদের রব কি তোমাদেরকে পুত্র সন্তানের জন্য নির্বাচিত করেছেন এবং তিনি নিজে কি ফিরিশ্‌তাদেরকে কন্যারূপে গ্রহণ করেছেন? তোমরা তো নিশ্চয়ই ভয়ানক কথা বলে থাক(১)!

পঞ্চম রুকূ'

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿٤١﴾

৪১. আর অবশ্যই আমরা এ কুরআনে (বহু বিষয়) বারবার বিবৃত করেছি যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। কিন্তু এতে তাদের বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়।

قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ﴿٤٢﴾

৪২. বলুন, 'যদি তাঁর সাথে আরও ইলাহ্ থাকত যেমন তারা বলে, তবে তারা 'আরশ-অধিপতির (নৈকট্য লাভের) উপায় খুঁজে বেড়াত(২)।'

---

(১) এ আয়াতের সমার্থে আরো আয়াত পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এসেছে। যেমন, সূরা মারইয়ামঃ ৮৮-৯৫] এ আয়াতে কাফের মুশরিকদের মারাত্মক ভুল ধরিয়ে দেয়া হচ্ছে। তারা ফেরেশ্‌তাদেরকে আল্লাহর কন্যা সাব্যস্ত করেছে, এতে করে তারা তিনটি ভুল করেছে। এক, আল্লাহ্‌র বান্দাদেরকে মেয়ে বানিয়ে নিয়েছে। দুই, তাদেরকে আল্লাহ্‌র মেয়ে হওয়ার দাবী করেছে। তিন, তারপর তাদের ইবাদতও করেছে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে তাদের সমস্ত অযৌক্তিক ও মিথ্যা দাবী ও কর্মকাণ্ডকে খণ্ডন করে বলছেন, তোমরা কিভাবে এটা মনে করছ যে, যাবতীয় পুরুষ সন্তান তোমাদের জন্য রেখে তিনি তাঁর নিজের জন্য মেয়ে সন্তানগুলোকে নির্ধারণ করেছেন? তোমরা তো এক মারাত্মক কথা বলছ। নিজেদের জন্য অপছন্দ করে আল্লাহ্‌র জন্য তা সাব্যস্ত করা কি যুলুম নয়?

(২) এ আয়াতের দু'টি অর্থ করা হয়ে থাকেঃ
এক, যদি আল্লাহ্‌র সাথে আরো অনেক ইলাহ থাকত তবে তারা আরশের অধিপতির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হতো। যেমনিভাবে দুনিয়ার রাজা-বাদশারা করে থাকে। [ফাতহুল কাদীর] এ অর্থটি ইমাম শাওকানী প্রাধান্য দিয়েছেন।
দুই, আয়াতের আরেকটি অর্থ হলো, যদি আল্লাহ্‌র সাথে আরও ইলাহ থাকত, তবে তারা তাদের অক্ষমতা জেনে আরশের অধিপতি সত্যিকারের ইলাহ আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় ব্যস্ত হয়ে পড়ত। [ইবন কাসীর] এ শেষোক্ত অর্থটিই

৪৩. তিনি পবিত্র, মহিমান্বিত এবং তারা যা বলে তা থেকে তিনি বহু ঊর্ধ্বে।

سُبْحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿٤٣﴾

৪৪. সাত আসমান ও যমীন এবং এগুলোর অন্তর্বর্তী সব কিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে[১] এবং এমন

تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَٰوَٰتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ۚ وَإِن مِّن شَىْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِۦ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ

সঠিক। ইমাম ইবন কাসীর এটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এটি শায়খুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যা ও ইবনুল কাইয়্যেমও প্রাধান্য দিয়েছেন।[দেখুন, আল-ফাতাওয়া আল-হামাওয়িয়্যাহ; মাজমু' ফাতাওয়া: ১৬/১২২-১২৪, ৫৭৭; ইবনুল কাইয়্যেম, আল-জাওয়াবুল কাফী: ২০৩; আস-সাওয়া'য়িকুল মুরসালাহ: ২/৪৬২] কারণ প্রথমত, এখানে ﴿إِلَىٰ ذِى ٱلْعَرْشِ﴾ আরশের অধিপতির দিকে বলা হয়েছে, عَلَىٰ ذِي الْعَرْشِ আরশের অধিপতির বিপক্ষে বলা হয়নি। আর আরবী ভাষায় إلى শব্দটি নৈকট্যের অর্থেই ব্যবহার হয়। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে, ﴿ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوٓا۟ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ﴾ [সূরা আল-মায়িদাহঃ ৩৫] পক্ষান্তরে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য على শব্দটি ব্যবহার হয়। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে, ﴿فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا﴾ [সূরা আন-নিসাঃ ৩৪] দ্বিতীয়ত, এ অর্থের সমর্থনে এ সূরারই ৫৭ নং আয়াত প্রমাণবহ। সেখানে বলা হয়েছে, "তারা যাদেরকে ডাকে তারাই তো তাদের রবের নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে যে, তাদের মধ্যে কে কত নিকটতর হতে পারে, তাঁর দয়া প্রত্যাশা করে ও তাঁর শাস্তিকে ভয় করে। নিশ্চয়ই আপনার রবের শাস্তি ভয়াবহ।" এতে করে বুঝা গেল যে, এখানে এ আয়াতের অর্থ হবে এই যে, যদি তারা যেভাবে বলে সেভাবে সেখানে আরো ইলাহ থাকত তবে সে বানানো ইলাহগুলো নিজেদের অক্ষমতা সম্যক বুঝতে পেরে প্রকৃত ইলাহ রাব্বুল আলামীন আল্লাহ তা'আলার প্রতি নৈকট্য লাভের আশায় ধাবিত হতো। এ অর্থের সমর্থনে তৃতীয় আরেকটি প্রমাণ আমরা পাই এ কথা থেকেও যে কাফেরগণ কখনও এ কথা দাবী করেনি যে, তাদের ইলাহগণ আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিদ্বন্দ্বী বরং তারা সবসময় বলে আসছে যে, "আমরা তো কেবল তাদেরকে আল্লাহর কাছে নৈকট্য লাভে সুপারিশকারী হিসেবেই ইবাদত করে থাকি"। [সূরা আয-যুমারঃ ৩] এখানেও আয়াতে বলা হয়েছে, "যেমনটি তারা বলে"। আর তারা কখনো তাদের মা'বুদদেরকে আল্লাহ্র প্রতিদ্বন্দ্বী বলে ঘোষণা করেনি। এ দ্বিতীয় তাফসীরটি প্রখ্যাত তাফসীরবিদ কাতাদা রাহেমাহুল্লাহ থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে।

(১) ইচ্ছাগত তাসবীহ্ তো শুধু ফেরেশতা এবং ঈমানদার জিন ও মানবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু সৃষ্টিগতভাবে আল্লাহ্ তাআলা জগতের প্রত্যেকটি অণু-পরমাণুকে তাসবীহ্ পাঠকারী বানিয়ে রেখেছেন। [ইবন কাসীর] কিন্তু তাদের এই সৃষ্টিগত ও বাধ্যতামূলক তাসবীহ্ সাধারণ মানুষের শ্রুতিগোচর হয়না। এ আয়াতেই বলা হয়েছে, ﴿وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ এ উক্তি এ কথা প্রমাণ করে যে, প্রত্যেক বস্তুর সৃষ্টিগত

تَسْبِيحَهُمْ ۗ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٤٤﴾

কিছু নেই যা তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না; কিন্তু তাদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা বুঝতে পার না; নিশ্চয় তিনি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ﴿٤٥﴾

৪৫. আর আপনি যখন কুরআন পাঠ করেন তখন আমরা আপনার ও যারা আখিরাতের উপর ঈমান রাখে না তাদের মধ্যে এক প্রচ্ছন্ন পর্দা রেখে দেই।

وَّجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۚ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ

৪৬. আর আমরা তাদের অন্তরের উপর আবরণ রেখে দিয়েছি যেন তারা তা বুঝতে না পারে এবং তাদের কানে

তাসবীহ্ এমন জিনিস, যা সাধারণ মানুষ বুঝতে সক্ষম নয়। অবস্থাগত তাসবীহ্ তো বিবেকবান ও বুদ্ধিমানরা বুঝতে পারে। এ থেকে জানা গেল যে, এই তাসবীহ্ পাঠ শুধু অবস্থাগত নয়, সত্যিকারের; কিন্তু আমাদের বোধশক্তি ও অনুভূতির ঊর্ধ্বে। তাছাড়া মু'জেযা ও কারামত হিসেবে কখনও কখনও অচেতন বস্তু সমূহের তাসবীহও আল্লাহ্ তা'আলা মাঝে মধ্যে শুনিয়ে থাকেন। যেমন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে খাবার খেতাম, এমতাবস্থায় আমরা খাবারের তাসবীহও শুনতাম" [বুখারীঃ৩৫৭৯] অনুরূপভাবে মরা খেজুরগাছের কাঠের কান্না। [বুখারীঃ ৩৫৮৩] মক্কার এক পাথর কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সালাম দেয়া। [মুসলিমঃ ২২৭৭] উদাহরণতঃ সূরা ছোয়াদে দাউদ আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ "আমি পাহাড়সমূহকে আজ্ঞাবহ করে দিয়েছি। তারা দাউদের সাথে সকাল-বিকাল তাসবীহ্ পাঠ করে"। [১৮] সূরা আল-বাক্বারায় পাহাড়ের পাথর সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ "কতক পাথর আল্লাহ্‌র ভয়ে নীচে পড়ে যায়" [৭৪]। এতে প্রমাণিত হয়েছে যে, পাথরের মধ্যেও চেতনা, অনুভূতি ও আল্লাহ্‌র ভয় রয়েছে। সূরা মারইয়ামে নাসারা সম্প্রদায় কর্তৃক ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ্‌র পুত্র আখ্যায়িত করার প্রতিবাদে বলা হয়েছেঃ "তারা বলে, 'দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন। তোমরা তো এমন এক বীভৎস বিষয়ের অবতারণা করছ; যাতে আকাশমণ্ডলী বিদীর্ণ হয়ে যাবে, পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড হবে ও পর্বতমণ্ডলী চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে আপতিত হবে, যেহেতু তারা দয়াময়ের প্রতি সন্তান আরোপ করে। অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের শোভন নয়!" [৮৮-৯২] বলাবাহুল্য, এই ভয়-ভীতি তাদের চেতনা ও অনুভূতির পরিচায়ক। চেতনা ও অনুভূতি থাকলে তসবীহ্ পাঠ করা অসম্ভব নয়।

أَدْبَارِهِمْ نُفُوْرًا﴿٤٦﴾

দিয়েছি বধিরতা; 'আপনার রব এক', এটা যখন আপনি কুরআন থেকে উল্লেখ করেন তখন তারা পিঠ দেখিয়ে সরে পড়ে(১) ।

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُوْنَ بِهٖٓ إِذْ يَسْتَمِعُوْنَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوٰٓى إِذْ يَقُوْلُ الظّٰلِمُوْنَ إِنْ تَتَّبِعُوْنَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا﴿٤٧﴾

৪৭. যখন তারা কান পেতে আপনার কথা শুনে তখন তারা কেন কান পেতে শুনে তা আমরা ভাল জানি এবং এটাও জানি, গোপনে আলোচনাকালে যালিমরা বলে, 'তোমরা তো এক জাদুগ্রস্ত ব্যক্তির অনুসরণ করছ(২) ।'

---

(১) অর্থাৎ আপনি যে একমাত্র আল্লাহকে নিজের রব গণ্য করেন, একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করেন, তারা যাদের ভক্তি করে তাদের কোন কথা বলেন না, এটা তাদের কাছে বড়ই বিরক্তিকর ঠেকে । মানুষ কেবল আল্লাহর কথা বলতে থাকবে, বুযর্গদের কার্যকলাপের কোন কথা বলবে না, মাযার, পবিত্রস্থান ইত্যাদির অনুগ্রহ ও দাক্ষিণ্যলাভের কোন স্বীকৃতি দেবে না এবং তাদের উদ্দেশ্যে কোন প্রশংসাবাণীও নিবেদন করবে না, এ ধরনের আচরণ তাদের একদম পছন্দ নয় । কুরআনের অন্যান্য স্থানেও এ কথাটির প্রতিধ্বনি আমরা দেখতে পাই । যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে যে, "শুধু এক আল্লাহ্‌র কথা বলা হলে যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাদের অন্তর বিতৃষ্ণায় সংকুচিত হয় এবং আল্লাহ্‌র পরিবর্তে উপাস্যগুলোর উল্লেখ করা হলে তারা আনন্দে উল্লসিত হয়" । [সূরা আয-যুমারঃ৪৫] কাতাদা রাহেমাহুল্লাহ্ বলেন, মুসলিমরা যখন বলত: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ্ ব্যতীত কোন হক ইলাহ নেই), তখন কাফেররা সেটা অস্বীকার করত । আর এটা তাদের কাছে বড় হয়ে দেখা দিত । অনুরূপভাবে তা ইবলীস ও তার দলবলকে ক্লিষ্ট করত । তখন আল্লাহ্ চাইলেন যে, তিনি তাঁর কালেমাকে প্রসার করবেন, উন্নত করবেন, সাহায্য করবেন এবং যারা এটার বিরোধিতা করবে তাদেরও বিপক্ষে এটাকেই বিজয়ী করবেন । [ইবন কাসীর]

(২) মক্কার কাফের সরদাররা পরস্পর যেসব কথা বলাবলি করতো, এখানে সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছ । তাদের অবস্থা ছিল এই যে, তারা লুকিয়ে লুকিয়ে কুরআন শুনতো এবং তারপর তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করতো । অনেক সময় তাদের নিজেদের লোকদের মধ্য থেকে কারো প্রতি তাদের সন্দেহ হতো যে, সে কুরআন শুনে প্রভাবিত হয়েছে । তাই তারা সবাই মিলে তাকে এ বলে বুঝাতো যে, ভাই এ তুমি কার ধোঁকায় পড়ে গেলে ? এতো একজন জাদুগ্রস্ত ব্যক্তি । অর্থাৎ কোন শত্রু এর উপর জাদু করে দিয়েছে । তাইতো প্ররোচনামূলক কথা বলে চলছে । [ইবন কাসীর]

৪৮. দেখুন, তারা আপনার কী উপমা দেয়! ফলে তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে[১], সুতরাং তারা পথ পাবে না।

انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿٤٨﴾

৪৯. আর তারা বলে, 'আমরা অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হলেও কি নূতন সৃষ্টিরূপে উত্থিত হব[২]?'

وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿٤٩﴾

৫০. বলুন, 'তোমরা হয়ে যাও পাথর বা লোহা[৩],

قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴿٥٠﴾

৫১. 'অথবা এমন কোন সৃষ্টি যা তোমাদের অন্তরে খুবই বড় মনে

أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ

(১) অর্থাৎ এরা আপনার সম্পর্কে কোন একটি মত প্রকাশ করছে না। বরং বিভিন্ন সময় সম্পূর্ণ ভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী কথা বলছে। কখনো বলছে, আপনি নিজে জাদুকর। কখনো বলছে, আপনাকে কেউ জাদু করেছে। কখনো বলছে, আপনি কবি। কখনো বলছে, আপনি পাগল। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] এদের যে আসল সত্যের খবর নেই, এদের এসব পরস্পর বিরোধী কথাই তার প্রমাণ। নয়তো প্রতিদিন তারা একটা করে নতুন মত প্রকাশ করার পরিবর্তে কোন একটা চূড়ান্ত মত প্রকাশ করতো। তাছাড়া এ থেকে একথাও জানা যায় যে, তারা নিজেরা নিজেদের কোন কথায়ও নিশ্চিত নয়। একটি অপবাদ দেয়ার পর নিজেরাই অনুভব করছে, এটা তো ঠিকমতো খাপ খাচ্ছে না। তাই পরে আর একটা অপবাদ দিচ্ছে। আবার সেটাকেও খাপ খেতে না দেখে তৃতীয় আর একটা অপবাদ তৈরী করছে। এভাবে নিছক শত্রুতা বশত তারা একের পর এক বড় বড় মিথ্যা রচনা করে চলছে। ফলে তারা পথভ্রষ্ট হয়েই চলেছে, তারা যা বলছে সেগুলোতে তারা সঠিক পথে নেই। হেদায়াত থেকে দূরে সরে গেছে। সে পথভ্রষ্টতা থেকে আর বের হতে পারছে না। [ফাতহুল কাদীর]

(২) একই অর্থে অন্যান্য সূরায়ও আখেরাতে পুনরুত্থান সম্পর্কে কাফেরদের সন্দেহের কথা উল্লেখ করে তার জওয়াব দেয়া হয়েছে। [যেমন, এ সূরারই ৯৮ নং আয়াত এবং সূরা আন-নাযি'আতঃ ১০-১২, ইয়াসীনঃ ৭৮-৭৯]

(৩) অর্থাৎ যদি তোমরা আশ্চর্য মনে করে থাক যে, আমরা অস্থি ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেলে কিভাবে আবার পুনরুত্থিত হব, তাহলে তোমরা যদি পার তো পাথর বা লোহা হয়ে যাও। [তাবারী] অথবা আয়াতের অর্থ, যদি তোমরা পাথর ও লোহাও হয়ে যাও তারপরও তোমরা আল্লাহ্‌র হাত থেকে রেহাই পাবে না। অথবা এর অর্থ, যদি তোমরা পাথর কিংবা লোহাও হয়ে যাও তারপরও আল্লাহ্ তোমাদেরকে তেমনি নিয়ে আসবেন, যেমনি তিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন। [ফাতহুল কাদীর]

يُعِيدُنَا ۖ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ ۖ قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ﴿٥١﴾

হয়[১];' তবুও তারা বলবে, 'কে আমাদেরকে পুনরুত্থিত করবে?' বলুন, 'তিনিই, যিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন[২]।' অতঃপর তারা আপনার সামনে মাথা নাড়বে[৩] ও বলবে, 'সেটা কবে?[৪]' বলুন, 'সম্ভবত সেটা হবে শীঘ্রই,

---

(১) মুজাহিদ বলেন, এখানে যা বড় মনে হয় বলে আসমান, যমীন ও পাহাড় বোঝানো হয়েছে। অন্য বর্ণনায় তিনি বলেছেন, এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে, যা ইচ্ছে তা হয়ে যাও, কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদেরকে অবশ্যই মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করবেন। [ইবন কাসীর] ইবন আব্বাস, সায়ীদ ইবনে জুবাইর, আবু সালেহ, হাসান, কাতাদা এবং দাহ্হাক বলেন, তাদের উদ্দেশ্য, মৃত্যু। কারণ বনী আদমের কাছে এর চেয়ে বড় বিষয় আর নেই। অর্থাৎ যদি তোমরা মৃতই হয়ে যাও তারপরও তিনি তোমাদেরকে মৃত্যু দিবেন তারপর জীবিত করবেন। [ফাতহুল কাদীর]

(২) অর্থাৎ যিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন তিনিই তোমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন। এ আয়াতে তাদের সন্দেহের দু'টি উত্তর দেয়া হয়েছে, এক, তোমাদেরকে প্রথম যিনি সৃষ্টি করেছেন সে মহান প্রভু সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কেমন হতে পারে? কিভাবে মনে করতে পারলে যে, তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করতে পারবেন না? তোমরা তাঁর শক্তি সামর্থ সম্পর্কে এতই অজ্ঞ রয়ে গেলে? দুই, তোমরা যদি পুনরায় সৃষ্টি করাকে অসম্ভব মনে করে থাক তবে অত্যন্ত বাজে ধারণা ও বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করছ। কারণ, তোমরা জান যে, প্রথমবার সৃষ্টি করা যত কঠিন দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা তার থেকেও সহজ কাজ। আল্লাহ্ তা'আলাই তোমাদেরকে প্রথম সৃষ্টি করেছেন তাঁর জন্য পুনরায় সৃষ্টি করা কোন ব্যাপারই নয়। এ ধরনের আলোচনা অন্য সূরায়ও উল্লেখ করা হয়েছে। [যেমন, সূরা আর-রূমঃ২৭]

(৩) আরবীতে ব্যবহৃত "ইন্গাদ" শব্দের মানে হচ্ছে, উপর থেকে নিচের দিকে এবং নিচ থেকে উপরের দিকে মাথা নাড়া। এভাবে মাথা নেড়ে বিস্ময় প্রকাশ বা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়। [ইবন কাসীর]

(৪) তারা দু'টি কারণে একথাটি বলেছে, এক, তারা পুনরুত্থানকে অসম্ভব মনে করে এভাবে উপর-নীচ মাথা ঝাকাচ্ছিল। [ইবন কাসীর] দুই, তারা এ পুনরুত্থান কেন তাড়াতাড়ি হচ্ছেনা সে প্রশ্ন তুলছে। কুরআনের অন্যান্য আয়াতেও তাদের এ ধরনের আচরণ উল্লেখ করা হয়েছে। [যেমন সূরা আল-মুলকঃ ২৫, আস-শূরাঃ ১৮]

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِۦ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٥٢﴾

৫২. 'যেদিন তিনি তোমাদেরকে ডাকবেন, এবং তোমরা তাঁর প্রশংসার সাথে তাঁর ডাকে সাড়া দেবে(১) এবং তোমরা মনে করবে, তোমরা অল্পকালই অবস্থান করেছিলে(২) ।'

(১) আয়াতের অর্থ এই যে, হাশরের ময়দানে যখন তোমাদেরকে ডাকা হবে, তখন তোমরা সবাই ঐ আওয়ায অনুসরণ করে একত্রিত হয়ে যাবে । ময়দানে আসার সময় তোমরা সবাই আল্লাহ্‌র প্রশংসা করতে করতে উপস্থিত হবে । আয়াতের বাহ্যিক অর্থ থেকে জানা যায় যে, তখন মুমিন ও কাফের সবারই এই অবস্থা হবে । কিন্তু ইবন আব্বাস বলেন, এখানে হামদ দ্বারা তাঁর নির্দেশ ও ইচ্ছার অনুগত হয়ে যাওয়ার কথা বুঝানো হয়েছে । কাতাদা বলেন, এর অর্থ তোমরা তাঁর পরিচয় জানতে পারবে এবং আনুগত্য করে তাঁর ডাকে সাড়া দিবে । কোন কোন তফসীরবিদ বলে, এর অর্থ হচ্ছে, আর তাঁর জন্যই যাবতীয় হামদ ও স্তুতি সর্বাবস্থায় । [ইবন কাসীর] কুরআন ও হাদীসের অসংখ্য বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, হাশরের ময়দানে বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করতে হবে এবং প্রত্যেক অবস্থানস্থলে মানুষের অবস্থা বিভিন্নরূপ হবে । ইমাম কুরতুবী বলেনঃ হাশরে পুনরুত্থানের শুরু হাম্‌দ দ্বারা হবে । সবাই হাম্‌দ করতে করতে উত্থিত হবে এবং সব ব্যাপারে সমাপ্তিও হাম্‌দের মাধ্যমে হবে । যেমন- বলা হয়েছে, "আর তাদের (হাশরবাসীদের) ফয়সালা হক অনুযায়ী করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, সমস্ত প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ্‌র জন্যে ।" [সূরা আয-যুমারঃ ৭৫]

(২) অর্থাৎ দুনিয়ায় মৃত্যুকাল থেকে নিয়ে কিয়ামতের দিনে উত্থান পর্যন্তকার সময়কালটা মাত্র কয়েক ঘন্টার বেশী বলে মনে হবে না । তোমরা তখন মনে করবে, আমরা সামান্য একটু সময় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তার মধ্যে হঠাৎ এ কিয়ামতের শোরগোল আমাদের জাগিয়ে দিয়েছে । কুরআন তাদের এ সমস্ত কথাবার্তার বিভিন্ন চিত্র তুলে ধরেছে । কোথাও বলেছে, "যেদিন তারা তা দেখতে পাবে সেদিন তাদের মনে হবে যেন তারা পৃথিবীতে মাত্র এক সন্ধ্যা অথবা এক প্রভাত অবস্থান করেছে!" [সূরা আন-নাযি'আতঃ ৪৬] আবার বলা হয়েছে, "যেদিন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে এবং যেদিন আমি অপরাধীদেরকে দৃষ্টিহীন অবস্থায় সমবেত করব । সেদিন তারা নিজেদের মধ্যে চুপি চুপি বলাবলি করবে, 'তোমরা মাত্র দশদিন অবস্থান করেছিলে ।" [সূরা ত্বা-হাঃ ১০২-১০৪] আরো বলা হয়েছে, "যেদিন কিয়ামত হবে সেদিন অপরাধীরা শপথ করে বলবে যে, তারা মুহূর্তকালের বেশী অবস্থান করেনি । এভাবেই তারা সত্যভ্রষ্ট হত ।" [সূরা আর-রূমঃ ৫৫] আবার কোথাও বলা হয়েছে, "আল্লাহ্ বলবেন, 'তোমরা পৃথিবীতে কত বছর অবস্থান করেছিলে?' তারা বলবে, 'আমরা অবস্থান করেছিলাম একদিন বা দিনের কিছু অংশ; আপনি না হয়, গণনাকারীদেরকে জিজ্ঞেস করুন ।' তিনি বলবেন, 'তোমরা অল্প কালই অবস্থান করেছিলে, যদি তোমরা জানতে! [সূরা আল-মুমিনূনঃ ১১২-১১৪]

ষষ্ঠ রুকূ'

وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿٥٣﴾

৫৩. আর আমার বান্দাদেরকে বলুন, তারা যেন এমন কথা বলে যা উত্তম। নিশ্চয় শয়তান তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উস্কানি দেয়; নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।

رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ ۖ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ ۚ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿٥٤﴾

৫৪. তোমাদের রব তোমাদের সম্পর্কে অধিক অবগত। ইচ্ছে করলে তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন অথবা ইচ্ছে করলে তোমাদেরকে শাস্তি দেবেন[১]; আর আমরা আপনাকে তাদের কর্মবিধায়ক করে পাঠাইনি[২]।

وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ ۖ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا ﴿٥٥﴾

৫৫. আর যারা আসমানসমূহ ও যমীনে আছে তাদের সম্পর্কে আপনার রব অধিক অবগত। আর অবশ্যই আমরা নবীগণের কিছু সংখ্যককে কিছু সংখ্যকের উপর মর্যাদা দিয়েছি এবং দাউদকে দিয়েছি যাবূর[৩]।

---

(১) অর্থাৎ হেদায়াতের বিষয়টি কারও হাতে নেই। এ বিষয়টির ফায়সালা একমাত্র আল্লাহর ইখতিয়ারভুক্ত। তিনিই সকল মানুষের ভিতর-বাহির এবং বর্তমান-ভবিষ্যত জানেন। কার প্রতি অনুগ্রহ করতে হবে এবং তাকে তাঁর আনুগত্যের দিকে নিয়ে আসতে হবে এটা তিনিই ভাল জানেন। আর কে এ অনুগ্রহের হকদার নয় এটাও তিনি ভাল জানেন। [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ তাদের উপর আপনাকে যবরদস্তিকারী হিসেবে পাঠাইনি যে আপনি তাদেরকে জোর করে ঈমানদার বানিয়ে ছাড়বেন। তাদের জন্য আপনাকে 'বাশীর' বা সুসংবাদপ্রদানকারী এবং 'নাযীর' হিসেবেই পাঠিয়েছি। তারপর যদি কেউ আপনার আনুগত্য করে তবে সে জান্নাতে যাবে আর যদি অবাধ্য হয় তবে জাহান্নামে যাবে। [ইবন কাসীর] এ অর্থে কুরআনের অন্যান্য স্থানে বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে। [যেমন, সূরা আল-আন'আমঃ ১০৭, আয-যুমারঃ ৪১, আস-শূরাঃ ৬, ক্বাফঃ ৪৫]

(৩) যাবূর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নাযিলকৃত একটি গ্রন্থ। আমরা ঈমান রাখি যে, আল্লাহ্

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ﴿٥٦﴾

৫৬. বলুন, 'তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া যাদেরকে ইলাহ্ মনে কর তাদেরকে ডাক, অতঃপর দেখবে যে, তোমাদের দুঃখ-দৈন্য দূর করার বা পরিবর্তন করার শক্তি তাদের নেই(১) ।'

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ

৫৭. তারা যাদেরকে ডাকে তারাই তো তাদের রবের নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে(২) যে, তাদের মধ্যে কে

তা'আলা দাঊদ আলাইহিসসালামকে একখানি গ্রন্থ দিয়েছিলেন যার নাম যাবূর । তবে বর্তমানে বাইবেলে যে দাঊদের সংগীত নামে অভিহিত অংশ আছে তা তার গ্রন্থ বলা যাবে না । কারণ, এর পক্ষে সুস্পষ্ট কোন প্রমাণ নেই । কোন কোন হাদীসে দাউদ আলাইহিসসালামের গ্রন্থের নাম "কুরআন" বলা হয়েছে । তখন এর অর্থ হবে, 'পাঠকৃত' বা পাঠের যোগ্য । হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "দাঊদের উপর কুরআন সহজ করে দেয়া হয়েছিল । তিনি তার বাহনের লাগাম লাগাতে নির্দেশ দিতেন । তারা তা লাগিয়ে শেষ করার আগেই তিনি তা পড়া শেষ করে ফেলতেন ।" [বুখারীঃ ৪৭১৩]

(১) এ থেকে পরিষ্কার জানা যায়, কেবল গায়রুল্লাহকে (আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্তা) সিজদা করাই শির্ক নয় বরং আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্তার কাছে দো'আ চাওয়া বা তাকে সাহায্য করার জন্য ডাকাও শির্ক । দো'আ ও সাহায্য চাওয়া ইবাদতেরই অন্তর্ভুক্ত । কাজেই গায়রুল্লাহর কাছে প্রার্থনাকারী একজন মূর্তি পূজকের সমান অপরাধী । তাছাড়া এ থেকে একথাও জানা যায় যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ কোন আপদ-বিপদ থেকে বাঁচাতে পারে না এবং কোন খারাপ অবস্থাকে ভাল অবস্থায় পরিবর্তিত করে দিতেও পারে না । আল্লাহ ছাড়া অন্য যে কোন সত্তা সম্পর্কে এ ধরনের বিশ্বাস রাখা ভ্রষ্টতা ছাড়া আর কিছুই নয় ।

(২) এ শব্দগুলো নিজেই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, মুশরিকদের যেসব মাবুদ ও ত্রাণকর্তার কথা এখানে বলা হচ্ছে তারা পাথরের মূর্তি নয় বরং তারা হচ্ছে ফেরেশ্তা বা অতীত যুগের আল্লাহর প্রিয় বান্দা । ইবন আব্বাস বলেন, শির্ককারীরা বলত: আমরা ফেরেশতা, মসীহ ও উযায়ের এর ইবাদাত করি । অথচ যাদের ইবাদত করা হচ্ছে তারাই আল্লাহকে ডাকছে । [ইবন কাসীর] আয়াতের অর্থ পরিষ্কার । অর্থাৎ নবী হোক বা আউলিয়া অথবা ফেরেশতা, কারোই তোমাদের প্রার্থনা শুনার এবং তোমাদের সাহায্য করার ক্ষমতা নেই । তোমরা নিজেদের প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য তাদেরকে অসিলায় পরিণত করছো কিন্তু তাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তারা নিজেরাই আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশী, তাঁর আযাবের ভয়ে ভীত এবং তাঁর বেশী বেশী নিকটবর্তী হবার জন্য অসিলা ও উপায় খুঁজে বেড়াচ্ছে । এ আয়াত নাযিল হওয়ার ব্যাপারে আব্দুল্লাহ

إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿٥٧﴾

কত নিকটতর হতে পারে, আর তারা তাঁর দয়া প্রত্যাশা করে এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় করে[১]। নিশ্চয় আপনার রবের শাস্তি ভয়াবহ।

وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٥٨﴾

৫৮. আর এমন কোন জনপদ নেই যা আমরা কিয়ামতের দিনের আগে ধ্বংস করব না অথবা যাকে কঠোর শাস্তি দেব না; এটা তো কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে[২]।

ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ "কিছু লোক অপর কিছু জিনের ইবাদত করত, পরে সে জিনগুলো ইসলাম গ্রহণ করে। কিন্তু সে মানুষগুলো সে সমস্ত জিনের ইবাদত করতেই থাকল। তারা বুঝতেই পারল না যে, তারা যাদের ইবাদত করছে তারা ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেছে। এমতাবস্থায় এ আয়াত নাযিল হয়"। [বুখারীঃ ৪৭১৪, ৪৭১৫, মুসলিমঃ ৩০৩০]

(১) অসীলা শব্দের অর্থ, নৈকট্য অর্জন। যেমনটি কাতাদাহ রাহেমাহুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত হয়েছে। [ইবন কাসীর] আল্লাহ্‌র কাছে ওসিলা হচ্ছে কথায় ও কাজে আল্লাহ্‌র মর্জির প্রতি সব সময় লক্ষ্য রাখা এবং শরী'আতের বিধি-বিধান অনুসরণ করার মাধ্যমে তাঁর নৈকট্যলাভে সদা তৎপর থাকা। উদ্দেশ্য এই যে, তাঁরা সবাই সৎকর্মের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নৈকট্য অন্বেষণে মশগুল আছেন। আয়াতে রহমতের আশা এবং আযাবের ভয় করার কথা বলা হয়েছে। মূলতঃ আল্লাহ্‌র রহমতের আশা করতে থাকা এবং ভয়ও করতে থাকা মানুষের এ দু'টি ভিন্নমুখী অবস্থা যে পর্যন্ত সমান সমান পর্যায়ে থাকে, সেই পর্যন্ত মানুষ সঠিক পথে অনুগমন করে। ভয় থাকলে অন্যায় থেকে দূরে থাকবে, আর আশা থাকলে ইবাদাত ও আনুগত্যে প্রেরণা পাবে। [ইবন কাসীর] পক্ষান্তরে যদি কোন একটি অবস্থা দূর্বল হয়ে পড়ে, তবে সেই পরিমাণে সে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, নিশ্চয় তাঁর অর্থাৎ আল্লাহ্‌র আযাব ভীতিপ্রদ। তাই আযাব থেকে ভয়ে থাকা এবং আযাবে নিক্ষেপ করে এমন কাজ করা থেকেও সাবধান থাকা উচিত। [ইবন কাসীর]

(২) কিতাব বলে এখানে 'লাওহে মাহফূজ' বুঝানো হয়েছে। [ইবন কাসীর] তাদের কর্মফলের কারণেই তাদের জন্য এ শাস্তি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ববর্তী জাতি সমূহের ধ্বংসের ব্যাপারেও একই কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, "আর আমরা তাদের উপর যুলুম করিনি বরং তারাই তাদের নিজেদের উপর যুলুম করেছে"। [সূরা হূদঃ১০১] অন্য আয়াতে আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, "কত জনপদ তাদের প্রতিপালক ও তাঁর রাসূলগণের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। ফলে আমরা

وَمَا مَنَعَنَآ أَن نُّرۡسِلَ بِٱلۡأٓيَٰتِ إِلَّآ أَن كَذَّبَ بِهَا ٱلۡأَوَّلُونَۚ وَءَاتَيۡنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبۡصِرَةٗ فَظَلَمُواْ بِهَاۚ وَمَا نُرۡسِلُ بِٱلۡأٓيَٰتِ إِلَّا تَخۡوِيفٗا ﴿٥٩﴾

৫৯. আর আমাদেরকে নিদর্শন প্রেরণ করা থেকে শুধু এটাই বিরত রেখেছে যে, তাদের পূর্ববর্তীগণ তাতে মিথ্যারোপ করেছিল। আর আমরা শিক্ষাপ্রদ নিদর্শনস্বরূপ সামূদ জাতিকে উষ্ট্রী দিয়েছিলাম, অতঃপর তারা সেটার প্রতি যুলুম করেছিল। আমরা তো শুধু ভয় দেখানোর জন্যই নিদর্শন পাঠিয়ে থাকি[১]।

তাদের কাছ থেকে কঠোর হিসেব নিয়েছিলাম এবং তাদেরকে দিয়েছিলাম কঠিন শাস্তি। তারপর তারা তাদের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করল; ক্ষতিই হল তাদের কাজের পরিণাম।" [সূরা আত-তালাকঃ ৮,৯]

(১) এখানে বক্তব্য হচ্ছে এই যে, এ ধরনের মু'জিযা দেখার পর যখন লোকেরা একে মিথ্যা বলতে থাকে তখন তাদের উপর আযাব নাযিল হওয়া অনিবার্য হয়ে পড়ে এবং তখন এ জাতিকে ধ্বংস করা ছাড়া আর কোন পথ থাকে না। মানব জাতির অতীত ইতিহাস প্রমাণ করে, বিভিন্ন জাতি সুস্পষ্ট মু'জিযা দেখে নেবার পরও সেগুলোকে মিথ্যা বলেছে, ফলে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। এখন এটা পুরোপুরি আল্লাহর রহমত যে, তিনি এমন ধরনের কোন মু'জিযা আর পাঠাচ্ছেন না। এর মানে হচ্ছে, তিনি তোমাদের বুঝবার ও সংশোধিত হবার অবকাশ দিচ্ছেন। কিন্তু তোমরা এমনি নির্বোধ যে, মু'জিযার দাবী জানিয়ে সামুদ জাতির পরিণাম ভোগ করতে চাচ্ছ। সামূদ জাতি সুস্পষ্ট নিদর্শন চেয়েছিল। তারপর যখন তাদের কাছে তা আসল এবং তারা কুফরী করল তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিয়মানুসারে তাদেরকে ধ্বংস করে দিলেন। এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে জানা থাকলে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ 'মক্কাবাসীগণ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ দাবী করল যে, আপনি আমাদের জন্য সাফা পাহাড়কে স্বর্ণে পরিণত করে দিন। আমাদের জন্য মক্কার পাহাড়গুলো স্থানান্তরিত করে আমাদের মধ্যে প্রশস্ততার ব্যবস্থা করুন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ 'আপনি যদি চান তো আমি তারা যা চায় তা তাদেরকে দিব কিন্তু তারপর যদি তারা কুফরী করে তবে তাদের পূর্ববর্তীগণ যেভাবে ধ্বংস হয়েছে সেভাবে তাদেরকেও ধ্বংস করে দেব। আর যদি আপনি চান তো আমি অপেক্ষা করব হয়ত বা তাদের বংশধরদের কেউ ঈমান আনবে।' তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ 'বরং আমি তাদের জন্য অপেক্ষা করব।' তখন আল্লাহ্ এ আয়াত নাযিল করেন। [মুসনাদে আহমাদঃ ১/২৫৮, দ্বিয়া আল-মাকদেসী, আল-মুখতারাহঃ ১০/৭৮-৮০] সুতরাং কোন ম্যাজিক বা দর্শনীয় খেলা দেখানোর উদ্দেশ্যে

৬০. আর স্মরণ করুন, যখন আমরা আপনাকে বলেছিলাম যে, নিশ্চয় আপনার রব মানুষকে পরিবেষ্টন করে আছেন[১]। আর আমরা যে দৃশ্য আপনাকে দেখিয়েছি তা[২] এবং কুরআনে উল্লেখিত অভিশপ্ত গাছটিও[৩] শুধু মানুষের জন্য ফিতনাস্বরূপ[৪]

وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ ۚ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ ۚ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ﴿٦٠﴾

কখনো মু'জিযা দেখানো হয় না। সব সময় মু'জিযা এই উদ্দেশ্যে দেখানো হয়েছে যে, লোকেরা তা দেখে সাবধান হয়ে যাবে, তারা বুঝতে পারবে নবীর পেছনে আছে এক সর্বময় শক্তিশালী সত্তার অসীম ক্ষমতা এবং তাঁর নাফরানীর পরিণাম কি হতে পারে তাও তারা জানতে পারবে।

(১) অর্থাৎ আপনার নবুওয়াতী দাওয়াতের সূচনালগ্নেই যখন মক্কার এ কাফেররা আপনার বিরোধিতা করতে এবং আপনার পথে প্রতিবন্ধকতা দাঁড় করাতে শুরু করেছিল তখনই আমি পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করেছিলাম, আমি এ লোকদেরকে ঘিরে রেখেছি, এরা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে দেখে নিক, কোন ভাবেই এরা আপনার দাওয়াতের পথ রোধ করতে পারবে না এবং আপনি যে কাজে হাত দিয়েছেন সব রকমের বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও সে কাজ সম্পন্ন হবেই। অথবা আয়াতের অর্থ, আপনি দাওয়াত দিতে থাকুন, তারা আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। কারণ, তারা সবাই আল্লাহ্‌র আয়ত্বাধীন। [ইবন কাসীর] আল্লাহ বিরোধীদেরকে ঘিরে রেখেছেন এবং নবীর দাওয়াত আল্লাহর হেফাজতে রয়েছে–একথা মক্কার প্রাথমিক যুগের সূরাগুলোতে বিভিন্ন জায়গায় বলা হয়েছে। যেমন সূরা বুরুজে বলা হয়েছেঃ "কিন্তু এ কাফেররা মিথ্যা বলার ও অস্বীকার করার কাজে লেগেই আছে এবং আল্লাহ সবদিক থেকে তাদেরকে ঘেরাও করে রেখেছেন"। [১৯-২০] এর জন্য আরো দেখুন, সূরা আল-বাকারাহঃ ১৯, সূরা ফুসসিলাতঃ ৫৪।

(২) এ আয়াতে সংখ্যাগরিষ্ঠ তফসীরবিদদের মতে الرؤيا (স্বপ্ন) বলে رؤية (দেখা) বোঝানো হয়েছে। যা ইসরা ও মি'রাজের রাত্রিতে সংঘটিত হয়েছিল। [ইবন কাসীর]

(৩) অর্থাৎ "যাক্কুম"। এ সম্পর্কে কুরআনে খবর দেয়া হয়েছে, এ গাছটি জাহান্নামের তলদেশে উৎপন্ন হবে এবং জাহান্নামীদের তা খেতে হবে। একে অভিশপ্ত করার মানে হচ্ছে এই যে, যারা এ গাছ থেকে খাবে তারা অভিশপ্ত হবে। [ফাতহুল কাদীর] যেমন অন্য সূরায় বলা হয়েছে, "নিশ্চয় যাক্কুম গাছ হবে, পাপীর খাদ্য" [সূরা আদ-দোখান: ৪৩-৪৪]

(৪) অর্থাৎ মি'রাজের রাত্রিতে যে দৃশ্যাবলী আমি আপনাকে দেখিয়েছিলাম, তা মানুষের জন্য একটি ফেতনা ছিল। আরবী ভাষায় 'ফেতনা' শব্দটি অনেক অর্থে ব্যবহৃত

নির্ধারণ করেছি। আর আমরা তাদেরকে ভয় দেখাই, কিন্তু এটা তাদের ঘোর অবাধ্যতাই বৃদ্ধি করে।

সপ্তম রুকূ'

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِءَادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ قَالَ ءَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴿٦١﴾

৬১. আর স্মরণ করুন, যখন আমরা ফিরিশ্‌তাদেরকে বললাম, 'আদমকে সিজ্‌দা কর', তখন ইব্‌লীস ছাড়া সবাই সিজ্‌দা করল। সে বলেছিল, 'আমি কি তাকে সিজ্‌দা করব যাকে আপনি কাদা থেকে সৃষ্টি করেছেন?'

قَالَ أَرَءَيْتَكَ هَٰذَا ٱلَّذِى كَرَّمْتَ عَلَىَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُۥٓ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٦٢﴾

৬২. সে বলেছিল, 'আমাকে জানান, এই যাকে আপনি আমার উপর মর্যাদা দান করলেন, কিয়ামতের দিন পর্যন্ত যদি আমাকে অবকাশ দেন, তাহলে শপথ করে বলছি আমি অল্প কয়েকজন ছাড়া তার বংশধরকে অবশ্যই কর্তৃত্বাধীন করে ফেলব(১)।'

হয়। এর এক অর্থ গোমরাহী। আরেক অর্থ পরীক্ষাও হয় এবং অন্য এক অর্থ হাঙ্গামা ও গোলযোগ। এখানে সব অর্থের সম্ভাবনা বিদ্যমান। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা, সুফিয়ান, হাসান, মুজাহিদ রাহেমাহুমুল্লাহ প্রমুখ বলেনঃ এটা ছিল ধর্মত্যাগের ফেতনা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন শবে-মে'রাজে বায়তুল-মুকাদ্দাস, সেখান থেকে আকাশে যাওয়ার এবং প্রত্যুষের পূর্বে ফিরে আসার কথা প্রকাশ করলেন, তখন কোন কোন অপক্ক নও মুসলিম মুরতাদ হয়ে যাবার অবস্থায় পড়ে গিয়েছিল। [তাবারী; ফাতহুল কাদীর]

(১) যখন আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কাফেরদের শত্রুতার অবস্থা বর্ণনা করলেন, তখন রাসূলকে এ সান্তনা দিতে চাইলেন যে, নবীদের সাথে এ বিরোধিতা অনেক থেকে চলে এসেছে। ইবলীস সেটা শুরু করেছিল। [ফাতহুল কাদীর] আদম আলাইহিস সালামকে সেজদা না করার সময় ইবলিস দু'টি কথা বলেছিল। এক, আদম মাটি দ্বারা সৃজিত হয়েছে এবং আমি অগ্নি দ্বারা সৃজিত। আপনি মাটিকে অগ্নির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করলেন কেন? এ প্রশ্নটি আল্লাহ্‌র আদেশের বিপরীতে নির্দেশের রহস্য জানার সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল। কোন আদিষ্ট ব্যক্তির এরূপ

قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُورًا ﴿٦٣﴾

৬৩. আল্লাহ্ বললেন, 'যাও, অতঃপর তাদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে, নিশ্চয় জাহান্নামই হবে তোমাদের সবার প্রতিদান, পূর্ণ প্রতিদান হিসেবে।

وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ ۚ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿٦٤﴾

৬৪. 'আর তোমার কণ্ঠ দিয়ে তাদের মধ্যে যাকে পারো পদস্খলিত কর, তোমার অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী দ্বারা তাদেরকে আক্রমণ কর এবং তাদের ধনে[১] ও সন্তান-সন্ততিতে শরীক হয়ে যাও, আর তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দাও।'

প্রশ্ন করার অধিকার নেই। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আদিষ্ট ব্যক্তির যে রহস্য অনুসন্ধানের অধিকার নেই একথা বলা বাহুল্য। এর বাহ্যিক উত্তর এটাই যে, এক বস্তুকে অন্য বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করার অধিকার একমাত্র সে সত্তার, যিনি সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা। তিনি যখন যে বস্তুকে অন্য বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করবেন, তখন তাই শ্রেষ্ঠ হয়ে যাবে। ইবলীসদের দ্বিতীয় কথা ছিল এই যে, যদি আমাকে কেয়ামত পর্যন্ত জীবন দান করা হয়, তবে আমি আদমের গোটা বংশধরকে (অবশ্য তাদের কয়েকজন ছাড়া) পথভ্রষ্ট করে ছাড়ব। আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা এর উত্তরে বলেছেনঃ আমার খাঁটি বান্দা যারা, তাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা চলবে না; যদিও তোমার গোটা বাহিনী ও সর্বশক্তি এ কাজে নিয়োজিত হয়। অবশিষ্ট অখাঁটি বান্দারা তোমার বশীভূত হয়ে গেলে তাদেরও দূর্দশা তাই হবে, যা তোমার জন্য নির্ধারিত, অর্থাৎ জাহান্নামের আযাবে তোমাদের সবাই গ্রেফতার হবে। আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শয়তানের অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী রয়েছে। এতে করে বাস্তবেও শয়তানের কিছু অশ্বারোহী ও কিছু পদাতিক বাহিনী থাকা অবাস্তব নয়। এবং তা অস্বীকার করার কোন কারণ নেই। ইবন আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুমা বলেনঃ যারা কুফরের সমর্থনে যুদ্ধ করতে যায়, সেসব অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী শয়তানেরই অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী। আয়াতে উল্লেখিত শয়তানের আওয়াজ কি? এ সম্পর্কে ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেনঃ গান, বাদ্যযন্ত্র ও রং- তামাশার আওয়াজই শয়তানের আওয়াজ। এর মাধ্যমে সে মানুষকে সত্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এ থেকে জানা গেল যে, বাদ্যযন্ত্র ও গান-বাজনা হারাম। [বিস্তারিত দেখুন, ইবন কাসীর]

(১) ধন সম্পদে শরীক হওয়ার বহু পদ্ধতি রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, সুদ-ঘুষের মাধ্যমে লেনদেন করা। [আইসারুত তাফাসীর]

আর শয়তান ছলনা ছাড়া তাদেরকে কোন প্রতিশ্রুতিই দেয় না।

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَٰنٌ ۚ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴿٦٥﴾

৬৫. 'নিশ্চয় আমার বান্দাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা নেই।' আর কর্মবিধায়ক হিসেবে আপনার রবই যথেষ্ট।

رَّبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٦٦﴾

৬৬. তোমাদের রব তিনিই, যিনি তোমাদের জন্য সাগরে নৌযান পরিচালিত করেন, যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার। নিশ্চয় তিনি তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।

وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ ۖ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ ۚ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا ﴿٦٧﴾

৬৭. আর সাগরে যখন তোমাদেরকে বিপদ স্পর্শ করে তখন শুধু তিনি ছাড়া অন্য যাদেরকে তোমরা ডেকে থাক তারা হারিয়ে যায়[১]; অতঃপর তিনি যখন তোমাদেরকে উদ্ধার করে স্থলে আনেন তখন তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও। আর মানুষ খুবই অকৃতজ্ঞ।

---

(১) অর্থাৎ যখন বিপদাপদ দেখা দেয় তখন তারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য যাদের ইবাদত করে তাদেরকে ভুলে যায়। তারা তখন তাদের মন থেকে হারিয়ে যায়। একমাত্র আল্লাহকেই তারা ডাকতে থাকে। মক্কা বিজয়ের পর ইকরিমা ইবন আবি জাহল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পালিয়ে হাবশা চলে যাচ্ছিল। সাগরের মাঝে তার নৌকা প্রচণ্ড ঝড়ের কবলে পড়ে যায়। তখন নৌকার সবাই একমাত্র আল্লাহকে ডাকার জন্য একে অপরকে পরামর্শ দিতে থাকে। আর ঠিক তখনি ইকরিমা নিজ মনে বলছিল যে, যদি সাগর বক্ষে আল্লাহ্ ব্যতিত আর কেউ রক্ষা করার না থাকে তা হলে ডাঙ্গাতেও তিনিই একমাত্র রক্ষক। হে আল্লাহ্! আমি অঙ্গীকার করছি যে, যদি এ বিপদ থেকে বেঁচে যাই তবে অবশ্য ফিরে গিয়ে মুহাম্মাদের হাতে হাত রেখে ঈমান আনব। তাকে আমি অবশ্যই রহমদিল পাব। তারপর তারা যখন সমুদ্র বক্ষ থেকে বের হলো তখনি তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ফিরে আসলেন এবং ঈমান আনলেন। আর তার ইসলাম ছিল অত্যন্ত সুন্দর। [মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ৩/২৪১-২৪২]

৬৮. তোমরা কি নির্ভয় হয়েছ যে, তিনি তোমাদেরকে সহ কোন অঞ্চল ধসিয়ে দেবেন না অথবা তোমাদের উপর শিলা বর্ষণকারী ঝঞ্ঝা পাঠাবেন না? তারপর তোমরা তোমাদের জন্য কোন কর্মবিধায়ক পাবে না।

أَفَأَمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا ﴿٦٨﴾

৬৯. নাকি তোমরা নির্ভয় হয়েছ যে, তিনি তোমাদেরকে আরেকবার সাগরে নিয়ে যাবেন না এবং তোমাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ঝটিকা পাঠাবেন না এবং তোমাদের কুফরী করার জন্য তোমাদেরকে নিমজ্জিত করবেন না? তারপর তোমরা এ ব্যাপারে আমাদের বিরুদ্ধে কোন সাহায্যকারী পাবে না।

أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ﴿٦٩﴾

৭০. আর অবশ্যই আমরা আদম-সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি[১]; স্থলে ও সাগরে

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

(১) আল্লাহ্ তা'আলা আদম-সন্তানকে বিভিন্ন দিক দিয়ে এমন সব বৈশিষ্ট্য দান করেছেন, যেগুলো অন্যান্য সৃষ্টজীবের মধ্যে নেই। উদাহরণতঃ সুশ্রী চেহারা, সুষম দেহ, সুষম প্রকৃতি এবং অঙ্গসৌষ্ঠব। [ইবন কাসীর] যেমন অন্য আয়াতে বলেছেন, "অবশ্যই আমরা সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে" [সূরা আত-তীন:৪] তাকে দু' পায়ে সম্পূর্ণ সোজা হয়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। তাকে হাতে খাওয়ার শক্তি দেয়া হয়েছে। অন্যান্য প্রাণী চারপায়ে এবং মুখ দিয়ে খায়। মানুষের মধ্যে যে চোখ, কান ও অন্তর দেয়া হয়েছে সে এসবগুলোকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারে। দ্বীনী ও দুনিয়াবী বিষয়ে সে এগুলো দ্বারা ভাল-মন্দ বিচার করতে পারে। [ইবন কাসীর] বস্তুত এ বুদ্ধি ও চেতনায় মানুষকে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য দান করা হয়েছে। এর সাহায্যে সে সমগ্র ঊর্ধ্ব-জগত ও অধঃজগতকে নিজের কাজে নিয়োজিত করতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বিভিন্ন সৃষ্টবস্তুর সংমিশ্রণে বিভিন্ন শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করার শক্তি দিয়েছেন, সেগুলো তার বসবাস, চলাফেরা, আহার্য ও পোশাক-পরিচ্ছদে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাকশক্তি ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার যে নৈপুণ্য মানুষ লাভ করেছে, তা অন্য কোন প্রাণীর মধ্যে নেই। বিবেক-বুদ্ধি ও চেতনা মানুষের সর্বপ্রধান শ্রেষ্ঠত্ব। এর মাধ্যমে সে স্বীয় সৃষ্টিকর্তা ও প্রভুর পরিচয় এবং তার পছন্দ ও অপছন্দ জেনে পছন্দের অনুগমন করে এবং অপছন্দ থেকে বিরত থাকে। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا ۟

তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি; এবং তাদেরকে উত্তম রিয্‌ক দান করেছি আর আমরা যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের উপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।

অষ্টম রুকূ’

يَوْمَ نَدْعُوْا كُلَّ اُنَاسٍۭ بِاِمَامِهِمْ ۚ فَمَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ فَاُولٰٓئِكَ يَقْرَءُوْنَ كِتٰبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُوْنَ

৭১. স্মরণ করুন সে দিনকে, যখন আমরা প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাদের ‘ইমাম’(১)সহ ডাকব। অতঃপর যাদের

(১) إمام শব্দের বিভিন্ন অর্থ করা হয়ে থাকে।
কেউ কেউ এখানে إمام দ্বারা গ্রন্থ উদ্দেশ্য নিয়েছেন। সে হিসেবে গ্রন্থকে ইমাম বলার কারণ এই যে, ভুলভ্রান্তি ও দ্বিমত দেখা দিলে গ্রন্থের আশ্রয় নেয়া হয়। যেমন- কোন অনুসৃত ইমামের আশ্রয় নেয়া হয়। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, ﴿وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ فِيْٓ اِمَامٍ مُّبِيْنٍ﴾ “আর যাবতীয় বস্তুই আমি সুস্পষ্ট গ্রন্থে গুনে রেখেছি”। [সূরা ইয়াসীনঃ ১২] এখানেও ﴿اِمَامٍ مُّبِيْنٍ﴾ বলে সুস্পষ্ট গ্রন্থ বুঝানো হয়েছে। তাই এ আয়াতেও তাদের বিচারের জন্য তাদের আমলনামার গ্রন্থ হাযির করার কথা বলাই উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। [ইবন কাসীর] এ অর্থের সমর্থনে কুরআনের আরো কিছু আয়াত প্রমাণ বহন করছে। [যেমনঃ সূরা কাহাফঃ৪৯, আল-জাসিয়াঃ ২৮,২৯, আয-যুমারঃ৬৯, আন-নিসাঃ ৪১]
আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও মুজাহিদ থেকে এখানে ইমাম শব্দের অর্থ নেতাও বর্ণিত রয়েছে। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার নেতার নাম দ্বারা ডাকা হবে এবং সবাইকে এক জায়গায় জমায়েত করা হবে। উদাহরণতঃ ইবরাহীম আলাইহিস সালামের অনুসারী দল, মুসা আলাইহিস সালামের অনুসারী দল, ঈসা আলাইহিস সালামের অনুসারী দল এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারী দল। এ প্রসঙ্গে এসব অনুসারীর প্রত্যেক নেতাদের নাম নেয়াও সম্ভবপর। [ফাতহুল কাদীর] এ অর্থের সপক্ষে আরো প্রমাণ হলো, আল্লাহ্‌র বাণীঃ “প্রত্যেক জাতির জন্য আছে একজন রাসূল এবং যখন ওদের রাসূল আসবে তখন ন্যায়বিচারের সাথে ওদের মীমাংসা করে দেয়া হবে এবং ওদের প্রতি যুলুম করা হবে না ।” [সূরা ইউনুসঃ৪৭] তাছাড়া একই অর্থে কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আরো আয়াত এসেছে। [যেমন সূরা আন-নিসাঃ ৪১, আন-নাহলঃ ৮৪, ৮৯, আল-হাজ্বঃ ৭৮, আল-কাসাসঃ ৭৫, আয-যুমারঃ ৬৯] কোন কোন সালফে সালেহীন বলেন, এ আয়াত দ্বারা হাদীসের প্রকৃত অনুসারীদের সর্বোচ্চ মর্যাদা প্রমাণিত হয়। কারণ তাদের নেতা হলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

فَتِيۡلًا ۝٧١

ডান হাতে তাদের ‘আমলনামা দেয়া হবে, তারা তাদের ‘আমলনামা পড়বে এবং তাদের উপর সামান্য পরিমাণও যুলুম করা হবে না ।

وَمَنۡ كَانَ فِىۡ هٰذِهٖۤ اَعۡمٰى فَهُوَ فِى الۡاٰخِرَةِ اَعۡمٰى

৭২. আর যে ব্যক্তি এখানে অন্ধ[১] সে আখিরাতেও অন্ধ[২] এবং সবচেয়ে

তবে আয়াতের পরবর্তী অংশ অর্থ থেকে বুঝা যায় যে, এখানে إمام বলতে গ্রন্থই বুঝানো হয়েছে। ইবন কাসীর এ মতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। কারণ পরবর্তী অংশে বলা হয়েছে, “যাদের ডান হাতে তাদের ‘আমলনামা দেয়া হবে, তারা তাদের ‘আমলনামা পড়বে এবং তাদের উপর সামান্য পরিমাণও যুলুম করা হবে না” । অনুরূপভাবে অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, “তখন যাকে তার ‘আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে, সে বলবে, ‘লও, আমার ‘আমলনামা পড়ে দেখ; ‘আমি জানতাম যে, আমাকে আমার হিসেবের সম্মুখীন হতে হবে ।’ [সূরা আল-হাক্কাহঃ ১৯-২০] । আর কাফেরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, “কিন্তু যার ‘আমলনামা তার বাম হাতে দেয়া হবে, সে বলবে, ‘হায়! আমাকে যদি দেয়াই না হত আমার ‘আমলনামা, ‘এবং আমি যদি না জানতাম আমার হিসেব!”[সূরা আল-হাক্কাহঃ ২৫-২৬] যদিও মূলতঃ উভয় তাফসীরের মধ্যে কোন বিরোধ নেই । কারণ, তাদের আমলনামার উপর সাক্ষীস্বরূপ প্রত্যেক উম্মতের নবীদেরকে হাজির করা হবে । তারা সেগুলোর সত্যায়ন করবে । [ইবন কাসীর]

(১) এখানে অন্ধ বলে বাহ্যিক অন্ধদের বুঝানো হয়নি । বরং যাদের মন হক্ক বুঝার ক্ষেত্রে, আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী দেখার ক্ষেত্রে অন্ধত্ব গ্রহণ করেছে । হক্ক মানতে চায়না এবং নিদর্শনাবলী দেখতে চায়না এমন প্রকৃত অন্ধদেরকে উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে । অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, “তারা কি দেশ ভ্রমণ করেনি? তাহলে তারা জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন হৃদয় ও শ্রুতিশক্তিসম্পন্ন শ্রবণের অধিকারী হতে পারত । বস্তুত চোখ তো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হচ্ছে বুকের মধ্যে অবস্থিত হৃদয় ।” [সূরা আল-হাজ্বঃ ৪৬] পক্ষান্তরে দুনিয়ার জীবনে যারা অন্ধ তারা যদি ঈমানদার হয় এবং সৎকাজ করে ও ধৈর্যধারণ করে তবে তাদের ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে প্রশংসা বাণী এসেছে । কুরআনে বলা হয়েছে, “তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন । কারণ তার কাছে অন্ধ লোকটি আসল । আপনি কেমন করে জানবেন---সে হয়ত পরিশুদ্ধ হত, অথবা উপদেশ গ্রহণ করত, ফলে উপদেশ তার উপকারে আসত ।” [সূরা আবাসাঃ ১-৩] অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসেও ঐ সমস্ত লোকদের ব্যাপারে জান্নাতের সুসংবাদ জানানো হয়েছে যারা অন্ধ হয়ে যাবার পর ধৈর্যধারণ করেছে ।

(২) এখানে বলা হয়েছে যে, তারা আখেরাতে অন্ধ হবে । আখেরাতে তাদের অন্ধত্বের ধরণ সম্পর্কে দু’টি মত রয়েছে । এক, তারা বাস্তবিকই শারীরিকভাবে অন্ধ হিসেবে

وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٧٢﴾

বেশী পথভ্রষ্ট ।

وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ ۖ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا ﴿٧٣﴾

৭৩. আর আমরা আপনার প্রতি যা ওহী করেছি তা থেকে ওরা আপনাকে পদস্খলন ঘটাবার চেষ্টা প্রায় চুড়ান্ত করেছিল, যাতে আপনি আমাদের উপর সেটার বিপরীত মিথ্যা রটাতে পারেন[১]; আর নিঃসন্দেহে তখন তারা আপনাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত ।

وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا

৭৪. আর আমরা আপনাকে অবিচলিত না রাখলে আপনি অবশ্যই তাদের দিকে

হাশরের মাঠে উঠবে । এ অর্থের সমর্থনে কুরআনের অন্যত্র এসেছে, "যে আমার স্মরণে বিমুখ থাকবে, অবশ্যই তার জীবন-যাপন হবে সংকুচিত এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন উত্থিত করব অন্ধ অবস্থায় ।"[ত্বা-হাঃ ১২৪] আরো এসেছে, "কিয়ামতের দিন আমি তাদেরকে সমবেত করব তাদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায় অন্ধ, মূক ও বধির করে [সূরা আল-ইসরাঃ ৯৭] দুই, এ ছাড়া আয়াতের আরেক অর্থ করা হয়ে থাকে যে, তারা কিয়ামতের দিন তাদের দুনিয়ার জীবনে যে সমস্ত দলীল-প্রমাণাদি ব্যবহার করে হক্ক পথ থেকে দূরে থাকে, সে সব থেকে তাদেরকে অন্ধ করে উঠানো হবে । মুজাহিদ রাহেমাহুল্লাহ এ অর্থ গ্রহণ করেছেন । [ইবন কাসীর]

(১) কাফেররা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে সমস্ত প্রস্তাব দিত তন্মধ্যে এক বিশেষ প্রস্তাব ছিল যে, আপনি এ কুরআন বাদ দিয়ে ভিন্নধর্মী কিছু নিয়ে আসুন যা আমাদের মনঃপুত হবে । কিন্তু একজন নবীর পক্ষে কিভাবে ওহী ব্যতিত অন্য কিছু আনা সম্ভব হতে পারে? তিনি যদি তা করেন তবে হয়ত তারা তাকে বন্ধু বানাবে কিন্তু আল্লাহ্ কি তাকে এভাবেই ছেড়ে দিবেন? অবশ্যই না । আল্লাহ্ অন্যত্র বলেছেন, "তিনি যদি আমার নামে কোন কথা রচনা করে চালাতে চেষ্টা করতেন, আমি অবশ্যই ডান হাতে ধরে ফেলতাম, এবং কেটে দিতাম তার জীবন-ধমনী ।"[সূরা আল-হাক্কাহঃ ৪৪-৪৬] সুতরাং নবীর পক্ষে ওহী ব্যতীত কিছু বলা সম্ভব নয় । আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন, "যখন আমার আয়াত, যা সুস্পষ্ট, তাদের কাছে পাঠ করা হয় তখন যারা আমার সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না তারা বলে, 'অন্য এক কুরআন আন এটা ছাড়া, বা এটাকে বদলাও ।' বলুন, 'নিজ থেকে এটা বদলান আমার কাজ নয় । আমার প্রতি যা ওহী হয়, আমি শুধু তারই অনুসরণ করি । আমি আমার রবের অবাধ্যতা করলে অবশ্যই মহাদিনের শাস্তির আশংকা করি ।" [সূরা ইউনুসঃ ১৫] তাই একজন সত্য নবীর পক্ষে কক্ষনো নিজ থেকে বানিয়ে কিছু বলা সম্ভব নয় ।

قَلِيلًا ﴿٧٤﴾

প্রায় কিছুটা ঝুঁকে পড়তেন[১];

إِذًا لَّأَذَقْنَٰكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوٰةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿٧٥﴾

৭৫. তাহলে অবশ্যই আমরা আপনাকে ইহজীবনে দ্বিগুণ ও পরজীবনে দ্বিগুণ শাস্তি আস্বাদন করাতাম; তখন আমাদের বিরুদ্ধে আপনার জন্য কোন সাহায্যকারী পেতেন না[২] ।

وَإِن كَادُوا۟ لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا ۖ وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَٰفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٧٦﴾

৭৬. আর তারা আপনাকে দেশ থেকে উৎখাত করার চূড়ান্ত চেষ্টা করেছিল, আপনাকে সেখান থেকে বহিস্কার করার জন্য; তাহলে আপনার পর তারাও সেখানে অল্পকাল টিকে

(১) অর্থাৎ যদি অসম্ভবকে ধরে নেয়ার পর্যায়ে আপনি তাদের ভ্রান্ত কার্যক্রমের দিকে ঝুঁকে পড়ার কাছাকাছি হয়ে যেতেন, তবে আপনার শাস্তি দুনিয়াতেও দ্বিগুণ হত এবং মৃত্যুর পর কবর অথবা আখেরাতেও দ্বিগুণ হত । কেননা, নৈকট্যশীলদের মামুলী ভ্রান্তিকেও বিরাট মনে করা হয় । এ বিষয়বস্তুর প্রায় অনুরূপ, যা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর পত্নীদের সম্পর্কে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে "হে নবী পত্নীরা, যদি তোমাদের মধ্যে কেউ প্রকাশ্যে নির্লজ্জ কাজ করে, তবে তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেয়া হবে ।" [সূরা আল-আহযাবঃ৩০]

(২) এ সমগ্র কার্যবিবরণীর উপর মন্তব্য প্রসংগে আল্লাহ দু'টি কথা বলেছেন । এক, যদি আপনি সত্যকে জানার পর মিথ্যার সাথে কোন আপোস করে নিতেন তাহলে বিক্ষুব্ধ জাতি আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যেতো ঠিকই কিন্তু আল্লাহর গযব তোমার উপর নেমে পড়ত এবং আপনাকে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানেই দ্বিগুণ সাজা দেয়া হতো । দুই, মানুষ নবী হলেও আল্লাহর সাহায্য ও সুযোগ-সুবিধা তার সহযোগী না হলে শুধুমাত্র নিজের শক্তির উপর নির্ভর করে সে মিথ্যার তুফানের মোকাবিলা করতে পারে না । শুধুমাত্র আল্লাহ প্রদত্ত ধৈর্য ও অবিচলতার সাহায্যেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্য ও ন্যায়ের উপর পাহাড়ের মতো অটল থাকেন এবং বিপদের সয়লাব স্রোত তাকে একচুলও স্থানচ্যুত করতে পারেনি । তিনিই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন, দৃঢ়পদ রেখেছেন, হেফাযত করেছেন, অপরাধী ও দুষ্ট লোকদের ক্ষতি থেকে নিরাপদ করেছেন । আর তিনিই তার যাবতীয় কাজের দায়িত্ব নিচ্ছেন । তিনিই তাকে জয়ী করবেন । তিনি তাকে কারও কাছে তাঁর কোন বান্দার কাছে সোপর্দ করবেন না । তার দ্বীনকে তিনি তার বিরোধী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শক্তির পরাজিত করার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করবেন । [ইবন কাসীর]

থাকত[১]।

৭৭. আমাদের রাসূলদের মধ্যে আপনার আগে যাদেরকে পাঠিয়েছিলাম তাদের ক্ষেত্রেও ছিল এরূপ নিয়ম এবং আপনি আমাদের নিয়মের কোন পরিবর্তন পাবেন না[২]।

سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ﴿٧٧﴾

নবম রুকূ'

৭৮. সূর্য হেলে পড়ার পর থেকে রাতের ঘন অন্ধকার পর্যন্ত সালাত কায়েম করুন[৩]

أَقِمِ الصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْءَانَ

(১) এটি একটি সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী। সে সময় এটি তো নিছক একটি হুমকি মনে হচ্ছিল। কিন্তু দশ বারো বছরের মধ্যেই এর সত্যতা অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ হয়ে গেলো। এ সূরা নাযিলের দেড় বছর পর মক্কার কাফেররা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিজের জন্মভূমি থেকে বের হয়ে যেতে বাধ্য করলো। তারপর বদরের যুদ্ধে মক্কার কাফেরদের চরম বিপর্যয় ঘটলো, তাদের নেতারা মারা গেল [ইবন কাসীর] তারপর ৮ বছরের বেশী সময় অতিবাহিত হতে না হতেই তিনি বিজয়ীর বেশে মক্কা মুয়ায্যামায় প্রবেশ করলেন। তারপর দু'বছরের মধ্যেই সমগ্র আরব ভূখণ্ড মুশরিক শূন্য করা হলো। এরপর যারাই এ দেশে বসবাস করেছে মুসলিম হিসেবেই বসবাস করেছে, মুশরিক হিসেবে কেউ সেখানে টিকতে পারেনি।

(২) সকল নবীর ব্যাপারে আল্লাহ এ একই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। অর্থাৎ যে জাতি তাদেরকে হত্যা ও দেশান্তরী করেছে, তারপর সে আর বেশীদিন স্বস্থানে অবস্থান করতে পারেনি। এরপর হয় আল্লাহর আযাব তাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। যদি আল্লাহ্র রাসূল তাদের জন্য রহমতস্বরূপ না আসতেন তবে তাদের উপর এমন আযাব আসত যার মোকাবিলা করা তাদের কারও পক্ষে সম্ভব হতো না। [ইবন কাসীর]

(৩) আলোচ্য আয়াতসমূহে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সময় মত সালাত কায়েম করার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। [ইবন কাসীর] পূর্বের আয়াতসমূহে আল্লাহ্ সংক্রান্ত আকীদা, আখেরাতের জন্য পুনরুত্থান ও প্রতিফল বিষয়াদি বর্ণিত হয়েছে। এখানে সবচেয়ে উত্তম ইবাদাত সম্পর্কে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। [ফাতহুল কাদীর] পর্বত সমান সমস্যা ও সংকটের আলোচনা করার পর পরই সালাত কায়েম করার হুকুম দেয়ার মাধ্যমে মহান সর্বশক্তিমান আল্লাহ এ মর্মে একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত করেছেন যে, এ অবস্থায় একজন মুমিনের জন্য যে অবিচলতার প্রয়োজন হয় তা সালাত কায়েমের মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে। শত্রুদের দুরভিসন্ধি ও উৎপীড়ন থেকে আত্মরক্ষার উত্তম প্রতিকার হচ্ছে সালাত কায়েম করা। সূরা হিজরের আয়াতে আরও স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছেঃ "আমি জানি যে, কাফেরদের পীড়াদায়ক কথাবার্তা শুনে

এবং ফজরের সালাত[১]। নিশ্চয় | الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿٧٨﴾

আপনার অন্তর সংকুচিত হয়ে যায়। অতএব আপনি আপনার পালনকর্তার প্রশংসা দ্বারা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন এবং সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান।" [৯৭-৯৮] এ আয়াতে আল্লাহ্‌র যিকর, প্রশংসা, তসবীহ্‌ ও সালাতে মশগুল হয়ে যাওয়াকে শত্রুদের উৎপীড়নের প্রতিকার সাব্যস্ত করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র যিকর ও সালাত বিশেষভাবে এ থেকে আত্মরক্ষার প্রতিকার। এ ব্যাখ্যাও অবাস্তব নয় যে, শত্রুদের উৎপীড়ন থেকে আত্মরক্ষা করা আল্লাহ্‌র সাহায্যের উপর নির্ভরশীল এবং আল্লাহ্‌র সাহায্য লাভ করার উত্তম পন্থা হচ্ছে সালাত। যেমন কুরআন পাক বলেঃ "সবর ও সালাত দ্বারা সাহায্য প্রার্থনা কর।" [সূরা আল-বাকারাহঃ ৪৫]

(১) আয়াতে قرآن শব্দ এসেছে, যার অর্থঃ পড়া। আরও এসেছে فجر শব্দ, 'ফজর' শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, ভোর হওয়া বা প্রভাতের উদয় হওয়া। অর্থাৎ একেবারে সেই প্রথম লগ্নটি যখন প্রভাতের শুভ্রতা রাতের আঁধার চিরে উঁকি দিতে থাকে। তাই এ শব্দদ্বয়ের অর্থ দাঁড়ায়, ফজরের কুরআন পাঠ। কুরআন মজীদে সালাতের প্রতিশব্দ হিসেবে সালাতের বিভিন্ন অংশের মধ্য থেকে কোন একটির নাম নিয়ে সমগ্র সালাতটি ধরা হয়েছে। যেমন তাসবীহ, যিকির, হাম্‌দ(প্রশংসা), কিয়াম (দাঁড়ানো) রুকূ, সিজদাহ ইত্যাদি। এখানে قرآن শব্দ বলে সালাত বোঝানো হয়েছে। কেননা, কুরআন পাঠ নামাযের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। কাজেই আয়াতের দ্বারা ফজরের সালাতকেই বুঝানো হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর]

অধিকাংশ তাফসীরবিদদের মতে এ আয়াতটি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্যে একটি পূর্ণাঙ্গ নির্দেশ। কেননা, دلوك শব্দের অর্থ আসলে ঝুঁকে পড়া। সূর্যের ঝুঁকে পড়া তখন শুরু হয়, যখন সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ে, সূর্যাস্তকেও دلوك বলা যায়। কিন্তু অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ীগণ এস্থলে শব্দের অর্থ সূর্যের ঢলে পড়াই নিয়েছেন। আর غسق শব্দের অর্থ রাত্রির অন্ধকার সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়া। এভাবে ﴿لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ﴾ এর মধ্যে চারটি সালাত এসে গেছেঃ যোহর, আসর, মাগরিব ও এশা। এর পরবর্তী বর্ণনা ﴿قُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ দ্বারা ফজরের সালাতকে বুঝানো হয়েছে। এ আয়াতে সংক্ষেপে মি'রাজের সময় যে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করা হয়েছিল তার সময়গুলো কিভাবে সংগঠিত ও বিন্যস্ত করা হবে তা বলা হয়েছে। নির্দেশ দেয়া হয়েছে, একটি সালাত পড়ে নিতে হবে সূর্যোদয়ের আগে। আর বাকি চারটি সালাত সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে নিয়ে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত পড়ে নিতে হবে। তারপর এ হুকুমটি ব্যাখ্যা করার জন্য জিবরীল আলাইহিস সালামকে পাঠানো হয়েছে। তিনি এসে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নামাযগুলোর সঠিক সময়ের শিক্ষা দান করেছেন। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "জিবরীল দু'বার আমাকে বায়তুল্লাহর কাছাকাছি জায়গায় সালাত পড়ান। প্রথম দিন যোহরের সালাত ঠিক এমন সময় পড়ান যখন সূর্য সবেমাত্র হেলে পড়েছিল এবং ছায়া জুতার একটি ফিতার চাইতে

ফজরের সালাত উপস্থিতির সময়[১]।

বেশী লম্বা হয়নি। তারপর আসরের সালাত পড়ান এমন এক সময় যখন প্রত্যেক জিনিসের ছায়া তার দৈর্ঘ্যের সমপরিমাণ ছিল। এরপর মাগরিবের সালাত এমন সময় পড়ান যখন রোযাদার রোযার ইফতার করে। তারপর পশ্চিমাকাশের লালিমা খতম হবার পরপরই এশার সালাত পড়ান আর ফজরের সালাত পড়ান ঠিক যখন রোযাদারের উপর খাওয়া দাওয়া হারাম হয়ে যায় তেমনি সময়। দ্বিতীয় দিন তিনি আমাকে যোহরের সালাত এমন সময় পড়ান যখন প্রত্যেক জিনিসের ছায়া তার দৈর্ঘ্যের সমান ছিল। আসরের সালাত পড়ান এমন সময় যখন প্রত্যেক জিনিসের ছায়া তার দৈর্ঘের দ্বিগুণ ছিল। মাগরিবের সালাত পড়ান এমন সময় যখন সাওমপালনকারী সাওমের ইফতার করে। এশার সালাত পড়ান এমন সময় যখন রাতের তিনভাগের একভাগ অতিক্রান্ত হয়ে গেছে এবং ফজরের সালাত পড়ান আলো চারদিকে ভালভাবে ছড়িয়ে পড়ার পর। তারপর জিব্রীল আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেন, যে মুহাম্মাদ! এই হচ্ছে নবীদের সালাত আদায়ের সময় এবং এ দু'টি সময়ের মাঝখানেই হচ্ছে সালাতের সঠিক সময়।" [তিরমিযীঃ ১৫৯, আবুদাউদঃ ৩৯৩]

কুরআন মজীদের বিভিন্ন জায়গায়ও পাঁচ সালাতের এ ওয়াক্তসমূহের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। যেমন সূরা হূদে বলা হয়েছেঃ "সালাত কায়েম করো দিনের দুই প্রান্তে (অর্থাৎ ফজর ও মাগরিব) এবং কিছু রাত পার হয়ে গেলে (অর্থাৎ এশা)। [১১৪] সূরা 'ত্বা-হা'য়ে বলা হয়েছেঃ "আর নিজের রবের হাম্‌দ (প্রশংসা) সহকারে তাঁর তাসবীহ (পবিত্রতা বর্ণনা) করতে থাকো সূর্যোদয়ের পূর্বে (ফজর) ও সূর্যাস্তের পূর্বে (আসর) এবং রাতের সময় আবার তাসবীহ করো (এশা) আর দিনের প্রান্তসমূহে (অর্থাৎ সকাল, যোহর ও মাগরিব)" [১৩০] তারপর সূরা রূমে বলা হয়েছেঃ "কাজেই আল্লাহর তাসবীহ করো যখন তোমাদের সন্ধ্যা হয় (মাগরিব) এবং যখন সকাল হয় (ফজর)। তাঁরই জন্য প্রশংসা আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে এবং তাঁর তাসবীহ করো দিনের শেষ অংশে (আসর) এবং যখন তোমাদের দুপুর (যোহর) হয়।"[১৭-১৮] তবে যদিও আলোচ্য আয়াতসমূহে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের নির্দেশই সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে কিন্তু এর পূর্ণ তাফসীর ও ব্যাখ্যা কেবলমাত্র রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা ও কাজের মাধ্যমেই সাব্যস্ত হয়েছে। [ইবন কাসীর] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাখ্যা গ্রহণ না করা পর্যন্ত কোন ব্যক্তি সালাত আদায়ই করতে পারে না। জানি না, যারা কুরআনকে হাদীস ও রাসূলের বর্ণনা ছাড়াই বোঝার দাবী করে, তারা সালাত কিভাবে পড়ে? এমনিভাবে এ আয়াতে সালাতে কুরআন পাঠের কথাও সংক্ষেপে উল্লেখিত হয়েছে। এর বিবরণ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা ও কাজ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে।

(১) مشهود শব্দটি شهد ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ উপস্থিত হওয়া। হাদীসসমূহের বর্ণনা

৭৯. আর রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ[১] আদায় করুন, এটা আপনার জন্য অতিরিক্ত[২]। আশা করা যায় আপনার

وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰٓ اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا ۝

অনুযায়ী এ সময় দিবা-রাত্রির উভয় দল ফেরেশতা সালাতে উপস্থিত হয়। তাই একে مشهود বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "রাতের ফেরেশ্তা এবং দিনের ফেরেশ্তাগণ এ সময় উপস্থিত হয়।" [তিরমিযীঃ ৩১৩৫] অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "জামাতের সালাতের ফযীলত একাকী সালাতের চেয়ে পচিশ গুণ বেশী। রাতের ফেরেশ্তা এবং দিনের ফেরেশ্তাগণ ফজরের সালাতে একত্রিত হন।" [বুখারীঃ ৬৪৮, মুসলিমঃ ৬৪৯]

(১) تهجد শব্দটি নিদ্রা যাওয়া ও জাগ্রত হওয়া এই পরস্পর বিরোধী দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। [ফাতহুল কাদীর] আয়াতের অর্থ এই যে, রাত্রির কিছু অংশে কুরআন পাঠসহ জাগ্রত থাকুন। কেননা بـ এর সর্বনাম দ্বারা কুরআন বোঝানো হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর] আর কুরআন পাঠসহ জাগ্রত থাকার অর্থ সালাত পড়া। এ কারণেই শরী'আতের পরিভাষায় রাত্রিকালীন সালাতকে "তাহাজ্জুদ" বলা হয়। সাধারণতঃ এর অর্থ, এরূপ নেয়া হয় যে কিছুক্ষণ নিদ্রা যাওয়ার পর যে সালাত পড়া হয় তাই তাহাজ্জুদের সালাত। হাসান বসরী বলেনঃ এশার পরে পড়া হয় এমন প্রত্যেক সালাতকে তাহাজ্জুদ বলা যায়। [ইবন কাসীর] তবে প্রচলিত পদ্ধতির কারণে কিছুক্ষণ নিদ্রা যাওয়ার পর পড়ার অর্থেই অনেকে তাহাজ্জুদ বুঝে থাকেন। সাধারণতঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম শেষ রাত্রে জাগ্রত হয়ে তাহাজ্জুদের সালাত পড়তেন। তাই এভাবে পড়াই উত্তম হবে। তাহাজ্জুদের সালাতের ব্যাপারে বহু হাদীসে অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। এক হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "রমযানের সাওমের পর সবচেয়ে উত্তম হলো আল্লাহ্র মাস মুহররামের সাওম আর ফরয সালাতের পর সবচেয়ে উত্তম সালাত হলো, রাতের সালাত"। [মুসলিমঃ ১১৬৩]

(২) نافلة শব্দের আভিধানিক অর্থ অতিরিক্ত। এ কারণেই যেসব সালাত, দান-সদকা ওয়াজিব ও জরুরী নয়- করলে সওয়াব পাওয়া যায় এবং না করলে গোনাহ্ নাই, সেগুলোকে নফল বলা হয়। আয়াতে নামাযে তাহাজ্জুদের সাথে نافلة শব্দ সংযুক্ত হওয়ায় এটাই বোঝা যায় যে, তাহাজ্জুদের সালাত বিশেষভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর জন্যে নফল। অথচ সমগ্র উম্মতের জন্যেও নফল। এজন্যেই কোন কোন তফসীরবিদ এখানে نافلة শব্দটিকে উম্মতের ওপর তো শুধু পাঁচ ওয়াক্ত সালাতই ফরয; কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর উপর তাহাজ্জুদও একটি অতিরিক্ত ফরয। অতএব, এখানে نافلة শব্দের অর্থ অতিরিক্ত ফরয। নফলের সাধারণ অর্থে নয়। [তাবারী] আবার কোন কোন মুফাসসির

রব আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে[১]।

বলেন, এখানে نافلة শব্দটি তার সাধারণ অর্থ অতিরিক্ত অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে, তখন অর্থ হবেঃ আপনার যাবতীয় পূর্ব ও পরের গুণাহ মাফ হয়ে যাওয়ার কারণে আপনার জন্য তাহাজ্জুদের সালাত অতিরিক্তই রয়ে গেল। [ইবন কাসীর] আপনার উম্মাতের জন্য সেটার প্রয়োজনীয়তা হলো, গোনাহ্ মাফ পাওয়া। কিন্তু আপনার জন্য তা মর্যাদা বৃদ্ধি কারক। কিন্তু নফল হওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদ ত্যাগ করতেন না। এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন যে, أَفَلا أَكُونُ عَبْداً شَكُوراً অর্থাৎ 'আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না?' [মুসলিমঃ ২৮১৯]

(১) আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাকামে মাহমুদের ওয়াদা দেয়া হয়েছে। মাকামে মাহমূদ শব্দদ্বয়ের অর্থ, প্রশংসনীয় স্থান। এই মাকাম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যেই বিশেষভাবে নির্দিষ্ট-অন্য কোন নবীর জন্যে নয়। এর তাফসীর প্রসঙ্গে বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। সহীহ্ হাদীস সমূহে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে যে, এ হচ্ছে "বড় শাফা'আতের মাকাম"। [ফাতহুল কাদীর] হাশরের ময়দানে যখন সমগ্র মানব জাতি একত্রিত হবে এবং প্রত্যেক নবীর কাছেই শাফাআতের দরখাস্ত করবে, তখন সব নবীই শাফা'আত করতে অপারগতা প্রকাশ করবেন। তখন কেবল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই সমগ্র মানবজাতির জন্যে শাফাআত করবেন। এ সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ কিয়ামতের দিন লোকেরা দলে দলে বিভক্ত হবে। প্রত্যেক উম্মত তার নিজের নবীর কাছে যাবে। তারা বলবে, হে অমুক (নবী)! আল্লাহ্র কাছে আমাদের জন্য শাফা'আত করুন। হে অমুক (নবী)! আল্লাহ্র কাছে আমাদের জন্য শাফা'আত করুন। (কিন্তু তারা কেউ শাফা'আত করতে রাযী হবেন না)। শেষ পর্যন্ত শাফা'আতের দায়িত্ব এসে পড়বে নবী (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর। আর এই দিনেই আল্লাহ্ তাকে মাকামে মাহমূদে দাঁড় করাবেন। [বুখারীঃ ৪৭১৮] অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি আযান শুনার পর বলবে "আল্লাহুম্মা রাব্বা হাযিহিদ্ দাওয়াতিত্ তাম্মাতি ওয়াস সালাতিল কায়েমাহ, আতি মুহাম্মাদানিল ওয়াসিলাতা ওয়াল ফাদীলাহ ওয়াব'আসহু মাকামাম্ মাহমূদানিল্লাযী ওয়াদ্তাহু" তার জন্য আমার শাফা'আত হালাল হয়ে যাবে। [বুখারীঃ৪৭১৯] অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত তিনি এ আয়াতে مَقَامٌ مَحْمُود "মাকামে মাহমূদ তথা প্রশংসিত স্থান" সম্পর্কে বলেছেনঃ "এটা সে স্থান যেখান থেকে আমি আমার উম্মাতের জন্য শাফা'আত করব।" [মুসনাদে আহমাদঃ ২/৪৪১, ৫২৮]

وَقُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّىْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ﴿٨٠﴾

৮০. আর বলুন, 'হে আমার রব! আমাকে প্রবেশ করান সত্যতার সাথে এবং আমাকে বের করান সত্যতার সাথে[১] এবং আপনার কাছ থেকে আমাকে দান করুন সাহায্যকারী শক্তি।'

وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ﴿٨١﴾

৮১. আর বলুন, 'হক এসেছে ও বাতিল বিলুপ্ত হয়েছে;' নিশ্চয় বাতিল বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল[২]।

(১) উপরোক্ত অনুবাদটি বাগভীর অনুকরণে করা হয়েছে। অন্য অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্র সন্তোষ যেভাবে হয় সেভাবে প্রবেশ করানো এবং আল্লাহ্র সন্তোষ যাতে রয়েছে সেভাবে বের করা। মূলত: مدخل ও مخرج এর অর্থ প্রবেশ করার স্থান ও বহির্গমনের স্থান। উভয়ের সাথে صدق বিশ্লেষণ যুক্ত হওয়ার অর্থ এই যে, এই প্রবেশ ও বহির্গমন সব আল্লাহ্র ইচ্ছানুযায়ী উত্তম পন্থায় হোক। কেননা, আরবী ভাষায় صدق এমন কাজের জন্যে ব্যবহৃত হয়, যা বাহ্যতঃ ও আভ্যন্তরীন উভয় দিক দিয়ে সঠিক ও উত্তম হবে। কোন কোন মুফাসসির বলেনঃ এখানে 'প্রবেশ করার স্থান' বলে মদীনা এবং 'বহির্গমনের স্থান' বলে মক্কা বোঝানো হয়েছে। [তাবারী] উদ্দেশ্য এই যে, হে আল্লাহ্, মদীনায় আমার প্রবেশ উত্তমভাবে সম্পন্ন হোক। সেখানে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা যেন না ঘটে এবং মক্কা থেকে আমার বের হওয়া উত্তমভাবে সম্পন্ন হোক। এই তাফসীরটি অনেক তাবেয়ীন থেকে বর্ণিত হয়েছে।

(২) এ আয়াতটি হিজরতের পর মক্কা বিজয়ের সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উচ্চারণ করেছিলেন। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন বায়তুল্লাহ্র চতুর্পার্শ্বে তিনশ ষাটটি মূর্তি স্থাপিত ছিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সেখানে পৌঁছেন, তখন তাঁর মুখে এ আয়াতটি উচ্চারিত হচ্ছিল, এবং তিনি স্বীয় ছড়ি দ্বারা প্রত্যেক মূর্তির বক্ষে আঘাত করে যাচ্ছিলেন। [বুখারীঃ ২৪৭৮, ৪৭২০, মুসলিমঃ ১৭৮১] সুতরাং সত্য প্রতিষ্ঠিত হলে মিথ্যা অপসৃত হবেই। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "কিন্তু আমি সত্য দ্বারা আঘাত হানি মিথ্যার উপর; ফলে তা মিথ্যাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় এবং তৎক্ষণাৎ মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। [সূরা আল-আম্বিয়াঃ ১৮] আরো বলেন, "বলুন, 'সত্য এসেছে এবং অসত্য না পারে নূতন কিছু সৃজন করতে, আর না পারে পুনরাবৃত্তি করতে।' [সূরা সাবাঃ ৪৯] আরো বলেনঃ "আল্লাহ্ মিথ্যাকে মুছে দেন এবং নিজ বাণী দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। অন্তরে যা আছে সে বিষয়ে তিনি তো সবিশেষ অবহিত।" [সূরা আশ-শূরাঃ ২৪]

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۙ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿٨٢﴾

৮২. আর আমরা নাযিল করি কুরআন, যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত[১], কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে[২]।

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ ۖ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا ﴿٨٣﴾

৮৩. আর আমরা যখন মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করি তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও দূরে সরে যায়। আর যখন তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে তখন সে একেবারে হতাশ হয়ে পড়ে।

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿٨٤﴾

৮৪. বলুন, ‘প্রত্যেকেই নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী কাজ করে থাকে এবং আপনার রব সম্যক অবগত আছেন চলার পথে কে সবচেয়ে নির্ভুল।’

দশম রুকূ’

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۖ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي

৮৫. আর আপনাকে তারা রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে[৩]। বলুন, ‘রূহ আমার রবের

(১) কুরআন যে অন্তরের ঔষধ এবং শির্ক, কুচরিত্র ও আত্মিক রোগসমূহ থেকে মনের মুক্তিদাতা, এটা সর্বজনস্বীকৃত সত্য। মুমিনরা এর দ্বারা উপকৃত হয় আর কাফেররা এর দ্বারা উপকৃত হতে পারে না।

(২) অর্থাৎ যারা এ কুরআনকে নিজেদের পথ প্রদর্শক হিসেবে গ্রহণ করে, তাদের জন্য তা নিরাময়। কিন্তু যেসব যালেম একে প্রত্যাখ্যান করে এবং এর পথ নির্দেশনা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, এ কুরআন তাদেরকে আরো বেশী ক্ষতির মধ্যে ঠেলে দেয়। একথাটিই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি ছোট্ট তাৎপর্যবহ বাক্যের মধ্যে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেনঃ কুরআন হয় তোমার সপক্ষে প্রমাণ আর নয়তো তোমার বিপক্ষে প্রমাণ। [মুসলিমঃ ২২৩]

(৩) এ আয়াতে রূহ্ সম্পর্কে কাফেরদের পক্ষ থেকে একটি প্রশ্ন এবং আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে এর জওয়াব উল্লেখিত হয়েছে। রূহ্ শব্দটি অভিধান, বাকপদ্ধতি এবং কুরআনে একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত অর্থ তাই, যা এ শব্দ থেকে সাধারণভাবে বোঝা যায়। অর্থাৎ - প্রাণ যার বদৌলতে জীবন কায়েম রয়েছে। কুরআন পাকের এ শব্দটি জিবরাঈলের জন্যেও ব্যবহৃত হয়েছে যেমন, ﴿فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾ “তারপর আমরা তার কাছে আমাদের রূহকে

পাঠালাম, সে তার কাছে পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল।" [মারইয়ামঃ ১৭] এবং ঈসা আলাইহিস সালাম এর জন্যেও কয়েক আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে। এমন কি স্বয়ং কুরআনও ওহীকে রূহ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। যেমন-﴿وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ۚ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ "এভাবে আমি আপনার প্রতি ওহী করেছি রূহ তথা আমার নির্দেশ; আপনি তো জানতেন না কিতাব কি এবং ঈমান কি! পক্ষান্তরে আমি এটাকে করেছি আলো যা দ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছে পথনির্দেশ করি; আপনি তো দেখান শুধু সরল পথ"। [সূরা আস-শূরাঃ ৫২] কিন্তু এখানে রূহ বলে কি বোঝানো হয়েছে? কোন কোন তফসীরবিদ বর্ণনার পূর্বাপর ধারার প্রতি লক্ষ্য করে প্রশ্নটি ওহী, কুরআন অথবা ওহীবাহক ফেরেশতা জিবরাঈল সম্পর্কে সাব্যস্ত করেছেন। কেননা, এর পূর্বেও ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ﴾ অর্থাৎ ৮২ নং আয়াতে এ কুরআনের উল্লেখ ছিল এবং পরবর্তী আয়াতসমূহেও আবার ওহী ও কুরআনের উল্লেখ রয়েছে। এর সাথে মিল রেখে তারা বুঝেছেন যে, এ প্রশ্নেও রূহ বলে ওহী, কুরআন অথবা জিবরাঈলকেই বোঝানো হয়েছে। প্রশ্নের উদ্দেশ্য এই যে, আপনার প্রতি ওহী কিভাবে আসে? কে আনে? কুরআন এর উত্তরে শুধু এতটুকু বলেছে যে, আল্লাহ্‌র নির্দেশে ওহী আসে। ওহীর পূর্ণ বিবরণ ও অবস্থা বলা হয়নি। [ফাতহুল কাদীর]

কিন্তু যেসব সহীহ্ হাদীসে এ আয়াতের শানে-নূযুল বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলোতে প্রায় পরিষ্কার করেই বলা হয়েছে যে, প্রশ্নকারীরা প্রাণীর মধ্যস্থিত রূহ সম্পর্কেই প্রশ্ন করেছিল এবং রূহের স্বরূপ অবগত হওয়াই প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল। অর্থাৎ রূহ কি? মানবদেহে রূহ কিভাবে আগমন করে? কিভাবে এর দ্বারা জীবজন্তু ও মানুষ জীবিত হয়ে যায়? আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ আমি একদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মদীনার জনবসতিহীন এলাকায় পথ অতিক্রম করেছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে খর্জুর ডালের একটি ছড়ি ছিল। তিনি কয়েকজন ইহুদীর কাছ দিয়ে গমন করছিলেন। তারা পরস্পরে বলাবলি করছিলঃ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করছেন। তাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর। অপর কয়েকজন নিষেধ করল। কিন্তু কয়েকজন ইহুদী প্রশ্ন করেই বসল। প্রশ্ন শুনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছড়িতে ভর দিয়ে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে গেলেন। আমি অনুমান করলাম যে, তাঁর প্রতি ওহী নাযিল হবে। কিছুক্ষণ পর ওহী নাযিল হলে তিনি এ আয়াত পাঠ করে শোনালেনঃ ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۖ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ তখন তারা পরস্পর বলল, তোমাদেরকে নিষেধ করিনি যে, তাকে প্রশ্ন করো না? [বুখারীঃ ১২৫, মুসলিমঃ ২৭৯৪] অন্য বর্ণনায় আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেনঃ কোরায়শরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম - কে সঙ্গত অসঙ্গত প্রশ্ন করত। একবার তারা মনে করল যে, ইহুদীরা বিদ্বান লোক। তারা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহেরও জ্ঞান রাখে। কাজেই তাদের কাছ

وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

আদেশঘটিত[১] এবং তোমাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে অতি সামান্যই ।

وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا

৮৬. আর আমরা ইচ্ছে করলে আপনার প্রতি যা ওহী করেছি তা অবশ্যই প্রত্যাহার করতে পারতাম; তারপর এ বিষয়ে আপনি আমাদের বিরুদ্ধে কোন কর্মবিধায়ক পেতেন না[২] ।

থেকে কিছু প্রশ্ন জেনে নেয়া দরকার; যেগুলো দ্বারা মুহাম্মাদের পরীক্ষা নেয়া যেতে পারে । তদনুসারে কুরাইশরা কয়েকজন লোক ইহুদীদের কাছে প্রশ্ন প্রেরণ করল । তারা শিখিয়ে দিল যে, তোমরা তাঁকে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন কর । [মুসনাদে আহমাদ১/২৫৫, তিরমিযীঃ ৩১৪০, ইবনে হিব্বানঃ ৯৯, মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ২/৫৩১] এ আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে ইবনে মাসউদ ও ইবনে আব্বাসের যে দু'টি হাদীস উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, তন্মধ্যে ইবনে মাসউদের হাদীস অনুযায়ী প্রশ্নটি মদীনায় করা হয়েছিল । এ কারণেই কোন কোন তফসীরবিদ আয়াতটিকে 'মাদানী' সাব্যস্ত করেছেন যদিও সূরা বনী-ইসরাঈলের অধিকাংশই মক্কী । পক্ষান্তরে ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েত অনুসারে প্রশ্নটি মক্কায় করা হয়েছিল । এদিক দিয়ে গোটা সূরার ন্যায় এ আয়াতটিও মক্কী ।

(১) রূহ সম্পর্কে বলা হয়েছে, "বলুন! রূহ আমার প্রভুর নির্দেশঘটিত" । এই জওয়াবের ব্যাখ্যায় তফসীরবিদদের উক্তি বিভিন্নরূপ । কোন কোন মুফাসসির বলেন, এ জওয়াবে যতটুকু বিষয় বলা জরুরী ছিল এবং যতটুকু বিষয় সাধারণ লোকের বোধগম্য ছিল, ততটুকুই বলে দেয়া হয়েছে । রূহের সম্পূর্ণ স্বরূপ সম্পর্কে যে প্রশ্ন ছিল জওয়াবে তা বলা হয়নি । কারণ, তা বোঝা সাধারণ লোকের সাধ্যাতীত ব্যাপার ছিল এবং তাদের কোন প্রয়োজন এটা বোঝার উপর নির্ভরশীলও ছিল না । এই জওয়াব একথা ফুটিয়ে তুলেছে যে, রূহকে সাধারণ বস্তুসমূহের মাপকাঠিতে পরখ করার ফলশ্রুতিতে যেসব সন্দেহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে সেগুলো দূর হয়ে গেল । রূহ্ সম্পর্কে এতটুকু জ্ঞান মানুষের জন্যে যথেষ্ট । এর বেশী জ্ঞানের উপর তার কোন ধর্মীয় অথবা পার্থিব প্রয়োজন আটকা নয় । [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

(২) আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষকে যতটুকুই জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তাও তার ব্যক্তিগত জায়গীর নয় । আল্লাহ্‌র তা'আলা ইচ্ছা করলে তাও ছিনিয়ে নিতে পারে । কাজেই বর্তমান জ্ঞানের জন্য তার কৃতজ্ঞ থাকা এবং অনর্থক ও বাজে গবেষণায় সময় নষ্ট না করা উচিত । বিশেষতঃ যখন উদ্দেশ্য গবেষণা করা নয়; বরং অপরকে পরীক্ষা করা ও লজ্জিত করাই উদ্দেশ্য হয় । মানুষ যদি এরূপ করে, তবে এই বক্রতার পরিণতিতে তার অর্জিত জ্ঞানটুকু বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া আশ্চর্য নয় । এ আয়াতে যদিও

إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ إِنَّ فَضْلَهُۥ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿٨٧﴾

৮৭. তবে এটা প্রত্যাহার না করা আপনার রবের দয়া; নিশ্চয় আপনার প্রতি আছে তাঁর মহাঅনুগ্রহ[১]।

قُل لَّئِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُوا۟ بِمِثْلِ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِۦ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿٨٨﴾

৮৮. বলুন, 'যদি কুরআনের অনুরূপ কুরআন আনার জন্য মানুষ ও জিন সমবেত হয় এবং যদিও তারা পরস্পরকে সাহায্য করে তবুও তারা এর অনুরূপ আনতে পারবে না।

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِى هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰٓ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿٨٩﴾

৮৯. 'আর অবশ্যই আমরা মানুষের জন্য এ কুরআনে বিভিন্ন উপমা বিশদভাবে বর্ণনা করেছি; কিন্তু বেশীরভাগ মানুষ কুফরী করা ছাড়া ক্ষান্ত হয়নি।'

وَقَالُوا۟ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنۢبُوعًا ﴿٩٠﴾

৯০. আর তারা বলে, 'আমরা কখনই তোমার উপর ঈমান আনব না, যতক্ষন না তুমি আমাদের জন্য ভূমি হতে এক প্রস্রবণ উৎসারিত করবে,

أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ

৯১. 'অথবা তোমার খেজুরের ও আঙ্গুরের এক বাগান হবে যার ফাঁকে ফাঁকে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু আসলে উম্মতকে শোনানোই উদ্দেশ্য; অর্থাৎ রাসূলের জ্ঞানও যখন তার ক্ষমতাধীন নয়, তখন অন্যের তো প্রশ্নই উঠে না। আয়াতে আরেকটি দিকে দৃষ্টিপাত করা হয়েছে, তা হলো, এ কুরআন ওহী হিসেবে আপনার কাছে আসে। আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করেন তাহলে তিনি যা এসেছে তাও প্রত্যাহার করে নিতে পারেন। সহীহ হাদীসে এসেছে যে, বাস্তবিকই কিয়ামতের পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা এ কুরআনকে মানুষের মন ও কিতাবের পাতা থেকে উঠিয়ে নেবেন। [দেখুন, সুনান ইবনে মাজাহঃ ৪০৪৯]

(১) এ কুরআনকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল করা, তাকে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করা, তাকে আল্লাহ্র বন্ধু মনোনীত করা অবশ্যই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এ অনুগ্রহের কথা এ আয়াতে এবং কুরআনের অন্যত্রও এ অনুগ্রহকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। [যেমন, সূরা আন-নিসাঃ ১১৩, সূরা আল-ফাতহঃ ১-২, সূরা আশ-শারহঃ ১-৫]

الْأَنْهٰرَ خِلٰلَهَا تَفْجِيْرًا ﴿٩١﴾

তুমি অজস্র ধারায় প্রবাহিত করে দেবে নদী-নালা।

أَوْ تُسْقِطَ السَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ قَبِيْلًا ﴿٩٢﴾

৯২. 'অথবা তুমি যেমন বলে থাক, সে অনুযায়ী আকাশকে খণ্ড-বিখণ্ড করে আমাদের উপর ফেলবে, অথবা আল্লাহ্ ও ফিরিশ্‌তাদেরকে আমাদের সামনে উপস্থিত করবে,

أَوْ يَكُوْنَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقٰى فِي السَّمَآءِ ۚ وَلَنْ نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتّٰى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتٰبًا نَّقْرَؤُهٗ ۚ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا ﴿٩٣﴾

৯৩. 'অথবা তোমার একটি সোনার তৈরী ঘর হবে, অথবা তুমি আকাশে আরোহণ করবে, কিন্তু তোমার আকাশ আরোহণে আমরা কখনো ঈমান আনব না যতক্ষন তুমি আমাদের প্রতি এক কিতাব নাযিল না করবে যা আমরা পাঠ করব[১]।' বলুন, 'পবিত্র মহান আমার রব! আমি তো হচ্ছি শুধু একজন মানুষ রাসূল[২]।'

---

(১) মুজাহিদ রাহেমাহুল্লাহ বলেন, তাদের কথার উদ্দেশ্য হলো, আমাদের প্রত্যেকের নামে চিঠি আসে না কেন? যাতে করে আমরা সে চিঠি সর্বদা বালিশের কাছে রেখে দিতে পারি। [ইবন কাসীর] কাফেরগণ যে এ ধরনের আলাদা আলাদা চিঠি দাবী করেছিল তার বর্ণনা অন্যান্য আয়াতেও এসেছে, বলা হয়েছে, "বস্তুত তাদের প্রত্যেকেই কামনা করে যে, তাকে একটি উন্মুক্ত গ্রন্থ দেয়া হোক"। [সূরা আল-মুদ্দাস্‌সিরঃ ৫২]

(২) আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে যে কথাটি বুঝাতে চাচ্ছেন তা হলো, যদি তারা যা চায় তা দেয়াও হয় তারপরও তারা ঈমান আনবে না। কেননা যারা হতভাগা, যাদের ঈমান আনার ইচ্ছা নেই তারা এরপরও আরো অনেক কিছু খুঁজে বেড়াবে। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ্ তা'আলা এ সত্যটিকে সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলে ধরেছেন। যেমন অন্যত্র আল্লাহ্ বলেছেন, "আমি যদি আপনার প্রতি কাগজে লিখিত কিতাবও নাযিল করতাম আর তারা যদি সেটা হাত দিয়ে স্পর্শও করত তবুও কাফিররা বলত, 'এটা স্পষ্ট জাদু ছাড়া আর কিছু নয়।" [সূরা আল-আন'আমঃ৭] অন্যত্র বলেছেন, "তারা আল্লাহ্‌র নামে কঠিন শপথ করে বলে, তাদের কাছে যদি কোন নিদর্শন আসত তবে অবশ্যই তারা এতে ঈমান আনত। বলুন, 'নিদর্শন তো আল্লাহ্‌র ইখতিয়ারভুক্ত। তাদের কাছে নিদর্শন আসলেও তারা যে ঈমান আনবে না এটা কিভাবে তোমাদেরকে বোঝান যাবে? [সূরা আল-আন'আমঃ ১০৯] আরো বলেছেনঃ "আমি তাদের কাছে

এগারতম রুকূ’

وَمَامَنَعَ النَّاسَ اَنۡ يُّؤۡمِنُوۡۤا اِذۡ جَآءَهُمُ الۡهُدٰٓى اِلَّاۤ اَنۡ قَالُوۡۤا اَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُوۡلًا ﴿۹۴﴾

৯৪. আর যখন মানুষের কাছে হিদায়াত আসে, তখন তাদেরকে ঈমান আনা থেকে বিরত রাখে কেবল তাদের এ কথা যে, ‘আল্লাহ্ কি মানুষকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন(১)?’

قُلۡ لَّوۡ كَانَ فِى الۡاَرۡضِ مَلٰٓٮِٕكَةٌ يَّمۡشُوۡنَ مُطۡمَٮِٕنِّيۡنَ لَنَزَّلۡنَا عَلَيۡهِمۡ مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُوۡلًا ﴿۹۵﴾

৯৫. বলুন, ‘ফিরিশ্‌তাগণ যদি নিশ্চিন্ত হয়ে যমীনে বিচরণ করত তবে আমরা আসমান থেকে তাদের কাছে অবশ্যই ফিরিশ্‌তা রাসূল করে পাঠাতাম ।’

ফিরিশ্‌তা পাঠালেও এবং মৃতরা তাদের সাথে কথা বললেও এবং সকল বস্তুকে তাদের সামনে হাযির করলেও আল্লাহ্‌র ইচ্ছে না হলে তারা কখনো ঈমান আনবে না” [সূরা আল-আন‘আমঃ১১১] আবার অন্য জায়গায় বলেছেন, “যদি তাদের জন্য আকাশের দরজা খুলে দেই এবং তারা সারাদিন তাতে আরোহন করতে থাকে, তবুও তারা বলবে, ‘আমাদের দৃষ্টি সম্মোহিত করা হয়েছে; না, বরং আমরা এক জাদুগ্রস্ত সম্প্রদায় ।” [সূরা আল-হিজরঃ ১৪-১৫] আরো বলেছেনঃ “নিশ্চয়ই যাদের বিরুদ্ধে আপনার রবের বাক্য সাব্যস্ত হয়ে গেছে, তারা ঈমান আনবে না, যদিও তাদের কাছে সবগুলো নিদর্শন আসে, এমনকি তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেখতে পাবে ।” [সূরা ইউনুসঃ ৯৬-৯৭]

(১) অর্থাৎ প্রত্যেক যুগের অজ্ঞ ও মূর্খ লোকেরা এ ভুল ধারণায় নিমজ্জিত থাকে যে, মানুষ কখনো রাসূল হতে পারে না । তাই যখন কোন রাসূল এসেছেন এবং তারা দেখেছে তিনি পানাহার করছেন, তাঁর স্ত্রী-সন্তানাদি আছে , তিনি রক্ত -মাংসের মানুষ তখন তারা ফায়সালা দিয়ে বসেছে যে, এ ব্যক্তি রসূল নয়, কারণ এতো মানুষ । কুরআনের অন্যান্য বহু স্থানে আল্লাহ্ তা‘আলা তাদের এ প্রবণতার কথা উল্লেখ করেছেন । [যেমন, সূরা ইউনুসঃ ২, সূরা আত-তাগাবুনঃ৬, সূরা আল-মূমিনূনঃ ৪৭, সূরা ইবরাহীমঃ ১০] এভাবে তার জীবদ্দশায় তারা তাকে রাসূল হিসেবে মানেনি আর তিনি চলে যাবার দীর্ঘকাল পর তাঁর ভক্তদের মধ্যে এমনসব লোক জন্ম নিতে থাকে যারা বলতে থাকে, তিনি মানুষ ছিলেন না, কারণ তিনি ছিলেন রসূল । ফলে কেউ তাঁকে আল্লাহ বানিয়েছে, কেউ বানিয়েছে আল্লাহর পুত্র, আবার কেউ বলেছে আল্লাহ তাঁর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিলেন । মোটকথা মানবিক সত্তা ও নবুওয়াতী সত্তার একই সত্তার মধ্যে একত্র হওয়া হামেশা মূর্খদের কাছে একটি হেঁয়ালি হয়েই থেকেছে ।

قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ

৯৬. বলুন, 'আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট(১);

(১) আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "বনী ইসরাঈলের এক লোক বনী ইসরাঈলের অপর এক লোকের নিকট এক হাজার দীনার কর্জ চাইল। কর্জদাতা বললঃ কয়েকজন সাক্ষী আনুন, আমি তাদেরকে সাক্ষী রাখব। কর্জগ্রহীতা বললঃ সাক্ষীর জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। তখন কর্জদাতা বলল, তবে একজন যামিন উপস্থিত করুন। কর্জগ্রহীতা বললঃ যামিন হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। তখন কর্জদাতা বললঃ আপনি ঠিকই বলেছেন। তারপর সে নির্ধারিত সময়ে পরিশোধের শর্তে তাকে এক হাজার দীনার কর্জ দিয়ে দিল। তারপর কর্জগ্রহীতা সমূদ্র যাত্রা করল এবং তার ব্যবসায়িক প্রয়োজন সমাধা করল। তারপর সে বাহন খুঁজতে লাগল, যাতে নির্ধারিত সময়ে সে কর্জদাতার নিকট এসে পৌঁছতে পারে। কিন্তু কোন রূপ বাহন সে পেল না। অগত্যা সে এক টুকরা কাঠ নিয়ে তা ছিদ্র করে কর্জদাতার নামে একখানা চিঠি ও এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা তার মধ্যে পুরে ছিদ্রটি বন্ধ করে দিল। তারপর ঐ কাঠখন্ডটা নিয়ে সমুদ্র তীরে গিয়ে বললঃ হে আল্লাহ্! তুমি তো জান, আমি অমুকের কাছে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা কর্জ চাইলে সে আমার কাছে যামিন চেয়েছিল। আমি বলেছিলাম, যামিন হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট, এতে সে রাযী হয়েছিল। সে আমার কাছে সাক্ষী চেয়েছিল। আমি বলেছিলাম, স্বাক্ষী হিসেবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। এতে সে রাযী হয়ে যায়। আমি তার প্রাপ্য তার কাছে পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যে বাহনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম কিন্তু পেলাম না। আমি ঐ এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা আপনার নিকট আমানত রাখছি। এই বলে সে কাঠখন্ডটি সমুদ্রে নিক্ষেপ করল। তৎক্ষণাৎ তা সমুদ্রের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে গেল। তারপর লোকটি ফিরে গেল এবং নিজের শহরে যাবার জন্য বাহন খুঁজতে লাগল। ওদিকে কর্জদাতা নির্ধারিত দিনে এ আশায় সমুদ্রতীরে গেল যে, হয়ত বা দেনাদার তার পাওনা নিয়ে এসে পড়েছে। ঘটনাক্রমে ঐ কাঠখন্ডটি তার নজরে পড়ল যার ভিতরে স্বর্ণমুদ্রা ছিল। সে তা পরিবারের জ্বালানির জন্য বাড়ি নিয়ে গেল। যখন কাঠের টুকরাটি চিরল তখন ঐ স্বর্ণমুদ্রা ও চিঠি সে পেয়ে গেল। কিছুকাল পর দেনাদার লোকটি এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে পাওনাদারের নিকট এসে হাজির হলো এবং বললঃ আল্লাহ্র কসম! আমি আপনার মাল যথা সময়ে পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যে বাহনের খোঁজে সর্বদা চেষ্টিত ছিলাম কিন্তু যে জাহাজটিতে করে আমি এখন এসেছি এটির আগে আর কোন জাহাজই পেলাম না। কর্জদাতা বললঃ আপনি কি আমার কাছে কিছু পাঠিয়েছিলেন? দেনাদার বললঃ আমি তো আপনাকে বললামই যে, এর আগে আর কোন জাহাজই আমি পাইনি। কর্জদাতা বললঃ আপনি কাঠের টুকরোর ভিতরে করে যা পাঠিয়েছিলেন তা আল্লাহ্ আপনার হয়ে আমাকে আদায় করে দিয়েছেন। তখন সে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে প্রশান্ত চিত্তে ফিরে চলে আসল। [বুখারীঃ ২২৯১]

بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًاۢ بَصِيْرًا ﴿٩٦﴾

নিশ্চয় তিনি তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত, পূর্ণদ্রষ্টা।'

وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِهٖ ۚ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ عُمْيًا وَّبُكْمًا وَّصُمًّا ۚ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۚ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنٰهُمْ سَعِيْرًا ﴿٩٧﴾

৯৭. আর আল্লাহ্ যাদেরকে পথনির্দেশ করেন তারা তো পথপ্রাপ্ত এবং যাদেরকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন আপনি কখনো তাদের জন্য তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে অভিভাবক পাবেন না। আর কিয়ামতের দিন আমরা তাদেরকে সমবেত করব তাদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায় অন্ধ, বোবা ও বধির করে[১]। তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম; যখনই তা স্তিমিত হবে তখনই আমরা তাদের জন্য আগুনের শিখা বৃদ্ধি করে দেব[২]।

---

(১) অর্থাৎ দুনিয়ায় তারা যে অবস্থায় ছিল, সত্যকে দেখতে পেতো না, সত্য কথা শুনতে পেতো না এবং সত্য কথা বলতো না, ঠিক তেমনিভাবেই কিয়ামতেও তাদেরকে উঠানো হবে। তারা অন্ধ হিসেবে উঠার কি অর্থ তা এ সূরার ৭২ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বধির ও মূক হিসেবে হাশরের মাঠে উঠানোর অর্থ করা হয়েছে যে, তারা এমন মূক হবে যে, দুনিয়াতে তাদের যে সমস্ত আজে বাজে চিন্তাধারাকে দলীল হিসেবে পেশ করত তখন তারা তা পেশ করতে পারবে না। অনুরূপভাবে তারা খুশীর কিছু শুনতে পাবে না। আয়াতে আরো বলা হয়েছে যে, তারা তাদের মুখের উপর দিয়ে চলবে। আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, এক লোক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! কাফের কিভাবে তার চেহারার উপর হাশরের দিন চলবে? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ যে আল্লাহ্ দুনিয়াতে পায়ের উপর হাঁটতে দিয়েছেন তিনি কি কিয়ামতের দিন মুখের উপর হাঁটাতে পারবেন না?"। [বুখারী৪৭৬০, মুসলিমঃ ২৮০৬]

(২) আয়াতের অর্থে বলা হয়েছে যে, জাহান্নামের আগুন যখনই কিছুটা স্তিমিত হবে তখনই তার আগুনে নতুন মাত্রা যোগ করা হবে। কাতাদা রাহেমাহুল্লাহ এ আয়াতের তাফসীরে বলেছেন, এখানে উদ্দেশ্য হলো, যখনই তাদের চামড়া পুড়ে যাবে তখনই তাদের নতুন চামড়া লাগিয়ে দেয়া হবে যাতে শাস্তি ভোগ করতে পারে। [তাবারী] সে হিসেবে এ আয়াতটি সূরা আন-নিসাঃ৫৬ নং আয়াতের সমার্থবোধক।

৯৮. এটাই তাদের প্রতিদান, কারণ তারা আমাদের নিদর্শন অস্বীকার করেছিল ও বলেছিল, 'অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হলেও আমরা কি নূতন সৃষ্টিরূপে পুনরুত্থিত হব[১]?'

ذٰلِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمۡ كَفَرُواْ بِـَٔايَٰتِنَا وَقَالُوٓاْ أَءِذَا كُنَّا عِظَٰمٗا وَرُفَٰتًا أَءِنَّا لَمَبۡعُوثُونَ خَلۡقٗا جَدِيدًا ٩٨

৯৯. তারা কি লক্ষ্য করে না যে, নিশ্চয় আল্লাহ্, যিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে ক্ষমতাবান[২]? আর তিনি তাদের জন্য স্থির করেছেন এক নির্দিষ্ট কাল, যাতে কোন সন্দেহ নেই । কিন্তু যালিমরা কুফরী করা ছাড়া ক্ষান্ত হয়নি ।

أَوَلَمۡ يَرَوۡاْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ قَادِرٌ عَلَىٰٓ أَن يَخۡلُقَ مِثۡلَهُمۡ وَجَعَلَ لَهُمۡ أَجَلٗا لَّا رَيۡبَ فِيهِ فَأَبَى ٱلظَّٰلِمُونَ إِلَّا كُفُورٗا ٩٩

১০০. বলুন, 'যদি তোমরা আমার রবের দয়ার ভাণ্ডারের অধিকারী হতে, তবুও 'ব্যয় হয়ে যাবে' এ আশংকায় তোমরা তা ধরে রাখতে; আর মানুষ তো খুবই কৃপণ[৩] ।'

قُل لَّوۡ أَنتُمۡ تَمۡلِكُونَ خَزَآئِنَ رَحۡمَةِ رَبِّيٓ إِذٗا لَّأَمۡسَكۡتُمۡ خَشۡيَةَ ٱلۡإِنفَاقِۚ وَكَانَ ٱلۡإِنسَٰنُ قَتُورٗا ١٠٠

---

(১) এ আয়াতের ব্যাখ্যা জানার জন্য এ সূরারই ৪৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দেখুন ।

(২) এ অর্থে কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আরো আয়াত এসেছে । [যেমন, সূরা গাফিরঃ ৫৭, সূরা ইয়াসিনঃ ৮১, সূরা আল-আহক্বাফঃ ৩৩, সূরা আন-নাযি'আতঃ ২৭-৩৩]

(৩) আয়াতে বলা হয়েছে; যদি তোমরা আল্লাহ্র রহমতের ভান্ডারের মালিক হয়ে যাও, তবে তাতেও কৃপণতা করবে । কাউকে দেবে না এ আশঙ্কায় যে, এভাবে দিতে থাকলে ভান্ডারই নিঃশেষ হয়ে যাবে । অবশ্য আল্লাহ্র রহমতের ভান্ডার কখনও নিঃশেষ হয় না । হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ্র হাত পরিপূর্ণ, খরচে তা কমেনা, দিন রাতে প্রচুর প্রদানকারী, তোমরা কি দেখ না যে, আসমান ও যমীনের সৃষ্টির সময় থেকে এ পর্যন্ত যা কিছু তিনি খরচ করেছেন তাতে তার ডান হাতের মধ্যস্থিত কিছুই কমেনি ।" [বুখারীঃ ৭৪১৯, মুসলিমঃ৯৯৩] কিন্তু মানুষ স্বভাবগতভাবে ছোটমনা ও কম সাহসী । [দেখুন, সূরা আল-মা'আরিজঃ ১৯-২২] অকাতরে দান করার সাহস তার নেই ।

বারতম রুকূ'

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ فَسْـَٔلْ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهٗ فِرْعَوْنُ اِنِّيْ لَاَظُنُّكَ يٰمُوْسٰى مَسْحُوْرًا ﴿١٠١﴾

১০১. আর আমরা মূসাকে নয়টি স্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছিলাম[১]; সুতরাং আপনি বনী ইস্‌রাঈলকে জিজ্ঞেস করে দেখুন; যখন তিনি তাদের কাছে এসেছিলেন, অতঃপর ফির'আউন তাঁকে বলেছিল, 'হে মূসা! আমি মনে করি নিশ্চয় তুমি জাদুগ্রস্ত ।'

قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ اَنْزَلَ هٰٓؤُلَآءِ اِلَّا رَبُّ السَّمٰوٰتِ

১০২. মূসা বললেন, তুমি অবশ্যই জান[২]

(১) এখানে আবার মক্কার কাফেরদের মু'জিযা পেশ কবার দাবীর জবাব দেযা হয়েছে এবং এটি তৃতীয় জবাব । কাফেররা বলতো, আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনবো না যতক্ষণ না তুমি অমুক অমুক কাজগুলো করে দেখাবে । জবাবে তাদেরকে বলা হচ্ছে, তোমাদের পূর্বে ফির'আউন মুসা আলাইহিস সালামের কাছে এ ধরনের 'আয়াত' চেয়েছে । (পবিত্র কুরআনে "আয়াত" শব্দটি দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে । এক, নিদর্শন দুই, কিতাবের আয়াত অর্থাৎ আহকামে এলাহীর অর্থে ব্যবহৃত হয় । এ স্থলে উভয় অর্থের সম্ভাবনা আছে । তবে অধিকাংশ তাফসীরবিদ এখানে "আয়াত" দ্বারা নিদর্শন বা মু'জেযা অর্থ নিয়েছেন ।) তখন মূসা আলাইহিসসালামকে আল্লাহ্ নয়টি প্রকাশ্য "আয়াত" দিয়েছিলেন । অর্থাৎ একটি দু'টি নয় পরপর ৯টি সুস্পষ্ট মু'জিযা দেখানো হয়েছিল । তারপর এতসব মু'জিযা দেখার পরও যখন সে নবীকে অস্বীকার করলো তখন তার পরিণতি কি হলো তা তোমরা জানো । এখানে নয় সংখ্যা উল্লেখ করায় 'আয়াতের সংখ্যা' নয়ের বেশী না হওয়া জরুরী নয় । কিন্তু এখানে বিশেষ গুরুত্বের কারণে নয় উল্লেখ করা হয়েছে । সে নয়টি নিদর্শন নির্দিষ্টকরণে অনেক মতভেদ আছে, তবে তম্মধ্যে বিশেষভাবে পরিচিত হলো, (১) মুসা আলাইহিস সালাম এর লাঠি, যা অজগর সাপ হয়ে যেত, (২) শুভ্র হাত, যা জামার নীচ থেকে বের করতেই চমকাতে থাকত, (৩) ফল-ফলাদির অভাব হওয়া । (৪) দুর্ভিক্ষ লাগা (৫) অস্বাভাবিকভাবে পঙ্গপালের আযাব প্রেরণ করা, (৬) তুফান প্রেরণ করা, (৭) শরীরের কাপড়ে এত উকুন সৃষ্টি করা, যা থেকে আত্মরক্ষার কোন উপায় ছিল না, (৮) ব্যাঙের আযাব চাপিয়ে দেয়া, ফলে প্রত্যেক পানাহারের বস্তুতে ব্যাঙ কিলবিল করতো এবং (৯) রক্তের আযাব প্রেরণ করা । ফলে প্রত্যেক পাত্রে ও পানাহারের বস্তুতে রক্ত দেখা যেত । [ইবন কাসীর]

(২) এখানে ফির'আউনকে বলা হচ্ছে যে, 'মূসা আলাইহিসসালাম যা কিছু নিয়ে এসেছেন তা রাব্বুল আলামীনই যে নাযিল করেছেন তা সে জানে' । এভাবে কুরআনের অন্য আয়াতেও তাই বলা হয়েছে, যেমন, সূরা আন-নামলে বলা হয়েছে, "তারা অন্যায় ও

وَالْاَرْضِ بَصَآئِرَ ۚ وَاِنِّیْ لَاَظُنُّكَ یٰفِرْعَوْنُ مَثْبُوْرًا ﴿١٠٢﴾

যে, এ সব স্পষ্ট নিদর্শন আসমানসমূহ ও যমীনের রবই নাযিল করেছেন---প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ। আর হে ফির‘আউন! আমি তো মনে করছি তুমি হবে ধ্বংসপ্রাপ্ত।

فَاَرَادَ اَنْ یَّسْتَفِزَّهُمْ مِّنَ الْاَرْضِ فَاَغْرَقْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ جَمِیْعًا ﴿١٠٣﴾

১০৩. অতঃপর ফির‘আউন তাদেরকে দেশ থেকে উচ্ছেদ করার ইচ্ছা করল; তখন আমরা তাকে ও তার সঙ্গীদের সবাইকে নিমজ্জিত করলাম[১]।

وَّقُلْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ لِبَنِیْۤ اِسْرَآءِیْلَ اسْكُنُوا الْاَرْضَ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِیْفًا ﴿١٠٤﴾

১০৪. আর আমরা এরপর বনী ইস্‌রাঈলকে বললাম, ‘তোমরা যমীনে বসবাস কর এবং যখন আখেরাতের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হবে তখন তোমাদের সবাইকে আমরা একত্র করে উপস্থিত করব।

وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنٰهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ؕ وَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا

১০৫. আর আমরা সত্য-সহই কুরআন নাযিল করেছি এবং তা সত্য-সহই

উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলো প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তর এগুলোকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিল। দেখুন, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল!” [১৪] এতে করে একথা স্পষ্ট হলো যে, ফির‘আউন অবশ্যই আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সম্পর্কে অবগত ছিল কিন্তু সে তা অহংকার বশতঃ অস্বীকার করেছিল।

(১) এটিই হচ্ছে এ কাহিনীটি বর্ণনা করার মূল উদ্দেশ্য। মক্কার মুশরিকরা মুসলিমদেরকে এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আরবের মাটি থেকে উৎখাত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছিল। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, “আর তারা আপনাকে দেশ থেকে উৎখাত করার চূড়ান্ত চেষ্টা করেছিল আপনাকে সেখান থেকে বহিস্কার করার জন্য; তাহলে আপনার পর তারাও সেখানে অল্পকাল টিকে থাকত”। [সূরা আল-ইসরাঃ ৭৬] তাই তাদেরকে শুনানো হচ্ছে, ফির‘আউন এসব কিছু করতে চেয়েছিল মূসা ও বনী ইসরাঈলের সাথে। কিন্তু কার্যত হয়েছে এই যে, ফির‘আউন ও তার সাথীদেরকে নির্মূল ও নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছে এবং পৃথিবীতে মূসা ও তার অনুসারীদেরকে বসবাস করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখন তোমরাও যদি এ একই পথ অবলম্বন করো তাহলে তোমাদের পরিণামও এর থেকে ভিন্ন কিছু হবে না।

وَّنَذِيْرًا ۝١٠٥

নাযিল হয়েছে[১]। আর আমরা তো আপনাকে শুধু সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি।

وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَّنَزَّلْنٰهُ تَنْزِيْلًا ۝١٠٦

১০৬. আর আমরা কুরআন নাযিল করেছি খণ্ড খণ্ডভাবে; যাতে আপনি তা মানুষের কাছে পাঠ করতে পারেন ক্রমে ক্রমে এবং আমরা তা পর্যায়ক্রমে নাযিল করেছি[২]।

قُلْ اٰمِنُوْا بِهٖٓ اَوْ لَا تُؤْمِنُوْا ۭ اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖٓ اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا ۝١٠٧

১০৭. বলুন, 'তোমরা কুরআনে ঈমান আন আর নাই ঈমান আন, নিশ্চয় যাদেরকে এর আগে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তাদের কাছে যখন এটা তেলাওয়াত করা হয় তখনই তারা সিজ্‌দায় লুটিয়ে পড়ে।'

وَّيَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَآ اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا ۝١٠٨

১০৮. আর তারা বলে, 'আমাদের রব পবিত্র, মহান। আমাদের রবের প্রতিশ্রুতি কার্যকর হয়েই থাকে।'

وَيَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا ۝١٠٩ ۩

১০৯. 'আর তারা কাঁদতে কাঁদতে নতমস্তকে লুটিয়ে পড়ে এবং এটা তাদের বিনয় বৃদ্ধি করে।'

---

(১) আয়াতের ভাবার্থ হলো, আমরা এ কুরআনকে হক তথা সঠিক তথ্যসম্বলিত করে নাযিল করেছি। তাতে আল্লাহ্ তাঁর আপন ইলম যা তিনি তোমাদেরকে জানাতে চেয়েছেন যেমন তার নির্দেশ, নিষেধ, হুকুম-আহকামসমূহ সম্বলিত করেছেন। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন যে, 'আর এ কুরআন হক তথা সঠিকভাবেই নাযিল হয়েছে'। অর্থাৎ হে নবী! এ কুরআন আপনার কাছে সংরক্ষিত, অবিকৃত ও অমিশ্রিতভাবে, কোন কিছু বেশী বা কম না করেই নাযিল হয়েছে। কেননা, এটা তো সে মহাশক্তিশালী স্বত্তার পক্ষ থেকে এসেছে। [ইবন কাসীর]

(২) এখানে কুরআনকে একত্রে নাযিল না করে খন্ড খন্ড ভাবে নাযিল করার একটি কারণ বর্ণনা হয়েছে। আর তা হল. পরিবেশ পরিস্থিতি, প্রশ্নোত্তর ও রাসূলের অন্তরকে প্রশান্তি প্রদান করা। তবে আল্লাহ্ তা'আলা লাইলাতুল কদরের রাত্রিতে এ কুরআনকে পুরোপুরি নাযিল করে প্রথম আসমানে বাইতুল ইজ্জতে নাযিল করেছেন বলে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে কোন কোন বর্ণনায় দেখা যায়। [মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ২/৩৬৮, ইবনে হাজার আল-আসকালানীঃ ফাতহুল বারীঃ ৪/৯]

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ۖ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيلًا ﴿١١٠﴾

১১০. বলুন, 'তোমরা 'আল্লাহ্' নামে ডাক বা 'রাহমান' নামে ডাক, তোমরা যে নামেই ডাক সকল সুন্দর নামই তো তাঁর। আর আপনি সালাতে স্বর খুব উচ্চ করবেন না আবার খুব ক্ষীণও করবেন না; বরং এ দুয়ের মধ্যপথ অবলম্বন করুন[১]।

(১) এ আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ হিসেবে এসেছে যে, মক্কায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাতে উঁচুস্বরে তেলাওয়াত করতেন, তখন মুশরিকরা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত এবং কুরআন, জিবরাঈল ও স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলাকে উদ্দেশ্য করে ধৃষ্টতাপূর্ণ কথাবার্তা বলত এর জওয়াবে আয়াতের শেষাংশ অবতীর্ণ হয়েছে। [বুখারীঃ ৪৭২২, মুসলিমঃ ৪৪৬] এতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সশব্দ ও নিঃশব্দ উভয়ের মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। কেননা, মধ্যবর্তী শব্দে পাঠ করলেই প্রয়োজন পূর্ণ হয়ে যেত এবং সশব্দে পাঠ করলে মুশরিকরা নিপীড়নের যে সুযোগ পেত, তা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

কোন কোন মুফাসসির বলেন, এ আয়াতে সালাতে কুরআন তেলাওয়াতের আদব বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, খুব উচ্চঃস্বরে না হওয়া চাই এবং এমন নিঃশব্দেও না হওয়া চাই যে, মুক্তাদীরা শুনতে পায় না। বলাবাহুল্য এ বিধান বিশেষ করে সশব্দে পঠিত সালাতসমূহের জন্যে। যোহর ও আসরের নামাযে নিঃশব্দে পাঠ করা মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। জাহরী বা উচ্চঃস্বরে পড়তে হয় এমন সালাত বলতে ফজর, মাগরিব ও এশার সালাত বোঝায়। তাহাজ্জুদের সালাতও এর অন্তর্ভূক্ত। যেমন, এক হাদীসে রয়েছে, একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদের সময় আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু - এর কাছ দিয়ে গেলে আবু বকরকে নিঃশব্দে এবং ওমরকে উচ্চঃস্বরে তেলাওয়াতরত দেখতে পান। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু - কে বললেনঃ আপনি এত নিঃশব্দে তেলাওয়াত করেন কেন? তিনি আরয করলেনঃ যাঁকে শোনানো উদ্দেশ্য তাঁকে শুনিয়ে দিয়েছি। আল্লাহ্ তা'আলা গোপনতম আওয়াযও শ্রবণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ সামান্য শব্দ সহকারে পাঠ করুন। অতঃপর ওমরকে বললেনঃ আপনি এত উচ্চঃস্বরে তেলাওয়াত করেন কেন? তিনি আরয করলেনঃ আমি নিদ্রা ও শয়তানকে বিতাড়িত করে দেয়ার জন্যে উচ্চঃস্বরে পাঠ করি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আদেশ দিলেন, যে একটু অনুচ্চ শব্দে পাঠ করুন। [তিরমিযীঃ৪৪৭] তবে তাহাজ্জুদের সালাতে ইচ্ছা করলে কেরাত উচ্চস্বরে পড়তে পারে আবার ইচ্ছা করলে নিচুস্বরেও পড়তে

১১১. বলুন, 'প্রশংসা আল্লাহ্‌রই যিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেননি[১], তাঁর সার্বভৌমত্বে কোন অংশীদার নেই[২] এবং দুর্দশাগ্রস্ততা থেকে বাঁচতে তাঁর অভিভাবকের প্রয়োজন নেই[৩] । আর

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِىٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا ﴿١١١﴾

পারে । এ ব্যাপারে ধরাবাধা কোন নিয়ম নেই । [দেখুনঃ তিরমিযীঃ ৪৪৮] তবে এ আয়াতে বর্ণিত "সালাত" শব্দটির অর্থ সম্পর্কে আরো কিছু মত রয়েছে । আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলেন, এ আয়াতে সালাত বলতে দো'আ বুঝানো হয়েছে । [বুখারীঃ ৪৭২৩, মুসলিমঃ ৪৪৭] । সুতরাং সে অনুসারে দো'আ করতে স্বর খুব উঁচু করতে নিষেধ করা হয়েছে ।

(১) এখানে প্রত্যক্ষভাবে রাসূলকে নির্দেশ দেয়া হলেও নির্দেশটি সমস্ত উম্মতের জন্যও প্রযোজ্য । সবাইকে তাওহীদের ঘোষণা দেয়ার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে । আল্লাহ্‌র একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করার আদেশ করা হয়েছে । পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে তাওহীদের এ অংশের নির্দেশ সম্বলিত আয়াতসমূহ এসেছে । [যেমন, সূরা ইখলাস, সূরা আল-জিনঃ৩, সূরা আল-মু'মিনূনঃ ৯১, সূরা আল-আন'আমঃ ১০১, সূরা আল-বাকারাহঃ ১১৬, সূরা ইউনুসঃ ৬৮, সূরা আল-কাহফঃ ৪, সূরা মারইয়ামঃ ৮৮-৯২, সূরা আল-আম্বিয়াঃ ২৬, সূরা আল-ফুরকানঃ ২] এ সমস্ত আয়াতে যে সত্যটি তুলে ধরা হয়েছে তা হলো, দয়াময় আল্লাহ্‌র জন্য সন্তান গ্রহণ অসম্ভব । সন্তান তো তারাই আশা করে যারা তাদের অবর্তমানে তাদের কাজকারবার দেখাশুনা, তাদের নাম টিকিয়ে রাখা, তাদের চাহিদা পূরণ, তাদের কর্মকাণ্ডে সাহায্য-সহযোগিতার প্রয়োজন পড়ে । মহান আল্লাহ্ তা'আলা এ সমস্ত কিছু থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র । তিনি সর্বদা আছেন ও থাকবেন । তার কোন অভাব নেই । সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী । সুতরাং আল্লাহ্‌র কোন সন্তান হতে পারে না । এতে ইয়াহূদী ও নাসারাদের দাবীর রদ করা হয়েছে । [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

(২) এখানে আরও যে সমস্ত কারণে মানুষ তাওহীদ থেকে বিচ্যুত হয় তা হচ্ছে, কোন কোন মানুষ মনে করে থাকে যে, যদি তার সন্তান নাও থাকে তার রাজত্বে ও রবুবিয়াতে অন্য কেউ শরীক আছে । সুতরাং তাদেরকেও সন্তুষ্ট করা উচিত । যেমন, মাজুস সম্প্রদায় মনে করে থাকে । তারা দু'জন ইলাহ নির্ধারণ করে থাকে । [ফাতহুল কাদীর] অনুরূপভাবে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যেও অনেকে এ ধরনের বিশ্বাস করে থাকে ।

(৩) এখানে সে সমস্ত মুশরিকদের কথা বলা হয়েছে যারা বিভিন্ন দেবতা ও জ্ঞানী গুণী মহামানবদের সম্পর্কে বিশ্বাস করতো যে, আল্লাহ নিজের সার্বভৌম কর্তৃত্বের বিভিন্ন বিভাগ এবং নিজের রাজত্বের বিভিন্ন এলাকা তাদের ব্যবস্থাপনায় দিয়ে দিয়েছেন । এখানে তাদের এ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রমাণ পেশ করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ এমন নন যে, তিনি কোন কাজ করতে গিয়ে অপর কাজ করতে অপারগ হয়ে পড়েন ।

আপনি সসম্ভ্রমে তাঁর মাহাত্ম্য ঘোষণা করুন ।’

সুতরাং তার সহকারী কেন লাগবে? সুতরাং তাদের যে বিশ্বাস ছিল, আল্লাহ নিজে তাঁর সার্বভৌম কর্তৃত্বের বোঝা বহন করতে অক্ষম, তাই তিনি নিজের জন্য কোন সাহায্যকারী ও নির্ভর তালাশ করে বেড়াচ্ছেন । এটা একান্ত ভ্রান্ত ধারণা ও বিশ্বাস । তাই বলা হয়েছে, আল্লাহ অক্ষম নন । তাঁর কোন ডেপুটি, সহকারী ও সাহায্যকারীর প্রয়োজন নেই । [দেখুন, ইবন কাসীর]

১৮- সূরা আল-কাহ্ফ

সূরা সংক্রান্ত আলোচনাঃ

নামকরণঃ এ সূরার নাম সূরা আল-কাহাফ। কারণ সূরার মধ্যে কাহাফ বা গুহাবাসীদের আলোচনা স্থান পেয়েছে।

আয়াত সংখ্যাঃ ১১০।

নাযিল হওয়ার স্থানঃ সূরা আল-কাহাফ মক্কায় নাযিল হয়েছে। [কুরতুবী]

সূরার কিছু বৈশিষ্ট্যঃ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 'যে ব্যক্তি সূরা আল-কাহ্ফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ করবে, সে দাজ্জালের ফেৎনা থেকে নিরাপদ থাকবে'। [আবু দাউদঃ ৪৩২৩, আহমাদঃ ৬/৪৪৯] অন্য এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 'যে ব্যক্তি সূরা কাহ্ফের শেষ দশটি আয়াত মুখস্থ করবে সে দাজ্জালের ফেৎনা থেকে মুক্ত থাকবে'। [মুসলিমঃ ৮০৯] অন্য এক হাদীসে বারা ইবনে আযিব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, এক লোক সূরা আল-কাহাফ পড়ছিল তার ঘরে ছিল একটি বাহন। বাহনটি বারবার পালাচ্ছিল। সে তাকিয়ে দেখল যে, মেঘের মত কিছু যেন তাকে ঢেকে আছে। সে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সেটা বর্ণনা করার পর রাসূল বললেন: হে অমুক! তুমি পড়। এটাতো কেবল 'সাকীনাহ' বা প্রশান্তি যা কুরআন পাঠের সময় নাযিল হয়। [বুখারী: ৩৬১৪, মুসলিম: ৭৯৫]। অন্য হাদীসে এসেছে, 'যে কেউ শুক্রবারে সূরা আল-কাহাফ পড়বে পরবর্তী জুম'আ পর্যন্ত সে নূর দ্বারা আলোকিত থাকবে।' [মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৩৬৮, সুনান দারমী ২/৪৫৪] অপর হাদীসে এসেছে, 'যেভাবে সূরা আল-কাহাফ নাযিল হয়েছে সেভাবে কেউ তা পড়লে সেটা তার জন্য কিয়ামতের দিন নূর বা আলোকবর্তিকা হবে'। [মুস্তাদরাকে হাকিম: ১/৫৬৪]

।। রহমান রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

১. যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌রই যিনি তাঁর বান্দার উপর কিতাব নাযিল করেছেন(১) এবং তাতে তিনি বক্রতা রাখেননি(২);

(১) সূরার শুরুতে মহান আল্লাহ্ নিজেই নিজের প্রশংসা করছেন। এ ধরনের প্রশংসা একমাত্র তাঁরই। প্রথম ও শেষ সর্বাবস্থায় শুধু তাঁরই প্রশংসা করা যায়। তিনি তাঁর বান্দা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর কিতাব নাযিল করেছেন সুতরাং তিনি প্রশংসিত; কারণ এর মাধ্যমে তিনি মানুষদেরকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে এসেছেন। এর চেয়ে বড় নেয়ামত আর কী-ই বা আছে। [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ এর মধ্যে এমন কোন কথাবার্তা নেই যা বুঝতে পারা যায় না। আবার সত্য ও

২. সরলরূপে[১], তাঁর কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য এবং মুমিনগণ যারা সৎকাজ করে, তাদেরকে এ সুসংবাদ দেয়ার জন্য যে, তাদের জন্য আছে উত্তম পুরস্কার,

قَيِّمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّٰلِحَٰتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ﴿٢﴾

৩. যাতে তারা স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে,

مَّٰكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ﴿٣﴾

৪. আর সতর্ক করার জন্য তাদেরকে যারা বলে, আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন[২],

وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ﴿٤﴾

৫. এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরও ছিল না। তাদের মুখ থেকে বের হওয়া বাক্য কী সাংঘাতিক! তারা তো শুধু মিথ্যাই বলে[৩]।

مَّا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِءَابَآئِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَٰهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ﴿٥﴾

৬. তারা এ বাণীতে ঈমান না আনলে সম্ভবত তাদের পিছনে ঘুরে আপনি

فَلَعَلَّكَ بَٰخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا

ন্যায়ের সরল রেখা থেকে বিচ্যুত এমন কথাও নেই যা মেনে নিতে কোন সত্যপন্থী লোক ইতস্তত করতে পারে। [ইবন কাসীর]

(১) এমন সরল ও সহজরূপে যে তাতে নেই কোন স্ববিরোধিতা। [মুয়াসসার]

(২) যারা আল্লাহর সন্তান-সন্তুতি আছে বলে দাবী করে এদের মধ্যে রয়েছে নাসারা, ইহুদী ও আরব মুশরিকরা। [ফাতহুল কাদীর] তাছাড়া পাক-ভারতের হিন্দুরাও আল্লাহ্‌র জন্য সন্তান-সন্ততি সাব্যস্ত করে থাকে।

(৩) অর্থাৎ তাদের এ উক্তি যে, অমুক আল্লাহর পুত্র অথবা অমুককে আল্লাহ পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছেন, এগুলো তারা এ জন্য বলছে না যে, তাদের আল্লাহর পুত্র হবার বা আল্লাহর কাউকে পুত্র বানিয়ে নেবার ব্যাপারে তারা কিছু জানে। বরং নিছক নিজেদের ভক্তি শ্রদ্ধার বাড়াবাড়ির কারণে তারা একটি মনগড়া মত দিয়েছে এবং এভাবে তারা যে কত মারাত্মক গোমরাহীর কথা বলছে এবং বিশ্বজাহানের মালিক ও প্রভূ আল্লাহর বিরুদ্ধে যে কত বড় বেয়াদবী ও মিথ্যাচার করে যাচ্ছে তার কোন অনুভূতিই তাদের নেই। এভাবে তারা নিজেরা যেমন পথভ্রষ্ট হচ্ছে তেমনি ভ্রষ্ট করছে তাদের সন্তান-সন্ততিদেরকেও। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا ۝٦

দুঃখে আত্ম-বিনাশী হয়ে পড়বেন[১]।

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۝٧

৭. নিশ্চয় যমীনের উপর যা কিছু আছে আমরা সেগুলোকে তার শোভা করেছি[২], মানুষকে এ পরীক্ষা করার জন্য যে, তাদের মধ্যে কাজে কে শ্রেষ্ঠ।

وَإِنَّا لَجٰعِلُوْنَ مَا عَلَيْهَا صَعِيْدًا جُرُزًا ۝٨

৮. আর তার উপর যা কিছু আছে তা অবশ্যই আমরা উদ্ভিদশূন্য ময়দানে পরিণত করব[৩]।

---

(১) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে সে সময় যে মানসিক অবস্থার টানাপোড়ন চলছিল এখানে সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে। তিনি তাদের হিদায়াতের জন্য দিনরাত পরিশ্রম করে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তারা আল্লাহর আযাবের সম্মুখীন হবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই তার এ মানসিক অবস্থাকে একটি হাদীসে এভাবে বর্ণনা করেছেনঃ "আমার ও তোমাদের দৃষ্টান্ত এমন এক ব্যক্তির মতো যে আলোর জন্য আগুন জ্বালালো কিন্তু পতংগরা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে শুরু করলো পুড়ে মরার জন্য। সে এদেরকে কোনক্রমে আগুন থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করে কিন্তু এ পতংগরা তার কোন প্রচেষ্টাকেই ফলবতী করতে দেয় না। আমার অবস্থাও অনুরূপ। আমি তোমাদের হাত ধরে টান দিচ্ছি কিন্তু তোমরা আগুনে লাফিয়ে পড়ছো।" [বুখারীঃ ৩২৪৪, ৬১১৮ ও মুসলিমঃ ২২৮৪]। সূরা আশ্ শু'আরার ৩ নং আয়াতেও এ ব্যাপারে আলোচনা এসেছে।

(২) অর্থাৎ পৃথিবীর জীবজন্তু, উদ্ভিদ, জড় পদার্থ এবং ভূগর্ভস্থ বিভিন্ন বস্তুর খনি- এগুলো সবই পৃথিবীর সাজ-সজ্জা ও চাকচিক্য। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 'দুনিয়া সুমিষ্ট নয়নাভিরাম দৃশ্যে ভরা, আল্লাহ্ এতে তোমাদেরকে প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ করে দেখতে চান তোমরা এতে কি ধরনের আচরণ কর। সুতরাং তোমরা দুনিয়ায় মত্ত হওয়া থেকে বেঁচে থাক এবং মহিলাদের থেকেও বেঁচে থাক। কেননা; বনী ইসরাঈলের মধ্যে প্রথম ফিতনা ছিল মহিলাদের মধ্যে। [মুসলিম: ২৭৪২]

(৩) অর্থাৎ পৃথিবী পৃষ্ঠে তোমরা এই যেসব সাজ সরঞ্জাম দেখছো এবং যার মন ভুলানো চাকচিক্যে তোমরা মুগ্ধ হয়েছ, এতো নিছক একটি সাময়িক সৌন্দর্য, নিছক তোমাদের পরীক্ষার জন্য এর সমাবেশ ঘটানো হয়েছে। এসব কিছু আমি তোমাদের আয়েশ আরামের জন্য সরবরাহ করেছি, তোমরা এ ভুল ধারণা করে বসেছো। এগুলো আয়েশ আরামের জিনিস নয় বরং পরীক্ষার উপকরণ। যেদিন এ পরীক্ষা শেষ হয়ে যাবে সেদিনই ভোগের এসব সরঞ্জাম খতম করে দেয়া হবে এবং তখন এ পৃথিবী

৯. আপনি কি মনে করেন যে, কাহ্ফ[১] ও রাকীমের[২] অধিবাসীরা আমাদের নিদর্শনাবলীর মধ্যে বিস্ময়কর[৩]?

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَٰبَ ٱلْكَهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُوا۟ مِنْ ءَايَٰتِنَا عَجَبًا ٩

একটি লতাগুল্মহীন ধূ ধূ প্রান্তর ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। [দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(১) كهف -এর অর্থ বিস্তীর্ণ পার্বত্য গুহা। বিস্তীর্ণ না হলে তাকে غار বলা হয়। [কুরতুবী]

(২) رَقِيْم -এর শাব্দিক অর্থ مرقوم বা লিখিত বস্তু। এ স্থলে কি বোঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে তাফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত রয়েছে-

(এক) সাঈদ ইবন জুবাইর বলেন, এর অর্থ একটি লিখিত ফলক। সমসাময়িক বাদশাহ্ এই ফলকে আসহাবে কাহ্ফের নাম লিপিবদ্ধ করে গুহার প্রবেশপথে ঝুলিয়ে রেখেছিল। এ কারণেই আসহাবে কাহ্ফকে রকীমও বলা হয়।

(দুই) মুজাহিদ বলেন, রকীম সে পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত উপত্যকার নাম, যাতে আসহাবে কাহ্ফের গুহা ছিল।

(তিন) ইবন আব্বাস বলেন, সে পাহাড়টিই রকীম।

(চার) ইকরিমা বলেনঃ আমি ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমাকে বলতে শুনেছি যে, রকীম কোন লিখিত ফলকের নাম না কি জনবসতির নাম, তা আমার জানা নেই।

(পাঁচ) কা'ব আহ্বার, ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ্, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন যে, রকীম রোমে অবস্থিত আয়লা অর্থাৎ আকাবার নিকটবর্তী একটি শহরের নাম। [ইবন কাসীর]

মূলতঃ 'আসহাবে কাহ্ফ' ও 'আসহাবে রকীম' একই দলের দুই নাম, না তারা আলাদা দু'টি দল? এ মতভেদ নিয়েই উপরোক্ত মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। যদিও কোন সহীহ্ হাদীসে এ সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট বর্ণনা নেই, কিন্তু ইমাম বুখারী 'সহীহ্' নামক গ্রন্থে আসহাবে কাহ্ফ ও আসহাবে রকীমের দু'টি আলাদা আলাদা শিরোনাম রেখেছেন। ইমাম বুখারীর এ কাজ থেকে বোঝা যায় যে, তার মতে আসহাবে কাহ্ফ ও আসহাবে রকীম পৃথক পৃথক দু'টি দল। হাফেজ ইবনে হাজার ও অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে কুরআনের পূর্বাপর বর্ণনা অনুযায়ী আসহাবে কাহ্ফ ও আসহাবে রকীম একই দল।

(৩) অর্থাৎ যে আল্লাহ্ এ আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, রাত-দিনের ব্যবস্থা করেছেন, সূর্য ও চন্দ্রকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্ররাজিকে তাদের কক্ষপথে নিয়মবদ্ধ করেছেন তাঁর শক্তিমত্তার পক্ষে কয়েকজন লোককে দু'তিনশো বছর পর্যন্ত ঘুম পাড়িয়ে রাখা তারপর তাদেরকে ঘুমাবার আগে তারা যেমন তর-তাজা ও সুস্থ-সবল ছিল ঠিক তেমনি অবস্থায় জাগিয়ে তোলা কি তোমরা কিছুমাত্র অসম্ভব বলে মনে কর? যদি চন্দ্র, সূর্য ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে কেউ কখনো

إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ⑩

১০. যখন যুবকরা গুহায় আশ্রয় নিল তখন তারা বলেছিল, 'হে আমাদের রব! আপনি নিজ থেকে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান করুন এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজকর্ম সঠিকভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা করুন(১) ।'

فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ⑪

১১. অতঃপর আমরা তাদেরকে গুহায় কয়েক বছর ঘুমন্ত অবস্থায় রাখলাম(২),

ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ⑫

১২. পরে আমরা তাদেরকে জাগিয়ে দিলাম জানার জন্য যে, দু'দলের মধ্যে কোন্‌টি(৩) তাদের অবস্থিতিকাল সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারে ।

দ্বিতীয় রুকূ'

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ ۚ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ

১৩. আমরা আপনার কাছে তাদের বৃত্তান্ত সঠিকভাবে বর্ণনা করছি: তারা তো

চিন্তা-ভাবনা করে তাহলে একথা কেউ মনে করতে পারে না যে, আল্লাহর জন্য এটা কোন কঠিন কাজ । মহান আল্লাহ্‌র জন্য তো এটা ক্ষুদ্র ব্যাপার । [দেখুন, ইবন কাসীর]

(১) এ ধরনের দো'আ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও করতেন এবং উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন । তিনি বলতেন: اللَّهُمَّ مَا قَضَيْتَ لَنَا مِنْ قَضَاءٍ فَاجْعَلْ عَاقِبَتَهُ رُشْداً "হে আল্লাহ্! আমাদের জন্য আপনি যা ফয়সালা করেছেন সেগুলোর সুন্দর সমাপ্তি দিন" । [মুসনাদে আহমাদ: ৪/১৮১]

(২) ﴿فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ﴾ -এর শাব্দিক অর্থ কর্ণকুহর বন্ধ করে দেয়া । অচেতন নিদ্রাকে এই ভাষায় ব্যক্ত করা হয় । কেননা, নিদ্রায় সর্বপ্রথম চক্ষু বন্ধ হয়, কিন্তু কান সক্রিয় থাকে । আওয়াজ শোনা যায় । অতঃপর যখন নিদ্রা পরিপূর্ণ ও প্রবল হয়ে যায়, তখন কানও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে । জাগরণের সময় সর্বপ্রথম কান সক্রিয় হয় । আওয়াজের কারণে নিদ্রিত ব্যক্তি সচকিত হয়, অতঃপর জাগ্রত হয় । [দেখুন, কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

(৩) অর্থাৎ মতবিরোধে লিপ্ত দু'টি দলের মধ্যে কারা তাদের অবস্থানকাল সম্পর্কে সঠিক তথ্য দিতে পারে । এখানে জানা অর্থ, প্রকাশ করা । [ফাতহুল কাদীর]

ছিল কয়েকজন যুবক[১], তারা তাদের রব-এর উপর ঈমান এনেছিল[২] এবং

اٰمَنُوۡا بِرَبِّهِمۡ وَزِدۡنٰهُمۡ هُدًى ﴿١٣﴾

(১) فتية শব্দটি فتى এর বহুবচন, অর্থ যুবক। [ফাতহুল কাদীর] তাফসীরবিদগণ লিখেছেন, এ শব্দের মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, কর্ম সংশোধন, চরিত্র গঠন এবং হেদায়াত লাভের উপযুক্ত সময় হচ্ছে যৌবনকাল। বৃদ্ধ বয়সে পূর্ববর্তী কর্ম ও চরিত্র এত শক্তভাবে শেকড় গেড়ে বসে যে, যতই এর বিপরীত সত্য পরিস্ফুট হোক না কেন, তা থেকে বের হয়ে আসা দুরূহ হয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দাওয়াতে বিশ্বাস স্থাপনকারী সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে অধিকাংশ ছিলেন যুবক। [ইবন কাসীর]

(২) আসহাবে কাহ্ফের স্থান ও কাল নির্ণয়ে বিভিন্ন মত এসেছে। এগুলোর কোন্‌টি যে সঠিক সে ব্যাপারে সঠিক কোন সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়। আলেমগণ এ ব্যাপারে দু'টি অবস্থান গ্রহণ করেছেন। তাদের একদলের মত হলো, আমাদেরকে শুধু এ ঘটনার শুদ্ধ হওয়া ও তা থেকে শিক্ষা নেয়ার উপরই প্রচেষ্টা চালানো উচিত। তাদের স্থান ও কাল নির্ধারনে ব্যস্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই। অন্য একদল মুফাসসির ও ঐতিহাসিক এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত পেশ করার মাধ্যমে কাহিনীটি বোঝার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে চেয়েছেন। তাদের অধিকাংশের মতে, আসহাবে কাহ্ফের ঘটনাটি ঘটে আফসোস নগরীতে। হাফেয ইবন কাসীর রাহেমাহুল্লাহ তার তাফসীরে এ সাতজন যুবকের কালকে ঈসা আলাইহিসসালামের পূর্বেকার ঘটনা বলে মত দিয়েছেন। ইয়াহূদীগণ কর্তৃক এ ঘটনাটিকে বেশী প্রাধান্য দেয়া এবং মক্কার মুশরিকদেরকে এ বিষয়টি নিয়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করতে শিখিয়ে দেয়াকে তিনি তার মতের সপক্ষে দলীল হিসেবে পেশ করেন। [দেখুন, ইবন কাসীর]

কিন্তু অধিকাংশ মুফাসসির ও ঐতিহাসিকগণ এ ঘটনাটিকে ঈসা আলাইহিসসালামের পরবর্তী ঘটনা বলে বর্ণনা করে থাকেন। তাদের মতে, ঈসা আলাইহিস সালামের পর যখন তার দাওয়াত রোম সাম্রাজ্যে পৌঁছতে শুরু করে তখন এ শহরের কয়েকজন যুবকও শির্ক থেকে তাওবা করে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে। বিভিন্ন ঐতিহাসিক গ্রন্থে তাদের যে বর্ণনা এসেছে তা সংক্ষেপ করলে নিম্নরূপ দাঁড়ায়ঃ তারা ছিলেন সাতজন যুবক। তাদের ধর্মান্তরের কথা শুনে তৎকালীন রাজা তাদেরকে নিজের কাছে ডেকে পাঠান। তাদের জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের ধর্ম কি? তারা জানতেন, এ রাজা ঈসার অনুসারীদের রক্তের পিপাসু। কিন্তু তারা কোন প্রকার শংকা না করে পরিষ্কার বলে দেন, আমাদের রব তিনিই যিনি পৃথিবী ও আকাশের রব। তিনি ছাড়া অন্য কোন মাবুদকে আমরা ডাকি না। যদি আমরা এমনটি করি তাহলে অনেক বড় গুনাহ করবো। রাজা প্রথমে ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন, তোমাদের মুখ বন্ধ করো, নয়তো আমি এখনই তোমাদের হত্যা করার ব্যবস্থা করবো। তারপর কিছুক্ষণ থেমে থেকে বললেন, তোমরা এখনো শিশু। তাই তোমাদের তিনদিন সময় দিলাম। ইতিমধ্যে যদি তোমরা নিজেদের মত

বদলে ফেলো এবং জাতির ধর্মের দিকে ফিরে আসো তাহলে তো ভাল, নয়তো তোমাদের শিরচ্ছেদ করা হবে। এ তিন দিন অবকাশের সুযোগে এ সাতজন যুবক শহর ত্যাগ করেন। তারা কোন গুহায় লুকাবার জন্য পাহাড়ের পথ ধরেন। পথে একটি কুকুর তাদের সাথে চলতে থাকে। তারা কুকুরটাকে তাদের পিছু নেয়া থেকে বিরত রাখার জন্য বহু চেষ্টা করেন। কিন্তু সে কিছুতেই তাদের সংগ ত্যাগ করতে রাযী হয়নি। শেষে একটি বড় গভীর বিস্তৃত গুহাকে ভাল আশ্রয়স্থল হিসেবে বেছে নিয়ে তারা তার মধ্যে লুকিয়ে পড়েন। কুকুরটি গুহার মুখে বসে পড়ে। দারুন ক্লান্ত পরিশ্রান্ত থাকার কারণে তারা সবাই সংগে সংগেই ঘুমিয়ে পড়েন। কয়েকশত বছর পর তারা জেগে উঠেন। তখন ছিল অন্য রাজার শাসনামল। রোম সাম্রাজ্য তখন নাসারাধর্ম গ্রহণ করেছিল এবং আফসোস শহরের লোকেরাও মূর্তিপূজা ত্যাগ করেছিল।

এটা ছিল এমন এক সময় যখন রোমান সাম্রাজ্যের অধিবাসীদের মধ্যে মৃত্যু পরের জীবন এবং কিয়ামতের দিন হাশরের মাঠে জমায়েত ও হিসেব নিকেশ হওয়া সম্পর্কে প্রচণ্ড মতবিরোধ চলছিল। আখেরাত অস্বীকারের বীজ লোকদের মন থেকে কিভাবে নির্মূল করা যায় এ ব্যাপারটা নিয়ে কাইজার নিজে বেশ চিন্তিত ছিলেন। একদিন তিনি আল্লাহর কাছে দো'আ করেন যেন তিনি এমন কোন নির্দশন দেখিয়ে দেন যার মাধ্যমে লোকেরা আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে। ঘটনাক্রমে ঠিক এ সময়েই এ যুবকরা ঘুম থেকে জেগে উঠেন। জেগে উঠেই তারা পরস্পরকে জিজ্ঞেস করেন, আমরা কতক্ষণ ঘুমিয়েছি? কেউ বলেন একদিন, কেউ বলেন দিনের কিছু অংশ। তারপর আবার একথা বলে সবাই নীরব হয়ে যান যে এ ব্যাপারে আল্লাহই ভাল জানেন। এরপর তারা নিজেদের একজন সহযোগীকে রূপার কয়েকটি মুদ্রা দিয়ে খাবার আনার জন্য শহরে পাঠান। তারা ভয় করছিলেন, লোকেরা আমাদের ঠিকানা জানতে পারলে আমাদের ধরে নিয়ে যাবে এবং মূর্তি পূজা করার জন্য আমাদের বাধ্য করবে। কিন্তু লোকটি শহরে পৌঁছে সবকিছু বদলে গেছে দেখে অবাক হয়ে যান। একটি দোকানে গিয়ে তিনি কিছু রুটি কিনেন এবং দোকানদারকে একটি মুদ্রা দেন। এ মুদ্রার গায়ে অনেক পুরাতন দিনের সম্রাটের ছবি ছাপানো ছিল। দোকানদার এ মুদ্রা দেখে অবাক হয়ে যায়। সে জিজ্ঞেস করে, এ মুদ্রা কোথায় পেলে? লোকটি বলে, এ আমার নিজের টাকা, অন্য কোথাও থেকে নিয়ে আসিনি। এ নিয়ে দু'জনের মধ্যে বেশ কথা কাটাকাটি হয়। লোকদের ভীড় জমে উঠে। এমন কি শেষ পর্যন্ত বিষয়টি নগর কোতোয়ালের কাছে পৌঁছে যায়। কোতোয়াল বলেন, এ গুপ্ত ধন যেখান থেকে এনেছো সেই জায়গাটা কোথায় আমাকে বলো। সে বলেন, কিসের গুপ্তধন? এ আমার নিজের টাকা। কোন গুপ্তধনের কথা আমার জানা নেই। কোতোয়াল বলেন, তোমার একথা মেনে নেয়া যায় না। কারণ তুমি যে মুদ্রা এনেছো এতো কয়েক শো বছরের পুরনো। তুমি তো সবেমাত্র যুবক, আমাদের বুড়োরাও এ মুদ্রা

আমরা তাদের হিদায়াত বৃদ্ধি করে দিয়েছিলাম[১],

وَّرَبَطْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اِذْ قَامُوْا فَقَالُوْا رَبُّنَا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَنْ نَّدْعُوَا مِنْ دُوْنِهٖۤ اِلٰهًا لَّقَدْ قُلْنَاۤ اِذًا شَطَطًا ﴿١٤﴾

১৪. আর আমরা তাদের চিত্ত দৃঢ় করে দিলাম; তারা যখন উঠে দাঁড়াল তখন বলল, 'আমাদের রব। আসমানসমূহ ও যমীনের রব। আমরা কখনই তাঁর পরিবর্তে অন্য ইলাহ্‌কে ডাকব না; যদি ডাকি, তবে তা হবে খুবই গর্হিত কথা।

هٰۤؤُلَآءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اٰلِهَةً ؕ لَوْلَا يَاْتُوْنَ

১৫. 'আমাদের এ স্বজাতিরা, তারা তাঁর পরিবর্তে অনেক ইলাহ্ গ্রহণ করেছে।

দেখেনি। নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোন রহস্য আছে। লোকটি যখন শোনেন অত্যাচারী যালেম শাসক মারা গেছে বহুযুগ আগে তখন তিনি বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়েন। কিছুক্ষণ পর্যন্ত তিনি কোন কথাই বলতে পারেন না। তারপর আস্তে আস্তে বলেন, এ তো মাত্র কালই আমি এবং আমার ছয়জন সাথী এ শহর থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম এবং যালেম বাদশার যুলুম থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য একটি গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলাম। লোকটির একথা শুনে কোতোয়ালও অবাক হয়ে যান। তিনি তাকে নিয়ে যেখানে তার কথা মতো তারা লুকিয়ে আছেন সেই গুহার দিকে চলেন। বিপুল সংখ্যক জনতাও তাদের সাথী হয়ে যায়। তারা যে যথার্থই অনেক আগের সম্রাটের আমলের লোক সেখানে পৌঁছে এ ব্যাপারটি পুরোপুরি প্রমাণিত হয়ে যায়। এ ঘটনার খবর তৎকালীন সম্রাটের কাছেও পাঠানো হয়। তিনি নিজে এসে তাদের সাথে দেখা করেন। তারপর হঠাৎ তারা সাতজন গুহার মধ্যে গিয়ে সটান শুয়ে পড়েন এবং তাদের মৃত্যু ঘটে। এ সুস্পষ্ট নির্দশন দেখে লোকেরা যথার্থই মৃত্যুর পরে জীবন আছে বলে বিশ্বাস করে। এ ঘটনার পর সম্রাটের নির্দেশে গুহায় একটি ইবাদাতখানা নির্মাণ করা হয়। [বিস্তারিত দেখুন, কুরতুবী; বাগভী; ইবন কাসীর; তাফসীর ও আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ: ২/৫৭০]

(১) আয়াতের অর্থ হলো, যখন তারা সাচ্চা দিলে ঈমান আনলো তখন আল্লাহ তাদের ঈমান বৃদ্ধির মাধ্যমে সঠিকপথে চলার ক্ষমতা বাড়িয়ে দিলেন এবং তাদের ন্যায় ও সত্যের উপর অবিচল থাকার সুযোগ দিলেন। তারা নিজেদেরকে বিপদের মুখে ঠেলে দেবে কিন্তু বাতিলের কাছে মাথা নত করবে না। এ আয়াত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের একটি সুস্পষ্ট দলীল যে, ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। অনুরূপ দলীল সূরা মুহাম্মাদ এর ১৭, সূরা আত-তাওবার ১২৪ এবং সূরা আল-ফাতহ এর ৪ নং আয়াতেও এসেছে।

عَلَيْهِمْ بِسُلْطٰنٍۭ بَيِّنٍ ؕ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ﴿١٥﴾

এরা এ সব ইলাহ্ সম্বন্ধে স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করে না কেন? অতএব যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে তার চেয়ে অধিক যালেম আর কে?’

وَاِذِ اعْتَزَلْتُمُوْهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ فَاْوٗۤا اِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهٖ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِّنْ اَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا ﴿١٦﴾

১৬. তোমরা যখন বিচ্ছিন্ন হলে তাদের থেকে ও তারা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদের ‘ইবাদাত করে তাদের থেকে, তখন তোমরা গুহায় আশ্রয় গ্রহণ কর[১]। তোমাদের রব তোমাদের জন্য তাঁর রহমত বিস্তার করবেন এবং তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের জীবনোপকরণের বিষয়টি সহজ করে দিবেন[২]।

---

(১) এ আয়াত থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে, যদি কোথাও এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে, সেখানে অবস্থান করলে তাওহীদ ও ঈমান বজায় রাখা সম্ভব হবে না তখন সেখান থেকে হিজরত করতে হবে। যেখানে গেলে দ্বীন নিয়ে থাকতে পারবে সেখানে তাকে যেতে হবে। আর এ জন্যই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ‘অচিরেই এমন এক সময় আসবে যখন একজন ঈমানদারের সবচেয়ে বড় সম্পদ হবে কিছু ছাগল পাল যেগুলো নিয়ে সে পাহাড়ের চুড়া এবং বৃষ্টিস্নাত ভূমির পিছনে ছুটতে থাকবে। তার মূল উদ্দেশ্য হবে ফিতনা থেকে তার নিজ দ্বীনকে বাঁচিয়ে রাখা। [বুখারী: ১৯, ৩৩০০, সুনান আবু দাউদ: ৪২৩৭, মুসনাদে আহমাদ: ৩/৪৩] [ইবন কাসীর]

(২) তারা যখন তাদের দ্বীন নিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল মহান আল্লাহ্ তখন তাদের জন্য তাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ডকে সহজ সরল করে দিলেন। তারা পালিয়ে গুহাতে আশ্রয় নিল, তাদের জাতি তাদেরকে খুজে বের করতে অসমর্থ হলো এমনকি তৎকালীন বাদশাহও তাদের ব্যাপারে খোঁজাখুঁজি করে শেষে অপারগ হয়ে গেলেন। আল্লাহ্ তা‘আলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকরকেও এমনি এক সঙ্কটময় মুহূর্তে রক্ষা করেছিলেন। তারা উভয়ে সাওর গিরি গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। কুরাইশরা তাদের পিছু নিয়ে গর্তের মুখে প্রায় চলে আসছিল কিন্তু তারা তাদের অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারল না। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু একটু ভীত হয়ে বলেই ফেললেন, রাসূল! যদি তারা তাদের পায়ের নীচে তাকিয়ে দেখে তবে আমাদের দেখতে পাবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশান্ত চিত্তে উত্তর করলেন: ‘আবু বকর! যে দু’জনের জন্য তৃতীয় জন আল্লাহ্

وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزٰوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ مَن يَهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ﴿١٧﴾

১৭. আর আপনি দেখতে পেতেন- সূর্য উদয়ের সময় তাদের গুহার ডান পাশে হেলে যায় এবং অস্ত যাওয়ার সময় তাদেরকে অতিক্রম করে বাম পাশ দিয়ে[১], অথচ তারা গুহার প্রশস্ত চত্বরে, এ সবই আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের মধ্যে অন্যতম। আল্লাহ্ যাকে সৎপথে পরিচালিত করেন, সে সৎপথপ্রাপ্ত এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট

রয়েছেন তাদের ব্যাপারে তোমার কি ধারণা?' [বুখারী: ৩৬৫৩, মুসলিম: ২৩৮১] মহান আল্লাহ্ গুহাবস্থানের এ ঘটনাটিকে গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করে বলেছেন: "যদি তোমরা তাকে সাহায্য না কর, তবে আল্লাহ্ তো তাকে সাহায্য করেছিলেন যখন কাফিররা তাঁকে বহিষ্কার করেছিল এবং তিনি ছিলেন দুজনের দ্বিতীয়জন, যখন তারা উভয়ে গুহার মধ্যে ছিল; তিনি তখন তাঁর সংগীকে বলেছিলেন, 'বিষণ্ন হয়ো না, আল্লাহ্ তো আমাদের সাথে আছেন।' তারপর আল্লাহ্ তাঁর উপর তাঁর প্রশান্তি বর্ষণ করেন এবং তাঁকে শক্তিশালী করেন এমন এক সৈন্যবাহিনী দ্বারা যা তোমরা দেখনি এবং তিনি কাফিরদের কথা হেয় করেন। আল্লাহ্‌র কথাই সর্বোপরি এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" [সূরা আত-তাওবাহ: ৪০] সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুহাবস্থানের ঘটনা আসহাবে কাহফের গুহাবস্থানের ঘটনা থেকে অধিক মর্যাদা, গুরুত্বপূর্ণ ও আশ্চর্যজনক।

(১) আয়াতের অর্থ বর্ণনায় দু'টি মত রয়েছে। এক, তারা গুহার এক কোনে এমনভাবে আছে যে, সেখানে সূর্যের আলো পৌঁছে না। স্বাভাবিক আড়াল তাদেরকে সূর্যের আলো থেকে রক্ষা করছে। কারণ, তাদের গুহার মুখ ছিল উত্তর দিকে। এ কারণে সূর্যের আলো কোন মওসূমেই গুহার মধ্যে পৌঁছুতো না এবং বাহির থেকে কোন পথ অতিক্রমকারী দেখতে পেতো না গুহার মধ্যে কে আছে। [দেখুন, ইবন কাসীর]
দুই, তারা একটি প্রশস্ত চত্বরে অবস্থান করা সত্বেও দিনের বেলার আলো সূর্যের উদয় বা অস্ত কোন অবস্থায়ই তাদের কাছে পৌঁছে না। কেননা, মহান আল্লাহ্ তাদের সম্মানার্থে এ অলৌকিক ব্যবস্থা করেছেন। প্রশস্ত স্থানে সূর্যের আলো প্রবেশ করতে কোন বাধা না থাকলেও তিনি তার স্পেশাল ব্যবস্থাপনায় তাদেরকে সূর্যের আলোর তাপ থেকে রক্ষা করেছেন। এ অর্থের সপক্ষে প্রমাণ হলো এর পরে বর্ণিত মহান আল্লাহ্‌র বাণী: "এটা তো আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্যতম"। যদি স্বাভাবিক ব্যবস্থাপনা হতো তবে আল্লাহ্‌র নিদর্শন বলার প্রয়োজন ছিল না। [ফাতহুল কাদীর] ইবনে আব্বাস বলেন, সূর্যের আলো যদি তাদের গায়ে লাগত তবে তাদের কাপড় ও শরীর পুড়ে যেতে পারত। [ইবন কাসীর]

করেন, আপনি কখনো তার জন্য কোন পথনির্দেশকারী অভিভাবক পাবেন না।

তৃতীয় রুকূ'

وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ﴿١٨﴾

১৮. আর আপনি মনে করতেন তারা জেগে আছে, অথচ তারা ছিল ঘুমন্ত[১]। আর আমরা তাদেরকে পাশ ফিরাতাম ডান দিকে ও বাম দিকে[২] এবং তাদের কুকুর ছিল সামনের পা দু'টি গুহার দরজায় প্রসারিত করে। যদি আপনি তাদের প্রতি তাকিয়ে দেখতেন, তবে অবশ্যই আপনি পিছন ফিরে পালিয়ে যেতেন। আর অবশ্যই আপনি তাদের ভয়ে আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়তেন[৩];

وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ

১৯. আর এভাবেই[৪] আমরা তাদেরকে

(১) অর্থাৎ আপনি যদি তাদেরকে গুহায় অবস্থানকালে দেখতে পেতেন তাহলে মনে করতেন যে, তারা জেগে আছে অথচ তারা ঘুমন্ত। তাদেরকে জেগে আছে মনে করার কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে যে, তারা পাশ ফিরাচ্ছে। আর যারা পাশ ফিরে শুতে পারে তারা সামান্য হলেও জাগ্রত হয়। অথবা কারও কারও মতে, তারা ঘুমন্ত হলেও তাদের চোখ খোলা থাকত। [ফাতহুল কাদীর]

(২) অর্থাৎ কেউ বাইর থেকে উঁকি দিয়ে দেখলেও তাদের সাতজনের মাঝে মাঝে পার্শ্বপরিবর্তন করতে থাকার কারণে এ ধারণা করতো যে, এরা এমনিই শুয়ে আছে, ঘুমুচ্ছে না। পার্শ্ব পরিবর্তনের কারণ কারও কারও মতে, যাতে যমীন তাদের শরীর খেয়ে না ফেলে। [ফাতহুল কাদীর]

(৩) অর্থাৎ পাহাড়ের মধ্যে একটি অন্ধকার গুহায় কয়েকজন লোকের এভাবে অবস্থান করা এবং সামনের দিকে কুকুরের বসে থাকা এমন একটি ভয়াবহ দৃশ্য পেশ করে যে, উঁকি দিয়ে যারা দেখতো তারাই ভয়ে পালিয়ে যেতো। তাছাড়া আল্লাহ্ তাদের উপর ভীতি ঢেলে দিয়েছিলেন, সুতরাং যে কেউ তাদের দেখত, তারই ভয়ের উদ্রেক হতো। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(৪) وَكَذَٰلِكَ এ শব্দটি তুলনামূলক ও দৃষ্টান্তমূলক অর্থ দেয়। এখানে দু'টি ঘটনার পারস্পরিক তুলনা বোঝানো হয়েছে। প্রথম ঘটনা আসহাবে কাহ্‌ফের দীর্ঘকাল পর্যন্ত নিদ্রাভিভূত থাকা, যা কাহিনীর শুরুতে ﴿فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ﴾ আয়াতে ব্যক্ত

مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

জাগিয়ে দিলাম যাতে তারা পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করে[১]। তাদের একজন বলল, 'তোমরা কত সময় অবস্থান করেছ?' কেউ কেউ বলল, 'আমরা অবস্থান করেছি এক দিন বা এক দিনের কিছু অংশ।' অপর কেউ কেউ বলল, 'তোমরা কত সময় অবস্থান করেছ তা তোমাদের রবই ভাল জানেন[২]। সুতরাং তোমরা

করা হয়েছে। দ্বিতীয় ঘটনা দীর্ঘকালীন নিদ্রার পর সুস্থ থাকা এবং খাদ্য না পাওয়া সত্ত্বেও সবল ও সুঠাম দেহে জাগ্রত হওয়া। উভয় ঘটনা আল্লাহ্‌র কুদরতের নিদর্শন হওয়ার ব্যাপারে পরস্পর তুল্য। তাই এ আয়াতে তাদেরকে জাগ্রত করার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে كذلك ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাদের নিদ্রা যেমন সাধারণ মানুষের নিদ্রার মত ছিল না, তেমনি তাদের জাগরণও স্বতন্ত্র ছিল। [দেখুন, ইবন কাসীর] এখানে বর্ণিত ليتساءلوا এর ل টিকে বলা হয়, لام صيرورة বা لام العاقبة যার অর্থ পরিণামে যাতে এটা হয়। অর্থাৎ তাদেরকে জাগ্রত করার পরিণাম যেন এই দাঁড়ায়। [কুরতুবী] মোটকথা, তাদের দীর্ঘ নিদ্রা যেমন কুদরতের একটি নিদর্শন ছিল, এমনিভাবে শতশত বছর পর পানাহার ছাড়া সুস্থ-সবল অবস্থায় জাগ্রত হওয়াও ছিল আল্লাহ্‌র অপার শক্তির একটি নিদর্শন। [দেখুন, ইবন কাসীর]

(১) অর্থাৎ আল্লাহ্‌র এটাও ইচ্ছা ছিল যে, শত শত বছর নিদ্রামগ্ন থাকার বিষয়টি স্বয়ং তারাও জানুক। তাই পারস্পরিক জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে এর সূচনা হয় এবং সে ঘটনা দ্বারা চুড়ান্ত রূপ নেয়, যা পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ তাদের গোপন রহস্য শহরবাসীরা জেনে ফেলে এবং সময়কাল নির্ণয়ে মতানৈক্য সত্ত্বেও দীর্ঘকাল গুহায় নিদ্রামগ্ন থাকার ব্যাপারে সবার মনেই বিশ্বাস জন্মে। আর তারা মৃত্যু ও পুনরুত্থান সম্পর্কে আল্লাহ্‌র শক্তির কথা স্মরণ করে। [ফাতহুল কাদীর] বস্তুত: যে অদ্ভুত পদ্ধতিতে তাদেরকে ঘুম পাড়ানো হয়েছিল এবং দুনিয়াবাসীকে তাদের অবস্থা সম্পর্কে বেখবর রাখা হয়েছিল ঠিক তেমনি সুদীর্ঘকাল পরে তাদের জেগে উঠাও ছিল আল্লাহর শক্তিমত্তার বিস্ময়কর প্রকাশ।

(২) অর্থাৎ আসহাবে কাহ্‌ফের এক ব্যক্তি প্রশ্ন তুলল যে, তোমরা কতকাল নিদ্রামগ্ন রয়েছ? কেউ কেউ উত্তর দিল: একদিন অথবা একদিনের কিছু অংশ। কেননা, তারা সকাল বেলায় গুহায় প্রবেশ করেছিল এবং জাগরণের সময়টি ছিল বিকাল। তাই মনে করল যে, এটা সেই দিন যেদিন আমরা গুহায় প্রবেশ করেছিলাম। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] কিন্তু তাদের মধ্য থেকেই অন্যরা অনুভব করল যে, এটা সম্ভবতঃ সেই দিন নয়। তাহলে কতদিন গেল জানা নেই। তাই তারা বিষয়টি আল্লাহ্‌র উপর

তোমাদের একজনকে তোমাদের এ মুদ্রাসহ বাজারে পাঠাও। সে যেন দেখে কোন্ খাদ্য উত্তম তারপর তা থেকে যেন কিছু খাদ্য নিয়ে আসে তোমাদের জন্য(১)। আর সে যেন বিচক্ষণতার সাথে কাজ করে। আর কিছুতেই যেন তোমাদের সম্বন্ধে কাউকেও কিছু জানতে না দেয়।

২০. 'তারা যদি তোমাদের বিষয় জানতে পারে তবে তো তারা তোমাদেরকে পাথরের আঘাতে হত্যা করবে অথবা তোমাদেরকে তাদের মিল্লাতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। আর সে ক্ষেত্রে তোমরা কখনো সফল হবে না।'

إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا ﴿٢٠﴾

২১. আর এভাবে আমরা মানুষদেরকে তাদের হদিস জানিয়ে দিলাম যাতে তারা জানে যে, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য এবং কিয়ামতে কোন সন্দেহ নেই(২)। যখন তারা তাদের কর্তব্য

وَكَذَٰلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ

ছেড়ে দিয়ে ﴿رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ﴾ অতঃপর তারা এ আলোচনাকে অনাবশ্যক মনে করে জরুরী কাজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল যে, শহর থেকে কিছু খাদ্য আনার জন্য একজনকে পাঠানো হোক। [ফাতহুল কাদীর]

(১) আসহাবে কাহ্‌ফ নিজেদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে শহরে প্রেরণের জন্য মনোনীত করে এবং খাদ্য আনার জন্য তার কাছে অর্থ অর্পণ করে। এ থেকে কয়েকটি বিষয় জানা যায়। (এক) অর্থ-সম্পদে অংশীদারিত্ব জায়েয। (দুই) অর্থ-সম্পদের উকিল নিযুক্ত করা জায়েয এবং শরীকানাধীন সম্পদ কোন এক ব্যক্তি অন্যদের অনুমতিক্রমে ব্যয় করতে পারে। (তিন) খাদ্যদ্রব্যে কয়েকজন সঙ্গী শরীক হলে তা জায়েয; যদিও খাওয়ার পরিমাণ বিভিন্নরূপ হয়- কেউ কম খায় আর কেউ বেশী খায়। [দেখুন, কুরতবী]

(২) সেকালে সেখানে কেয়ামত ও আখেরাত সম্পর্কে বিষম বিতর্ক চলছিল। যদিও রোমান শাসনের প্রভাবে সাধারণ লোক ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ করেছিল এবং আখেরাত

الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ﴿٢١﴾

বিষয়ে নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করছিল তখন অনেকে বলল, 'তাদের উপর সৌধ নির্মাণ কর।' তাদের রব তাদের বিষয় ভাল জানেন[১]। তাদের কর্তব্য বিষয়ে যাদের মত প্রবল হল তারা[২]

এ ধর্মের মৌলিক আকীদা বিশ্বাসের অংগ ছিল তবুও তখনো রোমীয় শির্ক ও মূর্তি পূজা এবং গ্রীক দর্শনের প্রভাব ছিল যথেষ্ট শক্তিশালী। এর ফলে বহু লোক আখেরাত অস্বীকার অথবা কমপক্ষে তার অস্তিত্বের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করতো। ঠিক এ সময় আসহাবে কাহ্ফের ঘুম থেকে জেগে উঠার ঘটনাটি ঘটে এবং এটি মৃত্যুর পর পনরুত্থানের সপক্ষে এমন চাক্ষুষ প্রমাণ পেশ করে যা অস্বীকার করার কোন উপায় ছিল না। [দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(১) বক্তব্যের তাৎপর্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে,এটি ছিল ঈসায়ী সজ্জনদের উক্তি। তাদের মতে আসহাবে কাহ্ফ গুহার মধ্যে যেভাবে শুয়ে আছেন সেভাবেই তাদের শুয়ে থাকতে দাও এবং গুহার মুখ বন্ধ করে দাও। তাদের রবই ভাল জানেন তারা কারা,তাদের মর্যাদা কি এবং কোন ধরনের প্রতিদান তাদের উপযোগী। [ইবন কাসীর]

(২) সম্ভবত: এখানে রোম সাম্রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ এবং খৃষ্টীয় গীর্জার ধর্মীয় নেতৃবর্গের কথা বলা হয়েছে, যাদের মোকাবিলায় সঠিক আকীদা-বিশ্বাসের অধিকারী ঈসায়ীদের কথা মানুষের কাছে ঠাঁই পেতো না। পঞ্চম শতকের মাঝামাঝি সময়ে পৌঁছুতে পৌঁছুতে সাধারণ নাসারাদের মধ্যে বিশেষ করে রোমান ক্যাথলিক গীর্জাসমূহে শির্ক, আউলিয়া পূজা ও কবর পূজা পুরো জোরেশোরে শুরু হয়ে গিয়েছিল। বুযর্গদের আস্তানা পূজা করা হচ্ছিল এবং ঈসা, মারইয়াম ও হাওয়ারীগণের প্রতিমূর্তি গীর্জাগুলোতে স্থাপন করা হচ্ছিল। আসহাবে কাহ্ফের নিদ্রাভংগের মাত্র কয়েক বছর আগে মতান্তারে ৪৩১ খৃষ্টাব্দে সমগ্র খৃষ্টীয় জগতের ধর্মীয় নেতাদের একটি কাউন্সিল এ 'আফসোস' নগরীতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানে ঈসা আলাইহিস সালামের ইলাহ হওয়া এবং মারইয়াম আলাইহাসসালামের "ইলাহ-মাতা" হওয়ার আকীদা চার্চের সরকারী আকীদা হিসেবে গণ্য হয়েছিল। এ ইতিহাস সামনে রাখলে পরিষ্কার জানা যায়, এখানে ﴿الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ﴾ বাক্যে যাদেরকে প্রাধান্য লাভকারী বলা হয়েছে তারা হচ্ছে এমনসব লোক যারা ঈসা আলাইহিসসালামের সাচ্চা অনুসারীদের মোকাবিলায় তৎকালীন খৃষ্টান জনগণের নেতা এবং তাদের শাসকের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিল এবং ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিষয়াবলী যাদের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। মূলত এরাই ছিল শির্কের পতাকাবাহী এবং এরাই আসহাবে কাহ্ফের সমাধি সৌধ নির্মাণ করে সেখানে মসজিদ তথা ইবাদাতখানা নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যা রাহেমাহুল্লাহ এ সম্ভাবনাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। [দেখুন, ইকতিদায়ুস সিরাতিল মুস্তাকীম: ১/৯০]

বলল, 'আমরা তো নিশ্চয় তাদের পাশে মসজিদ নির্মাণ করব[1]।'

২২. কেউ কেউ বলবে, 'তারা ছিল তিনজন, তাদের চতুর্থটি ছিল তাদের কুকুর' এবং কেউ কেউ বলবে, 'তারা ছিল পাঁচজন, তাদের ষষ্ঠটি ছিল তাদের কুকুর', গায়েবী বিষয়ে অনুমানের উপর নির্ভর করে। আবার কেউ কেউ বলবে, 'তারা ছিল সাতজন, তাদের

سَيَقُولُونَ ثَلَٰثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَآءً ظَٰهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا ﴿٢٢﴾

(১) মুসলিমদের মধ্যে কিছু লোক কুরআন মজীদের এ আয়াতটির সম্পূর্ণ উল্টা অর্থ গ্রহণ করেছে। তারা এ থেকে প্রমাণ করতে চান যে, নবী-রাসূল সাহাবী ও সৎ লোকদের কবরের উপর সৌধ ও মসজিদ নির্মাণ জায়েয। অথচ কুরআন এখানে তাদের এ গোমরাহীর প্রতি ইংগিত করছে যে, এ যালেমদের মনে মৃত্যুর পর পুনরুত্থান ও আখেরাত অনুষ্ঠানের ব্যাপারে প্রত্যয় সৃষ্টি করার জন্য তাদেরকে যে নির্দশন দেখানো হয়েছিল তাকে তারা শির্কের কাজ করার জন্য আল্লাহ্ প্রদত্ত একটি সুযোগ মনে করে নেয় এবং ভাবে যে, ভালই হলো পূজা করার জন্য আরো কিছু আল্লাহর অলী পাওয়া গেলো। তাছাড়া এই আয়াত থেকে "সালেহীন" তথা সৎলোকদের কবরের উপর মসজিদ তৈরী করার প্রমাণ কেমন করে সংগ্রহ করা যেতে পারে যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিভিন্ন উক্তির মধ্যে এর প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছেঃ "কবর যিয়ারতকারী নারী ও কবরের উপর মসজিদ নির্মাণকারীদের প্রতি আল্লাহ্ লানত বর্ষণ করেছেন।" [সহীহ ইবনে হিব্বানঃ ৩১৮০, মুসনাদে আহমদঃ ১/২২৯, ২৮৭, ৩২৪, তিরমিযীঃ ৩২০, আবু দাউদঃ ৩২৩৬]। আরো বলেছেনঃ "সাবধান হয়ে যাও, তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তাদের নবীদের কবরকে ইবাদাতখানা বানিয়ে নিতো। আমি তোমাদের এ ধরনের কাজ থেকে নিষেধ করছি।" [মুসলিমঃ ৫৩২]। আরো বলেনঃ "আল্লাহ্ ইয়াহূদী ও নাসারাদের প্রতি লানত বর্ষণ করেছেন। তারা নিজেদের নবীদের কবরগুলোকে ইবাদাতখানায় পরিণত করেছে।" [আহমদঃ১/২১৮, মুসলিমঃ ৩৭৬]। অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "এদের অবস্থা এ ছিল যে, যদি এদের মধ্যে কোন সৎলোক থাকতো তার মৃত্যুর পর এরা তার কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করতো এবং তার ছবি তৈরী করতো। এরা কিয়ামতের দিন নিকৃষ্ট সৃষ্টি হিসেবে গণ্য হবে।" [বুখারীঃ ৪১৭, মুসলিমঃ ৫২৮]। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ সুস্পষ্ট বিধান থাকার পরও কোন আল্লাহভীরু ব্যক্তি কুরআন মজীদে ঈসায়ী পাদ্রী ও রোমীয় শাসকদের যে ভ্রান্ত কর্মকাণ্ড কাহিনীচ্ছলে বর্ণনা করা হয়েছে তাকেই ঐ নিষিদ্ধ কর্মটি করার জন্য দলীল ও প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করাবার দুঃসাহস কিভাবে করতে পারে? [এ ব্যাপারে আরও দেখুন, কুরতুবী; ইবন কাসীর]

অষ্টমটি ছিল তাদের কুকুর।' বলুন, 'আমার রবই তাদের সংখ্যা ভাল জানেন'; তাদের সংখ্যা কম সংখ্যক লোকই জানে[১]। সুতরাং সাধারণ আলোচনা ছাড়া আপনি তাদের বিষয়ে বিতর্ক করবেন না এবং এদের কাউকেও তাদের বিষয়ে জিজ্ঞেস করবেন না[২]।

চতুর্থ রুকূ'

২৩. আর কখনই আপনি কোন বিষয়ে বলবেন না, "আমি তা আগামী কাল করব,

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَا۟يْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ﴿٢٣﴾

২৪. 'আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে' এ কথা না বলে।[৩]" আর যদি ভুলে যান তবে

إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ

(১) এ থেকে জানা যায়, এ ঘটনার পৌনে তিনশো বছর পরে কুরআন নাযিলের সময় এর বিস্তারিত বিবরণ সম্পর্কে নাসারাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের কাহিনী প্রচলিত ছিল। তবে নির্ভরযোগ্য তথ্যাদি সাধারণ লোকদের জানা ছিল না। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে মৌখিক বর্ণনার সাহায্যে ঘটনাবলী চারদিকে ছড়িয়ে পড়তো এবং সময় অতিবাহিত হবার সাথে সাথে তাদের বহু বিবরণ গল্পের রূপ নিতো। তবুও যেহেতু তৃতীয় বক্তব্যটির প্রতিবাদ আল্লাহ করেননি তাই ধরে নেয়া যেতে পারে যে, সঠিক সংখ্যা সাতই ছিল। তাছাড়া ইবন্ আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলতেন: 'আমি সেই কম সংখ্যক লোকদের অন্যতম যারা তাদের সংখ্যা জানে, তারা সংখ্যায় ছিল সাতজন।' [দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(২) এর অর্থ হচ্ছে, তাদের সংখ্যাটি জানা আসল কথা নয় বরং আসল জিনিস হচ্ছে এ কাহিনী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। [দেখুন, ইবন কাসীর]

(৩) এখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার উম্মতকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, ভবিষ্যতকালে কোন কাজ করার ওয়াদা বা স্বীকারোক্তি করলে এর সাথে 'ইনশাআল্লাহ্' বাক্যটি যুক্ত করতে হবে। কেননা, ভবিষ্যতে জীবিত থাকবে কিনা তা কারো জানা নেই। জীবিত থাকলেও কাজটি করতে পারবে কিনা, তারও নিশ্চয়তা নেই। কাজেই মুমিনের উচিত মনে মনে এবং মুখে স্বীকারোক্তির মাধ্যমে আল্লাহ্র উপর ভরসা করা। ভবিষ্যতে কোন কাজ করার কথা বললে এভাবে বলা দরকারঃ যদি আল্লাহ্ চান, তবে আমি এ কাজটি আগামী কাল করব। ইনশাআল্লাহ্ বাক্যের

وَقُلْ عَسَىٰٓ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّى لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا

আপনার রবকে স্মরণ করবেন[১] এবং বলবেন, 'সম্ভবত আমার রব আমাকে এটার চেয়ে সত্যের কাছাকাছি পথ নির্দেশ করবেন।'

وَلَبِثُوا۟ فِى كَهْفِهِمْ ثَلَٰثَ مِا۟ئَةٍ سِنِينَ وَٱزْدَادُوا۟ تِسْعًا

২৫. আর তারা তাদের গুহায় ছিল তিন'শ বছর, আরো নয় বছর বেশী [২]।

অর্থ তাই। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 'সুলাইমান ইবনে দাউদ 'আলাইহিমাস্ সালাম বললেনঃ আমি আজ রাতে আমার সত্তর জন স্ত্রীর উপর উপগত হব। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে- নব্বই জন স্ত্রীর উপগত হব, তাদের প্রত্যেকেই একটি ছেলে সন্তান জন্ম দেবে যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করবে। তখন তাকে ফিরিশ্‌তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন যে, বলুনঃ ইনশাআল্লাহ্। কিন্তু তিনি বললেন না। ফলে তিনি সমস্ত স্ত্রীর উপর উপনীত হলেও তাদের কেউই কোন সন্তান জন্ম দিল না। শুধু একজন স্ত্রী একটি অপরিণত সন্তান প্রসব করল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ যার হাতে আমার প্রাণ, সে যদি বলত ইনশাআল্লাহ্, তবে অবশ্যই তার ওয়াদা ভঙ্গ হত না। আর তা তার ওয়াদা পূর্ণতায় সহযোগী হত'। [বুখারীঃ ৩৪২৪, ৫২৪২,৬৬৩৯, ৭৪৬৯, মুসলিমঃ ১৬৫৪, আহমাদঃ ২/২২৯, ৫০৬]

(১) কোন কোন মুফাসসির বলেন, আয়াতের অর্থ হলো, যখনি আপনি কোন কিছু ভুলে যাবেন তখনই আল্লাহ্‌কে স্মরণ করবেন। কারণ, ভুলে যাওয়াটা শয়তানের কারসাজির ফলে ঘটে। আর মহান আল্লাহ্‌র স্মরণ শয়তানকে দূরে তাড়িয়ে দেয় যা পুনরায় স্মরণ করতে সাহায্য করবে। এ অর্থটির সাথে পরবর্তী বাক্যের মিল বেশী। অপর কোন কোন মুফাসসির বলেন, এ আয়াতটি পূর্বের আয়াতের সাথে মিলিয়ে অর্থ করতে হবে। অর্থাৎ আপনি যদি ইনশাল্লাহ ভুলে যান তবে যখনই মনে হবে তখনই ইনশাআল্লাহ বলে নেবেন। [দেখুন, ইবন কাসীর]

(২) এ আয়াতে একটি বিরোধপূর্ণ আলোচনার ফয়সালা করা হয়েছে। অর্থাৎ গুহায় নিদ্রামগ্ন থাকার সময়কাল। এ আয়াতের তাফসীরে কোন কোন মুফাসসিরের মতে, এ বাক্যে তিন'শ ও নয় বছরের যে সংখ্যা বর্ণনা করা হয়েছে তা লোকদের উক্তি, এটা আল্লাহর উক্তি নয়। অর্থাৎ এখানে মতভেদকারীদের মত উল্লেখ করা হয়েছে। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর] তবে বিশুদ্ধ মত হচ্ছে যে, এখানে আল্লাহ্ তা'আলা পক্ষ থেকে তাদের গুহায় অবস্থানের কাল বর্ণনা করা হয়েছে। সে হিসাবে এ আয়াতে বলে দেয়া হয়েছে যে, এই সময়কাল তিনশ' নয় বছর। এখন কাহিনীর শুরুতে ﴿فَضَرَبْنَا عَلَىٰٓ ءَاذَانِهِمْ فِى ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا﴾ বলে যে বিষয়টি সংক্ষেপে বলা হয়েছিল, এখানে যেন তাই বর্ণনা করে দেয়া হল। [ইবন কাসীর]

قُلِ اللّٰهُ اَعۡلَمُ بِمَا لَبِثُوۡا ۚ لَهٗ غَيۡبُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ ؕ اَبۡصِرۡ بِهٖ وَاَسۡمِعۡ ؕ مَا لَهُمۡ مِّنۡ دُوۡنِهٖ مِنۡ وَّلِىٍّ وَّلَا يُشۡرِكُ فِىۡ حُكۡمِهٖۤ اَحَدًا ﴿۲۶﴾

২৬. আপনি বলুন, 'তারা কত কাল অবস্থান করেছিল তা আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন', আসমান ও যমীনের গায়েবের জ্ঞান তাঁরই। তিনি কত সুন্দর দ্রষ্টা ও শ্রোতা! তিনি ছাড়া তাদের অন্য কোন অভিভাবক নেই। তিনি কাউকেও নিজ কর্তৃত্বে শরীক করেন না।

وَاتۡلُ مَاۤ اُوۡحِىَ اِلَيۡكَ مِنۡ كِتَابِ رَبِّكَ ؕ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ۚ وَلَنۡ تَجِدَ مِنۡ دُوۡنِهٖ مُلۡتَحَدًا ﴿۲۷﴾

২৭. আর আপনি আপনার প্রতি ওহী করা আপনার রব-এর কিতাব থেকে পড়ে শুনান। তাঁর বাক্যসমূহের কোন পরিবর্তনকারী নেই। আর আপনি কখনই তাঁকে ছাড়া অন্য কোন আশ্রয় পাবেন না।

وَاصۡبِرۡ نَفۡسَكَ مَعَ الَّذِيۡنَ يَدۡعُوۡنَ رَبَّهُمۡ بِالۡغَدٰوةِ وَالۡعَشِىِّ يُرِيۡدُوۡنَ وَجۡهَهٗ وَلَا تَعۡدُ عَيۡنٰكَ عَنۡهُمۡ ۚ تُرِيۡدُ زِيۡنَةَ الۡحَيٰوةِ الدُّنۡيَا ۚ وَلَا تُطِعۡ مَنۡ اَغۡفَلۡنَا قَلۡبَهٗ عَنۡ ذِكۡرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰٮهُ وَكَانَ اَمۡرُهٗ فُرُطًا ﴿۲۸﴾

২৮. আর আপনি নিজকে ধৈর্যের সাথে রাখবেন তাদেরই সংসর্গে যারা সকাল ও সন্ধ্যায় ডাকে তাদের রবকে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে(১) এবং আপনি দুনিয়ার জীবনের শোভা কামনা করে তাদের থেকে আপনার দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবেন না(২)। আর আপনি তার

(১) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ্‌র স্মরণে অনুষ্ঠিত মজলিসে যারা একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিধানে একত্রিত হবে তাদের ব্যাপারে আকাশ থেকে আহ্বান করে বলা হয় তোমরা যখন তোমাদের মজলিস শেষ করবে তখন তোমরা ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে আর তোমাদের গোনাহসমূহ সৎকাজে পরিবর্তিত হবে। [মুসনাদে আহমাদ: ৩/১৪২]

(২) এ আয়াতটির মূল বক্তব্য সূরা আল-আন'আমের ৫২ নং আয়াতের মতই। সেখানে আয়াত নাযিল হওয়ার প্রেক্ষাপটে বলা হয়েছে যে, কাফেরদের আব্দার ছিল, 'আপনি যদি গরীব মুসলিমদেরকে আপনার মজলিস থেকে দূরে সরিয়ে দেন তবেই আমরা আপনার সাথে বসার কথা চিন্তা করে দেখতে পারি' [দেখুন, মুসলিম: ২৪১৩, মুসনাদে আহমাদ: ৫/২৬১] এ ধরণের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতে তাদের পরামর্শ গ্রহণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। শুধু নিষেধই নয়- নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আপনি নিজেকে তাদের সাথে বেঁধে

আনুগত্য করবেন না---যার চিত্তকে আমরা আমাদের স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি, যে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করেছে ও যার কর্ম বিনষ্ট হয়েছে।

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ اِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ نَارًا اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَاِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُوْهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٢٩﴾

২৯. আর বলুন, 'সত্য তোমাদের রব-এর কাছ থেকে; কাজেই যার ইচ্ছে ঈমান আনুক আর যার ইচ্ছে কুফরী করুক।' নিশ্চয় আমরা যালেমদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি আগুন, যার বেষ্টনী তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। তারা পানীয় চাইলে তাদেরকে দেয়া হবে গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয়, যা তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে; এটা নিকৃষ্ট পানীয়! আর জাহান্নাম কত নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল[১]!

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا ﴿٣٠﴾

৩০. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে ---আমরা তো তার শ্রমফল নষ্ট করি না- যে উত্তমরূপে কাজ সম্পাদন করেছে।

اُولٰٓئِكَ لَهُمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمُ

৩১. তারাই এরা, যাদের জন্য আছে স্থায়ী জান্নাত যার পাদদেশে নদীসমূহ

রাখুন। সম্পর্ক ও মনোযোগ তাদের প্রতি নিবদ্ধ রাখুন। কাজেকর্মে তাদের কাছ থেকেই পরামর্শ নিন। এর কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, তারা সকাল-সন্ধ্যায় অর্থাৎ সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত ও যিক্‌র করে। তাদের কার্যকলাপ একান্তভাবেই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে নিবেদিত। অপরদিকে কাফেরদের মন আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে গাফেল এবং তাদের সমস্ত কার্যকলাপ তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসারী। এসব অবস্থা মানুষকে আল্লাহ্‌র রহমত ও সাহায্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। [দেখুন, ইবন কাসীর]

(১) সূরা আল-ফুরকানের ৬৬ নং আয়াতেও অনুরূপ কাফেরদের শেষ আবাসস্থান সম্পর্কে অনুরূপ উক্তি করা হয়েছে।

الْأَنْهٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّيَلْبَسُوْنَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّنْ سُنْدُسٍ وَّإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِـِٕيْنَ فِيهَا عَلَى الْأَرَآئِكِ ۚ نِعْمَ الثَّوَابُ ۚ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٣١﴾

প্রবাহিত, সেখানে তাদেরকে স্বর্ণ কংকনে অলংকৃত করা হবে[১], তারা পরবে সূক্ষ্ম ও পুরু রেশমের সবুজ বস্ত্র, আর তারা সেখানে থাকবে হেলান দিয়ে সুসজ্জিত আসনে[২]; কত সুন্দর পুরস্কার ও উত্তম বিশ্রামস্থল[৩]!

পঞ্চম রুকূ'

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَّحَفَفْنٰهُمَا بِنَخْلٍ وَّجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿٣٢﴾

৩২. আর আপনি তাদের কাছে পেশ করুন দু'ব্যক্তির উপমা: তাদের একজনকে আমরা দিয়েছিলাম দু'টি আঙ্গুরের বাগান এবং এ দু'টিকে আমরা খেজুর গাছ দিয়ে পরিবেষ্টিত করেছিলাম ও এ দু'টির মধ্যবর্তী স্থানকে করেছিলাম শস্যক্ষেত্র।

كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ اٰتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِّنْهُ شَيْـًٔا ۙ وَّفَجَّرْنَا خِلٰلَهُمَا نَهَرًا ﴿٣٣﴾

৩৩. উভয় বাগানই ফল দান করত এবং এতে কোন ত্রুটি করত না আর আমরা উভয়ের ফাঁকে ফাঁকে প্রবাহিত করেছিলাম নহর।

---

(১) প্রাচীনকালে রাজা বাদশাহরা সোনার কাঁকন পরতেন। [ফাতহুল কাদীর] জান্নাতবাসীদের পোশাকের মধ্যে এ জিনিসটির কথা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা জানিয়ে দেয়া যে, সেখানে তাদেরকে রাজকীয় পোশাক পরানো হবে। একজন কাফের ও ফাসেক বাদশাহ সেখানে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে এবং একজন মুমিন ও সৎ মজদুর সেখানে থাকবে রাজকীয় জৌলুসের মধ্যে।

(২) বলা হয়েছে তারা আসন গ্রহণ করবে 'আরাইক এ। এ 'আরাইক' শব্দটি বহুবচন। এর এক বচন হচ্ছে "আরীকাহ" আরবী ভাষায় আরীকাহ এমন ধরনের আসনকে বলা হয় যার উপর ছত্র খাটানো আছে। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] এর মাধ্যমেও এখানে এ ধারণা দেয়াই উদ্দেশ্য যে, সেখানে প্রত্যেক জান্নাতী রাজকীয় সিংহাসনে অবস্থান করবে।

(৩) সূরা আল-ফুরকানের ৭৫-৭৬ নং আয়াতেও জান্নাতবাসীদের অবস্থানস্থল সম্পর্কে অনুরূপ উক্তি করা হয়েছে।

৩৪. এবং তার প্রচুর ফল-সম্পদ[১] ছিল। তারপর কথা প্রসঙ্গে সে তার বন্ধুকে বলল, 'ধন-সম্পদে আমি তোমার চেয়ে বেশী এবং জনবলে তোমার চেয়ে শক্তিশালী।'

وَّكَانَ لَهٗ ثَمَرٌ ۚ فَقَالَ لِصَاحِبِهٖ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗٓ اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَّاَعَزُّ نَفَرًا ﴿٣٤﴾

৩৫. আর সে তার বাগানে প্রবেশ করল নিজের প্রতি যুলুম করে। সে বলল, 'আমি মনে করি না যে, এটা কখনো ধ্বংস হয়ে যাবে[২];

وَدَخَلَ جَنَّتَهٗ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ۚ قَالَ مَآ اَظُنُّ اَنْ تَبِيْدَ هٰذِهٖٓ اَبَدًا ﴿٣٥﴾

৩৬. 'আমি মনে করি না যে, কেয়ামত সংঘটিত হবে। আর আমাকে যদি আমার রব-এর কাছে ফিরিয়ে নেয়াও হয়, তবে আমি তো নিশ্চয় এর চেয়ে উৎকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল পাব[৩]।'

وَّمَآ اَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً ۙ وَّلَئِنْ رُّدِدْتُّ اِلٰى رَبِّيْ لَاَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ﴿٣٦﴾

---

(১) ثمر শব্দের অর্থ বৃক্ষের ফল এবং সাধারণ ধন-সম্পদ। এখানে ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও কাতাদাহ্ থেকে দ্বিতীয় অর্থ বর্ণিত হয়েছে। [ইবন কাসীর] কামুস গ্রন্থে আছে ثمر একটি বৃক্ষের ফল এবং নানা রকমের ধন-সম্পদের অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ থেকে জানা যায় যে, লোকটির কাছে শুধু ফলের বাগান ও শস্যক্ষেত্রই ছিল না, বরং স্বর্ণ-রৌপ্য ও বিলাস-ব্যসনের যাবতীয় সাজ-সরঞ্জামও বিদ্যমান ছিল। [অনুরূপ দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(২) অর্থাৎ যে বাগানগুলোকে সে নিজের জান্নাত মনে করছিল। সে মনে করেছিল এগুলো স্থায়ী সম্পদ। অর্বাচীন লোকেরা দুনিয়ায় কিছু ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও শান-শওকতের অধিকারী হলেই সর্বদা এ বিভ্রান্তির শিকার হয় যে, তারা দুনিয়াতেই জান্নাত পেয়ে গেছে। এখন আর এমন কোন জান্নাত আছে যা অর্জন করার জন্য তাকে প্রচেষ্টা চালাতে হবে? এভাবে সে ফল-ফলাদি, ক্ষেত-খামার, গাছ-গাছালি, নদী- নালা, ইত্যাদি দেখে ধোঁকাগ্রস্ত হবে এবং মনে করবে এগুলো কখনো ধ্বংস হবে না। ফলে সে দুনিয়ার মোহে পড়ে থাকবে এবং আখেরাত অস্বীকার করে বসবে। [ইবন কাসীর]

(৩) অর্থাৎ যদি আখেরাত থেকেই থাকে তাহলে আমি সেখানে এখানকার চেয়েও বেশী সচ্ছল থাকবো। কারণ এখানে আমার সচ্ছল ও ধনাঢ্য হওয়া এ কথাই প্রমাণ করে যে, আমি আল্লাহর প্রিয়। অন্য আয়াতেও ধনবান কাফেরদের এধরনের কথা এসেছে, যেমন, "আর আমি যদি আমার রবের কাছে ফিরেও যাই তাঁর কাছে নিশ্চয় আমার জন্য কল্যাণই থাকবে।"[সূরা ফুসসিলাত: ৫০]

قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّىٰكَ رَجُلًا ﴿٣٧﴾

৩৭. তদুত্তরে তার বন্ধু বিতর্কমূলকভাবে তাকে বলল, 'তুমি কি তাঁর সাথে কুফরী করছ[১] যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি ও পরে বীর্য থেকে এবং তারপর পূর্ণাংগ করেছেন পুরুষ-আকৃতিতে?'

لَّٰكِنَّا۠ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿٣٨﴾

৩৮. 'কিন্তু তিনিই আল্লাহ্, আমার রব এবং আমি কাউকেও আমার রব-এর সাথে শরীক করি না।'

وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا ﴿٣٩﴾

৩৯. 'তুমি যখন তোমার বাগানে প্রবেশ করলে তখন কেন বললে না, 'আল্লাহ্ যা চান তা-ই হয়, আল্লাহ্‌র সাহায্য ছাড়া কোন শক্তি নেই[২]?' তুমি যদি

---

(১) যে ব্যক্তি মনে করলো, আমিই সব, আমার ধন-সম্পদ ও শান শওকত কারোর দান নয় বরং আমার শক্তি ও যোগ্যতার ফল এবং আমার সম্পদের ক্ষয় নেই,আমার কাছ থেকে তা ছিনিয়ে নেওয়ার কেউ নেই এবং কারোর কাছে আমাকে হিসেব দিতেও হবে না, সে আল্লাহকে মূলত: অস্বীকারই করল। যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন তাকে সে অস্বীকার করল। শুধু তাকে নয়, তিনি প্রথম মানুষকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন আর তিনি হচ্ছেন আদম। তারপর নিকৃষ্ট পানি হতে তাদের বংশধারা বজায় রেখেছেন। [ইবন কাসীর] অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ তা বলেছেন, "তোমরা কিভাবে আল্লাহ্‌র সাথে কুফরী করছ? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে জীবিত করেছেন।" [সূরা আল-বাকারাহ: ২৮]

(২) অর্থাৎ "আল্লাহ যা চান তাই হবে। আমাদের যদি কোন কিছু চলতে পারে তাহলে তা চলতে পারে একমাত্র আল্লাহরই সুযোগ ও সাহায্য -সহযোগিতা দানের মাধ্যমেই।" এ আয়াত থেকে সালফে সালেহীনের কেউ কেউ বলেনঃ কোন পছন্দনীয় বস্তু দেখার পর যদি مَا شَاءَ اللّٰهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ বলে দেয়া হয়, তবে কোন বস্তু তার ক্ষতি করে না। [ইবন কাসীর] অর্থাৎ পছন্দনীয় বস্তুটি নিরাপদ থাকে বা তাতে চোখ লাগার মত ক্ষতি হয় না। সহীহ হাদীসেও এ আয়াতের মত একটি হাদীস এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে বললেন: "আমি কি তোমাকে জান্নাতের একটি মূল্যবান সম্পদের সন্ধান দেব না? সেটা হলো: "লা হাওলা ওলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ"। [বুখারী: ৬৩৮৪, মুসলিম: ২৭০৪] আবার কোন কোন বর্ণনায় বলা হয়েছে, জান্নাতের সে মূল্যবান সম্পদ হলো: "লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ"। [মুসনাদে আহমাদ: ২/৩৩৫]

ধনে ও সন্তানে আমাকে তোমার চেয়ে নিকৃষ্টতর মনে কর---

৪০. 'তবে হয়ত আমার রব আমাকে তোমার বাগানের চেয়ে উৎকৃষ্টতর কিছু দেবেন এবং তোমার বাগানে আকাশ থেকে নির্ধারিত বিপর্যয় পাঠাবেন(১), যার ফলে তা উদ্ভিদশূন্য ময়দানে পরিণত হবে।

فَعَسٰى رَبِّيْٓ اَنْ يُّؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِيْدًا زَلَقًا ۙ﴿٤٠﴾

৪১. 'অথবা তার পানি ভূগর্ভে হারিয়ে যাবে এবং তুমি কখনো সেটার সন্ধান লাভে সক্ষম হবে না(২)।'

اَوْ يُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيْعَ لَهٗ طَلَبًا ﴿٤١﴾

৪২. আর তার ফল-সম্পদ বিপর্যয়ে বেষ্টিত হয়ে গেল এবং সে তাতে যা ব্যয় করেছিল তার জন্য হাতের তালু মেরে আক্ষেপ করতে লাগল যখন তা মাচানসহ ভূমিতে লুটিয়ে পড়ল। সে বলতে লাগল, 'হায়, আমি যদি কাউকেও আমার রব-এর সাথে শরীক

وَاُحِيْطَ بِثَمَرِهٖ فَاَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلٰى مَآ اَنْفَقَ فِيْهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا وَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ لَمْ اُشْرِكْ بِرَبِّيْٓ اَحَدًا ﴿٤٢﴾

(১) ইবনে আব্বাস এর অর্থ নিয়েছেন আযাব। অপর কারও মতে, অগ্নি। আবার কেউ কেউ অর্থ নিয়েছেন প্রস্তর বর্ষণ। কোন কোন মুফাসসিরের মতে এর অর্থ: এমন বৃষ্টিপাত যাতে গাছ-গাছড়া উপড়ে যায়, ফসলাদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ যে আল্লাহর হুকুমে তুমি এসব কিছু লাভ করেছো তাঁরই হুকুমে এসব কিছু তোমার কাছ থেকে ছিনিয়েও নেয়া যেতে পারে। তুমি যদি এখন প্রচুর পানি পাওয়ার কারণে ক্ষেত-খামার করার সুবিধা লাভ করে আল্লাহ্‌র নেয়ামতকে অস্বীকার করে কাফের হয়ে যাচ্ছ, তবে মনে রেখো তিনি ইচ্ছে করলে তোমাদের এ পানি পুনরায় ভূগর্ভে প্রোথিত করে দিতে পারেন, তারপর তুমি কোন ভাবেই তা আনতে সক্ষম হবে না। কুরআনের অন্যত্রও এ কথা বলে মহান আল্লাহ্ তাঁর এ বিরাট নেয়ামত পানি নিঃশেষ করে দেয়ার হুমকি দিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেন: "বলুন, 'তোমরা ভেবে দেখেছ কি যদি পানি ভূগর্ভে তোমাদের নাগালের বাইরে চলে যায়, তখন কে তোমাদেরকে এনে দেবে প্রবাহমান পানি?" [সূরা আল-মুলক: ৩০] [ইবন কাসীর]

না করতাম[১]!’

৪৩. আর আল্লাহ্ ছাড়া তাকে সাহায্য করার কোন লোকজন ছিল না এবং সে নিজেও প্রতিকারে সমর্থ হলো না।

وَلَمۡ تَكُن لَّهُۥ فِئَةٞ يَنصُرُونَهُۥ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ﴿٤٣﴾

৪৪. এখানে কর্তৃত্ব আল্লাহ্‌রই[২], যিনি

هُنَالِكَ ٱلۡوَلَٰيَةُ لِلَّهِ ٱلۡحَقِّۚ هُوَ خَيۡرٞ ثَوَابٗا

(১) এখানে বাহ্যত: সে দুনিয়া লাভের জন্য, দুনিয়ার সম্পদ বাঁচানোর জন্য একথা বলেছিল। অথবা বাস্তবেই সে নিজের ভুল বুঝতে পেরে শির্ক থেকে তাওবাহ করতে চেয়ে একথা বলেছিল। [ফাতহুল কাদীর]

(২) আয়াতটির অর্থ নির্ধারণে দু’টি প্রসিদ্ধ মত এসেছে:
এক, আয়াতে উল্লেখিত هنالك শব্দটির অর্থ আগের বাক্যের সাথে করা হবে। আর الولاية থেকে নতুনভাবে অর্থ করা হবে। সে মতে পূর্বের আয়াতের অর্থ হবে: যেখানে আল্লাহ্‌র আযাব নাযিল হয়েছে সেখানে আল্লাহ্ ছাড়া তাকে সাহায্য করার কোন লোকজন ছিল না এবং সে নিজেও প্রতিকারে সমর্থ হলো না। দুই, আর যদি هنالك শব্দটিকে এ আয়াতের পরবর্তী বাক্য الولاية এর সাথে মিলিয়ে অর্থ করা হয় তখন আয়াতের দু’ধরনের অর্থ হয়।
যদি الولاية শব্দটির واو এর উপর فتحة দিয়ে পড়া হয় তখন শব্দটির অর্থ হয়, অভিভাবকত্ব, বন্ধুত্ব। আর আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়: যখন আযাব নাযিল হয় তখন কাফের বা মুমিন সবাই অভিভাবক ও বন্ধু হিসেবে একমাত্র আল্লাহ্‌র দিকেই ফিরবে, তাঁর আনুগত্য মেনে নিবে। এর বাইরে কোন কিছু চিন্তাও করবে না। যেমন কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে, “তারপর তারা যখন আমার শাস্তি দেখতে পেল তখন বলল, ‘আমরা এক আল্লাহ্‌তেই ঈমান আনলাম এবং আমরা তাঁর সাথে যাদেরকে শরীক করতাম তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করলাম।”[সূরা গাফের: ৮৪] অনুরূপভাবে ফির‘আউনের মুখ থেকেও বিপদকালে এ কথাই বের হয়েছিল, মহান আল্লাহ্ বলেন: “পরিশেষে যখন সে নিমজ্জমান হল তখন বলল, ‘আমি বিশ্বাস করলাম বনী ইস্‌রাঈল যাঁর উপর বিশ্বাস করে। নিশ্চয়ই তিনি ছাড়া অন্য কোন সত্য ইলাহ্ নেই এবং আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত।‘এখন! ইতিপূর্বে তো তুমি অমান্য করেছ এবং তুমি অশান্তি সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।” [সূরা ইউনুস: ৯০-৯১]
আর যদি الولاية শব্দটির واو এর নীচে كسرة দিয়ে পড়া হয় যেমনটি কোন কোন قراءة তে আছে, তখন শব্দটির অর্থ হয় ক্ষমতা, নির্দেশ ও আইন। আর আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়: যখন আযাব নাযিল হবে তখন একমাত্র মহান আল্লাহ্‌র ক্ষমতা, আইন ও নির্দেশই কার্যকর হবে। অন্য কারো কোন কথা চলবে না। তিনি তাদের ধ্বংস করেই ছাড়বেন। [ইবন কাসীর]

وَّخَيْرٌ عُقْبًا ﴿٤٤﴾

সত্য[১]। পুরস্কার প্রদানে ও পরিণাম নির্ধারণে তিনিই শ্রেষ্ঠ।

ষষ্ঠ রুকূ'

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذْرُوْهُ الرِّيٰحُ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴿٤٥﴾

৪৫. আর আপনি তাদের কাছে পেশ করুন উপমা দুনিয়ার জীবনের: এটা পানির ন্যায় যা আমরা বর্ষণ করি আকাশ থেকে, যা দ্বারা ভূমিজ উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উদ্‌গত হয়, তারপর তা বিশুষ্ক হয়ে এমন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় যে, বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। আর আল্লাহ্ সব কিছুর উপর শক্তিমান[২]।

---

(১) আয়াতের দু'টি অর্থ করা যায়। এক, তখন একমাত্র হক্ক ও সত্য ইলাহ আল্লাহ্ তা'আলারই কর্তৃত্ব। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে, "তারপর তাদের হক্ক ও সত্য প্রতিপালক আল্লাহ্র দিকে তারা ফিরে আসে। দেখুন, কর্তৃত্ব তো তাঁরই এবং হিসেব গ্রহনে তিনিই সবচেয়ে তৎপর।" [সূরা আল-আন'আম: ৬২] দুই, তখন একমাত্র হক্ক ও সত্য কর্তৃত্ব ও অভিভাবকত্ব আল্লাহ্রই। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে, "সে দিন সত্য ও হক্ক কর্তৃত্ব ও অভিভাকত্ব হবে কেবলমাত্র দয়াময়ের এবং কাফিরদের জন্য সে দিন হবে কঠিন।" [সূরা আল-ফুরকান: ২৬] [ইবন কাসীর]

(২) কুরআনের বিভিন্ন স্থানে মহান আল্লাহ্ দুনিয়ার জীবনকে আকাশ থেকে নাযিল হওয়া পানির সাথে তুলনা করেছেন। দুনিয়ার জীবনের ক্ষণস্থায়ীত্বের উদাহরণ হলো আকাশ থেকে বর্ষিত পানির মত। যা প্রথমে যমীনে পতিত হওয়ার সাথে সাথে যমীনে অবস্থিত উদ্ভিদরাজিতে প্রাণের উন্মেষ ঘটে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সে পানি পুরিয়ে গেলে, পানির কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে গেলে আবার সে প্রাণের নিঃশেষ ঘটে। দুনিয়ার জীবনও ঠিক তদ্রূপ; এখানে আসার পর জীবনের বিভিন্ন অংশের প্রাচুর্যে মানুষ মোহান্ধ হয়ে আখেরাতকে ভুলে বসে থাকে কিন্তু অচিরেই তার জীবনের মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে সে আবার হতাশ হয়ে পড়ে। এ কথাটি মহান আল্লাহ্ কুরআনের অন্যত্র এভাবে বলেছেন: "বস্তুত পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত এরূপ, যেমন আমি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করি যা দ্বারা ভূমিজ উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উদ্‌গত হয়, যা থেকে মানুষ ও জীব-জন্তু খেয়ে থাকে। তারপর যখন ভূমি তার শোভা ধারণ করে ও নয়নাভিরাম হয় এবং তার অধিকারীগণ মনে করে ওটা তাদের আয়ত্তাধীন, তখন দিনে বা রাতে আমার নির্দেশ এসে পড়ে ও আমি ওটা এমনভাবে নির্মূল করে দেই, যেন গতকালও ওটার অস্তিত্ব ছিল না। এভাবে আমি নিদর্শনাবলী বিশদভাবে বর্ণনা করি চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।" [সূরা ইউনুস: ২৪] আরো বলেছেন: "আপনি কি দেখেন না, আল্লাহ্ আকাশ

৪৬. ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দুনিয়ার জীবনের শোভা; আর স্থায়ী সৎকাজ[১]

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاۚ

হতে বারি বর্ষণ করেন, তারপর তা ভূমিতে নির্ঝররূপে প্রবাহিত করেন এবং তা দ্বারা বিবিধ বর্ণের ফসল উৎপন্ন করেন, তারপর তা শুকিয়ে যায়। ফলে তোমরা তা পীত বর্ণ দেখতে পাও, অবশেষে তিনি ওটাকে খড়-কুটোয় পরিণত করেন? এতে অবশ্যই উপদেশ রয়েছে বোধশক্তিসম্পন্নদের জন্য।" [সূরা আয-যুমার: ২১] আরও বলেছেন: "তোমরা জেনে রাখ, পার্থিব জীবন তো খেল-তামাশা, জাঁকজমক, পারস্পরিক শ্লাঘা, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ছাড়া আর কিছু নয়। এর উপমা বৃষ্টি, যা দ্বারা উৎপন্ন শস্য-সম্ভার কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, তারপর সেগুলো শুকিয়ে যায়, ফলে আপনি ওগুলো পীতবর্ণ দেখতে পান, অবশেষে সেগুলো খড়-কুটোয় পরিণত হয়। পরকালে রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন প্রতারণার সামগ্রী ছাড়া কিছু নয়।" [সূরা আল-হাদীদ: ২০] অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও বলেছেন: "দুনিয়া হলো সুমিষ্ট সবুজ-শ্যামল মনোমুগ্ধকর। সুতরাং তোমরা দুনিয়া থেকে বেঁচে থাক আর মহিলাদের থেকে নিরাপদ থাক" [মুসলিম: ২৭৪২]

(১) স্থায়ী সৎকাজ বলতে কুরআনে বর্ণিত বা হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক অনুমোদিত যাবতীয় নেককাজই বুঝানো হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কিরামের বিভিন্ন উক্তির মাধ্যমে তা স্পষ্ট হয়েছে। উসমান রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর দাস হারেস বলেন, উসমান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু একদিন বসলে আমরা তার সাথে বসে পড়লাম। ইতিমধ্যে মুয়াজ্জিন আসল। তিনি পাত্রে করে পানি নিয়ে আসার নির্দেশ দিলেন। সে পানির পরিমাণ সম্ভবত এক মুদ (৮১৫.৩৯ গ্রাম মতান্তরে ৫৪৩ গ্রাম) পরিমান হবে। (দেখুন, মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা) তারপর উসমান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু সে পানি দ্বারা অজু করলেন এবং বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার এ অজুর মত অজু করতে দেখেছি। তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যদি কেউ আমার অজুর মত অজু করে জোহরের সালাত আদায় করে তবে এ সালাত ও ভোরের মাঝের সময়ের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। তারপর যদি আসরের সালাত আদায় করে তবে সে সালাত ও জোহরের সালাতের মধ্যকার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। এরপর যদি মাগরিবের সালাত আদায় করে তবে সে সালাত ও আসরের সালাতের মধ্যে কৃত গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হবে। তারপর এশার সালাত আদায় করলে সে সালাত এবং মাগরিবের সালাতের মধ্যে হওয়া সমূদয় গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। এরপর সে হয়ত: রাতটি ঘুমিয়েই কাটিয়ে দিবে। তারপর যখন ঘুম থেকে জেগে অজু করে এবং সকালের সালাত আদায় করে তখন সে সালাত এবং এশার সালাতের মধ্যকার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। আর এগুলোই হলো এমন সৎকাজ যেগুলো অপরাধ মিটিয়ে দেয়। লোকেরা এ হাদীস শোনার পর

وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا ﴿٤٦﴾

আপনার রব-এর কাছে পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং কাংখিত হিসেবেও উৎকৃষ্ট ।

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْاَرْضَ بَارِزَةً ۙ وَّحَشَرْنٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدًا ﴿٤٧﴾

৪৭. আর স্মরণ করুন, যেদিন আমরা পর্বতমালাকে করব সঞ্চালিত[১] এবং আপনি যমীনকে দেখবেন উন্মুক্ত প্রান্তর[২], আর আমরা তাদের সকলকে একত্র করব; তারপর তাদের কাউকে ছাড়ব না ।

বলল, হে উসমান এগুলো হলো "হাসানাহ" বা নেক-কাজ । কিন্তু 'আল-বাকিয়াতুস-সালেহাত' কোনগুলো? তখন তিনি বললেন: তা হলো, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', 'সুবহানাল্লাহ', 'আলহামদুলিল্লাহ', 'আল্লাহু আকবার' এবং 'লা হাওলা ওলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' ।[মুসনাদে আহমাদ: ১/৭১] 'আল-বাকিয়াতুস-সালেহাত' এর তাফসীরে এ পাঁচটি বাক্য অন্যান্য অনেক সাহাবা, তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ীনদের থেকেও বর্ণিত হয়েছে । তবে ইবন্ আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন: 'আল-বাকিয়াতুস-সালেহাত' দ্বারা আল্লাহ্‌র যাবতীয় যিক্‌র বা স্মরণকে বুঝানো হয়েছে । সে মতে তিনি 'তাবারাকাল্লাহ', 'আস্তাগফিরুল্লাহ', 'রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সালাত পাঠ', সাওম, সালাত, হজ্জ, সাদাকাহ, দাসমুক্তি, জিহাদ, আত্মীয়তার সম্পর্ক সংরক্ষণ সহ যাবতীয় সৎকাজকেই এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং বলেছেন: এর দ্বারা ঐ সমূদয় কাজই উদ্দেশ্য হবে যা জান্নাতবাসীদের জন্য যতদিন সেখানে আসমান ও যমীনের অস্তিত্ব থাকবে ততদিন বাকী থাকবে অর্থাৎ চিরস্থায়ী হবে; কারণ জান্নাতের আসমান ও যমীন স্থায়ী ও অপরিবর্তনশীল । [ইবন কাসীর]

(১) অর্থাৎ যখন যমীনের বাঁধন আলগা হয়ে যাবে এবং পাহাড় ঠিক এমনভাবে চলতে শুরু করবে যেমন আকাশে মেঘেরা ছুটে চলে । কুরআনের অন্য এক জায়গায় এ অবস্থাটিকে এভাবে বলা হয়েছে: "আর আপনি পাহাড়গুলো দেখছেন এবং মনে করছেন এগুলো অত্যন্ত জমাটবদ্ধ হয়ে আছে কিন্তু এগুলো চলবে ঠিক যেমন মেঘেরা চলে ।" [সূরা আন-নামলঃ ৮৮] আরো বলা হয়েছে: "যেদিন আকাশ আন্দোলিত হবে প্রবলভাবে এবং পর্বত চলবে দ্রুত; [সূরা আত-তূর: ৯-১০] আরো এসেছে: "আর পর্বতসমূহ হবে ধূনিত রঙ্গীন পশমের মত ।" [সূরা আল-কারি'আ: ৫]

(২) অর্থাৎ এর উপর কোন শ্যামলতা, বৃক্ষ তরুলতা এবং ঘরবাড়ি থাকবে না । সারাটা পৃথিবী হয়ে যাবে একটা ধু ধু প্রান্তর । এ সূরার সূচনায় এ কথাটিই বলা হয়েছিল এভাবে যে, "এ পৃথিবী পৃষ্ঠে যা কিছু আছে সেসবই আমি লোকদের পরীক্ষার জন্য একটি সাময়িক সাজসজ্জা হিসেবে তৈরী করেছি । এক সময় আসবে যখন এটি সম্পূর্ণ একটি পানি ও বৃক্ষ লতাহীন মরুপ্রান্তরে পরিণত হবে ।"

وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا ﴿٤٨﴾

৪৮. আর তাদেরকে আপনার রব-এর কাছে উপস্থিত করা হবে সারিবদ্ধভাবে[১] এবং আল্লাহ্ বলবেন, ‘তোমাদেরকে আমরা প্রথমবার যেভাবে সৃষ্টি করেছিলাম সেভাবেই তোমরা আমাদের কাছে উপস্থিত হয়েছ[২], অথচ তোমরা মনে করতে যে, তোমাদের জন্য আমরা কোন প্রতিশ্রুত সময় নির্ধারণ করব না[৩] ।’

(১) সারিবদ্ধভাবে বলা দ্বারা এ অর্থ উদ্দেশ্য হতে পারে যে, সবাই এক কাতার হয়ে দাঁড়াবে। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে: “সেদিন রূহ্ ও ফিরিশ্‌তাগণ এক কাতার হয়ে দাঁড়াবে; দয়াময় যাকে অনুমতি দেবেন সে ছাড়া অন্যেরা কথা বলবে না এবং সে যথার্থ বলবে।” [সূরা আন-নাবা: ৩৮] অথবা এর দ্বারা এটাও উদ্দেশ্য হতে পারে যে, তারা কাতারে কাতারে দাঁড়াবে। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে: “এবং যখন আপনার প্রতিপালক উপস্থিত হবেন ও সারিবদ্ধভাবে ফিরিশ্‌তাগণও” [সূরা আল-ফাজর: ২২]

(২) কেয়ামতের দিন সবাইকে বলা হবে: আজ তোমরা এমনিভাবে খালি হাতে, নগ্ন পায়ে, কোন খাদেম ব্যতীত, যাবতীয় জৌলুস বাদ দিয়ে, খালি গায়ে, কোন আসবাবপত্র না নিয়ে আমার সামনে এসেছ, যেমন আমি প্রথমে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম। কুরআনের অন্যত্রও এ ধরনের আয়াত এসেছে, যেমন সূরা আল-আন‘আম: ৯৪, সূরা মারইয়াম: ৮০, ৯৫, সূরা আল-আম্বিয়া: ১০৪। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ ‘লোকসকল! তোমরা কেয়ামতে তোমাদের পালনকর্তার সামনে খালি পায়ে, খালি গায়ে, পায়ে হেঁটে উপস্থিত হবে। সেদিন সর্বপ্রথম যাকে পোষাক পরানো হবে, তিনি হবেন ইব্‌রাহীম ‘আলাইহিস্ সালাম। একথা শুনে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা প্রশ্ন করলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সব নারী-পুরুষই কি উলঙ্গ হবে এবং একে অপরকে দেখবে? তিনি বললেনঃ সেদিন প্রত্যেককেই এমন ব্যস্ততা ও চিন্তা ঘিরে রাখবে যে, কেউ কারো প্রতি দেখার সুযোগই পাবে না।’ [বুখারীঃ ৩১৭১, মুসলিমঃ ২৮৫৯]

(৩) অর্থাৎ সে সময় আখেরাত অস্বীকারকারীদেরকে বলা হবেঃ দেখো, নবীগণ যে খবর দিয়েছিলেন তা সত্য প্রমাণিত হয়েছে তো। তারা তোমাদের বলতেন, আল্লাহ যেভাবে তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন ঠিক তেমনি দ্বিতীয়বারও সৃষ্টি করবেন। তোমরা তা মেনে নিতে অস্বীকার করেছিলে। কিন্তু এখন বলো, তোমাদের দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা হয়েছে কি না?

وَوُضِعَ الْكِتٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّآ اَحْصٰىهَا ۚ وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا ﴿٤٩﴾

৪৯. আর উপস্থাপিত করা হবে ‘আমলনামা, তখন তাতে যা লিপিবদ্ধ আছে তার কারণে আপনি অপরাধীদেরকে দেখবেন আতংকগ্রস্ত এবং তারা বলবে, ‘হায়, দুর্ভাগ্য আমাদের! এটা কেমন গ্রন্থ! এটা তো ছোট বড় কিছু বাদ না দিয়ে সব কিছুই হিসেব করে রেখেছে(১)।’ আর তারা যা আমল করেছে তা সামনে উপস্থিত পাবে(২);

(১) দুনিয়ার বুকে তারা যা যা করেছিল তা সবই লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। সে সব লিখিত গ্রন্থগুলো সেখানে তারা দেখতে পাবে। তাদের কারও আমলনামা ডান হাতে আবার কারও বাম হাতে দেয়া হবে। তারা সেখানে এটাও দেখবে যে, সেখানে ছোট-বড়, গুরুত্বপূর্ণ, গুরুত্বহীন সবকিছুই লিখে রাখা হয়েছে। অন্যত্র মহান আল্লাহ্ তাদের আমলনামা সম্পর্কে বলেন: “প্রত্যেক মানুষের কাজ আমি তার গ্রীবালগ্ন করেছি এবং কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য বের করব এক কিতাব, যা সে পাবে উন্মুক্ত। ‘তুমি তোমার কিতাব পাঠ কর, আজ তুমি নিজেই তোমার হিসেব-নিকেশের জন্য যথেষ্ঠ।”[সূরা আল-ইসরা: ১৩]

(২) অর্থাৎ হাশরবাসীরা তাদের কৃতকর্মকে উপস্থিত পাবে। অন্যান্য আয়াতে আরো স্পষ্ট ভাষায় তা বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে: “যে দিন প্রত্যেকে সে যা ভাল কাজ করেছে এবং সে যা মন্দ কাজ করেছে তা বিদ্যমান পাবে, সেদিন সে তার ও ওটার মধ্যে ব্যবধান কামনা করবে। আল্লাহ্ তাঁর নিজের সম্বন্ধে তোমাদেরকে সাবধান করতেছেন। আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়াদ্র।” [সূরা আলে-ইমরান: ৩০] আরও বলা হয়েছে: “সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে সে কী আগে পাঠিয়েছে ও কী পিছনে রেখে গেছে।” [সূরা আল-কিয়ামাহ: ১৩] আরও বলা হয়েছে: “যে দিন গোপন ভেদসমূহ প্রকাশ করা হবে” [সূরা আত-ত্বারেক:৯] মুফাস্সিরগণ বিভিন্ন হাদীসের ভিত্তিতে এর অর্থ সাধারণভাবে এরূপ বর্ণনা করেন যে, এসব কৃতকর্মই প্রতিদান ও শাস্তির রূপ পরিগ্রহ করবে। তাদের আকার-আকৃতি সেখানে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। যেমন, কোন কোন হাদীসে আছে, যারা যাকাত দেয় না, তাদের মাল কবরে একটি বড় সাপের আকার ধারণ করে তাদেরকে দংশন করবে এবং বলবেঃ আমি তোমার সম্পদ। [বুখারীঃ ১৩৩৮, তিরমিযীঃ ১১৯৫] সৎকর্ম সুশ্রী মানুষের আকারে কবরের নিঃসঙ্গ অবস্থায় আতঙ্ক দূর করার জন্য আগমন করবে। [মুসনাদে আহমাদঃ ৪/২৮৭] মানুষের গোনাহ্ বোঝার আকারে প্রত্যেকের মাথায় চাপিয়ে দেয়া হবে। অনূরূপভাবে, কুরআনে ইয়াতীমের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণকারীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে- ﴿إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾ [সূরা আন্-নিসাঃ ১০] অথবা, আয়াতের এ

আর আপনার রব তো কারো প্রতি যুলুম করেন না[১]।

সপ্তম রুকূ'

৫০. আর স্মরণ করুন, আমরা যখন ফিরিশ্‌তাদেরকে বলেছিলাম, 'আদমের প্রতি সিজ্‌দা কর', তখন তারা সবাই সিজ্‌দা করল ইব্‌লীস ছাড়া; সে ছিল জিন্‌দের একজন[২],

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّآ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِۦٓ ۗ أَفَتَتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥٓ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِى وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّۢ ۚ بِئْسَ لِلظَّٰلِمِينَ بَدَلًا ٥٠

অর্থও করা যায় যে, তারা তাদের কৃতকর্মের বিবরণ সম্বলিত দপ্তর দেখতে পাবে, কোন কিছুই সে আমলনামা লিখায় বাদ পড়েনি। কাতাদা রাহেমাহুল্লাহ এ আয়াত শুনিয়ে বলতেন: তোমরা যদি লক্ষ্য কর তবে দেখতে পাবে যে, লোকেরা ছোট-বড় সবকিছু গণনা হয়েছে বলবে কিন্তু কেউ এটা বলবে না যে, আমার উপর যুলুম করা হয়েছে। সুতরাং তোমরা ছোট ছোট গুনাহর ব্যাপারে সাবধান হও; কেননা এগুলো একত্রিত হয়ে বিরাট আকার ধারণ করে ধ্বংস করে ছাড়বে। [তাবারী]

(১) অর্থাৎ এক ব্যক্তি একটি অপরাধ করেনি কিন্তু সেটি খামাখা তার নামে লিখে দেয়া হয়েছে, এমনটি কখনো হবে না। আবার কোন ব্যক্তিকে তার অপরাধের কারণে প্রাপ্য সাজার বেশী দেয়া হবে না এবং নিরপরাধ ব্যক্তিকে অযথা পাকড়াও করেও শাস্তি দেয়া হবে না। জাবের ইবন আব্দুল্লাহ বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিনে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষদেরকে অথবা বলেছেন বান্দাদেরকে নগ্ন, অখতনাকৃত এবং কপর্দকশূণ্য অবস্থায় একত্রিত করবেন। তারপর কাছের লোকেরা যেমন শুনবে দূরের লোকরাও তেমনি শুনতে পাবে এমনভাবে ডেকে বলবেন: আমিই বাদশাহ, আমিই বিচার-প্রতিদান প্রদানকারী, জান্নাতে প্রবেশকারী কারও উপর জাহান্নামের অধিবাসীদের কোন দাবী অনাদায়ী থাকতে পারবে না। অনুরূপভাবে, জাহান্নামে প্রবেশকারী কারও উপর জান্নাতের অধিবাসীদের কারও দাবীও অনাদায়ী থাকতে পারবে না। এমনকি যদি তা একটি চপেটাঘাতও হয়। বর্ণনাকারী বললেন: কিভাবে তা সম্ভব হবে, অথচ আমরা তখন নগ্ন শরীর, অখতনাকৃত ও রিক্তহস্তে সেখানে আসব? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: নেককাজ ও বদকাজের মাধ্যমে সেটার প্রতিদান দেয়া হবে। [মুসনাদে আহমাদ: ৩/৪৯৫] অন্য হাদীসে এসেছে, 'শিংবিহীন প্রাণী সেদিন শিংওয়ালা প্রাণী থেকে তার উপর কৃত অন্যায়ের কেসাস নিবে।' [মুসনাদে আহমাদ: ১/৪৯৪]

(২) ইবলিস কি ফেরেশ্‌তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল নাকি ভিন্ন প্রজাতির ছিল এ নিয়ে দু'টি মত দেখা যায়। [দুটি মতই ইবন কাসীর বর্ণনা করেছেন।] কোন কোন মুফাসসিরের মতে, সে ফিরিশতাদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। তখন তাদের মতে, এ আয়াতে আল্লাহ্

সে তার রব-এর আদেশ অমান্য করল(১)। তবে কি তোমরা আমার পরিবর্তে তাকে এবং তার বংশধরকে(২)

তা'আলার বাণী “সে জিনদের একজন” এর ‘জিন’ শব্দ দ্বারা ফেরেশতাদের এমন একটি উপদল উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে, যাদেরকে ‘জিন’ বলা হতো। সম্ভবত: তাদেরকে মানুষের মত নিজেদের পথ বেছে নেয়ার এখতিয়ার দেয়া হয়েছিল। সে হিসেবে ইবলিস আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশের আওতায় ছিল কিন্তু সে নির্দেশ অমান্য করে অবাধ্য ও অভিশপ্ত বান্দা হয়ে যায়। তবে অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে ইবলীস ফেরেশ্তাদের দলভুক্ত ছিল না। তারা আলোচ্য আয়াত থেকে তাদের মতের সপক্ষে দলীল গ্রহণ করেন। ফেরেশ্তাদের ব্যাপারে কুরআন সুস্পষ্ট ভাষায় বলে, তারা প্রকৃতিগতভাবে অনুগত ও হুকুম মেনে চলেঃ “আল্লাহ তাদেরকে যে হুকুমই দেন না কেন তারা তার নাফরমানী করে না এবং তাদেরকে যা হুকুম দেয়া হয় তাই করে।”[সূরা আত-তাহরীমঃ ৬] আরো বলেছেনঃ “তারা অবাধ্য হয় না, তাদের রবের, যিনি তাদের উপর আছেন, ভয় করে এবং তাদেরকে যা হুকুম দেয়া হয় তাই করে।” [সূরা আন-নাহলঃ ৫০] তাছাড়া হাদীসেও এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ফেরেশ্তাদেরকে নূর থেকে তৈরী করা হয়েছে, ইবলীসকে আগুনের ফুল্কি থেকে এবং আদমকে যা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে তা তোমাদের কাছে বিবৃত করা হয়েছে।' [মুসলিমঃ ২৯৯৬]

(১) এতে বুঝা যাচ্ছে যে, জিনরা মানুষের মতো একটি স্বাধীন ক্ষমতাসম্পন্ন সৃষ্টি। তাদেরকে জন্মগত আনুগত্যশীল হিসেবে সৃষ্টি করা হয়নি। বরং তাদেরকে কুফর ও ঈমান এবং আনুগত্য ও অবাধ্যতা উভয়টি করার ক্ষমতা দান করা হয়েছে। এ সত্যটিই এখানে তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে, ইবলীস ছিল জিনদের দলভুক্ত, তাই সে স্বেচ্ছায় নিজের স্বাধীন ক্ষমতা ব্যবহার করে ফাসেকীর পথ বাছাই করে নেয়। এখানে আল্লাহ্র নির্দেশ থেকে অবাধ্য হয়েছিল এর দু'টি অর্থ করা হয়ে থাকে। এক. সে আল্লাহর নির্দেশ আসার কারণে অবাধ্য হয়েছিল। কারণ সিজদার নির্দেশ আসার কারণে সে সিজদা করতে অস্বীকার করেছিল। এতে বাহ্যত: মনে হবে যে, আল্লাহ্র নির্দেশই তার অবাধ্যতার কারণ। অথবা আয়াতের অর্থ, আল্লাহ্র নির্দেশ ত্যাগ করে সে অবাধ্য হয়েছিল। [ফাতহুল কাদীর]
তবে ইবলীস ফেরেশ্তাদের দলভুক্ত না হয়েও নির্দেশের অবাধ্য কারণ হচ্ছে, যেহেতু ফেরেশ্তাদের সাথেই ছিল, সেহেতু সিজদার নির্দেশ তাকেও শামিল করেছিল। কারণ, তার চেয়ে উত্তম যারা তাদেরকে যখন সিজদা করার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে তখন সে নিজেই এ নির্দেশের মধ্যে শামিল হয়েছিল এবং তার জন্যও তা মানা বাধ্যতামূলক ছিল। [ইবন কাসীর]

(২) وَذُرِّيَّتَهُ এ শব্দ থেকে বোঝা যায় যে, শয়তানের সন্তান-সন্ততি ও বংশধর আছে। কোন কোন মুফাস্সির বলেনঃ এখানে ذرية অর্থাৎ বংশধর বলে সাহায্যকারী দল বোঝানো

অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবে, অথচ তারা তোমাদের শত্রু[১]। যালেমদের এ বিনিময় কত নিকৃষ্ট[২]!

৫১. আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিকালে আমি তাদেরকে সাক্ষী করিনি এবং তাদের নিজেদের সৃষ্টির সময়ও নয়, আর আমি পথভ্রষ্টকারীদেরকে সাহায্যকারীরূপে গ্রহণকারী নই[৩]।

مَآ أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا ﴿٥١﴾

হয়েছে। কাজেই শয়তানের ঔরসজাত সন্তান-সন্ততি হওয়া জরুরী নয়। [ফাতহুল কাদীর]

(১) উদ্দেশ্য হচ্ছে পথভ্রষ্ট লোকদেরকে তাদের এ বোকামির ব্যাপারে সজাগ করে দেয়া যে, তারা নিজেদের স্নেহশীল ও দয়াময় আল্লাহ যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যত নেয়ামত তোমার প্রয়োজন সবই সরবরাহ করেছেন এবং শুভাকাংখী নবীদেরকে ত্যাগ করে এমন এক চিরন্তন শত্রুর ফাঁদে পা দিচ্ছে যে সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই তাদের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। সবসময় তোমার ক্ষতি করার অপেক্ষায় থাকে। [ফাতহুল কাদীর]

(২) যালেম তো তারা, যারা প্রতিটি বস্তুকে তার সঠিক স্থানে না রেখে অন্য স্থানে রেখেছে। তাদের রবের ইবাদাতের পরিবর্তে শয়তানের ইবাদাত করেছে। এত কত নিকৃষ্ট অদল-বদল! আল্লাহকে বাদ দিয়ে শয়তানের ইবাদাত! [ফাতহুল কাদীর] অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা তা বলেছেন, "আর 'হে অপরাধীরা! তোমরা আজ পৃথক হয়ে যাও।' হে বনী আদম! আমি কি তোমাদেরকে নির্দেশ দেইনি যে, তোমরা শয়তানের দাসত্ব করো না, কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? আর আমারই 'ইবাদাত কর, এটাই সরল পথ। শয়তান তো তোমাদের বহু দলকে বিভ্রান্ত করেছিল, তবুও কি তোমরা বুঝনি ?" [সূরা ইয়াসীন: ৫৯-৬২]

(৩) তাদের সৃষ্টি করার সময় আমার কোন সাহায্যকারীর প্রয়োজন হয়নি। যাদেরকে তোমরা আহ্বান করছ তারা সবাই তোমাদের মতই তাঁর বান্দাহ, কোন কিছুরই মালিক নয়। আসমান ও যমীন সৃষ্টি করার সময় তারা সেখানে ছিল না, তাই দেখার প্রশ্নও উঠে না। অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন: "বলুন, 'তোমরা ডাক তাদেরকে যাদেরকে তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে ইলাহ্ মনে করতে। তারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে অণু পরিমাণ কিছুর মালিক নয় এবং এ দু'টিতে তাদের কোন অংশও নেই এবং তাদের কেউ তাঁর সহায়কও নয়। যাকে অনুমতি দেয়া হয় সে ছাড়া আল্লাহ্‌র কাছে কারো সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না।" [সূরা সাবা: ২২-২৩]

وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَآءِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ﴿٥٢﴾

৫২. আর সেদিনের কথা স্মরণ করুন, যেদিন তিনি বলবেন, 'তোমরা যাদেরকে আমার শরীক মনে করতে তাদেরকে ডাক(১)।' তারা তখন তাদেরকে ডাকবে কিন্তু তারা তাদের ডাকে সাড়া দেবে না(২) আর আমরা

---

(১) অর্থাৎ তারা যেহেতু তাদেরকে আল্লাহর শরীক নির্ধারণ করে নিয়েছে, তাই তাদের ধারণামতে তারা যাদেরকে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করেছে তাদেরকে আহ্বান জানাতে বলা হয়েছে। নতুবা কোন শরীক হওয়া থেকে আল্লাহ্‌ সম্পূর্ণ পবিত্র ও মহান। [ফাতহুল কাদীর]

(২) অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে যাদের শরীক করতে তাদেরকে আহ্বান করে তাদের দ্বারা আল্লাহ্‌র আযাব থেকে উদ্ধার পাওয়া বা আযাবের বিপরীতে সাহায্য লাভ করো কি না দেখ। [ইবন কাসীর] তারা তাদেরকে আহ্বান করবে কিন্তু তাদের সে আহ্বান কোন কাজে আসবে না। ঐ সমস্ত উপাস্যের দল এদের ডাকে সাড়াও দিবে না, উদ্ধারও করবে না। কুরআনের অন্যত্র মহান আল্লাহ্‌ তা বর্ণনা করেছেন: "পরে কিয়ামতের দিন তিনি তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন এবং তিনি বলবেন, 'কোথায় আমার সেসব শরীক যাদের সম্বন্ধে তোমরা বিতন্ডা করতে?' যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছিল তারা বলবে, 'আজ লাঞ্ছনা ও অমংগল কাফিরদের---' [সূরা আন-নাহ্‌ল: ২৭] আরও এসেছে, "এবং সেদিন তিনি তাদেরকে ডেকে বলবেন, 'তোমরা যাদেরকে আমার শরীক গণ্য করতে, তারা কোথায়?' যাদের জন্য শাস্তি অবধারিত হয়েছে তারা বলবে, 'হে আমাদের রব! এদেরকেই আমরা বিভ্রান্ত করেছিলাম; এদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলাম যেমন আমরা বিভ্রান্ত হয়েছিলাম; আপনার সমীপে আমরা দায়িত্ব হতে অব্যাহতি চাচ্ছি। এরা তো আমাদের 'ইবাদাত করত না।' তাদেরকে বলা হবে, 'তোমাদের দেবতাগুলোকে ডাক।' তখন তারা ওদেরকে ডাকবে। কিন্তু ওরা এদের ডাকে সাড়া দেবে না। আর এরা শাস্তি দেখতে পাবে। হায়! এরা যদি সৎপথ অনুসরণ করত।" [সূরা আল-ক্বাসাস: ৬২-৬৪]। আরও এসেছে, "যেদিন আল্লাহ্‌ তাদেরকে ডেকে বলবেন, 'আমার শরীকেরা কোথায়?' তখন তারা বলবে, 'আমরা আপনার কাছে নিবেদন করি যে, এ ব্যাপারে আমরা কিছুই জানি না।' আগে তারা যাকে ডাকত তারা উধাও হয়ে যাবে এবং অংশীবাদীরা উপলব্ধি করবে যে, তাদের নিস্কৃতির কোন উপায় নেই।" [সূরা ফুস্‌সিলাত: ৪৭-৪৮]। আরও বলেন: "এবং তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা তো খেজুর আঁটির আবরণেরও অধিকারী নয়। তোমরা তাদেরকে ডাকলে তারা তোমাদের ডাক শুনবে না এবং শুনলেও তোমাদের ডাকে সাড়া দেবে না। তোমরা তাদেরকে যে শরীক করেছ তা তারা কিয়ামতের দিন অস্বীকার করবে। সর্বজ্ঞের মত কেউই আপনাকে অবহিত

তাদের উভয়ের মধ্যস্থলে রেখে দেব এক ধ্বংস-গহ্বর[১] ।

৫৩. আর অপরাধীরা আগুন দেখে বুঝবে যে, তারা সেখানে পতিত হচ্ছে এবং তারা সেখান থেকে কোন পরিত্রাণস্থল

وَرَاَ الْمُجْرِمُوْنَ النَّارَ فَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مُّوَاقِعُوْهَا وَلَمْ يَجِدُوْا عَنْهَا مَصْرِفًا ﴿٥٣﴾

করতে পারে না ।” [সূরা ফাতের: ১৩-১৪] অন্যত্র বলেছেন: “সে ব্যক্তির চেয়ে বেশী বিভ্রান্ত কে যে আল্লাহ্র পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তাকে সাড়া দেবে না? এবং এগুলো তাদের প্রার্থনা সম্বন্ধে অবহিতও নয় । যখন কিয়ামতের দিন মানুষকে একত্র করা হবে তখন ঐগুলো হবে তাদের শত্রু এবং ঐগুলো তাদের ‘ইবাদাত অস্বীকার করবে ।” [সূরা আল-আহকাফ: ৫-৬]

(১) এখানে “তাদের উভয়ের” বলে কাদের বুঝানো হয়েছে এ ব্যাপারে দু’টি মত রয়েছে, এক. তাদের এবং তারা যাদের ইবাদত করত সে সব বাতিল উপাস্যদের মধ্যে এমন দূরত্ব সৃষ্টি করে দিবেন যে তারা একে অপরের কাছে পৌঁছুতে পারবে না । তাদের মাঝখানে থাকবে ধ্বংস গহ্বর । [ফাতহুল কাদীর] দুই. অথবা “তাদের উভয়ের” বলে ঈমানদার ও কাফের দু’দলকে উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে । [ইবন কাসীর] তখন আয়াতের অর্থ হবে, ঈমানদার ও কাফের এর মাঝে পার্থক্য করে দেয়া হবে । কাফেরদের সামনে থাকবে শুধু ধ্বংস গহ্বর । এ অর্থে কুরআনের অন্যত্র এসেছে, “যেদিন কিয়ামত হবে সেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে । অতএব যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে তারা জান্নাতে থাকবে; এবং যারা কুফরী করেছে এবং আমার নিদর্শনাবলী ও আখিরাতের সাক্ষাত অস্বীকার করেছে, তারাই শাস্তি ভোগ করতে থাকবে ।” [সূরা আর-রূম: ১৪-১৬] আরও বলা হয়েছে, “আপনি সরল দ্বীনে নিজকে প্রতিষ্ঠিত করুন, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যে দিন অনিবার্য তা উপস্থিত হওয়ার আগে, সেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে । যে কুফরী করে কুফরীর শাস্তি তারই প্রাপ্য; যারা সৎকাজ করে তারা নিজেদেরই জন্য রচনা করে সুখশয্যা ।” [সূরা আর-রূম: ৪৩-৪৪] আরও এসেছে, “আর ‘হে অপরাধীরা! তোমরা আজ পৃথক হয়ে যাও ।”[সূরা ইয়াসীন: ৫৯] অন্য সূরায় এসেছে, “এবং যেদিন আমি ওদের সবাইকে একত্র করে যারা মুশরিক তাদেরকে বলব, ‘তোমরা এবং তোমরা যাদেরকে শরীক করেছিলে তারা নিজ নিজ স্থানে অবস্থান কর;’ আমি ওদেরকে পরস্পরের থেকে পৃথক করে দিলাম এবং ওরা যাদেরকে শরীক করেছিল তারা বলবে, তোমরা তো আমাদের ‘ইবাদাত করতে না । ‘আল্লাহ্ই আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট যে, তোমরা আমাদের ‘ইবাদাত করতে এ বিষয়ে আমরা গাফিল ছিলাম । সেখানে তাদের প্রত্যেকে তার পূর্ব কৃতকর্ম পরীক্ষা করে নেবে এবং ওদেরকে ওদের প্রকৃত অভিভাবক আল্লাহ্র কাছে ফিরিয়ে আনা হবে এবং ওদের উদ্ভাবিত মিথ্যা ওদের কাছ থেকে অন্তর্হিত হবে ।”[সূরা ইউনুস: ২৮-৩০]

পাবে না[১] ।

অষ্টম রুকূ'

৫৪. আর অবশ্যই আমরা মানুষের জন্য এ কুরআনে সব ধরনের উপমা বিশদভাবে বর্ণনা করেছি[২] । আর মানুষ সবচেয়ে বেশী বিতর্কপ্রিয়[৩] ।

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۭ وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ۝

(১) হাশরের দিন জাহান্নাম দেখার পর তারা স্পষ্ট বুঝতে ও বিশ্বাস করবে যে, তারা জাহান্নামে পতিত হচ্ছেই । তাদের বাঁচার কোন উপায় নেই । কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে: "হায়, আপনি যদি দেখতেন! যখন অপরাধীরা তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে অধোবদন হয়ে বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা দেখলাম ও শুনলাম, এখন আপনি আমাদেরকে আবার পাঠিয়ে দিন, আমরা সৎকাজ করব, আমরা তো দৃঢ় বিশ্বাসী ।" [সূরা আস-সাজদাহ: ১২] আরও এসেছে: "তুমি এ দিন সম্বন্ধে উদাসীন ছিলে, এখন আমি তোমার সামনে থেকে পর্দা উন্মোচন করেছি । আজ তোমার দৃষ্টি প্রখর ।"[সূরা ক্বাফ: ২২] অনুরূপ এসেছে: "তারা যেদিন আমার কাছে আসবে সেদিন তারা কত স্পষ্ট শুনবে ও দেখবে! কিন্তু যালিমরা আজ স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে ।" [সূরা মারইয়াম: ৩৮] হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "কিয়ামতের দিনের সময় কাফেরের জন্য পঞ্চাশ হাজার বছর নির্ধারণ করা হবে । আর কাফের চল্লিশ বছরের রাস্তা থেকে জাহান্নাম দেখে নিশ্চিত হয়ে যাবে সে তাতে পতিত হচ্ছে ।" [মুসনাদে আহমাদ: ৩/৭৫]

(২) অর্থাৎ আল্লাহ্ বলছেন, আমরা কুরআনে প্রতিটি বিষয় স্পষ্ট ও বিস্তারিত বর্ণনা করেছি । কোন ফাঁক রাখিনি । যাতে তারা সৎপথ থেকে হারিয়ে না যায়; হেদায়াতের পথ থেকে বের না হয়ে যায় । [ইবন কাসীর] এত সুন্দরভাবে বর্ণনা করার পরও এখন সত্যকে মেনে নেবার পথে তাদের জন্য কি বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে? শুধুমাত্র এটিই যে তারা আযাবের অপেক্ষা করছে ।

(৩) সমগ্র সৃষ্টজীবের মধ্যে মানুষ সর্বাধিক তর্কপ্রিয় । এর সমর্থনে আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে একটি হাদীস বর্ণিত রয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 'কেয়ামতের দিন কাফেরদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে পেশ করা হবে । তাকে প্রশ্ন করা হবেঃ আমার প্রেরিত রাসূল সম্পর্কে তোমার কর্মপন্থা কেমন ছিল? সে বলবেঃ হে আমার রব! আমি তো আপনার প্রতি, আপনার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলাম এবং তাঁদের আনুগত্য করেছিলাম । আল্লাহ্ তা'আলা বলবেনঃ তোমার আমলনামা সামনে রাখা রয়েছে । এতে তো এমন কিছু নেই । লোকটি বলবেঃ আমি এই আমলনামা মানি না । আমি এ আমলনামার লেখকদেরকে চিনি না এবং আমল করার সময় তাদেরকে দেখিনি । আল্লাহ্ তা'আলা বলবেনঃ

৫৫. আর যখন তাদের কাছে পথনির্দেশ আসে তখন মানুষকে ঈমান আনা ও তাদের রব-এর কাছে ক্ষমা চাওয়া থেকে বিরত রাখে শুধু এ যে, তাদের কাছে পূর্ববর্তীদের বেলায় অনুসৃত রীতি আসুক অথবা আসুক তাদের কাছে সরাসরি 'আযাব(১) ।

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْۤا اِذْ جَآءَهُمُ الْهُدٰى وَيَسْتَغْفِرُوْا رَبَّهُمْ اِلَّاۤ اَنْ تَاْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ اَوْ يَاْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ﴿٥٥﴾

সামনে লওহে-মাহ্ফুয রয়েছে। এতেও তোমার অবস্থা এরূপই লিখিত রয়েছে। সে বলবেঃ হে আমার রব! আপনি আমাকে যুলুম থেকে আশ্রয় দিয়েছেন কি না? আল্লাহ্ বলবেনঃ নিশ্চয় যুলুম থেকে তুমি আমার আশ্রয়ে রয়েছ। সে বলবেঃ হে আমার রব! যেসব সাক্ষ্য আমি দেখিনি সেগুলো কিরূপে আমি মানতে পারি? আমার নিজের পক্ষ হতে যে সাক্ষ্য হবে, আমি তাই মানতে পারি। তখন তার মুখ সীল করে দেয়া হবে এবং তার হাত-পা তার কুফর এবং শির্ক সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে। এরপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।' [দেখুন মুসলিমঃ ৫২৭১] অন্য এক হাদীসে এসেছে, 'রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন আলী ও ফাতেমাকে দেখতে গিয়েছিলেন, তাদেরকে তিনি বললেনঃ তোমরা রাতে সালাত আদায় কর না? তারা বললেনঃ আমরা ঘুমোলে আল্লাহ্ আমাদের প্রাণ হরণ করে তাঁর হাতে নিয়ে নেন। সুতরাং আমরা কিভাবে সালাত আদায় করব? তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফিরে গেলেন, তারপর তাকে শুনলাম তিনি ফেরা অবস্থায় নিজের রানে আঘাত করছেন আর বলছেন, মানুষ ভীষণ ঝগড়াটে।' [বুখারীঃ ১১২৭, ৪৭২৪, মুসলিমঃ ৭৭৫] এখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী ও ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমার পক্ষ থেকে এ ধরনের বিতণ্ডা অপছন্দ করলেন। কারণ, এটা বাতিল তর্ক। মহান আল্লাহ্র আনুগত্য না করার জন্য তাকদীরের দোহাই দেয়া জায়েয নেই।

(১) আয়াতে ব্যবহৃত قبلاً শব্দের অর্থ, সামনা সামনি বা চাক্ষুষ। [ইবন কাসীর] কাফেররা সবসময় নিজের চোখে আযাব দেখতে চাইত। কুরআনের অন্যত্র এসেছে, "তুমি যদি সত্যবাদী হও তবে আকাশের এক খণ্ড আমাদের উপর ফেলে দাও।"[সূরা আশ-শু'আরা: ১৮৭] অনুরূপ বলা হয়েছে, "উত্তরে তাঁর সম্প্রদায় শুধু এটাই বলল, 'আমাদের উপর আল্লাহ্র শাস্তি আনয়ন কর---তুমি যদি সত্যবাদী হও।" [সূরা আল-আনকাবূত: ২৯] "স্মরণ করুন, তারা বলেছিল, 'হে আল্লাহ্! এগুলো যদি আপনার কাছ থেকে সত্য হয়, তবে আমাদের উপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ করুন কিংবা আমাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিন।" [সূরা আল-আনফাল:৩২] "তারা বলে, ওহে যার প্রতি কুরআন নাযিল হয়েছে! তুমি তো নিশ্চয় উন্মাদ। 'তুমি সত্যবাদী হলে আমাদের কাছে ফিরিশ্তাদেরকে উপস্থিত করছ না কেন?" [সূরা আল-হিজর: ৬, ৭]

৫৬. আর আমরা শুধু সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেই রাসূলদেরকে পাঠিয়ে থাকি, কিন্তু কাফেররা বাতিল দ্বারা তর্ক করে, যাতে তার মাধ্যমে সত্যকে ব্যর্থ করে দিতে পারে। আর তারা আমার নিদর্শনাবলী ও যা দ্বারা তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে সেসবকে বিদ্রূপের বিষয়রূপে গ্রহণ করে থাকে।

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۚ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ ۖ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا ﴿٥٦﴾

৫৭. আর তার চেয়ে অধিক যালেম আর কে হতে পারে, যাকে তার রবের আয়াতসমূহ স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে, অতঃপর সে তা থেকে বিমুখ হয়েছে[১] এবং সে ভুলে গেছে যা তার দু-হাত পেশ করেছে? নিশ্চয় আমরা তাদের অন্তরের উপর আবরণ দিয়েছি যেন তারা কুরআন বুঝতে না পারে এবং তাদের কানে বধিরতা এঁটে দিয়েছি[২]। আর আপনি তাদেরকে সৎপথে ডাকলেও তারা কখনো সৎপথে আসবে না।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ۚ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۖ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ﴿٥٧﴾

৫৮. আর আপনার রব পরম ক্ষমাশীল, দয়াবান[৩]। তাদের কৃতকর্মের

وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ ۖ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا

(১) এ আয়াত থেকে বুঝা গেল যে, আল্লাহ্‌র দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকা, দ্বীনের ব্যাপারে উদাসীন থাকা, দ্বীন শিক্ষা করতে ও করাতে আগ্রহী না হওয়া কুফরী। এসবগুলোই বড় কুফরীর অংশ। [দেখুন, নাওয়াকিদুল ইসলাম]

(২) অর্থাৎ তাদের গোনাহ ও অবাধ্যতার কারণে শাস্তিস্বরূপ তাদের অন্তরের উপর আল্লাহ্ আবরণ দিয়েছেন। [ফাতহুল কাদীর] কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এ বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। যেমন সূরা আল বাকারাহ: ৭, সূরা আল-ইসরা: ৪৫-৪৭, সূরা মুহাম্মাদ: ২৩, সূরা হূদ: ২০।

(৩) এ আয়াতে মহান আল্লাহ্ তাঁর দু'টি গুণ ব্যবহার করেছেন। এক, তিনি ক্ষমাশীল। দুই, তিনি রহমতের মালিক। যে রহমত সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে। সুতরাং তিনি তাদেরকে তাদের অন্যায়ের কারণে দ্রুত শাস্তি দিচ্ছেন না। [ফাতহুল কাদীর]

كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ ۚ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا ﴿٥٨﴾

জন্য যদি তিনি তাদেরকে পাকড়াও করতেন, তবে তিনি অবশ্যই তাদের শাস্তি তরান্বিত করতেন; কিন্তু তাদের জন্য রয়েছে এক প্রতিশ্রুত মুহূর্ত, যা থেকে তারা কখনই কোন আশ্রয়স্থল পাবে না(১)।

وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا ﴿٥٩﴾

৫৯. আর ঐসব জনপদ--তাদের অধিবাসীদেরকে আমরা ধ্বংস করেছিলাম(২), যখন তারা যুলুম এবং তাদের ধ্বংসের জন্য আমরা স্থির করেছিলাম নির্দিষ্ট সময়(৩)।

নবম রুকূ'

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ

৬০. আর স্মরণ করুন, যখন মূসা তার সঙ্গী

---

(১) অর্থাৎ কেউ কোন দোষ করলে সংগে সংগেই তাকে পাকড়াও করে শাস্তি দিয়ে দেয়া আল্লাহর রীতি নয়। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন: "আল্লাহ্ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিলে ভূ-পৃষ্ঠে কোন জীব-জন্তুকেই রেহাই দিতেন না, কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। তারপর তাদের নির্দিষ্ট কাল এসে গেলে আল্লাহ্ তো আছেন তাঁর বান্দাদের সম্যক দ্রষ্টা।" [সূরা ফাতের: ৪৫] আরও বলেন: "মংগলের আগেই ওরা আপনাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে, যদিও ওদের আগে এর বহু দৃষ্টান্ত গত হয়েছে। মানুষের সীমালংঘন সত্ত্বেও আপনার রব তো মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল এবং আপনার প্রতিপালক শাস্তি দানে তো কঠোর।" [সূরা রা'দ: ৬] তিনি সহিষ্ণুতা অবলম্বন করেন, গোপন রাখেন, ক্ষমা করেন, কখনও তাদের কাউকে হেদায়াতের পথেও পরিচালিত করেন। তারপরও যদি কেউ অপরাধের পথে থাকে তাহলে তার জন্য তো এমন এক দিন রয়েছে যে দিন নবজাতক বৃদ্ধ হয়ে যাবে, গর্ভধারিনী তার গর্ভ রেখে দিবে। [ইবন কাসীর]

(২) এখানে আদ, সামূদ ইত্যাদি জাতির বিরাণ এলাকাগুলোর প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর]

(৩) অনুরূপভাবে তোমরাও নবীর বিরোধিতা করে সে ধরনের শাস্তির সম্মুখিন হতে চলেছ। তাদেরকে যেভাবে শাস্তি পেয়ে বসেছে সেভাবে তোমাদেরকেও পাকড়া করতে পারে। কেননা তোমরা সবচেয়ে মহান নবী ও সর্বোত্তম রাসূলের উপর মিথ্যারোপ করছ। তোমরা আমার কাছে তাদের থেকে বেশী ক্ষমতাধর নও। সুতরাং তোমরা আমার আযাব ও ধমকিকে ভয় কর। [ইবন কাসীর]

ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ۝٦٠

যুবককে[১] বলেছিলেন, 'দু'সাগরের মিলনস্থলে না পৌঁছে আমি থামব না অথবা আমি যুগ যুগ ধরে চলতে থাকব[২] ।'

---

(১) এ ঘটনায় 'মূসা' নামে প্রসিদ্ধ নবী মূসা ইবনে ইমরান 'আলাইহিস্ সালাম-কে বোঝানো হয়েছে । فتى এর শাব্দিক অর্থ যুবক । শব্দটিকে কোন বিশেষ ব্যক্তির সাথে সম্বন্ধ করা হলে অর্থ হয় খাদেম । [ফাতহুল কাদীর] বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে যে, এই খাদেম ছিল ইউশা' ইবনে নূন । [ইবন কাসীর] ﴿مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ﴾ -এর শাব্দিক অর্থ দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থল । বলাবাহুল্য, এ ধরনের স্থান দুনিয়াতে অসংখ্য আছে । এখানে কোন্ জায়গা বোঝানো হয়েছে, কুরআন ও হাদীসে তা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি । তাই ইঙ্গিত ও লক্ষণাদী দৃষ্টে তাফসীরবিদদের উক্তি বিভিন্নরূপ । [ফাতহুল কাদীর]

(২) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 'একদিন মূসা 'আলাইহিস্ সালাম বনী-ইসরাঈলের এক সভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন । জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করলঃ সব মানুষের মধ্যে অধিক জ্ঞানী কে? মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর জানামতে তাঁর চাইতে অধিক জ্ঞানী আর কেউ ছিল না । তাই বললেনঃ আমিই সবার চাইতে অধিক জ্ঞানী । আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নৈকট্যশীল বান্দাদেরকে বিশেষভাবে গড়ে তোলেন । তাই এ জবাব তিনি পছন্দ করলেন না । এখানে বিষয়টি আল্লাহ্‌র উপর ছেড়ে দেয়াই ছিল আদব । অর্থাৎ একথা বলে দেয়া উচিত ছিল যে, আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন, কে অধিক জ্ঞানী । এ জবাবের কারণে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-কে তিরস্কার করে ওহী নাযিল হল যে, দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে অবস্থানকারী আমার এক বান্দা আপনার চাইতে অধিক জ্ঞানী । একথা শুনে মূসা 'আলাইহিস্ সালাম প্রার্থনা জানালেন যে, তিনি অধিক জ্ঞানী হলে তার কাছ থেকে জ্ঞান লাভের জন্য আমার সফর করা উচিত । তাই বললেনঃ হে আল্লাহ্! আমাকে তার ঠিকানা বলে দিন । আল্লাহ্ তা'আলা বললেনঃ থলের মধ্যে একটি মাছ নিয়ে নিন এবং দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলের দিকে সফর করুন । যেখানে পৌঁছার পর মাছটি নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে, সেখানেই আমার এই বান্দার সাক্ষাত পাবেন । মূসা 'আলাইহিস্ সালাম নির্দেশমত থলের মধ্যে একটি মাছ নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেলেন । তার সাথে তার খাদেম ইউশা' ইবনে নূনও ছিল । পথিমধ্যে একটি প্রস্তর খণ্ডের উপর মাথা রেখে তারা ঘুমিয়ে পড়লেন । এখানে হঠাৎ মাছটি নড়াচড়া করতে লাগল এবং থলে থেকে বের হয়ে সমুদ্রে চলে গেল । (মাছটি জীবিত হয়ে সমুদ্রে যাওয়ার সাথে সাথে আরো একটি মু'জিযা প্রকাশ পেল যে,) মাছটি সমুদ্রের যে পথ দিয়ে চলে গেল, আল্লাহ্ তা'আলা সে পথে পানির স্রোত বন্ধ করে দিলেন । ফলে সেখানে পানির মধ্যে একটি সুড়ঙ্গের মত হয়ে গেল । ইউশা' ইবনে নূন এই আশ্চর্যজনক ঘটনা নিরীক্ষণ করছিল । মূসা 'আলাইহিস্ সালাম নিদ্রিত ছিলেন । যখন জাগ্রত হলেন, তখন ইউশা'

ইবনে নূন মাছের এই আশ্চর্যজনক ঘটনা তার কাছে বলতে ভুলে গেলেন এবং সেখান থেকে সামনে রওয়ানা হয়ে গেলেন। পূর্ণ একদিন একরাত সফর করার পর সকাল বেলায় মূসা 'আলাইহিস্ সালাম খাদেমকে বললেনঃ আমাদের নাশ্‌তা আন। এই সফরে যথেষ্ট ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। নাশ্‌তা চাওয়ার পর ইউশা' ইবনে নূনের মাছের ঘটনা মনে পড়ে গেল। সে ভুলে যাওয়ার ওযর পেশ করে বললঃ শয়তান আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। অতঃপর বললঃ মৃত মাছটি জীবিত হয়ে আশ্চর্যজনকভাবে সমুদ্রে চলে গেছে। তখন মূসা 'আলাইহিস্ সালাম বললেনঃ সে স্থানটিই তো আমাদের লক্ষ্য ছিল। (অর্থাৎ মাছের জীবিত হয়ে নিরুদ্দেশ হওয়ার স্থানটিই ছিল গন্তব্যস্থল।)
সে মতে তৎক্ষণাৎ তারা ফিরে চললেন এবং স্থানটি পাওয়ার জন্য পূর্বের পথ ধরেই চললেন। প্রস্তরখণ্ডের নিকট পৌঁছে দেখলেন, এক ব্যক্তি আপাদমস্তক চাদরে আবৃত হয়ে শুয়ে আছে। মূসা 'আলাইহিস্ সালাম তদবস্থায় সালাম করলে খাদির 'আলাইহিস্ সালাম বললেনঃ এই (জনমানবহীন) প্রান্তরে সালাম কোথা থেকে এল? মূসা 'আলাইহিস্ সালাম বললেনঃ আমি মূসা! খাদির 'আলাইহিস্ সালাম প্রশ্ন করলেনঃ বনী-ইসরাঈলের মূসা? তিনি জবাব দিলেনঃ হ্যাঁ, আমিই বনী-ইসরাঈলের মূসা। আমি আপনার কাছ থেকে ঐ বিশেষ জ্ঞান অর্জন করতে এসেছি, যা আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন। খাদির বললেনঃ যদি আপনি আমার সাথে থাকতে চান, তবে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন না, যে পর্যন্ত না আমি নিজে তার স্বরূপ বলে দেই।
একথা বলার পর উভয়ে সমুদ্রের তীর ধরে চলতে লাগলেন। ঘটনাক্রমে একটি নৌকা এসে গেলে তারা নৌকায় আরোহণের ব্যাপারে কথাবার্তা বললেন। মাঝিরা খাদিরকে চিনে ফেলল এবং কোন রকম পারিশ্রমিক ছাড়াই তাদেরকে নৌকায় তুলে নিল। নৌকায় চড়েই খাদির কুড়ালের সাহায্যে নৌকার একটি তক্তা তুলে ফেললেন। এতে মূসা 'আলাইহিস্ সালাম (স্থির থাকতে না পেরে) বললেনঃ তারা কোন প্রকার পারিশ্রমিক ছাড়াই আমাদেরকে নৌকায় তুলে নিয়েছে। আপনি কি এরই প্রতিদানে তাদের নৌকা ভেঙ্গে দিলেন যাতে সবাই ডুবে যায়? এতে আপনি অতি মন্দ কাজ করলেন। খাদির বললেনঃ আমি পূর্বেই বলেছিলাম, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরতে পারবেন না। তখন মূসা 'আলাইহিস্ সালাম ওযর পেশ করে বললেনঃ আমি ওয়াদার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। আমার প্রতি রুষ্ট হবেন না।
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ঘটনা বর্ণনা করে বললেনঃ মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর প্রথম আপত্তি ভুলক্রমে, দ্বিতীয় আপত্তি শর্ত হিসেবে এবং তৃতীয় আপত্তি ইচ্ছাক্রমে হয়েছিল। (ইতিমধ্যে) একটি পাখি উড়ে এসে নৌকার এক প্রান্তে বসল এবং সমুদ্র থেকে এক চঞ্চু পানি তুলে নিল। খাদির 'আলাইহিস্ সালাম মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-কে বললেনঃ আমার জ্ঞান এবং আপনার জ্ঞান

فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ﴿٦١﴾

৬১. অতঃপর তারা উভয়ে যখন দু'সাগরের মিলনস্থলে পৌঁছল তারা নিজেদের মাছের কথা ভুলে গেল; ফলে সেটা সুড়ঙ্গের মত নিজের পথ করে সাগরে নেমে গেল[১]।

উভয়ের মিলে আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞানের মোকাবিলায় এমন তুলনাও হয় না, যেমনটি এ পাখির চঞ্চুর পানির সাথে রয়েছে সমুদ্রের পানি।

অতঃপর তারা নৌকা থেকে নেমে সমুদ্রের তীর ধরে চলতে লাগলেন। হঠাৎ খাদির একটি বালককে অন্যান্য বালকের সাথে খেলা করতে দেখলেন। খাদির স্বহস্তে বালকটির মস্তক তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। বালকটি মারা গেল। মূসা 'আলাইহিস্ সালাম বললেনঃ আপনি একটি নিষ্পাপ প্রাণকে বিনা অপরাধে হত্যা করেছেন। এ যে বিরাট গোনাহ্‌র কাজ করলেন। খাদির বললেনঃ আমি তো পূর্বেই বলেছিলাম, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরতে পারবেন না। মূসা 'আলাইহিস্ সালাম দেখলেন, এ ব্যাপারটি পূর্বের চাইতেও গুরুতর। তাই বললেনঃ এরপর যদি কোন প্রশ্ন করি তবে আপনি আমাকে পৃথক করে দেবেন। আমার ওযর-আপত্তি চূড়ান্ত হয়ে গেছে।

অতঃপর আবার চলতে লাগলেন। এক গ্রামের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় তারা গ্রামবাসীদের কাছে খাবার চাইলেন। ওরা সোজা অস্বীকার করে দিল। খাদির এই গ্রামে একটি প্রাচীরকে পতনোন্মুখ দেখতে পেলেন। তিনি নিজ হাতে প্রাচীরটি সোজা করে দিলেন। মূসা 'আলাইহিস্ সালাম বিস্মিত হয়ে বললেনঃ আমরা তাদের কাছে খাবার চাইলে তারা দিতে অস্বীকার করলো অথচ আপনি তাদের এত বড় কাজ করে দিলেন; ইচ্ছা করলে এর পারিশ্রমিক তাদের কাছ থেকে আদায় করতে পারতেন। খাদির বললেনঃ ﴿هَٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ﴾ অর্থাৎ এখন শর্ত পূর্ণ হয়ে গেছে। এটাই আমার ও আপনার মধ্যে বিচ্ছেদের সময়। এরপর খাদির উপরোক্ত ঘটনাত্রয়ের স্বরূপ মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর কাছে বর্ণনা করে বললেনঃ ﴿ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ অর্থাৎ এ হচ্ছে সেসব ঘটনার স্বরূপ; যেগুলো আপনি দেখে ধৈর্য ধরতে পারেননি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করে বললেনঃ মূসা 'আলাইহিস্ সালাম যদি আরো কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরতেন, তবে আরো কিছু জানা যেত। [বুখারীঃ ১২২, মুসলিমঃ ২৩৮০] এই দীর্ঘ হাদীসে পরিস্কার উল্লেখ রয়েছে যে, মূসা বলতে বনী-ইসরাঈলের নবী মূসা 'আলাইহিস্ সালাম ও তার যুবক সঙ্গীর নাম ইউশা' ইবন নূন এবং দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে যে বান্দার কাছে মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-কে প্রেরণ করা হয়েছিল, তিনি ছিলেন খাদির 'আলাইহিস্ সালাম। [ফাতহুল কাদীর]

(১) মাছের সমুদ্রে চলে যাওয়ার কথাটি প্রথমবার سَرَبًا শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। এর

৬২. অতঃপর যখন তারা আরো অগ্রসর হল মূসা তার সঙ্গীকে বললেন, 'আমাদের দুপুরের খাবার আন, আমরা তো এ সফরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি ।'

فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتٰىهُ اٰتِنَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا ﴿٦٢﴾

৬৩. সে বলল, 'আপনি কি লক্ষ্য করেছেন যে, আমরা যখন শিলাখণ্ডে বিশ্রাম করছিলাম তখন মাছের যা ঘটেছিল আমি তা আপনাকে জানাতে ভুলে গিয়েছিলাম শয়তানই সেটার কথা আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল; আর মাছটি আশ্চর্যজনকভাবে নিজের পথ করে সাগরে নেমে গেল ।'

قَالَ اَرَءَيْتَ اِذْ اَوَيْنَآ اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّيْ نَسِيْتُ الْحُوْتَ ۡ وَمَآ اَنْسٰنِيْهُ اِلَّا الشَّيْطٰنُ اَنْ اَذْكُرَهٗ ۚ وَاتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِى الْبَحْرِ ۖ عَجَبًا ﴿٦٣﴾

৬৪. মূসা বললেন, আমরা তো সে স্থানটিরই অনুসন্ধান করছিলাম[১] ।' তারপর তারা নিজেদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে চলল ।

قَالَ ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ۖ فَارْتَدَّا عَلٰٓى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿٦٤﴾

৬৫. এরপর তারা সাক্ষাত পেল আমাদের বান্দাদের মধ্যে একজনের, যাকে

فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَآ اٰتَيْنٰهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا

অর্থ সুড়ঙ্গ । পাহাড়ে রাস্তা তৈরী করার জন্য অথবা শহরে ভূগর্ভস্থ পথ তৈরী করার উদ্দেশ্যে সুড়ঙ্গ খনন করা হয় । এ থেকে জানা গেল যে, মাছটি সমুদ্রের যেদিকে যেত, সেদিকে একটি সুড়ঙ্গের মত পথ তৈরী হয়ে যেত । [দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] উপরোক্ত হাদীস থেকে তা-ই জানা যায় । দ্বিতীয় বার যখন ইউশা' ইবন নূন দীর্ঘ সফরের পর এ ঘটনাটি উল্লেখ করেন, তখন ﴿وَاتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِى الْبَحْرِ ۖ عَجَبًا﴾ শব্দে বর্ণনা করা হয়েছে । এখানে عَجَباً শব্দের অর্থ: আশ্চর্যজনকভাবে । উভয় বর্ণনার মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই । কেননা, পানিতে সুড়ঙ্গ তৈরী হওয়া স্বয়ং একটি অভ্যাসবিরুদ্ধ আশ্চর্য ঘটনা । [ফাতহুল কাদীর]

(১) অর্থাৎ আমাদের গন্তব্যের এ নিশানীটিই তো আমাকে বলা হয়েছিল । এ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ ইংগিতই পাওয়া যায় যে, আল্লাহর ইংগিতেই মূসা আলাইহিসসালাম এ সফর করছিলেন । তার গন্তব্য স্থলের চিহ্ন হিসেবে তাকে বলে দেয়া হয়েছিল যে, যেখানে তাদের খাওয়ার জন্য নিয়ে আসা মাছটি অদৃশ্য হয়ে যাবে সেখানে তারা আল্লাহর সেই বান্দার দেখা পাবেন, যার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য তাকে পাঠানো হয়েছিল । [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

وَعَلَّمْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ﴿٦٥﴾

আমরা আমাদের কাছ থেকে অনুগ্রহ দান করেছিলাম ও আমাদের কাছ থেকে শিক্ষা দিয়েছিলাম এক বিশেষ জ্ঞান[১]।

قَالَ لَهٗ مُوْسٰى هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰٓى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴿٦٦﴾

৬৬. মূসা তাকে বললেন, 'যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হয়েছে তা থেকে আমাকে শিক্ষা দেবেন, যা দ্বারা আমি সঠিক পথ পাব, এ শর্তে আমি আপনার অনুসরণ করব কি[২]?'

قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٦٧﴾

৬৭. সে বলল, আপনি কিছুতেই আমার সংগে ধৈর্য ধারণ করে থাকতে পারবেন না,

وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰى مَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ خُبْرًا ﴿٦٨﴾

৬৮. 'যে বিষয় আপনার জ্ঞানায়ত্ত নয় সে বিষয়ে আপনি ধৈর্য ধারণ করবেন কেমন করে[৩]?'

---

(১) কুরআনুল কারীমে ঘটনার মূল ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়নি; বরং ﴿عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَآ﴾ (আমার বান্দাদের একজন) বলা হয়েছে। বুখারীর হাদীসে তার নাম 'খাদির' উল্লেখ করা হয়েছে। খাদির অর্থ সবুজ-শ্যামল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নামকরণের কারণ প্রসঙ্গে বলেন যে, তিনি যেখানে বসতেন, সেখানেই ঘাস উৎপন্ন হয়ে যেত, মাটি যেরূপই হোক না কেন। [বুখারীঃ ৩৪০২] খাদির কি নবী ছিলেন, না ওলী ছিলেন, এ ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে গ্রহণযোগ্য আলেমদের মতে, খাদির 'আলাইহিস্ সালামও একজন নবী। [ইবন কাসীর]

(২) এখানে মূসা 'আলাইহিস্ সালাম আল্লাহ্র নবী ও শীর্ষস্থানীয় রাসূল হওয়া সত্ত্বেও খাদির 'আলাইহিস্ সালাম-এর কাছে সবিনয় প্রার্থনা করেছিলেন যে, আমি আপনার জ্ঞান শিক্ষা করার জন্য আপনার সাহচর্য কামনা করি। এ থেকে বোঝা গেল যে, ছাত্রকে অবশ্যই উস্তাদের সাথে আদব রক্ষা করতে হবে। [ইবন কাসীর]

(৩) খাদির 'আলাইহিস্ সালাম মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-কে বললেনঃ আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না। আসল তথ্য যখন আপনার জানা নেই, তখন ধৈর্য ধরবেনই বা কেমন করে? উদ্দেশ্য এই যে, আমি যে জ্ঞান লাভ করেছি, তা আপনার জ্ঞান থেকে ভিন্ন ধরণের। তাই আমার কাজকর্ম আপনার কাছে আপত্তিকর ঠেকবে। আসল তথ্য আপনাকে না বলা পর্যন্ত আপনি নিজের কর্তব্যের খাতিরে আপত্তি করবেন। [ইবন কাসীর]

৬৯. মূসা বললেন, 'আল্লাহ্ চাইলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আপনার কোন আদেশ আমি অমান্য করব না।'

قَالَ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أَعۡصِي لَكَ أَمۡرًا ۝٦٩

৭০. সে বলল, 'আচ্ছা, আপনি যদি আমার অনুসরণ করবেনই তবে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন না, যতক্ষণ না আমি সে বিষয়ে আপনাকে কিছু বলি।'

قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعۡتَنِي فَلَا تَسۡـَٔلۡنِي عَن شَيۡءٍ حَتَّىٰٓ أُحۡدِثَ لَكَ مِنۡهُ ذِكۡرًا ۝٧٠

দশম রুকূ'

৭১. অতঃপর উভয়ে চলতে লাগল, অবশেষে যখন তারা নৌকায় আরোহণ করল তখন সে তা বিদীর্ণ করে দিল। মূসা বললেন, 'আপনি কি আরোহীদেরকে নিমজ্জিত করার জন্য তা বিদীর্ণ করলেন? আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন!'

فَٱنطَلَقَا حَتَّىٰٓ إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَاۖ قَالَ أَخَرَقۡتَهَا لِتُغۡرِقَ أَهۡلَهَا لَقَدۡ جِئۡتَ شَيۡـًٔا إِمۡرًا ۝٧١

৭২. সে বলল, 'আমি কি বলিনি যে, আপনি আমার সঙ্গে কিছুতেই ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না?'

قَالَ أَلَمۡ أَقُلۡ إِنَّكَ لَن تَسۡتَطِيعَ مَعِيَ صَبۡرًا ۝٧٢

৭৩. মূসা বললেন, 'আমার ভুলের জন্য আমাকে অপরাধী করবেন না ও আমার ব্যাপারে অত্যাধিক কঠোরতা অবলম্বন করবেন না।'

قَالَ لَا تُؤَاخِذۡنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرۡهِقۡنِي مِنۡ أَمۡرِي عُسۡرًا ۝٧٣

৭৪. অতঃপর উভয়ে চলতে লাগল, অবশেষে তাদের সাথে এক বালকের সাক্ষাত হলে সে তাকে হত্যা করল। তখন মূসা বললেন, 'আপনি কি এক নিষ্পাপ জীবন নাশ করলেন, হত্যার

فَٱنطَلَقَا حَتَّىٰٓ إِذَا لَقِيَا غُلَٰمًا فَقَتَلَهُۥ قَالَ أَقَتَلۡتَ نَفۡسًا زَكِيَّةَۢ بِغَيۡرِ نَفۡسٖ لَّقَدۡ جِئۡتَ شَيۡـًٔا نُّكۡرًا ۝٧٤

অপরাধ ছাড়াই? আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন[১]!'

৭৫. সে বলল, 'আমি কি আপনাকে বলিনি যে, আপনি আমার সংগে কিছুতেই ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না?'

قَالَ اَلَمۡ اَقُلۡ لَّكَ اِنَّكَ لَنۡ تَسۡتَطِيۡعَ مَعِىَ صَبۡرًا

৭৬. মূসা বললেন, 'এর পর যদি আমি আপনাকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করি তবে আপনি আমাকে সংগে রাখবেন না; আমার 'ওযর-আপত্তির চূড়ান্ত হয়েছে।

قَالَ اِنۡ سَاَلۡتُكَ عَنۡ شَىۡءٍۢ بَعۡدَهَا فَلَا تُصٰحِبۡنِىۡ‌ۚ قَدۡ بَلَغۡتَ مِنۡ لَّدُنِّىۡ عُذۡرًا

৭৭. অতঃপর উভয়ে চলতে লাগল; চলতে চলতে তারা এক জনপদের অধিবাসীদের কাছে পৌঁছে তাদের কাছে খাদ্য চাইল[২]; কিন্তু তারা তাদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করল। অতঃপর সেখানে তারা এক

فَانۡطَلَقَا حَتّٰۤى اِذَاۤ اَتَيَاۤ اَهۡلَ قَرۡيَةِ اۨسۡتَطۡعَمَاۤ اَهۡلَهَا فَاَبَوۡا اَنۡ يُّضَيِّفُوۡهُمَا فَوَجَدَا فِيۡهَا جِدَارًا يُّرِيۡدُ اَنۡ يَّنۡقَضَّ فَاَقَامَهٗ‌ ؕ قَالَ لَوۡ شِئۡتَ لَـتَّخَذۡتَ عَلَيۡهِ اَجۡرًا

(১) একবার নাজদাহ্‌ হারুরী (খারেজী) ইবনে আব্বাসের কাছে পত্র লিখল যে, খাদির 'আলাইহিস্‌ সালাম নাবালেগ বালককে কিরূপে হত্যা করলেন, অথচ রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাবালেগ হত্যা করতে নিষেধ করেছেন? ইবনে আব্বাস জবাব লিখলেনঃ কোন বালক সম্পর্কে যদি তোমার ঐ জ্ঞান অর্জিত হয়ে যায়, যা খাদির 'আলাইহিস্‌ সালাম-এর অর্জিত হয়েছিল, তবে তোমার জন্যও নাবালেগ হত্যা করা জায়েয হয়ে যাবে। [মুসলিম: ১৮১২] উদ্দেশ্য এই যে, খাদির 'আলাইহিস্‌ সালাম নবুওয়াতের ওহীর মাধ্যমে এই জ্ঞান লাভ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পর নবুওয়াত বন্ধ হয়ে যাবার কারণে এখন এই জ্ঞান আর কেউ লাভ করতে পারবে না।

(২) খাদির 'আলাইহিস্‌ সালাম যে জনপদে পৌঁছেন এবং যার অধিবাসীরা তার আতিথেয়তা করতে অস্বীকার করে, সহীহ্‌ মুসলিমের বর্ণনায় সে গ্রামটি সম্পর্কে বলা হয়েছে- 'কৃপণ জনগোষ্ঠী সম্বলিত গ্রামে এসে পৌঁছলো।' [মুসলিমঃ ২৩৮০, ১৭২] সুনির্দিষ্ট কোন গ্রামের উল্লেখ করা হয়নি।

প্রাচীর দেখতে পেল, যা পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল, তখন সে সেটাকে সুদৃঢ় করে দিল। মূসা বললেন, 'আপনি তো ইচ্ছে করলে এর জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতেন।'

৭৮. সে বলল, 'এখানেই আমার এবং আপনার মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হল; যে বিষয়ে আপনি ধৈর্য ধারণ করতে পারেননি অচিরেই আমি সেগুলোর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করছি।

قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِيْ وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيْلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا ﴿٧٨﴾

৭৯. 'নৌকাটির ব্যাপার---এটা ছিল কিছু দরিদ্র ব্যক্তির, ওরা সাগরে কাজ করত[১]; আমি ইচ্ছে করলাম নৌকাটিকে ত্রুটিযুক্ত করতে; কারণ তাদের সামনে ছিল এক রাজা, যে বলপ্রয়োগ করে প্রত্যেকটি ভাল নৌকা ছিনিয়ে নিত।

اَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتْ لِمَسٰكِيْنَ يَعْمَلُوْنَ فِى الْبَحْرِ فَاَرَدْتُّ اَنْ اَعِيْبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُمْ مَّلِكٌ يَّأْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا ﴿٧٩﴾

৮০. 'আর কিশোরটি-- তার পিতামাতা ছিল মুমিন। অতঃপর আমরা আশংকা করলাম যে, সে সীমালঙ্ঘন ও কুফরীর দ্বারা তাদেরকে অতিষ্ঠ করে তুলবে[২]।

وَاَمَّا الْغُلٰمُ فَكَانَ اَبَوٰهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيْنَا اَنْ يُّرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ﴿٨٠﴾

৮১. 'তাই আমরা চাইলাম যে, তাদের রব যেন তাদেরকে তার পরিবর্তে এক সন্তান দান করেন, যে হবে পবিত্রতায় উত্তম ও দয়া-মায়ায় ঘনিষ্ঠতর।

فَاَرَدْنَآ اَنْ يُّبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكٰوةً وَّاَقْرَبَ رُحْمًا ﴿٨١﴾

(১) অর্থাৎ এর দ্বারা সমুদ্রে কাজ করে জীবিকার তালাশ করত। [মুয়াসসার]

(২) হাদীসে এসেছেঃ যে বালককে খাদির 'আলাইহিস্ সালাম হত্যা করেছিলেন, সে কাফের হিসেবে লিখা হয়েছিল। যদি বড় হওয়ার সুযোগ পেত তবে পিতা-মাতাকে কুফরী ও সীমালংঘনের মাধ্যমে কষ্ট দিয়ে ছাড়ত। [মুসলিমঃ ২৬৬১]

وَاَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلٰمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِى الْمَدِيْنَةِ وَكَانَ تَحْتَهٗ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ اَبُوْهُمَا صَالِحًا ۚ فَاَرَادَ رَبُّكَ اَنْ يَّبْلُغَاۤ اَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا ۖ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلْتُهٗ عَنْ اَمْرِىْ ۗ ذٰلِكَ تَاْوِيْلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا ﴿٨٢﴾

৮২. ‘আর ঐ প্রাচীরটি-- সেটা ছিল নগরবাসী দুই ইয়াতিম কিশোরের এবং এর নীচে আছে তাদের গুপ্তধন[১] আর তাদের পিতা ছিল সৎকর্মপরায়ণ[২]। কাজেই আপনার রব তাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে ইচ্ছে করলেন যে, তারা বয়ঃপ্রাপ্ত হোক এবং তারা তাদের ধনভাণ্ডার উদ্ধার করুক। আর আমি নিজ থেকে কিছু করিনি; আপনি যে বিষয়ে ধৈর্য ধারণে অপারগ হয়েছিলেন, এটাই তার ব্যাখ্যা[৩]।’

(১) এখানে আল্লাহ্ তা‘আলা সে প্রাচীরের নীচে খনি আছে বলেছেন। এর অতিরিক্ত কোন তাফসীর করেননি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকেও সহীহ্ কোন তাফসীর বর্ণিত হয়নি। তাই এ ব্যাপারে সঠিক কোন মতামত দেয়া যায় না। তবে কাতাদাহ্ রাহিমাহুল্লাহ্ থেকে সহীহ্ সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, এখানে গচ্ছিত খনি বলতে সম্পদ বোঝানো হয়েছে। আর আয়াতের ভাষ্য থেকেও এ অর্থই বেশী সুস্পষ্ট। [দেখুন, তাবারী]

(২) এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, খাদির ‘আলাইহিস্ সালাম-এর মাধ্যমে ইয়াতীম বালকদের জন্য রক্ষিত গুপ্তধনের হেফাযত এজন্য করানো হয় যে, তাদের পিতা একজন সৎকর্মপরায়ণ আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দা ছিলেন। তাই আল্লাহ্ তা‘আলা তার সন্তান-সন্ততির উপকারার্থে এ ব্যবস্থা করেন। [ইবন কাসীর]

(৩) খাদির ‘আলাইহিস্ সালাম জীবিত আছেন, না ওফাত হয়ে গেছেঃ এ বিষয়ের সাথে কুরআনে বর্ণিত ঘটনার কোন সম্পর্ক নেই। তাই কুরআন ও হাদীসে স্পষ্টতঃ এ সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করা হয়নি। এ ব্যাপারে সর্বকালেই আলেমদের বিভিন্নরূপ মতামত পরিদৃষ্ট হয়েছে। যাদের মতে তিনি জীবিত আছেন, তাদের প্রমাণ হচ্ছে একটি বর্ণনা। যাতে বলা হয়েছেঃ ‘যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওফাত হয়ে যায়, তখন সাদা-কালো দাড়িওয়ালা জনৈক ব্যক্তি আগমন করে এবং ভীড় ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করে কান্নাকাটি করতে থাকে। এই আগন্তুক সাহাবায়ে কেরামের দিকে মুখ করে বলতে থাকেঃ আল্লাহ্‌র দরবারেই প্রত্যেক বিপদ থেকে সবর আছে, প্রত্যেক বিলুপ্ত বিষয়ের প্রতিদান আছে এবং তিনি প্রত্যেক ধ্বংসশীল বস্তুর স্থলাভিষিক্ত। তাই তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন কর এবং তাঁর কাছেই আগ্রহ প্রকাশ কর। কেননা, যে ব্যক্তি বিপদের সওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়, সে-ই প্রকৃত বঞ্চিত। আগন্তুক উপরোক্ত বাক্য বলে বিদায় হয়ে গেলে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু ও

এগারতম রুকূ'

৮৩. আর তারা আপনাকে যুল-কার্‌নাইন সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে[1]। বলুন,

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَن ذِى ٱلْقَرْنَيْنِ ۖ قُلْ سَأَتْلُوا۟ عَلَيْكُم

আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেনঃ ইনি খাদির 'আলাইহিস্ সালাম।' [মুস্তাদরাকঃ ৩/৫৯, ৬০] তবে বর্ণনাটি সম্পূর্ণ বানোয়াট।

পক্ষান্তরে যারা খাদির 'আলাইহিস্ সালাম-এর জীবদ্দশা অস্বীকার করে, তাদের বড় প্রমাণ হচ্ছে-

এক) আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ "আমরা আপনার আগেও কোন মানুষকে অনন্ত জীবন দান করিনি" [সূরা আল-আম্বিয়াঃ ৩৪] সুতরাং খাদির আলাইহিসসালামও অনন্ত জীবন লাভ করতে পারেন না। তিনি নিশ্চয়ই অন্যান্য মানুষের মত মারা গেছেন।

দুই) আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবনের শেষ দিকে এক রাতে আমাদেরকে নিয়ে এশার সালাত আদায় করেন। সালাত শেষে তিনি দাঁড়িয়ে যান এবং নিম্নোক্ত কথাগুলো বলেনঃ 'তোমরা কি আজকের রাতটি লক্ষ্য করছ? এই রাত থেকে একশ' বছর পর আজ যারা পৃথিবীতে আছে, তাদের কেউ জীবিত থাকবে না।' [মুসলিমঃ ২৫৩৭]

তিন) অনুরূপভাবে, খাদির 'আলাইহিস্ সালাম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আমলে জীবিত থাকলে তার কাছে উপস্থিত হয়ে ইসলামের সেবায় আত্মনিয়োগ করা তার জন্য অপরিহার্য ছিল। কেননা, হাদীসে বলা হয়েছে "মূসা জীবিত থাকলে আমার অনুসরণ করা ছাড়া তারও গত্যন্তর ছিল না।" [মুসনাদে আহমাদঃ ৩/৩৩৮] (কারণ, আমার আগমনের ফলে তার দ্বীন রহিত হয়ে গেছে।)

চার) বদরের প্রান্তরে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেনঃ "যদি আপনি এ ক্ষুদ্র দলটিকে ধ্বংস করেন তবে যমীনের বুকে আপনার ইবাদতকারী কেউ থাকবে না"। [মুসলিমঃ ১৭৬৩] এতে বোঝা যাচ্ছে যে, খাদির নামক কেউ জীবিত নেই।

এ সব দলীল-প্রমাণ দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে, খাদির 'আলাইহিস্ সালাম জীবিত নেই। সুতরাং যারাই তার সাথে সাক্ষাতের দাবী করবে, তারাই মিথ্যার উপর রয়েছে। এটাও অসম্ভব নয় যে, শয়তান তাদেরকে খিদিরের রূপ ধরে বিভ্রান্ত করছে। কারণ, শয়তানের পক্ষে খিদিরের রূপ ধারণ করা অসম্ভব নয়। [বিস্তারিত দেখুন, ইবন কাসীর; ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমু ফাতাওয়া ৪/৩৩৭]

(১) যুলকারনাইন কে ছিলেন, কোন্ যুগে ও কোন্ দেশে ছিলেন এবং তার নাম যুলকারনাইন হল কেনঃ যুলকারনাইন নামকরণের হেতু সম্পর্কে বহু উক্তি ও তীব্র

مِّنْهُ ذِكْرًا ﴿٨٣﴾

'অচিরেই আমি তোমাদের কাছে তার বিষয় বর্ণনা করব।

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴿٨٤﴾

৮৪. আমরা তো তাকে যমীনে কর্তৃত্ব দিয়েছিলাম এবং প্রত্যেক বিষয়ের উপায়-উপকরণ দান করেছিলাম[১]।

فَأَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٨٥﴾

৮৫. অতঃপর সে এক পথ অবলম্বন করল।

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي

৮৬. চলতে চলতে সে যখন সূর্যের অস্ত

মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়। কেউ বলেনঃ তার মাথার চুলে দু'টি গুচ্ছ ছিল। তাই যুলকারনাইন (দুই গুচ্ছওয়ালা) আখ্যায়িত হয়েছেন। কেউ বলেনঃ পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যদেশসমূহ জয় করার কারণে যুলকারনাইন খেতাবে ভূষিত হয়েছেন। কেউ এমনও বলেছেন যে, তার মাথায় শিং-এর অনুরূপ দু'টি চিহ্ন ছিল। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, তার মাথার দুই দিকে দু'টি ক্ষতচিহ্ন ছিল। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] তবে আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে সহীহ্ সনদে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি বলেছেনঃ 'যুলকারনাইন নবী বা ফিরিশ্তা ছিলেন না, একজন নেক বান্দা ছিলেন। আল্লাহ্‌কে তিনি ভালবেসেছিলেন, আল্লাহ্ও তাকে ভালবেসেছিলেন। আল্লাহ্‌র হকের ব্যাপারে অতিশয় সাবধানী ছিলেন, আল্লাহ্ও তার কল্যাণ চেয়েছেন। তাকে তার জাতির কাছে পাঠানো হয়েছিল। তারা তার কপালে মারতে মারতে তাকে হত্যা করল। আল্লাহ্ তাকে আবার জীবিত করলেন, এজন্য তার নাম হল যুলকারনাইন।' [মুখতারাঃ ৫৫৫, ফাত্হুল বারীঃ ৬/৩৮৩] যুলকারনাইনের ঘটনা সম্পর্কে কুরআনুল কারীম যা বর্ণনা করেছে, তা এইঃ তিনি একজন সৎ ও ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ্ ছিলেন এবং পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যদেশসমূহ জয় করেছিলেন। এসব দেশে তিনি সুবিচার ও ইনসাফের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তাকে লক্ষ্য অর্জনের জন্য সর্বপ্রকার সাজ-সরঞ্জাম দান করা হয়েছিল। তিনি দিগ্বিজয়ে বের হয়ে পৃথিবীর তিন প্রান্তে পৌঁছেছিলেন- পাশ্চাত্যের শেষ প্রান্তে, প্রাচ্যের শেষ প্রান্তে এবং উত্তরে উভয় পর্বতমালার পাদদেশ পর্যন্ত। এখানেই তিনি দুই পর্বতের মধ্যবর্তী গিরিপথকে একটি সুবিশাল লৌহ প্রাচীর দ্বারা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ফলে ইয়াজুজ-মাজুজের লুটতরাজ থেকে এলাকার জনগণ নিরাপদ হয়ে যায়।

(১) আরবী অভিধানে سبب শব্দের অর্থ এমন বস্তু বোঝায়, যা দ্বারা লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য নেয়া হয়। [ফাতহুল কাদীর] উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা যুলকারনাইনকে দেশ বিজয়েরই জন্য সে যুগে যেসব বিষয় প্রয়োজনীয় ছিল, তা সবই দান করেছিলেন।

عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَّوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا ۚ قُلْنَا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِمَّآ اَنْ تُعَذِّبَ وَاِمَّآ اَنْ تَتَّخِذَ فِيْهِمْ حُسْنًا ﴿٨٦﴾

গমন স্থানে পৌঁছল[১] তখন সে সূর্যকে এক পংকিল জলাশয়ে অস্তগমন করতে দেখল[২] এবং সে সেখানে এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেল। আমরা বললাম, 'হে যুল-কার্‌নাইন! তুমি এদেরকে শাস্তি দিতে পার অথবা এদের ব্যাপার সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পার।'

قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهٗ ثُمَّ يُرَدُّ اِلٰى رَبِّهٖ فَيُعَذِّبُهٗ عَذَابًا نُّكْرًا ﴿٨٧﴾

৮৭. সে বলল, 'যে কেউ যুলুম করবে অচিরেই আমরা তাকে শাস্তি দেব, অতঃপর তাকে তার রবের নিকট ফিরিয়ে নেয়া হবে তখন তিনি তাকে কঠিন শাস্তি দেবেন।

وَاَمَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهٗ جَزَآءَ ۨ الْحُسْنٰى ۚ وَسَنَقُوْلُ لَهٗ مِنْ اَمْرِنَا يُسْرًا ﴿٨٨﴾

৮৮. 'তবে যে ঈমান আনবে এবং সৎকাজ করবে তার জন্য প্রতিদানস্বরূপ আছে

(১) কোন কোন মুফাসসির বলেন, তিনি পশ্চিম দিকে দেশের পর দেশ জয় করতে করতে স্থলভাগের শেষ সীমানায় পৌঁছে যান, এরপর ছিল সমুদ্র। এটিই হচ্ছে সূর্যাস্তের সীমানার অর্থ। হাবীব ইবন্ হাম্মায বলেন: আমি আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর কাছে বসা ছিলাম। এমতাবস্থায় একলোক তাকে জিজ্ঞেস করল যে, যুলকারনাইন কিভাবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যদেশে পৌঁছুতে সক্ষম হয়েছিল? তিনি বললেন: সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ আকাশের মেঘকে তার নিয়ন্ত্রণাধীন করেছিলেন। পর্যাপ্ত উপায়-উপকরণ দিয়েছিলেন এবং প্রচুর শক্তি-সামর্থ দান করেছিলেন। তারপর আলী বললেন: আরও বলব? লোকটি চুপ করলে আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুও চুপ করে যান।' [আল-মুখতারাহ: ৪০৯] [ইবন কাসীর]

(২) حَمِئَةٍ এর শাব্দিক অর্থ কালো জলাভূমি অথবা কাদা। অর্থাৎ তিনি সূর্যকে তার দৃশ্যে মহাসাগরে ডুবতে দেখলেন। আর সাধারণত: যখন কেউ সমুদ্র তীরে দাঁড়িয়ে সূর্য অস্ত যাওয়া প্রত্যক্ষ করবে, তখনই তার এটা মনে হবে, অথচ সূর্য কখনও তার কক্ষপথ ত্যাগ করেনি। [ইবন কাসীর] এখানে সে জলাশয়কে বোঝানো হয়েছে, যার নীচে কালো রঙের কাদা থাকে। ফলে পানির রঙও কালো দেখায়। এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট হওয়া উচিত, তা হলো, কুরআন একথা বলেনি যে, সূর্য কালো জলাশয়ে ডুবে। বরং এখানে যুলকারনাইনের অনুভূতিই শুধু ব্যক্ত করা হয়েছে।

কল্যাণ এবং তার প্রতি ব্যবহারে আমরা নরম কথা বলব।'

৮৯. তারপর সে এক উপায় অবলম্বন করল,

ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٨٩﴾

৯০. চলতে চলতে যখন সে সূর্যোদয়ের স্থলে পৌছল তখন সে দেখল সেটা এমন এক সম্প্রদায়ের উপর উদয় হচ্ছে যাদের জন্য সূর্যতাপ হতে কোন অন্তরাল আমরা সৃষ্টি করিনি;

حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا ﴿٩٠﴾

৯১. প্রকৃত ঘটনা এটাই, আর তার কাছে যে বৃত্তান্ত ছিল তা আমরা সম্যক অবহিত আছি।

كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴿٩١﴾

৯২. তারপর সে আরেক মাধ্যম অবলম্বন করল,

ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٩٢﴾

৯৩. চলতে চলতে সে যখন দুই পর্বত-প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থলে[১] পৌঁছল, তখন সেখানে সে এক সম্প্রদায়কে পেল, যারা তার কথা তেমন বুঝতে পারছিল না।

حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿٩٣﴾

৯৪. তারা বলল, 'হে যুল-কার্নাইন! ইয়াজূজ ও মাজূজ[২] তো যমীনে

قَالُوا۟ يَٰذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ

(১) যে বস্তু কোন কিছুর জন্য বাধা হয়ে যায়, سد তাকে বলা হয়; তা প্রাচীর হোক কিংবা পাহাড় হোক, কৃত্রিম হোক কিংবা প্রাকৃতিক হোক। এখানে سدين বলে দুই পাহাড় বোঝানো হয়েছে। এগুলো ইয়াজুজ-মাজুজের পথে বাধা ছিল। কিন্তু উভয়ের মধ্যবর্তী গিরিপথ দিয়ে এসে তারা আক্রমণ চালাত। [উসাইমীন, তাফসীরুল কুরআনিল কারীম] যুলকারনাইন এই গিরিপথটি বন্ধ করে দেন।

(২) ইয়াজুজ-মাজুজ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বর্ণনা থেকে এতটুকু নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, ইয়াজুজ-মাজুজ মানব সম্প্রদায়ভুক্ত। অন্যান্য মানবের মত তারাও নূহ 'আলাইহিস্ সালাম-এর সন্তান-সন্ততি। কুরআনুল কারীম স্পষ্টতঃই বলেছেঃ

﴿وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ﴾ [আস্-সাফ্ফাতঃ ৭৭] অর্থাৎ নূহের মহাপ্লাবনের পর দুনিয়াতে যত মানুষ আছে এবং থাকবে, তারা সবাই নূহ 'আলাইহিস্ সালাম-এর সন্তান-সন্ততি হবে। ঐতিহাসিক বর্ণনা এ ব্যাপারে একমত যে, তারা ইয়াফেসের বংশধর।[মুসনাদে আহমাদঃ ৫/১১] তাদের অবশিষ্ট অবস্থা সম্পর্কে সর্বাধিক বিস্তারিত ও সহীহ্ হাদীস হচ্ছে নাওয়াস ইবনে সামআন রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর হাদীসটি। সেখানে দাজ্জালের ঘটনা ও তার ধ্বংসের কথা বিস্তারিত বর্ণনার পর বলা হয়েছে, "এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করবেনঃ আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে এমন লোক বের করব, যাদের মোকাবেলা করার শক্তি কারো নেই। কাজেই (হে ঈসা!) আপনি মুসলিমদেরকে সমবেত করে তূর পর্বতে চলে যান। (সে মতে তিনি তাই করবেন।) অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াজুজ-মাজুজের রাস্তা খুলে দেবেন। তাদের দ্রুত চলার কারণে মনে হবে যেন উপর থেকে পিছলে নীচে এসে পড়ছে। তাদের প্রথম দলটি তবরিয়া উপসাগরের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় তার পানি পান করে এমন অবস্থা করে দেবে যে, দ্বিতীয় দলটি এসে সেখানে কোনদিন পানি ছিল, একথা বিশ্বাস করতে পারবে না। ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম ও তার সঙ্গীরা তূর পর্বতে আশ্রয় নেবেন। অন্যান্য মুসলিমরা নিজ নিজ দূর্গে ও নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেবে। পানাহারের বস্তুসামগ্রী সাথে থাকবে, কিন্তু তাতে ঘাটতি দেখা দেবে। ফলে একটি গরুর মস্তককে একশ' দীনারের চাইতে উত্তম মনে করা হবে। ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম ও অন্যান্য মুসলিমরা কষ্ট লাঘবের জন্য আল্লাহ্র কাছে দো'আ করবেন। (আল্লাহ্ দো'আ কবুল করবেন।) তিনি মহামারী আকারে রোগব্যাধি পাঠাবেন। ফলে, অল্প সময়ের মধ্যেই ইয়াজুজ-মাজুজের গোষ্ঠী সবাই মরে যাবে। অতঃপর ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম সঙ্গীদেরকে নিয়ে তূর পর্বত থেকে নীচে নেমে এসে দেখবেন পৃথিবীতে তাদের মৃতদেহ থেকে অর্ধহাত পরিমিত স্থানও খালি নেই এবং (মৃতদেহ পচে) অসহ্য দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। (এ অবস্থা দেখে পুনরায়) ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম ও তার সঙ্গীরা আল্লাহ্র দরবারে দো'আ করবেন। (যেন এই বিপদও দূর করে দেয়া হয়)। আল্লাহ্ তা'আলা এ দো'আও কবুল করবেন এবং বিরাটাকার পাখি প্রেরণ করবেন, যাদের ঘাড় হবে উটের ঘাড়ের মত। (তারা মৃতদেহগুলো উঠিয়ে যেখানে আল্লাহ্ ইচ্ছা করবেন, সেখানে ফেলে দেবে।) কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, মৃতদেহগুলো সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে। এরপর বৃষ্টি বর্ষিত হবে। কোন নগর ও বন্দর এ বৃষ্টি থেকে বাদ থাকবে না। ফলে সমগ্র ভূপৃষ্ঠ ধৌত হয়ে কাঁচের মত পরিস্কার হয়ে যাবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ভূপৃষ্ঠকে আদেশ করবেনঃ তোমার পেটের সমুদয় ফল-ফুল উদ্গীরণ করে দাও এবং নতুনভাবে তোমার বরকতসমূহ প্রকাশ কর। (ফলে তাই হবে এবং এমন বরকত প্রকাশিত হবে যে) একটি ডালিম একদল লোকের আহারের জন্য যথেষ্ট হবে এবং মানুষ তার ছাল দ্বারা ছাতা তৈরী করে ছায়া লাভ করবে। দুধে এত বরকত হবে যে, একটি উষ্ট্রীর দুধ একদল লোকের জন্য, একটি গাভীর দুধ এক গোত্রের জন্য এবং একটি ছাগলের দুধ একটি পরিবারের জন্য

যথেষ্ট হবে। (চল্লিশ বছর যাবত এই অসাধারণ বরকত ও শান্তি-শৃংখলা অব্যাহত থাকার পর যখন কেয়ামতের সময় সমাগত হবে; তখন) আল্লাহ্ তা'আলা একটি মনোরম বায়ূ প্রবাহিত করবেন। এর পরশে সব মুসলিমের বগলের নীচে বিশেষ এক প্রকার রোগ দেখা দেবে এবং সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হবে; শুধু কাফের ও দুষ্ট লোকেরাই অবশিষ্ট থেকে যাবে। তারা ভূ-পৃষ্ঠে জন্তু-জানোয়ারের মত খোলাখুলিই অপকর্ম করবে। তাদের উপরই কেয়ামত আসবে।' [মুসলিমঃ ২৯৩৭]
আব্দুর রহমান ইবনে ইয়াযীদের বর্ণনায় ইয়াজুজ-মাজুজের কাহিনীর আরো অধিক বিবরণ পাওয়া যায়। তাতে রয়েছেঃ তবরিয়া উপসাগর অতিক্রম করার পর ইয়াজুজ-মাজুজ বায়তুল মোকাদ্দাস সংলগ্ন পাহাড় জাবালুল-খমরে আরোহণ করে ঘোষণা করবেঃ আমরা পৃথিবীর সমস্ত অধিবাসীকে হত্যা করেছি। এখন আকাশের অধিবাসীদেরকে খতম করার পালা। সেমতে তারা আকাশের দিকে তীর নিক্ষেপ করবে। আল্লাহ্র আদেশে সে তীর রক্তরঞ্জিত হয়ে তাদের কাছে ফিরে আসবে। (যাতে বোকারা এই ভেবে আনন্দিত হবে যে, আকাশের অধিবাসীরাও শেষ হয়ে গেছে।) [মুসলিমঃ ২৯৩৭]। অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা আদম 'আলাইহিস্ সালাম-কে বলবেনঃ আপনি আপনার সন্তানদের মধ্য থেকে জাহান্নামীদেরকে তুলে আনুন। তিনি বলবেনঃ হে আমার রব! তারা কারা? আল্লাহ্ বলবেনঃ প্রতি হাজারে নয়শত নিরান্নব্বই জন জাহান্নামী এবং মাত্র একজন জান্নাতী। একথা শুনে সাহাবায়ে কেরাম শিউরে উঠলেন এবং জিজ্ঞেস করলেনঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের মধ্যে সে একজন জান্নাতী কে হবে? তিনি উত্তরে বললেনঃ চিন্তা করো না। তোমাদের মধ্য থেকে এক এবং ইয়াজুজ-মাজুজের মধ্য থেকে এক হাজারের হিসেবে হবে। [মুসলিমঃ ২২২] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন যে, ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাবের পরও বায়তুল্লাহ্র হজ্ব ও উমরাহ্ অব্যাহত থাকবে। [বুখারীঃ ১৪৯০]। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন ঘুম থেকে এমন অবস্থায় জেগে উঠলেন যে, তার মুখমণ্ডল ছিল রক্তিমাভ এবং মুখে এই বাক্য উচ্চারিত হচ্ছিলঃ 'আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আরবদের ধ্বংস নিকটবর্তী! আজ ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীরে এতটুকু ছিদ্র হয়ে গেছে।' অতঃপর তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনী মিলিয়ে বৃত্ত তৈরী করে দেখান। যয়নব রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলেনঃ আমি এ কথা শুনে বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের মধ্যে সৎকর্মপরায়ণ লোক জীবিত থাকতেও কি ধ্বংস হয়ে যাবে? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, ধ্বংস হতে পারে; যদি অনাচারের আধিক্য হয়। [বুখারীঃ ৩৩৪৬, মুসলিমঃ ২৮৮০]। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেনঃ ইয়াজুজ-মাজুজ প্রত্যেহ যুলকারনাইনের দেয়ালটি খুঁড়তে থাকে। খুঁড়তে খুঁড়তে তারা এ লৌহ-প্রাচীরের প্রান্ত সীমার এত কাছাকাছি পৌঁছে যায় যে, অপরপার্শ্বের আলো দেখা যেতে থাকে। কিন্তু তারা একথা বলে ফিরে

مُفۡسِدُوۡنَ فِی الۡاَرۡضِ فَهَلۡ نَجۡعَلُ لَكَ خَرۡجًا عَلٰۤی اَنۡ تَجۡعَلَ بَیۡنَنَا وَ بَیۡنَهُمۡ سَدًّا ﴿۹۴﴾

অশান্তি সৃষ্টি করছে। তাই আমরা কি আপনাকে খরচ দেব যে, আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যে এক প্রাচীর গড়ে দেবেন?'

قَالَ مَا مَكَّنِّیۡ فِیۡهِ رَبِّیۡ خَیۡرٌ فَاَعِیۡنُوۡنِیۡ بِقُوَّۃٍ اَجۡعَلۡ بَیۡنَكُمۡ وَ بَیۡنَهُمۡ رَدۡمًا ﴿۹۵﴾

৯৫. সে বলল, 'আমার রব আমাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন, তা-ই উৎকৃষ্ট। কাজেই তোমরা আমাকে শ্রম দ্বারা সাহায্য কর, আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যে এক মজবুত প্রাচীর গড়ে দেব[১]।

اٰتُوۡنِیۡ زُبَرَ الۡحَدِیۡدِ ؕ حَتّٰۤی اِذَا سَاوٰی بَیۡنَ الصَّدَفَیۡنِ قَالَ انۡفُخُوۡا ؕ حَتّٰۤی اِذَا جَعَلَهٗ نَارًا ۙ قَالَ اٰتُوۡنِیۡۤ

৯৬. 'তোমরা আমার কাছে লোহারপাতসমূহ নিয়ে আস,' অবশেষে মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান পূর্ণ হয়ে যখন লৌহস্তূপ দুই

যায় যে, বাকী অংশটুকু আগামী কাল খুঁড়ব। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা প্রাচীরটিকে পূর্ববৎ মজবুত অবস্থায় ফিরিয়ে নেন। পরের দিন ইয়াজুজ-মাজুজ প্রাচীর খননে নতুনভাবে আত্মনিয়োগ করে। খননকার্যে আত্মনিয়োগ ও আল্লাহ্ তা'আলা থেকে মেরামতের এ ধারা ততদিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, যতদিন ইয়াজুজ-মাজুজকে বন্ধ রাখা আল্লাহ্র ইচ্ছা রয়েছে। যেদিন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে মুক্ত করার ইচ্ছা করবেন, সেদিন ওরা মেহনত শেষে বলবেঃ আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে আমরা আগামী কাল অবশিষ্ট অংশটুকু খুঁড়ে ওপারে চলে যাব। (আল্লাহ্র নাম ও তাঁর ইচ্ছার উপর নির্ভর করার কারণে সেদিন ওদের তাওফীক হয়ে যাবে।) পরের দিন তারা প্রাচীরের অবশিষ্ট অংশকে তেমনি অবস্থায় পাবে এবং তারা সেটুকু খুঁড়েই প্রাচীর ভেদ করে ফেলবে। [তিরমিযিঃ ৩১৫৩, ইবনে মাজাহ্ঃ ৪১৯৯, হাকিম মুস্তাদরাকঃ ৪/৪৮৮, মুসনাদে আহমাদঃ ২/৫১০, ৫১১]। আল্লামা ইবনে কাসীর বলেনঃ 'হাদীসের উদ্দেশ্য এই যে, ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীর খনন করার কাজটি তখন শুরু হবে, যখন তাদের আবির্ভাবের সময় নিকটবর্তী হবে। কুরআনে বলা হয়েছে যে, এই প্রাচীর ছিদ্র করা যাবে না এটা তখনকার অবস্থা, যখন যুলকারনাইন প্রাচীরটি নির্মান করেছিলেন। কাজেই এতে কোন বৈপরীত্য নেই।' তাছাড়া কুরআনে তারা ছিদ্র পুরোপুরি করতে পারছে না বলা হয়েছে, যা হাদীসের ভাষ্যের বিপরীত নয়।

(১) অর্থাৎ আল্লাহ দেশের যে অর্থভাণ্ডার আমার হাতে তুলে দিয়েছেন এবং যে ক্ষমতা আমাকে দিয়েছেন তা এ কাজ সম্পাদনের জন্য যথেষ্ট। তবে শারীরিক শ্রম দিয়ে ও নির্মান যন্ত্র তোমাদের আমাকে সাহায্য করতে হবে। [ইবন কাসীর]

أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿٩٦﴾

পর্বতের সমান হল তখন সে বলল, 'তোমরা হাঁপরে দম দিতে থাক।' অতঃপর যখন সেটা আগুনে পরিণত হল, তখন সে বলল, 'তোমরা আমার কাছে গলিত তামা নিয়ে আস, আমি তা ঢেলে দেই এর উপর[১]।'

فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ﴿٩٧﴾

৯৭. অতঃপর তারা সেটা অতিক্রম করতে পারল না এবং সেটা ভেদও করতে পারল না।

قَالَ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي ۖ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ ۖ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ﴿٩٨﴾

৯৮. সে বলল, 'এটা আমার রব-এর অনুগ্রহ। অতঃপর যখন আমার রব-এর প্রতিশ্রুত সময় আসবে তখন তিনি সেটাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবেন। আর আমার রব-এর প্রতিশ্রুতি সত্য।'

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ ۖ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ﴿٩٩﴾

৯৯. আর সেদিন আমরা তাদেরকে ছেড়ে দেব এ অবস্থায় যে, একদল আরেক দলের উপর তরঙ্গের ন্যায় আছড়ে পড়বে[২]। আর শিংগায় ফুঁক দেয়া

---

(১) زبر শব্দটি زبرة এ বহুবচন। এর অর্থ পাত। এখানে লৌহখণ্ড বোঝানো হয়েছে। ইবন আব্বাস, মুজাহিদ ও কাতাদা বলেন, এটি যেন ইটের মত ব্যবহার করা হয়েছিল। [ইবন কাসীর] অর্থাৎ গিরিপথ বন্ধ করার জন্য নির্মিতব্য প্রাচীর ইট-পাথরের পরিবর্তে লোহার পাত ব্যবহার করা হয়েছিল। الصَّدَفَيْنِ -দুই পাহাড়ের বিপরীতমুখী দুই দিক। [ফাতহুল কাদীর] قِطْرًا অধিকাংশ তাফসীরবিদগণের মতে এর অর্থ গলিত তামা। কারো কারো মতে এর অর্থ গলিত লোহা অথবা রাঙতা। [ফাতহুল কাদীর]

(২) بعضهم এর সর্বনাম দ্বারা বাহ্যতঃ ইয়াজুজ-মাজুজকেই বোঝানো হয়েছে। তাদের একদল অপরদলের মধ্যে ঢুকে পড়বে- বাহ্যতঃ এই অবস্থা তখন হবে, যখন তাদের পথ খুলে যাবে এবং তারা পাহাড়ের উচ্চতা থেকে দ্রুতবেগে নীচে অবতরণ করবে। [ফাতহুল কাদীর] উসাইমীন, তাফসীরুল কুরআনিল কারীম] তাফসীরবিদগণ অন্যান্য সম্ভাবনাও লিখেছেন। যেমন তারা মানুষের সাথে মিশে যমীনের মধ্যে ফাসাদ সৃষ্টি করবে। [ইবন কাসীর] কারও কারও মতে, এখানে কিয়ামতের সময়ের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। [ইবন কাসীর] কারও কারও মতে, যেদিন বাঁধ নির্মান শেষ হয়েছে সেদিন

হবে, অতঃপর আমরা তাদের সবাইকে[১] পুরোপুরি একত্রিত করব।

وَّعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكٰفِرِيْنَ عَرْضًا ﴿١٠٠﴾

১০০. আর সেদিন আমরা জাহান্নামকে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত করব কাফেরদের কাছে,

الَّذِيْنَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ فِيْ غِطَآءٍ عَنْ ذِكْرِيْ وَكَانُوْا لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَمْعًا ﴿١٠١﴾

১০১. যাদের চোখ ছিল অন্ধ আমার নিদর্শনের প্রতি এবং যারা শুনতেও ছিল অক্ষম।

বারতম রুকূ'

اَفَحَسِبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ يَّتَّخِذُوْا عِبَادِيْ مِنْ دُوْنِيْٓ اَوْلِيَآءَ ؕ اِنَّآ اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ نُزُلًا ﴿١٠٢﴾

১০২. যারা কুফরী করেছে তারা কি মনে করেছে যে, তারা আমার পরিবর্তে আমার বান্দাদেরকে[২] অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবে[৩]? আমরা তো

ইয়াজুজ মাজুজ বাঁধের ভিতরে পরস্পর পরস্পরের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছিল। [ফাতহুল কাদীর]

(১) فَجَمَعْنَاهُمْ এর সর্বনাম দ্বারা সাধারণ জিন ও মানবজাতিকে বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, শিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার মাধ্যমে হাশরের মাঠে সমগ্র জিন ও মানুষকে একত্রিত করা হবে। [ফাতহুল কাদীর]

(২) عِبَادِي (আমার দাস) বলে এখানে ফিরিশ্‌তা, নেককার লোক এবং সেসব নবীগণকে বোঝানো হয়েছে দুনিয়াতে যাদেরকে উপাস্য ও আল্লাহ্‌র শরীকরূপে স্থির করা হয়েছে; যেমন, উযায়ের ও ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম। কিছুসংখ্যক আরব ফিরিশ্‌তাদেরও উপাসনা করত, [ফাতহুল কাদীর] তাই আয়াতে ﴿الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا﴾ বলে কাফেরদের এসব দলকেই বোঝানো হয়েছে। কোন কোন মুফাসসির "আমার বান্দা" অর্থ সৃজিত এবং মালিকানাধীন বস্তু গ্রহণ করে একে ব্যাপকাকার করে দিয়েছেন। ফলে আগুন, মূর্তি, তারকা, এমনকি গরু ইত্যাদি মিথ্যা উপাস্যও এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। [উসাইমীন, তাফসীরুল কুরআনিল কারীম]

(৩) উদ্দেশ্য এই যে, এসব কাফেররা আমার পরিবর্তে আমার বান্দাদেরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে; তারা কি মনে করে যে, এ কাজ তাদেরকে উপকৃত করবে এবং এ দ্বারা তাদের কিছুটা কল্যাণ হবে? [ফাতহুল কাদীর] এই জিজ্ঞাসা অস্বীকারবোধক। অর্থাৎ এরূপ মনে করা ভ্রান্তি ও মূর্খতা। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ এর উত্তর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "কখনই নয়, ওরা তো তাদের 'ইবাদাত অস্বীকার করবে এবং তাদের বিরোধী হয়ে যাবে।" [সূরা মারইয়াম: ৮২]

কাফেরদের আপ্যায়নের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জাহান্নাম ।

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿١٠٣﴾

১০৩. বলুন, 'আমরা কি তোমাদেরকে এমন লোকদের কথা জানাব, যারা আমলের দিক থেকে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত(১)?'

الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١٠٤﴾

১০৪. ওরাই তারা, 'পার্থিব জীবনে যাদের প্রচেষ্টা পণ্ড হয়, যদিও তারা মনে করে যে, তারা সৎকাজই করছে,

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ﴿١٠٥﴾

১০৫. 'তারাই সেসব লোক, যারা তাদের রব-এর নিদর্শনাবলী ও তাঁর সাথে তাদের সাক্ষাতের ব্যাপারে কুফরি করেছে । ফলে তাদের সকল আমল নিষ্ফল হয়ে গেছে; সুতরাং আমরা তাদের জন্য কেয়ামতের দিন কোন ওজনের ব্যবস্থা রাখব না(২) ।

ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا ﴿١٠٦﴾

১০৬. 'জাহান্নাম, এটাই তাদের প্রতিফল, যেহেতু তারা কুফরী করেছে এবং আমার নিদর্শনাবলী ও রাসূলগণকে গ্রহণ করেছে বিদ্রূপের বিষয়স্বরূপ ।'

---

(১) এখানে প্রথম দুই আয়াত এমন ব্যক্তি ও দলকে অন্তর্ভুক্ত করেছে, যারা কোন কোন বিষয়কে সৎ মনে করে তাতে পরিশ্রম করে । কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে তাদের সে পরিশ্রম বৃথা এবং সে কর্মও নিষ্ফল । কুরতুবী বলেনঃ এ অবস্থা দু'টি কারণে সৃষ্টি হয় । (এক) ভ্রান্তবিশ্বাস এবং (দুই) লোক দেখানো মনোবৃত্তি । [কুরতুবী]

(২) অর্থাৎ তাদের আমল বাহ্যতঃ বিরাট বলে দেখা যাবে, কিন্তু হিসাবের দাঁড়িপাল্লায় তার কোন ওজন হবে না । কেননা, কুফর ও শির্কের কারণে তাদের আমল নিষ্ফল ও গুরুত্বহীন হয়ে যাবে । রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ কেয়ামতের দিন দীর্ঘদেহী স্থূলকায় ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে, আল্লাহ্‌র কাছে মাছির ডানার সমপরিমাণও তার ওজন হবে না । অতঃপর তিনি বলেনঃ যদি এর সমর্থন চাও, তবে কুরআনের এই আয়াত পাঠ কর- ﴿فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا﴾ [বুখারীঃ ৪৭২৯, মুসলিমঃ ৪৬৭৮]

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿١٠٧﴾

১০৭. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদের আতিথেয়তার জন্য রয়েছে জান্নাতুল ফিরদাউস[১]।

خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿١٠٨﴾

১০৮. সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, সেখান থেকে তারা স্থানান্তরিত হতে চাইবে না[২]।

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴿١٠٩﴾

১০৯. বলুন, 'আমার রব-এর কথা লিপিবদ্ধ করার জন্য সাগর যদি কালি হয়, তবে আমার রব-এর কথা শেষ হওয়ার আগেই সাগর নিঃশেষ হয়ে যাবে-- আমরা এর সাহায্যের জন্য এর মত আরো সাগর আনলেও[৩]।'

---

(১) فردوس এর অর্থ সবুজে ঘেরা উদ্যান। এটি আরবী শব্দ, না অনারব এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 'তোমরা যখন আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা কর, তখন জান্নাতুল ফিরদাউসের প্রার্থনা কর। কেননা, এটা জান্নাতের সর্বোৎকৃষ্ট স্তর। এর উপরেই আল্লাহ্‌র আরশ এবং এখান থেকেই জান্নাতের সব নহর প্রবাহিত হয়েছে।' [বুখারীঃ ২৭৯০, ৭৪২৩, মুসনাদে আহমাদঃ ২/৩৩৫]

(২) উদ্দেশ্য এই যে, জান্নাতের এ স্থানটি তাদের জন্য অক্ষয় ও চিরস্থায়ী নেয়ামত। যে জান্নাতে প্রবেশ করেছে, তাকে সেখান থেকে কখনো বের করা হবে না। কিন্তু এখানে একটি আশংকা ছিল এই যে, এক জায়গায় থাকতে থাকতে অতিষ্ঠ হয়ে যাওয়া মানুষের একটি স্বভাব। সে স্থান পরিবর্তনের ইচ্ছা করে। যদি জান্নাতের বাইরে কোথাও যাওয়ার অনুমতি না থাকে, তবে জান্নাতও কি খারাপ মনে হতে থাকবে?। আলোচ্য আয়াতে এর জবাব দেয়া হয়েছে যে, যে ব্যক্তি জান্নাতে যাবে, জান্নাতের নেয়ামত ও চিত্তাকর্ষক পরিবেশের সামনে দুনিয়াতে দেখা ও ব্যবহার করা বস্তুসমূহ তার কাছে নগণ্য ও তুচ্ছ মনে হবে। জান্নাত থেকে বাইরে যাওয়ার কল্পনাও কোন সময় মনে জাগবে না। অর্থাৎ তার চেয়ে আরামদায়ক কোন পরিবেশ কোথাও থাকবে না। ফলে জান্নাতের জীবন তার সাথে বিনিময় করার কোন ইচ্ছাই তাদের মনে জাগবে না। [দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(৩) অর্থাৎ যদি সাগরের পানি আল্লাহ্‌র কালেমাসমূহ লেখার কালি হয়ে যায়, তবে আল্লাহ্‌র কালেমাসমূহ শেষ হওয়ার আগেই সাগরের পানি নিঃশেষ হয়ে যাবে। যদিও এর কালি বাড়ানোর জন্য আরও সাগর এর সাথে যুক্ত করা হয়।[আদওয়াউল

قُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَيَّ أَنَّمَآ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ ۖ فَمَن كَانَ يَرْجُوا۟ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَٰلِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدًۢا ﴿١١٠﴾

১১০. বলুন, 'আমি তো তোমাদের মত একজন মানুষ, আমার প্রতি ওহী হয় যে, তোমাদের ইলাহ্ একমাত্র সত্য ইলাহ্। কাজেই যে তার রব-এর সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকাজ করে ও তার রব-এর 'ইবাদাতে কাউকেও শরীক না করে(১)।'

বায়ান] অনুরূপ অন্য স্থানেও আল্লাহ্ বলেছেন। যেমন, "আর যমীনের সব গাছ যদি কলম হয় এবং সাগর, তার পরে আরো সাত সাগর কালি হিসেবে যুক্ত হয়, তবুও আল্লাহ্র বাণী নিঃশেষ হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী, হিকমতওয়ালা।" [সূরা লুকমান: ২৭] এ আয়াতসমূহ প্রমাণ করছে যে, আল্লাহ্র কালেমাসমূহ কখনও শেষ হবে না। [আদওয়াউল বায়ান] হাদীসে এ আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ বর্ণিত হয়েছে। তা হচ্ছে, কুরাইশ সর্দাররা ইয়াহূদীদের কাছে এসে বলল, আমাদেরকে এমন কিছু দাও যা আমরা ঐ লোকটাকে প্রশ্ন করতে পারি। তারা বলল, তাকে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন কর। তারা তাকে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে নাযিল হল, ﴿وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ ۖ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ অর্থাৎ "আর আপনাকে তারা রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বলুন, 'রূহ আমার রবের আদেশঘটিত এবং তোমাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে অতি সামান্যই।" [সূরা আল-ইসরা: ৮৫] এটা শুনে ইয়াহূদীরা বলতে লাগল, আমাদেরকে তো অনেক জ্ঞান দেয়া হয়েছে। আর তা হচ্ছে তাওরাত। আর যাকে তাওরাত দেয়া হয়েছে তাকে অনেক কল্যাণ দেয়া হয়েছে। তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়। [তিরমিযী: ৩১৪০]

(১) এ আয়াতকে দ্বীনের ভিত্তি বলা হয়ে থাকে, এখানে এমন দু'টি শর্ত বর্ণনা করা হয়েছে যার উপরই সমস্ত দ্বীন নির্ভর করছে। এক, কার ইবাদত করছে দুই, কিভাবে করছে। একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করতে হবে ইখলাসের সাথে। আবার সে ইবাদত হতে হবে নেক আমলের মাধ্যমে। আর নেক আমল হবে একমাত্র রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রদর্শিত পথে আমল করলেই। মোদ্দাকথা, শির্ক ও বিদ'আত থেকে দূরে থাকার ব্যাপারে এ আয়াতে সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে।

এখানে উল্লেখিত শির্ক শব্দ দ্বারা যাবতীয় শির্কই বোঝানো হয়েছে। তন্মধ্যে কিছু কিছু শির্ক আছে যেগুলো শির্ক হওয়া অত্যন্ত স্পষ্ট তাই তা থেকে বাঁচা খুব সহজ। এর বিপরীতে কিছু কিছু শির্ক আছে যেগুলো খুব সুক্ষ্ম বা গোপন। এ সমস্ত গোপন শির্কের উদাহরণের মধ্যে আছে, সামান্য রিয়া তথা সামান্য লোক দেখানো মনোবৃত্তি। সারমর্ম এই যে, আয়াতে যাবতীয় শির্ক হতে তবে বিশেষ করে রিয়াকারীর গোপন শির্ক থেকে বারণ করা হয়েছে। আমল আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে হলেও যদি তার সাথে কোনরূপ সুখ্যাতি ও প্রভাব-প্রতিপত্তির বাসনা থাকে, তবে

তাও এক প্রকার গোপন শির্ক। এর ফলে মানুষের আমল বরবাদ এবং ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। মাহমুদ ইবনে লবীদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ 'আমি তোমাদের সম্পর্কে যে বিষয়ে সর্বাধিক আশংকা করি, তা হচ্ছে ছোট শির্ক। সাহাবায়ে কেরাম নিবেদন করলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ছোট শির্ক কি? তিনি বললেনঃ রিয়া।' [আহমাদঃ ৫/৪২৮, ৪২৯] অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, 'কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা যখন বান্দাদের কাজকর্মের প্রতিদান দেবেন, তখন রিয়াকার লোকদেরকে বলবেনঃ তোমরা তোমাদের কাজের প্রতিদান নেয়ার জন্য তাদের কাছে যাও, যাদেরকে দেখানোর উদ্দেশ্যে তোমরা কাজ করেছিলে। এরপর দেখ, তাদের কাছে তোমাদের জন্য কোন প্রতিদান আছে কি না।' কেননা, আল্লাহ্ শরীকদের শরীকানার সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী। [তিরমিযীঃ ৩১৫৪, ইবনে মাজাহ্ঃ ৪২০৩, আহমাদঃ ৪/৪৬৬, বায়হাকী শু'আবুল ঈমানঃ ৬৮১৭]
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ আমি শরীকদের সাথে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ঊর্ধ্বে। যে ব্যক্তি কোন সৎকর্ম করে এবং তাতে আমার সাথে অন্যকেও শরীক করে, আমি সেই আমল শরীকের জন্য ছেড়ে দেই। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, আমি সেই আমল থেকে মুক্ত; সে আমলকে আমি তার জন্যই করে দেই, যাকে সে আমার সাথে শরীক করেছিল। [মুসলিমঃ ২৯৮৫] আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি সুখ্যাতি লাভের জন্য সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তা'আলাও তার সাথে এমনি ব্যবহার করেন; যার ফলে সে ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত হয়ে যায়। [আহমাদঃ ২/১৬২, ১৯৫, ২১২, ২২৩] অন্য হাদীসে এসেছে, "পিঁপড়ার নিঃশব্দ গতির মতই শির্ক তোমাদের মধ্যে গোপনে অনুপ্রবেশ করে।" তিনি আরো বললেনঃ আমি তোমাদেরকে একটি উপায় বলে দিচ্ছি যা করলে তোমরা বড় শির্ক ও ছোট শির্ক (অর্থাৎ রিয়া) থেকে নিরাপদ থাকতে পারবে। তোমরা দৈনিক তিনবার এই দো'আ পাঠ করো اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَأَنَا أَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ [মুসনাদে আবু ইয়ালাঃ ১/৬০, ৬১ নং ৫৪, মাজমাউয যাওয়ায়েদঃ ১০/২২৪]

১৯- সূরা মার্‌ইয়াম[1]
৯৮ আয়াত, মক্কী

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. কাফ্-হা-ইয়া-‘আঈন-সোয়াদ[2];

كٓهٰيٰعٓصٓ ۝١

২. এটা আপনার রব-এর অনুগ্রহের বিবরণ তাঁর বান্দা যাকারিয়্যার[3] প্রতি,

ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهٗ زَكَرِيَّا ۝٢

৩. যখন তিনি তার রবকে ডেকেছিলেন নিভৃতে[4],

اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ نِدَآءً خَفِيًّا ۝٣

---

(১) আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন: বনী ইসরাইল, আল্-কাহফ, মার্‌ইয়াম, ত্বা-হা এবং আম্বিয়া এগুলো আমার সবচেয়ে প্রাচীন সম্পদ বা সর্বপ্রথম পুঁজি। [বুখারীঃ ৪৭৩৯] তাই এ সূরাসমূহের গুরুত্বই আলাদা। তন্মধ্যে সূরা মার্‌ইয়ামের গুরুত্ব আরো বেশী এদিক দিয়েও যে, এ সূরায় ঈসা আলাইহিস্‌সালাম ও তার মা সম্পর্কে স্পষ্ট বর্ণনা দেয়া হয়েছে। যা অনুধাবন করলে নাসারাদের ঈমান আনা সহজ হবে। উম্মে সালামাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বলেন: হাবশার রাজা নাজাসী জা‘ফর ইবন আবি তালিবকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তোমার কাছে তিনি (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ্‌র কাছ থেকে যা নিয়ে এসেছেন তার কিছু কি আছে? উম্মে সালামাহ বলেন, তখন জা‘ফর ইবন আবি তালিব বললেন: হ্যাঁ। নাজাসী বললেন: আমাকে তা পড়ে শোনাও। জা‘ফর ইবন আবি তালিব তখন কাফ্-হা-ইয়া-‘আইন-সাদ থেকে শুরু করে সূরার প্রথম অংশ শোনালেন। উম্মে সালামাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বলেন: আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি, এটা শোনার পর নাজাসী এমনভাবে কাঁদতে থাকল যে, তার চোখের পানিতে দাড়ি পর্যন্ত ভিজে গেল। তার দরবারের আলেমরাও কেঁদে ফেলল। তারা তাদের ধর্মীয় কিতাবসমূহ বন্ধ করে নিল। তারপর নাজাসী বলল: ‘অবশ্যই এটা এবং যা মূসা নিয়ে এসেছে সবই একই তাক থেকে বের হয়েছে।’ [মুসনাদে আহমাদ: ৫/৩৬৬-৩৬৮]

(২) এ শব্দগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা সূরা আল-বাকারার শুরুতে করা হয়েছে।

(৩) হাদীসে এসেছে, যাকারিয়্যা আলাইহিসসালাম কাঠ-মিস্ত্রির কাজ করতেন। [মুসলিম: ২৩৭৯] এতে বুঝা গেল যে, নবী-রাসূলগণ জীবিকা অর্জনের জন্য বিভিন্ন কারিগরি পেশা অবলম্বন করতেন। তারা কখনো অপরের উপর বোঝা হতেন না।

(৪) এতে জানা গেল যে, দো‘আ অনুচ্চস্বরে ও গোপনে করাই উত্তম। কাতাদা বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ পবিত্র মন জানেন এবং গোপন শব্দ শুনেন। [তাবারী] তিনি যে দো‘আ করেছিলেন তা-ই পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হচ্ছে। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ④

৪. তিনি বলেছিলেন, 'হে আমার রব! আমার অস্থি দুর্বল হয়েছে[১], বার্ধক্যে আমার মাথা শুভ্রোজ্জ্বল হয়েছে[২]; হে আমার রব! আপনাকে ডেকে আমি কখনো ব্যর্থকাম হইনি[৩] ।

وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ⑤

৫. 'আর আমি আশংকা করি আমার পর আমার স্বগোত্রীয়দের সম্পর্কে; আমার স্ত্রী বন্ধ্যা । কাজেই আপনি আপনার কাছ থেকে আমাকে দান করুন উত্তরাধিকারী,

يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ⑥

৬. 'যে আমার উত্তরাধিকারিত্ব করবে[৪]

---

(১) অস্থির দুর্বলতা উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, অস্থিই দেহের খুঁটি । অস্থির দুর্বলতা সমস্ত দেহের দুর্বলতার নামান্তর । [ফাতহুল কাদীর]

(২) اشتعل এর শাব্দিক অর্থ, প্রজ্জ্বলিত হওয়া, এখানে চুলের শুভ্রতাকে আগুনের আলোর সাথে তুলনা করে তা সমস্ত মস্তকে ছড়িয়ে পড়া বোঝানো হয়েছে ।[কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

(৩) এখানে দো'আর পূর্বে যাকারিয়্যা আলাইহিস সালাম তার দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেছেন । এর একটি কারণ এই যে, এমতাবস্থায় সন্তান না আসাই স্বাভাবিক । এখানে দ্বিতীয় কারণ এটাও যে, দো'আ করার সময় নিজের দুর্বলতা, দুর্দশা ও অভাবগ্রস্থতা উল্লেখ করা দো'আ কবুল হওয়ার পক্ষে সহায়ক । [কুরতুবী] তারপর বলছেন যে, আপনাকে ডেকে আমি কখনও ব্যর্থকাম হইনি । আপনি সবসময় আমার দো'আ কবুল করেছেন ।[কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(৪) আলেমদের মতে, এখানে উত্তরাধিকারিত্বের অর্থ নবুওয়াত-রিসালত তথা ইলমের উত্তরাধিকার । আর্থিক উত্তরাধিকারিত্ব নয় । কেননা, প্রথমতঃ যাকারিয়্যার কাছে এমন কোন অর্থ সম্পদ ছিল বলেই প্রমাণ নেই, যে কারণে চিন্তিত হবেন যে, এর উত্তরাধিকারী কে হবে ।একজন পয়গম্বরের পক্ষে এরূপ চিন্তা করাও অবান্তর ।এছাড়া যাকারিয়্যা আলাইহিসসালাম নিজে কাঠ-মিস্ত্রি ছিলেন ।নিজ হাতে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন । কাঠ-মিস্ত্রির কাজের মাধ্যমে এমন সম্পদ আহরণ করা সম্ভব হয় না যার জন্য চিন্তা করতে হয় । দ্বিতীয়ত: সাহবায়ে কেরামের ইজমা তথা ঐকমত্য সম্বলিত এক হাদীসে বলা হয়েছেঃ "নিশ্চিতই আলেমগণ পয়গম্বরগণের ওয়ারিশ । পয়গম্বরগণ কোন দীনার ও দিরহাম রেখে যান না; বরং তারা ইলম ও জ্ঞান ছেড়ে যান । যে ব্যক্তি ইল্‌ম হাসিল করে, সে বিরাট সম্পদ হাসিল করে ।"- [আবু দাউদ:

এবং উত্তরাধিকারিত্ব করবে ইয়া'কূবের বংশের[১] এবং হে আমার রব! তাকে করবেন সন্তোষভাজন'।

৭. তিনি বললেন, 'হে যাকারিয়্যা! আমরা আপনাকে এক পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছি, তার নাম হবে ইয়াহ্‌ইয়া; এ নামে আগে আমরা কারো নামকরণ[২] করিনি।'

يٰزَكَرِيَّآ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمِ ِۨاسْمُهٗ يَحْيٰى ۙ لَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ۝

৮. তিনি বললেন, 'হে আমার রব! কেমন করে আমার পুত্র হবে যখন আমার স্ত্রী বন্ধ্যা ও আমি বার্ধক্যের শেষ সীমায় উপনীত!'

قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّكَانَتِ امْرَاَتِيْ عَاقِرًا وَّقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ۝

৩৬৪১, ইবনে মাজাহ: ২২৩, তিরমিযী: ২৬৮২] তৃতীয়ত: স্বয়ং আলোচ্য আয়াতে এর ﴿يَّرِثُنِيْ وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ﴾ বাক্যের যোগ এরই প্রমাণ যে, এখানে আর্থিক উত্তরাধিকারিত্ব বোঝানো হয়নি। কেননা, যে পুত্রের জন্মলাভের জন্যে দো'আ করা হচ্ছে, তার পক্ষে ইয়াকুব আলাইহিসসালামের উত্তরাধিকার হওয়াই যুক্তিযুক্ত কিন্তু তাদের নিকটবর্তী আত্মীয়স্বজনরা যাদের উল্লেখ আয়াতে করা হয়েছে, তারা নিঃসন্দেহে আত্মীয়তায় ইয়াহ্‌ইয়া আলাইহিস সালাম থেকে অধিক নিকটবর্তী। নিকটবর্তী আত্মীয় রেখে দুরবর্তীর উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করা উত্তরাধিকার আইনের পরিপন্থী। [ইবন কাসীর]

(১) অর্থাৎ আমি কেবলমাত্র নিজের উত্তরাধিকারী চাই না বরং ইয়াকুব বংশের যাবতীয় কল্যাণের উত্তরাধিকারী চাই। সে নবী হবে যেমন তার পিতৃপুরুষরা যেভাবে নবী হয়েছে। [ইবন কাসীর]

(২) سميًّا শব্দের অর্থ সমনামও হয় এবং সমতুল্যও হয়। এখানে প্রথম অর্থ নেয়া হলে আয়াতের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট যে, তার পূর্বে ইয়াহ্‌ইয়া নামে কারও নামকরণ করা হয়নি। [তাবারী] নামের এই অনন্যতা ও অভূতপূর্বতাও কতক বিশেষ গুণে তাঁর অনন্যতার ইঙ্গিতবহ ছিল। কাতাদা রাহেমাহুল্লাহ বলেন: ইয়াহ্‌ইয়া অর্থ জীবিতকরণ, তিনি এমন এক বান্দা যাকে আল্লাহ্ ঈমানের মাধ্যমে জীবন্ত রেখেছিলেন। [তাবারী] পক্ষান্তরে যদি দ্বিতীয় অর্থ নেয়া হয় তখন উদ্দেশ্য হবে, তার মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল যা তার পূর্ববর্তী নবীগণের কারও মধ্যে ছিল না। সেসব বিশেষ গুণে তিনি তুলনাহীন ছিলেন। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] এতে জরুরী নয় যে, ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম পূর্ববর্তী নবীদের চাইতে সর্বাবস্থায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন। কেননা, তাদের মধ্যে ইবরাহীম খলীলুল্লাহ ও মূসা কলীমুল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত ও সুবিদিত।

قَالَ كَذٰلِكَ ۚ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَّقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْـًٔا ۝٩

৯. তিনি বললেন, 'এরূপই হবে।' আপনার রব বললেন, 'এটা আমার জন্য সহজ; আমি তো আগে আপনাকে সৃষ্টি করেছি যখন আপনি কিছুই ছিলেন না[১]।'

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْٓ اٰيَةً ۭ قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ۝١٠

১০. যাকারিয়্যা বললেন, 'হে আমার রব! আমাকে একটি নিদর্শন দিন।' তিনি বললেন, 'আপনার নিদর্শন এ যে, আপনি সুস্থ[২] থাকা সত্ত্বেও কারো সাথে তিন দিন কথাবার্তা বলবেন না।'

فَخَرَجَ عَلٰي قَوْمِهٖ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاَوْحٰٓى اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ۝١١

১১. তারপর তিনি ('ইবাদাতের জন্য নির্দিষ্ট) কক্ষ হতে বের হয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে আসলেন এবং ইঙ্গিতে তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে বললেন।

---

(১) অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে অস্তিত্ব প্রদান করা এটা তো মহান আল্লাহ্‌রই কাজ। তিনি ব্যতীত কেউ কি সেটা করতে পারে? তিনি যখন চাইলেন তখন বন্ধ্যা যুগলের ঘরে এমন অনন্য নাম ও গুণসম্পন্ন সন্তান প্রদান করলেন। এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা সবকিছুকেই অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে অস্তিত্বে নিয়ে আসেন। এর জন্য শুধু তাঁর ইচ্ছাই যথেষ্ট। মহান আল্লাহ্ বলেন: "মানুষ কি স্মরণ করে না যে, আমরা তাকে আগে সৃষ্টি করেছি যখন সে কিছুই ছিল না?" [সূরা মারইয়াম: ৬৭] আরও বলেন: "কালপ্রবাহে মানুষের উপর তো এমন এক সময় এসেছিল যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না।" [সূরা আল-ইনসান: ১] [দেখুন, ইবন কাসীর]

(২) سويًّا শব্দের অর্থ সুস্থ। শব্দটি একথা বোঝানোর জন্য যুক্ত করা হয়েছে যে, যাকারিয়্যা আলাইহিস সালাম এর কোন মানুষের সাথে কথা না বলার এ অবস্থাটি কোন রোগবশতঃ ছিল না। এ কারণেই আল্লাহর যিকর ও ইবাদতে তার জিহবা তিন দিনই পূর্ববৎ খোলা ছিল; বরং এ অবস্থা মু'জেযা ও গর্ভসঞ্চারের নিদর্শন স্বরূপই প্রকাশ পেয়েছিল। [ইবন কাসীর]

يٰيَحۡيٰى خُذِ الۡكِتٰبَ بِقُوَّةٍ ؕ وَاٰتَيۡنٰهُ الۡحُكۡمَ صَبِيًّا ﴿۱۲﴾

১২. 'হে ইয়াহ্ইয়া[১]! আপনি কিতাবটিকে দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ করুন।' আর আমরা তাকে শৈশবেই দান করেছিলাম প্রজ্ঞা[২]।

وَّحَنَانًا مِّنۡ لَّدُنَّا وَزَكٰوةً ؕ وَكَانَ تَقِيًّا ﴿۱۳﴾

১৩. এবং আমাদের কাছ থেকে হৃদয়ের কোমলতা[৩] ও পবিত্রতা; আর তিনি ছিলেন মুত্তাকী।

وَّبَرًّۢا بِوَالِدَيۡهِ وَلَمۡ يَكُنۡ جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿۱۴﴾

১৪. পিতা-মাতার অনুগত এবং তিনি ছিলেন না উদ্ধত ও অবাধ্য[৪]।

---

(১) মাঝখানে এই বিস্তারিত তথ্য পরিবেশিত হয়নি যে, আল্লাহর ফরমান অনুযায়ী ইয়াহ্ইয়ার জন্ম হয় এবং শৈশব থেকে তিনি যৌবনে পদার্পণ করেন। এখন বলা হচ্ছে, যখন তিনি জ্ঞানলাভের নির্দিষ্ট বয়ঃসীমায় পৌঁছেন তখন তাঁর উপর কি দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। এখানে মাত্র একটি বাক্যে নবুওয়াতের মহান মর্যাদায় অভিষিক্ত করার সময় তার উপর যে দায়িত্ব অর্পিত হয় তার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ তিনি তাওরাতকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবেন এবং বনী ইসরাঈলকে এ পথে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করবেন। আর যদি কিতাব বলে কোন সুনির্দিষ্ট সহীফা ও চিঠি সংবলিত গ্রন্থ বুঝানো হয়ে থাকে তবে তাও উদ্দেশ্য হতে পারে। [দেখুন, ইবন কাসীর]

(২) এখানে الحكم শব্দ দ্বারা জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বুঝ, দৃঢ়তা, স্থিরতা, কল্যাণমূলক কাজে অগ্রগামিতা এবং অসৎকাজ থেকে বিমুখতা বুঝানো হয়েছে। ছোট বেলা থেকেই তিনি এ সমস্ত গুণের অধিকারী ছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবন মুবারক বলেন, মা'মার বলেন: ইয়াহইয়া ইবন যাকারিয়্যাকে কিছু ছোট ছেলে-পুলে বলল যে, চল আমরা খেলতে যাই। তিনি জবাবে বললেন: খেল-তামাশা করার জন্য তো আমাদের সৃষ্টি করা হয়নি! [ইবন কাসীর]

(৩) حنان শব্দটি মমতার প্রায় সমার্থক শব্দ। আল্লাহ্ তার জন্য মায়া-মমতা ঢেলে দিয়েছিলেন। আল্লাহ্ও তাকে ভালবাসতেন তিনিও আল্লাহ্র বান্দাদেরকে ভালবাসতেন। একজন মায়ের মনে নিজের সন্তানের জন্য যে চূড়ান্ত পর্যায়ের স্নেহশীলতা থাকে, যার ভিত্তিতে সে শিশুর কষ্টে অস্থির হয়ে পড়ে, আল্লাহর বান্দাদের জন্য ইয়াহ্ইয়ার মনে এই ধরনের স্নেহ-মমতা সৃষ্টি হয়েছিল। [দেখুন, কুরতুবী; ইবন কাসীর]

(৪) তিনি আল্লাহ্র অবাধ্যতা ও পিতা-মাতার অবাধ্যতা হতে মুক্ত ছিলেন। হাদীসে এসেছে, 'কিয়ামতের দিন আদম সন্তান মাত্রই গুনাহ নিয়ে আসবে তবে ইয়াহইয়া ইবন যাকারিয়্যা এর ব্যতিক্রম।' [মুসনাদে আহমাদ: ১/২৫৪, ২৯২]

وَسَلٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوْتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴿١٥﴾

১৫. আর তার প্রতি শান্তি যেদিন তিনি জন্ম লাভ করেন, যেদিন তার মৃত্যু হবে এবং যেদিন তিনি জীবিত অবস্থায় উত্থিত হবেন[১]।

দ্বিতীয় রুকূ’

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مَرْيَمَ ۘ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ﴿١٦﴾

১৬. আর স্মরণ করুন এ কিতাবে মার্‌ইয়ামকে, যখন সে তার পরিবারবর্গ থেকে পৃথক হয়ে নিরালায় পূর্ব দিকে এক স্থানে আশ্রয় নিল[২],

فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا ۖ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴿١٧﴾

১৭. অতঃপর সে তাদের নিকট থেকে নিজেকে আড়াল করল। তখন আমরা তার কাছে আমাদের রূহকে পাঠালাম, সে তার নিকট পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল[৩]।

---

(১) সুফইয়ান ইবনে উয়াইনাহ বলেন: তিন সময় মানুষ সবচেয়ে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখিন হয়। এক. যখন সে দুনিয়াতে প্রথম আসে। কারণ সে তাকে এক ভিন্ন পরিবেশে আবিস্কার করে। দুই. যখন সে মারা যায়। কারণ সে তখন এমন এক সম্প্রদায়কে দেখে যাদেরকে দেখতে সে অভ্যস্ত নয়। তিন. হাশরের মাঠে; কারণ তখন সে নিজেকে এক ভীতিপ্রদ অবস্থায় জমায়েত দেখতে পায়। তাই ইয়াহইয়া ইবন যাকারিয়্যা আলাইহিসসালামকে এ তিন বিপর্যয়কর অবস্থার বিভিষিকা থেকে নিরাপত্তা প্রদান করেছেন। [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ পূর্বদিকের কোন নির্জন স্থানে চলে গেলেন। নির্জন স্থানে যাওয়ার কি কারণ ছিল, সে সম্পর্কে সম্ভাবনা ও উক্তি বিভিন্নরূপ বর্ণিত আছে। কেউ বলেনঃ গোসল করার জন্য পানি আনতে গিয়েছিলেন। কেউ বলেনঃ অভ্যাস অনুযায়ী ইবাদতে মশগুল হওয়ার জন্যে কক্ষের পূর্বদিকস্থ কোন নির্জন স্থানে গমন করেছিলেন। কেউ কেউ বলেনঃ এ কারণেই নাসারারা পূর্বদিককে তাদের কেবলা করেছে এবং তারা পূর্বদিকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে থাকে। [ইবন কাসীর]

(৩) এখানে ‘রূহ’ বলে জিবরাঈলকেই বোঝানো হয়েছে। [ইবন কাসীর] ফেরেশতাকে তার আসল আকৃতিতে দেখা মানুষের জন্যে সহজ নয়- এতে ভীষণ ভীতির সঞ্চার হয়। এ কারণে জিব্‌রাঈল আলাইহিসসালাম মারইয়ামের সামনে মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করেন। [ফাতহুল কাদীর] যেমন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেরা গিরি গুহায় এবং পরবর্তীকালেও এরূপ ভয়-ভীতির সম্মূখীন হয়েছিলেন।

قَالَتْ إِنِّىٓ أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَٰنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ﴿١٨﴾

১৮. মার্‌ইয়াম বলল, আমি তোমার থেকে দয়াময়ের আশ্রয় প্রার্থনা করছি (আল্লাহ্‌কে ভয় কর) যদি তুমি 'মুত্তাকী হও'[১]।

قَالَ إِنَّمَآ أَنَا۠ رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَٰمًا زَكِيًّا ﴿١٩﴾

১৯. সে বলল, 'আমি তো তোমার রব-এর দূত, তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করার জন্য[২]।'

قَالَتْ أَنَّىٰ يَكُونُ لِى غُلَٰمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِى بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴿٢٠﴾

২০. মার্‌ইয়াম বলল, 'কেমন করে আমার পুত্র হবে যখন আমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করেনি এবং আমি ব্যভিচারিণীও নই?'

قَالَ كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُۥٓ ءَايَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ﴿٢١﴾

২১. সে বলল, 'এ রূপই হবে।' তোমার রব বলেছেন, 'এটা আমার জন্য সহজ। আর আমরা তাকে এজন্যে সৃষ্টি করব যেন সে হয় মানুষের জন্য

---

(১) মারইয়াম যখন পর্দার ভেতর আগত একজন মানুষকে নিকটে দেখতে পেলেন, তখন তার উদ্দেশ্য অসৎ বলে আশংকা করলেন এবং বললেনঃ "আমি তোমার থেকে রহমানের আশ্রয় প্রার্থনা করি, যদি তুমি তাকওয়ার অধিকারী হও"। [ইবন কাসীর] এ বাক্যটি এমন, যেমন কেউ কোন যালেমের কাছে অপারগ হয়ে এভাবে ফরিয়াদ করেঃ যদি তুমি ঈমানদার হও, তবে আমার প্রতি যুলুম করো না। এ যুলুম থেকে বাধা দেয়ার জন্যে তোমার ঈমান যথেষ্ট হওয়া উচিত। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহকে ভয় করা এবং অপকর্ম থেকে বিরত থাকা তোমার জন্যে সমীচীন। [বাগভী] অথবা এর অর্থ: যদি তুমি আল্লাহ্‌র নিকট আমার আশ্রয় প্রার্থনাকে মূল্য দাও তবে আমার কাছ থেকে দূরে থাক। [তাবারী; আদওয়াউল বায়ান]

(২) সে দূত হলেন, জিবরাঈল আলাইহিস্‌সালাম। আল্লাহ্ তাঁর দূত জিবরাঈলকে পবিত্র ফুঁ নিয়ে পাঠালেন। যে ফুঁর মাধ্যমে মারইয়ামের গর্ভে এমন সন্তানের জন্ম হলো যিনি অত্যন্ত পবিত্র ও কল্যাণময় বিবেচিত হলেন। মহান আল্লাহ্ তার সম্পর্কে বলেন: "স্মরণ করুন, যখন ফিরিশতাগণ বলল, হে মার্‌ইয়াম! নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাকে তাঁর পক্ষ থেকে একটি কালেমার সুসংবাদ দিতেছেন। তার নাম মসীহ্ মার্‌ইয়াম তনয় 'ঈসা, সে দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মানিত এবং সান্নিধ্যপ্রাপ্তগণের অন্যতম হবে। সে দোলনায় থাকা অবস্থায় ও পরিণত বয়সে মানুষের সাথে কথা বলবে এবং সে হবে পুণ্যবানদের একজন।' [সূরা আলে-ইমরান: ৪৫-৪৬]

এক নিদর্শন[১] ও আমাদের কাছ থেকে এক অনুগ্রহ; এটা তো এক স্থিরীকৃত ব্যাপার।'

فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهٖ مَكَانًا قَصِيًّا ﴿٢٢﴾

২২. অতঃপর সে তাকে গর্ভে ধারণ করল এবং তা সহ দূরের এক স্থানে চলে গেল[২];

فَاَجَآءَهَا الْمَخَاضُ اِلٰى جِذْعِ النَّخْلَةِ ۚ قَالَتْ يٰلَيْتَنِىْ مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا ﴿٢٣﴾

২৩. অতঃপর প্রসব-বেদনা তাকে এক খেজুর-গাছের নিচে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল। সে বলল, 'হায়, এর আগে যদি আমি মরে যেতাম[৩] এবং

(১) এটা এমন এক নিদর্শন যা সর্বকালের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় হিসেবে নেয়া যায়। এর মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ তাঁর অপার কুদরতের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। [ফাতহুল কাদীর] তিনি আদমকে পিতা-মাতা ব্যতীত, হাওয়াকে মাতা ব্যতীত আর সমস্ত মানুষকে পিতা-মাতার মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু ঈসা আলাইহিসসালামকে সৃষ্টি করেছেন পিতা ব্যতীত। এর মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ তাঁর সব ধরনের শক্তি ও ক্ষমতা দেখিয়েছেন। তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। তার নিকট কোন কিছুই কঠিন নয়।

(২) দূরবর্তী স্থানে মানে বাইত লাহ্‌ম। [কুরতুবী] কাতাদা বলেন, পূর্বদিকে। [তাবারী] মারইয়াম আলাইহাস সালাম হঠাৎ গর্ভধারণ করলেন। এ অবস্থায় যদি তিনি নিজের ই'তিকাফের জায়গায় বসে থাকতেন এবং লোকেরা তাঁর গর্ভধারণের কথা জানতে পারতো, তাহলে শুধুমাত্র পরিবারের লোকেরাই নয়, সম্প্রদায়ের অন্যান্য লোকরাও তাঁর জীবন ধারণ কঠিন করে দিতো। তাই তিনি কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হবার পর নীরবে নিজের ই'তিকাফ কক্ষ ত্যাগ করে বাইরে বের হয়ে পড়লেন, যাতে আল্লাহর ইচ্ছা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত নিজ সম্প্রদায়ের তিরস্কার, নিন্দাবাদ ও ব্যাপক দুর্ণাম থেকে রক্ষা পান। [দেখুন, কুরতুবী; ইবন কাসীর] ঈসা আলাইহিস সালামের জন্ম যে পিতা ছাড়াই হয়েছিল এ ঘটনাটি নিজেই তার একটি বিরাট প্রমাণ। যদি তিনি বিবাহিত হতেন এবং স্বামীর ঔরসে সন্তান জন্মলাভের ব্যাপার হতো তাহলে তো সন্তান প্রসবের জন্য তাঁর শ্বশুরালয়ে বা পিতৃগৃহে না গিয়ে একাকী একটি দূরবর্তী স্থানে চলে যাওয়ার কোন কারণই ছিল না। সুতরাং নাসারাদের মিথ্যাচার এখানে স্পষ্ট। তারা তাকে বিবাহিত বানিয়ে চাড়ছে।

(৩) বিপদের কারণে মৃত্যু কামনা নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "তোমাদের কেউ যেন বিপদে পড়ে অধৈর্য হয়ে মৃত্যু কামনা না করে"

মানুষের স্মৃতি থেকে সম্পূর্ণ হারিয়ে যেতাম!'

২৪. তখন ফিরিশ্‌তা তার নিচ থেকে ডেকে তাকে বলল, 'তুমি পেরেশান হয়ো না[১], তোমার পাদদেশে তোমার রব এক নহর সৃষ্টি করেছেন[২];

فَنَادٰىهَا مِنۡ تَحۡتِهَاۤ اَلَّا تَحۡزَنِیۡ قَدۡ جَعَلَ رَبُّكِ تَحۡتَكِ سَرِیًّا ﴿۲۴﴾

২৫. 'আর তুমি তোমার দিকে খেজুর-গাছের কাণ্ডে নাড়া দাও, সেটা তোমার উপর তাজা-পাকা খেজুর ফেলবে।

وَهُزِّیۡۤ اِلَیۡكِ بِجِذۡعِ النَّخۡلَةِ تُسٰقِطۡ عَلَیۡكِ رُطَبًا جَنِیًّا ﴿۲۵﴾

২৬. 'কাজেই খাও, পান কর এবং চোখ জুড়াও। অতঃপর মানুষের মধ্যে কাউকেও যদি তুমি দেখ তখন বলো, 'আমি দয়াময়ের উদ্দেশ্যে মৌনতা

فَكُلِیۡ وَاشۡرَبِیۡ وَقَرِّیۡ عَیۡنًا ۚ فَاِمَّا تَرَیِنَّ مِنَ الۡبَشَرِ اَحَدًا ۙ فَقُوۡلِیۡۤ اِنِّیۡ نَذَرۡتُ لِلرَّحۡمٰنِ صَوۡمًا فَلَنۡ اُكَلِّمَ الۡیَوۡمَ اِنۡسِیًّا ﴿ۚ۲۶﴾

[বুখারীঃ ৫৯৮৯, মুসলিমঃ ২৬৮০, ২৬৮১, আবুদাউদঃ ৩১০৮] সম্ভবত: মারইয়াম ধর্মের দিক চিন্তা করে মৃত্যু কামনা করেছিলেন। অর্থাৎ মানুষ দুর্নাম রটাবে এবং সম্ভবতঃ এর মোকাবেলায় আমি ধৈর্যধারণ করতে পারব না, ফলে অধৈর্য হওয়ার গোনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ব। মৃত্যু হলেও গোনাহ থেকে বেঁচে যেতাম, তাই এখানে মৃত্যু কামনা মূল উদ্দেশ্য নয়, গোনাহ থেকে বাঁচাই উদ্দেশ্য। [দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(১) এখানে কে মারইয়াম আলাইহাসসালামকে ডেকেছিল তা নিয়ে দু'টি মত রয়েছে। এক. তাকে ফেরেশতা জিবরীলই ডেকেছিলেন। তখন 'তার নীচ থেকে' এর অর্থ হবে, গাছের নীচ থেকে। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] দুই. কোন কোন মুফাসসির বলেছেন: তাকে তার সন্তানই ডেকেছিলেন। তখন এটিই হবে ঈসা আলাইহিসসালামের প্রথম কথা বলা। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] কোন কোন কেরাআতে ﴿مَنۡ تَحۡتَهَاۤ﴾ ('যে তার নীচে আছে') পড়া হয়েছে। যা শেষোক্ত অর্থের সমর্থন করে। তবে অধিকাংশ মুফাসসির প্রথম অর্থটিকেই গুরুত্বসহকারে বর্ণনা করেছেন।

(২) এর আভিধানিক অর্থ ছোট নহর। [ইবন কাসীর] এ ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা তাঁর কুদরত দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে একটি ছোট নহর জারী করে দেন [ফাতহুল কাদীর] অথবা সেখানে একটি মৃত নহর ছিল। আল্লাহ্ সেটাকে পানি দ্বারা পূর্ণ করে দেন। [ফাতহুল কাদীর]

অবলম্বনের মানত করেছি[১]। কাজেই আজ আমি কিছুতেই কোন মানুষের সাথে কথাবার্তা বলব না।[২]’

২৭. তারপর সে সন্তানকে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে উপস্থিত হল; তারা বলল, ‘হে মার্‌ইয়াম! তুমি তো এক অঘটন করে বসেছ[৩]।

فَأَتَتْ بِهِۦ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُۥ ۖ قَالُوا۟ يَـٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْـًۭٔا فَرِيًّۭا ﴿٢٧﴾

২৮. ‘হে হারূনের বোন[৪]! তোমার পিতা

يَـٰٓأُخْتَ هَـٰرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمْرَأَ سَوْءٍۢ وَمَا كَانَتْ

(১) কাতাদাহ বলেন, তিনি খাবার, পানীয় ও কথা-বার্তা এ তিনটি বিষয় থেকেই সাওম পালন করেছিলেন। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(২) কোন কোন মুফাসসির বলেন, ইসলাম পূর্বকালে সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত মৌনতা অবলম্বন করা এবং কারও সাথে কথা না বলার সাওম পালন ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। [ইবন কাসীর] ইসলাম একে রহিত করে মন্দ কথাবার্তা, গালিগালাজ, মিথ্যা, পরনিন্দা ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকাকেই জরুরী করে দিয়েছে। সাধারণ কথাবার্তা ত্যাগ করা ইসলামে কোন ইবাদত নয়। তাই এর মানত করাও জায়েয নয়। এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ “সন্তান সাবালক হওয়ার পর পিতা মারা গেলে তাকে এতীম বলা হবে না এবং সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মৌনতা অবলম্বন করা কোন ইবাদত নয়।” [আবু দাউদঃ ২৮৭৩]

(৩) فَرِيًّا আরবী ভাষায় এ শব্দটির আসল অর্থ, কর্তন করা ও চিরে ফেলা। যে কাজ কিংবা বস্তু প্রকাশ পেলে অসাধারণ কাটাকাটি হয় তাকে فرى বলা হয়। [কুরতুবী] উপরে সেটাকেই ‘অঘটন’ অনুবাদ করা হয়েছে। শব্দটির অন্য অর্থ হচ্ছে, বড় বিষয় বা বড় ব্যাপার। [ইবন কাসীর]

(৪) মুসা আলাইহিস সালাম-এর ভাই ও সহচর হারূন আলাইহিস সালাম মারইয়ামের আমলের শত শত বছর পুর্বে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। এখানে মারইয়ামকে হারূন-ভগ্নি বলা বাহ্যিক অর্থের দিক দিয়ে শুদ্ধ হতে পারে না। মুগীরা ইবনে শো‘বা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজরানবাসীদের কাছে প্রেরণ করেন, তখন তারা প্রশ্ন করে যে, তোমাদের কুরআনে মারইয়ামকে হারূন-ভগিনী বলা হয়েছে। অথচ মুগীরা এ প্রশ্নের উত্তর জানতেন না। ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে ঘটনা ব্যক্ত করলে তিনি বললেনঃ তুমি বলে দিলে না কেন যে, বনী ইসরাঈলগণ নবীদের নামে নাম রাখা পছন্দ করতেন” [মুসলিমঃ ২১৩৫, তিরমিযীঃ ৩১৫৫] এই হাদীসের উদ্দেশ্য দু’রকম হতে পারে। (এক) মারইয়াম হারূন আলাইহিস সালাম এর বংশধর ছিলেন বলেই তাঁর সাথে সম্বন্ধ করা হয়েছে- যদিও তাদের মধ্যে সময়ের অনেক ব্যবধান

أُمُّكِ بَغِيًّا ﴿٢٨﴾

অসৎ ব্যক্তি ছিল না এবং তোমার মাও ছিল না ব্যভিচারিণী(১) ।'

فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ۖ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿٢٩﴾

২৯. তখন মার্‌ইয়াম সন্তানের প্রতি ইংগিত করল। তারা বলল, 'যে কোলের শিশু তার সাথে আমরা কেমন করে কথা বলব?'

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴿٣٠﴾

৩০. তিনি বললেন, 'আমি তো আল্লাহ্‌র বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন, আমাকে নবী করেছেন,

وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿٣١﴾

৩১. 'যেখানেই আমি থাকি না কেন তিনি আমাকে বরকতময়(২) করেছেন, তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যতদিন জীবিত থাকি ততদিন সালাত ও

রয়েছে; যেমন আরবদের রীতি রয়েছে যেমন তারা তামীম গোত্রের ব্যক্তিকে أخا تميم এবং আরবের লোককে أخا العرب বলে অভিহিত করে। [ইবন কাসীর] (দুই) এখানে হারূন বলে মুসা আলাইহিস সালাম -এর সহচর হারূন নবীকে বোঝানো হয়নি বরং মারইয়ামের কোন এক জ্ঞাতি ভ্রাতার নামও ছিল হারূন যিনি তৎকালিন সময়ে প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং এ নাম হারূন নবীর নামানুসারে রাখা হয়েছিল। এভাবে মারইয়াম হারুন-ভগিনী বলা সত্যিকার অর্থেই শুদ্ধ। [দেখুন, কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(১) কুরআনের এই বাক্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের সন্তান-সন্ততি মন্দ কাজ করলে তাতে সাধারণ লোকদের মন্দ কাজের তুলনায় বেশী গোনাহ্ হয়। কারণ, এতে তাদের বড়দের লাঞ্ছনা ও দুর্নাম হয়। কাজেই সম্মানিত লোকদের সন্তানদের উচিত সৎকাজ ও আল্লাহভীতিতে অধিক মনোনিবেশ করা। গোনাহ ও অপরাধ থেকে দূরে থাকা। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

(২) এখানে বরকতের মূল কথা হচ্ছে, আল্লাহ্‌র দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখা। কারও কারও মতে, বরকত অর্থ, সম্মান ও প্রতিপত্তিতে বৃদ্ধি। অর্থাৎ আল্লাহ্ আমার সব বিষয়ে প্রবৃদ্ধি ও সফলতা দিয়েছেন। কারও কারও মতে, বরকত অর্থ, মানুষের জন্য কল্যাণকর হওয়া। কেউ কেউ বলেন, কল্যাণের শিক্ষক। কারও কারও মতে, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ। [ফাতহুল কাদীর] বস্তুত: ঈসা আলাইহিস সালামের পক্ষে সবগুলো অর্থই সম্ভব।

যাকাত আদায় করতে[১]-

৩২. 'আর আমাকে আমার মায়ের প্রতি অনুগত করেছেন এবং তিনি আমাকে করেননি উদ্ধত, হতভাগ্য;

وَّبَرًّۢا بِوَالِدَتِيْ وَلَمْ يَجْعَلْنِيْ جَبَّارًا شَقِيًّا ۝٣٢

৩৩. 'আমার প্রতি শান্তি যেদিন আমি জন্ম লাভ করেছি[২], যেদিন আমার মৃত্যু হবে এবং যেদিন জীবিত অবস্থায় আমি উত্থিত হব।'

وَالسَّلٰمُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُّ وَيَوْمَ اَمُوْتُ وَيَوْمَ اُبْعَثُ حَيًّا ۝٣٣

৩৪. এ-ই মার্‌ইয়াম-এর পুত্র 'ঈসা। আমি বললাম সত্য কথা, যে বিষয়ে তারা সন্দেহ পোষণ করছে[৩]।

ذٰلِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِيْ فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ ۝٣٤

৩৫. আল্লাহ্ এমন নন যে, কোন সন্তান গ্রহণ করবেন, তিনি পবিত্র মহিমাময়।

مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ وَّلَدٍ ۙ سُبْحٰنَهٗ ۚ اِذَا

(১) তাকিদ সহকারে কোন কোন কাজের নির্দেশ দেয়া হলে তাকে أوصى শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়। ঈসা আলাইহিস সালাম এখানে বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে সালাত ও যাকাতের ওসিয়ত করেছেন। তাই এর অর্থ এই যে, খুব তাগিদ সহকারে আল্লাহ্ আমাকে উভয় কাজের নির্দেশ দিয়েছেন। ইমাম মালেক রাহেমাহুল্লাহ্ এ আয়াতের অন্য অর্থ করেছেন। তিনি বলেন, এর অর্থ, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে মৃত্যু পর্যন্ত যা হবে তা জানিয়ে দিয়েছেন। যারা তাকদীরকে অস্বীকার করে তাদের জন্য এ কথা অনেক বড় আঘাত। [ইবন কাসীর]

(২) জন্মের সময় আমাকে শয়তান স্পর্শ করতে পারে নি। সুতরাং আমি নিরাপদ ছিলাম। অনুরূপভাবে মৃত্যুর সময় ও পুনরুত্থানের সময়ও আমাকে পথভ্রষ্ট করতে পারবে না। অথবা আয়াতের অর্থ, সালাম ও সম্ভাষণ জানানো। [ফাতহুল কাদীর] ইবন কাসীর বলেন, এর মাধ্যমে তার বান্দা হওয়ার ঘোষণা দেয়া হচ্ছে। তিনি জানাচ্ছেন যে, তিনি আল্লাহ্‌র সৃষ্ট বান্দাদের মধ্য হতে একজন। অন্যান্য সৃষ্টির মত জীবন ও মৃত্যুর অধীন। অনুরূপভাবে অন্যদের মত তিনিও পুনরুত্থিত হবেন। তবে তার জন্য এ কঠিন তিনটি অবস্থাতেই নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। [ইবন কাসীর]

(৩) ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে নাসারারা তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনে বাড়াবাড়ি করে 'আল্লাহ্‌র পুত্র' বানিয়ে দেয়। পক্ষান্তরে ইহুদীরা তার অবমাননায় এতটুকু ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে যে তাকে জারজ সন্তান বলে আখ্যায়িত করে (নাউযুবিল্লাহ)। আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে উভয় প্রকার ভ্রান্ত লোকদের ভ্রান্তি বর্ণনা করে তাকে সঠিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। [দেখুন, ইবন কাসীর]

قَضٰٓى اَمۡرًا فَاِنَّمَا يَقُوۡلُ لَهٗ كُنۡ فَيَكُوۡنُ ؕ﴿۳۵﴾

তিনি যখন কিছু স্থির করেন, তখন সেটার জন্য বলেন, 'হও' তাতেই তা হয়ে যায়।

وَاِنَّ اللّٰهَ رَبِّىۡ وَرَبُّكُمۡ فَاعۡبُدُوۡهُ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسۡتَقِيۡمٌ﴿۳۶﴾

৩৬. আর নিশ্চয় আল্লাহ্ আমার রব ও তোমাদের রব; কাজেই তোমরা তাঁর 'ইবাদাত কর, এটাই সরল পথ[১]।

فَاخۡتَلَفَ الۡاَحۡزَابُ مِنۡۢ بَيۡنِهِمۡ ۚ فَوَيۡلٌ لِّلَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا مِنۡ مَّشۡهَدِ يَوۡمٍ عَظِيۡمٍ﴿۳۷﴾

৩৭. অতঃপর দলগুলো নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করল[২], কাজেই দুর্ভোগ কাফেরদের জন্য মহাদিবস প্রত্যক্ষকালে[৩]।

(১) এখানে জানানো হয়েছে যে, ঈসা আলাইহিস সালামের দাওয়াতও তাই ছিল যা অন্য নবীগণ এনেছিলেন। তিনি এছাড়া আর কিছুই শিখাননি যে কেবলমাত্র এক আল্লাহর ইবাদত তথা দাসত্ব করতে হবে। সুতরাং নবীদের সবার দাওয়াতী মিশন একটাই। আর তা হচ্ছে, তার ও অন্যান্য সবার রব। এভাবে তিনি বনী ইসরাঈলকে আল্লাহ্‌র ইবাদতের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন। [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ নাসারাগণ ঈসা আলাইহিসসালামের ব্যাপারে বিভিন্ন মত ও পথে বিভক্ত হয়ে গেল। তাদের মধ্যে কেউ বলল, তিনি জারজ সন্তান। তাদের উপর আল্লাহ্‌র লা'নত হোক। তারা বলল যে, তার বাণীসমূহ জাদু। অপর দল বলল, তিনি আল্লাহ্‌র পুত্র। আরেকদল বলল, তিনি তিনজনের একজন। অন্যরা বলল, তিনি আল্লাহ্‌র বান্দা ও রাসূল। এটাই হচ্ছে সত্য ও সঠিক কথা, আল্লাহ্ যেটার প্রতি মুমিনদেরকে হেদায়াত করেছেন। [ইবন কাসীর]

(৩) এ হচ্ছে যারা আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যারোপ করে তাঁর জন্য সন্তান সাব্যস্ত করে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদের জন্য সুস্পষ্ট ভীতি-প্রদর্শন। তিনি ইচ্ছে করলে দুনিয়াতেই তাৎক্ষনিক তাদেরকে পাকড়াও করতে পারতেন কিন্তু তিনি তাদেরকে কিছু সময় অবকাশ দিয়ে তাওবাহ ও ইস্তেগফারের সুযোগ দিয়ে সংশোধনের সুযোগ দিতে চান। কিন্তু তারা তাদের কর্মকাণ্ড থেকে বিরত না হলে তিনি অবশ্যই তাদেরকে পাকড়াও করবেন। [ইবন কাসীর] হাদীসে এসেছে, 'আল্লাহ্ যালেমকে ছাড় দিতেই থাকেন তারপর যখন তাকে পাকড়াও করেন তখন তার আর পালাবার কোন পথ অবশিষ্ট থাকে না।' [বুখারী:৪৬৮৬, মুসলিম:২৫৮৩] আর ঐ ব্যক্তির চেয়ে বড় যালেম আর কে হতে পারে যে, মহান আল্লাহ্‌র জন্য সন্তান ও পরিবার সাব্যস্ত করে? হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 'কষ্টদায়ক কিছু শুনার পরে আল্লাহ্‌র চেয়ে বেশী ধৈর্যশীল আর কেউ নেই, তারা তাঁর জন্য সন্তান সাব্যস্ত করছে অথচ তিনি তাদেরকে জীবিকা ও নিরাপত্তা দিয়েই যাচ্ছেন।' [বুখারী:

أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَٰكِنِ الظَّٰلِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٣٨﴾

৩৮. তারা যেদিন আমাদের কাছে আসবে সেদিন তারা কত চমৎকার শুনবে ও দেখবে[(১)]! কিন্তু যালেমরা আজ স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে।

وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي

৩৯. আর তাদেরকে সতর্ক করে দিন পরিতাপের দিন[(২)] সম্বন্ধে, যখন

৬০৯৯, মুসলিম: ২৮০৪] পক্ষান্তরে যারা এর বিপরীত কাজ করবে তাদের জন্য উত্তম পুরস্কার রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 'কেউ যদি এ সাক্ষ্য দেয় যে, একমাত্র আল্লাহ্ যার কোন শরীক নেই তিনি ব্যতীত হক কোন মা'বুদ নেই, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল, ঈসাও আল্লাহ্‌র বান্দা, রাসূল ও এমন এক বাণী যা তিনি মারইয়ামের কাছে ঢেলে দিয়েছিলেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে প্রেরিত একটি আত্মা। আর এও সাক্ষ্য দেয় যে, জান্নাত বাস্তব, জাহান্নাম বাস্তব। আল্লাহ্ তাকে তার আমল কম-বেশ যা-ই থাকুক না কেন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। [বুখারী: ৩৪৩৫, মুসলিম: ২৮]

(১) দুনিয়াতে কাফের ও মুশরিকরা দেখেও দেখে না শুনেও শুনে না। কিন্তু হাশরের দিন তারা সবচেয়ে ভাল দেখতে পাবে, বেশী শুনতে পাবে। [ইবন কাসীর] অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মুখ থেকেই এ কথা বের করে এনেছেন। আল্লাহ্ বলেন: 'হায়, আপনি যদি দেখতেন! যখন অপরাধীরা তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে অধোবদন হয়ে বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা দেখলাম ও শুনলাম, এখন আপনি আমাদেরকে আবার পাঠিয়ে দিন, আমরা সৎকাজ করব, আমরা তো দৃঢ় বিশ্বাসী।' [সূরা আস-সাজদাহ:১২]

(২) কেয়ামতের দিবসকে পরিতাপের দিবস বলা হয়েছে। কারণ, জাহান্নামীরা সেদিন পরিতাপ করবে যে, তারা ঈমানদার ও সৎকর্মপরায়ণ হলে জান্নাত লাভ করত; কিন্তু এখন তাদের জাহান্নামের আযাব ভোগ করতে হচ্ছে। পক্ষান্তরে বিশেষ এক প্রকার পরিতাপ জান্নাতীদেরও হবে। যেমন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "কোন এক দল মানুষ যখন কোন বৈঠকে বসবে তারপর আল্লাহ্‌র যিকর এবং রাসূলের উপর দরুদ পাঠ করা ব্যতীত যদি সে মজলিস শেষ হয় তবে কিয়ামতের দিন সেটা তাদের জন্য আফসোসের কারণ হিসেবে দেখা দিবে"। [তিরমিযী: ৩৩৮০] অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "জান্নাতীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশের পর মৃত্যুকে একটি ছাগলের রূপে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে হাজির করা হবে। তারপর বলা হবে, হে জান্নাতীরা তোমরা কি এটাকে চেন? তারা ঘাড় উচিয়ে দেখবে এবং বলবে: হ্যাঁ, এটা হলো মৃত্যু। তারপর জাহান্নামীদের বলা হবে, তোমরা কি এটাকে চেন? তারাও মাথা উঁচু করে দেখবে এবং বলবে: হ্যাঁ, এটা হলো মৃত্যু। তখন সেটাকে

غَفْلَةٍ وَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٣٩﴾

সব সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে। অথচ তারা রয়েছে গাফলতিতে নিমজ্জিত এবং তারা ঈমান আনছে না।

إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُوْنَ ﴿٤٠﴾

৪০. নিশ্চয় যমীন ও তার উপর যারা আছে তাদের চূড়ান্ত মালিকানা আমাদেরই রইবে এবং আমাদেরই কাছে তারা প্রত্যাবর্তিত হবে(১)।

তৃতীয় রুকূ'

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ إِبْرٰهِيْمَ ۬ إِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا

৪১. আর স্মরণ করুন এ কিতাবে ইব্‌রাহীমকে(২); তিনি তো ছিলেন এক

জবাই করার নির্দেশ দেয়া হবে এবং বলা হবে: হে জান্নাতীরা! চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান কর আর কোন মৃত্যু নেই।! হে জাহান্নামীরা! চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করবে আর কোন মৃত্যু নেই।" তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরোক্ত: ﴿وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ﴾ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন এবং তার হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে বললেন: "দুনিয়াদারগণ দুনিয়ার গাফিলতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত"। [বুখারী: ৪৭৩০, মুসলিম: ২৮৪৯]

(১) এ আয়াতে মহান আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন যমীন ও এতে যা আছে সবকিছুরই চূড়ান্ত ওয়ারিশ তিনিই হবেন। এর অর্থ, যমীনের জীবিত সবাইকে তিনি মৃত্যু দিবেন। তারপরই সমস্ত কিছুর মালিক তিনিই হবেন, যেমনটি তিনি পূর্বে মালিক ছিলেন। কারণ তিনিই কেবল অবশিষ্ট থাকবেন। [ইবন কাসীর] কিয়ামতের দিন আবার সবাই তাঁর নিকটই ফিরে আসতে হবে। মহান আল্লাহ্ অন্যত্র বলেছেন: "ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে সবকিছুই নশ্বর,অবিনশ্বর শুধু আপনার প্রতিপালকের সত্তা, যিনি মহিমাময়, মহানুভব।" [সূরা আর রহমান: ২৬-২৭] আরও বলেন: "আমিই জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই এবং আমিই চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী।" [সূরা আল-হিজর: ২৩]

(২) এখান থেকে মক্কাবাসীদেরকে সম্বোধন করে কথা বলা হচ্ছে। তারা তাদেরকে যুবক পুত্র, ভাই ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনদেরকে ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের অপরাধে গৃহত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল যেমন ইবরাহীমকে তার বাপ-ভাইয়েরা দেশ থেকে বের করে দিয়েছিল। কুরাইশ বংশের লোকেরা ইবরাহীমকে নিজেদের নেতা বলে মানতো এবং তাঁর আওলাদ হবার কারণে সারা আরবে গর্ব করে বেড়াতো, একারণে অন্য নবীদের কথা বাদ দিয়ে বিশেষ করে ইবরাহীমের কথা বলার জন্য এখানে নির্বাচিত করা হয়েছে। [দেখুন, ইবন কাসীর]

نَّبِيًّا ۝

সত্যনিষ্ঠ[১], নবী।

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَٰٓأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِى عَنكَ شَيْـًٔا ۝

৪২. যখন তিনি তার পিতাকে বললেন, 'হে আমার পিতা! আপনি তার 'ইবাদাত করেন কেন যে শুনে না, দেখে না এবং আপনার কোন কাজেই আসে না?'

يَٰٓأَبَتِ إِنِّى قَدْ جَآءَنِى مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِىٓ أَهْدِكَ صِرَٰطًا سَوِيًّا ۝

৪৩. 'হে আমার পিতা! আমার কাছে তো এসেছে জ্ঞান যা আপনার কাছে আসেনি; কাজেই আমার অনুসরণ করুন, আমি আপনাকে সঠিক পথ দেখাব।

يَٰٓأَبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَٰنَ ۖ إِنَّ ٱلشَّيْطَٰنَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ

৪৪. 'হে আমার পিতা! শয়তানের 'ইবাদাত করবেন না[২]। শয়তান তো দয়াময়ের

---

(১) صديق 'সিদ্দীক' শব্দটি কুরআনের একটি পারিভাষিক শব্দ। এর অর্থ সত্যবাদী বা সত্যনিষ্ঠ। [ফাতহুল কাদীর] শব্দটির সংজ্ঞা সম্পর্কে আলেমদের উক্তি বিভিন্নরূপ। কেউ বলেনঃ যে ব্যক্তি সারা জীবনে কখনও মিথ্যা কথা বলেননি, তিনি সিদ্দীক। কেউ বলেনঃ যে ব্যক্তি বিশ্বাস এবং কথা ও কর্মে সত্যবাদী, অর্থাৎ অন্তরে যেরূপ বিশ্বাস পোষণ করে, মুখে ঠিক তদ্রূপ প্রকাশ করে এবং তার প্রত্যেক কর্ম ও উঠা বসা এই বিশ্বাসেরই প্রতীক হয়, সে সিদ্দীক। [কুরতুবী, সূরা আন-নিসা: ৬৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ] সিদ্দীকের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। নবী-রাসূলগণ সবাই সিদ্দীক। কিন্তু সমস্ত সিদ্দীকই নবী ও রাসূল হবেন এমনটি জরুরী নয়, বরং নবী নয়- এমন ব্যক্তি যদি নবী ও রাসূলের অনুসরণ করে সিদ্দীকের স্তর অর্জন করতে পারেন, তবে তিনিও সিদ্দীক বলে অভিহিত হবেন। মারইয়ামকে আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে স্বয়ং সিদ্দীকাহ নামে অভিহিত করেছেন। তিনি নবী নন। কোন নারী নবী হতে পারেন না।

(২) বলা হচ্ছে, "শয়তানের ইবাদাত করবেন না।" যদিও ইবরাহীমের পিতা এবং তার জাতির অন্যান্য লোকেরা মূর্তি পূজা করতো কিন্তু যেহেতু তারা শয়তানের আনুগত্য করছিল তাই ইবরাহীম তাদের এ শয়তানের আনুগত্যকেও শয়তানের ইবাদাত গণ্য করেন। আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়, আপনি এ মূর্তিগুলোর ইবাদাত করার মাধ্যমে তার আনুগত্য করবেন না। কেননা, সেই তো এগুলোর ইবাদাতের প্রতি মানুষদেরকে আহ্বান জানায় এবং এতে সে সন্তুষ্ট। [ইবন কাসীর] বস্তুত: শয়তান কোন কালেও মানুষের মাবুদ (প্রচলিত অর্থে) ছিল না বরং তার নামে প্রতি যুগে মানুষ অভিশাপ বর্ষণ করেছে। তবে বর্তমানে মিশর, ইরাক, সিরিয়া, লেবাননসহ বিভিন্ন আরব ও ইউরোপীয় রাষ্ট্রে শয়তানের ইবাদতকারী 'ইয়াযীদিয়্যাহ' ফের্কা নামে একটি দলের

عَصِيًّا ۝٤٤

অবাধ্য।

يَٰٓأَبَتِ إِنِّيٓ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحۡمَٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيۡطَٰنِ وَلِيًّا ۝٤٥

৪৫. 'হে আমার পিতা! নিশ্চয় আমি আশংকা করছি যে, আপনাকে দয়াময়ের শাস্তি স্পর্শ করবে, তখন আপনি হয়ে পড়বেন শয়তানের বন্ধু।'

قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنۡ ءَالِهَتِي يَٰٓإِبۡرَٰهِيمُۖ لَئِن لَّمۡ تَنتَهِ لَأَرۡجُمَنَّكَۖ وَٱهۡجُرۡنِي مَلِيًّا ۝٤٦

৪৬. পিতা বলল, 'হে ইব্‌রাহীম! তুমি কি আমার উপাস্যদের থেকে বিমুখ? যদি তুমি বিরত না হও তবে অবশ্যই আমি পাথরের আঘাতে তোমার প্রাণ নাশ করব; আর তুমি চিরতরে আমাকে ত্যাগ করে চলে যাও।'

قَالَ سَلَٰمٌ عَلَيۡكَۖ سَأَسۡتَغۡفِرُ لَكَ رَبِّيٓۖ إِنَّهُۥ كَانَ بِي حَفِيًّا ۝٤٧

৪৭. ইব্‌রাহীম বললেন, 'আপনার প্রতি সালাম[১]। আমি আমার রব-এর কাছে আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব[২], নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি

সন্ধান পাওয়া যায়, যারা শয়তানের কাল্পনিক প্রতিকৃতি স্থাপন করে তার ইবাদাত করে।

(১) ইব্‌রাহীম আলাইহিসসালাম أَبَتِ বলে মিষ্ট ভাষায় পিতাকে সম্বোধন করেছিলেন। কিন্তু আযর তাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার হুমকি এবং বাড়ী থেকে বের হয়ে যাওয়ার আদেশ জারি করে দিল। তখন ইবরাহীম আলাইহিসসালাম বললেনঃ سَلَامٌ عَلَيْكَ এখানে سلام শব্দটি অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে, বয়কটের সালাম অর্থাৎ কারও সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার ভদ্রজনোচিত পন্থা হচ্ছে কথার উত্তর না দিয়ে সালাম বলে পৃথক হয়ে যাওয়া। পবিত্র কুরআন আল্লাহর প্রিয় ও সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের প্রশংসায় বলেঃ "মূর্খরা যখন তাদের সাথে মূর্খসুলভ তর্কবিতর্কে প্রবৃত্ত হয়, তখন তারা তাদের মোকাবেলা করার পরিবর্তে সালাম শব্দ বলে দেন।" [সূরা আল-ফুরকান: ৬৯] অথবা এর উদ্দেশ্য এই যে, বিরুদ্ধাচরণ সত্ত্বেও আমি আপনার কোন ক্ষতি করব না। [ফাতহুল কাদীর]

(২) কোন কাফেরের জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা শরী'আতের আইনে নিষিদ্ধ ও নাজায়েয। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার চাচা আবু তালেবকে বলেছিলেনঃ 'আল্লাহর কসম, আমি আপনার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকব, যে পর্যন্ত না আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাকে নিষেধ করে দেয়া হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নাযিল হয়: "নবী ও ঈমানদারদের পক্ষে মুশরেকদের

খুবই অনুগ্রহশীল ।

৪৮. 'আর আমি তোমাদের থেকে ও তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া যাদের 'ইবাদাত কর তাদের থেকে পৃথক হচ্ছি; আর আমি আমার রবকে ডাকছি; আশা করি, আমার রবকে ডেকে আমি দূর্ভাগা হব না ।'

وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴿٤٨﴾

৪৯. অতঃপর তিনি যখন তাদের থেকে ও তারা আল্লাহ্ ছাড়া যাদের 'ইবাদাত করত সেসব থেকে পৃথক হয়ে গেলেন, তখন আমরা তাকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়া'কূব এবং প্রত্যেককে

فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴿٤٩﴾

জন্যে ইস্তেগফার করা বৈধ নয় ।" [সূরা আত-তাওবাহঃ ১১৩] এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাচার জন্যে ইস্তেগফার ত্যাগ করেন । ইবরাহীম আলাইহিসসালাম কর্তৃক তার পিতার জন্য ক্ষমা চাওয়ার উত্তর এই যে, ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ওয়াদা "আপনার জন্যে আমার প্রভুর কাছে ইস্তেগফার করব" এটা নিষেধাজ্ঞার পূর্বেকার ঘটনা । নিষেধ পরে করা হয় । তারপর তিনি তার পিতার জন্য সুপারিশ করা পরিত্যাগ করেছিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ "ইব্‌রাহীম তার পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল, তাকে এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বলে; তারপর যখন এটা তার কাছে সুস্পষ্ট হল যে, সে আল্লাহ্‌র শত্রু তখন ইব্‌রাহীম তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন । ইব্‌রাহীম তো কোমল হৃদয় ও সহনশীল ।" [সূরা আত-তাওবাহঃ ১১৪] তারপরও ইবরাহীম আলাইহিসসালাম হাশরের মাঠে যখন তার পিতাকে কুৎসিত অবস্থায় দেখবেন তখন তার জন্য কোন দো'আ বা সুপারিশ করবেন না । এ ব্যাপারে হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "হাশরের মাঠে ইবরাহীম আলাইহিসসালাম তার পিতাকে দেখে বলবেন, হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে আজকের দিনে অপমান থেকে রক্ষা করার ওয়াদা করেছেন । আমার পিতার অপমানের চেয়ে বড় অপমান আর কি হতে পারে? আল্লাহ্ তা'আলা বলবেনঃ "আমি কাফেরদের জন্য জান্নাত হারাম করেছি ।" তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তখন তাকে তার পায়ের নীচে তাকাবার নির্দেশ দিবেন । তিনি তাকিয়ে একটি মৃত দুর্গন্ধযুক্ত পঁচা জানোয়ার দেখতে পাবেন, ফলে তিনি তার জন্য সুপারিশ না করেই তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন । [বুখারীঃ ৩১৭২, ৪৪৯০, ৪৪৯১]

নবী করলাম[১]।

৫০. এবং তাদেরকে আমরা দান করলাম আমাদের অনুগ্রহ, আর তাদের নাম-যশ সমুচ্চ করলাম।

وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ۝٥٠

চতুর্থ রুকূ'

৫১. আর স্মরণ করুন এ কিতাবে মূসাকে, তিনি ছিলেন বিশেষ মনোনীত[২] এবং তিনি ছিলেন রাসূল, নবী।

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ ۚ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ۝٥١

৫২. আর তাকে আমরা ডেকেছিলাম তূর পর্বতের ডান দিক থেকে[৩] এবং

وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ

(১) পূর্ববর্তী বাক্যে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর উক্তি বর্ণিত হয়েছে যে, আমি আশা করি, আমার পালনকর্তার কাছে দো'আ করে আমি বঞ্চিত ও বিফল মনোরথ হব না। বাহ্যতঃ এখানে গৃহ ও পরিবারবর্গ ত্যাগ করার পর নিঃসঙ্গতার আতঙ্ক ইত্যাদি থেকে আত্মরক্ষার দো'আ বোঝানো হয়েছিল। আলোচ্য বাক্যে এই দো'আ কবুল করার কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যখন আল্লাহর জন্য নিজ গৃহ, পরিবারবর্গ ও তাদের দেব-দেবীকে পরিহার করলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে পুত্র ইসহাক দান করলেন। এই পুত্র যে দীর্ঘায়ু ও সন্তানের পিতা হয়েছিলেন তাও 'ইয়াকুব' (পৌত্র) শব্দ যোগ করে বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। পুত্র দান থেকে বোঝা যায় যে, ইতিপূর্বে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বিবাহ করেছিলেন। কাজেই আয়াতের সারমর্ম এই দাঁড়াল যে আল্লাহ তা'আলা তাকে পিতার পরিবারের চাইতে উত্তম একটি স্বতন্ত্র পরিবার দান করলেন, যা নবী ও সৎকর্মপরায়ণ মহাপুরুষদের সমন্বয়ে গঠিত ছিল। [দেখুন, ইবন কাসীর, ফাতহুল কাদীর]

(২) مُخْلَصًا এর মানে হচ্ছে, "বিশেষভাবে মনোনিত করা, একান্ত করে নেয়া।" [ইবন কাসীর] অনুরূপভাবে মানুষের মধ্যে সে ব্যক্তি মুখলিস যে ব্যক্তি একান্তভাবে আল্লাহর জন্য আমল করে, মানুষ এর প্রশংসা করুক এটা চায় না। [ইবন কাসীর] মূসা আলাইহিসসালাম এ ধরনের বিশেষ গুণে বিশেষিত থাকায় মহান আল্লাহ তাকে তার কাজের পুরস্কারস্বরূপ একান্তভাবে নিজের করে নিয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলা যে ব্যক্তিকে নিজের জন্যে খাঁটি করে নেন তিনি পরম সৌভাগ্যবান ব্যক্তি। নবীগণই বিশেষভাবে এ গুণে গুণান্বিত হন, যেমন- কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছেঃ "আমি তাদেরকে (নবীদেরকে) আখেরাতের স্মরণ করা কাজের জন্যে একান্ত করে নিয়েছি।" [সূরা ছোয়াদঃ ৪৬]

(৩) এই সুপ্রসিদ্ধ পাহাড়টি সিরিয়া, মিসর ও মাদইয়ানের মধ্যস্থলে অবস্থিত। বর্তমানেও

نَجِيًّا ﴿٥٢﴾

আমরা অন্তরঙ্গ আলাপে তাকে নৈকট্য দান করেছিলাম।

وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ﴿٥٣﴾

৫৩. আর আমরা নিজ অনুগ্রহে তাকে দিলাম তার ভাই হারূনকে নবীরূপে।

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ﴿٥٤﴾

৫৪. আর স্মরণ করুন এ কিতাবে ইসমাঈলকে, তিনি তো ছিলেন প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী[১] এবং তিনি ছিলেন রাসূল, নবী;

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ

৫৫. তিনি তার পরিজনবর্গকে সালাত ও যাকাতের নির্দেশ দিতেন[২] এবং তিনি

পাহাড়টি এ নামেই প্রসিদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা একেও অনেক বিষয়ে বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য দান করেছেন। তুর পাহাড়ের ডানদিকে মুসা আলাইহিস সালামের দিক দিয়ে বলা হয়েছে। কেননা, তিনি মাদইয়ান থেকে রওয়ানা হয়েছিলেন। তুর পাহাড়ের বিপরীত দিকে পৌঁছার পর তুর পাহাড় তার ডান দিকে ছিল। [দেখুন,ফাতহুল কাদীর]

(১) ওয়াদা পালনে ইসমাঈল আলাইহিস সালামের স্বাতন্ত্র্যের কারণ এই যে, তিনি আল্লাহর সাথে কিংবা কোন বান্দার সাথে যে বিষয়ের ওয়াদা করেছেন, অবিচল নিষ্ঠা ও যত্ন সহকারে তা পালন করেছেন। তিনি আল্লাহর সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, নিজেকে জবাই এর জন্যে পেশ করে দেবেন এবং তজ্জন্যে সবর করবেন। তিনি এ ওয়াদায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। [ইবন কাসীর] একবার তিনি জনৈক ব্যক্তির সাথে একস্থানে সাক্ষাতের ওয়াদা করেছিলেন কিন্তু লোকটি সময়মত আগমন না করায় সেখানে অনেক দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকেন। [ফাতহুল কাদীর]

(২) ইসমাইল আলাইহিস সালামের আরও একটি বিশেষ গুণ এই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি নিজ পরিবার পরিজনকে সালাত ও যাকাতের নির্দেশ দিতেন। কুরআনে সাধারণ মুসলিমদেরকে বলা হয়েছেঃ "তোমরা নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবারবর্গকে অগ্নি থেকে রক্ষা কর।"[সূরা আত-তাহরীম:৬] এ ব্যাপারে ইসমাঈল 'আলাইহিস সালাম বিশেষ গুরুত্ব সহকারে ও সর্বপ্রযত্নে চেষ্টিত ছিলেন। তিনি চাননি তার পরিবারের লাকেরা জাহান্নামে প্রবেশ করুক। এ ব্যাপারে তিনি কোন ছাড় দেন নি। [ইবন কাসীর] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: 'আল্লাহ্ ঐ পুরুষকে রহমত করুন যিনি রাতে সালাত আদায়ের জন্য জাগ্রত হলো এবং তার স্ত্রীকে জাগালো তারপর যদি স্ত্রী জাগতে গড়িমসি করে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দিল। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ ঐ মহিলাকে রহমত করুন যিনি রাতে সালাত আদায়ের জন্য জাগ্রত হলো এবং তার স্বামীকে জাগালো তারপর যদি স্বামী জাগতে গড়িমসি

رَبِّهٖ مَرۡضِيًّا ﴿٥٥﴾

ছিলেন তার রব-এর সন্তোষভাজন।

وَاذۡكُرۡ فِى الۡكِتٰبِ اِدۡرِيۡسَ ۫ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيۡقًا نَّبِيًّا ﴿٥٦﴾

৫৬. আর স্মরণ করুন এ কিতাবে ইদ্‌রীসকে, তিনি ছিলেন সত্যনিষ্ঠ নবী;

وَّرَفَعۡنٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿٥٧﴾

৫৭. আর আমরা তাকে উন্নীত করেছিলাম উচ্চ মর্যাদায়[১]।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيۡنَ اَنۡعَمَ اللّٰهُ عَلَيۡهِمۡ مِّنَ النَّبِيّٖنَ مِنۡ ذُرِّيَّةِ اٰدَمَ ۗ وَمِمَّنۡ حَمَلۡنَا مَعَ نُوۡحٍ ۫ وَّمِنۡ ذُرِّيَّةِ اِبۡرٰهِيۡمَ وَاِسۡرَآءِيۡلَ ۫ وَمِمَّنۡ هَدَيۡنَا وَاجۡتَبَيۡنَا ؕ اِذَا تُتۡلٰى عَلَيۡهِمۡ اٰيٰتُ الرَّحۡمٰنِ خَرُّوۡا سُجَّدًا وَّبُكِيًّا ﴿٥٨﴾

৫৮. এরাই তারা, নবীদের মধ্যে আল্লাহ্ যাদেরকে অনুগ্রহ করেছেন, আদমের বংশ থেকে এবং যাদেরকে আমরা নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম। আর ইব্‌রাহীম ও ইসরাঈলের বংশোদ্ভূত, আর যাদেরকে আমরা হেদায়াত দিয়েছিলাম এবং মনোনীত করেছিলাম; তাদের কাছে দয়াময়ের আয়াত তিলাওয়াত করা

করে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দিল।' [আবু দাউদ:১৩০৮, ইবন মাজাহ:১৩৩৬] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 'যদি কোন লোক রাতে জাগ্রত হয়ে তার স্ত্রীকে জাগিয়ে দু'রাকাত সালাত আদায় করে তাহলে তারা দু'জনের নাম অধিক হারে আল্লাহ্‌র যিকরকারী পুরুষ ও যিকরকারিনী মহিলাদের মধ্যে লিখা হবে।' [আবু দাউদ:১৩০৯, ইবন মাজাহ:১৩৩৫]

(১) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ইদরীস আলাইহিস সালামকে উচ্চ মর্তবায় সমুন্নত করেছেন। উদ্দেশ্য এই যে, তাকে উচ্চ স্থান তথা আকাশে অবস্থান করার ব্যবস্থা করেছি। [ইবন কাসীর] হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 'যখন আমাকে আকাশে উঠানো হয়েছিল মি'রাজের রাত্রিতে আমি ইদরীসকে চতুর্থ আসমানে দেখেছি।' [তিরমিযী: ৩১৫৭] কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, ইদরীস আলাইহিস সালামকে জীবিত অবস্থায় আকাশে তুলে নেয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে ইবনে কাসীর বলেনঃ এটা কা'ব আল-আহবারের ইসরাঈলী বর্ণনা। এটা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে গ্রহণযোগ্য বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয়নি। কাজেই আকাশে জীবিত অবস্থায় তুলে নেয়ার বিষয়টি স্বীকৃত নয়। আয়াতের অন্য অর্থ হচ্ছে, তাকে উঁচু স্থান জান্নাতে দেয়া হয়েছে। অথবা তাকে নবুওয়াত ও রিসালাত দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর]

হলে তারা লুটিয়ে পড়ত সিজ্‌দায়[১] এবং কান্নায়[২]।

৫৯. তাদের পরে আসল অযোগ্য উত্তরসূরীরা[৩], তারা সালাত নষ্ট করল[৪]

فَخَلَفَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ أَضَاعُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ

(১) অন্য আয়াতেও বলা হয়েছে, "বলুন, 'তোমরা কুরআনে বিশ্বাস কর বা বিশ্বাস না কর, যাদেরকে এর আগে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তাদের কাছে যখন এটা পড়া হয় তখনই তারা সিজ্‌দায় লুটিয়ে পড়ে।' তারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক পবিত্র, মহান। আমাদের প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি কার্যকর হয়েই থাকে। 'এবং তারা কাঁদতে কাঁদতে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে এবং এটা তাদের বিনয় বৃদ্ধি করে।' [সূরা আল-ইসরা: ১০৭-১০৯]

(২) এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, কুরআনের আয়াত তেলাওয়াতের সময় কান্নার অবস্থা সৃষ্টি হওয়া প্রশংসনীয় এবং নবীদের সুন্নত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন ও সৎকর্মশীলদের থেকে এ ধরনের বহু ঘটনা বর্ণিত আছে। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার এ সূরা পড়ে সিজদা করলেন এবং বললেন, সিজদা তো হলো, কিন্তু ক্রন্দন কোথায়! [ইবন কাসীর]

(৩) خلف শব্দে লামের সাকিন যোগে এ শব্দটির অর্থ মন্দ উত্তরসূরী, মন্দ সন্তান-সন্ততি এবং লামের যবর যোগে এর অর্থ হয় উত্তম উত্তরসূরী এবং উত্তম সন্তান-সন্ততি। এখানে সাকিনযুক্ত হওয়ায় এর অর্থ হচ্ছে: খারাপ উত্তরসূরী। [ফাতহুল কাদীর] এদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 'ষাট বছরের পর থেকে খারাপ উত্তরসূরীদের আবির্ভাব হবে, যারা সালাত বিনষ্ট করবে, প্রবৃত্তির অনুসরণ করবে, তারা অচিরেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে জাহান্নামে নিপতিত হবে। তারপর এমন কিছু উত্তরসূরী আসবে যারা কুরআন পড়বে অথচ তা তাদের কণ্ঠনালীর নিম্নভাগে যাবে না। আর কুরআন পাঠকারীরা তিন শ্রেণীর হবে: মুমিন, মুনাফিক এবং পাপিষ্ঠ। বর্ণনাকারী বশীর বলেন: আমি ওয়ালিদকে এ তিন শ্রেণী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন: কুরআন পাঠকারী হবে অথচ সে এর উপর কুফরকারী, পাপিষ্ঠ কুরআন পাঠকারী হবে যে এর দ্বারা নিজের রুটি-রোজগারের ব্যবস্থা করবে আর ঈমানদার কুরআন পাঠকারী হবে যে এর উপর ঈমান আনবে'। [মুসনাদে আহমাদ:৩/৩৮, সহীহ ইবন হিব্বান: ৩/৩২, ৭৫৫]

(৪) মুজাহিদ বলেন: কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে যখন সৎকর্মপরায়ণ লোকদের অস্তিত্ব থাকবে না, তখন এরূপ ঘটনা ঘটবে। তখন সালাতের প্রতি কেউ ভ্রুক্ষেপ করবে না এবং প্রকাশ্যে পাপাচার অনুষ্ঠিত হবে। এ আয়াতে 'সালাত নষ্ট করা' বলে বিশিষ্ট তফসীরবিদদের মতে, অসময়ে সালাত পড়া বোঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন: সময়সহ সালাতের আদব ও শর্তসমূহের মধ্যে কোনটিতে ত্রুটি করা সালাত নষ্ট করার শামিল, আবার কারও কারও মতে 'সালাত নষ্ট করা' বলে জামা'আত ছাড়া নিজে

এবং কুপ্রবৃত্তির[1] অনুবর্তী হল । কাজেই | وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿٥٩﴾

গৃহে সালাত পড়া বোঝানো হয়েছে । [ইবন কাসীর] খলীফা ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু সকল সরকারী কর্মচারীদের কাছে এই নির্দেশনামা লিখে প্রেরণ করেছিলেনঃ 'আমার কাছে তোমাদের সব কাজের মধ্যে সালাত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ । অতএব যে ব্যক্তি সালাত নষ্ট করে সে দ্বীনের অন্যান্য বিধি-বিধান আরও বেশী নষ্ট করবে । [মুয়াত্তা মালেকঃ ৬] তদ্রূপ হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে সালাতের আদব ও রোকন ঠিকমত পালন করছে না । তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি কবে থেকে এভাবে সালাত আদায় করছ? লোকটি বললঃ চল্লিশ বছর ধরে । হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেনঃ "তুমি একটি সালাতও পড়নি । যদি এ ধরনের সালাত পড়েই তুমি মারা যাও, তবে মনে রেখো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত আদর্শের বিপরীতে তোমার মৃত্যু হবে ।" [নাসায়ীঃ ৩/৫৮, সহীহ ইব্‌ন হিব্বানঃ১৮৯৪] অনুরূপভাবে অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "ঐ ব্যক্তির সালাত হয় না, যে সালাতে 'একামত' করে না ।" অর্থাৎ যে ব্যক্তি রুকু ও সেজদায়, রুকু থেকে দাঁড়িয়ে অথবা দুই সেজদার মধ্যস্থলে সোজা দাঁড়ানো অথবা সোজা হয়ে বসাকে গুরুত্ব দেয় না, তার সালাত হয় না । [তিরমিযীঃ ২৬৫] মোটকথাঃ সালাত আদায় ত্যাগ করা অথবা সালাত থেকে গাফেল ও বেপরোয়া হয়ে যাওয়া প্রত্যেক উম্মতের পতন ও ধ্বংসের প্রথম পদক্ষেপ । সালাত আল্লাহর সাথে মু'মিনের প্রথম ও প্রধানতম জীবন্ত ও কার্যকর সম্পর্ক জুড়ে রাখে । এ সম্পর্ক তাকে আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের কেন্দ্র বিন্দু থেকে বিচ্যুত হতে দেয় না । এ বাঁধন ছিন্ন হবার সাথে সাথেই মানুষ আল্লাহ থেকে দূরে বহুদূরে চলে যায় । এমনকি কার্যকর সম্পর্ক খতম হয়ে গিয়ে মানসিক সম্পর্কেরও অবসান ঘটে । তাই আল্লাহ একটি সাধারণ নিয়ম হিসেবে এখানে একথাটি বর্ণনা করেছেন যে, পূর্ববর্তী সকল উম্মতের বিকৃতি শুরু হয়েছে সালাত নষ্ট করার পর । হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 'বান্দা ও শির্কের মধ্যে সীমারেখা হলো সালাত ছেড়ে দেয়া' [মুসলিম:৮২] আরও বলেছেন: 'আমাদের এবং কাফেরদের মধ্যে একমাত্র সালাতই হচ্ছে পার্থক্যকারী বিষয়, (তাদের কাছ থেকে এরই অঙ্গীকার নিতে হবে) সুতরাং যে কেউ সালাত পরিত্যাগ করল সে কুফরী করল' । [তিরমিযী:২৬২১]

(১) 'কুপ্রবৃত্তি' বলতে বুঝায় এমন কাজ যা মানুষের মন চায়, মনের ইচ্ছানুরুপ হয় এবং যা থেকে সে তাকওয়া অবলম্বন করে না । যেমন হাদীসে এসেছে, "জান্নাত ঘিরে আছে অপছন্দনীয় বিষয়াদিতে, আর জাহান্নাম ঘিরে আছে কুপ্রবৃত্তির চাহিদায়" [মুসলিম: ২৮২২] অনুরূপভাবে এখানেও 'কুপ্রবৃত্তি' বলে দুনিয়ার সেসব আকর্ষণকে বোঝানো হয়েছে, যেগুলো মানুষকে আল্লাহর স্মরণ ও সালাত থেকে গাফেল করে দেয় । আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ বিলাসবহুল গৃহ নির্মাণ, পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণকারী যানবাহনে আরোহণ এবং সাধারণ লোকদের থেকে স্বাতন্ত্র্যমূলক পোশাক আয়াতে উল্লেখিত কুপ্রবৃত্তির অন্তর্ভুক্ত । [কুরতুবী]

অচিরেই তারা ক্ষতিগ্রস্ততার[১] সম্মুখীন হবে।

৬০. কিন্তু তারা নয়---যারা তাওবা করেছে, ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে। তারা তো জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর তাদের প্রতি কোন যুলুম করা হবে না।

إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَأُو۟لَٰٓئِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْـًٔا ۝٦٠

৬১. এটা স্থায়ী জান্নাত, যে গায়েবী প্রতিশ্রুতি দয়াময় তাঁর বান্দাদেরকে দিয়েছেন[২]। নিশ্চয় তাঁর প্রতিশ্রুত বিষয় আসবেই।

جَنَّٰتِ عَدْنٍ ٱلَّتِى وَعَدَ ٱلرَّحْمَٰنُ عِبَادَهُۥ بِٱلْغَيْبِ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ وَعْدُهُۥ مَأْتِيًّا ۝٦١

৬২. সেখানে তারা 'সালাম' তথা শান্তি ছাড়া কোন অসার বাক্য শুনবে না[৩] এবং সেখানে সকাল-সন্ধ্যা তাদের

لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَٰمًا ۖ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ۝٦٢

(১) আরবী ভাষায় غي শব্দটি رشد এর বিপরীত। প্রত্যেক কল্যাণকর বিষয়কে رشد বলা হয়। অপরদিকে প্রত্যেক অকল্যাণকর ও ক্ষতিকর বিষয়কে غي বলা হয়। [ফাতহুল কাদীর] আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেনঃ 'গাই' জাহান্নামের এমন একটি গর্তের নাম যাতে সমগ্র জাহান্নামের চাইতে অধিক আযাবের সমাবেশ রয়েছে। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ 'গাই' জাহান্নামের এমন একটি গুহা জাহান্নামও এর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে। [দেখুন, কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(২) অর্থাৎ যার প্রতিশ্রুতি করুণাময় আল্লাহ্ তাদেরকে এমন অবস্থায় দিয়েছেন যখন ঐ জান্নাতসমূহ তাদের দৃষ্টির অগোচরে রয়েছে। সেটা একমাত্র গায়েবী ব্যাপার। [ইবন কাসীর]

(৩) لغو বলে অনর্থক ও অসার কথাবার্তা গালিগালাজ একং পীড়াদায়ক বাক্যালাপ বোঝানো হয়েছে। যেমন দুনিয়াতে কখনও কখনও মানুষ এটা শুনে থাকে। [ইবন কাসীর] জান্নাতবাসিগণ এ থেকে পবিত্র থাকবে। কোনরূপ কষ্টদায়ক কথা তাদের কানে ধ্বনিত হবেনা। অন্য আয়াতে এসেছে, "সেখানে তারা শুনবে না কোন অসার বা পাপবাক্য, 'সালাম' আর 'সালাম' বাণী ছাড়া।" [সূরা আল-ওয়াকি'আহ:২৫-২৬] জান্নাতীগণ একে অপরকে সালাম করবে এবং আল্লাহর ফেরেশতাগণ তাদের সবাইকে সালাম করবে। তারা দোষ-ক্রটিমুক্ত হবে। জান্নাতে মানুষ যে সমস্ত নিয়ামত লাভ করবে তার মধ্যে একটি বড় নিয়ামত হবে এই যে, সেখানে কোন আজেবাজে, অর্থহীন ও কটূ কথা শোনা যাবে না। তারা শুধু তা-ই শুনবে যা তাদেরকে শান্তি দেয়। [ফাতহুল কাদীর]

জন্য থাকবে তাদের রিযিক ।(১)

৬৩. এ সে জান্নাত, যার অধিকারী করব আমরা আমাদের বান্দাদের মধ্যে মুত্তাকীদেরকে(২) ।

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ﴿٦٣﴾

(১) জান্নাতে সুর্যোদয়, সুর্যাস্ত এবং দিন ও রাত্রির অস্তিত্ব থাকবে না । সদা সর্বদা একই প্রকার আলো থাকবে । কিন্তু বিশেষ পদ্ধতিতে দিন, রাত্রি ও সকাল সন্ধ্যার পার্থক্য সূচিত হবে । এই রকম সকাল-সন্ধ্যায় জান্নাতবাসীরা তাদের জীবনোপকরণ লাভ করবে । [ফাতহুল কাদীর] একথা সুস্পষ্ট যে, জান্নাতিগণ যখন যে বস্তু কামনা করবে, তখনই কালবিলম্ব না করে তা পেশ করা হবে । এমতাবস্থায় মানুষের অভ্যাস ও স্বভাবের ভিত্তিতে সকাল-সন্ধ্যার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে । মানুষ সকাল-সন্ধ্যায় আহারে অভ্যস্ত । আরবরা বলেঃ যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যার পূর্ণ আহার্য যোগাড় করতে পারে, সে সুখী ও স্বাচ্ছন্দশীল । হাদীসে এসেছে, ‘শহীদগণ জান্নাতের দরজায় নালাসমূহের উৎপত্তিস্থলে সবুজ গম্বুজে অবস্থানরত রয়েছে, তাদের নিকট জান্নাত থেকে সকাল-বিকাল খাবার যায়’ [মুসনাদে আহমাদ: ১/২৬৬] অন্য হাদীসে এসেছে, ‘প্রথম দলটি যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের রূপ হবে চৌদ্দ তারিখের রাতের চাঁদের রূপ । সেখানে তারা থুথু ফেলবে না, শর্দি-কাশি ফেলবে না, পায়খানা-পেশাব করবে না । তাদের প্লেট হবে স্বর্ণ ও রৌপ্যের, তাদের সুগন্ধি কাঠ হবে ভারতীয় উদ কাঠের, তাদের ঘাম হবে মিশকের । তাদের প্রত্যেকের জন্য থাকবে দু’জন করে স্ত্রী, যাদের সৌন্দর্য এমন হবে যে, গোস্তের ভিতর থেকেও হাঁড়ের ভিতরের মজ্জা দেখা যাবে । মতবিরোধ থাকবে না, থাকবেনা ঝগড়া-হিংসা হানাহানি, তাদের সবার অন্তর এক রকম হবে । সকাল বিকাল তারা আল্লাহ্‌র তাসবীহ পাঠ করবে ।” [বুখারী: ৩২৪৫] কোন কোন তফসীরবিদ বলেনঃ আয়াতে সকাল-সন্ধ্যা বলে ব্যাপক সময় বোঝানো হয়েছে, যেমন দিবারাত্রি ও পূর্ব-পশ্চিম শব্দগুলোও ব্যাপক অর্থে বলা হয়ে থাকে । কাজেই আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, জান্নাতীদের খায়েশ অনুযায়ী তাদের খাদ্য সদাসর্বদা উপস্থিত থাকবে । [ইবন কাসীর]

(২) তাকওয়ার অধিকারীদের জন্যই জান্নাত, তারাই জান্নাতের ওয়ারিশ হবে একথা এখানে যেমন বলা হয়েছে কুরআনের অন্যত্রও তা বলা হয়েছে, সূরা আল-মুমিনূনের প্রারম্ভে মুমিনদের গুণাগুণ বর্ণনা করে শেষে বলা হয়েছে: ‘তারাই হবে অধিকারী---অধিকারী হবে ফিরদাওসের যাতে তারা স্থায়ী হবে । [১০-১১] আরো এসেছে, ‘তোমরা তীব্র গতিতে চল নিজেদের প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে এবং সে জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃতি আকাশ ও পৃথিবীর সমান, যা প্রস্তুত রাখা হয়েছে মুত্তকীদের জন্য । [সূরা আলে ইমরান: ১৩৩] অন্যত্র বলা হয়েছে, ‘আর যারা তাদের প্রতিপালকের তাকওয়া অবলম্বন করত তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে ।’ [সূরা আয-যুমার: ৭৩]

وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَٰلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٦٤﴾

৬৪. 'আর আমরা আপনার রব-এর আদেশ ছাড়া অবতরণ করি না[১]; যা আমাদের সামনে ও পিছনে আছে ও যা এ দু'য়ের অন্তর্বর্তী তা তাঁরই। আর আপনার রব বিস্মৃত হন না[২]।'

رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴿٦٥﴾

৬৫. তিনি আসমানসমূহ, যমীন ও তাদের অন্তর্বর্তী যা কিছু আছে, সে সবের রব। কাজেই তাঁরই 'ইবাদাত করুন এবং

(১) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সাহাবীগণ অত্যন্ত দুর্ভাবনা ও দুশ্চিন্তার মধ্যে সময় অতিবাহিত করছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবীগণ সর্বক্ষণ অহীর অপেক্ষা করতেন। এর সাহায্যে তারা নিজেদের পথের দিশা পেতেন এবং মানসিক প্রশান্তি ও সান্ত্বনাও লাভ করতেন। অহীর আগমনে যতই বিলম্ব হচ্ছিল ততই তাদের অস্থিরতা বেড়ে যাচ্ছিল। এ অবস্থায় জিবরীল আলাইহিস সালাম ফেরেশতাদের সাহচর্যে আগমন করলেন। হাদীসে এসেছে, 'রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরীলকে বললেন: আপনি আমাদের নিকট আরো অধিকহারে আসতে বাধা কোথায়? তখন এ আয়াত নাযিল হয়। [বুখারী: ৪৭৩১] একথা ক'টির মধ্যে রয়েছে এত দীর্ঘকাল জিবরীলের নিজের গরহাজির থাকার ওজর, আল্লাহর পক্ষ থেকে সান্ত্বনাবাণী এবং এ সংগে সবর ও সংযম অবলম্বন করার উপদেশ ও পরামর্শ।

(২) বলা হয়েছে, আপনার রব বিস্মৃত হবার নয়। তিনি ভুলে যান না। জিবরীল বেশী বেশী নাযিল হলেই যে আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে ভুলেননি বা তার বান্দাদের জন্য বিধান দেয়ার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ আসবে নইলে নয় ব্যাপারটি এরূপ নয়। [ফাতহুল কাদীর] মহান আল্লাহ্ তার ওয়াদা পূর্ণ করবেন। তার দ্বীনকে পরিপূর্ণ করবেন এবং তার রাসূল ও ঈমানদারদেরকে রক্ষা করবেন এটাই মূল কথা। তিনি কোন কিছুই ভুলে যান না। সুতরাং তাড়াহুড়ো বা জিবরীলকে না দেখে অস্থির হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 'আল্লাহ্ তাঁর কিতাবে যা হালাল করেছেন তা হালাল আর যা হারাম করেছেন তা হারাম। যে সমস্ত ব্যাপারে চুপ থেকেছেন কোন কিছু জানাননি সেগুলো নিরাপদ। সুতরাং সে সমস্ত নিরাপদ বিষয় তোমরা গ্রহণ করতে পার; কেননা আল্লাহ্ ভুলে যাওয়া কিংবা বিস্মৃত হওয়ার মত গুণে গুণান্বিত নন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত আয়াত তেলাওয়াত করলেন' [মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৩৭৫] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা হালাল বা হারাম ঘোষণা করেছেন সেগুলোও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই। কারণ, রাসূল নিজ থেকে কিছুই করেননি। শরী'আতের প্রতিটি কর্মকাণ্ড আল্লাহ্‌র নির্দেশেই তিনি প্রবর্তন করেছেন।

তাঁর 'ইবাদাতে ধৈর্যশীল থাকুন[১]। আপনি কি তাঁর সমনামগুণসম্পন্ন কাউকেও জানেন[২]?

পঞ্চম রুকূ'

৬৬. আর মানুষ বলে, 'আমার মৃত্যু হলে আমি কি জীবিত অবস্থায় উত্থিত হব?'

وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ﴿٦٦﴾

৬৭. মানুষ কি স্মরণ করে না যে, আমরা তাকে আগে সৃষ্টি করেছি যখন সে

أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ

(১) اصطبار শব্দের অর্থ পরিশ্রম ও কষ্টের কাজে দৃঢ় থাকা। [ফাতহুল কাদীর] এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইবাদাতের স্থায়িত্ব পরিশ্রম সাপেক্ষ। ইবাদাতকারীর এ জন্যে প্রস্তুত থাকা উচিত। আয়াতের অর্থ এই দাঁড়ায়, তাঁর আদেশ ও নিষেধ সবরের সাথে পালন করুন। [বাগভী]

(২) মূলে سميًّا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, "সমনাম"। এটা আশ্চর্যের বিষয় বটে, মুশরিক ও প্রতিমা পূজারীরা যদিও ইবাদতে আল্লাহ তা'আলার সাথে অনেক মানুষ, ফেরেশতা, পাথর ও প্রতিমাকে অংশীদার করেছিল এবং তাদেরকে 'ইলাহ' তথা উপাস্য বলত; কিন্তু কেউ কোনদিন কোন মিথ্যা উপাস্যের নাম আল্লাহ রাখেনি। এ জন্যেই বলা হচ্ছে যে, কেউ কি আল্লাহ্ ছাড়া অপর কাউকে এ নামে ডেকেছে? [বাগভী] সৃষ্টিগত ও নিয়ন্ত্রণগত ব্যবস্থাধীনেই দুনিয়াতে কোন মিথ্যা উপাস্য আল্লাহ নামে অভিহিত হয়নি। তাই এই প্রসিদ্ধ অর্থের দিক দিয়েও আয়াতের বিষয়বস্তু সুস্পষ্ট যে, দুনিয়াতে আল্লাহর কোন সমনাম নেই। মুজাহিদ, সা'ঈদ ইবন্ জুবায়ের, কাতাদাহ, ইবনে আব্বাস প্রমুখ তফসীরবিদ থেকে এ স্থলে سميًّا শব্দের অর্থ অনুরূপ সদৃশ বর্ণিত রয়েছে। এর উদ্দেশ্য এই যে, নাম ও গুণাবলীতে আল্লাহ তা'আলার সমতুল্য, সমকক্ষ কেউ নেই। [ইবন কাসীর] অর্থাৎ তিনি হচ্ছেন আল্লাহ, তোমাদের জানা মতে দ্বিতীয় কোন আল্লাহ্ আছে কি? যদি না থাকে এবং তোমরা জানো যে নেই, তাহলে তোমাদের জন্য তাঁরই বন্দেগী করা এবং তাঁরই হুকুমের দাস হয়ে থাকা ছাড়া অন্য কোন পথ থাকে কি? তোমরা তাঁর জন্য নির্দিষ্ট কোন নাম ও গুণ অন্যকে দিও না। সৃষ্টিজগতের কোন নাম-গুণও তাঁর জন্য সাব্যস্ত করো না। সুন্দর সুন্দর নাম ও গুণগুলো তো তাঁরই জন্য। তিনিই এসব গুণে গুণান্বিত হওয়ার বেশী হকদার। যাদের কোন গুণ নেই, কাজ নেই, যাদের নামের বাস্তবতাও নেই তারা নিজেরাও অস্তিত্বহীন হওয়াটাই বেশী যুক্তিযুক্ত। [ইবনুল কাইয়্যেম, আস-সাওয়া'য়িকুল মুরসালাহ: ৩/১০২৮]

شَيْـًٔا ﴿٦٧﴾

কিছুই ছিল না[১]?

فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيٰطِيْنَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ﴿٦٨﴾

৬৮. কাজেই শপথ আপনার রব-এর! আমরা তো তাদেরকে ও শয়তানদেরকে একত্রে সমবেত করবই[২] তারপর

(১) কাফের মুশরিকদের ভ্রান্তির মূল হলো, পুনরুত্থানে অস্বীকার। তারা মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত হবে এ ধরনের বিশ্বাস কেউ করলে আশ্চার্যবোধ করত। অন্যত্র মহান আল্লাহ্ বলেন: "যদি আপনি বিস্মিত হন, তবে বিস্ময়ের বিষয় ওদের কথা: 'মাটিতে পরিণত হওয়ার পরও কি আমরা নূতন জীবন লাভ করব?" [সূরা আর-রা'দ: ৫] আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে প্রথমবার জীবন দেয়া যেমন তাঁর জন্য সহজ ছিল দ্বিতীয়বার জীবন দেয়া তাঁর জন্য আরো সহজ হবে এটা প্রমাণ করতে চেয়েছেন। মানুষ কেন এটা মনে করে না যে, এক সময় তার কোন অস্তিত্বই ছিল না, আল্লাহ্ তাকে অস্তিত্বে এনেছেন। তারপর সে অস্তিত্বকে বিনাশ করে আবার তাকে তৈরী করা প্রথমবারের চেয়ে অনেক সহজ কাজ। মহান আল্লাহ্ বলেন: "তিনি সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, তারপর তিনি এটাকে সৃষ্টি করবেন পুনর্বার; এটা তাঁর জন্য অতি সহজ।" [সূরা আর-রূম:২৭] আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন: "মানুষ কি দেখে না যে, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্রবিন্দু থেকে? অথচ পরে সে হয়ে পড়ে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী। আর সে আমার সম্বন্ধে উপমা রচনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টি কথা ভুলে যায়। সে বলে, 'কে অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করবে যখন তা পচে গলে যাবে?' বলুন, 'তাতে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই যিনি তা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত।" [সূরা ইয়াসীন: ৭৭-৭৯] হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: 'মহান আল্লাহ্ বলেন: আদম সন্তান আমার উপর মিথ্যাচার করে অথচ মিথ্যাচার করা তার জন্য কখনও উচিত নয়। অনুরূপভাবে আদম সন্তান আমাকে কষ্ট দেয় অথচ আমাকে কষ্ট দেয়া তার জন্য অগ্রহণযোগ্য কাজ। তার মিথ্যাচার হলো সে বলে: প্রথম যেভাবে আমাকে সৃষ্টি করেছে সেভাবে আল্লাহ্ আমাকে পুনর্বার সৃষ্টি করবে না। অথচ আমার কাছে প্রথমবারের সৃষ্টি যেমন সহজ পুনর্বার সৃষ্টিও তেমনি সহজ। আর সে আমাকে কষ্ট দেয় একথা বলে যে, আমার সন্তান রয়েছে। অথচ আমি হলাম এমন একক অমুখাপেক্ষী সত্ত্বা যিনি কোন সন্তান জন্ম দেননি, কেউ তাকে জন্মও দেয়নি এবং তার সমকক্ষও কেউ নেই।' [বুখারী: ৪৯৭৪]

(২) উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক কাফেরকে তার শয়তানসহ একই শিকলে বেঁধে উত্থিত করা হবে। [কুরতুবী; ইবন কাসীর] এমতাবস্থায় এ বর্ণনাটি শুধু কাফেরদেরকে সমবেত করা সম্পর্কে। পক্ষান্তরে যদি মুমিন ও কাফের ব্যাপক অর্থে নেয়া হয়, তবে শয়তানদের সাথে তাদের সবাইকে সমবেত করার মর্মার্থ হবে এই যে, প্রত্যেক কাফের তো তার শয়তানের বাঁধা অবস্থায় উপস্থিত হবেই এবং মুমিনগণও এই

আমরা নতজানু অবস্থায় জাহান্নামের চারদিকে তাদেরকে উপস্থিত করবই(১)।

৬৯. তারপর প্রত্যেক দলের মধ্যে যে দয়াময়ের সর্বাধিক অবাধ্য আমরা তাকে টেনে বের করবই(২)।

ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَٰنِ عِتِيًّا ﴿٦٩﴾

৭০. তারপর আমরা তো তাদের মধ্যে জাহান্নামে দগ্ধ হবার যারা সবচেয়ে বেশী যোগ্য তাদের বিষয় ভাল জানি।

ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا ﴿٧٠﴾

৭১. আর তোমাদের প্রত্যেকেই তার (জাহান্নামের) উপর দিয়ে অতিক্রম করবে(৩), এটা আপনার রব-এর

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ﴿٧١﴾

মাঠে আলাদা থাকবে না; ফলে সবার সাথে শয়তানদের সহঅবস্থান হবে। [দেখুন, কুরতুবী]

(১) হাশরের প্রাথমিক অবস্থায় মুমিন, কাফের, ভাগ্যবান হতভাগা সবাইকে জাহান্নামের চারদিকে সমবেত করা হবে। সবাই ভীতবিহ্বল নতজানু অবস্থায় পড়ে থাকবে। এরপর মুমিনগণকে জাহান্নাম অতিক্রম করিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। ফলে জাহান্নামের ভয়াবহ দৃশ্য দেখার পর তারা পুরোপুরি খুশী, ধর্মদ্রোহীদের দুঃখে আনন্দ এবং জান্নাতলাভের কারণে অধিকতর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। [কুরতুবী]

(২) আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, কাফেরদের বিভিন্ন দলের মধ্যে যে দলটি সর্বাধিক উদ্ধত হবে, তাকে সবার মধ্য থেকে পৃথক করে অগ্রে প্রেরণ করা হবে। কোন কোন তফসীরবিদ বলেনঃ অপরাধের আধিক্যের ক্রমানুসারে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরে অপরাধীদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে। [ইবন কাসীর]

(৩) এ আয়াতটি দ্বারা পুলসিরাত সংক্রান্ত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা প্রমাণিত হয়। মূলত: সিরাত শব্দের আভিধানিক অর্থঃ স্পষ্ট রাস্তা। আর শরী'আতের পরিভাষায় সিরাত বলতে বুঝায়ঃ এমন এক পুল, যা জাহান্নামের পৃষ্ঠদেশের উপর প্রলম্বিত, যার উপর দিয়ে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবাই পার হতে হবে, যা হাশরের মাঠের লোকদের জন্য জান্নাতে প্রবেশের রাস্তা। সিরাতের বাস্তবতার স্বপক্ষে কুরআনের এ আয়াতে আল্লাহ বলেনঃ "আর তোমাদের প্রত্যেকেই তার (জাহান্নামের) উপর দিয়ে অতিক্রম করবে, এটা আপনার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত। পরে আমরা মুত্তাকীদেরকে উদ্ধার করব এবং যালিমদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় রেখে দেব"।

[সূরা মারইয়ামঃ ৭১-৭২] অধিকাংশ মুফাসসিরদের মতে এখানে 'জাহান্নামের উপর দিয়ে অতিক্রম' দ্বারা তার উপরস্থিত সিরাতের উপর দিয়ে পার হওয়াই উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। আর এটাই ইবনে আব্বাস, ইবনে মাস'উদ এবং কা'ব আল-আহবার প্রমূখ মুফাসসিরদের থেকে বর্ণিত। আবু সা'ঈদ আল-খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত দীর্ঘ এক হাদীস যাতে আল্লাহর দীদার তথা আল্লাহকে দেখা এবং শাফা'আতের কথা আলোচিত হয়েছে, তাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: ".. 'তারপর পুল নিয়ে আসা হবে, এবং তা জাহান্নামের উপর স্থাপন করা হবে', আমরা বললামঃ হে আল্লাহর রাসূলঃ 'পুল' কি? তিনি বললেনঃ "তা পদস্খলনকারী, পিচ্ছিল, যাতে লোহার হুক ও বর্শি এবং চওড়া ও বাঁকা কাটা থাকবে, যা নাজদের সা'দান গাছের কাঁটার মত। মুমিনগণ তার উপর দিয়ে কেউ চোখের পলকে, কেউ বিদ্যুৎগতিতে, কেউ বাতাসের গতিতে, কেউ দ্রুতগামী ঘোড়া ও অন্যান্য বাহনের গতিতে অতিক্রম করবে। কেউ সহীহ সালামতে বেঁচে যাবে, আবার কেউ এমনভাবে পার হয়ে আসবে যে, তার দেহ জাহান্নামের আগুনে জ্বলসে যাবে। এমন কি সর্বশেষ ব্যক্তি টেনে-হেঁচড়ে, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কোনরকম অতিক্রম করবে"। [বুখারীঃ ৭৪৩৯] এ ছাড়া আরও বহু হাদীসে সিরাতের গুণাগুণ বর্ণিত হয়েছে। সংক্ষেপে তার মূল কথা হলোঃ সিরাত চুলের চেয়েও সরু, তরবারীর চেয়েও ধারাল, পিচ্ছিল, পদস্খলনকারী, আল্লাহ যাকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে চান সে ব্যতীত কারো পা তাতে স্থায়ী হবে না। অন্ধকারে তা স্থাপন করা হবে, মানুষকে তাদের ঈমানের পরিমাণ আলো দেয়া হবে, তাদের ঈমান অনুপাতে তারা এর উপর দিয়ে পার হবে। যেমনটি পূর্বে বর্ণিত হাদীসে এসেছে। আয়াত ও হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, মুমিনগণ জাহান্নাম অতিক্রম করবে। মুমিনরা তাতে প্রবেশ করবে এমন কথা বলা হয়নি। তাছাড়া কুরআনের উল্লেখিত মূল শব্দ ورود এর আভিধানিক অর্থও প্রবেশ করা নয়। কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে: ﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ﴾ "আর যখন মূসা মাদইয়ানের কূপের নিকট দিয়ে অতিক্রম করল" সূরা আল-কাসাস:২৩] এখানেও ورود অর্থ প্রবেশ করা নয় বরং অতিক্রম করা। তাই এটিই এর সঠিক অর্থ যে, সবাইকেই জাহান্নাম অতিক্রম করতে হবে। যেমন পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে, মুত্তাকীদেরকে তা থেকে বাঁচিয়ে নেয়া হবে এবং জালেমদেরকে তার মধ্যে ফেলে দেয়া হবে। তদুপরি একথাটি কুরআন মজীদ এবং বিপুল সংখ্যক সহীহ হাদীসেরও বিরোধী, যেগুলোতে সৎকর্মশীল মুমিনদের জাহান্নামে প্রবেশ না করার কথা চূড়ান্তভাবে বলে দেয়া হয়েছে এবং বলে দেয়া হয়েছে যে, তারা জাহান্নামের পরশও পাবে না। [যেমন, সূরা আল-আম্বিয়াঃ ১০১-১০২] অবশ্য কোন কোন বর্ণনায় وُرُوْدٌ শব্দ দ্বারা প্রবেশ অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে। [যেমন, মুসনাদে আহমাদঃ ৩/৩২৮, মুসনাদে হারেস: ১১২৭ এ আবু সুমাইয়া এবং মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ৪/৬৩০ এ মুস্‌সাহ আল-আযদিয়্যাহ কর্তৃক বর্ণিত হাদীস] সে সমস্ত বর্ণনার কোনটিই সনদের দিক থেকে খুব শক্তিশালী নয়। আর যদি وُرُوْدٌ অর্থ প্রবেশ করাই হয়। তবে তা মুমিনদের জন্য ঠাণ্ডা ও শান্তিদায়ক বিবেচিত হবে

অনিবার্য সিদ্ধান্ত।

৭২. পরে আমরা উদ্ধার করব তাদেরকে, যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে এবং যালেমদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় রেখে দেব।

ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّنَذَرُ الظّٰلِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا ﴿٧٢﴾

৭৩. আর তাদের কাছে আমাদের স্পষ্ট আয়াতসমূহ তোলাওয়াত করা হলে কাফেররা মুমিনদেরকে বলে, 'দু'দলের মধ্যে কারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠতর ও মজলিস হিসেবে উত্তম[1]?'

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا ۙ اَيُّ الْفَرِيْقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَّاَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿٧٣﴾

৭৪. আর তাদের আগে আমরা বহু মানবগোষ্ঠীকে বিনাশ করেছি---যারা তাদের চেয়ে সম্পদ ও বাহ্যদৃষ্টিতে শ্রেষ্ট ছিল।

وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ اَحْسَنُ اَثَاثًا وَّرِءْيًا ﴿٧٤﴾

যেমনটি উক্ত হাদীসের ভাষ্যেই জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত হয়েছে।

(১) অর্থাৎ কাফেরদের যুক্তি ছিল এ রকমঃ দেখে নাও দুনিয়ায় কার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও নিয়ামত বর্ষণ করা হচ্ছে? কার গৃহ বেশী জমকালো? কার জীবন যাত্রার মান বেশী উন্নত? কার মজলিসগুলো বেশী আড়ম্বরপূর্ণ? যদি আমরা এসব কিছুর অধিকারী হয়ে থাকি এবং তোমরা এসব থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকো তাহলে তোমরা নিজেরাই চিন্তা করে দেখো, এটা কেমন করে সম্ভবপর ছিল যে, আমরা বাতিলের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকেও এভাবে দুনিয়ার মজা লুটে যেতে থাকবো আর তোমরা হকের পথে অগ্রসর হয়েও এ ধরনের ক্লান্তিকর জীবন যাপন করে যেতে থাকবে? [দেখুন, ফাতহুল কাদীর; সা'দী] কাফেরদের এই বিভ্রান্তি পবিত্র কুরআন এভাবে দূর করেছে যে, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী নেয়ামত ও সম্পদ আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়ার আলামত নয় এবং দুনিয়াতেও একে কোন ব্যক্তিগত পরাকাষ্ঠার লক্ষণ মনে করা হয় না। কেননা, দুনিয়াতে অনেক নির্বোধ মুর্খও এগুলো জ্ঞানী ও বিদ্বানের চাইতেও বেশী লাভ করে। বিগত যুগের ইতিহাস খুঁজে দেখলে এ সত্য উদঘাটিত হবে যে, পৃথিবীতে এ পরিমাণ তো বটেই, বরং এর চাইতেও বেশী ধন-দৌলত স্তুপীকৃত হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেগুলো তো তাদের কোন কাজে আসেনি। [দেখুন, সা'দী]

قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَٰلَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا ۚ حَتَّىٰٓ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ﴿٧٥﴾

৭৫. বলুন, 'যারা বিভ্রান্তিতে আছে, দয়াময় তাদেরকে প্রচুর অবকাশ দেবেন যতক্ষণ না তারা যে বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে তা দেখবে; তা শাস্তি হোক বা কেয়ামতই হোক[১]। অতঃপর তারা জানতে পারবে কে মর্যাদায় নিকৃষ্ট ও কে দলবলে দুর্বল।

وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى ۗ وَالْبَٰقِيَٰتُ الصَّٰلِحَٰتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا ﴿٧٦﴾

৭৬. আর যারা সৎপথে চলে আল্লাহ্ তাদের হেদায়াত বৃদ্ধি করে দেন[২]; এবং স্থায়ী সৎকাজসমূহ[৩] আপনার

---

(১) কাফের মুশরিকদের অবাধ্যতার পরও আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে অবকাশ দিতে থাকেন তারপর সময়মত তাদের ঠিকই পাকড়াও করেন। তাদের সে পাকড়াও কখনও দুনিয়াতে হয় আবার কখনো কখনো তা কিয়ামতের মাঠ পর্যন্ত বর্ধিত হয়। অন্যত্র মহান আল্লাহ্ বলেন: "কাফিরগণ যেন কিছুতেই মনে না করে যে, আমি অবকাশ দেই তাদের মংগলের জন্য; আমি অবকাশ দিয়ে থাকি যাতে তাদের পাপ বৃদ্ধি পায় এবং তাদের জন্য লাঞ্চনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।" [সূরা আলে-ইমরান: ১৭৮] অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, "তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল তারা যখন তা ভুলে গেল তখন আমি তাদের জন্য সবকিছুর দরজা খুলে দিলাম; অবশেষে তাদেরকে যা দেয়া হল যখন তারা তাতে উল্লসিত হল তখন হঠাৎ তাদেরকে ধরলাম; ফলে তখনি তারা নিরাশ হল।" [সূরা আল-আন'আম: ৪৪] কোন কোন মুফাসসির বলেন, এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কাফের মুশরিকদের জন্য পেশকৃত 'মুবাহালা' বা প্রত্যেকে প্রত্যেকের জন্য মৃত্যুর দো'আ করবে, কারণ যদি তোমাদের এটাই মনে হয় যে, তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে প্রিয় হওয়ার কারণেই দুনিয়ার জিনিস বেশী পাচ্ছ, তাহলে মৃত্যু কামনা কর। তখন দেখা যাবে আসলে কারা আল্লাহ্‌র প্রিয়। [তাবারী]

(২) কাফেরদেরকে পথভ্রষ্টতায় ছেড়ে দেয়ার কথা বলার পর এখানে ঈমানদারদের অবস্থা বলা হচ্ছে যে, তিনি তাদের হেদায়াত বৃদ্ধি করে দেন। [ইবন কাসীর] তিনি তাদেরকে অসৎ কাজ ও ভুল-ভ্রান্তি থেকে বাঁচান। তাঁর হেদায়াত ও পথ নির্দেশনার মাধ্যমে তারা অনবরত সত্য-সঠিক পথে এগিয়ে চলে। এ আয়াত থেকেও এটা প্রমাণিত হয় যে, ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি, বাড়তি-কমতি আছে। আল্লাহ্ যখন ইচ্ছা কারও ঈমান বাড়িয়ে দেন। আবার তারা শয়তানের প্রলোভনে পড়ে ঈমানের এক বিরাট অংশ হারিয়ে ফেলে। [অন্যান্য সূরাতেও ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধির প্রমাণাদি রয়েছে। যেমন, সূরা আত-তাওবাহ: ১২৪-১২৫; সূরা আল-ফাতহ:৪, সূরা মুহাম্মাদ:১৭]

(৩) সূরা আল-কাহফের ৪৬ নং আয়াতের তাফসীরে ﴿وَالْبَٰقِيَٰتُ الصَّٰلِحَٰتُ﴾ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

রব-এর পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং পরিণতির দিক দিয়েও অতি উত্তম।

৭৭. আপনি কি জেনেছেন (এবং আশ্চর্য হয়েছেন) সে ব্যক্তি সম্পর্কে, যে আমাদের আয়াতসমূহে কুফরি করে এবং বলে, 'আমাকে অবশ্যই ধন-সম্পদ ও সন্তান- সন্ততি দেয়া হবে[১]।'

أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِى كَفَرَ بِـَٔايَـٰتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ﴿٧٧﴾

৭৮. সে কি গায়েব দেখে নিয়েছে, নাকি দয়াময়ের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে?

أَطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَـٰنِ عَهْدًا ﴿٧٨﴾

৭৯. কখনই নয়, সে যা বলে আমরা তা লিখে রাখব এবং তার শাস্তি বৃদ্ধিই করতে থাকব[২]।

كَلَّا ۚ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُۥ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًّا ﴿٧٩﴾

---

(১) খাব্বাব ইবনে আরত রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ তিনি 'আস ইবনে ওয়ায়েল কাফেরের কাছে কিছু পাওনার তাগাদায় গেলে সে বললঃ তুমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি ঈমান প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত আমি তোমার পাওনা পরিশোধ করব না। খাব্বাব জওয়াব দিলেনঃ এরূপ করা আমার পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভবপর নয়, চাই কি তুমি মরে পুনরায় জীবিত হতে পার। আ'স বললঃ ভালো তো, আমি কি মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হব? এরূপ হলে তাহলে তোমার ঋণ তখনই পরিশোধ করব। কারণ, তখনও আমার হাতে ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততি থাকবে। [বুখারীঃ ১৯৮৫, ২০৯১, ২১৫৫, ২২৭৫ মুসলিমঃ ২৭৯৫] অর্থাৎ সে বলে, তোমরা আমাকে যতই পথভ্রষ্ট ও দুরাচার বলতে এবং আল্লাহর আযাবের ভয় দেখাতে থাকো না কেন আমি তো আজো তোমাদের চাইতে অনেক বেশী সচ্ছল এবং আগামীতেও আমার প্রতি অনুগ্রহ ধারা বর্ষিত হতে থাকবে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এ বিকৃত মন-মানসিকতা উল্লেখ করে সেটার উত্তর দিয়ে বলেছেনঃ সে কিরূপে জানতে পারল যে, পুনরায় জীবিত হওয়ার সময়ও তার হাতে ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততি থাকবে? সে কি উঁকি মেরে অদৃশ্যের বিষয়সমূহ জেনে নিয়েছে?

(২) অর্থাৎ তার অপরাধের ফিরিস্তিতে তার এ দাম্ভিক উক্তিও শামিল করা হবে, সেটাকে লিখে নেয়া হবে। তারপর সেটার শাস্তি বিধান করা হবে এবং এর মজাও তাকে টের পাইয়ে দেয়া হবে।

وَّنَرِثُهٗ مَا يَقُوْلُ وَيَاْتِيْنَا فَرْدًا ۝٨٠

৮০. আর সে যা বলে তা থাকবে আমাদের অধিকারে(১) এবং সে আমাদের কাছে আসবে একা।

وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لِّيَكُوْنُوْا لَهُمْ عِزًّا ۝٨١

৮১. আর তারা আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য বহু ইলাহ্‌ গ্রহণ করেছে, যাতে ওরা তাদের সহায় হয়(২);

كَلَّا ۭ سَيَكْفُرُوْنَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ۝٨٢

৮২. কখনই নয়, ওরা তো তাদের 'ইবাদাত অস্বীকার করবে এবং তাদের বিরোধী হয়ে যাবে(৩)।

ষষ্ঠ রুকূ'

اَلَمْ تَرَ اَنَّآ اَرْسَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ تَؤُزُّهُمْ اَزًّا ۝٨٣

৮৩. আপনি কি লক্ষ্য করেননি যে, আমরা কাফেরদের জন্য শয়তানদেরকে ছেড়ে রেখেছি, তাদেরকে মন্দ কাজে

---

(১) সে যে আখেরাতেও সন্তান-সন্তুতি, ধন-সম্পদের অধিকারী হওয়ার দাম্ভিকতা দেখাচ্ছে সেটা কক্ষনো হবার নয়, কারণ সেগুলো তো তখন আল্লাহ্‌র মালিকানাধীন হবে। তার কাছ থেকে দুনিয়াতে প্রাপ্ত যাবতীয় সম্পদই কেড়ে নেয়া হবে। সে হাশরের মাঠে শুধু একাই রিক্ত হস্তে উপস্থিত হবে।

(২) মূলে عِزًّا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ তারা এদের জন্য ইজ্জত ও মর্যাদার কারণ হবে। এর আরেক অর্থ হচ্ছে, শক্তিশালী ও যবরদস্ত হওয়া। উদ্দেশ্য সেগুলো তার ধারণা মতে তাকে আল্লাহ্‌র আযাব থেকে রক্ষা করবে। কারও কারও নিকট এর অর্থ হচ্ছে, সহযোগী হওয়া। অথবা আখেরাতে সুপারিশকারী হওয়া। [ফাতহুল কাদীর]

(৩) অর্থাৎ সহায় হওয়ার আশায় কাফেররা যাদের ইবাদত করত, তারা এই আশার বিপরীত তাদের শত্রু হয়ে যাবে। তারা বলবে, আল্লাহ এদেরকে শাস্তি দিন। কেননা, এরা আপনার পরিবর্তে আমাদেরকে উপাস্য করে নিয়েছিল। আমরা কখনো এদেরকে বলিনি আমাদের ইবাদাত করো এবং এরা যে আমাদের ইবাদাত করছে তাও তো আমরা জানতাম না। অন্য আয়াতেও আল্লাহ্‌ সেটা বলেছেন, "আর সে ব্যক্তির চেয়ে বেশী বিভ্রান্ত কে যে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তাকে সাড়া দেবে না? এবং এগুলো তাদের আহ্বান সম্বন্ধেও গাফেল। আর যখন কিয়ামতের দিন মানুষকে একত্র করা হবে তখন সেগুলো হবে এদের শত্রু এবং এরা তাদের 'ইবাদাত অস্বীকার করবে।" [সূরা আল-আহকাফ: ৫-৬]

বিশেষভাবে প্রলুব্ধ করার জন্য[১]?

৮৪. কাজেই তাদের বিষয়ে আপনি তাড়াতাড়ি করবেন না। আমরা তো গুণছি তাদের নির্ধারিত কাল[২],

فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ﴿٨٤﴾

৮৫. যেদিন দয়াময়ের নিকট মুত্তাকীগণকে সম্মানিত মেহমানরূপে[৩] আমরা সমবেত করব,

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَٰنِ وَفْدًا ﴿٨٥﴾

৮৬. এবং অপরাধীদেরকে তৃষ্ণাতুর অবস্থায় জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাব।

وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا ﴿٨٦﴾

৮৭. যারা দয়াময়ের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছে, তারা ছাড়া কেউ সুপারিশ

لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ

(১) ﴿تَؤُزُّهُمْ أَزًّا﴾ শব্দের অর্থ দ্রুত করতে চাওয়া। [ফাতহুল কাদীর] তার অন্য অর্থ হচ্ছে, নাড়াচাড়া দেয়া, কোন কাজের জন্যে প্রলুব্ধ করা, উৎসাহিত করা। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] আয়াতের অর্থ এই যে, শয়তানরা কাফেরদেরকে মন্দ কাজে প্রেরণা যোগাতে থাকে, মন্দ কাজের সৌন্দর্য অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করে দেয় এবং সেগুলোর অনিষ্টের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে দেয় না। তাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে থাকে। সীমালঙ্গন করতে দেয়। [ইবন কাসীর]

(২) এর মানে হচ্ছে, এদের বাড়াবাড়ির কারণে তাদের জন্য আযাবের দো'আ করবেন না। [ইবন কাসীর] কারণ, এদের দুর্ভাগ্য ঘনিয়ে এসেছে। পাত্র প্রায় ভরে উঠেছে। আল্লাহর দেয়া অবকাশের মাত্র আর ক'দিন বাকি আছে। এ দিনগুলো পূর্ণ হতে দিন। সুতরাং আপনি তাদের শাস্তির ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না। শাস্তি সত্বরই হবে। কেননা, আমি তাদেরকে দুনিয়াতে বসবাসের জন্যে যে গুনাগুনতি দিন ও সময় দিয়েছি, তা দ্রুত পূর্ণ হয়ে যাবে। এরপর শাস্তিই শাস্তি। [ইবন কাসীর]

(৩) যারা বাদশাহ অথবা কোন শাসনকর্তার কাছে সম্মান ও মর্যাদা সহকারে বাহনে চড়ে গমন করে, তাদেরকে وفد বলা হয়। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, ঈমানদারদেরকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে তাদের প্রভুর সমীপে নিয়ে যাওয়া হবে। তাদেরকে জান্নাত ও সম্মানিত ঘরে প্রবেশ করানো হবে। [ফাতহুল কাদীর] পরবর্তী আয়াতে এর উল্টো চিত্রই ফুটে উঠেছে। সেখানে অপরাধীদেরকে তৃষ্ণার্ত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করানোর কথা বলা হয়েছে। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ۝٨٧

করার মালিক হবে না[1]।

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا ۝٨٨

৮৮. আর তারা বলে, 'দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন।'

لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْـًٔا إِدًّا ۝٨٩

৮৯. তোমরা তো এমন এক বীভৎস বিষয়ের অবতারণা করছ;

تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ۝٩٠

৯০. যাতে আসমানসমূহ বিদীর্ণ হয়ে যাবার উপক্রম হয়, আর যমীন খণ্ড-বিখণ্ড হবে এবং পর্বতমণ্ডলী চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে আপতিত হবে,

أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا ۝٩١

৯১. এ জন্যে যে, তারা দয়াময়ের প্রতি সন্তান আরোপ করে[2]।

وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمٰنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ۝٩٢

৯২. অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্য শোভন নয়!

---

(১) عهد অর্থ অঙ্গীকার আদায় করা। বলা হয়ে থাকে, বাদশাহ এ অঙ্গীকার নামা অমুকের জন্য দিয়েছেন। [ফাতহুল কাদীর] যেটাকে সহজ ভাষায় পরোয়ানা বলা যেতে পারে। অর্থাৎ যে পরোয়ানা হাসিল করে নিয়েছে তার পক্ষেই সুপারিশ হবে এবং যে পরোয়ানা পেয়েছে সে-ই সুপারিশ করতে পারবে। আয়াতের শব্দগুলো দু'দিকেই সমানভাবে আলোকপাত করে। সুপারিশ কেবলমাত্র তার পক্ষেই হতে পারবে যে রহমান থেকে পরোয়ানা হাসিল করে নিয়েছে, একথার অর্থ হচ্ছে এই যে, যে ব্যক্তি দুনিয়ায় আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন সত্য ইলাহ নেই এ সাক্ষ্য দিয়েছে এবং সেটার হক আদায় করেছে। ইবন আব্বাস বলেন, পরোয়ানা হচ্ছে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আর আল্লাহ্ ছাড়া আর কারও কাছে কোন প্রকার শক্তি-সামর্থ ও উপায় তালাশ না করা, আল্লাহ্ ব্যতীত কারও কাছে আশা না করা। [ইবন কাসীর]

(২) আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলার সাথে কাউকে শরীক করলে বিশেষতঃ আল্লাহর জন্য সন্তান সাব্যস্ত করলে পৃথিবী, পাহাড় ইত্যাদি ভীষণরূপে অস্থির ও ভীত হয়ে পড়ে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 'খারাপ কথা শোনার পর মহান আল্লাহ্‌র চেয়ে বেশী ধৈর্য-সহনশীল আর কেউ নেই, তার সাথে শরীক করা হয়, তার জন্য সন্তান সাব্যস্ত করা হয় তারপরও তিনি তাদেরকে নিরাপদ রাখেন এবং তাদেরকে জীবিকা প্রদান করেন।' [বুখারী: ৬০৯৯, মুসলিম: ২৮০৪]

৯৩. আসমানসমূহ ও যমীনে এমন কেউ নেই, যে দয়াময়ের কাছে বান্দারূপে উপস্থিত হবে না।

إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ إِلَّآ ءَاتِي الرَّحْمَٰنِ عَبْدًا ﴿٩٣﴾

৯৪. তিনি তাদের সংখ্যা জানেন এবং তিনি তাদেরকে বিশেষভাবে গুণে রেখেছেন[১],

لَّقَدْ أَحْصَىٰهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ﴿٩٤﴾

৯৫. আর কিয়ামতের দিন তাদের সবাই তাঁর কাছে আসবে একাকী অবস্থায়।

وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ الْقِيَٰمَةِ فَرْدًا ﴿٩٥﴾

৯৬. নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে দয়াময় অবশ্যই তাদের জন্য সৃষ্টি করবেন ভালবাসা[২]।

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحَٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا ﴿٩٦﴾

---

(১) অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সমগ্র মানুষের সংখ্যা সম্পর্কে সম্যক জানেন। তিনি সেগুলোকে সীমাবদ্ধ করে গুণে রেখেছেন সুতরাং তাঁর কাছে কোন কিছু গোপন থাকতে পারে না। সৃষ্টির শুরু থেকে ছোট বড়, পুরুষ মহিলা সবই তাঁর জ্ঞানে রয়েছে। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(২) ইবনে আব্বাস বলেন, এর অর্থ দুনিয়ার মানুষের মধ্যে তার জন্য তিনি ভালবাসা তৈরী করেন। অন্য অর্থ হচ্ছে, তিনি নিজে তাকে ভালবাসেন, অন্য ঈমানদারদের মনেও ভালবাসা তৈরী করে দেন। মুজাহিদ ও দাহহাক এ অর্থই করেছেন। ইবন আব্বাস থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি মুসলিমদের মধ্যে দুনিয়াতে তার জন্য ভালবাসা, উত্তম জীবিকা ও সত্যকথা জারী করেন। সুতরাং ঈমান ও সৎকর্মে দৃঢ়পদ ব্যক্তিদের জন্যে আল্লাহ তা'আলা বন্ধুত্ব ও ভালবাসা সৃষ্টি করে দেন। ঈমান ও সৎকর্ম পূর্ণরূপে পরিগ্রহ করলে এবং বাইরের কুপ্রভাব থেকে মুক্ত হলে ঈমানদার সৎকর্মশীলদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়ে যায়। একজন সৎকর্ম পরায়ণ ব্যক্তি অন্য একজন সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তির সাথে ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যায় এবং অন্যান্য মানুষ ও সৃষ্টজীবের মনেও আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি মহব্বত সৃষ্টি করে দেন। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে পছন্দ করেন, তখন জিবরাঈলকে বলেন, আমি অমুক বান্দাকে ভালবাসি তুমিও তাকে ভালবাস। তারপর জিবরাঈল সব আসমানে একথা ঘোষণা করেন এবং তখন আকাশের অধিবাসীরা সবাই সেই বান্দাকে ভালবাসতে থাকে। এরপর এই ভালবাসা পৃথিবীতে নাযিল করা হয়। ফলে পৃথিবীর অধিবাসীরাও তাকে ভালবাসতে থাকে। [বুখারীঃ ৫৬৯৩, মুসলিমঃ ২৬৩৭, তিরমিযীঃ ৩১৬১, এ বর্ণনায় আরও এসেছে, তারপর বর্ণনাকারী উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করলেন]

فَإِنَّمَا يَسَّرْنَٰهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِۦ قَوْمًا لُّدًّا ﴿٩٧﴾

৯৭. আর আমরা তো আপনার জবানিতে কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি যাতে আপনি তা দ্বারা মুত্তাকীদেরকে সুসংবাদ দিতে পারেন এবং বিতণ্ডাপ্রিয় সম্প্রদায়কে তা দ্বারা সতর্ক করতে পারেন।

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًۢا ﴿٩٨﴾

৯৮. আর তাদের আগে আমরা বহু প্রজন্মকে বিনাশ করেছি! আপনি কি তাদের কারো অস্তিত্ব অনুভব করেন অথবা ক্ষীণতম শব্দও শুনতে পান[১]?

সালফে সালেহীনদের মধ্য থেকে হারেম ইবনে হাইয়ান বলেনঃ যে ব্যক্তি সর্বান্তকরণে আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করে, আল্লাহ্ তাআলা সমস্ত ঈমানদারের অন্তর তার দিকে নিবিষ্ট করে দেন। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, কোন মানুষ ভাল কিংবা মন্দ যে আমলই করুক তাকে আল্লাহ্ সে আমলের চাদর পরিধান করিয়ে দেন। [ইবন কাসীর] ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যখন স্ত্রী হাজেরা ও দুগ্ধপোষ্য সন্তান ইসমাইল আলাইহিস সালামকে আল্লাহর নির্দেশে মক্কার শুষ্ক পর্বতমালা বেষ্টিত মরুভূমিতে রেখে সিরিয়া প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা করেন, তখন তাদের জন্যে দো'আ করে বলেছিলেনঃ "হে আল্লাহ! আমার নিঃসঙ্গ পরিবার পরিজনের প্রতি আপনি কিছু লোকের অন্তর আকৃষ্ট করে দিন।" এ দো'আর ফলেই হাজারো বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর এখনও মক্কা ও মক্কাবাসীদের প্রতি মহব্বতে সমগ্র বিশ্বের অন্তর আপ্লুত হচ্ছে। বিশ্বের প্রতি কোণ থেকে দুরতিক্রমা বাধা-বিপত্তি ডিঙ্গিয়ে সারা জীবনের উপার্জন ব্যয় করে মানুষ এখানে পৌছে এবং বিশ্বের কোণে কোণে যে দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদিত হয়, তা মক্কার বাজারসমূহে পাওয়া যায়।

(১) বোধগম্য নয়- এমন ক্ষীণতম শব্দকে رِكْز বলা হয়। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যে সমস্ত জাতিকে ধ্বংস করেছি, যেমন নূহ, আদ, সামূদ, ফির'আউন ইত্যাদি রাজ্যাধিপতি, জাঁকজমকের অধিকারী ও শক্তিধরদেরকে যখন আল্লাহ তা'আলার আযাব পাকড়াও করে ধ্বংস করে দেয় তখন তাদের কোন ক্ষীণতম শব্দ এবং আচরণ আলোড়ন শোনা যায় না। তাদের সবাইকে এমনভাবে ধ্বংস করা হয় যে, কাউকেই ছেড়ে দেয়া হয় না। বরং তাদের ধ্বংস পরবর্তীদের জন্য শিক্ষণীয় হয়েই আছে। [সা'দী]

২০- সূরা ত্বা-হা[১]
১৩৫ আয়াত, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

طٰهٰ ①

১. ত্বা-হা,[২]

مَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰٓى ②

২. আপনি কষ্ট-ক্লেশে পতিত হন- এ জন্য আমরা আপনার প্রতি কুরআন নাযিল করিনি[৩];

---

(১) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এ সূরা এবং আরো কয়েকটি সূরা সম্পর্কে বলেছেন: 'বনী ইসরাইল, আল-কাহফ, মার্‌ইয়াম, ত্বা-হা এবং আম্বিয়া এগুলো আমার সবচেয়ে প্রাচীন সম্পদ বা সর্বপ্রথম পুঁজি। [বুখারীঃ ৪৭৩৯] এর অর্থ, প্রাচীন সূরাসমূহের মধ্যে এগুলো অন্যতম। তাছাড়া সূরা ত্বা-হা, আল-বাকারাহ ও আলে-ইমরান সম্পর্কে এসেছে যে, এগুলোতে মহান আল্লাহ্‌র সবচেয়ে বড় ও সম্মানিত নাম রয়েছে যার অসীলায় দো'আ করলে আল্লাহ্ তা কবুল করেন'। [ইবনে মাজাহ: ৩৮৫৬]

(২) ত্বা-হা শব্দটি 'হুরুফে মুকাত্তা'আতের অন্তর্ভুক্ত'। যেগুলো সম্পর্কে পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এর প্রকৃত অর্থ মহান আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন। তবে উম্মতের সত্যনিষ্ঠ আলেমগণ এর কিছু অর্থ বর্ণনা করেছেন। যেমন, হে মানব! অথবা হে পুরুষ। কাযী ইয়াদ বলেন: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের সালাতে এক পায়ের উপর ভর করে কুরআন তেলাওয়াত করতেন। যা তার জন্য অনেক কষ্টের কারণ হয়ে পড়েছিল ফলে এ সম্বোধনের মাধ্যমে বলা হচ্ছে যে, যমীনের সাথে মিশে থাকেন অর্থাৎ দু'পায়ের উপর ভর করে দাঁড়িয়ে অথবা বসে বসেও আপনি কুরআন তেলাওয়াত করতে পারেন। [ইবন কাসীর]

(৩) لِتَشْقٰى শব্দটি شقاء থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ ক্লেশ, পরিশ্রম ও কষ্ট। [ফাতহুল কাদীর] অর্থাৎ কুরআন নাযিল করে আমি আপনার দ্বারা এমন কোন কাজ করাতে চাই না যা আপনার পক্ষে করা অসম্ভব। কুরআন নাযিলের সূচনাভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহাজ্জুদের সালাতে কুরআন তিলাওয়াতে মশগুল থাকতেন। তিনি পরপর দীর্ঘক্ষণ সালাত আদায়ের জন্য এক পায়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতেন, পরে অন্য পায়ে ভর দিয়ে সালাত আদায় করতেন। ফলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পা ফুলে যায়। কাফের মুশরিক কুরাইশরা বলতে থাকে যে, এ কুরআন মুহাম্মাদকে কষ্টে নিপতিত করার জন্যই নাযিল হয়েছে। [ইবন কাসীর] আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে এই উভয়বিধ ক্লেশ থেকে উদ্ধার করার জন্য বলা হয়েছে: আপনাকে কষ্ট ও পরিশ্রমে ফেলার জন্য আমি কুরআন নাযিল করিনি। যারা আখেরাত ও

৩. বরং যে ভয় করে তার জন্য উপদেশ হিসেবে[১],

إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ ۝

৪. যিনি যমীন ও সমুচ্চ আসমানসমূহ সৃষ্টি করেছেন তাঁর কাছ থেকে এটা নাযিলকৃত,

تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى ۝

৫. দয়াময় (আল্লাহ্) 'আরশের উপর উঠেছেন[২]।

الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ ۝

৬. যা আছে আসমানসমূহে ও যমীনে এবং এ দু'য়ের মধ্যবর্তী স্থানে ও

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

আল্লাহ্‌র আযাবকে ভয় করে আল্লাহ্‌র আদেশ নিষেধ মেনে চলে তাদের জন্য এ কুরআন উপদেশবাণী। তারাই এর মাধ্যমে হেদায়াত লাভ করতে পারে। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, "কাজেই যে আমার শাস্তিকে ভয় করে তাকে উপদেশ দান করুন কুরআনের সাহায্যে।" [সূরা ক্বাফ: ৪৫] আরও এসেছে, "আপনি শুধু তাকেই সতর্ক করতে পারেন যে উপদেশ তথা কুরআনকে মেনে চলে এবং না দেখে দয়াময় আল্লাহ্‌কে ভয় করে।" [সূরা ইয়াসীন: ১১] কাতাদাহ্ রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: আয়াতের অর্থ- আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি, তিনি এ কুরআনকে দুর্ভাগা বানানোর জন্য নাযিল করেননি। বরং তিনি তা নাযিল করেছেন রহমত, নূর ও জান্নাতের প্রতি পথপ্রদর্শক হিসেবে। [ইবন কাসীর]

(১) মু'আবিয়া রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: 'আল্লাহ্ যার কল্যাণ ইচ্ছা করেন, তাকে দ্বীনের বিশেষ জ্ঞান ও বুৎপত্তি দান করেন।' [বুখারীঃ ৭১, মুসলিমঃ ১০৩৭] কিন্তু এখানে সেসব জ্ঞানীকেই বোঝানো হয়েছে, যাদের মধ্যে কুরআন বর্ণিত ইলমের লক্ষণ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ভয় বিদ্যমান আছে। সুতরাং কুরআন নাযিল করে তাকে কষ্টে নিপতিত করা হয়নি। বরং তার জন্য অনেক কল্যাণ চাওয়া হয়েছে। আল্লাহ্‌র কিতাব নাযিল হওয়া, তাঁর রাসূলদেরকে প্রেরণ করা তাঁর বান্দাদের জন্য রহমত। এর মাধ্যমে তিনি যারা আল্লাহকে স্মরণ করতে চায় তাদেরকে স্মরণ করার সুযোগ দেন, কিছু লোক এ কিতাব শুনে উপকৃত হয়। এটা এমন এক স্মরনিকা যাতে তিনি তার হালাল ও হারাম নাযিল করেছেন। [ইবন কাসীর]

(২) আল্লাহ্ তা'আলা আরশের উপর উঠেছেন বলে তিনি নিজেই ঘোষণা করেছেন। এর উপর বিশ্বাস রাখা ফরয। তিনি কিভাবে আরশে উঠেছেন সেটার ধরণ আমাদের জানা নেই। এটা ঈমান বিল গায়েবের অংশ। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা সূরা বাকারার ২৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় করা হয়েছে।

وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى ⑥

ভূগর্ভে[১] তা তাঁরই ।

وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهٗ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفٰى ⑦

৭. আর যদি আপনি উচ্চকণ্ঠে কথা বলেন, তবে তিনি তো যা গোপন ও অতি গোপন সবই জানেন[২] ।

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ⑧

৮. আল্লাহ্, তিনি ছাড়া অন্য কোন সত্য ইলাহ্ নেই, সুন্দর নামসমূহ তাঁরই[৩] ।

---

(১) আদ্র ও ভেজা মাটিকে ثرى বলা হয়, যা মাটি খনন করার সময় নীচ থেকে বের হয় । অর্থাৎ সাত যমীনের নিচে । কেননা এ মাটি সাত যমীনের নিচে অবস্থিত ।[জালালাইন] একথা স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর নেই যে, মাটির অভ্যন্তরের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই বিশেষ গুণ । তিনি আরশের উপর থেকেও সব জায়গার খবর রাখেন । তাঁর অগোচরে কিছুই নেই । আসমানসমূহ ও যমীনের অভ্যন্তরের যাবতীয় বিষয়াদি তাঁর জানা রয়েছে । কারণ, সবকিছু তাঁরই রাজত্বের অংশ, তাঁর কব্জায়, তাঁর কর্তৃত্বে, তাঁর ইচ্ছা ও হুকুমের অধীন । আর তিনিই এগুলো সৃষ্টি করেছেন, তিনিই মালিক, তিনিই ইলাহ, তিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই, কোন রব নেই । [ইবন কাসীর]

(২) মানুষ মনে যে গোপন কথা রাখে, কারো কাছে তা প্রকাশ করে না, তাকে বলা হয় سر পক্ষান্তরে أخفى বলে সে কথা বোঝানো হয়েছে, যা এখন পর্যন্ত মনেও আসেনি, ভবিষ্যতে কোন সময় আসবে । আল্লাহ্ তা'আলা এসব বিষয় সম্পর্কেও সম্যক ওয়াকিফহাল । [ইবন কাসীর] অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "বলুন, 'এটা তিনিই নাযিল করেছেন যিনি আসমানসমূহ ও যমীনের সমুদয় রহস্য জানেন; নিশ্চয়ই তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ।" [সূরা আল-ফুরকান: ৬] সমস্ত সৃষ্টি তাঁর কাছে একই সৃষ্টির মত । এ সবের জ্ঞান তাঁর পরিপূর্ণভাবে রয়েছে । আল্লাহ্ বলেন, "তোমাদের সবার সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটি প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানেরই অনুরূপ । নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সম্যক দ্রষ্টা ।" [সূরা লুকমান: ২৮] [ইবন কাসীর]

(৩) এ আয়াতটিতে তাওহীদকে সুন্দরভাবে ফুটে তোলা হয়েছে । এখানে প্রথমেই মহান আল্লাহ্র নাম উল্লেখ করে তাঁর পরিচয় দেয়া হয়েছে যে, তিনি ব্যতীত সত্য কোন ইলাহ্ নেই । তারপর বলা হয়েছে যে, সুন্দর সুন্দর যত নাম সবই তাঁর । আর এটা সুবিদিত যে, যার যত বেশী নাম তত বেশী গুণ । আর সে-ই মহান যার গুণ বেশী । আল্লাহ্র প্রতিটি নামই অনেকগুলো গুণের ধারক । কুরআন ও হাদীসে আল্লাহ্র অনেক নাম ও গুণ বর্ণিত হয়েছে । তার নাম ও গুণের কোন সীমা ও শেষ নেই । কোন কোন হাদীসে এসেছে যে, মহান আল্লাহ্র এমন কিছু নাম আছে যা তিনি কাউকে না জানিয়ে তার ইলমে গায়েবের ভাণ্ডারে রেখে দিয়েছেন । রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: যে কেউ কোন বিপদে পড়ে নিম্নোক্ত দো'আ

৯. আর মূসার বৃত্তান্ত আপনার কাছে পৌঁছেছে কি[১]?

وَهَلْ أَتٰىكَ حَدِيثُ مُوسٰى ﴿٩﴾

১০. তিনি যখন আগুন দেখলেন তখন তার পরিবারবর্গকে বললেন, 'তোমরা অপেক্ষা কর, আমি তো আগুন দেখেছি। সম্ভবত আমি তোমাদের জন্য তা থেকে কিছু জ্বলন্ত অঙ্গার আনতে পারব অথবা আমি আগুনের কাছে-

إِذْ رَاٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوٓا إِنِّيٓ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّيٓ اٰتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ﴿١٠﴾

পাঠ করবে মহান আল্লাহ্ তাকে তা থেকে উদ্ধার করবেন সেটি হচ্ছে: হে আল্লাহ্! আমি আপনার দাস এবং আপনারই এক দাস ও আরেক দাসীর পুত্র। আমার ভাগ্য আপনারই হাতে, আমার উপর আপনার নির্দেশ কার্যকর। আমার প্রতি আপনার ফয়সালা ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমি আপনার যে সমস্ত নাম আপনি আপনার জন্য রেখেছেন অথবা আপনার যে নাম আপনি আপনার কিতাবে নাযিল করেছেন বা আপনার সৃষ্টি জগতের কাউকেও শিখিয়েছেন অথবা আপন ইলমে গাইবের ভাণ্ডারে সংরক্ষণ করে রেখেছেন সে সমস্ত নামের অসীলায় প্রার্থনা করছি আপনি কুরআনকে করে দিন আমার হৃদয়ের জন্য প্রশান্তি, আমার বক্ষের জ্যোতি, আমার চিন্তা-ভাবনার অপসারণকারী এবং উৎকণ্ঠা দূরকারী।' [সহীহ ইবন হিব্বান: ৩/২৫৩, মুসনাদে আহমাদ:১/৩৯১] তবে কোন কোন হাদীসে এ সমস্ত নামের মধ্যে ৯৯টি নামের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, সেগুলো সঠিকভাবে অনুধাবন করে সেগুলো দ্বারা আহ্বান জানালে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 'অবশ্যই আল্লাহ্র ৯৯টি নাম রয়েছে কেউ সঠিকভাবে সেগুলোর মাধ্যমে আহ্বান করলে জান্নাতে প্রবেশ করবে' [বুখারী:২৭৩৬, মুসলিম:২৬৭৭] কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, শুধু এ ৯৯টিই আল্লাহ্র নাম, বরং এখানে আল্লাহ্র নামগুলোর মধ্য থেকে ৯৯টি নামের ফযীলত বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য।

(১) পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কুরআনুল কারীমের মাহাত্ম্য এবং সে প্রসঙ্গে রাসূলের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। এরপর আলোচ্য আয়াতসমূহে মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। উভয় বিষয়বস্তুর পারস্পরিক সম্পর্ক এই যে, রেসালাত ও দাওয়াতের কর্তব্য পালনের পথে যেসব বিপদাপদ ও কষ্টের সম্মুখীন হতে হয় এবং পূর্ববর্তী নবীগণ যেসব কষ্ট সহ্য করেছেন, সেগুলো মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জানা থাকা দরকার যাতে তিনি পূর্ব থেকেই এসব বিপদাপদের জন্য প্রস্তুত হয়ে অবিচল থাকতে পারেন। যেমন, অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছেঃ ﴿وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنۢبَآءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِۦ فُؤَادَكَ﴾ অর্থাৎ "আমি নবীগণের এমন কাহিনী আপনার কাছে এজন্য বর্ণনা করি, যাতে আপনার অন্তর সুদৃঢ় হয়।" [সূরা হূদঃ ১২০]

ধারে কোন পথনির্দেশ পাব[১] ।’

১১. তারপর যখন তিনি আগুনের কাছে আসলেন তখন ডেকে বলা হল, ‘হে মূসা!

فَلَمَّآ أَتٰىهَا نُودِيَ يٰمُوسٰىٓ ﴿١١﴾

১২. ‘নিশ্চয় আমি আপনার রব, অতএব আপনার জুতা জোড়া খুলে ফেলুন, কারণ আপনি পবিত্র ‘তুওয়া’ উপত্যকায় রয়েছেন[২] ।

إِنِّيٓ أَنَا۠ رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۖ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٢﴾

(১) মনে হচ্ছে তখন সময়টা ছিল শীতকালের একটি রাত। খুব অন্ধকার একটি রাত। [কুরতুবী] মূসা আলাইহিসসালাম সিনাই উপদ্বীপের দক্ষিণ এলাকা অতিক্রম করছিলেন। দূর থেকে একটি আগুন দেখে তিনি মনে করেছিলেন সেখান থেকে কিছু আগুন পাওয়া যাবে যার সাহায্যে পরিবারের লোকজনদের সারারাত গরম রাখার ব্যবস্থা হবে অথবা কমপক্ষে সামনের দিকে অগ্রসর হবার পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। এখানে এসেছে যে, তিনি পরিবারকে বলেছিলেন যে, আমি যাচ্ছি যাতে আমি জ্বলন্ত অঙ্গার আনতে পারি। অন্য আয়াতে এসেছে, একখণ্ড জ্বলন্ত কাঠ আনতে পারি যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার।’ [সূরা আল-কাসাস: ২৯] এর দ্বারা বোঝা গেল যে, রাতটি ছিল প্রচণ্ড শীতের। তারপর বলেছেন যে, অথবা আমি পথের সন্ধান পাব। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, তিনি পথ হারিয়ে ফেলেছিলেন। যখন আগুন দেখলেন, তখন ভাবলেন, যদি কাউকে পথ দেখানোর মত নাও পাই, সেখান থেকে আগুন নিয়ে আসতে পারব। [ইবন কাসীর] তিনি দুনিয়ার পথের সন্ধান পাওয়ার কথা চিন্তা করেছিলেন আর পেয়ে গেলেন সেখানে আখেরাতের পথ।

(২) জুতা খোলার নির্দেশ দেয়ার এক কারণ এই যে, স্থানটি ছিল সম্ভ্রম প্রদর্শনের এবং জুতা খুলে ফেলা তার অন্যতম আদব। দ্বিতীয় কারণ যা কোন কোন বর্ণনা থেকে জানা যায় তা হলো, মূসা ‘আলাইহিস্ সালাম-এর জুতাদ্বয় ছিল মৃত গাধার চর্মনির্মিত। আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু, হাসান বসরী ও ইবনে জুরাইজ রাহিমাহুমাল্লাহ্ থেকে প্রথমোক্ত কারণই বর্ণিত আছে। কেউ কেউ বলেনঃ বিনয় ও নম্রতার আকৃতি ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে এ নির্দেশ দেয়া হয়। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে কবরস্থানে জুতা পায়ে হাঁটতে দেখে বলেছিলেনঃ ‘তুমি তোমার জুতা খুলে নাও।’ [নাসায়ীঃ ২০৪৮, আবু দাউদঃ ৩২৩০, ইবনে মাজাহ্ঃ ১৫৬৮] জুতা পাক হলে তা পরিধান করে সালাত আদায় করা সব ফেকাহ্বিদের মতে জায়েয। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম থেকে পাক জুতা পরিধান করে সালাত আদায় করা প্রমাণিতও রয়েছে।

وَاَنَا اخۡتَرۡتُكَ فَاسۡتَمِعۡ لِمَا يُوۡحٰى ﴿۱۳﴾

১৩. 'আর আমি আপনাকে মনোনীত করেছি। অতএব যা ওহী পাঠানো হচ্ছে আপনি তা মনোযোগের সাথে শুনুন।

اِنَّنِىۡۤ اَنَا اللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاعۡبُدۡنِىۡ ۙ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكۡرِىۡ ﴿۱۴﴾

১৪. 'আমিই আল্লাহ্, আমি ছাড়া অন্য কোন হক্ক ইলাহ্ নেই। অতএব আমারই 'ইবাদাত করুন(১) এবং আমার স্মরণার্থে সালাত কায়েম করুন(২)।

---

(১) লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে, এটা ছিল প্রথম নির্দেশ, যা একজন নবীর প্রতি আল্লাহ্ জারি করেছেন। সে হিসেবে প্রত্যেক মানুষের উপর প্রথম ওয়াজিব ও কর্তব্য হল এ কালেমার সাক্ষ্য দেয়া। [ইবন কাসীর]

(২) এখানে সালাতের মূল উদ্দেশ্যের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। সালাত কায়েম করুন, যাতে আমাকে স্মরণ করতে পারেন। [ইবন কাসীর] অর্থাৎ মানুষ যেন আল্লাহ থেকে গাফেল না হয়ে যায়। আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক জড়িত করার সবচেয়ে বড় মাধ্যম হচ্ছে সালাত। সালাত প্রতিদিন কয়েকবার মানুষকে দুনিয়ার কাজকারবার থেকে সরিয়ে আল্লাহর দিকে নিয়ে যায়। কোন কোন মুফাসসির এ অর্থও নিয়েছেন যে, সালাত কায়েম করো, যাতে আমি তোমাকে স্মরণ করতে পারি, যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে: "আমাকে স্মরণ করো আমি তোমাকে স্মরণ রাখবো।"[সূরা আল-বাকারাহঃ ১৫২] [ফাতহুল কাদীর] কোন কোন মুফাসসির এ আয়াতের অর্থ করেছেন, যদি কোন সালাত ভুলে যায় যখনই মনে পড়বে তখনই সালাত পড়ে নেয়া উচিত। [ফাতহুল কাদীর] এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "কোন ব্যক্তি কোন সময় সালাত পড়তে ভুলে গিয়ে থাকলে যখন তার মনে পড়ে যায় তখনই সালাত পড়ে নেয়া উচিত। এছাড়া এর আর কোন কাফফারা নেই।" [বুখারীঃ ৫৭২ মুসলিমঃ ৬৮০, ৬৮৪] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 'ঘুমানোর কারণে কারও সালাত ছুটে গেলে অথবা সালাত আদায় করতে বেখবর হয়ে গেলে যখনই তা স্মরণ হয় তখনই তা আদায় করা উচিত; কেননা মহান আল্লাহ্ বলেন: "আর আমার স্মরনার্থে সালাত কায়েম করুন"।' [মুসলিম: ৩১৬] এ সমস্ত হাদীসে এ আয়াতটিকে দলীল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। যা এ তাফসীরের যথার্থতার উপর প্রমাণবহ। অন্য এক হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়, যদি আমরা সালাতের সময় ঘুমিয়ে থাকি তাহলে কি করবো? জবাবে তিনি বলেন, "ঘুমের মধ্যে কোন দোষ নেই। দোষের সম্পর্ক তো জেগে থাকা অবস্থার সাথে। কাজেই যখন তোমাদের মধ্যে কেউ ভুলে যাবে অথবা ঘুমিয়ে পড়বে তখন জেগে উঠলে বা মনে পড়লে তৎক্ষণাৎ সালাত পড়ে নেবে।" [তিরমিযীঃ ১৭৭, আবু দাউদঃ ৪৪১]

১৫. ‘কেয়ামত তো অবশ্যম্ভাবী[১], আমি এটা গোপন রাখতে চাই[২] যাতে প্রত্যেককে নিজ কাজ অনুযায়ী প্রতিদান দেয়া যায়[৩] ।

إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ﴿١٥﴾

১৬. ‘কাজেই যে ব্যক্তি কিয়ামতে ঈমান রাখে না এবং নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, সে যেন আপনাকে তার উপর ঈমান আনা থেকে ফিরিয়ে না রাখে, নতুবা আপনি ধ্বংস হয়ে

فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ ﴿١٦﴾

(১) তাওহীদের পরে যে দ্বিতীয় সত্যটি প্রত্যেক যুগে সকল নবীর সামনে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে এবং যার শিক্ষা দেবার জন্য তাদেরকে নিযুক্ত করা হয়েছে সেটি হচ্ছে আখেরাত । বলা হচ্ছে, কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, আর সেটা হতেই হবে । [দেখুন, ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ কেয়ামত কখন হবে সে ব্যাপারটি আমি সব সৃষ্টজীবের কাছ থেকে গোপন রাখতে চাই; এমনকি নবী ও ফিরিশ্‌তাদের কাছ থেকেও । [ইবন কাসীর] أَكَادُ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কেয়ামত-আখেরাতের ভাবনা দিয়ে মানুষকে ঈমান ও সৎকাজে উদ্বুদ্ধ করা উদ্দেশ্য না হলে আমি কেয়ামত আসবে -একথাও প্রকাশ করতাম না । বিভিন্ন মুফাসসিরের মতে, এর অর্থ কিয়ামতকে এমন গোপন রেখেছি, মনে হয় যেন আমি আমার নিজের কাছেই গোপন রাখছি । অথচ আল্লাহ্‌র কাছে কোন কিছুই গোপন নেই ।[ইবন কাসীর] যেমন, অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, “আসমানসমূহ ও যমীনে সেটা ভারী বিষয় । হঠাৎ করেই তা তোমাদের উপর আসবে ।” [সূরা আল-আ‘রাফ: ১৮৭]

(৩) “যাতে প্রত্যেকেই নিজ কাজ অনুযায়ী ফল লাভ করতে পারে” । এই বাক্যটি آتِيَةٌ শব্দের সাথে সম্পর্কযুক্ত হলে অর্থ সুস্পষ্ট যে, এখানে কেয়ামত আগমনের রহস্য বর্ণনা করা হয়েছে । রহস্য এই যে, দুনিয়া প্রতিদানের স্থান নয় । এখানে কেউ সৎ ও অসৎকর্মের ফল লাভ করে না । কেউ কিছু ফল পেলেও তা তার কর্মের সম্পূর্ণ ফল লাভ নয়- একটি নমুনা হয় মাত্র । তাই এমন দিনক্ষণ আসা অপরিহার্য, যখন প্রত্যেক সৎ ও অসৎকর্মের প্রতিদান ও শাস্তি পুরোপুরি দেয়া হবে । [ইবন কাসীর] পক্ষান্তরে যদি বাক্যটি ﴿أَكَادُ أُخْفِيهَا﴾ এর সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়, তবে অর্থ এই যে, এখানে কেয়ামত ও মৃত্যুর সময়-তারিখ গোপন রাখার রহস্য বর্ণিত হয়েছে । রহস্য এই যে, মানুষ কর্ম-প্রচেষ্টায় নিয়োজিত থাকুক এবং ব্যক্তিগত কেয়ামত তথা মৃত্যু আর বিশ্বজনীন কেয়ামত তথা হাশরের দিনকে দূরে মনে করে গাফেল না হোক । [ফাতহুল কাদীর]

যাবেন[১]।

১৭. 'আর হে মূসা! আপনার ডান হাতে সেটা কী[২]?'

وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَٰمُوسَىٰ ۝١٧

১৮. মূসা বললেন, 'এটা আমার লাঠি; আমি এতে ভর দেই এবং এর দ্বারা আঘাত করে আমি আমার মেষপালের জন্য গাছের পাতা ফেলে থাকি আর এটা আমার অন্যান্য কাজেও লাগে[৩]।'

قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّؤُا۟ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَـَٔارِبُ أُخْرَىٰ ۝١٨

(১) এতে মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-কে লক্ষ্য করে সতর্ক করা হয়েছে যে, আপনি কাফের ও বেঈমানদের কথায় কেয়ামত সম্পর্কে অসাবধানতার পথ বেছে নেবেন না। তাহলে তা আপনার ধ্বংসের কারণ হয়ে যাবে। বলাবাহুল্য, নবী ও রাসূলগণ নিষ্পাপ হয়ে থাকেন। তাদের পক্ষ থেকে এরূপ অসাবধানতার সম্ভাবনা নেই। এতদসত্ত্বেও মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-কে এরূপ বলার আসল উদ্দেশ্য তার উম্মত ও সাধারণ মানুষকে শেখানো। অর্থাৎ তোমরা তাদের অনুসরণ করো না যারা কিয়ামতকে অস্বীকার করে এবং দুনিয়ার চাকচিক্যের মধ্যে পড়ে তাদের রব ও মাওলার নাফরমানিতে লিপ্ত হয়েছে। আর নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে। যারাই তাদের মত হবে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংস হবে। [ইবন কাসীর]

(২) আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন-এর পক্ষ থেকে মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-কে এরূপ জিজ্ঞাসা করা নিঃসন্দেহে তার প্রতি কৃপা, অনুকম্পা ও মেহেরবানীর সূচনা ছিল, যাতে বিস্ময়কর দৃশ্যাবলী দেখা ও আল্লাহ্র কালাম শোনার কারণে তার মনে যে ভয়ভীতি ও আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছিল, তা দূর হয়ে যায়। এটা ছিল একটা হৃদ্যতাপূর্ণ সম্বোধন। এছাড়া এ প্রশ্নের আরো একটি রহস্য এই যে, পরক্ষণেই তার হাতের লাঠিকে একটি সাপ বা অজগরে রূপান্তরিত করা উদ্দেশ্য ছিল। তাই প্রথমে তাকে সতর্ক করা হয়েছে যে, আপনার হাতে কি আছে দেখে নিন। তিনি যখন দেখে নিলেন যে, সেটা কাঠের লাঠি মাত্র, তখন একে সাপে রূপান্তরিত করার মু'জিযা প্রদর্শন করা হল। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] নতুবা মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর মনে এরূপ সম্ভাবনাও থাকতে পারত যে, আমি বোধহয় রাতের অন্ধকারে লাঠির স্থলে সাপই ধরে এনেছি। সুতরাং জ্ঞান লাভ করার বা জানার জন্য এ প্রশ্ন ছিল না।

(৩) মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-কে শুধু এতটুকু প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, হাতে কি? এ প্রশ্নটির উদ্দেশ্য হাতের বস্তুটির নাম কি? অথবা হাতের বস্তুটি কোন কাজে লাগে। এ দু'ধরনের প্রশ্ন উদ্দেশ্য হতে পারে। মূসা আলাইহিস সালাম অত্যন্ত আদবের কারণে দু সম্ভাবনার জবাবই প্রদান করেছেন। প্রথমে বলেছেন, এটা লাঠি। তারপর কি কাজে লাগে সেটার জওয়াবও দিয়েছেন যে, এটার উপর আমি ভর দেই। এটা

قَالَ اَلْقِهَا يٰمُوْسٰى ⑲

১৯. আল্লাহ্ বললেন, 'হে মূসা! আপনি তা নিক্ষেপ করুন ।'

فَاَلْقٰىهَا فَاِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعٰى ⑳

২০. তারপর তিনি তা নিক্ষেপ করলেন, সঙ্গে সঙ্গে সেটা সাপ[১] হয়ে ছুটতে লাগল,

قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيْدُهَا سِيْرَتَهَا الْاُوْلٰى ㉑

২১. আল্লাহ্ বললেন, 'আপনি তাকে ধরুন, ভয় করবেন না, আমরা এটাকে তার আগের রূপে ফিরিয়ে দেব ।

وَاضْمُمْ يَدَكَ اِلٰى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ

২২. 'এবং আপনার হাত আপনার বগলের[২]

দিয়ে আমি পাতা ঝেড়ে ছাগলকে দেই । এতে করে তিনি জানালেন যে, এটা মানুষের যেমন কাজে লাগে তেমনি জীব-জন্তুরও কাজে লাগে । [সা'দী] কোন কোন মুফাসসির বলেন, এর জবাব লাঠি বলাই যথেষ্ট ছিল । কিন্তু মূসা এ প্রশ্নের যে লম্বা জবাব দিলেন তাতে মহব্বত এবং পরিপূর্ণ আদবের পারাকাষ্ঠা প্রকাশ পেয়েছে । মহব্বতের দাবী এই যে, আল্লাহ্ যখন অনুকম্পাবশতঃ মনোযোগ দান করেছেন, তখন বক্তব্য দীর্ঘ করা উচিত, যাতে এই সুযোগ দ্বারা অধিকতর উপকৃত হওয়া যায় । কিন্তু সাথে সাথে আদবের দাবী এই যে, সীমাতিরিক্ত নিঃসঙ্কোচ হয়ে বক্তব্য অধিক দীর্ঘও না হওয়া চাই । এই দ্বিতীয় দাবীর প্রতি লক্ষ্য রেখে উপসংহারে সংক্ষেপে বলেছেনঃ "আর এটা আমার অন্যান্য কাজেও লাগে" । এরপর তিনি সেসব কাজের বিস্তারিত বিবরণ দেননি । [আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

(১) মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর হাতের লাঠি আল্লাহ্‌র নির্দেশে নিক্ষেপ করার পর তা সাপে পরিণত হয় । এই সাপ সম্পর্কে কুরআনুল কারীমের এক জায়গায় বলা হয়েছে ﴿كَاَنَّهَا جَآنٌّ﴾ [সূরা আন-নামলঃ ১০, সূরা আল-কাসাসঃ ৩১] আরবী অভিধানে দ্রুত নড়াচড়াকারী সরু সাপকে جَآنٌّ বলা হয় । অন্য জায়গায় বলা হয়েছে ﴿فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ﴾ [সূরা আল-আ'রাফঃ ১০৭, সূরা আশ-শু'আরাঃ ৩২] অজগর ও বৃহৎ মোটা সাপকে ثُعْبَانٌ বলা হয় । আলোচ্য আয়াতে حَيَّةٌ বলা হয়েছে, এটা ব্যাপক শব্দ । প্রত্যেক ছোট-বড়, মোটা-সরু সাপকে حَيَّةٌ বলা হয় । সাপটির অবয়ব ও আকৃতি সম্পর্কিত বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করার অর্থ সম্ভবতঃ এই যে, এটি চিকন সাপের ন্যায় দ্রুতগতিসম্পন্ন ছিল বলে جَآنٌّ বলা হত । আর আকারে বড় হওয়ায় লোকেরা দেখে ভীষণভাবে ভীত হত বলে ثُعْبَانٌ বলা হত । [ইবন কাসীর]

(২) মূলে ব্যবহৃত হয়েছে جناح শব্দটি । جناح আসলে জন্তুর পাখাকে বলা হয় । কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে তার বাজু বা পার্শ্বদেশের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় । পাখা বা ডানা এজন্য বলা হয়েছে কারণ, এটি তার জন্য ডানার স্থান । [ফাতহুল কাদীর] এটি এখানে

سُوۡٓءٍ اٰيَةً اُخۡرٰی ﴿۲۲﴾

সাথে মিলিত করুন, তা আরেক নিদর্শনস্বরূপ নির্মল উজ্জ্বল হয়ে বের হবে ।

لِنُرِيَكَ مِنۡ اٰيٰتِنَا الۡكُبۡرٰی ﴿۲۳﴾

২৩. 'এটা এ জন্যে যে, আমরা আপনাকে আমাদের মহানিদর্শনগুলোর কিছু দেখাব ।

اِذۡهَبۡ اِلٰی فِرۡعَوۡنَ اِنَّهٗ طَغٰی ﴿۲۴﴾

২৪. 'ফির'আউনের কাছে যান, সে তো সীমালংঘন করেছে[১] ।'

দ্বিতীয় রুকূ'

قَالَ رَبِّ اشۡرَحۡ لِیۡ صَدۡرِیۡ ﴿۲۵﴾

২৫. মূসা বললেন[২], 'হে আমার রব! আমার

উদ্দেশ্য নিজের বাহু অর্থাৎ বগলের নীচে হাত রেখে যখন বের করবে, তখন তা চাঁদের আলোর ন্যায় ঝলমল করতে থাকবে । ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে এর এরূপ তাফসীরই বর্ণিত আছে । [কুরতুবী; ইবন কাসীর]

(১) অর্থাৎ মিসরের বাদশা ফির'আউনের কাছে যান । যার কাছ থেকে পালিয়ে এসেছেন, তাকে একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদাতের দিকে আহ্বান জানান । আর তাকে বলুন, যেন বনী ইসরাঈলের সাথে ভাল ব্যবহার করে । তাদেরকে যেন শাস্তি না দেয় । কেননা সে সীমালঙ্ঘন করেছে, বাড়াবাড়ি করেছে, দুনিয়াকে প্রাধান্য দিয়েছে এবং মহান রবকে ভুলে গেছে । [ইবন কাসীর]

(২) মূসা 'আলাইহিস্ সালাম যখন আল্লাহ্‌র কালাম লাভের গৌরব অর্জন করলেন এবং নবুওয়াত ও রেসালাতের দায়িত্ব লাভ করলেন, তখন তিনি নিজ সত্তা ও শক্তির উপর ভরসা ত্যাগ করে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলারই দারস্থ হলেন । কারণ, তাঁরই সাহায্যে এই মহান পদের দায়িত্ব পালন করা সম্ভবপর । এ কাজে যেসব বিপদাপদ ও বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হওয়া অপরিহার্য, সেগুলো হাসিমুখে বরণ করার মনোবলও আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকেই পাওয়া যেতে পারে । অর্থাৎ আমার মনে এ মহান দায়িত্বভার বহন করার মতো হিম্মত সৃষ্টি করে দিন । আমার উৎসাহ-উদ্দীপনা বাড়িয়ে দিন । আমাকে এমন ধৈর্য, দৃঢ়তা, সংযম, সহনশীলতা, নির্ভীকতা ও দুর্জয় সংকল্প দান করুন যা এ কাজের জন্য প্রয়োজন । ইবন কাসীর বলেন, এর কারণ, তাকে আল্লাহ্ এমন এক গুরু দায়িত্ব দিয়ে পাঠাচ্ছেন এমন এক লোকের কাছে, যে তখনকার সময়ে যমীনের বুকে সবচেয়ে বেশী অহংকারী, দাম্ভিক, কুফরিতে চরম, সৈন্য-সামন্ত যার অগণিত । বহু বছর থেকে যার রাজত্ব চলে আসছে, তার ক্ষমতার দম্ভে সে দাবী করে বসেছে যে, আল্লাহকে চেনে না । তার প্রজারা তাকে ছাড়া আর কাউকে ইলাহ বলে মানে না । তিনি তার ঘরেই ছোট বেলায় লালিত-পালিত হয়েছিলেন । তাদেরই একজনকে হত্যা

বক্ষ সম্প্রসারিত করে দিন(১)।

২৬. 'এবং আমার কাজ সহজ করে দিন(২)। وَيَسِّرْ لِيٓ أَمْرِي ۝٢٦

২৭. 'আর আমার জিহ্‌বার জড়তা দূর করে দিন--- وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي ۝٢٧

২৮. 'যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে(৩)। يَفْقَهُوا قَوْلِي ۝٢٨

করে পালিয়েছিলেন। এতকিছুর পর আবার তার কাছেই ফিরে যাচ্ছেন তাওহীদের দাওয়াত নিয়ে। একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদাতের দাওয়াত দিতে যাচ্ছেন। সুতরাং তার তো প্রচুর দো'আ করা প্রয়োজন। [ইবন কাসীর] তাই তিনি আল্লাহ্‌র দরবারে পাঁচটি বিষয়ে দো'আ করলেন। যার বর্ণনা সামনে আসছে।

(১) প্রথম দো'আ, হে আমার রব, আমার বক্ষ ঈমান ও নবুওয়াত দিয়ে প্রশস্ত ও আলোকিত করে দিন। [কুরতুবী] অন্য আয়াতে বলেছেন "এবং আমার বক্ষ সংকুচিত হয়ে পড়ছে" [সূরা আশ-শু'আরা: ১৩] এভাবে তিনি তার অপারগতা ও প্রার্থনা প্রকাশ করলেন। [ফাতহুল কাদীর] অর্থাৎ অন্তরে এমন প্রশস্ততা দান করুন যেন নবুওয়াতের জ্ঞান বহন করার উপযোগী হয়ে যায়। ঈমানের দাওয়াত মানুষের কাছে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে তাদের পক্ষ থেকে যে কটু কথা শুনতে হয়, তা সহ্য করাও এর অন্তর্ভুক্ত।

(২) দ্বিতীয় দো'আ, আমার কাজ সহজ করে দিন। এই উপলব্ধি ও অন্তর্দৃষ্টিও নবুওয়াতেরই ফলশ্রুতি ছিল যে, কোন কাজের কঠিন হওয়া অথবা সহজ হওয়া বাহ্যিক চেষ্টা-চরিত্রের অধীন নয়। এটাও আল্লাহ্ তা'আলারই দান। তিনি যদি ইচ্ছা করেন তবে কারো জন্য কঠিনতর ও গুরুতর কাজ সহজ করে দেন এবং তিনি ইচ্ছা করলে সহজতর কাজও কঠিন হয়ে যায়। এ কারণেই হাদীসে মুসলিমদেরকে নিম্নোক্ত দো'আ শিক্ষা দেয়া হয়েছে। তারা নিজেদের কাজের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে এভাবে দো'আ করবেঃ "হে আল্লাহ্! আপনি যা সহজ করে দেন তা ব্যতীত কোন কিছুই সহজ নেই। আর আপনি চাইলে পেরেশানীযুক্ত কাজও সহজ করে দেন।"[সহীহ ইবনে হিব্বানঃ ৩/২৫৫, হাদীস নং ৯৭৪]

(৩) তৃতীয় দো'আ, আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দিন, যাতে লোকেরা আমার কথা বুঝতে পারে। কারণ রিসালাত ও দাওয়াতের জন্য স্পষ্টভাষী ও বিশুদ্ধভাষী হওয়াও একটি জরুরী বিষয়। মূসা 'আলাইহিস্ সালাম হারূনকে রিসালাতের কাজে সহকারী করার যে দো'আ করেছেন, তাতে একথাও বলেছেন যে, "হারূন আমার চাইতে অধিক বিশুদ্ধভাষী।" [সূরা আল-কাসাসঃ ৩৪] এ থেকে জানা যায় যে, ভাষাগত

২৯. ‘আর আমার জন্য করে দিন একজন সাহায্যকারী আমার স্বজনদের মধ্য থেকে(১);

وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ﴿٢٩﴾

৩০. ‘আমার ভাই হারূনকে;

هَارُونَ أَخِي ﴿٣٠﴾

৩১. ‘তার দ্বারা আমার শক্তি সুদৃঢ় করুন,

اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي ﴿٣١﴾

৩২. ‘এবং তাকে আমার কাজে অংশীদার করুন(২),

وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ﴿٣٢﴾

কিছু একটা সমস্যা তার মধ্যে ছিল। এছাড়া ফির‘আউন মূসা ‘আলাইহিস্ সালাম-এর চরিত্রে যেসব দোষারোপ করেছিল; তন্মধ্যে একটি ছিল এই, “সে তার বক্তব্য পরিস্কারভাবে ব্যক্ত করতে পারে না”। [সূরা আয-যুখরুফঃ ৫২] মূসা ‘আলাইহিস্ সালাম তার দো‘আয় জিহ্বার জড়তা এতটুকু দূর করার প্রার্থনা জানিয়েছিলেন, যতটুকুতে লোকেরা তার কথা বুঝতে পারে। বলাবাহুল্য, সে পরিমাণ জড়তা দূর করে দেয়া হয়েছিল। [দেখুন, ইবন কাসীর]

(১) চতুর্থ দো‘আ, আমার পরিবারবর্গ থেকেই আমার জন্য একজন উযীর করুন। এই দো‘আটি রিসালাতের করণীয় কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্য উপায়াদি সংগ্রহ করার সাথে সম্পর্ক রাখে। মূসা ‘আলাইহিস্ সালাম সাহায্য করতে সক্ষম এমন একজন উযীর নিযুক্তিকে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান উপায় সাব্যস্ত করেছেন। ইবন আব্বাস বলেন, সাথে সাথে হারূনকে নবী হিসেবে গ্রহণ করেছেন। [ইবন কাসীর] অভিধানে উযীরের অর্থই বোঝা বহনকারী। রাষ্ট্রের উযীর তার বাদশাহ্‌র বোঝা দায়িত্ব সহকারে বহন করেন। তাই তাকে উযীর বলা হয়। [ফাতহুল কাদীর] এ থেকে মূসা ‘আলাইহিস্ সালাম-এর পরিপূর্ণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায় যে, তিনি তার উপর অর্পিত বিরাট দায়িত্ব পালন করার জন্য একজন উযীর চেয়ে নিয়েছেন। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ ‘আল্লাহ্ তা‘আলা যখন কোন ব্যক্তির হাতে রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা অর্পণ করেন এবং চান যে, সে ভাল কাজ করুক এবং সুচারুরূপে রাষ্ট্র পরিচালনা করুক, তখন তার সাহায্যের জন্য একজন সৎ উযীর দান করেন। রাষ্ট্রপ্রধান কোন জরুরী কাজ ভুলে গেলে তিনি তাকে স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি যে কাজ করতে চান, উযীর তাতে সাহায্য করেন।’ [নাসায়ীঃ ৪২০৪]

(২) পঞ্চম দো‘আ হচ্ছে, হারূনকে নবুওয়াত ও রিসালাতেও শরীক করুন। মূসা ‘আলাইহিস্ সালাম তার দো‘আয় প্রথমে অনির্দিষ্টভাবে বলেছেন যে, উযীর আমার পরিবারভুক্ত লোক হওয়া চাই। অতঃপর নির্দিষ্ট করে বলেছেন যে, আমি যাকে উযীর করতে চাই, তিনি আমার ভাই হারূন- যাতে রিসালাতের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে আমি তার কাছ থেকে শক্তি অর্জন করতে পারি। হারূন ‘আলাইহিস্ সালাম মূসা ‘আলাইহিস্

كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا ﴿٣٣﴾

৩৩. 'যাতে আমরা আপনার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে পারি প্রচুর,

وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا ﴿٣٤﴾

৩৪. 'এবং আমরা আপনাকে স্মরণ করতে পারি বেশী পরিমাণ[১]।

إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا ﴿٣٥﴾

৩৫. 'আপনি তো আমাদের সম্যক দ্রষ্টা।'

قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَٰمُوسَىٰ ﴿٣٦﴾

৩৬. তিনি বললেন, 'হে মূসা! আপনি যা চেয়েছেন তা আপনাকে দেয়া হলো[২]।

وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰٓ ﴿٣٧﴾

৩৭. 'আর আমরা তো আপনার প্রতি আরো একবার অনুগ্রহ করেছিলাম[৩];

সালাম থেকে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং মূসার পূর্বেই মারা যান। বর্ণিত আছে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা একবার উমরায় বের হলে পথিমধ্যে এক বেদুঈনের মেহমান হলেন। তিনি তখন দেখলেন, তাদের একজন তার সাথীদের প্রশ্ন করছে, দুনিয়াতে কোন ভাই তার ভাইয়ের সবচেয়ে বড় উপকার করেছে? তারা বলল, জানি না। লোকটা বলল, মূসা। যখন সে তার ভাইয়ের জন্য নবুওয়াত চেয়ে নিল। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি বললাম, সত্য বলেছে। আর এজন্যই আল্লাহ্ তার প্রশংসায় বলেছেন, "আর আল্লাহ্‌র কাছে তিনি মর্যাদাবান।" [সূরা আল-আহযাব: ৬৯] [ইবন কাসীর]

(১) অর্থাৎ হারূনকে উযীর ও নবুওয়াতে অংশীদার করলে এই উপকার হবে যে, আমরা বেশী পরিমাণে আপনার যিক্‌র ও পবিত্রতা বর্ণনা করতে পারব। তিনি বুঝতে পারলেন যে, সমস্ত ইবাদাতের প্রাণ হচ্ছে যিকির। তাই তিনি তার ভাইকে সহ এটা করার সুযোগ দানের দো'আ করলেন। [সা'দী]

(২) এ পর্যন্ত পাঁচটি দো'আ সমাপ্ত হল পরিশেষে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এসব দো'আ কবুল হওয়ার সুসংবাদ দান করা হয়েছে অর্থাৎ হে মূসা! আপনি যা যা চেয়েছেন, সবই আপনাকে প্রদান করা হল। [দেখুন, ইবন কাসীর]

(৩) মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-কে এ সময় বাক্যালাপের গৌরবে ভূষিত করা হয়েছে, নবুওয়াত ও রিসালাত দান করা হয়েছে এবং বিশেষ বিশেষ মু'জিযা প্রদান করা হয়েছে। এর সাথে সাথে আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে তাকে সেসব নেয়ামতও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, যেগুলো জন্মের প্রারম্ভ থেকে এ যাবত তার জন্য ব্যয়িত হয়েছে। উপর্যুপরি পরীক্ষা এবং প্রাণনাশের আশংকার মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা বিস্ময়কর পন্থায় তার জীবন রক্ষা করেছেন। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

إِذْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰٓ ﴿٣٨﴾

৩৮. 'যখন আমরা আপনার মাকে জানিয়েছিলাম যা ছিল জানাবার[১],

أَنِ ٱقْذِفِيهِ فِى ٱلتَّابُوتِ فَٱقْذِفِيهِ فِى ٱلْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمُّ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّى وَعَدُوٌّ لَّهُۥ ۚ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّى وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِىٓ ﴿٣٩﴾

৩৯. 'যে, তুমি তাকে সিন্দুকের মধ্যে রাখ, তারপর তা দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও[২] যাতে দরিয়া তাকে তীরে ঠেলে দেয়[৩], ফলে তাকে আমার শত্রু ও তার শত্রু নিয়ে যাবে[৪]। আর আমি আমার কাছ থেকে আপনার উপর ভালবাসা ঢেলে দিয়েছিলাম[৫], আর যাতে আপনি আমার চোখের সামনে

---

(১) বলা হয়েছে, 'জানিয়েছিলাম যা ছিল জানাবার'। তবে যে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তা হলঃ وحي। এ ওহী ছিল ইলহামের আকারে। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা অন্তরে বিষয়টি জাগ্রত করে দেন এবং তাকে নিশ্চিত করে দেন যে, এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই। অথবা তাকে স্বপ্নে দেখিয়েছিলেন। অথবা ফিরিশ্‌তার মাধ্যমেও জানিয়ে থাকতে পারেন। [ফাতহুল কাদীর]

(২) ফির'আউন তার সিপাহীদেরকে ইস্‌রাঈলী নবজাতক শিশুদেরকে হত্যা করার আদেশ দিয়ে রেখেছিল। তাই সিপাহীদের কবল থেকে রক্ষা করার জন্য তার মাতাকে ওহীর মাধ্যমে বলা হল যে, তাকে একটি সিন্দুকে রেখে দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও এবং তার ধ্বংসের আশংকা করো না। আমি তাকে হেফাজতে রাখব এবং শেষে তোমার কাছেই ফিরিয়ে দেব। [ইবন কাসীর]

(৩) আয়াতে এক আদেশ মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর মাতাকে দেয়া হয়েছে যে, এই শিশুকে সিন্দুকে পুরে দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও। দ্বিতীয় আদেশ নির্দেশসূচকভাবে দরিয়াকে দেয়া হয়েছে যে, সে যেন এই সিন্দুককে তীরে নিক্ষেপ করে দেয়। [ফাতহুল কাদীর]

(৪) অর্থাৎ এই সিন্দুক ও তন্মধ্যস্থিত শিশুকে সমুদ্র তীর থেকে এমন ব্যক্তি কুড়িয়ে নেবে, যে আমার ও মূসার উভয়ের শত্রু; অর্থাৎ ফির'আউন। [ফাতহুল কাদীর]

(৫) এখানে مَحَبَّةً শব্দটি আদরণীয় হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ্ বলেনঃ আমি নিজ কৃপা ও অনুগ্রহে আপনার অস্তিত্বের মধ্যে আদরণীয় হওয়ার গুণ নিহিত রেখেছি। ফলে যে-ই আপনাকে দেখত, সে-ই আদর করতে বাধ্য হত। ইবনে আব্বাস ও ইকরামা থেকে এরূপ তাফসীরই বর্ণিত হয়েছে। অন্য অর্থ হচ্ছে, আপনার শত্রুর কাছে আপনাকে আদরণীয় বানিয়ে দিয়েছি। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

প্রতিপালিত হন[১] ।'

إِذْ تَمْشِيٓ أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُۥ ۖ فَرَجَعْنَٰكَ إِلَىٰٓ أُمِّكَ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَٰكَ مِنَ ٱلْغَمِّ وَفَتَنَّٰكَ فُتُونًا ۚ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِىٓ أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَٰمُوسَىٰ ﴿٤٠﴾

৪০. 'যখন আপনার বোন চলছিল, অতঃপর সে গিয়ে বলল, 'আমি কি তোমাদেরকে এমন একজনের সন্ধান দেব যে এ শিশুর দায়িত্বভার নিতে পারবে?' অতঃপর আমরা আপনাকে আপনার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলাম যাতে তার চোখ জুড়ায় এবং সে দুঃখ না পায়; আর আপনি এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন; অতঃপর আমরা আপনাকে মনঃকষ্ট থেকে মুক্তি দেই এবং আমরা আপনাকে বহু পরীক্ষা করেছি[২] । হে মূসা! তারপর আপনি কয়েক বছর মাদ্ইয়ানবাসীদের মধ্যে অবস্থান করেছিলেন, এর পরে আপনি নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হলেন ।

وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِى ﴿٤١﴾

৪১. 'এবং আমি আপনাকে আমার নিজের

(১) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা ছিল যে, মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর উত্তম লালন-পালন সরাসরি আল্লাহ্র তত্ত্বাবধানে হবে । তাই মিসরের সর্ববৃহৎ ব্যক্তিত্ব বাদশাহ ফির'আউনের গৃহে এই উদ্দেশ্য এমনভাবে সাধন হয়েছে যে, সে জানত না নিজের হাতে নিজেরই দুশমনকে লালন-পালন করছে । তার খাবার ছিল বাদশাহর খাবার । এটাই ছিল তৈরী করার অর্থ [ইবন কাসীর] এখানে عيني দ্বারা এও অর্থ হবে যে, আমার চোখের সামনে । এতে আল্লাহ্র জন্য চোখ থাকার গুণ সাব্যস্ত হবে । বিভিন্ন সহীহ্ হাদীসেও আল্লাহ্ তা'আলার এ গুণটি প্রমানিত ।

(২) অর্থাৎ আমরা বার বার আপনাকে পরীক্ষা করেছি অথবা আপনাকে বার বার পরীক্ষায় ফেলেছি । সম্ভবত: মূসা আলাইহিসসালামের জীবনের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনাপঞ্জীর দিকেই এখানে সামষ্টিকভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে । ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে এতদসংক্রান্ত এক বিরাট বর্ণনা কোন কোন হাদীস ও তাফসীর গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে । সম্ভবত এর দ্বারা মূসা আলাইহিস সালামের মনকে শক্ত করা উদ্দেশ্য যে, যেভাবে আমরা আপনাকে বিগত সময়ে পরীক্ষা করেছি এবং সমস্ত পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ করেছি, সেভাবে সামনেও সাহায্য করব, সুতরাং আপনার চিন্তিত হওয়ার কারণ নেই । [ফাতহুল কাদীর]

জন্য প্রস্তুত করে নিয়েছি[১]।

৪২. 'আপনি ও আপনার ভাই আমার নিদর্শনসহ যাত্রা করুন এবং আমার স্মরণে শৈথিল্য করবেন না[২],

اِذْهَبْ اَنْتَ وَاَخُوْكَ بِاٰيٰتِيْ وَلَا تَنِيَا فِيْ ذِكْرِيْ ۝٤٢

৪৩. 'আপনারা উভয়ে ফির'আউনের কাছে যান, সে তো সীমালংঘন করেছে।

اِذْهَبَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ۝٤٣

৪৪. 'আপনারা তার সাথে নরম কথা বলবেন[৩], হয়ত সে উপদেশ গ্রহণ

فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى ۝٤٤

(১) অর্থাৎ আপনাকে আমার ওহী ও রিসালাত বহনের জন্য তৈরী করে নিয়েছি, যাতে আমার ইচ্ছামত সমস্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন। [ইবন কাসীর] যাজ্জাজ বলেন, এর অর্থ, আমার দলীল-প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠা করার জন্য আপনাকে আমি পছন্দ করে নিয়েছি। আর আপনাকে আমার ও আমার বান্দাদের মধ্যে ওহী ও রিসালাতের বাহক হিসেবে নির্ধারণ করছি। এতে আপনি তাদের কাছে যখন প্রচার করবেন, তখন যেন সেটা আমিই প্রচার করছি ও আহ্বান জানাচ্ছি ও দলীল-প্রমাণাদি পেশ করছি।[ফাতহুল কাদীর] এ ভাবেই মহান আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাদের পছন্দ করেন তাদেরকে নিজের করে তৈরী করেন। যাতে করে পরবর্তী দায়িত্বের জন্য যোগ্য বিবেচিত হন। অন্যত্র বলা হয়েছে, "নিশ্চয় আল্লাহ্ আদমকে, নূহকে ও ইব্‌রাহীমের বংশধর ও 'ইমরানের বংশধরকে বিশ্বজগতে মনোনীত করেছেন।" [সূরা আলে-ইমরান: ৩৩]

(২) এর এক অর্থ হচ্ছে, আমার ওহী ও রিসালাত প্রচারে কোন প্রকার দেরী করবেন না। [ফাতহুল কাদীর] অর্থাৎ আপনারা দু'জন আমার স্মরণ কখনও পরিত্যাগ করবেন না। ফির'আউনের কাছে যাওয়ার সময়ও যিকির করবেন, যাতে করে যিকির আপনাদের জন্য তাকে মোকাবিলার সময় সহায়ক ভূমিকা পালন করে। [ইবন কাসীর]

(৩) অর্থাৎ আপনাদের দাওয়াত হবে নরম ভাষায়, যাতে তা তার অন্তরে প্রতিক্রিয়া করে এবং দাওয়াত সফল হয়। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন, "আপনি মানুষকে দা'ওয়াত দিন আপনার রবের পথে হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা" [সূরা আন-নাহল: ১২৫] এ আয়াতে দাওয়াত প্রদানকারীদের জন্য বিরাট শিক্ষা রয়েছে। সেটা হচ্ছে, ফির'আউন হচ্ছে সবচেয়ে বড় দাম্ভিক ও অহংকারী, আর মূসা হচ্ছেন আল্লাহ্র পছন্দনীয় লোকদের অন্যতম। তারপরও ফির'আউনকে নরম ভাষায় সম্বোধন করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। [ইবন কাসীর] এতে বুঝা যাচ্ছে যে, প্রতিপক্ষ যতই অবাধ্য এবং ভ্রান্ত বিশ্বাস ও চিন্তাধারার বাহক হোক না কেন, তার সাথেও সংস্কার ও পথ প্রদর্শনের কর্তব্য পালনকারীদের হিতাকাংখার ভঙ্গিতে নম্রভাবে কথাবার্তা বলতে হবে। এরই ফলশ্রুতিতে সে কিছু চিন্তা-ভাবনা করতে বাধ্য হতে পারে এবং তার অন্তরে আল্লাহ্র ভয় সৃষ্টি হতে পারে।

করবে অথবা ভয় করবে[১]।’

৪৫. তারা বলল, ‘হে আমাদের রব! আমরা আশংকা করি সে আমাদের উপর বাড়াবাড়ি করবে অথবা অন্যায় আচরণে সীমালংঘন করবে[২]।’

قَالَا رَبَّنَآ إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَآ أَوْ أَن يَطْغَىٰ ۝٤٥

৪৬. তিনি বললেন, ‘আপনারা ভয় করবেন না, আমি তো আপনাদের সঙ্গে আছি[৩], আমি শুনি ও আমি দেখি।’

قَالَ لَا تَخَافَآ إِنَّنِى مَعَكُمَآ أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ۝٤٦

(১) মানুষ সাধারণতঃ দু’ভাবে সঠিক পথে আসে। সে নিজে বিচার-বিশ্লেষণ করে বুঝে-শুনে ও উপদেশবাণীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে সঠিক পথ অবলম্বন করে, অথবা অশুভ পরিণামের ভয়ে সোজা হয়ে যায়। তাই আয়াতে ফির‘আউনের জন্য দুটি সম্ভাবনাই উল্লেখ করা হয়েছে। অন্য আয়াতে মূসা আলাইহিস সালাম কিভাবে সে নরম পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন সেটার বর্ণনা এসেছে। তিনি বলেছিলেন, “আপনার কি আগ্রহ আছে যে, আপনি পবিত্র হবেন--- ‘আর আমি আপনাকে আপনার রবের দিকে পথপ্রদর্শন করি যাতে আপনি তাঁকে ভয় করেন?” [সূরা আন-নাযি‘আত: ১৮-১৯] এ কথাটি অত্যন্ত নরম ভাষা। কেননা, প্রথমে পরামর্শের মত তাকে বলা হয়েছে যে, আপনার কি আগ্রহ আছে? কোন জোর নয়, আপনার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। দ্বিতীয়ত বলা হচ্ছে যে, আপনি পবিত্র হবেন, এটা বলা হয়নি যে, আমি আপনাকে পবিত্র করব। তৃতীয়তঃ তার রবের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন, যিনি তাকে লালন পালন করেছেন। [সা‘দী]

(২) ﴿إِنَّنَا نَخَافُ﴾ মূসা ও হারূন ‘আলাইহিমাস্ সালাম এখানে আল্লাহ্ তা‘আলার সামনে দুই প্রকার ভয় প্রকাশ করেছেন। এক ভয় ﴿أَن يَفْرُطَ﴾ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। এর অর্থ সীমালংঘন করা। উদ্দেশ্য এই যে, ফির‘আউন সম্ভবতঃ আমাদের বক্তব্য শ্রবণ করার আগেই ক্ষমতার অহমিকায় উত্তেজিত হয়ে উঠবে এবং অনাকাঙ্খিত কিছু করে বসবে। [ইবন কাসীর] দ্বিতীয় ভয় ﴿أَن يَطْغَىٰ﴾ শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছেন। এর উদ্দেশ্য এই যে, সম্ভবতঃ সে আপনার শানে অসমীচীন কথাবার্তা বলে আরো বেশী অবাধ্যতা প্রদর্শন করবে। অথবা তাড়াতাড়ি আক্রমন করে বসবে। অথবা আমাদের উপর তার হাত প্রসারিত করবে। ইবন আব্বাস বলেন, এর অর্থ সীমালঙ্ঘন করবে। [ইবন কাসীর]

(৩) আল্লাহ্ তা‘আলা বলেনঃ আমি তোমাদের সাথে আছি। আমি সব শুনব এবং দেখব। আল্লাহ্ তা‘আলা আরশের উপর আছেন, এটাই একজন মুমিনের আক্বীদা-বিশ্বাস। কিন্তু আল্লাহ্ তা‘আলা কুরআনের বিভিন্ন স্থানে তাঁর সঠিক বান্দা ও সৎলোকদের সাথে আছেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। আহ্‌লে সুন্নত ওয়াল জামা‘আতের আক্বীদা

فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَاءِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ ﴿٤٧﴾

৪৭. সুতরাং আপনারা তার কাছে যান এবং বলুন, 'আমরা তোমার রব-এর রাসূল, কাজেই আমাদের সাথে বনী ইস্‌রাঈলকে যেতে দাও এবং তাদেরকে কষ্ট দিও না, আমরা তো তোমার কাছে এনেছি তোমার রব-এর কাছ থেকে নিদর্শন। আর যারা সৎপথ অনুসরণ করে তাদের প্রতি শান্তি।

إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿٤٨﴾

৪৮. 'নিশ্চয় আমাদের প্রতি ওহী পাঠানো হয়েছে যে, শাস্তি তো তার জন্য যে মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়।'

قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَا مُوسَىٰ ﴿٤٩﴾

৪৯. ফির'আউন বলল, 'হে মূসা! তাহলে কে তোমাদের রব[১]?'

অনুসারে সে সমস্ত আয়াতে সঙ্গে থাকার অর্থ সাহায্য করা। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সাহায্য ও সহযোগিতা তাদের সাথে থাকবে। পরবর্তী বাক্য, "আমি শুনি ও আমি দেখি"ও এ কথা প্রমাণ করে যে, এখানে সহযোগিতার মাধ্যমে সংগে থাকা বোঝানো হয়েছে। [দেখুন, ইবন কাসীর]

(১) ফির'আউনের এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল, তোমরা দু'জন আবার কাকে রব বানিয়ে নিয়েছো, মিসর ও মিসরবাসীদের রব তো আমিই। অন্যত্র এসেছে, সে বলেছিল, "আমি তোমাদের প্রধান রব।" [সূরা আন-নাযি'আত:২৪] অন্যত্র বলেছে, "হে আমার জাতি! মিসরের রাজত্বের মালিক কি আমি নই? আর এ নদীগুলো কি আমার নীচে প্রবাহিত হচ্ছে না?" [সূরা আয-যুখরুফ: ৫১] আরও বলেছিল, "হে জাতির সরদারগণ! আমি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ আছে বলে আমি জানি না। হে হামান! কিছু ইট পোড়াও এবং আমার জন্য একটি উঁচু ইমারত নির্মাণ করো। আমি উপরে উঠে মূসার ইলাহকে দেখতে চাই।" [সূরা আল-কাসাস:৩৮] অন্য সূরায় সে মূসাকে ধমক দিয়ে বলেঃ "যদি আমাকে ছাড়া আর কাউকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করলে আমি তোমাকে কয়েদিদের অন্তর্ভুক্ত করবো।" [সূরা আশ-শু'আরা: ২৯] এভাবে সে প্রকাশ্যে একজন ইলাহের অস্বীকার করছিল যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, সবকিছুর মালিক। [ইবন কাসীর] আসলে সে একথা মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না যে, অন্য কোন সত্তা তার উপর কর্তৃত্ব করবে, তার প্রতিনিধি এসে তাকে

৫০. মূসা বললেন, 'আমাদের রব তিনি, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার সৃষ্টি আকৃতি দান করেছেন, তারপর পথনির্দেশ করেছেন(১) ।'

قَالَ رَبُّنَا الَّذِيٓ أَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى ۝٥٠

৫১. ফির'আউন বলল, 'তাহলে অতীত যুগের লোকদের অবস্থা কী(২)?'

قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُوْنِ الْأُوْلٰى ۝٥١

হুকুম দেবে এবং তার কাছে এ হুকুমের আনুগত্য করার দাবী জানাবে। মূলতঃ ফির'আউন সর্বেশ্বরবাদী লোক ছিল। সে মনে করত যে, তার মধ্যে ইলাহ ভর করেছে। আত্মগর্ব, অহংকার ও ঔদ্ধত্যের কারণে প্রকাশ্যে আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করতো এবং নিজে ইলাহ ও উপাস্য হবার দাবীদার ছিল। [এর জন্য বিস্তারিত দেখুন, ইবন তাইমিয়্যা, ইকতিদায়ুস সিরাতিল মুস্তাকীম: ২/৩৯১; মাজমু ফাতাওয়া: ২/১২৪; ২/২২০; ৬/৩১৪; ৮/৩০৮]

(১) আয়াতের কয়েকটি অর্থ হতে পারে। এক. তিনি প্রতিটি বস্তুর জোড়া সৃষ্টি করেছেন। দুই. মানুষকে মানুষই বানাচ্ছেন, গাধাকে গাধা, ছাগলকে ছাগল। তিন. তিনি প্রতিটি বস্তুর সুনির্দিষ্ট আকৃতি দিয়েছেন। চার. প্রতিটি সৃষ্টিকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তৈরী করেছেন। পাঁচ. প্রতিটি সৃষ্টিকে তার জন্য যা উপযোগী সে রকম সৃষ্টিরূপ দিয়েছেন। সুতরাং মানুষের জন্য গৃহপালিত জন্তুর কোন সৃষ্টিরূপ দেননি। গৃহপালিত জন্তুকে কুকুরের কোন অবস্থা দেননি। কুকুরকে ছাগলের বৈশিষ্ট্য দেননি। প্রতিটি বস্তুকে তার অনুপাতে বিয়ে ও তার জন্য যা উপযুক্ত সেটার ব্যবস্থা করেছেন। সৃষ্টি, জীবিকা ও বিয়ে-শাদীর ব্যাপারে কোন কিছুকে অপর কোন কিছুর মত করেননি। [ইবন কাসীর] ছয়. তিনি প্রতিটি বস্তুকেই যেটা তার জন্য ভাল সেটার জ্ঞান দিয়েছেন। তারপর সে ভাল জিনিসটার দিকে কিভাবে যেতে হবে সেটা দেখিয়ে দিয়েছেন। [ফাতহুল কাদীর] সাত. কোন কোন মুফাসসির বলেন, আয়াতের অর্থ, আল্লাহ্‌র বাণী "আর যিনি নির্ধারণ করেন অতঃপর পথনির্দেশ করেন" [সূরা আল-আ'লা: ৩] এর মত, তখন এর দ্বারা অর্থ হবে, আল্লাহ্ প্রতিটি বস্তুর তাকদীর নির্ধারণ করেছেন, তারপর সেটাকে সে তাকদীরের দিকে চলার জন্য পথ দেখান। তিনি কার্যাবলী, আয়ূ ও রিযিক লিখে নিয়েছেন। সে হিসেবে সমস্ত সৃষ্টিকুল চলছে। এর ব্যতিক্রম করার সুযোগ কারও নেই। এর থেকে বের হওয়াও কারও পক্ষে সম্ভব নয়। মূসা বললেন, আমাদের রব তো তিনিই, যিনি প্রতিটি সৃষ্টিকে সৃষ্টি করেছেন, তাকদীর নির্ধারণ করেছেন এবং সৃষ্টিকুলকে তাঁর ইচ্ছা অনুসারে চালাচ্ছেন। [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ ব্যাপার যদি এটাই হয়ে থাকে যে, যিনি প্রত্যেকটি জিনিসকে আকৃতি দিয়েছেন এবং তাকে দুনিয়ায় কাজ করার পথ বাতলে দিয়েছেন তিনি ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন রব নেই, তাহলে এ আমাদের সবার বাপ দাদারা, যারা বংশ পরম্পরায় ভিন্ন প্রভূ ও ইলাহর বন্দেগী করে চলে এসেছে তোমাদের দৃষ্টিতে তাদের অবস্থান কোথায় হবে?

৫২. মূসা বললেন, 'এর জ্ঞান আমার রব-এর নিকট কিতাবে রয়েছে, আমার রব ভুল করেন না এবং বিস্মৃতও হন না[১] ।'

قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَٰبٍ ۖ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى ۝٥٢

৫৩. 'যিনি তোমাদের জন্য যমীনকে করেছেন বিছানা এবং তাতে করে দিয়েছেন তোমাদের জন্য চলার পথ, আর তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন ।' অতঃপর তা দিয়ে আমরা বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ উৎপন্ন করি[২] ।

ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِۦٓ أَزْوَٰجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ ۝٥٣

তারা সবাই কি গোমরাহ ছিল? তারা সবাই কি আযাবের হকদার হয়ে গেছে? এ ছিল ফির'আউনের কাছে মূসার এ যুক্তির জবাব ।হতে পারে সে আসলেই তার পূর্বপুরুষদের ব্যাপারে জানতে চেয়েছিল । [ইবন কাসীর] অথবা ফির'আউন আগের প্রশ্নের উত্তরে হতবাক হয়ে প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্য এ প্রশ্ন করেছিল । [ফাতহুল কাদীর] অথবা সে নিজের সভাসদ ও সাধারণ মিসরবাসীদের মনে মূসার দাওয়াতের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করাও এর উদ্দেশ্য হতে পারে । সে মূসা আলাইহিসসালামের বিরুদ্ধে লোকদের ক্ষেপিয়ে তুলতে চাচ্ছিল । কারণ, মানুষ তাদের পিতামাতার ব্যাপারে যখন এটা শুনবে যে, তারা জাহান্নামে গেছে, তখন তারা মূসা আলাইহিসসালামের বিরুদ্ধে জোট করতে দ্বিধা করবে না ।

(১) এটি মূসার সে সময় প্রদত্ত একটি অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ জবাব । তিনি বলেন, তারা যাই কিছু ছিল, নিজেদের কাজ করে আল্লাহর কাছে পৌঁছে গেছে । তাদের কার্যাবলী এবং কাজের পেছনে নিহিত অন্তরের ইচ্ছাসমূহ জানার কোন উপায় নেই । কাজেই তাদের ব্যাপারে আমি কোন সিদ্ধান্ত দেই কেমন করে? তাদের সমস্ত রেকর্ড আল্লাহর কাছে সংরক্ষিত আছে । তাদের প্রতিটি পদক্ষেপ ও তার কারণসমূহের খবর আল্লাহই জানেন । কোন জিনিস আল্লাহর দৃষ্টির বাইরে থাকেনি এবং তাঁর স্মৃতি থেকেও কোন জিনিস বিলুপ্ত হয়ে যায়নি । আল্লাহই জানেন তাদের সাথে কি ব্যবহার করতে হবে । ছোট বড় কোন কিছুই তাঁর জ্ঞানের বাইরে নেই । সাধারণত: মানুষের জ্ঞানে দু' ধরণের সমস্যা থাকে । এক. সবকিছু জানা সম্ভব হয় না । দুই. জানার পরে ভুলে যাওয়া । কিন্তু আমার রব এ দু'টি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত । [দেখুন, ইবন কাসীর]

(২) এটি মূসা আলাইহিস সালামের ভাষণেরই বাকী অংশ । ফির'আউন রব সম্পর্কে যে প্রশ্ন করেছিল এ ছিল সে প্রশ্নের উত্তরের অবশিষ্ট অংশ । এখানে মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ্‌র অন্যান্য গুণাগুণ বর্ণনা করছেন । মাঝখানে ফির'আউনের এক প্রশ্ন

৫৪. তোমরা খাও ও তোমাদের গবাদি পশু চরাও; অবশ্যই এতে নিদর্শন আছে বিবেকসম্পন্নদের জন্য[১]।

كُلُوْا وَارْعَوْا اَنْعَامَكُمْ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي النُّهٰى ﴿٥٤﴾

তৃতীয় রুকূ'

৫৫. আমরা মাটি থেকে[২] তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তাতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেব এবং তা থেকেই পুনর্বার তোমাদেরকে বের করব[৩]।

مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى ﴿٥٥﴾

ও তার উত্তর গত হয়েছে। [ইবন কাসীর] অথবা আগের আয়াতে বর্ণিত "আমার রব তিনি যিনি ভুলেন না", এখানে যে রবের কথা বলেছেন সে রবের পরিচয় দিচ্ছেন। [ফাতহুল কাদীর] মোটকথা: এখানে মূসা আলাইহিস সালাম তার রবের পরিচয় তুলে ধরে বলছেন যে, আমার রব তো তিনি যিনি যমীনকে বসবাসের উপযোগী করেছেন, এখানে মানুষ অবস্থান করে, ঘুমায়, এর পিঠে ভ্রমন করে। এর মধ্যে রাস্তা ও পথ তৈরী করেছেন, যাতে মানুষ তাতে চলাফেরা করে। তারপর যমীনের বিবিধ নেয়ামত উল্লেখ করছেন। তাতে তিনি উদ্ভিদের অগণিত প্রকার সৃষ্টি করেছেন। মানুষ এসব প্রকার গণনা করে শেষ করতে পারে না। এরপর লতা-গুল্ম, ফল-ফুল ও বৃক্ষ ইত্যাদি সৃষ্টি করেছেন। এগুলোর স্বাদ, গন্ধ, রূপ বিভিন্ন প্রকার। এসব বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ মানুষ ও তাদের পালিত জন্তু এবং বন্য জন্তুদের খোরাক অথবা ভেষজ হয়ে থাকে। এদের কাঠ গৃহনির্মাণে এবং গৃহে ব্যবহরোপযোগী হাজারো রকমের আসবাবপত্র নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। [দেখুন, ইবন কাসীর]

(১) এতে আল্লাহ্ তা'আলার অপার শক্তির অনেক নিদর্শন রয়েছে বিবেকবানদের জন্য। نهى শব্দটি ناهية-এর বহুবচন। [ফাতহুল কাদীর] বিবেককে ناهية (নিষেধকারক) বলার কারণ এই যে, বিবেক মানুষকে মন্দ ও ক্ষতিকর কাজ থেকে নিষেধ করে। [ফাতহুল কাদীর] অর্থাৎ যারা ভারসাম্যপূর্ণ সুস্থ বিবেক বুদ্ধি ব্যবহার করে এ নিদের্শনাবলী তাদেরকে একথা জানিয়ে দেবে যে, এ বিশ্ব-জাহানের একজন রব আছেন এবং সমগ্র রবুবিয়াত ও ইলাহী কর্তৃত্ব একমাত্র তাঁরই হাতে কেন্দ্রীভূত। অন্য কোন রবের জন্য এখানে কোন অবকাশই নেই। আর তিনিই একমাত্র মা'বুদ, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। [দেখুন, ইবন কাসীর]

(২) منها শব্দের সর্বনাম দ্বারা মাটি বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, আমি তোমাদেরকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি। কারণ মানুষের মূল এবং সবার পিতা হলেন আদম 'আলাইহিস্ সালাম তিনি মাটি থেকে সৃষ্টি হয়েছেন। [ইবন কাসীর]

(৩) অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিকে অনিবার্যভাবে তিনটি পর্যায় অতিক্রম করতে হবে। একটি পর্যায় হচ্ছে, বর্তমান জগতে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত, দ্বিতীয় পর্যায়টি মৃত্যু থেকে

وَلَقَدْ أَرَيْنَٰهُ ءَايَٰتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ ﴿٥٦﴾

৫৬. আর আমরা তো তাকে আমাদের সমস্ত নিদর্শন দেখিয়েছিলাম(১); কিন্তু সে মিথ্যারোপ করেছে এবং অমান্য করেছে।

قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَٰمُوسَىٰ ﴿٥٧﴾

৫৭. সে বলল, 'হে মূসা! তুমি কি আমাদের কাছে এসেছ তোমার জাদু দ্বারা আমাদেরকে দেশ থেকে বহিস্কার করে দেয়ার জন্য(২)?

কেয়ামত পর্যন্ত এবং তৃতীয়টি হচ্ছে কিয়ামতের দিন পুনর্বার জীবিত হবার পরের পর্যায়। এই আয়াতের দৃষ্টিতে এ তিনটি পর্যায়ই অতিক্রান্ত হবে এ যমীনের উপর। যমীন থেকে তাদের শুরু। তারপর মৃত্যুর পর যমীনেই তাদের ঠাঁই। আর যখন সময় হবে তখন এখান থেকেই তাদেরকে পুনরুত্থান ঘটানো হবে। [ইবন কাসীর] আল্লাহ্ বলেন, "যেদিন তিনি তোমাদেরকে ডাকবেন , এবং তোমরা তাঁর প্রশংসার সাথে তাঁর ডাকে সাড়া দেবে এবং তোমরা মনে করবে, তোমরা অল্পকালই অবস্থান করেছিলে।" [সূরা আল-ইসরা: ৫২] আলোচ্য আয়াতটি অন্য একটি আয়াতের মত, যেখানে বলা হয়েছে, "তিনি বললেন, 'সেখানেই তোমরা জীবন যাপন করবে এবং সেখানেই তোমরা মারা যাবে। আর সেখান থেকেই তোমাদেরকে বের করা হবে।" [সূরা আল-আ'রাফ: ২৫]

(১) অর্থাৎ তাওহীদ ও নবুওয়তের যাবতীয় নিদর্শন আমরা তাকে দেখিয়েছিলাম।[কুরতুবী] পৃথিবী ও প্রাণী জগতের যুক্তি-প্রমাণসমূহের নিদর্শনাবলী এবং মূসাকে প্রদত্ত যাবতীয় মু'জিযাও সে প্রত্যক্ষ করেছে। ফির'আউনকে বুঝাবার জন্য মূসা আলাইহিসসালাম যেসব ভাষণ দিয়েছিলেন কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় সেগুলো বর্ণিত হয়েছে এবং তাকে একের পর এক যেসব মু'জিযা দেখানো হয়েছিল সেগুলোও কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু সেগুলোর প্রতি সে মিথ্যারোপ করেছিল। সে তা করেছিল সম্পূর্ণরূপে গোঁড়ামী ও অহংকারবশত [ইবন কাসীর] আল্লাহ্ বলেন, "আর তারা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলো প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তর এগুলোকে নিশ্চিত সত্য বলে গ্রহণ করেছিল । সুতরাং দেখুন, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল!" [সূরা আন-নামল: ১৪]

(২) জাদু বলতে এখানে বুঝানো হয়েছে লাঠি ও সাদা হাতকে। সূরা আল-আ'রাফ ও সূরা আশ-শু'আরায় এসেছে যে, মূসা প্রথম সাক্ষাতের সময় প্রকাশ্য দরবারে একথা পেশ করেছিলেন। এ মু'জিযা দেখে ফির'আউন যেরকম দিশেহারা হয়ে পড়েছিল তা কেবলমাত্র তার এ একটি বাক্য থেকেই আন্দাজ করা যেতে পারে যে, "তোমার জাদুর জোরে তুমি আমাদের দেশ থেকে আমাদের বের করে দিতে চাও।"এসব

فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَآ أَنتَ مَكَانًا سُوًى ﴿٥٨﴾

৫৮. 'তাহলে আমরাও অবশ্যই তোমার কাছে উপস্থিত করব এর অনুরূপ জাদু, কাজেই আমাদের ও তোমার মধ্যে স্থির কর এক নির্দিষ্ট সময় এক মধ্যবর্তী স্থানে, যার ব্যতিক্রম আমরাও করব না এবং তুমিও করবে না ।'

قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى ﴿٥٩﴾

৫৯. মূসা বললেন, 'তোমাদের নির্ধারিত সময় হলো উৎসবের দিন এবং যাতে সকালেই জনগণকে সমবেত করা হয়[১] ।'

فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ ﴿٦٠﴾

৬০. অতঃপর ফির'আউন প্রস্থান করে তার যাবতীয় কৌশলসমূহ একত্র করল[২], তারপর সে আসল ।

মু'জিযা নয়, জাদু এবং আমার রাজ্যের প্রত্যেক জাদুকরই এভাবে লাঠিকে সাপ বানিয়ে দেখাতে পারে । সুতরাং তুমি যা দেখাচ্ছ তা যেন তোমাকে প্রতারিত না করে । [ইবন কাসীর]

(১) ফির'আউনের উদ্দেশ্য ছিল, একবার জাদুকরদের লাঠি ও দড়িদড়ার সাহায্যে সাপ বানিয়ে দেখিয়ে দেই তাহলে মূসার মু'জিযার যে প্রভাব লোকদের উপর পড়েছে তা তিরোহিত হয়ে যাবে । মূসাও মনেপ্রাণে এটাই চাচ্ছিলেন । তিনি বললেন, এ জন্য কোন পৃথক দিন ও স্থান নির্ধারণ করার দরকার নেই । উৎসবের দিন কাছেই এসে গেছে । সারা দেশের লোক এদিন রাজধানীতে চলে আসবে । সেদিন যেখানে জাতীয় মেলা অনুষ্ঠিত হবে সেই ময়দানেই এই প্রতিযোগিতা হবে । সমগ্র জাতিই এ প্রতিযোগিতা দেখবে । আর সময়টাও এমন হতে হবে যখন দিনের আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে, যাতে কারো সন্দেহ ও সংশয় প্রকাশ করার কোন অবকাশই না থাকে ।

(২) ফির'আউন ও তার সভাসদদের দৃষ্টিতে এই প্রতিযোগিতার গুরুত্ব ছিল অনেক বেশী । সারা দেশে লোক পাঠানো হয় । যেখানে যে অভিজ্ঞ-পারদর্শী জাদুকর পাওয়া যায় তাকেই সংগে করে নিয়ে আসার হুকুম দেয়া হয় । এভাবে জনগণকে হাযির করার জন্যও বিশেষভাবে প্রেরণা দান করা হয় । এভাবে বেশী বেশী লোক একত্র হয়ে যাবে, তারা স্বচক্ষে জাদুর তেলেসমাতি দেখে মূসার লাঠির ভয় ও প্রভাব থেকে নিজেদেরকে সংরক্ষিত রাখতে পারবে ।

৬১. মূসা তাদেরকে বলল, 'দূর্ভোগ তোমাদের! তোমরা আল্লাহ্‌র ওপর মিথ্যা আরোপ করো না। করলে, তিনি তোমাদেরকে শাস্তি দ্বারা সমূলে ধ্বংস করবেন। আর যে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে সে-ই ব্যর্থ হয়েছে[১]।'

قَالَ لَهُمْ مُّوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ ﴿٦١﴾

৬২. তখন তারা নিজেদের মধ্যে নিজেদের কাজ সম্বন্ধে বিতর্ক করল[২] এবং তারা গোপনে পরামর্শ করল।

فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ ﴿٦٢﴾

৬৩. তারা বলল, 'এ দুজন অবশ্যই জাদুকর, তারা চায় তাদের জাদু দ্বারা তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বহিস্কার করতে[৩] এবং

قَالُوا إِنْ هَٰذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ ﴿٦٣﴾

---

(১) মু'জিযা দ্বারা জাদুর মোকাবেলা করার পূর্বে মূসা 'আলাইহিস্ সালাম জাদুকরদের কয়েকটি বাক্য বলে আল্লাহ্‌র আযাবের ভয় প্রদর্শন করলেন। তিনি বললেনঃ তোমাদের ধ্বংস অত্যাসন্ন। আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যারোপ করো না। অর্থাৎ তোমরা জাদু দিয়ে কোন কিছু সৃষ্টি করেছ বলে দাবী করবে অথচ তোমরা সৃষ্টি করতে পার না। এভাবে তোমরা আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যারোপ করবে। [ইবন কাসীর] অথবা মূসা আলাইহিস সালাম এখানেও দ্বীনের দাওয়াত দিতে ছাড়েননি। তিনি বললেন, তোমরা আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যারোপ করে তাঁর সাথে ফির'আউন অথবা অন্য কাউকে শরীক করো না। আর মু'জিযাগুলোকে জাদু বলো না। [কুরতুবী] এরূপ করলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে আযাব দ্বারা পিষ্ট করে দেবেন এবং তোমাদেরকে সমূলে উৎপাটিত করে দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করে, পরিণামে সে ব্যর্থ ও বঞ্চিত হয়।

(২) মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর এসব বাক্য শ্রবণ করে জাদুকরদের কাতার ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এবং তাদের মধ্যে তীব্র মতভেদ দেখা দিল। কারণ, এ জাতীয় কথাবার্তা কোন যাদুকরের মুখে উচ্চারিত হতে পারে না। এগুলো আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই মনে হয়। তাই তাদের কেউ কেউ বললঃ এদের মোকাবেলা করা সমীচীন নয়। আবার কেউ কেউ নিজের মতেই অটল রইল। [ইবন কাসীর]

(৩) উদ্দেশ্য এই যে, এরা দু'জন বড় জাদুকর। জাদুর সাহায্যে তোমাদের রাজ্য অধিকার করতে চায় এবং তোমাদের সর্বোত্তম ধর্মকে মিটিয়ে দিতে চায়। সুতরাং সেটার মোকাবিলায় সর্বশক্তি নিয়োগ কর। [দেখুন, ইবন কাসীর]

তোমাদের উৎকৃষ্ট জীবন পদ্ধতি ধ্বংস করতে[১]।

৬৪. 'অতএব তোমরা তোমাদের কৌশল (জাদুক্রিয়া) জোগাড় কর, তারপর সারিবদ্ধ হয়ে উপস্থিত হও। আর আজ যে জয়ী হবে সে-ই সফল হবে[২]।'

فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا ۚ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ ﴿٦٤﴾

৬৫. তারা বলল, 'হে মূসা! হয় তুমি নিক্ষেপ কর নতুবা আমরাই প্রথম নিক্ষেপকারী হই[৩]।'

قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ﴿٦٥﴾

৬৬. মূসা বললেন, 'বরং তোমরাই নিক্ষেপ কর।' অতঃপর তাদের জাদু-প্রভাবে হঠাৎ মূসার মনে হল তাদের দড়ি ও লাঠিগুলো ছুটোছুটি করছে[৪]।

قَالَ بَلْ أَلْقُوا ۖ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ﴿٦٦﴾

---

(১) অর্থাৎ এরা জাদুকর। তারা সমস্ত জাদুকরদের পরাজিত করে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে চায়। তারা তোমাদের কওমের সর্দার এবং সেরা লোক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে খতম করে দিতে চায়। কাজেই তাদের মোকাবেলায় তোমরা তোমাদের পূর্ণ কলাকৌশল ও শক্তি ব্যয় করে দাও এবং সব জাদুকর সারিবদ্ধ হয়ে এক যোগে তাদের মোকাবেলায় অবতীর্ণ হও। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে আয়াতের অর্থ এই বর্ণিত হয়েছে যে, এরা দু'জন তোমাদের মধ্যকার ভালো লোক যাদেরকে তোমরা কাজে খাটাতে পার এমন লোক অর্থাৎ বনী ইসরাইলদেরকে নিয়ে চলে যেতে চায়। [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ এদের মোকাবিলায় সংযুক্ত মোর্চা গঠন করো। তাই জাদুকররা সারিবদ্ধ হয়ে মোকাবেলা করল। [ইবন কাসীর]

(৩) জাদুকররা তাদের ভ্রূক্ষেপহীনতা ফুটিয়ে তোলার জন্য প্রথমে মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-কে বললঃ প্রথমে আপনি নিজের কলাকৌশল প্রদর্শন করবেন, না আমরা করব? মূসা 'আলাইহিস্ সালাম জবাবে বললেনঃ بَلْ أَلْقُوا অর্থাৎ প্রথমে আপনারাই নিক্ষেপ করুন এবং জাদুর লীলা প্রদর্শন করুন। জাদুকররা মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর কথা অনুযায়ী তাদের কাজ শুরু করে দিল এবং তাদের বিপুল সংখ্যক লাঠি ও দড়ি একযোগে মাটিতে নিক্ষেপ করল। সবগুলো লাঠি ও দড়ি দৃশ্যতঃ সাপ হয়ে ইতস্ততঃ ছুটোছুটি করতে লাগল। [ইবন কাসীর]

(৪) এ থেকে জানা যায় যে, ফির'আউনী জাদুকরদের জাদু ছিল এক প্রকার নযরবন্দী, যা মেসমেরিজমের মাধ্যমেও সম্পন্ন হয়ে যায়। লাঠি ও দড়িগুলো দর্শকদের দৃষ্টিতেই

৬৭. তখন মূসা তার অন্তরে কিছু ভীতি অনুভব করলেন[১]।

فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَىٰ ۝٦٧

৬৮. আমরা বললাম, 'ভয় করবেন না, আপনিই উপরে থাকবেন।

قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَىٰ ۝٦٨

৬৯. 'আর আপনার ডান হাতে যা আছে তা নিক্ষেপ করুন, এটা তারা যা করেছে তা খেয়ে ফেলবে[২]। তারা যা করেছে তা তো শুধু জাদুকরের কৌশল। আর জাদুকর যেখানেই আসুক, সফল হবে না।'

وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا ۖ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ ۖ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ ۝٦٩

৭০. অতঃপর জাদুকরেরা সিজ্‌দাবনত হল[৩], তারা বলল, 'আমরা হারূন ও মূসার রব-এর প্রতি ঈমান আনলাম।'

فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ ۝٧٠

নযরবন্দীর কারণে সাপরূপে দৃষ্টিগোচর হয়েছে; প্রকৃতপক্ষে এগুলো সাপ হয়নি। অধিকাংশ জাদু এরূপই হয়ে থাকে। [ইবন কাসীর]

(১) মনে হচ্ছে, যখনই মূসার মুখ থেকে "নিক্ষেপ করো" শব্দ বের হয়েছে তখনই জাদুকররা অকস্মাৎ নিজেদের লাঠিসোটা ও দড়িদড়াগুলো তাঁর দিকে নিক্ষেপ করে দিয়েছে এবং হঠাৎই তাঁর চোখে ভেসে উঠেছে যেন শত শত সাপ কিলবিল করতে করতে তাঁর দিকে দৌড়ে চলে আসছে। [ইবন কাসীর] এ দৃশ্য দেখে মূসা আলাইহিস্‌সালাম তাৎক্ষণিকভাবে এ আশংকা করলেন যে, মু'জিযার সাথে এতটা সাদৃশ্যপূর্ণ দৃশ্য দেখে জনসাধারণ নিশ্চয়ই বিভ্রাটে পড়ে যাবে এবং তাদের পক্ষে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কঠিন হয়ে পড়বে। [ইবন কাসীর]

(২) মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-কে ওহীর মাধ্যমে বলা হল যে, আপনার ডান হাতে যা আছে তা নিক্ষেপ করুন। মূসা 'আলাইহিস্ সালাম তার লাঠি নিক্ষেপ করতেই তা একটি বিরাট অজগর সাপ হয়ে যাদুর সাপগুলোকে গিলে ফেলল। [ইবন কাসীর]

(৩) অর্থাৎ মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর লাঠি যখন অজগর হয়ে তাদের কাল্পনিক সাপগুলোকে গ্রাস করে ফেলল, তখন জাদুবিদ্যা বিশেষজ্ঞ জাদুকরদের বুঝতে বাকী রইল না যে, এ কাজ জাদুর জোরে হতে পারে না; বরং নিঃসন্দেহে এটা মু'জিযা, যা একান্তভাবে আল্লাহ্‌র কুদরতে প্রকাশ পায়। তাই তারা হঠাৎ স্বতস্ফূর্তভাবে সিজদাবনত হয়, যেন কেউ তাদেরকে উঠিয়ে নিয়ে ফেলে দিয়েছে। এ অবস্থায়ই তারা ঘোষণা করলঃ আমরা মূসা ও হারূনের পালনকর্তার প্রতি ঈমান আনলাম। [ইবন কাসীর]

قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۚ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِيْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۚ فَلَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّلَاُوصَلِّبَنَّكُمْ فِيْ جُذُوْعِ النَّخْلِ ۫ وَلَتَعْلَمُنَّ اَيُّنَآ اَشَدُّ عَذَابًا وَّاَبْقٰى ۝٧١

৭১. ফির'আউন বলল, 'আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেয়ার আগেই তোমরা মূসার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে! সে তো তোমাদের প্রধান যে তোমাদেরকে জাদু শিক্ষা দিয়েছে[১]। কাজেই আমি তো তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কাটবই[২] এবং আমি তোমাদেরকে খেজুর গাছের কাণ্ডে শূলিবিদ্ধ করবই[৩] আর তোমরা অবশ্যই জানতে পারবে আমাদের

(১) সূরা আল-আ'রাফে বলা হয়েছেঃ "এটি একটি ষড়যন্ত্র, তোমরা শহরে বসে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে লোকদেরকে এখান থেকে হটিয়ে দেবার জন্য এ ষড়যন্ত্র করেছো।" এখানে এ উক্তিটির বিস্তারিত বর্ণনা আবার এভাবে দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের মধ্যে যে শুধু পারস্পরিক যোগসাজশ আছে তাই নয় বরং মনে হচ্ছে এ মূসা তোমাদের দলের গুরু। তোমরা মু'জিযার কাছে পরাজিত হওনি বরং নিজেদের গুরুর জাদুর পাতানো খেলার কাছে পরাজিত হয়েছো। বুঝা যাচ্ছে, তোমরা নিজেদের মধ্যে এ মর্মে পরামর্শ করে এসেছো যে, নিজেদের গুরুর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে এবং একে তার নবুওয়াতের প্রমাণ হিসেবে পেশ করবে। [দেখুন, ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ ফির'আউন জাদুকরদেরকে কঠোর শাস্তির হুমকি দিল যে, তোমাদের হস্তপদ এমনভাবে কাটা হবে যে, ডান হাত কেটে বাম পা কাটা হবে। সম্ভবতঃ ফির'আউনী আইনে শাস্তির এই পন্থাই প্রচলিত ছিল অথবা এভাবে হস্তপদ কাটা হলে মানুষের শিক্ষার একটা নমুনা হয়ে যায়। তাই ফির'আউন এই ব্যবস্থাই প্রস্তাব হিসেবে দিয়েছে। বলা হয়ে থাকে সেই সর্বপ্রথম এটা প্রচলন করেছে। [ইবন কাসীর]

(৩) শূলিবিদ্ধ করার প্রাচীন পদ্ধতি ছিল নিম্নরূপঃ একটি লম্বা কড়িকাঠ মাটিতে গেড়ে দেয়া হতো। অথবা পুরাতন গাছের গুড়ি একাজে ব্যবহৃত হতো। এর মাথার উপর একটি তখতা আড়াআড়িভাবে বেঁধে দেয়া হতো। অপরাধীকে উপরে উঠিয়ে তার দুই হাত ছড়িয়ে দিয়ে তখতার গায়ে পেরেক মেরে আটকে দেয়া হতো। এভাবে অপরাধী তখতার সাথে ঝুলতে থাকতো এবং ঘন্টার পর ঘন্টা কাতরাতে কাতরাতে মৃত্যুবরণ করতো। লোকদের শিক্ষালাভের জন্য শূলিদণ্ডপ্রাপ্তকে এভাবে দীর্ঘদিন পর্যন্ত ঝুলিয়ে রাখা হতো। ফির'আউনও তাই বলছিল যে, হস্তপদ কাটার পর তোমাদেরকে খর্জুর বৃক্ষের শূলে চড়ানো হবে। ক্ষুধা ও পিপাসায় না মরা পর্যন্ত তোমরা ঝুলে থাকবে। মুফাসসিরগণ বলেন, এ জন্যই فِيْ শব্দ ব্যবহার করেছে। কারণ, فِيْ দ্বারা স্থায়িত্ব বোঝায়। [ফাতহুল কাদীর]

মধ্যে কার শাস্তি কঠোরতর ও অধিক স্থায়ী[১] ।'

৭২. তারা বলল, 'আমাদের কাছে যে সকল স্পষ্ট নিদর্শন এসেছে তার উপর এবং যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর উপর তোমাকে আমরা কিছুতেই প্রাধান্য দেব না। কাজেই তুমি যা সিদ্ধান্ত নেবার নিতে পার। তুমি তো শুধু এ দুনিয়ার জীবনের উপর কর্তৃত্ব করতে পার[২] ।'

قَالُوْا لَنْ نُّؤْثِرَكَ عَلٰى مَا جَآءَنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالَّذِيْ فَطَرَنَا فَاقْضِ مَآ اَنْتَ قَاضٍ ۭ اِنَّمَا تَقْضِيْ هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۷۲

৭৩. 'আমরা নিশ্চয় আমাদের রব-এর প্রতি ঈমান এনেছি, যাতে তিনি ক্ষমা করেন আমাদের অপরাধ এবং তুমি আমাদেরকে যে জাদু করতে বাধ্য

اِنَّآ اٰمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطٰيٰنَا وَمَآ اَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ۭ وَاللّٰهُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ۷۳

(১) অর্থাৎ মূসা বেশী শাস্তি দিতে পারে নাকি আমি বেশী শাস্তি দিতে পারি। এখানে মূসাকে শাস্তিদাতা হিসেবে উল্লেখ করা এক ধরনের প্রহসন। মূসা আলাইহিস সালাম তাদেরকে শাস্তি দান কেন করবেন? অথবা মূসা আলাইহিস সালাম তাদেরকে কুফরি ও শির্কের উপর থাকলে যে শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে বলেছিলেন এটাকে নিয়েই সে ঠাট্টা করতে আরম্ভ করছিল। অথবা এখানে মূসা বলে মূসার রব বোঝানো হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর]

(২) জাদুকররা ফির'আউনী কঠোর হুমকি ও শাস্তির ঘোষণা শুনে ঈমানের ব্যাপারে এতটুকুও বিচলিত হল না। তারা বললঃ আমরা তোমাকে অথবা তোমার কোন কথাকে ঐসব নিদর্শন ও মু'জিযার উপর প্রাধান্য দিতে পারি না, যেগুলো মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। জগৎ-স্রষ্টা আসমান-যমীনের পালনকর্তাকে ছেড়ে আমরা তোমাকে পালনকর্তা স্বীকার করতে পারি না। ﴿فَاقْضِ مَآ اَنْتَ قَاضٍ﴾ এখন তোমার যা খুশী, আমাদের সম্পর্কে ফয়সালা কর এবং যে সাজার ইচ্ছা দাও। ﴿اِنَّمَا تَقْضِيْ هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا﴾ অর্থাৎ তুমি আমাদেরকে শাস্তি দিলেও তা এই ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবন পর্যন্তই হবে। মৃত্যুর পর আমাদের উপর তোমাদের কোন অধিকার থাকবে না। আল্লাহ্‌র অবস্থা এর বিপরীত। আমরা মৃত্যুর পূর্বেও তাঁর অধিকারে আছি এবং মৃত্যুর পরও থাকব। কাজেই তাঁর শাস্তির চিন্তা অগ্রগণ্য। [দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

করেছ তা[১]। আর আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী।'

৭৪. যে তার রব-এর কাছে অপরাধী হয়ে উপস্থিত হবে তার জন্য তো আছে জাহান্নাম, সেখানে সে মরবেও না, বাঁচবেও না[২]।

إِنَّهُۥ مَن يَأْتِ رَبَّهُۥ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُۥ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ۝٧٤

৭৫. আর যারা তাঁর কাছে সৎকর্ম করে মুমিন অবস্থায় আসবে, তাদের জন্যই রয়েছে উচ্চতম মর্যাদা।

وَمَن يَأْتِهِۦ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَٰتُ ٱلْعُلَىٰ ۝٧٥

৭৬. স্থায়ী জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং এটা তাদেরই পুরস্কার যারা পরিশুদ্ধ হয়।

جَنَّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَآءُ مَن تَزَكَّىٰ ۝٧٦

চতুর্থ রুকূ'

৭৭. আর আমরা অবশ্যই মূসার প্রতি ওহী করেছিলাম এ মর্মে যে, আমার

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى

(১) জাদুকররা এখন ফির'আউনের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করল যে, আমাদেরকে জাদু করতে তুমিই বাধ্য করেছ। নতুবা আমরা এই অর্থহীন কাজের কাছেও যেতাম না। এখন আমরা বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহ্র কাছে এই পাপ কাজেরও ক্ষমা প্রার্থনা করছি। ফির'আউন তার রাজ্যে জাদুশিক্ষা সবার জন্য অথবা কিছু লোকের জন্য বাধ্যতামূলক করে রেখেছিল। সম্ভবত: তারাই এখানে তার উপর দোষ দিচ্ছে। [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকবে। পুরোপুরি মৃত্যু হবে না। যার ফলে তার কষ্ট ও বিপদের সমাপ্তি সূচিত হবে না। আবার জীবনকে মৃত্যুর উপর প্রাধান্য দেবার মতো জীবনের কোন আনন্দও লাভ করবে না। জীবনের প্রতি বিরূপ হবে কিন্তু মৃত্যু লাভ করবে না। মরতে চাইবে কিন্তু মরতে পারবে না। কুরআন মজীদে জাহান্নামের আযাবের যে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে এ অবস্থাটি হচ্ছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী ভয়াবহ। এর কল্পনায়ও হৃদয় মন কেঁপে উঠে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 'আর যারা জাহান্নামের অধিবাসী হিসেবে জাহান্নামে যাবে তারা সেখানে মরবেও না বাঁচবেও না।' [মুসলিম: ১৮৫]

فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَخٰفُ دَرَكًا وَّلَا تَخْشٰى ۝

বান্দাদেরকে নিয়ে রাতে বের হন সুতরাং আপনি তাদের জন্য সাগরের মধ্য দিয়ে এক শুষ্ক পথের ব্যবস্থা করুন, পিছন থেকে এসে ধরে ফেলার আশংকা করবেন না এবং ভয়ও করবেন না[১]।

فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُوْدِهٖ فَغَشِيَهُمْ مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ۝

৭৮. অতঃপর ফির'আউন তার সৈন্যবাহিনীসহ তাদের পিছনে ছুটল, তারপর সাগর তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত করল[২]।

(১) এ সংক্ষিপ্ত কথাটির বিস্তারিত বিবরণ হচ্ছে এই যে, শেষ পর্যন্ত আল্লাহ একটি রাত নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। মূসা সবাইকে নিয়ে লোহিত সাগরের পথ ধরলেন। ফির'আউন একটি বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে ঠিক এমন সময় পৌঁছে গেলো যখন এ কাফেলা সবেমাত্র সাগরের তীরেই উপস্থিত হয়েছিল। মুহাজিরদের কাফেলা ফির'আউনের সেনা দল ও সমুদ্র দ্বারা সম্পূর্ণরূপে ঘেরাও হয়ে গিয়েছিল। [ইবন কাসীর] ঠিক এমনি সময় আল্লাহ মূসাকে হুকুম দিলেন "সমুদ্রের উপর আপনার লাঠি দ্বারা আঘাত করুন।" "তখনই সাগর ফেটে গেলো এবং তার প্রত্যেকটি টুকরা একটি বড় পর্বত শৃংগের মতো দাঁড়িয়ে গেলো।" [সূরা আশ-শু'আরাঃ ৬৩] সহীহ হাদীসে এসেছে, 'রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা আগমন করে দেখতে পেলেন যে, ইয়াহূদীরা মহররমের দশ তারিখ সাওম পালন করছে। তিনি তাদেরকে প্রশ্ন করলে তারা বললো, এ দিন মূসা ফির'আউনের উপর জয় লাভ করেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ আমরা তাদের চেয়েও মূসার বেশী নিকটের সুতরাং তোমরাও সাওম পালন করো।' [বুখারীঃ ৪৭৩৭]

(২) এখানে বলা হয়েছে, সমুদ্র তাকে ও তার সেনাদেরকে ডুবিয়ে মারলো। অন্যত্র বলা হয়েছে, মুহাজিরদের সাগর অতিক্রম করার পর পরই ফির'আউন তার সৈন্য সামন্ত সহ সমুদ্রের বুকে তৈরী হওয়া এ পথে নেমে পড়লো। [সূরা আশ-শু'আরাঃ ৬৩-৬৪] সূরা আল-বাকারায় বলা হয়েছে, বনী ইসরাঈল সমুদ্রের অন্য তীর থেকে ফির'আউন ও তার সেনাদলকে ডুবে যেতে দেখছিল। [৫০] অন্যদিকে সূরা ইউনুসে বলা হয়েছে, ডুবে যাবার সময় ফির'আউন চিৎকার করে উঠলোঃ "আমি মেনে নিয়েছি যে আর কোন ইলাহ নেই সেই ইলাই ছাড়া যাঁর প্রতি বনী ইসরাঈল ঈমান এনেছে এবং আমিও মুসলিমদের অন্তরভুক্ত।"[৯০] কিন্তু এ শেষ মুহূর্তের ঈমান গৃহীত হয়নি এবং জবাব দেয়া হলোঃ "এখন! আর ইতিপূর্বে এমন অবস্থা ছিল যে, নাফরমানীতেই ডুবে ছিলে এবং বিপর্যয় সৃষ্টি করেই চলছিলে। বেশ, আজ আমি তোমার লাশটাকে রক্ষা করছি, যাতে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য শিক্ষণীয় হয়ে থাকে।" [৯১-৯২]

وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ ۝٧٩

৭৯. আর ফির'আউন তার সম্প্রদায়কে পথভ্রষ্ট করেছিল এবং সৎপথ দেখায়নি।

يَٰبَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ قَدْ أَنجَيْنَٰكُم مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَٰعَدْنَٰكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَىٰ ۝٨٠

৮০. হে বনী ইসরাঈল! আমরা তো তোমাদেরকে শত্রু থেকে উদ্ধার করেছিলাম, আর আমরা তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তূর পর্বতের ডান পাশে[১] এবং তোমাদের উপর মান্না ও সাল্ওয়া নাযিল করেছিলাম[২],

كُلُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقْنَٰكُمْ وَلَا تَطْغَوْا۟ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي ۖ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ۝٨١

৮১. তোমাদেরকে আমরা যা রিযিক দান করেছি তা থেকে পবিত্র বস্তুসমূহ খাও এবং এ বিষয়ে সীমালংঘন করো না, করলে তোমাদের উপর আমার ক্রোধ আপতিত হবে। আর যার উপর আমার ক্রোধ আপতিত হবে সে তো ধ্বংস হয়ে যায়।

وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا ثُمَّ ٱهْتَدَىٰ ۝٨٢

৮২. আর আমি অবশ্যই ক্ষমাশীল তার প্রতি, যে তাওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে তারপর সৎপথে

---

(১) অর্থাৎ ফির'আউনের কবল থেকে মুক্তি পাওয়া এবং সমুদ্র পার হওয়ার পর আল্লাহ্ তা'আলা মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-কে এবং তার মধ্যস্থতায় বনী-ইস্রাঈলকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, তারা তূর পর্বতের ডান পার্শ্বে চলে আসুক, যাতে আল্লাহ্ তা'আলা মূসার সাথে কথা বলেন। এখানেই মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহকে দেখতে চেয়েছিলেন এবং তাকে এখানেই তাওরাত দেয়া হয়। [ইবন কাসীর]

(২) এটা তখনকার ঘটনা, যখন বনী-ইস্রাঈল সমুদ্র পার হওয়ার পর সামনে অগ্রসর হয় এবং তাদেরকে একটি পবিত্র শহরে প্রবেশ করার আদেশ দেয়া হয়। তারা আদেশ অমান্য করে। তখন সাজা হিসেবে তাদেরকে তীহ্ নামক উপত্যকায় আটক করা হয়। তারা চল্লিশ বছর পর্যন্ত এ উপত্যকা থেকে বাইরে যেতে সক্ষম হয়নি। এই শাস্তি সত্ত্বেও মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর দো'আয় নানা রকম নেয়ামত বর্ষিত হতে থাকে। 'মান্না' ও 'সালওয়া' ছিল এইসব নেয়ামতের অন্যতম, যা তাদের আহারের জন্যে দেয়া হত। [কুরতুবী]

অবিচল থাকে[১]।

৮৩. হে মূসা! আপনার সম্প্রদায়কে পিছনে ফেলে আপনাকে তাড়াহুড়া করতে বাধ্য করল কে?

وَمَآ اَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يٰمُوْسٰى ﴿٨٣﴾

৮৪. তিনি বললেন, 'তারা তো আমার পিছনেই আছে[২]। আর হে আমার রব! আমি তাড়াতাড়ি আপনার কাছে আসলাম, আপনি সন্তুষ্ট হবেন এ জন্য।'

قَالَ هُمْ اُولَآءِ عَلٰٓى اَثَرِىْ وَعَجِلْتُ اِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضٰى ﴿٨٤﴾

৮৫. তিনি বললেন, 'আমরা তো আপনার সম্প্রদায়কে পরীক্ষায় ফেলেছি আপনার চলে আসার পর। আর সামেরী[৩]

قَالَ فَاِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْۢ بَعْدِكَ وَاَضَلَّهُمُ السَّامِرِىُّ ﴿٨٥﴾

(১) অর্থাৎ মাগফিরাতের জন্য রয়েছে চারটি শর্ত। এক, তাওবা। অর্থাৎ বিদ্রোহ, নাফরমানী অথবা শির্ক ও কুফরী থেকে বিরত থাকা। দুই, ঈমান। অর্থাৎ আল্লাহ ও রাসূল এবং কিতাব ও আখেরাতকে সাচ্চা দিলে মেনে নেয়া। তিনি, সৎকাজ। অর্থাৎ আল্লাহ ও রাসূলের বিধান অনুযায়ী অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়ে ভালো কাজ করা। চার, সত্যপথাশ্রয়ী হওয়া। অর্থাৎ সত্য সঠিক পথে অবিচল থাকা এবং তারপর ভুল পথে না যাওয়া। ইবন আব্বাস বলেন, সন্দেহ না করা। সাঈদ ইবন জুবাইর বলেন, সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা। কাতাদাহ বলেন, মৃত্যু পর্যন্ত ইসলামের উপর থাকা। সুফিয়ান আস-সাওরী বলেন, এর অর্থ সে জানল যে, এগুলোর সওয়াব আছে। [ইবন কাসীর]

(২) আল্লাহ্ তা'আলার উল্লেখিত প্রশ্নের জবাবে মূসা 'আলাইহিস্ সালাম বললেন, আমার সম্প্রদায়ও পেছনে পেছনে আছে। এখানে 'তারা আমার পিছনে' বলে কারও কারও মতে বুঝানো হয়েছে যে, তারা আমার পিছনেই আমাকে অনুসরণ করে আসছে। অপর কারও কারও মতে, তারা আমার পিছনে আমার অপেক্ষায় আছে। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর] কোন কোন মুফাসসির বলেন, এখানে কাওমের সত্তর জন লোকের কথা বলা হচ্ছে যাদেরকে মূসা আলাইহিস সালাম সাক্ষী হিসেবে নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু পর্বতের কাছাকাছি এসে তিনি তাদেরকে রেখে আল্লাহ্র কথা শুনার আগ্রহে তাড়াতাড়ি এসে পড়েছিলেন। [বাগভী] অথবা আমি একটু ত্বরা করে এসে গেছি; কারণ নির্দেশ পালনে অগ্রে অগ্রে থাকা নির্দেশদাতার অধিক সন্তুষ্টির কারণ হয়ে থাকে। আপনাকে খুশী করার জন্যই আমি তাড়াতাড়ি এসেছি।

(৩) কোন কোন মুফাস্সির বলেন, সামেরী কোন ব্যক্তির নাম নয়। বরং সে সময় সামেরী নামে এক গোত্র ছিল এবং তাদের এক বিশেষ ব্যক্তি ছিল বনী ইসরাঈলের মধ্যে স্বর্ণ নির্মিত গো-বৎস পূজার প্রচলনকারী এ সামেরী। সে তাদেরকে গো বৎস পূজার আহ্বান জানিয়েছিল এবং শির্কে নিপতিত করেছিল। [ফাতহুল কাদীর]

তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে।’

৮৬. অতঃপর মূসা তার সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেলেন ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়ে[১]। তিনি বললেন, ‘হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের রব কি তোমাদেরকে এক উত্তম প্রতিশ্রুতি দেননি[২]? তবে কি প্রতিশ্রুতি কাল তোমাদের কাছে সুদীর্ঘ হয়েছে[৩]? না তোমরা

فَرَجَعَ مُوسَىٰٓ إِلَىٰ قَوْمِهِۦ غَضْبَٰنَ أَسِفًا ۚ قَالَ يَٰقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا ۚ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُّمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِى ﴿٨٦﴾

(১) এ বাক্য থেকে বুঝা যাচ্ছে, নিজ সম্প্রদায়কে পেছনে রেখে মূসা আলাইহিসসালাম আল্লাহর সাথে মোলাকাতের আগ্রহের আতিশয্যে আগে চলে গিয়েছিলেন। তূরের ডান পাশে যেখানকার ওয়াদা বনী ইসরাঈলদের সাথে করা হয়েছিল সেখানে তখনো কাফেলা পৌঁছুতে পারেনি। ততক্ষণ মূসা একাই রওয়ানা হয়ে গিয়ে আল্লাহর সামনে হাজিরা দিলেন। এ সময় আল্লাহ ও বান্দার সাথে যা ঘটে তার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে সূরা আল-আ'রাফের ১৪৩-১৪৫ নং আয়াতে। মূসার আল্লাহর সাক্ষাতের আবেদন জানানো এবং আল্লাহর একথা বলা যে, আপনি আমাকে দেখতে পারবেন না তারপর আল্লাহর একটি পাহাড়ের উপর সামান্য তাজাল্লি নিক্ষেপ করে তাকে ভেঙে গুঁড়ো করে দেয়া এবং মূসার বেহুশ হয়ে পড়ে যাওয়া, তারপর পাথরের তখতিতে লেখা বিধান লাভ করা- এসব সেই সময়েরই ঘটনা। এখানে এ ঘটনার শুধুমাত্র বনী ইসরাঈলের গো-বৎস পূজার সাথে সম্পর্কিত অংশটুকুই বর্ণনা করা হয়েছে।

(২) এর দু'টি অর্থ হতে পারেঃ এক, “ভালো ওয়াদা করেননি”ও হতে পারে। তখন অর্থ হবে, তোমাদেরকে শরী‘আত ও আনুগত্যনামা দেবার যে ওয়াদা করা হয়েছিল তোমাদের মতে তা কি কোন কল্যাণ ও হিতসাধনের ওয়াদা ছিল না?। মূলতঃ এই ওয়াদার জন্যই তিনি বনী-ইসরাঈলকে নিয়ে তূর পর্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে রওয়ানা হয়েছিলেন। সেখানে পৌঁছার পর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাওরাত প্রাপ্তির কথা ছিল। বলাবাহুল্য, তাওরাত লাভ করলে বনী-ইসরাঈলের দুনিয়া ও আখেরাতের মঙ্গল এসে যেত। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর] দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, আজ পর্যন্ত তোমাদের রব তোমাদের সাথে যেসব কল্যাণের ওয়াদা করেছেন তার সবই তোমরা লাভ করতে থেকেছো। তোমাদের নিরাপদে মিসর থেকে বের করেছেন। দাসত্ব মুক্ত করেছেন। তোমাদের শত্রুকে তছনছ করে দিয়েছেন। তোমাদের জন্য তাই মরুময় ও পার্বত্য অঞ্চলে ছায়া ও খাদ্যের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এ সমস্ত ভালো ওয়াদা কি পূর্ণ হয়নি? [ইবন কাসীর]

(৩) এর দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, তোমাদের নিকট কি দিনগুলো দীর্ঘতর মনে হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা এই মাত্র যে বিরাট অনুগ্রহ করেছেন, এরপর

চেয়েছ তোমাদের প্রতি আপতিত হোক তোমাদের রব-এর ক্রোধ(১), যে কারণে তোমরা আমাকে দেয়া অঙ্গীকার(২) ভঙ্গ করলে?’

৮৭. তারা বলল, ‘আমরা আপনাকে দেয়া অঙ্গীকার স্বেচ্ছায় ভংগ করিনি(৩); তবে আমাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল লোকের অলংকারের বোঝা। তাই আমরা তা আগুনে নিক্ষেপ করি(৪), অনুরূপভাবে সামিরীও (সেখানে কিছু মাটি) নিক্ষেপ করে।

قَالُوْا مَآ اَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلٰكِنَّا حُمِّلْنَآ اَوْزَارًا مِّنْ زِيْنَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنٰهَا فَكَذٰلِكَ اَلْقَى السَّامِرِيُّ ﴿٨٧﴾

কি অনেক বেশী সময় অতীত হয়ে গেছে যে, তোমরা তাঁকে ভুলে গেলে? তোমাদের বিপদের দিনগুলো কি সুদীর্ঘকাল আগে শেষ হয়ে গেছে যে, তোমরা পাগলের মতো বিপথে ছুটে চলেছো? দ্বিতীয় অনুবাদ এও হতে পারে, “ওয়াদা পূর্ণ হতে কি অনেক বেশী সময় লাগে যে, তোমরা অধৈর্য হয়ে পড়েছো?” অর্থাৎ তাওরাত প্রদানের মাধ্যমে পথনির্দেশনা দেবার যে ওয়াদা করা হয়েছিল তা পূর্ণ হতে তো কোন প্রকার বিলম্ব হয়নি, যাকে তোমরা নিজেদের জন্য ওজর বা বাহানা হিসেবে দাঁড় করাতে পারো। [দেখুন, ইবন কাসীর]

(১) অর্থাৎ ভুলে যাওয়ার অথবা অপেক্ষা করে ক্লান্ত হয়ে যাওয়ার তো কোন সম্ভাবনা নেই; এখন এ ছাড়া আর কি বলা যায় যে, তোমরা নিজেরাই স্বেচ্ছায় এমন কাজ করতে চেয়েছে যা তোমাদের রবের ক্রোধের উদ্রেক করবে? [ফাতহুল কাদীর]

(২) এ ওয়াদা হচ্ছেঃ তিনি তূর থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত আল্লাহ্‌র আনুগত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা। অথবা তাদের কাছ থেকে তিনি ওয়াদা নিয়েছিলেন যে, তোমরা আমার পিছনে পিছনে আস, কিন্তু তারা না এসে সেখানেই অবস্থান করে। [ফাতহুল কাদীর]

(৩) উদ্দেশ্য এই যে, আমরা গো-বৎস পূজায় স্বেচ্ছায় লিপ্ত হইনি; বরং সামেরীর কাজ দেখে বাধ্য হয়েছি। বলাবাহুল্য, তাদের এই দাবী সর্বৈব মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। [দেখুন, ইবন কাসীর] সামেরী অথবা তার কর্ম তাদেরকে বাধ্য করেনি। বরং তারা নিজেরাই চিন্তা-ভাবনার অভাবে তাতে লিপ্ত হয়েছে। তবে এটা সত্য যে, সামেরী তাদের গো-বাছুর পূজার কারণ ছিল।

(৪) যারা সামেরীর ফিতনায় জড়িয়ে পড়েছিল এটি ছিল তাদের ওজর। তাদের বক্তব্য ছিল, আমরা অলংকার ছুঁড়ে দিয়েছিলাম। এরপর যা ঘটেছে তা আসলে এমন ব্যাপারই ছিল যে, সেগুলো দেখে জাতির পথভ্রষ্ট লোকেরা বলতে লাগল যে, এটাই ইলাহ। [ইবন কাসীর]

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُۥ خُوَارٌ فَقَالُوا۟ هَٰذَآ إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِىَ ﴿٨٨﴾

৮৮. 'অতঃপর সে তাদের জন্য গড়লো এক বাছুর, এক অবয়ব, যা হাম্বা রব করত।' তখন তারা বলল, এ তোমাদের ইলাহ্ এবং মূসারও ইলাহ্, অতঃপর সে (মূসা) ভুলে গেছে।(১)

أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴿٨٩﴾

৮৯. তবে কি তারা দেখে না যে, ওটা তাদের কথায় সাড়া দেয় না এবং তাদের কোন ক্ষতি বা উপকার করার ক্ষমতাও রাখে না(২)?

---

(১) এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। এক. মূসা নিজেই তার ইলাহকে ভুলে দূরে খুঁজতে চলে গেছে । দুই. মূসা ভুলে গেছে তোমাদেরকে বলতে যে, এটাই তার ইলাহ। তিন. সামেরী ভুলে গেল যে সে এক সময় ইসলামে ছিল, অতঃপর সে ইসলাম ছেড়ে শির্কে প্রবেশ করল। [ইবন কাসীর]

(২) এ বাক্যে তাদের নির্বুদ্ধিতা ও পথভ্রষ্টতা বর্ণনা করা হয়েছে যে, বাস্তবে যদি একটি গো-বৎস জীবিত হয়ে গরুর মত আওয়াজ করতে থাকে, তবে এই জ্ঞানপাপীদের এই কথা তো চিন্তা করা উচিত ছিল যে, এর সাথে ইলাহ্ হওয়ার কি সম্পর্ক? যে ক্ষেত্রে গো-বৎসটি তাদের কথার কোন জবাব দিতে পারে না এবং তাদের কোন উপকার অথবা ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে না, সে ক্ষেত্রে তাকে ইলাহ্ মেনে নেয়ার নির্বুদ্ধিতার পেছনে কোন যুক্তি আছে কি? ইবন আব্বাস বলেন, এর শব্দ তো আর কিছুই নয় যে, বাতাস এর পিছন দিয়ে ঢুকে সামনে দিয়ে বের হয়। তাতেই আওয়াজ বের হতো। এ মূর্খরা যে ওজর পেশ করেছে তা এতই ঠুনকো ছিল যে তা যে কোন লোকই বুঝতে পারবে। তারা কিবতী কাওমের স্বর্ণালঙ্কার থেকে বাঁচতে চেয়ে সেগুলোকে নিক্ষেপ করল অথচ তারা গো বৎসের পূজা করল। তারা সামান্য জিনিস থেকে বাঁচতে চাইল অথচ বিরাট অপরাধ করল। [ইবন কাসীর] আব্দুল্লাহ ইবন উমর এর কাছে এক লোক এসে বলল, মশার রক্তের বিধান কি? ইবন উমর বললেন, তোমার বাড়ী কোথায়? লোকটি বলল, ইরাকের অধিবাসী। তখন ইবন ওমর বললেন, দেখ ইরাকবাসীদের প্রতি! তারা আল্লাহ্‌র রাসূলের মেয়ের ছেলেকে হত্যা করেছে, আর আমাকে মশার রক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। [বুখারী: ৫৯৯৪]

এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যিনি রব ও ইলাহ হবেন তাঁকে অবশ্যই কথা বলার মত গুণবিশিষ্ট হতে হবে। যার এ গুণ নেই তিনি ইলাহ হওয়ার উপযুক্ত নন। তাই আল্লাহ্ তা'আলাকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত কথাবলার গুণে গুণান্বিত বলে বিশ্বাস করে। এটা এ গুণের স্বপক্ষে একটা দলীল। এটা ছাড়াও কুরআন ও হাদীসে এ বিষয়ে বহু দলীল-প্রমাণাদি রয়েছে।

পঞ্চম রুকূ’

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هٰرُوْنُ مِنْ قَبْلُ يٰقَوْمِ اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهٖ ۚ وَاِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمٰنُ فَاتَّبِعُوْنِىْ وَاَطِيْعُوْٓا اَمْرِىْ ﴿٩٠﴾

৯০. অবশ্য হারূন তাদেরকে আগেই বলেছিলেন, ‘হে আমার সম্প্রদায়! এ দ্বারা তো শুধু তোমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে। আর তোমাদের রব তো দয়াময়; কাজেই তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার আদেশ মেনে চল।’

قَالُوْا لَنْ نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عٰكِفِيْنَ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَيْنَا مُوْسٰى ﴿٩١﴾

৯১. তারা বলেছিল, ‘আমাদের কাছে মূসা ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা কিছুতেই এর পূজা হতে বিরত হব না।’

قَالَ يٰهٰرُوْنُ مَا مَنَعَكَ اِذْ رَاَيْتَهُمْ ضَلُّوْٓا ﴿٩٢﴾

৯২. মূসা বললেন, ‘হে হারূন! আপনি যখন দেখলেন তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে তখন কিসে আপনাকে বাধা দিল ---

اَلَّا تَتَّبِعَنِ ۗ اَفَعَصَيْتَ اَمْرِىْ ﴿٩٣﴾

৯৩. ‘আমার অনুসরণ করা হতে? তবে কি আপনি আমার আদেশ অমান্য করলেন[১]?’

---

(১) হুকুম বলতে এখানে পাহাড়ে যাবার সময় এবং নিজের জায়গায় হারূনকে বনী ইসরাঈলের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত করার পূর্ব মুহূর্তে মূসা তাকে যে হুকুম দিয়েছিলেন সে কথাই বুঝানো হয়েছে। [ইবন কাসীর] অন্যত্র বলা হয়েছেঃ “আর মূসা (যাওয়ার সময়) নিজের ভাই, হারুনকে বললেন, আপনি আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে আমার প্রতিনিধিত্ব করুন এবং সংশোধন করবেন, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পথ অনুসরণ করবেন না।” [আল-আ‘রাফঃ ১৪২] আর অনুসরণের অর্থ সম্পর্কেও দু’টি মত রয়েছে। এক, এখানে অনুসরণের অর্থ, মূসা ‘আলাইহিস্ সালাম-এর কাছে তূর পর্বতে চলে যাওয়া। দুই, কোন কোন মুফাস্সির অনুসরণের এরূপ অর্থ করেছেন যে, তারা যখন পথভ্রষ্ট হয়ে গেল, তখন আপনি তাদের মোকাবেলা করলেন না কেন? কেননা, আমার উপস্থিতিতে এরূপ হলে আমি নিশ্চিতই তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতাম। আপনারও এরূপ করা উচিত ছিল। [ফাতহুল কাদীর]

قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَآءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ﴿٩٤﴾

৯৪. হারূন বললেন, 'হে আমার সহোদর! আমার দাড়ি ও চুল ধরবে না(১)। আমি আশংকা করেছিলাম যে, তুমি বলবে, 'আপনি বনী ইসরাঈলদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছেন ও আমার কথা শুনায় যত্নবান হননি।'

قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسَٰمِرِيُّ ﴿٩٥﴾

৯৫. মূসা বললেন, 'হে সামেরী! তোমার ব্যাপার কী?'

قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِۦ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَٰلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ﴿٩٦﴾

৯৬. সে বলল, 'আমি যা দেখেছিলাম তারা তা দেখেনি, তারপর আমি সে দূতের পদচিহ্ন হতে একমুঠি মাটি নিয়েছিলাম তারপর আমি তা

(১) হারূন 'আলাইহিস্ সালাম এই কঠোর ব্যবহার সত্বেও শিষ্টাচারের প্রতি পুরোপুরি লক্ষ্য রেখে মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-কে নরম করার জন্য 'হে আমার জননী-তনয়' বলে সম্বোধন করলেন। এতে কঠোর ব্যবহার না করার প্রতি বিশেষ ইঙ্গিত ছিল। অর্থাৎ আমি তো তোমার ভ্রাতা বৈ শত্রু নই। তাই আমার ওযর শুনে নাও। অতঃপর হারূন 'আলাইহিস্ সালাম এরূপ ওযর বর্ণনা করলেনঃ ﴿إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي﴾ [আল-আ'রাফঃ ১৫০] অর্থাৎ বনী-ইসরাঈল আমাকে শক্তিহীন ও দুর্বল মনে করেছে। কেননা, অন্যদের মোকাবেলায় আমার সঙ্গী-সাথী ছিল নগণ্য সংখ্যক। তাই তারা আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল। এ সূরায় আরো বলা হয়েছে যে, হারূন 'আলাইহিস্ সালাম তাদেরকে গো-বৎস পূজা করতে নিষেধ করেছিলেন এবং বলেছিলেনঃ 'হে আমার কওম! তোমরা ফেৎনায় নিপতিত, অবশ্যই তোমাদের একমাত্র মা'বুদ হল রহমান। সুতরাং তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার কথা শোন।' কিন্তু তারা তার কথা শুনল না; বরং তাকে হত্যা করতে উদ্যত হল। অন্যত্র হারূন 'আলাইহিস্ সালাম তার ওযরগুলো বর্ণনা করে বলেনঃ আমি আশংকা করলাম যে, তোমার ফিরে আসার পূর্বে যদি আমি তাদের বিরুদ্ধে জিহাদে অবতীর্ণ হই অথবা তাদেরকে ত্যাগ করে তোমার কাছে চলে যাই, তবে বনী-ইসরাঈলের মধ্যে বিভেদ দেখা দেবে। তুমি রওয়ানা হওয়ার সময় ﴿اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ﴾ [সূরা আল-আ'রাফঃ ১৪২] -বলে আমাকে সংস্কারের নির্দেশ দিয়েছিলে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আমি তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হতে দেইনি। কারণ, এরূপ সম্ভাবনা ছিল যে, তুমি ফিরে এলে তারা সবাই সত্য উপলব্ধি করবে এবং ঈমান ও তাওহীদে ফিরে আসবে।

নিক্ষেপ করেছিলাম[১]; আর আমার মন আমার জন্য শোভন করেছিল এরূপ করা।'

৯৭. মূসা বললেন, 'যাও; তোমার জীবদ্দশায় তোমার জন্য এটাই রইল যে, তুমি বলবে, 'আমি অস্পৃশ্য'[২] এবং তোমার জন্য রইল এক নির্দিষ্ট সময়, তোমার বেলায় যার ব্যতিক্রম হবে না। আর তুমি তোমার সে ইলাহের প্রতি লক্ষ্য কর যার পূজায় তুমি রত ছিলে; আমরা সেটাকে জ্বালিয়ে দেবই, তারপর সেটাকে বিক্ষিপ্ত করে সাগরে ছড়িয়ে দেবই।'

قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيٰوةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تُخْلَفَهُ وَانْظُرْ إِلٰٓى إِلٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ﴿٩٧﴾

৯৮. তোমাদের ইলাহ্ তো শুধু আল্লাহ্ই যিনি ছাড়া অন্য কোন সত্য ইলাহ্ নেই, সবকিছু তাঁর জ্ঞানের পরিধিভুক্ত।

إِنَّمَآ إِلٰهُكُمُ اللّٰهُ الَّذِي لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿٩٨﴾

---

(১) অর্থাৎ "আমি দেখেছিলাম যা তারা দেখেনি" এখানে জিবরাঈল ফিরিশ্‌তাকে বোঝানো হয়েছে। তাকে দেখার ঘটনা সম্পর্কে এক বর্ণনা এই যে, যেদিন মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর মু'জিযায় নদীতে রাস্তা হয়ে যায়, বনী-ইসরাঈল এই রাস্তা দিয়ে সমুদ্র পার হয়ে যায় এবং ফির'আউনী সৈন্য বাহিনী সাগরে নিমজ্জিত হয়, সেদিন জিবরাঈল ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। সামেরীর মনে শয়তান একথা জাগ্রত করে দেয় যে, জিবরাঈলের ঘোড়ার পা যেখানে পড়ে, সেখানকার মাটিতে জীবনের বিশেষ প্রভাব থাকবে। তুমি এই মাটি তুলে নাও। সে পদচিহ্নের মাটি তুলে নিল। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা-এর রেওয়ায়েতে একথা বর্ণিত হয়েছেঃ সামেরীর মনে আপনা-আপনি জাগল যে, পদচিহ্নের মাটি যে বস্তুর উপর নিক্ষেপ করে বলা হবে যে, অমুক বস্তু হয়ে যা, তা তাই হয়ে যাবে। সুতরাং সে সে সমস্ত অলঙ্কারের মধ্যে এ মাটি তাতে নিক্ষেপ করে। ফলে তাতে শব্দ হতে থাকে। [ইবন কাসীর]

(২) মূসা 'আলাইহিস্ সালাম সামেরীর জন্য পার্থিব জীবনে এই শাস্তি ধার্য করেন যে, সবাই তাকে বর্জন করবে এবং কেউ তার কাছে ঘেঁষবে না। তিনি তাকেও নির্দেশ দেন যে, কারো গায়ে হাত লাগাবে না। সারা জীবন এভাবেই সে বন্য জন্তুদের ন্যায় সবার কাছ থেকে আলাদা থাকবে। [দেখুন, কুরতুবী]

৯৯. পূর্বে যা ঘটেছে তার কিছু সংবাদ আমরা এভাবে আপনার নিকট বর্ণনা করি। আর আমরা আমাদের নিকট হতে আপনাকে দান করেছি যিক্‌র(১)।

كَذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۚ وَقَدْ اٰتَيْنٰكَ مِنْ لَّدُنَّا ذِكْرًا ۟ۖۚ

১০০. এটা থেকে যে বিমুখ হবে, অবশ্যই সে কিয়ামতের দিন মহাভার বহন করবে(২)।

مَنْ اَعْرَضَ عَنْهُ فَاِنَّهٗ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وِزْرًا ۟ۙ

১০১. সেটাতে তারা স্থায়ী হবে এবং কিয়ামতের দিন তাদের জন্য এ বোঝা হবে কত মন্দ!

خٰلِدِيْنَ فِيْهِ ؕ وَسَآءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ حِمْلًا ۟ۙ

১০২. যেদিন শিংগায়(৩) ফুঁক দেয়া হবে

يَّوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ

(১) অর্থাৎ যেভাবে আপনার কাছে মূসা আলাইহিস সালামের কাহিনী বর্ণনা করলাম এবং তার সাথে ফির'আউন ও তার দলবলের ঘটনা বিবৃত করলাম এভাবেই আমরা পূর্ববর্তী কালের সংবাদ আপনার কাছে কোন রূপ বৃদ্ধি বা কমতি না করে বর্ণনা করব। আর আপনার কাছে তো যিক্‌র বা কুরআন তো আমাদের পক্ষ থেকেই প্রদান করা হয়েছে। এটা এমন কিতাব যার সামনে বা পিছনে কোথাও বাতিলের কোন হাত নেই। হিকমতওয়ালা ও প্রশংসিতের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত। এ কুরআনের মত কোন কিতাব পূর্বে কোন নবীকে দেয়া হয়নি। [ইবন কাসীর] এখানে কুরআনকে যিক্‌র নাম দেয়া হয়েছে। কারণ এতে কর্তব্যকর্মসমূহ স্মরণিকা ও শিক্ষণীয়রূপে তুলে ধরা হয়েছে। অথবা যিকর বলতে এখানে সম্মান বোঝানো হয়েছে। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, "আর নিশ্চয় এ কুরআন আপনার ও আপনার সম্প্রদায়ের জন্য সম্মান।" [সূরা আয-যুখরুফ: ৪৪] [ফাতহুল কাদীর]

(২) এখানে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, কেয়ামতের দিন সে বিরাট পাপের বোঝা বহন করবে। তবে আয়াতে বর্ণিত কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া বিভিন্নভাবে হতে পারে; যথা- কুরআনের উপর মিথ্যারোপ করা, এর আদেশ নিষেধের আনুগত্য করা থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকা। কুরআন ছাড়া অন্য কিতাবে হেদায়াতের তালাশ করা। সুতরাং যে তা করবে আল্লাহ্ তাকে পথভ্রষ্ট করবেন, তাকে জাহান্নামের পথে ধাবিত করবেন। [ইবন কাসীর]

(৩) ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ জনৈক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে প্রশ্ন করলঃ صور (ছূর) কি? তিনি বললেনঃ শিঙ্গা। এতে ফুৎকার দেয়া হবে। [আবু দাউদঃ ৪৭৪২, তিরমিযিঃ ৩২৪৩, ৩২৪৪,

زُرۡقًا ﴿١٠٢﴾

এবং যেদিন আমরা অপরাধীদেরকে নীলচক্ষু তথা দৃষ্টিহীন অবস্থায় সমবেত করব[১]।

يَّتَخَافَتُوۡنَ بَيۡنَهُمۡ اِنۡ لَّبِثۡتُمۡ اِلَّا عَشۡرًا ﴿١٠٣﴾

১০৩. সেদিন তারা চুপিসারে পরস্পর বলাবলি করবে, 'তোমরা মাত্র দশদিন অবস্থান করেছিলে।'

نَحۡنُ اَعۡلَمُ بِمَا يَقُوۡلُوۡنَ اِذۡ يَقُوۡلُ اَمۡثَلُهُمۡ طَرِيۡقَةً اِنۡ لَّبِثۡتُمۡ اِلَّا يَوۡمًا ﴿١٠٤﴾

১০৪. আমরা ভালভাবেই জানি তারা কি বলবে, তাদের মধ্যে যে অপেক্ষাকৃত উত্তম পথে ছিল (বিবেকবান ব্যক্তি) সে বলবে, 'তোমরা মাত্র একদিন অবস্থান করেছিলে।'

ষষ্ঠ রুকূ'

وَيَسۡـَٔلُوۡنَكَ عَنِ الۡجِبَالِ فَقُلۡ يَنۡسِفُهَا رَبِّىۡ نَسۡفًا ﴿١٠٥﴾

১০৫. আর তারা আপনাকে পর্বতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলুন, 'আমার রব এগুলোকে সমূলে উৎপাটন করে বিক্ষিপ্ত করে দেবেন।

فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفۡصَفًا ﴿١٠٦﴾

১০৬. 'তারপর তিনি তাকে পরিণত করবেন মসৃণ সমতল ময়দানে,

আহমাদঃ ২/৩১২, সহীহ্ ইবনে হিব্বানঃ ৭০১২, হাকেমঃ ২/৪৩৬, ৫০৬] অর্থ এই যে, صور শিঙ্গা-এর মতই কোন বস্তু হবে। এতে ফিরিশ্‌তা ফুঁক দিলে সব মৃত জীবিত হয়ে যাবে। হাদীসে এর কিছু গুণাগুণ বর্ণনা করা হয়েছেঃ এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 'ইস্রাফিল শিঙ্গা মুখে পুরে আছেন, তার কপাল তীক্ষ্ণভাবে উৎকর্ণ করে নীচু করে রেখেছে, অপেক্ষা করছে, কখন তাকে ফুঁক দেয়ার নির্দেশ দেয়া হবে। [তিরমিযিঃ ২৪৩১, আহমাদঃ ৩/৭, ৭৩, হাকেমঃ ৪/৫৫৯] এর থেকে বোঝা যায় যে, এটা এক প্রকার শিঙ্গার মত, এর একাংশ মুখে পুরা যায়। তবে এর প্রকৃত স্বরূপ একমাত্র আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

(১) অর্থাৎ ভয়ে ও আতংকে তাদের রক্ত শুকিয়ে যাবে এবং তাদের অবস্থা এমন হয়ে যাবে যেন তাদের শরীরে এক বিন্দুও রক্ত নেই। অথবা শব্দটি "আয্‌রাকুল আইন" বা নীল চক্ষুওয়ালার অর্থে গ্রহণ করেছেন। তারা এর অর্থ করেন অত্যাধিক ভয়ে তাদের চোখের মণি স্থির হয়ে যাবে। [ফাতহুল কাদীর]

১০৭. 'যাতে আপনি বাঁকা ও উঁচু দেখবেন না[১] ।'

لَّا تَرٰى فِيْهَا عِوَجًا وَّلَآ اَمْتًا ۝١٠٧

১০৮. সেদিন তারা আহ্বানকারীর অনুসরণ করবে, এ ব্যাপারে এদিক ওদিক করতে পারবে না। আর দয়াময়ের সামনে সমস্ত শব্দ স্তব্ধ হয়ে যাবে; কাজেই মৃদু ধ্বনি[২] ছাড়া আপনি কিছুই শুনবেন না ।

يَوْمَئِذٍ يَّتَّبِعُوْنَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهٗ ۚ وَخَشَعَتِ الْاَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ فَلَا تَسْمَعُ اِلَّا هَمْسًا ۝١٠٨

১০৯. দয়াময় যাকে অনুমতি দেবেন ও যার কথায় তিনি সন্তুষ্ট হবেন, সে ছাড়া কারো সুপারিশ সেদিন কোন কাজে আসবে না[৩] ।

يَوْمَئِذٍ لَّا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِيَ لَهٗ قَوْلًا ۝١٠٩

---

(১) এ পাহাড়গুলো ভেঙ্গে বালুকারাশির মতো গুঁড়ো গুঁড়ো করে দেয়া হবে এবং সেগুলো ধূলোমাটির মতো সারা দুনিয়ার বুকে ছড়িয়ে সমগ্র দুনিয়াকে এমন একটি সমতল প্রান্তরে পরিণত করে দেয়া হবে যেখানে কোন উঁচু নীচু, ঢালু বা অসমতল জায়গা থাকবে না। তার অবস্থা এমন একটি পরিষ্কার বিছানার মতো হবে যাতে সামান্যতমও খাঁজ বা ভাঁজ থাকবে না। [দেখুন, কুরতুবী]

(২) মূলে 'হামস' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ শব্দটি পায়ের আওয়াজ, চুপিচুপি কথা বলার আওয়াজ, আরো এ ধরনের হালকা আওয়াজের জন্য বলা হয়। এর অর্থ এ দাঁড়ায় যে, সেখানে চলাচলকারীদের পায়ের আওয়াজ, হাল্কা শব্দ ছাড়া কোন আওয়াজ শোনা যাবে না। [ইবন কাসীর]

(৩) এ আয়াতের অর্থ "সেদিন সুপারিশ কার্যকর হবে না তবে যদি করুণাময় কাউকে অনুমতি দেন এবং তারকথা শুনতে পছন্দ করেন"। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, কিয়ামতের দিন কারো সুপারিশ করার জন্য স্বতপ্রণোদিত হয়ে মুখ খোলা তো দূরের কথা, টুঁ শব্দটি করারও কারো সাহস হবে না। এ দু'টি কথা কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে। একদিকে বলা হয়েছেঃ "কে আছে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর সামনে সুপারিশ করতে পারে?" [সূরা আল বাকারাহঃ ২৫৫] আরো বলা হয়েছেঃ "সেদিন যখন রূহ ও ফেরেশতারা সবাই কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়াবে, একটুও কথা বলবে না, শুধুমাত্র সে - ই বলতে পারবে যাকে করুণাময় অনুমতি দেবেন এবং যে ন্যায়সংগত কথা বলবে।" [সূরা আন-নাবাঃ ৩৮] অন্য আয়াতে বলা হয়েছেঃ "আর তারা কারোর জন্য সুপারিশ করে না সেই ব্যক্তির ছাড়া যার পক্ষে সুপারিশ শোনার জন্য (রহমান) রাজী হবেন এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত হয়ে থাকে।" [সূরা

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴿١١٠﴾

১১০. তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে, তা তিনি অবগত, কিন্তু তারা জ্ঞান দ্বারা তাঁকে বেষ্টন করতে পারে না।

وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴿١١١﴾

১১১. আর চিরঞ্জীব, চিরপ্রতিষ্ঠিত-সর্বসত্তার ধারকের কাছে সবাই হবে নিম্নমুখী এবং সে-ই ব্যর্থ হবে, যে যুলুম বহন করবে[১]।

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ﴿١١٢﴾

১১২. আর যে মুমিন হয়ে সৎকাজ করে, তার কোন আশংকা নেই অবিচারের এবং অন্য কোন ক্ষতির।

وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ﴿١١٣﴾

১১৩. আর এভাবেই আমরা কুরআনকে নাযিল করেছি আরবী ভাষায় এবং তাতে বিশদভাবে বিবৃত করেছি সতর্কবাণী, যাতে তারা তাকওয়া অবলম্বন করে অথবা এটা তাদের মধ্যে স্মরণিকার উৎপত্তি করে।

فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۗ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ

১১৪. সুতরাং প্রকৃত মালিক আল্লাহ্ অতি

আল-আম্বিয়াঃ ২৮] আরো বলা হয়েছেঃ “কত ফেরেশতা আকাশে আছে, তাদের সুপারিশ কোনই কাজে লাগবে না, তবে একমাত্র তখন যখন আল্লাহর কাছ থেকে অনুমতি নেওয়ার পর সুপারিশ করা হবে এবং এমন ব্যক্তির পক্ষে করা হবে যার জন্য তিনি সুপারিশ শুনতে চান এবং পছন্দ করেন।” [সূরা আন-নাজ্‌মঃ ২৬]

(১) যে কেউ যুলুম নিয়ে হাশরের মাঠে উপস্থিত হবে তার মত হতভাগা আর কেউ নেই। কেননা, সে প্রত্যেক মাজলুমকে তার হক বুঝিয়ে দিতে থাকবে, শেষ পর্যন্ত যখন আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না তখন তার উপর অপরের গোনাহের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হবে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ‘তোমরা যুলুম থেকে বেঁচে থাক; কেননা যুলুম কিয়ামতের দিন প্রগাঢ় অন্ধকার হিসেবে দেখা দিবে’ [মুসলিম:২৫৭৮] এ যুলুমের মধ্যে সবচেয়ে বড় যুলুম হলো, শির্ক। কারণ এটি আল্লাহর সাথে কৃত সবচেয়ে বড় গুনাহ। যে কেউ শির্কের ভার নিয়ে হাশরের মাঠে উপস্থিত হবে তার আর বাঁচার কোন পথ রইলো না। মহান আল্লাহ্ বলেন: “অবশ্যই শির্ক হচ্ছে বড় যুলুম” [সূরা লুকমান: ১৩]

قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰٓى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا ﴿١١٤﴾

মহান, সর্বোচ্চ স্বত্বা[১]। আর আপনার প্রতি আল্লাহ্‌র ওহী সম্পূর্ণ হওয়ার আগে আপনি কুরআন পাঠে তাড়াহুড়া করবেন না এবং বলুন, 'হে আমার রব! আমাকে জ্ঞানে সমৃদ্ধ করুন।'

وَلَقَدْ عَهِدْنَآ اِلٰٓى اٰدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهٗ عَزْمًا ﴿١١٥﴾

১১৫. আর আমরা তো ইতোপূর্বে আদমের প্রতি নির্দেশ দান করেছিলাম, কিন্তু তিনি ভুলে গিয়েছিলেন; আর আমরা তার মধ্যে সংকল্পে দৃঢ়তা পাইনি[২]।

(১) মহান আল্লাহ্ বলছেন, যখন পুনরুত্থানের দিন, ভাল-মন্দ প্রতিফলের দিন অবশ্যই ঘটবে, তখন আমরা এ কুরআন নাযিল করেছি, যাতে এরা নিজেদের গাফলতি থেকে সজাগ হবে, ভুলে যাওয়া শিক্ষাকে কিছুটা স্মরণ করবে এবং পথ ভুলে কোন পথে যাচ্ছে আর এই পথ ভুলে চলার পরিণাম কি হবে সে সম্পর্কে এদের মনে বেশ কিছুটা অনুভূতি জাগবে। সুতরাং সেই মহান হক বাদশাহর জন্যই যাবতীয় মহত্ব। যিনি হক, যাঁর ওয়াদা হক, যাঁর সতর্কীকরণ হক, যাঁর রাসূলরা হক, জান্নাত হক, জাহান্নাম হক। তার থেকে যা কিছু আসে সবই হক। তাঁর আদল ও ইনসাফ হচ্ছে যে, তিনি কাউকে সাবধান না করে রাসূল না পাঠিয়ে শাস্তি দেন না। যাতে করে তিনি মানুষের ওযর আপত্তির উৎস বন্ধ করে দিতে পারেন। ফলে তাদের কোন সন্দেহ বা প্রমাণ অবশিষ্ট না থাকে। [ইবন কাসীর]

(২) উদ্দেশ্য এই যে, আপনার অনেক পূর্বে আদম('আলাইহিস্ সালাম)-কে তাকিদ সহকারে একটি নির্দেশ দিয়েছিলাম। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট বৃক্ষ সম্পর্কে বলেছিলাম যে, এই বৃক্ষের ফল-ফুল অথবা কোন অংশ আহার করবেন না, এমনকি এর নিকটেও যাবেন না। এছাড়া জান্নাতের সব বাগ-বাগিচা ও নেয়ামতরাজি আপনাদের জন্য। সেগুলো ব্যবহার করুন। আরো বলেছিলাম যে, ইবলীস আপনাদের শত্রু। তার কুমন্ত্রণা মেনে নিলে আপনাদের বিপদ হবে। কিন্তু আদম 'আলাইহিস্ সালাম এসব কথা ভুলে গেলেন। এখানে আল্লাহ্ তা'আলা আদম 'আলাইহিস্ সালাম-এর ব্যাপারে দু'টি শব্দ ব্যবহার করেছেন- তন্মধ্যে প্রথম শব্দটি হলো: فَنَسِيَ এ শব্দটির তিনটি অর্থ হয়ঃ (ক) ত্যাগ করা, অর্থাৎ যে কাজের অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল তা ত্যাগ করা। আর এ অর্থই এখানে অধিকাংশ মুফাস্সিরগণ করেছেন। (খ) কারো কারো মতে এখানে فَنَسِيَ শব্দ দ্বারা এখানে ভুলে যাওয়া অর্থ নেয়া হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাকে যে নির্দেশ দিয়েছেন এবং যা করতে নিষেধ করেছেন, তা তিনি ভুলে গেলেন। আদম 'আলাইহিস্ সালাম-কে ভুলের কারণেও পাকড়াও করা হত। ভুলের কারণে ধরপাকড় না করা শুধুমাত্র উম্মতে মুহাম্মাদীর সাথে সংশ্লিষ্ট। এটা উম্মতে মুহাম্মাদীর

সপ্তম রুকূ'

وَاِذۡ قُلۡنَا لِلۡمَلٰٓئِكَةِ اسۡجُدُوۡا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوۡۤا اِلَّاۤ اِبۡلِیۡسَ ؕ اَبٰی ﴿۱۱۶﴾

১১৬. আর স্মরণ করুন[১], যখন আমরা ফিরিশ্‌তাগণকে বললাম, 'তোমরা আদমের প্রতি সিজ্‌দা কর,' তখন ইবলীস ছাড়া সবাই সিজ্‌দা করল; সে অমান্য করল।

فَقُلۡنَا یٰۤاٰدَمُ اِنَّ هٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوۡجِكَ فَلَا یُخۡرِجَنَّكُمَا مِنَ الۡجَنَّةِ فَتَشۡقٰی ﴿۱۱۷﴾

১১৭. অতঃপর আমরা বললাম, 'হে আদম! নিশ্চয় এ আপনার ও আপনার স্ত্রীর শত্রু, কাজেই সে যেন কিছুতেই আপনাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে না দেয়[২], দিলে আপনারা দুঃখ-

বৈশিষ্ট্য। (গ) কেউ কেউ শব্দটিকে نُسِّيَ পড়েছেন। তখন তার অর্থ হবে শয়তান তাকে প্ররোচনার মাধ্যমে ভুলিয়ে দিলেন। [ফাতহুল কাদীর]
আয়াতে ব্যবহৃত দ্বিতীয় শব্দটি হল- عزم এর অর্থ দৃঢ় অঙ্গীকার। কোন কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করা। আদম 'আলাইহিস্ সালাম যদিও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ছিলেন; কিন্তু শয়তানের প্ররোচনায় তার দৃঢ়তায় চ্যুতি ঘটেছিল। عزم শব্দের আরেক অর্থ হল صبر বা ধৈর্য্য ও প্রতিষ্ঠিত থাকা। আদম 'আলাইহিস্ সালাম নিষিদ্ধ গাছ থেকে খাওয়ার সময় তার উপর অটল থাকেননি। [ফাতহুল কাদীর]

(১) এখান থেকে আদম 'আলাইহিস্ সালাম-এর কাহিনী শুরু করা হয়েছে। এতে উম্মতে মুহাম্মাদীকে হুঁশিয়ার করা উদ্দেশ্য যে, শয়তান মানব জাতির আদি শত্রু। সে সর্বপ্রথম তোমাদের আদি পিতা-মাতার সাথে শত্রুতা সাধন করেছে এবং নানা রকমের কৌশল, বাহানা ও শুভেচ্ছামূলক পরামর্শের জাল বিস্তার করে তাদেরকে পদস্খলিত করে দিয়েছে। এর ফলেই তাদের উদ্দেশ্যে জান্নাত থেকে পৃথিবীতে অবতরণের নির্দেশ জারী হয় এবং জান্নাতের পোষাক ছিনিয়ে নেয়া হয়। তাই শয়তানী কুমন্ত্রণা থেকে মানব মাত্রেরই নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নয়। শয়তানী প্ররোচনা ও অপকৌশল থেকে আত্মরক্ষার জন্য প্রত্যেকেরই যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত।

(২) আল্লাহ্ তা'আলা আদম 'আলাইহিস্ সালাম-এর কাছ থেকে যে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, এটা তারই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। এতে আদম সৃষ্টির পর সব ফিরিশ্‌তাকে আদমের উদ্দেশ্যে সিজ্‌দা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। ইবলীসও এই নির্দেশের আওতাভুক্ত ছিল। কেননা, তখন পর্যন্ত ইবলীস ফিরিশ্‌তাদের সাথে একত্রে বাস করত। ফিরিশ্‌তারা সবাই সিজ্‌দা করল, কিন্তু ইবলীস অস্বীকার করল। অন্য আয়াতের বর্ণনা অনুযায়ী এর কারণ ছিল অহংকার। সে বললঃ আমি অগ্নিসৃজিত

কষ্ট পাবেন[১]।

১১৮. 'নিশ্চয় আপনার জন্য এ ব্যবস্থা রইল যে, আপনি জান্নাতে ক্ষুধার্তও হবেন না, নগ্নও হবেন না;

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿١١٨﴾

১১৯. 'এবং সেখানে পিপাসার্ত হবেন না, আর রোদেও আক্রান্ত হবেন না[২]।'

وَأَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ ﴿١١٩﴾

আর সে মৃত্তিকাসৃজিত। অগ্নি মাটির তুলনায় উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। কাজেই আমি কিরূপে তাকে সিজ্‌দা করব? এ কারণে ইবলীস অভিশপ্ত হয়ে জান্নাত থেকে বহিস্কৃত হল। পক্ষান্তরে আদম ও হাওয়ার জন্য জান্নাতের সব বাগ-বাগিচা ও অফুরন্ত নেয়ামতের দরজা উম্মুক্ত করে দেয়া হল। সবকিছু ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে শুধু একটি নির্দিষ্ট বৃক্ষ সম্পর্কে বলা হল যে, এটা থেকে আহার করো না এবং এর কাছেও যেয়ো না। সূরা আল-বাকারাহ্ ও সূরা আল-আ'রাফে এই বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। এখানে তা উল্লেখ না করে শুধু অঙ্গীকার সংরক্ষিত রাখা ও তাতে অটল থাকা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি আদমকে বলেনঃ দেখুন, সিজ্‌দার ঘটনা থেকে প্রকাশ পেয়েছে যে, ইবলীস আপনাদের শত্রু। যেন অপকৌশল ও ধোঁকার মাধ্যমে আপনাদেরকে অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে উদ্বুদ্ধ না করে। যদি তার প্ররোচনায় প্রলুব্ধ হয়ে আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধাচারণ করেন তাহলে এখানে থাকতে পারবেন না এবং আপনাদেরকে যেসব নিয়ামত দান করা হয়েছে সেসব ছিনিয়ে নেয়া হবে।

(১) অর্থাৎ শয়তান যেন আপনাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে না দেয়। ফলে, আপনারা বিপদে ও কষ্টে পড়ে যাবেন। আপনাদেরকে খেটে আহার্য উপার্জন করতে হবে। [ফাতহুল কাদীর] পরবর্তী আয়াতে জান্নাতের এমন চারটি নেয়ামত উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো প্রত্যেক মানুষের জীবনের স্তম্ভবিশেষ এবং জীবনধারণে প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মধ্যে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ অন্ন, পানীয়, বস্ত্র ও বাসস্থান। আয়াতে বলা হয়েছে যে, এসব নেয়ামত জান্নাতে পরিশ্রম ও উপার্জন ছাড়াই পাওয়া যায়। এ থেকে বোঝা গেল যে, এখান থেকে বহিস্কৃত হলে এসব নেয়ামতও হাতছাড়া হয়ে যাবে।

(২) জান্নাত থেকে বের হবার পর মানুষকে যে বিপদের মুখোমুখি হতে হবে তার বিবরণ এখানে দেয়া হয়েছে। এ সময় জান্নাতের বড় বড়, পূর্ণাংগ ও শ্রেষ্ঠ নিয়ামতগুলো উল্লেখ করার পরিবর্তে অন্ন, পানীয়, বস্ত্র ও বাসস্থান এ চারটি মৌলিক নিয়ামতের কথা বলা হয়েছে। বস্তুত: জীবনধারণের প্রয়োজনীয় এই চারটি মৌলিক বস্তু মানুষকে দুনিয়াতে সবচেয়ে বেশী কষ্ট দেয়। [ফাতহুল কাদীর]

فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطٰنُ قَالَ يٰٓاٰدَمُ هَلْ اَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلٰى ﴿١٢٠﴾

১২০. অতঃপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিল; সে বলল, 'হে আদম! আমি কি আপনাকে বলে দেব অনন্ত জীবনদায়িনী গাছের কথা ও অক্ষয় রাজ্যের কথা(১)?'

فَاَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصٰٓى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى ﴿١٢١﴾

১২১. তারপর তারা উভয়ে সে গাছ থেকে খেল; তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ল এবং তারা জান্নাতের গাছের পাতা দিয়ে নিজেদেরকে ঢাকতে লাগলেন। আর আদম তার রব-এর হুকুম অমান্য করলেন, ফলে তিনি পথভ্রান্ত হয়ে গেলেন(২)।

ثُمَّ اجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدٰى ﴿١٢٢﴾

১২২. তারপর তার রব তাকে মনোনীত করলেন(৩), অতঃপর তার তাওবা কবূল করলেন ও তাকে পথনির্দেশ করলেন।

---

(১) অন্যত্র আমরা শয়তানের কথাবার্তার আরো যে বিস্তারিত বিবরণ পাই তা হচ্ছে এই যে, "আর সে বললো, তোমাদের রব তোমাদেরকে এ গাছটি থেকে শুধুমাত্র এ জন্য বিরত রেখেছেন, যাতে তোমরা দু'জন ফেরেশতা অথবা চিরঞ্জীব না হয়ে যাও।" [সূরা আল-আ'রাফঃ ২০]

(২) غوى শব্দটির অনুবাদ ওপরে 'পথভ্রান্ত' করা হয়েছে। কোন কোন মুফাসসির বলেন, এর অর্থ, তার জীবনটা বিপর্যস্ত হয়ে গেল। কারণ, দুনিয়াতে অবতরণ করার অর্থই হচ্ছে, জীবন দুর্বিষহ হওয়া। [কুরতুবী]

(৩) অর্থাৎ শয়তানের মতো আল্লাহর দরবার থেকে বহিষ্কৃত করেন নি। আনুগত্যের প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে যেখানে তিনি পড়ে গিয়েছিলেন সেখানে তাকে পড়ে থাকতে দেননি বরং উঠিয়ে আবার নিজের কাছে ডেকে নিয়েছিলেন কারণ নিজেদের ভুলের অনুভূতি হবার সাথে সাথেই তারা বলে উঠেছিলেনঃ "হে আমাদের প্রতিপালক ! আমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছি এবং যদি আপনি আমাদের মাফ না করেন এবং আমাদের প্রতি করুণা না করেন তাহলে আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো।" [সূরা আল-আ'রাফঃ ২৩]

قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيْعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى ۙ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقٰى ﴿١٢٣﴾

১২৩. তিনি বললেন, ‘তোমরা উভয়ে একসাথে জান্নাত থেকে নেমে যাও। তোমরা পরস্পর পরস্পরের শত্রু। পরে আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে সৎপথের নির্দেশ আসলে যে আমার প্রদর্শিত সৎপথের অনুসরণ করবে সে বিপথগামী হবে না ও দুঃখ-কষ্ট পাবে না।

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى ﴿١٢٤﴾

১২৪. ‘আর যে আমার স্মরণ থেকে বিমুখ থাকবে, নিশ্চয় তার জীবন-যাপন হবে সংকুচিত[১] এবং আমরা তাকে

(১) এখানে যিক্‌র-এর অর্থ কুরআনও হতে পারে এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামও হতে পারে, যেমন- অন্য আয়াতে ذِكْرًا رَّسُوْلًا বলা হয়েছে। [কুরতুবী] তবে অধিকাংশের নিকট এখানে কুরআন বোঝানো হয়েছে। সারমর্ম এই যে, যে ব্যক্তি কুরআনের বিধি-বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে, কুরআনের নির্দেশের আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়; অন্যদের থেকে হিদায়াত গ্রহণ করে, তার পরিণাম এই যে, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে। [ইবন কাসীর] কুরআনের ভাষ্যে ঐ সমস্ত লোকদের জন্য সংকীর্ণ ও তিক্ত জীবনের ঘোষণা দেয়া হয়েছে, যারা আল্লাহ্‌র কুরআন ও তাঁর রাসূলের প্রদর্শিত পথে চলতে বিমুখ হয়। কিন্তু কোথায় তাদের সে সংকীর্ণ ও তিক্ত জীবন হবে তা নির্ধারণে বেশ কয়েকটি মত রয়েছেঃ

এক) তাদের দুনিয়ার জীবন সংকীর্ণ হবে। তাদের কাছ থেকে অল্পে তুষ্টির গুণ ছিনিয়ে নেয়া হবে এবং সাংসারিক লোভ-লালসা বাড়িয়ে দেয়া হবে। যা তাদের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলবে। ফলে তাদের কাছে যত অর্থ-সম্পদই সঞ্চিত হোক না কেন, আন্তরিক শান্তি তাদের ভাগ্যে জুটবে না। সদা-সর্বদা সম্পদ বৃদ্ধি করার চিন্তা এবং ক্ষতির আশঙ্কা তাদেরকে অস্থির করে তুলবে। কেননা, সুখ-শান্তি অন্তরের স্থিরতা ও নিশ্চিন্ততার মাধ্যমেই অর্জিত হয়; শুধু প্রাচুর্যে নয়। [দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

দুই) অনেক মুফাস্‌সিরের মতে এখানে সংকীর্ণ জীবন বলতে কবরের জীবনকে বোঝানো হয়েছে। [ইবন কাসীর] অর্থাৎ তাদের কবর তাদের উপর সংকীর্ণ হয়ে যাবে বিভিন্ন প্রকার শাস্তির মাধ্যমে। এতে করে কবরে তাদের জীবন দুর্বিষহ করে দেয়া হবে। তাদের বাসস্থান কবর তাদেরকে এমনভাবে চাপ দেবে যে, তাদের পাঁজর ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং ﴿مَعِيْشَةً ضَنْكًا﴾ -এর তাফসীরে বলেছেন যে, এখানে কবর জগত ও

কিয়ামতের দিন জমায়েত করব অন্ধ অবস্থায়[১] ।'

قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِىٓ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ﴿١٢٥﴾

১২৫. সে বলবে, 'হে আমার রব! কেন আমাকে অন্ধ অবস্থায় জমায়েত করলেন? অথচ আমি তো ছিলাম চক্ষুষ্মান ।

সেখানকার আযাব বোঝানো হয়েছে । [মুস্তাদরাকে হাকিমঃ ২/৩৮১, নং- ৩৪৩৯, ইবনে হিব্বানঃ ৭/৩৮৮, ৩৮৯ নং- ৩১১৯] তাছাড়া বিভিন্ন সহীহ্ হাদীসে কবরের যিন্দেগীর বিভিন্ন শাস্তির যে বর্ণনা এসেছে, তা থেকে বুঝা যায় যে, যারা আল্লাহ্, কুরআন ও রাসূলের প্রদর্শিত দ্বীন থেকে বিমুখ হবে, কবরে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি । রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 'মুমিন তার কবরে সবুজ প্রশস্ত উদ্যানে অবস্থান করবে আর তার কবরকে ৭০ গজ প্রশস্ত করা হবে । পূর্নিমার চাঁদের আলোর মত তার কবরকে আলোকিত করা হবে । তোমরা কি জান আল্লাহ্র আয়াত (তাদের জন্য রয়েছে সংকীর্ণ জীবন) কাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে? তোমরা কি জানো সংকীর্ণ জীবন কি? সাহাবায়ে কেরাম বললেনঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ভাল জানেন । রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: তা হল কবরে কাফেরের শাস্তি । যাঁর হাতে আমার জীবন, তাঁর শপথ করে বলছি- তাকে ন্যস্ত করা হবে ৯৯টি বিষাক্ত তিন্নিন সাপের কাছে । তোমরা কি জান তিন্নিন কি? তিন্নিন হল ৯৯টি সাপ । প্রত্যেকটি সাপের রয়েছে ৭টি মাথা । যেগুলো দিয়ে সে কাফেরের শরীরে ছোবল মারতে থাকবে, কামড়াতে ও ছিঁড়তে থাকবে কেয়ামত পর্যন্ত । [ইবনে হিব্বানঃ ৩১২২, দারেমীঃ ২৭১১, আহমাদঃ ৩/৩৮, আবু ইয়া'লাঃ ৬৬৪৪, আব্দ ইবনে হুমাইদঃ ৯২৯, মাজমা'উয্-যাওয়ায়েদঃ ৩/৫৫]

(১) অর্থাৎ তাকে কেয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় হাশর করা হবে । এখানে অন্ধ অবস্থার কয়েকটি অর্থ হতে পারে- (এক) বাস্তবিকই সে অন্ধ হয়ে উঠবে । (দুই) সে জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না । (তিন) সে তার পক্ষে পেশ করার মত কোন যুক্তি থেকে অন্ধ হয়ে যাবে । কোন প্রকার প্রমাণাদি পেশ করা থেকে অন্ধ হয়ে থাকবে । [দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] তখন তার পরবর্তী আয়াতের অর্থ হবে- সে বলবেঃ হে আমার রব! আমাকে কেন আমার যাবতীয় যুক্তিহীন অবস্থায় হাশর করেছেন? আল্লাহ্ উত্তরে বলবেনঃ অনুরূপভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনসমূহ এসেছিল, কিন্তু তুমি সেগুলো ত্যাগ করে ভুলে বসেছিলে, তাই আজকের দিনেও তোমাকে যুক্তি-প্রমাণহীন অবস্থায় অন্ধ করে ত্যাগ করা হবে, ভুলে যাওয়া হবে । কারণ এটা তো তোমারই কাজের যথোপযুক্ত ফল । [ইবন কাসীর]

قَالَ كَذٰلِكَ اَتَتْكَ اٰيٰتُنَا فَنَسِيْتَهَا ۚ وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰى ﴿١٢٦﴾

১২৬. তিনি বলবেন, 'এরূপই আমাদের নিদর্শনাবলী তোমার কাছে এসেছিল, কিন্তু তুমি তা ছেড়ে দিয়েছিলে এবং সেভাবে আজ তোমাকেও (জাহান্নামে) ছেড়ে রাখা হবে[১]।'

وَكَذٰلِكَ نَجْزِيْ مَنْ اَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ؕ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَدُّ وَاَبْقٰى ﴿١٢٧﴾

১২৭. আর এভাবেই আমরা প্রতিফল দেই তাকে যে বাড়াবাড়ি করে ও তার রব-এর নিদর্শনে ঈমান না আনে[২]। আর আখেরাতের শাস্তি তো অবশ্যই কঠিনতর ও অধিক স্থায়ী।

اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ يَمْشُوْنَ فِيْ مَسٰكِنِهِمْ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى النُّهٰى ﴿١٢٨﴾

১২৮. এটাও কি তাদেরকে[৩] সৎপথ দেখাল না যে, আমরা এদের আগে ধ্বংস করেছি বহু মানবগোষ্ঠী যাদের বাসভূমিতে এরা বিচরণ করে থাকে?

(১) বিস্মৃত হওয়া ছাড়া نسيان শব্দের আরেক অর্থ আছে ছেড়ে রাখা। অর্থাৎ যেভাবে আমার হেদায়াতকে দুনিয়াতে ছেড়ে রেখেছিলে তেমনি আজ তোমাদেরকে জাহান্নামে ছেড়ে রাখা হবে। [ফাতহুল কাদীর]

(২) এখানে আল্লাহ "যিকির" অর্থাৎ তাঁর কিতাব ও তাঁর প্রেরিত উপদেশমালা থেকে যারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাদের দুনিয়ায় যে "অতৃপ্ত জীবন" যাপন করানো হয় সেদিকে ইশারা করা হয়েছে। অর্থাৎ এভাবেই যারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহের উপর মিথ্যারোপ করে আমরা তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে প্রতিফল দিয়ে থাকি। "তাদের জন্য দুনিয়ার জীবনে আছে শাস্তি এবং আখিরাতের শাস্তি তো আরো কঠোর! আর আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে রক্ষা করার মত তাদের কেউ নেই।" [সূরা আর-রা'দ:৩৪] [ইবন কাসীর]

(৩) সে সময় মক্কাবাসীদেরকে সম্বোধন করে বক্তব্য রাখা হয়েছিল এবং এখানে তাদের প্রতিই ইংগিত করা হয়েছে। আয়াতের কয়েকটি অর্থ হতে পারে। এক. কুরআন অথবা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি মক্কাবাসীদেরকে এই হেদায়াত দেননি এবং এ সম্পর্কে জ্ঞাত করেননি যে, তোমাদের পূর্বে অনেক সম্প্রদায় ও দল নাফরমানীর কারণে আল্লাহ্‌র আযাবে গ্রেফতার হয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে, যাদের বাসভূমিতে এখন তোমরা চলাফেরা কর? দুই. আল্লাহ্ কি তাদেরকে হেদায়াত দেননি বা তাদেরকে সঠিক পথ দেখাননি? এ অর্থের উপর আরো প্রমাণ হল- কোন কোন কিরাআতে نَـهْدِ পড়া হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর]

নিশ্চয় এতে বিবেকসম্পন্নদের জন্য আছে নিদর্শন(১)।

অষ্টম রুকূ’

১২৯. আর আপনার রব-এর পূর্ব সিদ্ধান্ত ও একটা সময় নির্ধারিত না থাকলে অবশ্যম্ভাবী হত আশু শাস্তি।

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى ﴿١٢٩﴾

১৩০. কাজেই তারা যা বলে, সে বিষয়ে আপনি ধৈর্য ধারণ করুন(২) এবং সূর্যোদয়ের আগে ও সূর্যাস্তের আগে আপনার রব-এর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন এবং রাতে পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন, এবং দিনের প্রান্তসমূহেও(৩), যাতে

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۖ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿١٣٠﴾

(১) অর্থাৎ ইতিহাসের এ ঘটনাবলী, প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের এ পর্যবেক্ষণ, মানব জাতির এ অভিজ্ঞতায় তাদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে যেগুলো থেকে তারা শিক্ষা নিতে পারে। যেমন অন্য আয়াতে বলেছেন, “তারা কি দেশ ভ্রমণ করেনি? তাহলে তারা জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন হৃদয় ও শ্রুতিশক্তিসম্পন্ন শ্রবণের অধিকারী হতে পারত । বস্তুত চোখ তো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হচ্ছে বুকের মধ্যে অবস্থিত হৃদয়।” [সূরা আল-হাজ্জ: ৪৬] [ইবন কাসীর]

(২) মক্কাবাসীরা ঈমান থেকে গা বাঁচানোর জন্য নানারকম বাহানা খুঁজত এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে অশালীন কথাবার্তা বলত। কেউ জাদুকর, কেউ কবি এবং মিথ্যাবাদী বলত। [ফাতহুল কাদীর] কুরআনুল কারীম এখানে তাদের এসব যন্ত্রণাদায়ক কথাবার্তার দু’টি প্রতিকার বর্ণনা করেছে। (এক) আপনি তাদের কথাবার্তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবেন না; বরং সবর করবেন। (দুই) আল্লাহ্‌র ইবাদাতে মশগুল হয়ে যান। ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾ - বাক্যে একথা বলা হয়েছে।

(৩) অর্থাৎ যেহেতু মহান আল্লাহ এখনই তাদেরকে ধ্বংস করতে চান না এবং তাদের জন্য একটি অবকাশ সময় নির্ধারিত করে ফেলেছেন, তাই তাঁর প্রদত্ত এ অবকাশ সময়ে তারা আপনার সাথে যে ধরনের আচরণই করুক না কেন আপনাকে অবশ্যি তা বরদাশ্‌ত করতে হবে এবং সবরের সাথে তাদের যাবতীয় তিক্ত ও কড়া কথা শুনেও নিজের সত্যবাণী প্রচার ও স্মরণ করিয়ে দেবার দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে। আপনি সালাত থেকে এ সবর, সহিষ্ণুতা ও সংযমের শক্তি লাভ করবেন। এ নির্ধারিত সময়গুলোতে আপনার প্রতিদিন নিয়মিত এ সালাত পড়া উচিত।

আপনি সন্তুষ্ট হতে পারেন[১]।

১৩১. আর আপনি আপনার দু'চোখ কখনো প্রসারিত করবেন না[২] সে সবের প্রতি,

وَلَاتَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَامَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزْوَٰجًا

"রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা" করা মানে হচ্ছে সালাত। যেমন সামনের দিকে আল্লাহ নিজেই বলেছেনঃ "নিজের পরিবার পরিজনকে সালাত পড়ার নির্দেশ দিন এবং নিজেও নিয়মিত তা পালন করতে থাকুন।" সালাতের সময়গুলোর প্রতি এখানেও পরিষ্কার ইশারা করা হয়েছে। সূর্য উদয়ের পূর্বে ফজরের সালাত। সূর্য অস্ত যাবার আগে আসরের সালাত। আর রাতের বেলা হচ্ছে এশা ও তাহাজ্জুদের সালাত। দিনের প্রান্তগুলো অবশ্যি তিনটিই হতে পারে। একটি প্রান্ত হচ্ছে প্রভাত, দ্বিতীয় প্রান্তটি সূর্য ঢলে পড়ার পর এবং তৃতীয় প্রান্তটি হচ্ছে সন্ধ্যা। কাজেই দিনের প্রান্তগুলো বলতে ফজর, যোহর ও মাগরিবের সালাত হতে পারে। সহীহ্ হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 'তোমরা তোমাদের রবকে স্বচ্ছভাবে দেখতে পাবে যেমনিভাবে তোমরা এ (পূর্নিমার চাঁদ)কে দেখতে পাচ্ছ। দেখতে তোমাদের কোন সমস্যা হবে না। সুতরাং তোমরা যদি সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে তোমাদের সালাতগুলো আদায়ের ব্যাপারে কোন প্রকার ব্যাঘাত সৃষ্টি করা হতে মুক্ত হতে পার তবে তা কর; অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম (তোমরা সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে তোমাদের প্রভূর সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা কর) এ আয়াতটি বললেন। [বুখারীঃ ৫৭৩] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেনঃ 'যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে সালাত আদায় করবে সে জাহান্নামে যাবে না।' অর্থাৎ ফজর ও আসর। [মুসলিমঃ ৬৩৪] [ইবন কাসীর]

(১) অর্থাৎ তাসবীহ্ ও ইবাদাত এজন্যে করুন যাতে আপনার জন্য এমন কিছু অর্জিত হয়, যাতে আপনি সন্তুষ্ট হতে পারেন। মুমিনের সঠিক সন্তুষ্টি আসবে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে। হাদীসে এসেছে, 'আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ হে জান্নাতবাসী! তারা বলবেঃ হাজির হে আমাদের প্রভূ, হাজির। তারপর তিনি বলবেনঃ তোমরা কি সন্তুষ্ট হয়েছ? তারা বলবেঃ কেন আমরা সন্তুষ্ট হব না, অথচ আপনি আমাদেরকে যা দিয়েছেন, সৃষ্টি জগতের কাউকে তা দেননি। তারপর তিনি বলবেনঃ আমি তোমাদেরকে তার থেকেও উত্তম কিছু দেব। তারা বলবেঃ এর থেকে উৎকৃষ্ট আর কিইবা আছে। তিনি বলবেনঃ আমি তোমাদের উপর এমনভাবে সন্তুষ্ট হব, যার পরে আর কখনো অসন্তুষ্ট হব না। [বুখারীঃ ৬৫৪৯, ৭৫১৮, মুসলিমঃ ২৮২৯]

(২) এতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু আসলে উম্মতকে পথ প্রদর্শন করাই লক্ষ্য। বলা হয়েছে, দুনিয়ার ঐশ্বর্যশালী পুঁজিপতিরা হরেক রকমের পার্থিব চাকচিক্য ও বিবিধ নেয়ামতের অধিকারী হয়ে বসে

مِّنۡهُمۡ زَهۡرَةَ الۡحَيٰوةِ الدُّنۡيَا ۙ لِنَفۡتِنَهُمۡ فِيۡهِ ؕ وَرِزۡقُ رَبِّكَ خَيۡرٌ وَّاَبۡقٰى ﴿١٣١﴾

যা আমরা বিভিন্ন শ্রেণীকে দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ উপভোগের উপকরণ হিসেবে দিয়েছি, তা দ্বারা তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য। আর আপনার রব-এর দেয়া রিযিকই সর্বোৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী ।

وَاۡمُرۡ اَهۡلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصۡطَبِرۡ عَلَيۡهَا ؕ لَا نَسۡـَٔلُكَ رِزۡقًا ؕ نَحۡنُ نَرۡزُقُكَ ؕ وَالۡعَاقِبَةُ لِلتَّقۡوٰى ﴿١٣٢﴾

১৩২. আর আপনার পরিবারবর্গকে সালাতের আদেশ দিন ও তাতে অবিচল থাকুন[১], আমরা আপনার কাছে কোন রিযিক চাই না; আমরাই আপনাকে রিযিক দেই[২]। আর শুভ পরিণাম

আছে। আপনি তাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করবেন না। কেননা, এগুলো সব ধ্বংসশীল ও ক্ষণস্থায়ী। আল্লাহ্ তা'আলা যে নেয়ামত আপনাকে এবং আপনার মধ্যস্থতায় মুমিনদেরকে দান করেছেন, তা এই ক্ষণস্থায়ী পার্থিব চাকচিক্য থেকে বহুগুণে উৎকৃষ্ট। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

(১) অর্থাৎ আপনি পরিবারবর্গকে সালাতের আদেশ দিন এবং নিজেও এর উপর অবিচল থাকুন। বাহ্যতঃ এখানে আলাদা আলাদা দু'টি নির্দেশ রয়েছে। (এক) পরিবারবর্গকে সালাতের আদেশ এবং (দুই) নিজেও সালাত অব্যাহত রাখা। এর এমন ফলাফল সামনে এসে যাবে যাতে আপনার হৃদয় উৎফুল্ল হয়ে উঠবে। এ অর্থটি কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। যেমন অন্যত্র সালাতের হুকুম দেবার পর বলা হয়েছেঃ "আশা করা যায়, আপনার রব আপনাকে 'মাকামে মাহমুদে' (প্রশংসিত স্থান) পৌঁছিয়ে দেবেন।" [সূরা আল-ইসরাঃ ৭৯] অন্যত্র বলা হয়েছেঃ "আপনার জন্য পরবর্তী যুগ অবশ্যি পূর্ববর্তী যুগের চাইতে ভালো। আর শিগগির আপনার রব আপনাকে এত কিছু দেবেন যার ফলে আপনি খুশি হয়ে যাবেন।" [সূরা 'আদ-দুহা'ঃ ৪-৫]

(২) অর্থাৎ আপনি নিজের পরিবারবর্গের রিয্ক নিজস্ব জ্ঞান-গরিমা ও কর্মের জোরে সৃষ্টি করুন এবং সালাত থেকে দূরে থাকবেন এটা যেন না হয়। আপনি আল্লাহ্র ইবাদাতের দিকে বেশী মশগুল হোন। আপনি যদি সালাত কায়েম করেন তবে আপনার রিযিকের কোন ঘাটতি হবে না। কোত্থেকে রিযিক আসবে তা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। [ইবন কাসীর] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 'যার যাবতীয় চিন্তা-ভাবনা দুনিয়ার প্রতি ধাবিত হয়, আল্লাহ্ তার যাবতীয় কর্মকাণ্ড বিক্ষিপ্ত করে দেন। আর তার কপালে দারিদ্র্যতা লিখে দেন। আর তার কাছে দুনিয়া শুধু অতটুকুই নিয়ে আসে, যতটুকু আল্লাহ্ তার জন্য লিখেছেন। এবং যার যাবতীয় উদ্দেশ্য হবে

তো তাকওয়াতেই নিহিত[১]।

১৩৩. আর তারা বলে, 'সে তার রব-এর কাছ থেকে আমাদের কাছে কোন নিদর্শন নিয়ে আসে না কেন?' তাদের কাছে কি সুস্পষ্ট প্রমাণ আসেনি যা আগেকার গ্রন্থসমূহে রয়েছে[২]?

وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ ۚ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ ﴿١٣٣﴾

১৩৪. আর যদি আমরা তাদেরকে ইতোপূর্বে শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করতাম, তবে অবশ্যই তারা বলত, 'হে আমাদের রব! আপনি আমাদের কাছে কোন রাসূল পাঠালেন না কেন? পাঠালে আমরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হওয়ার আগে আপনার নিদর্শনাবলী অনুসরণ করতাম।'

وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ ﴿١٣٤﴾

১৩৫. বলুন, 'প্রত্যেকেই প্রতীক্ষা করছে,

قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا ۖ فَسَتَعْلَمُونَ

আখেরাত, আল্লাহ্ তার যাবতীয় কাজ গুছিয়ে দেন, তার অন্তরে অমুখাপেক্ষীতা সৃষ্টি করে দেন। আর দুনিয়া তার কাছে বাধ্য হয়ে এসে পড়ে। [ইবনে মাজাহ্ঃ ৪১০৫]

(১) আমার কোন লাভের জন্য আমি তোমাদের সালাত পড়তে বলছি না। বরং এতে লাভ তোমাদের নিজেদেরই। সেটি হচ্ছে এই যে, তোমাদের মধ্যে তাকওয়া সৃষ্টি হবে। আর এটিই দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানে স্থায়ী ও শেষ সাফল্যের মাধ্যম। এক হাদীসে এসেছে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নে দেখলেন যে, তার কাছে রুতাব 'তাজা' খেজুর নিয়ে আসা হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটার ব্যাখ্যা করলেন যে, আমাদের এ দ্বীনের মর্যাদা দুনিয়াতে বৃদ্ধি পাবে। [দেখুন, মুসলিম: ২২৭০]

(২) অর্থাৎ এটা কি কোন ছোটখাটো মু'জিযা যে, তাদের মধ্য থেকে এক নিরক্ষর ব্যক্তি এমন একটি কিতাব পেশ করেছেন, যাতে শুরু থেকে নিয়ে এ পর্যন্তকার সমস্ত আসমানী কিতাবের বিষয়বস্তু ও শিক্ষাবলীর নির্যাস বের করে রেখে দেয়া হয়েছে তাওরাত, যবুর, ইঞ্জীল ও ইবরাহিমী সহীফা ইত্যাদি আল্লাহ্র গ্রন্থসমূহ সর্বকালেই শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত ও রেসালাতের সাক্ষ্য দিয়েছে। এগুলোর বহিঃপ্রকাশ অবিশ্বাসীদের জন্য পর্যাপ্ত প্রমাণ নয় কি? [ফাতহুল কাদীর]

مَنْ أَصْحٰبُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدٰى ﴿١٣٥﴾

কাজেই তোমরাও প্রতীক্ষা কর[১]। তারপর অচিরেই তোমরা জানতে পারবে কারা রয়েছে সরল পথে এবং কারা সৎপথ অবলম্বন করেছে[২]।'

(১) অর্থাৎ যখন থেকে এ দাওয়াতটি তোমাদের শহরে পেশ করা হয়েছে তখন থেকে শুধুমাত্র এ শহরের নয় বরং আশেপাশের এলাকারও প্রতিটি লোক এর শেষ পরিণতি দেখার জন্য অপেক্ষা করছে। কার জন্য বিজয় রয়েছে এটা মুমিন, কাফের সবাই দেখার অপেক্ষায় আছে। [কুরতুবী]

(২) অর্থাৎ আজ তো আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেককে মুখ দিয়েছেন, প্রত্যেকেই তার তরীকা ও কর্মকে উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ বলে দাবী করতে পারে। কিন্তু এই দাবী কোন কাজে আসবে না। উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ তরীকা তা-ই হতে পারে, যা আল্লাহ্‌র কাছে প্রিয় ও বিশুদ্ধ। আল্লাহ্‌র কাছে কোনটি বিশুদ্ধ, তার সন্ধান কেয়ামতের দিন প্রত্যেকেই পেয়ে যাবে। তখন সবাই জানতে পারবে যে, কে ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট ছিল এবং কে বিশুদ্ধ ও সরল পথে ছিল। কে জান্নাতে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছে। [কুরতুবী] এটা কুরআনের অন্য আয়াতের মত হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে, "আর যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, তখন জানতে পারবে কে অধিক পথভ্রষ্ট।" [সূরা আল-ফুরকান: ৪২] [ইবন কাসীর]

২১- সূরা আল-আম্বিয়া’[১]
১১২ আয়াত, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ ۚ

১. মানুষের হিসেব-নিকেশের সময় আসন্ন[২], অথচ তারা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে রয়েছে[৩]।

مَا يَأْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ مُّحْدَثٍ اِلَّا اسْتَمَعُوْهُ

২. যখনই তাদের কাছে তাদের রব-এর

(১) আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন: বনী ইসরাঈল, কাহ্ফ, মার্ইয়াম, ত্বা-হা ও আম্বিয়া- এগুলো আমার প্রাচীন সম্পদ ও উপার্জন। [বুখারীঃ ৪৪৩১] এর থেকে বুঝা যায় যে, এ সুরাগুলো প্রাথমিক যুগে নাযিল হয়েছিল। এগুলোর প্রতি সাহাবায়ে কিরামের আলাদা দরদ ছিল। তাই আমাদেরও উচিত এগুলোকে বেশি ভালবাসা এবং এগুলো থেকে হেদায়াত সংগ্রহ করা।

(২) অর্থাৎ মানুষের কাছ থেকে তাদের কৃতকর্মের হিসাব নেয়ার দিন অর্থাৎ কেয়ামতের দিন ঘনিয়ে এসেছে। এখানে পৃথিবীর বিগত বয়সের অনুপাতে ঘনিয়ে আসার কথা বলা হয়েছে। লোকদের নিজেদের কাজের হিসেব দেবার জন্য তাদের রবের সামনে হাজির হবার সময় আর দূরে নেই। মুহাম্মাদ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমন একথারই আলামত যে, মানব জাতির ইতিহাস বর্তমানে তার শেষ পর্যায়ে প্রবেশ করছে। এখন সে তার সূচনাকালের পরিবর্তে পরিণামের বেশী নিকটবর্তী হয়ে গেছে। সূচনা ও মধ্যবর্তীকালীন পর্যায় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে এবং এবার শেষ পর্যায়ে শুরু হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর একটি হাদীসে একথাই বলেছেন। তিনি নিজের হাতের দু’টি আঙ্গুল পাশাপাশি রেখে বলেনঃ “আমার আগমন এমন সময়ে ঘটেছে যখন আমি ও কেয়ামত এ দু’টি আঙ্গুলের মতো অবস্থান করছি।” [বুখারীঃ ৪৯৯৫] অর্থাৎ আমার পরে শুধু কেয়ামতই আছে, মাঝখানে অন্য কোন নবীর আগমনের অবকাশ নেই। যদি সংশোধিত হয়ে যেতে চাও তাহলে আমার দাওয়াত গ্রহণ করে সংশোধিত হও।

(৩) অর্থাৎ কোন সতর্কসংকেত ও সর্তকবাণীর প্রতি দৃষ্টি দেয় না। দুনিয়া নিয়ে তারা এতই মগ্ন যে, আখেরাতের কথা ভুলে গেছে। আখেরাতের জন্য প্রস্তুতি নিতে হলে যে আল্লাহ্র উপর ঈমান, তাঁর ফরায়েযগুলো আদায় করতে হয়, নিষিদ্ধ কাজগুলো থেকে দূরে থাকতে হয় সেটার জন্য তারা প্রস্তুতি নিচ্ছে না। [ফাতহুল কাদীর] আর যে নবী তাদেরকে সর্তক করার চেষ্টা করছেন তার কথাও শোনে না। তাদের রাসূলের কাছে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যে ওহী এসেছে তারা সেটার প্রতি দৃষ্টি দেয় না। এ নির্দেশটি প্রাথমিকভাবে কুরাইশ ও তাদের মত যারা কাফের তাদেরকে করা হচ্ছে। [ইবন কাসীর]

কোন নতুন উপদেশ আসে[১] তখন তারা তা শোনে কৌতুকচ্ছলে[২],

وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿٢﴾

৩. তাদের অন্তর থাকে অমনোযোগী। আর যারা যালেম তারা গোপনে পরামর্শ করে, 'এ তো তোমাদের মত একজন মানুষই, তবুও কি তোমরা দেখে-শুনে জাদুর কবলে পড়বে[৩]?'

لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ ۗ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۖ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿٣﴾

৪. তিনি বললেন, 'আসমানসমূহ ও যমীনের সমস্ত কথাই আমার রব-এর

قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

(১) অর্থাৎ কুরআনের যে নতুন সূরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর নাযিল হয় এবং তাদেরকে শুনানো হয়। [ইবন কাসীর] তারা এটাকে কোন গুরুত্বের সাথে শুনে না। ইবন আব্বাস বলেন, তোমাদের কি হলো যে, তোমরা আহলে কিতাবদেরকে তাদের কাছে যা আছে তা জিজ্ঞেস কর, অথচ তারা তাদের কিতাবকে বিকৃতকরণ, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, বাড়ানো-কমানো সবই করেছে। আর তোমাদের কাছে রয়েছে এমন এক কিতাব যা আল্লাহ্ সবেমাত্র নাযিল করেছেন, যা তোমরা পাঠ করে থাক, যাতে কোন কিছুর সংমিশ্রণ ঘটেনি। [বুখারী: ২৬৮৫]।

(২) যারা আখেরাত ও কবরের আযাব থেকে গাফেল এবং তজ্জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করে না, এটা তাদের অবস্থার অতিরিক্ত বর্ণনা। যখন তাদের সামনে কুরআনের কোন নতুন আয়াত আসে এবং পঠিত হয়, তখন তারা একে কৌতুক ও হাস্য উপহাসচ্ছলে শ্রবণ করে। তাদের অন্তর আল্লাহ্ ও আখেরাতের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে। এর এ অর্থও হতে পারে যে, তারা খেলাধুলায় লিপ্ত থাকে, কুরআনের প্রতি মনোযোগ দেয় না এবং এরূপ অর্থও হতে পারে যে স্বয়ং কুরআনের আয়াতের সাথেই তারা রঙ-তামাশা করতে থাকে। আবার এ অর্থও হতে পারে যে, এখানে খেলা মানে হচ্ছে এই জীবনের খেলা। আল্লাহ ও আখেরাতের ব্যাপারে গাফেল লোকেরা এ খেলা খেলছে। [দেখুন, কুরতুবী]

(৩) অর্থাৎ তারা বলতো, এ ব্যক্তি তো কোনক্রমে নবী হতেই পারে না। কারণ এতো আমাদেরই মতো মানুষ, খায় দায়, বাজারে ঘুরে বেড়ায়, স্ত্রী-সন্তানও আছে। কাজেই এ লোক কি করে নবী হয়? তবে কিনা এ ব্যক্তির কথাবার্তায় এবং এর ব্যক্তিত্বের মধ্যে জাদু আছে। ফলে যে ব্যক্তি এর কথা কান লাগিয়ে শোনে এবং এর কাছে যায় সে এর ভক্ত হয়ে পড়ে। কাজেই যদি নিজের ভালো চাও তাহলে এর কথায় কান দিয়ো না এবং এর সাথে মেলামেশা করো না। কারণ এর কথা শোনা এবং এর নিকটে যাওয়া সুস্পষ্ট জাদুর ফাঁদে নিজেকে আটকে দেয়ার মতই। [দেখুন, ইবন কাসীর]

وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ④

জানা আছে এবং তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ ।(১)’

بَلْ قَالُوٓا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍۭ بَلِ افْتَرَىٰهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِـَٔايَةٍ كَمَآ أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ ⑤

৫. বরং তারা বলে, ‘এসব অলীক কল্পনা, হয় সে এগুলো রটনা করেছে, না হয় সে একজন কবি(২) । অতএব সে নিয়ে আসুক আমাদের কাছে এক নিদর্শন যেরূপ নিদর্শনসহ প্রেরিত হয়েছিল পূর্ববর্তীগণ ।’

مَآ ءَامَنَتْ قَبْلَهُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَٰهَآ ۖ أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ⑥

৬. এদের আগে যেসব জনপদ আমরা ধ্বংস করেছি সেখানকার অধিবাসীরা ঈমান আনেনি; তবে কি তারা ঈমান আনবে(৩)?

---

(১) অর্থাৎ নবী তাদের মিথ্যা প্রচারণা ও গুজব রটনার এই অভিযানের জবাবে এটাই বলেন যে, তোমরা যেসব কথা তৈরী করো, সেগুলো জোরে জোরে বলো বা চুপিসারে কানে কানে বলো, আল্লাহ সবই শোনেন ও জানেন । [ফাতহুল কাদীর] তিনি আসমান ও যমীনের সমস্ত কথা জানেন । কোন কথাই তার কাছে গোপন নেই । আর তিনিই এ কুরআন নাযিল করেছেন । যা আগের ও পরের সবার কল্যাণ সমৃদ্ধ । কেউ এর মত কোন কিছু আনতে পারবে না । শুধু তিনিই এটা আনতে পারবেন যিনি আসমান ও যমীনের গোপন রহস্য জানেন । তিনি তোমাদের কথা শুনেন, তোমাদের অবস্থা জানেন । [ইবন কাসীর]

(২) যেসব স্বপ্নের মানসিক অথবা শয়তানী কল্পনা শামিল থাকে, সেগুলোকে أحلام বলা হয় । এ কারণেই এর অনুবাদ “অলীক কল্পনা” করা হয়েছে । এর আরেক অর্থ হয়, মিথ্যা স্বপ্ন । [ফাতহুল কাদীর] অর্থাৎ অবিশ্বাসীরা প্রথমে কুরআনকে জাদু বলেছে, এরপর আরও অগ্রসর হয়ে বলতে শুরু করেছে যে, এটা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন ও অপবাদ যে, এটা তাঁর কালাম । অবশেষে বলতে শুরু করেছে যে, আসল কথা হচ্ছে লোকটি একজন কবি । তার কালামে কবিসুলভ কল্পনা আছে । এভাবে কাফেররা সীমালঙ্ঘন ও গোঁড়ামীর বশে যা ইচ্ছে তা-ই এ কুরআনের জন্য সাব্যস্ত করছে । যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন, “দেখুন, তারা আপনার কী উপমা দেয়! ফলে তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে , সুতরাং তারা পথ পাবে না ।” [সূরা আল-ইসরা: ৪৮] [ইবন কাসীর]

(৩) এ সংক্ষিপ্ত বাক্যে নিদর্শন দেখাবার দাবীর যে জবাব দেয়া হয়েছে তার মধ্যে তিনটি বিষয় রয়েছে । এক, পূর্ববর্তী রাসূলদেরকে যে ধরনের নিদর্শন দেয়া হয়েছিল

৭. আর আপনার আগে আমরা ওহীসহ পুরুষদেরকেই পাঠিয়েছিলাম[১]; সুতরাং যদি তোমরা না জান তবে

وَمَآ أَرۡسَلۡنَا قَبۡلَكَ إِلَّا رِجَالٗا نُّوحِيٓ إِلَيۡهِمۡۖ فَسۡـَٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ۝

তোমরা তেমনি ধরনের নিদর্শন চাচ্ছো? কিন্তু তোমরা ভুলে যাচ্ছো হঠকারী লোকেরা সেসব নিদর্শন দেখেও ঈমান আনেনি। দুই, তোমরা নিদর্শনের দাবী তো করছো কিন্তু একথা মনে রাখছো না যে, সুস্পষ্ট মু'জিযা স্বচক্ষে দেখে নেবার পরও যে জাতি ঈমান আনতে অস্বীকার করেছে তারা এরপর শুধু ধ্বংসই হয়ে গেছে। তিন, তোমাদের চাহিদামতো নিদর্শনাবলী না পাঠানো তো তোমাদের প্রতি আল্লাহর একটি বিরাট মেহেরবাণী। কারণ এ পর্যন্ত তোমরা আল্লাহর হুকুম শুধুমাত্র অস্বীকারই করে আসছো কিন্তু এ জন্য তোমাদের উপর আযাব পাঠানো হয়নি। এখন কি তোমরা নিদর্শন এ জন্য চাচ্ছো যে, যেসব জাতি নিদর্শন দেখার পরও ঈমান আনেনি এবং এ জন্য তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে তোমরাও তাদের মতো একই পরিণতির সম্মুখীন হতে চাও? তাদের পূর্বের লোকদের কাছে নিদর্শন পাঠানোর পরও তারা যখন ঈমান আনেনি তখন এরাও আসলে ঈমান আনবে না। আল্লাহ্ বলেন, “নিশ্চয় যাদের বিরুদ্ধে আপনার রবের বাক্য সাব্যস্ত হয়ে গেছে, তারা ঈমান আনবে না। যদিও তাদের কাছে সবগুলো নিদর্শন আসে, যে পর্যন্ত না তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেখতে পাবে।” [সূরা ইউনুস: ৯৬-৯৭] এত কিছু বলা হলেও মূল কথা হচ্ছে, তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এমন নিদর্শন দেখেছে যা পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদের কাছে যে সমস্ত নিদর্শন ছিল তা থেকে অনেক বেশী স্পষ্ট, অকাট্য ও শক্তিশালী। [দেখুন, ইবন কাসীর]

(১) এটি হচ্ছে “এ ব্যক্তি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ” তাদের এ উক্তির জবাব। তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মানবিক সত্তাকে তাঁর নবী না হওয়ার বিরুদ্ধে যুক্তি হিসেবে পেশ করতো। জবাব দেয়া হয়েছে যে, পূর্ব যুগের যেসব লোককে আল্লাহর পক্ষ থেকে পাঠানো হয়েছে বলে তোমরা মানো তারা সবাইও মানুষ ছিলেন এবং মানুষ থাকা অবস্থায়ই তারা আল্লাহর অহী লাভ করেছিলেন। যেমন অন্য আয়াতে বলেছেন, “আর আমরা আপনার আগেও জনপদবাসীদের মধ্য থেকে পুরুষদেরকেই পাঠিয়েছিলাম, যাদের কাছে ওহী পাঠাতাম।” [সূরা ইউসুফ: ১০৯]

এ আয়াত থেকে আরো জানা গেল যে, মহান আল্লাহ্ নবুওয়ত ও রিসালাতের জন্য শুধুমাত্র পুরুষদেরকেই মনোনীত করেছেন। নারীরা এটার যোগ্যতা রাখে না বলেই তাদের দেয়া হয়নি। সৃষ্টিগতভাবে এতবড় গুরু-দায়িত্ব নেয়ার যোগ্যতা তাদের নেই। নবুওয়তের প্রচার-প্রসারের জন্য যে নিরলস সংগ্রাম দরকার হয় তা নারীরা কখনো করতে পারে না। তাদেরকে তাদের সৃষ্টি উপযোগী দায়িত্বই দেয়া হয়েছে। তাদের দায়িত্বও কম জবাবদিহীতাও স্বল্প। তাদেরকে এ দায়িত্ব না দিয়ে আল্লাহ্ তাদের উপর বিরাট রহমত করেছেন।

জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর[১]।

৮. আর আমরা তাদেরকে এমন দেহবিশিষ্ট করিনি যে, তারা খাবার গ্রহণ করত না; আর তারা চিরস্থায়ীও ছিল না[২]।

وَمَا جَعَلْنٰهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوْا خٰلِدِيْنَ ۝

৯. তারপর আমরা তাদের প্রতি কৃত ওয়াদা সত্য করে দেখালাম, ফলে আমরা

ثُمَّ صَدَقْنٰهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنٰهُمْ وَمَنْ نَّشَآءُ وَأَهْلَكْنَا

(১) এখানে ﴿أَهْلَ الذِّكْرِ﴾ বা "জ্ঞানীদের" বলে তাওরাত ও ইঞ্জীলের যেসব আলেম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তাদেরকে বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, যে ইহুদীরা ইসলাম বৈরিতার ক্ষেত্রে আজ তোমার সাথে গলা মিলিয়ে চলছে এবং তোমাদেরকে বিরোধিতা করার কায়দা কৌশল শেখাচ্ছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, মূসা ও বনী ইসরাঈলের অন্যান্য নবীগণ কী ছিলেন? মানুষ ছিলেন, না ফেরেশতা ছিলেন? কেননা, তারা সবাই জানে যে পূর্ববর্তী সকল নবী মানুষই ছিলেন। এটা তো মূলত: তাদের জন্য রহমতস্বরূপ। কারণ, তাদের মধ্য থেকে পাঠানোর কারণেই তিনি তাদের কাছে বাণী পৌছাতে সক্ষম হয়েছেন। আর মানুষও নবীদের থেকে রিসালাত ও হুকুম আহকাম গ্রহণ করতে পেরেছেন। [ইবন কাসীর]

এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, শরী'আতের বিধি -বিধান জানে না, এরূপ মূর্খ ব্যক্তিদের উপর আলেমদের অনুসরণ করা ওয়াজিব। তারা আলেমদের কাছে জিজ্ঞেস করে তদনুযায়ী আমল করবে। [সা'দী]

(২) এটা তাদের আরেক প্রশ্নের উত্তর। তারা বলত যে, এটা কেমন নবী হলেন যে, খাওয়া-দাওয়া করেন? বলা হচ্ছে যে, যত নবী-রাসূলই পাঠিয়েছি তারা সবাই শরীর বিশিষ্ট লোক ছিলেন। তারা খাবার খেতেন। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "আপনার আগে আমরা যে সকল রাসূল পাঠিয়েছি তারা সকলেই তো খাওয়া-দাওয়া করত ও হাটে-বাজারে চলাফেরা করত।" [সূরা আল-ফুরকান: ২০] অর্থাৎ তারাও মানুষদের মতই মানুষ ছিলেন। তারাও মানুষদের মতই খানা-পিনা করতেন। কামাই রোযগার করতে, ব্যবসা করতে বাজারে যেতেন। এটা তাদের কোন ক্ষতি করেনি। তাদের কোন মানও কমায়নি। কাফের মুশরিকরা যে ধারণা করে থাকে তা ঠিক নয়। তারা বলত: "এ কেমন রাসূল' যে খাওয়া-দাওয়া করে এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করে; তার কাছে কোন ফিরিশ্‌তা কেন নাযিল করা হল না, যে তার সংগে থাকত সতর্ককারীরূপে?' 'অথবা তার কাছে কোন ধনভাণ্ডার এসে পড়ল না কেন অথবা তার একটি বাগান নেই কেন, যা থেকে সে খেতো?' যালিমরা আরো বলে, 'তোমরা তো এক জাদুগ্রস্ত ব্যক্তিরই অনুসরণ করছ।" [সূরা আল-ফুরকান: ৭-৮] [ইবন কাসীর]

الْمُسْرِفِينَ ⑨

তাদেরকে ও যাদেরকে ইচ্ছে রক্ষা করেছিলাম এবং সীমালংঘনকারীদেরকে করেছিলাম ধ্বংস[১] ।

لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ⑩

১০. আমরা তো তোমাদের প্রতি নাযিল করেছি কিতাব যাতে আছে তোমাদের আলোচনা, তবুও কি তোমরা বুঝবে না[২]?

দ্বিতীয় রুকূ’

وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ⑪

১১. আর আমরা ধ্বংস করেছি বহু জনপদ, যার অধিবাসীরা ছিল যালেম এবং তাদের পরে সৃষ্টি করেছি অন্য জাতি ।

فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَرْكُضُونَ ⑫

১২. অতঃপর যখন তারা আমাদের শাস্তি টের পেল[৩] তখনই তারা সেখান থেকে পালাতে লাগল ।

لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ

১৩. ‘পালিয়ে যেও না এবং ফিরে এসো যেখানে তোমরা বিলাসিতায় মত্ত

(১) অর্থাৎ পূর্ববর্তী ইতিহাসের শিক্ষা শুধুমাত্র একথা বলে না যে, পূর্বে যেসব রাসূল পাঠানো হয়েছিল তারা মানুষ ছিলেন বরং একথাও বলে যে, তাদের সাহায্য ও সমর্থন করার এবং তাদের বিরোধিতাকারীদেরকে ধ্বংস করে দেবার যতগুলো অংগীকার আল্লাহ তাদের সাথে করেছিলেন সবই পূর্ণ হয়েছে এবং যেসব জাতি তাদের প্রতি অমর্যাদা প্রদর্শন করার চেষ্টা করেছিল তারা সবাই ধ্বংস হয়েছে । [ইবন কাসীর] কাজেই নিজেদের পরিণতি তোমরা নিজেরাই চিন্তা করে নাও ।

(২) কিতাব অর্থ কুরআন এবং যিক্‌র অর্থ সম্মান শ্রেষ্ঠত্ব, খ্যাতি, উল্লেখ, আলোচনা ও বর্ণনা । আয়াতের অর্থ হচ্ছে, এটা তোমাদের জন্য সম্মান, প্রতিপত্তি ও স্থায়ী সুখ্যাতির বস্তু । যদি তোমরা এর উপর ঈমান আন এবং এটা অনুসারে আমল কর । বাস্তবিকই সাহাবোয়ে কিরাম এর বড় নিদর্শন । তারা এর উপর ঈমান এনেছিল এবং আমল করেছিল বলেই তাদের সম্মান এত বেশী । [সা‘দী]

(৩) অর্থাৎ যখন তাদের নবীর ওয়াদামত আল্লাহর আযাব মাথার উপর এসে পড়েছে এবং তারা জানতে পেরেছে যে, তাদের ধ্বংস এসে গেছে তখন তারা পালাতে লাগল । [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

لَعَلَّكُمْ تُسْـَٔلُونَ ﴿١٣﴾

ছিলে ও তোমাদের আবাসগৃহে, যাতে এ বিষয়ে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়[১]।'

قَالُوا يَـٰوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَّا ظَـٰلِمِينَ ﴿١٤﴾

১৪. তারা বলল, 'হায়! দুর্ভোগ আমাদের! আমরা তো ছিলাম যালেম[২]।'

فَمَا زَالَت تِّلْكَ دَعْوَىٰهُمْ حَتَّىٰ جَعَلْنَـٰهُمْ حَصِيدًا خَـٰمِدِينَ ﴿١٥﴾

১৫. অতঃপর তাদের এ আর্তনাদ চলতে থাকে আমরা তাদেরকে কাটা শস্য ও নেভানো আগুনের মত না করা পর্যন্ত।

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَـٰعِبِينَ ﴿١٦﴾

১৬. আর আসমান, যমীন ও যা এতদুভয়ের মধ্যে আছে তা আমরা খেলার ছলে সৃষ্টি করিনি।

---

(১) অর্থাৎ তোমরা পালিয়ে যেও না। এ কথাটি হয় ফেরেশতারা বলেছিল অথবা মুমিনরা তাদেরকে উপহাস করে তা বলেছিল। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর] অর্থাৎ তোমরা নিজের আগের ঠাঁট বজায় রেখে সাড়ম্বরে আবার মজলিস গরম করো। হয়তো এখনো তোমাদের চাকরেরা বুকে হাত বেঁধে জিজ্ঞেস করবে, হুজুর, বলুন কি হুকুম। নিজের আগের পরিষদ ও কমিটি নিয়ে বসে যাও, হয়তো এখনো তোমার বুদ্ধিবৃত্তিক পরামর্শ ও জ্ঞানপুষ্ট মতামত থেকে লাভবান হবার জন্য দুনিয়ার লোকেরা তৈরী হয়ে আছে। কিন্তু এটা আর কখনও সম্ভব নয়, তারা আর সে মজলিসগুলোতে ফিরে যেতে পারবে না। তাদের কর্মকাণ্ড ও অহংকার নিঃশেষ হয়ে গেছে। [সা'দী]

(২) অর্থাৎ খেলা-তামাসা করা আমার কাজ নয়। এগুলোকে আমি অনাহুত ও অসার সৃষ্টি করিনি। বরং এটা বোঝানোর জন্য যে, এর একজন সৃষ্টিকর্তা রয়েছে, যিনি ক্ষমতাবান, যার নির্দেশ মানতে সবাই বাধ্য। তিনি নেককার ও বদকারের শাস্তি বিধান করবেন। তিনি আসমান ও যমীন এজন্যে সৃষ্টি করেননি যে মানুষ একে অপরের উপর যুলুম করবে। এজন্যে সৃষ্টি করেননি যে, তাদের কেউ কুফরী করবে, তাদেরকে যা নির্দেশ দেয়া হয়েছে তার বিরোধিতা করবে। তারপর মারা যাবে কিন্তু তাদের কোন শাস্তি হবে না। তাদেরকে এজন্যে সৃষ্টি করা হয়নি যে, তাদেরকে দুনিয়াতে ভাল কাজের নির্দেশ দিবেন না, খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করবেন না। এ ধরনের খেলা একজন প্রাজ্ঞ থেকে কখনও হতে পারে না। এটা অবশ্যই প্রজ্ঞা বিরোধী কাজ। [কুরতুবী] বরং আল্লাহ্ আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে, ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার জন্য। বরং তিনি সৃষ্টি করেছেন, "যাতে তিনি তাদের কাজের প্রতিফল দিতে পারেন যারা মন্দ কাজ করে এবং তাদেরকে তিনি উত্তম পুরস্কার দিতে পারেন যারা সৎকাজ করে।" [সূরা আন-নাজম: ৩১] [ইবন কাসীর]

لَوْ أَرَدْنَآ أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنَٰهُ مِن لَّدُنَّآ إِن كُنَّا فَٰعِلِينَ ﴿١٧﴾

১৭. আমরা যদি খেলার উপকরণ গ্রহণ করতে চাইতাম তবে আমরা আমাদের কাছ থেকেই তা গ্রহণ করতাম; কিন্তু আমরা তা করিনি(১)।

بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَى ٱلْبَٰطِلِ فَيَدْمَغُهُۥ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ۚ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ﴿١٨﴾

১৮. বরং আমরা সত্য দ্বারা আঘাত হানি মিথ্যার উপর; ফলে তা মিথ্যাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় এবং তৎক্ষণাৎ মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়(২)। আর তোমরা আল্লাহকে যে গুণে গুণান্বিত

---

(১) অর্থাৎ আমি যদি ক্রীড়াচ্ছলে কোন কাজ গ্রহণ করতে চাইতাম এবং একাজ আমাকে করতেই হত, তবে পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি করার কি প্রয়োজন ছিল? একাজ তো আমার নিকটস্থ বস্তু দ্বারাই হতে পারত। لَهْو শব্দের আসল অর্থ, কর্মহীনতার কর্ম, বা রং-তামাশার জন্য যা করা হয় তা। উদ্দেশ্য এই যে, যেসব বোকা উর্ধ্ব জগত ও অধঃজগতের সমস্ত আশ্চর্যজনক সৃষ্টবস্তুকে রং তামাশা ও ক্রীড়া মনে করে, তারা কি এতটুকুও বোঝে না যে, খেলা ও রং তামাশার জন্য এত বিরাট বিরাট কাজ করা হয় না। একাজ যে করে, সে এভাবে করে না। এ আয়াতে ইঙ্গিত আছে যে, রং তামাশা ও ক্রীড়ার যে কোন কাজ কোন ভালো বিবেকবান মানুষের পক্ষেও সম্ভবপর নয় - আল্লাহ্ তা‘আলার মাহাত্ম্য তো অনেক উর্ধ্বে। তাছাড়া لَهْو শব্দটি কোন কোন সময় স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এখানে এ অর্থ ধরা হলে আয়াতের উদ্দেশ্য হবে ইয়াহূদী ও নাসারাদের দাবী খণ্ডন করা। তারা উযায়ের ও ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহর পুত্র বলে। আয়াতে বলা হয়েছে যে, যদি আমাকে সন্তানই গ্রহণ করতে হত, তবে মানবকে কেন গ্রহণ করতাম, আমার নিকটস্থ সৃষ্টিকেই গ্রহণ করতাম। [দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] এ আয়াতটির বক্তব্য অন্য আয়াতের মত, যেখানে বলা হয়েছে, “আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করতে চাইলে তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যাকে ইচ্ছে বেছে নিতেন। পবিত্র ও মহান তিনি! তিনি আল্লাহ্, এক, প্রবল প্রতাপশালী।” [সূরা আয-যুমার: ৪]

(২) আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, পৃথিবী ও আকাশের অত্যাশ্চর্য বস্তুসমূহ আমি খেলার জন্য নয়, বরং বড় বড় রহস্যের উপর ভিত্তিশীল করে সৃষ্টি করেছি। তন্মধ্যে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য ফুটিয়ে তোলাও এক রহস্য। সৃষ্ট জগতের অবলোকন মানুষকে সত্যের দিকে এমনভাবে পথ প্রদর্শন করে যে, মিথ্যা তার সামনে টিকে থাকতে পারে না। এ বিষয়বস্তুটিই এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, সত্যকে মিথ্যার উপর ছুঁড়ে মারা হয়, ফলে মিথ্যার মস্তিষ্ক চুর্ণ -বিচুর্ণ হয়ে যায় এবং মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়ে। [দেখুন, ইবন কাসীর]

করছ তার জন্য রয়েছে তোমাদের দুর্ভোগ[১]!

১৯. আর আসমানসমূহ ও যমীনে যারা আছে তারা তাঁরই; আর তাঁর সান্নিধ্যে যারা আছে[২] তারা অহংকার-বশে তাঁর 'ইবাদাত করা হতে বিমুখ হয় না এবং বিরক্তি বোধ করে না[৩]।

وَلَهُ مَن فِي السَّمَٰوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿١٩﴾

২০. তারা দিন-রাত তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, তারা ক্লান্তও হয় না[৪]।

يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴿٢٠﴾

২১. এরা যমীন থেকে যেগুলোকে মা'বুদ হিসেবে গ্রহণ করেছে সেগুলো কি

أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ﴿٢١﴾

---

(১) এ আয়াতে আল্লাহ্ সম্পর্কে তাদের যাবতীয় কু ধারণার মুলোৎপাটন করা হয়েছে। তারা আল্লাহকে তার সমস্ত কর্মকাণ্ড থেকে বিমুক্ত করে রাখে। তারা তাঁকে মনে করে থাকে যে, তিনি এমনিতেই আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, কোন সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছাড়া। এ সমস্ত মিথ্যা কথা ও রটনা দ্বারা আল্লাহকে খারাপ বিশেষণে বিশেষিত করা হয় বিধায় এ আয়াতে তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। [দেখুন, কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(২) যারা তাঁর সান্নিধ্যে আছে তারা হলেন 'ফিরিশ্তারা'। আরব মুশরিকরা সেসব ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর সন্তান অথবা প্রভুত্ব কর্তৃত্বে শামিল মনে করে মাবুদ বানিয়ে রেখেছিল। [কুরতুবী] এখানে তাদের ধারণা খণ্ডন করা হচ্ছে।

(৩) অন্য আয়াতেও এসেছে, "মসীহ্ আল্লাহ্র বান্দা হওয়াকে কখনো হেয় মনে করেন না, এবং ঘনিষ্ঠ ফেরেশ্তাগণও করে না। আর কেউ তাঁর ইবাদাতকে হেয় জ্ঞান করলে এবং অহংকার করলে তিনি অচিরেই তাদের সবাইকে তাঁর কাছে একত্র করবেন।" [সূরা আন-নিসা: ১৭২]

(৪) আয়াতের শেষে বলা হয়েছে যে, ফেরেশতাদের ইবাদাতে কোন অন্তরায় নেই। তারা ইবাদতে অহংকারও করে না যে, ইবাদাতকে পদমর্যাদার খেলাফ মনে করবে এবং ইবাদাতে কোন সময় ক্লান্তও হয় না। আয়াতে এ বিষয়বস্তুকেই পূর্ণতা দান করে বলা হয়েছে যে, ফেরেশতারা রাত দিন তসবীহ পাঠ করে এবং কোন সময় অলসতা করেন না। যাজ্জাজ বলেন, আমাদের নিঃশ্বাস নিতে যেমন কোন কাজ বাধা হয় না, তেমনি তাদের তাসবীহ পাঠ করতে কোন কাজ বাধা হয় না। [দেখুন, কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম[১]?

২২. যদি এতদুভয়ের (আসমান ও যমীনের) মধ্যে আল্লাহ্ ব্যতীত আরো অনেক ইলাহ্ থাকত, তাহলে উভয়ই বিশৃংখল হত[২]। অতএব, তারা

لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحَٰنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٢٢﴾

(১) 'ইনশার' মানে হচ্ছে, কোন পড়ে থাকা প্রাণহীন বস্তুকে তুলে দাঁড় করিয়ে দেয়া। [কুরতুবী] এতে আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়, যেসব সত্তাকে তারা ইলাহ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে রেখেছে এবং যাদেরকে নিজেদের মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে তাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে যে, নিষ্প্রাণ বস্তুর বুকে প্রাণ সঞ্চার করতে পারে? যদি এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো মধ্যে এ শক্তি না থেকে থাকে আর আরবের মুশরিকরা নিজেরাই একথা স্বীকার করতো যে, এ শক্তি কারো মধ্যে নেই তাহলে তারা তাদেরকে ইলাহ্ ও মাবুদ বলে মেনে নিচ্ছে কেন? [দেখুন, কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(২) এটা তাওহীদের প্রমাণ, যা সাধারণ অভ্যাসের উপর ভিত্তিশীল এবং যুক্তিসঙ্গত প্রমাণের দিকেও ইঙ্গিতবহ। অভ্যাসগত প্রমাণের ভিত্তি এই যে, পৃথিবী ও আকাশে দুই ইলাহ্ থাকলে উভয়ই সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হবে। এমতাবস্থায় উভয়ের নির্দেশাবলী পৃথিবী ও আকাশে পূর্ণরূপে কার্যকরী হওয়া উচিত। অভ্যাসগতভাবে এটা অসম্ভব যে, একজন যে নির্দেশ দেবে, অন্যজনও সেই নির্দেশ দেবে, একজন যা পছন্দ করবে, অন্যজনও তাই পছন্দ করবে। তাই উভয়ের মধ্যে মাঝে মাঝে মতবিরোধ ও নির্দেশ বিরোধ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। যখন দুই ইলাহ্র নির্দেশাবলী পৃথিবী ও আকাশে বিভিন্নরূপ হবে, তখন এর ফলশ্রুতি পৃথিবী ও আকাশের ধ্বংস ছাড়া আর কি হবে। এক ইলাহ্ চাইবে যে এখন দিন হোক, অপর ইলাহ্ চাইবে এখন রাত্রি হোক। একজন চাইবে বৃষ্টি হোক, অপরজন চাইবে বৃষ্টি না হোক। এমতাবস্থায় উভয়ের পরস্পর বিরোধী নির্দেশ কিরূপে প্রযোজ্য হবে? যদি একজন পরাভূত হয়ে যায়, তবে সে সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী ও ইলাহ্ থাকতে পারবে না। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, উভয় ইলাহ্ পরস্পরে পরামর্শ করে নির্দেশ জারি করলে তাতে অসুবিধা কি? তার উত্তর হলো এই যে, যদি উভয়ই পরামর্শের অধীন হয় এবং একজন অন্যজনের পরামর্শ ছাড়া কোন কাজ করতে না পারে, তবে এতে জরুরী হয়ে যায় যে, তাদের কেউ সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী নয় এবং কেউ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। বলাবাহুল্য, স্বয়ংসম্পূর্ণ না হয়ে ইলাহ্ হওয়া যায় না। সম্ভবতঃ পরবর্তী আয়াতেও এদিকে ইশারা পাওয়া যায় যে, যে ব্যক্তি কোন আইনের অধীন, যার ক্রিয়াকর্ম ধরপাকড় যোগ্য, সে ইলাহ্ হতে পারে না। ইলাহ তিনিই হবেন, যিনি কারও অধীন নয়, যাকে জিজ্ঞাসা করার অধিকার কারও নেই। পরামর্শের অধীন দুই ইলাহ্ থাকলে প্রত্যেকেই অপরিহার্যরূপে অপরকে জিজ্ঞাসা করার ও পরামর্শ বর্জনের কারণে ধরপাকড় করার অধিকারী হবে। এটা ইলাহ হওয়ার পদমর্যদার নিশ্চিত পরিপন্থী।

যা বর্ণনা করে তা থেকে 'আরশের অধিপতি আল্লাহ্ কতই না পবিত্র।

لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْـَٔلُونَ ﴿٢٣﴾

২৩. তিনি যা করেন সে বিষয়ে তিনি জিজ্ঞাসিত হবেন না; বরং তাদেরকেই জিজ্ঞাসা করা হবে।

أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِۦٓ ءَالِهَةًۖ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْۖ هَٰذَا ذِكْرُ مَن مَّعِىَ وَذِكْرُ مَن قَبْلِىۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّۖ فَهُم مُّعْرِضُونَ ﴿٢٤﴾

২৪. তারা কি তাঁকে ছাড়া বহু ইলাহ্ গ্রহণ করেছে? বলুন, তোমরা তোমাদের প্রমাণ দাও। এটাই, আমার সাথে যা আছে তার উপদেশ এবং এটাই উপদেশ ছিল আমার পূর্ববর্তীদের সাথে যা ছিল তার[১]। কিন্তু তাদের

[দেখুন, সা'দী] এটি একটি সরল ও সোজা যুক্তি আবার গভীর তাৎপর্যপূর্ণও। এটি এত সহজ সরল কথা যে, একজন মরুচারী বেদুঈন, সরল গ্রামবাসী এবং মোটা বুদ্ধির অধিকারী সাধারণ মানুষও একথা বুঝতে পারে। এ আয়াতটি অন্য আয়াতের মত, যেখানে বলা হয়েছে, "আল্লাহ্ কোন সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সাথে অন্য কোন ইলাহ্ও নেই; যদি থাকত তবে প্রত্যেক ইলাহ্ স্বীয় সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেত এবং একে অন্যের উপর প্রাধান্য বিস্তার করত। তারা যে গুণে তাকে গুণান্বিত করে তা থেকে আল্লাহ্ কত পবিত্র- মহান!" [সূরা আল-মুমিনূন: ৯১] [ইবন কাসীর] তবে লক্ষণীয় যে, আয়াতে এটা বলা হয়নি যে, যদি আসমান ও যমীনে আল্লাহ্ ব্যতীত আরো অনেক ইলাহ্ থাকত, তাহলে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত। বরং বলা হয়েছে যে, 'বিশৃংখল হত' বা ফাসাদ হয়ে যেত। আর সেটাই প্রমাণ করে যে, এখানে তাওহীদুল উলুহিয়্যাহর ব্যত্যয় ঘটলে কিভাবে দুনিয়াতে ফাসাদ হয় সেটাই বোঝানো উদ্দেশ্য। কারণ, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য মাবুদের ইবাদাত করলে সেখানেই ফাসাদ অনিবার্য। কিন্তু যদি দুই ইলাহ থাকত, তবে দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যেত। এ বিষয়টি প্রমাণ করে যে, আয়াতটি যেভাবে তাওহীদুর রবুবিয়্যাহ বা প্রভুত্বে একত্ববাদের প্রমাণ, সাথে সাথে সেটি তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ বা ইবাদাতের ক্ষেত্রে একত্ববাদেরও প্রমাণ। তবে এর দ্বারা তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ বা ইবাদাতে একত্ববাদের প্রয়োজনীয়তাই বেশী প্রমাণিত হচ্ছে। [বিস্তারিত দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ্, ইকতিদায়ুস সিরাতিল মুস্তাকীম ২/৩৮৭; আন-নুবুওয়াত: ১/৩৭৬; ইবনুল কাইয়্যেম, মিফতাহু দারিস সা'আদাহ: ১/২০৬, ২/১১, ১২২; তরীকুল হিজরাতাইন ৫৭,১২৫; আল-জাওয়াবুল কাফী ২০৩]

(১) এর অর্থ হচ্ছে, আজ পর্যন্ত যতগুলো কিতাবই আল্লাহর পক্ষ থেকে দুনিয়ার কোন দেশে কোন জাতির নবী-রাসূলের প্রতি নাযিল হয়েছে তার মধ্যে থেকে যে কোন একটি খুলে একথা দেখিয়ে দাও যে, পৃথিবী ও আকাশের স্রষ্টা এক আল্লাহ ছাড়া অন্য

বেশীর ভাগই প্রকৃত সত্য জানে না, ফলে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়।

২৫. আর আপনার পূর্বে আমরা যে রাসূলই প্রেরণ করেছি তার কাছে এ ওহীই পাঠিয়েছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন সত্য ইলাহ্ নেই, সুতরাং তোমরা আমারই 'ইবাদাত কর।

وَمَآ اَرۡسَلۡنَا مِنۡ قَبۡلِكَ مِنۡ رَّسُوۡلٍ اِلَّا نُوۡحِىۡۤ اِلَيۡهِ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاعۡبُدُوۡنِ ۝٢٥

২৬. আর তারা বলে, 'দয়াময় (আল্লাহ্) সন্তান গ্রহণ করেছেন।' তিনি পবিত্র মহান! তারা তো তাঁর সম্মানিত বান্দা।

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحۡمٰنُ وَلَدًا سُبۡحٰنَهٗ ؕ بَلۡ عِبَادٌ مُّكۡرَمُوۡنَ ۝٢٦

২৭. তারা তাঁর আগে বেড়ে কথা বলে না[১];

لَا يَسۡبِقُوۡنَهٗ بِالۡقَوۡلِ وَهُمۡ بِاَمۡرِهٖ يَعۡمَلُوۡنَ ۝٢٧

কেউ প্রভুত্বের কর্তৃত্বের সামান্যতম অধিকারী এবং অন্য কেউ ইবাদাত ও বন্দেগীর সামান্যতমও হকদার। কুরআন পুরোপুরিই এটার দাওয়াত দিচ্ছে যে, তোমরা এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কারও ইবাদত কর না। তাওরাত ও ইঞ্জীলে পরিবর্তন সাধিত হওয়া স্বত্বেও এ পর্যন্ত কোথাও পরিষ্কার উল্লেখ নেই যে, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে দ্বিতীয় উপাস্য গ্রহণ কর। বরং প্রত্যেক নবী-রাসূলের গ্রন্থেই রয়েছে যে, একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নেই। পরবর্তী আয়াতেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'আর আপনার পূর্বে আমরা যে রাসূলই প্রেরণ করেছি তার কাছে এ ওহীই পাঠিয়েছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন হক ইলাহ্ নেই, সুতরাং তোমরা আমারই 'ইবাদাত কর।' অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা এ সত্যটি তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, "আর আপনার পূর্বে আমরা আমাদের রাসূলগণ থেকে যাদেরকে প্রেরণ করেছিলাম তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, আমরা কি রহমান ছাড়া ইবাদাত করা যায় এমন কোন ইলাহ্ স্থির করেছিলাম?" [সূরা আয-যুখরুফ: ৪৫] আরও এসেছে, "আর অবশ্যই আমরা প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল পাঠিয়েছিলাম এ নির্দেশ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত কর এবং তাগূতকে বর্জন কর।" [সূরা আন-নাহল: ৩৬] সুতরাং যত নবীই আল্লাহ্ পাঠিয়েছেন সবই একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদাতের দাওয়াত দিত। আর এর উপর ফিতরাত বা স্বাভাবিক প্রকৃতিও প্রমাণবহ। মুশরিকরা যা বলছে এ ব্যাপারে তাদের কাছে কোন প্রমাণ নেই। তাদের জন্য রয়েছে গযব ও শাস্তি। [দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(১) অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে, এখানে ফেরেশতাদের কথাই বলা হয়েছে। আরবের মুশরিকরা তাদেরকে আল্লাহর মেয়ে গণ্য করতো। আর মনে করতো যে, এরা

তারা তো তাঁর আদেশ অনুসারেই কাজ করে থাকে।

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿٢٨﴾

২৮. তাদের সামনে ও পেছনে যা কিছু আছে তা সবই তিনি জানেন। আর তারা সুপারিশ করে শুধু তাদের জন্যই যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত[১]।

وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٢٩﴾

২৯. আর তাদের মধ্যে যে বলবে, ‘তিনি ব্যতীত আমিই ইলাহ্’, তাকে আমরা জাহান্নামের শাস্তির প্রতিদান দেব; এভাবেই আমরা যালেমদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি[২]।

আল্লাহ্‌র দরবারে এদের জন্য সুপারিশ করবে। [কুরতুবী; ইবন কাসীর] পরবর্তী ভাষণ থেকে একথা স্বতস্ফূর্তভাবে প্রকাশ হয়ে যায়। বলা হচ্ছে, ফেরেশতারা আল্লাহর সন্তান হওয়া তো দূরের কথা, তারা আল্লাহর সামনে এমন ভীত ও বিনীত থাকে যে, আগে বেড়ে কোন কথাও বলে না এবং তাঁর আদেশের খেলাফ কখনও কোন কাজ করে না। কথায় আগে না বাড়ার অর্থ এই যে, যে পর্যন্ত আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে কোন কথা না বলা হয় তারা নিজেরা আগে বেড়ে কথা বলার সাহস করে না।

(১) মুশরিকরা দু’টি কারণে ফেরেশতাদেরকে মাবুদে পরিণত করতো। এক. তাদের মতে তারা ছিল আল্লাহর সন্তান। দুই. তাদেরকে পূজা (খোশামোদ তোশামোদ) করার মাধ্যমে তারা তাদেরকে আল্লাহর কাছে নিজেদের জন্য শাফা‘আতকারীতে (সুপারিশকারী) পরিণত করতে চাচ্ছিল। এ আয়াতগুলোতে এ দু’টি কারণই প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

(২) আল্লাহ্ তা‘আলা এ কথা জানিয়ে দিচ্ছেন যে, যে কেউ দাবী করবে আল্লাহ্‌র সাথে আমিও ইলাহ বা মাবুদ আমি অবশ্যই তাকে জাহান্নাম দিয়ে শাস্তি দিব। এভাবেই আমি যালেমদের বা মুশরিকদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি। এর অর্থ এ নয় যে, কেউ এ দাবী করবে। [ইবন কাসীর] এ পর্যন্ত কেউ এ দাবী করেনি। যদি কেউ দাবী করে তবে সে নিঃসন্দেহে তাগুত। একমাত্র ইবলিসই এ দাবী করেছিল বলে কোন কোন কিতাবে উল্লেখ পাওয়া যায়। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর] তাই ইবলিসকে সমস্ত তাগুতের প্রধান বলা হয়।

তৃতীয় রুকূ’

৩০. যারা কুফরী করে তারা কি দেখে না[১] যে, আসমানসমূহ ও যমীন মিশে ছিল ওতপ্রোতভাবে, তারপর আমরা উভয়কে পৃথক করে দিলাম[২]; এবং প্রাণবান সব কিছু সৃষ্টি করলাম পানি থেকে[৩]; তবুও কি তারা ঈমান আনবে না?

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَىْءٍ حَىٍّ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٠﴾

(১) চোখে দেখে জানা হোক কিংবা বুদ্ধি-বিবেচনা দ্বারা জানা হোক। কেননা, এরপর যে বিষয়বস্তু আসছে তার সম্পর্ক কিছু চোখে দেখার সাথে এবং কিছু ভেবে দেখার সাথে। [ফাতহুল কাদীর]

(২) رتق শব্দের অর্থ বন্ধ হওয়া, আর فتق এর অর্থ খুলে দেয়া। উভয় শব্দের সমষ্টি رتق ও فتق কোন কাজের ব্যবস্থাপনা ও তার পূর্ণ ক্ষমতার অর্থে ব্যবহৃত হয়। সে হিসেবে আয়াতের অনুবাদ এই দাঁড়ায় যে, আকাশ ও পৃথিবী বন্ধ ছিল। আমি এদেরকে খুলে দিয়েছি। সহীহ সনদে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন এর অর্থ হচ্ছেঃ আসমান ও যমীন পরস্পর মিলিত ছিল তারপর আমরা সে দুটিকে পৃথকীকরণ করেছি। হাসান ও কাতাদা রাহেমাহুমাল্লাহ বলেনঃ এতদুভয়ের মধ্যে বাতাস দ্বারা পৃথকীকরণ করেছেন। [ইবন কাসীর; কুরতুবী] মোটকথাঃ এ শব্দগুলো থেকে যে কথা বুঝা যায় তা হচ্ছে এই যে, বিশ্ব-জাহান প্রথমে একটি পিণ্ডের আকারে ছিল। পরবর্তীকালে তাকে পৃথক পৃথক অংশে বিভক্ত করে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ, নক্ষত্র, ছায়াপথ, নীহারিকা ইত্যাদি স্বতন্ত্র জগতে পরিণত করা হয়েছে। কোন কোন মুফাসসির বলেন, এখানে বন্ধ হওয়ার অর্থ আকাশের বৃষ্টি ও মাটির ফসল বন্ধ হওয়া এবং খুলে দেয়ার অর্থ এতদুভয়কে খুলে দেয়া। [কুরতুবী] তখন এ আয়াতের অর্থে আরও এসেছে, “শপথ আসমানের, যা ধারণ করে বৃষ্টি, এবং শপথ যমীনের, যা বিদীর্ণ হয়” [সূরা আত-তারেক: ১১-১২]

(৩) অর্থাৎ প্রত্যেক প্রাণী সৃজনে পানির অবশ্যই প্রভাব আছে। এসব বস্তু সৃজন, আবিষ্কার ও ক্রমবিকাশে পানির প্রভাব অপরিসীম। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে আরয করলাম, “ইয়া রাসূলুল্লাহ্ আমি যখন আপনার সাথে সাক্ষাৎ করি, তখন আমার অন্তর প্রফুল্ল এবং চক্ষু শীতল হয়। আপনি আমাকে প্রত্যেক বস্তু সৃজন সম্পর্কে তথ্য বলে দিন।” জওয়াবে তিনি বললেনঃ “প্রত্যেক বস্তু পানি থেকে সৃজিত হয়েছে”। [মুসনাদে আহমাদঃ ২/২৯৫]

৩১. এবং আমরা পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছি সুদৃঢ় পর্বত, যাতে যমীন তাদেরকে নিয়ে এদিক-ওদিক ঢলে না যায়[১] এবং আমরা সেখানে করে দিয়েছি প্রশস্ত পথ, যাতে তারা গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারে।

وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٣١﴾

৩২. আর আমরা আকাশকে করেছি সুরক্ষিত ছাদ; কিন্তু তারা আকাশে অবস্থিত নিদর্শনাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ﴿٣٢﴾

৩৩. আর আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেছেন রাত ও দিন এবং সূর্য ও চাঁদ; প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে[২] বিচরণ করে।

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٣٣﴾

৩৪. আর আমরা আপনার আগেও কোন মানুষকে অনন্ত জীবন দান করিনি[৩];

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ

(১) ميد আরবী ভাষায় অস্থির নড়াচড়াকে বলা হয়। আয়াতের অর্থ এই যে, পৃথিবীর বুকে আল্লাহ্ তাআলা পাহাড়সমূহের বোঝা রেখে দিয়েছেন, যাতে পৃথিবীর ভারসাম্য বজায় থাকে এবং পৃথিবী অস্থির নড়াচড়া না করে। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] পৃথিবী নড়াচড়া করলে পৃথিবীর বুকে বসবাসকারীদের অসুবিধা হত। পৃথিবীর ভারসাম্য বজায় রাখার ব্যাপারে পাহাড়সমূহের প্রভাব অপরিসীম।

(২) প্রত্যেক বৃত্তাকার বস্তুকে فلك বলা হয়। এ কারণেই সূতা কাটার চরকায় লাগানো গোল চামড়াকে فلكة المغزل বলা হয়। [বাগভী; ফাতহুল কাদীর] আর একই কারণে আকাশকেও فلك বলা হয়ে থাকে। এখানে সূর্য ও চন্দ্রের কক্ষপথ বোঝানো হয়েছে। “সবাই এক একটি ফালাকে (কক্ষপথে) সাঁতরে বেড়াচ্ছে”-এ থেকে দু’টি কথা পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে। এক, প্রত্যেকের ফালাক বা কক্ষপথ আলাদা। দুই, ফালাক এমন কোন জিনিস নয় যেখানে এ গ্রহ-নক্ষত্রগুলো খুঁটির মতো প্রোথিত আছে এবং তারা নিজেরাই এ খুঁটি নিয়ে ঘুরছে। বরং তারা কোন প্রবাহমান অথবা আকাশ ও মহাশূন্য ধরনের কোন বস্তু, যার মধ্যে এই গ্রহ-নক্ষত্রের চলা ও গতিশীলতা সাঁতার কাটার সাথে সামঞ্জস্য রাখে।

(৩) এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, খাদির আলাইহিসসালাম মারা গেছেন। কারণ, তিনি একজন মানুষ। মানুষদের মধ্যে কাউকেই আল্লাহ্ চিরঞ্জীব করেননি। [ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমু ফাতাওয়া ৪/৩৩৭]

مِّتَّ فَهُمُ الْخٰلِدُوْنَ ﴿٣٤﴾

কাজেই আপনার মৃত্যু হলে তারা কি চিরজীবি হয়ে থাকবে?

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۗ وَاِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৫. জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে[১]; আমরা তোমাদেরকে মন্দ ও ভাল দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষা করে থাকি[২] এবং আমাদেরই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

وَاِذَا رَاٰكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ اِلَّا هُزُوًا ۗ اَهٰذَا الَّذِيْ يَذْكُرُ اٰلِهَتَكُمْ ۚ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمٰنِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿٣٦﴾

৩৬. আর যারা কুফরি করে, যখন তারা আপনাকে দেখে, তখন তারা আপনাকে শুধু বিদ্রূপের পাত্ররূপেই গ্রহণ করে। তারা বলে, 'এ কি সে, যে তোমাদের দেব-দেবীগুলোর সমালোচনা করে?' অথচ তারাই তো 'রহ্‌মান' তথা দয়াময়ের স্মরণে কুফরী করে[৩]।

---

(১) আলেমদের সর্বসম্মত মতে আত্মার দেহপিঞ্জর ত্যাগ করাই মৃত্যু। [ফাতহুল কাদীর] একটি গতিশীল, প্রাণবিশিষ্ট, সূক্ষ্ম ও নূরানী দেহকে আত্মা বলা হয়। এই আত্মা মানুষের সমগ্র দেহে সঞ্চারিত থাকে, যেমন গোলাপজল গোলাপ ফুলের মধ্যে বিরাজমান। [ইবনুল কাইয়্যেম, আর-রূহ: ১৭৮]

(২) অর্থাৎ আমি মন্দ ও ভালো উভয়ের মাধ্যমে মানুষকে পরীক্ষা করি। প্রত্যেক স্বভাব বিরুদ্ধ বিষয় যেমন- অসুখ-বিসুখ, দুঃখ-কষ্ট ইত্যাদিকে মন্দ বলে অপরদিকে ভাল বলে প্রত্যেক পছন্দনীয় ও কাম্য বিষয় যেমন-সুস্থতা, নিরাপত্তা ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে। দুঃখ-আনন্দ, দারিদ্র-ধনাঢ্যতা, জয়-পরাজয়, শক্তিমত্তা-দুর্বলতা, সুস্থতা-রুগ্নতা ইত্যাদি সকল অবস্থায় তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে। অনুরূপভাবে হালাল, হারাম, আনুগত্য, অবাধ্যতা, হেদায়াত ও পথভ্রষ্টতা এ সবই পরীক্ষার সামগ্রী। [দেখুন, ইবন কাসীর] আলেমগণ বলেন, বিপদাপদে সবর করার তুলনায় বিলাস-ব্যসন ও আরাম-আয়েশে হক আদায়ে দৃঢ়পদ থাকা অধিক কঠিন। তাই আব্দুর রহমান ইবন আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ 'আমরা যখন বিপদে পতিত হলাম, তখন তো সবর করলাম, কিন্তু যখন সুখ ও আরাম আয়েশে লিপ্ত হলাম, তখন সবর করতে পারলাম না অর্থাৎ এর হক আদায়ে দৃঢ়পদ থাকতে পারলাম না।' [ইবনুল কাইয়্যেম, উদ্দাতুস সাবেরীন: ৬৪]

(৩) অর্থাৎ মূর্তি ও বানোয়াট ইলাহদের বিরোধিতা তাদের কাছে এত বেশী অপ্রীতিকর যে, এর প্রতিশোধ নেবার জন্য আপনার প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও অবমাননা করে, কিন্তু

খُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ۚ سَأُورِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿٣٧﴾

৩৭. মানুষ সৃষ্টিগতভাবে ত্বরাপ্রবণ[১], শীঘ্রই আমি তোমাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী দেখাব; কাজেই তোমরা তাড়াহুড়া কামনা করো না।

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٨﴾

৩৮. আর তারা বলে, ‘তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল এ প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হবে?’

لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿٣٩﴾

৩৯. যদি কাফেররা সে সময়ের কথা জানত, যখন তারা তাদের চেহারা ও পিঠ থেকে আগুন প্রতিরোধ করতে পারবে না এবং তাদেরকে সাহায্য করাও হবে না (তাহলে তারা সে শাস্তিকে তাড়াতাড়ি চাইত না।)

بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿٤٠﴾

৪০. বরং তা তাদের উপর আসবে অতর্কিতভাবে এবং তাদেরকে হতভম্ব করে দেবে। ফলে তারা তা রোধ করতে পারবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া হবে না।

তারা যে আল্লাহ বিমূখ এবং আল্লাহর নামোল্লেখে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়, নিজেদের এ অবস্থার জন্য তাদের লজ্জাও হয় না। যেমন অন্য আয়াতে এসেছে, “আর তারা যখন আপনাকে দেখে, তখন তারা আপনাকে শুধু ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্ররূপে গণ্য করে বলে, ‘এ-ই কি সে, যাকে আল্লাহ্ রাসূল করে পাঠিয়েছেন? ‘সে তো আমাদেরকে আমাদের উপাস্যগণ হতে দূরে সরিয়েই দিত, যদি না আমরা তাদের আনুগত্যের উপর অবিচল থাকতাম।’ আর যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, তখন জানতে পারবে কে অধিক পথভ্রষ্ট।” [সূরা আল-ফুরকান: ৪১-৪২]

(১) ত্বরাপ্রবণতার স্বরূপ হচ্ছে, কোন কাজ সময়ের পূর্বেই করা। এটা স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে নিন্দনীয়। কুরআনের অন্যত্রও একে মানুষের দুর্বলতারূপে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছেঃ “মানুষ অত্যন্ত ত্বরাপ্রবন” [সূরা আল-ইসরাঃ ১১] আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের মজ্জায় যেসব দুর্বলতা নিহিত রয়েছে, তন্মধ্যে এক দুর্বলতা হচ্ছে ত্বরা-প্রবণতা। স্বভাবগত ও মজ্জাগত বিষয়কে আরবরা এরূপ ভঙ্গিতেই ব্যক্ত করে। উদাহরণতঃ কারও স্বভাবে ক্রোধ প্রবল হলে আরবরা বলেঃ লোকটি ক্রোধ দ্বারা সৃজিত হয়েছে। ঠিক তেমনি এখানে অর্থ করা হবে যে, ত্বরাপ্রবণতা মানুষের প্রকৃতিগত বিষয়। [দেখুন, কুরতুবী]

৪১. আর আপনার আগেও অনেক রাসূলের সাথেই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছিল; পরিণামে তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত তা বিদ্রূপকারীদেরকে পরিবেষ্টন করেছিল।

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٤١﴾

চতুর্থ রুকূ'

৪২. বলুন, 'রহ্‌মান হতে কে তোমাদেরকে রক্ষা করবে রাতে ও দিনে[১]?' তবুও তারা তাদের রব-এর স্মরণ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ ۗ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُّعْرِضُونَ ﴿٤٢﴾

৪৩. তবে কি তাদের এমন কতেক ইলাহ্‌ও আছে যারা আমাদের থেকে তাদেরকে রক্ষা করতে পারে? এরা তো নিজেদেরকেই সাহায্য করতে পারে না এবং আমাদের থেকে তাদের আশ্রয়দানকারীও হবে না।

أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا ۚ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ ﴿٤٣﴾

৪৪. বরং আমরাই তাদেরকে ও তাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে ভোগ-সম্ভার দিয়েছিলাম; তার উপর তাদের আয়ুষ্কালও হয়েছিল দীর্ঘ। তারা কি দেখছে না যে, আমরা যমীনকে চারদিক থেকে সংকুচিত করে আনছি[২]। তবুও

بَلْ مَتَّعْنَا هَٰؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ۗ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٤٤﴾

(১) আয়াতের আরেক অর্থ, রহমানের পরিবর্তে কে তোমাদেরকে রাত বা দিনে হেফাযত করবেন? তোমাদের এ সমস্ত ইলাহ্ তো তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না। [ইবন কাসীর] অথবা আয়াতের অর্থ, যদি রাত বা দিনের কোন সময় অকস্মাৎ আল্লাহ তোমাদেরকে পাকড়াও করতে চান তবে তাঁর পাকড়াও থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারে এমন শক্তিশালী সহায়ক ও সাহায্যকারী তোমাদের কে আছে? [কুরতুবী]

(২) এ আয়াতের প্রসিদ্ধ তাফসীর হলো, মক্কার কাফের মুশরিকরা কি এটা প্রত্যক্ষ করে না যে, আমরা চারদিক থেকে তাদেরকে সংকুচিত করে এনেছি। আর তা হচ্ছে, ইসলামের বিজয়ের মাধ্যমে তাদের যাবতীয় ঘাঁটির পতন দেখে। ইসলামের বিজয়

কি তারা বিজয়ী হবে?

৪৫. বলুন, 'আমি তো শুধু ওহী দ্বারাই তোমাদেরকে সতর্ক করি', কিন্তু যারা বধির তাদেরকে যখন সতর্ক করা হয় তখন তারা সে আহ্বান শুনে না।

قُلْ إِنَّمَآ أُنذِرُكُم بِٱلْوَحْىِ ۚ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴿٤٥﴾

৪৬. আর আপনার রব-এর শাস্তির কিছুমাত্রও তাদেরকে স্পর্শ করলে তারা অবশ্যই বলে উঠবে, 'হায়, দুর্ভোগ আমাদের, আমরা তো ছিলাম যালেম!'

وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَٰوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَّا ظَٰلِمِينَ ﴿٤٦﴾

৪৭. আর কেয়ামতের দিনে আমরা ন্যায়বিচারের পাল্লাসমূহ স্থাপন করব[১], সুতরাং কারো প্রতি কোন

وَنَضَعُ ٱلْمَوَٰزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا ۖ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ

কেতন উড়ার মানেই হলো কুফরী ও শির্কী পতাকার অবনমিত হওয়া, তাদের শক্তির পতন হওয়া। এসব দেখেও তারা ঈমান আনতে কেন পিছপা হচ্ছে? [দেখুন, কুরতুবী]

(১) লক্ষণীয় যে, এখানে موازين শব্দটি ميزان শব্দের বহুবচন। [কুরতুবী] অর্থ ওজনের যন্ত্র তথা দাঁড়িপাল্লা। আয়াতের অর্থ, দাঁড়িপাল্লাসমূহ স্থাপন করা হবে। এখন প্রশ্ন হলো, মানদন্ড কি একটি না বহু? এখানে আয়াতে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে দেখে কোন কোন তফসীরবিদ বলেন যে, আমল ওজন করার জন্য অনেকগুলো দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে। আমলের শ্রেণী অনুসারে অনেক দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে। অথবা, প্রত্যেকের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন দাঁড়িপাল্লা হবে। আবার এটাও হতে পারে যে, একই মীযানকে বহু হিসেবে দেখানো হয়েছে। [কুরতুবী]
কিন্তু অধিকাংশ আলেমগণের মতে, দাঁড়িপাল্লা একটিই হবে। যার থাকবে দু'টি পাল্লা। যে দু'টি পাল্লা সবাই দেখতে পাবে, অনুভব করতে পারবে। তবে বহুবচনে ব্যক্ত করার কারণ হয়ত এটাই যে, মীযানের পাল্লাতে যেমনিভাবে বান্দার আমলনামা ওজন করা হবে তেমনিভাবে বান্দার আমলকেও সরাসরি ওজন করা হবে এমনকি বান্দাকেও ওজন করা হবে। সে হিসেবে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। [শারহুত তাহাভীয়্যাহ]
বান্দার আমলনামা ওজন করা হবে তার প্রমাণঃ হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "আল্লাহ্ আমার উম্মতের মধ্যে একলোককে কেয়ামতের দিন সমস্ত সৃষ্টির সামনে পৃথক করে একান্তে ডেকে তার জন্য

خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ ﴿٤٧﴾

যুলুম করা হবে না এবং কাজ যদি শষ্য দানা পরিমাণ ওজনেরও হয় তবুও তা আমরা উপস্থিত করব; আর হিসেব গ্রহণকারীরূপে আমরাই যথেষ্ট ।

৯৯ টি দপ্তর বের করবেন যার প্রত্যেকটি চোখ যতদুর যায় তত লম্বা হবে । তারপর তাকে বলবেনঃ "তুমি কি এগুলো অস্বীকার কর? আমার রক্ষণাবেক্ষণকারী লেখক ফেরেশ্‌তাগণ কি তোমার উপর অত্যাচার করেছে? সে বলবেঃ না, হে প্রভূ! তারপর আল্লাহ্ বলবেনঃ তোমার কি কোন ওজর বা সৎকর্ম আছে? লোকটি তখন হতভম্ব হয়ে গিয়ে বলবেঃ না, হে প্রভূ! তখন আল্লাহ্ বলবেনঃ অবশ্যই তোমার একটি সৎকর্ম আছে, তোমার উপর আজ কোন যুলুম করা হবে না । তারপর তার জন্য একটি কার্ড বের করা হবে যাতে আছেঃ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلٰه إِلّا الله، وأَنَّ مُحَمّدًا عَبْدُه وَرَسُولُه "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন হক্ক ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল ।" তারপর আল্লাহ্ বলবেনঃ সেটা নিয়ে আস । তখন লোকটি বলবেঃ হে প্রভু! ঐ সমস্ত দপ্তরের বিপরীতে এ কার্ড কি ভুমিকা রাখতে পারে? তখন আল্লাহ্ বলবেনঃ তোমার উপর যুলুম করা হবে না । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তারপর সে সমস্ত দপ্তর এক পাল্লায় এবং কার্ডটি আরেক পাল্লায় রাখা হবে । রাসূল বললেনঃ আর তাতেই সমস্ত দপ্তর উপরে উঠে যাবে এবং কার্ডটি ভারী হয়ে যাবে । আল্লাহ্‌র নামের বিপরীতে কোন কিছু ভারী হতে পারে না ।" [তিরমিযীঃ ২৬৩৯, ইবনে মাজাহঃ ৪৩০০] এ হাদীস দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, বান্দার আমলনামা ওজন করা হবে ।

বান্দার আমলই সরাসরি ওজন করার প্রমাণঃ হাদীসে এসেছেঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "দু'টি বাক্য এমন যা দয়াময়ের কাছে প্রিয়, জিহবার উপর হাল্কা, মীযানের মধ্যে ভারী, আর তা হলোঃ 'সুবাহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি' (আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি তাঁর প্রশংসা সহকারে), 'সুবহানাল্লাহিল 'আজীম' (মহান আল্লাহ কতই না পবিত্র)" । [বুখারীঃ৭৫৬৩, মুসলিমঃ ২৬৯৪]

স্বয়ং আমলকারীকেও ওজন করা হবেঃ তার স্বপক্ষে প্রমাণ আল্লাহর বাণীঃ "সুতরাং আমরা তাদের জন্য ক্বিয়ামতের দিন কোন ওজন স্থির করব না" । [সূরা আল-কাহাফঃ১০৫] অন্য এক হাদীসে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ রাদিয়াল্লাহু আনহু 'আরাক' গাছে উঠলেন, তিনি ছিলেন সরু গোড়ালী বিশিষ্ট মানুষ, ফলে বাতাস তাকে নাড়াচ্ছিল তাতে উপস্থিত লোকেরা হেসে উঠল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেনঃ "তোমরা হাসছ কেন?" তারা বললঃ হে আল্লাহর নবী! তার সরু গোড়ালীর কারণে । তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ "যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি, এ দু'টি মীযানের উপর উহুদ পাহাড়ের চেয়েও বেশী ভারী" । [মুসনাদ আহমাদঃ ১/৪২০-৪২১, মুস্তাদরাক ৩/৩১৭]

৪৮. আর অবশ্যই আমরা দিয়েছিলাম[১] মূসা ও হারূনকে 'ফুরকান', জ্যোতি ও উপদেশ মুত্তাকীদের জন্য[২]---

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ الْفُرْقَانَ وَضِيَآءً وَّذِكْرًا لِّلْمُتَّقِيْنَ ۟

৪৯. যারা না দেখেও তাদের রবকে ভয় করে এবং তারা কেয়ামত সম্পর্কে ভীত-সন্ত্রস্ত।

الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُوْنَ ۟

৫০. আর এ হচ্ছে বরকতময়[৩] উপদেশ,

وَهٰذَا ذِكْرٌ مُّبٰرَكٌ اَنْزَلْنٰهُ ؕ اَفَاَنْتُمْ لَهٗ

(১) এখান থেকে নবীদের আলোচনা শুরু হয়েছে। একের পর এক বেশ কয়েকজন নবীর জীবনের সংক্ষিপ্ত বা বিস্তারিত ঘটনাবলীর প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। প্রথমে মূসা তারপর ইবরাহীম, লূত, ইসহাক, ইয়া'কূব, দাউদ, সুলাইমান, আইয়ূব, ইসমাঈল, ইদরীস, যুল কিফল, যুন্নূন বা ইউনুস, যাকারিয়্যা, ইয়াহ্‌ইয়া। সবশেষে একজন সিদ্দীকাহ মারইয়ামের আলোচনার মাধ্যমে তা শেষ করা হয়েছে।

(২) প্রথমেই মূসা আলাইহিস সালামের আলোচনা করা হয়েছে। কুরআনে সাধারণত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনার সাথে সাথে মূসা আলাইহিস সালামের আলোচনা করা হয়। অনুরূপভাবে কুরআনের আলোচনার সাথে তাওরাতের আলোচনা করা হয়। এখানেই সেই একই পদ্ধতিতে আলোচনা করা হয়েছে। [ইবন কাসীর] প্রথমেই বলা হয়েছে যে, "অবশ্যই আমরা দিয়েছিলাম মূসা ও হারূনকে 'ফুরকান', জ্যোতি ও উপদেশ মুত্তাকীদের জন্য ---"। এখানে তাওরাতের তিনটি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ তাওরাত ছিল হক ও বাতিল, হারাম ও হালালের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী, মানুষকে ভীতি ও আশার মাধ্যমে সত্য-সরল পথ দেখাবার আলোক বর্তিকা বা অন্তরের আলো এবং মানব জাতিকে তার বিস্মৃত পাঠ স্মরণ করিয়ে দেবার উপদেশ। কেউ কেউ বলেনঃ এখানে 'ফুরকান' বলে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য বোঝানো হয়েছে, যা সর্বত্র মূসা আলাইহিস সালামের সাথে ছিল। [কুরতুবী; ইবন কাসীর] অর্থাৎ ফির'আউনের মত শত্রুর গৃহে তিনি লালিত পালিত হয়েছেন, মোকাবেলার সময় আল্লাহ তা'আলা ফির'আউনকে লাঞ্ছিত করেছেন, এরপর ফির'আউনী সৈন্যবাহিনীর পশ্চাদ্ধাবনের সময় সমুদ্রে রাস্তা সৃষ্টি হয়ে তিনি রক্ষা পান এবং ফির'আউনের সৈন্যবাহিনীর সলিলসমাধি হয়। এমনিভাবে পরবর্তীতে সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার এই সাহায্য প্রত্যক্ষ করা হয়েছে। তবে আয়াতে মুত্তাকীনদেরকে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, যদিও তা পাঠানো হয়েছিল সমগ্র মানব জাতির জন্য কিন্তু তা থেকে কার্যত লাভবান তারাই হতে পারতো যারা ছিল এসব গুণে গুণান্বিত। [ফাতহুল কাদীর]

(৩) বরকত সংক্রান্ত আলোচনা সূরা মারইয়ামের ৩১ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় করা হয়েছে।

مُنْكِرُوْنَ ﴿٥٠﴾

এটা আমরা নাযিল করেছি। তবুও কি তোমরা এটাকে অস্বীকার কর?

পঞ্চম রুকূ'

وَلَقَدْ اٰتَيْنَآ اِبْرٰهِيْمَ رُشْدَهٗ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهٖ عٰلِمِيْنَ ﴿٥١﴾

৫১. আর আমরা তো এর আগে ইব্‌রাহীমকে তার শুভবুদ্ধি ও সত্যজ্ঞান দিয়েছিলাম[১] এবং আমরা তার সম্বন্ধে ছিলাম সম্যক পরিজ্ঞাত।

اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَا هٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِيْٓ اَنْتُمْ لَهَا عٰكِفُوْنَ ﴿٥٢﴾

৫২. যখন তিনি তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বললেন, 'এ মূর্তিগুলো কী, যাদের পূজায় তোমরা রত রয়েছ!'

قَالُوْا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا لَهَا عٰبِدِيْنَ ﴿٥٣﴾

৫৩. তারা বলল, 'আমরা আমাদের পিতৃ পুরুষদেরকে এদের 'ইবাদত করতে দেখেছি।'

قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٥٤﴾

৫৪. তিনি বললেন, 'অবশ্যই তোমরা নিজেরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষরাও স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছ।'

قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ اَمْ اَنْتَ مِنَ اللّٰعِبِيْنَ ﴿٥٥﴾

৫৫. তারা বলল, 'তুমি কি আমাদের কাছে সত্য নিয়ে এসেছ, না তুমি খেলা

(১) রুশ্‌দ এর অর্থ হচ্ছে সঠিক ও বেঠিকের মধ্যে পার্থক্য করে সঠিক কথা বা পথ অবলম্বন করা এবং বেঠিক কথা ও পথ থেকে দূরে সরে যাওয়া। যাকে আরবীতে صلاح বলা যায়। [বাগভী] এ অর্থের প্রেক্ষিতে "রুশ্‌দ" এর অনুবাদ "সত্যনিষ্ঠা"ও হতে পারে। কিন্তু যেহেতু রুশ্‌দ শব্দটি কেবলমাত্র সত্যনিষ্ঠা নয় বরং এমন সত্যজ্ঞানের ভাব প্রকাশ করে যা সঠিক চিন্তা ও ভারসাম্যপূর্ণ সুষ্ঠু বুদ্ধি ব্যবহারের ফলশ্রুতি, তাই "শুভবুদ্ধি ও সত্যজ্ঞান" এই দু'টি শব্দ একত্রে এর অর্থের কাছাকাছি। তাই অনুবাদ করা হয়েছে, "ইবরাহীমকে তার শুভবুদ্ধি ও সত্যজ্ঞান দান করেছিলাম।" [দেখুন, কুরতুবী] এখানে 'তার' বলার অর্থ, যতটুকু তার জন্য এবং তার মত অন্যান্য রাসূলদের জন্য উপযুক্ত ততটুকু আমরা তাকে দান করেছিলাম। [ফাতহুল কাদীর] সুতরাং সে যে সত্যের জ্ঞান ও শুভবুদ্ধি লাভ করেছিল তা আমরাই তাকে দান করেছিলাম। এটা তার জন্য আমাদের পক্ষ থেকে নির্ধারিত ছিল। যা ছিল আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহ।

করছ[১]?'

৫৬. তিনি বললেন, 'বরং তোমাদের রব তো আসমানসমূহ ও যমীনের রব, যিনি সেগুলো সৃষ্টি করেছেন এবং এ বিষয়ে আমি অন্যতম সাক্ষী।'

قَالَ بَلْ رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ الَّذِيْ فَطَرَهُنَّ ۖ وَأَنَا عَلٰى ذٰلِكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿٥٦﴾

৫৭. 'আর আল্লাহ্‌র শপথ, তোমরা পিছন ফিরে চলে গেলে আমি তোমাদের মূর্তিগুলো সম্বন্ধে অবশ্যই কৌশল অবলম্বন করব[২]।'

وَتَاللّٰهِ لَأَكِيْدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوْا مُدْبِرِيْنَ ﴿٥٧﴾

৫৮. অতঃপর তিনি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলেন মূর্তিগুলোকে, তাদের প্রধানটি

فَجَعَلَهُمْ جُذٰذًا إِلَّا كَبِيْرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ

(১) এ বাক্যটির শাব্দিক অনুবাদ হবে, "তুমি কি আমাদের সামনে সত্য পেশ করছো, না খেলা করছো?" আমরা তো এর আগে আর কারও কাছে এমন কথা শুনিনি। [ইবন কাসীর] অপর কারো কারো মতে এর অর্থ তুমি কি আমাদের সামনে প্রকৃত মনের কথা বলছো, নাকি কৌতুক করছো? [কুরতুবী] নিজেদের ধর্মের সত্যতার প্রতি তাদের বিশ্বাস এত বেশী ছিল যে, তারা গুরুত্ব সহকারে কেউ এ কথা বলতে পারে বলে কল্পনাও করতে প্রস্তুত ছিল না। তাই তারা বললো, তুমি নিছক ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও খেলা-তামাশা করছো, না কি প্রকৃতপক্ষে এটাই তোমার চিন্তাধারা? তাদের কাছে এটা ছিল ইবরাহীমের বোকামীসূলভ কথাবার্তা। [দেখুন, সা'দী]

(২) আয়াতের ভাষা বাহ্যতঃ একথাই বোঝায় যে, এ কথাটি ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তার সম্প্রদায়ের সামনে বলেছিলেন। কিন্তু এতে প্রশ্ন হয় যে, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তাদের কাছে (আমি অসুস্থ) এর ওযর পেশ করে তাদের সাথে ঈদের সমাবেশে যাওয়া থেকে নিবৃত্ত ছিলেন। যখন মুর্তি ভাঙ্গার ঘটনা ঘটল, তখন সম্প্রদায়ের লোকেরা অনুসন্ধানে রত হল যে, কাজটি কে করল? যদি ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর উপরোক্ত কথা পূর্বেই তাদের জানা থাকত, তবে এতসব খোঁজাখুজির কি প্রয়োজন ছিল? প্রথমেই তারা বুঝে নিত যে, ইবরাহীম একাজ করেছে। এর জওয়াব কয়েকটি হতে পারেঃ তফসীরবিদদের মধ্যে মুজাহিদ ও কাতাদাহ বলেন: ইবরাহীম আলাইহিস সালাম উপরোক্ত কথাটি সম্প্রদায়ের লোকদের সামনে বলেননি; বরং মনে মনে বলেছিলেন। শুধু একজন লোক তা শুনেছিল আর সেই তা অন্যদের কাছে প্রকাশ করে দেয়। [কুরতুবী] অথবা সম্প্রাদায়ের লোকেরা চলে যাওয়ার পর যে দু'একজন দুর্বল লোক সেখানে ছিল, তাদেরকে বলেছিলেন। এরপর মুর্তি ভাঙ্গার ঘটনা ঘটলে যখন খোঁজাখুজি শুরু হয়, তখন তারা এই তথ্য সরবরাহ করে। [ইবন কাসীর]

يَرْجِعُوْنَ ﴿٥٨﴾

ছাড়া[১]; যাতে তারা তার দিকে[২] ফিরে আসে।

قَالُوْا مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَآ اِنَّهٗ لَمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥٩﴾

৫৯. তারা বলল, 'আমাদের মা'বুদগুলোর প্রতি এরূপ করল কে? সে নিশ্চয়ই অন্যতম যালেম।'

قَالُوْا سَمِعْنَا فَتًى يَّذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهٗٓ اِبْرٰهِيْمُ ﴿٦٠﴾

৬০. লোকেরা বলল, 'আমরা এক যুবককে ওদের সমালোচনা করতে শুনেছি; তাকে বলা হয় ইব্‌রাহীম।'

قَالُوْا فَأْتُوْا بِهٖ عَلٰٓى اَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُوْنَ ﴿٦١﴾

৬১. তারা বলল, 'তাহলে তাকে জনসমক্ষে উপস্থিত কর, যাতে তারা সাক্ষ্য হয়[৩]।'

---

(১) অর্থাৎ ইবরাহীম আলাইহিস সালাম মুর্তিগুলোকে ভেঙ্গে খণ্ডবিখণ্ড করে দিলেন। শুধু বড় মুর্তিটিকে ভাঙ্গার কবল থেকে রেহাই দিলেন। এটা হয় দৈহিক আকার-আকৃতিতে অন্য মুর্তিদের চাইতে বড় ছিল [কুরতুবী] না হয় আকার আকৃতিতে সমান হওয়া সত্ত্বেও পূজারীরা তাকে বড় বলে মান্য করত। [ইবন কাসীর]

(২) এখানে إليه বা 'তার দিকে' বলে কাকে বুঝানো হয়েছে এ ব্যাপারে দু'টি মত রয়েছেঃ (এক) এখানে 'তার দিকে' বলে ইবরাহীম আলাইহিসসালামকে বোঝানো হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর] অর্থাৎ ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এ আশায় কাজটি করলেন যে তাদের উপাস্য মুর্তিদেরকে খণ্ড-বিখণ্ড দেখলে এরা যে পুজার যোগ্য নয় এ জ্ঞান তাদের মধ্যে ফিরে আসবে। এরপর তারা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর দ্বীনের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। [কুরতুবী] (দুই) কোন কোন মুফাসসিরের মতে, এখানে 'তার দিকে' বলে كبيرهم বা তাদের প্রধান মুর্তিকে বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, তারা ফিরে এসে যখন সবগুলো মুর্তিকে খণ্ড বিখণ্ড এবং বড় মুর্তিকে আস্ত অক্ষত ও কাঁধে কুড়াল রাখা অবস্থায় দেখবে, তখন সম্ভবত: এই মুর্তিটির দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে এবং তাকে জিজ্ঞেস করবে যে, এরূপ কেন হল? আর তারা মনে করবে যে, বড় মূর্তিই বোধ হয় নিজের আত্মসম্মানবোধের কারণে ছোট ছোট মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে ফেলেছে। [কুরতুবী; ইবন কাসীর]

(৩) এভাবে ইবরাহীমের মনের আশাই যেন পূরণ হলো। কারণ তিনি এটাই চাচ্ছিলেন। ব্যাপারটিকে তিনি শুধু পুরোহিত ও পূজারীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চাচ্ছিলেন না। বরং তিনি চাচ্ছিলেন, ব্যাপারটা সাধারণ মানুষের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ুক। তারাও আসুক, দেখে নিক এই যে মূর্তিগুলোকে তাদের অভাব পূরণকারী হিসেবে রাখা হয়েছে এরা কতটা অসহায় এবং স্বয়ং পুরোহিতরাই এদের সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করে। [ইবন কাসীর]

৬২. তারা বলল, 'হে ইব্‌রাহীম! তুমিই কি আমাদের মা'বুদগুলোর প্রতি এরূপ করেছ?'

قَالُوٓا ءَأَنتَ فَعَلۡتَ هَٰذَا بِـَٔالِهَتِنَا يَٰٓإِبۡرَٰهِيمُ ۝٦٢

৬৩. তিনি বললেন, 'বরং এদের এ প্রধান-ই তো এটা করেছে[১], সুতরাং এদেরকে

قَالَ بَلۡ فَعَلَهُۥ كَبِيرُهُمۡ هَٰذَا فَسۡـَٔلُوهُمۡ

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) তিন জায়গা ব্যতীত কোন দিন মিথ্যা কথা বলেননি। তন্মধ্যে দু'টি খাস আল্লাহর জন্যে বলা হয়েছে। একটি ﴿بَلْ فَعَلَهُۥ كَبِيرُهُمْ﴾ (বরং তাদের প্রধানই তো এটা করেছে) বলা। দ্বিতীয়টি ঈদের দিনে সম্প্রদায়ের কাছে ওযর পেশ করে ﴿إِنِّي سَقِيمٌ﴾ (আমি অসুস্থ) বলা এবং তৃতীয়টি স্ত্রী সারাহ সহ সফরে এক জনপদের নিকট দিয়ে গমন করেছিলেন। জনপদের প্রধান ছিল যালেম ও ব্যভিচারী। কোন ব্যক্তির সাথে তার স্ত্রীকে দেখলে সে স্বামীকে হত্যা করত ও তার স্ত্রীকে পাকড়াও করত এবং তার সাথে ব্যভিচার করত। কিন্তু কোন কন্যা পিতার সাথে কিংবা ভগিনী ভাইয়ের সাথে থাকলে সেই এরূপ করত না। ইবরাহীম আলাইহিস সালামের স্ত্রীসহ এই জনপদে পৌঁছার খবর কেউ এই যালেম ব্যভিচারীর কাছে পৌঁছে দিলে সে সারাহকে গ্রেফতার করিয়ে আনল। গ্রেফতারকারীরা ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞেস করল: এই মহিলা সাথে তোমার আত্মীয়তার সম্পর্ক কি? ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যালেমের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য বলে দিলেন: সে আমার ভগিনী। (এটা হাদীসে বর্ণিত তৃতীয় মিথ্যা)। [বুখারীঃ ৩১৭৯, ৪৪৩৫ মুসলিমঃ ২৩৭১]

এই হাদীসে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দিকে পরিষ্কারভাবে তিনটি মিথ্যার সম্বন্ধ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে কোন কোন আলেমের ব্যাখ্যা হলো যে, তিনটির মধ্যে একটিও সত্যিকার অর্থে মিথ্যা ছিল না। বরং এটা ছিল অলংকার শাস্ত্রের পরিভাষায় "তাওরিয়া"। এর অর্থ দ্ব্যর্থবোধক ভাষা ব্যবহার করা এবং শ্রোতা কর্তৃক এক অর্থ বোঝা ও বক্তার নিয়তে অন্য অর্থ থাকা। যুলুম থেকে আত্মরক্ষার জন্যে ফেকাহবিদগণের সর্বসম্মত মতে এই কৌশল অবলম্বন করা জায়েয ও হালাল। এটা মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত নয়। উল্লেখিত হাদীসে এর প্রমাণ এই যে, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম নিজেই সারাহকে বলেছিলেন আমি তোমাকে ভগিনী বলেছি। তোমাকে জিজ্ঞেস করা হলে তুমি ও আমাকে ভাই বলো। ভগিনী বলার কারণও তিনি বলে দিয়েছেন যে আমরা উভয় ইসলামী সম্পর্কের দিক দিয়ে ভ্রাতা-ভগিনী। বলাবাহুল্য এটাই "তাওরিয়া"। হুবহু এমনি ধরনের কারণ প্রথমোক্ত দুই জায়গায় বলা যায় যে, অসুস্থ শব্দটি যেমন শারীরিক অসুস্থতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, তেমনি মানসিক অসুস্থতা অর্থাৎ চিন্তান্বিত ও অবসাদগ্রস্ত হওয়ার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম দ্বিতীয় অর্থেই "আমি অসুস্থ" বলেছিলেন, কিন্তু শ্রোতারা একে শারীরিক অসুস্থতার অর্থে বোঝেছিলেন। মূর্তি ভাঙ্গার কাজটিতে তিনি যে ভাঙ্গার কাজটি বড় মূর্তির দিকে সম্পর্কযুক্ত

إِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ ﴿٦٣﴾

জিজ্ঞেস কর যদি এরা কথা বলতে পারে।'

فَرَجَعُوْٓا إِلٰٓى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوْٓا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٦٤﴾

৬৪. তখন তারা নিজেরা পূনর্বিবেচনা করে দেখল এবং একে অন্যকে বলতে লাগল, 'তোমরাই তো যালেম'।

ثُمَّ نُكِسُوْا عَلٰى رُءُوْسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هٰٓؤُلَآءِ يَنْطِقُوْنَ ﴿٦٥﴾

৬৫. তারপর তাদের মাথা নত হয়ে গেল এবং তারা বলল, 'তুমি তো জানই যে, এরা কথা বলে না।'

قَالَ أَفَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْـًٔا وَّلَا يَضُرُّكُمْ ﴿٦٦﴾

৬৬. ইব্‌রাহীম বললেন, 'তবে কি তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুর 'ইবাদাত কর যা তোমাদের কোন উপকার করতে পারে না এবং অপকারও করতে পারে না?

أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٧﴾

৬৭. 'ধিক্ তোমাদের জন্য এবং আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা যাদের 'ইবাদাত কর তাদের জন্য! তবুও কি তোমরা অনুধাবন করবে না?'

قَالُوْا حَرِّقُوْهُ وَانْصُرُوْٓا اٰلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ﴿٦٨﴾

৬৮. তারা বলল, 'তাকে পুড়িয়ে ফেল, আর সাহায্য কর তোমাদের মা'বুদদের, তোমরা যদি কিছু করতে চাও।'

করেছিলেন এ ব্যাপারে আলেমগণ নানা সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন:
ইবরাহীম আলাইহিস সালামের এ উক্তি ধরে নেয়ার পর্যায়ে ছিল; অথাৎ তোমরা একথা ধরেই নাও না কেন যে, একাজ প্রধান মুর্তিই করে থাকবে। ধরে নেয়ার পর্যায়ে বাস্তববিরোধী কথা বলা মিথ্যার আওতায় পড়ে না। [ফাতহুল কাদীর]
কোন কোন মুফাসসিরের মতে, মূলতঃপ্রধান মূর্তিটিই ইবরাহীম আলাইহিসসালামকে একাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তার সম্প্রদায় এই মুর্তির প্রতি সর্বাধিক সম্মান প্রদর্শন করত। সম্ভবত এ কারণেই বিশেষভাবে এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর]
তবে এ ব্যাপারে আলেমগণ একমত যে, নবী-রাসূলগণ কখনো নবুওয়ত ও তাবলীগ বা প্রচার-প্রসার সংক্রান্ত ব্যাপারে মিথ্যার আশ্রয় নেননি। তারা জগতশ্রেষ্ঠ সত্যবাদী লোক ছিলেন। [ইবন তাইমিয়্যাহ, আল-জাওয়াবুস সহীহ ১/৪৪৬]

قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ ﴿٦٩﴾

৬৯. আমরা বললাম, 'হে আগুন! তুমি ইব্‌রাহীমের জন্য শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও।'

وَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَخْسَرِيْنَ ﴿٧٠﴾

৭০. আর তারা তার ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা করেছিল। কিন্তু আমরা তাদেরকেই সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত করে দিলাম।

وَنَجَّيْنٰهُ وَلُوْطًا اِلَى الْاَرْضِ الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا لِلْعٰلَمِيْنَ ﴿٧١﴾

৭১. এবং আমরা তাকে ও লূতকে উদ্ধার করে নিয়ে গেলাম সে দেশে, যেখানে আমরা কল্যাণ রেখেছি সৃষ্টিজগতের জন্য[১]।

وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ ؕ وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً ؕ وَكُلًّا جَعَلْنَا صٰلِحِيْنَ ﴿٧٢﴾

৭২. এবংআমরাইব্‌রাহীমকেদানকরেছিলাম ইস্‌হাক আর অতিরিক্ত পুরস্কারস্বরূপ ইয়া'কূবকে[২]; এবং প্রত্যেককেই করেছিলাম সৎকর্মপরায়ণ।

(১) অর্থাৎ ইবরাহীম ও লূতকে আমরা নমরূদের অধিকারভূক্ত দেশ (অর্থাৎ ইরাক) থেকে উদ্ধার করে এমন এক দেশে পৌঁছতে দিলাম, যেখানে আমি বিশ্ববাসীদের জন্যে কল্যাণ রেখেছি অর্থাৎ সিরিয়া ও ফিলিস্তিনে। তার বরকত তথা সমৃদ্ধি বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক উভয় ধরনেরই। বস্তুগত দিক দিয়ে তা দুনিয়ার উর্বরতম এলাকাসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আর আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে দু'হাজার বছর থেকে তা থেকেছে আল্লাহর নবীগণের কর্মক্ষেত্র। দুনিয়ার কোন এলাকায় এতো বিপুল সংখ্যক নবী আবির্ভূত হয়নি। মূলতঃ সিরিয়া বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে অসংখ্য কল্যাণের আবাসস্থল। অভ্যন্তরীণ কল্যাণ এই যে, দেশটিতে অনেক নবী-রাসূলের সমারোহ ঘটেছিল। অধিকাংশ পয়গম্বর এ দেশেই জন্মগ্রহণ করেছেন। বাহ্যিক কল্যাণ হচ্ছে সুষম আবহাওয়া, নদ-নদী, প্রাচুর্য, ফল-মূল ও সর্বপ্রকার উদ্ভিদের অনন্য সমাহার ইত্যাদি। এগুলোর উপকারিতা শুধু সে দেশবাসীই নয়, বহির্বিশ্বের লোকেরাও ভোগ করে থাকে। [দেখুন, কুরতুবী]
কোন কোন মুফাসসির বলেন, এখানে মক্কাকে বোঝানো হয়েছে। কারণ অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, " নিশ্চয় মানব জাতির জন্য সর্বপ্রথম যে ঘর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা তো বাক্কায়, বরকতময় ও সৃষ্টিজগতের দিশারী হিসাবে।" [সূরা আলে ইমরান: ৯৬] [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ আমি তাকে (দো'আ ও অনুরোধ অনুযায়ী) পুত্র ইসহাক ও অতিরিক্ত দান হিসেবে পৌত্র ইয়াকুবও নিজের পক্ষ থেকে দান করলাম। অর্থাৎ ছেলের পরে পৌত্রকেও নবুওয়াতের মর্যাদায় অভিসিক্ত করেছি। দো'আর অতিরিক্ত হওয়ার কারণে একে نافلة বলা হয়েছে। [কুরতুবী]

৭৩. আর আমরা তাদেরকে করেছিলাম নেতা; তারা আমাদের নির্দেশ অনুসারে মানুষকে সঠিক পথ দেখাত; আর আমরা তাদেরকে সৎকাজ করতে ও সালাত কায়েম করতে এবং যাকাত প্রদান করতে ওহী পাঠিয়েছিলাম; এবং তারা আমাদেরই ‘ইবাদাতকারী ছিল।

وَجَعَلْنٰهُمْ اَىِٕمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءَ الزَّكٰوةِ ۚ وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ ۝٧٣

৭৪. আর লূতকে আমরা দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান[১] এবং তাকে উদ্ধার করেছিলাম এমন এক জনপদ থেকে[২] যার অধিবাসীরা লিপ্ত ছিল অশ্লীল কাজে[৩]; নিশ্চয় তারা ছিল এক মন্দ ফাসেক সম্প্রদায়।

وَلُوْطًا اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا وَّنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِيْ كَانَتْ تَّعْمَلُ الْخَبٰٓىِٕثَ ۭ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فٰسِقِيْنَ ۝٧٤

৭৫. এবং তাকে আমরা আমাদের অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম; তিনি ছিলেন সৎকর্মপরায়ণদের অন্যতম।

وَاَدْخَلْنٰهُ فِيْ رَحْمَتِنَا ۭ اِنَّهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝٧٥

(১) মূলে “হুকুম ও ইলম” শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। “হুকুম” অর্থ এখানে নবুওয়ত। তাছাড়া এর অন্য অর্থ, প্রজ্ঞা। [ফাতহুল কাদীর] আর “ইলম” এর অর্থ হচ্ছে এমন সত্য যথার্থ ইলম যা অহীর মাধ্যমে দান করা হয়েছে। অন্য কথায় দ্বীনের জ্ঞান এবং মানুষের মধ্যে যা ঘটবে তার সঠিক ফয়সালা [কুরতুবী] লূতের সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্যে দেখুন সূরা আল-আ'রাফ ৮০-৮৪, সূরা হুদ ৬৯-৮৩ এবং সূরা আল-হিজর ৫৭-৭৬ আয়াত।

(২) যে জনপদ থেকে লূত আলাইহিস সালামকে উদ্ধার করার কথা আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে উল্লেখ করা হয়েছে, সেই জনপদের নাম ছিল সাদূম। [ইবন কাসীর] এর অধীনে আরও সাতটি জনপদ ছিল। এগুলোকে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম ওলট-পালট করে দিয়েছিলেন। শুধু লূত আলাইহিস সালাম ও তার সঙ্গী মুমিনদের বসবাসের জন্যে একটি জনপদ অক্ষত রেখে দেয়া হয়েছিল। [কুরতুবী]

(৩) পুরুষের সাথে পুরুষের কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা ছিল তাদের সর্বপ্রধান নোংরা অভ্যাস, যা থেকে বন্য জন্তুরাও বেঁচে থাকে। কোন কোন তফসীরবিদ বলেনঃ এ ছাড়া অন্যান্য নোংরা অভ্যাসও তাদের মধ্যে ছিল। [দেখুন, কুরতুবী]

ষষ্ঠ রুকূ'

وَنُوْحًا اِذْ نَادٰى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ﴿٧٦﴾

৭৬. আর স্মরণ করুন নূহ্‌কে; পূর্বে তিনি যখন ডেকেছিলেন(১) তখন আমরা সাড়া দিয়েছিলাম তার ডাকে এবং তাকে ও তার পরিজনবর্গকে মহাসংকট(২) থেকে উদ্ধার করেছিলাম,

وَنَصَرْنٰهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۭ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فَاَغْرَقْنٰهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٧٧﴾

৭৭. এবং আমরা তাকে সাহায্য করেছিলাম সে সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যারা আমার নিদর্শনাবলীতে মিথ্যারোপ করেছিল; নিশ্চয় তারা ছিল এক মন্দ সম্প্রদায় । এজন্য আমরা তাদের সবাইকেই নিমজ্জিত করেছিলাম ।

وَدَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ اِذْ يَحْكُمٰنِ فِي الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ۚ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شٰهِدِيْنَ ﴿٧٨﴾

৭৮. আর স্মরণ করুন দাউদ ও সুলায়মানকে, যখন তাঁরা বিচার করছিলেন শস্যক্ষেত্র সম্পর্কে; তাতে রাতে প্রবেশ করেছিল কোন সম্প্রদায়ের মেষ; আর আমরা তাদের বিচার পর্যবেক্ষণ করছিলাম(৩) ।

---

(১) নূহের দো'আর প্রতি ইংগিত করা হয়েছে । সুদীর্ঘকাল নিজের জাতির সংশোধনের অবিরাম প্রচেষ্টা চালাবার পর শেষে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে তিনি যে দো'আ করেছিলেন "হে রব! আমি হেরে গেছি আমাকে সাহায্য করো ।" [সূরা আল কামারঃ ১০] এবং "হে আমার রব! পৃথিবী পৃষ্ঠে একজন কাফেরকেও ছেড়ে দিয়ো না ।" [সূরা নূহঃ ২৬]

(২) "মহাসংকট" অর্থ একটি অসৎ কর্মশীল জাতির মধ্যে জীবন যাপন করার বিপদ অথবা মহাপ্লাবন । নূহের কাহিনী বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন সূরা আল আ'রাফ ৫৯ থেকে ৬৪, সূরা ইউনুস ৭১ থেকে ৭৩, সূরা হূদ ২৫ থেকে ৪৮ এবং বনী ইসরাঈল ৩ আয়াতসমূহ ।

(৩) মুফাসসিরগণ ঘটনার বিবরণ এভাবে দিয়েছেন যে, দুই লোক দাউদ আলাইহিস সালামের কাছে উপস্থিত হয় । তাদের একজন ছিল ছাগলপালের মালিক ও অপরজন শস্যক্ষেত্রের মালিক । শস্যক্ষেত্রের মালিক ছাগলপালের মালিকের বিরুদ্ধে দাবী করল যে, তার ছাগপাল রাত্রিকালে আমার শস্যক্ষেত্রে চড়াও হয়ে সম্পূর্ণ ফসল বিনষ্ট করে

٧٩. فَفَهَّمْنٰهَا سُلَيْمٰنَ ۚ وَكُلًّا اٰتَيْنَا حُكْمًا وَّعِلْمًا ۫ وَّسَخَّرْنَا مَعَ دَاوٗدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ؕ وَكُنَّا فٰعِلِيْنَ ۝

৭৯. অতঃপর আমরা সুলায়মানকে এ বিষয়ের মীমাংসা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম এবং তাদের প্রত্যেককে আমরা দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান[১]। আর

দিয়েছে; কিছুই অবশিষ্ট রাখেনি। (সম্ভবতঃ বিবাদী স্বীকার করে নিয়েছিল এবং ছাগলপালের মূল্য ক্ষতিগ্রস্ত ফসলের মূল্যের সমান ছিল। তাই) দাউদ আলাইহিস-সালাম রায় দিলেন যে, ছাগলপালের মালিক তার সমস্ত ছাগল শস্যক্ষেত্রের মালিককে অর্পন করুক। (কেননা, ফিক্‌হ এর পরিভাষায় ‘যাওয়াতুল কিয়াম’ অর্থাৎ যেসব বস্তু মূল্যের মাধ্যমে আদান প্রদান করা হয়, সেগুলো কেউ বিনষ্ট করলে তার জরিমানা মূল্যের হিসাবেই দেয়া হয়। ছাগলপালের মূল্য বিনষ্ট ফসলের মূল্যের সমান বিধায় বিধি মোতাবেক এই রায় দেয়া হয়েছে। বাদী ও বিবাদী উভয়ই দাউদের আদালত থেকে বের হয়ে আসলে (দরজায় তার পুত্র) সুলাইমান আলাইহিস সালামের সাথে সাক্ষাত হয়। তিনি মোকদ্দমার রায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তারা তা শুনিয়ে দেয়। সুলাইমান বলেনঃ আমি রায় দিলে তা ভিন্নরূপ হত এবং উভয়পক্ষের জন্য উপকারী হত। তারপর তিনি পিতা দাউদের কাছে উপস্থিত হয়ে তাকে এ কথা জানালেন। দাউদ আলাইহিসসালাম বলেনঃ এই রায় থেকে উত্তম এবং উভয়ের জন্য উপকারী রায়টা কি? সুলায়মান বললেনঃ আপনি ছাগপাল শস্যক্ষেত্রের মালিককে দিয়ে দিন। সে এগুলোর দুধ, পশম ইত্যাদি দ্বারা উপকার লাভ করুক এবং ক্ষেত ছাগলপালের মালিককে অর্পণ করুন। সে তাতে চাষাবাদ করে শস্য উৎপন্ন করবে। যখন শস্যক্ষেত্র ছাগলপালে বিনষ্ট করার পূর্বের অবস্থায় পৌঁছে যাবে তখন শস্যক্ষেত্র উহার মালিককে এবং ছাগপাল ছাগলের মালিককে প্রত্যার্পণ করুন। দাউদ আলাইহিস সালাম এই রায় পছন্দ করে বললেনঃ বেশ এখন এই রায়ই কার্যকর হবে। অতঃপর তিনি উভয়পক্ষকে ডেকে দ্বিতীয় রায় কার্যকর করলেন। [দেখুন, কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(১) এ আয়াত থেকে পরোক্ষভাবে ন্যায়বিচারের এ মূলনীতি জানা যায় যে, দু’জন বিচারপতি যদি একটি মোকদ্দমার ফায়সালা করে এবং দু’জনের ফায়সালা বিভিন্ন হয়, তাহলে যদিও একজনের ফায়সালাই সঠিক হবে তবুও দু’জনেই ন্যায়বিচারক বিবেচিত হবেন। তবে এখানে শর্ত হচ্ছে বিচার করার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা উভয়ের মধ্যে থাকতে হবে। তাদের কেউ যেন অজ্ঞতা ও অনভিজ্ঞতা সহকারে বিচারকের আসনে বসে না যান। [দেখুন, কুরতুবী] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীসে একথা আরো বেশী সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ “যদি বিচারক নিজের সামর্থ অনুযায়ী ফায়সালা করার পূর্ণ প্রচেষ্টা চালান, তাহলে সঠিক ফায়সালা করার ক্ষেত্রে তিনি দু’টি প্রতিদান পাবেন এবং ভুল ফায়সালা করলে পাবেন একটি প্রতিদান।” [বুখারীঃ ৬৯১৯, মুসলিমঃ ১৭১৬] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

আমরা পর্বত ও পাখিদেরকে দাউদের অনুগত করে দিয়েছিলাম, তারা তার সাথে পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করত[১], আর আমরাই ছিলাম এ

বলেছেনঃ “বিচারক তিন প্রকারের। এদের একজন জান্নাতী এবং দু’জন জাহান্নামী। জান্নাতের অধিকারী হচ্ছেন এমন বিচারক যিনি সত্য চিহ্নিত করতে পারলে সে অনুযায়ী ফায়সালা দেন। কিন্তু যে ব্যক্তি সত্য চিহ্নিত করার পরও সত্য বিরোধী ফায়সালা দেয় সে জাহান্নামী। আর অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি জ্ঞান ছাড়াই লোকদের মোকদ্দমার ফায়সালা করতে বসে যায় সেও জাহান্নামী।” [আবুদাউদঃ ২৫৭৩, তিরমিযীঃ ১৩২২, ইবনে মাজাহঃ ২৩১৫]

(১) আয়াতে مع শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ দাউদ আলাইহিস সালামের সাথে পাহাড় ও পাখীদেরকে অনুগত করা হয়েছিল এবং সে কারণে তারাও দাউদের সাথে আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করতো। একথাটিই কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছেঃ “আমরা তার সাথে পাহাড়গুলোকে অনুগত করে দিয়েছিলাম। সকাল-সন্ধ্যা তারা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতো। আর সমবেত পাখিদেরকেও (অনুগত করা হয়েছিল)। তারা প্রত্যেকেই ছিল অধিক আল্লাহ অভিমুখী।” [সূরা সাদঃ১৮,১৯] অন্য সূরায় আরও অতিরিক্ত বলা হয়েছেঃ “পাহাড়গুলোকে আমরা হুকুম দিয়েছিলাম যে, তার সাথে সাথে পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার পুনরাবৃত্তি করো এবং এই একই হুকুম পাখিদেরকেও দিয়েছিলাম।” [সূরা সাবাঃ ১০]

এ বক্তব্যগুলো থেকে যে কথা বুঝা যায় তা হচ্ছে এই যে, দাউদ যখন আল্লাহর প্রশংসা ও মহিমা গীতি গাইতেন তখন তার উচ্চতর ও সুরেলা আওয়াজে পাহাড় ও পাখিরা গেয়ে ফেলত এবং একটা অপূর্ব মূর্ছনার সৃষ্টি হতো। তিনি যখন যবুর পাঠ করতেন, তখন পক্ষীকুল শূন্যে তার সাথে তসবীহ্ পাঠ করতে থাকত। [ইবন কাসীর] সমধুর কণ্ঠস্বর ছিল একটি বাহ্যিক গুণ এবং পক্ষীকুল ও পর্বতসমূহের তসবীহ্ পাঠে শরীক হওয়া ছিল আল্লাহর কুদরতের অধীন একটি মু‘জেযা। মু‘জেযার জন্য পক্ষীকুল ও পর্বতসমূহের মধ্যেও বিশেষ চেতনা সৃষ্টি হতে পারে। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে আবু মূসা আশ‘আরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু অত্যন্ত সুমধুর কণ্ঠস্বরের অধিকারী ছিলেন। একবার আবু মূসা আশ‘আরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন। তার কণ্ঠ ছিল অসাধারণ সুরেলা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেদিক দিয়ে যাচ্ছিলেন। তার আওয়াজ শুনে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং অনেকক্ষণ শুনতে থাকলেন। তার পড়া শেষ হলে তিনি বললেনঃ “এ ব্যক্তি দাউদের সুরেলা কণ্ঠের একটা অংশ পেয়েছে।” [মুসনাদে আহমাদঃ ৫/৩৫৯] আবু মুসা যখন জানতে পারলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার তিলাওয়াত শুনেছেন, তখন আরয করলেনঃ আপনি শুনছেন - একথা আমার জানা থাকলে আমি আরও সুন্দরভাবে তিলাওয়াত

সবের কর্তা।

৮০. আর আমরা তাকে তোমাদের জন্য বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলাম[১], যাতে তা তোমাদের যুদ্ধে তোমাদেরকে রক্ষা করে; কাজেই তোমরা কি কৃতজ্ঞ হবে?

وَعَلَّمْنٰهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْۢ بَاْسِكُمْ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ شٰكِرُوْنَ ﴿٨٠﴾

৮১. আর সুলাইমানের বশীভূত করে দিয়েছিলাম প্রবল বায়ুকে; সেটা তার আদেশে সে দেশের দিকে প্রবাহিত হত[২] যেখানে আমরা প্রভূত কল্যাণ

وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِيْ بِاَمْرِهٖۤ اِلَى الْاَرْضِ الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ۚ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عٰلِمِيْنَ ﴿٨١﴾

করার চেষ্টা করতাম। [ইবনে হিব্বানঃ ৭১৯৭, অনুরূপ মুসলিমঃ ৭৯৩] এ থেকে জানা গেল যে, কুরআন তেলাওয়াতে সুন্দর স্বর ও চিত্তাকর্ষক উচ্চারণ কাম্য ও পছন্দনীয়।

(১) এখানে লৌহবর্ম বোঝানো হয়েছে, যা যুদ্ধে হেফাযতের জন্যে ব্যবহৃত হয়। অন্য এক আয়াতে আছেঃ "আমরা দাউদের জন্যে লোহা নরম করে দিয়েছিলাম।" [সূরা সাবাঃ ১০] আলোচ্য আয়াতে বর্ম নির্মাণ শিল্প দাউদ আলাইহিস সালামকে শেখানোর কথা উল্লেখ করার সাথে সাথে এর রহস্যও বলে দেয়া হয়েছে যে, "যাতে এই বর্ম তোমাদেরকে যুদ্ধে (সুতীক্ষ্ণ তরবারির আঘাত থেকে) হেফাযত করে" এই প্রয়োজন থেকে দ্বীনদার হোক কিংবা দুনিয়াদার কেউই মুক্ত নয়। তাই এই শিল্প শিক্ষা দেয়াকে আল্লাহ তা'আলা নেয়ামত আখ্যা দিয়েছেন। এ থেকে জানা গেল যে, যে শিল্পের মাধ্যমে মানুষের প্রয়োজন সম্পন্ন হয়, তা শিক্ষা দেয়া সওয়াবের কাজ; তবে জনসেবার নিয়ত থাকা এবং শুধু উপার্জন লক্ষ্য না হওয়া শর্ত। নবী-রাসূলগণ বিভিন্ন প্রকার শিল্পকর্ম নিজেরা সম্পন্ন করেছেন বলে কুরআন ও বিভিন্ন সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে। [দেখুন, কুরতুবী]

(২) এ সম্পর্কে অন্যত্র আরো বিস্তারিত আলোচনা এসেছে, বলা হয়েছেঃ "আর সুলাইমানের জন্য আমরা বায়ুকে বশীভূত করে দিয়েছিলাম, সকালে তার চলা এক মাসের পথ পর্যন্ত এবং সন্ধ্যায় তার চলা এক মাসের পথ পর্যন্ত।" [সূরা সাবাঃ ১২] অন্যত্র আরও বলা হয়েছেঃ "কাজেই আমি তার জন্য বায়ুকে বশীভূত করে দিয়েছিলাম, যা তার হুকুম সহজে চলাচল করতো যেদিকে সে যেতে চাইতো।" [সূরা সাদঃ৩৬] এ থেকে জানা যায় বাতাসকে সুলাইমানের হুকুমের এভাবে অনুগত করে দেয়া হয়েছিল যে, তার রাজ্যের এক মাস দূরত্বের পথ পর্যন্ত যে কোন স্থানে তিনি সহজে সফর করতে পারতেন। যাওয়ার সময়ও সব সময় তার ইচ্ছা অনুযায়ী অনুকূল বাতাস পেতেন আবার ফেরার সময়ও। আল্লাহ্ তাআলা যেমন দাউদ

রেখেছি[১]; আর প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কে আমরাই সম্যক জ্ঞানী ।

৮২. আর শয়তানদের মধ্যে কিছু সংখ্যক তার জন্য ডুবুরীর কাজ করত, এ ছাড়া অন্য কাজও করত[২]; আর আমরা তাদের রক্ষাকারী ছিলাম ।

وَمِنَ الشَّيٰطِيۡنِ مَنۡ يَّغُوۡصُوۡنَ لَهٗ وَيَعۡمَلُوۡنَ عَمَلًا دُوۡنَ ذٰلِكَ ۚ وَكُنَّا لَهُمۡ حٰفِظِيۡنَ ۙ﴿۸۲﴾

৮৩. আর স্মরণ করুন আইয়ূবকে[৩], যখন

وَاَيُّوۡبَ اِذۡ نَادٰى رَبَّهٗۤ اَنِّىۡ مَسَّنِىَ الضُّرُّ

আলাইহিস সালাম এর জন্যে পর্বত ও পক্ষীকুলকে বশীভূত করে দিয়েছিলেন, যারা তার আওয়াজের সাথে তসবীহ্ পাঠ করত, তেমনি সুলাইমান আলাইহিস সালাম এর জন্য বায়ুকে বশীভূত করে দিয়েছিলেন । বায়ুতে ভর করে তিনি যথা ইচ্ছা দ্রুত ও সহজে পৌঁছে যেতেন । তিনি বায়ূতে তার কাঠের বিছানা পাততেন । তারপর তাতে রাষ্ট্রের যত প্রয়োজনী জিনিস যেমন ঘোড়া, উট, তাঁবু, সৈন্য-সামন্ত সবাই উঠানো হত । তারপর বাতাসকে বলা হত তা বহন করার জন্য । বাতাস তার নিচে ঢুকে তা বহন করে উঠিয়ে নিয়ে যেত । তখন তাদের উপরে পাখি ছায়া দিত, এভাবে তিনি যেখানে চাইতেন সেখানে নিয়ে যেত । যখন তিনি নামতেন তখন তার সাথে তার রাজকীয় সামগ্রী সবই থাকত । [ইবন কাসীর]

(১) যেখানে বরকত বা প্রভূত কল্যাণ রেখেছি বলে শাম দেশ তথা সিরিয়া, লেবানন ও ফিলিস্তিন এলাকাকেই বোঝানো হয়েছে । যার আলোচনা আগেই চলে গেছে ।

(২) অর্থাৎ আমরা সুলাইমানের জন্যে শয়তানের মধ্যে এমন কিছু সংখ্যককে বশীভূত করে দিয়েছিলাম, যারা তার জন্যে সমুদ্রে ডুব দিয়ে মনিমুক্তা সংগ্রহ করে আনত, এছাড়া অন্য কাজও করত; যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, “তারা সুলাইমান আলাইহিস সালামের জন্যে বেদী, সুউচ্চ প্রাসাদ, মূর্তি ও চৌবাচ্চার ন্যায় পাথরের বড় বড় পেয়ালা তৈরী করত ।” [সূরা সাবাঃ ১৩] সুলাইমান তাদেরকে অধিক পরিশ্রমের কাজেও নিয়োজিত করতেন এবং অভিনব শিল্পকাজও করাতেন । অন্য আয়াতে এসেছে, “ আর (অধীন করে দিলাম) প্রত্যেক প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরী শয়তান (জিন) দেরকেও, এবং শৃংখলে আবদ্ধ আরো অনেককে ।” [সূরা ছোয়াদ: ৩৭-৩৮]

(৩) কুরআন থেকে শুধু এতটুকু জানা যায় যে, তিনি কোন দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে সবর করে যান এবং অবশেষে আল্লাহ্‌র কাছে দো‘আ করে রোগ থেকে মুক্তি পান । এই অসুস্থতার দিনগুলোতে তার সন্তান-সন্ততি, বন্ধু-বান্ধব সবই উধাও হয়ে গিয়েছিল । এরপর আল্লাহ তা‘আলা তাকে সুস্থতা দান করেন । হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: আল্লাহ্‌র নবী আইয়ূব আলাইহিস্সালাম আঠার বছর মুসীবত ভোগ করেছিলেন । অবস্থা এমন হয়েছিল যে, তাকে তার ভাই বন্ধু-বান্ধবদের মাঝে দু’জন ব্যতীত সবাই ত্যাগ করে চলে

গিয়েছিল। এ দু’জন সকাল বিকাল তার কাছে আসত। তাদের একজন অপরজনকে বলল: জেনে নাও আল্লাহর শপথ! অবশ্যই আইয়ূব এমন কোন গোনাহ করেছে যার মত গোনাহ সৃষ্টিজগতের কেউ করেনি। তার সাথী বলল: এটা কেন বললে? জবাবে সে বলল: আঠার বছর থেকে সে এমন কঠিন রোগে ভূগছে অথচ আল্লাহ্ তার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাকে তা থেকে মুক্তি দিচ্ছে না। এ কথা শোনার পর সাথীটি আইয়ূব আলাইহিসসালামের সাথে দেখা করতে গিয়ে ব্যথিত হয়ে কথাটি তাকে জানিয়ে দিল। তখন আইয়ূব আলাইহিসসালাম তাকে বললেন: আমি জানি না তুমি কি বলছ, তবে আল্লাহ্ জানেন পূর্বে আমি কখনও কখনও ঝগড়ায় লিপ্ত দু’জনের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় এটাও শোনতাম যে, তারা আল্লাহ্র কথা বলে বলে নিজেদের ঝগড়া করছে। তখন আমি বাড়ী ফিরে তাদের পক্ষ থেকে কাফফারা আদায় করতাম এই ভয়ে যে, তারা হক ছাড়া অন্য কোন ভাবে আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করেনি তো? ঘটনা বর্ণনা করতে করতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আইয়ূব আলাইহিসসালাম তার প্রাকৃতিক কাজ সারতে বের হতেন। কাজ সারার পর তার স্ত্রী তার হাত ধরে নিয়ে আসতেন। একদিন তিনি তাঁর প্রাকৃতিকর কাজ সারার পর তার স্ত্রীর কাছে ফিরতে দেরী করছিলেন এমন সময় আল্লাহ্ তা‘আলা আইয়ূব আলাইহিসসালামের কাছে ওহী পাঠালেন যে, “আপনি আপনার পা দ্বারা ভূমিতে আঘাত করুন, এই তো গোসলের সুশীতল পানি ও পানীয়।” [সূরা সোয়াদ:৪২] তার স্ত্রী তার আগমনে দেরী দেখে নিজেই এগিয়ে গিয়ে তার কাছে পৌঁছলেন। তখন আইয়ূব আলাইহিসসালামের যাবতীয় মুসিবত দূর হয়ে তিনি পূর্বের ন্যায় সুন্দর হয়ে গেলেন। তার স্ত্রী তাকে দেখে বললেন: হে মানুষ! আল্লাহ্ আপনার উপর বরকত দিন, আপনি কি ঐ বিপদগ্রস্ত আল্লাহ্র নবীকে দেখেছেন? আল্লাহ্র শপথ, যখন সে সুস্থ ছিল তখন সে ছিল আপনার মতই দেখতে। তখন আইয়ূব আলাইহিসসালাম বললেন যে, আমিই সেই ব্যক্তি। আইয়ূব আলাইহিসসালামের দুটি উঠান ছিল। একটি গম শুকানোর অপরটি যব শুকানোর। আল্লাহ্ তা‘আলা সে দু’টির উপর দু’খণ্ড মেঘ পাঠালেন। এক খণ্ড মেঘ সে গমের উঠোনে এমনভাবে স্বর্ণ ফেললো যে, সেটি পূর্ণ হয়ে গেল। অপর মেঘ খণ্ডটি সেটির উপর এমনভাবে রৌপ্য বর্ষণ করল যে, সেটাও পূর্ণ হয়ে গেল। [সহীহ ইবন্ হিব্বান: ৭/১৫৭, হাদীস নং ২৮৯৮, মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৬৩৫, ৪১১৫] অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: একবার আইয়ূব আলাইহিসসালাম কাপড় খুলে গোসল করছিলেন, এমতাবস্থায় এক ঝাঁক স্বর্ণের টিডিড (পঙ্গপাল) তার উপর পড়তে আরম্ভ করল, তিনি সেগুলো মুঠি মুঠি তার কাপড়ে জমা করছিলেন। তখন তার প্রভু তাকে ডেকে বললেন: হে আইয়ূব আমি কি আপনাকে যা দেখছেন তা থেকেও বেশী প্রদান করে ধনী করে দেইনি? উত্তরে আইয়ূব আলাইহিসসালাম বললেন: অবশ্যই হে প্রভু! তবে আপনার দেয়া বরকত থেকে আমি কখনো অমুখাপেক্ষী হবো না। [বুখারী: ৩৩৯১, ২৭৯] এ ছাড়া আইয়ূব আলাইহিসসালাম সংক্রান্ত আরো কিছু কাহিনী বিভিন্ন

وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّٰحِمِينَ ﴿٨٣﴾

তিনি তার রবকে ডেকে বলেছিলেন, 'আমি তো দুঃখ-কষ্টে পড়েছি, আর আপনি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু(১)!'

فَاسْتَجَبْنَا لَهُۥ فَكَشَفْنَا مَا بِهِۦ مِن ضُرٍّ ۖ وَءَاتَيْنَٰهُ أَهْلَهُۥ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَٰبِدِينَ ﴿٨٤﴾

৮৪. অতঃপর আমরা তার ডাকে সাড়া দিলাম, তার দুঃখ-কষ্ট দূর করে দিলাম(২), তাকে তার পরিবার-পরিজন ফিরিয়ে দিলাম এবং আরো দিলাম তাদের সঙ্গে তাদের সমপরিমাণ, আমাদের পক্ষ থেকে বিশেষ রহমতরূপে এবং 'ইবাদাতকারীদের জন্য উপদেশস্বরূপ।

وَإِسْمَٰعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ ۖ كُلٌّ مِّنَ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿٨٥﴾

৮৫. এবং স্মরণ করুন ইসমা'ঈল, ইদরীস ও যুলকিফলকে, তাদের প্রত্যেকেই ছিলেন ধৈর্যশীল(৩);

ঐতিহাসিক বর্ণনাসমূহে এসেছে কিন্তু সেগুলো খুব বেশী গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি বিধায় এখানে উল্লেখ করা গেল না।

(১) দো'আর ধরণ অত্যন্ত পবিত্র, সূক্ষ্ম ও নমনীয়! সংক্ষিপ্ত বাক্যের মাধ্যমে নিজের কষ্টের কথা বলে যাচ্ছেন এবং এরপর একথা বলেই থেমে যাচ্ছেন-"আপনি করুণাকারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।" পরে কোন অভিযোগ ও নালিশ নেই, কোন জিনিসের দাবী নেই। তাতেই আল্লাহ্ খুশী হয়ে তার দো'আ কবুল করলেন। পরবর্তী আয়াতে দো'আ কবুল হওয়ার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

(২) কুরআনের অন্যত্র এসেছে, আল্লাহ্ তাকে বলেনঃ "নিজের পা দিয়ে আঘাত করুন, এ ঠাণ্ডা পানি মজুদ আছে গোসল ও পান করার জন্য।" [সূরা ছোয়াদঃ ৪২] এ থেকে জানা যায়, মাটিতে পা ঠুকবার সাথে সাথেই আল্লাহ্ তার জন্য একটি প্রাকৃতিক ঝরণা-ধারা প্রবাহিত করেন। এ ঝরণার পানির বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, এ পানি পান ও এতে গোসল করার সাথে সাথেই তিনি রোগমুক্ত হয়ে যান। এ রোগ নিরাময় এদিকে ইংগিত করে যে, তার কোন মারাত্মক চর্মরোগ হয়েছিল।

(৩) আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে তিন জন মনীষীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে ইসমাঈল ও ইদরীস যে নবী ও রাসূল ছিলেন, তা কুরআনের অনেক আয়াত দ্বারা প্রমাণিত আছে। কুরআনে তাদের কথা স্থানে স্থানে আলোচনাও করা হয়েছে। তৃতীয় জন হচ্ছেন যুলকিফল। ইবনে -কাসীর বলেনঃ তার নাম দু'জন নবীর সাথে শামিল করে উল্লেখ করা থেকে বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, তিনিও আল্লাহ্‌র নবী ছিলেন। কিন্তু

৮৬. আর আমরা তাদেরকে আমাদের অনুগ্রহে প্রবেশ করালাম; তারা ছিলেন সৎকর্মপরায়ণ ।

وَاَدۡخَلۡنٰهُمۡ فِیۡ رَحۡمَتِنَا ؕ اِنَّهُمۡ مِّنَ الصّٰلِحِیۡنَ ﴿۸۶﴾

৮৭. আর স্মরণ করুন, যুন্‌-নূনকে[১], যখন

وَ ذَا النُّوۡنِ اِذۡ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنۡ لَّنۡ

কোন কোন বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, তিনি নবীদের কাতারভুক্ত ছিলেন না; বরং একজন সৎকর্মপরায়ন ব্যক্তি ছিলেন । তবে সঠিক মত হলো এই যে, তিনি নবী ও রাসূলই ছিলেন । তার সম্পর্কে খুব বেশী তথ্য জানা যায় না । ইসরাঈলী বর্ণনায় যে সমস্ত ঘটনা এসেছে সেগুলোর কোনটিই গ্রহণযোগ্য নয় । [এ ব্যাপারে ইবন কাসীর আরও তথ্য বর্ণনা করেছেন ।]

(১) ইউনুস ইবনে মাত্তা আলাইহিস সালাম এর কাহিনী পবিত্র কুরআনের সূরা ইউনুস, সূরা আল-আম্বিয়া, সূরা আস-সাফ্‌ফাত ও সূরা আল-কালামে বিবৃত হয়েছে । কোথাও তার আসল নাম উল্লেখ করা হয়েছে, কোথাও যুননুন এবং কোথাও ছাহেবুল হূত উল্লেখ করা হয়েছে । নূন ও হূত উভয় শব্দের অর্থ মাছ । কাজেই যুন নূন ও সাহেবুল হূতের অর্থ মাছওয়ালা । ইউনুস আলাইহিস সালামকে কিছুদিন মাছের পেটে অবস্থান করতে হয়েছিল এই আশ্চার্য ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই তাকে যুন-নূন বা ছাহেবুল হূত শব্দদ্বয়ের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে ।

বিভিন্ন তাফসীরে এসেছে যে, ইউনুস আলাইহিস সালামকে মুসেলের একটি জনপদ নায়নুয়ার অধিবাসীদের হেদায়াতের জন্যে প্রেরণ করা হয়েছিল । তিনি তাদেরকে ঈমান ও সৎকর্ম করার দাওয়াত দেন । তারা অবাধ্যতা প্রদর্শন করে । ইউনুস আলাইহিস সালাম তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে আযাবের ভয় দেখিয়ে জনপদ ত্যাগ করেন । এতে তারা ভাবতে থাকে যে এখন আযাব এসেই যাবে । (কোন কোন বর্ণনা থেকে জানা যায় যে আযাবের কিছু কিছু চিহ্নও ফুটে উঠেছিল) তাই অনতিবিলম্বে তারা শির্ক ও কুফর থেকে তওবা করে নেয় এবং জনপদের সব আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা জঙ্গলের দিকে চলে যায় । তারা চতুষ্পদ জন্তু ও বাচ্চাদেরকেও সাথে নিয়ে যায় এবং বাচ্চাদেরকে তাদের মায়েদের কাছ থেকে আলাদা করে দেয় । এরপর সবাই কান্নাকাটি শুরু করে এবং কাকুতি-মিনতি সহকারে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করতে থাকে । জন্তুদের বাচ্চারা মা দের কাছ থেকে আলাদা করে দেয়ার কারণে পৃথক শোরগোল করতে থাকে । আল্লাহ্ তা'আলা তাদের খাঁটি তওবা ও কাকুতি-মিনতি কবুল করে নেন এবং তাদের উপর থেকে আযাব হটিয়ে দেন । এদিকে ইউনুস আলাইহিস সালাম ভাবছিলেন যে, আযাব আসার ফলে তার সম্প্রদায় বোধ হয় ধ্বংস হয়ে গেছে । কিন্তু পরে যখন জানতে পারলেন যে, আদৌ আযাব আসেনি এবং তার সম্প্রদায় সুস্থ ও নিরাপদে দিন গুজরান করছে, তখন তিনি চিন্তান্বিত হলেন যে, এখন আমাকে মিথ্যাবাদী মনে করা হবে । কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, তার সম্প্রদায়ের মধ্যে কেউ মিথ্যাবাদী

نَّقۡدِرَ عَلَيۡهِ فَنَادٰى فِى الظُّلُمٰتِ اَنۡ لَّاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنۡتَ سُبۡحٰنَكَ ۖ اِنِّىۡ كُنۡتُ مِنَ

তিনি ক্রোধ ভরে[১] চলে গিয়েছিলেন এবং মনে করেছিলেন যে, আমরা তাকে পাকড়াও করব না[২]। তারপর তিনি

প্রমাণিত হয়ে গেলে তাকে হত্যা করার প্রথা প্রচলিত ছিল। এর ফলে ইউনুস আলাইহিস সালাম –এর প্রাণনাশের আশঙ্কা দেখা দিল। তিনি সম্প্রদায়ের মধ্যে ফিরে আসার পরিবর্তে ভিনদেশে হিজরত করার ইচ্ছায় সফর শুরু করলেন। পথিমধ্যে একটি নদী পড়ল। তিনি একটি নৌকায় আরোহন করলেন। ঘটনাক্রমে নৌকা আটকে গিয়ে ডুবে যাওয়ার উপক্রম হল। মাঝিরা বলল যে, আরোহীদের মধ্যে একজনকে নদীতে ফেলে দিতে হবে। তাহলে অন্যরা ডুবে মরার কবল থেকে রক্ষা পাবে। এখন কাকে ফেলা হবে, এ নিয়ে আরোহীদের নামে লটারী করা হলে ঘটনাক্রমে এখানে ইউনুস আলাইহিস সালাম এর নাম বের হল। এই লটারীর কথা উল্লেখ প্রসঙ্গে কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে "লটারীর ব্যবস্থা করা হলে তার (ইউনুস আলাইহিস সালাম এর) নামই তাতে বের হয়।" [সূরা আস-সাফফাতঃ ১৪১] তখন ইউনুস আলাইহিস সালাম দাঁড়িয়ে গেলেন এবং অনাবশ্যক কাপড় খুলে নদীতে ঝাপিয়ে পড়লেন। এদিকে আল্লাহ্ তা'আলা সবুজ সাগরে এক মাছকে আদেশ দিলে সে সাগরের পানি চিরে দ্রুতগতিতে সেখানে পৌঁছে যায় (ইবনে মাসউদের উক্তি) এবং ইউনুস আলাইহিস সালাম –কে উদরে পুরে নেয়। আল্লাহ্ তা'আলা মাছকে নির্দেশ দেন যে, ইউনুস আলাইহিস সালাম এর অস্থি-মাংসের যেন কোন ক্ষতি না হয় সে তার খাদ্য নয়, বরং তার উদর কয়েকদিনের জন্যে তার কয়েদখানা। [ইবন কাসীর] কুরআনের বক্তব্য ও অন্যান্য বর্ণনা থেকে এতটুকু জানা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলার পরিষ্কার নির্দেশ ছাড়াই ইউনুস আলাইহিস সালাম তার সম্প্রদায়কে ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন। তার এই কার্যক্রম আল্লাহ তা'আলা অপছন্দ করেন। ফলে তিনি অসন্তোষের কারণ হন এবং তাকে সমুদ্রে মাছের পেটে অবস্থান করতে হয়।

(১) অর্থাৎ ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গেলেন। বাহ্যতঃ এখানে সম্প্রদায়ের প্রতি ক্রোধ বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ পালনকর্তার খাতিরে ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গেলেন। কাফের ও পাপাচারীদের প্রতি আল্লাহর খাতিরে রাগান্বিত হওয়া সাক্ষাত ঈমানের আলামত। [ফাতহুল কাদীর] অন্য অর্থ হচ্ছে, তিনি জাতির উপর রাগ করে চলে গেলেন। [ফাতহুল কাদীর]

(২) অভিধানের দিক দিয়ে نقدر শব্দের তিন রকম অর্থ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। প্রথম, কাবু করা। অর্থাৎ তিনি ধারণা করলেন যে, আমি তাকে কাবু করতে পারব না। বলাবাহুল্য, এরূপ ধারণা কোন নবী তো দূরের কথা সাধারণ মুসলিমও করতে পারে না। কারণ, এরূপ মনে করা প্রকাশ্য কুফর। [ফাতহুল কাদীর] কাজেই আয়াতে এই অর্থ হওয়া মোটেই সম্ভবপর নয়। দ্বিতীয় অর্থ, সংকীর্ণ করা; যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ ﴿ اَللّٰهُ يَبۡسُطُ الرِّزۡقَ لِمَنۡ يَّشَآءُ وَيَقۡدِرُ ﴾ "আল্লাহ্ যার জন্যে জীবিকা প্রশস্ত করে দেন এবং যার জন্যে ইচ্ছা সংকীর্ণ করে দেন।" [সূরা আর-রা'দঃ২৬, অনুরূপ আয়াত আরও দেখুন,

الظّٰلِمِيْنَ ۝٨٧

অন্ধকারে[১] এ আহবান করেছিলেন যে, ‘আপনি ব্যতীত কোন সত্য ইলাহ্ নেই; আপনি কতইনা পবিত্র ও মহান, নিশ্চয়ই আমি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছি’[২]।

فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۙ وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ ۭ وَكَذٰلِكَ نُـْۨجِي الْمُؤْمِنِيْنَ ۝٨٨

৮৮. তখন আমরা তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে দুশ্চিন্তা হতে উদ্ধার করেছিলাম, আর এভাবেই আমরা মুমিনদেরকে উদ্ধার করে থাকি[৩]।

সূরা আল-ইসরাঃ ৩০, সূরা আল-কাসাসঃ৮২, সূরা আল-আনকাবূতঃ ৬২, সূরা আর-রূমঃ৩৭, সূরা সাবাঃ৩৬, সূরা আয-যুমারঃ৫২, সূরা আশ-শূরাঃ১২] যেখানে সর্বসম্মতভাবে অর্থ হচ্ছেঃ সংকীর্ণ করা। তখন আয়াতের অর্থ হবে, ইউনুস আলাইহিস সালাম মনে করলেন, উদ্ভুত পরিস্থিতিতে সম্প্রদায়কে ছেড়ে কোথাও চলে যাওয়ার ব্যাপারে আমার প্রতি কোনরূপ সংকীর্ণ আচরণ করা হবে না। [ফাতহুল কাদীর] তৃতীয় অর্থ, বিচারে রায় দেয়া। তখন আয়াতের অর্থ হবে এই যে, ইউনুস আলাইহিস সালাম মনে করলেন, এ ব্যাপারে আমার কোন ত্রুটি ধরা হবে না। তাই আমাকে পাকড়াও করা হবে না। [ইবন কাসীর] মোটকথা, প্রথম অর্থের সম্ভাবনাই নেই, দ্বিতীয় অথবা, তৃতীয় অর্থ সম্ভবপর।

(১) অর্থাৎ মাছের পেটের মধ্য থেকে সেখানে তো অন্ধকার ছিলই, তার উপর ছিল সাগরের অন্ধকার ও রাতের অন্ধকার। [ইবন কাসীর] অথবা মাছের পেটের অন্ধকার, সে মাছের পেট থেকে অপর মাছের পেটের অন্ধকার তার উপর রয়েছে সমুদ্রের অন্ধকার। [ইবন কাসীর] ইবন মাসউদ ও ইবন আব্বাস বলেন, তাকে নিয়ে মাছটি সমুদ্রের গভীরে চলে গেলে সেখানে ইউনুস আলাইহিস সালাম পাথরের তাসবীহ শুনতে পেয়ে তাসবীহ পড়ার কথা স্মরণ করলেন। এবং তিনি সেই দো‘আটি করলেন। [ইবন কাসীর]

(২) ইউনুস আলাইহিস সালামের দো‘আ প্রত্যেকের জন্যে, প্রতি যুগের ও প্রতি মকসুদের জন্যে মকবুল। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ “মাছের পেটে পাঠকৃত ইউনুস আলাইহিস সালাম এর এই দো‘আটি যদি কোন মুসলিম কোন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে পাঠ করে, তবে আল্লাহ্ তা‘আলা তা কবুল করেন।” [তিরমিযীঃ ৩৫০৫]

(৩) অর্থাৎ আমরা যেভাবে ইউনুস আলাইহিস সালাম–কে দুশ্চিন্তা ও সংকট থেকে উদ্ধার করেছি, তেমনিভাবে সব মুমিনকেও করে থাকি; যদি তারা সততা ও আন্তরিকতার

৮৯. আর স্মরণ করুন যাকারিয়্যাকে, যখন তিনি তার রবকে ডেকে বলেছিলেন, 'হে আমার রব! আমাকে একা (নিঃসন্তান) রেখে দিবেন না, আপনি তো শ্রেষ্ঠ ওয়ারিশ[১]।'

وَزَكَرِيَّآ إِذۡ نَادَىٰ رَبَّهُۥ رَبِّ لَا تَذَرۡنِي فَرۡدٗا وَأَنتَ خَيۡرُ ٱلۡوَٰرِثِينَ ۝٨٩

৯০. অতঃপর আমরা তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে দান করেছিলাম ইয়াহ্ইয়া, আর তার জন্য তার স্ত্রীকে (গর্ভধারণের) যোগ্যা করেছিলাম। তারা সৎকাজে প্রতিযোগিতা করত, আর তারা আমাদেরকে ডাকত আগ্রহ ও ভীতির সাথে এবং তারা ছিল আমাদের নিকট ভীত-অবনত[২]।

فَٱسۡتَجَبۡنَا لَهُۥ وَوَهَبۡنَا لَهُۥ يَحۡيَىٰ وَأَصۡلَحۡنَا لَهُۥ زَوۡجَهُۥٓۚ إِنَّهُمۡ كَانُواْ يُسَٰرِعُونَ فِي ٱلۡخَيۡرَٰتِ وَيَدۡعُونَنَا رَغَبٗا وَرَهَبٗاۖ وَكَانُواْ لَنَا خَٰشِعِينَ ۝٩٠

সাথে আমার দিকে মনোনিবেশ করে এবং আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। [দেখুন, ইবন কাসীর]

(১) স্ত্রীকে যোগ্য করে দেয়ার অর্থ হচ্ছে, তার বন্ধ্যাত্ব দূর করে দেয়া এবং বার্ধক্য সত্ত্বেও তাকে গর্ভধারণের উপযোগী করা। "সবচেয়ে ভালো উত্তরাধিকারী আপনিই" মানে হচ্ছে, সন্তান না দিলে কোন দুঃখ নেই। আপনার পবিত্র সত্তা-উত্তরাধিকারী হবার জন্য যথেষ্ট। কারণ আমার জানা আছে যে, আপনারা দ্বীনের জন্য আপনি কাউকে না কাউকে মনোনীত করবেন। যিনি আপনার দ্বীনকে সঠিকভাবে প্রচার করতে পারবে। [ফাতহুল কাদীর] যাকারিয়্যা আলাইহিস সালাম–এর একজন উত্তরাধিকারী পুত্র লাভের একান্ত বাসনা ছিল। তিনি তারই দো'আ করেছেন, কিন্তু সাথে সাথে এটাও বলেছিলেন যে, পুত্র পাই বা না পাই; সর্বাবস্থায় আপনিই উত্তম ওয়ারিশ। এটা নবীসুলভ শিষ্টাচার প্রদর্শন বৈ নয়। আয়াতের অন্য অর্থ হচ্ছে, ওয়ারিশ বানানোর মালিক তো আপনিই। আপনিই তো দিতে পারেন। আপনার দ্বীন কখনও ধ্বংস হবে না। কিন্তু আমার ইচ্ছা আমার বংশ এ ফযীলত থেকে বঞ্চিত না হউক। [কুরতুবী; সা'দী]

(২) তারা আগ্রহ ও ভয় অর্থাৎ সুখ ও দুঃখ সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ তা'আলাকে ডাকে। এর এরূপ অর্থও হতে পারে যে, তারা ইবাদত ও দো'আর সময় আশা ও ভীতি উভয়ের মাঝখানে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলার কাছে কবুল ও সওয়াবের আশাও রাখে এবং স্বীয় গোনাহ্ ও ত্রুটির জন্যে ভয়ও করে। ভালো কিছু পাওয়ার আশা তারা করে, আর খারাপ কিছু থেকে বাঁচার আশাও তারা করে। [সা'দী]

وَالَّتِيٓ اَحۡصَنَتۡ فَرۡجَهَا فَنَفَخۡنَا فِيۡهَا مِنۡ رُّوۡحِنَا وَجَعَلۡنٰهَا وَابۡنَهَآ اٰيَةً لِّلۡعٰلَمِيۡنَ ﴿٩١﴾

৯১. এবং স্মরণ করুন সে নারীকে[১], যে নিজ লজ্জাস্থানের হেফাযত করেছিল, অতঃপর তার মধ্যে আমরা আমাদের রূহ্[২] ফুঁকে দিলাম এবং তাকে ও তার পুত্রকে করেছিলাম সৃষ্টিজগতের জন্য এক নিদর্শন ।

اِنَّ هٰذِهٖۤ اُمَّتُكُمۡ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۖ وَّاَنَا رَبُّكُمۡ فَاعۡبُدُوۡنِ ﴿٩٢﴾

৯২. নিশ্চয় তোমাদের এ জাতি---এ তো একই জাতি এবং আমিই তোমাদের রব, অতএব তোমরা আমারই ‘ইবাদাত কর[৩] ।

---

(১) এখানে মার্‌ইয়াম আলাইহাস সালামের কথা বলা হয়েছে । [ইবন কাসীর]

(২) এখানে যেভাবে ঈসা আলাইহিসসালাম সম্পর্কে রূহ ফুঁকে দেয়ার কথা বলা হলো অন্যত্র তদ্রুপ আদম আলাইহিস সালাম সম্পর্কেও এসেছে, যেমন বলা হয়েছেঃ “আমি মাটি থেকে একটি মানুষ তৈরী করছি । কাজেই যখন আমি তাকে পূর্ণরূপে তৈরী করে নেবো এবং তার মধ্যে নিজের রূহ ফুঁকে দেবো তখন (হে ফেরেশতারা !) তোমরা তার সামনে সিজদায় অবনত হয়ে যাবে ।” [সূরা সাদঃ ৭১-৭২] আদম আলাইহিসসালামের ব্যাপারে রূহ ফুঁকে দেয়ার কথা যেভাবে বলা হয়েছে তেমনিভাবে ঈসা সম্পর্কে বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে । আল্লাহ্ বলেনঃ “আল্লাহ্‌র রাসূল এবং তাঁর কালেমা, যা মার্‌ইয়ামের কাছে পাঠিয়েছিলেন এবং তার পক্ষ থেকে একটি রূহ ।” [সূরা আন-নিসাঃ ১৭১] অন্যত্র বলা হয়েছেঃ “আর ইমরানের মেয়ে মার্‌ইয়াম, যে নিজের লজ্জাস্থানের হেফাজত করেছিল, কাজেই ফুঁকে দিলাম আমরা তার মধ্যে আমাদের রূহ ।” [সূরা আত-তাহরীমঃ ১২] এ সংগে এ বিষয়টিও সামনে থাকা দরকার যে, মহান আল্লাহ্ ঈসা আলাইহিসসালাম ও আদমের আলাইহিসসালামের জন্মকে পরস্পরের সদৃশ গণ্য করেন । তাই অন্য সূরায় আল্লাহ্ বলেনঃ “ঈসার দৃষ্টান্ত আল্লাহ্‌র কাছে আদমের মতো, যাকে আল্লাহ্ মাটি থেকে তৈরী করেন তারপর বলেন,“হয়ে যাও” এবং সে হয়ে যায় । [সূরা আলে ইমরানঃ ৫৯] এসব আয়াত নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করলে একথা বুঝা যায় যে, স্বাভাবিক সৃষ্টি পদ্ধতির পরিবর্তে যখন আল্লাহ্ কাউকে নিজের হুকুমের সাহায্যে অস্তিত্বশীল করে জীবন দান করেন তখন একে “নিজের রূহ থেকে ফুঁকে দিয়েছি” শব্দাবলীর সাহায্যে বিবৃত করেন । এ রূহের সম্পর্ক আল্লাহ্‌র সাথে সম্ভবত এ জন্য করা হয়েছে যে, এর ফুঁকে দেয়াটা অলৌকিক ধরনের । ফলে সম্মানসূচক এ রূহকে আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁর নিজের বলে সম্পর্কিত করেছেন, এটি সৃষ্ট রূহ ।

(৩) এখানে “তোমরা” শব্দের মাধ্যমে সম্বোধন করা হয়েছে সমস্ত মানুষকে । এর অর্থ হচ্ছে, হে মানবজাতি! তোমরা সবাই আসলে একই দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত । [ইবন কাসীর]

وَتَقَطَّعُوٓا۟ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ ۖ كُلٌّ إِلَيْنَا رَٰجِعُونَ ﴿٩٣﴾

৯৩. কিন্তু তারা নিজেদের কার্যকলাপে পরস্পরের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে। প্রত্যেকেই আমাদের কাছে প্রত্যাবর্তনকারী।

সপ্তম রুকূ'

فَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِۦ وَإِنَّا لَهُۥ كَٰتِبُونَ ﴿٩٤﴾

৯৪. কাজেই যদি কেউ মুমিন হয়ে সৎকাজ করে তার প্রচেষ্টা অস্বীকার করা হবে না এবং আমরা তো তার লিপিবদ্ধকারী।

وَحَرَٰمٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَٰهَآ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٩٥﴾

৯৫. আর যে জনপদকে আমরা ধ্বংস করেছি তার সম্পর্কে নিষিদ্ধ করা হয়েছে যে, তার অধিবাসীরা ফিরে আসবে না[১],

---

দুনিয়ায় যত নবী এসেছেন তারা সবাই একই দ্বীন নিয়ে এসেছেন। আর তাদের সেই আসল দ্বীন এই ছিলঃ কেবলমাত্র এক ও একক আল্লাহ্ই মানুষের রব এবং এক আল্লাহ্রই বন্দেগী করা উচিত। পরবর্তীকালে যতগুলো ধর্ম তৈরী হয়েছে সবগুলোই এ দ্বীনেরই বিকৃত রূপ। অন্যত্র রাসূলদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে, "আর আপনাদের এ যে জাতি এ তো একই জাতি এবং আমিই আপনাদের রব; অতএব আমার তাকওয়া অবলম্বন করুন।" [সূরা আল-মুমিনূনঃ ৫২] সুতরাং যে রাসূলদের কথা বলা হলো, তারা তোমাদের নেতা, তোমাদেরকে তাদেরই অনুসরণ করতে হবে, তাদের হেদায়াতই তোমাদের জন্য পাথেয়। তারা সবাই একই দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাদের পথ একটিই, তাদের রবও একজনই। [সা'দী]

(১) এ আয়াতটির কয়েকটি অর্থ হয়ঃ
একঃ যে জাতির অন্যায় আচরণ, ব্যাভিচার, বাড়াবাড়ি ও সত্যের পথ নির্দেশনা থেকে দিনের পর দিন মুখ ফিরিয়ে নেয়া এত বেশী বেড়ে যায় যে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাকে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত হয়ে যায়, তাকে আবার ফিরে আসার ও তাওবা করার সুযোগ দেয়া হয় না। গোমরাহী থেকে হেদায়াতের দিকে ফিরে আসা তার পক্ষে আর সম্ভব হতে পারে না। [ইবন কাসীর]
দুইঃ যে জনপদ আমি আযাব দ্বারা ধ্বংস করেছি, তাদের কেউ যদি দুনিয়াতে এসে সৎকর্ম করতে চায়, তবে সেই সুযোগ সে পাবে না। এরপর তো শুধু কেয়ামত দিবসের জীবনই হবে। আল্লাহ্র আদালতেই তার শুনানি হবে। [ইবন কাসীর; সা'দী]
তিনঃ এখানে 'হারাম' শব্দটি' শরী'আতগত অসম্ভব' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তখন

৯৬. অবশেষে যখন ইয়া’জূজ ও মা’জূজকে মুক্তি দেয়া হবে(১) এবং তারা প্রতিটি উচ্চভূমি হতে দ্রুত ছুটে আসবে(২) ।

حَتّٰٓى اِذَا فُتِحَتْ يَاْجُوْجُ وَمَاْجُوْجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ ﴿٩٦﴾

৯৭. আর অমোঘ প্রতিশ্রুত সময় নিকটবর্তী হবে, আকস্মাৎ কাফেরদের চক্ষু স্থির হয়ে যাবে, তারা বলবে, ‘হায়, দুর্ভোগ আমাদের! আমরা তো ছিলাম এ বিষয়ে উদাসীন; বরং আমরা তো ছিলাম যালেম(৩) ।’

وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَاِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ اَبْصَارُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۗ يٰوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِيْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا بَلْ كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿٩٧﴾

আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়, যে জনপদ ও তার অধিবাসীদেরকে আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি, তাদের কোন আমল কবুল করা অসম্ভব। [কুরতুবী]

(১) হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, আমরা কয়েকজন সাহাবী একদিন পরস্পর কিছু আলোচনা করছিলাম। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমরা কি বিষয়ে আলোচনা করছ? আমরা বললাম: আমরা কেয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করছি। তিনি বললেনঃ যে পর্যন্ত দশটি আলামত প্রকাশ না পায়, সে পর্যন্ত কেয়ামত কায়েম হবে না। [মুসলিমঃ ২৯০১] তিনি দশটি আলামতের মধ্যে ইয়াজুজ-মাজুজের আত্মপ্রকাশও উল্লেখ করলেন। এ আয়াতে ইয়াজুজ-মাজুজের বের হওয়ার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে فتحت শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, সেই নির্ধারিত সময়ের পূর্বে তারা কোন বাধার সম্মুখীন হয়ে থাকবে। কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে যখন আল্লাহ্ তা‘আলা চাইবেন যে, তারা বের হোক, তখনই এই বাধা সরিয়ে দেয়া হবে। যুলকারনাইনের প্রাচীর, যা কেয়ামত নিকটবর্তী হলে খতম হয়ে যাবে। সুরা কাহফে ইয়াজুজ, যুরকারনাইনের প্রাচীরের অবস্থানস্থল ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির আলোচনা হয়েছে।

(২) حدب শব্দের অর্থ প্রত্যেক উচ্চ ভূমি-বড় পাহাড় কিংবা ছোট ছোট টিলা। [ইবন কাসীর] সূরা কাহফে ইয়াজুজ–মাজুজের আলোচনা থেকে জানা যায় যে, তাদের জায়গা কোন কোন পর্বতমালার পশ্চাতে। তাই আবির্ভাবের সময় তারা পর্বত ও টিলাসমূহ থেকে উছলিয়ে পড়ে যমীনের মধ্যে ফাসাদ সৃষ্টি করবে। [ইবন কাসীর]

(৩) তারা নিজেদের গাফলতি বর্ণনা করার পর আবার নিজেরাই পরিষ্কার স্বীকার করবে, নবীগণ এসে আমাদের এ দিনটি সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছিলেন, কাজেই মূলত আমরা গাফেল ও বেখবর ছিলাম না বরং আমরাই নবীদের কথা না শুনে তাদের প্রতি মিথ্যারোপ করে দোষী ও অপরাধী ছিলাম। এভাবে তারা নিজেদের অপরাধের স্বীকৃতি দিবে, কিন্তু তা তাদের কোন কাজে আসবে না। [ইবন কাসীর]

৯৮. নিশ্চয় তোমরা এবং আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা যাদের 'ইবাদাত কর সেগুলো তো জাহান্নামের ইন্ধন; তোমরা সবাই তাতে প্রবেশ করবে।

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ ﴿٩٨﴾

৯৯. যদি তারা ইলাহ্ হত তবে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করত না; আর তাদের সবাই তাতে স্থায়ী হবে,

لَوْ كَانَ هَٰؤُلَاءِ آلِهَةً مَّا وَرَدُوهَا ۖ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٩٩﴾

১০০. সেখানে থাকবে তাদের নাভিশ্বাসের শব্দ[১] এবং সেখানে তারা কিছুই শুনতে পাবে না;

لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٠٠﴾

১০১. নিশ্চয় যাদের জন্য আমাদের কাছ থেকে পূর্ব থেকেই কল্যাণ নির্ধারিত রয়েছে তাদেরকে তা থেকে দূরে রাখা হবে[২]।

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿١٠١﴾

---

(১) ভয়ংকর গরম, পরিশ্রম ও ক্লান্তিকর অবস্থায় মানুষ যখন টানা টানা শ্বাস বের করতে থাকে সেটাকে বলা হয় "যাফীর"। আর সে শ্বাস টানাকে বলে "শাহীক"। [ইবন কাসীর]

(২) পূর্ববর্তী ৯৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, "তোমরা এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা যাদের ইবাদত কর, সবাই জাহান্নামের ইন্দন হবে।" দুনিয়াতে কাফেরদের বিভিন্ন দল যেসব মিথ্যা উপাস্যের উপাসনা করেছে, এ আয়াতে তাদের সবার জাহান্নামে প্রবেশ করার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এ আয়াত শোনার পর কাফেররা এটা বলতে শুরু করল যে, যদি প্রত্যেক অবৈধ উপাস্যই জাহান্নামে যায় তবে ঈসা আলাইহিস্‌সালাম ও ফেরেশ্‌তারাও জাহান্নামে যাবে; কারণ অবৈধ ইবাদত তো ঈসা আলাইহিস সালাম ও ফেরেশতাদেরও করা হয়েছে। তাহলে তারাও কি জাহান্নামে যাবেন? এর জওয়াবে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন। [দেখুনঃ মুস্তাদরাকে হাকিমঃ ২/৩৮৪-৩৮৫]

এ থেকে জানা যায় যে,যারা দুনিয়ায় মানুষকে আল্লাহর বন্দেগী করার শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং লোকেরা তাদেরকেই উপাস্য পরিণত করে অথবা যারা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ বেখবর যে দুনিয়ায় তাদের বন্দেগী ও পূজা করা হচ্ছে এবং এ কর্মে তাদের ইচ্ছা ও আকাংখার কোন দখল নেই, তাদের জাহান্নামে যাবার কোন কারণ নেই। কারণ, তারা এ শির্কের জন্য দায়ী নয়।

لَا يَسْمَعُوْنَ حَسِيْسَهَا ۚ وَهُمْ فِيْ مَا اشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ خٰلِدُوْنَ ﴿١٠٢﴾

১০২. তারা সেসবের ক্ষীণতম শব্দও শুনবে না[১] এবং সেখানে তারা চিরকাল থাকবে তাদের মনের বাসনা অনুযায়ী ।

لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ وَتَتَلَقّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ۗ هٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ﴿١٠٣﴾

১০৩. মহাভীতি[২] তাদেরকে চিন্তান্বিত করবে না এবং ফিরিশ্‌তাগণ তাদেরকে অভ্যর্থনা করবে এ বলে, ‘এ তোমাদের সে দিন যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল ।’

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَآءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ۗ كَمَا بَدَاْنَآ اَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيْدُهٗ ؕ وَعْدًا عَلَيْنَا ؕ اِنَّا كُنَّا

১০৪. সেদিন আমরা আসমানসমূহকে গুটিয়ে ফেলব, যেভাবে গুটানো হয় লিখিত দফতর[৩]; যেভাবে আমরা

---

(১) অর্থাৎ তারা তাদের শরীরে সামান্যতম আগুনের আঁচও পাবে না । [কুরতুবী; ইবন কাসীর] আগুনের শব্দও পাবে না । যারা জাহান্নামে যাবে তাদেরও কোন শব্দ তারা পাবে না । [ফাতহুল কাদীর]

(২) ইবনে আব্বাস বলেনঃ ﴿الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ﴾ বা “মহাভীতি” বলে শিঙ্গার ফুঁৎকার বোঝানো হয়েছে । [ইবন কাসীর] যার ফলে সব মৃত জীবিত হয়ে হিসাব–নিকাশের জন্যে উত্থিত হবে । [ফাতহুল কাদীর] কারও কারও মতে শিঙ্গার প্রথম ফুঁৎকার বোঝানো হয়েছে । আবার কারও মতে, মৃত্যুর সময় বোঝানো হয়েছে । কারও কারও মতে, যখন মানুষকে জাহান্নামের দিকে নেয়ার নির্দেশ দেয়া হবে । কারও কারও মতে, যখন জাহান্নামীদের উপর আগুন বাস্তবায়ন করা হবে । কারও কারও মতে যখন মৃত্যুকে যবাই করা হবে । [কুরতুবী] তবে দ্বিতীয় ফুঁৎকার হওয়াটাই সবচেয়ে বেশী প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত । [ফাতহুল কাদীর]

(৩) আয়াতের অর্থ এই যে, কোন সহীফাকে তার লিখিত বিষয়বস্তুসহ যেভাবে গুটানো হয়, আকাশমণ্ডলীকে সেভাবে গুটানো হবে । আয়াতের মর্ম সম্পর্কে হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ “আল্লাহ্ তা‘আলা কেয়ামতের দিন পৃথিবীকে মুষ্টিবদ্ধ করবেন ও আকাশমন্ডলীকে গুটিয়ে নিজের ডান হাতে রাখবেন ।” [বুখারীঃ ৪৫৪৩, ৭৪১২ মুসলিমঃ ২৭৮৭] অন্য হাদীসে এসেছে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে বলেছিলেন, যদি যমীন মুষ্টিবদ্ধ থাকে এবং আসমানসমূহ তাঁর ডান হাতে থাকে তাহলে মানুষ কোথায় থাকবে? তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেনঃ “তারা জাহান্নামের পুলের উপর থাকবে । [মুসলিম:২৭৯১] এক বর্ণনায়

فٰعِلِيْنَ ۝١٠٤

প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব; এটা আমার কৃত প্রতিশ্রুতি, আর আমরা তা পালন করবই ।

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُوْرِ مِنْۢ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصّٰلِحُوْنَ ۝١٠٥

১০৫. আর অবশ্যই আমরা 'যিকর' এর পর যাবূরে[১] লিখে দিয়েছি যে, যমীনের[২] অধিকারী হবে আমার

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা সপ্ত আকাশকে তাদের অন্তর্বর্তী সব সৃষ্টবস্তুসহ এবং সপ্ত পৃথিবীকে তাদের অন্তর্বর্তী সব সৃষ্টবস্তুসহ গুটিয়ে একত্রিত করে দেবেন । সবগুলো মিলে আল্লাহ্ তা'আলার হাতে সরিষার একটিদানা পরিমাণ হবে ।

(১) زبور শব্দটি একবচন, এর বহুবচন হলো زُبُر । এর অর্থ কিতাব । [কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] দাউদ আলাইহিস সালাম–এর প্রতি নাযিলকৃত বিশেষ কিতাবের নামও যাবুর । এখানে 'যাবূর' বলে কি বোঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি আছে । কারো কারো মতে ذكر বলে তওরাত আর زبور বলে তওরাতের পর নাযিলকৃত আল্লাহ্র অন্যান্য গ্রন্থসমূহ বোঝানো হয়েছে; যথা ইঞ্জীল, যবুর ও কুরআন । আবার কোন কোন মুফাসসিরের মতে ذكر বলে লওহে মাহফুয زبور বলে নবীদের উপর নাযিলকৃত সকল ঐশী গ্রন্থই বোঝানো হয়েছে । [ইবন কাসীর]

(২) অধিক সংখ্যক তফসীরবিদের মতে এখানে যমীন বলে জান্নাতের যমীন বোঝানো হয়েছে । কুরআনের অন্য আয়াতও এর সমর্থন করে । তাতে বলা হয়েছে "তারা প্রবেশ করে বলবে, 'প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি আমাদের প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে অধিকারী করেছেন এ যমীনের; আমরা জান্নাতে যেখানে ইচ্ছে বসবাস করব ।' সদাচারীদের পুরস্কার কত উত্তম!" [সূরা আয-যুমারঃ৭৪] এটাও ইঙ্গিত যে, যমীন বলে জান্নাতের যমীন বোঝানো হয়েছে । কারণ দুনিয়ার যমীনের মালিক তো মুমিন-কাফের সবাই হয়ে যায় । এছাড়া এখানে সৎকর্মপরায়ণদের যমীনের মালিক হওয়ার কথাটি কেয়ামতের আলোচনার পর উল্লেখ করা হয়েছে । কেয়ামতের পর জান্নাতের যমীনই তো বাকী থাকবে ।

তবে কোন কোন মুফাসসির বলেন, এখানে যমীন বলে বর্তমান সাধারণ দুনিয়ার যমীন ও জান্নাতের যমীন উভয়টিই বোঝানো হবে । জান্নাতের যমীনের মালিক যে এককভাবে সৎকর্মপরায়ণগন হবে, তা বর্ণনা সাপেক্ষ নয় । তবে এক সময় তারা এককভাবে দুনিয়ার যমীনের মালিক হবে বলেও প্রতিশ্রুতি আছে । কুরআনের একাধিক আয়াতে এই সংবাদ দেয়া হয়েছে । এক আয়াতে আছেঃ "যমীন তো আল্লাহ্রই । তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছে সেটার উত্তরাধিকারী করেন এবং শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্য ।" [সূরা আল-আরাফঃ ১২৮] অন্য

যোগ্য বান্দাগণই ।

১০৬. নিশ্চয় এতে রয়েছে 'ইবাদতকারী সম্প্রদায়ের জন্য পর্যাপ্ত বিষয়বস্তু ।

إِنَّ فِي هَٰذَا لَبَلَٰغًا لِّقَوۡمٍ عَٰبِدِينَ ۝١٠٦

১০৭. আর আমরা তো আপনাকে সৃষ্টিকুলের জন্য শুধু রহমতরূপেই পাঠিয়েছি[১] ।

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةً لِّلۡعَٰلَمِينَ ۝١٠٧

আয়াতে এসেছেঃ "তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে আল্লাহ্ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন" [সূরা আন-নূরঃ ৫৫] আরও এক আয়াতে আছেঃ "নিশ্চয় আমরা আমার রাসূলগণকে এবং মুমিনগণকে পার্থিব জীবনে এবং কেয়ামতের দিন সাহায্য করব ।"[সূরা গাফেরঃ ৫১] ঈমানদার সৎকর্মপরায়ণেরা একবার পৃথিবীর বৃহদংশ অধিকারভূক্ত করেছিল । জগদ্বাসী তা প্রত্যক্ষ করেছে । দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই পরিস্থিতি অটল ছিল । [ইবন কাসীর]

(১) العالمين শব্দটি عالم শব্দের বহুবচন । মানব, জিন, জীবজন্তু, উদ্ভিদ, জড় পদার্থসমূহ সবই এর অন্তর্ভুক্ত । রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবার জন্যেই রহমতস্বরূপ ছিলেন । রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমন মানব জাতির জন্য আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহ । হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "আমি তো আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রেরিত রহমত" । [ত্বাবরানী, মু'জামুল আওসাত্বঃ ৩০০৫, আস-সাগীরঃ ১/১৬৮, নং২৬৪, মুস্তাদরাকে হাকিমঃ ১/৯১ নং ১০০, মুসনাদে শিহাবঃ ১১৬০, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৫/৬৯, ৩০৫, মারফু' সনদে আর সুনান দারমী, হাদীস নং ১৫ মুরসাল সহীহ সনদে] তাছাড়া যদি আখেরাতই সঠিক জীবন হয় তাহলে আখেরাতের আহ্বানকে প্রতিষ্ঠিত করতে কুফর ও শির্ককে নিশ্চিহ্ন করার জন্যে কাফেরদেরকে হীনবল করা এবং তাদের মোকাবেলায় জেহাদ করাও সাক্ষাত রহমত । এর ফলে আশা করা যায় যে, অবাধ্যদের জ্ঞান ফিরে আসবে এবং তারা ঈমান ও সৎকর্মের অনুসারী হয়ে যাবে । যারা রাসূলের উপর ঈমান আনবে ও তার কথায় বিশ্বাস করবে তারা অবশ্যই সৌভাগ্যবান হবে, আর যারা ঈমান আনবে না তারা দুনিয়াতে পূর্ববর্তী উম্মতদের মত ভূমিধ্বস বা ডুবে মরা থেকে অন্তত নিরাপদ থাকবে । সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বাবস্থায় রহমত । [কুরতুবী] অথবা আয়াতের অর্থ, আমরা আপনাকে সবার জন্যই রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছি । কিন্তু এটা তাদের জন্যই যারা ঈমান আনবে এবং আপনাকে মেনে নিবে । কিন্তু যারা আপনার কথা মানবে না, তারা দুনিয়া ও আখেরাত সর্বত্রই ক্ষতিগ্রস্ত হবে । যেমন আল্লাহ্ অন্য আয়াতে বলেন, "আপনি কি তাদেরকে লক্ষ্য করেন না যারা আল্লাহ্র অনুগ্রহকে কুফরী দ্বারা পরিবর্তন করে নিয়েছে এবং তারা তাদের সম্প্রদায়কে নামিয়ে আনে ধ্বংসের ঘরে -- জাহান্নামে, যার মধ্যে তারা দগ্ধ হবে, আর কত নিকৃষ্ট এ আবাসস্থল!" [সূরা ইবরাহীম: ২৮-২৯] অন্য আয়াতে

قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٠٨﴾

১০৮. বলুন, 'আমার প্রতি ওহী হয় যে, তোমাদের ইলাহ্ এক ইলাহ্, সুতরাং তোমরা কি আত্মসমর্পণকারী হবে?'

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۖ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ ﴿١٠٩﴾

১০৯. অতঃপর তারা মুখ ফিরিয়ে নিলে আপনি বলবেন, 'আমি তোমাদেরকে যথাযথভাবে জানিয়ে দিয়েছি এবং তোমাদেরকে যে বিষয়ের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে[১], আমি জানি না, তা কি খুব কাছে, নাকি তা দূরে।

إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴿١١٠﴾

১১০. নিশ্চয় তিনি জানেন যে কথা সশব্দে বল এবং তিনি জানেন যা তোমরা গোপন কর[২]।

وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿١١١﴾

১১১. 'আর আমি জানি না হয়ত এটা তোমাদের জন্য এক পরীক্ষা

কুরআন সম্পর্কে বলা হয়েছে, "বলুন, 'এটি মুমিনদের জন্য হেদায়াত ও আরোগ্য।' আর যারা ঈমান আনে না তাদের কানে রয়েছে বধিরতা এবং কুরআন এদের (অন্তরের) উপর অন্ধত্ব তৈরী করবে। তাদেরকেই ডাকা হবে দূরবর্তী স্থান হতে।" [সূরা ফুসসিলাত: ৪৪] তাছাড়া হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমাকে অভিশাপকারী করে পাঠানো হয়নি, আমাকে রহমত হিসেবে পাঠানো হয়েছে।" [মুসলিম: ২৫৯৯]

(১) অর্থাৎ ইসলামের বিজয় ও কুফরির পরাজয়। এ সময়টি কখন আসবে সেটা আমি জানি না। অথবা আয়াতের অর্থ, আমি জানি না কখন তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ এসে যাবে। তখন আল্লাহ তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন। অথবা আয়াতে আখেরাতের পাকড়াও উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। কিয়ামতের দিনের সময় কেউ জানে না। কোন পাঠানো নবী বা কোন ফেরেশতাও তা জানে না। [কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(২) অর্থাৎ তোমাদের যাবতীয় কুফরি, বিরোধিতাপূর্ণ কথা, ষড়যন্ত্র সবই আল্লাহ জানেন। চাই তা প্রকাশ্যে বল বা গোপনে বল। কারণ তিনি গায়বের খবর জানেন। [ফাতহুল কাদীর] তোমাদের শির্কের শাস্তি তোমাদের পেতেই হবে। [কুরতুবী] সুতরাং এমন মনে করো না যে, এসব বাতাসে উড়ে গেছে এবং এসবের জন্য আর কখনো জবাবদিহি করতে হবে না।

এবং জীবনোপভোগ কিছু কালের জন্য[১] ।'

১১২. রাসূল বলেছিলেন, 'হে আমার রব! আপনি ন্যায়ের সাথে ফয়সালা করে দিন, আর আমাদের রব তো দয়াময়, তোমরা যা সাব্যস্ত করছ সে বিষয়ে একমাত্র সহায়স্থল তিনিই ।'

قٰلَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ ۗ وَرَبُّنَا الرَّحْمٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ ﴿١١٢﴾

(১) অর্থাৎ এ বিলম্বের কারণে তোমরা পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছো । তোমাদের সামলে উঠার জন্য যথেষ্ট অবকাশ দেবার এবং দ্রুততা অবলম্বন করে সংগে সংগেই পাকড়াও না করার উদ্দেশ্যে বিলম্ব করা হচ্ছে । কিন্তু এর ফলে তোমরা বিভ্রান্তির শিকার হয়ে গেছো । তিনি তো তোমাদেরকে এর মাধ্যমে পরীক্ষা করতে চাচ্ছেন এবং দেখতে চাচ্ছেন যে তোমরা কি কর । [কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

২২- সূরা আল-হাজ্জ[1], ৭৮ আয়াত, মাদানী

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ۚ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ

১. হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবের তাকওয়া অবলম্বন কর[2]; নিশ্চয়

---

(১) এই সূরাটি মক্কায় নাযিল না মদীনায় নাযিল, সে সম্পর্কে তাফসীরবিদগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকেই উভয় প্রকার রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। অধিকসংখ্যক তাফসীরবিদগণ বলেনঃ এই সূরাটি মিশ্র। এতে মক্কায় নাযিল ও মদীনায় নাযিল উভয় প্রকার আয়াতের সমাবেশ ঘটেছে। কুরতুবী এই উক্তিকেই বিশুদ্ধতম আখ্যা দিয়েছেন। [কুরতুবী] কোন কোন মুফাস্‌সির এই সূরার কতিপয় বৈচিত্র্য উল্লেখ করে বলেনঃ এর কিছু আয়াত রাতে, কিছু দিনে, কিছু সফরে, কিছু গৃহে অবস্থানকালে, কিছু মক্কায়, কিছু মদীনায় এবং কিছু যুদ্ধাবস্থায় ও কিছু শান্তিকালে নাযিল হয়েছে। এছাড়া এর কিছু আয়াত রহিতকারী, কিছু আয়াত রহিত এবং কিছু মুহ্‌কাম তথা সুস্পষ্ট ও কিছু মুতাশাবিহ্ তথা অস্পষ্ট। সূরাটিতে নাযিলের সব প্রকারই সন্নিবেশিত রয়েছে। [কুরতুবী]

(২) হাদীসে এসেছে, সফর অবস্থায় এই আয়াত নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উচ্চঃস্বরে এর তিলাওয়াত শুরু করেন। সফরসঙ্গী সাহাবায়ে কেরাম তার আওয়াজ শুনে এক জায়গায় সমবেত হয়ে গেলেন। তিনি সবাইকে সম্বোধন করে বললেনঃ এই আয়াতে উল্লেখিত কেয়ামতের ভূকম্পন কোন্ দিন হবে তোমরা জান কি? সাহাবায়ে কেরাম বললেনঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ এটা সেই দিনে হবে, যেদিন আল্লাহ্ তা'আলা আদম 'আলাইহিস্ সালাম-কে সম্বোধন করে বললেনঃ যারা জাহান্নামে যাবে, তাদেরকে উঠাও। আদম 'আলাইহিস্ সালাম জিজ্ঞেস করবেনঃ কারা জাহান্নামে যাবে? উত্তর হবে, প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বললেনঃ এই সময়েই ত্রাস ও ভীতির আধিক্যে বালকরা বৃদ্ধ হয়ে যাবে, গর্ভবতী নারীদের গর্ভপাত হয়ে যাবে। সাহাবায়ে কেরাম একথা শুনে ভীত-বিহ্বল হয়ে গেলেন এবং প্রশ্ন করলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের মধ্যে কে মুক্তি পেতে পারে? তিনি বললেনঃ তোমরা নিশ্চিন্ত থাক। যারা জাহান্নামে যাবে, তাদের এক হাজার ইয়াজুজ-মাজুজের মধ্য থেকে এবং একজন তোমাদের মধ্য থেকে হবে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, সেদিন তোমরা এমন দুই সম্প্রদায়ের সাথে থাকবে যে, তারা যে দলে ভিড়বে, সেই দলই সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে। একটি ইয়াজুজ-মাজুজের সম্প্রদায় ও অপরটি ইবলীস ও তার সাঙ্গোপাঙ্গ এবং আদম সন্তানদের মধ্যে যারা তোমাদের পূর্বে মারা গেছে, তাদের সম্প্রদায়।

কেয়ামতের প্রকম্পন এক ভয়ংকর ব্যাপার[১]!

شَيْءٌ عَظِيمٌ ①

[তিরমিযিঃ ৩১৬৯, মুসনাদে আহমাদঃ ৪/৪৩৫, মুস্তাদরাকে হাকিমঃ ১/২৮, সহীহ্ ইবনে হিব্বানঃ ৭৩৫৪]

(১) আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ "এবং শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, ফলে যাদেরকে আল্লাহ্ ইচ্ছে করেন তারা ছাড়া আকাশমণ্ডলী ও যমীনের সবাই মূর্ছিত হয়ে পড়বে। তারপর আবার শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, তৎক্ষণাৎ তারা দাঁড়িয়ে তাকাতে থাকবে।" [সূরা আয্ যুমারঃ ৬৮] এ আয়াত থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারি যে, কেয়ামতের দু'টি পর্যায় রয়েছেঃ এক) ইস্রাফিল কর্তৃক প্রথমবার শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া। ঐ ফুঁক দেয়া মাত্রই সবকিছু কম্পিত হতে হতে ধ্বংস হয়ে যাবে। সে মহা ধ্বংসের কথা আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করেছেন। দুই) ইস্রাফিল কর্তৃক দ্বিতীয় বার শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া। ঐ ফুঁক দেয়ার সাথে সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহ্র সামনে নীত হবে। তখন হাশরের মাঠে সবাই জমায়েত হবে।

আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত ভূকম্পন কখন হবে অর্থাৎ কেয়ামত শুরু হওয়া এবং মনুষ্যকুলের পুনরুত্থিত হওয়ার পর ভূকম্পন হবে, না এর আগেই হবে এ সম্পর্কে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেনঃ কেয়ামতের পূর্বে এই পৃথিবীতে ভূকম্পন হবে এবং এটা কেয়ামতের প্রাথমিক কাজ হিসেবে গণ্য হবে। সে সময় পৃথিবী পৃষ্ঠে বসতকারীরা যে অবস্থার সম্মুখীন হবে তার চিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে অংকন করা হয়েছে। যেমনঃ "যখন সিংগায় এক ফুঁক দেয়া হবে এবং যমীন ও পাহাড় তুলে এক আঘাতে ভেঙে দেয়া হবে তখন সে বিরাট ঘটনাটি ঘটে যাবে।" [সূরা আল- হাক্কাহ ১৩-১৫] "যখন পৃথিবীকে পুরোপুরি প্রকম্পিত করে দেয়া হবে এবং সে তার পেটের বোঝা বের করে ছুঁড়ে ফেলে দেবে আর মানুষ বলবে, এর কি হলো?" [সূরা আয-যালযালাহ্ ১-৩] "যেদিন প্রকম্পনের একটি ঝট্কা একেবারে নাড়িয়ে দেবে এবং এরপর আসবে দ্বিতীয় ঝট্কা। সেদিন অন্তর কাঁপতে থাকবে এবং দৃষ্টি ভীতবিহ্বল হবে।" [সূরা আন- নাযিআত ৫-৯] "যে দিন পৃথিবীকে মারাত্মকভাবে ঝাঁকিয়ে দেয়া হবে এবং পাহাড় গুঁড়ো হয়ে ধূলির মতো উড়তে থাকবে।" [সূরা আল ওয়াকি'আহ, ৪-৬] "যদি তোমরা নবীর কথা না মানো, তাহলে কেমন করে রক্ষা পাবে সেদিনের বিপদ থেকে, যা বাচ্চাদেরকে বুড়া করে দেবে এবং যার প্রচণ্ডতায় আকাশ ফেটে চৌচির হয়ে যাবে?" [সূরা আল মুয্যাম্মিল, আয়াত ১৭-১৮] এ মতটি বেশ কিছু তাবে'য়ী থেকে বর্ণিত হয়েছে।

অপর একদল আলেমের মতে, এখানে হাশরের মাঠে যখন একত্রিত করা হবে তখনকার কথা বর্ণনা করা হচ্ছে। আর এ ব্যাপারে বিভিন্ন সহীহ্ হাদীসে সুস্পষ্ঠভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা আদম 'আলাইহিস্ সালাম-কে যখন তার সন্তানদের থেকে জাহান্নামীদেরকে আলাদা করতে বলবেন, তখন এ অবস্থার সৃষ্টি হবে। [বুখারীঃ ৩১৭০, মুসলিমঃ ২২২] আদম 'আলাইহিস্

২. যেদিন তোমরা তা দেখতে পাবে সেদিন প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী বিস্মৃত হবে তাদের দুগ্ধপোষ্য শিশুকে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তাদের গর্ভপাত করে ফেলবে[১]; মানুষকে দেখবেন নেশাগ্রস্তের মত, যদিও তারা নেশাগ্রস্ত নয়। বরং আল্লাহ্‌র শাস্তি কঠিন[২]।

يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكٰرٰى وَمَا هُمْ بِسُكٰرٰى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ ۝٢

সালাম-কে সম্বোধন সম্পর্কিত উপরোক্ত হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, ভূকম্পন হাশর-নশর ও পুনরুত্থানের পর হবে। আর আয়াতের তাফসীরে এটাই সবচেয়ে প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত। তবে কোন কোন সত্যনিষ্ঠ আলেম বলেনঃ উভয় উক্তির মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। কেয়ামতের পূর্বে ভূকম্পন হওয়া কুরআনের বিভিন্ন আয়াত দ্বারা প্রমাণিত এবং হাশর-নশরের পরে হওয়া বহু সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। দু'টিই উদ্দেশ্য হতে পারে; কারণ দু'টিই ভয়াবহ ব্যাপার।

(১) কেয়ামতের এই ভূকম্পনের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে আয়াতে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক গর্ভবতী নারীর গর্ভপাত হয়ে যাবে এবং স্তন্যদাত্রী মহিলারা তাদের দুগ্ধপোষ্য শিশুর কথা ভুলে যাবে। যদি এই ভূকম্পন কেয়ামতের পূর্বেই এই দুনিয়াতে হয়, তবে এরূপ ঘটনা ঘটার ব্যাপারে কোন সংশয় নেই। কোন কোন মুফাসসির বলেন, مرضعة এমন অবস্থাকে বলা হয় যখন কার্যত সে দুধ পান করাতে থাকে এবং শিশু তার স্তন মুখের মধ্যে নিয়ে থাকে। [ইবন কাসীর] কাজেই এখানে যে ছবিটি আঁকা হয়েছে সেটি হচ্ছে, যখন কেয়ামতের সে কম্পন শুরু হবে, মায়েরা নিজেদের শিশু সন্তানদেরকে দুধ পান করাতে করাতে ফেলে দিয়ে পালাতে থাকবে এবং নিজের কলিজার টুকরার কি হলো, একথা কোন মায়ের মনেও থাকবে না। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] পক্ষান্তরে যদি এ ঘটনা হাশর-নশরের পরে হয় তাহলে এর ব্যাখ্যা কারো কারো মতে এরূপ হবে যে, যে মহিলা দুনিয়াতে গর্ভাবস্থায় মারা গেছে, কেয়ামতের দিন সে তদাবস্থায়ই উত্থিত হবে এবং যারা স্তন্যদানের সময় মারা গেছে, তারাও তেমনিভাবে শিশুসহ উত্থিত হবে। তারা তাদের সন্তানদের দুধ খাওয়ানোর কথা চিন্তাও করবে না। [কুরতুবী]

(২) একথা সুস্পষ্ট যে, এখানে কিয়ামতের অবস্থা বর্ণনা করা বক্তব্যের আসল উদ্দেশ্য নয়। বরং কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা বর্ণনা করে পুনরুত্থান অস্বীকারকারীদের উপর দলীল প্রমাণাদি পেশ করা। তাই পরবর্তী আয়াতে সেদিকেই দৃষ্টিপাত করা হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর] অথবা উদ্দেশ্য তাদেরকে সেদিনের জন্য প্রস্তুতি নিতে উদ্বুদ্ধ করা ও নেক কাজ করার মাধ্যমে প্রস্তুতি গ্রহণ করা। [কুরতুবী]

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطٰنٍ مَّرِيْدٍ ۝٣

৩. মানুষের মধ্যে কিছু সংখ্যক না জেনে আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে[১] এবং সে প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তানের অনুসরণ করে,

كُتِبَ عَلَيْهِ اَنَّهٗ مَنْ تَوَلَّاهُ فَاَنَّهٗ يُضِلُّهٗ وَيَهْدِيْهِ اِلٰى عَذَابِ السَّعِيْرِ ۝٤

৪. তার সম্বন্ধে লিখে দেয়া হয়েছে যে, যে কেউ তাকে অভিভাবক বানাবে সে তাকে পথভ্রষ্ট করবে এবং তাকে পরিচালিত করবে প্রজ্জ্বলিত আগুনের শাস্তির দিকে।

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِ

৫. হে মানুষ! পুনরুত্থান সম্পর্কে যদি তোমরা সন্দেহে থাক তবে অনুধাবন কর---আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি[২] মাটি হতে[৩], তারপর

(১) এখানে আল্লাহ সম্পর্কে তাদের যে বিতর্কের উপর আলোচনা করা হচ্ছে তা হচ্ছে আখেরাতে বিচারের জন্য তাদেরকে মৃত্যু ও মাটির সাথে মিশে যাওয়ার পর পুনরায় জীবিত করতে পারেন কি না? আল্লাহ্ এখানে তাদের কর্মকাণ্ডের নিন্দা করছেন, যারা আল্লাহ্ যা তাঁর নবীর উপর নাযিল করেছেন তার অনুসরণ না করে, শয়তানের দেয়া পথের অনুসরণ করে পুনরুত্থান ও আল্লাহ্র শক্তিকে অস্বীকার করছে। আর সাধারণত: যারাই রাসূলের উপর আল্লাহ্র নাযিলকৃত বাণী ও সুস্পষ্ট হকের অনুসরণ করা থেকে বিরত থাকে, তারাই বাতিলপন্থী নেতা, বিদ'আতের প্রতি আহ্বানকারীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। [ইবন কাসীর]

(২) আয়াতটিকে আল্লাহ্ তা'আলা পুনরুত্থানের উপর প্রথম প্রমাণ হিসেবে পেশ করেছেন। প্রথম সৃষ্টি যার পক্ষে করা সম্ভব তাঁর পক্ষে দ্বিতীয় সৃষ্টি কিভাবে কঠিন হবে? প্রথম সৃষ্টিই প্রমাণ করছে যে, তিনি দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করতে সক্ষম। [ইবন কাসীর] আয়াতে মাতৃগর্ভে মানব সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ বলেনঃ মানুষের বীর্য চল্লিশ দিন পর্যন্ত গর্ভাশয়ে সঞ্চিত থাকে। চল্লিশ দিন পর তা জমাট রক্তে পরিণত হয়। এরপর আরো চল্লিশ দিন অতিবাহিত হলে তা মাংসপিণ্ড হয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে একজন ফিরিশ্তা প্রেরিত হয়। সে তাতে রূহ ফুঁকে দেয়। এ সময়েই তার সম্পর্কে চারটি বিষয় লিখে দেয়া হয়ঃ (১) তার বয়স কত হবে, (২) সে কি পরিমাণ রিযিক পাবে, (৩) সে কি কি কাজ করবে এবং (৪) পরিণামে সে ভাগ্যবান হবে, না হতভাগা হবে। [বুখারীঃ ২৯৬৯, মুসলিমঃ ২৬৪৩]

(৩) এর অর্থ হচ্ছে মানুষ নামের প্রজাতির সূচনা হয়েছে আদম আলাইহিস সালাম থেকে।

مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ۚ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا

শুক্র[১] হতে, তারপর 'আলাকাহ'[২] হতে, তারপর পূর্ণাকৃতি অথবা অপূর্ণাকৃতি গোশতপিণ্ড হতে[৩]--

---

তাঁকে সরাসরি মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং তারপর পরবর্তী পর্যায়ে শুক্র থেকেই মানব বংশের ধারাবাহিকতা চলতে থাকে। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছেঃ "মানুষের সৃষ্টি শুরু করেন মাটি থেকে তারপর তার বংশ-ধারা চালান একটি নির্যাস থেকে যা বের হয় তুচ্ছ পানির আকারে।" [সূরা আস্ সাজদাহ, ৭-৮]

(১) নুতফা শব্দের অর্থ শুক্র বা বীর্য। সাধারণতঃ নুতফা বলা হয়, অল্প পানিকে। [কুরতুবী] মাটি থেকে আদম সৃষ্টির পর তার বংশধারা জারি রাখা হয়েছে পানির মাধ্যম। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "আমরা তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির উপাদান থেকে" [সূরা আল-মুমিনূনঃ ১২] অন্য আয়াতে বলেন, "তারপর তিনি তার বংশ উৎপন্ন করেন তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস হতে।" [সূরা আস-সাজদাহঃ ৮]

(২) আলাকা শব্দের অর্থ শক্ত রক্ত, ঘন তাজা রক্ত। বা প্রচণ্ড লাল বর্ণ [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর] মানব সৃষ্টির প্রাথমিক পর্যায়ে যখন শুক্রটি মহিলার গর্ভাশয়ে স্থির হয়ে যায়, তখন সেটা চল্লিশ দিন এ অবস্থায় থাকে। এর সাথে যা জমা হবার তা জমা হয়। তারপর সেটি একটি পর্যায়ে আল্লাহ্‌র হুকুমে লাল তাজা রক্তপিণ্ডে পরিণত হয়। এভাবে সেটি চল্লিশ দিন অতিবাহিত করে। তারপর সেটি পরিবর্তিত হয়ে একখণ্ড গোস্তের টুকরোতে পরিণত হয়ে যায়। তখন তাতে কোন রূপ বা সূরত থাকে না। তারপর সেটি বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করতে থাকে। তখন তা থেকে মাথা, দু'হাত, বুক, পেট, দুই রান, দুই পা এবং বাকী অংগ-প্রত্যঙ্গসমূহ। কখনও কখনও সেটি সূরত গ্রহণ করার আগেই গর্ভপাত ঘটে যায়, আবার কখনও পূর্ণ অবয়ব ঘটনের পর সেটির গর্ভপাত হয়ে যায়। [ইবন কাসীর]

(৩) আব্দুল্লাহ ইবন্ মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, বীর্য যখন কয়েক স্তর অতিক্রম করে মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়, তখন মানব সৃষ্টির কাজে আদিষ্ট ফিরিশ্‌তা আল্লাহ্ তা'আলাকে জিজ্ঞেস করেঃ يَارَبِّ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ অর্থাৎ এই মাংসপিণ্ড দ্বারা মানব সৃষ্টি আপনার কাছে অবধারিত কি না? যদি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে উত্তরে বলা হয় ﴿وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ﴾ তবে গর্ভাশয়ে সেই মাংসপিণ্ডকে পাত করে দেয়া হয় এবং তা সৃষ্টির অন্যান্য স্তর অতিক্রম করে না। পক্ষান্তরে যদি জবাবে ﴿مُّخَلَّقَةٍ﴾ বলা হয়, তবে ফিরিশ্‌তা জিজ্ঞেস করেঃ ছেলে না মেয়ে, হতভাগা না ভাগ্যবান, বয়স কত, কি কর্ম করবে এবং কোথায় মৃত্যুবরণ করবে? এসব প্রশ্নের জবাব তখনই ফিরিশ্‌তাকে বলে দেয়া হয়। [ইবনে জরীর, ও ইবনে আবী হাতিম] উল্লেখিত শব্দদ্বয়ের তাফসীর থেকে এই জানা গেল যে, যে বীর্য দ্বারা মানবসৃষ্টি অবধারিত হয়, তা ﴿مُّخَلَّقَةٍ﴾। আর যা বিনষ্ট ও পাত হওয়া অবধারিত, তা ﴿وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ﴾। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] কোন কোন মুফাস্‌সির ﴿مُّخَلَّقَةٍ﴾ ও ﴿وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ﴾ এর এরূপ তাফসীর করেন যে, যে

ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓا۟ أَشُدَّكُمْ ۖ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنۢ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْـًٔا ۚ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنۢبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍۭ بَهِيجٍ ۝٥

যাতে আমরা বিষয়টি তোমাদের কাছে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করি। আর আমরা যা ইচ্ছে তা এক নির্দিষ্ট কালের জন্য মাতৃগর্ভে স্থিত রাখি, তারপর আমরা তোমাদেরকে শিশুরূপে বের করি[১], পরে যাতে তোমরা পরিণত বয়সে উপনীত হও[২]। তোমাদের মধ্যে কারো কারো মৃত্যু ঘটান হয় এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে কাউকে হীনতম বয়সে[৩] প্রত্যাবৃত্ত

শিশুর সৃষ্টি পূর্ণাঙ্গ এবং সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুস্থ, সুঠাম ও সুষম হয়, সে ﴿مُّخَلَّقَةٍ﴾ অর্থাৎ পূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট এবং যার কতক অঙ্গ অসম্পূর্ণ অথবা দৈহিক গড়ন ইত্যাদি অসম, সে ﴿وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ﴾। [কুরতুবী]

(১) অর্থাৎ মাতৃগর্ভ থেকে তোমাদেরকে দুর্বল শিশুর আকারে বের করি। এ সময় শিশুর দেহ, শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, জ্ঞান, নড়াচড়া ও ধারণশক্তি ইত্যাদি সবই দুর্বল থাকে। অতঃপর পর্যায়ক্রমে এগুলোকে শক্তি দান করা হয় এবং পরিশেষে পূর্ণশক্তির স্তরে পৌঁছে যায়। [ইবন কাসীর]

(২) أشد শব্দটির অর্থ বুদ্ধি, শক্তি ও ভাল-মন্দ পৃথকীকরণে পূর্ণতা। কারও কারও মতে, ত্রিশ থেকে চল্লিশ বয়সের মধ্যে। [ফাতহুল কাদীর] উদ্দেশ্য এই যে, পর্যায়ক্রমে উন্নতির ধারা ততক্ষণ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে যতক্ষণ তোমাদের প্রত্যেকটি শক্তি পূর্ণতা লাভ না করে, যা যৌবনকালে প্রত্যক্ষ করা হয়। [ইবন কাসীর]

(৩) এটা সেই বয়সকে বলা হয়, যে বয়সে মানুষের বুদ্ধি, চেতনা ও ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে ত্রুটি দেখা দেয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন বয়স থেকে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নোক্ত দো'আ অধিক পরিমাণে পাঠ করতেন: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوْذُ بك من الجُبْن وَأعوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلى أَرْذَلِ العُمُر وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدّنْيا وَأَعوذُ بِكَ مِنْ عَذابِ القَبر 'হে আল্লাহ্! আমি কৃপণতা থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি ভীরুতা থেকেও আপনার কাছে আশ্রয় নিচ্ছি। অনুরূপভাবে হীনতম বয়সে উপণীত হওয়া থেকেও আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তদ্রুপ আমি দুনিয়ার ফেতনায় নিপতিত হওয়া থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তাছাড়া আমি কবরের শাস্তি থেকেও আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।' [বুখারীঃ ৫৮৯৩] এমন বৃদ্ধাবস্থায় মানুষের নিজের শরীরের ও অংগ-প্রত্যংগের কোন খোঁজ-খবর থাকে না। যে ব্যক্তি অন্যদেরকে জ্ঞান দিতো বুড়ো হয়ে সে এমন অবস্থায় পৌঁছে যায়, যাকে শিশুদের অবস্থার সাথে তুলনা করা

করা হয়, যার ফলে সে জানার পরেও যেন কিছুই (আর) জানে না। আর আপনি ভূমিকে দেখুন শুষ্ক, অতঃপর তাতে আমরা পানি বর্ষণ করলে তা আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং উদ্‌গত করে সব ধরনের সুদৃশ্য উদ্ভিদ[১];

৬. এটা এ জন্যে যে, আল্লাহ্‌ই সত্য[২] এবং তিনিই মৃতকে জীবিত করেন এবং তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান;

ذٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِ الْمَوْتٰى وَأَنَّهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝٦

৭. এবং এ কারণে যে, কেয়ামত আসবেই,

وَّأَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا ۙ وَأَنَّ اللّٰهَ

যায়। যে জ্ঞান,জানা শোনা, অভিজ্ঞতা ও দুরদর্শিতা ছিল তার গর্বের বস্তু তা এমনই অজ্ঞতায় পরিবর্তিত হয়ে যায় যে, একটি ছোট ছেলেও তার কথায় হাসতে থাকে। এভাবে বান্দার শক্তি দু'টি দুর্বল অবস্থা ঘিরে আছে। এক.ছোট কালের দুর্বলতা, দুই. বৃদ্ধাবস্থার দুর্বলতা। যেমন অন্য আয়াতে বলেছেন, "আল্লাহ্‌, তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেন দুর্বলতা থেকে, দুর্বলতার পর তিনি দেন শক্তি; শক্তির পর আবার দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা ইচ্ছে সৃষ্টি করেন এবং তিনিই সর্বজ্ঞ, সর্বক্ষম।" [সূরা আররূম: ৫৪] [সা'দী]

(১) আয়াতের এ অংশে আল্লাহ্‌ তা'আলা পুনরুত্থানের উপর দ্বিতীয় আরেকটি প্রমাণ পেশ করছেন। [কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] অর্থাৎ যেভাবে তিনি মৃত ভূমিকে জীবিত করতে পারেন, যে যমীনে কোন প্রাণের স্পন্দন নেই, কোন উদ্ভিদ দেখা যায় না। তারপর তাতে বৃষ্টি বর্ষণ করে তিনি জীবনের উন্মেষ ঘটান, সেভাবে তাঁর পক্ষে পুনরুত্থান ঘটানো কোন কঠিন বিষয় নয়।

(২) এ ধারাবাহিক বক্তব্যের মধ্যে এ বাক্যাংশটির তিনটি অর্থ হয়। এক, আল্লাহই সত্য এবং মৃত্যুর পর পুনরায় জীবনদানের কোন সম্ভাবনা নেই, তোমাদের এ ধারণা ডাহা মিথ্যা। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর] দুই, আল্লাহ, তিনি প্রকৃত স্বাধীন ক্ষমতা সম্পন্ন কর্তা, যিনি প্রতি মুহূর্তে নিজের শক্তিমত্তা, সংকল্প, জ্ঞান ও কলা-কৌশলের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্ব-জাহান ও এর প্রতিটি বস্তু পরিচালনা করছেন। [দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] তিন, তিনি কোন খেলোয়াড় নন যে, নিছক মন ভুলাবার জন্য খেলনা তৈরী করেন এবং তারপর অযথা তা ভেঙ্গে চুরে মাটির সাথে মিশিয়ে দেন। বরং তিনি সত্য তাঁর যাবতীয় কাজ গুরুত্বপূর্ণ, উদ্দেশ্যমূলক ও বিজ্ঞানময়। তিনি তাঁর কর্মকাণ্ডে হক ও যথার্থ। তিনি কিয়ামত যথার্থ কারণেই সংঘটিত করবেন। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর] বস্তুত: এখানে হক শব্দের অর্থ হচ্ছে, এমন অস্তিত্ব, যার কোন পরিবর্তন নেই, অস্থায়ী নয়। [ফাতহুল কাদীর]

يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ۝٧

এতে কোন সন্দেহ নেই এবং যারা কবরে আছে তাদেরকে নিশ্চয় আল্লাহ্ পুনরুত্থিত করবেন[১]।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلَا هُدًى وَّلَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ ۝٨

৮. আর মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে; তাদের না আছে জ্ঞান[২], না আছে পথনির্দেশ[৩], না আছে কোন দীপ্তিমান কিতাব[৪]।

(১) উপরের আয়াতগুলোতে মানুষের জন্মের বিভিন্ন পর্যায়, মাটির উপর বৃষ্টির প্রভাব এবং উদ্ভিদ উৎপাদনকে পাঁচটি সত্য নির্ণয়ের প্রমাণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। সে সত্যগুলো হচ্ছেঃ একঃ আল্লাহই সত্য। দুইঃ তিনি মৃতকে জীবিত করেন। তিনঃ তিনি সর্বশক্তিমান। চারঃ কেয়ামত অনুষ্ঠিত হবেই। পাঁচঃ যারা মরে গেছে আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদের সবাইকে জীবিত করে উঠাবেন।

(২) অর্থাৎ ব্যক্তিগত জ্ঞান, যা সরাসরি পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত হয়। [ফাতহুল কাদীর] তবে জ্ঞান বলতে ব্যাপক জ্ঞান বুঝাই যথার্থ। [ফাতহুল কাদীর]

(৩) অর্থাৎ এমন জ্ঞান যা কোন যুক্তির মাধ্যমে অর্জিত হয়, অথবা কোন জ্ঞানের অধিকারীর পথনির্দেশনা দানের মাধ্যমে লাভ করা যায়। [ফাতহুল কাদীর]

(৪) অর্থাৎ এমন জ্ঞান, যা আল্লাহর নাযিল করা কিতাব থেকে লাভ করা যায়। এ আয়াতে তর্কশাস্ত্রের বিশেষ কয়েকটি মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে। কোন তর্ক শুরুর পূর্বে সে বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এ ধরনের জ্ঞানের তিনটি উৎস থাকে। এক. পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান। যে সমস্ত কাফের ও মুশরিক আল্লাহ্ সম্পর্কে বাক-বিতণ্ডা করছে তারা যদি দাবী করে যে, আমরা যা বলছি অর্থাৎ কেয়ামত সংঘটিত না হওয়া, পুনরুত্থান না ঘটা, একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদতে বাধ্য না হওয়া আমাদের সরাসরি পর্যবেক্ষণ বা অভিজ্ঞতার ফল তবে তারা যেন তা পেশ করে। কিন্তু তারা তা কখনো পেশ করতে পারবে না বরং অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ তাদের দাবীর বিপরীতে আল্লাহ্র যাবতীয় ওয়াদাকে সত্য বলে প্রমাণ করছে। দুই. দ্বিতীয় যে ধরনের জ্ঞান থাকলে তর্ক করা যায় তা হলো, গ্রহণযোগ্য যুক্তি বা কোন জ্ঞানের অধিকারীর পথনির্দেশ প্রাপ্ত হলে। কাফের ও মুশরিকরা যারা তাওহীদ বা আখেরাত সম্পর্কে বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত ছিল তারা তাদের মতের সমর্থনে এ ধরনের কিছুও পেশ করতে ব্যর্থ ছিল। তিন. তৃতীয় যে ধরনের প্রমাণ যুক্তি-তর্কে পেশ করা হয় তা হলো, পূর্ববর্তী কোন কিতাবলব্ধ জ্ঞান। কাফের মুশরিকদের তাওহীদ ও আখেরাত বিরোধী কর্মকাণ্ডের স্বপক্ষে পূর্ববর্তী গ্রন্থ থেকেও কোন প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেনি। মোটকথা: তাদের তর্কের সপক্ষে কোন সুস্থ বিবেকের প্রমাণ যেমন নেই, তেমনি সহীহ ও স্পষ্টভাষী কোন কিতাব বা নবী-রাসূলদের পেশকৃত জ্ঞানও নেই। তারা শুধু মত ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করছে। [ইবন কাসীর]

ثَانِيَ عِطْفِهٖ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهٗ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَّنُذِيْقُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَذَابَ الْحَرِيْقِ ۝٩

৯. সে বিতণ্ডা করে অহংকারে ঘাড় বাঁকিয়ে[১] লোকদেরকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে ভ্রষ্ট করার জন্য[২]। তার জন্য লাঞ্ছনা আছে দুনিয়াতে এবং কেয়ামতের দিনে আমরা তাকে আস্বাদন করাব দহন যন্ত্রণা।

ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدٰكَ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ۝١٠

১০. 'এটা তোমার কৃতকর্মেরই ফল, আর আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি বিন্দুমাত্রও যুলুমকারী নন।'

---

(১) عطف শব্দের অর্থ পার্শ্ব। [ফাতহুল কাদীর] এখানে মুখ ফিরিয়ে নেয়া বোঝানো হয়েছে। এর তিনটি অবস্থা রয়েছেঃ এক, মুর্খতাপ্রসূত জিদ ও হঠকারিতা। দুই, অহংকার ও আত্মম্ভরিতা। তিন, যে ব্যক্তি বুঝায় ও উপদেশ দান করে তার কথায় কর্ণপাত না করা। এখানে সব প্রকারই উদ্দেশ্য হতে পারে। অর্থাৎ হকের দিকে আহ্বান করলে সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ঘাঁড় বাঁকিয়ে চলে যায়, তাকে যে হকের প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছে অহংকারবশত: তা থেকে বিমুখ হয়। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "তাদেরকে যখন বলা হয় আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তার দিকে এবং রাসূলের দিকে আস, তখন মুনাফিকদেরকে আপনি আপনার কাছ থেকে একেবারে মুখ ফিরিয়ে নিতে দেখবেন।" [সূরা আন-নিসা: ৬১] [ইবন কাসীর] কুরতুবী বলেন, তর্কের সময় সে হক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর তার কথা-বার্তা ও দলীল-প্রমাণাদির মধ্যে গভীর দৃষ্টি দেয়া থেকেও বিরত থাকে। যেমন অন্য আয়াতে এসেছে, "আর যখন তার কাছে আমাদের আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয় তখন সে অহংকারে মুখ ফিরিয়ে নেয় যেন সে এটা শুনতে পায়নি" [সূরা লুকমান: ৭] অন্যত্র এসেছে, "আর যখন তাদেরকে বলা হয়, 'তোমরা আস, আল্লাহ্‌র রাসূল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন' তখন তারা মাথা ফিরিয়ে নেয়" [সূরা আল-মুনাফিকূন: ৫] আরও এসেছে, "আর আমরা যখন মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করি তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও দূরে সরে যায়।" [সূরা আল-ইসরা: ৮৩] অনুরূপ অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন, "তারপর সে তার পরিবার পরিজনের কাছে চলে গিয়েছিল অহংকার করে" [সূরা আল-কিয়ামাহ: ৩৩]

(২) অর্থাৎ তারা শুধু নিজেরাই পথভ্রষ্ট নয় বরং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করার জন্য উঠে পড়ে লাগে। [ফাতহুল কাদীর] এখানে আরেক অর্থ এও হতে পারে যে, সে অন্যকে পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছা না করলেও তার কর্মকাণ্ডের ফলাফল তা-ই দাঁড়ায়। [ইবন কাসীর]

দ্বিতীয় রুকূ’

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ ۚ فَاِنْ اَصَابَهٗ خَيْرُ ِۨاطْمَاَنَّ بِهٖ ۚ وَاِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةُ ِۨانْقَلَبَ عَلٰى وَجْهِهٖ ۚ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ ﴿١١﴾

১১. আর মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ্‌র ‘ইবাদাত করে দ্বিধার সাথে(১); তার মঙ্গল হলে তাতে তার চিত্ত প্রশান্ত হয় এবং কোন বিপর্যয় ঘটলে সে তার পূর্ব চেহারায় ফিরে যায়। সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় দুনিয়াতে এবং আখেরাতে; এটাই তো সুস্পষ্ট ক্ষতি(২)।

(১) অর্থাৎ দ্বীনী বৃত্তের মধ্যখানে নয় বরং তার এক প্রান্তে বা কিনারায় অথবা অন্য কথায় কুফর ও ইসলামের সীমান্তে দাঁড়িয়ে বন্দেগী করে। অথবা সন্দেহে দোদুল্যমান থাকে। [ইবন কাসীর] যেমন কোন দো-মনা ব্যক্তি কোন সেনাবাহিনীর এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকে। যদি দেখে সেনাদল বিজয়লাভ করছে তাহলে তাদের সাথে মিলে যায় আর যদি দেখে পরাজিত হচ্ছে তাহলে আস্তে আস্তে কেটে পড়ে। এখানে এমন সব লোকের কথা বলা হয়েছে যাদের মানসিক গঠন অপরিপক্ক, আকীদা-বিশ্বাস নড়বড়ে এবং যারা প্রবৃত্তির পূজা করে। তারা ইসলাম গ্রহণ করে লাভের শর্তে। তাদের ঈমান এ শর্তের সাথে জড়িত হয় যে, তাদের আকাংখা পূর্ণ হতে হবে, সব ধরনের নিশ্চিন্ততা অর্জিত হতে হবে, আল্লাহর দ্বীন তাদের কাছে কোন স্বার্থ ত্যাগ দাবী করতে পারবে না এবং দুনিয়াতে তাদের কোন ইচ্ছা ও আশা অপূর্ণ থাকতে পারবে না। এসব হলে তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট এবং তার দ্বীন তাদের কাছে খুবই ভালো। কিন্তু যখনই কোন আপদ বালাই নেমে আসে অথবা আল্লাহর পথে কোন বিপদ, কষ্ট ও ক্ষতির শিকার হতে হয় কিংবা কোন আকাংখা পূর্ণ হয় না তখনই আর আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতা, রাসূলের রিসালাত ও দ্বীনের সত্যতা কোনটার উপরই তারা নিশ্চিন্ত থাকে না। এরপর তারা লাভের আশা ও লোকসান থেকে বাঁচার জন্য শির্ক করতে পিছপা হয় না। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হিজরত করে মদীনায় বসবাস করতে শুরু করেন, তখন এমন লোকেরাও এসে ইসলাম গ্রহণ করত, যাদের অন্তরে ইসলাম পাকাপোক্ত ছিল না। ইসলাম গ্রহণের তাদের সন্তান ও ধন-দৌলতে উন্নতি দেখা গেলে তারা বলতঃ এই দ্বীন ভাল। পক্ষান্তরে এর বিপরীত দেখা গেলে বলতঃ এই দ্বীন মন্দ। এই শ্রেণীর লোকদের সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে। বলা হয়েছে যে, তারা ঈমানের এক কিনারায় দণ্ডায়মান আছে। ঈমানের পর যদি তারা পার্থিব সুখ ও ধন-সম্পদ লাভ করে, তবে ইসলামে অটল হয়ে যায়, পক্ষান্তরে যদি পরীক্ষাস্বরূপ কোন বিপদাপদ ও পেরেশানীতে পতিত হয়, তবে দ্বীন ত্যাগ করে বসে। [বুখারীঃ ৪৭৪২]

(২) অর্থাৎ এ দো-মনা মুসলিম নিজের দুনিয়ার স্বার্থও লাভ করতে পারে না এবং আখেরাতেও তার সাফল্যের কোন সম্ভাবনা থাকে না। কারণ সে তো আল্লাহ্‌র সাথে কুফরি করে আছে। [ইবন কাসীর] এভাবে সে দুনিয়া ও আখেরাত দুটোই হারায়।

يَدْعُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُۥ وَمَا لَا يَنفَعُهُۥ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلضَّلَٰلُ ٱلْبَعِيدُ ﴿١٢﴾

১২. সে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা তার কোন অপকার করতে পারে না আর যা তার উপকারও করতে পারে না; এটাই চরম পথভ্রষ্টতা!

يَدْعُوا۟ لَمَن ضَرُّهُۥٓ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِۦ ۚ لَبِئْسَ ٱلْمَوْلَىٰ وَلَبِئْسَ ٱلْعَشِيرُ ﴿١٣﴾

১৩. সে এমন কিছুকে ডাকে যার ক্ষতিই তার উপকারের চেয়ে বেশী নিকটতর[১]। কত নিকৃষ্ট এ অভিভাবক এবং কত নিকৃষ্ট এ সহচর[২]!

---

(১) পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য মাবুদদের উপকার ও ক্ষতি করার ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা হয়েছে। কারণ, মূলত ও যথার্থই তাদের উপকার ও ক্ষতি করার কোন ক্ষমতা নেই। এ আয়াতে তাদের ক্ষতিকে উপকারের চেয়ে অধিক নিকটতর বলা হয়েছে। এর কারণ দু'টি হতে পারে। এক. এখানে অধিক বলে 'সম্পূর্ণরূপে' বোঝোনো হয়েছে। অথবা তর্কের খাতিরে বলা হয়েছে। যেমন অন্যত্র এ ধরনের ব্যবহার এসেছে, "হয় আমরা না হয় তোমরা সৎপথে স্থিত অথবা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পতিত।" [সূরা সাবা: ২৪] [ফাতহুল কাদীর] কোন কোন মুফাসসির বলেন, এ পূর্ববর্তী যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা কোন উপকার বা অপকার করতে পারে না, তারা হচ্ছে মূর্তি ও প্রতিমা। আর এ আয়াতে ঐ সমস্ত মাবুদদের কথা বলা হচ্ছে যারা জীবিত অবস্থায় তাদের যারা ইবাদাত করে তাদের কোন কোন উপকার করতে পারে। যেমন, তাদেরকে দুনিয়ার সম্পদ দিয়ে ভরে দিতে পারে। তাদের কোন উদ্দেশ্য পূরণ করে দিতে পারে। যেমন ফির'আউন। যারা তার ইবাদাত করত, হয়ত সে তাদের কোন স্বার্থ হাসিল করে দিত। সে জন্যই এখানে من শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, যা বিবেকসম্পন্নদের সাথে সংশ্লিষ্ট। আর পূর্ববর্তী আয়াতে ما শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, যা বিবেকহীন মূর্তি, প্রতিমা ইত্যাদির সাথে সংশ্লিষ্ট। [আদওয়াউল বায়ান] এতো গেল দুনিয়ার ব্যাপার কিন্তু আখেরাতে তার যে ক্ষতি হবার সেটা নিঃসন্দেহ ও সম্পূর্ণ দৃঢ় সত্য। [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ মানুষ বা শয়তান যে-ই হোক না কেন, যে তাকে এ পথে এনেছে সে নিকৃষ্টতম কর্মসম্পাদক ও অভিভাবক এবং নিকৃষ্টতম বন্ধু ও সাথী। [ইবন কাসীর] অথবা আয়াতের অর্থ, আল্লাহ্ ব্যতীত যাকে সাহায্যকারী ও বন্ধু বানিয়েছে অর্থাৎ মূর্তিদেরকে যারা সাহায্যকারী বানিয়েছে সে গুলো কতই না নিকৃষ্ট! [ইবন কাসীর] অথবা আয়াতের অর্থ, সে লোকটি কতই না খারাপ ও নিকৃষ্ট যে দোদুল্যমান অবস্থায় আল্লাহ্‌র ইবাদাত করেছে। [তাবারী; ইবন কাসীর] অথবা সে কাফের আল্লাহ্ ব্যতীত যাদেরকে বন্ধু ও সাহায্যকারী বানিয়েছিল কিয়ামতের দিন তাদেরকে বলবে, তোমরা কত নিকৃষ্ট বন্ধু। [ফাতহুল কাদীর]

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿١٤﴾

১৪. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে আল্লাহ্ তাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত(১); নিশ্চয় আল্লাহ্ যা ইচ্ছে তা-ই করেন(২) ।

مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ﴿١٥﴾

১৫. যে কেউ মনে করে, আল্লাহ্ তাকে কখনই দুনিয়া ও আখেরাতে সাহায্য করবেন না, সে আকাশের দিকে একটি রশি বিলম্বিত করার পর কেটে দিক, তারপর দেখুক তার এ কৌশল তার আক্রোশের হেতু দূর করে কি না(৩) ।

---

(১) অর্থাৎ যাদের অবস্থা উল্লেখিত মতলবী, ধান্দাবাজ, দো-মনা ও দৃঢ় বিশ্বাসহীন মুসলমানের মতো নয় বরং যারা ঠাণ্ডা মাথায় খুব ভালোভাবে ভেবে চিন্তে আল্লাহ, রাসূল ও আখেরাতকে মেনে নেবার ফায়সালা করে তারপর ভালো মন্দ যে কোন অবস্থার সম্মুখীন হতে হোক এবং বিপদের পাহাড় মাথায় ভেঙে পড়ুক বা বৃষ্টিধারার মতো পুরস্কার ঝরে পড়ুক সর্বাবস্থায় দৃঢ়পদে সত্যের পথে এগিয়ে চলে । তারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে, খারাপ কাজ থেকে দূরে থেকেছে । সুতরাং আল্লাহ্ তাদেরকে জান্নাতের সেই উঁচু বাগ-বাগিচার ওয়ারিশ বানিয়েছেন । [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ আল্লাহর ক্ষমতা অসীম । দুনিয়ায় বা আখেরাতে অথবা উভয় স্থানে তিনি যাকে যা চান দিয়ে দেন এবং যার থেকে যা চান ছিনিয়ে নেন । তিনি দিতে চাইলে বাধা দেবার কেউ নেই । না দিতে চাইলে আদায় করারও কেউ নেই । যেহেতু তিনি কাউকে হিদায়াত করেছেন আর কাউকে পথভ্রষ্ট করেছেন তাই আয়াতের শেষে বলেছেন, "তিনি যা ইচ্ছে তা করেন ।" [ইবন কাসীর]

(৩) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বহু মত হয়েছে । বিভিন্ন তাফসীরকার এর ব্যাখ্যায় যা বলেছেন তার সংক্ষিপ্ত সার হচ্ছেঃ
একঃ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, এর অর্থ, যে মনে করে আল্লাহ তাকে (অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে) সাহায্য করবেন না সে ছাদের গায়ে দড়ি ঝুলিয়ে আত্মহত্যা করুক । [ইবন কাসীর]
দুইঃ আব্দুর রহমান ইবন যায়দ ইবন আসলাম বলেন, এর অর্থ, যে মনে করে আল্লাহ তাকে (অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে) সাহায্য করবেন না সে কোন দড়ির সাহায্যে আকাশে যাবার ও সাহায্য বন্ধ করার চেষ্টা করে দেখুক । [ইবন কাসীর]

১৬. আর এভাবেই আমরা সুস্পষ্ট নিদর্শনরূপে তা নাযিল করেছি; আর নিশ্চয় আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছে হেদায়াত করেন।

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يُّرِيْدُ ﴿١٦﴾

১৭. নিশ্চয় যারা[১] ঈমান এনেছে এবং যারা ইয়াহূদী হয়েছে, যারা সাবিয়ী[২],

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصّٰبِـِٕيْنَ

তিনঃ যে মনে করে আল্লাহ তাকে (অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে) সাহায্য করবেন না সে আকাশে গিয়ে অহীর সূত্র কেটে দেবার ব্যবস্থা করুক। [আদওয়াউল বায়ান]

চারঃ যে মনে করে আল্লাহ তাকে (অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে) সাহায্য করবেন না সে আকাশে গিয়ে তার রিযিক বন্ধ করার চেষ্টা করে দেখুক। [তাবারী, মুজাহিদ থেকে]

পাঁচঃ যে মনে করে আল্লাহ তাকে (অর্থাৎ যে নিজেই এ ধরনের চিন্তা করে তাকে) সাহায্য করবেন না সে নিজের গৃহের সাথে দড়ি ঝুলিয়ে আত্মহত্যা করুক। কারণ, যে জীবনে আল্লাহ্‌র সাহায্য নেই সে জীবনে কল্যাণ নেই। [তাবারী; কুরতুবী]

(১) এ আয়াতটি পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের ধারাবাহিকতায় নাযিল হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বলা হয়েছিল, যারা আকীদা-বিশ্বাসে দোদুল্যমান থাকবে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তখন প্রশ্ন হতে পারে যে, তাহলে অন্য ধর্মাবলম্বীদের কি অবস্থা? তাই এ আয়াতে বিশ্বের যাবতীয় মূল ধর্মাবলম্বীদের আলোচনা করে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌র বিধান জানিয়ে দেয়া হচ্ছে। [আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

(২) প্রাচীন যুগে সাবেয়ী নামে দু'টি সম্প্রদায় সর্বজন পরিচিত ছিল। এদের একটি ছিল ইয়াহ্ইয়া আলাইহিস সালামের অনুসারী। তারা ইরাকের উচ্চভূমিতে বিপুল সংখ্যায় বসবাস করতো। ইয়াহ্ইয়া আলাইহিস সালামের অনুগামী হিসেবে তারা মাথায় পানি ছিটিয়ে ধর্মান্তরিত হবার পদ্ধতি মেনে চলতো। তারকা পূজারী দ্বিতীয় দলের লোকেরা নিজেদের শীশ ও ইদরিস আলাইহিস সালামের অনুসারী বলে দাবী করতো। তারা মৌলিক পদার্থের উপর গ্রহের এবং গ্রহের উপর ফেরেশতাদের শাসনের প্রবক্তা ছিল। হার্‌রান ছিল তাদের কেন্দ্র। ইরাকের বিভিন্ন এলাকায় তাদের শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে ছিল। এ দ্বিতীয় দলটি নিজেদের দর্শন, বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শিতার কারণে বেশী খ্যাতি অর্জন করে। কিন্তু এখানে প্রথম দলটির কথা বলা হয়েছে এ সম্ভাবনাই প্রবল। বর্তমানে ইরাকে এ সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব রয়েছে। তবে তাদের অনেকেই বর্তমানে প্রচণ্ডতম বিভ্রান্তি-মূলক আকীদায় বিশ্বাসী। [বিস্তারিত দেখুন, আশ-শির্ক ফিল কাদীম ওয়াল হাদীস]

وَالنَّصٰرٰى وَالْمَجُوْسَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا ۖ اِنَّ اللّٰهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ﴿١٧﴾

নাসারা ও অগ্নিপূজক[১] এবং যারা শির্ক করেছে[২] কেয়ামতের দিন[৩] আল্লাহ্ তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন[৪]। নিশ্চয় আল্লাহ্ সব কিছুর

(১) অর্থাৎ ইরানের অগ্নি উপাসকগণ, যারা আলোক ও অন্ধকারের দু'জন ইলাহর প্রবক্তা ছিল এবং নিজেদেরকে যরদশ্‌তের অনুসারী দাবী করতো। মায্দাকের ভ্রষ্টতা তাদের ধর্ম ও নৈতিক চরিত্রকে সাংঘাতিকভাবে বিকৃত করে দিয়েছিল।[আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

(২) অর্থাৎ আরব ও অন্যান্য দেশের মুশরিকবৃন্দ, যারা উপরের বিভিন্ন দলীয় নামের মতো কোন নামে আখ্যায়িত ছিল না। কুরআন মজীদ তাদেরকে অন্যান্য দল থেকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করার জন্য "মুশরিক" ও "যারা শির্ক করেছে" ধরনের পারিভাষিক নামে স্মরণ করেছে। অবশ্য মুমিনদের দল ছাড়া বাকি সবার আকীদা ও কর্মধারায় শির্ক অনুপ্রবেশ করেছিল। কিন্তু শির্কের প্রধান দর্শনীয় বিষয় হচ্ছে, মূর্তিপুজা। উপরোক্ত ইয়াহূদী, নাসারা, সাবেয়ী, মাজূস এরা কেউ মূর্তিপূজা করে না। মূর্তিপূজার শির্ক ব্যতীত সকল শির্কই তাদের মধ্যে আছে। তাই মূর্তিপুজার শির্কের উল্লেখ আলাদাভাবে করা হয়েছে।[আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

(৩) অর্থাৎ মানুষদের বিভিন্ন দলের মধ্যে আল্লাহ সম্পর্কে যে মত বিরোধ ও বিবাদ রয়েছে এ দুনিয়ায় তার কোন ফায়সালা হবে না। তার ফায়সালা হবে কেয়ামতের দিন। [আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর] সেখানে তাদের মধ্যে কারা সত্যপন্থী এবং কারা মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে তার চূড়ান্ত মীমাংসা করে দেয়া হবে। তারপর যারা তাঁর উপর ঈমান এনেছে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, আর যারা কুফরী করেছে তাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। কেননা আল্লাহ্ তাদের কাজ দেখছেন, তাদের কথাবার্তা সংরক্ষণ করছেন। তাদের গোপন ভেদ জানেন, তাদের মনের গোপন তথ্য সম্পর্কেও তিনি অবগত। [ইবন কাসীর]

(৪) তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের জন্য এ আয়াত একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সংযোজন করেছে। এ আয়াতে মোট ছয়টি ধর্মনীতির উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা যদি পৃথিবীর ধর্মসমূহের মূলের দিকে দৃষ্টিপাত করি তবে তাদেরকে এ ছয়টি মৌলিক ধর্মমতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ দেখতে পাব। আর সে জন্যই আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন: "দ্বীন হলো ছয়টি তন্মধ্যে একটি আল্লাহ্‌র সেটা হলো ইসলাম। আর বাকী পাঁচটি শয়তানের"। [তাফসীর তাবারী:১৭/২৭, রাগায়েবুল ফুরকান ১৭/৭৪, ইবনুল কাইয়্যেম: হিদায়াতুল হায়ারা, পৃ.১২, মাদারেজুসসালেকীন ৩/৪৭৬] বর্তমানে ইসলাম ব্যতীত প্রতিষ্ঠিত ধর্মমত হলো: ১। ইয়াহূদী, ২। সাবেয়ী, ৩। নাসারা, ৪। অগ্নি উপাসক। এ চারটি সবচেয়ে বড় সম্প্রদায়। এদের অনেকেই নিজেদেরকে আসমানী কিতাবের অনুসারী বলে দাবী করে এবং কোন কোন নবীর অনুসারী হওয়ার

সম্যক প্রত্যক্ষকারী ।

১৮. আপনি কি দেখেন না যে, আল্লাহ্‌কে সিজ্‌দা করে যারা আছে আসমানসমূহে ও যারা আছে যমীনে, আর সূর্য, চাঁদ, নক্ষত্রমণ্ডলী, পর্বতরাজি, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু[১] এবং সিজ্‌দা করে মানুষের

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ ۖ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ۗ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن

দাবী করে । এ চারটি সম্প্রদায়ের বাইরে যারা আছে তারা এত পথ ও মতে বিভক্ত যে, তাদেরকে মৌলিকভাবে কোন একটি পরিচয়ে নিবন্ধন করতে হলে এটাই বলতে হবে যে, এরা মুশরিক । তাই আল্লাহ্ তা'আলা পাঁচটি প্রধান ধর্মমতের কথা উল্লেখ করে বাকীদের একক পরিচয় এভাবে দিলেন যে, “আর যারা শির্ক করেছে” । এতে করে পৃথিবীর যাবতীয় মুশরিক যথা হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি সবই একই কাতারে মুশরিক হিসেবে শামিল হয়ে যাবে ।[এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, আল-হিন্দুসিয়্যাহ ওয়া তাআসসুরু বা'দিল ফিরাকিল ইসলামিয়্যাতি বিহা]

(১) সমগ্র সৃষ্টজগত স্রষ্টার আজ্ঞাধীন ও ইচ্ছাধীন । কারো কারো মতে এখানে সিজ্‌দা করার দ্বারা আনুগত্য করা বোঝানো হয়েছে । [ফাতহুল কাদীর] সৃষ্টজগতের এই আজ্ঞানুবর্তিতা দুই প্রকার- (এক) সৃষ্টিগত ব্যবস্থাপনার অধীনে বাধ্যতামূলক আনুগত্য । মুমিন, কাফের, জীবিত, মৃত, জড়পদার্থ ইত্যাদি কেউ এই আনুগত্যের আওতা বহির্ভূত নয় ।এই দৃষ্টিকোণ থেকে সবাই সমভাবে আল্লাহ্ তা'আলার আজ্ঞাধীন ও ইচ্ছাধীন । বিশ্ব-চরাচরের কোন কণা অথবা পাহাড় আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতিরেকে এতটুকুও নড়াচড়া করতে পারে না । (দুই) সৃষ্টজগতের ইচ্ছাধীন আনুগত্য । অর্থাৎ স্ব-ইচ্ছায় আল্লাহ্ তা'আলার বিধানাবলী মেনে চলা । আয়াতে এ প্রকার আনুগত্যই বোঝানো হয়েছে । আসমান যমীনে যত কিছু আছে যেমন ফেরেশতা, যাবতীয় জীব-জন্তু সবাই আল্লাহকে সিজদা করে বা তাঁর আনুগত্য করে । অনুরূপভাবে সূর্য, চন্দ্র ও তারকাসমূহও আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও সিজদা করে । সূর্য, চন্দ্র ও তারকাসমূহকে আলাদাভাবে বর্ণনা করার কারণ হচ্ছে, আল্লাহ্ ব্যতীত এ গুলোর ইবাদাত করা হয়েছিল, তাই জানিয়ে দেয়া হলো যে, তোমরা এদের পূজা কর, অথচ এরা আল্লাহ্‌র জন্য সিজদা করে । অন্য আয়াতে সেটা স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, “তোমরা সূর্যকে সিজ্‌দা করো না, চাঁদকেও নয় ; আর সিজ্‌দা কর আল্লাহ্‌কে, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন , যদি তোমরা কেবলমাত্র তাঁরই ‘ইবাদাত কর ।” [সূরা ফুসসিলাত: ৩৭] [ইবন কাসীর] যদি প্রশ্ন করা হয় যে, ইচ্ছাধীন আনুগত্য তো শুধু বিবেকবান মানুষ, জিন ইত্যাদির মধ্যে হতে পারে । জীবজন্তু, উদ্ভিদ ও জড়পদার্থের মধ্যে তো বিবেক ও চেতনাই নেই । এমতাবস্থায় এগুলোর মধ্যে ইচ্ছাধীন আনুগত্য কিভাবে হবে? এর উত্তর এই যে, কুরআনুল কারীমের বহু আয়াত ও বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, বিবেক, চেতনা ও ইচ্ছা থেকে কোন সৃষ্টবস্তুই মুক্ত নয় । সবার মধ্যেই কম-বেশী

মধ্যে অনেকে[১]? আবার অনেকের | مُّكْرِمٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۩

এগুলো বিদ্যমান আছে। জন্তু-জানোয়ারের বিবেক ও চেতনা সাধারণতঃ অনুভব করা হয়। উদ্ভিদের বিবেক ও চেতনাও সামান্য চিন্তা ও গবেষণা দ্বারা চেনা যায়, কিন্তু জড় পদার্থের বিবেক ও চেতনা এতই অল্প ও লুক্কায়িত যে, সাধারণ মানুষ তা বুঝতেই পারে না। কিন্তু তাদের স্রষ্টা ও মালিক বলেছেন যে, তারাও বিবেক ও চেতনার অধিকারী। যেমন আল্লাহ্ বলেন, "এমন কিছু নেই যা তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না" [সূরা আল-ইসরা: ৪৪] তাছাড়া সূর্য আরশের নিচে সিজদা করার কথা হাদীসে এসেছে। আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি জান, সূর্য কোথায় যায়? আমি বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল বেশী জানেন। তিনি বললেন, এটা যায় তারপর আরশের নিচে সিজদা করে। অতঃপর অনুমতি গ্রহণ করে। অচিরেই এমন এক সময় আসবে যখন তাকে বলা হবে, যেখান থেকে এসেছ সেখানেই ফিরে যাও।' [বুখারী: ৩১৯৯] আবুল আলীয়া বলেন, আকাশের যত তারকা আছে, সূর্য ও চাঁদ সবই যখন ডুবে তখন আল্লাহ্র জন্য সিজদা করে, যতক্ষণ সেগুলোকে অনুমতি না দেয়া হয়, ততক্ষণ সেগুলো ফিরে আসে না। তারপর তাদের উদিত হওয়ার স্থানে উদিত হয়। আর পাহাড় ও গাছের সিজদা হচ্ছে ডানে ও বামে তাদের ছায়া পড়া। [ইবন কাসীর] কাজেই আলোচ্য আয়াতে সে আনুগত্যকে সিজ্দা শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে, তা ইচ্ছাধীন আনুগত্য। আয়াতের অর্থ এই যে, মানব জাতি ছাড়াও (জিনসহ) সব সৃষ্টবস্তু স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে সিজ্দা করে অর্থাৎ আজ্ঞা পালন করে।

তবে মানব ও জিন জাতিকে আল্লাহ্ তা'আলা বিবেক ও চেতনার একটি পূর্ণস্তর দান করেছেন। এ কারণেই তাদেরকে আদেশ ও নিষেধের অধীন করা হয়েছে। মানব জাতিই সর্বাধিক বিবেক ও চেতনা লাভ করেছে। এ জন্য তারা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে- (এক) মুমিন, অনুগত ও সিজ্দাকারী এবং (দুই) কাফের, অবাধ্য ও সিজ্দার প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শনকারী। সিজ্দার তাওফীক না দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা শেষোক্ত দলকে হেয় করেছেন। [সা'দী] হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যখন আদম সন্তান সিজদার আয়াত পড়ে (এবং সিজদা করে), শয়তান তখন দূরে গিয়ে কাঁদতে থাকে। সে বলতে থাকে, আদম সন্তানকে সিজদা করতে বলা হয়েছে সে সিজদা করেছে, তার জন্য নির্ধারিত হলো জান্নাত। আর আমাকে সিজদা করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল আর আমি তা করতে অস্বীকার করেছি, ফলে আমার জন্য নির্ধারিত হলো জাহান্নাম।' [মুসলিম: ৮১] এ আয়াতটি সিজদার আয়াত। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, 'সূরা আল-হজ্জে দু'টি সাজদাহ রয়েছে।' [মুস্তাদরাকে হাকিম: ৩৪৭২]

(১) অর্থাৎ এমন বহু মানুষ রয়েছে যারা নিছক বাধ্য হয়েই নয় বরং ইচ্ছাকৃতভাবে, সানন্দে ও আনুগত্যশীলতা সহকারেও তাঁকে সিজদা করে। [ইবন কাসীর] পরবর্তী বাক্যে

প্রতি অবধারিত হয়েছে শাস্তি[১]। আল্লাহ্ যাকে হেয় করেন[২] তার সম্মানদাতা কেউই নেই; নিশ্চয় আল্লাহ্ যা ইচ্ছে তা করেন।

১৯. এরা দু'টি বিবাদমান পক্ষ[৩], তারা

هٰذٰنِ خَصۡمٰنِ اخۡتَصَمُوۡا فِيۡ رَبِّهِمۡ ۡ فَالَّذِيۡنَ

তাদের মোকাবিলায় মানব সম্প্রদায়ের অন্য যে দলের কথা বলা হচ্ছে তারা স্বেচ্ছায় আল্লাহর সামনে মাথা নত হতে অস্বীকার করে এবং অহংকার করে। [ইবন কাসীর] কিন্তু অন্যান্য স্বাধীন ক্ষমতাহীন সৃষ্টির মতো তারাও প্রাকৃতিক আইনের বাঁধন মুক্ত নয়। কিন্তু তারাও ইচ্ছে করলেই যা ইচ্ছে তা করে বেড়াতে পারে না। তাদেরকেও জন্ম, মৃত্যু, জ্বরা, রোগ-শোক ইত্যাদিতে আল্লাহ্র নিয়মনীতির বাইরে চলার সুযোগ দেয়া হয়নি। সে হিসেবে আনুগত্যের ব্যাপকতা ও বাধ্যতামূলক সিজদার মধ্যে তারাও শামিল রয়েছে। নিজেদের ক্ষমতার পরিসরে বিদ্রোহের নীতি অবলম্বনের কারণে তারা আযাবের অধিকারী হয়।

(১) তাদের অনেকের উপর আযাব অবধারিত হওয়ার কারণ হচ্ছে, তারা আনুগত্য করেনি। তারা সিজদা করেনি। [কুরতুবী]

(২) অর্থাৎ তাকে আল্লাহ্ কাফের ও দূর্ভাগা বানিয়ে অপমানিত করেছেন। সুতরাং তাকে সম্মান দেয়ার আর কেউ নেই যে সে তার দ্বারা সৌভাগ্যশালী ও সম্মানিত হতে পারে। আল্লাহ্ যা ইচ্ছে তা করতে পারেন। দূর্ভাগা হওয়া, সৌভাগ্যশালী হওয়া, সম্মানিত বা অপমানিত হওয়া এ সবই আল্লাহ্র ইচ্ছাধীন। [ফাতহুল কাদীর] যে ব্যক্তি চোখ মেলে প্রকাশ্য ও উজ্জ্বল সত্য দেখে না এবং যে তাকে বুঝায় তার কথাও শোনে না সে নিজেই নিজের জন্য লাঞ্ছনা ও অবমাননার ডাক দেয়। সে নিজে যা প্রার্থনা করে, আল্লাহ তার ভাগ্যে তাই লিখে দেন। তারপর আল্লাহই যখন তাকে সত্য অনুসরণ করার মর্যাদা দান করেননি তখন তাকে এ মর্যাদায় অভিষিক্ত করার ক্ষমতা আর কার আছে?

(৩) আয়াতে উল্লেখিত দুই পক্ষ হচ্ছে, সাধারণ মুমিনগণ এবং তাদের বিপরীতে সব কাফের দল; ইসলামের যুগের হোক কিংবা পূর্ববর্তী যুগসমূহের। ইয়াহূদী, নাসারা, সাবেয়ী, মাজূস ও শির্ককারী সবাই এ কাতারভুক্ত। [ফাতহুল কাদীর] বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, এই আয়াত সেই দুই পক্ষ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যারা বদরের রণক্ষেত্রে একে অপরের বিপক্ষে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল। মুসলিমদের মধ্য থেকে আলী, হামযা, ওবায়দা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম ও কাফেরদের পক্ষ থেকে ওতবা ইবনে রবী'আ, তার পুত্র ওলীদ ও তার ভাই শায়বা এতে শরীক ছিল। তন্মধ্যে কাফের পক্ষের তিন জনই নিহত এবং মুসলিমদের মধ্য থেকে আলী ও হামযা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা অক্ষত অবস্থায় ফিরে এসেছিলেন। ওবায়দা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু গুরুতর আহত অবস্থায় ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর

كَفَرُوْا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ ﴿١٩﴾

তাদের রব সম্বন্ধে বিতর্ক করে; অতএব যারা কুফরী করে তাদের জন্য কেটে তৈরী করা হয়েছে আগুনের পোষাক[১], তাদের মাথার উপর ঢেলে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি।

يُصْهَرُ بِهٖ مَا فِيْ بُطُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدُ ﴿٢٠﴾

২০. যা দ্বারা তাদের পেটে যা আছে তা এবং তাদের চামড়া বিগলিত করা হবে।

কাছে শাহাদাত বরণ করেন। আয়াত যে এই সম্মুখযোদ্ধাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, তা বুখারী ও মুসলিমের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। [দেখুন- বুখারীঃ ২৭৪৩, মুসলিমঃ ৩০৩৩] কিন্তু বাহ্যতঃ এই হুকুম তাদের সাথেই বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত নয়; বরং সমগ্র উম্মতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য- যে কোন যামানার উম্মতই হোক না কেন। আয়াতে আল্লাহ সম্পর্কে বিরোধকারী সমস্ত দলগুলোকে তাদের সংখ্যাধিক্য সত্বেও দু'টি পক্ষে বিভক্ত করা হয়েছে। একটি পক্ষ নবীদের কথা মেনে নিয়ে আল্লাহর সঠিক বন্দেগীর পথ অবলম্বন করে। দ্বিতীয় পক্ষ নবীদের কথা মানে না এবং তারা কুফরীর পথ অবলম্বন করে। তাদের মধ্যে বহু মতবিরোধ রয়েছে এবং তাদের কুফরী বিভিন্ন বিচিত্র রূপও পরিগ্রহ করেছে। কাতাদা বলেন, মুসলিম ও আহলে কিতাব দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে তর্কে লিপ্ত হলো। আহলে কিতাবরা বলল, আমাদের নবী তোমাদের নবীর আগে আর আমাদের কিতাব তোমাদের কিতাবের আগে, সুতরাং আমরা তোমাদের থেকে উত্তম। অপরদিকে মুসলিমরা বলল, আমাদের কিতাব সমস্ত কিতাবের মধ্যে ফয়সালা করে (সেগুলোর সত্যাসত্য নিরূপন করে)। আর আমাদের নবী সর্বশেষ নবী, সুতরাং আমরা তোমাদের থেকে উত্তম। তখন আল্লাহ্ ইসলামের অনুসারীদেরকে তাদের শত্রুদের উপর প্রাধান্য দিয়ে আয়াত নাযিল করেন। [ইবন কাসীর] কোন কোন মুফাসসির বলেন, এখানে দুই প্রতিপক্ষ বলে জান্নাত ও জাহান্নাম বোঝানো হয়েছে। জাহান্নাম বলেছিল, আমাকে আপনার শাস্তির জন্য নির্ধারিত করে দিন। আর জান্নাত বলেছিল, আমাকে আপনার দয়ার জন্য নির্ধারিত করে দিন। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] তবে আয়াতে দু'টি দল বলে মুমিন ও কাফের ধরে নিলে সব মতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান হয়ে যায়। [তাবারী; ইবন কাসীর]

(১) ভবিষ্যতে যে বিষয়টির ঘটে যাওয়া একেবারে সুনিশ্চিত তার প্রতি জোর দেবার জন্য সেটি এমনভাবে বর্ণনা করা হয় যেন তা ঘটে গেছে। আগুনের পোশাক বলতে সম্ভবত এমন জিনিস বুঝানো হয়েছে যাকে সূরা ইবরাহীমের ৫০ আয়াতে বলা হয়েছে যে, "তাদের জামা হবে আলকাতরার"। অর্থাৎ তাদের জন্য আগুনের টুকরা দিয়ে কাপড়ের মত করে তৈরী করে দেয়া হবে। [ইবন কাসীর] সা'য়ীদ ইবন জুবাইর বলেন, এখানে জামাগুলো হবে, তামার। যা গরম হলে সবচেয়ে বেশী তাপ সৃষ্টি হয়। [ইবন কাসীর]

وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ ۝٢١

২১. এবং তাদের জন্য থাকবে লোহার গদা তথা হাতুড়ি ।

كُلَّمَآ اَرَادُوْٓا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِيْدُوْا فِيْهَا ۗ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ۝٢٢

২২. যখনই তারা যন্ত্রণায় কাতর হয়ে জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে তখনই তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হবে তাতে; এবং বলা হবে, 'আস্বাদন কর দহন-যন্ত্রণা ।'

তৃতীয় রুকূ'

اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا ۗ وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ ۝٢٣

২৩. নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে আল্লাহ্ তাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তাদেরকে অলংকৃত করা হবে সোনার কাঁকন ও মুক্তা দ্বারা(১) এবং সেখানে তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ হবে রেশমের(২) ।

---

(১) মাথার মুকুট এবং হাতে কংকন পরিধান করা পূর্বকালের রাজা-বাদশাদের একটি স্বাতন্ত্র্যমূলক বৈশিষ্ট্য হিসেবে প্রচলিত ছিল । সাধারণ পুরুষদের মধ্যে যেমন মাথায় পরিধান করার প্রচলন নেই, এটা রাজকীয় ভূষণ, তেমনি হাতে কংকন পরিধান করাকেও রাজকীয় ভূষণ মনে করা হয় । তাই জান্নাতীদেরকে কংকন পরিধান করানো হবে । কংকন সম্পর্কে এই আয়াতে এবং সূরা ফাতির-এ বলা হয়েছে যে, তা স্বর্ণ নির্মিত হবে, কিন্তু সূরা নিসা-য় রৌপ্য নির্মিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে । এই পরিপ্রেক্ষিতে তাফসীরকারগণ বলেনঃ জান্নাতীদের হাতে তিন রকমের কংকন পরানো হবে- স্বর্ণ নির্মিত, রৌপ্য নির্মিত এবং মোতি নির্মিত । এই আয়াতে মোতির কথাও উল্লেখ করা হয়েছে । [কুরতুবী] জান্নাতীদের কংকন সম্পর্কে হাদীসে এসেছে, "মুমিনের কংকন ততটুকুতে থাকবে, যতটুকুতে তার অযু থাকবে ।" [মুসলিম: ২৫০]

(২) আলোচ্য আয়াতে আছে যে, জান্নাতীদের পোষাক রেশমের হবে । উদ্দেশ্য এই যে, তাদের সমস্ত পরিচ্ছদ, বিছানা, পর্দা ইত্যাদি রেশমের হবে । রেশমী বস্ত্র দুনিয়াতে সর্বোত্তম গণ্য হয় ।[কুরতুবী] বলাবহুল্য, জান্নাতের রেশমের উৎকৃষ্টতার সাথে দুনিয়ার রেশমের মান কোন অবস্থাতেই তুল্য নয় । রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তি দুনিয়াতে রেশমী বস্ত্র পরিধান করবে, সে আখেরাতে তা পরিধান করবে না ।' [বুখারী: ৫৮৩৩] আবদুল্লাহ ইবন যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, যে আখেরাতে রেশমী বস্ত্র পরিধান করবে না সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না ।

وَهُدُوٓا۟ إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوٓا۟ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلْحَمِيدِ ﴿٢٤﴾

২৪. আর তাদেরকে পবিত্র বাক্যের অনুগামী করা হয়েছিল[1] এবং তারা পরিচালিত হয়েছিল পরম প্রশংসিত আল্লাহ্‌র পথে ।

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ

২৫. নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে ও মানুষকে বাধা দিয়েছে আল্লাহ্‌র পথ[2] থেকে

কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "আর তাদের পোষাক হবে রেশমী কাপড়" । [ইবন কাসীর]

(১) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ এখানে কালেমা তাইয়্যেবা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বোঝানো হয়েছে ।[ফাতহুল কাদীর] কোন কোন বর্ণনায় কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আলহামদুলিল্লাহ । [কুরতুবী] কারও কারও নিকট,আল-কুরআনের প্রতি তাদেরকে পথ দেখানো হবে । এজন্যই বলা হয় যে, এখানে দুনিয়ায় পথ দেখানো উদ্দেশ্য ।সুতরাং দুনিয়াতে তাদেরকে কালেমায়ে শাহাদাত এবং কুরআন পড়ার প্রতি পথনির্দেশ করা হয়েছিল ।[কুরতুবী] কোন কোন মুফাসসির বলেন, এখানে উত্তম বাণী বলে আখেরাতের কথা বলা হয়েছে ।অর্থাৎ আখেরাতে তাদেরকে "আলহামদুলিল্লাহ" বলার প্রতি হেদায়াত করা হবে । কেননা তারা জান্নাতে বলবে, "যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌রই যিনি আমাদেরকে এ পথের হিদায়াত করেছেন ।" [সূরা আল-আ'রাফ: ৪৩] "আর তারা বলবে, 'প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদের দুঃখ-দুর্দশা দূরীভূত করেছেন" ।[সূরা ফাতির: ৩৪] সুতরাং জান্নাতে কোন খারাপ কথা ও মিথ্যা বা অসার শোনা যাবে না । তারা যাই বলবে তা-ই ভাল কথা । আর তারা জান্নাতে আল্লাহ্‌র পথেই চলবে, কারণ সেখানে আল্লাহ্‌র নির্দেশের বিরোধী কোন কিছু থাকবে না । কারও কারও মতে, আয়াতে উত্তম কথা বলে সে সমস্ত কথা বোঝানো হয়েছে যা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদের কাছে উত্তম সুসংবাদ আকারে প্রদান করা হয়ে থাকে । [কুরতুবী]

আর প্রশংসিতের পথে বলে এমন স্থানের কথা বলা হয়েছে যেখানে তারা তাদের রবের প্রশংসা করবে ।কারণ তিনি তাদের প্রতি দয়া করেছেন, নেয়ামত দিয়েছেন । অর্থাৎ জান্নাত । যেমন হাদীসে এসেছে, "তাদের প্রতি তাসবীহ ও তাহমীদ পাঠ করার ইলহাম হবে যেমন দুনিয়াতে কেউ শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে থাকে ।" [মুসনাদে আহমাদ ৩/৩৮৪] অপর কারও মতে, এখানে দুনিয়াতে সিরাতুল মুস্তাকীম প্রাপ্তির কথা বোঝানো হয়েছে । [ইবন কাসীর]

(২) আল্লাহ্‌র পথ বলে ইসলামকে বোঝানো হয়েছে । আয়াতের অর্থ এই যে, তারা নিজেরা তো ইসলাম থেকে দূরে সরে আছেই; অন্যদেরকেও ইসলাম থেকে বাধা দেয় । [ফাতহুল কাদীর]

ও মসজিদুল হারাম থেকে[১], যা আমরা করেছি স্থানীয় ও বহিরাগত সব মানুষের জন্য সমান[২], আর যে

وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنٰهُ لِلنَّاسِ سَوَآءَ ۨالْعَاكِفُ فِيْهِ وَالْبَادِ ؕ وَمَنْ يُّرِدْ فِيْهِ

(১) এটা তাদের দ্বিতীয় গোনাহ্। তারা মুসলিমদেরকে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করতে বাধা দেয়। 'মসজিদুল হারাম' ঐ মসজিদকে বলা হয়, যা বায়তুল্লাহ্র চতুষ্পার্শ্বে নির্মিত হয়েছে। এটা মক্কার হারাম শরীফের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কিন্তু কোন কোন সময় 'মসজিদুল হারাম' বলে মক্কার সম্পূর্ণ হারাম শরীফ বোঝানো হয়; যেমন- হুদায়বিয়ার ঘটনাতে মক্কার কাফেররা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে শুধু মসজিদে হারামে প্রবেশে বাধা দেয়নি; বরং হারামের সীমানায় প্রবেশ করতে বাধা দান করেছিল। সহীহ্ হাদীস দ্বারা তা-ই প্রমাণিত রয়েছে। কুরআনুল কারীম এ ঘটনায় মসজিদুল হারাম শব্দটি সাধারণ হারাম অর্থে ব্যবহার করেছে এবং বলেছেঃ ﴿وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [সূরা আল-ফাত্হঃ ২৫] তাফসীরে দুররে-মনসূরে এ স্থানে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে রেওয়ায়েত বর্ণনা করা হয়েছে যে, আয়াতে মসজিদে হারাম বলে হারাম এলাকা বোঝানো হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর]

(২) এখানে যারা কুফরি করেছে, আল্লাহ্র পথ থেকে বাধা দিচ্ছে এবং মাসজিদুল হারাম থেকে বাধা দেয় তাদের কি অবস্থা হবে সেটা উল্লেখ করা হয় নি। তবে আয়াত থেকে সেটা বুঝা যায়, আর তা হচ্ছে, তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে বা ধ্বংস হবে। [ফাতহুল কাদীর]

আয়াতে বর্ণিত 'সব মানুষের জন্য সমান' বলে বুঝানো হয়েছে যে, হারাম কোন ব্যক্তি, পরিবার বা গোত্রের নিজস্ব সম্পত্তি নয়। বরং সর্বসাধারণের জন্য ওয়াকফকৃত, যার যিয়ারত থেকে বাধা দেবার অধিকার কারো নেই। মাসজিদুল হারাম ও হারাম শরীফের যে যে অংশে হজের ক্রিয়াকর্ম পালন করা হয়; যেমন- ছাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থান, মীনার সমগ্র ময়দান, আরাফাতের সম্পূর্ণ ময়দান এবং মুযদালিফার গোটা ময়দান, এসব ভূখণ্ড সারা বিশ্বের মুসলিমদের জন্য সাধারণ ওয়াক্ফ। কোন ব্যক্তি বিশেষের ব্যক্তিগত মালিকানা এগুলোর উপর কখনো হয়নি এবং হতেও পারে না। এ বিষয়ে সমগ্র উম্মত ও ফেকাহ্বিদগণ একমত। এগুলো ছাড়া মক্কা মুকার্‌রমার সাধারণ বাসগৃহ এবং হারামের অবশিষ্ট ভূখণ্ড সম্পর্কেও কোন কোন ফেকাহ্বিদ বলেন যে, এগুলোও সাধারণ ওয়াক্ফ সম্পত্তি। এগুলো বিক্রয় করা ও ভাড়া দেয়া হারাম। প্রত্যেক মুসলিম যে কোন স্থানে অবস্থান করতে পারে। তবে অধিকসংখ্যক ফেকাহ্বিদগণের উক্তি এই যে, মক্কার বাসগৃহসমূহের উপর ব্যক্তিবিশেষের মালিকানা হতে পারে। কারণ, ওমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে প্রমাণিত আছে যে, তিনি সফওয়ান ইবনে উমাইয়ার বাসগৃহ ক্রয় করে কয়েদীদের জন্য জেলখানা নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে হারামের যে যে অংশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো সর্বাবস্থায় সাধারণ ওয়াক্ফ। এগুলোতে প্রবেশে বাধা দেয়া

بِإِلْحَادٍۭ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٥﴾

সেখানে অন্যায়ভাবে ‘ইলহাদ[১]’ তথা দ্বীনবিরোধী পাপ কাজের ইচ্ছে করে, তাকে আমরা আস্বাদন করাব যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ।

চতুর্থ রুকূ’

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَٰهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِى شَيْـًٔا وَطَهِّرْ بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْقَآئِمِينَ

২৬. আর স্মরণ করুন, যখন আমরা ইব্‌রাহীমের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম[২] ঘরের

হারাম । আলোচ্য আয়াত থেকে এই অবৈধতা প্রমাণিত হয় । [দেখুন, কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

(১) অভিধানে إلحاد-এর অর্থ সরল পথ থেকে সরে যাওয়া, ঝুঁকে পড়া । অর্থাৎ কোন বড় মারাত্মক গোনাহ করার ইচ্ছা পোষণ করাই ইলহাদ । [ইবন কাসীর] তবে এখানে আল্লাহ্ তা‘আলা যুলুমের সাথে ইলহাদের কথা বলেছেন । ইবন আব্বাস এর অর্থ করেছেন, ইচ্ছাকৃতভাবে এ অপরাধ করা । ইবন আব্বাস থেকে অপর বর্ণনায় এসেছে, হারাম শরীফে আল্লাহ্ যা হারাম করেছেন যেমন, হত্যা, খারাপ আচরণ, এসবের কোন কিছুকে হালাল মনে করা । ফলে যে যুলুম করেনি তার উপর যুলুম করা, যে হত্যা করেনি তাকে হত্যা করা । সুতরাং কেউ যদি এ ধরনের কোন আচরণ করে তবে আল্লাহ্ তার জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন । অপর কারও কারও মতে, এখানে যুলুম অর্থ শির্ক । মুজাহিদ বলেন, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করা । মুজাহিদ থেকে অপর বর্ণনায় এসেছে যে, কোন খারাপ করাই যুলুম শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য । [ইবন কাসীর] মোটকথা: যাবতীয় খারাপ কাজই এর মধ্যে শামিল হবে । যদিও সকল অবস্থায় খারাপ কাজ করা পাপ কিন্তু হারাম শরীফে একাজ করা আরো অনেক বেশী মারাত্মক পাপ । মুফাস্‌সিরগণ বিনা প্রয়োজনে কসম খাওয়া কিংবা চাকরদেরকে গালি দেয়াকে পর্যন্ত হারাম শরীফের মধ্যে বেদ্বীনী গণ্য করেছেন এবং একে এ আয়াতের ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করেছেন । আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে এই আয়াতের তাফসীর এরূপও বর্ণিত আছে যে, হারাম শরীফ ছাড়া অন্যত্র পাপ কাজের ইচ্ছা করলেই পাপ লেখা হয় না, যতক্ষণ না তা কার্যে পরিণত করা হয় । কিন্তু হারামে শুধু পাকাপোক্ত ইচ্ছা করলেই গোনাহ্ লেখা হয় । [ইবন কাসীর]

(২) এ আয়াতে যারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও ইবাদাত করে তাদের ব্যাপারে সাবধান করা হয়েছে । যারা আল্লাহ্‌র সাথে এমন ঘরে শির্ক করে যার ভিত্তি রচিত হয়েছিল তাওহীদের উপর । আল্লাহ্ জানিয়ে দিচ্ছেন যে, তিনি ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে সেটার স্থান দেখিয়ে দিলেন, তার কাছে সমর্পন করলেন এবং তা তৈরী করার অনুমতি

স্থান[১], তখন বলেছিলাম, 'আমার সাথে কোন কিছু শরীক করবেন না[২]

وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ۝

দিলেন। [ইবন কাসীর] অভিধানে بوأ শব্দের অর্থ বর্ণনা করা। [জালালাইন] অপর অর্থ, তৈরী করা, কারণ সেটার স্থান অপরিচিত ছিল। [মুয়াসসার] আয়াতের অর্থ এইঃ একথা উল্লেখযোগ্য ও স্মর্তব্য যে, আমি ইব্রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-কে বায়তুল্লাহ্‌র অবস্থানস্থলের ঠিকানা বর্ণনা করে দিয়েছি। আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ যখন ইব্রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-কে ঘর বানানোর নির্দেশ দেয়া হলো, তিনি বিবি হাজেরা ও ইসমাঈলকে নিয়ে তা বানাতে বের হলেন, যখন মক্কার উপত্যকায় আসলেন তখন তিনি তার মাথার উপর ঘরের স্থানটুকুতে মেঘের মত দেখলেন, যাতে মাথার মত ছিল, সে মাথা থেকে ইব্রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-কে বলা হলঃ হে ইব্রাহীম! আপনি আমার ছায়ায় বা আমার পরিমাণ স্থানে ঘর বানান, এর চেয়ে কমাবেন না, বাড়াবেনও না। তারপর যখন ঘর বানানো শেষ করলেন, তখন তিনি বের হয়ে চলে গেলেন এবং ইসমাঈল ও হাজেরাকে ছেড়ে গেলেন, আর এটাই আল্লাহ্‌র বাণীঃ ﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَٰهِيمَ﴾ আয়াতের মর্মার্থ। [মুস্তাদরাকে হাকিমঃ ২/৫৫১]

(১) ﴿مَكَانَ الْبَيْتِ﴾ শব্দে ইঙ্গিত রয়েছে যে, বায়তুল্লাহ্ ইব্রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-এর আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল। বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে যে, এর প্রথম নির্মাণ আদম 'আলাইহিস্ সালাম-কে পৃথিবীতে আনার পূর্বে অথবা সাথে সাথে হয়েছিল। আদম 'আলাইহিস্ সালাম ও তৎপরবর্তী নবীগণ বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করতেন। কিন্তু এ সমস্ত বর্ণনা খুব শক্তিশালী নয়। সহীহ বর্ণনানুসারে ইবরাহীম আলাইহিসসালামই প্রথম কা'বা শরীফ নির্মাণ করেছিলেন। তখন আয়াতের অর্থ হবে, আমরা তাকে হবু ঘরের স্থান দেখিয়েছিলাম। এ অর্থ হবে না যে, সেখানে ঘর ছিল আর তা নষ্ট হয়ে যাবার পরে আবার তা ইবরাহীম আলাইহিসসালামকে নির্মাণের জন্য দেখিয়ে দেয়া হয়েছিল। ইবনে কাসীর রাহেমাহুল্লাহ্ বলেন, এ আয়াত থেকেই অনেকে প্রমাণ করেছেন যে, ইবরাহীম আলাইহিস সালামই প্রথম আল্লাহ্‌র ঘর নির্মাণ করেছেন। তার পূর্বে সেটি নির্মিত হয়নি। এর সপক্ষে প্রমাণ হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক হাদীস, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কোন মসজিদটি প্রথম নির্মিত হয়েছে? তিনি বললেন, মাসজিদুল হারাম। আমি বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, বাইতুল মুকাদ্দাস। আমি বললাম, এ দুয়ের মাঝখানে কত সময়? তিনি বললেন, চল্লিশ বছর। [বুখারী: ৩৩৬৬; মুসলিম: ৫২০]

(২) অর্থাৎ ইব্রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-কে এই ঘরের কাছেই পুনর্বাসিত করার পর কতগুলো আদেশ দেয়া হয়। তন্মধ্যে প্রথম নির্দেশটি ছিল সর্বকালের সবচেয়ে বড় গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ। আর তা হলো, 'আমার সাথে কাউকে শরীক করবেন না।' ইবন কাসীর বলেন, এর অর্থ, একমাত্র আমার জন্যই এ ঘরটি বানাবেন। অথবা এ ঘরে

এবং আমার ঘরকে তাওয়াফকারী, সালাতে দণ্ডায়মান, এবং রুকূ' ও সিজ্‌দাকারীদের জন্য পবিত্র রাখুন(১)।

২৭. আর মানুষের কাছে হজের ঘোষণা করে দিন(২), তারা আপনার কাছে

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ

শুধু আমাকেই ডাকবেন। অথবা এর অর্থ, আমার সাথে কাউকে শরীক করবেন না। [ফাতহুল কাদীর]

(১) দ্বিতীয় আদেশ এরূপ দেয়া হয় যে, আমার গৃহকে পবিত্র রাখুন। পবিত্র করার অর্থ কুফর ও শির্ক থেকে পবিত্র রাখা। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] অনুরূপভাবে বাহ্যিক ময়লা-আবর্জনা থেকেও পবিত্র রাখা।[ফাতহুল কাদীর] ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-কে একথা বলার উদ্দেশ্য অন্য লোকদেরকে এ ব্যাপারে সচেষ্ট করা। কারণ, ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম নিজেই শির্ক ও কুফরী থেকে মুক্ত ছিলেন, তিনি আল্লাহ্‌র ঘরকে ময়লা-আবর্জনামুক্ত করতেন। এতদসত্বেও যখন তাকে একাজ করতে বলা হয়েছে, তখন অন্যদের এ ব্যাপারে কতটুকু যত্নবান হওয়া উচিত, তা সহজেই অনুমেয়। আয়াত থেকে আরও স্পষ্ট হচ্ছে যে, এখানে কাবাঘরের সেবার দাবীদার তৎকালীন কাফের মুশরিকদের সাবধান করা হচ্ছে যে, এ ঘর নির্মাণের জন্য তোমাদের পিতার উপর শর্ত দেয়া হয়েছিল যে, তিনি এটাকে শির্কমুক্ত রাখবেন। তোমরা সে শর্তটি পূর্ণ করতে পারনি বরং শির্ক দ্বারা কলুষিত করেছ। [ফাতহুল কাদীর] এ নির্দেশের সাথে কাদের জন্য ঘরটি পবিত্র রাখবেন তাদের কথাও জানিয়ে দেয়া হয়েছে। তারা হচ্ছেন, তাওয়াফকারী ও সালাতে দণ্ডায়মানকারী, রুকুকারী ও সিজদাকারী লোকদের জন্য। বিশেষ করে তাওয়াফ এ ঘর ছাড়া আর কোথাও জায়েয নেই, আর সালাত এ ঘর ব্যতীত অন্য কোন দিকে মুখ করে পড়া (নফল ও যুদ্ধের সময়কার সালাত ব্যতীত) জায়েয নেই। অনুরূপভাবে রুকু ও সিজদা বলার কারণে ইবাদাতের মধ্যে এ দু'টি রুকনের গুরুত্ব প্রকাশ পাচ্ছে। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(২) ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-এর প্রতি তৃতীয় আদেশ এই যে, মানুষের মধ্যে ঘোষণা করে দিন যে, বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে। ইবনে আবী হাতেম ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন যে, যখন ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-কে হজ্জ ফরয হওয়ার কথা ঘোষণা করার আদেশ দেয়া হয়, তখন তিনি আল্লাহ্‌র কাছে আরয করলেনঃ এখানে তো জনমানবহীন প্রান্তর। ঘোষণা শোনার মত কেউ নেই; যেখানে জনবসতি আছে সেখানে আমার আওয়াজ কিভাবে পৌঁছবে? জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা বললেনঃ আপনার দায়িত্ব শুধু ঘোষণা করা। বিশ্বে পৌঁছানোর দায়িত্ব আমার। ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম মাকামে ইব্‌রাহীমে দাঁড়িয়ে

كُلِّ ضَامِرٍ يَّأْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ ﴿٢٧﴾

আসবে পায়ে হেঁটে এবং সব ধরনের কৃশকায় উটের পিঠে করে, তারা আসবে দূর-দূরান্তের পথ অতিক্রম করে(১);

لِّيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِيْٓ

২৮. যাতে তারা তাদের কল্যাণের স্থানগুলোতে উপস্থিত হতে পারে(২)

ঘোষণা করলে আল্লাহ্ তা'আলা তা উচ্চ করে দেন। কোন কোন বর্ণনায় আছে, তিনি আবু কুবাইস পাহাড়ে আরোহণ করে দুই কানে আঙ্গুলি রেখে ডানে-বামে এবং পূর্ব-পশ্চিমে মুখ করে বললেনঃ 'লোক সকল! তোমাদের পালনকর্তা গৃহ নির্মাণ করেছেন এবং তোমাদের উপর এই গৃহের হজ ফরয করেছেন। তোমরা সবাই পালনকর্তার আদেশ পালন কর।' এই বর্ণনায় আরো বলা হয়েছে যে, ইব্রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-এর এই আওয়াজ আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্বের কোণে কোণে পৌঁছে দেন এবং শুধু তখনকার জীবিত মানুষ পর্যন্তই নয়; বরং ভবিষ্যতে কেয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ আগমনকারী ছিল, তাদের প্রত্যেকের কান পর্যন্ত এ আওয়াজ পৌঁছে দেয়া হয়। যার যার ভাগ্যে আল্লাহ্ তা'আলা হজ লিখে দিয়েছেন, তাদের প্রত্যেকেই এই আওয়াজের জবাবে لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ বলেছে অর্থাৎ হাজির হওয়ার কথা স্বীকার করেছে। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ ইব্রাহিমী আওয়াজের জবাবই হচ্ছে হজ্জে 'লাব্বাইকা' বলার আসল ভিত্তি। [দেখুন- তাবারীঃ ১৪/১৪৪, হাকীম মুস্তাদরাকঃ ২/৩৮৮]

(১) এ আয়াতে সেই প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করা হয়েছে, যা ইব্রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-এর ঘোষণাকে সব মানবমণ্ডলী পর্যন্ত পৌঁছানোর কারণে কেয়ামত পর্যন্তের জন্য কায়েম হয়ে গেছে। তা এই যে, বিশ্বের প্রতিটি প্রত্যন্ত এলাকা থেকেও মানুষ বায়তুল্লাহ্র দিকে চলে আসবে; কেউ পদব্রজে, কেউ সওয়ার হয়ে। যারা সওয়ার হয়ে আসবে, তারাও দূর-দুরান্ত দেশ থেকে আগমন করবে। ফলে তাদের সওয়ারীর জন্তুগুলো কৃশকায় হয়ে যাবে। পরবর্তী নবীগণ এবং তাদের উম্মতগণও এই আদেশের অনুসারী ছিলেন। ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর পর যে সুদীর্ঘ জাহেলিয়াতের যুগ অতিবাহিত হয়েছে, তাতেও আরবের বাসিন্দারা মূর্তিপূজায় লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও হজ্জের বিধান তেমনিভাবে পালন করেছে, যেমন ইব্রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম থেকে বর্ণিত ছিল। যদিও পরবর্তীতে আরবরা বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থায় হজ্জের সঠিক পদ্ধতি পরিবর্তন করে নিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সে সমস্ত ভুলের সংশোধন করে দিয়েছিলেন।

(২) অর্থাৎ দূর-দুরান্ত পথ অতিক্রম করে তাদের এই উপস্থিতি তাদেরই উপকারের নিমিত্ত। এখানে منافع শব্দটি نكرة ব্যবহার করে ব্যাপক অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তন্মধ্যে দ্বীনী উপকার তো অসংখ্য আছেই; পার্থিব উপকারও অনেক প্রত্যক্ষ করা হয়।

أَيَّامٍ مَّعْلُومَٰتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَٰمِ ۖ فَكُلُوا۟ مِنْهَا وَأَطْعِمُوا۟ ٱلْبَآئِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴿٢٨﴾

এবং তিনি তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তু হতে যা রিয্ক হিসেবে দিয়েছেন তার উপর নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করতে পারে(১)। অতঃপর

চিন্তা করলে এ বিষয়টি সাধারণভাবে প্রত্যক্ষ করা যাবে যে, হজ্জের দ্বীনী কল্যাণ অনেক; তন্মধ্যে নিম্নে বর্ণিত কল্যাণটি কোন অংশে কম নয়। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র জন্য হজ্জ করে এবং তাতে অশ্লীল ও গোনাহ্‌র কার্যাদি থেকে বেঁচে থাকে, সে হজ্জ থেকে এমতাবস্থায় ফিরে আসে যেন আজই মায়ের গর্ভ থেকে বের হয়েছে; [বুখারীঃ ১৪৪৯, ১৭২৩,১৭২৪, মুসলিমঃ ১৩৫০] অর্থাৎ জন্মের অবস্থায় শিশু যেমন নিষ্পাপ থাকে, সে-ও তদ্রূপই হয়ে যায়'। তাছাড়া আরেকটি উপকার তো তাদের অপেক্ষায় আছে। আর তা হচ্ছে, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি। [ইবন কাসীর] অনুরূপভাবে হজ্জের মধ্যে আরাফাহ, মুযদালিফাহ, ইত্যাদি হজের স্থানে অবস্থান ও দো'আর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও ক্ষমা লাভ করা যায়। [কুরতুবী] তবে এখানে কেবলমাত্র দ্বীনী কল্যাণের কথাই বলা হয়নি, এর সাথে পার্থিব কল্যাণও সংযুক্ত রয়েছে। এ হজ্জের বরকতেই আরবের যাবতীয় সন্ত্রাস, বিশৃংখলা ও নিরাপত্তাহীনতা অন্তত চারমাসের জন্য স্থগিত হয়ে যেতো এবং সে সময় এমন ধরনের নিরাপত্তা লাভ করা যেতো যার মধ্যে দেশের সকল এলাকার লোকেরা সফর করতে পারতো এবং বাণিজ্য কাফেলাও নিরাপদে চলাফেরা করতে সক্ষম হতো। এজন্য আরবের অর্থনৈতিক জীবনের জন্যও হজ্জ একটি রহমত ছিল। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "তোমাদের রব-এর অনুগ্রহ সন্ধান করাতে তোমাদের কোন পাপ নেই।" [সূরা আল-বাকারাহঃ ১৯৮] অর্থাৎ ব্যবসা। [কুরতুবী] ইসলামের আগমনের পরে হজ্জের দ্বীনী কল্যাণের সাথে সাথে পার্থিব কল্যাণও কয়েকগুণ বেশী হয়ে গেছে। প্রথমে তা ছিল কেবলমাত্র আরবের জন্য রহমত, এখন হয়ে গেছে সারা দুনিয়ার তাওহীদবাদীদের জন্য রহমত।

(১) বায়তুল্লাহ্‌র কাছে হাজীদের আগমনের এক উপকার তো উপরে বর্ণিত হল যে, তারা তাদের দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ প্রত্যক্ষ করবে। এরপর দ্বিতীয় উপকার এরূপ বর্ণিত হয়েছে- ﴿وَيَذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِىٓ أَيَّامٍ مَّعْلُومَٰتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَٰمِ﴾ - অর্থাৎ যাতে নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে সেসব জন্তুর উপর, যেগুলো আল্লাহ্ তাদেরকে দিয়েছেন। হাদঈ বা কুরবানীর গোশ্‌ত তাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। এটা বাড়তি নেয়ামত। 'নির্দিষ্ট দিনগুলো' বলে সেই দিনগুলো বোঝানো হয়েছে, যেগুলোতে কুরবানী করা জায়েয, অর্থাৎ যিলহজ্জ মাসের ১০, ১১, ১২ ও ১৩ তারিখ। [ইবন কাসীর] কোন কোন মুফাস্‌সিরের মতে, এখানে ﴿أَيَّامٍ مَّعْلُومَٰتٍ﴾ বলে যিলহজ্জের দশ দিন এবং আইয়ামে তাশরিকের দিনগুলোসহ মোট তের দিনকে বোঝানো হয়েছে। [ইবন কাসীর] অবশ্য এ ব্যাপারে সহীহ্ হাদীসেও এসেছে, রাসূল

তোমরা তা থেকে খাও[১] এবং দুঃস্থ, অভাবগ্রস্তকে আহার করাও[২]।

২৯. তারপর তারা যেন তাদের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে[৩] এবং তাদের মানত পূর্ণ

ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ ‘যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশদিনের আমলের মত উৎকৃষ্ট আমল আর কিছু নেই। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেনঃ এমনকি আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদও নয়? তিনি বললেনঃ এমনকি জিহাদও নয়, তবে যদি সে মুজাহিদ তার জান ও মাল নিয়ে জিহাদ করতে বের হয়ে আর ফিরে না আসে।’ [বুখারীঃ ৯৬৯] আয়াতে পশু বলতে গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তুর কথা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ উট, গরু, ছাগল ভেড়া, যেমন সূরা আল-আন‘আমের ১৪২-১৪৪ আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আর তাদের উপর আল্লাহর নাম নেওয়ার অর্থ হচ্ছে,আল্লাহর নামে এবং তাঁর নাম উচ্চারণ করে তাদেরকে যবেহ করা যেমন পরবর্তী বাক্য নিজেই বলে দিচ্ছে। কুরআন মজীদে কুরবানীর জন্য সাধারণভাবে “পশুর উপর আল্লাহর নাম নেওয়া”র পরিভাষাটি ব্যবহার করা হয়েছে এবং সব জায়গায়ই এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহর নামে পশু যবেহ করা। [কুরতুবী; ইবন কাসীর] এভাবে যেন এ সত্যটির ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর নাম না নিয়ে অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে পশু যবেহ করা কাফের ও মুশরিকদের পদ্ধতি। মুসলিম যখনই পশু যবেহ করবে আল্লাহর নাম নিয়ে করবে এবং যখনই কুরবানী করবে আল্লাহর জন্য করবে। [দেখুন, কুরতুবী]

(১) এখানে كلوا শব্দটি আদেশসূচক পদ হলেও অর্থ ওয়াজিব করা নয়; বরং অনুমতি দান ও বৈধতা প্রকাশ করা; [কুরতুবী] যেমন- কুরআনের ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [সূরা আল-মায়েদাহ্‌ঃ ২] আয়াতে শিকারের আদেশ অনুমতিদানের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

(২) দুর্দশাগ্রস্ত অভাবীকে আহার করানোর ব্যাপারে যা বলা হয়েছে তার অর্থ এ নয় যে, সচ্ছল বা ধনী ব্যক্তিকে আহার করানো যেতে পারে না। বন্ধু, প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন অভাবী না হলেও তাদেরকে কুরবানীর গোশত দেওয়া জায়েয। এ বিষয়টি সাহাবায়ে কেরামের কার্যাবলী থেকে প্রমাণিত। আলকামা বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু আমার হাতে কুরবানীর পশু পাঠান এবং নির্দেশ দেন,কুরবানীর দিন একে যবেহ করবে, নিজে খাবে, মিসকীনদেরকে দেবে এবং আমার ভাইয়ের ঘরে পাঠাবে। [আস-সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকী: ১০২৩৮] ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমাও একই কথা বলেছেন অর্থাৎ একটি অংশ খাও, একটি অংশ প্রতিবেশীদেরকে দাও এবং একটি অংশ মিসকীনদের মধ্যে বণ্টন করো। [ইবন কাসীর]

(৩) تفث এর আভিধানিক অর্থ ময়লা, যা মানুষের দেহে জমা হয়। [ফাতহুল কাদীর] ইহ্‌রাম অবস্থায় চুল মুণ্ডানো, চুল কাটা, উপড়ানো, নখ কাটা, সুগন্ধি ব্যবহার করা

وَلۡيَطَّوَّفُوۡا بِالۡبَيۡتِ الۡعَتِيۡقِ ۝٢٩

করে[১] আর তাওয়াফ করে প্রাচীন ঘরের[২]।

ইত্যাদি হারাম। তাই এগুলোর নীচে ময়লা জমা হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, হজ্জের কুরবানী সমাপ্ত হলে দেহের ময়লা দূর করে দাও। অর্থাৎ এহ্‌রাম খুলে ফেল, মাথা মুণ্ডাও এবং নখ কাট। নাভীর নীচের চুলও পরিস্কার কর। [কুরতুবী] আয়াতে প্রথমে হাদঈ জবাই ও পরে ইহ্‌রাম খোলার কথা বলা হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, এই ক্রম অনুযায়ী এসব কার্যাদি সম্পন্ন করা মুস্তাহাব। যদি এতে আগ-পিছ হয়, তবে কোন সমস্যা নেই। কারণ, হাদীসে এসেছে, 'সেদিন (১০ই যিলহজ্জ তারিখে) হজ্জের কাজগুলোর মধ্যে কোনটা আগ-পিছ করার ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে যখনই কোন প্রশ্ন করা হয়েছে, তখনি তিনি বলেছেনঃ কর, কোন সমস্যা নেই।' [বুখারীঃ ৮১, ১২১, ১৬২১, ১৬২২, ৬১৭২, মুসলিমঃ ১৩০৬] এ প্রসংগে এ কথা জেনে নেয়া উচিত যে, পাথর নিক্ষেপ ও মাথামুণ্ডন এ দু'টির যে কোন একটি এবং হাদঈ জবাইয়ের কাজ শেষ করার পর অন্যান্য যাবতীয় নিষেধাজ্ঞা শেষ হয়ে যায় কিন্তু স্ত্রী সহবাস ততক্ষণ পর্যন্ত বৈধ হয় না যতক্ষণ না "তাওয়াফে ইফাদাহ" শেষ করা হয়।

(১) نذور শব্দটি نذر এর বহুবচন। অর্থাৎ এ সময়ের জন্য যে ব্যক্তি কোন মানত করে সে যেন তা পূরণ করে। শরী'আতে মানতের স্বরূপ এই যে, শরী'আতের আইনে যে কাজ কোন ব্যক্তির উপর ওয়াজিব নয়, যদি সে মুখে মানত করে যে, আমি এ কাজ করব অথবা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমার জন্য এ কাজ করা জরুরী, একেই নযর বা মানত বলা হয়। একে পূর্ণ করা ওয়াজিব হয়ে যায়, যদিও মূলতঃ তা ওয়াজিব ছিল না। তবে এর ওয়াজিব হওয়ার জন্য কাজটা গোনাহ্ ও নাজায়েয না হওয়া সর্বসম্মতিক্রমে শর্ত। যদি কেউ কোন গোনাহ্‌র কাজের মানত করে, সেই গোনাহ্‌র কাজ করা তার উপর ওয়াজিব নয়; বরং বিপরীত করা ওয়াজিব। [কুরতুবী] তবে কসমের কাফ্‌ফারা আদায় করা জরুরী হবে। মানত পূর্ণ করা ওয়াজিব; আলোচ্য আয়াত থেকে মূলতঃ তাই প্রমাণিত হয়। এতে মানত পূর্ণ করার আদেশ দেয়া হয়েছে। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, এ আয়াতে উট বা গৃহপালিত জন্তুর যা যবেহ করার জন্য মানত করেছে সেটাকে পূরণ করতে বলা হয়েছে। মুজাহিদ বলেন, এখানে উদ্দেশ্য, হজ ও হাদঈ সংক্রান্ত মানত এবং এমন মানত যা হজের সময় সম্পন্ন করতে হয়। কারও কারও মতে হজের যাবতীয় কাজকে এখানে মানত হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(২) এখানে তাওয়াফ বলে তাওয়াফে যিয়ারত বা "তাওয়াফে ইফাদাহ" বোঝানো হয়েছে, যা যিলহজ্জের দশ তারিখে কঙ্কর নিক্ষেপ ও হাদঈ যবাই করার পর করা হয়। এটি হজ্জের রোকন তথা ফরযের অন্তর্ভুক্ত। যা কখনও বাদ দেয়ার সুযোগ নেই। [কুরতুবী] আর যেহেতু ধূলা-ময়লা দূর করার হুকুমের সাথে সাথেই এর উল্লেখ করা হয়েছে তাই এ বক্তব্য একথা প্রকাশ করে যে, হাদঈ যবাই করার এবং ইহরাম খুলে

ذٰلِكَ وَمَنْ يُّعَظِّمْ حُرُمٰتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ۗ وَاُحِلَّتْ لَكُمُ الْاَنْعَامُ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ ۝

৩০. এটাই বিধান এবং কেউ আল্লাহ্‌র সম্মানিত বিধানাবলীর(১) প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলে তার রব-এর কাছে তার জন্য এটাই উত্তম। আর যেগুলো তোমাদেরকে তিলাওয়াত করে জানানো হয়েছে(২) তা ব্যতীত তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে চতুষ্পদ জন্তু। কাজেই তোমরা বেঁচে

গোসল করে নেবার পর এ তাওয়াফ করা উচিত। এখানে কাবাঘরের জন্য عتيق শব্দ অত্যন্ত অর্থবহ।"আতীক" শব্দটি আরবী ভাষায় তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। একটি অর্থ হচ্ছে প্রাচীন। দ্বিতীয় অর্থ স্বাধীন,যার উপর কারোর মালিকানা নেই। তৃতীয় অর্থ সম্মানিত ও মর্যাদাপূর্ণ। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর] এ তিনটি অর্থই এ পবিত্র ঘরটির বেলায় প্রযোজ্য। তাছাড়া লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, আল্লাহ্‌র এ ঘরটি বহিঃশত্রুর আক্রমণ হতেও মুক্ত। মুজাহিদ রাহেমাহুল্লাহ বলেনঃ আল্লাহ্ তাঁর গৃহের নাম ﴿الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ﴾ রেখেছেন; কারণ, আল্লাহ্ একে কাফের ও অত্যাচারীদের আধিপত্য ও অধিকার থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন। কোন কাফেরের সাধ্য নেই যে, একে অধিকারভুক্ত করে। আসহাবে-ফীল তথা হস্তী-বাহিনীর ঘটনা এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

(১) ﴿حُرُمٰتِ اللّٰهِ﴾ - বলে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সম্মানযোগ্য বিষয়াদি অর্থাৎ শরী'আতের বিধানাবলী বোঝানো হয়েছে। সুতরাং যে কেউ আল্লাহ্‌র অপরাধ থেকে বেঁচে থাকবে, তাঁর হারামকৃত বিষয়াদি বর্জন করবে এবং যার কাছে হারামকৃত বিষয়াদি করা অনেক বড় গোনাহের কাজ বলে মনের মধ্যে জাগ্রত হয়, তবে তা তার রবের নিকট তার জন্য উত্তম। [ইবন কাসীর] মুজাহিদ বলেন, মক্কা, হজের বিধি-বিধান, মক্কার বিভিন্ন সম্মানিত এলাকা, এসব কিছুই এ আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য। এগুলোর সম্মান করা, এগুলো সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করা এবং জ্ঞান অনুযায়ী আমল করা, আর আল্লাহ্ যা থেকে নিষেধ করেছেন তা থেকে বেঁচে থাকা দুনিয়া ও আখেরাতে সৌভাগ্য লাভের উপায়। [ইবন কাসীর]

(২) সূরা আল-আনআম ও সূরা আন-নাহ্‌লে যে হুকুম দেয়া হয়েছে সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছেঃ আল্লাহ যেসব জিনিস হারাম করেছেন সেগুলো হচ্ছেঃ মৃত, রক্ত, শুকরের মাংস এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর নামে যবেহ করা পশু। [সূরা আল-আন'আমঃ ১৪৫ ও সূরা আন-নাহলঃ ১১৫] এ গুলো ব্যতীত বিভিন্ন হাদীসে আরও কিছু জীব-জন্তু পাখী হারাম করার ঘোষণা এসেছে। সেগুলোও এ আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হবে। কারণ রাসূলের কথা ও বাণী ওহীর অন্তর্ভুক্ত এবং তা মানা অপরিহার্য।

থাক মূর্তিপূজার অপবিত্রতা থেকে[1]
এবং বর্জন কর মিথ্যা কথা[2] ।

---

(১) رجس শব্দের অর্থ অপবিত্রতা, ময়লা। [ফাতহুল কাদীর] অপবিত্রতা বলা হয়েছে; কারণ, এরা মানুষের অন্তরকে শির্কের অপবিত্রতা দ্বারা পূর্ণ করে দেয়। رجس শব্দের অন্য অর্থ হচ্ছে رجز বা শাস্তি। সে হিসেবে মূর্তিদেরকে رجس বলা হয়েছে, কারণ এগুলো শাস্তির কারণ। [ফাতহুল কাদীর] أوثان শব্দটি وثن এর বহুবচন; অর্থ মূর্তি। তা কাঠ, লোহা, সোনা বা রূপা, যাই হোক। আরবরা এগুলোর পূজা করত। আর নাসারারা ক্রুশ স্থাপন করত এবং তা পূজা করত, তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করত। [কুরতুবী] তাই আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়, মূর্তিপূজা থেকে এমনভাবে দূরে থাক যেমন দুর্গন্ধময় ময়লা আবর্জনা থেকে মানুষ নাকে কাপড় দিয়ে দূরে সরে আসে। অনুরূপভাবে মূর্তিপূজা থেকে দূরে থাক, কারণ তা স্থায়ী শাস্তির কারণ।

(২) ﴿قَوْلَ الزُّوْرِ﴾ -এর অর্থ মিথ্যা। যা কিছু সত্যের পরিপন্থী, তা-ই বাতিল ও মিথ্যাভুক্ত। [কুরতুবী] আল্লাহ্‌র সাথে শির্ক করা থেকে নিষেধ করার সাথে মিথ্যা কথাকে একসাথে অন্যত্রও উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, “বলুন, ‘নিশ্চয় আমার রব হারাম করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা। আর পাপ ও অন্যায়ভাবে সীমালঙ্ঘন এবং কোন কিছুকে আল্লাহ্‌র শরীক করা- যার কোন সনদ তিনি নাযিল করেননি। আর আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা যা তোমরা জান না।” [সূরা আল-আ‘রাফ: ৩৩] আর আল্লাহ্‌র উপর না জেনে কথা বলার একটি হচ্ছে মিথ্যা কথা বলা। [ইবন কাসীর] যাজ্জাজ বলেন, আরবের মুশরিকরা যে মিথ্যার ভিত্তিতে “বাহীরা”, “সায়েবা” ও “হাম” ইত্যাদিকে হারাম গণ্য করতো তাও এ ফরমানের সরাসরি আওতাধীনে এসে যায়। [ফাতহুল কাদীর] যেমন অন্যত্র বলা হয়েছেঃ “আর তোমাদের কণ্ঠ যে মিথ্যা বিধান দিয়ে থাকে যে, এটা হালাল এবং এটা হারাম, এ ধরনের বিধান দিয়ে আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করো না।” [সূরা আন নাহলঃ১১৬] সহীহ হাদীসেও শির্ককে সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ সাব্যস্ত করার পর পিতা-মাতার অবাধ্যতা এবং মিথ্যা কথা ও মিথ্যা সাক্ষীকে কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আবু বাকরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় কবীরা গোনাহ সম্পর্কে বলব না? আমরা বললাম, অবশ্যই বলবেন হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করা, পিতামাতার অবাধ্য হওয়া, তারপর তিনি বসা অবস্থা থেকে সোজা হয়ে বললেন, সাবধান! এবং মিথ্যা কথা বলা। সাবধান! এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া [বুখারী: ৫৯৭৬; মুসলিম: ৮৭] ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া শির্কের সমপর্যায়ের। [ইবন কাসীর] এর কারণ হচ্ছে, ‘মিথ্যা কথা’ শব্দটি ব্যাপক। এর সবচেয়ে বড় প্রকার হচ্ছে শির্ক। তা যে শব্দের মাধ্যমেই হোক না কেন। [ফাতহুল কাদীর] আল্লাহর সাথে অন্যদেরকে শরীক করা এবং তাঁর সত্তা, গুণাবলী, ক্ষমতা ও অধিকার তথা ইবাদাতে তাঁর বান্দাদেরকে অংশীদার করা সবচেয়ে বড় মিথ্যা।

حُنَفَآءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهٖ ۚ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِيْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ ﴿٣١﴾

৩১. আল্লাহ্‌র প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে এবং তাঁর কোন শরীক না করে। আর যে কেউ আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করে সে যেন(১) আকাশ হতে পড়ল, তারপর পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল, কিংবা বায়ু তাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে এক দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল।

ذٰلِكَ ۗ وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَآئِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى

৩২. এটাই আল্লাহ্‌র বিধান এবং কেউ আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকে(২) সম্মান

অনুরূপভাবে পারস্পরিক লেন-দেন ও সাক্ষ্য প্রদানে মিথ্যাও এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। এ সংগে মিথ্যা কসমও একই বিধানের আওতায় আসে। ইমামদের মতে, যে ব্যক্তি আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা প্রমাণিত হয়ে যাবে তার নাম চারদিকে প্রচার করে দিতে হবে। [কুরতুবী] উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, "তার পিঠে চাবুক মারতে হবে, মাথা ন্যাড়া করে দিতে হবে, মুখ কালো করে দিতে হবে এবং দীর্ঘদিন অন্তরীণ রাখার শাস্তি দিতে হবে।" উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর আদালতে এক ব্যক্তির সাক্ষ্য মিথ্যা প্রমাণিত হয়। তিনি তাকে একদিন প্রকাশ্যে জনসমাগমের স্থানে দাঁড় করিয়ে রাখেন এবং ঘোষণা করে দেন যে, এ ব্যক্তি হচ্ছে ওমুকের ছেলে ওমুক, এ মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে, একে চিনে রাখো। তারপর তাকে কারাগারে আটক করেন। [বাইহাকী: মা'রিফাতুস সুনানি ওয়াল আসার: ১৪/২৪৩] বর্তমান কালে এ ধরনের লোকের নাম খবরের কাগজে ছেপে দিলেই ব্যাপক প্রচারের উদ্দেশ্য হাসিল হতে পারে।

(১) এ আয়াতে যারা আল্লাহ্‌র সাথে শির্ক করে তারা হেদায়াত থেকে কত দূরত্বে অবস্থান করছে এবং ঈমানের সুউচ্চ শৃংগ থেকে কুফরীর অতল গহ্বরে পতিত হওয়ার মাধ্যমে ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ততার দিক থেকে তাদের অবস্থা কেমন দাঁড়ায় তার উদাহরণ দেয়া হয়েছে এমন এক ব্যক্তির সাথে যে আকাশ থেকে পড়ে গেল এমতাবস্থায় হয় সে পাখির শিকারে পরিণত হবে যাতে তার সমস্ত শরীর টুকরো টুকরো হয়ে যায়, অথবা কঠিন ঝড়ো হাওয়া তাকে বয়ে নিয়ে অনেক দুরে নিয়ে ফেলে আসল। [সা'দী] এ অবস্থা যেমন অত্যন্ত খারাপ তেমনি অবস্থা দাঁড়ায় শির্ককারীর অবস্থা। সে শয়তানের শিকারে পরিণত হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং তার অবস্থা হবে বেসামাল।

(২) شَعَائِر শব্দটি شعيرة -এর বহুবচন। এর অর্থ আলামত, চিহ্ন। আল্লাহ্‌র শা'য়ীরা বা চিহ্ন বলতে বুঝায় এমন প্রতিটি বিষয় যাতে আল্লাহ্‌র কোন নির্দেশের চিহ্ন দেয়া আছে। [কুরতুবী] সাধারণের পরিভাষায় যে যে বিধানকে মুসলিম হওয়ার আলামত মনে করা হয়, সেগুলোকে 'শা'আয়েরে ইসলাম' বলা হয়। [দেখুন, সা'দী] এগুলো আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের চিহ্ন। বিশেষ করে হজের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়াদি যেমন, হজের

الْقُلُوبِ ﴿٣٢﴾

করলে এ তো তার হৃদয়ের তাক্ওয়াপ্রসূত[১]।

لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَآ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٣٣﴾

৩৩. এ সব চতুষ্পদ জন্তুগুলোতে তোমাদের জন্য নানাবিধ উপকার রয়েছে এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত[২]; তারপর তাদের

যাবতীয় কর্মকাণ্ড। [কুরতুবী; সা'দী] হাদঈর জন্য হাজীদের সংগে নেয়া উট ইত্যাদি। [ইবন কাসীর] ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, এখানে আল্লাহ্র নিদর্শন বা চিহ্ন সম্মান করার দ্বারা হাদঈর জন্তুটি মোটাতাজা ও সুন্দর হওয়া বোঝানো হয়েছে। [ইবন কাসীর] হাদীসে এসেছে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি সাদাতে কালো রঙ্গ মিশ্রিত শিং বিশিষ্ট ছাগল দিয়ে কুরবানী করেছেন। [আবু দাউদ: ২৭৯৪] তাছাড়া তিনি চোখ, কান, ভালভাবে দেখতে নির্দেশ দিয়েছেন। [ইবন মাজাহ: ৩১৪৩] সুতরাং যারা এ নির্দেশ গুলো উন্নত মানের জন্তু হাদঈ ও কুরবানীতে প্রদান করবে সেটা তাদের মধ্যে তাকওয়ার পরিচায়ক। [ইবন কাসীর]

(১) অর্থাৎ আল্লাহ্র আলামতসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন আন্তরিক আল্লাহ্ভীতির লক্ষণ যার অন্তরে তাকওয়া বা আল্লাহ্ভীতি থাকে, সে-ই এগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে পারে। এ সম্মান প্রদর্শন হৃদয় অভ্যন্তরের তাকওয়ার ফল এবং মানুষের মনে যে কিছু না কিছু আল্লাহর ভয় আছে তা এরই চিহ্ন। [সা'দী] তাইতো কেউ আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের অমর্যাদা করলে এটা একথার সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, তার মনে আল্লাহর ভয় নেই। এতে বোঝা গেল যে, মানুষের অন্তরের সাথেই তাকওয়ার সম্পর্ক। অন্তরে আল্লাহ্ভীতি থাকলে তার প্রতিক্রিয়া সব কাজকর্মে পরিলক্ষিত হয়। এজন্যেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তাকওয়া এখানে, আর তিনি বুকের দিকে ইঙ্গিত করলেন" [মুসলিম: ২৫৬৪] আপাতদৃষ্টিতে এটা একটা সাধারণ উপদেশ। আল্লাহ প্রতিষ্ঠিত সকল মর্যাদাশালী জিনিসের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শনের জন্য একথা বলা হয়েছে। কিন্তু মসজিদে হারাম, হজ্জ, উমরাহ ও মক্কার হারামের যে মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে এ বক্তব্যে সেগুলোই প্রধানতম উদ্দেশ্য। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]]

(২) পূর্বের আয়াতে আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং তাকে মনের তাকওয়ার আলামত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আর যেহেতু হাদঈ তথা হজ্জ অথবা ওমরাহ্কারী ব্যক্তি যবেহ্ করার জন্য যে জন্তু সাথে নিয়ে যায়, তাও হজ্জের একটি নিদর্শন। যেমন কুরআন নিজেই পরবর্তী পর্যায়ে বলছেঃ "এবং এ সমস্ত হাদঈর উটকে আমরা তোমাদের জন্য আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অন্তর্ভুক্ত করেছি।"[৩৬] অর্থাৎ হাজীদের সাথে আনা হাদঈর পশুও আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তাই বলে কি এ সমস্ত চতুষ্পদ জন্তু থেকে দুধ, সওয়ারী, মাল পরিবহণ ইত্যাদি সর্বপ্রকার উপকার লাভ করা কি হালাল নয়? আল্লাহর নিদর্শনাবলীর প্রতি সম্মান দেখানোর যে

যবাইয়ের স্থান হচ্ছে প্রাচীন ঘরটির কাছে(১)।

হুকুম ওপরে দেয়া হয়েছে তার দাবী কি এই যে, কুরবানীর পশুগুলোকে যখন আল্লাহর ঘরের দিকে নিয়ে যাওয়া হয় তখন তাদেরকে কোন ভাবে ব্যবহার করা যাবে না? তাদের পিঠে চড়া অথবা পিঠে জিনিসপত্র চাপিয়ে দেয়া কিংবা তাদের দুধ পান করা কি আল্লাহর নিদর্শনাবলীর প্রতি সম্মান দেখাবার বিরোধী? আরবের লোকেরা একথাই মনে করতো। তারা এ পশুগুলোকে একেবারেই আরোহীশূন্য অবস্থায় সুসজ্জিত করে নিয়ে যেতো। পথে তাদের থেকে কোন প্রকার লাভবান হওয়া তাদের দৃষ্টিতে ছিল পাপ। এ ভুল ধারণা দূর করার জন্য এখানে বলা হচ্ছে, জবাই করার জায়গায় পৌঁছে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তোমরা এ পশুদের থেকে লাভবান হতে বা উপকার অর্জন করতে পারো। এটা আল্লাহর নিদর্শনালীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের বিরোধী নয়। এ ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীস রয়েছে।[দেখুন- বুখারীঃ ১৬৯০, মুসলিমঃ ২৩২৩, ১৩২৪]

(১) এখানে ﴿الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (প্রাচীন গৃহ) বলতে কা'বা বোঝানো হয়েছে। কিন্তু এর দ্বারা কি শুধু কা'বা উদ্দেশ্য না কি পূর্ণ হারাম উদ্দেশ্য?
যদি শুধু কা'বা উদ্দেশ্য নেয়া হয় তখন এর অর্থ হবে, হজের কর্মকাণ্ড, আরাফায় অবস্থান, পাথর নিক্ষেপ, সা'য়ী ইত্যাদি সবই বাইতুল্লাহর তাওয়াফে ইফাদার মাধ্যমে শেষ হবে। আর তখন محل শব্দের অর্থ হবে, মুহরিমের জন্য ইহরাম থেকে হালাল হওয়ার স্থান। [কুরতুবী] ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে এ তাফসীরটি বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন, কেউ বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করার সাথে সাথে হালাল হয়ে যাবে। তারপর তিনি এ আয়াতাংশ তেলাওয়াত করলেন। [ইবন কাসীর] ইবনুল আরাবী এখানে এ অর্থকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। কারণ, আয়াতে স্পষ্টভাবে কা'বার কথা আছে। [আহকামুল কুরআন; কুরতুবী]
আর যদি 'প্রাচীন গৃহ' বলে পূর্ণ হারাম এলাকা বোঝানো হয়ে থাকে, তখন আয়াতের অর্থ হবে, হাদঈ কা'বার কাছে পৌঁছতে হবে। আর محل অর্থ হাদঈর জন্তুর মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার স্থান বা যবেহ্ করার স্থান বোঝানো হয়েছে। কারণ, হারাম বায়তুল্লাহ্‌রই বিশেষ আঙিনা। সে হিসেবে আয়াতের অর্থ এই যে, হাদঈর জন্তু যবেহ্ করার স্থান বায়তুল্লাহ্‌র সন্নিকট; অর্থাৎ সম্পূর্ণ হারাম এলাকা। এতে বোঝা গেল যে, হারাম এলাকার ভিতরে হাদঈ যবেহ্ করা জরুরী, হারাম এলাকার বাইরে জায়েয নয়। হারাম এলাকার যে কোন স্থানে হাদঈর প্রাণী যবেহ করা যাবে। সে হিসেবে মক্কার হারাম এলাকা, মিনা, মুযদালিফার যেখানেই হাদঈর প্রাণী যবেহ্ করা হোক, তা শুদ্ধ হবে। শুধু কা'বা ঘরের কাছে হতে হবে এমন কথা নেই। আয়াতের অর্থ এই নয় যে, কাবাঘরে বা মসজিদে হারামে হাদঈ জবাই করতে হবে বরং এর অর্থ হচ্ছে হারামের সীমানার মধ্যে হাদঈ জবাই

পঞ্চম রুকূ'

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۗ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا ۗ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ﴿٣٤﴾

৩৪. আর আমরা প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য 'মানসাক'[১] এর নিয়ম করে দিয়েছি; যাতে তিনি তাদেরকে জীবনোপকরণস্বরূপ যেসব চতুষ্পদ জন্তু দিয়েছেন, সেসবের উপর তারা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে[২]।

করতে হবে। কুরআন যে কা'বা, বায়তুল্লাহ বা মসজিদে হারাম শব্দ উচ্চারণ করে এ থেকে সাধারণত শুধুমাত্র কাবার ইমারত নয় বরং মক্কার হারাম অর্থ গ্রহণ করে, এটি তার আর একটি প্রমাণ। কুরআনের অন্যত্র এ ধরনের অর্থে কা'বা শব্দটি ব্যবহার হয়েছে। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, "যার ফয়সালা করবে তোমাদের মধ্যে দুজন ন্যায়বান লোক- কা'বাতে পাঠানো হাদঈরূপে" [সূরা আল-মায়িদাহ: ৯৫] ও "তারাই তো কুফরী করেছিল এবং নিবৃত্ত করেছিল তোমাদেরকে মসজিদুল-হারাম হতে ও বাধা দিয়েছিল কুরবানীর জন্য আবদ্ধ পশুগুলোকে যথাস্থানে পৌঁছতে।" [সূরা আল-ফাতহ: ২৫] এ আয়াতে 'মসজিদে হারাম' বলে পূর্ণ হারাম এলাকা বোঝানো হয়েছে। কারণ, মুশরিকরা মুসলিমদের হাদঈকে শুধু কা'বাতে পৌঁছতেই বাধা দেয়নি। বরং হারাম এলাকায় প্রবেশ করতেই বাধা দিয়েছিল।

(১) আরবী ভাষায় منسك ও نسك কয়েক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন, জন্তু যবেহ্ করা, হজ্জের ক্রিয়াকর্ম, ঈদের জন্য একত্রিত হওয়া ইত্যাদি। তাফসীরকারক মুজাহিদ রাহেমাহুল্লাহ সহ অনেকে এখানে منسك এর অর্থ হাদঈর প্রাণী যবেহ্ করা নিয়েছেন। তখন আয়াতের অর্থ হবে, এই উম্মতকে হাদঈ যবেহ্ করার আদেশ দেয়া হয়েছে, তা কোন নতুন আদেশ নয়, পূর্ববর্তী উম্মতদেরকেও এ ধরনের আদেশ দেয়া হয়েছিল। [ইবন কাসীর] পক্ষান্তরে কাতাদাহ্ রাহেমাহুল্লাহর মতে আয়াতের অর্থ এই যে, হজ্জের ক্রিয়াকর্ম যেমন এই উম্মতের উপর আরোপ করা হয়েছে, তেমনি পূর্ববর্তী উম্মতদের উপরও হজ্জ ফরয করা হয়েছিল। তখন মক্কার সাথে এটি সুনির্দিষ্ট হবে। হজ্জের জায়গা মক্কা ছাড়া আর কোথাও ছিল না। তখন منسك শব্দের অর্থ হবে হজ্জ এর স্থান। [কুরতুবী] তবে প্রথম মতটি বেশী বিশুদ্ধ। পরবর্তী আয়াতাংশ এর উপর প্রমাণবহ। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

(২) أنعام বলে উট, গরু, ছাগল, মেষ, দুম্বা ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে। এগুলোকে যবেহ করার সময় আল্লাহ্র কথা স্মরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বরং যবেহ যেন একমাত্র তাঁরই উদ্দেশ্যে হয় সেটার খেয়াল রাখতে বলা হয়েছে, কারণ, তিনিই তো এ রিযিক তাদেরকে দিয়েছেন। [কুরতুবী] এ প্রসংগে গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তুর হালাল

তোমাদের ইলাহ্ এক ইলাহ্, কাজেই তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণ কর এবং সুসংবাদ দিন বিনীতদেরকে(১)।

৩৫. যাদের হৃদয় ভয়ে কম্পিত হয়(২) আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করা হলে, যারা তাদের বিপদে-আপদে ধৈর্য ধারণ করে এবং সালাত কায়েম করে এবং আমরা তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।

الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ عَلٰى مَآ اَصَابَهُمْ وَالْمُقِيْمِي الصَّلٰوةِ ۙ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٣٥﴾

হওয়ার কথা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা প্রমাণ করা যে, হাদঈ বা কুরবানী কেবল চতুষ্পদ জন্তু দ্বারাই সম্ভব। অন্য কিছু দ্বারা সম্ভব নয়। [ফাতহুল কাদীর]

(১) মূলে এসেছে, المخبتين। আরবী ভাষায় خبت শব্দের অর্থ নিম্নভূমি। [ফাতহুল কাদীর] এ কারণে এমন ব্যক্তিকে خبيت বলা হয়, যে নিজেকে হেয় মনে করে। [ফাতহুল কাদীর] এ কারণেই কাতাদাহ্ ও দাহহাক مخبتين-এর অর্থ করেছেন বিনয়ী। মুজাহিদ বলেন, এর অর্থ সন্তুষ্টচিত্ত মানুষ। আমর ইবন্ আউস বলেনঃ এমন লোকদেরকে مخبتين বলা হয়, যারা অন্যের উপর যুলুম করে না। কেউ তাদের উপর যুলুম করলে তারা তার প্রতিশোধ নেয় না। সুফিয়ান সাওরী বলেনঃ যারা সুখে-দুঃখে, স্বাচ্ছন্দ্যে ও অভাব-অনটনে আল্লাহ্‌র ফায়সালা ও তাকদীরে সন্তুষ্ট থাকে, তারাই مخبتين। [ইবন কাসীর] মূলতঃ কোন একটিমাত্র শব্দের সাহায্যে এর অন্তরনিহিত অর্থ পুরোপুরি প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এর মধ্যে রয়েছে তিনটি অর্থঃ অহংকার ও আত্মম্ভরিতা পরিহার করে আল্লাহর সামনে অক্ষমতা ও বিনয়াবনত ভাব অবলম্বন করা। তাঁর বন্দেগী ও দাসত্বে একাগ্র ও একনিষ্ঠ হয়ে যাওয়া। তাঁর ফায়সালায় সন্তুষ্ট হওয়া। পরবর্তী আয়াতই এর সবচেয়ে সুন্দর তাফসীর। [ইবন কাসীর]

(২) وجل এর আসল অর্থ ঐ ভয়-ভীতি, যা কারো মাহাত্ম্যের কারণে অন্তরে সৃষ্টি হয়। [ইবন কাসীর] আল্লাহ্‌র সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের অবস্থা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার যিক্‌র ও নাম শুনে তাদের অন্তরে এক বিশেষ ভীতির সঞ্চার হয়ে যায়। এটা তাদের পূর্ণ বিশ্বাস ও দৃঢ় ঈমানী শক্তির প্রমাণ। [ফাতহুল কাদীর] অন্যত্র এসেছে, "মুমিন তো তারাই যাদের হৃদয় আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা হলে কম্পিত হয় এবং তাঁর আয়াতসমূহ তাদের নিকট পাঠ করা হলে তা তাদের ঈমান বর্ধিত করে। আর তারা তাদের রব-এর উপরই নির্ভর করে।" [সূরা আল-আনফাল: ২] আরও এসেছে, "আল্লাহ্ নাযিল করেছেন উত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব যা সুসামঞ্জস্য এবং যা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা হয়। এতে, যারা তাদের রবকে ভয় করে, তাদের শরীর শিউরে ওঠে, তারপর তাদের দেহমন বিনম্র হয়ে আল্লাহ্‌র স্মরণে ঝুঁকে পড়ে।" [সূরা আয-যুমার: ২৩]

وَالْبُدْنَ جَعَلْنٰهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ ۖ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ ۚ فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۚ كَذٰلِكَ سَخَّرْنٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٣٦﴾

৩৬. আর উট[১]কে আমরা আল্লাহ্‌র নিদর্শনগুলোর অন্যতম করেছি[২]; তোমাদের জন্য তাতে অনেক মঙ্গল রয়েছে[৩]। কাজেই এক পা বাঁধা ও বাকী তিনপায়ে দাঁড়ানো অবস্থায় তাদের উপর তোমরা আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ কর[৪]। তারপর যখন

(১) মূলে الْبُدْنَ শব্দটি এসেছে। আরবী ভাষায় তা শুধুমাত্র উটের জন্য ব্যবহার করা হয়। [কুরতুবী] সাধারণত: ঐ উটকেই بدن বলা হয় যা কা'বার জন্য 'হাদঈ' হিসেবে প্রেরণ করা হয়। আর 'হাদঈ' হচ্ছে, উট, গরু, ছাগল সবগুলোর জন্য ব্যবহৃত নাম। [কুরতুবী] তবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরবানীর বিধানে গরুকেও উটের হুকুমের সাথে শামিল করেছেন ।একটি উট কুরবানী করলে যেমন তা সাতজনের জন্য যথেষ্ট, ঠিক তেমনি সাত জন মিলে একটি গরু কুরবানী দিতে পারে। হাদীসে এসেছে, জাবের ইবন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের হুকুম দিয়েছেন আমরা যেন কুরবানীতে উটের ক্ষেত্রে সাতজন এবং গরুর ক্ষেত্রে সাতজন শরীক হয়ে যাই।" [মুসলিমঃ ১২১৩] হজ্জের হাদঈতেও কুরবানীর মত একটি গরু, মহিষ ও উটে সাতজন শরীক হতে পারে। [কুরতুবী]

(২) পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, দ্বীন ইসলামের আলামতরূপে গণ্য হয়, এমন বিশেষ বিধি-বিধান ও ইবাদাতকে شعائر বলা হয়। হাদঈ যবেহ্ করা এমন বিধানাবলীর অন্যতম। কাজেই এ ধরণের বিধানসমূহ পালন করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

(৩) অর্থাৎ তোমরা তা থেকে ব্যাপকহারে কল্যাণ লাভ করে থাকো। দ্বীন ও দুনিয়ার সার্বিক উপকারিতা তাতে রয়েছে। এখানে কেন হাদঈ যবাই করতে হবে সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে। মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত যেসব জিনিস থেকে লাভবান হয় তার মধ্য থেকে প্রত্যেকটিই আল্লাহর নামে কুরবানী করা উচিত, শুধুমাত্র নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য নয় বরং আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও মালিকানার স্বীকৃতি দেবার জন্যও, যাতে মানুষ মনে মনে ও কার্যত একথা স্বীকার করে যে, আল্লাহ আমাকে যা কিছু দিয়েছেন এ সবই তাঁর। তারপরও এর মাধ্যমে মানুষ দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ লাভ করে থাকে। মুজাহিদ বলেন, এতে যেমন সওয়াব রয়েছে তেমনি রয়েছে উপকার। [ইবন কাসীর] দুনিয়ার উপকারিতা যেমন, খাওয়া, সদকা, ভোগ করা ইত্যাদি ।[সা'দী] ইবরাহীম নাখ'য়ী বলেন, যদি প্রয়োজন হয় তার উপর সওয়ার হতে পারবে এবং দুধ দুইয়ে খেতে পারবে। [ইবন কাসীর] আর আখেরাতের কল্যাণ তো আছেই।

(৪) صَوَآفَّ শব্দের অর্থ তিন পায়ে ভর দিয়ে দণ্ডায়মান থাকবে এবং এক পা বাঁধা থাকবে।

তারা কাত হয়ে পড়ে যায়[১] তখন তোমরা তা থেকে খাও এবং আহার করাও ধৈর্যশীল অভাবগ্রস্তকে ও সাহায্যপ্রার্থীদেরকে[২]; এভাবে আমরা সেগুলোকে তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছি যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

উটের জন্য এই নিয়ম। [কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] দণ্ডায়মান অবস্থায় উট কুরবানী করা সুন্নত ও উত্তম। অবশিষ্ট সব জন্তুকে শোয়া অবস্থায় যবেহ্ করা সুন্নত। [দেখুন, কুরতুবী] তাউস ও হাসান صَوَافَّ শব্দটির অর্থ করেছেন, খালেসভাবে। অর্থাৎ একান্তভাবে আল্লাহ্‌র জন্য। তাঁর নামের সাথে আর কারও নাম নিও না। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] এখানে "তাদের উপর আল্লাহর নাম নাও" বলে আল্লাহ্‌র নামে যবাই করার কথা বলা হয়েছে। ইসলামী শরী'আতে আল্লাহর নাম না নিয়ে পশু যবেহ করার কোন অবকাশ নেই। তাছাড়া এখানে নাম নেয়ার অর্থ শুধু নাম উচ্চারণ নয় বরং মনে-প্রাণে আল্লাহ্‌র জন্য এবং তাঁরই নামে যবাই করা বুঝাবে। যদি কেউ আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে এবং অন্য কোন ব্যক্তি যথা পীর, কবর, মাজার, জিন ইত্যাদির সন্তুষ্টি লাভের ইচ্ছা পোষণ করে তবে তা সম্পূর্ণভাবে হারাম ও শির্ক বলে বিবেচিত হবে।

(১) এখানে وَجَبَتْ-এর অর্থ سَقَطَتْ বা পড়ে যাওয়া করা হয়েছে। যেমন বাকপদ্ধতিতে বলা হয় الشَّمْسُ وَجَبَتْ অর্থাৎ সূর্য ঢলে পড়েছে। এখানে জন্তুর প্রাণ নির্গত হওয়া বোঝানো হয়েছে। [কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] সুতরাং সম্পূর্ণভাবে রূহ নির্গত না হওয়া পর্যন্ত প্রাণী থেকে কিছু খাওয়া জায়েয নেই। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রতিটি বস্তুর উপর দয়া লিখে দিয়েছেন। সুতরাং যখন তোমরা হত্যা করবে, তখন সুন্দরভাবে তা কর। আর যখন যবাই করবে তখন সুন্দরভাবে তা কর। তোমাদের কেউ যেন তার ছুরিটি ধার দিয়ে নেয় এবং যবেহকৃত প্রাণীটিকে শান্তি দেয়।" [আবু দাউদ: ২৮১৫]

(২) যাদেরকে হাদঈ ও কুরবানীর গোশ্‌ত দেয়া উচিত, পূর্ববর্তী আয়াতে তাদেরকে بائس বলা হয়েছে। এর অর্থ দুঃস্থ, অভাবগ্রস্ত। এই আয়াতে তদস্থলে قَانِعٌ ও مُعْتَرّ শব্দদ্বয়ের দ্বারা তার তাফসীর করা হয়েছে। قَانِعٌ ঐ অভাবগ্রস্ত ফকীরকে বলা হয়, যে কারো কাছে যাচঞা করে না, দারিদ্র্য সত্বেও স্বস্থানে বসে থাকে এবং কেউ কিছু দিলে তাতেই সন্তুষ্ট থাকে। পক্ষান্তরে مُعْتَرّ ঐ ফকীরকে বলা হয়, যে কিছু পাওয়ার আশায় অন্যত্র গমন করে-মুখে সওয়াল করুক বা না করুক। [দেখুন, ইবন কাসীর]

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ۗ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ ۗ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٣٧﴾

৩৭. আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছায় না সেগুলোর গোশত এবং রক্ত, বরং তাঁর কাছে পৌঁছায় তোমাদের তাক্‌ওয়া(১)। এভাবেই তিনি এদেরকে তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন যাতে তোমরা আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর এজন্য যে, তিনি তোমাদেরকে হেদায়াত করেছেন; কাজেই আপনি সুসংবাদ দিন সৎকর্মপরায়ণদেরকে(২)।

اِنَّ اللّٰهَ يُدٰفِعُ عَنِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۗ اِنَّ اللّٰهَ

৩৮. নিশ্চয় আল্লাহ্ মুমিনদের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ করেন(৩), তিনি কোন

(১) এখানে একথা বলা উদ্দেশ্য যে, হাদঈ যবেহ্ করা বা কুরবানী করা একটি মহান ইবাদাত; কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে এর গোশ্‌ত ও রক্ত পৌঁছে না কারণ তিনি অমুখাপেক্ষী। আর হাদঈ ও কুরবানীর উদ্দেশ্যও এগুলো নয়; বরং আসল উদ্দেশ্য জন্তুর উপর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা এবং পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারে পালনকর্তার আদেশ পালন করা। তাঁকে যথাযথভাবে স্মরণ করা। [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ অন্তরে তাঁর বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নাও এবং কাজে তার প্রকাশ ঘটাও ও ঘোষণা দাও। এরপর কুরবানীর হুকুমের উদ্দেশ্য ও কারণের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। পশুদের উপর আল্লাহ মানুষকে কর্তৃত্ব দান করেছেন, শুধুমাত্র এ নিয়ামতের বিনিময়ে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাই যথেষ্ট নয়। বরং এ জন্য ওয়াজিব করা হয়েছে যে, এগুলো যাঁর পশু এবং যিনি এগুলোর উপর আমাদের কর্তৃত্ব দান করেছেন, আমরা অন্তরে ও কাজে-কর্মেও তাঁর মালিকানা অধিকারের স্বীকৃতি দেবো, যাতে আমরা কখনো ভুল করে একথা মনে করে না বসি যে, এগুলো সবই আমাদের নিজেদের সম্পদ। কুরবানী করার সময় যে বাক্যটি উচ্চারণ করা হয় তার মধ্য দিয়ে এ বিষয়বস্তুটিরই প্রকাশ ঘটে। যেমন সেখানে বলা হয় "হে আল্লাহ ! তোমারই সম্পদ এবং তোমারই জন্য উপস্থিত"। [আবুদাউদঃ২৭৯৫]

(৩) আয়াতে মুমিনদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের যাবতীয় ক্ষতি দূরিভূত করবেন। এটা শুধু তাদের ঈমানের কারণে। তিনি কাফেরদের ক্ষতি, শয়তানের কুমন্ত্রণার ক্ষতি, নাফসের কুমন্ত্রণার ক্ষতি, তাদের খারাপ আমলের পরিণতি সংক্রান্ত ক্ষতি, এসব কিছুই প্রতিহত করবেন। কোন অপছন্দ কিছু সংঘটিত হলে তিনি তারা যা বহন করার ক্ষমতা নেই সেটা বহন করে নিবেন, ফলে মুমিনদের জন্য সেটা হাল্কা হয়ে যাবে। প্রত্যেক মুমিনই তার ঈমান অনুসারে

لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُوْرٍ ۝٣٨

বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞকে পছন্দ করেন না[1]।

এ প্রতিহত ও প্রতিরোধ প্রাপ্ত হবে। কারও বেশী ও কারও কম। [সা'দী] অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা তা বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, "আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল করে তার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট।" [সূরা আত-তালাক: ৩] "আল্লাহ্ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? অথচ তারা আপনাকে আল্লাহ্র পরিবর্তে অন্যের ভয় দেখায়।" [সূরা আয-যুমার: ৩৬] আরও বলেন, "তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। তোমাদের হাতে আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি দেবেন, তাদেরকে অপদস্থ করবেন, তাদের উপর তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন এবং মুমিন সম্প্রদায়ের চিত্ত প্রশান্তি করবেন, আর তিনি তাদের অন্তরের ক্ষোভ দূর করবেন এবং আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছে তার তাওবা কবুল করবেন। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" [সূরা আত-তাওবাহ: ১৪-১৫] আরও বলেন, "আর আমাদের দায়িত্ব তো মুমিনদের সাহায্য করা।" [সূরা আর-রূম: ৪৭] আরও বলেন, "আর আমাদের বাহিনীই হবে বিজয়ী।" [সূরা আস-সাফফাত: ১৭৩] অনুরূপ আরও আয়াত। এর দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনদের থেকে যাবতীয় খারাপ ও বিপদাপদ প্রতিরোধ করবেন। কেননা আল্লাহ্র উপর ঈমান বিপদাপদ থেকে বাঁচার সবচেয়ে বড় কারণ। অথবা আয়াতের অর্থ, তিনি মুমিনদের পক্ষ থেকে বেশী বেশী প্রতিরোধ ও মোকাবিলা করবেন। যখনই আক্রমণকারী আক্রমণ করে তখনই তিনি তাদের পক্ষ থেকে মোকাবিলা করবেন। তারা যত বেশীই ষড়যন্ত্র ও আক্রমনের সমাবেশ করুক না কেন, তিনি তত বেশীই তাদের পক্ষ থেকে তা প্রতিহত করবেন। [আদওয়াউল বায়ান] সুতরাং কুফর ও ঈমানের সংঘাতে মুমিনরা একা ও নিঃসঙ্গ নয় বরং আল্লাহ নিজেই তাদের সাথে এক পক্ষ হয়ে দাঁড়ান। তিনি তাদেরকে সমর্থন দান করেন। তাদের বিরুদ্ধে শত্রুদের কৌশল ব্যর্থ করে দেন। অনিষ্টকারকদের অনিষ্টকে তাদের থেকে দূরে সরিয়ে দিতে থাকেন। কাজেই এ আয়াতটি আসলে হক পন্থীদের জন্য একটি বড় রকমের সুসংবাদ। তাদের মনকে সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করার জন্য এর চেয়ে বড় আর কোন জিনিস হতে পারে না।

(১) যারাই আল্লাহ্র অর্পিত আমানতের খেয়ানত করে, আল্লাহ্র হক নষ্ট করে, মানুষের হক নষ্ট করে এমন বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞ এবং নিয়ামত অস্বীকারকারীকে আল্লাহ্ কখনও ভালবাসেন না। কারণ, আল্লাহ তার কাছে যেসব আমানত সোপর্দ করেছেন সেগুলোতে সে খেয়ানত করেছে এবং তাকে যেসব নিয়ামত দান করেছেন অকৃতজ্ঞতা, অস্বীকৃতি ও নেমকহারামির মাধ্যমে তার জবাব দিয়ে চলছে। কাজেই আল্লাহ তাকে অপছন্দ করেন। আল্লাহ্ তার প্রতি দয়া ও ইহসান করেন, আর সে আল্লাহ্র প্রতি কুফরী ও অবাধ্যতা করে যাচ্ছে। সুতরাং আল্লাহ্ এটা পছন্দ করতে পারেন না। বরং তিনি সেটা ঘৃণা করেন। ক্রোধান্বিত হন। তিনি তাদের কুফরী ও খেয়ানতের শাস্তি তাদেরকে প্রদান করবেন। [সা'দী]

ষষ্ঠ রুকূ’

৩৯. যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল তাদেরকে যারা আক্রান্ত হয়েছে[১]; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে[২]। আর

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا۟ ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

(১) ইবনে আব্বাস বলেন, এ আয়াত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবীদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। যখন তাদেরকে মক্কা থেকে বের করে দেয়া হয়। [ইবন কাসীর] অধিকাংশ মনীষী বলেছেন, জিহাদের ব্যাপারে এটিই প্রথম নাযিলকৃত আয়াত। ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মক্কা থেকে বের করে দেয়া হলো, তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, এরা অবশ্যই ধ্বংস হবে, তারা তাদের নবীকে বের করে দিয়েছে। ‘ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন’ তখন এ আয়াত নাযিল হয়। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, যুদ্ধ হতে যাচ্ছে। আর এটিই প্রথম যুদ্ধের আয়াত। [তিরমিযী: ৩১৭১; মুসনাদে আহমাদ: ১/২১৬] এর আগে মুসলিমদেরকে যুদ্ধ করতে নিষেধ করা হয়েছিল। তাদেরকে সবর করতে নির্দেশ দেয়া হচ্ছিল। [মুয়াসসার]

(২) এদের উপর যে ধরনের অত্যাচার করে বের করে দেয়া হয় তা অনুমান করার জন্য একটি ঘটনা থেকেই বোঝা যায়: সুহাইব রুমী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু যখন হিজরত করতে থাকেন তখন কুরাইশ বংশীয় কাফেররা তাঁকে বলে, তুমি এখানে এসেছিলে খালি হাতে। এখন অনেক ধনী হয়ে গেছো। যেতে চাইলে তুমি খালি হাতে যেতে পারো। নিজের ধন-সম্পদ নিয়ে যেতে পারবে না। অথচ তিনি নিজে পরিশ্রম করেই এ ধন-সম্পদ উপার্জন করেছিলেন। কারো দান তিনি খেতেন না। ফলে বেচারা হাত-পা ঝেড়ে উঠে দাঁড়ান এবং সবকিছু ঐ জালেমদের হাওয়ালা করে দিয়ে এমন অবস্থায় মদীনায় পৌঁছেন যে, নিজের পরণের কাপড়গুলো ছাড়া তাঁর কাছে আর কিছুই ছিল না। [ইবন হিব্বান: ১৫/৫৫৭] মক্কা থেকে মদীনায় যারাই হিজরত করেন তাদের প্রায় সবাইকেই এ ধরনের যুলুম-নির্যাতনের শিকার হতে হয়। ঘর-বাড়ি ছেড়ে চলে আসার সময়ও যালেমরা তাদেরকে নিশ্চিন্তে ও নিরাপদে বের হয়ে আসতে দেয়নি। মোটকথাঃ মক্কায় মুসলিমদের উপর কাফেরদের নির্যাতন চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল। এমন কোন দিন যেত না যে, কোন না কোন মুসলিম তাদের নিষ্ঠুর হাতে আহত ও প্রহৃত হয়ে না আসত। মক্কায় অবস্থানের শেষ দিনগুলোতে মুসলিমদের সংখ্যাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। তারা কাফেরদের যুলুম ও অত্যাচার দেখে তাদের মোকাবেলায় যুদ্ধ করার অনুমতি চাইতেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে বলতেনঃ সবর কর। আমাকে এখনো যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়নি। দীর্ঘ দশ বছর পর্যন্ত এমনিতর পরিস্থিতি অব্যাহত রইল।

নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদেরকে সাহায্য করতে সম্যক সক্ষম[১];

৪০. তাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বহিস্কার করা হয়েছে শুধু এ কারণে যে, তারা বলে, 'আমাদের রব আল্লাহ্ ।' আল্লাহ্ যদি মানুষদের এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত

الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّآ اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ؕ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا ؕ

(১) অর্থাৎ তিনি তাঁর মুমিন বান্দাদের বিনা যুদ্ধে সাহায্য করতে সক্ষম । কিন্তু তিনি চান তাঁর বান্দারা তাদের প্রচেষ্টা তাঁর আনুগত্যে কাজে লাগাবে । যেমন অন্য আয়াতে এসেছে, "অতএব যখন তোমরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধে মুকাবিলা কর তখন ঘাড়ে আঘাত কর, অবশেষে যখন তোমরা তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত করবে তখন তাদেরকে মজবুতভাবে বাঁধ; তারপর হয় অনুকম্পা, নয় মুক্তিপণ । যতক্ষণ না যুদ্ধ এর ভার (অস্ত্র) নামিয়ে না ফেলে । এরূপই, আর আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে তাদের থেকে প্রতিশোধ নিতে পারতেন, কিন্তু তিনি চান তোমাদের একজনকে অন্যের দ্বারা পরীক্ষা করতে । আর যারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয় তিনি কখনো তাদের আমলসমূহ বিনষ্ট হতে দেন না । অচিরেই তিনি তাদেরকে পথনির্দেশ করবেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করে দিবেন । আর তিনি তাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার পরিচয় তিনি তাদেরকে জানিয়েছিলেন ।" [সূরা মুহাম্মাদ: ৪-৬] আর এজন্যই ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, তিনি অবশ্যই সে সাহায্য করেছেন । [ইবন কাসীর] জিহাদ তো তিনি তখনই ফরয করেছেন যখন তার উপযোগিতা দেখা গিয়েছিল । কেননা, তারা যখন মক্কায় ছিল তখন মুসলিমদের সংখ্যা ছিল কম । যদি তখন জিহাদের কথা বলা হত, তবে তাদের কষ্ট আরও বেড়ে যেত । আর এজন্যই যখন মদীনাবাসীরা আকাবার রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে বাই'আত বা শপথ নিয়েছিল, তারা ছিল আশি জনেরও কিছু বেশী । তখন তারা বলেছিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা কি উপত্যকাবাসীদের উপর আক্রমন করবো না? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমাকে এ জন্য নির্দেশ দেয়া হয়নি । তারপর যখন তারা সীমালঙ্ঘন করল, আর তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাদের কাছ থেকে বের করে দিল এবং তাকে হত্যা করতে চাইল । আর সাহাবায়ে কিরামের কেউ হাবশাতে কেউ মদীনাতে হিজরত করল । তারপর যখন মদীনাতে তারা স্থির হলো এবং তাদের কাছে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে পৌঁছালেন, তারা তার চারপাশে জমা হলেন । তাকে সাহায্য করার জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন । আর তাদের জন্য একটি ইসলামী দেশ হলো, একটি কেল্লা হলো যেখানে তারা আশ্রয় নিতে পারে, তখনই আল্লাহ্ শত্রুদের সাথে জিহাদ করার অনুমতি দিলেন । [ইবন কাসীর]

وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ﴿٤٠﴾

না করতেন[১], তাহলে বিধ্বস্ত হয়ে যেত নাসারা সংসারবিরাগীদের উপাসনাস্থান, গির্জা, ইয়াহূদীদের উপাসনালয়[২] এবং মসজিদসমূহ---যাতে খুব বেশী স্মরণ করা হয় আল্লাহ্‌র নাম। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করেন যে আল্লাহ্‌কে সাহায্য করে[৩]। নিশ্চয় আল্লাহ্

(১) অর্থাৎ আল্লাহ কোন একটি গোত্র বা জাতিকে স্থায়ী কর্তৃত্ব দান করেননি, এটি তাঁর বিরাট অনুগ্রহ। বরং বিভিন্ন সময় দুনিয়ায় একটি দলকে দিয়ে তিনি অন্য একটি দলকে প্রতিহত করতে থেকেছেন। নয়তো কোন একটি নির্দিষ্ট দল যদি কোথাও স্থায়ী কর্তৃত্ব লাভ করতো তাহলে ইবাদাতগৃহসমূহও বিধ্বস্ত হওয়ার হাত থেকে রেহাই পেতো না। সূরা বাকারায় এ বিষয়বস্তুকে এভাবে বলা হয়েছেঃ "যদি আল্লাহ লোকদেরকে একজনের সাহায্যে অন্যজনকে প্রতিহত না করতে থাকতেন তাহলে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়ে যেতো। কিন্তু আল্লাহ সৃষ্টিজগতের প্রতি বড়ই করুণাময়।" [আয়াত ২৫১]

(২) আয়াতে বলা হয়েছে, صَوَامِعُ এ শব্দটি صَوْمَعَةٌ এর বহুবচন। এটা নাসারাদের বিশেষ ইবাদাতখানা। আর بِيَعٌ -শব্দটি بِيْعَةٌ এর বহুবচন। নাসারাদের সাধারণ গীর্জাকে بِيْعَةٌ বলা হয়। ইয়াহূদীদের ইবাদাতখানাকে صَلَوَاتٌ এবং মুসলিমদের ইবাদাতখানাকে مَسَاجِدُ বলা হয়। [ইবন কাসীর] আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, কাফেরদের সাথে যুদ্ধ ও জিহাদের আদেশ নাযিল না হলে কোন যুগেই আল্লাহ্‌র দ্বীনের নিরাপত্তা থাকত না। মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর আমলে صَلَوَاتٌ ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর আমলে صَوَامِعُ ও بِيَعٌ এবং শেষনবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আমলে মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেত। তবে বিগত যামানায় যত শরী'আতের ভিত্তি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এবং ওহীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এখন তা পরিবর্তিত হয়ে কুফর ও শির্কে পরিণত হয়েছে, সেসব শরী'আতের ইবাদাতগৃহসমূহের নাম এই আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, স্ব স্ব যামানায় তাদের ইবাদাতগৃহসমূহের সম্মান ও সংরক্ষণ ফরয ছিল। বর্তমানে সেসব ইবাদতস্থানের সম্মান করার নিয়ম রহিত হয়ে গেছে। লক্ষণীয় যে, আয়াতে সেসব ধর্মের উপাসনালয়ের কথা উল্লেখ করা হয়নি, যেগুলোর ভিত্তি কোন সময়ই নবুওয়ত ও ওহীর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না; যেমন অগ্নিপূজারী মজুস অথবা মূর্তিপূজারী হিন্দু। কেননা, তাদের উপাসনালয় কোন সময়ই নবুওয়ত ও ওহী নির্ভর ছিল বলে প্রমাণিত হয়নি। [দেখুন, কুরতুবী]

(৩) এ বক্তব্যটি কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় উপস্থাপিত হয়েছে। বলা হয়েছে, যারা আল্লাহর বান্দাদেরকে তাওহীদের দিকে আহ্বান করে এবং সত্য দ্বীন কায়েম ও

শক্তিমান, পরাক্রমশালী।

৪১. তারা(১) এমন লোক যাদেরকে আমরা

ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ

মন্দের জায়গায় ভালোকে বিকশিত করার জন্য প্রচেষ্টা চালায়, আর এজন্যে তারা নবী-রাসূল ও তাদের আনীত দ্বীনকে সাহায্য করে এবং আল্লাহ্‌র বন্ধুদের সাহায্য করে, তারা আসলে আল্লাহর সাথে সহযোগিতা করে। [দেখুন, কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর] অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে সাহায্য কর, তবে তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা সমূহ সুদৃঢ় করবেন। আর যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ এবং তিনি তাদের আমলসমূহ ব্যর্থ করে দিয়েছেন।" [সূরা মুহাম্মাদ: ৭-৮] [ইবন কাসীর]

(১) এই আয়াতে তাদেরই বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে, যাদেরকে তাদের ভিটেমাটি থেকে বিনা কারণে উচ্ছেদ করা হয়েছে। এজন্যেই আবুল আলীয়া বলেন, এখানে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের কথা বলা হয়েছে। [ইবন কাসীর] হাসান বসরী বলেন, তারা হচ্ছে এ উম্মতের সে সমস্ত লোক, যারা কোন জায়গা জয় করলে সেখানে সালাত কায়েম করে। ইবন আবী নাজীহ বলেন, এখানে শাসকদের উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। দাহহাক বলেন, এটা এমন এক শর্ত যা আল্লাহ্ তা'আলা যাদেরকে রাষ্ট্র ক্ষমতা প্রদান করেছেন তাদের উপর আরোপ করেছেন। [কুরতুবী] উমর ইবন আবদুল আযীয বলেন, এটি শুধু গভর্ণরের দায়িত্ব নয়, এটা গভর্ণর ও যাদের উপর তাকে গভর্ণর বানানো হয়েছে তাদের সবার দায়িত্ব। আমি কি তোমাদেরকে গভর্ণরের উপর কি দায়িত্ব আর গভর্ণরের জন্য তোমাদের উপর কি দায়িত্ব সেটা জানিয়ে দেব না? গভর্ণরের দায়িত্ব হচ্ছে, তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র হকের ব্যাপারে তোমাদেরকে পাকড়াও করা। আর তোমাদের কারও দ্বারা অপর কারও আক্রান্ত হলে আক্রান্ত ব্যক্তি থেকে তার হক আদায় করা। আর যতটুকু সম্ভব তোমাদেরকে সহজ সরল সঠিক পথে পরিচালিত করা। আর তোমাদের উপর ওয়াজিব হচ্ছে, আনুগত্য করা। তবে জোর করে নয়। অনুরূপভাবে প্রকাশ্য কথার বিপরীতে গোপনে ভিন্ন কথা না বলা। [ইবন কাসীর] আতিয়্যাহ আল-আওফী বলেন, এ আয়াতটি অন্য একটি আয়াতের মত। যেখানে বলা হয়েছে, "তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে আল্লাহ্ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে যমীনে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে"। [সূরা আন-নূর: ৫৫]

আয়াতে বলা হয়েছে যে, আমি তাদেরকে যমীনে প্রতিষ্ঠিত করলে তারা তাদের ক্ষমতাকে সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, সৎকর্মের আদেশ ও অসৎকর্মে নিষেধের কাজে প্রয়োগ করবে। এই আয়াত মদীনায় হিজরতের অব্যবহিত পরে তখন নাযিল হয়, যখন মুসলিমদের কোথাও পূর্ণ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্পর্কে পূর্বেই বলে দিলেন যে, তারা ক্ষমতা লাভ করলে তা দ্বীনের উল্লেখিত গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদনে ব্যয় করবে। এ কারণেই

وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ﴿٤١﴾

যমীনের বুকে প্রতিষ্ঠিত করলে সালাত কায়েম করবে[১], যাকাত দেবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দেবে ও অসৎকাজে নিষেধ করবে; আর সব কাজের চূড়ান্ত পরিণতি আল্লাহ্‌র ইখতিয়ারে।

وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّعَادٌ وَّثَمُوْدُ ﴿٤٢﴾

৪২. আর যদি লোকেরা আপনার প্রতি মিথ্যারোপ করে, তবে তাদের আগে নূহ্‌, 'আদ ও সামূদের সম্প্রদায়ও তো মিথ্যারোপ করেছিল।

وَقَوْمُ اِبْرٰهِيْمَ وَقَوْمُ لُوْطٍ ﴿٤٣﴾

৪৩. এবং ইব্‌রাহীম ও লূতের সম্প্রদায়,

وَّاَصْحٰبُ مَدْيَنَ ۚ وَكُذِّبَ مُوْسٰى فَاَمْلَيْتُ لِلْكٰفِرِيْنَ ثُمَّ اَخَذْتُهُمْ ۚ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿٤٤﴾

৪৪. আর মাদ্‌ইয়ানবাসীরা; অনুরূপভাবে মিথ্যারোপ করা হয়েছিল মূসার প্রতিও। অতঃপর আমি কাফেরদেরকে অবকাশ দিয়েছিলাম, তারপর আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছিলাম। অতএব (প্রত্যক্ষ করুন) আমার প্রত্যাখ্যান (শাস্তি) কেমন ছিল[২]!

ওসমান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ ثَنَاءٌ قَبْلَ بَلَاءٍ - অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলার এই এরশাদ কর্ম অস্তিত্ব লাভ করার পূর্বেই কর্মীদের গুণ ও প্রশংসা করার শামিল। [আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর] এরপর আল্লাহ্‌ তা'আলার এই নিশ্চিত সুসংবাদ দুনিয়াতে বাস্তব রূপ লাভ করেছে। চারজন খোলাফায়ে রাশেদীন এ আয়াতের বিশুদ্ধ প্রতিচ্ছবি ছিলেন। [কুরতুবী] আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকেই ক্ষমতা দান করলেন এবং কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণীর অনুরূপ তাদের কর্ম ও কীর্তি বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, তারা তাদের ক্ষমতা এ কাজেই ব্যয় করেন। তারা সালাত প্রতিষ্ঠিত করেন, যাকাতের ব্যবস্থা সুদৃঢ় করেন, সৎকাজের প্রবর্তন করেন এবং মন্দ কাজের পথ রুদ্ধ করেন।

(১) সালাত কায়েম করার অর্থ হলোঃ সময়মত, সালাতের সীমারেখা, আরকান ও আহকামসহ জামা'আতের সাথে আদায় করা।

(২) এখানে যে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তা হলো, نكير এর অর্থ, কোন কিছুকে পূর্ণভাবে অস্বীকার করা। অর্থাৎ তাদের কর্মকাণ্ডের পরিণতি অস্বীকার করে আমার যে সমস্ত কর্মপ্রণালী ছিল তা কেমন হয়েছে তা দেখে নিন। তারা নবী-রাসূলদেরকে অস্বীকার

৪৫. অতঃপর আমরা বহু জনপদ ধ্বংস করেছি যেগুলোর বাসিন্দা ছিল যালেম। ফলে এসব জনপদ তাদের ঘরের ছাদসহ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। অনুরূপভাবে বহু কূপ পরিত্যক্ত হয়েছে এবং অনেক সুদৃঢ় প্রাসাদও!

فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَٰهَا وَهِىَ ظَالِمَةٌ فَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ ﴿٤٥﴾

৪৬. তারা কি যমীনে ভ্রমণ করেনি? তাহলে তারা জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন হৃদয় ও শ্রুতিশক্তিসম্পন্ন শ্রবণের অধিকারী হতে পারত[১]। বস্তুত চোখ তো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হচ্ছে বুকের মধ্যে অবস্থিত হৃদয়।

أَفَلَمْ يَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَٰرُ وَلَٰكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِى فِى ٱلصُّدُورِ ﴿٤٦﴾

৪৭. আর তারা আপনাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে, অথচ আল্লাহ্ তাঁর প্রতিশ্রুতি কখনো ভংগ করেন না[২]।

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُۥ ۚ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا

করে, তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্নের মাধ্যমে যে অন্যায় করেছিল আমি সে অন্যায়কে অস্বীকার করে তার প্রতিকার করেছি তাদেরকে প্রথমে ছাড় দিয়ে তারপর পাকড়াও করে শাস্তি বিধান করার মাধ্যমে। তাদের নেয়ামতসমূহ ধ্বংস করার মাধ্যমে। [দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(১) এই আয়াতে শিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেশভ্রমণে উৎসাহিত করা হয়েছে এতে আরও ইঙ্গিত আছে যে, অতীতকাল ও অতীত জাতিসমূহের অবস্থা সরেযমীনে প্রত্যক্ষ করলে মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি বৃদ্ধি পায়। তবে শর্ত এই যে, এসব অবস্থা শুধু ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নয়, শিক্ষা গ্রহণের দৃষ্টিভঙ্গিতেও দেখতে হবে। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

(২) আয়াতের পূর্ণ অর্থ কি? এ ব্যাপারে কয়েকটি মত রয়েছে- (এক) এসব মিথ্যাপ্রতিপন্নকারীরা তাদের মূর্খতা, অবাধ্যতা ও অদূরদর্শিতার কারণে তাড়াতাড়ি আল্লাহ্‌র আযাব কামনা করছে। অথচ আল্লাহ্ কখনো ওয়াদা খেলাফ করেন না। তিনি যে শাস্তির ধম্‌কি দিয়েছেন, তা আসবেই। তারা আপনার কাছে তাড়াতাড়ি সে শাস্তি কামনা করলেও তা তো আর আপনার কাছে নেই, সুতরাং তাদের এই তাড়াহুড়া করা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হওয়ার কিছুই নেই। কেননা, তাদের সামনে রয়েছে কেয়ামত দিবস, যেদিন তিনি পূর্বাপর সমস্ত সৃষ্টিজগতকে একত্রিক করবেন। তখন

تَعُدُّوْنَ﴿٤٧﴾

আর নিশ্চয় আপনার রব-এর কাছে একদিন তোমাদের গণনার হাজার বছরের সমান[১];

وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ اَخَذْتُهَا ۚ وَاِلَيَّ الْمَصِيْرُ﴿٤٨﴾

৪৮. আর আমি অবকাশ দিয়েছি বহু জনপদকে যখন তারা ছিল যালেম; তারপর আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছি, আর আমারই কাছে প্রত্যাবর্তনস্থল।

সপ্তম রুকূ'

قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَاۤ اَنَا لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ﴿٤٩﴾

৪৯. বলুন, 'হে মানুষ! আমি তো কেবল তোমাদের জন্য এক সুস্পষ্ট সতর্ককারী;

فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ﴿٥٠﴾

৫০. কাজেই যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তাদের জন্য আছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা[২];

তিনি তাদেরকে তাদের প্রতিফল দেবেন। তাদের উপর তো চিরস্থায়ী শাস্তি আপতিত হবে। সুতরাং দুনিয়ার বুকে তাদের উপর শাস্তি আসুক বা নাই আসুক, সেদিন তা তাদের উপর আসবেই। [দেখুন, ইবন কাসীর] (দুই) যদি আয়াতে উল্লেখিত আযাব দ্বারা দুনিয়ার আযাব উদ্দেশ্য হয় তখন আগের অংশের সাথে পরের অংশের মিল হবে এভাবে যে, তোমাদের উপর আযাব দুনিয়াতেই আসবে। আর সেটা এসেছিল বদরের যুদ্ধে। [কুরতুবী]

(১) এ আয়াতে বলা হয়েছে, "আপনার রব-এর কাছে একদিন তোমাদের গণনার হাজার বছরের সমান"। আখেরাতের একদিন সার্বক্ষণিকভাবে দুনিয়ার এক হাজার বছরের সমান হওয়ার ব্যাপারে বিভিন্ন হাদীসে এর পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 'নিঃস্ব মুসলিমগণ ধনীদের থেকে অর্ধেক দিন পাঁচশত বছর পূর্বে জান্নাতে যাবে।' [তিরমিযিঃ ২৩৫৩, ২৩৫৪]। সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে, বান্দাদের এক হাজার বছরের সমান হচ্ছে আল্লাহ্‌র একদিন। [ইবন কাসীর]

(২) "মাগফেরাত" বলতে বুঝানো হয়েছে অপরাধ,পাপ, ভুল-ভ্রান্তি ও দুর্বলতা উপেক্ষা করা ও এড়িয়ে চলা। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাদের পূর্ববর্তী সকল গোনাহ মাফ করে দিবেন। আর "সম্মানজনক জীবিকা"র অর্থ, জান্নাত। [ইবন কাসীর]

৫১. এবং যারা আমাদের আয়াতসমূহকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করে, তারাই হবে জাহান্নামের অধিবাসী।

وَالَّذِيْنَ سَعَوْا فِيْٓ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿٥١﴾

৫২. আর আমরা আপনার পূর্বে যে রাসূল কিংবা নবী প্রেরণ করেছি[১], তাদের কেউ যখনই (ওহীর কিছু) তিলাওয়াত করেছে[২], তখনই শয়তান তাদের

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلَا نَبِيٍّ اِلَّآ اِذَا تَمَنّٰٓى اَلْقَى الشَّيْطٰنُ فِيْٓ اُمْنِيَّتِهٖ ۚ فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطٰنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ ۗ

(১) এ থেকে জানা যায় যে, রাসূল ও নবী এক নয়; পৃথক পৃথক অর্থ রাখে। তবে এ পার্থক্য নির্ধারণে আলেমগণের মধ্যে বিভিন্ন মত রয়েছেঃ
(এক) রাসূল বলা হয়- যার কাছে ওহী পাঠানো হয়েছে এবং প্রচারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে আর নবী বলা হয়- যার কাছে ওহী পাঠানো হয়েছে কিন্তু প্রচারের নির্দেশ দেয়া হয়নি। (দুই) রাসূল হলেন যাকে নতুন শরী'আত দিয়ে পাঠানো হয়েছে এবং প্রচারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আর নবী হলেন যাকে পূর্ববর্তী শরী'আতের অনুসারী সংস্কারক হিসেবে পাঠানো হয়েছে। (তিন) রাসূল হলেন যাকে দ্বীনের বিরোধী জাতির কাছে পাঠানো হয়েছে, আর নবী হলেন যাকে দ্বীনের স্বপক্ষীয় জাতির কাছে পাঠানো হয়েছে। তবে সবচেয়ে প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত হল- রাসূল হলেনঃ যাকে দ্বীন-বিরোধী জাতি অর্থাৎ কাফের সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি মানুষকে তার কাছে যে শরী'আত আছে সে শরী'আতের দিকে আহ্বান করবেন। তাকে সে জাতির কেউ কেউ মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে এবং তার সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হবে। তিনি প্রচার ও ভীতি প্রদর্শনের জন্য নির্দেশিত হবেন। কখনো কখনো তার সাথে কিতাব থাকবে আর এটাই স্বাভাবিক, আবার কখনো কখনো রাসূলের সাথে কিতাব থাকবে না। কখনো তার শরী'আত হবে সম্পূর্ণ নতুন, আবার কখনো তার শরী'আত হবে পূর্ববর্তী শরী'আতের পরিপূরক হিসেবে। অর্থাৎ সেখানে বাড়তি বা কমতি থাকবে। আর নবী হলেনঃ যার কাছে ওহী প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি মুমিন সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরিত হবেন। পূর্ব শরী'আত অনুযায়ী হুকুম দেবেন। পূর্ব শরী'আতকে পুনর্জীবিত করবেন এবং সেদিকে মানুষকে আহ্বান করবেন। তাকে প্রচার ও ভীতি প্রদর্শনের নির্দেশও দেয়া হবে। তার জন্য নতুন কিতাব থাকাও অসম্ভব নয়। [এ ব্যাপারে বিস্তারিত দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, আন-নুবুওয়াত: ২/৭১৮; ইবনুল কাইয়্যেম, তরীকুল হিজরাতাইন, ৩৪৯; ইবন আবিল ইযয, শারহুত তাহাভীয়্যা: ১৫৮; ড. উমর সুলাইমান আল-আশকার, আর-রুসুল ওয়ার রিসালাত: ১৪-১৫]

(২) মূল শব্দটি হচ্ছে, تمنى (তামান্না)। আরবী ভাষায় এ শব্দটি দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয়। একটি অর্থ হচ্ছে কোন জিনিসের আশা-আকাংখা করা। [ফাতহুল কাদীর] দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে তিলাওয়াত অর্থাৎ কিছু পাঠ করা। তবে আয়াতে تمنى শব্দের অর্থ قرأ অর্থাৎ

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٥٢﴾

তিলাওয়াতে (কিছু) নিক্ষেপ করেছে, কিন্তু শয়তান যা নিক্ষেপ করে আল্লাহ্ তা বিদূরিত করেন[১]। তারপর আল্লাহ্ তাঁর আয়াতসমূকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِى الشَّيْطٰنُ فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ ؕ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَفِىْ شِقَاقٍۢ بَعِيْدٍ ﴿٥٣﴾

৫৩. এটা এ জন্য যে, শয়তান যা প্রক্ষিপ্ত করে তিনি সেটাকে পরীক্ষাস্বরূপ করেন তাদের জন্য যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে আর যারা

আবৃত্তি করে এবং أمنية শব্দের অর্থ قراءة অর্থাৎ আবৃত্তি করা। [কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] আরবী অভিধানে এ অর্থ প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। আয়াতের অর্থ হল- আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পূর্বে যখনই কোন নবী বা রাসূল পাঠিয়েছেন, তিনি যখন মানুষকে উপদেশ দেয়ার জন্য আদেশ-নিষেধ প্রদান করতেন, তখনি সেখানে শয়তান মানুষের কানে তার ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তমূলক এমন কথাবার্তা প্রবিষ্ট করত যা নবীর কথা ও পড়ার সম্পূর্ণ বিপরীত বিষয়। আর আল্লাহ্ যেহেতু নবী-রাসূলদেরকে উম্মতের জন্য প্রচার করা বিষয়সমূহ এবং তাঁর ওহীর হেফাযত ও সম্পূর্ণ নিরাপত্তা বিধান করেছেন, সেহেতু তিনি শয়তানের সে সমস্ত কারসাজি ও ষড়যন্ত্রকে স্থায়িত্ব দেন না; বরং অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দেন। ফলে কোনটা আল্লাহ্‌র আয়াত আর কোনটা তাঁর আয়াত নয়, তা সুস্পষ্ট হয়ে পড়ে। এভাবেই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর আয়াতসমূহের হেফাযত করে থাকেন। মূলতঃ আল্লাহ্ প্রবল পরাক্রান্ত মহাশক্তিধর। তিনি একদিকে তাঁর সুনির্দিষ্ট হেকমত ও প্রজ্ঞার কারণে শয়তানের পক্ষ থেকে তা হতে দেন অপরদিকে তাঁর শক্তিতে তাঁর ওহীর হেফাযত করেন। যাতে করে যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে এবং কঠোর হৃদয়ের অধিকারী মানুষদের মনে শয়তানের এ বাক্যগুলো ফেৎনা সৃষ্টি করতে পারে। এর বিপরীতে যাদের কাছে রয়েছে ইলম বা জ্ঞান, তারা এ দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে এবং শয়তানের প্রক্ষিপ্ত বিষয় ত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে। বরং এতে তাদের অন্তরে ঈমান বর্ধিত হয় এবং তারা আল্লাহ্‌র জন্য বিনম্র ও বিনয়ী হয়ে পড়ে। [বাগভী; কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর; সা'দী থেকে সংক্ষেপিত]

(১) অর্থাৎ তিনি জানেন শয়তান কোথায় কি বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে এবং তার কি প্রভাব পড়েছে। তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা শয়তানী ফিতনার প্রতিবিধান করে থাকে। তিনি শয়তানী চক্রান্তকে কখনো সফল হতে দেন না। প্রক্ষিপ্ত অংশ বাতিল করে দেন। [দেখুন, ইবন কাসীর]

পাষাণহৃদয়[১]। আর নিশ্চয় যালেমরা দুস্তর বিরোধিতায় লিপ্ত রয়েছে।

وَّلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوْا بِهٖ فَتُخْبِتَ لَهٗ قُلُوْبُهُمْ ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿۵۴﴾

৫৪. আর এ জন্যেও যে, যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তারা যেন জানতে পারে যে, এটা আপনার রব-এর কাছ থেকে পাঠানো সত্য; ফলে তারা তার উপর ঈমান আনে ও তাদের অন্তর তার প্রতি বিনয়াবনত হয়। আর যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ্ নিশ্চয় তাদেরকে সরল পথ প্রদর্শনকারী।

وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً اَوْ يَاْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيْمٍ ﴿۵۵﴾

৫৫. আর যারা কুফরী করেছে, তারা তাতে সন্দেহ পোষণ থেকে বিরত হবে না, যতক্ষণ না তাদের কাছে কেয়ামত এসে পড়বে হঠাৎ করে, অথবা এসে পড়বে এক বন্ধ্যা দিনের শাস্তি[২]।

---

(১) অর্থাৎ শয়তানের ফিতনাবাজীকে আল্লাহ লোকদের জন্য পরীক্ষা এবং নকল থেকে আসলকে আলাদা করার একটা মাধ্যমে পরিণত করেছেন। বিকৃত মানসিকতাসম্পন্ন লোকেরা এসব জিনিস থেকে ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং এগুলো তাদের জন্য ভ্রষ্টতার উপকরণে পরিণত হয়। অন্যদিকে স্বচ্ছ চিন্তার অধিকারী লোকেরা এসব কথা থেকে নবী ও আল্লাহর কিতাবের সত্য হবার দৃঢ় প্রত্যয় লাভ করে এবং তারা অনুভব করতে থাকে যে, এগুলো শয়তানের অনিষ্টকর কার্যকলাপ। এ জিনিসটি তাদেরকে একদম নিশ্চিন্ত করে দেয় যে, এটি নির্ঘাত কল্যাণ ও সত্যের দাওয়াত। যা আল্লাহ্র জ্ঞানে ও সংরক্ষণে নাযিল হয়েছে, সুতরাং তার সাথে অন্য কিছু মিলে মিশে যাবে না। বরং এটি হচ্ছে এমন প্রাজ্ঞ কিতাব, "বাতিল এতে অনুপ্রবেশ করতে পারে না---সামনে থেকেও না, পিছন থেকেও না। এটা প্রজ্ঞাময়, স্বপ্রশংসিতের কাছ থেকে নাযিলকৃত।" [সূরা ফুসসিলাত: ৪২] এভাবে তাদের ঈমান আরও দৃঢ় হয়। তারা বিশ্বাসী এবং অনুগত হয়। তাদের মন এ কুরআনের জন্য বিনয়ী হয়ে যায়। [ইবন কাসীর]

(২) মূলে আছে عقيم শব্দ। এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে "বন্ধ্যা"। [ফাতহুল কাদীর] দিনকে বন্ধ্যা বলার দু'টি অর্থ হতে পারে। যদি দুনিয়ার দিন উদ্দেশ্য হয়, তখন অর্থ হবে, আযাব ও শাস্তি নাযিলের দিন। যা এমন ভাগ্য বিড়ম্বিত দিন তাতে কোনরকম কলাকৌশল কার্যকর হয় না। কোন কল্যাণ ও দয়া অবশিষ্ট থাকে না। প্রত্যেকটা প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়

اَلۡمُلۡکُ یَوۡمَئِذٍ لِّلّٰهِ ؕ یَحۡکُمُ بَیۡنَهُمۡ ؕ فَالَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِیۡ جَنّٰتِ النَّعِیۡمِ ﴿۵۶﴾

৫৬. সেদিন আল্লাহ্‌রই আধিপত্য; তিনিই তাদের মাঝে বিচার করবেন। অতঃপর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে, তারা নেয়ামত পরিপূর্ণ জান্নাতে অবস্থান করবে।

وَالَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا وَکَذَّبُوۡا بِاٰیٰتِنَا فَاُولٰٓئِکَ لَهُمۡ عَذَابٌ مُّهِیۡنٌ ﴿۵۷﴾

৫৭. আর যারা কুফরী করেছে ও আমাদের আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ করেছে, তাদেরই জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

অষ্টম রুকূ'

وَالَّذِیۡنَ هَاجَرُوۡا فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰهِ ثُمَّ قُتِلُوۡۤا اَوۡ مَاتُوۡا لَیَرۡزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزۡقًا حَسَنًا ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ خَیۡرُ الرّٰزِقِیۡنَ ﴿۵۸﴾

৫৮. আর যারা হিজরত করেছে আল্লাহ্‌র পথে, তারপর নিহত হয়েছে অথবা মারা গেছে, তাদেরকে আল্লাহ্ অবশ্যই উৎকৃষ্ট জীবিকা দান করবেন; আর নিশ্চয় আল্লাহ্, তিনি তো সর্বোৎকৃষ্ট রিযিকদাতা।

প্রত্যেকটা আশা নিরাশায় পরিণত হয়। যেমন, বদরের দিন। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] এ দিনটি প্রতি উম্মতের জন্যই এসেছিল। যেদিন নূহের জাতির উপর তুফান এলো সেদিনটি তাদের জন্য ছিল 'বন্ধ্যা' দিন। এমনিভাবে আদ, সামুদ, লূতের জাতি, মাদইয়ানবাসী ও অন্যান্য সকল ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির জন্য আল্লাহর আযাব নাযিলের দিনটি বন্ধ্যা দিনই প্রমাণিত হয়েছে। কারণ, "সেদিনের" পরে আর তার "পরের দিন" দেখা যায়নি এবং নিজেদের বিপর্যস্ত ভাগ্যকে সৌভাগ্যে রূপান্তরিত করার কোন পথই খুঁজে পাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। রহমত ও দয়ার দেখা তারা আর পায় নি। সুতরাং দুনিয়াতে এ আযাব ও যুদ্ধের দিনগুলো হচ্ছে বন্ধ্যা দিন। অথবা এখানে বন্ধ্যা দিন বলে কিয়ামতের দিনকে বুঝানো হয়েছে। কারণ সেটা এমন দিন যার পরে আর কোন রাত নেই। [কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর; সা'দী] সেদিন যখন আসবে তখন কাফেররা জানতে পারবে যে, তারা মিথ্যাবাদী ছিল। আর তারা অনুশোচনা করবে, কিন্তু তাদের সে অনুশোচনা কোন কাজে আসবে না। তারা যাবতীয় কল্যাণ হতেই নিরাশ ও হতাশ হয়ে যাবে। তখন আশা করবে, যদি তারা রসুলের উপর ঈমান আনত এবং তার পথে চলত। সুতরাং এ আয়াতে তাদের মিথ্যা পথ ও বানোয়াট রাস্তায় স্থির থাকার ব্যাপারে সাবধান করা হয়েছে। [সা'দী]

لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿٥٩﴾

৫৯. তিনি তাদেরকে অবশ্যই এমন স্থানে প্রবেশ করাবেন, যা তারা পছন্দ করবে, আর আল্লাহ্‌ তো সম্যক জ্ঞানী[১], পরম সহনশীল।

ذَٰلِكَ ۖ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ﴿٦٠﴾

৬০. এটাই হয়ে থাকে, আর কোন ব্যক্তি নিপীড়িত হয়ে নিপীড়ন পরিমান প্রতিশোধ গ্রহণ করলে[২] তারপর পুনরায় সে নিপীড়িত হলে আল্লাহ্‌ তাকে অবশ্যই সাহায্য করবেন[৩]; নিশ্চয় আল্লাহ্‌ পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল[৪]।

---

(১) এ আয়াতের শেষে আল্লাহ্‌র দু'টি গুরুত্বপূর্ণ গুণসম্পন্ন নাম এসেছে, যার সাথে আয়াতের বক্তব্যের সম্পর্ক নির্ণয়ে বলা যায় যে, প্রথম গুণটি বলা হয়েছে যে তিনি হচ্ছেন عليم বা সর্বজ্ঞাত অর্থাৎ তিনি জানেন কে প্রকৃতপক্ষে তাঁর পথে ঘর-বাড়ি ত্যাগ করেছে এবং সে কোন ধরনের পুরস্কার লাভের যোগ্য। দ্বিতীয়গুণটি বলা হয়েছে, তিনি حليم বা পরম সহিষ্ণু অর্থাৎ এ ধরনের ছোট ছোট ভুল-ভ্রান্তি ও দুর্বলতার কারণে তাদের বড় বড় কর্মকাণ্ড ও ত্যাগকে তিনি বিনষ্ট করে দেবেন না। তিনি সেগুলো উপেক্ষা করবেন এবং তাদের অপরাধ মাফ করে দেবেন। [ইবন কাসীর]

(২) প্রথমে এমন মাযলুমদের কথা বলা হয়েছিল যারা যুলুমের জবাবে কোন পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি। আর এখানে এমন মযলুমদের কথা বলা হচ্ছে যারা যুলুমের জবাবে শক্তি ব্যবহার করে। আয়াতে মযলুমকে যালিমের সাথে সে ধরনের ব্যবহার করতে বলেছে যে ধরনের ব্যবহার সে মাযলুমের সাথে করেছে। সুতরাং যদি কেউ যালেমের সাথে তার যুলুম অনুরূপ ব্যবহার করে, তবে তাতে কোন দোষ নেই। [সা'দী] এটাকে শাস্তি বলা হলেও আসলে এটি প্রতিশোধ। [দেখুন, কুরতুবী]

(৩) অর্থাৎ যুলুমের জবাবে যে প্রতিশোধ নেয়া হবে, তাতে দোষের কিছু নেই। তারপর যদি তার উপর আবার যুলুম করা হয়, তবে আল্লাহ্‌ তাকে সাহায্য করবেন। কেননা সে মাযলুম। সুতরাং সে তার অধিকার আদায় করেছে বা প্রতিশোধ নিয়েছে বলে তার উপর যুলুম করা বৈধ হবে না। সুতরাং যদি অন্যায় ও যুলুমের প্রতিশোধ নেয়ার পর কেউ প্রতিশোধ নেয়ার কারণে তার উপর যুলুম করা হলে আল্লাহ্‌ তাকে সাহায্য করেন, তাহলে যে ব্যক্তি তার উপর অন্যায় ও যুলুমের প্রতিশোধ নেয়নি সে আল্লাহ্‌র সাহায্য পাবার অধিক নিকটবর্তী। [সা'দী]

(৪) আয়াতের এ অংশের সম্পর্ক শুধুমাত্র নিকটবর্তী শেষ বাক্যটির সাথে হলে এর অর্থ হবে, যদিও প্রথম অন্যায়কারীর অন্যায় বেশী, তারপরও তোমরা বেশী প্রতিশোধ না

৬১. এটা এ জন্যে যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ রাতকে প্রবেশ করান দিনের মধ্যে এবং দিনকে প্রবেশ করান রাতের মধ্যে[১]। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা[২];

ذٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ يُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَأَنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌۢ بَصِيرٌ ﴿٦١﴾

৬২. এজন্যেও যে, নিশ্চয় আল্লাহ্, তিনিই সত্য এবং তারা তাঁর পরিবর্তে যাকে ডাকে তা তো অসত্য[৩]। আর নিশ্চয়

ذٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِۦ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ

নিয়ে প্রতিশোধে সমতা বিধানের কারণ হচ্ছে, আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও মার্জনা গুণ দু'টি এটাই চাচ্ছে যে, যুলুমের বিপরীতে সম প্রতিশোধই নেয়া হোক, কারণ, তা হকের কাছাকাছি। আর যদি এ গুণ দু'টির সম্পর্ক উপরের কতেক আয়াতের সাথে সমভাবে হয়, অর্থাৎ হিজরতকারীদের সাথে হয়, তখন অর্থ হবে, মুহাজিরদের এরকম প্রতিফল এজন্যেই দেব যে, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, মার্জনাকারী। তিনি তাদের গোনাহ ক্ষমা করে দিবেন। [আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

(১) অর্থাৎ তিনিই সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক এবং দিন রাত্রির আবর্তন তাঁরই কর্তৃত্বাধীন। তিনি রাতের এক অংশে দিনের প্রবেশ ঘটান, আবার দিনের একাংশে রাত প্রবেশ করান। তাই কখনও দিন বড় হয়, আবার কখনও রাত বড় হয়। [ইবন কাসীর] এই বাহ্যিক অর্থের সাথে সাথে এ বাক্যের মধ্যে এদিকেও একটি সূক্ষ্ম ইংগিত রয়েছে যে, রাতের অন্ধকার থেকে যে আল্লাহ দিনের আলো বের করে আনেন এবং উজ্জ্বল দিনের উপর যিনি রাতের অন্ধকার জড়িয়ে দেন তাঁরই এমন ক্ষমতা আছে যার ফলে আজ যাদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব রয়েছে তাদের দ্রুত দুনিয়াবাসী দেখতে পাবে এবং কুফর ও জাহেলিয়াতের অন্ধকার তাঁর হুকুমে সরে যাবে এবং এ সংগে সেদিনের উদয় হবে যেদিন সত্য, সততা ও জ্ঞানের আলোকে সারা দুনিয়া আলোকিত হয়ে উঠবে। মুমিনরা বিজয় লাভ করবে। [দেখুন, আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

(২) এ আয়াতে মহান আল্লাহ্‌র দু'টি মহান গুণ বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। অর্থাৎ তিনি অন্ধ ও বধির আল্লাহ নন বরং এমন আল্লাহ যিনি দেখতে ও শুনতে পান। বান্দাদের যাবতীয় অবস্থা, কার্যক্রম ও উঠাবসা তাঁর কাছে গোপন নেই। [ইবন কাসীর] সুতরাং কে তার কাছে সাহায্য চাচ্ছে এবং কার সাহায্য করা দরকার এটা তিনি সম্যক অবগত। আর তিনি তাকে সেভাবে সময়মত ঠিকই সাহায্য-সহযোগিতা করবেন।

(৩) অর্থাৎ তিনিই সত্যিকার ক্ষমতার অধিকারী ও যথার্থ রব। একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করা যাবে। কারণ, তিনিই মহান শক্তিধর, তিনি যা চাইবেন তা হবে, আর যা চাইবেন না তা হবে না। সবকিছু তাঁরই মুখাপেক্ষী। সবাই তাঁর কাছে মাথা নোয়াতে বাধ্য। [ইবন কাসীর] সুতরাং তাঁর বন্দেগীকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে না। আর অন্যান্য

الْكَبِيرُ ﴿٦٢﴾

আল্লাহ্, তিনিই সমুচ্চ, সুমহান[১]।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً ۗ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ

৬৩. আপনি কি দেখেন না যে, আল্লাহ্ পানি বর্ষণ করেন আকাশ হতে; যাতে সবুজ শ্যামল হয়ে উঠে যমীন[২]? নিশ্চয়

সকল মাবুদই আসলে পুরোপুরি অসত্য ও অর্থহীন। তাদেরকে যেসব গুণাবলী ও ক্ষমতার মালিক মনে করা হয়েছে সেগুলোর মূলত কোন ভিত্তি নেই। তারা লাভ বা ক্ষতি কিছুরই মালিক নয়। [ইবন কাসীর] সুতরাং আল্লাহর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তাদের ভরসায় যারা বেঁচে থাকে তারা কখনো সফলতা লাভ করতে পারে না।

(১) আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, এবং আল্লাহ্, তিনিই তো সমুচ্চ, মহান। অনুরূপ অন্যত্র বলা হয়েছে, "আর তিনি সুউচ্চ সুমহান।" [সূরা আল-বাকারাহ: ২৫৫] আরও এসেছে, "তিনি গায়েব ও প্রকাশ্যের জ্ঞানী, মহান, সর্বোচ্চ।" [সূরা আর-রা'দ: ৯] সুতরাং সবকিছুই তাঁর ক্ষমতা, প্রতাপ ও মাহাত্ম্যের অধীন। তিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই। তিনি ব্যতীত আর কোন রব নেই। তিনিই মহান, তাঁর চেয়ে মহৎ কেউ নেই। তিনিই সর্বোচ্চ সত্তা, তাঁর উপরে কেউ নেই, তিনিই বড় তাঁর থেকে বড় কেউ নেই। যালেমরা তাঁর সম্পর্কে যা বলে তা থেকে তিনি কতই না পবিত্র ও মহান! [ইবন কাসীর]

(২) এখানে আবার প্রকাশ্য অর্থের পেছনে একটি সুক্ষ্ম ইশারা প্রচ্ছন্ন রয়েছে। প্রকাশ্য অর্থ তো হচ্ছে কেবলমাত্র আল্লাহর ক্ষমতা বর্ণনা করা। কিন্তু এর মধ্যে এ সুক্ষ্ম ইশারা রয়েছে যে, আল্লাহ যে বৃষ্টি বর্ষণ করেন তার ছিটেফোঁটা পড়ার সাথে সাথেই যেমন তোমরা দেখো বিশুষ্ক ভূমি অকস্মাৎ সবুজ শ্যামল হয়ে উঠে, ঠিক তেমনি আজ যে অহীর শান্তিধারা বর্ষিত হচ্ছে তা শিগগিরই তোমাদের এক অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখাবে। তোমরা দেখবে আরবের অনুর্বর বিশুষ্ক মরুভূমি জ্ঞান, নৈতিকতা ও সুসংস্কৃতির গুলবাগীচায় পরিণত হয়ে গেছে। অথবা আয়াতে পুনরুত্থানের প্রতি বিশ্বাসের জন্য এ উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। কারণ, সাধারণতঃ বৃষ্টি ও তার দ্বারা নতুন করে ফসলের উৎপাদনের ব্যাপারটি কুরআনের বিভিন্ন স্থানে পুনরুত্থানের প্রমাণ হিসেবে এসেছে। যেমন, "আর তাঁর একটি নিদর্শন এই যে, আপনি ভূমিকে দেখতে পান শুস্ক ও ঊষর, তারপর যখন আমরা তাতে পানি বর্ষণ করি তখন তা আন্দোলিত ও স্ফীত হয়।" [সূরা ফুসসিলাত: ৩৯] কারণ, তারপরেই স্পষ্ট বলে দেয়া হয়েছে যে, "নিশ্চয় যিনি যমীনকে জীবিত করেন তিনি অবশ্যই মৃতদের জীবনদানকারী। নিশ্চয় তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।" [সূরা ফুসসিলাত: ৩৯] অন্যত্র বলেছেন, "সুতরাং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের ফল সম্বন্ধে চিন্তা করুন, কিভাবে তিনি যমীনকে জীবিত করেন সেটার মৃত্যুর পর।" [সূরা আর-রূম: ৫০] কারণ আল্লাহ্ তারপর বলেছেন, "এভাবেই আল্লাহ্ মৃতকে জীবিত করেন, আর তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

خَبِيرٌ ۝٦٣

আল্লাহ্ সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবহিত(১) ।

لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ وَإِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۝٦٤

৬৪. আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে তা তাঁরই । আর নিশ্চয় আল্লাহ্, তিনিই তো অভাবমুক্ত, পরম প্রশংসিত(২) ।

[সূরা আর-রূম: ৫০] আরও বলেছেন, " বান্দাদের রিয্‌কস্বরূপ । আর আমরা বৃষ্টি দিয়ে সঞ্জীবিত করি মৃত ভূমিকে ।" [সূরা কাফ: ৯-১১] কারণ আয়াতের শেষাংশেই আল্লাহ্ বলেছেন, এভাবেই উত্থান ঘটবে ।" [সূরা কাফ: ১১] অর্থাৎ মৃত্যুর পর কবর থেকে জীবিত হয়ে বের হওয়া, বা পুনরুত্থান ঘটা । যেমন অন্য আয়াতে এসেছে, "আর এভাবেই তোমাদেরকে বের করা হবে ।" [সূরা আর-রূম: ১৯] আরও এসেছে, "আর এভাবেই আমরা মৃতদের বের করব, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর ।" [সূরা আল-আ'রাফ: ৫৭] এ সংক্রান্ত আরও বহু আয়াত রয়েছে । [আদওয়াউল বায়ান] সুতরাং আয়াত দ্বারা আল্লাহ্‌র ক্ষমতা সম্পর্কে চিন্তাকরার পাশাপাশি আখেরাতের জন্য পুনরুত্থানের উপর বিশ্বাসেরও প্রমাণ পেশ করা হয়ে গেছে ।

(১) এ আয়াতের শেষে মহান আল্লাহ্‌র দু'টি গুরুত্বপূর্ণ গুণসম্পন্ন নাম উল্লেখ করা হয়েছে । প্রথমেই বলা হয়েছে, তিনি لطيف । এর মানে হচ্ছে, অননুভূত পদ্ধতিতে নিজের ইচ্ছা ও সংকল্প পূর্ণকারী । তিনি এমন কৌশল অবলম্বন করেন যার ফলে লোকেরা তার সূচনায় কখনো তার পরিণামের কল্পনাও করতে পারে না । তিনি এত সুক্ষ্মদর্শী যে, ছোট বড় কোন কিছু তাঁর দৃষ্টি এড়ায় না । [ফাতহুল কাদীর] অনরূপভাবে, তিনি বান্দার রিযক অত্যন্ত সুক্ষ্ম পদ্ধতিতে পৌঁছিয়ে থাকেন । তদ্রূপ অত্যন্ত সূক্ষ্ম পদ্ধতিতে তিনি কোন দানার কাছে পানির ব্যবস্থা করে সেটাকে মাটি থেকে তা উৎপন্ন করেন । [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর] لطيف এর অন্য অর্থ হচ্ছে, মেহেরবান, দয়াশীল । সে হিসেবে তিনি বান্দাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাদের জন্য বৃষ্টির ব্যবস্থা করেছেন । এর মাধ্যমে তাদের রিযিকের ব্যবস্থাও করেন । [আদওয়াউল বায়ান] তারপর দ্বিতীয় গুণটি বলা হয়েছে যে, তিনি خبير অর্থাৎ তিনি নিজের দুনিয়ার অবস্থা, প্রয়োজন ও উপকরণাদি সম্পর্কে অবগত । কোথায় কোন দানা কিভাবে পড়ে আছে সেটাকে কি করতে হবে সে সম্পর্কে তিনি সম্যক অবগত । তাঁর কাছে কোন কিছুই গোপন নেই । তিনি সেগুলোতে পানির অংশ পৌঁছিয়ে সেটা থেকে উদ্ভিদ বের করে আনেন । [ইবন কাসীর] যেমন অন্য আয়াতে বলেছেন, "হে প্রিয় বৎস! নিশ্চয় তা (পাপ-পুণ্য) যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয়, অতঃপর তা থাকে শিলাগর্ভে অথবা আসমানসমূহে কিংবা যমীনে, আল্লাহ্ তাও উপস্থিত করবেন । নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবহিত ।" [সূরা লুকমান: ১৬]

(২) এ আয়াতের শেষেও মহান রাব্বুল আলামীনের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ গুণবাচক নামের সমাহার আমরা লক্ষ্য করি । বলা হয়েছে যে, তিনি ﴿الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ অর্থাৎ তিনি "অমুখাপেক্ষী" সবকিছুরই তিনি মালিক, আর সবকিছু তাঁরই মুখাপেক্ষী, তাঁরই

নবম রুকূ’

الَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ؕ وَيُمْسِكُ السَّمَآءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿٦٥﴾

৬৫. আপনি কি দেখতে পান না যে, আল্লাহ্ তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন[১] পৃথিবীতে যা কিছু আছে সেসবকে এবং তাঁর নির্দেশে সাগরে বিচরণশীল নৌযানসমূহকে? আর তিনিই আসমানকে[২] ধরে রাখেন যাতে তা পড়ে না যায় যমীনের উপর তাঁর অনুমতি ছাড়া। নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষের প্রতি স্নেহপ্রবণ, পরম দয়ালু।

বান্দা। [ইবন কাসীর] আর তিনিই “প্রশংসার্হ” অর্থাৎ প্রশংসা ও স্তব-স্তুতি একমাত্র তাঁরই জন্য এবং কেউ প্রশংসা করুক বা না করুক সর্বাবস্থায় তিনি প্রশংসিত। [কুরতুবী]

(১) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা‘আলা ভূপৃষ্ঠের জীবজন্তু, নিশ্চল বস্তুনিচয়, ক্ষেত-খামার, ফল-ফলাদি সবকিছুই মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন। যেমন অন্য আয়াতে বলেছেন, “আর তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন আসমানসমূহ ও যমীনের সমস্ত কিছু নিজ অনুগ্রহে”। [সূরা আল-জাসিয়া: ১৩] [ইবন কাসীর] এখানে জানা দরকার যে, যমীনের সবকিছুকে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন, আজ্ঞাধীন করে দেননি। কারণ, আজ্ঞাধীন করে দিলে এর পরিণাম স্বয়ং মানুষের জন্য ক্ষতিদায়ক হত। কারণ, মানুষের স্বভাব, আশা-আকাঙ্খা ও প্রয়োজন বিভিন্নরূপ। একজন নদীকে একদিকে গতি পরিবর্তন করার আদেশ করত, অন্যজন তার বিপরীত দিকে আদেশ করত। এর পরিণাম অনর্থ সৃষ্টি ছাড়া কিছুই হত না। এ কারণেই আল্লাহ্ তা‘আলা সবকিছুকে আজ্ঞাধীন তো নিজেরই রেখেছেন, কিন্তু অধীন করার যে আসল উপকার তা মানুষকে পৌঁছে দিয়েছেন।

(২) অর্থাৎ আল্লাহ্‌র বিশেষ রহমত যে, তিনি আকাশকে যমীনের উপর ছেড়ে দেন না। যদি তাঁর রহমত ও শক্তি তা না করত, তবে আসমান যমীনের উপর পড়ে যেত। ফলে এতে যা আছে তা ধ্বংস হয়ে যেত। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, “অবশ্যই আল্লাহ্ আসমানসমূহ ও যমীনকে ধারণ করেন, যাতে তারা স্থানচ্যুত না হয়, আর যদি তারা স্থানচ্যুত হয় তবে তিনি ছাড়া কেউ তাদেরকে ধরে রাখতে পারে না। অবশ্যই তিনি অতি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।” [সূরা ফাতির: ৪১] [সা‘দী]

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ۗ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ ﴿٦٦﴾

৬৬. আর তিনিই তোমাদেরকে জীবিত করেছেন; তারপর তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, পুনরায় তিনিই তোমাদেরকে জীবিত করবেন। মানুষ তো খুব বেশী অকৃতজ্ঞ[১]।

لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوْهُ فَلَا

৬৭. আমরা প্রত্যেক উম্মতের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছি 'মানসাক'[২] (ইবাদত

(১) অর্থাৎ এসব কিছু দেখেও আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম যে সত্য পেশ করেছেন তা অস্বীকার করে যেতে থাকে। এটা নি:সন্দেহে বড় ধরনের কুফরী। কারণ, তারা আল্লাহ্‌র নেয়ামতকে অস্বীকার করছে। তারা বরং আরও বেড়ে গিয়ে পুনরুত্থান ও আল্লাহ্‌র শক্তিকেও অস্বীকার করে বসে। [সা'দী]

(২) আয়াতের منسك শব্দটি مصدر ধরে অর্থ করা হবে, শরী'আত। [কুরতুবী] অর্থাৎ প্রত্যেক নবীর উম্মতের জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা সুনির্দিষ্ট শরী'আত ও ইবাদাত পদ্ধতি নির্ধারণ করেছেন। তারা সে অনুসারে ইবাদাত করবে। যদিও তাদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে পার্থক্য ছিল কিন্তু মূল আদল, হিকমতে কোন পার্থক্য ছিল না। [সা'দী] সে সব উম্মত তাদের কাছে যে শরী'আত এসেছে, সেটা অনুসারে আমল করে। সুতরাং তাওরাত ছিল ইবাদাত ও শরী'আতের পদ্ধতি, কিন্তু তা ছিল মূসা আলাইহিস সালামের সময় হতে ঈসা আলাইহিস সালামের সময় পর্যন্ত। আর ইঞ্জীল ছিল ইবাদাত ও শরী'আতের পদ্ধতি, তবে তা ছিল ঈসা আলাইহিস সালামের সময় হতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় পর্যন্ত। সে ধারাবাহিকতায় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের জন্যও আল্লাহ্ তা'আলা ইবাদাত ও হজ্জের নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ করেছেন। সুতরাং তাদেরকে তা মেনে চলতে হবে। [ফাতহুল কাদীর]

অথবা আয়াতের منسك শব্দটি اسم ظرف বা স্থান নির্দেশক বিশেষ্য। তখন এর অর্থ হবে نسك এর স্থান। হজ্জের স্থান, বা ইবাদাতের স্থান। [ফাতহুল কাদীর] কেননা, অভিধানে نسك এর অর্থ এমন নির্দিষ্ট স্থান, যা কোন বিশেষ ভাল অথবা মন্দ কাজের জন্য নির্ধারিত থাকে। এ কারণেই হজ্জের বিধি-বিধানকে مناسك الحج বলা হয়। কেননা, এগুলোতে বিশেষ বিশেষ স্থান বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য নির্ধারিত আছে। [ইবন কাসীর] সে হিসেবে আয়াতের অর্থ হবে, প্রতিটি উম্মতের জন্যই আমরা শরী'আত হিসেবে ইবাদতের জন্য একটি স্থান নির্ধারণ করেছি। তারা সেখানে একত্রিত হবে। তাই কাফেররা যেন আপনার সাথে এ ব্যাপারে ঝগড়া না করে। অথবা আয়াতের অর্থ, প্রতিটি উম্মতই একটি স্থানকে তাদের জন্য নির্ধারণ করে নিয়েছে। আর আল্লাহ্ প্রকৃতিগতভাবে তাদের সেটা করতে দেন। (শরী'আতগতভাবে সেগুলো আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অনুমোদিত নয়) তারা সেটা

يُنَازِعُنَّكَ فِى الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ ۖ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُّسْتَقِيمٍ ﴿٦٧﴾

পদ্ধতি) যা তারা পালন করে। কাজেই তারা যেন এ ব্যাপারে আপনার সাথে বিতর্ক না করে। আর আপনি আপনার রব-এর দিকে ডাকুন, আপনি তো সরল পথেই প্রতিষ্ঠিত।

وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٦٨﴾

৬৮. আর তারা যদি আপনার সাথে বিতণ্ডা করে তবে বলে দিন, 'তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সম্যক অবগত'[১]।

করবেই। সুতরাং আপনি তাদের সে সমস্ত কর্মকাণ্ড নিয়ে তাদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হবেন না। তাদের সাথে এ সমস্ত বাতিল বিষয় নিয়ে তর্ক করে আপনি আপনার কাছে যে হক এসেছে সেটাকে ছেড়ে দিবেন না। আর এজন্যই আয়াতের পরবর্তী অংশে বলা হয়েছে, "আপনি তাদেরকে আপনার রব-এর দিকে ডাকুন, আপনি তো সরল পথেই প্রতিষ্ঠিত।" অর্থাৎ আপনার বিরোধীরাই পথচ্যুত। আপনি স্পষ্ট সরল-সোজা পথে আছেন যা আপনাকে মনজিলে মাকসূদে পৌঁছে দিবে। [ইবন কাসীর]

অথবা আয়াতে منسك অর্থ যবেহ্ করার বিধি-বিধান বা জন্তুর গোশ্‌ত খাওয়ার পদ্ধতি। [ফাতহুল কাদীর] সে হিসেবে আয়াতে কাফেরদের কোন সুনির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়েছে। কোন কোন কাফের মুসলিমদের সাথে তাদের যবেহ্ করা জন্তু সম্পর্কে অনর্থক তর্ক-বিতর্ক করত। তারা বলত: তোমাদের দ্বীনের এই বিধান আশ্চর্যজনক যে, যে জন্তুকে তোমরা স্বহস্তে হত্যা কর, তা তো হালাল এবং যে জন্তুকে আল্লাহ্ তা'আলা সরাসরি মৃত্যু দান করেন অর্থাৎ সাধারণ মৃত জন্তু তা হারাম। তাদের এই বিতর্কের জবাবে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। [কুরতুবী] অতএব, এখানে منسك এর অর্থ হবে যবেহ্ করার নিয়ম। জবাবের সারমর্ম এই যে, মৃতজন্তু হালাল নয়, এটা এই উম্মত ও শরী'আতেরই বৈশিষ্ট্য নয়; পূর্ববর্তী শরী'আতসমূহেও তা হারাম ছিল। সুতরাং তোমাদের এই উক্তি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এই ভিত্তিহীন কথার উপর ভিত্তি করে নবীগণের সাথে বিতর্কে প্রবৃত্ত হওয়া একেবারেই নির্বুদ্ধিতা।

(১) যেমন অন্য আয়াতে এসেছে, "আর তারা যদি আপনার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তবে আপনি বলুন, 'আমার কাজের দায়িত্ব আমার এবং তোমাদের কাজের দায়িত্ব তোমাদের। আমি যা করি সে বিষয়ে তোমরা দায়মুক্ত এবং তোমরা যা কর সে বিষয়ে আমিও দায়মুক্ত।" [সূরা ইউনুস: ৪১] তারপর বলা হয়েছে, 'তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সম্যক অবহিত' যেমন অন্য আয়াতে এসেছে, "তোমরা যে বিষয়ে আলোচনায় লিপ্ত আছ, সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবগত। আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে তিনিই যথেষ্ট।" [সূরা আল-আহকাফ: ৮]

৬৯. 'তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছ আল্লাহ্ কেয়ামতের দিন সে বিষয়ে তোমাদের মধ্যে বিচার-মীমাংসা করে দেবেন[১]।'

اَللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿٦٩﴾

৭০. আপনি কি জানেন না যে, আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে আল্লাহ্ তা জানেন। এসবই তো আছে এক কিতাবে[২]; নিশ্চয় তা আল্লাহ্র নিকট অতি সহজ।

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ فِىْ كِتٰبٍ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ﴿٧٠﴾

(১) যেমন অন্য আয়াতে বলেছেন, "সুতরাং আপনি তার দিকে ডাকুন এবং তাতেই দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকুন যেভাবে আপনি আদিষ্ট হয়েছেন এবং তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না; এবং বলুন, 'আল্লাহ্ যে কিতাব নাযিল করেছেন আমি তাতে ঈমান এনেছি এবং আমি আদিষ্ট হয়েছি তোমাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করতে। আল্লাহ্ আমাদের রব এবং তোমাদেরও রব। আমাদের আমল আমাদের এবং তোমাদের আমল তোমাদের; আমাদের ও তোমাদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ নেই। আল্লাহ্ আমাদেরকে একত্র করবেন এবং ফিরে যাওয়া তাঁরই কাছে।" [সূরা আশ-শূরা: ১৫]

(২) আল্লাহ্ তা'আলা এখানে তাঁর সৃষ্টিকুল সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানের কথা জানাচ্ছেন। আর এও জানাচ্ছেন যে, আসমান ও যমীনের সবকিছুকে তাঁর জ্ঞান ঘিরে আছে। তা থেকে ছোট কিংবা বড় সামান্যতম জিনিসও বাদ পড়ে না। তিনি সৃষ্টিকুলের সবকিছু সেগুলোর অস্তিত্বের আগ থেকেই জানেন। আর তিনি সেগুলো লাওহে মাহফূযে লিখে রেখেছেন। যেমন হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ্ আসমান ও যমীন সৃষ্টি করার পঞ্চাশ হাজার বছর আগেই সৃষ্টিকুলের তাকদীর লিখে রেখেছেন। আর তখন তাঁর আরশ ছিল পানির উপর"। [মুসলিম: ২৬৫৩] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ্ যখন কলম সৃষ্টি করলেন, তখন তাকে বললেন, লিখ। কলম বলল, কি লিখব? আল্লাহ্ বললেন, যা হবে সবই লিখ। তখন কিয়ামত পর্যন্ত যা হবে তা লিখতে কলম চালু হল।" [মুসনাদে আহমাদ: ৫/৩১৭] এ সবই আল্লাহ্র পূর্ণ জ্ঞানের প্রমাণ যে, তিনি সবকিছু হওয়ার আগেই তা জানেন। আর তিনি সেটা নির্ধারণ করেছেন এবং লিখে রেখেছেন। সুতরাং বান্দারা যা করবে, কিভাবে করবে সেটা তাঁর জ্ঞানে পূর্ব থেকেই বিদ্যমান। সৃষ্টির আগেই জানেন যে, এ সৃষ্টি তার ইচ্ছা অনুসারে আমার আনুগত্য করবে, আর এ সৃষ্টি তার ইচ্ছা অনুসারে আমার অবাধ্য হবে। আর তিনি সেটা লিখে রেখেছেন এবং জ্ঞানে সবকিছু পরিবেষ্টন করে আছেন। এটা তাঁর জন্য সহজ ও অনায়াসসাধ্য। [ইবন কাসীর]

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهٖ عِلْمٌ ۗ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ ﴿٧١﴾

৭১. আর তারা 'ইবাদাত করে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুর যার সম্পর্কে তিনি কোন দলীল নাযিল করেননি এবং যার সম্বন্ধে তাদের কোন জ্ঞান নেই[১]। আর যালেমদের কোন সাহায্যকারী নেই[২]।

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ تَعْرِفُ فِيْ وُجُوْهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ ۗ يَكَادُوْنَ يَسْطُوْنَ بِالَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ۗ قُلْ اَفَاُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكُمْ ۗ اَلنَّارُ ۗ وَعَدَهَا اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۗ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿٧٢﴾

৭২. আর তাদের কাছে আমাদের সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হলে আপনি কাফেরদের মুখমণ্ডলে অসন্তোষ দেখতে পাবেন। যারা তাদের কাছে আমাদের আয়াত তিলাওয়াত করে তাদেরকে তারা আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। বলুন, 'তবে কি আমি তোমাদেরকে এর চেয়েও মন্দ কিছুর

(১) অর্থাৎ আল্লাহর কোন কিতাবে বলা হয়নি, 'আমি অমুক অমুককে আমার সাথে প্রভুত্বের কর্তৃত্বে শরীক করেছি। কাজেই আমার সাথে তোমরা তাদেরকেও ইবাদাতে শরীক করো।' সুতরাং তাদের কাছে এ ব্যাপারে কোন দলীল-প্রমাণ নেই। অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ তা বলেছেন, "আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে অন্য ইলাহ্‌কে ডাকে, এ বিষয়ে তার নিকট কোন প্রমাণ নেই; তার হিসাব তো তার রব-এর নিকটই আছে; নিশ্চয়ই কাফেররা সফলকাম হবে না।" [সূরা আল-মুমিনূন: ১১৭] আর কোন জ্ঞান মাধ্যমেও তারা এ কথা জানেনি যে, এরা অবশ্যই প্রভুত্বের কর্তৃত্বে অংশীদার এবং এজন্য এরা ইবাদাতলাভের হকদার। সুতরাং এখন যেভাবে বিভিন্ন ধরনের উপাস্য তৈরী করে এদের গুণাবলী ও ক্ষমতা সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের আকীদা তৈরী করে নেয়া হয়েছে এবং প্রয়োজন পূরণের জন্য এদের কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে, এসব কিছু জাহেলী ধারণার অনুসরণ ছাড়া আর কিছু হতে পারে? এ ব্যাপারে তাদের সর্বোচ্চ কথা হচ্ছে, তারা এগুলো তাদের পিতা-প্রপিতা পূর্বপুরুষদেরকে করতে দেখেছে। আর তারা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করবে। কোন দলীল-প্রমাণ তাদের নেই। কেবল শয়তান তাদের অন্তরে এগুলো সুশোভিত করে দিয়েছে। [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ এ নির্বোধরা মনে করছে, আল্লাহ্‌র আযাব নাযিল হলে এ উপাস্যরা দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের সাহায্যকারী হবে। অথচ আসলে তাদের কোনই সাহায্যকারী নেই, এ উপাস্যরা তো নয়ই। কারণ তাদের সাহায্য করার কোন ক্ষমতা নেই। আর আল্লাহও তাদের সাহায্যকারী নন। [ইবন কাসীর]

সংবাদ দেব? --- এটা আগুন[১]। যারা কুফরি করে আল্লাহ্ তাদেরকে এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর এটা কত নিকৃষ্ট ফিরে যাওয়ার স্থান!'

দশম রুকূ'

৭৩. হে মানুষ! একটি উপমা দেয়া হচ্ছে, মনোযোগের সাথে তা শোন: তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা তো কখনো একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না, এ উদ্দেশ্যে তারা সবাই একত্র হলেও[২]। এবং মাছি যদি কিছু

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَٱسْتَمِعُوا۟ لَهُۥٓ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخْلُقُوا۟ ذُبَابًا وَلَوِ ٱجْتَمَعُوا۟ لَهُۥ ۖ وَإِن يَسْلُبْهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْـًٔا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ۚ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ﴿٧٣﴾

(১) অর্থাৎ আল্লাহর কালাম কুরআন পেশ করা হয়, সঠিক দলীল প্রমাণাদি উল্লেখ করার মাধ্যমে তাওহীদের কথা জানানো হয় এবং বলা হয় যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, আর রাসূলগণ হক ও সত্য, তখন যারা সঠিক দলীল প্রমাণাদি উপস্থাপন করে, তাদের প্রতি এদের হাত মুখ আক্রমণাত্মক হয়ে যায়। বলুন, তোমাদের মনে যে ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠে তার চেয়ে মারাত্মক জিনিস অথবা তাঁর আয়াত যারা শুনায় তাদের সাথে যে সবচেয়ে খারাপ ব্যবহার তোমরা করতে পারো তার চেয়েও খারাপ জিনিসের মুখোমুখি তোমাদের হতে হবে। আর তা হচ্ছে জাহান্নাম ও তার শাস্তি ও নিগ্রহ। [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ সাহায্যপ্রার্থী তো দুর্বল হবার কারণেই তার চাইতে উচ্চতর কোন শক্তির কাছে সাহায্য চাচ্ছে। কিন্তু এ উদ্দেশ্যে সে যাদের কাছে সাহায্য চাচ্ছে তাদের দুর্বলতার অবস্থা হচ্ছে এই যে, তারা একটি মাছির কাছেও হার মানে। এখন তাদের দুর্বলতার অবস্থা চিন্তা করো যারা নিজেরাও দুর্বল এবং যাদের উপর নির্ভর করে তাদের আশা-আকাংখা-কামনা-বাসনাগুলো দাঁড়িয়ে আছে তারাও দুর্বল। আল্লাহ ছাড়া তারা যাদের ইবাদাত করে, এরা সবাই যদি একত্রিত হয়ে একটি মাছি বানাতে চেষ্টা করে তবে তাতেও সমর্থ হবে না। যেমন এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আর তার চেয়ে বড় যালেম আর কে, যে আমার সৃষ্টির মত সৃষ্টি করতে চায়? তাহলে সে একটি পিপড়া বা ছোট বস্তু তৈরী করে দেখাক, অথবা একটি মাছি তৈরী করুক, অথবা একটি দানা তৈরী করে দেখাক” [মুসনাদে আহমাদ: ২/৩৯১] অন্য বর্ণনায় আরও এসেছে, “সে যেন একটি যবের দানা তৈরী করে দেখায়” [বুখারী: ৫৯৫৩, ৭৫৫৯] অপর বর্ণনায় এসেছে, “সে যেন একটি মশা তৈরী করে দেখায়।” [মুসনাদে আহমাদ: ২/২৫৯] বস্তুত তারা একটি মাছি তৈরী করতেও সক্ষম নয়। বরং তার চেয়েও তাদের অবস্থা আরও অধম। [ইবন কাসীর]

ছিনিয়ে নিয়ে যায় তাদের কাছ থেকে, এটাও তারা তার কাছ থেকে উদ্ধার করতে পারবে না। অন্বেষণকারী ও অন্বেষণকৃত কতই না দুর্বল[১];

৭৪. তারা আল্লাহকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়নি যেমন মর্যাদা দেয়া উচিত ছিল[২], নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমতাবান, পরাক্রমশালী।

مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ۝

৭৫. আল্লাহ্ ফিরিশ্‌তাদের মধ্য থেকে মনোনীত করেন রাসূল এবং মানুষের মধ্য থেকেও[৩]; নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সম্যক দ্রষ্টা[৪]।

اَللّٰهُ يَصْطَفِيْ مِنَ الْمَلٰۗىِٕكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ۝

---

(১) বলা হয়েছে, যে মূর্তিদেরকে তোমরা কার্যোদ্ধারকারী মনে কর, তারা এতই অসহায় ও শক্তিহীন যে, সবাই একত্রিত হয়ে একটি মাছির ন্যায় নিকৃষ্ট বস্তুও সৃষ্টি করতে পারে না। সৃষ্টি করা তো বড় কথা, তোমরা রোজই তাদের সামনে মিষ্টান্ন, ফল-মূল ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য রেখে দাও। মাছিরা এসে সেগুলো খেয়ে ফেলে। মাছিদের কাছ থেকে নিজেদের ভোগের বস্তুকে বাঁচিয়ে রাখার শক্তিও তাদের হয় না। অতএব, তারা তোমাদেরকে বিপদ থেকে কিরূপে উদ্ধার করবে? এ কারণেই আয়াতের শেষে ﴿ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ﴾ বলে তাদের মূর্খতা ও বোকামী ব্যক্ত করা হয়েছে; অর্থাৎ যাদের উপাস্যই এমন শক্তিহীন সেই উপাস্যের উপাসক আরো বেশী শক্তিহীন হবে। ইবন আব্বাস বলেন, মূর্তি ও মাছি উভয়ই দুর্বল। [দেখুন, কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(২) অর্থাৎ এই নির্বোধ নিমকহারামরা আল্লাহ্‌র মর্যাদা বোঝেনি। ফলে এমন সর্বশক্তিমানের সাথে এমন শক্তিহীন ও চেতনাহীন প্রস্তরসমূহকে শরীক সাব্যস্ত করেছে। এমন সর্বজ্ঞানী স্রষ্টার সাথে তাঁর সৃষ্ট কোন কোন বান্দাকে শরীক সাব্যস্ত করছে। [দেখুন ফাতহুল কাদীর; সা'দী]

(৩) পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তাঁর নিজের পূর্ণতা ও মূর্তিদের দুর্বলতা বর্ণনা করলেন, আর এও বর্ণনা করলেন যে তিনিই একমাত্র মা'বুদ, এ আয়াতে তাঁর রাসূলদের অবস্থা বর্ণনা করছেন। তারা সমস্ত সৃষ্টি থেকে আলাদা প্রকৃতির। তাদের রয়েছে ভিন্ন বিশেষত্ব। [সা'দী]

(৪) অর্থাৎ যিনি রাসূলদেরকে পছন্দ করে নিয়েছেন তিনি এমন নন যে, তাদের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে বেখবর। বরং তিনি সবকিছু দেখেন ও শোনেন। প্রত্যেক ব্যক্তির

৭৬. তাদের সামনে ও পিছনে যা কিছু আছে তিনি তা জানেন এবং সব বিষয়ই আল্লাহ্‌র কাছে প্রত্যাবর্তিত করা হবে[১]।

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۗ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٧٦﴾

৭৭. হে মুমিনগণ! তোমরা রুকূ‘ কর, সিজ্‌দা কর এবং তোমাদের রব-এর ‘ইবাদাত কর ও সৎকাজ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার[২]।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۩ ﴿٧٧﴾

৭৮. আর জিহাদ কর আল্লাহ্‌র পথে যেভাবে জিহাদ করা উচিত[৩]। তিনি

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ

প্রকাশ্য ও গোপন অবস্থা একমাত্র তিনিই জানেন। তিনি জানেন কোথায় তাঁর রিসালাত রাখতে হবে আর কে এর জন্য অধিক উপযুক্ত। তিনি রাসূলদের পাঠান, ফলে তাদের কেউ কেউ এতে সাড়া দেয়, আর কেউ দেয় না। কিন্তু রাসূলদের দায়িত্ব এখানেই শেষ। তারপরই তারা আল্লাহ্‌র দরবারে ফিরে যাবে। সেখানেই তাদের কর্মকাণ্ডের প্রতিফল পাবে। [সা‘দী]

(১) তারা যা করেছে এবং যা কল্যাণকর ছিল অথচ তারা করেনি এসবই আল্লাহ্ জানেন। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, “আর আমরা লিখে রাখি যা তারা আগে পাঠায় ও যা তারা পিছনে রেখে যায়।” [সূরা ইয়াসীন: ১২]

(২) অর্থাৎ সফল হতে হলে এ কাজগুলো করতে হবে। সালাত কায়েম করতে হবে, রুকু ও সিজদার মাধ্যমে, এ দু’টি সালাতেরই গুরুত্বপূর্ণ রুকন। আর এ ইবাদতই হচ্ছে চক্ষু শীতলকারী, চিন্তান্বিত অন্তরের জন্য সান্ত্বনা। আর আল্লাহ্‌র রুবুবিয়াতে বিশ্বাসের এটাই দাবী যে, বান্দা একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করবে এবং যাবতীয় কল্যাণের কাজ করবে। [সা‘দী]

(৩) جهاد ও مجاهدة শব্দের অর্থ কোন লক্ষ্য অর্জনের জন্য পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করা এবং তজ্জন্যে কষ্ট স্বীকার করা। [বাগভী] কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধেও মুসলিমরা তাদের কথা, কর্ম ও সর্বপ্রকার সম্ভাব্য শক্তি ব্যয় করে। তাই এই যুদ্ধকেও জিহাদ বলা হয়। ﴿حَقَّ جِهَادِهِ﴾ -এর অর্থ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য কাফেরদের বিরুদ্ধে সম্পদ, জিহ্বা ও জান দিয়ে জিহাদ করা। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] অর্থাৎ তাতে জাগতিক নাম-যশ ও গনীমতের অর্থ লাভের লালসা না থাকা। কারও কারও মতে, ﴿حَقَّ جِهَادِهِ﴾ বা যথাযথ জিহাদ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহ্‌র যাবতীয় নির্দেশ মান্য করা, আর যাবতীয় নিষেধ পরিত্যাগ করা। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র আনুগত্যে নিজেদের প্রবৃত্তির সাথে জিহাদ করা এবং নাফসকে প্রবৃত্তির দাসত্ব হতে

اجْتَبٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِلَّةَ أَبِيْكُمْ إِبْرٰهِيْمَ ۚ هُوَ سَمّٰكُمُ

তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন[১]। তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা রাখেননি[২]।

ফিরিয়ে আনা। আর শয়তানের সাথে জিহাদ করবে তার কুমন্ত্রণা ঝেঁড়ে ফেলে দিয়ে, যালেমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে তাদের যুলুমের প্রতিরোধ করে এবং কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে তাদের কুফরিকে প্রতিহত করে।[কুরতুবী] কারও কারও মতে, ﴿حَقَّ جِهَادِهٖ﴾ এর অর্থ জিহাদে পূর্ণ শক্তি ব্যয় করা এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে কর্ণপাত না করা।[ফাতহুল কাদীর] দাহ্হাক ও মুকাতিল বলেনঃ ﴿حَقَّ جِهَادِهٖ﴾ দ্বারা উদ্দেশ্য, আল্লাহ্র জন্য কাজ করা, যেমন করা উচিত এবং আল্লাহ্র ইবাদাত করা যেমন করা উচিত। আব্দুল্লাহ্ ইবন মুবারক বলেনঃ এ স্থলে জিহাদ বলে নিজের প্রবৃত্তি ও অন্যায় কামনা-বাসনার বিরুদ্ধে জিহাদ করা বোঝানো হয়েছে।[বাগভী]

(১) ওয়াসিলা ইবনে আসকা' রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র বনী-ইসমাঈলের মধ্য থেকে কেনানা গোত্রকে মনোনীত করেছেন, অতঃপর কেনানার মধ্য থেকে কুরাইশকে, অতঃপর কুরাইশের মধ্য থেকে বনী-হাশেমকে এবং বনী-হাশেমের মধ্য থেকে আমাকে মনোনীত করেছেন।[মুসলিমঃ ২২৭৬]

(২) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা এ দ্বীনে তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা রাখেননি। 'দ্বীনে সংকীর্ণতা নেই' -এই বাক্যের তাৎপর্য বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে, কোন কোন মুফাসসির বলেন, এর অর্থঃ এই দ্বীনে এমন কোন গোনাহ্ নেই, যা তাওবা করলে মাফ হয় না এবং আখেরাতের আযাব থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার কোন উপায় হতে পারে না। পূর্ববর্তী উম্মতদের অবস্থা এর বিপরীত। তাদের মধ্যে এমন কতিপয় গোনাহ্ও ছিল, যা তাওবা করলেও মাফ হত না।[ফাতহুল কাদীর]

কারও কারও নিকট এর অর্থ, দ্বীনের মধ্যে এমন কোন হুকুম নেই যা মানুষকে সমস্যায় নিপতিত করবে। বরং এখানে যাবতীয় সংকীর্ণ অবস্থা থেকে উত্তরণের উপায় আছে। মূলতঃ ইসলাম সহজ দ্বীন, সুনির্দিষ্ট কোন দিক নয়; বরং সর্বদিক দিয়েই ইসলাম সহজ দ্বীন। এ দ্বীনে কোন সংকীর্ণতার অবকাশ নেই। আল্লাহ্ তা'আলা এ দ্বীন ইসলামকে কেয়ামত পর্যন্ত সর্বশেষ দ্বীন হিসাবে অবশিষ্ট রাখবেন। তাই সর্বসাধারণের উপযোগী করে তিনি এ দ্বীন নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এ দ্বীনের মধ্যে সংকীর্ণতা না থাকার ব্যাপারে বিভিন্ন পুস্তক রচনা করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়- অযুর পানি না পেলে তায়াম্মুমের অনুমতি, যমীনের সমস্ত স্থান সালাতের জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া, সফর অবস্থায় সালাতের কসর, সওমের জন্য অন্য সময়ে পূরণ করার অনুমতি ইত্যাদি অন্যতম।[দেখুন, ইবন কাসীর]

الْمُسْلِمِينَ ۙ مِن قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

তোমাদের পিতা[১] ইব্‌রাহীমের মিল্লাত[২]। তিনি আগে তোমাদের নামকরণ করেছেন 'মুসলিম' এবং এ কিতাবেও[৩]; যাতে রাসূল তোমাদের

(১) এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, তোমাদের পিতা বলে কাদের বোঝানো হয়েছে? কোন কোন মুফাস্‌সির বলেনঃ এখানে প্রকৃতপক্ষে কুরাইশী মুমিনদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, যারা সরাসরি ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-এর বংশধর। [কুরতুবী] এরপর কুরাইশদের অনুগামী হয়ে সব মুসলিম এই ফযীলতে শামিল হয়; যেমন-হাদীসে আছেঃ সব মানুষ দ্বীনের ক্ষেত্রে কুরাইশদের অনুগামী। মুসলিম মুসলিম কুরাইশদের অনুগামী এবং কাফের কাফের কুরাইশদের অনুগামী। [মুসনাদে আহমাদঃ ১৯, অনুরূপ হাদীস- বুখারীঃ ৩৪৯৫, মুসলিমঃ ১৮১৮, ইবনে হিব্বানঃ ৬২৬৪] কারও কারও মতে, এ আয়াতে সব মুসলিমকে সম্বোধন করা হয়েছে। ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম এদিক দিয়ে সবার পিতা। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র মানব জাতির জন্য ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-কে তার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরে নেতা হিসাবে মনোনীত করেন। তিনি আনুগত্যের চরম পারাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন, সুতরাং সমস্ত আনুগত্যকারীদের তিনি পিতা। তাছাড়া ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সম্মান করা তেমনি অবশ্য কর্তব্য যেমনি সন্তান তার পিতার সম্মান করা একান্ত কর্তব্য। কারণ তিনি তাদের নবীর পিতা। [আহকামুল কুরআন লিল জাসসাস; কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

(২) আয়াতের অর্থ, তোমরা তোমাদের পিতা ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-এর মিল্লাতকে আঁকড়ে ধর। [ফাতহুল কাদীর] আয়াতের অন্য অর্থ হচ্ছে, তোমাদের দ্বীনে তোমাদের জন্য কোন সংকীর্ণতা রাখেন নি, যেমন তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাতে কোন সংকীর্ণতা ছিল না। [তাবারী; ইবন কাসীর] অপর অর্থ হচ্ছে, পূর্ববর্তী আয়াতে যে নির্দেশগুলো দেয়া হয়েছিল, অর্থাৎ রুকু, সিজদা, কল্যাণমূলক কাজ এবং যথাযথ জিহাদ করা এগুলো ইবরাহীম আলাইহিস সালামের মিল্লাত। তখন আয়াতটির সমর্থন অন্য আয়াতেও এসেছে, "বলুন, 'আমার রব তো আমাকে সৎপথে পরিচালিত করেছেন। এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীন, ইব্‌রাহীমের মিল্লাত (আদর্শ), তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।" [সূরা আল-আন'আম: ১৬১] কারণ, রুকু, সিজদা, কল্যাণমূলক কাজ, যথাযথ জ্বিহাদ এসবই সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত। [আদওয়াউল বায়ান]

(৩) তিনি তোমাদেরকে পূর্বে এবং এ কিতাব কুরআনে মুসলিম নামকরণ করেছেন। এখানে তিনি বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে এ ব্যাপারে দু'টি মত রয়েছে- (এক) এখানে ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-কে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্ সালামই কুরআনের পূর্বে উম্মতে মুহাম্মাদী এবং সমগ্র বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের

وَاعْتَصِمُوا بِاللّٰهِ هُوَ مَوْلٰىكُمْ فَنِعْمَ

জন্য সাক্ষীস্বরূপ হন এবং তোমরা সাক্ষীস্বরূপ হও মানুষের জন্য(১)।

জন্য 'মুসলিম' নামকরণ করেছেন; যেমন, ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-এর এই দো'আ কুরআনে বর্ণিত আছেঃ ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَآ﴾ [সূরা আল-বাকারাঃ ১২৮] -কুরআনে মুমিনদের নামকরণ করা হয়েছে মুসলিম। যদিও এই নামকরণকারী প্রত্যক্ষভাবে ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম নন, কিন্তু কুরআনের পূর্বে তার এই নামকরণ কুরআনে মুসলিম নামে অভিহিত করার কারণ হয়েছে। তাই এর সম্বন্ধও ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-এর দিকে করে দেয়া হয়েছে। (দুই) প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত হলঃ এখানে "তিনি" বলে আল্লাহ্‌কে বোঝানো হয়েছে, অর্থাৎ আল্লাহ্‌ই তোমাদেরকে পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে এবং কুরআনে মুসলিম নামে অভিহিত করেছেন। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর] সে হিসেবে এখানে "তোমাদের" সম্বোধনটি শুধুমাত্র এ উম্মতের জন্য নির্দিষ্ট। অর্থাৎ এ উম্মতকেই আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ববর্তী কিতাব ও এ কিতাবে মুসলিম হিসেবে নামকরণ করেছেন। এটি এ উম্মতের উপর আল্লাহ্‌র খাস রহমত ও দয়া। [দেখুন, ইবন কাসীর]

(১) অর্থাৎ ওপরে যে খিদমতের কথা বলা হয়েছে সমগ্র মানব জাতির মধ্য থেকে তোমাদেরকে তা সম্পাদন করার জন্য বাছাই করে নেয়া হয়েছে। এ বিষয়বস্তুটি কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এভাবে আমরা তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতিতে পরিণত করেছি, যাতে তোমরা মানবজাতির উপর স্বাক্ষী হও এবং রাসূল তোমাদের উপর সাক্ষী হতে পারেন"। [সূরা আল-বাকারাহঃ ১৪৩] এখানে একথাটিও জানা দরকার যে, সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা যেসব আয়াতের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় এবং যেসব আয়াতের মাধ্যমে সাহাবায়ে কেরামের বিরুদ্ধে বিদ্রূপ ও দোষারোপকারীদের ভ্রান্তি প্রমাণিত হয় এ আয়াতটি সেগুলোর অন্তর্ভুক্ত। একথা সুস্পষ্ট যে, এ আয়াতে সরাসরি সাহাবায়ে কেরামকে সম্বোধন করা হয়েছে, অন্যলোকদের প্রতি সম্বোধন মূলত তাদেরই মাধ্যমে করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে বিভিন্ন হাদীসে বিস্তারিতভাবে এসেছে, যার সারমর্ম হলো, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাশরের ময়দানে সাক্ষ্য দেবেন যে, আমি আল্লাহ্ তা'আলার বিধি-বিধান এই উম্মতের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলাম। তখন উম্মতে মুহাম্মাদী তা স্বীকার করবে। কিন্তু অন্যান্য নবীগণ যখন এই দাবী করবেন, তখন তাদের উম্মতরা অস্বীকার করে বসবে। তখন উম্মতে মুহাম্মাদী সাক্ষ্য দেবে যে, সব নবীগণ নিশ্চিতরূপেই তাদের উম্মতের কাছে আল্লাহ্ তা'আলার বিধানাবলী পৌঁছে দিয়েছিলেন। সংশ্লিষ্ট উম্মতের পক্ষ থেকে তাদের এই সাক্ষ্যের উপর জেরা করা হবে যে, আমাদের যামানায় উম্মতে মুহাম্মাদীর অস্তিত্বই ছিল না। সুতরাং তারা আমাদের ব্যাপারে কিরূপে সাক্ষ্য হতে পারে? উম্মতে মুহাম্মাদীর পক্ষ থেকে জেরার জবাবে বলা হবেঃ

الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

কাজেই তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও[১] এবং আল্লাহ্‌কে মজবুতভাবে অবলম্বন কর[২]; তিনিই তোমাদের অভিভাবক, তিনি কতই না উত্তম অভিভাবক আর কতই না উত্তম সাহায্যকারী!

আমরা বিদ্যমান ছিলাম না ঠিকই, কিন্তু আমরা আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মুখ থেকে এ কথা শুনেছি, যার সত্যবাদিতায় কোন সন্দেহ নেই। কাজেই আমরা সাক্ষ্য দিতে পারি। অতঃপর তাদের সাক্ষ্য কবুল করা হবে। এই বিষয়বস্তু বুখারী ইত্যাদি গ্রন্থে আবু সায়ীদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর হাদীসে বর্ণিত আছে। [দেখুন- বুখারীঃ ৩৩৩৯]

(১) উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা যখন তোমাদের প্রতি এতসব বিরাট অনুগ্রহ করেছেন যেগুলো ওপরে বর্ণিত হয়েছে, তখন তোমাদের কর্তব্য আল্লাহ্‌র বিধানাবলী পালনে পুরোপুরি সচেষ্ট হওয়া। বিধানাবলীর মধ্যে এস্থলে শুধু সালাত ও যাকাত উল্লেখ করার কারণ এই যে, দৈহিক কর্ম ও বিধানাবলীর মধ্যে সালাত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং আর্থিক বিধানাবলীর মধ্যে যাকাত সর্বাধিক গুরুত্ববহ; যদিও শরী'আতের সব বিধান পালন করাই উদ্দেশ্য। মূলকথা হচ্ছে, আল্লাহ্ যা অবশ্য কর্তব্য করেছেন সেটা সম্পন্ন করা এবং যা হারাম করেছেন সেটা থেকে বেঁচে থাকার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র হক আদায় করা। আর তন্মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, সালাত কায়েম করা, যাকাত দেয়া, আল্লাহ্‌র সৃষ্টির প্রতি ইহসান বা দয়া করা, আল্লাহ্ ফকীরদের জন্য, দুর্বল ও অভাবীদের জন্য ধনীদের উপর তাদের সম্পদ থেকে বছরে যৎকিঞ্চিত যা ফরয করেছেন তা বের করে আদায় করা। [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ মজবুতভাবে আল্লাহকে আঁকড়ে ধরো। পথ নির্দেশনা ও জীবন যাপনের বিধান তাঁর কাছ থেকেই নাও। তাঁরই আনুগত্য করো। তাঁকেই ভয় করো। আশা-আকাংখা তাঁরই সাথে বিজড়িত করো। তাঁরই কাছে হাত পাতো। তাঁরই সত্তার উপর নির্ভর করে তাওয়াক্কুল ও আস্থার বুনিয়াদ গড়ে তোলো। তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা কর। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ এই বাক্যের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দো'আ কর- তিনি যেন তোমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতের অপছন্দনীয় বিষয়াদি থেকে নিরাপদ রাখেন। কেউ কেউ বলেনঃ এই বাক্যের অর্থ এই যে, কুরআন ও সুন্নাহ্‌কে অবলম্বন কর, সর্বাবস্থায় এগুলোকে আঁকড়ে থাক; যেমন এক হাদীসে আছে- 'আমি তোমাদের জন্য দু'টি বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি। তোমরা যে পর্যন্ত এ দু'টিকে অবলম্বন করে থাকবে; পথভ্রষ্ট হবে না। একটি আল্লাহ্‌র কিতাব ও অপরটি আমার সুন্নাত। [মুয়াত্তা ইমাম মালেকঃ ১৩৯৫]

২৩- সূরা আল-মুমিনূন[১]
১১৮ আয়াত, মক্কী

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝١

১. অবশ্যই সফলকাম হয়েছে[২] মুমিনগণ,

الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۝٢

২. যারা তাদের সালাতে ভীতি-অবনত[৩],

---

(১) সূরাটি মক্কায় নাযিল হয়েছে। আয়াত সংখ্যা: ১১৮। এর প্রথম আয়াতের المؤمنون শব্দ থেকেই সূরার নামকরণ করা হয়েছে। এ সূরায় মুমিনদের গুণাবলী বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও কখনও এ সূরাটি ফজরের সালাতে পড়তেন। [দেখুন, মুসলিম:৪৫৫]

(২) فلاح শব্দটি কুরআন ও হাদীসে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ সাফল্য, [সা'দী] أفلح শব্দটির অর্থ, উদ্দেশ্য হাসিল হওয়া, অপছন্দ বিষয়াদি থেকে মুক্তি পাওয়া, কারও কারও নিকট: সর্বদা কল্যাণে থাকা [ফাতহুল কাদীর] আয়াতের অর্থ মুমিনরা অবশ্যই সফলতা অর্জন করেছে। অথবা মুমিনরা সফলতা অর্জন করেছে এবং সফলতার উপরই আছে। [ফাতহুল কাদীর] তারা দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ লাভ করেছে। [আদওয়াউল বায়ান] ইবন আব্বাস থেকে বর্ণিত, আয়াতের অর্থ হচ্ছে, যারা তাওহীদের সত্যতায় বিশ্বাসী হয়েছে এবং জান্নাতে প্রবেশ করেছে তারা সৌভাগ্যবান হয়েছে। [বাগভী]

(৩) এ হচ্ছে সফলতা লাভে আগ্রহী মুমিনের প্রথম গুণ। "খুশূ" এর আসল মানে হচ্ছে, স্থিরতা, অন্তরে স্থিরতা থাকা; অর্থাৎ ঝুঁকে পড়া, দমিত বা বশীভূত হওয়া, বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করা। [আদওয়াউল বায়ান] ইবন আব্বাস বলেন, এর অর্থ, ভীত ও শান্ত থাকা। [ইবন কাসীর] মুজাহিদ বলেনঃ দৃষ্টি অবনত রাখা। শব্দ নিচু রাখা। [বাগভী] "খুশূ' এবং খুদূ' দুটি পরিভাষা। অর্থ কাছাকাছি। তবে খুদূ' কেবল শরীরের উপর প্রকাশ পায়। আর খুশূ' মন, শরীর, চোখ ও শব্দের মধ্যে প্রকাশ পায়। আল্লাহ্ বলেন, "আর রহমানের জন্য যাবতীয় শব্দ বিনীত হয়ে গেছে।" [সূরা ত্বা-হা: ১০৮] আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, খুশূ' হচ্ছে, ডানে বা বাঁয়ে না থাকানো। [বাগভী] অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন, খুশূ' হচ্ছে মনের বিনয়। [ইবন কাসীর] সা'য়ীদ ইবন জুবাইর বলেন, খুশূ' হচ্ছে, তার ডানে ও বামে কে আছে সেটা না জানা। আতা বলেনঃ দেহের কোন অংশ নিয়ে খেলা না করা। [বাগভী]

উপরের বর্ণনাগুলো পর্যালোচনা করলে আমরা বুঝতে পারি যে, "খুশূ"র সম্পর্ক মনের সাথে এবং দেহের বাহ্যিক অবস্থার সাথেও। মনের 'খুশূ' হচ্ছে, মানুষ

৩. আর যারা অসার কর্মকাণ্ড থেকে থাকে | وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۝

কারোর ভীতি, শ্রেষ্ঠত্ব, প্রতাপ ও পরাক্রমের দরুন সন্ত্রস্ত ও আড়ষ্ট থাকবে। আর দেহের খুশূ' হচ্ছে, যখন সে তার সামনে যাবে তখন মাথা নত হয়ে যাবে, অংগ-প্রত্যংগ ঢিলে হয়ে যাবে, দৃষ্টি নত হবে, কণ্ঠস্বর নিম্নগামী হবে এবং কোন জবরদস্ত প্রতাপশালী ব্যক্তির সামনে উপস্থিত হলে মানুষের মধ্যে যে স্বাভাবিক ভীতির সঞ্চার হয় তার যাবতীয় চিহ্ন তার মধ্যে ফুটে উঠবে। সালাতে খুশূ' বলতে মন ও শরীরের এ অবস্থাটি বুঝায় এবং এটাই সালাতের আসল প্রাণ।

যদিও খুশূ'র সম্পর্ক মূলত মনের সাথে এবং মনের খুশূ' আপনা আপনি দেহে সঞ্চারিত হয়, তবুও শরী'আতে সালাতের এমন কিছু নিয়ম-কানুন নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে যা একদিকে মনের খুশূ' (আন্তরিক বিনয়-নম্রতা) সৃষ্টিতে সাহায্য করে এবং অন্যদিকে খুশূ'র হ্রাস-বৃদ্ধির অবস্থায় সালাতের কর্মকাণ্ডকে কমপক্ষে বাহ্যিক দিক দিয়ে একটি বিশেষ মানদণ্ডে প্রতিষ্ঠিত রাখে। এই নিয়মগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে, সালাত আদায়কারী যেন ডানে বামে না ফিরে এবং মাথা উঠিয়ে উপরের দিকে না তাকায়, সালাতের মধ্যে বিভিন্ন দিকে ঝুঁকে পড়া নিষিদ্ধ। বারবার কাপড় গুটানো অথবা ঝাড়া কিংবা কাপড় নিয়ে খেলা করা জায়েয নয়। সিজদায় যাওয়ার সময় বসার জায়গা বা সিজদা করার জায়গা পরিষ্কার করার চেষ্টা করতেও নিষেধ করা হয়েছে। তাড়াহুড়া করে টপাটপ সালাত আদায় করে নেয়াও ভীষণ অপছন্দনীয়। নির্দেশ হচ্ছে, সালাতের প্রত্যেকটি কাজ পুরোপুরি ধীরস্থিরভাবে শান্ত সমাহিত চিত্তে সম্পন্ন করতে হবে। এক একটি কাজ যেমন রুকূ', সিজদা, দাঁড়ানো বা বসা যতক্ষণ পুরোপুরি শেষ না হয় ততক্ষণ অন্য কাজ শুরু করা যাবে না। সালাত আদায় করা অবস্থায় যদি কোন জিনিস কষ্ট দিতে থাকে তাহলে এক হাত দিয়ে তা দূর করে দেয়া যেতে পারে। কিন্তু বারবার হাত নাড়া অথবা বিনা প্রয়োজনে উভয় হাত একসাথে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। এ বাহ্যিক আদবের সাথে সাথে সালাতের মধ্যে জেনে বুঝে সালাতের সাথে অসংশ্লিষ্ট ও অবান্তর কথা চিন্তা করা থেকে দূরে থাকার বিষয়টিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অনিচ্ছাকৃত চিন্তা-ভাবনা মনের মধ্যে আসা ও আসতে থাকা মানুষ মাত্রেরই একটি স্বভাবগত দুর্বলতা। কিন্তু মানুষের পুর্ণপ্রচেষ্টা থাকতে হবে সালাতের সময় তার মন যেন আল্লাহর প্রতি আকৃষ্ট থাকে এবং মুখে যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে অন্য চিন্তাভাবনা এসে যায় তাহলে যখনই মানুষের মধ্যে এর অনুভূতি সজাগ হবে তখনই তার মনোযোগ সেদিক থেকে সরিয়ে নিয়ে পুনরায় সালাতের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। সুতরাং পূর্ণাঙ্গ 'খুশু' হচ্ছে, অন্তরে বাড়তি চিন্তা-ভাবনা ইচছাকৃতভাবে উপস্থিত না করা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও স্থিরতা থাকা; অনর্থক নড়াচড়া না করা। বিশেষতঃ এমন নড়াচড়া, যা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতে নিষিদ্ধ করেছেন। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

বিমুখ[১],

'সালাতের সময় আল্লাহ তা'আলা বান্দার প্রতি সর্বক্ষণ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন যতক্ষণ না সে অন্য কোন দিকে দৃষ্টি না দেয়। তারপর যখন সে অন্য কোন দিকে মনোনিবেশ করে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তার দিকে থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন।' [ইবনে মাজাহঃ ১০২৩]

(১) পূর্ণ মুমিনের এটি দ্বিতীয় গুণঃ অনর্থক বিষয়াদি থেকে বিরত থাকা। لغو এর অর্থ অসার ও অনর্থক কথা বা কাজ। এর মানে এমন প্রত্যেকটি কথা ও কাজ যা অপ্রয়োজনীয়, অর্থহীন ও যাতে কোন ফল লাভও হয় না। শির্কও এর অন্তর্ভুক্ত, গোনাহের কাজও এর দ্বারা উদ্দেশ্য হতে পারে [ইবন কাসীর] অনরূপভাবে গান-বাজনাও এর আওতায় পড়ে [কুরতুবী] মোটকথা: যেসব কথায় বা কাজে কোন লাভ হয় না, যেগুলোর পরিণাম কল্যাণকর নয়, যেগুলোর আসলে কোন প্রয়োজন নেই, যেগুলোর উদ্দেশ্যও ভালো নয় সেগুলোর সবই 'বাজে' কাজের অন্তরভুক্ত। যাতে কোন দ্বীনী উপকার নেই বরং ক্ষতি বিদ্যমান। এ থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব। রাসূলুলল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'মানুষ যখন অনর্থক বিষয়াদি ত্যাগ করে, তখন তার ইসলাম সৌন্দর্য মণ্ডিত হতে পারে। [তিরমিযীঃ ২৩১৭, ২৩১৮, ইবনে মাজাহঃ ৩৯৭৬] এ কারণেই আয়াতে একে কামেল মুমিনদের বিশেষ গুণ সাব্যস্ত করা হয়েছে। আয়াতের পূর্ণ বক্তব্য হচ্ছে এই যে, তারা বাজে কথায় কান দেয় না এবং বাজে কাজের দিকে দৃষ্টি ফেরায় না। সে ব্যাপারে কোন প্রকার কৌতূহল প্রকাশ করে না। যেখানে এ ধরনের কথাবার্তা হতে থাকে অথবা এ ধরনের কাজ চলতে থাকে সেখানে যাওয়া থেকে দূরে থাকে। তাতে অংশগ্রহণ থেকে বিরত হয় আর যদি কোথাও তার সাথে মুখোমুখি হয়ে যায় তাহলে তাকে উপেক্ষা করে, এড়িয়ে চলে যায় অথবা অন্ততপক্ষে তা থেকে সম্পর্কহীন হয়ে যায়। একথাটিকেই অন্য জায়গায় এভাবে বলা হয়েছেঃ "যখন এমন কোন জায়গা দিয়ে তারা চলে যেখানে বাজে কথা হতে থাকে অথবা বাজে কাজের মহড়া চলে তখন তারা ভদ্রভাবে সে জায়গা অতিক্রম করে চলে যায়।" [সূরা আল ফুরকানঃ ৭২]

এ ছাড়াও মুমিন হয় একজন শান্ত-সমাহিত ভারসাম্যপূর্ণ প্রকৃতির অধিকারী এবং পবিত্র-পরিচ্ছন্ন স্বভাব ও সুস্থ রুচিসম্পন্ন মানুষ। বেহুদাপনা তার মেজাজের সাথে কোন রকমেই খাপ খায় না। সে ফলদায়ক কথা বলতে পারে, কিন্তু আজেবাজে গল্প-গুজব তার স্বভাব বিরুদ্ধ। সে ব্যাঙ্গ, কৌতূক ও হালকা পরিহাস পর্যন্ত করতে পারে কিন্তু উচ্ছল ঠাট্টা-তামাসায় মেতে উঠতে পারে না, বাজে ঠাট্টা-মস্করা ও ভাঁড়ামি বরদাশ্ত করতে পারে না এবং আনন্দ-ফূর্তি ও ভাঁড়ামির কথাবার্তাকে নিজের পেশায় পরিণত করতে পারে না। তার জন্য তো এমন ধরনের সমাজ হয় একটি স্থায়ী নির্যাতন কক্ষ বিশেষ, যেখানে কারো কান কখনো গালি-গালাজ, পরনিন্দা, পরচর্চা, অপবাদ, মিথ্যা কথা, কুরুচিপুর্ণ গান-বাজনা ও অশ্লীল কথাবার্তা থেকে নিরাপদ থাকে না। আল্লাহ তাকে যে জান্নাতের আশা দিয়ে থাকেন

৪. এবং যারা যাকাতে সক্রিয়[১],

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ۙ﴿٤﴾

৫. আর যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে রাখে সংরক্ষিত[২],

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۙ﴿٥﴾

৬. নিজেদের স্ত্রী বা অধিকারভুক্ত দাসীগণ ছাড়া, এতে তারা হবে না নিন্দিত[৩],

اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۚ﴿٦﴾

৭. অতঃপর কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে, তারাই হবে

فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ۚ﴿٧﴾

তার একটি অন্যতম নিয়ামত তিনি এটাই বর্ণনা করেছেন যে, "সেখানে তুমি কোন বাজে কথা শুনবে না।" [সূরা মারইয়ামঃ ৬২, সূরা আল-ওয়াকি'আহঃ২৫, সূরা আন-নাবাঃ ৩৫, অনুরূপ সূরা আত-তূরের ২৩ নং আয়াত]

(১) পূর্ণ মুমিনের এটি তৃতীয় গুণঃ তারা যাকাতে সদা তৎপর। এটি যাকাত দেয়ার অর্থই প্রকাশ করে। [কুরতুবী] এখানে যাকাত দ্বারা আর্থিক যাকাতও হতে পারে আবার আত্মিক পবিত্রতাও উদ্দেশ্য হতে পারে। [ইবন কাসীর] এ বিষয়বস্তুটি কুরআন মজীদের অন্যান্য স্থানেও বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন সূরা আল-আ'লায় বলা হয়েছেঃ "সফলকাম হয়েছে সে ব্যক্তি যে পবিত্রতা অবলম্বন করেছে এবং নিজের রবের নাম স্মরণ করে সালাত আদায় করেছে।" সূরা আশ-শামসে বলা হয়েছেঃ "সফলকাম হলো সে ব্যক্তি যে আত্মশুদ্ধি করেছে এবং ব্যর্থ হলো সে ব্যক্তি যে তাকে দলিত করেছে।"

(২) পূর্ণ মুমিনের এটি চতুর্থ গুণঃ তা হচ্ছে, যৌনাঙ্গকে হেফাযত করা। তারা নিজের দেহের লজ্জাস্থানগুলো ঢেকে রাখে। অর্থাৎ উলংগ হওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করে এবং অন্যের সামনে লজ্জাস্থান খোলে না। আর তারা নিজেদের লজ্জাস্থানের সততা ও পবিত্রতা সংরক্ষণ করে। অর্থাৎ যৌন স্বাধীনতা দান করে না এবং কামশক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে লাগামহীন হয় না। অর্থাৎ যারা স্ত্রী ও যুদ্ধলব্ধ দাসীদের ছাড়া সব পর নারী থেকে যৌনাঙ্গকে হেফাযতে রাখে এবং এই দুই শ্রেণীর সাথে শরী'আতের বিধি মোতাবেক কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা ছাড়া অন্য কারও সাথে কোন অবৈধ পন্থায় কামবাসনা পূর্ণ করতে প্রবৃত্ত হয় না।

(৩) দুনিয়াতে পূর্বেও একথা মনে করা হতো এবং আজো বহু লোক এ বিভ্রান্তিতে ভুগছে যে, কামশক্তি মূলত একটি খারাপ জিনিস এবং বৈধ পথে হলেও তার চাহিদা পূরণ করা সৎ ও আল্লাহর প্রতি অনুগত লোকদের জন্য সংগত নয়। তাই একটি প্রাসংগিক বাক্য বাড়িয়ে দিয়ে এ সত্যটি সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, বৈধ স্থানে নিজের প্রবৃত্তির কামনা পূর্ণ করা কোন নিন্দনীয় ব্যাপার নয়। তবে কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য এ বৈধ পথ এড়িয়ে অন্য পথে চলা অবশ্যই গোনাহর কাজ ও স্পষ্ট সীমালঙ্ঘন।

সীমালংঘনকারী[১],

৮. আর যারা রক্ষা করে নিজেদের আমানত[২] ও প্রতিশ্রুতি[৩],

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٨﴾

৯. আর যারা নিজেদের সালাতে থাকে যত্নবান[৪]

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩﴾

(১) অর্থাৎ বিবাহিত স্ত্রী অথবা যুদ্ধলব্ধ দাসীর সাথে শরী'আতের বিধি মোতাবেক কামবাসনা করা ছাড়া কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার আর কোন পথ হালাল নয়। স্ত্রী অথবা দাসীর সাথে হায়েয-নেফাস অবস্থায় কিংবা অস্বাভাবিক পন্থায় সহবাস করা অথবা কোন পুরুষ অথবা বালক অথবা জীব-জন্তুর সাথে কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা-এগুলো সব নিষিদ্ধ ও হারাম। অধিক সংখ্যক আলেমের মতে হস্তমৈথুনও এর অন্তর্ভুক্ত। [দেখুন, ইবন কাসীর]

(২) পূর্ণ মুমিনের পঞ্চম গুণ হচ্ছে, আমানত প্রত্যার্পণ করাঃ আমানত শব্দের আভিধানিক অর্থে এমন প্রত্যেকটি বিষয় শামিল, যার দায়িত্ব কোন ব্যক্তি বহন করে এবং সে বিষয়ে কোন ব্যক্তির উপর আস্থা স্থাপন করা হয়। দ্বীনী বা দুনিয়াবী, কথা বা কাজ যাই হোক। [দেখুন, কুরতুবী] এর অসংখ্য প্রকার আছে বিধায় এ শব্দটিকে বহুবচনে ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে যাবতীয় প্রকার এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। হুকুকুল্লাহ তথা আল্লাহর হক সম্পর্কিত হোক কিংবা হুকুকুল-এবাদ তথা বান্দার হক সম্পর্কিত হোক। [ফাতহুল কাদীর] আল্লাহর হক সম্পর্কিত আমানত হচ্ছে শরী'আত আরোপিত সকল ফরয ও ওয়াজিব পালন করা এবং যাবতীয় হারাম ও মাকরূহ বিষয়াদি থেকে আত্মরক্ষা করা। বান্দার হক সম্পর্কিত আমানতের মধ্যে আর্থিক আমানতও যে অন্তর্ভুক্ত তা সুবিদিত; অর্থাৎ কেউ কারও কাছে টাকা-পয়সা গচ্ছিত রাখলে তা তার আমানত প্রত্যার্পণ করা পর্যন্ত এর হেফাযত করা তার দায়িত্ব। এছাড়া কেউ কোন গোপন কথা কারও কাছে বললে তাও তার আমানত। শরীআতসম্মত অনুমতি ব্যতিরেকে কারও গোপন তথ্য ফাঁস করা আমানতে খেয়ানতের অন্তর্ভুক্ত। মুমিনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সে কখনো আমানতের খেয়ানত করেনা এবং কখনো নিজের চুক্তি ও অংগীকার ভংগ করে না। রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম প্রায়ই তাঁর ভাষণে বলতেনঃ যার মধ্যে আমানতদারীর গুণ নেই তার মধ্যে ঈমান নেই এবং যার মধ্যে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার গুণ নেই তার মধ্যে দ্বীনদারী নেই। [মুসনাদে আহমাদঃ ৩/১৩৫]

(৩) পূর্ণ মুমিনের ষষ্ঠ গুণ হচ্ছে, অঙ্গীকার পূর্ণ করা। আমানত সাধারণত যার উপর মানুষ কাউকে নিরাপদ মনে করে। আর অঙ্গীকার বলতে বুঝায় আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বা বান্দার পক্ষ থেকে যে সমস্ত অঙ্গীকার বা চুক্তি হয়। আমানত ও অঙ্গীকার একসাথে বলার কারণে দ্বীন-দুনিয়ার যা কিছু কারও উপর দায়িত্ব দেয়া হয় সবই এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। [ফাতহুল কাদীর]

(৪) পূর্ণ মুমিনের সপ্তম গুণ হচ্ছে, সালাতে যত্নবান হওয়া। উপরের খুশূ'র আলোচনায় সালাত শব্দ এক বচনে বলা হয়েছিল আর এখানে বহুবচনে "সালাতসমূহ" বলা হয়েছে। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, সেখানে লক্ষ্য ছিল মূল সালাত আর এখানে পৃথক

১০. তারাই হবে অধিকারী---

১১. যারা অধিকারী হবে ফিরদাউসের[১], যাতে তারা হবে স্থায়ী[২]।

أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۝١٠

الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝١١

পৃথকভাবে প্রতিটি ওয়াক্তের সালাত সম্পর্কে বক্তব্য দেয়া হয়েছে। "সালাতগুলোর সংরক্ষণ" এর অর্থ হচ্ছেঃ সে সালাতের সময়, সালাতের নিয়ম-কানুন, আরকান ও আহকাম, প্রথম ওয়াক্ত, রুকু সিজদা, মোটকথা সালাতের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকটি জিনিসের প্রতি পুরোপুরি নজর রাখে। [দেখুন, কুরতুবী; ইবন কাসীর] এ গুণগুলোর শুরু হয়েছিল সালাত দিয়ে আর শেষও হয়েছে সালাত দিয়ে। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, সালাত শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট ইবাদাত। হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা দৃঢ়তা অবলম্বন কর, তবে তোমরা কখনও পুরোপুরি দৃঢ়পদ থাকতে পারবে না। জেনে রাখ যে, তোমাদের সর্বোত্তম আমল হচ্ছে সালাত। আর মুমিনই কেবল ওযুর ব্যাপারে যত্নবান হয়।" [ইবন মাজাহ: ২৭৭]

(১) ফিরদৌস জান্নাতের সবচেয়ে বেশী পরিচিত প্রতিশব্দ। মানব জাতির বেশীরভাগ ভাষায়ই এ শব্দটি পাওয়া যায়। মুজাহিদ ও সা'য়ীদ ইবন জুবাইর বলেন, ফিরদৌস শব্দটি রুমী ভাষায় বাগানকে বলা হয়। কোন কোন মনীষী বলেন, বাগানকে তখনই ফেরদৌস বলা হবে, যখন তাতে আঙুর থাকবে। [ইবন কাসীর] কুরআনের দু'টি স্থানে এ শব্দটি এসেছে। বলা হয়েছেঃ "তাদের আপ্যায়নের জন্য ফিরদৌসের বাগানগুলো আছে।" [সূরা আল-কাহফঃ ১০৭] আর এ সূরায় বলা হয়েছেঃ "যারা অধিকারী হবে ফিরদাউসের, যাতে তারা হবে চিরস্থায়ী।" [১১] অনুরূপভাবে ফিরদৌসের পরিচয় বিভিন্ন হাদীসেও বিস্তারিত এসেছে। এক হাদীসে এর পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, জান্নাতের রয়েছে একশ'টি স্তর। যা মহান আল্লাহ্ তাঁর পথে জিহাদকারীদের জন্য তৈরী করেছেন। প্রতি দু'স্তরের মাঝের ব্যবধান হলো আসমান ও যমীনের মাঝের ব্যবধানের সমান। সুতরাং তোমরা যখন আল্লাহ্র কাছে জান্নাত চাইবে তখন তার নিকট ফিরদাউস চাইবে ; কেননা সেটি জান্নাতের মধ্যমনি এবং সর্বোচ্চ জান্নাত। আর তার উপরেই রয়েছে দয়াময় আল্লাহ্র আরশ। সেখান থেকেই জান্নাতের নালাসমূহ প্রবাহিত। [বুখারীঃ ২৬৩৭]

(২) উল্লেখিত গুণে গুণান্বিত লোকদেরকে এই আয়াতে জান্নাতুল-ফেরদাউসের অধিকারী বা ওয়ারিশ বলা হয়েছে। ওয়ারিশ বলার মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি যেমন ওয়ারিশদের মালিকানায় আসা অমোঘ ও অনিবার্য, তেমনি এসব গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিদের জান্নাত প্রবেশও সুনিশ্চিত। তাছাড়া ﴿قَدْ أَفْلَحَ﴾ বাক্যের পর সফলকাম ব্যক্তিদের গুণাবলী পুরোপুরি উল্লেখ করার পর এই বাক্যে আরও ইঙ্গিত আছে যে, পূর্ণাঙ্গ সাফল্য ও প্রকৃত সাফল্যের স্থান জান্নাতই। মুজাহিদ বলেন, প্রত্যেক বান্দার জন্য দু'টি স্থান রয়েছে। একটি স্থান জান্নাতে, অপর স্থানটি জাহান্নামে। মুমিনের ঘরটি জান্নাতে নির্মিত হয়, আর জাহান্নামে তার ঘরটি ভেঙে দেয়া হয়। পক্ষান্তরে কাফেরের জন্য জান্নাতে যে ঘরটি সেটা ভেঙে দেয়া হয়, আর তার জন্য জাহান্নামের ঘরটি তৈরী করা হয়। [ইবন কাসীর] কোন কোন মনীষী বলেন, মুমিনরা

১২. আর অবশ্যই আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির উপাদান থেকে[১],

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ۝١٢

১৩. তারপর আমরা তাকে শুক্রবিন্দুরূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ ভাণ্ডারে;

ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ۝١٣

১৪. পরে আমরা শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি 'আলাকা-তে, অতঃপর 'আলাকা-কে পরিণত করি গোশতপিণ্ডে, অতঃপর গোশতপিণ্ডকে পরিণত করি অস্থিতে; অতঃপর অস্থিকে ঢেকে দেই গোশ্‌ত দিয়ে; তারপর তাকে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টিরূপে[২]। অতএব (দেখে

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ۗ ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ ۗ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ۝١٤

জান্নাতের কাফেরদের স্থানসমূহেরও মালিক হবে। তারা আনুগত্যের মাধ্যমে এ অতিরিক্ত পুরস্কার লাভ করবে। বরং হাদীসে এটাও এসেছে যে, 'কিয়ামতের দিন কিছু মুসলিম পাহাড় পরিমাণ গোনাহ নিয়ে আসবে, তারপর আল্লাহ্ তাদের সে গোনাহ ক্ষমা করে দিবেন এবং সেগুলোকে ইয়াহূদী ও নাসারাদের উপর রাখবেন।' [মুসলিম: ২৭৬৭] এ আয়াতটির মত অন্য আয়াত হচ্ছে, " এ সে জান্নাত, যার অধিকারী করব আমি আমার বান্দাদের মধ্যে মুত্তাকীদেরকে।" [সূরা মারইয়াম: ৬৩] "আর এটাই জান্নাত, তোমাদেরকে যার অধিকারী করা হয়েছে, তোমাদের কাজের ফলস্বরূপ।" [সূরা আয-যুখরুফ: ৭২]

(১) سلالة শব্দের অর্থ সারাংশ এবং طين অর্থ আর্দ্র মাটি। [কুরতুবী] অর্থ এই যে, পৃথিবীর মাটির বিশেষ অংশ বের করে তা দ্বারা মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। [দেখুন, কুরতুবী] মানব সৃষ্টির সূচনা আদম আলাইহিস সালাম থেকে এবং তার সৃষ্টি মাটির সারাংশ থেকে হয়েছে। তাই প্রথম সৃষ্টিকে মাটির সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। এরপর এক মানুষের শুক্র অন্য মানুষের সৃষ্টির কারণ হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে ﴿ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً﴾ "তারপর আমরা তাকে করে দিয়েছি বীর্য" বলে এ কথাই বর্ণনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, প্রাথমিক সৃষ্টি মাটি দ্বারা হয়েছে, এরপর আদম সন্তানদের সৃষ্টিধারা এই মাটির সূক্ষ্ম অংশ অর্থাৎ শুক্র দ্বারা চালু করা হয়েছে। অধিকাংশ তফসীরবিদগণ আয়াতের এ তফসীরই লিখেছেন। [দেখুন, কুরতুবী] মুজাহিদ বলেন, এখানে ﴿سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ﴾ বলে মানুষের শুক্রই বোঝানো হয়েছে। তখন অর্থ হবে, পরিষ্কার নিংড়ানো পানি হতে তৈরী করেছি। ইবন আব্বাস থেকেও এ অর্থ বর্ণিত আছে। [ইবন কাসীর]

(২) আলোচ্য আয়াতসমূহে মানব সৃষ্টির সাতটি স্তর উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বপ্রথম স্তর মৃত্তিকার সারাংশ, দ্বিতীয় বীর্য, তৃতীয় জমাট রক্ত, চতুর্থ মাংসপিণ্ড, পঞ্চম অস্থি-পিঞ্জর,

নিন) সর্বোত্তম স্রষ্টা[১] আল্লাহ্ কত বরকতময়[২]!

ষষ্ঠ অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃতকরণ ও সপ্তম সৃষ্টিটির পূর্ণত্ব অর্থাৎ রূহ সঞ্চারকরণ। আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে এ শেষোক্ত স্তরকে এক বিশেষ ও স্বতন্ত্র ভঙ্গিতে বর্ণনা করে বলেছেনঃ "তারপর আমরা তাকে এক বিশেষ ধরনের সৃষ্টি দান করেছি।" এই বিশেষ বর্ণনার কারণ এই যে, প্রথমোক্ত ছয় স্তরে সে পূর্ণত্ব লাভ করেনি। শেষ স্তরে এসে সে সম্পূর্ণ এক মানুষে পরিণত হয়েছে। এ কথাই বিভিন্ন তাফসীরকারকগণ বলেছেন। তারা বলেন, এ স্তরে এসে তার মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা 'রূহ সঞ্চার' করিয়েছেন। [দেখুন, ইবন কাসীর] কোন কোন মুফাসসির বলেন, "তারপর আমরা তাকে এক বিশেষ ধরনের সৃষ্টি দান করেছি।" এর অর্থ তাকে এক স্তর থেকে অন্য স্তরে নিয়ে গেছি। প্রথমে শিশু, তারপর ছোট, তারপর কৈশোর, তারপর যুবক, তারপর পূর্ণবয়স্ক, তারপর বৃদ্ধ, তারপর অতি বয়স্ক। বস্তুত দু'টি অর্থের মধ্যে বিরোধ নেই। কারণ, রূহ ফুঁকে দেয়ার পর এসবই সংঘটিত হয়। [ইবন কাসীর]

(১) خالق এর আসল অর্থ নুতনভাবে কোন সাবেক নমুনা ছাড়া কোন কিছু সৃষ্টি করা যা আল্লাহ্ তা'আলারই বিশেষ গুণ। এই অর্থের দিক দিয়ে خالق একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা-ই। কিন্তু মাঝে মাঝে خلق ও تخليق শব্দ কারিগরীর অর্থেও ব্যবহার করা হয়। কারিগরীর স্বরূপ এর বেশী কিছু নয় যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরত দ্বারা এই বিশ্বে যেসব উপকরণ ও উপাদান সৃষ্টি করে রেখেছেন, সেগুলোকে জোড়াতালি দিয়ে পরস্পরে মিশ্রণ করে এক নতুন জিনিস তৈরী করা। একাজ কারও কারও দ্বারা হওয়া সম্ভব। তখন এর অর্থ হবে, উদ্ভাবন করা, আকৃতি প্রদান করা, গঠন করা ইত্যাদি। এ অর্থেই কুরআনের অন্যত্র ইবরাহীম আলাইহিসসালামের মূখে এসেছে, ﴿إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا﴾ "তোমরা তো আল্লাহ্ ছাড়া শুধু মূর্তিপূজা করছ এবং মিথ্যা উদ্ভাবন করছ।" [সূরা আল-আনকাবূতঃ ১৭] অনুরূপভাবে ঈসা আলাইহিস সালামও বলেছেনঃ ﴿أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ "আমি তোমাদের জন্য কর্দম দ্বারা একটি পাখিসদৃশ আকৃতি গঠন করব; তারপর ওটাতে আমি ফুঁ দেব; ফলে আল্লাহর হুকুমে ওটা পাখি হয়ে যাবে।" [সূরা আলে ইমরানঃ ৪৯] তাছাড়া আল্লাহ্ তা'আলা নিজেও ঈসা আলাইহিসসালামকে তার উপর কৃত নেয়ামতসমূহ স্মরণ করিয়ে দিতে গিয়ে বলেনঃ ﴿وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي﴾ "আপনি কাদামাটি দিয়ে আমার অনুমতিক্রমে পাখির মত আকৃতি গঠন করতেন এবং ওটাতে ফুঁক দিতেন, ফলে আমার অনুমতিক্রমে ওটা পাখি হয়ে যেত" [সূরা আল মায়েদাহঃ ১১০] এসব ক্ষেত্রে خلق শব্দ কারিগরীর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সৃষ্টির অর্থে নয়। [দেখুন, বাগভী; কুরতুবী]

(২) মূলে تبارك শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর এক অর্থ তিনি প্রশংসা ও সম্মানের অধিকারী। অথবা এর অর্থ, তাঁর কল্যাণ ও বরকত বৃদ্ধি পেয়েছে। [ফাতহুল কাদীর]

ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَٰلِكَ لَمَيِّتُونَ ⑮

১৫. এরপর তোমরা নিশ্চয় মরবে,

ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ⑯

১৬. তারপর কেয়ামতের দিন নিশ্চয় তোমাদেরকে উত্থিত করা হবে(১)।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ⑰

১৭. আর অবশ্যই আমরা তোমাদের উর্ধ্বে সৃষ্টি করেছি সাতটি আসমান(২) এবং আমরা সৃষ্টি বিষয়ে মোটেই উদাসীন নই(৩),

---

(১) পূর্ববর্তী ১২-১৪ নং আয়াতে সৃষ্টির প্রাথমিক স্তর উল্লেখ করা হয়েছিল, এখন ১৫ ও ১৬ আয়াতে তার শেষ পরিণতির কথা বলা হয়েছে। বলা হচ্ছেঃ তোমরা সবাই এ জগতে আসা ও বসবাস করার পর মৃত্যুর সম্মুখীন হবে। কেউ এর কবল থেকে রক্ষা পাবে না। মৃত্যুর পর আবার কেয়ামতের দিন তোমাদেরকে জীবিত করে পুনরুত্থিত করা হবে, যাতে তোমাদের ক্রিয়াকর্মের ভাল কিংবা মন্দের হিসাবান্তে তোমাদেরকে আসল ঠিকানা জান্নাত অথবা জাহান্নামে পৌঁছে দেয়া হয়। [দেখুন, ইবন কাসীর] এ হচ্ছে মানুষের শেষ পরিণতি।

(২) মানুষ সৃষ্টির কথা আলোচনা করার পর সাত আসমান সৃষ্টি করার আলোচনা করা হচ্ছে। সাধারণতঃ যখনই আল্লাহ্ আসমান যমীনের সৃষ্টির কথা আলোচনা করেন, তখনই মানুষ সৃষ্টির কথা আলোচনা করেন। যেমন, আল্লাহ্ বলেন, “মানুষ সৃষ্টি অপেক্ষা আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি অবশ্যই বড় বিষয়, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।” [সূরা গাফির: ৫৭] অনুরূপভাবে সূরা আস্-সাজদাহ এর ৪-৯ আয়াতসমূহ। [ইবন কাসীর] আকাশ সৃষ্টির আলোচনায় বলা হয়েছে যে, “আমরা তো তোমাদের ঊর্ধ্বে সৃষ্টি করেছি সাতটি طرائق। এ طرائق শব্দটি طريقة শব্দের বহুবচন। এর মানে পথও হয় আবার স্তরও হয়। [কুরতুবী] যদি প্রথম অর্থটি গ্রহণ করা হয় এখানে রাস্তা বলতে ফেরেশতাদের চলাচলের পথ বুঝানো হয়েছে। কারণ, সবগুলো আসমান বিধানাবলী নিয়ে যমীনে যাতায়াতকারী ফেরেশতাদের পথ। [বাগভী; কুরতুবী] আর যদি দ্বিতীয় অর্থটি গ্রহণ করা হয় তাহলে طرائق এর অর্থ তাই হবে যা ﴿سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا﴾ বা সাতটি আকাশ স্তরে স্তরে [সূরা আল-মুলক:৩; নূহ: ১৫] এর অর্থ হয়। অর্থাৎ স্তরে স্তরে সাত আসমান তোমাদের ঊর্ধ্বে সৃষ্টি করা হয়েছে, এর দ্বারা যেন এ কথা বলাই উদ্দেশ্য যে, তোমাদের চাইতে বড় জিনিস আমি নির্মাণ করেছি সেটা হলো, এ আকাশ। মুজাহিদ বলেন, এখানে সাত আসমানই বলা উদ্দেশ্য। যেমন অন্য আয়াতে এসেছে, “সাত আসমান ও যমীন এবং এগুলোর অন্তর্বর্তী সব কিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে ” [সূরা আল-ইসরা: ৪৪] [ইবন কাসীর]

(৩) এর অর্থ আমি যা কিছুই সৃষ্টি করেছি তাদের কারোর কোন প্রয়োজন থেকে আমি কখনো গাফিল এবং কোন অবস্থা থেকে কখনো বেখবর থাকিনি। প্রত্যেকটি বিন্দু,

وَاَنۡزَلۡنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءًۢ بِقَدَرٍ فَاَسۡكَنّٰهُ فِی الۡاَرۡضِ ۖ وَاِنَّا عَلٰی ذَهَابٍۭ بِهٖ لَقٰدِرُوۡنَ ﴿۱۸﴾

১৮. আর আমরা আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি পরিমিতভাবে(১); অতঃপর আমরা তা মাটিতে সংরক্ষিত করি; আর অবশ্যই আমরা তা নিয়ে যেতেও সম্পূর্ণ সক্ষম(২)।

বালুকণা ও পত্র-পল্লবের অবস্থা আমি অবগত থেকেছি। আমি মানুষকে শুধু সৃষ্টি করেই ছেড়ে দেইনি। আমি তাদের ব্যাপারে বেখবরও হতে পারি না; বরং তাদের পালন, বসবাস ও সুখের সরঞ্জামও সরবরাহ করেছি। আকাশ সৃষ্টি দ্বারা এ কাজের সূচনা হয়েছে। এরপর আকাশ থেকে বারিবর্ষণ করে মানুষের জন্যে খাদ্য ও ফল-ফুল দ্বারা সুখের সরঞ্জাম সৃষ্টি করেছি। [দেখুন, কুরতুবী]

অথবা আয়াতের অর্থ, আমি আমার সৃষ্টি সম্পর্কে কখনো গাফেল নই। আমি আমার সৃষ্টির সবকিছু জানি। যমীনে যা প্রবেশ করে, যমীন থেকে যা বের হয়, আকাশ থেকে যা নাযিল হয়, যা আকাশে উঠে, তিনি সবই জানেন। তোমরা যেখানেই থাক সেখানেই তোমরা তাঁর জ্ঞানের আওতাভুক্ত। আর তোমরা যা আমল কর আল্লাহ্ তা সম্যক দেখছেন। তিনি এমন এক সত্তা, কোন আসমান অপর আসমানের, কোন যমীন অপর যমীনের মধ্যে তার দৃষ্টিতে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। কোন পাহাড়ের কঠিন স্থানে, কোন সমুদ্রের গভীর কোণে কি আছে সবই তাঁর জানা। পাহাড়ে, টিলায়, বালু, সমুদ্রে, মরুভূমিতে, গাছে কি আছে আর পরিমাণ কত সবই তিনি জানেন। [ইবন কাসীর] আল্লাহ্ বলেন, "স্থল ও সমুদ্রের অন্ধকারসমূহে যা কিছু আছে তা তিনিই অবগত, তাঁর অজানায় একটি পাতাও পড়ে না। মাটির অন্ধকারে এমন কোন শস্যকণাও অংকুরিত হয় না বা রসযুক্ত কিংবা শুস্ক এমন কোন বস্তু নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই।" [সূরা আল-আন'আম: ৫৯]

(১) এই আয়াতে আকাশ থেকে বারিবর্ষণের আলোচনার সাথে بقدر বা 'পরিমিত পরিমান' কথাটি যুক্ত করা হয়েছে। কারণ, পানি প্রয়োজনের চাইতে বেশী বর্ষিত হয়ে গেলে প্লাবন এসে যায় এবং মানুষ ও তার জীবন-জীবিকার জন্যে বিপদ ও আযাব হয়ে পড়ে। তাই আকাশ থেকে বারিবর্ষণও পরিমিতভাবে হয়। যা মানুষের অভাব দূর করে দেয় এবং সর্বনাশের কারণ হয় না। তবে যেসব ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা কোন কারণে প্লাবন-তুফান চাপিয়ে দেয়ার ইচ্ছা করেন, সেসব ক্ষেত্র ভিন্ন। [দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(২) অর্থাৎ সেটাকে অদৃশ্য করার কোন একটাই পদ্ধতি নেই। অসংখ্য পদ্ধতিতে তাকে অদৃশ্য করা সম্ভব। এর মধ্য থেকে যে কোনটিকে আমরা যখনই চাই ব্যবহার করে তোমাদেরকে জীবনের এ গুরুত্বপূর্ণ উপকরণটি থেকে বঞ্চিত করতে পারি। এভাবে এ আয়াতটি সূরা আল-মুলকের আয়াতটি থেকে ব্যাপকতর অর্থ বহন করে, যেখানে

فَاَنْشَاْنَا لَكُمْ بِهٖ جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ لَكُمْ فِيْهَا فَوَاكِهُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ﴿١٩﴾

১৯. তারপর আমরা তা দিয়ে তোমাদের জন্য খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান সৃষ্টি করি; এতে তোমাদের জন্য আছে প্রচুর ফল; আর তা থেকে তোমরা খেয়ে থাক(১);

وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُوْرِ سَيْنَآءَ تَنْۢبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْاٰكِلِيْنَ ﴿٢٠﴾

২০. আর সৃষ্টি করি এক গাছ যা জন্মায় সিনাই পর্বতে, এতে উৎপন্ন হয় তৈল এবং যারা খায় তাদের জন্য খাবার তথা তরকারী(২) ।

وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ؕ نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهَا وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ﴿٢١﴾ۙ

২১. আর তোমাদের জন্য অবশ্যই শিক্ষণীয় বিষয় আছে চতুষ্পদ জন্তুগুলোয়; তোমাদেরকে আমরা পান করাই তাদের পেটে যা আছে তা থেকে এবং তাতে

বলা হয়েছেঃ “তাদেরকে বলুন, তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছো , যমীন যদি তোমাদের এ পানিকে নিজের ভেতরে চুষে নেয়, তাহলে কে তোমাদেরকে বহমান ঝর্ণাধারা এনে দেবে?”[৩০] অনুরূপভাবে আলোচ্য আয়াতের ভাষ্য সূরা আল-কাহাফে নির্দেশিত আয়াত থেকেও ব্যাপকতর, যেখানে বলা হয়েছেঃ “অথবা তার পানি ভূগর্ভে হারিয়ে যাবে এবং আপনি কখনো সেটার সন্ধান লাভে সক্ষম হবেন না ।”[৪১]

(১) এখানে হিজাযবাসীদের মেজায ও রুচি অনুযায়ী এমন কিছুসংখ্যক বস্তুর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো পানি দ্বারা উৎপন্ন । বলা হয়েছে, খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান পানি সেচের দ্বারাই সৃষ্টি করা হয়েছে । তারপর এ দু'টি ছাড়া অন্যান্য ফলের কথাও আলোচনা করা হয়েছে, অর্থাৎ এসব বাগানে তোমাদের জন্যে খেজুর ও আঙ্গুর ছাড়া হাজারো প্রকারের ফল সৃষ্টি করেছি । এগুলো তোমরা শুধু মুখরোচক হিসেবেও খাও এবং কোন কোন ফল গোলাজাত করে খাদ্য হিসেবে ভক্ষণ কর । [দেখুন, ইবন কাসীর]

(২) এখানে বিশেষ করে যয়তুন ও তার তৈল সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে । কেননা, এর উপকারিতা অপরিসীম । যয়তুনের তৈল মালিশ ও বাতি জ্বালানের কাজেও আসে এবং ব্যঞ্জনেরও কাজ দেয় । [দেখুন, ইবন মাজাহঃ ৩৩১৯] যয়তুনের বৃক্ষ তূর পর্বতে উৎপন্ন হয় বিধায় এর দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে । বলা হয়েছে سيناء এই সায়না ও সিনিন সেই স্থানের নাম, যেখানে তূর পর্বত অবস্থিত । এ পাহাড়ের সাথে একে সম্পর্কিত করার কারণ সম্ভবত এই যে, সিনাই পাহাড় এলাকার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য স্থানই এর আসল স্বদেশ ভূমি । [দেখুন, কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর উপকারিতা; আর তোমরা তা থেকে খাও(১),

২২. আর তাতে ও নৌযানে তোমাদের বহনও করা হয়ে থাকে(২)।

وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿٢٢﴾

দ্বিতীয় রুকূ'

২৩. আর অবশ্যই আমরা নূহ্‌কে পাঠিয়েছিলাম তার সম্প্রদায়ের কাছে(৩)। তিনি বললেন, 'হে আমার

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٢٣﴾

(১) এরপর আল্লাহ্ তা'আলা এমন নেয়ামতের কথা উল্লেখ করেছেন, যা থেকে মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করে এবং আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তি ও অপরিসীম রহমতের কথা স্মরণ করে তাওহীদ ও ইবাদতে মশগুল হয়। বলা হয়েছে, তোমাদের জন্যে চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্যে শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে। তারপর এর কিছু বিবরণ এভাবে দেয়া হয়েছে যে, এসব জন্তুর পেটে আমি তোমাদের জন্যে পাক-সাফ দুধ তৈরী করেছি, যা মানুষের উৎকৃষ্ট খাদ্য। এ সম্পর্কে কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে, রক্ত ও গোবরের মাঝখানে এটি আর একটি তৃতীয় জিনিস। [সূরা আন-নাহলঃ ৬৬] মূলতঃ পশুর খাদ্য থেকে এটি সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। এরপর বলা হয়েছেঃ শুধু দুধই নয় এসব জন্তুর মধ্যে তোমাদের অনেক উপকারিতা রয়েছে। চিন্তা করলে দেখা যায়, জন্তুদের দেহের প্রতিটি অংশ মানুষের কাজে আসে এবং তার দ্বারা মানুষের জীবনধারণের অসংখ্য সরঞ্জাম তৈরী হয়। জন্তুদের পশম, অস্থি, অন্ত্র ইত্যাদি প্রতিটি অংশ দ্বারা মানুষ জীবিকার কত যে সাজ-সরঞ্জাম তৈরী করে, তা গণনা করা কঠিন। এসব উপকার ছাড়া আরও একটি বড় উপকার এই যে, এগুলোর মধ্য থেকে যে সমস্ত জন্তু হালাল সেগুলোর গোশত মানুষের সর্বোৎকৃষ্ট খাদ্য। [দেখুন, ইবন কাসীর]

(২) এখানে সবশেষে জানোয়ারদের আরও একটি মহা উপকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, তোমরা তাদের পিঠে আরোহণও কর এবং মাল পরিবহনেরও কাজে নিযুক্ত কর। এই শেষ উপকারের মধ্যে জন্তুদের সাথে নদীতে চলাচলকারী নৌকাও শরীক আছে। মানুষ নৌকায় আরোহণ করে এবং একস্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যায়। তাই এর সাথে নৌকার আলোচনা করা হয়েছে। কোন কোন মুফাস্‌সির বলেন, এখানে গবাদি পশু ও নৌযানকে একত্রে উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে এই যে, আরববাসীরা আরোহণ ও বোঝা বহন উভয় কাজের জন্য বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে উট ব্যবহার করতো এবং উটের জন্য "স্থল পথের জাহাজ" উপমাটি অনেক পুরানো। [দেখুন, আদওয়াউল বায়ান]

(৩) তুলনামূলক আলোচনার জন্য দেখুন সূরা আল আ'রাফের ৫৯ থেকে ৬৪; ইউনুসের ৭১ থেকে ৭৩; হূদের ২৫ থেকে ৪৮; বনী ইসরাঈলের ৩ এবং আল আম্বিয়ার ৭৬-৭৭ আয়াত।

সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ‘ইবাদাত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন সত্য ইলাহ্ নেই, তবুও কি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে না[১]?’

২৪. অতঃপর তার সম্প্রদায়ের নেতারা, যারা কুফরী করেছিল[২], তারা বলল, ‘এ তো তোমাদের মত একজন মানুষই, সে তোমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে চাচ্ছে, আর আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে ফেরেশ্‌তাই নাযিল করতেন; আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদের কালে এরূপ ঘটেছে বলে শুনিনি ।

فَقَالَ الْمَلَؤُا الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ﴿٢٤﴾

২৫. ‘এ তো এমন লোক যাকে উন্মাদনা পেয়ে বসেছে; কাজেই তোমরা এর সম্পর্কে কিছুকাল অপেক্ষা কর ।’

إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٢٥﴾

২৬. নূহ্ বলেছিলেন, ‘হে আমার রব! আমাকে সাহায্য করুন, কারণ তারা আমার প্রতি মিথ্যারোপ করেছে[৩] ।’

قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴿٢٦﴾

---

(১) অর্থাৎ নিজেদের আসল ও যথার্থ আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদের বন্দেগী করতে, তাঁর সাথে অন্যকে শরীক করতে তোমাদের ভয় লাগে না? [ইবন কাসীর]

(২) নূহের সম্প্রদায় আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করতো না এবং তারা একথাও অস্বীকার করতো না যে, তিনিই বিশ্ব-জাহানের প্রভু এবং সমস্ত ফেরেশতা তাঁর নির্দেশের অনুগত, এ বক্তব্য তার সুস্পষ্ট প্রমাণ । শির্ক বা আল্লাহকে অস্বীকার করা এ জাতির আসল ভ্রষ্টতা ছিল না বরং তারা আল্লাহর গুণাবলী ও ক্ষমতা এবং তাঁর অধিকার তথা ইবাদতে শরীক করতো । অন্য আয়াত থেকেও সেটা সুস্পষ্ট হয়েছে ।

(৩) অর্থাৎ আমার প্রতি এভাবে মিথ্যা আরোপ করার প্রতিশোধ নিন । যেমন অন্যত্র বলা হয়েছেঃ “কাজেই নূহ নিজের রবকে ডেকে বললেন : আমাকে দমিত করা হয়েছে, এখন আপনিই এর বদলা নিন ।” [সূরা আল-কামারঃ ১০] অন্যত্র বলা হয়েছেঃ “আর নূহ বললোঃ হে আমার রব! এ পৃথিবীতে কাফেরদের মধ্য থেকে একজন অধিবাসীকেও ছেড়ে দিবেন না । যদি আপনি তাদেরকে থাকতে দেন তাহলে তারা আপনার বান্দাদেরকে গোমরাহ করে দেবে এবং তাদের বংশ থেকে কেবল দুষ্কৃতকারী ও সত্য অস্বীকারকারীরই জন্ম হবে ।” [সূরা নূহঃ ২৬-২৭]

فَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَٱسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَٰطِبْنِى فِى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا۟ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ﴿٢٧﴾

২৭. তারপর আমরা তার কাছে ওহী পাঠালাম, 'আপনি আমাদের চাক্ষুষ তত্ত্বাবধান ও আমাদের ওহী অনুযায়ী নৌযান নির্মাণ করুন, তারপর যখন আমাদের আদেশ আসবে এবং উনুন[১] উথলে উঠবে, তখন উঠিয়ে নেবেন প্রত্যেক জীবের এক এক জোড়া এবং আপনার পরিবার-পরিজনকে, তাদেরকে ছাড়া যাদের বিরুদ্ধে আগে সিদ্ধান্ত হয়েছে। আর তাদের সম্পর্কে আপনি আমাকে কিছু বলবেন না যারা যুলুম করেছে। তারা তো নিমজ্জিত হবে।

فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى نَجَّىٰنَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٢٨﴾

২৮. অতঃপর যখন আপনি ও আপনার সঙ্গীরা নৌযানের উপরে স্থির হবেন তখন বলুন, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, যিনি আমাদেরকে উদ্ধার করেছেন যালেম সম্প্রদায় থেকে।'

وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِى مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿٢٩﴾

২৯. আরো বলুন, 'হে আমার রব! আমাকে নামিয়ে দিন কল্যাণকরভাবে; আর আপনিই শ্রেষ্ঠ অবতারণকারী।'

إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿٣٠﴾

৩০. এতে অবশ্যই রয়েছে বহু নিদর্শন[২]।

---

(১) تنور এ শব্দটির অর্থ উনুন বা চুল্লী। যা রুটি পাকানোর জন্য তৈরী করা হয়। এই অর্থই প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। এর অপর অর্থ ভূপৃষ্ঠ। কেউ এর দ্বারা বিশেষ চুল্লীর অর্থ নিয়েছেন। কারও কারও মতে এটি কোন এক জায়গার নাম। তবে আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন তিনি এর দ্বারা কোন সুনির্দিষ্ট চুল্লি উদ্দেশ্য নিয়েছেন নাকি তখনকার যাবতীয় চুল্লিই উদ্দেশ্য নিয়েছেন। [এ ব্যাপারে সূরা হূদের ৪০ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বিস্তারিত আলোচনা চলে গেছে]

(২) অর্থাৎ ঈমানদারদেরকে নাজাত দেয়া এবং কাফেরদেরকে ধ্বংস করার মধ্যে রয়েছে অনেক নিদর্শন যেগুলো থেকে শিক্ষা নেয়া জরুরী। এ শিক্ষাগুলোর মধ্যে রয়েছে,

আর আমরা তো তাদেরকে পরীক্ষা করেছিলাম[১]।

ثُمَّ اَنۡشَاۡنَا مِنۡۢ بَعۡدِهِمۡ قَرۡنًا اٰخَرِیۡنَ ﴿۳۱﴾

৩১. তারপর আমরা তাদের পরে অন্য এক প্রজন্ম[২] সৃষ্টি করেছিলাম;

فَاَرۡسَلۡنَا فِیۡهِمۡ رَسُوۡلًا مِّنۡهُمۡ اَنِ اعۡبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمۡ مِّنۡ اِلٰهٍ غَیۡرُهٗ ؕ اَفَلَا تَتَّقُوۡنَ ﴿۳۲﴾

৩২. এরপর আমরা তাদেরই একজনকে তাদের কাছে রাসূল করে পাঠিয়েছিলাম! তিনি বলেছিলেন, 'তোমরা আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের

তাওহীদের দাওয়াতদানকারী নবীগণ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং শির্কপন্থী কাফেররা ছিল মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং নবী-রাসূলরা সত্যবাদী। তারা যা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে নিয়ে এসেছে তা হক। আর তিনি যা ইচ্ছা তা করতে সক্ষম। সবকিছু তার জ্ঞানে রয়েছে। [ইবন কাসীর] আর রাসূলের যুগে মক্কায় সে একই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যা এক সময় ছিল নূহ ও তার জাতির মধ্যে। এর পরিণামও তার চেয়ে কিছু ভিন্ন হবার নয়। আল্লাহর ফায়সালা যতই বিলম্ব হোক না কেন একদিন অবশ্যই তা হয়েই যায় এবং অনিবার্যভাবে তা হয় সত্যপন্থীদের পক্ষে এবং মিথ্যাপন্থীদের বিপক্ষে।

(১) উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ রাসূলদেরকে পাঠিয়ে তাদেরকে পরীক্ষা করে মানুষের জন্য অথবা ফেরেশতাদের জন্য প্রকাশ করতে চাইলেন যে, কে আনুগত্য করে আর কে অবাধ্য হয়। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(২) কোন কোন মুফাসসির এখানে সামূদ জাতির কথা বলা হয়েছে বলে মনে করেছেন। কারণ সামনের দিকে গিয়ে বলা হচ্ছেঃ এ জাতিকে "সাইহাহ"তথা প্রচণ্ড আওয়াজের আযাবে ধ্বংস করা হয়েছিল এবং কুরআনের অন্যান্য স্থানে বলা হয়েছে , সামূদ এমন একটি জাতি যার উপর এ আযাব এসেছিল। [হূদঃ৬৭; আল-হিজ্‌রঃ৮৩ ও আল-কামারঃ৩১]। অন্য কিছু মুফাসসির বলেছেন, এখানে আসলে আদ জাতির কথা বলা হয়েছে। কারণ কুরআনের দৃষ্টিতে নূহের জাতির পরে এ জাতিটিকেই বৃহৎ শক্তিধর করে সৃষ্টি করা হয়েছিল। [দেখুনঃ আল-আ'রাফঃ ৬৯] এ দ্বিতীয় মতটিই অধিক গ্রহণযোগ্য বলা যায়। কারণ "নূহের জাতির পরে" শব্দাবলী এ দিকেই ইংগিত করে। আর "সাইহাহ্‌" (প্রচণ্ড আওয়াজ, চিৎকার, শোরগোল, মহাগোলযোগ) এর সাথে যে সম্বন্ধ স্থাপন করা হয়েছে নিছক এতটুকু সম্বন্ধই এ জাতিকে সামূদ গণ্য করার জন্য যথেষ্ট নয়। কারণ এ শব্দটি সাধারণ ধ্বংস ও মৃত্যুর জন্য দায়ী বিকট ধ্বনির জন্য যেমন ব্যবহার হয় তেমনি ধ্বংসের কারণ যা-ই হোক না কেন ধ্বংসের সময় যে শোরগোল ও মহা গোলযোগের সৃষ্টি হয় তার জন্যও ব্যবহার হয়। [দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

অন্য কোন সত্য ইলাহ্ নেই[১], তবুও কি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে না?'

তৃতীয় রুকূ'

৩৩. আর তার সম্প্রদায়ের নেতারা, যারা কুফরী করেছিল ও আখেরাতের সাক্ষাতে মিথ্যারোপ করেছিল এবং যাদেরকে আমরা দিয়েছিলাম দুনিয়ার জীবনের প্রচুর ভোগ-সম্ভার[২], তারা বলেছিল, 'এ তো তোমাদেরই মত একজন মানুষ; তোমরা যা খাও, সে তা-ই খায় এবং তোমরা যা পান কর সেও তাই পান করে;

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿٣٣﴾

৩৪. 'যদি তোমরা তোমাদেরই মত একজন মানুষের আনুগত্য কর তবে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে[৩];

وَلَئِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ ﴿٣٤﴾

---

(১) এ শব্দগুলোর দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে,আল্লাহর অস্তিত্বকে তারাও অস্বীকার করতো না। তাদেরও আসল ভ্রষ্টতা ছিল শির্ক তথা আল্লাহর ইবাদাতে শির্ক করা। কুরআনের অন্যান্য স্থানেও এ জাতির এ অপরাধই বর্ণনা করা হয়েছে। [যেমন দেখুন, আল-আরাফঃ ৬৫; হূদঃ ৫৩-৫৪; ফুসসিলাতঃ ১৪ এবং আল-আহকাফঃ ২১-২২ আয়াত]।

(২) এখানে বর্ণিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো ভেবে দেখার মতো। নবীর বিরোধিতায় যারা এগিয়ে এসেছিল। তারা ছিল জাতির নেতৃস্থানীয় লোক। তাদের সবার মধ্যে যে ভ্রষ্টতা কাজ করছিল তা ছিল এই যে, তারা আখেরাত অস্বীকার করতো। তাই তাদের মনে আল্লাহর সামনে কোন জবাবদিহি করার আশংকা ছিল না। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মক্কায় তার তাওহীদের দাওয়াত চালিয়ে যাচ্ছিলেন তখন এটিই ছিল সেখানকার পরিস্থিতি।

(৩) মানুষ নবী হতে পারে না এবং নবী মানুষ হতে পারে না, এ চিন্তাটি সর্বকালের পথভ্রষ্ট লোকদের একটি সম্মিলিত ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। কুরআন বারবার এ জাহেলী ধারণাটির উল্লেখ করে এর প্রতিবাদ করেছে এবং পুরোপুরি জোর দিয়ে একথা বর্ণনা করেছে যে, সকল নবীই মানুষ ছিলেন এবং মানুষদের জন্য মানুষেরই নবী হওয়া

৩৫. 'সে কি তোমাদেরকে এ প্রতিশ্রুতিই দেয় যে, তোমাদের মৃত্যু হলে এবং তোমরা মাটি ও অস্থিতে পরিণত হলেও তোমাদেরকে বের করা হবে?

أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُم مُّخْرَجُونَ ٣٥

৩৬. 'অসম্ভব, তোমাদেরকে যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা অসম্ভব।

هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ٣٦

৩৭. 'একমাত্র দুনিয়ার জীবনই আমাদের জীবন, আমরা মরি বাঁচি এখানেই। আর আমরা পুনরুত্থিত হবার নই।

إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ٣٧

৩৮. 'সে তো এমন ব্যক্তি যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে, আমরা তো তাকে বিশ্বাস করার নই।'

إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ٣٨

৩৯. তিনি বললেন, 'হে আমার রব! আমাকে সাহায্য করুন; কারণ তারা আমার প্রতি মিথ্যারোপ করেছে।'

قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ٣٩

৪০. আল্লাহ্ বললেন, 'অচিরেই তারা অনুতপ্ত হবে।'

قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَّيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ ٤٠

৪১. তারপর এক বিরাট আওয়াজ সত্য-ন্যায়ের সাথে[১] তাদেরকে পাকড়াও

فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً

উচিত। [বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, আল-আরাফ, ৬৩-৬৯ ; ইউনুস, ২ ; হূদ, ২৭-৩১ ; ইউসুফ, ১০৯; আর রা'দ, ৩৮ ; ইবরাহীম, ১০-১১ ; আন-নামল, ৪৩ ; বনী-ইসরাঈল, ৯৪-৯৫ ; আল-আম্বিয়া, ৩-৮; আল-মুমিনূন, ৩৩-৩৪ ও ৪৭; আল-ফুরকান, ৭-২০ ; আশ্‌শুআরা, ১৫৪-১৮৪; ইয়াসীন, ১৫ ও ফুসসিলাত, ৬ আয়াত]।

(১) অর্থাৎ তাদের উপর যে আযাব এসেছে সেটা যথার্থ ছিল। তাদের উপর কোন প্রকার যুলুম করা হয়নি। তাদের অপরাধের কারণেই সেটা এসেছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের উপর যুলুম করেন না। তারা কুফরি ও সীমালঙ্ঘনের মাধ্যমে এটার হকদার হয়েছিল। সম্ভবতঃ বিরাট আওয়াজের সাথে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ঝড়ো বাতাসও তাদের পেয়ে বসেছিল। [ইবন কাসীর] যেমন অন্য আয়াতে এসেছে, "এটা তার রবের নির্দেশে সমস্ত কিছুকে ধ্বংস করে দেবে।' অতঃপর তাদের পরিণাম এ হল যে, তাদের বসতিগুলো ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না।" [সূরা আল-আহকাফ: ২৫]

فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝٤١

করল, ফলে আমরা তাদেরকে তরঙ্গ-তাড়িত আবর্জনার মত[১] করে দিলাম। কাজেই যালেম সম্প্রদায়ের জন্য রইল ধ্বংস।

ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قُرُوْنًا اٰخَرِيْنَ ۝٤٢

৪২. তারপর তাদের পরে আমরা বহু প্রজন্ম সৃষ্টি করেছি।

مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَاْخِرُوْنَ ۝٤٣

৪৩. কোন জাতিই তার নির্ধারিত কালকে ত্বরান্বিত করতে পারে না, বিলম্বিতও করতে পারে না।

ثُمَّ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا ؕ كُلَّمَا جَآءَ اُمَّةً رَّسُوْلُهَا كَذَّبُوْهُ فَاَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَّجَعَلْنٰهُمْ اَحَادِيْثَ ۚ فَبُعْدًا لِّقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ۝٤٤

৪৪. এরপর আমরা একের পর এক আমাদের রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি। যখনই কোন জাতির কাছে তার রাসূল এসেছেন তখনই তারা তার প্রতি মিথ্যারোপ করেছে। অতঃপর আমরা তাদের একের পর এককে ধ্বংস করে তাদেরকে কাহিনীর বিষয় করে দিয়েছি। কাজেই যারা ঈমান আনে না সে সমস্ত সম্প্রদায়ের জন্য ধ্বংসই রইল!

ثُمَّ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى وَاَخَاهُ هٰرُوْنَ ۙ بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۝٤٥

৪৫. তারপর আমরা আমাদের নিদর্শনসমূহ এবং সুস্পষ্ট প্রমাণসহ মূসা ও তার ভাই হারূনকে পাঠালাম[২],

(১) মূলে غثاء শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মানে হয় বন্যার তোড়ে ভেসে আসা ময়লা আবর্জনা, যা পরবর্তী পর্যায়ে কিনারায় আটকে পড়ে পচে যেতে থাকে। [ফাতহুল কাদীর]

(২) নিদর্শনের পরে "সুস্পষ্ট প্রমাণ" বলার অর্থ এও হতে পারে যে, ঐ নিদর্শনাবলী তাঁদের সাথে থাকাটাই একথার সুস্পষ্ট প্রমাণ ছিল যে, তাঁরা আল্লাহর প্রেরিত নবী। অথবা নিদর্শনাবলী বলতে বুঝানো হয়েছে "লাঠি" ছাড়া মিসরে অন্যান্য যেসব মু'জিযা দেখানো হয়েছে সেগুলো সবই, আর "সুস্পষ্ট প্রমাণ" বলতে "লাঠি" বুঝানো হয়েছে। কারণ এর মাধ্যমে যে মু'জিযার প্রকাশ ঘটেছে সেগুলোর পরে তো

৪৬. ফির‘আউন ও তার পরিষদবর্গের কাছে। কিন্তু তারা অহংকার করল; আর তারা ছিল উদ্ধত সম্প্রদায়[১]।

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ﴿٤٦﴾

৪৭. অতঃপর তারা বলল, ‘আমরা কি এমন দু’ব্যক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করব যারা আমাদেরই মত, অথচ তাদের সম্প্রদায় আমাদের দাসত্বকারী[২]?’

فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ ﴿٤٧﴾

৪৮. সুতরাং তারা তাদের উভয়ের প্রতি মিথ্যারোপ করল, ফলে তারা ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হল[৩]।

فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ﴿٤٨﴾

৪৯. আর আমরা তো মূসাকে দিয়েছিলাম কিতাব; যাতে তারা হেদায়াত পায়।

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٤٩﴾

৫০. আর আমরা মার্‌ইয়াম-পুত্র ও তার জননীকে করেছিলাম এক নিদর্শন এবং তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছিলাম

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴿٥٠﴾

একথা একেবারেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, এরা দু’ভাই আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছেন। [ফাতহুল কাদীর]

(১) মূলে ﴿قَوْمًا عَالِينَ﴾ শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ, তারা ছিল বড়ই আত্মম্ভরী, জালেম ও কঠোর। তারা নিজেদেরকে অনেক বড় মনে করতো এবং উদ্ধত আস্ফালন করতো। [ফাতহুল কাদীর]

(২) এখানে “ইবাদাতকারী” বলে আনুগত্যকারী বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তারা আমার অনুগত, আমাদের নির্দেশকে এমনভাবে পালন করে যেমন একজন দাস তার মনিবের কথা পালন করে। আর যে ব্যক্তি কারোর বন্দেগী-দাসত্ব ও একনিষ্ঠ আনুগত্য করে সে যেন তার ইবাদাত করে। মুবাররাদ বলেন, ‘আবেদ’ বলে অনুগত ও মান্যকারী বোঝানো হয়ে থাকে। আবু উবাইদা বলেন, যারাই কোন কর্তৃত্বের অধীনতা গ্রহণ করে আরবরা তাদেরকে তার ‘আবেদ’ বা ইবাদাতকারী বলে। আবার এটাও সম্ভব যে, সে যখন ইলাহ হওয়ার দাবী করল, তখন তাদের কেউ কেউ তাকে তা মেনে নিয়েছিল। [ফাতহুল কাদীর]

(৩) মূসা ও ফেরাউনের কাহিনীর বিস্তারিত বিবরণ জানার জন্য পড়ুন সূরা আল-বাকারাহঃ ৪৯-৫০; আল-আ'রাফঃ ১০৩-১৩৬; ইউনুসঃ ৭৫-৯২; হূদঃ ৯৬-৯৯ ; বনী ইসরাঈলঃ ১০১-১০৪ এবং ত্বা-হাঃ ৯-৮০ আয়াত।

এক অবস্থানযোগ্য ও প্রস্রবণবিশিষ্ট উচ্চ ভূমিতে[১]।

চতুর্থ রুকূ'

৫১. 'হে রাসূলগণ[২]! আপনারা পবিত্র বস্তু থেকে খাদ্য গ্রহণ করুন এবং সৎকাজ করুন[৩]; নিশ্চয় আপনারা যা করেন

يَٰٓأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُوا۟ مِنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَٱعْمَلُوا۟ صَٰلِحًا ۖ إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾

(১) আভিধানিক অর্থে "রাবওয়াহ" এমন সুউচ্চ ভূমিকে বলা হয় যা সমতল এবং আশপাশের এলাকা থেকে উঁচু। অন্যদিকে "যা-তি কারার" মানে হচ্ছে এমন জায়গা যেখানে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাওয়া যায় এবং অবস্থানকারী সেখানে স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন যাপন করতে পারে। আর "মাঈন" মানে হচ্ছে বহমান পানি বা নির্ঝরিণী। [ইবন কাসীর] এখানে কুরআন কোন স্থানটির প্রতি ইংগিত করছে তা নিশ্চয়তা সহকারে বলা কঠিন। বিভিন্নজন এ থেকে বিভিন্ন স্থানের কথা মনে করেছেন। কেউ বলেন, এ স্থানটি ছিল দামেশ্ক। কেউ বলেন, রামলাহ। কেউ বলেন, বাইতুল মাকদিস আবার কেউ বলেন, ফিলিস্তিন। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(২) এ থেকে একথা বলাই উদ্দেশ্য যে, প্রতি যুগে বিভিন্ন দেশে ও জাতির মধ্যে আগমনকারী নবীদেরকে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এবং স্থান-কালের বিভিন্নতা সত্ত্বেও তাঁদের সবাইকে একই হুকুম দেয়া হয়েছিল। তাদের সবাইকে হালাল খাওয়ার এবং সৎকাজ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। [ইবন কাসীর]

(৩) طيبات শব্দের আভিধানিক অর্থ, পবিত্র ও উত্তম বস্তু। [ফাতহুল কাদীর] এখানে এর দ্বারা এমন জিনিস বুঝানো হয়েছে যা নিজেও পাক-পবিত্র এবং হালাল পথে অর্জিতও হয়। তাই طيبات দ্বারা শুধু বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে পবিত্র ও হালাল বস্তুসমূহই বুঝতে হবে। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর] পবিত্র জিনিস খাওয়ার নির্দেশ দিয়ে নাসারাদের বৈরাগ্যবাদ ও অন্যদের ভোগবাদের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ মধ্যপন্থার দিকে ইংগিত করা হয়েছে। [দেখুন, আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

এখানে আরো প্রণিধানযোগ্য বিষয় হলো এই যে, নবী-রাসূলগণকে তাদের সময়ে দুই বিষয়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এক, হালাল ও পবিত্র বস্তু আহার কর। দুই, সৎকর্ম কর। আর এটা সর্বজনবিদিত সত্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা নবী-রাসূলগণকে নিষ্পাপ রেখেছিলেন, তাদেরকেই যখন একথা বলা হয়েছে, তখন উম্মতের জন্যে এই আদেশ আরও বেশী পালনীয়। বস্তুতঃ আসল উদ্দেশ্য উম্মতকে এই আদেশের অনুগামী করা। আলেমগণ বলেনঃ এই দু'টি আদেশকে একসাথে বর্ণনা করার মধ্যে ইঙ্গিত এই যে, সৎকর্ম সম্পাদনে হালাল খাদ্যের প্রভাব অপরিসীম। খাদ্য হালাল হলে সৎকর্মের তাওফীক হতে থাকে। [দেখুন, ইবন কাসীর] পক্ষান্তরে খাদ্য হারাম হলে সৎকর্মের ইচ্ছা করা সত্ত্বেও তাতে নানা আপত্তি প্রতিবন্ধক হয়ে

সে সম্পর্কে আমি সবিশেষ অবগত।

৫২. 'আর আপনাদের এ উম্মত তো একই উম্মত[১] এবং আমিই আপনাদের রব; অতএব আমারই তাকওয়া অবলম্বন করুন[২]।'

وَإِنَّ هَٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَأَنَا۠ رَبُّكُمْ فَٱتَّقُونِ ﴿٥٢﴾

যায়। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "হে লোকেরা! আল্লাহ নিজে পবিত্র, তাই তিনি পবিত্র জিনিসই পছন্দ করেন।" তারপর তিনি এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন এবং বলেনঃ "এক ব্যক্তি আসে সুদীর্ঘ পথ সফর করে। দেহ ধূলি ধূসরিত। মাথার চুল এলোমেলো। আকাশের দিকে হাত তুলে প্রার্থনা করেঃ হে প্রভু! হে প্রভু! কিন্তু অবস্থা হচ্ছে এই যে, তার খাবার হারাম, পানীয় হারাম, কাপড় চোপড় হারাম এবং হারাম খাদ্যে তার দেহ প্রতিপালিত হয়েছে। এখন কিভাবে এমন ব্যক্তির দোয়া কবুল হবে?" [মুসলিমঃ ১০১৫] এ থেকে বোঝা গেল যে, ইবাদতে ও দো'আ কবুল হওয়ার ব্যাপারে হালাল খাদ্যের অনেক প্রভাব আছে। খাদ্য হালাল না হলে ইবাদত ও দো'আ কুবল হওয়ার যোগ্য হয় না।

(১) "তোমাদের উম্মত একই উম্মত"। অর্থাৎ তোমরা একই দলের লোক। أمة শব্দটি যদিও সম্প্রদায় ও কোন বিশেষ নবীর জাতির অর্থে প্রচলিত ও সুবিদিত, তবুও কোন কোন সময় তরীকা ও দ্বীনের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন ﴿إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ﴾ "আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে একটি দ্বীনে (তরীকা বা জীবনপদ্ধতিতে) পেয়েছি" [সূরা আয-যুখরুফঃ ২২-২৩] তাই "উম্মত" শব্দটি এখানে এমন ব্যক্তি সমষ্টির জন্য ব্যবহৃত হয়েছে যারা কোন সম্মিলিত মৌলিক বিষয়ে একতাবদ্ধ। নবীগণ যেহেতু স্থান-কালের বিভিন্নতা সত্বেও একই বিশ্বাস ও একই দাওয়াতের উপর একতাবদ্ধ ছিলেন, তাই বলা হয়েছে, তাঁদের সবাই একই উম্মত। [দেখুন, কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] পরবর্তী বাক্য নিজেই সে মৌলিক বিষয়ের কথা বলে দিচ্ছে যার উপর সকল নবী একতাবদ্ধ ও একমত ছিলেন। আর তা হলো, একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করা। যার অপর নাম ইসলাম। নবীরা সবাই ইসলামের দিকে আহ্বান জানিয়েছেন। তাদের দ্বীনও ছিল ইসলাম। তাদের অনুসারীরাও ছিল মুসলিম। এ হিসেবে সমস্ত নবী-রাসূল ও তাদের সত্যিকারের উম্মতগণ একই উম্মত হিসেবে গণ্য। তারা সবাই মুসলিম উম্মত।

(২) আয়াতের মূল বক্তব্য হচ্ছে, নূহ আলাইহিস সালাম থেকে নিয়ে ঈসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত সকল নবী যখন এ তাওহীদ ও আখেরাত বিশ্বাসের শিক্ষা দিয়ে এসেছেন তখন অনিবার্যভাবে এ থেকে প্রমাণ হয়, এ ইসলামই মানুষের জন্য আল্লাহ্র মনোনীত দ্বীন। সুতরাং একমাত্র তাঁরই তাকওয়া অবলম্বন করা উচিত। তাঁকেই রব মানা এবং

فَتَقَطَّعُوٓا۟ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا ۖ كُلُّ حِزْبٍۭ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٥٣﴾

৫৩. অতঃপর লোকেরা তাদের নিজেদের মধ্যে তাদের এ বিষয় তথা দ্বীনকে বহুধা বিভক্ত করেছে[১]। প্রত্যেক দলই তাদের কাছে যা আছে তা নিয়ে আনন্দিত।

তাঁরই কেবল ইবাদাত করাই এর দাবী। এমন কোন কাজ করো না যা তোমাদের উপর আমার আযাবকে অবশ্যম্ভাবী করে দিবে। যেমন আমার সাথে শির্ক করা, অথবা আমার নির্দেশের বিরোধিতা, আমার নিষেধের বিপরীত কাজ করা। [ফাতহুল কাদীর] এ আয়াত অন্য আয়াতের মত যেখানে বলা হয়েছে, আর নিশ্চয় মসজিদসমূহ আল্লাহ্‌রই জন্য। কাজেই আল্লাহ্‌র সাথে তোমরা অন্য কাউকে ডেকো না।" [সূরা আল-জিন: ১৮] [কুরতুবী]

(১) زبر শব্দটি زبور এর বহুবচন। এর এক অর্থ কিতাব। এই অর্থের দিক দিয়ে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা সব নবী ও তাদের উম্মতকে মূলনীতি ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে একই দ্বীন ও তরীকা অনুযায়ী চলার নির্দেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু উম্মতগণ তা মানেনি। তারা পরস্পর বহুধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে। তারা এ ব্যাপারে বিভিন্ন কিতাবের অনুসারী হয়েছে। যে কিতাবগুলো তারা নিজেরা রচনা করেছে। তারা কিছু ভ্রষ্ট চিন্তাধারার অনুসরণ করেছে, যেগুলো তারা নিজেরা ঠিক করে নিয়েছে। [কুরতুবী] অথবা তারা কিতাবকে টুকরো টুকরো করে নিয়েছে। তাদের কেউ তাওরাতের অনুসরণ করেছে, কেউ যাবুরের কেউ ইঞ্জীলের। তারপর তারা সবগুলোকে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও বিকৃতি সাধন করেছে। [তাবারী; কুরতুবী] অথবা আয়াতের অর্থ, তাদের কোন দল যদি কোন কিতাবের উপর ঈমান আনে তো অন্যান্য কিতাবের উপর কুফরি করে। [কুরতুবী]
আবার زبر শব্দটি কোন কোন সময় زُبرة এরও বহুবচন হয়। এর অর্থ খণ্ড ও উপদল। যেমন অন্য আয়াতে এ অর্থে এসেছ, "তোমরা আমার কাছে লৌহপিণ্ডসমূহ নিয়ে আস" [সূরা আল-কাহাফ: ৯৬] এখানে এই অর্থই সুস্পষ্ট। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, তারা মূলত: একই দ্বীনের অনুসারী হওয়া সত্বেও পরবর্তীতে বিশ্বাস ও মূলনীতিতে বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। [কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর; সা'দী] এ আয়াতের অর্থে হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'সাবধান! তোমাদের পূর্বেকার কিতাবীরা বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছে। আর এ উম্মত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে। বাহাত্তরটি জাহান্নামে যাবে, আর একটি জান্নাতে। আর সেটি হচ্ছে, 'আল-জামা'আহ'। [আবু দাউদ: ৪৫৯৭] অন্য বর্ণনায় এসেছে, সাহাবায়ে কিরাম বললেন, সে দলটি কারা হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তিনি বললেন, যার উপর আমি ও আমার সাহাবীরা থাকবে। [তিরমিযী: ২৬৪১]

فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٥٤﴾

৫৪. কাজেই কিছু কালের জন্য তাদেরকে স্বীয় বিভ্রান্তিতে ছেড়ে দিন[১]।

أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ ﴿٥٥﴾

৫৫. তারা কি মনে করে যে, আমরা তাদেরকে যে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা সহযোগিতা করছি, তার মাধ্যমে,

نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ ۚ بَل لَّا يَشْعُرُونَ ﴿٥٦﴾

৫৬. তাদের জন্য সকল মঙ্গল ত্বরান্বিত করছি? না, তারা উপলব্ধি করে না[২]।

---

(১) অর্থাৎ তাদেরকে তাদের ভ্রষ্টতা ও ভুলের মধ্যে তাদের ধ্বংসের সময় পর্যন্ত ছেড়ে দিন। যেমন অন্য আয়াতে এসেছে, "অতএব কাফিরদেরকে অবকাশ দিন; তাদেরকে অবকাশ দিন কিছু কালের জন্য।" [সূরা আত-তারেক: ১৭]

(২) কাফেরদের মতে, যে ব্যক্তি ভালো খাবার, ভালো পোশাক ও ভালো ঘর-বাড়ি লাভ করেছে, যাকে অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দান করা হয়েছে এবং সমাজে যে খ্যাতি ও প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জন করতে পেরেছে সে সাফল্য লাভ করেছে। আর যে ব্যক্তি এসব থেকে বঞ্চিত হয়েছে সে ব্যর্থ হয়ে গেছে। এ মৌলিক বিভ্রান্তির ফলে তারা আবার এর চেয়ে অনেক বড় আর একটি বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে। সেটি ছিল এই যে, এ অর্থে যে ব্যক্তি কল্যাণ ও সাফল্য লাভ করেছে সে নিশ্চয়ই সঠিক পথে রয়েছে বরং সে আল্লাহর প্রিয় বান্দা, নয়তো এসব সাফল্য লাভ করা তার পক্ষে কেমন করে সম্ভব হলো। পক্ষান্তরে এ সাফল্য থেকে যাদেরকে আমরা প্রকাশ্যে বঞ্চিত দেখছি তারা নিশ্চয়ই বিশ্বাস ও কর্মের ক্ষেত্রে ভুল পথে রয়েছে। এ বিভ্রান্তিটি আসলে কাফের লোকদের ভ্রষ্টতার গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলোর অন্যতম। একে কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা করা হয়েছে, বিভিন্ন পদ্ধতিতে একে খণ্ডন করা হয়েছে এবং বিভিন্নভাবে প্রকৃত সত্য কি তা বলে দেয়া হয়েছে। [দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখুন সূরা আল বাকারাহ, ২১২; আত তাওবাহ, ৫৫, ৬৯ ও ৮৫; হূদ, ২৭ থেকে ৩১; আর রা'দ, ২৬; আল কাহ্ফ, ২৮, ৩২ থেকে ৪৩; মার্ইয়াম, ৭৭ থেকে ৮০; ত্বা-হা, ১৩১ ও ১৩২; আল আম্বিয়া, ৪৪ ও সূরা সাবা: ৩৫ আয়াত]। যখন কোন ব্যক্তি বা জাতি একদিকে সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং ফাসেকী, অশ্লীল কার্যকলাপ, যুলুম ও সীমালংঘন করতে থাকে এবং অন্যদিকে তার উপর অনুগ্রহ বর্ষিত হতে থাকে তখন বুঝতে হবে, বুদ্ধি ও কুরআন উভয় দৃষ্টিতে আল্লাহ তাকে কঠিনতর পরীক্ষার সম্মুখীন করেছেন এবং তার উপর আল্লাহর করুণা নয় বরং তাঁর ক্রোধ চেপে বসেছে। আর এজন্যই কাতাদাহ রাহেমাহুল্লাহ্ বলেন, আল্লাহ্র শপথ! তাদের সন্তান ও সম্পদের ব্যাপারে তাদের সাথে ধোঁকার আশ্রয় নেয়া হয়েছে। হে আদম সন্তান! তুমি সন্তান ও সম্পদ দিয়ে

৫৭. নিশ্চয় যারা তাদের রব-এর ভয়ে সন্ত্রস্ত,

إِنَّ الَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ﴿٥٧﴾

৫৮. আর যারা তাদের রব-এর নিদর্শনাবলীতে ঈমান আনে,

وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٨﴾

৫৯. আর যারা তাদের রব-এর সাথে শির্ক করে না[১],

وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾

৬০. আর যারা যা দেয়ার তা দেয়[২] ভীত-কম্পিত হৃদয়ে, এজন্য যে তারা তাদের রব-এর কাছে প্রত্যাবর্তনকারী[৩]।

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿٦٠﴾

কারও বিচার করো না, বরং তাদের ঈমান ও সৎকর্ম দিয়ে তাদের ভাল মন্দ সত্য ও অসত্য বিচার করো। [ইবন কাসীর]

(১) অর্থাৎ একমাত্র তাঁরই ইবাদত করে। তিনি ব্যতীত আর কারও ইবাদাত করে না। তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করে। আর এটা দৃঢ়ভাবে জানবে আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনি একক, অমুখাপেক্ষী। তিনি কোন সঙ্গিনী বা সন্তান গ্রহণ করেন নি। তাঁর মত কিছু নেই। [ইবন কাসীর]

(২) يؤتون শব্দটি إيتاء শব্দ থেকে উদ্ভুত। এর অর্থ দেয়া, খরচ করা ও দান-খয়রাত করা। তা যাকাতও হতে পারে, আবার নফল সাদকাহও হতে পারে। [ইবন কাসীর] এমনকি এর দ্বারা যাবতীয় নেক ও কল্যাণের কাজ যেমন সালাত, যাকাত, সাদাকাহ ও হজ্জ ইত্যাদি সবই উদ্দেশ্য হতে পারে। [সা'দী]

(৩) অর্থাৎ তারা দুনিয়ায় আল্লাহর ব্যাপারে ভীতি শূন্য ও চিন্তামুক্ত জীবন যাপন করে না। যা মনে আসে তাই করে না। বরং তাদের মন সবসময় তাঁর ভয়ে ভীত থাকে। তারা আরও ভয় করে যে, আমরা আল্লাহ্র নির্দেশ মোতাবেক দেয়ার পরও তা আমাদের থেকে কবুল করা হচ্ছে কি না? আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই আয়াতের মর্ম জিজ্ঞেস করে বললাম যে, এই কাজ করে যারা ভীত কম্পিত হবে তারা কি মদ্যপান করে কিংবা চুরি করে? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ না হে সিদ্দীক তনয়! বরং এরা ঐ সমস্ত লোক যারা সাওম পালন করে, সালাত পড়ে। এতদসত্ত্বেও তারা শঙ্কিত থাকে যে, সম্ভবতঃ আমাদের এই আমল আল্লাহর কাছে (আমাদের কোন ক্রুটির কারণে) কবুল হবে না। এ ধরনের লোকই সৎকাজ দ্রুত সম্পাদন করে এবং তাতে অগ্রগামী থাকে [আহমদ ৬/২০৫, তিরমিযীঃ ৩১৭৫] হাসান রাহেমাহুল্লাহ বলেনঃ আমি এমন লোক দেখেছি যারা সৎকাজ করে ততটুকুই ভীত হয় যতটুকু তোমরা মন্দ কাজ করেও ভীত হও না। [কুরতুবী] মুফাসসিরগণ

৬১. তারাই দ্রুত সম্পাদন করে কল্যাণকর কাজ এবং তারা তাতে অগ্রগামী হয়[১]।

أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴿٦١﴾

৬২. আর আমরা কাউকেও তার সাধ্যের বেশী দায়িত্ব দেই না। আর আমাদের কাছে আছে এমন এক কিতাব[২] যা

وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ ۚ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٢﴾

তাদের অন্তর ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়ার কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেছেন।
তাদেরকে যা দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা তারা দেয়া সত্ত্বেও ভয় পায় যে, তাদেরকে আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে যেতে হবে তিনি প্রত্যেকের যাবতীয় গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় জানেন। তাই তাদের দান যথাযোগ্য পন্থায় হয়েছে কি না সে ভয়ে তারা ভীত।
অথবা, তারা তাদের প্রভুর কাছে ফিরে যাবার কারণেই ভয় করছে, কারণ তাঁর কাছে কোন কাজই গোপন নেই। যে কোন ভাবেই তিনি ইচ্ছা করলে পাকড়াও করতে পারেন।
তাছাড়া, আয়াতের অন্য কেরাআত হলোঃ أتوا তখন অর্থ হবে, তারা যা কাজ করার তা করে, তারপর তারা ভয় করে যে, তাদেরকে তাদের রব-এর কাছে ফিরে যেতে হবে ফলে তিনি তাদের কাজের হিসাব নিবেন। আর যার হিসেব কড়াভাবে নেয়া হবে তার ধ্বংস অনিবার্য। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(১) দ্রুত সৎকাজ করার অর্থ এই যে, সাধারণ লোক যেমন পার্থিব মুনাফার পেছনে দৌড়ে এবং অপরকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, তারা দ্বীনী উপকারের কাজে তেমনি সচেষ্ট হয়। তাই তারা সময়ের আগেই সেটা করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। যেমন সালাতের প্রথম ওয়াক্তে তা আদায় করে। এ কারণেই তারা অন্যদের চাইতে অগ্রগামী থাকে। অন্যদেরকে তারা পিছনে ফেলে নিজেরা এগিয়েই থাকে। [কুরতুবী] অথবা আয়াতের অর্থ, আর তারা হচ্ছে এমন লোক, যাদের জন্য পূর্ব থেকেই আল্লাহ্‌র কাছে সৌভাগ্য লেখা হয়েছে। তাই তারা ভাল কাজে তাড়াতাড়ি করে। [তাবারী]

(২) কোন কোন মুফাস্‌সিরের মতে, কিতাব বলে এখানে আমলনামাকে বুঝানো হয়েছে। [ইবন কাসীর] প্রত্যেক ব্যক্তির এ আমলনামা পৃথক পৃথকভাবে তৈরী হচ্ছে। তার প্রত্যেকটি কথা, প্রত্যেকটি নড়াচড়া এমনকি চিন্তা-ভাবনা ও ইচ্ছা-সংকল্পের প্রত্যেকটি অবস্থা পর্যন্ত তাতে সন্নিবেশিত হচ্ছে। এ সম্পর্কেই বলা হয়েছে, "আর আমলনামা সামনে রেখে দেয়া হবে। তারপর তোমরা দেখবে অপরাধীরা তার মধ্যে যা আছে তাকে ভয় করতে থাকবে এবং বলতে থাকবে, হায়, আমাদের দুর্ভাগ্য ! এ কেমন কিতাব, আমাদের ছোট বা বড় এমন কোন কাজ নেই যা এখানে সন্নিবেশিত

সত্য ব্যক্ত করে এবং তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না।

بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَٰذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَٰلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ ﴿٦٣﴾

৬৩. বরং এ বিষয়ে তাদের অন্তর অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন, এছাড়াও তাদের আরো কাজ আছে যা তারা করছে[১]।

حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ

৬৪. শেষ পর্যন্ত যখন আমরা তাদের বিলাসী[২] ব্যক্তিদেরকে শাস্তি দ্বারা

হয়নি। তারা যে যা কিছু করেছিল সবই নিজেদের সামনে হাজির দেখতে পাবে। আর তোমার রব কারোর প্রতি জুলুম করেন না।" [সূরা আল-কাহ্ফ: ৪৯] অন্য আয়াতে এসেছে, "এই আমাদের লেখনি, যা তোমাদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবে সত্যভাবে। নিশ্চয় তোমরা যা আমল করতে তা আমরা লিপিবদ্ধ করেছিলাম।" [সূরা আল-জাসিয়াহ: ২৯] আবার কোন কোন মুফাসসির এখানে কিতাব অর্থ কুরআন গ্রহণ করেছেন। [ফাতহুল কাদীর]

(১) অর্থাৎ তাদের পথভ্রষ্টতার জন্য শির্ক ও কুফরের আবরণই যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তারা এতেই ক্ষান্ত ছিল না। বরং অন্যান্য কুকর্মও অনবরত করে যেত। [ইবন কাসীর] কারও কারও মতে এর অর্থ, তাদের তাকদীরে আরও কিছু খারাপ কাজ করবে বলে লিখা রয়েছে। সুতরাং তারা তাদের মৃত্যুর পূর্বে সেটা করবেই। যাতে করে তাদের উপর আযাবের বাণী সত্য পরিণত হয়। ইবন কাসীর বলেন, এ মতটি প্রকাশ্য এবং শক্তিশালী। তিনি এর সপক্ষে একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন যাতে এসেছে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে সত্তা ব্যতীত কোন ইলাহ নেই তার শপথ, কোন লোক আমল করে যেতে থাকে, এমনকি তার ও জান্নাতের মধ্যে মাত্র এক গজ দূরত্ব থাকে, তখনি তার কিতাব তথা তাকদীরের লেখা এগিয়ে আসে আর সে জাহান্নামের আমল করে জাহান্নামে প্রবেশ করে।" [বুখারী: ৩২০৮; মুসলিম: ২৬৪৩] সুতরাং কেউ যেন নিজের আমল নিয়ে গর্ব বা অহংকার না করে। বরং সর্বদা আল্লাহ্ ভয়ে ভীত ও তাঁর কাছে নত থাকে।

(২) মূলে শব্দ এসেছে, مُتْرَفِيْنَ "মুতরাফীন"। শব্দটি আসলে এমন সব লোককে বলা হয় যারা পার্থিব ধন-সম্পদ লাভ করে ভোগ বিলাসে লিপ্ত হয়েছে এবং আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টির অধিকার থেকে গাফিল হয়ে গেছে। "বিলাসপ্রিয়" শব্দটির মাধ্যমে এ শব্দটির সঠিক মর্মকথা প্রকাশ হয়ে যায়। এ আয়াতে তাদেরকে যে আযাবে গ্রেফতার করার কথা বলা হয়েছে সে সম্পর্কে মুফাসসিরগণ বলেনঃ সে আযাব বলে বদর যুদ্ধে মুসলিমদের তরবারি দ্বারা তাদের সরদারদের উপর যে শাস্তি আপতিত হয়েছিল সেটাই বোঝানো হয়েছে। [কুরতুবী] কারও কারও মতে এই আযাব দ্বারা দুর্ভিক্ষের আযাব বুঝানো হয়েছে, যা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বদদো'আর

يَجْـَٔرُوْنَ ﴿٦٤﴾

পাকড়াও করি তখনই তারা আর্তনাদ করে উঠে।

لَا تَجْـَٔرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِّنَّا لَا تُنْصَرُوْنَ ﴿٦٥﴾

৬৫. তাদেরকে বলা হবে, 'আজ আর্তনাদ করো না, তোমাদেরকে তো আমাদের পক্ষ থেকে সাহায্য করা হবে না।'

قَدْ كَانَتْ اٰيٰتِيْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُوْنَ ﴿٦٦﴾

৬৬. আমার আয়াত তো তোমাদের কাছে তিলাওয়াত করা হত[১], কিন্তু তোমরা উল্টো পায়ে পিছনে সরে পড়তে---

مُسْتَكْبِرِيْنَ ۖ بِهٖ سٰمِرًا تَهْجُرُوْنَ ﴿٦٧﴾

৬৭. দম্ভভরে এ বিষয়ে অর্থহীন গল্প-গুজবে[২]

কারণে মক্কাবাসীদের চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। [কুরতুবী] রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফেরদের জন্যে খুবই কম বদদো'আ করেছিলেন। কিন্তু এ স্থলে মুসলিমদের উপর তাদের অত্যাচারের সীমা ছাড়িয়ে গেলে তিনি বাধ্য হয়ে এরূপ দো'আ করেন, "হে আল্লাহ্! আপনি মুদার গোত্রের উপর আপনার পাকড়াও কঠোর করে দিন। আর তাদের জন্য এটাকে ইউসুফ আলাইহিসসালামের দুর্ভিক্ষের মত করে দিন।" [বুখারীঃ ৭৭১, মুসলিমঃ ৬৭৫]

(১) আয়াত বলে এখানে কুরআনের আয়াত বোঝানো হয়েছে। কারণ এখানে 'তিলাওয়াত করা' বলা হয়েছে। [কুরতুবী]

(২) আয়াতের দু'টি অর্থ হতে পারে। প্রথম অর্থ. তারা যখন ঈমান না এনে পিছনে ফিরে যায়, তখন তারা সেটা করে থাকে অহংকারবশত। তারা হক পন্থীদেরকে ঘৃণা ও হেয় মনে করে নিজেদেরকে বড় মনে করে এটি করে থাকে। এমতাবস্থায় আয়াতের পরবর্তী অংশ بِهٖ এর অর্থ নির্ণয়ে তিনটি মত রয়েছে। এক. بِهٖ এর সর্বনাম পবিত্র মক্কার হারামের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে তবে 'হারাম' শব্দটি পূর্বে কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। তার সাথে কুরাইশদের গভীর সম্পর্ক এবং একে নিয়ে তাদের গর্ব সুবিদিত ছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে শব্দটি উল্লেখ করার প্রয়োজন মনে করা হয়নি। অর্থ এই যে, মক্কার কুরাইশদের আল্লাহর আয়াতসমূহ শুনে মুখ ঘুরিয়ে সরে যাওয়া এবং না মানার কারণ হারামে বসে খারাপ কথা বলে রাত কাটায়। দুই. অথবা এখানে بِهٖ বলে কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ কুরাইশদের আল্লাহর আয়াতসমূহ শুনে মুখ ঘুরিয়ে সরে যাওয়া এবং না মানার কারণ তারা এ কুরআন নিয়ে খারাপ কথা বলে রাত কাটায়। কখনও এটাকে বলে জাদু, কখনও বলে কবিতা, কখনও গণকের কথা, ইত্যাদি বাতিল কথা। তিন. অথবা بِهٖ শব্দ দ্বারা এখানে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ কুরাইশদের আল্লাহর আয়াতসমূহ শুনে মুখ ঘুরিয়ে সরে যাওয়া এবং না মানার কারণ তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে খারাপ ও কটু কথা বলে রাত কাটায়। কখনও তাকে কবি,

রাত মাতিয়ে[১] তোমরা খারাপ কথা বলতে।

৬৮. তবে কি তারা এ বাণীতে চিন্তা-গবেষণা করেনি[২]? নাকি এ জন্যে যে, তাদের

أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُم مَّا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ

আবার কখনও গণক, কখনও জাদুকর, কখনও মিথ্যাবাদী অথবা পাগল, ইত্যাদি বাতিল ও অসার কথাসমূহ বলে থাকে। অথচ তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল। যাকে আল্লাহ্ তাদের উপর বিজয় দিয়েছেন আর তাদেরকে সেখান থেকে অপমানিত ও হেয় করে বের করে দিয়েছেন। [ইবন কাসীর] আয়াতের দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, তারা যখন ঈমান না এনে পিছনে ফিরে যায়, তখন তারা কা'বা ঘর নিয়ে অহংকারে মত্ত থাকে। এ অহংকারেই তারা হক গ্রহণ করতে রাযী হয় না। কারণ, তারা কা'বার সাথে সম্পর্ক ও তত্ত্বাবধানপ্রসূত অহংকার ও গর্বে ফেটে পড়ার উপক্রম হয়। তারা মনে করে যে, যতকিছুই হোক তাদের ব্যাপারটা আলাদা। কারণ, তারা কা'বার অভিভাবক, অথচ তারা কা'বার অভিভাবক নয়। [ইবন কাসীর] ইবন আব্বাস বলেন, তারা সেখানে বসে রাত জেগে খোশগল্পে মেতে থাকত। মসজিদ ও কা'বাকে খোশ-গল্প ও অসার কথাবার্তার আসরে পরিণত করেছিল, ইবাদাতের মাধ্যমে আবাদ করেনি। [ইবন কাসীর]

(১) রাত্রিকালে কাহিনী বলার প্রথা আরব-আজমে প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত রয়েছে। এতে অনেক ক্ষতিকর দিক ছিল এবং বৃথা সময় নষ্ট হত। বর্তমান কালেও যারা সবচেয়ে ভয়ংকর ধরনের লোক তারা রাত জেগে ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র ও দ্বীনের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র পাকাতে থাকে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই প্রথা মিটানোর প্রচেষ্টা চালান। তিনি "এশার পূর্বে নিদ্রা যাওয়া এবং এশার পর অনর্থক কিস্সা-কাহিনী বলা নিষিদ্ধ করেন।" [বুখারীঃ ৫৭৪] এর পেছনে সম্ভবত অন্য এক রহস্য এটাও ছিল যে, এশার সালাতের সাথে সাথে মানুষের সেদিনের কাজকর্ম শেষ হয়ে যায়। এই সালাত সারাদিনের গোনাহসমূহের কাফ্ফারাও হতে পারে। কাজেই এটাই তার দিনের সর্বশেষ কাজ হওয়া উত্তম। যদি এশার পর অনর্থক কিস্সা-কাহিনীতে লিপ্ত হয়, তবে প্রথমতঃ এটা স্বয়ং অনর্থক ও অপছন্দনীয়; এছাড়া এই প্রসঙ্গে পরনিন্দা, মিথ্যা এবং আরও বহু রকমের গোনাহ্ সংঘটিত হয়। এর আরেকটি কুপরিণতি এই যে, বিলম্বে নিদ্রা গেলে প্রত্যুষে জাগ্রত হওয়া সম্ভবপর হয় না। [কুরতুবী]

(২) অর্থাৎ তাদের এ মনোভাবের কারণ কি? তারা কি এ কুরআন বুঝে না? অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "তবে কি তারা কুরআনকে গভীরভাবে অনুধাবন করে না?" [সূরা আন-নিসা: ৮২] তারা যদি এ কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করত, তবে তা তাদেরকে গোনাহের কাজ থেকে দূরে রাখত। কিন্তু তারা মুতাশাবাহ আয়াতসমূহের পিছনে পড়ে ধ্বংস হয়ে গেছে। [ইবন কাসীর]

الْأَوَّلِينَ ﴿٦٨﴾

কাছে এমন কিছু এসেছে যা তাদের পূর্বপুরুষদের কাছে আসেনি[১]?

أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴿٦٩﴾

৬৯. নাকি তারা তাদের রাসূলকে চিনে না বলে তাকে অস্বীকার করছে[২]?

(১) অর্থাৎ বরং তারা এজন্যেই বিরোধিতা করছে যে, তাদের কাছে এমন কিতাব এসেছে যা তাদের পূর্ববর্তীদের কাছে আসে নি। তাদের তো উচিত ছিল এ কুরআনকে নেয়ামত মনে করে শুকরিয়াস্বরূপ ঈমান আনা। তা না করে তারা উল্টো কাজই করে চলেছে। [ইবন কাসীর] অথবা আয়াতের অর্থ, নাকি তাদের কাছে এমন কোন নিরাপত্তার গ্যারান্টি এসে গেছে যা তাদের পূর্ববর্তী ইসমাঈল আলাইহিস সালামের কাছে আসে নি? [ফাতহুল কাদীর] অথবা আয়াতের অর্থ, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নবীদের আসা, কিতাবসহকারে আসা, তাওহীদের দাওয়াত দেয়া, আখেরাতের জবাবদিহির ভয় দেখানো, এগুলোর মধ্য থেকে কোন একটিও এমন নয় যা ইতিহাসে আজ প্রথমবার দেখা দিয়েছে। তাদের আশপাশের দেশগুলোয় ইরাকে, সিরিয়ায় ও মিসরে নবীর পর নবী এসেছেন। তারা এসব কথাই বলেছেন। এগুলো তারা জানে না এমন নয়। তাদের নিজেদের দেশেই ইবরাহীম ও ইসমাঈল আলাইহিমাস সালাম এসেছেন। হূদ, সালেহ ও শোআইব আলাইহিমুস সালামও এসেছেন। তাদের নাম আজো তাদের মুখে মুখে। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

(২) অর্থাৎ তাদের অস্বীকারের এক কারণ হতে পারত এই যে, যে ব্যক্তি সত্যে দাওয়াত ও নবুওয়তের দাবী নিয়ে আগমন করেছেন, তিনি ভিন্ন দেশের লোক। তার বংশ, অভ্যাস, চালচলন ও চরিত্র সম্পর্কে তারা জ্ঞাত নয়। এমতাবস্থায় তারা বলতে পারত যে, আমরা এই নবীর জীবনালেখ্য সম্পর্কে অবগত নই; কাজেই তাকে নবী রাসূল মেনে কিরূপে অনুসরণ করতে পারি? কিন্তু এখানে তো এরূপ অবস্থা নয়। বরং একথা সুস্পষ্ট ছিল যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্ভ্রান্ততম কুরাইশ বংশে এই শহরেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং শৈশব থেকে শুরু করে তার যৌবন ও পরবর্তী সমগ্র সময় তাদের সামনেই অতিবাহিত হয়েছিল। তার কোন কর্ম, কোন অভ্যাসই তাদের কাছে গোপন ছিল না। নবুওয়ত দাবী করার পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র কাফের সম্প্রদায় তাকে ‘সাদিক’ ও ‘আমীন’- সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত বলে সম্বোধন করত। তার চরিত্র ও কর্ম সম্পর্কে কেউ কোন দিন কোন সন্দেহই করেনি। তারপর তারা এও জানতো যে, নবুওয়াতের দাবীর একদিন আগে পর্যন্তও কেউ তার মুখ থেকে এমন কোন কথা শোনেনি যা থেকে এ সন্দেহ করা যেতে পারে যে, তিনি কোন দাবী করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আর যেদিন তিনি দাবী করেন তার পর থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত একই কথা বলে আসছেন। আবার তার জীবন যাপন প্রণালী সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, অন্যদেরকে তিনি যা কিছু বলেন, তা সবার আগে নিজে পালন করে দেখিয়ে দেন। তার কথায় ও কাজে কোন বৈপরীত্য নেই। কাজেই তাদের

৭০. নাকি তারা বলে যে, তিনি উন্মাদনাগ্রস্ত ?[১] না, তিনি তাদের কাছে সত্য এনেছেন, আর তাদের অধিকাংশই সত্যকে অপছন্দকারী[২] ।

এ অজুহাতও অচল যে, তারা তাকে চেনে না। তাই জা'ফর ইবন আবু তালেব হাবশার বাদশাকে বলেছিলেন, "হে রাজন! আল্লাহ্ আমাদের কাছে এমন এক রাসূল পাঠিয়েছেন আমরা তার বংশ, সত্যবাদিতা ও আমানতদারীসহ যাবতীয় পরিচয় জানি।" [মুসনাদে আহমাদ ৫/২৯০] অনুরূপভাবে আবু সুফিয়ান ইবন হারবের কাছে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণাগুণ, বংশ, সত্যবাদিতা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল তখন সে কাফের থাকা অবস্থায়ও সত্য কথা বলতে বাধ্য হয়েছিল। [বুখারী: ৭]

(১) অর্থাৎ তাদের অস্বীকার করার কারণ কি এই যে,তারা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাগল মনে করে? মোটেই না, এটাও আসলে কোন কারণই নয়। মুখে তারা যাই বলুক না কেন মনে মনে তারা তার জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার স্বীকৃতি দিয়ে চলছে। বরং আল্লাহ্ হক নিয়ে তাকে পাঠিয়েছেন। আর তিনি হক নিয়ে এসেছেন। তিনি যে বাণী বহন করে এনেছেন কোন পাগল বা রোগীর মুখ দিয়ে তা বের হতে পারে না। সুতরাং তাদের এ দাবীও অসার। [সা'দী]

(২) ঈমান না আনার পেছনে যে সমস্ত সম্ভাব্য কারণ থাকতে পারে ৬৩, ৬৭-৭০ ও পরবর্তী ৭২ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তার অনেকগুলো কারণ উল্লেখ করেছেন। অনুরূপভাবে ঈমান আনার পক্ষে যুক্তিস্বরূপও অনেকগুলো কারণ বর্ণনা করেছেন। ঈমান না আনার পক্ষে তাদের যে সমস্ত কারণ থাকতে পারে তা বর্ণনা করে তার প্রত্যেকটি খণ্ডন করেছেন। ঈমান না আনার কারণসমূহ উল্লেখ করে প্রথমেই বলেছেন, ১. তাদের মন ও অন্তর এ ব্যাপারে অজ্ঞতায় আচ্ছন্ন। ২. হারাম শরীফের তত্ত্বাবধান তথা ইবাদত-বন্দেগীর গর্ব ও অহংকার। ৩. ভিত্তিহীন গল্প-গুজবে মেতে থাকা। ৪. খারাপ গালি-গালাজ ও রাত্রি জাগরণ করে সময় নষ্ট করা। ৫. কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা না করা। ৬. কুরআনে যা এসেছে তা পূর্ববর্তীদের কাছে যা নাযিল হয়েছে তার থেকে ভিন্নতর হওয়ার দাবী করা। ৭. নবীকে বুঝতে চেষ্টা না করা। ৮. নবীকে মোহগ্রস্থ বা পাগল বলে দাবী করা। ৯. কুরআন ও রাসূলের আহ্বান তাদের প্রবৃত্তির বিপরীত হওয়া। ১০. কুরআন থেকে বিমুখতা। কাফেরদের এসব যুক্তি উল্লেখ করে তা পুরোপুরি খণ্ডন করা হয়েছে। এর বিপরীতে ঈমান আনার পক্ষে যে সমস্ত যুক্তি দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে, ১. কুরআন গবেষণা করা। ২. আল্লাহ্র নেয়ামতকে কবুল করা। ৩. মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা সম্পর্কে জানা। তাঁর পূর্ণ সত্যবাদিতা ও আমানতদারী সম্পর্কে অবহিত হওয়া। ৪. দাওয়াতের উপর বিনিময় না চাওয়া। ৫. তিনি তাদের উপকারার্থে যাবতীয় শ্রম দিয়ে যাচ্ছেন।

وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنٰهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ ﴿٧١﴾

৭১. আর হক্ক যদি তাদের কামনা-বাসনার অনুগামী হত তবে বিশৃংখল হয়ে পড়ত আসমানসমূহ ও যমীন এবং এগুলোতে যা কিছু আছে সবকিছুই[১]। বরং আমরা তাদের কাছে নিয়ে এসেছি তাদের ইজ্জত ও সম্মান সম্বলিত যিক্‌র[২] কিন্তু তারা তাদের এ যিক্‌র

---

৬. তিনি সঠিক সরল পথের দিকে আহ্বান জানাচ্ছেন। যে পথ চলা অত্যন্ত সহজ। যে পথে চললে মনজিলে মাকসূদে পৌঁছা যায়। তারপরও তারা আপনার অনুসরণ না করে কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে? আপনার অনুসরণ না করার পিছনে তাদের কোন যুক্তি নেই। তারা হাতে শুধু পথভ্রষ্টতাই রয়েছে। আর এভাবে যারাই হক থেকে দূরে থাকে তারা সবকিছু বক্রভাবেই দেখে। আল্লাহ্ বলেন, "তারপর তারা যদি আপনার ডাকে সাড়া না দেয়, তাহলে জানবেন তারা তো শুধু নিজেদের খেয়াল-খুশীরই অনুসরণ করে। আল্লাহ্র পথনির্দেশ অগ্রাহ্য করে যে ব্যক্তি নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে তার চেয়ে বেশী বিভ্রান্ত আর কে? আল্লাহ্ যালিম সম্প্রদায়কে হেদায়াত করেন না।" [সূরা আল-কাসাস:৫০] [দেখুন, সা'দী]

(১) মুজাহিদ বলেন, এখানে হক বলে আল্লাহকে উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। অর্থাৎ যদি আল্লাহ্ তাদের মনের প্রবৃত্তি অনুসারে সাড়া দেন, আর সেটা অনুসারে শরী'আত প্রবর্তন করেন তবে আসমান ও যমীন এবং তাতে যা আছে সেগুলোতে বিপর্যয় লেগে যেত। যেমন তারা বলেছিল যে, "আর তারা বলে, 'এ কুরআন কেন নাযিল করা হল না দুই জনপদের কোন মহান ব্যক্তির উপর?" [সূরা আয-যুখরুফ: ৩১] তখন আল্লাহ্ বললেন, "তারা কি আপনার রবের রহমত বণ্টন করে?" [সূরা আয-যুখরুফ: ৩২] [ইবন কাসীর]
মুকাতিল ও সুদ্দী বলেন, এর অর্থ, যদি তারা যেভাবে পছন্দ করে সেভাবে আল্লাহ্ তাঁর জন্য কোন শরীক নির্ধারণ করেন, তবে আসমান ও যমীন ফাসাদে পূর্ণ হয়ে যেত। এ তাফসীর অনুসারে আয়াতটি অন্য আয়াতের অনুরূপ, যেখানে বলা হয়েছে, "যদি এতদুভয়ের (আসমান ও যমীনের) মধ্যে আল্লাহ্ ব্যতীত আরো অনেক ইলাহ্ থাকত, তাহলে উভয়ই বিশৃংখল হয়ে যেত।" [সূরা আল-আম্বিয়া: ২২] [ফাতহুল কাদীর]

(২) আয়াতে 'যিকর' শব্দটি দু'বার এসেছে। প্রথম বর্ণিত 'যিক্‌র' শব্দটির অর্থ কুরআন ধরা হলে, অর্থ হবে তাদের জন্য প্রতিশ্রুত সে কুরআন এসে গেছে অথচ তারা "কুরআন" থেকে মুখ ফিরিয়ে আছে। [ইবন কাসীর] অথবা 'যিকর' দ্বারা সম্মান ও মর্যাদা উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। তখন আয়াতের অর্থ হবে, আমরা এমন জিনিস তাদের কাছে এনেছি যা তারা গ্রহণ করলে তারাই মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী হবে। এ থেকে

(কুরআন) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

৭২. নাকি আপনি তাদের কাছে কোন প্রতিদান চান?[১] আপনার রব-এর প্রতিদানই তো শ্রেষ্ঠ এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ রিয্‌কদাতা।

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٧٢﴾

৭৩. আর আপনি তো তাদেরকে সরল পথের দিকেই আহ্বান করছেন।

وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٧٣﴾

৭৪. আর নিশ্চয় যারা আখেরাতে ঈমান রাখে না, তারা সরল পথ থেকে বিচ্যুত,

وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ ﴿٧٤﴾

৭৫. আর যদি আমরা তাদেরকে দয়া করি এবং তাদের দুঃখ-দৈন্য দূর করি তবুও তারা অবাধ্যতায় বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরতে থাকবে।

وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَّلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٥﴾

৭৬. আর অবশ্যই আমরা তাদেরকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করলাম, তারপরও তারা তাদের রব-এর প্রতি অবনত হল না এবং কাতর প্রার্থনাও করল

وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴿٧٦﴾

তাদের এ মুখ ফিরিয়ে নেয়া অন্য কোন জিনিস থেকে নয় বরং নিজেদেরই উন্নতি এবং নিজেদেরই উত্থানের একটি সুবর্ণ সুযোগ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার নামান্তর। [ফাতহুল কাদীর]

(১) এটি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ। অর্থাৎ নিজের এ কাজে আপনি পুরোপুরি নিঃস্বার্থ। কোন ব্যক্তি সততার সাথে এ দোষারোপ করতে পারে না যে, নিজের কোন ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য আপনার সামনে রয়েছে তাই আপনি এ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এটি এমন একটি যুক্তি যা কুরআনে শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরই নয় বরং সাধারণভাবে সকল নবীর সত্যতার প্রমাণ হিসেবে বারবার পেশ করা হয়েছে। [যেমনঃ সূরা আল আন'আমঃ ৯০; ইউনুসঃ ৭২; হূদঃ ২৯ ও ৫১ ; ইউসুফঃ ১০৪ ; আল ফুরকানঃ ৫৭ ; আশ্ শু'আরাঃ ১০৯, ১২৭, ১৪৫, ১৮০; সাবাঃ ৪৭ ; ইয়াসিনঃ ২১ ; সাদঃ ৮৬ ; আশশূরাঃ ২৩ ও আন্ নাজমঃ ৪০]।

না[১]।

৭৭. অবশেষে যখন আমরা তাদের উপর কঠিন কোন শাস্তির দুয়ার খুলে দেব তখনই তারা এতে আশাহত হয়ে পড়বে[২]।

حَتّٰٓى اِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيْدٍ اِذَا هُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ ۝

পঞ্চম রুকূ'

৭৮. আর তিনিই তোমাদের জন্য কান, চোখ ও অন্তকরণ সৃষ্টি করেছেন;

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ۭ

(১) পূর্ববর্তী আয়াতে মুশরিকদের সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, তারা আযাবে পতিত হওয়ার সময় আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদ করে। আমি যদি তাদের ফরিয়াদের কারণে দয়াপরবশ হয়ে আযাব সরিয়ে দেই, তবে মজ্জাগত অবাধ্যতার কারণে আযাব থেকে মুক্তি পাওয়ার পরক্ষণেই ওরা আবার নাফরমানীতে মশগুল হয়ে যাবে। এ আয়াতে তাদের এমনি ধরণের এক ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদেরকে একবার এক আযাবে গ্রেফতার করা হয় কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দো'আর বরকতে আযাব থেকে মুক্তি পওয়ার পরও তারা আল্লাহর কাছে নত হয়নি এবং শির্ককেই আঁকড়ে ধরে থাকে। মূলতঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কাবাসীদের উপর দুর্ভিক্ষের আযাব দেয়ার জন্য দো'আ করেছিলেন। ফলে কুরাইশরা ঘোরতর দুর্ভিক্ষে পতিত হয় এবং মৃত জন্তু, কুকুর ইত্যাদি খেতে বাধ্য হয়। অবস্থা বেগতিক দেখে আবু সুফিয়ান রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হয় এবং বলেঃ আমি আপনাকে আত্মীয়তার কসম দিচ্ছি। আপনি কি একথা বলেননি যে, আপনি বিশ্ববাসীদের জন্যে রহমতস্বরূপ প্রেরিত হয়েছেন? তিনি উত্তরে বললেনঃ হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে আমি একথা বলেছি এবং বাস্তবেও তাই। আবু সুফিয়ান বললঃ স্বগোত্রের প্রধানদেরকে তো বদর যুদ্ধে তরবারী দ্বারা হত্যা করেছেন। যারা জীবিত আছে, তাদেরকে ক্ষুধা দিয়ে হত্যা করছেন। আল্লাহর কাছে দো'আ করুন, যাতে এই আযাব আমাদের উপর থেকে সরে যায়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দো'আ করলেন। ফলে, তৎক্ষণাৎ আযাব খতম হয়ে যায়। এর পরিপ্রেক্ষিতেই উক্ত আয়াত নাযিল হয়। আয়াতে বলা হয়েছে যে, আযাবে পতিত হওয়া এবং আযাব থেকে মুক্তি পাওয়ার পরও তারা তাদের পালনকর্তার সামনে নত হয়নি। বাস্তব ঘটনা তাই ছিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দো'আয় দুর্ভিক্ষ দূর করা হলো কিন্তু মক্কার মুশরিকরা তাদের শির্ক ও কুফরে পূর্ববৎ অটল রইল। [সহীহ ইবনে হিব্বানঃ ১৭৫৩ (মাওয়ারিদুজ্জামআন)]।

(২) অর্থাৎ হতাশ হয়ে পড়বে। তারা কি করবে তা নির্ধারণ করতে সক্ষম হবে না। [ফাতহুল কাদীর]

قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝٧٨

তোমরা খুব অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক।

وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝٧٩

৭৯. আর তিনিই তোমাদেরকে যমীনে বিস্তৃত করেছেন[১] এবং তোমাদেরকে তাঁরই কাছে একত্র করা হবে।

وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝٨٠

৮০. আর তিনিই জীবিত করেন এবং মৃত্যু দেন আর তাঁরই অধিকারে রাত ও দিনের পরিবর্তন[২]। তবুও কি তোমরা বুঝবে না?

بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ۝٨١

৮১. বরং তারা বলে, যেমন বলেছিল পূর্ববর্তীরা।

قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ۝٨٢

৮২. তারা বলে, 'আমাদের মৃত্যু ঘটলে এবং আমরা মাটি ও অস্থিতে পরিণত হলেও কি আমরা পুনরুত্থিত হব?

لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَٰذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝٨٣

৮৩. 'আমাদেরকে তো এ বিষয়েই প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছে এবং অতীতে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকেও। এটা তো পূর্ববর্তীদের উপকথা ছাড়া আর কিছুই নয়।'

قُل لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝٨٤

৮৪. বলুন, 'যমীন এবং এতে যা কিছু আছে এগুলো(র মালিকানা) কার? যদি তোমরা জান (তবে বল)।'

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝٨٥

৮৫. অবশ্যই তারা বলবে, 'আল্লাহ্‌র।' বলুন, 'তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ

(১) ذرأ অর্থ, সৃষ্টি করা [জালালাইন; মুয়াসসার] তাছাড়া এখানে বিস্তৃত ও ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয়ার অর্থও হয়। [সা'দী]

(২) কিভাবে একটির পর আরেকটি আসছে। কিভাবে সাদা ও কালো পরপর আসছে। কিভাবে একটি কমছে অপরটি বাড়ছে। দিনের পর দিন রাতের পর রাত আসছে। তাদের কোন বিরতি নেই। [ফাতহুল কাদীর]

করবে না?'

৮৬. বলুন, 'সাত আসমান ও মহা-'আরশের রব কে?'

قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿٨٦﴾

৮৭. অবশ্যই তারা বলবে, 'আল্লাহ্।' বলুন, 'তবুও কি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে না?'

سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ؕ قُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿٨٧﴾

৮৮. বলুন, 'কার হাতে সমস্ত বস্তুর কর্তৃত্ব? যিনি আশ্রয় প্রদান করেন অথচ তাঁর বিপক্ষে কেউ কাউকে আশ্রয় দিতে পারে না[১], যদি তোমরা জান (তবে বল)।'

قُلْ مَنْ ۢ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٨٨﴾

৮৯. অবশ্যই তারা বলবে, 'আল্লাহ্।' বলুন, 'তাহলে কোথা থেকে তোমরা জাদুগ্রস্থ হচ্ছো?'

سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ؕ قُلْ فَاَنّٰى تُسْحَرُوْنَ ﴿٨٩﴾

৯০. বরং আমরা তো তাদের কাছে হক নিয়ে এসেছি; আর নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী[২]।

بَلْ اَتَيْنٰهُمْ بِالْحَقِّ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿٩٠﴾

(১) অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যাকে আযাব, মুসীবত ও দুঃখ-কষ্ট থেকে আশ্রয় দান করেন কারও সাধ্য নেই যে তার কোন অনিষ্ট করে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তা'আলা যদি কাউকে বালা-মুসিবত, দু:খ-কষ্টে নিপতিত হতে দেন তবে কারও সাধ্য নেই যে, তার মোকাবেলায় কাউকে আশ্রয় দিয়ে তাঁর আযাব থেকে বাঁচিয়ে নেয়। দুনিয়ার দিক দিয়েও এ কথা সত্য যে, আল্লাহ যাঁর উপকার করতে চান, তাকে কেউ বাধা দিতে পারে না এবং যাকে কষ্ট ও আযাব দিতে চান, তা থেকেও কেউ তাকে বাঁচাতে পারে না। আখিরাতের দিক দিয়েও এই বিষয়বস্তু নির্ভুল যে, যাকে তিনি আযাব দেবেন, তাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না এবং যাকে জান্নাত ও সুখ দেবেন, তাকে কেউ ফেরাতে পারবে না। তাঁর অনুমতি ব্যতীত কেউ সুপারিশও করতে পারবে না। [দেখুন, সা'দী]

(২) অর্থাৎ আল্লাহ্র জন্য যে সঙ্গিনী ও সন্তান সাব্যস্ত করছে এ ব্যাপারে তারা নির্লজ্জ মিথ্যা বলছে। অনুরূপভাবে তাঁর জন্য যে তারা শরীক সাব্যস্ত করছে তাতেও তারা মিথ্যাবাদী। [ফাতহুল কাদীর]

مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَّلَدٍ وَّمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍۭ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿٩١﴾

৯১. আল্লাহ্ কোন সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সাথে অন্য কোন ইলাহ্ও নেই; যদি থাকত তবে প্রত্যেক ইলাহ্ স্বীয় সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেত এবং একে অন্যের উপর প্রাধান্য বিস্তার করত[১]। তারা যে গুণে তাকে গুণান্বিত করে তা থেকে আল্লাহ্ কত পবিত্র- মহান!

عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٩٢﴾

৯২. তিনি গায়েব ও উপস্থিতের জ্ঞাণী, সুতরাং তারা যা কিছু শরীক করে তিনি তার ঊর্ধ্বে।

ষষ্ঠ রুকূ'

قُلْ رَّبِّ اِمَّا تُرِيَنِّيْ مَا يُوْعَدُوْنَ ﴿٩٣﴾

৯৩. বলুন, 'হে আমার রব! যে বিষয়ে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হচ্ছে, আপনি যদি তা আমাকে দেখাতে চান,

رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِيْ فِى الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٩٤﴾

৯৪. 'তবে, হে আমার রব! আপনি আমাকে যালেম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করবেন না[২]।'

---

(১) অর্থাৎ বিশ্ব-জাহানের বিভিন্ন শক্তির ও বিভিন্ন অংশের স্রষ্টা ও প্রভু যদি আলাদা আলাদা ইলাহ হতো তাহলে তাদের মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতা বজায় থাকতো না। বিশ্ব-জাহানের নিয়ম শৃংখলা ও তার বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক একাত্মতা প্রমাণ করছে যে, এর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব একজন একক আল্লাহর হাতে কেন্দ্রীভূত। যদি কর্তৃত্ব বিভক্ত হতো তাহলে কর্তৃত্বশীলদের মধ্যে অনিবার্যভাবে মতবিরোধ সৃষ্টি হতো। আর এ মতবিরোধ তাদের মধ্যে সংঘর্ষ ও যুদ্ধ পর্যন্ত না পৌঁছে ছাড়তো না। অন্যত্র বলা হয়েছেঃ "যদি পৃথিবী ও আকাশে আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্য ইলাহ থাকতো তাহলে এ উভয়ের ব্যবস্থা লণ্ডভণ্ড হয়ে যেতো।" [সূরা আল-আম্বিয়াঃ ২২] আরও বলা হয়েছেঃ "যদি আল্লাহ্র সাথে অন্য ইলাহও থাকতো, যেমন লোকেরা বলে,তাহলে নিশ্চয়ই তারা আরশের মালিকের নৈকট্যলাভের প্রচেষ্টায় ব্যস্ত থাকত" [সূরা আল-ইসরাঃ ৪২]

(২) উদ্দেশ্য এই যে, কুরআনের অনেক আয়াতে মুশরিক ও কাফেরদের উপর যে আযাবের কথা উল্লেখিত হয়েছে, কেয়ামতে এই আযাব হওয়া তো অকাট্য ও নিশ্চিতই, দুনিয়াতে হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। যদি এই আযাব দুনিয়াতে হয়,

وَإِنَّا عَلَىٰٓ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَٰدِرُونَ ﴿٩٥﴾

৯৫. আর আমরা তাদেরকে যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি প্রদান করছি, আমরা তা আপনাকে দেখাতে অবশ্যই সক্ষম[১]।

ٱدْفَعْ بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ ۚ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿٩٦﴾

৯৬. মন্দের মুকাবিলা করুন যা উত্তম তা দ্বারা; তারা (আমাকে) যে গুণে গুণান্বিত করে আমরা সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত[২]।

তবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পরে হওয়ারও সম্ভাবনা আছে এবং তার যমানায় তার চোখের সামনে তাদের উপর কোন আযাব আসার সম্ভাবনাও আছে। দুনিয়াতে যখন কোন সম্প্রদায়ের উপর কোন আযাব আসে, তখন মাঝে মাঝে সেই আযাবের প্রতিক্রিয়া শুধু যালেমদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং সৎলোকও এর কারণে পার্থিব কষ্টে পতিত হয়। তবে হয়ত এ কারণে আখেরাতে তাদের আযাবের ভার লাঘব হবে। তাছাড়া এই পার্থিব কষ্টের কারণে তারা সওয়াবও পাবে। আল্লাহ বলেনঃ "এমন আযাবকে ভয় করো, যা এসে গেলে শুধু যালেমদের পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে না" [সূরা আল-আনফালঃ ২৫] বরং অন্যরাও এর কবলে পতিত হবে। তাই এখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই দো'আ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, আপনি বলুনঃ হে আল্লাহ, যদি তাদের উপর আপনার আযাব আমার সামনে এবং আমার চোখের উপরই আসে, তবে আমাকে এই যালেমদের সাথে রাখবেন না। আমাকে তাদের বাইরে রাখবেন। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

(১) যেহেতু কাফেররা আযাবকে অস্বীকার করত এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে ঠাট্টা করত, তাই আল্লাহ্ বলেন, আমি আপনার সামনেই তাদের উপর আযাব দেখিয়ে দিতে পুরোপুরি সক্ষম। [ফাতহুল কাদীর] কোন কোন তাফসীরবিদ বলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে যদিও এই উম্মতের উপর ব্যাপক আযাব না আসার ওয়াদা হয়ে গেছে। আল্লাহ বলেনঃ "আপনার বর্তমানে আমি তাদেরকে ধ্বংস করব না।" [সূরা আল-আনফালঃ ৩৩] কিন্তু বিশেষ লোকদের উপর বিশেষ অবস্থায় দুনিয়াতেই আযাব আসা এর পরিপন্থী নয়। এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, আমি আপনাকেও তাদের আযাব দেখিয়ে দিতে সক্ষম। মক্কাবাসীদের উপরি দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধার আযাব এবং বদর যুদ্ধে এবং মক্কা বিজয়ের সময় মুসলিমদের তরবারির আযাব রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনেই তাদের উপর পতিত হয়েছিল। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

(২) অর্থাৎ আপনি মন্দকে উত্তম দ্বারা, যুলুমকে ইনসাফ দ্বারা এবং নির্দয়তাকে দয়া দ্বারা

৯৭. আর বলুন, 'হে আমার রব! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি শয়তানের প্ররোচনা থেকে[১] ।'

وَقُلْ رَّبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ ﴿٩٧﴾

৯৮. 'আর হে আমার রব! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি আমার কাছে তাদের উপস্থিতি থেকে ।'

وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ ﴿٩٨﴾

৯৯. অবশেষে যখন তাদের কারো মৃত্যু আসে, সে বলে, 'হে আমার রব!

حَتّٰٓى اِذَا جَآءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ ﴿٩٩﴾

প্রতিহত করুন। এটা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রদত্ত উত্তম চরিত্রের শিক্ষা, যা মুসলিমদের পারস্পরিক কাজ কারবারে সর্বদাই প্রচলিত আছে। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "মন্দ প্রতিহত করুন তা দ্বারা যা উৎকৃষ্ট; ফলে আপনার ও যার মধ্যে শত্রুতা আছে, সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। আর এটি শুধু তারাই প্রাপ্ত হবে যারা ধৈর্যশীল। আর এর অধিকারী তারাই হবে কেবল যারা মহাভাগ্যবান।" [সূরা ফুসসিলাত: ৩৪-৩৫] অর্থাৎ যুলুম ও নির্যাতনের জওয়াবে কাফের ও মুশরিকদের ক্ষমা ও মার্জনাই করতে থাক। কারও কারও মতে, কাফেরদেরকে প্রত্যাঘাত না করার নির্দেশ পরবর্তীকালে জেহাদের আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। কারও কারও মতে, উম্মতের নিজেদের মধ্যে এর বিধান ঠিকই কার্যকর। শুধু কাফেরদের ক্ষেত্রে তা রহিত হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর] কিন্তু ঠিক জেহাদের অবস্থায়ও এই সচ্চরিত্রতার অনেক প্রতীক অবশিষ্ট রাখা হয়েছে, যেমন-কোন নারীকে হত্যা না করা, শিশু হত্যা না করা, ধর্মীয় পুরোহিত, যারা মুসলিমদের মোকাবেলায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি, তাদেরকে হত্যা না করা। কাউকে হত্যা করা হলে তার নাক, কান ইত্যাদি কেটে 'মুছলা' তথা বিকৃত না করা ইত্যাদি।

(১) همز শব্দের অর্থ পশ্চাদ্দিক থেকে চাপ দেয়া। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর] শয়তানের প্ররোচনা ও চক্রান্ত থেকে আত্মরক্ষার জন্যে এটা একটা সুদুরপ্রসারী অর্থবহ দো'আ। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিমদেরকে এই দো'আ পড়ার আদেশ করেছেন, যাতে ক্রোধ ও গোস্সার অবস্থায় মানুষ যখন বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে পড়ে, তখন শয়তানের প্ররোচনা থেকে এই দো'আর বরকতে নিরাপদ থাকতে পারে। এ ছাড়া শয়তান ও জিনদের অন্যান্য প্রভাব ও আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যেও দো'আটি পরীক্ষিত। এক সাহাবীর রাত্রিকালে নিদ্রা আসত না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-তাকে নিম্ন বর্ণিত দো'আটি পাঠ করে শোয়ার আদেশ দিলেন। তিনি পড়া শুরু করলে অনিদ্রার কবল থেকে মুক্তি পান। দোয়াটি এইঃ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّة مِنْ غَضَبِ اللهِ وَعِقَابِهِ وَمِنْ شَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُون [আবুদাউদঃ ৩৮৯৩, মুসনাদে আহমাদঃ ৪/৫৭, ৬/৬]

আমাকে আবার ফেরত পাঠান(১),

১০০. 'যাতে আমি সৎকাজ করতে পারি যা আমি আগে করিনি(২) ।' না, এটা হবার নয় । এটা তো তার একটি বাক্য মাত্র যা সে বলবেই(৩) । তাদের সামনে

لَعَلِّيٓ أَعۡمَلُ صَٰلِحٗا فِيمَا تَرَكۡتُۚ كَلَّآۚ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَاۖ وَمِن وَرَآئِهِم بَرۡزَخٌ إِلَىٰ يَوۡمِ يُبۡعَثُونَ ١٠٠

(১) এখানে ارْجِعُونِ শব্দটি এসেছে, যার মূল অর্থ, 'তোমরা আমাকে ফেরৎ পাঠিয়ে দাও' । এখানে লক্ষণীয় যে, সম্বোধন করা হচ্ছে আল্লাহকে অথচ বহুবচনের ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা হয়েছে । এর একটি কারণ এ হতে পারে যে, এটি সম্মানার্থে করা হয়েছে যেমন বিভিন্ন ভাষায় এ পদ্ধতি প্রচলন আছে । [কুরতুবী] দ্বিতীয় কারণ কেউ কেউ এও বর্ণনা করেছেন যে,আবেদনের শব্দ বারবার উচ্চারণ করার ধারণা দেবার জন্য এভাবে বলা হয়েছে । যাতে তা 'আমাকে ফেরত পাঠাও, আমাকে ফেরত পাঠাও, আমাকে ফেরত পাঠাও' এর অর্থ প্রকাশ করে । এ ছাড়া কোন কোন মুফাসসির এ মত প্রকাশ করেছেন যে, رَبِّ বলে সম্বোধন করা হয়েছে আল্লাহকে এবং ارْجِعُونِ শব্দের মাধ্যমে সম্বোধন করা হয়েছে এমন সব ফেরেশতাদেরকে যারা সংশ্লিষ্ট অপরাধী আত্মাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাচ্ছিলেন । [কুরতুবী]

(২) অর্থাৎ মৃত্যুর সময় যখন কাফের ব্যক্তি আখেরাতের আযাব অবলোকন করতে থাকে, তখন এরূপ বাসনা প্রকাশ করে, আফসোস, আমি যদি পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে যেতাম এবং সৎকর্ম করে এই আযাব থেকে রেহাই পেতাম । [ইবন কাসীর] অন্য আয়াতেও এসেছে, "আর আমরা তোমাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছি তোমরা তা থেকে ব্যয় করবে তোমাদের কারও মৃত্যু আসার আগে । অন্যথায় মৃত্যু আসলে সে বলবে, 'হে আমার রব! আমাকে আরো কিছু কালের জন্য অবকাশ দিলে আমি সাদাকাহ্ দিতাম ও সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হতাম! ' আর যখন কারো নির্ধারিত কাল উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ্ তাকে কিছুতেই অবকাশ দেবেন না । তোমরা যা আমল কর আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত ।"[সূরা আল-মুনাফিকূন: ১০-১১] আরও এসেছে, "আর সেখানে তারা আর্তনাদ করে বলবে, 'হে আমাদের রব! আমাদেরকে বের করুন, আমরা যা করতাম তার পরিবর্তে সৎকাজ করব ।' আল্লাহ্ বলবেন, 'আমরা কি তোমাদেরকে এতো দীর্ঘ জীবন দান করিনি যে, তখন কেউ উপদেশ গ্রহণ করতে চাইলে উপদেশ গ্রহণ করতে পারতো ? আর তোমাদের কাছে সতর্ককারীও এসেছিল । কাজেই শাস্তি আস্বাদন কর; আর যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই ।" [সূরা ফাতির: ৩৭] কিন্তু তাদের সে চাওয়া পূরণ করা হবে না । [ইবন কাসীর]

(৩) অর্থাৎ ফেরত পাঠানো হবে না । নতুন করে কাজ শুরু করার জন্য তাকে আর দ্বিতীয় কোন সুযোগ দেয়া যেতে পারে না । তাছাড়া যদি তাদের কথামত তাদেরকে পাঠানোও হতো তারপরও তারা আবার অন্যায় করত । যেমন অন্য আয়াতে এসেছে, "আর তারা আবার ফিরে গেলেও তাদেরকে যা করতে নিষেধ করা হয়েছিল আবার তারা তাই করত" [সূরা আল-আন'আম: ২৮] [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

বার্‌যাখ[১] থাকবে উত্থান দিন পর্যন্ত ।

১০১. অতঃপর যেদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে[২] সেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না[৩] এবং একে অন্যের খোঁজ-খবর নেবে না[৪],

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَآ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَآءَلُونَ ﴿١٠١﴾

(১) ‘বারযাখ’ এর শাব্দিক অর্থ অন্তরায় ও পৃথককারী বস্তু । দুই অবস্থা অথবা দুই বস্তুর মাঝখানে যে বস্তু আড়াল হয় তাকে বরযখ বলা হয় । [ফাতহুল কাদীর] এ কারণেই মৃত্যুর পর কেয়ামত ও হাশর পর্যন্ত কালকে বারযাখ বলা হয় । কারণ এটা দুনিয়ার জীবন ও আখেরাতের জীবনের মাঝখানে সীমা প্রাচীর । আয়াতের অর্থ এই যে, মরণোম্মুখ ব্যক্তির ফেরেশতাদেরকে দুনিয়াতে পাঠানোর কথা বলা শুধু একটি কথা মাত্র, যা সে বলতে বাধ্য । কেননা, এখন আযাব সামনে এসে গেছে । কিন্তু এখন এই কথার ফায়দা নেই । কারণ, সে বরযখে পৌঁছে গেছে । বরযখ থেকে দুনিয়াতে ফিরে আসে না এবং কেয়ামত ও হাশর-নশরের পূর্বে পুনর্জীবন পায় না, এটাই নিয়ম ।

(২) দু’বার শিংগায় ফুঁৎকার দেয়া হবে । প্রথম ফুঁৎকারের ফলে যমীন-আসমান এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সব ধ্বংস হয়ে যাবে এবং দ্বিতীয় ফুঁৎকারের ফলে পুনরায় সব মৃত জীবিত হয়ে উত্থিত হবে । কুরআনের ﴿ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ﴾ আয়াতে একথার স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে । তবে আলোচ্য আয়াতে শিংগায় প্রথম ফুঁৎকার বোঝানো হয়েছে, না দ্বিতীয় ফুঁৎকার-এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে । যদিও দ্বিতীয় ফুঁৎকার বুঝানোই অধিক সঠিক মত বলে মনে হয় । [দেখুন, ইবন কাসীর]

(৩) এর অর্থ হচ্ছে, সে সময় বাপ ছেলের কোন কাজে লাগবে না এবং ছেলে বাপের কোন কাজে লাগবে না । প্রত্যেকে এমনভাবে নিজের অবস্থার শিকার হবে যে, একজন অন্যজনের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা তো দূরের কথা কারোর কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করার মতো চেতনাও থাকবে না । অন্যান্য স্থানে এ বিষয়টিকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছেঃ “কোন অন্তরংগ বন্ধু নিজের বন্ধুকে জিজ্ঞেস করবে না ।” [সূরা আল-মা‘আরিজঃ ১০] আরও বলা হয়েছে, “সেদিন অপরাধীর মন তার নিজের সন্তান, স্ত্রী, ভাই ও নিজের সহায়তাকারী নিকটতম আত্মীয় এবং সারা দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে ক্ষতিপূরণ বাবদ দিতে এবং নিজেকে আযাব থেকে মুক্ত করতে চাইবে ।” [সূরা আল-মা‘আরিজঃ ১১-১৪] । অন্যত্র বলা হয়েছে, “সেদিন মানুষ নিজের ভাই, মা, বাপ ও স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের থেকে পালাতে থাকবে । সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের অবস্থার মধ্যে এমনভাবে লিপ্ত থাকবে যে, তার কারোর কথা মনে থাকবে না ।” [সূরা আবাসাঃ ৩৪-৩৭]

(৪) অর্থাৎ পরস্পর কেউ কারও সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবে না । অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ﴿وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ﴾ “আর তারা একে অপরকে প্রশ্ন করতে এগিয়ে যাবে” । [সূরা আস-সাফফাতঃ ২৭] অর্থাৎ হাশরের ময়দানে একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ

فَمَنۡ ثَقُلَتۡ مَوَازِيۡنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الۡمُفۡلِحُوۡنَ ﴿١٠٢﴾

১০২. অতঃপর যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই হবে সফলকাম,

وَمَنۡ خَفَّتۡ مَوَازِيۡنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيۡنَ خَسِرُوۡۤا اَنۡفُسَهُمۡ فِىۡ جَهَنَّمَ خٰلِدُوۡنَ ﴿١٠٣﴾

১০৩. আর যাদের পাল্লা হালকা হবে, তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে; তারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে ।

تَلۡفَحُ وُجُوۡهَهُمُ النَّارُ وَهُمۡ فِيۡهَا كٰلِحُوۡنَ ﴿١٠٤﴾

১০৪. আগুন তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে এবং তারা সেখানে থাকবে বীভৎস চেহারায়[১];

اَلَمۡ تَكُنۡ اٰيٰتِىۡ تُتۡلٰى عَلَيۡكُمۡ فَكُنۡتُمۡ بِهَا تُكَذِّبُوۡنَ ﴿١٠٥﴾

১০৫. তোমাদের কাছে কি আমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হত না? তারপর তোমরা সেসবে মিথ্যারোপ করতে[২] ।

করবে । এই আয়াত সম্পর্কে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেনঃ হাশরে বিভিন্ন অবস্থানস্থল হবে এবং প্রত্যেক অবস্থানস্থলের অবস্থা বিভিন্নরূপ হবে । এমনও সময় আসবে, যখন কেউ কাউকে জিজ্ঞেস করবে না । এরপর কোন অবস্থানকালে ভয়ভীতি ও আতঙ্ক হ্রাস পেলে একে অপরের অবস্থা জিজ্ঞেস করবে ।[দেখুন, বাগভী; ফাতহুল কাদীর]

(১) আয়াতে এসেছে তারা كالح অবস্থায় থাকবে । যার অর্থ করা হয়েছে বীভৎস চেহারা । অবশ্য অভিধানে كالح এমন ব্যক্তিকে বলা হয়, যার ওষ্ঠদ্বয় মুখের দাঁতকে আবৃত করে না । এক ওষ্ঠ উপরে উত্থিত এবং অপর ওষ্ঠ নীচে ঝুলে থাকে, ফলে দাঁত বের হয়ে থাকে । এটা খুব বীভৎস আকার হবে । জাহান্নামে জাহান্নামী ব্যক্তির ওষ্ঠদ্বয়ও তদ্রুপ হবে এবং দাঁত খোলা ও বেরিয়ে থাকবে । [দেখুন, কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(২) অর্থাৎ দুনিয়ায় আমার নবী ক্রমাগতভাবে তোমাদের বলেছেন যে, দুনিয়ার জীবন নিছক হাতে গোনা কয়েকটি পরীক্ষার ঘণ্টা মাত্র । একেই আসল জীবন এবং একমাত্র জীবন মনে করে বসো না । আসল জীবন হচ্ছে আখেরাতের জীবন । সেখানে তোমাদের চিরকাল থাকতে হবে । এখানকার সাময়িক লাভ ও স্বাদ-আহলাদের লোভে এমন কাজ করো না যা আখেরাতের চিরন্তন জীবনে তোমাদের ভবিষ্যত ধ্বংস করে দেয় । কিন্তু তখন তোমরা তাঁর কথায় কান দাওনি । তোমরা এ আখেরাতের জগত অস্বীকার করতে থেকেছো । তোমরা মৃত্যুপরের জীবনকে একটি মনগড়া কাহিনী মনে করেছো । তোমরা নিজেদের এ ধারণার উপর জোর দিতে থেকেছো যে, জীবন-মৃত্যুর ব্যাপারটি নিছক এ দুনিয়ার সাথে সম্পর্কিত এবং এখানে চুটিয়ে মজা

قَالُوْا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِّيْنَ ﴿١٠٦﴾

১০৬. তারা বলবে, 'হে আমাদের রব! দুর্ভাগ্য আমাদেরকে পেয়ে বসেছিল এবং আমরা ছিলাম এক পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়;

رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْهَا فَاِنْ عُدْنَا فَاِنَّا ظٰلِمُوْنَ ﴿١٠٧﴾

১০৭. 'হে আমাদের রব! এ আগুন থেকে আমাদেরকে বের করুন; তারপর আমরা যদি পুনরায় কুফরী করি, তবে তো আমরা অবশ্যই যালিম হব।'

قَالَ اخْسَــُٔوْا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنِ ﴿١٠٨﴾

১০৮. আল্লাহ্ বলবেন, 'তোমরা হীন অবস্থায় এখানেই থাক এবং আমার সাথে কোন কথা বলবে না[১]।'

اِنَّهٗ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْ عِبَادِيْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿١٠٩﴾

১০৯. আমার বান্দাগণের মধ্যে একদল ছিল যারা বলত, 'হে আমাদের রব! আমরা ঈমান এনেছি অতএব আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করুন ও দয়া করুন, আর আপনি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।'

فَاتَّخَذْتُمُوْهُمْ سِخْرِيًّا حَتّٰٓى اَنْسَوْكُمْ ذِكْرِيْ وَكُنْتُمْ مِّنْهُمْ تَضْحَكُوْنَ ﴿١١٠﴾

১১০. 'কিন্তু তাদেরকে নিয়ে তোমরা এতো ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে যে, তা তোমাদেরকে ভুলিয়ে দিয়েছিল আমার স্মরণ। আর তোমরা তাদের নিয়ে হাসি-ঠাট্টাই করতে।'

লুটে নিতে হবে। কাজেই এখন আর অনুশোচনা করে কী লাভ। তখনই ছিল সাবধান হবার সময় যখন তোমরা দুনিয়ার কয়েক দিনের জীবনের ভোগ বিলাসে মত্ত হয়ে এখানকার চিরন্তন জীবনের লাভ বিসর্জন দিচ্ছিলে।

(১) হাসান বসরী রাহেমাহুল্লাহ বলেনঃ এটা হবে জাহান্নামীদের সর্বশেষ কথা। এরপরই কথা না বলার আদেশ হয়ে যাবে। ফলে, তারা কারও সাথে বাক্যালাপ করতে পারবে না; জন্তুদের ন্যায় একজন অপরজনের দিকে তাকিয়ে ঘেউ ঘেউ করবে। মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব রাহেমাহুল্লাহ বলেনঃ পবিত্র কুরআনে জাহান্নামীদের পাঁচটি আবেদন উদ্ধৃত করা হয়েছে। তন্মধ্যে চারটির জওয়াব দেয়া হয়েছে কিন্তু এ পঞ্চমটির জওয়াবে ﴿اخْسَــُٔوْا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنِ﴾ বলা হয়েছে। এটাই হবে তাদের শেষ কথা। এরপর তারা কিছুই বলতে পারবে না। [বাগভী]

إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوٓا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَآئِزُونَ ﴿١١١﴾

১১১. 'নিশ্চয় আমি আজ তাদেরকে তাদের ধৈর্যের কারণে এমনভাবে পুরস্কৃত করলাম যে, তারাই হল সফলকাম।'

قٰلَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِيْنَ ﴿١١٢﴾

১১২. আল্লাহ্ বলবেন, 'তোমরা যমীনে কত বছর অবস্থান করেছিলে?'

قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْـَٔلِ الْعَآدِّيْنَ ﴿١١٣﴾

১১৩. তারা বলবে, 'আমরা অবস্থান করেছিলাম একদিন বা দিনের কিছু অংশ; সুতরাং আপনি গণনাকারীদেরকে জিজ্ঞেস করুন।'

قٰلَ إِنْ لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيْلًا لَّوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١١٤﴾

১১৪. তিনি বলবেন, 'তোমরা অল্প কালই অবস্থান করেছিলে, যদি তোমরা জানতে!

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ ﴿١١٥﴾

১১৫. 'তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমরা তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে আনা হবে না?'

فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ﴿١١٦﴾

১১৬. সুতরাং আল্লাহ্ মহিমান্বিত, প্রকৃত মালিক, তিনি ছাড়া কোন হক্ক ইলাহ্ নেই; তিনি সম্মানিত 'আরশের রব।

وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا اٰخَرَ ۙ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ ۙ فَإِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ۚ إِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿١١٧﴾

১১৭. আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে অন্য ইলাহ্‌কে ডাকে, এ বিষয়ে তার নিকট কোন প্রমাণ নেই; তার হিসাব তো তার রব-এর নিকটই আছে; নিশ্চয় কাফেররা সফলকাম হবে না।

وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿١١٨﴾

১১৮. আর বলুন, 'হে আমার রব! ক্ষমা করুন ও দয়া করুন, আর আপনিই তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।'

২৪- সূরা আন্‌-নূর, ৬৪ আয়াত, মাদানী

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سُوْرَةٌ اَنْزَلْنٰهَا وَفَرَضْنٰهَا وَاَنْزَلْنَا فِيْهَآ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ①

১. এটা একটি সূরা, এটা আমরা নাযিল করেছি এবং এর বিধানকে আমরা অবশ্য পালনীয় করেছি, আর এতে আমরা নাযিল করেছি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর ।

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا

২. ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী-- তাদের প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত করবে[১],

(১) جلد শব্দের অর্থ মারা । [ফাতহুল কাদীর] جلد শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, এই বেত্রাঘাতের প্রতিক্রিয়া চামড়া পর্যন্তই সীমিত থাকা চাই এবং মাংস পর্যন্ত না পৌঁছা চাই । [বাগভী] একশ' বেত্রাঘাতের উল্লেখিত শাস্তি শুধু অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য নির্দিষ্ট; বিবাহিতদের শাস্তি প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা । [সা'দী] হাদীসে এসেছে, দু'জন লোক রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বিবাদে লিপ্ত হলো । তাদের একজন বলল: আপনি আমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব দিয়ে ফয়সালা করে দিন । অপরজন-যে তাদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে জ্ঞানী ছিল সে- বললো: হ্যাঁ, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি আমাদের মাঝে ফয়সালা করে দিন এবং আমাকে কথা বলার অনুমতি দিন । তিনি বললেন: বল । লোকটি বলল: আমার ছেলে এ লোকের কাজ করতো । তারপর সে তার স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করে বসে । লোকেরা আমাকে বললো যে, আমার ছেলের উপর পাথর মেরে হত্যা করার হুকুম রয়েছে । তখন আমি একশত ছাগল এবং একটি দাসীর বিনিময়ে আমার ছেলেকে ছাড়িয়ে আনি । তারপর আমি জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস করলে তারা বললো যে, আমার সন্তানের উপর ১০০ বেত্রাঘাত এবং একবছরের দেশান্তর । পাথর মেরে হত্যা তো তার স্ত্রীর উপরই । তখন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তোমার ছাগল ও দাসী তোমার কাছে ফেরৎ যাবে । তারপর তিনি তার ছেলেকে ১০০ বেত্রাঘাত এবং এক বছরের দেশান্তরের শাস্তি দিলেন । এবং উনাইস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে বললেন: এ দ্বিতীয় ব্যক্তির স্ত্রীর নিকট যাও । যদি সে স্বীকারোক্তি দেয় তবে তাকে পাথর মেরে হত্যা কর । পরে মহিলা স্বীকারোক্তি করলে তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হয় । [বুখারী: ৬৬৩৩, ৬৬৩৪, মুসলিম: ১৬৯৭, ১৬৯৮] অনুরূপভাবে উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিম্বরে উপবিষ্ট অবস্থায় বললেন:

مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝٢

আল্লাহ্‌র বিধান কার্যকরীকরণে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবান্বিত না করে[১], যদি তোমরা আল্লাহ্ এবং আখেরাতের উপর ঈমানদার হও; আর মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে[২] ।

الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ۝٣

৩. ব্যভিচারী পুরুষ-ব্যভিচারিণীকে অথবা মুশরিক নারীকে ছাড়া বিয়ে করে না এবং ব্যভিচারিণী নারী, তাকে ব্যভিচারী অথবা মুশরিক ছাড়া কেউ বিয়ে করে না[৩], আর মুমিনদের জন্য

আল্লাহ্ তা‘আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্যসহ প্রেরণ করেন এবং তার প্রতি কিতাব নাযিল করেন। কিতাবে যেসব বিষয় নাযিল করা হয়, তন্মধ্যে প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধানও ছিল, যা আমরা পাঠ করেছি, স্মরণ রেখেছি এবং হৃদয়ঙ্গম করেছি। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামও প্রস্তরাঘাতে হত্যা করেছেন এবং তার পরে আমরাও করেছি। এখন আমি আশংকা করছি যে, সময়ের চাকা আবর্তিত হওয়ার পর কেউ একথা বলতে না শুরু করে যে, আমরা প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধান আল্লাহ্‌র কিতাবে পাই না। ফলে সে একটি দ্বীনী কর্তব্য পরিত্যাগ করার কারণে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে, যা আল্লাহ্ তা‘আলা নাযিল করেছেন। মনে রেখো, প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধান আল্লাহ্‌র কিতাবে সত্য এবং বিবাহিত পুরুষ ও নারীর প্রতি প্রযোজ্য- যদি ব্যভিচারের শরীয়তসম্মত সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত হয় অথবা গর্ভ ও স্বীকারোক্তি পাওয়া যায়। [বুখারীঃ ৬৮২৯, মুসলিমঃ ১৬৯১]

(১) ব্যভিচারের শাস্তি অত্যন্ত কঠোর বিধায় শাস্তি প্রয়োগকারীদের তরফ থেকে দয়াপরবশ হয়ে শাস্তি ছেড়ে দেয়ার কিংবা হ্রাস করার সম্ভাবনা আছে। [সা‘দী] তাই সাথে সাথে আদেশ দেয়া হয়েছে যে, দ্বীনের এই গুরুত্বপূর্ণ বিধান কার্যকর করণে অপরাধীদের প্রতি দয়াপরবশ হওয়া বৈধ নয়। [দেখুন,ইবন কাসীর,বাগভী,তাবারী]

(২) অর্থাৎ ঘোষণা দিয়ে সাধারণ লোকের সামনে শাস্তি দিতে হবে। এর ফলে একদিকে অপরাধী অপদস্ত হবে এবং অন্যদিকে সাধারণ মানুষ শিক্ষা লাভ করবে। [ফাতহুল কাদীর,কুরতুবী,সা‘দী]

(৩) আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে তাফসীরবিদদের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। কোন কোন তাফসীরকারক আয়াতটিকে মনসূখ তথা রহিত বলেন। তাদের মতে আয়াতের ভাষ্য হলো, ব্যভিচারী মহিলাকে বিয়ে করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা

এটা হারাম করা হয়েছে[১]।

৪. আর যারা সচ্চরিত্রা নারীর[২] প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারপর তারা চারজন সাক্ষী নিয়ে না আসে,

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاۤءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً

আরোপ করা। [বাগভী] কোন কোন মুফাস্সির এ হুকুমকে সুনির্দিষ্ট ঘটনার সাথে সম্পর্কযুক্ত মনে করেন। [দেখুন, ইবন কাসীর, কুরতুবী,বাগভী,ফাতহুল কাদীর] আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনুল 'আস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ সে যুগে এক মহিলার নাম ছিল উম্মে মাহযুল। সে যিনা করত (বেশ্যা ছিল)। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক সাহাবী তাকে বিয়ে করতে চাইলে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন। [মুসনাদে আহমাদঃ ২/১৫৯, ২/২২৫, নাসায়ীঃ কিতাবুত্-তাফসীর, হাদীস নং- ৩৭৯, মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ২/১৯৩-১৯৪, বায়হাকীঃ ৭/১৫৩] অনুরূপ অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, সে যুগে 'আনাক' নাম্নী এক বেশ্যা ছিল, মারসাদ নামীয় এক সাহাবী তাকে বিয়ে করতে চাইলে এ আয়াত নাযিল হয়। [তিরমিযীঃ ৩১৭৭, আবু দাউদঃ ২০৫১, মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ২/১৬৬]

(১) আয়াতের ذٰلِكَ শব্দ দ্বারা ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর বিয়ে এবং মুশরিক ও মুশরিকার বিয়ের দিকে ইশারা করা হয়েছে [দেখুন, কুরতুবী]
কোন নারী বা কোন পুরুষ যিনাকারী হিসাবে পরিচিত হলে যদি সেই কাজ থেকে তাওবাহ্ না করে তবে তাকে বিয়ে করা জায়েয নাই।[আয়সারুত-তাফাসির,সা'দী] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'তিন ধরনের লোক জান্নাতে যাবে না। আল্লাহ্ তাদের দিকে কেয়ামতের দিন তাকাবেন না। (এক) পিতা-মাতার অবাধ্য, (দুই) পুরুষের মত চলাফেরাকারিণী মহিলা এবং (তিন) দায়্যূস (যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে অপকর্ম হতে দেখেও তার আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত হয় না)। [মুসনাদে আহমাদঃ ২/১৩৪, ইবনে হিব্বানঃ ৭৩৪০]

(২) محصنات শব্দটি إحصان থেকে উদ্ভুত। শরীয়তের পরিভাষায় إحصان 'ইহসান' দুই প্রকার। একটি ব্যভিচারের শাস্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং অপরটি অপবাদ আরোপের শাস্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ব্যভিচারের শাস্তির ক্ষেত্রে إحصان এই যে, যার বিরুদ্ধে ব্যভিচার প্রমাণিত হয়, তাকে জ্ঞান সম্পন্ন, বালেগ, মুক্ত ও মুসলিম হতে হবে এবং শরীয়ত সম্মত পন্থায় কোন নারীকে বিয়ে করে তার সাথে সঙ্গমও হতে হবে। এরূপ ব্যক্তি যিনা করলে তার প্রতি রজম তথা প্রস্তরাঘাতে হত্যার শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। পক্ষান্তরে অপবাদ আরোপের শাস্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য إحصان এই যে, যে ব্যক্তির প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করা হয়, তাকে জ্ঞান সম্পন্ন বালেগ, মুক্ত ও মুসলিম হতে হবে, সৎ হতে হবে অর্থাৎ পূর্বে কখনো তার বিরুদ্ধে ব্যভিচার প্রমাণিত হয়নি। [দেখুন,কুরতুবী,বাগভী,সা'দী,যাদুল মাসির]

وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٤﴾

তাদেরকে তোমরা আশিটি বেত্রাঘাত কর এবং তোমরা কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না; এরাই তো ফাসেক(১)।

اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا ۚ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٥﴾

৫. তবে যারা এরপর তাওবা করে ও নিজেদেরকে সংশোধন করে, তাহলে আল্লাহ্ তো অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ اِلَّآ اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهٰدٰتٍۭ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٦﴾

৬. আর যারা নিজেদের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে অথচ নিজেরা ছাড়া তাদের কোন সাক্ষী নেই, তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য এ হবে যে, সে আল্লাহ্‌র নামে চারবার শপথ করে বলবে যে, সে নিশ্চয় সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত,

وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٧﴾

৭. এবং পঞ্চমবারে বলবে যে, সে মিথ্যাবাদী হলে তার উপর নেমে আসবে আল্লাহ্‌র লা'নত।

وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهٰدٰتٍۭ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٨﴾

৮. আর স্ত্রী লোকটির শাস্তি রহিত হবে যদি সে চারবার আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে সাক্ষ্য দেয় যে, নিশ্চয় তার স্বামীই মিথ্যাবাদী,

وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَآ اِنْ كَانَ مِنَ

৯. এবং পঞ্চমবারে বলবে যে, তার স্বামী সত্যবাদী হলে তার নিজের উপর

---

(১) যে ব্যক্তি অন্যের বিরুদ্ধে যিনার অভিযোগ আনে, সে সাক্ষ্য-প্রমাণের মাধ্যমে নিজের অভিযোগ প্রমাণ করবে আর যদি প্রমাণ করতে না পারে তাহলে তাকে আশি ঘা বেত্রাঘাত করো, যাতে ভবিষ্যতে আর সে কখনো এ ধরনের কোন কথা বিনা প্রমাণে নিজের মুখ থেকে বের করার সাহস না করে। আর তাদের সাক্ষ্য কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না। [ইবন কাসীর,মুয়াস্‌সার]

নেমে আসবে আল্লাহ্‌র গযব(১) ।   الصّٰدِقِيْنَ

(১) যখন কোন স্বামী তার স্ত্রীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ দেয় অথবা সন্তান সম্পর্কে বলে যে, সে আমার শুক্রজাত নয়, অপরপক্ষে স্ত্রী স্বামীকে মিথ্যাবাদী অভিহিত করে দাবী করে যে, তাকে মিথ্যা অপবাদের শাস্তি আশিটি বেত্রাঘাত প্রদান করা হোক, তখন স্বামীকে স্বপক্ষে চার জন সাক্ষী উপস্থিত করাতে বলা হবে । সে যদি যথাবিহিত চার জন সাক্ষী পেশ করে যারা স্ত্রীর ব্যভিচারের পক্ষে এমনভাবে সাক্ষ্য দিবে যে স্ত্রীর ব্যভিচার বিচারকের কাছে প্রমাণিত হয়ে পড়ে, তখন স্ত্রীর প্রতি ব্যভিচারের হদ প্রয়োগ করা হবে । পক্ষান্তরে সে চার জন সাক্ষী পেশ করতে না পারলে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে লি'আন করানো হবে । প্রথমে স্বামীকে বলা হবে যে, সে কুরআনে উল্লেখিত ভাষায় চার বার সাক্ষ্যদান করুক যে, সে এ ব্যাপারে সত্যবাদী এবং পঞ্চম বার বলুক যে, সে মিথ্যাবাদী হলে তার প্রতি আল্লাহ্‌র লা'নত বা অভিশাপ বর্ষিত হবে ।

স্বামী যদি এসব কথা থেকে বিরত থাকে, তবে যে পর্যন্ত নিজের মিথ্যাবাদী হওয়ার কথা স্বীকার না করে অথবা উপরোক্ত ভাষায় পাঁচ বার কসম না করে, সে পর্যন্ত তাকে আটক রাখা হবে । সে যদি মিথ্যাবাদী হওয়ার কথা স্বীকার করে, তবে তার উপর অপবাদের শাস্তি প্রয়োগ করা হবে । পক্ষান্তরে যদি পাঁচ বার কসম করে নেয়, তবে স্ত্রীর কাছ থেকেও কুরআনে বর্ণিত ভাষায় পাঁচ বার কসম করিয়ে নেয়া হবে । যদি সে কসম করতে অস্বীকার করে, তবে যে পর্যন্ত সে স্বামীর কথার সত্যতা স্বীকার না করে এবং নিজের ব্যভিচারের অপরাধ স্বীকার না করে, সে পর্যন্ত তাকে আটক রাখা হবে । আর এরূপ স্বীকারোক্তি করলে তার উপর ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগ করা হবে । পক্ষান্তরে যদি উপরোক্ত ভাষায় কসম করতে সম্মত হয়ে যায় এবং কসম করে নেয়, তবে লি'আন পূর্ণতা লাভ করবে । এর ফলশ্রুতিতে দুনিয়ার শাস্তির কবল থেকে উভয়েই বেঁচে যাবে । আখেরাতের ব্যাপার আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন যে, তাদের মধ্যে কে মিথ্যাবাদী । মিথ্যাবাদী আখেরাতের শাস্তি ভোগ করবে । কিন্তু দুনিয়াতেও যখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে লি'আন হয়ে গেল, তখন তারা একে অপরের জন্য চিরতরে হারাম হয়ে যাবে । বিচারক উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেবেন । এটা তালাকেরই অনুরূপ হবে । এখন তাদের মধ্যে পুনর্বিবাহও হতে পারবে না । [ইবন কাসীর,কুরতুবী,সা'দী]

হাদীসের কিতাবাদিতে লি'আন সংক্রান্ত দু'টি ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে । একটি ঘটনা হেলাল ইবন্ উমাইয়া ও তার স্ত্রীর, যা সহীহ্ বুখারীতে আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমার বর্ণনায় রয়েছে । এ ঘটনার প্রাথমিক অংশ ইবনে আব্বাসেরই বর্ণনায় মুসনাদে আহমাদে এভাবে রয়েছে- ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ যখন কুরআনে অপবাদের হদ সম্পর্কিত ﴿وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً﴾ আয়াত নাযিল হল, তখন মুসলিমদের মধ্যে কিছুটা চাঞ্চল্য দেখা দিল । কারণ এতে কোন নারীর প্রতি

ব্যভিচারের অপবাদ আরোপকারী পুরুষের জন্য জরুরী করা হয়েছে যে, হয় সে স্বপক্ষে চার জন সাক্ষী উপস্থিত করবে, তন্মধ্যে এক জন সে নিজে হবে, না হয় তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে আশিটি বেত্রাঘাত করা হবে এবং চিরতরে তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হবে। এ আয়াত শুনে আনসারদের সর্দার সা'দ ইবনে উবাদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেনঃ হে আল্লাহ্র রাসূল, এ আয়াতগুলো ঠিক এভাবেই নাযিল হয়েছে? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সা'দ ইবনে উবাদার মুখে এরূপ কথা শুনে বিস্মিত হলেন। তিনি আনসারদেরকে সম্বোধন করে বললেনঃ তোমরা কি শুনলে, তোমাদের সর্দার কি কথা বলছেন? আনসারগণ বললঃ হে আল্লাহ্র রাসূল, আপনি তাকে তিরস্কার করবেন না। তার একথা বলার কারণ তার তীব্র আত্মমর্যাদাবোধ। অতঃপর সা'দ ইবনে উবাদা নিজেই বললেনঃ হে আল্লাহ্র রাসূল, আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ; আমার পুরোপুরি বিশ্বাস রয়েছে যে, আয়াতগুলো সত্য এবং আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকেই নাযিল করা হয়েছে। কিন্তু আমি আশ্চর্য বোধ করি যে, যদি আমি লজ্জাহীনা স্ত্রীকে এমতাবস্থায় দেখি যে, তার উপর ভিন্ন পুরুষ সওয়ার হয়ে আছে, তখন কি আমার জন্য বৈধ হবে না যে, আমি তাকে শাসন করি এবং সেখান থেকে সরিয়ে দেই; না আমার জন্য এটা জরুরী যে, আমি চার জন লোক এনে এটা দেখাই এবং সাক্ষী করি? যতক্ষণে আমি সাক্ষী সংগ্রহ করব, ততক্ষণে কি তারা উদ্দেশ্য সাধন করে পলায়ণ করবে না?

সা'দ ইবনে উবাদার এ কথাবার্তার অল্পদিন পরেই একটি ঘটনা সংঘটিত হল। হেলাল ইবনে উমাইয়া এশার সময় ক্ষেত থেকে ফিরে এসে স্ত্রীর সাথে এক জন পুরুষকে স্বচক্ষে দেখলেন এবং তাদের কথাবার্তা নিজ কানে শুনলেন। কিন্তু কিছুই বললেন না। সকালে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি খুব দুঃখিত হলেন এবং ব্যাপারটিকে গুরুতর মনে করলেন। এদিকে আনসারগণ একত্রিত হয়ে বলতে লাগল যে, আমাদের সর্দার সা'দ যে কথা বলেছিলেন, এক্ষণে আমরা তাতেই লিপ্ত হয়ে পড়লাম। এখন শরীয়তের আইন অনুযায়ী রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেলাল ইবনে উমাইয়াকে আশিটি বেত্রাঘাত করবেন এবং জনগণের মধ্যে চিরতরে তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হবে। কিন্তু হেলাল ইবনে উমাইয়া জোর দিয়ে বললেনঃ আল্লাহ্র কসম! আমার পূর্ণ বিশ্বাস যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন। বুখারীর বর্ণনায় আরো বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেলালের ব্যাপার শুনে কুরআনের বিধান মোতাবেক তাকে বলেও দিয়েছিলেন যে, হয় দাবীর স্বপক্ষে চার জন সাক্ষী উপস্থিত কর, না হয় তোমার পিঠে অপবাদের শাস্তিস্বরূপ আশিটি বেত্রাঘাত পড়বে। হেলাল উত্তরে বললেনঃ যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তাঁর কসম, আমি আমার কথায় সত্যবাদী এবং আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই এমন কোন বিধান নাযিল করবেন, যা আমার পিঠকে অপবাদের

শাস্তি থেকে মুক্ত করে দেবে। [বুখারীঃ ৪৭৪৭, ৫৩০৭] এই কথাবার্তা চলছিল এমতাবস্থায় জিব্‌রাঈল ‘আলাইহিস্ সালাম লি‘আনের আইন সম্বলিত আয়াত নিয়ে নাযিল হলেন’ অর্থাৎ ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾

আবু ইয়ালা এই বর্ণনাটিই আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন। এতে আরো বলা হয়েছে যে, লি‘আনের আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেলাল ইবনে উমাইয়াকে সুসংবাদ দিলেন যে, আল্লাহ্ তা‘আলা তোমার সমস্যার সমাধান নাযিল করেছেন। হেলাল বললেনঃ আমি আল্লাহ্ তা‘আলার কাছে এই আশাই পোষণ করেছিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেলালের স্ত্রীকে ডেকে আনলেন। স্বামী-স্ত্রীর উপস্থিতিতে স্ত্রীর জবানবন্দী নেয়া হল। সে বললঃ আমার স্বামী হেলাল ইবনে উমাইয়া আমার প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমাদের মধ্যে একজন যে মিথ্যাবাদী, তা আল্লাহ্ তা‘আলা জানেন। জিজ্ঞাস্য এই যে, তোমাদের কেউ কি আল্লাহ্‌র আযাবের ভয়ে তাওবাহ্ করবে এবং সত্য কথা প্রকাশ করবে? হেলাল বললেনঃ আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ; আমি সম্পূর্ণ সত্য কথা বলছি। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়াত অনুযায়ী উভয়কে লি‘আন করানোর আদেশ দিলেন। প্রথমে হেলালকে বলা হল যে, তুমি কুরআনের বর্ণিত ভাষায় চার বার সাক্ষ্য দাও; অর্থাৎ আমি আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রেখে বিশ্বাস করে বলছি যে, আমি সত্যবাদী। হেলাল আদেশ অনুযায়ী চার বার সাক্ষ্য দিলেন। পঞ্চম সাক্ষ্যর কুরআনী ভাষা এরূপঃ “যদি আমি মিথ্যা বলি, তবে আমার প্রতি আল্লাহ্‌র লা‘নত বর্ষিত হবে।” এই সাক্ষ্যের সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেলালকে বললেনঃ দেখ হেলাল, আল্লাহ্‌কে ভয় কর। কেননা, দুনিয়ার শাস্তি আখেরাতের শাস্তির তুলনায় অনেক হাল্কা। আল্লাহ্‌র আযাব মানুষের দেয়া শাস্তির চাইতে অনেক কঠোর। এই পঞ্চম সাক্ষ্যই শেষ সাক্ষ্য। এর ভিত্তিতেই ফয়সালা হবে। কিন্তু হেলাল বললেনঃ আমি কসম করে বলতে পারি যে, আল্লাহ্ তা‘আলা আমাকে এই সাক্ষ্যের কারণে আখেরাতের আযাব দেবেন না। এরপর তিনি পঞ্চম সাক্ষ্যর শব্দগুলোও উচ্চারণ করে দিলেন। অতঃপর হেলালের স্ত্রীর কাছ থেকেও এমনি ধরণের চার সাক্ষ্য অথবা কসম নেয়া হল। পঞ্চম সাক্ষ্যর সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ একটু থাম। আল্লাহ্‌কে ভয় কর। এই সাক্ষ্যই শেষ সাক্ষ্য। আল্লাহ্‌র আযাব মানুষের আযাব অর্থাৎ ব্যভিচারের শাস্তির চাইতেও অনেক কঠোর। এ কথা শুনে সে কসম করতে ইতস্ততঃ করতে লাগল। এ অবস্থায় কিছুক্ষণ অতিবাহিত হলে অবশেষে সে বললঃ আল্লাহ্‌র কসম আমি আমার গোত্রকে চিরদিনের জন্য লাঞ্ছিত করব না। অতঃপর সে পঞ্চম সাক্ষ্যও একথা বলে দিয়ে দিল যে, আমার স্বামী সত্যবাদী হলে আমার উপর আল্লাহ্‌র গজব বা ক্রোধ আপতিত হবে। এভাবে লি‘আনের কার্যধারা সমাপ্ত হয়ে গেলে

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বামী-স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন অর্থাৎ তাদের বিয়ে নাকচ করে দিলেন। তিনি আরো ফয়সালা দিলেন যে, এই গর্ভ থেকে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, সে এই স্ত্রীর সন্তান বলে কথিত হবে- পিতার সাথে সম্বন্ধযুক্ত হবে না। কিন্তু সন্তানটিকে ধিকৃতও করা হবে না। [মুসনাদে আহমাদঃ ১/২৩৮-২৩৯, আবু দাউদঃ ২২৫৬, আবু ইয়া‘লাঃ ২৭৪০]
বুখারী ও মুসলিমে সাহ্ল ইবনে সা‘দ সায়েদীর বর্ণনা এভাবে আছে যে, ওয়াইমের আজলানী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বললেনঃ হে আল্লাহ্র রাসূল, যদি কেউ তার স্ত্রীকে ভিন্ন পুরুষের সাথে দেখে, তবে সে কি তাকে হত্যা করবে, যার ফলে তাকেও হত্যা করা হবে? বা তার কি করা উচিত? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ আল্লাহ্ তা‘আলা তোমার এবং তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে বিধান নাযিল করেছেন। যাও স্ত্রীকে নিয়ে এস। বর্ণনাকারী সাহ্ল বলেনঃ তাদেরকে এনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের মধ্যে লি‘আন করালেন। যখন উভয় পক্ষ থেকে পাঁচটি সাক্ষ্য পূর্ণ হয়ে লি‘আন সমাপ্ত হল, তখন ওয়াইমের বললেনঃ হে আল্লাহ্র রাসূল, এখন যদি আমি তাকে স্ত্রীরূপে রাখি, তবে এর অর্থ এই হয় যে, আমি তার প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছি। তারপর তিনি তাকে তালাক দিয়ে দিলেন। [বুখারীঃ ৪৭৪৫, ৪৭৪৬, ৫৩০৯, মুসলিমঃ ১৪৯২]
আলোচ্য ঘটনাদ্বয়ের মধ্য থেকে প্রত্যেকটি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, লি‘আনের আয়াত এর পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে। হাফেয ইবনে হাজার ও ইমাম বগভী উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানকল্পে বলেছেন যে, মনে হয় প্রথম ঘটনা হেলাল ইবনে উমাইয়ার ছিল এবং লি‘আনের আয়াত এরই পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে। এরপর ওয়াইমের এমনি ধরণের ঘটনার সম্মুখীন হয়। হেলাল ইবনে উমাইয়ার ঘটনা তার জানা ছিল না। কাজেই এ ব্যাপারটি যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পেশ করা হল তখন তিনি বললেনঃ তোমার ব্যাপারে ফয়সালা এই। এর স্বপক্ষে ইঙ্গিত এই যে, হেলাল ইবনে উমাইয়ার ঘটনায় হাদীসের ভাষা হচ্ছে فَنَزَلَ جِبْرَئِيلُ এবং ওয়াইমেরের ঘটনায় ভাষা হচ্ছে قَدْ نَزَّلَ اللهُ فِيْكَ এর অর্থ এরূপও হতে পারে যে, আল্লাহ্ তা‘আলা তোমার অনুরূপ এক ঘটনায় এর বিধান নাযিল করেছেন।
উপরোক্ত দু’টি বর্ণনা ছাড়াও লি‘আন সংক্রান্ত আরো কিছু হাদীস এসেছে যেগুলো থেকে লি‘আনের গুরুত্বপূর্ণ মাস‘আলা সাব্যস্ত হয়েছে। যেমন, ইবন্ উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা বলেন, স্বামী-স্ত্রী লি‘আন শেষ করার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি করে দেন। [বুখারীঃ ৫৩০৬,৪৭৪৮ মুসনাদে আহমদঃ ২/৫৭] ইবনে উমরের অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, এক ব্যক্তি ও তার স্ত্রীর মধ্যে লি‘আন করানো হয়। তারপর স্বামীটি গর্ভের সন্তান অস্বীকার করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি

করে দেন এবং ফায়সালা শুনিয়ে দেন, সন্তান হবে শুধুমাত্র মায়ের। [বুখারীঃ ৫৩১৫,৬৭৪৮] ইবনে উমরের আর একটি বর্ণনায় এসেছে যে, উভয়ে লি'আন করার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "তোমাদের হিসাব এখন আল্লাহর জিম্মায়। তোমাদের একজন অবশ্যই মিথ্যুক।" তারপর তিনি পুরুষটিকে বলেন, এখন এ আর তোমার নয়। তুমি এর উপর নিজের কোন অধিকার দেখাতে পারো না। এর উপর কোনরকম হস্তক্ষেপও করতে পারো না। অথবা এর বিরুদ্ধে অন্য কোন প্রকার প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করার অধিকারও আর তোমার নেই। পুরুষটি বলে, হে আল্লাহর রসূল! আর আমার সম্পদ? (অর্থাৎ যে মোহরানা আমি তাকে দিয়েছিলাম তা আমাকে ফেরত দেবার ব্যবস্থা করুন)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "সম্পদ ফেরত নেবার কোন অধিকার তোমার নেই। যদি তুমি তার উপর সত্য অপবাদ দিয়ে থাকো তাহলে ঐ সম্পদ সে আনন্দ উপভোগের প্রতিদান যা তুমি হালাল করে তার থেকে লাভ করেছো। আর যদি তুমি তার উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়ে থাকো তাহলে সম্পদ তোমার কাছ থেকে আরো অনেক দূরে চলে গেছে। তার তুলনায় তোমার কাছ থেকে তা বেশী দূরে রয়েছে।" [বুখারীঃ ৫৩৫০] অপর বর্ণনায় আলী ইবন্‌ আবু তালেব ও ইবন্‌ মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেনঃ "সুন্নাত এটিই নির্ধারিত হয়েছে যে, লি'আনকারী স্বামী-স্ত্রী পরবর্তী পর্যায়ে আর কখনো বিবাহিতভাবে একত্র হতে পারে না।" [দারু কুতনী ৩/২৭৬] আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এরা দু'জন আর কখনো একত্র হতে পারে না। [দারুকুত্‌নীঃ ৩/২৭৬] লি'আনের উপযুক্ত আয়াত এবং এ হাদীসগুলোর আলোকে ফকীহগণ লি'আনের বিস্তারিত আইন-কানুন তৈরী করেছেন। এ আইনের গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলো হচ্ছেঃ

একঃ যে ব্যক্তি স্ত্রীর ব্যভিচার স্বচক্ষে দেখে লি'আনের পথ অবলম্বন না করে হত্যা করে বসে তার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। একটি দল বলে, তাকে হত্যা করা হবে। কারণ নিজের উদ্যোগে 'হদ' জারি করার তথা আইন হাতে তুলে নেয়ার অধিকার তার ছিল না। দ্বিতীয় দল বলে, তাকে হত্যা করা হবে না এবং তার কর্মের জন্য তাকে জবাবদিহিও করতে হবে না, তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে তার দাবীর সত্যতা প্রমাণিত হতে হবে (অর্থাৎ যথার্থই সে তার যিনার কারণে এ কাজ করেছে)। ইমাম আহমদ ও ইসহাক ইবনে রাহ্‌ওয়াইহ্‌ বলেন, এটিই হত্যার কারণ এ মর্মে তাকে দু'জন সাক্ষী আনতে হবে। মালেকীদের মধ্যে ইবনুল কাসেম ও ইবনে হাবীব এ মর্মে অতিরিক্ত শর্ত আরোপ করেন যে, যাকে হত্যা করা হয়েছে সেই যিনাকারীর বিবাহিত হতে হবে। অন্যথায় কুমার যিনাকারীকে হত্যা করলে তার কাছ থেকে কিসাস নেয়া হবে। কিন্তু অধিকাংশ ফকীহের মতে তাকে কিসাস থেকে শুধুমাত্র তখনই মাফ করা হবে যখন সে যিনার চারজন সাক্ষী পেশ করবে

অথবা নিহত ব্যক্তি মরার আগে নিজ মুখে একথা স্বীকার করে যাবে যে, সে তার স্ত্রীর সাথে যিনা করছিল এবং এ সংগে নিহত ব্যক্তিকে বিবাহিতও হতে হবে।
দুইঃ ঘরে বসে লি'আন হতে পারে না। এ জন্য আদালতে যাওয়া জরুরী।
তিনঃ লি'আন দাবী করার অধিকার শুধু স্বামীর নয়, স্ত্রীরও। স্বামী যখন তার উপর যিনার অপবাদ দেয় অথবা তার শিশুর বংশধারা মেনে নিতে অস্বীকার করে তখন স্ত্রী আদালতে গিয়ে লি'আন দাবী করতে পারে।
চারঃ সব স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কি লি'আন হতে পারে অথবা এ জন্য তাদের দু'জনের মধ্যে কি কিছু শর্ত পাওয়া যেতে হবে? এ বিষয়ে ফকীহদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। ইমাম শাফেঈ বলেন, যার কসম আইনের দিক দিয়ে নির্ভরযোগ্য এবং যার তালাক দেবার ক্ষমতা আছে সে লি'আন করতে পারে। প্রায় একই ধরনের অভিমত ইমাম মালেক ও ইমাম আহমাদেরও। কিন্তু হানাফীগণ বলেন, লি'আন শুধুমাত্র এমন স্বাধীন মুসলিম স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে হতে পারে যারা কাযাফের অপরাধে শাস্তি পায়নি। যদি স্বামী ও স্ত্রী দু'জনই কাফের, দাস বা কাযাফের অপরাধে পূর্বেই শাস্তি প্রাপ্ত হয়ে থাকে, তাহলে তাদের মধ্যে লি'আন হতে পারে না। এ ছাড়াও যদি স্ত্রীর এর আগেও কখনো হারাম বা সন্দেহযুক্ত পদ্ধতিতে কোন পুরুষের সাথে মাখামাখি থেকে থাকে, তাহলে এ ক্ষেত্রেও লি'আন ঠিক হবে না।
পাঁচঃ নিছক ইশারা-ইংগিত, রূপক, উপমা বা সন্দেহ-সংশয় প্রকাশের ফলে লি'আন অনিবার্য হয়ে পড়ে না। বরং কেবলমাত্র এমন অবস্থায় তা অনিবার্য হয় যখন স্বামী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় যিনার অপবাদ দেয় অথবা সুস্পষ্ট ভাষায় সন্তানকে নিজের বলে মেনে নিতে অস্বীকার করে।
ছয়ঃ যদি অপবাদ দেবার পর স্বামী কসম খেতে ইতঃস্তত করে বা ছলনার আশ্রয় নেয় তাহলে ইমাম আবু হানীফার মতে, তাকে বন্দী করতে হবে এবং যতক্ষণ সে লি'আন না করে অথবা নিজের অপবাদকে মিথ্যা বলে না মেনে নেয় ততক্ষণ তাকে মুক্তি দেয়া হবে না। আর মিথ্যা বলে মেনে নিলে তার বিরুদ্ধে কাযাফের দণ্ড জারি হয়ে যাবে। এর বিপরীতপক্ষে ইমাম মালেক, শাফেঈ এর মতে, লি'আন করতে ইতঃস্তত করার ব্যাপারটি নিজেই মিথ্যার স্বীকারোক্তি। ফলে কসম করতে ইতঃস্তত করলেই তার উপর কাযাফের হদ্ ওয়াজিব হয়ে যায়।
সাতঃ স্বামীর কসম খাওয়ার পর স্ত্রী যদি লি'আন করতে ইতঃস্তত করে, তাহলে হানাফীদের মতে তাকে বন্দী করতে হবে এবং ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে মুক্তি দেয়া যাবে না যতক্ষণ না সে লি'আন করবে অথবা যিনার স্বীকারোক্তি না করে নেবে। অন্যদিকে উপরোক্ত ইমামগণ বলেন, এ অবস্থায় তাকে রজম করে দেয়া হবে। তারা কুরআনের ঐ উক্তি থেকে যুক্তি পেশ করেন যে, একমাত্র কসম খাওয়ার পরই স্ত্রী শাস্তি মুক্ত হবে। এখন যেহেতু সে কসম খাচ্ছে না, তাই নিশ্চিতভাবেই সে শাস্তির যোগ্য হবে।
আটঃ যদি লি'আনের সময় স্ত্রী গর্ভবতী থাকে তাহলে ইমাম আহমাদের মতে স্বামী

গর্ভস্থিত সন্তানকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করুক বা না করুক স্বামীর গর্ভস্থিত সন্তানের দায়মুক্ত হবার এবং সন্তান তার ঔরষজাত গণ্য না হবার জন্য লি'আন নিজেই যথেষ্ট। ইমাম শাফেঈ বলেন, স্বামীর যিনার অপবাদ ও গর্ভস্থিত সন্তানের দায়িত্ব অস্বীকার করা এক জিনিস নয়। এ জন্য স্বামী যতক্ষণ গর্ভস্থিত সন্তানের দায়িত্ব গ্রহণ করতে সুস্পষ্টভাবে অস্বীকার না করবে ততক্ষণ তা যিনার অপবাদ সত্ত্বেও তার ঔরসজাত গণ্য হবে। কারণ স্ত্রী যিনাকারিনী হওয়ার ফলেই বর্তমান গর্ভজাত সন্তানটি যে যিনার কারণে জন্ম নিয়েছে, এটা অপরিহার্য নয়।

নয়ঃ ইমাম মালেক, ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহমাদ স্ত্রীর গর্ভধারণকালে স্বামীকে গর্ভস্থিত সন্তান অস্বীকার করার অনুমতি দিয়েছেন এবং এরই ভিত্তিতে লি'আনকে বৈধ বলেন। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা বলেন, যদি স্বামীর অপবাদের ভিত্তি যিনা না হয়ে থাকে বরং শুধু এটাই হয়ে থাকে যে, সে স্ত্রীকে এমন অবস্থায় গর্ভবতী পেয়েছে যখন তার মতে এ গর্ভস্থিত সন্তান তার হতে পারে না তখন এ অবস্থায় লি'আনের বিষয়টিকে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত মূলতবী করে দেয়া উচিত। কারণ অনেক সময় কোন কোন রোগের ফলে গর্ভ সঞ্চার হয়েছে বলে সন্দেহ দেখা দেয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গর্ভসঞ্চার হয় না।

দশঃ যদি পিতা সন্তানের বংশধারা অস্বীকার করে তাহলে লি'আন অনিবার্য হয়ে পড়ে, এ ব্যাপারে সবাই একমত। আবার এ ব্যাপারেও সবাই একমত যে, একবার সন্তানকে গ্রহণ করে নেবার পর পিতার পক্ষে আর তার বংশধারা অস্বীকার করার অধিকার থাকে না। এ অবস্থায় পিতা বংশধারা অস্বীকার করলে কাযাফের শাস্তির অধিকারী হবে।

এগারঃ যদি স্বামী তালাক দেওয়ার পর সাধারণভাবে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর বিরুদ্ধে যিনার অপবাদ দেয় তাহলে ইমাম আবু হানীফার মতে লি'আন হবে না। বরং তার বিরুদ্ধে কাযাফের মামলা দায়ের করা হবে। কারণ লি'আন হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর জন্য। আর তালাকপ্রাপ্তা নারীটি তার স্ত্রী নয়। তবে যদি রজ'ঈ তালাক হয় এবং রুজু করার (স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেবার) সময়-কালের মধ্যে সে অপবাদ দেয়, তাহলে ভিন্ন কথা।

বারঃ লি'আনের আইনগত ফলাফলের মধ্য থেকে কোন কোনটার ব্যাপারে সবাই একমত আবার কোন কোনটার ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে। যেসব ফলাফলের ব্যাপারে মতৈক্য হয়েছে সেগুলো হচ্ছেঃ

লি'আন অনুষ্ঠিত হলে স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই কোন শাস্তি লাভের উপযুক্ত হবে না। স্বামী যদি সন্তানের বংশধারা অস্বীকার করে তাহলে সন্তান হবে একমাত্র মায়ের। সন্তান বাপের সাথে সম্পর্কিত হবে না এবং তার উত্তরাধিকারীও হবে না। মা তার উত্তরাধিকারী হবে এবং সে মায়ের উত্তরাধিকারী হবে।

নারীকে ব্যভিচারিনী এবং তার সন্তানকে জারজ সন্তান বলার অধিকার কারোর থাকবে না। যদিও লি'আনের সময় তার অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যার

১০. তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে[১]; এবং আল্লাহ্ তো

وَلَوۡلَا فَضۡلُ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ وَرَحۡمَتُهُۥ وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ

ফলে তার ব্যাভিচারিনী হবার ব্যাপারে কারোর মনে সন্দেহ না থাকে, তবুও তাকে ও তার সন্তানকে একথা বলার অধিকার থাকবে না।

যে ব্যক্তি লি'আনের পরে তার অথবা তার সন্তানের বিরুদ্ধে আগের অপবাদের পুনরাবৃত্তি করবে সে 'হদে'র যোগ্য হবে।

নারীর মোহরানা বাতিল হয়ে যাবে না।

ইদ্দত পালনকালে নারী পুরুষের থেকে খোরপোশ ও বাসস্থানের সুবিধা লাভের হকদার হবে না।

নারী ঐ পুরুষের জন্য হারাম হয়ে যাবে।

তাছাড়া, দু'টি বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। এক, লি'আনের পরে পুরুষ ও নারী কিভাবে আলাদা হবে? এ বিষয়ে ইমাম শাফেঈ বলেন, যখনই পুরুষ লি'আন শেষ করবে, নারী জবাবী লি'আন করুক বা না করুক তখনই সংগে সংগেই ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে। ইমাম মালেক, লাইস ইবনে সা'দ ও যুফার বলেন, পুরুষ ও নারী উভয়েই যখন লি'আন শেষ করে তখন ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। অন্যদিকে ইমাম আবু হানীফা , আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ বলেন, লি'আনের ফলে ছাড়াছাড়ি আপনা আপনি হয়ে যায় না বরং আদালত ছাড়াছাড়ি করে দেবার ফলেই ছাড়াছাড়ি হয়। যদি স্বামী নিজেই তালাক দিয়ে দেয় তাহলে ভালো, অন্যথায় আদালতের বিচারপতি তাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি করার কথা ঘোষণা করবেন। দুই, লি'আনের ভিত্তিতে আলাদা হয়ে যাবার পর কি তাদের উভয়ের আবার মিলিত হওয়া সম্ভব? এ বিষয়টিতে ইমাম মালেক, আবু ইউসুফ, শাফেঈ, আহমাদ ইবন্ হাম্বল বলেন, লি'আনের মাধ্যমে যে স্বামী-স্ত্রী আলাদা হয়ে গেছে তারা এরপর থেকে চিরকালের জন্য পরস্পরের উপর হারাম হয়ে যাবে। তারা পুনর্বার পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চাইলেও কোন অবস্থাতেই পারবে না। উমর, আলী ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমও এ একই মত পোষণ করেন। বিপরীত পক্ষে সা'ঈদ ইবন্ মুসাইয়েব, ইবরাহীম নাখঈ, শা'বী, সাঈদ ইবনে জুবাইর, আবু হানীফা ও মুহাম্মাদ রাহেমাহুমুল্লাহর মতে, যদি স্বামী নিজের মিথ্যা স্বীকার করে নেয় এবং তার উপর কাযাফের হদ জারি হয়ে যায় তাহলে তাদের দু'জনের মধ্যে পুর্নবার বিয়ে হতে পারে। তারা বলেন, তাদের উভয়কে পরস্পরের জন্য হারামকারী জিনিস হচ্ছে লি'আন। যতক্ষণ তারা এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে ততক্ষণ হারামও প্রতিষ্ঠিত থাকবে কিন্তু যখনই স্বামী নিজের মিথ্যা স্বীকার করে নিয়ে শাস্তি লাভ করবে তখনই লি'আন খতম হয়ে যাবে এবং হারামও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। [দেখুন,কুরতুবী]

(১) এখানে বাক্যের বাকী অংশ উহ্য আছে। কারণ, এখানে অনেক কিছুই বর্ণিত হয়েছে যদি আল্লাহ্‌র রহমত ও অনুগ্রহ না থাকত তবে অনেক কিছুই ঘটে যেতে পারত।

حَكِيمٌ ۝١٠

তাওবা গ্রহণকারী ও প্রজ্ঞাময়।

দ্বিতীয় রুকূ’

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُو بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ

১১. নিশ্চয় যারা এ অপবাদ[১] রচনা

যদি আল্লাহ্‌র রহমত ও অনুগ্রহ হিসেবে এ আয়াতসমূহ নাযিল না করা হতো তবে এ সমস্ত বিষয় মানুষের জীবনকে বিপর্যস্ত করে দিত। যদি আল্লাহ্‌র রহমত না হতো তবে কেউ নিজেদেরকে তাওবার মাধ্যমে পবিত্র করার সুযোগ পেত না। যদি আল্লাহ্‌র রহমত না হতো তবে তাদের মধ্যে যারা মিথ্যাবাদী তাদের উপর লা’নত বা গজব নাযিল হয়েই যেত। এ সমস্ত সম্ভাবনার কারণেই আল্লাহ্ তা’আলা এখানে উত্তরটি উহ্য রেখেছেন। [দেখুন,তাবারী,বাগভী,ফাতহুল কাদীর]

(১) পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, সূরা আন-নূরের অধিকাংশ আয়াত চারিত্রিক নিষ্কলুষতা ও পবিত্রতা সংরক্ষণের জন্য প্রবর্তিত বিধানাবলীর সাথে সম্পর্কযুক্ত। এর বিপরীতে চারিত্রিক নিষ্কলুষতা ও পবিত্রতার উপর অবৈধ হস্তক্ষেপ ও এর বিরুদ্ধাচরণের জাগতিক শাস্তি ও আখেরাতের মহা বিপদের কথা আলোচনা করা হয়েছে। তাই পরম্পরায় প্রথমে ব্যভিচারের শাস্তি, তারপর অপবাদের শাস্তি ও পরে লি’আনের কথা বর্ণিত হয়েছে। অপবাদের শাস্তি সম্পর্কে চার জন সাক্ষীর অবর্তমানে কোন পবিত্রা নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করাকে মহাপাপ সাব্যস্ত করা হয়েছে। এরূপ অপবাদ আরোপকারীর শাস্তি আশিটি বেত্রাঘাত প্রবর্তন করা হয়েছে। এ বিষয়টি সাধারণ মুসলিম পবিত্রা নারীদের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। ষষ্ঠ হিজরীতে কতিপয় মুনাফেক উম্মুল মু’মিনীন আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহার প্রতি এমনি ধরণের অপবাদ আরোপ করেছিল এবং তাদের অনুসরণ করে কয়েকজন মুসলিমও এ আলোচনায় জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। ব্যাপারটি সাধারণ মুসলিম সচ্চরিত্রা নারীদের পক্ষে অত্যাধিক গুরুতর ছিল। তাই কুরআনুল কারীমে আল্লাহ্ তা’আলা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহার পবিত্রতা বর্ণনা করে এ স্থলে উপরোক্ত দশটি আয়াত নাযিল করেছেন। [ইবন কাসীর] এসব আয়াতে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহার পবিত্রতা ঘোষণা করতঃ তার ব্যাপারে যারা কুৎসা রটনা ও অপপ্রচারে অংশগ্রহণ করেছিল, তাদের সবাইকে হুশিয়ার করা হয়েছে এবং দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের বিপদ বর্ণনা করা হয়েছে। এই অপবাদ রটনার ঘটনাটি কুরআন ও হাদীসে ‘ইফ্‌কের ঘটনা’ নামে খ্যাত। ইফ্‌ক শব্দের অর্থ জঘন্য মিথ্যা অপবাদ। [বাগভী]এসব আয়াতের তাফসীর বুঝার জন্য অপবাদের কাহিনীটি জেনে নেয়া অত্যন্ত জরুরী। তাই প্রথমে সংক্ষেপে কাহিনীটি বর্ণনা করা হচ্ছে।

বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে এই ঘটনাটি অসাধারণ দীর্ঘ ও বিস্তারিত আকারে উল্লেখ করা হয়েছে। এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এই যে, ষষ্ঠ হিজরীতে যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনী মুস্তালিক নামান্তরে মুরাইসী যুদ্ধে গমন করেন, তখন স্ত্রীদের মধ্য থেকে আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা সাথে ছিলেন। ইতিপূর্বে

নারীদের পর্দার বিধান নাযিল হয়েছিল। তাই আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার উটের পিঠে পর্দাবিশিষ্ট আসনের ব্যবস্থা করা হয়। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা প্রথমে পর্দাবিশিষ্ট আসনে সওয়ার হয়ে যেতেন। এরপর লোকেরা আসনটিকে উটের পিঠে বসিয়ে দিত। এটাই ছিল নিত্যকার নিয়ম। যুদ্ধ সমাপ্তির পর মদীনায় ফেরার পথে একদিন একটি ঘটনা ঘটল। এক মনযিলে কাফেলা অবস্থান করার পর শেষ রাতে প্রস্থানের কিছু পূর্বে ঘোষণা করা হল যে, কাফেলা কিছুক্ষণের মধ্যেই এখান থেকে রওয়ানা হয়ে যাবে। তাই প্রত্যেকেই যেন নিজ নিজ প্রয়োজন সেরে প্রস্তুত হয়। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা প্রয়োজন সারতে জঙ্গলের দিকে চলে গেলেন। সেখানে ঘটনাক্রমে তার গলার হার ছিঁড়ে কোথাও হারিয়ে গেল। তিনি সেখানে হারটি খুঁজতে লাগলেন। এতে বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। অতঃপর স্বস্থানে ফিরে এসে দেখলেন যে, কাফেলা রওয়ানা হয়ে গেছে। রওয়ানা হওয়ার সময় আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার আসনটি যথারীতি উটের পিঠে সওয়ার করিয়ে দেয়া হয়েছে এবং বাহকরা মনে করেছে যে, তিনি ভেতরেই আছেন। এমনকি উঠানোর সময়ও সন্দেহ হল না। কারণ, তিনি তখন অল্পবয়স্কা ক্ষীণাঙ্গিণী ছিলেন। ফলে আসনটি যে শূণ্য এরূপ ধারণাও কারো মনে উদয় হল না। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা ফিরে এসে যখন কাফেলাকে পেলেন না, তখন অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা ও স্থিরচিত্ততার পরিচয় দিলেন এবং কাফেলার পশ্চাতে দৌড়াদৌড়ি করা কিংবা এদিক-ওদিক খুঁজে দেখার পরিবর্তে স্বস্থানে চাদর গায়ে জড়িয়ে বসে রইলেন। তিনি মনে করলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সঙ্গীগণ যখন জানতে পারবেন যে, আমি আসনে অনুপস্থিত তখন আমার খোঁজে তারা এখানে আসবেন। কাজেই আমি এদিক-সেদিক চলে গেলে তাদের জন্য আমাকে খুঁজে বের করা মুশকিল হয়ে যাবে। সময় ছিল শেষ রাত, তাই তিনি কিছুক্ষণের মধ্যেই নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লেন।

অপরদিকে সফওয়ান ইবনে মুয়াত্তাল রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কাজের জন্য নিযুক্ত করেছিলেন যে, তিনি কাফেলার পশ্চাতে সফর করবেন এবং কাফেলা রওয়ানা হয়ে যাওয়ার পর কোন কিছু পড়ে থাকলে তা কুড়িয়ে নেবেন। তিনি সকাল বেলায় এখানে পৌঁছলেন। তখন পর্যন্ত প্রভাত-রশ্মি ততটুকু উজ্জ্বল ছিল না। তিনি শুধু একজন মানুষকে নিদ্রামগ্ন দেখতে পেলেন। কাছে এসে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহাকে চিনে ফেললেন। কারণ, পর্দা সংক্রান্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে তিনি তাকে দেখেছিলেন। চেনার পর অত্যন্ত বিচলিত কণ্ঠে তার মুখ থেকে 'ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্নাইলাইহি রাজি'উন' উচ্চারিত হয়ে গেল। এই বাক্য আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার কানে পৌঁছার সাথে সাথে তিনি জাগ্রত হয়ে গেলেন এবং মুখমণ্ডল ঢেকে ফেললেন। সফওয়ান নিজের উট কাছে এনে বসিয়ে দিলেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা তাতে সওয়ার হয়ে গেলেন এবং সফওয়ান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু নিজে উটের নাকের রশি ধরে পায়ে

لَا تَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَّكُمْ ۭ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۭ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْاِثْمِ ۚ وَالَّذِيْ تَوَلّٰى كِبْرَهٗ مِنْهُمْ لَهٗ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١١﴾

করেছে, তারা তো তোমাদেরই একটি দল[১]; এটাকে তোমরা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর মনে করো না; বরং এটা তো তোমাদের জন্য কল্যাণকর; তাদের প্রত্যেকের জন্য আছে তাদের পাপকাজের ফল[২] এবং তাদের

হেঁটে চলতে লাগলেন। অবশেষে তিনি কাফেলার সাথে মিলিত হয়ে গেলেন। আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাই ছিল দুশ্চরিত্র, মুনাফেক ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের শত্রু। সে একটা সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে গেল। এই হতভাগা আবোল-তাবোল বকতে শুরু করল। কিছুসংখ্যক সরল-প্রাণ মুসলিমও কানকথায় সাড়া দিয়ে এ আলোচনায় মেতে উঠল। পুরুষদের মধ্যে হাস্সান ইবনে সাবিত, মিস্তাহ্ ইবনে আসাল এবং নারীদের মধ্যে হামনাহ্ বিনতে জাহাশ ছিল এ শ্রেণীভুক্ত।

যখন এই মুনাফেক-রটিত অপবাদের চর্চা হতে লাগল, তখন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতে খুবই মর্মাহত হলেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার তো দুঃখের সীমাই ছিল না। সাধারণ মুসলিমগণও তীব্রভাবে বেদানাহত হলেন। একমাস পর্যন্ত এই আলোচনা চলতে লাগল। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার পবিত্রতা বর্ণনা এবং অপবাদ রটনাকারী ও এতে অংশগ্রহণকারীদের নিন্দা করে উপরোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল করলেন। অপবাদের হদ-এ বর্ণিত কুরআনী-বিধান অনুযায়ী অপবাদ আরোপকারীদের কাছ থেকে সাক্ষ্য তলব করা হল। তারা এই ভিত্তিহীন খবরের সাক্ষ্য কোথা থেকে আনবে? ফলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম শরীয়তের নিয়মানুযায়ী তাদের প্রতি অপবাদের হদ প্রয়োগ করলেন। প্রত্যেককে আশিটি বেত্রাঘাত করা হল। আবু দাউদের বর্ণনায়, তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন জন মুসলিম মিসতাহ্, হামানাহ্ ও হাস্সানের প্রতি হদ প্রয়োগ করেন। [আবু দাউদঃ ৪৪৭৪] অতঃপর মুসলিমরা তাওবাহ্ করে নেয় এবং মুনাফেকরা তাদের অবস্থানে কায়েম থাকে। তবে আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাইকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাস্তি দিয়েছেন প্রমাণিত হয়নি। যদিও তাবরানী কয়েকজন সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে শাস্তি দিয়েছেন। [দেখুন- মু'জামুল কাবীরঃ ২৩/১৪৬(২১৪), ২৩/১৩৭(১৮১), ২৩/১২৫(১৬৪), ২৩/১২৪(১৬৩)]

(১) عُصْبَةٌ শব্দের অর্থ দশ থেকে চল্লিশ জন পর্যন্ত লোকের দল। এর কমবেশীর জন্যও এই শব্দ ব্যবহৃত হয়। [দেখুন-ইবন কাসীর,কুরতুবী,ফাতহুল কাদীর]

(২) অর্থাৎ যারা এই অপবাদে যতটুকু অংশ নিয়েছে, তাদের জন্য সে পরিমাণ গোনাহ্ লেখা হয়েছে এবং সে অনুপাতেই তাদের শাস্তি হবে। [বাগভী]

মধ্যে যে এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তার জন্য আছে মহা শাস্তি(১) ।

১২. যখন তারা এটা শুনল তখন মুমিন পুরুষ এবং মুমিন নারীগণ তাদের নিজেদের সম্পর্কে কেন ভাল ধারণা করল না এবং (কেন) বলল না, 'এটা তো সুস্পষ্ট অপবাদ(২)?'

لَوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَٰتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا۟ هَٰذَآ إِفْكٌ مُّبِينٌ ﴿١٢﴾

---

(১) উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি অপবাদে বড় ভূমিকা নিয়েছে অর্থাৎ একে রচনা করে চালু করেছে, তার জন্য গুরুতর আযাব রয়েছে। বলাবাহুল্য, এ ব্যক্তি হচ্ছে মুনাফেক আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাই। [মুয়াস্‌সার]

(২) এ আয়াতের দু'টি অনুবাদ হতে পারে। এক, যখন তোমরা শুনেছিলে তখনই কেন মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীরা নিজেদের সম্পর্কে সুধারণা করেনি? অন্য একটি অনুবাদ এও হতে পারে, নিজেদের লোকদের অথবা নিজেদের সমাজের লোকদের ব্যাপারে ভালো ধারণা করনি কেন? আয়াতের শব্দাবলী দু'ধরনের অর্থের অবকাশ রাখে। অর্থাৎ তোমরা যখন এই অপবাদের সংবাদ শুনলে, তখন মুসলিম পুরুষ ও নারী নিজেদের মুসলিম ভাই-বোনদের সম্পর্কে সুধারণা করলে না কেন এবং একথা বললে না কেন যে, এটা প্রকাশ্য মিথ্যা? এ আয়াতে কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। প্রথমতঃ ﴿بِأَنفُسِهِمْ﴾ শব্দ দ্বারা কুরআনুল কারীম ইঙ্গিত করেছে যে, যে মুসলিম অন্য মুসলিমের দুর্নাম রটায় ও তাকে লাঞ্ছিত করে, সে প্রকৃতপক্ষে নিজেকেই লাঞ্ছিত করে। কারণ, ইসলামের সম্পর্ক সবাইকে এক করে দিয়েছে। সর্বক্ষেত্রে কুরআন এই ইঙ্গিত ব্যবহার করেছে। যেমন এক জায়গায় বলা হয়েছে ﴿وَلَا تَلْمِزُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ﴾ [সূরা আল-হুজরাতঃ ১১] অর্থাৎ তোমাদের নিজেদের প্রতি দোষারোপ করো না। উদ্দেশ্য, কোন মুসলিম পুরুষ ও নারীর প্রতি দোষারোপ করো না। এ আয়াতে দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, এখানে ﴿ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ﴾ বলা হয়েছে। এতে হাল্কা ইঙ্গিত রয়েছে যে, যাদের দ্বারা এই কাজ সংঘটিত হয়েছে, তারা এই কাজের প্রেক্ষাপটে মুমিন কথিত হওয়ার যোগ্য নয়। কেননা, এক মুসলিম অন্য মুসলিমের প্রতি সুধারণা পোষণ করবে এটাই ছিল ঈমানের দাবী। এখানে তৃতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় হলো, এই আয়াতের শেষ বাক্য ﴿هَٰذَآ إِفْكٌ مُّبِينٌ﴾ এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, খবরটি শুনামাত্রই মুসলিমদের 'এটা প্রকাশ্য অপবাদ' বলে দেয়াই ছিল ঈমানের দাবী। অর্থাৎ তাদের এ সব অপবাদ তো বিবেচনার যোগ্যই ছিল না। একথা শোনার সাথে সাথেই প্রত্যেক মুসলিমের একে সুস্পষ্ট মিথ্যাচার, মিথ্যা বানোয়াট কথা ও অপবাদ আখ্যা দেয়া উচিত ছিল। [বাগভী]

১৩. তারা কেন এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনি? যেহেতু তারা সাক্ষী উপস্থিত করেনি, সুতরাং তারাই আল্লাহ্‌র কাছে মিথ্যাবাদী[১]।

لَوْلَا جَآءُوْ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ۚ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوْا بِالشُّهَدَآءِ فَأُولَٰٓئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ﴿١٣﴾

১৪. দুনিয়া ও আখেরাতে তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে, তোমরা যাতে জড়িয়ে গিয়েছিলে তার জন্য মহাশাস্তি তোমাদেরকে স্পর্শ করত[২],

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِىْ مَآ أَفَضْتُمْ فِيْهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١٤﴾

---

(১) এ আয়াতের প্রথম বাক্যে শিক্ষা আছে যে, এরূপ খবর রটনাকারীদের কথা চালু করার পরিবর্তে মুসলিমদের উচিত ছিল তাদের কাছে প্রমাণ দাবী করা। ব্যভিচারের অপরাধ সম্পর্কে শরীয়তসম্মত প্রমাণ চার জন সাক্ষী ছাড়া প্রতিষ্ঠিত হয় না। তাই তাদের কাছে এরূপ দাবী করা উচিত যে, তোমরা তোমাদের বক্তব্যের সপক্ষে চার জন সাক্ষী উপস্থিত কর, নতুবা মুখ বন্ধ কর। কারণ, তাদের দাবীর সপক্ষে কোন দলীল-প্রমাণ নেই। সামান্য সন্দেহ করাও সেখানে গর্হিত। দ্বিতীয় বাক্যে বলা হয়েছে, যখন তারা সাক্ষী উপস্থিত করতে পারল না, তখন আল্লাহ্‌র কাছে তারাই মিথ্যাবাদী। এখানে "আল্লাহর কাছে" অর্থাৎ আল্লাহর আইনে অথবা আল্লাহর আইন অনুযায়ী। নয়তো আল্লাহ তো জানতেন ঐ অপবাদ ছিল মিথ্যা। তারা সাক্ষী আনেনি বলেই তা মিথ্যা, আল্লাহর কাছে তার মিথ্যা হবার জন্য এর প্রয়োজন নেই। [দেখুন-বাগভী,ফাতহুল কাদীর]

(২) যেসব মুসলিম ভুলক্রমে এই অপবাদে কোন না কোনরূপে অংশগ্রহণ করেছিল, এরপর তাওবাহ্ করেছিল এবং কেউ কেউ শাস্তিও ভোগ করেছিল, এই আয়াত তাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। এ আয়াতে তাদের সবাইকে একথাও বলা হয়েছে যে, তোমাদের অপরাধ খুবই গুরুতর। এর কারণে দুনিয়াতেও আযাব আসতে পারত, যেমন পূর্ববর্তী জাতিসমূহের উপর এসেছে এবং আখেরাতেও কঠোর শাস্তি হত। কিন্তু মুসলিমদের সাথে আল্লাহ্ তা'আলার আচরণ দয়া ও অনুগ্রহ মূলত: দুনিয়াতেও এবং আখেরাতেও। তাই এই শাস্তি তোমাদের উপর থেকে অন্তর্হিত হয়েছে। দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও রহমত এভাবে প্রকাশ পেয়েছে যে, প্রথমে তিনি ইসলাম ও ঈমানের তাওফীক দিয়েছেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংসর্গ দান করেছেন। এটা আযাব নাযিলের পক্ষে প্রতিবন্ধক। এরপর কৃত গোনাহ্‌র জন্য সত্যিকার তাওবার তাওফীক দিয়েছেন এবং তাওবাহ্ কবুল করেছেন। আখেরাতে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়ার প্রভাবে তোমাদেরকে ক্ষমা, মার্জনা ও মাগফেরাতের ওয়াদা দিয়েছেন। [দেখুন-মুয়াস্‌সার,বাগভী]

إِذْ تَلَقَّوْنَهُۥ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِۦ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُۥ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾

১৫. যখন তোমরা মুখে মুখে এটা ছড়াচ্ছিলে[১] এবং এমন বিষয় মুখে উচ্চারণ করছিলে যার কোন জ্ঞান তোমাদের ছিল না। আর তোমরা এটাকে তুচ্ছ গণ্য করেছিলে, অথচ আল্লাহ্‌র কাছে এটা ছিল গুরুতর বিষয়[২]।

وَلَوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَٰنَكَ هَٰذَا بُهْتَٰنٌ عَظِيمٌ ﴿١٦﴾

১৬. আর তোমরা যখন এটা শুনলে তখন কেন বললে না, 'এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের উচিত নয়; আল্লাহ্ পবিত্র, মহান। এটা তো এক গুরুতর অপবাদ!'

يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُوا۟ لِمِثْلِهِۦٓ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٧﴾

১৭. আল্লাহ্ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, 'তোমরা যদি মুমিন হও তবে কখনো যাতে অনুরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি না করো[৩]।'

---

(১) تلقى শব্দের মর্ম এই যে, একে অন্যের কাছে জিজ্ঞাসা ও বর্ণনা করে। এখানে কোন কথা শুনে তার সত্যাসত্য যাচাই না করে সামনে চালু করে দেয়া বুঝানো হয়েছে। অপর قراءة -এ পড়া হয় تَلِقُوْنَهُ তখন এর অর্থ হবে মিথ্যা বানিয়ে বলা। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা এভাবে পড়তেন। [বুখারীঃ ৪১৪৪]

(২) অর্থাৎ তোমরা একে তুচ্ছ ব্যাপার মনে করেছিলে যে, যা শুনলে তাই অন্যের কাছে বলতে শুরু করেছিলে। তোমরা সত্যাসত্য যাচাই না করে এমন কথা চালু করে দিয়েছিলে, যদ্দরুন অন্য মুসলিম দারুণ মর্মাহত হয়, লাঞ্ছিত হয় এবং তার জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'কোন কোন লোক আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি হয় এমন কথা বলে, অথচ সে জানে না যে, এটা কতদূর গিয়ে গড়াবে (অর্থাৎ সে কোন গুরুত্বের সাথে বলেনি)। অথচ এর কারণে সে জাহান্নামের আসমান ও যমীনের দূরত্বের চেয়েও বেশী গভীরে পৌঁছবে।' [বুখারীঃ ৬৪৭৮, মুসলিমঃ ২৯৮৮]

(৩) এখানে আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনদেরকে যে কোন খারাপ সংবাদ, অপবাদ তাদের কাছে বর্ণনা করা হলে তার সাথে কি আচরণ করতে হবে সে উত্তম চরিত্রের শিক্ষা দিয়েছেন। তাদেরকে এ সমস্ত অপবাদ মুখে উচ্চারণ করা থেকে নিষেধ করেছেন। কেননা, মানুষের প্রতিটি কথারই হিসাব দিতে হবে। পক্ষান্তরে যদি কোন কিছু মনে

১৮. আর আল্লাহ্ তোমাদের জন্য আয়াতসমূহকে স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

وَيُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ۭ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١٨﴾

১৯. নিশ্চয় যারা মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে, তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আর আল্লাহ্ জানেন, তোমরা জান না।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۙ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۭ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿١٩﴾

২০. আর তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে[১]; আর আল্লাহ্ তো দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু।

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ وَاَنَّ اللّٰهَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٠﴾

তৃতীয় রুকূ'

২১. হে মুমিনগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। আর কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করলে শয়তান তো অশ্লীলতা ও মন্দ কাজেরই নির্দেশ দেয়। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের কেউই কখনো পবিত্র হতে পারতে না, তবে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছে পবিত্র করেন এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۭ وَمَنْ يَّتَّبِعْ خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ فَاِنَّهٗ يَاْمُرُ بِالْفَحْشَاۗءِ وَالْمُنْكَرِ ۭ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ مَا زَكٰى مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَبَدًا ۙ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَاۗءُ ۭ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢١﴾

২২. আর তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে, তারা আত্মীয়-

وَلَا يَاْتَلِ اُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُّؤْتُوْٓا اُولِي الْقُرْبٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ

উদ্রেক হয় কিন্তু মুখে উচ্চারণ না করে, তবে তাতে গোনাহ্ লেখা হয় না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা আমার উম্মতের মনে যা উদিত হয় তা যতক্ষণ পর্যন্ত মুখে না বলে ততক্ষণের জন্য তা ক্ষমা করে দিয়েছেন।' [বুখারীঃ ৫২৬৯, মুসলিমঃ ১২৭]

(১) এখানেও ১০ নং আয়াতের মতো উত্তর উহ্য রাখা হয়েছে। [বাগভী]

اللهِ ۖ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٢﴾

স্বজন, অভাবগ্রস্তকে ও আল্লাহ্‌র রাস্তায় হিজরতকারীদেরকে কিছুই দেবে না; তারা যেন ওদেরকে ক্ষমা করে এবং ওদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে(১)। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন(২)?

---

(১) আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার প্রতি অপবাদের ঘটনায় মুসলিমদের মধ্যে মিসতাহ্ ও হাস্‌সান জড়িয়ে পড়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়াত নাযিল হওয়ার পর তাদের প্রতি অপবাদের শাস্তি প্রয়োগ করেন। তারা উভয়েই বিশিষ্ট সাহাবী এবং বদর-যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বিশিষ্ট সাহাবীদের অন্যতম ছিলেন। কিন্তু তাদের দ্বারা একটি ভুল হয়ে যায় এবং তারা খাঁটি তাওবাহ্‌র তাওফীক লাভ করেন। আল্লাহ্ তা'আলা যেমন আয়েশার দোষমুক্ততা প্রকাশ্যে আয়াত নাযিল করেন, এমনিভাবে এই মুসলিমদের তাওবাহ্ কবুল করা ও ক্ষমা করার কথাও ঘোষণা করে দেন।

মিসতাহ্ আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর আত্মীয় ও নিঃস্ব ছিলেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তাকে আর্থিক সাহায্য করতেন। যখন অপবাদের ঘটনার সাথে তার জড়িত থাকার কথা প্রমাণিত হল, তখন কন্যা-বৎসল পিতা আবু বকর সিদ্দীক কন্যাকে এমন কষ্টদানের কারণে স্বাভাবিকভাবেই মিসতাহ্‌র প্রতি ভীষণ অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি কসম করে বসলেন, ভবিষ্যতে তাকে কোনরূপ আর্থিক সাহায্য করবেন না। বলাবাহুল্য, কোন বিশেষ ফকীরকে আর্থিক সাহায্য নির্দিষ্টভাবে কোন বিশেষ মুসলিমের উপর ওয়াজিব নয়। কেউ কাউকে আর্থিক সাহায্য করার পর যদি বন্ধ করে দেয়, তবে গোনাহ্‌র কোন কারণ নেই। কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের দলকে আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্বের জন্য একটি আদর্শ দলরূপে গঠন করতে ইচ্ছুক ছিলেন। তাই একদিকে বিচ্যুতিকারীদেরকে খাঁটি তাওবাহ্ এবং ভবিষ্যত সংশোধনের নেয়ামত দ্বারা ভূষিত করেছেন এবং অপরদিকে যারা স্বাভাবিক মনোকষ্টের কারণে গরীবদের সাহায্য ত্যাগ করার কসম করেছিলেন, তাদেরকেও আদর্শ চরিত্রের শিক্ষা আলোচ্য আয়াতে দান করেছেন। তাদেরকে বলা হয়েছে, তারা যেন কসম ভঙ্গ করে কাফ্‌ফারা দিয়ে দেয়। গরীবদের আর্থিক সাহায্য থেকে হাত গুটিয়ে নেয়া তাদের উচ্চমর্যাদার পক্ষে সমীচীন নয়। আল্লাহ্ তা'আলা যেমন তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, তেমনি তাদেরও ক্ষমা ও মার্জনা প্রদর্শন করা উচিত। [দেখুন-কুরতুবী]

(২) আয়াতের শেষ বাক্যে বলা হয়েছেঃ তোমরা কি পছন্দ করা না যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের গোনাহ্ মাফ করবেন? আয়াত শুনে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেনঃ بَلٰى وَاللهِ يَا رَبَّنَا إِنَّا لَنُحِبُّ أَنْ تَغْفِرَ لَنَا অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ্

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَٰتِ الْغَٰفِلَٰتِ الْمُؤْمِنَٰتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾

আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

২৩. যারা সচ্চরিত্রা, সরলমনা-নির্মলচিত্ত, ঈমানদার নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে(১) তারা তো দুনিয়া ও আখেরাতে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি(২)।

আমাকে মাফ করুন, আমি অবশ্যই তা পছন্দ করি। এরপর তিনি মিসতাহ্‌র আর্থিক সাহায্য পুনর্বহাল করে দেন এবং বলেনঃ এ সাহায্য কোনদিন বন্ধ হবে না। [বুখারীঃ ৪৭৫৭, মুসলিমঃ ২৭৭০]

(১) মূলে (গাফেলাত) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, সরলমনা ও ভদ্র মহিলারা, যারা ছল-চাতুরী জানে না, যাদের মন নির্মল,কলুষমুক্ত ও পাক-পবিত্র, যারা অসভ্যতা ও অশ্লীল আচরণ কি ও কিভাবে করতে হয় তা জানে না এবং কেউ তাদের বিরুদ্ধে অপবাদ দেবে একথা যারা কোনদিন কল্পনাও করতে পারে না। হাদীসে বলা হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নিষ্কলুষ মহিলাদের বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়া সাতটি "সর্বনাশা" কবীরাহ গোনাহের অন্তরভুক্ত। [দেখুন, বুখারীঃ ২৭৬৬, মুসলিমঃ ৮৯]

(২) আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার এমন কতিপয় বৈশিষ্ট্য আছে, যেগুলো অন্য কোন মহিলার ভাগ্যে জোটেনি। তিনি নিজেও আল্লাহ্‌র নেয়ামত প্রকাশার্থে এসব বিষয় গর্বভরে বর্ণনা করতেন।

প্রথম- হাদীসে এসেছে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলেন: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বিয়ে হওয়ার পূর্বে ফিরিশ্‌তা জিব্‌রাঈল 'আলাইহিস্ সালাম একটি রেশমী কাপড়ে আমার ছবি নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আগমন করেন এবং বলেন: এ আপনার স্ত্রী। [তিরমিযী: ৩৮৮০]

দ্বিতীয়- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ছাড়া কোন কুমারী বালিকাকে বিয়ে করেননি।

তৃতীয়- তার কোলে মাথা রেখে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল করেন।

চতুর্থ- আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার গৃহেই তিনি সমাধিস্থ হন।

পঞ্চম- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তখনো ওহী নাযিল হত, যখন তিনি আয়েশার সাথে একই লেপের নীচে শায়িত থাকতেন। অন্য কোন স্ত্রীর এরূপ বৈশিষ্ট্য ছিল না। [তিরমিযীঃ ৩৮৭৯]

ষষ্ঠ- আসমান থেকে তার নির্দোষিতার বিষয় নাযিল হয়েছে।

২৪. যেদিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে তাদের জিহবা, তাদের হাত ও তাদের পা তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে[১]---

يَّوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٤﴾

২৫. সেদিন আল্লাহ্ তাদের হক্ক তথা প্রাপ্য প্রতিফল পুরোপুরি দেবেন এবং তারা জেনে নেবে যে, আল্লাহ্ই সুস্পষ্ট সত্য।

يَوْمَئِذٍ يُّوَفِّيْهِمُ اللّٰهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ ﴿٢٥﴾

২৬. দুশ্চরিত্রা নারী দুশ্চরিত্র পুরুষের জন্য;

اَلْخَبِيْثٰتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثٰتِ وَالطَّيِّبٰتُ

সপ্তম- তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের খলীফার কন্যা এবং সিদ্দীকা ছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা যাদেরকে দুনিয়াতেই ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকার ওয়াদা দিয়েছেন, তিনি তাদেরও অন্যতমা।

অষ্টম- সাহাবাগণ কোন ব্যাপারে সমস্যায় পড়ে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার কাছে আসলে তার কাছে কোন না কোন ইলম পেতেন।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার ফকীহ্ ও পণ্ডিতসুলভ জ্ঞানানুসন্ধান এবং বিজ্ঞজনোচিত বক্তব্য দেখে মূসা ইবনে তালহা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ আমি আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার চাইতে অধিক শুদ্ধভাষী ও প্রাঞ্জলভাষী কাউকে দেখিনি। [তিরমিযীঃ ৩৮৮৪] কোন কোন মুফাস্সির বলেনঃ ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালামের প্রতি অপবাদ আরোপ করা হলে আল্লাহ্ তা'আলা একটি কচি শিশুকে বাকশক্তি দান করে ওর সাক্ষ্য দ্বারা তার দোষমুক্ততা প্রকাশ করেন। মার্ইয়ামের প্রতি অপবাদ আরোপ করা হলে আল্লাহ্ তা'আলা তার শিশু পুত্র ঈসা 'আলাইহিস্ সালামের সাক্ষ্য দ্বারা তাকে দোষমুক্ত করেন। আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার প্রতি অপবাদ আরোপ করা হলে আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনের দশটি আয়াত নাযিল করে তার দোষমুক্ততা ঘোষণা করেন, যা তার গুণ ও জ্ঞান-গরিমাকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।

(১) অর্থাৎ যেদিন তাদের বিরুদ্ধে স্বয়ং তাদের জিহ্বা ও হস্তপদাদী কথা বলবে ও তাদের অপরাধসমূহের সাক্ষ্য দেবে। হাদীসে এসেছে, কেয়ামতের দিন যে গোনাহ্গার তার গোনাহ্র স্বীকার করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে মাফ করে দেবেন এবং হাশরের মাঠে সবার দৃষ্টি থেকে তার গোনাহ্ গোপন রাখবেন। [দেখুন- বুখারীঃ ৬০৭০, মুসলিমঃ ২৭৬৮, মুসনাদে আহমাদঃ ২/৭৪] পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সেখানেও অস্বীকার করে বলবে যে, আমি এ কাজ করিনি; পরিদর্শক ফিরিশ্তারা ভুল করে এটা আমার আমলনামায় লিখে দিয়েছে, তখন তার মুখ বন্ধ করে দেয়া হবে এবং হস্তপদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। তখন তারা বলবে এবং সাক্ষ্য দেবে। [দেখুন- মুসলিমঃ ২৯৬৮, ২৯৬৯]

لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَٰتِ ۚ أُولَٰٓئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۖ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

দুশ্চরিত্র পুরুষ দুশ্চরিত্রা নারীর জন্য; সচ্চরিত্রা নারী সচ্চরিত্র পুরুষের জন্য এবং সচ্চরিত্র পুরুষ সচ্চরিত্রা নারীর জন্য। লোকেরা যা বলে তার সাথে তারা সম্পর্কহীন; তাদের জন্য আছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা(১)।

চতুর্থ রুকূ'

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَدْخُلُوا۟ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ

২৭. হে মুমিনগণ(২)! তোমরা নিজেদের ঘর

(১) অর্থাৎ দুশ্চরিত্রা নারীকুল দুশ্চরিত্র পুরুষকুলের জন্য এবং দুশ্চরিত্র পুরুষকুল দুশ্চরিত্রা নারীকুলের জন্য উপযুক্ত। সচ্চরিত্রা নারীকুল সচ্চরিত্র পুরুষকুলের জন্য এবং সচ্চরিত্র পুরুষকুল সচ্চরিত্রা নারীকুলের জন্য উপযুক্ত। এদের সম্পর্কে লোকে যা বলে, এরা তা থেকে পবিত্র। এদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা। এ আয়াতে একটি নীতিগত কথা বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা মানবচরিত্রে স্বাভাবিকভাবে যোগসূত্র রেখেছেন। দুশ্চরিত্রা, ব্যভিচারিণী নারী ব্যভিচারী পুরুষের প্রতি এবং দুশ্চরিত্র ও ব্যভিচারী পুরুষ দুশ্চরিত্রা নারীদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এমনিভাবে সচ্চরিত্রা নারীদের আগ্রহ সচ্চরিত্র পুরুষদের প্রতি এবং সচ্চরিত্র পুরুষদের আগ্রহ সচ্চরিত্রা নারীদের প্রতি হয়ে থাকে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ আগ্রহ অনুযায়ী জীবনসঙ্গী খোঁজ করে নেয় এবং আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী সে সেরূপই পায়।

কোন কোন মুফাসসির এ আয়াতের এ অর্থও করেছেন যে, খারাপ কথা খারাপ লোকদের জন্য (অর্থাৎ তারা এর হকদার) এবং ভালো কথা ভালো লোকদের জন্য, আর ভালো লোকদের সম্পর্কে দুর্মুখেরা যেসব কথা বলে তা তাদের প্রতি প্রযুক্ত হওয়া থেকে তারা মুক্ত ও পবিত্র। অন্য কিছু মুফাসসির এর অর্থ করেছেন এভাবে, খারাপ কাজ খারাপ লোকদের পক্ষেই সাজে এবং ভালো কাজ ভালো লোকদের জন্যই শোভনীয়, ভালো লোকেরা খারাপ কাজের অপবাদ বহন থেকে পবিত্র। ভিন্ন কিছু তাফসীরকারক এর অর্থ নিয়েছেন এভাবে, খারাপ কথা খারাপ লোকদেরই বলার মতো এবং ভালো লোকেরা ভালো কথাই বলে থাকে, অপবাদদাতারা যে ধরনের কথা বলছে ভালো লোকেরা তেমনি ধরনের কথা বলা থেকে পবিত্র। [দেখুন-ইবন কাসীর,সা'দী,কুরতুবী,বাগভী]

(২) এ আয়াতে অন্য কারো গৃহে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি নেয়ার বিধান আলোকপাত করা হয়েছে। অন্য কারো গৃহে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি নেয়ার বিধানে প্রতিটি ইমানদার নারী, পুরুষ, মাহ্‌রাম ও গায়র-মাহ্‌রাম সবাই শামিল রয়েছে। আতা ইবন আবী রাবাহ্ বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ অনুমতি নেয়া মানুষ অস্বীকার করছে, বর্ণনাকারী বলল, আমি বললামঃ আমার কিছু

حَتّٰى تَسۡتَاۡنِسُوۡا وَتُسَلِّمُوۡا عَلٰٓى اَهۡلِهَا ؕ ذٰلِكُمۡ خَيۡرٌ لَّكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُوۡنَ

ছাড়া অন্য কারো ঘরে তার অধিবাসীদের সম্প্রীতিসম্পন্ন অনুমতি না নিয়ে এবং তাদেরকে সালাম না করে[১] প্রবেশ

ইয়াতীম বোন রয়েছে, তারা আমার কাছে আমার ঘরেই প্রতিপালিত হয়, আমি কি তাদের কাছে যাবার সময় অনুমতি নেব? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ । আমি কয়েকবার তার কাছে সেটা উত্থাপন করে এ ব্যাপারে ব্যতিক্রম করার অনুরোধ করলাম । কিন্তু তিনি অস্বীকার করলেন । এবং বললেনঃ তুমি কি তাদেরকে উলঙ্গ দেখতে চাও? [বুখারীঃ আদাবুল মুফরাদ- ১০৬৩] ইমাম মালেক মুয়াত্তা গ্রন্থে আতা ইবনে ইয়াসার থেকে বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলঃ আমি আমার মায়ের কাছে যাওয়ার সময়ও অনুমতি চাইব? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, অনুমতি চাও । তিনি বললেনঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আমি তো আমার মায়ের ঘরেই বসবাস করি । তিনি বললেনঃ তবুও অনুমতি না নিয়ে ঘরে যাবে না । লোকটি আবার বললঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আমি তো সর্বদা তার কাছেই থাকি । তিনি বললেনঃ তবুও অনুমতি না নিয়ে ঘরে যাবে না । তুমি কি তোমার মাকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখা পছন্দ কর? সে বললঃ না । তিনি বললেনঃ তাই অনুমতি চাওয়া আবশ্যক । [মুয়াত্তা ইমাম মালেকঃ ১৭২৯]

(১) আয়াতে ﴿حَتّٰى تَسۡتَاۡنِسُوۡا وَتُسَلِّمُوۡا عَلٰٓى اَهۡلِهَا﴾ বলা হয়েছে; অর্থাৎ দু'টি কাজ না করা পর্যন্ত কারো গৃহে প্রবেশ করো না ।

প্রথম বলা হয়েছে, تَسْتَأْنِسُوا বিশিষ্ট তাফসীরকারগণের মতে এর অর্থ, تَسْتَأْذِنُوا বা অনুমতি হাসিল করা । কিন্তু আসলে উভয় ক্ষেত্রে শাব্দিক অর্থের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে । تَسْتَأْذِنُوا বললে আয়াতের অর্থ হতোঃ "কারোর বাড়িতে প্রবেশ করো না যতক্ষণ না অনুমতি নিয়ে নাও ।" এ প্রকাশ ভংগী পরিহার করে আল্লাহ تَسْتَأْنِسُوا শব্দ ব্যবহার করেছেন । যার অর্থ হয়, পরিচিতি, অন্তরংগতা, সম্মতি ও প্রীতি সৃষ্টি করা । আর এটা যখনই বলা হবে তখনই এর মানে হবে, সম্মতি আছে কি না জানা অথবা নিজের সাথে অন্তরংগ করা, সম্প্রীতি তৈরী করা । কাজেই আয়াতের সঠিক অর্থ হবেঃ "লোকদের গৃহে প্রবেশ করো না, যতক্ষণ না তাদেরকে অন্তরংগ করে নেবে অথবা তাদের সম্মতি জেনে নেবে ।" অর্থাৎ একথা না জেনে নেবে যে, গৃহমালিক তোমার আসাকে অপ্রীতিকর বা বিরক্তিকর মনে করছে না এবং তার গৃহে তোমার প্রবেশকে সে পছন্দ করছে । এখানে اسْتِينَاسْ শব্দ উল্লেখ করার মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, প্রবেশের পূর্বে অনুমতি লাভ করার দ্বারা প্রতিপক্ষ পরিচিত ও আপন হয়, ফলে সে আতঙ্কিত হয় না । [দেখুন-বাগভী,সা'দী,আইসারুত তাফাসির]

দ্বিতীয় কাজ এই যে, গৃহের লোকদেরকে সালাম কর । কোন কোন মুফাস্‌সির এর অর্থ নিয়েছেন যে, প্রথমে অনুমতি লাভ কর এবং গৃহে প্রবেশের সময় সালাম কর । কুরতুবী এই অর্থই পছন্দ করেছেন । এই অর্থের দিক দিয়ে আয়াতে অগ্র-পশ্চাত

করো না[১]। এটাই তোমাদের জন্য

নেই। কোন কোন আলেম বলেনঃ যদি অনুমতি নেয়ার পূর্বে গৃহের কোন ব্যক্তির উপর দৃষ্টি পড়ে, তবে প্রথমে সালাম করবে, এরপর অনুমতি চাইবে। নতুবা প্রথমে অনুমতি নেবে এবং গৃহে প্রবেশ করার সময় সালাম করবে। [দেখুন- বাগভী] কিন্তু অধিকাংশ হাদীস থেকে সুন্নত তরীকা এটাই জানা যায় যে, প্রথমে বাইরে থেকে সালাম করবে, এরপর নিজের নাম নিয়ে বলবে যে, অমুক ব্যক্তি সাক্ষাত করতে চায়। বিভিন্ন হাদীসগুলো থেকে প্রথমে সালাম ও পরে প্রবেশের অনুমতি গ্রহণের বিষয় প্রমাণিত হয়েছে। এতে নিজের নাম উল্লেখ করে অনুমতি চাওয়াই উত্তম। হাদীসে আছে, আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর কাছে গেলেন এবং অনুমতি চাওয়ার জন্য বললেন, السَّلَامُ عَلَيْكُم هٰذا عَبْدُ اللهِ بن قَيْس، السَّلَامُ عَلَيْكُم هَذا أَبو مُوسَى، السَّلَامُ عَلَيْكُم هَذا الأَشْعَري [মুসলিমঃ ২১৫৪] এতেও তিনি প্রথমে নিজের নাম আবু মূসা বলেছেন, এরপর আরো নির্দিষ্টভাবে প্রকাশ করার জন্য আল-আশ'আরী বলেছেন।

(১) এ হুকুমটি নাযিল হবার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেসব নিয়ম ও রীতিনীতির প্রচলন করেন নীচে সেগুলোর কিছু বর্ণনা করা হলোঃ

একঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যক্তিগত গোপনীয়তার এ অধিকারটিকে কেবলমাত্র গৃহের চৌহদ্দীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি। বরং একে একটি সাধারণ অধিকার গণ্য করেন। এ প্রেক্ষিতে অন্যের গৃহে উঁকি ঝুঁকি মারা, বাহির থেকে চেয়ে দেখা নিষিদ্ধ। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলেন এবং ঠিক তার দরজার উপর দাঁড়িয়ে অনুমতি চাইলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, "পিছনে সরে গিয়ে দাঁড়াও, যাতে দৃষ্টি না পড়ে। সে জন্যই তো অনুমতি চাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।" [আবু দাউদঃ ৫১৭৪] নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিজের নিয়ম ছিল এই যে, যখন কারোর বাড়িতে যেতেন, দরজার ঠিক সামনে কখনো দাঁড়াতেন না। তিনি দরজার ডান পাশে বা বাম পাশে দাঁড়িয়ে অনুমতি চাইতেন। [আবু দাউদঃ ৫১৮৬] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাদেম আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, এক ব্যক্তি বাইরে থেকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কামরার মধ্যে উঁকি দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে সে সময় একটি তীর ছিল। তিনি তার দিকে এভাবে এগিয়ে এলেন যেন তীরটি তার পেটে ঢুকিয়ে দেবেন। [আবু দাউদঃ ৫১৭১] অপর বর্ণনায় এসেছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "যদি কোন ব্যক্তি তোমার গৃহে উঁকি মারে এবং তুমি একটি কাঁকর মেরে তার চোখ কানা করে দাও, তাহলে তাতে কোন গোনাহ হবে না।" [মুসলিমঃ২১৫৮, মুসনাদে আহমাদঃ ২/২২৩, ২/৪২৮] অন্য হাদীসে বলা হয়েছেঃ "যে ব্যক্তি কারোর ঘরে উঁকি মারে এবং ঘরের লোকেরা তার চোখ ছেঁদা করে দেয়, তবে তাদের কোন জবাবদিহি করতে হবে না।"[আবু দাউদঃ৫১৭২]

দুইঃ কেবলমাত্র অন্যের গৃহে প্রবেশ করার অনুমতি নেবার হুকুম দেয়া হয়নি বরং নিজের মা-বোনদের কাছে যাবার সময়ও অনুমতি নিতে হবে। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ "নিজের মা-বোনদের কাছে যাবার সময়ও অনুমতি নিয়ে যাও।" [ইবনে কাসীর]

তিনঃ প্রথম যখন অনুমতি চাওয়ার বিধান জারি হয় তখন লোকেরা তার নিয়ম কানুন জানতো না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে এ ব্যাপারে বিস্তারিত শিক্ষা দেন। যেমন, তাদেরকে ঘরে ঢুকার অনুমতির জন্য সঠিক শব্দ নির্বাচন করা শিখিয়ে দেনঃ একবার এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসে এবং দরজা থেকে চিৎকার করে বলতে থাকে "আমি কি ভেতরে ঢুকে যাবো?" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার খাদেমকে বললেনঃ এ ব্যক্তি অনুমতি চাওয়ার নিয়ম জানে না। একটু উঠে গিয়ে তাকে বলে এসো, "আসসালামু আলাইকুম, আমি কি ভিতরে আসতে পারি?" বলতে হবে। [আবু দাউদঃ৫১৭৭]।

তাদেরকে নিজের পরিচয় স্পষ্টভাবে দেয়ার জন্য নির্দেশ দেনঃ জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, আমি আমার বাবার ঋণের ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেলাম এবং দরজায় করাঘাত করলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে? আমি বললাম, আমি। তিনি দু-তিনবার বললেন, "আমি? আমি?" অর্থাৎ এখানে আমি বললে কে কি বুঝবে যে, তুমি কে? [বুখারীঃ ৬২৫০, মুসলিমঃ ২১৫৫, আবু দাউদঃ ৫১৮৭] এতে বুঝা গেল যে, অনুমতি চাওয়ার সঠিক পদ্ধতি ছিল, মানুষ নিজের নাম বলে অনুমতি চাইবে। উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু অনুমতি নেয়ার ক্ষেত্রে বলতেনঃ "আসসালামু আলাইকুম, হে আল্লাহর রসূল! উমর কি ভেতরে যাবে?" [আবু দাউদঃ৫২০১]

সালাম ব্যতীত কেউ ঢুকে গেলে তাকে ফেরত দিয়ে সালামের মাধ্যমে ঢুকা শিখিয়ে দিলেনঃ এক ব্যক্তি কোন কাজে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেলেন। সালাম ছাড়াই এমনিই সেখানে গিয়ে বসলেন। তিনি বললেন, বাইরে যাও এবং আসসালামু আলাইকুম বলে ভেতরে এসো। [আবু দাউদঃ৫১৭৬]

অনুমতি লাভের জন্য সালাম দেয়াঃ অনুমতি নেবার জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বড় জোর তিনবার ডাক দেবার সীমা নির্দেশ করেছেন এবং বলেছেন যদি তিনবার ডাক দেবার পরও জবাব না পাওয়া যায়, তাহলে ফিরে যাও। আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু একবার উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর কাছে আসলেন এবং তিনবার সালাম দিলেন। কিন্তু উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু কোন উত্তর না করায় তিনি ফিরে চললেন। তখন লোকেরা বললঃ আবু মূসা ফিরে যাচ্ছে। উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেনঃ তাকে ফিরিয়ে আন, তাকে ফিরিয়ে আন। ফিরে আসার পর উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি ফিরে

উত্তম, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ ۖ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا ۖ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨﴾

২৮. যদি তোমরা ঘরে কাউকেও না পাও তাহলে সেখানে প্রবেশ করবে না যতক্ষণ না তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া হয়[১]। যদি তোমাদেরকে বলা হয়, 'ফিরে যাও', তবে তোমরা ফিরে যাবে, এটাই তোমাদের জন্য অধিক পবিত্র[২]। আর তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবগত।

যাচ্ছিলে কেন? আমরা কাজে ব্যস্ত ছিলাম। আবু মূসা বললেনঃ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, 'অনুমতি তিন বার, যদি তাতে অনুমতি দেয় ভাল, নতুবা ফিরে যাও।' [বুখারীঃ ৬২৪৫, মুসলিমঃ ২১৫৪]
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও এ পদ্ধতি অনুসরণ করতেন। একবার তিনি সা'দ ইবনে উবাদার বাড়ীতে গেলেন এবং আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ বলে দু'বার অনুমতি চাইলেন। কিন্তু ভেতর থেকে জবাব এলো না। তৃতীয় বার জবাব না পেয়ে ফিরে গেলেন। সা'দ ভেতর থেকে দৌড়ে এলেন এবং বললেনঃ হে আল্লাহর রসূল ! আমি আপনার আওয়াজ শুনছিলাম। কিন্তু আমার মন চাচ্ছিল আপনার মুবারক কণ্ঠ থেকে আমার জন্য যতবার সালাম ও রহমতের দো'আ বের হয় ততই ভালো, তাই আমি খুব নীচু স্বরে জবাব দিচ্ছিলাম। [আবু দাউদঃ ৫১৮৫ ও আহমাদঃ ৩/১৩৮]
চারঃ অনুরূপভাবে কেউ যদি সফর হতে ফিরে আসে তবে আপন স্ত্রীর কাছে যাবার আগেও অনুমতি নিয়ে যাওয়া সুন্নত। যাতে তাকে অপ্রস্তুত অবস্থায় না পায়। এ ব্যাপারে বিভিন্ন হাদীস এসেছে। [দেখুন- বুখারীঃ ৫০৭৯, মুসলিমঃ ৭১৫]

(১) অর্থাৎ কারোর শূন্য গৃহে প্রবেশ করা জায়েয নয়। তবে যদি গৃহকর্তা নিজেই প্রবেশকারীকে তার খালি ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি দিয়ে থাকে, তাহলে প্রবেশ করতে পারে। [ফাতহুল কাদীর]

(২) অর্থাৎ যদি আপাততঃ ফিরে যেতে বলা হয়, তখন হৃষ্টচিত্তে ফিরে আসা উচিত। একে খারাপ মনে করা অথবা সেখানেই অটল হয়ে বসে থাকা উভয়ই অসঙ্গত। [দেখুন- বাগভী,মুয়াস্‌সার]

লَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿٢٩﴾

২৯. যে ঘরে কেউ বাস করে না[১] তাতে তোমাদের কোন ভোগ করা[২] বা উপকৃত হওয়ার অধিকার থাকলে সেখানে তোমাদের প্রবেশে কোন পাপ নেই। আর আল্লাহ্ জানেন যা তোমরা প্রকাশ কর এবং যা তোমরা গোপন কর।

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا

৩০. মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে[৩]; এটাই

---

(১) আয়াতে ﴿بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ﴾ বলে এমন গৃহ বুঝানো হয়েছে, যা কোন বিশেষ ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠীর বাসগৃহ নয়; বরং সেটাকে ভোগ করার ও সেখানে অবস্থান করার অধিকার প্রত্যেকের আছে। যেমন বিভিন্ন শহরে ও প্রান্তরে এই উদ্দেশ্যে নির্মিত মুসাফিরখানাসমূহ, হোটেল,বাজার এবং একই কারণে মসজিদ, দ্বীনী পাঠাগার ইত্যাদি সব জনহিতকর প্রতিষ্ঠানও এই বিধানের অন্তর্ভুক্ত। যেখানে লোকদের জন্য প্রবেশের সাধারণ অনুমতি আছে এসব স্থানে প্রত্যেকেই বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করতে পারে। [তাবারী,ফাতহুল কাদীর,মুয়াস্‌সার]

(২) مَتَاعٌ - শব্দের আভিধানিক অর্থ কোন বস্তুকে ভোগ করা, ব্যবহার করা এবং তা দ্বারা উপকৃত হওয়া। যার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় তাকেও مَتَاعٌ বলা হয়। [কুরতুবী,বাগভী]

(৩) যৌনাঙ্গ সংযত রাখার অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। নিম্নে তার কিছু উদাহরণ পেশ করা হলোঃ
কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার যত পন্থা আছে, সবগুলো থেকে যৌনাঙ্গকে সংযত রাখা। এতে ব্যভিচার, পুংমৈথুন, দুই নারীর পারস্পরিক ঘর্ষণ– যাতে কামভাব পূর্ণ হয় এবং হস্তমৈথুন ইত্যাদি সব অবৈধ কর্ম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। [দেখুন-সা'দী,ফাতহুল কাদীর] আয়াতের উদ্দেশ্য অবৈধ ও হারাম পন্থায় কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা এবং তার সমস্ত ভূমিকাকে নিষিদ্ধ করা। তন্মধ্যে কাম-প্রবৃত্তির প্রথম ও প্রারম্ভিক কারণ হচ্ছে- দৃষ্টিপাত করা ও দেখা এবং সর্বশেষ পরিণতি হচ্ছে ব্যভিচার। এ দু'টিকে স্পষ্টতঃ উল্লেখ করে হারাম করে দেয়া হয়েছে। এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী হারাম ভূমিকাসমূহ- যেমন কথাবার্তা শোনা, স্পর্শ করা ইত্যাদি প্রসঙ্গক্রমে এগুলোর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। ইবনে সীরীন রাহিমাহুল্লাহ্ আবিদা আস্-সালমানী রাহিমাহুল্লাহ্ থেকে বর্ণনা করেন যে, যা দ্বারা আল্লাহ্‌র বিধানের বিরুদ্ধাচরণ হয়, তাই কবীরা গোনাহ্। কিন্তু আয়াতে তার দুই প্রান্ত- সূচনা ও পরিণতি উল্লেখ করা

হয়েছে। সূচনা হচ্ছে চোখ তুলে দেখা এবং পরিণতি হচ্ছে ব্যভিচার। জারীর ইবন আব্দুল্লাহ্ বাজালী থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'ইচ্ছা ছাড়াই হঠাৎ কোন বেগানা নারীর উপর দৃষ্টি পতিত হলে সেদিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নাও। [মুসলিমঃ ২১৫৯] আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর হাদীসে আছে, 'প্রথম দৃষ্টি মাফ এবং দ্বিতীয় দৃষ্টিপাত গোনাহ্।' [আবু দাউদঃ ২১৪৯, তিরমিযীঃ ২৭৭৭, মুসনাদে আহমাদঃ ৫/৩৫১, ৩৫৭] এর উদ্দেশ্য এই যে, প্রথম দৃষ্টিপাত অকস্মাৎ ও অনিচ্ছাকৃত হওয়ার কারণে ক্ষমার্হ। নতুবা ইচ্ছাকৃতভাবে প্রথম দৃষ্টিপাতও ক্ষমার্হ নয়। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা বনী আদমের উপর কিছু কিছু ব্যভিচার (যিনা) হবে জানিয়ে দিয়েছেন, তা অবশ্যই সংঘটিত হবে। চক্ষুর যিনা হল তাকানো, ... । [বুখারীঃ ৬২৪৩, ৬৬১২, মুসলিমঃ ২৬৫৭]
তদ্রুপ নিজের সতরকে অন্যের সামনে উন্মুক্ত করা থেকে দূরে থাকাও যৌনাঙ্গ সংযত করার পর্যায়ভুক্ত। [ফাতহুল কাদীর] পুরুষের জন্য সতর তথা লজ্জাস্থানের সীমানা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত নির্ধারণ করেছেন। তিনি বলেছেনঃ "নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত সতর।" [দারুকুতনীঃ ৯০২] শরীরের এ অংশ স্ত্রী ছাড়া আর কারোর সামনে ইচ্ছাকৃতভাবে খোলা হারাম। জারহাদে আল- আসলামী বর্ণনা করেছেন, একবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসে আমার রান খোলা অবস্থায় ছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ "তুমি কি জানো না, রান ঢেকে রাখার জিনিস?" [তিরমিযী ২৭৯৬, আবু দাউদঃ ৪০১৪] অন্য একটি হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "নিজের স্ত্রী ও ক্রীতদাসী ছাড়া বাকি সবার থেকে নিজের সতরের হেফাজত করো।" এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করে, আর যখন আমরা একাকী থাকি? জবাব দেনঃ "এ অবস্থায় আল্লাহ থেকে লজ্জা করা উচিত, তিনিই এর হকদার।" [আবু দাউদঃ ৪০১৭, তিরমিযীঃ ২৭৬৯, ইবনে মাজাহঃ ১৯২০]। অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'কোন লোক যেন অপর লোকের লজ্জাস্থানের দিকে না তাকায়, অনুরূপভাবে কোন মহিলা যেন অপর মহিলার লজ্জাস্থানের দিকে না তাকায় এবং কোন পুরুষ যেন অপর কোন পুরুষের সাথে একই কাপড়ে অবস্থান না করে, তদ্রূপ কোন মহিলাও যেন অপর মহিলার সাথে একই কাপড়ে অবস্থান না করে। [মুসলিমঃ ৩৩৮] অপর এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা রাস্তায় বসা থেকে বেঁচে থাক। লোকেরা বললঃ আমরা এ ধরণের বসা থেকে বাঁচতে পারি না; কেননা, সেখানে বসে আমরা কথাবার্তা বলে থাকি। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ যদি বসা ব্যতীত তোমার গত্যন্তর না থাকে তবে পথের হক আদায় করবে। তারা বললঃ পথের দাবী কি? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ চক্ষু নত করা, কষ্টদায়ক

يَصْنَعُوْنَ ۝٣٠

তাদের জন্য অধিক পবিত্র। তারা যা করে নিশ্চয় আল্লাহ্ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত।

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

৩১. আর মুমিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে[১] এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত

বিষয় দূর করা, সালামের জবাব দেয়া, সৎকাজের আদেশ করা, অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা। [বুখারীঃ ২৪৬৫, মুসলিমঃ ২১২১]
অনুরূপভাবে দাড়ি-গোঁফ বিহীন বালকদের প্রতি ইচ্ছাকৃত দৃষ্টিপাত করাও অনুচিত। ইবনে কাসীর লিখেছেন- পূর্ববর্তী অনেক মনীষী শ্মশ্রুবিহীন বালকদের প্রতি অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছেন এবং অনেক আলেমের মতে এটা হারাম।

(১) এ দীর্ঘ আয়াতের সূচনাভাগে সেই বিধানই বর্ণিত হয়েছে, যা পূর্ববর্তী আয়াতে পুরুষদের জন্য ব্যক্ত হয়েছে। অর্থাৎ তারা যেন দৃষ্টি নত রাখে তথা দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। পুরুষদের বিধানে নারীরাও অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু জোর দেয়ার জন্য তাদের কথা পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। [কুরতুবী,ফাতহুল কাদীর] অনেক আলেমের মতেঃ নারীদের জন্য মাহ্‌রাম নয়, এমন পুরুষের প্রতি দেখা সর্বাবস্থায় হারাম; কামভাব সহকারে বদ নিয়তে দেখুক অথবা এ ছাড়াই দেখুক। [ইবন কাসীর] তার প্রমাণ উম্মে সালমা বর্ণিত হাদীস যাতে বলা হয়েছেঃ ‘একদিন উম্মে-সালমা ও মায়মুনা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা উভয়েই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলেন। হঠাৎ অন্ধ সাহাবী আব্দুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাকতুম তথায় আগমন করলেন। এই ঘটনার সময়-কাল ছিল পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার পর। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের উভয়কে পর্দা করতে আদেশ করলেন। উম্মে-সালমা বললেনঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল, সে তো অন্ধ, সে আমাদেরকে দেখতে পাবে না এবং আমাদেরকে চেনেও না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমরা তো অন্ধ নও, তোমরা তাকে দেখছ। [তিরমিযীঃ ২৭৭৮, আবু দাউদঃ ৪১১২] তবে হাদীসটির সনদ দূর্বল। অপর কয়েকজন ফেকাহ্‌বিদ বলেনঃ কামভাব ব্যতীত বেগানা পুরুষকে দেখা নারীর জন্য দোষনীয় নয়। তাদের প্রমাণ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহার হাদীস, যাতে বলা হয়েছেঃ একবার ঈদের দিন মসজিদে নববীর আঙ্গিনায় কিছু সংখ্যক হাবশী যুবক সামরিক কুচকাওয়াজ করছিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কুচকাওয়াজ নিরিক্ষণ করতে থাকেন এবং তার আড়ালে দাঁড়িয়ে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহাও এই কুচকাওয়াজ উপভোগ করতে থাকেন এবং নিজে অতিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত দেখে যান। [বুখারীঃ ৪৫৫, মুসলিমঃ ৭৯২]

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ

করে[১]; আর তারা যেন তাদের সৌন্দর্য[২] প্রদর্শন না করে তবে যা সাধারণত প্রকাশ হয়ে থাকে[৩]।

(১) অর্থাৎ তারা যেন অবৈধ যৌন উপভোগ থেকে দূরে থাকে এবং নিজের সতর অন্যের সামনে উন্মুক্ত করাও পরিহার করে। [তাবারী,ইবন কাসীর] হাদীসে এসেছে, “মহিলা হলো আওরত তথা গোপণীয় বিষয়” [তিরমিযীঃ ১১৭৩, সহীহ ইবনে হিব্বানঃ ৫৫৯৯, সহীহ ইবনে খুযাইমাহঃ ১৬৮৫] পুরুষদের জন্য মেয়েদের সতর তার সারা শরীর। স্বামী ছাড়া অন্য কোন-পুরুষ এমন কি বাপ ও ভাইয়ের সামনেও তা খোলা উচিত নয়। মেয়েদের এমন পাতলা বা চোস্ত পোশাক পরা উচিত নয় যার মধ্য দিয়ে শরীর দেখা যায় বা শরীরের গঠন কাঠামো ভেতর থেকে ফুটে উঠতে থাকে। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বর্ণনা করেন, তার বোন আসমা বিনতে আবু বকর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে আসেন। তখন তিনি পাতলা কাপড় পরে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংগে সংগেই মুখ ফিরিয়ে নেন এবং বলেনঃ “হে আসমা ! কোন মেয়ে যখন বালেগ হয়ে যায় তখন তার এটা ও ওটা ছাড়া শরীরের কোন অংশ দেখা যাওয়া জায়েয নয়।” বর্ণনাকারী বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাতের কব্জি ও চেহারার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। [আবু দাউদঃ ৪১০৪]

(২) আয়াতের অর্থ এই যে, মুহরিম ব্যতিত সাজ-সজ্জার স্থানসমূহ প্রকাশ না করা মহিলাদের উপর ওয়াজিব। [তাবারী,বাগভী]

(৩) আয়াতে পর্দার বিধানের কয়েকটি ব্যতিক্রম আলোচনা করা হচ্ছে। প্রথম ব্যতিক্রম হচ্ছে ﴿مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ অর্থাৎ নারীর কোন সাজ-সজ্জার অঙ্গ পুরুষের সামনে প্রকাশ করা বৈধ নয়, অবশ্য সেসব অঙ্গ ব্যতীত, যেগুলো আপনা-আপনি প্রকাশ হয়ে পড়ে অর্থাৎ কাজকর্ম ও চলাফেরার সময় সেসব অঙ্গ স্বভাবতঃ খুলেই যায়। এগুলো ব্যতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো প্রকাশ করার মধ্যে কোন গোনাহ্ নেই। এ সম্পর্কে আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ ও আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমের তাফসীর দু’ধরনের। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা বলেনঃ ﴿مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ বাক্যে উপরের কাপড়; যেমন বোরকা, লম্বা চাদর ইত্যাদিকে ব্যতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এগুলো সাজ-সজ্জার পোশাককে আবৃত রাখার জন্য পরিধান করা হয়। আয়াতের অর্থ এই যে, প্রয়োজনবশতঃ বাইরে যাওয়ার সময় যেসব উপরের কাপড় আবৃত করা সম্ভবপর নয়, সেগুলো ব্যতীত সাজ-সজ্জার কোন বস্তু প্রকাশ করা জায়েয নয়। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমাও বলেনঃ এখানে প্রকাশ্য সৌন্দর্য বলতে চেহারা, চোখের সুরমা, হাতের মেহেদী বা রঙ এবং আংটি। সুতরাং এগুলো সে তার ঘরে যে সমস্ত মানুষ তার কাছে প্রবেশ করার অনুমতি আছে, তাদের সামনে প্রকাশ করবে।

কোন কোন মুফাস্‌সির এ আয়াতের তাফসীরে বলেনঃ নারীর আসল বিধান এই

أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِيٓ

আর তারা তাদের গলা ও বুক যেন মাথার কাপড় দ্বারা ঢেকে রাখে(১)। আর তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা,

---

যে, সে তার সাজ-সজ্জার কোন কিছুই প্রকাশ করবে না। আয়াতের উদ্দেশ্যও তাই। তবে চলাফেরা ও কাজকর্মে স্বভাবতঃ যেগুলো খুলে যায়, সেগুলো অপারগতার কারণে গোনাহ্ থেকে মুক্ত। নারী কোন প্রয়োজনে বাইরে বের হলে বোরকা, চাদর ইত্যাদি প্রকাশ হয়ে পড়া সুনির্দিষ্ট। লেন-দেনের প্রয়োজনে কোন সময় মুখমণ্ডল ও হাতের তালুও প্রকাশ হয়ে পড়ে। এটাও ক্ষমার্হ- গোনাহ্ নয়। পক্ষান্তরে কোন কোন মুফাসসির ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ এর অর্থ নিয়েছেনঃ "মানুষ স্বাভাবিকভাবে যা প্রকাশ করে দেয়" এবং তারপর তারা এর মধ্যে শামিল করে দিয়েছেন মুখ ও হাতকে তাদের সমস্ত সাজসজ্জাসহ। [দেখুন-তাবারী,ইবন কাসীর,ফাতহুল কাদীর,সহীহ্ আল-মাসবুর]

(১) অর্থাৎ তারা যেন বক্ষদেশে ওড়না ফেলে রাখে। خُمُر শব্দটি خمار এর বহুবচন। অর্থ ঐ কাপড়, যা নারী মাথায় ব্যবহার করে এবং তা দ্বারা গলা ও বক্ষ আবৃত হয়ে যায়। جيوب শব্দটি جيب এর বহুবচন- এর অর্থ জামার কলার। [কুরতুবী,ফাতহুল কাদীর] জাহেলী যুগে মহিলারা মাথায় এক ধরনের আঁটসাঁট বাঁধন দিতো। মাথার পেছনে চুলের খোঁপার সাথে এর গিরো বাঁধা থাকতো। সামনের দিকে বুকের একটি অংশ খোলা থাকতো। সেখানে গলা ও বুকের উপরের দিকের অংশটি পরিষ্কার দেখা যেতো। বুকে জামা ছাড়া আর কিছুই থাকতো না। পেছনের দিকে দুটো তিনটে খোঁপা দেখা যেতো। তাই মুসলিম নারীদেরকে আদেশ করা হয়েছে তারা যেন এরূপ না করে; বরং ওড়নার উভয় প্রান্ত পরস্পর উল্টিয়ে রাখে, এতে করে যেন সকল অঙ্গ আবৃত হয়ে পড়ে। [ইবন কাসীর] আয়াত নাযিল হবার পর মুসলিম মহিলাদের মধ্যে ওড়নার প্রচলন করা হয়। মু'মিন মহিলারা কুরআনের এ হুকুমটি শোনার সাথে সাথে যেভাবে একে কার্যকর করে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা তার প্রশংসা করে বলেনঃ সূরা নূর নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ﴾ বাক্যাংশ শোনার পর তারা নিজের কোমরে বাঁধা কাপড় খুলে নিয়ে আবার অনেকে চাদর তুলে নিয়ে সংগে সংগেই ওড়না বানিয়ে ফেলল এবং তা দিয়ে শরীর ঢেকে ফেললো। [বুখারীঃ ৪৭৫৯] অন্য বর্ণনায় এসেছে, উম্মে সালামাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলেন, যখন ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ﴾ এ আয়াত নাযিল হলো, তখন তাদের মাথা এমনভাবে কালো কাপড় দিয়ে ঢেকে ফেলল মনে হয় যেন তাদের মাথার উপর কাক রয়েছে। [আবু দাউদঃ ৪১০১] এ সম্পর্কিত অন্য একটি হাদীসে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা আরো বিস্তারিত বর্ণনা করে বলেনঃ আল্লাহ্ প্রথম যুগের মুহাজির মহিলাদের উপর রহমত নাযিল করুন তারা ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ﴾ নাযিল হওয়ার পরে পাতলা কাপড় পরিত্যাগ করে নিজেদের মোটা কাপড় বাছাই করে তা দিয়ে ওড়না তৈরী করে। [আবু দাউদঃ ৪১০২]

إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِيٓ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِيٓ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَٰتِ ٱلنِّسَآءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن

শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভাই, ভাইয়ের ছেলে, বোনের ছেলে, আপন নারীরা(১), তাদের মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যে যৌন কামনা-রহিত পুরুষ(২) এবং নারীদের গোপন

(১) পর্দার বিধান থেকে পরবর্তী ব্যতিক্রম হলো আল্লাহ্‌র বাণীঃ ﴿أَوْ نِسَآئِهِنَّ﴾ অর্থাৎ নিজেদের স্ত্রীলোক;এর উদ্দেশ্য মুসলিম স্ত্রীলোক। তাদের সামনেও এমনসব অঙ্গ খোলা যায়, যেগুলো নিজ পিতা ও পুত্রের সামনে খোলা যায়। [ইবন কাসীর]
তবে আয়াতে 'তাদের নিজেদের স্ত্রীলোক' বলা থেকে জানা গেল যে, কাফের মুশরিক স্ত্রীলোকরা পর্দার হুকুমের ব্যতিক্রম নয়। তাদের সাথে পর্দা করা প্রয়োজন। তারা বেগানা পুরুষদের বিধানের অন্তর্ভুক্ত। এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে ইবনে কাসীর মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেনঃ এ থেকে জানা গেল যে, কাফের নারীদের সামনে অঙ্গ প্রকাশ করা কোন মুসলিম নারীর জন্য জায়েয নয়। কিন্তু সহীহ্ হাদীসসমূহে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের সামনে কাফের নারীদের যাতায়াত প্রমাণিত আছে। তাই এ প্রশ্নে মুজতাহিদ ইমামগণের মধ্যে মতভেদ বিদ্যমান। কারো মতে কাফের নারী বেগানা পুরুষদের মত। কেউ কেউ এ ব্যাপারে মুসলিম ও কাফের উভয় প্রকার নারীর একই বিধান রেখেছেন; অর্থাৎ তাদের কাছে পর্দা করতে হবে না। [দেখুন-বাগভী,ফাতহুল কাদীর]

(২) একাদশ প্রকার ﴿أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ﴾ আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ এখানে এমন নির্বোধ ও ইন্দ্রিয়বিকল ধরনের লোকদের বুঝানো হয়েছে, যাদের নারী জাতির প্রতি কোন আগ্রহ ও ঔৎসুক্যই নেই। ইবনে জরীর তাবারী একই বিষয়বস্তুই আবু আব্দুল্লাহ্, ইবনে জুবায়র, ইবনে আতিয়্যা প্রমুখ থেকে বর্ণনা করেছেন। কাজেই আয়াতে এমনসব পুরুষকে বুঝানো হয়েছে, যাদের মধ্যে নারীদের প্রতি কোন আগ্রহ ও কামভাব নেই এবং নারীদের রূপ-গুণের প্রতিও তাদের কোন ঔৎসুক্য নেই যে, অপরের কাছে গিয়ে বর্ণনা করবে।
তবে নপুংসক ধরনের লোক যারা নারীদের বিশেষ গুণাবলীর সাথে সম্পর্ক রাখে, তাদের কাছেও পর্দা করা ওয়াজিব। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বর্ণিত হাদীসে আছে, জনৈক খুনসা বা হিজড়া ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের কাছে আসা-যাওয়া করত। রাসূলের স্ত্রীগণ তাকে আয়াতে বর্ণিত ﴿غَيْرِ أُوْلِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ﴾ এর অন্তর্ভুক্ত মনে করে তার সামনে আগমন করতেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাকে গৃহে প্রবেশ করতে নিষেধ করে দিলেন। [দেখুন, মুসলিমঃ ২১৮০] এ কারণেই কোন কোন আলেম বলেনঃ পুরুষ যদিও পুরুষত্বহীন, লিঙ্গকর্তিত অথবা খুব বেশী বৃদ্ধ হয়, তবুও সে ﴿غَيْرِ أُوْلِي ٱلْإِرْبَةِ﴾ শব্দের অন্তর্ভুক্ত নয়। তার কাছে পর্দা করা ওয়াজিব। এখানে

زِيْنَتِهِنَّ وَتُوبُوٓا إِلَى اللّٰهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক[1] ছাড়া কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদচারণা না করে[2]। হে মুমিনগণ! তোমরা

﴾غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ﴿ শব্দের সাথে ﴾أَوِ التَّابِعِينَ﴿ শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, নির্বোধ ইন্দ্রিয়বিকল লোক, যারা অনাহূত গৃহে ঢুকে পড়ে, তারা ব্যতিক্রমভুক্ত। [দেখুন-তাবারী,কুরতুবী,ফাতহুল কাদীর]

(১) দ্বাদশ প্রকার ﴾أَوِ الطِّفْلِ﴿ এখানে এমন অপ্রাপ্তবয়স্ক বালককে বুঝানো হয়েছে, যে এখনো সাবালকত্বের নিকটবর্তীও হয়নি এবং নারীদের বিশেষ আকর্ষণ, কমনীয়তা ও গতিবিধি সম্পর্কে সম্পূর্ণ বেখবর। যে বালক এসব অবস্থা সম্পর্কে সচেতন, সে 'মোরাহিক' অর্থাৎ সাবালকত্বের নিকটবর্তী। তার কাছে পর্দা করা ওয়াজিব। [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ নারীরা যেন সজোরে পদক্ষেপ না করে, যার দরুন অলঙ্কারাদির আওয়াজ ভেসে উঠে এবং তাদের বিশেষ সাজ-সজ্জা পুরুষদের কাছে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। [ফাতহুল কাদীর] এখানে মূল উদ্দেশ্য নিজেদের অঙ্গ-প্রত্যাঙ্গাদি ও সেগুলোর সৌন্দর্য প্রকাশ হয়ে পড়ার যাবতীয় বস্তুই নিষেধ করা। অনুরূপভাবে দৃষ্টি ছাড়া অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলোকে উত্তেজিতকারী জিনিসগুলোও আল্লাহ তা'আলা মহিলাদেরকে যে উদ্দেশ্যে সাজসজ্জা ও সৌন্দর্যের প্রকাশনী করতে নিষেধ করেছেন তার বিরোধী। তাই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদেরকে খোশবু লাগিয়ে বাইরে বের না হবার হুকুম দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "আল্লাহর দাসীদেরকে আল্লাহর মসজিদে আসতে নিষেধ করো না। কিন্তু তারা যেন খোশবু লাগিয়ে না আসে।" [আবু দাউদঃ ৫৬৫, মুসনাদে আহমাদঃ ২/৪৩৮] অন্য একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন "যে মেয়ে মসজিদে খোশবু মেখে আসে তার সালাত ততক্ষণ কবুল হয় না যতক্ষণ না সে বাড়ি ফিরে ফরয গোসলের মত গোসল করে।" [আবু দাউদঃ ৪১৭৪, ইবনে মাজাহঃ ৪০০২, মুসনাদে আহমাদঃ ২/২৪৬] আবু মূসা আশআরী বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "যে নারী আতর মেখে পথ দিয়ে যায়, যাতে লোকেরা তার সুবাসে বিমোহিত হয়, সে এমন ও এমন । তিনি তার জন্য খুবই কঠিন শব্দ ব্যবহার করেছেন।" [আবু দাউদঃ ৪১৭৩, মুসনাদে আহমাদঃ ৪/৪০০]।

তদ্রূপ নারীরা প্রয়োজন ছাড়া নিজেদের আওয়াজ পুরুষদেরকে শোনাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাও অপছন্দ করতেন। প্রয়োজনে কথা বলার অনুমতি কুরআনেই দেয়া হয়েছে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র স্ত্রীগণ নিজেরাই লোকদেরকে দ্বীনী মাসায়েল বর্ণনা করতেন। কিন্তু যেখানে

সবাই আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে আস[১],
যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

এর কোন প্রয়োজন নেই এবং কোন দ্বীনী বা নৈতিক লাভও নেই সেখানে মহিলারা নিজেদের আওয়াজ ভিন্ পুরুষদেরকে শুনাবে এটা পছন্দ করা হয়নি। কাজেই সালাতে যদি ইমাম ভুলে যান তাহলে পুরুষদেরকে সুবহানাল্লাহ বলার হুকুম দেয়া হয়েছে কিন্তু মেয়েদেরকে এক হাতের উপর অন্য হাত মেরে ইমামকে সতর্ক করে দেবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। [দেখুন, বুখারীঃ ১২০৩, মুসলিমঃ ৪২১,৪২২]।

(১) অর্থাৎ মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহ্‌র কাছে তাওবাহ্ কর। [কুরতুবী] হাদীসে এসেছে, তাওবাহ্ হলো, অনুতপ্ত হওয়া, অনুশোচনা করা, [ইবনে মাজাহ্ঃ ৪২৫২]
এ বিধানগুলো নাযিল হবার পর কুরআনের মর্মবাণী অনুযায়ী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামী সমাজে অন্য যেসব সংস্কারমূলক বিধানের প্রচলন করেন তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি হচ্ছেঃ
একঃ মাহরাম আত্মীয়ের অনুপস্থিতিতে অন্য লোকেরা (আত্মীয় হলেও) কোন মেয়ের সাথে একাকী সাক্ষাত করতে ও তার কাছে নির্জনে বসতে পারে না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "যেসব নারীর স্বামী বাইরে গেছে তাদের কাছে যেয়ো না। কারণ শয়তান তোমাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকের রক্ত ধারায় আবর্তন করছে।" [তিরমিযীঃ ১১৭২] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন কখনো কোন মেয়ের সাথে নির্জনে সাক্ষাৎ না করে যতক্ষণ না ঐ মেয়ের কোন মাহরাম তার সাথে থাকে। কারণ সে সময় তৃতীয়জন থাকে শয়তান।" [মুসনাদে আহমাদঃ ১/১৮]
দুইঃ কোন পুরুষের হাত কোন গায়ের মাহরাম মেয়ের গায়ে লাগুক এটাও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৈধ করেননি। তাই তিনি পুরুষদের হাতে হাত রেখে বাই'আত করতেন। কিন্তু মেয়েদের বাই'আত নেবার সময় কখনো এ পদ্ধতি অবলম্বন করতেন না। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলেন, "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাত কখনো কোন ভিন্ মেয়ের শরীরে লাগেনি। তিনি মেয়েদের থেকে শুধুমাত্র মৌখিক শপথ নিতেন এবং শপথ নেয়া শেষ হলে বলতেন, যাও তোমাদের বাই'আত হয়ে গেছে।" [বুখারীঃ ৫২৮৮, মুসলিমঃ ১৮৬৬]।
তিনঃ মেয়েদের মাহরাম ছাড়া একাকী অথবা গায়ের মুহাররামের সাথে সফর করতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কঠোরভাবে নিষেধ করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "কোন পুরুষ যেন মহিলার সাথে একান্তে সাক্ষাৎ না করে যতক্ষণ তার সাথে তার মাহরাম না থাকে এবং কোন মহিলা যেন সফর না করে যতক্ষণ না তার কোন মাহরাম তার সাথে থাকে।" [বুখারীঃ ১৮৬২, ৩০০৬, ৩০৬১, ৫২৩৩, মুসলিমঃ ১৩৪১]

৩২. আর তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন'[১] তাদের বিয়ে সম্পাদন কর এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরও[২] । তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন; আল্লাহ্ তো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ ।

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

৩৩. আর যাদের বিয়ের সামর্থ্য নেই, আল্লাহ্ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম অবলম্বন করে[৩] এবং তোমাদের মালিকানাধীন

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ

(১) أيامى শব্দটি أَيِّم -এর বহুবচন । অর্থ প্রত্যেকটি এমন নর ও নারী, যার বিয়ে বর্তমান নেই; একেবারেই বিয়ে না করার কারণে হোক কিংবা বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একজনের মৃত্যু অথবা তালাকের কারণে হোক । [দেখুন-বাগভী]এমন নর ও নারীদের বিয়ে সম্পাদনের জন্য তাদের অভিভাবকদেরকে আদেশ করা হয়েছে । বিয়ে করার প্রতি উৎসাহ দিয়ে বিভিন্ন হাদীসেও নির্দেশ এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'যাদের বিয়ে সম্পন্ন হয়েছিল এমন মহিলাদের পুনরায় বিয়ে দিতে হলে তার সরাসরি স্পষ্টভাষায় মতামত না নিয়ে বিয়ে দেয়া যাবে না । আর যাদের বিয়ে ইতিপূর্বে হয়নি, তাদের বিয়েতেও অনুমতি নিতে হবে । সাহাবাগণ বললেনঃ হে আল্লাহ্র রাসূল, তার অনুমতি কিভাবে নিবে? তিনি জবাব দিলেনঃ চুপ থাকা । [বুখারীঃ ৫১৩৬, মুসলিমঃ ১৪১৯] অন্য বর্ণনায় আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিয়ের নির্দেশ দিতেন, বৈরাগ্যপনা (অবিবাহিত থাকা) থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করতেন এবং বলতেনঃ 'যারা স্বামীকে ভালবাসবে এবং বেশি সন্তান জন্ম দেয় এমন মেয়েদের তোমরা বিয়ে কর । কেননা, আমি কেয়ামতের দিন নবীদের কাছে বেশী সংখ্যা দেখাতে পারব ।' [ইবনে হিব্বানঃ ৪০২৮, মুসনাদে আহমাদঃ ৩/১৫৮, ২৪৫]

(২) অর্থাৎ নারীদেরকে বিয়েতে বাধা না দেয়ার জন্য অভিভাবকদের জন্য অপরিহার্য । এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামও বলেছেনঃ 'তোমাদের কাছে যদি কেউ বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসে, তবে তার চরিত্র পছন্দনীয় হলে অবশ্যই বিয়ে সম্পাদন করে দাও । এরূপ না করলে দেশে বিপুল পরিমাণে অনর্থ দেখা দেবে ।' [তিরমিযীঃ ১০৮৪, ১০৮৫]

(৩) অর্থাৎ যারা অর্থ-সম্পদের দিক দিয়ে বিয়ের সামর্থ্য রাখে না এবং বিয়ে করলে আশঙ্কা আছে যে, স্ত্রীর অধিকার আদায় না করার কারণে গোনাহ্গার হয়ে যাবে, তারা

خَيْرًا ۖ وَّاٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِيْٓ اٰتٰىكُمْ ۗ وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْۢ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٣٣﴾

দাস-দাসীদের মধ্যে কেউ তার মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি চাইলে, তাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হও, যদি তোমরা তাদের মধ্যে কল্যাণ আছে বলে জানতে পার। আর আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছেন তা থেকে তোমরা তাদেরকে দান কর। আর তোমাদের দাসীরা লজ্জাস্থানের পবিত্রতা রক্ষা করতে চাইলে দুনিয়ার জীবনের ধন-লালসায় তাদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করো না। আর যারা তাদেরকে বাধ্য করবে, নিশ্চয় তাদেরকে বাধ্য করার পর আল্লাহ্ তো

যেন পবিত্রতা ও ধৈর্যসহকারে অপেক্ষা করে, যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে সম্পদশালী বানিয়ে দেন। বিয়ে করার কারণে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে ধনাঢ্যতা দান করার ওয়াদা তখন, যখন পবিত্রতা সংরক্ষণ ও সুন্নাত পালনের নিয়তে তা সম্পাদন করা হয়, অতঃপর আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল ও ভরসা করা হয়। [দেখুন-কুরতুবী] এই ধৈর্যের জন্য হাদীসে একটি কৌশলও বলে দেয়া হয়েছে যে, তারা বেশী পরিমানে সিয়াম পালন করবে। তারা এরূপ করলে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে বিয়ের সামর্থ্য পরিমানে অর্থ-সম্পদ দান করবেন। এ প্রসংগে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যে হাদীসগুলো বর্ণিত হয়েছে সেগুলোই এ আয়াতগুলোর সবচেয়ে ভালো ব্যাখ্যা করতে পারে। যেমন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ "হে যুবকগণ ! তোমাদের মধ্য থেকে যে বিয়ে করতে পারে তার বিয়ে করে নেয়া উচিত। কারণ এটি হচ্ছে চোখকে কুদৃষ্টি থেকে বাঁচাবার এবং মানুষের সততা ও চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষার উৎকৃষ্ট উপায়। আর যার বিয়ে করার ক্ষমতা নেই তার সাওম পালন করা উচিত। কারণ সাওম মানুষের দেহের উত্তাপ ঠাণ্ডা করে দেয়।" [বুখারীঃ ১৯০৫, মুসলিমঃ ১০১৮] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেনঃ "তিন ব্যক্তিকে সাহায্য করা আল্লাহর দায়িত্ব। এক ব্যক্তি হচ্ছে, যে চারিত্রিক বিশুদ্ধতা বজায় রাখার জন্য বিয়ে করে। দ্বিতীয় ব্যক্তি হচ্ছে, মুক্তিলাভের জন্য যে গোলাম লিখিতভাবে চুক্তিবদ্ধ হয় এবং তার মুক্তিপণ দেবার নিয়ত রাখে। আর তৃতীয় ব্যক্তি, যে আল্লাহর পথে জিহাদ করার জন্য বের হয়।" [তিরমিযীঃ ১৬৫৫, নাসাঈঃ ৬/১৫, ইবনে মাজাহঃ ২৫১৮, আহমাদঃ ২/২৫১]।

ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু[১]।

৩৪. আর অবশ্যই আমরা তোমাদের কাছে নাযিল করেছি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ, তোমাদের পূর্ববর্তীদের থেকে দৃষ্টান্ত ও মুত্তাকীদের জন্য উপদেশ।

وَلَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ ءَايَٰتٍ مُّبَيِّنَٰتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ۝

পঞ্চম রুকূ'

৩৫. আল্লাহ্ আসমানসমূহ ও যমীনের নূর[২],

اللَّهُ نُورُ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ مَثَلُ نُورِهِۦ كَمِشْكَوٰةٍ

(১) এ আয়াতে বর্ণিত, "আর তোমাদের দাসীরা লজ্জাস্থানের পবিত্রতা রক্ষা করতে চাইলে দুনিয়ার জীবনের ধন-লালসায় তাদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করো না।" এখানে "লজ্জাস্থানের পবিত্রতা রক্ষা করতে চাইলে" কথাটি শর্ত হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি। বরং সাধারণ নিয়মের কথাই বলা হয়েছে। কারণ, সাধারণতঃ পবিত্রা মেয়েদেরকে জোর জবরদস্তি ছাড়া অন্যায় কাজে প্রবৃত্ত করা যায় না। [ফাতহুল কাদীর] আয়াতে পরবর্তীতে বলা হয়েছে, "আর যারা তাদেরকে বাধ্য করবে, নিশ্চয় তাদেরকে বাধ্য করার পর আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" এখানেও এ মেয়েদেরকে ক্ষমা করার কথা বলা হয়েছে। যবরদস্তিকারীদেরকে নয়। যবরদস্তিকারীদের গোনাহ অবশ্যই হবে। তবে যাদের উপর যবরদস্তি করা হয়েছে আল্লাহ্ তাদের প্রতি ক্ষমাশীল। [ফাতহুল কাদীর]

(২) নূরের সংজ্ঞাঃ নূর শব্দের আভিধানিক অর্থ আলো। [ফাতহুল কাদীর] কুরআন ও হাদীসে আল্লাহ্‌র জন্য নূর কয়েকভাবে সাব্যস্ত হয়েছে।

এক) আল্লাহ্‌র নাম হিসাবে। যে সমস্ত আলেমগণ এটাকে আল্লাহ্‌র নাম হিসাবে সাব্যস্ত করেছেন তারা হলেন, সুফিয়ান ইবনে উ'য়াইনাহ্ খাত্তাবী, ইবনে মান্দাহ্, হালিমী, বাইহাকী, ইস্পাহানী, ইবনে আরাবী, কুরতুবী, ইবনু তাইমিয়্যাহ, ইবনুল কাইয়্যেম, ইবনুল ওয়াযীর, ইবনে হাজার, আস-সা'দী, আল-কাহ্তানী, আল-হামুদ, আশ্-শারবাসী, নূরুল হাসান খান প্রমুখ।

দুই) আল্লাহ্‌র গুণ হিসাবে। আল্লাহ্ তা'আলা নূর নামক গুণ তাঁর জন্য বিভিন্ন ভাবে সাব্যস্ত করেছেন। যেমন-

(ক) কখনো কখনো সরাসরি নূরকে তাঁর দিকে সম্পর্কিত করেছেন। আল্লাহ্ বলেনঃ ﴿مَثَلُ نُورِهِۦ كَمِشْكَوٰةٍ﴾ অর্থাৎ "আল্লাহ্‌র নূরের উদাহরণ হলো ...। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেনঃ ﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا﴾ অর্থাৎ "আর আলোকিত হলো যমীন তার প্রভূর আলোতে।" [সূরা আয-যুমারঃ ৬৯] হাদীসে এসেছে, 'আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সৃষ্টিকে অন্ধকারে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি তাতে তাঁর নূরের কিছু ঢেলে দিলেন। সুতরাং এ নূরের কিছু অংশ যার উপরই পড়েছে, সে হেদায়াত লাভ করেছে। আর যার উপর পড়েনি সে পথভ্রষ্ট হয়েছে।' [তিরমিযীঃ ২৬৪২]

(খ) কখনো কখনো আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর এ নূরকে তাঁর চেহারার দিকে সম্পর্কযুক্ত করেছেন। আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ 'আসমান ও যমীনের যাবতীয় নূর তাঁরই চেহারার আলো।' [আবু সাইদ আদ-দারেমী]
তিন) আল্লাহ্র নূরকে আসমান ও যমীনের দিকে সম্পর্কযুক্ত করে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ ﴿ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ﴾ অর্থাৎ "আল্লাহ্ আসমান ও যমীনের নূর।" এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ اللّٰهُمَّ لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ অর্থাৎ 'হে আল্লাহ্, আপনার জন্য সমস্ত প্রশংসা, আপনি আসমান ও যমীনের আলো এবং এ দু'য়ের মধ্যে যা আছে তারও (আলো)...। [বুখারীঃ ১১২০, মুসলিমঃ ১৯৯]
চার) আল্লাহ্র পর্দাও নূর। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'তাঁর পর্দা হলো নূর।' [মুসলিমঃ ২৯৩] আর আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মি'রাজের রাতে এর নূরই দেখেছিলেন। সাহাবাগণ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছিলেনঃ 'আপনি কি আপনার প্রভূকে দেখেছিলেন? তিনি বললেনঃ নূর! কিভাবে তাকে দেখতে পারি?' [মুসলিমঃ ২৯১] অপর বর্ণনায় এসেছে, 'আমি নূর দেখেছি।' [মুসলিমঃ ২৯২] এ হাদীসের সঠিক অর্থ হলো, আমি কিভাবে তাঁকে দেখতে পাব? সেখানে তো নূর ছিল। যা তাকে দেখার মাঝে বাঁধা দিচ্ছিল। আমি তো কেবল নূর দেখেছি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, আল্লাহ্র পর্দাও নূর। এ নূরের পর্দার কারণেই সবকিছু পুড়ে যাচ্ছে না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'যদি তিনি তাঁর পর্দা খুলতেন তবে তাঁর সৃষ্টির যতটুকুতে তাঁর নজর পড়ত সবকিছু তাঁর চেহারার আলোর কারণে পুড়ে যেত।' [মুসলিমঃ ২৯৩-২৯৫]
সুতরাং আসমান ও যমীনের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য দু'ধরনের নূরই আল্লাহ্র।
প্রকাশ্য নূর যেমন- আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং নূর। তাঁর পর্দা নূরের। যদি তিনি তাঁর সে পর্দা উন্মোচন করেন, তাহলে তাঁর সৃষ্টির যতটুকুতে তাঁর দৃষ্টি পড়বে তার সবকিছুই ভস্ম হয়ে যাবে। তাঁর নূরেই আরশ আলোকিত। তাঁর নূরেই কুরসী, সূর্য, চাঁদ ইত্যাদি আলোকিত। অনুরূপভাবে তাঁর নূরেই জান্নাত আলোকিত। কারণ, সেখানে তো আর সূর্য নেই।
আর অপ্রকাশ্য নূর যেমন- আল্লাহ্র কিতাব নূর [সূরা আল-আ'রাফঃ ১৫৭], তাঁর শরীয়ত নূর [সূরা আল-মায়েদাঃ ৪৪], তাঁর বান্দা ও রাসূলদের অন্তরে অবস্থিত ঈমান ও জ্ঞান তাঁরই নূর [সূরা আয-যুমারঃ ২২]। যদি এ নূর না থাকত তাহলে অন্ধকারের উপর অন্ধকারে সবকিছু ছেয়ে যেত। সুতরাং যেখানেই তাঁর নূরের অভাব হবে সেখানেই অন্ধকার ও বিভ্রান্তি দানা বেঁধে থাকে। আর এজন্যই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দো'আ করতেনঃ 'হে আল্লাহ্, আমার অন্তরে নূর দিন, আমার শ্রবণেন্দ্রীয়ে নূর দিন, আমার দৃষ্টিশক্তিতে নূর দিন, আমার ডানে নূর দিন, আমার বামে নূর দিন, আমার সামনে নূর দিন, আমার পিছনে

তাঁর[1] নূরের উপমা যেন একটি | فِيهَامِصۡبَاحٌ ٱلۡمِصۡبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ٱلزُّجَاجَةُ

নূর দিন, আমার উপরে নূর দিন, আমার নীচে নূর দিন। আর আমার জন্য নূর দিন অথবা বলেছেনঃ আমাকে নূর বানিয়ে দিন। অন্য বর্ণনায় এসেছে, আর আমার জন্য আমার আত্মায় নূর দিন। আমার জন্য বৃহৎ নূরের ব্যবস্থা করে দিন। [বুখারীঃ ৬৩১৬, মুসলিমঃ ৭৬৩]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'হে আল্লাহ্, আমাকে নূর দিন, আমার জন্য আমার অস্থি ও শিরা-উপশিরায় নূর দিন। আমার মাংসে নূর দিন, আমার রক্তে নূর দিন, আমার চুলে নূর দিন, আমার শরীরে নূর দিন।' অপর বর্ণনায় এসেছে, 'হে আল্লাহ্, আমার জন্য আমার কবরে নূর দিন। আমার হাড্ডিতে নূর দিন।' [তিরমিযীঃ ৩৪১৯] অন্যত্র এসেছে, 'আর আমার নূর বাড়িয়ে দিন, আমার নূর বাড়িয়ে দিন, আমার নূর বাড়িয়ে দিন। [বুখারীঃ আদাবুল মুফরাদ- ৬৯৫] 'আমাকে নূরের উপর নূর দান করুন।' [ফাতহুল বারীঃ ১১/১১৮]

আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সত্তার জন্য ব্যবহৃত 'নূর' শব্দটির অর্থ কোন কোন তাফসীরবিদের মতে 'মুনাওয়ের' অর্থাৎ ঔজ্জ্বল্যদানকারী। অথবা অতিশয়ার্থবোধক পদের ন্যায় নূরওয়ালাকে নূর বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। তখন আয়াতের অর্থ হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যে বসবাসকারী সব সৃষ্টজীবের নূরদাতা। এই নূর বলে হেদায়াতের নূর বুঝানো হয়েছে। [দেখুন- বাগভী] ইবনে কাসীর ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে এর তাফসীর এরূপ বর্ণনা করেছেনঃ اللهُ هَادِى أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ অর্থাৎ আল্লাহ্ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অধিবাসীদের হেদায়াতকারী। [ইবন কাসীর]

(১) ﴿مَثَلُ نُورِهِۦ﴾ এর সর্বনাম দ্বারা কাকে বুঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে তাফসীরবিদগণের কয়েকটি উক্তি এসেছেঃ

(এক) এই সর্বনাম দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলাকে বুঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্র নূর হেদায়াত যা মুমিনের অন্তরে রাখা হয়েছে, তার দৃষ্টান্ত كَمِشْكَاةٍ এটা ইবনে-আব্বাসের উক্তি। অর্থাৎ মুমিনের অন্তরস্থিত কুরআন ও ঈমানের মাধ্যমে সঞ্চিত আল্লাহ্র নূরকে তুলনা করে বলা হচ্ছে যে, এ নূরের উদাহরণ হলো এমন একটি তাকের মত যেখানে আল্লাহ্র নূর আলোর মত উজ্জল ও সদা বিকিরনশীল। সে হিসেবে আয়াতের প্রথমে আল্লাহ্ তা'আলা নিজের নূর উল্লেখ করেছেন ﴿ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ﴾ অতঃপর মুমিনের অন্তরে অবস্থিত তাঁরই নূর উল্লেখ করেছেন ﴿مَثَلُ نُورِهِۦ﴾ - উবাই ইবনে কা'ব এই আয়াতের কেরাআতও ﴿مَثَلُ نُورِهِۦ﴾ এর পরিবর্তে مَثَلُ نُوْرِ مَنْ آمَنَ بِهِ পড়তেন। সাঈদ ইবনে যুবায়ের এই কেরাআত এবং আয়াতের এই অর্থ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকেও বর্ণনা করেছেন।

(দুই) এই সর্বনাম দ্বারা মুমিনকেই বুঝানো হয়েছে। তখন দৃষ্টান্তের সারমর্ম এই যে,

---

মুমিনের বক্ষ একটি তাকের মত এবং এতে তার অন্তর একটি প্রদীপ সদৃশ। এতে যে স্বচ্ছ যয়তূন তৈলের কথা বলা হয়েছে, এটা মুমিনের স্বভাবে গচ্ছিত রাখা নূরে ঈমানের দৃষ্টান্ত। এর বৈশিষ্ট্য আপনা-আপনি সত্যকে গ্রহণ করা। যয়তূন তৈল অগ্নি স্পর্শে প্রজ্বলিত হয়ে যেমন অপরকে আলোকিত করে, এমনিভাবে মুমিনের অন্তরে রাখা নূরে-হেদায়াত যখন আল্লাহ্‌র ওহী ও জ্ঞানের সাথে মিলিত হয়, তখন আলোকিত হয়ে বিশ্বকে আলোকিত করে দেয়। সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণ এই দৃষ্টান্তকে বিশেষভাবে মুমিনের অন্তরের সাথে সম্পর্কযুক্ত করেছেন। এর কারণও সম্ভবতঃ এই যে, এই নূর দ্বারা শুধু মুমিনই উপকার লাভ করে। নতুবা এই সৃষ্টিগত হেদায়াতের নূর যা সৃষ্টির সময় মানুষের অন্তরে রাখা হয়, তা বিশেষভাবে মুমিনের অন্তরেই রাখা হয় না; বরং প্রত্যেক মানুষের মজ্জায় ও স্বভাবে এই হেদায়াতের নূর রাখা হয়। এরই প্রতিক্রিয়া জগতের প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক ভূখণ্ড এবং প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীর মধ্যে পরিদৃষ্ট হয় যে, তারা আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও তাঁর মহান কুদরতের প্রতি সৃষ্টিগতভাবে বিশ্বাস রাখে এবং তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করে। তারা আল্লাহ্ তা'আলা সম্পর্কিত ধারণা ও ব্যাখ্যায় যত ভুলই করুক, কিন্তু আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রত্যেক মানুষ সৃষ্টিগতভাবেই বিশ্বাসী। তবে কিছুসংখ্যক বস্তুবাদীর কথা ভিন্ন। তাদের স্বভাবধর্মই বিকৃত হয়ে গেছে। ফলে তারা আল্লাহ্‌র অস্তিত্বই অস্বীকার করে। একটি সহীহ্ হাদীস থেকে এই ব্যাপক অর্থের সমর্থন পাওয়া যায়। এতে বলা হয়েছে, كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ অর্থাৎ "প্রত্যেকটি শিশু ফিত্‌রতের উপর জন্মগ্রহণ করে।"[বুখারীঃ ২৪৪, মুসলিমঃ ২৬৫৮] এরপর তার পিতামাতা তাকে ফিত্‌রতের দাবী থেকে সরিয়ে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করে। এই ফিত্‌রতের অর্থ ঈমানের হেদায়াত। ঈমানের হেদায়াত ও তার নূর প্রত্যেক মানুষকে সৃষ্টি করার সময় তার মধ্যে রাখা হয়। যখন নবী ও তাদের নায়েবদের মাধ্যমে তাদের কাছে ওহীর জ্ঞান পৌঁছে, তখন তারা সহজেই তা গ্রহণ করে নেয়। তবে স্বভাবধর্ম বিকৃত কতিপয় লোকের কথা ভিন্ন। তারা নিজেদের কুকর্মের দ্বারা সৃষ্টিগত নূরকে ধ্বংস করে দিয়েছে। সম্ভবতঃ এ কারণেই আয়াতের শুরুতে নূর দান করার কথাটি ব্যাপকাকারে বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে ভূমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অধিবাসীরা সবাই শামিল। এতে মুমিন ও কাফেরেরও প্রভেদ করা হয়নি। কিন্তু আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ﴿يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ﴾ অর্থাৎ "আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ইচ্ছা তাঁর নূরের দিকে পথ প্রদর্শন করেন"। এখানে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার শর্তটি সেই সৃষ্টিগত নূরের সাথে সম্পৃক্ত নয়, যা প্রত্যেক মানুষের মধ্যে রাখা হয়; বরং এর সম্পর্ক কুরআনের নূরের সাথে, যা প্রত্যেকের অর্জিত হয় না। যারা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাওফীক পায়, তারাই এই নূর লাভ করে। নতুবা আল্লাহ্‌র তৌফিক ছাড়া মানুষের চেষ্টাও অনর্থক; বরং মাঝে মাঝে ক্ষতিকরও হয়।

(তিন) এখানে نوره দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরের নূরকে বুঝানো হয়েছে। ইমাম বগভী বর্ণনা করেন যে, একবার ইবনে আব্বাস

كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَٰرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِىٓءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ۚ نُّورٌ عَلَىٰ نُورٍ ۗ يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِۦ مَن يَشَآءُ ۚ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَٰلَ لِلنَّاسِ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣٥﴾

দীপাধার যার মধ্যে আছে এক প্রদীপ, প্রদীপটি একটি কাঁচের আবরণের মধ্যে স্থাপিত, কাঁচের আবরণটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত, তা জ্বালানো হয় বরকতময় যায়তূন গাছের তৈল দ্বারা(১) যা শুধু পূর্ব দিকের (সূর্যের আলোকপ্রাপ্ত) নয় আবার শুধু পশ্চিম দিকের (সূর্যের আলোকপ্রাপ্তও) নয়, আগুন তাকে স্পর্শ না করলেও যেন তার তৈল উজ্জ্বল আলো দিচ্ছে; নূরের উপর নূর! আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছে হেদায়াত করেন তাঁর নূরের দিকে। আল্লাহ্ মানুষের জন্য উপমাসমূহ বর্ণনা করে থাকেন এবং আল্লাহ্ সব কিছু সম্পর্কে সর্বজ্ঞ।

রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কা‘ব আহ্বারকে জিজ্ঞেস করলেনঃ এই আয়াতের তাফসীরে আপনি কি বলেন? কা‘ব আহ্বার তাওরাত ও ইঞ্জিলের সুপণ্ডিত মুসলিম ছিলেন। তিনি বললেনঃ এটা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র অন্তরের দৃষ্টান্ত। মিশ্কাত তথা তাক মানে তার বক্ষদেশ, زُجَاجَةٍ তথা কাঁচপাত্র মানে তার পবিত্র অন্তর এবং مِصْبَاحٌ তথা প্রদীপ মানে নবুয়ত। এই নবুয়তরূপী নূরের বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রকাশিত ও ঘোষিত হওয়ার পূর্বেই এতে মানবমণ্ডলীর জন্য আলো ও ঔজ্জ্বল্য ছিল। এরপর ওহী ও ঘোষণা এর সাথে সংযুক্ত হলে এটা এমন নূরে পর্যবসিত হয়, যা সমগ্র বিশ্বকে আলোকোজ্জ্বল করে দেয়। [দেখুন-ইবন কাসীর,কুরতুবী,বাগভী]

(১) এতে প্রমাণিত হয় যে, যয়তূন ও যয়তূন বৃক্ষ কল্যাণময় ও উপকারী। আলেমগণ বলেনঃ আল্লাহ্ তা‘আলা এতে অগণিত উপকারিতা নিহিত রেখেছেন। একে প্রদীপে ব্যবহার করা হয়। এর আলো অন্যান্য তৈলের আলোর চাইতে অধিক স্বচ্ছ হয়। একে রুটির সাথে ব্যবহার করা হয়। এর ফলও ভক্ষিত হয়। এর তৈল সংগ্রহ করার জন্য কোন যন্ত্র অথবা মাড়াইকল ইত্যাদির প্রয়োজন হয় না- আপনাআপনিই ফল থেকে তৈল বের হয়ে আসে। [বাগভী] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ “যয়তূন তৈল খাও এবং শরীরে মালিশও কর। কেননা, এটা কল্যাণময় বৃক্ষ।” [তিরমিযীঃ ১৮৫১, ১৮৫২, ইবনে মাজাহ্ঃ ৩৩১৯]

৩৬. সে সব ঘরে[১] যাকে সমুন্নত করতে[২] এবং যাতে তাঁর নাম স্মরণ

فِىْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ

(১) পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের অন্তরে নিজের হেদায়াতের আলো রাখার একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন এবং শেষে বলেছেনঃ এই নূর দ্বারা সে-ই উপকার লাভ করে, যাকে আল্লাহ্ চান ও তাওফীক দেন। [ইবন কাসীর] আলোচ্য আয়াতে এমন মুমিনদের আবাসস্থল ও স্থান বর্ণনা করা হয়েছে যে, এরূপ মুমিনদের আসল আবাসস্থল, যেখানে তারা প্রায়ই বিশেষতঃ পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সময় দৃষ্টিগোচর হয়- সেসব গৃহ, যেগুলোকে উচ্চ রাখার জন্য এবং যেগুলোতে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা আদেশ করেছেন। এসব গৃহে সকাল-সন্ধ্যায় অর্থাৎ সর্বদা এমন লোকেরা আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করে, যাদের বিশেষ গুণাবলী পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হচ্ছে। অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে এসব গৃহ হচ্ছে মসজিদ। অধিকাংশ মুফাস্‌সিরগণ এ তাফসীরকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। [দেখুন-কুরতুবী,বাগভী]

(২) কোন কোন মুফাসসির এর অর্থ নিয়েছেন মু'মিনদের ঘর এবং সেগুলোকে উন্নত করার অর্থ সেগুলোকে নৈতিক দিক দিয়ে উন্নত করা, নৈতিক মান রক্ষার জন্য তাতে মসজিদের ব্যবস্থা করা। এ অর্থের সমর্থনে আমরা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে একটি হাদীস পাই যাতে তিনি বলেছেনঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বাসগৃহের মধ্যেও মসজিদ অর্থাৎ সালাত আদায় করার বিশেষ জায়গা তৈরী করার এবং তাকে পবিত্র রাখার জন্য আদেশ করেছেন। [ইবনে মাজাহ্‌ঃ ৭৫৮, ৭৫৯]

তবে অধিকাংশ মুফাসসির এ "ঘরগুলো"কে মসজিদ অর্থে গ্রহণ করেছেন এবং এগুলোকে উন্নত করার অর্থ নিয়েছেন এগুলো নির্মাণ ও এগুলোকে মর্যাদা প্রদান করা। "সেগুলোর মধ্যে নিজের নাম স্মরণ করতে আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন" এ শব্দগুলো বাহ্যত মসজিদ সংক্রান্ত ব্যাখ্যার বেশী সমর্থক দেখা যায়। তখন আয়াতের অর্থ হবে, আল্লাহ্ তা'আলা মসজিদসমূহকে সমুন্নত করার অনুমতি দিয়েছেন। অনুমতি দেয়ার মানে আদেশ করা এবং উচ্চ করা মানে সম্মান করা। উচ্চ করার দু'টি অর্থ করা হয়ে থাকে-

(১) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ উচ্চ করার অর্থ আল্লাহ্ তা'আলা মসজিদসমূহে অনর্থক কাজ ও কথাবার্তা বলতে নিষেধ করেছেন।
হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহ্ বলেনঃ رَفْعُ مَسَاجِدَ বলে মসজিদসমূহের সম্মান, ইয্‌যত ও সেগুলোকে নাপাকী ও নোংরা বস্তু থেকে পবিত্র রাখা বুঝানো হয়েছে। আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "মসজিদে থুথু ফেলা গোনাহ্ আর তার কাফ্‌ফারা হলো তা দাফন করা, মিটিয়ে দেয়া"। [বুখারীঃ ৪১৫, মুসলিমঃ ৫৫২]

(২) ইকরিমা ও মুজাহিদ বলেনঃ رفع বলে মসজিদ নির্মাণ বুঝানো হয়েছে; যেমন কা'বা

يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴿٣٦﴾

করতে আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন[১], সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে[২],

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ

৩৭. সেসব লোক[৩], যাদেরকে ব্যবসা-বানিজ্য

নির্মাণ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছেঃ ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ﴾ এখানে رفع قواعد বলে ভিত্তি নির্মাণ বুঝানো হয়েছে। উসমান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "যে আল্লাহ্র জন্য মসজিদ বানায়, আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানাবেন"। [বুখারীঃ ৪৫০, মুসলিমঃ ৫৩৩] প্রকৃত কথা এই যে, تُرْفَعَ শব্দের অর্থ মসজিদ নির্মাণ করা, পাক-পবিত্র রাখা এবং মসজিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ইত্যাদি সবই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। [দেখুন-তাবারী,ইবন কাসীর,কুরতুবী] এ কারণেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম রসুন ও পেঁয়াজ খেয়ে মুখ না ধুয়ে মসজিদে গমন করতে নিষেধ করেছেন। উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ "আমি দেখেছি, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ব্যক্তির মুখে রসুন বা পেঁয়াজের দুর্গন্ধ অনুভব করতেন, তাকে মসজিদ থেকে বের করে 'বাকী' নামক স্থানে পাঠিয়ে দিতেন এবং বলতেনঃ যে ব্যক্তি রসুন-পেঁয়াজ খেতে চায়, সে যেন উত্তম রূপে পাকিয়ে খায় যাতে দুর্গন্ধ নষ্ট হয়ে যায়।" [মুসলিমঃ ৫৬৭]

(১) আবু উমামাহ্ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "যে ব্যক্তি গৃহে অযু করে ফরয সালাত আদায়ের জন্য মসজিদের দিকে যায়, তার সওয়াব সেই ব্যক্তির সমান, যে ইহ্রাম বেঁধে গৃহ থেকে হজ্জের জন্য যায়। যে ব্যক্তি এশরাকের সালাত আদায়ের জন্য গৃহ থেকে অযু করে মসজিদের দিকে যায়, তার সওয়াব উমরাকারীর অনুরূপ। এক সালাতের পর অন্য সালাত ইল্লিয়্যীনে লিখিত হয় যদি উভয়ের মাঝখানে কোন অপ্রয়োজনীয় কাজ না করে।" [আবু দাউদঃ ৫৫৮] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেনঃ "যারা অন্ধকারে মসজিদে গমন করে, তাদেরকে কেয়ামতের দিন পরিপূর্ণ নূরের সুসংবাদ শুনিয়ে দাও।" [আবু দাউদঃ ৫৬১, তিরমিযীঃ ২২৩]

(২) আল্লাহ্র নাম স্মরণ করা দ্বারা এখানে তাসবীহ্ (পবিত্রতা বর্ণনা), তাহ্মীদ (প্রশংসা বর্ণনা), নফল সালাত, কুরআন তিলাওয়াত, ওয়াজ-নসীহত, দ্বীনী শিক্ষা ইত্যাদি সর্বপ্রকার যিক্র বুঝানো হয়েছে। [তাবারী,সা'দী,মুয়াস্সার]

(৩) এখানে رجال শব্দের মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, মসজিদে উপস্থিত হওয়ার বিধান আসলে পুরুষদের জন্য, নারীদের জন্য গৃহে সালাত আদায় করা উত্তম। [বাগভী,কুরতুবী] মুসনাদে আহমাদে উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "নারীদের উত্তম মসজিদ তাদের গৃহের সংকীর্ণ ও অন্ধকার প্রকোষ্ঠ"। [মুসনাদে আহমাদঃ ৬/২৯৭]

الصَّلٰوةِ وَإِيْتَآءِ الزَّكٰوةِ ۙ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٣٧﴾

ও ক্রয়-বিক্রয় কোনটিই আল্লাহ্‌র স্মরণ হতে এবং সালাত কায়েম ও যাকাত প্রদান হতে বিরত রাখে না, তারা ভয় করে সে দিনকে যেদিন অনেক অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ উল্টে যাবে।

لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۗ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٨﴾

৩৮. যাতে তারা যে উত্তম কাজ করে তার জন্য আল্লাহ্ তাদেরকে পুরস্কার দেন[(১)] এবং তিনি নিজ অনুগ্রহে তাদের প্রাপ্যের বেশী দেন। আর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছে অপরিমিত জীবিকা দান করেন।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍۭ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَآءً ۗ حَتّٰٓى إِذَا جَآءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا وَّوَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهٗ فَوَفّٰىهُ حِسَابَهٗ ۗ وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿٣٩﴾

৩৯. আর যারা কুফরী করে[(২)] তাদের আমলসমূহ মরুভূমির মরীচিকার মত, পিপাসা কাতর ব্যক্তি যাকে পানি মনে করে থাকে, কিন্তু যখন সে সেটার কাছে আসে তখন দেখে সেটা কিছুই নয় এবং সে পাবে সেখানে[(৩)]

(১) আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে তাদের কর্মের উৎকৃষ্টতম প্রতিদান দেবেন। অর্থাৎ শুধু কর্মের প্রতিদানই শেষ নয়; বরং আল্লাহ্ নিজ কৃপায় তাদেরকে বাড়তি নেয়ামতও দান করবেন। [মুয়াস্‌সার]

(২) অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর নবীগণ এবং সে সময় আল্লাহর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সত্যের শিক্ষা দিচ্ছিলেন সরল মনে তা মেনে নিতে অস্বীকার করে। [দেখুন-মুয়াস্‌সার]

(৩) কোন কোন মুফাসসির বলেন, এ আয়াতে 'সেখানে' বলে দুনিয়াই উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে।কারণ, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কাফেরদের কর্মকাণ্ডের যাবতীয় প্রতিফল দুনিয়াতেই দিয়ে দেয়া হবে। যেমনিভাবে অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, "যে কেউ পার্থিব জীবন ও তার শোভা কামনা করে, দুনিয়াতে আমি ওদের কাজের পূর্ণ ফল দান করি এবং সেখানে তাদেরকে কম দেয়া হবে না। ওদের জন্য আখিরাতে আগুন ছাড়া অন্য কিছুই নেই এবং ওরা যা করে আখিরাতে তা নিষ্ফল হবে এবং ওরা যা করে থাকে তা নিরর্থক।" [সূরা হুদ: ১৫-১৬] অন্যত্র এসেছে, "যে কেউ আখিরাতের ফসল কামনা করে তার জন্য আমি তার ফসল বাড়িয়ে দেই এবং যে কেউ দুনিয়ার ফসল কামনা করে আমি তাকে তা থেকে কিছু দেই, আখিরাতে তার জন্য কিছুই

আল্লাহ্‌কে, অতঃপর তিনি তাকে তার হিসাব পূর্ণমাত্রায় দেবেন। আর আল্লাহ্ দ্রুত হিসেব গ্রহণকারী।

৪০. অথবা তাদের কাজ গভীর সাগরের তলের অন্ধকারের মত, যাকে আচ্ছন্ন করে তরংগের উপর তরঙ্গ, যার ঊর্ধ্বে মেঘপুঞ্জ, অন্ধকারপুঞ্জ স্তরের উপর স্তর, এমনকি সে হাত বের করলে তা আদৌ দেখতে পাবে না। আর আল্লাহ্ যার জন্য নূর রাখেননি তার জন্য কোন নূরই নেই।

أَوْ كَظُلُمَٰتٍ فِى بَحْرٍ لُّجِّىٍّ يَغْشَىٰهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِۦ مَوْجٌ
مِّن فَوْقِهِۦ سَحَابٌ ۚ ظُلُمَٰتٌۢ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ
إِذَآ أَخْرَجَ يَدَهُۥ لَمْ يَكَدْ يَرَىٰهَا ۗ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ ٱللَّهُ
لَهُۥ نُورًا فَمَا لَهُۥ مِن نُّورٍ ﴿٤٠﴾

ষষ্ঠ রুকূ’

৪১. আপনি কি দেখেন না যে, আসমানসমূহ ও যমীনে যারা আছে তারা এবং সারিবদ্ধভাবে উড্ডীয়মান পাখীরা আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে? প্রত্যেকেই জানে তার ‘ইবাদাতের ও পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি। আর তারা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ্ সম্যক অবগত[১]।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُۥ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ
وَٱلطَّيْرُ صَٰٓفَّٰتٍ ۖ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُۥ وَتَسْبِيحَهُۥ ۗ
وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٤١﴾

থাকবে না।” [সূরা আশ-শূরা: ২০] তবে অধিকাংশ আলেমদের নিকট এ আয়াতে ‘সেখানে’ বলে আখেরাতে মহান আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিতির কথা বুঝানো হয়েছে। সেখানে তারা দুনিয়াতে যা করেছে সেটার প্রতিফল যদি প্রাপ্য হতো তবে তা দেয়া হতো। কিন্তু যেহেতু তাদের কৃত যাবতীয় কর্ম বিনষ্ট হয়েছে সেহেতু তারা সেখানে কিছুই পাবে না। যেমন, অন্য আয়াতে বলা হয়েছে: “আর আমরা তাদের কৃতকর্মের প্রতি লক্ষ্য করব, তারপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধুলিকণায় পরিণত করব।” [সূরা আল-ফুরকান:২৩]

(১) আয়াতের শুরুতে বলা হয়েছে যে, নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী প্রত্যেক সৃষ্টবস্তু আল্লাহ্ তা‘আলার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণায় মশগুল। এই পবিত্রতা ঘোষণার অর্থ কোন কোন মুফাস্‌সিরের মতে এই যে, আল্লাহ্ তা‘আলা পৃথিবীর প্রত্যেক বস্তু আসমান, যমীন, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, উপাদান চতুষ্টয় অগ্নি, পানি,

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ﴿٤٢﴾

৪২. আর আসমানসমূহ ও যমীনের সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌রই এবং আল্লাহ্‌রই দিকে ফিরে যাওয়া[১]।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُزْجِيْ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهٗ ثُمَّ يَجْعَلُهٗ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ۚ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ جِبَالٍ فِيْهَا مِنْۢ بَرَدٍ فَيُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ وَيَصْرِفُهٗ عَنْ مَّنْ يَّشَآءُ ۗ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهٖ يَذْهَبُ بِالْاَبْصَارِ ﴿٤٣﴾

৪৩. আপনি কি দেখেন না, আল্লাহ্ সঞ্চালিত করেন মেঘমালাকে, তারপর তিনি তা একত্র করেন এবং পরে পুঞ্জীভূত করেন, অতঃপর আপনি দেখতে পান, তার মধ্য থেকে নির্গত হয় বারিধারা; আর তিনি আকাশে অবস্থিত মেঘের পাহাড়ের মধ্যস্থিত শিলাস্তূপ থেকে বর্ষণ করেন শিলা অতঃপর এটা দ্বারা তিনি যাকে ইচ্ছে আঘাত করেন এবং যাকে ইচ্ছে তার উপর থেকে এটাকে অন্য দিকে ফিরিয়ে দেন। মেঘের বিদ্যুৎ ঝলক যেন দৃষ্টিশক্তি প্রায়

মাটি, বাতাস সবাইকে বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং যাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন, সে সর্বক্ষণ সে কাজে ব্যাপৃত আছে এর চুল পরিমাণও বিরোধিতা করে না। এই আনুগত্যকেই তাদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা বলা হয়েছে।

কোন কোন তাফসীরবিদ বলেনঃ এটা অবান্তর নয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে এতটুকু বোধশক্তি ও চেতনা নিহিত রেখেছেন, যদ্বারা সে তার স্রষ্টা ও প্রভুর পরিচয় জানতে পারে এবং এটাও অবাস্তব নয় যে, তাদেরকে বিশেষ প্রকার বাকশক্তি দান করা হয়েছে ও বিশেষ প্রকার তাসবীহ্ এবং ইবাদাত শেখানো হয়েছে; যাতে তারা মশগুল থাকে। ﴿كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهٗ﴾ এই শেষ বাক্যে এ বিষয়বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলার তাসবীহ্ ও সালাতে সমগ্র সৃষ্টজগতই ব্যাপৃত আছে, কিন্তু প্রত্যেকের সালাত ও তাসবীহ্‌র পদ্ধতি ও আকার বিভিন্নরূপ। ফিরিশ্‌তাদের পদ্ধতি ভিন্ন, মানুষের পদ্ধতি ভিন্ন এবং উদ্ভিদরা অন্য পদ্ধতিতে সালাত ও তাসবীহ্ আদায় করে। জড় পদার্থের পদ্ধতিও ভিন্নরূপ। [দেখুন-তাবারী, কুরতুবী, সা'দী, ফাতহুল কাদীর]

(১) সবকিছুই তাঁর মালিকানাভুক্ত। তারা ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় তাঁর কাছেই ফিরে যাবে। তাদের মধ্যে যারা সেথায় তাসবীহ পাঠ করেছে তারা হবে পুরস্কৃত। আর যারা করেনি তারা হবে তিরস্কৃত। [দেখুন-তাবারী, মুয়াস্‌সার]

কেড়ে নেয়[১]।

৪৪. আর আল্লাহ্ রাত ও দিনের আবর্তন ঘটান[২], নিশ্চয় এতে শিক্ষা রয়েছে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্নদের জন্য[৩]।

يُقَلِّبُ اللَّهُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿٤٤﴾

৪৫. আর আল্লাহ্ সমস্ত জীব সৃষ্টি করেছেন পানি থেকে[৪], অতঃপর তাদের কিছু সংখ্যক পেটে ভর দিয়ে চলে, কিছু সংখ্যক দু'পায়ে চলে এবং কিছু সংখ্যক চলে চার পায়ে। আল্লাহ্ যা ইচ্ছে সৃষ্টি করেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٥﴾

৪৬. অবশ্যই আমরা সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ নাযিল করেছি, আর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছে সরল সঠিক পথে পরিচালিত করেন।

لَّقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٤٦﴾

৪৭. আর তারা বলে, 'আমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনলাম এবং আমরা আনুগত্য করেছি।' এর পর

وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ

(১) অর্থাৎ যিনি এ মেঘমালা সৃষ্টি করেছেন এবং এটাকে তিনি তার মুখাপেক্ষী বান্দাদের জন্য হাঁকিয়ে নিয়ে গেছেন, আর এমনভাবে সেটাকে নাযিল করেছেন যে এর দ্বারা উপকার অর্জিত হয়েছে, ক্ষতি থেকে বাঁচা সম্ভব হয়েছে, তিনি কি পূর্ণ শক্তিমান, ইচ্ছা বাস্তবায়নকারী, প্রশস্ত রহমতের অধিকারী নন? [সা'দী]

(২) অর্থাৎ তিনি ঠাণ্ডা থেকে গরম, আবার গরম থেকে ঠাণ্ডা, দিন থেকে রাত আবার রাত থেকে দিন তিনিই পরিবর্তন করেন। অনুরূপভাবে তিনিই বান্দাদের মধ্যে দিনগুলো ঘুরিয়ে আনেন। [সা'দী]

(৩) যারা সত্যিকার বান্দা, বুদ্ধি ও বিবেকবান, তারা এগুলোর প্রতি দৃষ্টি দিয়ে এগুলো কেন সৃষ্টি করা হয়েছে সেটা সহজেই বুঝতে পারে। কিন্তু তারা ব্যতিক্রম, যারা পশুদের মত এগুলোর দিকে তাকায়। [সা'দী]

(৪) সুতরাং যেগুলো জন্তু সেগুলো বীর্য থেকে সৃষ্টি হয়। যা পুরুষ জন্তু মাদী জন্তুর উপর ফেলে। আর যেগুলো যমীনে তৈরী হয়, সেগুলোও আদ্র যমীন ছাড়া তৈরী হয় না। যেমন, কীট-পতঙ্গ। সুতরাং কোন কিছুই পানি ব্যতীত সৃষ্টি হয় না। [সা'দী]

بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾

তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়; আসলে তারা মুমিন নয়।

وَإِذَا دُعُوٓا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ ﴿٤٨﴾

৪৮. আর যখন তাদেরকে ডাকা হয় আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দিকে, তাদের মধ্যে বিচার-ফয়সালা করে দেয়ার জন্য, তখন তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়।

وَإِن يَكُن لَّهُمُ ٱلْحَقُّ يَأْتُوٓا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿٤٩﴾

৪৯. আর যদি হক্ক তাদের সপক্ষে হয়, তাহলে তারা বিনীতভাবে রাসূলের কাছে ছুটে আসে।

أَفِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ٱرْتَابُوٓا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُۥ ۚ بَلْ أُولَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٥٠﴾

৫০. তাদের অন্তরে কি রোগ আছে, না তারা সংশয় পোষণ করে? না তারা ভয় করে যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল তাদের প্রতি যুলুম করবেন? বরং তারাই তো যালিম।

সপ্তম রুকূ'

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُولَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٥١﴾

৫১. মুমিনদের উক্তি তো এই---যখন তাদের মধ্যে বিচার-ফয়সালা করে দেয়ার জন্য আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের দিকে ডাকা হয়, তখন তারা বলে, 'আমরা শুনলাম এবং আনুগত্য করলাম।' আর তারাই সফলকাম।

وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ ﴿٥٢﴾

৫২. আর যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহ্‌কে ভয় করে ও তাঁর তাকওয়া অবলম্বন করে, তাহলে তারাই কৃতকার্য[১]।

---

(১) এই আয়াতে চারটি বিষয় বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি এই চারটি বিষয় যথাযথ পালন করে, সে-ই দুনিয়া ও আখেরাতে সফলকাম। [দেখুন-তাবারী,ইবন কাসীর,ফাতহুল কাদীর] কোন কোন তাফসীর গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে উমার রাদিয়াল্লাহু

৫৩. আর তারা দৃঢ়ভাবে আল্লাহ্‌র শপথ করে বলে যে, আপনি তাদেরকে আদেশ করলে তারা অবশ্যই বের হবে; আপনি বলুন, 'শপথ করো না, আনুগত্যের ব্যাপারটি জানাই আছে। তোমরা যা কর নিশ্চয় আল্লাহ্ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।'

وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ اَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ ؕ قُلْ لَّا تُقْسِمُوْا ۚ طَاعَةٌ مَّعْرُوْفَةٌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٥٣﴾

৫৪. বলুন, 'তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর।' তারপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তার উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তিনিই দায়ী এবং তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তোমরাই দায়ী;

قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ ؕ وَاِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا ؕ وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿٥٤﴾

'আনহুর একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। এতে এই চারটি বিষয়ের ব্যাখ্যা ও পারস্পরিক পার্থক্য ফুটে উঠে। ফারূকে আযম একদিন মসজিদুন্ নববীতে দণ্ডায়মান ছিলেন। হঠাৎ, জনৈক রূমী গ্রাম্য ব্যক্তি তার কাছে এসে বলতে লাগলোঃ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু জিজ্ঞেস করলেনঃ ব্যাপার কি? সে বললোঃ আমি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে মুসলিম হয়ে গেছি। উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু জিজ্ঞেস করলেনঃ এর কোন কারণ আছে কি? সে বললোঃ হ্যাঁ, আমি তাওরাত, ইঞ্জীল, যবূর ও পূর্ববর্তী নবীগণের অনেক গ্রন্থ পাঠ করেছি। কিন্তু সম্প্রতি জনৈক মুসলিম কয়েদীর মুখে একটি আয়াত শুনে জানতে পারলাম যে, এই ছোট্ট আয়াতটির মধ্যে সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থের বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত রয়েছে। এতে আমার মনের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই আগত। উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু জিজ্ঞেস করলেনঃ আয়াতটি কি? রূমী ব্যক্তি উল্লেখিত আয়াতটিই তিলাওয়াত করলো এবং সাথে সাথে তার অভিনব তাফসীরও বর্ণনা করলো যে, ﴿وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ﴾ আল্লাহ্‌র ফরয কার্যাদির সাথে, ﴿وَرَسُوْلَهٗ﴾ রাসূলের সুন্নাতের সাথে, ﴿وَيَخْشَ اللّٰهَ﴾ অতীত জীবনের সাথে এবং ﴿وَيَتَّقْهِ﴾ ভবিষ্যত জীবনের সাথে সম্পর্ক রাখে। মানুষ যখন এই চারটি বিষয় পালন করবে, তখন তাকে ﴿فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ﴾ এর সুসংবাদ দেয়া হবে। فائز তথা সফলকাম সে ব্যক্তি, যে জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাতে স্থান পায়। উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু একথা শুনে বললেনঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথায় এর সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বলেছেনঃ "আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে সুদূরপ্রসারী স্বল্পবাক্যসম্পন্ন অথচ ব্যাপক অর্থবোধক বাক্যাবলী দান করেছেন।" [বুখারীঃ ২৮১৫, মুসলিমঃ ৫২৩]

আর তোমরা তার আনুগত্য করলে সৎপথ পাবে, মূলতঃ রাসূলের দায়িত্ব শুধু স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া ।

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۪ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ؕ يَعْبُدُوْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْـًٔا ؕ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٥٥﴾

৫৫. তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে আল্লাহ্ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে যমীনে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দ্বীনকে যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়ভীতির পরে তাদেরকে নিরাপত্তা দান করবেন । তারা আমার 'ইবাদাত করবে, আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না[১], আর এরপর যারা

(১) উবাই ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সাথীরা যখন মদীনায় তাশরীফ আনলেন এবং আনসারগণ তাদেরকে আশ্রয় দিলেন, তখন সমস্ত আরব এক বাক্যে তাদের শত্রুতে পরিণত হলো । সাহাবাগণ তখন রাতদিন অস্ত্র নিয়ে থাকতেন । তখন তারা বললোঃ আমরা কি কখনো এমনভাবে বাঁচতে পারবো যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে ভয় না করে সন্তুষ্ট চিত্তে ঘুমাতে পারবো? তখন এ আয়াত নাযিল হয় ।" [ত্বাবারানী, মুজামুল আওসাত্বঃ ৭/১১৯, হাদীসঃ ৭০২৯, হাকীম- মুস্তাদরাকঃ ২/৪০১, দ্বিয়া আল-মাকদেসীঃ মুখতারাহ্ঃ ১১৪৫]

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনটি বিষয়ের ওয়াদা দিয়েছেন । (১) আপনার উম্মাতকে যমীনের বুকে খলীফা ও শাসনকর্তা করা হবে, (২) আল্লাহ্‌র মনোনীত দ্বীন ইসলামকে প্রবল করা হবে এবং (৩) মুসলিমদেরকে এমন শক্তি ও শৌর্যবীর্য দান করা হবে যে, তাদের অন্তরে শত্রুর কোন ভয়ভীতি থাকবে না । আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর এই ওয়াদা পূর্ণ করেছেন । স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূণ্যময় আমলে মক্কা, খাইবার, বাহ্‌রাইন, সমগ্র আরব উপদ্বীপ ও সমগ্র ইয়ামান তারই হাতে বিজিত হয় এবং তিনি হিজরের অগ্নিপূজারী ও শাম দেশের কতিপয় অঞ্চল থেকে জিযিয়া কর

কুফরী করবে তারাই ফাসিক।

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝٥٦

৫৬. আর তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং রাসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমাদের উপর রহমত করা যায়।

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ ۚ وَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ۗ وَلَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝٥٧

৫৭. যারা কুফরী করেছে তাদের ব্যাপারে আপনি কক্ষনো এটা মনে করবেন না যে, তারা যমীনে অপারগকারী[১]।

আদায় করেন। রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস মিসর ও আলেকজান্দ্রিয়ার সম্রাট মুকাউকিস, আম্মান ও আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাসী প্রমুখ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপঢৌকন প্রেরণ করেন ও তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। তার ওফাতের পর আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু খলীফা হন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত মাথাচাড়া দিয়ে উঠে, তিনি তা খতম করেন এবং পারস্য, সিরিয়া ও মিসর অভিমুখে সৈন্যাভিযান প্রেরণ করেন। বসরা ও দামেস্ক তারই আমলে বিজিত হয় এবং অন্যান্য দেশেরও কতক অংশ করতলগত হয়। আবু বকর সিদ্দীকের ওফাতের সময় নিকটবর্তী হলে আল্লাহ্ তা'আলা তার অন্তরে উমার ইবনুল খাত্তাবকে পরবর্তী খলীফা নিযুক্ত করার ইলহাম করেন। উমার ইবনুল খাত্তাব খলীফা নিযুক্ত হয়ে শাসনব্যবস্থা এমনভাবে সুবিন্যস্ত করলেন যে, নবীগণের পর পৃথিবী এমন সুন্দর ও সুশৃংখল শাসন ব্যবস্থা আর প্রত্যক্ষ করেনি। তার আমলে সিরিয়া পুরোপুরি বিজিত হয়। এমনিভাবে মিসর ও পারস্যের অধিকাংশ এলাকা তার করতলগত হয়। তার হাতে কায়সার ও কিসরা সমূলে নিশ্চিহ্ন হয়। এরপর উসমান ইবন্ আফফান রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর খেলাফতকালে ইসলামী বিজয়ের পরিধি পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। পাশ্চাত্য দেশসমূহ, আন্দালুস ও সাইপ্রাস পর্যন্ত, দূরপ্রাচ্য চীন ভূখণ্ড পর্যন্ত এবং ইরাক, খোরাসান ও আহওয়ায ইত্যাদি সব তার আমলেই মুসলিমদের অধিকারভুক্ত হয়। [দেখুন-কুরতুবী] সহীহ্ হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "আমাকে সমগ্র ভূখণ্ডের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত একত্রিত করে দেখানো হয়েছে।" [সহীহ্ মুসলিমঃ ২৮৮৯] আল্লাহ্ তা'আলা এই প্রতিশ্রুতি উসমান ইবন্ আফফান রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর আমলেই পূর্ণ করে দেন। অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছেঃ "খেলাফত আমার পরে ত্রিশ বছর থাকবে।" [আবু দাউদঃ ৪৬৪৬, তিরমিযীঃ ২২২৬, আহমাদঃ ৫/২২১]

(১) এর অর্থ হচ্ছে, তারা আমার কাছ থেকে হারিয়ে যাবে। বা তারা আমার পাকড়াও থেকে বেঁচে যাবে। [ফাতহুল কাদীর]

তাদের আশ্রয়স্থল হচ্ছে আগুন; আর কত নিকৃষ্ট এ প্রত্যাবর্তনস্থল!

অষ্টম রুকূ’

৫৮. হে মুমিনগণ! তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীরা এবং তোমাদের মধ্যে যারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়নি তারা যেন তোমাদের কক্ষে প্রবেশ করতে তিন সময়ে অনুমতি গ্রহণ করে, ফজরের সালাতের আগে, দুপুরে যখন তোমরা তোমাদের পোষাক খুলে রাখ তখন এবং ‘ইশার সালাতের পর; এ তিন সময় তোমাদের গোপনীয়তার সময়। এ তিন সময় ছাড়া (অন্য সময় বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করলে) তোমাদের এবং তাদের কোন দোষ নেই[১]। তোমাদের এককে অন্যের কাছে তো যেতেই হয়। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِيَسْتَـْٔذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا۟ ٱلْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَٰثَ مَرَّٰتٍ ۚ مِّن قَبْلِ صَلَوٰةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنۢ بَعْدِ صَلَوٰةِ ٱلْعِشَآءِ ۚ ثَلَٰثُ عَوْرَٰتٍ لَّكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌۢ بَعْدَهُنَّ ۚ طَوَّٰفُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٨﴾

(১) এ আয়াতে বিশেষ তিনটি সময়ে অনুমতি চাওয়ার বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। এই তিনটি সময় হচ্ছে ফযরের সালাতের পূর্বে, দুপুরের বিশ্রাম গ্রহণের সময় এবং এশার সালাতের পরবর্তী সময়। এই তিন সময়ে মাহ্‌রাম, আত্মীয়স্বজন এমনকি বুদ্ধিসম্পন্ন অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-বালিকা এবং দাসদাসীদেরকেও আদেশ করা হয়েছে, তারা যেন কারো নির্জন কক্ষে অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ না করে। কেননা, এসব সময়ে মানুষ স্বাধীন ও খোলাখুলি থাকতে চায়, অতিরিক্ত বস্ত্রও খুলে ফেলে এবং মাঝে মাঝে স্ত্রীর সাথে খোলাখুলি মেলামেশায় মশগুল থাকে। এসব সময় কোন বুদ্ধিমান বালক অথবা গৃহের কোন নারী অথবা নিজ সন্তানদের মধ্য থেকে কেউ অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ করলে প্রায়ই লজ্জার সম্মুখীন হতে হয় ও অত্যন্ত কষ্ট বোধ হয়, কমপক্ষে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির খোলাখুলিভাবে থাকা ও বিশ্রামে বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়া তো বলাই বাহুল্য। তাই আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদের জন্য বিশেষ অনুমতি চাওয়ার বিধানাবলী বর্ণিত হয়েছে। এসব বিধানের পর একথাও বলা হয়েছে যে, ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌۢ بَعْدَهُنَّ﴾ অর্থাৎ এসব সময় ছাড়া একে অপরের কাছে অনুমতি ব্যতীত যাতায়াত করায় কোন দোষ নেই। [কুরতুবী]

বিবৃত করেন। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾

৫৯. আর তোমাদের সন্তান-সন্ততি বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তারাও যেন অনুমতি প্রার্থনা করে যেমন অনুমতি প্রার্থনা করে থাকে তাদের বড়রা। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ বিবৃত করেন। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ۖ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾

৬০. আর বৃদ্ধা নারীরা, যারা বিয়ের আশা রাখে না, তাদের জন্য অপরাধ নেই, যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে তাদের বহির্বাস খুলে রাখে। আর এ থেকে তাদের বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম[১]। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

---

(১) এখানে একটি নারীর ব্যক্তিগত অবস্থার দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি নীতি বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ যে বৃদ্ধা নারীর প্রতি কেউ আকর্ষণ বোধ করে না এবং সে বিবাহেরও যোগ্য নয়, তার জন্য পর্দার বিধান শিথিল করা হয়েছে। অনাত্মীয় ব্যক্তিও তার পক্ষে মাহ্রামের ন্যায় হয়ে যায়। মাহ্রামদের কাছে যেসব অঙ্গ আবৃত করা জরুরী নয়, এই বৃদ্ধা নারীর জন্য বেগানা পুরুষদের কাছেও সেগুলো আবৃত রাখা জরুরী নয়। এরূপ বৃদ্ধা নারীর জন্য বলা হয়েছে যেসব অঙ্গ মাহ্রামের সামনে খোলা যায়- যে মাহ্রাম নয় এরূপ ব্যক্তির সামনেও সেগুলো খুলতে পারবে, কিন্তু শর্ত হচ্ছে যদি সাজসজ্জা না করে। পরিশেষে আরো বলা হয়েছে ﴿وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ۗ﴾ অর্থাৎ সে যদি মাহ্রাম নয় এরূপ ব্যক্তিদের সামনে আসতে পুরোপুরি বিরত থাকে, তবে তা তার জন্য উত্তম। কাজেই আয়াতের অর্থ হচ্ছে, চাদর নামিয়ে নেবার এ অনুমতি এমন সব বৃদ্ধাদেরকে দেয়া হচ্ছে যাদের সাজসজ্জা করার ইচ্ছা ও শখ খতম হয়ে গেছে এবং যাদের যৌন আবেগ শীতল হয়ে গেছে। কিন্তু যদি এ আগুনের মধ্যে এখনো একটি স্ফুলিংগ সজীব থেকে থাকে এবং তা সৌন্দর্যের প্রদর্শনীর রূপ অবলম্বন করতে থাকে তাহলে আর এ অনুমতি থেকে লাভবান হওয়া যেতে পারে না। [দেখুন- মুয়াস্সার,সা'দী]

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ وَّلَا عَلٰٓى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوْا مِنْۢ بُيُوْتِكُمْ أَوْ بُيُوْتِ اٰبَآئِكُمْ أَوْ بُيُوْتِ أُمَّهٰتِكُمْ أَوْ بُيُوْتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوْتِ أَخَوٰتِكُمْ أَوْ بُيُوْتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوْتِ عَمّٰتِكُمْ أَوْ بُيُوْتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوْتِ خٰلٰتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَّفَاتِحَهٗٓ أَوْ صَدِيْقِكُمْ ۗ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوْا جَمِيْعًا أَوْ أَشْتَاتًا ۗ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا فَسَلِّمُوْا عَلٰٓى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبٰرَكَةً طَيِّبَةً ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٦١﴾

৬১. অন্ধের জন্য দোষ নেই, খঞ্জের জন্য দোষ নেই, রুগ্নের জন্য দোষ নেই এবং তোমাদের নিজেদের জন্যও দোষ নেই খাওয়া-দাওয়া করা তোমাদের ঘরে অথবা তোমাদের পিতাদের ঘরে, মাতাদের ঘরে, ভাইদের ঘরে, বোনদের ঘরে, চাচা-জেঠাদের ঘরে, ফুফুদের ঘরে, মামাদের ঘরে, খালাদের ঘরে অথবা সেসব ঘরে যেগুলোর চাবির মালিক তোমরা অথবা তোমাদের বন্ধুদের ঘরে। তোমরা একত্রে খাও বা পৃথক পৃথকভাবে খাও তাতে তোমাদের জন্য কোন অপরাধ নেই। তবে যখন তোমরা কোন ঘরে প্রবেশ করবে তখন তোমরা পরস্পরের প্রতি সালাম করবে অভিবাদনস্বরূপ যা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে কল্যাণময় ও পবিত্র। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার।

নবম রুকূ’

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَإِذَا كَانُوْا مَعَهٗ عَلٰٓى أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوْا حَتّٰى يَسْتَأْذِنُوْهُ ۗ إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَأْذِنُوْنَكَ أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوْكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِّمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّٰهَ ۗ إِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٦٢﴾

৬২. মুমিন তো তারাই যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনে এবং রাসূলের সঙ্গে সমষ্টিগত ব্যাপারে একত্র হলে তারা অনুমতি ছাড়া সরে পড়ে না; নিশ্চয় যারা আপনার অনুমতি প্রার্থনা করে তারাই আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের উপর ঈমান রাখে। অতএব তারা তাদের কোন কাজের জন্য আপনার অনুমতি চাইলে তাদের

মধ্যে যাদেরকে ইচ্ছে আপনি অনুমতি দেবেন এবং তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ۚ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا ۚ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾

৬৩. তোমরা রাসূলের আহ্বানকে তোমাদের একে অপরের আহ্বানের মত গণ্য করো না; তোমাদের মধ্যে যারা একে অপরকে আড়াল করে অলক্ষ্যে সরে পড়ে আল্লাহ্ তো তাদেরকে জানেন[১]। কাজেই যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদের উপর আপতিত হবে অথবা আপতিত হবে তাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি[২]।

(১) আয়াতের অর্থ নির্ধারনে বেশ কয়েকটি মত এসেছে, (এক) ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ﴾ এর অর্থ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরফ থেকে মুসলিমদেরকে ডাকা। (ব্যাকরণগত কায়দার দিক দিয়ে এটা إضافة إلى الفاعل) আয়াতের অর্থ এই যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ডাকেন, তখন একে সাধারণ মানুষের ডাকার মত মনে করো না যে, সাড়া দেয়া না দেয়া ইচ্ছাধীন; বরং তখন সাড়া দেয়া ফরয হয়ে যায় এবং অনুমতি ছাড়া চলে যাওয়া হারাম হয়ে যায়। আয়াতের বর্ণনাধারার সাথে এই তাফসীর অধিক নিকটবর্তী ও মিলে যায়। (দুই) আয়াতের অপর একটি তাফসীর ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে ইবনে কাসীর, কুরতুবী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, ﴿دُعَاءَ الرَّسُولِ﴾ এর অর্থ মানুষের তরফ থেকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোন কাজের জন্য ডাকা। (ব্যাকরণগত কায়দার দিক দিয়ে এটা إضافة إلى المفعول)। এই তাফসীরের ভিত্তিতে আয়াতের অর্থ এই যে, যখন তোমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোন প্রয়োজনে আহ্বান কর অথবা সম্বোধন কর, তখন সাধারণ লোকের ন্যায় তার নাম নিয়ে 'ইয়া মুহাম্মাদ' (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলবে না- এটা বেআদবী; বরং সম্মানসূচক উপাধি দ্বারা 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্' অথবা 'ইয়া নবীআল্লাহ্' বলবে। [বাগভী]

(২) অর্থাৎ যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রদর্শিত পথের বিরোধিতা করে, তার প্রবর্তিত শরীয়ত ও আইন অনুসারে জীবন পরিচালনা করে না, তার সুন্নাতের বিরোধিতা করে, তারা যেন তাদের অন্তরে কুফরী, নিফাকী, বিদ'আত ইত্যাদি লালন

৬৪. জেনে রাখ, আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে তা আল্লাহ্‌রই; তোমরা যাতে ব্যাপৃত তিনি তা অবশ্যই জানেন। আর যেদিন তাদেরকে তাঁর কাছে ফিরিয়ে নেয়া হবে, সেদিন তিনি তাদেরকে জানিয়ে দেবেন তারা যা করত। আর আল্লাহ্ সবকিছু সম্পর্কে সর্বজ্ঞ।

أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ قَدْ يَعْلَمُ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا۟ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۢ ﴿٦٤﴾

করে অথবা তারা তাতে নিপতিত হওয়ার আশংকা করে। আরো আশংকা করে যে, তাদের উপর কঠোর শাস্তি আসবে। হত্যা, দণ্ডবিধি, জেল ইত্যাদি দুনিয়াতে এবং আখেরাতেও তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করবে যা আমার প্রদর্শিত পথের উপর নয়, তা তার উপরই ফিরিয়ে দেয়া হবে, গ্রহণযোগ্য হবে না।” [বুখারীঃ ২৬৯৭, মুসলিমঃ ১৭১৮]

অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “আমার এবং তোমাদের মাঝে উদাহরণ হলো এমন এক ব্যক্তির, যে আগুন জ্বালালো, তারপর সে আলোয় যখন চতুর্দিক আলোকিত হলো, তখন দেখা গেল যে, পোকামাকড় এবং ঐসমস্ত প্রাণী যা আগুনে পড়ে, সেগুলো আগুনে পড়তে লাগলো। তখন সে ব্যক্তি তাদেরকে আগুন থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাইলো। কিন্তু সেগুলো তাকে ছাড়িয়ে সে আগুনে ঝাঁপ দিতে থাকলো। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ এটাই হলো আমার এবং তোমাদের উদাহরণ। আমি তোমাদের কোমরের কাপড়ের গিরা ধরে আগুন থেকে দূরে রাখছি এবং বলছিঃ আগুন থেকে দূরে থাক। কিন্তু তোমরা আমাকে ছাড়িয়ে ছুটে গিয়ে আগুনে ঝাঁপ দিচ্ছ।” [বুখারীঃ ৬৪৮৩, মুসলিমঃ ২২৮৪]

২৫- সূরা আল-ফুরকান, ৭৭ আয়াত, মক্কী

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

১. কত বরকতময় তিনি[১]! যিনি তাঁর বান্দার উপর ফুরকান নাযিল করেছেন, সৃষ্টিজগতের জন্য[২] সতর্ককারী

تَبٰرَكَ الَّذِیۡ نَزَّلَ الۡفُرۡقَانَ عَلٰی عَبۡدِهٖ لِیَكُوۡنَ لِلۡعٰلَمِیۡنَ نَذِیۡرَا ۙ﴿۱﴾

(১) تَبَارَكَ শব্দটি بركة থেকে উদ্ভুত। এর পূর্ণ অর্থ এক শব্দে তো দূরের কথা এক বাক্যে বর্ণনা করাও কঠিন। এর শব্দমূল রয়েছে ب-ر-ك অক্ষরত্রয়। এ থেকে بركة ও بروك দু'টি ধাতু নিষ্পন্ন হয়। তন্মধ্যে প্রথম শব্দ بركة শব্দের মধ্যে রয়েছে কল্যাণ, বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি, বিপুলতা ও প্রাচুর্যের ধারণা। আর بروك এর মধ্যে স্থায়িত্ব, দৃঢ়তা, অটলতা ও অনিবার্যতার ধারণা রয়েছে। তারপর এ ধাতু থেকে যখন تبارك এর ক্রিয়াপদ তৈরী করা হয় তখন تفاعل এর বৈশিষ্ট্য হিসেবে এর মধ্যে বাড়াবাড়ি, অতিরঞ্জন ও পূর্ণতা প্রকাশের অর্থ শামিল হয়ে যায়। এ অবস্থায় এর অর্থ দাঁড়ায় চরম প্রাচুর্য, বর্ধমান প্রাচুর্য ও চূড়ান্ত পর্যায়ের স্থায়িত্ব। আল্লাহর জন্য تبارك শব্দটি এক অর্থে নয় বরং বহু অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন- একঃ মহা অনুগ্রহকারী ও সর্বজ্ঞ, কল্যাণকারী। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ প্রত্যেক কল্যাণ ও বরকত আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে। তিনি নিজের বান্দাকে ফুরকানের মহান নিয়ামত দান করে সারা দুনিয়াকে জানিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছেন। দুইঃ বড়ই মর্যাদাশালী ও সম্মানীয়। কারণ, পৃথিবী ও আকাশে তাঁরই রাজত্ব চলছে। তিনঃ বড়ই পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন। কারণ, তাঁর সত্তা সকল প্রকার শির্কের গন্ধমুক্ত। তাঁর সমজাতীয় কেউ নেই। ফলে আল্লাহর সত্তার সার্বভৌমত্বে তাঁর কোন নজির ও সমকক্ষ নেই। তাঁর কোন ধ্বংস ও পরিবর্তন নেই। কাজেই তাঁর স্থলাভিষিক্তের জন্য কোন পুত্রের প্রয়োজন নেই। চারঃ বড়ই উন্নত ও শ্রেষ্ঠ। কারণ, সমগ্র রাজত্ব তাঁরই কর্তৃত্বাধীন। তাঁর ক্ষমতায় অংশীদার হবার যোগ্যতা ও মর্যাদা কারো নেই। পাঁচঃ শক্তির পূর্ণতার দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ। কারণ, তিনি বিশ্ব-জাহানের প্রত্যেকটি জিনিস সৃষ্টিকারী ও তার ক্ষমতা নির্ধারণকারী। [দেখুন,তাবারী,কুরতুবী,ফাতহুল কাদীর]

(২) সারা বিশ্ববাসীর জন্য সতর্ককারী হবার যে কথা এখানে বলা হয়েছে এ থেকে জানা যায় যে, কুরআনের দাওয়াত ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত কোন একটি দেশের জন্য নয় বরং সারা দুনিয়ার জন্য এবং কেবলমাত্র নিজেরই যুগের জন্য নয় বরং ভবিষ্যতের সকল যুগের জন্য। এ বিষয়বস্তুটি কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বিবৃত হয়েছে। যেমন বলা হয়েছেঃ "হে মানুষেরা ! আমি তোমাদের সবার প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত"। [সূরা আল-আ'রাফঃ ১৫৮] আরো এসেছে, "আমার কাছে এ কুরআন পাঠানো হয়েছে যাতে এর মাধ্যমে আমি তোমাদের এবং যাদের কাছে

হওয়ার জন্য ।

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيْرًا ﴿٢﴾

২. যিনি আসমানসমূহ ও যমীনের সার্বভৌমত্বের অধিকারী; তিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেননি; সার্বভৌমত্বে তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন অতঃপর তা নির্ধারণ করেছেন যথাযথ অনুপাতে ।

وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖ اٰلِهَةً لَّا يَخْلُقُوْنَ شَيْـًٔا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ وَلَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا وَّلَا يَمْلِكُوْنَ مَوْتًا وَّلَا حَيٰوةً وَّلَا نُشُوْرًا ﴿٣﴾

৩. আর তারা তাঁর পরিবর্তে ইলাহ্‌রূপে গ্রহণ করেছে অন্যদেরকে, যারা কিছুই সৃষ্টি করে না, বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট এবং তারা নিজেদের অপকার কিংবা উপকার করার ক্ষমতা রাখে না । আর মৃত্যু, জীবন ও উত্থানের উপরও কোন ক্ষমতা রাখে না ।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اِفْكُ اِفْتَرٰىهُ وَاَعَانَهٗ عَلَيْهِ قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ ۚ فَقَدْ جَآءُوْ ظُلْمًا وَّزُوْرًا ﴿٤﴾

৪. আর কাফেররা বলে, ‘এটা মিথ্যা ছাড়া কিছুই নয়, সে এটা রটনা করেছে এবং ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক তাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করেছে ।’ সুতরাং অবশ্যই কাফেররা যুলুম ও মিথ্যা নিয়ে এসেছে ।

এটা পৌঁছে যায় তাদের সতর্ক করে দেই ।” [সূরা আল-আন‘আমঃ ৯] আরো বলা হয়েছে, “আমরা আপনাকে সমগ্র মানব জাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী করে পাঠিয়েছি” । [সূরা আস-সাবাঃ ২৮] অন্য আয়াতে এসেছে, “আর আমরা আপনাকে সারা দুনিয়াবাসীর জন্য রহমত বানিয়ে পাঠিয়েছি” । [সূরা আল-আম্বিয়াঃ ১০৭]
এ বিষয়বস্তুটিকে আরো সুস্পষ্টভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীসে বার বার বর্ণনা করেছেনঃ তিনি বলেছেনঃ “আমাকে লাল-কালো সবার কাছে পাঠানো হয়েছে ।” [মুসনাদে আহমাদঃ ১/৩০১] আরো বলেছেনঃ “প্রথমে একজন নবীকে বিশেষ করে তার নিজেরই জাতির কাছে পাঠানো হতো এবং আমাকে সাধারণভাবে সমগ্র মানব জাতির কাছে পাঠানো হয়েছে ।” [বুখারীঃ ৩৩৫, ৪৩৮, মুসলিমঃ ৫২১] তিনি আরো বলেনঃ “আমাকে সমস্ত সৃষ্টির কাছে পাঠানো হয়েছে এবং আমার আগমনে নবীদের আগমনের ধারাবাহিকতা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে ।” [মুসলিমঃ ৫২৩]

وَقَالُوْٓا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلٰى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ۝٥

৫. তারা আরও বলে, ‘এগুলো তো সে কালের উপকথা, যা সে লিখিয়ে নিয়েছে; তারপর এগুলো সকাল-সন্ধ্যা তার কাছে পাঠ করা হয় ।’

قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذِيْ يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ اِنَّهٗ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝٦

৬. বলুন, ‘এটা তিনিই নাযিল করেছেন যিনি আসমানসমূহ ও যমীনের সমুদয় রহস্য জানেন; নিশ্চয় তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ।’

وَقَالُوْا مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ يَاْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِيْ فِي الْاَسْوَاقِ ۭ لَوْلَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُوْنَ مَعَهٗ نَذِيْرًا ۝٧

৭. আরও তারা বলে, ‘এ কেমন রাসূল’ যে খাওয়া-দাওয়া করে এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করে; তার কাছে কোন ফিরিশ্‌তা কেন নাযিল করা হল না, যে তার সঙ্গে থাকত সতর্ককারীরূপে?’

اَوْ يُلْقٰٓى اِلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ تَكُوْنُ لَهٗ جَنَّةٌ يَّاْكُلُ مِنْهَا ۭ وَقَالَ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا ۝٨

৮. ‘অথবা তার কাছে কোন ধনভাণ্ডার এসে পড়ল না কেন অথবা তার একটি বাগান নেই কেন, যা থেকে সে খেতো?’ আর যালিমরা আরো বলে, ‘তোমরা তো এক জাদুগ্রস্ত ব্যক্তিরই অনুসরণ করছ ।’

اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا ۝٩

৯. দেখুন, তারা আপনার কি উপমা দেয়! ফলে তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে, সুতরাং তারা পথ পেতে পারে না[১] ।

দ্বিতীয় রুকূ’

تَبٰرَكَ الَّذِيْٓ اِنْ شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذٰلِكَ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ وَيَجْعَلْ لَّكَ قُصُوْرًا ۝١٠

১০. কত বরকতময় তিনি যিনি ইচ্ছে করলে আপনাকে দিতে পারেন এর চেয়ে উৎকৃষ্ট বস্তু---উদ্যানসমূহ যার পাদদেশে নদী-নালা প্রবাহিত

(১) এ আয়াত সংক্রান্ত কিছু আলোচনা সূরা আল-ইসরায় করা হয়েছে ।

এবং তিনি দিতে পারেন আপনাকে প্রাসাদসমূহ!

১১. বরং তারা কিয়ামতের উপর[১] মিথ্যারোপ করেছে। আর যে কিয়ামতে মিথ্যারোপ করে তার জন্য আমরা প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত আগুন।

بَلْ كَذَّبُوْا بِالسَّاعَةِ وَاَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا ﴿١١﴾

১২. দূর থেকে আগুন যখন তাদেরকে দেখবে তখন তারা শুনতে পাবে এর ক্রুদ্ধ গর্জন ও হুঙ্কার।

اِذَا رَاَتْهُمْ مِّنْ مَّكَانٍۭ بَعِيْدٍ سَمِعُوْا لَهَا تَغَيُّظًا وَّزَفِيْرًا ﴿١٢﴾

১৩. আর যখন তাদেরকে গলায় হাত পেঁচিয়ে শৃংখলিত অবস্থায় সেটার কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে, তখন তারা সেখানে ধ্বংস কামনা করবে।

وَاِذَآ اُلْقُوْا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِيْنَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوْرًا ﴿١٣﴾

১৪. বলা হবে, আজ তোমরা এক ধ্বংসকে ডেকো না, বরং বহু ধ্বংসকে ডাক।'

لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُوْرًا وَّاحِدًا وَّادْعُوْا ثُبُوْرًا كَثِيْرًا ﴿١٤﴾

১৫. বলুন, 'এটাই শ্রেয়, না স্থায়ী জান্নাত, যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে মুত্তাকীদেরকে?' তা হবে তাদের প্রতিদান ও প্রত্যাবর্তনস্থল।

قُلْ اَذٰلِكَ خَيْرٌ اَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ۭ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاۗءً وَّمَصِيْرًا ﴿١٥﴾

১৬. সেখানে তারা চিরকাল বসবাসরত অবস্থায় যা চাইবে তাদের জন্য তা-ই থাকবে; এ প্রতিশ্রুতি পূরণ আপনার রব-এরই দায়িত্ব।

لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَاۗءُوْنَ خٰلِدِيْنَ ۭ كَانَ عَلٰي رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْـُٔوْلًا ﴿١٦﴾

১৭. আর সেদিন তিনি একত্র করবেন তাদেরকে এবং তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদের 'ইবাদাত করত তাদেরকে, তারপর তিনি জিজ্ঞেস

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَقُوْلُ ءَاَنْتُمْ اَضْلَلْتُمْ عِبَادِيْ هٰٓؤُلَاۗءِ اَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيْلَ ﴿١٧﴾

(১) السَّاعة শব্দ দ্বারা কিয়ামত বুঝানো হয়েছে। [কুরতুবী]

করবেন, 'তোমরাই কি আমার এ বান্দাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলে, না তারা নিজেরাই বিভ্রান্ত হয়েছিল?'

قَالُوْا سُبْحٰنَكَ مَا كَانَ يَنْۢبَغِيْ لَنَآ اَنْ نَّتَّخِذَ مِنْ دُوْنِكَ مِنْ اَوْلِيَآءَ وَلٰكِنْ مَّتَّعْتَهُمْ وَاٰبَآءَهُمْ حَتّٰى نَسُوا الذِّكْرَ ۚ وَكَانُوْا قَوْمًاۢ بُوْرًا ﴿١٨﴾

১৮. তারা বলবে, 'পবিত্র ও মহান আপনি! আপনার পরিবর্তে আমরা অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করতে পারি না[১]; আপনিই তো তাদেরকে এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরকে ভোগ-সম্ভার দিয়েছিলেন; পরিণামে তারা যিকর তথা স্মরণ ভুলে গিয়েছিল এবং পরিণত হয়েছিল এক ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ে[২]।

فَقَدْ كَذَّبُوْكُمْ بِمَا تَقُوْلُوْنَ ۙ فَمَا تَسْتَطِيْعُوْنَ صَرْفًا وَّلَا نَصْرًا ۚ وَمَنْ يَّظْلِمْ مِّنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيْرًا ﴿١٩﴾

১৯. (আল্লাহ্ মুশরিকদেরকে বলবেন) 'তোমরা যা বলতে তারা তো তা মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে। কাজেই তোমরা শাস্তি প্রতিরোধ করতে

---

(১) কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে এ বিষয়বস্তুটি এসেছে। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছেঃ "যেদিন তিনি তাদের সবাইকে একত্র করবেন তারপর ফেরেশতাদের জিজ্ঞেস করবেন, এরা কি তোমাদেরই বন্দেগী করতো? তারা বলবেঃ পাক-পবিত্র আপনার সত্তা, আমাদের সম্পর্ক তো আপনার সাথে, এদের সাথে নয়। এরা তো জিনদের (অর্থাৎ শয়তান) ইবাদাত করতো। এদের অধিকাংশই তাদের প্রতিই ঈমান এনেছিল।" [সূরা সাবা ৪০-৪১] অনুরূপভাবে আরো বলা হয়েছেঃ "আর যখন আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন,হে মারইয়ামের ছেলে ঈসা ! তুমি কি লোকদের বলেছিলে তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমাকে ও আমার মাকে উপাস্যে পরিণত করো? সে বলবে,পাক-পবিত্র আপনার সত্তা, যে কথা বলার অধিকার আমার নেই তা বলা আমার জন্য কবে শোভন ছিল? আমি তো এদেরকে এমন সব কথা বলেছিলাম যা বলার হুকুম আপনি আমাকে দিয়েছিলেন, তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহর বন্দেগী করো, যিনি আমার রব এবং তোমাদেরও রব।" [সূরা আল-মায়েদাহ্ঃ ১১৭]

(২) অর্থাৎ তারা ছিল সংকীর্ণমনা ও নীচ প্রকৃতির লোক। তিনি রিযিক দিয়েছিলেন যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। কিন্তু তারা সবকিছু খেয়েদেয়ে নিমকহারাম হয়ে গেছে এবং তাঁর প্রেরিত নবীগণ তাদেরকে যেসব উপদেশ দিয়েছিলেন তা ভুলে গেছে। [দেখুন-ফাতহুল কাদীর,বাগভী]

পারবে না এবং সাহায্যও পাবে না। আর তোমাদের মধ্যে যে যুলুম তথা শির্ক করবে আমরা তাকে মহাশাস্তি আস্বাদন করাব[১]।’

وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّآ اِنَّهُمْ لَيَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَيَمْشُوْنَ فِى الْاَسْوَاقِ ۗ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ۗ اَتَصْبِرُوْنَ ۚ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيْرًا ﴿٢٠﴾

২০. আর আপনার আগে আমরা যে সকল রাসূল পাঠিয়েছি তারা সকলেই তো খাওয়া-দাওয়া করত ও হাটে-বাজারে চলাফেরা করত[২]। এবং (হে মানুষ!) আমরা তোমাদের এক-কে অন্যের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ করেছি। তোমরা ধৈর্য ধারণ করবে কি? আর আপনার রব তো সর্বদ্রষ্টা।

তৃতীয় রুকূ’

وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ نَرٰى رَبَّنَا ؕ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوْا فِىْٓ اَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيْرًا ﴿٢١﴾

২১. আর যারা আমাদের সাক্ষাতের আশা করে না তারা বলে, ‘আমাদের কাছে ফিরিশ্‌তা নাযিল করা হয় না কেন? অথবা আমরা আমাদের রবকে দেখি না কেন?’ তারা তো তাদের অন্তরে অহংকার পোষণ করে[৩] এবং তারা গুরুতর অবাধ্যতায় মেতে উঠেছে।

(১) এখানে জুলুম বলতে আল্লাহর সাথে শির্ক করাকে বুঝানো হয়েছে। [ইবন কাসীর,আদওয়াউল বায়ান]

(২) কাফেরদের দ্বিতীয় কথা ছিল এই যে, তিনি নবী হলে সাধারণ মানুষের মতই পানাহার করতেন না এবং জীবিকা উপার্জনের জন্য হাটবাজারে চলাফেরা করতেন না। এই আপত্তির ভিত্তি, অনেক কাফেরের এই ধারণা যে, আল্লাহ্‌র রাসূল মানব হতে পারেন না- ফিরিশ্‌তাই রাসূল হওয়ার যোগ্য। কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন স্থানে এর উত্তর দেয়া হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে এই উত্তর দেয়া হয়েছে যে, যেসব নবীকে তোমরা নবী ও রাসূল বলে স্বীকার কর, তারাও তো মানুষই ছিলেন; তারা মানুষের মত পানাহার করতেন এবং হাটে বাজারে চলাফেরা করতেন। [কুরতুবী]

(৩) অর্থাৎ তারা নিজেদের মনে মনে নিজেদের নিয়ে বড়ই অহংকার করে। [দেখুন- ফাতহুল কাদীর,আয়সারুত-তাফাসির]

২২. যেদিন তারা ফিরিশ্‌তাদেরকে দেখতে পাবে সেদিন অপরাধীদের জন্য কোন সুসংবাদ থাকবে না এবং তারা বলবে, 'রক্ষা কর, রক্ষা কর।[১]'

يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ لَا بُشْرٰى يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِيْنَ وَيَقُوْلُوْنَ حِجْرًا مَّحْجُوْرًا ﴿٢٢﴾

২৩. আর আমরা তাদের কৃতকর্মের প্রতি অগ্রসর হয়ে সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব।

وَقَدِمْنَآ اِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَآءً مَّنْثُوْرًا ﴿٢٣﴾

২৪. সেদিন জান্নাতবাসীদের বাসস্থান হবে উৎকৃষ্ট এবং বিশ্রামস্থল হবে মনোরম[২]।

اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَّاَحْسَنُ مَقِيْلًا ﴿٢٤﴾

---

(১) এখানে ﴿وَيَقُوْلُوْنَ حِجْرًا مَّحْجُوْرًا﴾ এ উক্তিটি কাদের তা নির্ধারণে দু'টি মত রয়েছে। যদি উক্তিটি ফেরেশতাদের হয় তবে এর অর্থ হবে, তারা বলবে যে, তোমাদের জন্য কোন প্রকার সুসংবাদ হারাম করা হয়েছে। অথবা বলবে, তোমাদের সাহায্য করা থেকে আমরা আল্লাহ্‌র দরবারে আশ্রয় নিচ্ছি। আর যদি উক্তিটি কাফেরদের হয় তখন অর্থ হবে, তারা ভয়ে আর্তচিৎকার দিতে দিতে বলবে, বাঁচাও বাঁচাও এবং তাদের কাছ থেকে পালাবার চেষ্টা করবে কিন্তু পালাবার কোন পথ তারা পাবে না। অথবা বলবে, কোন বাধা যদি এ আযাবকে বা ফেরেশ্‌তাদেরকে আটকে রাখত! মূলত حجر শব্দের অর্থ সুরক্ষিত স্থান। محجور অর্থ এর তাকীদ। আরবী বাচনভঙ্গিতে শব্দটি তখন বলা হয়, যখন সামনে বিপদ থাকে এবং তা থেকে বাঁচার জন্য মানুষকে বলা হয়ঃ আশ্রয় চাই! আশ্রয় চাই! অর্থাৎ আমাকে এই বিপদ থেকে আশ্রয় দাও। কেয়ামতের দিন যখন কাফেররা ফিরিশ্‌তাদেরকে আযাবের সাজ-সরঞ্জাম আনতে দেখবে, তখন দুনিয়ার অভ্যাস অনুযায়ী এ কথা বলবে। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে এর অর্থ حرامًا محرمًا বর্ণিত আছে। অর্থাৎ কেয়ামতের দিন যখন তারা ফিরিশ্‌তাদেরকে আযাবসহ দেখবে এবং তাদের কাছে ক্ষমা করার ও জান্নাতে যাওয়ার আবেদন করবে কিংবা অভিপ্রায় প্রকাশ করবে, তখন ফিরিশ্‌তারা জবাবে ﴿حِجْرًا مَّحْجُوْرًا﴾ বলবে। অর্থাৎ কাফেরদের জন্য জান্নাত হারাম ও নিষিদ্ধ। [দেখুন-তাবারী,ইবন কাসীর,ফাতহুল কাদীর]

(২) مستقر শব্দের অর্থ হলো স্বতন্ত্র আবাসস্থল। مقيل শব্দটি قيلولة থেকে উদ্ভুত- এর অর্থ দুপুরে বিশ্রাম করার স্থান। অর্থাৎ হাশরের ময়দানে জান্নাতের হকদার লোকদের সাথে অপরাধীদের থেকে ভিন্নতর ব্যবহার করা হবে। তাদের সম্মানের সাথে বসানো হবে। হাশরের দিনের কঠিন দুপুর কাটাবার জন্য তাদের আরাম করার জায়গা দেয়া হবে। সেদিনের সব রকমের কষ্ট ও কঠোরতা হবে অপরাধীদের জন্য। সৎকর্মশীলদের জন্য নয়। [দেখুন-আদওয়াউল বায়ান,বাগভী]

২৫. আর সেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে মেঘপুঞ্জ দ্বারা[১] এবং দলে দলে ফিরিশ্‌তাদেরকে নামিয়ে দেয়া হবে--

وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَآءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلٰٓئِكَةُ تَنْزِيْلًا ﴿٢٥﴾

২৬. সে দিন চূড়ান্ত কর্তৃত্ব হবে দয়াময়ের[২] এবং কাফেরদের জন্য সে দিন হবে অত্যন্ত কঠিন।

اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذِ اِلْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ ۚ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ عَسِيْرًا ﴿٢٦﴾

---

(১) এখানে بِالْغَمَامِ এর অর্থ عَنِ الْغَمَامِ অর্থাৎ আকাশ বিদীর্ণ হয়ে তা হতে একটি হালকা মেঘমালা নীচে নামবে, যাতে ফিরিশ্‌তারা থাকবে। এই মেঘমালা চাঁদোয়ার আকারে আকাশ থেকে আসবে এবং আল্লাহ্ তা'আলা বিচার-ফয়সালার জন্য হাশরের মাঠে নেমে আসবেন; আশপাশে থাকবে ফিরিশ্‌তাদের দল। এটা হবে হিসাব নিকাশ শুরু হবার সময়; সূরা আল-বাকারার ২১০ নং আয়াতেও একথা বলা হয়েছে। তখন কেবল খোলার নিমিত্তই আকাশ বিদীর্ণ হবে। এটা সেই বিদারণ নয় যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়ার সময় আকাশ ও যমীনকে ধ্বংস করার জন্য হবে। কেননা, আয়াতে যে মেঘমালা অবতরণের কথা বলা হয়েছে, তা দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়ার পর হবে। তখন নতুন ধরনের আসমান ও যমীন পুনরায় বহাল হয়ে যাবে। মোটকথা, আসমানসমূহ বিদীর্ণ হবার পর সেগুলোর উপরস্থিত সাদা মেঘ দেখা যাবে। রাব্বুল আলামীন যে মেঘসহ সৃষ্টিকুলের মধ্যে ফায়সালা করতে নাযিল হবেন। আসমানসমূহ বিদীর্ণ হয়ে যাবার পর প্রত্যেক আসমানের ফিরিশ্‌তাগণ কাতারে কাতারে দাঁড়াবে। তারপর তারা সৃষ্টিজগতকে ঘিরে রাখবে। তারা তাদের রব-এর নির্দেশ পালন করে যাবে। তাদের মধ্যে কেউই আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত কোন কথা বলবে না। যদি ফিরিশ্‌তাদেরই এ অবস্থা হবে তাহলে অন্যান্য সৃষ্টিকুলের কি অবস্থা হবে তা সহজেই অনুমেয়।[দেখুন- কুরতুবী, বাগভী, আদওয়াউল বায়ান]

(২) অর্থাৎ সেখানে কেবলমাত্র একটি রাজত্বই বাকি থাকবে এবং তা হবে এ বিশ্ব-জাহানের যথার্থ শাসনকর্তা আল্লাহর রাজত্ব। [আদওয়াউল বায়ান] অন্যত্র বলা হয়েছেঃ "সেদিন যখন এরা সবাই প্রকাশ হয়ে যাবে, আল্লাহর কাছে এদের কোন জিনিস গোপন থাকবে না, জিজ্ঞেস করা হবে আজ রাজত্ব কার? সবদিক থেকে জবাব আসবে, একমাত্র আল্লাহর যিনি সবার উপর বিজয়ী।" [সূরা গাফিরঃ ১৬] হাদীসে এ বিষয়বস্তুকে আরো বেশী স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ এক হাতে পৃথিবীগুলো ও অন্য হাতে আকাশসমূহ গুটিয়ে নিয়ে বলবেনঃ "আমিই বাদশাহ, আমিই শাসনকর্তা। এখন সেই পৃথিবীর বাদশাহরা কোথায়? কোথায় স্বৈরাচারী একনায়কের দল? অহংকারী ক্ষমতাদর্পীরা?" [বুখারীঃ ৭৪১২, মুসলিমঃ ২৭৮৮]।

২৭. যালিম[১] ব্যক্তি সেদিন নিজের দু'হাত দংশন করতে করতে বলবে, 'হায়, আমি যদি রাসূলের সাথে কোন পথ অবলম্বন করতাম[২]!

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿٢٧﴾

২৮. 'হায়, দুর্ভোগ আমার, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম!

يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿٢٨﴾

২৯. 'আমাকে তো সে বিভ্রান্ত করেছিল আমার কাছে উপদেশ পৌঁছার পর।' আর শয়তান তো মানুষের জন্য মহাপ্রতারক।

لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ﴿٢٩﴾

৩০. আর রাসূল বললেন, 'হে আমার রব! আমার সম্প্রদায় তো এ

وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا

(১) এখানে যালিম ব্যক্তি বলতেঃ মুশরিক, কাফের, মুনাফিক ও সীমালজ্ঘনকারী অবাধ্যদের বুঝানো হয়েছে। [দেখুন-সা'দী]

(২) অর্থাৎ যারাই রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রদর্শিত পথে না চলে অন্য কারো পথে চলবে, তারাই হাশরের মাঠে আফসোস করতে থাকবে এবং নিজের আঙ্গুল কামড়াতে থাকবে। কিন্তু তখন তাদের সে আফসোস করা তাদের কোন উপকারে আসবে না। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে এ সত্যকে তুলে ধরেছেন। [যেমন, সূরা আল-আহযাবঃ ৬৬-৬৮, সূরা আয্-যুখরুফঃ ৬৭] এই আয়াতের ভাষা যেমন ব্যাপক, তার বিধানও তেমনি ব্যাপক। এই ব্যাপকতার দিকে ইঙ্গিত করার জন্য সম্ভবতঃ আয়াতে বন্ধুর নামের পরিবর্তে فلانا বা "অমুক" শব্দ অবলম্বন করা হয়েছে। আয়াতে বিধৃত হয়েছে যে, যে দুই বন্ধু পাপ কাজে সম্মিলিত হয় এবং শরীয়ত বিরোধী কার্যাবলীতে একে অপরের সাহায্য করে, তাদের সবারই বিধান এই যে, কেয়ামতের দিন তারা এই বন্ধুত্বের কারণে কান্নাকাটি করবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "কোন অমুসলিমকে সঙ্গী করো না এবং তোমার ধনসম্পদ (সঙ্গীদের দিক দিয়ে) যেন মুত্তাকী ব্যক্তিই খায়।" [মুসনাদে আহমাদ ৩/৩৮, সহীহ ইবনে হিব্বানঃ ২/৩১৫, হাদীস নং ৫৫৫, তিরমিযীঃ ২৩৯৫, আবু দাউদঃ ৪৮৩২] অর্থাৎ মুত্তাকী বা পরহেযগার নয় এমন কোন ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব করো না। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "প্রত্যেক মানুষ (অভ্যাসগতভাবে) বন্ধুর ধর্ম ও চালচলন অবলম্বন করে। তাই কিরূপ লোককে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা হচ্ছে, তা পূর্বেই ভেবে দেখা উচিত।" [আবু দাউদঃ ৪৮৩৩, তিরমিযীঃ ২৩৭৮, মুসনাদে আহমাদঃ ২/৩৩৪]

الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا ﴿٣٠﴾

কুরআনকে পরিত্যাজ্য সাব্যস্ত করেছে।'

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِيْنَ ۭ وَكَفٰى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَّنَصِيْرًا ﴿٣١﴾

৩১. আল্লাহ্ বলেন, 'আর এভাবেই আমরা প্রত্যেক নবীর জন্য অপরাধীদের থেকে শত্রু বানিয়ে থাকি। আর আপনার রবই পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারীরূপে যথেষ্ট।'

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً ۚ كَذٰلِكَ ۚ لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلًا ﴿٣٢﴾

৩২. আর কাফেররা বলে, 'সমগ্র কুরআন তার কাছে একবারে নাযিল হলো না কেন?' এভাবেই আমরা নাযিল করেছি আপনার হৃদয়কে তা দ্বারা মযবুত করার জন্য এবং তা ক্রমে ক্রমে স্পষ্টভাবে আবৃত্তি করেছি।

وَلَا يَاْتُوْنَكَ بِمَثَلٍ اِلَّا جِئْنٰكَ بِالْحَقِّ وَاَحْسَنَ تَفْسِيْرًا ﴿٣٣﴾

৩৩. আর তারা আপনার কাছে যে বিষয়ই উপস্থিত করে না কেন, আমরা সেটার সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা আপনার কাছে নিয়ে আসি।

اَلَّذِيْنَ يُحْشَرُوْنَ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ اِلٰى جَهَنَّمَ ۙ اُولٰۗىِٕكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضَلُّ سَبِيْلًا ﴿٣٤﴾

৩৪. যাদেরকে মুখের উপর ভর দিয়ে চলা অবস্থায় জাহান্নামের দিকে একত্র করা হবে, তারা স্থানের দিক থেকে অতি নিকৃষ্ট এবং অধিক পথভ্রষ্ট।

চতুর্থ রুকূ'

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنَا مَعَهٗٓ اَخَاهُ هٰرُوْنَ وَزِيْرًا ﴿٣٥﴾

৩৫. আর আমরা তো মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম এবং তার সাথে তার ভাই হারূনকে সাহায্যকারী করেছিলাম,

فَقُلْنَا اذْهَبَآ اِلَى الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۭ فَدَمَّرْنٰهُمْ تَدْمِيْرًا ﴿٣٦﴾

৩৬. অতঃপর আমরা বলেছিলাম, 'তোমরা সে সম্প্রদায়ের কাছে যাও যারা আমার নিদর্শনাবলীতে মিথ্যারোপ

করেছে[১]।' তারপর আমরা তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করেছিলাম;

৩৭. আর নূহের সম্প্রদায়কেও, যখন তারা রাসূলগণেরপ্রতি মিথ্যা আরোপ করল[২] তখন আমরা তাদেরকে ডুবিয়ে দিলাম এবং তাদেরকে মানুষের জন্য নিদর্শনস্বরূপ করে রাখলাম। আর যালিমদের জন্য আমরা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।

وَقَوْمَ نُوحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَٰهُمْ وَجَعَلْنَٰهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً ۖ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّٰلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣٧﴾

৩৮. আর আমরা ধ্বংস করেছিলাম 'আদ, সামূদ, 'রাস্'[৩] -এর অধিবাসীকে এবং তাদের অন্তর্বর্তীকালের বহু প্রজন্মকেও।

وَعَادًا وَثَمُودَا۟ وَأَصْحَٰبَ ٱلرَّسِّ وَقُرُونًۢا بَيْنَ ذَٰلِكَ كَثِيرًا ﴿٣٨﴾

৩৯. আর আমরা তাদের প্রত্যেকের জন্য দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছিলাম এবং তাদের সকলকেই আমরা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেছিলাম।

وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْثَٰلَ ۖ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا ﴿٣٩﴾

৪০. আর তারা তো সে জনপদ দিয়েই যাতায়াত করে যার উপর বর্ষিত হয়েছিল অকল্যাণের বৃষ্টি, তবে কি তারা এসব দেখতে পায় না[৪]? বস্তুত

وَلَقَدْ أَتَوْا۟ عَلَى ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِىٓ أُمْطِرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوْءِ ۚ أَفَلَمْ يَكُونُوا۟ يَرَوْنَهَا ۚ بَلْ كَانُوا۟ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ﴿٤٠﴾

(১) এতে ফির'আউন সম্প্রদায় সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা অভিহিত করেছে। [মুয়াস্‌সার]

(২) এর উদ্দেশ্য এই যে, তারা স্বয়ং নূহ 'আলাইহিস্ সালামের প্রতি মিথ্যারোপ করেছে। দ্বীনের মূলনীতি সকল নবীগণের বেলায়ই অভিন্ন, তাই একজনের প্রতি মিথ্যারোপ সবার প্রতি মিথ্যারোপ করার শামিল। [বাগভী, মুয়াস্‌সার]

(৩) ﴿وَأَصْحَٰبَ ٱلرَّسِّ﴾ অভিধানে رَسّ শব্দের অর্থ কাঁচা কূপ। তারা ছিল সামূদ গোত্রের অবশিষ্ট জনসমষ্টি এবং তারা কোন একটি কুপের ধারে বাস করত। [দেখুন-আদওয়াউল বায়ান,বাগভী]

(৪) অর্থাৎ লূত জাতির জনপদ। নিকৃষ্টতম বৃষ্টি মানে পাথর বৃষ্টি। কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় একথা বলা হয়েছে। হিজায বাসীদের বানিজ্য কাফেলা ফিলিস্তিন ও সিরিয়া

তারা পুনরুত্থানের আশাই করে না ।

৪১. আর তারা যখন আপনাকে দেখে, তখন তারা আপনাকে শুধু ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্ররূপে গণ্য করে, বলে, 'এ-ই কি সে, যাকে আল্লাহ্ রাসূল করে পাঠিয়েছেন?

وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ﴿٤١﴾

৪২. 'সে তো আমাদেরকে আমাদের উপাস্যগণ হতে দূরে সরিয়েই দিত, যদি না আমরা তাদের আনুগত্যের উপর অবিচল থাকতাম ।' আর যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, তখন জানতে পারবে কে অধিক পথভ্রষ্ট ।

إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا ۚ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٤٢﴾

৪৩. আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে তার প্রবৃত্তিকে ইলাহ্‌রূপে গ্রহণ করে? তবুও কি আপনি তার যিম্মাদার হবেন?

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿٤٣﴾

৪৪. নাকি আপনি মনে করেন যে, তাদের অধিকাংশ শোনে অথবা বোঝে? তারা তো পশুর মতই; বরং তারা আরও অধিক পথভ্রষ্ট ।

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ ۖ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٤٤﴾

পঞ্চম রুকূ'

৪৫. আপনি কি আপনার রব-এর প্রতি লক্ষ্য করেন না[১] কিভাবে তিনি ছায়া সম্প্রসারিত করেন? তিনি ইচ্ছে করলে এটাকে তো স্থির রাখতে পারতেন;

أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿٤٥﴾

যাবার পথে এ এলাকা অতিক্রম করতো । সেখানে তারা কেবল ধ্বংসাবশেষ দেখতো না বরং আশপাশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মুখে লূত জাতির শিক্ষণীয় ধ্বংস কাহিনীও শুনতো । [দেখুন-কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর]

(১) ৪৫ থেকে ৬০ -এ আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলার সর্বময় ক্ষমতা এবং বান্দার প্রতি তাঁর নেয়ামত ও অনুগ্রহ বর্ণিত হয়েছে, যার ফলে আল্লাহ্ তা'আলার তাওহীদ প্রমাণিত হয় এবং এতে বান্দার করণীয় কি তাও বর্ণনা করা হয়েছে । [দেখুন-ফাতহুল কাদীর]

তারপর আমরা সূর্যকে করেছি এর নির্দেশক।

ثُمَّ قَبَضْنَٰهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴿٤٦﴾

৪৬. তারপর আমরা এটাকে আমাদের দিকে ধীরে ধীরে গুটিয়ে আনি।

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ﴿٤٧﴾

৪৭. আর তিনিই তোমাদের জন্য রাতকে করেছেন আবরণস্বরূপ, বিশ্রামের জন্য তোমাদের দিয়েছেন নিদ্রা[১] এবং ছড়িয়ে পড়ার জন্য করেছেন দিন[২]।

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِۦ ۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا ﴿٤٨﴾

৪৮. আর তিনিই তাঁর রহমতের বৃষ্টির আগে সুসংবাদবাহীরূপে বায়ু প্রেরণ করেন এবং আমরা আকাশ হতে পবিত্র পানি বর্ষণ করি[৩]-

لِّنُحْـِۧىَ بِهِۦ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُۥ مِمَّا خَلَقْنَآ أَنْعَٰمًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿٤٩﴾

৪৯. যাতে তা দ্বারা আমরা মৃত ভূ-খণ্ডকে সঞ্জীবিত করি এবং আমরা যা সৃষ্টি করেছি তার মধ্য হতে বহু জীবজন্তু ও মানুষকে তা পান করাই[৪],

---

(১) এ আয়াতে রাত্রিকে 'লেবাস' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। লেবাস যেমন মানবদেহকে আবৃত করে, রাত্রিও তেমনি একটি প্রাকৃতিক আবরণ, যা সমগ্র সৃষ্টজগতের উপর ফেলে দেয়া হয়। سُبَاتًا শব্দটি سبت থেকে উদ্ভুত। এর আসল অর্থ ছিন্ন করা। سُبَاتٌ এমন বস্তু যদ্দারা অন্য বস্তুকে ছিন্ন করা হয়। নিদ্রাকে আল্লাহ্ তা'আলা এমন করেছেন যে, এর ফলে সারাদিনের ক্লান্তি ও শ্রান্তি ছিন্ন তথা দূর হয়ে যায়। চিন্তা ও কল্পনা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে মস্তিষ্ক শান্ত হয়। তাই سُبَاتٌ এর অর্থ করা হয় আরাম, শান্তি। আয়াতের অর্থ এই যে, আমি রাত্রিকে আবৃতকারী করেছি, অতঃপর তাতে মানুষ ও প্রাণীদের উপর নিদ্রা চাপিয়ে দিয়েছি, যা তাদের আরাম ও শান্তির উপকরণ। [দেখুন- কুরতুবী, আদওয়াউল বায়ান]

(২) এখানে দিনকে نشور অর্থাৎ 'জীবন বা ছড়িয়ে পড়া' বলা হয়েছে। কেননা, এর বিপরীত অর্থাৎ নিদ্রা এক প্রকার মৃত্যু। [আদওয়াউল বায়ান]

(৩) طهور শব্দটি আরবী ভাষায় অতিশয়ার্থে ব্যবহৃত হয়। কাজেই এমন জিনিসকে طهور বলা হয়, যা নিজেও পবিত্র এবং অপরকেও তদ্দারা পবিত্র করা যায়। [বাগভী]

(৪) আয়াতে বলা হয়েছে যে, আকাশ থেকে অবতীর্ণ পানি দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা মাটিকে সিক্ত করেন এবং জীবজন্তু এবং অনেক মানুষেরও তৃষ্ণা নিবারণ করেন। [দেখুন-মুয়াস্সার]

৫০. আর আমরা তো তা তাদের মধ্যে বিতরণ করি যাতে তারা স্মরণ করে। অতঃপর অধিকাংশ লোক শুধু অকৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করে[১]।

وَلَقَدْ صَرَّفْنٰهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوْا ۖ فَاَبٰٓى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا ﴿٥٠﴾

৫১. আর আমরা ইচ্ছে করলে প্রতিটি জনপদে একজন সতর্ককারী পাঠাতে পারতাম।

وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِيْ كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيْرًا ﴿٥١﴾

৫২. কাজেই আপনি কাফেরদের আনুগত্য করবেন না এবং আপনি কুরআনের সাহায্যে তাদের সাথে বড় জিহাদ চালিয়ে যান।

فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا ﴿٥٢﴾

৫৩. আর তিনিই দুই সাগরকে সমান্তরালে প্রবাহিত করেছেন, একটি মিষ্ট, সুপেয় এবং অন্যটি লোনা, খর; আর তিনি উভয়ের মধ্যে রেখে দিয়েছেন এক অন্তরায়, এক অনতিক্রম্য ব্যবধান[২]।

وَهُوَ الَّذِيْ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَّهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ۚ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَّحِجْرًا مَّحْجُوْرًا ﴿٥٣﴾

---

(১) ইকরিমা রাহেমাহুল্লাহ এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, অর্থাৎ তারা বলে আমরা অমুক নক্ষত্র এবং অমুক নক্ষত্রের কাছাকাছি হওয়ার কারণে বৃষ্টিপ্রাপ্ত হয়েছি। ইকরিমা রাহেমাহুল্লাহর এ তাফসীরের সপক্ষে আমরা হাদীস থেকে প্রমাণ দেখতে পাই। একবার রাত্রিকালে বৃষ্টি হওয়ার পর ভোরে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে বললেন, তোমরা কি জান তোমাদের প্রভু কি বলেছেন? তারা বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সবচেয়ে ভাল জানেন। তিনি বললেনঃ "আল্লাহ্ বলেন, আমার বান্দাদের কতক লোক আমার উপর ঈমানদার এবং কতক লোক কাফেরে পরিণত হয়েছে। যারা বলে, আমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়ায় বৃষ্টিপ্রাপ্ত হয়েছি তারা আমার উপর ঈমান এনেছে এবং নক্ষত্ররাজির উপর কুফরী করেছে। আর যারা বলে, আমরা অমুক অমুক নক্ষত্রের কাছাকাছি হওয়ার কারণে বৃষ্টি পেয়েছি তারা আমার সাথে কুফরী করেছে এবং নক্ষত্ররাজির উপর ঈমান এনেছে। [মুসলিমঃ ১২৫]

(২) مرج শব্দের অর্থ স্বাধীন ছেড়ে দেয়া। عذب মিঠা পানিকে বলা হয়। فُرَاتٌ-এর অর্থ সুপেয়, مِلْحٌ-এর অর্থ লোনা এবং أجاجٌ এর অর্থ তিক্ত বিস্বাদ। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কৃপা ও অপার রহস্য দ্বারা পৃথিবীতে দুই প্রকার সাগর সৃষ্টি করেছেন। (এক) সর্ববৃহৎ যাকে মহাসাগর বলা হয়। গোটা পৃথিবী এর দ্বারা পরিবেষ্টিত। এর প্রায়

৫৪. আর তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পানি হতে; তারপর তিনি তাকে বংশগত ও বৈবাহিক সম্পর্কশীল করেছেন[১]। আর আপনার রব হলেন প্রভূত ক্ষমতাবান।

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾

৫৫. আর তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুর 'ইবাদাত করে, যা তাদের উপকার করতে পারে না এবং তাদের অপকারও করতে পারে না। আর কাফের তো তার রব-এর বিরোধিতায় সহযোগিতাকারী।

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۗ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا ﴿٥٥﴾

৫৬. আর আমরা তো আপনাকে শুধু সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেই পাঠিয়েছি।

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٥٦﴾

৫৭. বলুন, 'আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোন বিনিময় চাই না, তবে যে

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَن شَاءَ

এক-চতুর্থাংশ এ জলধির বাইরে উন্মুক্ত, যাতে সারা বিশ্বের মানব সমাজ বসবাস করে। এই সর্ববৃহৎ সাগরের পানি রহস্যবশতঃ তীব্র লোনা ও বিস্বাদ। পৃথিবীর স্থলভাগে আকাশ থেকে বর্ষিত পানির ঝর্ণা, নদনদী, নহর ও বড় বড় সাগর আছে। এগুলোর পানি মিষ্ট ও সুপেয়। মানুষের নিজেদের তৃষ্ণা নিবারণে এবং দৈনন্দিন ব্যবহারে এরূপ পানিরই প্রয়োজন, যা আল্লাহ্ তা'আলা স্থলভাগে বিভিন্ন প্রকারে সরবরাহ করেছেন। সমুদ্রে স্থলভাগের চাইতে অনেক বেশী সামুদ্রিক জন্তুজানোয়ার বসবাস করে। এগুলো সেখানেই মরে, সেখানেই পচে এবং সেখানেই মাটি হয়ে যায়। সমগ্র পৃথিবীর পানি ও আবর্জনা অবশেষে সমুদ্রে পতিত হয়। যদি সমুদ্রের পানি মিষ্ট হত, তবে মিষ্ট পানি দ্রুত পচনশীল বিধায় দু'চার দিনেই পচে যেত। এই পানি পচে গেলে তার দুর্গন্ধে ভূপৃষ্ঠের অধিবাসীদের জীবনধারন দুরূহ হয়ে যেত। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাকে এত তীব্র লোনা, তিক্ত ও তেজস্ক্রিয় করে দিয়েছেন যেন সারা বিশ্বের আবর্জনা তাতে পতিত হয়ে বিলীন হয়ে যায় এবং সেখানে বসবাসকারী যে সকল সৃষ্টজীব সেখানে মরে, তাও পচতে পারে। [দেখুন-আদওয়াউল-বায়ান]

(১) পিতামাতার দিক থেকে যে সম্পর্ক ও আত্মীয়তা হয়, তাকে نسب বলা হয় এবং স্ত্রীর পক্ষ হতে যে আত্মীয়তা হয়, তাকে صهر বলা হয়। [আদওয়াউল বায়ান,বাগভী]

أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿٥٧﴾

তার রব-এর দিকের পথ অবলম্বন করার ইচ্ছা করে।'

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ﴿٥٨﴾

৫৮. আর আপনি নির্ভর করুন তাঁর উপর যিনি চিরঞ্জীব, যিনি মরবেন না এবং তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন, তিনি তাঁর বান্দাদের পাপ সম্পর্কে অবহিত হিসেবে যথেষ্ট।

الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ الرَّحْمَٰنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا ﴿٥٩﴾

৫৯. তিনি আসমানসমূহ, যমীন ও এ দু'য়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেন; তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠলেন। তিনিই 'রাহ্‌মান', সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে যে অবহিত তাকে জিজ্ঞেস করে দেখুন।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَٰنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ۩ ﴿٦٠﴾

৬০. আর যখন তাদেরকে বলা হয়, 'সিজ্‌দাবনত হও 'রাহ্‌মান' -এর প্রতি,' তখন তারা বলে, 'রাহ্‌মান আবার কি[১]? তুমি কাউকে সিজ্‌দা করতে বললেই কি আমরা তাকে সিজ্‌দা করব?' আর এতে তাদের পলায়নপরতাই বৃদ্ধি পায়।

---

(১) মক্কার কাফেররা এ নামটি যে জানত না তা নয়। তারা এ নামটি জানত তবে আল্লাহ্‌র জন্য নির্দিষ্ট করতে দ্বিধা করত। তারা এ নামটিকে কোন কোন মানুষকেও প্রদান করত। অথচ এ নামটি এমন এক নাম যা শুধুমাত্র মহান রাব্বুল আলামীনের জন্যই নির্দিষ্ট। কোন ক্রমেই অন্য কারো জন্য এ নামটিকে নাম হিসেবে বা গুণ হিসেবে ব্যবহার করা জায়েয নেই। কিন্তু তারা হঠকারিতাবশতঃ প্রশ্ন করল যে, রহমান কে এবং কি? হুদায়বিয়ার সন্ধির দিনও তারা এমনটি অস্বীকার করে বলেছিলঃ "আমরা রহমান বা রহীম কি জিনিস তা জানিনা; বরং যেভাবে তুমি আগে লিখতে, সেভাবে 'বিস্‌মিকা আল্লাহুম্মা' লিখ।" [মুসলিমঃ ১৭৮৪] সূরা আল-ইসরার ১১০ নং আয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা কাফেরদেরকে উদ্দেশ্য করে তাঁর এ নামের তাৎপর্য বর্ণনা করে বলেছেন যে, "আল্লাহ্‌কে ডাক বা রহমানকে ডাক, যেভাবেই ডাক এগুলো তাঁর সুন্দর নামসমূহের অন্তর্গত"।

ষষ্ঠ রুকূ’

تَبٰرَكَ الَّذِیْ جَعَلَ فِی السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِیْهَا سِرٰجًا وَّقَمَرًا مُّنِیْرًا ﴿٦١﴾

৬১. কত বরকতময় তিনি যিনি নভোমণ্ডলে সৃষ্টি করেছেন বিশাল তারকাপুঞ্জ এবং তাতে স্থাপন করেছেন প্রদীপ(১) ও আলো বিকিরণকারী চাঁদ।

وَهُوَ الَّذِیْ جَعَلَ الَّیْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ یَّذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا ﴿٦٢﴾

৬২. আর তিনিই করেছেন রাত ও দিনকে পরস্পরের অনুগামীরূপে তার জন্য---যে উপদেশ গ্রহণ করতে বা কৃতজ্ঞ হতে চায়।

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِیْنَ یَمْشُوْنَ عَلَی الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا ﴿٦٣﴾

৬৩. আর ‘রাহ্‌মান’ -এর বান্দা তারাই, যারা যমীনে অত্যন্ত বিনম্রভাবে চলাফেরা করে(২) এবং যখন জাহেল ব্যক্তিরা

---

(১) অর্থাৎ সূর্য।[বাগভী] যেমন সূরা নূহে পরিষ্কার করে বলা হয়েছেঃ “আর সূর্যকে প্রদীপ বানিয়েছেন” [১৬]

(২) অর্থাৎ তারা পৃথিবীতে নম্রতা সহকারে চলাফেরা করে। هون শব্দের অর্থ এখানে স্থিরতা, গাম্ভীর্য, বিনয় অর্থাৎ গর্বভরে না চলা, অহংকারীর ন্যায় পা না ফেলা। অহংকারের সাথে বুক ফুলিয়ে চলে না। গর্বিত স্বৈরাচারী ও বিপর্যয়কারীর মতো নিজের চলার মাধ্যমে নিজের শক্তি প্রকাশ করার চেষ্টা না করা। বরং তাদের চালচলন হয় একজন ভদ্র, মার্জিত ও সৎস্বভাব সম্পন্ন ব্যক্তির মতো। খুব ধীরে চলা উদ্দেশ্য নয়। কেননা, বিনা প্রয়োজনে ধীরে চলা সুন্নাত বিরোধী। হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব ধীরে চলতেন না; বরং কিছুটা দ্রুত গতিতে চলতেন। হাদীসের ভাষা এরূপ, كَأَنَّمَا الأَرْضُ تُطْوَى لَهُ অর্থাৎ “চলার সময় পথ যেন তার জন্য সংকুচিত হত”। [ইবনে হিব্বানঃ ৬৩০৯] এ কারণেই পূর্ববর্তী মনীষীগণ ইচ্ছাকৃতভাবেই রোগীদের ন্যায় ধীরে চলাকে অহংকার ও কৃত্রিমতার আলামত হওয়ার কারণে মাকরূহ সাব্যস্ত করেছেন। উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু জনৈক যুবককে খুব ধীরে চলতে দেখে জিজ্ঞেস করেনঃ তুমি কি অসুস্থ? সে বললঃ না। তিনি তার প্রতি চাবুক উঠালেন এবং শক্তি সহকারে চলার আদেশ দিলেন। [দেখুন-ইবন কাসীর,কুরতুবী,বাদাইউত তাফসির]
হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহ্ ﴿یَمْشُوْنَ عَلَی الْاَرْضِ هَوْنًا﴾ আয়াতের তাফসীরে বলেনঃ খাঁটি মুমিনদের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, চক্ষু, কর্ণ, হাত, পা, আল্লাহ্‌র সামনে হীন ও অক্ষম হয়ে থাকে। অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে দেখে অপারগ ও পঙ্গু মনে করে, অথচ তারা রুগ্নও নয় এবং পঙ্গুও নয়; বরং সুস্থ ও সবল। তবে তাদের উপর আল্লাহ্‌ভীতি

তাদেরকে (অশালীন ভাষায়) সম্বোধন করে, তখন তারা বলে, 'সালাম'(১);

৬৪. এবং তারা রাত অতিবাহিত করে তাদের রব-এর উদ্দেশ্যে সিজ্‌দাবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে থেকে(২);

وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا ﴿٦٤﴾

প্রবল, যা অন্যদের উপর নেই। তাদেরকে পার্থিব কাজকর্ম থেকে আখেরাতের চিন্তা নিবৃত্ত রাখে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে না এবং তার সমস্ত চিন্তা দুনিয়ার কাজেই ব্যাপৃত, সে সর্বদা দুঃখই ভোগ করে। কারণ, সে তো দুনিয়া পুরোপুরি পায় না এবং আখেরাতের কাজেও অংশগ্রহণ করে না। যে ব্যক্তি পানাহারের বস্তুর মধ্যেই আল্লাহ্‌র নেয়ামত সীমিত মনে করে এবং উত্তম চরিত্রের প্রতি লক্ষ্য করে না, তার জ্ঞান খুবই অল্প এবং তার জন্য শাস্তি তৈরী রয়েছে। [ইবন কাসীর]

(১) অর্থাৎ যখন জাহেল ব্যক্তিরা তাদের সাথে কথা বলে, তখন তারা বলে- 'সালাম'। এখানে جاهلون শব্দের অর্থ বিদ্যাহীন ব্যক্তি নয়; বরং যারা মূর্খতার কাজ ও মূর্খতাপ্রসূত কথাবার্তা বলে, যদিও বাস্তবে বিদ্বানও বটে। মূর্খ মানে অশিক্ষিত বা লেখাপড়া না জানা লোক নয় বরং এমন লোক যারা জাহেলী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হবার উদ্যোগ নিয়েছে এবং কোন ভদ্রলোকের সাথে অশালীন ব্যবহার করতে শুরু করেছে। রহমানের বান্দাদের পদ্ধতি হচ্ছে, তারা গালির জবাবে গালি এবং দোষারোপের জবাবে দোষারোপ করে না। [দেখুন-ফাতহুল কাদীর,কুরতুবী,বাদাইউত তাফসির] যেমন কুরআনের অন্য জায়গায় বলা হয়েছেঃ "আর যখন তারা কোন বেহুদা কথা শোনে, তা উপেক্ষা করে যায়। বলে, আমাদের কাজের ফল আমরা পাবো এবং তোমাদের কাজের ফল তোমরা পাবে। সালাম তোমাদের, আমরা জাহেলদের সাথে কথা বলি না।"[সূরা আল-কাসাসঃ ৫৫]

(২) অর্থাৎ তারা রাত্রি যাপন করে তাদের পালনকর্তার সামনে সিজ্‌দারত অবস্থায় ও দণ্ডায়মান অবস্থায়। ইবাদাতে রাত্রি জাগরণের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, এই সময়টি নিদ্রা ও আরামের। এতে সালাত ও ইবাদাতের জন্য দণ্ডায়মান হওয়া যেমন বিশেষ কষ্টকর, তেমনি এতে লোকদেখানো ও নামযশের আশংকাও নেই। উদ্দেশ্য এই যে, তারা দিবারাত্রি আল্লাহ্‌র ইবাদাতে মশগুল থাকে। কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে তাদের জীবনের এ দিকগুলো সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে। যেমন অন্য সূরায় বলা হয়েছেঃ "তাদের পিঠ বিছানা থেকে আলাদা থাকে, নিজেদের রবকে ডাকতে থাকে আশায় ও আশংকায়।" [সূরা আস-সাজদাহঃ ১৬] অন্যত্র আরো বলা হয়েছেঃ "এ সকল জান্নাতবাসী ছিল এমন সব লোক যারা রাতে সামান্যই ঘুমাতো এবং ভোর রাতে মাগফিরাতের দো'আ করতো।" [সূরা আয-যারিয়াতঃ ১৭-১৮]

৬৫. এবং তারা বলে, হে আমাদের রব! আপনি আমাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি হটিয়ে দিন, তার শাস্তি তো অবিচ্ছিন্ন।

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٦٥﴾

৬৬. নিশ্চয় সেটা বসবাস ও অবস্থানস্থল হিসেবে খুব নিকৃষ্ট।

إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٦٦﴾

৬৭. এবং যখন তারা ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না, কৃপনতাও করে না, আর তাদের পন্থা হয় এতদুভয়ের মধ্যবর্তী[১]।

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

আরো বলা হয়েছেঃ "যে ব্যক্তি হয় আল্লাহর হুকুম পালনকারী, রাতের বেলা সিজদা করে ও দাঁড়িয়ে থাকে, আখেরাতকে ভয় করে এবং নিজের রবের রহমতের প্রত্যাশা করে তার পরিণাম কি মুশরিকের মতো হতে পারে?" [সূরা আয-যুমারঃ ৯] হাদীসে সালাতুত্ তাহাজ্জুদের অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "নিয়মিত তাহাজ্জুদ আদায় কর। কেননা, এটা তোমাদের পূর্ববর্তী সকল নেককারদের অভ্যাস ছিল। এটা তোমাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য দানকারী, মন্দ কাজের কাফ্ফারা এবং গোনাহ্ থেকে নিবৃত্তকারী।" [সহীহ্ ইবনে খুযাইমাহ্ঃ ১১৩৫] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেনঃ "যে ব্যক্তি এশার সালাত জামা'আতে আদায় করে, সে যেন অর্ধরাত্রি ইবাদাতে অতিবাহিত করে এবং যে ব্যক্তি ফজরের সালাত জামা'আতের সাথে আদায় করে, তাকে অবশিষ্ট অর্ধরাত্রিও ইবাদাতে অতিবাহিতকারী হিসেবে গণ্য করা হবে।" [মুসলিমঃ ৬৫৬]

(১) অর্থাৎ আল্লাহ্র প্রিয় বান্দারা অপব্যয় করে না এবং কৃপণতাও করে না; বরং উভয়ের মধ্যবর্তী সমতা বজায় রাখে। আয়াতে إِسْرَافٌ এবং এর বিপরীতে إِقْتَارٌ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। إِسْرَافٌ এর অর্থ সীমা অতিক্রম করা। শরীয়তের পরিভাষায় ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, কাতাদাহ্, ইবনে জুবায়রের মতে আল্লাহ্র অবাধ্যতার কাজে ব্যয় করা إِسْرَافٌ তথা অপব্যয়; যদিও তা এক পয়সাও হয়। কেউ কেউ বলেন, বৈধ এবং অনুমোদিত কাজে প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যয় করাও অপব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, تَبْذِيْرٌ তথা অনর্থক ব্যয় কুরআনের আয়াত দ্বারা হারাম ও গোনাহ্। আল্লাহ্ বলেনঃ ﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ﴾ [সূরা আল-ইসরাঃ ২৭]
إقتار শব্দের অর্থ ব্যয়ে ত্রুটি ও কৃপণতা করা। শরীয়তের পরিভাষায় এর অর্থ যেসব কাজে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ব্যয় করার আদেশ দেন, তাতে ব্যয় না করা বা কম করা। এই তাফসীরও ইবনে আব্বাস, কাতাদাহ্ প্রমুখ হতে বর্ণিত আছে। তখন

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا ۟ۙ

৬৮. এবং তারা আল্লাহ্‌র সাথে কোন ইলাহ্‌কে ডাকে না[১]। আর আল্লাহ্ যার হত্যা নিষেধ করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না[২]। আর তারা ব্যভিচার করে না[৩]; যে এগুলো করে, সে শাস্তি ভোগ করবে।

يُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهٖ مُهَانًا ۟ۖ

৬৯. কিয়ামতের দিন তার শাস্তি বর্ধিতভাবে প্রদান করা হবে এবং সেখানে সে স্থায়ী হবে হীন অবস্থায়;

اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۟

৭০. তবে যে তাওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, ফলে আল্লাহ্ তাদের গুণাহসমূহ নেক দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন। আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

আয়াতের অর্থ হবে, আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাদের গুণ এই যে, তারা ব্যয় করার ক্ষেত্রে অপব্যয় ও ক্রুটির মাঝখানে সততা ও মিতব্যয়ীতার পথ অনুসরণ করে। [দেখুন- [ফাতহুল কাদীর,কুরতুবী]

(১) পূর্ববর্তী ছয়টি গুণের মধ্যে আনুগত্যের মূলনীতি এসে গেছে। এখন গোনাহ্ ও অবাধ্যতার প্রধান প্রধান মূলনীতি বর্ণিত হচ্ছে। তন্মধ্যে প্রথম মূলনীতি বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কযুক্ত অর্থাৎ তারা ইবাদাতে আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করে না। [ফাতহুল কাদীর]

(২) এ আয়াতে বলা হচ্ছে যে, আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দারা কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে না। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 'একজন মুমিন ঐ পর্যন্ত পরিত্রাণের আশা করতে পারে যতক্ষণ সে কোন হারামকৃত রক্ত প্রবাহিত না করে'। [বুখারী: ৬৮৬২]

(৩) রহমানের বান্দারা কোন ব্যভিচার করে না। ব্যভিচারের নিকটবর্তীও হয় না। একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, সবচেয়ে বড় গুণাহ কি? তিনি বললেনঃ "তুমি যদি কাউকে (প্রভুত্ব, নাম-গুণে এবং ইবাদতে) আল্লাহ্‌র সমকক্ষ দাঁড় করাও"। জিজ্ঞেস করা হলো, তারপর? তিনি বললেনঃ "তুমি যদি তোমার সন্তানকে হত্যা কর এই ভয়ে যে, সে তোমার সাথে আহারে অংশ নেবে"। জিজ্ঞেস করা হলো, তারপর? তিনি বললেনঃ "তুমি যদি তোমার পড়শীর স্ত্রীর সাথে যিনা কর"। [বুখারীঃ ৬৮৬১, মুসলিমঃ ৮৬]

৭১. আর যে তাওবা করে ও সৎকাজ করে, সে তো সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র অভিমুখী হয়।

وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ﴿٧١﴾

৭২. আর যারা মিথ্যার সাক্ষ্য হয় না এবং অসার কার্যকলাপের সম্মুখীন হলে আপন মর্যাদা রক্ষার্থে তা পরিহার করে চলে[১]।

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ﴿٧٢﴾

৭৩. এবং যারা তাদের রব-এর আয়াতসমূহ স্মরণ করিয়ে দিলে তার উপর অন্ধ এবং বধিরের মত পড়ে থাকে না[২]।

وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ﴿٧٣﴾

৭৪. এবং যারা প্রার্থনা করে বলে, ‘হে আমাদের রব! আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান করুন যারা হবে আমাদের জন্য চোখজুড়ানো। আর আপনি আমাদেরকে করুন মুত্তাকীদের জন্য অনুসরণযোগ্য।

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

৭৫. তারাই, যাদেরকে প্রতিদান হিসেবে দেয়া হবে জান্নাতের সুউচ্চ কক্ষ[৩]

أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا

(১) অর্থাৎ আল্লাহর সৎ বান্দাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা জেনে শুনে আজে-বাজে কথা ও কাজ দেখতে বা শুনতে অথবা তাতে অংশ গ্রহণ করে না। আর যদি কখনো তাদের পথে এমন কোন জিনিস এসে যায়, তাহলে তার প্রতি একটা উড়ো নজর না দিয়েও তারা এভাবে সে জায়গা অতিক্রম করে যেমন একজন অত্যন্ত সুরুচিসম্পন্ন ব্যক্তি কোন ময়লার স্তুপ অতিক্রম করে চলে যায়। [দেখুন-ফাতহুল কাদীর,কুরতুবী]

(২) অর্থাৎ এই প্রিয় বান্দাগণকে যখন আল্লাহ্‌র আয়াত ও আখেরাতের কথা স্মরণ করানো হয়, তখন তারা এসব আয়াতের প্রতি অন্ধ ও বধিরদের ন্যায় মনোযোগ দেয় না; বরং শ্রবণশক্তি ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের ন্যায় এগুলো সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে ও তদনুযায়ী আমল করে। [তাবারী]

(৩) غرفة শব্দের আভিধানিক অর্থ উঁচু কক্ষ, উপরতলার কক্ষ। বিশেষ নৈকট্যপ্রাপ্তগণ এমন উঁচু কক্ষ পাবে, যা সাধারণ জান্নাতীদের কাছে তেমনি দৃষ্টিগোচর হবে, যেমন পৃথিবীর লোকদের নিকট তারকা-নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হয়। [বুখারীঃ ৩০৮৩, মুসলিমঃ ২৮৩১, মুসনাদে আহমাদঃ ৮৪৫২] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো

تَحِيَّةً وَّسَلٰمًا ۙ﴿٧٥﴾

যেহেতু তারা ছিল ধৈর্যশীল। আর তারা প্রাপ্ত হবে সেখানে অভিবাদন ও সালাম।

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ﴿٧٦﴾

৭৬. সেখানে তারা স্থায়ী হবে। অবস্থানস্থল ও বাসস্থান হিসেবে তা কত উৎকৃষ্ট!

قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّيْ لَوْلَا دُعَآؤُكُمْ ۚ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُوْنُ لِزَامًا ﴿٧٧﴾

৭৭. বলুন, ‘আমার রব তোমাদের মোটেই ভ্রুক্ষেপ করেন না, যদি না তোমরা তাকে ডাক[১]। অতঃপর তোমরা মিথ্যারোপ করেছ, সুতরাং অচিরেই অপরিহার্য হবে শাস্তি।’

বলেনঃ “জান্নাতে এমন কক্ষ থাকবে, যার ভেতরের অংশ বাইরে থেকে এবং বাইরের অংশ ভেতর থেকে দৃষ্টিগোচর হবে। লোকেরা জিজ্ঞেস করলঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম), এসব কক্ষ কাদের জন্য? তিনি বললেনঃ যে ব্যক্তি সৎ ও পবিত্র কথাবার্তা বলে, প্রত্যেক মুসলিমকে সালাম করে, ক্ষুধার্তকে আহার করায় এবং রাত্রে যখন সবাই নিদ্রিত থাকে, তখন সে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করে।” [সহীহ্ ইবনে হিব্বানঃ ৫০৯, সহীহ্ ইবনে খুযাইমাঃ ২১৩৭, মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ১/১৫৩, তিরমিযীঃ ১৯৮৪, মুসনাদে আহমাদঃ ১৩৩৭]

(১) এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে অনেক উক্তি আছে। তবে স্পষ্ট কথা হলো, আল্লাহ্‌র কাছে তোমাদের কোন গুরুত্ব থাকত না যদি তোমাদের পক্ষ থেকে তাঁকে ডাকা ও তাঁর ইবাদাত করা না হত। কেননা, মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যই আল্লাহ্‌র ইবাদাত করা। [বাগভী]যেমন অন্য আয়াতে আছে ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ﴾ [সূরা আয্-যারিয়াতঃ ৫৬] অর্থাৎ আমি মানব ও জিনকে আমার ইবাদাত ব্যতীত অন্য কোন কাজের জন্য সৃষ্টি করিনি।

২৬- সূরা আশ-শু'আরা', ২২৭ আয়াত, মক্কী

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. ত্বা-সীন-মীম।

طٰسٓمّٓ ①

২. এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত।

تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ②

৩. তারা মুমিন হচ্ছে না বলে আপনি হয়ত মনোকষ্টে আত্মঘাতী হয়ে পড়বেন।

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ③

৪. আমরা ইচ্ছে করলে আসমান থেকে তাদের কাছে এক নিদর্শন নাযিল করতাম, ফলে সেটার প্রতি তাদের ঘাড় অবনত হয়ে পড়ত।

اِنْ نَّشَاْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ اٰيَةً فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خٰضِعِيْنَ ④

৫. আর যখনই তাদের কাছে দয়াময়ের কাছ থেকে কোন নতুন উপদেশ আসে, তখনই তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمٰنِ مُحْدَثٍ اِلَّا كَانُوْا عَنْهُ مُعْرِضِيْنَ ⑤

৬. অতএব তারা তো মিথ্যারোপ করেছে। কাজেই তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত তার প্রকৃত বার্তা তাদের কাছে শীঘ্রই এসে পড়বে।

فَقَدْ كَذَّبُوْا فَسَيَاْتِيْهِمْ اَنْۢبٰٓؤُا مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ⑥

৭. তারা কি যমীনের দিকে লক্ষ্য করে না? আমরা তাতে প্রত্যেক প্রকারের অনেক উৎকৃষ্ট উদ্ভিদ উদ্‌গত করেছি[১]!

اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الْاَرْضِ كَمْ اَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ ⑦

৮. নিশ্চয় এতে আছে নিদর্শন, আর

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۚ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ⑧

(১) زَوْجٍ এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে যুগল। এ কারণেই পুরুষ ও স্ত্রী, নর ও নারীকে زَوْجٍ বলা হয়। অনেক বৃক্ষের মধ্যেও নর ও নারী থাকে, সেগুলোকে এদিক দিয়ে زَوْجٍ বলা যায়। কোন সময় এ শব্দটি বিশেষ প্রকার ও শ্রেণীর অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এ হিসাবে বৃক্ষের প্রত্যেক প্রকারকে زَوْجٍ বলা যায়। كَرِيمٍ শব্দের অর্থ উৎকৃষ্ট ও পছন্দনীয় বস্তু। [দেখুন-আদওয়াউল বায়ান,কুরতুবী,ফাতহুল কাদীর]

তাদের অধিকাংশই মুমিন নয়।

৯. আর নিশ্চয় আপনার রব, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٩﴾

দ্বিতীয় রুকূ'

১০. আর স্মরণ করুন, যখন আপনার রব মূসাকে ডেকে বললেন, 'আপনি যালিম সম্প্রদায়ের কাছে যান,

وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠﴾

১১. 'ফির'আউনের সম্প্রদায়ের কাছে; তারা কি তাকওয়া অবলম্বন করবে না?'

قَوْمَ فِرْعَوْنَ ۚ أَلَا يَتَّقُونَ ﴿١١﴾

১২. মূসা বলেছিলেন, 'হে আমার রব! আমি আশংকা করি যে, তারা আমার উপর মিথ্যারোপ করবে,

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿١٢﴾

১৩. 'এবং আমার বক্ষ সংকুচিত হয়ে পড়ছে, আর আমার জিহ্‌বা তো সাবলীল নেই। কাজেই হারূনের প্রতিও ওহী পাঠান।

وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ ﴿١٣﴾

১৪. 'আর আমার বিরুদ্ধে তো তাদের এক অভিযোগ আছে, সুতরাং আমি আশংকা করছি যে, তারা আমাকে হত্যা করবে।'

وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿١٤﴾

১৫. আল্লাহ্ বললেন, 'না, কখনই নয়, অতএব আপনারা উভয়ে আমাদের নিদর্শনসহ যান, আমরা তো আপনাদের সাথেই আছি, শ্রবণকারী।

قَالَ كَلَّا ۖ فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا ۖ إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ ﴿١٥﴾

১৬. 'অতএব আপনারা উভয়ে ফির'আউনের কাছে যান এবং বলুন, 'আমরা তো সৃষ্টিকুলের রব-এর রাসূল,

فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾

أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ ﴿١٧﴾

১৭. যাতে তুমি আমাদের সাথে যেতে দাও বনী ইসরাঈলকে(১) ।’

قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴿١٨﴾

১৮. ফির‘আউন বলল, ‘আমরা কি তোমাকে শৈশবে আমাদের মধ্যে লালন-পালন করিনি? আর তুমি তো তোমার জীবনের বহু বছর আমাদের মধ্যে কাটিয়েছ,

وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾

১৯. ‘এবং তুমি তোমার কাজ যা করার তা করেছ; তুমি তো অকৃতজ্ঞ ।’

قَالَ فَعَلْتُهَآ إِذًا وَأَنَا۠ مِنَ الضَّآلِّينَ ﴿٢٠﴾

২০. মূসা বললেন, ‘আমি তো এটা করেছিলাম তখন, যখন আমি ছিলাম বিভ্রান্ত’(২) ।

فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢١﴾

২১. ‘তারপর আমি যখন তোমাদের ভয়ে ভীত হলাম তখন আমি তোমাদের কাছ থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম । এরপর আমার রব আমাকে প্রজ্ঞা (নবুওয়ত) দিয়েছেন এবং আমাকে রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন ।

وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ ﴿٢٢﴾

২২. ‘আর আমার প্রতি তোমার যে অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করে তুমি দয়া দেখাচ্ছ তা তো এই যে, তুমি বনী ইসরাঈলকে দাসে পরিণত করেছ(৩) ।’

---

(১) বনী ইসরাঈল ছিল শাম দেশের বাসিন্দা । তাদেরকে স্বদেশে যেতে ফির‘আউন বাধা দিত । এভাবে চার শত বছর ধরে তারা ফির‘আউনের বন্দীশালায় গোলামীর জীবন যাপন করছিল । [দেখুন- বাগভী,কুরতুবী]

(২) সারকথা এই যে, এ হত্যাকাণ্ড অনিচ্ছাকৃতভাবে হয়েছিল । কাজেই এখানে ضلال শব্দের অর্থ অজ্ঞাত তথা অনিচ্ছাকৃতভাবে কিবতীর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়া । [ফাতহুল কাদীর,কুরতুবী]

(৩) অর্থাৎ তোমরা যদি বনী ইসরাঈলের প্রতি জুলুম-নিপীড়ন না চালাতে তাহলে আমি প্রতিপালিত হবার জন্য তোমাদের গৃহে কেন আসতাম? তোমাদের জুলুমের কারণেই

২৩. ফির'আউন বলল, 'সৃষ্টিকুলের রব আবার কী?'

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٣﴾

২৪. মূসা বললেন, 'তিনি আসমানসমূহ ও যমীন এবং তাদের মধ্যবর্তী সব কিছুর রব, যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও।'

قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۭ اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ﴿٢٤﴾

২৫. ফির'আউন তার আশেপাশের লোকদের লক্ষ্য করে বলল, 'তোমরা কি ভাল করে শুনছ না?'

قَالَ لِمَنْ حَوْلَهٗٓ اَلَا تَسْتَمِعُوْنَ ﴿٢٥﴾

২৬. মূসা বললেন, 'তিনি তোমাদের রব এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদেরও রব।'

قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَاۗىِٕكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٢٦﴾

২৭. ফির'আউন বলল, 'তোমাদের প্রতি প্রেরিত তোমাদের রাসূল তো অবশ্যই পাগল।'

قَالَ اِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِيْٓ اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ ﴿٢٧﴾

২৮. মূসা বললেন, 'তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের এবং তাদের মধ্যবর্তী সব কিছুর রব; যদি তোমরা বুঝে থাক!'

قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۭ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٢٨﴾

২৯. ফির'আউন বলল, 'তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্যকে ইলাহ্‌রূপে গ্রহণ কর আমি তোমাকে অবশ্যই কারারুদ্ধ করব'।

قَالَ لَىِٕنِ اتَّخَذْتَ اِلٰــهًا غَيْرِيْ لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ ﴿٢٩﴾

৩০. মূসা বললেন, 'আমি যদি তোমার কাছে কোন স্পষ্ট বিষয় নিয়ে আসি, তবুও[১]?'

قَالَ اَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِيْنٍ ﴿٣٠﴾

তো আমার মা আমাকে ঝুড়িতে ভরে নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। নয়তো আমার লালন-পালনের জন্য কি আমার নিজের গৃহ ছিল না? তাই এ লালন-পালনের জন্য অনুগৃহীত করার খোঁটা দেয়া তোমার মুখে শোভা পায় না। [দেখুন- কুরতুবী]

(১) অর্থাৎ যদি আমি সত্যিই সমগ্র বিশ্ব-জাহানের, আকাশ ও পৃথিবীর এবং পূর্ব ও পশ্চিমের রবের পক্ষ থেকে যে আমাকে পাঠানো হয়েছে এর সপক্ষে সুস্পষ্ট আলামত

قَالَ فَأْتِ بِهِۦٓ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿٣١﴾

৩১. ফির'আউন বলল, 'তুমি যদি সত্যবাদী হও তবে তা উপস্থিত কর।'

فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِىَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿٣٢﴾

৩২. তারপর মূসা তাঁর লাঠি নিক্ষেপ করলে তৎক্ষনাৎ তা এক স্পষ্ট অজগরে(১) পরিণত হল।

وَنَزَعَ يَدَهُۥ فَإِذَا هِىَ بَيْضَآءُ لِلنَّٰظِرِينَ ﴿٣٣﴾

৩৩. আর মূসা তার হাত বের করলে তৎক্ষনাৎ তা দর্শকদের দৃষ্টিতে শুভ্র উজ্জ্বল প্রতিভাত হল।

তৃতীয় রুকূ'

قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُۥٓ إِنَّ هَٰذَا لَسَٰحِرٌ عَلِيمٌ ﴿٣٤﴾

৩৪. ফির'আউন তার আশেপাশের পরিষদবর্গকে বলল, 'এ তো এক সুদক্ষ জাদুকর!

يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِۦ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿٣٥﴾

৩৫. 'সে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে তার জাদুবলে বহিস্কৃত করতে চায়। এখন তোমরা কী করতে বল?'

قَالُوٓا۟ أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَٱبْعَثْ فِى ٱلْمَدَآئِنِ حَٰشِرِينَ ﴿٣٦﴾

৩৬. তারা বলল, 'তাকে ও তার ভাইকে কিছু অবকাশ দাও এবং নগরে নগরে সংগ্রাহকদেরকে পাঠাও,

يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ ﴿٣٧﴾

৩৭. 'যেন তারা তোমার কাছে প্রতিটি অভিজ্ঞ জাদুকরকে উপস্থিত করে।'

পেশ করি, তাহলে এ অবস্থায়ও কি আমার কথা মেনে নিতে অস্বীকার করা হবে এবং আমাকে কারাগারে পাঠানো হবে? [দেখুন- বাগভী]

(১) কুরআন মজীদে কোন জায়গায় এ জন্য حَيَّة (সাপ) আবার কোথাও جَانّ (ছোট সাপ) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর এখানে বলা হচ্ছে ثعبان (অজগর)। এর ব্যাখ্যা এভাবে করা যায় যে حَيَّة আরবী ভাষায় সর্পজাতির সাধারণ নাম। তা ছোট সাপও হতে পারে আবার বড় সাপও হতে পারে। আর ثعبان শব্দ ব্যবহার করার কারণ হচ্ছে এই যে, দৈহিক আয়তন ও স্থূলতার দিক দিয়ে তা ছিল অজগরের মতো। অন্যদিকে جان শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে ছোট সাপের মতো তার ক্ষীপ্রতা ও তেজস্বীতার জন্য। [দেখুন- ফাতহুল কাদীর]

৩৮. অতঃপর এক নির্ধারিত দিনে নির্দিষ্ট সময়ে জাদুকরদেরকে একত্র করা হল,

فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٣٨﴾

৩৯. এবং লোকদেরকে বলা হল, 'তোমরাও সমবেত হচ্ছ কি?

وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم مُّجْتَمِعُونَ ﴿٣٩﴾

৪০. 'যেন আমরা জাদুকরদের অনুসরণ করতে পারি, যদি তারা বিজয়ী হয়।'

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ﴿٤٠﴾

৪১. অতঃপর জাদুকরেরা এসে ফির'আউনকে বলল, 'আমরা যদি বিজয়ী হই আমাদের জন্য পুরস্কার থাকবে তো?'

فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴿٤١﴾

৪২. ফির'আউন বলল, 'হ্যাঁ, তখন তো তোমরা অবশ্যই আমার ঘনিষ্ঠদের শামিল হবে।'

قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٤٢﴾

৪৩. মূসা তাদেরকে বললেন, 'তোমরা যা নিক্ষেপ করার তা নিক্ষেপ কর।'

قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنتُم مُّلْقُونَ ﴿٤٣﴾

৪৪. অতঃপর তারা তাদের রশি ও লাঠি নিক্ষেপ করল এবং তারা বলল, 'ফির'আউনের ইয্যতের শপথ! আমরাই তো বিজয়ী হব।'

فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ ﴿٤٤﴾

৪৫. অতঃপর মূসা তার লাঠি নিক্ষেপ করলেন, সহসা সেটা তাদের অলীক কীর্তিগুলোকে গ্রাস করতে লাগল।

فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿٤٥﴾

৪৬. তখন জাদুকরেরা সিজ্‌দাবনত হয়ে পড়ল।

فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ﴿٤٦﴾

৪৭. তারা বলল, 'আমরা ঈমান আনলাম সৃষ্টিকুলের রব-এর প্রতি---

قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٧﴾

৪৮. 'যিনি মূসা ও হারূনেরও রব ।'

رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ﴿٤٨﴾

৪৯. ফির'আউন বলল, 'কী! আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেয়ার আগেই তোমরা তার প্রতি বিশ্বাস করলে? সে-ই তো তোমাদের প্রধান যে তোমাদেরকে জাদু শিক্ষা দিয়েছে। সুতরাং শীঘ্রই তোমরা এর পরিণাম জানবে। আমি অবশ্যই তোমাদের হাত এবং তোমাদের পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলব এবং তোমাদের সবাইকে শূলবিদ্ধ করবই ।'

قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۚ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِيْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۚ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۬ؕ لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّلَاُوصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٤٩﴾

৫০. তারা বলল, 'কোন ক্ষতি নেই[১], আমরা তো আমাদের রব-এর কাছেই প্রত্যাবর্তনকারী ।

قَالُوْا لَا ضَيْرَ ۫ اِنَّاۤ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ﴿٥٠﴾

৫১. আমরা আশা করি যে, আমাদের রব আমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন, কারণ আমরা মুমিনদের মধ্যে অগ্রণী ।'

اِنَّا نَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطٰيٰنَاۤ اَنْ كُنَّاۤ اَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٥١﴾

চতুর্থ রুকূ'

৫২. আর আমরা মূসার প্রতি ওহী করেছিলাম এ মর্মে যে, 'আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাতে বের হউন[২],

وَاَوْحَيْنَاۤ اِلٰى مُوْسٰۤى اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِيْۤ اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ ﴿٥٢﴾

(১) অর্থাৎ যখন ফির'আউন জাদুকরদেরকে বিশ্বাস স্থাপনের কারণে হত্যা, হস্ত-পদ কর্তন ও শূলে চড়ানোর হুমকি দিল, তখন জাদুকররা অত্যন্ত তাচ্ছিল্যভরে জবাব দিলঃ তুমি যা করতে পার, কর । আমাদের কোন ক্ষতি নেই । আমরা নিহত হলেও পালনকর্তার কাছে পৌঁছে যাব, সেখানের আরামই আরাম । [কুরতুবী,ফাতহুল কাদীর,মুয়াস্‌সার]

(২) এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক বেদুঈনের বাসায় গেলে সে তাঁকে সম্মান করে । রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেনঃ তুমি আমার সাথে সাক্ষাত করতে এসো । বেদুঈন রাসূলের সাথে সাক্ষাত করতে আসলে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ কিছু চাও? সে বললঃ এক উট তার মালামালসহ, আর কিছু ছাগল যা আমার স্ত্রী দোহাতে পারে ।

অবশ্যই তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে।'

৫৩. তারপর ফির'আউন শহরে শহরে লোক সংগ্রহকারী পাঠাল,

فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ ۝٥٣

৫৪. এ বলে, 'এরা তো ক্ষুদ্র একটি দল,

اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيْلُوْنَ ۝٥٤

৫৫. আর তারা তো আমাদের ক্রোধ উদ্রেক করেছে;

وَاِنَّهُمْ لَنَا لَغَآئِظُوْنَ ۝٥٥

৫৬. আর আমরা তো সবাই সদা সতর্ক।'

وَاِنَّا لَجَمِيْعٌ حٰذِرُوْنَ ۝٥٦

৫৭. পরিণামে আমরা ফির'আউন গোষ্ঠীকে বহিস্কৃত করলাম তাদের উদ্যানরাজি ও প্রস্রবণ হতে

فَاَخْرَجْنٰهُمْ مِّنْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ۝٥٧

৫৮. এবং ধন-ভাণ্ডার ও সুরম্য সৌধমালা হতে।

وَّكُنُوْزٍ وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ ۝٥٨

৫৯. এরূপই ঘটেছিল এবং আমরা বনী

كَذٰلِكَ ۖ وَاَوْرَثْنٰهَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۝٥٩

তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ তুমি কি বনী ইস্রাঈলের বৃদ্ধার মত হতে পারলে না? সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ বনী ইস্রাঈলের বৃদ্ধা, হে আল্লাহ্র রাসূল, সে আবার কে? রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ মূসা 'আলাইহিস্ সালাম যখন বনী ইস্রাঈলদের নিয়ে বের হলেন, তখন পথ হারিয়ে ফেললেন। তিনি বনী ইস্রাঈলদের বললেনঃ কেন এমন হল? তখন তাদের মাঝে আলেমগণ বললেনঃ ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম মৃত্যুর পূর্বে বনী ইস্রাঈল থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, বনী ইস্রাঈল মিসর ছেড়ে যাবার সময় অবশ্যই তার কফিনের বাক্স সাথে নিয়ে যাবে। আর যেহেতু তা নেয়া হয়নি, সেহেতু পথ হারিয়ে যাচ্ছে। তখন ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর কফিনের সন্ধান করা হল, কেউই তার হদিস দিতে পারল না শুধু এক বৃদ্ধা ব্যতীত। কিন্তু সে শর্ত সাপেক্ষে বলতে রাজী হল। সে জান্নাতে মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-এর সাথে থাকার শর্ত দিল। মূসা 'আলাইহিস্ সালাম কিছুতেই রাজী হন না। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্র নির্দেশে মূসা 'আলাইহিস্ সালাম রাজী হলেন। তখন বৃদ্ধা এক এলাকায় সেটা দেখিয়ে দিল। সেখানে পানি ছিল। লোকজন সেই পানি সেঁচে ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর কফিনের বাক্স বের করে আনলে সমস্ত পথ স্পষ্ট হয়ে যায়। [ইবনে হিব্বানঃ ৭২৩, মুস্তাদরাকে হাকিমঃ ২/৪০৪-৪০৫, ৫৭১,৫৭২]

ইসরাঈলকে করেছিলাম এসবের অধিকারী(১) ।

৬০. অতঃপর তারা সূর্যোদয়কালে ওদের পিছনে এসে পড়ল ।

فَأَتْبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ ۝٦٠

৬১. অতঃপর যখন দু'দল পরস্পরকে দেখল, তখন মূসার সঙ্গীরা বলল, 'আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম!'

فَلَمَّا تَرَاءَا الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ۝٦١

৬২. মূসা বললেন, 'কখনই নয়! আমার সঙ্গে আছেন আমার রব(২); সত্বর তিনি আমাকে পথনির্দেশ করবেন ।'

قَالَ كَلَّا ۖ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ۝٦٢

৬৩. অতঃপর আমরা মূসার প্রতি ওহী করলাম যে, আপনার লাঠি দ্বারা সাগরে আঘাত করুন । ফলে তা বিভক্ত হয়ে প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বতের মত হয়ে গেল(৩);

فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ ۖ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ۝٦٣

৬৪. আর আমরা সেখানে কাছে নিয়ে এলাম অন্য দলটিকে,

وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ ۝٦٤

---

(১) এ আয়াতে বাহ্যতঃ বলা হয়েছে যে, ফির'আউন সম্প্রদায়ের পরিত্যক্ত সম্পত্তি, বাগ-বাগিচা ও ধন-ভাণ্ডারের মালিক তাদের নিমজ্জিত হওয়ার পর বনী ইস্‌রাঈলকে করে দেয়া হয় । [তাবারী,কুরতুবী] এই ঘটনাটি কুরআনুল কারীমের একাধিক সূরায় ব্যক্ত হয়েছে । যেমন, সূরা আল-আ'রাফের ১৩৬ ও ১৩৭ নং আয়াতে, সূরা আল-কাসাসের ৫ নং আয়াতে, সূরা আদ্-দোখানের ২৫ থেকে ২৮ নং আয়াতসমূহে এবং সূরা আশ্-শু'আরার আলোচ্য ৫৯ নং আয়াতে এ ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে ।

(২) পশ্চাদ্ধাবনকারী ফির'আউনী সৈন্য বাহিনী যখন তাদের সামনে এসে যায়, তখন সমগ্র বনী ইস্‌রাঈল চিৎকার করে উঠল, হায়! আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম! আর ধরা পড়ার মধ্যে সন্দেহ ও দেরীই বা কি ছিল, পশ্চাতে অতিবিক্রম সেনাবাহিনী এবং সম্মুখে সমুদ্র-অন্তরায় । এই পরিস্থিতি মূসা 'আলাইহিস্ সালাম-এরও অগোচরে ছিল না । কিন্তু তিনি দৃঢ়তার হিমালয় হয়ে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিশ্রুতিতে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন । তিনি তখনো সজোরে বলেনঃ كَلَّا আমরা তো ধরা পড়তে পারি না । ﴿إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ আমার সাথে আমার পালনকর্তা আছেন । তিনি আমাদের পথ বলে দেবেন । [দেখুন-কুরতুবী]

(৩) অর্থাৎ পানি উভয় দিকে খুব উঁচু উঁচু পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে গিয়েছিল । [কুরতুবী]

৬৫. এবং আমরা উদ্ধার করলাম মূসা ও তার সঙ্গী সকলকে,

وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥٓ أَجْمَعِينَ ﴿٦٥﴾

৬৬. তারপর নিমজ্জিত করলাম অন্য দলটিকে ।

ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْـَٔاخَرِينَ ﴿٦٦﴾

৬৭. এতে তো অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই মুমিন নয় ।

إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٦٧﴾

৬৮. আর আপনার রব, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু ।

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٦٨﴾

পঞ্চম রুকূ’

৬৯. আর আপনি তাদের কাছে ইব্‌রাহীমের বৃত্তান্ত বর্ণনা করুন ।

وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَٰهِيمَ ﴿٦٩﴾

৭০. যখন তিনি তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, ‘তোমরা কিসের ‘ইবাদাত কর?’

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِۦ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٧٠﴾

৭১. তারা বলল, ‘আমরা মূর্তির পূজা করি সুতরাং আমরা নিষ্ঠার সাথে সেগুলোকে আঁকড়ে থাকব ।’

قَالُوا۟ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَٰكِفِينَ ﴿٧١﴾

৭২. তিনি বললেন, ‘তোমরা যখন আহ্বান কর তখন তারা তোমাদের আহ্বান শোনে কি?’

قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿٧٢﴾

৭৩. ‘অথবা তারা কি তোমাদের উপকার কিংবা অপকার করতে পারে?’

أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴿٧٣﴾

৭৪. তারা বলল, ‘না, তবে আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে পেয়েছি, তারা এরূপই করত ।’

قَالُوا۟ بَلْ وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٧٤﴾

৭৫. ইবরাহীম বললেন, ‘তোমরা কি ভেবে দেখেছ, যাদের ‘ইবাদাত তোমরা করে থাক,

قَالَ أَفَرَءَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٧٥﴾

৭৬. 'তোমরা এবং তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষরা!	اَنۡتُمۡ وَاٰبَآؤُكُمُ الۡاَقۡدَمُوۡنَ ﴿٧٦﴾
৭৭. সৃষ্টিকুলের রব ব্যতীত এরা সবাই তো আমার শত্রু।	فَاِنَّهُمۡ عَدُوٌّ لِّیۡۤ اِلَّا رَبَّ الۡعٰلَمِیۡنَ ﴿٧٧﴾
৭৮. 'যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনিই আমাকে হেদায়াত দিয়েছেন।	الَّذِیۡ خَلَقَنِیۡ فَهُوَ یَهۡدِیۡنِ ﴿٧٨﴾
৭৯. আর 'তিনিই আমাকে খাওয়ান ও পান করান।	وَالَّذِیۡ هُوَ یُطۡعِمُنِیۡ وَیَسۡقِیۡنِ ﴿٧٩﴾
৮০. 'এবং রোগাক্রান্ত হলে তিনিই আমাকে আরোগ্য দান করেন[১];	وَاِذَا مَرِضۡتُ فَهُوَ یَشۡفِیۡنِ ﴿٨٠﴾
৮১. 'আর তিনিই আমার মৃত্যু ঘটাবেন, তারপর আমাকে পুনর্জীবিত করবেন।	وَالَّذِیۡ یُمِیۡتُنِیۡ ثُمَّ یُحۡیِیۡنِ ﴿٨١﴾
৮২. 'এবং যার কাছে আশা করি যে, তিনি কিয়ামতের দিন আমার অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন।	وَالَّذِیۡۤ اَطۡمَعُ اَنۡ یَّغۡفِرَ لِیۡ خَطِیۡٓـَٔتِیۡ یَوۡمَ الدِّیۡنِ ﴿٨٢﴾
৮৩. 'হে আমার রব! আমাকে প্রজ্ঞা দান করুন এবং সৎকর্মশীলদের সাথে মিলিয়ে দিন।	رَبِّ هَبۡ لِیۡ حُكۡمًا وَّاَلۡحِقۡنِیۡ بِالصّٰلِحِیۡنَ ﴿٨٣﴾
৮৪. 'আর আমাকে পরবর্তীদের মধ্যে যশস্বী করুন[২],	وَاجۡعَلۡ لِّیۡ لِسَانَ صِدۡقٍ فِی الۡاٰخِرِیۡنَ ﴿٨٤﴾

(১) অর্থাৎ আমি যখন অসুস্থ হই, তখন তিনিই আমাকে আরোগ্য দান করেন। এখানে লক্ষণীয় ব্যাপার যে, রোগাক্রান্ত হওয়াকে ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম তার নিজের দিকে সম্পর্কযুক্ত করেছেন, যদিও আল্লাহ্‌র নির্দেশেই সবকিছু হয়। এটাই হল আল্লাহ্‌র সাথে আদাব বা শিষ্টাচার। [দেখুন-বাগভী,কুরতুবী]

(২) এ আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ আমাকে এমন সুন্দর তরিকা ও উত্তম নিদর্শন দান করুন, যা কেয়ামত পর্যন্ত মানবজাতি অনুসরণ করে এবং আমাকে উৎকৃষ্ট আলোচনা ও সদ্‌গুণাবলী দ্বারা স্মরণ করে। [ফাতহুল কাদীর,বাগভী,কুরতুবী]

৮৫. 'এবং আমাকে সুখময় জান্নাতের অধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন,

وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ﴿٨٥﴾

৮৬. 'আর আমার পিতাকে ক্ষমা করুন, তিনি তো পথভ্রষ্টদের শামিল ছিলেন(১) ।

وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ ﴿٨٦﴾

৮৭. 'এবং আমাকে লাঞ্ছিত করবেন না পুনরুত্থানের দিনে(২)

وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿٨٧﴾

---

(১) পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে, ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ "আত্মীয়-স্বজন হলেও মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী এবং মু'মিনদের জন্য সংগত নয় যখন এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, নিশ্চিতই ওরা জাহান্নামী" । [সূরা আত্-তাওবাঃ ১১৩] কুরআনুল কারীমের এই ফরমান জারি হওয়ার পর এখন যার মৃত্যু কুফরের উপর নিশ্চিত ও অবধারিত; তার জন্য মাগফেরাতের দো'আ করা অবৈধ ও হারাম । কিন্তু এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইব্রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম-এর দো'আ উল্লেখ করে বলেছেনঃ ﴿وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ﴾ "আর আমার পিতাকে ক্ষমা করে দিন তিনি তো পথভ্রষ্টদের শামিল ছিলেন" । তা থেকে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, উপরোক্ত নিষেধাজ্ঞার পর ইব্রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম তার মুশরিক পিতার জন্য কেন মাগফেরাতের দো'আ করলেন? আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন নিজেই কুরআনুল কারীমে এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন । তিনি বলেনঃ ﴿وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ﴾ [সূরা আত্-তাওবাঃ ১১৪] -অর্থাৎ " ইব্রাহীম তাঁর পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন, তাকে এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বলে; তারপর যখন এটা তাঁর কাছে সুস্পষ্ট হল যে, সে আল্লাহ্র শত্রু তখন ইব্রাহীম তার থেকে নিজেকে বিমুক্ত ঘোষণা করলেন । ইব্রাহীম তো কোমল হৃদয় ও সহনশীল ।"

(২) অর্থাৎ ইব্রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম বললেনঃ 'হে আমার রব! যেদিন সমস্ত সৃষ্টিজগতকে পুনরুত্থান করা হবে, সেই কেয়ামতের দিন আমাকে লজ্জিত করবেন না ।'হাদীসে এসেছে, ইব্রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম কেয়ামতের দিন তার পিতা আজরকে তার মুখে ধুলিমলিন কুৎসিত অবস্থায় দেখতে পাবেন । তখন ইব্রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম তাকে বলবেনঃ আমি কি আপনাকে বলিনি যে, আমার অবাধ্য হবেন না? তখন তার বাবা তাকে বলবেনঃ আমি আজ তোমার অবাধ্য হব না । তখন ইব্রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম বলবেনঃ হে রব! আপনি আমাকে পুনরুত্থান দিনে লজ্জিত না করার ওয়াদা করেছেন । আমার পিতার ধ্বংসের চেয়ে লজ্জাজনক ব্যাপার আর কি হতে পারে? তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেনঃ আমি কাফেরদের উপর জান্নাত হারাম করে দিয়েছি । তারপর বলা হবেঃ হে ইব্রাহীম! আপনার পায়ের

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ ﴿٨٨﴾

৮৮. 'যে দিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবে না;

إِلَّا مَنْ أَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ﴿٨٩﴾

৮৯. 'সে দিন উপকৃত হবে শুধু সে, যে আল্লাহ্‌র কাছে আসবে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ নিয়ে ।'

وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿٩٠﴾

৯০. আর মুত্তাকীদের নিকটবর্তী করা হবে জান্নাত,

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِلْغٰوِيْنَ ﴿٩١﴾

৯১. এবং পথভ্রষ্টদের জন্য উন্মোচিত করা হবে জাহান্নাম[১];

وَقِيْلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ﴿٩٢﴾

৯২. তাদেরকে বলা হবে, 'তারা কোথায়, তোমরা যাদের 'ইবাদাত করতে---

مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۗ هَلْ يَنْصُرُوْنَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُوْنَ ﴿٩٣﴾

৯৩. 'আল্লাহ্‌র পরিবর্তে? তারা কি তোমাদের সাহায্য করতে পারে অথবা তারা কি আত্মরক্ষা করতে সক্ষম?'

فَكُبْكِبُوْا فِيْهَا هُمْ وَالْغَاوٗنَ ﴿٩٤﴾

৯৪. অতঃপর তাদেরকে এবং পথ ভ্রষ্টকারীদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে অধোমুখী করে[২],

---

নীচে কি? তখন তিনি তাকালে দেখতে পাবেন বিদঘুটে কুৎসিত হায়েনা জাতীয় এক প্রাণী । তখন তার চার পা ধরে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে । (অর্থাৎ সে এমন ঘৃণিত হবে যে, ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম তার জন্য কথা বলতে চাইবেন না ।) [বুখারীঃ ৩৩৫০]

(১) অর্থাৎ একদিকে মুত্তাকিরা জান্নাতে প্রবেশ করার আগেই দেখতে থাকবে, আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে কেমন নিয়ামতে পরিপূর্ণ জায়গায় তারা যাবে । অন্যদিকে পথভ্রষ্টরা তখনো হাশরের ময়দানেই অবস্থান করবে । যে জাহান্নামে তাদের গিয়ে থাকতে হবে তার ভয়াবহ দৃশ্য তাদের সামনে উপস্থাপিত করা হবে । [দেখুন-ফাতহুল কাদীর,কুরতুবী]

(২) মূলে كُبْكِبُوا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে । এর মধ্যে দু'টি অর্থ নিহিত । এক, একজনের উপর অন্য একজনকে ধাক্কা দিয়ে অধোমুখী করে ফেলে দেয়া হবে । দুই, তারা জাহান্নামের গর্তের তলদেশ পর্যন্ত গড়িয়ে যেতে থাকবে । [দেখুন-কুরতুবী]

৯৫. এবং ইব্‌লীসের বাহিনীর সকলকেও । وَجُنُوْدُ اِبْلِيْسَ اَجْمَعُوْنَ ۝٩٥

৯৬. তারা সেখানে বিতর্কে লিপ্ত হয়ে বলবে, قَالُوْا وَهُمْ فِيْهَا يَخْتَصِمُوْنَ ۝٩٦

৯৭. 'আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা তো স্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত ছিলাম', تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝٩٧

৯৮. 'যখন আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টিকুলের রব-এর সমকক্ষ গণ্য করতাম । اِذْ نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝٩٨

৯৯. 'আর আমাদেরকে কেবল দুস্কৃতিকারীরাই পথভ্রষ্ট করেছিল; وَمَآ اَضَلَّنَآ اِلَّا الْمُجْرِمُوْنَ ۝٩٩

১০০. 'অতএব আমাদের কোন সুপারিশকারী নেই । فَمَا لَنَا مِنْ شٰفِعِيْنَ ۝١٠٠

১০১. এবং কোন সহৃদয় বন্ধুও নেই । وَلَا صَدِيْقٍ حَمِيْمٍ ۝١٠١

১০২. 'হায়, যদি আমাদের একবার ফিরে যাওয়ার সুযোগ ঘটত, তাহলে আমরা মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম[১]!' فَلَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝١٠٢

১০৩. এতে তো অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই মুমিন নয় । اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝١٠٣

১০৪. আর আপনার রব, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু । وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝١٠٤

ষষ্ঠ রুকূ'

১০৫. নূহের সম্প্রদায় রাসূলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল । كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوْحِ ِۨ الْمُرْسَلِيْنَ ۝١٠٥

১০৬. যখন তাদের ভাই নূহ তাদেরকে বলেছিলেন, 'তোমরা কি তাকওয়া اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ نُوْحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ۝١٠٦

(১) এ আকাংখার জবাবও কুরআনের এভাবে দেয়া হয়েছে, "যদি তাদেরকে পূর্ববর্তী জীবনে ফিরিয়ে দেয়া হয় তাহলে তারা তাই করতে থাকবে যা করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে ।" [সূরা আল-আন'আম: ২৮]

অবলম্বন করবে না?

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٠٧﴾

১০৭. 'আমি তো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল।

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٠٨﴾

১০৮. 'অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর[১]।

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠٩﴾

১০৯. 'আর আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না; আমার পুরস্কার তো সৃষ্টিকুলের রব-এর কাছেই আছে।

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١١٠﴾

১১০. 'কাজেই তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর।'

قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ ﴿١١١﴾

১১১. তারা বলল, 'আমরা কি তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব অথচ ইতরজনেরা তোমার অনুসরণ করছে?'

قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٢﴾

১১২. নূহ্ বললেন, 'তারা কী করত তা আমার জানার কি দরকার?'

إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿١١٣﴾

১১৩. 'তাদের হিসেব গ্রহণ তো আমার রব-এরই কাজ; যদি তোমরা বুঝতে!

وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٤﴾

১১৪. আর আমি তো 'মুমিনদেরকে তাড়িয়ে দেয়ার নই।

إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿١١٥﴾

১১৫. 'আমি তো শুধু একজন স্পষ্ট সতর্ককারী।'

---

(১) আয়াতটি তাকীদ বা গুরুত্ব প্রকাশের জন্য এবং একথা ব্যক্ত করার জন্য আনা হয়েছে যে, রাসূলের আনুগত্য ও আল্লাহ্‌কে ভয় করার জন্য কেবল রাসূলের বিশ্বস্ততা ও ন্যায়পরায়ণতা অথবা কেবল প্রচারকার্যে প্রতিদান না চাওয়াই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু যে রাসূলের মধ্যে সবগুলো গুণই বিদ্যমান আছে, তার আনুগত্য করা ও আল্লাহ্‌কে ভয় করা তো আরো অপরিহার্য হয়ে পড়ে। [ফাতহুল কাদীর]

قَالُوْا لَىِٕنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰنُوْحُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمَرْجُوْمِيْنَ ﴿١١٦﴾

১১৬. তারা বলল, ‘হে নূহ্! তুমি যদি নিবৃত্ত না হও তবে তুমি অবশ্যই পাথরের আঘাতে নিহতদের মধ্যে শামিল হবে।’

قَالَ رَبِّ اِنَّ قَوْمِيْ كَذَّبُوْنِ ﴿١١٧﴾

১১৭. নূহ্ বললেন, ‘হে আমার রব! আমার সম্প্রদায় তো আমার উপর মিথ্যারোপ করেছে।

فَافْتَحْ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَّنَجِّنِيْ وَمَنْ مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١١٨﴾

১১৮. ‘কাজেই আপনি আমার ও তাদের মধ্যে স্পষ্ট মীমাংসা করে দিন এবং আমাকে ও আমার সাথে যেসব মুমিন আছে, তাদেরকে রক্ষা করুন[১]।’

فَاَنْجَيْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ﴿١١٩﴾

১১৯. অতঃপর আমরা তাকে ও তার সঙ্গে যারা ছিল, তাদেরকে রক্ষা করলাম বোঝাই নৌযানে[২]।

ثُمَّ اَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبٰقِيْنَ ﴿١٢٠﴾

১২০. এরপর আমরা বাকী সবাইকে ডুবিয়ে দিলাম।

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٢١﴾

১২১. এতে তো অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই ঈমানদার নয়।

وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٢٢﴾

১২২. আর আপনার রব, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

---

(১) অর্থাৎ নূহ্ ‘আলাইহিস্ সালাম দো‘আ করলেন যে, হে আল্লাহ্! আপনি আমার ও আমার জাতির মধ্যে ফায়সালা করে দিন এবং আমাকে ও আমার সাথী ঈমানদারদেরকে রক্ষা করুন। [দেখুন-মুয়াস্সার] অন্যান্য সূরাসমূহেও নূহ্ ‘আলাইহিস্ সালাম-এর এ দো‘আ এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তার জবাব উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, সূরা আল-কামারঃ ১০-১৪।

(২) “বোঝাই নৌযান” এর অর্থ হচ্ছে, এ নৌকাটি সকল মু’মিন ও সকল প্রাণীতে পরিপূর্ণ ছিল। [দেখুনঃ ফাতহুল কাদীর, সা‘দী] পূর্বেই এ প্রাণীদের এক একটি জোড়া সংগে নেবার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। এ সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন সূরা হূদ ৪০ আয়াত।

সপ্তম রুকূ'

১২৩. 'আদ সম্প্রদায় রাসূলদের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল। كَذَّبَتْ عَادُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٣﴾

১২৪. যখন তাদের ভাই হূদ তাদেরকে বললেন, 'তোমরা কি তাকওয়া অবলম্বন করবে না? إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٢٤﴾

১২৫. 'আমি তো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল। إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٢٥﴾

১২৬. 'অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর। فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٢٦﴾

১২৭. 'আর আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না, আমার পুরস্কার তো সৃষ্টিকুলের রব-এর কাছেই। وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٢٧﴾

১২৮. 'তোমরা কি প্রতিটি উচ্চ স্থানে(১) স্তম্ভ নির্মাণ করছ নিরর্থক(২)? أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ ﴿١٢٨﴾

১২৯. 'আর তোমরা প্রাসাদসমূহ(৩) নির্মাণ করছ যেন তোমরা স্থায়ী হবে(৪)। وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴿١٢٩﴾

---

(১) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমার মতে ريع উচ্চ স্থানকে বলা হয়। মুজাহিদ ও অনেক তাফসীরবিদের মতে ريع দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী পথকে বলা হয়। [কুরতুবী]

(২) آيَةً -এর আসল অর্থ নিদর্শন। এস্থলে সুউচ্চ স্মৃতিসৌধ বোঝানো হয়েছে। تَعْبَثُونَ শব্দটি عبث থেকে উদ্ভুত। এর অর্থ অযথা বা যাতে কোন প্রকার উপকার নেই। এখানে অর্থ এই যে, তারা অযথা সুউচ্চ অট্টালিকা নির্মাণ করত, যার কোন প্রয়োজন ছিল না। এতে শুধু গর্ব করাই উদ্দেশ্য থাকত। [ইবন কাসীর]

(৩) مَصَانِعَ শব্দটি مَصْنَعٌ -এর বহুবচন। কাতাদাহ্ বলেনঃ مَصَانِعَ বলে পানির চৌবাচ্চা বোঝানো হয়েছে; কিন্তু মুজাহিদ বলেন যে, এখানে সুদৃঢ় প্রাসাদ বোঝানো হয়েছে। [ইবন কাসীর]

(৪) ﴿لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ﴾ ইমাম বুখারী সহীহ্ বুখারীতে বর্ণনা করেন যে, এখানে لعل শব্দটি تشبيه অর্থাৎ উদাহরণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ইবনে আব্বাস এর অনুবাদে বলেনঃ كَأَنَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ -অর্থাৎ যেন তোমরা চিরকাল থাকবে। [কুরতুবী]

وَاِذَا بَطَشۡتُمۡ بَطَشۡتُمۡ جَبَّارِیۡنَ ﴿۱۳۰﴾

১৩০. আর যখন তোমরা আঘাত হান তখন আঘাত হেনে থাক স্বেচ্ছাচারী হয়ে।

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِیۡعُوۡنِ ﴿۱۳۱﴾

১৩১. সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর।

وَاتَّقُوا الَّذِیۡۤ اَمَدَّکُمۡ بِمَا تَعۡلَمُوۡنَ ﴿۱۳۲﴾

১৩২. আর তোমরা তাঁর তাকওয়া অবলম্বন কর যিনি তোমাদেরকে দান করেছেন সে সমুদয়, যা তোমরা জান।

اَمَدَّکُمۡ بِاَنۡعَامٍ وَّ بَنِیۡنَ ﴿۱۳۳﴾

১৩৩. তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন চতুষ্পদ জন্তু ও পুত্র সন্তান,

وَ جَنّٰتٍ وَّ عُیُوۡنٍ ﴿۱۳۴﴾

১৩৪. এবং উদ্যান ও প্রস্রবণ;

اِنِّیۡۤ اَخَافُ عَلَیۡکُمۡ عَذَابَ یَوۡمٍ عَظِیۡمٍ ﴿۱۳۵﴾

১৩৫. 'আমি তো তোমাদের জন্য আশংকা করি মহাদিনের শাস্তির।'

قَالُوۡا سَوَآءٌ عَلَیۡنَاۤ اَوَعَظۡتَ اَمۡ لَمۡ تَکُنۡ مِّنَ الۡوٰعِظِیۡنَ ﴿۱۳۶﴾

১৩৬. তারা বলল, 'তুমি উপদেশ দাও বা না-ই দাও, উভয়ই আমাদের জন্য সমান।

اِنۡ هٰذَاۤ اِلَّا خُلُقُ الۡاَوَّلِیۡنَ ﴿۱۳۷﴾

১৩৭. 'এটা তো কেবল পূর্ববর্তীদেরই স্বভাব।

وَ مَا نَحۡنُ بِمُعَذَّبِیۡنَ ﴿۱۳۸﴾

১৩৮. 'আমরা মোটেই শাস্তিপ্রাপ্ত হবো না।'

فَکَذَّبُوۡهُ فَاَهۡلَکۡنٰهُمۡ ؕ اِنَّ فِیۡ ذٰلِکَ لَاٰیَۃً ؕ وَ مَا کَانَ اَکۡثَرُهُمۡ مُّؤۡمِنِیۡنَ ﴿۱۳۹﴾

১৩৯. সুতরাং তারা তার প্রতি মিথ্যারোপ করল ফলে আমরা তাদেরকে ধ্বংস করলাম। এতে তো অবশ্যই আছে নিদর্শন; কিন্তু তাদের অধিকাংশই মুমিন নয়[১]।

وَ اِنَّ رَبَّکَ لَهُوَ الۡعَزِیۡزُ الرَّحِیۡمُ ﴿۱۴۰﴾

১৪০. আর আপনার রব, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

---

(১) আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন যে, তারা তাদের নবী হুদ আলাইহিস সালাম এর উপর মিথ্যারোপ করেছিল, ফলে আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। [ইবন কাসীর]

অষ্টম রুকূ'

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٤١﴾

১৪১. সামূদ সম্প্রদায় রাসূলগণের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল।

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوْهُمْ صٰلِحٌ أَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٤٢﴾

১৪২. যখন তাদের ভাই সালিহ্ তাদেরকে বললেন, 'তোমরা কি তাকওয়া অবলম্বন করবে না?

إِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ أَمِيْنٌ ﴿١٤٣﴾

১৪৩. 'আমি তো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল।

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوْنِ ﴿١٤٤﴾

১৪৪. সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর,

وَمَا أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٤٥﴾

১৪৫. 'আর আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না, আমার প্রতিদান তো সৃষ্টিকুলের রব-এর কাছেই আছে।

أَتُتْرَكُوْنَ فِيْ مَا هٰهُنَا أٰمِنِيْنَ ﴿١٤٦﴾

১৪৬. 'তোমাদেরকে কি নিরাপদ অবস্থায় ছেড়ে রাখা হবে, যা এখানে আছে তাতে-

فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ﴿١٤٧﴾

১৪৭. 'উদ্যানে, প্রস্রবণে

وَّزُرُوْعٍ وَّنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيْمٌ ﴿١٤٨﴾

১৪৮. 'ও শস্যক্ষেত্রে এবং সুকোমল গুচ্ছ বিশিষ্ট খেজুর বাগানে?

وَتَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا فٰرِهِيْنَ ﴿١٤٩﴾

১৪৯. 'আর তোমরা নৈপুণ্যের সাথে পাহাড় কেটে ঘর নির্মাণ করছ।

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوْنِ ﴿١٥٠﴾

১৫০. সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর

وَلَا تُطِيْعُوْٓا أَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿١٥١﴾

১৫১. আর তোমরা সীমালংঘনকারীদের নির্দেশের আনুগত্য করো না;

الَّذِيْنَ يُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ ﴿١٥٢﴾

১৫২. 'যারা যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে এবং সংশোধন করে না।'

قَالُوْٓا اِنَّمَآ اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ ﴿١٥٣﴾

১৫৩. তারা বলল, 'তুমি তো জাদুগ্রস্তদের অন্যতম।

مَآ اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۚۖ فَاْتِ بِاٰيَةٍ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١٥٤﴾

১৫৪. 'তুমি তো আমাদের মতই একজন মানুষ, কাজেই তুমি যদি সত্যবাদী হও তবে একটি নিদর্শন উপস্থিত কর।'

قَالَ هٰذِهٖ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَّلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ﴿١٥٥﴾

১৫৫. সালিহ্ বললেন, 'এটা একটা উষ্ট্রী, এর জন্য আছে পানি পানের পালা এবং তোমাদের জন্য আছে নির্ধারিত দিনে পানি পানের পালা;

وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿١٥٦﴾

১৫৬. 'আর তোমরা এর কোন অনিষ্ট সাধন করো না; করলে মহাদিনের শাস্তি তোমাদের উপর আপতিত হবে।'

فَعَقَرُوْهَا فَاَصْبَحُوْا نٰدِمِيْنَ ﴿١٥٧﴾

১৫৭. অতঃপর তারা সেটাকে হত্যা করল, পরিণামে তারা অনুতপ্ত হল।

فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٥٨﴾

১৫৮. অতঃপর শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করল। এতে অবশ্যই রয়েছে নিদর্শন, কিন্তু তাদের অধিকাংশই মুমিন নয়।

وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٥٩﴾

১৫৯. আর আপনার রব, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

নবম রুকূ'

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطِ ِۨالْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٦٠﴾

১৬০. লূতের সম্প্রদায় রাসূলগণের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল,

اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ لُوْطٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٦١﴾

১৬১. যখন তাদের ভাই লূত তাদেরকে বললেন, 'তোমরা কি তাকওয়া অবলম্বন করবে না?

১৬২. 'আমি তো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল।

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٦٢﴾

১৬৩. 'কাজেই তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর।

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٦٣﴾

১৬৪. 'আর আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না, আমার প্রতিদান তো সৃষ্টিকুলের রব-এর কাছেই আছে।

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٤﴾

১৬৫. 'সৃষ্টিকুলের মধ্যে তো তোমরাই কি পুরুষের সাথে উপগত হও?

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٥﴾

১৬৬. 'আর তোমাদের রব তোমাদের জন্য যে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন তাদেরকে তোমরা বর্জন করে থাক। বরং তোমরা তো এক সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।'

وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٦﴾

১৬৭. তারা বলল, 'হে লূত! তুমি যদি নিবৃত্ত না হও, তবে অবশ্যই তুমি নির্বাসিত হবে।'

قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ ﴿١٦٧﴾

১৬৮. লূত বললেন, 'আমি অবশ্যই তোমাদের এ কাজের ঘৃণাকারী।

قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ ﴿١٦٨﴾

১৬৯. 'হে আমার রব! আমাকে এবং আমার পরিবার-পরিজনকে, তারা যা করে, তা থেকে রক্ষা করুন।'

رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٦٩﴾

১৭০. তারপর আমরা তাকে এবং তার পরিবার-পরিজন সকলকে রক্ষা করলাম

فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٧٠﴾

إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغٰبِرِينَ ﴿١٧١﴾

১৭১. এক বৃদ্ধা ছাড়া[১], যে ছিল পিছনে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

ثُمَّ دَمَّرْنَا الْاٰخَرِينَ ﴿١٧٢﴾

১৭২. তারপর আমরা অপর সকলকে ধ্বংস করলাম।

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۚ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ﴿١٧٣﴾

১৭৩. আর আমরা তাদের উপর শাস্তি মূলক বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম, ভীতি প্রদর্শিতদের জন্য এ বৃষ্টি ছিল কত নিকৃষ্ট[২]!

إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٧٤﴾

১৭৪. এতে তো অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই মুমিন নয়।

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٧٥﴾

১৭৫. আর আপনার রব, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

দশম রুকূ'

كَذَّبَ أَصْحٰبُ لْـَٔيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٧٦﴾

১৭৬. আইকাবাসীরা[৩] রাসূলগণের প্রতি

---

(১) এখানে عَجُوز বলে লূত 'আলাইহিস্ সালাম-এর স্ত্রীকে বোঝানো হয়েছে। সে কওমে লূতের এই কুকর্মে সম্মত ছিল এবং কাফের ছিল। সূরা আত-তাহরীমে নূহ ও লূত আলাইহিমাসসালামের স্ত্রীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে: "এ মহিলা দু'টি আমার দু'জন সৎ বান্দার গৃহে ছিল। কিন্তু তারা তাঁদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে" [১০] অর্থাৎ তারা উভয়ই ছিল ঈমান শূন্য এবং নিজেদের সৎ স্বামীদের সাথে সহযোগিতা করার পরিবর্তে তারা তাদের কাফের জাতির সহযোগী হয়। এজন্য আল্লাহ যখন লূতের জাতির উপর আযাব নাযিল করার ফায়সালা করলেন এবং লূতকে নিজের পরিবার পরিজনদের নিয়ে এ এলাকা ত্যাগ করার হুকুম দিলেন তখন সাথে সাথে নিজের স্ত্রীকে সংগে না নেবার হুকুমও দিলেন: "কাজেই কিছু রাত থাকতেই আপনি নিজের পরিবার-পরিজনদেরকে সাথে নিয়ে বের হয়ে যান এবং আপনাদের কেউ যেন পেছন ফিরে না তাকায়। কিন্তু আপনার স্ত্রীকে সংগে করে নিয়ে যাবেন না। তাদের ভাগ্যে যা ঘটবে তারও তাই ঘটবে।" [সূরা হূদ: ৮১]

(২) কোন কোন মুফাসসিরের মতে, এ বৃষ্টি বলতে এখানে পানির বৃষ্টি বুঝানো হয়নি, বরং পাথর বৃষ্টির কথা বুঝানো হয়েছে। [দেখুন-তবারী,মুয়াস্‌সার]

(৩) ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম-এর পরে আল্লাহ্ তা'আলা শু'আইব 'আলাইহিস্ সালাম-কে পাঠান। তার জাতি ছিল মাদ্‌ইয়ান জাতি। [সূরা আল-আ'রাফঃ ৮৫] মাদ্‌ইয়ান

মিথ্যারোপ করেছিল,

إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ۝١٧٧

১৭৭. যখন শু'আইব তাদেরকে বলেছিলেন, 'তোমরা কি তাকওয়া অবলম্বন করবে না?

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۝١٧٨

১৭৮. আমি তো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল।

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۝١٧٩

১৭৯. 'কাজেই তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর।

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝١٨٠

১৮০. 'আর আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না। আমার পুরস্কার তো সৃষ্টিকুলের রব-এর কাছেই আছে।

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۝١٨١

১৮১. 'মাপে পূর্ণ মাত্রায় দেবে; আর যারা মাপে কম দেয় তোমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না

وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۝١٨٢

১৮২. 'এবং ওজন করবে সঠিক দাঁড়িপাল্লায়।

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝١٨٣

১৮৩. 'আর লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিও না এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়িও না।

وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ ۝١٨٤

১৮৪. আর তাঁর তাকওয়া অবলম্বন কর যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের আগে

ছিল শু'আইব 'আলাইহিস্ সালাম-এর জাতির এক পূর্বপুরুষের নাম। অপরদিকে কখনো কখনো পবিত্র কুরআনে শুয়াইব 'আলাইহিস্ সালাম-এর কওম সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'আসহাবুল আইকাহ্' বা গাছওয়ালাগণ। [সূরা আশ্-শুয়ারাঃ ১৭৬] অধিকাংশ মুফাস্সিরদের মতে আইকাবাসীদ্বারা মাদ্ইয়ান জাতিকে বুঝানো হয়েছে। [আদওয়া আল-বায়ান]

যারা গত হয়েছে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন ।'

১৮৫. তারা বলল, 'তুমি তো জাদুগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত;

قَالُوٓا۟ إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ﴿١٨٥﴾

১৮৬. 'আর তুমি তো আমাদের মতই একজন মানুষ, আমরা তো তোমাকে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত মনে করি ।

وَمَآ أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ﴿١٨٦﴾

১৮৭. 'সুতরাং তুমি যদি সত্যবাদী হও তবে আকাশের এক খণ্ড আমাদের উপর ফেলে দাও ।'

فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿١٨٧﴾

১৮৮. তিনি বললেন, 'আমার রব ভাল করে জানেন তোমরা যা কর ।'

قَالَ رَبِّىٓ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨٨﴾

১৮৯. সুতরাং তারা তার প্রতি মিথ্যারোপ করল, ফলে তাদেরকে মেঘাচ্ছন্ন দিনের শাস্তি গ্রাস করল[১] । এ তো ছিল এক ভীষণ দিনের শাস্তি!

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٨٩﴾

১৯০. এতে তো অবশ্যই রয়েছে নিদর্শন[২],

إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٩٠﴾

---

(১) এই আয়াতের ঘটনা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা এই সম্প্রদায়ের উপর তীব্র গরম চাপিয়ে দেন । ফলে তারা গৃহের ভেতরে ও বাইরে কোথাও শান্তি পেত না । এরপর তিনি তাদের নিকটবর্তী এক মাঠের উপর গাঢ় কালো মেঘ প্রেরণ করেন । এই মেঘের নীচে সুশীতল বায়ু ছিল । গরমে অস্থির সম্প্রদায় দৌড়ে দৌড়ে এই মেঘের নীচে জমায়েত হয়ে গেল, তখন তাদের উপর আল্লাহ্র সুনির্ধারিত শাস্তি এসে গেল । আর তাতে তারা সবাই ধ্বংস হয়ে গেল । [মুয়াস্সার]

(২) শু'আইব 'আলাইহিস্ সালাম-এর জাতির ধ্বংসের কথা পবিত্র কুরআনে বিভিন্নভাবে এসেছে । এর কারণ হল, শু'আইব 'আলাইহিস্ সালাম-এর জাতির অপরাধ ছিল বিভিন্ন প্রকার । প্রত্যেক প্রকার অপরাধের জন্য তাদের শাস্তি হয়েছিল । সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাদের কোন অপরাধের কথা উল্লেখ করেছেন, তখন সেখানে সে অপরাধ মোতাবেক শাস্তির কথাও উল্লেখ করেছেন । যেমন সূরা আশ্-শু'আরায় এসেছে, তারা বলেছিলঃ তুমি যদি সত্যবাদী হও তবে আমাদের জন্য আকাশের টুকরা ফেলে দাও । এর জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের শাস্তির কথা উল্লেখ করে

আর তাদের অধিকাংশই মুমিন নয়।

১৯১. আর আপনার রব, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٩١﴾

এগারতম রুকূ'

১৯২. আর নিশ্চয় এটা (আল-কুরআন) সৃষ্টিকুলের রব হতে নাযিলকৃত।

وَاِنَّهٗ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٩٢﴾

১৯৩. বিশ্বস্ত রূহ (জিব্‌রাঈল) তা নিয়ে নাযিল হয়েছেন।

نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ ﴿١٩٣﴾

১৯৪. আপনার হৃদয়ে, যাতে আপনি সতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন।

عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ﴿١٩٤﴾

১৯৫. সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়[১]।

بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ ﴿١٩٥﴾

১৯৬. আর পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে অবশ্যই এর উল্লেখ আছে।

وَاِنَّهٗ لَفِيْ زُبُرِ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٩٦﴾

১৯৭. বনী ইস্‌রাঈলের আলেমগণ এ সম্পর্কে জানে---এটা কি তাদের জন্য

اَوَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ اٰيَةً اَنْ يَّعْلَمَهٗ عُلَمٰٓؤُا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ﴿١٩٧﴾

বলেনঃ তাদেরকে ছায়ার দিনে শাস্তি পেয়ে বসল। [সূরা আশ্-শু'আরাঃ ১৮৯] যা তাদের দাবীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সূরা আল-আ'রাফের ৮৮ নং আয়াতে তারা শু'আইব 'আলাইহিস্ সালাম ও তার সাথীদেরকে এমন ভয় দেখাল যে, তারা কেঁপে উঠেছিল। তারা বলেছিলঃ "হে শু'আইব! আমরা তোমাকে এবং যারা তোমার উপর ঈমান এনেছে তাদেরকে আমাদের জনপদ থেকে বের করে দেব অথবা তোমরা আমাদের দলে ফিরে আসবে।" তাদের এ কথার জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের শাস্তির কথা উল্লেখ করে বলেছেনঃ "তাদেরকে পেয়ে বসল কম্পন।" [সূরা আল-আ'রাফঃ ৯১] কিন্তু সূরা হূদের ৮৭ নং আয়াতে তারা শু'আইব 'আলাইহিস্ সালাম-এর সালাত নিয়ে ঠাট্টা করে তাকে অপমান করেছিল। সে ঠাট্টার জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের শাস্তি হিসাবে বলেছেনঃ "তাদেরকে পেয়ে বসল চিৎকার।" [সূরা হূদঃ ৯৪]

(১) আয়াত থেকে জানা গেল যে, আরবী ভাষায় লিখিত কুরআনই কুরআন। অন্য যে কোন ভাষায় কুরআনের কোন বিষয়বস্তুর অনুবাদকে কুরআন বলা হবে না। দেখুন- [ইবন কাসীর]

নিদর্শন নয়[১]?

১৯৮. আর আমরা যদি এটা কোন অনারবের উপর নাযিল করতাম

وَلَوْ نَزَّلْنٰهُ عَلٰى بَعْضِ الْاَعْجَمِيْنَ ﴿١٩٨﴾

১৯৯. এবং এটা সে তাদের কাছে পাঠ করত, তবে তারা তাতে ঈমান আনত না;

فَقَرَاَهٗ عَلَيْهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ مُؤْمِنِيْنَ ﴿١٩٩﴾

২০০. এভাবে আমরা সেটা অপরাধীদের অন্তরে সঞ্চার করেছি[২]।

كَذٰلِكَ سَلَكْنٰهُ فِيْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٢٠٠﴾

২০১. তারা এতে ঈমান আনবে না যতক্ষণ না তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেখতে পাবে;

لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ﴿٢٠١﴾

২০২. সুতরাং তা তাদের কাছে এসে পড়বে

فَيَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٢٠٢﴾

---

(১) অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের আলেমরা একথা জানে যে, কুরআন মজীদে যে শিক্ষা দেয়া হয়েছে তা ঠিক সেই একই শিক্ষা যা পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবগুলোতে দেয়া হয়েছিল। মক্কাবাসীরা কিতাবের জ্ঞান না রাখলেও আশেপাশের এলাকায় বনী ইসরাঈলের বিপুল সংখ্যক আলেম ও বিদ্বান রয়েছে। তারা জানে, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ আজ প্রথমবার তাদের সামনে কোন অভিনব ও অদ্ভুত "কথা" রাখেননি বরং হাজার হাজার বছর থেকে আল্লাহর নবীগণ এই একই কথা বারবার এনেছেন। এ নাযিলকৃত বিষয়ও সেই একই রব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে এসেছে যিনি পূর্ববর্তী কিতাবগুলো নাযিল করেছিলেন, এ কথাটি কি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ততা অর্জন করার জন্য যথেষ্ট নয়? [দেখুন-ফাতহুল কাদীর]

(২) এ আয়াতের কাছাকাছি আয়াত সূরা আল-হিজরের ১২ নং আয়াতেও এসেছে। সেখানে এর অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে। মূলতঃ অনেকেই এর অর্থ এভাবে বর্ণনা করেছেনঃ "আমরা এভাবে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করা, কুফরী করা, অস্বীকার করা এবং সীমালঙ্ঘন করাকে অপরাধীদের অন্তরে প্রবেশ করিয়ে দেই, তারা হক্ক এর প্রতি ঈমান আনবে না।" আরবী ভাষায় (سلك) শব্দের অর্থ হচ্ছে কোন জিনিসকে অন্য জিনিসের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া, অনুপ্রবেশ করানো, চালিয়ে দেয়া বা গলিয়ে দেয়া। যেমন সুঁইয়ের ছিদ্রে সূতো গলিয়ে দেয়া হয়। কাজেই এ আয়াতের অর্থ এটাও হতে পারে যে, অপরাধীদের অন্তরে এ কুরআন বারুদের মত আঘাত করে এবং তা শুনে তাদের মনে এমন আগুন জ্বলে ওঠে যেন মনে হয় একটি গরম শলাকা তাদের বুকে বিদ্ধ হয়ে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়েছে। সুতরাং তারা এটা সহ্য করতে পারবে না, এর উপর ঈমানও আনবে না। [দেখুন-ফাতহুল কাদীর]

হঠাৎ করে; অথচ তারা কিছুই উপলব্ধি করতে পারবে না ।

فَيَقُوْلُوْا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُوْنَ ﴿٢٠٣﴾

২০৩. তখন তারা বলবে, 'আমাদেরকে কি অবকাশ দেয়া হবে?'

اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿٢٠٤﴾

২০৪. তারা কি তবে আমাদের শাস্তি ত্বরান্বিত করতে চায়?

اَفَرَءَيْتَ اِنْ مَّتَّعْنٰهُمْ سِنِيْنَ ﴿٢٠٥﴾

২০৫. আপনি ভেবে দেখুন, যদি আমরা তাদেরকে দীর্ঘকাল ভোগ-বিলাস করতে দেই[১],

ثُمَّ جَآءَهُمْ مَّا كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ ﴿٢٠٦﴾

২০৬. তারপর তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছিল তা তাদের কাছে এসে পড়ে,

مَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يُمَتَّعُوْنَ ﴿٢٠٧﴾

২০৭. তখন যা তাদের ভোগ-বিলাসের উপকরণ হিসেবে দেয়া হয়েছিল তা তাদের কি উপকারে আসবে?

وَمَآ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا لَهَا مُنْذِرُوْنَ ﴿٢٠٨﴾

২০৮. আর আমরা এমন কোন জনপদ ধ্বংস করিনি যার জন্য সতর্ককারী ছিল না[২];

---

(১) এ আয়াতে ইঙ্গিত আছে যে, দুনিয়াতে দীর্ঘ জীবন লাভ করাও আল্লাহ্ তা'আলার একটি নেয়ামত । কিন্তু যারা এই নেয়ামতের না-শোকরী করে, বিশ্বাস স্থাপন করে না, তাদের দীর্ঘ জীবনের নিরাপত্তা ও অবকাশ কোন কাজে আসবে না । আর এজন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এক হাদীসে এসেছে, তিনি বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন কাফেরকে নিয়ে এসে জাহান্নামে এক প্রকার চুবিয়ে আনার পর তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তুমি কি তোমার জীবনে কখনো ভাল কিছু পেয়েছ? সে বলবেঃ হে প্রভূ! আপনার শপথ, কখনো পাইনি । অপরদিকে দুনিয়ার সবচেয়ে দূর্ভাগা ব্যক্তিকে নিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে তুমি কি দুনিয়াতে কখনো কষ্ট পেয়েছ? সে বলবে, আপনার শপথ, হে আমার প্রভূ! কখনো নয় । [মুসলিমঃ ২৮০৭]

(২) অর্থাৎ আমি কোন জনপদ ধ্বংস করে দেয়ার পূর্বে সতর্ককারী ছিল, তাদের স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য । আমি যালেম নই । আল্লাহ্ তা'আলা বিনা অপরাধে কাউকে শাস্তি দেন না ।

ذِكْرٰى ۛ وَمَا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿٢٠٩﴾

২০৯. (তাদের জন্য) স্মরণ হিসেবে, আর আমরা যুলুমকারী নই,

وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيٰطِيْنُ ﴿٢١٠﴾

২১০. আর শয়তানরা এটাসহ নাযিল হয়নি।

وَمَا يَنْۢبَغِيْ لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ﴿٢١١﴾

২১১. আর তারা এ কাজের যোগ্যও নয় এবং তারা এর সামর্থ্যও রাখে না ।

اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُوْلُوْنَ ﴿٢١٢﴾

২১২. তাদেরকে তো শোনার সুযোগ হতে দূরে রাখা হয়েছে ।

فَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَكُوْنَ مِنَ الْمُعَذَّبِيْنَ ﴿٢١٣﴾

২১৩. অতএব আপনি অন্য কোন ইলাহ্‌কে আল্লাহ্‌র সাথে ডাকবেন না, ডাকলে আপনি শাস্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবেন ।

وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ ﴿٢١٤﴾

২১৪. আর আপনার নিকটস্থ জ্ঞাতি-গোষ্ঠীকে সতর্ক করুন ।

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢١٥﴾

২১৫. এবং যারা আপনার অনুসরণ করে সেসব মুমিনদের প্রতি আপনার পক্ষপুট অবনত করে দিন ।

فَاِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٢١٦﴾

২১৬. অতঃপর তারা যদি আপনার অবাধ্য হয় তাহলে আপনি বলুন, 'তোমরা যা কর নিশ্চয় আমি তা থেকে দায়মুক্ত ।'

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ﴿٢١٧﴾

২১৭. আর আপনি নির্ভর করুন পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র উপর,

الَّذِيْ يَرٰىكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ﴿٢١٨﴾

২১৮. যিনি আপনাকে দেখেন যখন আপনি দাঁড়ান[১],

সে জন্য তিনি যুগে যুগে সতর্ককারী নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন । [দেখুন-মুয়াস্‌সার] অনুরূপ আয়াত আরো দেখুন- সূরা আল-ইস্‌রাঃ ১৫, সূরা আল-কাসাসঃ ৫৯]

(১) এ আয়াতের তাফসীরে কয়েকটি বর্ণনা এসেছে-
(এক) আপনি একমাত্র আল্লাহ্‌র উপরই ভরসা করুন যিনি আপনার হেফাজত

২১৯. এবং সিজ্‌দাকারীদের মাঝে আপনার উঠাবসা[১]।	وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّٰجِدِينَ ﴿٢١٩﴾
২২০. তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।	إِنَّهُۥ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٢٢٠﴾
২২১. তোমাদেরকে কি আমি জানাব কার কাছে শয়তানরা নাযিল হয়?	هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَٰطِينُ ﴿٢٢١﴾
২২২. তারা তো নাযিল হয় প্রত্যেকটি ঘোর মিথ্যাবাদী ও পাপীর কাছে।	تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٢٢٢﴾
২২৩. তারা কান পেতে থাকে এবং তাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী[২]।	يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَٰذِبُونَ ﴿٢٢٣﴾

করবেন, আপনার সাহায্য-সহযোগিতা করবেন। যেমনটি অন্য আয়াতে বলা হয়েছে- "আপনি আপনার প্রভূর নির্দেশের উপর ধৈর্য ধারণ করুন, কারণ আপনি আমাদের হেফাজতে রয়েছেন। আমাদের চক্ষুর সামনেই আছেন। [সূরা আত্-তূরঃ ৪৮]

(দুই) ইবনে আব্বাস বলেনঃ যিনি আপনাকে দেখেন যখন আপনি সালাতে দাঁড়ান।

(তিন) ইকরামা বলেনঃ যিনি তার কিয়াম, রুকূ', সিজ্‌দা ও বসা দেখেন।

(চার) কাতাদাহ্ বলেনঃ সালাতে দেখেন, যখন একা সালাত আদায় করেন এবং যখন জামা'আতে অন্যদের সাথে সালাত আদায় করেন। এটা ইকরামা, হাসান বসরী, আতা প্রমূখেরও মত। [দেখুন-ইবন কাসীর,কুরতুবী,বাগভী]

(১) এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে । এক, আপনি যখন জামায়াতের সাথে নামায পড়ার সময় নিজের মুকতাদীদের সাথে উঠা-বসা ও রুকূ'-সিজ্‌দা করেন তখন আল্লাহ আপনাকে দেখতে থাকেন। দুই, রাতের বেলা উঠে যখন নিজের সাথীরা (যাদের বৈশিষ্ট্যসূচক গুণ হিসেবে "সিজদাকারী" শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে) তাদের আখেরাত গড়ার জন্য কেমন তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে তা দেখার উদ্দেশ্যে ঘোরাফেরা করতে থাকেন তখন আপনি আল্লাহর দৃষ্টির আড়ালে থাকেন না। তিন, আপনি নিজের সিজ্‌দাকারী সাথীদেরকে সংগে নিয়ে আল্লাহর বান্দাদের সংশোধন করার জন্য যেসব প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন আল্লাহ তা অবগত আছেন। চার, সিজ্‌দাকারী লোকদের দলে আপনার যাবতীয় তৎপরতা আল্লাহর নজরে আছে। তিনি জানেন আপনি কিভাবে তাদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন, কিভাবে ও কেমন পর্যায়ে তাদের আত্মশুদ্ধি করছেন এবং কিভাবে ভেজাল সোনাকে খাঁটি সোনায় পরিণত করেছেন। [দেখুন-তবারী,বাগভী]

(২) এর দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি হচ্ছে, শয়তানরা কিছু শুনে নিয়ে নিজেদের

وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوٗنَ ﴿٢٢٤﴾

২২৪. আর কবিগণ, তাদের অনুসরণ তো বিভ্রান্তরাই করে।

اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فِيْ كُلِّ وَادٍ يَّهِيْمُوْنَ ﴿٢٢٥﴾

২২৫. আপনি কি দেখেন না যে, ওরা উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে প্রত্যেক উপত্যকায় ঘুরে বেড়ায়?

وَاَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ ﴿٢٢٦﴾

২২৬. এবং তারা তো বলে এমন কথা, যা তারা করে না।

اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَذَكَرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّانْتَصَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا ۗ وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَيَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ ﴿٢٢٧﴾

২২৭. কিন্তু তারা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে, আল্লাহ্‌কে বেশী পরিমাণ স্মরণ করেছে এবং অত্যাচারিত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে। আর যালিমরা শীঘ্রই জানবে কোন ধরনের গন্তব্যস্থলে তারা ফিরে যাবে।

চেলাদেরকে জানিয়ে দেয় এবং তাতে সামান্যতম সত্যের সাথে বিপুল পরিমাণ মিথ্যার মিশ্রণ ঘটায়। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, মিথ্যুক-প্রতারক গণকরা শয়তানের কাছ থেকে কিছু শুনে নেয় এবং তারপর তার সাথে নিজের পক্ষ থেকে অনেকটা মিথ্যা মিশিয়ে মানুষের কানে ফুঁকে দিতে থাকে। [দেখুন-ফাতহুল কাদীর] একটি হাদীসে এর আলোচনা এসেছে। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলেনঃ কোন কোন লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গণকদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে। জবাবে তিনি বলেন, ওসব কিছুই নয়। তারা বলে, হে আল্লাহর রাসূল ! কখনো কখনো তারা তো আবার ঠিক সত্যি কথাই বলে দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে বলেন, সত্যি কথাটা কখনো কখনো জিনেরা নিয়ে আসে এবং তাদের বন্ধুদের কানে ফুঁকে দেয় তারপর তারা তার সাথে শত মিথ্যার মিশ্রণ ঘটিয়ে একটি কাহিনী তৈরী করে। [বুখারীঃ ৩২১০]

২৭- সূরা আন-নাম্‌ল, ৯৩ আয়াত, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

طٰسٓ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْقُرْاٰنِ وَكِتَابٍ مُّبِيْنٍ ۙ﴿١﴾

১. ত্বা-সীন; এগুলো আল-কুরআন এবং সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত (১);

هُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ﴿٢﴾

২. পথনির্দেশ ও সুসংবাদ মুমিনদের জন্য(২) ।

الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ﴿٣﴾

৩. যারা সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় আর তারাই আখেরাতে নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে(৩) ।

---

(১) "সুস্পষ্ট কিতাবের" একটি অর্থ হচ্ছে, এ কিতাবটি নিজের শিক্ষা, বিধান ও নিদের্শগুলো একেবারে দ্ব্যর্থহীন পদ্ধতিতে বর্ণনা করে দেয়। এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, এটি যে আল্লাহর কিতাব সে ব্যাপারটি সুস্পষ্ট। [ফাতহুল কাদীর]

(২) অর্থাৎ এ আয়াতগুলো হচ্ছে পথনির্দেশ ও সুসংবাদ। যার অর্থ "পথনির্দেশকারী" ও "সুসংবাদদানকারী"। [ফাতহুল কাদীর]

(৩) অর্থাৎ কুরআন মজীদের এ আয়াতগুলো কেবলমাত্র এমনসব লোকদেরই পথ নির্দেশনা দেয় এবং শুভ পরিণামের সুসংবাদও একমাত্র এমনসব লোকদের দান করে যাদের মধ্যে দু'টি বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী পাওয়া যায়। একটি হচ্ছে, তারা ঈমান আনে এবং সে ঈমান অনুসারে আমল করে। ঈমান আনার অর্থ হচ্ছে তারা কুরআন ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত গ্রহণ করে। এক আল্লাহকে নিজেদের একমাত্র উপাস্য ও রব বলে মেনে নেয়। কুরআনকে আল্লাহর কিতাব হিসেবে স্বীকার করে নেয়। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সত্য নবী বলে গ্রহণ করে। আর আমল করার অর্থ হচ্ছে, তারা এ বিষয়গুলো কেবলমাত্র মেনে নিয়েই বসে থাকে না বরং কার্যত এগুলোর অনুসরণ ও আনুগত্য করতে উদ্বুদ্ধ হয়। তাই তারা সালাত কায়েম করে এবং যাকাত দেয়। দ্বিতীয় গুণটি হচ্ছে, তারা ঈমান রাখে যে, এ জীবনের পর দ্বিতীয় আর একটি জীবন আছে, সেখানে আমাদের নিজেদের কাজের হিসেব দিতে এবং প্রত্যেকটি কাজের প্রতিদান লাভ করতে হবে। এ দু'টি শর্ত যারা পূর্ণ করবে কুরআন মজীদের আয়াত তাদেরকেই দুনিয়ায় সত্য সরল পথের সন্ধান দেবে। [ইবন কাসীর] এ পথের প্রতিটি পর্যায়ে তাদেরকে শুদ্ধ ও অশুদ্ধ এবং ন্যায় ও অন্যায়ের পার্থক্য বুঝিয়ে দেবে। তাদেরকে ভুল পথের দিকে অগ্রসর হবার হাত থেকে রক্ষা করবে। তাদেরকে এ নিশ্চয়তা দান করবে যে, সত্য-সঠিক পথ অবলম্বন করার ফল দুনিয়ায় যাই হোক না কেন শেষ পর্যন্ত তারই বদৌলতে চিরন্তন সফলতা

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ④

৪. নিশ্চয় যারা আখেরাতে ঈমান আনে না, তাদের জন্য তাদের কাজকে আমরা শোভন করেছি(১), ফলে তারা বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়;

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ ⑤

৫. এদেরই জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট শাস্তি এবং এরাই আখেরাতে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত(২) ।

وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ⑥

৬. আর নিশ্চয় আপনি আল-কুরআন প্রাপ্ত হচ্ছেন প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞের নিকট থেকে(৩) ।

তারাই অর্জন করবে এবং তারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের সৌভাগ্য লাভে সক্ষম হবে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, “বলুন, ‘এটি মুমিনদের জন্য হেদায়াত ও আরোগ্য।’ আর যারা ঈমান আনে না তাদের কানে রয়েছে বধিরতা এবং কুরআন এদের (অন্তরের) উপর অন্ধত্ব তৈরী করবে।” [সূরা ফুসসিলাত:৪৪]

(১) এখানে বলা হয়েছে যে, যারা আখেরাতে ঈমান রাখে না আমরা তাদের দৃষ্টিতে তাদের কুকর্মকে শোভন করে দিয়েছি। ফলে তারা সেগুলোকে উত্তম মনে করে পথ ভ্রষ্টতায় লিপ্ত থাকে। এটা এ জন্যই যে, তারা আখেরাতকে অস্বীকার করেছে। [ইবন কাসীর] সুতরাং আখেরাতকে অস্বীকার করাই তাদের জন্য যাবতীয় পতনের মূল কারণ হিসেবে বিবেচিত হলো। এক গুনাহ অন্য গুনাহর কারণ হয়। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ “তারা যেমন প্রথমবারে তাতে ঈমান আনেনি তেমনি আমরাও তাদের মনোভাবের ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে দেব এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়াতে দেব।” [সূরা আল-আন'আমঃ ১১০]

(২) এ নিকৃষ্ট শাস্তিটি কিভাবে, কখন ও কোথায় হবে। তা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। কারণ তা ব্যাপক, দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানেই তাদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট শাস্তি। [ইবন কাসীর] এ দুনিয়ায়ও বিভিন্ন ব্যক্তি, দল ও জাতি নানাভাবে এ শাস্তি লাভ করে থাকে। এ দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার সময় একেবারে মৃত্যুর দ্বারদেশেও যালেমরা এর একটি অংশ লাভ করে। মৃত্যুর পরে “আলমে বরযখে”ও (মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামত পূর্ববর্তী সময়) মানুষ এর মুখোমুখি হয়। আর তারপর হাশরের ময়দানে এর একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে এবং তারপর এক জায়গায় গিয়ে তা আর কোনদিন শেষ হবে না।

(৩) অর্থাৎ এ কুরআনে যেসব কথা বলা হচ্ছে এগুলো কোন উড়ো কথা নয়। এগুলো কোন মানুষের আন্দাজ অনুমান ও মতামত ভিত্তিকও নয়। বরং এক জ্ঞানবাদ প্রাজ্ঞ সত্তা এগুলো নাযিল করেছেন। যাঁর সমস্ত আদেশ-নিষেধে রয়েছে প্রাজ্ঞতা। তিনি

إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ⑦

৭. স্মরণ করুন, যখন মূসা তার পরিবারের লোকদেরকে বলেছিলেন, 'নিশ্চয় আমি আগুন দেখেছি, অচিরেই আমি সেখান থেকে তোমাদের জন্য কোন খবর আনব অথবা তোমাদের জন্য আনব জলন্ত অঙ্গার, যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার[১]।'

فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ⑧

৮. অতঃপর তিনি যখন সেটার কাছে আসলেন[২], তখন ঘোষিত হল, 'বরকতময়, যা আছে এ আলোর মধ্যে এবং যা আছে এর চারপাশে[৩],

নিজের সৃষ্টির প্রয়োজন ও কল্যাণ এবং তার অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত, অনুরূপ ছোট বড় সবকিছু সম্পর্কে পুরোপুরি জানেন। বান্দাদের সংশোধন ও পথনির্দেশনার জন্য তাঁর জ্ঞান সর্বোত্তম কৌশল ও ব্যবস্থা অবলম্বন করে। তাঁর পাঠানো যাবতীয় সংবাদ কেবল সত্য আর সত্য। তাঁর দেয়া যাবতীয় বিধান ইনসাফপূর্ণ ও ন্যায়ানুগ। যেমন অন্য আয়াতে বলেছেন, "আর সত্য ও ন্যায়ের দিক দিয়ে আপনার রব-এর বাণী পরিপূর্ণ।" [সূরা আল-আন'আম: ১১৫] [ইবন কাসীর]

(১) মূসা আলাইহিসসালাম এ স্থলে দু'টি প্রয়োজনের সম্মুখীন হন। এক, হারানো পথ জিজ্ঞাসা। দুই, আগুন থেকে উত্তাপ সংগ্রহ। কেননা, রাত্রি ছিল কনকনে শীতের। [বাগভী] এ ব্যাপারে আরও আলোচনা পূর্বে সূরা ত্বা-হা এর ১০ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় গত হয়েছে।

(২) যখন তিনি গাছের কাছে আসলেন, তখন তিনি ভয়ানক ও আশ্চর্যজনক এক দৃশ্য দেখতে পেলেন, তিনি সেখানে দেখতে পেলেন সবুজ গাছে আগুন জ্বলছে। আর সে আগুনে শুধু আলোর তীব্রতাই প্রকাশ পাচ্ছে। অপরদিকে গাছটিতেও সবুজতা ও সজীবতা বেড়েই চলেছে। তারপর তিনি তার মাথা উপরের দিকে উঠালেন, দেখলেন সে নূর আকাশ পর্যন্ত ছেয়ে আছে। ইবন আব্বাস বলেন, এটা কোন আগুন ছিল না। বরং জ্বলে উঠার মত আলো ছিল। তখন মূসা আলাইহিস সালাম আশ্চর্যান্বিত ও হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন। আর তখনই বলা হল, যিনি আগুনে আছেন তিনি বরকতময় হোন। ইবন আব্বাস বলেন, বরকতময় হওয়ার অর্থ, পবিত্র ও মহিয়ান হওয়া। আর তার পাশে যারা আছে তারা হচ্ছেন ফিরিশতা। [ইবন কাসীর]

(৩) এখানে আল্লাহ্‌র বাণীঃ "বরকতপূর্ণ হয়েছে, যা আছে এ আলোর মধ্যে এবং যা আছে এর চারপাশে" এর মধ্যে আলোতে কে আছে এবং আলোর চারপাশে কি আছে তা নির্ধারণ করার ব্যাপারে কয়েকটি মত রয়েছে।

আর সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ্ পবিত্র ও মহিমান্বিত(১)!

এক, এখানে 'অগ্নিতে যা আছে' তা দ্বারা মূসা আলাইহিসসালামকে বুঝানো হয়েছে। আর তখন 'এর চারপাশে যা আছে' তা বলে আশেপাশে উপস্থিত ফেরেশ্‌তাদেরকে বুঝানো হবে। [বাগভী; কুরতুবী]
দুই, কোন কোন মুফাসসির এখানে 'অগ্নিতে যা আছে' বলে ফেরেশ্‌তাদেরকে উদ্দেশ্য নিয়েছেন এবং 'এর চারপাশে যা আছে' তা বলে মূসা আলাইহিসসালামকে বুঝানো হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছেন। [বাগভী]
তিন, 'এখানে অগ্নিতে যা আছে' তা বলে আল্লাহর নূরকে বুঝানো হয়েছে, আর 'এর চারপাশে যা আছে' তা বলে ফেরেশ্‌তা [ইবন কাসীর] অথবা মূসা বা সেই পবিত্র উপত্যকা অথবা সে গাছ সবই উদ্দেশ্য হতে পারে। আর এ মতটিই অধিক গ্রহণযোগ্য। তবে কোন অবস্থাতেই এখানে 'অগ্নিতে যা আছে' দ্বারা স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র ও মহান সত্তা বুঝানো হবে না। কেননা স্রষ্টা তাঁর আরশে রয়েছেন। কোন সৃষ্টিবস্তুর মধ্যে স্রষ্টার অনুপ্রবেশ হতে পারে না। এটা তাওহীদের পরিপন্থী কথা। সুতরাং রাব্বুল আলামিনের নূরের আলোর দ্বারাই সে গাছ কোন ভাবে আলোকিত হয়েছিল। তবে সরাসরি কোন আলো কোথায় পতিত হলে তা ভস্ম হয়ে যাবে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "আল্লাহ্ ঘুমান না, ঘুমানো তার জন্য সমীচীনও নয়, ইনসাফের পাল্লা বাড়ান এবং কমান, দিবাভাগের আগেই রাতের আমল তার কাছে উত্থিত হয় অনুরূপভাবে রাত্রি আগমণের আগেই তার কাছে দিবাভাগের আমল উত্থিত হয়। তাঁর পর্দা হলো নূরের। যদি তিনি তার পর্দাকে অপসারণ করেন তবে তা তার চেহারার আলো দৃষ্টিশক্তি যতদূর যায় ততদুর জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেবে।"[সহীহ মুসলিমঃ ১৭৯]

(১) অর্থাৎ তিনি আরশের উপর থেকেও যমীনে এক গাছের উপরে তাঁর আলো ফেলে সেখান থেকে তাঁর বান্দা মূসার সাথে কথা বলছেন। তিনি অত্যন্ত মহান ও পবিত্র, তিনি যা ইচ্ছে করতে পারেন। তাঁর সত্তা, গুণাগুণ ও কার্যধারা কোন কিছুই কোন সৃষ্টজীবের মত হতে পারে না। তাঁর সৃষ্ট কোন কিছু তাঁকে আয়ত্ব করতে পারে না। আসমান ও যমীন তাঁকে ঘিরে রাখতে পারে না। তিনি সুউচ্চ, সুমহান, সমস্ত সৃষ্টিকুল থেকে পৃথক। [ইবন কাসীর] তিনি এ গাছের উপর থেকে কথা বললেও এটা যেন কেউ মনে না করে বসে যে, তিনি সৃষ্ট কোন কিছুর ভিতরে প্রবেশ করেছেন। এ আয়াতাংশ বলার উদ্দেশ্য সম্ভবত এও হতে পারে যে, দুনিয়াতে অধিকাংশ শির্ক সংঘটিত হয়েছে আল্লাহ্ সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে। তাঁর কোন দৃষ্টি কোন কিছুর উপর পতিত হলে মানুষ সেটাকেই ইলাহ মনে করে পুজা করতে আরম্ভ করে। যদি আল্লাহকে সঠিকভাবে তাঁর মর্যাদা, সম্মান ও প্রতিপত্তি দেয়া হতো তা হলে কেউ শির্কে লিপ্ত হতো না। তাই এখানে তাঁকে এ ধরণের কাজ থেকে মুক্ত করার জন্য নির্দেশ দেয়া হচ্ছে।

৯. 'হে মূসা! নিশ্চয় আমি আল্লাহ্[১]! পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়,

يٰمُوْسٰٓى اِنَّهٗٓ اَنَا اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۙ﴿۹﴾

১০. 'আর আপনি আপনার লাঠি নিক্ষেপ করুন।' তারপর যখন তিনি সেটাকে সাপের মত ছুটোছুটি করতে দেখলেন তখন তিনি পিছনের দিকে ছুটতে লাগলেন[২] এবং ফিরেও তাকালেন না। 'হে মূসা! ভীত হবেন না, নিশ্চয়

وَاَلْقِ عَصَاكَ ۭ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَاۤنٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبْ ۭ يٰمُوْسٰى لَا تَخَفْ ۣ اِنِّيْ لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُوْنَ ﴿۱۰﴾

(১) মূসা আলাইহিসসালামের এ ঘটনা কুরআনের অন্যান্য স্থানেও বর্ণনা করা হয়েছে। সূরা ত্বা-হায় বলা হয়েছে, ﴿اِنِّيْٓ اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۚ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۞ وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْحٰى ۞ اِنَّنِيْٓ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدْنِيْ ۙ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ﴾ "আমিই আপনার রব, অতএব আপনার পাদুকা খুলে ফেলুন, কারণ আপনি পবিত্র 'তুওয়া' উপত্যকায় রয়েছেন। এবং আমি আপনাকে মনোনীত করেছি। অতএব যা ওহী পাঠানো হচ্ছে আপনি তা মনোযোগের সাথে শুনেন। 'আমিই আল্লাহ্, আমি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ্ নেই। অতএব আমার 'ইবাদাত করুন এবং আমার স্মরণার্থে সালাত কায়েম করুন"। [সূরা ত্বা-হাঃ ১২-১৪] অনুরূপভাবে সূরা আল-কাসাসে বলা হয়েছে, ﴿فَلَمَّآ اَتٰىهَا نُوْدِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبٰرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ يّٰمُوْسٰٓى اِنِّيْٓ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ﴾ "যখন মূসা আগুনের কাছে পৌঁছলেন তখন উপত্যকার দক্ষিণ পাশে পবিত্র ভূমির উপর অবস্থিত একটি গাছের দিক থেকে তাঁকে ডেকে বলা হল, 'হে মূসা! আমিই আল্লাহ্, সৃষ্টিকুলের রব;" [সূরা আল-কাসাসঃ ৩০] এ সূরাত্রয়ের দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্নরূপ হলেও বিষয়বস্তু প্রায় একই। তা এই যে, সে রাত্রিতে আল্লাহ্ তা'আলা তূর পাহাড়ের কাছে এক গাছে মূসা আলাইহিসসালামকে তাঁর আলো দেখালেন।

আয়াত থেকে এটাই জানা যাচ্ছে যে, আল্লাহ্ তাঁকে জানিয়ে দিলেন, যিনি তাকে সম্বোধন করছেন, তার সাথে আলাপ করছেন, তিনি তার একমাত্র প্রবল পরাক্রমশালী রব, যিনি সবকিছুকে তাঁর ক্ষমতা, প্রভাব, ও শক্তি দিয়ে অধীন করে রেখেছেন। তিনি তাঁর প্রতিটি কাজ ও কথা প্রজ্ঞার সাথে সম্পন্ন করেন। [ইবন কাসীর]

(২) সূরা আল-আ'রাফে ও সূরা আশ-শু'আরাতে এ জন্য ثعبان (অজগর) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু এখানে একে جَانّ শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হচ্ছে। "জান" শব্দটি বলা হয় ছোট সাপ অর্থে। এখানে "জান"শব্দ ব্যবহার করার কারণ হচ্ছে এই যে, দৈহিক দিক দিয়ে সাপটি ছিল অজগর কিন্তু তার চলার দ্রুততা ছিল ছোট সাপদের মতো। সূরা ত্বা-হা-য় ﴿حَيَّةٌ تَسْعٰى﴾ (ছুটন্ত সাপ) এর মধ্যেও এ অর্থই বর্ণনা করা হয়েছে।

আমি এমন যে, আমার সান্নিধ্যে রাসূলগণ ভয় পায় না[১];

১১. 'তবে যে যুলুম করে,[২] তারপর মন্দ কাজের পরিবর্তে সৎকাজ করে, তাহলে নিশ্চয় আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوٓءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١﴾

১২. 'আর আপনি আপনার হাত আপনার বগলে রাখুন, এটা বের হয়ে আসবে শুভ্র নির্দোষ অবস্থায়। এটা ফির'আউন ও তার সম্প্রদায়ের কাছে আনীত নয়টি নিদর্শনের অন্তর্গত[৩]। তারা তো ছিল ফাসেক সম্প্রদায়।'

وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوٓءٍ فِي تِسْعِ ءَايَٰتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِۦٓ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَٰسِقِينَ ﴿١٢﴾

১৩. অতঃপর যখন তাদের কাছে আমাদের নিদর্শনসমূহ দৃশ্যমান হল, তারা বলল, 'এটা সুস্পষ্ট জাদু।'

فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ ءَايَٰتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١٣﴾

---

(১) অর্থাৎ আমার কাছে রাসূলদের ক্ষতি হবার কোন ভয় নেই। রিসালাতের মহান মর্যাদায় অভিষিক্ত করার জন্য যখন আমি কাউকে নিজের কাছে ডেকে আনি তখন আমি নিজেই তার নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়ে থাকি। [দেখুন, ইবন কাসীর]

(২) এখানে বলা হয়েছে, 'তবে যে যুলুম করে' অর্থাৎ যে যুলুম করে সে আল্লাহর কাছ থেকে নিরাপত্তা পেতে পারে না। অধিকাংশ মুফাসসির বলেন, এখানে পূর্ববর্তী আয়াতে যাদের বলা হয়েছে অর্থাৎ নবী-রাসূলদের কথা, তাদের ব্যাপারে কথা হচ্ছে না। পূর্ববর্তী আয়াতে নবী-রাসূলদেরকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নিরাপত্তা বিধানের পর কারা নিরাপত্তা পাবে না তাদের আলোচনা করা হচ্ছে। কারণ, নবীগণ নিষ্পাপ। [ইবন কাসীর]

(৩) সূরা আল্‌-ইসরায় বলা হয়েছে মূসাকে আমি সুস্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হয় এমন ধরনের নয়টি নিদর্শন দিয়ে পাঠিয়েছিলাম। সূরা আল-আ'রাফে এগুলোর বিস্তারিত বিবরণ এভাবে বর্ণনা করা হয়েছেঃ (১) লাঠি, যা অজগর হয়ে যেতো (২) হাত, যা বগলে রেখে বের করে আনলে সূর্যের মতো ঝিকমিক করতো। (৩) যাদুকরদের প্রকাশ্য জনসমক্ষে পরাজিত করা (৪) মূসার পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী সারা দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়া। (৫) বন্যা ও ঝড় (৬) পংগপাল (৭) সমস্ত শস্য গুদামে শস্যকীট এবং মানুষ-পশু নির্বিশেষে সবার গায়ে উকুন। (৮) ব্যাঙয়ের আধিক্য (৯) রক্ত। [দেখুন, সূরা আল-আ'রাফ: ১৩৩]

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٤﴾

১৪. আর তারা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলো প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তর এগুলোকে নিশ্চিত সত্য বলে গ্রহণ করেছিল[১]। সুতরাং দেখুন, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল!

দ্বিতীয় রুকূ'

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا ۖ وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ

১৫. আর অবশ্যই আমরা দাউদ ও সুলাইমানকে জ্ঞান দান করেছিলাম[২]

(১) কুরআনের অন্যান্য স্থানে বলা হয়েছে যে, যখন মূসা আলাইহিস সালামের ঘোষণা অনুযায়ী মিসরের উপর কোন সাধারণ বালা-মুসীবত নাযিল হতো তখন ফির'আউন মূসাকে বলতো, আপনার আল্লাহর কাছে দো'আ করে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করুন তারপর আপনি যা বলবেন তা মেনে নেবো। কিন্তু যখন সে বিপদ সরে যেতো তখন ফির'আউন আবার তার আগের হঠকারিতায় ফিরে যেতো। [সূরা আল-আ'রাফঃ১৩৪ এবং সূরা আয্‌ যুখরুফঃ ৪৯-৫০] তাছাড়া এমনিতেও একটি দেশের সমগ্র এলাকা দুর্ভিক্ষ, বন্যা ও ঘূর্ণি কবলিত হওয়া, সারা দেশের উপর পংগপাল ঝাঁপিয়ে পড়া এবং ব্যাঙ ও শস্যকীটের আক্রমণ কোন জাদুকরের তেলসমাতি হতে পারে বলে কোনক্রমেই ধারণা করা যেতে পারে না। এগুলো এমন প্রকাশ্য মু'জিযা ছিল যেগুলো দেখে একজন নিরেট বোকাও বুঝতে পারতো যে, নবীর কথায় এ ধরনের দেশ ব্যাপী বালা-মুসীবতের আগমন এবং আবার তার কথায় তাদের চলে যাওয়া একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামীনেরই হস্তক্ষেপের ফল হতে পারে। এ কারণে মূসা ফির'আউনকে পরিষ্কার বলে দিয়েছিলেনঃ "তুমি খুব ভালো করেই জানো, এ নিদর্শনগুলো পৃথিবী ও আকাশের মালিক ছাড়া আর কেউ নাযিল করেনি।" [সূরা আল-ইসরাঃ ১০২] কিন্তু যে কারণে ফির'আউন ও তার জাতির সরদাররা জেনে বুঝে সেগুলো অস্বীকার করে তা এই ছিলঃ "আমরা কি আমাদের মতই দু'জন লোকের কথা মেনে নেবো, অথচ তাদের জাতি আমাদের গোলাম ?" [সূরা আল-মুমিনূনঃ৪৭]

(২) এখানে নবীদের নবুওয়ত-রেসালত সহ যাবতীয় প্রশস্ত জ্ঞান সবই উদ্দেশ্য। [ইবন কাসীর; জালালাইন; সা'দী] যেমন দাউদ আলাইহিসসালামকে লৌহবর্ম নির্মাণ শিল্প শেখানো হয়েছিল। নবীগণের মধ্যে দাউদ ও সুলাইমান আলাইহিমাসসালাম এই বৈশিষ্টের অধিকারী ছিলেন যে, তাদেরকে নবুওয়ত ও রেসালতের সাথে রাজত্ব দান করা হয়েছিল। তাদেরকে বিচার-ফয়সালার জ্ঞানও প্রদান করা হয়েছিল। সুলাইমানের রাজত্ব এমন নজিরবিহীন যে, শুধু মানুষের উপর নয়- জিন ও জন্তু-জানোয়ারদের উপরও তার শাসন ক্ষমতা ছিল।

الَّذِيْ فَضَّلَنَا عَلٰى كَثِيْرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٥﴾

এবং তারা উভয়ে বলেছিলেন, ‘সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি আমাদেরকে তাঁর বহু মুমিন বান্দাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন[১] ।’

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوٗدَ وَقَالَ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا

১৬. আর সুলাইমান হয়েছিলেন দাউদের উত্তরাধিকারী[২] এবং তিনি বলেছিলেন,

---

(১) আসলে আল্লাহর দেয়া যে ক্ষমতা তাদেরকে দেয়া হয়েছে তাকে আল্লাহর ইচ্ছা ও মর্জি অনুযায়ী ব্যবহার করা উচিত । কারণ, এ ক্ষমতার সঠিক ব্যবহার ও অপব্যবহারের জন্য তাদেরকে প্রকৃত মালিকের কাছে জবাবদিহি করতে হবে । ফির‘আউন শাসন ক্ষমতা ধন-সম্পদ, মান-মর্যাদা, এগুলো লাভ করেছিল এবং দাউদ ও সুলাইমান আলাইহিমাস সালামও সে ধরনের নেয়ামত লাভ করেছিলেন । কিন্তু অজ্ঞতা তাদের মধ্যে কত বড় ব্যবধান সৃষ্টি করে দিয়েছে তা বর্ণনার জন্যই এখানে সুলাইমান আলাইহিসসালামের ঘটনা উল্লেখ করা হচ্ছে । [আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

(২) উত্তরাধিকার বলে এখানে জ্ঞান ও নবুওয়তের উত্তরাধিকার বোঝানো হয়েছে- আর্থিক উত্তরাধিকার নয় । [ইবন কাসীর] কেননা, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আমরা নবীগোষ্ঠি আমরা কাউকে ওয়ারিশ করি না” [মুসনাদে আহমাদঃ২/৪৬৩, মুসনাদে হুমাইদীঃ ২২] অর্থাৎ নবীগণ উত্তরাধিকারী হন না এবং কেউ তাদের উত্তরাধিকার হয় না । অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “আলেমগণ নবীগণের উত্তরাধিকারী; কিন্তু নবীগণ দীনার বা দিরহামের উত্তরাধিকারী করেন না বরং তারা জ্ঞানের উত্তরাধিকারী করে থাকেন । সুতরাং যে কেউ সেটা গ্রহণ করতে পেরেছে সে তা পূর্ণরূপেই গ্রহণ করতে পেরেছে” । [আবুদাউদঃ ৩৬৪১, মুসনাদে আহমাদ ৫/১৯৬] অর্থাৎ আলেমগণ নবীগণের উত্তরাধিকারী; কিন্তু নবীগণের মধ্যে জ্ঞান ও নবুওয়তের উত্তরাধিকার হয়ে থাকে-আর্থিক উত্তরাধিকার হয় না । যুক্তির দিক দিয়েও এখানে আর্থিক উত্তরাধিকার বুঝানো যেতে পারে না । কারণ, দাউদ আলাইহিসসালামের মৃত্যুর সময় তার আরও সন্তান ছিল । আর্থিক উত্তরাধিকার বোঝানো হলে এই পুত্রদের সবাই উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত হবে । এমতাবস্থায় বিশেষভাবে সুলাইমান আলাইহিসসালামকে উত্তরাধিকারী বলার কোন অর্থ নেই । এ থেকে বুঝা গেল যে, এখানে উত্তরাধিকার বলতে নবুওয়তের উত্তরাধিকার বুঝানো হয়েছে । [বাগভী] এর সাথে আল্লাহ্‌ তা‘আলা দাউদ আলাইহিসসালামের রাজত্বও সুলাইমান আলাইহিসসালামকে দান করেন এবং এতে অতিরিক্ত সংযোজন হিসেবে তার রাজত্ব জিন, জন্তু-জানোয়ার এবং বিহংগকুলের উপরও সম্প্রসারিত করে দেন । বায়ূকে তার নির্দেশাধীন করে দেন ।

مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ﴿١٦﴾

‘হে মানুষ! আমাদেরকে[১] পাখিদের ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়েছে এবং আমাদেরকে সবকিছু দেয়া হয়েছে[২], এটা অবশ্যই সুস্পষ্ট অনুগ্রহ।’

وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٧﴾

১৭. আর সুলাইমানের সামনে সমবেত করা হল তার বাহিনীকে---জিন্ মানুষ ও বিহঙ্গকুলকে এবং তাদেরকে বিন্যস্ত করা হল বিভিন্ন ব্যূহে[৩]।

(১) লক্ষণীয় যে, এখানে সুলাইমান আলাইহিসসালাম ‘আমাদেরকে’ বলে বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করেছেন অথচ তিনি একজন মাত্র। অধিকাংশ আলেমদের মতে শুধু তাকেই আল্লাহ্ তা‘আলা পশু-পাখিদের ভাষার জ্ঞান দিয়েছিলেন। সে জন্য আলেমগণ বলেন, সুলাইমান আলাইহিসসালাম একা হওয়া সত্ত্বেও নিজের জন্য বহুবচনের পদ রাজকীয় বাকপদ্ধতি অনুযায়ী ব্যবহার করেছেন, যাতে প্রজাদের মধ্যে তার প্রতি সম্মান ও ভয় সৃষ্টি হয় এবং তারা আল্লাহ্‌র আনুগত্যে ও সুলাইমান আলাইহিসসালামের আনুগত্যে শৈথিল্যও প্রদর্শন না করে। এমনিভাবে গভর্ণর, শাসনকর্তা ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণ তাদের অধিনস্থদের উপস্থিতিতে নিজের জন্য বহুবচনের পদ ব্যবহার করলে তাতে দোষ নেই, যদি তা শাসনতান্ত্রিক এবং নেয়ামত প্রকাশের উদ্দেশ্যে হয়। অহংকার ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনের জন্যে না হয়। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর; আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর] আমরা চিন্তা করলে আরো বুঝতে পারব যে, মহান আল্লাহ্ তাঁর নিজ সত্তাকে কুরআনের অধিকাংশ স্থানে বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করে থাকেন, এটাও তাঁর নিজের সম্মান, প্রতিপত্তি প্রকাশের জন্য। যাতে বান্দাগণ তাঁর মত মহান সত্তার ব্যাপারে সাবধান হয়। তাছাড়া একমাত্র মহান আল্লাহ্‌র জন্যই বহু-বচনের শব্দ অহংকার ও গর্ব সহকারে বলার অধিকার রয়েছে, আর কারও সেটা নেই। [দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, আল-জাওয়াবুস সহীহ লিমান বাদ্দালা দীনাল মাসীহ: ৩/৪৪৮; ইবন ফারিস, মু‘জামু মাকায়ীসুল লুগাহ: ৩৫৩; ইবন কুতাইবাহ, শারহু মুশকিলিল কুরআন: ২৯৩]

(২) সবকিছু বলতে এখানে এটাই বুঝানো হয়েছে যে, একজন নবী ও বাদশাহর জন্য যা যা দরকার তার সবই আমাকে দেয়া হয়েছে। [সা‘দী; মুয়াসসার] ‘আল্লাহর দেয়া সবকিছু আমার কাছে আছে’ একথাটির অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর দেয়া ধন-দৌলত ও সাজ-সরঞ্জামের আধিক্য। সুলাইমান অহংকারে স্ফীত হয়ে একথা বলেননি। বরং তাঁর উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর অনুগ্রহ এবং তাঁর দান ও দাক্ষিণ্যের শোকর আদায় করা। [দেখুন, ইবন কাসীর]

(৩) يوزعون শব্দটি وزع শব্দ থেকে উদ্ভূত। এর শাব্দিক অর্থ, বিরত রাখা। অর্থাৎ বাহিনীকে প্রাচুর্যের কারণে বিরত রাখা, যাতে বিচ্ছিন্ন না হয়ে যায়। বিক্ষিপ্ত ভাবে ঘুরাপিরা না করে একটি সুনির্দিষ্ট পন্থায় চলাফেরা করতে তাদেরকে বাধ্য করা হয়। [মুয়াসসার]

حَتّٰۤی اِذَاۤ اَتَوۡا عَلٰی وَادِ النَّمۡلِ ۙ قَالَتۡ نَمۡلَۃٌ یّٰۤاَیُّهَا النَّمۡلُ ادۡخُلُوۡا مَسٰکِنَکُمۡ ۚ لَا یَحۡطِمَنَّکُمۡ سُلَیۡمٰنُ وَ جُنُوۡدُهٗ ۙ وَ هُمۡ لَا یَشۡعُرُوۡنَ ﴿۱۸﴾

১৮. অবশেষে যখন তারা পিপড়া অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌঁছল তখন এক পিপড়া বলল, 'হে পিপড়া-বাহিনী! তোমরা তোমাদের ঘরে প্রবেশ কর, যেন সুলাইমান এবং তার বাহিনী তাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদেরকে পায়ের নীচে পিষে না ফেলে।'

فَتَبَسَّمَ ضَاحِکًا مِّنۡ قَوۡلِهَا وَ قَالَ رَبِّ اَوۡزِعۡنِیۡۤ اَنۡ اَشۡکُرَ نِعۡمَتَکَ الَّتِیۡۤ اَنۡعَمۡتَ عَلَیَّ وَ عَلٰی وَالِدَیَّ وَ اَنۡ اَعۡمَلَ صَالِحًا تَرۡضٰىهُ وَ اَدۡخِلۡنِیۡ بِرَحۡمَتِکَ فِیۡ عِبَادِکَ الصّٰلِحِیۡنَ ﴿۱۹﴾

১৯. অতঃপর সুলাইমান তার এ কথাতে মৃদু হাসলেন এবং বললেন, 'হে আমার রব! আপনি আমাকে সামর্থ্য দিন[১] যাতে আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, আমার প্রতি ও আমার পিতামাতার প্রতি আপনি যে অনুগ্রহ করেছেন তার জন্য এবং যাতে আমি এমন সৎকাজ করতে পারি যা আপনি পছন্দ করেন[২]। আর আপনার অনুগ্রহে আমাকে আপনার

(১) এখানে উদ্দেশ্য এই যে, আমাকে সামর্থ্য দিন। আমাকে ইলহাম করুন। [মুয়াসসার] যাতে আমি নেয়ামতের কৃতজ্ঞতাকে সর্বদা সাথে রাখি, তা থেকে কোন সময় পৃথক না হই। মোটকথা এই যে, সর্বক্ষণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। কারণ, আপনি আমাকে পাখি ও জীবজন্তুর কথা বুঝতে শিখিয়েছেন। আর আমার পিতার উপর নেয়ামত দিয়েছেন যে, তিনি আপনার কাছে আত্মসমর্পন করেছেন এবং ঈমান এনেছেন। [ইবন কাসীর]

(২) এখানে সৎকাজ করার সাথে একটি শর্ত জুড়ে দেয়া হয়েছে যে, 'যা আপনি পছন্দ করেন' অর্থাৎ যাতে আপনার সন্তুষ্টি বিধান হয়। এর দ্বারা মূলতঃ কবুল হওয়াই উদ্দেশ্য। তখন আয়াতের অর্থ হবে, হে আল্লাহ্! আমাকে এমন সৎকর্মের তাওফীক দিন, যা আপনার কাছে মকবুল হয়। নবী-রাসূলগণ তাদের সৎকর্মসমূহ মাকবুল হওয়ার জন্যেও দো'আ করতেন; যেমন ইবরাহীম ও ইসমাঈল আলাইহিমাস্‌সালাম কাবা গৃহ নির্মাণের সময় দো'আ করেছিলেনঃ ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلۡ مِنَّا﴾ "হে আমাদের প্রভু! আমাদের থেকে তা কবুল করুন"। [সূরা আল-বাকারাহঃ ১২৭] এর দ্বারা বুঝা গেল যে, কোন সৎকর্ম সম্পাদন করেই নিশ্চিন্ত হয়ে যাওয়া ঠিক নয়; বরং তা কবুল হওয়ার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে কাকুতি-মিনতির মাধ্যমে দো'আ করা উচিত।

সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের শামিল করুন[১]।’

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَآ أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَآئِبِينَ ۝٢٠

২০. আর সুলাইমান পাখিদের সন্ধান নিলেন[২] এবং বললেন, ‘আমার কি হলো[৩] যে, আমি হুদ্‌হুদ্‌কে দেখছি

(১) সুলাইমান আলাইহিসসালাম এসব বাক্যে জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য আল্লাহ্‌র রহমত ও দয়ার দরখাস্ত করেছেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, জান্নাতে যাওয়া আল্লাহ্‌র রহমতের উপর নির্ভরশীল। শুধুমাত্র সৎকাজের বিনিময়ে জান্নাত পাওয়া যাবে না। হাদীসেও এসেছে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “কোন ব্যক্তি তার কর্মের উপর ভরসা করে জান্নাতে যাবে না। সাহাবায়ে কেরাম বললেনঃ আপনিও কি? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, আমিও না, তবে যদি আমাকে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ পরিবেষ্টন করে” [বুখারীঃ ৫৩৪৯, ৬৮০৮, ৬০৯৮, মুসলিমঃ ২৮১৬]

(২) ‘সন্ধান নেয়া’র দ্বারা এটা প্রমাণিত হলো যে, রাজ্যশাসনের নীতি অনুযায়ী সর্বস্তরের প্রজাদের দেখাশোনা করা ও খোঁজ-খবর নেয়া শাসনকর্তার অন্যতম কর্তব্য। এই নীতির পরিপ্রেক্ষিতেই সুলাইমান আলাইহিসসালাম এ সন্ধান ও খোঁজ-খবর নিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এ কাজটি করতেন। তিনি সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতেন। যে ব্যক্তি অনুপস্থিত থাকতেন তিনি অসুস্থ হলে দেখার জন্য তাশরীফ নিয়ে যেতেন, সেবা-শুশ্রূষা করতেন এবং কেউ কোন কষ্টে থাকলে তা দূরীকরণের ব্যবস্থা করতেন। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তার খেলাফতের আমলে নবীদের এ সুন্নাতকে পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত করেন। রাতের অন্ধকারে তিনি মদীনার অলিতে-গলিতে ঘুরে বেড়াতেন, যাতে সবার অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতে পারেন। কাউকে কোন বিপদ ও কষ্টে পতিত দেখলে তিনি তাকে সাহায্য করতেন। এ ধরনের অজস্র ঘটনা তার জীবনীতে উল্লেখিত আছে। তিনি বলতেন, যদি ফোরাত নদীর কিনারায় কোন বাঘ কোন ছাগলছানাকে গিলে ফেলে, তবে এর জন্যও উমরকে প্রশ্ন করা হবে। এ হচ্ছে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালনের নবী-রাসূলদের রীতি-নীতি যা তারা তাদের অনুসারীদের শিক্ষা দিয়েছেন। সাহাবায়ে কেরাম তা বাস্তবায়িত করেছেন। যার ফলে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর জনসাধারণ সুখে-শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করত। তাদের পর পৃথিবী এমন সুবিচার, ইনসাফ, শান্তি, সুখ ও নিশ্চয়তার সে দৃশ্য আর দেখেনি। [দেখুন, কুরতুবী]

(৩) সুলাইমান আলাইহিসসালাম বললেন, ‘আমার কি হলো যে, আমি হুদহুদকে দেখছিনা’ কথাটি অন্যভাবেও বলা যেত, যেমনঃ হুদহুদের কি হল যে, সে উপস্থিত নেই? বা হুদহুদ কোথায় গেল? কথাটি এভাবে নিজের দিকে সম্বোধন করার কারণ কোন কোন মুফাসসিরের মতে এই যে, হুদহুদ ও অন্যান্য বিহংগকুল তার অধীনস্থ হওয়া আল্লাহ্‌

না! না কি সে অনুপস্থিত?

২১. 'আমি অবশ্যই তাকে কঠিন শাস্তি দেব কিংবা তাকে যবেহ্ করব[১] অথবা সে আমার নিকট উপযুক্ত কারণ দর্শাবে[২]।'

لَأُعَذِّبَنَّهٗ عَذَابًا شَدِيْدًا اَوْ لَاَا۟ذْبَحَنَّهٗۤ اَوْ لَيَاْتِيَنِّيْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢١﴾

২২. কিছুক্ষণ পরেই হুদ্‌হুদ্ এসে পড়ল এবং বলল, 'আপনি যা জ্ঞানে পরিবেষ্টন করতে পারেননি আমি তা পরিবেষ্টন করেছি[৩] এবং 'সাবা'[৪] হতে সুনিশ্চিত সংবাদ নিয়ে এসেছি।

فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيْدٍ فَقَالَ اَحَطْتُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَاٍۭ بِنَبَاٍ يَّقِيْنٍ ﴿٢٢﴾

২৩. 'আমি তো এক নারীকে দেখলাম তাদের উপর রাজত্ব করছে[৫]।

اِنِّيْ وَجَدْتُّ امْرَاَةً تَمْلِكُهُمْ وَاُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ

তা'আলার একটি বিশেষ অনুগ্রহ ছিল। হুদহুদের অনুপস্থিতি দেখে শুরুতে সুলাইমান আলাইহিসসালামের মনে এ আশংকা দেখা দিল যে, সম্ভবতঃ আমার কোন ত্রুটির কারণে এই অনুগ্রহ হ্রাস পেয়েছে এবং এক শ্রেণীর পাখি অর্থাৎ হুদহুদ গায়েব হয়ে গেছে। তাই তিনি নিজেকে প্রশ্ন করলেন যে, এরূপ কেন হলো? এটা একধরনের মুহাসাবাতুন-নাফস বা আত্মসমালোচনা। আল্লাহ্ তা'আলার নেয়ামতকে ধরে রাখার জন্য এটা খুব জরুরী বিষয়। [কুরতুবী]

(১) এ আয়াত থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা আমরা পাই, এক. শাস্তি দিতে হবে অপরাধ মোতাবেক শরীর মোতাবেক নয়। দুই. যদি কোন পালিত জন্তু গাভী, বলদ, গাধা, ঘোড়া, উট ইত্যাদি কাজে অলসতা করে তবে প্রয়োজনমাফিক প্রহারের সুষম শাস্তি দেয়া জায়েয। তবে বিনা কারণে কাউকে শাস্তি দেয়া জায়েয নেই। [কুরতুবী]

(২) এর দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়া বিচারকের কর্তব্য। উপযুক্ত ওযর পেশ করলে তা গ্রহণ করা উচিত। [দেখুন, তাবারী; আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

(৩) এর দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, নবী-রাসূলগণ গায়েব জানেন না। তাদেরকে আল্লাহ্ যতটুকু জ্ঞান দান করেন তাই শুধু জানতে পারেন। [কুরতুবী]

(৪) সাবা ছিল আরবের দক্ষিণ এলাকার একটি বিখ্যাত ব্যবসাজীবী জাতি। তাদের রাজধানী মারিব বর্তমান ইয়ামানের রাজধানী সান্'আ থেকে তিন দিনের পথের দূরত্বে (৫৫ মাইল উত্তরপূর্বে) অবস্থিত ছিল। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

(৫) 'সাবা' জাতির এ সম্রাজ্ঞীর নাম কোন কোন বর্ণনায় বিলকীস বিনত শারাহীল বলা

شَيۡءٖ وَلَهَا عَرۡشٌ عَظِيمٞ ﴿٢٣﴾

তাকে দেয়া হয়েছে সকল কিছু হতেই[১] এবং তার আছে এক বিরাট সিংহাসন ।

وَجَدتُّهَا وَقَوۡمَهَا يَسۡجُدُونَ لِلشَّمۡسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَعۡمَٰلَهُمۡ فَصَدَّهُمۡ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمۡ لَا يَهۡتَدُونَ ﴿٢٤﴾

২৪. 'আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে সূর্যকে সিজ্‌দা করছে[২] । আর শয়তান[৩] তাদের কার্যাবলী তাদের

হয়েছে ।[ইবন কাসীর] এ আয়াত থেকে কোন ক্রমেই নারীদেরকে রাষ্ট্রপ্রধান বানানোর প্রমাণ নেয়া জায়েয নয় । কারণ, এটা ছিল বিলকীসের ইসলাম গ্রহণের পূর্বের ঘটনা । ইসলাম গ্রহণের পরে সুলাইমান আলাইহিসসালাম তাকে এ পদে বহাল রেখেছেন বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি । তদুপরি ইসলামী শরীয়তে তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে । রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন শোনলেন যে, পারস্যবাসীরা তাদের সম্রাটের মৃত্যুর পর তার কন্যাকে রাজ-সিংহাসনে বসিয়েছে তখন তিনি বললেনঃ "যে জাতি তাদের শাসনক্ষমতা একজন নারীর হাতে সমর্পণ করেছে, তারা কখনও সাফল্য লাভ করতে পারবে না ।" [বুখারীঃ ৪১৬৩] এ কারণেই আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, কোন নারীকে শাসনকর্তৃত্ব, খেলাফত অথবা রাজত্ব সমর্পণ করা যায় না; বরং সালাতের ইমামতির ন্যায় বৃহৎ ইমামতি অর্থাৎ শাসনকর্তৃত্বও একমাত্র পুরুষের জন্যই উপযুক্ত । [কুরতুবী; উসাইমীন, তাফসীরু সূরাতায়িল ফাতিহা ওয়াল বাকারাহ: ৩/১০৬]

(১) অর্থাৎ একজন রাষ্ট্রনায়কের যা প্রয়োজন সে সবই তার আছে ।[কুরতুবী; ইবন কাসীর] সে যুগে যেসব বস্তু অনাবিষ্কৃত ছিল, সেগুলো না থাকা এর পরিপন্থী নয় ।

(২) এ থেকে জানা যায়, সেকালে এ জাতিটি সূর্যের পূজা করতো । আরবের প্রাচীন বর্ণনাগুলো থেকেও এ জাতির এ একই ধর্মের কথা জানা যায় ।[আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

(৩) বক্তব্যের ধরণ থেকে অনুমিত হয় যে, হুদহুদের বক্তব্য এর পূর্বের অংশটুকু । অর্থাৎ "সূর্যের সামনে সিজদা করে" পর্যন্ত তার বক্তব্য শেষ হয়ে যায় । এরপর এ উক্তিগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে করা হয়েছে । [কুরতুবী; আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর] এ অনুমানকে যে জিনিস শক্তিশালী করে তা হচ্ছে এ বাক্যটি "আর তিনি সবকিছু জানেন, যা তোমরা লুকাও এবং প্রকাশ করো ।" এ শব্দগুলো থেকে প্রবল ধারণা জন্মে যে, বক্তা হুদ্‌হুদ এবং শ্রোতা সুলাইমান ও তার দরবারীগণ নন বরং বক্তা হচ্ছেন আল্লাহ এবং তিনি সম্বোধন করছেন মক্কার মুশরিকদেরকে, যাদেরকে নসিহত করার জন্যই এ কাহিনী শুনানো হচ্ছে । তবে কারও কারও মতে পুরো কথাটিই হুদহুদের । [তাবারী]

কাছে সুশোভিত করে দিয়েছে এবং তাদেরকে সৎপথ থেকে বাধাগ্রস্থ করেছে, ফলে তারা হেদায়াত পাচ্ছেনা;

أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿٢٥﴾

২৫. 'নিবৃত্ত করেছে এ জন্যে যে, তারা যেন সিজ্‌দা না করে আল্লাহ্‌কে, যিনি আসমানসমূহ ও যমীনের লুক্কায়িত বস্তুকে বের করেন[১]। আর যিনি জানেন, যা তোমরা গোপন কর এবং যা তোমরা ব্যক্ত কর।

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۩ ﴿٢٦﴾

২৬. 'আল্লাহ্‌, তিনি ছাড়া সত্য কোন ইলাহ্‌ নেই, তিনি মহা'আরশের রব[২]।'

قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٢٧﴾

২৭. সুলাইমান বললেন, 'আমরা দেখব তুমি কি সত্য বলেছ, নাকি তুমি মিথ্যুকদের অন্তর্ভুক্ত?

اذْهَب بِّكِتَابِي هَٰذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ

২৮. 'তুমি যাও আমার এ পত্র নিয়ে এবং এটা তাদের কাছে নিক্ষেপ কর;

---

(১) যিনি প্রতিমুহূর্তে এমন সব জিনিসের উদ্ভব ঘটাচ্ছেন যেগুলো জন্মের পূর্বে কোথায় কোথায় লুকিয়ে ছিল কেউ জানে না। ভূ-গর্ভ থেকে প্রতি মুহূর্তে অসংখ্য উদ্ভিদ, বিভিন্ন ধরনের রিযিক এবং নানা ধরনের খনিজ পদার্থ বের করছেন। উর্ধ্ব জগত থেকে প্রতিনিয়ত এমন সব জিনিসের আর্বিভাব ঘটাচ্ছেন, যার আবির্ভাব না ঘটলে মানুষের ধারণা ও কল্পনায়ও কোনদিন আসতে পারতো না। যেমন বৃষ্টির পানি। [দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(২) অর্থাৎ তিনি সবচেয়ে প্রকাণ্ড সৃষ্টি আরশের রব। আর যেহেতু হুদহুদ কল্যাণের প্রতি আহ্বানকারী, এক আল্লাহ্‌র ইবাদাতের দাওয়াত প্রদানকারী, একমাত্র তাঁর জন্যই সিজদা করার আহ্বান করে থাকে, তাই হাদীসে তাকে হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে। [দেখুন, আবু দাউদ: ৫২৬৭; ইবন মাজাহ: ৩২২৪]
এ আয়াত পড়ার পর সিজদা করা ওয়াজিব। [দেখুন, কুরতুবী; আদওয়াউল বায়ান] এখানে সিজদা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে একজন মুমিনের সূর্যপূজারীদের থেকে নিজেকে সচেতনভাবে পৃথক করা এবং নিজের কর্মের মাধ্যমে একথার স্বীকৃতি দেয়া ও একথা প্রকাশ করা উচিত যে, সে সূর্যকে নয় বরং একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকেই নিজের সিজদার ও ইবাদাতের উপযোগী এবং যোগ্য মনে করে।

فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُوْنَ ﴿٢٨﴾

তারপর তাদের কাছ থেকে সরে থেকো[১] এবং লক্ষ্য করো তাদের প্রতিক্রিয়া কী?'

قَالَتْ يٰۤاَيُّهَا الْمَلَؤُا اِنِّيْۤ اُلْقِيَ اِلَيَّ كِتٰبٌ كَرِيْمٌ ﴿٢٩﴾

২৯. সে নারী বলল, 'হে পরিষদবর্গ! আমাকে এক সম্মানিত পত্র[২] দেয়া হয়েছে;

اِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَاِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿٣٠﴾

৩০. 'নিশ্চয় এটা সুলাইমানের কাছ থেকে এবং নিশ্চয় এটা রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে[৩],

---

(১) সুলাইমান আলাইহিসসালাম হুদহুদকে পত্রবাহকের দায়িত্ব দিয়েই ক্ষান্ত হননি বরং এ শিষ্টাচারও শিক্ষা দিলেন যে, সম্রাজ্ঞীর হাতে পত্র অর্পণ করে মাথার উপর সওয়ার হয়ে থাকবে না বরং সেখান থেকে কিছুটা সরে যাবে। এটাই রাজকীয় নিয়ম। এতে জানা গেল যে, সামাজিক শিষ্টাচার ও মানবিক চরিত্র সবার সাথেই কাম্য। [কুরতুবী]

(২) সম্মানিত পত্র বলে কোন কোন মুফাসসিরের মতেঃ মোহরাঙ্কিত পত্র বুঝানো হয়েছে। [কুরতুবী] অথবা এর কারণ, পত্রটি এসেছে অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক পথে। কোন রাষ্ট্রদূত এসে দেয়নি। বরং তার পরিবর্তে এসেছে একটি পাখি। কারও কারও মতে, যখন তিনি দেখলেন যে, একটি হুদহুদ এটি বয়ে এনেছে আর সে হুদহুদ আদব রক্ষা করে সরে দাঁড়িয়েছে, তার বুঝতে বাকী রইল না যে, এটা কোন সম্মানিত ব্যক্তি থেকেই এসে থাকবে। তারপর যখন চিঠি পড়লেন, তখন বুঝলেন যে, এটি নবী সুলাইমানের পক্ষ থেকে। সুতরাং নবীর পত্র অবশ্যই সম্মানিত হবে। পূর্বোক্ত দিকনির্দেশনাগুলো ছাড়াও আরো কয়েকটি কারণেও পত্রটি গুরুত্বপূর্ণ। পত্রটি শুরু করা হয়েছে আল্লাহ রহমানুর রহীমের নামে। সর্বোপরি যে বিষয়টি এর গুরুত্ব আরো বেশী বাড়িয়ে দিয়েছে তা হচ্ছে এই যে, পত্রে আমাকে একেবারে পরিষ্কার ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় দাওয়াত দেয়া হয়েছে, আমি যেন অবাধ্যতার পথ পরিহার করে আনুগত্যের পথ অবলম্বন করি এবং হুকুমের অনুগত বা মুসলিম হয়ে সুলাইমানের সামনে হাজির হয়ে যাই। আর এতে এটাও বলা হয়েছে যে, তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার তাদের কারও নেই। এসবই প্রমাণ করে যে চিঠিটি অত্যন্ত সম্মানিত। [কুরতুবী; ইবন কাসীর]

(৩) এ একটি আয়াতে অনেকগুলো পথনির্দেশ বা হেদায়াত রয়েছেঃ তন্মধ্যে সর্বপ্রথম দিকনির্দেশ এই যে, পত্রের প্রারম্ভেই প্রেরকের নাম লেখা নবীদের সুন্নাত। এর উপকারিতা অনেক। উদাহরণতঃ পত্র পাঠ করার পূর্বেই প্রাপক জানতে পারবে যে, সে কার পত্র পাঠ করছে, যাতে সে সেই পরিবেশে পত্রের বিষয়বস্তু পাঠ করে এবং চিন্তা-ভাবনা করে এবং যাতে কার পত্র, 'কোথা থেকে এলো?' এরূপ খোঁজাখুঁজি

اَلَّا تَعۡلُوۡا عَلَیَّ وَاۡتُوۡنِیۡ مُسۡلِمِیۡنَ ﴿۳۱﴾

৩১. 'যাতে তোমরা আমার বিরোধিতার ঔদ্ধত্য প্রকাশ না করো এবং আনুগত্য স্বীকার করে আমার কাছে উপস্থিত হও[১] ।'

তৃতীয় রুকূ'

قَالَتۡ یٰۤاَیُّهَا الۡمَلَؤُا اَفۡتُوۡنِیۡ فِیۡۤ اَمۡرِیۡ ۚ مَا کُنۡتُ قَاطِعَۃً اَمۡرًا حَتّٰی تَشۡهَدُوۡنِ ﴿۳۲﴾

৩২. সে নারী বলল, 'হে পরিষদবর্গ! আমার এ ব্যাপারে তোমাদের মতামত দাও[২] । আমি কোন ব্যাপারে চূড়ান্ত

করার কষ্ট ভোগ করতে না হয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং এভাবেই তার যাবতীয় পত্র লিখতেন। এতে ছোট-বড় ভেদাভেদ করা উচিত নয়। কারণ সাহাবায়ে কিরাম যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে চিঠি লিখতেন তখনও একই পদ্ধতি অনুসরণ করতেন। যেমন, রাসূলের কাছে লিখা 'আলা ইবনুল হাদরামীর চিঠি। তবে এটা জানা আবশ্যক যে, এর বিপরীত করলে সুন্নাত মোতাবেক না হলেও তা জায়েয। বর্তমানে খামের উপর প্রেরকের নাম লিখা থাকলে তার মাধ্যমে উপরোক্ত উদ্দেশ্য হাসিল হতে পারে। আলোচ্য ঘটনাতে দ্বিতীয় দিকনির্দেশ হলো, পত্রের উত্তর দেয়া উচিত। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা পত্রের উত্তর দেয়াকে সালামের উত্তরের মত ওয়াজিব মনে করতেন। এখানে তৃতীয় আরেকটি দিক নির্দেশ হলো, বিসমিল্লাহ লেখা। তবে এখানে দেখা যায় যে, আগে প্রেরকের নাম লিখার পর বিসমিল্লাহ বলা হয়েছে। এর দ্বারা প্রেরকের নামের পরে বিসমিল্লাহ লিখা জায়েয প্রমাণিত হলো। যদিও আগেই বিসমিল্লাহ লেখার নিয়ম বেশী প্রচলিত এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এ কাজটি বেশী করতেন বলে প্রমাণিত হয়েছে। [কুরতুবী]

(১) "মুসলিম" হয়ে হাযির হবার দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, অনুগত হয়ে হাযির হয়ে যাও। দুই, তাওহীদবাদী হয়ে যাও বা দ্বীন ইসলাম গ্রহণ করে হাযির হয়ে যাও। প্রথম হুকুমটি সুলাইমানের শাসকসুলভ মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্য রাখে। দ্বিতীয় হুকুমটি সামঞ্জস্য রাখে তার নবীসুলভ মর্যাদার সাথে। [বাগভী; ইবন কাসীর] সম্ভবত এই ব্যাপক অর্থবোধক শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে পত্রে উভয় উদ্দেশ্য অন্তর্ভুক্ত থাকার কারণে।

(২) أَفْتُوْنِيْ শব্দটি فتوى শব্দ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কোন বিশেষ প্রশ্নের জওয়াব দেয়া। এখানে পরামর্শ দেয়া এবং নিজের মত প্রকাশ করা বোঝানো হয়েছে। সম্রাজ্ঞী বিলকীসের কাছে যখন সুলাইমান আলাইহিসসালামের পত্র পৌঁছল তখন সে তার সভাসদদেরকে একত্রিত করে ঘটনা বর্ণনা করল এবং তাদের পরামর্শ তলব করল যে, এ ব্যাপারে কি করা উচিত। সে তাদের অভিমত জিজ্ঞাসা করার পূর্বে

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না তোমাদের উপস্থিতি ছাড়া।

৩৩. তারা বলল, 'আমরা তো শক্তিশালী ও কঠোর যোদ্ধা; তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আপনারই, কি আদেশ করবেন তা আপনি ভেবে দেখুন।'

قَالُوۡا نَحۡنُ اُولُوۡا قُوَّةٍ وَّاُولُوۡا بَاۡسٍ شَدِيۡدٍ ۙ وَّالۡاَمۡرُ اِلَيۡكِ فَانۡظُرِىۡ مَاذَا تَاۡمُرِيۡنَ ﴿۳۳﴾

৩৪. সে নারী বলল, 'রাজা-বাদশারা যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে তখন তো সেটাকে বিপর্যস্ত করে দেয় এবং সেখানকার মর্যাদাবান ব্যক্তিদেরকে অপদস্ত করে, আর এরূপ করাই তাদের রীতি(১);

قَالَتۡ اِنَّ الۡمُلُوۡكَ اِذَا دَخَلُوۡا قَرۡيَةً اَفۡسَدُوۡهَا وَجَعَلُوۡۤا اَعِزَّةَ اَهۡلِهَاۤ اَذِلَّةً ۚ وَكَذٰلِكَ يَفۡعَلُوۡنَ ﴿۳۴﴾

৩৫. 'আর আমি তো তাদের নিকট উপঢৌকন পাঠাচ্ছি, দেখি, দূতেরা কী

وَاِنِّىۡ مُرۡسِلَةٌ اِلَيۡهِمۡ بِهَدِيَّةٍ فَنٰظِرَةٌ ۢ بِمَ يَرۡجِعُ

মনোরঞ্জনের জন্য একথাও বলল, আমি তোমাদের উপস্থিতি ব্যতীত কোন ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না। [ফাতহুল কাদীর] এর ফলেই সেনাধ্যক্ষগণ ও মন্ত্রীবর্গ এর জওয়াবে সম্পূর্ণ তৎপরতা সহকারে আদেশ পালনের জন্য সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারে সম্মতি জ্ঞাপন করল। এ থেকে বোঝা গেল যে, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করার পদ্ধতি সুপ্রাচীন। ইসলাম পরামর্শকে বিশেষ গুরুত্ব দান করেছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং বিভিন্ন কাজে সাহাবায়ে কিরামের সাথে পরামর্শ করতেন এবং তাকে পরামর্শ করার নির্দেশও প্রদান করা হয়েছে। [বাগভী; কুরতুবী]

(১) আর এরূপ করাই তাদের রীতি। এ কথাটি যদি 'সাবা' সম্রাজ্ঞীর হয় তবে এর অর্থ দু'টি হতে পারেঃ এক, কথাটি তিনি আগের কথার তাকিদ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ রাজা বাদশাহগণ কোন দেশ জোর করে দখল করেন তখন সেখানকার সম্মানিত অধিবাসীদের অসম্মানিত করে তাদের মনে ভয়-ভীতি ঢুকিয়ে দিয়ে রাষ্ট্রযন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করা তাদের চিরাচরিত নিয়ম। [মুয়াসসার] দুই, অথবা তিনি একথা বলতে চেয়েছেন যে, যেহেতু রাজা-বাদশাহগণ এরূপ করে থাকেন তাই সুলাইমান ও তার সৈন্য-সামন্তরা অনুরূপ কাজই করবে। [জালালাইন] আর যদি এ কথাটি আল্লাহ্‌র কথা হয় তবে তা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা সাবা সম্রাজ্ঞীর কথাকে বাস্তব বলে স্বীকৃতি দিলেন। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

الْمُرْسَلُوْنَ ﴿٣٥﴾

নিয়ে ফিরে আসে[১] ।’

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمٰنَ قَالَ اَتُمِدُّوْنَنِ بِمَالٍ فَمَآ اٰتٰىنِۦَ اللّٰهُ خَيْرٌ مِّمَّآ اٰتٰىكُمْ بَلْ اَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُوْنَ ﴿٣٦﴾

৩৬. অতঃপর দূত সুলাইমানের কাছে আসলে সুলাইমান বললেন, ‘তোমরা কি আমাকে ধন-সম্পদ দিয়ে সাহায্য করছ? আল্লাহ্ আমাকে যা দিয়েছেন, তা তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তার চেয়ে উৎকৃষ্ট[২] বরং তোমরাই তোমাদের উপঢৌকন নিয়ে উৎফুল্ল

(১) বিলকীস সুলাইমান আলাইহিসসালামকে পরীক্ষা করার মনস্থ করলেন । তিনি কি নবী নাকি আধিপত্যবাদী অর্থলিপ্সু কোন অত্যাচারী শাসক । তিনি আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনকে বেশী গুরুত্ব দেন নাকি আধিপত্য বিস্তারের গুরুত্ব তার কাছে বেশী । এই পরীক্ষা দ্বারা বিলকিসের লক্ষ্য ছিল এই যে, বাস্তবিকই তিনি নবী হলে তার আদেশ পালন করা হবে এবং বিরোধিতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে না । পক্ষান্তরে যদি তিনি আধিপত্যবাদের নেশায় আমাদেরকে দাসে পরিণত করতে চান, তবে তার মোকাবেলা কিভাবে করা হবে, সে সম্পর্কে চিন্তা করা হবে । [দেখুন, ইবন কাসীর] এ পরীক্ষার জন্য তিনি সুলাইমান ও তার সভাষদদের জন্য কিছু উপঢৌকন পাঠালেন । যদি তিনি উপঢৌকন পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে যান, তবে বোঝা যাবে যে, তিনি একজন সম্রাটই । পক্ষান্তরে তিনি নবী হলে ইসলাম ও ঈমান ব্যতীত কোন কিছুতেই সন্তুষ্ট হবেন না । [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

(২) এখানে সুলাইমান আলাইহিসসালাম হাদীয়া বা উপঢৌকন গ্রহণ করেননি । এটা কি এ জন্যে যে, কাফেরের উপঢৌকন গ্রহণ করা জায়েয নেই নাকি তিনি এজন্যে গ্রহণ করেননি যে, ঈমান ও ইসলাম ছাড়া তার কাছে আর কোন কিছুর তেমন গুরুত্বই নেই । শেষোক্তটিই এখানে বেশী স্পষ্ট । তারপর এটাও আমাদের জানা দরকার যে, কাফেরদের দেয়া হাদীয়া বা উপঢৌকন গ্রহণ করা যাবে কি না? এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দু’ধরনের সহীহ বর্ণনা এসেছে । কখনও কখনও তিনি গ্রহণ করেছেন আবার কখনো কখনো তিনি কাফের-মুশরিকদের হাদীয়া গ্রহণ করা থেকে বিরত থেকেছেন এবং বলেছেন আমি মুশরিকদের হাদীয়া বা উপঢৌকন গ্রহণ করি না । এমতাবস্থায় সঠিক মত হলো, যদি কাফেরের হাদীয়া বা উপঢৌকন গ্রহণ করার মাধ্যমে দ্বীনি কোন স্বার্থ থাকে যেমন সে ইসলাম গ্রহণ করবে বা তার শত্রুতা থেকে মুসলিমগণ নিরাপদ থাকবে তখন তা গ্রহণ জায়েয । আর যদি এটা গ্রহণের মাধ্যমে তাদের অন্তরে ইসলাম সম্পর্কে ভিন্ন কোন ধারনা সৃষ্টি হওয়ার অবকাশ থাকে তবে তা গ্রহণ করা জায়েয নয় । মূলকথাঃ পুরো ব্যাপারটি দ্বীনী ‘মাসলাহাত’ বা স্বার্থ চিন্তা করে করতে হবে । [দেখুন, কুরতুবী]

বোধ কর[১]।

৩৭. 'তাদের কাছে ফিরে যাও, অতঃপর আমরা অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে নিয়ে আসব এক সৈন্য বাহিনী যার মুকাবিলা করার শক্তি তাদের নেই। আর আমরা অবশ্যই তাদেরকে সেখান থেকে বহিস্কৃত করব লাঞ্ছিতভাবে এবং তারা হবে অপদস্থ।'

ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُم بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٣٧﴾

৩৮. সুলাইমান বললেন, 'হে পরিষদবর্গ! তারা আত্মসমর্পণ করে[২] আমার কাছে আসার[৩] আগে তোমাদের

قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿٣٨﴾

(১) অর্থাৎ হাদীয়া ও উপঢৌকন নিয়ে খুশী হওয়া তোমাদের কাজ, আমার কাজ নয়। কারণ, তোমরা দুনিয়ার সম্পদ ভালবাসো। আমি দুনিয়ার সম্পদের তোয়াক্কা করি না। আল্লাহ্ আমাকে যথেষ্ট দিয়েছেন তদুপরি তিনি আমাকে নবুওয়তও দিয়েছেন। আমি সম্পদ চাই না চাই তোমাদের ঈমান। অহংকার ও দাম্ভীকতার প্রকাশ এ কথা বা কাজের উদ্দেশ্য নয়। আসল বক্তব্য হচ্ছে, তোমাদের অর্থ-সম্পদ আমার লক্ষ্য নয় বরং তোমরা ঈমান আনো এটাই আমার কাম্য। [ফাতহুল কাদীর] তোমরা কি মনে করেছ যে সম্পদ নিয়ে আমি তোমাদেরকে শির্ক এর উপর রেখে দেব? তোমাদের সম্পদের তুলনায় আমার রব নবুওয়ত ও রাজত্বের আমাকে যা কিছু দিয়েছেন তা ঢের বেশী। কাজেই তোমাদের সম্পদের প্রতি আমার লোভাতুর হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। হাদীয়া নিয়ে তোমরাই খুশী হয়ে থাক, আমি তো কেবল ইসলাম অথবা তরবারী এ দু'টোর যে কোন একটায় শুধু খুশী হই। [দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(২) মূলে مسلمين শব্দ আছে। যার আভিধানিক অর্থ, আত্মসমর্থন। এখানে কোন কোন মুফাসসির আভিধানিক অর্থ হওয়াটাকেই বেশী প্রাধান্য দিয়েছেন। কেননা, সে তখনো ইসলাম গ্রহণ করেনি। সে মূলতঃ আত্মসমর্পন করতেই আসছিল। পরবর্তী বিভিন্ন আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, সাবার রাণী সুলাইমান আলাইহিসসালামের দরবারে আসার পর বিভিন্ন নিদর্শণাবলী দেখার পর ঈমান এনেছিল। তাই এখানে ইসলাম শব্দের আভিধানিক অর্থ গ্রহণই অধিক যুক্তিসম্মত। [দেখুন, মুয়াসসার] তবে এখানে পারিভাষিক অর্থে মুসলিম হয়ে যাওয়ার অর্থও গ্রহণ করা যেতে পারে। কারণ, যদি মুসলিম হয়ে যায় তবে তার সম্পদের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে না। [দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর; সা'দী]

(৩) সুলাইমান আলাইহিসসালামের কথা ও কর্মকান্ড ও তার প্রতিপত্তি দেখে সাবার রাণীর দূতগণ হতভম্ব হয়ে প্রত্যাবর্তন করল। সুলাইমান আলাইহিসসালামের যুদ্ধ ঘোষণার

মধ্যে কে তার সিংহাসন আমার কাছে নিয়ে আসবে?'

৩৯. এক শক্তিশালী জিন্ বলল, 'আপনি আপনার স্থান থেকে উঠার আগেই আমি তা এনে দেব[১] এবং এ ব্যাপারে আমি অবশ্যই শক্তিমান, বিশ্বস্ত[২]।'

قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ ۖ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ﴿٣٩﴾

৪০. কিতাবের জ্ঞান যার ছিল[৩], সে বলল,

قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ

কথা শুনিয়ে দিলে সাবার রাণী তার সম্প্রদায়কে বলল, পূর্বেও আমার এই ধারণা ছিল যে, সুলাইমান দুনিয়ার সম্রাটদের ন্যায় কোন সম্রাট নন; বরং তিনি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে বিশেষ পদমর্যাদাও লাভ করেছেন। আল্লাহ্‌র নবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নামান্তর। এরূপ শক্তি আমাদের নেই। এ কথা বলে সে সুলাইমান আলাইহিসসালামের দরবারে হাযির হওয়ার প্রস্তুতি শুরু করে দিল। সুলাইমান আলাইহিসসালাম সেটা বুঝতে পেরে তার সভাষদদের মধ্যে জানতে চাইলেন যে, কে এমন আছে যে বিলকীসের সিংহাসনটি সে আসার আগেই এখানে আনতে পারে? কারণ, তিনি চাইলেন যে বিলকীস রাজকীয় শক্তি ও শান-শওকতের সাথে একটি নবীসুলভ মু'জিযাও প্রত্যক্ষ করুক। এটা তার ঈমান আনার অধিক সহায়ক হবে। [দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর; সা'দী]

(১) সুলাইমান আলাইহিস সালামের নিয়ম ছিল যে, তিনি সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত রাষ্ট্র, বিচারকাজ ও খাওয়া দাওয়ার জন্য মজলিসে বসতেন। তাই জিনটি বলেছিল, আপনি সে বসা শেষ করার আগেই আমি সে সিংহাসনটি নিয়ে হাযির হব। [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ আপনি আমার প্রতি আস্থা রাখতে পারেন, আমি নিজে তার কোন মূল্যবান জিনিস চুরি করে নেব না। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(৩) বলা হয়েছেঃ 'কিতাবের জ্ঞান যার কাছে ছিল সে বলল' এখানে কিতাবের জ্ঞান কার কাছে ছিল তার সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। এ ব্যক্তি কে ছিল, তার কাছে কোন্ বিশেষ ধরনের জ্ঞান ছিল এবং যে কিতাবের জ্ঞান তার আয়ত্বাধীন ছিল সেটি কোন্ কিতাব ছিল, এ সম্পর্কে কোন চূড়ান্ত ও নিশ্চিত কথা বলা সম্ভবপর নয়। কুরআনে বা কোন সহীহ হাদীসে এ বিষয়গুলো সুস্পষ্ট করা হয়নি। তাফসীরকারদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ বলেন, সে ছিল একজন ফেরেশতা আবার কেউ কেউ বলেন, একজন মানুষই ছিল। তারপর সে মানুষটিকে চিহ্নিত করার ব্যাপারেও তাদের মধ্যে মতদ্বৈধতা রয়েছে। এভাবে কিতাব সম্পর্কেও মুফাস্‌সিরগণের বিভিন্ন বক্তব্য পেশ করেছেন। কেউ বলেন, এর অর্থ লাওহে মাহফুজ এবং কেউ বলেন, শরী'আতের কিতাব। কিন্তু এগুলো সবই নিছক অনুমান। আর কিতাব থেকে ঐ অর্জিত জ্ঞান সম্পর্কেও বিনা যুক্তি-প্রমাণে ঐ একই ধরনের অনুমানের আশ্রয় নেয়া হয়েছে। তবে এ সম্পর্কে এমন

بِهٖ قَبۡلَ اَنۡ یَّرۡتَدَّ اِلَیۡکَ طَرۡفُکَ ؕ فَلَمَّا رَاٰہُ مُسۡتَقِرًّا عِنۡدَہٗ قَالَ ھٰذَا مِنۡ فَضۡلِ رَبِّیۡ ۟ۖ لِیَبۡلُوَنِیۡۤ ءَاَشۡکُرُ اَمۡ اَکۡفُرُ ؕ وَ مَنۡ شَکَرَ فَاِنَّمَا یَشۡکُرُ لِنَفۡسِہٖ ۚ وَ مَنۡ کَفَرَ فَاِنَّ رَبِّیۡ غَنِیٌّ کَرِیۡمٌ ۝

‘আপনি চোখের পলক ফেলার আগেই আমি তা আপনাকে এনে দেব।’ অতঃপর সুলাইমান যখন তা সামনে স্থির অবস্থায় দেখলেন তখন তিনি বললেন, ‘এ আমার রব-এর অনুগ্রহ, যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন যে, আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, না অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। আর যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে তো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে নিজেরই কল্যাণের জন্য, আর যে কেউ অকৃতজ্ঞ হবে, সে জেনে

সম্ভাবনাও আছে যে, স্বয়ং সুলাইমান আলাইহিসসালামই তিনি। কেননা, আল্লাহ্‌র কিতাবের সর্বাধিক জ্ঞান তারই বেশী ছিল। এমতাবস্থায় গোটা ব্যাপারটাই একটা মু'জিযা এবং সাবার রাণীকে নবীসুলভ মু'জিযা দেখানোই উদ্দেশ্য ছিল। কাজেই এ ব্যাপারে আপত্তির কোন কিছু নেই। কিন্তু অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে, এ লোক সুলাইমান আলাইহিসসালামের সহচর ছিলেন, যার নাম ছিলঃ আসেফ ইবন্ বরখিয়া। সে হিসেবে এটা একটি কারামত ছিল। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর] এখানে মু'জিযা ও কারামাতের মধ্যে কিছু সুনির্দিষ্ট পার্থক্য বর্ণনা করছিঃ

মু'জিযা নবুওয়তের দাবীর সাথে সম্পৃক্ত। আর কারামতের ব্যাপারে এ দাবী থাকতে পারে না।

মু'জিযা নবীর ইচ্ছাধীন। তিনি সেটা দেখাতে ও প্রকাশে সমর্থ হন। পক্ষান্তরে কারামত দেখাবার ব্যাপার নয়। আল্লাহ্ তা'আলা কারামতের মাধ্যমে নবীর উম্মতের মধ্যে যাকে ইচ্ছে সম্মানিত করেন। তারা প্রকাশ্য সৎকর্মশীল লোকই হয়ে থাকেন।

নবীদের মু'জিযার উপরে তার উম্মাতের কারো কারামত প্রাধান্য পেতে পারে না। অর্থাৎ নবীর মু'জিযা জাতীয় হবে। নবীকে ছাড়িয়ে কেউ কারামত দেখাতে পারে না।

কারামত মূলতঃ নবীর মু'জিযারই অংশ। নবীর অনুসরণ না করলে কারামত কখনো হাসিল হতে পারে না। যারা নবীর অনুসরণ করবে না তারা যদি এ ধরণের কিছু দেখায় তবে স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে যে, সেটা কোন যাদু বা সম্মোহনী অথবা ধোঁকার অংশ। [ইমাম আল-লালকায়ী, কারামাতু আওলিয়ায়িল্লাহ এর ভূমিকা; ইবন তাইমিয়্যাহ, আন-নুবুওয়াত: ৫০৩; উমর সুলাইমান আল-আশকার; আর-রুসুল ওয়ার রিসালাহ]

রাখুক যে, আমার রব অভাবমুক্ত, মহানুভব(১) ।'

৪১. সুলাইমান বললেন, 'তোমরা তার সিংহাসনের আকৃতি তার কাছে অপরিচিত করে বদলে দাও; দেখি সে সঠিক দিশা পায়, না সে তাদের অন্তর্ভুক্ত যাদের দিশা নেই(২)?

قَالَ نَكِّرُوْا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ اَتَهْتَدِيْٓ اَمْ تَكُوْنُ مِنَ الَّذِيْنَ لَا يَهْتَدُوْنَ ﴿٤١﴾

৪২. অতঃপর সে নারী যখন আসল, তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হল, 'তোমার

فَلَمَّا جَآءَتْ قِيْلَ اَهٰكَذَا عَرْشُكِ ؕ قَالَتْ

(১) অর্থাৎ তিনি কারো কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মুখাপেক্ষী নন। কারো কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ফলে তাঁর সার্বভৌম কর্তৃত্ব সামান্য পরিমাণও বৃদ্ধি পায় না আবার কারো অকৃতজ্ঞতার ফলে তাতে এক চুল পরিমাণ কমতিও হয় না। তিনি নিজস্ব শক্তি বলে সর্বময় কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে যাচ্ছেন। বান্দাদের মানা না মানার উপর তাঁর কর্তৃত্ব নির্ভরশীল নয়। কুরআন মজীদে একথাটিই এক জায়গায় মূসার মুখ দিয়ে উদ্ধৃত করা হয়েছেঃ "যদি তোমরা এবং সারা দুনিয়াবাসীরা মিলে কুফরী করো তাহলেও তাতে আল্লাহর কিছু আসে যায় না, তিনি অমুখাপেক্ষী এবং আপন সত্তায় আপনি প্রশংসিত।" [সূরা ইবরাহীমঃ ৮] অনুরূপভাবে, নিম্নোক্ত হাদীসে কুদসীতেও এ একই বিষয়বস্তুর অবতারণা করা হয়েছেঃ "মহান আল্লাহ বলেন, হে আমার বান্দারা যদি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তোমরা সকল মানুষ ও জিন তোমাদের মধ্যকার সবচেয়ে বেশী মুত্তাকী ব্যক্তির হৃদয়ের মতো হয়ে যাও, তাহলে তার ফলে আমার বাদশাহী ও শাসন কর্তৃত্বে কিছুমাত্র বৃদ্ধি ঘটে না। হে আমার বান্দারা ! যদি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তোমরা সকল মানুষ ও জিন তোমাদের মধ্যকার সবচেয়ে বেশী বদকার ব্যক্তিটির হৃদয়ের মতো হয়ে যাও, তাহলে এর ফলে আমার বাদশাহীতে কোন কমতি দেখা যাবে না। হে আমার বান্দারা! এগুলো তোমাদের নিজেদেরই কর্ম, তোমাদের হিসেবের খাতায় আমি এগুলো গণনা করি, তারপর এগুলোর পুরোপুরি প্রতিদান আমি তোমাদের দিয়ে থাকি। কাজেই যার ভাগ্যে কিছু কল্যাণ এসেছে তার উচিত আল্লাহর শোকরগুজারী করা এবং যে অন্যকিছু লাভ করেছে সে যেন নিজেকেই ভর্ৎসনা করে"। [মুসলিমঃ ২৫৭৭]

(২) এর অর্থ হচ্ছে, হঠাৎ তিনি স্বদেশ থেকে এত দূরে নিজের সিংহাসন দেখে একথা বুঝতে পারেন কি না যে এটা তারই সিংহাসন এবং এটা উঠিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। আবার এ বিস্ময়কর মু'জিযা দেখে তিনি সত্য-সঠিক পথের সন্ধান পান অথবা নিজের ভ্রষ্টতার মধ্যে অবস্থান করতে থাকেন কি না এ অর্থও এর মধ্যে নিহিত রয়েছে। [দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

كَاَنَّهٗ هُوَ ۚ وَاُوْتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِيْنَ ﴿٤٢﴾

সিংহাসন কি এরূপই?' সে বলল, 'মনে হয় এটা সেটাই। আর আমাদেরকে ইতিপূর্বেই প্রকৃত জ্ঞান দান করা হয়েছে এবং আমরা আজ্ঞাবহও হয়ে গেছি[১]।'

وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَّعْبُدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ اِنَّهَا

৪৩. আর আল্লাহ্‌র পরিবর্তে সে যার পূজা করত সেটাই তাকে নিবৃত্ত করেছিল[২],

(১) আয়াতের শেষাংশ অর্থাৎ 'আমাদেরকে ইতিপূর্বেই প্রকৃত জ্ঞান দান করা হয়েছে এবং আমরা আজ্ঞাবহও হয়ে গেছি' এটা কার কথা তা নির্ধারণে দুটি মত রয়েছেঃ এক, এটা সাবার রাণীর বক্তব্য। সুতরাং তখন অর্থ হবে, আমাদের কাছে আপনার নবুওয়ত ও ঐশ্বর্যের জ্ঞান আগেই এসেছে তাই আমরা পূর্ব থেকেই আনুগত্য প্রকাশ করে নিয়েছি। এর আরেক অর্থ এটাও হতে পারে যে, অর্থাৎ এ মু'জিযা দেখার আগেই সুলাইমান আলাইহিস সালামের যেসব গুণাবলী ও বিবরণ আমরা জেনেছিলাম তার ভিত্তিতে আমাদের বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল যে, তিনি নিছক একটি রাজ্যের শাসনকর্তা নন বরং আল্লাহর একজন নবী। দুই, এটা সুলাইমান আলাইহিসসালামের কথা। তখন অর্থ হবে, আমরা আগে থেকেই আল্লাহ্‌র কুদরত সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান থাকায় তাঁর উপর ঈমান এনেছি। বা আমরা আগে থেকেই জানতাম যে, আপনি আনুগত্য করবেন অথবা আপনার আগমনের পূর্বেই আমাদের জানা ছিল যে, আপনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং আপনি অনুগত হয়ে আসছেন। [ফাতহুল কাদীর]

(২) বলা হয়েছেঃ 'আল্লাহ্‌র পরিবর্তে সে যার পূজা করত সেটাই তাকে নিবৃত্ত করেছে' এখানে যে অর্থ করা হয়েছে তার দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যে সমস্ত বস্তুর ইবাদত সে করত যেমন চাঁদ-সূর্য সেগুলিই তাকে ঈমান আনতে বাধ সাধছিল। কারণ, মানুষের মনে একবার কোন কিছুর মহব্বত গেঁথে গেলে সেটা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়ে। সে জন্য সে হক জানার পরও ঈমান আনতে দেরী করছিল। এ অর্থানুসারে আলোচ্য বাক্যাংশটি আল্লাহর পক্ষ থেকে তার অবস্থান সুস্পষ্ট করার জন্য বলা হয়েছে। অর্থাৎ তার মধ্যে জিদ ও একগুয়েমী ছিল না। শুধুমাত্র কাফের জাতির মধ্যে জন্ম নেয়ার কারণেই তিনি তখনো পর্যন্ত কাফের ছিলেন। সচেতন বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী হবার পর থেকেই যে জিনিসের সামনে সিজদাবনত হবার অভ্যাস তার মধ্যে গড়ে উঠেছিল সেটিই ছিল তার পথের প্রতিবন্ধক। সুলাইমান আলাইহিসসালামের মুখোমুখি হবার পর যখন তার চোখ খুলে তখন এ প্রতিবন্ধক দূর হতে এক মুহূর্তও দেরী হয় নি। আয়াতের আরেকটি অর্থ এও করা হয় যে, 'আল্লাহ্ ছাড়া যাদের ইবাদত সে করত তা থেকে তাকে নিবৃত্ত করা হয়েছে'। তখন নিবৃত্তকারী স্বয়ং আল্লাহ্ হতে পারেন কারণ তিনি তা হারাম ঘোষণা করেছেন। অথবা সুলাইমান আলাইহিসসালামও হতে পারেন। কারণ, ঈমান আনতে বাধ্য করার মাধ্যমে

كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ﴿٤٣﴾

সে তো ছিল কাফের সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ।

قِيْلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ ۚ فَلَمَّا رَاَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَّكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا ۗ قَالَ اِنَّهٗ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيْرَ ۬ؕ قَالَتْ رَبِّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَاَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمٰنَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٤﴾

৪৪. তাকে বলা হল, 'প্রাসাদটিতে প্রবেশ কর ।' অতঃপর যখন সে সেটা দেখল তখন সে সেটাকে এক গভীর জলাশয় মনে করল এবং সে তার পায়ের গোছা দুটো অনাবৃত করল । সুলাইমান বললেন, এটা তো স্বচ্ছ স্ফটিক মণ্ডিত প্রাসাদ । সেই নারী বলল, 'হে আমার রব! আমি তো নিজের প্রতি যুলুম করেছিলাম[১], আর আমি সুলাইমানের সাথে সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ্‌র কাছে আত্মসমর্পণ করছি ।'

চতুর্থ রুকূ'

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَاۤ اِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ فَاِذَا هُمْ فَرِيْقٰنِ يَخْتَصِمُوْنَ ﴿٤٥﴾

৪৫. আর অবশ্যই আমরা সামূদ সম্প্রদায়ের কাছে তাদের ভাই সালেহ্‌কে পাঠিয়েছিলাম এ আদেশসহ যে, 'তোমরা আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত কর[২],' এতে তারা দু'দলে বিভক্ত হয়ে বিতর্কে লিপ্ত হল[৩] ।

সুলাইমান আলাইহিসসালাম তাকে অন্য কিছুর ইবাদত ত্যাগ করতে বাধ্য করলেন । [দেখুন, তাবারী; কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(১) অর্থাৎ শির্ক করার মাধ্যমে, তাছাড়া পূর্বেকার যে সমস্ত কুফরি ও গোনাহ সে করেছিল সবই উদ্দেশ্য হতে পারে । [ইবন কাসীর]

(২) তুলনামূলক অধ্যায়নের জন্য সূরা আল-আ'রাফের ৭৩ থেকে ৭৯,হূদের ৬১ থেকে ৬৮, আশ্‌ শু'আরার ৪১ থেকে ৫৯, আল-কামারের ২৩ থেকে ৩২ এবং আশ্‌-শামসের ১১ থেকে ১৫ আয়াত পড়ুন ।

(৩) অর্থাৎ সালেহ আলাইহিস সালামের দাওয়াত শুরু হওয়ার সাথে সাথেই তার জাতি দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে গেলো । একটি দল মুমিনদের এবং অন্যটি অস্বীকারকারীদের এ বিভক্তির সাথে সাথেই তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাতও শুরু হয়ে গেলো । [ইবন কাসীর] যেমন কুরআন মজীদে বলা হয়েছে: "তার জাতির শ্রেষ্ঠত্বের গর্বে গর্বিত সরদাররা

৪৬. তিনি বললেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা কেন কল্যাণের আগে অকল্যাণ ত্বরান্বিত করতে চাচ্ছ[১]? কেন তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছ না, যাতে তোমরা রহমত পেতে পার?'

قَالَ يٰقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُوْنَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ۚ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝

৪৭. তারা বলল, 'তোমাকে ও তোমার সঙ্গে যারা আছে তাদেরকে আমরা অমঙ্গলের কারণ মনে করি[২]।' সালেহ্‌ বললেন, 'তোমাদের 'কুলক্ষণ গ্রহণ করা' আল্লাহ্‌র ইখ্‌তিয়ারে,

قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَّعَكَ ۚ قَالَ طٰٓئِرُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُوْنَ ۝

দলিত ও নিষ্পেষিত জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে বললো, সত্যই কি তোমরা জানো, সালেহ তার রবের পক্ষ থেকে পাঠানো একজন নবী? তারা জবাব দিল, তাকে যে জিনিস সহকারে পাঠানো হয়েছে আমরা অবশ্যই তার প্রতি ঈমান রাখি। এ অহংকারীরা বললো, তোমরা যে জিনিসের প্রতি ঈমান এনেছো আমরা তা মানি না।" [সূরা আল-আ'রাফঃ ৭৫-৭৬] মনে রাখতে হবে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের সাথে সাথে মক্কায়ও এ একই ধরনের অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। তখনও জাতি দু'ভাগে বিভক্ত হয়েছিল।

(১) অর্থাৎ আল্লাহর কাছে কল্যাণ চাওয়ার পরিবর্তে অকল্যাণ চাওয়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করছো কেন? অন্য জায়গায় সালেহের জাতির সরদারদের এ উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছেঃ "হে সালেহ ! আনো সেই আযাব আমাদের উপর, যার হুমকি তুমি আমাদের দিয়ে থাকো, যদি সত্যি তুমি রসূল হয়ে থাকো।" [সূরা আল-আ'রাফঃ ৭৭]

(২) তাদের উক্তির একটি অর্থ হচ্ছে এই যে, তোমার এ কর্মকাণ্ড আমাদের জন্য বড়ই অমংগলজনক প্রমাণিত হয়েছে। যখন থেকে তুমি ও তোমার সাথীরা পূর্বপুরুষদের ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করে দিয়েছো তখন থেকেই নিত্যদিন আমাদের উপর কোন না কোন বিপদ আসছে। কারণ আমাদের উপাস্যরা আমাদের প্রতি নারাজ হয়ে গেছে। এ অর্থের দিক দিয়ে আলোচ্য উক্তিটি সেই সব মুশরিক জাতির উক্তির সাথে সামঞ্জস্যশীল, যারা নিজেদের নবীদেরকে অপয়া গণ্য করতো। সূরা ইয়াসীনে একটি জাতির কথা বলা হয়েছে। তারা তাদের নবীদেরকে বললোঃ "আমরা তোমাদের অপয়া পেয়েছি" [১৮] মূসা সম্পর্কে ফির'আউনের জাতি এ কথাই বলতো: "যখন তাদের সুসময় আসতো, তারা বলতো আমাদের এটাই প্রাপ্য আর যখন কোন বিপদ আসতো তখন মুসা ও তার সাথিদের কুলক্ষুণে হওয়াটাকে এ জন্য দায়ী মনে করতো।" [সূরা আল-আ'রাফঃ ১৩১]

বস্তুত তোমরা এমন এক সম্প্রদায় যাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে[১] ।'

৪৮. আর সে শহরে ছিল এমন নয় ব্যক্তি[২], যারা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করত এবং সংশোধন করত না ।

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُّفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿٤٨﴾

৪৯. তারা বলল, 'তোমরা পরস্পর আল্লাহ্‌র নামে শপথ গ্রহণ কর, 'আমরা রাতেই শেষ করে দেব তাকে ও তার পরিবার-পরিজনকে; তারপর তার অভিভাবককে নিশ্চিত করে বলব যে, 'তার পরিবার-পরিজনের হত্যা আমরা প্রত্যক্ষ করিনি; আর আমরা অবশ্যই সত্যবাদী[৩] ।'

قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٤٩﴾

---

(১) অর্থাৎ তোমরা যা মনে করছো আসল ব্যাপার তা নয় । আসল ব্যাপারটি তোমরা এখনো বুঝতে পারোনি । সেটি হচ্ছে, আমার আসার ফলে তোমাদের পরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে । যতদিন আমি আসিনি ততদিন তোমরা নিজেদের মূর্খতার পথে চলছিলে । তোমাদের সামনে হক ও বাতিলের কোন সুস্পষ্ট পার্থক্য-রেখা ছিল না । এখন তোমাদের সবাইকে যাচাই ও পরখ করা হবে । অথবা আয়াতের অর্থ, তোমাদের গোনাহের কারণে তোমাদেরকে শাস্তি পেতে হবে । [কুরতুবী]

(২) এখানে যে শব্দটি এসেছে, তা হলো: رهط এ শব্দটির অনুবাদ করা হয়েছে, ব্যক্তি । কিন্তু শব্দটির আসল অর্থঃ দল । অর্থাৎ ন'জন সরদার । তাদের প্রত্যেকের সাথে ছিল একটি বিরাট দল । এখানে নয় ব্যক্তির মধ্য থেকে প্রত্যেককেই رهط বলার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, তারা তাদের অর্থ-সম্পদ, জাঁক-জমক ও প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে সম্প্রদায়ের প্রধানরূপে গণ্য হত এবং প্রত্যেকের সাথে ভিন্ন ভিন্ন দল ছিল । কাজেই এই নয় ব্যক্তিকে নয় দল বলা হয়েছে । [দেখুন, কুরতুবী]

(৩) উদ্দেশ্য এই যে, আমরা সবাই মিলে রাতের অন্ধকারে তার উপর ও তার জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর উপর হানা দেব এবং সবাইকে হত্যা করব । এরপর তার হত্যার দাবীদার তদন্ত করলে আমরা বলে দেব, আমরা তো তাকে হত্যা করিনি এবং কাউকে হত্যা করতেও দেখিনি । একথায় আমরা সত্যবাদী গণ্য হব ।[দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

হুবহু এ একই ধরনের চক্রান্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে করার জন্য মক্কার গোত্রীয় সরদাররা চিন্তা করতো । অবশেষে হিজরতের সময়

وَمَكَرُوا مَكْرًا وَّمَكَرْنَا مَكْرًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٥٠﴾

৫০. আর তারা এক চক্রান্ত করেছিল এবং আমরাও এক কৌশল অবলম্বন করলাম, অথচ তারা উপলব্ধিও করতে পারেনি[১]।

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ ۙ اَنَّا دَمَّرْنٰهُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٥١﴾

৫১. অতএব দেখুন, তাদের চক্রান্তের পরিণাম কি হয়েছে---আমরা তো তাদেরকে ও তাদের সম্প্রদায়ের সকলকে ধ্বংস করেছি।

فَتِلْكَ بُيُوْتُهُمْ خَاوِيَةًۢ بِمَا ظَلَمُوْا ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿٥٢﴾

৫২. সুতরাং এ তো তাদের ঘরবাড়ী---যুলুমের কারণে যা জনশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে; নিশ্চয় এতে নিদর্শন রয়েছে, সে সম্প্রদায়ের জন্য যারা জানে[২]।

তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করার জন্য এ চক্রান্ত করলো। অর্থাৎ তারা সব গোত্রের লোক একত্র হয়ে তার উপর হামলা করবে। এর ফলে বনু হাশেম কোন একটি বিশেষ গোত্রকে অপরাধী গণ্য করতে পারবে না এবং সকল গোত্রের সাথে একই সংগে লড়াই করা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। [আল-আজুররী; আশ-শারী'আহ: ৪/১৬৬০]

(১) অর্থাৎ তারা নিজেদের স্থিরীকৃত সময়ে সালেহের উপর নৈশ আক্রমণ করার পূর্বেই আল্লাহ তাঁর আযাব নাযিল করলেন এবং এর ফলে কেবলমাত্র তারা নিজেরাই নয় বরং তাদের সমগ্র সম্প্রদায় ধ্বংস হয়ে গেলো। মনে হয়, উটনীর পায়ের রগ কেটে ফেলার পর তারা এ চক্রান্তটি করেছিল। সূরা হূদে বলা হয়েছে, যখন তারা উটনীকে মেরে ফেললো তখন সালেহ তাদেরকে নোটিশ দিলেন। তাদেরকে বললেন, ব্যস আর মাত্র তিন দিন ফূর্তি করে নাও তারপর তোমাদের উপর আযাব এসে যাবে একথায় সম্ভবত তারা চিন্তা করেছিল, সালেহ আলাইহিসসালামের কথিত আযাব আসুক বা না আসুক আমরা উটনীর সাথে তারও বা দফা রফা করে দিই না কেন। কাজেই খুব সম্ভবত নৈশ আক্রমণ করার জন্য তারা সেই রাতটিই বেছে নেয়, যে রাতে আযাব আসার কথা ছিল এবং সালেহের গায়ে হাত দেবার আগেই আল্লাহর জবরদস্ত হাত তাদেরকে পাকড়াও করে ফেললো। [বিস্তারিত দেখুন, কুরতুবী; ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ তাদের জন্যই নিদর্শন রয়েছে যারা প্রকৃত অবস্থা জানে। আর যারা আল্লাহ্‌র আযাব ও শাস্তি নাযিল হওয়ার ব্যাপারটি সম্পর্কে সম্যক অবগত। তারা আরও

৫৩. আর আমরা উদ্ধার করেছিলাম তাদেরকে, যারা ঈমান এনেছিল। আর তারা তাকওয়া অবলম্বন করত।

وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٥٣﴾

৫৪. আর স্মরণ করুন লূতের কথা[১], তিনি তার সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, 'তোমরা জেনে-দেখে[২] কেন অশ্লীল কাজ করছ?

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿٥٤﴾

৫৫. 'তোমরা কি কামতৃপ্তির জন্য নারীকে ছেড়ে পুরুষে উপগত হবে? তোমরা

أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ

জানে যে, আল্লাহ্‌ তাঁর বন্ধুদের সাথে কি ব্যবহার করেন। তাদের এটাও জানা রয়েছে যে, যুলুমের পরিণতি হচ্ছে, ধ্বংস ও বিপর্যয়, আর ঈমান ও ইনসাফের পরিণতি হচ্ছে নাজাত ও সফলতা। [সা'দী] কিন্তু মূর্খদের ব্যাপার আলাদা। তারা তো বলবে, সামূদ জাতি যে ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হয় তার সাথে সালেহ ও তার উটনীর কোন সম্পর্ক নেই। এসব তো প্রাকৃতিক কারণে হয়ে থাকে। কিন্তু চিন্তাশীল ও জ্ঞানবান লোক মাত্রই জানেন, কোন অন্ধ ও বধির আল্লাহ এ বিশ্ব-জাহানের উপর রাজত্ব করছেন না বরং এক সর্বজ্ঞ ও পরম বিজ্ঞ সত্তা এখানে সকলের ভাগ্যের নিষ্পত্তি করছেন।

(১) কওমে লূতের কাহিনী তুলনামূলক অধ্যায়নের জন্য দেখুন আল আ'রাফঃ ৮০ থেকে ৮৪, হূদঃ ৭৪ থেকে ৮৩, আল হিজরঃ ৫৭ থেকে ৭৭, আল-আম্বিয়াঃ ৭১ থেকে ৭৫, আশ্‌ শু'আরাঃ ১৬০ থেকে ১৭৪, আল আনকাবুতঃ ২৮ থেকে ৭৫, আস্‌ সাফ্‌ফাতঃ ১৩৩ থেকে১৩৮ এবং আল- কামারঃ ৩৩ থেকে ৩৯ আয়াত।

(২) এখানে تبصرون শব্দটির দু অর্থ হতে পারেঃ এক, চাক্ষুষ দেখা। তখন এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। সম্ভবত এ সবগুলো অর্থই এখানে প্রযোজ্য। এক, এ কাজটি যে অশ্লীল ও খারাপ তা তোমরা জানো না এমন নয়। বরং জেনে বুঝে তোমরা এ কাজ করো। [সা'দী] দুই, তোমরা প্রকাশ্যে কোন প্রকার রাখ-ডাক ছাড়াই এ অশ্লীল কাজ করে যাচ্ছো। কারণ, তারা এ সমস্ত কদর্য কাজগুলো লোকসমক্ষেই করে বেড়াত। তাদের বিভিন্ন বৈঠকেও তারা সেটা করত। [কুরতুবী; ইবন কাসীর] অন্যদিকে চক্ষুষ্মান লোকেরা তোমাদের কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করছে, যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, "আর তোমরা নিজেদের মজলিসে বদকাম করে থাকো।" [সূরা আল-আনকাবূতঃ ২৯] দুই, অন্তর দিয়ে জেনে উপলব্ধি করা। তখন অর্থ হবে, তোমরা অন্তর দিয়ে ভালকরেই জানো ও বোঝ যে, কোন ক্রমেই এ কাজটি ভাল নয়। তারপরও তোমরা সেটা করে যাচ্ছ। [কুরতুবী]

النِّسَاۤءِؕ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ۝٥٥

তো এক অজ্ঞ[১] সম্প্রদায়।'

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖۤ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوْۤا اَخْرِجُوْۤا اٰلَ لُوْطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْۚ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ۝٥٦

৫৬. উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু বলল, 'লূত-পরিবারকে তোমরা জনপদ থেকে বহিস্কার কর, এরা তো এমন লোক যারা পবিত্র থাকতে চায়।'

فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَهْلَهٗۤ اِلَّا امْرَاَتَهٗ ؗ قَدَّرْنٰهَا مِنَ الْغٰبِرِيْنَ۝٥٧

৫৭. অতঃপর আমরা তাকে ও তার পরিজনবর্গকে উদ্ধার করলাম, তার স্ত্রী ছাড়া, আমরা তাকে অবশিষ্টদের অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম।

وَ اَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۚ فَسَاۤءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ۝٥٨

৫৮. আর আমরা তাদের উপর ভয়ংকর বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম; সুতরাং ভীতি প্রদর্শিতদের জন্য এ বর্ষণ কতই না নিকৃষ্ট ছিল!

পঞ্চম রুকূ'

قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلٰمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ

৫৯. বলুন, 'সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই[২]

(১) تجهلون শব্দের মূল হলো جهالة। এর প্রসিদ্ধ অর্থ হচ্ছে নির্বুদ্ধিতা ও বোকামি। [আল-কাসেমী, মাহাসীনুত তাওয়ীল: ৩/৫০, ৪/৩৭৬; উসাইমীন, তাফসীরু সূরাতায়িল ফাতিহা ওয়াল বাকারাহ: ২৩৫] গালি গালাজ ও বেহুদা কাজ কারবার করলেও তাকে জাহেলী কাজ বলা হয়। যেমন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেছিলেন। [দেখুন, বুখারী: ৩০] আবার এ শব্দটি জ্ঞানহীনতা অর্থেও ব্যবহার করা হয়, [ইবন কাসীর] তখন এর অর্থ হবে, তোমরা নিজেদের এ খারাপ কাজটির পরিণাম জানো না। তোমরা পরিণাম সম্পর্কে অজ্ঞ হয়েই এ ধরণের জঘন্য কাজ করছ। তোমরা জানো না যে, এর শাস্তি কত ভয়াবহ হতে পারে। তোমরা তো একথা জানো, তোমরা যা অর্জন করছো তা প্রবৃত্তিকে তৃপ্তি দান করে। কিন্তু তোমরা জানো না এ চরম অপরাধমূলক ও জঘন্য ভোগ লিপ্সার জন্য শীঘ্রই তোমাদের কেমন কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। আবার এটাও অর্থ হতে পারে যে, এটা যে হারাম সেটা তোমরা জান না বা জানতে চেষ্টা করছ না। [কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(২) এ ভূমিকার মাধ্যমে মুসলিমরা কিভাবে তাদের বক্তৃতা শুরু করবে তা শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এরই ভিত্তিতে সঠিক ইসলামী চিন্তা ও মানসিকতা সম্পন্ন লোকেরা সব সময় আল্লাহর প্রশংসা এবং তাঁর সৎ বান্দাদের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার দো'আ করে

এবং শান্তি তাঁর মনোনীত বান্দাদের প্রতি[১]!' শ্রেষ্ঠ কি আল্লাহ্, নাকি তারা যাদেরকে শরীক করে তারা[২]?

اصْطَفٰى ءٰٓاللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٥٩﴾

তাদের বক্তৃতা শুরু করে থাকেন। [কুরতুবী] কিন্তু আজকাল কোন কোন মুসলিম বক্তারা তো এর মাধ্যমে বক্তৃতা শুরু করার কথা কল্পনাই করতে পারেন না অথবা এভাবে বক্তৃতা শুরু করতে তারা লজ্জা অনুভব করেন।

(১) পূর্ববর্তী নবী ও তাদের উম্মতদের আযাব ও ধ্বংসের কিছু অবস্থা বর্ণনা করার পর এই বাক্যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যে, আপনি আল্লাহ্ তা'আলার সপ্রশংস কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন। কারণ, আপনার উম্মতকে দুনিয়ার ব্যাপক আযাব থেকে নিরাপদ করে দেয়া হয়েছে। পূর্ববর্তী নবী ও আল্লাহ্‌র মনোনীত বান্দাদের প্রতি সালাম প্রেরণ করুন। এখানে 'আল্লাহ্‌র মনোনীত বান্দাহ্' বলে সে সমস্ত ঈমানদার লোকদেরকেই বুঝানো হবে যারা আল্লাহ্‌র সাথে কোন প্রকার শির্ক করেনি। কোন ধরনের কুফরীতে লিপ্ত হয়নি। নিঃসন্দেহে তারা হলেন নবী-রাসূলগণ। যারা তাওহীদ বাস্তবায়ণ করেছে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "আর শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলদের প্রতি!" [সূরা আস-সাফফাত: ১৮১] তাছাড়া নবী-রাসূলদের অনুসারীদের মধ্যে যাদেরকে আল্লাহ্ পছন্দ করেছেন তারাও নবী-রাসূলদের অনুগামী হয়ে এ 'সালাম' বা শান্তি লাভের দো'আর আওতায় পড়বেন। আমাদের নবীর উম্মতদের মধ্যে সাহাবায়ে কেরাম এদের অগ্রভাগে রয়েছেন। আর এ জন্যই কোন কোন মুফাসসির এখানে 'আল্লাহ্‌র মনোনীত বান্দাহ্' বলে সাহাবায়ে কেরামদের উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে বলেও মত প্রকাশ করেছেন। [দেখুন, কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] আর যদি 'আল্লাহ্‌র মনোনীত বান্দাহ্' বলে সাহাবায়ে কেরামদের বোঝানো হয়ে থাকে তবে এ আয়াত দ্বারা এটা সাব্যস্ত হবে যে, নবীদের প্রতি 'আলাইহিস সালাম' বলে সালাম প্রেরণের সাথে সাথে তাদের অনুসারীদের জন্য সেটি ব্যবহার জায়েয। কিন্তু নবীদের প্রতি সালাম প্রেরণ ব্যতীত অন্যান্যদের উপর সরাসরি 'আলাইহিস্ সালাম' বলার সপক্ষে কোন যুক্তি নেই। বরং সেটা বিদ'আত হিসেবে বিবৃত হবে। যেমন, আলী আলাইহিসসালাম বলা বা হুসাইন আলাইহিসসালাম বলা। তাই এ ধরনের ব্যবহার ত্যাগ করতে হবে। [দেখুন, ইবন কাসীর: ৬/৪৭৮; তাফসীরুল আলূসী: ৬/৭, ১১/২৬১]

(২) মুশরিকদের একজনও একথার জবাবে বলতে পারতো না, একাজ আল্লাহর নয়, অন্য কারো অথবা আল্লাহর সাথে অন্য কেউ তাঁর একাজে শরীক আছে। কুরআন মজীদে অন্যান্য স্থানে মক্কার কাফের সমাজ ও আরব মুশরিকদের সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ "আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, পৃথিবী ও আকাশসমূহ কে সৃষ্টি করেছে? তাহলে তারা নিশ্চয়ই বলবে, মহা পরাক্রান্ত মহাজ্ঞানী সত্তাই এসব সৃষ্টি করেছেন।"[সূরা আয-যুখরুফঃ ৯] আরো এসেছে, "আর যদি তাদেরকে

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَأَنْۢبَتْنَا بِهِۦ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ۚ مَّا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْۢبِتُوا۟ شَجَرَهَا ۗ أَءِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُوْنَ ﴿٦٠﴾

৬০. নাকি তিনি(১), যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমানসমূহ ও যমীন এবং আকাশ থেকে তোমাদের জন্য বর্ষণ করেন বৃষ্টি, তারপর আমরা তা দ্বারা মনোরম উদ্যান সৃষ্টি করি, তার গাছ উদ্‌গত করার ক্ষমতা তোমাদের নেই। আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন ইলাহ্ আছে কি? বরং তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা (আল্লাহ্‌র) সমকক্ষ নির্ধারণ করে(২)।

জিজ্ঞেস করেন, তাদেরকে কে সৃষ্টি করেছে তাহলে তারা নিশ্চয়ই বলবে, আল্লাহ।" [সূরা আয-যুখরুফঃ ৮৭] আরো বলেছেনঃ "আর যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন কে আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছে এবং মৃত পতিত জমি কে জীবিত করেছে? তাহলে তারা নিশ্চয়ই বলবে আল্লাহ।" [সূরা আল-আনকাবূতঃ ৬৩] আল্লাহ্ আরো বলেছেনঃ "তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে তোমাদের আকাশ ও পৃথিবী থেকে জীবিকা দান করেন? এ শ্রবণও দর্শনের শক্তি কার নিয়ন্ত্রণাধীন? কে সজীবকে নির্জীব এবং নির্জীবকে সজীব করেন? কে এ বিশ্ব ব্যবস্থা পরিচালনা করছেন? তারা নিশ্চয়ই বলবে আল্লাহ।" [সূরা ইউনুসঃ ৩১] আরবের মুশরিকরা এবং সারা দুনিয়ার মুশরিকরা সাধারণত একথা স্বীকার করতো এবং আজো স্বীকার করে যে, আল্লাহই বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা এবং বিশ্বব্যবস্থা পরিচালনাকারী। তাই কুরআন মজীদের এ প্রশ্নের জবাবে তাদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তি নিতান্ত হঠকারিতা ও গোয়ার্তুমীর আশ্রয় নিয়ে ও নিছক বিতর্কের খাতিরেও বলতে পারতো না যে, আমাদের উপাস্য দেবতারা আল্লাহর সাথে এসব কাজে শরীক আছে। কারণ যদি তারা একথা বলতো তাহলে তাদের নিজেদের জাতির হাজার হাজার লোক তাদেরকে মিথ্যুক বলতো এবং তারা পরিষ্কার বলে দিতো, এটা আমাদের আকীদা নয়।

(১) পরবর্তী কয়েকটি আয়াতে 'নাকি তিনি' বলে এটা বলাই উদ্দেশ্য যে, যিনি এ কাজগুলো করতে পারেন, তিনি কি তাদের মত, যারা কিছুই করতে পারে না? কথার আগ-পিছ থেকে এটা বোঝা যায়, যদিও দ্বিতীয়টি এখানে বর্ণিত হয়নি। তাছাড়া আগের আয়াত "শ্রেষ্ঠ কি আল্লাহ্, নাকি তারা যাদেরকে শরীক করে তারা ?" এ কথা এর উপর প্রমাণবহ। [ইবন কাসীর]

(২) মূলে يَعْدِلُوْنَ শব্দ এসেছে, এ শব্দটির পরে যদি بـ অব্যয় যুক্ত হয়ে তখন এর অর্থ হয়, সমকক্ষ দাঁড় করানো যেমন, সূরা আল-আন'আমের ১ম আয়াতে এসেছে। কিন্তু যদি এর পরে عن অব্যয় আসে তখন এর অর্থ হয়, কোন কিছু ত্যাগ করে অন্য কিছু গ্রহণ

أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلٰلَهَآ أَنْهٰرًا وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ أَءِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٦١﴾

৬১. নাকি তিনি, যিনি যমীনকে করেছেন বসবাসের উপযোগী এবং তার মাঝে মাঝে প্রবাহিত করেছেন নদীনালা এবং তাতে স্থাপন করেছেন সুদৃঢ় পর্বত ও দুই সাগরের মাঝে সৃষ্টি করেছেন অন্তরায়[১]; আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন ইলাহ্ আছে কি? বরং তাদের অধিকাংশই জানে না।

أَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْٓءَ

৬২. নাকি তিনি, যিনি আর্তের ডাকে[২] সাড়া দেন, যখন সে তাঁকে ডাকে

করা। এ আয়াতে যেহেতু কোন কিছুই উল্লেখ করা হয়নি সেহেতু এর অর্থ নির্ধারণে দুটি মত এসেছে, একঃ তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা আল্লাহ্‌র সাথে সমকক্ষ দাঁড় করায়। দুইঃ তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা হক্ককে পরিত্যাগ করে বাতিলকে গ্রহণ করেছে। [ফাতহুল কাদীর] তবে এখানে প্রথম অর্থটিই বেশী গ্রহণযোগ্য। [ইবন কাসীর] তাছাড়া يعدلون শব্দের আরেকটি অর্থ হচ্ছে, ইনসাফ করা। যেমন সূরা আল-আ'রাফঃ ১৫৯, ১৮১। কিন্তু এ অর্থ এখানে উদ্দেশ্য নয়।

(১) অর্থাৎ মিঠা ও নোনা পানির ভাণ্ডার। এ ভাণ্ডার এ পৃথিবীতেই রয়েছে কিন্তু তারা কখনো পরস্পর মিশে যায় না। ভূ-গর্ভের পানির স্রোতও কখনো একই এলাকায় মিঠা পানির স্রোত আলাদা এবং নোনা পানির স্রোত আলাদা দেখা যায়। নোনা পানির সাগরেও দেখা যায় কোথাও মিঠা পানির স্রোত আলাদা প্রবাহিত হচ্ছে। [দেখুন ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(২) مضطر শব্দটি اضطرار থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ, কোন অভাব হেতু অপারগ ও অস্থির হওয়া। এটা তখনই হয়, যখন কোন হিতকামী, সাহায্যকারী ও সহায় না থাকে। কাজেই এমন ব্যক্তিকে مضطر বলা হয়, যে দুনিয়ার সব সহায় থেকে নিরাশ হয়ে একান্তভাবে আল্লাহ্ তা'আলাকেই সাহায্যকারী মনে করে এবং তাঁর প্রতি মনোযোগী হয়। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ রকম পরিস্থিতিতে যে দো'আ করতে বলেছেন তা হলোঃ أَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُوْ فَلَا تَكِلْنِيْ إِلى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ، وأَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّه لا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ 'হে আল্লাহ্! আমি আপনার রহমতের আশা করি। অতএব, মুহূর্তের জন্যেও আমাকে আমার নিজের কাছে সমর্পণ করবেন না। আর আপনি আমার সবকিছু ঠিক-ঠাক করে দিন। আপনি ছাড়া কোন হক্ক ইলাহ নেই।' [আবু দাউদঃ ৫০৯০, মুসনাদে আহমাদঃ ৫/৪২]

وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾

এবং বিপদ দূরীভূত করেন[১], আর তোমাদেরকে যমীনের প্রতিনিধি বানান[২]। আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন ইলাহ্ আছে কি? তোমরা খুব অল্পই শিক্ষা গ্রহণ করে থাক।

(১) নিঃসহায়ের দো'আ কবুল হওয়ার মূল কারণ হলো, আন্তরিকতা। কারণ, দুনিয়ার সব সহায় থেকে নিরাশ এবং সম্পর্কাদি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাকেই কার্যোদ্ধারকারী মনে করে দো'আ করার মাধ্যমে ইখলাস প্রকাশ পায়। আল্লাহ্ তা'আলার কাছে ইখলাসের মর্তবা ও মর্যাদাই আলাদা। মুমিন, কাফের, পরহেযগার ও পাপিষ্ঠ নির্বিশেষে যার কাছ থেকেই ইখলাস পাওয়া যায় তার প্রতিই দুনিয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার করুণা হয়। [ফাতহুল কাদীর] যেমন কোন কোন আয়াতেও এসেছে যে, "তিনিই তোমাদেরকে জলে-স্থলে ভ্রমণ করান। এমনকি তোমরা যখন নৌযানে আরোহন কর এবং সেগুলো আরোহী নিয়ে অনুকূল বাতাসে বেরিয়ে যায় এবং তারা তাতে আনন্দিত হয়, তারপর যখন দমকা হাওয়া বইতে শুরু করে এবং চারদিক থেকে উত্তাল তরংগমালা ধেয়ে আসে, আর তারা নিশ্চিত ধারণা করে যে, এবার তারা ঘেরাও হয়ে পড়েছে, তখন তারা আল্লাহকে তাঁর জন্য দ্বীনকে একনিষ্ঠ করে ডেকে বলেঃ 'আপনি আমাদেরকে এ থেকে বাঁচালে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব। অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে বিপদমুক্ত করেন তখন তারা যমীনে অন্যায়ভাবে সীমালজ্ঘন করতে থাকে।" [সূরা ইউনুস:২২-২৩] আরও এসেছে, "তারা যখন নৌযানে আরোহণ করে তখন তারা আনুগত্যে বিশুদ্ধ হয়ে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌কে ডাকে। তারপর তিনি যখন স্থলে ভিড়িয়ে তাদেরকে উদ্ধার করেন, তখন তারা শির্কে লিপ্ত হয়" [সূরা আল-আনকাবূত: ৬৫] অনুরূপভাবে বিভিন্ন হাদীসে যাদের দো'আ কবুল হয় বলে ঘোষণা এসেছে সেটার গূঢ় রহস্যও এ ইখলাসে নিহিত। যেমন, উৎপীড়িতের দো'আ, মুসাফিরের দো'আ। অনুরূপভাবে সন্তানের জন্য দো'আ বা বদ-দো'আ। এসব ঐ সময়ই হয় যখন তাদের আর করার কিছু থাকে না। তারা একান্তভাবেই আল্লাহ্‌র দিকে ধাবিত হয়। তখনকার অবস্থা অনুযায়ী আল্লাহ্ তাদের প্রার্থনা কবুল করে নেন। যদিও তিনি জানেন যে, তারা অচিরেই শির্কের দিকে ফিরে যাবে। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

(২) এখানে কাদের স্থলাভিষিক্ত করেন সেটা স্পষ্ট করে বলা হয়নি। আর তাই সেটা নির্ধারণে কয়েকটি মত রয়েছেঃ এক, তোমাদের এক প্রজন্মকে অন্য প্রজন্মের শেষে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেন। অর্থাৎ এক প্রজন্ম ধ্বংস করেন এবং তার স্থানে অন্য প্রজন্মকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এক জাতির পর আর এক জাতির উত্থান ঘটান। দুই, তোমাদের সন্তানদেরকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করেন। তিন, মুসলিমদেরকে কাফেরদের স্থলাভিষিক্ত করেন, তাদের যমীন ও ভিটে-মাটিতে মুসলিমদের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করেন। [ফাতহুল কাদীর]

أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَٰتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَٰحَ بُشْرًۢا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِۦٓ ۗ أَءِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ تَعَٰلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٣﴾

৬৩. নাকি তিনি, যিনি তোমাদেরকে স্থলভূমি ও সমূদ্রের অন্ধকারে পথ দেখান[১] এবং যিনি তাঁর অনুগ্রহের প্রাক্কালে সুসংবাদবাহী বাতাস প্রেরণ করেন। আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন ইলাহ্ আছে কি? তারা যাকে শরীক করে আল্লাহ্ তা থেকে বহু উর্ধ্বে।

أَمَّن يَبْدَؤُا۟ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۗ أَءِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ قُلْ هَاتُوا۟ بُرْهَٰنَكُمْ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٦٤﴾

৬৪. নাকি তিনি, যিনি প্রথম সৃষ্টি করেন, তারপর সেটার পুনরাবৃত্তি করবেন[২] এবং যিনি তোমাদেরকে আসমান ও যমীন হতে জীবনোপকরণ দান করেন[৩]। আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন

---

(১) যেমন অন্য আয়াতে বলেছেন, "আর তিনিই তোমাদের জন্য তারকামণ্ডল সৃষ্টি করেছেন যেন তা দ্বারা তোমরা স্থলের ও সাগরের অন্ধকারে পথ খুঁজে পাও।" [সূরা আল-আন'আম: ৯৭] অর্থাৎ যিনি তারকার সাহায্যে এমন ব্যবস্থা করে দিয়েছেন যার ফলে তোমরা রাতের অন্ধকারেও নিজেদের পথের সন্ধান করতে পারো। মানুষ জলে-স্থলে যেসব সফর করে, সেখানে তাকে পথ দেখাবার জন্য আল্লাহ এমন সব উপায়-উপকরণ সৃষ্টি করেছেন যাতে সে সহজেই পথ চিনে নিতে পারে। [দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] এ সবই আল্লাহর জ্ঞানগর্ভ ব্যবস্থাপনারই একটি অংশ। অন্যত্র এসবগুলোকে আল্লাহর অনুগ্রহের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে। [দেখুন, সূরা আন-নাহল: ১৫-১৬]

(২) অর্থাৎ যিনি মাতৃগর্ভে শুক্রের মাধ্যমে সৃষ্টির সূচনা করেন, [জালালাইন] তারপর তাদের মৃত্যুর পর পুনরায় তাদেরকে উত্থিত করবেন, তাঁর সাথে কি আর কোন শরীক আছে? এ কাজ কি তিনি ব্যতীত আর কেউ করতে পারে? তাহলে তিনি ব্যতীত অন্যরা কিভাবে ইবাদাত পেতে পারে? যেমন অন্য আয়াতে বলেছেন, "নিশ্চয় তিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, আর তিনিই তার পুনরাবৃত্তি ঘটাবেন।" [সূরা আল-বুরূজ: ১৩]

(৩) এ পৃথিবীতে পশু প্রাণীর বহু শ্রেণী পাওয়া যায়। তাদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা খাদ্যের প্রয়োজন। স্রষ্টা তাদের প্রত্যেক শ্রেণীর খাদ্যবস্তু এত বিপুল পরিমাণে এবং প্রত্যেকের আহরণ ক্ষমতার এত কাছাকাছি রেখে দিয়েছেন যার ফলে কোন শ্রেণীর কোন একজনও খাদ্য থেকে বঞ্চিত থাকে না। তিনি আকাশ থেকে বৃষ্টি নাযিল করেন, এর দ্বারা যমীন থেকে উদ্ভিদ উদ্গত করেন, যা যমীনের বরকত হিসেবে গণ্য। তিনি আকাশ থেকে যে পানি নাযিল করেন তা তিনি যমীনের অভ্যন্তরে সুচারুরূপে

ইলাহ্ আছে কি? বলুন, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে তোমাদের প্রমাণ পেশ কর(১) ।'

৬৫. বলুন, 'আল্লাহ্ ব্যতীত আসমান ও যমীনে কেউই গায়েব জানে না(২) এবং

قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ

পরিচালিত করেন, তারপর তা থেকে বের করেন হরেক রকম ক্ষেত-খামার, ফল-ফলাদি ও ফুল ইত্যাদি। এসব তো আল্লাহ্‌র কাজ। তিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ কি এগুলো করতে পারেন? যদি আর কেউ করতে না পারে তবে তাকে কিভাবে ইবাদাত করা হবে? [ইবন কাসীর]

(১) অর্থাৎ এসব কাজে সত্যিই অন্য কেউ শরীক আছে, এর সপক্ষে কোন প্রমাণ পেশ করো অথবা যদি তা না পারো তাহলে কোন যুক্তিসংগত প্রমাণের সাহায্যে একথা বুঝিতে দাও যে, এ সমস্ত কাজ তো একমাত্র আল্লাহরই কিন্তু বন্দেগী ও ইবাদাত লাভের অধিকার লাভ করবে তিনি ছাড়া অন্য কেউ অথবা তাঁর সাথে অন্যজনও। যা আল্লাহ্ করেন তারা কি তা করতে পারে? যদি তোমাদের কোন দলীল-প্রমাণাদি না থাকে তবে এ সমস্ত বাতিল ইলাহ ছেড়ে এক আল্লাহ্‌র ইবাদাতই শুধু কর। তা না করলে তোমরা কখনো সফলকাম হতে পারবে না। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে অন্য ইলাহ্‌কে ডাকে, এ বিষয়ে তার নিকট কোন প্রমাণ নেই; তার হিসাব তো তার রব-এর নিকটই আছে; নিশ্চয় কাফেররা সফলকাম হবে না।" [সূরা আল-মুমিনূন: ১১৭] [দেখুন, ইবন কাসীর]

(২) এখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আদেশ করা হয়েছে যে, আপনি লোকদেরকে বলে দিন, যত মাখলুক আকাশে আছে; যেমন ফেরেশ্‌তা, যত মাখলুক যমীনে আছে; যেমন মানবজাতি, জিন জাতি ইত্যাদি-তাদের কেউই গায়েবের খবর রাখে না। কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই সেসবের খবর রাখেন। গায়েব একমাত্র একজনের কাছে দৃশ্যমান। তিনি হচ্ছেন মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ। তাঁর কাছে কোন জিনিস অদৃশ্য নয়। সবকিছুই তাঁর কাছে সুস্পষ্টভাবে পরিদৃশ্যমান। আল্লাহ ছাড়া আর কেউ এ জ্ঞানের অধিকারী নয়। এটি ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে চান যতটুকু চান জ্ঞান দান করেন। কোন অদৃশ্য বা কতগুলো অদৃশ্য জিনিসকে তার সামনে উন্মুক্ত করে দেন। কিন্তু অদৃশ্য জ্ঞান সামগ্রিকভাবে কেউ লাভ করতে পারে না এবং "আলেমুল গায়েব" অদৃশ্য জ্ঞানী উপাধি একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাথে সংশ্লিষ্ট। আল্লাহ বলেনঃ "আর তাঁর কাছেই আছে অদৃশ্যের চাবিগুলো, সেগুলো তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না।" [সূরা আল-আন'আম ৫৯] তিনি আরও বলেনঃ "একমাত্র আল্লাহই রাখেন কিয়ামতের জ্ঞান। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তিনিই জানেন মাতৃগর্ভে কি (লালিত) হচ্ছে, কোন প্রাণী জানে না আগামীকাল সে কি উপার্জন করবে এবং

إِلَّا اللَّهُ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٦٥﴾

তারা উপলব্ধিও করেনা কখন উত্থিত হবে[১] ।'

কোন প্রাণী জানে না কোন ভূমিতে তার মৃত্যু হবে।" [সূরা লুকমানঃ ৩৪] তিনি আরও বলেনঃ "তিনি জানেন যা কিছু সৃষ্টির সামনে আছে এবং যা কিছু আছে তাদের অগোচরে। আর তাঁর জ্ঞানের কিছুমাত্র অংশও তারা আয়ত্ব করতে পারে না, তবে তিনি যে জিনিসটির জ্ঞান তাদেরকে দিতে চান, দেন।" [সূরা আল বাকারাহঃ ২৫৫]

কোন সৃষ্টি অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী হতে পারে এ ধারণা কুরআন সর্বতোভাবে নাকচ করে দেয়। এমনকি বিশেষভাবে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম এবং স্বয়ং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারেও এ বিষয়টি পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেয় যে, তিনি অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী নন এবং তাকে অদৃশ্যের কেবলমাত্র ততটুকু জ্ঞান আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে যতটুকু রিসালাতের দায়িত্ব পালন করার জন্য প্রয়োজন ছিল। দেখুনঃ সূরা আল-আন'আমঃ ৫০, সূরা আল-আ'রাফঃ ১৮৭, সূরা আত-তাওবাহঃ ১০১, সূরা হূদঃ ৩১, সূরা আল-আহযাবঃ ৬৩, সূরা আল-আহকাফঃ ৯, সূরা আত-তাহরীমঃ ৩, এবং সূরা জিনঃ ২৬ আয়াত এ ব্যাপারে কোন প্রকার অনিশ্চয়তা ও সংশয়ের অবকাশই রাখেনি। কুরআনের এ সমস্ত সুস্পষ্ট ভাষণ আলোচ্য আয়াতটির বক্তব্য সমর্থন ও ব্যাখ্যা করে এর পর এ ব্যাপারে আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী মনে করা এবং যা কিছু আছে ও যা কিছু হবে এর জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া আর কারো আছে–এ কথা মনে করা পুরোপুরি একটি শির্কী আকীদা ও বিশ্বাস। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি দাবী করে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগামী কাল কি হবে তা জানেন, সে আল্লাহর প্রতি মহা মিথ্যা আরোপ করে। কারণ আল্লাহ তো বলেন, হে নবী ! আপনি বলে দিন আল্লাহ ছাড়া আকাশ ও পৃথিবীর অধিবাসীদের মধ্যে আর কেউ অদৃশ্যের জ্ঞান রাখে না।" [বুখারীঃ ৩০৬২, মুসলিমঃ ২৮৭, মুসনাদে আহমাদঃ ৬/৪৯]

(১) অর্থাৎ অন্যরা, যাদের সম্পর্কে ধারণা করা হয় যে,তারা অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী এবং এ জন্য যাদেরকে তোমরা আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বে শরীক করে নিয়েছো, তারা নিজেরা তো নিজেদের ভবিষ্যতের খবর রাখে না। তারা জানে না, কিয়ামত কবে আসবে যখন আল্লাহ পুনর্বার তাদেরকে উঠিয়ে দাঁড় করাবেন। কাতাদাহ বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা এ তারকাগুলোকে তিনটি কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আকাশের সৌন্দর্যের জন্য, তার মাধ্যমে পথের দিশা পাওয়ার জন্য আর শয়তানদের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ। এর বাইরে অন্য কোন কাজ যারা এগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট করবে, তারা নিজের পক্ষ থেকে একটা কথা বানিয়ে বলেছে এবং তার বিচার-বিবেকে ভুল করেছে, সঠিক তথ্য হারিয়েছে। আর এমন কাজে এগিয়ে গেছে যাতে তার কোন

بَلِ ادّٰرَكَ عِلۡمُهُمۡ فِى الۡاٰخِرَةِ ۚ بَلۡ هُمۡ فِىۡ شَكٍّ مِّنۡهَا ۚ بَلۡ هُمۡ مِّنۡهَا عَمُوۡنَ ﴿٦٦﴾

৬৬. বরং আখেরাত সম্পর্কে তাদের জ্ঞান তো নিঃশেষ হয়েছে(১); তারা তো এ বিষয়ে সন্দেহে রয়েছে, বরং এ বিষয়ে তারা অন্ধ(২)।

জ্ঞান নেই। কিছু মূর্খ লোক আছে যারা এগুলোতে গণনার ব্যবস্থা নিয়েছে। তারা বলে থাকে, যে ব্যক্তি অমুক অমুক তারকার সময় বিয়ে করবে, তার এটা এটা হবে, আর যে ব্যক্তি অমুক অমুক তারকার সময় সফর করে, তার এটা বা ওটা হবে, যার সন্তান অমুক ও অমুক তারকার সময় হবে, সে এরকম বা ওরকম হবে। নিঃসন্দেহ যে, প্রতি তারকার সময়েই লাল, কালো, বেঁটে, লম্বা, সুন্দর, কুৎসিত জন্মগ্রহণ করে। এ সকল তারকা থেকে জ্ঞানের দাবী, এ চতুস্পদ জন্তুর সাথে সম্পর্ক করে কোন জ্ঞানের দাবী, এবং এ সকল পাখির ডান বা বাম হওয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট করে জ্ঞান বের করা কখনো গায়েবের জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত নয়। আল্লাহ্ এ ফয়সালা করেছেন যে, তিনি আল্লাহ্ ব্যতীত আসমান ও যমীনের কেউই গায়েবের খবর জানবে না। আর তারা জানে না কখন তাদেরকে উত্থিত করা হবে। [ইবন কাসীর]

(১) আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে, اِدَّارَكَ শব্দটি। এ শব্দে বিভিন্ন কেরাআত আছে এবং অর্থ সম্পর্কেও নানা উক্তি রয়েছে। কোন কোন তাফসীরকার اِدَّارَكَ শব্দের অর্থ নিয়েছেন تكامل অর্থাৎ পরিপূর্ণ হওয়া এবং ﴿فِى الۡاٰخِرَةِ﴾ কে اِدَّارَكَ এর সাথে সম্পর্কযুক্ত করে আয়াতের অর্থ এই সাব্যস্ত করেছেন যে, আখেরাতে এ সম্পর্কে তাদের জ্ঞান পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। কেননা, তখন প্রত্যেক বস্তুর স্বরূপ পরিস্ফুট হয়ে সামনে এসে যাবে। তবে তখনকার জ্ঞান তাদের কোন কাজে লাগবে না। কারণ, দুনিয়াতে তারা আখেরাতকে মিথ্যা বলে বিশ্বাস করত। তখন পরবর্তী বাক্য 'তারা তো এ বিষয়ে সন্দেহে রয়েছে, বরং এ বিষয়ে তারা অন্ধ' এর দ্বারা দুনিয়ার বর্তমান অবস্থা বুঝানো উদ্দেশ্য হবে। অর্থাৎ একই আয়াতের প্রথমাংশ আখেরাতের সাথে আর বাকী অংশ দুনিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট। [দেখুন, কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] আবার কেউ কেউ 'আখেরাতে তাদের জ্ঞান পরিপূর্ণ হওয়া' কথাটি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অস্বীকারের সুরে এবং উপহাস হিসেবে নিয়েছেন। অর্থাৎ আখেরাত সম্পর্কে তাদের জ্ঞান কি পরিপূর্ণতা লাভ করেছে যে, তারা এতো বেপরোয়া হয়ে গেছে? পরবর্তী আয়াতাংশ 'তারা তো এ বিষয়ে সন্দেহে রয়েছে, বরং এ বিষয়ে তারা অন্ধ' এর দ্বারা উপরোক্ত অর্থের জোরালো সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে। [দেখুন, কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর] কোন কোন তাফসীরকারের মতে, اِدَّارَكَ শব্দের অর্থ ضَلَّ ও غَابَ এবং ﴿فِى الۡاٰخِرَةِ﴾ শব্দটি عِلْمُهُم এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ আখেরাতের ব্যাপারে তাদের জ্ঞান উধাও হয়ে গেছে। তারা একে বুঝতে পারেনি। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(২) عَمُوْنَ শব্দটি عم শব্দের বহুবচন। এটা অন্তরের অন্ধত্বকে বুঝায়। অর্থাৎ তারা অন্তর্দৃষ্টির অভাবে কোন দলীল-প্রমাণই প্রত্যক্ষ করছে না। তারা যেন অন্ধই থেকে

ষষ্ঠ রুকূ’

৬৭. কাফেররা বলে, ‘আমরা ও আমাদের পিতৃপুরুষেরা মাটিতে পরিণত হয়ে গেলেও কি আমাদেরকে বের করা হবে?

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوٓا ءَإِذَا كُنَّا تُرَٰبًا وَءَابَآؤُنَآ أَئِنَّا لَمُخْرَجُونَ ۝٦٧

৬৮. ‘এ বিষয়ে তো আমাদেরকে এবং আগে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকেও প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল। এ তো পূর্ববর্তীদের উপকথা ছাড়া আর কিছু নয়।’

لَقَدْ وُعِدْنَا هَٰذَا نَحْنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَٰذَآ إِلَّآ أَسَٰطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝٦٨

৬৯. বলুন, ‘তোমরা যমীনে পরিভ্রমণ কর অতঃপর দেখ অপরাধীদের পরিণাম কিরূপ হয়েছিল(১)।’

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ۝٦٩

৭০. আর তাদের উপর আপনি দুঃখ করবেন না এবং তাদের ষড়যন্ত্রে মনঃক্ষুণ্ন হবেন না(২)।

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ۝٧٠

যাবে। তাদের কাছে কোন দলীল-প্রমাণই কাজে আসবে না। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(১) অর্থাৎ পূর্ববর্তী অপরাধীদের পরিণতি দেখে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো এবং আখেরাত অস্বীকার করার যে নির্বোধসূলভ বিশ্বাস তাদেরকে অপরাধীতে পরিণত করেছিল তার উপর টিকে থাকার চেষ্টা করো না। বিভিন্ন জায়গায় সফর করে দেখো কিরূপ হয়েছিল নবী-রাসূলদের সাথে যারা মিথ্যারোপ করেছিল, যারা আখেরাত, পুনরুত্থান ইত্যাদি সংক্রান্ত নবী-রাসূলদের আনীত বিষয়াদিতে মিথ্যারোপ করেছিল তাদের উপর আল্লাহ্‌র শাস্তি কেমন হয়েছিল তা দেখে নাও। এ সমস্ত ঘটনায় আল্লাহ্ তাঁর নবী-রাসূল ও তাদের অনুসারী মুমিনদেরকে কিভাবে সুন্দরভাবে রক্ষা করলেন সেটাও দেখে নিন। এটা অবশ্যই নবী-রাসূলদের সত্যতা ও তাদের আনীত বিধানের সঠিক হওয়া প্রমাণ করে। [ইবন কাসীর]

(২) সব মানুষের প্রতি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্নেহ, মমতা ও সহানুভূতির অন্ত ছিল না। তিনি সর্বদা চাইতেন যে, সবাইকে আল্লাহ্‌র বাণী শুনিয়ে জাহান্নাম থেকে বাঁচাবেন। কেউ তার কথা কবুল না করলে তিনি নিদারুন মর্মপিড়া অনুভব করতেন এবং এমন দুঃখিতও হতেন, যেমন কারও সন্তান তার কথা অমান্য

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٧١﴾

৭১. আর তারা বলে, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল, কখন এ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে?'

قُلْ عَسٰۤى اَنْ يَّكُوْنَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِیْ تَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿٧٢﴾

৭২. বলুন, 'তোমরা যে বিষয় ত্বরান্বিত করতে চাচ্ছ সম্ভবত তার কিছু তোমাদের পেছনে এসেই আছে[১]!'

وَاِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٧٣﴾

৭৩. আর নিশ্চয় আপনার রব মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল; কিন্তু তাদের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ।

وَاِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ﴿٧٤﴾

৭৪. আর নিশ্চয় আপনার রব, তিনি অবশ্যই জানেন তাদের অন্তর যা গোপন করে এবং তারা যা প্রকাশ করে।

وَمَا مِنْ غَآئِبَةٍ فِى السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اِلَّا فِیْ

৭৫. আর আসমান ও যমীনে এমন কোন

করে আগুনে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভংগিতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়েছেন। এ আয়াতটিও তাকে সান্ত্বনা দেয়ার উদ্দেশ্যে নাযিল করা হয়। বলা হচ্ছে যে, আপনি যা নিয়ে এসেছেন এর উপর মিথ্যারোপকারীদের নিয়ে আপনি দুঃখিত হবেন না। আর নিজেকে বিনাশ করে ফেলবেন না। তারা আপনার প্রতি যে ষড়যন্ত্র করছে তাতে আপনি মনঃক্ষুন্ন হবেন না; কারণ আল্লাহ্ আপনার হিফাযত করবেন, সাহায্য-সহযোগিতা করবেন, আপনার দ্বীনকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিরোধীদের উপর জয়ী করবেন। [ইবন কাসীর]

(১) এটি একটি রাজসিক বাকভংগীমা। সর্বশক্তিমানের বাণীর মধ্যে যখন "সম্ভবত", "বিচিত্র কি" এবং "অসম্ভব কি" ধরনের শব্দাবলী এসে যায় তখন তার মধ্যে সন্দেহের কোন অর্থ থাকে না বরং তার মাধ্যমে একটি বেপরোয়া ভাব ফুটে উঠে। ইবন আব্বাস বলেন, কুরআনে এ ধরনের শব্দ 'অবশ্যম্ভাবী' হওয়ার অর্থ দেয়। [দেখুন, তাবারী, সূরা আত-তাওবাহ এর ১৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যায়] অর্থাৎ তাঁর শক্তি এতই প্রবল ও প্রচণ্ড যে, তাঁর কোন জিনিস চাওয়া এবং তা হয়ে যাওয়া যেন একই ব্যাপার। তিনি কোন কাজ করতে চান এবং তা করা সম্ভব হলো না এমন কোন কথা কল্পনাও করা যেতে পারে না। এজন্য তাঁর পক্ষে "এমন হওয়া বিচিত্র কি" বলা এ অর্থ প্রকাশ করে যে, যদি তোমরা সোজা না হও তাহলে এমনটি হবেই।

كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ﴿٧٥﴾

গোপন রহস্য নেই, যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই।

إِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَقُصُّ عَلٰى بَنِيْٓ إِسْرَاۗءِيْلَ أَكْثَرَ الَّذِيْ هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿٧٦﴾

৭৬. বনী ইসরাঈল যে সব বিষয়ে মতভেদ করে, নিশ্চয় এ কুরআন তার অধিকাংশ তাদের কাছে বিবৃত করে(১)।

(১) আয়াতে বলা হয়েছে যে, বনী ইসরাঈলের আলেমদের মধ্যে যেসব বিষয়ে কঠোর মতবিরোধ ছিল এবং যার মীমাংসা ছিল সুদূরপরাহত, কুরআন সেসব বিষয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করে বিশুদ্ধ ফয়সালার পথনির্দেশ করেছে। বলাবাহুল্য, যে আলেমদের মতবিরোধে বিচার-বিশ্লেষণ ও ফয়সালা করে তার সর্বাধিক জ্ঞানী ও শ্রেষ্ঠ হওয়া নেহায়েত জরুরী। এতে বুঝা গেল যে, কুরআন সর্বাধিক জ্ঞান-সম্পন্ন এবং সত্যবাদী সংবাদদাতা। আমরা যদি আহ্‌লে কিতাব তথা বনি ইসরাঈলদের মধ্যে যে সব বিষয়ে মতভেদ রয়েছে তা দেখি এবং এ ব্যাপারে কুরআনের ভাষ্য দেখি তাহলে আমরা সহজেই এ সিদ্ধান্তে আসতে পারব যে, এ কুরআন সত্যিকার অর্থেই মানুষদেরকে বিভ্রান্তি থেকে মুক্তি দেয়ার জন্যই দুনিয়াতে এসেছে। উদাহরণস্বরূপ নীচে এমন কয়েকটি বিষয় আলোচনা করছি যাতে আহলে কিতাবগণ বিভিন্ন মতে বিভক্ত অথচ কুরআন সেখানে সুস্পষ্ট মত দিয়ে দিয়েছে।

আহলে কিতাবগণ ঈসা আলাইহিসসালাম সম্পর্কে এ ব্যাপারে দু মেরুতে অবস্থান নিয়েছে। তাদের মধ্যকার ইয়াহূদীরা তার সম্পর্কে খুব খারাপ মন্তব্য করে; পক্ষান্তরে নাসারারা তার সম্পর্কে অতিরঞ্জন করে। তখন কুরআন তাদের মধ্যে হক ও ইনসাফপূর্ণ মধ্য পন্থা ঘোষণা করেছে যে, তিনি আল্লাহ্‌র বান্দাদের অন্যতম এবং তাঁর রাসূলদের একজন। যেমন আল্লাহ্ বলেন, “এ-ই মার্‌ইয়াম-এর পুত্র ‘ঈসা। আমি বললাম সত্য কথা, যে বিষয়ে তারা সন্দেহ পোষণ করছে।” [সূরা মারইয়াম: ৩৪] [ইবন কাসীর]

অনুরূপভাবে খোদ নাসারারা ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে মতভেদে লিপ্ত। তারা বলে থাকে যে, তিনি ইলাহ্ বা তিন ইলাহর একজন। এ ব্যাপারে তাদের মতভেদ চরম আকার ধারণ করেছে, তারা কোন সমাধানে পৌঁছুতে পারেনি। কুরআন সেখানে তাদেরকে সঠিক দিশা দিয়ে বলছে যে, তিনি ইলাহ নন, যেমনিভাবে তার মাকেও ইলাহ সাব্যস্ত করা ভ্রষ্টতা। “মার্‌ইয়াম-তনয় মসীহ্ তো শুধু একজন রাসূল। তার আগে বহু রাসূল গত হয়েছেন এবং তার মা সত্যনিষ্ঠা ছিলেন। তারা দুজনেই খাওয়া-দাওয়া করত। দেখুন, আমি ওদের জন্য আয়াতগুলোকে কেমন বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করি; আরো দেখুন, ওরা কিভাবে সত্যবিমুখ হয়!” [সূরা আল-মায়েদাহঃ ৭৫]

তারা মনে করে যে, ঈসা আলাইহিসসালামকে শূলে চড়িয়েছে, এ ব্যাপারে তাদের কোন কোন সম্প্রদায় দ্বিমত পোষণ করে। কুরআন সেখানে স্পষ্ট ঘোষণা করেছে

৭৭. আর নিশ্চয় এটি মুমিনদের জন্য হেদায়াত ও রহমত।

وَإِنَّهُۥ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝٧٧

৭৮. আপনার রব তো তাঁর বিধান অনুযায়ী তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন। আর তিনি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ।

إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُم بِحُكْمِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ۝٧٨

৭৯. সুতরাং আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করুন; আপনি তো স্পষ্ট সত্যে প্রতিষ্ঠিত।

فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۖ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ۝٧٩

৮০. মৃতকে তো আপনি শোনাতে পারবেন না[১], বধিরকেও পারবেন না ডাক

إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ

যে, "আর তাদের কথা, 'আমরা আল্লাহ্‌র রসূল মার্‌ইয়াম তনয় 'ঈসা মসীহ্‌কে হত্যা করেছি'। অথচ তারা তাকে হত্যা করেনি, ক্রুশবিদ্ধও করেনি; কিন্তু তাদের এরূপ বিভ্রম হয়েছিল। যারা তাঁর সম্বন্ধে মতভেদ করেছিল, তারা নিশ্চয় এ সম্বন্ধে সংশয়যুক্ত ছিল; এ সম্পর্কে অনুমানের অনুসরণ ছাড়া তাদের কোন জ্ঞানই ছিল না। এটা নিশ্চিত যে, তারা তাঁকে হত্যা করেনি, বরং আল্লাহ্ তাকে তাঁর নিকট তুলে নিয়েছেন এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" [সূরা আন-নিসাঃ ১৫৭-১৫৮]

অনুরূপভাবে আহলে কিতাবগণ যে সমস্ত নবী-রাসূলদের শানে আজে-বাজে কথা বলেছে সেখানে কুরআন তাদেরকে সম্মানিত করেছে এবং তাদের সম্পর্কে সঠিক তথ্য তুলে ধরেছে। যেমন, নূহ, লূত, হারূন, দাউদ ও সুলাইমানসহ আরও অনেক নবী-রাসূলদের সম্পর্কে তাদের মনগড়া মতবাদকে কুরআন খণ্ডন করেছে এবং তাদের মর্যাদাকে সংরক্ষণ করেছে।

(১) মৃতরা কি কিছু শুনতে পায়? আর মৃতদের কি কিছু শোনানো সম্ভব? যে সমস্ত বিষয়ে সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমদের মাঝেও মতপার্থক্য ছিল মৃতদের শ্রবণ করার বিষয়টি সেগুলোর অন্যতম। [মাজমূ' ফাতাওয়া: ৩/২৩০, ১৯/১২৩; আল-মুস্তাদরাক আলা মাজমূয়িল ফাতাওয়া: ১/৯৪] আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা এর পক্ষে এবং আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বিপক্ষে মতপ্রকাশ করেছেন। [দেখুন, বুখারী: ৩৯৮০, ৩৯৮১; মুসলিম: ৯৩২] তাই তাবেয়ীগণ এবং এর পরবর্তী আলেমগণ সবাই ভিন্ন দুটি মতে বিভক্ত হয়েছেন। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে যা এসেছে এখানে তা বর্ণনা করছি। আলোচ্য সূরা আন-নামল এর আয়াতে বলা হয়েছে, "মৃতকে তো আপনি শোনাতে পারবেন না"। সূরা আর-রূমে বলা হয়েছে, "আপনি তো মৃতকে শুনাতে পারবেন না" [৫২] অনুরূপভাবে সূরা ফাতিরে এসেছে, "আপনি শোনাতে পারবেন না যারা কবরে রয়েছে তাদেরকে" [২২] এতে বুঝা যায় যে,

الدُّعَآءَ اِذَا وَلَّوۡا مُدۡبِرِيۡنَ ﴿٨٠﴾

শুনাতে, যখন তারা পিঠ ফিরিয়ে চলে যায়।

وَمَاۤ اَنۡتَ بِهٰدِى الۡعُمۡىِ عَنۡ ضَلٰلَتِهِمۡ ؕ اِنۡ تُسۡمِعُ اِلَّا مَنۡ يُّؤۡمِنُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمۡ مُّسۡلِمُوۡنَ ﴿٨١﴾

৮১. আপনি অন্ধদেরকেও তাদের পথ ভ্রষ্টতা থেকে পথে আনতে পারবেন না। আপনি তো কেবল তাদেরকে শোনাতে পারবেন, যারা আমাদের নিদর্শনাবলীতে ঈমান আনে। অতঃপর তারাই আত্মসমর্পণকারী।

وَاِذَا وَقَعَ الۡقَوۡلُ عَلَيۡهِمۡ اَخۡرَجۡنَا لَهُمۡ دَآبَّةً مِّنَ الۡاَرۡضِ تُكَلِّمُهُمۡ ۙ اَنَّ النَّاسَ كَانُوۡا

৮২. আর যখন তাদের উপর ঘোষিত শাস্তি আসবে তখন আমরা তাদের জন্য যমীন থেকে এক জীব বের করব[১],

মৃতদেরকে শোনানোর দায়িত্ব মানুষের নয়, এটা আল্লাহ্‌র কাজ। তাই সর্বাবস্থায় মৃতরা শুনতে পাবে এটার সপক্ষে কোন দলীল নেই। তবে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় মাঝে মধ্যে তারা যে শুনতে পায় তার প্রমাণ আমরা পাচ্ছি এক হাদীসে, বদরের যুদ্ধের পরে কাফেরদের লাশ যখন একটি গর্তে রেখে দেয়া হলো, তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের লাশদের উদ্দেশ্য করে নাম ধরে ডেকে ডেকে বললেনঃ তোমরা কি তোমাদের মা'বুদদের কৃত ওয়াদাকে বাস্তব পেয়েছ? আমরা তো আমাদের মা'বুদের ওয়াদা বাস্তব পেয়েছি। সাহাবীগণ বললেনঃ রাসূল! আপনি এমন লোকদের সাথে কি কথা বলছেন যারা মরে পঁচে গেছে? তিনি বললেনঃ 'আল্লাহ্‌র শপথ! তোমরা আমার কথা তাদের থেকে বেশী শুনতে পাচ্ছ না'। [বুখারীঃ ৩৭৫৭] সুতরাং কবর যেহেতু আখেরাতের ব্যাপার। আর আখেরাতের ব্যাপারে যতটুকু কুরআন ও হাদীসে যা এসেছে তার বাইরে কোন কিছু বলা কোন ক্রমেই ঠিক নয়। [বিস্তারিত দেখুন, কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর; নূ'মান খাইরুদ্দীন আল-আলূসী, আল-আয়াতুল বাইয়্যিনাত ফী 'আদামি সামা'য়িল আমওয়াত]

(১) 'যমীন থেকে এক জীব বের করব' যা কিয়ামতের আলামত। কিয়ামতের পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিদর্শনবাহী বেশ কিছু অলৌকিক কর্মকাণ্ড হতে দেবেন, এটা সেগুলোর অন্যতম। কিয়ামতের দশটি বড় বড় নিদর্শন সম্পর্কে হুযাইফা ইবনে আসীদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর হাদীসে এসেছে, তিনি বলেনঃ "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের প্রতি দৃষ্টি দিলেন, আমরা পরস্পর আলোচনা করছিলাম, তিনি বললেনঃ 'তোমরা কি আলোচনা করছিলে'? আমরা বললামঃ 'আমরা কিয়ামতের কথা আলোচনা করছিলাম'। তিনি বললেনঃ 'যতক্ষণ পর্যন্ত দশটি বৃহৎ আলামত বা নিদর্শন না দেখবে ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না'। তারপর তিনি ধোঁয়া, দাজ্জাল, বিশেষ ধরনের প্রাণীর আবির্ভাব, পশ্চিমে সূর্য উদিত হওয়া, 'ঈসা ইবনে

بِاٰيٰتِنَا لَا يُوْقِنُوْنَ ﴿٨٢﴾

যা তাদের সাথে কথা বলবে[১] যে, মানুষ আমাদের নিদর্শনসমূহে নিশ্চিত বিশ্বাস করত না।

সপ্তম রুকূ'

وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُّكَذِّبُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ﴿٨٣﴾

৮৩. আর স্মরণ করুন সে দিনের কথা, যেদিন আমরা সমবেত করব প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে একেকটি দলকে, যারা

মারইয়াম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবতরণ, ইয়া'জুজ ও মা'জুজ, তিনটি ভূমি ধস যার একটি প্রাচ্যে, আরেকটি প্রাশ্চাত্যে, অন্যটি আরব উপদ্বীপে হবে, আর এ আলামাতগুলোর সবশেষে ইয়ামেন থেকে একটি আগুন বের হবে যা মানুষকে তাদের একত্রিত হওয়ার স্থানের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে"। [মুসলিমঃ ২৯০১] কোন কোন হাদীসে মাহদী, ক্বাবার ধ্বংস ও যমীন থেকে কুরআন উঠে যাওয়ার কথা এসেছে। সে যাই হোক, সবার মতেই দাব্বাতুল আরদ হলো কিয়ামতের বড় আলামতের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলামত। কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত যে, কিয়ামতের পূর্বে তার আবির্ভাব হবে, যেমন আলোচ্য আয়াত তার প্রমাণ। তাছাড়া হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "তিনটি বস্তু যখন বের হবে তখন কোন আত্মার ঈমান গ্রহণ করা তার কোন উপকারে আসবে না যদি তারা আগে ঈমান না এনে থাকে বা তারা ঈমানের মাধ্যমে কল্যাণকর কিছু অর্জন না করে থাকে। পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদয় হওয়া, দাজ্জাল এবং দাব্বাতুল আরদ বা যমীন থেকে উত্থিত জীব" [মুসলিমঃ ১৫৮]। অনুরূপভাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেনঃ "দাব্বাহ বের হয়ে মানুষের নাকের উপর দাগ দিয়ে দিবে, তারপর তোমাদের মধ্যে বিচরণ করবে, এমনকি কোন লোক উট খরিদ করার পর কেউ জিজ্ঞাসা করবে কার থেকে খরিদ করেছ? বলবেঃ একজন নাকের উপর দাগ বিশিষ্ট লোক থেকে" [মুসনাদে আহমাদঃ ৫/২৬৮]। সুতরাং আমাদেরকে এটার উপর ঈমান আনতে হবে।

(১) ভূগর্ভের জীব মানুষের সাথে কথা বলবে, এর অর্থ কি? কোন কোন মুফাসসির বলেনঃ কুরআনে উল্লেখিত বাক্যটিই হবে তার কথা। অর্থাৎ ﴿اَنَّ النَّاسَ كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا لَا يُوْقِنُوْنَ﴾ বা "মানুষ আমাদের নিদর্শনসমূহে নিশ্চিত বিশ্বাস করত না"। এ বাক্যটি সে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শোনাবে। বাক্যের অর্থ এইঃ অনেক মানুষ আজকের পূর্বে আমাদের আয়াতসমূহে বিশ্বাস করবে না। উদ্দেশ্য এই যে, এখন সময় এসে গেছে। এখন সবাই বিশ্বাস করবে। কিন্তু তখনকার বিশ্বাস আইনতঃ ধর্তব্য হবে না। যদিও ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে যে, অদ্ভুত সে জন্তুটি শুধু কথাই বলবে না বরং দাগও দিবে। অর্থাৎ ঈমানদার ও কাফেরদেরকে দাগ দিয়ে পৃথক করে দিবে। [ফাতহুল কাদীর]

আমার নিদর্শনাবলী প্রত্যাখ্যান করত অতঃপর তাদেরকে সারিবদ্ধভাবে একত্রিত করা হবে[১]।

৮৪. শেষ পর্যন্ত যখন তারা এসে যাবে তখন আল্লাহ্ তাদেরকে বলবেন, 'তোমরা কি আমার নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করেছিলে, অথচ তা তোমরা জ্ঞানে আয়ত্ত করতে পারনি[২]? নাকি তোমরা আর কিছু করছিলে[৩]?'

حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْ قَالَ اَكَذَّبْتُمْ بِاٰيٰتِيْ وَلَمْ تُحِيْطُوْا بِهَا عِلْمًا اَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٨٤﴾

(১) يُوْزَعُوْنَ শব্দটি وزع শব্দ থেকে উদ্ভূত। উপরে এর অর্থ করা হয়েছেঃ সারিবদ্ধভাবে একত্রিত করা। অর্থাৎ আগের ও পরের সবাই সেখানে থাকবে। যাতে তাদেরকে প্রশ্ন করে তাদের দোষের স্বীকৃতি আদায় করা যায়। [সা'দী] এর আরেক অর্থ আছে, বাধা দেয়া। তখন অর্থ হবে, তাদের অগ্রবর্তী অংশকে বাধা প্রদান করা হবে, যাতে পেছনে পড়া লোক তাদের সাথে মিলে যায়। কোন কোন মুফাসসির وزع শব্দের অর্থ করেছেন, ঠেলে দেয়া। অর্থাৎ তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে হিসাবের জন্য হাশরের মাঠে নিয়ে যাওয়া হবে। [কুরতুবী; ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ কোন তথ্যভিত্তিক গবেষণার মাধ্যমে তোমরা এ আয়াতগুলোর মিথ্যা হবার কথা জানতে পেরেছিলে, এ আয়াতগুলো অস্বীকার করার পেছনে তোমাদের এ কারণ কখনোই ছিল না। তোমরা কোন প্রকার চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা-অনুসন্ধান ছাড়াই আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছিলে। [দেখুন, কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর] এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহে মিথ্যা বলা একটি গুরুতর অপরাধ ও গোনাহ; বিশেষতঃ যখন কেউ চিন্তা-ভাবনাও বোঝা-শোনার চেষ্টা না করেই মিথ্যা বলতে থাকে। এমতাবস্থায় এটা দ্বিগুণ অপরাধ হয়ে যায়। এতে আরও প্রমাণিত হয় যে, যারা ইসলামী শরী'আতের কোন ইলম যথা আরবী ভাষা বা উসুলে ফিকহ বা এ জাতীয় কিছুর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে তারা নিঃসন্দেহে মূর্খ। মূর্খতাই তাদেরকে এ ধরনের কার্যকলাপে নিপতিত করে। [ফাতহুল কাদীর]

(৩) অর্থাৎ যদি এমন না হয়, তাহলে কি তোমরা একথা প্রমাণ করতে পারবে যে, গবেষণা-অনুসন্ধানের পর তোমরা এ আয়াতগুলোকে মিথ্যা পেয়েছিলে এবং সত্যিই কি তোমরা এ আয়াতগুলোয় যা বর্ণনা করা হয়েছে তা প্রকৃত সত্য নয়, এ ধরনের কোন জ্ঞান লাভ করেছিলে? মূলত: তোমরা এগুলোতে কোন শ্রম দাওনি। তোমরা তোমাদের কোন কাজে এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলে যে, আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহের প্রতি নজর দিতে, আর সেগুলোর অর্থের প্রতি চিন্তা গবেষণা করা থেকে তোমাদেরকে বিরত রেখেছিল? [ফাতহুল কাদীর]

৮৫. আর যুলুমের কারণে তাদের উপর ঘোষিত শাস্তি এসে পড়বে; ফলে তারা কিছুই বলতে পারবে না।

وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ﴿٨٥﴾

৮৬. তারা কি দেখে না যে, আমরা রাত সৃষ্টি করেছি তাদের বিশ্রামের জন্য এবং দিনকে করেছি দৃশ্যমান? এতে তো অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা ঈমান আনে[১]।

أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٨٦﴾

৮৭. আর যেদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, সেদিন আসমানসমূহ ও যমীনের সকলেই ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়বে[২],

وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ

(১) অর্থাৎ কেন তারা রাতের বেলা আরাম করার মুহূর্তে এবং দিনের সুযোগে লাভবান হবার সময় একথা চিন্তা করেনি যে, এক মহাবিজ্ঞ ও বিজ্ঞানময় সত্তা এ ব্যবস্থা পরিচালনা করছেন এবং তিনি তাদের যথাযথ প্রয়োজন অনুযায়ী পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করেছেন? এটি কোন আকস্মিক ঘটনা হতে পারে না। আবার এগুলো বহু ইলাহ্‌র কার্যপ্রণালীও নয়। এগুলো মূলত: মহান আল্লাহ্‌র শক্তি ও সামর্থের উপরই প্রমাণবহ। তারা কেন আমার এ সমস্ত ক্ষমতা সম্পর্কে চিন্তা করে না, ফলে তারা ঈমান আনত? [দেখুন, কুরতুবী]

(২) فزع শব্দের অর্থ, অস্থির ও উদ্বিগ্ন হওয়া। [ফাতহুল কাদীর] অন্য এক আয়াতে এ স্থলে فزع শব্দের পরিবর্তে صعق শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। [সূরা আয-যুমার: ৬৮] এর অর্থ অজ্ঞান হওয়া। যদি উভয় আয়াতকে সিঙ্গার প্রথম ফুৎকারের সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়, তবে উভয় শব্দের সারমর্ম হবে এই যে, সিঙ্গার ফুঁক দেয়ার সময় প্রথমে সবাই অস্থির উদ্বিগ্ন হবে, এরপর অজ্ঞান হয়ে যাবে এবং অবশেষে মরে যাবে। [দেখুন, ইবন কাসীর] কোন কোন মুফাসসির এ ফুৎকারকে সিঙ্গায় দ্বিতীয় ফুৎকারের সাথে সংশ্লিষ্ট করেছেন, যারপর সকল মৃত পুনরুজ্জীবন লাভ করবে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, সবাই জীবিত হওয়ার সময় ভীতবিহ্বল অবস্থায় উত্থিত হবে। অথবা তাড়াতাড়ি আহ্বানে সাড়া দেয়ার কথা বোঝানো হয়েছে। কারণ, তাড়াতাড়ি আহ্বানে সাড়া দেয়াকেও فزع বলা হয়ে থাকে। [কুরতুবী]

কোন কোন মুফাসসির এ আয়াতের সুত্র ধরে বলেন, সিঙ্গায় তিন বার ফুৎকার দেয়া হবে। প্রথম ফুৎকারে সবাই অস্থির হয়ে যাবে, দ্বিতীয় ফুৎকারে সবাই মারা যাবে আর তৃতীয় ফুৎকারে হাশর-নশর কায়েম হবে এবং সকল মৃত জীবিত হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে মুসনাদে আবী ইয়া'লায় একটি দীর্ঘ হাদীসও বর্ণিত আছে। কিন্তু হাদীসটির সনদ দুর্বল। কুরআনের আয়াত ও সহীহ হাদীস থেকে দুই

اللهُ ۖ وَكُلٌّ اَتَوْهُ دٰخِرِيْنَ ﴿٨٧﴾

তবে আল্লাহ্ যাদেরকে চাইবেন তারা ব্যতীত(১) এবং সকলেই তাঁর কাছে আসবে হীন অবস্থায়।

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَّهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ۖ صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِيْۤ اَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ۖ اِنَّهٗ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَفْعَلُوْنَ ﴿٨٨﴾

৮৮. আর আপনি পর্বতমালা দেখছেন, মনে করছেন, সেটা অচল, অথচ ওগুলো হবে মেঘপুঞ্জের ন্যায় চলমান(২)। এটা আল্লাহ্‌রই সৃষ্টি-নৈপুণ্য, যিনি সমস্ত কিছুকেই করেছেন সুষম(৩)। তোমরা

ফুৎকারেরই প্রমাণ পাওয়া যায়। সহীহ হাদীসে এও এসেছে যে, উভয় ফুৎকারের মধ্যে চল্লিশের মত ব্যবধান থাকবে। [দেখুন, বুখারী: ৪৮১৪; মুসলিম: ২৯৫৫] এ ব্যাপারে এটা বলাও সম্ভব যে, এ অস্থির ও উদ্বিগ্ন অবস্থা দুটি ফুৎকারের সময়ই হবে। এটি আলাদা কোন ফুৎকার নয়। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

(১) উদ্দেশ্য এই যে, হাশরের মাঠে কিছুসংখ্যক লোক ভীতবিহ্বল হবে না। তারা কারা তা নির্ধারণে বিভিন্ন মত এসেছে। কারও কারও মতে তারা ফেরেশ্‌তা, বিশেষ করে জিবরাঈল ও মীকাইল ও ইস্‌রাফীল। আবার কারো মতে, নবীগণ। [ফাতহুল কাদীর] আবার কারও কারও মতে তারা হলেন শহীদগণ। [ইবন কাসীর] কোন কোন মুফাসসির বলেন যে, এরা সমস্ত মুমিন। কারণ পরবর্তী ৮৯ নং আয়াতে তাদের কথা বলা হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর] তবে কারও কারও মতে উপরে বর্ণিত সবাই এ ব্যতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। [ফাতহুল কাদীর]

(২) উদ্দেশ্য এই যে, পাহাড়সমূহ স্থানচ্যুত হয়ে মেঘমালার ন্যায় চলমান হবে। এটা কিয়ামতের প্রথম ফুৎকারের সাথে সাথে হবে। অন্য আয়াতে এসেছে, “যেদিন আকাশ আন্দোলিত হবে প্রবলভাবে এবং পর্বত চলবে দ্রুত;[সূরা আত-তূরঃ ৯-১০] “তারা আপনাকে পর্বতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলুন, ‘আমার রব ওগুলোকে সমূলে উৎপাটন করে বিক্ষিপ্ত করে দেবেন। ‘তারপর তিনি তাকে পরিণত করবেন মসৃণ সমতল ময়দানে, ‘যাতে আপনি বাঁকা ও উঁচু দেখবেন না।” [সূরা ত্বা-হাঃ ১০৫-১০৭] “স্মরণ করুন, যেদিন আমি পর্বতমালাকে করব সঞ্চালিত এবং আপনি পৃথিবীকে দেখবেন উন্মুক্ত প্রান্তর, সেদিন তাদের সবাইকে আমি একত্র করব এবং তাদের কাউকেও অব্যাহতি দেব না” [সূরা আল-কাহফঃ ৪৭]

(৩) صنع - শব্দের অর্থ কারিগরবিদ্যা, শিল্প। কোন কিছু অপর কিছুর সাথে জুড়ে দিয়ে কিছু বানানো। [আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর] আর أتقن - শব্দটি إتقان থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কোন কিছুকে মজবুত ও সংহিত করা। [জালালাইন] বাহ্যতঃ এই বাক্যটি পূর্ববর্তী সব বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ দিবারাত্রির পরিবর্তন এবং শিঙ্গার ফুৎকার থেকে হাশর-নাশর পর্যন্ত সব অবস্থা। [ফাতহুল কাদীর] উদ্দেশ্য এই যে,

যা কর নিশ্চয় তিনি সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত ।

৮৯. যে কেউ সৎকাজ নিয়ে আসবে, সে তা থেকে উৎকৃষ্ট প্রতিফল[১] পাবে এবং সেদিন তারা শংকা থেকে নিরাপদ থাকবে[২] ।

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا ۚ وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَّوْمَئِذٍ اٰمِنُوْنَ ﴿٨٩﴾

৯০. আর যে কেউ অসৎকাজ নিয়ে আসবে, তাকে অধোমুখে নিক্ষেপ করা হবে আগুনে 'তোমরা যা করতে তারই

وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوْهُهُمْ فِى النَّارِ ۗ هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٠﴾

এগুলো মেটেই বিস্ময় ও আশ্চর্যের বিষয় নয় । কেননা এগুলোর স্রষ্টা কোন সীমিত জ্ঞান ও শক্তিসম্পন্ন মানব অথবা ফিরিশ্‌তা নয় । বরং বিশ্বজগতের পালনকর্তা । আর যা তাঁর কাজ হবে সেটা অবশ্যই মজবুত ও সংহিত হবে । [কুরতুবী]

(১) এটা হাশর-নাশর ও হিসাব-নিকাশের পরবর্তী পরিণতির বর্ণনা, حسنة বলে কোন কোন মুফাসসিরের মতে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বুঝানো হয়েছে । [তাবারী; কুরতুবী] কারও কারও নিকট: ইখলাস ও তাওহীদ [বাগভী] কেউ কেউ সাধারণ 'ইবাদত ও আনুগত্য তথা ফরয কাজসমূহ অর্থ নিয়েছেন । তবে বস্তুত এখানে সব ধরনের ভাল কাজ বোঝানো হয়েছে । [ফাতহুল কাদীর] অর্থাৎ যে ব্যক্তি সৎকর্ম করবে, সে তার কর্মের কল্যাণ লাভ করবে বা কর্মের চাইতে উৎকৃষ্টতর প্রতিদান পাবে । বলাবাহুল্য, সৎকর্ম তখন সৎকর্ম হয়, যখন তার মধ্যে প্রথম শর্ত ঈমান বিদ্যমান থাকে । 'উৎকৃষ্টতর প্রতিদান' বলে এক নেকীর প্রতিদান দশ গুণ থেকে নিয়ে সাত'শ গুণ পর্যন্ত পাওয়া যাবে । [আদওয়াউল বায়ান]

(২) فزع বলে প্রত্যেক বড় বিপদ ও পেরেশানী বোঝানো হয়েছে । উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়াতে প্রত্যেক আল্লাহ্‌ভীরু পরহেযগারও পরিণামের ভয় থেকে মুক্ত থাকতে পারে না এবং থাকা উচিতও নয় । যেমন, কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে, ﴿اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَاْمُوْنٍ﴾ অর্থাৎ অবশ্যই আপনার রবের আযাব থেকে কেউ নিশ্চিন্ত ও ভাবনামুক্ত হয়ে বসে থাকতে পারে না । এ কারণে নবী-রাসূলগণ, সাহাবায়ে কেরাম ও আল্লাহ্‌র সৎ বান্দাগণ সদাসর্বদা ভীত ও কম্পিত থাকতেন । কিন্তু সে দিন হিসাব-নিকাশ সমাপ্ত হলে যারা সৎকর্ম নিয়ে আগমনকারী হবে, তারা সর্বপ্রকার ভয় ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত ও প্রশান্ত হবে । যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, "মহাভীতি তাদেরকে চিন্তান্বিত করবে না" [সূরা আল-আম্বিয়া: ১০৩] [ইবন কাসীর] তাছাড়া পূর্বে ৮৭ নং আয়াতে যাদেরকে ভয়ভীতি থেকে ব্যতিক্রম থাকবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে তারা যদি এ আয়াতে বর্ণিত সৎকর্মশীল লোকগণ হয়ে থাকেন তবে এ আয়াতকে পূর্বোক্ত আয়াতের তাফসীর হিসেবে ধরা যাবে । [ফাতহুল কাদীর]

প্রতিফল তোমাদেরকে দেয়া হচ্ছে।'

৯১. আমি তো আদেশপ্রাপ্ত হয়েছি এ নগরীর রবের[১] 'ইবাদাত করতে, যিনি একে করেছেন সম্মানিত। আর সমস্ত কিছু তাঁরই। আরো আদেশপ্রাপ্ত হয়েছি, যেন আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হই।

إِنَّمَآ أُمِرۡتُ أَنۡ أَعۡبُدَ رَبَّ هَٰذِهِ ٱلۡبَلۡدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُۥ كُلُّ شَيۡءٖۖ وَأُمِرۡتُ أَنۡ أَكُونَ مِنَ ٱلۡمُسۡلِمِينَ ٩١

(১) অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে, بلدة বলে মক্কা মুকাররামাকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা তো বিশ্বজাহান এবং নভোমন্ডল ও ভূমণ্ডলের পালনকর্তা। এখানে বিশেষ করে মক্কার পালনকর্তা বলার কারণ মক্কার মাহাত্ম্য ও সম্মানিত হওয়ার বিষয়বস্তু প্রকাশ করা। [ইবন কাসীর] তাছাড়া এটাও হতে পারে যে, এটা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বেশী প্রিয় ছিল। [ফাতহুল কাদীর] حرم শব্দটি تحريم থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সাধারণ সম্মানও হয়ে থাকে। এই সম্মানের কারণে মক্কা ও পবিত্র ভূমির যেসব বিধান প্রবর্তিত হয়েছে, সেগুলোও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। যেমন, কেউ হারামে আশ্রয় নিলে সে নিরাপদ হয়ে যায়, হারামে প্রতিশোধ গ্রহণ করা ও হত্যাকাণ্ড সম্পাদন বৈধ নয়, হারামের ভুমিতে শিকার বধ করাও জায়েয নয়, বৃক্ষ কর্তন করা জায়েয নয়... ইত্যাদি। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর] হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "নিশ্চয় এই শহর (মক্কা) যেদিন আল্লাহ্ আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন সেদিনই হারাম ঘোষণা করেছেন। এটা আল্লাহ্‌র হারাম করার কারণে কিয়ামত পর্যন্ত হারাম থাকবে।" [বুখারী: ৩১৮৯; মুসলিম: ১৩৫৩] এর উদ্দেশ্য মক্কার কাফেরদেরকে এই মর্মে সতর্ক করে দেয়া যে, চরম অশান্তি, হানাহানি, যুদ্ধবিগ্রহ ও রক্তপাত বিধ্বস্ত আরব ভূখণ্ডের এ শহরকে শান্তি ও নিরাপত্তার কেন্দ্রভূমিতে পরিণত করে যে আল্লাহ তোমাদের প্রতি এ বিপুল অনুগ্রহ করেছেন এবং যাঁর অনুগ্রহে তোমাদের এ শহর সমগ্র আরব দেশে ভক্তি ও শ্রদ্ধার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে, তোমরা তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞ হতে চাইলে হতে পারো কিন্তু আমাকে তো হুকুম দেয়া হয়েছে আমি যেন তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দায় পরিণত হই এবং তাঁরই সামনে নিজের বিনয় ও নম্রতার শির নত করি। তোমরা যাদেরকে উপাস্য বানিয়েছো তাদের কারো এ শহরকে হারামে পরিণত করার এবং আরবের যুদ্ধপ্রিয় ও লুটেরা গোত্রগুলোকে এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে বাধ্য করার ক্ষমতা ছিল না। কাজেই আসল অনুগ্রহকারীকে বাদ দিয়ে এমন সব সত্তার সামনে মাথা নত করা আমার পক্ষে সম্ভব নয় যাদের আমার প্রতি সামান্যতমও অনুগ্রহ ও অবদান নেই। অন্য আয়াতে এসেছে, "অতএব, তারা 'ইবাদাত করুক এ ঘরের রবের যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় খাদ্য দিয়েছেন এবং ভীতি থেকে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন।" [সূরা কুরাইশ: ৩-৪] [দেখুন, ইবন কাসীর]

وَاَنۡ اَتۡلُوَا الۡقُرۡاٰنَ ۚ فَمَنِ اهۡتَدٰی فَاِنَّمَا یَهۡتَدِیۡ لِنَفۡسِهٖ ۚ وَمَنۡ ضَلَّ فَقُلۡ اِنَّمَاۤ اَنَا مِنَ الۡمُنۡذِرِیۡنَ ﴿۹۲﴾

৯২. আমি আরো আদেশপ্রাপ্ত হয়েছি, কুরআন তিলাওয়াত করতে[১]; অতঃপর যে ব্যক্তি সৎপথ অনুসরণ করে, সে সৎপথ অনুসরণ করে নিজেরই কল্যাণের জন্য। আর কেউ ভুল পথ অনুসরণ করলে, আপনি বলুন, 'আমি তো শুধু সতর্ককারীদের একজন।'

وَقُلِ الۡحَمۡدُ لِلّٰهِ سَیُرِیۡكُمۡ اٰیٰتِهٖ فَتَعۡرِفُوۡنَهَا ؕ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعۡمَلُوۡنَ ﴿۹۳﴾

৯৩. আর বলুন, সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই[২], তিনি তোমাদেরকে সত্বর দেখাবেন তাঁর নিদর্শন; তখন তোমরা তা চিনতে পারবে[৩]।' আর তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আপনার রব গাফিল নন[৪]।

---

(১) উপরোক্ত দু'টি আয়াত থেকে জানা গেল যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দু'টি কাজের নির্দেশ বিশেষভাবে প্রদান করা হয়েছে। এক. তাওহীদ তথা একমাত্র আল্লাহ্‌রই ইবাদাত করতে। দুই. কুরআন তিলাওয়াত করতে। মানুষকে এ তেলাওয়াত শোনাতে ও তাদের কাছে পয়গাম পৌঁছাতে। অর্থাৎ তিনি তো শুধু প্রচারকারী ও ভীতিপ্রদর্শনকারী। তারপর যদি কেউ হেদায়াত গ্রহণ করে তবে সেটা তার নিজেরই উপকারার্থে, আর যদি পথভ্রষ্ট হয়, তবে সেটার ভারও তার নিজের উপর। রাসূলের উপর এর দায়-দায়িত্ব বর্তাবে না। তাই রাসূলকে বলতে বলা হয়েছে যে, যদি কেউ পথভ্রষ্ট হয়, তবে আমি তো কেবল অন্যান্য নবী-রাসূলদের মত ভীতি প্রদর্শন করতে পারি। তারা যেভাবে তাদের সম্প্রদায়কে ভীতি প্রদর্শন করেই তাদের দায়িত্ব পালন করেছেন, সেভাবে আমিও তাদের অনুসরণ করব। তারপর সে সমস্ত সম্পদ্রায়ের হিসাবের দায়িত্ব আল্লাহ্‌রই উপর। [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ এজন্যই আল্লাহ্‌র প্রশংসা যে, তিনি কারও বিপক্ষে প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত না করে শাস্তি দেন না। অনুরূপভাবে কাউকে ওযর পেশ করার সুযোগ শেষ করা পর্যন্ত আযাব নাযিল করেন না। আর সে জন্যই তিনি তাঁর আয়াতসমূহ নাযিল করবেন। যাতে কেউ তাঁর বিরুদ্ধে বলতে না পারে যে, আমাদের কাছে আয়াত আসলে তো আমরা ঈমান আনতাম। [দেখুন, ইবন কাসীর]

(৩) যেমন অন্য আয়াতে বলেছেন, " অচিরেই আমরা তাদেরকে আমাদের নিদর্শনাবলী দেখাব, বিশ্ব জগতের প্রান্তসমূহে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে; যাতে তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, অবশ্যই এটা (কুরআন) সত্য।" [সূরা ফুসসিলাত: ৫৩]

(৪) বরং তিনি সবকিছুর উপর সাক্ষী। [ইবন কাসীর] তাঁর কাছে কোন কিছু অজ্ঞাত নয়।

২৮- সূরা আল-কাসাস[১], ৮৮ আয়াত, মক্কী

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. ত্বা-সীন-মীম;

طٰسٓمّٓ ①

২. এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত।

تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ②

৩. আমরা আপনার কাছে মূসা ও ফির'আউনের কিছু বৃত্তান্ত যথাযথভাবে বিবৃত করছি[২], এমন সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে যারা ঈমান আনে[৩]।

نَتْلُوْا عَلَيْكَ مِنْ نَّبَاِ مُوْسٰى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ③

৪. নিশ্চয় ফির'আউন যমীনের বুকে অহংকারী হয়েছিল[৪] এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন শ্রেণীতে

اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِى الْاَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا يَّسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ

(১) সূরা আল-কাসাস মক্কায় নাযিলকৃত সূরাসমূহের মধ্যে সর্বশেষ সূরা। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, এ সূরাটি মক্কা ও মদীনার মাঝখানে হিজরতের সফরে নাযিল হয়েছিল। এ সূরার শেষভাগে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, পরিণামে মক্কা বিজিত হয়ে আপনার অধিকারভুক্ত হবে। [দেখুন, কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

(২) তুলনামূলক অধ্যায়নের জন্য দেখুন আল বাকারাহঃ ৬০-৭২, আল-আ'রাফঃ ১০৩-১৭৪, ইউনুসঃ ৭৫-৯২, হূদঃ ৯৬-১১০, আল-ইসরাঃ ১০১-১০৪, মারয়ামঃ ৫১-৫২, ত্বা-হাঃ ৯-৯৯, আল মুমিনুনঃ ৪৫-৫০, আশ্ শু'আরাঃ ১০-৬৮, আন নামলঃ ৭-১৪, আল-আনকাবূতঃ ৩৯-৪০, গাফিরঃ ২৩-৪৬, আয্ যুখরুফঃ ৪৬-৫৬, আদ্ দুখানঃ ১৭-৩৩, আয্ যারিয়াতঃ ৩৮-৪০, এবং আন্নাযিআ'তঃ ১৫-২৬, আয়াতসমূহ।

(৩) অর্থাৎ যারা কথা মেনে নিতে প্রস্তুত নয় তাদেরকে কথা শুনানো তো অর্থহীন। তাই যারা মনের দুয়ারে একগুঁয়েমীর তালা ঝুলিয়ে রাখে না, এ আলোচনায় সেই মুমিনদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

(৪) মূলে علا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, সে উদ্বত হয়ে মাথা উঠিয়েছে, বিদ্রোহাত্মক নীতি অবলম্বন করেছে, নিজের আসল মর্যাদা অর্থাৎ দাসত্বের স্থান থেকে উঠে স্বেচ্ছাচারী ও প্রভুর রূপ ধারণ করেছে, অধীন হয়ে থাকার পরিবর্তে প্রবল হয়ে গেছে এবং স্বৈরাচারী ও অহংকারী হয়ে যুলুম করতে শুরু করেছে। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর] এখানে যমীন বলে, মিসর বোঝানো হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর]

أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ④

বিভক্ত করে তাদের একটি শ্রেণীকে সে হীনবল করেছিল; তাদের পুত্রদেরকে সে হত্যা করত এবং নারীদেরকে জীবিত থাকতে দিত। সে তো ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারী[১]।

وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ⑤

৫. আর আমরা ইচ্ছে করলাম, সে দেশে যাদেরকে হীনবল করা হয়েছিল তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে এবং তাদেরকে নেতা বানাতে, আর তাদেরকে উত্তরাধিকারী করতে;

وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ ⑥

৬. আর যমীনে তাদেরকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করতে, আর ফির'আউন, হামান ও তাদের বাহিনীকে তা দেখিয়ে দিতে, যা তারা সে দূর্বল দলের কাছ থেকে আশংকা করত[২]।

وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا

৭. আর মূসা-জননীর প্রতি আমরা নির্দেশ দিলাম[৩], 'তাকে দুধ পান করাও।

---

(১) অর্থাৎ তার কাছে দেশের সকল অধিবাসী সমান থাকেনি এবং সবাইকে সমান অধিকারও দেয়া হয়নি। বরং সে এমন পদ্ধতি অবলম্বন করেছে যার মাধ্যমে রাজ্যের অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে দেয়া হয়। একদলকে সুযোগ সুবিধা ও বিশেষ অধিকার দিয়ে শাসক দলে পরিণত করা হয় এবং অন্যদলকে অধীন করে পদানত, পর্যুদস্ত, নিষ্পেষিত ও ছিন্নবিচ্ছিন্ন করা হয়। অর্থাৎ বনী ইসরাঈলকে হেয় করে রেখেছিল। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

(২) এ আয়াতে ফির'আউনী কৌশলের শুধু ব্যর্থ ও বিপর্যস্ত হওয়ার কথাই নয়; বরং ফির'আউন ও তার পরিষদবর্গকে চরম বোকা ও অন্ধ বানানোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যে বালকের জন্মরোধ করতে বনী ইসরাঈলের অসংখ্য নবজাতককে হত্যা করেছিল সে বালককে আল্লাহ্ তা'আলা এই ফির'আউনের ঘরে তারই হাতে লালন-পালন করালেন এবং সে বালকের জননীর মনতুষ্টির জন্যে তারই কোলে বিস্ময়কর পন্থায় পৌঁছে দিলেন। [দেখুন, কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(৩) বলা হয়েছে, وأوحينا এর মূল হলো, وحي যার শাব্দিক অর্থ হলো, الإِعْلَامُ فِي خَفَاءٍ বা গোপনে কোন কিছু জানিয়ে দেয়া। [দেখুন, ফাতহুল বারী: ১/২০৪৪৫] এখানে

خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۚ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝

যখন তুমি তার সম্পর্কে কোন আশংকা করবে, তখন একে দরিয়ায় নিক্ষেপ করো এবং ভয় করো না, পেরেশানও হয়ো না। আমরা অবশ্যই একে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেব এবং একে রাসূলদের একজন করব।'

فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ۗ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ ۝

৮. তারপর ফির'আউনের লোকজন তাকে কুড়িয়ে নিল। এর পরিণাম তো এ ছিল যে, সে তাদের শত্রু ও দুঃখের কারণ হবে(১)। নিঃসন্দেহে ফির'আউন, হামান ও তাদের বাহিনী ছিল অপরাধী।

وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ ۖ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝

৯. ফির'আউনের স্ত্রী বলল, 'এ শিশু আমার ও তোমার নয়ন-প্রীতিকর। একে হত্যা করো না, সে আমাদের উপকারে আসতে পারে অথবা আমরা তাকে সন্তান হিসেবেও গ্রহণ করতে পারি।' প্রকৃতপক্ষে ওরা এর পরিণাম উপলব্ধি করতে পারেনি।

وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا ۖ إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

১০. আর মূসা-জননীর হৃদয় অস্থির হয়ে পড়েছিল। যাতে সে আস্থাশীল হয় সে জন্য আমরা তার হৃদয়কে দৃঢ় করে না দিলে সে তার পরিচয় তো প্রকাশ করেই দিত।

মূসা-জননীকে আল্লাহ্ তা'আলা যে কোন উপায়ে তাঁর কোন নির্দেশ পৌঁছানোই উদ্দেশ্য। যে অর্থে কুরআনে নবুওয়তের ওহী ব্যবহার হয়েছে সে অর্থের وحي হওয়া বাধ্যতামূলক নয়।

(১) অর্থাৎ এটা তাদের উদ্দেশ্য ছিল না বরং এ ছিল তাদের কাজের পরিণাম। যা তাদের জন্য নির্ধারিত ছিল। তারা এমন এক শিশুকে উঠাচ্ছিল যার হাতে শেষ পর্যন্ত তাদেরকে ধ্বংস হতে হবে। [দেখুন, কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

১১. আর সে মূসার বোনকে বলল, 'এর পিছনে পিছনে যাও।' সে দূর থেকে তাকে দেখছিল অথচ তারা তা উপলব্ধি করতে পারছিল না।

وَقَالَتۡ لِاُخۡتِهٖ قُصِّیۡهِ ۫ فَبَصُرَتۡ بِهٖ عَنۡ جُنُبٍ وَّهُمۡ لَا یَشۡعُرُوۡنَ ۙ﴿۱۱﴾

১২. আর পূর্ব থেকেই আমরা ধাত্রী-স্তন্যপানে তাকে বিরত রেখেছিলাম। অতঃপর মূসার বোন বলল, 'তোমাদেরকে কি আমি এমন এক পরিবারের সন্ধান দেব, যারা তোমাদের হয়ে একে লালন-পালন করবে এবং এর মঙ্গলকামী হবে?'

وَحَرَّمۡنَا عَلَیۡهِ الۡمَرَاضِعَ مِنۡ قَبۡلُ فَقَالَتۡ هَلۡ اَدُلُّکُمۡ عَلٰۤی اَهۡلِ بَیۡتٍ یَّکۡفُلُوۡنَهٗ لَکُمۡ وَهُمۡ لَهٗ نٰصِحُوۡنَ ﴿۱۲﴾

১৩. অতঃপর আমরা তাকে ফিরিয়ে দিলাম তার জননীর কাছে, যাতে তার চোখ জুড়ায় এবং সে দুঃখ না করে, আর সে জেনে নেয় যে, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য; কিন্তু অধিকাংশ মানুষই এটা জানে না।

فَرَدَدۡنٰهُ اِلٰۤی اُمِّهٖ کَیۡ تَقَرَّ عَیۡنُهَا وَلَا تَحۡزَنَ وَلِتَعۡلَمَ اَنَّ وَعۡدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰکِنَّ اَکۡثَرَهُمۡ لَا یَعۡلَمُوۡنَ ﴿۱۳﴾

দ্বিতীয় রুকূ'

১৪. আর যখন মূসা পূর্ণ যৌবনে উপনীত ও পরিণত বয়স্ক হল[১] তখন আমরা

وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَاسۡتَوٰۤی اٰتَیۡنٰهُ حُکۡمًا وَّعِلۡمًا ؕ

(১) أشدّ শব্দের আভিধানিক অর্থ, শক্তি ও জোরের চরম সীমায় পৌঁছা। মানুষ শৈশবের দুর্বলতা থেকে আস্তে আস্তে শক্তি-সামর্থ্যের দিকে অগ্রসর হয়। তারপর এমন এক সময় আসে, যখন অস্তিত্বে যতটুকু শক্তি আসা সম্ভবপর, সবটুকুই পূর্ণ হয়ে যায়। এই সময়কেই أشد বলা হয়। এটা বিভিন্ন ভূখণ্ড ও বিভিন্ন জাতির মেজায অনুসারে বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে। কারও এই সময় তাড়াতাড়ি আসে এবং কারও দেরীতে। কোন কোন মুফাস্‌সির এটাকে ৩৪ বছর বলে মত প্রকাশ করেছেন। যাকে আমরা পরিণত বয়স বলে থাকি এখানে সেটাই বোঝানো হয়েছে। এতে দেহের বৃদ্ধি একটি বিশেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছে থেমে যায়। এরপর চল্লিশ বছর পর্যন্ত বিরতিকাল। একে استوى শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে, استوى তথা পরিণত বয়স ত্রিশ বছর থেকে শুরু করে চল্লিশ বছর পর্যন্ত বর্তমান থাকে। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর; তাছাড়া সূরা আল-আন'আমের ১৫২ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় কিছু আলোচনা এসেছে]

وَكَذٰلِكَ نَجۡزِي الۡمُحۡسِنِيۡنَ ﴿١٤﴾

তাকে হিকমত ও জ্ঞান দান করলাম[১]; আর এভাবেই আমরা মুহসিনদেরকে পুরস্কার প্রদান করে থাকি ।

وَدَخَلَ الۡمَدِيۡنَةَ عَلٰى حِيۡنِ غَفۡلَةٍ مِّنۡ اَهۡلِهَا فَوَجَدَ فِيۡهَا رَجُلَيۡنِ يَقۡتَتِلٰنِ هٰذَا مِنۡ شِيۡعَتِهٖ وَهٰذَا مِنۡ عَدُوِّهٖ فَاسۡتَغَاثَهُ الَّذِيۡ مِنۡ شِيۡعَتِهٖ عَلَى الَّذِيۡ مِنۡ عَدُوِّهٖ فَوَكَزَهٗ مُوۡسٰى فَقَضٰى عَلَيۡهِ قَالَ هٰذَا مِنۡ عَمَلِ الشَّيۡطٰنِ اِنَّهٗ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِيۡنٌ ﴿١٥﴾

১৫. আর তিনি নগরীতে প্রবেশ করলেন, যখন এর অধিবাসীরা ছিল অসতর্ক[২] । সেখানে তিনি দুটি লোককে সংঘর্ষে লিপ্ত দেখলেন, একজন তার নিজ দলের এবং অন্যজন তার শত্রুদলের । অতঃপর মূসার দলের লোকটি ওর শত্রুর বিরুদ্ধে তার সাহায্য প্রার্থনা করল, তখন মূসা তাকে ঘুষি মারলেন[৩]; এভাবে তিনি তাকে হত্যা করে বসলেন । মূসা বললেন, 'এটা শয়তানের কাণ্ড[৪] । সে তো প্রকাশ্য

(১) হুকুম অর্থ হিকমত, বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা-ধী-শক্তি ও বিচারবুদ্ধি । আর জ্ঞান বলতে বুঝানো হয়েছে দ্বীনী জ্ঞান বা ফিক্‌হ । অথবা নিজের দ্বীন সম্পর্কিত জ্ঞান ও তার পিতৃপুরুষদের দ্বীন । [ফাতহুল কাদীর] কারণ নিজের পিতামাতার সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত থাকার কারণে তিনি নিজের বাপ-দাদা তথা ইউসুফ, ইয়াকুব ও ইসহাক আলাইহিমুস সালামের শিক্ষার সাথে পরিচিত হতে পেরেছিলেন ।

(২) অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে, মূসা আলাইহিসসালাম দুপুর সময়ে শহরে প্রবেশ করেছিলেন । এ সময় মানুষ দিবানিদ্রায় মশগুল থাকত । [ফাতহুল কাদীর] কারণ, তিনি তার সঠিক দ্বীন সম্পর্কে জানার পর ফির'আউনের দ্বীনের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করতে আরম্ভ করলে, সেটা প্রসিদ্ধি লাভ করে । তাই তিনি বাইরে বের হতেন না । [কুরতুবী]

(৩) وكز শব্দের অর্থ ঘুষি মারা । ঘুষির সাথেই লোকটি মারা গেল । [দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(৪) কিব্‌তী লোকটিকে হত্যা করা শয়তানের কারসাজী ছিল । কারণ, যে স্থানে মুসলিম এবং কিছুসংখ্যক অমুসলিম অন্য কোন রাষ্ট্রে পরস্পর শান্তিতে বসবাস করে, একে অপরের উপর হামলা করা অথবা লুটতরাজ করাকে উভয়পক্ষে বিশ্বাসঘাতকতা মনে করে; সেইস্থানে এ ধরনের জীবন যাপন ও আদান-প্রদানও এক প্রকার কার্যগত চুক্তি যা অবশ্য পালনীয় এবং বিরুদ্ধাচারণ বিশ্বাসঘাতকতার শামিল । [ফাতহুল কাদীর] সারকথা এই যে, কার্যগত চুক্তির কারণে কিবতীকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা হলে তা

শত্রু ও বিভ্রান্তকারী।'

১৬. তিনি বললেন, 'হে আমার রব! আমি তো আমার নিজের প্রতি যুলুম করেছি; কাজেই আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।' অতঃপর তিনি তাঁকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٦﴾

১৭. তিনি বললেন, 'হে আমার রব! আপনি যেহেতু আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, আমি কখনো অপরাধীদের সাহায্যকারী হব না[১]।'

قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ﴿١٧﴾

জায়েয হত না, কিন্তু মূসা আলাইহিসসালাম তাকে প্রাণে মারার ইচ্ছা করেননি; বরং ইসরাঈলী লোকটিকে তার যুলুম থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে হাতে প্রহার করেছিলেন। এটা স্বভাবতঃ হত্যার কারণ হয় না। কিন্তু কিবতী এতেই মারা গেল। [ফাতহুল কাদীর] মুসা আলাইহিসসালাম অনুভব করলেন যে, তাকে প্রতিরোধ করার জন্য আরও কম মাত্রার প্রহারও যথেষ্ট ছিল কাজেই এই বাড়াবাড়ি না করলেও চলত। এ কারণেই তিনি একে শয়তানের কারসাজী আখ্যা দিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন।

(১) মূসা আলাইহিসসালামের এই বিচ্যুতি আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করলেন। তিনি এর শোকর আদায় করণার্থে আরয করলেন, আমি ভবিষ্যতে কোন অপরাধীকে সাহায্য করব না। এর অর্থ কেবল এই নয় যে, আমি কোন অপরাধীর সহায়ক হবো না বরং এর অর্থ এটাও হয় যে, আমার সাহায্য-সহায়তা কখনো এমন লোকদের পক্ষে থাকবে না যারা দুনিয়ায় যুলুম ও নিপীড়ন চালায়। মুসলিম আলেমগণ সাধারণভাবে মূসার এ অঙ্গীকার থেকে একথা প্রমাণ করেছেন যে, একজন মু'মিনের কোন যালেমকে সাহায্য করা থেকে পুরোপুরি দূরে থাকা উচিত। প্রখ্যাত তাবেঈ আতা ইবন আবী রাবাহর কাছে এক ব্যক্তি বলে, আমার ভাই বনী উমাইয়া সরকারের অধীনে কূফার গভর্ণরের কাতিব বা লিখক, বিভিন্ন বিষয়ের ফায়সালা করা তার কাজ নয়, তবে যেসব ফায়সালা করা হয় সেগুলো তার কলমের সাহায্যেই জারী হয়। এ চাকুরী না করলে সে ভাতে মারা যাবে। আতা জবাবে এ আয়াতটি পাঠ করেন এবং বলেন, তোমার ভাইয়ের নিজের কলম ছুঁড়ে ফেলে দেয়া উচিত, রিযিকদাতা হচ্ছেন আল্লাহ। আর একজন কাতিব 'আমের শা'বীকে জিজ্ঞেস করেন, "হে আবু 'আমর! আমি শুধুমাত্র হুকুমনামা লিখে তা জারী করার দায়িত্ব পালন করি মূল ফায়সালা করার দায়িত্ব আমার নয়। এ জীবিকা কি আমার জন্য বৈধ?" তিনি জবাব দেন, "হতে পারে কোন নিরাপরাধ ব্যক্তিকে হত্যার ফায়সালা করা হয়েছে এবং তোমার কলম দিয়ে তা জারী হবে। হতে পারে, কোন সম্পদ অন্যায়ভাবে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে অথবা কারো গৃহ

فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ ۚ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ ﴿١٨﴾

১৮. অতঃপর ভীত সতর্ক অবস্থায় সে নগরীতে তার ভোর হল। হঠাৎ তিনি শুনতে পেলেন আগের দিন যে ব্যক্তি গতকাল তার কাছে সাহায্য চেয়েছিল, সে সাহায্যের জন্য চিৎকার করছে। মূসা তাকে বললেন, 'তুমি তো স্পষ্টই একজন বিভ্রান্ত ব্যক্তি(১)।'

فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا

১৯. অতঃপর মূসা যখন উভয়ের শত্রুকে ধরতে উদ্যত হলেন, তখন সে ব্যক্তি বলে উঠল(২), 'হে মূসা! গতকাল

ধসানোর হুকুম দেয়া হয়েছে এবং তা তোমার কলম দিয়ে জারী হচ্ছে"। তারপর ইমাম এ আয়াতটি পাঠ করেন। আয়াতটি শুনেই কাতিব বলে ওঠেন, "আজকের পর থেকে আমার কলম বনী উমাইয়ার হুকুমনামা জারী হবার কাজে ব্যবহৃত হবে না।" ইমাম বললেন, "তাহলে আল্লাহও তোমাকে রিযিক থেকে বঞ্চিত করবেন না।" [কুরতুবী]
আবদুর রহমান ইবনে মুসলিম যাহ্হাককে শুধুমাত্র বুখারায় গিয়ে সেখানকার লোকদের বেতন বণ্টন করে দেবার কাজে পাঠাতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু তিনি সে দায়িত্ব গ্রহণ করতেও অস্বীকার করেন। তাঁর বন্ধুরা বলেন, এতে ক্ষতি কি? তিনি বলেন, আমি জালেমদের কোন কাজেও সাহায্যকারী হতে চাই না। [কুরতুবী] পূর্ববর্তী মনীষীগণের কাছ থেকে এ সম্পর্কে আরও বহু বর্ণনা এসেছে।

(১) অর্থাৎ তুমি ঝগড়াটে স্বভাবের বলে মনে হচ্ছে। প্রতিদিন কারো না কারো সাথে তোমার ঝগড়া হতেই থাকে। গতকাল একজনের সাথে ঝগড়া বাধিয়েছিলে, আজ আবার আরেকজনের সাথে বাধিয়েছো। [বাগভী]

(২) অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে এ কথাটি ইসরাঈলী লোকটিই বলেছিল। সে মূসা আলাইহিসসালামের পূর্ববর্তী সম্বোধনের কারণে এ ভয় করেছিল যে, মূসা আলাইহিসসালাম বুঝি তাকেই আক্রমণ করতে উদ্যত হচ্ছে। আর মূসা আলাইহিসসালামের আক্রমণ মানেই নির্ঘাত মৃত্যু; কারণ গতকালই এক লোককে আক্রমণ করে শেষ করে দিয়েছে। আজ বুঝি আমাকেই শেষ করে দেবে। তাই সে গতকালের কিবতী হত্যার গোপণ কথা ফাঁস করে দিয়েছে। আর তাতেই কিবতী লোকটি সুযোগ পেয়ে তা ফের'আউনের পরিষদবর্গের কাছে জানিয়ে দিলে তারা তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে উদ্যত হয়। [ইবন কাসীর]
তবে কোন কোন মুফাসসির বলেন, এ কথাটি ইসরাঈলী লোকটির নয়। বরং এটা কিবতী লোকেরই কথা। সে মূসা আলাইহিসসালামের ভয়াল চিত্র দেখে ঘাবড়ে

قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ ۖ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ﴿١٩﴾

তুমি যেমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছ, সেভাবে আমাকেও কি হত্যা করতে চাচ্ছ? তুমি তো যমীনের বুকে স্বেচ্ছাচারী হতে চাচ্ছ, তুমি তো চাও না শান্তি স্থাপনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে!'

وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ﴿٢٠﴾

২০. আর নগরীর দূর প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি ছুটে এসে বলল, 'হে মূসা! পরিষদবর্গ তোমাকে হত্যা করার পরামর্শ করছে[১]। কাজেই তুমি বাইরে চলে যাও, আমি তো তোমার কল্যাণকামী।'

فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ ۖ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢١﴾

২১. তখন তিনি ভীত সতর্ক অবস্থায় সেখান থেকে বের হয়ে পড়লেন এবং বললেন, 'হে আমার রব! আপনি যালিম সম্প্রদায় থেকে আমাকে রক্ষা করুন।'

তৃতীয় রুকূ'

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن

২২. আর যখন মূসা মাদ্ইয়ান[২] অভিমুখে

গিয়েছিল। তার মনে হয়েছিল যে, আজ যে আমাকে এমনভাবে মারার জন্য এগিয়ে আসছে সেই নিশ্চয়ই গতকালের হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। সে ছাড়া আর কার এমন বুকের পাটা আছে যে, আমাদের শাসকগোষ্ঠীর গায়ে হাত তুলে? তাই সে অনুমান নির্ভর হয়ে বলে বসে যে, তুমি কাল যেভাবে হত্যা করেছ আজ কি সে রকমই আমাকে হত্যা করতে চাচ্ছ? [ফাতহুল কাদীর]

(১) অর্থাৎ এ দ্বিতীয় ঝগড়ার ফলে হত্যা রহস্য প্রকাশ হয়ে যাবার পর সংশ্লিষ্ট মিসরীয়টি যখন গিয়ে সরকারকে জানিয়ে দিল তখন এ পরামর্শের ঘটনা ঘটে। [দেখুন, কুরতুবী]

(২) মাদইয়ান নামক এ শহরটি মতান্তরে ইবরাহীম আলাইহিসসালামের ছেলে মাদইয়ানের নামানুসারে নামকরণ করা হয়েছে। জায়গাটি সম্পর্কে বলা হয় যে, সেটি ফের'আউনী রাষ্ট্রের বাইরে ছিল। মূসা আলাইহিসসালাম ফির'আউনের হাত থেকে বাঁচার জন্য স্বাভাবিক আশংকাবোধ করে মিশর থেকে হিজরত করার ইচ্ছা করলেন। বলাবাহুল্য,

يَّهْدِيَنِيْ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ﴿٢٢﴾

যাত্রা করলেন তখন বললেন, 'আশা করি আমার রব আমাকে সরল পথ দেখাবেন[১]।'

وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُوْنَ ۟ وَوَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمُ امْرَاَتَيْنِ تَذُوْدٰنِ ۚ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ؕ قَالَتَا لَا نَسْقِيْ حَتّٰى يُصْدِرَ الرِّعَآءُ ٚ وَاَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ ﴿٢٣﴾

২৩. আর যখন তিনি মাদ্‌য়ানের কূপের কাছে পৌঁছলেন[২], দেখতে পেলেন, একদল লোক তাদের জানোয়ারগুলোকে পানি পান করাচ্ছে এবং তাদের পিছনে দুজন নারী তাদের পশুগুলোকে আগ্‌লে রাখছে। মূসা বললেন, 'তোমাদের কী ব্যাপার[৩]?' তারা বলল, 'আমরা

এই আশংকাবোধ নবুওয়ত ও তাওয়াক্কুল কোনটিরই পরিপন্থি নয়। মাদইয়ানের দিক নির্দিষ্ট করার কারণ সম্ভবতঃ এই ছিল যে, মাদইয়ানেও ইবরাহীম আলাইহিসসালামের বংশধরদের বসতি ছিল। মূসা আলাইহিসসালামও এই বংশের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। [দেখুন, কুরতুবী]

(১) অর্থাৎ এমন পথ যার সাহায্যে সহজে মাদ্‌য়ানে পৌঁছে যাবো। উল্লেখ্য, সে সময় মাদ্‌ইয়ান ছিল ফেরাউনের রাজ্য-সীমার বাইরে। মূসা আলাইহিসসালাম সম্পূর্ণ নিঃসম্বল অবস্থায় মিশর থেকে বের হন। তার সাথে পাথেয় বলতে কিছুই ছিল না এবং রাস্তাও জানা ছিল না। এই সংকটময় অবস্থায় তিনি আল্লাহ্‌র দিকে মনোনিবেশ করে এ দো'আ করেছিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তার দো'আ কবুল করলেন। [কুরতুবী]

(২) এ স্থানটি, যেখানে মূসা পৌঁছেছিলেন, এটি আকাবা উপসাগরের পশ্চিম তীরে। বর্তমানে এ জায়গাটিকে আল বিদ্‌'আ বলা হয়। সেখানে একটি ছোট মতো শহর গড়ে উঠেছে। আমি ২০০৪ সালে তাবুক যাওয়ার পথে এ জায়গাটি দেখেছি। স্থানীয় অধিবাসীরা আমাকে জানিয়েছে, বাপ-দাদাদের আমল থেকে আমরা শুনে আসছি মাদ্‌য়ান এখানেই অবস্থিত ছিল। এর সন্নিকটে সামান্য দূরে একটি স্থানকে বর্তমানে "মাগায়েরে শু'আইব" বা "মাগারাতে শু'আইব" বলা হয়। সেখানে সামূদী প্যাটার্নের কিছু ইমারত রয়েছে। আর এর প্রায় এক মাইল দু'মাইল দূরে কিছু প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। এর মধ্যে আমরা দেখেছি দু'টি অন্ধকূপ। স্থানীয় লোকেরা আমাদের জানিয়েছে, নিশ্চিতভাবে আমরা কিছু বলতে পারি না তবে আমাদের এখানে একথাই প্রচলিত যে, এ দু'টি কূয়ার মধ্য থেকে একটি কূয়ায় মূসা তাঁর ছাগলের পানি পান করিয়েছেন।

(৩) মূসা আলাইহিসসালাম নারীদ্বয়কে জিজ্ঞেস করলেনঃ 'তোমাদের কি ব্যাপার? তোমরা তোমাদের ছাগলগুলোকে আগলিয়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন? অন্যদের ন্যায় কূপের কাছে

আমাদের জানোয়ারগুলোকে পানি পান করাতে পারি না, যতক্ষণ রাখালেরা তাদের জানোয়ারগুলোকে নিয়ে সরে না যায়। আর আমাদের পিতা খুব বৃদ্ধ(১)।'

২৪. মূসা তখন তাদের পক্ষে জানোয়ারগুলোকে পানি পান করালেন।

فَسَقٰى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلّٰۤى اِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ اِنِّيْ

এনে পানি পান করাও না কেন? তারা জওয়াব দিল, আমাদের অভ্যাস এই যে, আমরা পুরুষের সাথে মেলামেশা থেকে আত্মরক্ষার জন্যে ছাগলগুলোকে পানি পান করাই না, যে পর্যন্ত তারা কূপের কাছে থাকে। তারা চলে গেলে আমরা ছাগলগুলোকে পানি পান করাই। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

(১) অর্থাৎ নারীদ্বয়ের পূর্বোক্ত বাক্য শুনে এ প্রশ্ন দেখা দিতে পারত যে, তোমাদের কি কোন পুরুষ নেই যে, নারীদেরকে একাজে আসতে হয়েছে? নারীদ্বয় এই সম্ভাব্য প্রশ্নের জওয়াবও সাথে সাথে দিয়ে দিল যে, আমাদের পিতা অতিশয় বৃদ্ধ। তিনি একাজ করতে পারেন না। তাই আমরা করতে বাধ্য হয়েছি। [দেখুন, কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

এ মেয়েদের পিতার ব্যাপারে আমাদের সাধারণভাবে এ কথা প্রচার হয়ে গেছে যে, তিনি ছিলেন শু'আইব আলাইহিস সালাম। কিন্তু কুরআন মজীদে ইশারা ইংগিতে কোথাও এমন কথা বলা হয়নি যা থেকে বুঝা যেতে পারে তিনি শু'আইব আলাইহিস সালাম ছিলেন। অথচ শু'আইব আলাইহিস সালাম কুরআনের একটি পরিচিত ব্যক্তিত্ব। এ মেয়েদের পিতা যদি তিনিই হতেন তাহলে এখানে একথা সুস্পষ্ট না করে দেয়ার কোন কারণই ছিল না। শু'আইব নবী না হলেও এ সৎ ব্যক্তিটির দ্বীন সম্পর্কে অনুমান করা হয় যে, মূসা আলাইহিস সালামের মতো তিনিও ইবরাহীমী দ্বীনের অনুসারী ছিলেন। কেননা, যেভাবে মূসা ছিলেন ইসহাক ইবনে ইবরাহীম আলাইহিমাসসালামের আওলাদ ঠিক তেমনি তিনিও ছিলেন মাদ্ইয়ান ইবনে ইবরাহীমের বংশধর। কুরআন ব্যাখ্যাতা নিশাপুরী হাসান বাসরীর বরাত দিয়ে লিখেছেনঃ "তিনি একজন মুসলিম ছিলেন। শু'আইবের দ্বীন তিনি গ্রহন করে নিয়েছিলেন"। মোট কথা তিনি নবী শু'আইব ছিলেন না। কোন মহৎ ব্যক্তি ছিলেন। তবে তার নাম 'শু'আইব' থাকাটা বিচিত্র কিছু নয়। কারণ, বনী ইসরাঈলগণ তাদের নবীদের নামে নিজেদের সন্তানদের নামকরণ করতেন। আর হয়ত সে কারণেই লোকদের মধ্যে এ ব্যাপারে সংশয় বিরাজ করছে। [শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ এ ব্যাপারটি তার কয়েকটি গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। যেমন, আল-জাওয়াবুস সহীহ, ২/২৪৯-২৫০; জামেউর রাসায়িল: ১/৬১-৬২; মাজমু' ফাতাওয়া: ২০/৪২৯]

لِمَآ أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴿٢٤﴾

তারপর তিনি ছায়ার নীচে আশ্রয় গ্রহণ করে বললেন, 'হে আমার রব! আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করবেন আমি তার কাঙ্গাল[১]।'

فَجَآءَتْهُ إِحْدَىٰهُمَا تَمْشِى عَلَى ٱسْتِحْيَآءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِى يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ۚ فَلَمَّا جَآءَهُۥ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ ۖ نَجَوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٢٥﴾

২৫. তখন নারী দুজনের একজন শরম-জড়িত পায়ে তার কাছে আসল[২] এবং বলল, 'আমার পিতা আপনাকে আমন্ত্রণ করছেন, আমাদের জানোয়ারগুলোকে পানি পান করানোর পারিশ্রমিক দেয়ার জন্য।' অতঃপর মূসা তার কাছে এসে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করলে তিনি বললেন, 'ভয় করো না, তুমি যালিম সম্প্রদায়ের কবল থেকে বেঁচে গেছ।'

---

(১) মূসা আলাইহিসসালাম বিদেশে অনাহারে কাটাচ্ছেন। তিনি এক গাছের ছায়ায় এসে আল্লাহ্ তা'আলার সামনে নিজের অবস্থা ও অভাব পেশ করলেন। এটা দো'আ করার একটি সূক্ষ্ম পদ্ধতি। خير শব্দটির অর্থ কল্যাণ। এখানে তিনি আহার্য হতে শুরু করে যাবতীয় কল্যাণের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার মুখাপেক্ষী হলেন। [কুরতুবী]

(২) উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ বাক্যাংশটির এরূপ ব্যাখ্যা করেছেনঃ "সে নিজের মুখ ঘোমটার আড়ালে লুকিয়ে লজ্জাজড়িত পায়ে হেঁটে এলো। সেই সব ধিংগি চপলা মেয়েদের মতো হন হন করে ছুটে আসেনি, যারা যেদিকে ইচ্ছা যায় এবং যেখানে খুশী ঢুকে পড়ে।" এ বিষয়বস্তু সম্বলিত কয়েকটি বর্ণনা সাঈদ ইবনে মানসুর, ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম ও ইবনুল মুনযির নির্ভরযোগ্য সনদ সহকারে উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে উদ্ধৃত করেছেন। এ থেকে পরিষ্কার জানা যায়, সাহাবায়ে কেরামের যুগে কুরআন ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের বদৌলতে এ মনীষীগণ লজ্জাশীলতার যে ইসলামী ধারণা লাভ করেছিলেন তা অপরিচিত ও ভিন্ পুরুষদের সামনে চেহারা খুলে রেখে ঘোরাফেরা করা এবং বেপরোয়াভাবে ঘরের বাইরে চলাফেরা করার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল। উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু পরিষ্কার ভাষায় এখানে চেহারা ঢেকে রাখাকে লজ্জাশীলতার চিহ্ন এবং তা ভিন পুরুষের সামনে উন্মুক্ত রাখাকে নির্লজ্জতা গণ্য করেছেন। [দেখুন, বাগভী; কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর; আত-তাফসীরুস সহীহ]

২৬. নারীদ্বয়ের একজন বলল, 'হে আমার পিতা! আপনি একে মজুর নিযুক্ত করুন, কারণ আপনার মজুর হিসেবে উত্তম হবে সে ব্যক্তি, যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত[১]।'

قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

২৭. তিনি মূসাকে বললেন, 'আমি আমার এ কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সাথে বিয়ে দিতে চাই, এ শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার কাজ করবে, আর যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ কর, সে তোমার ইচ্ছে। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে তুমি আমাকে সদাচারী পাবে।'

قَالَ إِنِّىٓ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَىَّ هَٰتَيْنِ عَلَىٰٓ أَن تَأْجُرَنِى ثَمَٰنِىَ حِجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ ۖ وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِىٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿٢٧﴾

২৮. মূসা বললেন, 'আমার ও আপনার মধ্যে এ চুক্তিই রইল। এ দুটি মেয়াদের কোন একটি আমি পূর্ণ করলে আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকবে না। আমরা যে বিষয়ে কথা বলছি আল্লাহ্ তার কর্মবিধায়ক।'

قَالَ ذَٰلِكَ بَيْنِى وَبَيْنَكَ ۖ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَٰنَ عَلَىَّ ۖ وَٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٢٨﴾

চতুর্থ রুকূ'

২৯. অতঃপর মূসা যখন তার মেয়াদ পূর্ণ করার পর[২] সপরিবারে যাত্রা

فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِۦٓ ءَانَسَ

(১) এ পরামর্শের অর্থ ছিল, আপনার বার্ধক্যের কারণে বাধ্য হয়ে আমাদের মেয়েদের বিভিন্ন কাজে বাইরে বের হতে হয়। বাইরের কাজ করার জন্য আমাদের কোন ভাই নেই। আপনি এ ব্যক্তিকে কর্মচারী নিযুক্ত করুন। সুঠাম দেহের অধিকারী বলশালী লোক। সবরকমের পরিশ্রমের কাজ করতে পারবে। আবার নির্ভরযোগ্যও। সে আমাদের মতো মেয়েদেরকে অসহায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমাদের সাহায্য করেছে এবং আমাদের দিকে কখনো চোখ তুলে তাকায়ওনি। [দেখুন, কুরতুবী]

(২) অর্থাৎ মূসা আলাইহিসসালাম চাকুরীর নির্দিষ্ট মেয়াদ পূর্ণ করলেন। এখানে প্রশ্ন হয় যে, মূসা আলাইহিসসালাম আট বছরের মেয়াদ পূর্ণ করেছিলেন নাকি দশ বছরের? এ ব্যাপারে ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম বলেন যে, অধিক মেয়াদ অর্থাৎ দশ

مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا ۚ قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿٢٩﴾

করলেন[১], তখন তিনি তূর পর্বতের দিকে আগুন দেখতে পেলেন। তিনি তার পরিজনবর্গকে বললেন, 'তোমরা অপেক্ষা কর, আমি আগুন দেখেছি, সম্ভবত আমি সেখান থেকে তোমাদের জন্য খবর আনতে পারি অথবা একখণ্ড জ্বলন্ত কাঠ আনতে পারি যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার।'

فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٠﴾

৩০. অতঃপর যখন মূসা আগুনের কাছে পৌঁছলেন তখন উপত্যকার ডান পাশে[২] বরকতময়[৩] ভূমির উপর অবস্থিত সুনির্দিষ্ট গাছের দিক থেকে তাকে ডেকে বলা হল, 'হে মূসা! আমিই আল্লাহ্, সৃষ্টিকুলের রব[৪];'

বছর মেয়াদকাল তিনি পূর্ণ করেছিলেন। নবীগণ যা বলেন তা পূর্ণ করেন। [বুখারীঃ ২৫৩৮] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও প্রাপককে তার প্রাপ্যের চাইতে বেশী দিতেন এবং তিনি উম্মতকেও নির্দেশ দিয়েছেন যে, চাকুরী, পারিশ্রমিক ও কেনাবেচার ক্ষেত্রে ত্যাগ স্বীকার করতে।

(১) এর থেকে প্রমাণ হয় যে, একজন মানুষ তার পরিবারের উপর কর্তৃত্বশীল। সে তাদেরকে নিয়ে যেখানে ইচ্ছা যাওয়ার অধিকার রাখে। [কুরতুবী] এ সফরে মূসার তূর পাহাড়ের দিকে যাওয়া দেখে অনুমান করা যায় তিনি পরিবার পরিজন নিয়ে সম্ভবত মিসরের দিকে যেতে চাচ্ছিলেন। কারণ মাদ্ইয়ান থেকে মিসরের দিকে যে পথটি গেছে তূর পাহাড় তার উপর অবস্থিত। সম্ভবত মূসা মনে করে থাকবেন, দশটি বছর চলে গেছে, এখন যদি আমি নীরবে সেখানে চলে যাই এবং নিজের পরিবারের লোকজনদের সাথে অবস্থান করতে থাকি তাহলে হয়তো আমার কথা কেউ জানতেই পারবে না। [দেখুন, ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ মূসার ডান হাতের দিকে যে কিনারা ছিল সেই কিনারা বা পাশ থেকে। [কুরতুবী]

(৩) সূরা মারইয়ামের ৩১ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বরকত সংক্রান্ত আলোচনা করা হয়েছে।

(৪) এ আয়াত সংক্রান্ত ব্যাখ্যা সূরা আন-নামলের ৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় গত হয়েছে।

وَاَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَآنٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبْ ؕ يٰمُوْسٰٓى اَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ ۟ اِنَّكَ مِنَ الْاٰمِنِيْنَ ﴿٣١﴾

৩১. আরও বলা হল, 'আপনি আপনার লাঠি নিক্ষেপ করুন।' তারপর, তিনি যখন সেটাকে সাপের ন্যায় ছুটোছুটি করতে দেখলেন তখন পিছনের দিকে ছুটতে লাগলেন এবং ফিরে তাকালেন না। তাকে বলা হল, 'হে মূসা! সামনে আসুন, ভয় করবেন না; আপনি তো নিরাপদ।

اُسْلُكْ يَدَكَ فِيْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ ۫ وَّاضْمُمْ اِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذٰنِكَ بُرْهَانٰنِ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ﴿٣٢﴾

৩২. 'আপনার হাত আপনার বগলে রাখুন, এটা বের হয়ে আসবে শুভ্র-সমুজ্জল নির্দোষ হয়ে। আর ভয় দূর করার জন্য আপনার দুহাত নিজের দিকে চেপে ধরুন। অতঃপর এ দু'টি আপনার রব-এর দেয়া প্রমাণ, ফির'আউন ও তার পরিষদবর্গের জন্য[১]। তারা তো ফাসেক সম্প্রদায়।

قَالَ رَبِّ اِنِّيْ قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنِ ﴿٣٣﴾

৩৩. মূসা বললেন, 'হে আমার রব! আমি তো তাদের একজনকে হত্যা করেছি। ফলে আমি আশংকা করছি তারা আমাকে হত্যা করবে[২]।

(১) এ মু'জিযা দু'টি তখন মূসাকে দেখানোর কারণ তাকে ফির'আউনের কাছে যে ভয়াবহ দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হচ্ছে সেখানে তিনি একেবারে খালি হাতে তার মুখোমুখি হবেন না বরং প্রচণ্ড শক্তিশালী অস্ত্র নিয়ে যাবেন। এ দু'টি মু'জিযাই ছিল অত্যন্ত সুস্পষ্ট। নবুওয়াতের পক্ষে বিরাট ও অকাট্য প্রমাণ। [দেখুন, ইবন কাসীর]

(২) এর অর্থ এ ছিল না যে, এ ভয়ে আমি সেখানে যেতে চাই না। বরং অর্থ ছিল, আপনার পক্ষ থেকে এমন কোন ব্যবস্থা থাকা দরকার যার ফলে আমার সেখানে পৌঁছার সাথে সাথেই কোন প্রকার কথাবার্তা ও রিসালাতের দায়িত্বপালন করার আগেই তারা যেন আমাকে হত্যার অপরাধে গ্রেফতার করে না নেয়। কারণ এ অবস্থায় তো আমাকে যে উদ্দেশ্যে এ অভিযানে সেখানে পাঠানো হচ্ছে তা ব্যর্থ হয়ে যাবে। পরবর্তী আয়াত থেকে একথা স্বতস্ফূর্তভাবে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, মূসার এ আবেদনের উদ্দেশ্য ছিল স্বাভাবিক ভয় যা মানুষ মাত্রই করে থাকে। এ ধরনের ভয় থাকা নবুওয়তের মর্যাদার পরিপন্থী কোন কাজ নয়।

৩৪. 'আর আমার ভাই হারূন আমার চেয়ে বাগ্মী[১]; অতএব তাকে আমার সাহায্যকারীরূপে প্রেরণ করুন, সে আমাকে সমর্থন করবে। আমি আশংকা করি তারা আমার প্রতি মিথ্যারোপ করবে।'

وَاَخِيْ هٰرُوْنُ هُوَ اَفْصَحُ مِنِّيْ لِسَانًا فَاَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْاً يُّصَدِّقُنِيْٓ اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ ﴿٣٤﴾

৩৫. আল্লাহ্ বললেন, 'অচিরেই আমরা আপনার ভাইয়ের দ্বারা আপনার বাহুকে শক্তিশালী করব এবং আপনাদের উভয়কে প্রাধান্য দান করব। ফলে তারা আপনাদের কাছে পৌঁছতে পারবে না। আপনারা এবং আপনাদের অনুসারীরা আমাদের নিদর্শন বলে তাদের উপর প্রবল হবেন।'

قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِاَخِيْكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُوْنَ اِلَيْكُمَا ۚ بِاٰيٰتِنَآ ۚ اَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغٰلِبُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৬. অতঃপর মূসা যখন তাদের কাছে আমাদের সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে আসল, তারা বলল, 'এটা তো অলীক জাদু মাত্র[২]! আর আমাদের পূর্বপুরুষদের কালে কখনো এরূপ কথা শুনিনি[৩]।'

فَلَمَّا جَآءَهُمْ مُّوْسٰى بِاٰيٰتِنَا بَيِّنٰتٍ قَالُوْا مَا هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَّمَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِيْٓ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ ﴿٣٦﴾

(১) এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, ওয়াজ ও প্রচারকার্যে ভাষার প্রাঞ্জলতা ও প্রশংসনীয় বর্ণনাভঙ্গি কাম্য। এই গুণ অর্জনে প্রচেষ্টা চালানো নিন্দনীয় নয়। তবে হারূন আলাইহিস্সালাম তার ভাই মূসা আলাইহিস্সালাম থেকে বেশী বাগ্মি হলেও ফের'আউনের সাথে কথাবার্তা মূসা আলাইহিস্সালামের মাধ্যমে সংঘটিত হয়েছিল বলেই প্রমাণিত হয়। এর দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, বাগ্মীতার যেমন প্রয়োজন তেমনি জ্ঞানের পরিধিরও আলাদা কদর রয়েছে।

(২) বলা হয়েছেঃ অলীক জাদু বা বানোয়াট জাদু। [কুরতুবী] তুমি নিজে এটা বানিয়ে নিয়েছ। [ফাতহুল কাদীর]

(৩) রিসালাতের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে মূসা আলাইহিস্সালাম যেসব কথা বলেছিলেন সে দিকে ইংগিত করা হয়েছে। কুরআনের অন্যান্য জায়গায় এগুলোর বিস্তারিত বিবরণ এসেছে। অন্যত্র এসেছে, মূসা তাকে বলেনঃ "তুমি কি পবিত্র-

وَقَالَ مُوسٰى رَبِّيْٓ اَعْلَمُ بِمَنْ جَآءَ بِالْهُدٰى مِنْ عِنْدِهٖ وَمَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ ۭ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ۝

৩৭. আর মূসা বললেন, 'আমার রব সম্যক অবগত, কে তাঁর কাছ থেকে পথনির্দেশ এনেছে এবং আখেরাতে কার পরিণাম শুভ হবে। যালিমরা তো কখনো সফলকাম হবে না[১]।'

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَاُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِيْ ۚ فَاَوْقِدْ لِيْ يٰهَامٰنُ عَلَى الطِّيْنِ فَاجْعَلْ لِّيْ صَرْحًا لَّعَلِّيْٓ اَطَّلِعُ اِلٰٓى اِلٰهِ مُوْسٰى ۙ وَاِنِّيْ لَاَظُنُّهٗ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝

৩৮. আর ফির'আউন বলল, 'হে পরিষদবর্গ! আমি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন ইলাহ্ আছে বলে জানি না! অতএব হে হামান! তুমি আমার জন্য ইট পোড়াও এবং একটি সুউচ্চ প্রাসাদ তৈরী কর; হয়ত আমি সেটাতে উঠে মূসার ইলাহ্কে দেখতে পারি। আর আমি তো মনে করি, সে অবশ্যই মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত।'

পরিচ্ছন্ন নীতি অবলম্বন করতে আগ্রহী? এবং আমি তোমাকে তোমার রবের পথ বাতলে দিলে কি তুমি ভীত হবে? [সূরা আন-নাযি'আতঃ ১৮-১৯] সূরা ত্বা-হায়ে বলা হয়েছেঃ "আর আমরা তোমার রবের রাসূল, তুমি বনী ইসরাঈলকে আমাদের সাথে যেতে দাও। আমরা তোমার কাছে তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে নির্দশন নিয়ে এসেছি। আর যে ব্যক্তি সঠিক পথের অনুসারী হয় তার জন্য রয়েছে শান্তি ও নিরাপত্তা। আমাদের প্রতি অহী নাযিল করা হয়েছে এ মর্মে যে, শাস্তি তার জন্য যে মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়।" [৪৭-৪৮] এ কথাগুলো সম্পর্কেই ফির'আউন বলে, আমাদের বাপ দাদারাও কখনো একথা শোনেনি যে, মিসরের ফির'আউনের উপরেও কোন কর্তৃত্বশালী সত্তা আছে, যে তাকে হুকুম করার ক্ষমতা রাখে, তাকে শাস্তি দিতে পারে, তাকে নির্দেশ দেবার জন্য কোন লোককে তার দরবারে পাঠাতে পারে এবং যাকে ভয় করার জন্য মিসরের বাদশাহ্কে উপদেশ দেয়া যেতে পারে। এ সম্পূর্ণ অভিনব কথা আমরা আজ এক ব্যক্তির মুখে শুনছি। অথবা আয়াতের অর্থ আমরা নবুওয়ত ও রিসালাত সম্পর্কে আগে কখনও শুনিনি। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

(১) অর্থাৎ আমার রব আমার অবস্থা ভালো জানেন। তিনি জানেন তাঁর পক্ষ থেকে যাকে রাসূল নিযুক্ত করা হয়েছে সে কেমন লোক। পরিণামের ফায়সালা তাঁরই হাতে রয়েছে। তিনিই তোমাদের ও আমাদের মাঝে ফায়সালা করে দেবেন। তিনিই জানেন কার জন্য তিনি আখেরাতের সুন্দর পরিণাম নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। [ইবন কাসীর]

৩৯. আর ফির'আউন ও তার বাহিনী অন্যায়ভাবে যমীনে অহংকার করেছিল এবং তারা মনে করেছিল যে, তাদেরকে আমাদের নিকট ফিরিয়ে আনা হবে না।

وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ﴿٣٩﴾

৪০. অতঃপর আমরা তাকে ও তার বাহিনীকে পাকড়াও করলাম এবং তাদেরকে সাগরে নিক্ষেপ করলাম। সুতরাং দেখুন, যালিমদের পরিণাম কিরূপ হয়েছিল!

فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾

৪১. আর আমরা তাদেরকে নেতা করেছিলাম; তারা লোকদেরকে জাহান্নামের দিকে ডাকত[১]; এবং কিয়ামতের দিন তাদেরকে সাহায্য করা হবে না।

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ ﴿٤١﴾

৪২. আর এ দুনিয়াতে আমরা তাদের

وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ

(১) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ফির'আউনের পরিষদবর্গকে খারাপ ও নিন্দনীয় ব্যাপারে নেতা করে দিয়েছিলেন। সুতরাং দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে যারাই খারাপ কাজ করবে, যারাই কোন খারাপ কাজের প্রচার ও প্রসার ঘটাবে ফির'আউন ও তার পরিষদবর্গকে তারাই উত্তরসূরী হিসেবে পাবে। এরা হলো সমস্ত ভ্রান্ত মতবাদের হোতা। এ ভ্রান্ত নেতারা জাতিকে জাহান্নামের দিকে আহ্বান করতে থাকবে। কেয়ামত পর্যন্ত যারাই পথভ্রষ্ট কোন মত ও পথের দিকে মানুষকে আহ্বান করবে তারাই ফির'আউন ও তার সভাষদদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে থাকবে। [দেখুন, কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর] তারা জাহান্নামের পথের সর্দার। দুনিয়াতে যে ব্যক্তি মানুষকে কুফরী ও যুলুমের দিকে আহ্বান করে, সে প্রকৃতপক্ষে জাহান্নামের দিকেই আহ্বান করে। আমরা যদি জাতিসমূহের পথভ্রষ্টতার উৎসের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করি তবে দেখতে পাব যে, সবচেয়ে প্রাচীন ভ্রষ্টতার উৎপত্তি ঘটেছে মিসর থেকে। ফির'আউন সর্বপ্রথম 'ওয়াহদাতুল ওজুদ' তথা সর্বেশ্বরবাদের দাবী তুলেছিল। আর সে দাবী এখনো পর্যন্ত ভারত তথা হিন্দুস্থানের হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও সুফীবাদের অনেকের মধ্যেই পাওয়া যায়। আর এ জন্যেই ফের'আউনকে অনেক সুফীরা ঈমানদার বলার মত ধৃষ্টতা দেখায়।

الْقِيٰمَةِ هُمْ مِّنَ الْمَقْبُوْحِيْنَ ﴿٤٢﴾

পিছনে লাগিয়ে দিয়েছি অভিসম্পাত এবং কিয়ামতের দিন তারা হবে ঘৃণিতদের অন্তর্ভুক্ত(১)।

পঞ্চম রুকূ'

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِ مَآ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ الْاُوْلٰى بَصَآئِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٤٣﴾

৪৩. আর অবশ্যই পূর্ববর্তী বহু প্রজন্মকে বিনাশ করার পর(২) আমরা মূসাকে দিয়েছিলাম কিতাব, মানবজাতির জন্য জ্ঞান-বর্তিকা; পথনির্দেশ ও অনুগ্রহস্বরূপ; যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

---

(১) مقبوح শব্দের মূল অর্থ হচ্ছে, বিকৃত ঘৃণিত। অর্থাৎ কেয়ামতের দিন তারা "মাকবূহীন"দের অন্তর্ভুক্ত হবে। এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। তারা হবে প্রত্যাখ্যাত ও বহিস্কৃত। আল্লাহর রহমত থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা হবে। তাদের অবস্থা বড়ই শোচনীয় করে দেয়া হবে। তাদের চেহারা বিকৃত করে দেয়া হবে। তাদের মুখমণ্ডল বিকৃত হয়ে কালোবর্ণ এবং চক্ষু নীলবর্ণ ধারণ করবে। তারা ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত হবে। [দেখুন, কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

(২) 'পূর্ববর্তী বহু প্রজন্ম' বলে নূহ, হূদ, সালেহ আলাইহিমুসসালামের সম্প্রদায়সমূহকে বোঝানো হয়েছে। তারা মূসা আলাইহিসসালামের পূর্বে অবাধ্যতার কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর] পূর্ববর্তী প্রজন্মগুলো যেমনিভাবে পূর্বের নবীদের শিক্ষাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার অশুভ পরিণাম ভোগ করেছিল তেমনিভাবে ফির'আউন ও তার সৈন্যরা সে একই ধরনের পরিণতি দেখেছিল। তার পরে মূসা আলাইহিস সালামকে কিতাব দেয়া হয়েছিল, যাতে মানব জাতির একটি নব যুগের সূচনা হয়। এরপর থেকে আর কোন সম্প্রদায়ের সকলকে একত্রে আযাব দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা ধ্বংস করেননি। [ইবন কাসীর]
بصائر শব্দটি بصيرة এর বহুবচন। এর শাব্দিক অর্থ জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি। এখানে উদ্দেশ্য সেই জ্ঞান যা দ্বারা মানুষ বস্তুর স্বরূপ দেখতে পারে, হক জানতে পারে এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বুঝতে পারে। যা অনুসরণ করলে মানুষ হেদায়াত পেতে পারে। পথভ্রষ্টতা থেকে নিজেদেরকে উদ্ধার করতে পারে। [ফাতহুল কাদীর] এখানে ناس বলে মূসা আলাইহিসসালামের উম্মতদের বোঝানো হয়েছে। কারণ; তাওরাত তাদের জন্য আলোকবর্তিকাস্বরূপ ছিল। আমাদের নবীর উপর কুরআন নাযিল হওয়ার পর সে আলোকবর্তিকার পরিবর্তে অন্য আলোকবর্তিকা এসে যাওয়ায় পূর্বেরটা রহিত হয়ে গেছে। এখন আর তা থেকে হেদায়াত নেওয়ার দরকার নেই।

৪৪. আর মূসাকে যখন আমরা বিধান দিয়েছিলাম তখন আপনি পশ্চিম প্রান্তে উপস্থিত ছিলেন না[১] এবং আপনি প্রত্যক্ষদর্শীদেরও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿٤٤﴾

৪৫. বস্তুত আমরা অনেক প্রজন্মের আবির্ভাব ঘটিয়েছিলাম; তারপর তাদের উপর বহু যুগ অতিবাহিত হয়ে গেছে। আর আপনি তো মাদ্‌ইয়ানবাসীদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন না যে তাদের কাছে আমাদের আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করবেন[২]। মূলতঃ আমরাই ছিলাম রাসূল প্রেরণকারী[৩]।

وَلٰكِنَّآ أَنْشَأْنَا قُرُوْنًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ۚ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِيْٓ أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ۙ وَلٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ﴿٤٥﴾

৪৬. আর মূসাকে যখন আমরা ডেকেছিলাম তখনও আপনি তূর পর্বতের পাশে উপস্থিত ছিলেন না[৪]। বস্তুত

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّوْرِ إِذْ نَادَيْنَا وَلٰكِنْ رَّحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ أَتٰىهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ

(১) পশ্চিম প্রান্ত বলতে সিনাই উপদ্বীপের যে পাহাড়ে মূসাকে শরীয়াতের বিধান দেয়া হয়েছিল সেই পাহাড় বুঝানো হয়েছে। এ এলাকাটি হেজাযের পশ্চিম দিকে অবস্থিত। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(২) অর্থাৎ যখন মূসা মাদ্‌ইয়ানে পৌঁছেন, তার সাথে সেখানে যা কিছু ঘটে এবং দশ বছর অতিবাহিত করে যখন তিনি সেখান থেকে রওয়ানা দেন তখন সেখানে কোথাও আপনি বিদ্যমান ছিলেন না। আপনি চোখে দেখে এ ঘটনাবলীর উল্লেখ করছেন না বরং আমার মাধ্যমেই আপনি এ জ্ঞান লাভ করছেন। [দেখুন, কুরতুবী; ইবন কাসীর]

(৩) অর্থাৎ আপনাকে তো আমরা রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছি। সে কারণেই আপনি এ সমস্ত ঘটনাবলী আপনার কাছে নাযিলকৃত ওহী থেকে বর্ণনা করতে সক্ষম হচ্ছেন। [কুরতুবী] সরাসরি এ তথ্যগুলো লাভ করার কোন উপায় আপনার ছিল না। আজ দু'হাজার বছরের বেশী সময় অতিবাহিত হয়ে যাবার পরও যে আপনি এ ঘটনাবলীকে এমনভাবে বর্ণনা করছেন যেন চোখে দেখা ঘটনা, আল্লাহর অহীর মাধ্যমে এসব তথ্য তোমাদের সরবরাহ করা হচ্ছে বলেই এটা সম্ভব হয়েছে।

(৪) অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের সত্তর জন প্রতিনিধি যাদেরকে শরীয়াতের বিধান মেনে চলার অংগীকার করার জন্য মূসার সাথে ডাকা হয়েছিল। [ফাতহুল কাদীর]

مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٤٦﴾

এটা আপনার রব-এর কাছ থেকে দয়াস্বরূপ, যাতে আপনি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারেন, যাদের কাছে আপনার আগে কোন সতর্ককারী আসেনি[১], যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে;

وَلَوْلَآ اَنْ تُصِيْبَهُمْ مُّصِيْبَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ فَيَقُوْلُوْا رَبَّنَا لَوْلَآ اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٧﴾

৪৭. আর রাসূল না পাঠালে তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদের উপর কোন বিপদ হলে তারা বলত, 'হে আমাদের রব! আপনি আমাদের কাছে কোন রাসূল পাঠালেন না কেন? পাঠালে আমরা আপনার নিদর্শন মেনে চলতাম এবং আমরা মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।'

فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْا لَوْلَآ اُوْتِيَ مِثْلَ مَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى ؕ اَوَلَمْ يَكْفُرُوْا بِمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ ۚ قَالُوْا سِحْرٰنِ تَظٰهَرَا ۗ وَقَالُوْٓا اِنَّا بِكُلٍّ كٰفِرُوْنَ ﴿٤٨﴾

৪৮. অতঃপর যখন আমাদের কাছ থেকে তাদের কাছে সত্য আসল, তারা বলতে লাগল, 'মূসাকে যেরূপ দেয়া হয়েছিল, তাকে সেরূপ দেয়া হল না কেন?' কিন্তু আগে মূসাকে যা দেয়া হয়েছিল তা কি তারা অস্বীকার করেনি? তারা বলেছিল, 'দু'টিই জাদু, একে অন্যকে সমর্থন করে।' এবং তারা বলেছিল, 'আমরা সকলকেই প্রত্যাখ্যান করি।'

---

(১) এখানে কাওম বলে ইসমাঈল আলাইহিসসালামের বংশধর মক্কার আরবদেরকে বোঝানো হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর] ইসমাঈল আলাইহিসসালামের পর থেকে শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত তাদের মধ্যে কোন নবী প্রেরিত হয়নি। সূরা ইয়াসীনের প্রথমেও এটা এসেছে। কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে, ﴿وَاِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ﴾ অর্থাৎ এমন কোন উম্মত নেই, যাদের কাছে আল্লাহ্‌র কোন নবী আসেনি। মক্কার আরবদের নিকটও নবী-রাসূলগণের আগমন ঘটেছিল। তাই এখানে বা এ জাতীয় যেখানেই বলা হয়েছে যে, তাদের কাছে নবী-রাসূল আসেনি তার অর্থ, অদূর অতীতে আগমন না করা।

৪৯. বলুন, 'তোমরা সত্যবাদী হলে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এক কিতাব নিয়ে আস, যা পথনির্দেশে এ দু'টি থেকে উৎকৃষ্ট হবে; আমি সে কিতাব অনুসরণ করব।'

قُلْ فَأْتُوا بِكِتٰبٍ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ هُوَ أَهْدٰى مِنْهُمَآ أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٤٩﴾

৫০. তারপর তারা যদি আপনার ডাকে সাড়া না দেয়, তাহলে জানবেন তারা তো শুধু নিজেদের খেয়াল-খুশীরই অনুসরণ করে। আর আল্লাহ্‌র পথ নির্দেশ অগ্রাহ্য করে যে ব্যক্তি নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে তার চেয়ে বেশী বিভ্রান্ত আর কে? আল্লাহ্ তো যালিম সম্প্রদায়কে হেদায়াত করেন না।

فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُوْنَ أَهْوَآءَهُمْ ۚ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰىهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ ۚ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥٠﴾

ষষ্ঠ রুকূ'

৫১. আর অবশ্যই আমরা তাদের কাছে পরপর বাণী পৌঁছে দিয়েছি[১]; যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٥١﴾

৫২. এর আগে আমরা যাদেরকে কিতাব

الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِهٖ هُمْ بِهٖ

(১) وصّلنا শব্দটি توصيل থেকে উদ্ভূত। এর আসল আভিধানিক অর্থ রশির সূতায় আরো সূতা মিলিয়ে রশিকে মজবুত করা। [ফাতহুল কাদীর] উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে একের পর এক হেদায়াত অব্যাহত রেখেছেন এবং অনেক উপদেশমূলক বিষয়বস্তুর বার বার পুনরাবৃত্তিও করা হয়েছে, যাতে শ্রোতারা প্রভাবান্বিত হয়। [কুরতুবী] এ থেকে জানা গেল যে, সত্য কথা উপর্যুপরি বলা ও পৌঁছাতে থাকা নবীগণের তাবলীগ তথা দ্বীন-প্রচারের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল। মানুষের অস্বীকার ও মিথ্যারোপ তাদের কাজে ও কর্মাসক্তিতে কোনরূপ বাধা সৃষ্টি করতে পারত না। সত্যকথা একবার না মানা হলে দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার ও চতুর্থবার তারা পেশ করতে থাকতেন। কারও মধ্যে প্রকৃত অন্তর সৃষ্টি করে দেয়ার সাধ্য তো কোন সহৃদয় উপদেশদাতার নেই। কিন্তু নিজের অক্লান্ত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার ব্যাপারে তারা ছিলেন আপোষহীন। আজকালও যারা দাওয়াতের কাজ করেন, তাদের এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾

দিয়েছিলাম, তারা এতে ঈমান আনে(১)।

وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِهِۦٓ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَآ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِۦ مُسْلِمِينَ ﴿٥٣﴾

৫৩. আর যখন তাদের কাছে এটা তেলাওয়াত করা হয় তখন তারা বলে, 'আমরা এতে ঈমান আনি, নিশ্চয়

(১) এ আয়াতে সেসব আহ্‌লে কিতাবের কথা বলা হয়েছে, যারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত ও কুরআন নাযিলের পূর্বেও তাওরাত ও ইঞ্জীল প্রদত্ত সুসংবাদের ভিত্তিতে কুরআন ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতে বিশ্বাসী ছিল। এরপর যখন প্রেরিত হন, তখন সাবেক বিশ্বাসের ভিত্তিতে কালবিলম্ব না করে মুসলিম হয়ে যায়। [ইবন কাসীর] যেমন অন্য আয়াতে এসেছে, "যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছি , তাদের মধ্যে যারা যথাযথভাবে তা তিলাওয়াত করে , তারা তাতে ঈমান আনে ।" [সূরা আল-বাকারাহ: ১২১] কোন কোন ঐতিহাসিক ও জীবনীকার এ ঘটনাকে মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকের বরাত দিয়ে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করেছেনঃ 'আবিসিনিয়ায় হিজরাতের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত প্রাপ্তি এবং তার দাওয়াতের খবর যখন সেই দেশে ছড়িয়ে পড়লো তখন সেখান থেকে প্রায় ২০ জনের একটি খৃষ্টান প্রতিনিধি দল প্রকৃত অবস্থা অনুসন্ধানের জন্য মক্কায় এলো। তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মসজিদে হারামে সাক্ষাৎ করলো। কুরাইশদের বহু লোকও এ ব্যাপার দেখে আশপাশে দাঁড়িয়ে গেলো। প্রতিনিধি দলের লোকেরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কিছু প্রশ্ন করলেন। তিনি সেগুলোর জবাব দিলেন। তারপর তিনি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং কুরআন মজীদের আয়াত তাদের সামনে পাঠ করলেন। কুরআন শুনে তাদের চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগলো। তারা একে আল্লাহর বাণী বলে অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করলেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনলেন। মজলিস শেষ হবার পর আবু জাহল ও তার কয়েকজন সাথী প্রতিনিধিদলের লোকদেরকে পথে ধরলো এবং তাদেরকে যাচ্ছে তাই বলে তিরস্কার করলো। তাদেরকে বললো, "তোমাদের সফরটাতো বৃথাই হলো। তোমাদের স্বধর্মীয়রা তোমাদেরকে এজন্য পাঠিয়েছিল যে, এ ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে তোমরা যথাযথ অনুসন্ধান চালিয়ে প্রকৃত ও যথার্থ ঘটনা তাদেরকে জানাবে। কিন্তু তোমরা সবেমাত্র তার কাছে বসেছিলে আর এরি মধ্যেই নিজেদের ধর্ম ত্যাগ করে তার প্রতি ঈমান আনলে? তোমাদের চেয়ে বেশী নির্বোধ কখনো আমরা দেখিনি।" একথায় তারা জবাব দিল, "ভাইয়েরা, তোমাদের প্রতি সালাম। আমরা তোমাদের সাথে জাহেলী বিতর্ক করতে চাই না। আমাদের পথে আমাদের চলতে দাও এবং তোমরা তোমাদের পথে চলতে থাকো। আমরা জেনেবুঝে কল্যাণ থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত করতে পারি না।" [সীরাতে ইবনে হিশাম, ২/৩২, এবং আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৩/৮২]।

এটা আমাদের রব হতে আসা সত্য। আমরা তো আগেও আত্মসমর্পণকারী[১] ছিলাম;

৫৪. তাদেরকে দু'বার প্রতিদান দেয়া হবে[২]; যেহেতু তারা ধৈর্যশীল এবং তারা ভাল দিয়ে মন্দের মুকাবিলা করে[৩]। আর আমরা তাদেরকে যে

أُولَٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا۟ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٥٤﴾

(১) অর্থাৎ আহ্‌লে কিতাবের এই আলেমগণ বললঃ আমরা তো কুরআন নাযিল হওয়ার পূর্বেই মুসলিম ছিলাম। এর এক অর্থ, আমরা পূর্ব থেকেই তাওহীদপন্থী ছিলাম। অথবা আমরা এটার উপর ঈমানদার ছিলাম যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূল হিসেবে পাঠানো হবে, আর তার উপর কুরআন নাযিল হবে। [কুরতুবী]

(২) অর্থাৎ আহলে কিতাবের মুমিনদেরকে দুইবার পুরস্কৃত করা হবে। পবিত্র কুরআনে এমনি ধরনের প্রতিশ্রুতি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্রা স্ত্রীগণের সম্পর্কেও বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে, ﴿وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتَعْمَلْ صَٰلِحًا نُّؤْتِهَآ أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ﴾ "তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি অনুগত হবে ও সৎকাজ করবে তাকে আমরা পুরস্কার দেব দু'বার" [সূরা আল-আহযাবঃ ৩১] অনুরূপভাবে এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'তিন ব্যক্তির জন্য দু'বার পুরস্কার রয়েছে ১। যে কিতাবধারী পূর্বে তার নবীর প্রতি ঈমান এনেছে তারপর এই নবীর প্রতি ঈমান এনেছে ২। যে অপরের মালিকানাধীন দাস মনিব এবং তার মূল প্রভু রাব্বুল আলামীনের আনুগত্য করে ৩। যার মালিকানায় কোন যুদ্ধ-লব্ধ দাসী ছিল সে তাকে গোলামী থেকে মুক্ত করে বিবাহিতা স্ত্রী করে নিল।' [বুখারীঃ ৯৭]

এখানে চিন্তাসাপেক্ষ বিষয় এই যে, এই কয়েক প্রকার লোককে দু বার পুরস্কৃত করার কারণ কি? এর জওয়াবে বলা যায় যে, তাদের প্রত্যেক আমল যেহেতু দুটি, তাদেরকে দুইবার পুরস্কার প্রদান করা হবে। কিতাবধারী মুমিনের দুই আমল এই যে, সে পূর্বে এক নবীর প্রতি ঈমান এনেছিল, এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি ঈমান এনেছে। পবিত্র স্ত্রীগণের দুই আমল এই যে, তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আনুগত্য ও মহব্বত রাসূল হিসেবেও করেন, আবার স্বামী হিসেবেও করেন। গোলামের দুই আমল তার দ্বিমুখী আনুগত্য, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য এবং তার মালিকের আনুগত্য। বাঁদীকে মুক্ত করে যে বিবাহ করে, তার এক আমল মুক্ত করা, আর দ্বিতীয় আমল বিবাহ করা। [কুরতুবী]

(৩) অর্থাৎ তারা মন্দের জবাব মন্দ দিয়ে নয় বরং ভালো দিয়ে দেয়। মিথ্যার মোকাবিলায় মিথ্যা নয় বরং সত্য নিয়ে আসে। যুলুমকে যুলুম দিয়ে নয় বরং ইনসাফ দিয়ে

রিযিক দিয়েছি তা থেকে তারা ব্যয় করে।

৫৫. আর তারা যখন অসার বাক্য শুনে তখন তা উপেক্ষা করে চলে এবং বলে, 'আমাদের আমল আমাদের জন্য এবং তোমাদের আমল তোমাদের জন্য; তোমাদের প্রতি 'সালাম'। আমরা অজ্ঞদের সাথে জড়াতে চাই না[১]।'

وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ﴿٥٥﴾

প্রতিরোধ করে। দুষ্টামির মুখোমুখি দুষ্টামির সাহায্যে নয় বরং ভদ্রতার সাহায্যে হয়। এই মন্দ ও ভাল বলে কি বোঝানো হয়েছে, সে সম্পর্কে অনেক উক্তি বর্ণিত আছেঃ কেউ বলেন, ভাল বলে ইবাদাত এবং মন্দ বলে গোনাহ বোঝানো হয়েছে। কেননা, পুণ্য কাজ অসৎকাজকে মিটিয়ে দেয়। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "গোনাহের পর নেক কাজ কর। নেককাজ গোনাহকে মিটিয়ে দেবে"। [তিরমিযীঃ ১৯৮৭] কেউ কেউ বলেন, ভাল বলে জ্ঞান ও সহনশীলতা এবং মন্দ বলে অজ্ঞতা ও অসহনশীলতা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তারা অপরের অজ্ঞতার জওয়াব জ্ঞান ও সহনশীলতা দ্বারা দেয়। [বাগভী] প্রকৃতপক্ষে এসব উক্তির মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কেননা, এগুলো সবই ভাল ও মন্দের অন্তর্ভুক্ত।

এ আয়াতে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ হেদায়াত রয়েছেঃ এক, কারও দ্বারা কোন গোনাহ হয়ে গেলে তার প্রতিকার এই যে, এরপর সৎকাজে সচেষ্ট হতে হবে। সৎকাজ গোনাহের কাফ্ফারা হয়ে যাবে। দুই, কেউ কারও প্রতি উৎপীড়ন ও মন্দ আচরণ করলে শরীয়তের আইনে যদিও সমান সমান হওয়ার শর্তে প্রতিশোধ নেয়া জায়েয আছে, কিন্তু প্রতিশোধ নেয়ার পরিবর্তে মন্দের প্রত্যুত্তরে ভাল এবং উৎপীড়নের প্রত্যুত্তরে অনুগ্রহ করাই উত্তম। এটা উৎকৃষ্ট চরিত্রের সর্বোচ্চ স্তর। দুনিয়া ও আখেরাতে এর উপকারিতা অনেক। কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছেঃ "ভাল ও মন্দ একসমান হতে পারে না। মন্দ ও যুলুমকে উৎকৃষ্ট পন্থায় প্রতিহত কর। (যুলুমের পরিবর্তে অনুগ্রহ কর)। এরূপ করলে যে ব্যক্তি ও তোমার মধ্যে শত্রুতা আছে, সে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যাবে।" [সূরা ফুসসিলাতঃ ৩৪]

(১) অর্থাৎ তাদের একটি উৎকৃষ্ট চরিত্র এই যে, তারা কোন অজ্ঞ শত্রুর কাছ থেকে নিজেদের সম্পর্কে যখন অর্থহীন ও বাজে কথাবার্তা শোনে, তখন তার জওয়াব দেয়ার পরিবর্তে একথা বলে দেয়, আমার সালাম গ্রহণ কর। আমি অজ্ঞদের সাথে জড়াতে চাই না। ইমাম জাস্সাস বলেন, সালাম দুই প্রকারঃ এক, মুসলিমদের মধ্যে প্রচলিত অভিবাদনমূলক সালাম। দুই, সন্ধি ও বর্জনমূলক সালাম। অর্থাৎ প্রতিপক্ষকে বলে দেয়া যে, আমি তোমার অসার আচরণের প্রতিশোধ নেব না। এখানে এ অর্থই বোঝানো হয়েছে।

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾

৫৬. আপনি যাকে ভালবাসেন ইচ্ছে করলেই তাকে সৎপথে আনতে পারবেন না। বরং আল্লাহ্ই যাকে ইচ্ছে সৎপথে আনয়ন করেন এবং সৎপথ অনুসারীদের সম্পর্কে তিনিই ভাল জানেন[১]।

وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا ۚ أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَٰكِنَّ

৫৭. আর তারা বলে, 'আমরা যদি তোমার সাথে সৎপথ অনুসরণ করি তবে আমাদেরকে দেশ থেকে উৎখাত করা হবে[২]।' আমরা কি তাদের জন্য

---

(১) 'হেদায়াত' শব্দটি কয়েক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক, শুধু পথ দেখানো। এর জন্য জরুরী নয় যে, যাকে পথ দেখানো হয় সে গন্তব্যস্থলে পৌছতেই হবে। দুই, পথ দেখিয়ে গন্তব্যস্থলে পৌছে দেয়া। প্রথম অর্থের দিক থেকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বরং সমস্ত নবীগণ যে হাদী বা পথপ্রদর্শক ছিলেন এবং হেদায়াত যে তাদের ক্ষমতাধীন ছিল, তা বলাই বাহুল্য। কেননা, এই হেদায়াতই ছিল তাদের পরম দায়িত্ব ও কর্তব্য। এটা তাদের ক্ষমতাধীন না হলে তারা নবুওয়াত ও রিসালাতের কর্তব্য পালন করবে কীরূপে? আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিদায়াতের উপর ক্ষমতাশীল নন। এতে দ্বিতীয় অর্থের হেদায়াত বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ গন্তব্যস্থলে পৌছে দেয়া। উদ্দেশ্য এই যে, প্রচার ও শিক্ষার মাধ্যমে আপনি কারও অন্তরে ঈমান সৃষ্টি করে দিবেন এবং মুমিন বানিয়ে দিবেন, এটা আপনার কাজ নয়। এটা সরাসরি আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমতাধীন। এ সংক্রান্ত আলোচনা সূরা আল-ফাতিহার তাফসীরে উল্লেখিত হয়েছে। হাদীসে এসেছে, এই আয়াত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা আবু তালিব সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আন্তরিক বাসনা ছিল যে, সে কোনরূপেই ইসলাম গ্রহণ করুক। এর প্রেক্ষাপটে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হয়েছে যে, কাউকে মুমিন-মুসলিম করে দেয়া আপনার ক্ষমতাধীন নয়। [দেখুন, বুখারীঃ ৩৬৭১, মুসলিমঃ ২৪]।

(২) মক্কার কাফেররা তাদের ঈমান কবুল না করার এক কারণ এই বর্ণনা করল যে, আপনার শিক্ষাকে সত্য মনে করি, কিন্তু আমাদের আশংকা এই যে, আপনার পথনির্দেশ মেনে আমরা আপনার সাথে একাত্ম হয়ে গেলে সমগ্র আরব আমাদের শত্রু হয়ে যাবে এবং আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে উৎখাত করে দেয়া হবে। আরবের সমস্ত উপজাতি মিলে আমাদের মক্কা ত্যাগ করতে বাধ্য করবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, তাদের এই অজুহাত বাতিল। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষভাবে মক্কাবাসীদের

أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾

এক নিরাপদ হারাম প্রতিষ্ঠা করিনি, যেখানে সর্বপ্রকার ফলমূল আমদানী হয় আমাদের দেয়া রিযিকস্বরূপ[1]? কিন্তু তাদের বেশীর ভাগই এটা জানে না ।

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ۖ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ۖ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ﴿٥٨﴾

৫৮. আর আমরা বহু জনপদকে ধ্বংস করেছি যার বাসিন্দারা নিজেদের ভোগ-সম্পদের অহংকার করত! এগুলোই তো তাদের ঘরবাড়ী; তাদের পর এগুলোতে লোকজন সামান্যই বসবাস করেছে[2] । আর আমরাই তো

হেফাযতের জন্যে একটি স্বাভাবিক ব্যবস্থা পূর্ব থেকেই করে রেখেছেন । তা এই যে, তিনি মক্কার ভূখণ্ডকে নিরাপদ হারাম করে দিয়েছেন । তাছাড়া জগতের অন্যান্য কাফির সম্প্রদায়ের অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত কর । কুফর ও শিরকের কারণে তারা কীভাবে নিপাত হয়েছে । তাদের বসত-বাড়ি, সুদৃঢ় দুর্গ ও প্রতিরক্ষামূলক সাজ-সরঞ্জাম মাটিতে মিশে গেছে । অতএব কুফর ও শির্কই হচ্ছে প্রকৃত আশঙ্কার বিষয় । এটা ধ্বংসের কারণ হয়ে থাকে । তাওহীদ অনুসরণের মাধ্যমে ধ্বংসের ভয় নেই । [দেখুন, ইবন কাসীর]

(১) মক্কা মোকাররমা, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা নিজ গৃহের জন্যে সারা বিশ্বের মধ্য থেকে মনোনীত করেছেন, এটা এমন একটি স্থান যে, এখানে পার্থিব জীবনোপকরণের কোন বস্তু সহজে পাওয়া যাওয়ার কথা নয় । কিন্তু মক্কার এসব বস্তুর প্রাচুর্য দেখে বিবেক-বুদ্ধি বিমূঢ় হয়ে পড়ে । প্রতি বছর হজ্জের মওসুমে মক্কায় লাখ লাখ লোক একত্রিত হয় । কিন্তু কখনও শোনা যায়নি যে, সেখানে কোন প্রকার অভাব হয়েছে । এ হচ্ছে মক্কার কাফেরদের অজুহাতের জওয়াব যে, যিনি তোমাদের কুফর ও শির্ক সত্ত্বেও তোমাদের প্রতি এতসব অনুগ্রহ করেছেন, তোমাদের দেশকে যাবতীয় বিপদাশঙ্কা থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন এবং এদেশে কোন কিছুই উৎপন্ন না হওয়া সত্ত্বেও সারা বিশ্বের উৎপাদিত দ্রব্য-সামগ্রী এখানে এনে সমাবেশ করেছেন, সেই বিশ্বস্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে এসব নেয়ামত হাতছাড়া হয়ে যাবে-এরূপ আশংকা করা চূড়ান্ত নির্বুদ্ধিতা বৈ নয় । [দেখুন, ইবন কাসীর]

(২) এখানে অর্থ হবে এই যে, অতীত সম্প্রদায়সমূহের যেসব জনপদকে আল্লাহর আযাব দ্বারা বিধ্বস্ত করা হয়েছিল, এখন পর্যন্ত সেগুলোতে মানুষ সামান্যই মাত্র বাস করছে । এই 'সামান্য'র অর্থ যদি যৎসামান্য বাসস্থান কিংবা আবাস নেয়া হয়, তবে উদ্দেশ্য হবে এই যে, সামান্য সংখ্যক বাসগৃহ ব্যতীত এসব ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদসমূহের কোন

চূড়ান্ত ওয়ারিশ (প্রকৃত মালিক)!

৫৯. আর আপনার রব জনপদসমূহকে ধ্বংস করেন না, সেখানকার কেন্দ্রে তাঁর আয়াত তিলাওয়াত করার জন্য রাসূল প্রেরণ না করে এবং আমরা জনপদসমূহকে তখনই ধ্বংস করি যখন এর বাসিন্দারা যালিম হয়।

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى حَتّٰى يَبْعَثَ فِيْٓ اُمِّهَا رَسُوْلًا يَّتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ۚ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرٰٓى اِلَّا وَاَهْلُهَا ظٰلِمُوْنَ ﴿٥٩﴾

৬০. আর তোমাদেরকে যা কিছু দেয়া হয়েছে তা তো দুনিয়ার জীবনের ভোগ ও শোভামাত্র। আর যা আল্লাহ্‌র কাছে আছে তা উত্তম ও স্থায়ী। তোমরা কি অনুধাবন করবে না?

وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتُهَا ۚ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ۗ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٠﴾

সপ্তম রুকূ'

৬১. যাকে আমরা উত্তম পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, সে তো তা পাবেই, সে কি ঐ ব্যক্তির সমান যাকে আমরা দুনিয়ার জীবনের ভোগ-সম্ভার দিয়েছি, তারপর কিয়ামতের দিন সে হবে হাযিরকৃতদের[১] অন্তর্ভুক্ত?

اَفَمَنْ وَّعَدْنٰهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيْهِ كَمَنْ مَّتَّعْنٰهُ مَتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ﴿٦١﴾

বাসগৃহ পুনরায় আবাদ হয়নি। কিন্তু আবদুল্লাহ্ ইবন 'আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, 'সামান্য'র অর্থ সামান্যক্ষণ বা সামান্য সময় অর্থাৎ এসব জনপদে কেউ থাকলেও সামান্যক্ষণ থাকে; যেমন কোন পথিক অল্পক্ষণের জন্যে কোথাও বিশ্রাম নেয়। একে জনপদের আবাদী বলা যায় না।

(১) কিয়ামতের দিন সবাই হাযির হবে। তবে যাকে আল্লাহ্ ভালো ওয়াদা করেছেন, যাকে তার আনুগত্যের কারণে জান্নাতে যাওয়ার ফরমান আল্লাহ্ দিয়েছেন, সে তা অবশ্যই পাবে। কিন্তু যে দুনিয়ার জীবনে সবকিছু পেয়ে গেছে এবং আল্লাহ্‌র কাজ করেনি। সে তো হিসাব ও প্রতিফল পাওয়ার জন্য হাযির হবে। আর যার হিসাব নেয়া হবে সে তো ধ্বংস হয়ে যাবে। সুতরাং দু'দল কখনো সমান হতে পারে না। সুতরাং বুদ্ধিমানের উচিত জেনে বুঝে যা ভাল তা গ্রহণ করা। [মুয়াসসার] এভাবে প্রথম ব্যক্তি হচ্ছে ঈমানদার, তার জন্য জান্নাত। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি হচ্ছে কাফের, সে জাহান্নামে হাযির হবে। [জালালাইন] মুজাহিদ বলেন, এর অর্থ তারা জাহান্নামে শাস্তি পাবে। [ইবন কাসীর]

৬২. আর সেদিন তিনি তাদেরকে ডেকে বলবেন, 'তোমরা যাদেরকে আমার শরীক গণ্য করতে, তারা কোথায়[১]?'

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٦٢﴾

৬৩. যাদের জন্য শাস্তির বাণী অবধারিত হয়েছে, তারা বলবে, 'হে আমাদের রব! এরা তো তারা যাদেরকে আমরা বিভ্রান্ত করেছিলাম; আমরা এদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলাম যেমন আমরা বিভ্রান্ত হয়েছিলাম; আপনার সমীপে আমরা তাদের ব্যাপারে দায়মুক্ততা ঘোষণা করছি[২]। এরা তো আমাদের 'ইবাদাত করত না।'

قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿٦٣﴾

---

(১) অর্থাৎ যেসব শয়তান ইত্যাদিকে তোমরা আমার শরীক বলতে এবং তাদের কথামত চলতে, তারা আজ কোথায়? তারা তোমাদেরকে কোন সাহায্য করতে পারে কি? জওয়াবে মুশরিকদের একথা বলাই স্পষ্ট ছিল যে, আমাদের কোন দোষ নেই। আমরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে শির্ক করিনি; বরং এই শয়তানরা আমাদের বিভ্রান্ত করেছিল। তাই আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং শয়তানদের মুখ থেকে একথা বের করাবেন যে, আমরা বিভ্রান্ত করেছি ঠিকই, কিন্তু আমরা তাদেরকে বাধ্য করিনি। এজন্যে আমরাও অপরাধী, কিন্তু অপরাধ থেকে মুক্ত তারাও নয়। কারণ, আমরা যেমন তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলাম, এর বিপরীতে নবী-রাসূলগণ ও তাদের প্রতিনিধিগণ তাদেরকে হেদায়াতও করেছিলেন এবং প্রমাণাদি দ্বারা তাদের কাছে সত্যও ফুটিয়ে তুলেছিলেন। তারা স্বেচ্ছায় নবী-রাসূলগণের কথা অগ্রাহ্য করেছে এবং আমাদের কথা মেনে নিয়েছে। এমতাবস্থায় তারা কিরূপে দোষমুক্ত হতে পারে? এ থেকে জানা গেল যে, সত্যের সুস্পষ্ট প্রমাণাদি সামনে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় সত্যের দাওয়াত কবুল না করে পথভ্রষ্ট হয়ে যাওয়া কোন ধর্তব্য ওযর নয়।

(২) এখানে দু'টি অর্থ হতে পারে। এক. আমরা তাদের ইবাদাত হতে দায়মুক্তি ঘোষণা করছি। তারা আমাদের ইবাদাত করত না। তারা তো শয়তানের ইবাদাত করত। [ইবন কাসীর; সা'দী] দুই. অথবা আয়াতের অর্থ, আমরা তাদের সাহায্য সহযোগিতা করা থেকে নিজেদেরকে মুক্ত ঘোষণা করছি। আমরা তাদের সাহায্য করতে পারব না। [মুয়াসসার]

৬৪. আর তাদেরকে বলা হবে, 'তোমাদের (পক্ষ থেকে আল্লাহ্‌র জন্য শরীক করা) দেবতাগুলোকে ডাক[১]।' তখন তারা ওদেরকে ডাকবে। কিন্তু ওরা এদের ডাকে সাড়া দেবে না। আর তারা শাস্তি দেখতে পাবে। হায়! এরা যদি সৎপথ অনুসরণ করত[২]।

وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ ۚ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ﴿٦٤﴾

৬৫. আর সেদিন আল্লাহ্ এদেরকে ডেকে বলবেন, 'তোমরা রাসূলগণকে কী জবাব দিয়েছিলে?'

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴿٦٥﴾

৬৬. অতঃপর সেদিন সকল তথ্য তাদের কাছ থেকে বিলুপ্ত হবে তখন এরা একে অন্যকে জিজ্ঞাসাবাদও করতে পারবে না।

فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿٦٦﴾

৬৭. তবে যে ব্যক্তি তাওবা করেছিল এবং ঈমান এনেছিল ও সৎকাজ করেছিল, আশা করা যায় সে সাফল্য অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ﴿٦٧﴾

৬৮. আর আপনার রব যা ইচ্ছে সৃষ্টি করেন এবং যা ইচ্ছে মনোনীত করেন[৩],

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۗ مَا كَانَ لَهُمُ

---

(১) অর্থাৎ যাতে তারা তোমাদেরকে তোমাদের এ বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য এগিয়ে আসে। যেভাবে তোমরা দুনিয়ার জীবনে এ উদ্ধারের আশায় তাদের ইবাদাত করতে। তখন তারা ডাকবে। কিন্তু সে উপাস্যগুলো এদের ডাকে সাড়া দিবে না। আর তারা আযাব দেখতে পাবে এবং তারা নিশ্চিত হয়ে যাবে যে, জাহান্নামের দিকেই তাদের পদযাত্রা শুরু হবে। [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ তারা তখন আশা করত যে, যদি দুনিয়ার জীবনে তারা সঠিক পথের উপর থাকত, তাহলেই কেবল তা তাদের উপকারে লাগত। [ইবন কাসীর]

(৩) আয়াতটির তাফসীরে সঠিক মত হচ্ছে, যা ইমাম বাগাভী তার তাফসীরে এবং ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম তার যাদুল মা'আদ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা মানবজাতির মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা সম্মান দানের জন্য

الْخِيَرَةُ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٨﴾

এতে ওদের কোন হাত নেই। আল্লাহ্ পবিত্র, মহান এবং তারা যা শরীক করে তা থেকে তিনি ঊর্ধ্বে!

وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ﴿٦٩﴾

৬৯. আর আপনার রব জানেন এদের অন্তর যা গোপন করে এবং এরা যা ব্যক্ত করে।

মনোনীত করেন। বগভীর উক্তি অনুযায়ী এটা মুশরিকদের এই কথার জওয়াব ﴿وَقَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ﴾ "আর তারা বলেঃ 'এ কুরআন কেন নাযিল করা হল না দুই জনপদের কোন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির উপর?"[সূরা আয-যুখরুফঃ ৩১] অর্থাৎ কাফেররা এটা বলে যে, এ কুরআন আরবের দু'টি বড় শহর মক্কা ও তায়েফের মধ্য থেকে কোন প্রধান ব্যক্তির প্রতি নাযিল করা হল না কেন? এরূপ করলে এর প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করা হত। একজন পিতৃহীন দরিদ্র লোকের প্রতি নাযিল করার রহস্য কি? এর জওয়াবে বলা হয়েছে যে, যে প্রভু সমগ্র সৃষ্টিজগতকে কোন অংশীদারের সাহায্য ব্যাতিরেকে সৃষ্টি করেছেন, কোন বান্দাকে বিশেষ সম্মান দানের জন্য মনোনিত করার ক্ষমতাও তাঁরই। এ ব্যাপারে তিনি তোমাদের এই প্রস্তাবের অনুসারী হবেন কেন যে, অমুক যোগ্য, অমুক যোগ্য নয়?

ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম রাহেমাহুল্লাহ এ আয়াত থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান উদ্ভাবন করেছেন। তা এই যে, দুনিয়াতে এক স্থানকে অন্য স্থানের উপর অথবা এক বস্তুকে অন্য বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। এই শেষ্ঠত্ব দান সংশ্লিষ্ট বস্তুর উপার্জন ও কর্মের ফল নয়; বরং এটা প্রত্যক্ষভাবে স্রষ্টার মনোনয়ন ও ইচ্ছার ফলশ্রুতি। তিনি সপ্ত-আকাশ সৃষ্টি করেছেন। তন্মধ্যে ঊর্ধ্ব আকাশকে অন্যগুলোর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তিনি জান্নাতুল ফেরদাউসকে অন্য সব জান্নাতের উপর, জিবরীল, মীকাঈল, ইসরাফীল প্রমুখ বিশেষ ফেরেশ্তাগণকে অন্য ফেরেশ্তাদের উপর, নবী-রাসূলগণকে সমগ্র আদম সন্তানের উপর, তাদের মধ্যে দৃঢ়চেতা নবী-রাসূলগণকে অন্য নবী-রাসূলদের উপর, ইবরাহীম ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিমা ওয়াসাল্লামকে অন্য দৃঢ়চেতা নবী-রাসূলগণের উপর, ইসমাঈল আলাইহিসসালামের বংশধরদের সমগ্র মানবজাতির উপর, কুরাইশদেরকে আরবদের উপরে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বনী হাশেমের উপর এবং এমনিভাবে সাহাবায়ে কেরাম ও অন্যান্য মনীষীকে অন্য মুসলিমদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। এগুলো সব আল্লাহ্ তা'আলার মনোনয়ন ও ইচ্ছার ফলশ্রুতি। এমনিভাবে পৃথিবীর অনেক স্থানকে অন্য স্থানের উপর, অনেক দিন ও রাতকে অন্য দিন ও রাতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করাও আল্লাহ্ তা'আলার মনোনয়ন ও ইচ্ছার প্রভাব। মোটকথাঃ শ্রেষ্ঠত্ব ও অশ্রেষ্ঠত্বের আসল মাপকাঠি এই মনোনয়ন ইচ্ছাই। এখানে অন্য কিছুর হাত নেই।

৭০. আর তিনিই আল্লাহ্, তিনি ছাড়া কোন সত্য ইলাহ্ নেই, দুনিয়া ও আখেরাতে সমস্ত প্রশংসা তাঁরই; বিধান তাঁরই; আর তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।

وَهُوَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۭ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْاُوْلٰى وَالْاٰخِرَةِ ۡ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝

৭১. বলুন, 'আমাকে জানাও, আল্লাহ্ যদি রাতকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, আল্লাহ্ ছাড়া এমন কোন্ ইলাহ্ আছে, যে তোমাদেরকে আলো এনে দিতে পারে? তবুও কি তোমরা কর্ণপাত করবে না?'

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِضِيَاۗءٍ ۭ اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ ۝

৭২. বলুন, 'তোমরা আমাকে জানাও, আল্লাহ্ যদি দিনকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, আল্লাহ্ ছাড়া এমন কোন্ ইলাহ্ আছে, যে তোমাদের জন্য রাতের আবির্ভাব ঘটাবে যাতে বিশ্রাম করতে পার? তবুও কি তোমরা ভেবে দেখবে না[১]?'

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ ۭ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ۝

(১) এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা রাতের সাথে তার একটি উপকারিতা উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, ﴿بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ﴾ অর্থাৎ রাতে বিশ্রাম গ্রহণ করে। এর বিপরীতে দিনের সাথে শুধু بِضِيَاۗءٍ বলা হয়েছে। ضياء বা আলোকের কোন উপকারিতা উল্লেখ করেননি। কারণ এই যে, দিবালোক নিজ সত্তাগতভাবে উত্তম। অন্ধকার থেকে আলোক যে উত্তম তা সুবিদিত। আলোকের অসংখ্য উপকারিতা এত সুবিদিত যে, তা বর্ণনা করার মোটেই প্রয়োজন নেই। রাত হচ্ছে অন্ধকার, যা সত্তাগতভাবে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী নয়। বরং মানুষের আরাম ও বিশ্রামের কারণে এর শ্রেষ্ঠত্ব। তাই একে বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। সবশেষে বলেছেন, তবুও কি তোমরা দেখবে না? এখানে দেখার দু'টি অর্থ হতে পারে। এক. তোমরা কি ভেবে দেখবে না যে, তোমরা যে শির্কের উপর আছ সেটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত পথ। তারপরও কি তোমরা সেটা থেকে ফিরে আসবে না? তোমরা যদি তোমাদের বিবেক খাটাও তাহলে অনায়াসেই সরল সোজা পথে সমর্থ হতে পার। [জালালাইন; সা'দী] অথবা তোমরা যদি আল্লাহ্‌র এ বিরাট নে'আমতের উপর চিন্তা-ভাবনা করো তাহলে তা তোমাদেরকে ঈমান আনতে সহযোগিতা করতে পারে। [ইবন কাসীর] দুই. তোমরা কি রাত দিনের এ পার্থক্য স্বচক্ষে দেখতে পাও না? [মুয়াসসার]

وَمِنْ رَّحْمَتِهٖ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٧٣﴾

৭৩. তিনিই তাঁর দয়ায় তোমাদের জন্য করেছেন রাত ও দিন, যেন তাতে তোমরা বিশ্রাম করতে পার এবং তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার। আর যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার।

وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ﴿٧٤﴾

৭৪. আর সেদিন তিনি তাদেরকে ডেকে বলবেন, 'তোমরা যাদেরকে আমার শরীক গণ্য করতে তারা কোথায়?'

وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا فَقُلْنَا هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوْٓا اَنَّ الْحَقَّ لِلّٰهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٧٥﴾

৭৫. আর আমরা প্রত্যেক জাতি থেকে একজন সাক্ষী বের করে আনব[১] এবং বলব, 'তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর।' তখন তারা জানতে পারবে যে[২], ইলাহ্ হওয়ার অধিকার আল্লাহ্‌রই এবং তারা যা মিথ্যা রটনা করত তা তাদের কাছ থেকে হারিয়ে যাবে[৩]।

লক্ষণীয় যে, রাতের অনুগ্রহ বর্ণনা করার পর আল্লাহ্ বলেছেন "তোমরা কি কর্ণপাত করবে না?" আর দিনের অনুগ্রহ বর্ণনা করার পর বলেছেন, "তোমরা কি দেখবে না?" কারণ, রাতে শ্রবণশক্তির কাজ বেশী আর দিনে দৃশ্যমান হওয়া বেশী কার্যকর। [সা'দী]

(১) অর্থাৎ নবী ও যিনি সংশ্লিষ্ট উম্মতকে সতর্ক করেছিলেন। অথবা নবীদের অনুসারীদের মধ্য থেকে এমন কোন হিদায়াত প্রাপ্ত ব্যক্তি যিনি সংশ্লিষ্ট উম্মতের মধ্যে সত্য প্রচারের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। কিংবা কোন প্রচার মাধ্যম যার সাহায্যে সংশ্লিষ্ট উম্মতের কাছে সত্যের পয়গাম পৌঁছেছিল।

(২) অর্থাৎ আল্লাহ্‌ই একমাত্র হক ইলাহ। [জালালাইন] আর তখন তারা জানতে পারবে যে, তারা যে সমস্ত কথা বলেছিল, যাদেরকে ইলাহ বা উপাস্য বানিয়েছিল সবই ছিল মিথ্যা, অসার ও অলীক। আর তখন তাদের কাছে স্পষ্ট হবে যে, ইলাহ হওয়ার ব্যাপারে সঠিক তথ্য তো শুধু আল্লাহ্‌রই। তাদের উপস্থাপিত দলীল-প্রমাণাদি ভেস্তে গেছে। আর আল্লাহ্‌র পক্ষে যে সমস্ত প্রমাণাদি পেশ করা হয়েছিল তা-ই শুধু বাকী আছে। [সা'দী]

(৩) অর্থাৎ দুনিয়াতে তারা যে সমস্ত মিথ্যাচার করত যে, আল্লাহ্‌র সাথে শরীক আছে, সে সমস্ত কথা সবই তখন হারিয়ে যাবে। [ফাতহুল কাদীর]

অষ্টম রুকূ'

৭৬. নিশ্চয় কারূন ছিল মূসার সম্প্রদায়ভুক্ত, কিন্তু সে তাদের প্রতি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিল। আর আমরা তাকে দান করেছিলাম এমন ধনভাণ্ডার যার চাবিগুলো বহন করা একদল বলবান লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল। স্মরণ করুন, যখন তার সম্প্রদায় তাকে বলেছিল, 'অহংকার করো না, নিশ্চয় আল্লাহ্ অহংকারীদেরকে পছন্দ করেন না।

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ ۖ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿٧٦﴾

৭৭. 'আর আল্লাহ্ যা তোমাকে দিয়েছেন তা দ্বারা আখেরাতের আবাস অনুসন্ধান কর এবং দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলো না[১]; তুমি অনুগ্রহ কর যেমন আল্লাহ্ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

(১) অর্থাৎ ঈমানদারগণ কারূনকে এই উপদেশ দিল যে, আল্লাহ্ তোমাকে যে ধন-সম্পদ দান করেছেন তা দ্বারা আখেরাতের শান্তির ব্যবস্থা কর এবং দুনিয়াতে তোমার যে অংশ আছে তা ভুলে যেয়ো না। তবে এখানে দুনিয়ার অংশ বলে কি উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছেঃ
কোন কোন মুফাসসিরের মতে, এর অর্থঃ মানুষের বয়স এবং এ বয়সের মধ্যে করা হয় এমন কাজকর্ম, যা আখেরাতে কাজে আসতে পারে। সাদকাহ্ দানসহ অন্যান্য সব সৎকর্ম এর অন্তর্ভুক্ত। এমতাবস্থায় দ্বিতীয় বাক্য প্রথম বাক্যের তাগিদ ও সমর্থন হবে। প্রথম বাক্যে বলা হয়েছে, তোমাকে আল্লাহ্ যা কিছু দিয়েছেন অর্থাৎ টাকা-পয়সা, বয়স, শক্তি, স্বাস্থ্য ইত্যাদি-এগুলোকে আখেরাতের কাজে লাগাও। প্রকৃতপক্ষে দুনিয়াতে তোমার অংশ ততটুকুই যতটুকু আখেরাতের কাজে লাগবে। অবশিষ্টাংশ তো ওয়ারিশদের প্রাপ্য।
কোন কোন তাফসীরকারের মতে, দ্বিতীয় বাক্যের উদ্দেশ্য এই যে, তোমাকে আল্লাহ্ যা কিছু দিয়েছেন, তদ্বারা আখেরাতের ব্যবস্থা কর, কিন্তু নিজের সাংসারিক প্রয়োজনও ভুলে যেয়ো না যে, সবকিছু দান করে নিজে কাঙ্গাল হয়ে যাবে। বরং যতটুকু প্রয়োজন, নিজের জন্যে রাখ। এই তাফসীর অনুযায়ী দুনিয়ার অংশ বলে জীবন ধারণের উপকরণ বোঝানো হয়েছে।

এবং যমীনের বুকে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদেরকে ভালবাসেন না।’

৭৮. সে বলল, ‘এ সম্পদ আমি আমার জ্ঞানবলে পেয়েছি[১]।’ সে কি জানত না আল্লাহ্ তার আগে ধ্বংস করেছেন বহু প্রজন্মকে, যারা তার চেয়ে শক্তিতে ছিল প্রবল, জনসংখ্যায় ছিল বেশী[২]?

قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِىٓ ۚ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِۦ مِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا ۚ وَلَا يُسْـَٔلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿٧٨﴾

(১) বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, এখানে ‘ইলম’ দ্বারা অর্থনৈতিক কলাকৌশল বোঝানো হয়েছে। উদাহরণতঃ ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ইত্যাদি। এর দু’টি অর্থ হতে পারে। এক, আমি যা কিছু পেয়েছি নিজের যোগ্যতার বলে পেয়েছি। এটা কোন অনুগ্রহ নয়। অধিকার ছাড়াই নিছক দয়া করে কেউ আমাকে এটা দান করেনি। তাই আমাকে এখন এজন্য এভাবে কারো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার প্রয়োজন নেই যে, যেসব অযোগ্য লোককে কিছুই দেয়া হয় নি তাদেরকে দয়া ও অনুগ্রহ হিসেবে আমি এর মধ্য থেকে কিছু দেবো অথবা আমার কাছ থেকে এ সম্পদ যাতে ছিনিয়ে না নেওয়া হয় সেজন্য কিছু দান খয়রাত করে দেবো। মূর্খ কারূন একথা বুঝল না যে, বিচক্ষণতা, কর্মতৎপরতা, শিল্প অথবা ব্যবসা-বানিজ্য -এগুলোও তো আল্লাহ্ তা‘আলারই দান ছিল- তার নিজস্ব গুণ-গরিমা ছিল না।
এর দ্বিতীয় অর্থ এও হতে পারে যে, আমার মতে আল্লাহ এই যে সম্পদরাজি আমাকে দিয়েছেন এটি তিনি আমার গুণাবলী সম্পর্কে জেনেই দিয়েছেন। যদি তাঁর দৃষ্টিতে আমি একজন পছন্দনীয় মানুষ না হতাম, তাহলে তিনি এসব আমাকে কেন দিলেন? আমার প্রতি তাঁর নেয়ামত বর্ষিত হওয়াটাই প্রমাণ করে আমি তাঁর প্রিয় পাত্র এবং আমার নীতিপদ্ধতি তিনি পছন্দ করেন।

(২) কারূনের উক্তির আসল জওয়াব তো এটাই যে, যদি স্বীকার করে নেয়া যায় যে, তোমার ধন-সম্পদ তোমার বিশেষ কর্মতৎপরতা ও কারিগরি জ্ঞান দ্বারাই অর্জিত হয়েছে তবুও তো তুমি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ থেকে মুক্ত হতে পার না। কেননা, এই কারিগরি জ্ঞান ও উপার্জনশক্তিও তো আল্লাহ্ তা‘আলার দান। এই জওয়াব যেহেতু অত্যন্ত সুস্পষ্ট, তাই আল্লাহ্ তা‘আলা এটা উপেক্ষা করে এই জওয়াব দিয়েছেন যে, ধরে নাও, তোমার অর্থ-সম্পদ তোমার নিজস্ব জ্ঞান-গরিমা দ্বারাই অর্জিত হয়েছে। কিন্তু স্বয়ং এই ধন-সম্পদের কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। অর্থের প্রাচুর্য কোন মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি নয় বরং অর্থ সর্বাবস্থায় তার কাজে লাগে না। প্রমাণ হিসেবে কুরআন অতীত যুগের বড় বড় ধনকুবেরদের দৃষ্টান্ত পেশ করেছে। তারা যখন অবাধ্যতার পথে চলতে থাকে, তখন আল্লাহ্‌র আযাব তাদেরকে হঠাৎ পাকড়াও

আর অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে না[১]।

৭৯. অত:পর কারূন তার সম্প্রদায়ের সামনে বের হয়েছিল জাঁকজমকের সাথে। যারা দুনিয়ার জীবন কামনা করত তারা বলল, ‘আহা, কারূনকে যেরূপ দেয়া হয়েছে আমাদেরকেও যদি সেরূপ দেয়া হত! প্রকৃতই সে মহাভাগ্যবান[২]।’

فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ فِىْ زِيْنَتِهٖ ؕ قَالَ الَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا يٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَاۤ اُوْتِىَ قَارُوْنُ ۙ اِنَّهٗ لَذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ۝

৮০. আর যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছিল তারা বলল, ‘ধিক তোমাদেরকে! যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তাদের জন্য আল্লাহ্‌র পুরস্কারই শ্রেষ্ঠ এবং ধৈর্যশীল ছাড়া তা কেউ পাবে না[৩]।’

وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ۚ وَلَا يُلَقّٰىهَاۤ اِلَّا الصّٰبِرُوْنَ ۝

করে। তখন অগাধ ধন-সম্পদ তাদের কোন কাজে আসেনি। সুতরাং এ ব্যক্তি যে নিজেকে বড় পণ্ডিত, জ্ঞানী,গুণী ও চতুর বলে দাবী করে বেড়াচ্ছে এবং নিজের যোগ্যতার অহংকারে মাটিতে পা ফেলছে না, সে কি জানে না যে, তার চাইতেও বেশী অর্থ,মর্যাদা, প্রতিপত্তি শক্তি ও শান শওকতের অধিকারী লোক ইতিপূর্বে দুনিয়ায় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে এবং আল্লাহ শেষ পর্যন্ত তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন? যোগ্যতা ও নৈপূণ্যই যদি পার্থিব উন্নতির রক্ষাকারী বিষয় হয়ে থাকে তাহলে যখন তারা ধ্বংস হয়েছিল তখন তাদের এ যোগ্যতাগুলো কোথায় গিয়েছিল? আর যদি কারো পার্থিব উন্নতি লাভ অনিবার্যভাবে একথাই প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনি তার কর্ম ও গুণাবলী পছন্দ করেন তাহলে সর্বনাশ হলো কেন?

(১) এখানে তাদের প্রশ্ন না করার অর্থ হলো, তাদের অপরাধ কি তা জানার জন্য কোন প্রশ্ন আল্লাহ্ তাদেরকে করবেন না। কেননা তাদের অপরাধ সম্পর্কে আল্লাহ্ সম্যক খবর রাখেন। তাদেরকে তাদের অপরাধের স্বীকৃতি আদায় এবং অপরাধের কারণেই যে তারা শাস্তির যোগ্য হয়েছে তা প্রমাণের জন্যই শুধু প্রশ্ন করা হবে।

(২) হ্যাঁ সত্যিই সে মহা ভাগ্যবান, তবে সেটা তাদের দৃষ্টিতে, যাদের কাছে মানুষের ভাগ্য শুধু দুনিয়ার প্রাচুর্যের উপর নির্ভরশীল। যারা মৃত্যুর পরের জগত সম্পর্কে মোটেও চিন্তা করে না, সেখানকার অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করে না। তারা তো এটা বলবেই [সা'দী]

(৩) পূর্ব আয়াতে বর্ণিত ‘যারা দুনিয়ার জীবন কামনা করত’ তাদের বিপরীতে এ আয়াতে

فَخَسَفْنَا بِهٖ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ فَمَا كَانَ لَهٗ مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ ﴿٨١﴾

৮১. অতঃপর আমরা কারূনকে তার প্রাসাদসহ ভূগর্ভে প্রোথিত করলাম। তার সপক্ষে এমন কোন দল ছিল না যে আল্লাহ্‌র শাস্তি হতে তাকে সাহায্য করতে পারত এবং সে নিজেও নিজেকে সাহায্য করতে সক্ষম ছিল না।

وَاَصْبَحَ الَّذِيْنَ تَمَنَّوْا مَكَانَهٗ بِالْاَمْسِ يَقُوْلُوْنَ وَيْكَاَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَوْلَآ اَنْ مَّنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَاَنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٨٢﴾

৮২. আর আগের দিন যারা তার মত হওয়ার কামনা করেছিল, তারা বলতে লাগল, 'দেখলে তো, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছে তার রিযিক বাড়িয়ে দেন এবং যার জন্য ইচ্ছে কমিয়ে দেন। যদি আল্লাহ্ আমাদের প্রতি সদয় না হতেন, তবে আমাদেরকেও তিনি ভূগর্ভে প্রোথিত করতেন। দেখলে তো! কাফেররা সফলকাম হয় না[১]।'

বলা হয়েছে, 'যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছিল'। এতে পরিষ্কার ইঙ্গিত আছে যে, দুনিয়ার ভোগসম্ভার কামনা করা এবং একে লক্ষ্য স্থির করা আলেমদের কাজ নয়। আলেমদের দৃষ্টি সর্বদা আখেরাতের চিরস্থায়ী সুখের প্রতি নিবদ্ধ থাকে। তারা যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুই দুনিয়ার ভোগসম্ভার উপার্জন করেন এবং তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন। আয়াতে আল্লাহ্‌র সাওয়াব বলে দুনিয়াতে আল্লাহ্ তাদেরকে যা দিয়েছেন যেমন আল্লাহ্‌র ইবাদাত, তাঁর ভালবাসা, তাঁর কাছে যাওয়ার আগ্রহ, তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি যেমন বুঝানো হয়েছে, তেমনি আখেরাতের জান্নাত ও তার নেয়ামতও উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। যে নেয়ামতের কোন শেষ নেই। আর যে নেয়ামতের কোন কিছু চিন্তা-ভাবনা করেও মানুষ দুনিয়াতে শেষ করতে পারবে না। মনে যা চাইবে তা পাবে, চোখে যা দেখবে তা-ই তাদের জন্য থাকবে। [সা'দী]

(১) অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে রিযিক প্রসারিত বা সংকুচিত করা যেটাই ঘটুক না কেন তা ঘটে তাঁর ইচ্ছাক্রমেই। এ ইচ্ছার মধ্যে তাঁর ভিন্নতর উদ্দেশ্য সক্রিয় থাকে। কাউকে বেশী রিযিক দেবার অর্থ নিশ্চিত ভাবে এ নয় যে, আল্লাহ তার প্রতি খুবই সন্তুষ্ট তাই তাকে পুরষ্কার দিচ্ছেন। অনেক সময় কোন ব্যক্তি হয় আল্লাহর কাছে বড়ই ঘৃণিত ও অভিশপ্ত কিন্তু তিনি তাকে বিপুল পরিমাণ ধন-দৌলত দিয়ে যেতে থাকেন। এমনকি এ ধন শেষ পর্যন্ত তার উপর আল্লাহর কঠিন আযাব নিয়ে আসে। পক্ষান্তরে যদি

নবম রুকূ'

৮৩. এটা আখেরাতের সে আবাস যা আমরা নির্ধারিত করি তাদের জন্য যারা যমীনে উদ্ধত হতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না(১)। আর শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য(২)।

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ۝

কারো রিযিক সংকুচিত হয়, তাহলে নিশ্চিতভাবে তার এ অর্থ হয় না যে, আল্লাহ তার প্রতি নারাজ হয়ে গেছেন এবং তাকে শাস্তি দিচ্ছেন। অধিকাংশ সৎলোক আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়া সত্ত্বেও আর্থিক অভাব অনটনের মধ্যে থাকে। অনেক সময় দেখা যায় এ অভাব অনটন তাঁদের জন্য আল্লাহর রহমতে পরিণত হয়েছে। এ সত্যটি না বোঝার ফলে যারা আসলে আল্লাহর গযবের অধিকারী হয় তাদের সমৃদ্ধিকে মানুষ ঈর্ষার দৃষ্টিতে দেখে।

(১) এ আয়াতে আখেরাতের মুক্তি ও সাফল্য শুধু তাদের জন্য নির্ধারিত বলা হয়েছে, যারা যমীনে ঔদ্ধত্য ও অনর্থের ইচ্ছা করে না। علو শব্দের অর্থ অহংকার তথা নিজেকে অন্যের চাইতে বড় মনে করা ও অন্যকে ঘৃণিত ও হেয় মনে করা। فساد বলে, অপরের উপর যুলুম বোঝানো হয়েছে। কোন কোন তাফসীরকারক বলেন, গোনাহ মাত্রই যমীনে ফাসাদের শামিল। কারণ, গোনাহের কুফলস্বরূপ বিশ্বময় বরকত হ্রাস পায়। এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, যারা অহংকার, যুলুম অথবা গোনাহের ইচ্ছা করে, পরকালে তাদের অংশ নেই।

আয়াতে ঔদ্ধত্য ও ফাসাদের ইচ্ছার কারণে আখেরাত থেকে বঞ্চিত হওয়ার বিষয় থেকে জানা গেল যে, কোন গোনাহের বদ্ধপরিকতার পর্যায়ে দৃঢ় সংকল্পও গোনাহ। তবে পরে যদি আল্লাহ্‌র ভয়ে সংকল্প পরিত্যাগ করে, তবে গোনাহের পরিবর্তে তার আমলনামায় সওয়াব লিখা হয়। পক্ষান্তরে যদি কোন ইচ্ছা-বহির্ভূত কারণে সে গোনাহ্ করতে সক্ষম না হয়; কিন্তু চেষ্টা ষোলআনাই করে, তবে গোনাহ্ না করলেও তার আমলনামায় গোনাহ্ লিখা হবে।

(২) এর সারমর্ম এই যে, আখেরাতের মুক্তি ও সাফল্যের জন্য দু'টি বিষয় জরুরী। এক, ঔদ্ধত্য ও অনর্থ সৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকা এবং দুই, তাকওয়া অবলম্বন করা। আখেরাতের মুক্তির জন্য শুধু ঔদ্ধত্য ও অনর্থ থেকে মুক্ত থাকলেই চলবে না সাথে সাথে তাকওয়ার অধিকারীও হতে হবে। ফির'আউন দুনিয়ার বুকে ঔদ্ধত্য, অনর্থ ও অহংকার করেছিল যা এ সূরার প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছিল, অনুরূপভাবে কারূনও চরম ঔদ্ধত্যপূর্ণ কাজ করেছিল ফলে আখেরাতে সে কোন কল্যাণ লাভ করবে না। পক্ষান্তরে মূসা ও অপরাপর নবী-রাসূল ও তাদের অনুসারীগণ বিনীত ও নিরহংকার তাকওয়াভিত্তিক জীবন-যাপন করেছেন সুতরাং তাদের জন্যই আখেরাতের যাবতীয় আবাসভূমি অপেক্ষা করছে।

৮৪. যে কেউ সৎকাজ নিয়ে উপস্থিত হয় তার জন্য রয়েছে তার চেয়েও উত্তম ফল, আর যে মন্দকাজ নিয়ে উপস্থিত হয় তবে যারা মন্দকাজ করে তাদেরকে শুধু তারা যা করেছে তারই শাস্তি দেয়া হবে।

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا ۚ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٨٤﴾

৮৫. যিনি আপনার জন্য কুরআনকে করেছেন বিধান, তিনি আপনাকে অবশ্যই ফিরিয়ে নেবেন প্রত্যাবর্তনস্থলে[১]। বলুন, ‘আমার রব ভাল জানেন কে সৎপথের নির্দেশ এনেছে আর কে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে।’

اِنَّ الَّذِيْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَآدُّكَ اِلٰى مَعَادٍ ۭ قُلْ رَّبِّيْٓ اَعْلَمُ مَنْ جَآءَ بِالْهُدٰى وَمَنْ هُوَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٨٥﴾

৮৬. আর আপনি আশা করেননি যে, আপনার প্রতি কিতাব নাযিল হবে। এ তো শুধু আপনার রব-এর অনুগ্রহ। কাজেই আপনি কখনো কাফেরদের সহায় হবেন না।

وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْٓا اَنْ يُّلْقٰٓى اِلَيْكَ الْكِتٰبُ اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ ظَهِيْرًا لِّلْكٰفِرِيْنَ ﴿٨٦﴾

---

(১) বলা হয়েছে, যে পবিত্র সত্তা আপনার প্রতি কুরআন ফরয করেছেন, বিধান হিসেবে দিয়েছেন তথা তিলাওয়াত, প্রচার ও মেনে চলা ফরয করেছেন, তিনি পুনরায় আপনাকে ‘মা‘আদে’ ফিরিয়ে নিবেন। কোন কোন মুফাসসিরের মতে,এখানে ‘মা‘আদ’ বলে আখেরাতের জান্নাত বোঝানো হয়েছে। কারণ, যিনি আপনার প্রতি বিধান নাযিল করেছেন, হালাল ও হারামের ব্যাখ্যা স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন তিনি আপনাকে ও আপনার অনুসরণ যারা করবে, তাদেরকে তাদের কর্মকাণ্ডের সঠিক প্রতিফল জান্নাত অবশ্যই প্রদান করবেন। [সা‘দী] কোন কোন মুফাসসিরের মতে, এখানে ‘মা‘আদ’ বলে মক্কা নগরীকে বোঝানো হয়েছে। [জালালাইন] উদ্দেশ্য এই যে, কিছু দিনের জন্যে আপনাকে প্রিয় জন্মভূমি হারাম ও বায়তুল্লাহকে ত্যাগ করতে হয়েছে, কিন্তু যিনি কুরআন নাযিল করেছেন এবং তা মেনে চলা ফরয করেছেন তিনি অবশেষে আপনাকে আবার মক্কায় ফিরিয়ে আনবেন। মূলতঃ এটা ছিল মক্কা বিজয়ের সুসংবাদ। মক্কার কাফেররা তাকে বিব্রত করেছে, তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছে এবং মক্কায় মুসলিমদের জীবন দুঃসহ করেছে, কিন্তু আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁর চিরন্তন রীতি অনুযায়ী তাঁর রাসূলকে সবার উপর বিজয় ও প্রাধান্য দান করেছেন এবং যে মক্কা হতে কাফেররা তাকে বহিষ্কার করেছিল, সেই মক্কায় পুনরায় তাঁর পুরোপুরি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

৮৭. আর আপনার প্রতি আল্লাহ্‌র আয়াত নাযিল হওয়ার পর তারা যেন কিছুতেই আপনাকে সেগুলো থেকে বিরত না করে। আপনি আপনার রব-এর দিকে ডাকুন এবং কিছুতেই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না[১]।

وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ بَعْدَ اِذْ اُنْزِلَتْ اِلَيْكَ وَادْعُ اِلٰى رَبِّكَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝

৮৮. আর আপনি আল্লাহ্‌র সাথে অন্য ইলাহ্‌কে ডাকবেন না, তিনি ছাড়া অন্য কোন সত্য ইলাহ্ নেই। আল্লাহ্‌র সত্তা ছাড়া সমস্ত কিছুই ধ্বংসশীল[২]। বিধান তাঁরই এবং তাঁরই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝

(১) অর্থাৎ আল্লাহ যখন না চাইতেই তোমাদের এ নেয়ামত দান করেছেন তখন তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে, তোমাদের সমস্ত শক্তি ও শ্রম এর পতাকা বহন করা এবং এর প্রচার ও প্রসারের কাজে ব্যয় করবে এ কাজে ত্রুটি ও গাফলতি করার মানে হবে তোমরা সত্যের পরিবর্তে সত্য অস্বীকারকারীদেরকে সাহায্য করেছো। এর অর্থ এ নয়, নাউযুবিল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ ধরনের কোন ভুলের আশংকা ছিল। বরং এভাবে আল্লাহ কাফেরদেরকে শুনিয়ে শুনিয়ে নিজের নবীকে এ হিদায়াত দান করছেন যে, এদের শোরগোল ও বিরোধিতা সত্ত্বেও আপনি নিজের কাজ করে যান এবং আপনার এ দাওয়াতের ফলে সত্যের দুশমনরা তাদের জাতীয় স্বার্থ বিঘ্নিত হবার যেসব আশংকা প্রকাশ করে তার পরোয়া করার কোন প্রয়োজন নেই।

(২) এখানে وجهه বলে আল্লাহ্ তা'আলার পুরো সত্তাকে বোঝানো হলেও অন্য দিক থেকে এটা সাব্যস্ত হচ্ছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার 'চেহারা' রয়েছে। কারণ; যার চেহারা নেই তার সম্পর্কে এ শব্দ ব্যবহার করা যায় না। মূল উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌র সত্তা ব্যতীত সবকিছু ধ্বংসশীল। কোন কোন তাফসীরকার বলেন, وجهه বলে এমন আমল বোঝানো হয়েছে, যা একান্তভাবে আল্লাহ্‌র জন্য করা হয়। তখন আয়াতের উদ্দেশ্য হবে এই যে, যে আমল আল্লাহ্‌র জন্য খাঁটিভাবে করা হয়, তাই অবশিষ্ট থাকবে- এছাড়া সব ধ্বংসশীল। উভয় তাফসীরই বিশুদ্ধ। [ইবন কাসীর]

২৯- সূরা আল-'আনকাবূত
৬৯ আয়াত, মক্কী

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আলিফ-লাম-মীম;

الٓمّٓ ①

২. মানুষ কি মনে করেছে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' এ কথা বললেই তাদেরকে পরীক্ষা(১) না করে অব্যাহতি দেয়া হবে(২)?

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ②

(১) يفتنون শব্দটি فتنة থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ পরীক্ষা। [ফাতহুল কাদীর] ঈমানদার বিশেষত: নবীগণকে এ জগতে বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়েছে। পরিশেষে বিজয় ও সাফল্য তাদেরই হাতে এসেছে। এসব পরীক্ষা জান ও মালের উপর ছিল। [ফাতহুল কাদীর] এর মাধ্যমে তাদের ঈমানের দৃঢ়তার পরীক্ষা হয়ে যেত। কোন সময় কাফের ও পাপাচারীদের শত্রুতা এবং তাদের নির্যাতনের মাধ্যমে হয়েছে, যেমন অধিকাংশ নবীগণ, শেষনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সাহাবীগণ প্রায়ই এ ধরনের পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন। সীরাত ও ইতিহাসের গ্রন্থাবলী এ ধরনের ঘটনাবলী দ্বারা পরিপূর্ণ। কোন সময় এই পরীক্ষা রোগ-ব্যাধি ও অন্যান্য কষ্টের মাধ্যমে হয়েছে। যেমন হযরত আইয়্যুব আলাইহিস সালাম-এর হয়েছিল। কারও কারও বেলায় সর্বপ্রকার পরীক্ষার সমাবেশও করে দেয়া হয়েছে। বর্ণনাদৃষ্টে বোঝা যায়, আলোচ্য আয়াত সেসব সাহাবীদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছিল, যারা মদীনায় হিজরতের প্রাক্কালে কাফেরদের হাতে নির্যাতিত হয়েছিলেন। কিন্তু উদ্দেশ্য ব্যাপক। সর্বকালের আলেম, সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন এবং হতে থাকবেন। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষায় নিপতিত করা হয় নবীদেরকে, তারপর সৎকর্মপরায়ন বান্দাদেরকে, তারপর তাদের অনুরূপ, তারপর তাদের অনুরূপদেরকে। প্রত্যেক মানুষকে তার দ্বীনদারী অনুসারে পরীক্ষা করা হয়। যদি দ্বীনদারী বেশী হয় তাকে বেশী পরীক্ষা করা হয়। [তিরমিযী:২৩৯৮, ইবনে মাজাহ:৪০২৩] কুরআনের অন্যত্রও এ পরীক্ষার কথা বলা হয়েছে, যেমন: 'তোমরা কি মনে করেছ তোমাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে অথচ আল্লাহ্ এখনো তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে তাদের জেনে নেননি। [সূরা আত-তাওবাহ:১৬]

(২) যে অবস্থায় একথা বলা হয় তা ছিল এই যে, মক্কা মু'আয্‌যামায় কেউ ইসলাম গ্রহণ করলেই তার ওপর বিপদ আপদ ও জুলুম-নিপীড়নের পাহাড় ভেঙ্গে পড়তো। এ পরিস্থিতি যদিও দৃঢ় ঈমানের অধিকারী সাহাবীগণের অবিচল নিষ্ঠার মধ্যে কোন

৩. আর অবশ্যই আমরা এদের | وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ

প্রকার দোদুল্যমানতা সৃষ্টি করে নি তবুও মানবিক প্রকৃতির তাগিদে অধিকাংশ সময় তাদের মধ্যেও চিত্তচাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়ে যেতো। এ ধরনের অবস্থার একটা চিত্র পেশ করে খাব্বাব ইবনে আরত বর্ণিত একটি হাদীস। তিনি বলেন, 'যে সময় মুশরিকদের কঠোর নির্যাতনে আমরা ভীষণ দুরবস্থার সম্মুখীন হয়ে পড়েছিলাম সে সময় একদিন আমি দেখলাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কা'বাঘরের দেয়ালের ছায়ায় বসে রয়েছেন। আমি সেখানে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি আমাদের জন্য দো'আ করেন না? একথা শুনে তাঁর চেহারা আবেগে-উত্তেজনায় রক্তিমবর্ণ ধারণ করলো এবং তিনি বললেন, "তোমাদের পূর্বে যেসব মুমিনদল অতিক্রান্ত হয়েছে তারা এর চাইতেও বেশী নিগৃহীত হয়েছে। তাদের কাউকে মাটিতে গর্ত করে তার মধ্যে বসিয়ে দেয়া হতো এবং তারপর তার মাথার ওপর করাত চালিয়ে দু'টুকরা করে দেয়া হতো। কারো অংগ-প্রত্যংগের সন্ধিস্থলে লোহার চিরুনী দিয়ে আঁচড়ানো হতো, যাতে তারা ঈমান প্রত্যাহার করে। আল্লাহর কসম, এ কাজ সম্পন্ন হবেই, এমন কি এক ব্যক্তি সান'আ থেকে হাদ্বারামাউত পর্যন্ত নিঃশংক চিত্তে সফর করবে এবং আল্লাহ ছাড়া আর কারো ভয় তার মনে থাকবে না।" [বুখারী: ৩৬১২, মুসনাদে আহমাদ: ৫/১০৯]

এ চিত্তচাঞ্চল্যকে অবিচল ধৈর্য ও সহিষ্ণুতায় রূপান্তরিত করার জন্য মহান আল্লাহ মুমিনদেরকে বুঝান, দুনিয়া ও আখেরাতের সাফল্য অর্জনের জন্য আমার যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি রয়েছে কোন ব্যক্তি নিছক মৌখিক ঈমানের দাবীর মাধ্যমে তার অধিকারী হতে পারে না। বরং প্রত্যেক দাবীদারকে অনিবার্যভাবে পরীক্ষা অতিক্রম করতে হবেই। অন্যত্র আল্লাহ বলেনঃ "তোমরা কি মনে করেছো তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করে যাবে, অথচ এখনো তোমরা সে অবস্থার সম্মুখীন হওনি, যে অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী ঈমানদারগণ ? তারা সম্মুখীন হয়েছিল নির্মমতা ও দুঃখ-ক্লেশের এবং তাদেরকে অস্থির করে তোলা হয়েছিল। এমনকি রাসূল ও তাঁর সাথে যারা ঈমান এনেছিল তারা চিৎকার করে বলে উঠেছিল আল্লাহর সাহায্য কবে আসবে? (তখনই তাদেরকে সুখবর দেয়া হয়েছিল এই মর্মে যে) জেনে রাখো, আল্লাহর সাহায্য নিকটেই।" [সূরা আল-বাকারাহ: ২১৪] অনুরূপভাবে ওহুদ যুদ্ধের পর যখন মুসলিমদের ওপর আবার বিপদ-মুসীবতের একটি দুর্যোগপূর্ণ যুগের অবতারণা হয় তখন বলা হয়ঃ "তোমরা কি মনে করে নিয়েছো, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করে যাবে, অথচ এখনো আল্লাহ দেখেনইনি যে, তোমাদের মধ্য থেকে কে জিহাদে প্রাণ উৎসর্গকারী এবং কে সবরকারী?" [সূরা আলে ইমরান: ১৪২] প্রায় একই বক্তব্য সূরা আলে ইমরানের ১৭৯, সূরা তাওবার ১৬ এবং সূরা মুহাম্মাদের ৩১ আয়াতে বলা হয়েছে। এসব বক্তব্যের মাধ্যমে মহান আল্লাহ মুসলিমদের মনে এ সত্যটি গেঁথে দিয়েছেন যে, পরীক্ষাই হচ্ছে এমন একটি মানদণ্ড যার মাধ্যমে ভেজাল ও নির্ভেজাল যাচাই করা যায়।

الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ③

পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম[১]; অতঃপর আল্লাহ্ অবশ্যই প্রকাশ করে দেবেন কারা সত্যবাদী এবং তিনি অবশ্যই প্রকাশ করে দেবেন কারা মিথ্যাবাদী[২] ।

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا ۚ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ④

৪. তবে কি যারা মন্দকাজ করে তারা মনে করে যে, তারা আমাদের আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে[৩]? তাদের সিদ্ধান্ত

---

(১) অর্থাৎ তোমাদের সাথে যা কিছু হচ্ছে, তা কোন নতুন ব্যাপার নয়। ইতিহাসে হরহামেশা এমনটিই হয়ে এসেছে। যে ব্যক্তিই ঈমানের দাবী করেছে তাকে অবশ্যই পরীক্ষার অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে দগ্ধ করা হয়েছে। আর অন্যদেরকেও যখন পরীক্ষা না করে কিছু দেয়া হয়নি তখন তোমাদের এমন কি বিশেষত্ব আছে যে, কেবলমাত্র মৌখিক দাবীর ভিত্তিতেই তোমাদেরকে দেয়া হবে? [দেখুন, সা'দী]

(২) মূল শব্দ হচ্ছে لَيَعْلَمَنَّ এর শাব্দিক অনুবাদ হবে, "আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন"। অর্থাৎ এসব পরীক্ষা ও বিপদাপদের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা খাঁটি-অখাঁটি এবং সৎ ও অসাধুর মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য ফুটিয়ে তুলবেন। কেননা, খাঁটিদের সাথে কপট বিশ্বাসীদের মিশ্রণের ফলে মাঝে মাঝে বিরাট ক্ষতিসাধিত হয়ে যায়। [মুয়াসসার] আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য সৎ, অসৎ এবং খাঁটি-অখাঁটি পার্থক্য ফুটিয়ে তোলা। একে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা জেনে নেবেন কারা সত্যবাদী এবং কারা মিথ্যাবাদী। প্রত্যেক মানুষের সত্যবাদিতা ও মিথ্যাবাদিতা তার জন্মের পূর্বেই আল্লাহ্ তা'আলার জানা রয়েছে। তবুও পরীক্ষার মাধ্যমে জানার অর্থ এই যে, এই পার্থক্যকে অপরাপর লোকদের কাছেও প্রকাশ করে দেবেন। বস্তুত: মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলা বিভিন্ন ভাবে পরীক্ষা করে থাকেন। ভাল-মন্দ, ধনী-গরিব, দুঃখ-কষ্ট, সার্বিক অবস্থায় ফেলে তিনি তাদের পরীক্ষা সম্পন্ন করেন। এসমস্ত অবস্থায় তারা হয় সন্দেহে নিপতিত হয় নতুবা প্রবৃত্তির তাড়নায় চলে বেড়ায়। তার আকীদা-বিশ্বাসে সন্দেহ হলে যদি সে তা তাড়িয়ে দিয়ে ঈমানের উপর স্থির থাকতে পারে তবেই সে সফলকাম। অনুরূপভাবে তার প্রবৃত্তির পাগলা ঘোড়া তাকে যা ইচ্ছে তা করতে বললে সে যদি তা থেকে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে তবেই সে এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও পাশ করেছে বলে বিবেচিত হবে। [দেখুন, সা'দী]

(৩) মূল শব্দ হচ্ছে سابق অর্থাৎ আমার থেকে এগিয়ে যাবে। আয়াতের এ অর্থও হতে পারে, "আমার পাকড়াও এড়িয়ে অন্য কোথাও পালিয়ে যেতে পারবে।" [সা'দী] অপর অর্থ হচ্ছে, তারা কি মনে করে যে, তাদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড ও গোনাহসমূহ এমনিতেই ছেড়ে দেয়া হবে? তারা কি মনে করে যে, আল্লাহ্ এগুলো

কত মন্দ!

৫. যে আল্লাহ্‌র সাক্ষাত কামনা করে সে জেনে রাখুক, আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সময় আসবেই[১]। আর তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ[২]।

مَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ اللّٰهِ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَاٰتٍ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝

থেকে উদাসীন হয়ে যাবেন? আর এজন্যই কি তারা অপরাধগুলো করে যাচ্ছে? [সা'দী] কারও কারও মতে, এখানে এর অর্থ হচ্ছে, যা কিছু আমি করতে চাই তা করতে আমার সফল না হওয়া এবং যা কিছু তারা করতে চায় তা করতে তাদের সফল হওয়া। [দেখুন, আত-তাফসীরুস সহীহ] আয়াতের আরেকটি অর্থ হচ্ছে, যারা অপরাধী তারা যেন এটা মনে না করে যে, তারা পরীক্ষা থেকে বাদ পড়ে যাবে। তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না। এ ধারণা কখনো ঠিক নয়। তারা যদি এ দুনিয়াতে পারও পেয়ে যায়, তাদের সামনে এমন শাস্তি ও আযাব রয়েছে তা তাদের জন্য যথেষ্ট। [ইবন কাসীর]

(১) অর্থাৎ যে ব্যক্তি আখেরাতের জীবনে বিশ্বাসই করে না এবং মনে করে, কারো সামনে নিজের কাজের জবাবদিহি করতে হবে না এবং এমন কোন সময় আসবে না যখন নিজের জীবনের যাবতীয় কাজের কোন হিসেব-নিকেশ দিতে হবে, তার কথা আলাদা। সে নিজের গাফলতির মধ্যে পড়ে থাকুক এবং নিশ্চিন্তে যা করতে চায় করে যাক। নিজের আন্দাজ-অনুমানের বিপরীত নিজের পরিণাম সে নিজেই দেখে নেবে। কিন্তু যারা আশা রাখে, এক সময় তাদেরকে তাদের মা'বুদের সামনে হাজির হতে হবে এবং নিজের কর্ম অনুযায়ী পুরষ্কার ও শাস্তি পেতে হবে, তাদের এ ভুল ধারণায় ডুবে থাকা উচিত নয় যে, মৃত্যুর সময় অনেক দূরে। তাদের তো মনে করা উচিত, সে সময় অতি নিকটেই এসে গেছে এবং কাজের অবকাশ খতম হবারই পথে। তাই নিজের শুভ পরিণামের জন্য তারা যা কিছু করতে চায় করে ফেলুক। [বাগভী; জালালাইন; ফাতহুল কাদীর] দীর্ঘ জীবন-কালের ভিত্তিহীন নির্ভরতার ওপর ভরসা করে নিজের সংশোধনে বিলম্ব করা উচিত নয়। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "কাজেই যে তার রব-এর সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকাজ করে ও তার রব-এর 'ইবাদাতে কাউকেও শরীক না করে"। [সূরা আল-কাহাফ:১১০]

(২) অর্থাৎ তাদের এ ভুল ধারণাও পোষণ করা উচিত নয় যে, এমন কোন বাদশাহর সাথে তাদের ব্যাপার জড়িত, যিনি বিভিন্ন ব্যাপারের কোন খোঁজ খবর রাখেন না। যে আল্লাহর সামনে তাদের জবাবদিহি করার জন্য হাজির হতে হবে তিনি বেখবর নন বরং সবকিছু শোনেন ও জানেন। তাঁর কাছে তাদের কোন কথা গোপন নেই। [দেখুন, ইবন কাসীর] তিনি জানেন কে কোন নিয়তে কাজ করে, আরও জানেন কে তাঁর মহব্বতের উপযুক্ত আর কে উপযুক্ত নয়। [সা'দী]

وَمَنْ جٰهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ ۚ إِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ۝٦

৬. আর যে কেউ প্রচেষ্টা চালায়, সে তো নিজের জন্যই প্রচেষ্টা চালায়[১]; আল্লাহ্ তো সৃষ্টিকুল থেকে অমুখাপেক্ষী[২]।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝٧

৭. আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে আমরা অবশ্যই তাদের থেকে তাদের মন্দকাজগুলো মিটিয়ে দেব এবং আমরা অবশ্যই তাদেরকে তারা

(১) "মুজাহাদা" শব্দটির মূল অর্থ হচ্ছে, কোন বিরোধী শক্তির মোকাবিলায় দ্বন্দ্ব, প্রচেষ্টা চালানো। আর যখন কোন বিশেষ বিরোধী শক্তি চিহ্নিত করা হয় না বরং সাধারণভাবে "মুজাহাদা" শব্দ ব্যবহার করা হয় তখন এর অর্থ হয় একটি সর্বাত্মক ও সর্বব্যাপী দ্বন্দ্ব-সংঘাত। মুমিনকে এ দুনিয়ায় যে দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম করতে হয় তা হচ্ছে এ ধরনের। তাকে নাফস, শয়তান ও কাফেরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়। [সা'দী] তাকে শয়তানের সাথে লড়াই করতে হয়, কারণ সে তাকে সর্বক্ষণ সৎকাজের ক্ষতির ভয় দেখায় এবং অসৎকাজের লাভ ও স্বাদ উপভোগের লোভ দেখিয়ে বেড়ায়। তাকে নিজের নফসের বা কুপ্রবৃত্তির সাথেও লড়তে হয়, যে তাকে সর্বক্ষণ নিজের খারাপ ইচ্ছা-আকাংখার দাসে পরিণত করে রাখার জন্য জোর দিতে থাকে। নিজের গৃহ থেকে নিয়ে বিশ্ব-সংসারের এমন সকল মানুষের সাথে তাকে লড়তে হয় যাদের আদর্শ, মতবাদ, মানসিক প্রবণতা, চারিত্রিক নীতি, রসম-রেওয়াজ, সাংস্কৃতিক ধারা এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিধান সত্য দ্বীনের সাথে সংঘর্ষিক। তাকে কাফেরদের বিরুদ্ধেও লড়তে হয়। [দেখুন, সা'দী; আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর] এ প্রচেষ্টা এক-দু'দিনের নয়, সারাজীবনের। দিন-রাতের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে প্রতি মুহূর্তের। কোন একটি ময়দানে নয় বরং জীবনের প্রত্যেকটি ময়দানে ও প্রতি দিকে। হাসান বসরী বলেন, একজন মানুষ প্রতিনিয়ত জিহাদ করে যাচ্ছে অথচ একদিনও তরবারী ব্যবহার করেনি। [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ আল্লাহ এ জন্য তোমাদের কাছে এ দ্বন্দ্ব-সংগ্রামের দাবী করছেন না যে, নিজের সার্বভৌম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করার ও প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য তোমাদের সাহায্যের প্রয়োজন, বরং এটিই তোমাদের উন্নতি ও অগ্রগতির পথ, তাই তিনি তোমাদের এ দ্বন্দ্ব-সংগ্রামে লিপ্ত হবার নির্দেশ দিচ্ছেন। এ পথে অগ্রসর হয়ে তোমরা এমন শক্তির অধিকারী হতে পারো যার ফলে দুনিয়ায় তোমরা কল্যাণ ও সুকৃতির ধারক এবং আখেরাতে আল্লাহর জান্নাতের অধিকারী হবে। এ যুদ্ধ চালিয়ে তোমরা আল্লাহর কোন উপকার করবে না বরং তোমরা নিজেরাই উপকৃত হবে। তাছাড়া এ প্রচেষ্টার মাধ্যমে তোমরা আল্লাহ্র সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পার যার কথা সূরার শুরুতে আল্লাহ্ উল্লেখ করেছেন। [দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর; সা'দী; ইবনুল কাইয়্যেম, শিফাউল আলীল: ২৪৬]

যে উত্তম কাজ করত, তার প্রতিদান দেব[১]।

৮. আর আমরা মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে[২]। তবে তারা যদি তোমার উপর বল প্রয়োগ করে আমার সাথে এমন কিছু শরীক করতে যার সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই[৩], তাহলে

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۖ وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝٨

(১) আয়াতে ঈমান ও সৎকাজের দু'টি ফল বর্ণনা করা হয়েছে, এক: মানুষের দুষ্কৃতি ও পাপগুলো তার থেকে দূর করে দেয়া হবে। দুই: তার সর্বোত্তম কাজসমূহের সর্বোত্তম পুরস্কার তাকে দেয়া হবে। পাপ ও দুষ্কৃতি দূর করে দেয়ার অর্থ সৎকাজের কারণে গোনাহ ক্ষমা পেয়ে যাওয়া। কারণ সৎ কাজ সাধারণ গোনাহ মিটিয়ে দেয়। [জালালাইন; সা'দী] যেমন হাদীসে এসেছে, ঈমান আনার আগে মানুষ যতই পাপ করে থাকুক না কেন ঈমান আনার সাথে সাথেই তা সব মাফ হয়ে যাবে। [দেখুন, মুসলিম: ১২১] আর সর্বোত্তম কাজসমূহের সর্বোত্তম পুরস্কার দেয়ারও দু'টি অর্থ হয়। এক. মানুষের সৎকাজগুলোর মধ্যে যেটি হবে সবচেয়ে ভালো সৎকাজ, তাকে সামনে রেখে তার জন্য প্রতিদান ও পুরস্কার নির্ধারণ করা হবে। যেমন মানুষের সৎকাজের মধ্যে রয়েছে ওয়াজিব-ফরয ও মুস্তাহাব কাজ। এ দু'টি অনুসারে তাকে প্রতিদান দেয়া হবে। কারণ, তার আমলের কিছু আমল আছে মুবাহ বা জায়েয আমল, সেটা অনুসারে নয়। [সা'দী] দুই. মানুষ তার কার্যাবলীর দৃষ্টিতে যতটা পুরস্কারের অধিকারী হবে তার চেয়ে বেশী ভালো পুরস্কার তাকে দেয়া হবে। [ফাতহুল কাদীর] একথাটি কুরআনের অন্যান্য স্থানেও বলা হয়েছে। বলা হয়েছেঃ "যে ব্যক্তি সৎকাজ নিয়ে আসবে তাকে তার থেকে দশগুণ বেশী দেয়া হবে।" [সূরা আল-আন'আম: ১৬০] আরো বলা হয়েছে: "যে ব্যক্তি সৎকাজ নিয়ে আসবে তাকে তার চেয়ে উত্তম প্রতিদান দেয়া হবে।" [সূরা আল কাসাসে: ৮৪] অন্যত্র বলা হয়েছে, "আল্লাহ তো কণামাত্রও জুলুম করেন না এবং সৎকাজ হলে তাকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেন।" [সূরা আন-নিসা: ৪০]

(২) হাদীসে এসেছে, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহর কাছে সবচেয়ে উত্তম আমল কোনটি? তিনি বললেন: সময়মত সালাত আদায় করা। বলল: তারপর কোনটি? তিনি বললেন: পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার। বলল: তারপর কোনটি? তিনি বললেন: আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ।' [বুখারী:৫৯৭০]

(৩) আয়াতে বর্ণিত 'যাকে তুমি আমার শরীক হিসেবে জানো না' বাক্যাংশটিও অনুধাবনযোগ্য। এর মধ্যে তাদের কথা না মানার সপক্ষে একটি শক্তিশালী যুক্তি

তুমি তাদেরকে মেনো না[১]। আমারই

প্রদান করা হয়েছে। এতে শির্কের জঘন্যতা প্রকাশ পেয়েছে। কারণ শির্কের সপক্ষে কোন জ্ঞান নেই। কেউ শির্ককে সঠিক বলে প্রমাণ করতে পারবে না। [সা'দী] এটা পিতা-মাতার অধিকার যে, ছেলেমেয়েরা তাদের সেবা করবে, তাদেরকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করবে এবং বৈধ বিষয়ে তাদের কথা মেনে চলবে। কিন্তু শির্কের ব্যাপারে তাদের অনুসরণ করা যাবে না। অনুরূপভাবে কোন গোনাহর কাজেও নয়। যেমনটি রাসূলের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। [মুয়াসসার] এ অধিকার দেয়া হয়নি যে, মানুষ নিজের জ্ঞানের বিরুদ্ধে পিতামাতার অন্ধ অনুকরণ করবে। শুধুমাত্র বাপ-মায়ের ধর্ম বলেই তাদের ছেলে বা মেয়ের সেই ধর্ম মেনে চলার কোন কারণ নেই। সন্তান যদি এ জ্ঞান লাভ করে যে, তার বাপ-মায়ের ধর্ম ভুল ও মিথ্যা তাহলে তাদের ধর্ম পরিত্যাগ করে তার সঠিক ধর্ম গ্রহণ করা উচিত এবং তাদের চাপ প্রয়োগের পরও যে পথের ভ্রান্তি তার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে সে পথ অবলম্বন করা তার উচিত নয়। বাপ-মায়ের সাথে যখন এ ধরনের ব্যবহার করতে হবে তখন দুনিয়ার প্রত্যেক ব্যক্তির সাথেও এ ব্যবহার করা উচিত। যতক্ষণ না কোন ব্যক্তির সত্য পথে থাকা সম্পর্কে জানা যাবে ততক্ষণ তার অনুসরণ করা বৈধ নয়।

(১) অর্থাৎ পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার সাথে সাথে এটাও জরুরী যে, আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলীর অবাধ্যতা না হয়, সীমা পর্যন্ত পিতা-মাতার আনুগত্য করতে হবে। তারা যদি সন্তানকে কুফর ও শির্ক করতে বাধ্য করে, তবে এ ব্যাপারে কিছুতেই তাদের আনুগত্য করা যাবে না; যেমন হাদীসে আছে, আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা করে কোন মানুষের আনুগত্য করা বৈধ নয়। [মুসনাদে আহমাদঃ ১/১৩১] কোন কোন বর্ণনা মতে আলোচ্য আয়াত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি দশ জন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবীগণের অন্যতম ছিলেন এবং অতিশয় মাতৃভক্ত ছিলেন। তার মাতা হামনা বিনতে সুফিয়ান পুত্রের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ অবগত হয়ে খুবই মর্মাহত হয়। সে পুত্রকে শাসিয়ে শপথ করল, আমি তখন পর্যন্ত আহার্য ও পানীয় গ্রহণ করব না, যে পর্যন্ত তুমি পৈতৃক ধর্মে ফিরে না আস। আমি এমনিভাবে ক্ষুধা ও পিপাসায় মৃত্যুবরণ করব, যাতে তুমি মাতৃহন্তা রূপে বিশ্ববাসীর দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্ন হও। [মুসলিমঃ ১৭৪৮] এই আয়াত সা'দকে মাতার আবদার রক্ষা করতে নিষেধ করল। অন্য বর্ণনায় এসেছে, সা'দের জননী একদিন একরাত মতান্তরে তিনদিন তিনরাত শপথ অনুযায়ী অনশন ধর্মঘট অব্যাহত রাখলে সা'দ উপস্থিত হলেন। মাতৃভক্তি পূর্ববৎ ছিল; কিন্তু আল্লাহ্‌র ফরমানের মোকাবেলায় তা ছিল তুচ্ছ। তাই জননীকে সম্বোধন করে তিনি বললেনঃ আম্মাজান, যদি আপনার দেহে একশ' আত্মা থাকত, এবং একটি একটি করে বের হতে থাকত, তা দেখেও আমি আমার দ্বীন ত্যাগ করতাম না। এখন আপনি ইচ্ছা করলে পানাহার করুন অথবা মৃত্যুবরণ করুন। আমি আমার দ্বীন ত্যাগ করতে পারি না। এ কথায় নিরাশ হয়ে তার মাতা অনশন ভঙ্গ করল। [বাগভী]

কাছে তোমাদের ফিরে আসা। অতঃপর তোমরা কি করছিলে তা আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব[১]।

৯. আর যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে আমরা অবশ্যই তাদেরকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করব।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصّٰلِحِيْنَ ۝٩

১০. আর মানুষের মধ্যে কেউ কেউ বলে, 'আমরা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেছি'[২], কিন্তু আল্লাহ্‌র পথে যখন

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ فَاِذَآ اُوْذِيَ فِي اللّٰهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِ ؕ

(১) অর্থাৎ এ দুনিয়ার আত্মীয়তা এবং আত্মীয়দের সাহায্য-সহযোগিতা কেবলমাত্র এ দুনিয়ার সীমা-ত্রিসীমা পর্যন্তই বিস্তৃত। সবশেষে পিতা-মাতা ও সন্তান সবাইকে তাদের স্রষ্টার কাছে ফিরে যেতে হবে। সেখানে তাদের প্রত্যেকের জবাবদিহি হবে তাদের ব্যক্তিগত দায়িত্বের ভিত্তিতে। যদি পিতা-মাতা সন্তানকে পথভ্রষ্ট করে থাকে তাহলে তারা পাকড়াও হবে। যদি সন্তান পিতা-মাতার জন্য পথভ্রষ্টতা গ্রহণ করে থাকে তাহলে তাকে শাস্তি পেতে হবে। আর সন্তান যদি সঠিক পথ অবলম্বন করে থাকে এবং পিতা-মাতার বৈধ অধিকার আদায় করার ক্ষেত্রেও কোন প্রকার ত্রুটি না করে থাকে কিন্তু পিতা-মাতা কেবলমাত্র পথভ্রষ্টতার ক্ষেত্রে তাদের সহযোগী না হবার কারণে তাকে নির্যাতন করে থাকে, তাহলে তারা আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচতে পারবে না। আল্লাহ্ বলছেন যে, কিয়ামতের দিন তোমাদের প্রত্যাবর্তন তো আমারই কাছে। তখন আমি তোমাদেরকে তোমাদের পিতামাতার প্রতি যে সদ্ব্যবহার করেছ এবং তোমাদের দ্বীনের উপর যে দৃঢ়পদ থেকেছ তার জন্য পুরস্কৃত করব। আর আমি তোমাকে সৎবান্দাদের সাথে হাশর করব, তোমার পিতা-মাতার দলে নয়। যদিও তারা দুনিয়াতে তোমার সবচেয়ে কাছের মানুষ ছিল। কারণ, একজন মানুষের হাশর কিয়ামতের দিন তার সাথেই হবে, যাকে সে ভালবাসে। অর্থাৎ দ্বীনী ভালবাসা। তাই পরবর্তী আয়াতে বলেছেন যে, "আর যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে আমরা অবশ্যই তাদেরকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করব।" [ইবন কাসীর; আরও দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

(২) যদিও বক্তা এক ব্যক্তিমাত্র কিন্তু সে "আমি ঈমান এনেছি" বলার পরিবর্তে বলছে, "আমরা ঈমান এনেছি"। এর মধ্যে একটি সূক্ষ্ম অর্থের প্রতি ইংগিত রয়েছে তা হলো মুনাফিক সবসময় নিজেকে মুমিনদের মধ্যে শামিল করার চেষ্টা করে থাকে এবং নিজের ঈমানের উল্লেখ এমনভাবে করে থাকে যাতে মনে হয় সেও ঠিক অন্যদের মতই মুমিন। এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে, যেমন কোন কাপুরুষ যদি কোন সেনাদলের সাথে গিয়ে থাকে এবং সেনাদলের অসম সাহসী সৈনিকেরা লড়াই করে শত্রুদলকে

وَلَئِنْ جَآءَ نَصْرٌ مِّنْ رَّبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ۗ اَوَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِمَا فِيْ صُدُوْرِ الْعٰلَمِيْنَ ۝١٠

তারা নিগৃহীত হয়, তখন তারা মানুষের পীড়নকে আল্লাহ্‌র শাস্তির মত গণ্য করে[১]। আর আপনার রবের কাছ থেকে কোন সাহায্য আসলে তারা বলতে থাকে, 'আমরা তো তোমাদের সঙ্গেই ছিলাম[২]।' সৃষ্টিকুলের

বিতাড়িত করে দিয়ে থাকে তাহলে কাপুরুষটি নিজে কোন কাজে অংশ গ্রহণ না করে থাকলেও সে এসে লোকদেরকে বলবে, আমরা গিয়েছি, আমরা ভীষণ যুদ্ধ করেছি এবং শত্রুকে পরাস্ত করেছি। অর্থাৎ সেও যেন সেই অমিত সাহসী যোদ্ধাদের সাথে মিলে যুদ্ধ করেছিল। [আত-তাফসীরুল কাবীর]

(১) অর্থাৎ আল্লাহর আযাবের ভয়ে যেমন কুফরী ও গোনাহ থেকে বিরত থাকা উচিত এ ব্যক্তি ঠিক তেমনি বান্দা প্রদত্ত নির্যাতন-নিগ্রহের ভয়ে ঈমান ও সৎকাজ থেকে বিরত হয়েছে। ঈমান আনার পর যখন সে কাফেরদের হুমকি, মারধর ও নির্যাতনের সম্মুখীন হয় তখন সে মনে করে যে এটা বোধ হয় আল্লাহ্‌র শাস্তি তখন সে ঈমান থেকে সরে যায়। [ইবন কাসীর] অথবা আয়াতের অর্থ, তখন সে এমন পেরেশান হয়ে যায় যে রকম পেরেশান হতে হয় আল্লাহ্‌র আযাবের ক্ষেত্রে। ফলে মুরতাদ হয়ে যায় [মুয়াসসার] অথবা আয়াতের অর্থ, তারা মানুষের নির্যাতনের সম্মুখীন হলে সে নির্যাতন তাদের জন্য দ্বীন ইসলাম থেকে ফিরে যাওয়া বা মুরতাদ হওয়ার কারণে পরিণত হয়, যেমন আল্লাহ্‌র আযাব কুফরি ও গোনাহ থেকে ফিরে থাকার কারণ হয়। [সা'দী; আদওয়াউল বায়ান] এ আয়াতের সমর্থনে অন্য আয়াত হচ্ছে, "আর মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত করে দ্বিধার সাথে ; তার মংগল হলে তাতে তার চিত্ত প্রশান্ত হয় এবং কোন বিপর্যয় ঘটলে সে তার পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় দুনিয়াতে এবং আখেরাতে; এটাই তো সুস্পষ্ট ক্ষতি।" [সূরা আল-হাজ্জ: ১১]

(২) অর্থাৎ আজ সে নিজেকে বাঁচাবার জন্য কাফেরদের সাথে যোগ দিয়েছে এবং মুমিনদের পক্ষ ত্যাগ করেছে। কারণ সত্য দ্বীনের সম্প্রসারণের জন্য নিজের গায়ে আঁচড়টি লাগাতেও সে প্রস্তুত নয়। কিন্তু যখন এ দ্বীনের জন্য জীবন উৎসর্গকারীদেরকে আল্লাহ সাফল্য ও বিজয়-দান করবেন তখন এ ব্যক্তি বিজয়ের ফল গনীমতের মাল ভাগ করে নেবার জন্য এসে যাবে এবং মুসলিমদের বলবে, আমি তো মনে প্রাণে তোমাদেরই সাথে ছিলাম, তোমাদের সাফল্যের জন্য দো'আ করছিলাম এবং তোমাদের প্রচেষ্টা, সংগ্রাম ও কুরবানীকে আমি বিরাট মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখেছি। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "যারা তোমাদের অমংগলের প্রতীক্ষায় থাকে, তারা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তোমাদের জয় হলে বলে, 'আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না।' আর যদি কাফেরদের কিছু বিজয় হয়, তবে তারা বলে, 'আমরা কি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রবল

অন্তঃকরণে যা আছে, আল্লাহ্ কি তা সম্যক অবগত নন?'

১১. আর আল্লাহ্ অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা ঈমান এনেছে এবং অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা মুনাফিক(১)।

وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ ⑪

ছিলাম না এবং আমরা কি তোমাদেরকে মুমিনদের হাত থেকে রক্ষা করিনি?" [সূরা আন-নিসা: ১৪১] আরও বলেন, "আর নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে এমন লোক আছে, যে গড়িমসি করবেই। অতঃপর তোমাদের কোন মুসীবত হলে সে বলবে, 'তাদের সংগে না থাকায় আল্লাহ্ আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।' আর তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ হলে, যেন তোমাদের ও তার মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই এমনভাবে বলবেই, 'হায়! যদি তাদের সাথে থাকতাম তবে আমিও বিরাট সাফল্য লাভ করতাম।" [সূরা আন-নিসা: ৭২-৭৩] আরও বলেন, "অতঃপর হয়ত আল্লাহ্ বিজয় বা তাঁর কাছ থেকে এমন কিছু দেবেন যাতে তারা তাদের অন্তরে যা গোপন রেখেছিল সে জন্য লজ্জিত হবে।" [সূরা আল-মায়িদাহ: ৫২] মোটকথা পরবর্তী বাক্যে আল্লাহ্ তাদেরকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে বলেছেন যে, তিনি সৃষ্টিকুলের অন্তরের সব খবর জানেন। [আদওয়াউল বায়ান]

(১) আয়াতের শাব্দিক অনুবাদ হচ্ছে, আল্লাহ্ অবশ্যই জানবেন কারা ঈমান এনেছে, আর অবশ্যই জানবেন কারা মুনাফিক। আল্লাহ্র এ জানার অর্থ প্রকাশ করে দেয়া। যাতে করে মুমিনদের ঈমান ও মুনাফিকদের মুনাফিকির অবস্থা যাতে উন্মুক্ত হয়ে যায় এবং যার মধ্যে যাকিছু লুকিয়ে আছে সব সামনে এসে যায় সে জন্য আল্লাহ বারবার পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন। [দেখুন, ইবন কাসীর] একথাটিই কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছেঃ "আল্লাহ মুমিনদেরকে কখনো এমন অবস্থায় থাকতে দেবেন না, যে অবস্থায় এখন তোমরা আছো (অর্থাৎ সাচ্চা ঈমানদার ও মুনাফিক সবাই মিশ্রিত হয়ে আছো।) যতক্ষণ না তিনি পবিত্র লোকদেরকে অপবিত্র লোকদের থেকে সুস্পষ্টভাবে আলাদা করে দেবেন।" [সূরা আলে ইমরান: ১৭৯] আরও এসেছে, "আর আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব, যতক্ষণ না আমরা জেনে নেই তোমাদের মধ্যে জিহাদকারী ও ধৈর্যশীলদেরকে এবং আমরা তোমাদের কর্মকাণ্ড পরীক্ষা করি।" [সূরা মুহাম্মাদ: ৩১] অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা শুধু তাঁর জ্ঞান অনুসারে কোন ফয়সালা করতে চান না। তিনি চান তাদের অন্তরের লুকানো বিষয় প্রকাশ হয়ে পড়ুক। আর সে জন্যই তিনি তাদেরকে পরীক্ষা করেন। এ পরীক্ষার মাধ্যমে তিনি প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করতে চান। যাতে কিয়ামতের মাঠে বলতে না পারে যে, আপনি আমাদের যদি পরীক্ষা করতেন হয়ত আমরা সে পরীক্ষায় টিকে যেতাম। [সা'দী]

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّبِعُوْا سَبِيْلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطٰيٰكُمْۗ وَمَا هُمْ بِحٰمِلِيْنَ مِنْ خَطٰيٰهُمْ مِّنْ شَيْءٍۗ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿١٢﴾

১২. আর কাফিররা মুমিনদেরকে বলে, 'তোমরা আমাদের পথ অনুসরণ কর তাহলে আমরা তোমাদের পাপভার বহন করব[১] ।' কিন্তু ওরা তো তাদের পাপভারের কিছুই বহন করবে না । নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী[২] ।

وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ وَاَثْقَالًا مَّعَ اَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْـَٔلُنَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَمَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿١٣﴾

১৩. তারা তো বহন করবে নিজেদের ভার এবং নিজেদের বোঝার সাথে আরো কিছু বোঝা[৩]; আর তারা যে মিথ্যা

(১) কুরাইশ সর্দারদের এ উক্তিটি ছিল সেসব ঈমানদারদের প্রতি যারা তাওহীদ ও আখেরাতের পুরস্কার ও শাস্তিতে বিশ্বাস করত । তারা তাদেরকে তাওহীদের কথা, মৃত্যু পরবর্তী জীবন, হাশর-নশর, হিসেব ও শাস্তি-পুরষ্কার সম্পর্কে বলত, এসব কথা একদম বাজে ও উদ্ভট । কিন্তু ধরে নেয়া যাক যদি আখেরাতের কোন জীবন এবং সেখানে জবাবদিহির কোন বিষয় থেকেই থাকে, তাহলে তার দায়ভার আমরা গ্রহণ করছি । আল্লাহর সামনে সমস্ত শাস্তি ও পুরষ্কারের বোঝা আমরা মাথা পেতে নেবো । আমাদের কথায় তোমরা এ নতুন দ্বীন ত্যাগ করো এবং নিজেদের পিতৃ পুরুষের দ্বীনের দিকে ফিরে এসো । [দেখুন, মুয়াসসার]

(২) 'মিথ্যাচার' মানে তারা যে বলেছিল "তোমরা আমাদের অনুসরণ করো এবং তোমাদের গোনাহগুলো আমরা নিজেদের ওপর চাপিয়ে নেবো ।" এটা পুরোপুরি মিথ্যাচার । [দেখুন, মুয়াসসার] কারণ কিয়ামতে একে অপরের বোঝা কখনও বহন করবে না । আল্লাহ্ অন্য আয়াতে বলেন, " আর কোন বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না; এবং কোন ভারাক্রান্ত ব্যক্তি যদি কাউকেও তা বহন করতে ডাকে তবে তার থেকে কিছুই বহন করা হবে না--- এমনকি নিকট আত্মীয় হলেও ।" [সূরা ফাতির: ১৮] আরও বলেন, "আর সুহৃদ সুহৃদের খোঁজ নেবে না, তাদেরকে করা হবে একে অন্যের দৃষ্টিগোচর । অপরাধী সেদিনের শাস্তির বদলে দিতে চাইবে তার সন্তান-সন্ততিকে---" [সূরা আল-মা'আরিজ: ১০-১১]

(৩) অর্থাৎ কাফেররা মুসলিমগণকে বলত, তোমরা অহেতুক আখেরাতে শাস্তির ভয়ে আমাদের পথে চলছ না । আমরা কথা দিচ্ছি, যদি তোমাদের কথাই সত্য হয় যে, আমাদের পথে চললে আখেরাতে শাস্তি পেতে হবে, তবে তোমাদের পাপভার আমরাই বহন করব । যা কিছু শাস্তি হবে, আমাদেরই হবে । [ইবন কাসীর] সাধারণ মুসলিমগণের সাথে কাফেরদের এমনি ধরনের উক্তির জওয়াবে আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন, যারা এরূপ বলে তারা সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী । আখেরাতের ভয়াবহ আযাব দেখে তারা তাদের পাপভার বহন করবেই না । কাজেই তাদের এই ওয়াদা মিথ্যা ।

রটনা করত সে সম্পর্কে কিয়ামতের দিন অবশ্যই তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে।

দ্বিতীয় রুকূ’

১৪. আর আমরা তো নূহকে তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম[১]। তিনি তাদের

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِۦ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ

তাছাড়া তোমাদের পাপভার বহন করে তারা তোমাদেরকে মুক্ত করে দেবে- একথা তো ভ্রান্ত ও মিথ্যা, তবে তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করা ও সত্য পথ থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা স্বয়ং একটি বড় পাপ। এই পাপভারও তাদের কাঁধে চাপিয়ে দেয়া হবে। ফলে তারা নিজেদের পাপভারও বহন করবে এবং যাদের বিভ্রান্ত করেছিল, তাদের পাপভারও এক সাথে বহন করবে। [ইবন কাসীর] এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, যে ব্যক্তি অপরকে পাপকাজে লিপ্ত করতে অনুপ্রাণিত করে অথবা পাপকাজে তাকে সাহায্য করে, সে-ও আসল পাপীর অনুরূপ অপরাধী। কুরআন মজীদের অন্য এক জায়গায় এ নিয়মটিকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, “যাতে কিয়ামতের দিন তারা নিজেদের বোঝাও পুরোপুরি বহন করে এবং এমনসব লোকদের বোঝার একটি অংশও বহন করে যাদেরকে তারা জ্ঞান ছাড়াই গোমরাহ করে।” [সূরা আন-নাহল: ২৫] আর এ নিয়মটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নোক্ত হাদীসটিতে বর্ণনা করেছেন: “যে ব্যক্তি সঠিক পথের দিকে আহ্বান জানায় সে তাদের সমান প্রতিদান পাবে যারা তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে সঠিক পথ অবলম্বন করে, এ জন্য তাদের প্রাপ্যে কোন কমতি করা হবে না। আর যে ব্যক্তি গোমরাহীর দিকে আহ্বান জানায় সে তাদের সবার সমান গোনাহের ভাগী হবে যারা তার অনুসরণ করে এবং এ জন্য তাদের গোনাহের মধ্যে কোন কমতি করা হবে না।” [মুসলিম: ২৬৭৪]

(১) পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফেরদের বিরোধিতা ও মুসলিমদের উপর নির্যাতনমূলক অবস্থা বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে নির্যাতনমূলক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সান্তনা দেয়ার জন্যে পূর্ববর্তী নবীগণ ও তাদের উম্মতের কিছু অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। [দেখুন, ইবন কাসীর] উদ্দেশ্য এই যে, প্রাচীনকাল থেকেই সত্যপন্থীদের উপর কাফেরদের তরফ থেকে নির্যাতনের ধারা অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু এসব-উৎপীড়নের কারণে তারা কোন সময় সাহস হারাননি। মুমিনদের উচিত কাফেরদের উৎপীড়নের পরওয়া না করা। পূর্ববর্তী নবীগণের মধ্যে সর্বপ্রথম নূহ আলাইহিস সালাম-এর কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমত: এর কারণ এই যে, তিনিই প্রথম নবী, যিনি কুফর ও শির্কের মোকাবেলা করেছেন। দ্বিতীয়ত: তার সম্প্রদায়ের তরফ থেকে তিনি যতটুকু নির্যাতিত হয়েছিলেন, অন্য কোন নবী ততটুকু হননি। কেননা, আল্লাহ্ তা‘আলা তাকে বিশেষভাবে সুদীর্ঘ জীবন দান করেছিলেন এবং তার সমস্ত জীবন কাফেরদের নিপীড়নের মধ্যে অতিবাহিত হয়।

سَنَةٍ اِلَّا خَمۡسِیۡنَ عَامًا ؕ فَاَخَذَهُمُ الطُّوۡفَانُ وَهُمۡ ظٰلِمُوۡنَ ﴿۱۴﴾

মধ্যে অবস্থান করেছিলেন পঞ্চাশ কম হাজার বছর। অতঃপর প্লাবন তাদেরকে গ্রাস করে; এমতাবস্থায় যে তারা ছিল যালিম[১]।

فَاَنۡجَیۡنٰهُ وَاَصۡحٰبَ السَّفِیۡنَۃِ وَجَعَلۡنٰهَاۤ اٰیَۃً لِّلۡعٰلَمِیۡنَ ﴿۱۵﴾

১৫. অতঃপর আমরা তাকে এবং যারা নৌকায় আরোহণ করেছিল তাদেরকে রক্ষা করলাম এবং সৃষ্টিকুলের জন্য এটাকে করলাম একটি নিদর্শন[২]।

কুরআনের এ সূরায় বর্ণিত তার বয়স সাড়ে নয়শ’ বছর তো অকাট্য ও নিশ্চিতই। কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, এটা তার প্রচার ও দাওয়াতের বয়স। এর আগে এবং প্লাবনের পরেও তার আরও বয়স আছে। [ফাতহুল কাদীর] মোটকথা, এই অসাধারণ সুদীর্ঘ বয়স অবিরাম দাওয়াত ও তাবলীগে ব্যয় করা এবং প্রতিক্ষেত্রেই কাফেরদের তরফ থেকে নানারকম উৎপীড়ন সহ্য করা সত্বেও কোন সময় সাহস না হারানো–এগুলো সব নূহ আলাইহিস সালাম-এরই বৈশিষ্ট্য। এখানে এ জিনিসটি বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য যে, হে মুহাম্মাদ ! আপনি কাফের মুশরিকদের অবাধ্যতায় আফসোস করে নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত করবেন না। কারণ হেদায়াত আল্লাহ্‌র হাতে তিনি যাকে ইচ্ছা হেদায়াত করবেন আর যাকে ইচ্ছে হেদায়াত থেকে দূরে রাখবেন। আপনার দায়িত্ব তো তাবলীগের মাধ্যমেই সমাপ্ত হবে। তবে এটা জেনে রাখুন যে, আল্লাহ্ আপনার দ্বীনকে জয়ী করবেন। আপনার শত্রুদের বিনাশ করবেন। [ইবন কাসীর] আর আয়াতের মাধ্যমে মুমিনদের হেদায়াত দেয়া হচ্ছে যে, তোমরা তো মাত্র পাঁচ বছর থেকে জুলুম-নির্যাতন সহ্য করছো এবং একটি গোমরাহ জাতির হঠকারিতা বরদাশ্‌ত করে চলছো কিন্তু আমার এ বান্দা যে অনবরত সাড়ে নয়শ’ বছর ধরে এসবের মোকাবিলা করেছে তার সবর ও দৃঢ়তার কথা ভেবে দেখো। তুলনামূলক অধ্যয়নের জন্য দেখুন সূরা আলে ইমরান, ৩৩-৩৪; আন নিসা, ১৬৩; আল আন‘আম, ৮৪; আল-আ’রাফ, ৫৯ থেকে ৬৪; ইউনুস, ৭১ ও ৭৩; হূদ, ২৫ ও ৪৮; আল আম্বিয়া, ৭৬ ও ৭৭; আল মুমিনূন, ২৩ ও ৩০; আল ফুরকান, ৩৭; আশ্ শো‘আরা, ১০৫ থেকে ১২৩; আস্ সাফ্‌ফাত, ৭৫ ও ৮২; আল কামার, ৯০; আল হাক্কাহ,১১ ও ১২ আয়াত এবং সূরা নূহ সম্পূর্ণ।

(১) অর্থাৎ তারা নিজেদের যুলুম-নিপীড়ন চালিয়ে যেতে থাকা অবস্থায় মহাপ্লাবনের গ্রাসে পরিণত হয়। যদি মহাপ্লাবন আসার আগে তারা নিজেদের যুলুম-নিপীড়ন থেকে বিরত হতো তাহলে আল্লাহ তাদের ওপর এ আযাব পাঠাতেন না। কিন্তু তারা নূহের কথা না শুনে যুলুম ও শির্কেই নিপতিত ছিল। [ফাতহুল কাদীর]

(২) অর্থাৎ এ নৌকাটিকে আমরা সৃষ্টিকুলের জন্য শিক্ষণীয় নির্দশন করেছি। পরবর্তীকালের লোকদের জন্য শিক্ষণীয় করে দেয়া হয়েছে। অন্যত্র এসেছে, “আর নূহকে আমরা

وَإِبْرٰهِيْمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٦﴾

১৬. আর স্মরণ করুন ইব্‌রাহীমকে[১], যখন তিনি তার সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, তোমরা আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত কর এবং তাঁর তাকওয়া অবলম্বন কর; তোমাদের জন্য এটাই উত্তম যদি তোমরা জানতে!

إِنَّمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ أَوْثَانًا وَّتَخْلُقُوْنَ إِفْكًا ۚ إِنَّ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ

১৭. 'তোমরা তো আল্লাহ্ ছাড়া শুধু মূর্তিপূজা করছ এবং মিথ্যা উদ্ভাবন করছ[২]। তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া

বহন করালাম কাঠ ও কীলক নির্মিত এক নৌযানে, যা চলত আমাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে; এটা পুরস্কার তাঁর জন্য, যিনি প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন। আর আমরা এটাকে রেখে দিয়েছি এক নিদর্শনরূপে; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?" [সূরা আল-কামার: ১৩-১৫] এর মাধ্যমে একথাই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, নৌকাটিই ছিল শিক্ষণীয় নির্দশন। শত শত বছর ধরে সেটি পর্বত শৃংগে অবস্থান করছিল। এর মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মদের কাছে এ সংবাদ পৌঁছে যেতে থেকেছে যে, এ ভূখণ্ডে এক সময় এমন ভয়াবহ প্লাবন এসেছিল যার ফলে এ নৌকাটি পাহাড়ের মাথায় উঠে যায়। [ফাতহুল কাদীর] অথবা আয়াতে ঈমানদারদেরকে নাজাত দেয়াকেই নিদর্শন হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। [মুয়াসসার]

(১) এখানে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে, যিনি অনেক কঠিন অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। নমরূদের অগ্নি, অতঃপর শাম থেকে হিজরত করে তরুলতাহীন জনশূন্য প্রান্তরে অবস্থান, আদরের দুলালকে যবেহ্ করার ঘটনা ইত্যাদি। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর কাহিনী প্রসঙ্গে লুত আলাইহিস সালাম ও তার উম্মতের ঘটনাবলী এবং সূরার শেষ পর্যন্ত অন্য কয়েকজন নবী ও তাদের উম্মতের অবস্থা এগুলো সব রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও উম্মতে মুহাম্মদীর সান্ত্বনার জন্যে এবং তাদেরকে দ্বীনের কাজে দৃঢ়পদ রাখার জন্যে বর্ণিত হয়েছে।

(২) অর্থাৎ তোমরা এসব মূর্তি তৈরী করছো না বরং মিথ্যা তৈরী করছো। এ মূর্তিগুলোর অস্তিত্ব নিজেই একটি মূর্তিমান মিথ্যা। তার ওপর তোমাদের এ আকীদা-বিশ্বাস যে, এরা দেব-দেবী, আল্লাহর অবতার, তাঁর সন্তান, আল্লাহর সান্নিধ্যে অবস্থানকারী ও তাঁর কাছে শাফা'আতকারী অথবা এদের মধ্য থেকে কেউ রোগ নিরাময়কারী আবার কেউ সন্তান-দাতা এবং কেউ রিযিকদাতা এসবই মিথ্যা কথা। তোমরা নিজেদের ধারণা ও কল্পনার মাধ্যমে এসব রচনা করেছো। আসল সত্য এছাড়া আর কিছুই নয় যে, এগুলো নিছক হাতে গড়া নিষ্প্রাণ মূর্তি এবং এদের কোন ক্ষমতা ও প্রভাব নেই। এগুলো কখনো ইলাহ হতে পারে না। [দেখুন, সা'দী; মুয়াসসার]

مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُوْنَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوْهُ وَاشْكُرُوْا لَهٗ ؕ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝١٧

যাদের ইবাদাত কর তারা তো তোমাদের রিযিকের মালিক নয়। কাজেই তোমরা আল্লাহ্‌র কাছেই রিযিক চাও এবং তাঁরই 'ইবাদাত কর। আর তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তোমরা তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে(১)।

وَاِنْ تُكَذِّبُوْا فَقَدْ كَذَّبَ اُمَمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ؕ وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ۝١٨

১৮. 'আর যদি তোমরা মিথ্যারোপ কর তবে তো তোমাদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যারোপ করেছিল। সুস্পষ্টভাবে প্রচার করা ছাড়া রাসূলের আর কোন দায়িত্ব নেই।

اَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللّٰهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۝١٩

১৯. তারা কি লক্ষ্য করে না(২), কিভাবে আল্লাহ্ সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেন? তারপর তিনি তা আবার সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয় এটা আল্লাহ্‌র জন্য সহজ।

---

(১) এ কয়েকটি বাক্যের মধ্যে ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে সমস্ত যুক্তি একত্র করেছেন। মনে হয় যেন তিনি বলছেন, যে নিজে অসম্পূর্ণ, অন্যের দ্বারস্থ হতে হয় তার অস্তিত্বের জন্য, যে মূর্তিগুলো তোমাদের কোন প্রকারের কোন রিযিক দান করতে পারে না, তারা সামান্য– সামান্যতমও কোন প্রকার ইবাদাতের মালিক হতে পারে না। তোমাদেরকে তো আল্লাহর দিকে ফিরে যেতেই হবে। সুতরাং তোমরা তাঁরই ইবাদাত কর। [সা'দী]

(২) ১৯-২৩ নং পর্যন্ত আয়াতগুলো কি ইবরাহীম আলাইহিস সালামের বাকী কথা নাকি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে স্বতন্ত্র প্রসংগ, এ নিয়ে দুটি মত রয়েছে। ইবন কাসীর বলেন, এটি ইবরাহীম আলাইহিস সালামের কথার বাকী অংশ। তবে ইবন জারীর তাবারী বলেন, এটি মূল আলোচনার মাঝখানে স্বতন্ত্র প্রাসংগিক বিষয় হিসেবে আনা হয়েছে। সে হিসেবে ইবরাহীমের কাহিনীর ধারা বর্ণনা ছিন্ন করে আল্লাহ মক্কার কাফেরদেরকে সম্বোধন করে একথাগুলো বলেছেন। অর্থাৎ হে কুরাইশরা তোমরা তাদের মতই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর মিথ্যারোপ করেছ যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীরা ইবরাহীম আলাইহিস সালামের উপর মিথ্যারোপ করেছে। [তাবারী]

قُلْ سِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ بَدَاَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِئُ النَّشْاَةَ الْاٰخِرَةَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۚ﴿٢٠﴾

২০. বলুন, 'তোমরা যমীনে ভ্রমণ কর অতঃপর প্রত্যক্ষ কর, কিভাবে তিনি সৃষ্টি আরম্ভ করেছেন? তারপর আল্লাহ্ সৃষ্টি করবেন পরবর্তী সৃষ্টি। নিশ্চয় আল্লাহ্ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَاِلَيْهِ تُقْلَبُوْنَ ﴿٢١﴾

২১. তিনি যাকে ইচ্ছে শাস্তি দেন এবং যার প্রতি ইচ্ছে অনুগ্রহ করেন। আর তোমরা তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে।

وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ ۫ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ۧ﴿٢٢﴾

২২. আর তোমরা আল্লাহ্‌কে ব্যর্থ করতে পারবে না যমীনে[১], আর না আসমানে এবং আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবক নেই, সাহায্যকারীও নেই[২]।

তৃতীয় রুকূ'

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَلِقَآئِهٖٓ اُولٰٓئِكَ

২৩. আর যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শন ও তাঁর

(১) অর্থাৎ আসমান ও যমীনের কেউ আল্লাহকে অপারগ করতে পারবে না। [তাবারী] অথবা, তোমরা পালিয়ে এমন কোন জায়গায় চলে যেতে পারো না যেখানে গিয়ে আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচতে পারো। [দেখুন, সা'দী; মুয়াসসার] সূরা আর রাহমানে এ কথাটিই জিন ও মানুষকে সম্বোধন করে চ্যালেঞ্জের সুরে এভাবে বলা হয়েছে যে, যদি তোমরা আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্ব ও শাসন থেকে বের হয়ে যেতে পারো তাহলে একটু বের হয়ে দেখিয়ে দাও। তা থেকে বের হবার জন্য শক্তির প্রয়োজন এবং সে শক্তি তোমাদের নেই। কাজেই তোমরা কোনক্রমেই বের হতে পারো না। [সূরা আর-রাহমান : ২৩]

(২) অর্থাৎ আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিজেদের শক্তির জোরে রক্ষা পাওয়ার ক্ষমতা তোমাদের নেই এবং তোমাদের এমন কোন অভিভাবক, পৃষ্ঠপোষক বা সাহায্যকারীও নেই যে আল্লাহর মোকাবিলায় তোমাদের আশ্রয় দিতে পারে এবং তাঁর কাছে জবাবদিহি থেকে বাঁচতে পারে। [দেখুন, তাবারী] যারা শির্ক ও কুফরী করেছে, আল্লাহর নাফরমানী করেছে, সমগ্র বিশ্ব-জাহানে তাদের সাহায্য ও সহায়তা দানকারী হিসেবে দাঁড়িয়ে যাবার এবং আল্লাহর আযাবকে তাদের ওপর কার্যকর হওয়া থেকে ঠেকিয়ে রাখার ক্ষমতা কারো নেই।

يَئِسُوا مِن رَّحْمَتِي وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٣﴾

সাক্ষাত অস্বীকার করে, তারাই আমার অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়েছে। আর তাদের জন্যই রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٤﴾

২৪. উত্তরে ইব্‌রাহীমের সম্প্রদায় শুধু এটাই বলল, 'একে হত্যা কর অথবা অগ্নিদগ্ধ কর[১]।' অতঃপর আল্লাহ্‌ তাঁকে আগুন থেকে রক্ষা করলেন। নিশ্চয় এতে বহু নিদর্শন রয়েছে, এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা ঈমান আনে[২]।

---

(১) অর্থাৎ ইবরাহীমের ন্যায়সংগত যুক্তির কোন জবাব তাদের কাছে ছিল না। তাদের যদি কোন জবাব থেকে থাকে তাহলে তা এই ছিল যে, হক কথা বলছে যে কণ্ঠটি সেটি স্তব্ধ করে দাও এবং যে ব্যক্তি আমাদের ভুল আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরছে এবং তা থেকে আমাদের বিরত থাকতে বলছে তাকে জীবন্ত রেখো না। এভাবে তারা তাদের ক্ষমতা ও শক্তির জোর দেখাল। [ইবন কাসীর] "হত্যা করো ও জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারো" শব্দাবলী থেকে একথা প্রকাশিত হচ্ছে যে, সমগ্র জনতা ইবরাহীমকে মেরে ফেলার ব্যাপারে একমত ছিল তবে মেরে ফেলার পদ্ধতির ব্যাপারে ছিল বিভিন্ন মত। কিছু লোকের মত ছিল, তাঁকে হত্যা করা হোক। আবার কিছু লোকের মত ছিল, জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হোক, এর ফলে ভবিষ্যতে যারা এ ভূখণ্ডে হক কথা বলার পাগলামী করতে চাইবে এটা তাদের জন্য একটা শিক্ষা হয়ে থাকবে। তবে সবশেষে পুড়িয়ে ফেলার ব্যাপারেই তাদের মত স্থির হলো। [আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

(২) এর মধ্যে ঈমানদারদের জন্য এ মর্মে নিদর্শন রয়েছে যে, তারা রাসূলগণ যা নিয়ে এসেছেন তার সত্যতার প্রমাণ পাবে। আর এটাও জানতে পারবে যে, নবী-রাসূলগণ সবচেয়ে বড় নেককার ও তারা মানুষের কল্যাণকামী। আরও প্রমাণ পাবে যে, যারা নবী-রাসূলদের বিরোধিতা করবে তাদের কথা অসার ও স্ববিরোধী। আরও প্রমাণ পাবে যে, যুগে যুগে নবী-রাসূলদের বিরোধিরা যেন পরস্পর শলা-পরামর্শ করে রাসূলদের উপর মিথ্যারোপ করেছে ও পরস্পর এ ব্যাপারে উৎসাহ যুগিয়েছে। [সা'দী] তাছাড়া এতে আরও নিদর্শন রয়েছে আল্লাহ্‌র ক্ষমতা, তাঁর রাসূলদের সম্মান রক্ষা, তাঁর ওয়াদার বাস্তবায়ণ, তাঁর শত্রুদের হেয়করণ। তাছাড়া আরও প্রমাণ রয়েছে যে, সমস্ত সৃষ্ট সে বড় কিংবা ছোট যাই হোক না কেন আল্লাহ্‌ তা'আলার কুদরতের অধীন। [আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর] তাছাড়া এ ব্যাপারেও নির্দশন রয়েছে যে, তিনি আগুনের

وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا ۖ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَىٰكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّٰصِرِينَ ﴿٢٥﴾

২৫. ইব্‌রাহীম আরও বললেন[১], 'তোমরা তো আল্লাহ্‌র পরিবর্তে মূর্তিগুলোকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছ, দুনিয়ার জীবনে তোমাদের পারস্পরিক বন্ধুত্বের খাতিরে[২]। পরে কিয়ামতের দিন তোমরা একে অন্যকে অস্বীকার করবে এবং পরস্পর পরস্পরকে লা'নত দেবে। আর তোমাদের আবাস হবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না[৩]।'

ভয়াবহ শাস্তি মেনে নিতে প্রস্তুত হয়ে যান এবং সত্য ও ন্যায়ের পথ পরিহার করতে প্রস্তুত হননি। নিদর্শন এ ব্যাপারেও রয়েছে যে, মহান আল্লাহ ইবরাহীম আলাইহিস সালামকেও পরীক্ষার পুল পার না করিয়ে ছাড়েননি। আবার এ ব্যাপারেও যে, ইবরাহীমকে আল্লাহ যে পরীক্ষার সম্মুখীন করেন তাতে তিনি সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হন, তবে এই আল্লাহর সাহায্য তার জন্য এমন অলৌকিক পদ্ধতিতে আসে যে, জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড তাঁর জন্য ঠাণ্ডা করে দেয়া হয়। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

(১) বক্তব্যটি আগুনে নিক্ষেপের আগেও বলা হয়ে থাকতে পারে। তবে বক্তব্যের ধারাবাহিকতা থেকে বুঝা যায়, আগুনের মধ্য থেকে নিরাপদে বের হয়ে আসার পর ইবরাহীম আলাইহিস সালাম লোকদেরকে একথা বলেন। [আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

(২) অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের পরিবর্তে মূর্তিপূজার ভিত্তিতে নিজেদের সামাজিক জীবন গড়ে তুলেছো। এ ব্যবস্থা দুনিয়ার জীবনের সীমানা পর্যন্ত তোমাদের জাতীয় সত্ত্বাকে একত্র করে রাখতে পারে। কারণ এখানে সত্য-মিথ্যা নির্বিশেষে যে কোন আকীদার ভিত্তিতেই যে কোন ঐক্য ও সমাজ গড়ে উঠুক না কেন তা পারস্পরিক বন্ধুত্ব, আত্মীয়তা, ভ্রাতৃত্ব ও অন্যান্য সকল ধর্মীয়, সামাজিক, তামাদ্দুনিক, অর্থনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যম হতে পারে। সেটাই কেবল তোমাদেরকে এ শির্কের উপর একত্রিত করে রেখেছে। [দেখুন, আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

(৩) অর্থাৎ মিথ্যা আকীদার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত তোমাদের এ সম্পর্ক আখেরাতে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না। সেখানে পারস্পরিক প্রীতি-ভালোবাসা, সহযোগিতা, আত্মীয়তা এবং আকীদা-বিশ্বাস ও কামনা-বাসনার কেবলমাত্র এমন ধরনের সম্পর্ক বজায় থাকতে পারে যা দুনিয়ায় এক আল্লাহর বন্দেগী এবং সৎকর্মশীলতা ও আল্লাহভীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। কুফরী ও শির্ক এবং ভুল পথ ও কুপথের সাথে জড়িত যাবতীয় সম্পর্ক সেখানে ছিন্ন হয়ে যাবে। সকল ভালোবাসা শত্রুতায় পরিণত হবে। সমস্ত শ্রদ্ধা-ভক্তি ঘৃণায় রূপান্তরিত হবে। একে অন্যের ওপর লা'নত বর্ষণ করবে

২৬. অতঃপর লূত তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলেন। আর ইব্রাহীম বললেন, 'আমি আমার রবের উদ্দেশ্যে হিজরত করছি[১]। নিশ্চয় তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'

فَاٰمَنَ لَهٗ لُوۡطٌ ۘ وَقَالَ اِنِّیۡ مُهَاجِرٌ اِلٰی رَبِّیۡ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الۡعَزِیۡزُ الۡحَکِیۡمُ ﴿۲۶﴾

২৭. আর আমরা ইব্রাহীমকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়া'কূব[২] এবং

وَوَهَبۡنَا لَهٗۤ اِسۡحٰقَ وَیَعۡقُوۡبَ وَجَعَلۡنَا فِیۡ

[ইবন কাসীর] এবং প্রত্যেকে নিজের গোমরাহীর দায়-দায়িত্ব অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে বলবে, এই যালেম আমাকে ধ্বংস করেছে, কাজেই একে দ্বিগুণ শাস্তি দেয়া হোক। একথা কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে। এক স্থানে বলা হয়েছে: "বন্ধুরা সেদিন পরস্পরের শত্রু হয়ে যাবে, মুত্তাকীরা ছাড়া।" [সূরা যুখরুফ: ৬৭] অন্যত্র বলা হয়েছে, "প্রত্যেকটি দল যখন জাহান্নামে প্রবেশ করবে তখন তার কাছের দলের প্রতি লানত বর্ষণ করতে করতে প্রবেশ করবে, এমনকি শেষ পর্যন্ত যখন সবাই সেখানে একত্র হয়ে যাবে তখন প্রত্যেক পরবর্তী দল পূর্ববর্তী দলের বিরুদ্ধে বলবে: হে আমাদের রব ! এ লোকেরাই আমাদের পথভ্রষ্ট করেছে, কাজেই এদেরকে দ্বিগুণ আগুনের শাস্তি দিন।" [সূরা আল-আ'রাফ: ৩৮] অন্যত্র বলা হয়েছে, "আর তারা বলবে , হে আমাদের রব ! আমরা নিজেদের সরদারদের ও বড়দের আনুগত্য করেছি এবং তারা আমাদের বিপথগামী করেছে। হে আমাদের রব! আপনি তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দিন এবং তাদের ওপর বড় রকমের লানত বর্ষণ করুন।" [সূরা আল-আহযাব:৬৭-৬৮]

(১) লূত আলাইহিস সালাম ছিলেন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর মু'জিযা দেখে সর্বপ্রথম যিনি মুসলিম হন। তিনি এবং তার পত্নী সারা, যিনি চাচাত বোন ও মুসলিম ছিলেন, দেশত্যাগের সময় তারা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর সঙ্গী হন। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বললেন, আমি আমার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে দেশ-ত্যাগ করছি। উদ্দেশ্য এই যে, এমন কোন জায়গায় যাব, যেখানে পালনকর্তার ইবাদাতে কোন বাধা নেই। ইবরাহীম নখ'য়ী ও কাতাদাহ বলেন, ﴿اِنِّیۡ مُهَاجِرٌ﴾ ইবরাহীমের উক্তি। কেননা, এর পরবর্তী বাক্য ﴿وَوَهَبۡنَا لَهٗۤ اِسۡحٰقَ وَیَعۡقُوۡبَ﴾ তে নিশ্চিতরূপে তারই অবস্থা। কোন কোন তফসীরকার ﴿اِنِّیۡ مُهَاجِرٌ﴾ কে লূত আলাইহিস সালাম-এর উক্তি প্রতিপন্ন করেছেন। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] কিন্তু পূর্বাপর বর্ণানাদৃষ্টে প্রথম তফসীরই উপযুক্ত। লূত আলাইহিস সালামও এই হিজরতে শরীক ছিলেন, কিন্তু ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর অধীন হওয়ার কারণে যেমন সারার কথা উল্লেখ করা হয়নি, তেমনি লূত আলাইহিস সালাম-এর হিজরতের কথাও স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়নি।

(২) ইসহাক আলাইহিস্ সালাম ছিলেন তাঁর পুত্র এবং ইয়াকূব ছিলেন পৌত্র। এখানে ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের অন্যান্য পুত্রদের উল্লেখ না করার কারণ হচ্ছে এই যে, ইবরাহীম সন্তানদের মাদ্ইয়ানী শাখায় কেবলমাত্র শু'আইব আলাইহিস সালামই

ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ وَاٰتَيْنٰهُ اَجْرَهٗ فِى الدُّنْيَا ۚ وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٢٧﴾

তাঁর বংশধরদের জন্য স্থির করলাম নবূওয়ত ও কিতাব। আর আমরা তাকে তার প্রতিদান দুনিয়ায় দিয়েছিলাম; এবং আখিরাতেও তিনি নিশ্চয়ই সৎকর্মপরায়ণদের অন্যতম হবেন[১]।

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖۤ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ ۫ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٨﴾

২৮. আর স্মরণ করুন লূতের কথা, যখন তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, 'নিশ্চয় তোমরা এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের আগে সৃষ্টিকুলের কেউ করেনি।'

নবুওয়াত লাভ করেন এবং ইসমাঈলী শাখায় মুহাম্মাদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত লাভ পর্যন্ত আড়াই হাজার বছরে আর কোন নবী আসেননি। পক্ষান্তরে ইসহাক আলাইহিস সালাম থেকে যে শাখাটি চলে তার মধ্যে একের পর এক ঈসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত নবুওয়াত ও কিতাবের নেয়ামত প্রদত্ত হতে থাকে।

(১) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর আত্মত্যাগ ও অন্যান্য সৎকর্মের প্রতিদান দুনিয়াতেও দান করেছেন। তাঁকে মানুষের প্রিয় ও নেতা করেছেন। যারাই ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দাওয়াতকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিল তারা সবাই দুনিয়ার বুক থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং এমনভাবে বিলুপ্ত হয়ে গেছে যে, আজ দুনিয়ার কোথাও তাদের কোন নাম নিশানাও নেই। কিন্তু যে ব্যক্তিকে আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করার অপরাধে তারা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে চেয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত যাকে সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় স্বদেশভূমি ত্যাগ করতে হয়েছিল তাকে আল্লাহ এমন সফলতা দান করেন যে, দুনিয়াতে তাকে উত্তম স্বচ্ছন্দ রিযিক, প্রশস্ত আবাস, উত্তম নেককার স্ত্রী, সুপ্রশংসা প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া চার হাজার বছর থেকে দুনিয়ার বুকে তার নাম সমুজ্জ্বল রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। দুনিয়ার সকল মুসলিম, নাসারা ও ইয়াহূদী রাব্বুল আলামীনের সেই খলীল তথা বন্ধুকে একযোগে নিজেদের নেতা বলে স্বীকার করে। একমাত্র সেই ব্যক্তি এবং তার সন্তানদের থেকেই তারা হিদায়াতের আলোকবর্তিকা লাভ করতে পেরেছে। আখেরাতে তিনি যে মহাপুরস্কার লাভ করবেন তাতো তার জন্য নির্ধারিত হয়েই আছে কিন্তু এ দুনিয়ায়ও তিনি যে মর্যাদা লাভ করেছেন তা দুনিয়ার বৈষয়িক স্বার্থ উদ্ধার প্রচেষ্টায় জীবনপাতকারীদের একজনও আজ পর্যন্ত লাভ করতে পারেনি। [দেখুন, ইবন কাসীর; সা'দী; আদওয়াউল বায়ান] এ থেকে জানা গেল যে, কর্মের আসল প্রতিদান তো আখেরাতে পাওয়া যাবে, কিন্তু তার কিছু অংশ দুনিয়াতেও নগদ দেয়া হয়। অনেক নির্ভরযোগ্য হাদীসে অনেক সৎকর্মের পার্থিব উপকারিতা ও অসৎকর্মের পার্থিব অনিষ্ট বর্ণিত হয়েছে।

২৯. 'তোমরাই তো পুরুষে উপগত হচ্ছ, তোমরাই তো রাহাজানি করে থাক এবং তোমরাই তো নিজেদের মজলিশে প্রকাশ্যে ঘৃণ্য কাজ করে থাক(১) ।' উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু এটাই বলল, 'আমাদের উপর আল্লাহ্‌র শাস্তি আনয়ন কর---তুমি যদি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাক ।'

أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ ۙ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ ۖ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٩﴾

৩০. তিনি বললেন, 'হে আমার রব! বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করুন ।'

قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ﴿٣٠﴾

চতুর্থ রুকূ'

৩১. আর যখন আমার প্রেরিত ফেরেশ্‌তাগণ সুসংবাদসহ ইব্‌রাহীমের কাছে আসল,

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا

(১) এখানে লূত আলাইহিস সালাম তার সম্প্রদায়ের বেশ কয়েকটি গুরুতর পাপের কথা উল্লেখ করেছেন । প্রথমত, পুংমৈথুন, যা এর পূর্বে আদম সন্তানদের আর কেউ করে নি । সাথে সাথে তারা আল্লাহ্‌র সাথে কুফরি করত এবং রাসূলদের প্রতি মিথ্যারোপ করত । দ্বিতীয়ত, রাহাজানি, অর্থাৎ পথে মানুষদেরকে আক্রমন করে তাদের হত্যা করত এবং সবকিছু নিয়ে নিত । আর তৃতীয়ত, তারা মজলিসে সবার সামনে এমন অপকর্ম করত, যা সম্পূর্ণ অশোভনীয় ছিল । তাদের একজন অন্যজনকে তা থেকে বাধা দিত না । কুরআন তৃতীয় পাপকাজটি নির্দিষ্ট করেনি । এ থেকে জানা যায় যে, যে কোন গুনাহ্ প্রকাশ্যে করাও একটি স্বতন্ত্র গোনাহ্ । কোন কোন তফসীরকারক এ স্থলে সেসব গোনাহ্ একটি একটি করে উল্লেখ করেছেন, যেগুলো এই নির্লজ্জেরা তাদের প্রকাশ্যে মজলিসে করত । উদাহরণত: পথিকদের গায়ে পাথর ছুঁড়ে মারা এবং তাদের প্রতি বিদ্রূপাত্মক ধ্বনি দেয়া । কেউ কেউ বলেন, তাদের প্রসিদ্ধ অশ্লীল কাজটি তারা গোপনে নয়, প্রকাশ্যেই মজলিসের সবার সামনে করত । কারও কারও মতে, তারা প্রকাশ্যে বড় শব্দ করে গুহ্যদেশ দিয়ে বাতাস বের করত । কারও কারও মতে, ছাগল ও মোরগ লড়াই চালিয়ে যেত । এই সবই তারা করত । আর তারা আরও কঠিন প্রকৃতির খারাপ কাজ করত । [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] আয়াতে উল্লেখিত প্রথম গোনাহ্‌টিই সর্বাধিক মারাত্মক । তাদের পূর্বে পৃথিবীতে কেউ এই অপকর্ম করত না । বনের পশুরাও এ থেকে বেঁচে থাকে । এটা যে এক গুরুতর অপরাধ, এ ব্যাপারে কারও দ্বিমত নেই ।

إِنَّا مُهْلِكُوٓا أَهْلِ هَٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ۖ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَٰلِمِينَ ﴿٣١﴾

তারা বলেছিল, 'নিশ্চয় আমরা এ জনপদবাসীকে ধ্বংস করব(১), এর অধিবাসীরা তো যালিম।'

قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا ۚ قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا ۖ لَنُنَجِّيَنَّهُۥ وَأَهْلَهُۥٓ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُۥ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَٰبِرِينَ ﴿٣٢﴾

৩২. ইব্‌রাহীম বললেন, 'এ জনপদে তো লূত রয়েছে।' তারা বলল, 'সেখানে কারা আছে, তা আমরা ভাল জানি, নিশ্চয় আমরা লূতকে ও তার পরিজনবর্গকে রক্ষা করব, তার স্ত্রীকে ছাড়া(২); সে তো পিছনে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত।'

وَلَمَّآ أَن جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِىٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ ۖ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَٰبِرِينَ ﴿٣٣﴾

৩৩. আর যখন আমার প্রেরিত ফেরেশ্‌তাগণ লূতের কাছে আসল, তখন তাদের জন্য তিনি বিষণ্ন হয়ে পড়লেন এবং নিজেকে তাদের রক্ষায় অসমর্থ মনে করলেন। আর তারা বলল, 'ভয় করবেন না, দুঃখও করবেন না; আমরা আপনাকে ও আপনার পরিজনবর্গকে রক্ষা করব, আপনার স্ত্রী ছাড়া; সে তো পিছনে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত;

---

(১) "এ জনপদ" বলে লূত জাতির এলাকা সাদূমকে বুঝানো হয়েছে। [বাগভী; মুয়াসসার] ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম এ সময় ফিলিস্তিনের বর্তমান আল খলীল শহরে থাকতেন। এ শহরের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে কয়েক মাইল দূরে মৃতসাগরের অংশ রয়েছে। সেখানে পূর্বে বাস করতো লূত জাতির লোকেরা এবং বর্তমানে এ সমগ্র এলাকা রয়েছে সাগরের পানির তলায়।

(২) এ মহিলা সম্পর্কে অন্যত্র বলা হয়েছে যে, লূতের এই স্ত্রী তার প্রতি বিশ্বস্ত ছিল না। এ জন্য তার ব্যাপারে এ ফায়সালা করা হয় যে, একজন নবীর স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও তা তার কোন কাজে লাগবে না। [যেমন, সূরা আত-তাহরীম:১০] যেহেতু আল্লাহর কাছে প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যাপারে ফায়সালা হয় তার ঈমান ও চরিত্রের ভিত্তিতে, তাই নবীর স্ত্রী হওয়ায় তার কোন লাভ হয়নি। তার পরিণাম তার স্বামীর অনুরূপ হয়নি বরং যে জাতির ধর্ম ও চরিত্র সে গ্রহণ করে রেখেছিল তার অনুরূপ হয়েছিল। সে তার কাওমের কুফরিকে সমর্থন করছিল এবং তাদের সীমালঙ্ঘনকে সহযোগিতা করে যাচ্ছিল। [দেখুন, ইবন কাসীর]

৩৪. 'নিশ্চয় আমরা এ জনপদবাসীদের উপর আকাশ হতে শাস্তি নাযিল করব, কারণ তারা পাপাচার করছিল।'

إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰٓ أَهْلِ هَٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُوا۟ يَفْسُقُونَ ۝٣٤

৩৫. আর অবশ্যই আমরা এতে বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য একটি স্পষ্ট নিদর্শন রেখেছি(১)।

وَلَقَد تَّرَكْنَا مِنْهَآ ءَايَةًۢ بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝٣٥

৩৬. আর আমরা মাদ্‌ইয়ানবাসীদের প্রতি তাদের ভাই শু'আইবকে পাঠিয়েছিলাম। অতঃপর তিনি বলেছিলেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত কর, এবং শেষ দিনের আশা কর(২)। আর যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়িও না।'

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱرْجُوا۟ ٱلْيَوْمَ ٱلْءَاخِرَ وَلَا تَعْثَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝٣٦

৩৭. অতঃপর তারা তার প্রতি মিথ্যা আরোপ করল; ফলে তারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হয়ে নিজ ঘরে নতজানু অবস্থায় শেষ হয়ে গেল।

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا۟ فِى دَارِهِمْ جَٰثِمِينَ ۝٣٧

---

(১) এই সুস্পষ্ট নিদর্শনটি হচ্ছে মৃতসাগর। একে লূত সাগরও বলা হয়। কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে মক্কার কাফেরদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, এই যালেম জাতিটির ওপর তার কৃতকর্মের বদৌলতে যে আযাব নাযিল হয়েছিল তার একটি চিহ্ন আজো প্রকাশ্যে রাজপথে বর্তমান রয়েছে। তোমরা সিরিয়ার দিকে নিজেদের বাণিজ্য সফরে যাবার সময় দিনরাত এ চিহ্নটি দেখে থাকো। [দেখুন, সূরা আল-হিজর: ৭৫-৭৭; সূরা আস-সাফফাত: ১৩৭] বর্তমান যুগে এখানে পানির মধ্যে কিছু ডুবন্ত জনপদের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়।

(২) এর দু'টো অর্থ হতে পারে। একটি হচ্ছে, আখেরাতের আগমন কামনা করো। একথা মনে করো না, যা কিছু আছে ব্যস এ দুনিয়ার জীবন পর্যন্তই এবং এরপর আর এমন কোন জীবন নেই, যেখানে তোমাদের নিজেদের যাবতীয় কাজ-কর্মের হিসেব দিতে হবে এবং তার পুরস্কার ও শাস্তি লাভ করতে হবে। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, এমন কাজ করো যার ফলে তোমরা আখেরাতে ভালো পরিণতি লাভের আশা করতে পারো। যেমন অন্য আয়াতে এসেছে, "তোমরা যারা আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রত্যাশা কর অবশ্যই তাদের জন্য রয়েছে ওদের মধ্যে উত্তম আদর্শ।" [সূরা আল-মুমতাহিনাহ: ৬] [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

وَعَادًا وَّثَمُودَا۟ وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَٰكِنِهِمْ ۖ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَعْمَٰلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُوا۟ مُسْتَبْصِرِينَ ﴿٣٨﴾

৩৮. আর আমরা 'আদ ও সামূদকে ধ্বংস করেছিলাম; তাদের বাড়ীঘরের কিছু তোমাদের জন্য উন্মোচিত হয়েছে(১)। আর শয়তান তাদের কাজকে তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল এবং তাদেরকে সৎপথ অবলম্বনে বাধা দিয়েছিল, যদিও তারা ছিল বিচক্ষণ(২)।

وَقَٰرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَٰمَٰنَ ۖ وَلَقَدْ جَآءَهُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَٰتِ فَٱسْتَكْبَرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانُوا۟ سَٰبِقِينَ ﴿٣٩﴾

৩৯. আর আমরা ধ্বংস করেছিলাম কারূন, ফির'আউন ও হামানকে। আর অবশ্যই মূসা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ এসেছিল; অতঃপর তারা যমীনে অহংকার করেছিল; কিন্তু তারা আমার শাস্তি এড়াতে পারেনি।

فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنۢبِهِۦ ۖ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ

৪০. সুতরাং তাদের প্রত্যেককেই আমরা তার অপরাধের জন্য পাকড়াও

---

(১) আরবের যেসব এলাকায় এ সব জাতির বসতি ছিল আরবের লোকেরা তা জানতো। দক্ষিণ আরবের যেসব এলাকা বর্তমানে আহকাফ, ইয়ামন ও হাদরামাউত নামে পরিচিত, প্রাচীনকালে সে এলাকাগুলোতে ছিল আদ জাতির বাস। হিজাযের দক্ষিণ অংশে রাবেগ থেকে আকাবাহ পর্যন্ত শু'আইব জাতির এবং মদীনার ওয়াদিউল কুরা থেকে তাইমা ও তাবুক পর্যন্ত সমগ্র এলাকা আজো সামূদ জাতির ধ্বংসাবশেষে পরিপূর্ণ দেখা যায়। কুরআন নাযিল হবার যুগে এ ধ্বংসাবশেষগুলোর অবস্থা বর্তমানের তুলনায় আরো কিছু বেশী সুস্পষ্ট থেকে থাকবে। [দেখুন, ইবন কাসীর]

(২) مستبصر এর অর্থ বিচক্ষণ বা চক্ষুষ্মান। উদ্দেশ্য এই যে, যারা কুফর ও শির্ক করে আযাব ও ধ্বংসে পতিত হয়েছে, তারা মোটেই বেওকুফ অথবা উম্মাদ ছিল না। তারা দলীল-প্রমাণাদি থেকে সত্য গ্রহণ করতে সমর্থ ছিল, কিন্তু পার্থিব স্বার্থ তাদেরকে অস্বীকারে বাধ্য করে রেখেছিল। তারা ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে চিন্তে ও খোলা চোখে শয়তান যে পথ দেখিয়েছিল এবং যে পথে তারা বড়ই লাভ ও ভোগের সন্ধান পেয়েছিল সে পথে পাড়ি জমিয়েছিল এবং এমন পথ পরিহার করেছিল যা তাদের কাছে নীরস, বিস্বাদ এবং নৈতিক বিধি-নিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ হবার কারণে কষ্টকর মনে হচ্ছিল। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর] অন্যত্র বলা হয়েছে: "তারা জাগতিক কাজ কর্ম খুব বোঝে ; কিন্তু আখেরাতের ব্যাপারে উদাসীন।" [সূরা আর-রূম: ৭]

حَاصِبًا ۚ وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤٠﴾

করেছিলাম। তাদের কারো উপর আমরা পাঠিয়েছিলাম পাথরকুচিসম্পন্ন প্রচণ্ড ঝটিকা[১], তাদের কাউকে আঘাত করেছিল মহানাদ, কাউকে আমরা প্রোথিত করেছিলাম ভূগর্ভে এবং কাউকে আমরা করেছিলাম নিমজ্জিত। আর আল্লাহ্ এমন নন যে, তিনি তাদের প্রতি যুলুম করবেন; বরং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম করছিল।

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا ۖ وَإِنَّ أَوْهَنَ

৪১. যারা আল্লাহ্ ছাড়া বহু অভিভাবক গ্রহণ করে, তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সার ন্যায়[২], যে ঘর বানায়। আর ঘরের

(১) অর্থাৎ আদ জাতির। তাদের ওপর অবিরাম সাত রাত ও আট দিন পর্যন্ত ভয়াবহ তুফান চলতে থাকে। [সূরা আল-হাক্কাহ:৭]

(২) মাকড়সাকে "আনকাবূত" বলা হয়। এখানে সে মাকড়সা বোঝানো হয়েছে, যে জাল তৈরী করে এবং তাতে ঝুলতে থাকে। এই জালের সাহায্যে সে মশা-মাছি শিকার করে। বলাবাহুল্য, জন্তু জানোয়ারের যত প্রকার বাসা ও ঘর বিদিত আছে, তন্মধ্যে মাকড়সার জাল দুর্বলতর। যা সামান্য বাতাসেও ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করে এবং অন্যের উপর ভরসা করে, তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সার জাল, যা অত্যন্ত দুর্বল। এমনিভাবে যারা কোন প্রতিমা অথবা কোন মানুষের উপর ভরসা করে, তাদের ভরসা এমন, যেমন মাকড়সা তার জালের উপর ভরসা করে। [ইবন কাসীর] বিশ্ব-জাহানের প্রকৃত মালিককে বাদ দিয়ে যারা একেবারে অক্ষম বান্দা ও সম্পূর্ণ কাল্পনিক উপাস্যদের ওপর নির্ভর করে চলেছ তার প্রকৃত অবস্থা মাকড়শার জালের চাইতে বেশী কিছু নয়। মাকড়শার জাল যেমন আঙ্গুলের সামান্য একটি টোকাও বরদাশ্ত করতে পারে না, তেমনি তোমাদের আশার অট্টালিকাও আল্লাহর ব্যবস্থার সাথে প্রথম সংঘাতেই চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে। সামান্য বৃষ্টিও যার সবকিছু বিনষ্ট করে দেয়, তোমাদের সামান্যতম উপকারও তারা করতে পারে না [দেখুন, ফাতহুল কাদীর] সুতরাং সত্য কেবল এই যে, একমাত্র রব্বুল আলামীন ছাড়া আর কারও উপর নির্ভর করা যায় না। আল্লাহ্ বলেন: "যে ব্যক্তি তাগুতকে (আল্লাহ বিরোধী শক্তিকে) অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে সে এমন মজবুত নির্ভরকে আঁকড়ে ধরেছে যা কখনো ছিন্ন হবার নয়। বস্তুত আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন।" [সূরা আল-বাকারাহ: ২৫৬]

ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنكَبُوتِ ۖ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো দুর্বলতম, যদি তারা জানত[১]।

إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ مِن شَىْءٍ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٤٢﴾

৪২. তারা আল্লাহ্ ছাড়া যা কিছুকে ডাকে, আল্লাহ্ তো তা জানেন। আর তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়[২]।

وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَٰلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۖ وَمَا يَعْقِلُهَآ إِلَّا ٱلْعَٰلِمُونَ ﴿٤٣﴾

৪৩. আর এ সকল দৃষ্টান্ত আমরা মানুষের জন্য দেই; কিন্তু শুধু জ্ঞানী ব্যক্তিরাই এটা বুঝে[৩]।

---

(১) এর দুটি অর্থ হয়। এক. যদি তারা জানত যে তাদের মা'বুদগুলো মাকড়শার জালের মত, তবে এ ধরনের মা'বুদের পিছনে কখনও থাকত না। দুই. যদি তাদের কোন জ্ঞান থাকত, তবে তারা জানত যে, আল্লাহ্ তাদের মা'বুদদের অবস্থা খুব ভাল করেই জানেন। [ফাতহুল কাদীর]

(২) অর্থাৎ যেসব জিনিসকে এরা মা'বুদে পরিণত করেছে এবং যাদেরকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করে, তাদের প্রকৃত স্বরূপ আল্লাহ ভালোভাবেই জানেন। তাদের কোন ক্ষমতাই নেই। একমাত্র আল্লাহই ক্ষমতার মালিক এবং তাঁরই বিচক্ষণ কর্মকুশলতা ও জ্ঞান এ বিশ্ব-জাহানের ব্যবস্থা পরিচালনা করছে। এ আয়াতের আর একটি অনুবাদ এও হতে পারে, আল্লাহ খুব ভালোভাবেই জানেন, তাঁকে বাদ দিয়ে এরা যাদেরকে ডাকে তারা কিছুই নয় (অর্থাৎ ভিত্তিহীন ও ক্ষমতাহীন) এবং একমাত্র তিনিই পরাক্রান্ত ও জ্ঞানের অধিকারী। সুতরাং অচিরেই তিনি তাদেরকে তাদের কর্মকাণ্ডের শাস্তি দিবেন। [দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(৩) মাকড়সার জাল দ্বারা মুশরিকদের উপাস্যদের দৃষ্টান্ত দেয়ার পর এখন বলা হয়েছে যে, আমি সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত দ্বারা তাওহীদের স্বরূপ বর্ণনা করি; কিন্তু এসব দৃষ্টান্ত থেকেও কেবল আলেমগণই জ্ঞান আহরণ করে। অন্যরা চিন্তা-ভাবনাই করে না। ফলে সত্য তাদের সামনে ফোটে না। মূলতঃ কুরআন ও হাদীসের কিছু শব্দ বুঝে নিলে কেউ আল্লাহ্‌র কাছে আলেম হয় না, যে পর্যন্ত কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনার অভ্যাস গড়ে না তোলে এবং যে পর্যন্ত সে কুরআন অনুযায়ী আমল না করে। আমর ইবন আস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছ থেকে এক হাজার দৃষ্টান্ত শিক্ষা করেছি। [মুসনাদে আহমাদ: ৪/২০৩] এটা নিঃসন্দেহে আমর ইবন আস রাদিয়াল্লাহু আনহুর একটি বিরাট শ্রেষ্ঠত্ব। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতে তাদেরকেই আলেম বলেছেন, যারা আল্লাহ্ ও রাসূল বর্ণিত দৃষ্টান্তসমূহ বোঝে। আমর ইবনে মুররা বলেন, আমি যখন এমন কোন আয়াতে পৌঁছি, যা আমার বোধগম্য নয়, তখন মনে খুব দুঃখ পাই। কেননা, আল্লাহ্ বলেন: "এ সকল উদাহরণ আমি মানুষের জন্য দেই, কিন্তু জ্ঞানীরাই তা বোঝে"। [ইবন কাসীর]

خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیَةً لِّلْمُؤْمِنِیْنَ ﴿٤٤﴾

৪৪. আল্লাহ্ যথাযথভাবে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন[১]; এতে তো অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে মুমিনদের জন্য ।

পঞ্চম রুকূ'

اُتْلُ مَاۤ اُوْحِیَ اِلَیْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ

৪৫. আপনি[২] তেলাওয়াত করুন কিতাব থেকে যা আপনার প্রতি ওহী করা হয়[৩] এবং সালাত কায়েম করুন[৪] ।

(১) অর্থাৎ আল্লাহ্ আসমান ও যমীন যথাযথই সৃষ্টি করেছেন । তিনি কোন খেলাচ্ছলে তা সৃষ্টি করেন নি । [ইবন কাসীর] তিনি আসমান ও যমীন ইনসাফ ও আদলের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন । অথবা আয়াতের অর্থ, তিনি আসমান ও যমীন তাঁর কালেমা ও নির্দেশ দ্বারা সৃষ্টি করেছেন । অথবা আয়াতের অর্থ, তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, যখন সেটা সৃষ্টি করা ছিল যথাযথ । [ফাতহুল কাদীর]

(২) আপাত দৃষ্টিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে কিন্তু আসলে সমস্ত মুসলিমদেরকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে । এতে দু'টি অংশ আছে, কুরআন তেলাওয়াত ও সালাত কায়েম করা । কারণ এ দু'টি জিনিসই মুমিনকে এমন সুগঠিত চরিত্র ও উন্নতর যোগ্যতার অধিকারী করে যার সাহায্যে সে বাতিলের প্রবল বন্যা এবং দুষ্কৃতির ভয়াবহ ঝঞ্ঝার মোকাবিলায় সঠিক পথে থাকতে পারে । [দেখুন, আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

(৩) কুরআন তেলাওয়াতের এ শক্তি মানুষ তখনই অর্জন করতে পারে যখন সে কুরআনের শুধুমাত্র শব্দগুলো পাঠ করেই ক্ষান্ত হয় না বরং তার শিক্ষাগুলোও সঠিকভাবে অনুধাবন করে হৃদয়ের প্রতিটি তন্ত্রীতে সেগুলোকে সঞ্চারিত করে যেতে থাকে । আসলে যে তেলাওয়াতের পরে মানুষের মন-মানস, চিন্তা-চেতনা ও চরিত্র-কর্মনীতিতে কোন পরিবর্তন আসে না বরং কুরআন পড়ার পরও কুরআন যা নিষেধ করে মানুষ তা সব করে যেতে থাকে তা একজন মুমিনের কুরআন তেলাওয়াত হতেই পারে না । মূলত: কুরআনের হারামকৃত জিনিসকে যে হালাল করে নিয়েছে যে কুরআনের প্রতি ঈমানই আনেনি । এ অবস্থাটিকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি ছোট্ট বাক্যের মধ্য দিয়ে অত্যন্ত চমৎকারভাবে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছেনঃ "কুরআন তোমার পক্ষে বা বিপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ ।" [মুসলিম: ২২৩]

(৪) কুরআন তেলাওয়াতের পর দ্বিতীয় যে কাজটির প্রতি উম্মতকে অনুবর্তী করার নির্দেশ এখানে দেয়া হয়েছে তা হলো, সালাত । সালাতকে অন্যান্য ফরয কর্ম থেকে পৃথক করার এই রহস্যও বর্ণিত হয়েছে যে, সালাত স্বকীয়ভাবেও একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত এবং দ্বীনের স্তম্ভ । এর উপকারিতা এই যে, যে ব্যক্তি সালাত কায়েম করে, সালাত

وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾

নিশ্চয় সালাত বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে(১)। আর আল্লাহ্‌র স্মরণই তো সর্বশ্রেষ্ঠ(২)। তোমরা যা

তাকে অশ্লীল ও গর্হিত কার্য থেকে বিরত রাখে। [ইবন কাসীর] আয়াতে ব্যবহৃত 'ফাহ্‌শা' শব্দের অর্থ এমন সুস্পষ্ট মন্দ কাজ, যাকে প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই মন্দ মনে করে; যেমন ব্যভিচার, অন্যায় হত্যা, চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি। পক্ষান্তরে 'মুনকার' এমন কথা ও কাজকে বলা হয়, যার হারাম ও অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে শরী'আত বিশারদগণ একমত। [বাগভী; ফাতহুল কাদীর] 'ফাহ্‌শা' ও 'মুনকার' শব্দদ্বয়ের মধ্যে যাবতীয় অপরাধ এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য গোনাহ্‌ দাখিল হয়ে গেছে। যেগুলো স্বয়ং নিঃসন্দেহরূপে মন্দ এবং সৎকর্মের পথে সর্ববৃহৎ বাধা। সালাতের মাধ্যমে এ সকল বাধা দূরীভুত হয়।

(১) এখানে কেউ কেউ সন্দেহ করে যে, অনেক মানুষকে সালাতের অনুবর্তী হওয়া সত্বেও বড় বড় গুনাহে লিপ্ত থাকতে দেখা যায়। এটা আলোচ্য আয়াতের পরিপন্থী নয় কি? এর কয়েকটি জওয়াব দেয়া হয়। এক. প্রকৃত সালাত আদায়কারীকে সালাত অবশ্যই অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে দূরে রাখবে। হাসান ও কাতাদাহ বলেন, যার সালাত তাকে অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে দূরে রাখল না সে সালাত দ্বারা আল্লাহ্‌ থেকে দূরেই রয়ে গেল। [তাবারী] দুই. ইবন কাসীর বলেন, এর অর্থ যারা নিয়মিত সালাত আদায় করবে, তাদের এ অবস্থাটি তৈরী হবে। হাদীসে এসেছে, এক লোক রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল,অমুক লোক রাতে সালাত আদায় করে, আর সকাল হলে চুরি করে। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অচিরেই তার সালাত তাকে তা থেকে নিষেধ করবে। [মুসনাদে আহমাদ: ২/৪৪৭]

(২) অর্থাৎ আল্লাহ্‌র স্মরণ সর্বশ্রেষ্ঠ। এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। এক, আল্লাহ্‌র যিকির সবচেয়ে বড় ইবাদাত। সালাত বড় ইবাদাত হবার কারণ হচ্ছে, এতে আল্লাহর যিকির থাকে। সুতরাং যে সালাতে যিকির বেশী সে সালাত বেশী উত্তম। [ইবন কাসীর; মুয়াসসার] দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর স্মরণ অনেক বড় জিনিস, সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ। মানুষের কোন কাজ এর চেয়ে বেশী বড় নয়। [তাবারী] এর তৃতীয় অর্থ হচ্ছে, তোমার আল্লাহকে স্মরণ করার চাইতে আল্লাহ কর্তৃক তোমাকে স্মরণ করা অনেক বেশী বড় জিনিস। [তাবারী] কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন: "তোমরা আমাকে স্মরণ করো আমি তোমাদের স্মরণ করবো।" [সূরা আল-বাকারাহ: ১৫২] কাজেই বান্দা যখন সালাতে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করবে তখন অবশ্যই আল্লাহ্‌ও তাকে স্মরণ করবেন। আর বান্দার আল্লাহকে স্মরণ করার তুলনায় আল্লাহর বান্দাকে স্মরণ করা অনেক বেশী উচ্চমানের। বান্দা যখন আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে, তখন আল্লাহ্‌ ওয়াদা অনুযায়ী স্মরণকারী বান্দাকে ফেরেশতাদের সমাবেশেও স্মরণ করেন। আল্লাহ্‌র এ স্মরণ

কর আল্লাহ্ তা জানেন।

৪৬. আর তোমরা উত্তম পন্থা ছাড়া কিতাবীদের সাথে বিতর্ক করবে না[১], তবে তাদের সাথে করতে পার, যারা তাদের মধ্যে যুলুম করেছে[২]। আর

وَلَا تُجَادِلُوٓا أَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنۡهُمۡۖ وَقُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱلَّذِيٓ أُنزِلَ إِلَيۡنَا وَأُنزِلَ إِلَيۡكُمۡ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمۡ وَٰحِدٞ

ইবাদতকারী বান্দার সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত। এ স্থলে অনেক সাহাবী ও তাবেয়ী থেকে এই অর্থই বর্ণিত আছে। এই অর্থের দিক দিয়ে এতে এদিকেও ইঙ্গিত আছে যে, সালাত পড়ার মধ্যে গোনাহ্ থেকে মুক্তির আসল কারণ হল আল্লাহ্ স্বয়ং সালাত আদায়কারীর দিকে অভিনিবেশ করেন এবং ফেরেশতাদের সমাবেশে তাকে স্মরণ করেন। [দেখুন, বাগভী]

(১) অর্থাৎ কিতাবীদের সাথে উত্তম পন্থায় তর্ক-বিতর্ক কর। উদাহরণত: কঠোর কথাবার্তার জওয়াব নম্র ভাষায়, ক্রোধের জওয়াব সহনশীলতার সাথে এবং মূর্খতাসূলভ হট্টগোলের জওয়াব গাম্ভীর্যপূর্ণ কথাবার্তার মাধ্যমে দাও। বিতর্ক ও আলাপ-আলোচনা উপযুক্ত যুক্তি-প্রমাণ সহকারে, ভদ্র ও শালীন ভাষায় এবং বুঝবার ও বুঝাবার ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে করতে হবে। [ফাতহুল কাদীর] এর ফলে যার সাথে আলোচনা হয় তার চিন্তার সংশোধন হবে। প্রচারকের চিন্তা করা উচিত, তিনি শ্রোতার হৃদয় দুয়ার উন্মুক্ত করে সত্যকথা তার মধ্যে বসিয়ে দেবেন এবং তাকে সঠিক পথে আনবেন। পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে কিতাবীদের সাথে বিতর্ক-আলোচনা করার ব্যাপারে এ নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু এটা কেবলমাত্র বিশেষভাবে কিতাবীদের জন্য নয়। মুশরিকদের সাথেও তর্কের ব্যাপারে অনুরূপ নির্দেশ আছে। বরং দ্বীনের প্রচারের ক্ষেত্রে এটি একটি সাধারণ নির্দেশ। যেমন বলা হয়েছে, "আহ্বান করুন নিজের রবের পথের দিকে প্রজ্ঞা ও উৎকৃষ্ট উপদেশের মাধ্যমে এবং লোকদের সাথে উত্তম পদ্ধতিতে বিতর্ক-আলোচনা করুন।" [সূরা আন-নাহল: ১২৫] আরো বলা হয়েছে, "সুকৃতি ও দুষ্কৃতি সমান নয়। (বিরোধীদের আক্রমণ) প্রতিরোধ করুন উৎকৃষ্ট পদ্ধতিতে। আপনি দেখবেন এমন এক ব্যক্তি যার সাথে আপনার শত্রুতা ছিল সে এমন হয়ে গেছে যেমন আপনার অন্তরংগ বন্ধু।" [সূরা ফুসসিলাত: ৩৪] আরো এসেছে, "আপনি উত্তম পদ্ধতিতে দুষ্কৃতি নির্মূল করুন। আমরা জানি (আপনার বিরুদ্ধে) তারা যেসব কিছু তৈরী করে।" [সূরা আল-মুমিনূন: ৯৬] বলা হয়েছে, "ক্ষমার পথ অবলম্বন করুন, ভালো কাজ করার নির্দেশ দিন এবং মূর্খদেরকে এড়িয়ে চলুন। আর যদি (মুখে মুখে জবাব দেবার জন্য) শয়তান আপনাকে উসকানী দেয় তাহলে আল্লাহর আশ্রয় চান।" [সূরা আল-আ'রাফ: ১৯৯-২০০]

(২) অর্থাৎ যারা যুলুমের নীতি অবলম্বন করে তাদের সাথে তাদের যুলুমের প্রকৃতি বিবেচনা করে ভিন্ন নীতিও অবলম্বন করা যেতে পারে। এর অর্থ হচ্ছে, সবসময় সব অবস্থায় সব ধরনের লোকদের মোকাবিলায় নরম ও সুমিষ্ট স্বভাবের হয়ে থাকলে

وَّنَحۡنُ لَهٗ مُسۡلِمُوۡنَ۝

তোমরা বল, 'আমাদের প্রতি এবং তোমাদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে, তাতে আমরা ঈমান এনেছি। আর আমাদের ইলাহ্ ও তোমাদের ইলাহ্ তো একই। আর আমরা তাঁরই প্রতি আত্মসমর্পণকারী(১)।'

চলবে না। যেন মানুষ সত্যের আহ্বায়কের ভদ্রতাকে দুর্বলতা ও অসহায়তা মনে না করে বসে। ইসলাম তার অনুসারীদেরকে অবশ্যই ভদ্রতা, বিনয়, শালীনতা ও যুক্তিবাদিতার শিক্ষা দেয় কিন্তু হীনতা ও দীনতার শিক্ষা দেয় না। এ আয়াতে আল্লাহর পথে দাওয়াতের আরও একটি পদ্ধতির উল্লেখ করা হয়েছে। তা হলো, যারা যুলুম করে এবং সীমালজ্ঘন করবে তাদের সাথে তারা যে রকম ব্যবহার করবে সে রকম ব্যবহার করা বৈধ। সুতরাং যারা তোমাদের প্রতি যুলুম করে তোমাদের গাম্ভীর্যপূর্ণ নম্র কথাবার্তা এবং সুস্পষ্ট প্রমাণাদির মোকাবেলায় জেদ ও হঠকারিতা করে তাদেরকে কঠোর ভাষায় জওয়াব দেয়া যাবে, যদিও তখনো তাদের অসদাচরণের জওয়াবে অসদাচরণ না করা এবং যুলুমের জওয়াবে যুলুম না করাই শ্রেয়; যেমন কুরআনের অন্যান্য আয়াতে বলা হয়েছে: "তোমরা যদি তাদের কাছ থেকে অন্যায় অবিচারের সমান সমান প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তবে এরূপ করার অধিকার তোমাদের আছে, কিন্তু যদি সবর কর তবে এটা অধিক শ্রেয়। [সূরা আন-নাহল:১২৬] [দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] মুজাহিদ বলেন, এখানে যারা যুলুম করে বলে, সরাসরি যোদ্ধা কাফেরদের বোঝানো হয়েছে। তাদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করবে না তাদেরকে জিযিয়া দিতে হবে। জিযিয়া দিতে অস্বীকার করলে তাদের সাথে আর সাধারণ সুন্দর অবস্থা বিরাজ করবে না। [ইবন কাসীর]

(১) অর্থাৎ কিতাবধারীদের সাথে তর্ক বিতর্ক করার সময় তাদেরকে নিকটে আনার জন্যে তোমরা একথা বল যে, আমরা মুসলিমগণ সেই ওহীতেই বিশ্বাস করি, যা আমাদের নবীগণের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে এবং সে ওহীতেও বিশ্বাস করি, যা তোমাদের নবীদের মধ্যস্থতায় প্রেরিত হয়েছে। কাজেই আমাদের সহিত বিরোধিতার কোন কারণ নেই। এ বাক্যগুলোতে মহান আল্লাহ নিজেই উৎকৃষ্ট পদ্ধতিতে বিতর্ক-আলোচনার পথ-নির্দেশ দিয়েছেন। সত্য প্রচারের দায়িত্ব যারা গ্রহণ করেছেন তাদের এ পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত। এখানে শেখানো হয়েছে, যে ব্যক্তির সাথে তোমাকে বিতর্ক করতে হবে তার ভ্রষ্টতাকে আলোচনার সূচনা বিন্দুতে পরিণত করো না। বরং সত্য ও ন্যায়-নীতির যে অংশগুলোর তোমার ও তার মধ্যে সমভাবে বিরাজ করছে সেগুলো থেকে আলোচনা শুরু করো। অর্থাৎ বিরোধীয় বিন্দু থেকে আলোচনা শুরু না করে ঐক্যের বিন্দু থেকে শুরু করতে হবে। তারপর সেই সর্বসম্মত বিষয়াবলী থেকে যুক্তি পেশ করে শ্রোতাকে একথা বুঝাবার চেষ্টা করতে হবে যে, তোমার ও তার মধ্যে

৪৭. আর এভাবেই আমরা আপনার প্রতি কুরআন নাযিল করেছি[১] অতঃপর যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছিলাম তারা এর উপর ঈমান রাখে[২] । আর এদেরও[৩] কেউ কেউ এতে ঈমান রাখে । আর কাফিররা ছাড়া কেউই আমাদের নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে না ।

وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ ۚ فَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ ٱلْكِتَٰبَ يُؤْمِنُونَ بِهِۦ ۖ وَمِنْ هَٰٓؤُلَآءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِۦ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِـَٔايَٰتِنَآ إِلَّا ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿٤٧﴾

৪৮. আর আপনি তো এর আগে কোন কিতাব পড়েননি এবং নিজ হাতে কোন কিতাবও লেখেননি যে, বাতিলপন্থীরা সন্দেহ পোষণ করবে[৪] ।

وَمَا كُنتَ تَتْلُوا۟ مِن قَبْلِهِۦ مِن كِتَٰبٍ وَلَا تَخُطُّهُۥ بِيَمِينِكَ ۖ إِذًا لَّٱرْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿٤٨﴾

যেসব বিষয়ে বিরোধ রয়েছে সেগুলোতে তোমার অভিমত সর্বসম্মত ভিত্তিগুলোর সাথে সামঞ্জস্য রাখে এবং তার অভিমত হচ্ছে তার বিপরীতধর্মী । [দেখুন, আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

(১) এর দু'টি অর্থ হতে পারে । এক, যেভাবে পূর্ববর্তী নবীগণের প্রতি আমি কিতাব নাযিল করেছিলাম ঠিক তেমনিভাবে এ কিতাব আপনার প্রতি নাযিল করেছি । [তাবারী] দুই, আমি এই শিক্ষা সহকারেই একে নাযিল করেছি যে, আমার পূর্ববর্তী কিতাবগুলো অস্বীকার করে নয় বরং সেগুলোর সত্যায়ণকারী রূপেই নাযিল করেছি । [সা'দী]

(২) পূর্বাপর বিষয়বস্তু নিজেই একথা জানিয়ে দিচ্ছে যে, এখানে সমস্ত আহলে কিতাবের কথা বলা হয়নি । বরং এমন সব আহলে কিতাবের কথা বলা হয়েছে যারা আল্লাহর কিতাবের সঠিক জ্ঞান ও উপলব্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন । তাদের সামনে যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে পূর্ববর্তী কিতাবগুলোকে সত্যায়িত করে এ শেষ কিতাবটি এলো তখন তারা কোন প্রকার জিদ, হঠকারিতা ও সংকীর্ণ স্বার্থ প্রীতির আশ্রয় নিলেন না এবং তাকেও ঠিক তেমনি আন্তরিকতা সহকারে স্বীকার করে নিলেন যেমন পূর্ববর্তী কিতাবগুলোকে স্বীকার করতেন । যেমন আব্দুল্লাহ ইবন সালাম ও সালমান আল-ফারেসী এবং তাদের মত যারা ছিলেন । [ইবন কাসীর]

(৩) "এদের" শব্দের মাধ্যমে কুরাইশ ও অন্যান্য আরববাসীদের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে । [ইবন কাসীর] এর অর্থ হচ্ছে, সত্যপ্রিয় লোকেরা, তারা আহলে কিতাব বা অ-আহলে কিতাব যারাই হোক না কেন, সর্বত্রই এর প্রতি ঈমান আনছে ।

(৪) অর্থাৎ আপনি কুরআন নাযিল হওয়ার পূর্বে কোন কিতাব পাঠ করতেন না এবং কোন কিতাব লিখতেও পারতেন না; বরং আপনি ছিলেন নিরক্ষর । আল্লাহ্ তা'আলা

৪৯. বরং যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে বস্তুত তাদের অন্তরে এটা স্পষ্ট নিদর্শন[১]।

بَلْ هُوَ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ فِيْ صُدُوْرِ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুওয়ত প্রমাণ করার জন্যে যেসব সুস্পষ্ট মু'জিযা প্রকাশ করেছেন, তন্মধ্যে তাকে পূর্ব থেকে নিরক্ষর রাখাও অন্যতম। এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের সপক্ষে একটি যুক্তি। তার স্বদেশবাসী ও আত্মীয়-বান্ধবগন, যাদের মধ্যে তিনি শৈশব থেকে প্রৌঢ়ত্ব পর্যন্ত জীবনকাল অতিবাহিত করেছিলেন, সবাই ভালোভাবে জানতো তিনি সারা জীবন কখনো কোন বই পড়েননি এবং কলম হাতে ধরেননি। [দেখুন, ইবন কাসীর] এ সত্য ঘটনাটি পেশ করে মহান আল্লাহ বলছেন, এটি একথার সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, আসমানী কিতাবসমূহের শিক্ষাবলী, পূর্ববর্তী নবীগণের অবস্থা, বিভিন্ন ধর্ম ও দ্বীনের আকীদা-বিশ্বাস, প্রাচীন জাতিসমূহের ইতিহাস এবং সভ্যতা, সংস্কৃতি ও মানবিক জীবন যাপনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী সম্পর্কে যে গভীর ও ব্যাপক জ্ঞানের প্রকাশ ও নিরক্ষর নবীর কণ্ঠ থেকে হচ্ছে তা তিনি অহী ছাড়া আর অন্য কোন উপায়ে অর্জন করতে পারতেন না। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর] যদি তিনি লেখাপড়া জানতেন তবে হয়ত কেউ বলতে পারত যে, তিনি আগেকার নবীদের কোন কিতাব থেকে শিখে নিয়ে তা মানুষদের মধ্যে প্রচার করছেন। তবে মক্কার কিছু লোক রাসূলের নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও একথা বলতে ছাড়েনি যে, তিনি কারও কাছ থেকে লিখে নিয়ে তা সকাল বিকাল পড়ে শোনাচ্ছেন। যেমন তারা বলেছিল, "তারা আরও বলে, 'এগুলো তো সে কালের উপকথা, যা সে লিখিয়ে নিয়েছে; তারপর এগুলো সকাল-সন্ধ্যা তার কাছে পাঠ করা হয়।" [সূরা আল-ফুরকান: ৫] এর জওয়াবে আল্লাহ্ বলেন, "বলুন, 'এটা তিনিই নাযিল করেছেন যিনি আসমানসমূহ ও যমীনের সমুদয় রহস্য জানেন; নিশ্চয়ই তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" [সূরা আল-ফুরকান: ৬]

(১) অর্থাৎ বলা হয়েছে যে, "বরং যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে বস্তুত তাদের অন্তরে এটা স্পষ্ট নিদর্শন।" অর্থাৎ এ কুরআন তার যাবতীয় আদেশ-নিষেধ ও সংবাদে হকের উপর প্রমাণবহ হওয়ার দিক থেকে সুস্পষ্ট নিদর্শন। আলেমগণ এটাকে তাদের বক্ষে সংরক্ষণ করেন। আল্লাহ্ তা'আলা এটা মুখস্থ, তেলাওয়াত ও তাফসীর সহজ করে দিয়েছেন। এ সবই এ কুরআনের জন্য বিরাট নিদর্শন। যেমন অন্য আয়াতে বলেছেন, "আর অবশ্যই আমরা কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?" [সূরা আল-কামার: ১৭] অনুরূপ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও বলেছেন, "প্রত্যেক নবীকেই এমন কিছু নিদর্শন দেয়া হয়, যা দেখে মানুষ তার উপর ঈমান আনে। আমাকে দেয়া হয়েছে ওহী। যা আল্লাহ্ আমার কাছে ওহী করেছেন। আমি আশা করব যে তাদের থেকেও বেশী অনুসারী পাব।" [বুখারী: ৪৯৮১; মুসলিম: ১৫২] [ইবন কাসীর] অথবা আয়াতের অর্থ, একজন নিরক্ষরের পক্ষে কুরআনের মতো একটি কিতাব পেশ করা এবং সহসা এমনসব অসাধারণ বিস্ময়কর ঘটনাবলীর প্রকাশ ঘটানো, যেগুলোর জন্য

وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا الظّٰلِمُوْنَ ﴿٤٩﴾

আর শুধু যালিমরাই আমাদের নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করে।

وَقَالُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيٰتٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَاِنَّمَآ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٥٠﴾

৫০. তারা আরও বলে, 'তার রব- এর কাছ থেকে তার কাছে নিদর্শনসমূহ নাযিল হয় না কেন?' বলুন, 'নিদর্শনসমূহ তো আল্লাহ্‌রই কাছে। আর আমি তো একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী মাত্র।'

اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَرَحْمَةً وَّذِكْرٰى لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٥١﴾

৫১. এটা কি তাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, আমরা আপনার প্রতি কুরআন নাযিল করেছি, যা তাদের কাছে পাঠ করা হয়[১]। এতে তো অবশ্যই অনুগ্রহ ও উপদেশ রয়েছে সে সম্প্রদায়ের জন্য, যারা ঈমান আনে।

ষষ্ঠ রুকূ'

قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ شَهِيْدًا ۚ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوْا بِاللّٰهِ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٥٢﴾

৫২. বলুন, 'আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। আসমানসমূহ ও যমীনে যা আছে তা তিনি জানেন। আর যারা বাতিলে বিশ্বাস করে ও আল্লাহ্‌র সাথে কুফরী করে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।'

পূর্বাহ্নে প্রস্তুতি গ্রহণ করার কোন উদ্যোগ আয়োজন কখনো কারো চোখে পড়েনি, এগুলোই বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ লোকদের দৃষ্টিতে তার নবুওয়াতের প্রমাণ পেশকারী উজ্জ্বলতম নিদর্শন। [আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর] পূর্ববর্তী আহলে কিতাবদের কাছেও এটা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তের প্রমাণ। [তাবারী]

(১) অর্থাৎ তিনি নিরক্ষর হওয়া সত্বেও এই যে অপারগকারী কিতাব নিয়ে এসেছেন, যার মোকাবিলা কারও পক্ষে সম্ভব হয়নি, এটাই তো তাদের নিদর্শনের জন্য যথেষ্ট। এ কিতাবে রয়েছে পূর্ববর্তীদের খবর, পরবর্তীদের খবর, তাদের মধ্যে ঘটে যাওয়া ব্যাপারসমূহের সঠিক ফয়সালা। তারপরও তারা কেন নিদর্শনের জন্য পীড়াপীড়ি করছে? [ইবন কাসীর]

৫৩. আর তারা আপনাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে। আর যদি নির্ধারিত কাল না থাকত তবে শাস্তি অবশ্যই তাদের উপর আসত। আর নিশ্চয় তাদের উপর শাস্তি আসবে আকস্মিকভাবে, অথচ তারা উপলব্ধিও করবে না।

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ۚ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٣﴾

৫৪. তারা আপনাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে, আর জাহান্নাম তো কাফিরদেরকে পরিবেষ্টন করবেই।

يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿٥٤﴾

৫৫. সেদিন শাস্তি তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে তাদের উপর থেকে ও তাদের নীচ থেকে। আর তিনি বলবেন, 'তোমরা যা করতে তা আস্বাদন কর।'

يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٥﴾

৫৬. হে আমার মুমিন বান্দাগণ! নিশ্চয় আমার যমীন প্রশস্ত; কাজেই তোমরা আমারই 'ইবাদাত কর[১]।

يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

৫৭. জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণকারী; তারপর তোমরা আমাদেরই কাছে

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۖ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٥٧﴾

(১) আলোচ্য আয়াতে মুসলিমগণের জন্যে কাফেরদের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা করা, সত্য প্রচার করা এবং দুনিয়াতে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার একটি কৌশল বর্ণনা করা হয়েছে। এই কৌশলের নাম 'হিজরত' তথা দেশত্যাগ। অর্থাৎ যে দেশে সত্যের বিরুদ্ধে কথা বলতে ও কাজ করতে বাধ্য হতে হয়, সেই দেশ পরিত্যাগ করা। আল্লাহ্ বলেছেন, আমার পৃথিবী প্রশস্ত। কাজেই কারও এই ওযর গ্রহণ করা হবে না যে, অমুক শহরে অথবা দেশে কাফেররা প্রবল ছিল বিধায় আমরা তাওহীদ ও ইবাদাত পালনে অপারগ ছিলাম। তাদের উচিত, যে দেশে কুফর ও অবাধ্যতা করতে বাধ্য করা হয়, আল্লাহ্র জন্যে সেই দেশ ত্যাগ করা এবং এমন কোন স্থান তালাশ করা, যেখানে স্বাধীন ও মুক্ত পরিবেশে আল্লাহ্র নির্দেশাবলী নিজেরাও পালন করতে পারে এবং অপরকেও উদ্বুদ্ধ করতে পারে। আর এজন্যই সাহাবায়ে কিরাম হাবশায় হিজরত করেছিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও অন্য সাহাবীগণ মদীনায় হিজরত করেছিলেন। [দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

প্রত্যাবর্তিত হবে[১]।

৫৮. আর যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে আমরা অবশ্যই তাদের বসবাসের জন্য সুউচ্চ প্রাসাদ দান করব জান্নাতে, যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত[২], সেখানে তারা স্থায়ী হবে, কত উত্তম প্রতিদান সে সকল কর্মশীলদের জন্য,

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿٥٨﴾

৫৯. যারা ধৈর্য ধারণ করে[৩] এবং তাদের

الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٥٩﴾

(১) হিজরতের পথে প্রথম বাধা হলো, মৃত্যুর ভয়। স্বদেশ পরিত্যাগ করে অন্যত্র যাবার মধ্যে মানুষ প্রথম যে সমস্যাটির সম্মুখীন হয় তা হলো, নিজের প্রাণের আশংকা। স্বদেশ ত্যাগ করে অন্যত্র রওয়ানা হলে পথিমধ্যে স্থানীয় কাফেরদের সাথেও প্রাণঘাতী সংঘর্ষের আশংকা বিদ্যমান থাকে। আয়াতে এই আশংকার জওয়াব দেয়া হয়েছে যে, জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। কেউ কোথাও কোন অবস্থাতেই মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পাবে না। কাজেই মৃত্যুর ভয়ে অস্থির হওয়া মুমিনের কাজ হতে পারে না। তাই স্বস্থানে থাকা অথবা হিজরত করে অন্যত্র চলে যাওয়ার মধ্যে মৃত্যুর ভয় অন্তরায় না হওয়া উচিত। [ফাতহুল কাদীর] বিশেষত: আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী পালন করা অবস্থায় মৃত্যু আসা চিরস্থায়ী সুখ ও নেয়ামতের কারণ। আখেরাতে এই সুখ ও নেয়ামত পাওয়া যাবে। তাই প্রাণের কথা ভেবে ঈমান ও হিজরত থেকে পিছপা হয়ো না।

(২) সে সমস্ত প্রাসাদ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: 'নিশ্চয় জান্নাতে এমন প্রাসাদ আছে যার অভ্যন্তর থেকে বাইরের অংশ দেখা যায় আর বাইরের অংশ থেকে অভ্যন্তরের অংশ দেখা যায়। আল্লাহ্ তা তাদের জন্যই তৈরী করেছেন যারা খাবার খাওয়ায়, নরমভাবে কথা বলে, পরপর সাওম রাখে আর মানুষের নিদ্রাবস্থায় সে সালাত আদায় করে।' [মুসনাদ:৫/৩৪৩]

(৩) অর্থাৎ যারা সব রকমের সমস্যা, সংকট, বিপদ-আপদ, ক্ষতি ও কষ্টের মোকাবিলায় ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। যারা ঈমান আনার বিপদ নিজের মাথায় তুলে নিয়েছে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়নি। ঈমান ত্যাগ করার পার্থিব উপকারিতা ও মুনাফা যারা নিজের চোখে দেখেছে কিন্তু এরপরও তার প্রতি সামান্যতমও ঝুঁকে পড়েনি। যারা কাফের ও ফাসেকদেরকে নিজেদের সামনে ফুলে ফেঁপে উঠতে দেখেছে এবং তাদের ধন-দৌলত ও ক্ষমতা-প্রতিপত্তির দিকে ভুলেও নজর দেয়নি। একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য, তাঁর কাছে যা আছে তা পাবার আশায়, তাঁর ওয়াদার সত্যতায় বিশ্বাসী হয়ে আল্লাহ্‌র পথে হিজরত করেছে, শত্রুদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেছে। পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে এসেছে, তাদের জন্যই স্থায়ী জান্নাত রয়েছে। [দেখুন, ইবন কাসীর]

রব-এর উপরই তাওয়াক্কুল করে[১]।

৬০. আর এমন কত জীবজন্তু রয়েছে যারা নিজেদের রিযিক মজুদ রাখে না। আল্লাহ্ই রিযিক দান করেন তাদেরকে ও তোমাদেরকে; আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ[২]।

وَكَأَيِّن مِّن دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٦٠﴾

(১) অর্থাৎ যারা নিজেদের সহায়-সম্পত্তি, কাজ-কারবার ও বংশ-পরিবারের ওপর ভরসা করেনি বরং দ্বীন ও দুনিয়ার প্রতিটি কাজে নিজেদের রবের ওপর ভরসা করেছে। তারাই উক্ত জান্নাতের অধিকারী। [দেখুন, ইবন কাসীর] যারা দুনিয়াবী উপায়-উপাদানের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে নিছক নিজেদের রবের ভরসায় ঈমানের খাতিরে প্রত্যেকটি বিপদ সহ্য করার জন্য তৈরী হয়ে যায় এবং সময় এলে বাড়িঘর ছেড়ে বের হয়ে পড়ে। যারা নিজেদের রবের প্রতি এতটুকু আস্থা রাখে যে, ঈমান ও নেকীর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার প্রতিদান তাঁর কাছে কখনো নষ্ট হবে না এবং বিশ্বাস রাখে যে, তিনি নিজের মুমিন ও সৎকর্মশীল বান্দাদেরকে এ দুনিয়ায় সহায়তা দান করবেন এবং আখেরাতেও তাদের কার্যক্রমের সর্বোত্তম প্রতিদান দেবেন।

(২) হিজরতের পথে দ্বিতীয় আশংকা এই যে, অন্য দেশে যাওয়ার পর রুযী রোজগারের কি ব্যবস্থা হবে? জন্মস্থানে তো মানুষ কিছু পৈতৃক সম্পত্তি, কিছু নিজের উপার্জন দ্বারা বিষয়-সম্পত্তির ব্যবস্থা করে থাকে। হিজরতের সময় এগুলো সব এখানে থেকে যাবে। কাজেই পরবর্তী পর্যায়ে জীবননির্বাহ কিরূপে হবে? এ আয়াতসমূহে এর জওয়াব দেয়া হয়েছে যে, অর্জিত আসবাবপত্রকে রিযিকের যথেষ্ট কারণ মনে করা ভুল। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলাই রিযিক দান করেন। তিনি ইচ্ছা করলে বাহ্যিক আয়োজন ছাড়াও রিযিকদান করেন এবং ইচ্ছা না করলে সব আয়োজন সত্ত্বেও মানুষ সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকতে পারে। প্রমাণস্বরূপ প্রথম বলা হয়েছে, চিন্তা কর, পৃথিবীতে বিচরণকারী এমন হাজারো জীব-জন্তু আছে যারা খাদ্য সঞ্চয় করার কোন ব্যবস্থা করে না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা নিজ কৃপায় প্রত্যহ তাদেরকে খাদ্য সরবরাহ করেন। পৃথিবীর অসংখ্য ও অগণিত প্রকার জীব-জন্তুর মধ্যে অধিকাংশের অবস্থা এই যে, তারা খাদ্য সংগ্রহ করার পর আগামীকালের জন্যে তা সঞ্চিত রাখে না এবং এর প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জামও তাদের নেই। [দেখুন, ইবন কাসীর] হাদীসে আছে, 'পক্ষীকূল সকালে ক্ষুধার্ত অবস্থায় বাসা থেকে বের হয় এবং সন্ধ্যায় উদরপূর্তি করে ফিরে আসে।' [তিরমিযী: ২৩৪৪] অথচ তাদের না আছে ক্ষেত-খলা, না আছে জমি ও বিষয়-সম্পত্তি। তারা কোন কারখানা অথবা অফিসের কর্মচারীও নয়। তারা আল্লাহ্ তা'আলার উন্মুক্ত পৃথিবীতে বিচরণ করে এবং পেটভর্তি খাদ্যলাভ করে। এটা একদিনের ব্যাপার নয়। বরং তাদের আজীবন কর্মধারা।

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ فَأَنّٰى يُؤْفَكُونَ ۝٦١

৬১. আর যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, 'কে আসমানসমূহ ও যমীনকে সৃষ্টি করেছেন এবং চন্দ্র-সূর্যকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন?' তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ্'। তাহলে কোথায় তাদের ফিরানো হচ্ছে!

اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ ۚ إِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝٦٢

৬২. আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছে তার রিযিক বাড়িয়ে দেন এবং যার জন্য ইচ্ছে সীমিত করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত।

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ ۚ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۝٦٣

৬৩. আর যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, 'আকাশ হতে বারি বর্ষণ করে কে ভূমিকে সঞ্জীবিত করেন তার মৃত্যুর পর?' তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ্'। বলুন, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্রই'(১)। কিন্তু তাদের অধিকাংশই এটা অনুধাবন করে না।

সপ্তম রুকূ'

وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ إِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ ۚ وَإِنَّ الدَّارَ

৬৪. আর এ দুনিয়ার জীবন তো খেল-তামাশা ছাড়া কিছুই নয়(২)। আর

(১) এখানে "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য" শব্দগুলোর দু'টি অর্থ প্রকাশিত হচ্ছে। একটি অর্থ হচ্ছে, এসব যখন আল্লাহরই কাজ তখন একমাত্র তিনিই প্রশংসার অধিকারী। অন্যেরা প্রশংসা লাভের অধিকার অর্জন করলো কোথায় থেকে ? দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে, আল্লাহর শোকর, তোমরা নিজেরাও একথা স্বীকার করছো। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

(২) এ আয়াতে পার্থিবজীবন ক্রীড়াকৌতুক বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, ক্রীড়াকৌতুকের যেমন কোন স্থিতি নেই এবং এর দ্বারা কোন বড় সমস্যার সমাধান হয় না, অল্পক্ষণ পরেই সব তামাশা খতম হয়ে যায়, পার্থিব জীবনের অবস্থাও তদ্রূপ। পার্থিব জীবনের বাস্তবতা শুধুমাত্র এতটুকুই যেমন ছোট ছেলেরা কিছুক্ষণের জন্য নেচে গেয়ে

الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٦٤﴾

আখেরাতের জীবনই তো প্রকৃত জীবন(১), যদি তারা জানত!

فَاِذَا رَكِبُوْا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ فَلَمَّا نَجّٰىهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٥﴾

৬৫. অতঃপর তারা যখন নৌযানে আরোহণ করে, তখন তারা আনুগত্যে বিশুদ্ধ হয়ে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌কে ডাকে। তারপর তিনি যখন স্থলে ভিড়িয়ে তাদেরকে উদ্ধার করেন, তখন তারা শির্কে লিপ্ত হয়(২);

আমোদ করে এবং তারপর যার যার ঘরে চলে যায়। জীবনের কোন একটি আকৃতিও এখানে স্থায়ী ও চিরন্তন নয়। যে যে অবস্থায়ই আছে সাময়িকভাবে একটি সীমিত সময়কালের জন্যই আছে। [দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(১) অর্থাৎ যদি তারা একথা জানতো, এ দুনিয়ার জীবন একটি পরীক্ষার অবকাশ মাত্র এবং মানুষের জন্য আসল জীবন, যা চিরকাল স্থায়ী হবে, তা হচ্ছে আখেরাতের জীবন, তাহলে তারা এখানে পরীক্ষার সময়-কালকে খেলা-তামাশায় নষ্ট না করে এর প্রতিটি মুহূর্ত এমনসব কাজে ব্যবহার করতো যা সেই চিরন্তন জীবনের জন্য উৎকৃষ্ট ফলদায়ক হতো। দুনিয়ার জীবনের উপর আখেরাতের জীবনকে প্রাধান্য দিত। [দেখুন, ইবন কাসীর]

(২) এ আয়াতে মুশরিকদের একটি মন্দ অবস্থা এই বর্ণিত হয়েছে যে, তারা জগৎ সৃষ্টির কাজে আল্লাহ্‌কে একক স্বীকার করা সত্ত্বেও ইবাদতে প্রতিমাদেরকে অংশীদার মনে করে। তাদের এই অবস্থার চাইতেও আশ্চর্যজনক অবস্থা এই যে, তাদের উপর যখন কোন বড় বিপদ পতিত হয়, তখনও তারা বিশ্বাস ও স্বীকার করে যে, এ ব্যাপারে কোন প্রতিমা আমাদের সাহায্যকারী হতে পারে না। বিপদ থেকে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই উদ্ধার করতে পারেন। তাহলে সবসময় তাঁকেই কেন ডাকা হয় না? [দেখুন, ইবন কাসীর] উদাহরণস্বরূপ বলা হয়েছে যে, তারা যখন সমুদ্রে ভ্রমণরত থাকে এবং জাহাজ নিমজ্জিত হওয়ার আশংকা দেখা দেয়, তখন এই আশংকা দূর করার জন্যে কোন প্রতিমাকে ডাকার পরিবর্তে তারা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাকেই ডাকে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অসহায়ত্ব এবং সাময়িকভাবে জগতের সব অবলম্বন থেকে বিচ্ছিন্নতার ভিত্তিতে তাদের দো'আ কবুল করেন এবং উপস্থিত ধ্বংসের কবল থেকে উদ্ধার করেন। কিন্তু যালেমরা যখন তীরে পৌছে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে, তখন পুনরায় প্রতিমাদেরকে শরীক বলতে শুরু করে। ফলে এর মাধ্যমে তারা আল্লাহ্‌র নেয়ামতের সাথে কুফরি করে। তাই তারা কিছু দিন ভোগ করে নিক। অচিরেই তারা জানতে পারবে।

৬৬. আমরা তাদেরকে যা দিয়েছি, তার সাথে কুফরী করার এবং ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকার উদ্দেশ্যে; সুতরাং শীঘ্রই তারা জানতে পারবে ।

لِيَكْفُرُوا بِمَآ اٰتَيْنٰهُمْ ۚ وَلِيَتَمَتَّعُوا ۗ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿٦٦﴾

৬৭. তারা কি দেখে না আমরা 'হারাম'কে নিরাপদ স্থান করেছি, অথচ এর চারপাশে যেসব মানুষ আছে, তাদের উপর হামলা করা হয় । তবে কি তারা বাতিলকে স্বীকার করবে, আর আল্লাহ্‌র নেয়ামতকে অস্বীকার করবে[১]?

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اٰمِنًا وَّيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ۗ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَكْفُرُوْنَ ﴿٦٧﴾

৬৮. আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা রটনা করে অথবা তাঁর কাছ থেকে সত্য আসার পর তাতে মিথ্যারোপ করে, তার চেয়ে বেশী যালিম আর কে[২]?

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهٗ ۗ اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكٰفِرِيْنَ ﴿٦٨﴾

---

(১) কোন কোন মুশরিকের এক অজুহাত এরূপও পেশ করা হত যে, তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আনীত দ্বীনকে সত্য ও সঠিক বলে বিশ্বাস করে; কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করার মধ্যে তারা তাদের প্রাণনাশের আশংকা অনুভব করে । কারণ, সমগ্র আরব ইসলামের বিরোধী । তারা মুসলিম হয়ে গেলে অবশিষ্ট আরব তাদেরকে দেশ থেকে উচ্ছেদ করবে এবং প্রাণে বধ করবে । এর জওয়াবে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন যে, তাদের এই অজুহাতও অন্তঃসার শূন্য । আল্লাহ্ তা'আলা বায়তুল্লাহ্‌র কারণে মক্কাবাসীদেরকে এমন মাহাত্ম্য দান করেছেন, যা পৃথিবীর কোন স্থানের অধিবাসীদের ভাগ্যে জুটেনি । আল্লাহ্ বলেন, আমি সমগ্র মক্কাভূমিকে হারাম তথা নিরাপদ আশ্রয়স্থল করে দিয়েছি । মুমিন, কাফের নির্বিশেষে আরবের বাসিন্দারা সবাই হারামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এতে খুন-খারাবি হারাম মনে করে । মানুষ তো মানুষ, এখানে শিকার বধ করা এবং বৃক্ষ কর্তন করাও সবার মতে অবৈধ । বহিরাগত কোন ব্যক্তি হারামে প্রবেশ করলে সে-ও হত্যার কবল থেকে নিরাপদ হয়ে যায় । অতএব মক্কার বাসিন্দারা যদি ইসলাম গ্রহণ করার ক্ষেত্রে প্রাণনাশের আশংকা আছে বলে অজুহাত পেশ করে, তবে সেটা খোঁড়া অজুহাত বৈ নয় । [দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(২) অর্থাৎ নবী রিসালাতের দাবী করেছেন এবং তোমরা তা প্রত্যাখ্যান করেছো । এখন বিষয়টি দু'টি অবস্থা থেকে মুক্ত নয় । নবী যদি আল্লাহর নাম নিয়ে মিথ্যা দাবী করে থাকেন, তাহলে তার চেয়ে বড় যালেম আর কেউ নেই । আর যদি তোমরা সত্য নবীর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে থাক, তাহলে তোমাদের চেয়ে বড় যালেম আর কেউ নেই । [ইবন কাসীর]

জাহান্নামের মধ্যেই কি কাফিরদের আবাস নয়?

৬৯. আর যারা আমাদের পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়, আমরা তাদেরকে অবশ্যই আমাদের পথসমূহের হিদায়াত দিব[১]। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ মুহসিনদের সঙ্গে আছেন[২]।

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾

(১) جهاد ও مجاهدة এর আসল অর্থ দ্বীনের পথে বাধা বিপত্তি দূর করার জন্যে পূর্ণ শক্তি ব্যয় করা। এখানে এ নিশ্চয়তা দান করা হচ্ছে যে, যারা আল্লাহর পথে আন্তরিকতা সহকারে পূর্ণ শক্তি ব্যয় করবে তাদেরকে মহান আল্লাহ্ তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দেন না। বরং তিনি তাদেরকে পথ দেখান এবং তাঁর দিকে যাওয়ার পথ তাদের জন্য খুলে দেন। তারা তাঁর সন্তুষ্টি কিভাবে লাভ করতে পারে তা তিনি প্রতি পদে পদে তাদেরকে জানিয়ে দেন। এই আয়াতের তফসীরে ফুদাইল ইবন আয়াদ বলেন, যারা বিদ্যার্জনে ব্রতী হয়, আমি তাদের জন্য আমলও সহজ করে দেই। [বাগভী]

(২) আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বান্দার সঙ্গে থাকা দু ধরনের। এক. মুমিন, কাফির নির্বিশেষে সবার সঙ্গে থাকার অর্থ হচ্ছে তাদের সম্পর্কে পরিপূর্ণ জানা, তাদেরকে পর্যবেক্ষনে রাখা ও নিয়ন্ত্রণ করা। দুই. মুমিন, মুহসিন, মুত্তাকীদের সাথে থাকা। তাদের সঙ্গে থাকার অর্থ হচ্ছে, তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করা, তাদের হেফাযত করা। তাছাড়া তাদের সম্পর্কে জানা, দেখা, পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ তো আছেই। তবে এটা অবশ্যই ঈমান রাখতে হবে যে, মহান আল্লাহ্ তাঁর আরশের উপরেই আছেন।

৩০- সূরা আর-রূম
৬০ আয়াত, মক্কী

سُورَةُ الرُّومِ

। । রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে । ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আলিফ-লাম-মীম,

الٓمٓ ۝١

২. রোমক[১]রা পরাজিত হয়েছে---

غُلِبَتِ الرُّوْمُ ۝٢

(১) রোম বা রোমান কারা? ইবন কাসীর বলেন, ঈসু ইবনে ইসহাক ইবনে ইবরাহীমের বংশধরদেরকে রোম বলা হয়। যারা বনী-ইসরাঈলদের চাচাতো ভাইদের গোষ্ঠী। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এ আয়াতে 'রোম' বলে কাদেরকে বোঝানো হয়েছে? বস্তুত: আরবদের ভাষায় রোম বলতে দু'টি সম্প্রদায় থেকে উত্থিত একটি বিরাট জাতিকে বুঝায়। একদিকে গ্রীক, শ্লাভ সম্প্রদায়ভুক্ত রোমান, অপরদিকে লাতিন ভাষাভাষী ইতালিয়ান রোমান। যারা পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে আছে। তাদের মিশ্রণে একটি রাষ্ট্র গড়ে উঠে। যার কিছু অংশ ইউরোপে আর কিছু অংশ এশিয়া মাইনরে। এই পুরো মিশ্রিত জাতিটাকেই আরবরা 'রোম' জাতি নামে অভিহিত করত। তবে মূল ল্যাটিন রোমানরা সবসময় স্বতন্ত্র ছিল। [আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর] তাদেরকে 'বনুল আসফার' বা হলুদ রংয়ের সন্তানও বলা হয়। তারা গ্রীকদের ধর্মমতে বিশ্বাসী ছিল। আর গ্রীকরা সাতটি বিখ্যাত তারকার পূজারী ছিল। ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মের ৩০০ বছর (মতান্তরে ৩২২ বছর) পর্যন্ত রোমরা গ্রীকদের ধর্মমতের উপরই ছিল। তাদের রাজত্ব শাম তথা বর্তমান সিরিয়া, ফিলিস্তিন সহ জাযীরা তথা আরব সাগরীয় উপদ্বীপের এলাকাসমূহে বিস্তৃত ছিল। এ অংশের রাজাকে বলা হতো: কায়সার। তাদের রাজাদের মধ্যে প্রথম যে ব্যক্তি নাসারাদের ধর্মে প্রবেশ করে সে হচ্ছে, সম্রাট কন্সটান্টাইন ইবন অগাস্টি। তার মা তার আগেই নাসারা হয়েছিল। সে তাকে নাসারা ধর্ম গ্রহণের আহ্বান জানালে সে তা গ্রহণ করে। তার সময়ে নাসারাদের মধ্যে মতবিরোধ চরম আকার ধারণ করে। পরস্পর বিরোধিতা এমন পর্যায় পৌঁছেছিল যে, তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন সম্ভব ছিল না। তখন ৩১৮ জন ধর্মীয় নেতা একত্রিত হয়ে কন্সটান্টাইনের জন্য এক প্রকার আকীদা বিশ্বাসের ভিত রচনা করে দেয়। যেটাকে তারা "প্রধান আমানত" বলে অভিহিত করে থাকে। বস্তুত তা ছিল নিকৃষ্টতম খিয়ানত। আর তারা তার জন্য আইনের বই রচনা করে। যাতে প্রয়োজনীয় হালালকে হারাম, আর হারামকে হালাল করে নেয়। এভাবে তারা মসীহ ঈসা আলাইহিস সালামের দ্বীন পরিবর্তন করে নেয়, তাতে কোথাও বাড়িয়ে নেয় আবার কোথাও কমিয়ে নেয়। আর তখনই তারা পূর্বদিকে ফিরে সালাত আদায় করা আবিস্কার করে, শনিবারের পরিবর্তে রবিবারকে সম্মানিত দিন ঘোষণা করে, ক্রুশের ইবাদাত চালু করে, শুকর হালাল করে দেয়, নতুন নতুন ঈদের প্রচলন করে, যেমন ক্রুশ দিবসের ঈদ, কাদ্দাস বা পবিত্র ঈদ, গাতাস ঈদ ইত্যাদি। তারা এর জন্য পোপ

সিষ্টেম চালু করে। যে হবে তাদের নেতা। তার নীচে থাকবে বাতারেকা (কার্ডিনেল), তার নীচে মাতারেনা, তার নীচে উসকুফ (বিশপ)ও কিসসিস (পাদ্রী), তার নীচে শামামিছাহ (ডিকন)। তাছাড়া তারা বৈরাগ্যবাদ চালু করে। বাদশাহ তখন তাদের জন্য রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে গীর্জা ও ইবাদাতখানা তৈরী করে দেয়। আর তার নামের সাথে সংশ্লিষ্ট করে এক নগরীর পত্তন করে তার নাম দেয়া হয়, কন্সটান্টিনোপল। বলা হয়ে থাকে যে, সে রাজ্যে বার হাজার গীর্জা তৈরী করে। বেথেলহামকে তিন মিহরাব বিশিষ্ট ইবাদাতখানা তৈরী করে। তার মা তৈরী করে কুমামাহ গীর্জা। এ দলটিকেই বলা হয়, আল-মালাকিয়্যাহ, যারা বাদশাহর দলভুক্ত লোক। তারপর তাদের থেকে ইয়া'কুবীয়্যাহ সম্প্রদায় বের হয়। যারা ছিল ইয়া'কূব আল-ইসকাফ এর অনুসারী। তারপর তাদের থেকে বের হয় নাসতুরীয়্যাহ সম্প্রদায়। যারা নাসতূরা এর অনুসারী ছিল। তাদের দলের কোন কূল কিনারা নেই। যেমন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "নাসারারা ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছে" [আবু দাউদ: ৪৫৯৭] মোটকথা: তখন থেকে সে দেশের রাজারা খৃষ্টান ধর্মমতের উপর ছিল। যখনই কোন কায়সার মারা যেত, তার স্থানে অন্য কায়সার আসত। অবশেষে যে ছিল তার নাম ছিল হিরাক্লিয়াস। [ইবন কাসীর]

এ মিশ্রিত জাতির অর্থাৎ গ্রীক শ্লাভ ও এশিয়া মাইনরের জাতিদের সাথে মিশ্রিত হয়ে যে নব্য রোমান সমাজ সৃষ্টি হয়েছে তাদের সাথে মূল ইতালিয়ান রোমানদের সংযুক্তির কারণ হচ্ছে, সম্রাট ইউলিয়ূস তার দিগ্বিজয়ী আগ্রাসনে ইতালিয়ান রোমান এলাকা থেকে বের হয়ে এশিয়া মাইনর ও মধ্য এশিয়ার কোন কোন অঞ্চল যেমন ইরাক ও আরমেনিয়া, অনুরূপভাবে মিশর পর্যন্ত তার সম্রাজ্য বিস্তৃত করে। অন্যদিকে শ্লাভদের এলাকা সহ বসফরাসের তীরবর্তী বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। মসীহ এর প্রায় জন্মের ৪০০ বছর আগে আলেক্সান্ডার এর সময় পর্যন্ত বাইজেন্টাইন সম্প্রদায় আশেপাশের বিভিন্ন রাষ্ট্র নিয়ে এক রাষ্ট্র অভিহিত হত। আলেক্সান্ডারের মৃত্যুর পর বাইজেন্টাইন সম্রাজ্য আলাদা হয়ে যায় এবং ইতালিয়ান রোমানদের অধীনে চলে যায়। তখন থেকে ৩২২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এ অবস্থায় ছিল। তারপর সম্রাট কন্সটান্টাইন যখন কায়সার (সীজার) হন, তখন তিনি তার রাষ্ট্রকে আরও বিস্তৃত করেন এবং পুরো সাম্রাজ্যকে দু'ভাগে ভাগ করেন। পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজধানী হিসেবে ইটালিয়ান রোম নগরীকে বাছাই করেন। আর পূর্বাঞ্চলীয় রাজধানী হিসেবে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের সাথে মিলিয়ে এক শহর পত্তন করেন। যার নাম দিলেন, কন্সটান্টিনিয়্যাহ। (বর্তমান ইস্তাম্বুল)। তিনি এমনভাবে এ শহরটির পিছনে শ্রম দেন যে, তার প্রসিদ্ধি ও সুনাম ইটালিয়ান রোম নগরীকে ছাড়িয়ে যায়। ৩৩৭ খ্রিষ্টাব্দে তার মৃত্যুর পর পুরো রাজ্যটি তার সন্তানদের মধ্যে বন্টিত হয়। তখন এ পূর্বাংশ যা রোম দেশ নামে খ্যাত হয় তা তার সন্তান কন্সটান্টিনোস এর করায়ত্বে আসে। তখন থেকে কনস্টান্টিনোপল ভিত্তিক রাষ্ট্রকে বলা হতে লাগল, রোম সাম্রাজ্য। আর রোমা নগরীটি ইটালিয়ান রোমান সাম্রাজ্যের অধীন থেকে গেল। কিন্তু

৩. কাছাকাছি অঞ্চলে[১]; কিন্তু তারা তাদের এ পরাজয়ের পর শীঘ্রই বিজয়ী হবে,

فِيٓ أَدۡنَى ٱلۡأَرۡضِ وَهُم مِّنۢ بَعۡدِ غَلَبِهِمۡ سَيَغۡلِبُونَ ۝٣

৪. কয়েক বছরের মধ্যেই[২]। আগের ও

فِي بِضۡعِ سِنِينَۗ لِلَّهِ ٱلۡأَمۡرُ مِن قَبۡلُ وَمِنۢ

তখনও রোমান সাম্রাজ্য সম্পূর্ণ বিভক্ত হয়ে যায়নি। তারপর ৩৯৫ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট থিয়োদিসিয়োস তার দুই পুত্রের মধ্যে পুরো রোমান সম্রাজ্যকে দু'ভাগে ভাগ করে দেন। পূর্বাঞ্চলীয় রাষ্ট্র ও পশ্চিমাঞ্চলীয় রাষ্ট্র। তখন থেকে পূর্বাঞ্চলীয় রাষ্ট্র 'বিলাদুর রোম' বা রোম সাম্রাজ্য নামে খ্যাতি লাভ করে। যার রাজধানী ছিল কন্সটান্টিনোপল। ইউরোপিয়ানরা এ রাষ্ট্রকে বাইজেন্টাইন রাষ্ট্র নামেই অভিহিত করত। (মূল ইটালী ভিত্তিক রোমান সাম্রাজ্য থেকে আলাদা করে বুঝার সুবিধার্থে)। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এ সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি শাম (সিরিয়া, লেবানন) ও ফিলিস্তিন এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আর তখনকার রাজার নাম ছিল হিরাক্লিয়াস। যার কাছে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিঠি পাঠিয়েছিলেন। তার সাথে তখনকার দিনের অপর শক্তিমান রাষ্ট্র পারস্যের রাজা খসরু ইবন হুরমুযের যুদ্ধে যখন পারসিকরা তাদের উপর জয়লাভ করে এবং ইন্তাকিয়া ও দামেশক পারসিকদের হাতে ছেড়ে দিতে হয়, তখন এ আয়াত নাযিল হয়। [আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

(১) অর্থাৎ পারস্যের অনুপাতে রোমকদের সবচেয়ে কাছের জনপদে রোমকগণ পারসিকদের হাতে পরাজিত হয়েছে। [তাবারী]

(২) এই সূরায় রোমক ও পারসিকদের যুদ্ধের কাহিনী আলোচিত হয়েছে। এই যুদ্ধে উভয়পক্ষই ছিল কাফের। তাদের মধ্যে কারও বিজয় এবং কারও পরাজয় বাহ্যতঃ ইসলাম ও মুসলিমদের জন্যে কোন কৌতূহলের বিষয় ছিল না। কিন্তু উভয় কাফের দলের মধ্যে পারসিকরা ছিল অগ্নিপূজারী মুশরিক এবং রোমকরা ছিল নাসারা আহলে কিতাব। ফলে এরা ছিল মুসলিমদের অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী। [ইবন কাসীর]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মক্কায় অবস্থানকালে পারসিকরা রোমকদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করে। হাফেজ ইবনে হাজার প্রমুখের উক্তি অনুযায়ী তাদের এই যুদ্ধ শাম দেশের আযরু'আত ও বুসরার মধ্যস্থলে সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধ চলাকালে মক্কার মুশরিকরা পারসিকদের বিজয় কামনা করত। কেননা, শির্ক ও প্রতিমা পুজায় তারা ছিল পারসিকদের সহযোগী। অপরপক্ষে মুসলিমদের আন্তরিক বাসনা ছিল রোমকরা বিজয়ী হোক। কেননা, ধর্ম ও মাযহাবের দিক দিয়ে তারা ইসলামের নিকটবর্তী ছিল। [সা'দী] কিন্তু হল এই যে, তখনকার মত পারসিকরা যুদ্ধে জয়লাভ করল। এমনকি তারা কনষ্টাণ্টিনোপলও অধিকার করে নিল এবং সেখানে উপাসনার জন্যে একটি অগ্নিকুণ্ড নির্মাণ করল। এই ঘটনায় মক্কার মুশরিকরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল এবং মুসলিমদেরকে লজ্জা দিতে লাগল যে, তোমরা যাদের সমর্থন করতে তারা হেরে গেছে। ব্যাপার

بَعۡدُؕ وَيَوۡمَئِذٖ يَفۡرَحُ الۡمُؤۡمِنُوۡنَ ۟ۙ

পরের সব ফয়সালা আল্লাহ্‌রই। আর সেদিন মুমিনগণ খুশী হবে[১],

بِنَصۡرِ اللّٰهِؕ يَنۡصُرُ مَنۡ يَّشَآءُؕ وَهُوَ الۡعَزِيۡزُ الرَّحِيۡمُ ۟ۙ

৫. আল্লাহ্‌র সাহায্যে। তিনি যাকে ইচ্ছে সাহায্য করেন এবং তিনিই প্রবলপরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

এখানেই শেষ নয়; বরং আহ্‌লে কিতাব রোমকরা যেমন পারসিকদের মোকাবেলায় পরাজয় বরণ করেছে, তেমনি আমাদের মোকাবিলায় তোমরাও একদিন পরাজিত হবে। এতে মুসলিমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত হয়। [সা'দী] সূরা রূমের প্রাথমিক আয়াতগুলো এই ঘটনা সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে। এসব আয়াতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, কয়েক বছর পরেই রোমকরা পারসিকদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবে। আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু যখন এসব আয়াত শুনলেন, তখন মক্কার চতুষ্পার্শ্বে এবং মুশরিকদের সমাবেশ ও বাজারে উপস্থিত হয়ে ঘোষণা করলেন, তোমাদের হর্ষোৎফুল্ল হওয়ার কোন কারণ নেই। কয়েক বছরের মধ্যে রোমকরা পারসিকদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করবে। মুশরিকদের মধ্যে উবাই ইবনে খালফ কথা ধরল এবং বলল, তুমি মিথ্যা বলছ। এরূপ হতে পারে না। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, আল্লাহর দুশমন, তুই-ই মিথ্যাবাদী। আমি এই ঘটনার জন্যে বাজি রাখতে প্রস্তুত আছি। যদি তিন বছরের মধ্যে রোমকরা বিজয়ী না হয়, তবে আমি তোকে দশটি উষ্ট্রী দেব। উবাই এতে সম্মত হল। একথা বলে আবু বকর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে ঘটনা বিবৃত করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি তো তিন বছরের সময় নির্দিষ্ট করিনি। কুরআনের এই জন্যে بضع শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই তিন থেকে নয় বছরের মধ্যে এই ঘটনা ঘটতে পারে। তুমি যাও এবং উবাইকে বল যে, আমি দশটি উষ্ট্রীর স্থলে একশ উষ্ট্রী বাজি রাখছি, কিন্তু সময়কাল তিন বছরের পরিবর্তে নয় বছর এবং কোন কোন বর্ণনা মতে সাত বছর নির্দিষ্ট করছি। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু আদেশ পালন করলেন এবং উবাইও নতুন চুক্তিতে সম্মত হল। [তিরমিযী: ৩১৯৩,৩১৯৪] বিভিন্ন হাদিস থেকে জানা যায় যে, হিজরতের পাঁচ বছর পূর্বে এই ঘটনা সংঘটিত হয় এবং সাত বছর পূর্ণ হওয়ার পর বদর যুদ্ধের সময় রোমকরা পারসিকদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করে।

(১) অর্থাৎ যেদিন রোমকরা পারসিকদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবে, সেদিন আল্লাহর সাহায্যের কারণে মুসলিমরা উৎফুল্ল হবে। বাক্যবিন্যাস পদ্ধতির দিক দিয়ে বাহ্যতঃ এখানে রোমকদের সাহায্য বোঝানো হয়েছে। তারা যদিও কাফের ছিল, কিন্তু অন্য কাফেরদের তুলনায় তাদের কুফর কিছুটা হাল্কা ছিল। কাজেই আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে সাহায্য করা অবান্তর নয়। বিশেষতঃ যখন তাদেরকে সাহায্য করলে মুসলিমরাও আনন্দিত হয় এবং কাফেরদের মোকাবিলায় তাদের জিত হয় [সা'দী]।

৬. এটা আল্লাহ্‌রই প্রতিশ্রুতি; আল্লাহ্ তাঁর প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না।

وَعْدَ اللّٰهِ ۖ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝٦

৭. তারা দুনিয়ার জীবনের বাহ্য দিক সম্বন্ধে অবগত, আর তারা আখিরাত সম্বন্ধে গাফিল[১]।

يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۖۚ وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ ۝٧

৮. তারা কি নিজেদের অন্তরে ভেবে দেখে না? আল্লাহ্ আসমানসমূহ, যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে এবং এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। কিন্তু মানুষের মধ্যে অনেকেই তো তাদের রবের সাক্ষাতের ব্যাপারে কাফির।

اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ ۗ مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُوْنَ ۝٨

৯. তারা কি যমীনে ভ্রমণ করে না? তাহলে তারা দেখত যে, তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কিরূপ হয়েছিল, শক্তিতে তারা ছিল এদের চেয়ে প্রবল, তারা জমি চাষ করত, তারা সেটা আবাদ করত এদের আবাদ করার চেয়ে বেশী। আর তাদের কাছে এসেছিল তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ; বস্তুত আল্লাহ্ এমন নন যে, তাদের প্রতি যুলুম করেন, কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম করেছিল।

اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ كَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّاَثَارُوا الْاَرْضَ وَعَمَرُوْهَآ اَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوْهَا وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۗ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝٩

---

(১) অর্থাৎ পার্থিব জীবনের এক পিঠ তাদের নখদর্পণে। ব্যবসা কিরূপে করবে, কিসের ব্যবসা করবে, কোথা থেকে কিনবে, কোথায় বেচবে কৃষিকাজ কিভাবে করবে, কবে বীজ বপন করবে, কবে শস্য কাটবে, দালান-কোঠা কিভাবে নির্মাণ করবে, বিলাস-ব্যসনের উপকরণ কিভাবে আহরণ করবে-এসব বিষয় তারা সম্যক অবগত। [কুরতুবী; আরও দেখুন, আত-তাফসীরুস সহীহ]

ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوٓأَىٰٓ أَن كَذَّبُوا بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ ⑩

১০. তারপর যারা মন্দ কাজ করেছিল তাদের পরিণাম হয়েছে মন্দ[১]; কারণ তারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহে মিথ্যা আরোপ করত এবং তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত।

দ্বিতীয় রুকূ’

ٱللَّهُ يَبْدَؤُا۟ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ⑪

১১. আল্লাহ্ সৃষ্টির সূচনা করেন, তারপর তিনি এর পুনরাবৃত্তি করবেন[২], তারপর তোমাদেরকে তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন করানো হবে।

وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ ⑫

১২. আর যে দিন কিয়ামত সংঘটিত হবে সে দিন অপরাধীরা হতাশ হয়ে পড়বে।

وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكَآئِهِمْ شُفَعَٰٓؤُا۟ وَكَانُوا۟ بِشُرَكَآئِهِمْ كَٰفِرِينَ ⑬

১৩. আর (আল্লাহ্‌র সাথে) শরীককৃত তাদের উপাস্যগুলো তাদের জন্য সুপারিশকারী হবে না এবং তারা তাদের শরীককৃত উপাস্যগুলোকে অস্বীকারকারী হবে।

وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ ⑭

১৪. আর যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন তারা বিভক্ত হয়ে পড়বে।

فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَهُمْ فِى رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ⑮

১৫. অতএব যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তারা জান্নাতে খোশহালে থাকবে[৩];

---

(১) ইবন আব্বাস বলেন, এর অর্থ যারা কুফরী করেছে তাদের প্রতিদান হচ্ছে, শাস্তি। [তাবারী; আত-তাফসীরুস সহীহ]

(২) সৃষ্টির সূচনা করা যার পক্ষে সম্ভবপর তার পক্ষে একই সৃষ্টির পুনরাবৃত্তি করা আরো ভালোভাবেই সম্ভবপর [ইবন কাসীর]

(৩) অর্থাৎ জান্নাতীগণ যত প্রকার আনন্দ লাভ করবে, সবই এই শব্দের ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত। পবিত্র কুরআনের অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে, “দুনিয়াতে কেউ জানে না যে, তার জন্যে জান্নাতে চক্ষু শীতল করার কি কি সামগ্রী যোগাড় রাখা হয়েছে।”

১৬. আর যারা কুফরী করেছে এবং আমাদের আয়াতসমূহ ও আখিরাতের সাক্ষাতের প্রতি মিথ্যারোপ করেছে, পরিণামে তাদেরকেই আযাবের মাঝে উপস্থিত রাখা হবে।

وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَلِقَآئِ الْاٰخِرَةِ فَاُولٰٓئِكَ فِى الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ ﴿١٦﴾

১৭. কাজেই[1] তোমরা আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর যখন তোমরা সন্ধ্যা কর এবং যখন তোমরা ভোর কর,

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ ﴿١٧﴾

[সূরা আস-সাজদাহ:১৭]। কাতাদাহ বলেন, তারা ফুলের সুগন্ধে, ঘন উদ্ভিদঘেরা বাগানে, জান্নাতে বিভিন্ন প্রকার ফুলের মধ্যে খুশী প্রকাশ করবে। অতি মনোমুগ্ধকর শব্দ এবং প্রাচুর্যপূর্ণ উত্তম জীবিকা আস্বাদন করবে। [তাবারী; আত-তাফসীরুস সহীহ]

(১) এখানে ف শব্দটি পূর্ববর্তী বাক্যের জন্য কারণ সূচক। [আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর] তাই অনুবাদ করা হয়েছে, "কাজেই"। আয়াতে তাসবীহ, তাহমীদ দ্বারা যিকর উদ্দেশ্য হতে পারে। [সা'দী] তাছাড়া সালাত উত্তমরূপেই আয়াতের মধ্যে দাখিল আছে বলা যায়। [কুরতুবী] এ কারণেই কোন কোন আলেম বলেন, এই আয়াতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ও সেসবের সময়ের বর্ণনা আছে। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমাকে কেউ জিজ্ঞেস করল, কুরআনে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের স্পষ্ট উল্লেখ আছে কি? তিনি বললেন, "হ্যাঁ। অতঃপর তিনি প্রমাণ হিসেবে এই আয়াত পেশ করলেন। ﴿فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ﴾ এর অর্থ মাগরিবের সালাত, ﴿وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ﴾ শব্দে ফজরের সালাত, عشياً দ্বারা আসরের সালাত এবং حين تظهرون শব্দে যোহরের সালাত উল্লেখিত হয়েছে। অন্য এক আয়াতে ﴿وَمِنْۢ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَآءِ﴾ [সূরা আন-নূর:৫৮] এশার সালাতের কথা এসেছে।" [মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৪৪৫, নং ৩৫৪১] অবশ্য হাসান বসরী রাহেমাহুল্লাহর মতে ﴿حِيْنَ تُمْسُوْنَ﴾ শব্দে মাগরিব ও এশা উভয় সালাতই উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। [বাইহাকী, সুনানুল কুবরা: ১/৩৫৯] সে হিসেবে এ সূরাতেই সমস্ত সালাতের উল্লেখ আছে বলা যায়। এ ছাড়াও সালাতের ওয়াক্ত সম্পর্কে কুরআন মজিদে আরো যেসব ইশারা করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে: "সালাত কায়েম করো সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত এবং ফজরের সময় কুরআন পাঠ করো।" [সূরা আল-ইসরা:৭৮] আরো এসেছে, "আর সালাত কায়েম করো দিনের দুই মাথায় এবং রাতের কিছু অংশে।" [সূরা হূদ, ১১৪] অন্যত্র এসেছে, "আর তোমার রবের প্রশংসা সহকারে তাঁর মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করো সূর্য উদিত হবার আগে এবং তার অস্ত যাবার আগে। আর রাতের কিছু সময়ও আল্লাহর মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করো এবং দিনের প্রান্তভাগেও।" [সূরা ত্বা-হা, ১৩০] এভাবে সারা দুনিয়ার মুসলিমরা আজ যে পাঁচটি সময়ে সালাত পড়ে থাকে কুরআন মজীদ বিভিন্ন স্থানে সে সময়গুলোর প্রতি ইংগিত করেছে।

১৮. এবং বিকেলে, আর যখন তোমরা দুপুরে উপনীত হও। আর তাঁরই জন্য সমস্ত প্রশংসা আসমানে ও যমীনে।

وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ ﴿١٨﴾

১৯. তিনিই মৃত থেকে জীবিতকে বের করেন এবং তিনিই বের করেন মৃতকে জীবিত থেকে[১], আর যমীনকে জীবিত করেন তার মৃত্যুর পর এবং এভাবেই তোমাদের বের করে আনা হবে[২]।

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ﴿١٩﴾

তৃতীয় রুকূ'

২০. আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে[৩] রয়েছে যে, তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর এখন তোমরা মানুষ, সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছ[৪]।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَآ اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ ﴿٢٠﴾

(১) হাসান বসরী বলেন, এর অর্থ কাফের থেকে মুমিনকে বের করেন, আর মুমিন থেকে কাফের বের করেন। [তাবারী]

(২) যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, “আর তাদের জন্য একটি নিদর্শন মৃত যমীন, যাকে আমরা সঞ্জীবিত করি এবং তা থেকে বের করি শস্য, অতঃপর তা থেকেই তারা খেয়ে থাকে। আর সেখানে আমরা সৃষ্টি করি খেজুর ও আঙ্গুরের উদ্যান এবং সেখানে উৎসারিত করি কিছু প্রস্রবণ” [সূর ইয়াসীন: ৩৩-৩৪] [ইবন কাসীর]

(৩) ২০ থেকে ২৭নং আয়াতসমূহে মহান আল্লাহর যেসব নিদর্শন বর্ণনা করা হচ্ছে, সেগুলো বক্তব্য পরম্পরার সাথে সম্পর্ক রেখে আখেরাতের সম্ভাবনা ও অস্তিত্বশীলতার কথা প্রমাণ করে, কেয়ামতে পুনরুজ্জীবন, হিসাব-নিকাশ এবং শাস্তি ও প্রতিদানকে যেসব বাহ্যদর্শী অবান্তর মনে করতে পারতো, এ আয়াতসমূহে তাদেরকে বিভিন্ন ভঙ্গিতে জওয়াব দেয়া হয়েছে [ফাতহুল কাদীর; আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]।

(৪) আল্লাহর কুদরাতের প্রথম নিদর্শন: প্রথম নিদর্শন এই যে, মানব জাতীকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা। মানব সৃষ্টির উপাদান যে মৃত্তিকা , একথা আদম আলাইহিস সালামের দিক দিয়ে বুঝতে কষ্ট হয় না। তিনি সমগ্র মানব জাতির অস্তিত্বের মূলভিত্তি, তাই অন্যান্য মানুষের সৃষ্টিও পরোক্ষভাবে তাঁরই সাথে সম্বন্ধযুক্ত হওয়া অবান্তর নয় [কুরতুবী]। এটাও সম্ভবপর যে, সাধারণ মানুষের প্রজনন বীর্যের মাধ্যমে হলেও বীর্য যেসব উপাদান দ্বারা গঠিত, তন্মধ্যে মৃত্তিকা প্রধান [আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْۤا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١﴾

২১. আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জোড়া[১]; যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও[২] এবং সৃজন করেছেন তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও সহমর্মিতা। নিশ্চয় এতে বহু নিদর্শন রয়েছে সে সম্প্রদায়ের জন্য, যারা চিন্তা করে[৩]।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ ﴿٢٢﴾

২২. আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। এতে তো অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে

---

(১) আল্লাহর কুদরতের দ্বিতীয় নিদর্শনঃ দ্বিতীয় নিদর্শন এই যে, মানুষের মধ্য থেকে আল্লাহ তাআলা নারী জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। তারা পুরুষের সংগিনী হয়েছে। [ইবন কাসীর] হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ্ ও শেষ দিবসে ঈমান রাখবে সে যেন তার পড়শীকে কষ্ট না দেয়। আর তোমরা মহিলাদের প্রতি কল্যাণকর হওয়ার ব্যাপারে পরস্পরকে উপদেশ দাও; কেননা তারা বাঁকা হাড় থেকে সৃষ্টি হয়েছে। সবচেয়ে বাঁকা অংশ হচ্ছে হাড়ের উপরের অংশ। যদি তুমি তাকে সোজা করতে যাও তবে তা ভেঙ্গে ফেলবে। পক্ষান্তরে যদি তুমি ছেড়ে যাও তবে সব সময় বাঁকাই থেকে যাবে। সুতরাং তোমরা মহিলাদের প্রতি কল্যাণকর হওয়ার ব্যাপারে পরস্পরকে উপদেশ দাও।' [বুখারী: ৫১৮৫, ৫১৮৬]

(২) ইবন কাসীর বলেন, এর অর্থ তোমাদের স্বজাতি থেকে তোমাদের জন্য স্ত্রীর ব্যবস্থা করেছেন। যাতে তোমাদের মধ্যে প্রশান্তি আসে। যেমন অন্য আয়াতে বলেছেন, "তিনিই তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তার থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন, যাতে সে তার কাছে শান্তি পায়।" [সূরা আল-আ'রাফ: ১৮৯]

(৩) এখানে নারী জাতি সৃষ্টি করার রহস্য ও উপকারিতা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ অর্থাৎ তোমরা তাদের কাছে পৌঁছে শান্তি লাভ কর, এ কারণেই তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। পুরুষদের যত প্রয়োজন নারীর সাথে সম্পৃক্ত সবগুলো সম্পর্কে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, সবগুলোর সারমর্ম হচ্ছে মানসিক শান্তি ও সুখ। [আদওয়াউল-বায়ান; সা'দী]

জ্ঞানীদের জন্য[১]।

২৩. আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রাতে ও দিনে তোমাদের নিদ্রা এবং তোমাদের অন্বেষণ তাঁর অনুগ্রহ হতে। নিশ্চয় এতে বহু নিদর্শন রয়েছে সে সম্প্রদায়ের জন্য, যারা শোনে[২]।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ مَنَامُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَآؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৪. আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে, তিনি তোমাদেরকে প্রদর্শন করান বিদ্যুৎ, ভয় ও আশার সঞ্চারকরূপে এবং আসমান থেকে পানি নাযিল

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَيُحْيٖ بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿٢٤﴾

(১) আল্লাহর কুদরতের তৃতীয় নিদর্শনঃ তৃতীয় নিদর্শন হচ্ছে আকাশ ও পৃথিবী সৃজন, বিভিন্ন স্তরের মানুষের বিভিন্ন ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গি এবং বিভিন্ন স্তরের বর্ণবৈষম্য; যেমন কোন স্তর শ্বেতকায়, কেউ কৃষ্ণকায়, কেউ লালচে এবং কেউ হলদে। এখানে আকাশ ও পৃথিবী সৃজন তো শক্তির মহানিদর্শন বটেই, মানুষের ভাষার বিভিন্নতাও আল্লাহর বিস্ময়কর ব্যাপার। ভাষার বিভিন্নতার মধ্যে অভিধানের বিভিন্নতাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আরবী ফারসী, হিন্দী, তুর্কী, ইংরেজী ইত্যাদি কত বিভিন্ন ভাষা আছে। এগুলো বিভিন্ন ভূ-খণ্ডে প্রচলিত। তন্মধ্যে কোন কোন ভাষা পরস্পর এত ভিন্নরূপ যে, এদের মধ্যে পারস্পরিক কোন সম্পর্ক আছে বলেই মনে হয় না। স্বর ও উচ্চারণভঙ্গির বিভিন্নতাও ভাষার বিভিন্নতার মধ্যে শামিল। [দেখুন, কুরতুবী; ইবন কাসীর] আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক পুরুষ, নারী বালক ও বৃদ্ধের কণ্ঠস্বরে এমন স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করেছেন যে, একজনের কণ্ঠস্বর অন্য জনের কণ্ঠস্বরের সাথে পুরোপুরি মিল রাখে না। কিছু না কিছু পার্থক্য অবশ্যই থাকে। অথচ এই কণ্ঠস্বরের যন্ত্রপাতি তথা জিহবা, ঠোঁট, তালু ও কণ্ঠনালী সবার মধ্যেই অভিন্ন ও একরূপ। [সা'দী] এমনিভাবে বর্ণ-বৈষম্যের কথা বলা যায়। একই পিতা-মাতা থেকে একই প্রকার অবস্থায় দুই সন্তান বিভিন্ন বর্ণের জন্মগ্রহণ করে। এ হচ্ছে সৃষ্টি ও কারিগরির নৈপুণ্য। [ফাতহুল কাদীর; বাগভী]

(২) আল্লাহর কুদরতের চতুর্থ নিদর্শনঃ মানুষের রাত্রে ও দিবাভাগে নিদ্রা যাওয়া এমনিভাবে রাত্রে ও দিবাভাগে জীবিকা অন্বেষণ করা। এই আয়াতে দিনে-রাত্রে নিদ্রাও বর্ণনা করা হয়েছে এবং জীবিকা অন্বেষণও। অন্য কতক আয়াতে নিদ্রা শুধু রাত্রে এবং জীবিকা অন্বেষণ শুধু দিনে করা হয়েছে। কারণ এই যে, রাত্রের আসল কাজ নিদ্রা যাওয়া এবং জীবিকা অন্বেষণের কাজও কিছু চলে। দিনে এর বিপরীতে আসল কাজ জীবিকা অন্বেষণ করা এবং কিছু নিদ্রা ও বিশ্রাম গ্রহণেরও সময় পাওয়া যায়। তাই উভয় বক্তব্যই স্ব স্ব স্থানে নির্ভুল। [ফাতহুল কাদীর]

করেন অতঃপর তা দিয়ে যমীনকে পুনর্জীবিত করেন সেটার মৃত্যুর পর; নিশ্চয় এতে বহু নিদর্শন রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের জন্য, যারা অনুধাবন করে[১]।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ تَقُوْمَ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ بِاَمْرِهٖ ؕ ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً ۖ مِّنَ الْاَرْضِ ۖ اِذَآ اَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ ﴿٢٥﴾

২৫. আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তাঁরই আদেশে আসমান ও যমীনের স্থিতি থাকে; তারপর আল্লাহ্ যখন তোমাদেরকে যমীন থেকে উঠার জন্য একবার ডাকবেন তখনই তোমরা বেরিয়ে আসবে[২]।

(১) আল্লাহর কুদরতের পঞ্চম নিদর্শনঃ পঞ্চম নিদর্শন এই যে, আল্লাহ তাআলা মানুষকে বিদ্যুতের চমক দেখান। এতে উহার পতিত হওয়ার এবং ক্ষতি করারও আশংকা থাকে এবং এর পশ্চাতে বৃষ্টির আশাবাদও সঞ্চয় হয়। তিনি এই বৃষ্টির দ্বারা শুষ্ক এবং মৃত মৃত্তিকাকে জীবিত ও সতেজ করে তাতে রকমারি প্রকারের বৃক্ষ ও ফল-ফুল উৎপন্ন করেন। [ইবন কাসীর, ফাতহুল কাদীর] কাতাদাহ বলেন, এখানে যে ভয়ের কথা বলা হয়েছে তা সাধারণত মুসাফিরদের মনে উদ্রেক হয়। আর যে আশার কথা বলা হয়েছে সেটা সাধারণতঃ মুকীম বা স্থায়ী অবস্থানকারীদের মনে উদ্রেক হয়। [তাবারী]

(২) আল্লাহর কুদরতের ষষ্ঠ নিদর্শনঃ ষষ্ঠ নিদর্শন এই যে, আকাশ ও পৃথিবী আল্লাহ তাআলারই আদেশে কায়েম আছে। এতে নেই কোন খুঁটি। [তাবারী] হাজার হাজার বছর সক্রিয় থাকার পরও এগুলোতে কোথাও কোন ত্রুটি দেখা দেয় না। আল্লাহ তাআলা যখন এই ব্যবস্থাপনাকে ভেঙ্গে দেয়ার আদেশ দেবেন, তখন এই মজবুত ও অটুট বস্তুগুলো নিমেষের মধ্যে ভেঙ্গে-চুরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আর এ যমীনের পরিবর্তে অন্য যমীন ও আসমান তৈরী হবে। অতঃপর তাঁরই আদেশে সব মৃত পুনরুজ্জীবিত হয়ে হাশরের মাঠে সমবেত হবে। [ইবন কাসীর] যেমন অন্য আয়াতে বলেছেন, "'যেদিন তিনি তোমাদেরকে ডাকবেন এবং তোমরা তাঁর প্রশংসার সাথে তাঁর ডাকে সাড়া দেবে এবং তোমরা মনে করবে, তোমরা অল্পকালই অবস্থান করেছিলে।" [সূরা আল-ইসরা: ৫২] অন্য আয়াতেও এসেছে, "অতঃপর তা তো একটিমাত্র প্রচণ্ড ধমক---আর তখনই তারা দেখবে।" [সূরা আস-সাফফাত: ১৯] আরও এসেছে, "এ তো শুধু এক বিকট আওয়াজ, তখনই ময়দানে তাদের আবির্ভাব হবে।" [সূরা আন-নাযি'আত: ১৩-১৪] অন্যত্র বলা হয়েছে, "এটা হবে শুধু এক বিকট শব্দ; তখনই এদের সকলকে উপস্থিত করা হবে আমাদের সামনে" [সূরা

وَلَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ﴿٢٦﴾

২৬. আর আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে তা তাঁরই। সবকিছু তাঁরই অনুগত[১]।

وَهُوَ الَّذِيْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ ؕ وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٧﴾

২৭. আর তিনি-ই, যিনি সৃষ্টিকে শুরুতে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, তারপর তিনি সেটা পুনরাবৃত্তি করবেন; আর এটা তাঁর জন্য অতি সহজ[২]। আসমানসমূহ ও যমীনে সর্বোচ্চ গুণাগুন তাঁরই[৩]; এবং তিনিই পরাক্রমশালী, হিক্‌মতওয়ালা।

চতুর্থ রুকূ'

ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَلًا مِّنْ اَنْفُسِكُمْ ؕ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَآءَ فِيْ مَا رَزَقْنٰكُمْ فَاَنْتُمْ فِيْهِ سَوَآءٌ تَخَافُوْنَهُمْ كَخِيْفَتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ ؕ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ

২৮. আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের মধ্যে একটি দৃষ্টান্ত পেশ করছেনঃ তোমাদেরকে আমরা যে রিয্‌ক দিয়েছি, তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের কেউ

ইয়াসীন: ৫৩] উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন কোন ব্যাপারে কঠিন শপথ করতে চাইতেন তখন বলতেন, لَا، وَالَّذِيْ تَقُوْمُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ بِأَمْرِه অর্থাৎ শপথ তাঁর যাঁর নির্দেশে আসমান ও যমীন স্ব স্ব স্থানে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। [ইবন কাসীর]

(১) এ আনুগত্য কারও পক্ষ থেকে ঐচ্ছিক, আবার কারও পক্ষ থেকে তাদের ইচ্ছার বাইরে। ঈমানদারগণ ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করে, পক্ষান্তরে কাফিররা ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁর আনুগত্য করে না। কিন্তু তারা কখনো তাঁর ফয়সালাকে লঙ্ঘন করতে পারে না। [ইবন কাসীর]

(২) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'মহান আল্লাহ্ বলেন, আদম সন্তান আমার প্রতি মিথ্যারোপ করে অথচ এটা করা তার জন্য উচিত ছিল না। অনুরূপ সে আমাকে গালি দেয় অথচ সেটা তার জন্য ঠিক নয়। তার মিথ্যারোপ হচ্ছে এটা বলা যে, 'আমাকে যেভাবে পূর্বে সৃষ্টি করেছেন সেভাবে সৃষ্টি করবে না। অথচ প্রথম সৃষ্টি থেকে দ্বিতীয় সৃষ্টি আরো সহজ'। আর তার গালি হচ্ছে সে বলে 'আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন, অথচ আমি একক, অমুখাপেক্ষী, জন্ম দেইনি, জন্ম নেইনি। আর আমার সমকক্ষ কেউ নেই' [বুখারী: ৪৯৭৪]

(৩) যত সুন্দর সুন্দর গুণ সবই মহান আল্লাহ্‌র রয়েছে। [ফাতহুল কাদীর] তাঁর মত কোন কিছুই নেই। [তাবারী]

يَّعۡقِلُوۡنَ ﴿۲۸﴾

কি তাতে অংশীদার? ফলে তোমরা কি এ ব্যাপারে সমান? তোমরা কি তাদেরকে সেরূপ ভয় কর যেরূপ তোমরা পরস্পর পরস্পরকে ভয় কর? এভাবেই আমরা নিদর্শনাবলী বিস্তারিত বর্ণনা করি সে সম্প্রদায়ের জন্য, যারা অনুধাবন করে[১]।

بَلِ اتَّبَعَ الَّذِيۡنَ ظَلَمُوۡۤا اَهۡوَآءَهُمۡ بِغَيۡرِ عِلۡمٍ ۚ فَمَنۡ يَّهۡدِىۡ مَنۡ اَضَلَّ اللّٰهُ ؕ وَمَا لَهُمۡ مِّنۡ نّٰصِرِيۡنَ ﴿۲۹﴾

২৯. বরং যালিমরা অজ্ঞতাবশত তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে, কাজেই আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন কে তাকে হিদায়াত দান করবে? আর তাদের কোন সাহায্যকারী নেই।

فَاَقِمۡ وَجۡهَكَ لِلدِّيۡنِ حَنِيۡفًا ؕ فِطۡرَتَ اللّٰهِ الَّتِىۡ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيۡهَا ؕ لَا تَبۡدِيۡلَ لِخَلۡقِ

৩০. কাজেই আপনি একনিষ্ঠ হয়ে নিজ চেহারাকে দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত রাখুন[২]। আল্লাহ্র ফিতরাত (স্বাভাবিক রীতি

---

(১) আলোচ্য আয়াতসমুহে তাওহীদের বিষয়বস্তু বিভিন্ন সাক্ষ্য-প্রমাণ ও বিভিন্ন হৃদয়গ্রাহী শিরোনামে ব্যক্ত করা হয়েছে। প্রথমে একটি উদাহরণ দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, তোমাদের গোলাম-চাকর তোমাদের মতই মানুষ; আকার-আকৃতি, হাত-পা, মনের চাহিদা ইত্যাদি সব বিষয়ে তোমাদের শরীক। কিন্তু তোমরা তাদেরকে ক্ষমতায় নিজেদের সমান কর না যে, তারাও তোমাদের ন্যায় যা ইচ্ছা করবে এবং যা ইচ্ছা ব্যয় করবে। নিজেদের পুরোপুরি সমকক্ষ তো দূরের কথা, তাদেরকে তোমাদের ধন-সম্পদ ও ক্ষমতায় সামান্যতম অংশীদারিত্বেরও অধিকার দাও না। কোন ক্ষুদ্র ও মামুলী শরীককেও তোমরা ভয় কর যে, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করলে সে আপত্তি করবে। গোলাম-চাকরদেরকে তোমরা এই মর্যাদাও দাও না। অতএব, চিন্তা কর, ফেরেশ্তা, মানব ও জিনসহ সমগ্র সৃষ্টজগত আল্লাহর সৃজিত ও তাঁরই দাস, গোলাম। তাদেরকে তোমরা আল্লাহর সমকক্ষ অথবা তাঁর শরীক কিরূপে বিশ্বাস কর? [দেখুন, কুরতুবী,ইবন কাসীর,ফাতহুল কাদীর]

(২) অর্থাৎ একনিষ্ঠ হয়ে নিজের চেহারাকে এদিকে স্থির নিবদ্ধ করো, এরপর আবার অন্যদিকে ফিরে যেও না। জীবনের জন্য এ পথটি গ্রহণ করে নেবার পর অন্য কোন পথের দিকে দৃষ্টিও দেয়া যাবে না। [ফাতহুল কাদীর]

اللّٰهِ ۚ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۙ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۳۰﴾

বা দ্বীন ইসলাম)[১], যার উপর (চলার যোগ্য করে) তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন; আল্লাহ্‌র সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই[২]। এটাই প্রতিষ্ঠিত দ্বীন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।

---

(১) অর্থাৎ এ দ্বীনকে আঁকড়ে থাকো। অন্য কোন মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে নিজেদেরকে কলুষিত করো না। পরবর্তী বাক্যে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর ফিতরত বলে সেই ফিতরত বোঝানো হয়েছে, যার উপর আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তবে এখানে ফিতরত বলে কি বোঝানো হয়েছে এ সম্পর্কে তফসীরকারদের অনেক উক্তির মধ্যে দুইটি উক্তি প্রসিদ্ধ।

(এক) ফিতরত বলে ইসলাম বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানুষকে প্রকৃতিগতভাবে মুসলিম সৃষ্টি করেছেন। যদি পরিবেশ কোন কিছু খারাপ না করে, তবে প্রতিটি জন্মগ্রহণকারী শিশু ভবিষ্যতে মুসলিমই হবে। কিন্তু অভ্যাসগতভাবেই পিতা-মাতা তাকে ইসলামবিরোধী বিষয়াদি শিক্ষা দেয়। ফলে সে ইসলামের উপর কায়েম থাকে না। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'প্রতিটি শিশুই ফিতরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে। তারপর তার পিতামাতা তাকে ইয়াহূদী বানায় বা নাসারা বানায় অথবা মাজুসী বানায়। যেমন কোন জন্তুকে তোমরা সম্পূর্ণ দোষমুক্ত জন্ম নিতে দেখ, সেখানে তোমরা তাকে নাক কাটা অবস্থায় পাও না। তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন।' [বুখারী:৪৭৭৫, মুসলিম: ২৬৫৮]

(দুই) ফিতরত বলে যোগ্যতা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিগতভাবে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে স্রষ্টাকে চেনার ও তাঁকে মেনে চলার যোগ্যতা নিহিত রেখেছেন। এর ফলে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে যদি সে যোগ্যতাকে কাজে লাগায়। [ফাতহুল কাদীর;কুরতুবী]

(২) এ আয়াতের কয়েকটি অর্থ হতে পারে, এক: তোমরা আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে পরিবর্তন করো না। [ফাতহুল কাদীর] দুই. এখানে আল্লাহ্‌র সৃষ্টি বলে আল্লাহ্‌র দ্বীনকে বুঝানো হয়েছে। তখন অর্থ হবে, তোমরা আল্লাহ্‌র এ দ্বীনকে পরিবর্তন করোনা। তিনি মানুষকে ইসলামের উপর সৃষ্টি করেছেন, তোমরা তাদেরকে অন্যান্য মানব মতবাদে দীক্ষিত করো না। [বাগভী] তিন. অথবা আয়াতের অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ মানুষকে নিজের বান্দায় পরিণত করেছেন। কেউ চাইলেও এ কাঠামোয় কোন পরিবর্তন সাধন করতে পারে না। মানুষ বান্দা থেকে অ-বান্দা হতে পারে না এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ইলাহ বানিয়ে নিলেও প্রকৃতপক্ষে সে মানুষের ইলাহ হতে পারে না। [ইবন কাসীর]

৩১. তোমরা বিশুদ্ধ চিত্তে তাঁরই অভিমুখী হয়ে থাক আর তাঁরই তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সালাত কায়েম কর। আর অন্তর্ভুক্ত হয়ো না মুশরিকদের,

مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٣١﴾

৩২. যারা নিজেদের দ্বীনকে বিভক্ত করেছে এবং বিভিন্ন দলে পরিণত হয়েছে[1]। প্রত্যেক দলই যা তাদের কাছে আছে তা নিয়ে উৎফুল্ল।

مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا ۖ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٣٢﴾

৩৩. আর মানুষকে যখন দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন তারা তাদের রবকে ডাকে তাঁরই অভিমুখী হয়ে। তারপর তিনি যখন তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহ আস্বাদন করান, তখন তাদের একদল তাদের রবের সাথে শির্ক করে;

وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾

৩৪. ফলে তাদেরকে আমরা যা দিয়েছি, তাতে তারা কুফরী করে। কাজেই তোমরা ভোগ করে নাও, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে!

لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ ۚ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾

৩৫. নাকি আমরা তাদের কাছে এমন কোন প্রমাণ নাযিল করেছি যা তারা যে শির্ক করছে সে সম্পর্কে বক্তব্য দেয়[2]?

أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ﴿٣٥﴾

৩৬. আর আমরা যখন মানুষকে রহমত আস্বাদন করাই তখন তারা তাতে উৎফুল্ল হয় এবং যদি তাদের কৃতকর্মের কারণে কোন অনিষ্ট পৌঁছে তখনি তারা নিরাশ হয়ে পড়ে।

وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا ۖ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿٣٦﴾

---

(১) কাতাদাহ বলেন, তারা হচ্ছে ইয়াহূদী ও নাসারা। [তাবারী]

(২) কাতাদাহ বলেন, এর অর্থ আমরা কি এমন কোন কিতাব নাযিল করেছি যাতে তাদের শির্কের ঘোষণা রয়েছে? [তাবারী]

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٣٧﴾

৩৭. তারা কি লক্ষ্য করে না যে, আল্লাহ্ যার জন্য ইচ্ছে রিযিক প্রশস্ত করেন এবং সংকুচিত করেন? এতে তো অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে সে সম্প্রদায়ের জন্য, যারা ঈমান আনে[১]।

فَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۚ ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ ۖ وَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٣٨﴾

৩৮. অতএব আত্মীয়কে দাও তার হক[২] এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও[৩]। যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি[৪] কামনা করে তাদের জন্য এটা উত্তম এবং তারাই তো সফলকাম।

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا فِيْٓ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ﴿٣٩﴾

৩৯. আর মানুষের সম্পদ বৃদ্ধি পাবে বলে তোমরা যে সুদ দাও, আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তা ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে না। কিন্তু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে যাকাত তোমরা দাও (তা-ই বৃদ্ধি পায়) সুতরাং তারাই

---

(১) অনুরূপ আয়াত আরও এসেছে, সূরা আর-রা'দ: ২৬; সূরা আল-ইসরা: ৩০।

(২) কাতাদাহ বলেন, তোমার যদি কোন নিকটাত্মীয় থাকে, তারপর তুমি তাকে কোন সম্পদ না দাও বা তার কাছে না যাও, তাহলে তুমি তার সাথে সম্পর্ক কর্তন করেছ, সম্পর্ক রক্ষা করনি। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(৩) আলোচ্য আয়াতে ধন-সম্পদের কয়েকটি খাত বর্ণনা করা হয়েছে। (এক) আত্মীয়-স্বজন, (দুই) মিসকীন, (তিন) মুসাফির। অর্থাৎ, আল্লাহ প্রদত্ত ধন-সম্পদ তাদেরকে দান কর এবং তাদের জন্যে ব্যয় কর। সাথে সাথে আরও বলা হয়েছে যে, এটা তাদের প্রাপ্য, যা আল্লাহ তোমাদের ধন-সম্পদে শামিল করে দিয়েছেন। কাজেই দান করার সময় তাদের প্রতি কোন অনুগ্রহ করছ বলে বড়াই করো না। কেননা, প্রাপকের প্রাপ্য পরিশোধ করা ইনসাফের দাবী; কোন অনুগ্রহ নয়। [তাবারী, ইবন কাসীর, ফাতহুল কাদীর]

(৪) ﴿وَجْهَ اللّٰهِ﴾ এর মধ্যস্থিত وجه এর এক অর্থ চেহারা। সে হিসেবে এর দ্বারা আল্লাহর চেহারা থাকার গুণ সাব্যস্ত হয়। আবার অন্য অর্থ হচ্ছে, جهة বা দিক। তখন অর্থ হয়; আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে। অধিকাংশ মুফাসসির এ অর্থই করেছেন। তাছাড়া এর দ্বারা চেহারা (দর্শন) কামনা করাও উদ্দেশ্য হতে পারে।

সমৃদ্ধশালী[১]।

৪০. আল্লাহ্[২], যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তোমাদেরকে রিয্ক দিয়েছেন, তারপর তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন অবশেষে তিনি তোমাদেরকে জীবিত করবেন। (আল্লাহ্‌র সাথে শরীক সাব্যস্তকৃত) তোমাদের মা'বুদগুলোর এমন কেউ আছে কি, যে এসবের কোন কিছু করতে পারে[৩]? তারা যাদেরকে শরীক করে, তিনি (আল্লাহ্) সে সব (শরীক) থেকে মহিমাময়-পবিত্র ও অতি ঊর্ধ্বে।

اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ۗ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّفْعَلُ مِنْ ذٰلِكُمْ مِّنْ شَيْءٍ ۗ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۟

পঞ্চম রুকূ'

৪১. মানুষের কৃতকর্মের দরুন স্থলে ও সাগরে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে; ফলে তিনি তাদেরকে তাদের কোন কোন

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ

(১) এ বৃদ্ধির কোন সীমা নির্ধারণ করা হয়নি। যে ধরনের ঐকান্তিক সংকল্প, গভীর ত্যাগের অনুভূতি এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের প্রবল আকাংখা সহকারে কোন ব্যক্তি আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করবে অনুরূপভাবেই আল্লাহ তাকে বেশী বেশী প্রতিদানও দেবেন। তাই একটি সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে, 'নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সাদকা কবুল করেন এবং ডান হাতে তা গ্রহণ করেন, তারপর তিনি সেটাকে এমনভাবে বাড়িয়ে তোলেন যেমন তোমাদের কেউ উটের বাচ্চাকে লালন-পালন করে বাড়িয়ে তোলে। এমনকি শেষ পর্যন্ত সেই একটি লোকমাও বাড়িয়ে ওহুদ পাহাড়ের সমান করে দেন।' [তিরমিযী: ৬৬২, মুসনাদে আহমাদ: ২/৪৭১]

(২) এখান থেকে আবার মুশরিকদেরকে বুঝাবার জন্য বক্তব্যের ধারা তাওহীদ ও আখেরাতের বিষয়বস্তুর দিকে ফিরে এসেছে। [আইসারুত-তাফাসীর]

(৩) অর্থাৎ তোমাদের তৈরী করা উপাস্যদের মধ্যে কেউ কি সৃষ্টিকর্তা ও রিযিকদাতা? জীবন ও মৃত্যু দান করা কি কারো ক্ষমতার আওতাভুক্ত আছে? অথবা মরার পর সে আবার কাউকে পুনরুজ্জীবিত করার ক্ষমতা রাখে? তাহলে তাদের কাজ কি? তোমরা তাদেরকে উপাস্য বানিয়ে রেখেছো কেন? [তাবারী]

يَرْجِعُوْنَ۝

কাজের শাস্তি আস্বাদন করান[১], যাতে তারা ফিরে আসে[২]।

قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلُ ۚ كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّشْرِكِيْنَ۝

৪২. বলুন, 'তোমরা যমীনে ভ্রমণ কর অতঃপর দেখ পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হয়েছে!' তাদের অধিকাংশই ছিল মুশরিক।

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ يَوْمَىِٕذٍ يَّصَّدَّعُوْنَ۝

৪৩. সুতরাং আপনি সরল-সঠিক দ্বীনে নিজকে প্রতিষ্ঠিত করুন, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যে দিন অনিবার্য তা উপস্থিত

(১) অর্থাৎ স্থলে, জলে তথা সারা বিশ্বে মানুষের কুকর্মের বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। 'বিপর্যয়' বলে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অগ্নিকাণ্ড, পানিতে নিমজ্জিত হওয়ার ঘটনাবলীর প্রাচুর্য, সব কিছু থেকে বরকত উঠে যাওয়া, উপকারী বস্তুর উপকার কম এবং ক্ষতি বেশী হয়ে যাওয়া ইত্যাদি আপদ-বিপদ বোঝানো হয়েছে। [সা'দী, কুরতুবী, বাগভী] অন্য এক আয়াতে এই বিষয়বস্তু এভাবে বর্ণিত হয়েছে, "তোমাদেরকে যেসব বিপদাপদ স্পর্শ করে, সেগুলো তোমাদেরই কৃতকর্মের কারণে। অনেক গোনাহ তো আল্লাহ ক্ষমাই করে দেন।" [সূরা আশ-শূরা: ৩০] উদ্দেশ্য এই যে, এই দুনিয়ায় বিপদাপদের সত্যিকার কারণ তোমাদের গোনাহ; যদিও দুনিয়াতে এসব গোনাহের পুরোপুরি প্রতিফল দেয়া হয় না এবং প্রত্যেক গোনাহর কারণেই বিপদ আসে না। বরং অনেক গোনাহ, তো ক্ষমা করে দেয়া হয়। তবে এটা সত্য যে, সমস্ত গোনাহর কারণে বিপদ আসে না বরং কোন কোন গোনাহর কারণেই বিপদ আসে। দুনিয়াতে প্রত্যেক গোনাহর কারণে বিপদ আসলে একটি মানুষও পৃথিবীতে বেঁচে থাকত না। আল্লাহ্ বলেন, "আল্লাহ্ যদি মানুষকে তাদের সীমালংঘনের জন্য শাস্তি দিতেন তবে ভূপৃষ্ঠে কোন জীব-জন্তুকেই রেহাই দিতেন না; কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন।" [সূরা আন-নাহল: ৬১] আল্লাহ্ আরো বলেন, আল্লাহ্ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিলে ভূ-পৃষ্ঠে কোন জীব-জন্তুকেই রেহাই দিতেন না, কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন।" [সূরা ফাতির: ৪৫] বরং অনেক গোনাহ তো আল্লাহ মাফই করে দেন। যেগুলো মাফ করেন না, সেগুলোরও পুরোপুরি শাস্তি দুনিয়াতে দেন না; বরং সামান্য স্বাদ আস্বাদন করান।

(২) কাতাদাহ বলেন, এটা আল্লাহ্ কর্তৃক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূল হিসেবে পাঠানোর আগের অবস্থার বর্ণনা। যখন যমীন ভ্রষ্টতা ও অন্ধকারে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তারপর আল্লাহ্ যখন তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাঠালেন, তখন মানুষের মধ্যে যারা ফিরে আসার তারা ফিরে আসল। [তাবারী]

হওয়ার আগে, সেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে[১]।

৪৪. যে কুফরী করে কুফরীর শাস্তি তারই প্রাপ্য; আর যারা সৎকাজ করে তারা নিজেদেরই জন্য রচনা করে সুখশয্যা।

مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ ﴿٤٤﴾

৪৫. যাতে করে আল্লাহ্ যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে পুরস্কৃত করেন। নিশ্চয় তিনি কাফিরদেরকে পছন্দ করেন না।

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٤٥﴾

৪৬. আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি বায়ু পাঠান সুসংবাদ দেয়ার জন্য[২] এবং তোমাদেরকে তাঁর কিছু রহমত আস্বাদন করাবার জন্য; আর যাতে তাঁর নির্দেশে নৌযানগুলো বিচরণ করে এবং যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহের কিছু সন্ধান করতে পার, আর যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও[৩]।

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٤٦﴾

(১) কাতাদাহ বলেন, এর অর্থ আপনি ইসলামের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকুন। সেদিন আসার পূর্বেই। যেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে, একদল জান্নাতী হবে, আরেকদল হবে জাহান্নামী। [তাবারী] আল্লামা শানকীতী বলেন, এ আয়াত এ সূরার অন্য আয়াতের অনুরূপ যেখানে এসেছে, "আর যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন তারা বিভক্ত হয়ে পড়বে। অতএব যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তারা জান্নাতে খোশহালে থাকবে; আর যারা কুফরী করেছে এবং আমাদের আয়াতসমূহ ও আখিরাতের সাক্ষাতের প্রতি মিথ্যারোপ করেছে, পরিণামে তাদেরকেই আযাবের মাঝে উপস্থিত রাখা হবে।" তাছাড়া অন্য সূরায় এসেছে, "এবং সতর্ক করতে পারেন কেয়ামতের দিন সম্পর্কে, যাতে কোন সন্দেহ নেই। একদল থাকবে জান্নাতে আরেক দল জলন্ত আগুনে।" [সূরা আশ-শূরা: ৭]।

(২) মুজাহিদ বলেন, এর অর্থ বৃষ্টির পূর্বে সুসংবাদবাহী বাতাস। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(৩) এ আয়াতের সমার্থে আরও দেখুন, সূরা আল-বাকারাহ: ১৬৪; সূরা আল-মুমিনূন: ২২

وَلَقَدۡ اَرۡسَلۡنَا مِنۡ قَبۡلِكَ رُسُلًا اِلٰى قَوۡمِهِمۡ فَجَآءُوۡهُمۡ بِالۡبَيِّنٰتِ فَانۡتَقَمۡنَا مِنَ الَّذِيۡنَ اَجۡرَمُوۡا ؕ وَكَانَ حَقًّا عَلَيۡنَا نَصۡرُ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ ﴿۴۷﴾

৪৭. আর আমরা তো আপনার আগে রাসূলগণকে পাঠিয়েছিলাম তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের কাছে। অতঃপর তাঁরা তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিলেন; অতঃপর আমরা অপরাধীদের থেকে প্রতিশোধ নিয়েছিলাম। আর আমাদের দায়িত্ব তো মুমিনদের সাহায্য করা(১)।

اَللّٰهُ الَّذِيۡ يُرۡسِلُ الرِّيٰحَ فَتُثِيۡرُ سَحَابًا فَيَبۡسُطُهٗ فِي السَّمَآءِ كَيۡفَ يَشَآءُ وَيَجۡعَلُهٗ كِسَفًا فَتَرَى الۡوَدۡقَ يَخۡرُجُ مِنۡ خِلٰلِهٖ ۚ فَاِذَاۤ اَصَابَ بِهٖ مَنۡ يَّشَآءُ مِنۡ عِبَادِهٖۤ اِذَا هُمۡ يَسۡتَبۡشِرُوۡنَ ﴿۴۸﴾

৪৮. আল্লাহ্, যিনি বায়ু পাঠান, ফলে তা মেঘমালাকে সঞ্চালিত করে; অতঃপর তিনি এটাকে যেমন ইচ্ছে আকাশে ছড়িয়ে দেন; পরে এটাকে খণ্ড-বিখণ্ড করেন, ফলে আপনি দেখতে পান সেটার মধ্য থেকে নির্গত হয় বৃষ্টিধারা; তারপর যখন তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাদের কাছে ইচ্ছে এটা পৌঁছে দেন, তখন তারা হয় আনন্দিত,

وَاِنۡ كَانُوۡا مِنۡ قَبۡلِ اَنۡ يُّنَزَّلَ عَلَيۡهِمۡ مِّنۡ قَبۡلِهٖ لَمُبۡلِسِيۡنَ ﴿۴۹﴾

৪৯. যদিও ইতোপূর্বে তাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণের আগে তারা ছিল একান্ত নিরাশ।

فَانۡظُرۡ اِلٰۤى اٰثٰرِ رَحۡمَتِ اللّٰهِ كَيۡفَ يُحۡيِ الۡاَرۡضَ بَعۡدَ مَوۡتِهَا ؕ اِنَّ ذٰلِكَ لَمُحۡيِ الۡمَوۡتٰى ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيۡءٍ قَدِيۡرٌ ﴿۵۰﴾

৫০. সুতরাং আপনি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের ফল সম্বন্ধে চিন্তা করুন, কিভাবে তিনি যমীনকে জীবিত করেন সেটার মৃত্যুর পর। এভাবেই তো আল্লাহ্ মৃতকে জীবিতকারী, আর তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান(২)।

(১) অর্থাৎ আমি অপরাধী কাফেরদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিলাম এবং মুমিনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব ছিল। এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ তাআলা কৃপাবশতঃ মুমিনের সাহায্য করাকে নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করেছেন। [সা'দী]

(২) এ আয়াতের সমার্থে সূরা আল-আ'রাফের ৫৭ নং আয়াত দেখুন।

৫১. আর যদি আমরা এমন বায়ু পাঠাই যার ফলে তারা দেখে যে শস্য পীতবর্ণ ধারণ করেছে, তখন তো তারা কুফরী করতে শুরু করে ।

وَلَبِنْ اَرْسَلْنَا رِيْحًا فَرَاَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوْا مِنْۢ بَعْدِهٖ يَكْفُرُوْنَ ۝٥١

৫২. সুতরাং আপনি তো মৃতকে[১] শুনাতে পারবেন না, বধিরকেও পারবেন না ডাক শুনাতে, যখন তারা মুখ ফিরিয়ে চলে যায় ।

فَاِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ ۝٥٢

৫৩. আর আপনি অন্ধদেরকেও পথে আনতে পারবেন না তাদের পথভ্রষ্টতা থেকে । যারা আমাদের আয়াতসমূহে ঈমান রাখে শুধু তাদেরকেই আপনি শুনাতে পারবেন; কারণ তারা আত্মসমর্পণকারী ।

وَمَآ اَنْتَ بِهٰدِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ ؕ اِنْ تُسْمِعُ اِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۝٥٣

(১) এখানে এমন সব লোককে মৃত বলা হয়েছে, যাদের বিবেক মরে গেছে, যাদের মধ্যে নৈতিক জীবনের ছিঁটেফোটাও নেই এবং যাদের আপন প্রবৃত্তির দাসত্ব, জিদ ও একগুঁয়েমি সেই মানবীয় গুণাবলীর অবসান ঘটিয়েছে যা মানুষকে হক কথা বুঝার ও গ্রহণ করার যোগ্য করে তোলে । কাতাদাহ বলেন, এ উদাহরণটি আল্লাহ্ তা'আলা কাফেরদের উদ্দেশ্য করে পেশ করেছেন । যেভাবে মৃতরা আহ্বান শুনতে পায় না, তেমনি কাফেররাও শুনতে পায় না । অনুরূপভাবে যেভাবে কোন বধির ব্যক্তি পিছনে ফিরে চলে গেলে তাকে পিছন থেকে ডাকলে শুনতে পায় না, তেমনি কাফের কিছুই শুনতে পায় না, আর শুনলেও সেটা দ্বারা উপকৃত হতে পারে না । [তাবারী] হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'বদর যুদ্ধের পর বদরের কুপের পাশে যেখানে কাফেরদের লাশ রাখা ছিল সেখানে দাঁড়িয়ে কাফেরদের সম্বোধন করে বললেন, তোমাদের মাবুদরা তোমাদেরকে যা দেবার ওয়াদা করেছে তা কি তোমরা পেয়েছ? তারপর তিনি বললেন: তারা এখন আমি যা বলছি তা শুনছে । তারপর এ হাদীসটি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে জানানো হলে তিনি বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো এটাই বলেছেন যে, তারা এখন অবশ্যই জানছে যে, আমি তাদেরকে যা বলেছি তা-ই যথাযথ । তারপর আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন' । [বুখারী: ৩৯৮০,৩৯৮১]

ষষ্ঠ রুকূ'

৫৪. আল্লাহ্, তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেন দুর্বলতা থেকে, দুর্বলতার পর তিনি দেন শক্তি; শক্তির পর আবার দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য(১)। তিনি যা ইচ্ছে সৃষ্টি করেন এবং তিনিই সর্বজ্ঞ, সর্বক্ষম।

اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضُعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ ضُعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَّشَیْبَةً ؕ یَخْلُقُ مَا یَشَآءُ ۚ وَهُوَ الْعَلِیْمُ الْقَدِیْرُ ﴿۵۴﴾

৫৫. আর যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন অপরাধীরা শপথ করে বলবে যে, তারা মুহূর্তকালের বেশী অবস্থান করেনি(২)। এভাবেই তাদেরকে পথ

وَیَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ یُقْسِمُ الْمُجْرِمُوْنَ ۙ۬ مَا لَبِثُوْا غَیْرَ سَاعَةٍ ؕ كَذٰلِكَ كَانُوْا یُؤْفَكُوْنَ ﴿۵۵﴾

---

(১) কাতাদাহ বলেন, প্রথম দুর্বলতা হচ্ছে শুক্র। আর শেষ দুর্বলতা হচ্ছে বৃদ্ধ বয়স যখন তার চুল সাদা হয়ে যেতে থাকে। [তাবারী] আল্লামা শানকীতী বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা প্রথম দুর্বলতা ও শেষ দুর্বলতা উভয়টির কথাই কুরআনের অন্যত্র বর্ণনা করেছেন। যেমন প্রথম দুর্বলতা সম্পর্কে বলেন, "আমরা কি তোমাদেরকে তুচ্ছ পানি হতে সৃষ্টি করিনি?" [সূরা আল-মুরসালাত: ২০] "মানুষ কি দেখে না যে, আমরা তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্রবিন্দু থেকে? অথচ পরে সে হয়ে পড়ে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী।" [সূরা ইয়াসীন: ৭৭] "অতএব মানুষ যেন চিন্তা করে দেখে তাকে কী থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে! তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে স্খলিত পানি হতে" [সূরা আত-তারেক: ৫-৬] "কখনো নয়, আমরা তাদেরকে যা থেকে সৃষ্টি করেছি তা তারা জানে।" [সূরা আল-মা'আরেজ: ৩৯] "তিনি শুক্র হতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন; অথচ দেখুন, সে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী!" [সূরা আন-নাহল: ৪] আর দ্বিতীয় দুর্বলতা সম্পর্কে বলেন, "আর আল্লাহ্ই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন; তারপর তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে প্রত্যাবর্তিত করা হবে নিকৃষ্টতম বয়সে; যাতে জ্ঞান লাভের পরেও তার সবকিছু অজানা হয়ে যায়।" [সূরা আন-নাহল: ৭০] "আর আমরা যা ইচ্ছে তা এক নির্দিষ্ট কালের জন্য মাতৃগর্ভে স্থিত রাখি, তারপর আমরা তোমাদেরকে শিশুরূপে বের করি, পরে যাতে তোমরা পরিণত বয়সে উপনীত হও। তোমাদের মধ্যে কারো কারো মৃত্যু ঘটান হয় এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে কাউকে হীনতম বয়সে প্রত্যাবর্তিত করা হয়, যার ফলে সে জানার পরেও যেন কিছুই (আর) জানে না।" [সূরা আল-হাজ্জ: ৫] "আর আমরা যাকে দীর্ঘ জীবন দান করি, সৃষ্টি অবয়বে তার অবনতি ঘটাই। তবুও কি তারা বুঝে না?" [সূরা ইয়াসীন: ৬৮]

(২) অর্থাৎ হাশরে কাফেররা কসম খেয়ে এই মিথ্যা কথা বলবে, আমরা দুনিয়াতে অথবা কবরে এক মুহূর্তের বেশী থাকিনি। অন্য এক আয়াতে মুশরিকদের এই উক্তি

ভ্রষ্ট করা হত[১]।

وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَالْاِيْمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ الْبَعْثِ ۫ فَهٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٥٦﴾

৫৬. আর যাদেরকে জ্ঞান ও ঈমান দেয়া হয়েছে[২] তারা বলবে, 'অবশ্যই তোমরা আল্লাহ্‌র লিখা অনুযায়ী পুনরুত্থানের দিন পর্যন্ত অবস্থান করেছ। সুতরাং এটাই তো পুনরুত্থান দিন, কিন্তু তোমরা জানতে না।'

فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنْفَعُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ﴿٥٧﴾

৫৭. সুতরাং যারা যুলুম করেছে সেদিন তাদের ওযর-আপত্তি তাদের কোন কাজে আসবে না এবং তাদেরকে তিরস্কৃত হওয়ার (মাধ্যমে আল্লাহ্‌র

বর্ণিত আছে, "তারা কসম খেয়ে বলবে আমরা মুশরিক ছিলাম না।" [সূরা আল-আন'আম:২৩] এর কারণ এই যে, হাশরের ময়দানে রাব্বুল আলামীনের আদালত কায়েম হবে। তিনি সবাইকে স্বাধীনতা দেবেন। তারা সত্য কিংবা মিথ্যা যে কোন বিবৃতি দিতে পারবে। কেননা, রাব্বুল আলামীনের ব্যক্তিগত জ্ঞানও পূর্ণমাত্রায় আছে এবং বিচার বিভাগীয় তদন্তের জন্যে তিনি তাদের স্বীকারোক্তি করা না করার মুখাপেক্ষী নন। মানুষ যখন মিথ্যা বলবে, তখন তার মুখ মোহরাঙ্কিত করে দেয়া হবে এবং তার হস্ত-পদ ও চর্ম থেকে সাক্ষ্য নেয়া হবে। এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পূর্ণ সত্য ঘটনা বিবৃত করে দেবে। এরপর আর কোন প্রমাণ আবশ্যক হবে না। আলোচ্য আয়াতের অর্থ তাই। কুরআনের অন্যান্য আয়াত থেকে জানা যায় যে, হাশরের মাঠে বিভিন্ন অবস্থানস্থল হবে এবং প্রত্যেক অবস্থানস্থলের অবস্থা ভিন্নরূপ হবে। এক অবস্থানস্থলে আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কারও কথা বলার অধিকার থাকবে না। যাকে অনুমতি দেয়া হবে, সে কেবল সত্য ও নির্ভুল কথা বলতে পারবে মিথ্যা বলার সামর্থ্য থাকবে না। যেমন এরশাদ হয়েছে, "যখন সেদিন আসবে তখন আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া কেউ কথা বলতে পারবে না"। [সূরা হূদ:১০৫] এর বিপরীতে সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, কবরে যখন কাফেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমার পালনকর্তা কে এবং মুহাম্মাদ কে ? তখন সে বলবে, 'হায়, হায়, আমি কিছুই জানি না' [মুসনাদে আহমাদ: ৪/২৮৭, ২৯৫-২৯৬, আবু দাউদ: ৪৭৫৩]।

(১) কাতাদাহ বলেন, এর অর্থ এভাবেই তারা দুনিয়াতে মিথ্যা বলত। তারা সত্য থেকে বিমুখ থাকত। সত্য থেকে বিরত হয়ে মিথ্যার দিকে চলে যেত। [তাবারী]

(২) আল্লামা শানকীতী বলেন, এখানে যাদেরকে জ্ঞান ও ঈমান দেয়া হয়েছে বলে, ফেরেশতাগণ, রাসূলগণ, নবীগণ, সৎবান্দাগণ সবই উদ্দেশ্য হতে পারে।[আদওয়াউল বায়ান]

সন্তুষ্টি লাভের) সুযোগও দেয়া হবে না।

৫৮. আর অবশ্যই আমরা মানুষের জন্য এ কুরআনে সব ধরনের দৃষ্টান্ত দিয়েছি। আর আপনি যদি তাদের কাছে কোন নিদর্শন উপস্থিত করেন, তবে যারা কুফরী করেছে তারা অবশ্যই বলবে, 'তোমরা তো বাতিলপন্থী[১]।'

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۗ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِاٰيَةٍ لَّيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُبْطِلُوْنَ ﴿٥٨﴾

৫৯. যারা জানে না আল্লাহ্ এভাবেই তাদের হৃদয়ে মোহর করে দেন[২]।

كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٥٩﴾

৬০. অতএব আপনি ধৈর্য ধারণ করুন, নিশ্চয় আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য[৩]।

فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ

---

(১) অর্থাৎ আল্লাহ্ বলেন, অবশ্যই আমরা হক বর্ণনা করেছি, হককে তাদের জন্য স্পষ্ট করেছি, হকের জন্য বিভিন্ন প্রকার উদাহরণ তাদের সামনে তুলে ধরেছি। যাতে তারা হক চিনতে পারে এবং হকের অনুসরণ করতে পারে। কিন্তু তারা যে নিদর্শনই দেখুক না কেন, চাই সেটা তাদের প্রস্তাবনা মোতাবেকই হোক বা অন্যভাবেই পেশ করা হোক, তারা এর উপর ঈমান আনবে না। আর তারা বিশ্বাস করতে থাকবে যে, এটা জাদু ও বাতিল। যেমন চাঁদ দু'খণ্ডিত হওয়ার ব্যাপারে তাদের অবস্থান। [ইবন কাসীর] অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ বলেন, "নিশ্চয় যাদের বিরুদ্ধে আপনার রবের বাক্য সাব্যস্ত হয়ে গেছে, তারা ঈমান আনবে না। যদিও তাদের কাছে সবগুলো নিদর্শন আসে, যে পর্যন্ত না তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেখতে পাবে।" [সূরা ইউনুস: ৯৬-৯৭]

(২) সুতরাং সেখানে কোন কল্যাণ প্রবেশ করবে না, সে অন্তরে কোন বস্তুর সঠিক রূপ প্রকাশিত হবে না। বরং সেখানে হক বাতিলরূপে এবং বাতিল হকরূপে তাদের কাছে প্রতিভাত হবে। [সা'দী]

(৩) সুতরাং আপনাকে যে কাজের নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাতে ধৈর্য ধারণ করুন এবং আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াতেও লেগে থাকুন, তাদের কাছ থেকে বিমুখ হওয়া দেখলেও তা যেন আপনাকে আপনার কাজ থেকে বিমুখ না করে। আর বিশ্বাস করুন যে, আল্লাহ্‌র ওয়াদা হক। এতে কোন সন্দেহ নেই। এটা বিশ্বাস থাকলে আপনার পক্ষে ধৈর্য ধারণ করা সহজ হবে। কারণ, বান্দা যখন জানতে পারে যে, তার কাজ নষ্ট হচ্ছে না, বরং সে সেটাকে পূর্ণমাত্রায় পাবে, তখন এ পথে যত কষ্টের মুখোমুখিই সে হোক না কেন, সে সেটাকে ভ্রুক্ষেপ করবে না, কঠিন কাজও তার জন্য সহজ হয়ে যায়, বেশী কাজও তার কাছে অল্প মনে হয়, আর তার পক্ষে ধৈর্য ধারণ করা সহজ হয়ে যায়। [সা'দী]

الَّذِيْنَ لَا يُوْقِنُوْنَ ﴿٦٠﴾

আর যারা দৃঢ় বিশ্বাসী নয় তারা যেন আপনাকে বিচলিত করতে না পারে(১)।

(১) কারণ, তাদের ঈমান দুর্বল হয়ে গেছে, তাদের দৃঢ়তা কমে গেছে, তাই তাদের বিবেক হাল্কা হয়ে গেছে, তাদের সবর কমে গেছে। সুতরাং আপনি তাদের থেকে সাবধান থাকুন। আপনি যদি তাদের থেকে সাবধান না থাকুন, তবে তারা আপনাকে বিচলিত করে দিতে পারে, আপনাকে আল্লাহ্‌র আদেশ ও নিষেধের উপর থেকে সরিয়ে দিতে পারে। কারণ, সাধারণত মন চায় তাদের মত হতে। আয়াত থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, প্রত্যেক মুমিনই দৃঢ়বিশ্বাসী, স্থির বিবেকসম্পন্ন, তাই তার জন্য ধৈর্য ধারণ করা সহজ। পক্ষান্তরে প্রত্যেক দুর্বল বিশ্বাসী, অস্থিরমতি থাকে। [সা'দী]

৩১- সূরা লুকমান
৩৪ আয়াত, মক্কী

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আলিফ-লাম-মীম;

الٓمّٓ ﴿١﴾

২. এগুলো হিকমতপূর্ণ কিতাবের আয়াত,

تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ﴿٢﴾

৩. পথ-নির্দেশ ও দয়াস্বরূপ মুহসিনদের জন্য[১];

هُدًى وَّرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ ﴿٣﴾

৪. যারা সালাত কায়েম করে এবং যাকাত দেয়, আর তারাই আখিরাতে নিশ্চিত বিশ্বাসী;

الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ﴿٤﴾

৫. তারাই তাদের রবের পক্ষ থেকে হিদায়াতের উপর আছে এবং তারাই সফলকাম[২] ।

اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٥﴾

---

(১) অর্থাৎ এ আয়াতগুলো সঠিক পথনির্দেশক এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহের রূপ লাভ করে এসেছে। কিন্তু এ পথনির্দেশনা ও অনুগ্রহ থেকে লাভবান হয় একমাত্র তারাই যারা সৎকাজ করার পথ অবলম্বন করে, সৎ হতে চায়, কল্যাণ ও ন্যায়ের সন্ধান করে এবং অসৎকাজ সম্পর্কে যখনই সতর্ক করে দেয়া হয় তখনই তা পরিহার করে এবং কল্যাণ ও ন্যায়ের পথ যখনই সামনে খুলে রেখে দেয়া হয় তখনই সে পথে চলতে শুরু করে। আর যারা অসৎকাজ করে ও অসৎ মনোবৃত্তির অধিকারী তারা এ পথনির্দেশনা থেকে লাভবান হবে না এবং এ অনুগ্রহেরও কোন অংশ পাবে না। [তাবারী, ফাতহুল কাদীর]

(২) যাদেরকে সৎকর্মপরায়ণ বলা হয়েছে তারা কেবলমাত্র এ তিনটি গুণাবলীর অধিকারী, একথা বলা হয়নি। আসলে প্রথমে 'সৎকর্মপরায়ণ' শব্দটি ব্যাপক অর্থে বর্ণনা করে এদিকে ইংগিত করা হয়েছে যে, এ কিতাব যেসব অপকর্মে বাধা দেয় এ সৎকর্মশীলরা সেসবগুলো থেকেই বিরত থাকে। আর এ কিতাব যেসব সৎকাজ করার হুকুম দেয় এরা সেসবগুলোই করে। তারপর এ "সৎকর্মশীলদের" তিনটি গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলী বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে একথা প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য যে, বাদবাকি সমস্ত সৎকাজ কিন্তু এ তিনটি সদগুণের ওপরই নির্ভর করবে। তারা সালাত কায়েম করে। এর ফলে আল্লাহর হুকুম মেনে চলা ও আল্লাহর ভয়ে ভীত হওয়া তাদের স্থায়ী অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। তারা যাকাত দেয়। এর ফলে আত্মত্যাগের

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ وَّيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ؕ

৬. আর মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য অসার বাক্য কিনে নেয়(১)

প্রবণতা তাদের মধ্যে সুদৃঢ় ও শক্তিশালী হয়, পার্থিব সম্পদের প্রতি মোহ প্রদমিত হয় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আকাংখা জেগে ওঠে। তারা আখেরাতে বিশ্বাস করে। এর ফলে তাদের মধ্যে দায়িত্ববোধ ও জবাবদিহি করার অনুভূতি জাগে। এর বদৌলতে তারা এমন জন্তু-জানোয়ারের মতো হয় না যারা চারণক্ষেত্রে বাঁধনহারা হয়ে এদিক ওদিক চরে বেড়ায়। বরং তারা এমন মানুষদের মতো হয়ে যায় যারা নিজেদেরকে স্বেচ্ছাচারী মনে করে না। মনে করে, তারা কোন প্রভুর গোলাম এবং নিজেদের সমস্ত কাজের জন্য প্রভুর সামনে জবাবদিহি করতে বাধ্য। এ তিনটি বিশেষত্বের কারণে এ "সৎকর্মশীলরা" ঠিক তেমনি ধরনের সৎকর্মশীল থাকে না যারা ঘটনাক্রমে কোন সৎকাজ করে বসে এবং তাদের অসৎকাজও তেমনি সৎকাজের মতো একই ধারায় অনুষ্ঠিত হতে পারে। পক্ষান্তরে এ বিশেষত্বগুলো তাদের মধ্যে একটি চিন্তা ও নৈতিক ব্যবস্থার জন্ম দেয় যার ফলে তাদের সৎকাজগুলো একটি ধরা বাঁধা নিয়মানুসারে অনুষ্ঠিত হতে থাকে এবং অসৎকাজ যদি কখনো হয়ে যায়ই তাহলে তা হয় ঘটনাক্রমে। তাদের কোন গভীর চিন্তা ও নৈতিক উদ্যোগ তাদেরকে নিজেদের প্রাকৃতিক চাহিদা অনুসারে অসৎপথে নিয়ে যায় না। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

(১) ﴿لَهْوَ الْحَدِيْثِ﴾ বাক্যটিতে حديث শব্দের অর্থ কথা, কিসসা-কাহিনী এবং لهو শব্দের অর্থ গাফেল হওয়া। যেসব বিষয় মানুষকে প্রয়োজনীয় কাজ থেকে গাফেল করে দেয় সেগুলোকে لهو বলা হয়। মাঝে মাঝে এমন কাজকেও لهو বলা হয়, যার কোন উল্লেখযোগ্য উপকারিতা নেই, কেবল সময় ক্ষেপণ অথবা মনোরঞ্জনের জন্যে করা হয়। আলোচ্য আয়াতে ﴿لَهْوَ الْحَدِيْثِ﴾ এর অর্থ ও তফসীর কি, এ সম্পর্কে তাফসীরবিদগণের উক্তি বিভিন্নরূপ। ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস ও জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহুম- এর মতে এর অর্থ, গান-বাদ্য করা। অধিকাংশ সাহাবী, তাবেয়ী ও তফসীরবিদগণের মতে এর অর্থ গান, বাদ্যযন্ত্র ও অনর্থক কিসসা-কাহিনীসহ যেসব বস্তু মানুষকে আল্লাহ্‌র ইবাদত ও স্মরণ থেকে গাফেল করে, সেগুলো সবই ﴿لَهْوَ الْحَدِيْثِ﴾। ইমাম বুখারী তার কিতাবে ﴿لَهْوَ الْحَدِيْثِ﴾ এর এ তাফসীরই অবলম্বন করেছেন। তিনি বলেন, لَهْوُ الْحَدِيْثِ هُوَ الْغِنَاءُ وَأَشْبَاهُه অর্থাৎ, ﴿لَهْوَ الْحَدِيْثِ﴾ বলে গান ও অনুরূপ অন্যান্য বিষয় বোঝানো হয়েছে যা আল্লাহ্‌র ইবাদত থেকে গাফেল করে দেয়।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, অধিকাংশ সাহাবী উল্লেখিত আয়াতে ﴿لَهْوَ الْحَدِيْثِ﴾ এর তাফসীর করেছেন গান-বাজনা করা। তবে কোন কোন সাহাবী আয়াতের ব্যাপক তাফসীর করে বলেছেন যে, আয়াতে এমন যে কোন খেলা বোঝানো হয়েছে, যা মানুষকে আল্লাহ্‌ থেকে গাফেল করে দেয়। আলেমগণ পবিত্র কুরআনের ﴿لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ﴾ আয়াতের শব্দের তাফসীর করেছেন গান-বাজনা। রাসূলুল্লাহ্‌

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “আমার উম্মতের কিছু লোক মদের নাম পাল্টিয়ে তা পান করবে। তাদের সামনে গায়িকারা বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সহকারে গান করবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ভূ-গর্ভে বিলীন করে দেবেন এবং কতকের আকৃতি বিকৃত করে বানর ও শূকরে পরিণত করে দেবেন।” [বুখারী: ৫৫৯০, আবু দাউদ: ৪০৩৯] ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমার বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা মদ, জুয়া, তবলা ও সারেঙ্গী হারাম করেছেন। তিনি আরও বলেন, নেশাগ্রস্ত করে এমন প্রত্যেক বস্তু হারাম। [আহমদ:১/৩৫০, আবূ দাউদ: ৩৬৯৮] এতদ্ভিন্ন বহু প্রমাণ ও নির্ভরযোগ্য হাদীস রয়েছে, যাতে গান-বাদ্য হারাম ও না-জায়েয বলা হয়েছে, এ ব্যাপারে বিশেষ সতর্কবাণী রয়েছে এবং কঠিন শাস্তির ঘোষণা রয়েছে। সারকথা এই যে, যেসব কাজ প্রকৃতপক্ষে খেলা; অর্থাৎ যাতে কোন দ্বীনী বা পার্থিব উপকারিতা নেই, সেগুলো অবশ্যই নিন্দনীয় ও মাকরূহ। তবে কতক একেবারে কুফর পর্যন্ত পৌঁছে যায়, কতক প্রকাশ্য হারাম এবং কতক কমপক্ষে মাকরূহ। যেসব কাজ প্রকৃতই খেলা, তার কোনটিই এ বিধানের বাইরে নয়। বর্তমান যুগে অধিকাংশ যুবক-যুবতী অশ্লীল উপন্যাস, পেশাদার অপরাধীদের কাহিনী অথবা অশ্লীল কবিতা পাঠে অভ্যস্ত। এসব বিষয় উপরোক্ত হারাম খেলারই অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে পথভ্রষ্ট বাতিলপন্থীদের চিন্তাধারা অধ্যায়ন করাও সর্ব সাধারণের জন্যে পথভ্রষ্টতার কারণ বিধায় না-জায়েয। তবে গভীর জ্ঞানের অধিকারী আলেমগণ জওয়াব দানের উদ্দেশ্যে এগুলো পাঠ করলে তাতে আপত্তির কারণ নেই।

খেলার সাজ-সরঞ্জাম ক্রয়-বিক্রয়ের বিধান হলো, যেসব সাজ-সরঞ্জাম কুফর অথবা হারাম খেলায় ব্যবহৃত হয়, সেগুলো ক্রয়-বিক্রয় করাও হারাম এবং যেগুলো মাকরূহ খেলায় ব্যবহৃত হয়, সেগুলোর ব্যবসা করাও মাকরূহ। পক্ষান্তরে যেসব সাজ-সরঞ্জাম বৈধ ও ব্যতিক্রমভুক্ত খেলায় ব্যবহার করা হয়, সেগুলোর ব্যবসাও বৈধ এবং যেগুলো বৈধ ও অবৈধ উভয় প্রকার খেলায় ব্যবহার করা হয়; সেগুলোর ব্যবসাও অবৈধ।

এর বাইরে এমনও কতক খেলা রয়েছে যেগুলো রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশেষভাবে নিষিদ্ধ করেছেন, যদিও সেগুলোতে কিছু কিছু উপকারিতা আছে বলেও উল্লেখ করা হয়, যেমন দাবা, চওসর ইত্যাদি। এগুলোর সাথে হারজিত ও টাকা-পয়সার লেনদেন জড়িত থাকলে এগুলো জুয়া ও অকাট্য হারাম। অন্যথায় কেবল চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে খেলা হলেও হাদীসে এসব খেলা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি চওসর খেলায় প্রবৃত্ত হয়, সে যেন তার হাতকে শূকরের রক্তে রঞ্জিত করে। [মুসলিম: ২২৬০] এমনিভাবে কবুতর নিয়ে খেলা করাকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবৈধ সাব্যস্ত করেছেন। [আবূ দাউদ: ৪৯৪০] এই নিষেধাজ্ঞার বাহ্যিক কারণ এই যে, সাধারণভাবে এসব খেলায় মগ্ন হলে মানুষ জরুরী কাজকর্ম

জ্ঞান ছাড়াই[১] এবং আল্লাহ্‌র দেখানো | أُولَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

এমন কি সালাত, সাওম ও অন্যান্য ইবাদত থেকেও অসাবধান হয়ে যায়।
তাই সংক্ষেপে এটাই বলা যায় যে, যে খেলায় কোন ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারিতা নেই, সেসব খেলাই নিন্দনীয় ও নিষিদ্ধ। যে খেলা শারীরিক ব্যায়াম তথা স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে অথবা অন্য কোন ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারিতা লাভের জন্যে অথবা কমপক্ষে মানসিক অবসাদ দূর করার জন্যে খেলা হয়, সে খেলা শরীয়ত অনুমোদন করে, যদি তাতে বাড়াবাড়ি না করা এবং এতে ব্যস্ত থাকার কারণে প্রয়োজনীয় কাজকর্ম বিঘ্নিত না হয়। আর ধর্মীয় প্রয়োজনের নিয়তে খেলা হলে তাতে সওয়াবও আছে। হাদীসে তিনটি খেলাকে নিষেধাজ্ঞার বাইরে রাখা হয়েছে তীর নিক্ষেপ, অশ্বারোহণ এবং স্ত্রীর সাথে হাস্যরস করা। [সাঈদ ইবন মানসূর: ২৪৫০, ইবন আবি শাইবাহ: ৫/৩২০,৩২১ নাসায়ী: আস সুনানুল কুবরা ৪৩৫৪, ৮৯৩৮, ৮৯৩৯, ৮৯৪০, আস-সুগরা: ৬/২৮, ত্বাবরানী: আল-মু'জামুল কাবীর ১৭৮৫, আবু দাউদ: ২৫১৩, আল-মুনতাকা: ১০৬২, মুসনাদে আহমাদ ৪/১৪৪,১৪৬, ১৪৮] কোন কোন বর্ণনায় এর সাথে যোগ করা হয়েছে, সাঁতার কাটা। [ত্বাবরানী: মু'জামুল কাবীর ২/১৯৩, (১৭৮৬)। অপর বর্ণনায় এর সাথে যোগ করা হয়েছে, দৌড় প্রতিযোগিতা করা। [নাসায়ী: সুনানুল কুবরা ৫/৩০২, (৮৯৩৯)। অন্য বর্ণনায় এসেছে, সালামাহ ইবনে আকওয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, জনৈক আনসারী দৌড়ে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। প্রতিযোগিতায় কেউ তাঁকে হারাতে পারত না। তিনি একদিন ঘোষণা করলেন কেউ আমার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে প্রস্তুত আছে কি? আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে অনুমতি চাইলে তিনি অনুমতি দিলেন। অতঃপর প্রতিযোগিতায় আমি জয়ী হয়ে গেলাম। [মুসলিম: ১৮০৭] এ থেকে জানা গেল যে, দৌড় প্রতিযোগিতা বৈধ।
আবিসিনিয়ার কতিপয় যুবক মদীনা তাইয়্যেবায় সামরিক কলা-কৌশল অনুশীলনকল্পে বর্শা ইত্যাদি নিয়ে খেলায় প্রবৃত্ত ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে নিজের পেছনে দাঁড় করিয়ে তাদের খেলা উপভোগ করাচ্ছিলেন। তিনি তাদেরকে বলেছিলেন খেলাধুলা অব্যাহত রাখ। [বুখারী: ৪৫৪] অনুরূপভাবে কোন কোন সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, যখন তারা কুরআন ও হাদীস সম্পর্কিত কাজে ব্যস্ততার ফলে অবসন্ন হয়ে পড়তেন, তখন অবসাদ দুর করার জন্যে মাঝে মাঝে আরবে প্রচলিত কবিতা ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলী দ্বারা মনোরঞ্জন করতেন। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে "তোমরা মাঝে মাঝে অন্তরকে বিশ্রাম ও আরাম দিবে। [আবূ দাউদ: ১৫২৮] এ থেকে অন্তর ও মস্তিষ্কের বিনোদন এবং এর জন্যে কিছু সময় বের করার বৈধতা প্রমাণিত হয়।

(১) "জ্ঞান ছাড়াই" শব্দের সম্পর্ক "কিনে নেয়" এর সাথেও হতে পারে আবার "বিচ্যুত করে" এর সাথেও হতে পারে। যদি প্রথম বাক্যাংশের সাথে এর সম্পর্ক মেনে নেয়া

পথ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। তাদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি।

৭. আর যখন তার কাছে আমাদের আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয় তখন সে অহংকারে মুখ ফিরিয়ে নেয় যেন সে এটা শুনতে পায়নি[১], যেন তার কান দুটো বধির; অতএব তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দিন।

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَٰتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِىٓ أُذُنَيْهِ وَقْرًا ۖ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ⑦

৮. নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তাদের জন্য রয়েছে নেয়ামতপূর্ণ জান্নাত;

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَهُمْ جَنَّٰتُ ٱلنَّعِيمِ ⑧

৯. সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য (অকাট্য)। আর তিনি প্রবল পরাক্রমশালী,

خَٰلِدِينَ فِيهَا ۖ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقًّا ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ⑨

হয়, তাহলে এর অর্থ হবে, সেই মূর্খ অজ্ঞ লোক এই মনোমুগ্ধকর জিনিসটি কিনে নেয় এবং সে জানে না কেমন মূল্যবান জিনিস বাদ দিয়ে সে কেমন ধ্বংসকর জিনিস কিনে নিচ্ছে। একদিকে আছে জ্ঞান ও সঠিক পথনির্দেশনা সমৃদ্ধ আল্লাহর আয়াত। বিনামূল্যে সে তা লাভ করছে কিন্তু তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। অন্যদিকে রয়েছে সব অর্থহীন ও বাজে জিনিস। সেগুলো চিন্তা ও চরিত্রশক্তি ধ্বংস করে দেয়। নিজের টাকা পয়সা খরচ করে সে সেগুলো লাভ করছে। আর যদি একে দ্বিতীয় বাক্যাংশের সাথে সম্পর্কযুক্ত মনে করা হয়, তাহলে এর অর্থ হবে যে, সে জ্ঞান ছাড়াই লোকদের পথ দেখাচ্ছে এবং আল্লাহর সৃষ্টিকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা করে সে যে নিজের ঘাড়ে কত বড় জুলুমের দায়ভার চাপিয়ে নিচ্ছে, তা সে জানে না।

(১) অহংকারই মূলত কাফের-মুশরিকদেরকে ঈমান থেকে দূরে রেখেছিল। অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা এ সত্য প্রকাশ করে বলেছেন, দুর্ভোগ প্রত্যেক ঘোর মিথ্যাবাদী পাপীর, যে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহের তিলাওয়াত শোনে অথচ ঔদ্ধত্যের সাথে অটল থাকে যেন সে তা শোনেনি। তাকে সংবাদ দিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির; যখন আমার কোন আয়াত সে অবগত হয় তখন তা নিয়ে পরিহাস করে। তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। তাদের পিছনে রয়েছে জাহান্নাম; তাদের কৃতকর্ম তাদের কোন কাজে আসবে না, তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদেরকে অভিভাবক স্থির করেছে ওরাও নয়। তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। [সূরা আল-জাসিয়াহ্: ৭-১০]

হিকমতওয়ালা[১]!

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ؕ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ ﴿۱۰﴾

১০. তিনি আসমানসমূহ নির্মাণ করেছেন খুঁটি ছাড়া---তোমরা এটা দেখতে পাচ্ছ; তিনিই যমীনে স্থাপন করেছেন সুদৃঢ় পর্বতমালা যাতে এটা তোমাদেরকে নিয়ে ঢলে না পড়ে এবং এতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সব ধরনের জীব-জন্তু। আর আমরা আকাশ হতে বারি বর্ষণ করি তারপর এতে উদ্গত করি সব ধরনের কল্যাণকর উদ্ভিদ।

هٰذَا خَلْقُ اللّٰهِ فَاَرُوْنِىْ مَاذَا خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ؕ بَلِ الظّٰلِمُوْنَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿۱۱﴾

১১. এটা আল্লাহ্‌র সৃষ্টি! সুতরাং তিনি ছাড়া অন্যরা কি সৃষ্টি করেছে আমাকে দেখাও। বরং যালিমরা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে[২]।

দ্বিতীয় রুকূ'

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ اَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ ؕ وَمَنْ يَّشْكُرْ

১২. আর অবশ্যই আমরা লুক্‌মান[৩] কে

---

(১) অর্থাৎ নিজের প্রতিশ্রুতি পালন থেকে কোন জিনিসই তাঁকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না এবং তিনি যা কিছু করেন ঠিকমতো জ্ঞান ও ন্যায়পরায়ণতার দাবী অনুযায়ীই করেন। [ইবন কাসীর, ফাতহুল কাদীর; সা'দী]

(২) অর্থাৎ যখন এরা এ বিশ্ব-জাহানে আল্লাহ ছাড়া আর কারো কোন সৃষ্টি চিহ্নিত করতে পারেনি এবং একথা সুস্পষ্ট যে, তারা তা করতে পারে না তখন তাদের যারা স্রষ্টা নয় এমন সত্ত্বাকে আল্লাহর একচ্ছত্র ও সার্বভৌম কর্তৃত্বে শরীক করা, তাদের সামনে আনুগত্যের শির নত করা এবং তাদের কাছে প্রার্থনা করা ও অভাব মোচন করার জন্য আবেদন জানানোকে সুস্পষ্ট নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে?

(৩) কোন কোন তাবে'য়ী আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত লুকমানকে আইয়্যুব আলাইহিস সালাম-এর ভাগ্নে বলেছেন। আবার কেউ কেউ তার খালাতো ভাই বলে বর্ণনা করেছেন। বিভিন্ন তফসীরে রয়েছে যে, তিনি দীর্ঘায়ূ লাভ করেছিলেন এবং দাউদ আলাইহিস সালাম–এর সময়েও বেঁচে ছিলেন। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, লুকমান ছিলেন একজন হাবশী গোলাম। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু, মুজাহিদ, ইকরিমাহ ও খালেদ আর-রাব'ঈও একথাই বলেন। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, তিনি ছিলেন নূবার অধিবাসী। অপর বর্ণনায় তিনি বলেন,

লুকমান চেপ্টা নাকবিশিষ্ট, বেঁটে আকারের হাবশী ক্রীতদাস ছিলেন। সাঈদ ইবনে মুসাইয়েবের উক্তি হচ্ছে, তিনি মিসরের কালো লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মুজাহিদ বলেন, তিনি ফাটা পা ও পুরু ঠোঁটবিশিষ্ট হাবশী ক্রীতদাস ছিলেন। এ বক্তব্যগুলো প্রায় কাছাকাছি অবস্থান করছে। কারণ আরবের লোকেরা কালো বর্ণের মানুষদেরকে সেকালে প্রায়ই হাবশী বলতো। আর নূবা হচ্ছে মিসরের দক্ষিণে এবং সূদানের উত্তরে অবস্থিত একটি এলাকা। তাই উক্ত বক্তব্যগুলোতে একই ব্যক্তিকে নূবী, মিসরীয় ও হাবশী বলা কেবলমাত্র শাব্দিক বিরোধ ছাড়া আর কিছুই নয়। অর্থের দিক দিয়ে এখানে কোন বিরোধ নেই। এ ব্যক্তি আসলে বাসিন্দা ছিলেন মাদ্‌য়ান ও আইল (বর্তমান আকাবাহ) এলাকার। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমার বর্ণনা অনুযায়ী লুকমান কাঠ চেরার কাজ করতেন। আবার কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি দর্জি ছিলেন।

কোন কোন গবেষক লুকমানকে আদ জাতির অন্তর্ভুক্ত ইয়ামনের বাদশাহ মনে করতো। তাদের মতে 'আদ জাতির ওপর আল্লাহর আযাব নাযিল হবার পর হূদ আলাইহিস্ সালামের সাথে তাদের যে ঈমানদার অংশটি বেঁচে গিয়েছিল লুকমান ছিলেন তাঁদেরই বংশোদ্ভুত। ইয়ামনে এ জাতির যে শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তিনি ছিলেন তার অন্যতম শাসক ও বাদশাহ। কিন্তু প্রবীণ সাহাবী ও তাবেঈদের মাধ্যমে প্রাপ্ত অন্য বর্ণনাগুলো এর সম্পূর্ণ বিপরীত। সম্ভবতঃ এর কারণ হচ্ছে, ইতিহাসে লুকমান ইব্‌ন 'আদ নামক এক ব্যক্তি প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। কোন কোন গবেষক তাকে এই লুকমান হাকীমই ধরে নিয়েছেন। আল্লামা সুহাইলী এ সন্দেহ অপনোদন করে বলেছেন যে, লুকমান হাকীম ও লুকমান ইবনে আদ দু'জন আলাদা ব্যক্তি। তাদেরকে এক ব্যক্তি মনে করা ঠিক নয়।

লুকমান কোন নবী ছিলেন না; বরং ওলী, প্রজ্ঞাবান ও বিশিষ্ট মনীষী ছিলেন। ইবনে কাসীর বলেন যে, প্রাচীন ইসলামী মনীষীবৃন্দ এ ব্যাপারে একমত যে, তিনি নবী ছিলেন না। কেবল ইকরিমা থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী ছিলেন। কিন্তু এর বর্ণনাসূত্র বা সনদ দুর্বল। ইমাম বগবী বলেন, একথা সর্বসম্মত যে, তিনি বিশিষ্ট ফকীহ্ ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি ছিলেন, নবী ছিলেন না। ইবনে কাসীর আরো বলেন, তার সম্পর্কে কাতাদাহ থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ লুকমানকে নবুওয়ত ও হেকমত বা প্রজ্ঞা–দুয়ের মধ্যে যে কোন একটি গ্রহণের সুযোগ দেন। তিনি হেকমতই গ্রহণ করেন। কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, তাকে নবুওয়ত গ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়েছিল। তিনি আরয করলেন যে, "যদি আমার প্রতি এটা গ্রহণ করার নির্দেশ হয়ে থাকে, তবে তা শিরোধার্য। অন্যথায় আমাকে ক্ষমা করুন।" কাতাদা থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, লুকমানের নিকট এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, আপনি হেকমতকে নবুওয়ত থেকে সমধিক গ্রহণযোগ্য কেন মনে করলেন, যখন আপনাকে যে কোন একটা গ্রহণ করার অধিকার দেয়া হয়েছিল? তিনি বললেন যে, নবুওয়ত বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ পদ। যদি তা আমার ইচ্ছা ব্যতীত প্রদান

فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿١٢﴾

হিকমত[১] দিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম যে, আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। আর যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তো তা করে নিজেরই জন্য এবং কেউ অকৃতজ্ঞ হলে আল্লাহ্ তো অভাবমুক্ত, চির প্রশংসিত[২]।

করা হতো, তবে স্বয়ং মহান আল্লাহ্ তার দায়িত্ব গ্রহণ করতেন যাতে আমি সে কর্তব্যসমূহ পালন করতে সক্ষম হই। কিন্তু যদি আমি তা স্বেচ্ছায় চেয়ে নিতাম, তবে সে দায়িত্ব আমার উপর বর্তাতো। বর্ণিত আছে যে, দাঊদ আলাইহিস সালাম-এর আবির্ভাবের পূর্বে লুকমান শরীয়তী মাসআলাসমূহ সম্পর্কে জনগণের নিকট ফতোয়া দিতেন। দাঊদ আলাইহিস সালাম-এর নবুওয়ত প্রাপ্তির পর তিনি এ ফতোয়া প্রদান কার্য পরিত্যাগ করেন এই বলে যে, এখন আর তার প্রয়োজন নেই। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি ইসরাঈল গোত্রের বিচারপতি ছিলেন। লুকমানের বহু জ্ঞানগর্ভ বাণী লিপিবদ্ধ আছে। কোন কোন তাবে'য়ী বলেন, আমি লুকমানের জ্ঞান-বিজ্ঞানের দশ হাজারের চাইতেও বেশী অধ্যায় অধ্যায়ন করেছি। একদিন লুকমান এক বিরাট সমাবেশে উপস্থিত জনমণ্ডলীকে বহু জ্ঞানগর্ভ কথা শোনচ্ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করলো যে, আপনি কি সে ব্যক্তি -যে আমার সাথে অমুক বনে ছাগল চরাতো? লুকমান বলেন, হ্যাঁ-আমিই সে লোক। অতঃপর লোকটি বললো, তবে আপনি এ মর্যাদা কিভাবে লাভ করলেন যে, আল্লাহ্‌র গোটা সৃষ্টিকুল আপনার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং আপনার বাণী শোনার জন্যে দূর-দূরান্ত থেকে এসে জমায়েত হয়? উত্তরে লুকমান বললেন যে, এর কারণ আমার দু'টি কাজ-[এক] সর্বদা সত্য বলা, [দুই] অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা পরিহার করা। অপর এক বর্ণনায় আছে যে, লুকমান বলেছেন, এমন কতগুলো কাজ আছে যা আমাকে এর স্তরে উন্নীত করেছে। যদি তুমি তা গ্রহণ কর, তবে তুমিও এ মর্যাদা ও স্থান লাভ করতে পারবে। সে কাজগুলো এই : নিজের দৃষ্টি নিম্নমুখী রাখা এবং মুখ বন্ধ করা, হালাল জীবিকাতে তুষ্ট থাকা, নিজের লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করা, সত্য কথায় অটল থাকা, অঙ্গীকার পূর্ণ করা, মেহ্মানের আদর-আপ্যায়ন ও তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, প্রতিবেশীর প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখা এবং অপ্রয়োজনীয় কাজ ও কথা পরিহার করা। [ইবন কাসীরঃ আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ]

(১) হেকমত অর্থ প্রজ্ঞা, জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা, পাণ্ডিত্য, যুগ ও সময়োপযোগী কথা বলা ও কাজ করার যোগ্যতা ইত্যাদি। [তাবারী,ইবন কাসীর,বাগভী]

(২) অর্থাৎ যে ব্যক্তি কুফরী করে তার কুফরী তার নিজের জন্য ক্ষতিকর। এতে আল্লাহর কোন ক্ষতি হয় না। তিনি অমুখাপেক্ষী। কারো কৃতজ্ঞতার মুখাপেক্ষী নন। কারো

১৩. আর স্মরণ করুন, যখন লুকমান উপদেশ দিতে গিয়ে তার পুত্রকে বলেছিল, 'হে আমার প্রিয় বৎস! আল্লাহ্‌র সাথে কোন শির্ক করো না। নিশ্চয় শির্ক বড় যুলুম[১]।'

وَإِذْ قَالَ لُقْمَٰنُ لِٱبْنِهِۦ وَهُوَ يَعِظُهُۥ يَٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِٱللَّهِ ۖ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

কৃতজ্ঞতা তাঁর সার্বভৌম কর্তৃত্বে কোন বৃদ্ধি ঘটায় না। বান্দার যাবতীয় নিয়ামত যে একমাত্র তাঁরই দান, কারো অকৃতজ্ঞতা ও কুফরী এ জাজ্বল্যমান সত্যে কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। কেউ তাঁর প্রশংসা করুক বা নাই করুক তিনি আপনা আপনিই প্রশংসিত। বিশ্ব-জাহানের প্রতিটি অণু-কণিকা তাঁর পূর্ণতা ও সৌন্দর্য এবং তাঁর স্রষ্টা ও অন্নদাতা হবার সাক্ষ্য দিচ্ছে এবং প্রত্যেকটি সৃষ্ট বস্তু নিজের সমগ্র সত্তা দিয়ে তাঁর প্রশংসা গেয়ে চলছে। [ফাতহুল কাদীর]

(১) জ্ঞানগর্ভ বাণীসমূহের মধ্যে সর্বাগ্রে হলো আকীদাসমূহের পরিশুদ্ধিতার ব্যাপারে কথা বলা। সে জন্য লুকমানের সর্বপ্রথম কথা হলো কোন প্রকারের অংশীদারিত্ব স্থির না করে আল্লাহ্ কে গোটা বিশ্বের স্রষ্টা ও প্রভু বলে বিশ্বাস করা। সাথে সাথে আল্লাহ্‌র কোন সৃষ্ট বস্তুকে স্রষ্টার সমমর্যাদাসম্পন্ন মনে করার মত গুরুতর অপরাধ দুনিয়াতে আর কিছু হতে পারে না। তাই তিনি বলেছেন, 'হে আমার প্রিয় বৎস, আল্লাহ্‌র অংশীদার স্থির করো না, অংশীদার স্থাপন করা গুরুতর যুলুম'। জুলুমের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, কারো অধিকার হরণ করা এবং ইনসাফ বিরোধী কাজ করা। শির্ক এ জন্য বৃহত্তর জুলুম যে, মানুষ এমন সব সত্তাকে তার নিজের স্রষ্টা, রিযিকদাতা ও নিয়ামতদানকারী হিসেবে বরণ করে নেয়, তার সৃষ্টিতে যাদের কোন অংশ নেই। তাকে রিযিক দান করার ক্ষেত্রে যাদের কোন দখল নেই এবং মানুষ এ দুনিয়ায় যেসব নিয়ামত লাভে ধন্য হচ্ছে সেগুলো প্রদান করার ব্যাপারে যাদের কোন ভূমিকাই নেই। এটা এত বড় অন্যায়, যার চেয়ে বড় কোন অন্যায়ের কথা চিন্তাই করা যায় না। তারপর মানুষ একমাত্র তার স্রষ্টারই বন্দেগী করবে, এটা মানুষের ওপর তার স্রষ্টার অধিকার। কিন্তু সে অন্যের বন্দেগী ও পূজা-অর্চনা করে তাঁর অধিকার হরণ করে। তারপর স্রষ্টা ছাড়া অন্য সত্তার বন্দেগী ও পূজা করতে গিয়ে মানুষ যে কাজই করে তাতে সে নিজের দেহ ও মন থেকে শুরু করে পৃথিবী ও আকাশের বহু জিনিস ব্যবহার করে। অথচ এ সমস্ত জিনিস এক লা-শরীক আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন এবং এর মধ্যে কোন জিনিসকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো বন্দেগীতে ব্যবহার করার অধিকার তার নেই। তারপর মানুষ নিজেকে লাঞ্ছনা ও দুর্ভোগের মধ্যে ঠেলে দেবে না, তার নিজের ওপর এ অধিকার রয়েছে। কিন্তু সে স্রষ্টাকে বাদ দিয়ে সৃষ্টির বন্দেগী করে নিজেকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে এবং এই সঙ্গে শাস্তির যোগ্যও বানায়। এভাবে একজন মুশরিকের সমগ্র জীবন একটি সর্বমুখী ও সার্বক্ষণিক যুলুমে পরিণত হয়। তার কোন একটি মুহূর্তও যুলুমমুক্ত নয়।

১৪. আর আমরা মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করে, আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দু'বছরে। কাজেই আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও(১)। ফিরে আসা তো আমারই কাছে।

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿١٤﴾

১৫. আর তোমার পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সাথে শির্ক করার জন্য পীড়াপীড়ি করে, যে বিষয়ে তোমার

وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

পক্ষান্তরে মুমিন এ ধরনের অবস্থা থেকে মুক্ত। হাদীসে এসেছে, 'যখন নাযিল হল 'যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানের সাথে যুলুমের সংমিশ্রণ ঘটায়নি তাদের জন্যই রয়েছে নিরাপত্তা।[সূরা আল-আন'আম:৮২] তখন সাহাবায়ে কিরাম অত্যন্ত ভীত হয়ে গেলেন; (কারণ তারা যুলুমের আভিধানিক অর্থ ধরে নিয়েছিলেন)। তারা বলতে লাগলেন, আমাদের কেউ কি এমন আছে যে, যার ঈমানের সাথে যুলুম নেই? তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এটা সেই যুলুম নয় (যার ভয় তোমরা করছ)। তোমরা কি শুননি লুকমান তার ছেলেকে কি বলেছে, তিনি বলেছেন: নিশ্চয় শির্ক হচ্ছে বড় যুলুম' [বুখারী: ৪৭৭৬]

(১) এখানে যখন পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্য পালন এবং তাদের কৃতজ্ঞতা স্বীকারের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, তখন এর হেকমত ও অন্তর্নিহিত রহস্য এই বর্ণনা করেছেন যে, তার মা ধরাধামে তার আবির্ভাব ও অস্তিত্ব বজায় রাখার ক্ষেত্রে অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার ও অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট বরদাশত করেছেন। নয় মাস কাল উদরে ধারণ করে তার রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন এবং এ কারণে ক্রমবর্ধমান দুঃখ-কষ্ট বরদাশত করেছেন। আবার ভূমিষ্ট হওয়ার পরও দু'বছর পর্যন্ত স্তন্যদানের কঠিন ঝামেলা পোহাতে হয়েছে। যাতে দিন-রাত মাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে। ফলে তার দুর্বলতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। আর সন্তানের লালন-পালন করার ক্ষেত্রে মাকেই যেহেতু অধিক ঝুঁকি-ঝামেলা বহন করতে হয়, সেজন্য শরী'য়তে মায়ের স্থান ও অধিকার পিতার অগ্রে রাখা হয়েছে। যদি পিতা-মাতার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা না হয় তাতে আল্লাহ্‌রও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয় না। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে কেউ মানুষের কাছে কৃতজ্ঞ হয় না সে আল্লাহ্‌র কাছেও কৃতজ্ঞ হতে পারে না।' [আবুদাউদ:৪৮১১, তিরমিযী:১৯৫৪, মুসনাদে আহমাদ:২/২৯৫]

কোন জ্ঞান নেই[১], তাহলে তুমি তাদের কথা মেনো না এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে বসবাস করবে সদ্ভাবে[২] আর যে আমার অভিমুখী হয়েছে তার

وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ ۚ ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٥﴾

(১) অর্থাৎ তোমার জানা মতে যে আমার সাথে শরীক নয়। অথবা তুমি আমার কোন শরীক আছে বলে জান না। তুমি তো শুধু এটাই জান যে, আমি এক, আমার কোন শরীক নেই। এমতাবস্থায় কিভাবে তুমি তোমার পিতা-মাতার কথা মানতে পার? অন্যায়কে যেন তুমি প্রশ্রয় না দাও। শির্ক গুরুতর অপরাধ হওয়ার কারণেই আল্লাহ্‌র নির্দেশ এই যে, যদিও সন্তানের প্রতি পিতা-মাতাকে মান্য করার ও তাদের কৃতজ্ঞতা স্বীকারের বিশেষ তাকীদ রয়েছে এবং আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্য প্রকাশ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সাথে সাথে পিতা-মাতার প্রতিও তা করার জন্যে সন্তানকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু শির্ক এমন গুরুতর অন্যায় ও মারাত্মক অপরাধ যে, মাতা-পিতার নির্দেশে, এমন কি বাধ্য করার পরও কারো পক্ষে তা জায়েয হয়ে যায় না। যদি কারো পিতা-মাতা তাকে আল্লাহ্‌র সাথে অংশী স্থাপনে বাধ্য করতে চেষ্টা করতে থাকেন, এ বিষয়ে পিতা-মাতার কথাও রক্ষা করা জায়েয নয়। যেমনটি হয়েছিল, সা'দ ইব্‌ন আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর সাথে তার মায়ের আচরণ। তিনি ইসলাম গ্রহণ করলে তার মা শপথ করলেন যে, যতক্ষণ তুমি আবার পূর্ববর্তী দ্বীনে ফিরে না আসবে ততক্ষণ আমি কোন খাবার গ্রহণ করবনা। কিন্তু সা'দ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তার এ কথা মান্য করলেন না। তার সমর্থনেই এই আয়াত নাযিল হয়। [মুসলিম : ১৭৪৮]

(২) যদি পিতা-মাতা আল্লাহ্‌র অংশী স্থাপনে বাধ্য করার চেষ্টা করেন, তখন আল্লাহ্‌র নির্দেশ হল তাদের কথা না মানা। এমতাবস্থায় মানুষ স্বভাবতঃ সীমার মধ্যে স্থির থাকে না। এ নির্দেশ পালন করতে গিয়ে সন্তানের পক্ষে পিতা-মাতার প্রতি কটু বাক্য প্রয়োগ ও অশোভন আচরণ করে তাঁদেরকে অপমানিত করার সম্ভাবনা ছিল। ইসলাম তো ন্যায়নীতির জ্বলন্ত প্রতীক – প্রত্যেক বস্তুরই একটি সীমা আছে। তাই অংশীদার স্থাপনের বেলায় পিতা-মাতার অনুসরণ না করার নির্দেশের সাথে সাথে এ হুকুমও প্রদান করেছে যে, দ্বীনের বিরুদ্ধে তো তাদের কথা মানবে না, কিন্তু পার্থিব কাজকর্ম যথা শারীরিক সেবা-যত্ন বা ধন-সম্পদ ব্যয় ও অন্যান্য ক্ষেত্রে যেন কার্পণ্য প্রদর্শিত না হয়। তাদের প্রতি বেআদবী ও অশালীনতা প্রদর্শন করো না। তাদের কথাবার্তার এমনভাবে উত্তর দিবে না, যাতে অহেতুক মনোবেদনার উদ্রেক করে। মোটকথা, শিরক-কুফরীর ক্ষেত্রে তাদের কথা না মানার কারণে যে মর্মপীড়ার উদ্রেক হবে, তা তো অপারগতা হেতু বরদাশত করবে, কিন্তু প্রয়োজনকে তার সীমার মধ্যেই রাখতে হবে। অন্যান্য ব্যাপারে যেন মনোকষ্টের কারণ না ঘটে সে সম্পর্কে সচেতন থাকবে। [কুরতুবী, তাবারী, সা'দী]

পথ অনুসরণ কর। তারপর তোমাদের ফিরে আসা আমারই কাছে, তখন তোমরা যা করতে সে বিষয়ে আমি তোমাদেরকে অবহিত করব।

يٰبُنَيَّ إِنَّهَآ إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمٰوٰتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللّٰهُ ۚ إِنَّ اللّٰهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿١٦﴾

১৬. 'হে আমার প্রিয় বৎস! নিশ্চয় তা (পাপ-পুণ্য) যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয়, অতঃপর তা থাকে শিলাগর্ভে অথবা আসমানসমূহে কিংবা যমীনে, আল্লাহ্ তাও উপস্থিত করবেন[১]। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবহিত।

يٰبُنَيَّ أَقِمِ الصَّلٰوةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَآ أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٧﴾

১৭. 'হে আমার প্রিয় বৎস! সালাত কায়েম করো, সৎ কাজের নির্দেশ দাও এবং অসৎ কাজে নিষেধ কর, আর তোমার উপর যা আপতিত হয় তাতে ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয় এটা অন্যতম দৃঢ় সংকল্পের কাজ।

---

(১) এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আসমান ও যমীন এবং এর মাঝে যা কিছু আছে, এর প্রতিটি বিন্দুকণা আল্লাহ্‌র অসীম জ্ঞানের আওতাধীন এবং সবকিছুর উপর তাঁর পূর্ণ ক্ষমতা ও আধিপত্য রয়েছে। কোন বস্তু যত গভীর আঁধার বা যবনিকার অন্তরালেই থাক না কেন - মহান আল্লাহ্‌র জ্ঞান ও দৃষ্টির আড়ালে থাকতে পারে না এবং তিনি যে কোন বস্তুকে যখন ও যেখানে ইচ্ছা উপস্থিত করতে পারেন। যাবতীয় বস্তু মহান আল্লাহ্‌র জ্ঞান ও ক্ষমতার আওতাভুক্ত। আল্লাহর জ্ঞান ও তাঁর পাকড়াও এর বাইরে কেউ যেতে পারে না। পাথরের মধ্যে ছোট্ট একটি কণা তোমার দৃষ্টির অগোচরে থাকতে পারে কিন্তু তাঁর কাছে তা সুস্পষ্ট। আকাশ মণ্ডলে একটি ক্ষুদ্রতম কণিকা তোমার থেকে বহু দূরবর্তী হতে পারে কিন্তু তা আল্লাহর বহু নিকটতর। ভূমির বহু নিম্ন স্তরে পতিত কোন জিনিস, তোমার কাছে কোথায়, কোন অবস্থায় ও কী অবস্থায় রয়েছে, তুমি যে কোন সৎ বা অসৎ কাজই করো না কেন, তা আল্লাহর অগোচরে নয়। তিনি কেবল তা জানেন তাই নয় বরং যখন হিসেব-নিকেশের সময় আসবে তখন তিনি তোমাদের প্রত্যেকটি কাজের ও নড়াচড়ার রেকর্ড সামনে নিয়ে আসবেন। [কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর]

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾

১৮. 'আর তুমি মানুষের প্রতি অবজ্ঞাভরে তোমার গাল বাঁকা কর না[১] এবং যমীনে উদ্ধতভাবে বিচরণ কর না[২]; নিশ্চয় আল্লাহ্ কোন উদ্ধত, অহংকারীকে পছন্দ করেন না[৩]।

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ ۚ

১৯. 'আর তুমি তোমার চলার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন কর[৪] এবং

(১) পঞ্চম উপদেশ সামাজিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে, বলা হয়েছে যে, লোকের সাথে সাক্ষাত বা কথোপকথনের সময় মুখ ফিরিয়ে রেখো না-যা তাদের প্রতি উপেক্ষা ও অহংকারের নিদর্শন এবং ভদ্রোচিত স্বভাব ও আচরণের পরিপন্থী। এর আরেক অর্থ হলো, মানুষের প্রতি গাল বাঁকা করে কথা বলো না। এ অর্থ অনুসারে তার প্রতি তাকিয়েও যদি গাল বাঁকা করে তাকে অপমান করা উদ্দেশ্য হয় তবে তাও নিষিদ্ধ হবে। [কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর]

(২) অর্থাৎ গর্বভরে ঔদ্ধত্যের সহিত বিচরণ করো না। আল্লাহ্ ভূমিকে যাবতীয় বস্তু হতে নত ও পতিত করে সৃষ্টি করেছেন। তোমাদের সৃষ্টিও এ মাটি দিয়েই। তোমরা এর উপর দিয়েই চলাফেরা কর-নিজের নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝতে চেষ্টা কর। আত্মাভিমানীদের ধারা অনুসরণ করে অহংকারভরে বিচরণ করো না। আল্লাহ্ কোন অহংকারী আত্মাভিমানীকে পছন্দ করেন না। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যার অন্তরে শরিষা দানা পরিমান ঈমান আছে সে জাহান্নামে যাবে না, পক্ষান্তরে যার অন্তরে শরিষা দানা পরিমান অহংকার আছে সে জান্নাতে যাবে না।' [মুসলিম:১৩২] অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: আর তিনজনকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন না, অহংকারী, দাম্ভিক। যেমন তোমরা আল্লাহ্র কিতাবে পাও, তারপর আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করলেন। আর দান করে খোঁটা প্রদানকারী কৃপণ ব্যক্তি; এবং শপথের মাধ্যমে বিক্রয়কারী। [মুসনাদে আহমাদ:৫/১৭৬]

(৩) 'মুখতাল' মানে হচ্ছে, এমন ব্যক্তি যে নিজেই নিজেকে কোন বড় কিছু মনে করে। আর 'ফাখূর' তাকে বলে, যে নিজের বড়াই করে অন্যের কাছে। [ইবন কাসীর] মানুষের চালচলনে অহংকার, দম্ভ ও ঔদ্ধত্যের প্রকাশ তখনই অনিবার্য হয়ে ওঠে, যখন তার মাথায় নিজের শ্রেষ্ঠত্বের বিশ্বাস ঢুকে যায় এবং সে অন্যদেরকে নিজের বড়াই ও শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করাতে চায়। [ফাতহুল কাদীর]

(৪) অর্থাৎ দৌড়-ধাপসহ চলো না, যা সভ্যতা ও শালীনতার পরিপন্থী। এভাবে চলার ফলে নিজেরও দুর্ঘটনায় পতিত হওয়ার আশংকা থাকে বা অপরের দুর্ঘটনার কারণও ঘটতে পারে। আবার অত্যধিক মন্থর গতিতেও চলো না–যা সেসব গর্বস্ফীত

إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿١٩﴾

তোমার কণ্ঠস্বর নীচু করো[১]; নিশ্চয় সুরের মধ্যে গর্দভের সুরই সবচেয়ে অপ্রীতিকর[২] ।'

তৃতীয় রুকূ'

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴿٢٠﴾

২০. তোমরা কি দেখ না, নিশ্চয় আল্লাহ্ আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে সবকিছুই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করেছেন[৩]? আর মানুষের

আত্মাভিমানীদের অভ্যাস, যারা অন্যান্য মানুষের চাইতে নিজের অসার কৌলীন্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দেখাতে চায়। অথবা সেসব স্ত্রীলোকদের অভ্যাস, যারা অত্যধিক লজ্জা–সংকোচের দরুন দ্রুতগতিতে বিচরণ করে না । অথবা অক্ষম ব্যাধিগ্রস্তদের অভ্যাস । প্রথমটি তো হারাম । দ্বিতীয়টি যদি নারী জাতির অনুসরণে করা হয় তাও না-জায়েয । আর যদি এ উদ্দেশ্য না থাকে, তবে পুরুষের পক্ষে এটা একটা কলঙ্ক । তৃতীয় অবস্থায় আল্লাহ্‌র প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন–সুস্থ থাকা সত্বেও রোগগ্রস্তদের রূপ ধারণ করা । [ইবন কাসীর, কুরতুবী]

(১) অর্থাৎ তোমাদের স্বর ক্ষীণ কর । যার অর্থ স্বর প্রয়োজনাতিরিক্ত উচ্চ করো না । [ইবন কাসীর, কুরতুবী]

(২) অর্থাৎ চতুষ্পদ জন্তুসমূহের মধ্যে গাধার চীৎকারই অত্যন্ত বিকট ও শ্রুতিকটু । [কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর]

(৩) অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাদের উপর তাঁর প্রকাশ্য–অপ্রকাশ্য সকল প্রকারের নেয়ামত পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন । প্রকাশ্য নেয়ামত বলতে সেসব নেয়ামতকেই বোঝায়, যা মানুষ তার পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুধাবন করতে পারে । যেমন, মনোরম আকৃতি, মানুষের সুঠাম ও সংবদ্ধ অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ এবং প্রত্যেক অংগ এমন সুসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে তৈরী করা যেন তা মানুষের কাজে সর্বাধিক সহায়কও হয় অথচ আকৃতি–প্রকৃতিতেও কোন প্রকারের বিকৃতি না ঘটায় । অনুরূপভাবে জীবিকা, ধন-সম্পদ, জীবনযাপনের মাধ্যমসমূহ, সুস্থতা ও কুশলাবস্থা–এসবই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নেয়ামত ও অনুকম্পাসমূহের অন্তর্ভুক্ত । তদ্রূপ দ্বীন ইসলামকে সহজ ও অনায়াসলব্ধ করে দেয়া, আল্লাহ্-রাসূলের অনুসরণ ও আনুগত্য প্রদর্শনের তওফীক প্রদান, অন্যান্য দ্বীনের উপর ইসলামের বিজয় ও প্রভাবশীলতা এবং শত্রুদের মোকাবেলায় মুসলিমদের প্রতি সাহায্য ও সহায়তা– এসবই প্রকাশ্য

মধ্যে কেউ কেউ কোন জ্ঞান, কোন পথনির্দেশ বা কোন দীপ্তিমান কিতাব ছাড়াই আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۚ أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿٢١﴾

২১. আর তাদেরকে যখন বলা হয়, 'আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তোমরা তা অনুসরণ কর।' তারা বলে, 'বরং আমরা আমাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে যাতে পেয়েছি তারই অনুসরণ করব।' শয়তান যদি তাদেরকে জ্বলন্ত আগুনের দিকে ডাকে, তবুও কি? (তারা পিতৃ পুরুষদের অনুসরণ করবে?)

وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ ۗ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٢٢﴾

২২. আর যে নিজেকে আল্লাহ্র কাছে সমর্পণ করে, এমতাবস্থায় যে সে মুহসিন[১] সে তো দৃঢ়ভাবে ধরলো এক মযবুত হাতল। আর যাবতীয় কাজের পরিণাম আল্লাহ্রই কাছে।

وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ ۚ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ

২৩. আর কেউ কুফরী করলে তার কুফরী

নেয়ামতসমূহের পর্যায়ভূক্ত। আর গোপনীয় নেয়ামত সেগুলো, যা মানব হৃদয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত–যথা ঈমান, আল্লাহ্র পরিচয় লাভ এবং জ্ঞান-বুদ্ধি, সচ্চরিত্র, পাপসমূহ গোপন করা ও অপরাধসমূহের ত্বরিৎ শাস্তি আরোপিত না হওয়া ইত্যাদি। অথবা যেসব নেয়ামত মানুষ জানে না এবং অনুভবও করে না সেগুলো গোপন নিয়ামত। মানুষের নিজের শরীরে এবং তার বাইরে দুনিয়ায় তার স্বার্থে কাজ করে যাচ্ছে এমন অগণিত ও অসংখ্য জিনিস রয়েছে কিন্তু মানুষ জানেও না যে, তার স্রষ্টা তার হেফাযত ও সংরক্ষণের জন্য, তাকে জীবিকা দান করার জন্য, তার বৃদ্ধি ও বিকাশ সাধনের জন্য এবং তার কল্যাণার্থে কত রকমের সাজ-সরঞ্জাম যোগাড় করে রেখেছেন। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর; বাগভী]

(১) অর্থাৎ মুখে নিজেকে আল্লাহর হাতে সোপর্দ করার ঘোষণা দেয়া হবে কিন্তু কার্যত আল্লাহর অনুগত বান্দার নীতি অবলম্বন করা হবে না, এমনটি যেন না হয়। আর তা হবে কেবলমাত্র রাসূলকে অনুসরণ করার মাধ্যমে। এ আয়াতের প্রথম অংশ তাওহীদ আর দ্বিতীয় অংশ রাসূলের অনুসরন করা বাধ্য করে দিয়েছে। তাওহীদ পরিশুদ্ধ হতে হলে রাসূলের অনুসরণ জরূরী। [সা'দী]

فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٢٣﴾

যেন আপনাকে কষ্ট না দেয়[১]। আমাদেরই কাছে তাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর আমরা তাদেরকে তারা যা করত সে সম্পর্কে অবহিত করব। নিশ্চয় আল্লাহ্ অন্তরসমূহে যা রয়েছে সে সম্পর্কে সম্যক অবগত।

نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٢٤﴾

২৪. আমরা তাদেরকে ভোগ করতে দেব স্বল্প[২]। তারপর আমরা তাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব।

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٥﴾

২৫. আর যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, 'আসমানসমূহ ও যমীন কে সৃষ্টি করেছেন?' তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ্।' বলুন, 'সকল প্রশংসা আল্লাহ্রই', কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٦﴾

২৬. আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে তা আল্লাহ্রই; নিশ্চয় আল্লাহ্, তিনি তো অভাবমুক্ত, চির প্রশংসিত[৩]।

---

(১) সম্বোধন করা হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে। অর্থ হচ্ছে, হে নবী! যে ব্যক্তি আপনার কথা মেনে নিতে অস্বীকার করে, সে তো নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে একথা মনে করে যে, ইসলামকে প্রত্যাখ্যান এবং কুফরীকে মেনে নিয়েও তার ওপর জোর দিয়ে সে আপনাকে অপমানিত করেছে। কিন্তু আসলে সে নিজেই নিজেকে অপমানিত করেছে। সে আপনার কোন ক্ষতি করেনি বরং নিজেই নিজের ক্ষতি করেছে। কাজেই সে যদি আপনার কথা না মানে তাহলে তার পরোয়া করার প্রয়োজন নেই। [সা'দী]

(২) স্বল্প পরিমানও হতে পারে। আবার স্বল্প সময়ের জন্যও উদ্দেশ্য হতে পারে। দুনিয়ায় কাফেররা যা-ই পায় তা আখেরাতের তুলনায় পরিমানে স্বল্প আবার আখেরাতের তুলনায় স্বল্প সময়ের জন্যেই পেয়ে থাকে। [তাবারী, কুরতুবী, বাগভী]

(৩) অর্থাৎ কেবল এতটুকুই সত্য নয় যে, পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলীর স্রষ্টা আল্লাহ বরং পৃথিবী ও আকাশের মধ্যে যেসব জিনিস পাওয়া যায় তিনিই এসবের মালিক। [মুয়াস্সার]

২৭. আর যমীনের সব গাছ যদি কলম হয় এবং সাগর, তার পরে আরও সাত সাগর কালি হিসেবে যুক্ত হয়, তবুও আল্লাহ্‌র বাণী(১) নিঃশেষ হবে না।

وَلَوْ اَنَّمَا فِي الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَّالْبَحْرُ يَمُدُّهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللّٰهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

(১) ‘আল্লাহর কালেমা বা কথা’ এর মানে কি? এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত আছে। যদিও এর প্রতিটিই এখানে উদ্দেশ্য হতে পারে। অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে, আয়াতে বর্ণিত ‘আল্লাহ্‌র কালেমা বা কথা বলে মহান আল্লাহ্‌র জ্ঞানপূর্ণ ও প্রজ্ঞাময় বাক্যাবলীই বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ্‌র বাণীর কোন শেষ নেই। [সা‘দী; মুয়াসসার] এ কুরআন তার বাণীরই অংশ। অর্থ এই যে, এক সমুদ্রের সাথে আরো সাতটি সমুদ্রে সংযুক্ত হয়েছে বলে যদি ধরেও নেয়া হয়, তা সত্বেও এসবগুলির পানি দিয়ে আল্লাহ্‌র প্রজ্ঞাময় বাক্যসমূহ লিখে শেষ করা যাবে না। এখানে সাতের সংখ্যা উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে– সীমিত করে দেয়া উদ্দেশ্য নয়। যার প্রমাণ কুরআনের অন্য এক আয়াতে–যেখানে বলা হয়েছে –‘ আল্লাহ্‌র মহিমাসূচক বাণীসমূহ প্রকাশ করতে যদি সমুদ্রকে কালিতে রূপান্তরিত করে দেয়া হয়, তবে সমুদ্র শূন্য হয়ে যাবে–কিন্তু সে বাণীসমূহ শেষ হবে না। আর শুধু এ সমুদ্র নয়, অনুরূপ আরো সমুদ্র অন্তর্ভুক্ত করলেও অবস্থা একই থাকবে।’ [সূরা আল-কাহফ: ১০৯] মোটকথা: সমুদ্রসমুহের যতগুণ বা সংখ্যাই মেনে নেয়া হোক না কেন, এসবগুলোর পানি কালি হলেও আল্লাহ্‌র মহিমা প্রকাশক বাণীসমূহ লিখে শেষ করতে পারবে না। যুক্তি–বুদ্ধির দিক দিয়ে একথা সুস্পষ্ট যে সমুদ্র সাতটি কেন সাত হাজারও যদি হয়, তবুও তা সীমাবদ্ধ, শেষ অবশ্যই হবে–কিন্তু আল্লাহ্‌র বাক্যাবলী অসীম ও অনন্ত– কোন সসীম বস্তু অসীমকে কিরূপে আয়ত্ব করতে পারে? [দেখুন, ইবন কাসীর, কুরতুবী, সা‘দী]

কোন কোন মুফাসসিরের মতে ‘আল্লাহ্‌র কালেমা বা কথা’ বলে এই আয়াতে মহান আল্লাহ্‌ তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, তাঁর নেয়ামত (কৃপা ও দয়াসমূহ) যে একেবারে অসীম ও অফুরন্ত,- কোন ভাষার সাহায্যে তা প্রকাশ করা চলে না, তাই বুঝিয়েছেন। [কুরতুবী; মুয়াসসার; ইবন কাসীর] মূলত: আল্লাহ্‌র জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, তাঁর নেয়ামতসমূহ কোন কলম দিয়ে লিপিবদ্ধ করা চলে না, এখানে আল্লাহ্‌ এ তথ্যটুকুই সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। অধিকন্তু তিনি এরূপভাবে উদাহরণ পেশ করেছেন যে, ভু-পৃষ্ঠে যত বৃক্ষ আছে, যদি সেগুলোর সব শাখা–প্রশাখা দিয়ে কলম তৈরী করা হয় এবং বিশ্বের সাগরসমূহের পানি কালিতে রূপান্তরিত করে দেয়া হয় এবং এসব কলম আল্লাহ্‌ তা‘আলার প্রজ্ঞা ও জ্ঞান–গরিমা এবং তাঁর ক্ষমতা ব্যবহারের বিবরণ লিখতে আরম্ভ করে, তবে সমুদ্রের পানি নিঃশেষ হয়ে যাবে; তবু তাঁর অফুরন্ত প্রজ্ঞা ও মহিমার বর্ণনা শেষ হবে না। কেবল একটি মাত্র সমুদ্র কেন– যদি অনুরূপ আরো সাত সমুদ্রেও অন্তর্ভূক্ত করে নেয়া হয়, তবুও সব সাগর শেষ হয়ে যাবে তথাপি আল্লাহ্‌র মহিমা প্রকাশক বাণীসমূহের পরিসমাপ্তি ঘটবে না।

নিশ্চয় আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী, হিকমতওয়ালা।

مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ إِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٢٨﴾

২৮. তোমাদের সবার সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটি প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানেরই অনুরূপ। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সম্যক দ্রষ্টা।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَّأَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٩﴾

২৯. আপনি কি দেখেন না, নিশ্চয় আল্লাহ্ রাতকে দিনে প্রবেশ করান এবং দিনকে রাতে প্রবেশ করান? আর তিনি চন্দ্র-সূর্যকে করেছেন কাজে নিয়োজিত, প্রত্যেকটিই বিচরণ করে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত[১]; এবং তোমরা যা কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত।

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ

৩০. এগুলো প্রমাণ যে, আল্লাহ্ তিনিই সত্য[২] এবং তারা তাঁকে ছাড়া যাকে ডাকে,

---

কোন কোন মুফাসসিরের মতে এর অর্থ, তাঁর সৃষ্টিকর্ম এবং তাঁর শক্তির নিদর্শন। [কুরতুবী] অর্থাৎ পৃথিবীর গাছগুলো কেটে যতগুলো কলম তৈরী করা যেতে পারে এবং পৃথিবীর বর্তমান সাগরের পানির সাথে আরো তেমনি সাতটি সাগরের পানিকে কালিতে পরিণত করলে তা দিয়ে আল্লাহর শক্তি ও সৃষ্টির কথা লিখে শেষ করা তো দূরের কথা হয়তো পৃথিবীতে যেসব জিনিস আছে সেগুলোর তালিকা তৈরী করাই সম্ভবপর হবে না। শুধুমাত্র এ পৃথিবীতেই যেসব জিনিসের অস্তিত্ব রয়েছে সেগুলোই গণনা করা কঠিন, তার ওপর আবার এই অথৈ মহাবিশ্বের সৃষ্টির বিবরণ লেখার তো কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

(১) প্রত্যেকটি জিনিসের যে বয়স তথা সময়-কাল নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে সেই সময় পর্যন্ত তা চলছে। চন্দ্র, সূর্য বা বিশ্ব-জাহানের অন্য গ্রহ-নক্ষত্র কোনটাই চিরন্তন ও চিরস্থায়ী নয়। প্রত্যেকের একটি সূচনাকাল আছে। তার পূর্বে তার অস্তিত্ব ছিল না। আবার প্রত্যেকের আছে একটি সমাপ্তিকাল। তারপর আর তার অস্তিত্ব থাকবে না। এ আলোচনার উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা বুঝিয়ে দেয়া যে, এ ধরনের ধ্বংসশীল ও ক্ষমতাহীন বস্তু ও সত্তাগুলো উপাস্য হতে পারে কেমন করে? [দেখুন, তাবারী, কুরতুবী]

(২) অর্থাৎ প্রকৃত সার্বভৌম ক্ষমতাধর কর্তা, সৃষ্টি ও পরিচালনা ব্যবস্থাপনার আসল ও একচ্ছত্র মালিক হচ্ছেন মহান আল্লাহ্। [মুয়াস্‌সার]

الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٣٠﴾

তা মিথ্যা[১]। আর নিশ্চয় আল্লাহ্, তিনি তো সর্বোচ্চ[২], সুমহান।

চতুর্থ রুকূ'

اَلَمْ تَرَ اَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ لِيُرِيَكُمْ مِّنْ اٰيٰتِهٖ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ﴿٣١﴾

৩১. আপনি কি লক্ষ্য করেননি যে, আল্লাহ্র অনুগ্রহে নৌযানগুলো সাগরে বিচরণ করে, যা দ্বারা তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলীর কিছু দেখাতে পারেন? নিশ্চয় এতে অনেক নিদর্শন রয়েছে, প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য।

وَاِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ فَلَمَّا نَجّٰىهُمْ اِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ؕ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَاۤ اِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُوْرٍ ﴿٣٢﴾

৩২. আর যখন তরঙ্গ তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ছায়ার মত[৩], তখন তারা আল্লাহ্কে ডাকে তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে। অতঃপর যখন তিনি তাদেরকে উদ্ধার করে স্থলে পৌঁছান তখন তাদের কেউ কেউ মাঝামাঝি অবস্থানে থাকে[৪]; আর শুধু বিশ্বাসঘাতক, কাফির ব্যক্তিই আমাদের নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার

(১) অর্থাৎ তারা সবাই নিছক তোমাদের কাল্পনিক ইলাহ্। তোমরা কল্পনার জগতে বসে ধারণা করে নিয়েছো যে, অমুকজন আল্লাহ্র সার্বভৌম ক্ষমতার অংশীদার এবং অমুক মহাত্মা সংকট নিরসন ও অভাব মোচন করার ক্ষমতা রাখেন। অথচ প্রকৃতপক্ষে তাদের কেউ কোন কিছুই করার ক্ষমতা রাখে না। [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ প্রত্যেকটি জিনিসের ঊর্ধে এবং সবার শ্রেষ্ঠ। তাঁর সামনে সব জিনিসই নীচু। [ইবন কাসীর]

(৩) এখানে মেঘের ছায়া উদ্দেশ্য হতে পারে, আবার পাহাড় বা অনুরূপ বড় কিছুর ছায়াও উদ্দেশ্য হতে পারে।[কুরতুবী, মুয়াস্সার]

(৪) অর্থাৎ তখন তাদের মধ্যে একদল মাঝামাঝি অবস্থানে থাকে, আল্লাহ্র সত্যিকার শোকর আদায় করে না। আর তাদের মধ্যে আরেক দল সম্পূর্ণভাবে শির্ক ও কুফরি করে। তারা আল্লাহ্র নেয়ামতকে অস্বীকার করে। [জালালাইন; সা'দী; মুয়াসসার] আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা প্রথম দলের বর্ণনার পর দ্বিতীয় দলের বর্ণনা করেননি। কারণ, পরবর্তী বাক্য থেকে অপর দলটির অবস্থান বোঝা যাচ্ছে।

করে(১) ।

৩৩. হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবের তাক্ওয়া অবলম্বন কর এবং ভয় কর সে দিনকে, যখন কোন পিতা তার সন্তানের পক্ষ থেকে কিছু আদায় করবে না, অনুরূপ কোন সন্তান সেও তার পিতার পক্ষ থেকে আদায়কারী হবে না(২) । নিশ্চয় আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمْ وَٱخْشَوْا۟ يَوْمًا لَّا يَجْزِى وَالِدٌ عَن وَلَدِهِۦ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِۦ شَيْـًٔا ۚ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴿٣٣﴾

(১) বিশ্বাসঘাতক এমন এক ব্যক্তি যে মারাত্মক রকমের বেঈমানী করে এবং নিজের প্রতিশ্রুতি ও অংগীকার পালন করে না । [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ সেদিনকে ভয় কর যেদিন কোন পিতাও নিজের পুত্রের উপকার করতে পারবে না । অনুরূপভাবে কোন পুত্রও পিতার কোন কল্যাণ করতে পারবে না । বন্ধু, নেতা, পীর এবং এ পর্যায়ের অন্যান্য লোকেরা তবুতো দূর সম্পর্কের । দুনিয়ায় সবচেয়ে নিকট সম্পর্ক হচ্ছে সন্তান ও পিতামাতার মধ্যে । কিন্তু সেখানে অবস্থা হবে যদি পুত্র পাকড়াও হয়, তাহলে পিতা এগিয়ে গিয়ে একথা বলবে না যে, তার গোনাহের জন্য আমাকে পাকড়াও করো । অন্যদিকে পিতার দুর্ভোগ শুরু হয়ে গেলে পুত্রের একথা বলার হিম্মত হবে না যে, তার বদলে আমাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দাও । এ অবস্থায় নিকট সম্পর্কহীন ভিন্ন ব্যক্তিরা সেখানে পরস্পরের কোন কাজে লাগবে এ আশা করার কি অবকাশই বা থাকে ! [দেখুন, কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর] তবে এটা সত্য যে, যদি পিতা-পুত্র উভয়েই ঈমানদার হয় তবে মহান আল্লাহ্ তাদের পরস্পরের পদ-মর্যাদা উন্নীত করে তাদের একজনকে অপরের কাছাকাছি রাখবেন । যেমন, কুরআন করীমে রয়েছে: ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَٱتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَٰنٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ "যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের সন্তান–সন্ততিও ঈমানের ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ করেছে–আর তারাও মুমিনে পরিণত হয়েছে; আমরা এ সন্তান–সন্ততিদেরকে তাদের পিতা-মাতার মর্যাদায় উন্নীত করে দেব ।" [সূরা আত-তূর: ২১] যদিও তাদের কার্যাবলী এ স্তরে পৌঁছার উপযোগী নয় । সৎ পিতা-মাতার কল্যাণে কেয়ামতের দিন তারা এ ফল লাভ করতে সক্ষম হবে, কিন্তু এক্ষেত্রে শর্ত এই যে, সন্তানকে মুমিন হতে হবে, যদিও কাজকর্মে কোন ত্রুটি ও শৈথিল্য থেকে থাকে । অনুরূপভাবে অপর এক আয়াতে রয়েছে, ﴿جَنَّٰتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآئِهِمْ وَأَزْوَٰجِهِمْ وَذُرِّيَّٰتِهِمْ﴾ "তারা অক্ষয় ও অবিনশ্বর স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করবে এবং এক্ষেত্রে তাদের যোগ্য হিসাবে প্রতিপন্ন পিতা–মাতা, স্ত্রীগণ ও পুত্র–পরিজনও" [সূরা আর-রা'দ: ২৩] তাদের সাথে প্রবেশ করবে যোগ্য বলতে মুমিন হওয়া বোঝানো হয়েছে । এ আয়াতদ্বয় দ্বারা প্রমানিত হয় যে, পিতা–মাতা ও সন্তান–সন্ততি, অনুরূপভাবে স্বামী এবং স্ত্রী মুমিন হওয়ার ক্ষেত্রে যদি সমশ্রেণীভুক্ত হয়, তবে হাশর ময়দানে একের দ্বারা অপরের উপকার সাধিত হবে ।

সত্য[১]; কাজেই দুনিয়ার জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রতারিত না করে এবং সে প্রবঞ্চক[২] যেন তোমাদেরকে কিছুতেই আল্লাহ্ সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে ।

৩৪. নিশ্চয় আল্লাহ্[৩], তাঁর কাছেই রয়েছে কিয়ামতের জ্ঞান, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন যা মাতৃগর্ভে আছে । আর কেউ জানে না আগামী কাল সে কি অর্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন্ স্থানে তার মৃত্যু ঘটবে । নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত ।

إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌۢ بِأَىِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌۢ ﴿٣٤﴾

(১) আল্লাহর প্রতিশ্রুতি বলতে কিয়ামতের প্রতিশ্রুতির কথা বুঝানো হয়েছে । [কুরতুবী]

(২) আয়াতে‘আল-গারূর’ বা ‘প্রতারক’ বলতে শয়তান কে বুঝানো হয়েছে । [ইবন কাসীর, সা’দী]

(৩) এ আয়াতে পাঁচটি বস্তুর জ্ঞান সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্রই জন্য নির্দিষ্ট থাকা এবং অপর কোন সৃষ্টির সে জ্ঞান না থাকার কথা বলা হয়েছে । সুতরাং এর মাধ্যমেই সূরায়ে লুকমান শেষ করা হয়েছে । বলা হয়েছে যে, কেয়ামত সম্পর্কিত জ্ঞান কেবল আল্লাহ্রই রয়েছে (অর্থাৎ, কোন বছর কোন তারিখে সংঘটিত হবে) এবং তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন ও মাতৃগর্ভে কি আছে তা তিনিই জানেন (অর্থাৎ, কন্যা না পুত্র, কতদিন বাঁচবে, কি রিযিক পাবে, কোন স্বভাবের অধিকারী হবে ইত্যাদি) এবং আগামীকাল কি অর্জন করবে তা কোন ব্যক্তি জানে না । (অর্থাৎ, ভাল-মন্দ কি লাভ করবে) অথবা কোন স্থানে মারা যাবে, তাও কেউ জানে না । প্রথম তিন বস্তু সম্পর্কিত জ্ঞান যদিও একথা স্পষ্টভাবে বলা হয়নি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো এগুলোর জ্ঞান নেই । কিন্তু বাক্যবিন্যাস ও প্রকাশভঙ্গি থেকে একথাই বোঝা যায় যে, এসব বস্তুর জ্ঞান কেবল আল্লাহ্র অসীম জ্ঞান ভাণ্ডারেই সীমিত রয়েছে । অবশ্য অবশিষ্ট বস্তুদ্বয় সম্পর্কে একথা স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো এগুলোর তথ্য ও তত্ত্ব জানা নেই । [দেখুন, তাবারী, কুরতুবী] এ পাঁচ বস্তুকে সূরা আল-আন‘আমের ৫৯ নং আয়াতে (অদৃশ্য জগতের চাবিসমূহ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে) । তাছাড়া কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে সে ব্যাপারে হাদীসে জিবরীল নামে খ্যাত হাদীসেও অনুরূপ বলা হয়েছে যে, এর জ্ঞান আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো কাছে নেই । [দেখুন, বুখারী:৪৭৭৭, মুসলিম:৯, ১০]

৩২- সূরা আস-সাজ্দাহ
৩০ আয়াত, মক্কী

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আলিফ-লাম-মীম,

الٓمّٓ ①

২. এ কিতাব সৃষ্টিকুলের রবের পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া, এতে কোন সন্দেহ নেই[১]।

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ②

৩. নাকি তারা বলে, 'এটা সে নিজে রটনা করেছে[২]?' না, বরং তা আপনার রব হতে আগত সত্য, যাতে আপনি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারেন, যাদের কাছে আপনার আগে কোন সতর্ককারী আসেনি[৩], হয়তো তারা হিদায়াত লাভ করে।

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ۚ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اَتٰىهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ③

৪. আল্লাহ্‌, যিনি আসমানসমূহ, যমীন ও এ দু'য়ের অন্তর্বর্তী সব কিছু সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে। তারপর তিনি 'আর্‌শের উপর উঠেছেন। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবক নেই এবং সুপারিশকারীও নেই; তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ؕ مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا شَفِيْعٍ ؕ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ④

---

(১) এ কিতাব রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে নাযিল করা হয়েছে, শুধুমাত্র এতটুকু কথা বলেই এখানে শেষ করা হয়নি। বরং এর পরেও পূর্ণ জোরেশোরে বলা হয়েছে যে, এটা আল্লাহর কিতাব এবং আল্লাহর কাছ থেকে এর অবতীর্ণ হবার ব্যাপারে আদৌ কোন সন্দেহের অবকাশই নেই। [কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর]

(২) এটি নিছক প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসা নয়। বরং এখানে মহাবিস্ময় প্রকাশের ভংগী অবলম্বন করা হয়েছে। [বাগভী]

(৩) কাতাদাহ বলেন, তারা ছিল নিরক্ষর জাতি। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পূর্বে তাদের কাছে দূর অতীতে কোন সতর্ককারী আসে নি। [তাবারী]

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ۝٥

৫. তিনি আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত সমুদয় বিষয় পরিচালনা করেন, তারপর সব কিছুই তাঁর সমীপে উত্থিত হবে এমন এক দিনে যার পরিমাণ হবে তোমাদের গণনা অনুসারে হাজার বছর(১) ।

ذَٰلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝٦

৬. তিনি, গায়েব ও উপস্থিত (যাবতীয় বিষয়ে) জ্ঞানী, প্রবল পরাক্রমশালী(২), পরম দয়ালু(৩) ।

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ۝٧

৭. যিনি তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে সৃজন করেছেন উত্তমরূপে(৪) এবং কাদা হতে মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন ।

ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ۝٨

৮. তারপর তিনি তার বংশ উৎপন্ন করেন তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস থেকে ।

---

(১) অর্থাৎ সেদিনের পরিমাণ তোমাদের গণনানুসারে এক হাজার বছর হবে । কাতাদাহ বলেন, দুনিয়ার দিনের হিসেবে সে সময়টি হচ্ছে, এক হাজার বছর । তন্মধ্যে পাঁচশত বছর হচ্ছে নাযিল হওয়ার জন্য, আর পাঁচ শত বছর হচ্ছে উপরে উঠার জন্য । মোট: এক হাজার বছর । [তাবারী] অন্যত্র বলা হয়েছে, "সেদিনের পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর হবে ।" [সূরা আল-মা'আরিজ:৪] এর এক সহজ উত্তর তো এই যে, সেদিনটি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হবে বিধায় মানুষের নিকট অতিশয় দীর্ঘ বলে মনে হবে । এরূপ দীর্ঘানুভূতি নিজ নিজ ঈমান ও আমলানুপাতে হবে । যারা বড় অপরাধী তাদের নিকট সুদীর্ঘ এবং যারা কম অপরাধী তাদের নিকট কম দীর্ঘ বলে বোধ হবে । এমনকি সেদিন কিছু লোকের নিকট এক হাজার বছর বলে মনে হবে, আবার কারো কারো নিকট পাঁচশত বছর বলে মনে হবে । আবার কারো কারো নিকট পঞ্চাশ হাজার বছর বলে মনে হবে । [তাবারী, বাগভী; ফাতহুল কাদীর]

(২) অর্থাৎ প্রত্যেকটি জিনিসের ওপর প্রাধান্যের অধিকারী । [মুয়াস্‌সার]

(৩) অর্থাৎ তিনি নিজের সৃষ্টির প্রতি দয়ার্দ্র ও করুণাময় । [ইবন কাসীর]

(৪) অর্থাৎ তিনি যেভাবে সৃষ্টি করেছেন সেটাই উত্তম ও সুন্দর । [তাবারী] মুজাহিদ বলেন, তিনি প্রতিটি বস্তুর সৃষ্টি অত্যন্ত মজবুত ও নৈপুণ্য সহকারে সম্পন্ন করেছেন । [আত-তাফসীরুস সহীহ]

ثُمَّ سَوّٰىهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ۝٩

৯. পরে তিনি সেটাকে করেছেন সুঠাম এবং তাতে ফুঁকে দিয়েছেন তাঁর রূহ থেকে। আর তোমাদেরকে দিয়েছেন কান, চোখ ও অন্তঃকরণ, তোমরা খুব সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর[১]।

وَقَالُوْٓا ءَاِذَا ضَلَلْنَا فِي الْاَرْضِ ءَاِنَّا لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ؕ بَلْ هُمْ بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ كٰفِرُوْنَ ۝١٠

১০. আর তারা বলে, ‘আমরা মাটিতে হারিয়ে গেলেও কি আমরা হবো নূতন সৃষ্টি?’ বরং তারা তাদের রবের সাক্ষাতের সাথে কুফরিকারী।

قُلْ يَتَوَفّٰىكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِيْ وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ ۝١١

১১. বলুন, ‘তোমাদের জন্য নিযুক্ত মৃত্যুর ফেরেশ্‌তা তোমাদের প্রাণ হরণ করবে[২]। তারপর তোমাদের রবের কাছেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে।’

দ্বিতীয় রুকূ’

وَلَوْ تَرٰٓى اِذِ الْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوْا رُءُوْسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ رَبَّنَآ اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوْقِنُوْنَ ۝١٢

১২. আর আপনি যদি দেখতেন! যখন অপরাধীরা তাদের রবের নিকট অবনত মস্তকে বলবে, ‘হে আমাদের রব! আমরা দেখলাম ও শুনলাম, সুতরাং আপনি আমাদেরকে ফেরত পাঠান, আমরা সৎকাজ করব, নিশ্চয় আমরা দৃঢ় বিশ্বাসী[৩]।’

---

(১) আয়াতের সমার্থে আরও দেখুন, সূরা আল-মুমিনূন: ১৩-১৪।

(২) আলোচ্য আয়াতে “মালাকুল মাউত” এক বচনে বর্ণনা করা হয়েছে, অথচ অপর আয়াতে রয়েছে “ফেরেশ্‌তাগণ যাদের প্রাণ বিয়োগ ঘটায়” [সূরা আল-আন‘আমঃ৬১] এতে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, “মালাকুল মাউত” একাকী এ কাজ সম্পন্ন করেন না; বহু ফেরেশ্‌তা তাঁর অধীনে এ কাজে অংশগ্রহণ করেন। [কুরতুবী, আদওয়াউল-বায়ান]

(৩) অন্য আয়াতে আল্লাহ্ জানিয়েছেন যে, তাদেরকে যদি ফেরৎ দেয়া হত, তবে তারা পুনরায় আল্লাহ্‌র দ্বীনের উপর মিথ্যারোপ করত। আল্লাহ্ বলেন, “আপনি যদি দেখতে পেতেন যখন তাদেরকে আগুনের উপর দাঁড় করান হবে তখন তারা বলবে, ‘হায়!

১৩. আর আমরা ইচ্ছে করলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার হেদায়াত দিতাম[১]; কিন্তু আমার পক্ষ থেকে এ কথা অবশ্যই সাব্যস্ত যে, আমি নিশ্চয় কতেক জিন ও মানুষের সমন্বয়ে জাহান্নাম পূর্ণ করব।

وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٣﴾

১৪. কাজেই 'শাস্তি আস্বাদন কর, কারণ তোমাদের এ দিনের সাক্ষাতের কথা তোমরা ভুলে গিয়েছিলে। আমরাও তোমাদেরকে পরিত্যাগ করলাম[২]। আর তোমরা যা আমল করতে তার জন্য তোমরা স্থায়ী শাস্তি ভোগ করতে থাক।'

فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

১৫. শুধু তারাই আমাদের আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনে, যারা সেটার দ্বারা উপদেশপ্রাপ্ত হলে সিজ্‌দায় লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, আর তারা অহংকার করে না।

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۩ ﴿١٥﴾

যদি আমাদেরকে ফেরত পাঠান হত, আর আমরা আমাদের রবের আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ না করতাম এবং আমরা মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।' বরং আগে তারা যা গোপন করত তা এখন তাদের কাছে প্রকাশ হয়ে গিয়েছে। আর তারা আবার ফিরে গেলেও তাদেরকে যা করতে নিষেধ করা হয়েছিল আবার তারা তাই করত এবং নিশ্চয়ই তারা মিথ্যাবাদী।" [সূরা আল-আন'আম: ২৭-২৮]

(১) কাতাদাহ বলেন, যদি আল্লাহ্‌ চাইতেন তবে তারা সবাই ঈমান আনত। আর যদি আল্লাহ্‌ চাইতেন তবে তাদের উপর আসমান থেকে এমন কোন নিদর্শন নাযিল করতেন, যা দেখার পর তারা সবাই সেটার সামনে মাথা নত করে দিত। কিন্তু তিনি জোর করে ঈমানে নিয়ে আসতে চান না। কারণ, তাঁর কাছ থেকে তাদের উপর একটি বাণী সত্য হয়েছে যে, তিনি তাদের দিয়ে জাহান্নাম পূর্ণ করবেন। [তাবারী]

(২) এখানে نسي শব্দের অর্থ পরিত্যাগ করা, ছেড়ে যাওয়া। আরবী ভাষায় এ শব্দটি ভুলে যাওয়া, ছেড়ে দেয়া এ দুটি অর্থেই ব্যবহৃত হয়। [তাবারী; কুরতুবী]

তَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ⑯

১৬. তাদের পার্শ্বদেশ শয্যা হতে দূরে থাকে[1] তারা তাদের রবকে ডাকে আশংকা ও আশায়[2] এবং আমরা

---

(১) অর্থাৎ আয়েশ-আরাম করে রাত কাটাবার পরিবর্তে তারা নিজেদের রবের ইবাদাত করে। তাদের অবস্থা এমনসব দুনিয়াপূজারীদের মতো নয় যাদের দিনের পরিশ্রমের কষ্ট দূর করার জন্য রাতে নাচ-গান, শরাব পান ও খেলা তামাশার মতো আমোদ প্রমোদের প্রয়োজন হয়। এর পরিবর্তে তাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, সারা দিন নিজেদের দায়িত্ব পালন করে কাজ শেষে এসে দাঁড়ায় তারা নিজেদের রবের সামনে। তাঁকে স্মরণ করে রাত কাটিয়ে দেয়। তাঁর ভয়ে কাঁপতে থাকে এবং তাঁর কাছেই নিজেদের সমস্ত আশা-আকাংখা সমর্পণ করে। [দেখুন, মুয়াস্‌সার, কুরতুবী, বাগভী]

(২) আয়াতে মুমিনগণের এক গুণ এই বলে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদের শরীরের পার্শ্বদেশ শয্যা থেকে আলাদা থাকে এবং শয্যা পরিত্যাগ করে আল্লাহর যিক্‌র ও দো'আয় আত্মনিয়োগ করে। কেননা, এরা মহান আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি ও শাস্তিকে ভয় করে এবং তাঁর করুণা ও পূণ্যের আশা করে থাকে। আশা-নিরাশাপূর্ণ এ অবস্থা তাদেরকে যিক্‌র ও দো'আর জন্য ব্যাকুল করে রাখে। অধিকাংশ মুফাসসিরগণের মতে শয্যা পরিত্যাগ করে যিকর ও দো'আয় আত্মনিয়োগ করার অর্থ তাহাজ্জুদ ও নফল সালাত যা ঘুম থেকে উঠার পর গভীর রাতে পড়া হয়। হাদীসের অপরাপর বর্ণনা থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। মা'আয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদা নবীজীর সঙ্গে সফরে ছিলাম, সফরকালে একদিন আমি আরজ করলাম; ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাকে এমন কোন আমল বলে দিন যার মাধ্যমে আমি জান্নাত লাভ করতে পারি এবং জাহান্নাম থেকে অব্যাহতি পেতে পারি। তিনি বললেন, তুমি তো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বস্তু প্রার্থনা করেছ। কিন্তু আল্লাহ পাক যার জন্যে তা সহজ করে দেন তার পক্ষে তা লাভ করা অতি সহজ। অতঃপর বললেন, সে আমল এই যে, আল্লাহর ইবাদাত করবে এবং তাঁর সাথে কোন অংশীদার স্থাপন করবে না। সালাত প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত প্রদান করবে, সাওম রাখবে এবং বায়তুল্লাহ শরীফের হজ সম্পন্ন করবে। অতঃপর তিনি বললেন, এসো, তোমাকে পুণ্য দ্বারের সন্ধান দিয়ে দেই, (তা এই যে,) সাওম হচ্ছে ঢাল স্বরূপ (যা শাস্তি থেকে মুক্তি দেয়)। আর সদকা মানুষের পাপানল নির্বাপিত করে দেয়। অনুরূপভাবে মানুষের গভীর রাতের সালাত; এই বলে কোরআন মজীদের উল্লেখিত আয়াত তেলাওয়াত করেন। [তিরমিযী: ২৬১৬, ইবনে মাজাহ্‌: ৩৯৭৩, মুসনাদে আহমাদ: ৫/২৩১]

সাহাবী আবুদ্দারদা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু, প্রখ্যাত তাবেয়ী কাতাদাহ ও যাহহাক রাহেমাহুমাল্লাহ বলেন যে, সেসব লোকও শয্যা থেকে শরীরের পার্শ্বদেশ পৃথক হয়ে থাকা গুণের অধিকারী, যারা এশা ও ফজর উভয় সালাত জামা'আতের সাথে আদায় করেন। প্রখ্যাত সাহাবী আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত

তাদেরকে যে রিযিক দান করেছি তা থেকে তারা ব্যয় করে ।

১৭. অতএব কেউই জানে না তাদের জন্য চোখ জুড়ানো কী লুকিয়ে রাখা হয়েছে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কারস্বরূপ[১]!

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾

আছে, উল্লেখিত আয়াত যারা এশার সালাতের পূর্বে শয্যা গ্রহণ না করে, এশার জামাতের জন্য প্রতীক্ষারত থাকেন, তাদের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে ।[আবু দাউদ: ১৩২১, তিরমিযী: ৩১৯৬] ইবনে-কাসীর ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলছেন যে, এসব বক্তব্যের মধ্যে পরস্পর কোন বিরোধ নেই । প্রকৃতপক্ষে এরা সকলেই এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত । এর মধ্যে শেষরাতের সালাতই সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী ।

(১) হাদীসে কুদসীতে উদ্ধৃত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ “আল্লাহ বলেন, আমার সৎকর্মশীল বান্দাদের জন্য আমি এমনসব জিনিস তৈরী করে রেখেছি যা কখনো কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শোনেনি এবং কোন মানুষ কোনদিন তা কল্পনাও করতে পারে না ।” [বুখারী: ৪৭৭৯; মুসলিম: ১৮৯, ২৪২৪] হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহকে বললেন, জান্নাতে কার অবস্থানগত মর্যাদা সবচেয়ে সামান্য হবে? তিনি বললেন, সে এক ব্যক্তি, তাকে সমস্ত জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করার পরে জান্নাতের নিকট নিয়ে আসা হবে । তাকে বলা হবে, জান্নাতে প্রবেশ কর । সে বলবে, হে রব! সবাই তাদের স্থান নিয়ে নিয়েছে । তারা তাদের যা নেবার তা নিয়েছে । তখন তাকে বলা হবে, তুমি কি সন্তুষ্ট হবে, যদি তোমাকে দুনিয়ার বাদশাদের রাজত্বের মত রাজত্ব দেয়া হয়? সে বলবে, হে রব! আমি সন্তুষ্ট । তখন তাকে বলা হবে, তোমার জন্য তা-ই রইল, আরও অনুরূপ, আরও অনুরূপ, আরও অনুরূপ, আরও অনুরূপ । পঞ্চম বারে আল্লাহ্ বলবেন, তুমি কি সন্তুষ্ট হয়েছ? সে বলবে, হে রব! আমি সন্তুষ্ট । তখন তিনি বলবেন, এটা তোমার জন্য, তাছাড়া অনুরূপ দশগুণ । আর তোমার জন্য থাকবে তাতে যা তোমার মন চায়, তোমার চোখ শান্তি করে, সে বলবে, হে রব! আমি সন্তুষ্ট । সে বলবে, হে রব! (এই যদি আমার অবস্থা হয়) তবে জান্নাতে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারীর কি অবস্থা? তিনি বলবেন, তাদের জন্য আমি নিজ হাতে তাদের সম্মানের বীজ বপন করেছি, আর তাতে আমার মোহর মেরে দিয়েছি । সুতরাং কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শুনেনি, আর কোন মানুষের মনে তা উদিত হয়নি । তারপর তিনি উপরোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করলেন । [মুসলিম: ১৮৯] অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে কেউ জান্নাতে যাবে নেয়ামত প্রাপ্ত হবে, সে কোনদিন নিরাশ হবে না, তার কাপড় পুরনো হবে না, আর তার যৌবন নিঃশেষ হবে না ।” [মুসলিম: ২৮৩৬]

১৮. সুতরাং যে ব্যক্তি মুমিন, সে কি তার ন্যায় যে ফাসেক[১]? তারা সমান নয়।

أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ ⑱

১৯. যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে, তাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ তাদের আপ্যায়নের জন্য রয়েছে জান্নাতের বাসস্থান।

أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ⑲

২০. আর যারা নাফরমানী করে, তাদের বাসস্থান হবে আগুন; যখনই তারা তা থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে তাতে ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, 'যে আগুনের শাস্তিতে তোমরা মিথ্যারোপ করতে, তা আস্বাদন কর।'

وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ ⑳

২১. আর অবশ্যই আমরা তাদেরকে মহা শাস্তির পূর্বে কিছু লঘু শাস্তি আস্বাদন করাব[২], যাতে তারা ফিরে আসে।

وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ㉑

২২. যে ব্যক্তি তার রবের আয়াতসমূহ দ্বারা উপদেশপ্রাপ্ত হয়ে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার চেয়ে বড় যালিম

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ㉒

(১) এখানে মুমিন ও ফাসেকের দু'টি বিপরীতমুখী পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। মুমিন বলতে এমন লোক বুঝানো হয়েছে, যে আল্লাহকে নিজের রব ও একমাত্র উপাস্য মেনে নিয়ে আল্লাহ তাঁর নবী-রাসূলদের মাধ্যমে যে আইন-কানুন পাঠিয়েছেন তার আনুগত্য করে। পক্ষান্তরে ফাসেক হচ্ছে এমন এক ব্যক্তি যে ফাসেকী আনুগত্য থেকে বের হয়ে আসা বা অন্যকথায় বিদ্রোহ, বল্গাহীন স্বেচ্ছাচারী মনোবৃত্তি ও আল্লাহ ছাড়া অন্য সত্তার আনুগত্যের নীতি অবলম্বন করে। [দেখুন, তাবারী, কুরতুবী]

(২) নিকটতম শাস্তি বা "ছোট শাস্তি" বলে বোঝানো হয়েছে, এ দুনিয়ায় মানুষ যেসব কষ্ট পায় সেগুলো। যেমন, ব্যক্তিগত জীবনে কঠিন রোগ, নিজের প্রিয়তম লোকদের মৃত্যু, ভয়াবহ দুর্ঘটনা, মারাত্মক ক্ষতি,ব্যর্থতা ইত্যাদি। আর বৃহত্তর শাস্তি বা "বড় শাস্তি" বলতে আখেরাতের শাস্তি বোঝানো হয়েছে। কুফরী ও ফাসেকীর অপরাধে এ শাস্তি দেয়া হবে। [মুয়াস্‌সার]

আর কে? নিশ্চয় আমরা অপরাধীদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

তৃতীয় রুকূ'

২৩. আর অবশ্যই আমরা মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, অতএব আপনি তার সাক্ষাত সম্বন্ধে সন্দেহে থাকবেন না(১) এবং আমরা ওটাকে করে দিয়েছিলাম বনী ইসরাঈলের জন্য হিদায়াতস্বরূপ।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَلَا تَكُنْ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَآئِهٖ وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ﴿٢٣﴾

২৪. আর আমরা তাদের মধ্য থেকে বহু নেতা মনোনীত করেছিলাম, যারা আমাদের নির্দেশ অনুসারে হেদায়াত করত; যেহেতু তারা ধৈর্য ধারণ

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا ۗ وَكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يُوْقِنُوْنَ ﴿٢٤﴾

---

(১) لقاء শব্দের অর্থ সাক্ষাৎ। এ আয়াতে কার সাথে সাক্ষাৎ বোঝানো হয়েছে সে সম্বন্ধে মুফাসসিরগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। لقائه এর ـه (সর্বনাম) কিতাব অর্থাৎ কুরআনের দিকে ধাবিত করে এই অর্থ করা যায় যে, যেরূপভাবে মহান আল্লাহ মুসা আলাইহিস্‌ সালামকে গ্রন্থ প্রদান করেছেন অনুরূপভাবে আপনার প্রতিও আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে গ্রন্থ অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কে কোন সন্দেহ পোষণ করবেন না। যেমন কুরআন সম্পর্কে অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে, "এবং নিশ্চয় আপনাকে প্রজ্ঞাময় প্রশংসিতের পক্ষ থেকে কুরআন প্রদান করা হবে"। [সূরা আন-নামল: ৬] ইবনে-আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা এবং কাতাদাহ রাহেমাহুল্লাহ এর ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন যে, لقائه এর ـه (সর্বনাম) মুসা আলাইহিস্‌ সালাম এর দিকে ধাবিত হয়েছে। সে হিসেবে এ আয়াতে মুসা আলাইহিস্‌ সালাম এর সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাতের সংবাদ দেয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, আপনি এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ পোষণ করবেন না যে, মূসা আলাইহিস্‌ সালামের সাথে আপনার সাক্ষাত সংঘটিত হবে। সুতরাং মে'রাজের রাতে এক সাক্ষাৎকার সংঘটিত হওয়ার কথা বিশুদ্ধ হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত; [দেখুন, বুখারী:৩২৩৯; মুসলিম:১৬৫] অতঃপর কেয়ামতের দিন সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হওয়ার কথাও প্রমাণিত আছে। হাসান বসরী রাহেমাহুল্লাহ এর ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন যে, মূসা আলাইহিস্‌ সালামকে ঐশী গ্রন্থ প্রদানের দরুন যেভাবে মানুষ তাঁকে নানাভাবে দুঃখ-যন্ত্রণা দিয়েছে আপনিও এসব কিছুর সম্মুখীন হবেন বলে নিশ্চিত থাকুন। তাই কাফেরদের প্রদত্ত দুঃখ-যন্ত্রণার ফলে আপনি মনক্ষুন্ন হবেন না; বরং নবীগণের ক্ষেত্রে এমনটি হওয়া স্বাভাবিক রীতি মনে করে আপনি তা বরদাশ্‌ত করুন।

করেছিল। আর তারা আমাদের আয়াতসমূহে দৃঢ় বিশ্বাস রাখত[১]।

২৫. নিশ্চয় আপনার রব, যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করছে তিনি কিয়ামতের দিন তাদের মধ্যে সেটার ফয়সালা করে দিবেন।

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَٰمَةِ فِيمَا كَانُوا۟ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٢٥﴾

২৬. এটাও কি তাদেরকে হেদায়াত করলো না যে, আমরা তাদের পূর্বে ধ্বংস করেছি বহু প্রজন্মকে ---যাদের বাসভূমিতে তারা বিচরণ করে থাকে? নিশ্চয় এতে প্রচুর নিদর্শন রয়েছে; তবুও কি তারা শুনবে না?

أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِى مَسَٰكِنِهِمْ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ ۖ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ﴿٢٦﴾

২৭. তারা কি লক্ষ্য করে না যে, আমরা শুকনো ভূমির[২] উপর পানি প্রবাহিত করে, তার সাহায্যে উদ্‌গত করি শস্য, যা থেকে আহার্য গ্রহণ করে তাদের চতুষ্পদ জন্তু এবং তারা নিজেরাও? তারপরও কি তারা লক্ষ্য করবে না[৩]?

أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّا نَسُوقُ الْمَآءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِۦ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَٰمُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ ۖ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴿٢٧﴾

---

(১) অর্থাৎ আমি ইসরাঈল সম্প্রদায়ের মাঝে কিছু লোককে নেতা ও অগ্রপথিক নিযুক্ত করেছিলাম যারা তাঁদের পয়গম্বরের প্রতিনিধি হিসাবে মহান প্রভুর নির্দেশানুসারে লোকদেরকে হেদায়াত করতেন। [দেখুন, মুয়াস্‌সার]

(২) অর্থাৎ তারা কি লক্ষ্য করে না যে, আমি শুষ্ক ভূমিতে পানি প্রবাহিত করি যদ্বারা নানা প্রকারের শস্যাদি উদগত হয়। ﴿الْأَرْضِ الْجُرُزِ﴾ শুষ্ক ভূমিকে বলা হয় যেখানে কোন বৃক্ষলতা উদগত হয় না। ইবন আব্বাস বলেন, এখানে এমন ভূমির কথা বলা হচ্ছে, যে ভূমিতে অল্প পানি পড়লে কোন কাজে লাগে না। তবে সেখানে যদি প্রবল বর্ষণের পানি আসে তবেই সেটা কাজে লাগে। [তাবারী]

(৩) শুষ্ক ভূমিতে পানি প্রবাহে; এবং সেখানে নানাবিধ উদ্ভিদ ও তরু-লতা উদগত হওয়ার বর্ণনা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় এভাবে করা হয়েছে যে, ভূমিতে বৃষ্টি বর্ষিত হয় ফলে ভূমি রসালো হয়ে শস্যাদি উৎপাদনের যোগ্য হয়ে উঠে। কিন্তু এ আয়াতে বৃষ্টির স্থলে ভূ-পৃষ্ঠের উপর দিয়ে শুষ্ক ভূমির দিকে পানি প্রবাহিত করে গাছপালা

২৮. আর তারা বলে, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে বল, কখন হবে এ বিজয়[১]?'

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٨﴾

২৯. বলুন, 'বিজয়ের দিন কাফিরদের ঈমান আনা তাদের কোন কাজে আসবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া হবে না[২]।'

قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٢٩﴾

৩০. অতএব আপনি তাদেরকে উপেক্ষা করুন এবং অপেক্ষা করুন, তারাও তো অপেক্ষমান[৩]।

فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ ﴿٣٠﴾

উদগত করার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ অন্য কোন ভূমির উপর বৃষ্টি বর্ষণ করে সেখান থেকে নদী-নালার মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠের উপর দিয়ে যেসব শুষ্ক ভূ-ভাগে সাধারণত বৃষ্টি হয় না সেদিকে প্রবাহিত করা হয়। [কুরতুবী; সা'দী]

(১) তাফসীরকার মুজাহিদ আলোচ্য আয়াতে বিজয় এর অর্থ কেয়ামতের দিন বলে বর্ণনা করেছেন। [ইবন কাসীর; বাগভী] কাতাদাহ বলেন, এখানে فتح বলে বিচার ফয়সালাই বোঝানো হয়েছে। [আত-তাফসীরুস সহীহ] আল্লামা শানকীতী বলেন, কারণ, কুরআনের বহু আয়াতে এ শব্দটি বিচার-ফয়সালা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন শু'আইব আলাইহিস সালাম এর যবানীতে এসেছে, "হে আমাদের রব! আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ন্যায্যভাবে মীমাংসা করে দিন এবং আপনিই শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী।" [সূরা আল-আ'রাফ: ১৮৯] [আদওয়াউল বায়ান]

(২) অর্থাৎ যখন আল্লাহ্‌র আযাব এসে যাবে এবং তাঁর ক্রোধ আপতিত হবে, তখন কাফেরদের ঈমান কোন কাজে আসবে না। আর তাদেরকে তখন আর কোন সুযোগও দেয়া হবে না। যেমন অন্য আয়াতে এসেছে, "অতঃপর তাদের কাছে যখন স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ তাদের রাসূলগণ আসলেন, তখন তারা নিজেদের কাছে বিদ্যমান থাকা জ্ঞানে উৎফুল্ল হল। আর তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত তা-ই তাদেরকে বেষ্টন করল। অতঃপর তারা যখন আমাদের শাস্তি দেখল তখন বলল, 'আমরা একমাত্র আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনলাম এবং আমরা তাঁর সাথে যাদেরকে শরীক করতাম তাদের সাথে কুফরী করলাম।' কিন্তু তারা যখন আমার শাস্তি দেখল তখন তাদের ঈমান তাদের কোন উপকারে আসল না। আল্লাহ্‌র এ বিধান পূর্ব থেকেই তাঁর বান্দাদের মধ্যে চলে আসছে এবং তখনই কাফিররা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।" [সূরা গাফির: ৮৩-৮৫]

(৩) যেমন অন্য আয়াতে এসেছে, "নাকি তারা বলে, 'সে একজন কবি? আমরা তার মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছি। বলুন, 'তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষাকারীদের অন্তর্ভুক্ত।" [সূরা আত-তূর: ৩০-৩১]

৩৩- সূরা আল-আহ্‌যাব[১]
৭৩ আয়াত, মাদানী

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. হে নবী! আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন করুন এবং কাফিরদের ও মুনাফিকদের আনুগত্য করবেন না। আল্লাহ্ তো সর্বজ্ঞ, হিকমতওয়ালা[২]।

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللّٰهَ وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۙ﴿۱﴾

২. আর আপনার রবের কাছ থেকে আপনার প্রতি যা ওহী হয় তার অনুসরণ করুন[৩]; নিশ্চয় তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা সম্বন্ধে সম্যক অবহিত।

وَّاتَّبِعْ مَا يُوْحٰٓى اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۙ﴿۲﴾

৩. এবং আপনি নির্ভর করুন আল্লাহ্‌র

وَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿۳﴾

(১) সূরাতুল-আহযাব মদীনায় নাযিল হয়। এর অধিকাংশ আলোচ্য বিষয় আল্লাহ্ সমীপে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর বিশিষ্ট স্থান ও উচ্চ মর্যাদা সংশ্লিষ্ট। এ সূরার বিভিন্ন শিরোনামে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নির্দেশ পালনের বাধ্যবাধকতা, তার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের আবশ্যকতা এবং তাকে দুঃখ-যন্ত্রণা দেয়া হারাম হওয়ার কথা বিবৃত হয়েছে। সূরার অবশিষ্ট বিষয়সমূহও এগুলোরই পরিপূরক ও সহায়ক। তাছাড়া বিবাহিত পুরুষ ও বিবাহিতা মহিলাকে রজম করার আয়াতটি এ সূরাতেই ছিল। পরবর্তীতে সেটার বিধান বহাল রেখে তেলাওয়াত রহিত করা হয়। [দেখুন, কুরতুবী; ইবন কাসীর] এ ব্যাপারে উবাই ইবন কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। [দেখুন, মুসনাদে আবী দাউদ আত-তায়ালিসী, ৫৪২; ইবন হিব্বান ৪৪২৮; মুস্তাদরাকে হাকিম: ৪/৩৫৯]

(২) এ আয়াতের উপসংহার ﴿اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا﴾ বলে আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন করার এবং কাফের ও মুনাফেকদের অনুসরণ না করার পূর্ব বর্ণিত যে হুকুম তার তাৎপর্য ও যৌক্তিকতা বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা, যে আল্লাহ্ যাবতীয় কর্মের পরিণতি ও ফলাফল সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত, তিনি অত্যন্ত প্রজ্ঞাময়। মানুষের যাবতীয় কল্যাণ ও মঙ্গল তাঁর পরিজ্ঞাত। [ইবন কাসীর]

(৩) এটা পূর্ববর্তী হুকুমেরই অবশিষ্টাংশ-যেন আপনি কাফের ও মুনাফেকদের কথায় পড়ে তাদের অনুসরণ না করেন, বরং ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যা কিছু পৌঁছেছে, আপনি কেবল তাই অনুসরণ করুন। [ফাতহুল কাদীর]

উপর। আর কর্মবিধায়ক হিসেবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

৪. আল্লাহ্ কোন মানুষের জন্য তার অভ্যন্তরে দুটি হৃদয় সৃষ্টি করেননি। আর তোমাদের স্ত্রীগণ, যাদের সাথে তোমরা যিহার করে থাক, তিনি তাদেরকে তোমাদের জননী করেননি(১) এবং তোমাদের পোষ্য পুত্রদেরকে তিনি তোমাদের পুত্র করেননি(২);

مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهٖ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الّٰٓئِيْ تُظٰهِرُوْنَ مِنْهُنَّ أُمَّهٰتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ۚ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيْلَ ④

(১) এ আয়াতে 'যিহার'-এর দরুন স্ত্রী চিরতরে হারাম হয়ে যাওয়ার জাহেলিয়াত যুগের ভ্রান্ত ধারণা সম্পূর্ণ বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আর এরূপ বলার ফলে শরী'য়তের কোন প্রতিক্রিয়া হয় কিনা, এ সম্পর্কে 'সূরা মুজাদালায়' এরূপ বলাকে পাপ বলে আখ্যায়িত করে এ থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এরূপ বলার পর যদি যিহারের কাফ্‌ফারা আদায় করে; তবে স্ত্রী তার জন্যে হালাল হয়ে যাবে। 'সূরা আল-মুজাদালায়' আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং যিহারের কাফ্‌ফারার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। [দেখুন, মুয়াস্‌সার; বাগভী; ফাতহুল কাদীর]

(২) দ্বিতীয় বিষয় পালক পুত্র সংশ্লিষ্ট। আয়াতের মর্ম এই, যেমন কোন মানুষের দু'টি অন্ত:করণ থাকে না এবং যেমন স্ত্রীকে মা বলে সম্বোধন করলে সে প্রকৃত মা হয়ে যায় না; অনুরূপভাবে তোমাদের পোষ্য ছেলেও প্রকৃত ছেলেতে পরিণত হয় না। দেখুন,[মুয়াস্‌সার,সা'দী] অর্থাৎ, অন্যান্য সন্তানদের ন্যায় সে মীরাসেরও অংশীদার হবে না এবং বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ হওয়া সংশ্লিষ্ট মাসআলাসমূহও তার প্রতি প্রযোজ্য হবে না। সুতরাং সন্তানের তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী যেমন পিতার জন্য চিরতরে হারাম, কিন্তু পোষ্যপুত্রের স্ত্রী পালক পিতার তরে তেমনভাবে হারাম হবে না। যেহেতু এই শেষোক্ত বিষয়ের প্রতিক্রিয়া বহু ক্ষেত্রে পড়ে থাকে; সুতরাং এ নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে যে, যখন পালক ছেলেকে ডাকবে বা তার উল্লেখ করবে, তখন তা তার প্রকৃত পিতার নামেই করবে। পালক পিতার পুত্র বলে সম্বোধন করবে না। কেননা, এর ফলে বিভিন্ন ব্যাপারে নানাবিধ সন্দেহ ও জটিলতা উদ্ভবের আশংকা রয়েছে। হাদীসে এসেছে, সাহাবায়ে কেরাম বলেন, এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে আমরা যায়েদ ইবনে হারেসাকে যায়েদ ইবন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে সম্বোধন করতাম। [বুখারী: ৪৭৮২, মুসলিম: ২৪২৫] কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে পালক ছেলেরূপে গ্রহণ করেছিলেন। এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর আমরা এ অভ্যাস পরিত্যাগ করি। এ আয়াতটি নাযিল হবার পর কোন ব্যক্তির নিজের আসল বাপ ছাড়া অন্য কারো সাথে পিতৃ সম্পর্ক স্থাপন করাকে হারাম গণ্য করা হয়। হাদীসে এসেছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যে

এগুলো তোমাদের মুখের কথা। আর আল্লাহ্ সত্য কথাই বলেন এবং তিনিই সরল পথ নির্দেশ করেন।

৫. ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

ডাকো তোমরা তাদেরকে তাদের পিতৃ-পরিচয়ে; আল্লাহ্‌র নিকট এটাই বেশী ন্যায়সংগত। অতঃপর যদি তোমরা তাদের পিতৃ-পরিচয় না জান, তবে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই এবং বন্ধু। আর এ ব্যাপারে তোমরা কোন অনিচ্ছাকৃত ভুল করলে তোমাদের কোন অপরাধ নেই; কিন্তু তোমাদের অন্তর যা স্বেচ্ছায় করেছে (তা অপরাধ), আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৬. النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَاجُهُ

নবী মুমিনদের কাছে তাদের নিজেদের চেয়েও ঘনিষ্টতর[১] এবং তাঁর স্ত্রীগণ

ব্যক্তি নিজেকে আপন পিতা ছাড়া অন্য কারো পুত্র বলে দাবী করে, অথচ সে জানে ঐ ব্যক্তি তার পিতা নয়, তার জন্য জান্নাত হারাম।"[বুখারী: ৪৩২৬, মুসলিম: ৬৩] অন্য হাদীসে এসেছে, 'তোমরা তোমাদের পিতাদের সাথে সম্পর্কিত হওয়া থেকে বিমুখ হয়োনা, যে তার পিতা থেকে বিমুখ হয় সে কুফরী করল।' [মুসলিম:৬২] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'কোন মানুষ যখন না জেনে কোন নসব প্রমান করতে যায় বা অস্বীকার করতে যায় তখন সে কুফরী করে, যদিও তা সামান্য হোক'। [ইবনে মাজাহ:২৭৪৪]

(১) অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মুসলিমদের এবং মুসলিমদের সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে সম্পর্ক তা অন্যান্য সমস্ত মানবিক সম্পর্কের উর্ধ্বের এক বিশেষ ধরনের সম্পর্ক। নবী ও মুমিনদের মধ্যে যে সম্পর্ক বিরাজিত, অন্য কোন আত্মীয়তা ও সম্পর্ক তার সাথে কোন দিক দিয়ে সামান্যতমও তুলনীয় নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিমদের জন্য তাদের বাপ-মায়ের চাইতেও বেশী স্নেহশীল ও দয়ার্দ্র হৃদয় এবং তাদের নিজেদের চাইতেও কল্যাণকামী। তাদের বাপ-মা, স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা তাদের ক্ষতি করতে পারে, তাদের সাথে স্বার্থপরের মতো ব্যবহার করতে পারে, তাদেরকে জাহান্নামে ঠেলে দিতে পারে, কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের পক্ষে কেবলমাত্র এমন

তাদের মা[১]। আর আল্লাহ্‌র বিধান | أُمَّهَٰتُهُمْ ۗ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ

কাজই করতে পারেন যাতে তাদের সত্যিকার সাফল্য অর্জিত হয়। তারা নিজেরাই নিজেদের পায়ে কুড়াল মারতে পারে, বোকামি করে নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করতে পারে কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের জন্য তাই করবেন যা তাদের জন্য লাভজনক হয়। আসল ব্যাপার যখন এই মুসলিমদের ওপরও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ অধিকার আছে তখন তারা তাকে নিজেদের বাপ-মা ও সন্তানদের এবং নিজেদের প্রাণের চেয়েও বেশী প্রিয় মনে করবে। দুনিয়ার সকল জিনিসের চেয়ে তাকে বেশী ভালোবাসবে। নিজেদের মতামতের ওপর তার মতামতকে এবং নিজেদের ফায়সালার ওপর তার ফায়সালাকে প্রাধান্য দেবে। তার প্রত্যেকটি হুকুমের সামনে মাথা নত করে দেবে। তাই হাদীসে এসেছে, "তোমাদের কোন ব্যক্তি মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা, তার সন্তান-সন্ততি ও সমস্ত মানুষের চাইতে বেশী প্রিয় হই।" [বুখারী: ১৪, মুসলিম: ৪৪] সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ পালন করা স্বীয় পিতা-মাতার নির্দেশের চাইতেও অধিক আবশ্যকীয়। যদি পিতা-মাতার হুকুম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হুকুমের পরিপন্থী হয়, তবে তা পালন করা জায়েয নয়। এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশকে নিজের সকল আশা-আকাংক্ষার চাইতেও অগ্রাধিকার দিতে হবে। হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: 'এমন কোন মুমিনই নেই যার পক্ষে আমি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়া ও আখেরাতে সমস্ত মানবকূলের চাইতে অধিক হিতাকাঙ্ক্ষী ও আপনজন নই। যদি তোমাদের মন চায়, তবে এর সমর্থন ও সত্যতা প্রমাণের জন্য কুরআনের আয়াত পাঠ করতে পার।' [বুখারী: ২৩৯৯]

(১) রাসূলের পূণ্যবর্তী স্ত্রীগণকে সকল মুসলিমের মা বলে আখ্যায়িত করার অর্থ-সম্মান ও শ্রদ্ধার ক্ষেত্রে মায়ের পর্যায়ভুক্ত হওয়া। মা-ছেলের সম্পর্ক-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আহ্‌কাম, যথা-পরস্পর বিয়ে-শাদী হারাম হওয়া, মুহরিম হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে পরস্পর পর্দা না করা এবং মীরাসে অংশীদারিত্ব প্রভৃতি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যেমন, আয়াতের শেষে স্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে। আর রাসূলের পত্নীগণের সাথে উম্মতের বিয়ে অনুষ্ঠান হারাম হওয়ার কথা অন্য এক আয়াতে ভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে বিয়ে অনুষ্ঠান হারাম মা হওয়ার কারণেই ছিল, এমনটি হওয়া জরুরী নয়। মোটকথা: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণ শুধুমাত্র এ অর্থে মুমিনদের মাতা যে, তাদেরকে সম্মান করা মুসলিমদের জন্য ওয়াজিব। বাদবাকি অন্যান্য বিষয়ে তারা মায়ের মতো নন। যেমন তাদের প্রকৃত আত্মীয়গণ ছাড়া বাকি সমস্ত মুসলিম তাদের জন্য গায়ের মাহরাম ছিল এবং তাদের থেকে পর্দা করা ছিল ওয়াজিব। তাদের মেয়েরা মুসলিমদের জন্য বৈপিত্রেয় বোন ছিলেন না, যার ফলে তাদের সাথে মুসলিমদের বিয়ে নিষিদ্ধ হতে পারে। তাদের ভাই ও বোনেরা মুসলিমদের জন্য মামা ও খালার পর্যায়ভুক্ত ছিলেন না। কোন ব্যক্তি নিজের মায়ের তরফ থেকে যে মীরাস

فِي كِتٰبِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ اِلَّآ اَنْ تَفْعَلُوْٓا اِلٰٓى اَوْلِيٰٓئِكُمْ مَّعْرُوْفًا ؕ كَانَ ذٰلِكَ فِي الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا ۝

অনুসারে মুমিন ও মুহাজিরগণের চেয়ে---যারা আত্মীয় তারা পরস্পর কাছাকাছি[১]।তবে তোমরা তোমাদের বন্ধু-বান্ধবের প্রতি কল্যাণকর কিছু করার কথা আলাদা[২]। এটা কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوْحٍ وَّاِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۠ وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ۝

৭. আর স্মরণ করুন, যখন আমরা নবীদের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম[৩] এবং আপনার কাছ থেকেও, আর নূহ, ইব্‌রাহীম, মূসা ও মারইয়াম পুত্র ‘ঈসার কাছ থেকেও। আর আমরা তাদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলাম দৃঢ় অঙ্গীকার--

---

লাভ করে তাদের তরফ থেকে কোন অনাত্মীয় মুসলিম সে ধরনের কোন মীরাস লাভ করে না।[দেখুন, ফাতহুল কাদীর; মুয়াস্‌সার,বাগভী]

(১) এ আয়াতের মাধ্যমে একটি ঐতিহাসিক চুক্তির বিধান পরিবর্তন করা হয়েছে।হিজরতের পর পরই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুমিন মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেন। যার কারণে তাদের একজন অপরজনের ওয়ারিশ হতো। এটা ছিল ঐতিহাসিক প্রয়োজনে। তারপর যখন প্রত্যেকের অবস্থারই পরিবর্তন হলো তখন এ নীতির কার্যকারিতা রহিত করে যাবিল আরহামদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করা হলো।[তাবারী, ইবন কাসীর, ফাতহুল কাদীর; কুরতুবী, মুয়াস্‌সার]

(২) এ আয়াতে বলা হয়েছে, কোন ব্যক্তি চাইলে হাদীয়া, তোহ্‌ফা, উপঢৌকন বা অসিয়াতের মাধ্যমে নিজের কোন দ্বীনী ভাইকে সাহায্য করতে পারে। [ফাতহুল কাদীর]

(৩) উল্লেখিত আয়াতে নবীগণ থেকে যে অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি গ্রহণের কথা আলোচিত হয়েছে তা সমস্ত মানবকূল থেকে গৃহীত সাধারণ অঙ্গীকার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। যেমন উবাই ইবন কা‘ব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে সহীহ সনদে এসেছে, ‘রেসালত ও নবুওয়ত সংক্রান্ত অঙ্গীকার নবী ও রাসূলগণ থেকে স্বতন্ত্ররূপে বিশেষভাবে গ্রহণ করা হয়েছে’। [আহমাদ:৫/১৩৫, মিশকাতুল মাসাবীহ: ১/৪৪, মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৩২৪, আল-লালকায়ী: আস-সুন্নাহ: ৯৯১, ইব্‌ন বাত্তাহ: আল-ইবানাহ ২/৬৯,৭১,২১৫,২১৭] নবী আলাইহিস সালামগণ থেকে গৃহীত এ অঙ্গীকার ছিল নবুওয়ত ও রেসালাত বিষয়ক দায়িত্বসমূহ পালন এবং পরস্পর সত্যতা প্রকাশ ও সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান সম্পর্কিত।

৮. সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদিতা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করার জন্য। আর তিনি কাফিরদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি(১)।

لِّيَسْـَٔلَ الصّٰدِقِيْنَ عَنْ صِدْقِهِمْ ۚ وَاَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا ۟

দ্বিতীয় রুকূ’

৯. হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যখন শত্রু বাহিনী তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিল অতঃপর আমরা তাদের বিরুদ্ধে পাঠিয়েছিলাম ঘূর্ণিবায়ু(২) এবং এমন বাহিনী যা তোমরা দেখনি(৩)। আর তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُوْدٌ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّجُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا ۗ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ۟ۚ

১০. যখন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিল তোমাদের উপরের দিক ও নীচের দিক হতে(৪), তোমাদের চোখ বিস্ফোরিত হয়েছিল এবং তোমাদের প্রাণ হয়ে পড়েছিল কন্ঠাগত(৫), আর

اِذْ جَآءُوْكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَاِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَا ۟

(১) অর্থাৎ আল্লাহ কেবলমাত্র অংগীকার নিয়েই ক্ষান্ত হননি বরং এ অংগীকার কতটুকু পালন করা হয়েছে সে সর্ম্পকে তিনি প্রশ্ন করবেন। [কুরতুবী, মুয়াস্‌সার]

(২) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমাকে মৃদৃ বাতাস দিয়ে সহযোগিতা করা হয়েছে। আর আ’দ সম্প্রদায়কে ঝঞ্ঝা বাতাসে ধ্বংস করা হয়েছে’ [বুখারী:১০৩৫]

(৩) এমন বাহিনী বলে ফেরেশতাদের বুঝানো হয়েছে। [তাবারী, ইবন কাসীর, বাগভী, ফাতহুল কাদীর]

(৪) এর একটি অর্থ হতে পারে, সবদিক থেকে চড়াও হয়ে এলো। দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে, নজ্‌দ ও খায়বারের দিক থেকে আক্রমণকারীরা ওপরের দিক থেকে এবং মক্কা মো‘আয্‌যামার দিক থেকে আক্রমণকারীরা নিচের দিক থেকে আক্রমণ করলো। [ফাতহুল কাদীর]

(৫) হাদীসে এসেছে, আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা খন্দকের দিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! অন্তরসমূহ

তোমরা আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে নানাবিধ ধারণা পোষণ করছিলে;

১১. তখন মুমিনগণ পরীক্ষিত হয়েছিল এবং তারা ভীষণভাবে প্রকম্পিত হয়েছিল।

هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ⑪

১২. আর স্মরণ কর, যখন মুনাফিকরা ও যাদের অন্তরে ছিল ব্যাধি, তারা বলছিল, 'আল্লাহ্‌ এবং তাঁর রাসূল আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা প্রতারণা ছাড়া কিছু নয়।'

وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ⑫

১৩. আর যখন তাদের একদল বলেছিল, 'হে ইয়াসরিববাসী[১]! (এখানে রাসূলের কাছে প্রতিরোধ করার) তোমাদের কোন স্থান নেই সুতরাং তোমরা (ঘরে) ফিরে যাও' এবং তাদের মধ্যে একদল নবীর কাছে অব্যাহতি প্রার্থনা করে বলছিল, 'আমাদের বাড়িঘর অরক্ষিত'; অথচ সেগুলো অরক্ষিত ছিল না, আসলে পালিয়ে যাওয়াই ছিল তাদের উদ্দেশ্য।

وَإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا ۚ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۖ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ⑬

কণ্ঠাগত হয়েছে, আমরা কি কিছু বলব? তিনি বললেন, হ্যাঁ, বল, اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِنَا وَآمِن رَوْعَاتِنَا 'হে আল্লাহ্‌! আমাদের গোপনীয়তা রক্ষা করা এবং আমাদেরকে ভীতি থেকে নিরাপত্তা দাও'। আবু সাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ফলে আল্লাহ্‌ শত্রুদের মুখে ঝঞ্ঝা বায়ূ প্রবাহিত করলেন, এভাবেই আল্লাহ্‌ তাদেরকে বাতাস দিয়ে পরাজিত করলেন। [মুসনাদে আহমাদ:৩/৩]

(১) ইয়াসরিববাসী বলে এখানে মদীনাবাসীদের বুঝানো হয়েছে। এটা মদীনার ইসলাম পূর্ব নাম ছিল। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটাকে পরিবর্তন করে মদীনা রাখেন। দেখুন, [কুরতুবী,মুয়াস্‌সার,ফাতহুল কাদীর] তিনি বলেন, 'আমাকে এমন এক জনপদের দিকে হিজরত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে যা সমস্ত জনপদকে গ্রাস করবে (করায়ত্ত্ব করবে) লোকেরা সেটাকে বলে ইয়াসরিব, প্রকৃতপক্ষে সেটা হলো মদীনা। সেখান থেকে খারাপ লোককে এমনভাবে নির্বাসিত করে যেমন কামারের হাঁপর লোহার ময়লা দূর করে।' [বুখারী: ১৮৭১, মুসলিম:১৩৮২]

وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ﴿١٤﴾

১৪. আর যদি বিভিন্ন দিক হতে তাদের বিরুদ্ধে শত্রুদের প্রবেশ ঘটত, তারপর তাদেরকে শির্ক করার জন্য প্ররোচিত করা হত, তবে অবশ্যই তারা সেটা করে বসত, তারা সেটা করতে সামান্যই বিলম্ব করত(১)।

وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ ۚ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا ﴿١٥﴾

১৫. অবশ্যই তারা পূর্বে আল্লাহ্‌র সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে, তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। আর আল্লাহ্‌র সাথে করা অঙ্গীকার সম্বন্ধে অবশ্যই জিজ্ঞেস করা হবে(২)।

قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٦﴾

১৬. বলুন, ‘তোমাদের কোন লাভই হবে না পালিয়ে বেড়ানো, যদি তোমরা মৃত্যু অথবা হত্যার ভয়ে পালিয়ে যাও, তবে সে ক্ষেত্রে তোমাদেরকে সামান্যই ভোগ করতে দেয়া হবে।’

قُلْ مَن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ۚ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٧﴾

১৭. বলুন, ‘কে তোমাদেরকে আল্লাহ্ থেকে বাধা দান করবে, যদি তিনি তোমাদের অমঙ্গল ইচ্ছে করেন অথবা তিনি তোমাদেরকে অনুগ্রহ করতে ইচ্ছে করেন?’ আর তারা আল্লাহ্

---

(১) আয়াতের আরেক অর্থ হলো, তারা এরপর সামান্যই মদীনাতে অবস্থান করতে সমর্থ হতো; কারণ তারা অচিরেই ধ্বংস হয়ে যেত। [বাগভী]

(২) অর্থাৎ ওহুদ যুদ্ধের সময় তারা যে দুর্বলতা দেখিয়েছিল তারপর লজ্জা ও অনুতাপ প্রকাশ করে তারা আল্লাহর কাছে অংগীকার করেছিল যে, এবার যদি পরীক্ষার কোন সুযোগ আসে তাহলে তারা নিজেদের এ ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করবে। কিন্তু আল্লাহকে নিছক কথা দিয়ে প্রতারণা করা যেতে পারে না। যে ব্যক্তিই তাঁর সাথে কোন অংগীকার করে তাঁর সামনে তিনি পরীক্ষার কোন না কোন সুযোগ এনে দেন। এর মাধ্যমে তার সত্য ও মিথ্যা যাচাই হয়ে যায়। তাই ওহুদ যুদ্ধের মাত্র দু'বছর পরেই তিনি তার চাইতেও বেশী বড় বিপদ সামনে নিয়ে এলেন এবং এভাবে তারা তাঁর সাথে কেমন ও কতটুকু সাচ্চা অংগীকার করেছিল তা যাচাই করে নিলেন। [দেখুন, মুয়াস্‌সার]

ছাড়া নিজেদের জন্য কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না ।

১৮. আল্লাহ্ অবশ্যই জানেন তোমাদের মধ্যে কারা বাধাদানকারী এবং কারা তাদের ভাইদেরকে বলে, 'আমাদের দিকে চলে এসো ।' তারা অল্পই যুদ্ধে যোগদান করে---

قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّقِيْنَ مِنْكُمْ وَالْقَآئِلِيْنَ لِاِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ اِلَيْنَا ۚ وَلَا يَأْتُوْنَ الْبَأْسَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿١٨﴾

১৯. তোমাদের ব্যাপারে কৃপণতাবশত[১] । অতঃপর যখন ভীতি আসে তখন আপনি দেখবেন, মৃত্যুভয়ে মূর্চ্ছাতুর ব্যক্তির মত চোখ উল্টিয়ে তারা আপনার দিকে তাকায় । কিন্তু যখন ভয় চলে যায় তখন তারা ধনের লালসায় তোমাদেরকে তীক্ষ্ণ ভাষায় বিদ্ধ করে[২] । তারা ঈমান আনেনি ফলে আল্লাহ্ তাদের কাজকর্ম নিষ্ফল করেছেন এবং এটা আল্লাহ্র পক্ষে সহজ ।

اَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۖ فَاِذَا جَآءَ الْخَوْفُ رَاَيْتَهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ تَدُوْرُ اَعْيُنُهُمْ كَالَّذِيْ يُغْشٰى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۚ فَاِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوْكُمْ بِاَلْسِنَةٍ حِدَادٍ اَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ ۗ اُولٰٓئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوْا فَاَحْبَطَ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ ۗ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿١٩﴾

২০. তারা মনে করে, সম্মিলিত বাহিনী চলে যায়নি । যদি সম্মিলিত বাহিনী

يَحْسَبُوْنَ الْاَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوْا ۚ وَاِنْ يَّأْتِ الْاَحْزَابُ

(১) তারা তোমাদের জন্য তাদের জান, মাল, শক্তি-সামর্থ ব্যয় করতে কৃপণতা করে । কারণ তারা তোমাদেরকে ভালবাসে না, তোমাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে । [মুয়াস্সার, ফাতহুল কাদীর; কুরতুবী, বাগভী]

(২) আভিধানিক দিক দিয়ে আয়াতটির দু'টি অর্থ হয় । এক, যুদ্ধের ময়দান থেকে সাফল্য লাভ করে যখন তোমরা ফিরে আসো তখন তারা বড়ই হৃদ্যতা সহকারে ও সাড়ম্বরে তোমাদেরকে স্বাগত জানায় এবং বড় বড় বুলি আউড়িয়ে এই বলে প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করে যে, আমরাও পাক্কা মুমিন এবং এ কাজ সম্প্রসারণে আমরাও অংশ নিয়েছি কাজেই আমরাও গনীমাতের মালের হকদার । দুই, বিজয় অর্জিত হলে গনীমাতের মাল ভাগ করার সময় তাদের কণ্ঠ বড়ই তীক্ষ্ণ ও ধারাল হয়ে যায় এবং তারা অগ্রবর্তী হয়ে দাবী করতে থাকে, আমাদের ভাগ দাও, আমরাও কাজ করেছি, সবকিছু তোমরাই লুটে নিয়ে যেয়ো না । [দেখুন, কুরতুবী]

يَوَدُّوْا لَوْ اَنَّهُمْ بَادُوْنَ فِى الْاَعْرَابِ يَسْاَلُوْنَ عَنْ اَنْۢبَاۤىِٕكُمْ ۗ وَلَوْ كَانُوْا فِيْكُمْ مَّا قٰتَلُوْٓا اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٢٠﴾

আবার এসে পড়ে, তখন তারা কামনা করবে যে, ভাল হত যদি ওরা যাযাবর মরুবাসীদের সাথে থেকে তোমাদের সংবাদ নিত! আর যদি তারা তোমাদের সঙ্গে অবস্থান করত তবে তারা খুব অল্পই যুদ্ধ করত।

তৃতীয় রুকূ'

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا ﴿٢١﴾

২১. অবশ্যই তোমাদের জন্য রয়েছে রাসূলুল্লাহ্‌র মধ্যে উত্তম আদর্শ(১), তার জন্য যে আশা রাখে আল্লাহ্ ও শেষ দিনের এবং আল্লাহ্‌কে বেশী স্মরণ করে।

وَلَمَّا رَاَ الْمُؤْمِنُوْنَ الْاَحْزَابَ ۙ قَالُوْا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ ۫ وَمَا زَادَهُمْ اِلَّآ اِيْمَانًا وَّتَسْلِيْمًا ﴿٢٢﴾

২২. আর মুমিনগণ যখন সম্মিলিত বাহিনীকে দেখল, তারা বলে উঠল, 'এটা তো তাই, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল যার প্রতিশ্রুতি আমাদেরকে দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সত্যই বলেছেন।' আর এতে তাদের ঈমান ও আনুগত্যই বৃদ্ধি পেল।

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا ﴿٢٣﴾

২৩. মুমিনদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ্‌র সাথে তাদের করা অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে, তাদের কেউ কেউ (অঙ্গীকার পূর্ণ করে) মারা গেছে(২) এবং কেউ

---

(১) এরপর অকপট ও খাঁটি মুসলিমগণের বর্ণনা প্রসঙ্গে এদের অসম দৃঢ়তার প্রশংসা করা হয়েছে। এরই প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অনুসরণ-অনুকরণের প্রয়োজনীয়তা ও অপরিহার্যতাকে মূলনীতিরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রাসূলের মধ্যে উত্তম অনুপম আদর্শ রয়েছে'। এদ্বারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীসমূহ ও কার্যাবলী উভয়ই অনুসরণের হুকুম রয়েছে বলে প্রমাণিত হয়। [দেখুন, মুয়াস্‌সার]

(২) এ আয়াতে উল্লেখিত ﴿قَضٰى نَحْبَهٗ﴾ এর তাফসীরে কয়েকটি মত এসেছে, এক. আল্লাহ্‌র

কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। তারা তাদের অঙ্গীকারে কোন পরিবর্তন করেনি;

لِّيَجْزِيَ اللّٰهُ الصّٰدِقِيْنَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ
الْمُنٰفِقِيْنَ اِنْ شَآءَ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ
كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٢٤﴾

২৪. যাতে আল্লাহ্ পুরস্কৃত করেন সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদীতার জন্য এবং শাস্তি দেন মুনাফিকদেরকে যদি তিনি চান অথবা তাদেরকে ক্ষমা করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوْا خَيْرًا ؕ
وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ
قَوِيًّا عَزِيْزًا ﴿٢٥﴾

২৫. আর আল্লাহ্ কাফিরদেরকে ক্রুদ্ধাবস্থায় ফিরিয়ে দিলেন, তারা কোন কল্যাণ লাভ করেনি। আর যুদ্ধে মুমিনদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট; এবং আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান, প্রবল পরাক্রমশালী।

وَاَنْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوْهُمْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ
صَيَاصِيْهِمْ وَقَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيْقًا
تَقْتُلُوْنَ وَتَاْسِرُوْنَ فَرِيْقًا ﴿٢٦﴾

২৬. আর কিতাবীদের[১] মধ্যে যারা তাদেরকে সাহায্য করেছিল, তাদেরকে তিনি তাদের দূর্গ হতে অবতরণ করালেন এবং তাদের অন্তরে ভীতি

সাথে কৃত তাদের মানত পূর্ণ করেছে এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় শহীদ হয়ে গেছে। দুই. আল্লাহ্‌র সাথে যে অঙ্গীকার তারা করেছে তারা তা পূর্ণ করা অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয়েছে। তারা এ অঙ্গীকারের ক্ষেত্রে কোন অন্যথা করেনি। তিন. তাদের মধ্যে কেউ কেউ মারা গেছে। এ আয়াতে সাহাবায়ে কিরামের প্রশংসা করা হয়েছে। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমার চাচা আনাস, যার নাম আমার নাম। তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। এটা তাকে পীড়া দিচ্ছিল। তিনি বলছিলেন যে, প্রথম যুদ্ধেই আমি রাসূলের সাথে থাকতে পারিনি। যদি আল্লাহ্ আমাকে এর পরবর্তী যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেয় তাহলে আল্লাহ্ দেখবেন আমি কি করি। তারপর তিনি রাসূলের সাথে ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন। যুদ্ধের ময়দানে সা'দ ইবনে মু'আজকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু আমর! কোথায়? তিনি জবাবে বললেন, আমি ওহুদের দিকে জান্নাতের সুগন্ধ পাচ্ছি। তারপর আনাস ইবনে নাদর রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রচণ্ডরকম যুদ্ধ করলেন এবং শহীদ হয়ে গেলেন। এমনকি তার গায়ে আশিটিরও বেশী আঘাত পরিলক্ষিত হয়েছিল। তার জন্যই এ আয়াত নাযিল হয়েছিল। [বুখারী: ৪৭৮৩]

(১) অর্থাৎ বনী কুরাইযার ইয়াহূদী সম্প্রদায়। [মুয়াস্‌সার]

সঞ্চার করলেন; তোমরা তাদের কিছু সংখ্যককে হত্যা করছ এবং কিছু সংখ্যককে করছ বন্দী[১]।

وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَـُٔوهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿٢٧﴾

২৭. আর তিনি তোমাদেরকে অধিকারী করলেন তাদের ভূমি, ঘরবাড়ী ও ধন-সম্পদের এবং এমন ভূমির যাতে তোমরা এখনো পদার্পণ করনি[২]। আর আল্লাহ্‌ সবকিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

চতুর্থ রুকূ'

يَـٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَوٰةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٢٨﴾

২৮. হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে বলুন, 'তোমরা যদি দুনিয়ার জীবন ও এর চাকচিক্য কামনা কর তবে আস, আমি তোমাদের ভোগ-সমগ্রীর ব্যবস্থা করে দেই এবং সৌজন্যের সাথে তোমাদেরকে বিদায় দেই[৩]।

(১) এখানে বনু-কুরাইযার ঘটনা বিবৃত হয়েছে। বলা হয়েছে, যে সকল আহলে কিতাব সম্মিলিত শত্রুবাহিনীর সহযোগিতা করেছে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের অন্তরে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের প্রতি ভীতি সঞ্চার করে তাদেরকে তাদের সুরক্ষিত দুর্গ থেকে নীচে নামিয়ে দেন এবং তাদের ধন-সম্পদ ও ঘর-বাড়ি মুসলিমগণের স্বত্বভুক্ত করে দেন। [দেখুন, মুয়াস্‌সার]

(২) এখানে মুসলিমদের অদূর ভবিষ্যতে জয়যাত্রার সুসংবাদ দান করা হয়েছে যে, এখন থেকে কাফেরদের অগ্রাভিযানের অবসান এবং মুসলিমদের বিজয় যুগের সূচনা হলো। আর এমন সব ভু-খণ্ড তাদের অধিকারভুক্ত হবে যেগুলোর উপর কখনো তাদের পদচারণা পর্যন্ত হয়নি। যার বাস্তবায়ন সাহাবায়ে কেরামের যুগে বিশ্বমানব প্রত্যক্ষ করেছে। পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যের এক বিশাল ও সুবিস্তীর্ণ অঞ্চল তাদের অধিকারভূক্ত হয়। আল্লাহ্‌ তা'আলা যা চান তাই করেন। [দেখুন, ইবন কাসীর]

(৩) উল্লেখিত আয়াতসমূহে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পুণ্যবতী স্ত্রীগণের প্রতি বিশেষ নির্দেশ রয়েছে যেন তাদের কোন কথা ও কাজের দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি কোন দুঃখ-যন্ত্রণা না পৌঁছে; সেদিকে যেন তারা যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করেন। [ফাতহুল কাদীর] আয়াতে রাসূলের স্ত্রীদেরকে তালাক

وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَإِنَّ اللّٰهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٢٩﴾

২৯. 'আর যদি তোমরা কামনা কর আল্লাহ্‌, তাঁর রাসূল ও আখিরাতের আবাস, তবে তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীলা আল্লাহ্‌ তাদের জন্য মহাপ্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন[১] ।'

গ্রহণের যে অধিকার প্রদানের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, এ সম্পর্কিত পুণ্যবতী স্ত্রীগণ কর্তৃক সংঘটিত এক বা একাধিক এমন ঘটনা রয়েছে, যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মর্জির পরিপন্থী ছিল, যদ্বারা রসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনিচ্ছাকৃতভাবেই দুঃখ পান । এসব ঘটনাবলীর মধ্যে একটি ঘটনা হচ্ছে, একদিন স্ত্রীগণ সমবেতভাবে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খেদমতে তাদের জীবিকা ও অন্যান্য খরচাদির পরিমান বৃদ্ধির দাবী পেশ করেন । [মুসলিম: ১৪৭৮]

(১) এ আয়াতে সকল পুণ্যবতী স্ত্রীগণকে অধিকার প্রদান করা হয়েছে যে, তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বর্তমান দারিদ্র্যপীড়িত চরম আর্থিক সঙ্কটপূর্ণ অবস্থা বরণ করে হয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক অক্ষুন্ন রেখে জীবন যাপন করবেন অথবা তালাকের মাধ্যমে তার থেকে মুক্ত হয়ে যাবেন । প্রথমাবস্থায় অন্যান্য স্ত্রীলোকের তুলনায় পুরস্কার এবং আখেরাতে স্বতন্ত্র ও সুউচ্চ মর্যাদাসমূহের অধিকারী হবেন । আর দ্বিতীয় অবস্থা, অর্থাৎ তালাক গ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতেও তাদেরকে দুনিয়ার অপরাপর লোকের ন্যায় বিশেষ জটিলতা ও অপ্রীতিকর অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে না; বরং সুন্নত মোতাবেক যুগল বস্ত্র প্রভৃতি প্রদান করে সসম্মানে বিদায় দেয়া হবে । ইসলামী পরিভাষায় একে বলা হয় "তাখঈর" । অর্থাৎ স্ত্রীকে তার স্বামীর সাথে থাকার বা আলাদা হয়ে যাবার মধ্য থেকে যে কোন একটিকে বাছাই করে নেবার ফায়সালা করার ইখতিয়ার দান করা । [ফাতহুল কাদীর;বাগাওয়ী] হাদীসে এসেছে, উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন অধিকার প্রদানের এ আয়াত নাযিল হয়, তখন রসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে এটি প্রকাশ ও প্রচারের সূচনা করেন । আয়াত শোনানোর পূর্বে বলেন যে, আমি তোমাকে একটি কথা বলব-উত্তরটা কিন্তু তাড়াহুড়া করে দেবে না । বরং তোমার পিতা-মাতার সাথে পরামর্শের পর দেবে । আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলেন, আমাকে আমার পিতা-মাতার সাথে পরামর্শ না করে মতামত প্রকাশ করা থেকে যে বারণ করেছিলেন, তা ছিল আমার প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক অপার অনুগ্রহ । কেননা, তার অটুট বিশ্বাস ছিল যে, আমার পিতা-মাতা কখনো আমাকে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বনের পরামর্শ দেবেন না । এ আয়াত শোনার সঙ্গে সঙ্গেই আমি আরয করলাম যে, এ ব্যাপারে আমার পিতা-মাতার পরামর্শ গ্রহণের জন্য যেতে পারি কি? আমি তো আল্লাহ্‌ তা'আলা, তাঁর রাসূল

৩০. হে নবী-পত্নিগণ! যে কাজ স্পষ্টত ‘ফাহেশা’, তোমাদের মধ্যে কেউ তা করলে তার জন্য বাড়িয়ে দেয়া হবে শাস্তি --- দ্বিগুণ এবং এটা আল্লাহ্‌র জন্য সহজ ।

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ مَنْ يَّأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُّضٰعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ۚ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿٣٠﴾

৩১. আর তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের প্রতি অনুগত হবে এবং সৎকাজ করবে তাকে আমরা পুরস্কার দেব দু’বার। আর তার জন্য আমরা প্রস্তুত রেখেছি সম্মানজনক রিযিক ।

وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَآ اَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ۙ وَاَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيْمًا ﴿٣١﴾

৩২. হে নবী-পত্নিগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও; যদি তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর সুতরাং পর-পুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলো না, কারণ এতে যার অন্তরে ব্যাধি আছে, সে প্রলুব্ধ হয় এবং তোমরা ন্যায়সংগত কথা বলবে ।

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۚ ﴿٣٢﴾

৩৩. আর তোমরা নিজ ঘরে অবস্থান করবে(১)

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ

ও আখেরাতকে বরণ করে নিচ্ছি। আমার পরে অন্যান্য সকল পুণ্যবতী স্ত্রীগণকে কুরআনের এ নির্দেশ শোনানো হলো। আমার মত সবাই একই মত ব্যক্ত করলেন; রসুলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে দাম্পত্য সম্পর্কের মোকাবেলায় ইহলৌকিক প্রাচুর্য ও স্বাচ্ছন্দ্যকে কেউ গ্রহণ করলেন না। [মুসলিম: ১৪৭৫]

(১) আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়,নারীর আসল অবস্থানক্ষেত্র হচ্ছে তার গৃহ। কেবলমাত্র প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সে গৃহের বাইরে বের হতে পারে। [ইবন কাসীর,মুয়াস্‌সার] আয়াতের শব্দাবলী থেকেও এ অর্থ প্রকাশ হচ্ছে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস একে আরো বেশী সুস্পষ্ট করে দেয়। মুজাহিদ তো তখনই স্থিরচিত্তে আল্লাহর পথে লড়াই করতে পারবে যখন নিজের ঘরের দিক থেকে সে পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকতে পারবে, তার স্ত্রী তার গৃহস্থালী ও সন্তানদেরকে আগলে রাখবে এবং তার অবর্তমানে তার স্ত্রী কোন অঘটন ঘটাবে না, এ ব্যাপারে সে পুরোপুরি আশংকামুক্ত

الْأُوْلَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ الزَّكَوٰةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

এবং প্রাচীন জাহেলী যুগের প্রদর্শনীর মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না। আর তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের অনুগত থাক[১]। হে নবী-পরিবার[২]! আল্লাহ্‌ তো শুধু চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে।

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِى بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَٰتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿٣٤﴾

৩৪. আর আল্লাহ্‌র আয়াত ও হিকমত থেকে যা তোমাদের ঘরে পাঠ করা হয়, তা তোমরা স্মরণ রাখবে[৩];

থাকবে। যে স্ত্রী তার স্বামীকে এ নিশ্চিন্ততা দান করবে সে ঘরে বসেও তার জিহাদে পুরোপুরি অংশীদার হবে। অন্য একটি হাদীসে এসেছে, "নারী পর্দাবৃত থাকার জিনিস। যখন সে বের হয় শয়তান তার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে এবং তখনই সে আল্লাহর রহমতের নিকটতর হয় যখন সে নিজের গৃহে অবস্থান করে।" [সহীহ ইবন খুযাইমাহ: ১৬৮৫, সহীহ ইবন হিব্বান: ৫৫৯৯]

(১) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর স্ত্রীগণের প্রতি কুরআনের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম হেদায়েত হলো, সালাত প্রতিষ্ঠা কর, যাকাত প্রদান কর এবং মহান আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ কর। [ইবন কাসীর]

(২) এ আয়াতে আহলে বাইত বা নবী পরিবার বলতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদেরকে বুঝানো হয়েছে। [ইবন কাসীর,কুরতুবী,বাগভী]

(৩) মূলে وَاذْكُرْنَ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এর দু'টি অর্থ: "স্মরণ রেখো" এবং "বর্ণনা করো।" প্রথম অর্থের দৃষ্টিতে এর তাৎপর্য এই দাঁড়ায়: হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমরা কখনো ভুলে যেয়ো না যে, যেখান থেকে সারা দুনিয়াকে আল্লাহর আয়াত, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার শিক্ষা দেয়া হয় সেটিই তোমাদের আসল গৃহ। তাই তোমাদের দায়িত্ব বড়ই কঠিন। তোমাদের গৃহে যেসব বিষয় আলোচনা হয় সেসব বিষয় স্বয়ং স্মরণ রেখো –যার ফলশ্রুতি ও পরিচয় হলো এগুলোর উপর আমল করা। দ্বিতীয় অর্থটির দৃষ্টিতে এর তাৎপর্য হয়: হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমরা যা কিছু শোনো এবং দেখো তা লোকদের সামনে বর্ণনা করতে থাকো। কারণ রাসূলের সাথে সার্বক্ষণিক অবস্থানের কারণে এমন অনেক বিধান তোমাদের গোচরীভূত হবে যা তোমাদের ছাড়া অন্য কোন মাধ্যমে লোকদের জানা সম্ভব হবে না। রাসুলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে যেসব শিক্ষা প্রদান করেছেন, উম্মতের অন্যান্য লোকদের সঙ্গে সেসবের

নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবহিত।

পঞ্চম রুকূ'

৩৫. নিশ্চয় মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী, মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, সওম পালনকারী পুরুষ ও সওম পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হিফাজতকারী পুরুষ ও যৌনাঙ্গ হিফাজতকারী নারী, আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণকারী নারী--- তাদের জন্য আল্লাহ্ রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান।

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَٰتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَٰتِ وَالْقَٰنِتِينَ وَالْقَٰنِتَٰتِ وَالصَّٰدِقِينَ وَالصَّٰدِقَٰتِ وَالصَّٰبِرِينَ وَالصَّٰبِرَٰتِ وَالْخَٰشِعِينَ وَالْخَٰشِعَٰتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَٰتِ وَالصَّٰٓئِمِينَ وَالصَّٰٓئِمَٰتِ وَالْحَٰفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَٰفِظَٰتِ وَالذَّٰكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّٰكِرَٰتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾

৩৬. আর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ের ফয়সালা দিলে কোন মুমিন পুরুষ কিংবা মুমিন নারীর জন্য সে বিষয়ে তাদের কোন (ভিন্ন সিদ্ধান্তের) ইখতিয়ার সংগত নয়। আর যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করল

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾

আলোচনা করা এবং তাদেরকে সেগুলো পৌঁছে দেয়া তাদের দায়িত্ব।
এ আয়াতে দু'টি জিনিসের কথা বলা হয়েছে। এক, আল্লাহর আয়াত, দুই, হিকমাত বা জ্ঞান ও প্রজ্ঞা। আল্লাহর আয়াত অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর কিতাবের আয়াত। কিন্তু হিকমাত শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবোধক। সকল প্রকার জ্ঞানের কথা এর অন্তরভুক্ত, যেগুলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদেরকে শেখাতেন। আল্লাহর কিতাবের শিক্ষার ওপরও এ শব্দটি প্রযোজ্য হতে পারে। কিন্তু কেবলমাত্র তার মধ্যেই একে সীমিত করে দেবার সপক্ষে কোন প্রমাণ নেই। কুরআনের আয়াত শুনানো ছাড়াও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের পবিত্র জীবন ও নৈতিক চরিত্র এবং নিজের কথার মাধ্যমে যে হিকমাতের শিক্ষা দিতেন তাও অপরিহার্যভাবে এর অন্তর্ভুক্ত। [দেখুন: তাবারী, ফাতহুল কাদীর; কুরতুবী]

সে স্পষ্টভাবে পথভ্রষ্ট হলো(১) ।

---

(১) আলোচ্য আয়াতে কয়েকটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে । তন্মধ্যে এক ঘটনা হচ্ছে, যায়েদ ইবন হারেসা রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিয়ে সংক্রান্ত ঘটনা । ঘটনার সংক্ষিপ্ত রূপ এই যে, যায়েদ ইবন হারেসা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু একজন স্বাধীন লোক ছিলেন । কিন্তু জাহেলী যুগে কিছু লোক তাকে অল্প বয়সে ধরে এনে ওকায বাজারে বিক্রি করে দেয়, খাদিজা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা সে লোক থেকে তাকে খরীদ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দান করেন । আর আরব দেশের প্রথানুযায়ী তাকে পোষ্য-পুত্রের গৌরবে ভুষিত করে লালন-পালন করেন । মক্কাতে তাকে 'মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামপুত্র যায়েদ' নামে সম্বোধন করা হত । কুরআনে কারীম এটাকে অজ্ঞতার যুগের ভ্রান্ত রীতি আখ্যায়িত করে তা নিষিদ্ধ করে দেয় এবং পোষ্যপুত্রকে তার প্রকৃত পিতার সাথে সম্পর্কযুক্ত করতে নির্দেশ দেয় । যায়েদ ইবন হারেসা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু যৌবনে পদার্পনের পর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ ফুফাত বোন যয়নব বিনতে জাহ্‌শকে তার নিকট বিয়ে দেয়ার প্রস্তাব পাঠান । যায়েদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু যেহেতু মুক্তিপ্রাপ্ত দাস ছিলেন সুতরাং যয়নব ও তার ভ্রাতা আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহশ এ সম্বন্ধ স্থাপনে এই বলে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন যে, আমরা বংশ মর্যাদায় তার চাইতে শ্রেষ্ঠ ও উন্নত । মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন: এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাযিল হয় । যাতে এ দিকনির্দেশনা রয়েছে যে, যদি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কারো প্রতি বাধ্যতামূলকভাবে কোন কাজের নির্দেশ দান করেন, তবে সে কাজ করা ওয়াজিব হয়ে যায় । শরী'য়তানুযায়ী তা না করার অধিকার থাকে না । শরী'য়তে একাজ যে লোক পালন করবে না, আয়াতের শেষে একে স্পষ্ট গোমরাহ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে । যয়নব ও তার ভাই এ আয়াত শুনে তাদের অসম্মতি প্রত্যাহার করে নিয়ে বিয়েতে রাযী হয়ে যায় । অত:পর বিয়ে অনুষ্ঠিত হয় । [বাগাওয়ী]

এ আয়াত সম্পর্কে দ্বিতীয় যে ঘটনাটি বর্ণনা করা হয় তা হলো, জুলাইবীব রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর ঘটনা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জন্য কোন এক আনসার সাহাবীর মেয়ের সাথে বৈবাহিক সম্বদ্ধ স্থাপন করতে ইচ্ছুক ছিলেন । এই আনসার ও তার পরিবার-পরিজন এ সম্বন্ধ স্থাপনে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন । কিন্তু এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর সবাই রাযী হয়ে যান এবং যথারীতি বিয়েও সম্পন্ন হয়ে যায় । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের জন্য পর্যাপ্ত জীবিকা কামনা করে দো'আ করলেন । সাহাবায়ে কেরাম বলেন যে, তার গৃহে এত বরকত ও ধন-সম্পদের এত আধিক্য ছিল যে, মদীনার গৃহসমূহের মধ্যে এ বাড়ীটিই ছিল সর্বাধিক উন্নত ও প্রাচুর্যের অধিকারী এবং এর খরচের অঙ্কই ছিল সবচাইতে বেশী । পরবর্তীকালে জুলাইবীব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এক জিহাদে শাহাদত বরণ করেন । রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দাফন-কাফন নিজ হাতে সম্পন্ন করেন । [দেখুন, ইবন কাসীর]

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِىٓ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَٱتَّقِ ٱللَّهَ وَتُخْفِى فِى نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰهُ ۖ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَٰكَهَا لِكَىْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِىٓ أَزْوَٰجِ أَدْعِيَآئِهِمْ إِذَا قَضَوْا۟ مِنْهُنَّ وَطَرًا ۚ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾

৩৭. আর স্মরণ করুন, আল্লাহ্ যাকে অনুগ্রহ করেছেন এবং আপনিও যার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, আপনি তাকে বলছিলেন, 'তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখ এবং আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর(১)।' আর আপনি আপনার অন্তরে গোপন করছিলেন এমন কিছু যা আল্লাহ্ প্রকাশ করে দিচ্ছেন(২); এবং আপনি লোকদেরকে ভয় করছিলেন, অথচ আল্লাহ্‌কেই ভয় করা আপনার পক্ষে অধিকতর সংগত। তারপর যখন যায়েদ তার (স্ত্রীর) সাথে প্রয়োজন শেষ করল(৩), তখন আমরা তাকে আপনার নিকট বিয়ে দিলাম(৪), যাতে

---

(১) অর্থাৎ "স্মরণ করুন যখন আল্লাহ্ ও আপনি নিজে যার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তাকে বলছিলেন যে, তুমি নিজের স্ত্রীকে তোমার বিবাহাধীনে থাকতে দাও।" এ ব্যক্তি হলো যায়েদ। আল্লাহ্ তাকে ইসলামে দীক্ষিত করে তার প্রতি প্রথম অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। যায়েদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু যয়নব রাদিয়াল্লাহু 'আনহার সম্পর্কে ভাষাগত শ্রেষ্ঠত্ব, গোত্রগত কৌলিন্যভিমান এবং আনুগত্য ও শৈথিল্য প্রদর্শনের অভিযোগ উত্থাপন করতেন। একদিন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খেদমতে এসব অভিযোগ পেশ করতে গিয়ে যয়নবকে তালাক দেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন: 'নিজ স্ত্রীকে তোমার বিবাহধীনে থাকতে দাও এবং আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর।' [দেখুন, বাগভী; ফাতহুল কাদীর; তাবারী]

(২) এর ব্যাখ্যা এই যে, আপনি অন্তরে যে বিষয় গোপন রেখেছেন তা এ বাসনা যে, যায়েদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু যয়নবকে তালাক দিলে পরে আপনি তাকে বিয়ে করবেন। [ফাতহুল কাদীর; বাগভী]

(৩) অর্থাৎ যায়েদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু যখন নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিলেন এবং তার ইদ্দত পুরা হয়ে গেলো। "প্রয়োজন পূর্ণ করলো" শব্দগুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে একথাই প্রকাশ করে যে, তার কাছে যায়েদের আর কোন প্রয়োজন থাকলো না। [মুয়াস্‌সার; ফাতহুল কাদীর]

(৪) অর্থাৎ আপনার সাথে তার বিয়ে স্বয়ং আমরা সম্পন্ন করে দিয়েছি। এর ফলে একথা

মুমিনদের পোষ্য পুত্রদের স্ত্রীদেরকে (স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে) কোন সমস্যা না হয় যখন তারা (পোষ্য পুত্ররা) নিজ স্ত্রীর সাথে প্রয়োজন শেষ করবে (এবং তালাক দিবে)। আর আল্লাহ্‌র আদেশ কার্যকর হয়েই থাকে।

৩৮. নবীর জন্য সেটা (করতে) কোন সমস্যা নেই যা আল্লাহ্ বিধিসম্মত করেছেন তার জন্য। আগে যারা চলে গেছে তাদের ক্ষেত্রেও এটাই ছিল আল্লাহ্‌র বিধান[১]। আর আল্লাহ্‌র ফয়সালা সুনির্ধারিত, অবশ্যম্ভাবী।

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ ۖ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ﴿٣٨﴾

৩৯. তারা আল্লাহ্‌র বাণী প্রচার করত, আর তাঁকে ভয় করত এবং আল্লাহ্‌কে ছাড়া অন্য কাউকেও ভয় করত না[২]। আর হিসাব গ্রহণকারীরূপে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٣٩﴾

বোঝা যায় যে, এ বিয়ে স্বয়ং আল্লাহ্ নিজেই সম্পন্ন করে দেয়ার মাধ্যমে বিয়ে–শাদীর সাধারণভাবে প্রচলিত শর্তাবলীর ব্যতিক্রম ঘটিয়ে এ বিয়ের প্রতি বিশেষ মর্যাদা আরোপ করেছেন। [তাবারী; বাগভী]

(১) এ আয়াতের মাধ্যমে এ বিয়ের পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত সন্দেহসমূহের উত্তরের সূচনা এরূপভাবে করা হয়েছে যে, অন্যান্য পুণ্যবতী স্ত্রীগণ থাকা সত্ত্বেও এ বিয়ের পেছনে কি উদ্দেশ্য নিহিত ছিল ? এরশাদ হয়েছে যে, এটা আল্লাহ্ তা'আলার চিরন্তন বিধান যা কেবল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্য নির্দিষ্ট নয়; আপনার পূর্ববর্তী নবীগণের কালেই দ্বীনি স্বার্থ ও মঙ্গলামঙ্গলের কথা বিবেচনা করে বহু সংখ্যক স্ত্রীলোককে বিয়ে করার অনুমতি ছিল। যন্মধ্যে দাউদ ও সুলায়মান আলাইহিস সালাম-এর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। [বাগভী]

(২) নবী আলাইহিমুস সালামগণের যে অপর এক গুণ বৈশিষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে তা এই যে, এসব মহাত্মাবৃন্দ আল্লাহ্‌কে ভয় করেন এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করেন না। [মুয়াস্‌সার, ফাতহুল কাদীর]

ﻣَﺎ ﻛَﺎﻥَ ﻣُﺤَﻤَّﺪٌ ﺃَﺑَﺎٓ ﺃَﺣَﺪٍ ﻣِّﻦ ﺭِّﺟَﺎﻟِﻜُﻢْ ﻭَﻟَٰﻜِﻦ ﺭَّﺳُﻮﻝَ ﭐﻟﻠَّﻪِ ﻭَﺧَﺎﺗَﻢَ ﭐﻟﻨَّﺒِﻴِّـۧﻦَ ۗ ﻭَﻛَﺎﻥَ ﭐﻟﻠَّﻪُ ﺑِﻜُﻞِّ ﺷَﻰْﺀٍ ﻋَﻠِﻴﻤًﺎ ﴿٤٠﴾

৪০. মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নন[১]; বরং তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল এবং শেষ নবী । আর আল্লাহ্‌ সর্ববিছু সম্পর্কে সর্বজ্ঞ ।

ষষ্ঠ রুকূ'

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿٤١﴾

৪১. হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণ কর,

وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٤٢﴾

৪২. এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর ।

هُوَ ٱلَّذِى يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَٰٓئِكَتُهُۥ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۚ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿٤٣﴾

৪৩. তিনিই, যিনি তোমাদের প্রশংসা করেন[২] এবং দো'আ ও ক্ষমা চান তোমাদের জন্য তাঁর ফিরিশ্‌তাগণ; যেন তিনি তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আনেন আলোর দিকে । আর তিনি মুমিনদের প্রতি পরম দয়ালু ।

---

(১) উল্লেখিত আয়াতে সেসব লোকের ধারণা অপনোদন করা হয়েছে যারা বর্বর যুগের প্রথা অনুযায়ী যায়েদ বিন হারেসাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সন্তান বলে মনে করতো এবং তিনি যয়নবকে তালাক দেয়ার পর নবীসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে তার বিয়ে সংঘটিত হওয়ায় তার প্রতি পুত্রবধুকে বিয়ে করেছেন বলে কটাক্ষ করত । এ ভ্রান্ত ধারণা অপনোদনের জন্য এটুকু বলাই যথেষ্ট ছিল যে, যায়েদের পিতা রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নন বরং তার পিতা হারেসা । কিন্তু এ বিষয়টির প্রতি বিশেষ তাকীদ দেয়াচ্ছলে ঘোষণা করা হয়েছে যে, 'মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যকার কোন পুরুষের পিতা নন' । যে ব্যক্তি সন্তান–সন্ততিদের মধ্যে কোন পুরুষ নেই, তার প্রতি এরূপ কটাক্ষ করা কিভাবে যুক্তিসংগত হতে পারে যে, তার পুত্র রয়েছে এবং তার পরিত্যক্ত স্ত্রী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পুত্রবধূ বলে তার জন্য হারাম হবে । রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর স্ত্রী খাদিজার গর্ভস্থ তিন পুত্র-সন্তান কাসেম, তাইয়্যেব ও তাহের এবং মারিয়ার গর্ভস্থ এক সন্তান ইব্রাহীম–মোট চার পুত্র–সন্তান ছিলেন । কিন্তু এরা সবাই শৈশবাবস্থায় মারা যান । [দেখুন, কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর; বাগভী]

(২) 'সালাত' শব্দটি যখন আল্লাহর ক্ষেত্রে বান্দাদের জন্য ব্যবহার করা হয় তখন এর অর্থ হয় রহমত, অনুগ্রহ । আর যখন এটি ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে মানুষের জন্য ব্যবহৃত হয় তখন এর অর্থ হয় দো'আ, ইসতিগফার । [ফাতহুল কাদীর]

৪৪. যেদিন তারা আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাত করবে, সেদিন তাদের অভিবাদন হবে 'সালাম'[১]। আর তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন সম্মানজনক প্রতিদান।

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ﴿٤٤﴾

৪৫. হে নবী! অবশ্যই আমরা আপনাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে[২];

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٤٥﴾

৪৬. এবং আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারী[৩] ও উজ্জ্বল প্রদীপরূপে[৪]।

وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﴿٤٦﴾

---

(১) আয়াতে বলা হয়েছেঃ "তার সাথে মোলাকাতের সময় সেদিন তাদের অভ্যর্থনা হবে সালাম"। অর্থাৎ যেদিন আল্লাহ্ তা'আলার সাথে এদের সাক্ষাত ঘটবে–তখন তাঁর পক্ষ থেকে এদেরকে সালাম বা আস্‌সালামু আলাইকুমের মাধ্যমে সম্ভাষণ জানানো হবে। এখন প্রশ্ন হলো, এ সালাম কখন দেয়া হবে? এর উত্তরে বিভিন্ন সম্ভাবনা উল্লেখ করা হয়েছে। অধিকাংশের মতে, এখানে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সালাম দেয়ার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং এ সালাম মুমিনগণের প্রতি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হয় বা হবে। ইমাম রাগেব প্রমূখের মতে, আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাতের দিন হলো আখেরাতের দিন। আবার কোন কোন তাফসীরকারকের মতে এ সাক্ষাতের সময় হলো জান্নাতে প্রবেশকাল যেখানে তাদের প্রতি আল্লাহ্ ও ফেরেশতাগণের পক্ষ থেকে সালাম পৌঁছানো হবে। আবার কোন কোন মুফাস্‌সির মৃত্যু দিবসকে আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাতের দিন বলে মন্তব্য করেছেন। সেদিন সমগ্র বিশ্বের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে আল্লাহ্ সমীপে উপস্থিত হওয়ার দিন। আবার কোন কোন মুফাসসিরের মতে, এ সালাম মুমিনগণ পরস্পর পরস্পরকে প্রদান করবে। [দেখুন, ইবন কাসীর,ফাতহুল কাদীর]

(২) 'মুবাশ্‌শির' এর মর্মার্থ এই যে, তিনি স্বীয় উম্মতের মধ্য থেকে সৎ ও শরীয়তানুসারী ব্যক্তিবর্গকে জান্নাতের সুসংবাদ দেন এবং 'নাযির' অর্থাৎ, তিনি অবাধ্য ও নীতিচ্যুত ব্যক্তিবর্গকে আযাব ও শাস্তির ভয়ও প্রদর্শন করেন। [তাবারী, বাগভী]

(৩) ﴿وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ﴾ এর অর্থ তিনি উম্মতকে আল্লাহ্‌র সত্তা ও অস্তিত্ব এবং তাঁর আনুগত্যের প্রতি আহ্বানকারী। আয়াতে بِإِذْنِهِ শব্দ এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করায় বোঝা যায় যে, তিনি মানবমণ্ডলীকে আল্লাহ্‌র দিকে তাঁর অনুমতি সাপেক্ষেই আহ্বান করেন। [কুরতুবী, সা'দী, বাগভী]

(৪) আয়াতে ﴿وَسِرَاجًا مُنِيرًا﴾ এর মর্মার্থ 'পবিত্র কুরআন' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। [ইবন কাসীর; কুরতুবী]

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَضْلًا كَبِيْرًا ﴿٤٧﴾

৪৭. আর আপনি মুমিনদেরকে সুসংবাদ দিন যে, তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে মহাঅনুগ্রহ।

وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَدَعْ اَذٰىهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿٤٨﴾

৪৮. আর আপনি কাফির ও মুনাফিকদের আনুগত্য করবেন না, তাদের নির্যাতন উপেক্ষা করুন এবং নির্ভর করুন আল্লাহ্‌র উপর এবং কর্মবিধায়করূপে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا ۚ فَمَتِّعُوْهُنَّ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ﴿٤٩﴾

৪৯. হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা মুমিন নারীদেরকে বিয়ে করবে, তারপর তাদেরকে স্পর্শ করার আগে তালাক দিবে, তখন তোমাদের জন্য তাদের পালনীয় কোন 'ইদ্দত নেই যা তোমরা গুণবে। সুতরাং তোমরা তাদেরকে কিছু সামগ্রী দেবে এবং সৌজন্যের সাথে তাদেরকে বিদায় করবে।

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّاۤ اَحْلَلْنَا لَكَ اَزْوَاجَكَ الّٰتِيْۤ اٰتَيْتَ اُجُوْرَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ مِمَّاۤ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَبَنٰتِ عَمِّكَ وَبَنٰتِ عَمّٰتِكَ وَبَنٰتِ خَالِكَ وَبَنٰتِ خٰلٰتِكَ الّٰتِيْ هَاجَرْنَ مَعَكَ ۫ وَامْرَاَةً مُّؤْمِنَةً اِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ اِنْ اَرَادَ النَّبِيُّ اَنْ يَّسْتَنْكِحَهَا ۚ خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْۤ اَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُوْنَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٥٠﴾

৫০. হে নবী! আমরা আপনার জন্য বৈধ করেছি আপনার স্ত্রীগণকে, যাদের মাহ্‌র আপনি দিয়েছেন এবং বৈধ করেছি ফায় হিসেবে আল্লাহ্ আপনাকে যা দান করেছেন তাদের মধ্য থেকে যারা আপনার মালিকানাধীন হয়েছে তাদেরকে। আর বিয়ের জন্য বৈধ করেছি আপনার চাচার কন্যা ও ফুফুর কন্যাকে, মামার কন্যা ও খালার কন্যাকে, যারা আপনার সঙ্গে হিজরত করেছে এবং এমন মুমিন নারীকে (বৈধ করেছি) যে নবীর জন্যে নিজেকে সমর্পণ করে, যদি নবী তাকে বিয়ে করতে চায়--- এটা বিশেষ করে

আপনার জন্য, অন্য মুমিনদের জন্য নয়; যাতে আপনার কোন অসুবিধা না হয়। আমরা অবশ্যই জানি মুমিনদের স্ত্রী এবং তাদের মালিকানাধীন দাসীগণ সম্বন্ধে তাদের উপর যা নির্ধারিত করেছি[১]। আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৫১. আপনি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছে আপনার কাছ থেকে দূরে রাখতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছে আপনার কাছে স্থান দিতে পারেন[২]। আর আপনি যাকে দূরে রেখেছেন তাকে কামনা করলে আপনার কোন অপরাধ নেই[৩]। এ বিধান এ জন্যে যে, এটা তাদের চোখ জুড়ানোর অধিক নিকটবর্তী এবং তারা দুঃখ পাবে না আর তাদেরকে আপনি যা দেবেন তাতে তাদের প্রত্যেকেই

تُرْجِي مَن تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُـْٔوِيٓ إِلَيْكَ مَن تَشَآءُ ۖ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَآ ءَاتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ﴿٥١﴾

(১) কাতাদাহ বলেন, আল্লাহ্ তাদের উপর যা ফরয করেছেন তার অন্যতম হচ্ছে, কোন মহিলাকে অভিভাবক ও মাহ্‌র ব্যতীত বিয়ে করবে না। আর থাকতে হবে দু'জন গ্রহণযোগ্য সাক্ষ্য, আর তাদের জন্য চার জন নারীর অধিক বিয়ে করা জায়েয নয়, তবে যদি ক্রীতদাসী হয় সেটা ভিন্ন কথা। [তাবারী]

(২) আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, যে সমস্ত নারীরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজেদেরকে দান করত এবং বিয়ে করত, আমি তাদের প্রতি ঈর্ষাণ্বিত হতাম। আমি বলতাম, একজন মহিলা কি করে নিজেকে দান করতে পারে? কিন্তু যখন এ আয়াত নাযিল হল, তখন আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, আমি দেখছি আপনার রব আপনার ইচ্ছা অনুসারেই তা করেছেন। [বুখারী: ৫১১৩; মুসলিম: ১৪৬৪]

(৩) মুজাহিদ ও কাতাদাহ বলেন, এর অর্থ আপনার স্ত্রীদের কাউকে যদি তালাক ব্যতীতই আপনি দূরে রাখতে চান, অথবা যাদেরকে দূরে রেখেছেন তাদের কাউকে কাছে রাখতে চান, তবে সেটা আপনি করতে পারেন। এতে কোন অপরাধ নেই। [তাবারী; আত-তাফসীরুস সহীহ]

খুশী থাকবে[১]। আর তোমাদের অন্তরে যা আছে আল্লাহ্ তা জানেন এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সহনশীল।

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَآءُ مِنۢ بَعۡدُ وَلَآ اَنۡ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنۡ اَزۡوَاجٍ وَّلَوۡ اَعۡجَبَكَ حُسۡنُهُنَّ اِلَّا مَا مَلَكَتۡ يَمِيۡنُكَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىۡءٍ رَّقِيۡبًا ﴿٥٢﴾

৫২. এরপর আপনার জন্য কোন নারী বৈধ নয় এবং আপনার স্ত্রীদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণও বৈধ নয়, যদিও তাদের সৌন্দর্য আপনাকে মুগ্ধ করে[২]; তবে আপনার অধিকারভুক্ত দাসীদের ব্যাপার ভিন্ন। আর আল্লাহ্ সবকিছুর উপর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণকারী।

সপ্তম রুকূ'

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَا تَدۡخُلُوۡا بُيُوۡتَ النَّبِىِّ اِلَّاۤ اَنۡ يُّؤۡذَنَ لَكُمۡ اِلٰى طَعَامٍ غَيۡرَ نٰظِرِيۡنَ اِنٰٮهُ وَلٰكِنۡ اِذَا دُعِيۡتُمۡ فَادۡخُلُوۡا فَاِذَا طَعِمۡتُمۡ فَانۡتَشِرُوۡا وَلَا مُسۡتَاۡنِسِيۡنَ لِحَدِيۡثٍ ؕ اِنَّ ذٰلِكُمۡ كَانَ يُؤۡذِى النَّبِىَّ فَيَسۡتَحۡىٖ مِنۡكُمۡ وَاللّٰهُ لَا يَسۡتَحۡىٖ مِنَ الۡحَـقِّ ؕ وَاِذَا سَاَلۡتُمُوۡهُنَّ

৫৩. হে ঈমানদারগণ! তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া না হলে তোমরা খাবার-দাবার তৈরীর জন্য অপেক্ষা না করে খাওয়ার জন্য নবীর ঘরে প্রবেশ করো না। তবে তোমাদেরকে ডাকা হলে তোমরা প্রবেশ করো তারপর খাওয়া শেষে তোমরা চলে যেও; তোমরা

(১) অর্থাৎ কাতাদাহ বলেন, তারা যখন জানতে পারবে যে, এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে রাসূলের জন্য বিশেষ ছাড়, তখন তাদের অন্তরের পেরেশানী ও দুঃখ কমে যাবে এবং তাদের অন্তর পবিত্র হয়ে যাবে। [তাবারী]

(২) ইবন আব্বাস, মুজাহিদ, দাহহাক, কাতাদাহ সহ অনেক আলেমের নিকট এ আয়াতটি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের পুরস্কারস্বরূপ নাযিল হয়েছিল। তারা যখন দুনিয়ার সামগ্রীর উপর আখেরাতকে প্রাধান্য দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কষ্টকর জীবন বেছে নিয়েছিলেন, তখন আল্লাহ্ তাদেরকে এ আয়াত নাযিল করে তাদের অন্তরে খুশীর প্রবেশ ঘটালেন। [ইবন কাসীর] তবে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর আগেই আল্লাহ্ তার জন্য বিয়ে করা হালাল করে দিয়েছেন। এ হিসেবে এ আয়াতটি পূর্বের ৫১ নং আয়াত দ্বারা রহিত। এটি মৃত্যু জনিত ইদ্দতের আয়াতের মতই হবে, যেখানে তেলাওয়াতের দিক থেকে আগে হলেও সেটি পরবর্তী আয়াতকে রহিত করেছে। [ইবন কাসীর]

مَتَاعًا فَسْـَٔلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۚ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿٥٣﴾

কথাবার্তায় মশগুল হয়ে পড়ো না। নিশ্চয় তোমাদের এ আচরণ নবীকে কষ্ট দেয়, কারণ তিনি তোমাদের ব্যাপারে (উঠিয়ে দিতে) সংকোচ বোধ করেন। কিন্তু আল্লাহ্ সত্য বলতে সংকোচ বোধ করেন না[১]। তোমরা তার পত্নীদের কাছ থেকে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এ বিধান তোমাদের ও তাদের হৃদয়ের জন্য বেশী পবিত্র[২]। আর তোমাদের কারো পক্ষে আল্লাহ্‌র রাসূলকে কষ্ট দেয়া সংগত নয় এবং তার মৃত্যুর পর তার স্ত্রীদেরকে বিয়ে করাও তোমাদের

---

(১) কোন কোন লোক খাওয়ার দাওয়াতে এসে খাওয়া দাওয়া সেরে এমনভাবে ধর্ণা দিয়ে বসে চুটিয়ে আলাপ জুড়ে দেয় যে, আর উঠবার নামটি নেয় না, মনে হয় এ আলাপ আর শেষ হবে না। গৃহকর্তা ও গৃহবাসীদের এতে কি অসুবিধা হচ্ছে তার কোন পরোয়াই তারা করে না। ভদ্রতাজ্ঞান বিবর্জিত লোকেরা তাদের এ আচরণের মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও কষ্ট দিতে থাকতো এবং তিনি নিজের ভদ্র ও উদার স্বভাবের কারণে এসব বরদাশত করতেন। শেষে যয়নবের ওলিমার দিন এ কষ্টদায়ক আচরণ সীমা ছাড়িয়ে যায়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশেষ খাদেম আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণনা করেছেন, 'রাতের বেলা ছিল ওলিমার দাওয়াত। সাধারণ লোকেরা খাওয়া শেষ করে বিদায় নিয়েছিল। কিন্তু দু'তিনজন লোক বসে কথাবার্তায় মশগুল হয়ে গিয়েছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিরক্ত হয়ে উঠলেন এবং পবিত্র স্ত্রীদের ওখান থেকে এক চক্কর দিয়ে এলেন। ফিরে এসে দেখলেন তারা যথারীতি বসেই আছেন। তিনি আবার ফিরে গেলেন এবং আয়েশার কামরায় বসলেন। অনেকটা রাত অতিবাহিত হয়ে যাবার পর যখন তিনি জানলেন তারা চলে গেছেন। তখন তিনি যয়নবের কক্ষে গেলেন। এরপর এ বদ অভ্যাসগুলো সম্পর্কে লোকদেরকে সতর্ক করে দেয়ার ব্যাপারটি স্বয়ং আল্লাহ্ নিজেই গ্রহণ করলেন। আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর বর্ণনা অনুযায়ী এ আয়াত সে সময়ই নাযিল হয়। [বুখারী: ৫১৬৩, মুসলিম: ১৪২৮] [দেখুন, তাবারী, ফাতহুল কাদীর]

(২) এ আয়াতে বর্ণিত পর্দার হুকুমটি শুধু নবী-স্ত্রীদের সাথে নির্দিষ্ট নয়। বরং প্রতিটি ঈমানদার নারীই পর্দার হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। [আদওয়াউল-বায়ান; কুরতুবী]

জন্য কখনো বৈধ নয়। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র কাছে এটা গুরুতর অপরাধ।

৫৪. যদি তোমরা কোন কিছু প্রকাশ কর অথবা তা গোপন রাখ (তবে জেনে রাখ) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সবকিছু সম্পর্কে সর্বজ্ঞ।

إِن تُبْدُوا۟ شَيْـًٔا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا ﴿٥٤﴾

৫৫. নবী-স্ত্রীদের জন্য তাদের পিতাগণ, পুত্রগণ, ভাইগণ, ভাইয়ের ছেলেরা, বোনের ছেলেরা, আপন নারীগণ এবং তাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীগণের ব্যাপারে তা[১] পালন না করা অপরাধ নয়। আর হে নবী-স্ত্রীগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সবকিছুর সম্যক প্রত্যক্ষদর্শী।

لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِىٓ ءَابَآئِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآئِهِنَّ وَلَآ إِخْوَٰنِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآءِ إِخْوَٰنِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآءِ أَخَوَٰتِهِنَّ وَلَا نِسَآئِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُنَّ ۗ وَٱتَّقِينَ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدًا ﴿٥٥﴾

৫৬. নিশ্চয় আল্লাহ্‌ নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফেরেশ্‌তাগণ নবীর জন্য দো'আ-ইসতেগফার করেন[২]। হে

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ﴿٥٦﴾

(১) অর্থাৎ তাদের সাথে পর্দা করা বাধ্যতামূলক নয়। [ফাতহুল কাদীর]

(২) আরবী ভাষায় সালাত শব্দের অর্থ রহমত, দো'আ প্রশংসা। অধিকাংশ আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁর নবীর প্রতি যে সালাত সম্পৃক্ত করা হয়েছে এর অর্থ, আল্লাহ নবীর প্রশংসা করেন। তার কাজে বরকত দেন। তার নাম বুলন্দ করেন। তার প্রতি নিজের রহমতের বারি বর্ষণ করেন। ফেরেশ্‌তাদের পক্ষ থেকে তার উপর সালাত প্রেরণের অর্থ হচ্ছে, তারা তাকে চরমভাবে ভালোবাসেন এবং তার জন্য আল্লাহর কাছে দো'আ করেন, আল্লাহ যেন তাকে সর্বাধিক উচ্চ মর্যাদা দান করেন, তার শরীয়াতকে প্রসার ও বিস্তৃতি দান করেন এবং তাকে সর্বোচ্চ প্রশংসিত স্থানে পৌঁছিয়ে দেন। তার উপর রহমত নাযিল করেন। আর সাধারণ মুমিনদের তরফ থেকে সালাতের অর্থ দো'আ ও প্রশংসার সমষ্টি। এ আয়াতের তাফসীরে আবুল আলিয়া রাহিমাহুল্লাহ্‌ বলেন: আল্লাহ্‌ তা'আলার সালাতের অর্থ আল্লাহ্‌ কর্তৃক ফিরিশতাদের সামনে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সম্মান ও প্রশংসা করা। [সহীহ বুখারী, কিতাবুত্তাফসীর] আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ

ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর উপর সালাত[১] পাঠ কর এবং তাকে যথাযথ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মান দুনিয়াতে এই যে, তিনি ফিরিশতাদের কাছে তার কথা আলোচনা করেন। তাছাড়া তার নামকে সমুন্নত করেন। তিনি পূর্ব থেকেই তার নাম সমুন্নত করেছেন। ফলে আযান, ইকামত ইত্যাদিতে আল্লাহ্‌র নামের সাথে সাথে তার নামও শামিল করে দিয়েছেন, তার দ্বীন পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন, প্রবল করেছেন; তার শরী'য়তের কাজ কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত রেখেছেন এবং তার শরী'য়তের হেফাযতের দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেছেন। পক্ষান্তরে আখেরাতে তার সম্মান এই যে, তার স্থান সমগ্র সৃষ্টির ঊর্ধ্বে রেখেছেন এবং যে সময় কোন নবী ও ফেরেশতার সুপারিশ করার ক্ষমতা থাকবে না, তখনও তাকে সুপারিশের ক্ষমতা দিয়েছেন, যাকে "মাকামে–মাহ্‌মুদ" বলা হয়। মনে রাখা প্রয়োজন যে, রাসূলের উপর সালাত প্রেরণের ক্ষেত্রে সালাত শব্দ দ্বারা একই সময়ে একাধিক অর্থ (রহমত, দো'আ ও প্রশংসা) নেয়ার পরিবর্তে সালাত শব্দের এক অর্থ নেয়াই সঙ্গত অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মান, প্রশংসা ও শুভেচ্ছা। [দেখুন, ইবনুল কাইয়্যেম, জালাউল আফহাম]

(১) আয়াতের আসল উদ্দেশ্য ছিল মুসলিমদেরকে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ করার আদেশ দান করা। কিন্তু তা এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, প্রথমে আল্লাহ্‌ স্বয়ং নিজের ও তাঁর ফেরেশতাগণের দরূদ পাঠানোর কথা উল্লেখ করেছেন। অতঃপর সাধারণ মুমিনগণকে দরূদ প্রেরণ করার আদেশ দিয়েছেন।

অধিকাংশ ইমাম এ বিষয়ে একমত যে, কেউ রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম উল্লেখ করলে অথবা শুনলে দরূদ পাঠ করা ওয়াজিব হয়ে যায়। [দেখুন, কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর] কেননা, হাদীসে এরূপ ক্ষেত্রে দরূদ পাঠ করা ওয়াজিব হওয়া বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: 'সেই ব্যক্তি অপমানিত হোক যার সামনে আমার নাম উচ্চারণ করা হলে সালাত পাঠ করে না।' [তিরমিযী: ৩৫৪৫] অন্য এক হাদীসে আছে– 'সেই ব্যক্তি কৃপণ, যার কাছে আমার নাম উচ্চারণ করা হলে দরূদ পাঠ করে না।' [তিরমিযী: ৩৫৪৬]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া অন্যের জন্য 'সালাত' পেশ করা জায়েয কিনা, এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। একটি দল, কাযী ঈয়াদের নাম এ দলের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, একে সাধারণভাবে জায়েয মনে করে। এদের যুক্তি হচ্ছে, কুরআনে আল্লাহ নিজেই অ-নবীদের ওপর একাধিক জায়গায় সালাতের কথা সুস্পষ্টভাবে বলেছেন। এভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও একাধিকবার অ-নবীদের জন্য সালাত শব্দ সহকারে দো'আ করেন। যেমন একজন সাহাবীর জন্য তিনি দো'আ করেন, হে আল্লাহ!

ভাবে সালাম[১] জানাও ।

আবু আওফার পরিজনদের ওপর সালাত পাঠাও। জাবের ইবনে আবদুল্লাহর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর স্ত্রীর আবেদনের জবাবে বলেন, আল্লাহ তোমার ও তোমার স্বামীর ওপর সালাত পাঠান। যারা যাকাত নিয়ে আসতেন তাদের পক্ষে তিনি বলতেন, হে আল্লাহ! ওদের উপর সালাত পাঠাও'। সা'দ ইবনে উবাদার পক্ষে তিনি বলেন, হে আল্লাহ্! সা'দ ইব্‌ন উবাদার পরিজনদের ওপর তোমার সালাত ও রহমত পাঠাও'। আবার মুমিনের রূহ সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খবর দিয়েছেন যে, ফেরেশ্‌তারা তার জন্য সালাত পাঠ করে। কিন্তু মুসলিম উম্মাহর অধিকাংশের মতে এমনটি করা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জন্য তো সঠিক ছিল কিন্তু আমাদের জন্য সঠিক নয়। তারা বলেন, সালাত ও সালামকে মুসলিমরা আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের জন্য নির্দিষ্ট করে নিয়েছে। এটি বর্তমানে তাদের ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে। তাই নবীদের ছাড়া অন্যদের জন্য এগুলো ব্যবহার না করা উচিত। এ জন্যই উমর ইবনে আবদুল আযীয একবার নিজের একজন শাসনকর্তাকে লিখেছিলেন, "আমি শুনেছি কিছু বক্তা এ নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করতে শুরু করেছেন যে, তারা 'আস-সালাতু আলান নাবী'-এর মতো নিজেদের পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারীদের জন্যও "সালাত" শব্দ ব্যবহার করেছেন। আমার এ পত্র পৌঁছে যাবার পরপরই তাদেরকে এ কাজ থেকে বিরত রাখ এবং সালাতকে একমাত্র নবীদের জন্য নির্দিষ্ট করে অন্য মুসলিমদের জন্য দো'আ করেই ক্ষান্ত হবার নির্দেশ দাও।" [রূহুল মা'আনী]

(১) এ হুকুমটি নাযিল হবার পর বহু সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সালামের পদ্ধতি তো আপনি আমাদের বলে দিয়েছেন। (অর্থাৎ নামাযে "আসসালামু আলাইকা আইয়ূহান নাবীয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু" এবং দেখা সাক্ষাত হলে "আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ" বলা।) কিন্তু আপনার প্রতি সালাত পাঠাবার পদ্ধতিটা কি? [দেখুন,তাবারী,কুরতুবী,তাহরীর ওয়া তানওয়ীর] এর জবাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন লোককে বিভিন্ন সময় যেসব সালাত বা দরূদ শিখিয়েছেন তা বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। যেমন,

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ [বুখারী: ৩৩৬৯, ৬৩৬০,৯৭৯]

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، اللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ [বুখারী: ৩৩৭০]

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيمَ [বুখারী: ৪৭৯৮]

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَآلِ إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ [মুসনাদে আহমাদ: ৪/১১৯]

৫৭. নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ্‌ তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে লা‘নত করেন এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি(১)।

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿٥٧﴾

৫৮. আর যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে কষ্ট দেয় যা তারা করেনি তার জন্য; নিশ্চয় তারা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করলো(২)।

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٨﴾

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দরূদ পড়ার ফযীলত সংক্রান্ত অনেক হাদীস রয়েছে [ফাতহুল কাদীর] । যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে ফেরেশ্‌তারা তার প্রতি দরূদ পাঠ করে যতক্ষণ সে দরূদ পাঠ করতে থাকে ।” [মুসনাদে আহমাদ:৩/৪৪৫, ইবনে মাজাহ: ৯০৭] আরো বলেছেন, “যে আমার ওপর একবার দরূদ পড়ে আল্লাহ তার ওপর দশবার দরূদ পড়েন ।” [মুসলিম: ৩৮৪] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন আমার সাথে থাকার সবচেয়ে বেশী হকদার হবে সেই ব্যক্তি যে আমার ওপর সবচেয়ে বেশী দরূদ পড়বে ।” [তিরমিযী:৪৮৪] আরো বলেছেন, আমার কথা যে ব্যক্তির সামনে আলোচনা করা হয় এবং সে আমার ওপর দরূদ পাঠ করে না সে কৃপণ । [তিরমিযী: ৩৫৪৬]

(১) যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কোন প্রকার কষ্ট দেয়, তার সত্তা অথবা গুণাবলীতে প্রকাশ্য অথবা ইঙ্গিতে কোন দোষ বের করে, সে কাফের হয়ে যায় । [দেখুন, আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর; মুয়াস্‌সার]

(২) এ আয়াত দ্বারা কোন মুসলিমকে শরীয়তসম্মত কারণ ব্যতিরেকে কষ্টদানের অবৈধতা প্রমাণিত হয়েছে । [দেখুন, ফাতহুল কাদীর; মুয়াস্‌সার] রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “কেবল সে-ই মুসলিম, যার হাত ও মুখ থেকে অন্য মুসলিমগণ নিরাপদ থাকে, কেউ কষ্ট না পায় আর কেবল সে-ই মুমিন, যার কাছ থেকে মানুষ তাদের রক্ত ও ধন-সম্পদের ব্যাপারে নিরুদ্বেগ থাকে । [তিরমিযী: ২৬২৭] তাছাড়া এ আয়াতটি অপবাদেরও সংজ্ঞা নিরূপণ করে । অর্থাৎ মানুষের মধ্যে যে দোষ নেই অথবা যে অপরাধ মানুষ করেনি তা তার ওপর আরোপ করা । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও এটি সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন । হাদীসে এসেছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়, গীবত কি? জবাবে বলেন, “তোমার নিজের ভাইয়ের আলোচনা এমনভাবে করা যা সে অপছন্দ করে ।” জিজ্ঞেস করা হয়, যদি

অষ্টম রুকূ'

৫৯. হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে ও মুমিনদের নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিছু অংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়[1]।

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ

আমার ভাইয়ের মধ্যে সেই দোষ সত্যিই থেকে থাকে? জবাব দেন, "তুমি যে দোষের কথা বলছো তা যদি তার মধ্যে থাকে তাহলে তুমি তার গীবত করলে আর যদি তা তার মধ্যে না থাকে তাহলে তার ওপর অপবাদ দিলে।" [মুসলিম: ২৫৮৯]

(১) উল্লেখিত আয়াতের جلابيب শব্দটি جلباب এর বহুবচন। 'জিলবাব' অর্থ বিশেষ ধরনের লম্বা চাদর। [দেখুন, কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর] এই চাদরের আকার-আকৃতি সম্পর্কে হযরত ইবনে মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন : এই চাদর ওড়নার উপরে পরিধান করা হয়। [ইবনে কাসীর] ইমাম মুহাম্মাদ ইব্‌ন সিরীন বলেন: আমি আবীদা আস-সালমানীকে এই আয়াতের উদ্দেশ্য এবং জিলবাবের আকার-আকৃতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি মস্তকের উপর দিক থেকে চাদর মুখমণ্ডলের উপর লটকিয়ে মুখমণ্ডল ঢেকে ফেললেন এবং কেবল বামচক্ষু খোলা রেখে إدناء ও جلباب এর তাফসীর কার্যত: দেখিয়ে দিলেন। আর নিজের উপর চাদরকে নিকটবর্তী করার অর্থ চাদরকে মস্তকের উপরদিক থেকে লটকানো। সুতরাং চেহারা, মাথা ও বুক ঢেকে রাখা যায় এমন চাদর পরিধান করা উচিত। এ আয়াতে পরিষ্কারভাবে মুখমণ্ডল আবৃত করার আদেশ ব্যক্ত করেছে। ফলে উপরে বর্ণিত পর্দার প্রথম আয়াতের বিষয়বস্তুর সমর্থন হয়ে গেছে। (এই আবীদা আস-সালমানী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে মুসলিম হন কিন্তু তাঁর খিদমতে হাযির হতে পারেননি। উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর আমলে তিনি মদীনা আসেন এবং সেখানেই থেকে যান। তাকে ফিক্‌হ ও বিচার সংক্রান্ত বিষয়ে কাযী শুরাইহ্-এর সমকক্ষ মনে করা হতো।) ইবন আব্বাসও প্রায় এই একই ব্যাখ্যা করেন। তার যেসব উক্তি ইবনে জারীর, ইবনে আবি হাতেম ও ইবনে মারদুওইয়া উদ্ধৃত করেছেন তা থেকে তার যে বক্তব্য পাওয়া যায় তা হচ্ছে এই যে, "আল্লাহ্ মহিলাদেরকে হুকুম দিয়েছেন যে, যখন তারা কোন কাজে ঘরের বাইরে বের হবে তখন নিজেদের চাদরের পাল্লা ওপর দিয়ে লটকে দিয়ে যেন নিজেদের মুখ ঢেকে নেয় এবং শুধুমাত্র চোখ খোলা রাখে।" কাতাদাহ ও সুদ্দীও এ আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন।

সাহাবা ও তাবে'ঈদের যুগের পর ইসলামের ইতিহাসে যত বড় বড় মুফাসসির অতিক্রান্ত হয়েছেন তারা সবাই একযোগে এ আয়াতের এ অর্থই বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইবনে জারীর তাবারী বলেন, 'ভদ্র ঘরের মেয়েরা যেন নিজেদের পোশাক আশাকে বাঁদীদের মতো সেজে ঘর থেকে বের না হয়। তাদের চেহারা ও কেশদাম যেন খোলা না থাকে। বরং তাদের নিজেদের ওপর চাদরের একটি অংশ লটকে

غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٥٩﴾

এতে তাদেরকে চেনা সহজতর হবে, ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না[১]। আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْمُرْجِفُوْنَ فِي الْمَدِيْنَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُوْنَكَ فِيْهَآ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٦٠﴾

৬০. মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে আর যারা নগরে গুজব রটনা করে, তারা বিরত না হলে আমরা অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে আপনাকে

দেয়া উচিত। ফলে কোন ফাসেক তাদেরকে উত্যক্ত করার দুঃসাহস করবে না।' [জামে'উল বায়ান, ২২/৩৩]

আল্লামা আবু বকর জাস্‌সাস বলেন, "এ আয়াতটি প্রমাণ করে, যুবতী মেয়েদের চেহারা অপরিচিত পুরুষদের থেকে লুকিয়ে রাখার হুকুম দেয়া হয়েছে। এই সাথে ঘর থেকে বের হবার সময় তাদের 'পবিত্রতাসম্পন্না' হবার কথা প্রকাশ করা উচিত। এর ফলে সন্দেহযুক্ত চরিত্র ও কর্মের অধিকারী লোকেরা তাদেরকে দেখে কোন প্রকার লোভ ও লালসার শিকার হবে না।" [আহকামুল কুরআন, ৩/৪৫৮]

যামাখ্‌শারী বলেন, 'তারা যেন নিজেদের ওপর নিজেদের চাদরের একটি অংশ লটকে নেয় এবং তার সাহায্যে নিজেদের চেহারা ও প্রান্তভাগগুলো ভালোভাবে ঢেকে নেয়।' [আল-কাশ্‌শাফ, ২/২২১]

আল্লামা নিযামুদ্দীন নিশাপুরী বলেন, 'নিজেদের ওপর চাদরের একটি অংশ লটকে দেয়। এভাবে মেয়েদেরকে মাথা ও চেহারা ঢাকার হুকুম দেয়া হয়েছে।' [গারায়েবুল কুরআন, ২২/৩২]

ইমাম রাযী বলেন, 'এর উদ্দেশ্য হচ্ছে লোকেরা যেন জানতে পারে এরা দুশ্চরিত্রা মেয়ে নয়। কারণ যে মেয়েটি নিজের চেহারা ঢাকবে, অথচ চেহারা সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়, তার কাছে কেউ আশা করতে পারে না যে, সে নিজের 'সতর' অন্যের সামনে খুলতে রাজী হবে। এভাবে প্রত্যেক ব্যক্তি জানবে, এ মেয়েটি পর্দানশীন, একে যিনার কাজে লিপ্ত করার আশা করা যেতে পারে না।" [তাফসীরে কবীর, ২/৫৯১]

(১) "চেনা সহজতর হবে" এর অর্থ হচ্ছে, তাদেরকে এ ধরনের অনাড়ম্বর লজ্জা নিবারণকারী পোশাকে সজ্জিত দেখে প্রত্যেক প্রত্যক্ষকারী জানবে তারা অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের পবিত্র মেয়ে, এমন ভবঘুরে অসতী ও পেশাদার মেয়ে নয়, কোন অসদাচারী মানুষ যার কাছে নিজের কামনা পূর্ণ করার আশা করতে পারে। "না কষ্ট দেয়া হয়" এর অর্থ হচ্ছে এই যে, তাদেরকে যেন উত্যক্ত ও জ্বালাতন না করা হয়। [দেখুন,তাবারী,কুরতুবী,ফাতহুল কাদীর]

প্রবল করব; এরপর এ নগরীতে আপনার প্রতিবেশীরূপে তারা স্বল্প সময়ই থাকবে---

مَّلْعُوْنِيْنَ ۚ اَيْنَمَا ثُقِفُوْٓا اُخِذُوْا وَقُتِّلُوْا تَقْتِيْلًا ﴿٦١﴾

৬১. অভিশপ্ত হয়ে; তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই ধরা হবে এবং নির্দয়ভাবে হত্যা করা হবে[১]।

سُنَّةَ اللّٰهِ فِى الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ﴿٦٢﴾

৬২. আগে যারা অতীত হয়ে গেছে তাদের ব্যাপারে এটাই ছিল আল্লাহ্‌র রীতি। আর আপনি কখনো আল্লাহ্‌র রীতিতে কোন পরিবর্তন পাবেন না।

يَسْـَٔلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ۗ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ ۗ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُوْنُ قَرِيْبًا ﴿٦٣﴾

৬৩. লোকেরা আপনাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলুন, 'এর জ্ঞান শুধু আল্লাহ্‌র নিকটই আছে।' আর কিসে আপনাকে জানাবে, সম্ভবত কিয়ামত শীঘ্রই হয়ে যেতে পারে?

اِنَّ اللّٰهَ لَعَنَ الْكٰفِرِيْنَ وَاَعَدَّ لَهُمْ سَعِيْرًا ﴿٦٤﴾

৬৪. নিশ্চয় আল্লাহ্ কাফিরদেরকে করেছেন অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জ্বলন্ত আগুন;

خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۚ لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿٦٥﴾

৬৫. সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে এবং তারা কোন অভিভাবক পাবে না, কোন সাহায্যকারীও নয়।

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِى النَّارِ يَقُوْلُوْنَ يٰلَيْتَنَآ اَطَعْنَا اللّٰهَ وَاَطَعْنَا الرَّسُوْلَا ﴿٦٦﴾

৬৬. যেদিন তাদের মুখমণ্ডল আগুনে উলট-পালট করা হবে, সেদিন তারা বলবে, 'হায়! আমরা যদি আল্লাহ্‌কে মানতাম আর রাসূলকে মানতাম!'

---

(১) আলোচ্য আয়াতে মুনাফিকদের দ্বিবিধ দুষ্কর্মের উল্লেখ করার পর তা থেকে বিরত না হলে এই শাস্তির বর্ণনা করা হয়েছে যে, "ওরা যেখানেই থাকবে অভিসম্পাত ও লাঞ্ছনা ওদের সঙ্গী হবে এবং যেখানেই পাওয়া যাবে, গ্রেফতার করত: হত্যা করা হবে।" [ইবন কাসীর,ফাতহুল কাদীর;বাগভী]

৬৭. তারা আরো বলবে, 'হে আমাদের রব! আমরা আমাদের নেতা ও বড় লোকদের আনুগত্য করেছিলাম এবং তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল;

وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا ﴿٦٧﴾

৬৮. 'হে আমাদের রব! আপনি তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দিন এবং তাদেরকে দিন মহাঅভিসম্পাত।'

رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا ﴿٦٨﴾

নবম রুকূ'

৬৯. হে ঈমানদারগণ! মূসাকে যারা কষ্ট দিয়েছে তোমরা তাদের মত হয়ো না; অতঃপর তারা যা রটনা করেছিল আল্লাহ্‌ তা থেকে তাকে নির্দোষ প্রমাণিত করেন(১); আর তিনি ছিলেন

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا ۚ وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا ﴿٦٩﴾

(১) এ আয়াতে বিশেষভাবে মুসলিমদেরকে আল্লাহ্‌ ও রাসূলের বিরোধিতা থেকে আত্মরক্ষার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কেননা, এই বিরোধিতা তাদের কষ্টের কারণ। তাদেরকে মূসা আলাইহিস্‌ সালামের কওমের মত হতে নিষেধ করা হয়েছে। যারা সবসময় মূসা আলাইহিস্‌ সালামকে সার্বিকভাবে কষ্ট দিত। [দেখুন,ফাতহুল কাদীর;কুরতুবী] রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াতের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটি হলো, মূসা আলাইহিস্‌ সালাম অত্যন্ত লজ্জাশীল হওয়ার কারণে তাঁর দেহ ঢেকে রাখতেন। তাঁর শরীর কেউ দেখত না। তিনি পর্দার আড়ালে গোসল করতেন। তাঁর সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলের মধ্যে সকলের সামনে উলঙ্গ হয়ে গোসল করার ব্যাপক প্রচলন ছিল। মূসা আলাইহিস্‌ সালাম কারও সামনে গোসল করেন না দেখে কেউ কেউ বলাবলি করল– এর কারণ এই যে, তাঁর দেহে নিশ্চয় কোন খুঁত আছে– হয় তিনি ধবল কুষ্ঠরোগী, না হয় একশিরা রোগী। নতুবা তিনি অন্য কোন ব্যাধিগ্রস্ত। আল্লাহ্‌ তা'আলা এ ধরনের খুঁত থেকে মূসা আলাইহিস্‌ সালাম-এর নির্দোষিতা প্রকাশ করার ইচ্ছা করলেন। একদিন মূসা আলাইহিস্‌ সালাম নির্জনে গোসল করার জন্যে কাপড় খুলে একখণ্ড পাথরের উপর তা রেখে দিলেন। গোসল শেষে যখন হাত বাড়িয়ে কাপড় নিতে চাইলেন, তখন প্রস্তর খণ্ডটি (আল্লাহ্‌র আদেশে) নড়ে উঠল এবং তাঁর কাপড়সহ দৌড়াতে লাগল। মূসা আলাইহিস্‌ সালাম তাঁর লাঠি নিয়ে প্রস্তরের পেছনে পেছনে "আমার কাপড় আমার কাপড়" বলতে বলতে দৌড় দিলেন। কিন্তু প্রস্তরটি থামল না– যেতেই লাগল। অবশেষে প্রস্তরটি বনী- ইসরাঈলের এক সমাবেশে পৌঁছে থেমে গেল। তখন সেসব লোক মুসা আলাইহিস্‌ সালাম-কে উলঙ্গ

আল্লাহ্‌র নিকট মর্যাদাবান[১]।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ۝٧٠

৭০. হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সঠিক কথা বল[২];

يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ۝٧١

৭১. তাহলে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন[৩]। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে।

اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

৭২. আমরা তো আসমান, যমীন ও পর্বতমালার প্রতি এ আমানত[৪] পেশ

অবস্থায় দেখে নিল এবং তাঁর দেহ নিখুঁত ও সুস্থ দেখতে পেল। (এতে তাদের বর্ণিত কোন খুঁত বিদ্যমান ছিল না।) এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা মূসা আলাইহিস্ সালাম-এর নির্দোষিতা সকলের সামনে প্রকাশ করে দিলেন। অতঃপর তিনি লাঠি দ্বারা প্রস্তর খণ্ডকে মারতে লাগলেন। আল্লাহ্‌র কসম, মূসা আলাইহিস্ সালাম এর আঘাতের কারণে পাথরের গায়ে তিন, চার অথবা পাঁচটি দাগ পড়ে গিয়েছিল। [বুখারী:৩৪০৪]

(১) অর্থাৎ মূসা আলাইহিস্ সালাম আল্লাহ্‌র কাছে মর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন। [কুরতুবী]

(২) এর তাফসীর সত্য কথা, সরল কথা, সঠিক কথা করা হয়েছে। ইবন কাসীর সবগুলো উদ্ধৃত করে বলেন, সবই ঠিক। [ইবন কাসীর]

(৩) অর্থাৎ, তোমরা যদি মুখকে ভুলভ্রান্তি থেকে নিবৃত রাখ এবং সঠিক ও সরল কথা বলার অভ্যস্ত হয়ে যাও, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের যাবতীয় সংশোধন করে দেবেন। আয়াতের শেষে আরও ওয়াদা করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ ব্যক্তির ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দেবেন। [তাবারী]

(৪) এখানে আমানত শব্দের তাফসীর প্রসঙ্গে সাহাবী ও তাবেয়ী প্রমুখ তাফসীরবিদগণের অনেক উক্তি বর্ণিত আছে; যেমন শরী'য়তের ফরয কর্মসমূহ, লজ্জাস্থানের হেফাযত, ধন-সম্পদের আমানত, অপবিত্রতার গোসল, সালাত, যাকাত, সওম, হজ ইত্যাদি। এ কারণেই অধিকাংশ তাফসীরবিদ বলেন যে, দ্বীনের যাবতীয় কর্তব্য ও কর্ম এই আমানতের অন্তর্ভুক্ত। শরী'য়তের যাবতীয় আদেশ নিষেধের সমষ্টিই আমানত। আমানতের উদ্দেশ্য হচ্ছে শরী'য়তের বিধানাবলী দ্বারা আদিষ্ট হওয়া, যেগুলো পুরোপুরি পালন করলে জান্নাতের চিরস্থায়ী নেয়ামত এবং বিরোধিতা অথবা ত্রুটি করলে জাহান্নামের আযাব প্রতিশ্রুত। কেউ কেউ বলেন: আমানতের উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র

وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

করেছিলাম, কিন্তু তারা এটা বহন করতে অস্বীকার করল এবং তাতে শংকিত হল, আর মানুষ তা বহন করল; সে অত্যন্ত যালিম, খুবই অজ্ঞ(১)।

لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٣﴾

৭৩. যাতে আল্লাহ্ মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীকে শাস্তি দেন এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীকে ক্ষমা করেন। আর আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

বিধানাবলীর ভার বহনের যোগ্যতা ও প্রতিভা, যা বিশেষ স্তরের জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনার উপর নির্ভরশীল। উন্নতি এবং আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতা এই বিশেষ যোগ্যতার উপর নির্ভরশীল। মোটকথা, এখানে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য ও তাঁদের আদেশাবলী পালনকে “আমানত” শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। এ আমানত কতটা গুরুত্বপূর্ণ ও দুর্বহ সে ধারণা দেবার জন্য আল্লাহ বলেন, আকাশ ও পৃথিবী তাদের সমস্ত শ্রেষ্ঠত্ব এবং পাহাড় তার বিশাল ও বিপুলায়তন দেহাবয়ব ও গম্ভীরতা সত্ত্বেও তা বহন করার শক্তি ও হিম্মত রাখতো না কিন্তু দুর্বল দেহাবয়বের অধিকারী মানুষ নিজের ক্ষুদ্রতম প্রাণের ওপর এ ভারী বোঝা উঠিয়ে নিয়েছে। [দেখুন, ইবন কাসীর, ফাতহুল কাদীর; কুরতুবী, বাগভী]

(১) ظلوم অর্থ নিজের প্রতি যুলুমকারী এবং جهول এর মর্মার্থ পরিণামের ব্যাপারে অজ্ঞ। [বাগভী]

৩৪- সূরা সাবা
৫৪ আয়াত, মক্কী

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আসমানসমূহে যা কিছু আছে ও যমীনে যা কিছু আছে তার মালিক এবং আখিরাতেও সমস্ত প্রশংসা তাঁরই। আর তিনি হিকমতওয়ালা, সম্যক অবহিত[১]।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْاٰخِرَةِ ۚ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ①

২. তিনি জানেন যা যমীনে প্রবেশ করে[২] এবং যা তা থেকে নির্গত হয়, আর যা আসমান থেকে নাযিল হয় এবং যা কিছু তাতে উত্থিত হয়[৩]। আর তিনি পরম দয়ালু, অতিশয় ক্ষমাশীল।

يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا ۚ وَهُوَ الرَّحِيْمُ الْغَفُوْرُ ②

৩. আর কাফিররা বলে, 'আমাদের কাছে কিয়ামত আসবে না।' বলুন, অবশ্যই হ্যাঁ, শপথ আমার রবের, নিশ্চয় তোমাদের কাছে তা আসবে।' তিনি

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَاْتِيْنَا السَّاعَةُ ۗ قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتَاْتِيَنَّكُمْ عٰلِمِ الْغَيْبِ ۚ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ وَلَآ اَصْغَرُ مِنْ

(১) অর্থাৎ তিনি তাঁর যাবতীয় নির্দেশে প্রাজ্ঞ, তিনি তাঁর সৃষ্টিজগত সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত। [তাবারী]

(২) অর্থাৎ আসমান থেকে যে পানি নাযিল হয় সে পানির কতটুকু যমীনে প্রবেশ করে তা আল্লাহ্ ভাল করেই জানেন। [আদওয়াউল বায়ান] যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "আপনি কি দেখেন না, আল্লাহ্ আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন, অতঃপর তা ভূমিতে নির্ঝররূপে প্রবাহিত করেন তারপর তা দ্বারা বিবিধ বর্ণের ফসল উৎপন্ন করেন, তারপর তা শুকিয়ে যায়।" [সূরা আয-যুমার: ২১]

(৩) যমীন থেকে যা নির্গত হয় যেমন, উদ্ভিদ, খনিজ সম্পদ, পানি। আর আসমান থেকে যা নাযিল হয় যেমন, বৃষ্টির পানি, ফেরেশতা, কিতাবাদি। আকাশে যা উত্থিত হয় যেমন, ফেরেশতাগণ, মানুষের আমল। তিনি বান্দাদের প্রতি দয়াশীল বলেই তাদের অপরাধের কারণে তাদের উপর দ্রুত শাস্তি নাযিল করেন না। যারা তাঁর কাছে তাওবা করবে, তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। [মুয়াসসার]

ذٰلِكَ وَلَآ اَكۡبَرُ اِلَّا فِیۡ كِتٰبٍ مُّبِیۡنٍ ﴿۳﴾

গায়েব সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত; আসমানসমূহ ও যমীনে তাঁর অগোচরে নয় অণু পরিমাণ কিছু কিংবা তার চেয়ে ছোট বা বড় কিছু; এর প্রত্যেকটিই আছে সুস্পষ্ট কিতাবে[১]।

لِّیَجۡزِیَ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمۡ مَّغۡفِرَةٌ وَّرِزۡقٌ كَرِیۡمٌ ﴿۴﴾

৪. যাতে তিনি প্রতিদান দেন তাদের, যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে। তাদেরই জন্য আছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক[২]।

وَالَّذِیۡنَ سَعَوۡ فِیۡۤ اٰیٰتِنَا مُعٰجِزِیۡنَ اُولٰٓئِكَ لَهُمۡ عَذَابٌ مِّنۡ رِّجۡزٍ اَلِیۡمٌ ﴿۵﴾

৫. আর যারা আমাদের আয়াতকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করে, তাদেরই জন্য রয়েছে ভয়ংকর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

وَیَرَی الَّذِیۡنَ اُوۡتُوا الۡعِلۡمَ الَّذِیۡۤ اُنۡزِلَ اِلَیۡكَ مِنۡ رَّبِّكَ هُوَ الۡحَقَّ ۙ وَیَهۡدِیۡۤ اِلٰی صِرَاطِ الۡعَزِیۡزِ الۡحَمِیۡدِ ﴿۶﴾

৬. আর যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তারা জানে যে, আপনার রবের কাছ থেকে আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে তা-ই সত্য; এবং এটা পরাক্রমশালী প্রশংসিত আল্লাহ্‌র পথ নির্দেশ করে।

وَقَالَ الَّذِیۡنَ كَفَرُوۡا هَلۡ نَدُلُّكُمۡ عَلٰی رَجُلٍ یُّنَبِّئُكُمۡ اِذَا مُزِّقۡتُمۡ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۙ اِنَّكُمۡ لَفِیۡ خَلۡقٍ جَدِیۡدٍ ﴿۷﴾

৭. আর কাফিররা বলে, 'আমরা কি তোমাদেরকে এমন ব্যক্তির সন্ধান দেব যে তোমাদেরকে জানায় যে, 'তোমাদের দেহ সম্পূর্ণ ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়লেও অবশ্যই তোমরা হবে নতুনভাবে সৃষ্ট[৩]!'

(১) অর্থাৎ কোন কিছুই হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। সবকিছুই এক কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। সে কিতাব হচ্ছে, লাওহে মাহফূয। [মুয়াসসার]

(২) কাতাদাহ বলেন, এর অর্থ, তাদের গোনাহের জন্য ক্ষমা ও জান্নাতে তাদের জন্য থাকবে সম্মানজনক রিযিক। [তাবারী]

(৩) এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তারা তাদের আখেরাত অস্বীকৃতির চরম সীমানায় গিয়ে এসব কথা বলত। [মুয়াসসার]

৮. সে কি আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে, নাকি তার মধ্যে আছে উন্মাদনা[১]? বরং যারা আখিরাতের উপর ঈমান আনে না, তারা শাস্তি ও ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছে।

أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِۦ جِنَّةٌۢ ۗ بَلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْـَٔاخِرَةِ فِى ٱلْعَذَابِ وَٱلضَّلَٰلِ ٱلْبَعِيدِ ⑧

৯. তারা কি তাদের সামনে ও তাদের পিছনে, আসমান ও যমীনে যা আছে তার প্রতি লক্ষ্য করে না[২]? আমরা ইচ্ছে করলে ধ্বসিয়ে দেব তাদেরসহ যমীন অথবা পতন ঘটাব তাদের উপর আসমান থেকে এক খণ্ড; নিশ্চয় এতে রয়েছে নিদর্শন, আল্লাহ্‌র অভিমুখী প্রতিটি বান্দার জন্য।

أَفَلَمْ يَرَوْا۟ إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِن نَّشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ⑨

দ্বিতীয় রুকূ'

১০. আর অবশ্যই আমরা আমাদের পক্ষ থেকে দাউদকে দিয়েছিলাম মর্যাদা এবং আদেশ করেছিলাম, 'হে পর্বতমালা! তোমরা দাউদের সাথে বার বার আমার পবিত্রতা ঘোষণা

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ مِنَّا فَضْلًا ۖ يَٰجِبَالُ أَوِّبِى مَعَهُۥ وَٱلطَّيْرَ ۖ وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ⑩

(১) অর্থাৎ তারা রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি এমন মারাত্মক অপবাদ আরোপ করছে যে, এ লোক যেহেতু মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের কথা বলছে, তা হলে সে দু'অবস্থা থেকে মুক্ত নয়। হয় সে ইচ্ছা করে আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা বানিয়ে বলছে, নতুবা তাকে পাগলামীতে পেয়ে বসেছে। কি বলছে তা জানে না। আল্লাহ্‌ তার জওয়াবে বলেন, তোমরা যা মনে করেছ ব্যাপারটি তা নয়। বরং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবচেয়ে বড় সত্যবাদী। আর যারা পুনরুত্থানে বিশ্বাস করবে না। আর সেটার জন্য আমল করবে না, তারা তো স্থায়ী কঠিন শাস্তিতে থাকবে। দুনিয়াতেও তারা সঠিক পথ থেকে অনেক দূরে থাকবে। [মুয়াসসার]

(২) কাতাদাহ বলেন, তারা কি তাদের ডানে ও তাদের বাঁয়ে তাকিয়ে দেখে না যে, কিভাবে আসমান তাদেরকে পরিবেষ্টন করে আছে? যদি তিনি ইচ্ছা করেন তবে যমীন তাদেরকে নিয়ে ধ্বসে যেতে পারে যেমন তাদের পূর্বে কিছু লোকের ব্যাপারে তা ঘটেছিল। অথবা আমরা আকাশ থেকে একটি টুকরো তাদের উপর নিক্ষেপ করতে পারি। [তাবারী]

কর’ এবং পাখিদেরকেও । আর তার জন্য আমরা নরম করে দিয়েছিলাম লোহা---

১১. (এ নির্দেশ দিয়ে যে) আপনি পূর্ণ মাপের বর্ম তৈরী করুন(১) এবং বুননে পরিমাণ রক্ষা করুন’ । আর তোমরা সৎকাজ কর, নিশ্চয় তোমরা যা কিছু কর আমি তার সম্যক দ্রষ্টা ।

أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١﴾

১২. আর সুলাইমানের অধীন করেছিলাম বায়ুকে যা ভোরে একমাসের পথ অতিক্রম করত ও সন্ধ্যায় একমাসের পথ অতিক্রম করত(২) । আমরা তার জন্য গলিত তামার এক প্রস্রবণ প্রবাহিত করেছিলাম এবং তার রবের অনুমতিক্রমে জিনদের কিছু সংখ্যক তার সামনে কাজ করত । আর তাদের মধ্যে যে আমাদের নির্দেশ অমান্য করে, তাকে আমরা জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি আস্বাদন করাব(৩) ।

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿١٢﴾

(১) কাতাদাহ বলেন, সর্বপ্রথম বর্ম দাউদ আলাইহিস সালামই তৈরী করেন । তার আগে কেউ সেটা তৈরী করে নি । [তাবারী] কাতাদাহ আরও বলেন, তিনি এটা বানাতে আগুনের ব্যবহার করার প্রয়োজন বোধ করতেন না । তাছাড়া লাঠি দিয়েও আঘাত করতে হতো না । [তাবারী]

(২) এর অর্থ হচ্ছে প্রতিদিন তিনি দু’মাসের পথ বাতাসের উপর করে ভ্রমণ করতেন । [তাবারী]

(৩) অর্থাৎ কোন জিন যদি সুলাইমান আলাইহিস সালাম এর আনুগত্য না করে, তবে তাকে আগুন দ্বারা শাস্তি দেয়া হবে । অধিকাংশ তাফসীরবিদদের মতে এখানে আখেরাতে জাহান্নামের আযাব বোঝানো হয়েছে । কেউ কেউ বলেন, দুনিয়াতেও আল্লাহ তাআলা তাদের উপর একজন ফেরেশ্‌তা নিয়োজিত রেখেছিলেন । সে অবাধ্য জিনকে আগুনের চাবুক মেরে মেরে কাজ করতে বাধ্য করত । [কুরতুবী,ফাতহুল কাদীর]

১৩. তারা সুলাইমানের ইচ্ছানুযায়ী তার জন্য প্রাসাদ[১], ভাস্কর্য, হাউজসদৃশ বৃহদাকার পাত্র এবং সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত ডেগ নির্মাণ করত। 'হে দাউদ পরিবার! কৃতজ্ঞতার সাথে তোমরা কাজ করতে থাক। আর আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পই কৃতজ্ঞ!'

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ ۚ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا ۚ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ﴿١٣﴾

১৪. অতঃপর যখন আমরা সুলাইমানের মৃত্যু ঘটালাম, তখন জিনদেরকে তার মৃত্যুর খবর জানাল শুধু মাটির পোকা, যা তার লাঠি খাচ্ছিল। অতঃপর যখন তিনি পড়ে গেলেন তখন জিনরা বুঝতে পারল যে, যদি তারা গায়েব জানত, তাহলে তারা লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তিতে আবদ্ধ থাকত না[২]।

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ ۖ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿١٤﴾

১৫. অবশ্যই সাবাবাসীদের[৩] জন্য তাদের

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ ۖ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ

(১) মুজাহিদ বলেন, এগুলো ছিল প্রাসাদের চেয়ে ছোট আকৃতির ঘর-দোর বিশেষ। [আত-তাফসীরুস সহীহ] কাতাদাহ বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য বিল্ডিং ও মাসজিদ। [তাবারী]

(২) কারণ, সুলাইমান আলাইহিস সালাম তার ঘরে ইবাদাতে মশগুল ছিলেন। তারপর জিনরা তার জন্য বিল্ডিং বানাচ্ছিল। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ সুলাইমান আলাইহিস সালামের মৃত্যু দিলেন। কিন্তু জিনরা তা জানতেই পারল না। শেষ পর্যন্ত তার লাঠিতে যমীনের পোকা লেগে সেটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর তিনি পড়ে গেলেন। কোন কোন বর্ণনায় দেখা যায় সেটা ছিল পূর্ণ এক বছর পর। তখন জিনরা তাদের ভুল বুঝতে পারল যে, যদি তারা গায়েবের কিছু জানত তবে এতদিন কষ্ট করত না। [সা'দী]

(৩) হাদীসে এসেছে, 'সাবা ছিল আরবের এক ব্যক্তির নাম। আরবে তার বংশ থেকে নিম্নোক্ত গোত্রগুলোর উদ্ভব হয়ঃ কিন্দাহ, হিম্য়ার, আয্দ, আশ'আরিয়্যীন, মায্হিজ, আনমার (এর দু'টি শাখাঃ খাস'আম ও বাজীলাহ), আমেলাহ, জুযাম, লাখ্ম ও গাস্সান।' [তিরমিযী:৩২২২] ইবনে কাসীরের মতে, ইয়ামনের সম্রাট ও সে দেশের অধিবাসীদের উপাধি হচ্ছে সাবা। তাবাবেয়া সম্প্রদায়ও সাবা সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল।[ইবন কাসীর]

وَّشِمَالٍ ۬ۚ كُلُوْا مِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوْا لَهٗ ؕ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَّرَبٌّ غَفُوْرٌ ﴿۱۵﴾

বাসভূমিতে ছিল এক নিদর্শনঃ দুটি উদ্যান, একটি ডান দিকে, অন্যটি বাম দিকে(১)। বলা হয়েছিল, 'তোমরা তোমাদের রবের দেয়া রিযিক ভোগ কর এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর(২)। উত্তম নগরী এবং ক্ষমাশীল রব।'

فَاَعْرَضُوْا فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنٰهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ اُكُلٍ خَمْطٍ وَّاَثْلٍ وَّشَيْءٍ

১৬. অতঃপর তারা অবাধ্য হল। ফলে আমরা তাদের উপর প্রবাহিত করলাম 'আরেম'(৩) বাঁধের বন্যা এবং তাদের

---

(১) শহরের ডানে ও বায়ে অবস্থিত পাহাড়দ্বয়ের কিনারায় ফল-মুলের বাগান তৈরী করা হয়েছিল। এসব বাগানে খালের পানি প্রবাহিত হত। সমগ্র সাবা রাজ্য শ্যামল সবুজ ক্ষেত ও বনানীতে পরিপূর্ণ ছিল। তার যে কোন জায়গায় দাঁড়ালে দেখা যেতো ডানেও বাগান এবং বাঁয়েও বাগান। এ সব বাগান পরস্পর সংলগ্ন অবস্থায় পাহাড়ের কিনারায় দু'সারিতে বহুদূর পর্যন্ত ছিল। এগুলো সংখ্যায় অনেক হলেও পবিত্র কুরআন দু'টি বাগানের কথা ব্যক্ত করেছে। কারণ, এক সারির সমস্ত বাগান পরস্পর সংলগ্ন হওয়ার কারণে এক বাগান এবং অপর সারির সমস্ত বাগানকে একই কারণে দ্বিতীয় বাগান বলে অভিহিত করা হয়েছে। এসব বাগানে সবরকম বৃক্ষ ফল-মুল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হত। কাতাদাহ প্রমুখের বর্ণনা অনুযায়ী একজন লোক মাথায় খালি ঝুড়ি নিয়ে গমন করলে গাছ থেকে পতিত ফলমুল দ্বারা তা আপনা-আপনি ভরে যেত; হাত লাগানোরও প্রয়োজন হত না।[ইবন কাসীর,কুরতুবী,ফাতহুল কাদীর]

(২) আল্লাহ তা'আলা নবীগণের মাধ্যমে তাদেরকে আদেশ দিয়েছিলেন, তোমরা আল্লাহ প্রদত্ত এই অফুরন্ত জীবনোপকরণ ব্যবহার কর এবং কৃতজ্ঞতা স্বরূপ সৎকর্ম ও আল্লাহর আনুগত্য করতে থাক। আল্লাহ তাআলা তোমাদের এ শহরকে পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যকর শহর করেছেন। শহরটি নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত ছিল এবং আবহাওয়া স্বাস্থ্যকর ও বিশুদ্ধ ছিল। সমগ্র শহরে মশা-মাছি ,ছারপোকা ও সাপ-বিচ্ছুর মত ইতর প্রাণীর নামগন্ধও ছিল না। বাইরে থেকে কোন ব্যক্তি শরীরে ও কাপড়-চোপড়ে উকুন ইত্যাদি নিয়ে এ শহরে পৌঁছালে সেগুলো আপনা-আপনি মরে সাফ হয়ে যেত। [দেখুন-কুরতুবী]

(৩) ইবনে কাসীরের বর্ণনা অনুযায়ী এই বাঁধের ইতিহাস এইঃ ইয়ামনের রাজধানী সানআ থেকে তিন মনযিল দূরে মাআরেব নগরী অবস্থিত ছিল। এখানে ছিল সাবা সম্প্রদায়ের বসতি। দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী উপত্যকায় শহরটি অবস্থিত ছিল বিধায় উভয় পাহাড়ের উপর থেকে বৃষ্টির পানি বন্যার আকারে নেমে আসত। ফলে শহরের

مِّنْ سِدْرٍ قَلِيْلٍ ﴿١٦﴾

উদ্যান দুটিকে পরিবর্তন করে দিলাম এমন দুটি উদ্যানে, যাতে উৎপন্ন হয় বিস্বাদ ফলমূল, ঝাউ গাছ এবং সামান্য কিছু কুল গাছ।

ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِمَا كَفَرُوْا ۖ وَهَلْ نُجٰزِيْٓ اِلَّا الْكَفُوْرَ ﴿١٧﴾

১৭. ঐ শাস্তি আমরা তাদেরকে দিয়েছিলাম তাদের কুফরির কারণে। আর অকৃতজ্ঞ ছাড়া আমরা আর কাউকেও এমন শাস্তি দেই না।

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَّقَدَّرْنَا فِيْهَا السَّيْرَ ۖ سِيْرُوْا فِيْهَا لَيَالِيَ وَاَيَّامًا اٰمِنِيْنَ ﴿١٨﴾

১৮. আর তাদের ও যেসব জনপদের মধ্যে আমরা বরকত দিয়েছিলাম, সেগুলোর মধ্যবর্তী স্থানে আমরা দৃশ্যমান বহু জনপদ স্থাপন করেছিলাম এবং ঐ সব জনপদে ভ্রমনের যথাযথ ব্যবস্থা করেছিলাম। বলেছিলাম, 'তোমরা এসব জনপদে নিরাপদে ভ্রমণ কর দিনে ও রাতে।'

فَقَالُوْا رَبَّنَا بٰعِدْ بَيْنَ اَسْفَارِنَا وَظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنٰهُمْ اَحَادِيْثَ وَمَزَّقْنٰهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ﴿١٩﴾

১৯. অতঃপর তারা বলল, 'হে আমাদের রব! আমাদের সফরের মন্‌যিলের ব্যবধান বাড়িয়ে দিন।' আর তারা নিজদের প্রতি যুলুম করেছিল।

জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে যেত। দেশের সম্রাটগণ উভয় পাহাড়ের মাঝখানে একটি শক্ত ও মজবুত বাঁধ নির্মাণ করলেন। এ বাঁধ পাহাড় থেকে আগত বন্যার পানি রোধ করে পানির একটি বিরাট ভাণ্ডার তৈরী করে দেয়। পাহাড়ী ঢলের পানিও এতে সঞ্চিত হতে থাকে। বাঁধের উপরে-নীচে ও মাঝখানে পানি বের করার তিনটি দরজা নির্মাণ করা হয় যাতে সঞ্চিত পানি সুশৃংখলভাবে শহরের লোকজনের মধ্যে এবং তাদের ক্ষেতে ও বাগানে পৌঁছানো যায়। প্রথমে উপরের দরজা খুলে পানি ছাড়া হত। উপরের পানি শেষ হয়ে গেলে মাঝখানের এবং সর্বশেষে নীচের তৃতীয় দরজা খুলে দেয়া হত। পরবর্তী বছর বৃষ্টির মওসুমে বাঁধের তিনটি স্তরই আবার পানিতে পূর্ণ হয়ে যেত। বাঁধের নীচে পানি সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যে একটি সুবৃহৎ আধার নির্মাণ করা হয়েছিল। এতে পানির বারটি খাল তৈরী করে শহরের বিভিন্ন দিকে পৌঁছানো হয়েছিল। সব খালে একই গতিতে পানি প্রবাহিত হত এবং নাগরিকদের প্রয়োজন মেটাত।

ফলে আমরা তাদেরকে কাহিনীর বিষয়বস্তুতে পরিণত করলাম এবং তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিলাম। নিশ্চয় এতে নিদর্শন রয়েছে, প্রত্যেক ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য।

وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠﴾

২০. আর অবশ্যই তাদের সম্বন্ধে ইবলীস তার ধারণা সত্য প্রমাণ করল, ফলে তাদের মধ্যে একটি মুমিন দল ছাড়া সবাই তার অনুসরণ করল;

وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ ۗ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿٢١﴾

২১. আর তাদের উপর শয়তানের কোন আধিপত্য ছিল না। তবে কে আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে এবং কে তাতে সন্দিহান, তা প্রকাশ করে দেয়াই ছিল আমাদের উদ্দেশ্য। আর আপনার রব সবকিছুর সম্যক হিফাযতকারী।

তৃতীয় রুকূ'

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ ۖ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ ﴿٢٢﴾

২২. বলুন, 'তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া যাদেরকে ইলাহ্ মনে করতে তাদেরকে ডাক। তারা আসমানসমূহে অণু পরিমাণ কিছুরও মালিক নয়, যমীনেও নয়। আর এ দু'টিতে তাদের কোন অংশও নেই এবং তাদের মধ্য থেকে কেউ তাঁর সহায়কও নয়[১]।'

---

(১) এ আয়াত ও এর পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কিছুর ইবাদাতের মুলোৎপাটন করা হয়েছে। কারণ আল্লাহ্ ছাড়া যাদের ইবাদাত করা হয়, তারা কেউই কোন কিছুর মালিক নয়। যদি মালিক না হয় তবে কিভাবে কোন কিছু দাবী করতে পারে? আর তাছাড়া ইবাদাতের অন্য কারণ এটাও হতে পারত যে, তারা মালিক না হলেও অংশীদার। কিন্তু আসমান ও যমীনে কোন কিছুতেই তাদের কোন অংশীদারিত্ব নেই।

২৩. আর আল্লাহ্ যাকে অনুমতি দেবেন, সে ছাড়া তাঁর কাছে কারো সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না। অবশেষে যখন তাদের অন্তর থেকে ভয় বিদূরিত হয়, তখন তারা পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করে, 'তোমাদের রব কী বললেন?' তার উত্তরে তারা বলে, 'যা সত্য তিনি তা-ই বলেছেন।(১)' আর

وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٢٣﴾

সুতরাং তাদের ইবাদাত কেন করা হবে? তাছাড়া ইবাদাতের আরও একটি কারণ হতে পারত যে, তারা মালিক বা অংশীদার না হলেও আল্লাহ্ তাদের সাহায্যের মুখাপেক্ষী। তিনি তাদের সাহায্য নিয়ে থাকেন। কিন্তু আল্লাহ্র তো কোন সাহায্যকারীর প্রয়োজন নেই। সুতরাং তাদের ইবাদাত কেন করা হবে? আর যদি বলা হয় যে, তারা কোন কিছুর মালিক নয়, তারা অংশীদার নয়, তারা সাহায্যকারীও নয়, কিন্তু তারা নেক বান্দা, তাদের সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। এ শেষোক্ত সন্দেহটির উত্তর পরবর্তী আয়াতে দেয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, তাদের কারও কারও যদি সুপারিশ থেকেও থাকে, তবে তা একমাত্র আল্লাহ্র অনুমতিক্রমেই হবে। তিনি তাদেরকে সেটার অনুমতি না দিলে তারা সেটার জন্য অগ্রণী হয়ে কিছু করবে না। সুতরাং এ আয়াতের মাধ্যমে শির্কের মুলোৎপাটন করা হয়েছে। [ইবন তাইমিয়্যা, আল-জাওয়াবুস সহীহ, ৩/১৫৪; আর-রাদ্দু আলাল মানতিকিয়্যীন, ৫২৯; দারয়ু তাআরিযিল আকলি ওয়ান নাকল ৫/১৪৯] বরং যাদের সুপারিশ কামনা করা হয়, তাদের মধ্যে প্রধান হচ্ছে, ফেরেশতাগণ। আল্লাহ্র সামনে তাদের অবস্থা কি তা পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

(১) আয়াতের একটি তাফসীর বিভিন্ন সহীহ হাদীসে এসেছে, তা হলো আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহর আদেশ নাযিল হওয়ার সময় ফেরেশ্তাগণ সংজ্ঞাহীন হয়ে যায়, অতঃপর তারা একে অপরকে আদেশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে। হাদীসে এসেছে যে, 'যখন আল্লাহ তা'আলা আকাশে কোন আদেশ জারী করেন, তখন সমস্ত ফেরেশ্তা বিনয় ও নম্রতা সহকারে পাখা নাড়তে থাকে। (এবং সংজ্ঞাহীনের মত হয়ে যায়) অতঃপর তাদের মন থেকে অস্থিরতা ও ভয়ভীতির প্রভাব দূর হয়ে গেলে তারা বলে তোমাদের পালনকর্তা কি বলছেন? অন্যরা বলে, অমুক সত্য আদেশ জারী করেছেন। [বুখারী: ৪৮০০] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন, 'আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ যখন কোন আদেশ দেন তখন আরশ বহনকারী ফেরেশ্তাগণ তসবীহ পাঠ করতে থাকে। তাদের তসবীহ শুনে তাদের নিকটবর্তী আকাশের ফেরেশ্তাগণও তসবীহ পাঠ করে। অতঃপর তাদের তসবীহ শুনে তাদের নীচের আকাশের ফেরেশ্তাগণ তসবীহ পাঠ করে। এভাবে দুনিয়ার আকাশ

তিনি সমুচ্চ, মহান।

২৪. বলুন, 'আসমানসমূহ ও যমীন থেকে কে তোমাদেরকে রিযিক প্রদান করেন?' বলুন, 'আল্লাহ্। আর নিশ্চয় আমরা অথবা তোমরা সৎপথে স্থিত অথবা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পতিত[১]।'

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ قُلِ اللّٰهُ ۙ وَ اِنَّاۤ اَوْ اِيَّاكُمْ لَعَلٰى هُدًى اَوْ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢٤﴾

২৫. বলুন, 'আমাদের অপরাধের জন্য তোমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে না এবং তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আমাদেরকেও জবাবদিহি করতে হবে না।'

قُلْ لَّا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّاۤ اَجْرَمْنَا وَلَا نُسْـَٔلُ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٥﴾

২৬. বলুন, 'আমাদের রব আমাদের সকলকে একত্র করবেন, তারপর তিনি আমাদের মধ্যে সঠিকভাবে ফয়সালা করে দেবেন। আর তিনিই শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী, সর্বজ্ঞ।'

قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ۗ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ ﴿٢٦﴾

২৭. বলুন, 'তোমরা আমাকে তাদের দেখাও, যাদেরকে তোমরা শরীকরূপে তাঁর সাথে জুড়ে দিয়েছ। না, কখনো না, বরং তিনিই আল্লাহ্, পরাক্রমশালী, হিকমতওয়ালা।'

قُلْ اَرُوْنِيَ الَّذِيْنَ اَلْحَقْتُمْ بِهٖ شُرَكَآءَ كَلَّا ۗ بَلْ هُوَ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٧﴾

২৮. আর আমরা তো আপনাকে সমগ্র মানুষের জন্যই সুসংবাদদাতা ও

وَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا

তথা সর্বনিম্ন আকাশের ফেরেশ্‌তাগণও তসবীহ পাঠে আত্মনিয়োগ করে ফেলে। অতঃপর তারা আরশ বহনকারী ফেরেশ্‌তাগণের নিকটবর্তী ফেরেশ্‌তাগণকে জিজ্ঞেস করে, আপনাদের পালনকর্তা কি আদেশ দিয়েছেন? তারা তা বলে দেয়। এভাবে তাদের নীচের আকাশের ফেরেশ্‌তারা উপরের ফেরেশ্‌তাগণকে একই প্রশ্ন করে। এভাবে দুনিয়ার আকাশ পর্যন্ত সওয়াল ও জওয়াব পৌঁছে যায়। [মুসলিম: ২২২৯]

(১) অর্থাৎ দু'দলের মধ্যে কেউ হক পথে থাকবে, আর কেউ থাকবে ভ্রান্ত পথে। [সা'দী]

وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٨﴾

সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি[১]; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না ।

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٩﴾

২৯. আর তারা বলে, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল, এ প্রতিশ্রুতি কখন বাস্তবায়িত হবে?'

قُلْ لَّكُمْ مِّيْعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَاْخِرُوْنَ عَنْهُ سَاعَةً وَّلَا تَسْتَقْدِمُوْنَ ﴿٣٠﴾

৩০. বলুন, 'তোমাদের জন্য আছে এক নির্ধারিত দিনের প্রতিশ্রুতি, তা থেকে তোমরা মুহূর্তকালও বিলম্ব করতে পারবে না, আর ত্বরান্বিতও করতে পারবে না ।'

---

(১) আলোচ্য আয়াতে রেসালাতের বিষয় বর্ণিত হয়েছে এবং বিশেষভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আমাদের রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশ্বের সমগ্র জাতিসমূহের প্রতি প্রেরিত হয়েছেন । [তাবারী,ইবন কাসীর]
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কেবল তার নিজের দেশ বা যুগের জন্য নয় বরং কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মানব জাতির জন্য পাঠানো হয়েছে, একথা কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছেঃ "আর আমার প্রতি এ কুরআন অহীর সাহায্যে পাঠানো হয়েছে যাতে এর মাধ্যমে আমি তোমাদেরকে এবং যার কাছে এ বাণী পৌঁছে যায় তাকেই সতর্ক করে দেই ।" [সূরা আল-আন'আম: ১৯৭] "হে নবী ! বলে দিন, হে মানবজাতি, আমি হচ্ছি তোমাদের সবার প্রতি আল্লাহ্র রাসূল ।" [সূরা আল-আ'রাফ: ১৫৮] "আর হে নবী ! আমি পাঠিয়েছি আপনাকে সমগ্র সৃষ্টিকুলের জন্যই রহমত হিসেবে ।" [সূরা আল-আম্বিয়া: ১০৭] "বড়ই বরকতসম্পন্ন তিনি যিনি তাঁর বান্দার ওপর ফুরকান নাযিল করেছেন যাতে তিনি সমগ্র সৃষ্টিকুলের জন্য সতর্ককারীতে পরিণত হন ।" [সূরা আল-ফুরকান: ১] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই এই একই বক্তব্য বিভিন্ন হাদীসে বিভিন্নভাবে পেশ করেছেন । যেমন, "আমাকে সাদা কালো সবার কাছে পাঠানো হয়েছে ।" [মুসনাদে আহমাদ: ৩/৩০৪, ৪/৪১৬] "আমাকে ব্যাপকভাবে সমস্ত মানুষের কাছে পাঠানো হয়েছে । অথচ আমার আগে যে নবীই অতিক্রান্ত হয়েছেন তাঁকে নির্দিষ্ট জাতির কাছে পাঠানো হতো ।" [মুসনাদে আহমাদ: ২/২২২] "প্রথমে প্রত্যেক নবীকে বিশেষভাবে তার জাতির কাছে পাঠানো হতো আর আমাকে সমগ্র মানব জাতির কাছে পাঠানো হয়েছে । [বুখারী:৩৩৫, মুসলিম: ৫২১] "আমার আগমন ও কিয়ামতের অবস্থান এরূপ, একথা বলতে গিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের দু'টি আঙুল উঠান ।" [বুখারী:৪৯৩৬, মুসলিম:৮৬৭]

চতুর্থ রুকূ'

৩১. আর যারা কুফরী করেছে তারা বলে, 'আমরা এ কুরআনের ওপর কখনো ঈমান আনব না এবং এর আগে যা আছে তাতেও না।' আর হায়! আপনি যদি দেখতেন যালিমদেরকে, যখন তাদের রবের সামনে দাঁড় করানো হবে, তখন তারা পরস্পর বাদ-প্রতিবাদ করতে থাকবে, যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত, তারা অহংকারীদেরকে বলবে, 'তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই মুমিন হতাম।'

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ۗ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴿٣١﴾

৩২. যারা অহংকারী ছিল তারা, যাদেরকে দূর্বল করে রাখা হয়েছিল তাদেরকে বলবে, 'তোমাদের কাছে সৎপথের দিশা আসার পর আমরা কি তোমাদেরকে তা থেকে নিবৃত্ত করেছিলাম? বরং তোমরাই ছিলে অপরাধী।'

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ ۖ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ ﴿٣٢﴾

৩৩. আর যাদেরকে দুর্বল করে রাখা হয়েছিল তারা, যারা অহংকার করেছিল তাদেরকে বলবে, 'প্রকৃতপক্ষে তোমরাই তো দিনরাত চক্রান্তে লিপ্ত ছিলে, যখন তোমরা আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলে যেন আমরা আল্লাহ্‌র সাথে কুফরী করি এবং তাঁর জন্য সমকক্ষ (শির্ক) স্থাপন করি[১]।'

وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا ۚ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ ۚ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٣﴾

(১) অন্যকথায় এ জনতার জবাব হবে, তোমরা এ দায়িত্বের ক্ষেত্রে আমাদেরকে সমান অংশীদার করছ কেমন করে? তোমাদের কি মনে আছে, তোমরা চালবাজী, প্রতারণা ও মিথ্যা প্রচারণার কেমন মোহময় যাদু সৃষ্টি করে রেখেছিলে এবং রাতদিন আল্লাহর বান্দাদেরকে নিজেদের ফাঁদে আটকাবার জন্য কেমন সব পদক্ষেপ নিয়েছিলে?

আর যখন তারা শাস্তি দেখতে পাবে, তখন তারা অনুতাপ গোপন রাখবে এবং যারা কুফরী করেছে আমরা তাদের গলায় শৃঙ্খল পরাব। তারা যা করত তাদেরকে কেবল তারই প্রতিফল দেয়া হবে।

৩৪. আর আমরা কোন জনপদে সতর্ককারী প্রেরণ করলেই তার বিত্তশালী অধিবাসীরা বলেছে, 'তোমরা যা সহ প্রেরিত হয়েছ আমরা তার সাথে কুফরী করি[১]।'

وَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَآ اِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿٣٤﴾

৩৫. তারা আরও বলেছে, 'আমরা ধনে-জনে সমৃদ্ধশালী; আর আমাদেরকে কিছুতেই শাস্তি দেয়া হবে না[২]।'

وَقَالُوْا نَحْنُ اَكْثَرُ اَمْوَالًا وَّاَوْلَادًا وَّمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ﴿٣٥﴾

তোমরা আমাদের সামনে দুনিয়া পেশ করেছিলে এবং আমরা তার জন্য জান দিয়ে দিলাম, ব্যাপারতো মাত্র এতটুকুই ছিল না বরং তোমরা রাতদিনের প্রতারণা ও চালাকির মাধ্যমে আমাদেরকে বেকুব বানাচ্ছিলে এবং তোমাদের প্রত্যেক শিকারী প্রতিদিন একটি নতুন জাল তৈরী করে নানা ছলচাতুরী ও কলা-কৌশলের মাধ্যমে আল্লাহর বান্দাদেরকে তাতে ফাঁসিয়ে দিচ্ছিল, এটাও ছিল বাস্তব ঘটনা। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পদ্ধতিতে নেতাদের এই বিবাদের উল্লেখ করা হয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য নিম্নোক্ত স্থানগুলো দেখুন, সূরা আল-আ'রাফ, ৩৮-৩৯ সূরা ইবরাহীম, ২১; আল কাসাস, ৬৩; আল মুমিন, ৪৭-৪৮ এবং হা মীম আস্ সাজদাহ, ২৯ আয়াত।

(১) একথা কুরআন মজীদের বহুস্থানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আম্বিয়া আলাইহিমুস্সালামের দাওয়াতকে সর্বপ্রথম ও সবার আগে রুখে দাঁড়াতো সমাজের সচ্ছল শ্রেণী, যারা অর্থ-বিত্ত, সহায়-সম্পদ ও কর্তৃত্ব-ক্ষমতার অধিকারী ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নোক্ত স্থানগুলো দেখুন, [আল আন'আম, ১২৩; আল আ'রাফ, ৬০,৬৬,৭৫,৮০,৯০; সূরা হুদ, ২৭; বনী ইসরাঈল, ১৬; আল মু'মিমূন, ২৪, ৩৩ থেকে ৩৮,৪৬,৪৭ এবং আয্ যুখরুফ, ২৩ আয়াত]।

(২) এখানে তাদের উক্তি বর্ণিত হয়েছেঃ 'আমরা ধনে-জনে সবদিক দিয়েই তোমাদের অপেক্ষা বেশী সমৃদ্ধ। সুতরাং আমরা আযাবে পতিত হব না।' (বাহ্যতঃ তাদের উক্তির উদ্দেশ্য ছিল এই যে, আল্লাহ তা'আলার কাছে আমরা শাস্তিযোগ্য হলে আমাদের এই

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝٣٦

৩৬. বলুন, 'আমার রব যার প্রতি ইচ্ছে তার রিযিক বাড়িয়ে দেন অথবা সীমিত করেন; কিন্তু অধিকাংশ লোকই এটা জানে না।'

পঞ্চম রুকূ'

وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ ۝٣٧

৩৭. আর তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি এমন কিছু নয় যা তোমাদেরকে মর্যাদায় আমাদের নিকটবর্তী করে দেবে; তবে যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, তারাই তাদের কাজের জন্য পাবে বহুগুণ প্রতিদান; আর তারা সুউচ্চ প্রাসাদে নিরাপদে থাকবে।

বিপুল ধনৈশ্বর্য্য কেন দিতেন?) ৩৬ ও ৩৭ আয়াতে তাদের জওয়াব দেয়া হয়েছে যে, দুনিয়াতে ধন-সম্পদ, মান-সম্মান ও প্রভাব প্রতিপত্তির হ্রাস-বৃদ্ধি আল্লাহর কাছে প্রিয়-অপ্রিয় হওয়ার দলীল নয়; বরং সৃষ্টিগত সুবিবেচনার ভিত্তিতে দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা অগাধ ধন-সম্পদ দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা কম দেন। এর রহস্য তিনিই জানেন। ধন-সম্পদের প্রাচুর্যকে আল্লাহর প্রিয় হওয়ার দলীল মনে করা মূর্খতা। আল্লাহর প্রিয় হওয়া একমাত্র ঈমান ও সৎকর্মের উপর নির্ভরশীল। যে ব্যক্তি এগুলো অর্জন করে না, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্য তাকে আল্লাহর প্রিয়পাত্র করতে পারে না। এ বিষয়বস্তুটি পবিত্র কুরআন বিভিন্ন আয়াতে ব্যক্ত করেছে। এক আয়াতে আছেঃ 'তারা কি মনে করে যে, আমি ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা তাদেরকে যে সাহায্য করি, তা তাদের জন্যে পরিণাম ও আখেরাতের দিক দিয়েও মঙ্গলজনক? (কখনই নয়) বরং তারা আসল সত্য সম্পর্কে বে-খবর।' [সূরা আল-মুমিনূন: ৫৫-৫৬] (অর্থাৎ তারা বেখবর যে, যে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি মানুষকে আল্লাহ থেকে গাফেল করে দেয়, তা তাদের জন্যে শাস্তিস্বরূপ) এ ছাড়াও পবিত্র কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে দুনিয়া পূজারীদের এ বিভ্রান্তির উল্লেখ করে তা খণ্ডন করা হয়েছে। [দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নোক্ত স্থানগুলো দেখুনঃ আল বাকারাহ, ১২৬,২১২; আত তাওবাহ, ৫৫, ৬৯; হূদ, ৩, ২৭; আর রা'দ, ২৬; আল কাহ্ফ, ৩৪-৪৩; , মার্ইয়াম, ৭৩-৭৭; ত্বা-হা, ১৩১; আল মুমিনূন, ৫৫-৬১; আশ্ শু'আরা, ১১১; আল কাসাস, ৭৬-৮৩; আর্ রূম, ৯; আল মুদ্দাসসির, ১১-২৬; এবং আল ফাজর, ১৫-২০;] আয়াত। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ তোমাদের রূপ ও ধন-সম্পদ দেখেন না, তিনি তোমাদের অন্তর ও কাজকর্ম দেখেন। [মুসলিম : ২৫৬৪]

৩৮. আর যারা আমাদের আয়াতকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করে, তারা হবে শাস্তিতে উপস্থিতকৃত।

وَالَّذِيْنَ يَسْعَوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ ﴿٣٨﴾

৩৯. বলুন, 'নিশ্চয় আমার রব তো তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছে রিযিক বাড়িয়ে দেন এবং তার জন্য সীমিত করেন। আর তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে, তিনি তার বিনিময় দেবেন[১] এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা।'

قُلْ اِنَّ رَبِّيْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ ۚ وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهٗ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ﴿٣٩﴾

৪০. আর স্মরণ করুন, যেদিন তিনি তাদের সকলকে একত্র করবেন তারপর ফেরেশ্‌তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, 'এরা কি তোমাদেরই ইবাদাত করত[২]?'

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ يَقُوْلُ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اَهٰٓؤُلَآءِ اِيَّاكُمْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ ﴿٤٠﴾

৪১. ফেরেশ্‌তারা বলবে, 'আপনি পবিত্র, মহান! আপনিই আমাদের অভিভাবক, তারা নয়; বরং তারা তো ইবাদাত করত জিনদের। তাদের অধিকাংশই জিনদের প্রতি ঈমান রাখত।

قَالُوْا سُبْحٰنَكَ اَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ بَلْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ الْجِنَّ ۚ اَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُّؤْمِنُوْنَ ﴿٤١﴾

---

(১) অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার আদেশ অনুযায়ী ব্যয় করে তাকে বিনিময় দান আল্লাহ নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করেছেন। [কুরতুবী] হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'প্রতিদিন ভোরে দু'জন ফেরেশতা নাযিল হয়। তাদের একজন এ দো'আ করতে থাকে যে, হে আল্লাহ্, আপনি ব্যয়কারীকে প্রতিফল দিন। আরেকজন দো'আ করে যে, হে আল্লাহ্, যে ব্যয় করে না তার সম্পদ ধ্বংস করে দিন' [বুখারী:১৪৪২, মুসলিম:১০১০]

(২) কিয়ামতে এ প্রশ্ন কেবল ফেরেশ্‌তাদেরকেই করা হবে না বরং দুনিয়ায় যাদের ইবাদাত ও পূজা করা হয় তাদেরকেও করা হবে। তাই অন্যত্র বলা হয়েছেঃ "যেদিন আল্লাহ এদেরকে এবং যেসব সত্তার এরা ইবাদাত করতো তাদের সবাইকে একত্র করবেন তারপর জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা কি আমার এ বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিলে, না এরা নিজেরাই সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছিল ?" [সূরা আল-ফুরকান:১৭]

فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّفْعًا وَّلَا ضَرًّا ۭ وَنَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّتِيْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ۝

৪২. 'ফলে আজ তোমাদের একে অন্যের উপকার বা অপকার করার মালিক হবে না।' আর যারা যুলুম করেছিল আমরা তাদেরকে বলব, 'তোমরা যে আগুনের শাস্তিতে মিথ্যারোপ করেছিলে তা আস্বাদন কর।'

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالُوْا مَا هٰذَآ اِلَّا رَجُلٌ يُّرِيْدُ اَنْ يَّصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَاۗؤُكُمْ ۚ وَقَالُوْا مَا هٰذَآ اِلَّآ اِفْكٌ مُّفْتَرًى ۭ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاۗءَهُمْ ۙ اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝

৪৩. আর তাদের কাছে যখন আমাদের সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয় তখন তারা বলে, 'তোমাদের পূর্বপুরুষ যার 'ইবাদাত করত এ ব্যক্তিই তো তার 'ইবাদাতে তোমাদেরকে বাধা দিতে চায়।' তারা আরও বলে, 'এটা তো মিথ্যা উদ্ভাবন ছাড়া আর কিছুই নয়'। আর কাফিরদের কাছে যখন সত্য আসে তখন তারা বলে, 'এ তো এক সুস্পষ্ট জাদু।'

وَمَآ اٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ كُتُبٍ يَّدْرُسُوْنَهَا وَمَآ اَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَّذِيْرٍ ۝

৪৪. আর আমরা তাদেরকে আগে কোন কিতাব দেইনি যা তারা অধ্যয়ন করত এবং আপনার আগে এদের কাছে কোন সতর্ককারীও প্রেরণ করিনি[১]।

وَكَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۙ وَمَا بَلَغُوْا مِعْشَارَ مَآ اٰتَيْنٰهُمْ فَكَذَّبُوْا رُسُلِيْ ۣ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ۝

৪৫. আর তাদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যারোপ করেছিল। অথচ তাদেরকে আমরা যা দিয়েছিলাম, এরা (মক্কাবাসীরা) তার এক-দশমাংশও পায়নি, তারপরও তারা আমার রাসূলদের প্রতি মিথ্যারোপ করেছে। ফলে কেমন হয়েছিল আমার প্রত্যাখ্যান (শাস্তি)!

(১) কাতাদাহ বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আরব জাতির কাছে কুরআনের আগে কোন কিতাব পাঠান নি এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগে (দূর অতীতে) কোন নবীও পাঠান নি। [তাবারী]

ষষ্ঠ রুকূ'

قُلْ اِنَّمَآ اَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ۚ اَنْ تَقُوْمُوْا لِلّٰهِ مَثْنٰى وَفُرَادٰى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوْا ۗ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ جِنَّةٍ ۗ اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ ﴿٤٦﴾

৪৬. বলুন, 'আমি তোমাদেরকে কেবল একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছিঃ তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে দু-দুজন অথবা এক-একজন করে দাঁড়াও, তারপর তোমরা চিন্তা করে দেখ---তোমাদের সাথীর মধ্যে কোন উন্মাদনা নেই। তিনি তো আসন্ন কঠিন শাস্তি সম্পর্কে তোমাদের জন্য একজন সতর্ককারী মাত্র[১]।'

قُلْ مَا سَاَلْتُكُمْ مِّنْ اَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ۗ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ﴿٤٧﴾

৪৭. বলুন, 'যদি আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই তবে তা তোমাদেরই জন্য[২]; আমার পুরস্কার তো আছে কেবল আল্লাহ্‌র কাছে এবং তিনি সব কিছু প্রত্যক্ষকারী।'

قُلْ اِنَّ رَبِّيْ يَقْذِفُ بِالْحَقِّ ۚ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ﴿٤٨﴾

৪৮. বলুন, 'নিশ্চয় আমার রব সত্য দিয়ে আঘাত করেন[৩]; যাবতীয় গায়েবের

---

(১) আয়াতে কাফেরদেরকে দাওয়াত দেয়ার এক সুন্দর পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে বিনা চিন্তা-ভাবনা করে আমার অনুসরণ করতে বলছি না। অনুরূপভাবে তোমাদের কথাও ছেড়ে দিতে তোমাদের বলছি না। আমি তো শুধু এটাই বলব যে, তোমরা নিজেরা সব রকমের প্রবৃত্তি তাড়িত কথা পরিত্যাগ করে এ নবী সম্পর্কে চিন্তা করে দেখ, তিনি কিসের আহ্বান জানাচ্ছেন, এতে তার লাভ কি? তিনি কি আসলেই পাগলামীর মত কিছু বলছেন। যদি তোমরা এককভাবে চিন্তা করে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে না পার, তবে দুইজন পরস্পর আলোচনা করে সিদ্ধান্তে যাও। যদি তোমরা এটা কর, তবে নিশ্চিত যে, তোমরা সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারবে। [সা'দী]

(২) কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে, বলুন, 'আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না, তবে যে ইচ্ছে করে সে তার প্রতিপালকের পথ অবলম্বন করুক।' [সূরা আল-ফুরকান: ৫৭] আরও এসেছে, বলুন, 'আমি এর বিনিময়ে তোমাদের কাছ থেকে আত্মীয়ের সৌহার্দ্য ছাড়া অন্য কোন প্রতিদান চাই না।' [সূরা আশ-শূরা: ২৩]

(৩) অর্থাৎ আমার আলেমুল-গায়ব পালনকর্তা সত্যকে মিথ্যার উপর ছুঁড়ে মারেন। ফলে

সম্যক জ্ঞানী ।’

৪৯. বলুন, ‘সত্য এসেছে, আর অসত্য না পারে নতুন কিছু সৃজন করতে এবং না পারে পুনরাবৃত্তি করতে[১] ।’

قُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴿٤٩﴾

৫০. বলুন, ‘আমি বিভ্রান্ত হলে বিভ্রান্তির পরিণাম আমারই, আর যদি আমি সৎপথে থাকি তবে তা এ জন্যে যে, আমার রব আমার প্রতি ওহী পাঠান । নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, অতি নিকটবর্তী ।’

قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَآ أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي ۖ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِيٓ إِلَيَّ رَبِّيٓ ۚ إِنَّهُۥ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴿٥٠﴾

৫১. আর আপনি যদি দেখতেন যখন তারা ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়বে, তখন তারা অব্যাহতি পাবে না এবং তারা খুব কাছের স্থান থেকে ধরা পড়বে,

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴿٥١﴾

৫২. আর তারা বলবে, ‘আমরা তাতে ঈমান আনলাম ।’ কিন্তু এত দূরবর্তী স্থান থেকে তারা (ঈমানের) নাগাল পাবে কিরূপে[২]?

وَقَالُوٓا ءَامَنَّا بِهِۦ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍۭ بَعِيدٍ ﴿٥٢﴾

মিথ্যা চুরমার হয়ে যায় । উদ্দেশ্য, মিথ্যার মোকাবেলায় সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা । মিথ্যার উপর সত্যের আঘাতের গুরুতর প্রভাব সৃষ্টি হয় । এটা একটা উপমা । কোন ভারী বস্তুকে হালকা বস্তুর উপর নিক্ষেপ করলে যেমন তা চুরমার হয়ে যায়, তেমনিভাবে সত্যের মোকাবিলায় মিথ্যাও চুরমার হয়ে যায় । তাই এরপর বলা হয়েছে, সত্যের মোকাবিলায় মিথ্যা এমন পর্যুদস্ত হয়ে যায় যে, তা কোন বিষয়ের সুচনা বা পুনরাবৃত্তির যোগ্য থাকে না ।

(১) এখানে বাতিল বলে ইবলীস বুঝানো হয়েছে । [বাগভী]

(২) تناوش অর্থ হাত বাড়িয়ে কোন কিছু তুলে নেয়া । বলাবাহুল্য, যে বস্তু বেশী দূরে নয়, হাতের নাগালের মধ্যে, তাই হাত বাড়িয়ে তোলা যায় । আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, কাফের ও মুশরিকরা কেয়ামতের দিন সত্যাসত্য সামনে এসে যাওয়ার পর বলবে, আমরা কুরআনের প্রতি অথবা রাসূলের প্রতি ঈমান আনলাম । কিন্তু তারা জানে না যে, ঈমানের স্থান তাদের থেকে অনেক দূরে চলে গেছে । ঈমান আনার জায়গা ছিল দুনিয়া । সেখান থেকে এখন তারা বহুদূরে চলে এসেছে । আখেরাতের জগতে

৫৩. আর অবশ্যই তারা পূর্বে তা অস্বীকার করেছিল; এবং তারা দূরবর্তী স্থান থেকে গায়েবের বিষয়ে বাক্য ছুঁড়ে মারত[১]।

وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ ۖ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٥٣﴾

৫৪. আর তাদের ও তাদের বাসনার মধ্যে অন্তরাল করা হয়েছে[২], যেমন আগে করা হয়েছিল এদের সমপন্থীদের ক্ষেত্রে[৩]। নিশ্চয় তারা ছিল বিভ্রান্তিকর সন্দেহের মধ্যে।

وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ ﴿٥٤﴾

পৌঁছে যাবার পর এখন আর তাওবা করা ও ঈমান আনার সুযোগ কোথাও পাওয়া যেতে পারে? কেবল পার্থিব জীবনের ঈমানই গ্রহণীয়। আখেরাত কর্মজগৎ নয়। সেখানকার কোন কর্ম হিসাবে ধরা যাবে না। তাই এটা কেমন করে সম্ভব যে, তারা ঈমানরূপী ধন হাত বাড়িয়ে তুলে নেবে?

(১) না জেনে বিভিন্ন কথা বলত। মুজাহিদ বলেন, তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বলত, জাদুকর, গণক বরং কবি। [আত-তাফসীরুস সহীহ] কাতাদা বলেন, তারা আখেরাত সম্পর্কে না জেনে অনুমানের উপর কথা বলত, তারা বলত, কোন পুনরুত্থান নেই, কোন জান্নাত বা জাহান্নাম নেই। [তাবারী]

(২) হাসান বসরী বলেন, এর অর্থ, তাদের ও আল্লাহ্‌র উপর ঈমানের মাঝে ব্যবধান রেখে দেয়া হয়েছে। [তাবারী] মুজাহিদ বলেন, তাদের ও তারা যে সমস্ত সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও দুনিয়ার সামগ্রী কামনা করে সেগুলোর মধ্যে অন্তরায় তৈরী করা হয়েছে। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(৩) কাতাদাহ বলেন, এর অর্থ, পূর্বেও যারা ঈমান আনেনি, তারা যখন আল্লাহ্‌র আযাব নাযিল হতে দেখেছিল তখন ঈমান আনার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল, কিন্তু তাদের ঈমান তখন আর গ্রহণ করা হয়নি। [তাবারী]

৩৫- সূরা ফাতির
৪৫ আয়াত, ৫ রুকূ', মক্কী

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا اُولِيْٓ اَجْنِحَةٍ مَّثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۗ يَزِيْدُ فِى الْخَلْقِ مَا يَشَآءُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ①

১. সকল প্রশংসা আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌রই[১]--- যিনি রাসূল করেন ফিরিশ্‌তাদেরকে যারা দুই দুই, তিন তিন অথবা চার চার পক্ষবিশিষ্ট[২]। তিনি সৃষ্টিতে যা ইচ্ছে বৃদ্ধি করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۚ

২. আল্লাহ্ মানুষের প্রতি কোন অনুগ্রহ অবারিত করলে কেউ তা নিবারণকারী

(১) আল্লাহ্ তা'আলা এখানে তাঁর নিজের প্রশংসা করছেন। কারণ তিনি আসমান, যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যে সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। এ সৃষ্টিই প্রমাণ করছে যে, তিনি পূর্ণ ক্ষমতাবান। আর যিনি এত ক্ষমতার অধিকারী তাঁর প্রশংসা করাই যথাযথ। [সা'দী] এ আয়াত ছাড়াও কুরআনের অন্যান্য আয়াতে এ ধরণের প্রশংসা আল্লাহ্ নিজেই করেছেন। যেমন, সূরা আল-ফাতিহার প্রথমে, সূরা আল-আন'আমের শুরুতে, সূরা আস-সাফফাতের শেষে। [আদওয়াউল বায়ান]

(২) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাগণকে পালকবিশিষ্ট ডানা দান করেছেন যদ্বারা তারা উড়তে পারে। এ ফেরেশ্‌তাদের হাত ও ডানার অবস্থা ও ধরণ জানার কোন মাধ্যম আমাদের কাছে নেই। কিন্তু এ অবস্থা ও ধরন বর্ণনা করার জন্য আল্লাহ যখন এমন শব্দ ব্যবহার করেছেন যা মানুষের ভাষায় পাখিদের হাত ও ডানার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে তখন অবশ্যই আমাদের ভাষায় এ শব্দকেই আসল অবস্থা ও ধরণ বর্ণনার নিকটতর বলে ধারণা করা যেতে পারে। এর কারণ সুস্পষ্ট যে, তারা আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত দূরত্ব বার বার অতিক্রম করে। এটা দ্রুতগতি সম্পন্ন হওয়ার মাধ্যমেই সম্ভবপর। উড়ার মাধ্যমে দ্রুতগতি হয়ে থাকে। ফেরেশতাগণের পাখার সংখ্যা বিভিন্ন। কারও দুই দুই, কারও তিন তিন এবং কারও চার চার খানা পাখা রয়েছে। এ থেকে বুঝা যায় যে, বিভিন্ন ফেরেশ্‌তাকে আল্লাহ বিভিন্ন পর্যায়ের শক্তি দান করেছেন এবং যাকে দিয়ে যেমন কাজ করতে চান তাকে ঠিক তেমনিই দ্রুতগতি ও কর্মশক্তি ও দান করেছেন। এখানেই শেষ নয়, এক হাদীসে এসেছে, জিবরাঈল আলাইহিস্ সালামের ছয়শ' পাখা রয়েছে [বুখারী: ৩২৩২, মুসলিম: ১৭৪]। দৃষ্টান্ত স্বরূপ চার পর্যন্ত উল্লেখিত হয়েছে।

وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ②

নেই এবং তিনি কিছু নিরুদ্ধ করতে চাইলে পরে কেউ তার উন্মুক্তকারী নেই[১]। আর তিনি পরাক্রমশালী, হিকমতওয়ালা[২]।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ③

৩. হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর। আল্লাহ্ ছাড়া কি কোন স্রষ্টা আছে, যে তোমাদেরকে আসমানসমূহ ও যমীন থেকে রিযিক দান করে? আল্লাহ্ ছাড়া কোন সত্য ইলাহ্ নেই। কাজেই তোমাদেরকে কোথায় ফিরানো হচ্ছে[৩]?

وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ④

৪. আর যদি এরা আপনার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তবে আপনার আগেও রাসূলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করা

(১) অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "এমন কে আছে, যে তোমাদেরকে রিযিক দান করবে, যদি তিনি তাঁর রিযিক বন্ধ করে দেন? বরং তারা অবাধ্যতা ও সত্য বিমুখতায় অবিচল রয়েছে।" [সূরা আল-মুলক: ২১]

(২) এক হাদীসে এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে বলেন, হে বৎস! জেনে রাখ, যদি দুনিয়ার সমস্ত জাতি তোমার কোন উপকার করতে চায় তবে সে আল্লাহ্ যা নির্ধারিত করে রেখেছেন এর বাইরে তোমার কোন উপকার করতে পারবে না, পক্ষান্তরে যদি দুনিয়ার সমস্ত জাতি তোমার ক্ষতি করতে চায় তবে ততটুকুই ক্ষতি করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ্ তোমার উপর লিখে রেখেছেন।' [তিরমিযী:২৫১৬]

(৩) অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "বলুন, 'কে আসমানসমূহ ও যমীনের রব?' বলুন, 'আল্লাহ্।' বলুন, 'তবে কি তোমরা অভিভাবকরূপে গ্রহণ করেছ আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্যকে যারা নিজেদের লাভ বা ক্ষতি সাধনে সক্ষম নয়?' বলুন, 'অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হতে পারে? নাকি অন্ধকার ও আলো সমান হতে পারে?' তবে কি তারা আল্লাহ্‌র এমন শরীক করেছে, যারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মত সৃষ্টি করেছে, যে কারণে সৃষ্টি তাদের কাছে সদৃশ মনে হয়েছে? বলুন, 'আল্লাহ্ সকল বস্তুর স্রষ্টা ; আর তিনি এক, মহা প্রতাপশালী।" [সূরা আর-রা'দ: ১৬] [আদওয়াউল বায়ান]

হয়েছিল[১]। আর আল্লাহ্‌র দিকেই সকল বিষয় প্রত্যাবর্তিত হবে।

৫. হে মানুষ! নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য; কাজেই দুনিয়ার জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রতারিত না করে এবং সে প্রবঞ্চক (শয়তান) যেন কিছুতেই তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র ব্যাপারে প্রবঞ্চিত না করে[২]।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ۝٥

৬. নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু; কাজেই তাকে শত্রু হিসেবেই গ্রহণ কর। সে তো তার দলবলকে ডাকে শুধু এজন্যে যে, তারা যেন প্রজ্জলিত আগুনের অধিবাসী হয়।

إِنَّ ٱلشَّيْطَٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُوا۟ حِزْبَهُۥ لِيَكُونُوا۟ مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ ۝٦

---

(১) কাতাদাহ বলেন, এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা প্রদান করা হচ্ছে, যেমনটি তোমরা শুনতে পাচ্ছ। [তাবারী]

(২) الغرور শব্দটি আধিক্যবোধক। অর্থাৎ, “অতি প্রবঞ্চক” বা “বড় প্রতারক” এখানে হচ্ছে শয়তান যেমন সামনের বাক্য বলছে। তার কাজই মানুষকে প্রতারিত করে কুফর ও গোনাহে লিপ্ত করা। বলা হয়েছে, ‘শয়তান যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র ব্যাপারে ধোঁকা না দেয়। মূলতঃ শয়তানের ধোঁকা বিভিন্ন ধরনের। কখনো কখনো সে মন্দ কর্মকে শোভনীয় করে মানুষদেরকে তাতে লিপ্ত করে দেয়। তখন মানুষের অবস্থা হয় যে, তারা গোনাহ্ করার সাথে সাথে মনে করতে থাকে যে, তারা আল্লাহ্‌র প্রিয় এবং তাদের শাস্তি হবে না। আবার কখনো কখনো সন্দেহ সৃষ্টি করে তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে দেয়। শয়তান লোকদেরকে একথা বুঝায় যে, আসলে আল্লাহ বলে কিছুই নেই এবং কিছু লোককে এ বিভ্রান্তির শিকার করে যে, আল্লাহ একবার দুনিয়াটা চালিয়ে দিয়ে তারপর বসে আরাম করছেন, এখন তাঁর সৃষ্ট এ বিশ্ব-জাহানের সাথে কার্যত তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। আবার কিছু লোককে সে এভাবে ধোঁকা দেয় যে, আল্লাহ অবশ্যই এ বিশ্ব-জাহানের ব্যবস্থাপনা করে যাচ্ছেন কিন্তু তিনি মানুষকে পথ দেখাবার কোন দায়িত্ব নেননি। কাজেই এ অহী ও রিসালাত নিছক একটি ধোঁকাবাজী ছাড়া আর কিছুই নয়। সে কিছু লোককে এ মিথ্যা আশ্বাসও দিয়ে চলছে যে, আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান, তোমরা যতই গোনাহ কর না কেন তিনি সব মাফ করে দেবেন এবং তাঁর এমন কিছু প্রিয় বান্দা আছে যাদেরকে আঁকড়ে ধরলেই তোমরা কামিয়াব হয়ে যাবে। [এ ব্যাপারে বিস্তারিত দেখুন, ইবনুল কাইয়্যেম, ইগাসাতুল লাহফান ফী মাসায়িদিস শায়তান]

৭. যারা কুফরী করে তাদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি। আর যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তাদের জন্য আছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۬ؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ ۟

দ্বিতীয় রুকূ'

৮. কাউকে যদি তার মন্দকাজ শোভন করে দেখানো হয় ফলে সে এটাকে উত্তম মনে করে, (সে ব্যক্তি কি তার সমান যে সৎকাজ করে?) তবে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছে বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছে হিদায়াত করেন[১]। অতএব তাদের জন্য আক্ষেপ করে আপনার প্রাণ যেন ধ্বংস না হয়। তারা যা করে নিশ্চয় আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত।

اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهٗ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ فَرَاٰهُ حَسَنًا ؕ فَاِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ۖؗ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرٰتٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ۟

৯. আর আল্লাহ্, যিনি বায়ু পাঠিয়ে তা দ্বারা মেঘমালা সঞ্চারিত করেন। তারপর আমরা সেটাকে নির্জীব ভূখণ্ডের দিকে পরিচালিত করি, এরপর আমরা তা দ্বারা যমীনকে তার মৃত্যুর পর আবার জীবিত করি। এভাবেই হবে মৃত্যুর পর আবার জীবিত হয়ে উঠা[২]।

وَاللّٰهُ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَسُقْنٰهُ اِلٰى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَحْيَيْنَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ كَذٰلِكَ النُّشُوْرُ ۟

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সৃষ্টিকে অন্ধকারে সৃষ্টি করেছেন। তারপর সেগুলোতে তার নূরের আলো ফেললেন। সুতরাং যার কাছে এ নূরের কিছু পৌঁছেছে সেই হেদায়েত প্রাপ্ত হবে। আর যার কাছে সে নূরের আলো পৌঁছেনি সে ভ্রষ্ট হবে। আর এজন্যই বলি, আল্লাহ্‌র জ্ঞান অনুসারে কলম শুকিয়ে গেছে। [তিরমিযী: ২৬৪২; মুসনাদে আহমাদ: ২/১৭৬]

(২) মৃত্যুর পর জীবিত হয়ে উঠার জন্য আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে উদ্ভিদ উৎপন্ন করার উদাহরণ আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনের অন্যত্রও পেশ করেছেন। [আদওয়াউল বায়ান]

১০. যে কেউ সম্মান-প্রতিপত্তি চায়, তবে সকল সম্মান-প্রতিপত্তির মালিক তো আল্লাহ্‌ই[১]। তাঁরই দিকে পবিত্র বাণীসমূহ হয় সমুত্থিত এবং সৎকাজ, তিনি তা করেন উন্নীত[২]। আর যারা মন্দকাজের ফন্দি আঁটে তাদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি। আর তাদের ষড়যন্ত্র, তা ব্যর্থ হবেই।

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا ۚ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ۚ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ ﴿١٠﴾

১১. আর আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে; তারপর শুক্রবিন্দু থেকে, তারপর তোমাদেরকে করেছেন যুগল! আল্লাহ্‌র অজ্ঞাতে কোন নারী গর্ভ ধারণ করে না এবং প্রসবও করে না। আর কোন দীর্ঘায়ু ব্যক্তির আয়ু বৃদ্ধি করা হয় না এবং তার আয়ু হ্রাস করা হয় না, কিন্তু তা রয়েছে 'কিতাবে'[৩]। এটা আল্লাহ্‌র

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا ۚ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١١﴾

---

(১) অর্থাৎ সম্মান চাইলে কেবলমাত্র তাঁর কাছেই চাওয়া উচিত। আর তা চাইতে হবে তাঁর আনুগত্য করেই। কারণ, তিনি সম্মান প্রতিপত্তির মালিক। [বাগভী,মুয়াসসার] আসল ও চিরস্থায়ী মর্যাদা, দুনিয়া থেকে নিয়ে আখেরাত পর্যন্ত যা কখনো হীনতা ও লাঞ্ছনার শিকার হতে পারে না, তা কেবলমাত্র আল্লাহর বন্দেগীর মধ্যে পাওয়া যেতে পারে। তুমি যদি তাঁর হয়ে যাও, তাহলে তাঁকে পেয়ে যাবে এবং যদি তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে। [দেখুন, কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

(২) ইবন আব্বাস বলেন, ভাল কথা হচ্ছে, আল্লাহ্‌র যিকির। আর সৎকাজ হচ্ছে, আল্লাহ্‌র ফরয আদায় করা, সুতরাং যে কেউ আল্লাহ্‌র ফরয আদায়ে আল্লাহ্‌র যিকির করবে তারই সে আমল উপরের দিকে উঠবে। আর যে কেউ যিকির করবে, কিন্তু আল্লাহ্‌র ফরয আদায় করবে না তার কথা তার আমলের দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে, তখন সেটা তার ধ্বংসের কারণ হবে। [তাবারী] কাতাদাহ বলেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা আমল ব্যতীত কোন কথা কবুল করেন না। যে ভাল বলল এবং ভাল আমল করল সেটাই শুধু আল্লাহ্‌ কবুল করেন। [তাবারী]

(৩) কিতাবে বলে লাওহে মাহফুযে রয়েছে বুঝানো হয়েছে। [মুয়াসসার] অধিকাংশ

জন্য সহজ[১]।

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرٰنِ ۖ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآئِغٌ شَرَابُهٗ وَهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ۗ وَمِنْ كُلٍّ تَاْكُلُوْنَ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْنَ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ۚ وَتَرَى

১২. আর সাগর দুটি একরূপ নয়ঃ একটির পানি সুমিষ্ট ও সুপেয়, অন্যটির পানি লোনা, খর। আর প্রত্যেকটি থেকে তোমরা তাজা গোশ্‌ত খাও এবং

তাফসীরবিদদের মতে এ আয়াতের মর্ম এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা যাকে দীর্ঘ জীবন দান করেন, তা পূর্বেই লওহে মাহফুযে লিখিত রয়েছে। অনুরূপভাবে স্বল্প জীবনও পূর্ব থেকে লওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ থাকে। যার মর্ম দাঁড়াল এই যে, এখানে ব্যক্তিবিশেষের জীবনের দীর্ঘতা বা হ্রস্বতা বোঝানো উদ্দেশ্য নয়। বরং গোটা মানবজাতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যে, তাদের কাউকে দীর্ঘ জীবন দান করা হয় এবং কাউকে তার চেয়ে কম। কেউ কেউ বলেন, যদি আয়াতের অর্থ একই ব্যক্তির বয়সের হ্রাসবৃদ্ধি ধরে নেয়া যায়, তবে বয়স হ্রাস করার উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তির বয়স আল্লাহ্ তা'আলা যা লিখে দিয়েছেন, তা নিশ্চিত কিন্তু এই নির্দিষ্ট বয়ঃক্রম থেকে একদিন অতিবাহিত হলে একদিন হ্রাস পায়, দু'দিন অতিবাহিত হলে দু'দিন হ্রাস পায়। এমনিভাবে প্রতিটি দিন ও প্রতিটি নিঃশ্বাস তার জীবনকে হ্রাস করতে থাকে। রাসূলুল্লাহ্ বলেন: "যে ব্যক্তি চায় যে, তার রিযিক প্রশস্ত ও জীবন দীর্ঘ হোক, তার উচিত আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদ্ব্যবহার করা।" [বুখারী:২০৬৭, মুসলিম:২৫৫৭] এই হাদীস থেকে বাহ্যতঃ জানা যায় যে, আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহারের ফলে জীবন দীর্ঘ হয়। সারকথা, যেসব হাদীসে কোন কোন কর্ম সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এগুলো সম্পাদন করলে বয়স বেড়ে যায়, সেগুলোর অর্থ, পূর্বেই তার তাকদীরে লিখা আছে অমুক আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করবে, তাই তার আয়ূ বর্ধিত আকারে দেয়া হলো। সুতরাং যে কেউ আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করার তাওফীক পাবে সে যেন এটা বুঝে নেয় যে, এ কারণেই হয়ত: তার আয়ূ বৃদ্ধি ঘটেছে।

(১) যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "হে মানুষ! পুনরুত্থান সম্পর্কে যদি তোমরা সন্দেহে থাক তবে অনুধাবন কর--আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মাটি হতে, তারপর শুক্র হতে, তারপর 'আলাকাহ' (রক্তপিণ্ড বা লেগে থাকে এরকম পিণ্ড) হতে, তারপর পূর্ণাকৃতি অথবা অপূর্ণাকৃতি গোশতপিণ্ড হতে -- যাতে আমরা বিষয়টি তোমাদের কাছে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করি। আর আমরা যা ইচ্ছে তা এক নির্দিষ্ট কালের জন্য মাতৃগর্ভে স্থিত রাখি, তারপর আমরা তোমাদেরকে শিশুরূপে বের করি, পরে যাতে তোমরা পরিণত বয়সে উপনীত হও। তোমাদের মধ্যে কারো কারো মৃত্যু ঘটান হয় এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে কাউকে হীনতম বয়সে প্রত্যাবর্তিত করা হয়, যার ফলে সে জানার পরেও যেন কিছুই (আর) জানে না। [সূরা আল-হাজ্জ: ৫] আরও বলেন, "তিনি শুক্র হতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন ; অথচ দেখুন, সে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী !" [সূরা আন-নাহল: ৪]

الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢﴾

আহরণ কর অলংকার, যা তোমরা পরিধান কর। আর তোমরা দেখ তার বুক চিরে নৌযান চলাচল করে, যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ
الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى ذَٰلِكُمُ
اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ
مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ﴿١٣﴾

১৩. তিনি রাতকে দিনে প্রবেশ করান এবং দিনকে প্রবেশ করান রাতে, তিনি সূর্য ও চাঁদকে করেছেন নিয়মাধীন; প্রত্যেকে পরিভ্রমণ করে এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। তিনিই আল্লাহ্ তোমাদের রব। আধিপত্য তাঁরই। আর তোমরা তাঁর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা তো খেজুর আঁটির আবরণেরও অধিকারী নয়[১]।

إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا
مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ
بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴿١٤﴾

১৪. তোমরা তাদেরকে ডাকলে তারা তোমাদের ডাক শুনবে না এবং শুনলেও তোমাদের ডাকে সাড়া দেবে না। আর তোমরা তাদেরকে যে শরীক করেছ তা তারা কিয়ামতের দিন অস্বীকার করবে[২]। সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র

(১) মূলে "কিতমীর" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিতমীর বলা হয় খেজুরের আঁটির গায়ে জড়ানো পাতলা ঝিল্লি বা আবরণকে। [মুয়াসসার] উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা বলা যে, মুশরিকদের মাবুদ ও উপাস্যরা কোন তুচ্ছ ও নগণ্য জিনিসেরও মালিক নয়। [সা'দী] তারা যে সমস্ত মুর্তি, কতক নবী ও ফেরেশতার পূজা করে; বিপদ মুহূর্তে তাদেরকে আহ্বান করলে প্রথমত: তারা শুনতেই পারবে না। কেননা, তাদের মধ্যে শ্রবনের যোগ্যতাই নেই। নবী ও ফেরেশতাগণের মধ্যে যোগ্যতা থাকলেও তারা তোমাদের আবেদন পূর্ণ করার ক্ষমতা রাখে না। আল্লাহ্ তা'আলার অনুমতি ব্যতিরেকে তারা তাঁর কাছে কারও জন্যে সুপারিশও করতে পারে না।

(২) অর্থাৎ তারা পরিষ্কার বলে দেবে, আমরা কখনো এদেরকে বলিনি, আমরা আল্লাহর শরীক এবং তোমরা আমাদের ইবাদাত করো। বরং আমরা এও জানতাম না যে,

মত কেউই আপনাকে অবহিত করতে পারে না[১]।

তৃতীয় রুকূ'

১৫. হে মানুষ! তোমরা আল্লাহ্‌র মুখাপেক্ষী; আর আল্লাহ্, তিনিই অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।

يَاَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ اِلَى اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿١٥﴾

১৬. তিনি ইচ্ছে করলে তোমাদেরকে অপসৃত করতে পারেন এবং এক নূতন সৃষ্টি নিয়ে আসতে পারেন।

اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ ﴿١٦﴾

১৭. আর এটা আল্লাহ্‌র পক্ষে কঠিন নয়।

وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ ﴿١٧﴾

১৮. আর কোন বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না[২]; এবং কোন

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ۚ وَاِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ

এরা আমাদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সাথে শরীক করছে এবং আমাদের কাছে প্রার্থনা করছে। এদের কোন প্রার্থনা আমাদের কাছে আসেনি এবং এদের কোন নজরানা ও উৎসর্গ আমাদের হস্তগত হয়নি। বরং তারা বলবে, “আপনিই তো কেবল আমাদের অভিভাবক, তারা নয়।” [সাবা:৪১]

(১) সর্বতোভাবে অবহিত বলে আল্লাহকেই বুঝানো হয়েছে। [সা'দী; মুয়াসসার; জালালাইন] অর্থাৎ অন্য কোন ব্যক্তি তো বড় জোর বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি-প্রমাণ পেশ করে শির্ক খণ্ডন ও মুশরিকদের মাবুদদের শক্তিহীনতা বর্ণনা করবে। কিন্তু আমি সরাসরি প্রকৃত অবস্থা জানি। আমি নির্ভুল জ্ঞানের ভিত্তিতে তোমাদের জানাচ্ছি, লোকেরা যাদেরকেই আমার সার্বভৌম কর্তৃত্বের মধ্যে স্বাধীন ক্ষমতাসম্পন্ন করে রেখেছে তারা সবাই ক্ষমতাহীন। তাদের কাছে এমন কোন শক্তি নেই যার মাধ্যমে তারা কারো কোন কাজ সফল বা ব্যর্থ করে দিতে পারে। আমি সরাসরি জানি, কিয়ামতের দিন মুশরিকদের এসব মা'বুদরা নিজেরাই তাদের শির্কের প্রতিবাদ করবে।

(২) অর্থাৎ কেয়ামতের দিন কোন মানুষ অন্য মানুষের পাপভার বহন করতে পারবে না। প্রত্যেককে নিজের বোঝা নিজেই বহন করতে হবে। “বোঝা” মানে কৃতকর্মের দায়-দায়িত্বের বোঝা। এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর কাছে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই তার কাজের জন্য দায়ী এবং প্রত্যেকের ওপর কেবলমাত্র তার নিজের কাজের দায়-দায়িত্ব আরোপিত হয়। এক ব্যক্তির কাজের দায়-দায়িত্বের বোঝা আল্লাহর পক্ষ থেকে অন্য ব্যক্তির ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার কোন সম্ভাবনা নেই। কোন ব্যক্তি অন্যের দায়-দায়িত্বের বোঝা নিজের ওপর চাপিয়ে নেবে এবং তাকে বাঁচাবার জন্য তার অপরাধে নিজেকে পাকড়াও করাবে

إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۚ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ۝

ভারাক্রান্ত ব্যক্তি যদি কাউকেও তা বহন করতে ডাকে তবে তার থেকে কিছুই বহন করা হবে না--- এমনকি নিকট আত্মীয় হলেও(১)। আপনি শুধু তাদেরকেই সতর্ক করতে পারেন যারা তাদের রবকে না দেখে ভয় করে এবং সালাত কায়েম করে। আর যে কেউ নিজেকে পরিশোধন করে, সে তো পরিশোধন করে নিজেরই কল্যাণের জন্য। আর আল্লাহ্‌রই দিকে প্রত্যাবর্তন।

এরও কোন সম্ভাবনা নেই। সূরা আল-আনকাবূতে বলা হয়েছে: “যারা পথভ্রষ্ট করে, তারা নিজেদের পথভ্রষ্টতার বোঝাও বহন করবে এবং তৎসহ তাদের বোঝাও বহন করবে, যাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল।” [১৩] এর অর্থ এমন নয় যে, যাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল, তাদের বোঝা তারা কিছুটা হালকা করে দেবে। বরং তাদের বোঝা তাদের উপর পুরোপুরিই থাকবে, কিন্তু পথ-ভ্রষ্টকারীদের অপরাধ দ্বিগুণ হয়ে যাবে- একটি পথ ভ্রষ্ট হওয়ার ও অপরটি পথভ্রষ্ট করার। অতএব উভয় আয়াতে কোন বৈপরিত্য নেই।

(১) এ বাক্যে বলা হয়েছে, আজ যারা বলছে, তোমরা আমাদের দায়িত্বের কুফরী ও গোনাহের কাজ করে যাও কিয়ামতের দিন তোমাদের গোনাহর বোঝা আমরা নিজেদের ঘাড়ে নিয়ে নেবো তারা আসলে নিছক একটি মিথ্যা ভরসা দিচ্ছে। যখন কিয়ামত আসবে এবং লোকেরা দেখে নেবে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য তারা কোন ধরনের পরিণামের সম্মুখীন হতে যাচ্ছে তখন প্রত্যেকে নিজেকে বাঁচাবার ফিকিরে লেগে যাবে। ভাই ভাইয়ের থেকে এবং পিতা পুত্রের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। কেউ কারো সামান্যতম বোঝা নিজের ওপর চাপিয়ে নিতে প্রস্তুত হবে না। ইকরিমা উল্লেখিত আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, সেদিন এক পিতা তার পুত্রকে বলবে, তুমি জান যে, আমি তোমার প্রতি কেমন স্নেহশীল ও সদয় পিতা ছিলাম। পুত্র স্বীকার করে বলবে, নিশ্চয় আপনার ঋণ অসংখ্য। আমার জন্যে পৃথিবীতে অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন। অত:পর পিতা বলবে, বৎস, আজ আমি তোমার মুখাপেক্ষী। তোমার পূণ্যসমূহের মধ্য থেকে আমাকে যৎসামান্য দিয়ে দাও এতে আমার মুক্তি হয়ে যাবে। পুত্র বলবে, পিতা আপনি সামান্য বস্তুই চেয়েছেন- কিন্তু আমি কি করব, যদি আমি তা আপনাকে দিয়ে দেই, তবে আমারও যে, সে অবস্থা হবে। অতএব আমি অক্ষম। অতঃপর সে তার স্ত্রীকেও এই কথা বলবে যে, দুনিয়াতে আমি তোমার জন্যে সবকিছু বিসর্জন দিয়েছি। আজ তোমার সামান্য পূণ্য আমি চাই। তা দিয়ে দাও। স্ত্রীও পুত্রের অনুরূপ জওয়াব দেবে। [ইবন কাসীর]

১৯. সমান নয় অন্ধ ও চক্ষুষ্মান,

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ﴿١٩﴾

২০. আর না অন্ধকার ও আলো,

وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ﴿٢٠﴾

২১. আর না ছায়া ও রোদ,

وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ ﴿٢١﴾

২২. এবং সমান নয় জীবিত ও মৃত। নিশ্চয় আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছে শোনান; আর আপনি শোনাতে পারবেন না যারা কবরে রয়েছে তাদেরকে।

وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ ۖ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ ﴿٢٢﴾

২৩. আপনি তো একজন সতর্ককারী মাত্র।

إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿٢٣﴾

২৪. নিশ্চয় আমরা আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে; আর এমন কোন উম্মত নেই যার কাছে গত হয়নি সতর্ককারী[১]।

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿٢٤﴾

২৫. আর তারা যদি আপনার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তবে এদের পূর্ববর্তীরাও তো মিথ্যা আরোপ করেছিল---তাদের কাছে এসেছিল তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট প্রমাণাদি, গ্রন্থাদি ও দীপ্তিমান কিতাবসহ।

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿٢٥﴾

---

(১) একথাটি কুরআন মজীদের বিভিন্ন জায়গায় বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, দুনিয়ায় এমন কোন জাতি ও সম্প্রদায় অতিক্রান্ত হয়নি যাকে সত্য-সঠিক পথের সন্ধান দেবার জন্য আল্লাহ কোন নবী পাঠাননি। আরো বলা হয়েছে, 'আর প্রত্যেক জাতির জন্য রয়েছে হেদায়াতকারী' [সূরা আর-রা'দ:৭] অন্যত্র বলা হয়েছে, 'আর আপনার আগে আমরা আগেকার অনেক সম্প্রদায়ের কাছে রাসূল পাঠিয়েছিলাম' [সূরা আল-হিজর:১০] অন্য সূরায় বলা হয়েছে, 'আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত করার ও তাগূতকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি।' [সূরা আন-নাহল:৩৬] অন্যত্র বলা হয়েছে, 'আর আমরা এমন কোন জনপদ ধ্বংস করিনি যার জন্য সতর্ককারী ছিল না; [সূরা আশ-শূ'আরা:২০৮]

ثُمَّ اَخَذْتُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿٢٦﴾

২৬. তারপর যারা কুফরি করেছিল আমি তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিলাম। সুতরাং (দেখে নিন) কেমন ছিল আমার প্রত্যাখ্যান (শাস্তি)!

চতুর্থ রুকূ'

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ ثَمَرٰتٍ مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهَا ۗ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌۢ بِيْضٌ وَّحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهَا وَغَرَابِيْبُ سُوْدٌ ﴿٢٧﴾

২৭. আপনি কি দেখেন না, আল্লাহ্ আকাশ হতে বৃষ্টিপাত করেন; তারপর আমরা তা দ্বারা বিচিত্র বর্ণের ফলমূল উদ্‌গত করি। আর পাহাড়ের মধ্যে আছে বিচিত্র বর্ণের পথ---শুভ্র, লাল ও নিকষ কাল[১]।

وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَآبِّ وَالْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ كَذٰلِكَ ۗ اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ ﴿٢٨﴾

২৮. আর মানুষের মাঝে, জন্তু ও গৃহপালিত জানোয়ারের মাঝেও বিচিত্র বর্ণ রয়েছে অনুরূপ। আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারাই কেবল তাঁকে ভয় করে[২]; নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রবল

(১) পর্বতের ক্ষেত্রে جدد বলা হয়েছে। جدد শব্দটি جدة এর বহুবচন। এর প্রসিদ্ধ অর্থ ছোট গিরিপথ। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] কেউ কেউ جدد এর অর্থ নিয়েছেন অংশ বা খণ্ড। [ফাতহুল কাদীর] উভয় অবস্থায় এর উদ্দেশ্য, পাহাড়ের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন বর্ণবিশিষ্ট হওয়া। এতে সর্বপ্রথম সাদা ও সর্বশেষে কাল রং উল্লেখ করা হয়েছে। মাঝখানে লাল উল্লেখ করে حمر বলা হয়েছে। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

(২) বলা হয়েছে যে, কেবল আলেম ও জ্ঞানীগণই আল্লাহকে ভয় করে। আল্লাহর শক্তিমত্তা, জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও বিজ্ঞানময়তা, ক্রোধ, পরাক্রম, সার্বভৌম কর্তৃত্ব-ক্ষমতা ও অন্যান্য গুণাবলী সম্পর্কে যে ব্যক্তি যতবেশী জানবে সে ততবেশী তাঁর নাফরমানী করতে ভয় পাবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলীর ব্যাপারে যতবেশী অজ্ঞ হবে সে তাঁর ব্যাপারে তত বেশী নির্ভীক হবে। এ আয়াতে জ্ঞান অর্থ দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, অংক ইত্যাদি স্কুল-কলেজে পঠিত বিষয়ের জ্ঞান নয়। বরং এখানে জ্ঞান বলতে আল্লাহর গুণাবলীর জ্ঞান বুঝানো হয়েছে। এ জন্য শিক্ষিত ও অশিক্ষিত হবার প্রশ্ন নেই। তাই আয়াতে العلماء বা 'উলামা' বলে এমন লোকদের বোঝানো হয়েছে, যারা আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে সম্যক অবগত এবং পৃথিবীর সৃষ্টবস্তু সামগ্রী, তার পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও আল্লাহ্‌র দয়া-করুণা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করেন। কেবল আরবী ভাষা, ব্যাকরণ-অলংকারাদি সম্পর্কে জ্ঞানী

পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল ।

ব্যক্তিকেই কুরআনের পরিভাষায় 'আলেম' বলা হয় না । যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে না সে যুগের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হলেও এ জ্ঞানের দৃষ্টিতে সে নিছক একজন মূর্খ ছাড়া আর কিছুই নয় । আর যে ব্যক্তি আল্লাহর গুণাবলী জানে এবং নিজের অন্তরে তাঁর ভীতি পোষণ করে সে অশিক্ষিত হলেও জ্ঞানী । তবে কারও ব্যাপারে তখনই এ আয়াতটির প্রয়োগ ক্ষেত্রে পরিণত হবে যখন তাদের মধ্যে আল্লাহভীতি থাকবে । রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও এক হাদীসে ইঙ্গিত করেছেন । তিনি বলেন, 'যদি আমি যা জানি তা তোমরা জানতে তবে হাসতে কম কাঁদতে বেশী । [বুখারী:৬৪৮৬, মুসলিম:২৩৫৯] এর কারণ, রাসূল আল্লাহকে সবচেয়ে বেশী জানেন, তার তাকওয়াও সবচেয়ে বেশী । আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু একথাই বলেছেন, "বিপুল সংখ্যক হাদীস জানা জ্ঞানের পরিচায়ক নয় বরং বেশী পরিমাণ আল্লাহভীতিই জ্ঞানের পরিচয় বহন করে ।" ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, 'তারাই হচ্ছে আলেম যারা নিশ্চিত বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্ সবকিছুর উপর শক্তিমান ।' তিনি আরও বলেছেন, 'সেই ব্যক্তি রহমান সম্পর্কে আলেম যিনি তাঁর সাথে কাউকে শরীক করেন নি, তাঁর হালালকে হালাল করেছেন, হারামকে হারাম করেছেন, তাঁর অসীয়ত বা নির্দেশাবলীর পূর্ণ হিফাযত করেছেন, আর বিশ্বাস করেছেন যে, একদিন তাকে তার সাথে সাক্ষাত করতে হবে এবং তার যাবতীয় কর্মকাণ্ডের হিসাব দিতে হবে ।' হাসান বাসরী রাহেমাহুল্লাহ বলেন, "আল্লাহকে না দেখে বা একান্তে ও জনসমক্ষে যে ভয় করে সেই হচ্ছে আলেম । আল্লাহ যা কিছু পছন্দ করেন সেদিকেই আকৃষ্ট হয় এবং যে বিষয়ে আল্লাহ নারাজ সে ব্যাপারে সে কোন আগ্রহ পোষণ করে না ।" সুফিয়ান সাওরী বর্ণনা করেন যে, জ্ঞানী তিন ধরনের হয় । এক. আল্লাহ্ সম্পর্কে সম্যক অবগত, তাঁর নির্দেশ সম্পর্কেও জ্ঞানী । দুই. আল্লাহ্ সম্পর্কে সম্যক অবগত, কিন্ত তাঁর নির্দেশ সম্পর্কে অজ্ঞ । তিন. আল্লাহ্র নির্দেশ সম্পর্কে জ্ঞানী, কিন্তু আল্লাহ্ সম্পর্কে অজ্ঞ । সুতরাং যে আল্লাহ্ সম্পর্কে সম্যক অবগত ও তার নির্দেশ সম্পর্কেও জ্ঞানী সে হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহকে ভয় করে এবং আল্লাহর ফরয ওয়াজিবের সীমারেখা সম্পর্কে জ্ঞান রাখে । আর যে আল্লাহর নির্দেশ সম্পর্কে জ্ঞানী কিন্তু আল্লাহ সম্পর্কে অজ্ঞ সে হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহকে ভয় করে কিন্তু তাঁর ফরয ওয়াজিবের সীমারেখা সম্পর্কে জ্ঞান রাখেনা । আর যে আল্লাহ্র নির্দেশ সম্পর্কে জ্ঞানী অথচ তাঁর সম্পর্কে জ্ঞান রাখেনা সে এ ব্যক্তি যে, আল্লাহকে ভয় করে না কিন্তু আল্লাহর ফরয ওয়াজিবের সীমারেখা সম্পর্কে জ্ঞান রাখে । সারকথা, যার মধ্যে যে পরিমাণ আল্লাহ্ ভীতি হবে, সে সেই পরিমাণ আলেম হবে । আহমদ ইবনে সালেহ্ মিসরী বলেন, অধিক বর্ণনা ও অধিক জ্ঞান দ্বারা আল্লাহভীতির পরিচয় পাওয়া যায় না; বরং কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ দ্বারা এর পরিচয় পাওয়া যায় । সুতরাং যার মধ্যে আল্লাহ্ভীতি নেই, সে আলেম নয় । [দেখুন, তাবারী; বাগভী; কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

২৯. নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌র কিতাব তিলাওয়াত করে এবং সালাত কায়েম করে, আর আমরা তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারাই আশা করে এমন ব্যবসায়ের, যার ক্ষয় নেই ।

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَٰبَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَٰرَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾

৩০. যাতে আল্লাহ তাদের কাজের প্রতিফল পরিপূর্ণ ভাবে দেন এবং তিনি নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে আরো বেশী দেন । নিশ্চয় তিনি পরম ক্ষমাশীল, অসীম গুণগ্রাহী ।

لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٠﴾

৩১. আর আমরা কিতাব হতে আপনার প্রতি যে ওহী করেছি তা সত্য, এর আগে যা রয়েছে তার প্রত্যয়নকারী । নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক অবহিত, সর্বদ্রষ্টা ।

وَالَّذِىٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَٰبِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِۦ لَخَبِيرٌۢ بَصِيرٌ ﴿٣١﴾

৩২. তারপর আমরা কিতাবের অধিকারী করলাম তাদেরকে, যাদেরকে আমাদের বান্দাদের মধ্য থেকে আমরা মনোনীত করেছি[১]; তবে তাদের কেউ নিজের প্রতি অত্যাচারী, কেউ মধ্যমপন্থী এবং কেউ আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় কল্যাণের কাজে অগ্রগামী[২] । এটাই তো

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَٰبَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۖ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِۦ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌۢ بِالْخَيْرَٰتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٣٢﴾

(১) অর্থাৎ আমার বান্দাদের মধ্যে যাদেরকে আমি মনোনীত করেছি । অধিকাংশ তফসীরবিদ এর অর্থ নিয়েছেন উম্মতে মুহাম্মদী । [ইবন কাসীর] আলেমগণ প্রত্যক্ষভাবে এবং অন্যান্য মুসলিমগণ আলেমগণের মধ্যস্থতায় এর অন্তর্ভুক্ত ।

(২) অর্থাৎ যাদেরকে মনোনীত করে কুরআনের অধিকারী করেছি, তারা তিন প্রকার । [ইবন কাসীর] এক. যুলুমকারী মুসলিম । এরা হচ্ছে এমনসব লোক যারা আন্তরিকতা সহকারে কুরআনকে আল্লাহর কিতাব এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহর রাসূল বলে মানে কিন্তু কার্যত আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতের অনুসরণের হক আদায় করে না । এরা মুমিন কিন্তু গোনাহগার । অপরাধী কিন্তু বিদ্রোহী

নয়। দূর্বল ঈমানদার, তবে মুনাফিক নয় এবং চিন্তা ও মননের দিক দিয়ে কাফেরও নয়। তাই এদেরকে আত্মনিপীড়ক হওয়া সত্ত্বেও কিতাবের ওয়ারিসদের অন্তর্ভুক্ত এবং আল্লাহর নির্বাচিত বান্দাদের মধ্যে শামিল করা হয়েছে। নয়তো একথা সুস্পষ্ট, বিদ্রোহী, মুনাফিক এবং চিন্তা ও মননের দিক দিয়ে কাফেরদের প্রতি এ গুণাবলী আরোপিত হতে পারে না। তিন শ্রেণীর মধ্য থেকে এ শ্রেনীর ঈমানদারদের কথা সবার আগে বলার কারণ হচ্ছে এই যে, উম্মাতের মধ্যে এদের সংখ্যাই বেশী।

দুইঃ মাঝামাঝি অবস্থানকারী। এরা হচ্ছে এমন লোক যারা এ উত্তরাধিকারের হক কমবেশী আদায় করে কিন্তু পুরোপুরি করে না। হুকুম পালন করে এবং অমান্যও করে। নিজেদের প্রবৃত্তিকে পুরোপুরি লাগামহীন করে ছেড়ে দেয়নি বরং তাকে আল্লাহর অনুগত করার জন্য নিজেদের যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালায় কিন্তু মাঝে মাঝে কোন কোন মোস্তাহাব কাজ ছেড়ে দেয় এবং কোন কোন মাকরূহ কাজে জড়িত হয়ে পড়ে। কখনো কখনো গোনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এভাবে এদের জীবনে ভালো ও মন্দ উভয় ধরনের কাজের সমাবেশ ঘটে। এরা সংখ্যায় প্রথম দলের চেয়ে কম এবং তৃতীয় দলের চেয়ে বেশী হয়। তাই এদেরকে দু'নম্বরে রাখা হয়েছে।

তিনঃ ভালো কাজে যারা অগ্রবর্তী । এরা যাবতীয় ফরয,ওয়াজিব ও মোস্তাহাব কর্ম সম্পাদন করে এবং যাবতীয় হারাম ও মাকরূহ কর্ম থেকে বেঁচে থাকে; কিন্তু কোন কোন মোবাহ বিষয়, ইবাদতে ব্যাপৃত থাকার কারণে অথবা হারাম সন্দেহে ছেড়ে দেয়। এরা কিতাবের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে প্রথম সারির লোক। এরাই আসলে এ উত্তরাধিকারের হক আদায়কারী। কুরআন ও সুন্নাতের অনুসরণের ক্ষেত্রেও এরা অগ্রগামী। [বিস্তারিত বর্ণনা দেখুন, কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর] আবুদ্দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে অনুরূপ একটি তাফসীর বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'তাদের কেউ নিজের প্রতি অত্যাচারী' অর্থাৎ অত্যাচারীকে হাশরের মাঠে চিন্তা ও পেরেশানীর মাধ্যমে পাকড়াও করা হবে। আর 'কেউ মধ্যমপন্থী' যার হিসেব হবে সহজ এবং 'কেউ আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় কল্যাণের কাজে অগ্রগামী' তারা বিনা হিসেবে জান্নাতে যাবে। [মুসনাদে আহমাদ:৫/১৯৪] সে হিসেবে আমাদের নিকট স্পষ্ট যে, এ তিন প্রকার লোকই উম্মতে মুহাম্মাদীর অন্তর্ভুক্ত এবং اصطفى বা 'মনোনয়ন' গুণের বাইরে নয়। এটি হল উম্মতে মুহাম্মাদীর মুমিন বান্দাদের একান্ত বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব। তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কার্যত: ত্রুটিযুক্ত, সেও এই মর্যাদার অন্তর্ভুক্ত। উপরোক্ত তাফসীর ছাড়াও এ আয়াতের আরও একটি তাফসীর রয়েছে। কোন কোন মুফাসসির এ আয়াতের তিন শ্রেণীকে সূরা আল-ওয়াকি'আর তিন শ্রেণী অর্থাৎ মুকাররাবীন, আসহাবুল ইয়ামীন এবং আসহাবুশ শিমাল বলে মত প্রকাশ করেছেন। সে অনুসারে আয়াতে 'তাদের কেউ নিজের প্রতি অত্যাচারী' বলে কাফের, মুনাফিকদের বোঝানো হয়েছে। আর 'কেউ মধ্যমপন্থী' বলে ডানপন্থী সাধারণ ঈমানদার এবং 'কেউ আল্লাহ্‌র ইচ্ছায়

মহাঅনুগ্রহ---(১)

৩৩. স্থায়ী জান্নাত, যাতে তারা প্রবেশ করবে(২), সেখানে তাদেরকে স্বর্ণ

جَنّٰتُ عَدۡنٍ يَّدۡخُلُوۡنَهَا يُحَلَّوۡنَ فِيۡهَا مِنۡ

কল্যাণের কাজে অগ্রগামী’ বলে আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্ত লোকদের বোঝানো হয়েছে। এ তাফসীরটিও সহীহ সনদে কাতাদা, হাসান ও মুজাহিদ থেকে বর্ণিত হয়েছে। [ইবন কাসীর] কিন্তু প্রথম তাফসীরটিই এখানে অগ্রগণ্য। কারণ তা সহীহ হাদীস দ্বারা সমর্থিত। তাছাড়া পরবর্তী আয়াতসমূহ থেকেও তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

(১) “এটাই মহা অনুগ্রহ” বাক্যটির সম্পর্ক যদি নিকটতম বাক্যের সাথে ধরে নেয়া হয় তাহলে এর অর্থ হবে, ভালো কাজে অগ্রগামী হওয়াই হচ্ছে বড় অনুগ্রহ এবং যারা এমনটি করে মুসলিম উম্মাতের মধ্যে তারাই সবার সেরা। আর এ বাক্যটির সম্পর্ক পূর্ববর্তী বাক্যের সাথে করা হলে এর অর্থ হবে, আল্লাহর কিতাবের উত্তরাধিকারী হওয়া এবং এ উত্তরাধিকারের জন্য নির্বাচিত হওয়াই বড় অনুগ্রহ এবং আল্লাহর সকল বান্দাদের মধ্যে সেই বান্দাই সর্বশ্রেষ্ঠ যে কুরআন ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান এনে এ নির্বাচনে সফলকাম হয়েছে। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

(২) মুফাসসিরগণের একটি দলের মতে এ বাক্যের সম্পর্ক নিকটবর্তী দু’টি বাক্যের সাথেই রয়েছে। অর্থাৎ সৎকাজে অগ্রগামীরাই বড় অনুগ্রহের অধিকারী এবং তারাই এ জান্নাতগুলোতে প্রবেশ করবে। অন্যদিকে প্রথম দু’টি দলের ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করা হয়েছে, যাতে তারা নিজেদের পরিণামের কথা চিন্তা করে এবং নিজেদের বর্তমান অবস্থা থেকে বের হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাবার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে পারে। কোন কোন মুফাসসির বলেন, ওপরের সমগ্র আলোচনার সাথে এর সম্পর্ক রয়েছে। আর এর অর্থ হচ্ছে, এ তিনটি দলই শেষ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করবে, কোনপ্রকার হিসেব-নিকেশ ছাড়াই বা হিসেব নিকেশের পর এবং সব রকমের জবাবদিহি থেকে সংরক্ষিত থেকে অথবা কোন শাস্তি পাওয়ার পর যে কোন অবস্থাতেই হোক না কেন। কুরআনের পূর্বাপর আলোচনা এ ব্যাখ্যার প্রতি সমর্থন দিচ্ছে। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর] কারণ সামনের দিকে কিতাবের উত্তরাধিকারীদের মোকাবিলায় অন্যান্য দল সম্পর্কে বলা হচ্ছে, “আর যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন।” এ থেকে জানা যায়, যারা এ কিতাবকে মেনে নিয়েছে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত এবং যারা এর প্রতি ঈমান আনতে অস্বীকার করেছে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম। আবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নোক্ত হাদীসও এর প্রতি সমর্থন জানায়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “যারা সৎকাজে এগিয়ে গেছে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে কোনরকম হিসেব-নিকেশ ছাড়াই। আর যারা মাঝপথে থাকবে তাদের হিসেব-নিকেশ হবে, তবে তা হবে হাল্কা। অন্যদিকে যারা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছে তাদেরকে হাশরের দীর্ঘকালীন

أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا ۚ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٣٣﴾	নির্মিত কংকন ও মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হবে এবং সেখানে তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ হবে রেশমের।
وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ۖ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٤﴾	৩৪. এবং তারা বলবে, 'প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদের দুঃখ-দুর্দশা দূরীভূত করেছেন; নিশ্চয় আমাদের রব তো পরম ক্ষমাশীল, অসীম গুণগ্রাহী;
الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ ۚ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَّلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴿٣٥﴾	৩৫. 'যিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে স্থায়ী আবাসে প্রবেশ করিয়েছেন যেখানে কোন ক্লেশ আমাদেরকে স্পর্শ করে না এবং কোন ক্লান্তিও স্পর্শ করে না।'
وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ۚ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ ﴿٣٦﴾	৩৬. আর যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য আছে জাহান্নামের আগুন। তাদের উপর ফয়সালা দেয়া হবে না যে, তারা মরবে এবং তাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তিও লাঘব করা হবে না। এভাবেই আমরা প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে শাস্তি দিয়ে থাকি।
وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا ۚ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۚ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ ۖ	৩৭. আর সেখানে তারা আর্তনাদ করে বলবে, 'হে আমাদের রব! আমাদেরকে বের করুন, আমরা যা করতাম তার পরিবর্তে সৎকাজ

সময়ে আটকে রাখা হবে, তারপর তাদেরকে আল্লাহর রহমতের মধ্যে নিয়ে নেয়া হবে এবং এরাই হবে এমনসব লোক যারা বলবে, "সেই আল্লাহর শোকর যিনি আমাদের থেকে দুঃখ দূর করে দিয়েছেন।" [তাফসীর তাবারী:২২/১৩৭] এ বিষয়বস্তু সম্বলিত বিভিন্ন উক্তি মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন সাহাবী যেমন, উমর, উসমান, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আয়েশা, আবু সাঈদ খুদরী, এবং বারা ইবনে আযেব রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম থেকে উদ্ধৃত করেছেন। আর একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, সাহাবীগণ এহেন ব্যাপারে কোন কথা ততক্ষণ পর্যন্ত বলতে পারেন না, যতক্ষণ না তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখে শুনে থাকবেন।[বিস্তারিত বর্ণনা দেখুন, কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

فَذُوقُوا فَمَا لِلظّٰلِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ﴿٣٧﴾

করব।' আল্লাহ্ বলবেন, 'আমরা কি তোমাদেরকে এতো দীর্ঘ জীবন দান করিনি যে, তখন কেউ উপদেশ গ্রহণ করতে চাইলে উপদেশ গ্রহণ করতে পারতো[১]? আর তোমাদের কাছে সতর্ককারীও এসেছিল[২]। কাজেই তোমরা শাস্তি আস্বাদন কর; আর যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই।'

(১) অর্থাৎ জাহান্নামে যখন কাফেররা ফরিয়াদ করবে যে, হে আমাদের পালনকর্তা; আমাদেরকে এ আযাব থেকে মুক্ত করুন, আমরা সৎকর্ম করব এবং অতীত কুকর্ম ছেড়ে দেব, তখন জওয়াব দেয়া হবে যে, আমি কি তোমাদেরকে এমন বয়স দেইনি যাতে চিন্তাশীল ব্যক্তি চিন্তা করে বিশুদ্ধ পথে আসতে পারে? আলী ইবন হুসাইন যয়নুল আবেদীন রাহেমাহুল্লাহ বলেন, এর অর্থ সতের বছর বয়স। কাতাদাহ্ আঠার বছর বয়স বলেছেন।[ইবন কাসীর] এতে সতের বা আঠারোর পার্থক্য সম্ভবত এই যে, কেউ সতের বছরে এবং কেউ আঠারো বছরে সাবালক হতে পারে। শরী'আতে এ বয়সটি প্রথম সীমা, যাতে প্রবেশ করার পর মানুষকে নিজের ভাল-মন্দ বোঝার জ্ঞান আল্লাহর পক্ষ থেকে দান করা হয়। এ বয়সে মানুষ সত্য ও মিথ্যা এবং ভালো ও মন্দের মধ্যে ফারাক করতে চাইলে করতে পারে এবং গোমরাহী ত্যাগ করে হিদায়াতের পথে পাড়ি দিতে চাইলেও দিতে পারে। যে ব্যক্তি সুদীর্ঘকাল বেঁচে থাকার পরও সতর্ক হয়নি এবং প্রকৃতির প্রমাণাদি দেখে ও নবী-রাসূলগণের কথাবর্তা শুনে সত্যের পরিচয় গ্রহণ করেনি সে অধিক ধিক্কারযোগ্য হবে। [দেখুন-ইবন কাসীর,বাগভী] একথাটিই একটি হাদীসে এসেছে এভাবে, 'যে ব্যক্তি কম বয়স পাবে তার জন্য তো ওজরের সুযোগ থাকে কিন্তু ৬০ বছর এবং এর বেশী বয়সের অধিকারীদের জন্য কোন ওযর নেই।' [বুখারী: ৬৪১৯] আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, আল্লাহ্ যে বয়সে গোনাহ্গার বান্দাদেরকে লজ্জা দেন, তা হচ্ছে ষাট বছর। ইবনে আব্বাসও এক বর্ণনায় চল্লিশ, আর অন্য বর্ণনায় ষাট বছর বলেছেন। এ বয়সে মানুষের উপর আল্লাহ্র প্রমাণ পূর্ণ হয়ে যায় এবং মানুষের জন্যে কোন ওযর আপত্তি পেশ করার অবকাশ থাকে না। কারণ, ষাট বছর এমন সুদীর্ঘ বয়স যে, এতেও কেউ সত্যের পরিচয় লাভ না করলে তার ওযর আপত্তি করার কোন অবকাশ থাকে না। এ কারণেই উম্মতে মুহাম্মদীর বয়সের গড় ষাট থেকে সত্তর বছর পর্যন্ত নির্ধারিত রয়েছে। [দেখুন, ইবনে মাজাহ:৪২৩৬]

(২) এ সতর্ককারী সম্পর্কে কয়েকটি মত আছে। কারও কারও মতে, চুল শুভ্র হওয়া। বার্ধক্যের নিদর্শন প্রকাশ পাওয়া। আবার কারও কারও মতে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। [ইবন কাসীর] আবার কারও নিকট, কুরআনুল কারীম। কেউ কেউ বলেছেন, জ্বর-ব্যাধি। [ফাতহুল কাদীর]

পঞ্চম রুকূ’

إِنَّ اللّٰهَ عٰلِمُ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّهٗ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٣٨﴾

৩৮. নিশ্চয় আল্লাহ্ আসমানসমূহ ও যমীনের গায়েবী বিষয় অবগত। নিশ্চয় অন্তরে যা রয়েছে সে সম্বন্ধে তিনি সম্যক জ্ঞাত।

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ فِي الْأَرْضِ ۚ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهٗ ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكٰفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكٰفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿٣٩﴾

৩৯. তিনিই তোমাদেরকে যমীনে স্থলাভিষিক্ত করেছেন[১]। কাজেই কেউ কুফরী করলে তার কুফরীর জন্য সে নিজেই দায়ী হবে। কাফিরদের কুফরী শুধু তাদের রবের ক্রোধই বৃদ্ধি করে এবং কাফিরদের কুফরী শুধু তাদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।

قُلْ أَرَءَيْتُمْ شُرَكَآءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ ۗ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ ۚ أَمْ ءَاتَيْنٰهُمْ كِتٰبًا فَهُمْ عَلٰى بَيِّنَتٍ مِّنْهُ ۚ بَلْ إِنْ يَعِدُ الظّٰلِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴿٤٠﴾

৪০. বলুন, ‘তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমাদের যে সব শরীকদের ডাক, তাদের কথা ভেবে দেখেছ কি? তারা যমীনে কিছু সৃষ্টি করে থাকলে আমাকে দেখাও; অথবা আসমানের সৃষ্টিতে তাদের কোন অংশ আছে কি? না কি আমরা তাদেরকে এমন কোন কিতাব দিয়েছি যার প্রমানের উপর তারা নির্ভর করে[২]?’ বরং যালিমরা একে

---

(১) خَلَائِف শব্দটি خَلِيْفَةٌ এর বহুবচন। এর অর্থ, স্থলাভিষিক্ত, প্রতিনিধি। উদ্দেশ্য এই যে, আমি মানুষকে একের পর এক ভূমি, বাসগৃহ ইত্যাদির মালিক করেছি। একজন চলে গেলে অন্যজন তার স্থলাভিষিক্ত হয়। এতে আল্লাহ্ তা'আলার দিকে রুজু করার জন্য শিক্ষা রয়েছে। তাছাড়া, আয়াতে উম্মাতে মুহাম্মাদীকেও বলা হতে পারে যে, আমি বিগত জাতিসমূহের পরে তাদের স্থলাভিষিক্তরূপে তোমাদেরকে মালিক ও ক্ষমতাশালী করেছি। সুতরাং পূর্ববর্তীদের অবস্থা থেকে তোমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য। [বাগভী]

(২) কাতাদাহ এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, আল্লাহ্ বলেন, বলুন, ‘তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমাদের যে সব শরীকদের ডাক, তাদের কথা ভেবে দেখেছ কি? তারা যমীনে কিছু সৃষ্টি করে থাকলে আমাকে দেখাও’ তারা এর মধ্য থেকে কিছুই সৃষ্টি করে নি। ‘অথবা আসমানের সৃষ্টিতে তাদের কোন অংশ আছে কি?’ না, তারা আসমান সৃষ্টিতেও শরীক নয়। এতে তাদের কোন অংশীদারীত্ব নেই। ‘না কি আমরা

অন্যকে প্রতারণা ছাড়া আর কিছুরই প্রতিশ্রুতি দেয় না ।

إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا ۚ وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٤١﴾

৪১. নিশ্চয় আল্লাহ্ আসমানসমূহ ও যমীনকে ধারণ করেন, যাতে তারা স্থানচ্যুত না হয়, আর যদি তারা স্থানচ্যুত হয়, তবে তিনি ছাড়া কেউ নেই যে, তাদেরকে ধরে রাখতে পারে(১) । নিশ্চয় তিনি অতি সহনশীল, অসীম ক্ষমাপরায়ণ ।

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدٰى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿٤٢﴾

৪২. আর তারা দৃঢ়তার সাথে আল্লাহ্‌র শপথ করে বলত যে, তাদের কাছে কোন সতর্ককারী আসলে এরা অন্য সকল জাতির চেয়ে সৎপথের অধিকতর অনুসারী হবে; অতঃপর যখন এদের কাছে সতর্ককারী আসল(২), তখন তা শুধু তাদের বিমুখতা ও দূরত্বই বৃদ্ধি করল---

اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ ۚ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ ۚ فَلَنْ تَجِدَ

৪৩. যমীনে ঔদ্ধত্য প্রকাশ এবং কূট ষড়যন্ত্রের কারণে(৩) । আর কূট ষড়যন্ত্র তার উদ্যোক্তাদেরকেই পরিবেষ্টন করবে । তবে কি এরা প্রতীক্ষা করছে

তাদেরকে এমন কোন কিতাব দিয়েছি যার প্রমানের উপর তারা নির্ভর করে' । অর্থাৎ নাকি তাদেরকে আমরা কোন কিতাব দিয়েছি যা তাদেরকে শির্ক করতে নির্দেশ দেয়? [তাবারী]

(১) অন্য আয়াতে এসেছে, "আপনি কি দেখতে পান না যে, আল্লাহ্ তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন পৃথিবীতে যা কিছু আছে সেসবকে এবং তাঁর নির্দেশে সাগরে বিচরণশীল নৌযানসমূহকে? আর তিনিই আসমানকে ধরে রাখেন যাতে তা পড়ে না যায় যমীনের উপর তাঁর অনুমতি ছাড়া । নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষের প্রতি স্নেহপ্রবণ, পরম দয়ালু ।" [সূরা আল-হাজ্জ: ৬৫] [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(২) অর্থাৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম । [তাবারী]

(৩) কাতাদাহ বলেন, এখানে কূট ষড়যন্ত্র বলে শির্ক বোঝানো হয়েছে । [তাবারী]

لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبۡدِيۡلًا ۚ وَلَنۡ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَحۡوِيۡلًا ﴿۴۳﴾

পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রযুক্ত পদ্ধতির[১]? কিন্তু আপনি আল্লাহ্‌র পদ্ধতিতে কখনো কোন পরিবর্তন পাবেন না এবং আল্লাহ্‌র পদ্ধতির কোন ব্যতিক্রমও লক্ষ্য করবেন না।

اَوَلَمۡ يَسِيۡرُوۡا فِى الۡاَرۡضِ فَيَنۡظُرُوۡا كَيۡفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيۡنَ مِنۡ قَبۡلِهِمۡ وَكَانُوۡۤا اَشَدَّ مِنۡهُمۡ قُوَّةً ؕ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعۡجِزَهٗ مِنۡ شَىۡءٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الۡاَرۡضِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ عَلِيۡمًا قَدِيۡرًا ﴿۴۴﴾

৪৪. আর এরা কি যমীনে পরিভ্রমণ করেনি? তাহলে তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হয়েছিল তা তারা দেখতে পেত। আর তারা ছিল এদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী[২]। আর আল্লাহ্ এমন নন যে, তাঁকে অক্ষম করতে পারে কোন কিছু আসমানসমূহে আর না যমীনে। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, ক্ষমতাবান।

وَلَوۡ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوۡا مَا تَرَكَ عَلٰى ظَهۡرِهَا مِنۡ دَآبَّةٍ وَّلٰـكِنۡ يُّؤَخِّرُهُمۡ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمۡ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِعِبَادِهٖ بَصِيۡرًا ﴿۴۵﴾

৪৫. আর আল্লাহ্ মানুষদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্য পাকড়াও করলে, ভূ-পৃষ্ঠে কোন প্রাণীকেই তিনি রেহাই দিতেন না, কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। অতঃপর যখন তাদের নির্দিষ্ট সময় এসে যাবে, তখন তো আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে সম্যক দ্রষ্টা[৩]।

---

(১) কাতাদাহ বলেন, অর্থাৎ পূর্ববর্তীদের শাস্তি। [তাবারী]

(২) কাতাদাহ বলেন, আল্লাহ্ অবহিত করছেন যে, তিনি সে সমস্ত জাতিকে এমন কিছু দিয়েছেন যা তোমাদেরকে দেন নি। [তাবারী]

(৩) যেমন অন্য আয়াতে বলেছেন, "আর আল্লাহ্ যদি মানুষকে তাদের সীমালংঘনের জন্য শাস্তি দিতেন তবে ভূপৃষ্ঠে কোন জীব-জন্তুকেই রেহাই দিতেন না; কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। অতঃপর যখন তাদের সময় আসে তখন তারা মুহূর্তকাল আগাতে বা পিছাতে পারে না।" [সূরা আন-নাহল: ৬১]

৩৬- সূরা ইয়াসীন
৮৩ আয়াত, মক্কী

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. ইয়াসীন(১),

يٰسٓ ①

২. শপথ প্রজ্ঞাময় কুরআনের,

وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ②

৩. নিশ্চয় আপনি রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত;

اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ③

৪. সরল পথের উপর প্রতিষ্ঠিত।

عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ④

৫. এ কুরআন প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র কাছ থেকে নাযিলকৃত।

تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ⑤

৬. যাতে আপনি সতর্ক করতে পারেন এমন এক জাতিকে যাদের পিতৃ পুরুষদেরকে সতর্ক করা হয়নি, সুতরাং তারা গাফিল।

لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّاۤ اُنْذِرَ اٰبَآؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ⑥

৭. অবশ্যই তাদের অধিকাংশের উপর সে বাণী অবধারিত হয়েছে(২); কাজেই তারা ঈমান আনবে না।

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰۤى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ⑦

---

(১) ইয়াসীন শব্দের বিভিন্ন অর্থ করা হয়ে থাকে। তবে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা বলেন, এটা দ্বারা আল্লাহ্ শপথ করেছেন। আর তা আল্লাহ্‌র একটি নাম। অবশ্য ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে, এর অর্থ: হে মানুষ। [তাবারী,বাগভী]

(২) আল্লামা শানক্বীতী রাহেমাহুল্লাহ বলেন, এ আয়াতে ‘বাণী অবধারিত হয়ে গেছে’ বলে অন্যান্য আয়াতে যেভাবে ﴿وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ﴾ [সূরা ফুসসিলাত:২৫], বা ﴿فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَآ اِنَّا لَذَآئِقُوْنَ﴾ [সূরা আস-সাফফাত-৩১] বা ﴿اَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ﴾ [সূরা আয-যুমার:১৯] অথবা, ﴿حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ﴾ [সূরা আয-যুমার: ৭১] অথবা ﴿حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ﴾ [সূরা ইউনুস:৯৬] এসবগুলোর অর্থ একই আয়াতের তাফসীর। আর তা হচ্ছে: ﴿لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ﴾ [সূরা আস-সাজদাহ:১৩] অর্থাৎ আমি মানুষ ও জিন জাতি থেকে জাহান্নাম পূর্ণ করব। তাই এ আয়াতের قول এবং উপরোক্ত অন্যান্য আয়াতের كلمة শব্দসমূহ একই অর্থবোধক।

إِنَّا جَعَلْنَا فِيٓ أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَٰلًا فَهِيَ إِلَى ٱلْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ ۝٨

৮. নিশ্চয় আমরা তাদের গলায় চিবুক পর্যন্ত বেড়ি পরিয়েছি, ফলে তারা ঊর্ধ্বমুখী হয়ে গেছে।

وَجَعَلْنَا مِنۢ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ۝٩

৯. আর আমরা তাদের সামনে প্রাচীর ও পিছনে প্রাচীর স্থাপন করেছি তারপর তাদেরকে আবৃত করেছি; ফলে তারা দেখতে পায় না[১]।

وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝١٠

১০. আর আপনি তাদেরকে সতর্ক করুন বা না করুন, তাদের পক্ষে উভয়ই সমান; তারা ঈমান আনবে না।

إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكْرَ وَخَشِيَ ٱلرَّحْمَٰنَ بِٱلْغَيْبِ ۖ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ۝١١

১১. আপনি শুধু তাকেই সতর্ক করতে পারেন যে 'যিক্‌র' এর অনুসরণ করে[২] এবং গায়েবের সাথে রহমানকে ভয় করে। অতএব তাকে আপনি ক্ষমা ও সম্মানজনক পুরস্কারের সুসংবাদ দিন।

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا۟ وَءَاثَٰرَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَٰهُ فِيٓ إِمَامٍ

১২. নিশ্চয় আমরা মৃতকে জীবিত করি এবং লিখে রাখি যা তারা আগে পাঠায় ও যা তারা পিছনে রেখে যায়[৩]। আর

---

(১) অর্থাৎ তারা হেদায়াত দেখতে পায় না এবং এর দ্বারা উপকৃতও হতে পারে না। [তাবারী]

(২) কাতাদাহ বলেন, এখানে যিক্‌র বলে কুরআন বোঝানো হয়েছে। আর যিক্‌রের অনুসরণ বলে কুরআনের অনুসরণ বোঝানো হয়েছে। [তাবারী]

(৩) যা তারা পিছনে রেখে যায় তাও লিপিবদ্ধ করার ঘোষণা আয়াতে এসেছে। অর্থাৎ তাদের সম্পাদিত কর্মসমূহের ন্যায় কর্মসমূহের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও লিপিবদ্ধ করা হয়। আয়াতে বর্ণিত آثار শব্দের দু'ধরনের অর্থ করা হয়ে থাকে। এক. এর অর্থ, কর্মের ক্রিয়া তথা ফলাফল, যা পরবর্তীকালে প্রকাশ পায় ও টিকে থাকে। উদাহরণত: কেউ মানুষকে দ্বীনী শিক্ষা দিল, বিধি-বিধান বর্ণনা করল অথবা কোন পুস্তক রচনা করল, যদ্দারা মানুষের দ্বীনী উপকারিতা লাভ করা যায় অথবা ওয়াকফ ইত্যাদি ধরনের কোন জনহিতকর কাজ করল-তার এই সৎকর্মের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া যতদূর পৌঁছবে এবং যতদিন পর্যন্ত পৌঁছতে থাকবে, সবই তার আমলনামায় লিখিত হতে থাকবে।

مُّبِيْنٍ ﴿١٢﴾

আমরা প্রত্যেক জিনিস স্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত রেখেছি[১]।

দ্বিতীয় রুকূ'

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا اَصْحٰبَ الْقَرْيَةِ ۘ اِذْ جَآءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ ﴿١٣﴾

১৩. আর তাদের কাছে বর্ণনা করুন এক জনপদের অধিবাসীদের দৃষ্টান্ত; যখন তাদের কাছে এসেছিল রাসূলগণ।

অনুরূপভাবে কোন রকম মন্দকার্য যার মন্দ ফলাফল ও ক্রিয়া পৃথিবীতে থেকে যায়- কেউ যদি নিপীড়নমূলক আইন-কানূন প্রবর্তন করে কিংবা এমন কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে যা মানুষের আমল-আখলাককে ধ্বংস করে দেয় কিংবা মানুষকে কোন মন্দ পথে পরিচালিত করে, তবে তার এ মন্দকর্মের ফলাফল ও প্রভাব যে পর্যন্ত থাকবে এবং যতদিন পর্যন্ত তা দুনিয়াতে কায়েম থাকবে, ততদিন তার আমলনামায় সব লিখিত হতে থাকবে। [দেখুন, ইবন কাসীর] যেমন, এ আয়াতের তাফসীর প্রসংগে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোন উত্তম পন্থা প্রবর্তন করে, তার জন্যে রয়েছে এর সওয়াব এবং যত মানুষ এই পন্থার উপর আমল করবে, তাদের সওয়াব-অথচ পালনকারীদের সওয়াব মোটেও হ্রাস করা হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন কু-প্রথা প্রবর্তন করে, সে তার গোনাহ্ ভোগ করবে এবং যত মানুষ এই কুপ্রথা পালন করতে থাকবে, তাদের গোনাহও তার আমলনামায় লিখিত হবে। অথচ আমলকারীর গোনাহ্ হ্রাস করা হবে না' [মুসলিম: ১০১৭]
দুই. آثار শব্দের অর্থ পদাংকও হয়ে থাকে। হাদীসে এসেছে, 'কেউ সালাতের জন্যে মাসজিদে গমন করলে তার প্রতি পদক্ষেপে সওয়াব লেখা হয়' [মুসলিম:১০৭০] কোন কোন বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, এখানে آثار বলে এ পদাংকই বোঝানো হয়েছে। সালাতের সাওয়াব যেমন লেখা হয় তেমনি সালাতে যাওয়ার সময় যত পদক্ষেপ হতে থাকে তাও প্রতি পদক্ষেপে একটি করে পুণ্য লেখা হয়। মদীনা তাইয়্যেবায় যাদের বাসগৃহ মসজিদে নববী থেকে দূরে অবস্থিত ছিল, তারা মসজিদের কাছাকাছি বাসগৃহ নির্মান করতে চাইলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে তা থেকে বিরত করলেন এবং বললেন, 'তোমরা যেখানে আছ, সেখানেই থাক। দূর থেকে হেঁটে মসজিদে এলে পদক্ষেপ যত বেশী হবে তোমাদের সওয়াব তত বেশী হবে।' [মুসলিম: ৬৬৫]

(১) বলা হয়েছে, আমরা প্রত্যেকটি বস্তু সুস্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত রেখেছি। অর্থাৎ লাওহে মাহফূজে। কেননা যা হয়েছে এবং যা হবে সব কিছুই সেখানে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আর তা অনুসারেই তাদের ভাল-মন্দ নির্ধারিত হবে। [ইবন কাসীর,মুয়াস্‌সার] সূরা আল-ইসরা এর ১৭ নং আয়াতেরও একই অর্থ। অনুরূপভাবে সূরা আল-কাহফের ৪৯ নং আয়াতেও একই কথা বলা হয়েছে।

১৪. যখন আমরা তাদের কাছে পাঠিয়েছিলাম দুজন রাসূল, তখন তারা তাদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল, তারপর আমরা তাদেরকে শক্তিশালী করেছিলাম তৃতীয় একজন দ্বারা। অতঃপর তারা বলেছিলেন, 'নিশ্চয় আমরা তোমাদের কাছে প্রেরিত হয়েছি।'

إِذْ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوٓا۟ إِنَّآ إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ ﴿١٤﴾

১৫. তারা বলল, 'তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ[1], রহমান তো কিছুই

قَالُوا۟ مَآ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَآ أَنزَلَ

(১) অন্য কথায় তাদের বক্তব্য ছিল, তোমরা যেহেতু মানুষ, কাজেই তোমরা আল্লাহ প্রেরিত রাসূল হতে পারো না। মক্কার কাফেররাও এ একই ধারণা করতো। তারা বলতো, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাসূল নন, কারণ তিনি মানুষ। "তারা বলে, এ কেমন রাসূল, যে খাবার খায় এবং বাজারে চলাফেরা করে"। [সূরা আল-ফুরকান: ৭] "আর যালেমরা পরস্পর কানাঘুষা করে যে, এ ব্যক্তি (অর্থাৎ, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তোমাদের মতো একজন মানুষ ছাড়া আর কি! তারপর কি তোমরা চোখে দেখা এ যাদুর শিকার হয়ে যাবে?" [সূরা আল-আম্বিয়া: ৩] কুরআন মজীদ মক্কার কাফেরদের এ জাহেলী চিন্তার প্রতিবাদ করে বলে, এটা কোন নতুন জাহেলীয়াত নয়। আজ প্রথমবার এ লোকদের থেকে এর প্রকাশ হচ্ছে না। বরং অতি প্রাচীনকাল থেকে সকল মূর্খ ও অজ্ঞের দল এ বিভ্রান্তির শিকার ছিল যে, মানুষ রাসূল হতে পারে না এবং রাসূল মানুষ হতে পারে না। নূহের জাতির সরদাররা যখন নূহের রিসালাত অস্বীকার করেছিল তখন তারাও একথাই বলেছিলঃ "এ ব্যক্তি তোমাদের মতো একজন মানুষ ছাড়া আর কিছুই নয়। সে চায় তোমাদের ওপর তার নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে। অথচ আল্লাহ চাইলে ফেরেশতা নাযিল করতেন। আমরা কখনো নিজেদের বাপ-দাদাদের মুখে একথা শুনিনি।" [সূরা আল-মুমিনূন: ২৪] আদ জাতি একথাই হুদ আলাইহিস্ সালাম সম্পর্কে বলেছিলঃ "এ ব্যক্তি তোমাদের মতো একজন মানুষ ছাড়া আর কিছুই নয়। সে তাই খায় যা তোমরা খাও এবং পান করে তাই যা তোমরা পান করো। এখন যদি তোমরা নিজেদেরই মতো একজন মানুষের আনুগত্য করো তাহলে তোমরা বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।" [সূরা আল-মুমিনূন: ৩৩-৩৪] সামূদ জাতি সালেহ আলাইহিস্ সালাম সম্পর্কেও এ একই কথা বলেছিলঃ "আমরা কি আমাদের মধ্য থেকে একজন মানুষের আনুগত্য করবো ?" [সূরা আল-ক্বামার: ২৪] আর প্রায় সকল নবীর সাথেই এরূপ ব্যবহার করা হয়। কাফেররা বলেঃ তোমরা আমাদেরই মতো মানুষ ছাড়া আর কিছুই নও।" নবীগণ তাদের জবাবে বলেনঃ "অবশ্যই আমরা তোমাদের মতো মানুষ ছাড়া আর কিছুই নই।

الرَّحْمٰنُ مِنْ شَيْءٍ ۙ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُوْنَ ⑮

নাযিল করেননি। তোমরা শুধু মিথ্যাই বলছ।

قَالُوْا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُوْنَ ⑯

১৬. তারা বললেন, 'আমাদের রব জানেন---নিশ্চয় আমরা তোমাদের কাছে প্রেরিত হয়েছি।

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ⑰

১৭. আর 'স্পষ্টভাবে প্রচার করাই আমাদের দায়িত্ব।'

قَالُوْا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ۚ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهُوْا

১৮. তারা বলল, 'আমরা তো তোমাদেরকে অমঙ্গলের কারণ মনে করি[১], যদি

কিন্তু আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যার প্রতি চান অনুগ্রহ বর্ষণ করেন।" [সূরা ইবরাহীম: ১১] এরপর কুরআন মজীদ বলছে, এ জাহেলী চিন্তাধারা প্রতি যুগে লোকদের হিদায়াত গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখে এবং এরই কারণে বিভিন্ন জীবনে ধ্বংস নেমে এসেছেঃ "তোমাদের কাছে কি এমন লোকদের খবর পৌঁছেনি? যারা ইতিপূর্বে কুফরী করেছিল তারপর নিজেদের কৃতকর্মের স্বাদ আস্বাদন করে নিয়েছে এবং সামনে তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। এসব কিছু হয়েছে এজন্য যে, তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আসতে থেকেছে কিন্তু তারা বলছে,"এখন কি মানুষ আমাদের পথ দেখাবে?" এ কারণে তারা কুফরী করেছে এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।" [সূরা আত-তাগাবুন: ৫-৬] "লোকদের কাছে যখন হিদায়াত এলো তখন এ অজুহাত ছাড়া আর কোন জিনিস তাদের ঈমান আনা থেকে বিরত রাখেনি যে, তারা বললো, "আল্লাহ মানুষকে রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন?" [সূরা ইসরা: ৯৪] তারপর কুরআন মজীদ সুস্পষ্টভাবে বলছে, আল্লাহ চিরকাল মানুষদেরকেই রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন এবং মানুষের হিদায়াতের জন্য মানুষই রাসূল হতে পারে কোন ফেরেশ্‌তা বা মানুষের চেয়ে উচ্চতর কোন সত্তা এ দায়িত্ব পালন করতে পারে নাঃ "তোমার পূর্বে আমি মানুষদেরকে রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছি, যাদের কাছে আমি অহি পাঠাতাম। যদি তোমরা না জানো তাহলে জ্ঞানবানদেরকে জিজ্ঞেস করো। আর তারা আহার করবে না এবং চিরকাল জীবিত থাকবে, এমন শরীর দিয়ে তাদেরকে আমি সৃষ্টি করিনি।" [সূরা আল-আম্বিয়া: ৭-৮] "আমি তোমার পূর্বে যে রাসূলই পাঠিয়েছিলাম তারা সবাই আহার করতো এবং বাজারে চলাফেরা করতো।" [সূরা আল-ফুরকান: ২০] "হে নবী! তাদেরকে বলে দিন, যদি পৃথিবীতে ফেরেশতারা নিশ্চিন্তে চলাফেরা করতে থাকতো, তাহলে আমি তাদের প্রতি ফেরেশতাদেরকেই রাসূল বানিয়ে নাযিল করতাম।" [সূরা আল-ইসরা: ৯৫]

(১) মূলে تطير বলা হয়েছে, এর অর্থ অশুভ, অমঙ্গল ও অলক্ষুণে মনে করা। উদ্দেশ্য

لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٨﴾

তোমরা বিরত না হও তোমাদেরকে অবশ্যই পাথরের আঘাতে হত্যা করব এবং অবশ্যই স্পর্শ করবে তোমাদের উপর আমাদের পক্ষ থেকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ।'

قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ أَئِن ذُكِّرْتُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿١٩﴾

১৯. তারা বললেন, 'তোমাদের অমঙ্গল তোমাদেরই সাথে[১]; এটা কি এজন্যে যে, তোমাদেরকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে[২]? বরং তোমরা এক সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায় ।

এই যে, শহরবাসীরা প্রেরিত লোকদের কথা অমান্য করল এবং বলতে লাগল, তোমরা অলক্ষুণে । কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, তাদের অবাধ্যতা ও রাসূলদের কথা অমান্য করার কারণে জনপদে দূর্ভিক্ষ শুরু হয়ে যায় । ফলে তারা তাদেরকে অলক্ষুণে বলল । কাফেরদের সাধারণ অভ্যাস এই যে, কোন বিপদাপদ দেখলে তার কারণ হেদায়াতকারী ব্যক্তিবর্গকে সাব্যস্ত করে । অথবা তাদের এ বক্তব্যের উদ্দেশ্য ছিল একথা বুঝানো যে, তোমরা এসে আমাদের উপাস্য দেবতাদের বিরুদ্ধে যেসব কথাবার্তা বলতে শুরু করেছো তার ফলে দেবতারা আমাদের প্রতি রুষ্ট হয়ে উঠেছে এবং এখন আমাদের ওপর যেসব বিপদ আসছে তা আসছে তোমাদেরই বদৌলতে । ঠিক এ একই কথাই আরবের কাফের ও মোনাফিকরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে বলতোঃ "যদি তারা কোন কষ্টের সম্মুখীন হতো, তাহলে বলতো, এটা হয়েছে তোমার কারণে ।" [সূরা আন-নিসা: ৭৮] তাই কুরআন মজীদে বিভিন্ন স্থানে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, এ ধরনের জাহেলী কথাবার্তাই প্রাচীন যুগের লোকেরাও তাদের নবীদের সম্পর্কে বলতো । সামূদ জাতি তাদের নবীকে বলতো, "আমরা তোমাকে ও তোমার সাথীদেরকে অমংগল জনক পেয়েছি ।" [সূরা আন-নমল:৪৭] আর ফেরাউনের জাতিও এ একই মনোভাবের অধিকারী ছিলঃ "যখন তারা ভালো অবস্থায় থাকে তখন বলে, এটা আমাদের সৌভাগ্যের ফল এবং তাদের ওপর কোন বিপদ এলে তাকে মূসা ও তার সাথীদের অলক্ষুণের ফল গণ্য করতো ।" [সূরা আল-আ'রাফ: ১৩১]

(১) যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, "প্রত্যেক ব্যক্তির কল্যাণ ও অকল্যাণের পরোয়ানা আমি তার গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছি ।" [সূরা আল-ইসরা:১৩]

(২) অর্থাৎ তোমাদেরকে আল্লাহ্‌ সম্পর্কে উপদেশ দেয়াতে, আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়াতেই কি তোমরা আমাদের অলক্ষুণে মনে করছ? তোমরা তো সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায় । [তাবারী]

২০. আর নগরীর প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি ছুটে আসল, সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা রাসূলদের অনুসরণ কর;

وَجَآءَ مِنۡ أَقۡصَا ٱلۡمَدِينَةِ رَجُلٞ يَسۡعَىٰ قَالَ يَٰقَوۡمِ ٱتَّبِعُواْ ٱلۡمُرۡسَلِينَ ٢٠

২১. 'অনুসরণ কর তাদের, যারা তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চায় না[১] এবং যারা সৎপথপ্রাপ্ত।

ٱتَّبِعُواْ مَن لَّا يَسۡـَٔلُكُمۡ أَجۡرٗا وَهُم مُّهۡتَدُونَ ٢١

২২. 'আর আমার কি যুক্তি আছে যে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যাঁর কাছে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে, আমি তাঁর 'ইবাদাত করব না?

وَمَا لِيَ لَآ أَعۡبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ٢٢

২৩. 'আমি কি তাঁর পরিবর্তে অন্য ইলাহ্ গ্রহণ করব[২]? রহমান আমার কোন ক্ষতি করতে চাইলে তাদের সুপারিশ

ءَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِۦٓ ءَالِهَةً إِن يُرِدۡنِ ٱلرَّحۡمَٰنُ بِضُرّٖ لَّا تُغۡنِ عَنِّي شَفَٰعَتُهُمۡ شَيۡـٔٗا وَلَا يُنقِذُونِ ٢٣

---

(১) কাতাদাহ বলেন, সে ব্যক্তি যখন রাসূলদের কাছে এসে পৌঁছলেন তখন তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি তোমাদের এ কাজের বিনিময়ে কোন পারিশ্রমিক চাও? তারা বলল, না। তখন সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা রাসূলদের অনুসরণ কর। অনুসরণ কর তাদের, যারা তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চান না, আর তারা তো সৎপথপ্রাপ্ত। [তাবারী]

(২) আল্লামা শানকীতী বলেন, এর অর্থ, আমি তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া যাদের ইবাদাত কর তাদের ইবাদাত করব না। আমার আল্লাহ্ যদি আমার কোন ক্ষতির ইচ্ছা করেন, তবে এ মাবুদগুলো আমার কোন কাজে আসবে না। তারা আমার থেকে সে ক্ষতিকে প্রতিহত করতে পারবে না। আর আমাকে বিপদ থেকেও উদ্ধার করতে পারবে না। এ আয়াতে এ সমস্ত উপাস্যরা যে কোন উপকার করতে পারে না বলে বর্ণিত হয়েছে, তা অন্য আয়াতেও এসেছে। যেমন, "বলুন, 'তোমরা ভেবে দেখেছ কি, আল্লাহ্ আমার অনিষ্ট করতে চাইলে তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা কি সে অনিষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করতে চাইলে তারা কি সে অনুগ্রহকে রোধ করতে পারবে?' বলুন, 'আমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট।' নির্ভরকারীগণ তাঁর উপরই নির্ভর করে।" [সূরা আয-যুমার: ৩৮] "বলুন, 'তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া যাদেরকে ইলাহ্ মনে কর তাদেরকে ডাক, অতঃপর দেখবে যে, তোমাদের দুঃখ-দৈন্য দূর করার বা পরিবর্তন করার শক্তি তাদের নেই।" [সূরা আল-ইসরা: ৫৬]

আমার কোন কাজে আসবে না এবং তারা আমাকে উদ্ধার করতেও পারবে না ।

إِنِّيٓ إِذًا لَّفِي ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٢٤﴾

২৪. ‘এরূপ করলে আমি অবশ্যই স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পড়ব ।

إِنِّيٓ ءَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَٱسْمَعُونِ ﴿٢٥﴾

২৫. ‘নিশ্চয় আমি তোমাদের রবের ওপর ঈমান এনেছি, অতএব তোমরা আমার কথা শোন ।’

قِيلَ ٱدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ ۖ قَالَ يَٰلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾

২৬. তাকে বলা হল, ‘জান্নাতে প্রবেশ কর[১] ।’ সে বলে উঠল, ‘হায়! আমার সম্প্রদায় যদি জানতে পারত---

بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿٢٧﴾

২৭. ‘কিরূপে আমার রব আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে সম্মানিত করেছেন ।’

وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِۦ مِنۢ بَعْدِهِۦ مِن جُندٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ﴿٢٨﴾

২৮. আর আমরা তার পরে তার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আসমান থেকে কোন বাহিনী পাঠাইনি এবং পাঠাবারও ছিলাম না[২] ।

إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَٰحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَٰمِدُونَ ﴿٢٩﴾

২৯. সেটা ছিল শুধুমাত্র এক বিকট শব্দ । ফলে তারা নিথর নিস্তব্ধ হয়ে গেল ।

---

(১) কুরআনের উপরোক্ত বাক্য থেকে এ দিকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, লোকটিকে শহীদ করে দেয়া হয়েছিল । কেননা, কেবল জান্নাতে প্রবেশ অথবা জান্নাতের বিষয়াদি দেখা মৃত্যুর পরই সম্ভবপর ।[দেখুন-কুরতুবী,ফাতহুল কাদীর] কাতাদাহ বলেন, এ লোকটি তার সম্প্রদায়কে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান জানিয়েছে এবং তাদের জন্য উপদেশ ব্যক্ত করেছে, কিন্তু তারা তাকে হত্যা করেছে । [তাবারী]

(২) কাতাদাহ বলেন, অর্থাৎ তাদের জন্য আর কোন কথা বা কোন প্রকার তিরস্কার আসমান থেকে করা হয়নি । বরং সাথে সাথেই তাদের জন্য আযাবের পরোয়ানা নাযিল হয়ে গিয়েছিল । আর সেটা ছিল এক বিকট শব্দ, যা তাদের নিরব নিথরে পরিণত করল । [তাবারী]

يٰحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ۚ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٣٠﴾

৩০. পরিতাপ বান্দাদের জন্য[১]; তাদের কাছে যখনই কোন রাসূল এসেছে তখনই তারা তার সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে[২]।

أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٣١﴾

৩১. তারা কি লক্ষ্য করে না, আমরা তাদের আগে বহু প্রজন্মকে ধ্বংস করেছি[৩]? নিশ্চয় তারা তাদের মধ্যে ফিরে আসবে না।

وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٣٢﴾

৩২. আর নিশ্চয় তাদের সবাইকে একত্রে আমাদের কাছে উপস্থিত করা হবে[৪]।

---

(১) কাতাদাহ বলেন, এর অর্থ, বান্দারা তাদের নফসের উপর যে অপরাধ করেছে, আল্লাহ্‌র নির্দেশকে বিনষ্ট করেছে, আল্লাহ্‌র ব্যাপারে তারা যে ঘাটতি করেছে সে জন্য তাদের নিজেদের উপর তাদের আফসোস। [তাবারী] মুজাহিদ বলেন, আল্লাহ্ বান্দাদের উপর আফসোস করলেন এ জন্যে যে, তারা তাদের রাসূলদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে। [তাবারী] ইবন আব্বাস থেকে বর্ণিত, এখানে حسرة এর অর্থ ويل বা দূর্ভোগ। [তাবারী] অথবা আয়াতের অর্থ, পরিতাপ সে সমস্ত বান্দাদের জন্য যাদের কাছে যখনই কোন রাসূল এসেছে তখনই তারা তাদের উপর মিথ্যারোপ করেছে, ফলে তারা ধ্বংস হয়েছে। [জালালাইন] অথবা আয়াতের অর্থ, হায় বান্দাদের জন্য আফসোস ও পরিতাপ! যখন তারা কিয়ামতের দিন আযাব দেখতে পাবে। কারণ তাদের কাছে দুনিয়াতে যখনই কোন রাসূল আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছেন তখনই তারা তার সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে। [মুয়াসসার]

(২) এ আয়াতের ব্যাপকতা থেকে অন্য আয়াতে কেবল ইউনুস আলাইহিস সালামের জাতিকে ব্যতিক্রম ঘোষণা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, “অতঃপর কোন জনপদবাসী কেন এমন হল না যারা ঈমান আনত এবং তাদের ঈমান তাদের উপকারে আসত? তবে ইউনুস এর সম্প্রদায় ছাড়া, তারা যখন ঈমান আনল তখন আমরা তাদের থেকে দুনিয়ার জীবনের হীনতাজনক শাস্তি দূর করলাম এবং তাদেরকে কিছু কালের জন্য জীবনোপভোগ করতে দিলাম।” [সূরা ইউনুস: ৯৮]

(৩) অর্থাৎ আদ, সামূদ ও অন্যান্য বহু প্রজন্ম। [তাবারী]

(৪) অর্থাৎ কিয়ামতের দিন। [তাবারী]

তৃতীয় রুকূ’

وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَٰهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ٣٣

৩৩. আর তাদের জন্য একটি নিদর্শন মৃত যমীন, যাকে আমরা সঞ্জীবিত করি এবং তা থেকে বের করি শস্য, অতঃপর তা থেকেই তারা খেয়ে থাকে।

وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّٰتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَٰبٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ ٣٤

৩৪. আর সেখানে আমরা সৃষ্টি করি খেজুর ও আঙ্গুরের উদ্যান এবং সেখানে উৎসারিত করি কিছু প্রস্রবণ,

لِيَأْكُلُوا۟ مِن ثَمَرِهِۦ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ ۖ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ٣٥

৩৫. যাতে তারা খেতে পারে তার ফলমূল হতে অথচ তাদের হাত এটা সৃষ্টি করেনি। তবুও কি তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না?

سُبْحَٰنَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَٰجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ٣٦

৩৬. পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি সৃষ্টি করেছেন সকল প্রকার সৃষ্টি, যমীন থেকে উৎপন্ন উদ্ভিদ এবং তাদের (মানুষদের) মধ্য থেকেও (পুরুষ ও নারী)। আর তারা যা জানে না তা থেকেও[১]।

وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ ٣٧

৩৭. আর তাদের জন্য এক নিদর্শন রাত, তা থেকে আমরা দিন অপসারিত করি, তখন তারা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে[২]।

وَٱلشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ

৩৮. আর সূর্য ভ্রমণ করে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে[৩], এটা পরাক্রমশালী,

---

(১) অনুরূপ আয়াত দেখুন, সূরা আল-আন‘আম: ৯৯; সূরা আল-হাজ্জ: ৫; সূরা ক্বাফ: ৭-১১; সূরা আল-হিজর: ১৯।

(২) কাতাদা বলেন, এর অর্থ, রাতকে দিনে প্রবিষ্ট করাই, আর দিনকে রাতে প্রবিষ্ট করাই। [তাবারী]

(৩) এ আয়াতের দু’টি তাফসীর হতে পারে। এক. কোন কোন তাফসীরবিদ এখানে

الْعَلِيْمِ ۝

সর্বজ্ঞের নির্ধারণ।

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ ۝

৩৯. আর চাঁদের জন্য আমরা নির্দিষ্ট করেছি বিভিন্ন মন্‌যিল; অবশেষে সেটা শুষ্ক বাঁকা, পুরোনো খেজুর শাখার আকারে ফিরে যায়।

কালগত অবস্থানস্থল অর্থ নিয়েছেন, অর্থাৎ সেই সময়, যখন সূর্য তার নির্দিষ্ট গতি সমাপ্ত করবে। সে সময়টি কেয়ামতের দিন। এ তাফসীর অনুযায়ী আয়াতের অর্থ এই যে, সূর্য তার কক্ষ পথে মজবুত ও অটল ব্যবস্থাধীনে পরিভ্রমণ করছে। এতে কখনও এক মিনিট ও এক সেকেণ্ডের পার্থক্য হয় না। সূর্যের এই গতি চিরস্থায়ী নয়। তার একটি বিশেষ অবস্থানস্থল আছে; যেখানে পৌঁছে তার গতি স্তব্ধ হয়ে যাবে। সেটা হচ্ছে কেয়ামতের দিন। এ তাফসীর প্রখ্যাত তাবে'য়ী কাতাদাহ থেকে বর্ণিত আছে।

দুই. কতক তাফসীরবিদ আয়াতে স্থানগত অবস্থানস্থল অর্থ নিয়েছেন। [ইবন কাসীর] তাদের মতের সমর্থনে এক হাদীসে এসেছে, আবু যর গিফারী রাদিয়াল্লাহু আনহু একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে সুর্যাস্তের সময় মসজিদে উপস্থিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আবু যর, সূর্য কোথায় অস্ত যায় জান? আবু যর বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সূর্য চলতে চলতে আরশের নীচে পৌঁছে সিজদা করে। অতঃপর বললেন, ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا﴾ আয়াতে مستقر বলে তাই বোঝানো হয়েছে। [বুখারী: ৪৮০২, ৪৮০৩, মুসলিম: ১৫৯]

আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমর থেকে এ সম্পর্কে অপর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রত্যেক দিন সূর্য আরশের নীচে পৌঁছে সিজদা করে এবং নতুন পরিভ্রমণের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে। অনুমতি লাভ করে নতুন পরিভ্রমণ শুরু করে। অবশেষে এমন একদিন আসবে, যখন তাকে নতুন পরিভ্রমণের অনুমতি দেয়া হবে না, বরং যেখান থেকে অস্ত গিয়েছে সেখানেই উদিত হওয়ার নির্দেশ দেয়া হবে। এটা হবে কেয়ামত সন্নিকটবর্তী হওয়ার একটি আলামত। তখন তাওবাহ ও ঈমানের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে এবং কোন গোনাহগার, কাফের ও মুশরিকের তাওবাহ কবুল করা হবে না। [বুখারী:৩১৯৯, মুসলিম: ১৫৯]

এখানে আরও একটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা জরূরী, তা হচ্ছে, বৈজ্ঞানিকগণ কিছু দিন আগেও বলতেন যে, সূর্য স্থায়ী, পৃথিবী এর চার পাশে প্রদক্ষিণ করছে। কিন্তু বর্তমানে তারা তাদের মত পাল্টিয়ে বলতে শুরু করেছে যে, সূর্যও তার কক্ষপথে ঘুরে। এটি কুরআনের এ বাণীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তারা যা এখন আবিষ্কার করে বলেছে, আল্লাহ তা'আলা তা বহু শতক পূর্বে কুরআনে বলে দিয়েছেন। যা কুরআনের সত্যতার উপর প্রমাণবহ।

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٤٠﴾

৪০. সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চাঁদের নাগাল পাওয়া এবং রাতের পক্ষে সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রমকারী হওয়া। আর প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সাঁতার কাটে।

وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿٤١﴾

৪১. আর তাদের জন্য এক নিদর্শন এই যে, আমরা তাদের বংশধরদেরকে বোঝাই নৌযানে আরোহণ করিয়েছিলাম[১];

وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ﴿٤٢﴾

৪২. এবং তাদের জন্য অনুরূপ যানবাহন সৃষ্টি করেছি যাতে তারা আরোহণ করে[২]।

وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ ﴿٤٣﴾

৪৩. আর আমরা ইচ্ছে করলে তাদেরকে নিমজ্জিত করতে পারি; সে অবস্থায় তাদের কোন উদ্ধারকারী থাকবে না এবং তারা পরিত্রাণও পাবে না---

إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿٤٤﴾

৪৪. আমার পক্ষ থেকে রহমত না হলে এবং কিছু কালের জন্য জীবনোপভোগ করতে না দিলে।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٤٥﴾

৪৫. আর যখন তাদেরকে বলা হয়, ‘যা তোমাদের সামনে ও তোমাদের পিছনে রয়েছে সে ব্যাপারে তাকওয়া

---

(১) এখানে الفُلك দ্বারা নূহ আলাইহিস্ সালাম এর নৌকাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। [ইবন কাসীর,কুরতুবী]

(২) বাক্যের অর্থ এই যে, মানুষের আরোহণ ও বোঝা বহনের জন্য কেবল নৌকাই নয়, নৌকার অনুরূপ আরও যানবাহন সৃষ্টি করেছি। আরবরা তাদের প্রথা অনুযায়ী এর অর্থ নিয়েছে উটের সওয়ারী। কারণ, বোঝা বহনে উট সমস্ত জন্তুর সেরা। বড় বড় স্তুপ নিয়ে দেশ-বিদেশ সফর করে। তাই আরবরা উটকে سَفِيْنَةُ البَرّ অর্থাৎ স্থলের জাহাজ বলে থাকে। [দেখুন-ইবন কাসীর,ফাতহুল কাদীর]

অবলম্বন কর[১]; যাতে তোমাদের উপর রহমত করা হয়,

وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٤٦﴾

৪৬. আর যখনই তাদের রবের আয়াতসমূহের কোন আয়াত তাদের কাছে আসে, তখনই তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٤٧﴾

৪৭. আর যখন তাদেরকে বলা হয়, 'আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছেন তা থেকে ব্যয় কর' তখন কাফিররা মুমিনদেরকে বলে, 'যাকে আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে খাওয়াতে পারতেন আমরা কি তাকে খাওয়াব? তোমরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছ।'

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٨﴾

৪৮. আর তারা বলে, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল, এ প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হবে?'

مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴿٤٩﴾

৪৯. তারা তো অপেক্ষায় আছে এক বিকট শব্দের, যা তাদেরকে আঘাত করবে তাদের বাক-বিতণ্ডাকালে[২]।

---

(১) কাতাদাহ বলেন, এর অর্থ, তাদেরকে বলা হয়, তোমরা তোমাদের পূর্বেকার উম্মতদের উপর যে সমস্ত ঘটনাবলী ঘটেছে, তাদের উপর যে সমস্ত আযাব এসেছে, সে সমস্ত আযাব তোমাদের উপর আসার ব্যাপারে তাকওয়া অবলম্বন কর এবং তোমাদের সামনে যা রয়েছে অর্থাৎ কিয়ামত, সে ব্যাপারেও তাকওয়া অবলম্বন কর। [তাবারী] তবে মুজাহিদ বলেন, তোমাদের পূর্বে বলে, তাদের যে সমস্ত গোনাহ ও অপরাধ ইতোপূর্বে সংঘটিত হয়েছে সেগুলোকে উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। [তাবারী]

(২) কাফেররা ঠাট্টা ও পরিহাসচ্ছলে মুসলিমদেরকে জিজ্ঞেস করত, তোমরা যে কেয়ামতের প্রবক্তা, তা কোন বছর ও কোন তারিখে সংঘটিত হবে। বর্ণিত আয়াতে তারই জওয়াব দেয়া হয়েছে। তাদের প্রশ্ন বাস্তব বিষয় জানার জন্যে নয়, বরং ঠাট্টা ও পরিহাসের ছলে নিছক চ্যালেঞ্জের ঢংয়ে কূটতর্ক করার জন্য। এ ব্যাপারে তারা একথা বলতে চাচ্ছিল যে, কোন কিয়ামত হবে না, তোমরা খামাখা আমাদের ভয়

فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ۝٥٠

৫০. তখন তারা ওসিয়াত করতে সমর্থ হবে না এবং নিজেদের পরিবার-পরিজনদের কাছে ফিরেও আসতে পারবে না।

চতুর্থ রুকূ'

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ۝٥١

৫১. আর যখন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে তখনই তারা কবর থেকে ছুটে আসবে তাদের রবের দিকে[১]।

দেখাচ্ছো। এ কারণে তাদের জবাবে বলা হয়নি, কিয়ামত অমুক দিন আসবে বরং তাদেরকে বলা হয়েছে, তা আসবে এবং প্রচণ্ড শক্তিতে আসবে। জানার জন্য হলেও কেরামতের সন-তারিখের নিশ্চিত জ্ঞান কাউকে না দেয়াই স্রষ্টার সৃষ্টি রহস্যের দাবি ছিল। তাই আল্লাহ তাআলা এ জ্ঞান তাঁর নবী-রসুলকেও দান করেননি। নির্বোধদের এই প্রশ্ন অনর্থক ও বাজে ছিল বিধায় এর জওয়াবে কেয়ামতের তারিখ বর্ণনা করার পরিবর্তে তাদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, যে বিষয়ের আগমন অবশ্যম্ভাবী তার জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করা এবং সন-তারিখ খোঁজাখুঁজিতে সময় নষ্ট না করাই বুদ্ধিমানের কাজ। কেয়ামতের খবর শুনে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং সৎকর্ম সম্পাদন করাই ছিল বিবেকের দাবি। কিন্তু তারা এমনি গাফেল যে, কেয়ামতের আগমনের পর তারা যেন চিন্তা করার অপেক্ষায় আছে। তাই বলা হয়েছে যে, তারা কেয়ামতের অপেক্ষা করছে। অথচ কিয়ামত আস্তে আস্তে ধীরে-সুস্থে আসবে এবং লোকেরা তাকে আসতে দেখবে, এমনটি হবে না। বরং তা এমনভাবে আসবে যখন লোকেরা পূর্ণ নিশ্চিন্ততা সহকারে নিজেদের কাজ কারবারে মশগুল থাকবে এবং তাদের মনের ক্ষুদ্রতম কোণেও এ চিন্তা জাগবে না যে, দুনিয়ার শেষ সময় এসে গেছে। এ অবস্থায় অকস্মাৎ একটি বিরাট বিস্ফোরণ ঘটবে এবং যে যেখানে থাকবে সেখানেই খতম হয়ে যাবে। হাদীসে এসেছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, লোকেরা পথে চলাফেরা করবে, বাজারে কেনাবেচা করতে থাকবে, নিজেদের মজলিসে বসে আলাপ আলোচনা করতে থাকবে, এমন সময় হঠাৎ শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে। কেউ কাপড় কিনছিল। হাত থেকে রেখে দেবার সময়টুকু পাবে না, সে শেষ হয়ে যাবে। কেউ নিজের পশুগুলোকে পানি পান করাবার জন্য জলাধার ভর্তি করবে এবং তখনো পানি পান করানো শুরু করবে না তার আগেই কিয়ামত হয়ে যাবে। কেউ খাবার খেতে বসবে এবং এক গ্রাস খাবার মুখ পর্যন্ত নিয়ে যাবার সুযোগও পাবে না। [বুখারীঃ ৬৫০৬]

(১) صور শব্দের অর্থ শিঙ্গা। সঠিক মত অনুসারে কিয়ামতের শিঙ্গার ফুঁক দু'টি। এক. ধ্বংসের ফুৎকার। যার কথা এ সূরারই ৪৯ নং আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে।

قَالُوْا يٰوَيْلَنَا مَنْۢ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا ۜ هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ ﴿٥٢﴾

৫২. তারা বলবে, 'হায়! দুর্ভোগ আমাদের! কে আমাদেরকে আমাদের নিদ্রাস্থল থেকে উঠাল? দয়াময় আল্লাহ্ তো এরই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং রাসূলগণ সত্যই বলেছিলেন।'

اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ﴿٥٣﴾

৫৩. এটা হবে শুধু এক বিকট শব্দ; তখনই এদের সকলকে উপস্থিত করা হবে আমাদের সামনে,

فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا وَّلَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٥٤﴾

৫৪. অতঃপর আজ কারো প্রতি কোন যুলুম করা হবে না এবং তোমরা যা করতে শুধু তারই প্রতিফল দেয়া হবে।

اِنَّ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِيْ شُغُلٍ فٰكِهُوْنَ ﴿٥٥﴾

৫৫. এ দিন জান্নাতবাসীগণ আনন্দে মগ্ন থাকবে,

هُمْ وَاَزْوَاجُهُمْ فِيْ ظِلٰلٍ عَلَى الْاَرَآئِكِ مُتَّكِـُٔوْنَ ﴿٥٦﴾

৫৬. তারা এবং তাদের স্ত্রীগণ সুশীতল ছায়ায় সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে বসবে।

لَهُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّلَهُمْ مَّا يَدَّعُوْنَ ﴿٥٧﴾

৫৭. সেখানে থাকবে তাদের জন্য ফলমূল এবং তাদের জন্য বাঞ্ছিত সমস্ত কিছু,

سَلٰمٌ ۣ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ ﴿٥٨﴾

৫৮. পরম দয়ালু রবের পক্ষ থেকে সালাম, (সাদর সম্ভাষণ বা নিরাপত্তা)।

দুই. পূনরুত্থানের জন্য ফুৎকার। এ আয়াতে এ ফুঁৎকারের কথাই আলোচনা করা হয়েছে। [আদওয়াউল বায়ান] তখনকার অবস্থা বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, যখন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে তখনই তারা কবর থেকে ছুটে আসবে তাদের প্রতিপালকের দিকে। এখানে ينسلون শব্দটি نسلان থেকে উদ্ভুত। যার অর্থ দ্রুত চলা। [ইবন কাসীর] অন্য এক আয়াতে এসেছে, "যেদিন তাদের উপরস্থ জমীন বিদীর্ণ হবে এবং মানুষ ত্রস্ত-ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করবে, এ সমবেত সমাবেশকরণ আমার জন্য সহজ।" [সূরা কাফ: ৪৪] আরও এসেছে, "সেদিন তারা কবর থেকে বের হবে দ্রুতবেগে, মনে হবে তারা যেন কোন উপাসনালয়ের দিকে ধাবিত হচ্ছে" [সূরা মা'আরিজ:৪৩] অপর আয়াতে বলা হয়েছে, "হাশরের সময় মানুষ কবর থেকে উঠে দেখতে থাকবে।" [সূরা আয-যুমার: ৬৮]

৫৯. আর 'হে অপরাধীরা! তোমরা আজ পৃথক হয়ে যাও[১]।'

وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿٥٩﴾

৬০. হে বনী আদম! আমি কি তোমাদেরকে নির্দেশ দেইনি যে, তোমরা শয়তানের ইবাদাত করো না[২], কারণ সে

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٦٠﴾

(১) হাশরের ময়দানে প্রথমে মানুষ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় সমবেত হবে। অন্য আয়াতে এ অবস্থার চিত্র বর্ণনা করে বলা হয়েছে, "তারা হবে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের মত" [সূরা আল-কামার:৭] কিন্তু পরে কর্মের ভিত্তিতে তাদের পৃথক পৃথক দলে বিভক্ত করা হবে। এর দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি হচ্ছে, অপরাধীরা সৎকর্মশীল মুমিনদের থেকে ছাঁটাই হয়ে আলাদা হয়ে যাও। কারণ দুনিয়ায় তোমরা তাদের সম্প্রদায়, পরিবার ও গোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত থাকলে থাকতে পারো, কিন্তু এখানে এখন তোমাদের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। ফলে কাফের, মুমিন, সৎকর্মী ও অসৎকর্মী লোকগণ পৃথক পৃথক জায়গায় অবস্থান করবে। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, "আর যখন আত্মাসমূহকে জোড়া জোড়া করা হবে"। [সূরা আত-তাকওয়ীর:৭] আলোচ্য আয়াতেও এ পৃথকীকরণ ব্যক্ত হয়েছে। অনুরূপভাবে এ পৃথকীকরণের কথা কুরআনের অন্যান্য সূরায়ও বর্ণিত হয়েছে, যেমন: সূরা ইউনুস: ৩৮, সূরা আর-রূম:১৪,৪৩, সূরা আস-সাফ্ফাত:২২-২৩। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, তোমরা নিজেদের মধ্যে আলাদা হয়ে যাও। এখন তোমাদের কোন দল ও জোট থাকতে পারে না। তোমাদের সমস্ত দল ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে। তোমাদের সকল প্রকার সম্পর্ক ও আত্মীয়তা খতম করে দেয়া হয়েছে। তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তিকে এখন একাকী ব্যক্তিগতভাবে নিজের কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। [দেখুন,কুরতুবী,ফাতহুল কাদীর]

(২) অর্থাৎ সমস্ত মানুষ এমনকি, জিনদেরকেও কেয়ামতের দিন বলা হবে, আমি কি তোমাদেরকে দুনিয়াতে শয়তানের ইবাদত না করার আদেশ দেইনি? এখানে প্রশ্ন হয় যে, কাফেররা সাধারণত শয়তানের এবাদত করত না, বরং দেবদেবী অথবা অন্যকোন বস্তুর পূজা করত। কাজেই তাদেরকে শয়তানের ইবাদত করার অভিযোগে কেমন করে অভিযুক্ত করা যায়? এর জওয়াব হচ্ছে, এখানে আল্লাহ "ইবাদাত" কে আনুগত্য অর্থে ব্যবহার করেছেন। প্রত্যেক কাজে ও প্রত্যেক অবস্থায় কারও আনুগত্য করার নামই ইবাদত। শয়তানকে নিছক সিজদা করাই নিষিদ্ধ নয় বরং তার আনুগত্য করা এবং তার হুকুম মেনে চলাও নিষিদ্ধ। কাজেই আনুগত্য হচ্ছে ইবাদাত। শয়তানের ইবাদাত করার বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে। কখনো এমন হয়, মানুষ একটি কাজ করে এবং তার অংগ-প্রত্যংগের সাথে সাথে তার কণ্ঠও তার সহযোগী হয় এবং মনও তার সাথে অংশ গ্রহণ করে। আবার কখনো এমনও হয়, অংগ-প্রত্যংগের সাহায্যে মানুষ একটি কাজ করে কিন্তু অন্তর ও কণ্ঠ সে কাজে তার সহযোগী হয় না। এ হচ্ছে নিছক বাইরের অংগ-প্রত্যংগের সাহায্যে শয়তানের ইবাদাত। আবার এমন কিছু লোকও

তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু?

وَّاَنِ اعۡبُدُوۡنِیۡ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسۡتَقِیۡمٌ ﴿۶۱﴾

৬১. আর আমারই 'ইবাদাত কর, এটাই সরল পথ।

وَلَقَدۡ اَضَلَّ مِنۡكُمۡ جِبِلًّا كَثِیۡرًا ؕ اَفَلَمۡ تَكُوۡنُوۡا تَعۡقِلُوۡنَ ﴿۶۲﴾

৬২. আর শয়তান তো তোমাদের বহু দলকে বিভ্রান্ত করেছিল, তবুও কি তোমরা বুঝনি?

هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِیۡ كُنۡتُمۡ تُوۡعَدُوۡنَ ﴿۶۳﴾

৬৩. এটাই সে জাহান্নাম, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল।

اِصۡلَوۡهَا الۡیَوۡمَ بِمَا كُنۡتُمۡ تَكۡفُرُوۡنَ ﴿۶۴﴾

৬৪. তোমরা যে কুফরী করতে সে কারণে আজ তোমরা এতে দগ্ধ হও[১]।

اَلۡیَوۡمَ نَخۡتِمُ عَلٰۤی اَفۡوَاهِهِمۡ وَتُكَلِّمُنَاۤ اَیۡدِیۡهِمۡ وَتَشۡهَدُ اَرۡجُلُهُمۡ بِمَا كَانُوۡا یَكۡسِبُوۡنَ ﴿۶۵﴾

৬৫. আমরা আজ এদের মুখ মোহর করে দেব, এদের হাত কথা বলবে আমাদের সাথে এবং এদের পা সাক্ষ্য দেবে এদের কৃতকর্মের[২]।

আছে যারা ঠাণ্ডা মাথায় অপরাধ করে এবং মুখেও নিজেদের এ কাজে আনন্দ ও সন্তোষ প্রকাশ করে। এরা ভিতরে বাইরে উভয় পর্যায়ে শয়তানের ইবাদাতকারী। তারা চিরকাল শয়তানী শিক্ষার অনুসরণ করেছিল বিধায় তাদেরকে শয়তানের ইবাদতকারী বলা হয়েছে। সে অনুসারেই যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কিংবা অসন্তুষ্টির তোয়াক্কা না করে অর্থের মহব্বতে এমনসব কাজ করে, যদ্দারা অর্থ বৃদ্ধি পায় এবং স্ত্রীর মহব্বতে এমনসব কাজ করে যদ্দারা স্ত্রী সন্তুষ্ট হয়, হাদীসে তাদেরকে অর্থের দাস ও স্ত্রীর দাস বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। [দেখুন: বুখারী: ২৮৮৬, তিরমিযী: ২৩৭৫]

(১) যেমন অন্য আয়াতে এসেছে, "যেদিন তাদেরকে ধাক্কা মারতে মারতে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের আগুনের দিকে 'এটাই সে আগুন যাকে তোমরা মিথ্যা মনে করতে।' এটা কি তবে জাদু? না কি তোমরা দেখতে পাচ্ছ না!" [সূরা আত-তূর: ১৩-১৫]

(২) হাশরে হিসাব-নিকাশের জন্য উপস্থিতির সময় প্রথমে প্রত্যেকেই যা ইচ্ছা ওযর বর্ণনা করার স্বাধীনতা পাবে। মুশরিকরা সেখানে কসম করে কুফর ও শিরক অস্বীকার করবে। তারা বলবে, "আল্লাহর শপথ আমরা মুশরিক ছিলাম না" [সূরা আল-আন'আম:২৩] তাদের কেউ বলবে, আমাদের আমলনামায় ফেরেশতা যা কিছু লিখেছে, আমরা তা থেকে মুক্ত। তখন আল্লাহ তাআলা তাদের মুখে মোহর এঁটে দেবেন, যাতে তারা কোন কিছুই বলতে না পারে। অতঃপর তাদেরই হাত, পা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে রাজসাক্ষী করে কথা বলার যোগ্যতা দান করা হবে। তারা কাফেরদের

যাবতীয় কার্যকলাপের সাক্ষ্য দেবে। আলোচ্য আয়াতে হাত ও পায়ের কথা উল্লিখিত হয়েছে। অন্য আয়াতে মানুষের কর্ণ, চক্ষু ও চর্মের সাক্ষ্য দানের উল্লেখিত রয়েছে। যেমন, [সূরা ফুসসিলাতঃ ২১-২২, সূরা নূরঃ ২৪]।

এখানে এ প্রশ্ন দেখা দেয় যে, একদিকে আল্লাহ বলেন, আমি এদের কণ্ঠ রুদ্ধ করে দেবো এবং অন্যদিকে সূরা নূরের আয়াতে বলেন, এদের কণ্ঠ সাক্ষ্য দেবে এ দু'টি বক্তব্যের মধ্যে কিভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা যাবে ? এর জবাব হচ্ছে, কণ্ঠ রুদ্ধ করার অর্থ হলো, তাদের কথা বলার ক্ষমতা কেড়ে নেয়া। এরপর তারা স্বেচ্ছায় নিজেদের মর্জি মাফিক কথা বলতে পারবে না। আর কণ্ঠের সাক্ষ্যদানের অর্থ হচ্ছে, পাপিষ্ঠ লোকেরা তাদেরকে কোন কোন কাজে লাগিয়েছিল, তাদের মাধ্যমে কেমন সব কুফরী কথা বলেছিল, কোন ধরনের মিথ্যা উচ্চারণ করেছিল, কতপ্রকার ফিতনা সৃষ্টি করেছিল এবং কোন কোন সময় তাদের মাধ্যমে কোন কোন কথা বলেছিল সেসব বিবরণ তাদের কণ্ঠ স্বতস্ফূর্তভাবে দিয়ে যেতে থাকবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বিভিন্ন হাদীসে এ ভয়াবহ অবস্থার বর্ণনা এসেছে। আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, আমরা একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে ছিলাম। এমন সময় তিনি এমনভাবে হাসলেন যে, তার মাড়ির দাঁত দেখা গেল। তারপর তিনি বললেন, তোমরা কি জানো আমি কেন হাসছি? আমরা বললামঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেনঃ কিয়ামতের দিন বান্দা তার প্রভুর সাথে যে ঝগড়া করবে তা নিয়ে হাসছি। সে বলবে, হে রব, আমাকে কি আপনি যুলুম থেকে নিরাপত্তা দেননি? তিনি বলবেন, হ্যাঁ, তখন সে বলবে, আমি আমার বিরুদ্ধে নিজের ছাড়া অন্য কারও সাক্ষ্য গ্রহণ করবো না। তখন আল্লাহ্ বলবেন, তুমি নিজেই তোমার হিসেবের জন্য যথেষ্ঠ। আর সম্মানিত লেখকবৃন্দকে সাক্ষ্য বানাব। তারপর তার মুখের উপর মোহর মেরে দেয়া হবে এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে কথা বলার নির্দেশ দেয়া হবে। ফলে সেগুলো তাদের কাজের বিবরণ দিবে। তারপর তাদেরকে কথা বলার অনুমতি দেয়া হবে তখন তারা বলবে, তোমাদের ধ্বংস হোক, তোমাদের জন্যই তো আমি প্রতিরোধ করছিলাম। [মুসলিমঃ ২৯৬৯] অন্য হাদীসে এসেছে, তোমাদেরকে মূক করে ডাকা হবে। তারপর প্রথম তোমাদের উরু এবং দু'হাতকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। [মুসনাদে আহমাদঃ ৪/৪৪৬, ৪৪৭, ৫/৪-৫] অন্য হাদীসে এসেছে ... তারপর তৃতীয় জনকে ডাকা হবে। আর তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তুমি কে? সে বলবেঃ আমি আপনার বান্দা, আপনার প্রতি ঈমান এনেছি এবং আপনার নবী ও কিতাবাদির প্রতিও। আর আপনার জন্য সালাত, সাওম, সাদাকাহ্ ইত্যাদি ভাল কাজের প্রশংসা করে তা আদায় করার দাবী করবে। তখন তাকে বলা হবে, আমরা কি তোমার জন্য আমাদের সাক্ষীকে উপস্থাপন করব না? তখন সে চিন্তা করবে যে, এমন কে আছে যে, তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়? আর তখনই তার মুখের উপর মোহর এঁটে দেয়া হবে এবং তার উরুকে বলা হবে, কথা বল। তখন তার

৬৬. আর আমরা ইচ্ছে করলে অবশ্যই এদের চোখগুলোকে লোপ করে দিতাম, তখন এরা পথ অন্বেষণে দৌড়ালে[১] কি করে দেখতে পেত!

وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلٰٓى اَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاَنّٰى يُبْصِرُوْنَ ﴿٦٦﴾

৬৭. আর আমরা ইচ্ছে করলে অবশ্যই স্ব স্ব স্থানে এদের আকৃতি পরিবর্তন করে দিতাম, ফলে এরা এগিয়েও যেতে পারত না এবং ফিরেও আসতে পারত না।

وَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنٰهُمْ عَلٰى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوْا مُضِيًّا وَّلَا يَرْجِعُوْنَ ﴿٦٧﴾

পঞ্চম রুকূ'

৬৮. আর আমরা যাকে দীর্ঘ জীবন দান করি, সৃষ্টি অবয়বে তার অবনতি ঘটাই। তবুও কি তারা বুঝে না[২]?

وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِى الْخَلْقِ ۭ اَفَلَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٦٨﴾

উরু, গোস্ত, হাঁড় যা করেছে তার সাক্ষ্য দিবে। আর এটাই হলো মুনাফিক। এটা এজন্যই যাতে তিনি (আল্লাহ্) নিজের ওজর পেশ করতে পারেন এবং তার উপরই আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট। [মুসলিম: ২৯৬৮]

(১) অর্থাৎ জান্নাতের দিকে যেতে হলে যে পথ পাড়ি দিতে হবে, যদি তাদের অন্ধ করে দেয়া হয় তবে সে পুলসিরাত তারা কিভাবে পার হতে পারবে? [সা'দী] অথবা আমরা যদি তাদেরকে সৎপথ থেকে অন্ধ করে দেই, তারা কিভাবে সৎপথ পাবে? [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(২) আল্লামা শানকীতী বলেন, আয়াতের অর্থ, তাদের সৃষ্টিকে উল্টিয়ে দেই। আগে যেভাবে সৃষ্টি করেছি ঠিক তার বিপরীত সৃষ্টি করি। কারণ, তাদেরকে দূর্বল শরীর দিয়ে সৃষ্টি করেছিলাম, যেখানে বিবেক ও জ্ঞানের অভাব ছিল। তারপর তা বাড়াতে লাগলাম এবং এক অবস্থা থেকে অপর অবস্থায় স্থানান্তর চলতে থাকল। এক স্তর থেকে অন্য স্তরে উন্নীত হতে লাগল, শেষ পর্যন্ত সে পূর্ণতা পেল। তার শক্তি-সামর্থ সর্বোচ্চ পর্যায়ে গেল। যে বুঝতে পারল ও জানতে পারল কোনটা তার পক্ষে আর কোনটা তার বিপক্ষে। যখন এ পর্যায়ে পৌঁছে গেল, তখনই তার সৃষ্টিকে আমরা উল্টিয়ে দিলাম। তার সবকিছুতে ঘাটতি দিতে থাকলাম, অবশেষে সে বার্ধক্যে উপনীত হয়ে ছোট বাচ্চাদের মতই দুর্বল শরীর, স্বল্প বিবেক ও জ্ঞানহীন হয়ে গেল। বস্তুত: تنكيس এর অর্থই হচ্ছে কোন বস্তুর উপরের অংশ নিচের দিকে করে দেয়া। [আদওয়াউল বায়ান] অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা এ অবস্থার কথা ব্যক্ত করেছেন। আল্লাহ্ বলেন, "আল্লাহ্, তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেন দুর্বলতা থেকে, দুর্বলতার পর তিনি

৬৯. আর আমরা রাসূলকে কাব্য রচনা করতে শিখাইনি এবং এটা তাঁর পক্ষে শোভনীয়ও নয়[১]। এটা তো শুধু এক উপদেশ এবং সুস্পষ্ট কুরআন;

وَمَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْۢبَغِيْ لَهٗ ؕ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَّقُرْاٰنٌ مُّبِيْنٌ ۙ﴿۶۹﴾

৭০. যাতে তা সতর্ক করতে পারে জীবিতকে এবং যাতে কাফিরদের বিরুদ্ধে শাস্তির কথা সত্য হতে পারে।

لِّيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَّيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿۷۰﴾

৭১. আর তারা কি লক্ষ্য করে না যে, আমাদের হাত যা তৈরী করেছে তা থেকে তাদের জন্য আমরা সৃষ্টি করেছি গবাদিপশুসমূহ অতঃপর তারাই এগুলোর অধিকারী[২]?

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَاۤ اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مٰلِكُوْنَ ﴿۷۱﴾

দেন শক্তি; শক্তির পর আবার দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য।" [সূরা আর-রূম: ৫৪] আরও বলেন, "অবশ্যই আমরা সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে, তারপর আমরা তাকে হীনতাগ্রস্তদের হীনতমে পরিণত করি" [সূরা আত-তীন: ৪-৫] এক তাফসীর অনুসারে এখানে এ বার্ধক্যই উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। তাছাড়া আরও এসেছে, "আর আমরা যা ইচ্ছে তা এক নির্দিষ্ট কালের জন্য মাতৃগর্ভে স্থিত রাখি, তারপর আমরা তোমাদেরকে শিশুরূপে বের করি, পরে যাতে তোমরা পরিণত বয়সে উপনীত হও। তোমাদের মধ্যে কারো কারো মৃত্যু ঘটান হয় এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে কাউকে হীনতম বয়সে প্রত্যাবর্তিত করা হয়, যার ফলে সে জানার পরেও যেন কিছুই (আর) জানে না।" [সূরা আল-হাজ্জ: ৫] আরও এসেছে, "আর আল্লাহ্ই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন; তারপর তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে প্রত্যাবর্তিত করা হবে নিকৃষ্টতম বয়সে; যাতে জ্ঞান লাভের পরেও তার সবকিছু অজানা হয়ে যায়।" [সূরা আন-নাহল: ৭০]

(১) দেখুন, সূরা আল-হাক্কাহ: ৪১।

(২) আয়াতে চতুষ্পদ জন্তু সৃজনে মানুষের উপকারিতা এবং প্রকৃতির অসাধারণ কারিগরি উল্লেখ করার সাথে আল্লাহ তা'আলার আরও একটি মহা অনুগ্রহ বিধৃত হয়েছে। তা এই যে, চতুষ্পদ জন্তু সৃজনে মানুষের কোনই হাত নেই। এগুলো একান্তভাবে প্রকৃতির স্বহস্তে নির্মিত। আল্লাহ তা'আলা মুমিনকে কেবল চতুষ্পদ জন্তু দ্বারা উপকার লাভের সুযোগ ও অনুমতিই দেননি, বরং তাদেরকে এগুলোর মালিকও করে দিয়েছেন। ফলে তারা এগুলোতে সর্ব প্রকারে মালিকসুলভ অধিকার প্রয়োগ করতে পারে। নিজে এগুলোকে কাজে লাগাতে পারে অথবা এগুলো বিক্রি করে সে মূল্য দ্বারা উপকৃত হতে পারে। [দেখুন, তাবারী, সা'দী]

وَذَلَّلْنٰهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوْبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُوْنَ ﴿٧٢﴾

৭২. আর আমরা এগুলোকে তাদের বশীভূত করে দিয়েছি। ফলে এগুলোর কিছু সংখ্যক হয়েছে তাদের বাহন। আর কিছু সংখ্যক থেকে তারা খেয়ে থাকে।

وَلَهُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ ۭ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٧٣﴾

৭৩. আর তাদের জন্য এগুলোতে আছে বহু উপকারিতা এবং আছে পানীয় উপাদান। তবুও কি তারা কৃতজ্ঞ হবে না?

وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٧٤﴾ۭ

৭৪. আর তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্য ইলাহ্ গ্রহণ করেছে এ আশায় যে, তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে।

لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَهُمْ ۙ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُوْنَ ﴿٧٥﴾

৭৫. কিন্তু তারা (এ সব ইলাহ্) তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম নয়; আর তারা তাদের বাহিনীরূপে উপস্থিতকৃত হবে[১]।

فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۘ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ﴿٧٦﴾

৭৬. অতএব তাদের কথা আপনাকে যেন দুঃখ না দেয়। আমরা তো জানি যা তারা গোপন করে এবং যা তারা ব্যক্ত করে।

اَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ﴿٧٧﴾

৭৭. মানুষ কি দেখে না যে, আমরা তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্রবিন্দু থেকে? অথচ পরে সে হয়ে পড়ে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী।

---

(১) এখানে جند এর অর্থ প্রতিপক্ষ নেয়া হলে আয়াতের উদ্দেশ্য হবে এই যে, তারা দুনিয়াতে যাদেরকে উপাস্য স্থির করেছে, তারাই কেয়ামতের দিন তাদের প্রতিপক্ষ হয়ে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে। তবে হাসান ও কাতাদাহ্ রাহেমাহুমাল্লাহ্ থেকে বর্ণিত এ আয়াতের তাফসীর এই যে, কাফেররা সাহায্য পাওয়ার আশায় মূর্তিদেরকে উপাস্য স্থির করেছিল, কিন্তু অবস্থা হচ্ছে এই যে, স্বয়ং তারাই মূর্তিদের সেবাদাস ও সিপাহী হয়ে গেছে। তারা মূর্তিদের হেফাযত করে। কেউ বিরুদ্ধে গেলে তারা ওদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করে। অথচ তাদেরকে সাহায্য করার যোগ্যতা মূর্তিদের নেই। অথবা আয়াতের অর্থ, তারাও জাহান্নামে হাযির হবে, যেমন তাদের এ মূর্তিগুলোও জাহান্নামে তাদের সাথে উপস্থিত থাকবে। [দেখুন-ইবন কাসীর,ফাতহুল কাদীর]

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَّنَسِيَ خَلْقَهُ ۖ قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ ۝

৭৮. আর সে আমাদের সম্বন্ধে উপমা রচনা করে[১], অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়[২]। সে বলে, 'কে অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করবে যখন তা পচে গলে যাবে?'

قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِيْٓ اَنْشَاَهَآ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ ۝

৭৯. বলুন, 'তাতে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই যিনি তা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন[৩] এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি

---

(১) সূরা ইয়াসীনের আলোচ্য সর্বশেষ পাঁচটি আয়াত একটি বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হয়েছে, যা কোন কোন রেওয়ায়াতে উবাই ইবনে খলফের ঘটনা বলে এবং কোন কোন রেওয়াতে আ'স ইবনে ওয়ায়েলের ঘটনা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে উভয়ের তরফ থেকে ঘটনাটি সংঘটিত হওয়াও অসম্ভব নয়। ঘটনাটি এই যে, আ'স ইবনে ওয়ায়েল মক্কা উপত্যকা থেকে একটি পুরাতন হাড় কুড়িয়ে তাকে স্বহস্তে ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলল, এই যে হাড়টি চূর্ণ বিচূর্ণ অবস্থায় দেখছেন, আল্লাহ তা'আলা একেও জীবিত করবেন কি? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে মৃত্যু দেবেন, পুনরুজ্জীবিত করবেন এবং জাহান্নামে দাখিল করবেন। [মুস্তাদরাক ২/৪২৯]

(২) অর্থাৎ বীর্য থেকে সৃষ্ট এ মানুষ আল্লাহর কুদরত অস্বীকার করে কেমন খোলাখুলি বাকবিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হয়েছে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার হাতে থুথু ফেললেন। তারপর তার তর্জনী সেখানে রাখলেন এবং বললেন, আল্লাহ্ বলেন, হে বনী আদম! কিসে আমাকে অপারগ করল? অথচ তোমাকে এ ধরণের বস্তু থেকে আমি সৃষ্টি করেছি। তারপর যখন তোমার আত্মা তোমার কণ্ঠনালীর কাছে পৌঁছায় তখন তুমি বল, আমি সাদাকাহ করব। তোমার সাদাকাহ দেয়ার সময় তখন আর কোথায়? [ইবন মাজাহ: ২৭০৭, মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৫০২]

(৩) অর্থাৎ এ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করার সময় সে নিজের সৃষ্টিতত্ত্ব ভুলে গেল যে, নিস্প্রাণ একটি শুক্রবিন্দুতে প্রাণসঞ্চার করে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। যদি সে এই মূল তত্ত্ব বিস্মৃত না হত, তবে এরূপ দৃষ্টান্ত উপস্থিত করে আল্লাহ্‌র কুদরতকে অস্বীকার করার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করতে পারত না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "বনী ইসরাইলের এক মুসলিম ব্যক্তির মৃত্যু সময় উপস্থিত হলো, সে তার পরিবার-পরিজনকে এ বলে অসিয়ত করল যে, যখন আমি মারা যাব তখন তোমরা আমার জন্য কাঠ সংগ্রহ করে আমাকে আগুনে পুড়িয়ে দিও। তারপর যখন আগুন আমার গোস্ত খেয়ে ফেলবে এবং আমার হাঁড় পর্যন্ত কঙ্কাল হয়ে যাবে তখন তা নিয়ে গুড়ো

সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত।’

৮০. তিনি তোমাদের জন্য সবুজ গাছ থেকে আগুন উৎপাদন করেন, ফলে তোমরা তা থেকে আগুন প্রজ্বলিত কর।

الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ﴿٨٠﴾

৮১. যিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সমর্থ নন? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আর তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ।

أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم ۚ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿٨١﴾

৮২. তাঁর ব্যাপার শুধু এই যে, তিনি যখন কোন কিছুর ইচ্ছে করেন, তিনি বলেন, ‘হও’, ফলে তা হয়ে যায়।

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿٨٢﴾

৮৩. অতএব পবিত্র ও মহান তিনি, যাঁর হাতেই প্রত্যেক বিষয়ের সর্বময় কর্তৃত্ব; আর তাঁরই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে[১]।

فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾

করে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিও। তারা তাই করল। তখন আল্লাহ্ তা‘আলা তাকে পুরোপুরি একত্রিত করে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এমনটি কেন করলে? সে বলল, আপনার ভয়ে। আল্লাহ্ তখন তাকে ক্ষমা করে দিলেন। [বুখারী: ৩৪৫২, ৩৪৮১, ৩৪৭৮, মুসলিম: ২৭৫৬, ২৭৫৭]

(১) অনুরূপ বর্ণনা পবিত্র কুরআনের অন্যান্য সূরায় এসেছে, [যেমন: সূরা আল-মুমিনূন:৮৮, সূরা আল-মুলক:১] এখানে আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁর নিজ সত্তাকে পবিত্র ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত এবং সমস্ত ক্ষমতা যে তাঁরই হাতে সে ঘোষণা দিয়ে বান্দাকে আখেরাতের ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করাচ্ছেন যে, তাঁর কাছেই সবাইকে ফিরে যেতে হবে তখন তিনি সবাইকে তার কাজ ও কথার সঠিক প্রতিফল প্রদান করবেন। আয়াতে ব্যবহৃত ملكوت এবং ملك একই অর্থবোধক। যার অর্থ ক্ষমতা, চাবিকাঠি ইত্যাদি। তবে ملكوت এর পরিধি ব্যাপক। [দেখুন- ইবন কাসীর]

৩৭- সূরা আস-সাফ্‌ফাত
১৮২ আয়াত, ৫ রুকূ‘, মক্কী

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. শপথ তাদের যারা সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান[১]

وَالصّٰٓفّٰتِ صَفًّا ①

২. অতঃপর যারা কঠোর পরিচালক[২]

فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ②

৩. আর যারা ‘যিক্‌র’ আবৃত্তিতে রত-[৩]

فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا ③

৪. নিশ্চয় তোমাদের ইলাহ্ এক,

اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ④

৫. যিনি আসমানসমূহ, যমীন ও তাদের অন্তর্বর্তী সবকিছুর রব এবং রব সকল উদয়স্থলের[৪] ।

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ⑤

৬. নিশ্চয় আমরা কাছের আসমানকে নক্ষত্ররাজির সুষমা দ্বারা সুশোভিত

اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ ِالْكَوَاكِبِ ⑥

---

(১) কাতাদাহ বলেন, আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁর সৃষ্টির শপথ করেছেন, তারপর আরেক সৃষ্টির শপথ করেছেন, তারপর অপর সৃষ্টির শপথ করেছেন। এখানে কাতারবন্দী দ্বারা ফেরেশতাদেরকে বুঝানো হয়েছে। যারা আকাশে কাতারবন্দী হয়ে আছেন। [তাবারী]

(২) মুজাহিদ বলেন, এখানে কঠোর পরিচালক বলে ফেরেশতাদেরকে বুঝানো হয়েছে। [তাবারী] পক্ষান্তরে কাতাদাহ বলেন, এর দ্বারা কুরআনে যে সমস্ত জিনিসের ব্যাপারে আল্লাহ্ সতর্ক করেছেন তাই বুঝানো হয়েছে। [তাবারী]

(৩) মুজাহিদ বলেন, এখানে তেলাওয়াতে রত বলে ফেরেশতাদেরকে বোঝানো হয়েছে। আর কাতাদাহ বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য, কুরআন থেকে মানুষের ঘটনাবলী ও পূর্ববর্তী উম্মতদের কাহিনী যা তোমাদের উপর তেলাওয়াত করে শোনানো হয়। [তাবারী] আল্লামা শানকীতী বলেন, এখানে কাতারবন্দী, কঠোর পরিচালক ও তেলাওয়াতকারী বলে ফেরেশতাদের কয়েকটি দলকে বুঝানো হয়েছে। কারণ, এ সূরারই অন্যত্র কাতারবন্দী থাকা ফেরেশতাদের গুণ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে, “আর আমরা তো সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান এবং আমরা অবশ্যই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণাকারী।” [১৬৫-১৬৬]

(৪) সুদ্দী বলেন, এর বহু বচনের কারণ হচ্ছে, শীত কাল এবং গ্রীষ্ম কালে সূর্য উদিত হওয়ার স্থানের ভিন্নতা। তিনি আরও বলেন, সারা বছরে সূর্যের ৩৬০টি উদিত হওয়ার স্থান রয়েছে, অনুরূপভাবে সূর্যাস্ত যাওয়ারও অনুরূপ স্থান রয়েছে। [তাবারী]

করেছি[১],

৭. এবং রক্ষা করেছি প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান থেকে[২] ।

وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ ۝٧

৮. ফলে ওরা ঊর্ধ্ব জগতের কিছু শুনতে পারে না[৩] । আর তাদের প্রতি নিক্ষিপ্ত হয় সব দিক থেকে---

لَا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۝٨

৯. বিতাড়নের জন্য[৪] এবং তাদের জন্য আছে অবিরাম শাস্তি ।

دُحُوْرًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ۝٩

১০. তবে কেউ হঠাৎ কিছু শুনে ফেললে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড তার পশ্চাদ্ধাবন করে ।

اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ۝١٠

১১. সুতরাং তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, তারা সৃষ্টিতে দৃঢ়তর, না আমরা অন্য যা কিছু সৃষ্টি করেছি তা[৫]? তাদেরকে তো আমরা সৃষ্টি করেছি আঠাল মাটি হতে ।

فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمْ مَّنْ خَلَقْنَا ۭ اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّنْ طِيْنٍ لَّازِبٍ ۝١١

১২. আপনি তো বিস্ময় বোধ করছেন, আর তারা করছে বিদ্রূপ[৬] ।

بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُوْنَ ۝١٢

---

(১) এর সমার্থে দেখুন, সূরা ফুসসিলাত: ১২; সূরা আল-হিজর: ১৬; সূরা আল-মুলক: ৫ ।

(২) অনুরূপ দেখুন, সূরা আল-হিজর: ১৭-১৮ ।

(৩) কাতাদাহ বলেন, ﴿الْمَلَاِ الْاَعْلٰى﴾ বলে ফেরেশতাদের ঐ দলটিকে বোঝানো হয়েছে, যারা তাদের নীচে যারা আছে তাদের উপরে অবস্থান করছে । সেখান থেকে কোন কিছু শোনা নিষিদ্ধ করা হয়েছে । [তাবারী]

(৪) কি নিক্ষিপ্ত হয়, তা বলা হয়নি । কাতাদাহ বলেন, তাদের উপর অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বা উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপ করা হয় । [তাবারী] আর মুজাহিদ বলেন, এখানে دحوراً শব্দটির অন্য অর্থ বিতাড়িত অবস্থায় [তাবারী]

(৫) মুজাহিদ বলেন, অন্য সৃষ্টি যেমন, আসমান, যমীন ও পাহাড় । [তাবারী]

(৬) কাতাদাহ বলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশ্চর্য হচ্ছিলেন যে, এ কুরআন তাকে দেয়া হয়েছে, অথচ পথভ্রষ্টরা এটাকে নিয়ে উপহাস করছে । [তাবারী]

وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ ﴿١٣﴾

১৩. এবং যখন তাদেরকে উপদেশ দেয়া হয়, তখন তারা তা গ্রহণ করে না ।

وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ ﴿١٤﴾

১৪. আর যখন তারা কোন নিদর্শন দেখে, তখন তারা উপহাস করে

وَقَالُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿١٥﴾

১৫. এবং বলে, ‘এটা তো এক সুস্পষ্ট জাদু ছাড়া আর কিছুই নয় ।

أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿١٦﴾

১৬. ‘আমরা যখন মরে যাব এবং মাটি ও অস্থিতে পরিণত হব, তখনও কি আমরা পুনরুত্থিত হব?

أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ﴿١٧﴾

১৭. ‘এবং আমাদের পিতৃপুরুষরাও?’

قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ ﴿١٨﴾

১৮. বলুন, ‘হ্যাঁ, এবং তোমরা হবে লাঞ্ছিত ।’

فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ﴿١٩﴾

১৯. অতঃপর তা তো একটিমাত্র প্রচণ্ড ধমক---আর তখনই তারা দেখবে[১] ।

وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَٰذَا يَوْمُ الدِّينِ ﴿٢٠﴾

২০. এবং তারা বলবে, ‘হায়, দুর্ভোগ আমাদের! এটাই তো প্রতিদান দিবস ।’

هَٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٢١﴾

২১. এটাই ফয়সালার দিন, যার প্রতি তোমরা মিথ্যা আরোপ করতে ।

দ্বিতীয় রুকূ’

احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا

২২. (ফেরেশ্‌তাদেরকে বলা হবে,) ‘একত্র কর যালিম[২] ও তাদের

---

(১) زجرة শব্দের একাধিক অর্থ হয়ে থাকে । এর এক অর্থ, ‘প্রচণ্ড ধমক’ বা ‘ভয়ানক শব্দ’ । এখানে মৃতদেরকে জীবিত করার উদ্দেশ্যে ইসরাফীল আলাইহিস্ সালাম এর শিংগায় দ্বিতীয় ফুৎকার বোঝানো হয়েছে । [ফাতহুল কাদীর]

(২) আল্লামা শানকীতী বলেন, যালেম বলে এখানে কাফেরদেরকে বোঝানো হয়েছে । কারণ, পরবর্তী অংশ ‘আর যাদের ইবাদাত করত তারা আল্লাহর পরিবর্তে’ থেকে এটাই সুস্পষ্ট । কুরআনের বিভিন্ন স্থানে যুলুম বলে শির্ক উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে । [আদওয়াউল বায়ান]

সহচরদেরকে[১] এবং তাদেরকে, যাদের ‘ইবাদাত করত তারা---	يَعْبُدُونَ ﴿٢٢﴾
২৩. আল্লাহ্‌র পরিবর্তে। আর তাদেরকে পরিচালিত কর জাহান্নামের পথে[২],	مِن دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴿٢٣﴾
২৪. ‘আর তাদেরকে থামাও, কারণ তাদেরকে তো প্রশ্ন করা হবে।	وَقِفُوهُمْ ۖ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ ﴿٢٤﴾
২৫. ‘তোমাদের কী হল যে, তোমরা একে অন্যের সাহায্য করছ না?’	مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ﴿٢٥﴾
২৬. বস্তুত তারা হবে আজ আত্মসমর্পণকারী।	بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ﴿٢٦﴾
২৭. আর তারা একে অন্যের সামনাসামনি হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে---	وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٢٧﴾
২৮. তারা বলবে, ‘তোমরা তো তোমাদের শপথ নিয়ে আমাদের কাছে আসতে[৩]।’	قَالُوا إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ﴿٢٨﴾

(১) ইবনে আব্বাস বলেন, এখানে أزواج বলে অনুরূপ ও সমমতের লোক বোঝানো হয়েছে। কাতাদাহ বলেন, এর দ্বারা তাদের মত অন্যান্য কাফের বোঝানো হয়েছে। [তাবারী]

(২) অথবা জাহান্নামের চতুর্থ দরজা হচ্ছে জাহীম। তাদেরকে সেদিকে পথনির্দেশ কর। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(৩) এ আয়াতের কয়েকটি অর্থ হতে পারে। এক. তোমরা তোমাদের শপথ নিয়ে এসে বলতে যে, তোমরা হকের উপর আছ, তাই আমরা তোমাদেরকে বিশ্বাস করেছিলাম। তোমরা এমনভাবে আসতে যে, আমরা তোমাদেরকে নিরাপদ মনে করতাম। ফলে আমরা তোমাদের অনুসরণ করেছিলাম। অর্থাৎ তোমরাই আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছ। [জালালাইন] দুই. অন্য অর্থ হচ্ছে, তোমরা দ্বীন ও হকের লেবাস পরে আসতে, আর আমাদেরকে শরী‘আতের বিধি-বিধান সম্পর্কে উদাসীন করে দিতে। তা থেকে দূরে রাখতে। আর আমাদের কাছে ভ্রষ্ট পথকে শোভিত করে দেখাতে। [তাবারী; মুয়াসসার] তিন. তোমরা তোমাদের শক্তি ও প্রভাব নিয়ে আমাদেরকে প্রভাবিত করতে, ফলে আমরা তোমাদের অনুসরণ করতাম। [সা‘দী]

২৯. তারা (নেতৃস্থানীয় কাফেররা) বলবে, 'বরং তোমরা তো মুমিন ছিলে না,

قَالُوا بَل لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۝٢٩

৩০. 'এবং তোমাদের উপর আমাদের কোন কর্তৃত্ব ছিল না; বস্তুত তোমরাই ছিলে সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।

وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ ۖ بَلْ كُنتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ ۝٣٠

৩১. 'তাই আমাদের বিরুদ্ধে আমাদের রবের কথা সত্য হয়েছে, নিশ্চয় আমরা শাস্তি আস্বাদন করব।

فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا ۖ إِنَّا لَذَائِقُونَ ۝٣١

৩২. 'সুতরাং আমরা তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলাম, কারণ আমরা নিজেরাও ছিলাম বিভ্রান্ত।'

فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ ۝٣٢

৩৩. অতঃপর তারা সবাই সেদিন শাস্তির শরীক হবে।

فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ۝٣٣

৩৪. নিশ্চয় আমরা অপরাধীদের সাথে এরূপ করে থাকি।

إِنَّا كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ۝٣٤

৩৫. তাদেরকে 'আল্লাহ্ ছাড়া কোন সত্য ইলাহ্ নেই' বলা হলে তারা অহংকার করত[১]।

إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ۝٣٥

---

(১) অহংকারের কারণেই তারা মূলত: এ কালেমা উচ্চারণ করেনি। যদি তারা এ কালেমা উচ্চারণ করত তবে তাদের অবস্থা সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলেছেন তা হতো। তিনি বলেছেন, 'আমি তো মানুষের সাথে যুদ্ধ করার জন্য নির্দেশিত হয়েছি যতক্ষণ না তারা বলবে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। যদি তারা তা বলে তবে তাদের জান ও মাল আমার হাত থেকে নিরাপদ হবে। তবে ইসলামের হক ছাড়া। আর তাদের হিসেব তো আল্লাহ্‌রই উপর। [বুখারী:২৫, মুসলিম:২২] ইমাম যুহরী বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবেও তা উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর কিতাবে একদল লোকের অহংকারের কথা বর্ণনা করে বলেছেন, "তাদেরকে 'আল্লাহ্ ছাড়া কোন সত্য ইলাহ্ নেই' বলা হলে তারা অহংকার করত"। আরও বলেছেন, "যখন কাফিররা তাদের অন্তরে পোষণ করেছিল গোত্রীয় অহমিকা---অজ্ঞতার যুগের অহমিকা, তখন আল্লাহ্ তাঁর রাসূল ও মুমিনদের উপর স্বীয় প্রশান্তি নাযিল করলেন; আর তাদেরকে তাকওয়ার কালেমায় সুদৃঢ় করলেন," আর সেই তাকওয়ার কালেমা

৩৬. এবং বলত, 'আমরা কি এক উন্মাদ কবির কথায় আমাদের ইলাহ্‌দেরকে বর্জন করব?'

وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوٓا۟ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ ۝٣٦

৩৭. বরং তিনি তো সত্য নিয়ে এসেছেন এবং তিনি রাসূলদেরকে সত্য বলে স্বীকার করেছেন।

بَلْ جَآءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۝٣٧

৩৮. তোমরা অবশ্যই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আস্বাদনকারী হবে,

إِنَّكُمْ لَذَآئِقُوا۟ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ ۝٣٨

৩৯. এবং তোমরা যা করতে তারই প্রতিফল পাবে---

وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝٣٩

৪০. তবে তারা নয়, যারা আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ বান্দা।

إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ۝٤٠

৪১. তাদের জন্য আছে নির্ধারিত রিযিক---

أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ۝٤١

৪২. ফলমূল; আর তারা হবে সম্মানিত,

فَوَٰكِهُ ۖ وَهُم مُّكْرَمُونَ ۝٤٢

৪৩. নেয়ামত-পূর্ণ জান্নাতে

فِى جَنَّٰتِ ٱلنَّعِيمِ ۝٤٣

৪৪. মুখোমুখি হয়ে আসনে আসীন হবে।

عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَٰبِلِينَ ۝٤٤

৪৫. তাদেরকে ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করা হবে বিশুদ্ধ সুরাপূর্ণ পাত্র(১)

يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ ۝٤٥

হচ্ছে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। মুশরিকরা হুদাইবিয়ার দিন এটা বলা থেকে অহংকার করে বিরত ছিল। [ইবন হিব্বান: ১/৪৫১-৪৫২; আত-তাফসীরুস সহীহ]

(১) শরাবের পানপাত্র নিয়ে ঘুরে ঘুরে জান্নাতীদের মধ্যে কারা পরিবেশন করবে সেকথা এখানে বলা হয়নি। এর বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে অন্যান্য স্থানেঃ "আর তাদের খিদমত করার জন্য ঘুরবে তাদের খাদেম ছেলেরা যারা এমন সুন্দর যেমন ঝিনুকে লুকানো মোতি।" [সূরা আত-তূর: ২৪] "আর তাদের খিদমত করার জন্য ঘুরে ফিরবে এমন সব বালক যারা হামেশা বালকই থাকবে। তোমরা তাদেরকে দেখলে মনে করবে মোতি ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে।" [সূরা আল-ইনসান: ১৯]

بَيْضَآءَ لَذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ ﴿٤٦﴾

৪৬. শুভ্র উজ্জ্বল, যা হবে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু।

لَا فِيْهَا غَوْلٌ وَّلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُوْنَ ﴿٤٧﴾

৪৭. তাতে ক্ষতিকর কিছু থাকবে না এবং তাতে তারা মাতালও হবে না,

وَعِنْدَهُمْ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ عِيْنٌ ﴿٤٨﴾

৪৮. তাদের সঙ্গে থাকবে আনতনয়না[১], ডাগর চোখ বিশিষ্টা[২] (হূরীগণ)।

كَاَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُوْنٌ ﴿٤٩﴾

৪৯. তারা যেন সুরক্ষিত ডিম্ব[৩]।

فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ ﴿٥٠﴾

৫০. অতঃপর তারা একে অন্যের সামনাসামনি হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে

قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ اِنِّيْ كَانَ لِيْ قَرِيْنٌ ﴿٥١﴾

৫১. তাদের কেউ বলবে, 'আমার ছিল এক সঙ্গী;

يَّقُوْلُ ءَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِيْنَ ﴿٥٢﴾

৫২. 'সে বলত, 'তুমি কি তাদের অন্তর্ভুক্ত যারা বিশ্বাস করে যে,

---

(১) এখানে জান্নাতের হুরীদের বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। এ আয়াতে প্রথমে তাদের গুণ বর্ণিত হয়েছে যে, তারা হবে 'আনতনয়না'। যেসব স্বামীর সাথে আল্লাহ তা'আলা তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করে দেবেন, তারা তাদের ছাড়া কোন ভিন্ন পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে না। কোন কোন মুফাসসির এর অর্থ করেছেন, তারা তাদের স্বামীদের দৃষ্টি নত রাখবে। অর্থাৎ তারা নিজেরা এমন 'অনিন্দ্য সুন্দরী ও স্বামীর প্রতি নিবেদিতা' হবে যে, স্বামীদের মনে অন্য কোন নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করার বাসনাই হবে না। [দেখুন, তাবারী; আদওয়াউল বায়ান]

(২) এখানে হুরীদের দ্বিতীয় গুণ বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, তাদের চোখ বড় বড় হবে। মেয়েদের চোখ বড় হলে সুন্দর দেখায়। [দেখুন,তাবারী; আদওয়াউল বায়ান]

(৩) এখানে জান্নাতের হুরীগণের তৃতীয় গুণ বর্ণিত হয়েছে। তাদেরকে সুরক্ষিত ডিমের সাথে তুলনা করা হয়েছে। আরবদের কাছ এই তুলনা প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত ছিল। যে ডিম পাখার নিচে লুকানো থাকে, তা এমনই সুরক্ষিত থাকে যে, এর উপর বাইরের ধূলিকণার কোন প্রভাব পড়ে না। ফলে তা খুব স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন থাকে। এছাড়া এর রঙ সাদা হলুদাভ হয়ে থাকে; যা আরবদের কাছে মহিলাদের সর্বাধিক চিত্তাকর্ষক রঙ হিসেবে গণ্য হত। তাই এর সাথে তুলনা করা হয়েছে। [দেখুন,তাবারী; আদওয়াউল বায়ান]

৫৩. 'আমরা যখন মরে যাব এবং আমরা মাটি ও অস্থিতে পরিণত হব তখনও কি আমাদেরকে প্রতিফল দেয়া হবে?'

ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَدِيْنُوْنَ ﴿٥٣﴾

৫৪. আল্লাহ্ বলবেন, 'তোমরা কি তাকে দেখতে চাও?'

قَالَ هَلْ اَنْتُمْ مُّطَّلِعُوْنَ ﴿٥٤﴾

৫৫. অতঃপর সে ঝুঁকে দেখবে এবং তাকে দেখতে পাবে জাহান্নামের মধ্যস্থলে;

فَاطَّلَعَ فَرَاٰهُ فِيْ سَوَآءِ الْجَحِيْمِ ﴿٥٥﴾

৫৬. বলবে, 'আল্লাহ্‌র কসম! তুমি তো আমাকে প্রায় ধ্বংসই করেছিলে,

قَالَ تَاللّٰهِ اِنْ كِدْتَّ لَتُرْدِيْنِ ﴿٥٦﴾

৫৭. 'আমার রবের অনুগ্রহ না থাকলে আমিও তো হাযিরকৃত[১] ব্যক্তিদের মধ্যে শামিল হতাম।

وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّيْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ﴿٥٧﴾

৫৮. 'আমাদের তো আর মৃত্যু হবে না

اَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِيْنَ ﴿٥٨﴾

৫৯. প্রথম মৃত্যুর পর এবং আমাদেরকে শাস্তিও দেয়া হবে না!'

اِلَّا مَوْتَتَنَا الْاُوْلٰى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ﴿٥٩﴾

৬০. এটা তো অবশ্যই মহাসাফল্য।

اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٦٠﴾

৬১. এরূপ সাফল্যের জন্য আমলকারীদের উচিত আমল করা,

لِمِثْلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعٰمِلُوْنَ ﴿٦١﴾

৬২. আপ্যায়নের জন্য কি এটাই শ্রেয়, না যাক্কুম গাছ?

اَذٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا اَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ ﴿٦٢﴾

৬৩. যালিমদের জন্য আমরা এটা সৃষ্টি করেছি পরীক্ষাস্বরূপ,

اِنَّا جَعَلْنٰهَا فِتْنَةً لِّلظّٰلِمِيْنَ ﴿٦٣﴾

৬৪. এ গাছ উদ্‌গত হয় জাহান্নামের তলদেশ থেকে,

اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِيْٓ اَصْلِ الْجَحِيْمِ ﴿٦٤﴾

৬৫. এর মোচা যেন শয়তানের মাথা,

طَلْعُهَا كَاَنَّهٗ رُءُوْسُ الشَّيٰطِيْنِ ﴿٦٥﴾

(১) অর্থাৎ যদি আমার উপর আল্লাহ্‌র নেয়ামত না থাকত, তবে তো আমি জাহান্নামের শাস্তিতে হাযিরকৃত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম। [সা'দী]

فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿٦٦﴾

৬৬. তারা তো এটা থেকে খাবে এবং উদর পূর্ণ করবে এটা দিয়ে[১]।

ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ ﴿٦٧﴾

৬৭. তদুপরি তাদের জন্য থাকবে ফুটন্ত পানির মিশ্রণ।

ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ ﴿٦٨﴾

৬৮. তারপর তাদের প্রত্যাবর্তন হবে প্রজ্বলিত আগুনেরই দিকে।

إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ ﴿٦٩﴾

৬৯. তারা তো তাদের পিতৃপুরুষদেরকে পেয়েছিল বিপথগামী,

فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ ﴿٧٠﴾

৭০. অতঃপর তাদের পদাঙ্ক অনুসরণে ধাবিত হয়েছিল[২]।

وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٧١﴾

৭১. আর অবশ্যই তাদের আগে পূর্ববর্তীদের বেশীর ভাগ বিপথগামী হয়েছিল,

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ ﴿٧٢﴾

৭২. আর অবশ্যই আমরা তাদের মধ্যে সতর্ককারী পাঠিয়েছিলাম।

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ ﴿٧٣﴾

৭৩. কাজেই লক্ষ্য করুন যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল, তাদের পরিণাম কী হয়েছিল!

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿٧٤﴾

৭৪. তবে আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ বান্দাদের কথা স্বতন্ত্র[৩]।

---

(১) আল্লামা শানকীতী বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন যে, তারা তো যাক্কুম গাছ থেকে খাবে এবং উদর পূর্ণ করবে এটা দিয়ে। তদুপরি তাদের জন্য থাকবে ফুটন্ত পানির মিশ্রণ। অন্যত্রও তা বলেছেন, "তারপর হে বিভ্রান্ত মিথ্যারোপকারীরা! তোমরা অবশ্যই আহার করবে যাক্কূম গাছ থেকে, অতঃপর সেটা দ্বারা তারা পেট পূর্ণ করবে, তদুপরি তারা পান করবে তার উপর অতি উষ্ণ পানি--অতঃপর পান করবে তৃষ্ণার্ত উটের ন্যায়।" [সূরা আল-ওয়াকি'আহ: ৫১-৫৫]

(২) মুজাহিদ বলেন, এর অর্থ কোন কিছুর পিছনে দ্রুত চলা। [তাবারী] কাতাদাহ বলেন, খুব দ্রুত চলা। [তাবারী]

(৩) সুদ্দী বলেন, এরা হচ্ছে, তারা আল্লাহ্ যাদেরকে তাঁর নিজের জন্য বিশেষভাবে বাছাই করে নিয়েছেন। [তাবারী]

তৃতীয় রুকূ'

وَلَقَدْ نَادٰىنَا نُوْحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيْبُوْنَ ﴿٧٥﴾

৭৫. আর অবশ্যই নূহ্ আমাদেরকে ডেকেছিলেন, অতঃপর (দেখুন) আমরা কত উত্তম সাড়াদানকারী।

وَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ﴿٧٦﴾

৭৬. আর তাকে এবং তার পরিবারবর্গকে আমরা উদ্ধার করেছিলাম মহাসংকট থেকে।

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهٗ هُمُ الْبٰقِيْنَ ﴿٧٧﴾

৭৭. আর তার বংশধরদেরকেই আমরা বিদ্যমান রেখেছি (বংশপরম্পরায়)(১),

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْاٰخِرِيْنَ ﴿٧٨﴾

৭৮. আর আমরা পরবর্তীদের মধ্যে তার জন্য সুখ্যাতি রেখেছি।

سَلٰمٌ عَلٰى نُوْحٍ فِي الْعٰلَمِيْنَ ﴿٧٩﴾

৭৯. সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে নূহের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।

اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٨٠﴾

৮০. নিশ্চয় আমরা এভাবে মুহসিনদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি,

اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٨١﴾

৮১. নিশ্চয় তিনি ছিলেন আমাদের মুমিন বান্দাদের অন্যতম।

ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخَرِيْنَ ﴿٨٢﴾

৮২. তারপর অন্য সকলকে আমরা নিমজ্জিত করেছিলাম।

وَاِنَّ مِنْ شِيْعَتِهٖ لَاِبْرٰهِيْمَ ﴿٨٣﴾

৮৩. আর ইব্‌রাহীম তো তার অনুগামীদের অন্তর্ভুক্ত(২)।

اِذْ جَآءَ رَبَّهٗ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ﴿٨٤﴾

৮৪. স্মরণ করুন, যখন তিনি তার

(১) ইবনে আব্বাস বলেন, এর অর্থ শুধু নূহের সন্তানরাই অবশিষ্ট ছিল। [তাবারী]

(২) ইবরাহীম আলাইহিস সালামের কাহিনী বিস্তারিত দেখুন, তার পিতা ও সম্প্রদায়ের সাথে তার বিভিন্ন আলোচনা, সূরা মারইয়াম: ৪১-৪৯; সূরা আশ-শু'আরা: ৬৯-৭০। ইবন আব্বাস বলেন, এখানে তার অনুগামী বলে, তার দ্বীনের অনুগামী বোঝানো হয়েছে। [তাবারী] মুজাহিদ বলেন, তার পদ্ধতি ও নিয়ম-নীতির অনুগামী বোঝানো হয়েছে। [তাবারী]

রবের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন বিশুদ্ধচিত্তে[১];

৮৫. যখন তিনি তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তোমরা কিসের ইবাদাত করছ?

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِۦ مَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿٨٥﴾

৮৬. 'তোমরা কি আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অলীক ইলাহ্‌গুলোকে চাও?

أَئِفْكًا ءَالِهَةً دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ ﴿٨٦﴾

৮৭. 'তাহলে সকলসৃষ্টির রব সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা কী[২]?'

فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٨٧﴾

৮৮. অতঃপর তিনি তারকারাজির দিকে একবার তাকালেন,

فَنَظَرَ نَظْرَةً فِى ٱلنُّجُومِ ﴿٨٨﴾

৮৯. এবং বললেন, 'নিশ্চয় আমি অসুস্থ[৩] ।'

فَقَالَ إِنِّى سَقِيمٌ ﴿٨٩﴾

---

(১) সুদ্দী বলেন, অর্থাৎ শির্কমুক্ত হয়ে আল্লাহ্‌র কাছে আসলেন। [তাবারী]

(২) কাতাদাহ বলেন, অর্থাৎ যদি তোমরা তাঁর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করেছ যে, তোমরা তাকে ছাড়া অন্যকে ইবাদাত করেছ। [তাবারী] তখন তাঁর ব্যাপারে তোমাদের কি ধারণা? তিনি কি তোমাদের এমনিই ছেড়ে দিবেন?

(৩) ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তার জীবনে তিনটি মিথ্যা বলেছিলেন বলে যে কথা বলা হয়ে থাকে এটি তার একটি। কোন কোন মুফাসসির বলেন, এখানে অসুস্থ বলে বোঝানো হয়েছে যে, আমি অসুস্থ হয়ে পড়ব। কারণ, আরবী ভাষায় فعيل এর পদবাচ্য বহুল পরিমাণে ভবিষ্যৎ কালের জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন পবিত্র কুরআনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ﴾ [সূরা আয-যুমার:৩০] এর বাহ্যিক অর্থ আপনিও মৃত এবং তারাও মৃত। কিন্তু এখানে এরূপ অর্থ উদ্দেশ্য নয়, বরং অর্থ হল, আপনিও মৃত্যুবরণ করবেন এবং তারাও মৃত্যুবরণ করবে। এমনিভাবে ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালাম سقيم এর অর্থ নিয়েছিলেন যে, 'আমি অসুস্থ হয়ে পড়ব'। এ কথা বলার কারণ এই যে, মৃত্যুর পূর্বে প্রত্যেক মানুষের অসুস্থ হওয়া স্থির নিশ্চিত। কোন কোন মুফাসসির বলেন, এতে তার উদ্দেশ্য ছিল মানসিক সংকোচ; যা স্বগোত্রের মুশরিকসুলভ কাণ্ডকীর্তি দেখে তার মনে সৃষ্টি হচ্ছিল। 'আমার মন খারাপ' বলেও এ অর্থ অনেকটা ব্যক্ত করা যায়। বলা বাহুল্য, এ বাক্যে 'মানসিক সংকোচ' অর্থেরও পুরোপুরি অবকাশ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালাম

فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِيْنَ ﴿٩٠﴾

৯০. অতঃপর তারা তাকে পিছনে রেখে চলে গেল।

فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٩١﴾

৯১. পরে তিনি চুপিচুপি তাদের দেবতাগুলোর কাছে গেলেন এবং বললেন, 'তোমরা খাদ্য গ্রহণ করছ না কেন?'

مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ ﴿٩٢﴾

৯২. 'তোমাদের কী হয়েছে যে তোমরা কথা বল না?'

فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِيْنِ ﴿٩٣﴾

৯৩. অতঃপর তিনি তাদের উপর সবলে আঘাত হানলেন।

فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ ﴿٩٤﴾

৯৪. তখন ঐ লোকগুলো তার দিকে ছুটে আসল।

قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ﴿٩٥﴾

৯৫. তিনি বললেন, 'তোমরা নিজেরা যাদেরকে খোদাই করে নির্মাণ কর তোমরা কি তাদেরই ইবাদাত কর?

এর একথাটিকে মিথ্যা বা বাস্তববিরোধী বলার জন্য প্রথমে কোন উপায়ে একথা জানা উচিত যে, সে সময় ইবরাহীম আলাইহিস্‌সালামের কোন প্রকারের কোন কষ্ট ও অসুস্থতা ছিল না এবং তিনি নিছক বাহানা করে একথা বলেছিলেন। যদি এর কোন প্রমাণ না থেকে থাকে, তাহলে অযথা কিসের ভিত্তিতে একে মিথ্যা গণ্য করা হবে? হতে পারে ইব্রাহীম আলাইহিস্‌সালাম তখন বাস্তবিকই কিছুটা অসুস্থ ছিলেন; তবে উৎসবে যোগদানে প্রতিবন্ধক হতে পারে, এমন অসুস্থতা ছিল না। তিনি তার মামুলি অসুস্থতার কথাই এমনভাবে ব্যক্ত করেছেন, যাতে শ্রোতারা মনে করে নেয় যে, তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, কাজেই মেলায় যাওয়া সম্ভবপর নয়। আলেমগণ এটাকেই তাওরিয়াহ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। যা বাহ্যিক আকার-আকৃতিতে মিথ্যা মনে হয়, কিন্তু বক্তার উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য করলে মিথ্যা হয় না। অর্থাৎ যার বাহ্যিক অর্থ বাস্তবের প্রতিকূলে এবং বক্তার উদ্দিষ্ট অর্থ বাস্তবের অনুকূলে। [দেখুন-তাবারী; ফাতহুল কাদীর] এ ব্যাখ্যা সর্বাধিক যুক্তিযুক্ত এবং সন্তোষজনক। কারণ, এক হাদিসে ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালাম এর উক্তি ﴿فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ﴾ এর জন্যে كذب (মিথ্যা) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। [বুখারী:৩৩৫৮] এ হাদীসেরই কোন কোন বর্ণনায় আরও বলা হয়েছে, "এগুলোর মধ্যে কোন মিথ্যা এরূপ নয়; যা আল্লাহর দ্বীনের প্রতিরক্ষা ও সমর্থনে বলা হয়নি"। [তিরমিযী: ৩১৪৮]

৯৬. অথচ আল্লাহ্‌ই সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমরা যা তৈরী কর তাও[১]।'

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٦﴾

৯৭. তারা বলল, 'এর জন্য এক ইমারত নির্মাণ কর, তারপর একে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ কর।'

قَالُوا ابْنُوْا لَهٗ بُنْيَانًا فَاَلْقُوْهُ فِى الْجَحِيْمِ ﴿٩٧﴾

৯৮. এভাবে তারা তার বিরুদ্ধে চক্রান্তের সংকল্প করেছিল; কিন্তু আমরা তাদেরকে খুবই হেয় করে দিলাম[২]।

فَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَسْفَلِيْنَ ﴿٩٨﴾

৯৯. তিনি বললেন, 'আমি আমার রবের দিকে চললাম[৩], তিনি আমাকে অবশ্যই হেদায়াত করবেন,

وَقَالَ اِنِّىْ ذَاهِبٌ اِلٰى رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ ﴿٩٩﴾

১০০. 'হে আমার রব! আমাকে এক সৎকর্মপরায়ণ সন্তান দান করুন।'

رَبِّ هَبْ لِىْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٠٠﴾

১০১. অতঃপর আমরা তাকে এক সহিষ্ণু পুত্রের সুসংবাদ দিলাম[৪]।

فَبَشَّرْنٰهُ بِغُلٰمٍ حَلِيْمٍ ﴿١٠١﴾

১০২. অতঃপর তিনি যখন তার পিতার সাথে কাজ করার মত বয়সে উপনীত হলেন, তখন ইব্‌রাহীম বললেন, 'হে

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْىَ قَالَ يٰبُنَىَّ اِنِّىْۤ اَرٰى فِى الْمَنَامِ اَنِّىْۤ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى ؕ قَالَ يٰۤاَبَتِ

---

(১) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ্‌ই প্রত্যেক শিল্পী ও তার শিল্পকে তৈরী করেন' [মুস্তাদরাকে হাকিম: ১/৩১] অর্থাৎ মানুষের কাজের স্রষ্টাও আল্লাহ্। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(২) কাতাদাহ বলেন, অর্থাৎ এরপর আর তাদের সাথে বিতণ্ডায় যেতে হয়নি। তারপূর্বেই তাদের ধ্বংস করা হয়েছিল। [তাবারী; আত-তাফসীরুস সহীহ]

(৩) কাতাদাহ বলেন, অর্থাৎ তিনি বললেন, তিনি তার আমল, মন ও নিয়্যত সব নিয়েই যাচ্ছেন। [তাবারী]

(৪) এখান থেকে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও তার বড় সন্তান ইসমাঈলের কাহিনী বর্ণিত হচ্ছে। এখানে আরও আছে ইসমাঈলের যবেহ ও তার বিনিময় দেয়ার আলোচনা। এ সূরা আস-সাফফাত ব্যতীত আর কোথাও এ ঘটনা আলোচিত হয় নি। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٠٢﴾

প্রিয় বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে আমি যবেহ্ করছি[১], এখন তোমার অভিমত কি বল?' তিনি বললেন, 'হে আমার পিতা! আপনি যা আদেশপ্রাপ্ত হয়েছেন তা-ই করুন। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন।'

فَلَمَّآ اَسْلَمَا وَتَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ ﴿١٠٣﴾

১০৩. অতঃপর যখন তারা উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করলেন[২] এবং ইব্‌রাহীম তার পুত্রকে উপুড় করে শায়িত করলেন,

وَنَادَيْنٰهُ اَنْ يّٰٓاِبْرٰهِيْمُ ﴿١٠٤﴾

১০৪. তখন আমরা তাকে ডেকে বললাম, 'হে ইব্‌রাহীম!

قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا ۚ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٠٥﴾

১০৫. 'আপনি তো স্বপ্নের আদেশ সত্যই পালন করলেন!'---এভাবেই আমরা মুহসিনদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি।

اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰٓؤُا الْمُبِيْنُ ﴿١٠٦﴾

১০৬. নিশ্চয়ই এটা ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা।

وَفَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ ﴿١٠٧﴾

১০৭. আর আমরা তাকে মুক্ত করলাম এক বড় যবেহ এর বিনিময়ে।

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْاٰخِرِيْنَ ﴿١٠٨﴾

১০৮. আর আমরা তার জন্য পরবর্তীদের মধ্যে সুনাম-সুখ্যাতি রেখে দিয়েছি।

سَلٰمٌ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ ﴿١٠٩﴾

১০৯. ইব্‌রাহীমের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١١٠﴾

১১০. এভাবেই আমরা মুহসিনদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি।

---

(১) কাতাদাহ বলেন, নবী-রাসূলদের স্বপ্ন ওহী হয়ে থাকে। তারা যখন স্বপ্নে কিছু দেখতেন সেটা বাস্তবে রূপ দিতেন। [তাবারী]

(২) কাতাদাহ বলেন, যখন ইসমাঈল তার আত্মাকে আল্লাহ্‌র জন্য সোপর্দ করলেন, আর ইবরাহীম তার ছেলেকে আল্লাহ্‌র জন্য সমর্পন করলেন। [তাবারী]

إِنَّهُۥ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١١١﴾

১১১. নিশ্চয় তিনি ছিলেন আমাদের মুমিন বান্দাদের অন্যতম;

وَبَشَّرْنَٰهُ بِإِسْحَٰقَ نَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿١١٢﴾

১১২. আর আমরা তাকে সুসংবাদ দিয়েছিলাম ইসহাকের, তিনি ছিলেন এক নবী, সৎকর্মপরায়ণদের অন্যতম।

وَبَٰرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰٓ إِسْحَٰقَ ۚ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِۦ مُبِينٌ ﴿١١٣﴾

১১৩. আর আমরা ইবরাহীমের ওপর বরকত দান করেছিলাম এবং ইস্‌হাকের উপরও; তাদের উভয়ের বংশধরদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মুহসিন এবং কিছু সংখ্যক নিজেদের প্রতি স্পষ্ট অত্যাচারী।

চতুর্থ রুকূ'

وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَٰرُونَ ﴿١١٤﴾

১১৪. আর অবশ্যই আমরা অনুগ্রহ করেছিলাম মূসা ও হারূনের প্রতি,

وَنَجَّيْنَٰهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴿١١٥﴾

১১৫. এবং তাদেরকে এবং তাদের সম্প্রদায়কে আমরা উদ্ধার করেছিলাম মহাসংকট থেকে(১)।

وَنَصَرْنَٰهُمْ فَكَانُوا۟ هُمُ ٱلْغَٰلِبِينَ ﴿١١٦﴾

১১৬. আর আমরা সাহায্য করেছিলাম তাদেরকে, ফলে তারাই হয়েছিল বিজয়ী।

وَءَاتَيْنَٰهُمَا ٱلْكِتَٰبَ ٱلْمُسْتَبِينَ ﴿١١٧﴾

১১৭. আর আমরা উভয়কে দিয়েছিলাম বিশদ কিতাব(২)।

وَهَدَيْنَٰهُمَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿١١٨﴾

১১৮. আর উভয়কে আমরা পরিচালিত করেছিলাম সরল পথে।

(১) সুদ্দী বলেন, মহাসংকট বলে ডুবে যাওয়া বুঝানো হয়েছে। [তাবারী] তবে হাসান বসরী বলেন, মহাসংকট বলে ফের'আউনের বংশধরদের বুঝানো হয়েছে। [তাবারী]

(২) কাতাদাহ বলেন, অর্থাৎ তাওরাত দিয়েছিলাম। যাতে হেদায়াত বর্ণিত ছিল, বিস্তারিত ও আহকামসমৃদ্ধ ছিল। [তাবারী]

وَتَرَكۡنَا عَلَيۡهِمَا فِي ٱلۡأٓخِرِينَ ﴿١١٩﴾

১১৯. আর আমরা তাদের উভয়ের জন্য পরবর্তীদের মধ্যে সুনাম-সুখ্যাতি রেখে দিয়েছি।

سَلَٰمٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَٰرُونَ ﴿١٢٠﴾

১২০. মূসা ও হারূনের প্রতি সালাম (শান্তি ও নিরাপত্তা)।

إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجۡزِي ٱلۡمُحۡسِنِينَ ﴿١٢١﴾

১২১. এভাবেই আমরা মুহসিনদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি।

إِنَّهُمَا مِنۡ عِبَادِنَا ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ﴿١٢٢﴾

১২২. নিশ্চয় তারা উভয়ে ছিলেন আমাদের মুমিন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।

وَإِنَّ إِلۡيَاسَ لَمِنَ ٱلۡمُرۡسَلِينَ ﴿١٢٣﴾

১২৩. আর নিশ্চয় ইল্‌ইয়াস ছিলেন রাসূলদের একজন[1]।

إِذۡ قَالَ لِقَوۡمِهِۦٓ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٢٤﴾

১২৪. যখন তিনি তার সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, ‘তোমরা কি তাকওয়া অবলম্বন করবে না?

أَتَدۡعُونَ بَعۡلًا وَتَذَرُونَ أَحۡسَنَ ٱلۡخَٰلِقِينَ ﴿١٢٥﴾

১২৫. ‘তোমরা কি বা‘আলকে ডাকবে এবং পরিত্যাগ করবে শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা---

ٱللَّهَ رَبَّكُمۡ وَرَبَّ ءَابَآئِكُمُ ٱلۡأَوَّلِينَ ﴿١٢٦﴾

১২৬. ‘আল্লাহ্‌কে, যিনি তোমাদের রব এবং তোমাদের প্রাক্তন পিতৃপুরুষদেরও রব।’

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمۡ لَمُحۡضَرُونَ ﴿١٢٧﴾

১২৭. কিন্তু তারা তার প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল, কাজেই তাদেরকে অবশ্যই শাস্তির জন্য উপস্থিত করা হবে।

إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلۡمُخۡلَصِينَ ﴿١٢٨﴾

১২৮. তবে আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ বান্দাদের কথা স্বতন্ত্র।

---

(১) কাতাদা বলেন, ইলইয়াস ও ইদ্রীস একই ব্যক্তি। [তাবারী] অন্যদের নিকট তাদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। [ইবন কাসীর] সে মতে তিনি ছিলেন, ইলইয়াস ইবনে ফিনহাস ইবনে আইযার ইবনে হারূন ইবনে ইমরান। তারা বা‘ল নামীয় এক মূর্তির পূজা করত। তিনি তাদেরকে তা থেকে নিষেধ করেন। কিন্তু তারা তা থেকে বিরত হয় না। [ইবন কাসীর]

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١٢٩﴾

১২৯. আর আমরা তার জন্য পরবর্তীদের মধ্যে সুনাম-সুখ্যাতি রেখে দিয়েছি।

سَلَامٌ عَلَىٰ إِلْ يَاسِينَ ﴿١٣٠﴾

১৩০. ইল্‌য়াসীনের[1] উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣١﴾

১৩১. এভাবেই তো আমরা মুহসিনদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি।

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣٢﴾

১৩২. তিনি তো ছিলেন আমাদের মুমিন বান্দাদের অন্যতম।

وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٣﴾

১৩৩. আর নিশ্চয় লূত ছিলেন রাসূলদের একজন।

إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٣٤﴾

১৩৪. স্মরণ করুন, যখন আমরা তাকে ও তার পরিবারের সকলকে উদ্ধার করেছিলাম---

إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ﴿١٣٥﴾

১৩৫. পিছনে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত এক বৃদ্ধা ছাড়া।

ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ ﴿١٣٦﴾

১৩৬. অতঃপর অবশিষ্টদেরকে আমরা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করেছিলাম।

وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ ﴿١٣٧﴾

১৩৭. আর তোমরা তো তাদের ধ্বংসাবশেষগুলো অতিক্রম করে থাক সকালে

---

(১) অধিকাংশ মুফাসসির বলেন, এটি ইলিয়াসের দ্বিতীয় নাম। যেমন ইবরাহীমের দ্বিতীয় নাম ছিল আব্রাহাম। আর অন্য কোন কোন মুফাসসিরের মতে আরববাসীদের মধ্যে ইবরানী (হিব্রু) ভাষায় শব্দাবলীর বিভিন্ন উচ্চারণের প্রচলন ছিল। যেমন মীকাল ও মীকাইল এবং মীকাইন একই ফেরেশ্‌তাকে বলা হতো। একই ঘটনা ঘটেছে ইলিয়াসের নামের ব্যাপারেও। স্বয়ং কুরআন মজীদে একই পাহাড়কে একবার “তূরে সাইনা” বলা হচ্ছে এবং অন্যত্র বলা হচ্ছে, “তূরে সীনীন।”[তাবারী]

১৩৮. ও সন্ধ্যায়[১] । তবুও কি তোমরা বোঝ না?

وَبِالَّيۡلِ ۚ اَفَلَا تَعۡقِلُوۡنَ ﴿۱۳۸﴾

পঞ্চম রুকূ'

১৩৯. আর নিশ্চয় ইউনুস ছিলেন রাসূলদের একজন ।

وَاِنَّ يُوۡنُسَ لَمِنَ الۡمُرۡسَلِيۡنَ ﴿۱۳۹﴾

১৪০. স্মরণ করুন, যখন তিনি বোঝাই নৌযানের দিকে পালিয়ে গেলেন,

اِذۡ اَبَقَ اِلَى الۡفُلۡكِ الۡمَشۡحُوۡنِ ﴿۱۴۰﴾

১৪১. অতঃপর তিনি লটারীতে যোগদান করে পরাভূতদের অন্তর্ভুক্ত হলেন[২] ।

فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الۡمُدۡحَضِيۡنَ ﴿۱۴۱﴾

১৪২. অতঃপর এক বড় আকারের মাছ তাকে গিলে ফেলল, আর তিনি ছিলেন ধিকৃত ।

فَالۡتَقَمَهُ الۡحُوۡتُ وَهُوَ مُلِيۡمٌ ﴿۱۴۲﴾

১৪৩. অতঃপর তিনি যদি আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণাকারীদের অন্তর্ভুক্ত না হতেন[৩],

فَلَوۡلَاۤ اَنَّهٗ كَانَ مِنَ الۡمُسَبِّحِيۡنَ ﴿۱۴۳﴾

---

(১) এ বিষয়ের দিকে ইংগিত করা হয়েছে যে, কুরাইশ ব্যবসায়ীরা সিরিয়া ও ফিলিস্তীন যাবার পথে লূতের সম্প্রদায়ের বিধ্বস্ত জনপদ যেখানে অবস্থিত ছিল দিনরাত সে এলাকা অতিক্রম করতো । [দেখুন, তাবারী,মুয়াস্‌সার,ফাতহুল কাদীর]

(২) কাতাদাহ বলেন, তিনি নৌকায় উঠার পর নৌকাটির চলা থেমে গেল । তখন লোকেরা বুঝল যে, কোন ঘটনা ঘটেছে, যার কারণে এটা আটকে গেছে । তখন তারা লটারী করল । তাতে ইউনুস আলাইহিস সালামের নাম আসল । তখন তিনি তার নিজেকে সাগরে নিক্ষেপ করলেন । আর তখনি একটি বড় মাছ তাকে গিলে ফেলল । [তাবারী]

(৩) এর দু'টি অর্থ হয় এবং দু'টি অর্থই এখানে প্রযোজ্য । একটি অর্থ হচ্ছে, ইউনুস আলাইহিস সালাম পূর্বেই আল্লাহ থেকে গাফিল লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না বরং তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা ছিলেন আল্লাহর চিরন্তন প্রশংসা, মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণাকারী । দ্বিতীয়টি হচ্ছে, যখন তিনি মাছের পেটে পৌঁছুলেন তখন আল্লাহরই দিকে রুজূ করলেন এবং তারই প্রশংসা, মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করতে থাকলেন । অন্যত্র বলা হয়েছেঃ "তাই সে অন্ধকারের মধ্যে তিনি ডেকে উঠলেন, আপনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই,পাক-পবিত্র আপনার সত্তা, অবশ্যই আমি অপরাধী ।" [সূরা আল আম্বিয়াঃ ৮৭] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মাছের পেটে

لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِۦٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۝١٤٤

১৪৪. তাহলে তাকে উত্থানের দিন পর্যন্ত থাকতে হত তার পেটে ।

فَنَبَذْنَٰهُ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ۝١٤٥

১৪৫. অতঃপর ইউনুসকে আমরা নিক্ষেপ করলাম এক তৃণহীন প্রান্তরে(১) এবং তিনি ছিলেন অসুস্থ ।

وَأَنۢبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ ۝١٤٦

১৪৬. আর আমরা তার উপর ইয়াকতীন(২) প্রজাতির এক গাছ উদ্‌গত করলাম,

وَأَرْسَلْنَٰهُ إِلَىٰ مِا۟ئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ۝١٤٧

১৪৭. আর তাকে আমরা একলক্ষ বা তার চেয়ে বেশী লোকের প্রতি পাঠিয়েছিলাম ।

فَـَٔامَنُوا۟ فَمَتَّعْنَٰهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ۝١٤٨

১৪৮. অতঃপর তারা ঈমান এনেছিল; ফলে আমরা তাদেরকে কিছু কালের জন্য জীবনোপভোগ করতে দিলাম ।

فَٱسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ ۝١٤٩

১৪৯. এখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, 'আপনার রবের জন্যই কি রয়েছে কন্যা সন্তান(৩) এবং তাদের জন্য পুত্র সন্তান?'

ইউনূস আলাইহিস্ সালাম-এর পঠিত দোআ যে কোন মুসলিম যে কোন উদ্দেশ্যে পাঠ করবে, তার দো'আ কবুল হবে । [তিরমিযী:৩৫০৫]

(১) এটি কাতাদাহ এর মত । ইবন আব্বাস থেকে বর্ণিত, এর অর্থ, নদীর তীরে । [তাবারী]

(২) ইয়াকতীন আরবী ভাষায় এমন ধরনের গাছকে বলা হয় যা কোন গুঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে থাকে না বরং লতার মতো ছড়িয়ে যেতে থাকে । যেমন লাউ, তরমুজ, শশা ইত্যাদি । মোটকথা সেখানে অলৌকিকভাবে এমন একটি লতাবিশিষ্ট বা লতানো গাছ উৎপন্ন করা হয়েছিল যার পাতাগুলো ইউনুসকে ছায়া দিচ্ছিল এবং ফলগুলো একই সংগে তার জন্য খাদ্য সরবরাহ করছিল এবং পানিরও যোগান দিচ্ছিল । [দেখুন, তাবারী]

(৩) বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে আরবের কুরাইশ, জুহাইনা, বনী সালামাহ, খুযা'আহ এবং অন্যান্য গোত্রের কেউ কেউ বিশ্বাস করতো, ফেরেশ্‌তারা আল্লাহর কন্যা । কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে তাদের এ জাহেলী আকীদার কথা বলা হয়েছে । উদাহরণস্বরূপ দেখুন সূরা আন নিসা, ১১৭ ; আন নাহল, ৫৭-৫৮; আল-ইসরা, ৪০ ; আয্ যুখরুফ, ১৬-১৯ এবং আন নাজম, ২১-২৭ আয়াতসমূহ ।

أَمۡ خَلَقۡنَا ٱلۡمَلَٰٓئِكَةَ إِنَٰثٗا وَهُمۡ شَٰهِدُونَ ١٥٠

১৫০. অথবা আমরা কি ফেরেশ্‌তাদেরকে নারীরূপে সৃষ্টি করেছিলাম আর তারা দেখেছিল[১]?

أَلَآ إِنَّهُم مِّنۡ إِفۡكِهِمۡ لَيَقُولُونَ ١٥١

১৫১. সাবধান! তারা তো মনগড়া কথা বলে যে,

وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمۡ لَكَٰذِبُونَ ١٥٢

১৫২. 'আল্লাহ্ সন্তান জন্ম দিয়েছেন।' আর তারা নিশ্চয় মিথ্যাবাদী।

أَصۡطَفَى ٱلۡبَنَاتِ عَلَى ٱلۡبَنِينَ ١٥٣

১৫৩. তিনি কি পুত্র সন্তানের পরিবর্তে কন্যা সন্তান পছন্দ করেছেন?

مَا لَكُمۡ كَيۡفَ تَحۡكُمُونَ ١٥٤

১৫৪. তোমাদের কী হয়েছে, তোমরা কিরূপ বিচার কর?

أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ١٥٥

১৫৫. তবে কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

أَمۡ لَكُمۡ سُلۡطَٰنٞ مُّبِينٞ ١٥٦

১৫৬. নাকি তোমাদের কোন সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ আছে?

فَأۡتُواْ بِكِتَٰبِكُمۡ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ ١٥٧

১৫৭. তোমরা সত্যবাদী হলে তোমাদের কিতাব[২] উপস্থিত কর।

وَجَعَلُواْ بَيۡنَهُۥ وَبَيۡنَ ٱلۡجِنَّةِ نَسَبٗاۚ وَلَقَدۡ عَلِمَتِ

১৫৮. তারা আল্লাহ্ ও জিন জাতির মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থির করেছে[৩],

---

(১) অন্যস্থানে এসেছে, " আর তারা রহমানের বান্দা ফেরেশ্‌তাগণকে নারী গণ্য করেছে; এদের সৃষ্টি কি তারা দেখেছিল? তাদের সাক্ষ্য অবশ্যই লিপিবদ্ধ করা হবে এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে।" [সূরা আয-যুখরুফ: ১৯]

(২) কাতাদাহ বলেন, এখানে কিতাব বলে, গ্রহণযোগ্য ওযর উদ্দেশ্য। [তাবারী]

(৩) এটা মুশরিকদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের বর্ণনা যে, জিন সরদার দুহিতারা ফেরেশতাগণের জননী। কাজেই (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ তা'আলা ও জিন সরদার-দুহিতাদের মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক ছিল। এই সম্পর্কের ফলেই ফেরেশতাগণ জন্মলাভ করেছে। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, মুশরিকরা যখন ফেরেশতাগণকে আল্লাহর কন্যা সাব্যস্ত করল, তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে তাদের জননী কে? তারা জওয়াবে বলল, জিন সরদার-দুহিতারা। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, কোন

অথচ জিনেরা জানে, নিশ্চয় তাদেরকে উপস্থিত করা হবে (শাস্তির জন্য) ।	الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٥٨﴾
১৫৯. তারা (মুশরিকরা) যা আরোপ করে তা থেকে আল্লাহ্ পবিত্র, মহান---	سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٥٩﴾
১৬০. তবে আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ বান্দাগণ ছাড়া,	إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٦٠﴾
১৬১. অতঃপর নিশ্চয় তোমরা এবং তোমরা যাদের ‘ইবাদাত কর তারা---	فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿١٦١﴾
১৬২. তোমরা (একনিষ্ঠ বান্দাদের) কাউকেও আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করতে পারবে না---	مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ ﴿١٦٢﴾
১৬৩. শুধু প্রজ্জলিত আগুনে যে দগ্ধ হবে সে ছাড়া[১] ।	إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ ﴿١٦٣﴾
১৬৪. ‘আর (জিবরীল বললেন) আমাদের প্রত্যেকের জন্য নির্ধারিত স্থান রয়েছে,	وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ﴿١٦٤﴾
১৬৫. ‘আর আমরা তো সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান,	وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ ﴿١٦٥﴾
১৬৬. ‘এবং আমরা অবশ্যই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণাকারী[২] ।’	وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ ﴿١٦٦﴾

কোন আরববাসীর বিশ্বাস ছিল যে, (নাউযুবিল্লাহ) ইবলীস আল্লাহর ভ্রাতা । আল্লাহ্ মঙ্গলের স্রষ্টা আর সে অমঙ্গলের স্রষ্টা । এখানে তাদের বাতিল বিশ্বাস খণ্ডন করা হয়েছে । [দেখুন, ইবন কাসীর]

(১) ইবনে আব্বাস বলেন, তোমরা কাউকে পথভ্রষ্ট করতে পারবে না, আর আমিও তোমাদের কাউকে পথভ্রষ্ট করব না তবে যার জন্য আমার ফয়সালা হয়ে গেছে সে জাহান্নামে দগ্ধ হবে, তার কথা ভিন্ন । [তাবারী] কাতাদাহ বলেন, তোমরা তোমাদের বাতিল দিয়ে আমার বান্দাদের কাউকে পথভ্রষ্ট করতে পারবে না, তবে যে জাহান্নামের আমল করে তোমাদেরকে বন্ধু বানিয়েছে সে ছাড়া । [তাবারী]

(২) আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আসমানসমূহের মধ্যে এমন এক

وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ ﴿١٦٧﴾

১৬৭. আর তারা (মক্কাবাসীরা) অবশ্যই বলে আসছিল,

لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ ﴿١٦٨﴾

১৬৮. 'পূর্ববর্তীদের কিতাবের মত যদি আমাদের কোন কিতাব থাকত,

لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٦٩﴾

১৬৯. 'আমরা অবশ্যই আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ বান্দা হতাম।'

فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿١٧٠﴾

১৭০. কিন্তু তারা কুরআনের সাথে কুফরী করল সুতরাং শীঘ্রই তারা জানতে পারবে(১);

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿١٧١﴾

১৭১. আর অবশ্যই আমাদের প্রেরিত বান্দাদের সম্পর্কে আমাদের এ বাক্য আগেই স্থির হয়েছে যে,

إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ﴿١٧٢﴾

১৭২. নিশ্চয় তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে,

وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿١٧٣﴾

১৭৩. এবং আমাদের বাহিনীই হবে বিজয়ী।

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ ﴿١٧٤﴾

১৭৪. অতএব কিছু কালের জন্য আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকুন।

وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿١٧٥﴾

১৭৫. আর আপনি তাদেরকে পর্যবেক্ষণ করুন, শীঘ্রই তারা দেখতে পাবে।

আসমান রয়েছে যার প্রতি বিঘত জায়গায় কোন ফেরেশতার কপাল অথবা তার দু'পা দাঁড়ানো অথবা সিজদা-রত অবস্থায় আছে। তারপর আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন। [তাফসীর আবদুর রাযযাক: ২৫৬৫] হাদীসে আরও এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা কি সেভাবে কাতারবন্দী হবে না যেভাবে ফেরেশতারা তাদের রবের কাছে কাতারবন্দী হয়? আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কিভাবে তারা তাদের রবের কাছে কাতারবন্দী হয়? তিনি বললেন, প্রথম কাতারগুলো পূর্ণ করে এবং কাতারে প্রাচীরের ন্যায় ফাঁক না রেখে দাঁড়ায়। [মুসলিম: ৫২২]

(১) অর্থাৎ তারা তাদের কাছে নাযিলকৃত কিতাব কুরআনের সাথে কুফরী করেছে। অচিরেই তারা এ কুফরীর পরিণাম জানতে পারবে। [জালালাইন]

أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿١٧٦﴾

১৭৬. তারা কি তবে আমাদের শাস্তি ত্বরান্বিত করতে চায়?

فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ﴿١٧٧﴾

১৭৭. অতঃপর তাদের আঙিনায় যখন শাস্তি নেমে আসবে তখন সতর্কীকৃতদের প্রভাত হবে কত মন্দ[১]!

وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿١٧٨﴾

১৭৮. আর কিছু কালের জন্য আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকুন।

وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿١٧٩﴾

১৭৯. আর আপনি তাদেরকে পর্যবেক্ষণ করুন, শীঘ্রই তারা দেখতে পাবে।

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٨٠﴾

১৮০. তারা যা আরোপ করে, তা থেকে পবিত্র ও মহান আপনার রব, সকল ক্ষমতার অধিকারী।

وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿١٨١﴾

১৮১. আর শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলদের প্রতি!

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨٢﴾

১৮২. আর সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য[২]।

---

(১) আরবী বাক-পদ্ধতিতে আঙিনায় নেমে আসার অর্থ কোন বিপদ একেবারে সামনে এসে উপস্থিত হওয়া বোঝায়। “সকাল” বলার কারণ এই যে, আরবে শত্রুরা সাধারণতঃ এ সময়েই আক্রমণ পরিচালনা করত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাই করতেন। তিনি কোন শত্রুর ভূখণ্ডে রাত্রিবেলায় পৌঁছালেও আক্রমণের জন্যে সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন। [মুসলিম: ৮৭৩] হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সকালবেলায় খায়বার দুর্গ আক্রমণ করেন, তখন এই বাক্যাবলি উচ্চারণ করেন, اللهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ অর্থাৎ, আল্লাহ মহান। খায়বার বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। আমরা যখন কোন সম্প্রদায়ের আঙিনায় অবতরণ করি, তখন যাদেরকে পূর্ব-সতর্ক করা হয়েছিল, তাদের সকাল খুবই মন্দ হয়। [বুখারী: ৩৭১, মুসলিম: ১৩৬৫]

(২) ১৮০-১৮২ নং আয়াতগুলোর মাধ্যমে সূরা সাফফাত সমাপ্ত করা হয়েছে। কি সুন্দর সমাপ্তি! সংক্ষেপে বলা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা এই সংক্ষিপ্ত তিনটি আয়াতের মধ্যে সূরার সমস্ত বিষয়বস্তু ভরে দিয়েছেন। তাওহীদের বর্ণনা দ্বারা সূরার সূচনা হয়েছিল, যার সারমর্ম ছিল এই যে, মুশরিকরা আল্লাহ সম্পর্কে যেসব বিষয় বর্ণনা করে,

আল্লাহ তা'আলা সেগুলো থেকে পবিত্র। সে মতে আলোচ্য প্রথম আয়াতে সে দীর্ঘ বিষয়বস্তুর দিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। এরপর সূরায় নবী-রাসূলগণের ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছিল। সে মতে দ্বিতীয় আয়াতে সেগুলোর দিকে ইশারা করা হয়েছে। অতঃপর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কাফেরদের বিশ্বাস, সন্দেহ ও আপত্তিসমূহ যুক্তি ও উক্তির মাধ্যমে খণ্ডন করে বলা হয়েছিল যে, শেষ বিজয় সত্যপন্থীরাই অর্জন করবে। এসব বিষয়বস্তু যে ব্যক্তিই জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি সহকারে পাঠ করবে, সে অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা ও স্তুতি পাঠ করতে বাধ্য হবে। সে মতে এই প্রশংসা ও স্তুতির ওপরই সূরার সমাপ্তি টানা হয়েছে।

তাছাড়া এ তিন আয়াতের পরস্পর এক ধরনের সামঞ্জস্যতা লক্ষণীয়, প্রথম আয়াতে বলা হচ্ছে যে, কাফের মুশরিকরা যে সমস্ত খারাপ গুণে মহান আল্লাহ্‌কে চিত্রিত করার অপচেষ্টা চালিয়েছে তা থেকে তিনি কতই না পবিত্র! তাদের কথা ও কর্মকাণ্ড তাঁর মহান সমীপে ও তার মর্যাদার সামান্যতমও হেরফের করার ক্ষমতা রাখে না। তারা তাঁকে খারাপ গুণে গুণান্বিত করতে চায়, পক্ষান্তরে নবী রাসূলগণ তাঁকে সঠিকভাবে জানে বিধায় তাঁর জন্য সমস্ত হক নাম ও সঠিক গুণে গুণান্বিত করে। তাই তারা সালাম পাওয়ার যোগ্য। তারা নিরাপত্তা পাবে কারণ তারা আল্লাহ্‌র ব্যাপারে নিরাপত্তার বেষ্টনী অবলম্বন করেছে। আল্লাহ্‌র সঠিক গুণাগুণকে অস্বীকার করেনি। তারা তাঁকে তাঁর সঠিক নাম ও গুণ দ্বারা গুণান্বিত করে এবং সেগুলোর অসীলায় আহ্বান করে। আর তাদের আহ্বানে তিনিই সাড়া দেন; কারণ তিনিই তো সর্বপ্রশংসিত সত্ত্বা। দুনিয়া ও আখেরাতে সর্বদা সর্বত্র সর্বাবস্থায় তিনি প্রশংসিত। আর এটাই শেষ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

এখানে আরো একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, প্রথম আয়াতে তাসবীহ বা পবিত্রতা ও মহানুভবতা ঘোষণার মাধ্যমে যাবতীয় খারাপ গুণকে সরাসরি অস্বীকার করা হয়েছে। আর পরোক্ষভাবে যাবতীয় সৎ ও সঠিক গুণকে সাব্যস্ত করা হয়েছে। তৃতীয় আয়াতে তাহমীদ বা প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যমে যাবতীয় সৎ ও সঠিক গুণাবলীকে আল্লাহ্‌র জন্য সরাসরি সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর পরোক্ষভাবে যাবতীয় খারাপ গুণ থেকে মুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। এর মাঝখানে রাসূলদের উল্লেখ করে এ কথাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, এ তাওহীদ বা আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে সে নীতি অবলম্বন করা উচিত, যা প্রথম ও তৃতীয় আয়াতে বর্ণিত হয়েছে এবং তা একমাত্র রাসূলগণই সঠিকভাবে বুঝতে সক্ষম হয়েছেন; সুতরাং তারাই সালাম ও নিরাপত্তা পাওয়ার যোগ্য। এর বিপরীতে যারা আল্লাহ্‌র সুন্দর সুন্দর নামসমূহকে অস্বীকার করে, তার সিফাত বা গুণাগুণকে বিকৃত করে তারা রাসূলদের পথে নয়, তাদের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তা নেই। [দেখুন, মাজমু' ফাতাওয়া ৩/১৩০; ইবনুল কাইয়্যেম, বাদায়ে'উল ফাওয়ায়েদ ২/১৭১; জালাউল আফহাম: ১৭০]

৩৮- সূরা সোয়াদ
৮৮ আয়াত, মক্কী

سُوْرَةُ صٓ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. সোয়াদ[১], শপথ উপদেশপূর্ণ

صٓ وَالْقُرْاٰنِ ذِی الذِّكْرِ ۝١

(১) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, এই সূরার প্রাথমিক আয়াতগুলো কাফের-মুশরিক ও তাদের সেই মজলিসের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। অর্থাৎ আবু তালিব ও আবু জাহলসহ কুরাইশ কাফেরদের অন্যান্য নেতৃবর্গের প্রস্তাব সম্পর্কিত ঘটনা। যখন তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়েছিল [মুস্তাদরাকে হাকিম:২/৪৩২] এ ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ হচ্ছে এই যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পিতব্য আবু তালেব ইসলাম গ্রহণ না করা সত্বেও ভ্রাতুস্পুত্রের পূর্ণ দেখা–শোনা ও হেফাযত করে যাচ্ছিলেন। তিনি যখন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন, তখন কোরাইশ সরদাররা এক পরামর্শসভায় মিলিত হল। এতে আবু জাহল, আস ইবনে ওয়ায়েল, আসওয়াদ ইবনে মুত্তালিব, আসওয়াদ ইবনে আবদে ইয়াগুস ও অন্যান্য সরদার যোগদান করল। তারা পরামর্শ করল যে, আবু তালেব রোগাক্রান্ত। যদি তিনি মারা যান এবং তার অবর্তমানে আমরা মুহাম্মদ-এর বিরুদ্ধে কোন কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করি, তবে আরবের লোকেরা আমাদেরকে দোষারোপ করার সুযোগ পাবে। বলবে: আবু তালেবের জীবদ্দশায় তো তারা মুহাম্মদ-এর কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারল না, এখন তার মৃত্যুর পর তাকে উৎপীড়নের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে। তাই আমরা আবু তালেব জীবিত থাকতেই তার সাথে মুহাম্মদ এর ব্যাপারে একটা মীমাংসায় উপনীত হতে চাই, যাতে সে আমাদের দেব-দেবীর নিন্দাবাদ পরিত্যাগ করে। সেমতে তারা আবু তালেবের কাছে গিয়ে বলল: আপনার ভ্রাতুস্পুত্র আমাদের উপাস্য দেব-দেবীর নিন্দা করে। আবু তালেব রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মজলিসে ডেকে এনে বললেন: ভ্রাতুস্পুত্র, এ কোরাইশ সরদাররা তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে যে, তুমি নাকি তাদের উপাস্য দেব-দেবীর নিন্দা কর। তাদেরকে তাদের ধর্মে ছেড়ে দাও এবং তুমি আল্লাহর ইবাদত করে যাও। অবশেষে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: চাচাজান, "আমি কি তাদেরকে এমনি বিষয়ের প্রতি দাওয়াত দেবো না, যাতে তাদের মঙ্গল রয়েছে?" আবু তালেব বললেন: সে বিষয়টি কি? তিনি বললেন: আমি তাদেরকে এমন একটি কালেমা বলাতে চাই, যার বদৌলতে সমগ্র আরব তাদের সামনে মাথা নত করবে এবং তারা সমগ্র অনারবদের অধীশ্বর হয়ে যাবে। একথা শুনে আবু জাহল বলে উঠল: বল, সে কলেমা কি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: "লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ"। একথা শুনে সবাই পরিধেয় বস্ত্র ঝেড়ে উঠে দাঁড়াল এবং বলল: আমরা কি সমস্ত দেব-দেবীকে পরিত্যাগ করে মাত্র একজনকে

কুরআনের!

بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ عِزَّةٍ وَّشِقَاقٍ ۝٢

২. বরং কাফিররা ঔদ্ধত্য ও বিরোধিতায় নিপতিত আছে।

كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَّلَاتَ حِيْنَ مَنَاصٍ ۝٣

৩. এদের আগে আমরা বহু জনগোষ্ঠী ধ্বংস করেছি; তখন তারা আর্ত চীৎকার করেছিল। কিন্তু তখন পরিত্রাণের কোনই সময় ছিল না।

وَعَجِبُوْٓا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ ۫ وَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا سٰحِرٌ كَذَّابٌ ۝٤

৪. আর তারা বিস্ময় বোধ করছে যে, এদের কাছে এদেরই মধ্য থেকে একজন সতর্ককারী আসল এবং কাফিররা বলে, 'এ তো এক জাদুকর(১), মিথ্যাবাদী।'

اَجَعَلَ الْاٰلِهَةَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ۝٥

৫. 'সে কি বহু ইলাহ্‌কে এক ইলাহ্‌ বানিয়ে নিয়েছে? এটা তো এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার!'

وَانْطَلَقَ الْمَلَاُ مِنْهُمْ اَنِ امْشُوْا وَاصْبِرُوْا عَلٰٓى اٰلِهَتِكُمْ ۚ

৬. আর তাদের নেতারা এ বলে সরে পড়ে যে, 'তোমরা চলে যাও এবং

অবলম্বন করব? এ যে, বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপার! এ ঘটনার প্রেক্ষাপটে সূরা ছোয়াদের আলোচ্য আয়াতগুলো নাযিল হয়।[দেখুন, তিরমিযী:৩২৩২, আত-তাফসীরুস সহীহ ৪/২১৭]

(১) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য জাদুকর শব্দটি তারা যে অর্থে ব্যবহার করতো তা হচ্ছে এই যে, তিনি মানুষকে এমন কিছু জাদু করতেন যার ফলে তারা পাগলের মতো তাঁর পেছনে লেগে থাকতো। কোন সম্পর্কচ্ছেদ করার বা কোন প্রকার ক্ষতির মুখোমুখি হবার কোন পরোয়াই তারা করতো না। পিতা পুত্রকে এবং পুত্র পিতাকে ত্যাগ করতো। স্ত্রী স্বামীকে ত্যাগ করতো এবং স্বামী স্ত্রী থেকে আলাদা হয়ে যেতো। হিজরাত করার প্রয়োজন দেখা দিলে একেবারে সবকিছু সম্পর্ক ত্যাগ করে স্বদেশভূমি থেকে বের হয়ে পড়তো। কারবার শিকেয় উঠুক এবং সমস্ত জ্ঞাতি-ভাইরা বয়কট করুক কোনদিকেই দৃষ্টিপাত করতো না। কঠিন থেকে কঠিনতর শারীরিক কষ্টও বরদাশ্‌ত করে নিতো কিন্তু ঐ ব্যক্তির পেছনে চলা থেকে বিরত হতো না।[দেখুন, কুরতুবী]

إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ۝٦

তোমাদের দেবতাগুলোর পূজায় তোমরা অবিচলিত থাক। নিশ্চয়ই এ ব্যাপারটি উদ্দেশ্যমূলক।’

مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَٰذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ ۝٧

৭. ‘আমরা তো অন্য ধর্মাদর্শে[১] এরূপ কথা শুনিনি; এটা এক মনগড়া উক্তি মাত্র।

أَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا ۚ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّن ذِكْرِي ۖ بَل لَّمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ ۝٨

৮. ‘আমাদের মধ্যে কি তারই উপর যিক্‌র (বাণী) নাযিল হল? প্রকৃতপক্ষে তারা তো আমার বাণীতে (কুরআনে) সন্দিহান। বরং তারা এখনো আমার শাস্তি আস্বাদন করেনি।

أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ۝٩

৯. নাকি তাদের কাছে আছে আপনার রবের অনুগ্রহের ভাণ্ডার, যিনি পরাক্রমশালী, মহান দাতা?

أَمْ لَهُم مُّلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ ۝١٠

১০. নাকি তাদের কর্তৃত্ব আছে আসমানসমূহ ও যমীন এবং এ দু’য়ের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছুর উপর? থাকলে, তারা কোন উপায় অবলম্বন করে আরোহণ করুক!

جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ ۝١١

১১. এ বাহিনী সেখানে অবশ্যই পরাজিত হবে, পূর্ববর্তী দলসমূহের মত[২]।

---

(১) অন্য ধর্মাদর্শ বলে কি বুঝানো হয়েছে এ ব্যাপারে মতভেদ আছে। ইবনে আব্বাস থেকে এক বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, এখানে সর্বশেষ মিল্লাত নাসারাদের দ্বীনকে উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। অপর বর্ণনা মতে এখানে কুরাইশদের পুর্বপুরুষদের দ্বীন বুঝানো হয়েছে। [কুরতুবী,বাগভী]

(২) অর্থাৎ যেভাবে পূর্ববর্তী সময়ের লোকেরা তাদের নবীর উপর মিথ্যারোপ করার কারণে পরাজিত হয়েছে, তেমনি এ মিথ্যারোপকারী কাফের বাহিনীও পরাজিত হবে। এখন তাদেরকে কখন পরাজিত করা হয়েছে সে ব্যাপারে কারও কারও মত হচ্ছে, বদরের যুদ্ধে। [মুয়াস্‌সার,কুরতুবী]

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ ⑫

১২. এদের আগেও রাসূলদের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল নূহের সম্প্রদায়, ‘আদ ও কীলকওয়ালা ফির‘আউন[১],

وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لْئَيْكَةِ أُولَٰئِكَ الْأَحْزَابُ ⑬

১৩. সামূদ, লূত সম্প্রদায় ও ‘আইকা’র অধিবাসী; ওরা ছিল এক-একটি বিশাল বাহিনী।

إِنْ كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ⑭

১৪. তাদের প্রত্যেকেই রাসূলগণের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল। ফলে তাদের ক্ষেত্রে আমার শাস্তি ছিল যথার্থ।

দ্বিতীয় রুকূ’

وَمَا يَنْظُرُ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ⑮

১৫. আর এরা তো কেবল অপেক্ষা করছে একটি মাত্র প্রচণ্ড শব্দের, যাতে কোন বিরাম থাকবে না[২]।

وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ

১৬. আর তারা বলে, ‘হে আমাদের রব! হিসাব দিবসের আগেই আমাদের

(১) এর শাব্দিক অর্থ-“কীলকওয়ালা ফেরাউন”। এর তাফসীরে তাফসীরবিদদের উক্তি বিভিন্নরূপ। কেউ কেউ বলেন: এতে তার সাম্রাজ্যের দৃঢ়তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন: সে মানুষকে চিৎ করে শুইয়ে তার চার হাত-পায়ে কীলক এটে দিত এবং তার উপরে সাপ-বিচ্ছু ছেড়ে দিত। এটাই কি ছিল তার শাস্তি দানের পদ্ধতি। কেউ কেউ বলেন: সে রশি ও কীলক দ্বারা বিশেষ এক প্রকার খেলা খেলত। কেউ কেউ আরও বলেন: এখানে কীলক বলে অট্টালিকা বোঝানো হয়েছে। সে সুদৃঢ় অট্টালিকা নির্মাণ করেছিল। আবার কেউ কেউ বলেন, এখানে সে যে বহু সেনাদলের অধিপতি ছিল এবং তাদের ছাউনির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আবার সম্ভবত কীলক বলতে মিসরের পিরামিডও বুঝানো যেতে পারে, কেননা এগুলো যমীনের মধ্যে কীলকের মতো গাঁথা রয়েছে। [দেখুন, কুরতুবী]

(২) আরবীতে فواق এর একাধিক অর্থ হয়। (এক) একবার দুগ্ধ দোহনের পর পুনরায় স্তনে দুগ্ধ আসার মধ্যবর্তী সময়কে فواق বলা হয়। (দুই) সুখ-শান্তি। উদ্দেশ্য এই যে, ইসরাফিলের শিঙ্গার ফুঁক অনবরত চলতে থাকবে এতে কোন বিরতি হবে না। [দেখুন- বাগভী,কুরতুবী]

الْحِسَابِ ﴿١٦﴾

প্রাপ্য[১] আমাদেরকে শীঘ্রই দিয়ে দিন!’

اِصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوٗدَ ذَا الْاَيْدِ ۚ اِنَّهٗۤ اَوَّابٌ ﴿١٧﴾

১৭. তারা যা বলে তাতে আপনি ধৈর্য ধারণ করুন এবং স্মরণ করুন আমাদের শক্তিশালী বান্দা দাউদের কথা; তিনি ছিলেন খুব বেশী আল্লাহ্ অভিমুখী[২]।

اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهٗ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِشْرَاقِ ﴿١٨﴾

১৮. নিশ্চয় আমরা অনুগত করেছিলাম পর্বতমালাকে, যেন এগুলো সকাল-সন্ধ্যায় তার সাথে আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে,

وَالطَّيْرَ مَحْشُوْرَةً ؕ كُلٌّ لَّهٗۤ اَوَّابٌ ﴿١٩﴾

১৯. এবং সমবেত পাখীদেরকেও; সবাই ছিল তার অভিমুখী[৩]।

---

(১) আসলে কাউকে পুরস্কার দানের প্রতিশ্রুতি সম্বলিত দলীল দস্তাবেজকে قط বলা হয়। কিন্তু পরে শব্দটি “অংশ” অর্থে ব্যবহৃত হতে শুরু করেছে। এখানে তা-ই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আখেরাতের শাস্তি ও প্রতিদানে আমাদের যা অংশ রয়েছে, তা এখানেই আমাদেরকে দিয়ে দিন। [তাবারী]

(২) এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: আল্লাহ্ তা‘আলার কাছে সর্বাধিক পছন্দনীয় সালাত ছিল দাউদ আলাইহিস্ সালাম -এর সালাত এবং সর্বাধিক পছন্দনীয় সাওম ছিল দাউদ আলাইহিস্ সালাম-এর সাওম। তিনি অর্ধরাত্রি নিদ্রা যেতেন, এক তৃতীয়াংশ ইবাদত করতেন এবং পুনরায় রাত্রির ষষ্ঠাংশে নিদ্রা যেতেন এবং তিনি একদিন পর পর রোযা রাখতেন। [বুখারী: ১১৩১, মুসলিম:১১৫৯] অন্য বর্ণনায় এসেছে, ‘শত্রুর মোকাবেলায় অবতীর্ণ হয়ে তিনি কখনও পশ্চাদপসরণ করতেন না।’ [বুখারী: ১৯৭৭, মুসলিম:১১৫৯] অন্য বর্ণনায় এসেছে, ‘তিনি কখনো ওয়াদা খেলাফ করতেন না, শত্রুর মোকাবেলায় অবতীর্ণ হয়ে তিনি কখনও পশ্চাদপসরণ করতেন না’ [মুসনাদে আহমাদ:২/২০০]

(৩) এ আয়াতে দাউদ আলাইহিস্সালাম-এর সাথে পর্বতমালা ও পক্ষীকুলের ইবাদতের তাসবীহে শরীক হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইতিপূর্বে এর ব্যাখ্যা সূরা আম্বিয়া ও সূরা সাবায় বর্ণিত হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, পর্বতমালা ও পক্ষীকুলের তাসবীহ পাঠকে আল্লাহ তা‘আলা এখানে দাউদ আলাইহিস্ সালাম-এর প্রতি নেয়ামত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কারণ, এতে দাউদ আলাইহিস্ সালাম-এর একটি মু‘জিযা প্রকাশ পেয়েছে। বলাবাহুল্য, মু‘জিযা এক বড় নেয়ামত। [দেখুন, কুরতুবী]

وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ﴿٢٠﴾

২০. আর আমরা তার রাজ্যকে সুদৃঢ় করেছিলাম এবং তাকে দিয়েছিলাম হিকমত ও ফয়সালাকারী বাগ্মিতা[১]।

وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ﴿٢١﴾

২১. আর আপনার কাছে বিবদমান লোকদের বৃত্তান্ত পৌঁছেছে কি? যখন তারা প্রাচীর ডিঙিয়ে আসল 'ইবাদাতখানায়,

إِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ ﴿٢٢﴾

২২. যখন তারা দাউদের কাছে প্রবেশ করল, তখন তাদের কারণে তিনি ভীত হয়ে পড়লেন। তারা বলল, 'ভীত হবেন না, আমরা দুই বিবাদমান পক্ষ---আমাদের একে অন্যের উপর সীমালজ্ঘন করেছে; অতএব আপনি আমাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করুন; অবিচার করবেন না এবং আমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন।

إِنَّ هَٰذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ

২৩. 'নিশ্চয় এ ব্যক্তি আমার ভাই, এর আছে নিরানব্বইটি ভেড়ী[২]। আর

(১) হেকমত অর্থ প্রজ্ঞা। অর্থাৎ আমি তাকে অসাধারণ বিবেকবুদ্ধি দান করেছিলাম। কেউ কেউ হেকমতের অর্থ নিয়েছেন নবুওয়াত। ﴿وَفَصْلَ الْخِطَابِ﴾ এর বিভিন্ন তাফসীর করা হয়েছে। কেউ বলেছেন, এর ভাবার্থ অসাধারণ বাগ্মিতা। দাউদ আলাইহিস্ সালাম উচ্চস্তরের বক্তা ছিলেন। বক্তৃতায় হামদ ও সালাতের পর أما بعد শব্দ সর্বপ্রথম তিনিই বলেছিলেন। তার বক্তব্য জটিল ও অস্পষ্ট হতো না। সমগ্র ভাষণ শোনার পর শ্রোতা একথা বলতে পারতো না যে তিনি কি বলতে চান তা বোধগম্য নয়। বরং তিনি যে বিষয়ে কথা বলতেন তার সমস্ত মূল কথাগুলো পরিষ্কার করে তুলে ধরতেন এবং আসল সিদ্ধান্ত প্রত্যাশী বিষয়টি যথাযথভাবে নির্ধারণ করে দিয়ে তার দ্ব্যর্থহীন জবাব দিয়ে দিতেন। কোন ব্যক্তি জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা,বিচার-বিবেচনা ও বাকচাতূর্যের উচ্চতম পর্যায়ে অবস্থান না করলে এ যোগ্যতা অর্জন করতে পারে না। কেউ কেউ বলেন, এর ভাবার্থ সর্বোত্তম বিচারশক্তি। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাকে ঝগড়া-বিবাদ মেটানো ও বাদানুবাদ মীমাংসা করার শক্তি দান করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে শব্দের মধ্যে একই সময়ে উভয় অর্থের পুরোপুরি অবকাশ রয়েছে। [তাবারী]

(২) نعجة শব্দের মূল অর্থ, ভেড়ী বা বন্যগরু। [আল-মু'জামুল ওয়াসীত] সাধারণত:

وَّاحِدَةٌ ۚ فَقَالَ اَكْفِلْنِيْهَا وَعَزَّنِيْ فِي الْخِطَابِ ﴿٢٣﴾

আমার আছে মাত্র একটি ভেড়ী। তবুও সে বলে, 'আমার যিম্মায় এটি দিয়ে দাও', এবং কথায় সে আমার প্রতি প্রাধান্য বিস্তার করেছে।

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ اِلٰى نِعَاجِهٖ ؕ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْخُلَطَآءِ لَيَبْغِيْ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَقَلِيْلٌ مَّا هُمْ ؕ وَظَنَّ دَاوٗدُ اَنَّمَا فَتَنّٰهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهٗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَّاَنَابَ ﴿٢٤﴾

২৪. দাউদ বললেন, 'তোমার ভেড়ীটিকে তার ভেড়ীগুলোর সঙ্গে যুক্ত করার দাবী করে সে তোমার প্রতি যুলুম করেছে। আর শরীকদের অনেকে একে অন্যের উপর তো সীমালজ্ঘন করে থাকে---করে না শুধু যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে, আর তারা সংখ্যায় স্বল্প।' আর দাউদ বুঝতে পারলেন, আমরা তো তাকে পরীক্ষা করলাম। অতঃপর তিনি তার রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং নত হয়ে লুটিয়ে পড়লেন(১), আর তাঁর অভিমুখী হলেন।

فَغَفَرْنَا لَهٗ ذٰلِكَ ؕ وَاِنَّ لَهٗ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ ﴿٢٥﴾

২৫. অতঃপর আমরা তার ত্রুটি ক্ষমা করলাম। আর নিশ্চয় আমাদের কাছে তার জন্য রয়েছে নৈকট্যের মর্যাদা ও উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল।

আরবরা এ শব্দটি দিয়ে অনিন্দ্য সুন্দরী ও বড় চোখ বিশিষ্টা নারীকে বুঝায়। [দেখুন, তাবারী; বাগভী; কুরতুবী; ইবন কাসীর; জালালাইন; ফাতহুল কাদীর; সা'দী; মুয়াসসার] এখানে এ শব্দটি দ্বারা কি উদ্দেশ্য নিয়েছেন তা একমাত্র আল্লাহই ভালো জানেন। [ইবন কাসীর]

(১) এখানে "রুকু" শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ নত হওয়া। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে, এখানে সাজদাহ বোঝানো হয়েছে। [ইবন কাসীর,বাগভী] ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, 'সোয়াদ' এর সাজদাহ বাধ্যতামূলক নয়। তবে আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাজদাহ করতে দেখেছি। [বুখারী:১০৬৯] অপর বর্ণনায় ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, দাউদকে অনুসরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, দাউদ যেহেতু সাজদাহ করেছেন সেহেতু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও সাজদাহ করেছেন। [বুখারী:৪৮০৭]

يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِي الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

২৬. 'হে দাউদ! আমরা আপনাকে যমীনে খলীফা বানিয়েছি, অতএব আপনি লোকদের মধ্যে সুবিচার করুন এবং খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না, কেননা এটা আপনাকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত করবে।' নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌র পথ থেকে ভ্রষ্ট হয় তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি, কারণ তারা বিচার দিনকে ভুলে আছে।

তৃতীয় রুকূ'

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ؕ ذٰلِكَ ظَنُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنَ النَّارِ ﴿٢٧﴾

২৭. 'আর আমরা আসমান, যমীন ও এ দু'য়ের মধ্যবর্তী কোন কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করিনি[১]। অনর্থক সৃষ্টি করার ধারণা তাদের যারা কুফরী করেছে, কাজেই যারা কুফরী করে তাদের জন্য রয়েছে আগুনের দুর্ভোগ।

اَمْ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِي الْاَرْضِ ۫ اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفُجَّارِ ﴿٢٨﴾

২৮. যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে আমরা কি তাদেরকে যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের সমান গণ্য করব? নাকি আমরা মুত্তাকীদেরকে অপরাধীদের সমান গণ্য করব?

كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْٓا اٰيٰتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿٢٩﴾

২৯. এক মুবারক কিতাব, এটা আমরা আপনার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহে গভীরভাবে

(১) অর্থাৎ নিছক খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। একথাটিই কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে বলা হয়েছে। যেমনঃ "তোমরা কি মনে করেছো আমরা তোমাদের অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের আমাদের দিকে ফিরে আসতে হবে না।" [আল-মুমিনূন: ১১৫] অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, "আমরা আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে এবং তাদের মাঝখানে যে বিশ্ব-জাহান রয়েছে তাদেরকে খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। আমরা তাদেরকে সত্য সহকারে সৃষ্টি করেছি। কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না। চূড়ান্ত বিচারের দিনে তাদের সবার জন্য উপস্থিতির সময় নির্ধারিত রয়েছে।" [আদ দুখান:৩৮-৪০]

চিন্তা করে এবং যাতে বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরা গ্রহণ করে উপদেশ।

وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمٰنَ ۭ نِعْمَ الْعَبْدُ ۭ اِنَّهٗٓ اَوَّابٌ ﴿٣٠﴾

৩০. আর আমরা দাউদকে দান করলাম সুলাইমান[১]। কতই না উত্তম বান্দা তিনি! নিশ্চয় তিনি ছিলেন অতিশয় আল্লাহ্ অভিমুখী।

اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصّٰفِنٰتُ الْجِيَادُ ﴿٣١﴾

৩১. যখন বিকেলে তার সামনে দ্রুতগামী উৎকৃষ্ট অশ্বরাজিকে[২] পেশ করা হল,

فَقَالَ اِنِّيْٓ اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّيْ ۚ حَتّٰى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ﴿٣٢﴾

৩২. তখন তিনি বললেন, 'আমি তো আমার রবের স্মরণ হতে বিমুখ হয়ে ঐশ্বর্য প্রীতিতে মগ্ন হয়ে পড়েছি, এদিকে সূর্য পর্দার আড়ালে চলে গেছে;

رُدُّوْهَا عَلَيَّ ۭ فَطَفِقَ مَسْحًۢا بِالسُّوْقِ وَالْاَعْنَاقِ ﴿٣٣﴾

৩৩. 'এগুলোকে আমার কাছে ফিরিয়ে আন।' তারপর তিনি ওগুলোর পা এবং গলা ছেদন করতে লাগলেন[৩]।

---

(১) সুলাইমান আলাইহিস সালাম সম্পর্কিত আলোচনা ইতিপূর্বে বিভিন্ন সূরায় বর্ণিত হয়েছে, যেমনঃ সূরা আল-বাকারাহঃ ১০৪; আল-ইসরাঃ৭; আল-আম্বিয়াঃ৭০-৭৫; আন-নামল, ১৮-৫৬ এবং সাবাঃ ১২-১৪]

(২) মূলে বলা হয়েছে الصَّافِنَات এর অর্থ হচ্ছে এমনসব ঘোড়া যেগুলো দাঁড়িয়ে থাকার সময় অত্যন্ত শান্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, লাফালাফি দাপাদাপি করে না এবং যখন দৌড়ায় অত্যন্ত দ্রুতবেগে দৌড়ায়। [দেখুন, আত-তাফসীরুস সহীহ,বাগভী]

(৩) আলোচ্য ৩০-৩৩ নং আয়াতসমূহে সুলাইমান আলাইহিস্ সালাম-এর একটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। এ ঘটনার প্রসিদ্ধ বিবরণের সারমর্ম এই যে, সুলাইমান আলাইহিস্ সালাম অশ্বরাজি পরিদর্শনে এমনভাবে মগ্ন হয়ে পড়েন যে, আসরের সালাত আদায়ের নিয়মিত সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। পরে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে তার প্রতিকার করেন। এখন প্রশ্ন হলো, কিভাবে তিনি সে প্রতিকার করেছিলেন? কুরআন বলছে, ﴿فَطَفِقَ مَسْحًۢا بِالسُّوْقِ وَالْاَعْنَاقِ﴾ এর অর্থ বর্ণনায় বিভিন্ন মত রয়েছে,

এক, তিনি সমস্ত অশ্ব যবেহ করে দেন। কেননা, এগুলোর কারণেই আল্লাহর স্মরণ বিঘ্নিত হয়েছিল। এ সালাত নফল হলেও কোন আপত্তির কারণ নেই। কেননা, নবী-রাসূলগণ এতটুকু ক্ষতিও পুরণ করার চেষ্টা করে থাকেন। পক্ষান্তরে তা ফরয সালাত হলে ভুলে যাওয়ার কারণে তা কাযা হতে পারে এতে কোন গোনাহ হয়

না। কিন্তু সুলাইমান আলাইহিস্ সালাম তার উচ্চ মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে এরও প্রতিকার করেছেন। এ তাফসীরটি কয়েকজন তাফসীরবিদ থেকে বর্ণিত হয়েছে। হাফেয ইবন কাসীরের ন্যায় অনুসন্ধানী আলেমও এই তাফসীরকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কিন্তু এতে সন্দেহ হয় যে, অশ্বরাজি আল্লাহ্ প্রদত্ত একটি পুরস্কার ছিল। নিজের সম্পদকে এভাবে বিনষ্ট করা একজন নবীর পক্ষে শোভা পায় না। কোন কোন তাফসীরবিদ এর জওয়াবে বলেন যে, এ অশ্বরাজি সুলাইমান আলাইহিস্ সালাম-এর ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ছিল। তার শরী'আতে গরু, ছাগল ও উটের ন্যায় অশ্ব কোরবানী করাও বৈধ ছিল। তাই তিনি অশ্বরাজি বিনষ্ট করেননি; বরং আল্লাহর নামে কোরবানী করেছেন।

দুই, আলোচ্য আয়াতের আরও একটি তাফসীর আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে। তাতে ঘটনাটি সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে বর্ণনা করা হয়েছে। এই তফসীরের সারমর্ম এই যে, সুলাইমান আলাইহিস্ সালাম-এর সামনে জেহাদের জন্যে তৈরি অশ্বরাজি পরিদর্শনের নিমিত্তে পেশ করা হলে সেগুলো দেখে তিনি খুব আনন্দিত হন। সাথে সাথে তিনি বললেনঃ এই অশ্বরাজির প্রতি আমার যে মহব্বত ও মনের টান, তা পার্থিব মহব্বতের কারণে নয়; বরং আমার পালকর্তার স্মরণের কারণেই। কারণ, এগুলো জেহাদের উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে। জেহাদ একটি উচ্চস্তরের ইবাদত। ইতিমধ্যে অশ্বরাজির দল তার দৃষ্টি থেকে উধাও হয়ে গেল। তিনি আদেশ দিলেনঃ এগুলোকে আবার আমার সামনে উপস্থিত কর। সে মতে পুনরায় উপস্থিত করা হলে তিনি অশ্বরাজির গলদেশে ও পায়ে আদর করে হাত বুলালেন। প্রাচীন তাফসীরবিদগণের মধ্যে হাফেয ইবনে জরীর, তাবারী, ইমাম রাযী প্রমুখ এ তাফসীরকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কেননা, এই তাফসীর অনুযায়ী সম্পদ নষ্ট করার সন্দেহ হয় না। পবিত্র কুরআনের ভাষ্যে উভয় তাফসীরের অবকাশ আছে।

এ আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহর স্মরণে শৈথিল্য হলে নিজের উপর শাস্তি নির্ধারণ করা ধর্মীয় মর্যাদাবোধের দাবী। কোন সময় আল্লাহর স্মরণে শৈথিল্য হয়ে গেলে নিজেকে শাস্তি দেয়ার জন্যে কোন মুবাহ (অনুমোদিত) কাজ থেকে বঞ্চিত করে দেয়া জায়েয। কোন সৎকাজের অভ্যাস গড়ে তোলার জন্যে নিজের উপর এ ধরনের শাস্তি নির্ধারণ করা আত্মশুদ্ধির একটি ব্যবস্থা। এ ঘটনা থেকে এর বৈধতা বরং পছন্দনীয়তা জানা যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার আবু জাহম রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তাকে একটি শামী চাদর উপহার দেন। চাদরটি ছিল কারুকার্যখচিত। তিনি চাদর পরিধান করে সালাত পড়লেন এবং ফিরে এসে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহাকে বললেন, চাদরটি আবু জাহামের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দাও। কেননা, সালাতে আমার দৃষ্টি এর কারুকার্যের উপর পড়ে গিয়েছিল এবং আমার মনোনিবেশে বিপর্যয় সৃষ্টি হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। [বুখারী: ৩৭৩, মুসলীম:১৭৬] হাদীসে আরও এসেছে,

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمٰنَ وَاَلْقَيْنَا عَلٰى كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ ﴿٣٤﴾

৩৪. আর অবশ্যই আমরা সুলাইমানকে পরীক্ষা করলাম এবং তার আসনের উপর রাখলাম একটি ধড়(১); তারপর সুলাইমান আমার অভিমুখী হলেন।

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِىْ وَهَبْ لِىْ مُلْكًا لَّا يَنْۢبَغِىْ لِاَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِىْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٣٥﴾

৩৫. তিনি বললেন, 'হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমাকে দান করুন এমন এক রাজ্য(২) যা আমার পর আর কারও জন্যই প্রযোজ্য হবে না। নিশ্চয় আপনি পরম দাতা।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "তুমি আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করতে গিয়ে যা-ই ত্যাগ করবে আল্লাহ তার থেকে উত্তম বস্তু তোমাকে দিবে। [মুসনাদে আহমাদ: ৫/৭৮,৭৯, ৩৬৩] [দেখুন, কুরতুবী]

(১) এখানে ধড় বলে কি বোঝানো হয়েছে এ ব্যাপারে দু'টি মত রয়েছে। এক. এখানে ধড় বলে একটি অপূর্ণাঙ্গ সন্তান বোঝানো হয়েছে। কারণ, সুলাইমান আলাইহিস সালাম শপথ করে বলেছিলেন, আমি আমার স্ত্রীদের সাথে সহবাস করলে প্রত্যেকেই একটি সন্তান নিয়ে আসবে, যাতে করে তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করতে পারে, কিন্তু তিনি ইনশাল্লাহ বলতে ভুলে গিয়েছিলেন, তারপর তিনি তার স্ত্রীদের সাথে সহবাস করলেন, কিন্তু তাদের মধ্যে কেবল একজনই একটি অপূর্ণাঙ্গ সন্তানের জন্ম দিল। তারপর সুলাইমান আলাইহিস সালাম তার রবের দিকে ফিরে আসলেন এবং তাওবাহ করলেন [মুয়াসসার]
দুই. এখানে ধড় বলে সে জিনকে বোঝানো হয়েছে যে সুলাইমান আলাইহিস সালামের অবর্তমানে তার সিংহাসনে আরোহন করেছিল এবং কিছুদিন রাজ্য শাসন করেছিল। তারপর সুলাইমান আলাইহিস সালাম আল্লাহর দিকে ফিরে গেলেন এবং তাওবাহ করলেন। [সা'দী]

(২) অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে এ দো'আর অর্থ এই যে, আমার পরেও কেউ যেন এরূপ সাম্রাজ্যের অধিকারী না হয়। সুতরাং বাস্তবেও তাই দেখা যায় যে, সুলাইমান আলাইহিস্ সালাম-কে যেরূপ সাম্রাজ্য দান করা হয়েছিল, তেমন রাজত্বের অধিকারী পরবর্তী কালে কেউ হতে পারেনি। কেননা, বাতাস অধীনস্থ হওয়া, জিন জাতি বশীভূত হওয়া এগুলো পরবর্তীকালে কেউ লাভ করতে পারেনি। সুলাইমান আলাইহিস্ সালাম জিনদের উপর যেরূপ সর্বব্যাপী রাজত্ব কায়েম করেছিলেন তদ্রূপ কেউ কায়েম করতে পারেনি। এক হাদীসে এসেছে, এক দুষ্ট জিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সালাত নষ্ট করতে চাইলে তিনি সেটাকে বেঁধে রাখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সুলাইমান আলাইহিস সালামের এ দো'আর কথা স্মরণ করে তার সম্মানে তা করা ত্যাগ করেন। [দেখুন, বুখারী:৩৪২৩]

৩৬. তখন আমরা তার অধীন করে দিলাম বায়ুকে, যা তার আদেশে, তিনি যেখানে ইচ্ছে করতেন সেখানে মৃদুমন্দভাবে প্রবাহিত হত,

فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ﴿٣٦﴾

৩৭. আর (অধীন করে দিলাম) প্রত্যেক প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরী শয়তানসমূহকেও,

وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ ﴿٣٧﴾

৩৮. এবং শৃংখলে আবদ্ধ আরও অনেককে(১)।

وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿٣٨﴾

৩৯. 'এসব আমাদের অনুগ্রহ, অতএব এ থেকে আপনি অন্যকে দিতে বা নিজে রাখতে পারেন। এর জন্য আপনাকে হিসেব দিতে হবে না।'

هَٰذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٩﴾

৪০. আর নিশ্চয় আমাদের কাছে রয়েছে তার জন্য নৈকট্যের মর্যাদা ও উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল।

وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ ﴿٤٠﴾

চতুর্থ রুকূ'

৪১. আর স্মরণ করুন, আমাদের বান্দা আইউবকে, যখন তিনি তার রবকে ডেকে বলেছিলেন, 'শয়তান তো আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্টে ফেলেছে',

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ﴿٤١﴾

৪২. (আমি তাকে বললাম) 'আপনি আপনার পা দ্বারা ভূমিতে আঘাত করুন, এই তো গোসলের সুশীতল পানি ও পানীয়(২)।'

ارْكُضْ بِرِجْلِكَ ۖ هَٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴿٤٢﴾

---

(১) শয়তান বলতে জিন বুঝানো হয়েছে। [আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর] আর শৃংখলিত জিন বলতে এমনসব জিন বুঝানো হয়েছে যাদেরকে বিভিন্ন দুষ্কর্মের কারণে বন্দী করা হতো। [ইবন কাসীর] অথবা তারা এমনভাবে তার বশ্যতা স্বীকার করেছিল যে, তিনি তাদেরকে বন্দী করে রাখতে সমর্থ হতেন। [বাগভী]

(২) অর্থাৎ আল্লাহর হুকুমে মাটিতে পায়ের আঘাত করতেই একটি পানির ঝরণা প্রবাহিত

وَوَهَبْنَا لَهٗۤ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ ﴿٤٣﴾

৪৩. আর আমরা তাকে দান করলাম তার পরিজনবর্গ ও তাদের মত আরো অনেক; আমাদের পক্ষ থেকে অনুগ্রহস্বরূপ এবং বোধশক্তি সম্পন্ন লোকদের জন্য উপদেশস্বরূপ[১]।

وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِّهٖ وَلَا تَحْنَثْ ؕ اِنَّا وَجَدْنٰهُ صَابِرًا ؕ نِعْمَ الْعَبْدُ ؕ اِنَّهٗۤ اَوَّابٌ ﴿٤٤﴾

৪৪. 'আর (আমি তাকে আদেশ করলাম), একমুঠ ঘাস নিন এবং তা দ্বারা আঘাত করুন এবং শপথ ভঙ্গ করবেন না।' নিশ্চয় আমরা তাকে পেয়েছি ধৈর্যশীল[২]। কতই উত্তম বান্দা

হলো। এর পানি পান করা এবং এ পানিতে গোসল করা ছিল আইয়ূবের জন্য তার রোগের চিকিৎসা। সম্ভবত আইয়ূব কোন কঠিন চর্মরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। [দেখুন, মুয়াসসার,কুরতুবী]

(১) বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, এ রোগে আক্রান্ত হবার পর আইয়ূবের স্ত্রী ছাড়া আর সবাই তাঁর সংগ ত্যাগ করেছিল, এমন কি সন্তানরাও তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। এ দিকে ইংগিত করেই আল্লাহ বলছেন, যখন আমি তার রোগ নিরাময় করলাম, সমস্ত পরিবারবর্গ তার কাছে ফিরে এলো এবং তারপর আমি তাকে আরো সন্তান দান করলাম। একজন বুদ্ধিমানের জন্য এর মধ্যে এ শিক্ষা রয়েছে যে, ভালো অবস্থায় আল্লাহকে ভুলে গিয়ে তার বিদ্রোহী হওয়া উচিত নয় এবং খারাপ অবস্থায় তার আল্লাহ থেকে নিরাশ হওয়াও উচিত নয়। তাকদীরের ভালমন্দ সরাসরি এক ও লা শরীক আল্লাহর ক্ষমতার আওতাধীন। তিনি চাইলে মানুষের সবচেয়ে ভাল অবস্থাকে সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় পরিবর্তিত করে দিতে পারেন আবার চাইলে সবচেয়ে খারাপ অবস্থার মধ্য দিয়ে তাকে সবচেয়ে ভাল অবস্থায় পৌঁছিয়ে দিতে পারেন। তাই বুদ্ধিমান ব্যক্তির সকল অবস্থায় তাঁর ওপর ভরসা এবং তাঁর প্রতি পুরোপুরি নির্ভর করা উচিত। [দেখুন, মুয়াসসার]

(২) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত যে, আইয়্যুব আলাইহিস্ সালামের অসুস্থতার সময় একদা শয়তান চিকিৎসকের বেশে আইয়্যুব আলাইহিস্ সালামের পত্নীর সাথে সাক্ষাত করেছিল। তিনি ওকে চিকিৎসক মনে করে স্বামীর চিকিৎসা করতে অনুরোধ করেন। শয়তান বলল, এই শর্তে চিকিৎসা করতে পারি যে, আরোগ্য লাভ করলে একথার স্বীকৃতি দিতে হবে যে, আমিই তাকে আরোগ্য দান করেছি। এ স্বীকৃতিটুকু ছাড়া আমি আর কোন পারিশ্রমিক চাই না। স্ত্রী আইয়্যুবকে একথা বললে, তিনি বললেন -তোমার সরলতা দেখে সত্যই দুঃখ হয়। ওতো শয়তান ছিল। এ ঘটনার বিশেষতঃ তার স্ত্রীর মুখ দিয়ে শয়তান কর্তৃক এমন একটা প্রস্তাব তার সামনে

তিনি! নিশ্চয় তিনি ছিলেন আমার অভিমুখী।

৪৫. আর স্মরণ করুন, আমাদের বান্দা ইব্‌রাহীম, ইস্‌হাক ও ইয়া'কূবের কথা, তাঁরা ছিলেন শক্তিশালী ও সূক্ষ্মদর্শী।

وَاذْكُرْ عِبٰدَنَآ إِبْرٰهِيمَ وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ أُولِى الْأَيْدِى وَالْأَبْصٰرِ ﴿٤٥﴾

৪৬. নিশ্চয় আমরা তাদেরকে অধিকারী করেছিলাম এক বিশেষ গুণের, তা ছিল আখিরাতের স্মরণ(১)।

إِنَّآ أَخْلَصْنٰهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ﴿٤٦﴾

৪৭. আর নিশ্চয় তারা ছিলেন আমাদের নিকট মনোনীত উত্তম বান্দাদের অন্যতম।

وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ ﴿٤٧﴾

৪৮. আর স্মরণ করুন, ইসমাঈল, আল-ইয়াসা'আ ও যুল-কিফ্‌লের কথা, আর এরা প্রত্যেকেই ছিলেন সজ্জনদের অন্তর্ভুক্ত।

وَاذْكُرْ إِسْمٰعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ ۖ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ ﴿٤٨﴾

৪৯. এ এক স্মরণ(২)। মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে উত্তম আবাস---

هٰذَا ذِكْرٌ ۚ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَـَٔابٍ ﴿٤٩﴾

উচ্চারিত করানোর বিষয়টা তিনি স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারলেন না। তিনি খুব দুঃখ পেলেন। কারণ, প্রস্তাবটা ছিল শেরেকীতে লিপ্ত করার একটা সূক্ষ্ম অপপ্রয়াস। তাই তিনি শপথ করে বসলেন যে, আল্লাহ তাআলা আমাকে সুস্থ করে তুললে স্ত্রীর এ অপরাধের জন্য তাকে একশত বেত্রাঘাত করব। সে ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেই আল্লাহ পাক নির্দেশ দিচ্ছেন, শপথ ভঙ্গ করো না, বরং হাতে এক মুঠো তৃণশলাকা নিয়ে তদ্বারা স্ত্রীকে একশত বেত্রাঘাত করে শপথ পূর্ণ কর। তবে কোন অসমীচীন কাজের প্রতিজ্ঞা করলে তা ভেঙ্গে কাফফারা আদায় করাই শরী'আতের বিধান। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 'যে ব্যক্তি কোন প্রতিজ্ঞা করে, অতঃপর দেখে যে, এ প্রতিজ্ঞার বিপরীত কাজ করাই উত্তম, তবে তার উচিত উত্তম কাজটি করা এবং প্রতিজ্ঞার কাফফারা আদায় করা। [মুসলিম:১৬৫০]

(১) অর্থাৎ তাদেরকে আখেরাত স্মরণের জন্য বিশেষ লোক হিসেবে নির্বাচন করেছিলাম। সুতরাং তারা আখেরাতের জন্যই আমার আনুগত্য করত ও আমল করত। মানুষদেরকে তারা এর জন্য উপদেশ দিত এবং আখেরাতের প্রতি আহ্বান জানাত। [মুয়াসসার]

(২) অর্থাৎ এ কুরআন আপনার ও আপনার জাতির জন্য এক সম্মানজনক স্মরণ। এতে আপনাকে ও আপনার জাতির সুন্দর প্রশংসা করা হয়েছে। [মুয়াসসার]

جَنّٰتِ عَدۡنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الۡاَبۡوَابُ ﴿٥٠﴾

৫০. চিরস্থায়ী জান্নাত, যার দরজাসমূহ তাদের জন্য উন্মুক্ত[১]।

مُتَّكِـِٕيۡنَ فِيۡهَا يَدۡعُوۡنَ فِيۡهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيۡرَةٍ وَّشَرَابٍ ﴿٥١﴾

৫১. সেখানে তারা আসীন হবে হেলান দিয়ে, সেখানে তারা বহুবিধ ফলমূল ও পানীয় চাইবে।

وَعِنۡدَهُمۡ قٰصِرٰتُ الطَّرۡفِ اَتۡرَابٌ ﴿٥٢﴾

৫২. আর তাদের পাশে থাকবে আনতনয়না সমবয়স্কারা।

هٰذَا مَا تُوۡعَدُوۡنَ لِيَوۡمِ الۡحِسَابِ ﴿٥٣﴾

৫৩. এটা হিসেবের দিনের জন্য তোমাদেরকে দেয়া প্রতিশ্রুতি।

اِنَّ هٰذَا لَرِزۡقُنَا مَا لَهٗ مِنۡ نَّفَادٍ ﴿٥٤﴾

৫৪. নিশ্চয় এটা আমাদের দেয়া রিযিক যা নিঃশেষ হবার নয়।

هٰذَا ؕ وَاِنَّ لِلطّٰغِيۡنَ لَشَرَّ مَاٰبٍ ﴿٥٥﴾

৫৫. এটাই। আর নিশ্চয় সীমালজ্ঘনকারীদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্টতম প্রত্যাবর্তনস্থল---

جَهَنَّمَ ۚ يَصۡلَوۡنَهَا ۚ فَبِئۡسَ الۡمِهَادُ ﴿٥٦﴾

৫৬. জাহান্নাম, সেখানে তারা অগ্নিদগ্ধ হবে, কত নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল!

هٰذَا ۙ فَلۡيَذُوۡقُوۡهُ حَمِيۡمٌ وَّغَسَّاقٌ ﴿٥٧﴾

৫৭. এটাই। কাজেই তারা আস্বাদন করুক ফুটন্ত পানি ও পুঁজ[২]।

---

(১) এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। এক, এসব জান্নাতে তারা দ্বিধাহীনভাবে ও নিশ্চিন্তে ঘোরাফেরা করবে এবং কোথাও তাদের কোনপ্রকার বাধার সম্মুখীন হতে হবে না। দুই, জান্নাতের দরজা খোলার জন্য তাদের কোন প্রচেষ্টা চালাবার দরকার হবে না বরং শুধুমাত্র তাদের মনে ইচ্ছা জাগার সাথে সাথেই তা খুলে যাবে। তিন, জান্নাতের ব্যবস্থাপনায় যেসব ফেরেশ্‌তা নিযুক্ত থাকবে তারা জান্নাতের অধিবাসীদেরকে দেখতেই তাদের জন্য দরজা খুলে দেবে। [ইবন কাসীর, সা'দী,ফাতহুল কাদীর] এ তৃতীয় বিষয়বস্তুটি কুরআনের এক জায়গায় বেশী স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, 'এমনকি যখন তারা সেখানে পৌঁছুবে এবং তার দরজা আগে থেকেই খোলা থাকবে তখন জান্নাতের ব্যবস্থাপকরা তাদেরকে বলবে, 'সালামুন আলাইকুম, শুভ আগমন' চিরকালের জন্য এর মধ্যে প্রবেশ করুন।' [সূরা আয-যুমার:৭৩]

(২) মূলে غساق শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আভিধানিকগণ এর কয়েকটি অর্থ বর্ণনা

৫৮. আরো আছে এরূপ বিভিন্ন ধরনের শাস্তি[১] ।

وَّاٰخَرُ مِنۡ شَكۡلِهٖۤ اَزۡوَاجٌ ﴿٥٨﴾

৫৯. 'এ তো এক বাহিনী, তোমাদের সঙ্গে প্রবেশ করছে। তাদের জন্য নেই কোন অভিনন্দন। নিশ্চয় তারা আগুনে জ্বলবে।'

هٰذَا فَوۡجٌ مُّقۡتَحِمٌ مَّعَكُمۡ ۚ لَا مَرۡحَبًۢا بِهِمۡ ؕ اِنَّهُمۡ صَالُوا النَّارِ ﴿٥٩﴾

৬০. অনুসারীরা বলবে, 'বরং তোমরাও, তোমাদের জন্যও কোন অভিনন্দন নেই। তোমরাই তো আগে আমাদের জন্য ওটার ব্যবস্থা করেছ। অতএব কত নিকৃষ্ট এ আবাসস্থল[২]!'

قَالُوۡا بَلۡ اَنۡتُمۡ ۟ لَا مَرۡحَبًۢا بِكُمۡ ؕ اَنۡتُمۡ قَدَّمۡتُمُوۡهُ لَنَا ۚ فَبِئۡسَ الۡقَرَارُ ﴿٦٠﴾

৬১. তারা বলবে, 'হে আমাদের রব! যে এটাকে আমাদের সম্মুখীন করেছে, আগুনে তার শাস্তি আপনি দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিন।'

قَالُوۡا رَبَّنَا مَنۡ قَدَّمَ لَنَا هٰذَا فَزِدۡهُ عَذَابًا ضِعۡفًا فِی النَّارِ ﴿٦١﴾

৬২. তারা আরও বলবে, 'আমাদের কী হল যে, আমরা যেসব লোককে মন্দ বলে গণ্য করতাম তাদেরকে দেখতে পাচ্ছি না[৩]।

وَقَالُوۡا مَا لَنَا لَا نَرٰی رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمۡ مِّنَ الۡاَشۡرَارِ ﴿٦٢﴾

করেছেন। এর একটি অর্থ হচ্ছে, শরীর থেকে বের হয়ে আসা রক্ত, পূঁজ ইত্যাদি জাতীয় নোংরা তরল পদার্থ এবং চোখের পানিও এর অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, অত্যন্ত ও চরম ঠাণ্ডা জিনিস। তৃতীয় অর্থ হচ্ছে, চরম দুর্গন্ধযুক্ত পচা জিনিস। কিন্তু প্রথম অর্থেই এ শব্দটির সাধারণ ব্যবহার হয়, যদিও বাকি দু'টি অর্থও আভিধানিক দিক দিয়ে নির্ভুল। [তাবারী]

(১) ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এর দ্বারা প্রচণ্ড শীত বোঝানো হয়েছে। আর ইবন আব্বাস বলেন, এর অর্থ, অনুরূপ। [তাবারী]

(২) কাতাদাহ বলেন, এটা অনুসারীরা তাদের নেতাদেরকে বলবে। [তাবারী]

(৩) কাতাদাহ বলেন, তারা জান্নাতীদেরকে দেখতে পাবে না। তখন বলবে, আমরা দুনিয়াতে তাদেরকে উপহাস করতাম, এখন তো তাদেরকে হারিয়ে ফেলেছি। নাকি তারা জাহান্নামেই আছে তবে আমাদের চোখ তাদেরকে পাচ্ছে না? [তাবারী]

٦٣. أَتَّخَذْنَٰهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ ﴿٦٣﴾

৬৩. 'তবে কি আমরা তাদেরকে (অহেতুক) ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্র মনে করতাম; না তাদের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টি বিভ্রম ঘটেছে[১]?'

إِنَّ ذَٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ﴿٦٤﴾

৬৪. নিশ্চয় এটা বাস্তব সত্য--- জাহান্নামীদের এ পারস্পরিক বাদ-প্রতিবাদ।

(১) ফলে চোখ তাদের দেখতে পাচ্ছে না? [তাবারী] ইবন কাসীর বলেন, বস্তুত এটি এক উদাহরণ। নতুবা সকল কাফেরের অবস্থাই এ রকম। তারা বিশ্বাস করত যে, মুমিনরা জাহান্নামে যাবে। তারপর যখন তারা জাহান্নামে যাবে আর সেখানে মুমিনদের খুঁজতে থাকবে, কিন্তু তারা তাদেরকে সেখানে পাবে না। তখন তারা বলবে যে, 'আমাদের কী হল যে, আমরা যেসব লোককে মন্দ বলে গণ্য করতাম তাদেরকে দেখতে পাচ্ছি না, 'আমরা তো দুনিয়াতে তাদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্র মনে করতাম; এরপর তারা নিজেদেরকে শুধুই অসম্ভবকে সম্ভব মনে করে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে বলবে, নাকি তারা আমাদের সাথেই জাহান্নামে আছে তবে তাদের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টি বিভ্রম ঘটেছে? তখন তারা জানতে পারবে যে, মূলতঃ তারা জান্নাতের সুউচ্চ স্তরে রয়েছে। আর সেটাই হচ্ছে তা যা অন্যত্র বলা হয়েছে, " আর জান্নাতবাসীগণ জাহান্নামবাসীদেরকে সম্বোধন করে বলবে, 'আমাদের রব আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আমরা তো তা সত্য পেয়েছি। তোমাদের রব তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তোমরা তা সত্য পেয়েছ কি?' তারা বলবে, 'হ্যাঁ।' অতঃপর একজন ঘোষণাকারী তাদের মধ্যে ঘোষণা করবে, 'আল্লাহ্‌র লা'নত যালিমদের উপর--- 'যারা আল্লাহ্‌র পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করত এবং সে পথে জটিলতা খুঁজে বেড়াত; এবং তারা আখেরাতকে অস্বীকারকারী ছিল।' আর তাদের উভয়ের মধ্যে পর্দা থাকবে। আর আ'রাফে কিছু লোক থাকবে, যারা প্রত্যেককে তার চিহ্ন দ্বারা চিনবে। আর তারা জান্নাতবাসীদেরকে সম্বোধন করে বলবে, 'তোমাদের উপর সালাম।' তারা তখনো জান্নাতে প্রবেশ করেনি, কিন্তু আকাংখা করে। আর যখন তাদের দৃষ্টি অগ্নিবাসীদের দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে, তখন তারা বলবে, 'হে আমাদের রব! আমাদেরকে যালিম সম্প্রদায়ের সঙ্গী করবেন না।' আর আ'রাফবাসীরা এমন লোকদেরকে ডাকবে, যাদেরকে তারা তাদের চিহ্ন দ্বারা চিনবে, তারা বলবে, 'তোমাদের দল ও তোমাদের অহংকার কোন কাজে আসল না।' এরাই কি তারা, যাদের সম্বন্ধে তোমরা শপথ করে বলতে যে, আল্লাহ্ তাদেরকে রহমতে শামিল করবেন না? (এদেরকেই বলা হবে) 'তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর, তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না।" [৪৪-৪৯] [ইবন কাসীর]

পঞ্চম রুকূ’

৬৫. বলুন, ‘আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র এবং সত্য কোন ইলাহ্ নেই আল্লাহ্ ছাড়া, যিনি এক, প্রবল প্রতাপশালী ।

قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ ۖ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٦٥﴾

৬৬. ‘যিনি আসমানসমূহ, যমীন ও তাদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর রব, প্রবল পরাক্রমশালী, মহাক্ষমাশীল ।’

رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ﴿٦٦﴾

৬৭. বলুন, ‘এটা এক মহাসংবাদ,

قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ ﴿٦٧﴾

৬৮. ‘যা থেকে তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ ।

أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿٦٨﴾

৬৯. ‘ঊর্ধ্বলোক সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান ছিল না যখন তারা বাদানুবাদ করছিল(১) ।

مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٦٩﴾

---

(১) অর্থাৎ আমার রেসালতের উজ্জ্বল প্রমাণ এই যে, আমি তোমাদেরকে ঊর্ধ্ব জগতের বিষয়াদি সম্পর্কে অবহিত করে থাকি যা ওহী ছাড়া অন্য কোন উপায়েই আমার জানার কথা নয় । এসব বিষয়াদির এক অর্থ সেসব আলোচনা, যা আদম সৃষ্টির সময় আল্লাহ তাআলা ও ফেরেশতাগণের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছিল । [ইবন কাসীর] ফেরেশতাগণ বলেছিল, “আপনি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন, যারা সেখানে অনর্থ সৃষ্টি করবে এবং রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবে? [কুরতুবী] এসব কথাবার্তাকে এখানে اختصام বলে ব্যক্ত করা হয়েছে, যার শাব্দিক অর্থ “ঝগড়া করা” অথবা “বাকবিতণ্ডা করা” । অথচ বাস্তব ঘটনা এই যে, ফেরেশতাগণের এই প্রশ্ন কোন আপত্তি অথবা বাকবিতণ্ডার উদ্দেশ্যে ছিল না, বরং তারা কেবল আদম সৃষ্টির রহস্য জানতে চেয়েছিল । কিন্তু প্রশ্ন ও উত্তরের বাহ্যিক আকার বাকবিতণ্ডার অনুরূপ হয়ে গিয়েছিল বিধায় একে اختصام শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে ।

উপরোক্ত তাফসীর ছাড়াও এ বিবাদের আরেক অর্থ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে । ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘আমার রব আজ স্বপ্নে আমার কাছে সবচেয়ে সুন্দর আকৃতিতে আসেন । তারপর তিনি বললেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি কি জানেন কি নিয়ে ঊর্ধ্বলোকে ঝগড়া হচ্ছে? আমি বললাম: না, তারপর তিনি তাঁর হাত আমার কাঁধের মাঝখানে রাখলেন, এমনকি আমি তার শীতলতা আমার গলা ও বক্ষদেশে

إِنْ يُوحَىٰ إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٧٠﴾

৭০. 'আমার কাছে তো এ ওহী এসেছে যে, আমি একজন স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।'

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّن طِينٍ ﴿٧١﴾

৭১. স্মরণ করুন, যখন আপনার রব ফেরেশ্‌তাদেরকে বলেছিলেন, 'আমি মানুষ সৃষ্টি করছি কাদা থেকে,

فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا۟ لَهُۥ سَٰجِدِينَ ﴿٧٢﴾

৭২. 'অতঃপর যখন আমি তাকে সুষম করব এবং তাতে আমার রূহ সঞ্চার করব, তখন তোমরা তার প্রতি সিজ্‌দাবনত হয়ো।'

فَسَجَدَ الْمَلَٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٧٣﴾

৭৩. তখন ফেরেশ্‌তারা সকলেই সিজ্‌দাবনত হল---

إِلَّآ إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَٰفِرِينَ ﴿٧٤﴾

৭৪. ইবলীস ছাড়া, সে অহংকার করল এবং কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হল।

অনুভব করি। তখন জানতে পারলাম আসমানে ও যমীনে যা আছে তা। বললেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি কি জানেন ঊর্ধ্বলোকে কি নিয়ে ঝগড়া হচ্ছে? আমি বললাম, হ্যাঁ, বললেন, কাফফারা নিয়ে। কাফফারা হচ্ছে, সালাতের পরে মসজিদে অবস্থান করা এবং জামা'আতের দিকে পায়ে হেঁটে যাওয়া; আর কষ্টকর জায়গায় অযুর পানি পৌঁছানো। যে ব্যক্তি এটা করবে সে কল্যাণের সাথে জীবন অতিবাহিত করবে এবং কল্যাণের সাথে মারা যাবে। আর সে তার গোনাহ থেকে এমনভাবে মুক্ত হবে যেমন তার মা তাকে প্রথম জন্ম দিয়েছিল। আরও বললেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি যখন সালাত আদায় করবেন তখন বলবেন, اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنِ، وَإِذَا أَرَدْتَّ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِيْ إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُوْنٍ অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে কল্যাণকর কাজ করার সামর্থ চাই, অন্যায়-অশ্লীলতা পরিত্যাগ করার সামর্থ চাই এবং দরিদ্রদের ভালবাসার তাওফীক চাই। আর যখন আপনি আপনার বান্দাদেরকে কোন পরীক্ষায় নিপতিত করতে চান তখন আমাকে আপনার কাছে বিনা পরীক্ষায় নিয়ে নিন'। অনুরূপভাবে (ঊর্ধ্বালোকের আরেকটি) বিবাদের বিষয় হচ্ছে, 'দারাজাহ' বা উচ্চ পদ মর্যাদা সম্পর্কে। 'দারাজাহ' বা উচ্চ পদ মর্যাদা হচ্ছে, প্রথম সালাম দেয়া, খাবার খাওয়ানো এবং মানুষ যখন ঘুমায় তখন সালাত আদায় করা।' [তিরমিযী:৩২৩৫] তবে হাফেয ইবনে কাসীর প্রথম তাফসীরটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। [দেখুন, ইবন কাসীর]

قَالَ يَٰٓإِبۡلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسۡجُدَ لِمَا خَلَقۡتُ بِيَدَيَّۖ أَسۡتَكۡبَرۡتَ أَمۡ كُنتَ مِنَ ٱلۡعَالِينَ ۝٧٥

৭৫. তিনি বললেন, 'হে ইবলীস! আমি যাকে আমার দু'হাতে[১] সৃষ্টি করেছি, তার প্রতি সিজ্‌দাবনত হতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? তুমি কি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করলে, না তুমি অধিকতর উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন?'

قَالَ أَنَا۠ خَيۡرٌ مِّنۡهُ خَلَقۡتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقۡتَهُۥ مِن طِينٍ ۝٧٦

৭৬. সে বলল, 'আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন কাদা থেকে।'

قَالَ فَٱخۡرُجۡ مِنۡهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ۝٧٧

৭৭. তিনি বললেন, 'তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও, কেননা নিশ্চয় তুমি বিতাড়িত।

وَإِنَّ عَلَيۡكَ لَعۡنَتِيٓ إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلدِّينِ ۝٧٨

৭৮. 'আর নিশ্চয় তোমার উপর আমার লা'নত থাকবে, কর্মফল দিন পর্যন্ত।'

قَالَ رَبِّ فَأَنظِرۡنِيٓ إِلَىٰ يَوۡمِ يُبۡعَثُونَ ۝٧٩

৭৯. সে বলল, 'হে আমার রব! অতএব আপনি আমাকে সে দিন পর্যন্ত অবকাশ দিন, যে দিন তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে।

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلۡمُنظَرِينَ ۝٨٠

৮০. তিনি বললেন, 'তাহলে তুমি অবকাশপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হলে---

(১) আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা বিশ্বাস হচ্ছে যে, মহান আল্লাহর হাত রয়েছে। তবে সেটার স্বরূপ আমরা জানি না। [ইমাম আবু হানীফার দিকে সম্পর্কযুক্ত গ্রন্থ, আল-ফিকহুল আকবার: ২৭] আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা আদমকে নিজ দু' হাতে সৃষ্টি করেছেন। অন্য হাদীসে তাওরাত লেখার কথাও এসেছে। [বুখারী: ৬৬১৪] তাছাড়া তিনি জান্নাতও নিজ হাতে তৈরী করেছেন। [মুসলিম: ১৮৯] অনুরূপভাবে তিনি নিজ হাতে একটি কিতাব লিখে তাঁর কাছে রেখে দিয়েছেন যাতে লিখা আছে যে, তাঁর রহমত তাঁর ক্রোধের উপর প্রাধান্য পাবে। [ইবন মাজাহ: ১৮৯] [বিস্তারিত দেখুন, উমর সুলাইমান আল-আশকার, আল -আকীদা ফিল্লাহ: ১৭৭-১৭৮]

৮১. 'নির্ধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত ।'

إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٨١﴾

৮২. সে বলল, 'আপনার ক্ষমতা-সম্মানের শপথ! অবশ্যই আমি তাদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করব,

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٢﴾

৮৩. 'তবে তাদের মধ্যে আপনার একনিষ্ঠ বান্দারা ব্যতীত ।'

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿٨٣﴾

৮৪. তিনি বললেন, 'তবে এটাই সত্য, আর আমি সত্যই বলি--

قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ ﴿٨٤﴾

৮৫. 'অবশ্যই তোমার দ্বারা ও তাদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে তাদের সবার দ্বারা আমি জাহান্নাম পূর্ণ করব ।'

لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٥﴾

৮৬. বলুন, 'আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না এবং আমি কৃত্রিমতাশ্রয়ীদের অন্তর্ভুক্ত নই[১] ।'

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴿٨٦﴾

৮৭. এ তো সৃষ্টিকুলের জন্য উপদেশ মাত্র[২] ।

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٨٧﴾

---

(১) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে যা দিয়ে পাঠিয়েছেন আমি তা থেকে কোন কিছু বাড়িয়ে বলব না, এর বাইরে বাড়তি কিছুই আমি চাই না । বরং আমাকে যা নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাই আমি আদায় করে দিয়েছি । আমি এর চেয়ে কোন কিছু বাড়াবোও না, কমাবোও না । আমি তো শুধু এর দ্বারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও আখেরাতই কামনা করি । [ইবন কাসীর] মাসরূক বলেন, আমরা আবদুল্লাহ ইবন মাসউদের নিকট আসলাম । তিনি বললেন, হে মানুষ! তোমরা কোন কিছু জানলে বলবে । আর না জানলে বলবে, আল্লাহ্ জানেন । কেননা, জ্ঞানের কথা হচ্ছে, কেউ যদি কোন কিছু না জানে তবে বলবে, আল্লাহ্ জানেন । কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের নবীকে বলেছেন, "বলুন, 'আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না এবং আমি কৃত্রিমতাশ্রয়ীদের অন্তর্ভুক্ত নই" [বুখারী: ৪৭৭৪; মুসলিম: ২৭৯৮]

(২) অর্থাৎ এ কুরআন সৃষ্টিকুলের জন্য উপদেশ মাত্র । এটা জিন ও ইনসানকে তা স্মরণ করিয়ে দেয় যা তাদের দুনিয়া ও আখেরাতে কাজে আসে । [মুয়াসসার]

৮৮. আর এর সংবাদ তোমরা অবশ্যই জানবে, কিছুদিন পরে[১]।

وَلَتَعۡلَمُنَّ نَبَاَهٗ بَعۡدَ حِيۡنٍ ۝٨٨

(১) অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যারা জীবিত থাকবে তারা কয়েক বছরের মধ্যে স্বচক্ষে দেখে নেবে আমি যা বলছি তা সঠিক প্রমাণিত হবেই । আর যারা মরে যাবে তারা মৃত্যুর দুয়ার অতিক্রম করার পরপরই জানতে পারবে, আমি যা কিছু বলছি তা-ই প্রকৃত সত্য । [দেখুন, তাবারী, ইবন কাসীর]

৩৯- সূরা আয-যুমার
৭৫ আয়াত, মক্কী

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ①

১. এ কিতাব পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র কাছ থেকে নাযিল হওয়া।

إِنَّآ أَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ②

২. নিশ্চয় আমরা আপনার কাছে এ কিতাব সত্যসহ নাযিল করেছি। কাজেই আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত করুন তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে।

أَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ ۚ وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ أَوْلِيَآءَ ۘ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَآ إِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى ۗ إِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيْ مَا هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۗ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ كٰذِبٌ كَفَّارٌ ③

৩. জেনে রাখুন, অবিমিশ্র আনুগত্য আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য। আর যারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্যদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তারা বলে, 'আমরা তো এদের ইবাদত এ জন্যে করি যে, এরা আমাদেরকে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে এনে দেবে[১]।' তারা যে

(১) মক্কার কাফের-মুশরিকরা অনুরূপ দুনিয়ার সব মুশরিকও একথাই বলে থাকে যে, আমরা স্রষ্টা মনে করে অন্যসব সত্তার ইবাদাত করি না। আমরা তো আল্লাহকেই প্রকৃত স্রষ্টা বলে মানি এবং সত্যিকার উপাস্য তাকেই মনে করি। যেহেতু তাঁর দরবার অনেক উঁচু। আমরা সেখানে কি করে পৌঁছতে পারি? তাই এসব বুজুর্গ সত্তাদেরকে আমরা মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করি যাতে তারা আমাদের প্রার্থনা ও আবেদন-নিবেদন আল্লাহর কাছে পৌঁছিয়ে দেন। অথচ তারা জানত যে, এসব মূর্তি তাদেরই হাতের তৈরি। এদের কোন বুদ্ধি-জ্ঞান, চেতনা-চৈতন্য, ও শক্তি-বল কিছুই নেই। তারা আল্লাহ তা'আলার দরবারকে দুনিয়ার রাজা-বাদশাহদের দরবারের মতই ধারণা করে নিয়েছিল। রাজ দরবারের নৈকট্যশীল ব্যক্তি কারও প্রতি প্রসন্ন হলে রাজার কাছে সুপারিশ করে তাকেও রাজার নৈকট্যশীল করে দিতে পারে। তারা মনে করত, ফেরেশতাগণও রাজকীয় সভাসদবর্গের ন্যায় যে কারও জন্যে সুপারিশ করতে পারে। কিন্তু তাদের এসব ধারণা শয়তানী, বিভ্রান্তি ও ভিত্তিহীন কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রথমতঃ এসব মূর্তি-বিগ্রহ ফেরেশতাগণের আকৃতির অনুরূপ নয়। হলেও আল্লাহর নৈকট্যশীল ফেরেশতাগণ নিজেদের পূজা-অর্চনায় কিছুতেই সন্তুষ্ট হতে পারে না। আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয় এমন যে কোন বিষয়কে তারা স্বভাবগতভাবে ঘৃণা করে।

বিষয়ে নিজেদের মধ্যে মতভেদ করছে নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের মধ্যে সে ব্যাপারে ফয়সালা করে দেবেন। যে মিথ্যাবাদী ও কাফির, নিশ্চয় আল্লাহ্ তাকে হিদায়াত দেন না।

لَوْ أَرَادَ اللّٰهُ أَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفٰى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ سُبْحٰنَهٗ هُوَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٤﴾

৪. আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করতে চাইলে তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যাকে ইচ্ছে বেছে নিতেন। পবিত্র ও মহান তিনি! তিনি আল্লাহ্, এক, প্রবল প্রতাপশালী।

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ

৫. তিনি যথাযথভাবে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। তিনি রাত দ্বারা দিনকে আচ্ছাদিত করেন এবং রাতকে

এতদ্ব্যতীত তারা আল্লাহর দরবারে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কোন সুপারিশ করতে পারে না, যে পর্যন্ত না তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা কোন বিশেষ ব্যক্তির ব্যাপারে সুপারিশ করার অনুমতি দেন। সুতরাং তারা একদিকে আল্লাহ্র বান্দাদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছে, অপরদিকে আল্লাহ্ সম্পর্কে খারাপ ধারণা করছে। তারা আল্লাহ্কে অত্যাচারী জালেম বাদশাদের মত মনে করছে, অথচ আল্লাহ্ সবার ডাকেই সাড়া দেন। তাঁর কাছে কারও অভাব গোপন নাই যে তাকে মাধ্যম ধরে জানাতে হবে। তাছাড়া তারা এ সমস্ত উপাস্যদের ব্যাপারেও সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত। কোন কোন সত্তা আল্লাহর কাছে পৌঁছার মাধ্যম সে ব্যাপারে দুনিয়ার মুশরিকরা কখনো একমত হতে পারেনি। কেউ একজন মহাপুরুষকে মানলে আরেকজন অপর একজনকে মানছে। কেননা, কেবল তাওহীদের ব্যাপারেই ঐক্যমত হওয়া সম্ভব। শির্কের ব্যাপারে কোন প্রকার ঐক্যমত হতে পারে না। এর কারণ হচ্ছে, ভিন্ন ভিন্ন এসব মহাপুরুষ সম্পর্কে তাদের এই ধারণা কোন জ্ঞানের ভিত্তিতে গড়ে উঠেনি কিংবা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের কাছে এমন কোন তালিকাও আসেনি যাতে বলা হয়েছে, অমুক ও অমুক ব্যক্তি আমার বিশেষ নৈকট্যপ্রাপ্ত সুতরাং আমাকে পেতে হলে তাদেরকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করো। এটা বরং এমন এক আকীদা যা কেবল কুসংস্কার ও অন্ধভক্তি এবং পুরনো দিনের লোকদেরকে অযৌক্তিক এবং অন্ধ অনুসরণের কারণে মানুষের মধ্যে বিস্তার লাভ করেছে। তাই এ ক্ষেত্রে মতের বিভিন্নতা অবশ্যম্ভাবী। [দেখুন, তাবারী; সা'দী; মাকরিযী , তাজরীদুত তাওহীদিল মুফীদ; ইবন তাইমিয়্যাহ, আল-ওয়াসিতা বাইনাল হাক্কি ওয়াল খালক, ১৫-১৮; ইবনুল কাইয়্যেম, ইগাসাতুল লাহফান, ৩৩৯-৩৪৪; আরও দেখুন, আশ-শির্ক ফিল কাদীম ওয়াল হাদীস, ১১৯৯-১২১১]

وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ۝٥

আচ্ছাদিত করেন দিন দ্বারা(১)। সূর্য ও চাঁদকে তিনি করেছেন নিয়মাধীন। প্রত্যেকেই পরিক্রমণ করে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। জেনে রাখ, তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।

خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ۚ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ ۝٦

৬. তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একই ব্যক্তি হতে। তারপর তিনি তার থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন(২)। আর তিনি তোমাদের জন্য নাযিল করেছেন আট জোড়া আন‘আম(৩)। তিনি তোমাদেরকে তোমাদের মাতৃগর্ভের ত্রিবিধ অন্ধকারে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই আল্লাহ্; তোমাদের রব; সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁরই; তিনি ছাড়া কোন সত্য ইলাহ্ নেই। অতঃপর তোমাদেরকে কোথায় ফিরানো হচ্ছে?

إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ ۖ وَلَا يَرْضَىٰ

৭. যদি তোমরা কুফরী কর তবে (জেনে রাখ) আল্লাহ্ তোমাদের মুখাপেক্ষী

(১) تكوير অর্থ এক বস্তুকে অপর বস্তুর উপর রেখে তাকে আচ্ছাদিত করে দেয়া। কুরআন পাক দিবারাত্রির পরিবর্তনকে এখানে সাধারণের জন্য تكوير শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছে। রাত্রি আগমন করলে যেন দিনের আলোর উপর পর্দা রেখে দেয়া হয় এবং দিনের আগমনে রাত্রির অন্ধকার যেন যবনিকার অন্তরালে চলে যায়। [তাবারী]

(২) একথার অর্থ এ নয় যে, প্রথমে আদম থেকে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং পরে তার স্ত্রী হাওয়াকে সৃষ্টি করেছেন। এখানে বক্তব্যের মধ্যে সময়ের পরম্পরার প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে বর্ণনার পরম্পরার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। প্রত্যেক ভাষায়ই এ ধরনের দৃষ্টান্ত বর্তমান। যেমন, আমরা বলি তুমি আজ যা করেছো তা জানি এবং গতকাল যা করেছো তাও আমার জানা আছে। এ ধরনের বর্ণনার অর্থ এ নয় যে, গতকালের ঘটনা আজকের পরে সংঘটিত হয়েছে। [দেখুন, তাবারী]

(৩) আল-আন‘আম বলতে গবাদি পশু বুঝানো হয়েছে। বলা হয়েছে যে আট জোড়া, কারণ; গবাদি পশু অর্থ উট, গরু, ভেড়া, বকরী। এ চারটি নর ও চারটি মাদি মিলে মোট আটটি নর ও মাদি হয়। [তাবারী,কুরতুবী]

لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ۚ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ⑦

নন[১]। আর তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য কুফরী পছন্দ করেন না। এবং যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও তবে তিনি তোমাদের জন্য তা-ই পছন্দ করেন। আর কোন বোঝা বহনকারী অপরের বোঝা বহন করবে না। তারপর তোমাদের রবের কাছেই তোমাদের ফিরে যাওয়া। তখন তোমরা যা আমল করতে তা তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন। নিশ্চয় অন্তরে যা আছে তিনি তা সম্যক অবগত।

وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ۖ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ⑧

৮. আর মানুষকে যখন দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন সে একাগ্রচিত্তে তার রবকে ডাকে। তারপর যখন তিনি নিজের পক্ষ থেকে তার প্রতি অনুগ্রহ করেন তখন সে ভুলে যায় তার আগে যার জন্য সে ডেকেছিল তাঁকে এবং সে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ দাঁড় করায়, অন্যকে তাঁর পথ থেকে বিভ্রান্ত করার জন্য। বলুন, ‘কুফরীর জীবন তুমি কিছুকাল উপভোগ করে নাও। নিশ্চয় তুমি আগুনের অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত।’

---

(১) অর্থাৎ তোমাদের কুফরীর কারণে তাঁর প্রভুত্বের সামান্যতম ক্ষতিও হতে পারে না। তোমাদের ঈমান দ্বারাও আল্লাহর কোন উপকার হয় না তোমরা মানলেও তিনি আল্লাহ, না মানলেও তিনি আল্লাহ আছেন এবং থাকবেন। তাঁর নিজের ক্ষমতায় তাঁর কর্তৃত্ব চলছে। তোমাদের মানা বা না মানাতে কিছু আসে যায় না। হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, ‘আল্লাহ বলেন, হে আমার বান্দারা, যদি তোমরা আগের ও পরের সমস্ত মানুষ ও জিন তোমাদের মধ্যকার কোন সর্বাধিক পাপিষ্ঠ ব্যক্তির মত হয়ে যাও তাতেও আমার বাদশাহীর কোন ক্ষতি হবে না।’ [মুসলিম:২৫৭৭]

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ⑨

৯. যে ব্যক্তি রাতের বিভিন্ন প্রহরে(১) সিজ্‌দাবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে, আখিরাতকে ভয় করে(২) এবং তার রবের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে, (সে কি তার সমান, যে তা করে না?) বলুন, 'যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান?' বোধশক্তি সম্পন্ন লোকেরাই শুধু উপদেশ গ্রহণ করে।

দ্বিতীয় রুকূ'

قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ ۗ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ⑩

১০. বলুন, 'হে আমার মুমিন বান্দাগণ! তোমরা তোমাদের রবের তাকওয়া অবলম্বন কর। যারা এ দুনিয়াতে কল্যাণকর কাজ করে তাদের জন্য আছে কল্যাণ। আর আল্লাহ্‌র যমীন প্রশস্ত(৩), ধৈর্যশীলদেরকেই তো তাদের পুরস্কার পূর্ণরূপে দেয়া হবে

---

(১) ﴿آنَاءَ اللَّيْلِ﴾ এর অর্থ রাত্রির প্রহরসমূহ। অর্থাৎ রাত্রির শুরুভাগ, মধ্যবর্তী ও শেষাংশ। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন: যে ব্যক্তি হাশরের ময়দানে সহজ হিসাব কামনা করে, তার উচিত হবে আল্লাহ যেন তাকে রাত্রির অন্ধকারে সেজদারত ও দাঁড়ানো অবস্থায় পান। তার মধ্যে আখেরাতের চিন্তা এবং রহমতের প্রত্যাশাও থাকা দরকার। কেউ কেউ মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়কেও آناء الليل বলেছেন।[ইবন কাসীর, তাবারী]

(২) তবে মৃত্যুর সময় আশাকে প্রাধান্য দিতে হবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যাক্তির মৃত্যুর সময় তার কাছে প্রবেশ করে বললেন, তোমার কেমন লাগছে? লোকটি বলল, আমি আশা করছি এবং ভয়ও পাচ্ছি। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ দুটি বস্তু অর্থাৎ আশা এবং ভয় যে অন্তরে এ সময় একত্রিত হবে আল্লাহ্ তাকে তার আশার বিষয়টি দিবেন এবং ভয়ের বিষয়টি থেকে দূরে রাখবেন।[তিরমিযী: ৯৮৩]

(৩) মুজাহিদ বলেন, আল্লাহ্‌র যমীন যেহেতু প্রশস্ত সুতরাং তোমরা তাতে হিজরত কর, জিহাদ কর এবং মূর্তি থেকে দূরে থাক। আতা বলেন, আল্লাহ্‌র যমীন প্রশস্ত সুতরাং তোমাদেরকে গুনাহর দিকে ডাকা হয় তবে সেখান থেকে চলে যেও।[ইবন কাসীর]

বিনা হিসেবে[১] ।'

قُلْ إِنِّيٓ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿١١﴾

১১. বলুন, 'আমি তো আদেশপ্রাপ্ত হয়েছি, আল্লাহ্‌র আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে তাঁর 'ইবাদাত করতে;

وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿١٢﴾

১২. 'আরও আদেশপ্রাপ্ত হয়েছি, আমি যেন প্রথম মুসলিম হই ।'

قُلْ إِنِّيٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٣﴾

১৩. বলুন, 'আমি যদি আমার রবের অবাধ্য হই, তবে আমি ভয় করি মহাদিনের শাস্তির ।'

قُلِ ٱللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُۥ دِينِي ﴿١٤﴾

১৪. বলুন, 'আমি 'ইবাদাত করি আল্লাহ্‌রই তাঁর প্রতি আমার আনুগত্যকে একনিষ্ঠ রেখে ।

فَٱعْبُدُوا۟ مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِۦ ۗ قُلْ إِنَّ ٱلْخَٰسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴿١٥﴾

১৫. 'অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যার ইচ্ছে তার 'ইবাদাত কর ।' বলুন, 'ক্ষতিগ্রস্ত তারাই যারা কিয়ামতের দিন নিজেদের ও নিজেদের পরিজনবর্গের ক্ষতিসাধন করে[২] । জেনে রাখ, এটাই

---

(১) অর্থ সবরকারীদের সওয়াব কোন নির্ধারিত পরিমাণে নয়- অপরিসীম ও অগণিত দেয়া হবে । কেউ কেউ এর অর্থ বর্ণনা করেছেন যে, দুনিয়াতে কারও কারও কোন প্রাপ্য থাকলে তাকে নিজের প্রাপ্য দাবী করে আদায় করতে হয় । কিন্তু আল্লাহর কাছে দাবী ব্যতিরেকেই সবরকারীরা তাদের সওয়াব পাবে । ইমাম মালেক রাহেমাহুল্লাহ এ আয়াতে صَابِرِيْنَ এর অর্থ নিয়েছেন, যারা দুনিয়াতে বিপদাপদ ও দু:খ-কষ্টে সবর করে । কেউ কেউ বলেন, যারা পাপকাজ থেকে সংযম অবলম্বন করে, আয়াতে তাদেরকে صابر বলা হয়েছে । কুরতুবী বলেন صَابِرُوْنَ শব্দকে অন্য কোন শব্দের সাথে সংযুক্ত না করে ব্যবহার করলে তার অর্থ হয় পাপকাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখার কষ্ট সহ্যকারী । পক্ষান্তরে বিপদাপদে সবরকারী অর্থে ব্যবহার করা হলে তার সাথে সে বিপদও সংযুক্ত হয়ে উল্লেখিত হয় । তবে সত্যনিষ্ঠ একদল মুফাফসিরের মতে এখানে صابر বলে সাওম পালনকারীদের বোঝানো হয়েছে ।[দেখুন, কুরতুবী, তাবারী]

(২) কারণ তারা এবং তাদের পরিবারের মধ্যে স্থায়ী বিচ্ছেদ হয়ে গেছে । এরা আর কোন

সুস্পষ্ট ক্ষতি ।’

১৬. তাদের জন্য থাকবে তাদের উপরের দিকে আগুনের আচ্ছাদন এবং নিচের দিকেও আচ্ছাদন। এ দ্বারা আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদেরকে সতর্ক করেন। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা আমারই তাকওয়া অবলম্বন কর ।

لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذٰلِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهٖ عِبَادَهٗ يٰعِبَادِ فَاتَّقُوْنِ ﴿١٦﴾

১৭. আর যারা তাগূতের ইবাদাত থেকে দূরে থাকে এবং আল্লাহ্র অভিমুখী হয় তাদের জন্য আছে সুসংবাদ। অতএব সুসংবাদ দিন আমার বান্দাদেরকে---

وَالَّذِيْنَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوْتَ اَنْ يَّعْبُدُوْهَا وَاَنَابُوْۤا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرٰى فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿١٧﴾

১৮. যারা মনোযোগের সাথে কথা শোনে এবং তার মধ্যে যা উত্তম তা অনুসরণ করে। তাদেরকেই আল্লাহ্ হিদায়াত দান করেছেন আর তারাই বোধশক্তি সম্পন্ন ।

الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدٰىهُمُ اللّٰهُ وَاُولٰٓئِكَ هُمْ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿١٨﴾

১৯. যার উপর শাস্তির আদেশ অবধারিত হয়েছে; আপনি কি রক্ষা করতে পারবেন সে ব্যক্তিকে, যে আগুনে (জাহান্নামে) আছে?

اَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ اَفَاَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِى النَّارِ ﴿١٩﴾

২০. তবে যারা তাদের রবের তাকওয়া অবলম্বন করে, তাদের জন্য আছে বহু প্রাসাদ যার উপর নির্মিত আরো প্রাসাদ[১], যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত;

لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَعْدَ اللّٰهِ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ الْمِيْعَادَ ﴿٢٠﴾

দিন একত্রিত হতে পারবে না। চাই তাদের পরিবার জান্নাতে যাক বা তারা সবাই জাহান্নামে যাক। কোন অবস্থাতেই তাদের আর একসাথে হওয়া ও আনন্দিত হওয়া সম্ভব নয়। [ইবন কাসীর]

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতিরা জান্নাতে উঁচু কামরা সমূহ দেখবে, যেমন দেখা যায় আকাশের প্রান্তদেশে উজ্জ্বল তারকা। [বুখারী: ৩২৫৬; মুসলিম: ২৮৩১]

এটা আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি, আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতির বিপরীত করেন না।

২১. আপনি কি দেখেন না, আল্লাহ্ আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন, অতঃপর তা ভূমিতে নির্ঝররূপে প্রবাহিত করেন তারপর তা দ্বারা বিবিধ বর্ণের ফসল উৎপন্ন করেন, তারপর তা শুকিয়ে যায়। ফলে আপনি তা হলুদ বর্ণ দেখতে পান, অবশেষে তিনি সেটাকে খড়-কুটোয় পরিণত করেন? এতে অবশ্যই উপদেশ রয়েছে বোধশক্তিসম্পন্নদের জন্য।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿٢١﴾

তৃতীয় রুকূ'

২২. আল্লাহ্ ইসলামের জন্য যার বক্ষ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন ফলে সে তার রবের দেয়া নূরের উপর রয়েছে, সে কি তার সমান যে এরূপ নয়? অতএব দুর্ভোগ সে কঠোর হৃদয় ব্যক্তিদের জন্য, যারা আল্লাহ্‌র স্মরণ বিমুখ! তারা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে।

أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ ۚ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٢﴾

২৩. আল্লাহ্ নাযিল করেছেন উত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব যা সুসামঞ্জস্য[১] এবং যা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা হয়। এতে,

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ

(১) মুজাহিদ বলেন, পুরো কুরআনই সামঞ্জস্যপূর্ণ পুনঃ পুনঃ পঠিত। কাতাদাহ বলেন, এক আয়াত অন্য আয়াতের মত। দাহহাক বলেন, কুরআনে কোন কথাকে বারবার বলা হয়েছে যাতে করে তাদের রবের কথা বুঝা সহজ হয়। হাসান বসরী বলেন, কোন সুরায় একটি আয়াত আসলে অন্য সুরায় অনুরূপ আয়াত পাওয়া যায়। আব্দুর রহমান ইবন যায়েদ ইবন আসলাম বলেন, বারবার নিয়ে আসা হয়েছে যেমন মুসাকে কুরআনে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে, অনুরূপ সালেহ, হূদ ও অন্যান্য নবীদেরকেও। [ইবন কাসীর] কাতাদা বলেন, এখানে ফরয বিষয়াদি, বিচারিক বিষয়াদি ও শরী'আত নির্ধারিত সীমারেখার কথা বারবার এসেছে। [তাবারী]

تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ إِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ﴿٢٣﴾

যারা তাদের রবকে ভয় করে, তাদের শরীর শিউরে ওঠে, তারপর তাদের দেহমন বিনম্র হয়ে আল্লাহ্‌র স্মরণে ঝুঁকে পড়ে। এটাই আল্লাহ্‌র হিদায়াত, তিনি তা দ্বারা যাকে ইচ্ছে হিদায়াত করেন। আল্লাহ্ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার কোন হেদায়াতকারী নেই।

أَفَمَنْ يَّتَّقِيْ بِوَجْهِهٖ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ وَقِيْلَ لِلظّٰلِمِيْنَ ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ﴿٢٤﴾

২৪. যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তার মুখমণ্ডল দ্বারা কঠিন শাস্তি ঠেকাতে চাইবে, (সে কি তার মত যে নিরাপদ?) আর যালিমদেরকে বলা হবে, ‘তোমরা যা অর্জন করতে তা আস্বাদন কর[১]।’

كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتٰىهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٢٥﴾

২৫. তাদের পূর্ববর্তীগণও মিথ্যারোপ করেছিল, ফলে শাস্তি এমনভাবে তাদেরকে গ্রাস করল যে, তারা অনুভবও করতে পারেনি।

فَأَذَاقَهُمُ اللّٰهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ أَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٦﴾

২৬. ফলে আল্লাহ্ তাদেরকে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ভোগ করালেন, আর আখিরাতের শাস্তি তো আরো কঠিন। যদি তারা জানত!

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٧﴾

২৭. আর অবশ্যই আমরা এ কুরআনে মানুষের জন্য সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে,

---

(১) যেমন অন্য আয়াতে এসেছে, “যে ব্যক্তি ঝুঁকে মুখে ভর দিয়ে চলে, সে-ই কি ঠিক পথে চলে, না কি সে ব্যক্তি যে সোজা হয়ে সরল পথে চলে?” [সূরা আল-মুলক: ২২] আরও এসেছে, “যেদিন তাদেরকে উপুড় করে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের দিকে; সেদিন বলা হবে, ‘জাহান্নামের যন্ত্রণা আস্বাদন কর।” [সূরা আল-কামার: ৪৮] আরও এসেছে, “যে অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হবে সে কি শ্রেষ্ঠ, না যে কিয়ামতের দিন নিরাপদে উপস্থিত হবে সে? তোমরা যা ইচ্ছে আমল কর।” [সূরা ফুসসিলাত: ৪০]

২৮. আরবী ভাষায় এ কুরআন বক্রতামুক্ত, যাতে তারা তাকওয়া অবলম্বন করে ।	قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِيْ عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿٢٨﴾
২৯. আল্লাহ্ একটি দৃষ্টান্ত পেশ করছেনঃ এক ব্যক্তির প্রভু অনেক, যারা পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন এবং আরেক ব্যক্তি, যে এক প্রভুর অনুগত; এ দু'জনের অবস্থা কি সমান? সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই; কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না[১] ।	ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيْهِ شُرَكَآءُ مُتَشٰكِسُوْنَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ ۭ هَلْ يَسْتَوِيٰنِ مَثَلًا ۭ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ۭ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٩﴾
৩০. আপনি তো মরণশীল এবং তারাও মরণশীল ।	اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ ﴿٣٠﴾ ۡ
৩১. তারপর কিয়ামতের দিন নিশ্চয় তোমরা তোমাদের রবের সামনে পরস্পর বাক-বিতণ্ডা করবে[২] ।	ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ ﴿٣١﴾ ۧ
৩২. সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা বলে এবং সত্য আসার পর তাতে মিথ্যারোপ করে তার চেয়ে বেশী যালিম আর কে? কাফিরদের আবাসস্থল কি জাহান্নাম নয়?	فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ اِذْ جَآءَهٗ ۭ اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكٰفِرِيْنَ ﴿٣٢﴾

---

(১) মুজাহিদ বলেন, এটা বাতিল ইলাহ ও সত্য ইলাহের জন্য দেয়া উদাহরণ । [তাবারী] অর্থাৎ মুশরিক ও প্রকৃত মুমিন । [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(২) এ আয়াত নাযিল হলে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! দুনিয়াতে আমরা যে ঝগড়া করছি সেটা কি আবার আখেরাতেও হবে? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, তখন যুবাইর বললেন, বিষয়টি তাহলে ভয়াবহ । [তিরমিযী: ৩২৩৬] ইবন উমর বলেন, আমরা এ আয়াত নাযিল হয়েছে জানতাম কিন্তু কেন নাযিল হলো বুঝতে পারিনি । আমরা বলতাম, কার সাথে আমরা ঝগড়া করব? আমাদের মধ্যে এবং আহলে কিতাবদের মধ্যে তো কোন ঝগড়া নেই । অবশেষে যখন মুসলিমদের মাঝে ফেতনা শুরু হলো তখনই বুঝতে পারলাম যে, এটাই আমাদের রবের পক্ষ থেকে যে ঝগড়ার ওয়াদা করা হয়েছিল তা । [আত-তাফসীরুস সহীহ]

وَالَّذِىْ جَآءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهٖٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩৩. আর যে সত্য নিয়ে এসেছে এবং যে তা সত্য বলে মেনেছে তারাই তো মুত্তাকী।

لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ ذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٣٤﴾

৩৪. তাদের জন্য তা-ই থাকবে যা চাইবে তারা তাদের রবের নিকট। এটাই মুহসিনদের পুরস্কার।

لِيُكَفِّرَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَسْوَاَ الَّذِىْ عَمِلُوْا وَيَجْزِيَهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ الَّذِىْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৫. যাতে এরা যেসব মন্দকাজ করেছে আল্লাহ্ তা ক্ষমা করে দেন এবং এদেরকে এদের সর্বোত্তম কাজের জন্য পুরস্কৃত করেন।

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ ۚ وَيُخَوِّفُوْنَكَ بِالَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ﴿٣٦﴾

৩৬. আল্লাহ্ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? অথচ তারা আপনাকে আল্লাহ্র পরিবর্তে অন্যের ভয় দেখায়[১]। আর আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য কোন হেদায়াতকারী নেই।

وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّضِلٍّ ۗ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَزِيْزٍ ذِى انْتِقَامٍ ﴿٣٧﴾

৩৭. আর যাকে আল্লাহ্ হেদায়াত করেন তার জন্য কোন পথভ্রষ্টকারী নেই; আল্লাহ্ কি পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী নন?

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ۗ قُلْ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَنِىَ اللّٰهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كٰشِفٰتُ ضُرِّهٖٓ اَوْ اَرَادَنِىْ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكٰتُ رَحْمَتِهٖ ۗ قُلْ حَسْبِىَ اللّٰهُ ۗ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ﴿٣٨﴾

৩৮. আর আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, আসমানসমূহ ও যমীন কে সৃষ্টি করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ্।' বলুন, 'তোমরা ভেবে দেখেছ কি, আল্লাহ্ আমার অনিষ্ট করতে চাইলে তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা কি সে অনিষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করতে

(১) অর্থাৎ তারা আপনাকে তাদের উপাস্য মা'বুদদের ভয় দেখায়। [তাবারী]

চাইলে তারা কি সে অনুগ্রহকে রোধ করতে পারবে?' বলুন, 'আমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট।' নির্ভরকারীগণ তাঁর উপরই নির্ভর করে।

قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّيْ عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٩﴾

৩৯. বলুন, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা স্ব স্ব অবস্থানে কাজ করতে থাক, নিশ্চয় আমি আমার কাজ করব[১]। অতঃপর শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে[২]---

مَنْ يَّأْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ﴿٤٠﴾

৪০. 'কার উপর আসবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আর আপতিত হবে তার উপর স্থায়ী শাস্তি।'

اِنَّآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ﴿٤١﴾

৪১. নিশ্চয় আমরা আপনার প্রতি সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছি মানুষের জন্য; তারপর যে সৎপথ অবলম্বন করে সে তা করে নিজেরই কল্যাণের জন্য এবং যে বিপথগামী হয় সে তো বিপথগামী হয় নিজেরই ধ্বংসের জন্য, আর আপনি তাদের তত্ত্বাবধায়ক নন[৩]।

পঞ্চম রুকূ'

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِيْ لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَامِهَا ۚ فَيُمْسِكُ الَّتِيْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْاُخْرٰۤى اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ

৪২. আল্লাহ্ই জীবসমূহের প্রাণ হরণ করেন তাদের মৃত্যুর সময় এবং যাদের মৃত্যু আসেনি তাদের প্রাণও নিদ্রার সময়। তারপর তিনি যার জন্য মৃত্যুর সিদ্ধান্ত

(১) মুজাহিদ বলেন, অর্থাৎ আমিও আমার পূর্ববর্তী নবীদের মত করে ধীরে ধীরে কাজ করে যাব। [তাবারী]

(২) অর্থাৎ যখন আল্লাহ্র আযাব আসবে, তখন আমাদের মধ্যে কে হকপথে আছে আর কে বাতিল পথে আছে, কে পথভ্রষ্ট আর কে সঠিক পথে আছে তা তখনই জানা যাবে। [তাবারী]

(৩) অনুরূপ আয়াত দেখুন, সূরা আল-ইসরা: ১৫।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝٤٢

করেন তার প্রাণ তিনি রেখে দেন এবং অন্যগুলো ফিরিয়ে দেন, এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য(১)। নিশ্চয় এতে নিদর্শন

---

(১) توفى এর শাব্দিক অর্থ লওয়া ও করায়ত্ত করা। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, প্রাণীদের প্রাণ সর্বাবস্থায় ও সর্বক্ষণই আল্লাহ্ তা'আলার আয়ত্ত্বাধীন। তিনি যখন ইচ্ছা তা হরণ করতে বা ফিরিয়ে নিতে পারেন। আল্লাহ তা'আলার এ কুদরত প্রত্যেক প্রাণীই প্রত্যহ দেখে ও অনুভব করে। নিদ্রার সময় তার প্রাণ আল্লাহ তা'আলার করায়ত্তে চলে যায় এবং ফিরিয়ে দেয়ার পর জাগ্রত হয়। অবশেষে এমন এক সময় আসবে, যখন তা সম্পূর্ণ করায়ত্ত হয়ে যাবে এবং ফিরে পাওয়া যাবে না। প্রাণ হরণ করা অর্থ তার সম্পর্ক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া। কখনও বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সবদিক দিয়ে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়, এরই নাম মৃত্যু। আবার কখনও শুধু বাহিক্যভাবে বিচ্ছিন্ন করা হয়। আভ্যন্তরীণভাবে যোগাযোগ থাকে। এর ফলে কেবল বাহ্যিকভাবে জীবনের লক্ষণ, চেতনা ও ইচ্ছাভিত্তিক নড়াচড়ার শক্তি বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয় এবং আভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে দেহের সাথে প্রাণের সম্পর্ক বাকী থাকে। ফলে সে শ্বাস গ্রহণ করে ও জীবিত থাকে। আলোচ্য আয়াতে توفى শব্দটি উপরোক্ত উভয় প্রকার প্রাণ হরণের অর্থকেই অন্তর্ভুক্ত করে। এখানে প্রথমে বড় মৃত্যুর কথা পরে ছোট মৃত্যু বা ঘুমের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনের অন্যত্রও দু'ধরনের মৃত্যুর উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ "তিনিই রাতে তোমাদের মৃত্যু ঘটান এবং দিনে তোমরা যা কর তা তিনি জানেন। তারপর দিনে তোমাদেরকে তিনি আবার জীবিত করেন যাতে নির্ধারিত সময় পূর্ণ হয়। তারপর তাঁর দিকেই তোমাদের ফিরে যাওয়া। তারপর তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন।" [সূরা আল-আন'আম:৬০] এখানে প্রথমে ছোট মৃত্যু বা ঘুমের কথা, পরে বড় মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে। [ইবন কাসীর]

মোটকথা: এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানুষকে এ অনুভূতি দিতে চাচ্ছেন যে, জীবন ও মৃত্যু কিভাবে তাঁর অসীম ক্ষমতার করায়ত্ব। শয়নে, জাগরণে, ঘরে অবস্থানের সময় কিংবা কোথাও চলাফেরা করার সময় মানব দেহের আভ্যন্তরীণ কোন ত্রুটি অথবা বাইরের অজানা কোন বিপদ অকস্মাৎ এমন মোড় নিতে পারে যা তার মৃত্যু ঘটাতে পারে। যে মানুষ আল্লাহর হাতে এতটা অসহায় সে যদি সেই আল্লাহ সম্পর্কে এতটা অমনোযোগী ও বিদ্রোহী হয় তাহলে সে কত অজ্ঞ। সে জন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুমাবার আগে এবং ঘুম থেকে উঠে যে দো'আ করতেন তাতে রূহ ফেরত পাওয়ায় আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করতেন। হাদীসে এসেছে, তিনি ঘুমাবার সময় বলতেন: بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوْتُ وَأَحْيَا "হে আল্লাহ! আপনার নামেই আমি মারা যাই এবং জীবিত হই।" আর যখন ঘুম থেকে জাগতেন তখন বলতেন: الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ "সকল

রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের জন্য, যারা চিন্তা করে।

৪৩. তবে কি তারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে সুপারিশকারী ধরেছে? বলুন, 'তারা কোন কিছুর মালিক না হলেও এবং তারা না বুঝলেও?'

أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ ۚ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٤٣﴾

৪৪. বলুন, 'সকল সুপারিশ আল্লাহ্‌রই মালিকানাধীন, আসমানসমূহ ও যমীনের মালিকানা তাঁরই, তারপর তাঁরই কাছে তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তিত করা হবে।'

قُل لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ۖ لَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٤٤﴾

৪৫. আর যখন শুধু এক আল্লাহ্‌র কথা বলা হয় তখন যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না, তাদের অন্তর বিতৃষ্ণায় সংকুচিত হয়। আর আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্য মাবুদগুলোর উল্লেখ করা হলে তখনই তারা আনন্দে উল্লসিত হয়।

وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ۖ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٤٥﴾

৪৬. বলুন, 'হে আল্লাহ্, আসমানসমূহ ও যমীনের স্রষ্টা, গায়েব ও উপস্থিত বিষয়াদির জ্ঞানী, আপনিই আপনার বান্দাদের মধ্যে সে বিষয়ের ফয়সালা করে দিবেন যাতে তারা মতবিরোধ করছে[১]।'

قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٤٦﴾

প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য যিনি আমাদেরকে আমাদের মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করেছেন। আর তাঁর কাছেই আমরা উত্থিত হবো।" [বুখারী: ৬৩১২]

(১) আব্দুর রহমান ইব্‌ন আওফ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, আমি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহাকে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহাজ্জদের সালাত কি দ্বারা শুরু করতেন? তিনি বললেন, তিনি যখন তাহাজ্জদের জন্যে উঠতেন, তখন এ দো'আ পাঠ করতেন: اللّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَإِسْرَافِيْلَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ، اهْدِنِيْ لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الحَقِّ بِإِذْنِكَ؛

وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِن سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴿٤٧﴾

৪৭. আর যারা যুলুম করেছে, যদি যমীনে যা আছে তা সম্পূর্ণ এবং তার সাথে এর সমপরিমাণও তাদের হয়, তবে কিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তি হতে মুক্তিপণস্বরূপ তার সবটুকুই তারা দিয়ে দেবে এবং তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এমন কিছু প্রকাশিত হবে যা তারা ধারণাও করেনি।

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٤٨﴾

৪৮. আর তারা যা অর্জন করেছিল তার মন্দ ফল তাদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত তা তাদেরকে পরিবেষ্টন করবে।

فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ ۚ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٩﴾

৪৯. অতঃপর যখন কোন বিপদ-আপদ মানুষকে স্পর্শ করে, তখন সে আমাদেরকে ডাকে; তারপর যখন তাকে আমরা আমাদের কোন নিয়ামতের অধিকারী করি তখন সে বলে, 'আমাকে এটা দেয়া হয়েছে কেবল আমার জ্ঞানের কারণে।' বরং এটা এক পরীক্ষা, কিন্তু তাদের বেশীর ভাগই তা জানে না।

قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٥٠﴾

৫০. অবশ্যই তাদের পূর্ববর্তীরা এটা বলত, কিন্তু তারা যা অর্জন করেছে তা তাদের কোন কাজে আসেনি।

إِنَّكَ تَهْدِيْ مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ হে আল্লাহ্‌! জিবরীল, মীকাইল ও ইসরাফীলের প্রভু, আসমানসমূহ ও যমীনের প্রভু, গায়েব ও প্রত্যক্ষ সবকিছুর জ্ঞানী, আপনিই আপনার বান্দারা যে সব বিষয়ে মতবিরোধ করছে তাতে ফয়সালা করবেন। যে ব্যাপারে মতবিরোধ করা হয়েছে তাতে আপনার অনুমতিক্রমে আমাকে সত্য-সঠিক পথ দিন। নিশ্চয় আপনি যাকে ইচ্ছা তাকে সরল সোজা পথের হেদায়েত করেন। [মুসলিম: ৭৭০]

৫১. সুতরাং তাদের কৃতকর্মের মন্দ ফল তাদের উপর আপতিত হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা যুলুম করে তাদের উপরও শীঘ্রই আপতিত হবে তারা যা অর্জন করেছে তার মন্দ ফল এবং তারা অপারগ করতে পারবে না।

فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا ۚ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَٰؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٥١﴾

৫২. তারা কি জানে না, আল্লাহ্ যার জন্য ইচ্ছে রিযিক প্রশস্ত করেন, আর সীমিত করেন? নিশ্চয় এতে নিদর্শনাবলী রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের জন্য, যারা ঈমান আনে।

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾

ষষ্ঠ রুকূ'

৫৩. বলুন, 'হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ---আল্লাহ্র অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়ো না; নিশ্চয় আল্লাহ্ সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু(১)।'

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥٣﴾

৫৪. আর তোমরা তোমাদের রবের অভিমুখী হও এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ কর তোমাদের কাছে শাস্তি আসার আগে; তার পরে তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে না।

وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ﴿٥٤﴾

---

(১) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, কিছু লোক ছিল, যারা অন্যায় হত্যা করেছিল এবং অনেক করেছিল। আরও কিছু লোক ছিল, যারা ব্যভিচার করেছিল এবং অনেক করেছিল। তারা এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে আরজ করল: আপনি যে ধর্মের দাওয়াত দেন, তা তো খুবই উত্তম, কিন্তু চিন্তার বিষয় হল এই যে, আমরা অনেক জঘন্য গোনাহ করে ফেলেছি। আমরা যদি ইসলাম গ্রহণ করি, তবে আমাদের তওবা কবুল হবে কি? এর পরিপ্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। [বুখারী: ৪৮১০, মুসলিম: ১২২]

وَاتَّبِعُوٓا اَحۡسَنَ مَاۤ اُنۡزِلَ اِلَیۡکُمۡ مِّنۡ رَّبِّکُمۡ مِّنۡ قَبۡلِ اَنۡ یَّاۡتِیَکُمُ الۡعَذَابُ بَغۡتَۃً وَّ اَنۡتُمۡ لَا تَشۡعُرُوۡنَ ﴿۵۵﴾

৫৫. আর তোমরা তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের কাছ থেকে উত্তম যা নাযিল করা হয়েছে তার অনুসরণ কর[১], তোমাদের উপর অতর্কিতভাবে শাস্তি আসার আগে, অথচ তোমরা উপলব্ধিও করতে পারবে না।

اَنۡ تَقُوۡلَ نَفۡسٌ یّٰحَسۡرَتٰی عَلٰی مَا فَرَّطۡتُّ فِیۡ جَنۡۢبِ اللّٰہِ وَ اِنۡ کُنۡتُ لَمِنَ السّٰخِرِیۡنَ ﴿۵۶﴾

৫৬. যাতে কাউকেও বলতে না হয়, 'হায় আফসোস! আল্লাহ্‌র প্রতি আমার কর্তব্যে আমি যে শৈথিল্য করেছি তার জন্য[২]! আর আমি তো ঠাট্টাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।'

اَوۡ تَقُوۡلَ لَوۡ اَنَّ اللّٰہَ ہَدٰىنِیۡ لَکُنۡتُ مِنَ الۡمُتَّقِیۡنَ ﴿۵۷﴾

৫৭. অথবা কেউ যেন না বলে, 'হায়! আল্লাহ্ আমাকে হিদায়াত করলে আমি তো অবশ্যই মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত

(১) এখানে উত্তম অবতীর্ণ বিষয়' বলে কুরআনকে বোঝানো হয়েছে। সমগ্র কুরআনই উত্তম। একে এদিক দিয়েও উত্তম বলা যায় যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তওরাত, ইঞ্জীল, যবুর ইত্যাদি যত কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে, তন্মধ্যে উত্তম ও পূর্ণতম কিতাব হচ্ছে কুরআন। অথবা, আল্লাহর কিতাবের সর্বোত্তম দিকসমূহ অনুসরণ করার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা যেসব কাজের নির্দেশ দিয়েছেন মানুষ তা পালন করবে। তিনি যেসব কাজ করতে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকবে এবং উপমা ও কিস্‌সা-কাহিনীতে যা বলেছেন তা থেকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করবে। অপরদিকে যে ব্যক্তি তাঁর নির্দেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, নিষিদ্ধ কাজসমূহ করে এবং আল্লাহর উপদেশ বাণীর কানা কড়িও মূল্য দেয় না, সে আল্লাহর কিতাবের এমন দিক গ্রহণ করে যাকে আল্লাহর কিতাব নিকৃষ্টতম দিক বলে আখ্যায়িত করে। [মুয়াসসার]

(২) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'প্রত্যেক জাহান্নামবাসীকেই জান্নাতে তার যে স্থানটি ছিল তা দেখানো হবে, তখন সে বলবে, হায় যদি আল্লাহ্ আমাকে হিদায়াত করত ফলে তা তার জন্য আফসোসের কারণ হবে। আর প্রত্যেক জান্নাতবাসীকেই জাহান্নামে তার যে স্থানটি ছিল তা দেখানো হবে; তখন সে বলবে, হায় যদি আল্লাহ্ আমাকে হিদায়াত না করত তবে আমার কি হতো! ফলে সেটা তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হিসেবে দেখা দিবে। তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন।' [মুস্তাদরাকে হাকিম:২/৪৩৫]

হতাম ।’

৫৮. অথবা শাস্তি দেখতে পেলে যেন কাউকেও বলতে না হয়, ‘হায়! যদি একবার আমি ফিরে যেতে পারতাম তবে আমি মুহসিনদের অন্তর্ভুক্ত হতাম!’

اَوْ تَقُوْلَ حِيْنَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ اَنَّ لِيْ كَرَّةً فَاَكُوْنَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٥٨﴾

৫৯. হ্যাঁ, অবশ্যই আমার নিদর্শন তোমার কাছে এসেছিল, কিন্তু তুমি এগুলোতে মিথ্যারোপ করেছিলে এবং অহংকার করেছিলে; আর তুমি ছিলে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত ।

بَلٰى قَدْ جَآءَتْكَ اٰيٰتِيْ فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٥٩﴾

৬০. আর যারা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, আপনি কিয়ামতের দিন তাদের চেহারাসমূহ কালো দেখবেন । অহংকারীদের আবাসস্থল কি জাহান্নাম নয়?

وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ تَرَى الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلَى اللّٰهِ وُجُوْهُهُمْ مُّسْوَدَّةٌ ؕ اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿٦٠﴾

৬১. আর যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে, আল্লাহ্ তাদেরকে উদ্ধার করবেন তাদের সাফল্যসহ; তাদেরকে অমঙ্গল স্পর্শ করবে না এবং তারা চিন্তিতও হবে না ।

وَيُنَجِّى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ ۫ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوْٓءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٦١﴾

৬২. আল্লাহ্ সব কিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সমস্ত কিছুর তত্ত্বাবধায়ক ।

اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۫ وَّهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ﴿٦٢﴾

৬৩. আসমানসমূহ ও যমীনের চাবিসমূহ তাঁরই কাছে[১] । আর যারা আল্লাহ্‌র

لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا

(১) চাবি কারও হাতে থাকা তার মালিক ও নিয়ন্ত্রক হওয়ার লক্ষণ । তাই আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায় এই যে, আকাশে ও পৃথিবীতে লুকায়িত সকল ভাণ্ডারের চাবি আল্লাহর হাতে । তিনিই এগুলোর রক্ষক, তিনিই নিয়ন্ত্রক, যখন ইচ্ছা যাকে ইচ্ছা যে পরিমাণ ইচ্ছা দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা দান করবেন আর যাকে ইচ্ছা দান করেন না ।[মুয়াসসার, তাবারী]

بِاٰيٰتِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٦٣﴾

আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

সপ্তম রুকূ'

قُلْ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَاْمُرُوْٓنِّيْٓ اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجٰهِلُوْنَ ﴿٦٤﴾

৬৪. বলুন, 'হে অজ্ঞরা! তোমরা কি আমাকে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের 'ইবাদাত করতে নির্দেশ দিচ্ছ?'

وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٦٥﴾

৬৫. আর আপনার প্রতি ও আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই ওহী করা হয়েছে যে, 'যদি আপনি শির্ক করেন তবে আপনার সমস্ত আমল তো নিষ্ফল হবে এবং অবশ্যই আপনি হবেন ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।

بَلِ اللّٰهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿٦٦﴾

৬৬. 'বরং আপনি আল্লাহ্‌রই 'ইবাদাত করুন এবং কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হোন।'

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ۖ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌۢ بِيَمِيْنِهٖ ۚ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٧﴾

৬৭. আর তারা আল্লাহ্‌কে যথোচিত সম্মান করেনি অথচ কিয়ামতের দিন সমস্ত যমীন থাকবে তাঁর হাতের মুঠিতে এবং আসমানসমূহ থাকবে ভাঁজ করা অবস্থায় তাঁর ডান হাতে[১]। পবিত্র ও

(১) কেয়ামতের দিন পৃথিবী আল্লাহর মুঠোতে থাকবে এবং আকাশ ভাঁজ করা অবস্থায় তার ডান হাতে থাকবে। আলেমগণের মতে আক্ষরিক অর্থেই এমনটি হবে। যার স্বরূপ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। এ আয়াতের ভাষ্য থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার 'মুঠি' ও 'ডান হাত' আছে। এ দু'টি আল্লাহর অন্যান্য গুণাগুণের মতই দু'টি গুণ। এগুলোতে বিশ্বাস করতে হবে। এগুলোর অর্থ সাব্যস্ত করতে হবে। কিন্তু পরিচিত কোন অবয়ব দেয়া যাবে না। একথা মানতে হবে যে, আল্লাহর সত্ত্বা যেমন আমরা না দেখে সাব্যস্ত করছি তেমনিভাবে তার গুণও নাদেখে সাব্যস্ত করব। যমীন আল্লাহ তা'আলার হাতের মুঠিতে থাকা এবং আসমান ডান হাতে পেঁচানো থাকার মাধ্যমে মহান আল্লাহ্‌র সঠিক মর্যাদা, বড়ত্ব ও সম্মান সম্পর্কে মানুষকে কিছুটা ধারণা দেয়া হয়েছে। কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষ (যারা আজ আল্লাহর বড়ত্ব ও মহত্বের

মহান তিনি, তারা যাদেরকে শরীক করে তিনি তাদের ঊর্ধ্বে।

৬৮. আর শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে[১], ফলে

وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ

অনুমান করতেও অক্ষম) নিজ চোখে দেখতে পাবে যমীন ও আসমান আল্লাহর হাতে একটা নগণ্যতম বল ও ছোট একটি রুমালের মত। হাদীসে এসেছে, একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বরে উঠে খুতবা দিচ্ছিলেন। খুতবা দানের সময় তিনি এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন এবং বললেনঃ আল্লাহ তা'আলা আসমান ও যমীনকে (অর্থাৎ গ্রহসমূহকে) তাঁর মুষ্ঠির মধ্যে নিয়ে এমনভাবে ঘুরাবেন যেমন শিশুরা বল ঘুরিয়ে থাকে। এবং বলবেনঃ আমি একমাত্র আল্লাহ্। আমি বাদশাহ। আমি সর্বশক্তিমান। আমি বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের মালিক। কোথায় পৃথিবীর বাদশাহ? কোথায় শক্তিমানরা? কোথায় অহংকারীরা? এভাবে বলতে বলতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমনভাবে কাঁপতে থাকলেন যে, তিনি মিম্বারসহ পড়ে না যান আমাদের সে ভয় হতে লাগলো। [মুসলিম:২৭৮৮] অপর হাদীসে এসেছে, ইয়াহূদী এক আলেম এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন: হে মুহাম্মাদ! আমরা আমাদের কিতাবে পাই যে, আল্লাহ্ তা'আলা আসমানসমূহকে এক আঙ্গুলে রাখবেন, যমীনসমূহকে অপর আঙ্গুলে রাখবেন, গাছ-গাছালীকে এক আঙ্গুলে রাখবেন, পানি ও মাটিকে এক আঙ্গুলে রাখবেন আর সমস্ত সৃষ্টিকে অপর আঙ্গুলে রাখবেন, তারপর বলবেন: আমিই বাদশাহ্! তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই ইয়াহূদী আলেমের বক্তব্যের সমর্থনে এমনভাবে হাসলেন যে, তার মাড়ির দাঁত পর্যন্ত দেখা গিয়েছিল। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন।[বুখারী: ৪৮১১] অন্য এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: আল্লাহ্ তা'আলা যমীনকে মুষ্ঠিবদ্ধ করবেন আর আসমানসমূহকে ডানহাতে গুটিয়ে রাখবেন তারপর বলবেন: আমিই বাদশাহ্! কোথায় দুনিয়ার বাদশাহ্রা? [বুখারী: ৪৮১২, মুসলিম: ২৭৮১] অপর এক হাদীসে এসেছে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন: আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! "কিয়ামতের দিন সমস্ত যমীন থাকবে তাঁর হাতের মুঠিতে এবং আসমানসমূহ থাকবে ভাঁজ করা অবস্থায় তাঁর ডান হাতে।" সেদিন ঈমানদারগণ কোথায় থাকবে? তিনি বললেন: হে আয়েশা! সিরাতের (পুলসিরাতের) উপরে থাকবে। [তিরমিযী: ৩২৪২]

(১) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কিভাবে আমি শান্তিতে থাকব অথচ শিঙ্গাওয়ালা (ইসরাফীল) শিঙ্গা মুখে পুরে আছে, তার কপাল টান করে আছে এবং কান খাড়া করে আছে, অপেক্ষা করছে কখন তাকে ফুঁক দেয়ার নির্দেশ দেয়া হবে আর সে ফুঁক দিবে। তখন মুসলিমরা বললো, হে আল্লাহ্র রাসূল! তাহলে আমরা কি বলবো? তিনি বললেন, তোমরা বলো, حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ، تَوَكَّلْنَا عَلَى اللهِ رَبِّنَا

فِى الْأَرْضِ اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ ؕ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ ﴿٦٨﴾

আসমানসমূহে যারা আছে ও যমীনে যারা আছে তারা সবাই বেহুশ হয়ে পড়বে, যাদেরকে আল্লাহ্ ইচ্ছে করেন তারা ছাড়া[১]। তারপর আবার শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে[২], ফলে তৎক্ষণাৎ তারা দাঁড়িয়ে তাকাতে থাকবে।

وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتٰبُ وَجِاْۤىءَ بِالنَّبِيّٖنَ وَالشُّهَدَآءِ وَقُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٦٩﴾

৬৯. আর যমীন তার প্রভুর নূরে উদ্ভাসিত হবে এবং আমলনামা পেশ করা হবে। আর নবীগণকে ও সাক্ষীগণকে উপস্থিত করা হবে[৩] এবং সকলের মধ্যে ন্যায়

'আমাদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ঠ; আর তিনি কতইনা উত্তম কর্মবিধায়ক, আমরা আমাদের রব আল্লাহর উপরই তাওয়াক্কুল করছি।' [তিরমিযী:৩২৪৩]

(১) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: শিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার পর প্রথম আমি মাথা উঠাবো তখন দেখতে পাবো যে, মূসা 'আরশ ধরে আছেন। আমি জানিনা তিনি কি এভাবেই ছিলেন নাকি শিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার পরে হুশে এসে এরূপ করেছেন। [বুখারী: ৪৮১৩]

(২) প্রথম ও দ্বিতীয় ফুঁক দেয়ার মধ্যবর্তী সময়ের ব্যবধান বর্ণনায় এক হাদীসে এসেছে যে, তা চল্লিশ হবে। বর্ণনাকারী আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করলেন: চল্লিশ দিন? তিনি বললেন: আমি তা বলতে অস্বীকার করছি। তারা বললো: চল্লিশ বছর? তিনি বললেন: আমি তাও বলতে অস্বীকার করছি। তারা বললো: চল্লিশ মাস? তিনি বললেন: আমি তাও অস্বীকার করছি। আর মানুষের সবকিছুই পঁচে যাবে তবে তার নিম্নাংশের এক টুকরো ছাড়া। যার উপর মানুষ পুনরায় সংযোজিত হবে। [বুখারী: ৪৮১৪]

(৩) অর্থাৎ হাশরের ময়দানে হিসাব-নিকাশের সময় সমস্ত নবী-রাসুলগণও উপস্থিত থাকবেন এবং অন্যান্য সাক্ষীও উপস্থিত থাকবে। সাক্ষীগণের এ তালিকায় থাকবেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। যেমন অন্য আয়াতে এসেছে, ﴿فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍۭ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰۤؤُلَآءِ شَهِيْدًا﴾ "অতঃপর যখন আমরা প্রত্যেক উম্মত হতে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং আপনাকে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করব তখন কি অবস্থা হবে?" [সূরা আন-নিসা: ৪১] অনুরূপভাবে ফেরেশতাগণও। যেমন, এক আয়াতে আছে, ﴿وَجَآءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَآئِقٌ وَّشَهِيْدٌ﴾ "আর সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি উপস্থিত হবে, তার সঙ্গে থাকবে চালক ও সাক্ষী।" [সূরা ক্বাফ: ২১]। তদ্রূপ উম্মতে মোহাম্মদীও থাকবে। যেমন, এক আয়াতে বলা হয়েছে, ﴿وَتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ﴾ "এবং তোমরা সাক্ষীস্বরূপ হও মানুষের জন্য।" [সূরা আল-হাজ্জ:৭৮]

বিচার করা হবে এমতাবস্থায় যে, তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না।

وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ۝

৭০. আর প্রত্যেককে তার আমলের পূর্ণ প্রতিফল দেয়া হবে এবং তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ সর্বাধিক অবগত।

অষ্টম রুকূ'

وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا ۚ قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝

৭১. আর কাফিরদেরকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে[1]। অবশেষে যখন তারা জাহান্নামের কাছে আসবে তখন এর দরজাগুলো খুলে দেয়া হবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে,

---

কোন কোন মুফাসসিরের মতে, আল্লাহর পথে যারা শহীদ হয়েছেন তারাও থাকবেন এবং স্বয়ং মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও থাকবে। যেমন, কুরআনে বলা হয়েছে, ﴿وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ "আর এদের হাত কথা বলবে আমাদের সাথে এবং এদের পা সাক্ষ্য দেবে এদের কৃতকর্মের।" [সূরা ইয়াসীন:৬৫] [আরো দেখুন-কুরতুবী]

(১) আল্লাহ্ তা'আলা কাফের দূর্ভাগাদের অবস্থা বর্ণনা করছেন, কিভাবে তাদেরকে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। তাদেরকে সেদিকে অত্যন্ত কঠোর, ধমক ও কর্কশভাবে নেয়া হবে। যেমন অন্যত্র বলেছেন, "যেদিন তাদেরকে ধাক্কা মারতে মারতে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের আগুনের দিকে" [সূরা আত-তূর: ১৩] এমতাবস্থায় যে, তারা থাকবে পিপাসার্ত ও ক্ষুধার্ত। যেমন অন্য আয়াতে এসেছে, "এবং অপরাধীদেরকে তৃষ্ণাতুর অবস্থায় জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাব।" [সূরা মারইয়াম: ৮৬] তাদের অবস্থা হবে এমন যে, তারা বোবা, বধির ও অন্ধ হবে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ মুখের উপর ভর দিয়ে চলবে। আল্লাহ্ বলেন, "আর আল্লাহ্ যাদেরকে পথনির্দেশ করেন তারা তো পথপ্রাপ্ত এবং যাদেরকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন আপনি কখনো তাদের জন্য তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে অভিভাবক পাবেন না। আর কিয়ামতের দিন আমরা তাদেরকে সমবেত করব তাদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায় অন্ধ, মূক ও বধির করে। তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম; যখনই তা স্তিমিত হবে তখনই আমরা তাদের জন্য আগুনের শিখা বৃদ্ধি করে দেব।" [সূরা আল-ইসরা: ৯৭]

'তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে রাসূল আসেনি যারা তোমাদের কাছে তোমাদের রবের আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করত এবং এ দিনের সাক্ষাত সম্বন্ধে তোমাদেরকে সতর্ক করত?' তারা বলবে, 'অবশ্যই হ্যাঁ।' কিন্তু শাস্তির বাণী কাফিরদের উপর বাস্তবায়িত হয়েছে।

৭২. বলা হবে, 'তোমরা জাহান্নামের দরজাসমূহে প্রবেশ কর তাতে স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য। অতএব অহংকারীদের আবাসস্থল কত নিকৃষ্ট!'

قِيلَ ادْخُلُوٓا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۖ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٢﴾

৭৩. আর যারা তাদের রবের তাকওয়া অবলম্বন করেছে তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। অবশেষে যখন তারা জান্নাতের কাছে আসবে এবং এর দরজাসমূহ খুলে দেয়া হবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, 'তোমাদের প্রতি 'সালাম', তোমরা ভাল ছিলে[১] সুতরাং জান্নাতে প্রবেশ কর স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য।'

وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَٰبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَٰلِدِينَ ﴿٧٣﴾

৭৪. আর তারা (প্রবেশ করে) বলবে, 'সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদের প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতি সত্য করেছেন[২] এবং

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى صَدَقَنَا وَعْدَهُۥ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ

(১) মুজাহিদ বলেন, অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য অত্যন্ত সুন্দরভাবে করতে। [তাবারী]

(২) অর্থাৎ যে ওয়াদা তিনি তার সম্মানিত রাসূলদের মাধ্যমে ঈমানদারদেরকে দিয়েছেন। যেমন তারা দুনিয়াতেও এ দো'আ করেছিল "হে আমাদের রব! আপনার রাসূলগণের

نَشَآءُ فَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ۝٧٤

আমাদেরকে অধিকারী করেছেন এ যমীনের; আমরা জান্নাতে যেখানে ইচ্ছে বসবাসের জায়গা করে নেব।' অতএব নেক আমলকারীদের পুরস্কার কত উত্তম!

وَتَرَى الْمَلٰٓئِكَةَ حَآفِّيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۚ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝٧٥

৭৫. আর আপনি ফেরেশ্‌তাদেরকে দেখতে পাবেন যে, তারা 'আরশের চারপাশে ঘিরে তাদের রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে। আর তাদের মধ্যে বিচার করা হবে ন্যায়ের সাথে এবং বলা হবে, সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ্‌র প্রাপ্য।

মাধ্যমে আমাদেরকে যা দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা আমাদেরকে দান করুন এবং কেয়ামতের দিন আমাদেরকে হেয় করবেন না। নিশ্চয় আপনি প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না।" [সূরা আলে ইমরান: ১৯৪]

৪০- সূরা আল-মু'মিন
৮৫ আয়াত, মক্কী

سُورَةُ المُؤْمِن

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. হা-মীম[১] ।

حٰمٓ ۝١

২. এ কিতাব নাযিল হয়েছে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে যিনি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ---

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۝٢

৩. পাপ ক্ষমাকারী, তাওবা কবুলকারী, কঠোর শাস্তি প্রদানকারী, অনুগ্রহ বর্ষনকারী। তিনি ব্যতীত কোন সত্য ইলাহ্ নেই। ফিরে যাওয়া তাঁরই কাছে।

غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ ۭ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۭ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۝٣

৪. আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহে বিতর্ক কেবল তারাই করে যারা কুফরী করেছে; কাজেই দেশে দেশে তাদের অবাধ বিচরণ যেন আপনাকে ধোঁকায় না ফেলে।

مَا يُجَادِلُ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ اِلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ ۝٤

৫. তাদের আগে নূহের সম্প্রদায় এবং তাদের পরে অনেক দলও মিথ্যারোপ করেছিল। প্রত্যেক উম্মত নিজ নিজ রাসূলকে পাকড়াও করার সংকল্প করেছিল এবং তারা অসার তর্কে লিপ্ত হয়েছিল, তা দ্বারা সত্যকে ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য। ফলে আমি তাদেরকে

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّالْاَحْزَابُ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ۠ وَهَمَّتْ كُلُّ اُمَّةٍۢ بِرَسُوْلِهِمْ لِيَاْخُذُوْهُ وَجٰدَلُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ فَاَخَذْتُهُمْ ۣ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۝٥

(১) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন এক জেহাদের রাত্রিকালীন হেফাযতের জন্যে বলেছিলেন, রাত্রিতে তোমরা আক্রান্ত হলে حم لَا يُنْصَرُوْنَ পড়ে নিও। অর্থাৎ হা-মীম শব্দ দ্বারা দো'আ করতে হবে যে, শত্রুরা সফল না হোক। কোন কোন রেওয়ায়েতে حم لَا يُنْصَرُ (নুন ব্যতিরেকে) বর্ণিত আছে। এর অর্থ এই যে, তোমরা হা-মীম-বললে শত্রুরা সফল হবে না। এ থেকে জানা গেল যে, হা-মীম শত্রু থেকে হেফাযতের দুর্গ ।[তিরমিযী ১৬৮২, আবু দাউদ: ২৫৭৯]

পাকড়াও করলাম। সুতরাং কত কঠোর ছিল আমার শাস্তি!

৬. আর যারা কুফরী করেছে, এভাবেই তাদের উপর সত্য হল আপনার রবের বাণী যে, এরা জাহান্নামী।

وَكَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ ۝٦

৭. যারা 'আরশ ধারণ করে আছে এবং যারা এর চারপাশে আছে, তারা তাদের রবের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে প্রশংসার সাথে এবং তাঁর উপর ঈমান রাখে, আর মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে, 'হে আমাদের রব! আপনি দয়া ও জ্ঞান দ্বারা সবকিছুকে পরিব্যাপ্ত করে রেখেছেন। অতএব যারা তাওবা করে এবং আপনার পথ অবলম্বন করে আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন। আর জাহান্নামের শাস্তি হতে আপনি তাদের রক্ষা করুন।

اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهٗ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ۝٧

৮. 'হে আমাদের রব! আর আপনি তাদেরকে প্রবেশ করান স্থায়ী জান্নাতে, যার প্রতিশ্রুতি আপনি তাদেরকে দিয়েছেন এবং তাদের পিতামাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকাজ করেছে তাদেরকেও। নিশ্চয়ই আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ ِۨالَّتِيْ وَعَدْتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ ۭ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝٨

৯. 'আর আপনি তাদেরকে অপরাধের শাস্তি হতে রক্ষা করুন। সেদিন আপনি যাকে (অপরাধের) খারাপ পরিণতি হতে রক্ষা করবেন, তাকে অবশ্যই অনুগ্রহ করবেন; আর এটাই মহাসাফল্য!'

وَقِهِمُ السَّيِّاٰتِ ۭ وَمَنْ تَقِ السَّيِّاٰتِ يَوْمَىِٕذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهٗ ۭ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝٩

দ্বিতীয় রুকূ'

১০. নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে তাদেরকে উচ্চ কণ্ঠে বলা হবে, 'তোমাদের নিজেদের প্রতি তোমাদের অসন্তোষের চেয়ে আল্লাহ্‌র অসন্তোষ ছিল অধিকতর--- যখন তোমাদেরকে ঈমানের প্রতি ডাকা হয়েছিল কিন্তু তোমরা তার সাথে কুফরী করেছিলে।'

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ ⑩

১১. তারা বলবে, 'হে আমাদের রব! আপনি আমাদেরকে দু'বার মৃত্যু দিয়েছেন এবং দু'বার আমাদেরকে জীবন দিয়েছেন। অতঃপর আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করছি। অতএব (জাহান্নাম থেকে) বের হবার কোন পথ আছে কি[১]?'

قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ ⑪

১২. 'এটা এজন্যে যে, যখন একমাত্র আল্লাহ্‌কে ডাকা হত তখন তোমরা কুফরী করতে, আর যখন তাঁর সাথে শির্ক করা হত তখন তোমরা তাতে বিশ্বাস করতে।' সুতরাং যাবতীয় কর্তৃত্ব সমুচ্চ, মহান আল্লাহ্‌রই।

ذَٰلِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ⑫

---

(১) দু'বার মৃত্যু এবং দু'বার জীবন বলতে বুঝানো হয়েছে তোমরা প্রাণহীন ছিলে, তিনি তোমাদের প্রাণ দান করেছেন। এরপর তিনি পুনরায় তোমাদের মৃত্যু দিবেন এবং পরে আবার জীবন দান করবেন। কাফেররা এসব ঘটনার প্রথম তিনটি অস্বীকার করে না। কারণ, ঐগুলো বাস্তবে প্রত্যক্ষ করা যায় এবং সে জন্য অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তারা শেষোক্ত ঘটনাটি সংঘটিত হওয়া অস্বীকার করে। কারণ, এখনো পর্যন্ত তারা তা প্রত্যক্ষ করেনি এবং শুধু নবী-রসূলগণই এটির খবর দিয়েছেন। কিয়ামতের দিন এ চতুর্থ অবস্থাটিও তারা কার্যত দেখতে পাবে এবং তখন স্বীকার করবে যে, আমাদেরকে যে বিষয়ের খবর দেয়া হয়েছিলো তা প্রকৃতই সত্যে পরিণত হলো। [দেখুন, তাবারী]

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا ۚ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ ﴿١٣﴾

১৩. তিনিই তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী দেখান এবং আকাশ হতে তোমাদের জন্য রিযিক নাযিল করেন। আর যে আল্লাহ্-অভিমুখী সেই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে।

فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿١٤﴾

১৪. সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌কে ডাক তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে। যদিও কাফিররা অপছন্দ করে।

رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ﴿١٥﴾

১৫. তিনি সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী, 'আর্‌শের অধিপতি[১], তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছে স্বীয় আদেশ হতে ওহী প্রেরণ করেন[২], যাতে তিনি সতর্ক করেন সম্মেলন দিবস[৩] সম্পর্কে।

يَوْمَ هُم بَارِزُونَ ۖ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ۚ لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ۖ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿١٦﴾

১৬. যেদিন তারা (লোকসকল) প্রকাশিত হবে সেদিন আল্লাহ্‌র কাছে তাদের কিছুই গোপন থাকবে না। আজ কর্তৃত্ব কার? আল্লাহ্‌রই, যিনি এক, প্রবল প্রতাপশালী[৪]।

---

(১) এর আরেক অর্থ 'তাঁর মহান আরশ সমুচ্চ'। আল্লাহর আরশ সমস্ত পৃথিবী ও আকাশসমূহে পরিব্যাপ্ত এবং সবার ছাদস্বরূপ উচ্চ। সূরা আল-মা'আরেজে বলা হয়েছে ﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ এ আয়াতে উল্লেখিত পঞ্চাশ হাজার বছরের পরিমাণ হলে সে দূরত্বের বিশ্লেষণ যা মাটির সপ্তম স্তর থেকে আরশ পর্যন্ত রয়েছে। এ ব্যাখ্যা বহু সংখ্যক পুর্ববর্তী ও পরবর্তী তফসীরবিদদের কাছে অগ্রগণ্য। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন, এর অর্থ আল্লাহ তাআলা মুমিন-মুত্তাকীদের মর্যাদা বৃদ্ধিকারী। যেমন, কুরআনের অন্যান্য আয়াত এর সাক্ষ্য বহন করে। এক আয়াতে আছে, ﴿نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ﴾ [সূরা আল-আন'আম:৮৩] অন্য এক আয়াতে আছে, ﴿هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ﴾ [সূরা আলে ইমরান: ১৬৩]

(২) রূহ অর্থ অহী ও নবুওয়াত ।[কুরতুবী]

(৩) কিয়ামতের একটি নাম ﴿يَوْمَ التَّلَاقِ﴾ বা সম্মেলন দিবস। [তাবারী]

(৪) উল্লেখিত আয়াতসমূহে এ বাক্যটি ﴿يَوْمَ التَّلَاقِ﴾ ও ﴿يَوْمَ هُم بَارِزُونَ﴾ এর পরে এসেছে। বলাবাহুল্য, ﴿يَوْمَ التَّلَاقِ﴾ তথা সাক্ষাত ও সমাবেশের দিন দ্বিতীয় ফুঁকের পরে হবে।

اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۢ بِمَا كَسَبَتْ ۗ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ۗ إِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿١٧﴾

১৭. আজ প্রত্যেককে তার অর্জন অনুসারে প্রতিফল দেয়া হবে; আজ কোন যুলুম নেই[১]। নিশ্চয় আল্লাহ্ দ্রুত হিসেব

এমনিভাবে ﴿يَوْمَ هُم بَارِزُونَ﴾ এর ঘটনাও তখন হবে, যখন দ্বিতীয় ফুৎকারের পরে নতুন ভুপৃষ্ঠ সমতল করে দেয়া হবে, যাতে কোন আড়াল থাকবে না। এরপরে ﴿لِمَنِ الْمُلْكُ﴾ বাক্যটি আনার কারণে বাহ্যত: বোঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার এ বাণী দ্বিতীয় ফুঁকের মাধ্যমে সবকিছু পুনরুজ্জীবিত হওয়ার পরে বাস্তবায়িত হবে। কিন্তু একটি হাদীসে এসেছে "কিয়ামতের প্রারম্ভে আহবানকারী আহবান করে বলবেন: হে লোক সকল! তোমাদের কিয়ামত এসেছে, তখন জীবিত মৃত সবাই শুনতে পাবে। আর আল্লাহ প্রথম আসমানে নেমে এসে বললেন: আজকের দিনে কার রাজত্ব? একমাত্র পরাক্রম আল্লাহর জন্যই। [মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৪৭৫, ৩৬৩৭] তাছাড়া অন্য বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা এ উক্তি তখন করবেন, যখন প্রথম ফুঁকের পর সমগ্র সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে। এবং জিবরাইল, মীকাইল, ইস্রাফীল, প্রমূখ নৈকট্যশীল ফেরেশতাগণও মারা যাবে এবং আল্লাহ্র সত্ত্বা ব্যতীত কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। আল্লাহ বলবেন, আজকের দিন রাজত্ব কার? আল্লাহ নিজেই জওয়াব দেবেন: প্রবল পরাক্রান্ত এক আল্লাহর!' হাদীস থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায় 'কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা সমগ্র পৃথিবী এবং সমগ্র আসমানসমূহকে হাতে গুটিয়ে বলবেন: আমিই বাদশাহ! আমিই পরাক্রমশালী, আমি অহংকারী, দুনিয়ার বাদশারা কোথায়? কোথায় পরাক্রমশালীরা? কোথায় অহংকারকারীরা? [বুখারী: ৭৪১২; মুসলিম: ২৭৮৮]

(১) অর্থাৎ কোন ধরনের যুলুমই হবে না। প্রতিদানের ক্ষেত্রে যুলুমের কয়েকটি রূপ হতে পারে। এক, প্রতিদানের অধিকারী ব্যক্তিকে প্রতিদান না দেয়া। দুই, সে যতটা প্রতিদান লাভের উপযুক্ত তার চেয়ে কম দেয়া। তিন, শাস্তি যোগ্য না হলেও শাস্তি দেয়া। চার, যে শাস্তির উপযুক্ত তাকে শাস্তি না দেয়া। পাঁচ, যে কম শাস্তির উপযুক্ত তাকে বেশী শাস্তি দেয়া। ছয়, যালেমের নির্দোষ মুক্তি পাওয়া এবং মযলুমের তা চেয়ে দেখতে থাকা। সাত, একজনের অপরাধে অন্যকে শাস্তি দেয়া। আল্লাহ তা'আলার এ বাণীর উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাঁর আদালতে এ ধরনের কোন যুলুমই হতে পারবে না। এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদেরকে নগ্ন পা, খৎনাবিহীন এবং নিঃস্ব অবস্থায় হাশর করবেন। তারপর তাদেরকে এমনভাবে ডেকে বলবেন যে, দূরের ও কাছের সবাই তা শুনতে পাবে। তিনি বলবেন, আমিই বিচারক। সুতরাং কোন জান্নাতী জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, অনুরূপ কোন জাহান্নামী জাহান্নামে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ তার কাছে কোন যুলুমের পাওনা অবশিষ্ট থাকবে আর আমি তার বদলা নেব না। এমনকি যদি তা একটি চড়ও হয়। সাহাবাগণ বললেন, আমরা বললাম, কিভাবে তা সম্ভব হবে অথচ আমরা সেখানে নিঃস্ব অবস্থায় হাযির হব। তিনি বললেন, সওয়াব ও গোনাহর

গ্রহণকারী।

১৮. আর আপনি তাদেরকে সতর্ক করে দিন আসন্ন দিন(১) সম্পর্কে; যখন দুঃখ-কষ্ট সম্বরণরত অবস্থায় তাদের প্রাণ কণ্ঠাগত হবে। যালিমদের জন্য কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু নেই এবং এমন কোন সুপারিশকারীও নেই যার সুপারিশ গ্রাহ্য হবে।

وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ ۚ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴿١٨﴾

১৯. চোখসমূহের খেয়ানত এবং অন্তরসমূহ যা গোপন রাখে তা তিনি জানেন।

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ﴿١٩﴾

২০. আর আল্লাহ্ ফয়সালা করেন যথাযথ ভাবে এবং আল্লাহ্র পরিবর্তে তারা যাদেরকে ডাকে তারা কোন কিছুর ফয়সালা করতে পারে না। নিশ্চয় আল্লাহ্, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ ۖ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿٢٠﴾

তৃতীয় রুকূ'

২১. এরা কি যমীনে বিচরণ করে না? ফলে দেখত তাদের পূর্বে যারা ছিল তাদের পরিণাম কেমন হয়েছিল। তারা এদের চেয়ে যমীনে শক্তিতে এবং কীর্তিতে ছিল প্রবলতর। তারপর

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ ﴿٢١﴾

মাধ্যমে সেসবের বদলা নেয়া হবে। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন। [মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৪৩৭-৪৩৮]

(১) আসন্ন দিন বলতে এখানে কিয়ামতের দিবসকে বোঝানো হয়েছে। কুরআন মজীদে মানুষকে বার বার এ উপলব্ধি দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে যে, কিয়ামত তাদের থেকে বেশী দূরে নয় বরং তা অতি সন্নিকটবর্তী হয়ে পড়েছে এবং যে কোন মুহূর্তে সংঘটিত হতে পারে। [কুরতুবী] কোথাও বলা হয়েছেঃ ﴿أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ﴾ [আন-নাহল:১] কোথাও বলা হয়েছে ﴿اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ﴾ [আল-আম্বিয়া:১] কোথাও সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়েছে ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ﴾ [আল-ক্বামার: ১]। কোথাও বলা হয়েছেঃ ﴿أَزِفَتِ الْآزِفَةُ﴾ [আন-নাজম ৫৭]।

আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের অপরাধের জন্য পাকড়াও করলেন এবং আল্লাহ্র শাস্তি থেকে তাদেরকে রক্ষাকারী কেউ ছিল না।

২২. এটা এ জন্যে যে, তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ আসত অতঃপর তারা কুফরী করেছিল। ফলে আল্লাহ্ তাদেরকে পাকড়াও করলেন। নিশ্চয় তিনি শক্তিশালী, শাস্তিদানে কঠোর।

ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنٰتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللّٰهُ ۚ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٢﴾

২৩. আর অবশ্যই আমরা আমাদের নিদর্শন ও স্পষ্ট প্রমাণসহ মূসাকে প্রেরণ করেছিলাম,

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسٰى بِـَٔايٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ﴿٢٣﴾

২৪. ফির'আউন, হামান ও কারূনের কাছে। অতঃপর তারা বলল, 'জাদুকর, চরম মিথ্যাবাদী।'

إِلٰى فِرْعَوْنَ وَهٰمٰنَ وَقٰرُونَ فَقَالُوا سٰحِرٌ كَذَّابٌ ﴿٢٤﴾

২৫. অতঃপর মূসা আমাদের নিকট থেকে সত্য নিয়ে তাদের কাছে উপস্থিত হলে তারা বলল, 'মূসার সাথে যারা ঈমান এনেছে, তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা কর এবং তাদের নারীদেরকে জীবিত রাখ।' আর কাফিরদের ষড়যন্ত্র কেবল ব্যর্থই হবে।

فَلَمَّا جَآءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا اقْتُلُوٓا أَبْنَآءَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَآءَهُمْ ۚ وَمَا كَيْدُ الْكٰفِرِينَ إِلَّا فِى ضَلٰلٍ ﴿٢٥﴾

২৬. আর ফির'আউন বলল, 'আমাকে ছেড়ে দাও আমি মূসাকে হত্যা করি এবং সে তার রবকে আহ্বান করুক। নিশ্চয় আমি আশংকা করি যে, সে তোমাদের দ্বীন পরিবর্তন করে দেবে অথবা সে যমীনে বিপর্যয় ছড়িয়ে দেবে।'

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِىٓ أَقْتُلْ مُوسٰى وَلْيَدْعُ رَبَّهُۥٓ ۖ إِنِّىٓ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِى الْأَرْضِ الْفَسَادَ ﴿٢٦﴾

وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٢٧﴾

২৭. মূসা বললেন, 'আমি আমার রব ও তোমাদের রবের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি এমন প্রত্যেক অহংকারী হতে যে বিচার দিনের উপর ঈমান রাখে না।'

চতুর্থ রুকূ'

وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ ۖ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ ۖ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴿٢٨﴾

২৮. আর ফির'আউন বংশের এক মুমিন ব্যক্তি[১] যে তার ঈমান গোপন রাখছিল সে বলল, 'তোমরা কি এক ব্যক্তিকে এ জন্য হত্যা করবে যে, সে বলে, 'আমার রব আল্লাহ,' অথচ সে তোমাদের রবের কাছ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ তোমাদের কাছে এসেছে[২]? সে মিথ্যাবাদী হলে তার

(১) উপরে স্থানে স্থানে তাওহীদ ও রেসালত অস্বীকারকারীদের প্রতি শাস্তিবাণী উচ্চারণ প্রসঙ্গে কাফেরদের বিরোধিতা ও হঠকারিতা উল্লেখিত হয়েছে। এর ফলে স্বভাবগত কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুঃখিত ও চিন্তান্বিত হয়েছে। তার সান্ত্বনার জন্যে মুসা আলাইহিস্সালাম ও ফেরাউনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এতে ফির'আউন ও ফির'আউন গোত্রের সাথে একজন মহৎ ব্যক্তির দীর্ঘ কথোপকথন উক্ত হয়েছে, যিনি ফির'আউনের গোত্রের একজন হওয়া সত্ত্বেও মুসা আলাইহিস্সালাম এর মো'জেযা দেখে ঈমান এনেছিলেন। কিন্তু উপযোগিতার পরিপ্রেক্ষিতে নিজের ঈমান তখন পর্যন্ত গোপন রেখেছিলেন। কথোপকথনের সময় তার ঈমানও জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। মোকাতেল, সুদ্দী, হাসান বসরী প্রমুখ তফসীরবিদ বলেন, উনি ফেরাউনের চাচাত ভাই ছিলেন। কিবতী হত্যার ঘটনায় যখন ফের'আউনের দরবারে মূসা আলাইহিস্ সালামকে পাল্টা হত্যা করার পরামর্শ চলছিল, তখন তিনি শহরের এক প্রান্ত থেকে দৌড়ে এসে মূসা আলাইহিস্ সালাম কে অবহিত করেছিলেন এবং মিসরের বাইরে চলে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। সূরা আল- কাসাসে এ ঘটনা বর্ণনা করে বলা হয়েছে: ﴿وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ﴾ 'শহরের প্রান্ত থেকে একজন লোক দৌড়ে আসল'। [সূরা আল- কাসাস; আয়াত-২০] [দেখুন, কুরতবী]

(২) অনুরূপ অবস্থা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপরও আপতিত হয়েছিল। উরওয়া ইবনে যুবাইর বলেন, আমি আব্দুল্লাহ্ ইবন আমর ইবন আসকে বললাম, মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সবচেয়ে

মিথ্যাবাদিতার জন্য সে দায়ী হবে, আর যদি সে সত্যবাদী হয়, সে তোমাদেরকে যে ওয়াদা দিচ্ছে, তার কিছু তোমাদের উপর আপতিত হবে।' নিশ্চয় আল্লাহ্ তাকে হেদায়াত দেন না, যে সীমালংঘনকারী, মিথ্যাবাদী।

يٰقَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظٰهِرِيْنَ فِى الْاَرْضِ ۡ فَمَنْ يَّنْصُرُنَا مِنْۢ بَاْسِ اللّٰهِ اِنْ جَآءَنَا ؕ قَالَ فِرْعَوْنُ مَاۤ اُرِيْكُمْ اِلَّا مَاۤ اَرٰى وَمَاۤ اَهْدِيْكُمْ اِلَّا سَبِيْلَ الرَّشَادِ ﴿۲۹﴾

২৯. 'হে আমার সম্প্রদায়! আজ তোমাদেরই রাজত্ব, যমীনে তোমরাই প্রভাবশালী; কিন্তু আমাদের উপর আল্লাহ্র শাস্তি এসে পড়লে কে আমাদেরকে সাহায্য করবে?' ফির'আউন বলল, 'আমি যা সঠিক মনে করি, তা তোমাদেরকে দেখাই। আর আমি তোমাদেরকে শুধু সঠিক পথই দেখিয়ে থাকি।'

وَقَالَ الَّذِيْۤ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اِنِّيْۤ اَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ الْاَحْزَابِ ﴿۳۰﴾

৩০. যে ঈমান এনেছিল সে আরও বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য পূর্ববর্তী দলসমূহের দিনের অনুরূপ আশংকা করি ---

مِثْلَ دَاْبِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ وَالَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ؕ وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ ﴿۳۱﴾

৩১. 'যেমন ঘটেছিল নূহ, 'আদ, সামূদ এবং তাদের পরবর্তীদের ব্যাপারে। আর আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি কোন যুলুম করতে চান না।

কঠোর যে ব্যবহার করেছিল তা সম্পর্কে আমাকে জানান। তিনি বললেন, একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কা'বার সামনে সালাত আদায় করছিলেন, এমতাবস্থায় উকবা ইবন আবি মু'আইত এসে রাসূলের ঘাড় ধরলো এবং তার কাপড় দিয়ে রাসূলের গলা পেঁচিয়ে ধরলো। ফলে তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হলো, তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু দৌড়ে আসলেন এবং তার কাঁধ ধরে ফেললেন ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রতিরোধ করে বললেন, "তোমরা কি এক ব্যক্তিকে এ জন্য হত্যা করবে যে, সে বলে, 'আমার রব আল্লাহ্,' অথচ সে তোমাদের রবের কাছ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ তোমাদের কাছে এসেছে।" [বুখারী: ৮৪১৫]

৩২. আর 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জন্য আশংকা করি ভয়ার্ত আহ্বান দিনের,

وَيٰقَوْمِ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ﴿٣٢﴾

৩৩. 'যেদিন তোমরা পিছনে ফিরে পালাতে চাইবে, আল্লাহ্‌র শাস্তি হতে তোমাদেরকে রক্ষা করার কেউ থাকবে না। আর আল্লাহ্ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার জন্য কোন হেদায়াতকারী নেই।'

يَوْمَ تُوَلُّوْنَ مُدْبِرِيْنَ ۚ مَا لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ﴿٣٣﴾

৩৪. আর অবশ্যই পূর্বে তোমাদের কাছে ইউসুফ এসেছিলেন স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ; অতঃপর তিনি তোমাদের কাছে যা নিয়ে এসেছিলেন তোমরা তাতে সর্বদা সন্দেহ করেছিলে। পরিশেষে যখন তার মৃত্যু হল তখন তোমরা বলেছিলে, 'তার পরে আল্লাহ্ আর কোন রাসূল প্রেরণ করবেন না।' এভাবেই আল্লাহ্ যে সীমালংঘনকারী, সংশয়বাদী তাকে বিভ্রান্ত করেন ---

وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوْسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا زِلْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِّمَّا جَآءَكُمْ بِهٖ ۖ حَتّٰٓى اِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِهٖ رَسُوْلًا ۚ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابُ ۚ ﴿٣٤﴾

৩৫. যারা নিজেদের কাছে (তাদের দাবীর সমর্থনে) কোন দলীল-প্রমাণ না আসলেও আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী সম্পর্কে বিতণ্ডায় লিপ্ত হয়। তাদের এ কাজ আল্লাহ্ ও মুমিনদের দৃষ্টিতে খুবই ঘৃণার যোগ্য। এভাবে আল্লাহ্ মোহর করে দেন প্রত্যেক অহংকারী, স্বৈরাচারী ব্যক্তির হৃদয়ে[১]।

الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتٰىهُمْ ۗ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۗ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴿٣٥﴾

(১) অর্থাৎ বিনা কারণে কারো মনে মোহর লাগিয়ে দেয়া হয় না। যার মধ্যে অহংকার ও স্বেচ্ছাচারিতা সৃষ্টি হয় লা'নতের এ মোহর কেবল তার মনের ওপরেই লাগানো হয়। 'তাকাববুর' অর্থ ব্যক্তির মিথ্যা অহংকার যার কারণে ন্যায় ও সত্যের

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰهَامٰنُ ابْنِ لِيْ صَرْحًا لَّعَلِّيْٓ اَبْلُغُ الْاَسْبَابَ ۝٣٦

৩৬. ফির'আউন আরও বলল, 'হে হামান! আমার জন্য তুমি নির্মাণ কর এক সুউচ্চ প্রাসাদ যাতে আমি অবলম্বন পাই ---

اَسْبَابَ السَّمٰوٰتِ فَاَطَّلِعَ اِلٰٓى اِلٰهِ مُوْسٰى وَاِنِّيْ لَاَظُنُّهٗ كَاذِبًا ۭ وَكَذٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيْلِ ۭ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ اِلَّا فِيْ تَبَابٍ ۝٣٧

৩৭. 'আসমানে আরোহণের অবলম্বন, যেন দেখতে পাই মূসার ইলাহ্‌কে; আর নিশ্চয় আমি তাকে মিথ্যাবাদী মনে করি।' আর এভাবে ফির'আউনের কাছে শোভনীয় করা হয়েছিল তার মন্দ কাজকে এবং তাকে নিবৃত্ত করা হয়েছিল সরল পথ থেকে এবং ফির'আউনের ষড়যন্ত্র কেবল ব্যর্থই ছিল।

পঞ্চম রুকূ'

وَقَالَ الَّذِيْٓ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوْنِ اَهْدِكُمْ سَبِيْلَ الرَّشَادِ ۝٣٨

৩৮. আর যে ঈমান এনেছিল সে আরও বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করব।

সামনে মাথা নত করাকে সে তার মর্যাদার চেয়ে নীচু কাজ বলে মনে করে। স্বেচ্ছাচারিতা অর্থ আল্লাহর সৃষ্টির ওপর জুলুম করা। এ জুলুমের অবাধ লাইসেন্স লাভের জন্য ব্যক্তি আল্লাহর শরীয়াতের বাধ্য-বাধকতা মেনে নেয়া থেকে দূরে থাকে। ফির'আউন ও হামানের অন্তর যেমন মুসা আলাইহিস্ সালাম ও মুমিন ব্যক্তির উপদেশে প্রভাবান্বিত হয়নি, এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক উদ্ধত, স্বৈরাচারীর অন্তরে মোহর এটে দেন। ফলে তাদের অন্তরে ঈমানের নূর প্রবেশ করে না এবং সে ভাল-মন্দের পার্থক্য করতে পারবে না। আয়াতে مُتَكَبِّر ও جَبَّار শব্দদ্বয়কে قلب এর বিশেষণ করা হয়েছে। কারণ, সকল নৈতিকতা ও ক্রিয়াকর্মের উৎস হচ্ছে অন্তর। অন্তর থেকেই ভাল-মন্দ কর্ম জন্ম লাভ করে। এ কারণেই হাদীসে বলা হয়েছে, মানুষের দেহে একটি মাংসপিন্ড (অর্থাৎ অন্তরে) এমন আছে, যা ঠিক থাকলে সমগ্র দেহ ঠিক থাকে এবং যা নষ্ট হলে সমগ্র দেহ নষ্ট হয়ে যায়। [বুখারী: ৫২, মুসলিম: ১৫৯৯]

৩৯. 'হে আমার সম্প্রদায়! এ দুনিয়ার জীবন কেবল অস্থায়ী ভোগের বস্তু, আর নিশ্চয় আখিরাত, তা হচ্ছে স্থায়ী আবাস ।

يٰقَوْمِ اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ ۫ وَّاِنَّ الْاٰخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ۝٣٩

৪০. 'কেউ মন্দ কাজ করলে সে শুধু তার কাজের অনুরূপ শাস্তিই প্রাপ্ত হবে। আর যে পুরুষ কিংবা নারী মুমিন হয়ে সৎকাজ করবে তবে তারা প্রবেশ করবে জান্নাতে, সেখানে তাদেরকে দেয়া হবে অগণিত রিযিক ।

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَا ۚ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝٤٠

৪১. 'আর হে আমার সম্প্রদায়! আমার কি হলো যে, আমি তোমাদেরকে ডাকছি মুক্তির দিকে, আর তোমরা আমাকে ডাকছ আগুনের দিকে!

وَيٰقَوْمِ مَا لِيْٓ اَدْعُوْكُمْ اِلَى النَّجٰوةِ وَتَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَى النَّارِ ۝٤١

৪২. 'তোমরা আমাকে ডাকছ যাতে আমি আল্লাহ্‌র সাথে কুফরী করি এবং তাঁর সাথে শরীক করি, যে ব্যাপারে আমার কোন জ্ঞান নেই; আর আমি তোমাদেরকে ডাকছি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীলের দিকে ।

تَدْعُوْنَنِيْ لِاَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَاُشْرِكَ بِهٖ مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ ۫ وَّاَنَا اَدْعُوْكُمْ اِلَى الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ ۝٤٢

৪৩. 'নিঃসন্দেহ যে, তোমরা আমাকে যার দিকে ডাকছ, সে দুনিয়া ও আখিরাতে কোথাও ডাকের যোগ্য নয়। আর আমাদের ফিরে যাওয়া তো আল্লাহ্‌র দিকে এবং নিশ্চয় সীমালঙ্ঘনকারীরা আগুনের অধিবাসী ।

لَا جَرَمَ اَنَّمَا تَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَيْهِ لَيْسَ لَهٗ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْاٰخِرَةِ وَاَنَّ مَرَدَّنَآ اِلَى اللّٰهِ وَاَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ هُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ ۝٤٣

৪৪. 'সুতরাং তোমরা অচিরেই স্মরণ করবে যা আমি তোমাদেরকে বলছি এবং আমি আমার ব্যাপার আল্লাহ্‌র

فَسَتَذْكُرُوْنَ مَآ اَقُوْلُ لَكُمْ ۗ وَاُفَوِّضُ اَمْرِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌ ۢ بِالْعِبَادِ ۝٤٤

নিকট সমর্পণ করছি; নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে সর্বদ্রষ্টা ।'

فَوَقٰىهُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِ مَا مَكَرُوْا وَحَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْٓءُ الْعَذَابِ ۝

৪৫. অতঃপর আল্লাহ্ তাকে তাদের ষড়যন্ত্রের অনিষ্ট হতে রক্ষা করলেন এবং ফির'আউন গোষ্ঠীকে ঘিরে ফেলল কঠিন শাস্তি;

اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا ۚ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ ۗ اَدْخِلُوْٓا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ ۝

৪৬. আগুন, তাদেরকে তাতে উপস্থিত করা হয় সকাল ও সন্ধ্যায় এবং যেদিন কিয়ামত ঘটবে সেদিন বলা হবে, 'ফির'আউন গোষ্ঠীকে নিক্ষেপ কর কঠোর শাস্তিতে[১] ।'

وَاِذْ يَتَحَآجُّوْنَ فِى النَّارِ فَيَقُوْلُ الضُّعَفٰٓؤُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا نَصِيْبًا مِّنَ النَّارِ ۝

৪৭. আর যখন তারা জাহান্নামে পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হবে, তখন দুর্বলেরা যারা অহংকার করেছিল তাদেরকে বলবে, 'আমরা তো তোমাদের অনুসরণ করেছিলাম সুতরাং তোমরা কি

(১) বহু সংখ্যক হাদীসে কবরের আযাবের যে উল্লেখ আছে এ আয়াত তার সুস্পষ্ট প্রমাণ । আল্লাহ তা'আলা এখানে সুস্পষ্ট ভাষায় আযাবের দু'টি পর্যায়ের উল্লেখ করছেন । একটি হচ্ছে কম মাত্রার আযাব যা কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পূর্বে ফির'আউনের অনুসারীদের দেয়া হচ্ছে । তাদেরকে সকাল ও সন্ধ্যায় জাহান্নামের আগুনের সামনে পেশ করা হয় । এরপর কিয়ামত আসলে তাদের জন্য নির্ধারিত বড় এবং সত্যিকার আযাব দেয়া হবে । ডুবে মরার সময় থেকে আজ পর্যন্ত তাদেরকে সে আযাবের দৃশ্য দেখানো হচ্ছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত দেখানো হবে । এ ব্যাপারটি শুধু ফির'আউন ও ফির'আউনের অনুসারীদের জন্য নির্দিষ্ট নয় । অপরাধীদের জন্য যে জঘন্য পরিণাম অপেক্ষা করছে, মৃত্যুর মুহূর্ত থেকে কিয়ামত পর্যন্ত তারা সবাই সে দৃশ্য দেখতে পায় আর সমস্ত সৎকর্মশীল লোকের জন্য আল্লাহ তা'আলা যে শুভ পরিণাম প্রস্তুত করে রেখেছেন তার সুন্দর দৃশ্যও তাদেরকে দেখানো হয় । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তিই মারা যায় তাকেই সকাল ও সন্ধ্যায় তার শেষ বাসস্থান দেখানো হতে থাকে । জান্নাতি ও দোযখী উভয়ের ক্ষেত্রেই এটি হতে থাকে । তাকে বলা হয় কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহ তোমাকে পুনরায় জীবিত করে তাঁর সান্নিধ্যে ডেকে নেবেন, তখন তোমাকে আল্লাহ যে জায়গা দান করবেন, এটা সেই জায়গা ।" [মুসনাদ:২/১১৩, বুখারী: ১৩৭৯, মুসলিম:২৮৬৬]

আমাদের থেকে জাহান্নামের আগুনের কিছু অংশ গ্রহণ করবে?'

৪৮. অহংকারীরা বলবে, 'নিশ্চয় আমরা সকলেই এতে রয়েছি, নিশ্চয় আল্লাহ্ বান্দাদের বিচার করে ফেলেছেন।'

قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُلٌّ فِيْهَآ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ﴿٤٨﴾

৪৯. আর যারা আগুনের অধিবাসী হবে তারা জাহান্নামের প্রহরীদেরকে বলবে, 'তোমাদের রবকে ডাক, তিনি যেন আমাদের থেকে শাস্তি লাঘব করেন এক দিনের জন্য।'

وَقَالَ الَّذِيْنَ فِى النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوْا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ﴿٤٩﴾

৫০. তারা বলবে, 'তোমাদের কাছে কি স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ তোমাদের রাসূলগণ আসেননি?' জাহান্নামীরা বলবে, 'হ্যাঁ, অবশ্যই।' প্রহরীরা বলবে, 'সুতরাং তোমরাই ডাক; আর কাফিরদের ডাক শুধু ব্যর্থই হয়।'

قَالُوْٓا اَوَلَمْ تَكُ تَاْتِيْكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۗ قَالُوْا بَلٰى ۗ قَالُوْا فَادْعُوْا ۚ وَمَا دُعٰٓؤُا الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِىْ ضَلٰلٍ ﴿٥٠﴾

ষষ্ঠ রুকূ'

৫১. নিশ্চয় আমরা আমাদের রাসূলদেরকে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে সাহায্য করব দুনিয়ার জীবনে[১], আর

اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ ۙ﴿٥١﴾

(১) এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা রয়েছে যে, তিনি তাঁর রাসুল ও মুমিনগণকে সাহায্য করেন দুনিয়ার জীবনে এবং আখেরাতেও। বলাবাহুল্য, এ সাহায্য কেবল শত্রুদের বিরুদ্ধেই সীমিত। অধিকাংশ নবী-রাসুলদের ক্ষেত্রে এর বাস্তবতা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। কিন্তু কোন কোন নবী-রাসূল যেমন, ইয়াহইয়া, যাকারিয়্যাকে শত্রুরা শহীদ করেছে এবং কতককে দেশান্তরিত করেছে। যেমন, ইবরাহীম ও খাতামুল আম্বিয়া মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিমা ওয়া সাল্লাম, তাদের ক্ষেত্রে আয়াতে বর্ণিত সাহায্যের ব্যাপারে সন্দেহ হতে পারে। ইবন কাসীর এর দু'টি জওয়াব দেন। এক. এখানে রাসূল বলে সমস্ত রাসূলগণকে বুঝানো হয়নি বরং কোন কোন রাসূল বোঝানো হয়েছে। দুই. এ আয়াতে বর্ণিত সাহায্যের অর্থ শত্রুর কাছ থেকে হোক, কিংবা তাদের ওফাতের পরে হোক। এর অর্থ কোনরূপ ব্যতিক্রম ছাড়াই সমস্ত নবী-রাসূল ও মুমিনের ক্ষেত্রে

যেদিন সাক্ষীগণ দাঁড়াবে[১]।

৫২. যেদিন যালিমদের 'ওজর-আপত্তি তাদের কোন কাজে আসবে না। আর তাদের জন্য রয়েছে লা'নত এবং তাদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট আবাস।

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظّٰلِمِيْنَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ ﴿٥٢﴾

৫৩. আর অবশ্যই আমরা মূসাকে দান করেছিলাম হেদায়াত এবং বনী ইস্‌রাঈলকে উত্তরাধিকারী করেছিলাম কিতাবের,

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْهُدٰى وَاَوْرَثْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْكِتٰبَ ﴿٥٣﴾

৫৪. পথনির্দেশ ও উপদেশস্বরূপ বোধশক্তি সম্পন্ন লোকদের জন্য।

هُدًى وَّذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ ﴿٥٤﴾

৫৫. অতএব আপনি ধৈর্য ধারণ করুন; নিশ্চয় আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য। আর আপনি আপনার ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং আপনার রবের সপ্রশংস পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণা করুন সন্ধ্যা ও সকালে।

فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ ﴿٥٥﴾

৫৬. নিশ্চয় যারা নিজেদের কাছে কোন দলীল না থাকলেও আল্লাহ্‌র

اِنَّ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ

প্রযোজ্য। নবী-রাসুলগণের হত্যাকারীদের আযাব ও দুর্দশার বর্ণনা দ্বারা ইতিহাসের পাতা পরিপূর্ণ। ইয়াহইয়া, যাকারিয়্যা আলাইহিমাস্ সালাম এর হত্যাকারীদের উপর বহিঃশত্রু চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, যারা তাদেরকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করে হত্যা করেছে। নমরূদকে আল্লাহ তা'আলা সামান্যতম প্রাণী দিয়ে পরাজিত করেছেন। এ উম্মতের প্রাথমিক যুগের কাফেরদেরকে বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের হাতেই পরাভূত করেছেন। তাদের বড় বড় সদরার নিহত হয়েছে, কিছু বন্দী হয়েছে এবং অবশিষ্টরা মক্কা বিজয়ের দিন গ্রেফতার হয়েছে। অবশ্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে মুক্ত করে দিয়েছেন। তার দ্বীনই জগতের সমস্ত দ্বীনের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে এবং তার জীবদ্দশায়ই আরব উপদ্বীপের বিরাটাংশে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। [দেখুন, ইবন কাসীর]

(১) যেদিন সাক্ষীরা দণ্ডায়মান হবে। অর্থাৎ কেয়ামতের দিন। সেখানে নবী - রাসূল ও মুমিনগণের জন্যে আল্লাহর সাহায্য বিশেষভাবে প্রকাশ লাভ করবে। [তাবারী]

سُلْطٰنٍ اَتٰىهُمْ ۙ اِنْ فِيْ صُدُوْرِهِمْ اِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ بِبَالِغِيْهِ ۚ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ۭ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴿٥٦﴾

নিদর্শনাবলী সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়, তাদের অন্তরে আছে শুধু অহংকার, তারা এ ব্যাপারে সফলকাম হবে না। অতএব আপনি আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চান; নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٥٧﴾

৫৭. মানুষ সৃষ্টি অপেক্ষা আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি অবশ্যই বড় বিষয়, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।

وَمَا يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۙ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَلَا الْمُسِيْٓءُ ۭ قَلِيْلًا مَّا تَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٥٨﴾

৫৮. আর সমান হয় না অন্ধ ও চক্ষুষ্মান, অনুরূপ যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে তারা আর মন্দকর্মকারী। তোমরা অল্পই উপদেশ গ্রহণ করে থাক।

اِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٥٩﴾

৫৯. নিশ্চয় কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, এতে কোন সন্দেহ নেই; কিন্তু অধিকাংশ লোক ঈমান আনে না।

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ۭ

৬০. আর তোমাদের রব বলেছেন, 'তোমরা আমাকে ডাক[১], আমি তোমাদের

(১) 'দো'আ'র শাব্দিক অর্থ ডাকা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশেষ কোন প্রয়োজনে ডাকার অর্থে ব্যবহৃত হয়। কখনও যিকরকেও দো'আ বলা হয়। যেমন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আরাফাতে আমার দো'আ ও পূর্ববর্তী সকল নবী-রাসূলগণের দো'আ এই কলেমা: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحمد وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شيءٍ قَدِيْرٌ এতে যিকরকে দো'আ বলা হয়েছে। কারণ, দো'আ দু' প্রকারঃ ১. প্রার্থনা বা কিছু পেতে দো'আ করা ও ইবাদাতের মাধ্যমে দো'আ করা। চাওয়া বা প্রার্থনার দো'আ হল - আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ চাওয়া। এতে চাওয়া আছে, যাচঞা আছে। পক্ষান্তরে ইবাদাতের দো'আর মধ্যে চাওয়া নেই। শুধু নৈকট্য লাভের জন্য যা যা করা হয় তাই এ প্রকারের ইবাদত। নৈকট্য লাভের সকল প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে; কেননা যে আল্লাহর ইবাদাত করে, সে স্বীয় কথা ও অবস্থার ভাষায় তার রবের কাছে উক্ত ইবাদাত কবুল করার এবং এর উপর সাওয়াব দেয়ার আবেদন করে থাকে। পবিত্র কুরআনে দো'আর যত নির্দেশ এসেছে, আর আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে দো'আ করা থেকে যত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে এবং

إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾

ডাকে সাড়া দেব। নিশ্চয় যারা অহংকারবশে আমার 'ইবাদাত থেকে বিমুখ থাকে, তারা অচিরেই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে[১]।'

দো'আকারীদের যত প্রশংসা করা হয়েছে, সে সবই প্রার্থনার দো'আ ও ইবাদাতের দো'আকে শামিল করে থাকে। যেমন, আল্লাহ্ বলেন, ﴿فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ "সুতরাং আল্লাহকে ডাক তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে"। [সূরা গাফিরঃ ১৪] আরও বলেন, ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ "আর মসজিদসমূহ আল্লাহরই জন্য। সুতরাং আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাউকে ডেকো না"। [সূরা আল-জ্বিনঃ ১৮] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার এক বাণীতে বলেছেন, 'দো'আই 'ইবাদাত। তারপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন'। [আবু দাউদ: ১৪৭৯, তিরমিযি: ২৯৬৯, ইবন মাজাহ: ৩৮২৮] অর্থাৎ প্রত্যেক দো'আই ইবাদত এবং প্রত্যেক ইবাদতই দো'আ। কারণ এই যে, ইবাদত বলা হয় কারও সামনে চূড়ান্ত দীনতা অবলম্বন করাকে। বলাবাহুল্য, নিজেকে কারও মুখাপেক্ষী মনে করে তার সামনে সওয়ালের হস্ত প্রসারিত করা বড় দীনতা, যা ইবাদতের অর্থ। এমনিভাবে প্রত্যেক ইবাদতের সারমর্মও আল্লাহর কাছে মাগফেরাত ও জান্নাত তলব করা এবং দুনিয়া ও আখেরাতের নিরাপত্তা প্রার্থনা করা। আলোচ্য আয়াতেও "দো'আ" ও "ইবাদাত" শব্দ দু'টিকে সমার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা, প্রথম বাক্যাংশে যে জিনিসকে দো'আ শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে দ্বিতীয় বাক্যাংশে সে জিনিসকেই ইবাদাত শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। এ দ্বারা একথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, দো'আই ইবাদাত আর ইবাদতই দো'আ। ঠিক এ বিষয়টিকে আমরা পবিত্র কুরআনের অন্য আয়াতে লক্ষ্য করতে পারি। সেখানে আল্লাহ্ বলেন: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ۞ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ﴾ "সে ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত কে, যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে আহ্বান করে যা ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্তও তার আহ্বানে সাড়া দিবে না? আর অবস্থা তো এরকম যে, এসব কিছু তাদের আহ্বান সম্পর্কে অবহিতও নয়। যখন (কিয়ামতের দিন) মানুষদেরকে একত্রিত করা হবে, তখন সে সকল কিছু হবে তাদের শত্রু এবং সেগুলো তাদের ইবাদাত অস্বীকার করবে"। [সূরা আল-আহকাফঃ ৫-৬]।

(১) উম্মতে মুহাম্মাদীয়ার বিশেষ সম্মানের কারণে এই আয়াতে তাদেরকে দো'আ করার আদেশ করা হয়েছে এবং তা কবুল করারও ওয়াদা করা হয়েছে। আর যারা দো'আ করে না, তাদের জন্যে শাস্তিবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে দো'আ অর্থ যদি ইবাদতের দো'আ বোঝানো হয় তবে দো'আ বর্জনকারী অবশ্যই গুনাহগার এমনকি কাফেরও হবে। আর সে হিসেবেই ইবাদত বর্জনকারীকে জাহান্নামের

সপ্তম রুকূ'

ٱللَّهُ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُوا۟ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٦١﴾

৬১. আল্লাহ্, যিনি তোমাদের জন্য তৈরী করেছেন রাতকে; যাতে তোমরা তাতে বিশ্রাম করতে পার এবং আলোকোজ্জ্বল করেছেন দিনকে। নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

শাস্তিবাণী শোনানো হয়েছে। আর যদি দো'আ বলে 'চাওয়া' বা 'যাচঞা করা' উদ্দেশ্য হয় তখন দো'আ না করলে জাহান্নামের শাস্তিবাণী ঐ সময়ই শুধু হবে যখন সে অহংকারবশত: তা বর্জন করে। কেননা, অহংকারবশত: দো'আ বর্জন করা কুফরের লক্ষণ, তাই সে জাহান্নামের যোগ্য হয়ে যায়। নতুবা সাধারণ দো'আ ফরয বা ওয়াজিব নয়। দো'আ না করলে গোনাহ হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহর কাছে দো'আ অপেক্ষা অধিক সম্মানিত কোন বিষয় নেই। [তিরমিযি:৩৩৭০] অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে তার প্রয়োজন প্রার্থনা করে না, আল্লাহ তার প্রতি রুষ্ট হন। [তিরমিযি:৩৩৭৩]

উপরোক্ত আয়াতে ওয়াদা রয়েছে যে বান্দা আল্লাহর কাছে যে দো'আ করে, তা কবুল হয়। কিন্তু মানুষ মাঝে মাঝে দো'আ কবুল না হওয়াও প্রত্যক্ষ করে। এর জওয়াব দু'টি। এক. দো'আ কবুল হওয়ার উপায় তিনটি। তন্মধ্যে কোন না কোন উপায়ে দো'আ কবুল হয়। (এক) যা চাওয়া হয়, তাই পাওয়া (দুই) প্রার্থিত বিষয়ের পরিবর্তে আখেরাতের কোন সওয়াব ও পুরস্কার দান করা এবং (তিন) প্রার্থিত বিষয় না পাওয়া। কিন্তু কোন সম্ভাব্য আপদ-বিপদ সরে যাওয়া। সুতরাং এর যে কোন একটি হলেই দো'আ কবুল হয়েছে ধরে নিতে হবে। দুই. নির্ভরযোগ্য হাদীসমূহে কোন বিষয়কে দো'আ কবুলের পথে বাধা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এসব বিষয় থেকে বেঁচে থাকা জরুরী। এক. হারাম খাবার ও হারাম পরিধেয় পরিধান: হাদীসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কোন কোন লোক খুব সফর করে এবং আকাশের দিকে হাত তুলে ইয়া রব, ইয়া রব, বলে দো'আ করে; কিন্তু তাদের পানাহার ও পোশাক-পরিচ্ছেদ হারাম পন্থায় অর্জিত। এমতাবস্থায় তাদের দো'আ কিরূপে কবুল হবে? [মুসলিম: ১০১৫] দুই. অসাবধান বেপরোয়া ও অন্যমনস্কভাবে দো'আর বাক্যাবলী উচ্চারণ করলে তাও কবুল হয় না বলেও হাদীসে বর্ণিত আছে। [তিরমিযি: ৩৪৭৯] তিন. অন্যায় কোন দো'আ যেন না হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মুসলিম আল্লাহর কাছে যে দো'আই করে, আল্লাহ তা দান করেন, যদি তা কোন গোনাহ অথবা সম্পর্কচ্ছেদের দো'আ না হয়। [মুসলিম: ২৭৩৫]

৬২. তিনিই আল্লাহ্, তোমাদের রব, সব কিছুর স্রষ্টা; তিনি ছাড়া কোন সত্য ইলাহ্ নেই; কাজেই তোমাদেরকে কোথায় ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে?

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۖ
فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ﴿٦٢﴾

৬৩. এভাবেই ফিরিয়ে নেয়া হয় তাদেরকে যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে।

كَذٰلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِيْنَ كَانُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ
يَجْحَدُوْنَ ﴿٦٣﴾

৬৪. আল্লাহ্, যিনি তোমাদের জন্য যমীনকে স্থিতিশীল করেছেন এবং আসমানকে করেছেন ছাদ এবং তিনি তোমাদের আকৃতি দিয়েছেন অতঃপর তোমাদের আকৃতিকে করেছেন সুন্দর এবং তোমাদেরকে রিযিক দান করেছেন পবিত্র বস্তু থেকে। তিনিই আল্লাহ্, তোমাদের রব। সুতরাং সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ্ কত বরকতময়!

اَللّٰهُ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّالسَّمَآءَ
بِنَآءً وَّصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ
وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ۚ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ
رَبُّكُمْ ۖ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦٤﴾

৬৫. তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ছাড়া কোন সত্য ইলাহ্ নেই। কাজেই তোমরা তাঁকেই ডাক, তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে। সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ্‌রই।

هُوَ الْحَيُّ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ
لَهُ الدِّيْنَ ۗ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦٥﴾

৬৬. বলুন, 'তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া যাদেরকে ডাক, তাদের 'ইবাদাত করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে, যখন আমার রবের কাছ থেকে আমার কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি এসেছে। আর আমি আদেশপ্রাপ্ত হয়েছি সৃষ্টিকুলের রবের কাছে আত্মসমর্পণ করতে।

قُلْ اِنِّيْ نُهِيْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ
مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَمَّا جَآءَنِيَ الْبَيِّنٰتُ مِنْ رَّبِّيْ ۡ
وَاُمِرْتُ اَنْ اُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦٦﴾

৬৭. 'তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, পরে শুক্রবিন্দু থেকে,

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ
مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ

ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا ۚ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ مِن قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾

তারপর আলাকাহ থেকে, তারপর তিনি তোমাদেরকে বের করেন শিশুরূপে, তারপর যেন তোমরা উপনীত হও তোমাদের যৌবনে, তারপর যেন তোমরা হয়ে যাও বৃদ্ধ। আর তোমাদের মধ্যে কারো মৃত্যু ঘটে এর আগেই এবং যাতে তোমরা নির্ধারিত সময়ে পৌঁছে যাও। আর যেন তোমরা বুঝতে পার।

هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿٦٨﴾

৬৮. 'তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান এবং যখন তিনি কিছু করা স্থির করেন তখন তিনি তার জন্য বলেন 'হও', ফলে তা হয়ে যায়।'

অষ্টম রুকূ'

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّىٰ يُصْرَفُونَ ﴿٦٩﴾

৬৯. আপনি কি লক্ষ্য করেন না তাদেরকে যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শন সম্পর্কে বিতর্ক করে? তাদেরকে কোথায় ফিরানো হচ্ছে?

الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٧٠﴾

৭০. যারা মিথ্যারোপ করে কিতাবে এবং যাসহ আমাদের রাসূলগণকে আমরা পাঠিয়েছি তাতে; অতএব, তারা শীঘ্রই জানতে পারবে---

إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ ﴿٧١﴾

৭১. যখন তাদের গলায় বেড়ী ও শৃংখল থাকবে, তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে

فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿٧٢﴾

৭২. ফুটন্ত পানিতে, তারপর তাদেরকে পোড়ানো হবে আগুনে[১]।

---

(১) এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, জাহান্নামীদেরকে প্রথমে حميم অর্থাৎ ফুটন্ত পানিতে ও পরে جحيم অর্থাৎ জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এ থেকে আরও জানা যায়

ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿٧٣﴾

৭৩. পরে তাদেরকে বলা হবে, 'কোথায় তারা যাদেরকে তোমরা শরীক করতে,

مِن دُونِ اللَّهِ ۖ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَّدْعُوا مِن قَبْلُ شَيْئًا ۚ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ﴿٧٤﴾

৭৪. আল্লাহ্ ছাড়া?' তারা বলবে, 'তারা তো আমাদের কাছ থেকে উধাও হয়েছে[১]; বরং আগে আমরা কোন কিছুকে ডাকিনি।' এভাবে আল্লাহ্ কাফিরদেরকে বিভ্রান্ত করেন।

ذَٰلِكُم بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ

৭৫. এটা এ জন্যে যে, তোমরা যমীনে অযথা উল্লাস করতে[২] এবং এজন্যে

যে, حميم জাহান্নামের বাইরের কোন স্থান, যার ফুটন্ত পানি পান করানোর জন্যে জাহান্নামীদেরকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হবে। অর্থাৎ তারা যখন তীব্র পিপাসায় বাধ্য হয়ে পানি চাইবে তখন দোযখের কর্মচারীরা তাদেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে টেনে হেঁচড়ে এমন জায়গায় নিয়ে যাবে, যা থেকে টগবগে গরম পানি বেরিয়ে আসছে। অতঃপর তাদের সে পানি পান করা শেষ হলে আবার তারা তাদেরকে টেনে হেঁচড়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে এবং জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করবে। সূরা আস-সাফ্ফাতের ৬৭-৬৮ নং আয়াত থেকেও তাই জানা যায়। কোন কোন আয়াত থেকে জানা যায় যে, حميم ও جحيم একই স্থান এবং جحيم এর মধ্যেই حميم অবস্থিত। আয়াতটি এইঃ ﴿هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ ۝ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ﴾ [সূরা আর রহমান: ৪৩-৪৪]

(১) অর্থাৎ জাহান্নামে পৌঁছে মুশরিকরা বলবে, আমাদের উপাস্য প্রতিমা ও শয়তান আজ উধাও হয়ে গেছে। অর্থাৎ আমাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না, যদিও তারা জাহান্নামের কোন কোণে পড়ে আছে। তারাও যে জাহান্নামেই থাকবে, এ সম্পর্কে অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ﴾ [সূরা আল-আম্বিয়া: ৯৮]

(২) فرح এর অর্থ আনন্দিত ও উল্লাসিত হওয়া এবং مرح এর অর্থ দম্ভ করা, অর্থ-সম্পদের অহংকারী হয়ে অপরের অধিকার খর্ব করা। مرح সর্বাবস্থায় নিন্দনীয় ও হারাম। পক্ষান্তরে فرح অর্থাৎ আনন্দ যদি ধন-সম্পদের নেশায় আল্লাহকে ভুলে গোনাহের কাজ দ্বারা হয়, তবে হারাম ও না জায়েয। আলোচ্য আয়াতে এই আনন্দই বোঝানো হয়েছে। কারূনের কাহিনীতেও فرح এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। বলা হয়েছে, ﴿لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾ [সূরা আল-কাসাস: ৭৬] অর্থাৎ আনন্দ- উল্লাস করো না। নিশ্চয় আল্লাহ আনন্দ উল্লাসকারীদেরকে পছন্দ করেন না। আনন্দ উল্লাসের আরেক স্তর হল পার্থিব নেয়ামত ও সুখকে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও দান মনে করে তজ্জন্যে আনন্দ প্রকাশ করা। এটা জায়েয, মোস্তাহাব বরং আদিষ্ট কর্তব্য।

الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ ﴿٧٥﴾

যে, তোমরা অহংকার করতে।

ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٦﴾

৭৬. তোমরা জাহান্নামের বিভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ কর, তাতে স্থায়ীভাবে অবস্থানের জন্য, অতএব কতই না নিকৃষ্ট অহংকারীদের আবাসস্থল!

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۚ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿٧٧﴾

৭৭. সুতরাং আপনি ধৈর্য ধারণ করুন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য। অতঃপর আমরা তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করি তার কিছু যদি আপনাকে দেখিয়ে দেই অথবা আপনার মৃত্যু ঘটাই---তবে তাদের ফিরে আসা তো আমাদেরই কাছে।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۗ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ﴿٧٨﴾

৭৮. আর অবশ্যই আমরা আপনার পূর্বে অনেক রাসূল পাঠিয়েছি। আমরা তাদের কারো কারো কাহিনী আপনার কাছে বিবৃত করেছি এবং কারো কারো কাহিনী আপনার কাছে বিবৃত করিনি। আর আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া কোন নিদর্শন নিয়ে আসা কোন রাসূলের কাজ নয়। অতঃপর যখন আল্লাহ্‌র আদেশ আসবে তখন ন্যায়সংগতভাবে ফয়সালা হয়ে যাবে। আর তখন বাতিলপন্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

নবম রুকূ'

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا

৭৯. আল্লাহ্, যিনি তোমাদের জন্য গবাদিপশু সৃষ্টি করেছেন, যাতে

এ আনন্দ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا﴾ অর্থাৎ বলুন, আল্লাহ্‌র রহমত ও অনুগ্রহে (তা হয়েছে), সুতরাং এ কারণে তাদের আনন্দিত হওয়া উচিত। [সূরা ইউনুস: ৫৮]

مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُوْنَ ﴿٧٩﴾

তার কিছু সংখ্যকের উপর তোমরা আরোহণ কর এবং কিছু সংখ্যক হতে তোমরা খাও ।

وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوْا عَلَيْهَا حَاجَةً فِيْ صُدُوْرِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ ﴿٨٠﴾

৮০. আর এতে তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর উপকার এবং যাতে তোমরা অন্তরে যা প্রয়োজন বোধ কর সেগুলো দ্বারা তা পূর্ণ করতে পার । সেগুলোর উপর ও নৌযানের উপর তোমাদেরকে বহন করা হয় ।

وَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ ۖ فَاَيَّ اٰيٰتِ اللّٰهِ تُنْكِرُوْنَ ﴿٨١﴾

৮১. আর তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী দেখিয়ে থাকেন । অতএব, তোমরা আল্লাহ্‌র কোন্ কোন্ নিদর্শনকে অস্বীকার করবে?

اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَانُوْۤا اَكْثَرَ مِنْهُمْ وَاَشَدَّ قُوَّةً وَّاٰثَارًا فِي الْاَرْضِ فَمَاۤ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٨٢﴾

৮২. তারা কি যমীনে বিচরণ করেনি তাহলে তারা দেখত তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল? তারা যমীনে ছিল এদের চেয়ে সংখ্যায় বেশী এবং শক্তিতে ও কীর্তিতে বেশী প্রবল । অতঃপর তারা যা অর্জন করত তা তাদের কোন কাজে আসেনি ।

فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَرِحُوْا بِمَا عِنْدَهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٨٣﴾

৮৩. অতঃপর তাদের কাছে যখন স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ তাদের রাসূলগণ আসলেন, তখন তারা নিজেদের কাছে বিদ্যমান থাকা জ্ঞানে উৎফুল্ল হল । আর তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত তা-ই তাদেরকে বেষ্টন করল ।

فَلَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا قَالُوْۤا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهٖ مُشْرِكِيْنَ ﴿٨٤﴾

৮৪. অতঃপর তারা যখন আমাদের শাস্তি দেখল তখন বলল, 'আমরা একমাত্র আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনলাম এবং আমরা তাঁর সাথে যাদেরকে

শরীক করতাম তাদের সাথে কুফরী করলাম।'

৮৫. কিন্তু তারা যখন আমার শাস্তি দেখল তখন তাদের ঈমান তাদের কোন উপকারে আসল না[১]। আল্লাহ্‌র এ বিধান পূর্ব থেকেই তাঁর বান্দাদের মধ্যে চলে আসছে এবং তখনই কাফিররা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

فَلَمۡ يَكُ يَنفَعُهُمۡ إِيمَٰنُهُمۡ لَمَّا رَأَوۡاْ بَأۡسَنَاۖ سُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدۡ خَلَتۡ فِي عِبَادِهِۦۖ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلۡكَٰفِرُونَ ۝٨٥

(১) অর্থাৎ আযাব সম্মুখে আসার পর তারা ঈমান আনছে। এ সময়কার ঈমান আল্লাহর কাছে গ্রহনীয় ও ধর্তব্য নয়। হাদীসে আছে- মুমূর্ষু অবস্থা ও মৃত্যু কষ্ট শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার তওবা কবুল করেন। মৃত্যু কষ্ট শুরু হলে আর তওবা কবুল হয় না। তিরমিযী: ৩৫৩৭, ইবনে মাজাহ: ৪২৫৩]

৪১- সূরা হা-মীম আস-সাজদাহ্
৫৪ আয়াত, মক্কী

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. হা-মীম।

حٰمٓ ۚ﴿١﴾

২. এটা রহমান, রহীমের কাছ থেকে নাযিলকৃত

تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۚ﴿٢﴾

৩. এক কিতাব, বিশদভাবে বিবৃত হয়েছে এর আয়াতসমূহ, কুরআনরূপে আরবী ভাষায়, জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য,

كِتٰبٌ فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۙ﴿٣﴾

৪. সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী। অতঃপর তাদের অধিকাংশই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। অতএব, তারা শুনবে না[১]।

بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۚ فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ﴿٤﴾

---

(১) আলোচ্য সূরায় কুরাইশ কাফেরদের প্রত্যক্ষভাবে সম্বোধন করা হয়েছে। তারা কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর প্রাথমিক যুগে বলপূর্বক ইসলামকে নস্যাৎ করার এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার প্রতি বিশ্বাসীদেরকে নানাভাবে নির্যাতনের মাধ্যমে ভীত-সন্ত্রস্ত করার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু ইসলাম তাদের মর্জির বিপরীতে দিন দিন সমৃদ্ধ ও শক্তিশালীই হয়েছে। প্রথমে ওমর ইবন খাত্তাবের ন্যায় অসম সাহসী বীর পুরুষ ইসলামে দাখিল হন। অতঃপর সর্বজনস্বীকৃত কুরাইশ সরদার হামযা মুসলিম হয়ে যান। ফলে কুরাইশ কাফেররা ভীতি প্রদর্শনের পথ পরিত্যাগ করে প্রলোভন ও প্ররোচনার মাধ্যমে ইসলামের অগ্রযাত্রা ব্যাহত করার কৌশল চিন্তা করতে শুরু করে। এমনি ধরনের এক ঘটনা হাফেয ইবন কাসীর মুসনাদে বায্যার, আবু ইয়া'লা ও বগভী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন।

ঘটনা হচ্ছে, কুরাইশ সরদার ওতবা ইবন রবীয়া একদিন একদল কুরাইশসহ মসজিদে হারামে উপবিষ্ট ছিল। অপরদিকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদের এক কোণে একাকী বসেছিলেন। ওতবা তার সঙ্গীদেরকে বলল, তোমরা যদি মত দাও, তবে আমি মুহাম্মদের সাথে কথাবার্তা বলি। আমি তার সামনে কিছু লোভনীয় বস্তু পেশ করব। যদি সে কবুল করে, তবে আমরা সেসব বস্তু তাকে দিয়ে দেব-যাতে সে আমাদের ধর্মের বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান থেকে নিবৃত হয়। এটা তখনকার ঘটনা, যখন হযরত হামযা মুসলিম হয়ে গিয়েছিলেন এবং ইসলামের শক্তি দিন দিন বেড়ে চলছিল। ওতবার সঙ্গীরা সমস্বরে বলে উঠল,

হে আবুল ওলীদ, (ওতবার ডাকনাম), আপনি অবশ্যই তার সাথে আলাপ করুন। ওতবা সেখান থেকে উঠে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে গেল এবং কথাবার্তা শুরু করল: প্রিয় ভ্রাতুস্পুত্র। আপনি জানেন, কুরাইশ বংশে আপনার অসাধারণ মর্যাদা ও সম্মান রয়েছে। আপনার বংশ সুদুর বিস্তৃত এবং আমরা সবাই আপনার কাছে সম্মানার্হ। কিন্তু আপনি জাতিকে এক গুরুতর সংকটে জড়িত করে দিয়েছেন। আপনার আনীত দাওয়াত জাতিকে বিভক্ত করে দিয়েছে, তাদেরকে বোকা ঠাওরিয়েছে, তাদের উপাস্য দেবতা ও ধর্মের গায়ে কলঙ্ক আরোপ করেছে এবং তাদের পূর্বপুরুষদেরকে কাফের আখ্যায়িত করেছে। এখন আপনি আমার কথা শুনুন। আমি কয়েকটি বিষয় আপনার সামনে পেশ করছি, যাতে আপনি কোন একটি পছন্দ করে নেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আবুল ওলীদ, বলুন, আপনি কি বলতে চান। আমি শুনব।
আবুল ওলীদ বলল: ভ্রাতুস্পুত্র! যদি আপনার পরিচালিত দাওয়াতের উদ্দেশ্য ধন-সম্পদ অর্জন করা হয়, তবে আমরা ওয়াদা করছি, আপনাকে কুরাইশ গোত্রের সেরা বিত্তশালী করে দেব। আর যদি শাসনক্ষমতা অর্জন করা লক্ষ্য হয়, তবে আমরা আপনাকে কুরাইশের প্রধান সরদার মেনে নেব এবং আপনার আদেশ ব্যতীত কোন কাজ করব না। আপনি রাজত্ব চাইলে আমরা আপনাকে রাজারূপেও স্বীকৃতি দেব। পক্ষান্তরে যদি কোন জিন অথবা শয়তান আপনাকে দিয়ে এসব কাজ করায় বলে আপনি মনে করেন এবং আপনি সেটাকে বিতাড়িত করতে অক্ষম হয়ে থাকেন, তবে আমরা আপনার জন্যে চিকিৎসক ডেকে আনব, সে আপনাকে এই কষ্ট থেকে উদ্ধার করবে। এর যাবতীয় ব্যয়ভার আমরাই বহন করব। কেননা, আমরা জানি, মাঝে মাঝে জিন অথবা শয়তান মানুষকে কাবু করে ফেলে এবং চিকিৎসার ফলে তা সেরে যায়।
ওতবার এই দীর্ঘ বক্তৃতা শুনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: আবুল ওলীদ। আপনার বক্তব্য শেষ হয়েছে কি? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এবার আমার কথা শুনুন। সে বলল, অবশ্যই শুনব।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের পক্ষ থেকে কোন জওয়াব দেয়ার পরিবর্তে আলোচ্য সূরা 'ফুসসিলাত' তেলাওয়াত করতে শুরু করে দিলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তেলাওয়াত করতে করতে যখন ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ﴾ পর্যন্ত পৌছালেন, তখন ওতবা তাঁর মুখে হাত রেখে দিল এবং বংশ ও আত্মীয়তার কসম দিয়ে বলল, আমার প্রতি দয়া করুন, আর পাঠ করবেন না। অন্য বর্ণনায় এসেছে- রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তেলাওয়াত শুরু করলে ওতবা চুপচাপ শুনতে থাকে এবং হাতের পিঠ পিছনে লাগিয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেজদার আয়াতে পৌঁছে সেজদা করলেন এবং ওতবাকে বললেন: আবুল ওলীদ! আপনি যা শুনবার শুনলেন। এখন আপনি যা ইচ্ছা করতে

وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا فِيْٓ اَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ وَفِيْٓ اٰذَانِنَا وَقْرٌ وَّمِنْۢ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ اِنَّنَا عٰمِلُوْنَ ۝٥

৫. আর তারা বলে, 'তুমি যার প্রতি আমাদেরকে ডাকছ সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণ-আচ্ছাদিত, আমাদের কানে আছে বধিরতা এবং তোমার ও আমাদের মধ্যে আছে পর্দা; কাজেই তুমি তোমার কাজ কর, নিশ্চয় আমরা আমাদের কাজ করব।'

قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَاسْتَقِيْمُوْٓا اِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ ۝٦

৬. বলুন, 'আমি কেবল তোমাদের মত একজন মানুষ, আমার প্রতি ওহী হয় যে, তোমাদের ইলাহ্ই কেবলমাত্র এক ইলাহ্। অতএব তোমরা তাঁর প্রতি দৃঢ়তা অবলম্বন কর এবং তাঁরই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। আর দুর্ভোগ মুশরিকদের জন্য ---

পারেন। ওতবা সেখান থেকে উঠে তার লোকজনের দিকে চলল। তারা দূর থেকে ওতবাকে দেখে পরস্পর বলতে লাগল, আল্লাহর কসম, আবুল ওলীদের মুখমন্ডল বিকৃত দেখা যাচ্ছে। সে যে মুখ নিয়ে এখান থেকে গিয়েছিল, সে মুখ আর নেই। ওতবা মজলিসে পৌছলে সবাই বলল, বলুন, কি খবর আনলেন। ওতবা বলল, খবর এই: আল্লাহর কসম। আমি এমন কালাম শুনেছি, যা জীবনে কখনও শুনিনি। আল্লাহর কসম, সেটা জাদু নয়, কবিতা নয় এবং অতীন্দ্রিয়বাদীদের শয়তান থেকে অর্জিত কখনও নয়। হে কুরাইশ সম্প্রদায়, তোমরা আমার কথা মেনে নাও এবং ব্যাপারটি আমার কাছে সোপর্দ কর। আমার মতে তোমরা তার মোকাবেলা ও তাকে নির্যাতন করা থেকে সরে আস এবং তাকে তার কাজ করতে দাও। কেননা, তার এই কালামের এক বিশেষ পরিণতি প্রকাশ পাবেই। তোমরা এখন অপেক্ষা কর। অবশিষ্ট আরবদের আচরণ দেখে যাও। যদি তারাই কুরাইশের সহযোগিতা ব্যতীত তাকে পরাভুত করে ফেলে, তবে বিনা শ্রমেই তোমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে যাবে। আর সে যদি সবার উপর প্রবল হয়ে যায়, তবে তার রাজত্ব হবে তোমাদেরই রাজত্ব; তার ইয্যত হবে তোমাদেরই ইযযত। তখন তোমরাই হবে তার সাফল্যের অংশীদার। তার সঙ্গীরা তার একথা শুনে বলল, আবুল ওলীদ, তোমাকে তো মুহাম্মদ কথা দিয়ে জাদু করেছে। ওতবা বলল, আমারও অভিমত তাই। এখন তোমাদের যা মন চায়, তাই কর। [মুসান্নাফে ইবন আবী শাইবাহ ১৪/২৯৫, মুসনাদে আবি ইয়া'লা, হাদীস নং ১৮১৮, মুস্তাদরাকে হাকিম ২/২৫৩, বাইহাকী, দালায়েল ২/২০২-২০৪]

الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ۝

৭. যারা যাকাত প্রদান করে না এবং তারাই আখিরাতের সাথে কুফরিকারী ।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ۝

৮. নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার[১] ।

দ্বিতীয় রুকূ'

قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِيْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِيْ يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُوْنَ لَهٗۤ اَنْدَادًا ؕ ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

৯. বলুন, 'তোমরা কি তাঁর সাথেই কুফরী করবে যিনি যমীন সৃষ্টি করেছেন[২] দু'দিনে এবং তোমরা কি তাঁর সমকক্ষ তৈরী করছ? তিনি সৃষ্টিকুলের রব!

وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبٰرَكَ فِيْهَا وَقَدَّرَ فِيْهَاۤ اَقْوَاتَهَا فِيْۤ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ ؕ سَوَآءً

১০. আর তিনি স্থাপন করেছেন অটল পর্বতমালা ভূপৃষ্ঠে এবং তাতে

(১) মূল আয়াতে ممنون কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে। এ কথাটির আরো দুটি অর্থ আছে। একটি অর্থ হচ্ছে, তা হবে এমন পুরস্কার যা স্মরণ করিয়ে দেয়া হবে না বা সে জন্য খোঁটা দেয়া হবে না, যেমন কোন কৃপণ হিম্মত করে কোন কিছু দিলেও সে দানের কথা বার বার স্মরণ করিয়ে দেয়। আরেকটি অর্থ হচ্ছে, তা হবে এমন পুরস্কার যা কখনো হ্রাস পাবে না। উদ্দেশ্য এই যে, মুমিন ও সৎকর্মীদেরকে আখেরাতের স্থায়ী ও নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার দেয়া হবে। কোন কোন তফসীরবিদ এর অর্থ এই করেছেন যে, মুমিন ব্যক্তির অভ্যস্ত আমল কোন সময় কোন অসুস্থতা, সফর কিংবা অন্য কোন ওযরবশতঃ ছুটে গেলেও সে আমলের পুরস্কার ব্যাহত হয় না বরং আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাগণকে আদেশ করেন, আমার বান্দা সুস্থ অবস্থায় অথবা অবসর সময়ে যে আমল নিয়মিত করত, তার ওযর অবস্থায় সে আমল না করা সত্ত্বেও তার আমলনামায় তা লিখে দাও। এ বিষয়বস্তুর হাদীস সহীহ বোখারীতে বর্ণিত হয়েছে। [দেখুন-২৯৯৬]

(২) আলোচ্য আয়াতে মুশরিকদেরকে তাদের শিরক ও কুফরের কারণে এক সাবলীল ভঙ্গিতে হুশিয়ার করা উদ্দেশ্য। এতে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিগুণ তথা বিরাটকায় আকাশ ও পৃথিবীকে অসংখ্য রহস্যের উপর ভিত্তিশীল করে সৃষ্টি করার বিশদ বিবরণ দিয়ে তাদেরকে এই বলে শাসানো হয়েছে যে, তোমরা এমন নির্বোধ যে, মনে স্রষ্টা ও সর্বশক্তিমানের সাথেও অপরকে শরীক সাব্যস্ত কর? এমনি ধরনের হুশিয়ারী ও বিবরণ পবিত্র কুরআনের অন্যত্র এভাবে উল্লেখিত হয়েছে, ﴿كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ﴾ [সূরা আল-বাকারা: ২৮]

لِّلسَّآئِلِيْنَ ⑩	দিয়েছেন বরকত এবং চার দিনের মধ্যে[১] এতে খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন

(১) আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির বিষয় পবিত্র কুরআনে সংক্ষেপে ও বিস্তারিতভাবে বহু জায়গায় বিবৃত হয়েছে, কিন্তু কোনটির পরে কোনটি সৃজিত হয়েছে, এর উল্লেখ সম্ভবতঃ মাত্র তিন আয়াতে করা হয়েছে- (এক) হা-মীম সাজদার আলোচ্য আয়াত, (দুই) সূরা বাকারার ২৯ নং আয়াত ﴿هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ اسْتَوٰٓى اِلَى السَّمَآءِ فَسَوّٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ﴾ এবং (তিন) সূরা আন-নাযি'আতের নিম্নোক্ত আয়াত: ﴿ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَآءُ ۚ بَنٰىهَا ۞ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰىهَا ۞ وَاَغْطَشَ لَيْلَهَا وَاَخْرَجَ ضُحٰىهَا ۞ وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰىهَا ۞ اَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعٰىهَا ۞ وَالْجِبَالَ اَرْسٰىهَا﴾ বাহ্যদৃষ্টিতে এসব বিষয়বস্তুর মধ্যে কিছু বিরোধও দেখা যায়। কেননা, সূরা বাকারাহ্ ও সূরা হা-মীম সেজদার আয়াত থেকে জানা যায় যে, আকাশের পূর্বে পৃথিবী সৃজিত হয়েছে এবং সূরা আন-নাযি'আতের আয়াত থেকে এর বিপরীতে জানা যায় যে, আকাশ সৃজিত হওয়ার পরে পৃথিবী সৃজিত হয়েছে। সবগুলো আয়াত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে মনে হয় যে, প্রথমে পৃথিবীর উপকরণ সৃজিত হয়েছে। এমতাবস্থায়ই ধুম্রকুঞ্জের আকারে আকাশের উপকরণ নির্মিত হয়েছে। এরপর পৃথিবীকে বর্তমান আকারে বিস্তৃত করা হয়েছে এবং এতে পর্বতমালা, বৃক্ষ ইত্যাদি সৃষ্টি করা হয়েছে। এরপর আকাশের তরল ধুম্রকুঞ্জের উপকরণকে সপ্ত আকাশে পরিণত করা হয়েছে। আশা করি সবগুলো আয়াতই এই বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। বাকী প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। সহীহ বুখারীতে এ আয়াতের অধীনে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে কতিপয় প্রশ্ন ও উত্তর বর্ণিত হয়েছে। তাতে ইবন আব্বাস এ আয়াতের উপর্যুক্তরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। [বুখারী: কিতাবুত তাফসীর, বাব হা-মীম-আস-সাজদাহ]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার হাত ধরে বললেন, "আল্লাহ্ মাটি সৃষ্টি করেছেন শনিবার, আর তাতে পাহাড় সৃষ্টি করেছেন রবিবার, গাছ-গাছালি সোমবার, অপছন্দনীয় সবকিছু মঙ্গলবার, আলো সৃষ্টি করেছেন বুধবার, আর যমীনে জীব-জন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন বৃহস্পতিবার। আর আদমকে শুক্রবার আছরের পরে সর্বশেষ সৃষ্টি হিসেবে দিনের সর্বশেষ প্রহরে আসর থেকে রাত পর্যন্ত সময়ে সৃষ্টি করেছেন।" [মুসলিম: ২৭৮৯] এই হিসাব মতে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সাত দিনে হয়েছে বলে জানা যায়। কিন্তু কুরআনের আয়াত থেকে পরিস্কারভাবে জানা যায় যে, এই সৃষ্টিকাজ ছয় দিনে হয়েছে। এক আয়াতে আছে: "আমি আকাশ পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছি এবং আমাকে কোন ক্লান্তি স্পর্শ করেনি।" [সূরা কাফ:৩৮] এ কারণে হাদীসবিদগণ উপরোক্ত বিশুদ্ধ বর্ণনাটির বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। কেউ কেউ হাদীসটিকে অগ্রাহ্য বলে মনে করেছেন। আবার কেউ কেউ বর্ণনাটিকে কা'ব আহবারের উক্তি বলেও অভিহিত করেছেন। [ইবনে কাসীর] কিন্তু যেহেতু হাদীসটি সহীহ সনদে

বর্ণিত হয়েছে, তাই এটাকে অগ্রাহ্য করার কোন সুযোগ নেই। আল্লামা মুহাম্মাদ নাসেরুদ্দিন আল-আলবানী বলেন, এ হাদীসের সনদে কোন সমস্যা নেই। আর এ বর্ণনাটি কোনভাবেই কুরআনের বিরোধিতা করে না। যেমনটি কেউ কেউ মনে করে থাকে। কেননা, হাদীসটি শুধুমাত্র যমীন কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে তা বর্ণনা করে। আর তা ছিল সাতদিনে। আর কুরআনে এসেছে যে, আসমান ও যমীন সৃষ্টি হয়েছিল ছয় দিনে। আর যমীন সৃষ্টি হয়েছিল দুই দিনে। আসমান ও যমীন সৃষ্টির ছয়দিন এবং এ হাদীসে বর্ণিত সাতদিন ভিন্ন ভিন্ন সময় হতে পারে। আসমান ও যমীন ছয়দিনে সৃষ্টি হওয়ার পর যমীনকে আবার বসবাসের উপযোগী করার জন্য সাতদিন লেগেছিল। সুতরাং আয়াত ও সহীহ হাদীসের মধ্যে কোন বিরোধ নেই।

সারকথা এই যে, পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহকে একত্রিত করার ফলে কয়েকটি বিষয় নিশ্চিতরূপে জানা যায়, প্রথমত: আকাশ, পৃথিবী ও এতদূভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু মাত্র ছয় দিনে সৃজিত হয়েছে। সূরা হা-মীম সেজদার আয়াত থেকে দ্বিতীয়ত: জানা যায় যে, পৃথিবী, পর্বতমালা, বৃক্ষরাজি ইত্যাদি সৃষ্টিতে পূর্ণ চার দিন লেগেছে। তৃতীয়ত: জানা যায় যে, আকাশমন্ডলীর সৃজনে দু'দিন লেগেছিল। চতুর্থত: আসমান, যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সৃষ্টির পর যমীনকে বসবাসের উপযোগী করতে সাতদিন লেগেছিল। এ সাতদিনের সর্বশেষ দিন শুক্রবারের কিছু অংশ বেঁচে গিয়েছিল, যাতে আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছিল।

কোন কোন মুফাসসির উপরোক্ত হাদীস অগ্রহণযোগ্য বিবেচনা করে আসমান ও যমীন সৃষ্টির ক্ষেত্রে শুধু কুরআনের ভাষ্যের উপর নির্ভর করেছেন। তাদের মতে, এসব আয়াতের বাহ্যিক অর্থ এই যে, আকাশ সৃষ্টির পরে পৃথিবীকে বিস্তৃত ও সম্পূর্ণ করা হয়েছে। তাই এটা অবান্তর নয় যে, পৃথিবী সৃষ্টির কাজ দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম দু'দিনে পৃথিবী ও তার উপরিভাগের পর্বতমালা ইত্যাদির উপকরণ সৃষ্টি করা হয়েছে। এরপর দু'দিনে সপ্ত আকাশ সৃজিত হয়েছে। এরপর দু'দিনে পৃথিবীর বিস্তৃতি ও তৎমধ্যবর্তী পর্বতমালা, বৃক্ষরাজি, নদ-নদী, ঝর্ণা ইত্যাদির সৃষ্টি সম্পন্ন করা হয়েছে। এভাবে পৃথিবী সৃষ্টির চার দিন উপর্যুপরি রইল না। সূরা হা-মীম সেজদার আয়াতে প্রথমে ﴿خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ﴾ দু'দিনে পৃথিবী সৃষ্টির কথা বলে মুশরিকদেরকে হুশিয়ার করা হয়েছে। অতঃপর আলাদা করে বলা হয়েছে- ﴿وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ﴾ "আর তিনি স্থাপন করেছেন অটল পর্বতমালা ভূপৃষ্ঠে এবং তাতে দিয়েছেন বরকত এবং চার দিনের মধ্যে এতে খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন"। এতে তফসীরবিদগণ একমত যে, এই চার দিন প্রথমোক্ত দু'দিনসহ; পৃথক চার দিন নয়। নতুবা তা সর্বমোট আট দিন হয়ে যাবে, যা কুরআনের বর্ণনার বিপরীত। এখন চিন্তা করলে জানা যায় যে, ﴿خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ﴾ বলার পর যদি পবর্তমালা ইত্যাদির সৃষ্টিও দু'দিনে বলা হত, তবে মোট চারদিন আপনা-আপনিই

সমভাবে যাচঞাকারীদের জন্য ।

১১. তারপর তিনি আসমানের প্রতি ইচ্ছে করলেন, যা (পূর্বে) ছিল ধোঁয়া। অতঃপর তিনি ওটাকে (আসমান) ও যমীনকে বললেন, 'তোমরা উভয়ে আস ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়।' তারা বলল, 'আমরা আসলাম অনুগত হয়ে।'

ثُمَّ اسْتَوٰٓى إِلَى السَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا ۖ قَالَتَآ أَتَيْنَا طَآئِعِينَ ﴿١١﴾

১২. অত:পর তিনি সেগুলোকে সাত আসমানে পরিণত করলেন দু'দিনে এবং প্রত্যেক আসমানে তার নির্দেশ ওহী করে পাঠালেন এবং আমরা নিকটবর্তী আসমানকে সুশোভিত করলাম প্রদীপমালা দ্বারা এবং করলাম সুরক্ষিত। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের ব্যবস্থাপনা।

فَقَضٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحٰى فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا ۚ وَزَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ ۖ وَحِفْظًا ۚ ذٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿١٢﴾

১৩. অতঃপর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বলুন, 'আমি তো তোমাদেরকে সতর্ক করছি এক ধ্বংসকর শাস্তি সম্পর্কে, 'আদ ও সামূদের শাস্তির অনুরূপ।'

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صٰعِقَةً مِّثْلَ صٰعِقَةِ عَادٍ وَّثَمُودَ ﴿١٣﴾

১৪. যখন তাদের কাছে তাদের সামনে ও পিছন থেকে রাসূলগণ এসে বলেছিলেন যে, 'তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া কারো 'ইবাদাত করো না।' তারা

إِذْ جَآءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّا اللّٰهَ ۖ قَالُوا لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً فَإِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُمْ بِهِ كٰفِرُونَ ﴿١٤﴾

জানা যেত, কিন্তু পবিত্র কুরআন পৃথিবী সৃষ্টির অবশিষ্টাংশ উল্লেখ করে বলেছে, এ হল মোট চার দিন। এতে বাহ্যত: ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এই চার দিন উপর্যুপরি ছিল না; বরং দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। দু'দিন আকাশ সৃষ্টির পূর্বে এবং দু'দিন তার পরে। আয়াতে ﴿وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا﴾ বাক্যে আকাশ সৃষ্টির পরবর্তী অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। [ইবন কাসীর]

বলেছিল, 'যদি আমাদের রব ইচ্ছে করতেন তবে তিনি অবশ্যই ফেরেশ্‌তা নাযিল করতেন। অতএব তোমরা যা সহ প্রেরিত হয়েছ, নিশ্চয় আমরা তার সাথে কুফরী করলাম।'

১৫. অতঃপর 'আদ সম্প্রদায়, তারা যমীনে অযথা অহংকার করেছিল এবং বলেছিল, 'আমাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী কে আছে?' তবে কি তারা লক্ষ্য করেনি যে, নিশ্চয় আল্লাহ্, যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী? আর তারা আমাদের নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করত।

فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿١٥﴾

১৬. তারপর আমরা তাদের উপর প্রেরণ করলাম ঝঞ্ঝাবায়ু[১] অশুভ

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ

(১) এটা صاعقة এরই ব্যাখ্যা, যা পূর্বের ১৩ নং আয়াতে আদ ও সামুদের صاعقة বলে বর্ণিত হয়েছে। صاعقة শব্দের আসল অর্থ অচেতন ও বেহুশকারী বস্তু। এ কারণেই বজ্রকেও صاعقة বলা হয়। আকস্মিক বিপদ অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আদ সম্প্রদায়ের উপর চাপানো ঝড়ও একটি صاعقة ছিল। একেই এখানে ﴿رِيحًا صَرْصَرًا﴾ নামে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাস বুঝাতে এ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেনঃ এর অর্থ মারাত্মক 'লু' প্রবাহ; কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বাতাস এবং কারো কারো মতে এর অর্থ এমন বাতাস যা প্রবাহিত হওয়ার সময় প্রচণ্ড শব্দ সৃষ্টি হয়। তবে এ অর্থে সবাই একমত যে, শব্দটি প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। [দেখুন-তবারী] কুরআন মজীদের অন্যান্য স্থানে এ আযাব সম্পর্কে যেসব বিস্তারিত বর্ণনা আছে তা হচ্ছে, এ বাতাস উপর্যুপরি সাত দিন এবং আট রাত পর্যন্ত প্রবাহিত হয়েছিলো। এর প্রচণ্ডতায় মানুষ পড়ে গিয়ে এমনভাবে মৃত্যুবরণ করে এবং মরে মরে পড়ে থাকে যেমন খেজুরের ফাঁপা কাণ্ড পড়ে থাকে [আল-হাক্কাহ:৭]। এ বাতাস যে জিনিসের ওপর দিয়েই প্রবাহিত হয়েছে তাকেই জরাজীর্ণ করে ফেলেছে [আয-যারিয়াত:৪২]। যে সময় এ বাতাস এগিয়ে আসছিলো তখন আদ জাতির লোকেরা এই ভেবে আনন্দে মেতে উঠেছিলো যে মেঘ চারদিক থেকে ঘিরে আসছে। এখন বৃষ্টি হবে এবং তাদের আশা পূর্ণ হবে। কিন্তু তা এমনভাবে আসলো যে গোটা এলাকাই ধ্বংস করে রেখে গেল [আল-আহকাফ: ২৪, ২৫]

لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ ۖ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ﴿١٦﴾

দিনগুলোতে; যাতে আমরা তাদের আস্বাদন করাতে পারি দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি[১]। আর আখিরাতের শাস্তি তো তার চেয়ে বেশী লাঞ্ছনাদায়ক এবং তাদেরকে সাহায্য করা হবে না।

وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٧﴾

১৭. আর সামূদ সম্প্রদায়, আমরা তাদেরকে পথনির্দেশ করেছিলাম, কিন্তু তারা সৎপথের পরিবর্তে অন্ধপথে চলা পছন্দ করেছিল। ফলে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তির বজ্রাঘাত তাদের পাকড়াও করল; তারা যা অর্জন করেছিল তার জন্য।

وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿١٨﴾

১৮. আর আমরা রক্ষা করলাম তাদেরকে, যারা ঈমান এনেছিল এবং যারা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করত।

তৃতীয় রুকূ'

وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٩﴾

১৯. আর যেদিন আল্লাহ্‌র শত্রুদেরকে আগুনের দিকে সমবেত করা হবে, সেদিন তাদেরকে বিন্যস্ত করা হবে বিভিন্ন দলে।

حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٠﴾

২০. পরিশেষে যখন তারা জাহান্নামের সন্নিকটে পৌঁছবে, তখন তাদের কান, চোখ ও ত্বক তাদের বিরুদ্ধে তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেবে[২]।

(১) দাহ্‌হাক বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর তিন বছর পর্যন্ত বৃষ্টিপাত সম্পূর্ণ বন্ধ রাখেন। কেবল প্রবল শুষ্ক বাতাস প্রবাহিত হত। অবশেষে আট দিন ও সাত রাত্রি পর্যন্ত উপর্যুপরি তুফান চলতে থাকে।[দেখুন, বাগভী,ফাতহুল কাদীর]

(২) হাদীসে এসেছে, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর

وَقَالُوْا لِجُلُوْدِهِمْ لِمَ شَهِدْتُّمْ عَلَيْنَا ۗ قَالُوْٓا اَنْطَقَنَا اللّٰهُ الَّذِيْٓ اَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَّهُوَ خَلَقَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٢١﴾

২১. আর তারা (জাহান্নামীরা) তাদের ত্বককে বলবে, 'কেন তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে?' তারা বলবে, 'আল্লাহ্ আমাদেরকে বাকশক্তি দিয়েছেন, যিনি সবকিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন। আর তিনি তোমাদেরকে

সঙ্গে ছিলাম। অকস্মাৎ তিনি হেসে উঠলেন, অতঃপর বললেন, তোমরা জান, আমি কি কারণে হেসেছি? আমরা আরয করলাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই জানেন। তিনি বললেন, আমি সে কথা স্মরণ করে হেসেছি, বা হাশরে হিসাবের জায়গায় বান্দা তার পালনকর্তাকে বলবে। সে বলবে হে রব, আপনি কি আমাকে যুলুম থেকে আশ্রয় দেননি? আল্লাহ বলবেন, অবশ্যই দিয়েছি। তখন বন্দা বলবে, তাহলে আমি আমার হিসাব নিকাশের ব্যাপারে অন্য কারও সাক্ষ্যে সন্তুষ্ট নই। আমার অস্তিত্বের মধ্য থেকেই কোন সাক্ষী না দাড়ালে আমি সন্তুষ্ট হব না। আল্লাহ তা'আলা বলবেন ﴿كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا﴾ অর্থাৎ ভাল কথা, তুমি নিজেই তোমার হিসাব করে নাও। এরপর তার মুখে মোহর এটে দেয়া হবে এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে বলবে, অর্থাৎ তোমরা ধ্বংস হও, আমি তো দুনিয়াতে যা কিছু করেছি, তোমাদেরই সুখের জন্য করেছি। এখন তোমরাই আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে শুরু করলে। [মুসলিম: ২৯৩৯] অন্য বর্ণনায় এসেছে, এ ব্যক্তির মুখে মোহর এটে দেয়া হবে এবং উরুকে বলা হবে, তুমি কথা বল এবং তার ক্রিয়াকর্ম বর্ণনা কর। তখন মানুষের উরু, মাংস, অস্থি সকলেই তার কর্মের সাক্ষ্য দেবে। [মুসলিম:২৯৬৮]

যেসব আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, আখিরাত শুধু একটি আত্মিক জগত হবে না, বরং মানুষকে সেখানে দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে পুনরায় ঠিক তেমনি জীবিত করা হবে যেমনটি বর্তমানে তারা এই পৃথিবীতে জীবিত আছে-এ আয়াতটি তারই একটি। শুধু তাই নয়, যে দেহ নিয়ে তারা এই পৃথিবীতে আছে ঠিক সেই দেহই তাদের দেয়া হবে। যেসব উপাদান, অঙ্গ-প্রতঙ্গ এবং অণু-পরমাণুর সমন্বয়ে এই পৃথিবীতে তাদের দেহ গঠিত কিয়ামতের দিন সেগুলোই একত্রিত করে দেয়া হবে এবং যে দেহে অবস্থান করে সে পৃথিবীতে কাজ করেছিলো পূর্বের সেই দেহ দিয়েই তাকে উঠানো হবে। এ কথা সুস্পষ্ট যে, যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমন্বয়ে গঠিত দেহ নিয়ে সে পূর্বের জীবনে কোন অপরাধ করেছিলো সেই সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যেই যদি সে অবস্থান করে কেবল তখনি সে সেখানে সাক্ষ্য দিতে সক্ষম হবে। কুরআন মজীদের নিম্ন বর্ণিত আয়াতগুলোও এ বিষয়ের অকাট্য প্রমাণ। সূরা আল-ইসরা:৪৯-৫১, ৯৮; আল-মুমিনূন:৩৫-৩৮, ৮২-৮৩; আস-সাজদাহ:১০; ইয়াসীন:৬৫-৭৯; আস-সাফফাত: ১৬-১৮; আল-ওয়াকি'আ:৪৭-৫০ এবং আন-নাযি'আত:১০-১৪।

প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁরই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।'

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَآ اَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُوْدُكُمْ وَلٰكِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٢﴾

২২. 'আর তোমরা কিছুই গোপন করতে না এ বিশ্বাসে যে, তোমাদের কান, চোখ ও ত্বক তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে না--- বরং তোমরা মনে করেছিলে যে, তোমরা যা করতে তার অনেক কিছুই আল্লাহ্ জানেন না।

وَذٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِيْ ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اَرْدٰىكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٢٣﴾

২৩. 'আর তোমাদের রব সম্বন্ধে তোমাদের এ ধারণাই তোমাদের ধ্বংস করেছে। ফলে তোমরা হয়েছ ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।'

فَاِنْ يَّصْبِرُوْا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ۚ وَاِنْ يَّسْتَعْتِبُوْا فَمَا هُمْ مِّنَ الْمُعْتَبِيْنَ ﴿٢٤﴾

২৪. অতঃপর যদি তারা ধৈর্য ধারণ করে তবে আগুনই হবে তাদের আবাস। আর যদি তারা সন্তুষ্টি বিধান করতে চায় তবে তারা সন্তুষ্টিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُوْا لَهُمْ مَّا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ۚ اِنَّهُمْ كَانُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿٢٥﴾

২৫. আর আমরা তাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম মন্দ সহচরসমূহ, যারা তাদের সামনে ও পিছনে যা আছে তা তাদের দৃষ্টিতে শোভন করে দেখিয়েছিল। আর তাদের উপর শাস্তির বাণী সত্য হয়েছে, তাদের পূর্বে চলে যাওয়া জিন ও মানুষের বিভিন্ন জাতির ন্যায়। নিশ্চয় তারা ছিল ক্ষতিগ্রস্ত।

চতুর্থ রুকূ'

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ

২৬. আর কাফিররা বলে, 'তোমরা এ কুরআনের নির্দেশ শোন না এবং তা

وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ ﴿٢٦﴾

আবৃত্তির সময় শোরগোল সৃষ্টি কর, যাতে তোমরা জয়ী হতে পার।'

فَلَنُذِيْقَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَذَابًا شَدِيْدًا وَّلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَسْوَاَ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٧﴾

২৭. সুতরাং আমরা অবশ্যই কাফিরদেরকে কঠিন শাস্তি আস্বাদন করাব এবং অবশ্যই আমরা তাদেরকে তাদের নিকৃষ্ট কার্যকলাপের প্রতিফল দেব।

ذٰلِكَ جَزَآءُ اَعْدَآءِ اللّٰهِ النَّارُ ۚ لَهُمْ فِيْهَا دَارُ الْخُلْدِ ۗ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ﴿٢٨﴾

২৮. এই আগুন, আল্লাহ্‌র দুশমনদের প্রতিদান; সেখানে তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী আবাস, আমাদের নিদর্শনাবলীর প্রতি তাদের অস্বীকৃতির প্রতিফলস্বরূপ।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا رَبَّنَآ اَرِنَا الَّذَيْنِ اَضَلّٰنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ اَقْدَامِنَا لِيَكُوْنَا مِنَ الْاَسْفَلِيْنَ ﴿٢٩﴾

২৯. আর কাফিররা বলবে, 'হে আমাদের রব! জিন ও মানুষের মধ্য থেকে যে দু'জন আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল তাদেরকে দেখিয়ে দিন, আমরা তাদের উভয়কে আমাদের পায়ের নিচে রাখব, যাতে তারা নিকৃষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়।'

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ﴿٣٠﴾

৩০. নিশ্চয় যারা বলে, 'আমাদের রব আল্লাহ্', তারপর অবিচলিত থাকে, তাদের কাছে নাযিল হয় ফেরেশ্‌তা (এ বলে) যে, 'তোমরা ভীত হয়ো না, চিন্তিত হয়ো না এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তার জন্য আনন্দিত হও।

نَحْنُ اَوْلِيٰٓؤُكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ ۚ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْٓ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ ﴿٣١﴾ۭ

৩১. 'আমরাই তোমাদের বন্ধু দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে। আর সেখানে তোমাদের জন্য থাকবে যা কিছু তোমাদের মন চাইবে এবং সেখানে

তোমাদের জন্য থাকবে যা তোমরা দাবী করবে[১] ।’

৩২. এটা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে আপ্যায়ন হিসেবে ।

نُزُلًا مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ ﴿٣٢﴾

পঞ্চম রুকূ’

৩৩. আর তার চেয়ে কার কথা উত্তম যে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান জানায় এবং সৎকাজ করে । আর বলে, ‘অবশ্যই আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত[২] ।’

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿٣٣﴾

---

(১) ফেরেশতাগণ মুমিনদেরকে বলবে, তোমরা জান্নাতে মনে যা চাইবে তাই পাবে এবং যা দাবী করবে তাই সরবরাহ করা হবে । এর সারমর্ম এই যে, তোমাদের প্রতিটি বাসনা পূর্ণ হবে-তোমরা চাও বা না চাও । অতঃপর نُزُلًا তথা আপ্যায়নের কথা বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এমন অনেক নেয়ামতও পাবে, যার আকাঙ্খাও তোমাদের অন্তরে সৃষ্টি হবে না । যেমন মেহমানের সামনে এমন অনেক বস্তুও আসে যার কল্পনাও পূর্বে করা হয় না, বিশেষতঃ যখন কোন বড় লোকেরা মেহমান হয় । এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যদি জান্নাতী ব্যক্তি নিজ গৃহে সন্তান জন্মের বাসনা করে, তবে গর্ভধারণ, প্রসব, শিশুর দুধ ছাড়ানো এবং যৌবনে পদার্পন সব এক মুহূর্তের মধ্যে হয়ে যাবে । [তিরমিযী: ২৫৬৩]

(২) এটা মুমিনদের দ্বিতীয় অবস্থা । তারা কেবল নিজেদের ঈমান ও আমল নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে না, বরং অপরকেও দাওয়াত দেয় । বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে, তার চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে? মুমিনদের সান্ত্বনা দেয়া এবং মনোবল সৃষ্টির পর এখন তাদেরকে তাদের আসল কাজের প্রতি উৎসাহিত করা হচ্ছে । আগের আয়াতে তাদের বলা হয়েছিলো, আল্লাহর বন্দেগীর ওপর দৃঢ়পদ হওয়া এবং এই পথ গ্রহণ করার পর পুনরায় তা থেকে বিচ্যুত না হওয়াটাই এমন একটা মৌলিক নেকী যা মানুষকে ফেরেশতার বন্ধু এবং জান্নাতের উপযুক্ত বানায় । এখন তাদের বলা হচ্ছে, এর পরবর্তী স্তর হচ্ছে, তোমরা নিজে নেক কাজ করো, অন্যদেরকে আল্লাহর বন্দেগীর দিকে ডাকো এবং ইসলামের ঘোষণা দেয়াই যেখানে নিজের জন্য বিপদাপদ ও দুঃখ-মুসিবতকে আহ্বান জানানোর শামিল এমন কঠিন পরিবেশেও দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করো: আমি মুসলিম । মানুষের জন্য এর চেয়ে উচ্চস্তর আর নেই । কিন্তু আমি মুসলিম বলে কোন ব্যক্তির ঘোষণা করা, পরিণামের পরোয়া না করে সৃষ্টিকে আল্লাহর বন্দেগীর দিকে আহ্বান জানানো এবং কেউ যাতে ইসলাম ও তার ঝাণ্ডাবাহীদের দোষারোপ ও নিন্দাবাদ করার সুযোগ না পায় এ কাজ করতে গিয়ে নিজের তৎপরতাকে সেভাবে পবিত্র রাখা হচ্ছে পূর্ণ মাত্রার নেকী । এ থেকে

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿٣٤﴾

৩৪. আর ভাল ও মন্দ সমান হতে পারে না। মন্দ প্রতিহত করুন তা দ্বারা যা উৎকৃষ্ট; ফলে আপনার ও যার মধ্যে শত্রুতা আছে, সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত।

وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا ۚ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٣٥﴾

৩৫. আর এটি শুধু তারাই প্রাপ্ত হবে যারা ধৈর্যশীল। আর এর অধিকারী তারাই হবে কেবল যারা মহাভাগ্যবান।

وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٦﴾

৩৬. আর যদি শয়তানের পক্ষ থেকে কোন কুমন্ত্রণা আপনাকে প্ররোচিত করে, তবে আপনি আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাইবেন, নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ[১]।

বোঝা গেল যে, মানুষের সেই কথাই সর্বোত্তম ও সর্বোৎকৃষ্ট যাতে অপরকে সত্যের দাওয়াত দেয়া হয়। এতে মুখে, কলমে, অন্য কোনভাবে সর্বপ্রকার দাওয়াতই শামিল রয়েছে। আযানদাতাও এতে দাখিল আছে। কেননা, সে মানুষকে সালাতের দিকে আহবান করে। এ কারণেই আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলেন, আলোচ্য আয়াত মুয়াযযিন সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। কোন কোন মুফাসসির বলেন, এখানে ﴿دَعَا إِلَى اللَّهِ﴾ বাক্যের পর ﴿وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ বলে আযান-ইকামতের মধ্যস্থলে দু'রাকআত সালাত বোঝানো হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আযান ও একামাতের মাঝখানে যে দো'আ হয়, তা প্রত্যাখ্যাত হয় না। [আবু দাউদ: ৫২১]

(১) বলা হয়েছে, শয়তানের প্রতারণার ব্যাপারে সাবধান থাকো। সে অত্যন্ত দরদী ও মঙ্গলকামী সেজে এই বলে তোমাদেরকে উত্তেজিত করবে যে, অমুক অত্যাচার কখনো বরদাশত করা উচিত নয়, অমূকের কাজের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়া উচিত এবং এই আক্রমণের জবাবে লড়াই করা উচিত। তা না হলে তোমাদেরকে কাপুরুষ মনে করা হবে, এবং তোমাদের আদৌ কোন প্রভাব থাকবে না। এ ধরনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তোমরা যখন নিজেদের মধ্যে কোন অযথা উত্তেজনা অনুভব করবে তখন সাবধান হয়ে যাও। কারণ, তা শয়তানের প্ররোচনা। সে তোমাদের উত্তেজিত করে কোন ভুল সংঘটিত করাতে চায়। সাবধান হয়ে যাওয়ার পর মনে করো না, আমি আমার মেজাজকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে রাখছি, শয়তান আমাকে দিয়ে কোন ত্রুটি করাতে পারবে না। নিজের ইচ্ছা শক্তির বিভ্রম হবে শয়তানের আরেকটি বেশী ভয়ংকর হাতিয়ার। এর চেয়ে বরং আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত। কারণ তিনি যদি তাওফীক দান করেন ও রক্ষা করেন তবেই মানুষ ভুল-ত্রুটি থেকে রক্ষা পেতে পারে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে একবার এক ব্যক্তি হযরত আবু বকর

৩৭. আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রাত ও দিন, সূর্য ও চাঁদ। তোমরা সূর্যকে সিজ্‌দা করো না, চাঁদকেও নয়[১]; আর সিজ্‌দা কর আল্লাহ্‌কে,

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿٣٧﴾

সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুকে অকথ্য গালিগালাজ করতে থাকলো। আবু বকর চুপচাপ তার গালি শুনতে থাকলেন আর তার দিকে চেয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুচকি হাসতে থাকলেন। অবশেষে আবু বকর সিদ্দীক জবাবে তাকে একটি কঠোর কথা বলে ফেললেন। তার মুখ থেকে সে কথাটি বের হওয়া মাত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর চরম বিরক্তি ভাব ছেয়ে গেল এবং ক্রমে তা তার পবিত্র চেহারায় ফুটে উঠতে থাকলো। তিনি তখনই উঠে চলে গেলেন। আবু বকরও উঠে তাকে অনুসরণ করলেন এবং পথিমধ্যেই জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কি? সে যখন আমাকে গালি দিচ্ছিলো তখন আপনি চুপচাপ মুচকি হাসছিলেন। কিন্তু যখনই আমি তাকে জবাব দিলাম তখনই আপনি অসন্তুষ্ট হলেন? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ তুমি যতক্ষণ চুপচাপ ছিলে ততক্ষণ একজন ফেরেশতা তোমার সাথে ছিল এবং তোমার পক্ষ থেকে জবাব দিচ্ছিলো। কিন্তু যখন তুমি নিজেই জবাব দিলে তখন ফেরেশতার স্থানটি শয়তান দখল করে নিল। আমি তো শয়তানের সাথে বসতে পারি না। [মুসনাদে আহমাদ:২/৪৩৬]

(১) অর্থাৎ এসব আল্লাহর প্রতিভূ নয় যে এগুলোর আকৃতিতে আল্লাহ নিজেকে প্রকাশ করছেন বলে মনে করে তাদের ইবাদত করতে শুরু করবে। বরং এগুলো আল্লাহর নিদর্শন এসব নিদর্শন নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করলে তোমরা বিশ্ব জাহান ও তার ব্যবস্থাপনার সত্যতা ও বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারবে এবং এ কথাও জানতে পারবে যে নবী-রাসূল আলাইহিমুস সালাম আল্লাহ সম্পর্কে যে তাওহীদের শিক্ষা দিচ্ছেন তাই প্রকৃত সত্য। সূর্য ও চাঁদের উল্লেখের পূর্বে দিন ও রাতের উল্লেখ করা হয়েছে এ বিষয়ে সাবধান করে দেয়ার জন্য যে রাতের বেলা সূর্যের অদৃশ্য হওয়া ও চাঁদের আবির্ভূত হওয়া এবং দিনের বেলা চাঁদের অদৃশ্য হওয়া ও সূর্যের আবির্ভূত হওয়া সুস্পষ্ট ভাবে এ কথা প্রমাণ করে যে, এ দু'টির কোনটিই আল্লাহ্ বা আল্লাহ প্রতিভূ নয়। উভয়েই তাঁর একান্ত দাস। তারা আল্লাহর আইনের নিগড়ে বাঁধা পড়ে আবর্তন করছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাঁদ ও সূর্য সম্পর্কে মানুষের আকীদা-বিশ্বাসকে পরিশুদ্ধ করার জন্য বিভিন্নভাবে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্তান ইব্রাহীম মারা গেলে সেদিনই সূর্যগ্রহণ হয়। লোকেরা বলাবলি করতে লাগলো যে, ইব্রাহীমের মৃত্যুর কারণেই সূর্যগ্রহণ হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন যে, সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ কারো মৃত্যু বা জীবনের জন্য হয় না। বরং এ দু'টি আল্লাহর নিদর্শনাবলী থেকে দু'টি নিদর্শন; যা তিনি তাঁর বান্দাদের দেখিয়ে থাকেন। সুতরাং যখন তোমরা এরূপ কিছু দেখবে, তখন সালাতের দিকে ধাবিত হবে। [বুখারী: ১০৫৮]

যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা কেবলমাত্র তাঁরই ইবাদাত কর।

৩৮. অতঃপর যদি তারা অহংকার করে, তবে যারা আপনার রবের নিকটে রয়েছে তারা তো দিন ও রাতে তাঁর পবিত্রতা, মহিমা ঘোষণা করে এবং তারা ক্লান্তি বোধ করে না।

فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ ۩ ﴿٣٨﴾

৩৯. আর তাঁর একটি নিদর্শন এই যে, আপনি ভূমিকে দেখতে পান শুষ্ক ও ঊষর, অতঃপর যখন আমরা তাতে পানি বর্ষণ করি তখন তা আন্দোলিত ও স্ফীত হয়। নিশ্চয় যিনি যমীনকে জীবিত করেন তিনি অবশ্যই মৃতদের জীবনদানকারী। নিশ্চয় তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ۚ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۚ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

৪০. নিশ্চয় যারা আমার আয়াতসমূহে ইলহাদ করে, তারা আমার অগোচরে নয়। যে অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হবে সে কি শ্রেষ্ঠ, না যে কিয়ামতের দিন নিরাপদে উপস্থিত হবে সে? তোমরা যা ইচ্ছে আমল কর। তোমরা যা আমল কর, নিশ্চয় তিনি তার সম্যক দ্রষ্টা।

إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ۗ أَفَمَن يُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ۖ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤٠﴾

৪১. নিশ্চয় যারা তাদের কাছে কুরআন আসার পর তার সাথে কুফরী করে[১] (তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে); আর এ তো অবশ্যই এক সম্মানিত গ্রন্থ---

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ ۖ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴿٤١﴾

(১) এ আয়াতে ذكر বলে কুরআনকে বোঝানো হয়েছে। [তবারী]

৪২. বাতিল এতে অনুপ্রবেশ করতে পারে না---সামনে থেকেও না, পিছন থেকেও না। এটা প্রজ্ঞাময়, চিরপ্রশংসিতের কাছ থেকে নাযিলকৃত।

لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٢﴾

৪৩. আপনাকে শুধু তা-ই বলা হয়, যা বলা হত আপনার পূর্ববর্তী রাসূলগণকে। নিশ্চয় আপনার রব একান্তই ক্ষমাশীল এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিদাতা।

مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ﴿٤٣﴾

৪৪. আর যদি আমরা এটাকে করতাম অনারবী ভাষার কুরআন তবে তারা অবশ্যই বলত, ‘এর আয়াতগুলো বিশদভাবে বিবৃত হয়নি কেন? ভাষা অনারবীয়, অথচ রাসূল আরবীয়! বলুন, ‘এটি মুমিনদের জন্য হেদায়াত ও আরোগ্য।’ আর যারা ঈমান আনে না তাদের কানে রয়েছে বধিরতা এবং কুরআন এদের (অন্তরের) উপর অন্ধত্ব তৈরী করবে। তাদেরকেই ডাকা হবে দূরবর্তী স্থান থেকে।

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ۖ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ ۗ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ ۖ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۚ أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٤٤﴾

ষষ্ঠ রুকূ’

৪৫. আর অবশ্যই আমরা মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, অতঃপর তাতে মতভেদ ঘটেছিল। আর যদি আপনার রবের পক্ষ থেকে একটি বাণী (সিদ্ধান্ত) পূর্বেই না থাকত তবে তাদের মধ্যে ফয়সালা হয়ে যেত। আর নিশ্চয় তারা এ কুরআন সম্বন্ধে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রয়েছে।

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ ۗ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ﴿٤٥﴾

৪৬. যে সৎকাজ করে সে তার নিজের কল্যাণের জন্যই তা করে এবং কেউ

مَّنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۗ

وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿٤٦﴾

মন্দ কাজ করলে তার প্রতিফল সে-ই ভোগ করবে। আর আপনার রব তাঁর বান্দাদের প্রতি মোটেই যুলুমকারী নন।

إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ ﴿٤٧﴾

৪৭. কিয়ামতের জ্ঞান শুধু আল্লাহ্‌র কাছেই প্রত্যাবর্তিত হয়। তাঁর অজ্ঞাতসারে কোন ফল আবরণ হতে বের হয় না, কোন নারী গর্ভ ধারণ করে না এবং সন্তানও প্রসব করে না[১]। আর যেদিন আল্লাহ্ তাদেরকে ডেকে বলবেন, 'আমার শরীকেরা কোথায়?' তখন তারা বলবে, 'আমরা আপনার কাছে নিবেদন করি যে, এ ব্যাপারে আমাদের থেকে কোন সাক্ষী নেই।'

وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ ۖ وَظَنُّوا

৪৮. আর আগে তারা যাদেরকে ডাকত তারা তাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে

(১) একথা বলে শ্রোতাদেরকে দুটি বিষয় বুঝানো হয়েছে। একটি হচ্ছে, শুধু কিয়ামত নয়, বরং সমস্ত গায়েবী বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট। গায়েবী বিষয়ে জ্ঞানের অধিকারী আর কেউ নেই। অপরটি হচ্ছে, যে আল্লাহ খুঁটিনাটি বিষয়সমূহের এত বিস্তারিত জ্ঞান রাখেন, কোন ব্যক্তির কাজ কর্ম তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। অতএব তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতার আওতায় নির্ভয়ে যা ইচ্ছা তাই করা ঠিক নয়। দ্বিতীয় অর্থ অনুসারে এই বাক্যাংশের সম্পর্ক পরবর্তী বাক্যাংশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। একথাটির পরেই যা বলা হয়েছে সে সম্পর্কে যদি চিন্তা করা হয় তাহলে বক্তব্যের ধারাক্রম থেকে আপনা আপনি একথার ইংগিত পাওয়া যায় যে, কিয়ামতের তারিখ জানার ধান্ধায় কোথায় পড়ে আছ? বরং চিন্তা করো কিয়ামত যখন আসবে তখন নিজের এসব গোমরাহীর জন্য কি দুর্ভোগ পোহাতে হবে। কিয়ামতের তারিখ সম্পর্কে প্রশ্নকারী এক ব্যক্তিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথার মাধ্যমেই জবাব দিয়েছিলেন। একবার সফরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে এক ব্যক্তি দূর থেকে ডাকলো, হে মুহাম্মাদ! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, কি বলতে চাও, বলো। সে বললোঃ কিয়ামত কবে হবে? তিনি জবাবে বললেনঃ "হে আল্লাহর বান্দা, কিয়ামত তো আসবেই। তুমি সে জন্য কি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছো?" [বুখারী: ৬১৬৭, মুসলিম:২৬৩৯]

مَا لَهُمْ مِّنْ مَّحِيصٍ ﴿٤٨﴾

যাবে এবং তারা বিশ্বাস করবে যে, তাদের পলায়নের কোন উপায় নেই।

لَا يَسْـَٔمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَـُٔوسٌ قَنُوطٌ ﴿٤٩﴾

৪৯. মানুষ কল্যাণ প্রার্থনায় কোন ক্লান্তি বোধ করে না, কিন্তু যখন তাকে অকল্যাণ স্পর্শ করে তখন সে প্রচণ্ডভাবে হতাশ ও নিরাশ হয়ে পড়ে;

وَلَئِنْ أَذَقْنٰهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هٰذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَّلَئِنْ رُّجِعْتُ إِلٰى رَبِّيٓ إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنٰى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٥٠﴾

৫০. আর যদি দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করার পর আমরা তাকে আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহের আস্বাদন দেই, তখন সে অবশ্যই বলে থাকে, 'এ আমার প্রাপ্য এবং আমি মনে করি না যে, কিয়ামত সংঘটিত হবে। আর যদি আমাকে আমার রবের কাছে ফিরিয়ে নেয়াও হয়, তবুও তাঁর কাছে আমার জন্য কল্যাণই থাকবে।' অতএব, আমরা অবশ্যই কাফিরদেরকে তাদের আমল সম্বন্ধে অবহিত করব এবং তাদেরকে অবশ্যই আস্বাদন করাব কঠোর শাস্তি।

وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَاٰ بِجَانِبِهٖ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ ﴿٥١﴾

৫১. আর যখন আমরা মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করি তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও দূরে সরে যায়। আর যখন তাকে অকল্যাণ স্পর্শ করে তখন সে দীর্ঘ প্রার্থনাকারী হয়।

قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهٖ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿٥٢﴾

৫২. বলুন, 'তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি এ কুরআন আল্লাহ্‌র কাছ থেকে নাযিল হয়ে থাকে আর তোমরা এটা প্রত্যাখ্যান কর, তবে যে ব্যক্তি ঘোর বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত আছে, তার চেয়ে বেশী বিভ্রান্ত আর কে?'

سَنُرِيهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ؕ اَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ ﴿٥٣﴾

৫৩. অচিরেই আমরা তাদেরকে আমাদের নিদর্শনাবলী দেখাব, বিশ্ব জগতের প্রান্তসমূহে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে; যাতে তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, অবশ্যই এটা (কুরআন) সত্য। এটা কি আপনার রবের সম্পর্কে যথেষ্ট নয় যে, তিনি সব কিছুর উপর সাক্ষী?

اَلَآ اِنَّهُمْ فِىْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَآءِ رَبِّهِمْ ؕ اَلَآ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَىْءٍ مُّحِيْطٌ ﴿٥٤﴾

৫৪. জেনে রাখুন, নিশ্চয় তারা তাদের রবের সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে সন্দিহান। জেনে রাখুন যে, নিশ্চয় তিনি (আল্লাহ্) সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন।

৪২- সূরা আশ-শূরা
৫৩ আয়াত, মক্কী

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. হা-মীম।

حٰمٓ ①

২. ‘আইন-সীন-কাফ।

عٓسٓقٓ ②

৩. এভাবেই আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি ওহী করেন পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্[1]।

كَذٰلِكَ يُوْحِيْٓ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۙ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ③

৪. আসমানসমূহে যা আছে ও যমীনে যা আছে তা তাঁরই। তিনি সুউচ্চ, সুমহান।

لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ④

৫. আসমানসমূহ উপর থেকে ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়, আর ফেরেশ্‌তাগণ তাদের রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং যমীনে যারা আছে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। জেনে রাখুন, নিশ্চয় আল্লাহ্, তিনিই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ فِي الْاَرْضِ ۗ اَلَآ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ⑤

৬. আর যারা তাঁর পরিবর্তে অন্যদেরকে অভিভাবকরূপে[2] গ্রহণ করে, আল্লাহ্

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ اللّٰهُ حَفِيْظٌ عَلَيْهِمْ ۖ

---

(১) অহীর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, দ্রুত ইংগিত এবং গোপন ইংগিত [ইবন হাজার: ফাতহুল বারী: ১/২০৪]

(২) মূল আয়াতে أولياء শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী ভাষায় যার অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। বাতিল উপাস্যদের সম্পর্কে পথভ্রষ্ট মানুষদের বিভিন্ন আকীদা-বিশ্বাস এবং ভিন্ন ভিন্ন অনেক কর্মপদ্ধতি আছে। কুরআন মজীদে এগুলোকেই “আল্লাহ ছাড়া অন্যদের ওলী বা অভিভাবক বানানো” বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কুরআন মজীদে অনুসন্ধান করলে ‘ওলী’ শব্দটির কয়েকটি অর্থ জানা যায়। একঃ মানুষ যার কথামত কাজ করে, যার নির্দেশনা মেনে চলে এবং যার রচিত নিয়ম-পন্থা, রীতিনীতি এবং আইন-কানুন অনুসরণ করে [আন নিসা:১১৮-১২০; আল-আ‘রাফ:৩, ২৭-৩০] দুইঃ যার

وَمَآ أَنتَ عَلَيۡهِم بِوَكِيلٖ

তাদের প্রতি সম্যক দৃষ্টিদাতা। আর আপনি তো তাদের উপর কর্মবিধায়ক নন।

وَكَذَٰلِكَ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ قُرۡءَانًا عَرَبِيّٗا لِّتُنذِرَ أُمَّ ٱلۡقُرَىٰ وَمَنۡ حَوۡلَهَا وَتُنذِرَ يَوۡمَ ٱلۡجَمۡعِ لَا رَيۡبَ فِيهِۚ فَرِيقٞ فِي ٱلۡجَنَّةِ وَفَرِيقٞ فِي ٱلسَّعِيرِ

৭. আর এভাবে আমরা আপনার প্রতি কুরআন নাযিল করেছি আরবী ভাষায়, যাতে আপনি মক্কা ও তার চারদিকের জনগণকে[১] সতর্ক করতে পারেন এবং সতর্ক করতে পারেন কেয়ামতের দিন সম্পর্কে, যাতে কোন সন্দেহ নেই। একদল থাকবে জান্নাতে আরেক দল জলন্ত আগুনে।

وَلَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَهُمۡ أُمَّةٗ وَٰحِدَةٗ

৮. আর আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে তাদেরকে একই উম্মত করতে পারতেন; কিন্তু

দিকনির্দেশনার ওপর মানুষ আস্থা স্থাপন করে এবং মনে করে সে তাকে সঠিক রাস্তা প্রদর্শনকারী এবং ভ্রান্তি থেকে রক্ষাকারী। [আল বাকারাহ: ২৫৭; আল-ইসরা:৯৭; আল-কাহাফ:১৭ ও আল-জাসিয়া:১৯] তিনঃ যার সম্পর্কে মানুষ মনে করে, আমি পৃথিবীতে যাই করি না কেন সে আমাকে তার কুফল থেকে রক্ষা করবে। এমনকি যদি আল্লাহ থাকেন এবং আখেরাত সংঘটিত হয় তাহলে তার আযাব থেকেও রক্ষা করবেন [আন- নিসা:১২৩-১৭৩; আল-আন'আম:৫১; আর-রা'দ:৩৭; আল-'আনকাবুত:২২; আল-আহযাব:৬৫; আয-যুমার:৩] চারঃ যার সম্পর্কে মানুষ মনে করে, পৃথিবীতে তিনি অতি প্রাকৃতিক উপায়ে তাকে সাহায্য করেন, বিপদাপদে তাকে রক্ষা করেন। রুজি-রোজগার দান করেন, সন্তান দান করেন, ইচ্ছা পূরণ করেন এবং অন্যান্য সব রকম প্রয়োজন পূরণ করেন [হুদ:২০; আর-রা'দ-১৬, আল-আনকাবূত:৪১]

(১) এর অর্থ সকল জনপদ ও শহরের মূল ও ভিত্তি। এখানে মক্কা মোকাররমা বোঝানো হয়েছে। এই নামকরণের হেতু এই যে, এ শহরটি সমগ্র বিশ্বের শহর-জনপদ এমনকি ভূ-পৃষ্ঠ অপেক্ষা আল্লাহ তা'আলার কাছে অধিক সম্মানিত ও শ্রেষ্ঠ। [তাবারী,ইবনে কাসীর] হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা থেকে হিজরত করার সময় মক্কাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন: অবশ্যই তুমি আমার কাছে আল্লাহর সমগ্র পৃথিবী থেকে শ্রেষ্ঠ এবং সমগ্র পৃথিবী অপেক্ষা অধিক প্রিয়। যদি আমাকে তোমার থেকে বহিস্কার করা না হত, তবে আমি কখনও স্বেচ্ছায় তোমাকে ত্যাগ করতাম না। [তিরমিযী:৩৯২৬]

وَّلٰكِنۡ يُّدۡخِلُ مَنۡ يَّشَآءُ فِىۡ رَحۡمَتِهٖ‌ؕ وَالظّٰلِمُوۡنَ مَا لَهُمۡ مِّنۡ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيۡرٍ‏ ﴿۸﴾

তিনি যাকে ইচ্ছে তাকে স্বীয় অনুগ্রহে প্রবেশ করান। আর যালিমরা, তাদের কোন অভিভাবক নেই, কোন সাহায্যকারীও নেই।

اَمِ اتَّخَذُوۡا مِنۡ دُوۡنِهٖۤ اَوۡلِيَآءَ‌ ۚ فَاللّٰهُ هُوَ الۡوَلِىُّ وَهُوَ يُحۡىِ الۡمَوۡتٰى وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىۡءٍ قَدِيۡرٌ‏ ﴿۹﴾

৯. তারা কি আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করেছে, কিন্তু আল্লাহ্, অভিভাবক তো তিনিই এবং তিনি মৃতকে জীবিত করেন। আর তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

দ্বিতীয় রুকূ’

وَمَا اخۡتَلَفۡتُمۡ فِيۡهِ مِنۡ شَىۡءٍ فَحُكۡمُهٗۤ اِلَى اللّٰهِ‌ؕ ذٰ لِكُمُ اللّٰهُ رَبِّىۡ عَلَيۡهِ تَوَكَّلۡتُ ‌ۖ وَاِلَيۡهِ اُنِيۡبُ‏ ﴿۱۰﴾

১০. আর তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর না কেন---তার ফয়সালা তো আল্লাহ্‌রই কাছে। তিনিই আল্লাহ্ --- আমার রব; তাঁরই উপর আমি নির্ভর করেছি এবং আমি তাঁরই অভিমুখী হই।

فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ‌ؕ جَعَلَ لَكُمۡ مِّنۡ اَنۡفُسِكُمۡ اَزۡوَاجًا وَّمِنَ الۡاَنۡعَامِ اَزۡوَاجًا ۚ يَذۡرَؤُكُمۡ فِيۡهِ‌ؕ لَيۡسَ كَمِثۡلِهٖ شَىۡءٌ ‌ۚ وَهُوَ السَّمِيۡعُ الۡبَصِيۡرُ‏ ﴿۱۱﴾

১১. তিনি আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা, তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং গৃহপালিত জন্তুর মধ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন জোড়া। এভাবে তিনি তোমাদের বংশ বিস্তার করেন; কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

لَهٗ مَقَالِيۡدُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ‌ۚ يَبۡسُطُ الرِّزۡقَ لِمَنۡ يَّشَآءُ وَيَقۡدِرُ‌ؕ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَىۡءٍ عَلِيۡمٌ‏ ﴿۱۲﴾

১২. তাঁরই কাছে আসমানসমূহ ও যমীনের চাবিকাঠি। তিনি যার জন্যে ইচ্ছে তার রিযিক বাড়িয়ে দেন এবং সংকুচিত করেন। নিশ্চয় তিনি সবকিছু সম্পর্কে সর্বজ্ঞ।

شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴿١٣﴾

১৩. তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দ্বীন, যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহ্‌কে, আর যা আমরা ওহী করেছি আপনাকে এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইব্‌রাহীম, মূসা ও ‘ঈসাকে, এ বলে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে বিভেদ সৃষ্টি কর না[১]। আপনি মুশরিকদেরকে যার প্রতি ডাকছেন তা তাদের কাছে কঠিন মনে হয়। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছে তার দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং যে

---

(১) দ্বীন প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেয়ার পর আল্লাহ এ আয়াতে সর্বশেষ যে কথা বলেছেন তা হচ্ছে ‘দ্বীনে বিভেদ সৃষ্টি করো না’ কিংবা ‘তাতে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ো না। পূর্ববর্তী উম্মতদের কর্মকাণ্ড থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এ ধরনের কাজ থেকে সাবধান করে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবন মসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সামনে একটি সরল রেখা টানলেন। অত:পর এর ডানে ও বায়ে আরও কয়েকটি রেখা টেনে বললেন, ডান-বামের এসব রেখা শয়তানের আবিস্কৃত পথ। এর প্রত্যেকটিতে একটি করে শয়তান নিয়োজিত রয়েছে। সে মানুষকে সে পথেই চলার উপদেশ দেয়। অত:পর তিনি মধ্যবর্তী সকল রেখার দিকে ইশারা করে বললেন: ﴿وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ﴾ “আর এটা আমার সরল পথ, সুতরাং তোমরা এরই অনুসরণ কর।” [মুসনাদে আহমাদ: ১/৪৩৫] এ দৃষ্টান্তে সরল পথ বলে নবী-রাসূলগণের অভিন্ন দ্বীনের পথই বোঝানো হয়েছে। এতে শাখা-প্রশাখা বের করা ও বিভেদ সৃষ্টি করা হারাম ও শয়তানের কাজ। এ সম্পর্কে হাদীসে কঠোর নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: ‘যে ব্যক্তি মুসলিমদের জামাত (সামষ্টিকভাবে সকল উম্মত) থেকে অর্ধ হাত পরিমাণও দূরে সরে পড়ে, সে-ই ইসলামের বন্ধনই তার কাধ থেকে সরিয়ে দিল’। [আবু দাউদ: ৪৭৬০] তিনি আরও বলেন, ‘জামাত (তথা মুসলিম উম্মতের) উপর আল্লাহর হাত রয়েছে।’ [নাসায়ী: ৪০২০] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন, ‘শয়তান মানুষের জন্য ব্যাঘ্রস্বরূপ। বাঘ ছাগলের পেছনে লাগে অত:পর যে ছাগল পালের পেছনে অথবা এদিক ওদিক বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে সেটির উপরই পতিত হয়। তাই তোমাদের উচিত দলের সঙ্গে থাকা-পৃথক না থাকা। [মুসনাদে আহমাদ: ৫/২৩২] মনে রাখতে হবে যে, মুসলিমরা সবাই এক উম্মত; তাদের থেকে কেউ আলাদা কোন দল করে পৃথক হলে সে উম্মতের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ঘটালো। এটাই শরী‘আতে নিন্দনীয়।

তাঁর অভিমুখী হয় তাকে তিনি দ্বীনের দিকে হেদায়াত করেন।

وَمَا تَفَرَّقُوٓا۟ إِلَّا مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِىَ بَيْنَهُمْ ۚ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِنۢ بَعْدِهِمْ لَفِى شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ﴿١٤﴾

১৪. আর তাদের কাছে জ্ঞান আসার পর শুধুমাত্র পারস্পরিক বিদ্বেষবশত[১] তারা নিজেদের মধ্যে মতভেদ ঘটায়। আর এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত অবকাশ সম্পর্কে আপনার রবের পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকলে তাদের বিষয় ফয়সালা হয়ে যেত। আর তাদের পর যারা কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়েছে, নিশ্চয় তারা সে সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রয়েছে।

فَلِذَٰلِكَ فَٱدْعُ ۖ وَٱسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ ۖ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَٰبٍ ۖ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ۖ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۖ لَنَآ أَعْمَٰلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَٰلُكُمْ ۖ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ۖ ٱللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۖ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿١٥﴾

১৫. সুতরাং আপনি আহ্বান করুন[২] এবং দৃঢ় থাকুন, যেভাবে আপনি আদিষ্ট হয়েছেন। আর আপনি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না; এবং বলুন, 'আল্লাহ্ যে কিতাব নাযিল করেছেন আমি তাতে ঈমান এনেছি এবং আমি আদিষ্ট হয়েছি তোমাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করতে। আল্লাহ্ আমাদের রব এবং তোমাদেরও রব। আমাদের আমল আমাদের এবং তোমাদের আমল তোমাদের; আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোন বিবাদ-বিসম্বাদ নেই। আল্লাহ্ আমাদেরকে একত্র করবেন এবং

(১) এই মতভেদ সৃষ্টির চালিকা শক্তি ছিল নিজের নাম ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চিন্তা, পারস্পরিক জিদ ও একগুঁয়েমি, একে অপরকে পরাস্ত করার প্রচেষ্টা এবং সম্পদ ও মর্যাদা অর্জন প্রচেষ্টার ফল। [কুরতুবী,ফাতহুল কাদীর]

(২) তাওহীদের দিকে, অথবা এ সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীনের দিকে। যার নির্দেশ তিনি সমস্ত নবী-রাসূলদের দিয়েছেন এবং তার ওসিয়ত করেছেন। [জালালাইন; মুয়াসসার]

ফিরে যাওয়া তাঁরই কাছে[১] ।'

(১) হাফেয ইবনে কাসীর বলেন, দশটি বাক্য সম্বলিত এই আয়াতের প্রত্যেকটি বাক্যে বিশেষ বিশেষ বিধান বর্ণিত হয়েছে। সমগ্র কুরআনে আয়াতুল কুরসীই এর একমাত্র দৃষ্টান্ত। তাতেও দশটি বিধান বিধৃত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের প্রথম বিধান হচ্ছে ﴿فَلِذٰلِكَ فَادْعُ﴾ অর্থাৎ যদিও মুশরেকদের কাছে আপনার তওহীদের দাওয়াত কঠিন মনে হয়, তথাপি আপনি এ দাওয়াত ত্যাগ করবেন না এবং উপর্যুপরি দাওয়াতের কাজ অব্যাহত রাখুন।
দ্বিতীয় বিধান ﴿وَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ﴾ অর্থাৎ আপনি এ দ্বীনে নিজে অবিচল থাকুন, যেমন আপনাকে আদেশ করা হয়েছে। যাবতীয় বিশ্বাস, কর্ম, চরিত্র, অভ্যাস ও সামাজিকতার যথাযথ সমতা ও ভারসাম্য কায়েম রাখুন। কোন দিকেই যেন কোনরূপ বাড়াবাড়ি না হয়। কাফেদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য এই দ্বীনের মধ্যে কোন রদবদল ও হ্রাস-বৃদ্ধি করবেন না। 'কিছু নাও এবং কিছু দাও' নীতির ভিত্তিতে এই পথভ্রষ্ট লোকদের সাথে কোন আপোষ করবেন না। বলাবাহুল্য, এরূপ দৃঢ়তা সহজসাধ্য নয়। এ কারণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাহাবায়ে কেরামদের কেউ জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনাকে বৃদ্ধ দেখাচ্ছে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: شَيَّبَتْنِيْ هُوْد অর্থাৎ সুরা হুদ আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে। সূরা হূদের ১১২ নং আয়াতে এ আদেশ এ ভাষায়ই ব্যক্ত হয়েছে। সেখানেও দ্বীনের উপর অবিচল থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।
তৃতীয় বিধান- ﴿وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ﴾ অর্থাৎ প্রচারের দায়িত্ব পালনে আপনি কারও বিরোধিতার পরওয়া করবেন না। শুধু কোন না কোন ভাবে ইসলামের গণ্ডির মধ্যে এসে যাক, এ লোভের বশবর্তী হয়ে এদের কুসংস্কার ও গোঁড়ামি এবং জাহেলী আচার-আচরণের জন্য দ্বীনের মধ্যে কোন অবকাশ সৃষ্টি করবেন না। আল্লাহ তাঁর দ্বীনকে যেভাবে নাযিল করেছেন কেউ মানতে চাইলে সেই খাঁটি ও মূল দ্বীনকে যেন সরাসরি মেনে নেয়। অন্যথায় যে জাহান্নামে হুমড়ি খেয়ে পড়তে চায় পড়ুক। মানুষের ইচ্ছানুসারে আল্লাহর দ্বীনের পরিবর্তন সাধন করা যায় না। মানুষ যদি নিজের কল্যাণ চায় তাহলে যেন নিজেকেই পরিবর্তন করে দ্বীন অনুসারে গড়ে নেয়।
চতুর্থ বিধান- ﴿وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ﴾ অর্থাৎ আপনি ঘোষনা করুন: আল্লাহ তা'আলা যত কিতাব নাযিল করেছেন, সবগুলোর প্রতি আমি ঈমান এনেছি। অন্য কথায় আমি সেই বিভেদ সৃষ্টিকারী লোকদের মত নই যারা আল্লাহর প্রেরিত কোন কোন কিতাব মানে আবার কোন কোনটি মানে না। আমি আল্লাহর প্রেরিত প্রতিটি কিতাবই মানি।
পঞ্চম বিধান- ﴿وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ﴾ এই ব্যাপকার্থক আয়াতাংশের কয়েকটি অর্থ হয়ঃ একটি অর্থ হচ্ছে, আমি এসব দলাদলি থেকে দূরে থেকে নিরপেক্ষ ন্যায়

নিষ্ঠা অবলম্বনের জন্য আদিষ্ট। কোন দলের স্বার্থে এবং কোন দলের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্ব করা আমার কাজ নয়। সব মানুষের সাথে আমার সমান সম্পর্ক। আর সে সম্পর্ক হচ্ছে ন্যায় বিচার ও ইনসাফের সম্পর্ক। যার যে বিষয়টি ন্যায় ও সত্য সে যত দূরেরই হোক না কেন আমি তার সহযোগী। আর যার যে বিষয়টি ন্যায় ও সত্যের পরিপন্থী সে আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হলেও আমি তার বিরোধী। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, আমি তোমাদের সামনে যে সত্য পেশ করার জন্য আদিষ্ট তাতে কারো জন্য কোন বৈষম্য নেই, বরং তা সবার জন্য সমান। তাতে নিজের ও পরের, বড়র ও ছোটর, গরীবের ও ধনীর, উচ্চের ও নীচের ভিন্ন ভিন্ন সত্য নেই। যা সত্য তা সবার জন্য সত্য। যা গোনাহ তা সবার জন্য গোনাহ। যা হারাম তা সবার জন্য হারাম এবং যা অপরাধ তা সবার জন্য অপরাধ। এই নির্ভেজাল বিধানে আমার নিজের জন্যও কোন ব্যতিক্রম নেই। তৃতীয় অর্থ হচ্ছে, আমি পৃথিবীতে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য আদিষ্ট। মানুষের মধ্যে ইনসাফ কয়েম করা এবং তোমাদের জীবনে ও তোমাদের সমাজে যে ভারসাম্যহীনতা ও বে-ইনসাফী রয়েছে তার ধ্বংস সাধনের দায়িত্ব আমাকে দেয়া হয়েছে। পারস্পারিক বিবাদ-বিসংবাদের কোন মোকদ্দমা আমার কাছে আসলে তাতে ন্যায় বিচার করার নির্দেশ আমাকে দেয়া হয়েছে। চতুর্থ অর্থ এই যে, এখানে عدل এর অর্থ সাম্য। সুতরাং আয়াতের অর্থ হচ্ছে, আমি আদিষ্ট হয়েছি যে, দ্বীনের যাবতীয় বিধি-বিধান তোমাদের মধ্যে সমান সমান রাখি, প্রত্যেক নবী ও প্রত্যেক কিতাবে বিশ্বাস স্থাপন করি এবং সব বিধান পালন করি-এরূপ নয় যে, কোন বিধান মানবো আর কোনটি অমান্য করব। অথবা কোনটির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব ও কোনটির প্রতি করব না।
ষষ্ঠ বিধান- ﴿اللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ﴾ আল্লাহ্‌কেই একমাত্র রব হিসেবে মানব। তিনি আমাদের ও তোমাদের রব। একথা তোমরা স্বীকার করে থাক কিন্তু এ কথার কারণে একমাত্র আল্লাহ্‌রই যে ইবাদাত করতে হবে, তোমরা এটা মানতে রাজী নও। কিন্তু আমি তা মানি। আর আমার অনুসারীরা সবাই এটা মেনে একমাত্র আল্লাহ্‌রই ইবাদাত করে। সপ্তম বিধান- ﴿لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ﴾ অর্থাৎ আমাদের কর্ম আমাদের কাজে আসবে, তোমাদের তাতে কোন লাভ-লোকসান হবে না। আর তোমাদের কর্ম তোমাদের কাজে আসবে, আমার তাতে কোন লাভ ও ক্ষতি নাই। কেউ কেউ বলেন, মক্কায় যখন কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ করার আদেশ অবতীর্ণ হয়নি, তখন এ আয়াত নাযিল হয়েছিল। পরে জেহাদের আদেশ অবতীর্ণ হওয়ায় এই বিধান রহিত হয়ে যায়। কেননা, জেহাদের সারমর্ম এই যে, যারা উপদেশ ও অনুরোধে প্রভাবিত হয় না, যুদ্ধের মাধ্যমে তাদেরকে পরাভূত করতে হবে। তাদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দিলে চলবে না। কেউ কেউ বলেন, আয়াতটি রহিত হয়নি এবং উদ্দেশ্য এই যে, দলীলের মাধ্যমে সত্য প্রমাণিত হওয়ার পর তোমাদের না মানা কেবল শত্রুতা ও হঠকারিতা বশত:ই হতে পারে। শত্রুতা সৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পর এখন প্রমাণাদির আলোচনা অর্থহীন।

وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿١٦﴾

১৬. আর আল্লাহ্‌র আহ্বানে সাড়া আসার পর যারা আল্লাহ্ সম্পর্কে বিতর্ক করে, তাদের যুক্তি-তর্ক তাদের রবের দৃষ্টিতে অসার এবং তাদের উপর রয়েছে তাঁর ক্রোধ এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ ۗ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿١٧﴾

১৭. আল্লাহ্, যিনি নাযিল করেছেন সত্যসহকারে কিতাব এবং মীযান(১)। আর কিসে আপনাকে জানাবে যে, সম্ভবত কিয়ামত আসন্ন?

তোমাদের কর্ম তোমাদের সামনে এবং আমার কর্ম আমার সামনে থাকবে। অষ্টম বিধান- ﴿لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ﴾ অর্থাৎ সত্য স্পষ্ট ও প্রমাণিত হওয়ার পরও যদি তোমরা শত্রুতাকেই কাজে লাগাও, তবে তর্ক-বিতর্কের কোন অর্থ নেই। কাজেই আমাদেরও তোমাদের মধ্যে এমন কোন বিতর্ক নেই। নবম বিধান- ﴿اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا﴾ অর্থাৎ কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে একত্রিত করবেন এবং প্রত্যেকের কর্মের প্রতিদান দেবেন। দশম বিধান- ﴿وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾ অর্থাৎ আমরা সকলেই তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করব। সুতরাং তোমরা চিন্তা করে দেখ কি করলে তখন তোমরা উপকৃত হবে। [দেখুন, ইবনে কাসীর]

(১) অতঃপর উল্লেখ করা হয়েছে যে, কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। এতে আল্লাহর হক ও বান্দার হকের জন্য পূর্ণাঙ্গ আইন-কানুন রয়েছে। ﴿أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ﴾ এখানে 'কিতাব' বলে কুরআনসহ সমস্ত আসমানী গ্রন্থকে বোঝানো হয়েছে এবং হক বলতে পূর্বোক্ত সত্যদ্বীনকে বোঝানো হয়েছে। ميزان এর শাব্দিক অর্থ দাঁড়ি-পাল্লা। এটা যেহেতু ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার এবং অধিকার পূর্ণ মাত্রায় দেয়ার একটি মানদণ্ড তাই ইবনে আব্বাস এর তাফসীর করেছেন ন্যায় বিচার। মুজাহিদ বলেন, মানুষ যে দাঁড়ি-পাল্লা ব্যবহার করে এখানে তাই বোঝানো হয়েছে। সুতরাং হক শব্দের মধ্যে আল্লাহর যাবতীয় হক এবং ميزان শব্দের মধ্যে বান্দার যাবতীয় হকের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। আর তখন 'হকসহকারে' এর অর্থ হবে, হকের বর্ণনা সম্বলিত। কোন কোন মুফাসসির বলেন, এখানে মীযান অর্থ আল্লাহ্‌র শরীয়ত, যা দাঁড়িপাল্লার মত ওজন করে ভুল ও শুদ্ধ, হক ও বাতিল, জুলুম ও ন্যায়বিচার এবং সত্য ও অসত্যের পার্থক্য স্পষ্ট করে দেয়। ওপরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ দিয়ে বলানো হয়েছে যে, 'তোমাদের মধ্যে ইনসাফ করার জন্য আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে।' এখানে বলা হয়েছে যে, এই পবিত্র কিতাব সহকারে সেই 'মিযান' এসে গেছে যার সাহায্যে এই ইনসাফ কায়েম করা যাবে। [তাবারী, কুরতুবী]

يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ ۗ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿١٨﴾

১৮. যারা এটাতে ঈমান রাখে না তারাই তা ত্বরান্বিত করতে চায়। আর যারা ঈমান এনেছে তারা তা থেকে ভীত থাকে এবং তারা জানে যে, তা অবশ্যই সত্য। জেনে রাখুন, নিশ্চয় কিয়ামত সম্পর্কে যারা বাক-বিতণ্ডা করে তারা ঘোর বিভ্রান্তিতে নিপতিত।

اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ ۖ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴿١٩﴾

১৯. আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত কোমল; তিনি যাকে ইচ্ছে রিযিক দান করেন(১)। আর তিনি সর্বশক্তিমান, প্রবল পরাক্রমশালী।

তৃতীয় রুকূ’

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ۖ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ﴿٢٠﴾

২০. যে কেউ আখিরাতের ফসল কামনা করে তার জন্য আমরা তার ফসল বাড়িয়ে দেই এবং যে কেউ দুনিয়ার ফসল কামনা করে আমরা তাকে তা থেকে কিছু দেই। আর আখেরাতে

(১) অভিধানে لطيف শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইবনে আব্বাস এর অর্থ করেছেন, দয়ালু, পক্ষান্তরে মুকাতিল করেছেন অনুগ্রহকারী। অন্য অর্থ, সুক্ষ্মদর্শী। মুকাতিল বলেন, আল্লাহ তা‘আলা সমস্ত বান্দার প্রতিই দয়ালু। এমনকি কাফের এবং পাপাচারীর উপরও দুনিয়াতে তাঁর নেয়ামত বর্ষিত হয়। বান্দাদের প্রতি আল্লাহ তা‘আলার অনুগ্রহ ও কৃপা অসংখ্য প্রকার।

আল্লাহ তা‘আলার রিযিক সমগ্র সৃষ্টির জন্যে ব্যাপক। স্থলে ও জলে বসবাসকারী যেসব জন্তু সম্পর্কে কেউ কিছুই জানে না, আল্লাহর রিযিক তাদের কাছেও পৌঁছে। আয়াতে যাকে ইচ্ছা রিযিক দেন, বলা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলার রিযিক অসংখ্য প্রকার। জীবনধারণের উপযোগী রিযিক সবাই পায়। এরপর বিশেষ প্রকারের রিযিক বন্টনে তিনি বিভিন্ন স্তর ও মাপ রেখেছেন। কাউকে ধন-সম্পদের রিযিক অধিক দান করেছেন। কাউকে স্বাস্থ্য ও শক্তির, কাউকে জ্ঞান এবং কাউকে অন্যান্য প্রকার রিযিক দিয়েছেন। এভাবে প্রত্যেক মানুষ অপরের মুখাপেক্ষীও থাকে এবং এই মুখাপেক্ষিতাই তাদেরকে পারস্পারিক সাহায্য ও সহযোগিতায় উদ্বুদ্ধ করে, যার উপর মানব সভ্যতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। [দেখুন,কুরতুবী,ফাতহুল কাদীর]

তার জন্য কিছুই থাকবে না[১]।

أَمْ لَهُمْ شُرَكَٰٓؤُا۟ شَرَعُوا۟ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنۢ بِهِ ٱللَّهُ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ ۗ وَإِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢١﴾

২১. নাকি তাদের এমন কতগুলো শরীক রয়েছে, যারা এদের জন্য দ্বীন থেকে শরী'আত প্রবর্তন করেছে, যার অনুমতি আল্লাহ্ দেননি? আর ফয়সালার ঘোষণা না থাকলে এদের মাঝে অবশ্যই সিদ্ধান্ত হয়ে যেত। আর নিশ্চয় যালিমদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

تَرَى ٱلظَّٰلِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا۟ وَهُوَ وَاقِعٌۢ بِهِمْ ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فِى رَوْضَاتِ ٱلْجَنَّاتِ ۖ لَهُم مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ﴿٢٢﴾

২২. আপনি যালিমদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত দেখবেন তাদের কৃতকর্মের জন্য; অথচ তা আপতিত হবে তাদেরই উপর। আর যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তারা থাকবে জান্নাতের উদ্যানসমূহে। তারা যা কিছু চাইবে তাদের রবের কাছে তাদের জন্য তা-ই থাকবে। এটাই তো মহা অনুগ্রহ।

ذَٰلِكَ ٱلَّذِى يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ ۗ قُل لَّآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِى

২৩. এটা হলো তা, যার সুসংবাদ আল্লাহ্ দেন তাঁর বান্দাদেরকে যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে। বলুন, 'আমি

(১) একজন ঈমানদারের উচিত আখেরাতমুখী হওয়া। যে আখেরাতমুখী হবে সে দুনিয়া আখেরাত সবই পাবে। পক্ষান্তরে যে দুনিয়াকে প্রাধান্য দিবে সে দুনিয়াও হারাবে আখেরাতও পাবে না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'মহান আল্লাহ্ বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি আমার ইবাদতের জন্য নিজেকে নিয়োজিত কর; আমি তোমার বক্ষকে অমুখাপেক্ষিতা দিয়ে পূর্ণ করে দেব। তোমার দারিদ্রতাকে দূর করে দেব। আর যদি তা না কর আমি তোমার বক্ষ ব্যস্ততায় পূর্ণ করে দেব আর তোমার দারিদ্রতা অবশিষ্ট রেখে দেব।' [মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৪৪৩, তিরমিযী: ২৪৬৬] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এ জাতিকে সুসংবাদ দাও আলো, উচ্চমর্যাদা, দ্বীন, সাহায্য, যমীনের বুকে প্রতিষ্ঠার। তবে এ উম্মতের মধ্যে যে কেউ আখেরাতের কাজ দুনিয়া হাসিলের জন্য করবে, আখেরাতে সে কিছুই পাবে না। [মুসনাদে আহমাদ: ৫/১৩৪]

الْقُرْبٰى ۗ وَمَنْ يَّقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهٗ فِيْهَا حُسْنًا ۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ﴿٢٣﴾

এর বিনিময়ে তোমাদের কাছ থেকে আত্মীয়তার সৌহার্দ্য ছাড়া অন্য কোন প্রতিদান চাই না[১] ।' যে উত্তম কাজ

(১) অর্থাৎ আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না। তবে القربى এর ভালবাসা অবশ্যই প্রত্যাশা করি। এই শব্দটির ব্যাখ্যায় মুফাসসিরদের মধ্যে বেশ মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। এক দল মুফাসসির এ শব্দটিকে আত্মীয়তা (আত্মীয়তার বন্ধন) অর্থে গ্রহণ করেছেন এবং আয়াতের অর্থ বর্ণনা করেছেন এই যে, 'আমি এ কাজের জন্য তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক বা বিনিময় চাই না। তবে তোমাদের ও আমাদের মাঝে আত্মীয়তার যে বন্ধন আছে তোমরা (কুরাইশরা)' অন্তত সেদিকে লক্ষ্য রাখবে এতটুকু আমি অবশ্যই চাই। তোমাদের উচিত ছিল আমার কথা মেনে নেয়া। কিন্তু যদি তোমরা তা না মানো তাহলে গোটা আরবের মধ্যে সবার আগে তোমরাই আমার সাথে দুশমনী করতে বদ্ধপরিকর হবে তা অন্তত করো না। তোমাদের অধিকাংশ গোত্রে আমার আত্মীয়তা রয়েছে। আত্মীয়তার অধিকার ও আত্মীয় বাৎসল্যের প্রয়োজন তোমরা অস্বীকার কর না। অতএব, আমি তোমাদের শিক্ষা, প্রচার ও কর্ম সংশোধনের যে দায়িত্ব পালন করি, এর কোন পারিশ্রমিক তোমাদের কাছে চাই না। তবে এতটুকু চাই যে, তোমরা আত্মীয়তার অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখ। মানা না মানা তোমাদের ইচ্ছা। কিন্তু শত্রুতা প্রদর্শনে তো কমপক্ষে আত্মীয়তার সম্পর্ক প্রতিবন্ধক হওয়া উচিত। বলাবাহুল্য, আত্মীয়তার অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখা স্বয়ং তাদেরই কর্তব্য ছিল। একে কোন শিক্ষা ও প্রচারকার্যের পারিশ্রমিক বলে অভিহিত করা যায় না। অর্থাৎ আমি তোমাদের কাছে এটা চাই। এটা প্রকৃতপক্ষে কোন পারিশ্রমিক নয়। তোমরা একে পারিশ্রমিক মনে করলে ভুল হবে। যুগে যুগে নবী রাসুলগণ নিজ নিজ সম্প্রদায়কে পরিস্কার ভাষায় বলে দিয়েছেন, আমি তোমাদের মঙ্গলার্থে যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, তার কোন বিনিময় তোমাদের কাছে চাই না। আমার প্রাপ্য আল্লাহ তা'আলাই দেবেন। অতএব, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকলের সেরা নবী হয়ে স্বজাতির কাছে কেমন করে বিনিময় চাইবেন? ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোরাইশদের যে গোত্রের সাথে সম্পর্ক রাখতেন, তার প্রত্যেকটি শাখা-পরিবারের সাথে তাঁর আত্মীয়তার জন্মগত সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। [মুসনাদে আহমাদ: ১/২২৯] তাই আল্লাহ বলেছেন, আপনি মুশরিকদের বলুন, দাওয়াতের জন্যে আমি তোমাদের কাছে কোন বিনিময় চাই না। আমি চাই, তোমরা আত্মীয়তার খাতিরে আমাকে তোমাদের মধ্যে অবাধে থাকতে দাও এবং আমার হেফাযত কর। আরবের অন্যান্য লোক আমার হেফাযত ও সাহায্যে অগ্রণী হলে তোমাদের জন্যে তা গৌরবের বিষয় হবে না।

কোন কোন মুফাসসির القربى শব্দটিকে নৈকট্য (নৈকট্য অর্জন) অর্থে গ্রহণ করেন এবং আয়াতটির অর্থ করেছেন, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নৈকট্যের আগ্রহ সৃষ্টি

করে আমরা তার জন্য এতে কল্যাণ বাড়িয়ে দেই। নিশ্চয় আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী।

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۖ فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ ۗ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٢٤﴾

২৪. নাকি তারা বলে যে, সে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে, যদি তা-ই হত তবে আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে আপনার হৃদয় মোহর করে দিতেন। আর আল্লাহ্ মিথ্যাকে মুছে দেন এবং নিজ বাণী দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। নিশ্চয় অন্তরসমূহে যা আছে সে বিষয়ে তিনি সবিশেষ অবগত।

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٢٥﴾

২৫. আর তিনিই তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করেন ও পাপসমূহ মোচন করেন[১] এবং তোমরা যা কর তিনি তা জানেন।

হওয়া ছাড়া আমি তোমাদের কাছে এ কাজের জন্য আর কোন বিনিময় চাই না। অর্থাৎ তোমরা সংশোধিত হয়ে যাও। শুধু এটাই আমার পুরস্কার। এ ব্যাখ্যা হাসান বাসারী থেকে উদ্ধৃত হয়েছে পবিত্র কুরআনের অন্য এক স্থানে বিষয়টি এ ভাষায় বলা হয়েছে: 'এদের বলে দাও, এ কাজের জন্য আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না। যার ইচ্ছা সে তার রবের পথ অনুসরণ করুক, (আমার পারিশ্রমিক শুধু এটাই)।' [সূরা আল-ফুরকান:৫৭] [দেখুন,তাবারী, ইবনে কাসীর,সা'দী]

(১) আলোচ্য আয়াতে তাওবা কবুল করাকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিজের বিশেষ গুণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা মুমিন বান্দার তাওবায় ঐ ব্যক্তির চেয়েও বেশী খুশী হন, যে কোন ঊষর মরুর বুকে ছিল, তার সাথে ছিল বাহন যার উপর ছিল তার খাদ্য ও পানীয়। এমতাবস্থায় সে ঘুমিয়ে পড়েছিল, জাগ্রত হয়ে দেখতে পেল যে, বাহনটি তার খাবার ও পানীয়সহ চলে গেছে। সে তার বাহনের খুঁজতে খুঁজতে তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়ল। তারপর সে বলল, যেখানে ছিলাম সেখানে গিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ব ও মারা যাব। সে তার হাতের উপর মাথা রেখে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছিল, এমতাবস্থায় সে সচেতন হয়ে দেখল যে, তার বাহন ফিরে এসেছে এবং বাহনের উপর তার খাবার ও পানীয় তেমনিভাবে রয়েছে। তখন সে আনন্দে ভুল করে বলে ফেলল: আল্লাহ আপনি আমার বান্দা এবং আমি আপনার রব। আল্লাহ্ তাঁর মুমিন বান্দার তাওবাতে বাহন ও খাদ্য-পানীয় ফিরে পাওয়া লোকটি থেকেও বেশী খুশী হন। [মুসলিম: ২৭৪৪]

وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ ۚ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿٢٦﴾

২৬. আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তিনি তাদের ডাকে সাড়া দেন এবং তাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ বাড়িয়ে দেন; আর কাফিররা, তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি ।

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿٢٧﴾

২৭. আর যদি আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের রিযিক প্রশস্ত করে দিতেন, তবে তারা যমীনে অবশ্যই সীমালঙ্ঘন করত; কিন্তু তিনি তাঁর ইচ্ছেমত পরিমাণেই নাযিল করে থাকেন । নিশ্চয় তিনি তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক অবহিত ও সর্বদ্রষ্টা ।

وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ ۚ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٨﴾

২৮. আর তাদের নিরাশ হওয়ার পরে তিনিই বৃষ্টি প্রেরণ করেন এবং তাঁর রহমত ছড়িয়ে দেন; এবং তিনিই অভিভাবক, অত্যন্ত প্রশংসিত ।

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾

২৯. আর তাঁর অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টি এবং এ দু'য়ের মধ্যে তিনি যে সকল জীব-জন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন সেগুলো; আর তিনি যখন ইচ্ছে তখনই তাদেরকে সমবেত করতে সক্ষম ।

চতুর্থ রুকূ'

وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ﴿٣٠﴾

৩০. আর তোমাদের যে বিপদ-আপদ ঘটে তা তোমাদের হাত যা অর্জন করেছে তার কারণে এবং অনেক অপরাধ তিনি ক্ষমা করে দেন ।

وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ ۖ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٣١﴾

৩১. আর তোমরা যমীনে (আল্লাহ্কে) অপারগকারী নও এবং আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবক নেই, কোন সাহায্যকারীও নেই ।

৩২. আর তাঁর অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে পর্বতসদৃশ সাগরে চলমান নৌযানসমূহ।

وَمِنْ اٰيٰتِهِ الْجَوَارِ فِى الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ﴿٣٢﴾

৩৩. তিনি ইচ্ছে করলে বায়ুকে স্তব্ধ করে দিতে পারেন; ফলে নৌযানসমূহ নিশ্চল হয়ে পড়বে সমুদ্রপৃষ্ঠে। নিশ্চয় এতে অনেক নিদর্শন রয়েছে, প্রত্যেক চরম ধৈর্যশীল ও একান্ত কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য।

اِنْ يَّشَاْ يُسْكِنِ الرِّيْحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلٰى ظَهْرِهٖ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ﴿٣٣﴾

৩৪. অথবা তিনি তারা যা অর্জন করেছে তার কারণে সেগুলোকে বিধ্বস্ত করে দিতে পারেন। আর অনেক (অর্জিত অপরাধ) তিনি ক্ষমাও করেন;

اَوْ يُوْبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوْا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيْرٍ ﴿٣٤﴾

৩৫. আর আমার নিদর্শন সম্পর্কে যারা বিতর্ক করে তারা যেন জানতে পারে যে, তাদের কোন আশ্রয়স্থল নেই।

وَّيَعْلَمَ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِىْۤ اٰيٰتِنَا ؕ مَا لَهُمْ مِّنْ مَّحِيْصٍ ﴿٣٥﴾

৩৬. সুতরাং তোমাদেরকে যা কিছু দেয়া হয়েছে তা দুনিয়ার জীবনের ভোগ্য সামগ্রী মাত্র। আর আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে তা উত্তম ও স্থায়ী, তাদের জন্য যারা ঈমান আনে এবং তাদের রবের উপর নির্ভর করে।

فَمَاۤ اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَىْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿٣٦﴾

৩৭. আর যারা কবীরা গোনাহ ও অশ্লীল কাজ থেকে বেঁচে থাকে এবং যখন রাগান্বিত হয় তখন তারা ক্ষমা করে দেয়[১]।

وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَاِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ ﴿٣٧﴾

(১) এটা খাঁটি মুমিনদের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ। তারা ক্রোধের সময় নিজেদেরকে হারিয়ে ফেলে না, বরং তখনও ক্ষমা ও অনুকম্পা তাদের মধ্যে প্রবল থাকে। ফলে ক্ষমা করে দেয়। তারা রুক্ষ ও ক্রুদ্ধ স্বভাবের হয় না, বরং নম্র স্বভাব ও ধীর মেজাজের

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

৩৮. আর যারা তাদের রবের ডাকে সাড়া দেয়, সালাত কায়েম করে এবং তাদের কার্যাবলী পরস্পর পরামর্শের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। আর তাদেরকে আমরা যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ ﴿٣٩﴾

৩৯. আর যারা, যখন তাদের উপর সীমালঙ্গন হয় তখন তারা তার প্রতিবিধান করে।

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾

৪০. আর মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ অতঃপর যে ক্ষমা করে দেয় ও আপস-নিষ্পত্তি করে তার পুরস্কার আল্লাহ্‌র কাছে আছে। নিশ্চয় তিনি যালিমদেরকে পছন্দ করেন না।

وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ ﴿٤١﴾

৪১. তবে অত্যাচারিত হওয়ার পর যারা প্রতিবিধান করে, তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না;

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٢﴾

৪২. শুধু তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে যারা মানুষের উপর যুলুম করে এবং যমীনে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহাচরণ করে বেড়ায়, তাদেরই জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

মানুষ হয়। তাদের স্বভাব প্রতিশোধ পরায়ণ হয় না। তারা আল্লাহর বান্দাদের সাথে ক্ষমার আচরণ করে এবং কোন কারণে ক্রোধান্বিত হলেও তা হজম করে। এটি মানুষের সর্বোত্তম গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত। কুরআন মজীদ একে অত্যন্ত প্রশংসার যোগ্য বলে ঘোষণা করেছে [আলে ইমরান:১৩৪] এবং একে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাফল্যের বড় বড় কারণসমূহের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে [আলে ইমরান: ১৫৯] অনুরূপভাবে হাদীসে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেছেনঃ “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যক্তিগত কারণে কখনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। তবে আল্লাহর কোন হুরমত বা মর্যাদার অবমাননা করা হলে তিনি শাস্তি বিধান করতেন।” [বুখারী: ৩৫৬০, মুসলিম:২৩২৭]

৪৩. আর অবশ্যই যে ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করে দেয়, নিশ্চয় তা দৃঢ় সংকল্পেরই কাজ।

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿٤٣﴾

পঞ্চম রুকূ'

৪৪. আর আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, এরপর তার জন্য কোন অভিভাবক নেই। আর যালিমরা যখন শাস্তি দেখতে পাবে তখন আপনি তাদেরকে বলতে শুনবেন, 'ফিরে যাওয়ার কোন উপায় আছে কি?'

وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ ۗ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ ﴿٤٤﴾

৪৫. আর আপনি তাদেরকে দেখতে পাবেন যে, তাদেরকে জাহান্নামের সামনে উপস্থিত করা হচ্ছে; তারা অপমানে অবনত অবস্থায় আড় চোখে তাকাচ্ছে; আর যারা ঈমান এনেছে তারা কিয়ামতের দিন বলবে, 'নিশ্চয় ক্ষতিগ্রস্ত তারাই যারা নিজেদের ও নিজেদের পরিজনবর্গের ক্ষতি সাধন করেছে।' সাবধান, নিশ্চয় যালিমরা স্থায়ী শাস্তিতে নিপতিত থাকবে।

وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ ۗ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ ﴿٤٥﴾

৪৬. আর আল্লাহ্ ছাড়া তাদেরকে সাহায্য করার জন্য তাদের কোন অভিভাবক থাকবে না। আর আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার কোন পথ নেই।

وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ ﴿٤٦﴾

৪৭. তোমরা তোমাদের রবের ডাকে সাড়া দাও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সে দিন আসার আগে, যা অপ্রতিরোধ্য; যেদিন তোমাদের কোন আশ্রয়স্থল থাকবে

اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ ۚ مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَإٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ ﴿٤٧﴾

না এবং তোমাদের কোন অস্বীকার থাকবে না[১]।

৪৮. অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আপনাকে তো আমরা এদের রক্ষক করে পাঠাইনি। আপনার কাজ তো শুধু বাণী পৌঁছে দেয়া। আর আমরা যখন মানুষকে আমাদের পক্ষ থেকে কোন রহমত আস্বাদন করাই তখন সে এতে উৎফুল্ল হয় এবং যখন তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদের বিপদ-আপদ ঘটে, তখন তো মানুষ হয়ে পড়ে খুবই অকৃতজ্ঞ।

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۖ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ ۗ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ ﴿٤٨﴾

৪৯. আসমানসমূহ ও যমীনের আধিপত্য আল্লাহ্‌রই। তিনি যা ইচ্ছে তা-ই সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছে কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছে পুত্র সন্তান দান করেন,

لِّلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ ﴿٤٩﴾

৫০. অথবা তাদেরকে দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছে তাকে করে দেন বন্ধ্যা; নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, ক্ষমতাবান।

أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا ۖ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾

৫১. আর কোন মানুষেরই এমন মর্যাদা নেই যে, আল্লাহ্ তার সাথে কথা বলবেন ওহীর মাধ্যম ছাড়া, অথবা পর্দার আড়াল ছাড়া, অথবা এমন দূত প্রেরণ

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ ﴿٥١﴾

---

(১) আয়াতের শেষে ﴿مِّن نَّكِيرٍ﴾ বলে কি বোঝানো হয়েছে এ ব্যাপারে কয়েকটি অভিমত বর্ণিত হয়েছে। এক. সেদিন কেউ তার অপরাধ অস্বীকার করতে পারবে না। [জালালাইন] দুই. সে দিন কেউ কোনভাবেই আত্মগোপন করতে পারবে না। [ইবন কাসীর; মুয়াসসার] তিন. সেদিন তার জন্য কোন সাহায্যকারী থাকবে না। [তাবারী; সা'দী]

ছাড়া, যে দূত তাঁর অনুমতিক্রমে তিনি যা চান তা ওহী করেন, তিনি সর্বোচ্চ, হিকমতওয়ালা ।

৫২. আর এভাবে[১] আমরা আপনার প্রতি আমাদের নির্দেশ থেকে রূহকে ওহী করেছি; আপনি তো জানতেন না কিতাব কি এবং ঈমান কি! কিন্তু আমরা এটাকে করেছি নূর, যা দ্বারা আমরা আমাদের বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছে হেদায়াত দান করি; আর

وَكَذٰلِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنتَ تَدْرِى مَا الْكِتٰبُ وَلَا الْإِيمٰنُ وَلٰكِن جَعَلْنٰهُ نُورًا نَّهْدِى بِهِۦ مَن نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا ۚ وَإِنَّكَ لَتَهْدِىٓ إِلٰى صِرٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٢﴾

(১) "এভাবে" অর্থ শুধু শেষ পদ্ধতি নয়, বরং ওপরের আয়াতে যে তিনটি পদ্ধতি উল্লেখিত হয়েছে তার সব কটি। আর 'রূহ' অর্থ অহী [তাবারী] অথবা এখানে রূহ বলে কুরআনকে বোঝানো হয়েছে। কারণ, কুরআন হচ্ছে এমন রূহ যার দ্বারা অন্তরসমূহ জীবন লাভ করে। [জালালাইন]। কুরআন ও হাদীস থেকেই একথা প্রমাণিত যে, এই তিনটি পদ্ধতিতেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হিদায়াত দান করা হয়েছে। হাদীসে এসেছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অহী আসার সূচনা হয়েছিলো সত্য স্বপ্নের আকারে [বুখারী:৩] এই ধারা পরবর্তী সময় পর্যন্ত জারি ছিল। তাই হাদীসে তার বহু সংখ্যক স্বপ্নের উল্লেখ দেখা যায়। যার মাধ্যমে হয় তাকে কোনো শিক্ষা দেয়া হয়েছে কিংবা কোনো বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে। তাছাড়া কুরআন মজীদে নবীর একটি স্বপ্নের সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে [সূরা আল-ফাতহ:২৭] তাছাড়া কতিপয় হাদীসে একথারও উল্লেখ আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আমার মনে অমুক বিষয়টি সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে, কিংবা আমাকে একথাটি বলা হয়েছে বা আমাকেই নির্দেশ দান করা হয়েছে অথবা আমাকে এ কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে। এ ধরনের সব কিছু অহীর প্রথমোক্ত শ্রেণীর সাথে সম্পর্কিত। বেশীর ভাগ হাদীসে কুদসী এই শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত। মে'রাজে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দ্বিতীয় প্রকার অহী দ্বারা সম্মানিত করা হয়েছে। কতিপয় হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের নির্দেশ দেয়া এবং তা নিয়ে তার বার বার দরখাস্ত পেশ করার কথা যেভাবে উল্লেখিত হয়েছে তা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, সে সময় কথাবার্তা হয়েছিলো যেমনটি তূর পাহাড়ের পাদদেশে মূসা আলাইহিস সালাম ও আল্লাহর মধ্যে হয়েছিলো। এরপর থাকে অহীর তৃতীয় শ্রেণী। এ ব্যাপারে কুরআন নিজেই সাক্ষ্য দান করে যে, কুরআনকে জিবরাঈল আমীনের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌঁছানো হয়েছে [আল-বাকারাহ:৯৭, আশ-শু'আরা:১৯২-১৯৫]

আপনি তো অবশ্যই সরল পথের দিকে দিকনির্দেশ করেন---

৫৩. সে আল্লাহ্‌র পথ, যিনি আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে তার মালিক। জেনে রাখুন, সব বিষয় আল্লাহ্‌রই দিকে ফিরে যাবে।

صِرَاطِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ اَلَاۤ اِلَى اللّٰهِ تَصِيْرُ الْاُمُوْرُ ﴿٥٣﴾

৪৩- সূরা আয-যুখ্‌রুফ
৮৯ আয়াত, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

حٰمٓ ﴿١﴾

১. হা-মীম ।

وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ﴿٢﴾

২. সুস্পষ্ট কিতাবের শপথ;

اِنَّا جَعَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٣﴾

৩. নিশ্চয় আমরা এটাকে (অবতীর্ণ) করেছি আরবী (ভাষায়) কুরআন, যাতে তোমরা বুঝতে পার ।

وَاِنَّهٗ فِيْٓ اُمِّ الْكِتٰبِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيْمٌ ﴿٤﴾

৪. আর নিশ্চয় তা আমাদের কাছে উম্মুল কিতাবে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, হিকমতপূর্ণ ।

اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا اَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِيْنَ ﴿٥﴾

৫. আমরা কি তোমাদের থেকে এ উপদেশবাণী সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করে নেব এ কারণে যে, তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়?

وَكَمْ اَرْسَلْنَا مِنْ نَّبِيٍّ فِي الْاَوَّلِيْنَ ﴿٦﴾

৬. আর পূর্ববর্তীদের কাছে আমরা বহু নবী প্রেরণ করেছিলাম ।

وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ نَّبِيٍّ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٧﴾

৭. আর যখনই তাদের কাছে কোন নবী এসেছে তারা তাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে ।

فَاَهْلَكْنَآ اَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَّمَضٰى مَثَلُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٨﴾

৮. ফলে যারা এদের চেয়ে শক্তিতে প্রবল ছিল তাদেরকে আমরা ধ্বংস করেছিলাম; আর গত হয়েছে পূর্ববর্তীদের অনুরূপ দৃষ্টান্ত ।

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ﴿٩﴾

৯. আর আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, ‘কে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছে?’ তারা অবশ্যই

বলবে, 'এগুলো তো সৃষ্টি করেছেন পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞই',

১০. যিনি তোমাদের জন্য যমীনকে বানিয়েছেন শয্যা[১] এবং তাতে বানিয়েছেন তোমাদের চলার পথ[২], যাতে তোমরা সঠিক পথ পেতে পার;

الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَّجَعَلَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿١٠﴾

১১. আর যিনি আসমান থেকে বারি বর্ষণ করেন পরিমিতভাবে[৩]। অতঃপর তা দ্বারা আমরা সঞ্জীবিত করি নির্জীব জনপদকে। এভাবেই তোমাদেরকে বের করা হবে।

وَالَّذِيْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءًۢ بِقَدَرٍ ۚ فَاَنْشَرْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا ۚ كَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ﴿١١﴾

১২. আর যিনি সকল প্রকারের জোড়া যুগল সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তোমাদের

وَالَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْفُلْكِ

(১) উদ্দেশ্য এই যে, পৃথিবীর বাহ্যিক আকার শয্যা বা বিছানার মত এবং এতে বিছানার অনুরূপ আরাম পাওয়া যায়। সুতরাং এটা গোলাকার হওয়ার পরিপন্থী নয়। অন্যান্য স্থানেও পৃথিবীকে বিছানা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। [সূরা ত্বা-হা:৫৩, সূরা আন-নাবা:৬] লক্ষণীয় যে, সে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তা হচ্ছে, مهد শব্দটির এক অর্থ হচ্ছে, সুস্থির বিছানা বা শয্যা। অপর অর্থ হচ্ছে, দোলনা। অর্থাৎ একটি শিশু যেভাবে তার দোলনার মধ্যে আরামে শুয়ে থাকে মহাশূন্যে ভাসমান এই বিশাল গ্রহকে তোমাদের জন্য তেমনি আরামের জায়গা বানিয়ে দিয়েছেন। ইবনে কাসীর, জালালাইন,আয়সার আত-তাফাসির]

(২) ভূ-পৃষ্ঠে পাহাড়ের মাঝে গিরিপথ এবং পাহাড়ী ও সমতল ভূমি অঞ্চলে নদী হচ্ছে সেই সব প্রাকৃতিক পথ যা আল্লাহ তৈরী করেছেন ।[তাবারী,সা'দী]

(৩) অর্থাৎ প্রত্যেক অঞ্চলের জন্য বৃষ্টির একটা গড় পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন যা দীর্ঘকাল প্রতি বছর একই ভাবে চলতে থাকে। এ ক্ষেত্রে এমন কোন অনিয়ম নেই যে কখনো বছরে দুই ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হবে আবার কখনো দুইশ ইঞ্চি হবে। তাছাড়াও তিনি বিভিন্ন মওসুমের বিভিন্ন সময়ে বৃষ্টিকে বিক্ষিপ্ত করে এমনভাবে বর্ষণ করেন সাধারণত তা ব্যাপক মাত্রায় ভূমির উৎপাদন ক্ষমতার জন্য উপকারী হয়। এটাও তাঁর জ্ঞান ও কৌশলেরই অংশ যে, তিনি ভূ-পৃষ্ঠের কিছু অংশকে প্রায় পুরোপুরিই বৃষ্টি থেকে বঞ্চিত করে পানি ও লতাগুল্ম শূন্য মরুভূমি বানিয়ে দিয়েছেন এবং অপর কিছু অঞ্চলে কখনো দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করেন আবার কখনো ঝড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি বর্ষন করেন ।[দেখুন, তাবারী]

وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ﴿١٢﴾

জন্য সৃষ্টি করেছেন এমন নৌযান ও গৃহপালিত জন্তু যাতে তোমরা আরোহণ কর;

لِتَسْتَوُا عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿١٣﴾

১৩. যাতে তোমরা এর পিঠে স্থির হয়ে বসতে পার, তারপর তোমাদের রবের অনুগ্রহ স্মরণ করবে যখন তোমরা এর উপর স্থির হয়ে বসবে; এবং বলবে[১], 'পবিত্র-মহান তিনি, যিনি এগুলোকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন। আর আমরা সমর্থ ছিলাম না এদেরকে

(১) সওয়ারীর পিঠে বসার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে যেসব কথা উচ্চারিত হতো সেগুলোই এ আয়াতের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়ের সর্বোত্তম বাস্তব ব্যাখ্যা। আব্দুল্লাহ্ ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, সফরে রওয়ানা হওয়ার সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সওয়ারীর জন্তুর উপর সওয়ার হওয়ার পর তিনবার 'আল্লাহু আকবর' বলতেন। তারপর ﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا﴾ থেকে শুরু করে لَمُنْقَلِبُوْنَ পর্যন্ত পাঠ করতেন। তারপর এই বলে দো'আ করতেনঃ اللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ اللّٰهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ 'আল্লাহুম্মা ইন্না নাসআলুকা ফী সাফারিনা হাযাল বিররা ওয়াত তাকওয়া ওয়া মিনাল আমালে মা তারদা। আল্লাহুম্মা হাওয়িন আলাইনা সাফারানা হাযা ওয়াতওয়ে 'আন্না বু'দাহ। আল্লাহুম্মা আনতাস সাহিবু ফিস সাফারে ওয়াল খালিফাতু ফিল আহলে। আল্লাহুম্মা ইন্নি 'আউযু বিকা মিন ওয়া'সা-ইস সাফারে ওয়া কাআবাতিল মানযারে ওয়া সুয়িল মুনকালাবে ফিল মালে ওয়াল আহল।' [মুসলিম:২৩৯২]
আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিসমিল্লাহ্ বলে রিকাবে পা রাখলেন এবং সওয়ার হওয়ার পর 'আলহামদুলিল্লাহ' বললেন। তারপর এ আয়াত অর্থাৎ ﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا﴾ থেকে শুরু করে لَمُنْقَلِبُوْنَ পর্যন্ত বললেন, তারপর 'আলহামদুলিল্লাহ' তিনবার ও 'আল্লাহু আকবার' তিনবার বললেন এবং তারপর বললেনঃ "আপনি অতি পবিত্র। তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। আমি নিজের প্রতি যুলুম করেছি। আমাকে ক্ষমা করে দিন।" এরপর তিনি হেসে ফেললেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আপনি কি কারণে হাসলেন। তিনি বললেন, বান্দা (হে রব, আমাকে ক্ষমা করে দিন) বললে আল্লাহর কাছে তা বড়ই পছন্দনীয় হয়। তিনি বলেনঃ আমার এই বান্দা জানে যে, আমি ছাড়া ক্ষমাশীল আর কেউ নেই। [মুসনাদে আহমদ:১/৯৭, আবু দাউদ:২৬০২, তিরমিযী:৩৪৪৬]

বশীভূত করতে।

১৪. 'আর নিশ্চয় আমরা আমাদের রবের কাছেই প্রত্যাবর্তনকারী।'

وَإِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴿١٤﴾

১৫. আর তারা তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে তাঁর অংশ সাব্যস্ত করেছে[১]। নিশ্চয়ই মানুষ স্পষ্ট অকৃতজ্ঞ।

وَجَعَلُوا۟ لَهُۥ مِنْ عِبَادِهِۦ جُزْءًا ۚ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾

দ্বিতীয় রুকূ'

১৬. নাকি তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তা হতে কন্যা সন্তান গ্রহণ করেছেন এবং তোমাদেরকে বিশিষ্ট করেছেন পুত্র সন্তান দ্বারা?

أَمِ ٱتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَىٰكُم بِٱلْبَنِينَ ﴿١٦﴾

১৭. আর যখন তাদের কাউকে সুসংবাদ দেয়া হয় যা রহমানের প্রতি তারা দৃষ্টান্ত পেশ করে তা দ্বারা, তখন তার মুখমণ্ডল মলিন হয়ে যায়, এমতাবস্থায় যে সে দুঃসহ যাতনাক্লিষ্ট।

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُۥ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿١٧﴾

১৮. আর যে অলংকারে লালিত-পালিত হয় এবং সে বিতর্ককালে স্পষ্ট বক্তব্যে অসমর্থ সে কি? (আল্লাহ্‌র জন্য সাব্যস্ত হবে?)

أَوَمَن يُنَشَّؤُا۟ فِى ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِى ٱلْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴿١٨﴾

১৯. আর তারা রহমানের বান্দা ফেরেশ্‌তাগণকে নারী গণ্য করেছে; এদের সৃষ্টি কি তারা দেখেছিল? তাদের সাক্ষ্য অবশ্যই লিপিবদ্ধ করা

وَجَعَلُوا۟ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَٰدُ ٱلرَّحْمَٰنِ إِنَٰثًا ۚ أَشَهِدُوا۟ خَلْقَهُمْ ۚ سَتُكْتَبُ شَهَٰدَتُهُمْ وَيُسْـَٔلُونَ ﴿١٩﴾

---

(১) অংশ বানিয়ে দেয়ার অর্থ আল্লাহর কোন বান্দাকে তাঁর সন্তান ঘোষণা করা। কেননা সন্তান অনিবার্যরূপেই পিতার স্বগোত্রীয় এবং তার অস্তিত্বের একটি অংশ। তাই কোন ব্যক্তিকে আল্লাহর কন্যা বা পুত্র বলার অর্থ এই যে, তাকে আল্লাহর অস্তিত্ব ও সত্তায় শরীক করা। মুশরিকরা ফেরেশতাগণকে 'আল্লাহর কন্যা-সন্তান' আখ্যা দিত। [দেখুন, জালালাইন, আল-মুয়াস্‌সার]

হবে এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে।

وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمٰنُ مَا عَبَدْنٰهُمْ ۗ مَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٢٠﴾

২০. তারা আরও বলে, 'রহমান ইচ্ছে করলে আমরা এদের ইবাদাত করতাম না।' এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই; তারা তো শুধু মনগড়া কথা বলছে।

أَمْ اٰتَيْنٰهُمْ كِتٰبًا مِّنْ قَبْلِهٖ فَهُمْ بِهٖ مُسْتَمْسِكُوْنَ ﴿٢١﴾

২১. নাকি আমরা তাদেরকে কুরআনের আগে কোন কিতাব দিয়েছি অতঃপর তারা তা দৃঢ়ভাবে ধারণ করে আছে?

بَلْ قَالُوْٓا إِنَّا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا عَلٰٓى أُمَّةٍ وَّإِنَّا عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿٢٢﴾

২২. বরং তারা বলে, 'নিশ্চয় আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে এক মতাদর্শের উপর পেয়েছি এবং নিশ্চয় আমরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণে হেদায়াতপ্রাপ্ত হব।'

وَكَذٰلِكَ مَآ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَآ ۙ إِنَّا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا عَلٰٓى أُمَّةٍ وَّإِنَّا عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ مُّقْتَدُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৩. আর এভাবেই আপনার পূর্বে কোন জনপদে যখনই আমরা কোন সতর্ককারী পাঠিয়েছি তখনই তার বিলাসপ্রিয়রা বলেছে, 'নিশ্চয় আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে এক মতাদর্শে পেয়েছি এবং আমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করে থাকব।'

قٰلَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدٰى مِمَّا وَجَدْتُّمْ عَلَيْهِ اٰبَآءَكُمْ ۗ قَالُوْٓا إِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿٢٤﴾

২৪. সে সতর্ককারী বলেছে, 'তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষদেরকে যে পথে পেয়েছ, আমি যদি তোমাদের জন্য তার চেয়ে উৎকৃষ্ট পথ নিয়ে আসি তবুও কি (তোমরা তাদের অনুসরণ করবে)?' তারা বলেছে, 'নিশ্চয় তোমরা যা সহ প্রেরিত হয়েছ আমরা তার সাথে কুফরিকারী।'

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٢٥﴾

২৫. ফলে আমরা তাদের থেকে প্রতিশোধ নিলাম। সুতরাং দেখুন, মিথ্যারোপকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছে!

তৃতীয় রুকূ'

وَإِذْ قَالَ إِبْرٰهِيْمُ لِأَبِيْهِ وَقَوْمِهٖٓ إِنَّنِيْ بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُوْنَ ﴿٢٦﴾

২৬. আর স্মরণ করুন, যখন ইব্‌রাহীম তার পিতা এবং তার সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, 'তোমরা যেগুলোর ইবাদাত কর নিশ্চয় আমি তাদের থেকে সম্পর্কমুক্ত।

إِلَّا الَّذِيْ فَطَرَنِيْ فَإِنَّهٗ سَيَهْدِيْنِ ﴿٢٧﴾

২৭. তবে তিনি ব্যতীত যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন অতঃপর নিশ্চয় তিনি শীঘ্রই আমাকে সৎপথে পরিচালিত করবেন।'

وَجَعَلَهَا كَلِمَةًۢ بَاقِيَةً فِيْ عَقِبِهٖ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٢٨﴾

২৮. আর এ ঘোষণাকে তিনি চিরন্তন বাণীরূপে রেখে গিয়েছেন তার উত্তরসূরীদের মধ্যে, যাতে তারা ফিরে আসে।

بَلْ مَتَّعْتُ هٰٓؤُلَآءِ وَاٰبَآءَهُمْ حَتّٰى جَآءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُوْلٌ مُّبِيْنٌ ﴿٢٩﴾

২৯. বরং আমি তাদেরকে এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরকে দিয়েছিলাম ভোগ করতে, অবশেষে তাদের কাছে আসল সত্য এবং স্পষ্ট বর্ণনাকারী রাসূল।

وَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ وَّإِنَّا بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿٣٠﴾

৩০. আর যখন তাদের কাছে সত্য আসল, তখন তারা বলল, 'এ তো জাদু এবং নিশ্চয় আমরা তার সাথে কুফরিকারী।'

وَقَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ ﴿٣١﴾

৩১. আর তারা বলে, 'এ কুরআন কেন নাযিল করা হল না দুই জনপদের কোন মহান ব্যক্তির উপর?'

৩২. তারা কি আপনার রবের রহমত[১] বণ্টন করে? আমরাই দুনিয়ার জীবনে তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বণ্টন করি এবং তাদের একজনকে অন্যের উপর মর্যাদায় উন্নীত করি যাতে একে অন্যের দ্বারা কাজ করিয়ে নিতে পারে; আর আপনার রবের রহমত তারা যা জমা করে তা থেকে উৎকৃষ্টতর।

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

৩৩. আর সব মানুষ এক মতাবলম্বী হয়ে পড়বে, এ আশংকা না থাকলে দয়াময়ের সাথে যারা কুফরী করে, তাদেরকে আমরা দিতাম তাদের ঘরের জন্য রৌপ্য-নির্মিত ছাদ ও সিঁড়ি যাতে তারা আরোহণ করে,

وَلَوْلَآ أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿٣٣﴾

৩৪. এবং তাদের ঘরের জন্য দরজা ও পালংক---যাতে তারা হেলান দেয়,

وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَٰبًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِـُٔونَ ﴿٣٤﴾

৩৫. আর (অনুরূপ দিতাম) স্বর্ণ নির্মিতও[২]; এবং এ সবই তো শুধু দুনিয়ার জীবনের ভোগ-সম্ভার। আর

وَزُخْرُفًا ۚ وَإِن كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّا مَتَٰعُ الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا ۚ وَالْءَاخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣٥﴾

(১) এখানে রবের রহমত অর্থ তাঁর বিশেষ রহমত, অর্থাৎ নবুওয়াত ।সা'দী,জালালাইন]

(২) কাফেররা বলেছিল, মক্কা ও তায়েফের কোন বড় ধনাঢ্য ব্যক্তিকে নবী করা হল না কেন? ৩৩ থেকে ৩৫ নং আয়াতসমূহে এর দ্বিতীয় জওয়াব দেয়া হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, নিঃসন্দেহে নবুওয়তের জন্যে কিছু যোগ্যতা ও শর্ত থাকা জরুরী। কিন্তু ধন-দৌলতের প্রাচুর্যের ভিত্তিতে কাউকে নবুওয়ত দেয়া যায় না। কেননা, ধন-দৌলত আমার দৃষ্টিতে এত নিকৃষ্ট ও হেয় যে, সব মানুষের কাফের হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকলে আমি সব কাফেরের উপর স্বর্ণ-রৌপ্যের বৃষ্টি বর্ষণ করতাম। এই সম্পদ তো এমন সব মানুষের কাছেও আছে যাদের ঘৃণ্য কাজ-কর্মের পংকিলতায় গোটা সমাজ পূতিগন্ধময় হয়ে যায়। অথচ একেই তোমরা মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড বানিয়ে রেখেছো। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'দুনিয়া আল্লাহর কাছে যদি মশার এক পাখার সমানও মর্যাদা রাখত, তবে আল্লাহ কোন কাফেরকে দুনিয়া থেকে এক ঢোক পানিও দিতেন না।' [তিরমিযী:২৩২০]

আখিরাত আপনার রবের নিকট মুত্তাকীদের জন্যই ।

চতুর্থ রুকূ'

৩৬. আর যে রহমানের যিক্‌র থেকে বিমুখ হয় আমরা তার জন্য নিয়োজিত করি এক শয়তান, অতঃপর সে হয় তার সহচর ।

وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ ﴿٣٦﴾

৩৭. আর নিশ্চয় তারাই (শয়তানরা) মানুষদেরকে সৎপথ থেকে বাধা দেয়, অথচ মানুষরা (ভ্রষ্ট পথে থাকার পরও) মনে করে তারা (নিজেরা) হেদায়াতপ্রাপ্ত[১] ।

وَاِنَّهُمْ لَيَصُدُّوْنَهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿٣٧﴾

৩৮. অবশেষে যখন সে আমাদের নিকট আসবে, তখন সে শয়তানকে বলবে, হায়! আমার ও তোমার মধ্যে যদি পূর্ব ও পশ্চিমের ব্যবধান থাকত!' সুতরাং এ সহচর কতই না নিকৃষ্ট!

حَتّٰۤى اِذَا جَآءَنَا قَالَ يٰلَيْتَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِيْنُ ﴿٣٨﴾

৩৯. আর আজ তোমাদের এ অনুতাপ তোমাদের কোন কাজেই আসবে না, যেহেতু তোমরা যুলুম করেছিলে; নিশ্চয় তোমরা সকলেই শাস্তিতে শরীক ।

وَلَنْ يَّنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ اِذْ ظَّلَمْتُمْ اَنَّكُمْ فِى الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ ﴿٣٩﴾

৪০. আপনি কি শোনাতে পারবেন বধিরকে অথবা হেদায়াত দিতে পারবেন অন্ধকে ও যে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে?

اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ اَوْ تَهْدِى الْعُمْىَ وَمَنْ كَانَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٤٠﴾

---

(১) অর্থাৎ শয়তানরা সে সমস্ত লোকদেরকে সৎ পথ থেকে দূরে রাখে যারা আল্লাহ্‌র স্মরণ হতে বিমুখ । শয়তানরা স্মরণবিমুখ লোকদের জন্য ভ্রষ্ট পথকে সুশোভিত করে দেখায়, আর আল্লাহ্‌র উপর ঈমান ও সৎকাজ করাকে অপছন্দনীয় করে রাখে । আর আল্লাহ্‌র স্মরণ বিমুখ লোকেরা শয়তানের পক্ষ থেকে সুশোভিত করার কারণে তারা যে ভ্রষ্ট মতাদর্শের উপর রয়েছে সেটাকেই হক ও হেদায়াতের পথ মনে করতে থাকে । [দেখুন-মুয়াসসার]

فَاِمَّا نَذۡهَبَنَّ بِكَ فَاِنَّا مِنۡهُمۡ مُّنۡتَقِمُوۡنَ ﴿٤١﴾

৪১. অতঃপর যদি আমরা আপনাকে নিয়ে যাই, তবে নিশ্চয় আমরা তাদের থেকে প্রতিশোধ নেব[১];

اَوۡ نُرِيَنَّكَ الَّذِىۡ وَعَدۡنٰهُمۡ فَاِنَّا عَلَيۡهِمۡ مُّقۡتَدِرُوۡنَ ﴿٤٢﴾

৪২. অথবা আমরা তাদেরকে যে শাস্তির ওয়াদা দিয়েছি, আপনাকে আমরা তা দেখাই, তবে নিশ্চয় তাদের উপর আমরা পূর্ণ ক্ষমতাবান ।

فَاسۡتَمۡسِكۡ بِالَّذِىۡۤ اُوۡحِىَ اِلَيۡكَۚ اِنَّكَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسۡتَقِيۡمٍ ﴿٤٣﴾

৪৩. কাজেই আপনার প্রতি যা ওহী করা হয়েছে তা দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করুন । নিশ্চয় আপনি সরল পথে রয়েছেন ।

وَاِنَّهٗ لَذِكۡرٌ لَّكَ وَلِقَوۡمِكَۚ وَسَوۡفَ تُسۡـَٔلُوۡنَ ﴿٤٤﴾

৪৪. আর নিশ্চয় এ কুরআন আপনার ও আপনার সম্প্রদায়ের জন্য যিক্‌র[২]; এবং অচিরেই তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে ।

وَسۡـَٔلۡ مَنۡ اَرۡسَلۡنَا مِنۡ قَبۡلِكَ مِنۡ رُّسُلِنَاۤ اَجَعَلۡنَا مِنۡ دُوۡنِ الرَّحۡمٰنِ اٰلِهَةً يُّعۡبَدُوۡنَ ﴿٤٥﴾

৪৫. আর আপনার পূর্বে আমরা আমাদের রাসূলগণ থেকে যাদেরকে প্রেরণ করেছিলাম তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, আমরা কি রহমান ছাড়া ইবাদাত করা যায় এমন কোন ইলাহ স্থির করেছিলাম[৩]?

---

(১) কাতাদাহ্ রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন, আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চলে গেছেন এখন প্রতিশোধ নেয়া বাকী আছে । আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে তার উম্মাতের মধ্যে এমন কিছু দেখাননি যা তার মনোকষ্টের কারণ হবে । শেষ পর্যন্ত রাসূল চলে গেলেন । অন্যান্য নবীগণের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ছিল, তারা তাদের জীবদ্দশাতেই তাদের উম্মাতের উপর শাস্তি আপতিত হতে দেখেছিলেন । [মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৪৪৭]

(২) আয়াতের এক অর্থ হচ্ছে, এ কুরআন আপনার ও আপনার কাওমের জন্য স্মরনিকাস্বরূপ । অপর অর্থ হচ্ছে, এ কুরআন আপনার ও আপনার কাওমের জন্য খুবই সম্মানের বস্তু । অর্থাৎ, সুখ্যাতির বিষয় । উদ্দেশ্য এই যে, কুরআন পাক আপনার ও আপনার সম্প্রদায়ের জন্য মহাসম্মান ও সুখ্যাতির কারণ । [তাবারী]

(৩) এখানে প্রশ্ন হয় যে, পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণ তো মারা গেছেন । তাদেরকে জিজ্ঞেস

পঞ্চম রুকূ'

৪৬. আর অবশ্যই মূসাকে আমরা আমাদের নিদর্শনাবলীসহ ফির'আউন ও তার নেতৃবর্গের নিকট পাঠিয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, 'নিশ্চয় আমি সৃষ্টিকুলের রবের একজন রাসূল।'

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِۦ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٦﴾

৪৭. অতঃপর যখন তিনি তাদের কাছে আমাদের নিদর্শনাবলীসহ আসলেন তখনি তারা তা নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করতে লাগল।

فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ ﴿٤٧﴾

৪৮. আর আমরা তাদেরকে যে নিদর্শনই দেখিয়েছি তা ছিল তার অনুরূপ নিদর্শনের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর। আর আমরা তাদেরকে শাস্তি দিয়ে পাকড়াও করলাম যাতে তারা ফিরে আসে।

وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا ۖ وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤٨﴾

৪৯. আর তারা বলেছিল, 'হে জাদুকর! তোমার রবের কাছে তুমি আমাদের জন্য তা প্রার্থনা কর যা তিনি তোমার সাথে অঙ্গীকার করেছেন, নিশ্চয়ই আমরা সৎপথ অবলম্বন করব।'

وَقَالُوا يَا أَيُّهَ السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ ﴿٤٩﴾

৫০. অতঃপর যখন আমরা তাদের থেকে শাস্তি সরিয়ে নিলাম তখনই তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে বসল।

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴿٥٠﴾

৫১. আর ফির'আউন তার সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘোষণা করে বলল, 'হে আমার

وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِۦ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ

করার আদেশ কিরূপে দেয়া হল? অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে আয়াতের অর্থ এই যে, নবী-রাসূলগণের অনুসারীদের জিজ্ঞেস করুন। কোন কোন বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইসরা ও মি'রাজের রাত্রে নবী-রাসূলদেরকে এ প্রশ্ন করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। বাগভী,ফাতহুল কাদীর]

مِصۡرَ وَهٰذِهِ الۡاَنۡهٰرُ تَجۡرِیۡ مِنۡ تَحۡتِیۡ ۚ اَفَلَا تُبۡصِرُوۡنَ ﴿٥١﴾

সম্প্রদায়! মিসর রাজ্য কি আমার নয়? আর এ নদীগুলো আমার পাদদেশে প্রবাহিত; তোমরা কি দেখছ না?

اَمۡ اَنَا خَیۡرٌ مِّنۡ هٰذَا الَّذِیۡ هُوَ مَهِیۡنٌ ۬ۙ وَّ لَا یَکَادُ یُبِیۡنُ ﴿٥٢﴾

৫২. নাকি আমি এ ব্যক্তি হতে শ্রেষ্ঠ নই, যে হীন এবং স্পষ্ট কথা বলতেও প্রায় অক্ষম!

فَلَوۡ لَاۤ اُلۡقِیَ عَلَیۡهِ اَسۡوِرَۃٌ مِّنۡ ذَهَبٍ اَوۡ جَآءَ مَعَهُ الۡمَلٰٓئِکَۃُ مُقۡتَرِنِیۡنَ ﴿٥٣﴾

৫৩. 'তবে তাকে (মূসা) কেন দেয়া হল না স্বর্ণ-বলয় অথবা তার সংগে কেন আসল না ফেরেশ্‌তাগণ দলবদ্ধভাবে?'

فَاسۡتَخَفَّ قَوۡمَهٗ فَاَطَاعُوۡهُ ؕ اِنَّهُمۡ کَانُوۡا قَوۡمًا فٰسِقِیۡنَ ﴿٥٤﴾

৫৪. এভাবে সে তার সম্প্রদায়কে বোকা বানাল, ফলে তারা তার কথা মেনে নিল। নিশ্চয় তারা ছিল এক ফাসিক সম্প্রদায়।

فَلَمَّاۤ اٰسَفُوۡنَا انۡتَقَمۡنَا مِنۡهُمۡ فَاَغۡرَقۡنٰهُمۡ اَجۡمَعِیۡنَ ﴿٥٥﴾

৫৫. অতঃপর যখন তারা আমাদেরকে ক্রোধান্বিত করল তখন আমরা তাদের থেকে প্রতিশোধ নিলাম এবং নিমজ্জিত করলাম তাদের সকলকে একত্রিতভাবে।

فَجَعَلۡنٰهُمۡ سَلَفًا وَّ مَثَلًا لِّلۡاٰخِرِیۡنَ ﴿٥٦﴾

৫৬. ফলে পরবর্তীদের জন্য আমরা তাদেরকে করে রাখলাম অতীত ইতিহাস ও দৃষ্টান্ত।

ষষ্ঠ রুকূ'

وَ لَمَّا ضُرِبَ ابۡنُ مَرۡیَمَ مَثَلًا اِذَا قَوۡمُکَ مِنۡهُ یَصِدُّوۡنَ ﴿٥٧﴾

৫৭. আর যখনই মার্‌ইয়াম-তনয়ের দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়, তখন আপনার সম্প্রদায় তাতে শোরগোল আরম্ভ করে দেয়।

وَ قَالُوۡۤا ءَاٰلِهَتُنَا خَیۡرٌ اَمۡ هُوَ ؕ مَا ضَرَبُوۡهُ لَکَ اِلَّا جَدَلًا ؕ بَلۡ هُمۡ قَوۡمٌ خَصِمُوۡنَ ﴿٥٨﴾

৫৮. আর তারা বলে, 'আমাদের উপাস্যগুলো শ্রেষ্ঠ না 'ঈসা?' এরা শুধু বাক-বিতণ্ডার উদ্দেশ্যেই তাকে আপনার সামনে

পেশ করে। বরং এরা এক ঝগড়াটে সম্প্রদায়।

إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَٰهُ مَثَلًا لِّبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ﴿٥٩﴾

৫৯. তিনি তো কেবল আমারই এক বান্দা, যার উপর আমরা অনুগ্রহ করেছিলাম এবং তাকে বানিয়েছিলাম বনী ইস্রাঈলের জন্য দৃষ্টান্ত[১]।

وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَٰٓئِكَةً فِى ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ﴿٦٠﴾

৬০. আর যদি আমরা ইচ্ছে করতাম তবে তোমাদের পরিবর্তে ফেরেশ্তা সৃষ্টি করতে পারতাম, যারা যমীনে উত্তরাধিকারী হত[২]।

---

(১) এটা নাসারাদের সে বিভ্রান্তির জওয়াব, যার ভিত্তিতে তারা ঈসা আলাইহিস্সালাম-কে উপাস্য স্থির করেছিল। পিতা ব্যতীত জন্ম গ্রহণের বিষয়টিকে তারা তার ইলাহ্ হওয়ার প্রমাণস্বরূপ পেশ করেছিল। আল্লাহ তা'আলা এর খণ্ডনে বলেন, এটা তো নিছক আমার কুদরতের এক প্রদর্শনী ছিল। আমি স্বভাবাতীত কাজ করারও ক্ষমতা রাখি। পিতা ব্যতীত জন্মগ্রহণ করা খুব বেশি স্বভাবাতীত কাজ নয়। কেননা, আদমকে পিতা-মাতা ব্যতীত সৃষ্টি করা হয়েছে। তাছাড়া আল্লাহ্ তা'আলা ঈসা আলাইহিস সালামকে তাঁর অসীম ক্ষমতার নমুনা বানানোর অন্য অর্থ, তাকে এমন মু'জিযা দান করা যা না তার পূর্বে কাউকে দেয়া হয়েছিলো না তার পরে। তিনি মাটি দিয়ে পাখি তৈরী করে তাতে ফুঁ দিতেন আর অমনি তা জীবন্ত পাখি হয়ে যেতো। তিনি জন্মান্ধকে দৃষ্টিশক্তি দান করতেন এবং কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করতেন। এমনকি মৃত মানুষকে পর্যন্ত জীবিত করতেন। আল্লাহর বাণীর তাৎপর্য হচ্ছে, শুধু অসাধারণ জন্ম এবং এসব বড় বড় মু'জিযার কারণে তাকে আল্লাহর দাসত্বের উর্ধ্বে মনে করা এবং আল্লাহর পুত্র বলে আখ্যায়িত করে তার উপাসনা করা নিতান্তই ভ্রান্তি। একজন বান্দা হওয়ার চেয়ে অধিক কোন মর্যাদা তার ছিল না। তাকে নিয়ামতসমূহ দিয়ে অভিসিক্ত করে আল্লাহ্ তাঁর অসীম ক্ষমতার নমুনা বানিয়ে দিয়েছিলেন। [দেখুন,তাবারী]

(২) অধিকাংশ তাফসীরবিদ এখানে منكم শব্দটির অর্থ করেছেন, بدلاً منكم বা তোমাদের পরিবর্তে। কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন, আমি ইচ্ছা করলে এমন কাজও করতে পারি, যার নযীর এপর্যন্ত কায়েম হয়নি। অর্থাৎ মানুষের ঔরসে ফেরেশতাও সৃষ্টি করতে পারি। [ফাতহুল কাদীর]
আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, يخلفون। এর অর্থ তারা যমীনের খলীফা বা প্রতিনিধির মর্যাদা লাভ করত। অথবা তোমাদের স্থলাভিষিক্ত হতো। আয়াতের আরেক অর্থ হচ্ছে, তারা তোমাদের মত বংশবিস্তার করত। ফেরেশতারা উত্তরাধিকার রেখে যেত। [ইবনে কাসীর, বাগভী]

৬১. আর নিশ্চয় ‘ঈসা কিয়ামতের নিশ্চিত নিদর্শন; কাজেই তোমরা কিয়ামতে সন্দেহ করো না। আর তোমরা আমারই অনুসরণ কর। এটাই সরল পথ।

وَإِنَّهُۥ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ ۚ هَٰذَا صِرَٰطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾

৬২. শয়তান যেন তোমাদেরকে কিছুতেই বাধা না দেয়, নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ ۖ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٦٢﴾

৬৩. আর ‘ঈসা যখন স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ আসল, তখন তিনি বলেছিলেন, ‘আমি অবশ্যই তোমাদের কাছে এসেছি হিকমতসহ এবং তোমরা যে কিছু বিষয়ে মতভেদ করছ, তা স্পষ্ট করে দেয়ার জন্য। কাজেই তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর’।

وَلَمَّا جَآءَ عِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَٰتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِى تَخْتَلِفُونَ فِيهِ ۖ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿٦٣﴾

৬৪. ‘নিশ্চয় আল্লাহ্, তিনি আমার রব এবং তোমাদেরও রব, অতএব তোমরা তাঁর ‘ইবাদাত কর; এটাই সরল পথ।’

إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ رَبِّى وَرَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ ۚ هَٰذَا صِرَٰطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٦٤﴾

৬৫. অতঃপর তাদের মধ্য থেকে কতগুলো দল মতানৈক্য করল, কাজেই যালিমদের জন্য দুর্ভোগ যন্ত্রণাদায়ক দিনের শাস্তির!

فَٱخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنۢ بَيْنِهِمْ ۖ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ ﴿٦٥﴾

৬৬. তারা তো তাদের অজ্ঞাতসারে হঠাৎ করে কিয়ামত আসারই অপেক্ষা করছে।

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٦٦﴾

৬৭. বন্ধুরা সেদিন হয়ে পড়বে একে অন্যের শত্রু, মুত্তাকীরা ছাড়া।

ٱلْأَخِلَّآءُ يَوْمَئِذٍۭ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٦٧﴾

সপ্তম রুকূ’

يٰعِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَآ اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ ۟

৬৮. হে আমার বান্দাগণ! আজ তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা চিন্তিতও হবে না।

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ۟

৬৯. যারা আমার আয়াতে ঈমান এনেছিল এবং যারা ছিল মুসলিম---

اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُوْنَ ۟

৭০. তোমরা এবং তোমাদের স্ত্রীগণ[১] সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ কর।

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَّاَكْوَابٍ ۚ وَفِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الْاَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْاَعْيُنُ ۚ وَاَنْتُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۟

৭১. স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র নিয়ে তাদেরকে প্রদক্ষিণ করা হবে; সেখানে মন যা চায় এবং যাতে নয়ন তৃপ্ত হয় তাই থাকবে। আর সেখানে তোমরা স্থায়ী হবে।

وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْٓ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۟

৭২. আর এটাই জান্নাত, তোমাদেরকে যার অধিকারী করা হয়েছে, তোমাদের কাজের ফলস্বরূপ।

لَكُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ كَثِيْرَةٌ مِّنْهَا تَاْكُلُوْنَ ۟

৭৩. সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর ফলমূল, তা থেকে তোমরা খাবে।

اِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِيْ عَذَابِ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ ۟ۚ

৭৪. নিশ্চয় অপরাধীরা জাহান্নামের শাস্তি তে স্থায়ী হবে;

لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ ۟

৭৫. তাদের শাস্তি লাঘব করা হবে না এবং তারা তাতে হতাশ হয়ে পড়বে।

---

(১) কোন কোন মুফাসসির বলেনঃ মূল আয়াতে أزواج শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যা স্ত্রীদের বুঝাতেও ব্যবহৃত হতে পারে, আবার কোন ব্যক্তির একই পথের পথিক সমমনা ও সহপাঠী বন্ধুদের বুঝাতেও ব্যবহৃত হয়। এই ব্যাপক অর্থবোধক শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে এ জন্য যে, তার মধ্যে যেন এই উভয় অর্থই শামিল হয়। ঈমানদারদের ঈমানদার স্ত্রীরা এবং তাদের মুমিন বন্ধুরাও জান্নাতে তাদের সাথে থাকবে। [আদওয়াউল বয়ান]

৭৬. আর আমরা তাদের প্রতি যুলুম করিনি, কিন্তু তারা নিজেরাই ছিল যালিম।

وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْا هُمُ الظّٰلِمِيْنَ ۝٧٦

৭৭. তারা চিৎকার করে বলবে, ‘হে মালেক[১], তোমার রব যেন আমাদেরকে নিঃশেষ করে দেন।’ সে বলবে, ‘নিশ্চয় তোমরা অবস্থানকারী হবে।’

وَنَادَوْا يٰمٰلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ۗ قَالَ اِنَّكُمْ مّٰكِثُوْنَ ۝٧٧

৭৮. আল্লাহ্ বলবেন, ‘অবশ্যই আমরা তোমাদের কাছে সত্য নিয়ে এসেছিলাম, কিন্তু তোমাদের বেশীর ভাগই ছিলে সত্য অপছন্দকারী।’

لَقَدْ جِئْنٰكُمْ بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كٰرِهُوْنَ ۝٧٨

৭৯. নাকি তারা কোন ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে? নিশ্চয় আমিই তো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকারী।

اَمْ اَبْرَمُوْٓا اَمْرًا فَاِنَّا مُبْرِمُوْنَ ۝٧٩

৮০. নাকি তারা মনে করে যে, আমরা তাদের গোপন বিষয় ও মন্ত্রণা শুনতে পাই না? অবশ্যই হ্যাঁ। আর আমাদের ফেরেশ্‌তাগণ তাদের কাছে থেকে সবকিছু লিখছে।

اَمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوٰىهُمْ ۭ بَلٰى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُوْنَ ۝٨٠

৮১. বলুন, ‘দয়াময় আল্লাহ্‌র কোন সন্তান থাকলে আমি হতাম তাঁর ইবাদতে ঘৃণাকারীদের অগ্রণী[২];

قُلْ اِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ ۖ فَاَنَا اَوَّلُ الْعٰبِدِيْنَ ۝٨١

---

(১) মালেক অর্থ জাহান্নামের ব্যবস্থাপক ফেরেশ্‌তার নাম। কথার ইংগিত থেকে এটিই প্রকাশ পাচ্ছে। [ইবনে কাসীর]

(২) ওপরে عَابِدِيْنَ এর অর্থ করা হয়েছে, ঘৃণাকারী। এটা আরবী বিভিন্ন বাকরীতিতে ব্যবহৃত আছে। অন্য অনুবাদ হচ্ছে, বলুন হে মুহাম্মাদ! যদি রহমানের কোন সন্তান থাকে যেটা তোমরা তোমাদের কথায় দাবী করছ, তবে তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করণে ও তোমাদের দাবী অস্বীকারকরণে আমি প্রথম আল্লাহ্‌র উপর মুমিন। কারণ, তাঁর কোন সন্তান থাকতে পারে না। [তাবারী] তখন عَابِدِيْنَ শব্দের অর্থ হবে, مُؤْمِنِيْنَ। আর কথার বাকী অংশ উহ্য থাকবে। তাছাড়া আরেক অনুবাদ হচ্ছে, ইবাদতকারী।

سُبۡحٰنَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ رَبِّ الۡعَرۡشِ عَمَّا یَصِفُوۡنَ ﴿۸۲﴾

৮২. ‘তারা যা আরোপ করে তা থেকে আসমানসমূহ ও যমীনের রব এবং ‘আরশের রব পবিত্র-মহান।

فَذَرۡهُمۡ یَخُوۡضُوۡا وَیَلۡعَبُوۡا حَتّٰی یُلٰقُوۡا یَوۡمَهُمُ الَّذِیۡ یُوۡعَدُوۡنَ ﴿۸۳﴾

৮৩. অতএব আপনি তাদেরকে ছেড়ে দিন তারা মগ্ন থাকুক বেহুদা কথায় এবং মত্ত থাকুক খেল-তামাশায় যে দিনের ওয়াদা দেয়া হয়েছে তার সম্মুখীন হওয়ার আগ পর্যন্ত ।

وَهُوَ الَّذِیۡ فِی السَّمَآءِ اِلٰهٌ وَّفِی الۡاَرۡضِ اِلٰهٌ ؕ وَهُوَ الۡحَكِیۡمُ الۡعَلِیۡمُ ﴿۸۴﴾

৮৪. আর তিনিই সত্য ইলাহ্ আসমানে এবং তিনিই সত্য ইলাহ্ যমীনে। আর তিনি হিকমতওয়ালা, সর্বজ্ঞ।

وَتَبٰرَكَ الَّذِیۡ لَهٗ مُلۡكُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ وَمَا بَیۡنَهُمَا ۚ وَعِنۡدَهٗ عِلۡمُ السَّاعَةِ ۚ وَاِلَیۡهِ تُرۡجَعُوۡنَ ﴿۸۵﴾

৮৫. আর তিনি বরকতময়, যার কর্তৃত্বে রয়েছে আসমানসমূহ, যমীন ও এ দু’য়ের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছু। আর কিয়ামতের জ্ঞান শুধু তাঁরই আছে এবং তাঁরই কাছে তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তিত করা হবে।

وَلَا یَمۡلِكُ الَّذِیۡنَ یَدۡعُوۡنَ مِنۡ دُوۡنِهِ الشَّفَاعَةَ

৮৬. আর তিনি ছাড়া তারা যাদেরকে ডাকে, তারা সুপারিশের মালিক হবে

অর্থাৎ যদি ধরে নেয়া হয়, তাঁর সন্তান আছে তারপরও আমি আল্লাহ্‌রই ইবাদাত করব। কারণ, আমি তাঁর বান্দা। আর বান্দা স্রষ্টার নির্দেশের বাইরে যেতে পারে না। [ইবন কাসীর] কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহর সন্তান হওয়া কোন পর্যায়ে সম্ভব। বরং উদ্দেশ্য একথা ব্যক্ত করা যে, আমি কোন শত্রুতা ও হঠকারিতাবশতঃ তোমাদের বিশ্বাস অস্বীকার করছি না; বরং প্রমাণাদির আলোকেই করছি। বিশুদ্ধ প্রমাণাদি দ্বারা আল্লাহর সন্তান থাকা প্রমাণিত হলে আমি অবশ্যই তা মেনে নিতাম। কিন্তু সর্বপ্রকার দলীল এর বিপক্ষে। কাজেই মেনে নেয়ার প্রশ্নই উঠে না। এ থেকে জানা গেল যে, মিথ্যাপন্থীদের সাথে বিতর্কের সময় নিজের সত্যপ্রিয়তা ফুটানোর উদ্দেশ্যে একথা বলা জায়েয ও সমীচীন যে, তোমার দাবী সত্য প্রমাণিত হলে আমি মেনে নিতাম। কেননা, মাঝে মাঝে এধরনের কথায় প্রতিপক্ষের মনে নম্রতা সৃষ্টি হয়, যা তাকে সত্য গ্রহণে উৎসাহিত করে। [দেখুন, তাবারী; কুরতুবী; ইবন কাসীর,আদওয়াউল বায়ান]

না, তবে তারা ছাড়া, যারা জেনে-শুনে সত্য সাক্ষ্য দেয় ।	إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٨٦﴾
৮৭. আর যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে, তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ্ ।' অতঃপর তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে?	وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿٨٧﴾
৮৮. আর তার (রাসূল) এ উক্তিঃ 'হে আমার রব! নিশ্চয় এরা এমন সম্প্রদায় যারা ঈমান আনবে না ।'	وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾
৮৯. কাজেই আপনি তাদেরকে উপেক্ষা করুন এবং বলুন, 'সালাম'; অতঃপর তারা শীঘ্রই জানতে পারবে ।	فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٨٩﴾

৪৪- সূরা আদ-দুখান
৫৯ আয়াত, মক্কী

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

১. হা-মীম ।

حمٓ ①

২. শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের(১) ।

وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ②

৩. নিশ্চয় আমরা এটা নাযিল করেছি এক মুবারক রাতে(২); নিশ্চয় আমরা সতর্ককারী ।

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ ۚ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ③

৪. সে রাতে প্রত্যেক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত স্থিরকৃত হয়(৩),

فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ④

(১) 'সুস্পষ্ট কিতাব' বলে কুরআনকে বোঝানো হয়েছে ।[সা'দী,মুয়াস্‌সার, জালালাইন]

(২) গ্রহণযোগ্য তাফসীরবিদদের মতে এখানে কদরের রাত্রি বোঝানো হয়েছে, যা রমযান মাসের শেষ দশকে হয় । সূরা কদরে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, পবিত্র কুরআন শবে-কদরে নাযিল হয়েছে । এতে বোঝা গেল যে, এখানেও বরকতের রাত্রি বলে শবে-কদরই বোঝানো হয়েছে । এ রাত্রিকে 'মোবারক' বলার কারণ এই যে, এ রাত্রিতে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অসংখ্য কল্যাণ ও বরকত নাযিল হয় । এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন, দুনিয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা পয়গম্বরগণের প্রতি যত কিতাব নাযিল করেছেন, তা সবই রমযান মাসেরই বিভিন্ন তারিখে নাযিল হয়েছে । তাতে বলা হয়েছে, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর সহীফাসমূহ রমযানের প্রথম তারিখে, তাওরাত ছয় তারিখে, যবুর বার তারিখে, ইঞ্জীল আঠার তারিখে এবং কুরআন চব্বিশ তারিখ অতিবাহিত হওয়ার পর (পঁচিশের রাত্রিতে) অবতীর্ণ হয়েছে । [মুসনাদে আহমাদ:৪/১০৭]

(৩) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, এর অর্থ কুরআন অবতরণের রাত্রি অর্থাৎ, শবে-কদরে সৃষ্টি সম্পর্কিত সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ফয়সালা স্থির করা হয়, যা পরবর্তী শবে-কদর পর্যন্ত এক বছরে সংঘটিত হবে । অর্থাৎ, এ বছর কারা কারা জন্মগ্রহণ করবে, কে কে মারা যাবে এবং এ বছর কি পরিমাণ রিযিক দেয়া হবে । মাহ্‌দভী বলেন এর অর্থ এই যে, আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত তকদীরে পূর্বাহ্নে, স্থিরীকৃত সকল ফয়সালা এ রাত্রিতে সংশ্লিষ্ট ফেরেশতাগণের কাছে অর্পণ করা হয় । কেননা, কুরআন ও হাদীসের অন্যান্য বর্ণনা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ তা'আলা এসব ফয়সালা মানুষের জন্মের পূর্বেই সৃষ্টিলগ্নে লিখে দিয়েছেন । অতএব, এ রাত্রিতে এগুলোর স্থির করার অর্থ এই যে, যে ফেরেশতাগণের মাধ্যমে ফয়সালা ও তাকদীর প্রয়োগ

৫. আমাদের পক্ষ থেকে আদেশক্রমে, নিশ্চয় আমরা রাসূল প্রেরণকারী

أَمْرًا مِّنْ عِندِنَآ ۚ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۝٥

৬. আপনার রবের রহমতস্বরূপ; নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ--

رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۝٦

৭. আসমানসমূহ, যমীন ও এ দু'য়ের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর রব, যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও ।

رَبِّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَآ ۖ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ۝٧

৮. তিনি ছাড়া কোন সত্য ইলাহ্ নেই, তিনি জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান; তিনি তোমাদের রব এবং তোমাদের পিতৃপুরুষদেরও রব ।

لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْىِۦ وَيُمِيتُ ۖ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآئِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ۝٨

৯. বরং তারা সন্দেহের বশবর্তী হয়ে খেল--তামাসা করছে ।

بَلْ هُمْ فِى شَكٍّ يَلْعَبُونَ ۝٩

১০. অতএব আপনি অপেক্ষা করুন সে দিনের যেদিন স্পষ্ট ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হবে আকাশ(১),

فَٱرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِى ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ۝١٠

করা হয়, এ রাত্রিতে সারা বছরের বিধানাবলী তাদের কাছে অর্পণ করা হয় । ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, তুমি কোন মানুষকে বাজারে হাঁটাচলা করতে দেখবে অথচ তার নাম মৃতদের তালিকায় । তারপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করে বললেন, প্রতি বছরই এ বিষয়গুলো নির্ধারিত হয়ে যায় । [মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৪৪৮-৪৪৯]

(১) আলোচ্য আয়াতসমূহে উল্লেখিত ধোঁয়া সম্পর্কে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের তিন প্রকার উক্তি বর্ণিত আছে । প্রথম উক্তি এই যে, এটা কেয়ামতের অন্যতম আলামত বা কেয়ামতের সন্নিকটবর্তী সময়ে সংঘটিত হবে । এই উক্তি আলী, ইবন আব্বাস, ইবন ওমর, আবু হুরায়রা, রাদিয়াল্লাহু আনহুম ও হাসান বসরী রাহেমাহুল্লাহ্ প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে । দ্বিতীয় উক্তি এই যে, এ ভবিষ্যদ্বানী অতীতে পূর্ণ হয়ে গেছে এবং এতে মক্কার সে দুর্ভিক্ষ বোঝানো হয়েছে, যা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দো'আর ফলে মক্কাবাসীদের উপর অর্পিত হয়েছিল । তারা ক্ষুধার্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিল এবং মৃত জন্তু পর্যন্ত খেতে বাধ্য হয়েছিল । আকাশে বৃষ্টি ও মেঘের পরিবর্তে ধূম্র দৃষ্টিগোচর হত । এ উক্তি আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রমুখের । তৃতীয় উক্তি এই যে, এখানে মক্কা বিজয়ের দিন মক্কার

আকাশে উত্থিত ধুলিকণাকে ধুম্র বলা হয়েছে। এ উক্তি আবদুর রহমান আ'রাজ প্রমুখের। প্রথমোক্ত উক্তিদ্বয়ই সমধিক প্রসিদ্ধ। তৃতীয় উক্তি ইবনে-কাসীরের মতে অগ্রাহ্য। সহীহ হাদীসসমূহে দ্বিতীয় উক্তিই অবলম্বিত হয়েছে। প্রথমোক্ত উক্তিদ্বয়ের বর্ণনাসমূহ নিম্নরূপঃ

হুযায়ফা ইবনে আসীদ বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। আমরা তখন পরস্পর কেয়ামতের সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। তিনি বললেন, যত দিন তোমরা দশটি আলামত না দেখ, ততদিন কেয়ামত হবে না-(১) পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়, (২) দোখান তথা ধুম্র, (৩) দাব্বা (বা বিচিত্র ধরণের প্রাণী), (৪) ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব, (৫) ঈসা আলাইহিস্‌সালাম-এর অবতরণ, (৬) দাজ্জালের আবির্ভাব, (৭) পূর্বে ভূমিধস, (৮) পশ্চিমে ভূমিধস (৯) আরব উপদ্বীপে ভূমিধস, (১০) আদন থেকে এক অগ্নি বের হবে এবং মানুষকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে। মানুষ যেখানে রাত্রিযাপন করতে আসবে, অগ্নিও থেমে যাবে, যেখানে দুপুরে বিশ্রামের জন্যে আসবে, সেখানে অগ্নিও থেমে যাবে। [মুসলিমঃ ২৯০১] এছাড়া কিছু সহীহ ও হাসান হাদীসও একথা প্রমাণ করে যে, 'দোখান' ধুম্র কেয়ামতের ভবিষ্যৎ আলামতসমূহের অন্যতম। কুরআনের বাহ্যিক ভাষাও এর সাক্ষ্য দেয়।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, কাফেররা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দাওয়াত কবুল করতে অস্বীকার করল এবং কুফরীকেই আঁকড়ে রইল, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের উপর দো'আ করলেন যে, হে আল্লাহ এদের উপর ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর আমলের দুর্ভিক্ষের ন্যায় দুর্ভিক্ষ চাপিয়ে দিন। ফলে কাফেররা ভয়ংকর দুর্ভিক্ষে পতিত হল। এমনকি, তারা অস্থি এবং মৃত জন্তুও ভক্ষণ করতে লাগল। তারা আকাশের দিকে তাকালে ধুম্র ব্যতীত কিছুই দৃষ্টিগোচর হত না। এক বর্ণনায় আছে, তাদের কেউ আকাশের দিকে তাকালে ক্ষুধার তীব্রতায় সে কেবল ধুম্রের মত দেখত। অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ তার বক্তব্যের প্রমাণ স্বরূপ এ আয়াতখানি তেলাওয়াত করলেন। দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত জনগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে আবেদন করল, আপনি আপনার মুদার গোত্রের জন্য আল্লাহর কাছে বৃষ্টির দো'আ করুন। নতুবা আমরা সবাই ধ্বংস হয়ে যাব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দো'আ করলে, বৃষ্টি হল। তখন ﴿إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيلًا﴾ আয়াত নাযিল হল। অর্থাৎ, আমরা কিছু দিনের জন্যে তোমাদের থেকে আযাব প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। কিন্তু তোমরা বিপদমুক্ত হয়ে গেলে আবার কুফরের দিকে ফিরে যাবে। বাস্তবে তাই হল, তারা তাদের পূর্বাবস্থায় ফিরে গেল। তখন আল্লাহ তা'আলা ﴿يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنتَقِمُونَ﴾ আয়াত নাযিল করলেন। অর্থাৎ যেদিন আমরা প্রবলভাবে পাকড়াও করব, সেদিনের ভয় কর। অতঃপর ইবনে-মসউদ বললেন, এই প্রবল পাকড়াও বদরযুদ্ধে হয়ে গেছে।

يَّغۡشَى النَّاسَ ؕ هٰذَا عَذَابٌ اَلِيۡمٌ ﴿۱۱﴾

১১. তা আবৃত করে ফেলবে লোকদেরকে । এটা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ।

رَبَّنَا اكۡشِفۡ عَنَّا الۡعَذَابَ اِنَّا مُؤۡمِنُوۡنَ ﴿۱۲﴾

১২. (তারা বলবে) ‘হে আমাদের রব! আমাদের থেকে শাস্তি দূর করুন, নিশ্চয় আমরা মুমিন হব ।’

اَنّٰى لَهُمُ الذِّكۡرٰى وَقَدۡ جَآءَهُمۡ رَسُوۡلٌ مُّبِيۡنٌ ﴿۱۳﴾

১৩. তারা কি করে উপদেশ গ্রহণ করবে? অথচ ইতোপূর্বে তাদের কাছে এসেছে স্পষ্ট এক রাসূল;

ثُمَّ تَوَلَّوۡا عَنۡهُ وَقَالُوۡا مُعَلَّمٌ مَّجۡنُوۡنٌ ﴿۱۴﴾

১৪. তারপর তারা তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল এবং বলেছিল, ‘এ এক শিক্ষাপ্রাপ্ত পাগল!’

اِنَّا كَاشِفُوا الۡعَذَابِ قَلِيۡلًا اِنَّكُمۡ عَآئِدُوۡنَ ﴿۱۵﴾

১৫. নিশ্চয় আমরা অল্প সময়ের জন্য শাস্তি রহিত করব--- (কিন্তু) নিশ্চয় তোমরা তোমাদের আগের অবস্থায় ফিরে যাবে ।

يَوۡمَ نَبۡطِشُ الۡبَطۡشَةَ الۡكُبۡرٰى ۚ اِنَّا مُنۡتَقِمُوۡنَ ﴿۱۶﴾

১৬. যেদিন আমরা প্রবলভাবে পাকড়াও করব, সেদিন নিশ্চয় আমরা হব প্রতিশোধ গ্রহণকারী ।

وَلَقَدۡ فَتَنَّا قَبۡلَهُمۡ قَوۡمَ فِرۡعَوۡنَ وَجَآءَهُمۡ رَسُوۡلٌ كَرِيۡمٌ ﴿۱۷﴾

১৭. আর অবশ্যই এদের আগে আমরা ফির‘আউন সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করেছিলাম এবং তাদের কাছেও এসেছিলেন এক সম্মানিত রাসূল[১],

---

এই ঘটনা বর্ণনা করার পর তিনি আরও বললেন, পাঁচটি বিষয় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে । অর্থাৎ, দোখান তথা ধুম্র, রোম (এর পারসিকদের উপর জয়লাভ), চাঁদ (দ্বিখণ্ডিত হওয়া), পাকড়াও (যা বদরের প্রান্তরে সংঘটিত হয়েছিল) ও লেযাম (বা স্থায়ী আযাব) । [বুখারী:৪৮০৯, মুসলিম:২৭৯৮]

(১) মূল আয়াতে كريم শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে । শব্দটি যখন মানুষের জন্য ব্যবহার করা হয় তখন তার দ্বারা বুঝানো হয় এমন ব্যক্তিকে যে অত্যন্ত ভদ্র ও শিষ্ট আচার-আচরণ এবং অতীব প্রশংসনীয় গুণাবলীর অধিকারী । সাধারণ গুণাবলী বুঝাতে এ

১৮. (তিনি ফিরআউনকে বলেছিলেন) ‘আল্লাহ্‌র বান্দাদেরকে আমার কাছে ফিরিয়ে দাও[১]। নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল।

أَنْ أَدُّوٓا۟ إِلَىَّ عِبَادَ ٱللَّهِ ۖ إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۝١٨

১৯. ‘আর তোমরা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করো না, নিশ্চয় আমি তোমাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আসব।

وَأَن لَّا تَعْلُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ ۖ إِنِّىٓ ءَاتِيكُم بِسُلْطَٰنٍ مُّبِينٍ ۝١٩

২০. ‘আর নিশ্চয় আমি আমার রব ও তোমাদের রবের আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যাতে তোমরা আমাকে পাথরের আঘাত হানতে না পার[২]।

وَإِنِّى عُذْتُ بِرَبِّى وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ ۝٢٠

২১. ‘আর যদি তোমরা আমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন না কর, তবে তোমরা আমাকে ছেড়ে যাও।’

وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا۟ لِى فَٱعْتَزِلُونِ ۝٢١

২২. অতঃপর মূসা তার রবকে ডাকলেন, ‘নিশ্চয় এরা এক অপরাধী সম্প্রদায়।’

فَدَعَا رَبَّهُۥٓ أَنَّ هَٰٓؤُلَآءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ ۝٢٢

২৩. (আল্লাহ্‌ বললেন) ‘সুতরাং আপনি

فَأَسْرِ بِعِبَادِى لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ۝٢٣

শব্দ ব্যবহৃত হয় না। এখানে মূসা আলাইহিস সালামকে উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। [তবারী, কুরতুবী]

(১) মূল আয়াতে أَدُّوْا বলা হয়েছে। আয়াতাংশের একটি অনুবাদ হচ্ছে আল্লাহর বান্দাদেরকে আমার কাছে সোর্পদ করো। এই অনুবাদ অনুসারে এটা ইতোপূর্বে সূরা আল-আ'রাফ এর ১০৫, সূরা ত্বাহার ৪৭ এবং আশ-শু‘আরার ১৭ নং আয়াতে ‘বনী ইসরাঈলদের আমার সাথে যেতে দাও’ বলে যে দাবী করা হয়েছে সেই দাবীর সমার্থক।

(২) تَرْجُمُوْنِ শব্দের অর্থ প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করা। এর অপর অর্থ কাউকে গালি দেয়াও হয়। এখানে উভয় অর্থই হতে পারে, কিন্তু প্রথম অর্থ নেয়াই অধিক সঙ্গত। কেননা, ফির‘আউনের সম্প্রদায় মুসা আলাইহিস সালাম-কে হত্যার হুমকি দিচ্ছিল। [তাবারী,ইবনে কাসীর]

আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাতে বের হয়ে পড়ুন, নিশ্চয় তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে।'

২৪. আর সমুদ্রকে স্থির থাকতে দিন[১], নিশ্চয় তারা হবে এক ডুবন্ত বাহিনী।

وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا ۖ إِنَّهُمْ جُندٌ مُّغْرَقُونَ ﴿٢٤﴾

২৫. তারা পিছনে রেখে গিয়েছিল অনেক উদ্যান ও প্রস্রবণ;

كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٢٥﴾

২৬. শস্যক্ষেত্র ও সুরম্য প্রাসাদ,

وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٢٦﴾

২৭. আর বিলাস উপকরণ, তাতে তারা আনন্দ পেত।

وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ ﴿٢٧﴾

২৮. এরূপই ঘটেছিল এবং আমরা এ সবকিছুর উত্তরাধিকারী করেছিলাম ভিন্ন[২] সম্প্রদায়কে।

كَذَٰلِكَ ۖ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴿٢٨﴾

২৯. অতঃপর আসমান এবং যমীন তাদের জন্য অশ্রুপাত করেনি এবং তারা অবকাশপ্রাপ্তও ছিল না।

فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ ﴿٢٩﴾

দ্বিতীয় রুকূ'

৩০. আর অবশ্যই আমরা উদ্ধার করেছিলাম

وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿٣٠﴾

(১) মূসা আলাইহিস সালাম সঙ্গীগণসহ সমুদ্র পার হওয়ার পর স্বাভাবিকভাবে কামনা করবেন যে, সমুদ্র পুনরায় আসল অবস্থায় ফিরে যাক, যাতে ফির'আউনের বাহিনী পার হতে না পারে। তাই আল্লাহ তা'আলা তাকে বলে দিলেন, তোমরা পার হওয়ার পর সমুদ্রকে শান্ত ও অচল অবস্থায় থাকতে দাও এবং পুনরায় পানি চলমান হওয়ার চিন্তা করো না- যাতে ফির'আউন শুষ্ক ও তৈরী পথ দেখে সমুদ্রের মধ্যস্থলে প্রবেশ করে। তখন আমি সমুদ্রকে চলমান করে দেব এবং তারা নিমজ্জিত হবে। [দেখুন,তাবারী]

(২) অন্যত্র বলা হয়েছে যে, এই ভিন্ন জাতি হচ্ছে বনী ইসরাঈল। [সূরা আশ-শু'আরা:৫৯] অবশ্য বনী ইসরাঈল পুনরায় মিসরে আগমন করেছিল বলে ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুরা আশ-শু'আরার ৫৯ নং আয়াতের তফসীরে এর বিস্তারিত জবাবও দেয়া হয়েছে।

বনী ইস্‌রাঈলকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি হতে

৩১. ফির্‌'আউন থেকে; নিশ্চয় সে ছিল সীমালঙ্ঘনকারীদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়।

مِنۡ فِرۡعَوۡنَ ۚ اِنَّهٗ كَانَ عَالِيًا مِّنَ الۡمُسۡرِفِيۡنَ ﴿٣١﴾

৩২. আর আমরা জেনে শুনেই তাদেরকে সকল সৃষ্টির উপর নির্বাচিত করেছিলাম।

وَلَقَدِ اخۡتَرۡنٰهُمۡ عَلٰى عِلۡمٍ عَلَى الۡعٰلَمِيۡنَ ﴿٣٢﴾

৩৩. আর আমরা তাদেরকে এমন নিদর্শনাবলী দিয়েছিলাম যাতে ছিল সুস্পষ্ট পরীক্ষা[১];

وَاٰتَيۡنٰهُمۡ مِّنَ الۡاٰيٰتِ مَا فِيۡهِ بَلٰٓـؤٌا مُّبِيۡنٌ ﴿٣٣﴾

৩৪. নিশ্চয় তারা বলেই থাকে,

اِنَّ هٰٓؤُلَاۤءِ لَيَقُوۡلُوۡنَ ﴿٣٤﴾

৩৫. 'আমাদের প্রথম মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই নেই এবং আমরা পুনরুত্থিত হবার নই।

اِنۡ هِىَ اِلَّا مَوۡتَتُنَا الۡاُوۡلٰى وَمَا نَحۡنُ بِمُنۡشَرِيۡنَ ﴿٣٥﴾

৩৬. 'অতএব তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে নিয়ে আস।'

فَاۡتُوۡا بِاٰبَآئِنَاۤ اِنۡ كُنۡتُمۡ صٰدِقِيۡنَ ﴿٣٦﴾

৩৭. তারা কি শ্রেষ্ঠ না তুব্বা' সম্প্রদায়[২] ও

اَهُمۡ خَيۡرٌ اَمۡ قَوۡمُ تُبَّعٍ ۙ وَّالَّذِيۡنَ مِنۡ قَبۡلِهِمۡ

(১) এখানে লাঠি, দীপ্তিময় শুভ্র হাত ইত্যাদি মু'জিযা বোঝানো হয়েছে। بلاء শব্দের দু'অর্থ- পুরস্কার ও পরীক্ষা। এখানে উভয় অর্থ অনায়াসে সম্ভবপর। [দেখুন, কুরতুবী]

(২) কুরআনে দু'জায়গায় তুব্বার উল্লেখ রয়েছে- এখানে এবং সুরা ক্বাফে। কিন্তু উভয় জায়গায় কেবল নামই উল্লেখ করা হয়েছে-কোন বিস্তারিত ঘটনা বিবৃত হয়নি। তাই এরা কোন জনগোষ্ঠী এ সম্পর্কে তফসীরবিদগণ বিভিন্ন উক্তি করেছেন। বাস্তবে তুব্বা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম নয়, বরং এটা ইয়ামনের হিমইয়ারী সম্রাটদের উপাধিবিশেষ। তারা দীর্ঘকাল পর্যন্ত ইয়ামনের পশ্চিমাংশকে রাজধানী করে আরব, শাম, ইরাক ও আফ্রিকার কিছু অংশ শাসন করেছে। এই সম্রাটগণকে তাবাবি'য়ায়ে-ইয়ামন বলা হয়। কোন কোন মুফাসসির বলেন, এখানে তাদের মধ্যবর্তী এক সম্রাটকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যার নাম আস'আদ আবু কুরাইব ইবনে মা'দিকারেব। যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুওয়াত লাভের কমপক্ষে সাতশ বছর পূর্বে

أَهْلَكْنٰهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿٣٧﴾

তাদের পূর্বে যারা ছিল তারা? আমরা তাদেরকে ধ্বংস করেছিলাম। নিশ্চয় তারা ছিল অপরাধী।

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِينَ ﴿٣٨﴾

৩৮. আর আমরা আসমানসমূহ, যমীন ও এ দু'য়ের মধ্যকার কোন কিছুই খেলার ছলে সৃষ্টি করিনি;

مَا خَلَقْنٰهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾

৩৯. আমরা এ দু'টিকে যথাযথভাবেই সৃষ্টি করেছি, কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না।

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقٰتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٠﴾

৪০. নিশ্চয় ফয়সালার দিনটি তাদের সবার জন্য নির্ধারিত সময়।

يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَّوْلًى شَيْـًٔا وَّلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿٤١﴾

৪১. সেদিন এক বন্ধু অন্য বন্ধুর কোন কাজে আসবে না এবং তারা সাহায্যও পাবে না।

অতিক্রান্ত হয়েছে। হিমইয়ারী সম্রাটদের মধ্যে তার রাজত্বকাল সর্বাধিক ছিল। সে তার শাসনামলে অনেক দেশ জয় করে সমরকন্দ পর্যন্ত পৌছে যায়। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, এই দিগ্বিজয়কালে একবার সে মদীনা মুনাওয়ারার জনপদ অতিক্রম করে এবং তা করায়ত্ত করার ইচ্ছা করে। মদীনাবাসীরা দিনের বেলায় তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত এবং রাত্রিতে তার আতিথেয়তা করত। ফলে সে লজ্জিত হয়ে মদীনা জয়ের ইচ্ছা পরিত্যাগ করে। এ সময়েই মদীনার দুজন ইহুদী আলেম তাকে হুশিয়ার করে দেয় যে, এই শহর সে করায়ত্ত করতে পারবে না; কারণ, এটা শেষ নবীর হিজরতভূমি। সম্রাট ইহুদী আলেমদ্বয়কে সাথে নিয়ে ইয়ামন প্রত্যাবর্তন করে এবং তাদের শিক্ষা ও প্রচারে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। অতঃপর তার সম্প্রদায়ও সে দ্বীন গ্রহণ করে। কিন্তু তার মৃত্যুর পর তারা আবার মূর্তিপূজা ও অগ্নিপূজা শুরু করে দেয়। ফলে তাদের উপর আল্লাহর গযব নাযিল হয়। এ থেকে জানা যায় যে, তুব্বার সম্প্রদায় ইসলাম গ্রহণ করেছিল, কিন্তু পরে পথভ্রষ্ট হয়ে আল্লাহর গযবে পতিত হয়েছিল। এ কারণেই কুরআনের উভয় জায়গায় তুব্বার সম্প্রদায় উল্লেখ করা হয়েছে; শুধু তুব্বা উল্লেখিত হয়নি? [দেখুন, তাবারী, ইবন কাসীর, কুরতুবী]
কোন কোন হাদীস থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: তোমরা তুব্বাকে মন্দ বলো না; কারণ সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। [মুসনাদে আহমাদ:৫/৩৪০]

৪২. তবে আল্লাহ্ যার প্রতি দয়া করেন তার কথা স্বতন্ত্র। নিশ্চয় তিনিই মহাপরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

إِلَّا مَن رَّحِمَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٤٢﴾

তৃতীয় রুকূ'

৪৩. নিশ্চয় যাক্কূম গাছ হবে[১]---

إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُّومِ ﴿٤٣﴾

৪৪. পাপীর খাদ্য;

طَعَامُ ٱلْأَثِيمِ ﴿٤٤﴾

৪৫. গলিত তামার মত, পেটের মধ্যে ফুটতে থাকবে

كَٱلْمُهْلِ يَغْلِى فِى ٱلْبُطُونِ ﴿٤٥﴾

৪৬. ফুটন্ত পানি ফুটার মত।

كَغَلْىِ ٱلْحَمِيمِ ﴿٤٦﴾

৪৭. (বলা হবে) তাকে ধর এবং টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যস্থলে,

خُذُوهُ فَٱعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ﴿٤٧﴾

৪৮. তারপর তার মাথার উপর ফুটন্ত পানির শাস্তি ঢেলে দাও-

ثُمَّ صُبُّوا۟ فَوْقَ رَأْسِهِۦ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ ﴿٤٨﴾

৪৯. (বলা হবে) 'আস্বাদন কর, নিশ্চয় তুমিই সম্মানিত, অভিজাত!

ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ ﴿٤٩﴾

৫০. 'নিশ্চয় এটা তা-ই, যে বিষয়ে তোমরা সন্দেহ করতে।'

إِنَّ هَٰذَا مَا كُنتُم بِهِۦ تَمْتَرُونَ ﴿٥٠﴾

৫১. নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে[২]--

إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى مَقَامٍ أَمِينٍ ﴿٥١﴾

---

(১) যাক্কুমের স্বরূপ সম্পর্কে সূরা আস-সাফফাতে কিছু জরুরী বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, কুরআনের আয়াত থেকে বাহ্যতঃ জানা যায়, যাক্কুম কাফেরদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করার আগেই খাওয়ানো হবে। [ফাতহুল কাদীর] কেননা, এখানে মানুষকে খাওয়ানোর পর জাহান্নামের মধ্যস্থলে টেনে নিয়ে যাওয়ার আদেশ উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া অন্য সূরায় বলা হয়েছে, ﴿لَءَاكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ ۞ فَمَالِـُٔونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ۞ فَشَٰرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ۞ فَشَٰرِبُونَ شُرْبَ ٱلْهِيمِ ۞ هَٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ﴾ [সূরা আল-ওয়াকি'আ: ৫২-৫৬]

(২) শান্তি ও নিরাপত্তার জায়গা অর্থ এমন জায়গা যেখানে কোন প্রকার আশংকা থাকবে না। কোন দুঃখ, অস্থিরতা, বিপদ, আশংকা এবং পরিশ্রম ও কষ্ট থাকবে না। হাদীসে

৫২. উদ্যান ও ঝর্ণার মাঝে,

فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ۟ۙ

৫৩. তারা পরবে মিহি ও পুরু রেশমী বস্ত্র এবং বসবে মুখোমুখি হয়ে।

يَّلْبَسُوْنَ مِنْ سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ ۟ۙ

৫৪. এরূপই ঘটবে; আর আমরা তাদেরকে বিয়ে দিয়ে দেব ডাগর নয়না হূরদের সাথে,

كَذٰلِكَ ۫ وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ ۟ؕ

৫৫. সেখানে তারা প্রশান্ত চিত্তে বিবিধ ফলমূল আনতে বলবে।

يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ اٰمِنِيْنَ ۟ۙ

৫৬. প্রথম মৃত্যুর পর তারা সেখানে আর মৃত্যু আস্বাদন করবে না[১]। আর তিনি তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করবেন-

لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ اِلَّا الْمَوْتَةَ الْاُوْلٰى ۚ وَوَقٰىهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ۟ۙ

৫৭. আপনার রবের অনুগ্রহস্বরূপ[২]।

فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكَ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۟

আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ জান্নাতবাসীদের বলে দেয়া হবে, তোমরা এখানে চিরদিন সুস্থ থাকবে, কখনো রোগাক্রান্ত হবে না, চিরদিন জীবিত থাকবে, কখনো মরবে না চিরদিন সুখী থাকবে কখনো দুর্দশাগ্রস্ত হবে না এবং চিরদিন যুবক থাকবে, কখনো বৃদ্ধ হবে না। [মুসলিম:২৮৩৭]

(১) অর্থাৎ একবার মৃত্যুর পর আর কোন মৃত্যু হবে না। এ নিয়ম জাহান্নামীদের জন্যেও। কিন্তু সেটা তাদের জন্যে অধিক কঠোর এবং জান্নাতীদের জন্যে অধিক আনন্দ ও সুখের বিষয় হবে। কারণ, যত বড় নেয়ামতই হোক, তা বিলুপ্ত হওয়ার কল্পনা নিশ্চিতরূপেই মনে বিপদের রেখাপাত করে। জান্নাতীরা যখন কল্পনা করবে যে, এসব নেয়ামত তাদের কাছ থেকে কখনও ছিনিয়ে নেয়া হবে না, তখন এটা তাদের আনন্দকে আরও বৃদ্ধি করে দেবে। [দেখুন, ইবনে কাসীর]

(২) এ আয়াতে জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়া এবং জান্নাত লাভ করাকে আল্লাহ তাঁর দয়ার ফলশ্রুতি বলে আখ্যায়িত করছেন। এর দ্বারা মানুষকে এই সত্য সম্পর্কে অবহিত করা উদ্দেশ্য যে, আল্লাহর অনুগ্রহ না হওয়া পর্যন্ত কোন ব্যক্তির ভাগ্যেই এই সফলতা আসতে পারে না। আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া ব্যক্তি তার সৎকর্ম করার তাওফীক বা সামর্থ কিভাবে লাভ করবে? তাছাড়া ব্যক্তি দ্বারা যত উত্তম কাজই সম্পন্ন হোক না কেন তা পূর্ণাঙ্গ ও পূর্ণতর হতে পারে না। সুতরাং সে কাজ সম্পর্কে দাবী করে একথা বলা যাবে না যে, তাতে কোন ত্রুটি বা অপূর্ণতা নেই। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ যে তিনি বান্দার দুর্বলতা এবং তার কাজকর্মের অপূর্ণতাসমূহ উপেক্ষা করে তার খেদমত কবুল

এটাই তো মহাসাফল্য।

فَإِنَّمَا يَسَّرْنَٰهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٨﴾

৫৮. অতঃপর নিশ্চয় আমরা আপনার ভাষায় কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

فَٱرْتَقِبْ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ ﴿٥٩﴾ ع

৫৯. কাজেই আপনি প্রতীক্ষা করুন, নিশ্চয় তারা প্রতীক্ষমাণ।

করেন এবং তাকে পুরস্কৃত করে ধন্য করেন। অন্যথায়, তিনি যদি সূক্ষ্মভাবে হিসেব নিতে শুরু করেন তাহলে কার এমন দুঃসাহস আছে যে নিজের বাহুবলে জান্নাত লাভ করার দাবী করতে পারে? হাদীসে একথাই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেনঃ 'আমল করো এবং নিজের সাধ্যমত সব সর্বাধিক সঠিক কাজ করার চেষ্টা করো। জেনে রাখো, কোন ব্যক্তিকে শুধু তার আমল জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারবে না।' লোকেরা বললোঃ হে আল্লাহর রাসূল, অপনার আমলও কি পারবে না? তিনি বললেনঃ 'হ্যাঁ, আমিও শুধু আমার আমলের জোরে জান্নাতে যেতে পারবো না। তবে আমার রব যদি তাঁর রহমত দ্বারা আমাকে আচ্ছাদিত করেন।' [বুখারী:৬৪৬৭]

৪৫- সূরা আল-জাসিয়াহ
৩৭ আয়াত, মক্কী

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. হা-মীম।

حٰمٓ ﴿١﴾

২. এ কিতাব মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র কাছ থেকে নাযিলকৃত।

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ﴿٢﴾

৩. নিশ্চয় আসমানসমূহ ও যমীনে মুমিনদের জন্য রয়েছে বহু নিদর্শন।

اِنَّ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٣﴾

৪. আর তোমাদের সৃষ্টি এবং জীব-জন্তুর বিস্তারে বহু নিদর্শন রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের জন্য, যারা নিশ্চিত বিশ্বাস স্থাপন করে;

وَفِيْ خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَآبَّةٍ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ﴿٤﴾

৫. আর রাত ও দিনের পরিবর্তনে এবং আল্লাহ্ আকাশ হতে যে রিয্‌ক (পানি) বর্ষণ করেন, অতঃপর তিনি তা দ্বারা যমীনকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন তাতে এবং বায়ুর পরিবর্তনে অনেক নিদর্শন রয়েছে, এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা বোঝে।

وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ رِّزْقٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿٥﴾

৬. এগুলো আল্লাহ্‌র আয়াত, যা আমরা আপনার কাছে তিলাওয়াত করছি যথাযথভাবে। কাজেই আল্লাহ্ এবং তাঁর আয়াতের পরে তারা আর কোন বাণীতে ঈমান আনবে[১]?

تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۚ فَبِاَيِّ حَدِيْثٍۭ بَعْدَ اللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ يُؤْمِنُوْنَ ﴿٦﴾

(১) অর্থাৎ আল্লাহর সত্ত্বা ও তাঁর ইবাদতের ক্ষেত্রে "ওয়াহ্‌দানিয়াত" বা একত্বের সপক্ষে স্বয়ং আল্লাহর পেশকৃত এসব যুক্তি-প্রমাণ সামনে আসার পরও যখন এসব লোক ঈমান গ্রহণ করছে না তখন এমন কি জিনিস আর আসতে পারে যার কারণে ঈমানের সম্পদ তাদের ভাগ্যে জুটবে? আল্লাহর কালামই তো সেই চূড়ান্ত বস্তু যার মাধ্যমে কোন ব্যক্তি এই নিয়ামত লাভ করতে পারে। আর একটি অদেখা সত্য সম্পর্কে দৃঢ়

৭. দুর্ভোগ প্রত্যেক ঘোর মিথ্যাবাদী পাপীর(১),

وَيۡلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٖ ٧

৮. সে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ শোনে যা তার কাছে তিলাওয়াত করা হয়, তারপর সে ঔদ্ধত্যের সাথে অটল থাকে যেন সে তা শোনেনি। অতএব, আপনি তাকে সুসংবাদ দিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির;

يَسۡمَعُ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ تُتۡلَىٰ عَلَيۡهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسۡتَكۡبِرٗا كَأَن لَّمۡ يَسۡمَعۡهَاۖ فَبَشِّرۡهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٖ ٨

৯. আর যখন সে আমাদের কোন আয়াত অবগত হয়, তখন সে সেটাকে পরিহাসের পাত্র রূপে গ্রহণ করে। তাদেরই জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

وَإِذَا عَلِمَ مِنۡ ءَايَٰتِنَا شَيۡـًٔا ٱتَّخَذَهَا هُزُوًاۚ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ عَذَابٞ مُّهِينٞ ٩

১০. তাদের সামনে রয়েছে জাহান্নাম; তাদের কৃতকর্ম তাদের কোন কাজে আসবে না, তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদেরকে অভিভাবক স্থির করেছে ওরাও নয়। আর তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।

مِّن وَرَآئِهِمۡ جَهَنَّمُۖ وَلَا يُغۡنِي عَنۡهُم مَّا كَسَبُواْ شَيۡـًٔا وَلَا مَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوۡلِيَآءَۖ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠

১১. এ কুরআন সৎপথের দিশারী; আর যারা তাদের রবের আয়াতসমূহের

هَٰذَا هُدٗىۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِمۡ لَهُمۡ عَذَابٞ

বিশ্বাস সৃষ্টির জন্য সর্বাধিক যুক্তি সঙ্গত যেসব দলীল-প্রমাণ পেশ করা সম্ভব তা এই পবিত্র কালামে পেশ করা হয়েছে। এরপরও যদি কেউ অস্বীকার করতেই বদ্ধপরিকর থাকে তাহলে করতে থাকুক। তার অস্বীকৃতির ফলে প্রকৃত সত্যের কোন পরিবর্তন হবে না।[দেখুন, তাবারী]

(১) কোন কোন বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, এই আয়াত নদর ইবনে হারেছ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, কোন কোন বর্ণনা থেকে হারেছ ইবন কালদাহ সম্পর্কে, আবার কোন এক বর্ণনা থেকে আবু জাহল ও তার সঙ্গীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হওয়ার কথা জানা যায়। আয়াতের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার জন্য প্রকৃতপক্ষে কোন ব্যক্তি বিশেষকে নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন নেই। كل শব্দ ব্যক্ত করছে যে, যে কেউ এসব বিশেষণে বিশেষিত, তার জন্যই দুর্ভোগ-- একজন হোক অথবা তিন জন। [কুরতবী,বাগভী]

مِّنۡ رِّجۡزٍ اَلِیۡمٌ ⑪

সাথে কুফরী করে, তাদের জন্য রয়েছে খুবই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

দ্বিতীয় রুকূ'

اَللّٰهُ الَّذِیۡ سَخَّرَ لَكُمُ الۡبَحۡرَ لِتَجۡرِیَ الۡفُلۡكُ فِیۡهِ بِاَمۡرِهٖ وَلِتَبۡتَغُوۡا مِنۡ فَضۡلِهٖ وَلَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُوۡنَ ⑫

১২. আল্লাহ্‌, যিনি সাগরকে তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন, যেন তাঁর আদেশে তাতে নৌযানসমূহ চলাচল করতে পারে। আর যেন তোমরা তাঁর অনুগ্রহ তালাশ করতে পার[১] এবং যেন তোমরা (তাঁর প্রতি) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

وَسَخَّرَ لَكُمۡ مَّا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الۡاَرۡضِ جَمِیۡعًا مِّنۡهُ ؕ اِنَّ فِیۡ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوۡمٍ یَّتَفَكَّرُوۡنَ ⑬

১৩. আর তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন আসমানসমূহ ও যমীনের সমস্ত কিছু নিজ অনুগ্রহে, নিশ্চয় এতে অনেক নিদর্শনাবলী রয়েছে, এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা চিন্তা করে।

قُلۡ لِّلَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا یَغۡفِرُوۡا لِلَّذِیۡنَ لَا یَرۡجُوۡنَ اَیَّامَ اللّٰهِ لِیَجۡزِیَ قَوۡمًۢا بِمَا كَانُوۡا یَكۡسِبُوۡنَ ⑭

১৪. যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে বলুন, 'তারা যেন ক্ষমা করে ওদেরকে, যারা আল্লাহ্‌র দিনগুলোর প্রত্যাশা করে না। যাতে আল্লাহ্‌ প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাদের কৃতকর্মের জন্য প্রতিদান দিতে পারেন।'

مَنۡ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفۡسِهٖ ۚ وَمَنۡ اَسَآءَ فَعَلَیۡهَا ۫ ثُمَّ اِلٰی رَبِّكُمۡ تُرۡجَعُوۡنَ ⑮

১৫. যে সৎকাজ করে সে তার কল্যাণের জন্যই তা করে এবং কেউ মন্দ কাজ করলে তা তারই উপর বর্তাবে,

(১) পবিত্র কুরআনে 'অনুগ্রহ তালাশ করা' এর অর্থ সাধারণত জীবিকা উপার্জনের চেষ্টা প্রচেষ্টা হয়ে থাকে। এখানে এরূপ অর্থ হতে পারে যে, তোমাদেরকে সমুদ্রে জাহাজ চালনার শক্তি দেয়া হয়েছে, যাতে তোমরা ব্যবসা বাণিজ্য করতে পার। এরূপ অর্থও সম্ভবপর যে, সমুদ্রে আমি অনেক উপকারী বস্তু সৃষ্টি করে সমুদ্রকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছি, যাতে তোমরা সেগুলো খোঁজ করে উপকৃত হও।[দেখুন, তবারী, সা'দী]

তারপর তোমাদেরকে তোমাদের রবের দিকেই প্রত্যাবর্তিত করা হবে ।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦﴾

১৬. আর অবশ্যই আমরা বনী ইস্‌রাঈলকে কিতাব, কর্তৃত্ব[১] ও নবুওয়াত দান করেছিলাম এবং তাদেরকে রিযিক প্রদান করেছিলাম উত্তম বস্তু হতে, আর দিয়েছিলাম তাদেরকে সকল সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব ।

وَاٰتَيْنٰهُمْ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْاَمْرِ ۚ فَمَا اخْتَلَفُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ ۙ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿١٧﴾

১৭. আর আমরা তাদেরকে দ্বীনের যাবতীয় বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি দান করেছিলাম । তাদের কাছে জ্ঞান আসার পরও তারা শুধু পরস্পর বিদ্বেষবশতঃ মতবিরোধ করেছিল । তারা যে সব বিষয়ে মতবিরোধ করত, নিশ্চয় আপনার রব কিয়ামতের দিন তাদের মধ্যে সে সব বিষয়ে ফয়সালা করে দেবেন ।

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٨﴾

১৮. তারপর আমরা আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি দ্বীনের বিশেষ বিধানের উপর; কাজেই আপনি তার অনুসরণ করুন । আর যারা জানে না তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না ।

اِنَّهُمْ لَنْ يُّغْنُوْا عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ۗ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِيْنَ ﴿١٩﴾

১৯. নিশ্চয় তারা আল্লাহ্‌র মুকাবিলায় আপনার কোনই কাজে আসবে না; আর নিশ্চয় যালিমরা একে অন্যের বন্ধু; এবং আল্লাহ্ মুত্তাকীদের বন্ধু ।

---

(১) হুকুম শব্দের কয়েকটি অর্থ হতে পারে । এক-কিতাবের জ্ঞান ও উপলব্ধি এবং দ্বীনের অনুভূতি । দুই-কিতাবের অভিপ্রায় অনুসারে কাজ করার কৌশল । তিন-বিভিন্ন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতা । চার-ক্ষমতা বা রাজত্ব [কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর]

২০. এ কুরআন মানুষের জন্য আলোকবর্তিকা এবং হেদায়াত ও রহমত এমন সম্প্রদায়ের জন্য, যারা নিশ্চিত বিশ্বাস করে।

هٰذَا بَصَآئِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ۝٢٠

২১. নাকি যারা দুষ্কর্ম করেছে তারা মনে করে যে, আমরা জীবন ও মৃত্যুর দিক দিয়ে তাদেরকে ওদের মত গণ্য করব যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে? তাদের বিচার-সিদ্ধান্ত কতই না মন্দ!

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ سَوَآءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ۗ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ۝٢١

তৃতীয় রুকূ’

২২. আর আল্লাহ্ আসমানসমূহ ও যমীনকে সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে এবং যাতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কাজ অনুযায়ী ফল দেয়া যেতে পারে। আর তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না।

وَخَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝٢٢

২৩. তবে কি আপনি লক্ষ্য করেছেন তাকে, যে তার খেয়াল-খুশীকে নিজ ইলাহ্ বানিয়ে নিয়েছে? আর তার কাছে জ্ঞান আসার পর আল্লাহ্ তাকে বিভ্রান্ত করেছেন[১] এবং তিনি তার কান ও হৃদয়ে মোহর করে দিয়েছেন। আর তিনি তার চোখের উপর রেখেছেন আবরণ। অতএব আল্লাহ্র পরে কে তাকে হেদায়াত দিবে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

اَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ وَّخَتَمَ عَلٰى سَمْعِهٖ وَقَلْبِهٖ وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ غِشٰوَةً ؕ فَمَنْ يَّهْدِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ اللّٰهِ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝٢٣

(১) এই বাক্যাংশের একটি অর্থ হতে পারে এই যে, জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর পক্ষ থেকে সে ব্যক্তিকে গোমরাহীর মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছে। কেননা সে প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার দাস হয়ে গিয়েছিলো। আরেকটি অর্থ হতে পারে এই যে, সে তার প্রবৃত্তির ইচ্ছা ও কামনা-বাসনাকে ইলাহ বানিয়ে বসেছে এ বিষয়টি জেনে আল্লাহ তাকে গোমরাহীর মধ্যে নিক্ষেপ করেছেন। [দেখুন, কুরতুবী]

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ ۚ وَمَا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٢٤﴾

২৪. আর তারা বলে, 'একমাত্র দুনিয়ার জীবনই আমাদের জীবন, আমরা মরি ও বাঁচি, আর কাল-ই কেবল আমাদেরকে ধ্বংস করে[1]।' বস্তুত এ ব্যাপারে তাদের কোন জ্ঞান নেই, তারা তো শুধু ধারণাই করে।

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٥﴾

২৫. আর তাদের কাছে যখন আমাদের সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হয় তখন তাদের কোন যুক্তি থাকে না শুধু এ কথা ছাড়া যে, তোমরা সত্যবাদী হলে আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে নিয়ে আস।

قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾

২৬. বলুন, 'আল্লাহ্ই তোমাদেরকে জীবন দান করেন তারপর তোমাদের মৃত্যু ঘটান। তারপর তিনি তোমাদেরকে কিয়ামতের দিনে একত্র করবেন, যাতে

---

(১) دهر শব্দের অর্থ আসলে মহাকাল, অর্থাৎ জগতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সময়ের সমষ্টি। কখনও দীর্ঘ সময়কালকেও دهر বলা হয়। কাফেররা বলেছে যে, আল্লাহর আদেশ ও ইচ্ছার সাথে জীবন ও মৃত্যুর কোন সম্পর্ক নেই, বরং এগুলো প্রাকৃতিক কারণের অধীন। মৃত্যু সম্পর্কে তো সকলেই প্রত্যক্ষ করে যে, মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও শক্তি-সামর্থ্য ব্যবহারের কারণে ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে এবং দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। এরই নাম মৃত্যু। জীবনও তদ্রুপ, কোন ইলাহী আদেশে নয়, বরং উপকরণের প্রাকৃতিক গতিশীলতার মাধ্যমেই তা অর্জিত হয়। মূলত: কাফের ও মুশরিকরা মহাকালের চক্রকেই সৃষ্টিজগত ও তার সমস্ত অবস্থার কারণ সাব্যস্ত করত এবং সবকিছুকে তারই কর্ম বলে অভিহিত করত। অথচ এগুলো সব প্রকৃতপক্ষে সর্বশক্তিমান আল্লাহর কুদরত ও ইচ্ছায় সম্পন্ন হয়ে থাকে। তাই সহীহ্ হাদীসসমূহে দাহর তথা মহাকালকে মন্দ বলতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা, কাফেররা যে শক্তিকে দাহর শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে, প্রকৃতপক্ষে সেই কুদরত ও শক্তি আল্লাহ তা'আলারই। তাই দাহরকে মন্দ বলার ফল প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, বনী আদম 'দাহর তথা মহাকালকে গালি দেয়, অথচ আল্লাহ বলেন, আমিই প্রকৃতপক্ষে মহাকাল, আমিই রাত-দিনের পরিবর্তন ঘটাই। [বুখারী: ৫৭১৩]

কোন সন্দেহ নেই । কিন্তু বেশীর ভাগ মানুষ তা জানে না ।’

চতুর্থ রুকূ’

২৭. আর আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব আল্লাহ্‌রই; এবং যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন বাতিলপন্থীরা হবে ক্ষতিগ্রস্ত ।

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَىِٕذٍ يَّخْسَرُ الْمُبْطِلُوْنَ ﴿٢٧﴾

২৮. আর আপনি প্রত্যেক জাতিকে দেখবেন ভয়ে নতজানু[১], প্রত্যেক জাতিকে তার কিতাবের[২] প্রতি ডাকা হবে, (এবং বলা হবে) ‘আজ তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেয়া হবে যা তোমরা আমল করতে ।

وَتَرٰى كُلَّ اُمَّةٍ جَاثِيَةً ۫ كُلُّ اُمَّةٍ تُدْعٰۤى اِلٰى كِتٰبِهَا ؕ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٨﴾

---

(১) جاثية এর অর্থ নতজানু হয়ে বসা । ভয়ের কারণে এভাবে বসবে । ﴿كُلَّ اُمَّةٍ﴾ (প্রত্যেক দল) শব্দ থেকে বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, মুমিন, কাফের, সৎ ও অসৎ নির্বিশেষে সকলেই হাশরের ময়দানে ভয়ে নতজানু হয়ে বসবে । সেখানে হাশরের ময়দানের এবং আল্লাহর আদালতের এমন ভীতি সৃষ্টি হবে যে, বড় বড় অহংকারীদের অহংকারও উবে যাবে । সেখানে সবাই অত্যন্ত বিনয়ের সাথে নতজানু হবে । কোন কোন আয়াত ও বর্ণনায় রয়েছে যে, হাশরের ময়দানে নবী-রাসূল ও সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ ভীত হবেন না । এটা আলোচ্য আয়াতের পরিপন্থী নয়; কেননা, অল্প কিছুক্ষণের জন্যে এই ভয় ও ত্রাস নবী-রাসূল ও সৎলোকদের মধ্যেও দেখা দেয়া সম্ভবপর । কিন্তু যেহেতু খুব অল্প সময়ের জন্যে এই ভয় দেখা দেবে, তাই একে না হওয়ার পর্যায়ে রেখে দেয়া হয়েছে । আবার এটাও সম্ভবপর যে, প্রত্যেক দল বলে অধিকাংশ হাশরবাসী বোঝানো হয়েছে । তাছাড়া كل শব্দটি মাঝে মাঝে অধিকাংশের অর্থেও ব্যবহৃত হয় । [দেখুন, ইবনে কাসীর,কুরতুবী,সা‘দী]

(২) অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এখানে কিতাব অর্থ দুনিয়াতে ফেরেশতাগণের লিখিত আমলনামা । হাশরের ময়দানে এসব আমলনামা উড়ানো হবে এবং প্রত্যেকের আমলনামা তার হাতে পৌঁছে যাবে । তাকে বলা হবে, তুমি তোমার আমলনামা পাঠ কর এবং নিজেই হিসাব কর কি প্রতিফল তোমার পাওয়া উচিত । আমলনামার দিকে আহ্বান করার অর্থ আমলের হিসাবের দিকে আহ্বান করা । [দেখুন, ইবনে কাসীর,সা‘দী]

২৯. ‘এই আমাদের লেখনি, যা তোমাদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবে সত্যভাবে। নিশ্চয় তোমরা যা আমল করতে তা আমরা লিপিবদ্ধ করেছিলাম।’

هٰذَا كِتٰبُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ۚ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٩﴾

৩০. অতঃপর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে পরিণামে তাদের রব তাদেরকে প্রবেশ করাবেন স্বীয় রহমতে। এটাই সুস্পষ্ট সাফল্য।

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِيْ رَحْمَتِهٖ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ ﴿٣٠﴾

৩১. আর যারা কুফরী করেছে (তাদেরকে বলা হবে), ‘তোমাদের কাছে কি আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়নি? অতঃপর তোমরা অহংকার করেছিলে এবং তোমরা ছিলে এক অপরাধী সম্প্রদায়।’

وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۗ اَفَلَمْ تَكُنْ اٰيٰتِيْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ﴿٣١﴾

৩২. আর যখন বলা হয়, ‘নিশ্চয় আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য; এবং কিয়ামত--- এতে কোন সন্দেহ নেই, তখন তোমরা বলে থাক, ‘আমরা জানি না কিয়ামত কী; আমরা কেবল অনুমান করি এবং আমরা তো দৃঢ় বিশ্বাসী নই।’

وَاِذَا قِيْلَ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيْهَا قُلْتُمْ مَّا نَدْرِيْ مَا السَّاعَةُ ۙ اِنْ نَّظُنُّ اِلَّا ظَنًّا وَّمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِيْنَ ﴿٣٢﴾

৩৩. আর তাদের মন্দ কাজগুলোর কুফল তাদের কাছে প্রকাশিত হবে এবং যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত তা তাদেরকে পরিবেষ্টন করবে।

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا عَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩৪. আর বলা হবে, ‘আজ আমরা তোমাদেরকে ছেড়ে রাখব যেমন তোমরা এ দিনের সাক্ষাতের বিষয়টি ছেড়ে গিয়েছিলে। আর তোমাদের আবাসস্থল হবে জাহান্নাম এবং

وَقِيْلَ الْيَوْمَ نَنْسٰىكُمْ كَمَا نَسِيْتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا وَمَاْوٰىكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٣٤﴾

তোমাদের কোন সাহায্যকারীও থাকবে না ।

৩৫. ‘এটা এ জন্যে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্র বানিয়েছিলে এবং দুনিয়ার জীবন তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল ।’ সুতরাং আজ না তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে, আর না তাদেরকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের সুযোগ দেয়া হবে ।

ذٰلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا وَّغَرَّتْكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُوْنَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৬. অতএব, সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, যিনি আসমানসমূহের রব, যমীনের রব ও সকল সৃষ্টির রব ।

فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٦﴾

৩৭. আর আসমানসমূহ ও যমীনের যাবতীয় গৌরব-গরিমা তাঁরই[১] এবং তিনি মহা পরাক্রমশালী, হিকমতওয়ালা ।

وَلَهُ الْكِبْرِيَآءُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۪ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٣٧﴾

(১) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন, “বড়ত্ব আমার বস্ত্র আর অহংকার আমার চাদর; যে কেউ এ দু’টির কোন একটি নিয়ে টানাহেঁচড়া করবে, আমি তাকে জাহান্নামের অধিবাসী করে ছাড়বো ।” [মুসলিম: ২৬২০]

৪৬- সূরা আল-আহ্‌কাফ
৩৫ আয়াত, মক্কী

বِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

حٰمٓ ۝١

১. হা-মীম।

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ۝٢

২. এ কিতাব পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র কাছ থেকে নাযিলকৃত;

مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَمَّآ اُنْذِرُوْا مُعْرِضُوْنَ ۝٣

৩. আসমানসমূহ, যমীন ও এ দু'য়ের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুই আমরা যথাযথ ভাবে ও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সৃষ্টি করেছি। আর যারা কুফরী করেছে, তাদেরকে যে বিষয়ে ভীতিপ্রদর্শন করা হয়েছে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে আছে।

قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِى السَّمٰوٰتِ ؕ اِيْتُوْنِيْ بِكِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَآ اَوْ اَثٰرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝٤

৪. বলুন, 'তোমরা আমাকে সংবাদ দাও, তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদেরকে ডাক আমাকে দেখাও তো তারা যমীনে কী সৃষ্টি করেছে অথবা আসমানসমূহে তাদের কোন অংশীদারিত্ব আছে কি? এর পূর্ববর্তী কোন কিতাব অথবা পরম্পরাগত কোন জ্ঞান থাকলে তা তোমরা আমার কাছে নিয়ে আস যদি তোমরা সত্যবাদী হও[১]।'

---

(১) এ আয়াতে মুশরেকদের শির্ক এর দাবি বাতিল করার জন্য তাদের দাবীর সপক্ষে দলিল চাওয়া হয়েছে। কেননা, সাক্ষ্য-প্রমাণ ব্যতীত কোন দাবি গ্রহণীয় হয় না। দলিলের যত প্রকার রয়েছে, সবগুলো আয়াতে উল্লেখ করে প্রমাণ করা হয়েছে যে, মুশরেকদের দাবির পক্ষে কোন দলিল নেই। তাই এহেন দলিলবিহীন দাবিতে অটল থাকা নিরেট পথভ্রষ্টতা। আয়াতে দলিলকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম: যুক্তিভিত্তিক দলিল। এর খণ্ডন বলা হয়েছে ﴿اَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِى السَّمٰوٰتِ﴾ "এরা যমীনে কি সৃষ্টি করেছে আমাকে দেখাও অথবা আসমানসমূহে তাদের কোন অংশীদারিত্ব আছে কি?" দ্বিতীয় প্রকার ইতিহাসভিত্তিক দলিল। বলাবাহুল্য আল্লাহর ব্যাপারে কেবল সেই ইতিহাসভিত্তিক দলিল গ্রহণীয় হতে পারে; যা স্বয়ং আল্লাহর

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهٗۤ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَآئِهِمْ غٰفِلُوْنَ ۝٥

৫. আর সে ব্যক্তির চেয়ে বেশী বিভ্রান্ত কে যে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তাকে সাড়া দেবে না? এবং এগুলো তাদের আহ্বান সম্বন্ধেও গাফেল।

وَاِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ اَعْدَآءً وَّكَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ كٰفِرِيْنَ ۝٦

৬. আর যখন কিয়ামতের দিন মানুষকে একত্র করা হবে তখন সেগুলো হবে এদের শত্রু এবং এরা তাদের ইবাদাত অস্বীকার করবে।

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝٧

৭. আর যখন তাদের কাছে আমাদের সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হয় তখন যারা কুফরী করেছে তাদের কাছে সত্য আসার পর তারা বলে, 'এ তো সুস্পষ্ট জাদু।'

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ؕ قُلْ اِنِ افْتَرَيْتُهٗ فَلَا تَمْلِكُوْنَ لِيْ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ هُوَ اَعْلَمُ بِمَا تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ ؕ كَفٰى بِهٖ شَهِيْدًا بَيْنِيْ

৮. নাকি তারা বলে যে, 'সে এটা উদ্ভাবন করেছে।' বলুন, 'যদি আমি এটা উদ্ভাবন করে থাকি, তবে তোমরা আমাকে আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে বাঁচাতে

পক্ষ থেকে আসে। যেমন তাওরাত, ইঞ্জীল; কুরআন ইত্যাদি কিতাব অথবা আল্লাহ মনোনীত নবী ও রাসূলগণের উক্তি। এই দুই প্রকারের মধ্যে প্রথম প্রকারের খণ্ডনে বলা হয়েছে ﴿اِيْتُوْنِيْ بِكِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَآ﴾ অর্থাৎ তোমাদের মূর্তি পূজার কোন দলিল থাকলে কোন ইলাহী কিতাব পেশ কর, যাতে মূর্তি পূজার অনুমতি দেয়া হয়েছে। এর পর দ্বিতীয় প্রকার ঐতিহাসিক দলীল পেশ করার আহ্বান জানিয়ে বলা হয়েছে, ﴿اَوْ اَثٰرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ﴾ অর্থাৎ কিতাব আনতে না পারলে কমপক্ষে রাসূলগণের পরম্পরাগত কোন উক্তি পেশ কর। তাও পেশ করতে না পারলে তোমাদের কথা ও কাজ পথ ভ্রষ্টতা বৈ কিছুই নয়। এর পরবর্তী আয়াতে তাদের শির্কের তৃতীয় প্রকার দলীল পেশ করে তা খণ্ডন করা হয়েছে। কারণ, তারা হয়ত বলতে পারে যে, তাদেরকে আমরা আল্লাহর শরীক এজন্যই সাব্যস্ত করি যে, তারা আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমাদের কোন উপকার সাধন কিংবা অপকার থেকে আমাদের বাঁচাতে পারবে। তাদের সে দলিল পেশের সম্ভাবনাকে নাকচ করে বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে আহ্বান করছে তারা কিয়ামত পর্যন্ত তাদের আহ্বানে সাড়া দিতে পারবে না। সুতরাং তাদের শির্কের সপক্ষে কোন যুক্তি বা দলিলই অবশিষ্ট রইল না। [দেখুন, ইবনে কাসীর]

وَبَيْنَكُمْ ۖ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ⑧

কিছুরই মালিক নও। তোমরা যে বিষয়ে আলোচনায় লিপ্ত আছ, সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবগত। আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে তিনিই যথেষ্ট এবং তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَآ أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَيَّ وَمَآ أَنَا۠ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ⑨

৯. বলুন, 'রাসূলদের মধ্যে আমিই প্রথম নই। আর আমি জানি না, আমার ও তোমাদের ব্যাপারে কী করা হবে; আমি আমার প্রতি যা ওহী করা হয় শুধু তারই অনুসরণ করি। আর আমি তো এক স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।'

قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِۦ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنۢ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِۦ فَـَٔامَنَ وَٱسْتَكْبَرْتُمْ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ⑩

১০. বলুন, 'তোমরা আমাকে জানাও, যদি এ কুরআন আল্লাহ্‌র কাছ থেকে নাযিল হয়ে থাকে এবং তোমরা তার সাথে কুফরী কর, আর বনী ইস্‌রাঈলের একজন অনুরূপ কিতাবের আয়াতের উপর সাক্ষ্য দিয়ে তাতে ঈমান আনল; আর তোমরা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করলে, (তাহলে তোমাদের পরিণাম কি হবে?) নিশ্চয় আল্লাহ্ যালিম সম্প্রদায়কে হেদায়াত করেন না[১]।

---

(১) এ আয়াত এবং সূরা আশ-শু'আরার ১৯৬ ও ১৯৭ নং আয়াতের অর্থ একই রকম। সারমর্ম এই যে, যেসব ইহুদী ও নাসারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রেসালাত ও কুরআন অমান্য করে, তারা স্বয়ং তাদের কিতাব সম্পর্কেও অজ্ঞ। কেননা, বনী ইসরাঈলের অনেক আলেম তাদের কিতাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবুওয়াত ও নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। সে আলেমগণের সাক্ষ্য কি এই মূর্খদের জন্যে যথেষ্ট নয়? এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, তোমরা আমার নবুওয়াত দাবিকে ভ্রান্ত এবং কুরআনকে আমার রচনা বল। এর এক জওয়াব পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেউ বাস্তবে নবী না হয়ে নিজেকে নবী বলে মিথ্যা দাবি করলে তার দুনিয়াতে নিপাত হয়ে যাওয়া

দ্বিতীয় রুকূ'

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ ۚ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَٰذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ ﴿١١﴾

১১. আর যারা কুফরী করেছে তারা যারা ঈমান এনেছে তাদের সম্পর্কে বলে, 'যদি এটা ভাল হত তবে তারা এর দিকে আমাদেরকে অতিক্রম করে যেতে পারত না[১]। আর যখন তারা

জরুরি, যাতে জনসাধারণ প্রতারিত না হয়। এ জওয়াবই যথেষ্ট, কিন্তু তোমরা যদি না মান তবে এ সম্ভাবনার প্রতিও লক্ষ্য কর যে, আমার দাবি যদি সত্য হয় এবং কুরআন আল্লাহর কিতাব হয় আর তোমরা একে অমান্য করেই যাও, তবে তোমাদের পরিণতি কি হবে, বিশেষত যখন তোমাদের বনী ইসরাঈলেরই কোন মান্যবর ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, এটা আল্লাহর কিতাব, অতঃপর সে নিজেও মুসলিম হয়ে যায়? এ জ্ঞান লাভের পরও যদি তোমরা জেদ ও অহংকারে অটল থাক, তবে তোমরা গুরুতর শাস্তির যোগ্য হয়ে যাবে। আয়াতে বনী ইসরাঈলের কোন বিশেষ আলেমের নাম উল্লেখ করা হয়নি এবং এটাও নির্দিষ্ট করা হয়নি যে, এ সাক্ষ্য আয়াত অবতরণের পূর্বেই জনসমক্ষে এসে গেছে, না ভবিষ্যতে আসবে। তাই বনী ইসরাঈলের কোন ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করার ওপর আয়াতের অর্থ নির্ভরশীল নয়। আল্লাহর বাণীর প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে, কুরআন তোমাদের সামনে যে শিক্ষা পেশ করছে তা কোন অভিনব জিনিস নয়। পৃথিবীতে প্রথমবারের মত শুধুমাত্র তোমাদের সামনেই তা পেশ করা হয়নি যে, তোমরা ওজর পেশ করে বলবেঃ এ ধরনের কথা তো ইতোপূর্বে মানব জাতির কাছে আর আসেনি। তাই আমরা কি করে তা মানতে পারি। ইতোপূর্বেও এসব শিক্ষা এভাবেই অহীর মাধ্যমে বনী ইসরাঈলদের কাছে তাওরাত ও অন্যান্য আসমানী কিতাব রূপে এসেছিলো। বনী ইসরাঈলদের একজন সাধারণ মানুষও তা মেনে নিয়েছিলো এবং একথা স্বীকার করে নিয়োছিলো যে অহীই হচ্ছে এসব শিক্ষা নাযিল হওয়ার মাধ্যম। তাই অহী এবং এই শিক্ষা দুর্বোধ্য জিনিস তোমরা সে দাবী করতে পার না। আসল কথা হলো, তোমাদের গর্ব, অহংকার এবং ভিত্তিহীন আত্মম্ভরিতা ঈমানের পথে অন্তরায়। খ্যাতনামা ইহুদী আলেম আবদুল্লাহ ইবন সালামসহ যত ইহুদী ও নাসারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তারা সবাই এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, এ আয়াত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, দাহহাক প্রমুখ তাফসীরবিদগণ তাই বলেছেন। যদিও আবদুল্লাহ ইবনে সালাম এই আয়াত নাযিল হওয়ার পরে মদীনায় ইসলাম গ্রহণ করেন। তারপরও এ আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ হওয়ার পরিপন্থি নয়। এমতাবস্থায় আয়াতটি ভবিষ্যদ্বানি হিসেবে গণ্য হইবে। [দেখুন, তাবারী]

(১) কুরাইশ নেতারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করার জন্য যেসব যুক্তি কাজে লাগাতো এটা তার একটা। তারা বলতো,

এটা দ্বারা হেদায়াত পায়নি তখন তারা অচিরেই বলবে, 'এ এক পুরোনো মিথ্যা ।'

১২. আর এর আগে ছিল মূসার কিতাব পথ প্রদর্শক ও রহমতস্বরূপ । আর এ কিতাব (তার) সত্যায়নকারী, আরবী ভাষায়, যেন তা যালিমদেরকে সতর্ক করে, আর তা মুহসিনদের জন্য সুসংবাদ[১] ।

وَمِنْ قَبْلِهٖ كِتٰبُ مُوْسٰٓى اِمَامًا وَّرَحْمَةً ۗ وَهٰذَا كِتٰبٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنْذِرَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۖ وَبُشْرٰى لِلْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٢﴾

১৩. নিশ্চয় যারা বলে, 'আমাদের রব আল্লাহ্' তারপর অবিচল থাকে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না ।

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿١٣﴾

'এ কুরআন যদি সত্য হতো এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি একটি সঠিক জিনিসের দাওয়াত দিতেন তাহলে কওমের নেতারা, গোত্রসমূহের অধিপতিরা এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অগ্রসর হয়ে তা গ্রহণ করতো । এটা কি করে হতে পারে যে, কতিপয় অনভিজ্ঞ বালক এবং কিছু সংখ্যক নীচু পর্যায়ের ক্রীতদাস যেমন বিলাল, আম্মার, সুহাইব, খাব্বাব প্রমূখ সর্বাগ্রে ঈমান আনবে অথচ কওমের গণ্যমান্য ব্যক্তি যারা জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ এবং আজ পর্যন্ত কওম যাদের জ্ঞান-বুদ্ধি ও ব্যবস্থাপনার ওপর নির্ভর করে আসছে তারা তা প্রত্যাখ্যান করবে? নতুন এই ধর্মে মন্দ কিছু অবশ্যই আছে । তাই কওমের গণ্যমান্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তা মানছে না । অতএব, তোমরাও তা থেকে দূরে সরে যাও, এই প্রতারণামূলক যুক্তি খাড়া করে তারা সাধারণ মানুষকে শান্ত করে রাখার চেষ্টা করতো । তারা মূলত: অহংকারবশেই উপরোক্ত ধরনের কুটতর্কের অবতারণা করত । অহংকার ও গর্ব মানুষের জ্ঞান বুদ্ধিকেও বিকৃত করে দেয় । অহংকারী ব্যক্তি নিজের বুদ্ধিকেই ভালমন্দের মাপকাঠি বলে মনে করতে থাকে । সে যা পছন্দ করে না, অন্যেরা তা পছন্দ করলে সে সবাইকে বোকা মনে করে, অথচ বাস্তবে সে নিজেই বোকা । সূরা আল-আন'আমের ৫৩ নং আয়াতেও কাফেরদের এ ধরনের উক্তি বর্ণিত হয়েছে । [দেখুন, তাবারী,ইবনে কাসীর]

(১) এ আয়াত থেকে প্রমাণ পাওয়া গেল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন অভিনব রাসূল এবং কুরআন কোন অভিনব কিতাব নয় যে, এতে ঈমান আনতে আপত্তি হবে । বরং এর আগে মূসা আলাইহিস সালাম রাসূলরূপে আগমন করেছেন এবং তার প্রতি তাওরাত নাযিল হয়েছিল । ইহুদী ও নাসারা এমনকি কাফেরদের অনেকেই তা স্বীকার করে । [দেখুন, তাবারী]

أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

১৪. তারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে, তারা যা আমল করত তার পুরস্কার স্বরূপ।

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

১৫. আর আমরা মানুষকে তার মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে গর্ভে ধারণ করে কষ্টের সাথে এবং প্রসব করে কষ্টের সাথে, তাকে গর্ভে ধারণ করতে[১] ও তার স্তন্য ছাড়াতে লাগে ত্রিশ মাস[২], অবশেষে যখন সে পূর্ণ

(১) অর্থাৎ পিতা-মাতার সেবা যত্ন ও আনুগত্য জরুরি হওয়ার এক কারণ এই যে, তারা তোমাদের জন্যে অনেক কষ্টই সহ্য করেন। বিশেষত মাতার কষ্ট অনেক বেশি হয়ে থাকে। এখানে কেবল মাতার কষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে। মাতা দীর্ঘ নয় মাস তোমাদেরকে গর্ভে ধারণ করে। এছাড়া এ সময়ে তাকে অনেক দুঃখকষ্ট সহ্য করতে হয়। এরপর প্রসবকালে অসহনীয় প্রসব বেদনার পর তোমরা ভূমিষ্ঠ হও।
আয়াতের শুরুতেই পিতা-মাতা উভয়ের সাথে সদ্ব্যবহারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু এ স্থলে কেবল মাতার কষ্টের কথা উল্লেখ করার তাৎপর্য এই যে, মাতার পরিশ্রম ও কষ্ট অপরিহার্য ও জরুরী। গর্ভধারণের সময় কষ্ট, প্রসব বেদনার কষ্ট সর্বাবস্থায় ও সব সন্তানের ক্ষেত্রে মাতাকেই সহ্য করতে হয়। পিতার জন্যে লালন পালনের কষ্ট সহ্য করা সর্বাবস্থায় জরুরি হয় না। পিতা ধনাঢ্য হলে এবং তার চাকর বাকর থাকলে অপরের মাধ্যমে সন্তান দেখাশোনা করতে পারে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সন্তানের ওপর মাতার হক বেশি রেখেছেন। এক হাদীসে তিনি বলেন, 'মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর, অতঃপর মাতার সাথে, অতঃপর মাতার সাথে, অতঃপর পিতার সাথে, অতঃপর নিকট আত্মীয়ের সাথে'। [মুসলিম:৪৬২২]

(২) সন্তানদের যদিও মা-বাপ উভয়েরই সেবা করতে হবে কিন্তু গুরুত্বের দিক দিয়া মায়ের অধিকার এ কারণে বেশী যে, সে সন্তানের জন্য বেশী কষ্ট স্বীকার করে। এ আয়াত এ দিকেই ইংগিত করে। বিভিন্ন সহীহ হাদীস থেকেও এ বিষয়টি জানা যায়। আয়াতেও মায়ের তিনগুণ বেশী অধিকারের প্রতি ইংগিত দেয়া হয়েছেঃ (১) কষ্ট করে মা তাকে গর্ভে ধারণ করেছে। (২) কষ্ট করেই তাকে প্রসব করেছে এবং (৩) গর্ভধারণ ও দুধ পান করাতে ৩০ মাস লেগেছে। সন্তানকে গর্ভে ধারণ ও প্রসবের কষ্টের পরও মাতা রেহাই পায় না। এর পরে সন্তানের খাদ্যও আল্লাহ তা'আলা মাতার স্তনে রেখে দিয়েছেন। মাতা তাকে স্তন্যদান করে। আয়াতে বলা হয়েছে যে, সন্তানকে গর্ভে ধারণ এবং স্তন্য ছাড়ানো ত্রিশ মাসে হয়। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এই

শক্তিপ্রাপ্ত হয়[১] এবং চল্লিশ বছরে উপনীত হয়, তখন সে বলে, 'হে আমার রব! আপনি আমাকে সামর্থ্য দিন, যাতে আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, আমার প্রতি ও আমার পিতা-মাতার প্রতি আপনি যে অনুগ্রহ করেছেন, তার জন্য এবং যাতে আমি এমন সৎকাজ করতে পারি যা আপনি পছন্দ করেন; আর আমার জন্য আমার সন্তান-সন্ততিদেরকে সংশোধন করে দিন, নিশ্চয় আমি আপনারই অভিমুখী হলাম এবং নিশ্চয় আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত।

আয়াত দৃষ্টে বলেন যে, গর্ভ ধারণের সর্বনিম্ন সময়কাল ছয় মাস। কেননা সূরা আল-বাকারাহ এর ২৩৩ নং আয়াতে স্তন্যদানের সর্বোচ্চ সময়কাল পূর্ণ দু'বছর নির্দিষ্ট করা হয়েছে অথচ এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, সন্তানকে গর্ভে ধারণ এবং স্তন্যদান ছাড়ানো ত্রিশ মাসে হয়। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এর খেলাফতকালে জনৈকা মহিলার গর্ভ থেকে ছয় মাসে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়ে গেলে তিনি একে অবৈধ গর্ভ সাব্যস্ত করে শাস্তির আদেশ জারি করেন। কেননা, এটা সাধারণ নিয়ম বহির্ভুত ছিল। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এই সংবাদ অবগত হয়ে খলিফাকে শাস্তি কার্যকর করতে বারণ করলেন এবং আলোচ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণ করে দিলেন যে, গর্ভধারণের সর্বনিম্ন সময়কাল ছয় মাস। খলিফা তার যুক্তিপ্রমাণ কবুল করে শাস্তির আদেশ প্রত্যাহার করেন। এ কারণেই সমস্ত আলেমগণ একমত যে, গর্ভধারণের সর্বনিম্ন সময়কাল ছয় মাস হওয়া সম্ভবপর। এর কম সময়ে সন্তান সুস্থ ও পূর্ণাঙ্গ জন্মগ্রহণ করতে পারে না। তবে সর্বোচ্চ কতদিন সন্তান গর্ভে থাকতে পারে, এ সম্পর্কে অভ্যাস বিভিন্নরূপ। এমনিভাবে স্তন্যদানের সর্বোচ্চ সময়কাল দু'বছর নির্ধারিত। কিন্তু সর্বনিম্ন সময়কাল নির্দিষ্ট নেই। কোন কোন নারীর দুধই হয় না এবং কারও কারও দুধ কয়েক মাসেই শুকিয়ে যায়। কতক শিশু মায়ের দুধ পান করে না ফলে অন্য দুধ পান করাতে হয়। [দেখুন, ইবনে কাসীর]

(১) أشد এর শাব্দিক অর্থ শক্তি সামর্থ্য। পবিত্র কুরআনের মোট ছয়টি স্থানে এ শব্দটি এসেছে। তন্মধ্যে সূরা আল-আন'আমের ১৫২, সূরা ইউসুফের ১২, সূরা আল-ইসরার ৩৪, সূরা আল-কাহফ এর ৮২, সূরা আল-কাসাসের ১৪ নং আয়াতে এর তাফসীর করা হয়েছে, প্রাপ্ত বয়স বলে।

১৬. 'ওরাই তারা, আমরা যাদের সৎ আমলগুলো কবুল করি এবং মন্দ কাজগুলো ক্ষমা করি, তারা জান্নাতবাসীদের মধ্যে হবে[১]। এদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা সত্য ওয়াদা।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ ۖ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿١٦﴾

১৭. আর যে তার মাতা-পিতাকে বলে, 'আফসোস তোমাদের জন্য! তোমরা কি আমাকে এ ওয়াদা দাও যে, আমাকে পুনরুত্থিত করা হবে অথচ আমার আগে বহু প্রজন্ম গত হয়েছে[২]?' তখন তার মাতা-পিতা আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদ করে বলে, 'দুর্ভোগ তোমার জন্য! তুমি ঈমান আনয়ন কর, নিশ্চয় আল্লাহ্‌র ওয়াদা

وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٧﴾

(১) এ আয়াতের বিধান অত্যন্ত ব্যাপক। এমনকি সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে ঘটে যাওয়া বিষয়গুলোও এর অন্তর্ভুক্ত। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর এক উক্তি থেকে আয়াতের ব্যাপকতা বোঝা যায়। মুহাম্মদ ইবনে হাতেম বর্ণনা করেন, একবার আমি আমীরুল মুমেনীন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন তার কাছে আরও কিছু লোক উপস্থিত ছিল। তারা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর চরিত্রে কিছু দোষ আরোপ করলে তিনি বললেন: 'উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু সে লোকদের অন্যতম ছিলেন, যাদের কথা আল্লাহ তা'আলা ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ﴾ আয়াতে ব্যক্ত করেছেন। আল্লাহর কসম। উসমান ও তার সঙ্গীদের ক্ষেত্রেই এই আয়াত প্রযোজ্য। এ বাক্যটি তিনি তিনবার বললেন। [দেখুন, ইবনে কাসীর]

(২) পূর্বের আয়াতসমূহে মাতা-পিতার সেবাযত্ন ও আনুগত্য সম্পর্কিত নির্দেশ ব্যক্ত হয়েছিল। এ আয়াতে সে ব্যক্তির আযাব ও শাস্তি উল্লেখিত হয়েছে, যে পিতা-মাতার সাথে অসদ্ব্যবহার ও কটুক্তি করে। বিশেষতঃ পিতা-মাতা যখন তাকে ইসলাম ও সৎকর্মের দিকে দাওয়াত দেয়, তখন তাদের কথা অমান্য করা দ্বিগুণ পাপ। ইবনে কাসীর বলেন, যে কোন লোক পিতা-মাতার সাথে অসদ্ব্যবহার করবে, তার ক্ষেত্রেই এ আয়াত প্রযোজ্য হবে। এ আয়াতটি কোন অবস্থাতেই আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরিবারের সাথে সংশ্লিষ্ট করা যাবে না। (যেমনটি শী'য়া সম্প্রদায়ের লোকেরা করার চেষ্টা চালায়।) [দেখুন, ইবনে কাসীর]

সত্য। তখন সে বলে, 'এ তো অতীত কালের উপকথা ছাড়া কিছুই নয়।'

أُولَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِىٓ أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ خَٰسِرِينَ ﴿١٨﴾

১৮. এরা তো তারা, যাদের উপর সত্য হয়েছে আযাবের সে ফয়সালা, যা সত্য হয়েছিল সে সব উম্মতের জন্য যারা গত হয়ে গেছে এদের আগে, জিন ও ইনসান থেকে। নিশ্চয় তারা ছিল ক্ষতিগ্রস্ত।

وَلِكُلٍّ دَرَجَٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوا۟ ۖ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَٰلَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾

১৯. আর প্রত্যেকের জন্য তাদের আমল অনুসারে মর্যাদা রয়েছে; এবং যাতে আল্লাহ্ প্রত্যেকের কাজের পূর্ণ প্রতিফল দিতে পারেন। আর তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না[১]।

وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ عَلَى ٱلنَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَٰتِكُمْ فِى حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْتَعْتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ ﴿٢٠﴾

২০. আর যারা কুফরী করেছে যেদিন তাদেরকে জাহান্নামের সামনে পেশ করা হবে (সেদিন তাদেরকে বলা হবে) 'তোমরা তোমাদের দুনিয়ার জীবনেই যাবতীয় সুখ-সম্ভার নিয়ে গেছ এবং সেগুলো উপভোগও করেছ। সুতরাং আজ তোমাদেরকে দেয়া হবে অবমাননাকর শাস্তি[২];

(১) অর্থাৎ না ভাল লোকদের ত্যাগ ও কুরবানী নষ্ট হবে না মন্দ লোকদেরকে তাদের প্রকৃত অপরাধের অধিক শাস্তি দেয়া হবে। সৎ ব্যক্তি যদি তার পুরস্কার থেকে বঞ্চিত থাকে কিংবা প্রকৃত প্রাপ্যের চেয়ে কম পুরস্কার পায় তাহলে তা যুলুম। আবার খারাপ লোক যদি তার কৃত অপরাধের চেয়ে বেশী শাস্তি পায় তাহলে সেটাও যুলুম। [দেখুন, তাবারী, মুয়াস্‌সার]

(২) অর্থাৎ কাফেরদেরকে বলা হবে, তোমরা কিছু ভাল কাজ দুনিয়াতে করে থাকলে তার প্রতিদানও তোমাদেরকে পার্থিব আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসের আকারে দেয়া হয়েছে। এখন আখেরাতে তোমাদের কোন প্রাপ্য নেই। এ থেকে জানা যায় যে, কাফেরদের যেসব সৎকাজ ঈমানের অনুপস্থিতিতে আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় নয়; আখেরাতে সেগুলো মূল্যহীন; কিন্তু দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সেগুলোর প্রতিদান দিয়ে দেন।

কারণ তোমরা যমীনে অন্যায়ভাবে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে এবং তোমরা নাফরমানী করতে।'

তৃতীয় রুকূ'

وَاذْكُرْ اَخَا عَادٍ ؕ اِذْ اَنْذَرَ قَوْمَهٗ بِالْاَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖۤ اَلَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّا اللّٰهَ ؕ اِنِّیْۤ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿٢١﴾

২১. আর স্মরণ করুন, 'আদ্ সম্প্রদায়ের ভাইয়ের কথা, যখন সে আহ্‌কাফে[১] স্বীয় সম্প্রদায়কে সতর্ক করেছিল। যার আগে এবং পরেও সতর্ককারী এসেছিলেন (এ বলে) যে, 'তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া কারও ইবাদাত করো না। নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য মহাদিনের শাস্তির আশংকা করছি।'

কাজেই কাফেররা দুনিয়াতে যেসব বিষয় বৈভব, ধন-দৌলত, মান-সম্ভ্রম, প্রভাব-প্রতিপত্তি ইত্যাদি লাভ করে, সেগুলো তাদের দানশীলতা, সহানুভুতি, সততা ইত্যাদি সৎকর্মের প্রতিফল হয়ে থাকে। মুমিনদের জন্যে এরূপ নয়। তারা দুনিয়াতে ধন-সম্পদ, মান-সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি ইত্যাদি নেয়ামত লাভ করলেও আখেরাতের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হবে না।

আলোচ্য আয়াতে দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে মগ্ন থাকার কারণে কাফেরদের উদ্দেশ্যে শাস্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছে। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণ দুনিয়ার ভোগ-বিলাস বর্জন করার অভ্যাস গড়ে তুলেছিলেন। তাদের জীবনালেখ্য এর সাক্ষ্য দেয়। [দেখুন, ইবনে কাসীর]

(১) যেহেতু কুরাইশ নেতারা তাদের শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা পোষণ করতো এবং নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও মোড়লিপনার কারণে আনন্দে আত্মহারা ছিল তাই এখানে তাদেরকে 'আদ কাওমের কাহিনী শুনানো হচ্ছে। আরবে 'আদ জাতি এভাবে পরিচিত ছিল যে, প্রাচীনকালে এই ভূখণ্ডে তারা ছিল সর্বাধিক শক্তিশালী কওম। আয়াতে বর্ণিত أَحْقَافٌ শব্দটি حِقْفٌ শব্দের বহুবচন। এর আভিধানিক অর্থ বালুর এমন সব লম্বা লম্বা টিলা যা উচ্চতায় পাহাড়ের সমান নয়। পারিভাষিক অর্থে এটা আরব মরুভূমির দক্ষিণ পশ্চিম অংশের নাম, বর্তমানে যেখানে কোন জনবসতি নেই। [দেখুন, তাবারী] আহক্বাফ অঞ্চলের বর্তমান অবস্থা দেখে কেউ কল্পনাও করতে পারে না যে, এক সময় এখানে জাঁকালো সভ্যতার অধিকারী একটি শক্তিশালী জাতি বাস করতো। সম্ভবত হাজার হাজার বছর পূর্বে এটা এক উর্বর অঞ্চল ছিল। পরে আবহাওয়ার পরিবর্তন একে মরুভূমিতে পরিণত করেছে। বর্তমানে এটা সৌদী আরবের আর-রুবউল খালীর মরু এলাকায় অবস্থিত। যার আভ্যন্তরীণ এলাকায় যাওয়ার সাহসও কারো নেই।

২২. তারা বলেছিল, 'তুমি কি আমাদেরকে আমাদের উপাস্যগুলো থেকে নিবৃত্ত করতে এসেছ? তুমি যদি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাক তবে আমাদেরকে যার ওয়াদা করছ তা নিয়ে আস।'

قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا ۚ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٢٢﴾

২৩. তিনি বললেন, 'এ জ্ঞান তো শুধু আল্লাহ্‌রই কাছে। আর আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি শুধু তা-ই তোমাদের কাছে প্রচার করি, কিন্তু আমি দেখছি, তোমরা এক মূর্খ সম্প্রদায়।'

قَالَ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ ۖ وَاُبَلِّغُكُمْ مَّآ اُرْسِلْتُ بِهٖ وَلٰكِنِّيْٓ اَرٰىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৪. 'অতঃপর যখন তারা তাদের উপত্যকার দিকে মেঘ আসতে দেখল তখন বলতে লাগল, 'এ তো মেঘ আমাদেরকে বৃষ্টি দান করবে।' না, বরং এটাই তো তা, যা তোমরা ত্বরান্বিত করতে চেয়েছ, এক ঝড়, এতে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

فَلَمَّا رَاَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ ۙ قَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا ۗ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهٖ ۗ رِيْحٌ فِيْهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٢٤﴾

২৫. 'এটা তার রবের নির্দেশে সব কিছুকে ধ্বংস করে দেবে।' অতঃপর তাদের পরিণাম এ হল যে, তাদের বসতিগুলো ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না। এভাবে আমরা অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়ে থাকি।

تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍۢ بِاَمْرِ رَبِّهَا فَاَصْبَحُوْا لَا يُرٰٓى اِلَّا مَسٰكِنُهُمْ ۗ كَذٰلِكَ نَجْزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٢٥﴾

২৬. আর অবশ্যই আমরা তাদেরকে যেভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম তোমাদেরকে সেভাবে প্রতিষ্ঠিত করিনি[১]; আর

وَلَقَدْ مَكَّنّٰهُمْ فِيْمَآ اِنْ مَّكَّنّٰكُمْ فِيْهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَّاَبْصَارًا وَّاَفْـِٕدَةً ۖ فَمَآ

(১) অর্থাৎ অর্থ, সম্পদ, শক্তি, ক্ষমতা কোন বিষয়েই তোমাদের ও তাদের মধ্যে কোন তুলনা হয় না। তোমাদের ক্ষমতার ব্যাপ্তি মক্কা শহরের বাইরে কোথাও নেই। কিন্তু তারা পৃথিবীর একটি বড় অংশের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছিলো।[দেখুন, তাবারী]

أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَآ أَبْصَارُهُمْ وَلَآ أَفْـِٔدَتُهُم مِّن شَىْءٍ إِذْ كَانُوا۟ يَجْحَدُونَ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٢٦﴾

আমরা তাদেরকে দিয়েছিলাম কান, চোখ ও হৃদয়; অতঃপর তাদের কান, চোখ ও হৃদয় তাদের কোন কাজে আসেনি; যখন তারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছিল। আর যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তা-ই তাদেরকে পরিবেষ্টন করল।

চতুর্থ রুকূ'

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْـَٔايَـٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٧﴾

২৭. আর অবশ্যই আমরা ধ্বংস করেছিলাম তোমাদের চারপাশের জনপদসমূহ; এবং আমরা বিভিন্নভাবে আয়াতসমূহ বিবৃত করেছিলাম, যাতে তারা ফিরে আসে।

فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا ءَالِهَةًۢ ۖ بَلْ ضَلُّوا۟ عَنْهُمْ ۚ وَذَٰلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا۟ يَفْتَرُونَ ﴿٢٨﴾

২৮. অতঃপর তারা আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভের জন্য আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদেরকে ইলাহ্‌রূপে গ্রহণ করেছিল তারা তাদেরকে সাহায্য করল না কেন? বরং তাদের ইলাহ্‌গুলো তাদের কাছ থেকে হারিয়ে গেল। আর এটা ছিল তাদের মিথ্যাচার; এবং যা তারা অলীক উদ্ভাবন করছিল।

وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓا۟ أَنصِتُوا۟ ۖ فَلَمَّا

২৯. আর স্মরণ করুন, যখন আমরা আপনার দিকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম জিনদের একটি দলকে[১], যারা

---

(১) মক্কার কাফেরদেরকে শোনানোর জন্যে পূর্বেকার আয়াতসমূহে কুফর ও অহংকারের নিন্দা ও ধ্বংসকারিতা বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদেরকে লজ্জা দেয়ার উদ্দেশ্যে জিনদের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, জিনরা অহংকার ও গর্বে তোমাদের চেয়েও বেশি, কিন্তু কুরআন শুনে তাদের অন্তরও বিগলিত হয়ে গেছে এবং ইসলাম গ্রহণ করেছে। তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলা জিনদের চেয়ে বেশি জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনা দান করেছেন; কিন্তু তোমরা ইসলাম গ্রহণ করছ না।

قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ ﴿٢٩﴾

মনোযোগসহকারে কুরআন পাঠ শুনছিল। অতঃপর যখন তারা তার

জিনদের কুরআন শ্রবণ ও ইসলাম গ্রহণের ঘটনা সহীহ হাদীসসমূহে এভাবে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুওয়াত লাভের পর থেকে জিন জাতিকে আকাশের সংবাদ সংগ্রহ থেকে নিবৃত্ত রাখা হয়। সেমতে তাদের কেউ সংবাদ শোনার মানসে উপরে গেলে তাকে উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপ করে বিতাড়িত করা হত। জিনরা এই নতুন পরিস্থিতির কারণ উদঘাটনে সচেষ্ট হল এবং তাদের বিভিন্ন দল কারণ অনুসন্ধানে পৃথিবীর বিভিন্ন ভুখণ্ডে কয়েকজন সাথীসহ ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সে সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কয়েকজন সাহাবীসহ বাতনে নাখলা নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। তাঁর ওকায বাজারে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। আরবরা আমাদের যুগের প্রদর্শনীর মত বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ বিশেষ দিনে মেলার আয়োজন করত। এসব মেলায় বহুলোক উপস্থিত থাকত, দোকান খোলা হত এবং সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হত। ওকায নামক স্থানে প্রতি বছর এমনি ধরনের এক মেলা বসত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্ভবতঃ ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে সেখানে গমন করছিলেন। নাখলা নামক স্থানে তিনি যখন ফজরের সালাতে কুরআন পাঠ করছিলেন, তখন জিনদের অনুসন্ধানী দলটি সেখানে দিয়ে পৌঁছল। তারা কুরআন পাঠ শুনে বলতে লাগল, এই সে নতুন ঘটনা, যার কারণে আমাদেরকে আকাশের সংবাদ সংগ্রহে নিবৃত্ত করা হয়েছে। [বুখারী: ৭৭৩, মুসলিম: ৪৪৯, তিরমিযী: ৩৩২৩, নাসায়ী: আল-কুবরা ১১৬৪]

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, জিনরা সেখানে পৌছে পরস্পর বলতে লাগল, চুপ করে কুরআন শুন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত শেষ করলে জিনরা ইসলামের সত্যতায় বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেল এবং তদন্তকার্যের রিপোর্ট পেশ করে একথাও বলল, আমরা মুসলিম হয়ে গেছি। তোমাদেরও ইসলাম গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরা জিন অবতীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এই জিনদের গমনাগমন এবং তাদের কুরআন পাঠ শুনে ইসলাম গ্রহণের বিষয় কিছুই জানতেন না। সূরা জিনে আল্লাহ তা'আলা তাকে এ বিষয়ে অবহিত করেন। আরও এক বর্ণনায় আছে, নসীবাঈন নামক স্থানের অধিবাসী এই জিনদের সংখ্যা ছিল নয় অথবা সাত। [মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৪৫৬] অন্যান্য হাদীসে জিনদের আগমনের ঘটনা অন্যভাবেও ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে একাধিক ঘটনা বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত হওয়ার কারণে এসব বর্ণনায় কোন বৈপরীত্য নেই। ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, জিনরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে বার বার আগমন করেছে। খাফফাযী বলেন, সবগুলো হাদীস একত্রিত করলে দেখা যায় যে, জিনদের আগমনের ঘটনা ছয় বার সংঘটিত হয়েছে।

কাছে উপস্থিত হল, তারা বলল, 'চুপ করে শুন।' অতঃপর যখন কুরআন পাঠ সমাপ্ত হল তারা তাদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেল সতর্ককারীরূপে।

قَالُوْا يٰقَوْمَنَآ اِنَّا سَمِعْنَا كِتٰبًا اُنْزِلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ وَاِلٰى طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٣٠﴾

৩০. তারা বলেছিল, 'হে আমাদের সম্প্রদায়! নিশ্চয় আমরা এমন এক কিতাবের পাঠ শুনেছি যা নাযিল হয়েছে মূসার পরে, এটা তার সম্মুখস্থ কিতাবকে সত্যায়ন করে এবং সত্য ও সরল পথের দিকে হেদায়াত করে।

يٰقَوْمَنَآ اَجِيْبُوْا دَاعِيَ اللّٰهِ وَاٰمِنُوْا بِهٖ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٣١﴾

৩১. 'হে আমাদের সম্প্রদায়! আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া দাও এবং তাঁর উপর ঈমান আন, তিনি তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন[১] এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে তোমাদেরকে রক্ষা করবেন।'

وَمَنْ لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْاَرْضِ وَلَيْسَ لَهٗ مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءُ ۚ اُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٣٢﴾

৩২. আর যে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া না দেয় তবে সে যমীনে আল্লাহ্‌কে অপারগকারী নয়। আর আল্লাহ্ ছাড়া তার কোন অভিভাবক নেই। তারাই সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে।

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يُّحْيِۦَ الْمَوْتٰى ؕ

৩৩. আর তারা কি দেখে না যে, নিশ্চয় আল্লাহ্, যিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং এসবের সৃষ্টিতে

---

(১) ﴿يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ﴾ এর من অব্যয়টি আসলে 'কোন কোন' এর অর্থ নির্দেশ করে। এখানে এই অর্থ নেয়া হলে বাক্যের ফায়দা এই হবে যে, ইসলাম গ্রহণ করলে কোন কোন গোনাহ মাফ হবে, অর্থাৎ আল্লাহর হক মাফ হবে-বান্দার হক মাফ হবে না। কেউ কেউ من অব্যয়টিকে বর্ণনাসূচক সাব্যস্ত করেছেন। এমতাবস্থায় এ ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। [জালালাইন, আইসারুত্তাফাসীর]

بَلَىٰٓ إِنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝٣٣

কোন ক্লান্তি বোধ করেননি, তিনি মৃতের জীবন দান করতেও সক্ষম? অবশ্যই হ্যাঁ, নিশ্চয় তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ عَلَى ٱلنَّارِ أَلَيْسَ هَٰذَا بِٱلْحَقِّ ۖ قَالُوا۟ بَلَىٰ وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُوا۟ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ۝٣٤

৩৪. আর যারা কুফরী করেছে যেদিন তাদেরকে পেশ করা হবে জাহান্নামের আগুনের কাছে, (সেদিন তাদেরকে বলা হবে) ‘এটা কি সত্য নয়?’ তারা বলবে, ‘আমাদের রবের শপথ! অবশ্যই হ্যাঁ। তিনি বলবেন, ‘সুতরাং শাস্তি আস্বাদন কর; কারণ তোমরা কুফরী করেছিলে।’

فَٱصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُو۟لُوا۟ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ ۚ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوٓا۟ إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍۭ ۚ بَلَٰغٌ ۚ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ۝٣٥

৩৫. অতএব আপনি ধৈর্য ধারণ করুন যেমন ধৈর্য ধারণ করেছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ। আর আপনি তাদের জন্য তাড়াহুড়ো করবেন না। তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে তা যেদিন তারা দেখতে পাবে, সেদিন তাদের মনে হবে, তারা যেন দিনের এক দণ্ডের বেশী দুনিয়াতে অবস্থান করেনি। এ এক ঘোষণা, সুতরাং পাপাচারী সম্প্রদায়কেই কেবল ধ্বংস করা হবে।

৪৭- সূরা মুহাম্মাদ[১]
৩৮ আয়াত, মাদানী

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

اَلَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا وَصَدُّوۡا عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ اَضَلَّ اَعۡمَالَهُمۡ ①

১. যারা কুফরী করেছে এবং অন্যকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে নিবৃত করেছে তিনি তাদের আমলসমূহ ব্যর্থ করে দিয়েছেন[২]।

وَالَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاٰمَنُوۡا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّهُوَ الۡحَـقُّ مِنۡ رَّبِّهِمۡ‌ۙ كَفَّرَ عَنۡهُمۡ سَيِّاٰتِهِمۡ وَاَصۡلَحَ بَالَهُمۡ ②

২. আর যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে এবং মুহাম্মদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে তাতে ঈমান এনেছে, আর তা-ই তাদের রবের পক্ষ হতে প্রেরিত সত্য, তিনি তাদের মন্দ কাজগুলো বিদূরিত করবেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করবেন[৩]।

---

(১) সূরা মুহাম্মাদের অপর নাম সূরা কিতাল। কেননা, এতে "কিতাল" তথা জেহাদের বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে। মদীনায় হিজরতের পরেই এই সূরা নাযিল হয়েছে। এমনকি, এর ﴿وَكَاَيِّنۡ مِّنۡ قَرۡيَةٍ هِىَ اَشَدُّ قُوَّةً مِّنۡ قَرۡيَتِكَ﴾ আয়াত সম্পর্কে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে যে এটি মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত। কেননা, এই আয়াতটি তখন নাযিল হয়েছিল, যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরতের উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে বের হয়েছিলেন এবং মক্কার জনবসতি ও বায়তুল্লাহর দিকে দৃষ্টিপাত করে বলেছিলেনঃ হে মক্কা নগরী। জগতের সমস্ত নগরের মধ্যে তুমিই আমার কাছে প্রিয়। যদি মক্কার অধিকাসীরা আমাকে এখান থেকে বহিষ্কার না করত, তবে আমি স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে কখনও তোমাকে ত্যাগ করতাম না। [তিরমিযী: ৩৮৬০] তফসীরবিদগণের পরিভাষায় যে আয়াত হিজরতের সফরে অবতীর্ণ হয়েছে, তাকে মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত বলে অভিহিত করা হয়। মোটকথা এই যে, এই সূরা মদীনায় হিজরতের অব্যবহিত পরেই অবতীর্ণ হয়েছে এবং মদীনায় পৌঁছেই কাফেরদের সাথে জেহাদ ও যুদ্ধের বিধানাবলী নাযিল হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর]

(২) মূল আয়াতে ﴿اَضَلَّ اَعۡمَالَهُمۡ﴾ উল্লেখিত হয়েছে। অর্থাৎ তাদের কাজ-কর্মকে বিপথগামী করে দিয়েছেন, পথভ্রষ্ট করে দিয়েছেন। [দেখুন-আয়সারুত-তাফাসীর, ফাতহুল কাদীর]

(৩) আয়াতে বর্ণিত بال শব্দটি কখনও অবস্থার অর্থে এবং কখনও অন্তরের অর্থে ব্যবহৃত হয়। [ফাতহুল কাদীর,কুরতুবী]

ذٰلِكَ بِاَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَاَنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ اَمْثَالَهُمْ ۝٣

৩. এটা এজন্যে যে, যারা কুফরী করেছে তারা বাতিলের অনুসরণ করেছে এবং যারা ঈমান এনেছে তারা তাদের রবের প্রেরিত সত্যের অনুসরণ করেছে। এভাবে আল্লাহ্ মানুষের জন্য তাদের দৃষ্টান্তসমূহ উপস্থাপন করেন[১]।

فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ۭ حَتّٰٓى اِذَآ اَثْخَنْتُمُوْهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ ۙ فَاِمَّا مَنًّۢا بَعْدُ وَاِمَّا فِدَاۤءً حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا ۚ ذٰلِكَ ۭ وَلَوْ يَشَاۤءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلٰكِنْ لِّيَبْلُوَا۟ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ۭ وَالَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُّضِلَّ اَعْمَالَهُمْ ۝٤

৪. অতএব যখন তোমরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধে মুকাবিলা কর তখন ঘাড়ে আঘাত কর, অবশেষে যখন তোমরা তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত করবে তখন তাদেরকে মজবুতভাবে বাঁধ; তারপর হয় অনুকম্পা, নয় মুক্তিপণ। যতক্ষণ না যুদ্ধ এর ভার (অস্ত্র) নামিয়ে না ফেলে। এরূপই, আর আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে তাদের থেকে প্রতিশোধ নিতে পারতেন, কিন্তু তিনি চান তোমাদের একজনকে অন্যের দ্বারা পরীক্ষা করতে। আর যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয় তিনি কখনো তাদের আমলসমূহ বিনষ্ট হতে দেন না।

سَيَهْدِيْهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ۝٥

৫. অচিরেই তিনি তাদেরকে পথনির্দেশ করবেন[২] এবং তাদের অবস্থা ভাল করে দিবেন।

---

(১) আয়াতের অন্য অর্থ হচ্ছে, এভাবে আল্লাহ তা'আলা উভয় দলকে তাদের অবস্থান সঠিকভাবে বলে দেন। তাদের একদল বাতিলের অনুসরণ করতে বদ্ধপরিকর। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদের সমস্ত চেষ্টা-সাধনাকে নিষ্ফল করে দিয়েছেন। কিন্তু অপর দল ন্যায় ও সত্যের আনুগত্য গ্রহণ করেছে। তাই আল্লাহ তাদেরকে সমস্ত অকল্যাণ থেকে মুক্ত করে তাদের অবস্থা সংশোধন করে দিয়েছেন।[দেখুন- কুরতুবী,ফাতহুল কাদীর,বাগভী]

(২) এখানে হেদায়াত করা বা পথপ্রদর্শনের অর্থ স্পষ্টত জান্নাতের দিকে পথপ্রদর্শন করা। [কুরতুবী]

৬. আর তিনি তাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার পরিচয় তিনি তাদেরকে জানিয়েছিলেন[১]।

وَيُدۡخِلُهُمُ ٱلۡجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمۡ ۝٦

৭. হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে সাহায্য কর, তবে তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা সমূহ সুদৃঢ় করবেন।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرۡكُمۡ وَيُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ ۝٧

৮. আর যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য রয়েছে ধ্বংস এবং তিনি তাদের আমলসমূহ ব্যর্থ করে দিয়েছেন।

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعۡسٗا لَّهُمۡ وَأَضَلَّ أَعۡمَٰلَهُمۡ ۝٨

৯. এটা এজন্যে যে, আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তারা তা অপছন্দ করেছে। কাজেই তিনি তাদের আমলসমূহ নিষ্ফল করে দিয়েছেন।

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ كَرِهُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحۡبَطَ أَعۡمَٰلَهُمۡ ۝٩

১০. তবে কি তারা যমীনে ভ্রমণ করে দেখেনি তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছে? আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করেছেন। আর কাফিরদের জন্য রয়েছে অনুরূপ পরিণাম।

۞أَفَلَمۡ يَسِيرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَيَنظُرُواْ كَيۡفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡۖ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِمۡۖ وَلِلۡكَٰفِرِينَ أَمۡثَٰلُهَا ۝١٠

১১. এটা এজন্যে যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ মুমিনদের অভিভাবক এবং নিশ্চয় কাফিরদের কোন অভিভাবক নেই[২]।

ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوۡلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلۡكَٰفِرِينَ لَا مَوۡلَىٰ لَهُمۡ ۝١١

---

(১) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: এই আল্লাহর কসম, যিনি আমাকে সত্য ধর্মসহ প্রেরণ করেছেন, তোমরা দুনিয়াতে যেমন তোমাদের স্ত্রী ও গৃহকে চিন, তার চাইতেও বেশী জান্নাতে তোমাদের স্থান ও স্ত্রীদেরকে চিনবে [বুখারী: ৬৫৩৫]

(২) مولى শব্দটি অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর অর্থ অভিভাবক।[মুয়াস্‌সার,বাগভী] এখানে এই অর্থই বোঝানো হয়েছে। এর আরেক অর্থ মালিক। কুরআনের অন্যত্র কাফেরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে: ﴿ثُمَّ رُدُّوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ مَوۡلَىٰهُمُ ٱلۡحَقِّۚ﴾ 'অতঃপর তাদেরকে (কাফেরদের) তাদের মাওলার কাছে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে।' [সূরা আল-আন'আম:৬২]

দ্বিতীয় রুকূ'

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ﴿١٢﴾

১২. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে আল্লাহ্‌ তাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে যার নীচে নহরসমূহ প্রবাহিত; কিন্তু যারা কুফরী করেছে তারা ভোগ বিলাস করে এবং খায় যেমন চতুষ্পদ জন্তুরা খায়[১]; আর জাহান্নামই তাদের নিবাস।

وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ﴿١٣﴾

১৩. আর তারা আপনার যে জনপদ থেকে আপনাকে বিতাড়িত করেছে তার চেয়েও বেশী শক্তিশালী বহু জনপদ ছিল; আমরা তাদেরকে ধ্বংস করেছি অতঃপর তাদের সাহায্যকারী কেউ ছিল না[২]।

أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُم ﴿١٤﴾

১৪. যে ব্যক্তি তার রব প্রেরিত সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে কি তার ন্যায় যার কাছে নিজের মন্দ কাজগুলো শোভন করে দেয়া হয়েছে এবং যারা নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করেছে?

---

(১) অর্থাৎ জীবজন্তু খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে কোনরূপ পরিমাণ-পরিমাপ মেনে চলে না। অনুরূপভাবে কাফেররাও খাদ্য-পানীয় গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন নিয়মনীতির ধার ধারে না। [দেখুন- ফাতহুল কাদীর,কুরতুবী] তাই রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মুমিন এক খাদ্যনালীতে খাবার গ্রহণ করে পক্ষান্তরে কাফের যেন সাতটি খাদ্যনালীর মাধ্যমে খাবার গলধকরণ করে। [বুখারী: ৫৩৯৩]

(২) মক্কা ছেড়ে চলে যাওয়ার কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মনে বড় দুঃখ ছিল। তিনি যখন হিজরত করতে বাধ্য হলেন তখন শহরের বাইরে গিয়ে তিনি শহরের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, “হে মক্কা! আল্লাহর কাছে তুমি দুনিয়ার সব শহরের চেয়ে প্রিয়। আর আল্লাহর সমস্ত শহরের মধ্যে আমি তোমাকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসি। যদি মুশরিকরা আমাকে বের করে না দিতো তাহলে আমি কখনো তোমাকে ছেড়ে যেতাম না।” [মুসনাদে আহমাদ:৪/৩০৫, তিরমিযী: ৩৯২৫, ইবন মাজাহ: ৩১০৮]

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۖ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن
مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ
مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ
مُّصَفًّى ۖ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن
رَّبِّهِمْ ۖ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا
فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ﴿١٥﴾

১৫. মুত্তাকীদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্ত: তাতে আছে নির্মল পানির নহরসমূহ, আছে দুধের নহরসমূহ যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, আছে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নহরসমূহ, আছে পরিশোধিত মধুর নহরসমূহ[১] এবং সেখানে তাদের জন্য থাকবে প্রত্যেক প্রকারের ফলমূল। আর তাদের রবের পক্ষ থেকে ক্ষমা। তারা (মুত্তাকীরা) কি তাদের ন্যায় যারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে এবং যাদেরকে পান করানো হবে ফুটন্ত পানি, ফলে তা তাদের নাড়ীভুঁড়ি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিবে?

وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ
عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ
آنِفًا ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ
وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴿١٦﴾

১৬. আর তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক আপনার কথা মনোযোগের সাথে শুনে, অবশেষে আপনার কাছ থেকে বের হয়ে যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত তাদেরকে বলে, 'এ মাত্র সে কী বলল?' এরাই তারা, যাদের অন্তরসমূহে আল্লাহ্ মোহর করে দিয়েছেন এবং তারা অনুসরণ করেছে নিজেদের খেয়াল-খুশীর।

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ﴿١٧﴾

১৭. আর যারা হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়েছে আল্লাহ্ তাদের হিদায়াত বৃদ্ধি করেন এবং তাদেরকে তাদের তাকওয়া প্রদান করেন[২]।

---

(১) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জান্নাতে রয়েছে পানির সাগর, মধুর সাগর, দুধের সাগর এবং মদের সাগর। তারপর সেগুলো থেকে আরো নালাসমূহ প্রবাহিত করা হবে। [তিরমিযী: ২৫৭১]

(২) অর্থাৎ তারা নিজেরদের মধ্যে যে তাকওয়ার যোগ্যতা সৃষ্টি করে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সে তাওফীকই দান করেন। [দেখুন-ফাতহুল কাদীর]

فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً ۖ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا ۚ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ ﴿١٨﴾

১৮. সুতরাং তারা কি শুধু এজন্যে অপেক্ষা করছে যে, কিয়ামত তাদের কাছে এসে পড়ুক আকস্মিকভাবে? কিয়ামতের লক্ষণসমূহ[১] তো এসেই পড়েছে! অতঃপর কিয়ামত এসে পড়লে তারা উপদেশ গ্রহণ করবে কেমন করে!

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ﴿١٩﴾

১৯. কাজেই জেনে রাখুন যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন সত্য ইলাহ্ নেই[২] । আর ক্ষমা প্রার্থনা করুন আপনার ও মুমিন নর-নারীদের ত্রুটির জন্য । আল্লাহ্ তোমাদের গতিবিধি এবং অবস্থান সম্পর্কে অবগত রয়েছেন ।

তৃতীয় রুকূ’

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ ۖ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ ۙ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۖ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ ﴿٢٠﴾

২০. আর যারা ঈমান এনেছে তারা বলে, ‘একটি সূরা নাযিল হয় না কেন?’ অতঃপর যদি ‘মুহকাম’[৩] কোন সূরা নাযিল হয় এবং তাতে যুদ্ধের কোন নির্দেশ থাকে আপনি দেখবেন যাদের অন্তরে রোগ আছে তারা মৃত্যুভয়ে বিহ্বল মানুষের মত আপনার দিকে

---

(১) মূলে أَشْرَاطُ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এ শব্দের অর্থ আলামত বা লক্ষণ। এখানে কেয়ামতের প্রাথমিক আলামতসমূহ উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলামত হচ্ছে আল্লাহর শেষ নবীর আগমন যার পরে কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন নবী আসবে না। হাদীসে এসেছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর শাহাদাত ও মধ্যমা আঙ্গুলি উঠিয়ে বললেন, “আমার আগমন ও কিয়ামত এ দু অঙ্গুলির মত।” [বুখারী: ৬৫০৩, মুসলিম: ২৯৫০, মুসনাদে আহমাদ: ৫/৩৮৮]

(২) আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে: আপনি জেনে রাখুন, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়। [তবারী, মুয়াস্সার]

(৩) কাতাদাহ রাহেমাহুল্লাহ বলেন: যেসব সূরায় যুদ্ধ ও জেহাদের বিধানাবলী বিধৃত হয়েছে, সেগুলো সব মুহকামাহ্ তথা অরহিত। [কুরতুবী]

তাকাচ্ছে[১]। সুতরাং তাদের জন্য উত্তম হতো---

২১. আনুগত্য ও ন্যায়সংগত বাক্য; অতঃপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হলে যদি তারা আল্লাহ্‌র প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার সত্যে পরিণত করত তবে তাদের জন্য তা অবশ্যই কল্যাণকর হত।

طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ﴿٢١﴾

২২. সুতরাং অবাধ্য হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলে সম্ভবত তোমরা যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন[২] ছিন্ন

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴿٢٢﴾

(১) তাদের এ অবস্থা অন্যত্র এভাবে বর্ণনা করা হয়েছেঃ “আপনি কি সে লোকদের দেখেছেন যাদের বলা হয়েছিলো, নিজের হাতকে সংযত রাখো, সালাত কায়েম করো এবং যাকাত দাও। এখন তাদেরকে যখন যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়েছে তখন তাদের এক দলের অবস্থা এই যে, মানুষকে এমন ভয় পাচ্ছে যে ভয় আল্লাহকে করা উচিত। বরং তার চেয়েও বেশী ভয় পাচ্ছে। তারা বলছে, হে আমাদের রব! আমাদেরকে যুদ্ধের এ নির্দেশ কেন দিলে? আমাদেরকে আরো কিছু অবকাশ দিলে না কেন?’ [সূরা আন-নিসাঃ ৭৭]

(২) أَرْحَامٌ শব্দটি رِحْمٌ এর বহুবচন। এর অর্থ জননীর গর্ভাশয়। সাধারণ সম্পর্ক ও আত্মীয়তার ভিত্তি সেখান থেকেই সুচিত হয়, তাই বাকপদ্ধতিতে رِحْمٌ শব্দটি আত্মীয়তা ও সম্পর্কের অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইসলাম আত্মীয়তার হক আদায় করার জন্যে খুবই তাকীদ করেছে। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা‘আলা বলেন, যে ব্যক্তি আত্মীয়তা বজায় রাখবে, আল্লাহ তা‘আলা তাকে নৈকট্য দান করবেন এবং যে ব্যক্তি আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে, আল্লাহ তা‘আলা তাকে ছিন্ন করবেন। [বুখারী: ৫৫২৯] আত্মীয় ও সম্পর্কশীলদের সাথে কথায়, কর্মে ও অর্থ ব্যয়ে সহৃদয় ব্যবহার করার জোর নির্দেশ আছে। অন্য এক হাদীসে আছে, আল্লাহ তা‘আলা যেসব গোনাহের শাস্তি দুনিয়াতেও দেন এবং আখেরাতেও দেন, সেগুলোর মধ্যে নিপীড়ন ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার সমান কোন গোনাহ নেই। [ইবনে মাজাহ: ৪২১১] অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন: যে ব্যক্তি আয়ুবৃদ্ধি ও রুযী রোযগারে বরকত কামনা করে সে যেন আত্মীয়তার সাথে সহৃদয় ব্যবহার করে। [মুসনাদে আহমাদ ৫/২৭৯] সহীহ হাদীসসমূহে আরও বলা হয়েছে যে, আত্মীয়তার অধিকারের ক্ষেত্রে অপরপক্ষ থেকে সদ্ব্যবহার আশা করা উচিত নয়। যদি অপরপক্ষ সম্পর্ক ছিন্ন ও অসৌজন্যমুলক ব্যবহারও করে, তবুও তার সাথে তোমার সদ্ব্যবহার করা উচিত। এক হাদীসে বলা হয়েছে: সে ব্যক্তি আত্মীয়ের

করবে ।

أُولَٰٓئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰٓ أَبْصَارَهُمْ ﴿٢٣﴾

২৩. এরাই তারা, যাদেরকে আল্লাহ্ লা'নত করেছেন, ফলে তিনি তাদের বধির করেন এবং তাদের দৃষ্টিসমূহকে অন্ধ করেন ।

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴿٢٤﴾

২৪. তবে কি তারা কুরআন নিয়ে গভীর চিন্তা করে না? নাকি তাদের অন্তরসমূহে তালা রয়েছে?

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰٓ أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى ۙ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ﴿٢٥﴾

২৫. নিশ্চয় যারা নিজেদের কাছে সৎপথ স্পষ্ট হওয়ার পর তা থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে, শয়তান তাদের কাজকে শোভন করে দেখায় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দেয় ।

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴿٢٦﴾

২৬. এটা এজন্যে যে, আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন, তা যারা অপছন্দ করে তাদেরকে ওরা বলে, 'অচিরেই আমরা কোন কোন বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করব ।' আর আল্লাহ্ জানেন তাদের গোপন অভিসন্ধিসমূহ ।

فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَٰٓئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ﴿٢٧﴾

২৭. সুতরাং কেমন হবে তাদের দশা! যখন ফেরেশ্তারা তাদের চেহারা ও পৃষ্ঠাদেশে আঘাত করতে করতে প্রাণ হরণ করবে ।

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَآ أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴿٢٨﴾

২৮. এটা এজন্যে যে, তারা এমন সব বিষয় অনুসরণ করেছে যা আল্লাহ্‌র অসন্তোষ সৃষ্টি করেছে এবং তারা তাঁর

সাথে সদ্ব্যবহারকারী নয় যে কোন প্রতিদানের সমান সদ্ব্যবহার করে; বরং সেই সদ্ব্যবহারকারী, যে অপরপক্ষ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করলেও সদ্ব্যবহার অব্যাহত রাখে । [বুখারী: ৫৫৩২]

সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করেছে; সুতরাং তিনি তাদের আমলসমূহ নিষ্ফল করে দিয়েছেন।

চতুর্থ রুকূ'

২৯. নাকি যাদের অন্তরে রোগ আছে তারা মনে করে যে, আল্লাহ্ কখনো তাদের বিদ্বেষভাব প্রকাশ করে দেবেন না[১]?

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ ﴿٢٩﴾

৩০. আর আমরা ইচ্ছে করলে আপনাকে তাদের পরিচয় দিতাম; ফলে আপনি তাদের লক্ষণ দেখে তাদেরকে চিনতে পারতেন। তবে আপনি অবশ্যই কথার ভঙ্গিতে তাদেরকে চিনতে পারবেন। আর আল্লাহ্ তোমাদের যাবতীয় আমল সম্পর্কে জানেন।

وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ ۚ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٠﴾

৩১. আর আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব, যতক্ষণ না আমরা জেনে নেই তোমাদের মধ্যে জিহাদকারী ও ধৈর্যশীলদেরকে এবং আমরা তোমাদের কর্মকাণ্ড পরীক্ষা করি।

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ ﴿٣١﴾

৩২. নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে, মানুষকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে নিবৃত্ত করেছে এবং নিজেদের কাছে হিদায়াত সুস্পষ্ট হওয়ার পর রাসূলের বিরোধিতা করেছে, তারা আল্লাহ্‌র কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। আর অচিরেই তিনি তাদের আমলসমূহ নিষ্ফল করে দেবেন।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ ﴿٣٢﴾

---

(১) أضغان শব্দটি ضغن এর বহুবচন। এর অর্থ গোপন শত্রুতা ও বিদ্বেষ। [বাগভী, ফাতহুল কাদীর]

৩৩. হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর, আর তোমরা তোমাদের আমলসমূহ বিনষ্ট করো না।

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٣﴾

৩৪. নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে এবং আল্লাহ্‌র পথ থেকে মানুষকে নিবৃত্ত করেছে, তারপর কাফির অবস্থায় মারা গেছে, আল্লাহ্ তাদেরকে কখনই ক্ষমা করবেন না।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴿٣٤﴾

৩৫. কাজেই তোমরা হীনবল হয়ো না এবং সন্ধির প্রস্তাব করো না[১], যখন তোমরা প্রবল; আর আল্লাহ্ তোমাদের সঙ্গে আছেন[২] এবং তিনি তোমাদের কর্মফল কখনো ক্ষুণ্ন করবেন না[৩]।

فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٥﴾

৩৬. দুনিয়ার জীবন তো শুধু খেল-তামাশা ও অর্থহীন কথাবার্তা। আর যদি তোমরা ঈমান আন এবং তাক্ওয়া অবলম্বন কর তবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে তোমাদের পুরস্কার দেবেন এবং তিনি

إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ﴿٣٦﴾

(১) এ আয়াতে কাফেরদেরকে সন্ধির আহ্বান জানাতে নিষেধ করা হয়েছে।[বাগভী] কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا﴾ অর্থাৎ কাফেররা যদি সন্ধির দিকে ঝুকে পড়ে, তবে আপনিও ঝুকে পড়ুন। [সূরা আল-আনফাল:৬১]

(২) এখানে সঙ্গে থাকার অর্থ, সাহায্য-সহযোগিতা ও জ্ঞানে সাথে থাকা। নতুবা আল্লাহ্ তাঁর আরশের উপরই রয়েছেন।

(৩) অর্থাৎ যখন তোমাদের মধ্যে তিনটি গুণ থাকবে তখন তোমাদের জন্য হীনবল হওয়া, কাফেরদের সাথে সন্ধি করা উচিত হবেনা। আর সে গুণ তিনটি হলো, ১. যখন তোমাদের এ ঈমান থাকবে যে, তোমরা কাফেরদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং তোমরা কাফেরদের উপর প্রবল, ২. আল্লাহ্ সাহায্য-সহযোগিতাকারী হিসেবে তোমাদের সাথে আছেন বলে তোমাদের ঈমান থাকবে, ৩. আর আল্লাহ্ তোমাদের কোন কাজের প্রতিদান দেয়ায় এতটুকুও কমতি করবেন না।[দেখুন- তবারী,বাগভী,ফাতহুল কাদীর]

তোমাদের ধন-সম্পদ চান না[১] ।

৩৭. তোমাদের কাছ থেকে তিনি তা চাইলে ও তার জন্য তোমাদের উপর চাপ দিলে তোমরা তো কার্পণ্য করবে এবং তখন তিনি তোমাদের বিদ্বেষভাব প্রকাশ করে দেবেন[২] ।

إِن يَسْـَٔلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا۟ وَيُخْرِجْ أَضْغَـٰنَكُمْ ۝

৩৮. দেখ, তোমরাই তো তারা যাদেরকে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করতে বলা হচ্ছে অথচ তোমাদের কেউ কেউ কার্পণ্য করছে। তবে যে কার্পণ্য করছে সে তো কার্পণ্য করছে নিজেরই প্রতি[৩] । আর আল্লাহ্ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত। আর যদি তোমরা বিমুখ

هَـٰٓأَنتُمْ هَـٰٓؤُلَآءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ ۖ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِۦ ۚ وَٱللَّهُ ٱلْغَنِىُّ وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ ۚ وَإِن تَتَوَلَّوْا۟ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوٓا۟ أَمْثَـٰلَكُم ۝

(১) আয়াতে বাহ্যিক অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কাছে তোমাদের ধনসম্পদ চান না। এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তোমাদের ধনসম্পদ তোমাদের কাছ থেকে নিজের কোন উপকারের জন্যে চান না; বরং তোমাদেরই উপকারের জন্যে চান। এই আয়াতেও ﴿يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ﴾ শব্দ দ্বারা এই উপকারের উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয় করার জন্যে বলার কারণ এই যে, তোমরা সওয়াবের প্রতি সর্বাধিক মুখাপেক্ষী হবে। তখন এই ব্যয় তোমাদেরই কাজে লাগবে এবং সেখানে তোমাদেরকে এর প্রতিদান দেয়া হবে। এর নজীর হচ্ছে এই আয়াত: ﴿مَآ أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ﴾ অর্থাৎ আল্লাহ বলেন: আমি তাদের কাছে নিজের জন্যে কোন জীবনোপকরণ চাই না। আমার এর প্রয়োজনও নেই। [দেখুন-ইবন কাসীর,বাগভী,কুরতুবী,ফাতহুল কাদীর]

(২) আয়াতের সারমর্ম এই যে, যদি আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কাছে সমস্ত ধন-সম্পদ চাইতেন, তবে তোমরা কার্পণ্য করতে। কৃপণতার কারণে যে অপ্রিয়ভাব তোমাদের অন্তরে থাকত, তা অবশ্যই প্রকাশ হয়ে পড়ত। তাই তিনি তোমাদের ধন-সম্পদের মধ্য থেকে সামান্য একটি অংশ তোমাদের উপর ফরয করেছেন। কিন্তু তোমরা তাতেও কৃপণতা শুরু করেছ ।[ফাতহুল কাদীর,মুয়াস্সার]

(৩) অর্থাৎ তোমাদেরকে তোমাদের ধন-সম্পদের কিছু অংশ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার দাওয়াত দেয়া হলে তোমাদের কেউ কেউ এতে কৃপণতা করে। যে ব্যক্তি এতেও কৃপণতা করে, সে আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি করে না; বরং এর মাধ্যমে সে নিজেরই ক্ষতি করে। [ফাতহুল কাদীর,সা'দী]

হও, তবে তিনি তোমাদের ছাড়া অন্য সম্প্রদায়কে তোমাদের স্থলবর্তী করবেন; তারপর তারা তোমাদের মত হবে না[১] ।

(১) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সাহাবায়ে কেরামের সামনে এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন, তখন তারা বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্, তারা কোন জাতি, যাদেরকে আমাদের স্থলে আনা হবে, অতঃপর আমাদের মত শরী'য়তের বিধানাবলীর প্রতি বিমুখ হবে না? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মজলিসে উপস্থিত সালমান ফারেসী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর উরুতে হাত মেরে বললেনঃ সে এবং তার জাতি। যদি সত্য দ্বীন সপ্তর্ষিমণ্ডলস্থ নক্ষত্রেও থাকত, (যেখানে মানুষ পৌঁছতে পারে না) তবে পারস্যের কিছু সংখ্যক লোক সেখানেও পৌঁছে সত্যদ্বীন হাসিল করতো এবং তা মেনে চলত। [সহীহ ইবন হিব্বানঃ ৭১২৩, তিরমিযীঃ ৩২৬০, ৩২৬১] এখানে এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণীর উদ্দেশ্য হচ্ছে, যদি কোন সম্প্রদায় আল্লাহর দ্বীন থেকে, রাসূলের সুন্নাত থেকে দূরে সরে যায়, রাসূলের দ্বীনের সাহায্য করতে পিছপা হয়, তবে আল্লাহ তাদের পরিবর্তে অন্য কাউকে এর স্থলাভিষিক্ত করবেন, তারা হতে পারে আরব, হতে পারে অনারব, হতে পারে কাছে কিংবা দূরের কোন জাতি। ইতিহাস থেকে প্রমাণিত যে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন জাতির মাধ্যমে তাঁর দ্বীনের জন্য এ খেদমত নিয়েছেন। তারা সবাই পারস্য কিংবা কোন সুনির্দিষ্ট এক জাতি ছিল না। পারস্যের লোকদের মধ্য থেকে যারা এ কাজের আঞ্জাম দিয়েছেন তাদের মধ্যে বিখ্যাত হচ্ছেন, ইমাম বুখারী, তিরমিযী, ইবন মাজাহ, নাসায়ী সহ আরও অনেকে। তারা সবাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অনুসারী ছিলেন। এ ব্যাপারে শী'আ, রাফেযী, মু'তাযিলা কিংবা খারেজীদের কোন সামান্যতমও খেদমত ছিল না। বরং তাদের মতবাদ খণ্ডন করতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের যে সমস্ত ইমাম পরিশ্রম করেছেন এ আয়াত তাদেরকেও শামিল করে।

৪৮- সূরা আল-ফাত্‌হ্
২৯ আয়াত, মাদানী

বِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

إِنَّا فَتَحۡنَا لَكَ فَتۡحٗا مُّبِينٗا ١

১. নিশ্চয় আমরা আপনাকে দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয়[১],

(১) অধিকাংশ সাহাবী, তাবেয়ী ও তাফসীরবিদদের মতে সূরা ফাতহ ষষ্ঠ হিজরীতে অবতীর্ণ হয়, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমরার উদ্দেশ্যে সাহাবায়ে কেরামকে সাথে নিয়ে মক্কা মুকাররমা তাশরীফ নিয়ে যান এবং হারাম শরীফের সন্নিকটে হুদাইবিয়া নামক স্থান পৌঁছে অবস্থান গ্রহণ করেন। হুদাইবিয়া মক্কার বাইরে হারামের সীমানার সন্নিকটে অবস্থিত একটি স্থানের নাম। আজকাল এই স্থানটিকে সুমাইছী বলা হয়। ঘটনাটি এই স্থানেই ঘটে। এই ঘটনার এক অংশ এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় স্বপ্ন দেখলেন তিনি সাহাবায়ে কেরামসহ মক্কায় নির্ভয়ে ও নির্বিঘ্নে প্রবেশ করছেন এবং ইহরামের কাজ সমাপ্ত করে কেউ কেউ নিয়মানুযায়ী মাথা মুণ্ডন করেছেন, কেউ কেউ চুল কাটিয়েছেন এবং তিনি বায়তুল্লাহ প্রবেশ করেছেন ও বায়তুল্লাহর চাবি তার হস্তগত হয়েছে। এটা সূরায় বর্ণিত ঘটনার একটি অংশ। নবী-রাসূলগণের স্বপ্ন ওহী হয়ে থাকে। তাই স্বপ্নটি যে বাস্তবরূপ লাভ করবে, তা নিশ্চিত ছিল। কিন্তু স্বপ্নে এই ঘটনার কোন সন, তারিখ বা মাস নির্দিষ্ট করা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে স্বপ্নটি মক্কা বিজয়ের সময় প্রতিফলিত হওয়ার ছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সাহাবায়ে কেরামকে স্বপ্নের বৃত্তান্ত শুনালেন, তখন তারা সবাই পরম আগ্রহের সাথে মক্কা যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন। সাহাবায়ে কেরামের প্রস্তুতি দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও ইচ্ছা করে ফেললেন। কেননা, স্বপ্নে কোন বিশেষ সাল অথবা মাস নির্দিষ্ট ছিল না। কাজেই এই মুহূর্তেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনাও ছিল। কিন্তু মক্কার কাফেররা তাকে মক্কা প্রবেশে বাধা দান করে। অতঃপর তারা এই শর্তে সন্ধি করতে সম্মত হয় যে, এ বছর তিনি মদীনায় ফিরে যাবেন এবং পরবর্তী বছর তিনি উমরা করতে আসবেন। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে অনেকেই বিশেষত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ ধরনের সন্ধি করতে অসম্মত ছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই সন্ধিকে পরিণামে মুসলিমদের জন্যে সাফল্যের উপায় মনে করে গ্রহণ করে নেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন উমরার এহরাম খুলে হুদাইবিয়া থেকে ফেরত রওয়ানা হলেন, তখন পথিমধ্যে এই পূর্ণ সূরা অবতীর্ণ হয়। এতে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্বপ্ন সত্য এবং অবশ্যই বাস্তবরূপ লাভ করবে। কিন্তু তার সময় এখনও হয়নি। পরে মক্কা বিজয়ের সময় এই স্বপ্ন বাস্তবরূপ লাভ করে। এই সন্ধি প্রকৃতপক্ষে মক্কা বিজয়ের কারণ হয়েছিল। তাই একে প্রকাশ্য বিজয় বলে ব্যক্ত

لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنۢبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَٰطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿٢﴾

২. যেন আল্লাহ্ আপনার অতীত ও ভবিষ্যত ত্রুটিসমূহ মার্জনা করেন এবং আপনার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন। আর আপনাকে সরল পথের হেদায়াত দেন,

وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ﴿٣﴾

৩. এবং আল্লাহ্ আপনাকে বলিষ্ঠ সাহায্য দান করেন।

هُوَ الَّذِىٓ أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِى قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓا۟ إِيمَٰنًا مَّعَ إِيمَٰنِهِمْ ۗ وَلِلَّهِ جُنُودُ

৪. তিনিই মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি নাযিল করেছেন[১] যেন তারা তাদের ঈমানের সাথে ঈমান বৃদ্ধি করে নেয়[২]। আর

করা হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও অপর কয়েকজন সাহাবী বলেন: তোমরা মক্কা বিজয়কে বিজয় বলে থাক; কিন্তু আমরা হুদাইবিয়ার সন্ধিকেই বিজয় মনে করি। জাবের রাদিয়ালাহু আনহু বলেন: আমি হুদাইবিয়ার সন্ধিকে বিজয় মনে করি। বারা ইবনে আযেব বলেন: তোমরা মক্কা বিজয়কেই বিজয় মনে কর এবং নি:সন্দেহ তা বিজয়; কিন্তু আমরা হুদাইবিয়ার ঘটনার বাইয়াতে রিদওয়ানকেই আসল বিজয় মনে করি। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি বৃক্ষের নীচে উপস্থিত চৌদ্দশত সাহাবীর কাছ থেকে জেহাদের শপথ নিয়েছিল। [বুখারী: ৪২৮, মুসলিম: ৭৯৪]

(১) سَكِينَةٌ আরবী ভাষায় স্থিরতা, প্রশান্তি ও দৃঢ় চিত্ততাকে বুঝায়। হুদাইবিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- 'কুরা গামীম' নামক স্থানে পৌঁছেন, তখন আলোচ্য 'সূরা ফাতহ' অবতীর্ণ হয়। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে সূরাটি পাঠ করে শুনালেন। তাদের অন্তর পূর্বেই আহত ছিল। এমতাবস্থায় সূরায় একে প্রকাশ্য বিজয় আখ্যা দেয়ায় উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আবার প্রশ্ন করে বসলেনঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ। এটা কি বিজয়? তিনি বললেনঃ যার হাতে আমার প্রাণ সে সত্তার কসম, এটা প্রকাশ্য বিজয়। [মুসনাদে আহমাদ:৩/৪২০, আবু দাউদ:২৭৩৬, ৩০১৫]

(২) তাদের যে ঈমান এ অভিযানের পূর্বে ছিল, তার সাথে আরো ঈমান তারা অর্জন করলো এ কারণে যে, এ অভিযান চলাকালে একের পর এক যত পরীক্ষা এসেছে তার প্রত্যেকটিতে তারা নিষ্ঠা, তাকওয়া ও আনুগত্যের নীতির ওপর দৃঢ়পদ থেকেছে। এ আয়াত ও অনুরূপ আরো কিছু আয়াত ও হাদীস থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি আছে। আর এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা। [আদওয়াউল-বায়ান] ইমাম বুখারী তার গ্রন্থে এ আয়াত থেকে ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধির উপর দলীল গ্রহণ করেছেন।

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝

আসমানসমূহ ও যমীনের বাহিনীসমূহ আল্লাহ্‌রই এবং আল্লাহ্ হলেন সর্বজ্ঞ, হিকমতওয়ালা।

لِّيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ ۚ وَكَانَ ذٰلِكَ عِنْدَ اللّٰهِ فَوْزًا عَظِيْمًا ۝

৫. যাতে তিনি মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে প্রবেশ করান জান্নাতে, যার নিচ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত, যেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং তিনি তাদের পাপসমূহ মোচন করবেন; আর এটাই হলো আল্লাহ্‌র নিকট মহাসাফল্য।

وَّيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكٰتِ الظَّآنِّيْنَ بِاللّٰهِ ظَنَّ السَّوْءِ ۚ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ ۚ وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ ۚ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ۝

৬. আর যাতে তিনি মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী, মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারী যারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মন্দ ধারণা পোষণ করে তাদেরকে শাস্তি দেন। অমঙ্গল চক্র তাদের উপরই[১] আপতিত হয়। আর আল্লাহ্ তাদের প্রতি রুষ্ট হয়েছেন এবং তাদেরকে লা'নত করেছেন; আর তাদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত রেখেছেন। আর সেটা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল!

وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۝

৭. আর আসমানসমূহ ও যমীনের বাহিনীসমূহ আল্লাহ্‌রই এবং আল্লাহ্ হচ্ছেন পরাক্রমশালী, হিকমতওয়ালা।

---

(১) এ যাত্রায় মদীনার আশপাশের মুনাফিকদের ধারণা ছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার সাথীগণ এ সফর থেকে জীবিত ফিরে আসতে পারবেন না। তাছাড়া মক্কার মুশরিক এবং তাদের সহযোগী কাফেররা মনে করেছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার সংগীগণকে উমরা আদায় করা থেকে বিরত রেখে তারা তাকে পরাজিত ও অপমানিত করতে সক্ষম হয়েছে। [দেখুন- কুরতুবী]

৮. নিশ্চয় আমরা আপনাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে[১],

إِنَّآ أَرْسَلْنَٰكَ شَٰهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝

৯. যাতে তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন এবং তাঁর শক্তি যোগাও ও তাঁকে সম্মান কর; আর সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর[২] ।

لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝

১০. নিশ্চয় যারা আপনার কাছে বাই'আত করে[৩] তারা তো আল্লাহ্‌রই হাতে

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ

---

(১) আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সম্বোধন করে তাঁর তিনটি গুণ উল্লেখ করা হয়েছে, প্রথমে বলা হয়েছে যে, 'আমরা আপনাকে شاهد হিসেবে প্রেরণ করেছি। شاهد শব্দের অর্থ সাক্ষী। এর উদ্দেশ্য প্রত্যেক নবী তার উম্মত সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবেন যে, তিনি আল্লাহর পয়গাম তাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। এরপর কেউ আনুগত্য করেছে এবং কেউ নাফরমানি করেছে। এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তার উম্মতের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবেন। দ্বিতীয় যে গুণটি উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো, مُبَشِّرٌ শব্দটির অর্থ সুসংবাদদাতা আর তৃতীয় গুণটি বলা হয়েছে نذير বা সতর্ককারী। উদ্দেশ্য এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতের আনুগত্যশীল মুমিনদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিবেন এবং কাফের পাপাচারীদেরকে আযাবের ব্যাপারে সতর্ক করবেন। [কুরতুবী, আয়সারুত-তাফাসির]

(২) এ আয়াতে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনয়নের পরে আরো তিনটি কাজ করার জন্য মুমিনদেরকে আদেশ করা হয়েছে। তবে এগুলোতে যে সর্বনাম ব্যবহৃত হয়েছে তার দ্বারা কাকে বোঝানো হয়েছে এ নিয়ে দু'টি মত রয়েছে। এক. এখানে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলাকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য হচ্ছে, তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনবে এবং আল্লাহকে সাহায্য-সহযোগিতা করবে তথা তাঁর দ্বীনকে সহযোগিতা করবে, তাঁকে সম্মান করবে, সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর তাসবীহ পাঠ করবে। দুই. কেউ কেউ প্রথমোক্ত দুই বাক্যের সর্বনাম দ্বারা রাসূলকে বুঝিয়ে এরূপ অর্থ করেন যে, রাসূলকে সাহায্য কর, তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর এবং আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা কর। [কুরতুবী]

(৩) পবিত্র মক্কা নগরীতে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর শহীদ হয়ে যাওয়ার খবর শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরাম থেকে হুদাইবিয়া নামক

فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ ۚ فَمَنْ نَّكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ اَوْفٰى بِمَا عٰهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝

বাই'আত করে । আল্লাহ্‌র হাত[১] তাদের হাতের উপর[২] । তারপর যে তা ভঙ্গ করে, তা ভঙ্গ করার পরিণাম বর্তাবে তারই উপর এবং যে আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে, তবে তিনি অবশ্যই তাকে মহাপুরস্কার দেন ।

দ্বিতীয় রুকূ'

سَيَقُوْلُ لَكَ الْمُخَلَّفُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ شَغَلَتْنَآ

১১. যে সকল মরুবাসী পিছনে রয়ে গেছে[৩]

স্থানে গাছের নীচে যে বাইয়াত নিয়েছিলেন সেই বাইয়াতের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে । [দেখুন- ফাতহুল কাদীর]

(১) আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা-বিশ্বাস হচ্ছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার হাত রয়েছে । যেভাবে তাঁর হাত থাকা উপযোগী ঠিক সেভাবেই তাঁর হাত রয়েছে । এ হাতকে কোন প্রকার অপব্যাখা করা অবৈধ । তবে এটা স্মরণ রাখতে হবে যে, তাঁর হাত কোন সৃষ্টির হাতের মত নয় । তিনি যেমন তাঁর হাতও সে রকম । প্রত্যেক সত্ত্বা অনুসারে তার গুণাগুণ নির্ধারিত হয়ে থাকে । সুতরাং আমরা বিশ্বাস করব যে, আল্লাহ্ তা'আলার হাত রয়েছে । তবে তাঁর হাত আমাদের পরিচিত কারও হাতের মত নয় ।

(২) আল্লাহ বলেন, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাতে বাই'আত করেছে, তারা যেন স্বয়ং আল্লাহর হাতে বাই'আত করেছে । কারণ, এই বাই'আতের উদ্দেশ্য আল্লাহর আদেশ পালন করা ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন । রাসূলের আনুগত্য যেমন আল্লাহ্‌র আনুগত্যেরই নামান্তর, তেমনিভাবে রাসূলের হাতে বাই'আত হওয়া আল্লাহ্‌র হাতে বাই'আত হওয়ারই নামান্তর । কাজেই তারা যখন রাসূলের হাতে হাত রেখে বাই'আত করল, তখন যেন আল্লাহর হাতেই বাই'আত করল । মহান আল্লাহ্ এ কথা বলে সাহাবীদের সম্মানিত করেছেন । আল্লাহ্ তাদের কথা শুনছিলেন, তাদের অবস্থান অবলোকন করছিলেন, তাদের বাহ্যিক অবস্থা ও মনের অবস্থা জেনে নিয়েছিলেন । সে সময় লোকেরা যে হাতে বাইয়াত করছিলো তা আল্লাহর প্রতিনিধি রাসূলের হাত ছিল এবং রাসূলের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর সাথে এ বাইয়াত অনুষ্ঠিত হচ্ছিলো । [ইবন কাসীর, কুরতুবী]

(৩) এটা মদীনার আশেপাশের সেসব লোকদের কথা যাদেরকে উমরা যাত্রার প্রস্তুতিকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাথে রওয়ানা হবার আহবান জানিয়েছিলেন । কিন্তু তারা নানা টাল-বাহানার আশ্রয় নেয় । ঈমানের দাবীদার হওয়া সত্বেও তারা বাড়ী ছেড়ে শুধু এ কারণে বের হয় নি যে, নিজেদের প্রাণ ছিল তাদের কাছে অত্যন্ত প্রিয় । এ আয়াতে তাদেরকে সাবধান করা হচ্ছে । [ইবন কাসীর,কুরতুবী]

أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا ۚ يَقُولُونَ
بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۚ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ
لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ
نَفْعًا ۚ بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١١﴾

তারা তো আপনাকে বলবে, ‘আমাদের ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজন আমাদেরকে ব্যস্ত রেখেছে, অতএব আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন ।তারা মুখে তা বলে যা তাদের অন্তরে নেই । তাদেরকে বলুন, ‘আল্লাহ্ তোমাদের কারো কোন ক্ষতি কিংবা মঙ্গল সাধনের ইচ্ছে করলে কে আল্লাহ্‌র মোকাবিলায় তোমাদের জন্য কোন কিছুর মালিক হবে? বস্তুত তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ্ সম্যক অবহিত ।’

بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ
أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَٰلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ
السَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا ﴿١٢﴾

১২. বরং তোমরা ধারণা করেছিলে যে, রাসূল ও মুমিনগণ তাদের পরিবার পরিজনের কাছে কখনই ফিরে আসবে না এবং এ ধারণা তোমাদের অন্তরে প্রীতিকর মনে হয়েছিল; আর তোমরা খুব মন্দ ধারণা করেছিলে এবং তোমরা ছিলে ধ্বংসমুখী এক সম্প্রদায়[১]!

وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا
لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ﴿١٣﴾

১৩. আর যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে না তবে নিশ্চয় আমি কাফিরদের জন্য জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত রেখেছি ।

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ
وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٤﴾

১৪. আসমানসমূহ ও যমীনের সর্বময় কর্তৃত্ব আল্লাহ্‌রই, তিনি যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছে শাস্তি দেন । আর আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ।

---

(১) অর্থাৎ তোমরা এ ধরনের খারাপ ধারণার কারণে আল্লাহ্‌র কাছে ধ্বংসের উপযুক্ত সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছিলে । [জালালাইন] সুতরাং তোমাদের মধ্যে কোন কল্যাণ নেই । [মুয়াসসার]

سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ
لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ ۖ يُرِيدُونَ أَنْ
يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ ۚ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا
كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ ۖ فَسَيَقُولُونَ
بَلْ تَحْسُدُونَنَا ۚ بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ
إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٥﴾

১৫. তোমরা যখন যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সংগ্রহের জন্য যাবে তখন যারা পিছনে রয়ে গিয়েছিল, তারা অবশ্যই বলবে, 'আমাদেরকে তোমাদের অনুসরণ করতে দাও।' তারা আল্লাহ্‌র বাণী পরিবর্তন করতে চায়। বলুন, 'তোমরা কিছুতেই আমাদের অনুসরণ করবে না। আল্লাহ্‌ আগেই এরূপ ঘোষণা করেছেন।' তারা অবশ্যই বলবে, 'তোমরা তো আমাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করছ।' বরং তারা তো বোঝে কেবল সামান্যই।

قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ
أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ۖ فَإِنْ
تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا ۖ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا
تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦﴾

১৬. যেসব মরুবাসী পিছনে রয়ে গিয়েছিল তাদেরকে বলুন, 'অবশ্যই তোমরা আহূত হবে এক কঠোর যোদ্ধা জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে; তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে অথবা তারা আত্মসমর্পণ করে। অতঃপর তোমরা এ নির্দেশ পালন করলে আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে উত্তম পুরস্কার দান করবেন। আর তোমরা যদি আগের মত পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর, তবে তিনি তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন।

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا
عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ۗ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ
عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٧﴾

১৭. অন্ধের কোন অপরাধ নেই, খঞ্জের কোন অপরাধ নেই এবং পীড়িতেরও কোন অপরাধ নেই; এবং যে কেউ আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, তিনি তাকে প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতে, যার নিচে নহরসমূহ

প্রবাহিত; কিন্তু যে ব্যক্তি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে তিনি তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন।

তৃতীয় রুকূ'

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا ﴿۱۸﴾

১৮. অবশ্যই আল্লাহ্ মুমিনগণের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা গাছের নীচে আপনার কাছে বাই'আত গ্রহণ করেছিল[১], অতঃপর তাদের অন্তরে যা ছিল তা তিনি জেনে নিয়েছেন; ফলে তিনি তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয়ে পুরস্কৃত করলেন[২];

وَّمَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَّاْخُذُوْنَهَا وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿۱۹﴾

১৯. আর বিপুল পরিমান গণীমতে[৩], যা তারা হস্তগত করবে; এবং আল্লাহ্ প্রবল পরাক্রমশালী, হিকমতওয়ালা।

وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَاْخُذُوْنَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهٖ وَكَفَّ اَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُوْنَ اٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴿۲۰﴾

২০. আল্লাহ্ তোমাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যুদ্ধে লভ্য বিপুল সম্পদের, যার অধিকারী হবে তোমরা[৪]। অতঃপর তিনি এটা তোমাদের জন্য ত্বরান্বিত

(১) হুদাইবিয়া নামক স্থানে সাহাবায়ে কিরামের কাছে যে বাই'আত নেওয়া হয়েছিল এখানে তা উল্লেখ করা হচ্ছে। এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এই শপথে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি স্বীয় সন্তুষ্টি ঘোষণা করেছেন। এ কারণেই একে "বাই'আতে-রিদওয়ান" তথা সন্তুষ্টির শপথও বলা হয়। [দেখুন-সা'দী] জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হুদাইবিয়ার দিনে আমাদের সংখ্যা ছিল চৌদ্দশত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন 'তোমরা ভূ পৃষ্ঠের অধিবাসীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।' [বুখারী: ৩৮৩৯, মুসলিম: ৩৪৫৩] অন্য হাদীসে এসেছে, যারা এই বৃক্ষের নীচে শপথ করেছে, তাদের কেউ জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। [মুসলিম: ৪০৩৪]

(২) এই আসন্ন বিজয়ের অর্থ সর্বসম্মতভাবে খাইবর বিজয়। [কুরতুবী,সা'দী,বাগভী]

(৩) এতে খাইবরের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বোঝানো হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর,কুরতুবী]

(৪) এখানে কেয়ামত পর্যন্ত যেসব ইসলামী বিজয় ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ অর্জিত হবে, সেগুলো বোঝানো হয়েছে।[বাগভী,ফাতহুল কাদীর]

করেছেন। আর তিনি তোমাদের থেকে মানুষের হাত নিবারিত করেছেন[১] যেন এটা হয় মুমিনদের জন্য এক নিদর্শন। আর তিনি তোমাদেরকে পরিচালিত করেন সরল পথে;

وَّأُخْرٰى لَمْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا ﴿٢١﴾

২১. আর আরেকটি, এখনো যা তোমাদের অধিকারে আসেনি, তা তো আল্লাহ্ বেষ্টন করে রেখেছেন[২]। আর আল্লাহ্ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

وَلَوْ قٰتَلَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿٢٢﴾

২২. আর যারা কুফরী করেছে তারা যদি তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে তবে তারা অবশ্যই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, তারপর তারা কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না।

سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِيْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ ۖ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ﴿٢٣﴾

২৩. এটাই আল্লাহ্‌র বিধান---পূর্ব থেকেই যা চলে আসছে, আপনি আল্লাহ্‌র বিধানে কোন পরিবর্তন পাবেন না।

وَهُوَ الَّذِيْ كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ﴿٢٤﴾

২৪. আর তিনি মক্কা উপত্যকায় তাদের হাত তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাত তাদের থেকে নিবারিত করেছেন তাদের উপর তোমাদেরকে বিজয়ী

(১) আয়াতে খাইবরবাসী কাফের সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এই জিহাদে অধিক শক্তি প্রদর্শনের সুযোগ দেননি। এমনকি গাতফান গোত্র খাইবরের ইহুদিদের মিত্র ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক খাইবর আক্রমণের সংবাদ পেয়ে তারা ইহুদিদের সাহায্যার্থে অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে রওয়ানা হলো। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দিলেন। [দেখুন- আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

(২) অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে আরও অনেক বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যা এখনও তাদের ক্ষমতাসীন নয়। এসব বিজয়ের মধ্যে সর্বপ্রথম মক্কা বিজয় রয়েছে দেখে কোনো কোনো তফসিরবিদ আয়াতে মক্কা বিজয়কেই বোঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু ভাষা ব্যাপক হেতু কেয়ামত পর্যন্ত আগত সব বিজয়ই এর অন্তর্ভুক্ত। [বাগভী]

করার পর[১], আর তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা।

২৫. তারাই তো কুফরী করেছিল এবং বাধা দিয়েছিল তোমাদেরকে মসজিদুল-হারাম হতে ও বাধা দিয়েছিল কুরবানীর জন্য আবদ্ধ পশুগুলোকে যথাস্থানে পৌঁছতে[২]। আর যদি মুমিন পুরুষরা ও মুমিন নারীরা না থাকত, যাদের সম্পর্কে তোমরা জান না যে, তোমরা অজ্ঞাতসারে তাদেরকে পদদলিত করবে, ফলে তাদের কারণে তোমরা অপরাধী ও দোষী সাব্যস্ত হতে, (তবে অবশ্যই তিনি যুদ্ধের অনুমতি দিতেন। কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদেরকে তখন এর অনুমতি দেন নি)[৩] যাতে

هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوْفًا اَنْ يَّبْلُغَ مَحِلَّهٗ ۚ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُوْنَ وَنِسَآءٌ مُّؤْمِنٰتٌ لَّمْ تَعْلَمُوْهُمْ اَنْ تَطَـُٔوْهُمْ فَتُصِيْبَكُمْ مِّنْهُمْ مَّعَرَّةٌۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ لِيُدْخِلَ اللّٰهُ فِيْ رَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۚ لَوْ تَزَيَّلُوْا لَعَذَّبْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿٢٥﴾

(১) হাদীসে এসেছে, একবার মক্কার আশি জন কাফের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে অতর্কিতে হত্যা করার ইচ্ছা নিয়ে তান'য়ীম পাহাড় থেকে নীচে অবতরন করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে জীবিত গ্রেফতার করেন এবং মুক্তিপণ ব্যতিরেকেই মুক্ত করে দেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সুরা ফাতহের এ আয়াত অবতীর্ণ হয়ঃ ﴿وَهُوَ الَّذِيْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ﴾ [মুসলিম: ১৮০৮]

(২) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হুদাইবিয়ার কাছাকাছি ছিলেন, কুরাইশরা কিনানাহ গোত্রের এক লোককে রাসূলের সাথে কথা বলার জন্য পাঠাল। সে এবং তার সাথীরা যখন রাসূলের কাছাকাছি আসল, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এ হচ্ছে অমুক। সে এমন এক সম্প্রদায়ের লোক যারা হাদঈ এর পশুর সম্মান করে। সুতরাং তোমরা সেগুলোকে একত্রিত করে তার সামনে পাঠাও। সাহাবায়ে কিরাম তাই করলেন আর তারা তালবিয়াহ পাঠ করতে করতে তার সামনে আসলেন। সে যখন এ অবস্থা দেখল বলল, সুবহানাল্লাহ! এদেরকে আল্লাহ্‌র ঘর থেকে বাধা দেয়া ঠিক হবে না। তারপর সে ফিরে গিয়ে বলল: আমি তো হাদঈর উটকে কালাদা (পশুর গলায় পশম বা চুলের মালা) পরানো ও চিহ্নিত অবস্থায় দেখেছি। আমি চাইনা তাদেরকে আল্লাহ্‌র ঘর থেকে বাধা দেয়া হোক'। [বুখারী : ২৭৩২]

(৩) উপরোক্ত অংশটুকু উহ্য রয়েছে। [জালালাইন]

তিনি যাকে ইচ্ছে নিজ অনুগ্রহে প্রবেশ করাবেন(১)। যদি তারা(২) পৃথক হয়ে থাকত, তবে অবশ্যই আমরা তাদের মধ্যে কাফিরদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিতাম(৩)।

২৬. যখন কাফিররা তাদের অন্তরে পোষণ করেছিল গোত্রীয় অহমিকা---অজ্ঞতার যুগের অহমিকা(৪), তখন আল্লাহ্‌ তাঁর

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ

(১) অর্থাৎ যুদ্ধ করার অনুমতি না দেয়ার পিছনে দু'টি উদ্দেশ্য কাজ করেছে। এক. দুনিয়াবী উদ্দেশ্য, তা হচ্ছে, মক্কায় যারা এখনও ঈমানদার রয়ে গেছে, কিন্তু তাদের সম্পর্কে কেউ জানে না, তারা যেন তোমাদের হাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, আর তোমরাই তোমাদের দ্বীনী ভাইদের হত্যার কারণে মনঃকষ্টে না থাক। অপমান বোধ না কর। দুই. আরেকটি উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহ্‌ চাচ্ছেন তাদের মধ্যে কেউ কেউ ঈমান এনে তাঁর রহমতে শামিল হয়ে যাবে। [সা'দী]

(২) অর্থাৎ যাদের ঈমান সম্পর্কে তোমাদের জানা নেই, এমন মুমিন নারী ও পুরুষরা যদি আলাদা আলাদা থাকত। আর যুদ্ধের সময় তাদেরকে রক্ষা করা সম্ভব হতো, তবে অবশ্যই তিনি তাদেরকে শাস্তি দিতেন। [সা'দী; মুয়াসসার]

(৩) تزيل শব্দের আসল অর্থ বিচ্ছিন্ন হওয়া। [ফাতহুল কাদীর]

(৪) জাহেলী অহমিকা বা সংকীর্ণতার অর্থ হলো, এক ব্যক্তির শুধু তার মর্যাদা রক্ষার জন্য কিংবা নিজের কথার মর্যাদা রক্ষার জন্য জেনে শুনে কোন অবৈধ কাজ করা। মক্কার কাফেররা জানতো এবং মানতো যে, হজ ও উমরার জন্য বায়তুল্লাহর যিয়ারত করার অধিকার সবারই আছে। এ দ্বীনী কর্তব্য পালনে বাধা দেয়ার অধিকার কারো নেই। এটা ছিল আরবের সুপ্রাচীন ও সর্বজন স্বীকৃত আইন। কিন্তু তারা নিজেরা নিজেদেরকে অন্যায় ও অসত্যের অনুসারী এবং মুসলিমদেরকে সম্পূর্ণ ন্যায় ও সত্যের অনুসারী বলে জানা সত্বেও শুধু নিজেদের মর্যাদা রক্ষার খাতিরে মুসলিমদের উমরা করতে বাধা দান করে। এমনকি মুশরিকদের মধ্যেও যারা সত্যানুসারী ছিল তারাও বলছিলো যে, যারা ইহ্‌রাম অবস্থায় কুরবানীর উট সাথে নিয়ে উমরা পালন করতে এসেছে তাদেরকে বাধা দেয়া একটি অন্যায় কাজ। কিন্তু কুরাইশ নেতারা শুধু একথা ভেবে বাধা দিতে বদ্ধপরিকর ছিল যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি এত বড় দলবল নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন তাহলে সমগ্র আরবে আমাদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হবে। তাছাড়া তারা তাকে আল্লাহ্‌র নবী বলে মেনে নিতে কুণ্ঠিত হচ্ছিল। বিসমিল্লাহ লিখতে নিষেধ করেছিল। এ সবই ছিল তাদের জাহেলী সংকীর্ণতা। [দেখুন, বুখারীঃ ২৭৩১,২৭৩২]

رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى وَكَانُوْٓا اَحَقَّ بِهَا وَاَهْلَهَا ۚ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ﴿٢٦﴾

রাসূল ও মুমিনদের উপর স্বীয় প্রশান্তি নাযিল করলেন; আর তাদেরকে তাকওয়ার কালেমায়(১) সুদৃঢ় করলেন, আর তারাই ছিল এর অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত। আর আল্লাহ্ সবকিছু সম্পর্কে সর্বজ্ঞ।

চতুর্থ রুকূ'

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ ۚ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ ۙ مُحَلِّقِيْنَ

২৭. অবশ্যই আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে স্বপ্নটি যথাযথভাবে সত্যে পরিণত করে দিয়েছেন(২), আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তোমরা

(১) "কালেমায়ে-তাকওয়া" বলে তাকওয়া অবলম্বনকারী কলেমা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তাওহীদ ও রেসালতের কলেমা। এই কলেমাই তাকওয়ার ভিত্তি। তাই একে কলেমায়ে-তাকওয়া বলা হয়েছে। কালেমায়ে তাকওয়া বলে কি বোঝানো হয়েছে এ ব্যাপারে মতভেদ থাকলেও অধিকাংশ তাফসীরবিদদের মতে এর দ্বারা কালেমায়ে তাওহীদ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বোঝানো হয়েছে। [দেখুন, মুসনাদ:১/৩৫৩]

(২) হুদাইবিয়ার সন্ধি চূড়ান্ত হয়ে গেলে একথা স্থির হয়ে যায় যে, এখন মক্কায় প্রবেশ এবং উমরাহ পালন ব্যতিরেকেই মদিনায় ফিরে যেতে হবে। বলাবাহুল্য, সাহাবায়ে কেরাম উমরাহ পালনের সংকল্প রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর একটি স্বপ্নের ভিত্তিতে করেছিলেন, যা এক প্রকার ওহি ছিল। এখন বাহ্যতঃ এর বিপরীত হতে দেখে কারও কারও অন্তরে এই সন্দেহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে লাগল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর স্বপ্ন সত্য হলো না। অপরদিকে কাফের-মুনাফিকরা মুসলিমদেরকে বিদ্রূপ করল যে, তোমাদের রাসূলের স্বপ্ন সত্য নয়। তখন এই আয়াত নাযিল করে তাদের প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়। আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ তাঁর রাসূলকে স্বপ্নের ব্যাপারে সাচ্চা দেখিয়েছেন। যদিও এই সাচ্চা দেখানোর ঘটনা ভবিষ্যতে সংঘটিত হওয়ার ছিল; কিন্তু একে অতীত পদবাচ্য ব্যক্ত করে এর নিশ্চিত ও অকাট্য হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ মসজিদে-হারামে প্রবেশ সংক্রান্ত আপনার স্বপ্ন অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে; কিন্তু এ বছর নয়– এ বছরের পরে। স্বপ্নে মসজিদে হারামে প্রবেশের সময় নির্দিষ্ট ছিল না। পরম ঔৎসুক্যবশতঃ সাহাবায়ে কেরাম এ বছরই সফরের সংকল্প করে ফেললেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ও তাদের সাথে যোগ দিলেন। এতে আল্লাহ তা'আলার বিরাট রহস্য নিহিত ছিল, যা হুদাইবিয়ার সন্ধির মাধ্যমে বিকাশ লাভ করে। সেমতে সিদ্দিকে আকবর রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রথমেই উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর জওয়াবে বলেছিলেনঃ আপনার সন্দেহ করা উচিত নয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿٢٧﴾

অবশ্যই মসজিদুল-হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে--- মাথা মুণ্ডন করে এবং চুল ছেঁটে, নির্ভয়ে। অতঃপর তিনি (আল্লাহ্‌) জেনেছেন যা তোমরা জান নি। সুতরাং এ ছাড়াও তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন এক সদ্য বিজয়।

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿٢٨﴾

২৮. তিনিই তাঁর রাসূলকে পথনির্দেশ ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন, অন্য সমস্ত দ্বীনের উপর একে জয়যুক্ত করার জন্য। আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ۖ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۗ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾

২৯. মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাসূল; আর তার সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, তাদের পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল; আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকূ ও সিজ্‌দায় অবনত দেখবেন। তাদের লক্ষণ তাদের মুখমণ্ডলে সিজ্‌দার প্রভাবে পরিস্ফুট; এটাই তাওরাতে তাদের দৃষ্টান্ত। আর ইঞ্জীলে তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে এমন একটি চারাগাছ, যা থেকে নির্গত হয় কচিপাতা, তারপর তা শক্ত ও পুষ্ট হয় এবং পরে কাণ্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে যা চাষীর জন্য আনন্দদায়ক। এভাবে আল্লাহ্‌ মুমিনদের সমৃদ্ধি দ্বারা কাফিরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন। যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে আল্লাহ্‌

সাল্লাম-এর স্বপ্ন কোনো সময় ও বছর নির্দিষ্ট ছিল না। এখন না হলে পরে হবে। [বুখারী: ২৫২৯]

তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ক্ষমা ও মহাপ্রতিদানের[১]।

---

(১) منهم অব্যয়টি এখানে সবার মতে বর্ণনামূলক। অর্থ এই যে, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের ওয়াদা দিয়েছেন। এ থেকে প্রথমতঃ জানা গেল যে, সব সাহাবায়ে কেরামই ঈমান এনেছেন সৎকর্ম করতেন। দ্বিতীয়তঃ তাদের সবাইকে ক্ষমা ও মহাপুরষ্কারের ওয়াদা দেয়া হয়েছে। তিনি তাদের উপর সন্তুষ্টি হয়েই এ ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির এই ঘোষণা নিশ্চয়তা দেয় যে, তারা সবাই মৃত্যু পর্যন্ত ঈমান ও সৎকর্মের উপর কায়েম থাকবেন। কারণ, আল্লাহ আলীম ও খবীর তথা সর্বজ্ঞ। যদি কারও সম্পর্কে তার জানা থাকে যে, সে ঈমান থেকে কোনো না কোনো সময় মুখ ফিরিয়ে নেবে, তবে তার প্রতি আল্লাহ স্বীয় সন্তুষ্টি ঘোষণা করতে পারেন না। ইবন আবদুল বার রাহেমাহুল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ যার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান, তার প্রতি এরপর কখনও অসন্তুষ্ট হন না।' এই আয়াতের ভিত্তিতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, বাই'আতে-রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কেউ জাহান্নামে যাবে না। [আবু দাউদ:৪০৩৪] [আরো দেখুন- ইবন কাসীর]

৪৯- সূরা আল-হুজুরাত
১৮ আয়াত, মাদানী

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ①

১. হে ঈমানদারগণ[১]! আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সমক্ষে তোমরা কোন বিষয়ে অগ্রণী হয়ো না আর তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর; নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ ।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْۤا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ

২. হে ঈমানদারগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না[২] এবং নিজেদের মধ্যে

---

(১) আলোচ্য আয়াতসমূহ নাযিল হওয়ার ঘটনা এই যে, একবার বনী তামীম গোত্রের কিছু লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খেদমতে উপস্থিত হয়। এই গোত্রের শাসনকর্তা কাকে নিযুক্ত করা হবে তখন এ বিষয়েই আলোচনা চলছিল। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু কা'কা' ইবন মা'বাদ ইবন্ যুরারাহ্‌র নাম প্রস্তাব করলেন এবং উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আকরা' ইবন হাবিসের নাম প্রস্তাব করলেন এবং আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মধ্যে মজলিসেই কথাবার্তা হলো এবং ব্যাপারটি শেষ পর্যন্ত কথা কাটাকাটিতে উন্নীত হয়ে উভয়ের কণ্ঠস্বর উঁচু হয়ে গেল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ নাযিল হয়। [বুখারী: ৪৮৪৭]

(২) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মজলিসের এটা দ্বিতীয় আদব। যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসে ওঠাবসা ও যাতায়াত করতেন তাদেরকে এ আদব-কায়দা ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া হয়েছিলো। এর উদ্দেশ্য ছিল নবীর সাথে দেখা-সাক্ষাত ও কথাবার্তার সময় যেন ঈমানদাররা তার সম্মান ও মর্যাদার প্রতি একান্তভাবে লক্ষ্য রাখেন। কারো কণ্ঠ যেন তার কণ্ঠ থেকে উচ্চ না হয়। তাকে সম্বোধন করতে গিয়ে কেউ যেন একথা ভুলে না যায় যে, সে কোন কথা বলছে। তাই সাধারণ মানুষের সাথে কথাবার্তা এবং আল্লাহর রাসূলের সাথে কথাবার্তার মধ্যে পার্থক্য থাকতে হবে এবং কেউ তার সাথে উচ্চস্বরে কথাবার্তা বলবে না যেমন পরস্পর বিনা দ্বিধায় করা হয়; কারণ তা এক প্রকার বে-আদবি ও ধৃষ্টতা। সেমতে এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা পাল্টে যায়। তারা এরপর থেকে খুব আস্তে কথা বলতেন। সাবেত ইবনে কায়সের কণ্ঠস্বর স্বভাবগতভাবেই উঁচু ছিল। এই আয়াত শুনে তিনি ভয়ে সংযত হলেন এবং কণ্ঠস্বর নীচু করলেন। [দেখুন, বুখারী:৪৮৪৬, মুসনাদে আহমাদ: ৩/১৩৭] অনুরূপভাবে রাসূলের কোনো

لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ②

যেভাবে উচ্চস্বরে কথা বল তার সাথে সেরূপ উচ্চস্বরে কথা বলো না; এ আশঙ্কায় যে, তোমাদের সকল কাজ বিনষ্ট হয়ে যাবে অথচ তোমরা উপলব্ধিও করতে পারবে না ।

إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ③

৩. নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌র রাসূলের সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর নীচু করে, আল্লাহ্ তাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য পরীক্ষা করে নিয়েছেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার ।

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ④

৪. নিশ্চয় যারা হুজরাসমূহের পিছন থেকে আপনাকে উচ্চস্বরে ডাকে, তাদের অধিকাংশই বুঝে না ।

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ⑤

৫. আর আপনি বের হয়ে তাদের কাছে আসা পর্যন্ত যদি তারা ধৈর্য ধারণ করত, তবে তা-ই তাদের জন্য উত্তম হত[১] ।

সুন্নাত সম্পর্কে জানার পরে সেটা মানতে গড়িমসি বা সামান্যতম অনীহা প্রকাশ করাও বে-আদবি। এ আয়াতের নিষেধাজ্ঞার অধীন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হুজরা মোবারকের সামনেও বেশি উঁচুস্বরে সালাম ও কালাম করা নিষিদ্ধ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সম্মান ও আদব তার ওফাতের পরও জীবদ্দশার ন্যায় ওয়াজিব। তাই তার পবিত্র কবরের সামনেও বেশী উঁচুস্বরে সালাম ও কালাম করা আদবের খেলাফ। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু দুই ব্যক্তিকে মসজিদে নববীতে উচ্চস্বরে কথা বলতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কোথাকার লোক? তারা বলল: আমরা তায়েফের লোক। তিনি বললেন, যদি তোমরা মদীনাবাসী হতে তবে আমি তোমাদের বেত্রাঘাত করতাম। তোমরা রাসূলের মসজিদে উচ্চস্বরে কথা বলছ কেন? [বুখারী: ৪৭০]

(১) এই আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, বনি-তামিমের লোকগণ দুপুরের সময় মদীনায় উপস্থিত হয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো এক হুজরায় বিশ্রামরত ছিলেন। তারা ছিল বেদুঈন এবং সামাজিকতার রীতি-নীতি সম্পর্কে অজ্ঞ। কাজেই তারা হুজরার বাইরে থেকেই ডাকাডাকি শুরু করল, এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। [মুসনাদে আহমাদ:৩/৪৮৮] এতে এভাবে ডাকাডাকি করতে নিষেধ করা হয় এবং অপেক্ষা

আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৬. হে ঈমানদারগণ![১] যদি কোন ফাসিক

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا

করার আদেশ দেয়া হয়।
সাহাবী ও তাবেয়িগণ তাদের আলেম ও উস্তাদ-মাশায়েখের সাথেও এই আদব ব্যবহার করেছেন। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে– আমি যখন কোনো আলেম সাহাবীর কাছ থেকে কোনো হাদিস লাভ করতে চাইতাম, তখন তার গৃহে পৌঁছে ডাকাডাকি অথবা দরজার কড়া নাড়া থেকে বিরত থাকতাম এবং দরজার বাইরে বসে অপেক্ষা করতাম। তিনি যখন নিজেই বাইরে আগমন করতেন, তখন আমি তার কাছে হাদিস জিজ্ঞেস করতাম। তিনি আমাকে দেখে বলতেনঃ হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চাচাত ভাই। আপনি দরজার কড়া নেড়ে আমাকে সংবাদ দিলেন না কেন? ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তরে বলতেনঃ আলেম কোনো জাতির জন্যে নবী সদৃশ। আল্লাহ তা'আলা নবী সম্পর্কে আদেশ দিয়েছেন যে, তার বাইরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। [দারমী: ২/১২৩, ১২৭, মুস্তাদরাকে হাকিম: ৩৩৪, ৫৮১৩, ৬৩৫৫, ৮০৭৫]

(১) এ আয়াত নাযিল হওয়ার একটি কারণ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তা হলো, বনিল-মুস্তালিক গোত্রের সরদার, উম্মুল মুমিনিন জুয়াইরিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর পিতা হারেস ইবনে দ্বিরার বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খেদমতে উপস্থিত হলে তিনি আমাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং যাকাত প্রদানের আদেশ দিলেন। আমি ইসলামের দাওয়াত কবুল করতঃ যাকাত প্রদানে স্বীকৃত হলাম এবং বললামঃ এখন আমি স্বগোত্রে ফিরে গিয়ে তাদেরকেও ইসলাম ও যাকাত প্রদানের দাওয়াত দেব। যারা আমার কথা মানবে এবং যাকাত দেবে আমি তাদের যাকাত একত্রিত করে আমার কাছে জমা রাখব। আপনি অমুক মাসের অমুক তারিখ পর্যন্ত কোনো দূত আমার কাছে প্রেরণ করবেন, যাতে আমি যাকাতের জমা অর্থ তার হাতে সোপর্দ করতে পারি। এরপর হারেস যখন ওয়াদা অনুযায়ী যাকাতের অর্থ জমা করলেন এবং দূত আগমনের নির্ধারিত মাস ও তারিখ অতিক্রান্ত হওয়ার পরও কোনো দূত আগমন করল না, তখন হারেস আশঙ্কা করলেন যে, সম্ভবতঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো কারণে আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। নতুবা ওয়াদা অনুযায়ী দূত না পাঠানোর কোনো কারণ থাকতে পারে না। হারেস এই আশঙ্কার কথা ইসলাম গ্রহণকারী নেতৃস্থানীয় লোকদের কাছেও প্রকাশ করলেন এবং সবাই মিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খেদমতে উপস্থিত হওয়ার ইচ্ছা করলেন। এদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্ধারিত তারিখে ওলিদ ইবনে ওকবা রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে যাকাত গ্রহণের জন্য পাঠিয়ে দেন। কিন্তু পথিমধ্যে ওলিদ ইবনে ওকবা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মনে ধারণা জাগ্রত হয় যে, এই গোত্রের লোকদের সাথে তার পুরাতন শত্রুতা আছে। কোথাও

أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

তোমাদের কাছে কোন বার্তা নিয়ে আসে, তাহলে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখ, এ আশঙ্কায় যে, অজ্ঞতাবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়কে আক্রমণ করে বসবে, ফলে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য তোমাদেরকে অনুতপ্ত হতে হবে।

وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ ۚ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ﴿٧﴾

৭. আর তোমরা জেনে রাখ যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র রাসূল রয়েছেন; তিনি বহু বিষয়ে তোমাদের কথা শুনলে তোমরাই কষ্ট পেতে। কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদের কাছে ঈমানকে প্রিয়

তারা তাকে পেয়ে হত্যা না করে ফেলে। এই ভয়ের কথা চিন্তা করে তিনি সেখান থেকেই ফিরে আসেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- কে যেয়ে বলেন যে, তারা যাকাত দিতে অস্বীকার করেছে এবং আমাকে হত্যা করারও ইচ্ছা করেছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাগান্বিত হয়ে খালেদ ইবনে ওয়ালীদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নেতৃত্বে একদল মুজাহিদ প্রেরণ করলেন। এদিকে মুজাহিদ বাহিনী রওয়ানা হলো এবং ওদিকে হারেস জিজ্ঞাসা করলেনঃ আপনারা কোন গোত্রের প্রতি প্রেরিত হয়েছেন? উত্তর হলোঃ আমরা তোমাদের প্রতিই প্রেরিত হয়েছি। হারেস কারণ জিজ্ঞেস করলে তাকে ওলিদ ইবনে ওকবা রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে প্রেরণ ও তার প্রত্যাবর্তনের কাহিনী শুনানো হলো এবং ওলিদের এই বিবৃতিও শুনানো হলো যে, বনিল-মুস্তালিক গোত্র যাকাত দিতে অস্বীকার করে তাকে হত্যার পরিকল্পনা করেছে। এ কথা শুনে হারেস বললেনঃ সে আল্লাহর কসম, যিনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- কে রাসূল করে প্রেরণ করেছেন, আমি ওলিদ ইবনে ওকবাকে দেখিওনি। সে আমার কাছে যায়নি। অতঃপর হারেস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সামনে উপস্থিত হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি কি যাকাত দিতে অস্বীকার করেছ এবং আমার দূতকে হত্যা করতে চেয়েছ? হারেস বললেনঃ কখনই নয়; সে আল্লাহর কসম, যিনি আপনাকে সত্য পয়গামসহ প্রেরণ করেছেন, সে আমার কাছে যায়নি এবং আমি তাকে দেখিওনি। নির্ধারিত সময়ে আপনার দূত যায়নি দেখে আমার আশঙ্কা হয় যে, বোধ হয়, আপনি কোনো ত্রুটির কারণে আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তাই আমরা খেদমতে উপস্থিত হয়েছি। হারেস বলেন, এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সূরা হুজুরাতের আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। [মুসনাদে আহমাদঃ ৪/২৭৯, ৩/৪৮৮]

করেছেন এবং সেটাকে তোমাদের হৃদয়গ্রাহী করেছেন। আর কুফরী, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে করেছেন তোমাদের কাছে অপ্রিয়। তারাই তো সত্য পথপ্রাপ্ত।

فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَنِعْمَةً ۚ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٨﴾

৮. আল্লাহ্‌র দান ও অনুগ্রহস্বরূপ; আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, হিকমতওয়ালা।

وَاِنْ طَآئِفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا ۚ فَاِنْۢ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْٓءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ فَآءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ﴿٩﴾

৯. আর মুমিনদের দু'দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও; অতঃপর তাদের একদল অন্য দলের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করলে, যারা বাড়াবাড়ি করে তাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না তারা আল্লাহ্‌র নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। তারপর যদি তারা ফিরে আসে, তবে তাদের মধ্যে ইনসাফের সাথে আপোষ মীমাংসা করে দাও এবং ন্যায়বিচার কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ ন্যায়বিচারকদেরকে ভালবাসেন।

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ

১০. মুমিনগণ তো পরস্পর ভাই ভাই[১];

(১) এ আয়াতটি দুনিয়ার সমস্ত মুসলিমকে এক বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে। দুনিয়ার অন্য কোন আদর্শ বা মত ও পথের অনুসারীদের মধ্যে এমন কোন ভ্রাতৃত্ব বন্ধন পাওয়া যায় না যা মুসলিমদের মধ্যে পাওয়া যায়। এটাও এ আয়াতের বরকতে সাধিত হয়েছে। এ নির্দেশের দাবী ও গুরুত্বসমূহ কি, বহুসংখ্যক হাদীস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা বর্ণনা করেছেন। ঐ সব হাদীসের আলোকে এ আয়াতের আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বোধগম্য হতে পারে। জারীর ইবন আবদুল্লাহ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার থেকে তিনটি বিষয়ে "বাই'আত" নিয়েছেন। 'এক, সালাত কায়েম করবো। দুই, যাকাত আদায় করতে থাকবো। তিন, প্রত্যেক মুসলমানের কল্যাণ কামনা করবো।' [বুখারী: ৫৫] অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'মুসলিমকে গালি দেয়া ফাসেকী এবং তার সাথে লড়াই করা কুফরী।' [বুখারী:৬০৪৪, মুসলিম:৬৩] অপর

وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿١٠﴾

কাজেই তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে আপোষ মীমাংসা করে দাও। আর আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর, যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও।

দ্বিতীয় রুকূ'

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ؕ بِئْسَ الْاِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿١١﴾

১১. হে ঈমানদারগণ! কোন মুমিন সম্প্রদায় যেন অপর কোন মুমিন সম্প্রদায়কে উপহাস না করে; কেননা যাদেরকে উপহাস করা হচ্ছে তারা উপহাসকারীদের চেয়ে উত্তম হতে পারে এবং নারীরা যেন অন্য

হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপর মুসলমানের জান, মাল ও ইজ্জত হারাম।" [মুসলিম:২৫৬৪, কিতাবুল বিরর ওয়াসসিলাহ, তিরমিযী:১৯২৭] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেনঃ এক মুসলিম আরেক মুসলমানের ভাই। সে তার ওপরে জুলুম করে না, তাকে সহযোগিতা করা পরিত্যাগ করে না এবং তাকে লাঞ্ছিত ও হেয় করে না। কোন ব্যক্তির জন্য তার কোন মুসলিম ভাইকে হেয় ও ক্ষুদ্র জ্ঞান করার মত অপকর্ম আর নাই। [মুসনাদে আহমাদ: ১৬/২৯৭, ৭৭৫৬] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন, ঈমানদারদের সাথে একজন ঈমানদারের সম্পর্ক ঠিক তেমন যেমন দেহের সাথে মাথার সম্পর্ক। সে ঈমানদারদের প্রতিটি দুঃখ–কষ্ট ঠিক অনুভব করে যেমন মাথা দেহের প্রতিটি অংশের ব্যথা অনুভব করে। [মুসনাদে আহমাদ: ৫/৩৪০] অপর একটি হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, পারস্পরিক ভালবাসা, সুসম্পর্ক এবং একে অপরের দয়ামায়া ও স্নেহের ব্যাপারে মুমিনগণ একটি দেহের মত। দেহের যে অংগেই কষ্ট হোক না কেন তাতে গোটা দেহ জ্বর ও অনিদ্রায় ভুগতে থাকে। [বুখারীঃ৬০১১, মুসলিম:২৫৮৬] আরো একটি হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মুমিনগণ পরস্পরের জন্য একই প্রাচীরের ইটের মত একে অপরের থেকে শক্তিলাভ করে থাকে। [বুখারী: ২৬৪৬, মুসলিম:২৫৮৫] অন্য হাদীসে এসেছে, একজন মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই, সে তার উপর অত্যাচার করতে পারে না আবার তাকে ধ্বংসের মুখেও ঠেলে দিতে পারে না। [বুখারী:২৪৪২, মুসলিম:২৫৮০] অন্য হাদীসে এসেছে, আল্লাহ্ বান্দার সহযোগিতায় থাকেন যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সহযোগিতায় থাকে। [মুসলিম:২৬৯৯] হাদীসে আরো এসেছে, কোন মুসলিম যখন তার ভাইয়ের জন্য তার অনুপস্থিতিতে দো'আ করে তখন ফেরেশতা বলে, আমীন (কবুল কর) আর তোমার জন্যও তদ্রূপ হোক। [মুসলিম: ২৭৩২]

নারীদেরকে উপহাস না করে; কেননা যাদেরকে উপহাস করা হচ্ছে তারা উপহাসকারিণীদের চেয়ে উত্তম হতে পারে। আর তোমরা একে অন্যের প্রতি দোষারোপ করো না এবং তোমরা একে অন্যকে মন্দ নামে ডেকো না(১); ঈমানের পর মন্দ নাম অতি নিকৃষ্ট। আর যারা তওবা করে না তারাই তো যালিম।

১২. হে ঈমানদারগণ! তোমরা অধিকাংশ অনুমান হতে দূরে থাক; কারণ কোন কোন অনুমান পাপ এবং তোমরা একে অন্যের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না এবং একে অন্যের গীবত করো না(২)। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱجْتَنِبُوا۟ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا۟ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

(১) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদিনায় আগমন করেন, তখন সেখানকার অধিকাংশ লোকের দুই তিনটি করে নাম ছিল। তন্মধ্যে কোনো কোনো নাম সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে লজ্জা দেয়া ও লাঞ্ছিত করার জন্য লোকেরা খ্যাত করেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা জানতেন না। তাই মাঝে মাঝে সেই মন্দ নাম ধরে তিনিও সম্বোধন করতেন। তখন সাহাবায়ে কেরাম বলতেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ সে এই নাম শুনলে অসন্তুষ্ট হয়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। [আবু দাউদ:৪৯৬২, মুসনাদে আহমাদ:৫/৩৮০]

(২) এই আয়াতে পারস্পরিক হক ও সামাজিক রীতি-নীতি ব্যক্ত হয়েছে এবং এতে তিনটি বিষয় হারাম করা হয়েছে। (এক) ধারণা, (দুই) কোনো গোপন দোষ সন্ধান করা এবং (তিন) গীবত অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে এমন কথা বলা যা সে শুনলে অসহনীয় মনে করত।
তন্মধ্যে প্রথম বিষয় হচ্ছে, الظن বা প্রবল ধারণা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'তোমাদের কারও আল্লাহর প্রতি সু-ধারণা পোষণ ব্যতীত মৃত্যুবরণ করা উচিত নয়।' [মুসলিম:৫১২৫, আবুদাউদ:২৭০৬, ইবনে মাজাহ:৪১৫৭] অন্য এক হাদীসে আছে 'আমি আমার বান্দার সাথে তেমনি ব্যবহার করি, যেমন সে আমার সম্বন্ধে ধারণা রাখে। এখন সে আমার প্রতি যা ইচ্ছা ধারণা রাখুক।' [মুসনাদে আহমাদ:১৫৪৪২] এ থেকে জানা যায় যে, আল্লাহর প্রতি ভাল ধারণা পোষণ করা ফরয এবং কু-ধারণা পোষন করা হারাম। এমনিভাবে যেসব মুসলিম

বাহ্যিক অবস্থার দিক দিয়ে সৎকর্মপরায়ণ দৃষ্টিগোচর হয়, তাদের সম্পর্কে প্রমাণ ব্যতিরেকে কু-ধারণা পোষণ করা হারাম। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'তোমরা ধারণা থেকে বেঁচে থাক। কেননা, ধারণা মিথ্যা কথার নামান্তর।' [বুখারী:৪০৬৬, মুসলিম:২৫৬৩]
আয়াতে দ্বিতীয় নিষিদ্ধ বিষয় হচ্ছে. কারও দোষ সন্ধান করা। এর দ্বারা নানা রকম ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি হয়। এ কারণে একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর খোতবার দোষ অন্বেষণকারীদের সম্পর্কে বলেছেনঃ "হে সেই সব লোকজন, যারা মুখে ঈমান এনেছো কিন্তু এখনো ঈমান তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি, তোমরা মুসলিমদের গোপনীয় বিষয় খোঁজে বেড়িও না। যে ব্যক্তি মুসলিমদের দোষ-ক্রটি তালাশ করে বেড়াবে আল্লাহ তার দোষ-ক্রটির অন্বেষণে লেগে যাবেন। আর আল্লাহ যার ক্রটি তালাশ করেন তাকে তার ঘরের মধ্যে লাঞ্ছিত করে ছাড়েন।" [আবু দাউদ:৪৮৮০] মু'আবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ আমি নিজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ "তুমি যদি মানুষের গোপনীয় বিষয় জানার জন্য পেছনে লাগো। তাদের জন্য বিপর্যয় সৃষ্টি করবে কিংবা অন্তত বিপর্যয়ের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে দেবে।" [আবু দাউদ: ৪৮৮৮] অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "মুসলিমদের গীবত করো না এবং তাদের দোষ অনুসন্ধান করো না। কেননা, যে ব্যক্তি মুসলিমদের দোষ অনুসন্ধান করে, আল্লাহ্ তার দোষ অনুসন্ধান করেন। আল্লাহ্ যার দোষ অনুসন্ধান করেন, তাকে স্ব-গৃহেও লাঞ্ছিত করে দেন।" [আবুদাউদ:৪৮৮০]
দোষ-ক্রটি অনুসন্ধান না করার এ নির্দেশ শুধু ব্যক্তির জন্যই নয়, বরং ইসলামী সরকারের জন্যেও। এ ক্ষেত্রে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর এ ঘটনা অতীব শিক্ষাপ্রদ। একবার রাতের বেলা তিনি এক ব্যক্তির কণ্ঠ শুনতে পেলেন। সে গান গাইতেছিল। তাঁর সন্দেহ হলো। তিনি তার সাথী আব্দুর রহমান ইবন আওফ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেনঃ এ ঘরটি কার? বলা হল, এটা রবী'আ ইবন উমাইয়া ইবন খালফ এর ঘর। তারা এখন শরাব খাচ্ছে। আপনার কি অভিমত? অতঃপর আব্দুর রাহমান ইবন আওফ বললেন, আমার অভিমত হচ্ছে যে, আমরা আল্লাহ্ যা নিষেধ করেছে তা-ই করে ফেলছি। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে তা করতে নিষেধ করে বলেছেন: 'তোমরা গোপন বিষয়ে অন্বেষণ করো না"। [সূরা আল-হুজুরাত:১২] তখন উমর ফিরে আসলেন এবং তাকে ছেড়ে গেলেন। [মুস্তাদরাকে হাকিম: ৮২৪৯, মাকারিমূল আখলাক:আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে জা'ফর আল খারায়েতী:৩৯৮,৪২০, মুসান্নাফে আব্দির রাজ্জাক: ১০/২২১] এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, খুঁজে খুঁজে মানুষের গোপন দোষ-ক্রটি বের করা এবং তারপর তাদেরকে পাকড়াও করা শুধু ব্যক্তির জন্যই নয়, ইসলামী সরকারের জন্যও জায়েয নয়। একটি হাদীসেও একথা উল্লেখিত হয়েছে। উক্ত হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

মৃত ভাইয়ের গোশ্‌ত খেতে চাইবে[১]? বস্তুত তোমরা তো একে ঘৃণ্যই মনে কর। আর তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর; নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু।

১৩. হে মানুষ! আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে[২], আর তোমাদেরকে বিভক্ত

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ

ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ “শাসকরা যখন সন্দেহের বশে মানুষের দোষ অনুসন্ধান করতে শুরু করে তখন তাদের চরিত্র নষ্ট করে দেয়।” [আবু দাউদ:৪৮৮৯]
আয়াতে নিষিদ্ধ তৃতীয় বিষয় হচ্ছে গীবত। গীবতের সংজ্ঞায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “কোন ব্যক্তি সম্পর্কে কারো এমন কথা বলা যা শুনলে সে অপছন্দ করবে। প্রশ্ন হলো, আমি যা বলছি তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে সত্যিই থেকে থাকে তাহলে আপনার মত কি? তিনি বললেনঃ তুমি যা বলছো তা যদি তার মধ্যে থাকে তাহলেই তো তুমি তার গীবত করলে। আর তা যদি না থাকে তাহলে অপবাদ আরোপ করলে।” [মুসলিম: ২৫৮৯, আবুদাউদ:৪৮৭৪, তিরমিযী:১৯৩৪]

(১) এই আয়াতে তিনটি বিষয় নিষিদ্ধ করতে গিয়ে গীবতের নিষিদ্ধতাকে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং একে মৃত মুসলিমের মাংস ভক্ষণের সমতুল্য প্রকাশ করে এর নিষিদ্ধতা ও নীচতা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। মি'রাজের রাত্রির হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তারপর আমাকে নিয়ে যাওয়া হল, আমি এমন এক সম্প্রদায়ের কাছ দিয়ে গেলাম যাদের নখ ছিল তামার। তারা তাদের মুখমণ্ডল ও দেহের মাংস আঁচড়াচ্ছিল। আমি জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? তিনি বললেনঃ এরা তাদের ভাইয়ের গীবত করত এবং তাদের ইজ্জতহানি করত। [মুসনাদে আহমাদ:৩/২২৪, আবুদাউদ:৪৮৭৮]

(২) আল্লাহর এ বাণীটিই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বিভিন্ন বক্তৃতা ও উক্তিতে আরো স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন। যেমন-মক্কা বিজয়ের সময় কা'বার তাওয়াফের পর তিনি যে বক্তৃতা করেছিলেন তাতে বলেছিলেনঃ “সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি তোমাদের থেকে জাহেলিয়াতের দোষ-ত্রুটি ও অহংকার দূর করে দিয়েছেন। হে লোকেরা! সমস্ত মানুষ দু' ভাগে বিভক্ত। এক, নেককার ও পরহেজগার যারা আল্লাহর দৃষ্টিতে মর্যাদার অধিকারী। দুই, পাপী ও দুরাচার যারা আল্লাহর দৃষ্টিতে নিকৃষ্ট। অন্যথায় সমস্ত মানুষই আদমের সন্তান। আর আদম মাটির সৃষ্টি।” [তিরমিযী: ৩১৯৩] অনুরূপভাবে, বিদায় হজ্জের সময় আইয়ামে তাশরীকের

أَتْقٰىكُمْ ۚ إِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অন্যের সাথে পরিচিত হতে পার[১]। তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র কাছে সে ব্যক্তিই বেশী মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে বেশী তাকওয়াসম্পন্ন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত।

قَالَتِ الْأَعْرَابُ اٰمَنَّا ۗ قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْٓا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ ۗ وَإِنْ تُطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَا يَلِتْكُمْ مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْـًٔا ۗ إِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٤﴾

১৪. বেদুঈনরা বলে, ‘আমরা ঈমান আনলাম’। বলুন, ‘তোমরা ঈমান আননি, বরং তোমরা বল, ‘আমরা আত্মসমর্পণ করেছি’, কারণ ঈমান এখনো তোমাদের অন্তরে প্রবেশ

মাঝামাঝি সময়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বক্তৃতা করেছিলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন, “হে লোকজন! সাবধান তোমাদের আল্লাহ একজন। কোন অনারবের ওপর কোন আরবের ও কোন আরবের ওপর কোন অনারবের কোন কৃষ্ণাঙ্গের ওপর শ্বেতাঙ্গের ও কোন শ্বেতাঙ্গের ওপর কৃষ্ণঙ্গের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই আল্লাহভীতি ছাড়া। তোমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহভীরু সেই আল্লাহর কাছে সর্বাধিক মর্যাদাবান। আমি কি তোমাদেরকে পৌঁছিয়েছি? তারা বলল, আল্লাহর রাসূল পৌঁছিয়েছেন। তিনি বললেন, তাহলে যারা এখানে উপস্থিত আছে তারা যেন অনুপস্থিত লোকদের কাছে এ বাণী পৌঁছিয়ে দেয়।” [মুসনাদে আহমাদ:৫/৪১১] অন্য হাদীসে এসেছে, “তোমরা সবাই আদমের সন্তান। আর আদমকে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছিল। লোকজন তাদের বাপদাদার নাম নিয়ে গর্ব করা থেকে বিরত হোক। তা না হলে আল্লাহর দৃষ্টিতে তারা নাক দিয়ে পায়খানা ঠেলে এমন নগণ্য কীট থেকেও নীচ বলে গণ্য হবে।” [মুসনাদে বায্যার: ৩৫৮৪] আর একটি হাদীসে তিনি বলেছেনঃ “আল্লাহ তা‘আলা কিয়ামতের দিন তোমাদের বংশ ও আভিজাত্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন না। তোমাদের মধ্যে যে বেশী আল্লাহভীরু সে-ই আল্লাহর কাছে সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী”। [ইবনে জারীর: ৩১৭৭২] আরো একটি হাদীসের ভাষা হচ্ছেঃ “আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের চেহারা-আকৃতি ও সম্পদ দেখেন না, বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও কাজ-কর্ম দেখেন।” [মুসলিম:২৫৬৪, ইবনে মাজাহ:৪১৪৩]

(১) কোন কোন মুফাসসিরের মতে, বড় বড় গোত্রকে شعوب আর তার চেয়ে ছোট গোত্রকে قبائل বলা হয়। অপর কারও মতে, অনারব জাতিসমূহের বংশ পরিচয় যেহেতু সংরক্ষিত নেই সেহেতু তাদেরকে شعوب বলা হয় এবং আরব জাতিসমূহের বংশ পরিচয় সংরক্ষিত আছে, তাদেরকে قبائل বলা হয়। [দেখুন-কুরতুবী,ফাতহুল কাদীর]

করেনি। আর যদি তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর তবে তিনি তোমাদের আমলসমূহের সওয়াব সামান্য পরিমাণও লাঘব করবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿١٥﴾

১৫. তারাই তো মুমিন, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, তারপর সন্দেহ পোষণ করেনি এবং তাদের জীবন ও সম্পদ দিয়ে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করেছে, তারাই সত্যনিষ্ঠ।

قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٦﴾

১৬. বলুন, 'তোমরা কি তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে আল্লাহ্‌কে অবগত করাচ্ছ? অথচ আল্লাহ্ জানেন যা কিছু আছে আসমানসমূহে এবং যা কিছু আছে যমীনে। আর আল্লাহ্ সবকিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত।

يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا ۖ قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ ۖ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٧﴾

১৭. তারা ইসলাম গ্রহণ করে আপনাকে ধন্য করেছে মনে করে। বলুন, 'তোমরা ইসলাম গ্রহণ করে আমাকে ধন্য করেছ মনে করো না, বরং আল্লাহ্ই ঈমানের দিকে পরিচালিত করে তোমাদেরকে ধন্য করেছেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।'

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

১৮. নিশ্চয় আল্লাহ্ আসমানসমূহ ও যমীনের গায়েব সম্পর্কে অবগত। আর তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা।

৫০- সূরা ক্বাফ্[১]
৪৫ আয়াত, মক্কী

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. ক্বাফ্, শপথ সম্মানিত কুরআনের

قٓ ۚ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ ①

২. বরং তারা বিস্ময় বোধ করে যে, তাদের মধ্য থেকে একজন সতর্ককারী তাদের কাছে এসেছেন। আর কাফিররা বলে, 'এ তো এক আশ্চর্য জিনিস!

بَلْ عَجِبُوْٓا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا شَيْءٌ عَجِيْبٌ ②

৩. 'আমাদের মৃত্যু হলে এবং আমরা মাটিতে পরিণত হলে আমরা কি পুনরুত্থিত হব? এ ফিরে যাওয়া সুদূরপরাহত।'

ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ۚ ذٰلِكَ رَجْعٌۢ بَعِيْدٌ ③

৪. অবশ্যই আমরা জানি মাটি ক্ষয় করে তাদের কতটুকু এবং আমাদের কাছে আছে সম্যক সংরক্ষণকারী কিতাব।

قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ ۚ وَعِنْدَنَا كِتٰبٌ حَفِيْظٌ ④

৫. বস্তুত তাদের কাছে সত্য আসার পর তারা তাতে মিথ্যারোপ করেছে। অতএব, তারা সংশয়যুক্ত বিষয়ে নিপতিত।[২]

بَلْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِيْٓ اَمْرٍ مَّرِيْجٍ ⑤

---

(১) সূরা ক্বাফে অধিকাংশ বিষয়বস্তু আখেরাত, কেয়ামত, মৃতদের পুণরুজ্জীবন ও হিসাব-নিকাশ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। একটি হাদীস থেকে সূরা ক্বাফের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। হাদীসে উম্মে হিশাম বিনতে হারেসা বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর গৃহের সন্নিকটেই আমার গৃহ ছিল। প্রায় দু'বছর পর্যন্ত আমাদের ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রুটি পাকানোর চুল্লিও ছিল অভিন্ন। তিনি প্রতি শুক্রবার জুম্মার খোতবায় সূরা ক্বাফ তেলাওয়াত করতেন। এতেই সূরাটি আমার মুখস্থ হয়ে যায়। [মুসলিম:৮৭৩] অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই ঈদের সালাতে এই সূরা পাঠ করতেন [মুসলিম:৮৯১] জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের সালাতে অধিকাংশ সময় সূরা ক্বাফ তেলাওয়াত করতেন। (সূরাটি বেশ বড়) কিন্তু এতদসত্বেও সালাত হাল্কা মনে হতো। [মুসনাদে আহমাদ:১৯৯২৯]

(২) অভিধানে مَرِيْجٌ শব্দের অর্থ মিশ্র, যাতে বিভিন্ন প্রকার বস্তুর মিশ্রণ থাকে এবং যার প্রকৃত স্বরূপ অনুধাবন করা সম্ভব হয় না। এরূপ বস্তু সাধারণত ফাসেদ ও দূষিত

৬. তারা কি তাদের উপরে অবস্থিত আসমানের দিকে তাকিয়ে দেখে না, আমরা কিভাবে তা নির্মাণ করেছি ও তাকে সুশোভিত করেছি এবং তাতে কোন ফাটলও নেই?

أَفَلَمْ يَنظُرُوٓا۟ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَٰهَا وَزَيَّنَّٰهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ ۝٦

৭. আর আমরা বিস্তৃত করেছি যমীনকে এবং তাতে স্থাপন করেছি পর্বতমালা। আর তাতে উদ্‌গত করেছি নয়ন প্রীতিকর সর্বপ্রকার উদ্ভিদ্,

وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَٰهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَٰسِىَ وَأَنۢبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍۭ بَهِيجٍ ۝٧

৮. আল্লাহ্‌র অনুরাগী প্রত্যেক বান্দার জন্য জ্ঞান ও উপদেশস্বরূপ।

تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ۝٨

৯. আর আসমান থেকে আমরা বর্ষণ করি কল্যাণকর বৃষ্টি অতঃপর তা দ্বারা আমরা উৎপন্ন করি উদ্যান,

وَنَزَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً مُّبَٰرَكًا فَأَنۢبَتْنَا بِهِۦ جَنَّٰتٍ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ ۝٩

হয়ে থাকে। এ কারণেই কারো কারো মতে, এ শব্দের অর্থ ফাসেদ ও দুষ্ট। আবার অনেকেই এর অনুবাদ করেছে মিশ্র ও জটিল। এ সংক্ষিপ্ত বাক্যাংশটিতে একটি অতি বড় বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। এর অর্থ তারা শুধু বিস্ময়ে প্রকাশ করা এবং বিবেক-বুদ্ধি বিরোধী ঠাওরানোকেই যথেষ্ট মনে করেনি। বরং যে সময় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সত্যের দাওয়াত পেশ করেছেন সে সময় তারা কোন চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই তাকে নির্জলা মিথ্যা বলে আখ্যায়িত করেছে। অবশ্যম্ভাবীরূপে তার যে ফল হওয়ার ছিল এবং হয়েছে তা হচ্ছে, এ দাওয়াত এবং এ দাওয়াত পেশকারী রাসূলের ব্যাপারে এরা কখনো স্থির ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেনি। কখনো তাঁকে কবি বলে, কখনো বলে গণক কিংবা পাগল। কখনো বলে সে যাদুকর আবার কখনো বলে কেউ তাঁর ওপর যাদু করেছে। কখনো বলে নিজের বড়ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সে এ বাণী নিজে বানিয়ে এনেছে আবার কখনো অপবাদ আরোপ করে যে, অন্যকিছু লোক তার পৃষ্ঠপোষকতা করছে। তারাই তাকে এসব কথা বানিয়ে দেয়। এসব পরস্পর বিরোধী কথাই প্রকাশ করে যে, তারা নিজেদের দৃষ্টিভংগী সম্পর্কেই পুরোপুরি দ্বিধান্বিত। যদি তারা তাড়াহুড়া করে একেবারে প্রথমেই নবীকে অস্বীকার না করতো এবং কোন রকম চিন্তা ভাবনা না করে আগেভাগেই একটি সিদ্ধান্ত দেয়ার পূর্বে ধীরস্থিরভাবে একথা ভেবে দেখতো যে, কে এ দাওয়াত পেশ করছে, কি কথা সে বলছে এবং তার দাওয়াতের সপক্ষে কি দলীল-প্রমাণ পেশ করছে তাহলে তারা কখনো এ দ্বিধা-দ্বন্দের মধ্যে পড়তো না। [দেখুন-তবারী,ফাতহুল কাদীর,বাগভী]

কর্তনযোগ্য শস্য দানা,

১০. ও সমুন্নত খেজুর গাছ যাতে আছে গুচ্ছ গুচ্ছ খেজুর---

وَالنَّخْلَ بٰسِقٰتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيْدٌ ﴿١٠﴾

১১. বান্দাদের রিযিকস্বরূপ। আর আমরা বৃষ্টি দিয়ে সঞ্জীবিত করি মৃত শহরকে; এভাবেই উত্থান ঘটবে[১]।

رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ ۙ وَاَحْيَيْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا ؕ كَذٰلِكَ الْخُرُوْجُ ﴿١١﴾

১২. তাদের আগেও মিথ্যারোপ করেছিল নূহের সম্প্রদায়, রাস্ এর অধিবাসী[২] ও সামূদ সম্প্রদায়,

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّاَصْحٰبُ الرَّسِّ وَثَمُوْدُ ﴿١٢﴾

১৩. আর আদ, ফির'আউন ও লূত সম্প্রদায়।

وَعَادٌ وَّفِرْعَوْنُ وَاِخْوَانُ لُوْطٍ ﴿١٣﴾

১৪. আর আইকার অধিবাসী[৩] ও তুব্বা' সম্প্রদায়[৪]; তারা সকলেই রাসূলগণের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল[৫], ফলে

وَّاَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ ؕ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيْدِ ﴿١٤﴾

---

(১) এখানে পুনরুত্থানের পক্ষে যুক্তি পেশ করে বলা হচ্ছে, যে আল্লাহ এ পৃথিবী-গ্রহটিকে জীবন্ত সৃষ্টির বসবাসের জন্য উপযুক্ত স্থান বানিয়েছেন, যিনি পৃথিবীর প্রাণহীন মাটিকে আসমানের প্রাণহীণ পানির সাথে মিশিয়ে এত উচ্চ পর্যায়ের উদ্ভিদ জীবন সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি এ উদ্ভিদরাজিকে মানুষ ও জীব-জন্তু সবার জন্য রিযিকের মাধ্যম বানিয়ে দিয়েছেন, তাঁর সম্পর্কে তোমাদের এ ধারণা যে, মৃত্যুর পর তিনি পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম নন। এটা নিরেট নির্বুদ্ধিতামূলক ধারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। [দেখুন- ফাতহুল কাদীর,আদওয়াউল-বায়ান]

(২) সূরা আল-ফুরকানের ৩৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় 'রাস' এর সম্প্রদায় সম্পর্কে আলোচনা চলে গেছে।

(৩) অর্থাৎ শু'আইব আলাইহিস সালামের জাতি। [ইবন কাসীর] এদের আলোচনা পূর্বেই সূরা আল-হিজর এর ৭৮ নং আয়াত ও সূরা আশ-শু'আরা এর ১৭৬ নং আয়াতের টিকায় করা হয়েছে। এ ছাড়াও এদের আলোচনা সূরা সাদ এর ১৩ নং আয়াতে এসেছে।

(৪) ইয়ামনের সম্রাটদের উপাধি ছিল তোব্বা [ইবন কাসীর] সূরা আদ-দোখানের ৩৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় আলোচনা করা হয়েছে।

(৫) অর্থাৎ তারা সবাই তাদের রাসূলের রিসালাতকে অস্বীকার করেছে এবং মৃত্যুর পরে

তাদের উপর আমার শাস্তি যথার্থভাবে আপতিত হয়েছে।

১৫. আমরা কি প্রথমবার সৃষ্টি করেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি! বরং নতুন সৃষ্টির বিষয়ে তারা সন্দেহে পতিত[১]।

أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ ۚ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٥﴾

দ্বিতীয় রুকূ'

১৬. আর অবশ্যই আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার প্রবৃত্তি তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তাও আমরা জানি। আর আমরা তার গ্রীবাস্থিত ধমনীর চেয়েও নিকটতর[২]।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴿١٦﴾

তাদেরকে পুনরায় জীবিত করে উঠানো হবে তাদের দেয়া এ খবরও অস্বীকার করেছে। এখানে বলা হয়েছে যে, 'তারা সকলেই রাসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলেছিল'। যদিও প্রত্যেক জাতি কেবল তাদের কাছে প্রেরিত রাসূলকেই অস্বীকার করেছিল। কিন্তু তারা যেহেতু এমন একটি খবরকে অস্বীকার করছিল যা সমস্ত রাসূল সর্বসম্মতভাবে পেশ করছিলেন। তাই একজন রাসূলকে অস্বীকার করা প্রকৃতপক্ষে সমস্ত রাসূলকেই অস্বীকার করার নামান্তর। [ইবন কাসীর]

(১) এটা আখেরাতের সপক্ষে যৌক্তিক প্রমাণ। যে ব্যক্তি আল্লাহকে অস্বীকার করে না এবং সুশৃংখল ও সুবিন্যস্ত এ বিশ্ব-জাহানে মানুষের সৃষ্টিকে নিছক একটি আকস্মিক ঘটনা হিসেবে আখ্যায়িত করার মত নির্বুদ্ধিতা যাকে পেয়ে বসেনি তার পক্ষে একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, আল্লাহ তা'আলাই আমাদেরকে এবং পুরো এ বিশ্ব-জাহানকে সৃষ্টি করেছেন। আমরা যে এ দুনিয়ায় জীবিতাবস্থায় বর্তমান এবং দুনিয়া ও আসমানের এসব কাজ-কারবার যে আমাদের চোখের সামনেই চলছে, এটা স্বতই প্রমাণ করছে যে, আল্লাহ আমাদেরকে এবং এ বিশ্ব-জাহানকে সৃষ্টি করতে অক্ষম ছিলেন না। তা সত্ত্বেও কেউ যদি বলে যে, কিয়ামত সংঘটিত করার পর সেই আল্লাহই আরেকটি জগত সৃষ্টি করতে পারবেন না এবং মৃত্যুর পর তিনি পুনরায় আমাদের সৃষ্টি করতে পারবেন না তাহলে সে একটি যুক্তি বিরোধী কথাই বলে। আল্লাহ অক্ষম হলে প্রথমবারই তিনি সৃষ্টি করতে অক্ষম থাকতেন। তিনি যখন প্রথবার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন এবং সেই সৃষ্টিকর্মের বদৌলতেই আমরা অস্তিত্ব লাভ করেছি তখন নিজের সৃষ্ট বস্তুকে ধ্বংস করে তা পুনরায় সৃষ্টি করতে তিনি অপারগ হবেন কেন? এর কি যুক্তিসংগত কারণ থাকতে পারে? [দেখুন- আদওয়াউল-বায়ান,ফাতহুল কাদীর]

(২) এখানে نحن বা 'আমরা' বলে ফেরেশ্‌তাদেরকে বোঝানো হয়েছে। যাতে পরবর্তী

إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيٰنِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ ﴿١٧﴾

১৭. যখন তার ডানে ও বামে বসা দু'জন ফেরেশ্‌তা পরস্পর (তার আমল লিখার জন্য) গ্রহণ করে[১];

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ ﴿١٨﴾

১৮. সে যে কথাই উচ্চারণ করে তার কাছে সদা উপস্থিত সংরক্ষণকারী রয়েছে।

وَجَآءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ ﴿١٩﴾

১৯. আর মৃত্যুযন্ত্রণা নিয়ে এসেছে (সে) সত্যই[২]; এটা (তা-ই) যা থেকে তুমি পালাতে চাচ্ছিলে।

وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ ذٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيْدِ ﴿٢٠﴾

২০. আর শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, ওটাই প্রতিশ্রুত দিন।

وَجَآءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَآئِقٌ وَّشَهِيْدٌ ﴿٢١﴾

২১. আর সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি উপস্থিত হবে, তার সঙ্গে থাকবে চালক ও সাক্ষী[৩]।

আয়াতের সাথে অর্থের মিল হয়। তখন ঐ সমস্ত ফেরেশ্‌তাই উদ্দেশ্য হবে যারা মানুষের প্রাণ হরনের জন্য বান্দার কাছে এসে থাকে। আমার ফেরেশতাগণ তাদের ঘাড়ের শিরার কাছেই অবস্থান করছে। তারা আমার নির্দেশ মোতাবেক যে কোন সময় তাদেরকে পাকড়াও করবে। ফেরেশতাগণ সদাসর্বদা মানুষের সাথে সাথে থাকে। তারা মানুষের প্রাণ সম্বন্ধে এতটুকু ওয়াকিবহাল, যতটুকু খোদ মানুষ তার প্রাণ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নয়। [ইবন কাসীর]

(১) يتلقى শব্দের আভিধানিক অর্থ গ্রহণ করা, নেয়া এবং অর্জন করে নেয়া। المتلقيان বলে দুইজন ফেরেশতা বোঝানো হয়েছে, যারা প্রত্যেক মানুষের সাথে সদাসর্বদা থাকে এবং তার ক্রিয়াকর্ম লিপিবদ্ধ করে। ﴿عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ﴾ অর্থাৎ তাদের একজন ডান দিকে থাকে এবং সৎকর্ম লিপিবদ্ধ করে। অপরজন বাম দিকে থাকে এবং অসৎকর্ম লিপিবদ্ধ করে। قعيد শব্দটির অর্থ উপবিষ্ট। [বাগভী,কুরতুবী]

(২) ওফাতের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মধ্যে এই অবস্থা দেখা দিলে তিনি হাত ভিজিয়ে মুখমণ্ডলে মালিশ করেছিলেন এবং বলেছিলেনঃ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ আল্লাহ্ ছাড়া কোন হক ইলাহ নেই, মৃত্যুযন্ত্রণা বড় সাংঘাতিক। [বুখারী: ৪০৯৪, ৭১৭৫] এখানে সে সত্য বলে আখেরাতের কথা বুঝানো হয়েছে। যে সত্যকে তারা অস্বীকার করত। [জালালাইন]

(৩) এই আয়াতের পূর্বে কেয়ামত কায়েম হওয়ার কথা আছে। আলোচ্য আয়াতে হাশরের ময়দানে মানুষের হাযির হওয়ার একটি বিশেষ অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। হাশরের ময়দানে

২২. অবশ্যই তুমি এ দিন সম্বন্ধে উদাসীন ছিলে, অতঃপর আমরা তোমার সামনে থেকে পর্দা উন্মোচন করেছি। সুতরাং আজ তোমার দৃষ্টি প্রখর[১]।

لَقَدْ كُنْتَ فِىْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ ﴿٢٢﴾

২৩. আর তার সঙ্গী ফেরেশ্‌তা বলবে, এই তো আমার কাছে 'আমলনামা প্রস্তুত।'

وَقَالَ قَرِيْنُهٗ هٰذَا مَا لَدَىَّ عَتِيْدٌ ﴿٢٣﴾

২৪. আদেশ করা হবে, তোমরা উভয়ে[২] জাহান্নামে নিক্ষেপ কর প্রত্যেক উদ্ধত কাফিরকে-

اَلْقِيَا فِىْ جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيْدٍ ﴿٢٤﴾

২৫. কল্যাণকর কাজে প্রবল বাধাদানকারী, সীমালঙ্ঘনকারী ও সন্দেহ পোষণকারী[৩]।

مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيْبٍ ﴿٢٥﴾

প্রত্যেক মানুষের সাথে একজন ফেরেশতা থাকবে। سائق সেই ব্যক্তিকে বলা হয়, যে জন্তুদের অথবা কোনো দলের পেছনে থেকে তাকে কোনো বিশেষ জায়গায় পৌঁছে দেয়। شَهِيْدٌ এর অর্থ সাক্ষী। سائِقٌ যে ফেরেশতা হবে এ ব্যাপারে সবাই একমত। شَهِيْدٌ সম্পর্কে তফসিরবিদগণের উক্তি বিভিন্নরূপ। কারও কারও মতে সে-ও একজন ফেরেশতাই হবে। এভাবে প্রত্যেকের সাথে দুইজন ফেরেশতা থাকবে। একজন তাকে হাশরের ময়দানে পৌঁছাবে এবং অপরজন তার কর্মের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবে। এই ফেরেশতাদ্বয় ডান ও বামে বসে আমল লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতাও হতে পারে এবং অন্য দুই ফেরেশতাও হতে পারে। কারও কারও মতে, সে হবে মানুষের আমল এবং কেউ খোদ মানুষও বলেছেন। তবে ফেরেশতা হওয়াই আয়াতের বাহ্যিক অর্থ থেকে বোঝা যায়। [দেখুন-ইবন কাসীর,ফাতহুল কাদীর]

(১) অর্থাৎ আমি তোমাদের সামনে থেকে যবনিকা সরিয়ে দিয়েছি। ফলে আজ তোমাদের দৃষ্টি সুতীক্ষ্ম। এখানে কাকে সম্বোধন করা হয়েছে, এ সম্পর্কেও তফসিরবিদদের উক্তি বিভিন্নরূপ। ইবনে জরীর, ইবনে-কাসীর প্রমুখের মতে মুমিন, কাফের, মুত্তাকী ও ফাসেক নির্বিশেষে সবাইকে সম্বোধন করা হয়েছে। [দেখুন-ইবন কাসীর,কুরতুবী,ফাতহুল কাদীর]

(২) ألقيا শব্দটি দ্বিবাচক পদ। আয়াতে কোনো ফেরেশতাদ্বয়কে সম্বোধন করা হয়েছে। বাহ্যতঃ পূর্বোক্ত চালক ও সাক্ষী ফেরেশতাদ্বয়কে সম্বোধন করা হয়েছে। [ইবন কাসীর,ফাতহুল কাদীর]

(৩) মূল আয়াতে مريب শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এ শব্দটির দু'টি অর্থ। এক, সন্দেহপোষণকারী। দুই, সন্দেহের মধ্যে নিক্ষেপকারী। [ইবন কাসীর]

২৬. যে আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য ইলাহ্ গ্রহণ করেছিল, তোমরা তাকে কঠিন শাস্তি তে নিক্ষেপ কর।

الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ﴿٢٦﴾

২৭. তার সহচর শয়তান বলবে, 'হে আমাদের রব! আমি তাকে বিদ্রোহী করে তুলিনি। বস্তুত সেই ছিল ঘোর বিভ্রান্ত[১]।

قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَٰكِن كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿٢٧﴾

২৮. আল্লাহ্ বলবেন, 'তোমরা আমার সামনে বাক-বিতণ্ডা করো না; আমি তো তোমাদেরকে আগেই সতর্ক করেছিলাম।

قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِالْوَعِيدِ ﴿٢٨﴾

২৯. 'আমার কাছে কথা রদবদল হয় না এবং আমি বান্দাদের প্রতি যুলুমকারীও নই।'

مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿٢٩﴾

তৃতীয় রুকূ'

৩০. সেদিন আমরা জাহান্নামকে জিজ্ঞেস করব, 'তুমি কি পূর্ণ হয়েছ?' জাহান্নাম বলবে, 'আরো বেশী আছে কি[২]?'

يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ ﴿٣٠﴾

৩১. আর জান্নাতকে নিকটস্থ করা হবে মুত্তাকীদের---কোন দূরত্বে থাকবে না।

وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴿٣١﴾

---

(১) আলোচ্য আয়াতে قَرِيْنٌ বলে এই শয়তানই বোঝানো হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে যখন জাহান্নামে নিক্ষেপ করার আদেশ হয়ে যাবে; তখন এই শয়তান বলবে, 'আমি তাকে পথভ্রষ্ট করিনি; বরং সে নিজেই পথভ্রষ্টতা অবলম্বন করত' এবং সদুপদেশে কর্ণপাত করত না। [দেখুন-ফাতহুল কাদীর,বাগভী]

(২) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, জাহান্নামে ফেলা হবে শেষ পর্যন্ত জাহান্নাম বলবে, আরো বেশীর অবকাশ আছে কি? অবশেষে মহান আল্লাহ্ তাঁর পবিত্র পা জাহান্নামে রাখবেন, তখন জাহান্নাম বলবে, ক্বাত্ব, ক্বাত্ব। বা পূর্ণ হয়ে গেছি। [বুখারী:৪৮৪৮, ৭৪৪৯, মুসলিম: ২৮৪৬]

هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ لِكُلِّ اَوَّابٍ حَفِيْظٍ ﴿٣٢﴾

৩২. এরই প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল---প্রত্যেক আল্লাহ্-অভিমুখী[১], হিফাযতকারীর জন্য---

مَنْ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبٍ مُّنِيْبِ ﴿٣٣﴾

৩৩. যারা গায়েব অবস্থায় দয়াময় আল্লাহ্‌কে ভয় করেছে এবং বিনীত চিত্তে উপস্থিত হয়েছে ---

ادْخُلُوْهَا بِسَلٰمٍ ۭ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُوْدِ ﴿٣٤﴾

৩৪. তাদেরকে বলা হবে, ‘শান্তির সাথে তোমরা তাতে প্রবেশ কর; এটা অনন্ত জীবনের দিন ।’

لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ فِيْهَا وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ ﴿٣٥﴾

৩৫. এখানে তারা যা কামনা করবে তা-ই থাকবে[২] এবং আমার কাছে রয়েছে

---

(১) অর্থাৎ জান্নাতের প্রতিশ্রুতি প্রত্যেক أَوَّابٌ (‘আউয়াব’) এর জন্য রয়েছে। ‘আউয়াব’ এর অর্থ অনুরাগী । এমন ব্যক্তি যে নাফরমানী এবং প্রবৃত্তির আকাংখা চরিতার্থ করার পথ পরিহার করে আনুগত্য এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের পথ অবলম্বন করেছে, যে আল্লাহর পছন্দ নয় এমন প্রতিটি জিনিস পরিত্যাগ করে এবং আল্লাহ যা পছন্দ করে তা গ্রহণ করে, বন্দেগীর পথ থেকে পা সামান্য বিচ্যুত হলেই যে বিচলিত বোধ করে এবং তাওবা করে বন্দেগীর পথে ফিরে আসে, যে অধিক মাত্রায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের সমস্ত ব্যাপারে তাঁর স্মরণাপন্ন হয় । সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা‘আলার প্রতি অনুরক্ত হয় । মুফাসসেরীনদের অনেকেই বলেছেন, যে ব্যক্তি নির্জনতায় গোনাহ স্মরণ ও ক্ষমা প্রার্থনা করে, সেই ‘আউয়াব’ । [দেখুন-ইবন কাসীর,ফাতহুল কাদীর,বাগভী] রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘যে ব্যক্তি মজলিস থেকে উঠার সময় এই দো‘আ পাঠ করে, আল্লাহ তা‘আলা তার এই মজলিসেকৃত সব গোনাহ মাফ করে দেন । দো‘আ হচ্ছে, سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ অর্থাৎ হে আল্লাহ! আপনি পবিত্র এবং প্রশংসা আপনারই । আপনি ব্যতীত কোনো হক উপাস্য নেই । আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাওবা করছি । [তিরমিযী:৩৪৩৩, আবু দাউদ:৪৮৫৮]

(২) অর্থাৎ জান্নাতীরা জান্নাতে যা চাইবে, তাই পাবে । চাওয়া মাত্রই তা সামনে উপস্থিত দেখতে পাবে । বিলম্ব ও অপেক্ষার বিড়ম্বনা সইতে হবে না । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘জান্নাতে কারও সন্তানের বাসনা হলে গর্ভধারণ, প্রসব ও সন্তানের কায়িক বৃদ্ধি এগুলো সব এক মুহূর্তের মধ্যে নিষ্পন্ন হয়ে যাবে ।’ [মুসনাদে আহমাদ:৩/৯, তিরমিযী: ২৫৬৩, ইবনে মাজাহ: ৪৩৩৮]

তারও বেশী[১]।

৩৬. আর আমরা তাদের আগে বহু প্রজন্মকে ধ্বংস করে দিয়েছি, যারা ছিল পাকড়াও করার ক্ষেত্রে তাদের চেয়ে প্রবলতর, তারা দেশে দেশে ঘুরে বেড়াত; তাদের কোন পলায়ণস্থল ছিল কি?

وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ اَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوْا فِى الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَّحِيْصٍ ۝٣٦

৩৭. নিশ্চয় এতে উপদেশ রয়েছে তার জন্য, যার আছে অন্তঃকরণ[২] অথবা যে শ্রবণ করে মনোযোগের সাথে।

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِمَنْ كَانَ لَهٗ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيْدٌ ۝٣٧

৩৮. আর অবশ্যই আমরা আসমানসমূহ, যমীন ও তাদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ

(১) অর্থাৎ তারা যা চাইবে তাতো পাবেই। কিন্তু আমি তাদেরকে আরো এমন কিছু দেব যা পাওয়ার আকাংখা পোষণ করা তো দুরের কথা তাদের মন-মগজে তার কল্পনা পর্যন্ত উদিত হয়নি। কারণ, আমার কাছে এমন নেয়ামতও আছে, যার কল্পনাও মানুষ করতে পারে না। ফলে তারা এগুলোর আকাঙ্খা ও করতে পারবে না। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি আমার বান্দাদের জন্য এমন কিছু রেখেছি যা কোন চক্ষু কোনদিনে দেখেনি, কোন কান কোনোদিন শুনেনি এমনকি কোন মানুষের অন্তরেও উদিত হয়নি। [মুসলিম:২৮২৪] তবে আনাস ও জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, এই বাড়তি নেয়ামত হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার দর্শন ও সাক্ষাত, যা জান্নাতীরা লাভ করবে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন মহান আল্লাহ্ বলবেন, তোমরা কি বর্ধিত কিছু চাও? তারা বলবে, আপনি কি আমাদের চেহারা শুভ্র করে দেননি? আপনি কি আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাননি? এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেননি? রাসূল বলেন, তখন পর্দা খুলে দেয়া হবে, তখন তারা বুঝতে পারবে তাদেরকে তাদের রব আল্লাহ্‌র দিকে তাকানোর নেয়ামতের চেয়ে বড় কোনো নেয়ামত দেয়া হয়নি। আর এটাই হলো, বর্ধিত বা বাড়তি নেয়ামত। [মুসলিম: ১৮১]

(২) ইবন আব্বাস বলেনঃ এখানে 'কলব' বলে বোধশক্তি বোঝানো হয়েছে। বোধশক্তির কেন্দ্রস্থল হচ্ছে কলব তথা অন্তঃকরণ। তাই একে কলব বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। কোনো কোনো তাফসিরবিদ বলেনঃ এখানে কলব বলে হায়াত তথা জীবন বোঝানো হয়েছে। [কুরতুবী]

أَيَّامٍ ۖ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ

সৃষ্টি করেছি ছয় দিনে; আর আমাকে কোন ক্লান্তি স্পর্শ করেনি।

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ

৩৯. অতএব তারা যা বলে তাতে আপনি ধৈর্য ধারণ করুন এবং আপনার রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন সূর্যোদয়ের আগে ও সূর্যাস্তের আগে[১],

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ

৪০. আর তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন রাতের একাংশে এবং সালাতের পরেও[২]।

وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ

৪১. আর মনোনিবেশসহকারে শুনুন, যেদিন এক ঘোষণাকারী নিকটবর্তী

(১) অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার তসবীহ (পবিত্রতা বর্ণনা) করা। মুখে হোক কিংবা সালাতের মাধ্যমে হোক। এ কারণেই কেউ কেউ বলেন, সূর্যোদয়ের পূর্বে তসবিহ করার অর্থ ফজরের সালাত এবং সূর্যাস্তের পূর্বে তসবীহ করার মানে আছরের সালাত। [ফাতহুল কাদীর] এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, চেষ্টা কর, যাতে তোমার সূর্যোদয়ের পূর্বের এবং সূর্যাস্তের পূর্বের সালাতগুলো ছুটে না যায়, অর্থাৎ, ফজর ও আছরের সালাত। এর প্রমাণ হিসেবে তিনি উপরোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করেন। [বুখারী: ৫৭৩] তাছাড়া সে সব তসবিহও আয়াতের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো সকাল-বিকাল পাঠ করার প্রতি সহীহ হাদীসসমূহে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি সকালে ও বিকালে একশত বার করে 'সোবহানাল্লাহি ওয়া বেহামদিহি' পাঠ করে, তার গোনাহ ক্ষমা করা হবে, যদিও তা সমুদ্রের তরঙ্গ অপেক্ষাও বেশি হয়। [মুয়াত্তা: ৪৩৮, বুখারী:৫৯২৬, মুসলিম:৪৮৫৭]

(২) মুজাহিদ বলেন, এখানে فسبح বলে ফরয সালাত বোঝানো হয়েছে এবং ﴿وَأَدْبَارَ السُّجُودِ﴾ বা সালাতের পশ্চাতে বলে সেই সব তসবিহ বোঝানো হয়েছে, যেগুলোর ফযিলত প্রত্যেক ফরয সালাতের পর হাদীসে বর্ণিত আছে। [কুরতুবী,কাগভী] রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয সালাতের পর ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ ৩৩ বার আল্লাহু আকবার এবং একবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন কাদির' পাঠ করবে, তার গোনাহ মাফ করা হবে যদিও তা সমুদ্রের ঢেউয়ের সমান হয়। [মুয়াত্তা:৪৩৯ মুসলিম:৯৩৯]

স্থান হতে ডাকবে,

৪২. সেদিন তারা সত্য সত্যই শুনতে পাবে মহানাদ, সেদিনই বের হবার দিন ।

يَّوْمَ يَسْمَعُوْنَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوْجِ ﴿٤٢﴾

৪৩. আমরাই জীবন দান করি এবং আমরাই মৃত্যু ঘটাই, আর সকলের ফিরে আসা আমাদেরই দিকে ।

اِنَّا نَحْنُ نُحْيٖ وَنُمِيْتُ وَاِلَيْنَا الْمَصِيْرُ ﴿٤٣﴾

৪৪. যেদিন তাদের থেকে যমীন বিদীর্ণ হবে এবং লোকেরা ত্রস্ত-ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করবে, এটা এমন এক সমাবেশ যা আমাদের জন্য অতি সহজ ।

يَوْمَ تَشَقَّقُ الْاَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيْرٌ ﴿٤٤﴾

৪৫. তারা যা বলে তা আমরা ভাল জানি, আর আপনি তাদের উপর জবরদস্তিকারী নন, কাজেই যে আমার শাস্তিকে ভয় করে তাকে উপদেশ দান করুন কুরআনের সাহায্যে ।

نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ ﴿٤٥﴾

৫১- সূরা আয-যারিয়াত
৬০ আয়াত, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

وَالذّٰرِيٰتِ ذَرْوًا ①

১. শপথ[১] ধূলিঝঞ্ঝার,

فَالْحٰمِلٰتِ وِقْرًا ②

২. অতঃপর বোঝাবহনকারী মেঘপুঞ্জের,

فَالْجٰرِيٰتِ يُسْرًا ③

৩. অতঃপর স্বচ্ছন্দগতি নৌযানের,

فَالْمُقَسِّمٰتِ اَمْرًا ④

৪. অতঃপর নির্দেশ বন্টনকারী ফেরেশ্‌তাগণের---

اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَصَادِقٌ ⑤

৫. তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য ।

وَّاِنَّ الدِّيْنَ لَوَاقِعٌ ⑥

৬. নিশ্চয় প্রতিদান অবশ্যম্ভাবী ।

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ⑦

৭. শপথ বহু পথবিশিষ্ট আসমানের[২],

(১) ﴿وَالذّٰرِيٰتِ ذَرْوًا﴾ এখানে الذَّارِيَاتِ বলে ধূলিকণা বিশিষ্ট ঝঞ্ঝাবায়ু বোঝানো হয়েছে । তারপর বলা হয়েছে, ﴿فَالْحٰمِلٰتِ وِقْرًا﴾ এখানে الحَامِلَات এর শাব্দিক অর্থ বোঝাবাহী; অর্থাৎ যে মেঘমালা বৃষ্টির বোঝা বহন করে । তারপর বলা হয়েছে, ﴿فَالْجٰرِيٰتِ يُسْرًا ۞ فَالْمُقَسِّمٰتِ اَمْرًا﴾ এখানে الجَارِيَاتِ ও المُقَسِّمَاتِ এর ব্যাখ্যায় মুফাস্‌সিরগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন । কেউ এ কথাটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন যে, এ দু'টি বাক্যাংশের অর্থও বাতাস [ফাতহুল কাদীর] । অর্থাৎ এ বাতাসই আবার মেঘমালা বহন করে নিয়ে যায় এবং ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে । আল্লাহর নির্দেশানুসারে যেখানে যতটুকু বর্ষণের নির্দেশ দেয়া হয় ততটুকু পানি বন্টন করে [কুরতুবী] । এ তাফসীর অনুসারে পুরো চারটি আয়াতই ঝঞ্ঝাবায়ূর সাথে সংশ্লিষ্ট । পক্ষান্তরে আরেক দল মুফাসসির الجَارِيَاتِ আয়াতাংশের অর্থ করেছেন দ্রুতগতিশীল নৌকাসমূহ এবং المُقَسِّمَاتِ এর অর্থ করেছেন সেসব ফেরেশতা যারা আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে তাঁর সমস্ত সৃষ্টির জন্য বরাদ্দকৃত জিনিস যথা রিযিক, বৃষ্টির পানি এবং কষ্ট ও সুখ ইত্যাদি তাদের মধ্যে বন্টন করে [ফাতহুল কাদির] । আবার কারও কারও মতে الجَارِيَاتِ বলে বোঝানো হয়েছে, তারকাসমূহ যারা তাদের কক্ষপথের প্রতি সহজেই চলে থাকে । আল্লাহ্ তা'আলা এ চারটি বস্তুর শপথ করে কিয়ামত সংঘটিত হওয়া যে বাস্তব তা বিধৃত করেছেন ।[দেখুন,ইবন কাসীর] উপরে যে অর্থ বর্ণিত হয়েছে তা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর তাফসীর অনুসরণ করে করা হয়েছে । তিনি এরূপই তাফসীর করেছেন ।[দেখুন, ইবন কাসীর]

(২) حُبُك শব্দটি حبكة এর বহুবচন । حُبُك শব্দের বেশ কয়েকটি অর্থ রয়েছে । বায়ু প্রবাহের

৮. নিশ্চয় তোমরা পরস্পর বিরোধী কথায় লিপ্ত[১]। إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ۝٨

৯. ফিরিয়ে রাখা হয় তা থেকে যে ফিরে থাকে[২]। يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ ۝٩

১০. ধ্বংস হোক মিথ্যাচারীরা[৩], قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ ۝١٠

কারণে মরুভূমির বালুকারাশি এবং বদ্ধ পানিতে যে ঢেউ সৃষ্টি হয় তাকেও حُبُك বলা হয় [আদওয়া আল বায়ান]। এখানে আসমানকে حُبُك এর অধিকারী বলার কারণ হচ্ছে যে, অধিকাংশ সময় আসমানে নানা আকৃতির মেঘরাশি ছেয়ে থাকে এবং বাতাসের প্রভাবে বারবার তার আকৃতি পরিবর্তিত হতে থাকে এবং কখনো কোন আকৃতি না স্থায়িত্ব লাভ করে, না অন্য আকৃতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়। অথবা এ কারণে বলা হয়েছে যে, রাতের বেলা যখন আকাশে তারকাসমূহ ছড়িয়ে থাকে তখন মানুষ তার নানা রকম আকৃতি দেখতে পায় যার কোনটি অন্যগুলোর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয় না। অথবা, এর অর্থ কাপড় বয়নে উদ্ভূত পাড়। এটা পথসদৃশ হয় বলে পথকেও حُبُك বলা হয়। কোনো কোনো তাফসিরবিদ এখানে حُبُك এর অর্থ নিয়েছেন শোভা ও সৌন্দর্য। তখন আয়াতের অর্থ এই যে, শোভা ও সৌন্দর্যমণ্ডিত আসমানের কসম [দেখুন, কুরতুবী]।

(১) যে বিষয়বস্তুকে জোরদার করার জন্য এখানে কসম খাওয়া হয়েছে, তা এই: ﴿إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ﴾ বা "তোমরা তো বিভিন্নরূপ উক্তিতে লিপ্ত"। বাহ্যত এতে মুশরিকদের-কে সম্বোধন করা হয়েছে। কারণ, তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে বিভিন্নরূপ উক্তি করত এবং কখনও উন্মাদ, কখনও জাদুকর, কখনও কবি ইত্যাদি বাজে পদবী সংযুক্ত করত। [ফাতহুল কাদীর] কোন কোন মুফাস্‌সির বলেন, এখানে সকল স্তরের মানুষকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে; তাই এখানে "বিভিন্ন রূপ উক্তির" অর্থ হবে এই যে, তাদের কেউ তো ঈমান আনে এবং তাকে সত্যবাদী মনে করে এবং কেউ অস্বীকার ও বিরুদ্ধাচরণ করে। [তাবারী]

(২) أفك এর শাব্দিক অর্থ মুখ ফেরানো। এ আয়াতের কয়েকটি অর্থ হতে পারে। (এক) এই সর্বনাম দ্বারা কুরআন ও রাসূলকে বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, কুরআন ও রাসূল থেকে সেই হতভাগাই মুখ ফেরায়, যার জন্যে বঞ্চনা অবধারিত হয়ে গেছে। [তাবারী] (দুই) এই সর্বনাম দ্বারা পূর্বের আয়াত বোঝানো হয়েছে; অর্থাৎ এরূপ বিভিন্ন উক্তি বলা থেকে সে ব্যক্তিকেই মুখ ফিরিয়ে রাখা হয়েছে, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা রক্ষা করেছেন এবং তৌফিক দিয়েছেন। [ফাতহুল কাদীর]

(৩) الْخَرَّاصُوْنَ এর অর্থ অনুমানকারী, যে ব্যক্তি অনুমানের উপর ভিত্তি করে কথা বলে। এখানে সেই কাফের ও অবিশ্বাসীদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা কোনো প্রমাণ ও কারণ ব্যতিরেকেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে পরস্পর

১১. যারা সন্দেহ-সংশয়ে নিপতিত, উদাসীন!

الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ غَمْرَةٍ سَاهُوْنَ ﴿١١﴾

১২. তারা জিজ্ঞাসা করে, ‘প্রতিদান দিবস কবে হবে?’

يَسْـَٔلُوْنَ اَيَّانَ يَوْمُ الدِّيْنِ ﴿١٢﴾

১৩. ‘যে দিন তারা আগুনে সাজাপ্রাপ্ত হবে।’

يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُوْنَ ﴿١٣﴾

১৪. বলা হবে, ‘তোমরা তোমাদের শাস্তি[১] আস্বাদন কর, তোমরা এ শাস্তিই ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিলে।’

ذُوْقُوْا فِتْنَتَكُمْ ۭ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿١٤﴾

১৫. নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে জান্নাতসমূহে ও ঝর্ণাধারায়,

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ﴿١٥﴾

১৬. গ্রহণ করবে তা যা তাদের রব তাদেরকে দিবেন; নিশ্চয় ইতোপূর্বে তারা ছিল সৎকর্মশীল,

اٰخِذِيْنَ مَآ اٰتٰىهُمْ رَبُّهُمْ ۭ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُحْسِنِيْنَ ﴿١٦﴾

১৭. তারা রাতের সামান্য অংশই অতিবাহিত করত নিদ্রায়[২],

كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ ﴿١٧﴾

বিরোধী উক্তি করত। কাজেই এর অনুবাদে মিথ্যাবাদীরা বলা হয়েছে। এই বাক্যে তাদের জন্যে অভিশাপের অর্থে বদদো‘আ রয়েছে। [ফাতহুল কাদীর]

(১) পবিত্র কুরআন এখানে فتنة শব্দটি ব্যবহার করেছে। এখানে ‘ফিত্‌না’ শব্দটি দু’টি অর্থ প্রকাশ করছে। একটি অর্থ হচ্ছে, নিজের এ আযাবের স্বাদ গ্রহণ করো। অপর অর্থটি হচ্ছে, তোমরা পৃথিবীতে যে বিভ্রান্তির ধুম্রজাল সৃষ্টি করে রেখেছিলে তার স্বাদ গ্রহণ করো। আরবী ভাষায় এ শব্দটির এ দু’টি অর্থ গ্রহণের সমান অবকাশ আছে [কুরতুবী]।

(২) يَهْجَعُوْنَ শব্দটি هجوع থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ রাত্রিতে নিদ্রা যাওয়া। এখানে মুমিন মুত্তাকীদের এই গুণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ তা‘আলার ইবাদতে রাত্রি অতিবাহিত করে, কম নিদ্রা যায় এবং অধিক জাগ্রত থাকে। যারা তাদের রাতসমূহ পাপ-পঙ্কিলতা ও অশ্লীল কাজ-কর্মে ডুবে থেকে কাটায় এবং তারপরও মাগফিরাত প্রার্থনা করার চিন্তাটুকু পর্যন্ত তাদের মনে জাগে না এরা তাদের শ্রেণীভুক্ত ছিল না। কোন কোন মুফাসসির বলেন: এখানে ما শব্দটি ‘না’ বোধক অর্থ দেয় এবং আয়াতের অর্থ এই যে, তারা রাত্রির অল্প অংশে নিদ্রা যায় না এবং সেই অল্প অংশে

১৮. আর রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত[১],

وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۝١٨

১৯. আর তাদের ধন-সম্পদে রয়েছে ভিক্ষুক ও বঞ্চিতের হক[২]।

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۝١٩

২০. আর নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শনসমূহ রয়েছে যমীনে[৩],

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ ۝٢٠

সালাত, দো'আ ইত্যাদি ইবাদতে অতিবাহিত করে। এই অর্থের দিক দিয়ে যে ব্যক্তি রাত্রির শুরুতে অথবা শেষে অথবা মধ্যস্থলে যে কোন অংশে ইবাদত করে নেয় সে এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। এ কারণেই আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, "যে ব্যক্তি মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে সালাত পড়ে সে এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত।" [আবু দাউদ: ১৩২২] ইমাম আবু জাফর বাকের রাহেমাহুল্লাহ বলেনঃ যে ব্যক্তি এশার সালাতের পূর্বে নিদ্রা যায় না, আয়াতে তাকেও বোঝানো হয়েছে। [ইবনে কাসীর]

(১) অর্থাৎ মুমিন মুত্তাকীগণ রাত্রির শেষ প্রহরে গোনাহের কারণে ক্ষমাপ্রার্থনা করে। তারা রাতের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ আল্লাহর ইবাদাতে ব্যয় করতো এবং এরপরও রাতের শেষাংশে আপন প্রভুর কাছে এই বলে ক্ষমা প্রার্থনা করতো যে, আপনার যতটুকু ইবাদাত বন্দেগী করা আমাদের কর্তব্য ছিল তা করতে আমাদের ত্রুটি হয়েছে। [ইবনে কাসীর] রাতের শেষ প্রহরে ক্ষমাপ্রার্থনা করার ফযীলত অন্য এক আয়াতেও বর্ণিত হয়েছে: ﴿وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ﴾ [সূরা আলে ইমরান:১৭] হাদীসে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশে দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন। তখন তিনি ঘোষণা করেনঃ কোন তওবাকারী আছে কি, যার তওবা আমি কবুল করব? কোনো ক্ষমাপ্রার্থনাকারী আছে কি, যাকে আমি ক্ষমা করব? [বুখারী:১১৪৫, ৬৩২১, ৭৪৯৪ মুসলিম: ৭৫৮]

(২) المحروم বলে এমন দরিদ্র অভাবগ্রস্তকে বোঝানো হয়েছে, যে নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তিগত সম্মান রক্ষার্থে নিজের অভাব কারও কাছে প্রকাশ করে না। ফলে মানুষের সাহায্য থেকে বঞ্চিত থাকে [ফাতহুল কাদীর]।

(৩) অর্থাৎ ঈমানদারদের জন্যে যমীনে আল্লাহ্‌র অনেক নির্দশন আছে। মূলত: যমীনে মহান আল্লাহ্‌র অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে। উদ্ভিদ, বৃক্ষ ও বাগ-বাগিচাই দেখুন, এদের বিভিন্ন প্রকারের বর্ণ ও গন্ধ, এক একটি পত্রের নিখুঁত সৌন্দর্য এবং প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য ও ক্রিয়ার হাজারো বৈচিত্র্য রয়েছে। এমনিভাবে ভুপৃষ্টে নদীনালা কুপ ও অন্যান্য জলাশয় রয়েছে। ভূ-পৃষ্ঠে সুউচ্চ পাহাড় ও গিরিগুহা রয়েছে। মৃত্তিকায় জন্মগ্রহণকারী অসংখ্য প্রকার জীবজন্তু ও তাদের বিভিন্ন উপকারীতা রয়েছে। ভুপৃষ্ঠের মানবমণ্ডলীর বিভিন্ন গোত্র, জাতি এবং বিভিন্ন ভুখণ্ডের মানুষের মধ্যে বর্ণ ও ভাষার স্বাতন্ত্র্য, চরিত্র ও অভ্যাসের পার্থক্য ইত্যাদি বিষয়ে চিন্তা করলে প্রত্যেকটির মধ্যে

২১. এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও। তবুও তোমরা কি চক্ষুষ্মান হবে না?	وَفِيٓ أَنفُسِكُمۡۚ أَفَلَا تُبۡصِرُونَ ٢١
২২. আর আসমানে রয়েছে তোমাদের রিযিক ও প্রতিশ্রুত সব কিছু(১)।	وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِزۡقُكُمۡ وَمَا تُوعَدُونَ ٢٢
২৩. অতএব আসমান ও যমীনের রবের শপথ! নিশ্চয় তোমরা যে কথা বলে থাক তার মতই এটি সত্য(২)।	فَوَرَبِّ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِ إِنَّهُۥ لَحَقّٞ مِّثۡلَ مَآ أَنَّكُمۡ تَنطِقُونَ ٢٣

আল্লাহ তা'আলার কুদরত ও হিকমতের এত বিকাশ দৃষ্টিগোচর হবে, যা গণনা করাও সুকঠিন। এ সব নিদর্শনের মধ্যে এ আয়াতে সম্ভবত: সেসব নিদর্শনই বোঝানো উদ্দেশ্য, যা আখেরাতের সম্ভাবনা এবং তার অবশ্যম্ভাবিতা ও অনিবার্যতার সাক্ষ্য দিচ্ছে [দেখুন, কুরতুবী;ফাতহুল কাদীর]।

(১) অর্থাৎ আসমানে তোমাদের রিযিক ও প্রতিশ্রুত বিষয় রয়েছে। এর নির্মল ও সরাসরি তাফসীর এরূপ বর্ণিত আছে যে, আকাশে থাকা অর্থ "লওহে-মাহফুযে" লিপিবদ্ধ থাকা। বলাবাহুল্য প্রত্যেক মানুষের রিযিক, প্রতিশ্রুত বিষয় এবং পরিণাম সবই লওহে-মাহফুযে লিপিবদ্ধ আছে। তাছাড়া 'আসমান' বলে ঊর্ধজগতও উদ্দেশ্য হতে পারে। মানুষকে পৃথিবীতে বেঁচে থাকার এবং কাজ করার জন্য যা কিছু দেয়া হয় তার সবকিছুই রিযিক। আর সমস্ত আসমানী কিতাব ও এ কুরআনে কিয়ামত, হাশর ও পুনরুত্থান, হিসেব-নিকেশ ও জবাবদিহি, পুরস্কার ও শাস্তি এবং জান্নাত ও জাহান্নামের যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে ﴿وَمَا تُوعَدُونَ﴾ বলে সেসবকেই বুঝানো হয়েছে। আল্লাহর এ বাণীর অর্থ হচ্ছে, দুনিয়ায় তোমাদের কাকে কি দিতে হবে তার ফায়সালা ঊর্ধজগত থেকেই হয়। তাছাড়া জবাবদিহি ও কর্মফল দেয়ার জন্য কখন তলব করা হবে সে ফায়সালাও সেখান থেকেই হবে [দেখুন,কুরতুবী]।

(২) অর্থাৎ তোমরা যেমন নিজেদের কথাবার্তা বলার মাধ্যমে কোন সন্দেহ কর না, কেয়ামতের আগমনও তেমনি সুস্পষ্ট ও সন্দেহমুক্ত, এতে সন্দেহ ও সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। দেখাশোনা, আস্বাদন করা, স্পর্শ করা ও ঘ্রাণ লওয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত অনুভূত বিষয়সমূহের মধ্য থেকে এখানে বিশেষভবে কথা বলাকে মনোনীত করার কারণ সম্ভবত এই যে, উপরোক্ত অনুভূত বিষয়সমূহের মধ্যে মাঝে মাঝে রোগ-ব্যাধি ইত্যাদির কারণে ধোঁকা হয়ে যায়। দেখা ও শোনার মধ্যে পার্থক্য হওয়া সুবিদিত। অসুস্থ অবস্থায় মাঝে মাঝে মুখের স্বাদ নষ্ট হয়ে মিষ্ট বস্তুও তিক্ত লাগে, কিন্তু বাকশক্তিতে কখনও কোন ধোঁকা ও ব্যতিক্রম হওয়ার সম্ভাবনা নেই। [কুরতুবী;ইবন কাসীর]

দ্বিতীয় রুকূ'

هَلْ أَتٰىكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرٰهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ﴿٢٤﴾

২৪. আপনার কাছে ইব্‌রাহীমের সম্মানীত মেহমানদের বৃত্তান্ত এসেছে কি?

إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلٰمًا ۖ قَالَ سَلٰمٌ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴿٢٥﴾

২৫. যখন তারা তার কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, 'সালাম ।' উত্তরে তিনি বললেন, 'সালাম' । এরা তো অপরিচিত লোক(১) ।

فَرَاغَ إِلٰى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ﴿٢٦﴾

২৬. অতঃপর ইব্‌রাহীম তার স্ত্রীর কাছে দ্রুত চুপিসারে গেলেন(২) এবং একটি মোটা-তাজা গো-বাছুর (ভাজা) নিয়ে আসলেন,

فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٢٧﴾

২৭. অতঃপর তিনি তা তাদের সামনে রেখে বললেন, 'তোমরা কি খাবে না?'

فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۖ قَالُوا لَا تَخَفْ ۖ وَبَشَّرُوهُ بِغُلٰمٍ عَلِيمٍ ﴿٢٨﴾

২৮. এতে তাদের সম্পর্কে তার মনে ভীতির সঞ্চার হল(৩) । তারা বলল, 'ভীত হবেন না ।' আর তারা তাকে এক জ্ঞানী পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিল ।

---

(১) منكر শব্দের অর্থ অপরিচিত । বাক্যের অর্থ এই যে, ফেরেশতাগণ মানব আকৃতিতে আগমন করেছিল । ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম তাদেরকে চিনতে পারেননি । তাই মনে মনে বললেন, এরা তো অপরিচিত লোক । [কুরতুবী]

(২) راغ শব্দটি روغ থেকে উদ্ভূত । অর্থ গোপনে চলে যাওয়া । উদ্দেশ্য এই যে, ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম মেহমানদের খানাপিনার ব্যবস্থা করার জন্যে এভাবে গৃহ থেকে চলে গেলেন যে, মেহমানরা তা টের পায়নি । নতুবা তারা হয়ত এ কাজে বাধা দিত । [কুরতুবী]

(৩) ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম তাদের না খাওয়ার কারণে তাদের ব্যাপারে শংকাবোধ করতে লাগলেন । কেননা, তখন ভদ্র সমাজে এই রীতি প্রচলিত ছিল যে, আহার্য পেশ করলে মেহমান কিছু না কিছু আহার্য গ্রহণ করত । কোন মেহমান এরূপ না করলে তাকে ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে আগমনকারী শত্রু বলে আশংকা করা হত [কুরতুবী] ।

فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴿٢٩﴾

২৯. তখন তার স্ত্রী চিৎকার করতে করতে সম্মুখে আসল এবং তার গাল চাপড়িয়ে বলল, 'বৃদ্ধা-বন্ধ্যা(১) ।

قَالُوا كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿٣٠﴾

৩০. তারা বলল, 'আপনার রব এরূপই বলেছেন; নিশ্চয় তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ ।'

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٣١﴾

৩১. ইব্রাহীম বললেন, 'হে প্রেরিত ফেরেশ্তাগণ! তোমাদের বিশেষ কাজ(২) কি?'

قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ ﴿٣٢﴾

৩২. তারা বলল, 'নিশ্চয় আমরা এক অপরাধী সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছি ।'

---

(১) সারা যখন শুনলেন যে, ফেরেশতারা ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম-কে পুত্র-সন্তান জন্মের সুসংবাদ দিতেছে, আর এ কথা বলাই বাহুল্য যে, সন্তান স্ত্রীর গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করে, তখন তিনি বুঝলেন যে, এই সুসংবাদ আমরা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্যে । ফলে অনিচ্ছাকৃতভাবেই তার মুখ থেকে কিছু আশ্চর্য ও বিস্ময়ের বাক্য উচ্চারিত হয়ে গেল । তিনি বললেন, প্রথমত, আমি বৃদ্ধা, এরপর বন্ধ্যা । যৌবনে আমি সন্তান ধারণের যোগ্য ছিলাম না । এখন বার্ধক্যে এটা কিরূপে সম্ভব হবে? জওয়াবে ফেরেশতাগণ যা বললেন তার অর্থ, আল্লাহ তা'আলা সবকিছু করতে পারেন । এ কাজও এমনিভাবেই হবে । কোন কোন বর্ণনা মতে, এই সুসংবাদ অনুযায়ী যখন ইসহাক আলাইহিস্সালাম জন্মগ্রহণ করেন, তখন সারার বয়স নিরানব্বই বছর এবং ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম-এর বয়স একশত বছর ছিল । [ফাতহুল কাদীর]

(২) এই কথোপকথনের মধ্যে ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম জানতে পারলেন যে, আগন্তুক মেহমানগণ আল্লাহর ফেরেশতা । আর মানুষের আকৃতিতে ফেরেশতাদের আগমন যেহেতু কোন বড় গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য হয়ে থাকে । তাই তাদের আগমনের উদ্দেশ্য অবহিত হওয়ার জন্য ইবরাহীম আলাইহিস সালাম خطب শব্দ ব্যবহার করেছেন । আরবী ভাষায় خطب শব্দটি কোন মামুলি কাজের জন্য ব্যবহৃত হয় না, বরং কোন বড় গুরুত্বপূর্ণ কাজ বুঝাতে ব্যবহৃত হয় । তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কী অভিযানে আগমন করেছেন? উত্তরে তারা লূত আলাইহিস্ সালাম-এর সম্প্রদায়ের ওপর মাটির তৈরী প্রস্তর (কংকর) বর্ষণের আযাব নাযিল করার কথা বলল । [দেখুন,কুরতুবী;আত তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

لِنُرۡسِلَ عَلَيۡهِمۡ حِجَارَةٗ مِّن طِينٖ ٣٣

৩৩. ‘যাতে তাদের উপর নিক্ষেপ করি মাটির শক্ত ঢেলা,

مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلۡمُسۡرِفِينَ ٣٤

৩৪. ‘যা সীমালজ্ঘনকারীদের জন্য চিহ্নিত আপনার রবের কাছ থেকে[১] ।’

فَأَخۡرَجۡنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٣٥

৩৫. অতঃপর সেখানে যেসব মুমিন ছিল আমরা তাদেরকে বের করে নিয়ে আসলাম ।

فَمَا وَجَدۡنَا فِيهَا غَيۡرَ بَيۡتٖ مِّنَ ٱلۡمُسۡلِمِينَ ٣٦

৩৬. তবে আমরা সেখানে একটি পরিবার ছাড়া আর কোন মুসলিম পাইনি ।

وَتَرَكۡنَا فِيهَآ ءَايَةٗ لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلۡعَذَابَ ٱلۡأَلِيمَ ٣٧

৩৭. আর যারা মর্মন্তুদ শাস্তিকে ভয় করে আমরা তাদের জন্য ওখানে একটি নিদর্শন রেখেছি ।

وَفِي مُوسَىٰٓ إِذۡ أَرۡسَلۡنَٰهُ إِلَىٰ فِرۡعَوۡنَ بِسُلۡطَٰنٖ مُّبِينٖ ٣٨

৩৮. আর নিদর্শন রেখেছি মূসার বৃত্তান্তেও, যখন আমরা তাকে স্পষ্ট প্রমাণসহ ফির‘আউনের কাছে পাঠালাম[২],

فَتَوَلَّىٰ بِرُكۡنِهِۦ وَقَالَ سَٰحِرٌ أَوۡ مَجۡنُونٞ ٣٩

৩৯. তখন সে ক্ষমতার অহংকারে মুখ ফিরিয়ে নিল[৩] এবং বলল, ‘এ ব্যক্তি হয় এক জাদুকর, না হয় এক উন্মাদ ।’

---

(১) ফেরেশতারা বলল, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ চিহ্নযুক্ত ছিল অথবা প্রত্যেক কংকরের গায়ে সেই ব্যক্তির নাম লিখিত ছিল, যাকে ধ্বংস করার জন্যে কংকরটি প্রেরিত হয়েছিল । সে যেদিকে পলায়ন করেছে, কংকরও তার পশ্চাদ্ধাবন করেছে [কুরতুবী;ফাতহুল কাদীর] ।

(২) ফির‘আউনকে যখন মূসা আলাইহিস্ সালাম সত্যের পয়গাম দেন, তখন ফির‘আউন মুসা আলাইহিস্ সালাম-এর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে স্বীয় শক্তি, সেনাবাহিনী ও পারিষদবর্গের উপর ভরসা করে । [দেখুন,কুরতুবী,সা‘দী]

(৩) ركن শব্দের অর্থ খুঁটি । আবার নিজ পার্শ্বশক্তির অর্থেও ব্যবহৃত হয় । মুফাসসিরগণ এখানে দু’টি অর্থ বর্ণনা করেছেন । এক. সে তার শক্তির অহংকারে মত্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল । দুই. সে তার শক্তিশালী দলবল ও সেনাবাহিনীসহ মুখ ফিরিয়ে নিল [দেখুন,কুরতুবী] ।

فَأَخَذْنَٰهُ وَجُنُودَهُۥ فَنَبَذْنَٰهُمْ فِى ٱلْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿٤٠﴾

৪০. কাজেই আমরা তাকে ও তার দলবলকে শাস্তি দিলাম এবং ওদের সাগরে নিক্ষেপ করলাম, আর সে ছিল তিরস্কৃত ।

وَفِى عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ﴿٤١﴾

৪১. আর নিদর্শন রয়েছে ‘আদের ঘটনাতেও, যখন আমরা তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম অকল্যাণকর বায়ু(১);

مَا تَذَرُ مِن شَىْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَٱلرَّمِيمِ ﴿٤٢﴾

৪২. এটা যা কিছুর উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল তাকেই যেন পরিণত করল চূর্ণ-বিচূর্ণ ধ্বংসস্তুপে ।

وَفِى ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا۟ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٤٣﴾

৪৩. আরও নিদর্শন রয়েছে সামূদের বৃত্তান্তেও, যখন তাদেরকে বলা হয়েছিল, ‘ভোগ করে নাও একটি নির্দিষ্ট কাল ।’

فَعَتَوْا۟ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّٰعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴿٤٤﴾

৪৪. অতঃপর তারা তাদের রবের আদেশ মানতে অহংকার করল; ফলে তাদেরকে পাকড়াও করল বজ্র(২) এবং

---

(১) এ বাতাসের জন্য العَقِيْم শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যা বন্ধ্যা নারীদের বুঝাতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে । অভিধানে এর প্রকৃত অর্থ গরম ও শুষ্ক । যদি শব্দটিকে আভিধানিক অর্থে গ্রহণ করা হয় তাহলে এর অর্থ হবে, তা ছিল এমন প্রচণ্ড গরম ও শুষ্ক বাতাস যে, তা যে জিনিসের ওপর দিয়েই প্রবাহিত হয়েছে তাকে শুষ্ক করে ফেলেছে । আর যদি শব্দটিকে পারিভাষিক অর্থে গ্রহণ করা হয় তাহলে তার অর্থ হবে তা ছিল বন্ধ্যা নারীর মত এমন হওয়া যার মধ্যে কোন কল্যাণ ছিল না । তা না ছিল আরামদায়ক, না ছিল বৃষ্টির বাহক । না ছিল বৃক্ষরাজিকে ফলবানকারী না এমন কোন কল্যাণ তার মধ্যে ছিল যে জন্য বাতাস প্রবাহিত হওয়া কামনা করা হয় [দেখুন,কুরতুবী;তাবারী] ।

(২) সামূদ জাতির উপর আপতিত এ আযাবের কথা বুঝাতে কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে । কোথাও একে رجفة (ভীতি প্রদর্শনকারী ও প্রকম্পিতকারী বিপদ) বলা হয়েছে । [সূরা আল-আ‘রাফ:৭৮] কোথাও একে صيحة (বিস্ফোরণ ও বজ্রধ্বনি) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে । [সূরা হূদ:৬৭] কোথাও একে বুঝাতে طاغية (কঠিনতম বিপদ) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে । [সূরা আল-হাক্কাহ:৫] আর এখানে একেই صاعقة বলা হয়েছে, যার অর্থ বিদ্যুতের মত অকস্মাৎ আগমনকারী বিপদ

তারা তা দেখছিল।

৪৫. অতঃপর তারা উঠে দাঁড়াতে পারল না এবং প্রতিরোধ করতেও পারল না।

فَمَا اسْتَطَاعُوا مِن قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنتَصِرِينَ ﴿٤٥﴾

৪৬. আর (ধ্বংস করেছিলাম) এদের আগে নূহের সম্প্রদায়কে, নিশ্চয় তারা ছিল ফাসেক সম্প্রদায়।

وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٤٦﴾

তৃতীয় রুকূ'

৪৭. আর আসমান আমরা তা নির্মাণ করেছি আমাদের ক্ষমতা বলে[১] এবং আমরা নিশ্চয়ই মহাসম্প্রসারণকারী[২]।

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿٤٧﴾

৪৮. আর যমীন, আমরা তাকে বিছিয়ে দিয়েছি, অতঃপর কত সুন্দর ব্যবস্থাপনাকারী[৩] (আমরা)!

وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ ﴿٤٨﴾

এবং কঠোর বজ্রধ্বনি উভয়ই। সম্ভবত: এ আযাব এমন এক ভূমিকম্পের আকারে এসেছিলো যার সাথে আতংক সৃষ্টিকারী শব্দও ছিল। [দেখুন,ইরাব আল-কুরআন]

(১) أَيْيد শব্দের অর্থ শক্তি ও সামর্থ্য। এ স্থলে ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু, মুজাহিদ, কাতাদাহ ও সাওরী রাহেমাহুমুল্লাহ এ তাফসীরই করেছেন। কারণ, এখানে أيد শব্দটি يَدٌ এর বহুবচন নয়। যদি শব্দটি يد এর বহুবচন হতো তবে তার বহুবচন হতো, أَيدِيَ। বরং أيد শব্দটির প্রতিটি বর্ণ মূল শব্দ। যার অর্থই হলো শক্তি। অন্য আয়াতে এ শব্দ থেকে বলা হয়েছে, ﴿وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ﴾ "আর আমরা তাকে রুহুল কুদুস বা জিবরীলের মাধ্যমে শক্তি যুগিয়েছি" [সূরা আল-বাকারাহ:৮৭, ২৫৩] সুতরাং কেউ যেন এটা না ভাবে যে, এখানে أيد শব্দটি يد এর বহুবচন [দেখুন,আদওয়াউল বায়ান]।

(২) মূল আয়াতাংশ مُوْسِعُوْنَ অর্থ ক্ষমতা ও শক্তির অধিকারী এবং প্রশস্তকারী উভয়টিই হতে পারে। তাছাড়া مُوْسِعُوْنَ শব্দের অন্য আরেকটি অর্থও কোন কোন মুফাসসির থেকে বর্ণিত আছে, তা হলো রিযিক সম্প্রসারণকারী। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদের রিযিকে প্রশস্তি প্রদানকারী। [দেখুন,কুরতুবী] তবে ইবন কাসীর প্রশস্তকারী অর্থ গ্রহণ করেছেন। তিনি অর্থ করেছেন, 'আমরা আকাশের প্রান্তদেশের সম্প্রসারণ করেছি এবং একে বিনা খুঁটিতে উপরে উঠিয়েছি, অবশেষে তা তার স্থানে অবস্থান করছে।' [ইবন কাসীর]

(৩) مَاهِدُوْنَ শব্দের অর্থ দু'টি। এক. বিছানার মত সুন্দরভাবে বিছিয়ে দেয়া। দুই. সুন্দর ব্যবস্থাপনা তৈরী করা [দেখুন,কুরতুবী]।

৪৯. আর প্রত্যেক বস্তু আমরা সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায়(১), যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

৫০. অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র দিকে ধাবিত হও(২), নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এক স্পষ্ট সতর্ককারী(৩)।

فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ ۖ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٥٠﴾

৫১. আর তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে কোন ইলাহ্ স্থির করো না; আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ প্রেরিত এক স্পষ্ট সতর্ককারী।

وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ ۖ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٥١﴾

৫২. এভাবে তাদের পূর্ববর্তীদের কাছে যখনই কোন রাসূল এসেছেন তারাই তাকে বলেছে, ‘এ তো এক জাদুকর, না হয় এক উন্মাদ!’

كَذَٰلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴿٥٢﴾

৫৩. তারা কি একে অপরকে এ মন্ত্রণাই দিয়ে এসেছে? বরং এরা সীমালঙ্ঘনকারী

أَتَوَاصَوْا بِهِ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿٥٣﴾

---

(১) অর্থাৎ জোড়ায় জোড়ায় সৃজনের নীতির ভিত্তিতে পৃথিবীর সমস্ত বস্তু সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রতিটি উদ্ভিদ ও প্রাণীর সৃষ্টিতে আমরা পুরুষ ও নারী জোড়া জোড়া হিসেবে দেখতে পাই। অনুরূপভাবে প্রতিটি বস্তুরই বিপরীত দিক রয়েছে। যেমন, রাত-দিন, জল-স্থল, সাদা-কালো, আসমান-যমীন, কুফরী-ঈমান, সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য ইত্যাদি। [দেখুন,কুরতুবী]

(২) অর্থাৎ আল্লাহর দিকে ধাবিত হও। উদ্দেশ্য এই যে, তওবা করে গোনাহ্ থেকে ছুটে পালাও। প্রবৃত্তি ও শয়তান মানুষকে গোনাহের দিকে দাওয়াত ও প্ররোচনা দেয়। তোমরা এগুলো থেকে ছুটে আল্লাহর শরণাপন্ন হও। তিনি তোমাদেরকে এদের অনিষ্ট থেকে বাঁচিয়ে রাখবেন।। [দেখুন,ফাতহুল কাদীর; কুরতুবী]

(৩) এ বাক্যাংশ যদিও আল্লাহ তা'আলারই বাণী, কিন্তু এটি আল্লাহ তাঁর নবীর মুখ দিয়ে বলাচ্ছেন যে, আল্লাহর দিকে দ্রুত অগ্রসর হও। আমি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছি। এ ধরনের কথার উদাহরণ কুরআন মজীদেও বহু স্থানে এসেছে [দেখুন,আত তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

সম্প্রদায়[১]।

৫৪. কাজেই আপনি তাদেরকে উপেক্ষা করুন, এতে আপনি তিরস্কৃত হবেন না।

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَآ أَنتَ بِمَلُومٍ ﴿٥٤﴾

৫৫. আর আপনি উপদেশ দিতে থাকুন, কারণ নিশ্চয় উপদেশ মুমিনদের উপকারে আসে।

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٥﴾

৫৬. আর আমি সৃষ্টি করেছি জিন এবং মানুষকে এজন্যেই যে, তারা কেবল আমার ইবাদাত করবে।

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

৫৭. আমি তাদের কাছ থেকে কোন রিযিক চাই না এবং এটাও চাই না যে, তারা আমাকে খাওয়াবে[২]।

مَآ أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿٥٧﴾

৫৮. নিশ্চয় আল্লাহ্, তিনিই তো রিযিকদাতা, প্রবল শক্তিধর, পরাক্রমশালী।

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿٥٨﴾

---

(১) অর্থাৎ একথা সুস্পষ্ট যে, হাজার হাজার বছর ধরে প্রতিটি যুগে বিভিন্ন দেশ ও জাতির লোকদের নবী-রাসূলদের দাওয়াতের মোকাবিলায় এই আচরণ করা এবং তাঁদের বিরুদ্ধে একই রকমের কথা বলার কারণ এ নয় যে, একটি সম্মেলন করে আগের ও পরের সমস্ত মানুষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যখনই কোন নবী এসে এ দাওয়াত পেশ করবে তখনই তাঁকে এ জবাব দিতে হবে। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে, তাহলে তাদের আচরণের এ সাদৃশ্য এবং একই প্রকৃতির জবাবের ক্রমাগত পুনরাবৃত্তি কেন? এর একমাত্র জবাব এই যে, অবাধ্যতা ও সীমালংঘন এদের সবার সাধারণ বৈশিষ্ট্য। তাছাড়া এ আচরণের আর কোন কারণ নেই। প্রত্যেক যুগের অজ্ঞ লোকেরাই যেহেতু আল্লাহর দাসত্ব থেকে মুক্ত ও তাঁর জিজ্ঞাসাবাদ সম্পর্কে বেপরোয়া হয়ে পৃথিবীতে লাগামহীন পশুর মত জীবন যাপন করতে আগ্রহী তাই শুধু এ কারণে যিনিই তাদেরকে আল্লাহর দাসত্ব ও আল্লাহভীতিমূলক জীবন যাপনের আহবান জানিয়েছেন তাঁকেই তারা একই ধরাবাঁধা জবাব দিয়ে এসেছে। [দেখুন,কুরতুবী]

(২) অর্থাৎ আমি জিন ও মানবকে সৃষ্টি করে সাধারণ মানুষের অভ্যাস অনুযায়ী কোন উপকার চাই না যে, তারা রিযিক সৃষ্টি করবে আমার জন্যে অথবা আমার অন্যান্য সৃষ্টজীবের জন্যে। আমি এটাও চাই না যে, তারা আমাকে আহার্য যোগাবে। [দেখুন,তাবারী]

فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِّثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ ﴿٥٩﴾

৫৯. সুতরাং যারা যুলুম করেছে তাদের জন্য রয়েছে তাদের সমমতাবলম্বীদের অনুরূপ প্রাপ্য (শাস্তি)। কাজেই তারা এটার জন্য আমার কাছে যেন তাড়াহুড়ো না করে[১]।

فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٦٠﴾

৬০. অতএব, যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য দুর্ভোগ সে দিনের, যে দিনের বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে।

---

(১) ذَنُوب শব্দের আসল অর্থ কুয়া থেকে পানি তোলার বড় বালতি। জনগণের সুবিধার্থে জনপদের সাধারণ কুয়াগুলোতে পানি তোলার পালা নির্ধারণ করা হয়। প্রত্যেকেই নিজ নিজ পালা অনুযায়ী পানি তোলে। তাই এখানে ذَنُوب শব্দের অর্থ করা হয়েছে প্রাপ্য অংশ বা পালা। [কুরতুবী]।

৫২- সূরা আত-তূর
৪৯ আয়াত, মক্কী

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالطُّوْرِ ۝١
১. শপথ তূর পর্বতের[১],

وَكِتٰبٍ مَّسْطُوْرٍ ۝٢
২. শপথ কিতাবের, যা লিখিত আছে[২]

فِيْ رَقٍّ مَّنْشُوْرٍ ۝٣
৩. উন্মুক্ত পাতায়[৩];

وَّالْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ ۝٤
৪. শপথ বায়তুল মা'মূরের[৪],

---

(১) বলা হয়ে থাকে যে, সুরিয়ানী ভাষায় طور (তূর) এর অর্থ পাহাড়, যাতে লতাপাতা ও বৃক্ষ উদগত হয়। এখানে তূর বলে মাদইয়ানে অবস্থিত তূরে-সিনীন বোঝানো হয়েছে। এই পাহাড়ের উপর মূসা আলাইহিস্ সালাম আল্লাহ তা'আলার সাথে বাক্যালাপ করেছিলেন। তূরের কসম খাওয়ার দ্বারা মহান আল্লাহ্ এ পাহাড়টিকে সম্মানিত করেছেন। [ফাতহুল কাদীর;কুরতুবী]।

(২) লিখিত কিতাব বলে মানুষের আমলনামা বোঝানো হয়েছে, না হয় কোন কোন তফসীরবিদের মতে পবিত্র কুরআন বোঝানো হয়েছে। আবার কারো কারো মতে এর দ্বারা লাওহে মাহফুজই বুঝানো হয়েছে। কারো কারো মতে এর দ্বারা সকল আসমানী কিতাবকে বোঝানো হয়েছে , [ফাতহুল কাদীর]

(৩) رق শব্দের আসল অর্থ লেখার জন্যে কাগজের স্থলে ব্যবহৃত পাতলা চামড়া। তাই এর অনুবাদ করা হয় পত্র। [ফাতহুল কাদীর]

(৪) আকাশস্থিত ফেরেশতাদের কা'বাকে বায়তুল মা'মুর বলা হয়। এটা দুনিয়ার কা'বার ঠিক উপরে অবস্থিত। হাদীসে আছে যে, মে'রাজের রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বায়তুল মা'মুরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এতে প্রত্যহ সত্তর হাজার ফেরেশতা ইবাদতের জন্যে প্রবেশ করে। এরপর তাদের পুনরায় এতে প্রবেশ করার পালা আসে না। প্রত্যহ নতুন ফেরেশতাদের নম্বর আসে। [বুখারী:৩২০৭, মুসলিম:১৬২] সপ্তম আসমানে বসবাসকারী ফেরেশতাদের কা'বা হচ্ছে বায়তুল মা'মুর। এ কারণেই মেরাজের রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানে পৌঁছে ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম-কে বায়তুল মা'মুরের প্রাচীরে হেলান দিয়ে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখতে পান। [বুখারী:৩২০৭] তিনি ছিলেন দুনিয়ার কা'বার প্রতিষ্ঠাতা। আল্লাহ তা'আলা এর প্রতিদানে আকাশের কা'বার সাথেও তাঁর বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করে দেন। প্রতি আসমানেই ফেরেশতাদের জন্য একটি ইবাদতঘর রয়েছে। প্রথম আসমানের ইবাদতঘরের নাম 'বাইতুল ইযযত'। [ইবন কাসীর]

৫. শপথ সমুন্নত ছাদের[১],	وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوْعِ ﴿٥﴾
৬. শপথ উদ্বেলিত সাগরের[২]---	وَالْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ ﴿٦﴾
৭. নিশ্চয় আপনার রবের শাস্তি অবশ্যম্ভাবী,	اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ﴿٧﴾
৮. এটার নিবারণকারী কেউ নেই[৩]।	مَّا لَهٗ مِنْ دَافِعٍ ﴿٨﴾
৯. যেদিন আসমান আন্দোলিত হবে	يَّوْمَ تَمُوْرُ السَّمَآءُ مَوْرًا ﴿٩﴾

(১) সমুন্নত ছাদ বা উঁচু ছাদ অর্থ আসমান, যা পৃথিবীকে একটি গম্বুজের মত আচ্ছাদিত করে আছে বলে মনে হয়। [ফাতহুল কাদীর]

(২) مَسْجُوْرٌ শব্দটি سجر থেকে উদ্ভূত। এর কয়েকটি অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে। কোন কোন মুফাসসির একে 'আগুনে ভর্তি' অর্থে গ্রহণ করেছেন। কেউ কেউ অর্থ করেছেন, অগ্নি প্রজ্বলিত করা। তখন আয়াতের অর্থ, সমুদ্রের কসম, যাকে অগ্নিতে পরিণত করা হবে। এথেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, কিয়ামতের দিন সকল সমুদ্র অগ্নিতে পরিণত হবে। অন্য এক আয়াতে আছেঃ ﴿وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ﴾ [সূরা আত-তাকভীর:৬] কেউ কেউ একে শূন্য ও খালি অর্থে গ্রহণ করেন যার পানি মাটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। বা শপথ খালি সমুদ্রের যা পরিপূর্ণ হবে। কেউ কেউ একে আবদ্ধ বা আটকিয়ে রাখা বা বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার অর্থে গ্রহণ করেন। তাদের মতে এর অর্থ হচ্ছে, সমুদ্রকে আটকিয়ে বা থামিয়ে রাখা হয়েছে যাতে তার পানি মাটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে হারিয়ে না যায় এবং স্থলভাগকে প্লাবিত করে না ফেলে এবং পৃথিবীর সব অধিবাসী তাতে ডুবে না মরে। অথবা জলভাগকে স্থলভাগ গ্রাস করতে বাধা দিয়ে রাখা হয়েছে নতুবা তা অনেক আগেই গ্রাস করে ফেলত। কেউ কেউ একে মিশ্রিত অর্থে গ্রহণ করে থাকেন। অর্থাৎ এর মধ্যে মিঠা ও লবণাক্ত পানি এবং গরম ও ঠান্ডা সব রকম পানি এসে মিশ্রিত হয়। আর কেউ কেউ একে কানায় কানায় ভরা ও তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ অর্থে গ্রহণ করেন। কাতাদাহ্ রাহেমাহুল্লাহ্ প্রমুখ مَسْجُوْر এর অর্থ করেছেন পানিতে পরিপূর্ণ। ইবন জারীর রাহেমাহুল্লাহ এই অর্থই পছন্দ করেছেন। [কুরতুবী]।

(৩) বলা হয়েছে, একে অর্থাৎ আপনার রবের শাস্তিকে কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না। বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, একবার উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু সূরা আত-তূর পাঠ করে যখন এই আয়াতে পৌঁছেন, তখন একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বিশ দিন পর্যন্ত অসুস্থ থাকেন। তাঁর রোগ নির্ণয় করার ক্ষমতা কারও ছিল না। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি এক রাত্রে প্রজাদের অবস্থা দেখার জন্য ছদ্মবেশে বের হন, এমতাবস্থায় এক লোকের বাড়ির পাশে গিয়ে এ আয়াত শুনতে পান। তিনি তৎক্ষণাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং এক মাসের মত সময় অসুস্থ ছিলেন। কেউ তার রোগ নির্ণয় করতে সক্ষম ছিল না। [ইবন কাসীর]

প্রবলভাবে[১]

১০. আর পর্বত পরিভ্রমণ করবে দ্রুত[২]; وَّتَسِيْرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ⑩

১১. অতঃএব দুর্ভোগ সে দিন মিথ্যারোপকারীদের জন্য, فَوَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ⑪

১২. যারা খেলার ছলে অসার কাজকর্মে লিপ্ত থাকে[৩] । الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ خَوْضٍ يَّلْعَبُوْنَ ⑫

১৩. যেদিন তাদেরকে ধাক্কা মারতে মারতে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের আগুনের দিকে يَوْمَ يُدَعُّوْنَ اِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ⑬

১৪. 'এটাই সে আগুন যাকে তোমরা মিথ্যা মনে করতে ।' هٰذِهِ النَّارُ الَّتِيْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ⑭

১৫. এটা কি তবে জাদু? না কি তোমরা দেখতে পাচ্ছ না[৪]! اَفَسِحْرٌ هٰذَا اَمْ اَنْتُمْ لَا تُبْصِرُوْنَ ⑮

---

(১) আরবী ভাষায় مور শব্দটি আবর্তিত হওয়া, কেঁপে কেঁপে ওঠা, ঘুরপাক খাওয়া, নড়েচড়ে উঠা এবং বারবার সামনে ও পেছনে চলা বুঝাতে ব্যবহৃত হয় । কিয়ামতের দিন আসমানের যে অবস্থা হবে একথাটির মাধ্যমে তা বর্ণনা করে ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে যে, সেদিন ঊর্ধজগতের সমস্ত ব্যবস্থাপনা ধ্বংস হয়ে যাবে এবং কেউ যদি সেদিন আকাশের দিকে তাকায় তবে দেখবে যে, সেই সুশোভিত নকশা বিকৃত হয়ে গিয়েছে যা সবসময় একই রকম দেখা যেতো আর চারদিকে একটা অস্থিরতা বিরাজ করছে । [দেখুন, ফাতহুল কাদীর; ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ আসমান এমনভাবে শূন্যে উড়তে থাকবে যেন মেঘমালা ভেসে বেড়াচ্ছে । এভাবে পাহাড় নিজ অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় রূপান্তরিত হয়ে যাবে । [ফাতহুল কাদীর]

(৩) অর্থাৎ তারা নবীর কাছে কিয়ামত, আখেরাত, জান্নাত ও জাহান্নামের কথা শুনে সেগুলোকে হাসির খোরাক বানাচ্ছে এবং এ বিষয়ে সুস্থ মস্তিষ্কে গভীরভাবে চিন্তা করার পরিবর্তে কেবল বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করছে । আখেরাত নিয়ে তাদের বিতর্কের উদ্দেশ্য এর তাৎপর্য বুঝার প্রচেষ্টা নয়, বরং তা একটি খেলা যা দিয়ে তারা মনোরঞ্জন করে থাকে । কিন্তু এটা তাদের কোন পরিণতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে সে ব্যাপারে আদৌ কোন উপলব্ধি নেই । [কুরতুবী]

(৪) অর্থাৎ দুনিয়াতে রাসূল যখন তোমাদেরকে এ জাহান্নামের আযাব সম্পর্কে সাবধান

اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ ۖ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾

১৬. তোমরা এতে দগ্ধ হও, অতঃপর তোমরা ধৈর্য ধারণ কর অথবা ধৈর্য ধারণ না কর, উভয়ই তোমাদের জন্য সমান। তোমরা যা করতে তারই প্রতিফল তোমাদেরকে দেয়া হচ্ছে।

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ﴿١٧﴾

১৭. নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে জান্নাতে ও আরাম-আয়েশে,

فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿١٨﴾

১৮. তাদের রব তাদেরকে যা দিয়েছেন তারা তা উপভোগ করবে এবং তাদের রব তাদেরকে রক্ষা করেছেন জলন্ত আগুনের শাস্তি থেকে,

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾

১৯. ‘তোমরা যা করতে তার প্রতিফল স্বরূপ তোমরা তৃপ্তির সাথে পানাহার করতে থাক(১)।’

مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ ۖ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ ﴿٢٠﴾

২০. তারা বসবে শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে; আর আমরা তাদের মিলন ঘটাব ডাগর চোখবিশিষ্টা হূরের সঙ্গে;

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا

২১. আর যারা ঈমান আনে, আর তাদের সন্তান-সন্ততি ঈমানে তাদের অনুগামী

করতেন তখন তোমরা তো বিশ্বাস করতে না, এখন বলো তোমাদের সামনে বিদ্যমান এ জাহান্নাম কি সেই জাদুর খেলা, নাকি এখনো বুঝে উঠতে পারনি, যে জাহান্নামের খবর তোমাদের দেয়া হতো তোমরা সে জাহান্নামের মুখোমুখি হয়েছো? [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

(১) এখানে “তৃপ্তির সাথে” বা মজা করে কথাটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থ বহন করে। মানুষ জান্নাতে যে লাভ করবে কোন প্রকার কষ্ট বা পরিশ্রম ছাড়াই তা লাভ করবে। বরং তা হুবহু তার আকাংখা ও মনের পছন্দ মত হবে। যত চাইবে এবং যখনই চাইবে সামনে এনে হাজির করা হবে। সে যা কিছু লাভ করবে তা তার অতীত কাজের প্রতিদান হিসেবে এবং নিজের বিগত দিনের উপার্জনের ফল হিসেবে লাভ করবে। [দেখুন, সা‘দী]

بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ أَلَتْنَٰهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَىْءٍ ۚ كُلُّ ٱمْرِئٍۭ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿٢١﴾

হয়, আমরা তাদের সাথে মিলিত করব তাদের সন্তান-সন্তুতিকে[১] এবং তাদের কর্মফল আমরা একটুও কমাবো না[২]; প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী[৩]।

(১) অর্থাৎ যারা ঈমানদার এবং তাদের সন্তানগণও ঈমানে তাদের অনুগামী, আমরা তাদের সন্তানদেরকে জান্নাতে তাদের সাথে মিলিত করে দেব। [মুয়াসসার] পবিত্র কুরআনের অন্যান্য স্থানেও এ ওয়াদা করা হয়েছে। যেমন, সূরা আর রা'দ এর ২৩ এবং সূরা গাফির এর ৮ নং আয়াত। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, আল্লাহ তা'আলা সৎকর্মপরায়ণ মুমিনদের সন্তান-সন্ততিকেও তাদের সম্মানিত পিতৃপুরুষদের মর্তবায় পৌঁছিয়ে দেবেন, যদিও তারা কর্মের দিক দিয়ে সেই মর্তবার যোগ্য না হয়- যাতে সম্মানিত মুরব্বীদের চক্ষুশীতল হয়। সায়ীদ ইবন-জুবায়ের রাহেমাহুল্লাহ বলেন, ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেছেন, জান্নাতী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করে তার পিতামাতা, স্ত্রী ও সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে যে, তারা কোথায় আছে? জওয়াবে বলা হবে যে, তারা তোমার মর্তবা পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি। তাই তারা জান্নাতে আলাদা জায়গায় আছে। এই ব্যক্তি আরয করবে, হে রব! দুনিয়াতে নিজের জন্যে ও তাদের সবার জন্যে আমল করেছিলাম। তখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আদেশ হবে, তাদেরকেও জান্নাতের এই স্তরে একসাথে রাখা হোক। এসব বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, আখেরাতে সৎকর্মপরায়ণ পিতৃপুরুষ দ্বারা তাদের সন্তানরা উপকৃত হবে এবং আমলে তাদের মর্তবা কম হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে পিতৃপুরুষদের মর্তবায় পৌঁছিয়ে দেয়া হবে। অপরদিকে সৎকর্মপরায়ণ সন্তান-সন্ততি দ্বারা তাদের পিতা-মাতার উপকৃত হওয়াও হাদীসে প্রমাণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা'আলা কোন কোন নেকবান্দার মর্তবা তার আমলের তুলনায় অনেক উচ্চ করে দেবেন। সে প্রশ্ন করবে, হে রব! আমাকে এই মর্তবা কিরূপে দেয়া হল? আমার আমল তো এই পর্যায়ের ছিল না। উত্তর হবে, তোমার সন্তান-সন্ততি তোমার জন্যে ক্ষমাপ্রার্থনা ও দো'আ করেছে। এটা তারই ফল। [মুসনাদে আহমাদ:২/৫০৯]

(২) আয়াতের অর্থ এইঃ সন্তান-সন্ততিকে তাদের সম্মানিত পিতৃপুরুষদের সাথে মিলিত করার জন্যে এই পন্থা অবলম্বন করা হবে না যে, সম্মানিত পিতৃপুরুষদের আমল কিছু হ্রাস করে সন্তানদের আমল পূর্ণ করা হবে। বা পিতৃপুরুষদের পদাবনতির মাধ্যমে সমান করা হবে। বরং আল্লাহ তা'আলা নিজ কৃপায় তাদেরকে সমান করে দেবেন। [ইবন কাসীর]

(৩) অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি তার আমলের জন্যে দায়ী হবে। অপরের গোনাহের বোঝা তার মাথায় চাপানো হবে না। পূর্ববর্তী আয়াতে নেককর্মের বেলায় সৎকর্মশীল পিতৃপুরুষদের খাতিরে সন্তান-সন্ততির আমল বাড়িয়ে দেয়ার কথা আছে। কিন্তু গোনাহের

২২. আর আমরা তাদেরকে বাড়িয়ে দেব ফলমূল এবং গোশ্‌ত যা তারা কামনা করবে।

وَأَمْدَدْنَٰهُم بِفَٰكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٢٢﴾

২৩. সেখানে তারা পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদান করতে থাকবে পানপাত্র, সেখানে থাকবে না কোন অসার কথা-বার্তা, থাকবে না কোন পাপকাজও(১)।

يَتَنَٰزَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ ﴿٢٣﴾

২৪. আর তাদের সেবায় চারপাশে ঘুরাঘুরি করবে কিশোরেরা, তারা যেন সুরক্ষিত মুক্তা।

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ ﴿٢٤﴾

২৫. আর তারা একে অন্যের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করবে,

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ ﴿٢٥﴾

২৬. তারা বলবে, নিশ্চয় আগে আমরা পরিবার-পরিজনের মধ্যে শংকিত অবস্থায় ছিলাম(২)।

قَالُوٓا۟ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِىٓ أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿٢٦﴾

২৭. অতঃপর আমাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন।

فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَىٰنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ﴿٢٧﴾

২৮. নিশ্চয় আমরা আগেও আল্লাহ্‌কে ডাকতাম, নিশ্চয় তিনি কৃপাময়, পরম দয়ালু।

إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ ۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ﴿٢٨﴾

বেলায় এরূপ করা হবে না। একজনের গোনাহের প্রতিক্রিয়া অপরের উপর প্রতিফলিত হবে না। [ইবন কাসীর]

(১) অর্থাৎ সেই শরাব নেশা সৃষ্টিকারী হবে না। তাই তা পান করে কেউ মাতাল হয়ে বেহুদা ও আবোলতাবোল বকবে না, গালি-গালাজ করবে না, কিংবা দুনিয়ার শরাব পানকারীদের মত অশ্লীল ও অশালীন আচরণ করবে না। [আদওয়াউল বায়ান]

(২) অর্থাৎ আমরা দুনিয়ায় বিলাসিতায় ডুবে এবং আপন ভূবনে মগ্ন থেকে গাফলতির জীবন যাপন করিনি। সেখানে সবসময়ই আমাদের আশংকা থাকতো যে, কখন যেন আমাদের দ্বারা এমন কোন কাজ হয়ে যায়, যে কারণে আল্লাহ আমাদের পাকড়াও করবেন। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

দ্বিতীয় রুকূ’

فَذَكِّرْ فَمَآ أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ ﴿٢٩﴾

২৯. অতএব আপনি উপদেশ দিতে থাকুন, কারণ, আপনার রবের অনুগ্রহে আপনি গণক নন, উন্মাদও নন।

أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِۦ رَيْبَ الْمَنُونِ ﴿٣٠﴾

৩০. নাকি তারা বলে, ‘সে একজন কবি? আমরা তার মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছি।

قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّى مَعَكُم مِّنَ الْمُتَرَبِّصِينَ ﴿٣١﴾

৩১. বলুন, ‘তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষাকারীদের অন্তর্ভুক্ত[১]।’

أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَٰمُهُم بِهَٰذَآ ۚ أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿٣٢﴾

৩২. নাকি তাদের বিবেক-বুদ্ধি তাদেরকে এ আদেশ দিচ্ছে, বরং তারা এক সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়[২]।

أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُۥ ۚ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٣﴾

৩৩. নাকি তারা বলে, ‘এ কুরআন সে বানিয়ে বলেছে’? বরং তারা ঈমান আনবে না।

فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِۦٓ إِن كَانُوا صَٰدِقِينَ ﴿٣٤﴾

৩৪. অতএব, তারা যদি সত্যবাদী হয় তবে এটার মত কোন বাণী নিয়ে আসুক না[৩]!

---

(১) দুর্ভাগ্য আমার আসে না তোমাদের আসে, তা দেখার জন্য আমিও অপেক্ষা করছি। [মুয়াসসার]

(২) এ দু’টি বাক্যে বিরোধীদের সমস্ত অপপ্রচার খণ্ডন করা হয়েছে , কারণ তারা একই ব্যক্তিকে অনেকগুলো পরস্পর বিরোধী উপাধি দিয়েছিল, অথচ এক ব্যক্তি কবি, পাগল ও গণক একই সাথে হতে পারে না। [মুয়াসসার]

(৩) অর্থাৎ কথা শুধু এ টুকু নয় যে, এটা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী নয়, বরং এটা আদৌ মানুষের কথা নয় এ রকম বাণী রচনা করাও মানুষের সাধ্যাতীত। তোমরা যদি একে মানুষের কথা বলতে চাও তাহলে মানুষের রচিত এ মানের কোন কথা এনে প্রমাণ করো। শুধু কুরাইশদেরকে নয়, সারা দুনিয়ার মানুষকে এ আয়াতের মাধ্যমে সর্বপ্রথম এ চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছিল। এরপর পুনরায় মক্কায় তিনবার এবং মদীনায় শেষ বারের মত এ চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছে। [দেখুন ইউনুস:৩৮, হূদ: ১৩, আল-ইসরা: ৮৮, আল-বাকারাহ: ২৩]।

৩৫. তারা কি স্রষ্টা ছাড়া সৃষ্টি হয়েছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা[১]?

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴿٣٥﴾

৩৬. নাকি তারা আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছে? বরং তারা দৃঢ় বিশ্বাস করে না।

أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ ﴿٣٦﴾

৩৭. আপনার রবের গুপ্তভাণ্ডার কি তাদের কাছে রয়েছে, নাকি তারা এ সবকিছুর নিয়ন্তা?

أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ ﴿٣٧﴾

৩৮. নাকি তাদের কোন সিঁড়ি আছে যাতে আরোহন করে তারা শুনে থাকে? থাকলে তাদের সে শ্রোতা সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আসুক!

أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ ۖ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٣٨﴾

৩৯. তবে কি কন্যা সন্তান তাঁর জন্য এবং পুত্র সন্তান তোমাদের জন্য?

أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ ﴿٣٩﴾

৪০. তবে কি আপনি ওদের কাছে

أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ ﴿٤٠﴾

(১) এ আয়াতে তাদের সামনে প্রশ্ন রাখা হয়েছে যে, তোমরা কি নিজে নিজেই সৃষ্টি হয়েছো, কোন স্রষ্টা তোমাদের সৃষ্টি করেননি? নাকি তোমরা নিজেরাই নিজেদের স্রষ্টা? কিংবা এ বিশাল মহাবিশ্ব তোমাদের তৈরী? এসব কথার কোনটিই যদি সত্য না হয়, আর তোমরা নিজেরাই স্বীকার করো যে তোমাদের স্রষ্টা আল্লাহ আর এই বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টাও তিনিই, তাহলে যে ব্যক্তি তোমাদের বলে, সেই আল্লাহই তোমাদের বন্দেগী ও উপাসনা পাওয়ার অধিকারী সেই ব্যক্তির প্রতি তোমরা এত ক্রোধান্বিত কেন? [দেখুন, কুরতুবী]

এটা ছিল এমন একটি তীক্ষ্ণ প্রশ্ন যা মুশরিকদের আকীদা বিশ্বাসের ভিত্তিমূলকেই কাঁপিয়ে দিয়েছে। হাদীসে আছে, বদর যুদ্ধের পর বন্দী কুরাইশদের মুক্ত করার বিষয়ে আলোচনা করার জন্য মক্কার কাফেরদের পক্ষ থেকে জুবাইর ইবন মুতয়িম মদীনায় আসে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন মাগরিবের সালাতে সূরা তূর পাঠ করছিলেন। মসজিদের বাইরে থেকে আওয়ায শোনা যাচ্ছিল, তিনি যখন ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾ পাঠ করলেন, তখন হঠাৎ আমার মনে হল যেন অন্তর ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে যাবে। আমি তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করলাম, তখন আমার মনে হচ্ছিল যেন এই স্থান ত্যাগ করার পূর্বেই আমি আযাবে গ্রেফতার হয়ে যাব। [বুখারী:৪৮৫৪]

পারিশ্রমিক চাচ্ছেন যে, তারা এটাকে একটি দুর্বহ বোঝা মনে করে?

৪১. নাকি গায়েবী বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান আছে যে, তারা তা লিখছে?

أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿٤١﴾

৪২. নাকি তারা কোন ষড়যন্ত্র করতে চায়? পরিণামে যারা কুফরী করে তারাই হবে ষড়যন্ত্রের শিকার[১]।

أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا ۖ فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ ﴿٤٢﴾

৪৩. নাকি আল্লাহ্ ছাড়া ওদের অন্য কোন ইলাহ্ আছে? তারা যে শির্ক স্থির করে আল্লাহ্ তা থেকে পবিত্র!

أَمْ لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤٣﴾

৪৪. আর তারা আকাশের কোন খণ্ড ভেঙ্গে পড়তে দেখলে বলবে, 'এটা তো এক পুঞ্জিভূত মেঘ।'

وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ﴿٤٤﴾

৪৫. অতএব তাদেরকে ছেড়ে দিন সে দিন পর্যন্ত, যেদিন তারা বজ্রাঘাতে হতচেতন হবে।

فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿٤٥﴾

৪৬. সেদিন তাদের ষড়যন্ত্র কোন কাজে আসবে না এবং তাদেরকে সাহায্যও করা হবে না।

يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤٦﴾

৪৭. আর নিশ্চয় যারা যুলুম করেছে তাদের জন্য রয়েছে এছাড়া আরো শাস্তি। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না।

وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَٰلِكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٧﴾

৪৮. আর আপনি ধৈর্যধারণ করুন আপনার রবের সিদ্ধান্তের উপর; নিশ্চয় আপনি

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ۖ وَسَبِّحْ

---

(১) মক্কার কাফেররা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দেয়া ও তাকে হত্যা করার জন্য একত্রে বসে যে সলাপরামর্শ করতো ও ষড়যন্ত্র পাকাতো এখানে সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে। [দেখুন, কুরতুবী ,ফাতহুল কাদীর]

بِحَمْدِ رَبِّكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ﴿٤٨﴾

আমাদের চক্ষুর সামনেই রয়েছেন[১]। আপনি আপনার রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন যখন আপনি দণ্ডায়মান হন[২],

(১) শত্রুদের শত্রুতা-বিরোধিতার পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে সূরার উপসংহারে প্রথমে বলা হয়েছে যে, আপনি আমার দৃষ্টিতে আছেন। অর্থাৎ আল্লাহর চোখ আপনার হেফাযতে আছে। আপনাকে তিনি তাদের প্রত্যেক অনিষ্ট থেকে বাঁচিয়ে রাখবেন। [দেখুন, কুরতুবী] অন্য এক আয়াতে আছে ﴿وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ "আল্লাহ মানুষের অনিষ্ট থেকে আপনার হেফাযত করবেন।" [সূরা আল-মায়িদাহ:৬৭]

(২) এরপর আল্লাহ তা'আলার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণায় আত্মনিয়োগ করার আদেশ দেয়া হয়েছে, যা মানবজীবনের আসল লক্ষ্য এবং প্রত্যেক বিপদ থেকে বেঁচে থাকার প্রতিকারও। বলা হয়েছে, আল্লাহর সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করুন যখন আপনি দণ্ডায়মান হন। এখানে تقوم বা "দণ্ডায়মান হন" একথাটির কয়েকটি অর্থ হতে পারে এবং এখানে সবগুলো অর্থ গ্রহণীয় হওয়া অসম্ভব নয়। একটি অর্থ হচ্ছে, আপনি যখনই কোন মজলিস থেকে উঠবেন আল্লাহর প্রশংসা ও তাসবীহ করে উঠবেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও এ নির্দেশ পালন করতেন এবং মুসলিমদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে তারা যেন কোন মজলিস থেকে উঠার সময় আল্লাহর প্রশংসা ও তাসবীহ্ পাঠ করে। এভাবে সেই মজলিসে যেসব কথাবার্তা হয়েছে তার কাফফারা হয়ে যায়। হাদীসে এসেছে, যে ব্যক্তি কোন মজলিসে বসল এবং সেখানে অনেক বাকবিতণ্ডা করল সে যদি উঠে যাওয়ার সময় বলে, سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ "হে আল্লাহ! আমি আপনার প্রশংসাসহ তাসবীহ্ পাঠ করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি ছাড়া কোন হক্ক মা'বুদ নেই। আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি এবং আপনার কাছে তাওবা করছি।" [তিরমিযী:৩৪৩৩, মুসনাদে আহমাদ: ২/৪৯৪] তাহলে সেখানে যেসব ভুল ত্রুটি হবে আল্লাহ তা মাফ করে দেবেন। আতা ইবনে আবী রাবাহ রাহেমাহুল্লাহ বলেন, তুমি যখন মজলিস থেকে ওঠ, তখন তাসবীহ্ ও তাহ্মীদ কর। তুমি এই মজলিসে কোন সৎকাজ করে থাকলে তার পুণ্য অনেক বেড়ে যাবে। পক্ষান্তরে কোন পাপ কাজ করে থাকলে এই বাক্য তার কাফফারা হয়ে যাবে। এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, যখন তোমরা ঘুম থেকে জেগে বিছানা ছাড়বে তখন তাসবীহ্সহ তোমার রবের প্রশংসা কর। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটিও নিজে আমল করতেন এবং ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর একথাগুলো বলার জন্য সাহাবীদের শিক্ষা দিয়েছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি রাত্রে জাগ্রত হয়ে এই বাক্যগুলো পাঠ করে, সে যে দো'আই করে, তা-ই কবুল হয়। বাক্যগুলো এইঃ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

৪৯. আর তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করুন রাতের বেলা[১] ও তারকার অস্ত গমনের পর[২]।

وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُوْمِ ﴿٤٩﴾

"(একমাত্র লা-শরীক আল্লাহ্ ব্যতীত হক কোন ইলাহ নেই, তাঁর জন্যই যাবতীয় রাজত্ব, তাঁরই জন্য যাবতীয় প্রশংসা। আর তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। পবিত্র ও মহান আল্লাহ্, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, তিনি ব্যতীত আর কোন হক ইলাহ নেই, এবং তিনিই মহান। আর আল্লাহ্ ব্যতীত কোন বাঁচার পথ নেই, কোন শক্তিও নেই)" তারপর বলল, হে আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করে দিন, অথবা দো'আ করল, তার দো'আ কবুল করা হবে। তারপর যদি সে ওযু করে সালাত পড়ে, তবে তার সালাত কবুল করা হবে। [বুখারী:১১৫৪], এর তৃতীয় অর্থ হচ্ছে, আপনি যখন সালাতের জন্য দাঁড়াবেন তখন আল্লাহর হামদ ও তাসবীহ দ্বারা তার সূচনা করুন। এ হুকুম পালনের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তাকবীর তাহরীমার পর সালাত শুরু করবে একথা বলে, سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ [মুসলিম: ৩৯৯] এর চতুর্থ অর্থ হচ্ছে, যখন আপনি আল্লাহর পথে আহবান জানানোর জন্য প্রস্তুত হবেন তখন আল্লাহর প্রশংসা ও তাসবীহ দ্বারা তার সূচনা করুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ নির্দেশটিও স্থায়ীভাবে পালন করতেন। তিনি সবসময় আল্লাহর প্রশংসা দ্বারা তার খুতবা শুরু করতেন। তাফসীর বিশারদ ইবনে জারীর এর আরো একটি অর্থ বর্ণনা করেছেন। সে অর্থটি হচ্ছে, আপনি যখন দুপুরের আরামের পর উঠবেন তখন সালাত পড়বেন। অর্থাৎ যোহরের সালাত। [কুরতুবী]

(১) অর্থাৎ রাত্রে পবিত্রতা ঘোষণা করুন। এর অর্থ মাগরিব, ইশা এবং তাহজ্জুদের সালাত। সাথে সাথে এর দ্বারা কুরআন তিলাওয়াত, সাধারণ তাসবীহ্ পাঠ এবং আল্লাহর যিকরও বুঝানো হয়েছে। [দেখুন, কুরতুবী]

(২) অর্থাৎ তারকা অস্তমিত হওয়ার পর। এখানে ফজরের সালাত ও তখনকার তাসবীহ পাঠ বোঝানো হয়েছে। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, এখানে ফজরের সালাতের পূর্বের দু' রাকা'আত সুন্নাত সালাতকে বুঝানো হয়েছে। এ দু' রাকা'আত সালাতের ব্যাপারে হাদীসে বহু তাগীদ দেয়া হয়েছে। [কুরতুবী]হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন সুন্নাত সালাতের ব্যাপারে ফজরের দু' রাকা'আত সুন্নাত সালাতের চেয়ে বেশী গুরুত্ব দিতেন না। [বুখারী: ১১৬৯, মুসলিম: ৯৪] অপর হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "ফজরের দু' রাকা'আত সালাত দুনিয়া ও তাতে যা আছে তার থেকেও উত্তম" [মুসলিম: ৯৬]

৫৩- সূরা আন-নাজ্‌ম[১]
৬২ আয়াত, মক্কী

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. শপথ নক্ষত্রের, যখন তা হয় অস্তমিত[২],

وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى ﴿١﴾

২. তোমাদের সঙ্গী[৩] বিভ্রান্ত নয়,

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى ﴿٢﴾

---

(১) মুফাসসিরগণ সূরা আন-নাজমের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। যেমন, সূরা আন-নাজম প্রথম সূরা; যা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় ঘোষণা করেন [আততাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, এই সূরাতেই সর্বপ্রথম সেজদার আয়াত নাযিল হয় এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তেলাওয়াতের সেজদা করেন। মুসলিম ও কাফের সবাই এই সেজদায় শরীক হয়েছিল। কেবল এক অহংকারী ব্যক্তি সে সেজদা করেনি। সে এক মুষ্টি মাটি তুলে কপালে লাগিয়ে বলল, ব্যস এতটুকুই যথেষ্ট। আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ আমি সেই ব্যক্তিকে কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে দেখেছি। সে ছিল উমাইয়া ইবন খালাফ। [বুখারী:১০৬৭, ১০৭০, মুসলিম: ৫৭৬] ত্বাবরানীর বর্ণনায় এ কাফেরকে ওলীদ ইবনে মুগীরা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। [মু'জামুল কাবীর: ৯/৩৪, হাদীস ৮৩১৬] অনুরূপভাবে এই সূরার শুরুতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সত্য নবী হওয়া এবং তার প্রতি অবতীর্ণ ওহীতে সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ না থাকার কথা বর্ণিত হয়েছে। ত্বাবরানীর বর্ণনায় এ কাফেরকে ওলীদ ইবনে মুগীরা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। [মু'জামুল কাবীর: ৯/৩৪, হাদীস ৮৩১৬]

(২) নক্ষত্রমাত্রকেই نجم বলা হয় এবং বহুবচন نجوم [ইরাবুল কুরআন]। কখনও এই শব্দটি কয়েকটি নক্ষত্রের সমষ্টি সপ্তর্ষিমণ্ডলের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এই আয়াতেও কেউ কেউ নজমের তফসীর "সুরাইয়া" অর্থাৎ সপ্তর্ষিমণ্ডল দ্বারা করেছেন। সুদ্দী বলেন, এর অর্থ শুক্রগ্রহ। [কুরতুবী]। هوى শব্দটি পতিত হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়। নক্ষত্রের পতিত হওয়ার মানে অস্তমিত হওয়া। এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নক্ষত্রের কসম খেয়ে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওহী সত্য, বিশুদ্ধ ও সন্দেহ-সংশয়ের উর্ধ্বে। [আদওয়াউল বায়ান, সা'দী]

(৩) মূল শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে صَاحِبُكُمْ বা তোমাদের বন্ধু। এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বুঝানো হয়েছে এবং কুরাইশদের সম্বোধন করা হয়েছে। আরবী ভাষায় صاحب বলতে বন্ধু, সাথী, নিকটে অবস্থানকারী এবং সাথে উঠা-বসা করে এমন লোককে বুঝায়। এ স্থলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নাম অথবা নবী শব্দ ব্যবহার করার পরিবর্তে 'তোমাদের সঙ্গী'

বিপথগামীও নয়,

৩. আর তিনি মনগড়া কথা বলেন না(১)।

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۝٣

৪. তাতো কেবল ওহী, যা তার প্রতি ওহীরূপে প্রেরিত হয়,

إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى ۝٤

৫. তাকে শিক্ষা দান করেছেন প্রচণ্ড শক্তিশালী(২),

عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى ۝٥

৬. সৌন্দর্যপূর্ণ সত্তা(৩)। অতঃপর তিনি স্থির হয়েছিলেন(৪),

ذُوْ مِرَّةٍ ۭ فَاسْتَوٰى ۝٦

বলে ব্যক্ত করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইরে থেকে আগত কোন অপরিচিত ব্যক্তি নন, যার সত্যবাদিতায় তোমরা সন্দিগ্ধ হবে। বরং তিনি তোমাদের সার্বক্ষণিক সঙ্গী। [দেখুন, কুরতুবী; আততাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

(১) অর্থাৎ সেসব কথা তার মনগড়া নয় কিংবা তার প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা ঐ সবের উৎস নয়। তা আল্লাহর পক্ষ থেকে অহীর মাধ্যমে তার ওপর নাযিল করা হয়েছে এবং হচ্ছে। একইভাবে ইসলামের এ আন্দোলন, তাওহীদের এ শিক্ষা, আখেরাত, হাশর-নাশর এবং কাজকর্মের প্রতিদানের এ খবর মহাবিশ্ব ও মানুষ সম্পর্কে এসব সত্য ও তথ্য এবং পবিত্র জীবন যাপন করার জন্য যেসব নীতিমালা তিনি পেশ করছেন এসবও তার নিজের রচিত দর্শন নয়। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]।

(২) অর্থাৎ তাকে শিক্ষাদানকারী কোন মানুষ নয়, যা তোমরা মনে করে থাকো। মানব সত্তার উর্ধ্বের একটি মাধ্যম থেকে তিনি এ জ্ঞান লাভ করছেন। তাফসীরকারদের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এ ব্যাপারে একমত যে, "মহাশক্তির অধিকারী" এর অর্থ জিবরাঈল আলাইহিস্‌সালাম। [ফাতহুল কাদীর]

(৩) এর দ্বারা বোঝা যায় যে, ফেরেশতাগণ অত্যন্ত সুন্দর। তারা যেমন সুন্দর তাদের চরিত্রও তেমনি। তাই তারা কোন খারাপ সুরত গ্রহণ করেন না। বাহ্যিক ও অভ্যন্তরিন সার্বিকভাবে তারা সুন্দর। কোন কোন মুফাসসির مرة শব্দটির অর্থ করেছেন, শক্তিশালী হওয়া। জিবরাঈলের অধিক শক্তি বর্ণনা করার জন্যে এটাও তারই বিশেষণ। এতে করে এই ধারণার অবকাশ থাকে না, ওহী নিয়ে আগমনকারী ফেরেশতার কাজে কোন শয়তান প্রভাব বিস্তার করতে পারে। আবার কোন কোন মুফাসসির এর অর্থ করেছেন, প্রজ্ঞাসম্পন্ন, বিবেকবান। আবার কেউ কেউ অর্থ করেছেন, শারিরীক ও মানসিক সুস্থতা। এসবগুলোই মূলতঃ ফেরেশতাদের গুণ। [দেখুন, কুরতুবী]

(৪) এর অর্থ সোজা হয়ে গেলেন। এর দ্বারা উদ্দেশ্য যদি জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম হয়, তখন অর্থ হবে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরাঈলকে যখন

৭. আর তিনি ছিলেন ঊর্ধ্বদিগন্তে[১], | وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ۝

প্রথম দেখেন, তখন তিনি আকাশ থেকে নিচে অবতরণ করছিলেন। অবতরণের পর তিনি ঊর্ধ্ব দিগন্তে সোজা হয়ে বসে যান। রাসূলকে দেখা দেওয়ার পর পুনরায় তিনি তার জায়গায় ফিরে যান। অথবা সোজা হয়ে যাওয়ার অর্থ জিবরাইল তার সৃষ্ট সঠিক রূপে দাঁড়িয়ে গেলেন। যে প্রকৃত রূপে আল্লাহ্ তাকে সৃষ্টি করেছেন তিনি সে প্রকৃত রূপে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে উপস্থিত হলেন। আর যদি এখানে সোজা হয়ে যাওয়া দ্বারা কুরআন উদ্দেশ্য নেয়া হয় তখন আয়াতের অর্থ হবে, 'তারপর কুরআন রাসূলের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল'। আর যদি এখানে সোজা হওয়া দ্বারা আল্লাহকেই উদ্দেশ্য নেয়া হয়ে থাকে তখন এর অর্থ হবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর আরশের উপর উঠলেন। এ সব তাফসীর সবগুলিই সালফে সালেহীন থেকে বর্ণিত আছে এবং সবগুলিই উদ্দেশ্য হওয়া সম্ভব। [কুরতুবী; ইবন কাসীর]

(১) এ আয়াতে জিবরাঈলকে আসল আকৃতিতে দেখার বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। দিগন্ত অর্থ আসমানের পূর্ব প্রান্ত যেখানে সূর্য উদিত হয় এবং দিনের আলো ছড়িয়ে পড়ে। সূরা আত-তাকভীরের ২৩ আয়াতে একেই পরিষ্কার দিগন্ত বলা হয়েছে। দু'টি আয়াত থেকেই পরিষ্কার বুঝা যায় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমবার যখন জিবরাঈল আলইহিস সালামকে দেখেন তখন তিনি আসমানের পূর্ব প্রান্ত থেকে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। মূলতঃ মহাশক্তিশালী, সহজাত শক্তিসম্পন্ন বা প্রজ্ঞাবান, সৌন্দর্যমণ্ডিত, সোজা হওয়া, এবং নিকটবর্তী হওয়া এগুলো সব জিবরাঈলের বিশেষণ। এই তফসীরের পক্ষে অনেক সঙ্গত কারণ রয়েছে। ঐতিহাসিক দিক দিয়েও সূরা আন-নাজম সম্পূর্ণ প্রাথমিক সূরাসমূহের অন্যতম। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের বর্ণনা অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় সর্বপ্রথম যে সূরা প্রকাশ্যে পাঠ করেন তা সূরা আন-নাজম। বাহ্যত মে'রাজের ঘটনা এরপরে সংঘটিত হয়েছে। দ্বিতীয় কারণ এই যে, হাদীসে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসব আয়াতের যে তফসীর করেছেন, তাতে জিবরাঈলকে দেখার কথা উল্লেখিত আছে। ইমাম শা'বী তার উস্তাদ মাসরূক থেকে বর্ণনা করেন- তিনি একদিন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার কাছে ছিলেন এবং আল্লাহ তা'আলাকে দেখা সম্পর্কে আলোচনা চলছিল। মসরূক বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, ﴿وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِيْنِ﴾ এবং ﴿وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى﴾ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বললেন, মুসলিমদের মধ্যে সর্বপ্রথম আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি উত্তরে বলেছেন, আয়াতে যাকে দেখার কথা বলা হয়েছে, সে জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে মাত্র দু'বার আসল আকৃতিতে দেখেছেন। আয়াতে বর্ণিত দেখার অর্থ এই যে, তিনি জিবরাঈলকে আকাশ থেকে ভূমির দিকে অবতরণ করতে দেখেছেন। তার দেহাকৃতি আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী শূন্যমণ্ডলকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছিল। [বুখারী:৪৬১২, ৪৮৫৫, মুসলিম: ১৭৭/২৮৭, ২৮৮, ২৮৯, তিরমিযী:৩০৬৮, মুসনাদে আহমাদ:৬/২৪১] অন্য বর্ণনায় আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলেনঃ

এই আয়াত সম্পর্কে সর্বপ্রথম আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করেছি যে, আপনি আপনার পালনকর্তাকে দেখেছেন কি? তিনি বললেনঃ না, বরং আমি জিবরাঈলকে নিচে অবতরণ করতে দেখেছি। [মুসনাদে আহমাদ:৬/২৩৬] অনুরূপভাবে শায়বানী বর্ণনা করেন যে, তিনি আবু যরকে এই আয়াতের অর্থ জিজ্ঞাসা করেন, তিনি জওয়াবে বলেনঃ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরাঈলকে ছয়শত ডানাবিশিষ্ট দেখেছেন। [বুখারী: ৪৮৫৬] ইবনে জারীর রাহেমাহুল্লাহ আবদুল্লাহ ইবনে-মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরাঈলকে রফরফের পোশাক পরিহিত অবস্থায় দেখেছেন। তাঁর অস্তিত্ব আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী শূন্যমণ্ডলকে ভরে রেখেছিল। [তাফসীর তাবারী: ৩২৪৭০] এ সব বর্ণনা থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, সূরা নাজমের উল্লেখিত আয়াতসমূহ দেখা ও নিকটবর্তী হওয়া বলে জিবরাঈলকে দেখা ও নিকটবর্তী হওয়া বোঝানো হয়েছে। আয়েশা, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবুযর গেফারী, আবু হুরায়রা প্রমুখ সাহাবীর এই উক্তি। তাই ইবনে-কাসীর আয়াতসমূহের তফসীরে বলেনঃ আয়াতসমূহে উল্লেখিত দেখা ও নিকটবর্তী হওয়ার অর্থ জিবরাঈলকে দেখা ও জিবরাঈলের নিকটবর্তী হওয়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে প্রথমবার আসল আকৃতিতে দেখেছিলেন এবং দ্বিতীয়বার মে'রাজের রাত্রিতে সিদরাতুল-মুন্তাহার নিকটে দেখেছিলেন। প্রথমবারে দেখা নবুওয়তের সম্পূর্ণ প্রাথমিক যমানায় হয়েছিল। তখন জিবরাঈল সূরা ইকরার প্রাথমিক আয়াতসমূহের প্রত্যাদেশ নিয়ে প্রথমবার আগমন করেছিলেন। এরপর ওহীতে বিরতি ঘটে, যদ্দরুন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিদারুণ উৎকণ্ঠা ও দুর্ভাবনার মধ্যে দিন অতিবাহিত করেন। পাহাড় থেকে পড়ে আত্মহত্যা করার ধারণা বারবার তার মনে জাগ্রত হতে থাকে। কিন্তু যখনই এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হত, তখনই জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম দৃষ্টির অন্তরালে থেকে আওয়াজ দিতেনঃ হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনি আল্লাহ তা'আলার সত্য নবী, আর আমি জিবরাঈল। এই আওয়াজ শুনে তার মনের ব্যাকুলতা দূর হয়ে যেত। যখনই মনে বিরূপ কল্পনা দেখা দিত, তখনই জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম অদৃশ্যে থেকে এই আওয়াজের মাধ্যমে তাকে সান্ত্বনা দিতেন। অবশেষে একদিন জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম মক্কার উন্মুক্ত ময়দানে তার আসল আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করলেন। তার ছয়শত বাহু ছিল এবং তিনি গোটা দিগন্তকে ঘিরে রেখেছিলেন। এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট আসেন এবং তাকে ওহী পৌঁছান। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে জিবরাঈলের মাহাত্ম্য এবং আল্লাহ তা'আলার দরবারে তার সুউচ্চ মর্যাদার স্বরূপ ফুটে ওঠে। সারকথা এই যে, এই প্রথম দেখা এ জগতেই মক্কার দিগন্তে হয়েছিল। দ্বিতীয়বার দেখার কথা ﴿وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى﴾ আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে।

ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى ۝

৮. তারপর তিনি তার কাছাকাছি হলেন, অতঃপর খুব কাছাকাছি,

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى ۝

৯. ফলে তাদের মধ্যে দু ধনুকের ব্যবধান রইল অথবা তারও কম[১]।

فَاَوْحٰۤى اِلٰى عَبْدِهٖ مَاۤ اَوْحٰى ۝

১০. তখন আল্লাহ্‌ তাঁর বান্দার প্রতি যা ওহী করার তা ওহী করলেন[২]।

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى ۝

১১. যা তিনি দেখেছেন, তার অন্তঃকরণ তা মিথ্যা বলেনি[৩];

মে'রাজের রাত্রিতে এই দেখা হয়। উল্লেখিত কারণসমূহের ভিত্তিতে সুস্পষ্টভাবে এটাই বলা যায় যে, সূরা আন-নাজমের শুরুভাগের আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলাকে দেখার কথা আলোচিত হয়নি; বরং জিবরাঈলকে দেখার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। জিবরাঈলকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নিজস্ব আকৃতিতে দু'বার দেখেছেন। প্রথমবার নবুওয়াতের প্রারম্ভে। আর দ্বিতীয়টি মি'রাজের রাত্রিতে, সিদরাতুল মুন্তাহার নিকটে। [দেখুন, বুখারী: ৪৮৫৫, ৪৮৫৬]

(১) دَنَا শব্দের অর্থ নিকটবর্তী হল এবং فَتَدَلّٰى শব্দের অর্থ ঝুলে গেল। অর্থাৎ ঝুঁকে পড়ে নিকটবর্তী হল। ধনুকের কাঠ এবং এর বিপরীতে ধনুকের সুতার মধ্যবর্তী ব্যাবধানকে قاب বলা হয়। এই ব্যবধান আনুমানিক একহাত হয়ে থাকে। [কুরতুবী] আলোচ্য আয়াতসমূহে জিবরাঈল আলাইহিস্‌ সালাম-এর অধিকতর নিকটবর্তী হওয়ার বিষয়টি বর্ণনা করার কারণ এদিকে ইঙ্গিত করা যে, তিনি যে ওহী পৌঁছিয়েছেন তা শ্রবণে কোন সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই। [দেখুন, কুরতুবী]

(২) এখানে أَوْحٰى (বা ওহী প্রেরণ করেন) ক্রিয়াপদের কর্তা স্বয়ং আল্লাহ্‌ তা'আলা এবং عَبْدُهٗ (বা তার বান্দা) এর সর্বনাম দ্বারা আল্লাহ্‌ তা'আলাকেই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ জিবরাঈল আলাইহিস্‌ সালাম-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে প্রেরণ করে আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি ওহী নাযিল করলেন। [দেখুন, আততাহরীর ওয়াত তানওয়ীর, তাবারী] । এক হাদীসে এসেছে, তখন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তিনটি জিনিস দেয়া হয়। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, সূরা আল-বাকারাহ্‌ এর শেষ আয়াতসমূহ এবং তার উম্মতের মধ্যে যারা আল্লাহ্‌র সাথে শির্ক করবে না তাদের জন্য ক্ষমার ঘোষণা। [মুসলিম: ১৭৩]

(৩) فؤاد শব্দের অর্থ অন্তঃকরণ। উদ্দেশ্য এই যে, চক্ষু যা কিছু দেখেছে, অন্তঃকরণও তা যথাযথ উপলব্ধি করতে কোন ভুল করেনি। ﴿مَا رَاٰى﴾ শব্দের অর্থ যা কিছু দেখেছে। এখানে উদ্দেশ্য তিনি জিবরাঈল আলাইহিস্‌ সালাম-কে আসল আকৃতিতে দেখেছেন। [মুয়াসসার, কুরতুবী]

১২. তিনি যা দেখেছেন তোমরা কি সে বিষয়ে তাঁর সঙ্গে বিতর্ক করবে?	اَفَتُمٰرُوْنَهٗ عَلٰى مَا يَرٰى ﴿١٢﴾
১৩. আর অবশ্যই তিনি তাকে আরেকবার দেখেছিলেন	وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى ﴿١٣﴾
১৪. 'সিদরাতুল মুন্তাহা' তথা প্রান্তবর্তী কুল গাছ এর কাছে(১),	عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى ﴿١٤﴾
১৫. যার কাছে জান্নাতুল মা'ওয়া(২) অবস্থিত ।	عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى ﴿١٥﴾

এ আয়াতে فؤاد বা অন্তঃকরণকে উপলব্ধি করার কর্তা করা হয়েছে। অথচ অনেকের মতে উপলব্ধি করা বোধশক্তি বা عقل এর কাজ। [আততাহরীর ওয়াত তানওয়ীর] এই প্রশ্নের জওয়াব এই যে, পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, উপলব্ধির আসল কেন্দ্র অন্তঃকরণ। তাই কখনও বোধশক্তিকেও 'কলব' (অন্তঃকরণ) শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে দেয়া হয়; যেমন ﴿لِمَنْ كَانَ لَهٗ قَلْبٌ﴾ আয়াতে কলব বলে عقل বা বিবেক ও বোধশক্তি বোঝানো হয়েছে। পবিত্র কুরআনের ﴿لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا﴾ ইত্যাদি আয়াত এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

(১) এর অর্থ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক জিবরাঈলকে দ্বিতীয়বারের মত তার আসল আকৃতিতে দেখা। [বুখারী: ৩২৩৪, মুসলিম:১৭৪] দ্বিতীয়বারের এই দেখার স্থান সপ্তম আকাশের 'সিদরাতুল-মুন্তাহা' বলা হয়েছে। বলাবাহুল্য, মে'রাজের রাত্রিতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সপ্তম আকাশে গমন করেছিলেন। এতে করে দ্বিতীয়বার দেখার সময়ও মোটামুটিভাবে নির্দিষ্ট হয়ে যায়। অভিধানে 'সিদরাহ' শব্দের অর্থ বদরিকা বৃক্ষ। মুন্তাহা শব্দের অর্থ শেষপ্রান্ত। সপ্তম আকাশে আরশের নিচে এই বদরিকা বৃক্ষ অবস্থিত। মুসলিমের বর্ণনায় একে ষষ্ঠ আকাশে বলা হয়েছে। উভয় বর্ণনার সমন্বয় এভাবে হতে পারে যে, এই বৃক্ষের মূল শিকড় ষষ্ঠ আকাশে এবং শাখা প্রশাখা সপ্তম আকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। সাধারণ ফেরেশতাগণের গমনাগমনের এটাই শেষ সীমা। তাই একে মুন্তাহা বলা হয়। [ইবন কাসীর; কুরতুবী; আততাহরীর ওয়াত তানওয়ীর,ফাতহুল কাদীর] আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, আল্লাহ তা'আলার বিধানাবলি প্রথমে 'সিদরাতুল-মুন্তাহায়' নাযিল হয় এবং এখান থেকে সংশ্লিষ্ট ফেরেশতাগণের কাছে সোপর্দ করা হয়। যমীন থেকে আসমানগামী আমলনামা ইত্যাদিও ফেরেশতাগণ এখানে পৌঁছায় এবং এখান থেকে অন্য কোন পন্থায় আল্লাহ তা'আলার দরবারে পেশ করা হয়। [মুসলিম:১৭৩, মুসনাদে আহমাদ: ১/৩৮৭, ৪২২]

(২) المأوى শব্দের অর্থ ঠিকানা, বিশ্রামস্থল। জান্নাতকে مأوى বলার কারণ এই যে, এটাই মুমিনদের আসল ঠিকানা। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

১৬. যখন কুল গাছটিকে যা আচ্ছাদিত করার তা আচ্ছাদিত করেছিল[১],	إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ﴿١٦﴾
১৭. তার দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি, দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয়নি[২] ।	مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ﴿١٧﴾
১৮. অবশ্যই তিনি তার রবের মহান নিদর্শনাবলীর কিছু দেখেছিলেন;	لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ ﴿١٨﴾
১৯. অতএব, তোমরা আমাকে জানাও 'লাত' ও 'উয্‌যা' সম্পর্কে	أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ﴿١٩﴾
২০. এবং তৃতীয় আরেকটি 'মানাত' সম্পর্কে[৩] ?	وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ ﴿٢٠﴾

(১) অর্থাৎ যখন বদরিকা বৃক্ষকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল আচ্ছন্নকারী বস্তু । আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, তখন বদরিকা বৃক্ষের উপর স্বর্ণ নির্মিত প্রজাপতি চতুর্দিক থেকে এসে পতিত হচ্ছিল ।[মুসলিম: ১৭৩, মুসনাদে আহমাদ: ১/৩৮৭,৪২২] মনে হয়, আগন্তুক মেহমান রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সম্মানার্থে সেদিন বদরিকা বৃক্ষকে বিশেষভাবে সজ্জিত করা হয়েছিল । [কুরতুবী]

(২) زاغ শব্দটি زيغ থেকে উদ্ভূত । এর অর্থ বক্র হওয়া, বিপথগামী হওয়া । আর طغى শব্দটি طغيان থেকে উদ্ভূত । এর অর্থ সীমালঙ্ঘন করা । উদ্দেশ্য এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা কিছু দেখেছেন, তাতে দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি ।
তাছাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেদিন শুধু যে জিবরাঈলকে দেখেছেন তাও নয় । জিবরাইল ছাড়াও তিনি জান্নাত দেখেছেন, সিদরাতুল মুন্তাহা দেখেছেন, সেখানে যা পতিত হচ্ছিল তাও দেখেছেন, আল্লাহ্‌র অন্যান্য নিদর্শনাবলী দেখেছেন । মোটকথা: আল্লাহ্ তাকে যা দেখাতে চেয়েছেন তিনি তা স্পষ্টভাবে দেখেছেন । এর বাইরে দেখতে চাননি । এটা মূলত: আল্লাহ্‌র রাসূলের একটি গুণ যে, তিনি আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পথের বাইরে একটুও যাননি । [দেখুন, কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

(৩) অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের যে শিক্ষা দিচ্ছেন তোমরা তো তাকে গোমরাহী ও কুপথগামিতা বলে আখ্যায়িত করছো । অথচ এ জ্ঞান তাকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে দেয়া হচ্ছে । আর আল্লাহ তা'আলা তাকে চাক্ষুষভাবে এমন সব সত্য ও বাস্তবতা দেখিয়েছেন যার সাক্ষ্য তিনি তোমাদের সামনে পেশ করছেন । এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে মুশরিক আরবদের তিনজন দেবীর কথা উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে যাদেরকে মক্কা, তায়েফ, মদীনা এবং হিজাজের আশে পাশের লোক জন বেশী বেশী পূজা করত । এ তিনজন দেবীর মধ্যে (লাত) এর

২১. তবে কি তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান এবং আল্লাহ্‌র জন্য কন্যা সন্তান?

اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْاُنْثٰى ﴿٢١﴾

২২. এ রকম বন্টন তো অসঙ্গত[১]।

تِلْكَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِيْزٰى ﴿٢٢﴾

আস্তানা ছিল তায়েফে। বনী সাকীফ গোত্র তার পুজারী ছিল। লাত শব্দের অর্থ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। ইবনে জারীর তাবারীর জ্ঞানগর্ভ বিশ্লেষণ হচ্ছে এ শব্দটি আল্লাহ শব্দের স্ত্রীলিংগ। এর অর্থ ঘুরা বা কারো প্রতি ঝুঁকে পড়া। মুশরিকরা যেহেতু ইবাদাতের জন্য তার প্রতি মনযোগী হতো, তার সামনে ঝুঁকতো এবং তার তাওয়াফ করতো তাই তাকে 'লাত' আখ্যা দেয়া শুরু হলো। এর আরেক অর্থ মন্থন করা বা লেপন করা। ইবনে আব্বাস বলেন যে, "মুলত সে ছিল একজন মানুষ, যে তায়েফের সন্নিকটে এক কঙ্করময় ভুমিতে বাস করতো এবং হজের উদ্দেশ্যে গমনকারীদের ছাতু ও অন্যান্য খাদ্য খাওয়াতো।" [বুখারী: ৪৮৫৯] সে মারা গেলে লোকেরা ঐ কঙ্করময় ভূমিতে তার নামে একটা আস্তানা গড়ে তোলে এবং তার উপাসনা করতে শুরু করে। (উয্‌যা) শব্দটির উৎপত্তি 'আযীয' শব্দ থেকে। এর অর্থ সম্মানিতা। এটা ছিল কুরাইশদের বিশেষ দেবী। এর আস্তানা ছিল মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী "নাখলা" উপত্যকায়। বনী হাশেমের মিত্র বনী শায়বান গোত্রের লোক এর প্রতিবেশী ছিল। কুরাইশ এবং অন্যান্য গোত্রের লোকজন এর যিয়ারতের জন্য আসতো, এর উদ্দেশ্যে মানত করতো এবং বলি দান করতো। কা'বার মত এ স্থানটিতেও কুরবানী বা বলির জন্তু নিয়ে যাওয়া হতো এবং এটিকে সমস্ত মূর্তির চেয়ে অধিক সম্মান দেয়া হতো। (মানাত) এর আস্তানা ছিল মক্কা ও মদীনার মাঝে লোহিত সাগরের তীরবর্তী কুদাইদের মুশাল্লাল নামক স্থানে। বিশেষ করে খুযা'আ, আওস এবং খাযরাজ গোত্রের লোকেরা এর খুব ভক্ত ছিল। তার হজ ও তাওয়াফ করা হতো এবং তার উদ্দেশ্যে মানতের বলি দেয়া হতো। হজের মওসূমে হাজীরা বায়তুল্লাহর তাওয়াফ এবং আরাফাতে ও মিনায় অবস্থানের পর সেখান থেকে মানাতের যিয়ারত তথা দর্শনলাভের জন্য লাব্বায়কা লাব্বায়কা ধ্বনি দিতে শুরু করতো। যারা এ দ্বিতীয় হজ্জের নিয়ত করতো তারা সাফা এবং মারওয়ার মাঝে সাঈ করতো না। [দেখুন, বুখারী: ৪৮৬১] [ফাতহুল কাদীর; তাবারী, কুরতুবী;ইবন কাসীর]

(১) ضيزى শব্দটি ضوز থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ জুলুম করা, অধিকার খর্ব করা, অসংগত কিছু করা। অনেক মুফাসসির এর অর্থ করেছেন নিপীড়নমূলক বণ্টন। অর্থাৎ এসব দেবীদেরকে তোমরা আল্লাহর কন্যা সন্তান বলে ধরে নিয়েছো। [কুরতুবী , ফাতহুল কাদীর]এ অর্থহীন আকীদা-বিশ্বাস গড়ে নেয়ার সময় তোমরা আদৌ এ চিন্তা করনি যে, মেয়ে সন্তান জন্মগ্রহণকে তোমরা নিজেদের জন্য অপমানকর ও লজ্জাকর মনে করে থাক। তোমরা চাও যেন তোমরা পুত্র সন্তান লাভ কর। কিন্তু যখন আল্লাহর সন্তান আছে বলে ধরে নাও, তখন তাঁর জন্য কন্যা সন্তান বরাদ্দ কর। এটা কি নিপীড়নমূলক বণ্টন নয়? [মুয়াসসার]

২৩. এগুলো কিছু নাম মাত্র যা তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষরা রেখেছ, যার সমর্থনে আল্লাহ্ কোন দলীল-প্রমাণ নাযিল করেননি। তারা তো অনুমান এবং নিজেদের প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে, অথচ তাদের কাছে তাদের রবের পক্ষ থেকে হেদায়াত এসেছে[১]।

إِنْ هِيَ إِلَّآ أَسْمَآءٌ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَٰنٍ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ ۖ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ ٱلْهُدَىٰٓ ﴿٢٣﴾

২৪. মানুষ যা চায় তাই কি সে পায়?

أَمْ لِلْإِنسَٰنِ مَا تَمَنَّىٰ ﴿٢٤﴾

২৫. বস্তুতঃ আখেরাত ও দুনিয়া আল্লাহ্‌রই।

فَلِلَّهِ ٱلْءَاخِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ ﴿٢٥﴾

দ্বিতীয় রুকূ'

২৬. আর আসমানসমূহে বহু ফিরিশ্‌তা রয়েছে; তাদের সুপারিশ কিছুমাত্র ফলপ্রসূ হবে না, তবে আল্লাহ্‌র অনুমতির পর; যার জন্য তিনি ইচ্ছে করেন ও যার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট।

وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ لَا تُغْنِى شَفَٰعَتُهُمْ شَيْـًٔا إِلَّا مِنۢ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَىٰٓ ﴿٢٦﴾

২৭. নিশ্চয় যারা আখিরাতের উপর ঈমান আনে না তারাই নারীবাচক নাম দিয়ে থাকে ফিরিশ্‌তাদেরকে[২];

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْءَاخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلْأُنثَىٰ ﴿٢٧﴾

---

(১) অর্থাৎ প্রত্যেক যুগেই আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী-রাসূলগণ এসব পথহারা মানুষকে প্রকৃত সত্য সম্পর্কে অবহিত করেছেন। তারপর এখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসে সত্যিকার অর্থে বিশ্ব-জাহানের প্রভুত্ব ও ইবাদাত কার প্রাপ্য তা জানিয়ে দিয়েছেন। [ফাতহুল কাদীর]

(২) অর্থাৎ তাদের একটি নির্বুদ্ধিতা হচ্ছে, তারা ফেরেশতাদের উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে যারা আল্লাহ তা'আলার কাছে সুপারিশ পর্যন্ত করার সামর্থ ও সাহস রাখে না। তাছাড়া আরো নির্বুদ্ধিতা হচ্ছে এই যে, তারা তাদেরকে নারী বলে মনে করে এবং আল্লাহর কন্যা বলে আখ্যায়িত করে। এসব অজ্ঞতায় নিমজ্জিত হওয়ার মৌলিক কারণ হলো, তারা আখেরাতকে বিশ্বাস করে না। তারা যদি আখেরাতে বিশ্বাস করতো তাহলে এ ধরনের দায়িত্বহীন কথাবার্তা বলতে পারত না। [ফাতহুল কাদীর]

وَمَا لَهُم بِهِۦ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ ۖ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْـًٔا ﴿٢٨﴾

২৮. অথচ এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞানই নেই, তারা তো শুধু অনুমানেরই অনুসরণ করে; আর নিশ্চয় অনুমান সত্যের মোকাবিলায় কোনই কাজে আসে না[১]।

فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ﴿٢٩﴾

২৯. অতএব আপনি তাকে উপেক্ষা করে চলুন যে আমাদের স্মরণ[২] থেকে বিমুখ হয় এবং কেবল দুনিয়ার জীবনই কামনা করে।

ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱهْتَدَىٰ ﴿٣٠﴾

৩০. এটাই তাদের জ্ঞানের শেষ সীমা। নিশ্চয় আপনার রব, তিনিই ভাল জানেন কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনিই ভাল জানেন কে হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়েছে।

وَلِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِىَ ٱلَّذِينَ أَسَٰٓـُٔوا۟ بِمَا عَمِلُوا۟ وَيَجْزِىَ ٱلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ بِٱلْحُسْنَى ﴿٣١﴾

৩১. আর আসমানসমূহে যা কিছু আছে ও যমীনে যা কিছু আছে তা আল্লাহ্‌রই। যাতে তিনি তাদের কাজের প্রতিফল দিতে পারেন যারা মন্দ কাজ করে এবং তাদেরকে তিনি উত্তম পুরস্কার দিতে পারেন যারা সৎকাজ করে,

ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَٰٓئِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَٰحِشَ إِلَّا ٱللَّمَمَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ وَٰسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ ۚ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم

৩২. যারা বিরত থাকে গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কাজ থেকে, ছোটখাট অপরাধ ব্যতীত[৩]। নিশ্চয় আপনার রবের

---

(১) অর্থাৎ ফেরেশতারা যে স্ত্রীলোক এবং আল্লাহর কন্যা এ বিশ্বাসটি তারা জ্ঞান অর্জনের কোন একটি মাধ্যম ছাড়া জানতে পেরেছে বলে অবলম্বন করেনি। বরং নিজেদের অনুমান ও ধারণার ওপর ভিত্তি করে এ বিষয়টা স্থির করে নিয়েছে এবং এর ওপর ভিত্তি করেই এ সমস্ত আস্তানা গড়ে নিয়েছে। [ফাতহুল কাদীর]

(২) এখানে 'যিক্‌র' শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ কুরআন, ঈমান, আখিরাত কিংবা ইবাদত হতে পারে। [ফাতহুলকাদীর,আইসারুত তাফাসীর]

(৩) এতে اللمم শব্দের মাধ্যমে ব্যতিক্রম প্রকাশ করা হয়েছে। এই ব্যতিক্রমের সারমর্ম

مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ ﴿٣٢﴾

ক্ষমা অপরিসীম; তিনি তোমাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত---যখন তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলেন মাটি হতে এবং যখন তোমরা মাতৃগর্ভে ভ্রূণরূপে ছিলে। অতএব তোমরা আত্মপ্রশংসা করো না, তিনিই সম্যক জানেন তার সম্পর্কে যে তাকওয়া অবলম্বন করেছে[১]।

হচ্ছে, ছোটখাট গোনাহে লিপ্ত হওয়া তাদেরকে সৎকর্মীর উপাধি থেকে বঞ্চিত করে না। اللَّمَم শব্দের তাফসীর প্রসঙ্গে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের কাছ থেকে দু'রকম উক্তি বর্ণিত আছে। (এক) এর অর্থ সগীরা অর্থাৎ ছোটখাট গোনাহ। সূরা আন-নিসার ৩১ নং আয়াতে একে سيئات বলা হয়েছে। এই উক্তি ইবনে আব্বাস ও আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম থেকে ইবনে-কাসীর বর্ণনা করেছেন। (দুই) এর অর্থ সেসব গোনাহ, যা কদাচিৎ সংঘটিত হয়, অতঃপর তা থেকে তওবা করত চিরতরে বর্জন করা হয়। [ইবন কাসীর] এই উক্তিও ইবনে-কাসীর প্রথমে মুজাহিদ থেকে এবং পরে ইবনে আব্বাস ও আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকেও বর্ণনা করেছেন। [দেখুন, বুখারী: ৬৬১২]

(১) أجنة শব্দটি جَنِين এর বহুবচন। এর অর্থ গর্ভস্থিত ভ্রূণ। [কুরতুবী] আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, "তোমরা নিজেদের পবিত্রতা দাবি করো না। কারণ, আল্লাহ্-ই ভাল জানেন কে কতটুকু মুত্তাকী"। শ্রেষ্ঠত্ব তাকওয়ার ওপর নির্ভরশীল, বাহ্যিক কাজ-কর্মের ওপর নয়। তাকওয়াও তা-ই ধর্তব্য যা মৃত্যু পর্যন্ত কায়েম থাকে। যয়নব বিনতে আবু সালমা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা-এর পিতামাতা তার নাম রেখেছিলেন 'বাররা' যার অর্থ সৎকর্মপরায়ণ। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করে এই নাম রাখতে নিষেধ করেন। কারণ, এতে সৎ হওয়ার দাবি রয়েছে। অতঃপর তাঁর নাম পরিবর্তন করে যয়নব রাখা হয়। [মুসলিম: ১৮, ১৯]। অনরূপভাবে, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সামনে অন্য এক ব্যক্তির প্রশংসা করলে তিনি নিষেধ করে বললেনঃ তুমি যদি কারও প্রশংসা করতেই চাও, তবে এ কথা বলে করঃ আমার জানা মতে এই ব্যক্তি সৎ, আল্লাহ্‌ভীরু। সে আল্লাহর কাছেও পাক পবিত্র কিনা আমি জানি না। [বুখারী: ২৬৬২, মুসলিম: ৬৫, মুসনাদে আহমাদ:৫/৪১,৪৫] এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে একটি বর্ণনা এসেছে, সাবেত ইবনুল হারিস আনসারী বলেন, ইয়াহূদীদের কোন সন্তান ছোট অবস্থায় মারা গেলে তারা তাকে বলত, সে সিদ্দীকীনের মর্যাদায় পৌঁছে গেছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ কথা পৌঁছলে তিনি বললেন, ইয়াহূদীরা মিথ্যা বলেছে। কোন সন্তান তার মায়ের পেটে থাকতেই তার সৌভাগ্যবান হওয়া বা দূর্ভাগা হওয়া লিখে নেয়া

তৃতীয় রুকূ’

أَفَرَءَيْتَ الَّذِي تَوَلَّىٰ ﴿٣٣﴾

৩৩. আপনি কি দেখেছেন সে ব্যক্তিকে যে মুখ ফিরিয়ে নেয়;

وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ ﴿٣٤﴾

৩৪. এবং দান করে সামান্যই, পরে বন্ধ করে দেয়[১]?

أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰ ﴿٣٥﴾

৩৫. তার কাছে কি গায়েবের জ্ঞান আছে যে, সে প্রত্যক্ষ করে?

أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ﴿٣٦﴾

৩৬. নাকি তাকে জানানো হয়নি যা আছে মূসার সহীফায়,

وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ ﴿٣٧﴾

৩৭. এবং ইব্‌রাহীমের সহীফায়[২], যিনি পূর্ণ করেছিলেন (তার অঙ্গীকার)[৩]?

হয়েছে। তারপর আল্লাহ্ তা‘আলা উপরোক্ত আয়াত নাযিল করেন। [মু‘জামুল কাবীর লিত তাবরানী: ২/৮১,৮২ হাদীস নং ১৩৬৮]

(১) أكدى শব্দটি كدية থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সেই প্রস্তরখণ্ড, যা কূপ অথবা ভিত্তি খনন করার সময় মৃত্তিকা গর্ভ থেকে বের হয় এবং খননকার্যে বাধা সৃষ্টি করে। তাই এখানে أكدى এর অর্থ এই যে, প্রথমে কিছু দিল, এরপর হাত গুটিয়ে নিল। [ফাতহুল কাদীর] আয়াতের অর্থ এই হবে, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে কিছু ব্যয় করে অতঃপর তা পরিত্যাগ করে অথবা শুরুতে আল্লাহর আনুগত্যের দিকে কিছুটা আকৃষ্ট হয়,অতঃপর আনুগত্য বর্জন করে বসে। [মুয়াসসার]

(২) মূসা আলাইহিস্ সালামের সহীফা বলতে তাওরাতকে বোঝানো হয়েছে , কুরআনই একমাত্র গ্রন্থ যার দু’টি স্থানে ইব্রাহীমের সহীফার শিক্ষাসমূহের কোন কোন অংশ উদ্ধৃত হয়েছে। তার একটি স্থান হলো এটি এবং অপর স্থানটি হলো সূরা আল-আ’লার শেষ কয়েকটি আয়াত। [ফাতহুল কাদীর; কুরতুবী]

(৩) ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা বলেন, “ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের পূর্বে ইসলামের ত্রিশ অংশের পূর্ণ বাস্তবায়ন কেউ করতে পারেনি, এজন্যই আল্লাহ্ বলেছেন, ‘আর ইবরাহীম যিনি পূর্ণ করেছেন।” [মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৪৭০]
রেসালতের কর্তব্য পালনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সংশোধনও এর পর্যায়ভুক্ত। এক হাদীস দ্বারাও এর সমর্থন পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ “আল্লাহ বলেনঃ হে বনী আদম, দিনের শুরুতে আমার জন্যে চার রাকআত সালাত পড়, আমি দিনের শেষ পর্যন্ত তোমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাব।” [তিরমিযী:৪৭৫]

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ أُخْرَىٰ ﴿٣٨﴾

৩৮. তা এই যে[১], কোন বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না,

وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾

৩৯. আর এই যে, মানুষ তাই পায় যা সে চেষ্টা করে[২],

وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ﴿٤٠﴾

৪০. আর এই যে, তার প্রচেষ্টার ফল শীঘ্রই দেখা যাবে ---

ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ ﴿٤١﴾

৪১. তারপর তাকে দেয়া হবে পূর্ণ প্রতিদান,

وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ ﴿٤٢﴾

৪২. আর এই যে, সবার শেষ গন্তব্য তো আপনার রবের কাছে[৩],

وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ ﴿٤٣﴾

৪৩. আর এই যে, তিনিই হাসান এবং তিনিই কাঁদান[৪],

---

(১) এ আয়াত থেকে তিনটি বড় মূলনীতি পাওয়া যায়। কেয়ামতের দিন এক ব্যক্তির শাস্তি অপরের ঘাড়ে চাপানো হবে না এবং অপরের শাস্তি নিজে বরণ করার ক্ষমতাও কারও হবে না। [দেখুন, মুয়াসসার] অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে, ﴿وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ﴾ [সূরা ফাতির:১৮] অর্থাৎ কোন শক্তি যদি পাপের বোঝায় ভারাক্রান্ত হয়ে অপরকে অনুরোধ করে যে, আমার কিছু বোঝা তুমি বহন কর, তবে তার বোঝার কিয়দংশও বহন করার সাধ্য কারও হবে না।

(২) প্রত্যেক ব্যক্তি যা পরিণতি ভোগ করবে তা তার কৃতকর্মেরই ফল। চেষ্টা সাধনা ছাড়া কেউ-ই কিছু লাভ করতে পারে না। [কুরতুবী] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "মানুষ যখন মরে যায় তখন তিনটি কর্ম ব্যতীত আর কোন কাজ তার জন্য বাকী থাকে না। সাদকায়ে জারিয়া বা উপকৃত হওয়ার মত জ্ঞান অথবা এমন সৎ সন্তান যে তার জন্য দো'আ করে"। [মুসলিম: ১৬৩১]

(৩) উদ্দেশ্য এই যে, অবশেষে সবাইকে আল্লাহ তা'আলার দিকেই ফিরে যেতে হবে এবং কর্মের হিসাব-নিকাশ দিতে হবে। কোন কোন তফসীরবিদ এই বাক্যের অর্থ এরূপ সাব্যস্ত করেছেন যে, মানুষের চিন্তা-ভাবনার গতিধারা আল্লাহ তা'আলার সত্তায় পৌঁছে নিঃশেষ হয়ে যায়। তাঁর সত্তা ও গুণাবলির স্বরূপ চিন্তাভাবনার মাধ্যমে অর্জন করা যায় না [ইবন কাসীর; কুরতুবী]

(৪) অর্থাৎ কারও আনন্দ অথবা শোক এবং হাসি ও কান্না স্বয়ং তার কিংবা অন্য কারও করায়ত্ত নয়। এগুলো আল্লাহ তা'আলার পক্ষে থেকে আসে। তিনিই কারণ সৃষ্টি করেন এবং তিনিই কারণাদিকে ক্রিয়াশক্তি দান করেন। [ইবন কাসীর; কুরতুবী]

وَاَنَّهٗ هُوَ اَمَاتَ وَاَحْيَا ﴿٤٤﴾

৪৪. আর এই যে, তিনিই মারেন এবং তিনিই বাঁচান,

وَاَنَّهٗ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ﴿٤٥﴾

৪৫. আর এই যে, তিনিই সৃষ্টি করেন যুগল---পুরুষ ও নারী

مِنْ نُّطْفَةٍ اِذَا تُمْنٰى ﴿٤٦﴾

৪৬. শুক্রবিন্দু হতে, যখন তা স্খলিত হয়,

وَاَنَّ عَلَيْهِ النَّشْاَةَ الْاُخْرٰى ﴿٤٧﴾

৪৭. আর এই যে, পুনরুত্থান ঘটানোর দায়িত্ব তাঁরই[১],

وَاَنَّهٗ هُوَ اَغْنٰى وَاَقْنٰى ﴿٤٨﴾

৪৮. আর এই যে, তিনিই অভাবমুক্ত করেন এবং সম্পদ দান করেন[২],

وَاَنَّهٗ هُوَ رَبُّ الشِّعْرٰى ﴿٤٩﴾

৪৯. আর এই যে, তিনি শি'রা নক্ষত্রের রব[৩] ।

وَاَنَّهٗ اَهْلَكَ عَادَا ِۨالْاُوْلٰى ﴿٥٠﴾

৫০. আর এই যে, তিনিই প্রাচীন 'আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছিলেন,

وَثَمُوْدَاۡ فَمَاۤ اَبْقٰى ﴿٥١﴾

৫১. এবং সামূদ সম্প্রদায়কেও[৪]; অতঃপর

(১) অর্থাৎ যিনি মানুষকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, তার জন্য মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করা কোন কঠিন কাজ নয়। সেদিন হচ্ছে কিয়ামতের দিন। [ইবন কাসীর]

(২) غناء শব্দের অর্থ ধনাঢ্যতা এবং أغنى শব্দের অর্থ অপরকে ধনাঢ্য করা। أقنى শব্দটি قنية থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সংরক্ষিত ও রিজার্ভ সম্পদ। [আততাহরীর ওয়াত তানওয়ীর] আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলাই মানুষকে ধনবান ও অভাবমুক্ত করেন এবং তিনিই যাকে ইচ্ছা সম্পদ দান করেন; যাতে সে তা সংরক্ষিত করে। [মুয়াসসার]

(৩) شعرى একটি নক্ষত্রের নাম। আরবের কোন কোন সম্প্রদায় এই নক্ষত্রের পূজা করত। তাই বিশেষভাবে এর নাম উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, এই নক্ষত্রের মালিক ও পালনকর্তা আল্লাহ তা'আলাই; যদিও সমস্ত নক্ষত্র, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা, মালিক ও পালনকর্তা তিনি। [কুরতুবী]

(৪) 'আদ' জাতি ছিল পৃথিবীর শক্তিশালী দুর্ধর্ষতম জাতি। তাদের দুটি শাখা পর পর প্রথম ও দ্বিতীয় নামে পরিচিত। তাদের প্রতি হুদ আলাইহিস্ সালাম-কে রাসূলরূপে প্রেরণ করা হয়। অবাধ্যতার কারণে ঝঞ্ঝা বায়ুর আযাব আসে। ফলে সমগ্র জাতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যায়। কওমে-নূহের পর তারাই সর্বপ্রথম আযাব দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ছামূদ সম্প্রদায়ও তাদের অপর শাখা। তাদের প্রতি সালেহ আলাইহিস্ সালাম-কে

কাউকেও তিনি বাকী রাখেননি---

৫২. আর এদের আগে নূহের সম্প্রদায়কেও, নিশ্চয় তারা ছিল অত্যন্ত যালিম ও চরম অবাধ্য।

وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ ﴿٥٢﴾

৫৩. আর তিনি উল্টানো আবাসভূমিকে নিক্ষেপ করেছিলেন,(১)

وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ ﴿٥٣﴾

৫৪. অতঃপর সেটাকে আচ্ছন্ন করল যা আচ্ছন্ন করার(২)!

فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ ﴿٥٤﴾

৫৫. সুতরাং (হে মানুষ!) তুমি তোমার রবের কোন্ অনুগ্রহ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করবে(৩)?

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ ﴿٥٥﴾

৫৬. এ নবীও(৪) অতীতের সতর্ককারীদের মতই এক সতর্ককারী।

هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ ﴿٥٦﴾

প্রেরণ করা হয়। যারা অবাধ্যতা করে, তাদের প্রতি বজ্রনিনাদের আযাব আসে। ফলে তারা হৃদপিণ্ড বিদীর্ণ হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। [কুরতুবী]

(১) مؤتفكة এর অর্থ, উল্টোকৃত। লূত আলাইহিস্ সালাম তাদের প্রতি প্রেরিত হন। অবাধ্যতা ও নির্লজ্জতার শাস্তিস্বরূপ জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম তাদের জনপদসমূহ উল্টে দেন। [কুরতুবী]

(২) অর্থাৎ আচ্ছন্ন করে নিল জনপদগুলোকে উল্টে দেয়ার পর। তাদের ওপর প্রস্তর বর্ষণ করা হয়েছিল। [কুরতুবী]।

(৩) تمارى শব্দের এক অর্থ, সন্দেহ পোষণ করা। আরেক অর্থ বিবাদ ও বিরোধিতা করা। [তাবারী]

(৪) هذا শব্দ দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অথবা কুরআনের প্রতি ইশারা হয়েছে। অর্থাৎ ইনি অথবা এই কুরআনও পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণ অথবা কিতাবসমূহের ন্যায় আল্লাহর পক্ষ থেকে সতর্ককারীরূপে প্রেরিত। ইনি সরল পথ এবং দ্বীন ও দুনিয়ার সাফল্য সংবলিত নির্দেশাবলি নিয়ে আগমন করেছেন এবং বিরুদ্ধাচরণকারীদেরকে আল্লাহর শাস্তির ভয় দেখান। তাছাড়া এর দ্বারা তৃতীয় আরেকটি অর্থ হতে পারে, তা হচ্ছে, অতীতের ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের পরিণতি যা পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণনা করা হয়েছে, তা তোমাদের জন্য ভীতি প্রদর্শনকারী। [কুরতুবী]

৫৭. কিয়ামত আসন্ন[১],	أَزِفَتِ الْآزِفَةُ ﴿٥٧﴾
৫৮. আল্লাহ্ ছাড়া কেউই এটা প্রকাশ করতে সক্ষম নয়।	لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ﴿٥٨﴾
৫৯. তোমরা কি এ কথায় বিস্ময় বোধ করছ!	أَفَمِنْ هَٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ﴿٥٩﴾
৬০. আর হাসি-ঠাট্টা করছ! এবং কাঁদছো না[২]?	وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ﴿٦٠﴾
৬১. আর তোমরা উদাসীন[৩],	وَأَنتُمْ سَامِدُونَ ﴿٦١﴾
৬২. অতএব আল্লাহ্কে সিজ্‌দা কর এবং তাঁর 'ইবাদাত কর[৪]।	فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ۩ ﴿٦٢﴾

(১) আয়াতের শাব্দিক অর্থ দাঁড়ায়, নিকটে আগমনকারী বস্তু নিকটে এসে গেছে। আল্লাহ ব্যতীত কেউ এর গতিরোধ করতে পারবে না। [ইবন কাসীর; মুয়াসসার]। এখানে নিকটে আগমনকারী বলে কেয়ামত বোঝানো হয়েছে। সমগ্র বিশ্বের বয়সের দিক দিয়ে কেয়ামত নিকটে এসে গেছে। [কুরতুবী]

(২) ﴿هَٰذَا الْحَدِيثِ﴾ বলে কুরআন বোঝানো হয়েছে। [কুরতুবী] অর্থ এই যে, কুরআন স্বয়ং তোমাদের সামনে এসে গেছে। এ জন্যেও কি তোমরা আশ্চর্যবোধ করছ, উপহাসের ছলে হাস্য করছ এবং গোনাহ ও ত্রুটির কারণে ক্রন্দন করছ না? [মুয়াসসার]

(৩) سمود এর আভিধানিক অর্থ উদাসিনতা, গাফিলতি ও নিশ্চিন্ততা। এর অপর অর্থ গান-বাজনা করা। এস্থলে এই অর্থও হতে পারে। মক্কার কাফেররা কুরআনের আওয়াজকে স্তব্ধ করতে ও মানুষের দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য জোরে জোরে গান বাদ্য শুরু করতো। এখানে সেদিকেই ইংগিত দেয়া হয়েছে। কাতাদা এর অর্থ করেছেন غَافِلُوْنَ বা উদাসীন। আর সায়ীদ ইবনে জুবাইর অর্থ করেছেন مُعْرِضُوْنَ বা বিমুখ। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

(৪) এসব আয়াতের দাবি এই যে, তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে বিনয় ও নম্রতা সহকারে নত হও এবং সেজদা কর ও একমাত্র তাঁরই ইবাদত কর। [মুয়াসসার] ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে যে, সূরা নাজমের এই আয়াত পাঠ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেজদা করলেন এবং তার সাথে সব মুসলিম, মুশরিক, জিন ও মানব সেজদা করল। [বুখারী:৪৮৬২] অপর এক হাদীসে আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরা নজম পাঠ করত তেলাওয়াতের সেজদা আদায় করলে তার সাথে উপস্থিত সকল মুমিন ও মুশরিক সেজদা করল, একজন কোরাইশী

বৃদ্ধ ব্যতীত। সে একমুষ্টি মাটি তুলে নিয়ে কপালে স্পর্শ করে বললঃ আমার জন্য এটাই যথেষ্ট। [বুখারীঃ ১০৬৭, ১০৭০, মুসলিম:৫৭৬] আবদুল্লাহ ইবনে-মসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ এই ঘটনার পর আমি বৃদ্ধকে কাফের অবস্থায় নিহত হতে দেখেছি। সে ছিল উমাইয়া ইবনে খালাফ। [বুখারীঃ ৪৮৬৩]।

৫৪- সূরা আল-কামার
৫৫ আয়াত, মক্কী

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ①

১. কিয়ামত কাছাকাছি হয়েছে(১), আর চাঁদ বিদীর্ণ হয়েছে(২),

(১) পূর্ববর্তী সুরা আন-নাজমে ৫৭ ﴿اَزِفَتِ الْاٰزِفَةُ﴾ বলে সমাপ্ত করা হয়েছে, যাতে কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। আলোচ্য সূরাকে এই বিষয়বস্তু দ্বারাই অর্থাৎ ﴿اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ﴾ বলে শুরু করা হয়েছে।[কুরতুবী] কেয়ামতের বিপুলসংখ্যক আলামতের মধ্যে সর্ববৃহৎ আলামত হচ্ছে খোদ শেষনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুওয়াত।[কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর] এক হাদীসে তিনি বলেন, আমার আগমন ও কেয়ামত হাতের দুই অঙ্গুলির ন্যায় অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।[বুখারী:৪৯৩৬, ৬৫০৩, মুসলিম:২৯৫০, মুসনাদে আহমাদ:৫/৩৩৮] আরও কতিপয় হাদীসে এই নৈকট্যের বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে।

(২) এখানে কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার একটি দলীল চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার মু'জিযায় আলোচিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মু'জিযা হিসাবে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে আলাদা হয়ে যাওয়া কেয়ামতের একটি বড় আলামত। এছাড়াও এই মু'জিযাটি আরও এক দিক দিয়ে কেয়ামতের আলামত। তা এই যে, চন্দ্র যেমন আল্লাহর কুদরতে দুই খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, তেমনিভাবে কেয়ামতে সমস্ত গ্রহ উপগ্রহের খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাওয়া কোন অসম্ভব ব্যাপার নয়। মক্কার কাফেররা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে তার রেসালাতের সপক্ষে কোন নিদর্শন চাইলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর সত্যতার প্রমাণ হিসেবে চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার মু'জিযা প্রকাশ করেন। এই মু'জিযার প্রমাণ কুরআন পাকের এই আয়াতে আছে এবং অনেক সহীহ হাদীসেও আছে। এসব হাদীস সাহাবায়ে কেরামের একটি বিরাট দলের রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণিত আছে। তাদের মধ্যে রয়েছেন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, জুবায়ের ইবনে মুতইম, ইবনে আব্বাস ও আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম প্রমুখ। আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ এ কথাও বর্ণনা করেন যে, তিনি তখন অকুস্থলে উপস্থিত ছিলেন এবং মু'জিযা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন। ইমাম তাহাভী ও ইবনে কাসীর এই মু'জিযা সম্পর্কিত সকল রেওয়ায়েতকে 'মুতাওয়াতির' বলেছেন। তাই এই মু'জিযার বাস্তবতা অকাট্য রূপে প্রমাণিত। যা অস্বীকার করা সুস্পষ্ট কুফরী।[দেখুন, ইবন কাসীর; কুরতুবী; ফাতহুলকাদীর]

ঘটনার সার-সংক্ষেপ এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় ছিলেন। তখন মুশরিকরা তার কাছে নবুওয়াতের নিদর্শন চাইল। তখন ছিল চন্দ্রোজ্জ্বল রাত্রি। আল্লাহ তা'আলা এই সুস্পষ্ট অলৌকিক ঘটনা দেখিয়ে দিলেন

যে, চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে একখণ্ড পুর্বদিকে ও অপরখণ্ড পশ্চিমদিকে চলে গেল এবং উভয় খণ্ডের মাঝখানে পাহাড় অন্তরাল হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপস্থিত সবাইকে বললেনঃ দেখ এবং সাক্ষ্য দাও। সবাই যখন পরিষ্কাররূপে এই মু'জিযা দেখে নিল, তখন চন্দ্রের উভয় খণ্ড পুনরায় একত্রিত হয়ে গেল। কোন চক্ষুষ্মান ব্যক্তির পক্ষে এই সুস্পষ্ট মু'জিযা অস্বীকার করা সম্ভবপর ছিল না, কিন্তু মুশরিকরা বলতে লাগলঃ মুহাম্মদ সারা বিশ্বের মানুষকে জাদু করতে পারবে না। অতএব, বিভিন্ন স্থান থেকে আগত লোকদের জন্য অপেক্ষা কর। তারা কি বলে শুনে নাও। এরপর বিভিন্ন স্থান থেকে আগন্তুক মুশরিকদেরকে তারা জিজ্ঞাসাবাদ করল। তারা সবাই চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় দেখেছে বলে স্বীকার করল। নিম্নে এতদসংক্রান্ত বর্ণনাসমূহের কয়েকটি উল্লেখ করা হলো।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণনা করেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আমলে চন্দ্র বিদীর্ণ হয়ে দুই খণ্ড হয়ে গেল। সবাই এই ঘটনা অবলোকন করল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ তোমরা সাক্ষ্য দাও।[বুখারী:৩৮৬৯, মুসলিম:২৮০০, তিরমিযী: ৩২৮৫, মুসনাদে আহমাদ:১/৩৭৭]

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে অপর বর্ণনায় এসেছে, মক্কায় (অবস্থানকালে) চন্দ্র বিদীর্ণ হয়ে দুই খণ্ড হয়ে যায়। কোরাইশ কাফেররা বলতে থাকে, এটা জাদু, মুহাম্মদ তোমাদেরকে জাদু করেছে। অতএব, তোমরা বহির্দেশ থেকে আগমনকারী মুসাফিরদের অপেক্ষা কর। যদি তারাও চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় দেখে থাকে, তবে মুহাম্মদের দাবি সত্য। পক্ষান্তরে তারা এরূপ দেখে না থাকলে এটা জাদু ব্যতীত কিছু নয়। এরপর বহির্দেশ থেকে আগত মুসাফিরদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করায় তারা সবাই চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় দেখেছে বলে স্বীকার করে। [আবুদাউদ তায়ালেসী: ১/৩৮, হাদীস নং ২৯৫, বাইহাকী: দালায়েল ২/২৬৬]

জুবাইর ইবন মুতইম রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসূলের যুগে চাঁদ ফেটে গিয়ে দু ভাগে বিভক্ত হয়েছিল। এর এক অংশ ছিল এ পাহাড়ের উপর অপর অংশ অন্য পাহাড়ের উপর। তখন মুশরিকরা বলল, মুহাম্মাদ আমাদেরকে জাদু করেছে। তারপর তারা আবার বলল, যদি তারা আমাদেরকে জাদু করে থাকে তবে সে তো আর দুনিয়াসুদ্ধ সবাইকে জাদু করতে পারবে না। [মুসনাদে আহমাদ:৪/৮১-৮২]

আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণনা করেনঃ মক্কাবাসীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে নবুওয়তের কোন নিদর্শন দেখতে চাইলে আল্লাহ তা'আলা চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় দেখিয়ে দিলেন। তারা হেরা পর্বতকে

وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ﴿٢﴾

২. আর তারা কোন নিদর্শন দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, 'এটা তো চিরাচরিত জাদু[১]।'

وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ۚ وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ ﴿٣﴾

৩. আর তারা মিথ্যারোপ করে এবং নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে, অথচ প্রতিটি বিষয়ই শেষ লক্ষ্যে পৌঁছবে[২]।

وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ﴿٤﴾

৪. আর তাদের কাছে এসেছে সংবাদসমূহ, যাতে আছে কঠোর নিষেধাজ্ঞা;

حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ ۖ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ ﴿٥﴾

৫. এটা পরিপূর্ণ হিকমত, কিন্তু ভীতিপ্রদর্শন তাদের কোন কাজে

উভয় খণ্ডের মাঝখানে দেখতে পেল। [বুখারী: ৩৮৬৮, মুসলিম: ২৮০২]
আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এ আয়াতের তাফসীর করার সময় বলেন, এটা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে ঘটেছিল। চাঁদ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। একভাগ পাহাড়ের সামনে অপর ভাগ পাহাড়ের পিছনে ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা সাক্ষী থাক। [মুসলিম: ২১৫৯, তিরমিযী: ৩২৮৮]
আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে চাঁদ ফেটেছিল। [বুখারী: ৪৮৬৬]

(১) مُسْتَمِرٌّ শব্দের প্রচলিত অর্থ দীর্ঘস্থায়ী। এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। এক, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতদিন একের পর এক যে জাদু চালিয়ে যাচ্ছেন, নাউযুবিল্লাহ-এটিও তার একটি। দুই, এটা পাকা জাদু। অত্যন্ত নিপুণভাবে এটি দেখানো হয়েছে। তিন, অন্য সব জাদু যেভাবে অতীত হয়ে গিয়েছে এটিও সেভাবে অতীত হয়ে যাবে, এর দীর্ঘস্থায়ী কোন প্রভাব পড়বে না। এটা স্বল্পক্ষণস্থায়ী জাদুর প্রতিক্রিয়া, যা আপনাআপনি নিঃশেষ হয়ে যাবে। [বাগভী, কুরতুবী]

(২) استقرار এর শাব্দিক অর্থ স্থির হওয়া। অর্থাৎ যারা ন্যায় ও সত্যপন্থী, তারা ন্যায় ও সত্যপন্থা অনুসরণের এবং যারা বাতিল পন্থী, তারা বাতিল পন্থা অনুসরণের ফল একদিন অবশ্যই লাভ করবে। তাছাড়া যে সমস্ত নির্দেশ সংঘটিত হবার তা অবশ্যই ঘটবে এটাকে কেউ আটকিয়ে রাখতে পারবে না। যারা আল্লাহ্‌র নির্দেশ মানবে তারা জান্নাতে যাওয়া যেমন অবশ্যম্ভাবী তেমনি যারা মিথ্যাচার করবে এবং অমান্য করবে তাদের শাস্তিও অবধারিত। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

লাগেনি।

৬. অতএব, আপনি তাদের উপেক্ষা করুন। (স্মরণ করুন) যেদিন আহ্বানকারী আহ্বান করবে এক ভয়াবহ পরিণামের দিকে,

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُّكُرٍ ⑥

৭. অপমানে অবনমিত নেত্রে[১] সেদিন তারা কবর হতে বের হবে, মনে হবে যেন তারা বিক্ষিপ্ত পঙ্গপাল,

خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ⑦

৮. তারা আহ্বানকারীর দিকে ছুটে আসবে ভীত-বিহ্বল হয়ে[২]। কাফিররা বলবে, 'বড়ই কঠিন এ দিন।'

مُّهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ ۖ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ⑧

৯. এদের আগে নূহের সম্প্রদায়ও মিথ্যারোপ করেছিল--- সুতরাং তারা আমাদের বান্দার প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল আর বলেছিল, 'পাগল', আর তাকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল[৩]।

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ ⑨

(১) অর্থাৎ তাদের দৃষ্টি অবনতে থাকবে। এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। এক, ভীতি ও আতঙ্ক তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। দুই, তাদের মধ্যে লজ্জা ও অপমানবোধ জাগ্রত হবে এবং চেহারায় তার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে। তিন, তারা হতবুদ্ধি হয়ে তাদের চোখের সামনে বিদ্যমান সে ভয়াবহ দৃশ্য দেখতে থাকবে। তা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়ার হুঁশও তাদের থাকবে না। [দেখুন, কুরতুবী; ফাতহুলকাদীর]

(২) مهطع এর শাব্দিক অর্থ মাথা তোলা, আরেক অর্থ, দ্রুতগতিতে ছুটা। আয়াতের অর্থ এই যে, আহ্বানকারীর প্রতি তাকিয়ে হাশরের ময়দানের দিকে দ্রুতগতিতে ছুটতে থাকবে। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

(৩) وازدجر শব্দটির অর্থ, হুমকি প্রদর্শন করা হল। উদ্দেশ্য এই যে, তারা নূহ আলাইহিস্ সালাম-কে পাগলও বলল এবং তাকে হুমকি প্রদর্শন করে রেসালতের কর্তব্য পালন থেকে বিরতও রাখতে চাইল। [ফাতহুল কাদীর] অন্য এক আয়াতে আছে যে, তারা নূহ আলাইহিস্ সালাম-কে হুমকি প্রদর্শন করে বললঃ যদি আপনি প্রচার ও দাওয়াতের কাজ থেকে বিরত না হন, তবে আমরা আপনাকে প্রস্তর বর্ষণ করে মেরে ফেলব। [সূরা আস-শু'আরা:১১৬]

فَدَعَا رَبَّهُۥٓ أَنِّى مَغْلُوبٌ فَٱنتَصِرْ ﴿١٠﴾

১০. তখন তিনি তাঁর রবকে আহ্বান করে বলেছিলেন, 'নিশ্চয় আমি অসহায়, অতএব আপনি প্রতিবিধান করুন।'

فَفَتَحْنَآ أَبْوَٰبَ ٱلسَّمَآءِ بِمَآءٍ مُّنْهَمِرٍ ﴿١١﴾

১১. ফলে আমরা উন্মুক্ত করে দিলাম আকাশের দ্বারসমূহ প্রবল বর্ষণশীল বারিধারার মাধ্যমে,

وَفَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونًا فَٱلْتَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٰٓ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ﴿١٢﴾

১২. এবং মাটি থেকে উৎসারিত করলাম ঝর্ণাসমূহ; ফলে সমস্ত পানি মিলিত হল এক পরিকল্পনা অনুসারে[১]।

وَحَمَلْنَٰهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَٰحٍ وَدُسُرٍ ﴿١٣﴾

১৩. আর নূহকে আমরা আরোহণ করালাম কাঠ ও পেরেগ নির্মিত এক নৌযানে[২],

تَجْرِى بِأَعْيُنِنَا جَزَآءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ ﴿١٤﴾

১৪. যা চলত আমাদের চোখের সামনে; এটা পুরস্কার তাঁর জন্য, যার সাথে কুফরী করা হয়েছিল।

وَلَقَد تَّرَكْنَٰهَآ ءَايَةً فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴿١٥﴾

১৫. আর অবশ্যই আমরা এটাকে রেখে দিয়েছি এক নিদর্শনরূপে[৩]; অতএব

---

(১) অর্থাৎ ভূমি থেকে স্ফীত পানি এবং আকাশ থেকে বর্ষিত পানি এভাবে পরস্পরে মিলিত হয়ে গেল যে, সমগ্র জাতিকে ডুবিয়ে মারার যে পরিকল্পনা আল্লাহ তা'আলা করেছিলেন, তা বাস্তবায়িত হয়ে গেল। [কুরতুবী]

(২) ألواح শব্দটি لوح এর বহুবচন। অর্থ কাঠের তক্তা। আর دُسر শব্দটি دسار এর বহুবচন। অর্থ পেরেক, কীলক, যার সাহায্যে তক্তাকে সংযুক্ত করা হয়। উদ্দেশ্য নৌকা। [ফাতহুল কাদীর; কুরতুবী]

(৩) আয়াতের এ অর্থও হতে পারে যে, আমরা এ আযাবকে শিক্ষণীয় নির্দশন বানিয়ে দিয়েছি। তবে অগ্রাধিকার যোগ্য অর্থ হচ্ছে, সে জাহাজকে শিক্ষণীয় নিদর্শন বানিয়ে দেয়া হয়েছে। একটি সুউচ্চ পর্বতের ওপরে তার অস্তিত্ব টিকে থাকা হাজার হাজার বছর ধরে মানুষকে আল্লাহর গযব সম্পর্কে সাবধান করে আসছে। তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, এ ভূ-খণ্ডে আল্লাহর নাফরমানদের জন্য কি দুর্ভাগ্য নেমে এসেছিল এবং ঈমান গ্রহণকারীদের কিভাবে রক্ষা করা হয়েছিল। [দেখুন, কুরতুবী; ফাতহুলকাদীর]

উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?

১৬. সুতরাং কী কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও ভীতিপ্রদর্শন!

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنُذُرِ ⑯

১৭. আর অবশ্যই আমরা কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য[1]; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ⑰

১৮. ‘আদ সম্প্রদায় মিথ্যারোপ করেছিল, ফলে কিরূপ ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী!

كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنُذُرِ ⑱

১৯. নিশ্চয় আমরা তাদের উপর পাঠিয়েছিলাম এক প্রচণ্ড শীতল ঝড়োহাওয়া নিরবচ্ছিন্ন অমঙ্গল দিনে,

اِنَّآ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِيْ يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ ⑲

২০. তা মানুষকে উৎখাত করেছিল যেন তারা উৎপাটিত খেজুর গাছের কাণ্ড।

تَنْزِعُ النَّاسَ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنْقَعِرٍ ⑳

২১. অতএব কী কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও ভীতিপ্রদর্শন!

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنُذُرِ ㉑

২২. আর অবশ্যই আমরা কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ㉒

দ্বিতীয় রুকূ’

২৩. সামূদ সম্প্রদায় সতর্ককারীদের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল,

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِالنُّذُرِ ㉓

---

(১) ذكر এর অর্থ দ্বিবিধ (এক) মুখস্থ বা স্মরণ করা এবং (দুই) উপদেশ ও শিক্ষা অর্জন করা। এখানে উভয় অর্থ বোঝানো যেতে পারে। আল্লাহ তা‘আলা কুরআনকে মুখস্থ করার জন্যে সহজ করে দিয়েছেন। ইতিপূর্বে অন্য কোন ঐশীগ্রন্থ এরূপ ছিল না। তাওরাত, ইঞ্জীল ও যাবুর মানুষের মুখস্থ ছিল না। [কুরতুবী]

২৪. অতঃপর তারা বলেছিল, 'আমরা কি আমাদেরই এক ব্যক্তির অনুসরণ করব? তবে তো আমরা পথভ্রষ্টতায় এবং উন্মত্ততায় পতিত হব।

فَقَالُوٓا أَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُۥٓ إِنَّآ إِذًا لَّفِى ضَلَٰلٍ وَسُعُرٍ ﴿٢٤﴾

২৫. 'আমাদের মধ্যে কি তারই প্রতি যিক্‌র[১] পাঠানো হয়েছে? না, সে তো একজন মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক[২]।'

أَءُلْقِىَ ٱلذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنۢ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ ﴿٢٥﴾

২৬. আগামী কাল ওরা অবশ্যই জানবে, কে মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক।

سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَّنِ ٱلْكَذَّابُ ٱلْأَشِرُ ﴿٢٦﴾

২৭. নিশ্চয় আমরা তাদের পরীক্ষার জন্য উষ্ট্রী পাঠিয়েছি, অতএব আপনি তাদের আচরণ লক্ষ্য করুন এবং ধৈর্যশীল হোন।

إِنَّا مُرْسِلُوا ٱلنَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَٱرْتَقِبْهُمْ وَٱصْطَبِرْ ﴿٢٧﴾

২৮. আর তাদেরকে জানিয়ে দিন যে, তাদের মধ্যে পানি বন্টন নির্ধারিত এবং পানির অংশের জন্য প্রত্যেকে উপস্থিত হবে পালাক্রমে।

وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ ٱلْمَآءَ قِسْمَةٌۢ بَيْنَهُمْ ۖ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ ﴿٢٨﴾

২৯. অতঃপর তারা তাদের সঙ্গীকে ডাকল, ফলে সে সেটাকে (উষ্ট্রী) ধরে হত্যা করল।

فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ ﴿٢٩﴾

৩০. অতএব কিরূপ কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও ভীতিপ্রদর্শন!

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى وَنُذُرِ ﴿٣٠﴾

৩১. নিশ্চয় আমরা তাদের উপর পাঠিয়েছিলাম এক বিকট আওয়াজ;

إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَٰحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ ٱلْمُحْتَظِرِ ﴿٣١﴾

(১) এখানে যিক্‌র অর্থ, আল্লাহ্‌র বাণী ও শরী'আত। যা তিনি তাদেরকে জানাচ্ছেন। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

(২) বলা হয়েছে, أشر যার অর্থ আত্মগর্বী ও দাম্ভিক। অর্থাৎ কাফেরদের বক্তব্য হচ্ছে, এ ব্যক্তি এমন যে এর মগজে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছে এবং এ কারণে সে গর্ব প্রকাশ করছে। [কুরতুবী]

ফলে তারা হয়ে গেল খোয়াড় প্রস্তুতকারীর বিখণ্ডিত শুষ্ক খড়ের ন্যায়[১]।

৩২. আর অবশ্যই আমরা কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿٣٢﴾

৩৩. লূত সম্প্রদায় মিথ্যারোপ করেছিল সতর্ককারীদের প্রতি,

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطٍ بِالنُّذُرِ ﴿٣٣﴾

৩৪. নিশ্চয় আমরা তাদের উপর পাঠিয়েছিলাম পাথর বহনকারী প্রচণ্ড ঝটিকা, কিন্তু লূত পরিবারের উপর নয়; তাদেরকে আমরা উদ্ধার করেছিলাম রাতের শেষাংশে,

اِنَّاۤ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا اِلَّاۤ اٰلَ لُوْطٍ ؕ نَجَّيْنٰهُمْ بِسَحَرٍ ﴿٣٤﴾

৩৫. আমাদের পক্ষ থেকে অনুগ্রহস্বরূপ; যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, আমরা এভাবেই তাকে পুরস্কৃত করে থাকি।

نِّعْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِيْ مَنْ شَكَرَ ﴿٣٥﴾

৩৬. আর অবশ্যই লূত তাদেরকে সতর্ক করেছিল আমাদের কঠোর পাকড়াও সম্পর্কে; কিন্তু তারা সতর্কবাণী সম্বন্ধে বিতণ্ডা[২] শুরু করল।

وَلَقَدْ اَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ ﴿٣٦﴾

৩৭. আর অবশ্যই তারা লূতের কাছ থেকে

وَلَقَدْ رَاوَدُوْهُ عَنْ ضَيْفِهٖ فَطَمَسْنَاۤ اَعْيُنَهُمْ فَذُوْقُوْا

(১) যারা গবাদি পশু লালন পালন করে তারা পশুর খোঁয়াড়ের সংরক্ষণ ও হিফাজতের জন্য কাঠ ও গাছের ডাল পালা দিয়ে বেড়া তৈরী করে দেয়। এ বেড়ার কাঠ ও গাছ গাছালীর ডালপালা আস্তে আস্তে শুকিয়ে ঝরে পড়ে এবং পশুদের আসা যাওয়ায় পদদলিত হয়ে করাতের গুঁড়ার মত হয়ে যায়। সামূদ জাতির দলিত মথিত লাশসমূহকে করাতের ঐ গুড়োর সাথে তুলনা করা হয়েছে।

(২) আয়াতের অন্য অর্থ হচ্ছে, তারা সতর্কবাণী সম্পর্কে সন্দেহ করেছিল এবং মিথ্যারোপ করেছিল। [মুয়াসসার]

عَذَابِيْ وَنُذُرِ ۝٣٧

তার মেহমানদেরকে অসদুদ্দেশ্যে দাবি করল[১], তখন আমরা তাদের দৃষ্টি শক্তি লোপ করে দিলাম এবং বললাম, 'আস্বাদন কর আমার শাস্তি এবং ভীতির পরিণাম।

وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ۝٣٨

৩৮. আর অবশ্যই প্রত্যুষে তাদের উপর বিরামহীন শাস্তি আঘাত করেছিল।

فَذُوْقُوْا عَذَابِيْ وَنُذُرِ ۝٣٩

৩৯. সুতরাং 'আস্বাদন কর আমার শাস্তি এবং ভীতিপ্রদর্শনের পরিণাম।'

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ۝٤٠

৪০. আর অবশ্যই আমরা কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?

তৃতীয় রুকূ'

وَلَقَدْ جَآءَ اٰلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ۝٤١

৪১. আর অবশ্যই ফির'আউন সম্প্রদায়ের কাছে এসেছিল সতর্ককারী;

كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كُلِّهَا فَاَخَذْنٰهُمْ اَخْذَ عَزِيْزٍ مُّقْتَدِرٍ ۝٤٢

৪২. তারা আমাদের সব নিদর্শনে মিথ্যারোপ করল, সুতরাং আমরা মহাপরাক্রমশালী ও সর্বশক্তিমানরূপে তাদেরকে পাকড়াও করলাম।

---

(১) رَاوَدَ ও مُرَاوَدَةٌ শব্দের অর্থ কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্যে কাউকে ফুসলানো। কওমে লুত বালকদের সাথে অপকর্মে অভ্যস্ত ছিল। আল্লাহ তা'আলা তাদের পরীক্ষার জন্যেই কয়েকজন ফেরেশতাকে সুশ্রী বালকের বেশে প্রেরণ করেন। দুর্বৃত্তরা তাদের সাথে অপকর্মে লিপ্ত হওয়ার জন্যে লূত আলাইহিস্ সালাম-এর গৃহে উপস্থিত হয়। লুত আলাইহিস্ সালাম দরজা বন্ধ করে দেন। কিন্তু তারা দরজা ভেঙে অথবা প্রাচীর টপকিয়ে ভিতরে আসতে থাকে। লূত আলাইহিস্ সালাম বিব্রতবোধ করলে ফেরেশতাগণ তাদের পরিচয় প্রকাশ করে বললেনঃ আপনি চিন্তিত হবেন না। এরা আমাদের কিছুই করতে পারবে না। আমরা তাদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্যেই আগমন করেছি।

أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَٰئِكُمْ أَمْ لَكُم بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ ﴿٤٣﴾

৪৩. তোমাদের মধ্যকার কাফিররা কি তাদের চেয়ে ভাল? না কি তোমাদের অব্যাহতির কোন সনদ রয়েছে পূর্ববর্তী কিতাবে?

أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ ﴿٤٤﴾

৪৪. নাকি তারা বলে, ‘আমরা এক সংঘবদ্ধ অপরাজেয় দল?’

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ﴿٤٥﴾

৪৫. এ দল তো শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং পিঠ দেখিয়ে পালাবে(১),

بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ ﴿٤٦﴾

৪৬. বরং কিয়ামত তাদের শাস্তির নির্ধারিত সময়। আর কিয়ামত হবে কঠিনতর ও তিক্ততর(২);

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿٤٧﴾

৪৭. নিশ্চয় অপরাধীরা বিভ্রান্তি ও শাস্তিতে রয়েছে(৩)।

يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ﴿٤٨﴾

৪৮. যেদিন তাদেরকে উপুড় করে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের দিকে; সেদিন বলা হবে, ‘জাহান্নামের যন্ত্রণা

(১) এটা একটি সুস্পষ্ট ভবিষ্যতবাণী। অর্থাৎ কুরাইশদের সংঘবদ্ধ শক্তি, যা নিয়ে তাদের গর্ব ছিল অচিরেই মুসলিমদের কাছে পরাজিত হবে। [কুরতুবী; ইবন কাসীর] আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের ছাত্র ইকরিমা বর্ণনা করেন যে, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, যে সময় সূরা ক্বামারের এ আয়াত নাযিল হয় তখন আমি অস্থির হয়ে পড়েছিলাম যে, এটা কোন সংঘবদ্ধ শক্তি যা পরাজিত হবে? কিন্তু বদর যুদ্ধে যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ম পরিহিত অবস্থায় সামনের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন এবং তার পবিত্র জবান থেকে ﴿سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ﴾ উচ্চারিত হচ্ছে তখন আমি বুঝতে পারলাম এ পরাজয়ের খবরই দেয়া হয়েছিল। [দেখুন, বুখারী: ৪৮৭৫]

(২) আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর এ আয়াত নাযিল হয়েছিল তখন আমি এত ছোট ছিলাম যে, খেলা-ধুলা করতাম। [বুখারী: ৪৮৭৬]

(৩) এছাড়া আয়াতের আরেক অর্থ হচ্ছে, নিশ্চয় অপরাধীরা দুনিয়াতে রয়েছে বিভ্রান্তিতে আর আখেরাতে থাকবে প্রজ্জলিত আগুনে। [বাগভী] অপর অর্থ হচ্ছে, তারা দুনিয়াতে ধ্বংস ও আখেরাতে প্রজ্জলিত আগুনে। [জালালাইন]

আস্বাদন কর ।'

৪৯. নিশ্চয় আমরা প্রত্যেক কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে[১],

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَٰهُ بِقَدَرٍ ۝

(১) قدر বা 'কদর' শব্দের আভিধানিক অর্থ পরিমাপ করা, কোন বস্তু উপযোগিতা অনুসারে পরিমিতরূপে তৈরি করা । [ফাতহুল কাদীর] এছাড়া শরী'আতের পরিভাষায় 'কদর' শব্দটি মহান আল্লাহ্‌র তাকদীর তথা বিধিলিপির অর্থেও ব্যবহৃত হয় । অধিকাংশ তফসীরবিদ বিভিন্ন হাদীসের ভিত্তিতে আলোচ্য আয়াতে এই অর্থই নিয়েছেন । আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, কুরাইশ কাফেররা একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে তাকদীর সম্পর্কে বিতর্ক শুরু করলে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয় । [মুসলিম:২৬৫৬] তাকদীর ইসলামের একটি অকাট্য আকীদা-বিশ্বাস । যে একে সরাসরি অস্বীকার করে, সে কাফের । উপরোক্ত আয়াত ও তার শানে নুযুল থেকে আমরা এর প্রমাণ পাই । তাছাড়া পবিত্র কুরআনের অন্যত্রও তাকদীরের কথা এসেছে, মহান আল্লাহ বলেনঃ “আর আল্লাহর নির্দেশ ছিল সুনির্ধারিত” । [সূরা আল-আহযাবঃ ৩৮] অন্যত্র বলেন, “তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন তারপর নির্ধারণ করেছেন যথাযথ অনুপাতে” । [সূরা আল-ফুরকানঃ২] সহীহ মুসলিমে উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যা 'হাদীসে জিবরীল' নামে বিখ্যাত, তাতে রয়েছেঃ জিবরীল আলাইহিস সালাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে জানতে চেয়ে বলেন যে, আমাকে ঈমান সম্পর্কে অবহিত করুন, তিনি বললেনঃ “আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফিরিশ্‌তাগণের প্রতি, তাঁর গ্রন্থসমূহের প্রতি, তাঁর রাসূলগণ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনা, আর তাকদীরের ভাল ও মন্দের প্রতি ঈমান আনা” । [মুসলিম:১] অনুরূপভাবে আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর ইবনুল 'আস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ “আল্লাহ আসমান ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে সৃষ্টি জগতের তাকদীর লিখে রেখেছেন” । বললেনঃ “আর তাঁর আরশ ছিল পানির উপর” । [মুসলিম:২৬৫৩] অনুরূপভাবে তাকদীরের উপর ঈমান আনা উম্মাত তথা সাহাবা ও তাদের পরবর্তী সবার ইজ্‌মা' বা ঐক্যমতের বিষয় । সহীহ মুসলিমে ত্বাঊস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ 'আমি অনেক সাহাবীকে পেয়েছি যারা বলতেনঃ সব কিছু তাকদীর অনুসারে হয়' । আরো বলেনঃ আমি 'আব্দুল্লাহ ইবনে উমরকে বলতে শুনেছিঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ “সবকিছুই তাকদীর মোতাবেক হয়, এমনকি অপারগতা ও সক্ষমতা, অথবা বলেছেনঃ সক্ষমতা ও অপারগতা” । [মুসলিম:২৬৫৫]

তাকদীরের স্তর বা পর্যায়সমূহ চারটি; যার উপর কুরআন ও সুন্নায় অসংখ্য দলীল-প্রমাণাদি এসেছে আর আলেমগণও তার স্বীকৃতি দিয়েছেন ।

প্রথম স্তরঃ অস্তিত্ব সম্পন্ন, অস্তিত্বহীন, সম্ভব এবং অসম্ভব সবকিছু সম্পর্কে আল্লাহর

জ্ঞান থাকা এবং এ সবকিছু তাঁর জ্ঞানের আওতাভুক্ত থাকা। সুতরাং তিনি যা ছিল এবং যা হবে, আর যা হয় নি যদি হত তাহলে কি রকম হতো তাও জানেন। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণীঃ “যাতে তোমরা বুঝতে পার যে, আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান এবং জ্ঞানে আল্লাহ সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন”। [সূরা আত্‌তালাকঃ ১২] সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার হাদীসে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ ‘নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মুশরিকদের সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেনঃ “তারা কি কাজ করত (জীবিত থাকলে) তা আল্লাহই ভাল জানেন”’। [বুখারী:১৩৮৪, মুসলিম: ২৬৫৯]
দ্বিতীয় স্তরঃ ক্বিয়ামত পর্যন্ত যত কিছু ঘটবে সে সব কিছু মহান আল্লাহ কর্তৃক লিখে রাখা। মহান আল্লাহ বলেনঃ “আপনি কি জানেন না যে, আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে আল্লাহ তা জানেন। এসবই এক কিতাবে আছে; নিশ্চয়ই তা আল্লাহর নিকট সহজ। [সূরা আল- হাজ্জঃ৭০] আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেনঃ “আমরা তো প্রত্যেক জিনিস এক স্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত করেছি”। [সূরা ইয়াসীনঃ১২] পূর্বে বর্ণিত ‘আব্দুল্লাহ ইবনে ‘আমর ইবনুল ‘আসের হাদীসে এ কথাও বলা হয়েছে যে, আল্লাহ আসমান ও যমীন সৃষ্টি করার পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে সৃষ্টি জগতের তাকদীর লিখে রেখেছেন। [মুসলিম:২৬৫৩] তাছাড়া অন্য হাদীসে এসেছে, ওলীদ ইবনে উবাদাহ বলেন, আমি আমার পিতাকে অসিয়ত করতে বললে তিনি বললেন, ‘আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ যখন প্রথমে কলম সৃষ্টি করলেন তখন তাকে বললেন, লিখ। তখন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যা হবে সে মূহূর্ত থেকে কলম তা লিখতে শুরু করেছে।’ হে প্রিয় বৎস! তুমি যদি এটার উপর ঈমান না এনে মারা যাও তবে তুমি জাহান্নামে যাবে। [মুসনাদে আহমাদ:৫/৩১৭] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ঐ পর্যন্ত কেউ ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ চারটি বিষয়ের উপর ঈমান না আনবে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন হক্ক ইলাহ নেই এটার সাক্ষ্য দেয়া। আর আমি আল্লাহ্‌র রাসূল। আল্লাহ্ আমাকে হক সহ পাঠিয়েছে। অনুরূপভাবে সে মৃত্যুর উপর ঈমান আনবে। আরো ঈমান আনবে মৃত্যুর পরে পুনরুত্থানের। আরও ঈমান আনবে তাকদীরের ভাল-মন্দের উপর। [তিরমিযী: ২১৪৪]
তৃতীয় স্তরঃ আল্লাহর ইচ্ছাঃ তিনি যা চান তা হয়, আর যা চান না তা হয় না। মহান আল্লাহ বলেনঃ “তাঁর ব্যাপার শুধু এতটুকুই যে, তিনি যখন কোন কিছুর ইচ্ছা করেন, তিনি তখন তাকে বলেনঃ ‘হও’, ফলে তা হয়ে যায়”। [সূরা ইয়াসীনঃ ৮২] মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ “সমগ্র সৃষ্টি জগতের প্রতিপালক আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত তোমরা কোন ইচ্ছাই করতে পার না”। [সূরা আত-তাকওয়ীরঃ ২৯] হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ “তোমাদের কেউ যেন একথা কখনো না বলে যে, হে আল্লাহ! যদি আপনি চান আমাকে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ! যদি আপনি চান আমাকে দয়া করুন, বরং দো‘আ করার সময়

৫০. আর আমাদের আদেশ তো কেবল একটি কথা, চোখের পলকের

وَمَآ أَمۡرُنَآ إِلَّا وَٰحِدَةٌ كَلَمۡحِۭ بِٱلۡبَصَرِ ۝٥٠

দৃঢ়ভাবে কর; কেননা আল্লাহ যা ইচ্ছা তা-ই করেন, তাঁকে জোর করার কেউ নেই" ।[বুখারী:৬৩৩৯, মুসলিম: ২৬৭৯]

চতুর্থ স্তরঃ আল্লাহ কর্তৃক যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করা ও অস্তিত্বে আনা এবং এ ব্যাপারে তাঁর পূর্ণ ক্ষমতা থাকা । কেননা তিনিই সে পবিত্র সত্তা যিনি সমস্ত কর্মী ও তার কর্ম, প্রত্যেক নড়াচড়াকারী ও তার নড়াচড়া, এবং যাবতীয় স্থিরিকৃত বস্তু ও তার স্থিরতার সৃষ্টিকারক । মহান আল্লাহ বলেনঃ আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সবকিছুর কর্মবিধায়ক" । [সূরা আয-যুমারঃ৬২] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ "প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা যা কর তাও" । [সূরা আস-সাফফাতঃ ৯৬] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "একমাত্র আল্লাহ ছিলেন, তিনি ব্যতীত আর কোন বস্তু ছিলনা, আর তাঁর আরশ ছিল পানির উপর এবং তিনি সবকিছু লাওহে মাহফুজে লিখে রেখেছেন, আর আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন" । [বুখারী: ৩১৯১]

তাই তাকদীরের উপর ঈমান বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য এ চারটি স্তরের উপর ঈমান আনা ওয়াজিব । যে কেউ তার সামান্যও অস্বীকার করে তাকদীরের উপর তার ঈমান পূর্ণ হবে না ।

তাকদীরের উপর ঈমানের উপকারিতা: তাকদীরের উপর ঈমান যথার্থ হলে মু'মিনের জীবনের উপর তার যে বিরাট প্রভাব ও হিতকর ফলাফল অর্জিত হয়, তম্মধ্যে অন্যতম হচ্ছেঃ

কার্যোদ্ধারের জন্য কোন উপায় বা কৌশল অবলম্বন করলেও কেবলমাত্র আল্লাহর উপরই ভরসা করবে; কেননা তিনিই যাবতীয় কৌশল ও কৌশলকারীর নিয়ন্তা ।

যখন বান্দা এ কথা সত্যিকার ভাবে উপলব্ধি করতে পারবে যে, সবকিছুই আল্লাহর ফয়সালা ও তাকদীর অনুসারেই হয় তখন তার আত্মিক প্রশান্তি ও মানসিক প্রসন্নতা অর্জিত হয় ।

উদ্দেশ্য সাধিত হলে নিজের মন থেকে আত্মম্ভরিতা দূর করা সম্ভব হয় । কেননা আল্লাহ তার জন্য উক্ত কল্যাণ ও সফলতার উপকরণ নির্ধারণ করে দেয়ার কারণেই তার পক্ষে এ নেয়ামত অর্জন করা সম্ভব হয়েছে, তাই সে আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞ হবে এবং আত্মম্ভরিতা পরিত্যাগ করবে ।

উদ্দেশ্য সাধিত না হলে বা অপছন্দনীয় কিছু ঘটে গেলে মন থেকে অশান্তি ও পেরেশানীভাব দূর করা (তাকদীরে ঈমানের কারণে) সম্ভব হয়; কেননা এটা আল্লাহর ফয়সালা আর তাঁরই তাকদীরের ভিত্তিতে হয়েছে । সুতরাং সে ধৈর্য ধারণ করবে এবং সওয়াবের আশা করবে । [উসুলুল ঈমান ফি দাওয়িল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ্]

মত[১] ।

৫১. আর অবশ্যই আমরা ধ্বংস করেছি তোমাদের মত দলগুলোকে; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَآ أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴿٥١﴾

৫২. আর তারা যা করেছে সবকিছুই আছে 'আমলনামায়',

وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي ٱلزُّبُرِ ﴿٥٢﴾

৫৩. আর ছোট বড় সব কিছুই লিখিত আছে[২] ।

وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٌ ﴿٥٣﴾

৫৪. নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে বাগ-বাগিচা ও ঝর্ণাধারার মধ্যে,

إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّٰتٍ وَنَهَرٍ ﴿٥٤﴾

৫৫. যথাযোগ্য আসনে, সর্বশক্তিমান মহাঅধিপতি (আল্লাহ্)র সান্নিধ্যে ।

فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿٥٥﴾

(১) অর্থাৎ কিয়ামত সংগঠনের জন্য আমাকে কোন বড় প্রস্তুতি নিতে হবে না কিংবা তা সংঘটিত করতে কোন দীর্ঘ সময়ও ব্যয়িত হবে না । আমার পক্ষ থেকে একটি নির্দেশ জারী হওয়ার সময়টুকু মাত্র লাগবে । নির্দেশ জারী হওয়া মাত্রই চোখের পলকে তা সংঘটিত হয়ে যাবে ।

(২) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "হে আয়েশা! যে সমস্ত ছোটখাট গোনাহকে তুচ্ছ মনে কর তা থেকেও বেঁচে থাক, কেননা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এগুলোরও অন্বেষণকারী রয়েছে ।" [ইবনে মাজাহ: ৪২৪৩, মুসনাদে আহমাদ: ৫/৩৩১]

৫৫- সূরা আর-রাহ্‌মান(১)
৭৮ আয়াত, মাদানী

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আর-রাহমান(২), الرَّحْمٰنُ ۝١

২. তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন(৩), عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ۝٢

---

(১) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমগ্র সূরা আর-রহমান তেলাওয়াত করেন। অথবা তার সামনে তেলাওয়াত করা হলো। তারা নিশ্চুপ থাকলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমার কি হলো, আমি দেখতে পাচ্ছি জিনরা তোমাদের চেয়ে উত্তম উত্তর দিচ্ছে। তারা বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সেটা কি? তিনি বললেন, যখনই ﴿فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ﴾ পড়ছিলাম তখনি জিনরা বলছিল 'আমরা আমাদের রবের কোন নিয়ামতকেই মিথ্যা বলি না, আপনার জন্যই যাবতীয় প্রশংসা'। [তাবারী: ৩২৯২৮, বাযযার:২২৬৯]

(২) অর্থাৎ দয়াময় আল্লাহ্‌। সূরাটিকে 'আর-রাহমান' শব্দ দ্বারা শুরু করার তাৎপর্য সম্ভবত এই যে, মক্কার কাফেররা আল্লাহ তা'আলার এই নাম সম্পর্কে অবগত ছিল না। তাই মুসলিমদের মুখে রহমান নাম শুনে ওরা বলাবলি করতঃ রাহ্‌মান আবার কি? তাদেরকে অবহিত করার জন্য এখানে এই নাম ব্যবহার করা হয়েছে। [আদওয়াউল বায়ান]

(৩) এখান থেকে সমগ্র সূরায় আল্লাহ তা'আলার দুনিয়া ও আখেরাতের অবদানসমূহের অব্যাহত বর্ণনা হয়েছে। প্রথমেই علّم বাক্য দিয়ে সূচনা করার উদ্দেশ্য এটা হতে পারে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে এর রচয়িতা নন, এ শিক্ষা দানকারী স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। তারপর ﴿عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ﴾ বলে সর্ববৃহৎ অবদান দ্বারা শুরু করা হয়েছে। কুরআন সর্ববৃহৎ অবদান। কেননা, এতে মানুষের দুনিয়া ও আখেরাত উভয় প্রকার কল্যাণ রয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম কুরআনকে কায়মনোবাক্যে গ্রহণ করেছেন এবং এর প্রতি যথার্থ মর্যাদা প্রদর্শন করেছেন। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আখেরাতের উচ্চ মর্যাদা ও নেয়ামত দ্বারা গৌরবান্বিত করেছেন এবং দুনিয়াতেও এমন উচ্চ আসন দান করেছেন; যা রাজা-বাদশাহরাও হাসিল করতে পারে না।

ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী عَلَّم ক্রিয়াপদের দুটি কর্ম থাকে - এক যা শিক্ষা দেয়া হয় এবং 'দুই' যাকে শিক্ষা দেয়া হয়। আয়াতে প্রথম কর্ম উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ কুরআন। কিন্তু দ্বিতীয় কর্ম অর্থাৎ কাকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে, তার উল্লেখ নেই। কোন কোন তফসীরবিদ বলেনঃ এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উদ্দেশ্য। কেননা, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যক্ষভাবে তাকেই শিক্ষা দিয়েছেন। অতঃপর তার মধ্যস্থতায় সমগ্র সৃষ্টজীব এতে দাখিল রয়েছে। [আদওয়াউল বায়ান, আত তাহরীর ওয়াততানওয়ীর]

৩. তিনিই সৃষ্টি করেছেন মানুষ(১), — خَلَقَ الْإِنسَانَ ﴿٣﴾

৪. তিনিই তাকে শিখিয়েছেন ভাষা(২), — عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴿٤﴾

৫. সূর্য ও চাঁদ আবর্তন করে নির্ধারিত হিসেবে(৩), — الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴿٥﴾

---

(১) অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছেঃ ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ অর্থাৎ আমি জিন ও মানুষকে শুধুমাত্র আমার ইবাদত করার জন্যে সৃষ্টি করেছি। [সূরা আয-যারিয়াত:৫৬]
এখানে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মানুষকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হওয়া কোন আশ্চর্যজনক ব্যাপার নয়। বরং তাঁর পক্ষ থেকে যদি এ ব্যবস্থা না থাকতো তাহলে সেটাই হতো বিস্ময়কর ব্যাপার। এ বিষয়টি কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভঙ্গিতে বুঝানো হয়েছে। কোথাও বলা হয়েছেঃ "পথ প্রদর্শন করা আমার দায়িত্ব।" [সূরা আল-লাইল:১২] আবার কোথাও বলা হয়েছেঃ "সরল সোজা পথ দেখিয়ে দেয়া আল্লাহর দায়িত্ব। বাঁকা পথের সংখ্যা তো অনেক।" [সূরা আন-নাহ্‌ল:৯] অন্যত্র উল্লেখ করা হয়েছে যে, ফেরাউন মূসার মুখে রিসালাতের পয়গাম শুনে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলোঃ তোমার সেই 'রব' কে যে আমার কাছে দূত পাঠায়? জবাবে মূসা বললেনঃ "তিনিই আমার রব যিনি প্রতিটি জিনিসকে একটি নির্দিষ্ট আকার-আকৃতি দান করে পথ প্রদর্শন করেছেন।" [সূরা ত্বা-হা: ৪৭-৫০]

(২) মূল আয়াতে البيان শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর একটি অর্থ হচ্ছে মনের ভাব প্রকাশ করা। অর্থাৎ কোন কিছু বলা এবং নিজের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় ব্যক্ত করা। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট করে তোলা। বাকশক্তি এমন একটি বিশিষ্ট গুণ যা মানুষকে জীবজন্তু ও পৃথিবীর অন্যান্য সৃষ্টিকুল থেকে পৃথক করে দেয়। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর] বিভিন্ন ভূখণ্ড ও বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন বাকপদ্ধতি সবাই এই বর্ণনা শিক্ষার বিভিন্ন অঙ্গ এবং এটা কার্যত ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ [সূরা আল-বাকারাহ:৩১] আয়াতের তফসীরও।

(৩) حسبان শব্দটি কারও কারও মতে ধাতু। এর অর্থ হিসাব। কেউ কেউ বলেন যে, এটা حساب শব্দের বহুবচন। [ইরাবুল কুরআন] আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, সূর্য ও চন্দ্রের গতি এবং কক্ষপথে বিচরণের অটল ব্যবস্থা একটি বিশেষ হিসাব ও পরিমাপ অনুযায়ী চালু রয়েছে। সূর্য ও চন্দ্রের গতির উপরই মানব জীবনের সমস্ত কাজ-কারবার নির্ভর করে। এর মাধ্যমেই দিবারাত্রির পার্থক্য, ঋতু পরিবর্তন এবং মাস ও বছর নির্ধারিত হয়। حسبان শব্দটিকে حساب এর বহুবচন ধরা হলে অর্থ এই হবে যে, সূর্য ও চন্দ্র প্রত্যেকের পরিক্রমণের আলাদা আলাদা হিসাব আছে। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর, কুরতুবী]

৬. আর তৃণলতা ও বৃক্ষাদি সিজ্‌দা করছে[১],	وَّالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدٰنِ ﴿٦﴾
৭. আর আসমান, তিনি তাকে করেছেন সমুন্নত এবং স্থাপন করেছেন দাঁড়িপাল্লা,	وَالسَّمَاۤءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ ﴿٧﴾
৮. যাতে তোমরা সীমালঙ্ঘন না কর দাঁড়িপাল্লায় ।	اَلَّا تَطْغَوْا فِى الْمِيْزَانِ ﴿٨﴾
৯. আর তোমরা ওজনের ন্যায্য মান প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওজনে কম দিও না ।	وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ ﴿٩﴾
১০. আর যমীন, তিনি তা স্থাপন করেছেন সৃষ্ট জীবের জন্য;	وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ ﴿١٠﴾
১১. এতে রয়েছে ফলমূল ও খেজুর গাছ যার ফল আবরণযুক্ত,	فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّالنَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ ﴿١١﴾
১২. আর আছে খোসা বিশিষ্ট দানা[২] ও	وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ﴿١٢﴾

(১) نجم শব্দটির পরিচিত অর্থ তারকা হলেও আরবী ভাষায় কাণ্ডবিহীন লতানো গাছকেও نجم বলা হয় । [ফাতহুল কাদীর] আর কাণ্ডবিশিষ্ট বৃক্ষকে شجر বলা হয় । অর্থাৎ সর্বপ্রকার লতা-পাতা ও বৃক্ষ, আল্লাহ্ তা'আলার সামনে সিজদা করে । কোন কোন মুফাসসির বলেন, সিজদা চূড়ান্ত সম্মান প্রদর্শন ও আনুগত্যের লক্ষণ । তাই এখানে উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বৃক্ষ, লতা-পাতা, ফল ও ফুলকে যে যে বিশেষ কাজ ও মানুষের উপকারের জন্যে সৃষ্টি করেছেন, তারা অনবরত সে কাজ করে যাচ্ছে এবং নিজ নিজ কর্তব্য পালন করে মানুষের উপকার সাধন করে যাচ্ছে । এই বাধ্যতামূলক আনুগত্যকেই আয়াতে সিজদা বলে ব্যক্ত করা হয়েছে । আর যদি نجم দ্বারা তারকা উদ্দেশ্য নেয়া হয় তবে অর্থ হবে, তারকা ও বৃক্ষরাজি সিজদা করছে । [দেখুন, ফাতহুল কাদীর ,ইবন কাসীর; কুরতুবী]

(২) حب এর অর্থ শস্য; যেমন গম, বুট, ধান, মাষ, মসুর ইত্যাদি । عصف সেই খোসাকে বলে, যার ভিতরে আল্লাহর কুদরতে মোড়কবিশিষ্ট অবস্থায় শস্যের দানা সৃষ্টি করা যায় । এর সাথে সম্ভবত আরও একটি অবদানের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই খোসা তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুর খোরাক হয়, যাদের দুধ তোমরা পান কর এবং যাদের বোঝা বহনের কাজে নিয়োজিত কর । [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর; সা'দী]

সুগন্ধ ফুল[১] ।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٣﴾

১৩. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহে[২] মিথ্যারোপ করবে[৩]?

خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ﴿١٤﴾

১৪. মানুষকে তিনি সৃষ্টি করেছেন শুষ্ক ঠনঠনে মাটি থেকে যা পোড়া মাটির মত [৪],

---

(১) ريحان এর প্রসিদ্ধ অর্থ সুগন্ধি। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মৃত্তিকা থেকে উৎপন্ন বৃক্ষ থেকে নানা রকমের সুগন্ধি এবং সুগন্ধযুক্ত ফুল সৃষ্টি করেছেন। তাছাড়া ريحان শব্দটি কোন কোন সময় নির্যাস ও রিযিকের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। তখন অর্থ হবে, আল্লাহ্ তা'আলা মাটি থেকে তোমাদের জন্য রিযিকের ব্যবস্থাও করেছেন। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

(২) মূল আয়াতে آلَاء শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এবং পরবর্তী আয়াতসমূহে এ শব্দটি বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিত ও তাফসীর বিশারদগণ শব্দের অর্থ করেছেন 'নিয়ামতসমূহ' বা 'অনুগ্রহসমগ্র'। [কুরতুবী] তবে মুফাসসির ইবন যায়েদ বলেন, শব্দটির অন্য অর্থ হচ্ছে, শক্তি ও ক্ষমতা। [ফাতহুল কাদীর] আল্লামা আবদুল হামীদ ফারাহী এ অর্থটিকে অধিক প্রাধান্য দিতেন।

(৩) আয়াতে জিন ও মানবকে সম্বোধন করা হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর]

(৪) এখানে إنسان বলে সরাসরি মৃত্তিকা থেকে সৃষ্ট আদম আলাইহিস্ সালাম-কে বুঝানো হয়েছে। صلصال এর অর্থ পানি মিশ্রিত শুষ্ক মাটি। فخار এর অর্থ পোড়ামাটি। অর্থাৎ মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলা পোড়ামাটির ন্যায় শুষ্ক মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করেছেন। [কুরতুবী] কুরআন মজীদে মানুষ সৃষ্টির যে প্রাথমিক পর্যায়সমূহ বর্ণনা করা হয়েছে, কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানের বক্তব্য একত্রিত করে তার নিম্নোক্ত ক্রমিক বিন্যাস অবগত হওয়া যায় (১) تراب 'তুরাব' অর্থাৎ মাটি। আল্লাহ্ বলেন, ﴿كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ﴾ [সূরা আলে-ইমরান: ৫৯] (২) طين 'ত্বীন' অর্থাৎ পচা কর্দম যা মাটিতে পানি মিশিয়ে বানানো হয়। আল্লাহ্ বলেন, ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ﴾ [সূরা আস-সাজদাহ:৭] (৩) ﴿طِينٍ لَّازِبٍ﴾ 'ত্বীন লাযেব' বা আঠালো কাদামাটি। অর্থাৎ এমন কাদা, দীর্ঘদিন পড়ে থাকার কারণে যার মধ্যে আঠা সৃষ্ট হয়ে যায়। মহান আল্লাহ্ বলেন, ﴿إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَّازِبٍ﴾ [সূরা আস-সাফফাত: ১১] (৪) ﴿صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ﴾ 'সালসালিন মিন হামায়িন মাসনূন' যে কাদার মধ্যে গন্ধ সৃষ্টি হয়ে যায়। আল্লাহ্ বলেন, ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ﴾ [সূরা আল-হিজর: ২৬] (৫) ﴿صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ﴾ 'সালসালিন কাল-ফাখখার' অর্থাৎ পচা কাদা যা শুকিয়ে যাওয়ার পরে মাটির শুকনো ঢিলার মত হয়ে যায়। আলোচ্য সূরা

১৫. এবং জিনকে সৃষ্টি করেছেন নির্ধূম আগুনের শিখা থেকে[১]।

وَخَلَقَ الْجَآنَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ ﴿١٥﴾

১৬. কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহে মিথ্যারোপ করবে?

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿١٦﴾

১৭. তিনিই দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের রব[২]।

رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ﴿١٧﴾

আর-রাহমানের এ আয়াতেই আল্লাহ্ তা'আলা এ পর্যায়টি উল্লেখ করে বলেন, (৬) ﴿خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ﴾ 'বাশার' মাটির এ শেষ পর্যায় থেকে যাকে বানানো হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা যার মধ্যে তাঁর বিশেষ রূহ ফুৎকার করেছেন, ফেরেশতাদের দিয়ে যাকে সিজদা করানো হয়েছিল এবং তার সমজাতীয় থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করা হয়েছিল। আল্লাহ্ বলেন, ﴿اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ ۞ فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ﴾ [সূরা সোয়াদ: ৭১-৭২] (৭) ﴿مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ﴾ "মিন সুলালাতিন মিন মায়িন মাহীন' তারপর পরবর্তী সময়ে নিকৃষ্ট পানির মত সংমিশ্রিত দেহ নির্যাস থেকে তার বংশ ধারা চালু করা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন, ﴿ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ﴾ [সূরা আস-সাজদাহ:৮] এ কথাটি বুঝাতে অন্য স্থানসমূহে نطفة বা শুক্র শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

(১) جان এর অর্থ জিন জাতি। مارج এর অর্থ অগ্নিশিখা। জিন সৃষ্টির প্রধান উপাদান অগ্নিশিখা, যেমন মানব সৃষ্টির প্রধান উপাদান মৃত্তিকা। نار অর্থ এক বিশেষ ধরনের আগুন। কাঠ বা কয়লা জ্বালালে যে আগুন সৃষ্টি হয় এটা সে আগুন নয়। আর অর্থ ধোঁয়াবিহীন শিখা। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর] এ কথার অর্থ হচ্ছে প্রথম মানুষকে যেভাবে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তারপর সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করার সময় তার মাটির সত্তা অস্থি-মাংসে তৈরী জীবন্ত মানুষের আকৃতি লাভ করেছে এবং পরবর্তী সময়ে শুক্রের সাহায্যে তার বংশধারা চালু আছে। অনুরূপ প্রথম জিনকে নিছক আগুনের শিখা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং তার বংশধরদের থেকে পরবর্তী সময়ে জিনদের অধস্তন বংশধররা সৃষ্টি হয়ে চলেছে। মানব জাতির জন্য আদমের মর্যাদা যা, জিন জাতির জন্য সেই প্রথম জিনের মর্যাদাও তাই। জীবন্ত মানুষ হয়ে যাওয়ার পর আদম এবং তার বংশ থেকে জন্ম লাভকারী মানুষের দেহের সেই মাটির সাথে যেমন কোন মিল থাকলো না জিনদের ব্যাপারটাও তাই। তাদের সত্তাও মুলত আগুনের সত্তা। কিন্তু আমরা যেমন মাটির স্তুপ নই, অনুরূপ তারাও শুধু অগ্নি শিখা নয়। [দেখুন, আদওয়াউল বায়ান]

(২) দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের অর্থ শীত কালের সবচেয়ে ছোট দিন এবং গ্রীষ্মকালের সবচেয়ে বড় দিনের উদয়াচল ও অস্তাচলও হতে পারে। আবার পৃথিবীর দুই

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٨﴾

১৮. কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহে মিথ্যারোপ করবে?

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ﴿١٩﴾

১৯. তিনি প্রবাহিত করেন দুই সমুদ্র যারা পরস্পর মিলিত হয়,

بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ﴿٢٠﴾

২০. কিন্তু তাদের উভয়ের মধ্যে রয়েছে এক অন্তরাল যা তারা অতিক্রম করতে পারে না[১]।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢١﴾

২১. কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহে মিথ্যারোপ করবে?

يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٢٢﴾

২২. উভয় সমুদ্র হতে উৎপন্ন হয় মুক্তা ও

গোলার্ধের উদয়াচল ও অস্তাচলও হতে পারে। শীত মৌসুমের সর্বাপেক্ষা ছোট দিনে সূর্য অত্যন্ত সংকীর্ণ একটি কোণ সৃষ্টি করে উদয় হয় এবং অস্ত যায়। অপর দিকে গ্রীষ্মের সর্বাপেক্ষা বড় দিনে অতি বিস্তৃত কোণ সৃষ্টি করে উদয় হয় এবং অস্ত যায়। প্রতি দিন এ উভয় কোণের মাঝে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের স্থান পরিবর্তিত হতে থাকে। এ কারণে কুরআনের অন্য এক স্থানে বলা হয়েছে, ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ﴾ [সূরা আল-মা'আরিজ:৪০]। অনুরূপ পৃথিবীর এক গোলার্ধে যখন সূর্য উদয় হয় ঠিক সে সময় অন্য গোলার্ধে তা অস্ত যায়। এভাবেও পৃথিবীর দু'টি উদয়াচল ও অস্তাচল হয়ে যায়। [ইবন কাসীর; আততাহরীর ওয়াততানওয়ীর]

(১) مرج এর আভিধানিক অর্থ স্বাধীন ও মুক্ত ছেড়ে দেয়া। بحرين বলে মিঠা ও লোনা দুই দরিয়া বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে উভয় প্রকার দরিয়া সৃষ্টি করেছেন। কোন কোন স্থানে উভয় দরিয়া একত্রে মিলিত হয়ে যায়, যার নযীর পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখণ্ডে পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু যে স্থানে মিঠা ও লোনা উভয় প্রকার দরিয়া পাশাপাশি প্রবাহিত হয়, সেখানে বেশ দূর পর্যন্ত উভয়ের পানি আলাদা ও স্বতন্ত্র থাকে। একদিকে থাকে মিঠা পানি এবং অপরদিকে লোনা পানি। কোথাও কোথাও এই মিঠা ও লোনা পানি উপরে-নিচেও প্রবাহিত হয়। পানি তরল ও সূক্ষ্ম পদার্থ হওয়া সত্ত্বেও পরস্পরে মিশ্রিত হয় না। আল্লাহ তা'আলার এই অপার শক্তি প্রকাশ করার জন্যেই এখানে বলা হয়েছে যে, 'উভয় দরিয়া পরস্পরে মিলিত হয়; কিন্তু উভয়ের মাঝখানে আল্লাহর কুদরতের একটি অন্তরাল থাকে, যা দূর পর্যন্ত তাদেরকে মিশ্রিত হতে দেয় না'। [কুরতুবী; ইবন কাসীর]

প্রবাল[১]।

২৩. কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্‌ অনুগ্রহে মিথ্যারোপ করবে?

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٢٣﴾

২৪. আর সাগরে বিচরণশীল পর্বতপ্রমাণ নৌযানসমূহ তাঁরই (নিয়ন্ত্রণাধীন)[২];

وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَاٰتُ فِي الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ﴿٢٤﴾

২৫. কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্‌ অনুগ্রহে মিথ্যারোপ করবে?

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٢٥﴾

দ্বিতীয় রুকূ’

২৬. ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে সবকিছুই নশ্বর[৩],

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢٦﴾

(১) لؤلؤ শব্দের অর্থ মোতি এবং مرجان এর অর্থ প্রবাল। এটাও মূল্যবান মণিমুক্তা। যা বৃক্ষের ন্যায় শাখাময়। এই মোতি ও প্রবাল সমুদ্র থেকে বের হয়- মিঠা পানি থেকে নয়। আয়াতে উভয় প্রকার পানি থেকে বের হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এর জওয়াব এই যে, মোতি উভয় প্রকার সমুদ্রেই উৎপন্ন হয়। কিন্তু মিঠা পানির স্রোতধারা প্রবাহমান হওয়ার কারণে তা থেকে মোতি বের করা সহজসাধ্য নয়। মিঠা পানির স্রোত প্রবাহিত হয়ে লোনা সমুদ্রে পতিত হয় এবং সেখান থেকেই মোতি বের করা হয়। এ কারণেই লোনা সমুদ্রকে মোতির উৎস বলা হয়ে থাকে। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর; ইবন কাসীর]

(২) جوار শব্দটি جارية এর বহুবচন। [ইরাবুল কুরআন] এর এক অর্থ নৌকা বা জাহাজ। এখানে তাই বুঝানো হয়েছে। منشئات শব্দটি نشأ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ ভেসে উঠা, উঁচু হওয়া অর্থে, এখানে নৌকার পাল বুঝানো হয়েছে যা পতাকার ন্যায় উঁচু হয়। [ইবন কাসীর; কুরতুবী]

(৩) এর অর্থ এই যে, ভূপৃষ্ঠে যত জিন ও মানব আছে তারা সবাই ধ্বংসশীল। এই সূরায় জিন ও মানবকেই সম্বোধন করা হয়েছে। তাই আলোচ্য আয়াতে বিশেষভাবে তাদের প্রসঙ্গই উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে জরুরি হয় না যে, আকাশ ও আকাশস্থিত সৃষ্ট বস্তু ধ্বংসশীল নয়। কেননা অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা ব্যাপক অর্থবোধক ভাষায় সমগ্র সৃষ্টিজগতের ধ্বংসশীল হওয়ার বিষয়টিও ব্যক্ত করেছেন। বলা হয়েছে, ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ﴾ ‘তাঁর চেহারা, সত্তা ব্যতীত সবকিছুই ধ্বংসশীল।’ [সূরা আল-কাসাস:৮৮] [ফাতহুলকাদীর, ইবন কাসীর; কুরতুবী]

২৭. আর অবিনশ্বর শুধু আপনার রবের চেহারা[১], যিনি মহিমাময়, মহানুভব[২];

وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ ﴿٢٧﴾

২৮. কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহে মিথ্যারোপ করবে?

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٢٨﴾

২৯. আসমানসমূহ ও যমীনে যারা আছে সবাই তাঁর কাছে প্রার্থী[৩], তিনি প্রত্যহ

يَسْـَٔلُهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ

(১) এখানে وجه শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যা দ্বারা মহান আল্লাহ্ তায়ালার চেহারার সাথে সাথে তাঁর সত্তাকেও বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তিনি অবিনশ্বর। তাঁর চেহারাও অবিনশ্বর। তিনি ব্যতীত আর যা কিছু রয়েছে সবই ধ্বংসশীল। এগুলোর মধ্যে চিরস্থায়ী হওয়ার যোগ্যতাই নেই। আরেক অর্থ এরূপ হতে পারে যে, কিয়ামতের দিন এগুলো ধ্বংস হয়ে যাবে। কোন তফসীরবিদ ﴿وَجْهُ رَبِّكَ﴾ এর তফসীর এরূপ করেছেন যে, সমগ্র সৃষ্ট জগতের মধ্যে একমাত্র সেই বস্তুই স্থায়ী; যা আল্লাহ তা'আলার দিকে আছে। এতে শামিল আছে আল্লাহ তা'আলার সত্তা এবং মানুষের সেইসব কর্ম ও অবস্থা; যা আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্কযুক্ত। [দেখুন, কুরতুবী] এর সারমর্ম এই যে, মানব, জিন ও ফেরেশতা যে কাজ আল্লাহর জন্যে করে, সেই কাজও চিরস্থায়ী, অক্ষয়। তা কোন সময় ধ্বংস হবে না। পবিত্র কুরআনের অন্য আয়াত থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়, যেখানে বলা হয়েছে, ﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ﴾ [সূরা আন-নাহল:৯৬] অর্থাৎ তোমাদের কাছে যা কিছু অর্থ সম্পদ শক্তি-সামর্থ্য, সুখ-কষ্ট ভালবাসা ও শত্রুতা আছে, সব নিঃশেষ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে আল্লাহর কাছে যা কিছু আছে, তা অবশিষ্ট থাকবে। আল্লাহর সাথে সম্পর্কযুক্ত মানুষের যেসব কর্ম ও অবস্থা আছে, সেগুলো ধ্বংস হবে না।

(২) অর্থাৎ সেই রব মহিমামণ্ডিত এবং মহানুভবও। মহানুভব হওয়ার এক অর্থ যে, প্রকৃতপক্ষে সম্মান বলতে যা কিছু আছে, এ সবেরই যোগ্য একমাত্র তিনিই। আরেক অর্থ এই যে, তিনি মহিমাময় হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়ার রাজা-বাদশাহ ও সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের মত নন। [দেখুন, ইবন কাসীর] পরবর্তী আয়াত এই দ্বিতীয় অর্থের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। আয়াতে বর্ণিত ﴿ذُو الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ﴾ বাক্যটি আল্লাহ তা'আলার বিশেষ গুণাবলীর অন্যতম। এই শব্দগুলো উল্লেখ করে দো'আ করার জন্য রাসূলের হাদীসে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 'তোমরা 'ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম' বলে দো'আ করো।' [তিরমিযী:৩৫২৫]

(৩) অর্থাৎ আসমান ও যমীনের সমস্ত সৃষ্টবস্তু আল্লাহ তা'আলার মুখাপেক্ষী এবং তাঁর কাছেই প্রয়োজনাদি পূরণের জন্য প্রার্থনা করে। যমীনের অধিবাসীরা তাদের রিযিক,

فِيْ شَاْنٍ ۝٢٩ — গুরুত্বপূর্ণ কাজে রত[১]।

فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝٣٠

৩০. কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহে মিথ্যারোপ করবে?

سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَ الثَّقَلٰنِ ۝٣١

৩১. হে মানুষ ও জিন! আমরা অচিরেই তোমাদের (হিসাব নিকাশের) প্রতি মনোনিবেশ করব[২],

---

স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা সুখ-শান্তি, আখেরাতে ক্ষমা, রহমত ও জান্নাত প্রার্থনা করে এবং আসমানের অধিবাসীরা যদিও পানাহার করে না; কিন্তু তারাও আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও কৃপার মুখাপেক্ষী। আল্লাহ তা'আলার কাছে তাদের এই প্রার্থনা প্রতিনিয়তই অব্যাহত থাকে। [ফাতহুল কাদীর; কুরতুবী; ইবন কাসীর]

(১) অর্থাৎ মহাবিশ্বের এ কর্মক্ষেত্রে প্রতি মুহূর্তে তাঁরই কর্মতৎপরতার এক সীমাহীন ধারাবাহিকতা চলছে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তার কাজের মধ্যে আছে কারও গোনাহ ক্ষমা করা, কাউকে বিপদ থেকে উদ্ধার করা, কারো উত্থান ঘটানো আবার কারো পতন ঘটানো।" [ইবনে মাজাহ: ২০২] এটি একটি উদাহরণ, মূলত তিনি প্রতিদিন কাউকে আরোগ্য দান করছেন আবার কাউকে রোগাক্রান্ত করছেন। কোন ব্যথিত ও ক্রন্দনকারীর মুখে হাসি ফুটান, কোন প্রার্থনাকারীকে প্রার্থিত বস্তু দান করেন। সীমা সংখ্যাহীন সৃষ্টিকে নানাভাবে রিযিক দান করছেন। অসংখ্য বস্তুকে নতুন নতুন স্টাইল, আকার-আকৃতি ও গুণ-বৈশিষ্ট দিয়ে সৃষ্টি করছেন। তাঁর পৃথিবী কখনো এক অবস্থায় অপরিবর্তিত থাকে না। তাঁর পরিবেশ ও অবস্থা প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তিত হতে থাকে এবং তার স্রষ্টা তাকে প্রতিবারই একটি নতুন রূপে সজ্জিত করেন যা পূর্বের সব আকার-আকৃতি থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে। মোটকথা, প্রতিমুহূর্তে, প্রতি পলে আল্লাহ তা'আলার একটি বিশেষ শান থাকে। এটাকে বলা হয় আল্লাহ্‌র প্রাত্যহিক তাকদীর। [ফাতহুল কাদীর; কুরতুবী; তাবারী]

(২) ثقلان শব্দটি ثقل এর দ্বি-বচন। যে বস্তুর ওজন ও মূল্যমান সুবিদিত, আরবী ভাষায় তাকে ثقل বলা হয়। এখানে মানব ও জিন জাতিদ্বয় বুঝানো হয়েছে। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, إِنِّيْ تَارِكٌ فِيْكُمْ الثَّقَلَيْنِ অর্থাৎ আমি দুটি ওজনবিশিষ্ট ও সম্মানার্হ বিষয় ছেড়ে যাচ্ছি। [মুসনাদে আহমাদ:৪/৩৭১] আলোচ্য আয়াতে জিন ও মানব জাতিকে এই অর্থের দিকে দিয়েই ثقلان বলা হয়েছে। কারণ পৃথিবীতে যত প্রাণী বসবাস করে, তাদের মধ্যে জিন ও মানব সর্বাধিক ওজন বিশিষ্ট ও সম্মানার্হ। سنفرغ শব্দটি فراغ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কর্মমুক্ত হওয়া। এর বিপরীত কর্মব্যস্ততা। فراغ শব্দ থেকে দুটি বিষয় বুঝা যায়- (এক) পূর্বে কোন কাজে ব্যস্ত থাকা

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٢﴾

৩২. কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহে মিথ্যারোপ করবে?

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا ۚ لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ ﴿٣٣﴾

৩৩. হে জিন ও মানব সম্প্রদায়! আসমানসমূহ ও যমীনের সীমা তোমরা যদি অতিক্রম করতে পার অতিক্রম কর, কিন্তু তোমরা অতিক্রম করতে পারবে না সনদ ছাড়া(১)।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٤﴾

৩৪. কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহে মিথ্যারোপ করবে?

يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ

৩৫. তোমাদের উভয়ের প্রতি প্রেরিত হবে আগুনের শিখা ও ধুম্রপুঞ্জ(২), তখন

এবং (দুই) এখন সেই কাজ সমাপ্ত করে কর্মমুক্ত হওয়া। উভয় বিষয় সৃষ্টজীবের মধ্যে প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। [কুরতুবী] ইবনুল আরাবী,আবু আলী আল-ফারেসী প্রমুখের মতে এখানে কর্মব্যস্ততা উদ্দেশ্য। [ফাতহুল কাদীর]

(১) আয়াতে এ কথা বলা উদ্দেশ্য যে, প্রতিদান দিবসের উপস্থিতি এবং হিসাব-নিকাশ থেকে পলায়ন করতে পারবে না। মৃত্যুর কবল থেকে অথবা কিয়ামতের হিসাব থেকে গা বাঁচিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সাধ্য কারও নেই। হে জিন ও মানবকুল, তোমরা যদি মনে কর যে, তোমরা কোথাও পালিয়ে গিয়ে মালাকুল-মওতের কবল থেকে গা বাঁচিয়ে যাবে অথবা হাশরের ময়দান থেকে পালিয়ে গিয়ে হিসাব-নিকাশের ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে যাবে, তবে জেনে নাও যে, এ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তোমাদেরকে আল্লাহর প্রভুত্বাধীন এলাকা থেকে চলে যেতে হবে। কিন্তু সে ক্ষমতা তোমাদের নেই। যদি আকাশ ও পৃথিবীর সীমা অতিক্রম করার সামর্থ্য তোমাদের থাকে, তোমরা যদি মনে এ ধরনের অহমিকা পোষণ করে থাক তাহলে সর্বশক্তি নিয়োগ করে অতিক্রম করে দেখাও। এখানে আসমান ও যমীন অর্থ গোটা সৃষ্টিজগত অথবা অন্যকথায় আল্লাহর প্রভুত্ব। আয়াতে আকাশ ও পৃথিবীর প্রান্ত অতিক্রম করার সম্ভাব্যতা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়; বরং অসম্ভবকে সম্ভব ধরে নেয়ার পর্যায়ে তাদের অক্ষমতা ব্যক্ত করা উদ্দেশ্য। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর; ইবন কাসীর]

(২) অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেন, ধূম্রবিহীন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হবে شواظ এবং অগ্নিবিহীন ধূম্রকুঞ্জ نحاس বলা হয় এই আয়াতেও জিন ও মানবকে সম্বোধন করে তাদের প্রতি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও ধূম্রকুঞ্জ ছাড়ার কথা বর্ণনা হয়েছে। অর্থাৎ হে জিন ও মানব,

فَلَا تَنْتَصِرٰنِ ۝٣٥

তোমরা প্রতিরোধ করতে পারবে না।

فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝٣٦

৩৬. কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহে মিথ্যারোপ করবে?

فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاۤءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ۝٣٧

৩৭. যেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে সেদিন তা রক্তিম গোলাপের মত লাল চামড়ার রূপ ধারণ করবে(১);

فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝٣٨

৩৮. কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহে মিথ্যারোপ করবে?

فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْـَٔلُ عَنْ ذَنْۢبِهٖۤ اِنْسٌ وَّلَا جَاۤنٌّ ۝٣٩

৩৯. অতঃপর সেদিন না মানুষকে তার অপরাধ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হবে, না জিনকে(২)!

জাহান্নাম থেকে তোমরা যেদিকেই পালাতে চাইবে, সেদিকেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও ধূম্রকুঞ্জ তোমাদেরকে ঘিরে ফেলবে আথবা হিসাব-নিকাশের পর জাহান্নামের অপরাধীদের কেউ যদি পালাতে চেষ্টা করে তাদেরকে ফেরেশ্তাগণ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও ধূম্রকুঞ্জ দ্বারা ঘিরে ফেলবে।[ইবন কাসীর; কুরতুবী]

(১) এখানে কিয়ামতের দিনের কথা বলা হয়েছে। আসমান বিদীর্ণ হওয়ার অর্থ মহাকাশ বা মহাবিশ্বের মধ্যকার পারস্পরিক আকর্ষণ বা ভারাসম্যের নীতি অবশিষ্ট না থাকা, মহাকাশের সমস্ত সৌরজগতের বিক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়া । আরো বলা হয়েছে, সে সময় আসমান লাল চামড়ার মত বর্ণধারণ করবে। অর্থাৎ সেই মহাধ্বংসের সময় যে ব্যক্তি পৃথিবী থেকে আসমানের দিকে তাকাবে তার মনে হবে গোটা উর্ধজগতে যেন আগুন লেগে গিয়েছে।[দেখুন, কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর; সা'দী]

(২) অর্থাৎ সেদিন কোন মানব অথবা জিনকে তার অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না। এর এক অর্থ এই যে, তাদেরকে কিয়ামতে এই প্রশ্ন করা হবে না যে, তোমরা অমুক গোনাহ করেছ কি না? এ কথা তো ফেরেশতাদের লিখিত আমলনামায় এবং আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানে পূর্ব থেকেই বিদ্যমান রয়েছে। বরং প্রশ্ন এই হবে যে, তোমরা অমুক গোনাহ কেন করলে? কোন কোন মুফাসসির বলেন, এর অর্থ, অপরাধীদের শাস্তিদানে আদিষ্ট ফেরেশতাগণ অপরাধীদেরকে জিজ্ঞাসা করবে না যে, তোমরা এই গোনাহ করেছ কিনা? এর প্রয়োজনই হবে না কেননা, প্রত্যেক গোনাহের একটি বিশেষ চিহ্ন অপরাধীদের চেহারায় ফুঠে উঠবে।

৪০. কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহে মিথ্যারোপ করবে?

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝٤٠

৪১. অপরাধীদের পরিচয় পাওয়া যাবে তাদের লক্ষণ থেকে[১], অতঃপর তাদেরকে পাকড়াও করা হবে মাথার সামনের চুল ও পা ধরে[২]।

يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ ۝٤١

৪২. কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহে মিথ্যারোপ করবে?

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝٤٢

৪৩. এটাই সে জাহান্নাম, যাতে অপরাধীরা মিথ্যারোপ করত,

هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ ۝٤٣

৪৪. তারা জাহান্নামের আগুন ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ঘুরাঘুরি করবে[৩]।

يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ ۝٤٤

৪৫. কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহে মিথ্যারোপ করবে?

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝٤٥

ফেরেশতাগণ এই চিহ্ন দেখে তাদেরকে জাহান্নামে ঠেলে দেবে। [কুরতুবী; ইবন কাসীর]

(১) سيما শব্দের অর্থ আলামত, চিহ্ন। অর্থাৎ সেদিন অপরাধীদের আলামত হবে এই যে, তাদের মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ ও চক্ষু নীলাভ হবে। দুঃখ ও কষ্টের কারণে চেহারা বিষণ্ন হবে। এই আলামতের সাহায্যে ফেরেশতারা তাদেরকে পাকড়াও করবে। [ইবন কাসীর; কুরতুবী]

(২) نواصي শব্দটি ناصية এর বহুবচন। অর্থ কপালের চুল। কেশাগ্র ও পা ধরার এক অর্থ এই যে, কারও কেশাগ্র ধরে এবং কারও পা ধরে টানা হবে অথবা একসময় এভাবে এবং অন্য সময় অন্যভাবে টানা হবে। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, কেশাগ্র ও পা এক সাথে বেঁধে দেয়া হবে। [কুরতুবী]

(৩) অর্থাৎ জাহান্নামের মধ্যে বারবার পিপাসার্ত হওয়ার কারণে তাদের অবস্থা হবে অত্যন্ত করুণ। দৌঁড়িয়ে দৌঁড়িয়ে পানির ঝর্ণার দিকে যাবে। কিন্তু সেখানে পাবে টগবগে গরম পানি যা পান করে পিপাসা মিটবে না। [কুরতুবী; ইবন কাসীর]

তৃতীয় রুকূ'

৪৬. আর যে তার রবের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দুটি উদ্যান[১]।

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ ﴿٤٦﴾

৪৭. কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহে মিথ্যারোপ করবে?

فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٧﴾

৪৮. উভয়ই বহু শাখা-পল্লববিশিষ্ট[২]।

ذَوَاتَاۤ اَفْنَانٍ ﴿٤٨﴾

৪৯. কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহে মিথ্যারোপ করবে?

فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٩﴾

৫০. উভয় উদ্যানে রয়েছে প্রবাহমান দুই প্রস্রবণ[৩];

فِیْهِمَا عَیْنٰنِ تَجْرِیٰنِ ﴿٥٠﴾

৫১. কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহে মিথ্যারোপ করবে?

فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥١﴾

---

(১) অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে পৃথিবীতে জীবন যাপন করেছে, সবসময় যার এ উপলব্ধি ছিল যে, আমাকে একদিন আমার রবের সামনে দাঁড়াতে হবে এবং নিজের সব কাজ-কর্মের হিসেব দিতে হবে। তাদের জন্যই রয়েছে স্পেশাল দু'টি বাগান বা উদ্যান। তারাই এই দুই উদ্যানের অধিকারী হবে। [ইবন কাসীর; মুয়াসসার]

(২) এখান থেকে প্রথমোক্ত জান্নাতের প্রস্রবণ দু'টির বর্ণনা দেয়া হচ্ছে, যেগুলো জান্নাতীগণ লাভ করবে। বলা হচ্ছে, ﴿ذَوَاتَاۤ اَفْنَانٍ﴾ অর্থাৎ উদ্যানদ্বয় ঘন শাখাপল্লববিশিষ্ট হবে। এর অবশ্যম্ভাবী ফল এই যে, এগুলোর ছায়াও ঘন ও সুনিবিড় হবে এবং ফলও বেশি হবে। পরবর্তীতে উল্লিখিত উদ্যানদ্বয়ের ক্ষেত্রে এই বিশেষণ উল্লেখ করা হয়নি। ফলে সেগুলোর মধ্যে এ বিষয়ের অভাব বোঝা যায়। [কুরতুবী;ইবন কাসীর]

(৩) প্রথমোক্ত দুই উদ্যানের দুই প্রস্রবণ সম্পর্কে تَجْرِيَانِ তথা বহমান বলা হয়েছে, শেষোক্ত দুই উদ্যানের প্রস্রবণ থেকে উত্তম, যাদের সম্পর্কে نَضَّاخَتَانِ তথা উত্তাল বলা হয়েছে। কেননা, প্রস্রবণ মাত্রই উত্তাল হয়ে থাকে। কিন্তু যে প্রস্রবণ সম্পর্কে বহমান বলা হয়েছে, তার মধ্যে উত্তাল হওয়া ছাড়াও দূর পর্যন্ত প্রবাহিত হওয়ার গুণটি অতিরিক্ত। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, প্রথমোক্ত জান্নাত দু'টি নৈকট্যবান মুমিনদের। পক্ষান্তরে শেষোক্ত দু'টি জান্নাত সাধারণ ঈমানদারদের। [কুরতুবী]

৫২. উভয় উদ্যানে রয়েছে প্রত্যেক ফল দুই দুই প্রকার(১)।

فِيهِمَا مِن كُلِّ فَٰكِهَةٍ زَوْجَانِ ﴿٥٢﴾

৫৩. কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহে মিথ্যারোপ করবে?

فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥٣﴾

৫৪. সেখানে তারা হেলান দিয়ে বসবে এমন ফরাশে যার অভ্যন্তরভাগ হবে পুরু রেশমের। আর দুই উদ্যানের ফল হবে কাছাকাছি।

مُتَّكِـِٔينَ عَلَىٰ فُرُشٍۭ بَطَآئِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ ۚ وَجَنَى ٱلْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ﴿٥٤﴾

৫৫. কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহে মিথ্যারোপ করবে?

فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥٥﴾

৫৬. সেসবের মাঝে রয়েছে বহু আনত নয়না, যাদেরকে আগে কোন মানুষ অথবা জিন স্পর্শ করেনি(২)।

فِيهِنَّ قَٰصِرَٰتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ﴿٥٦﴾

---

(১) এখানে প্রথমোক্ত উদ্যানদ্বয়ের বিশেষণে ﴿مِن كُلِّ فَٰكِهَةٍ زَوْجَانِ﴾ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এগুলোতে সর্বপ্রকার ফল থাকবে। এর বিপরীতে শেষোক্ত উদ্যানদ্বয়ের বর্ণনায় শুধু فاكهة বলা হয়েছে। زوجان এর অর্থ এই যে, প্রত্যেক ফলের দুটি করে প্রকার হবে - শুষ্ক ও আর্দ্র। অথবা সাধারণ স্বাদযুক্ত ও অসাধারণ স্বাদযুক্ত। অথবা, উভয় বাগানের ফলই হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্টপূর্ণ। এক বাগানে গেলে গাছের শাখা প্রশাখায় প্রচুর ফল দেখতে পাবে। অপর বাগানে গেলে সেখানকার ফলের অবস্থা সম্পূণ ভিন্ন দেখতে পাবে। অথবা, এর প্রতিটি বাগানের এক প্রকারের ফল হবে তার পরিচিত। তার সাথে সে দুনিয়াতেও পরিচিত ছিল-যদিও তা স্বাদে দুনিয়ার ফল থেকে অনেক শ্রেষ্ঠ হবে। আর আরেক প্রকার ফল হবে বিরল ও অভিনব জাতের-দুনিয়ায় যা সে কোন সময় কল্পনাও করতে পারেনি। [দেখুন, ইবন কাসীর; কুরতুবী]

(২) طمث শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর এক অর্থ হায়েযের রক্ত। যে নারীর হায়েয হয়, তাকে طامث বলা হয়। কুমারী বালিকার সাথে সহবাসকেও طمث বলা হয়। এখানে এই অর্থই বোঝানো হয়েছে। আয়াতের দ্বিবিধ অর্থ হতে পারে। (এক) যেসব নারী মানুষের জন্যে নির্ধারিত তাদেরকে ইতিপূর্বে কোন মানুষ এবং যেসব নারী জিনদের জন্যে নির্ধারিত তাদেরকে ইতিপূর্বে কোন জিন স্পর্শ করেনি।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥٧﴾

৫৭. কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহে মিথ্যারোপ করবে?

كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٥٨﴾

৫৮. তারা যেন পদ্মরাগ ও প্রবাল।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥٩﴾

৫৯. কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহে মিথ্যারোপ করবে?

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ﴿٦٠﴾

৬০. ইহসানের প্রতিদান ইহসান ছাড়া আর কী হতে পারে[১]?

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦١﴾

৬১. কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহে মিথ্যারোপ করবে?

وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ﴿٦٢﴾

৬২. এ উদ্যান দুটি ছাড়া আরো দুটি উদ্যান রয়েছে[২]।

(দুই) দুনিয়াতে যেমন মাঝে মাঝে মানব নারীদের উপর জিন ভর করে বসে, জান্নাতে এরূপ কোন সম্ভাবনা নেই। [কুরতুবী;ফাতহুল কাদীর ,ইবন কাসীর]

(১) নৈকট্যশীলদের উদ্যানদ্বয়ের কিছু বিবরণ পেশ করার পর বলা হয়েছে যে, ইহসান বা সৎকর্মের প্রতিদান উত্তম পুরস্কারই হতে পারে, এছাড়া অন্য কোন সম্ভাবনা নেই। [ইবন কাসীর; কুরতুবী]

(২) মূল আয়াতে ব্যবহৃত বাক্যাংশ হলো, ﴿وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ﴾ আরবী ভাষায় دون শব্দটি তিনটি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক, ব্যতীত অর্থে। দুই. কোন জিনিসের নিকটে হওয়া অর্থে বা কোন উঁচু জিনিসের তুলনায় নীচু হওয়া অর্থে। তিন, কোন জিনিসের নিকটে অর্থে। চার. কোন উত্তম ও উৎকৃষ্ট জিনিসের তুলনায় নিম্নমানের হওয়া অর্থে। অর্থের এ ভিন্নতার কারণে বাক্যাংশের অর্থ নির্ধারণেও ভিন্ন ভিন্ন মত এসেছে। প্রথম অর্থ অনুসারে কোন কোন মুফাসসির অর্থ করেছেন, এ দু'টি বাগান ছাড়াও প্রত্যেক জান্নাতীকে আরো দু'টি বাগান দেয়া হবে। দ্বিতীয় অর্থ অনুসারে কোন কোন মুফাসসির এর অর্থ করেছেন, আগের দু'টি জান্নাতের থেকেও আল্লাহর আরশের নিকটে তাদের জন্য আরও দু'টি জান্নাত থাকবে। তৃতীয় অর্থ অনুসারে আয়াতের অর্থ হবে, উল্লেখিত জান্নাত দু'টির কাছেই আরও দু'টি জান্নাত থাকবে। তখন জান্নাত দু'টির কোনটিকে অপর কোনটির উপর শ্রেষ্ঠত্ব বোঝানো হবে না। চতুর্থ সম্ভাবনা হচ্ছে, এ দু'টি বাগান ওপরে উল্লেখিত বাগান দু'টির তুলনায় অবস্থান ও মর্যাদায় নীচু মানের হবে।

৬৩. কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহে মিথ্যারোপ করবে?

فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

৬৪. ঘন সবুজ এ উদ্যান দুটি[১]।

مُدْهَآمَّتٰنِ ۝

অর্থাৎ পূর্বোক্ত দু'টি বাগান হয়তো উচ্চস্থানে হবে এবং এ দু'টি তার নীচে অবস্থিত হবে কিংবা প্রথমোক্ত বাগান দু'টি অতি উন্নতমানের হবে এবং তার তুলনায় এ দু'টি নিম্নমানের হবে। প্রথম তিনটি সম্ভাবনা মেনে নিলে তার অর্থ হবে, ওপরে যেসব জান্নাতীদের কথা বলা হয়েছে অতিরিক্ত এ দু'টি বাগানও হবে তাদেরই। আর চতুর্থ অর্থের সম্ভাবনা মেনে নেয়ার ক্ষেত্রে অর্থ হবে প্রথমোক্ত দু'টি বাগান উন্নতমানের আর শেষোক্ত দু'টি হবে তার চেয়ে নীচু মানের । এ হিসেবে অনেকেই প্রথম দু'টি জান্নাতকে "মুকাররাবীন" বা আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী বান্দাদের জন্য এবং পরবর্তী দু'টি জান্নাতকে "আসহাবুল ইয়ামীন"-দের জন্য বলে মত দিয়েছেন। এ অর্থের সম্ভাবনাটি যে কারণে দৃঢ় ভিত্তি লাভ করছে তা হলো, প্রথমোক্ত জান্নাতে যা বলা হয়েছে শেষোক্ত জান্নাতে তার থেকে কিছু কম বর্ণনা এসেছে। বেশী দেয়ার পর কাউকে কম করে দেয়ার অর্থ হয় না। তাই এর দ্বারা দু'দল মুমিনকে দুটি ভিন্ন ধরনের জান্নাত দেয়া হবে বলাই অধিক গ্রহণযোগ্য। তাছাড়া সূরা আল-ওয়াকি'আয় সৎকর্মশীল মানুষদের দু'টি শ্রেণীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। একটি "সাবেকীন" বা অগ্রবর্তীগণ। তাদেরকে "মুকাররাবীন" বা নৈকট্য লাভকারীও বলা হয়েছে। অপরটি "আসহাবুল ইয়ামীন"। তাদেরকে অন্যত্র "আসহাবুল মায়মানাহ" নামেও আখ্যায়িত করা হয়েছে। সুতরাং তাদের উভয় শ্রেণীর জন্য দু'টি আলাদা বৈশিষ্ট্যের জান্নাতের কথা বলা হয়েছে এটাই বেশী যুক্তিযুক্ত। এ দ্বিতীয় অর্থটির সপক্ষে একটি হাদীসের ভাষ্য থেকে আমরা প্রমাণ পাই, যাতে জান্নাতের বিবরণ এসেছে, বলা হয়েছে, 'দুটি জান্নাত, যার পান, আহার ও অন্যান্য আসবাবপত্র সবই হবে রৌপ্যের। আর দু'টি জান্নাত, যার পান, আহার ও অন্যান্য আসবাবপত্র সবই হবে স্বর্ণের। স্থায়ী জান্নাতে তাদের ও তাদের রবের দীদারের মধ্যে পার্থক্য শুধু এটুকুই যে, মহান আল্লাহ্‌র চেহারার উপর থাকবে অহংকারের চাদর।' [বুখারী: ৪৮৮০, মুসলিম: ১৮০] এ হাদীসের শেষে কোন কোন বর্ণনায় সাহাবী আবু মূসা আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ প্রথম দু'টি 'মুকাররাবীন'-নৈকট্য লাভকারীদের জন্য আর শেষ দু'টি জান্নাত 'আসহাবুল ইয়ামীন'দের জন্য। [ফাতহুল বারী, কিতাবুত তাফসীর, তাফসীরে সূরা আর রাহমান]

(১) ঘন সবুজের কারণে যে কালো রঙ দৃষ্টিগোচর হয়, তাকে ادهام বলা হয়। অর্থাৎ এই উদ্যানদ্বয়ের ঘন সবুজতা এদের কালোমত হওয়ার কারণ হবে। [কুরতুবী;ফাতহুল কাদীর]

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٥﴾

৬৫. কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহে মিথ্যারোপ করবে?

فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴿٦٦﴾

৬৬. উভয় উদ্যানে আছে উচ্ছলিত দুই প্রস্রবণ।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٧﴾

৬৭. কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহে মিথ্যারোপ করবে?

فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ﴿٦٨﴾

৬৮. সেখানে রয়েছে ফলমূল---খেজুর ও আনার।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٩﴾

৬৯. কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহে মিথ্যারোপ করবে?

فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ﴿٧٠﴾

৭০. সে উদ্যানসমূহের মাঝে রয়েছে চরিত্রবর্তী, অনিন্দ্য সুন্দরীগণ[১]।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧١﴾

৭১. কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহে মিথ্যারোপ করবে?

حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ﴿٧٢﴾

৭২. তারা হূর, তাঁবুতে সুরক্ষিতা[২]।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٣﴾

৭৩. কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহে মিথ্যারোপ করবে?

---

(১) خيرات এর অর্থ চারিত্রিক দিক দিয়ে সুশীলা এবং حسانٌ এর অর্থ দেহাবয়বের দিক দিয়ে সুন্দরী। উভয় উদ্যানের নারীগণ সমভাবে এই বিশেষণে বিশেষিতা হবে। [ইবন কাসীর; কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

(২) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "জান্নাতে এমন একটি মুক্তার খীমা থাকবে যার অভ্যন্তরভাগ ফাঁকা থাকবে। যার আয়তন হবে ষাট মাইল। তার প্রতিটি কোণে মুমিনের যে পরিবার থাকবে অন্য কোণের লোকজন তাদের দেখতে পাবে না। মুমিনরা সেগুলোয় ঘুরাপিরা করবে। [বুখারী: ৪৮৭৯, মুসলিম: ২৮৩৮]

৭৪. এদেরকে এর আগে কোন মানুষ অথবা জিন স্পর্শ করেনি।

لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ﴿٧٤﴾

৭৫. কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্‌ অনুগ্রহে মিথ্যারোপ করবে?

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٥﴾

৭৬. তারা হেলান দিয়ে বসবে সবুজ তাকিয়ায় ও সুন্দর গালিচার উপরে[১]।

مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ﴿٧٦﴾

৭৭. কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্‌ অনুগ্রহে মিথ্যারোপ করবে?

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٧﴾

৭৮. কত বরকতময় আপনার রবের নাম যিনি মহিমাময় ও মহানুভব[২]!

تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٧٨﴾

---

(১) رفرف এর অর্থ সবুজ রঙের রেশমী বস্ত্র। এর দ্বারা বিছানা, বালিশ ও অন্যান্য বিলাস সামগ্রী তৈরি করা হয়। এমনকি এর উপর বৃক্ষ ও ফুলের কারুকার্যও করা হয়। عَبْقَرِيٌّ অর্থ সুশ্রী ও উৎকৃষ্ট বস্ত্র। [কুরতুবী; ইবন কাসীর]

(২) সূরা আর-রহমানে বেশির ভাগ আল্লাহ তা'আলার অবদান ও মানুষের প্রতি অনুগ্রহ বর্ণিত হয়েছে। উপসংহার সার-সংক্ষেপ হিসেবে বলা হয়েছেঃ আল্লাহর পবিত্র সত্তা অনন্য। তাঁর নামও খুব পুণ্যময়। তার নামের সাথেই এসব অবদান কায়েম ও প্রতিষ্ঠিত আছে। [কুরতুবী; ইবন কাসীর] হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত আদায়ের পরে বসা অবস্থায় বলতেন, اللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ "হে আল্লাহ্‌ আপনি সালাম (শান্তি ও নিরাপত্তাপ্রদানকারী), আপনার পক্ষ থেকেই সালাম (শান্তি ও নিরাপত্তা) আসে। আপনি বরকতময়, হে মহিমাময় মহানুভব।" [মুসলিম: ৫৯১, ৫৯২] কোন বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা "ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম" বলে বেশী বেশী করে সার্বক্ষনিক আল্লাহ্‌র কাছে চাও'। [তিরমিযী: ৩৫২২, মুসনাদে আহমাদ: ৪/১৭৭]

৫৬- সূরা আল-ওয়াকি'আহ্[১]
৯৬ আয়াত, মক্কী

।। **রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে** ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ①

১. যখন সংঘটিত হবে কিয়ামত[২],

لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ②

২. (তখন) এটার সংঘটন মিথ্যা বলার কেউ থাকবে না[৩]।

---

(১) হাদীসে এসেছে, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি বৃদ্ধ হয়ে গেলেন। তিনি বললেন, আমাকে হূদ, আল-ওয়াকি'আহ, আল-মুরসিলাত, 'আম্মা ইয়াতাছাআলুনা এবং ইযাসসামছু কুওয়িরাত বৃদ্ধ করে দিয়েছে।' [তিরমিযী: ৩২৯৭] অপর হাদীসে জাবির ইবনে সামুরাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, 'তোমরা বর্তমানে যেভাবে সালাত আদায় কর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তেমনি সালাত আদায় করতেন; তবে তিনি অনেকটা হাল্কা করতেন। তার সালাত তোমাদের সালাতের চেয়ে অধিক হাল্কা ছিল। অবশ্য তিনি ফজরের সালাতে সূরা আল-ওয়াকি'আহ্ এবং এ জাতীয় সূরা পড়তেন।' [মুসনাদে আহমাদ: ৫/১০৪]

(২) الواقعة শব্দটির অভিধানিক অর্থ হচ্ছে, "যা ঘটা অবশ্যম্ভাবী"। এখানে الواقعة বলে কিয়ামত বোঝানো হয়েছে। ওয়াকি'আহ্ কেয়ামতের অন্যতম নাম। কেননা, এর বাস্তবতায় কোনরূপ সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই। [ফাতহুল কাদীর]

(৩) অর্থাৎ আল্লাহ্ যখন সেটা ঘটাতে চাইবেন তখন সেটাকে রোধ করে বা সেটার আগমন ঠেকানোর কেউ থাকবে না। [ফাতহুল কাদীর] অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা তা বলেছেন, "তোমাদের রবের ডাকে সাড়া দাও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সে দিন আসার আগে, যা অপ্রতিরোধ্য; যেদিন তোমাদের কোন আশ্রয়স্থল থাকবে না এবং তোমাদের জন্য তা নিরোধ করার কেউ থাকবে না।" [সূরা আশ-শূরা: ৪৭] অন্যত্র বলা হয়েছে, "এক ব্যক্তি চাইল, সংঘটিত হোক শাস্তি যা অবধারিত--- কাফিরদের জন্য, এটাকে প্রতিরোধ করার কেউ নেই।" [সূরা আল-মা'আরিজ:১-২] তাছাড়া আরও এসেছে, "তাঁর কথাই সত্য। যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে সেদিনের কর্তৃত্ব তো তাঁরই। উপস্থিত ও অনুপস্থিত সবকিছু সম্বন্ধে তিনি পরিজ্ঞাত; আর তিনিই প্রজ্ঞাময়, সবিশেষ অবহিত।" [সূরা আল-আন'আম:৭৩] আয়াতে كاذبة এর অর্থ কোন কোন মুফাসসিরের মতে, "অবশ্যম্ভাবী"। কোন কোন মুফাসসিরের মতে, "যা থেকে কোন প্রত্যাবর্তন নেই"। আবার কারো কারো মতে, كاذبة শব্দটি عاقبة ও عافية এর ন্যায় একটি ধাতু। অর্থ এই যে, কেয়ামতের বাস্তবতা মিথ্যা হতে পারে না। [ইবন কাসীর]

৩. এটা কাউকে করবে নীচ, কাউকে করবে সমুন্নত[১];	خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ۝٣
৪. যখন প্রবল কম্পনে প্রকম্পিত হবে যমীন	إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا ۝٤
৫. এবং চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়বে পর্বতমালা,	وَّبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ۝٥
৬. অতঃপর তা পর্যবসিত হবে উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণায়;	فَكَانَتْ هَبَآءً مُّنۢبَثًّا ۝٦
৭. আর তোমরা বিভক্ত হয়ে পড়বে তিন দলে ---[২]	وَّكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلٰثَةً ۝٧

(১) "নীচুকারী ও উঁচুকারী" এর একটি অর্থ হতে পারে সেই মহা ঘটনা সব কিছু উলট-পালট করে দেবে। কেয়ামত ভয়াবহ হবে এবং এতে অভিনব বিপ্লব সংঘটিত হবে। আরেকটি অর্থ এও হতে পারে যে, তা নীচে পতিত মানুষদেরকে উপরে উঠিয়ে দেবে এবং উপরের মানুষদেরকে নীচে নামিয়ে দেবে। আরেকটি অর্থ এও হতে পারে যে, সেটার সংবাদ কাছের লোকদেরকে আস্তে আসবে আর দূরের লোকদের কাছে উঁচু স্বরে আসবে। মোটকথা: সেই মহাসংবাদটি দূরের কাছের সবাই শোনতে পাবে। আরেকটি অর্থ হচ্ছে, কিয়ামতের সেদিন কাউকে উঁচু জান্নাতে স্থান করে দেয়া হবে আর কাউকে নীচু জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। [ইবন কাসীর; কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

(২) ইবনে কাসীর বলেনঃ কেয়ামতের দিন সব মানুষ তিন দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। এক দল আরশের ডানপার্শ্বে থাকবে। তারা আদম আলাইহিস্ সালাম-এর ডানপার্শ্বে থেকে পয়দা হয়েছিল এবং তাদের আমলনামা তাদের ডান হাতে দেয়া হবে। তারা সবাই জান্নাতী। দ্বিতীয় দল আরশের বামদিকে একত্রিত হবে। তারা আদম আলাইহিস্ সালাম-এর বামপার্শ্ব থেকে পয়দা হয়েছিল এবং তাদের আমলনামা তাদের বাম হাতে দেয়া হবে। তারা সবাই জাহান্নামী। তৃতীয় দল হবে অগ্রবর্তীদের দল। তারা আরশাধিপতি আল্লাহ্‌র সামনে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য ও নৈকট্যের আসনে থাকবে। তারা হবেন নবী, রাসূল, সিদ্দীক, শহীদগণ। তাদের সংখ্যা প্রথমোক্ত দলের তুলনায় কম হবে। [ইবন কাসীর] মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনের অন্যত্রও মানুষকে এ তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। আল্লাহ্ বলেন, "তারপর আমরা কিতাবের অধিকারী করলাম আমার বান্দাদের মধ্য থেকে যাদেরকে আমরা মনোনীত করেছি; তবে তাদের কেউ নিজের প্রতি অত্যাচারী, কেউ মধ্যমপন্থী এবং কেউ আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় কল্যাণের কাজে অগ্রগামী। এটাই মহাঅনুগ্রহ---" [সূরা ফাতির: ৩২]

৮. অতঃপর ডান দিকের দল; ডান দিকের দলটি কত সৌভাগ্যবান[১]!

فَأَصْحَٰبُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَآ أَصْحَٰبُ ٱلْمَيْمَنَةِ ۝٨

৯. এবং বাম দিকের দল; আর বাম দিকের দলটি কত হতভাগা[২]!

وَأَصْحَٰبُ ٱلْمَشْـَٔمَةِ مَآ أَصْحَٰبُ ٱلْمَشْـَٔمَةِ ۝٩

১০. আর অগ্রবর্তিগণই তো অগ্রবর্তী[৩],

وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلسَّٰبِقُونَ ۝١٠

১১. তারাই নৈকট্যপ্রাপ্ত---

أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلْمُقَرَّبُونَ ۝١١

১২. নি‘আমতপূর্ণ উদ্যানে;

فِى جَنَّٰتِ ٱلنَّعِيمِ ۝١٢

১৩. বহু সংখ্যক হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে;

ثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ۝١٣

---

(১) মূল আয়াতে ﴿أَصْحَٰبُ ٱلْمَشْـَٔمَةِ﴾ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী ব্যাকরণ অনুসারে مَيْمَنَةٌ শব্দটি يمين শব্দ থেকে গৃহিত হতে পারে, যার অর্থ ডান হাত। অর্থাৎ যাদের আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে। বা যারা ডানপাশে থাকবে। আবার يمن শব্দ থেকেও গৃহিত হতে পারে যার অর্থ শুভ লক্ষণ বা "খোশ নসীব" ও সৌভাগ্যবান। [কুরতুবী]

(২) মূল ইবারতে ﴿أَصْحَٰبُ ٱلْمَشْـَٔمَةِ﴾ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। مشأمة শব্দের উৎপত্তি হয়েছে شؤم থেকে। এর অর্থ, দূর্ভাগ্য, কুলক্ষণ, অশুভ লক্ষণ। আরবী ভাষায় বাঁ হাতকেও شؤمي বলা হয়। অতএব ﴿أَصْحَٰبُ ٱلْمَشْـَٔمَةِ﴾ অর্থ দুর্ভাগা লোক অথবা এমন লোক যারা আল্লাহর কাছে লাঞ্ছনার শিকার হবে এবং আল্লাহর দরবারে তাদেরকে বাঁ দিকে দাঁড় করানো হবে। অথবা আমলনামা বাঁ হাতে দেয়া হবে। [কুরতুবী]

(৩) আয়াতে বলা হয়েছে, السابقون অর্থাৎ যারা সৎকাজ ও ন্যায়পরায়ণতায় সবাইকে অতিক্রম করেছে, প্রতিটি কল্যাণকর কাজে সবার আগে থেকেছে। আল্লাহ ও রাসূলের আহ্বানে সবার আগে সাড়া দিয়েছে, জিহাদের ব্যাপারে হোক কিংবা আল্লাহর পথে খরচের ব্যাপারে হোক কিংবা জনসেবার কাজ হোক কিংবা কল্যাণের পথে দাওয়াত কিংবা সত্যের পথে দাওয়াতের কাজ হোক। মুজাহিদ বলেন, অগ্রবর্তীগণ বলে নবী-রাসূলগণকে বোঝানো হয়েছে। ইবনে-সিরীন এর মতে যারা বায়তুল মুকাদ্দাস ও বায়তুল্লাহ উভয় কেবলার দিকে মুখ করে সালাত পড়েছে, তারা অগ্রবর্তীগণ। হাসান ও কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমার মতে, প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে অগ্রবর্তী সম্প্রদায় রয়েছে। এসব উক্তি উদ্ধৃত করার পর ইবনে-কাসীর বলেনঃ এসব উক্তি স্ব স্ব স্থানে সঠিক ও বিশুদ্ধ। পৃথিবীতে কল্যাণের প্রসার এবং অকল্যাণের উচ্ছেদের জন্য ত্যাগ ও কুরবানী এবং শ্রমদান জীবনদানের যে সুযোগই এসেছে তাতে সে-ই অগ্রগামী হয়ে কাজ করেছে। এ কারণে আখেরাতেও তাদেরকেই সবার আগে রাখা হবে। [ইবন কাসীর; কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

১৪. এবং অল্প সংখ্যক হবে পরবর্তীদের মধ্য থেকে[১]।

وَقَلِيۡلٌ مِّنَ الۡاٰخِرِيۡنَ ۞

(১) ثُلَّة শব্দের অর্থ দল অথবা বড় দল। আলোচ্য আয়াতসমূহে দু জায়গায় পূর্ববর্তীও পরবর্তীর বিভাগ উল্লেখিত হয়েছে - নৈকট্যশীলদের বর্ণনায় এবং সাধারণ মুমিনদের বর্ণনায়। নৈকট্যশীলদের বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, অগ্রবর্তী নৈকট্যশীলদের একটি বড় দল পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে হবে এবং অল্প সংখ্যক পরবর্তীদের মধ্য থেকে হবে। সাধারণ মুমিনদের বর্ণনায় পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উভয় জায়গায় ثُلَّة শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, সাধারণ মুমিনদের একটি বড় দল পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে হবে এবং একটি বড় দল পরবর্তীদের মধ্য থেকেও হবে। এখন চিন্তা সাপেক্ষ বিষয় এই যে, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বলে কাদেরকে বোঝানো হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তফসীরবিদগণ দু রকম উক্তি করেছেন। (এক) আদম আলাইহিস্ সালাম থেকে শুরু করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর পূর্ব পর্যন্ত সব মানুষ পূর্ববর্তী এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুরু করে কেয়ামত পর্যন্ত সব মানুষ পরবর্তী। (দুই) তফসীরবিদগণের দ্বিতীয় উক্তি এই যে, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বলে এই উম্মতেরই দুটি স্তর বোঝানো হয়েছে। পূর্ববর্তী বলে কুরুনে-উলা তথা সাহাবী, তাবেয়ী প্রমুখদের যুগকে এবং পরবর্তী বলে তাদের পরবর্তী কেয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী মুসলিম সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়েছে। অধিকাংশ মুফাসসির এই দ্বিতীয় উক্তিকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] এ পক্ষের যুক্তির সমর্থনে বলা যায় যে, পবিত্র কুরআন থেকে সুস্পষ্টরূপে বোঝা যায়, উম্মতে মুহাম্মদী পূর্ববর্তী সকল উম্মতের চাইতে শ্রেষ্ঠ। [সা'দী] বলাবাহুল্য কোন উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব তার ভিতরকার উচ্চস্তরের লোকদের সংখ্যাধিক্য দ্বারাই হয়ে থাকে। তাই শ্রেষ্ঠতম উম্মতের মধ্যে অগ্রবর্তী নৈকট্যশীলদের সংখ্যা কম হবে - এটা সুদূর পরাহত। যেসব আয়াত দ্বারা উম্মতে মুহাম্মদীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়, সেগুলো এইঃ ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [সূরা আলে ইমরান:১১০] এবং ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ [সূরা আল-বাকারাহ: ১৪৩] তাছাড়া এক হাদীসে বলা হয়েছে, "তোমরা সত্তরটি উম্মতের পরিশিষ্ট হবে। তোমরা সর্বশেষে এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে সর্বাধিক সম্মানিত ও শ্রেষ্ঠ হবে।" [তিরমিযী:৩০০১] অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন, "তোমরা জান্নাতীদের এক চতুর্থাংশ হবে - এতে তোমরা সন্তুষ্ট আছ কি? আমরা বললামঃ নিশ্চয় আমরা এতে সন্তুষ্ট। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ, সেই সত্তার কসম, আমি আশা করি তোমরা জান্নাতের অর্ধেক হবে।" [বুখারী: ৩৩৪৮, মুসলিম:২২২] অন্য হাদীসে এসেছে, জান্নাতীগণ মোট একশ বিশ কাতারে থাকবে তন্মধ্যে আশি কাতার এই উম্মতের মধ্য থেকে হবে এবং অবশিষ্ট চল্লিশ কাতারে সমগ্র উম্মত শরীক হবে। [তিরমিযী: ২৫৪৬, ইবনে মাজাহ: ৪২৮৯, মুসনাদে আহমাদ: ১/৪৫৩, ৫/৩৪৭, ৫/৩৫৫] উপরোক্ত বর্ণনাসমূহে অন্যান্য উম্মতের তুলনায় এই উম্মতের জান্নাতীদের

عَلٰى سُرُرٍ مَّوْضُوْنَةٍ ﴿١٥﴾

১৫. স্বর্ণ- ও দামী পাথর খচিত আসনে,

مُّتَّكِـِٔيْنَ عَلَيْهَا مُتَقٰبِلِيْنَ ﴿١٦﴾

১৬. তারা হেলান দিয়ে বসবে, পরস্পর মুখোমুখি হয়ে[১] ।

يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ﴿١٧﴾

১৭. তাদের আশেপাশে ঘুরাফিরা করবে চির- কিশোরেরা[২]

পরিমাণ কোথাও এক চতুর্থাংশ, কোথাও অর্ধেক এবং শেষ বর্ণনায় দুই তৃতীয়াংশ বলা হয়েছে। এতে বুঝা গেল যে, এ নৈকট্যপ্রাপ্তদের সংখ্যা এ উম্মতের মধ্যে কম হবার নয়।

(১) উপরোক্ত দু আয়াতে জান্নাতের আসনসমূহ কেমন হবে তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। বিশেষ করে নৈকট্যপ্রাপ্তদের আসন কেমন হবে তার বর্ণনা এসেছে। জান্নাতের অট্টালিকাসমূহ, তার বাগানসমূহে বসার জায়গা কিভাবে চিত্তাকর্ষকভাবে সাজানো হয়েছে পবিত্র কুরআনের বিভিন্নস্থানে তার বিবরণ এসেছে। এ আয়াতসমূহে মহান আল্লাহ্ বলেন, "স্বর্ণ-খচিত আসনে, ওরা হেলান দিয়ে বসবে, পরস্পর মুখোমুখি হয়ে" অন্যত্র বলেন,"উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন শয্যা, প্রস্তুত থাকবে পানপাত্র, সারি সারি উপাধান, এবং বিছানা গালিচা;" [সূরা আল-গাসিয়াহ:১৩-১৬] আরও বলেন, "সেখানে তারা হেলান দিয়ে বসবে পুরু রেশমের আস্তর বিশিষ্ট ফরাশে, দুই উদ্যানের ফল হবে কাছাকাছি।" [সূরা আর-রাহমান:৫৪] আরও বলেন, "তারা বসবে শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে; আমি তাদের মিলন ঘটাব আয়তলোচনা হূরের সংগে;"[সূরা আত-তূর: ২০] এভাবে ঠেস লাগিয়ে বসে তারা পরস্পর ভাই ভাই হিসেবে অবস্থান করবে। মহান আল্লাহ্ বলেন, "আর আমরা তাদের অন্তর হতে বিদ্বেষ দূর করব; তারা ভাইয়ের মত পরস্পর মুখোমুখি হয়ে আসনে অবস্থান করবে," [সূরা আল-হিজর:৪৭] " ওরা হেলান দিয়ে বসবে সবুজ তাকিয়ায় ও সুন্দর গালিচার উপরে।" [সূরা আর-রাহমান: ৭৬, "সেখানে সমাসীন হবে সুসজ্জিত আসনে; কত সুন্দর পুরস্কার ও উত্তম আশ্রয়স্থল!" [সূরা আল-কাহাফ: ৩১]

(২) অর্থাৎ এই কিশোররা সর্বদা কিশোরই থাকবে। তাদের মধ্যে বয়সের কোন তারতম্য দেখা দেবে না। হূরদের ন্যায় এই কিশোরগণও জান্নাতেই পয়দা হবে এবং তারা জান্নাতীদের খেদমতগার হবে। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, একজন জান্নাতীর কাছে হাজারো খাদেম থাকবে।[বাইহাকী আব্দুল্লাহ ইবনে আমর থেকে] এই কিশোররা খুবই সুন্দর হবে। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে কিশোরেরা, সুরক্ষিত মুক্তার মত।[সূরা আত-তূর: ২৪] আরও বলা হয়েছে, "তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে চিরকিশোরগণ, যখন আপনি তাদেরকে দেখবেন তখন মনে করবেন তারা যেন বিক্ষিপ্ত মুক্তা।" [সূরা আল-ইনসান: ১৯] তাদের চলাফেরায়

১৮. পানপাত্র, জগ ও প্রস্রবণ নিঃসৃত সুরাপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে[১] ।

بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ ﴿١٨﴾

১৯. সে সুরা পানে তাদের শিরঃপীড়া হবে না, তারা জ্ঞানহারাও হবে না---[২]

لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ ﴿١٩﴾

মনে হবে যেন মুক্তা ছড়িয়ে আছে। কোন কোন লোক মনে করে থাকে যে, ছোট ছোট বাচ্চারা যারা নাবালেগ অবস্থায় মারা যাবে তারা জান্নাতের খাদেম হবে। তাদের এ ধারণা সঠিক নয়। কারণ; ছোট ছোট বাচ্চারা তখন পরিণত বয়সের হবে এবং জান্নাতের অধিবাসী হবে। পক্ষান্তরে এ সমস্ত খাদেমদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতেই সৃষ্টি করবেন। তাদের কাজই হবে খেদমত করা। তারা দুনিয়ার কোন অধিবাসী নয়। [ইবনে তাইমিয়্যা: মাজমু ফাতাওয়া ৪/২৭৯, ৪/৩১১]

(১) أَكْوَابٌ শব্দটি كُوْبٌ এর বহুবচন। অর্থ গ্লাসের ন্যায় পানপাত্র। أَبَارِيْقُ শব্দটি إِبْرِيْقٌ এর বহুবচন। এর অর্থ কুজা। এ জাতীয় পাত্রে ধরার ও বের করার জায়গা থাকে। كأس এর অর্থ সুরা পানের পেয়ালা। যদি পানীয় না থাকে তখন তাকে كأس বলা হয় না। معين এর উদ্দেশ্য এই যে, এই পানীয় একটি ঝর্ণা থেকে আনা হবে। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর; ইবন কাসীর] জান্নাতের পানপাত্র, কুজা, পেয়ালা এ সবই সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্মী হবে। নামে এক হলেও গুণাগুণে হবে আলাদা। তাদের এ সমস্ত সরঞ্জামাদি হবে স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত। মহান আল্লাহ্ বলেন, "স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র নিয়ে তাদেরকে প্রদক্ষিণ করা হবে" [সূরা আয-যুখরুফ: ৭১] আরও বলেন, "তাদেরকে পরিবেশন করা হবে রৌপ্যপাত্রে এবং স্ফটিকের মত স্বচ্ছ পানপাত্রে--- রজতশুভ্র স্ফটিক পাত্রে, পরিবেশনকারীরা যথাযথ পরিমাণে তা পূর্ণ করবে।" [সূরা আল-ইনসান: ১৫] হাদীসেও এ সমস্ত পাত্রের বর্ণনা এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "মুমিনের জন্য জান্নাতে এমন একটি তাঁবু থাকবে, যা এমন একটি মুক্তা দিয়ে তৈরী হয়েছে যে মুক্তার মাঝখানে খালি করা হয়েছে। ... আর রৌপ্যের দু'টি জান্নাত থাকবে সেগুলোর পেয়ালা ও অন্যান্য প্রসাধনী সবই রৌপ্যের। অনুরূপভাবে দু'টি স্বর্ণ নির্মিত জান্নাত থাকবে, যার পেয়ালা ও অন্যান্য প্রসাধনী সবই স্বর্ণের।" [বুখারী: ৪৮৭৮, মুসলিম: ১৮০]

(২) يُصَدَّعُوْنَ শব্দটি صدع থেকে উদ্ভূত। অর্থ মাথা ব্যথা। দুনিয়ার সুরা অধিক মাত্রায় পান করলে মাথাব্যথা ও মাথাঘোরা দেখা দেয়। জান্নাতের সুরা এই সুরা-উপসর্গ থেকে পবিত্র হবে। [ফাতহুল কাদীর কুরতুবী] আর ينـزفون এর আসল অর্থ কুপের সম্পূর্ণ পানি উত্তোলন করা। এখানে অর্থ জ্ঞানবুদ্ধি হারিয়ে ফেলা, বা বিরক্তি বোধ করা। মহান আল্লাহ্ জান্নাতবাসীদের যে সমস্ত পানীয় দ্বারা সম্মানিত করবেন তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, সুরা। কিন্তু সেগুলো কখনো দুনিয়ার মদের মত হবে না। দুনিয়ার মদ বিবেক নষ্ট করে, মাথা ব্যথা সৃষ্টি করে, পেট ব্যথার উদ্রেক করে, শরীর অসুস্থ করে, রোগ-ব্যাধি টেনে আনে। [ফাতহুল কাদীর] মহান আল্লাহ্ বলেন, "তাদেরকে

২০. আর (ঘোরাফেরা করবে) তাদের পছন্দমত ফলমূল নিয়ে[১],

وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ

ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করা হবে বিশুদ্ধ সুরাপূর্ণ পাত্রে শুভ্র উজ্জ্বল, যা হবে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু। তাতে ক্ষতিকর কিছু থাকবে না এবং তাতে তারা মাতালও হবে না।" [সূরা আস-সাফফাত:৪৫-৪৭] অন্য আয়াতে বলেছেন, "মুত্তাকীদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্তঃ তাতে আছে নির্মল পানির নহর, আছে দুধের নহর যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, আছে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নহর, আছে পরিশোধিত মধুর নহর।" [সূরা মুহাম্মাদ:১৫] তাছাড়া সেটা পান করে তারা জ্ঞান-হারাও হবে না। আবার পান করতে বিরক্তি বোধও হবে না। বলা হয়েছে, "তারা তাতে মাতালও হবে না" [সূরা আস-সাফফাত:৪৭] আলোচ্য সূরার আয়াতেও সে সুরার গুণাগুণ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে বলা হয়েছে, "তাদের সেবায় ঘোরাফিরা করবে চির-কিশোরেরা, পানপাত্র, কুজা ও প্রস্রবণ নিঃসৃত সুরাপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে, সে সুরা পানে তাদের শিরঃপীড়া হবে না, তারা জ্ঞানহারাও হবে না। [সূরা আল-ওয়াকি'আহ:১৭-১৯] ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, দুনিয়ার মদের চারটি খারাপ গুণ রয়েছে। মাতলামী, মাথাব্যথা, বমি ও পেশাব। পক্ষান্তরে জান্নাতের সুরা এগুলো থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র থাকবে। [কুরতুবী] অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ্ জান্নাতের সুরা সম্পর্কে বলেন যে, "তাদেরকে মোহর করা বিশুদ্ধ পানীয় হতে পান করানো হবে; ওটার মোহর মিস্কের, এ বিষয়ে প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করুক।" [সূরা আল-মুতাফফিফীন:২৫-২৭]

(১) জান্নাতের ফল-মূল দুনিয়ার ফল-মূলের নামে হলেও সেগুলোর স্বাদ ও গন্ধ হবে ভিন্ন প্রকৃতির। [সা'দী] আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "যখনই তাদেরকে কোন ফল থেকে রিযিক দেয়া হবে তখনই তারা বলবে, পূর্বেও তো আমাদের এই রিযিক দেয়া হয়েছিল, আর তাদেরকে অনুরূপ ফলই দেয়া হয়েছে" [সূরা আল-বাকারাহ:২৫] সুতরাং দেখতে ও নামে এক প্রকার হলেও স্বাদ হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ সমস্ত ফলের গাছ বিভিন্ন ধরনের হবে। মহান আল্লাহ্ জানিয়েছেন যে, সে সমস্ত গাছের মধ্যে রয়েছে, আঙ্গুরের গাছ, খেজুর গাছ, রুম্মান বা বেদানা গাছ, যেমন তাতে রয়েছে, বরই ও কলা গাছ। আল্লাহ্ বলেন, "মুত্তাকীদের জন্য তো আছে সাফল্য, উদ্যান, আঙ্গুর" [সূরা আন-নাবা: ৩১-৩২] "সেখানে রয়েছে ফলমূল---খেজুর ও আনার।" [সূরা আর-রাহমান:৬৮] "আর ডান দিকের দল, কত ভাগ্যবান ডান দিকের দল! তারা থাকবে এমন উদ্যানে, সেখানে আছে কাঁটাহীন কুলগাছ, কাঁদি ভরা কদলী গাছ, সম্প্রসারিত ছায়া, সদা প্রবাহমান পানি, ও প্রচুর ফলমূল, যা শেষ হবে না ও যা নিষিদ্ধও হবে না।" [সূরা আল-ওয়াকি'আহ:২৭-৩২] জান্নাতের বাগানে যা থাকবে তার মধ্যে কুরআন যা বর্ণনা করেছে তা খুব সামান্যই। আর এ জন্যই মহান আল্লাহ্ এ সমস্ত ফলমূলকে অন্যত্র একত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, "উভয় উদ্যানে রয়েছে প্রত্যেক ফল দুই দুই প্রকার"। [সূরা আর-রাহমান:৫৩] জান্নাতের

ফল-ফলাদির প্রাচুর্যের কারণে সেখানকার অধিবাসীরা যা ইচ্ছে তা দাবী করে নিবে আর যা ইচ্ছে তা পছন্দ করবে। "সেখানে তারা আসীন হবে হেলান দিয়ে, সেখানে তারা বহুবিধ ফলমূল ও পানীয় চাইবে।" [সূরা সোয়াদ:৫১] "এবং তাদের পছন্দমত ফলমূল" [সূরা আল-ওয়াকি'আহ:২০] মুত্তাকীরা থাকবে ছায়ায় ও প্রস্রবণ বহুল স্থানে, তাদের বাঞ্ছিত ফলমূলের প্রাচুর্যের মধ্যে।[সূরা আল-মুরসালাত: ৪১-৪২] মোটকথা: জান্নাতে সবধরনের যাবতীয় স্বাদের ফল-ফলাদি থাকবে যা তাদের আনন্দ দিবে ও যা তাদের মন চাইবে। মহান আল্লাহ্ বলেন, "স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র নিয়ে তাদেরকে প্রদক্ষিণ করা হবে; সেখানে রয়েছে সমস্ত কিছু, যা অন্তর চায় এবং যাতে নয়ন তৃপ্ত হয়। সেখানে তোমরা স্থায়ী হবে।" [সূরা আয-যুখরুফ: ৭১] তাছাড়া জান্নাতের গাছসমূহের আরেকটি গুণ হলো যে, সেগুলো কখনো ফল-ফলাদি শূন্য হবে না। সবসময় সব ঋতুতে তাতে ফল থাকবে। মহান আল্লাহ্ বলেন, "মুত্তাকীদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, তার উপমা এরূপঃ তার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, তার ফলসমূহ ও ছায়া চিরস্থায়ী।"[সূরা আর-রা'দ:৩৫] আরও বলেন, "আর প্রচুর ফলমূল, যা শেষ হবে না ও যা নিষিদ্ধও হবে না।" [সূরা আল-ওয়াকি'আহ:৩৩-৩৪] এছাড়া জান্নাতের গাছসমূহ শাখা, কাণ্ডবিশিষ্ট ও বর্ধনশীল হবে। আল্লাহ্ বলেন, "আর যে আল্লাহ্র সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দুটি উদ্যান। কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? উভয়ই বহু শাখা-পল্লববিশিষ্ট" [সূরা আর-রাহমান:৪৭-৪৯] আরও বলেন, "এ উদ্যান দুটি ছাড়া আরো দুটি উদ্যান রয়েছে। কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? ঘন সবুজ এ উদ্যান দুটি। কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? [সূরা আর-রাহমান:৬৩-৬৫] এ সমস্ত গাছের ফল-ফলাদির আরো একটি গুণ হচ্ছে এই যে, এগুলো হাতের নাগালের মধ্যেই থাকবে, যাতে জান্নাতিদের কষ্ট না হয়। মহান আল্লাহ্ বলেন, "সেখানে তারা হেলান দিয়ে বসবে পুরু রেশমের আস্তর বিশিষ্ট ফরাশে, দুই উদ্যানের ফল হবে কাছাকাছি।" [সূরা আর-রাহমান: ৫৫] অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, "সন্নিহিত গাছের ছায়া তাদের উপর থাকবে এবং তার ফলমূল সম্পূর্ণরূপে তাদের আয়ত্তাধীন করা হবে।" [সূরা আল-ইনসান:১৪] এছাড়া জান্নাতের গাছের ছায়া; তা তো বলার অপেক্ষা রাখেনা; মহান আল্লাহ্ বলেন, "যারা ঈমান আনে এবং ভাল কাজ করে তাদেরকে প্রবেশ করাব জান্নাতে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে, সেখানে তাদের জন্য পবিত্র স্ত্রী থাকবে এবং তাদেরকে চিরস্নিগ্ধ ছায়ায় প্রবেশ করাব।" [সূরা আন-নিসা: ৫৬] "সম্প্রসারিত ছায়া" [সূরা আল-ওয়াকি'আহ:৩০] "মুত্তাকীরা থাকবে ছায়ায় ও প্রস্রবণ বহুল স্থানে" [সূরা আল-মুরসালাত: ৪১] তাছাড়া এ সমস্ত গাছের আরও কিছু বর্ণনা রাসূলের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন হাদীসে এসেছে যে, "জান্নাতের কোন কোন গাছ এমন হবে যে, যার নীচে দিয়ে সফরকারী তার সর্বশক্তি দিয়ে সফর করলেও তা অতিক্রম করতে একশত বছর লাগবে, তারপরও সে তা

২১. আর তাদের ঈপ্সিত পাখীর গোশ্‌ত নিয়ে(১)।

وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ﴿٢١﴾

২২. আর তাদের জন্য থাকবে ডাগর চক্ষুবিশিষ্টা হূর,

وَحُوْرٌ عِيْنٌ ﴿٢٢﴾

২৩. যেন তারা সুরক্ষিত মুক্তা(২),

كَاَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْنِ ﴿٢٣﴾

শেষ করতে পারবে না" [বুখারী:৩২৫১, মুসলিম: ২৮২৮] অন্য হাদীসে এসেছে, "জান্নাতের গাছের কাণ্ড হবে স্বর্ণের"। [তিরমিযী: ২৫২৫] জান্নাতের গাছ বৃদ্ধি করার উপায় সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "ইসরার রাত্রিতে আমি ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম এর সাথে সাক্ষাৎ করি। তিনি আমাকে বললেন, হে মুহাম্মাদ! তোমার উম্মতকে আমার পক্ষ থেকে সালাম জানাবে তারপর তাদের জানাবে যে, জান্নাতের মাটি অতি উত্তম। পানি অতি মিষ্ট। আর এটা হচ্ছে গাছবিহীন ভুমি। এখানকার গাছ হলো, সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার" [তিরমিযী: ৩৪৬২]

(১) অর্থাৎ রুচিসম্মত পাখির গোশত। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কাউসার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, এটা এমন এক নহর যা আমাকে আল্লাহ্ জান্নাতে দান করেছেন। যার মাটি মিসকের, যার পানি দুধের চেয়েও সাদা, আর যা মধু থেকেও সুমিষ্ট। সেখানে এমন এমন উঁচু ঘাড়বিশিষ্ট পাখিসমূহ পড়বে যেগুলো দেখতে উটের ঘাড়ের মত। তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এগুলো তো অত্যন্ত আকর্ষণীয় হবে। তিনি বললেন, যারা সেগুলো খাবে তারা তাদের থেকেও আকর্ষণীয়।" [মুসনাদে আহমাদ: ৩/২৩৬, তিরমিযী: ২৫৪২, আল-মুখতারাহ: ২২৫৮]

(২) আলোচ্য আয়াতে জান্নাতের নারীদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। জান্নাতে দু ধরনের নারী থাকবে।

এক. সে সমস্ত নারী যারা দুনিয়াতে ছিল। তারা সেখানে স্ত্রী হিসেবে থাকবে। এ সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো:

দুনিয়াতে যারা যাদের স্ত্রী ছিল তারা আখেরাতে তাদের স্বামীরা যদি জান্নাতে যায় তখন তারাও তাদের স্ত্রী হিসেবে থাকবে। এর প্রমাণ আল্লাহ্‌র বাণী, "স্থায়ী জান্নাত, তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের পিতা-মাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকাজ করেছে তারাও, এবং ফিরিশ্‌তাগণ তাদের কাছে উপস্থিত হবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে,"[সূরা আর-রা'দ: ২৩] সুতরাং তারা জান্নাতে পরস্পর আনন্দে বসবাস করবে। মহান আল্লাহ্ বলেন, "তারা এবং তাদের স্ত্রীগণ সুশীতল ছায়ায় সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে বসবে।" [সূরা ইয়াসিন:২] আরও বলেন, "তোমরা এবং তোমাদের সহধর্মিণিগণ সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ কর।" [সূরা আয-যুখরুফ: ৭০]

দুনিয়াতে যদি কোন মহিলা পরপর কয়েকজনের স্ত্রী ছিল, তারপর যদি সে সমস্ত পুরুষেরা সবাই জান্নাতে যায় এবং সবাই মহিলার জন্য সমপর্যায়ের হয়, তবে সে মহিলা তাদের মধ্যকার সর্বশেষ ব্যক্তিটির স্ত্রী হবে। কারণ মৃত্যুর কারণে তাদের পূর্বের সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়নি। স্বামীর জান্নাতে যাওয়ার কারণে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে যে, সে তার স্ত্রীর সাথে ভাল ব্যবহার করেছে। সুতরাং মহিলা তার সর্বশেষ যে স্বামীর সাথে ঘর করা অবস্থায় মারা গেছে তার সাথে সে জান্নাতে থাকবে। এর প্রমাণ রাসূল এর বাণী; তিনি বলেন, যে মহিলার স্বামী মারা যাওয়ার পরে অন্য স্বামী গ্রহণ করেছে সে তার সর্বশেষ স্বামীর সাথে জান্নাতে থাকবে। [ত্বাবরানী: আল-আওসাত: ৩/২৭৫, নং ৩১৩০, মাজমাউয যাওয়ায়েদ: ৪/২৭০] অন্য বর্ণনায় এসেছে, আসমা বিন্‌তে আবি বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা যুবাইর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর স্ত্রী ছিলেন। তিনি তার স্ত্রীর সাথে কঠোর ব্যবহার করতেন। আসমা তার পিতা আবু বকরের কাছে অভিযোগ করলে তিনি বললেন, বেটি! সবর করো, কোন মহিলা যদি তার স্বামীর সাথে থাকা অবস্থায় মারা যায় তারপর দু’জনই জান্নাতে যায় তবে আল্লাহ্ তাদের দু’জনকে জান্নাতেও এক সাথে রাখবেন। (বিশেষ করে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত মানুষ) [তারিখে ইবনে আসাকির, ১৯/১৯৩] অনুরূপ অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তার স্ত্রীকে মৃত্যুর সময় বলেন যে, তুমি যদি আখেরাতে আমার স্ত্রী হতে চাও তবে আমার পরে আর কারো সাথে বিয়ে করবেনা। কারণ; একজন মহিলা তার সর্বশেষ স্বামীর সাথেই জান্নাতে থাকবে। আর এজন্যই আল্লাহ্ তাঁর নবীর স্ত্রীদেরকে নবীর পরে বিয়ে করতে নিষেধ করেছেন। [বাইহাকী: আস-সুনানুল কুবরা: ৭/৬৯-৭০, খতিব বাগদাদী: তারিখে বাগদাদ: ৯/৩২৮] অনুরূপভাবে অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, আবুদ্দারদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর মৃত্যুর পরে মু‘আবিয়া রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তার স্ত্রীকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে তিনি এই বলে ফেরত দিলেন যে, আবুদ্দারদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাকে বলেছেন যে, একজন মহিলা তার সর্বশেষ স্বামীর সাথেই জান্নাতে থাকবে। আমি আবুদ্দারদার পরিবর্তে কাউকে চাই না। [বুসীরী: ইতহাফুল খিয়ারাতুল মাহারাহ: ৪/৩৭ নং ৩২৬৪, ইবনে হাজার: আলমাতালিবুল আলিয়া: ২/১১০]

আর যদি মহিলা কারও স্ত্রী হিসেবে সর্বশেষে ছিল না (যেমন তালাকপ্রাপ্তা ছিল), তখন সে তাদের মধ্যে যারা তার সাথে দুনিয়াতে সবচেয়ে বেশী সুন্দর ব্যবহার করেছে তার সাথে থাকবে। অথবা তাকে যে কাউকে গ্রহণ করার এখতিয়ার দেয়া হবে। বিভিন্ন বর্ণনা থেকে এ ব্যাপারে কিছু নির্দেশনা পাওয়া যায় (যদিও বর্ণনাগুলো দূর্বল)। এক বর্ণনায় এসেছে, উম্মে হাবীবা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের মহিলাদের কেউ কেউ দু’টি বা তিনটি স্বামীর ঘর করেছে সে

জান্নাতে কার থাকবে? তিনি উত্তরে বললেন, যার ব্যবহার-চরিত্র সবচেয়ে ভাল। [তাবরানী: মু'জামুল কাবীর: ২৩/২২২] কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, এ প্রশ্নটি উম্মে সালামাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহা করেছিলেন, জবাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, তাকে এখতিয়ার দেয়া হবে যে, যাকে ইচ্ছে বাছাই করে নাও। তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে উম্মে সালামাহ! উত্তম ব্যবহার- চরিত্র দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ নিয়ে গেল। [তাবরানী: মু'জামুল কাবীর ২৩/৩৬৭, হাইসামী: মাজমা'উয যাওয়ায়েদ ৭/১১৯]
জান্নাতে কোন কুমার থাকবে না। প্রত্যেক মুমিনের দু'জন স্ত্রী থাকবেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, প্রথম যে দলটি জান্নাতে যাবে তাদের চেহারার লাবন্য হবে পূর্নিমার রাত্রির চাঁদের চেয়েও বেশী। তারা থুথু নিক্ষেপকারী হবে না, শর্দি-কাশি সম্পন্ন হবে না, পায়খানা-পেশাব করবেনা, তাদের পেয়ালা হবে স্বর্ণের, চিরুনি হবে স্বর্ণ ও রৌপ্যের, তাদের আগরকাঠ হবে উন্নতমানের উদকাঠ, ঘাম হবে মিসক, তাদের প্রত্যেকের থাকবে দু'জন করে স্ত্রী, যাদের সৌন্দর্যের প্রমাণ এত স্পষ্ট যে, তাদের হাঁড়ের ভিতরের মজ্জা গোস্ত ভেদ করে দেখা যাবে। [বুখারী: ৩০০৬, মুসলিম: ২৮৩৪]
তবে দুনিয়াতে যদি কারও একাধিক স্ত্রী থাকে। তারপর তারা সবাই জান্নাতে যায় তবে তারা সবাই সে লোকের স্ত্রী হিসেবে থাকবে। এর প্রমাণ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।
আর যদি কারও স্বামী জান্নাতী না হয় তখন তাকে আল্লাহ্ যার সাথে পছন্দ করেন তার সাথে জান্নাতে থাকতে দিবেন।
জান্নাতী এ সমস্ত নারীরা তাদের দুনিয়ার অবস্থা থেকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন হবে। তারা হবে সবদিক থেকে পবিত্রা। তারা হায়েয, নিফাস, থুথু, কাশি, পেশাব, পায়খানা এসব থেকে মুক্ত থাকবে। মহান আল্লাহ্ বলেন, "আর তাদের জন্য সেখানে থাকবে পবিত্রা স্ত্রীগণ, এবং তারা সেখানে স্থায়ী হবে।" [সূরা আল-বাকারাহ: ২৫] তাছাড়া তাদের সৌন্দর্যও হবে চিত্তাকর্ষক। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যদি জান্নাতী কোন মহিলা যমীনের অধিবাসীদের দিকে তাকাতো তবে আসমান ও যমীনের মাঝের অংশ আলোতে ভরপুর হয়ে যেত, সুগন্ধিতে ভরে দিত। এমনকি তার মাথাস্থিত উড়না দুনিয়া ও তার মধ্যে যা আছে তা থেকে উত্তম।" [বুখারী: ২৬৪৩, ২৭৯৬]
দুই. সে সমস্ত নারী যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতে সৃষ্টি করেছেন। তাদেরকে বলা হয় হূর। মহান আল্লাহ্ বলেন, "আর আমরা তাদেরকে বড় চোখবিশিষ্টা হূরদের সাথে বিয়ে দেব" [সূরা আদ-দোখান:৫৪] কুরআন ও হাদীসে তাদের কিছু গুণাগুণ বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে:
তারা হবে অত্যন্ত শুভ্র। আর এজন্যই তাদের নাম হয়েছে, হূর। কেননা, হূর শব্দ

দ্বারা ঐ সমস্ত নারীদেরকে বোঝায় যাদের চোখের সাদা অংশ অত্যন্ত ফর্সা, কোন প্রকার খাদ নেই। আর যাদের চোখের কালো অংশ একেবারে কালো। তারা হবে প্রশস্ত চোখ বিশিষ্টা। তাদের এ দু'টি গুণ আলোচ্য আয়াতেই বর্ণিত হয়েছে। [সূরা আল-ওয়াকি‘আহ:২২]
তারা হবে সমবয়স্কা উদভিন্ন যৌবনা ও সুভাষিনী। আল্লাহ্ বলেন, "মুত্তাকীদের জন্য তো আছে সাফল্য, উদ্যান, আঙ্গুর, সমবয়স্কা উদ্‌ভিন্ন যৌবনা তরুণী" [সূরা আন-নাবা:৩১-৩৩]
তারা হবে কুমারী আর তারা হবে স্বামী সোহাগিনী, মহান আল্লাহ্ বলেন, "ওদেরকে আমরা সৃষ্টি করেছি বিশেষরূপে--ওদেরকে করেছি কুমারী, সোহাগিনী ও সমবয়স্কা," [সূরা আল-ওয়াকি‘আহ: ৩৫-৩৭]
তাদের দেখতে মনে হবে যেন মনি-মুক্তা; আল্লাহ্ বলেন, "সুরক্ষিত মুক্তাসদৃশ" [সূরা আল-ওয়াকি‘আহ: ২৩]
তাদের দেখতে মনে হবে যেন, পরিস্কার ডিম। আল্লাহ্ বলেন, "মনে হয় যেন তারা সুরক্ষিত ডিম্ব।" [সূরা আস-সাফফাত: ৪৯]
তাদেরকে এর আগে কেউ স্পর্শ করেনি। আর তারাও আপন স্বামী ছাড়া অন্য কারো দিকে তাকায় না। মহান আল্লাহ্ বলেন, "সেসবের মাঝে রয়েছে বহু আনত নয়না, যাদেরকে আগে কোন মানুষ অথবা জিন স্পর্শ করেনি।" [সূরা আর-রাহমান: ৫৬] অন্যত্র বলা হয়েছে, "তাদের সংগে থাকবে আয়তনয়না, আয়তলোচনা হূরীগণ।" [সূরা অস-সাফফাত: ৪৮] আরও বলা হয়েছে, "তারা হূর, তাঁবুতে সুরক্ষিতা।" [সূরা আর রাহমান: ৭১]
তারা দেখতে মূল্যবান পাথরের মত সুন্দর ও মসৃন হবে। আল্লাহ্ বলেন, "তারা যেন পদ্মরাগ ও প্রবাল।" [সূরা আর-রাহমান: ৫৭]
তাদের সৌন্দর্য এমন যে, তা বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীন সার্বিকভাবে ফুটে উঠবে। আল্লাহ্ বলেন, "সে উদ্যানসমূহের মাঝে রয়েছে সুশীলা, সুন্দরীগণ।" [সূরা আর-রাহমান: ৭০]
জান্নাতে তারা গানও গাইবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "জান্নাতীদের স্ত্রীগণ (হুরগণও এতে শামিল) তারা এমন সুন্দর স্বরে গান ধরবে যা কোনদিন কেউ শুনেনি। তারা যা বলবে, "আমরা অনিন্দ সুন্দরী, সুশীলা, সন্মানিত লোকের স্ত্রী, যারা আমাদের দিকে চক্ষু শীতল করার জন্য তাকায়" তারা আরও বলবে, "আমরা চিরস্থায়ী সুতরাং আমরা কখনো মরবনা, আমরা নিরাপদ সুতরাং আমাদের ভয় নেই, আমরা স্থায়ী অধিবাসী সুতরাং আমরা চলে যাব না" [তাবরানী: মু‘জামুস সাগীর: ২/৩৫, নং: ৭৩৪, আল-আওসাত:৫/১৪৯, নং ৪৯১৭, মাজমাউয যাওয়ায়িদ: ১০/৪১৯]
দুনিয়াতে কোন জান্নাতী পুরুষকে কোন নারী কষ্ট দিলে জান্নাতের হুরীরা সে জন্য কষ্ট অনুভব করে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কোন মহিলা

جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٤﴾

২৪. তাদের কাজের পুরস্কারস্বরূপ।

لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا تَأْثِيْمًا ﴿٢٥﴾

২৫. সেখানে তারা শুনবে না কোন অসার বা পাপবাক্য[১],

اِلَّا قِيْلًا سَلٰمًا سَلٰمًا ﴿٢٦﴾

২৬. ‘সালাম’ আর ‘সালাম’ বাণী ছাড়া।

وَاَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ ۙ مَآ اَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ ﴿٢٧﴾

২৭. আর ডান দিকের দল, কত ভাগ্যবান ডান দিকের দল!

فِيْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ ﴿٢٨﴾

২৮. তারা থাকবে এমন উদ্যানে, যাতে আছে[২] কাঁটাহীন কুলগাছ[৩],

যখনই কোন জান্নাতী পুরুষকে দুনিয়াতে কষ্ট দেয় তখনি তার জান্নাতী হূর স্ত্রী বলতে থাকে, “তোমার ধ্বংস হোক, তুমি তাকে কষ্ট দিও না, সে তো তোমার কাছে সাময়িক অবস্থান করছে, অচিরেই সে তোমাকে ছেড়ে আমাদের নিকট চলে আসবে”। [তিরমিযী: ১১৭৪, ইবনে মাজাহ: ২০১৪]

সহীহ হাদীসের কোথাও একজন মুমিনের জন্য কতজন হুর থাকবে তা নির্ধারণ করে দেয়া হয়নি। এটা আল্লাহ্‌র রহমত ও বান্দার আমলের উপর নির্ভরশীল। তবে শহীদের ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের জন্য নিজেদের স্ত্রী ছাড়াও সত্তরোর্ধ হূর থাকবে। [দেখুন, তিরমিযী: ১৬৬৩, মুসনাদে আহমাদ: ৪/১৩১]

(১) এটি জান্নাতের বড় বড় নিয়ামতের একটি। এসব নিয়ামত সম্পর্কে কুরআন মজীদের কয়েকটি স্থানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মানুষের কান সেখানে কোন অনর্থক ও বাজে কথা, মিথ্যা, গীবত, চোগলখুরী, অপবাদ, গালি, অহংকার ও বাজে গালগপ্প বিদ্রূপ ও উপহাস, তিরস্কার ও বদনামমূলক কথাবার্তা শোনা থেকে রক্ষা পাবে। [যেমন, আল-গাশিয়াহঃ১১, মারইয়ামঃ৬২]

(২) অর্থাৎ জান্নাতে প্রবেশের পরে তাদের কি কি নেয়ামত থাকবে তাই এখানে বর্ণিত হয়েছে। [তাবারী]

(৩) জান্নাতের নেয়ামতসমূহ অসংখ্য, অদ্বিতীয় ও কল্পনাতীত। তন্মধ্যে কুরআন পাক মানুষের বোধগম্য, ও পছন্দসই বস্তুসমূহ উল্লেখ করেছে। হাদীসে এসেছে, এক বেদুঈন এসে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্ তা‘আলা কুরআনে একটি কষ্টদায়ক গাছের কথা উল্লেখ করেছেন। আমি মনে করিনি যে, জান্নাতে কষ্ট দায়ক কিছু থাকবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সেটা কি? বেদুঈন বলল: বরই। কেননা তাতে কাঁটা রয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, “সেটা হবে কাঁটাহীন বরই গাছ। প্রতিটি কাঁটার জায়গায় একটি করে ফল থাকবে। এটা শুধু ফলই উৎপাদন করবে। ফলের সাথে বাহাত্তরটি বাহারী রং থাকবে যার এক রং অন্য রংয়ের সাথে সাদৃশ্য রাখবে না।” [মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৪৭৬]

২৯. এবং কাঁদি ভরা কলা গাছ, وَّطَلۡحٍ مَّنۡضُوۡدٍ ﴿٢٩﴾

৩০. আর সম্প্রসারিত ছায়া[১], وَّظِلٍّ مَّمۡدُوۡدٍ ﴿٣٠﴾

৩১. আর সদা প্রবাহমান পানি, وَّمَآءٍ مَّسۡكُوۡبٍ ﴿٣١﴾

৩২. ও প্রচুর ফলমূল, وَّفَاكِهَةٍ كَثِيۡرَةٍ ﴿٣٢﴾

৩৩. যা শেষ হবে না ও যা নিষিদ্ধও হবে না[২]। لَّا مَقۡطُوۡعَةٍ وَّلَا مَمۡنُوۡعَةٍ ﴿٣٣﴾

৩৪. আর সমুচ্চ শয্যাসমূহ[৩]; وَّفُرُشٍ مَّرۡفُوۡعَةٍ ﴿٣٤﴾

৩৫. নিশ্চয় আমরা তাদেরকে সৃষ্টি করেছি বিশেষরূপে[৪]--- اِنَّاۤ اَنۡشَاۡنٰهُنَّ اِنۡشَآءً ﴿٣٥﴾

---

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'জান্নাতে এমন গাছ থাকবে যার ছায়ায় ভ্রমণকারী একশত বছর ভ্রমণ করেও শেষ করতে পারবে না।" [বুখারী: ৪৮৮১, মুসলিম: ২১৭৫]

(২) দুনিয়ার সাধারণ ফলের অবস্থা এই যে, মওসুম শেষ হয়ে গেলে ফলও শেষ হয়ে যায়। কোন ফল গ্রীষ্মকালে হয় এবং মওসুম শেষ হয়ে গেলে নিঃশেষ হয়ে যায়। আবার কোন ফল শীতকালে হয় এবং শীতকাল শেষ হয়ে গেলে ফলের নাম-নিশানাও অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু জান্নাতের প্রত্যেক ফল চিরস্থায়ী হবে- কোন মওসুমের মধ্যে সীমিত থাকবে না। এমনিভাবে দুনিয়াতে বাগানের পাহারাদাররা ফল ছিঁড়তে নিষেধ করে কিন্তু জান্নাতের ফল ছিঁড়তে কোন বাধা থাকবে না। [ইবন কাসীর; বাগভী,কুরতুবী]

(৩) فرش শব্দটি فراش এর বহুবচন। অর্থ বিছানা। উচ্চস্থানে বিছানো থাকবে বিধায় জান্নাতের শয্যা সমুন্নত হবে। দ্বিতীয়ত, এই বিছানা মাটিতে নয়, পালঙ্কের উপর থাকবে। তৃতীয়ত, স্বয়ং বিছানাও খুব পুরু হবে। কারও কারও মতে এখানে বিছানা বলে শয্যাশায়িনী নারী বোঝানো হয়েছে। কেননা, নারীকেও বিছানা বলে ব্যক্ত করা হয়। এই অর্থ অনুযায়ী مرفوعة এর অর্থ হবে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ও সম্ভ্রান্ত। [ইবন কাসীর; কুরতুবী; বাগভী]

(৪) أنشأ শব্দের অর্থ সৃষ্টি করা। هُنَّ সর্বনাম দ্বারা জান্নাতের নারীদেরকে বোঝানো হয়েছে। পূর্বোক্ত আয়াতে فرش এর অর্থ জান্নাতে নারী হলে তার স্থলেই এই সর্বনাম ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়া শয্যা, বিছানা ইত্যাদি ভোগবিলাসের বস্তু উল্লেখ করায় নারীও তার অন্তর্ভুক্ত আছে বলা যায়। আয়াতের অর্থ এই যে, আমি জান্নাতের নারীদেরকে এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি করেছি। [কুরতুবী] জান্নাতী হুরদের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রক্রিয়া এই যে, তাদেরকে জান্নাতেই প্রজননক্রিয়া ব্যতিরেকে সৃষ্টি করা

৩৬. অতঃপর তাদেরকে করেছি কুমারী[১], فَجَعَلْنٰهُنَّ اَبْكَارًا ۙ

৩৭. সোহাগিনী[২] ও সমবয়স্কা[৩], عُرُبًا اَتْرَابًا ۙ

৩৮. ডানদিকের লোকদের জন্য। لِّاَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ۠

হয়েছে। দুনিয়ার যেসব নারী জান্নাতে যাবে, তাদের ক্ষেত্রে বিশেষভঙ্গি এই যে, যারা দুনিয়াতে কুশ্রী, কৃষ্ণাঙ্গী অথবা বৃদ্ধ ছিল; জান্নাতে তাদেরকে সুশ্রী দূরবর্তী ও লাবণ্যময়ী করে দেয়া হবে। আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলেনঃ একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গৃহে আগমন করলেন। তখন এক বৃদ্ধা আমার কাছে বসা ছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন এ কে? আমি আরয করলামঃ সে সম্পর্কে আমার খালা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রসচ্ছলে বললেনঃ "জান্নাতে কোন বৃদ্ধা প্রবেশ করবে না"। একথা শুনে বৃদ্ধা বিষণ্ন হয়ে গেল। কোন কোন বর্ণনায় আছে কাঁদতে লাগল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সান্ত্বনা দিলেন এবং স্বীয় উক্তির অর্থ এই বর্ণনা করলেন যে, বৃদ্ধারা যখন জান্নাতে যাবে, তখন বৃদ্ধা থাকবে না; বরং যুবতী হয়ে প্রবেশ করবে। অতঃপর তিনি উপরোক্ত আয়াত পাঠ করে শোনালেন। [শামায়েলে তিরমিযী: ২৪০]

(১) أبكار শব্দটি بكر এর বহুবচন। অর্থ কুমারী বালিকা। [আইসারুত-তাফাসীর] উদ্দেশ্য এই যে, জান্নাতের নারীদেরকে কুমারী করে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদেরকে কেউ কখনো স্পর্শ করেনি। অথবা তাদেরকে এমনভাবে সৃষ্টি করা হবে যে, প্রত্যেক সঙ্গম-সহবাসের পর তারা আবার কুমারী হয়ে যাবে। [কুরতুবী]

(২) عرب শব্দটি عروبة এর বহুবচন। অর্থ স্বামী সোহাগিনী ও প্রেমিকা নারী। আরবী ভাষায় এ শব্দটি মেয়েদের সর্বোত্তম মেয়েসুলভ গুণাবলী বুঝাতে বলা হয়। এ শব্দ দ্বারা এমন মেয়েদের বুঝানো হয় যারা কামনীয় স্বভাব ও বিনীত আচরণের অধিকারিনী, সদালাপী, নারীসুলভ আবেগ অনুভূতি সমৃদ্ধা, মনে প্রাণে স্বামীগত প্রাণ এবং স্বামীও যার প্রতি অনুরাগী। [কুরতুবী; ইবন কাসীর]

(৩) أتراب শব্দটি ترب এর বহুবচন। অর্থ সমবয়স্ক। এর দুটি অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ হচ্ছে তারা তাদের স্বামীদের সমবয়সী হবে। অন্য অর্থটি হচ্ছে, তারা পরস্পর সমবয়স্কা হবে। অর্থাৎ জান্নাতের সমস্ত মেয়েদের একই বয়স হবে এবং চিরদিন সেই বয়সেরই থকবে। যুগপৎ এ দু'টি অর্থই সঠিক হওয়া অসম্ভব নয়। অর্থাৎ এসব জান্নাতী নারী পরস্পরও সমবয়সী হবে এবং তাদের স্বামীদেরকেও তাদের সমবয়সী বানিয়ে দেয়া হবে। [ইবন কাসীর]"জান্নাতবাসীরা জান্নাতে প্রবেশ করলে তাদের শরীরে কোন পশম থাকবে না। দাড়ি থাকবে না। ফর্সা শ্বেত বর্ণ হবে। কুঞ্চিত কেশ হবে। কাজল কাল চোখ হবে এবং সবার বয়স ৩৩ বছর হবে" [তিরমিযী: ২৫৪৫, মুসনাদে আহমাদ:২/২৯৫]

দ্বিতীয় রুকূ'

৩৯. তাদের অনেকে হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে,

ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ۝٣٩

৪০. এবং অনেকে হবে পরবর্তীদের মধ্য থেকে[১]।

وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ۝٤٠

৪১. আর বাম দিকের দল, কত হতভাগ্য বাম দিকের দল!

وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ ۝٤١

৪২. তারা থাকবে অত্যন্ত উষ্ণ বায়ু ও উত্তপ্ত পানিতে,

فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ۝٤٢

৪৩. আর কালোবর্ণের ধূঁয়ার ছায়ায়,

وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ ۝٤٣

৪৪. যা শীতল নয়, আরামদায়কও নয়।

لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ۝٤٤

৪৫. ইতোপূর্বে তারা তো মগ্ন ছিল ভোগ-বিলাসে

إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُتْرَفِينَ ۝٤٥

৪৬. আর তারা অবিরাম লিপ্ত ছিল ঘোরতর পাপকাজে।

وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ ۝٤٦

৪৭. আর তারা বলত, 'মরে অস্থি ও মাটিতে পরিণত হলেও কি আমাদেরকে উঠানো হবে?

وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ۝٤٧

---

(১) আয়াতের এক অর্থ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, أَوَّلِينَ বলে এই উম্মতেরই প্রাথমিক লোকদের বোঝানো হয়েছে। আর آخِرِينَ বলে এ উম্মতেরই পরবর্তী লোকদের বোঝানো হয়েছে। এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ স্পষ্ট। অর্থাৎ এ উম্মতের আসহাবুল ইয়ামীন উম্মতের প্রাথমিক লোকদের থেকে একটি বড় দল হবে। আর শেষের লোকদের থেকেও একটি বড় দল হবে। আর যদি আয়াতে أَوَّلِينَ বলে আদম আলাইহিস্ সালাম থেকে শুরু করে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত সময়ের লোকদের বোঝানো হয় এবং آخِرِينَ বলে এ উম্মতে মুহাম্মদীকেই বোঝানো হয়ে থাকে তবে আয়াতের সারমর্ম এই হবে যে, 'আসহাবুল-ইয়ামীন' তথা মুমিন-মুত্তাকীগণ পূর্ববর্তী সমগ্র উম্মতের মধ্য থেকে একটি বড় দল হবে এবং একা উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্য থেকে একটি বড় দল হবে। [দেখুন, কুরতুবী]

৪৮. ‘এবং আমাদের পিতৃপুরুষরাও?’

أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ﴿٤٨﴾

৪৯. বলুন, ‘অবশ্যই পূর্ববর্তিরা ও পরবর্তিরা---

قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ﴿٤٩﴾

৫০. সবাইকে একত্র করা হবে এক নির্ধারিত দিনের নির্দিষ্ট সময়ে।

لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٥٠﴾

৫১. তারপর হে বিভ্রান্ত মিথ্যারোপকারীরা!

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ ﴿٥١﴾

৫২. তারা অবশ্যই আহার করবে যাক্কূম গাছ থেকে,

لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ ﴿٥٢﴾

৫৩. অতঃপর সেটা দ্বারা তারা পেট পূর্ণ করবে,

فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿٥٣﴾

৫৪. তদুপরি তারা পান করবে তার উপর অতি উষ্ণ পানি---

فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ ﴿٥٤﴾

৫৫. অতঃপর পান করবে তৃষ্ণার্ত উটের ন্যায়।

فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ ﴿٥٥﴾

৫৬. প্রতিদান দিবসে এটাই হবে তাদের আপ্যায়ন।

هَٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ﴿٥٦﴾

৫৭. আমরাই[১] তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তবে কেন তোমরা বিশ্বাস করছ না?

نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ﴿٥٧﴾

৫৮. তোমরা কি ভেবে দেখেছ তোমাদের বীর্যপাত সম্বন্ধে?

أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ ﴿٥٨﴾

৫৯. সেটা কি তোমরা সৃষ্টি কর, না আমরা সৃষ্টি করি[২]?

أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ﴿٥٩﴾

---

(১) আলোচ্য আয়াতসমূহে এমন পথভ্রষ্ট মানুষকে হুঁশিয়ার করা হচ্ছে, যারা মূলত কেয়ামত সংঘটিত হওয়ায় এবং পুনরুজ্জীবনেই বিশ্বাসী নয়। [ইবন কাসীর; কুরতুবী]

(২) ছোট্ট এ বাক্যে মানুষের সামনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন রাখা হয়েছে। মানুষের

৬০. আমরা তোমাদের মধ্যে মৃত্যু নির্ধারিত করেছি[১] এবং আমাদেরকে অক্ষম করা যাবে না ---

نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٦٠﴾

৬১. তোমাদের স্থলে তোমাদের সদৃশ আনয়ন করতে এবং তোমাদেরকে এমন এক আকৃতিতে সৃষ্টি করতে যা তোমরা জান না[২] ।

عَلَىٰ أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾

৬২. আর অবশ্যই তোমরা অবগত হয়েছ প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে, তবে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর না কেন[৩]?

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾

জন্ম পদ্ধতি তো এছাড়া আর কিছুই নয় যে, পুরুষ তার শুক্র নারীর গর্ভাশয়ে পৌঁছে দেয় মাত্র। কিন্তু ঐ শুক্রের মধ্যে কি সন্তান সৃষ্টি করার এবং নিশ্চিত রূপে মানুষের সন্তান সৃষ্টি করার যোগ্যতা আপনা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে? অথবা মানুষ নিজে সৃষ্টি করেছে? না আল্লাহ সৃষ্টি করেছে? এ যুক্তির সঙ্গত জওয়াব একটিই। তা হচ্ছে, মানুষ পুরোপুরি আল্লাহর সৃষ্টি। [তাবারী, আদওয়াউল-বায়ান]

(১) অর্থাৎ তোমাদেরকে সৃষ্টি করা যেমন আমার ইখতিয়ারে। তেমনি তোমাদের মৃত্যুও আমার ইখতিয়ারে। [কুরতুবী] কে মাতৃগর্ভে মারা যাবে, কে ভুমিষ্ঠ হওয়া মাত্র মারা যাবে এবং কে কোন্ বয়সে উপনীত হয়ে মারা যাবে সে সিদ্ধান্ত আমিই নিয়ে থাকি। [ফাতহুল কাদীর]

(২) অর্থাৎ কেউ আমার ইচ্ছাকে ডিঙ্গিয়ে যেতে পারে না। আমি এই মুহূর্তেও যা চাই, তাই করতে পারি। তোমাদের স্থলে তোমাদেরই মত অন্য কোন জাতি নিয়ে আসতে পারি। [কুরতুবী] এমনকি তোমাদের এমন আকৃতি করে দিতে পারি, যা তোমরা জান না। [মুয়াসসার]

(৩) অর্থাৎ কিভাবে তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছিল তা তোমরা অবশ্যই জান। যে শুক্র দ্বারা তোমাদের অস্তিত্বের সূচনা হয়েছে তা পিতার মেরুদণ্ড থেকে কিভাবে স্থানান্তরিত হয়েছিল, মায়ের গর্ভাশয় যা কবরের অন্ধকার থেকে কোন অংশে কম অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল না তার মধ্যে কিভাবে পর্যায়ক্রমে তোমাদের বিকাশ ঘটিয়ে জীবিত মানুষে রূপান্তরিত করা হয়েছে। [কুরতুবী] কিভাবে একটি অতি ক্ষুদ্র পরমাণু সদৃশ কোষের প্রবৃদ্ধি ও বিকাশ সাধন করে এই মন-মগজ, এই চোখ কান ও এই হাত পা সৃষ্টি করা হয়েছে এবং বুদ্ধি ও অনুভূতি, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, শিল্প জ্ঞান ও উদ্ভাবনী শক্তি, ব্যবস্থাপনা ও অধীনস্ত করে নেয়ার মত বিস্ময়কর যোগ্যতাসমূহ দান করা হয়েছে? [দেখুন, ইবন কাসীর] এটা কি মৃতদের জীবিত করে উঠানোর চেয়ে কম অলৌকিক

৬৩. তোমরা যে বীজ বপন কর সে সম্পর্কে চিন্তা করেছ কি[১]?	أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ ﴿٦٣﴾
৬৪. তোমরা কি সেটাকে অংকুরিত কর, না আমরা অংকুরিত করি?	ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلزَّٰرِعُونَ ﴿٦٤﴾
৬৫. আমরা ইচ্ছে করলে এটাকে খড়-কুটোয় পরিণত করতে পারি, তখন হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে তোমরা;	لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَٰهُ حُطَٰمًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿٦٥﴾
৬৬. (এই বলে) 'নিশ্চয় আমরা দায়গ্রস্ত হয়ে পড়েছি,'	إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴿٦٦﴾
৬৭. বরং 'আমরা হৃত-সর্বস্ব হয়ে পড়েছি।'	بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿٦٧﴾
৬৮. তোমরা যে পানি পান কর তা সম্পর্কে আমাকে জানাও[২]	أَفَرَءَيْتُمُ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِى تَشْرَبُونَ ﴿٦٨﴾

ও কম বিস্ময়কর? অতএব, তা থেকে এ শিক্ষা কেন গ্রহণ করছো না যে, আল্লাহর যে অসীম শক্তিতে দিন রাত এসব আশ্চর্য বিষয়াদি সংঘটিত হচ্ছে তাঁর ক্ষমতায়ই মৃত্যুর পরের জীবন, হাশর নাশর এবং জান্নাত ও জাহান্নামের মত বিষয়াদি সংঘটিত হতে পারে? [দেখুন, মুয়াসসার]

(১) মানব সৃষ্টির গূঢ়তত্ত্ব উদঘাটিত করার পর এখন এই খাদ্যের স্বরূপ সম্পর্কে প্রশ্ন রাখা হয়েছেঃ তোমরা যে বীজ বপন কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? এই বীজ থেকে অংকুর বের করার ব্যাপারে তোমাদের কাজের কতটুকু দখল আছে? চিন্তা করলে এছাড়া জওয়াব নেই, কৃষক ক্ষেতে লাঙ্গল চালিয়ে সার দিয়ে মাটি নরম করেছে মাত্র, যাতে দুর্বল অংকুর মাটি ভেদ করে সহজেই গজিয়ে উঠতে পারে। বীজ বপনকারী কৃষকের সমগ্র প্রচেষ্টা এই এক বিন্দুতেই সীমাবদ্ধ। চারা গজিয়ে উঠার পর সে তার হেফাযতে লেগে যায়। কিন্তু একটি বীজের মধ্য থেকে চারা বের করে আনার সাধ্য তার নেই। সে চারাটি তৈরি করেছে বলে দাবিও করতে পারে না। কাজেই প্রশ্ন দেখা দেয় যে, সুবিশাল মটির স্তূপে পতিত বীজের মধ্য থেকে এই সুন্দর ও মহোপকারী বৃক্ষ কে তৈরি করল? জওয়াব এটাই যে, সেই পরম প্রভু অপার শক্তিধর আল্লাহ তা'আলার অত্যাশ্চর্য কারিগরিই এর প্রস্তুতকারক। [দেখুন, আদওয়াউল-বায়ান]

(২) অর্থাৎ শুধু তোমাদের ক্ষুধা নিবারণের ব্যবস্থাই নয় তোমাদের পিপাসা মেটানোর ব্যবস্থাও আমিই করেছি। তোমাদের জীবন ধারণের জন্য যে পানি খাদ্যের চেয়েও অধিক প্রয়োজনীয় তার ব্যবস্থা তোমরা নিজেরা কর নাই। আমিই তা সরবরাহ করে

ءَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ ﴿٦٩﴾

৬৯. তোমরা কি সেটা মেঘ হতে নামিয়ে আন, না আমরা সেটা বর্ষণ করি?

لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴿٧٠﴾

৭০. আমরা ইচ্ছে করলে তা লবণাক্ত করে দিতে পারি। তবুও কেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না?

أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ﴿٧١﴾

৭১. তোমরা যে আগুন প্রজ্বলিত কর সে ব্যাপারে আমাকে বল---

ءَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ ﴿٧٢﴾

৭২. তোমরাই কি এর গাছ সৃষ্টি কর, না আমরা সৃষ্টি করি?

نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ ﴿٧٣﴾

৭৩. আমরা এটাকে করেছি স্মারক[১] এবং মরুচারীদের প্রয়োজনীয় বস্তু[২]।

থাকি। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর] আমি তোমাদেরকে শুধু অস্তিত্ব দান করেই বসে নাই। তোমাদের প্রতিপালনের এত সব ব্যবস্থাও আমি করছি যা না থাকলে তোমরা বেঁচেই থাকতে পারতে না। [আদওয়াউল-বায়ান]

(১) মুজাহিদ বলেন, এর অর্থ, আমরা এ আগুনকে স্মরণিকা করেছি, এ আগুন আখেরাতের আগুনকে স্বরণ করিয়ে দিবে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের এ আগুন যা তোমরা জালিয়ে থাক তা জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের একভাগ। সাগর দিয়ে দু'বার এটাকে ঠাণ্ডা করা হয়েছে। যদি তা না হতো তবে তা থেকে কেউ উপকৃত হতে পারত না। [মুসনাদে আহমাদ: ২/২৪৪, সহীহ ইবনে হিব্বান, ৭৪৬৩, মুসনাদে হুমাইদী: ১১২৯, অনুরূপ বর্ণনা বুখারী: ৩২৬৫, মুসলিম: ২৮৪৩]

(২) উপসংহারে সবগুলোর সার-সংক্ষেপ এরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, "আমরা এটাকে করেছি স্মারক এবং পথচারীদের জন্য উপভোগ্য"। আয়াতে مُقْوِيْنَ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ এর বিভিন্ন অর্থ বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন মরুভূমিতে উপনীত মুসাফির বা পথচারী। কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন ক্ষুধার্ত মানুষ। কারো কারো মতে এর অর্থ হচ্ছে, সেসব মানুষ যারা প্রান্তরে অবস্থান করে খাবার পাকানো, আলো পাওয়া কিংবা তা গ্রহণ করার কাজে আগুন ব্যবহার করে। সে সমস্ত মুসাফিরদেরকে বোঝানো হয়েছে। কারণ এ সমস্ত মরুচারী ও মুসাফিররা খাবারের জন্য যেমন আগুনের প্রয়োজন বোধ করে তেমনি নিজের শরীরের তাপমাত্রা ঠিক রাখার জন্যও আগুনের প্রতি বেশী মুখাপেক্ষী। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, এসব সৃষ্টি আমার শক্তি-সামর্থ্যের ফসল। সুতরাং তোমরা ভেবে দেখ কার গুণ-গান করবে। [কুরতুবী]

৭৪. কাজেই আপনি আপনার মহান রবের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন[১] ।

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٧٤﴾

তৃতীয় রুকূ'

৭৫. অতঃপর[২] আমি শপথ করছি নক্ষত্ররাজির অস্তাচলের[৩],

فَلَآ أُقْسِمُ بِمَوٰقِعِ النُّجُومِ ﴿٧٥﴾

৭৬. আর নিশ্চয় এটা এক মহাশপথ, যদি তোমরা জানতে---

وَإِنَّهُۥ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿٧٦﴾

---

(১) পূর্ববর্তী যে সমস্ত নেয়ামতের কথা উল্লেখ হলো এবং এটা স্পষ্ট হলো যে, এগুলো একমাত্র মহান আল্লাহ্ই সম্পন্ন করে থাকেন। এর অবশ্যম্ভাবী ও যুক্তিভিত্তিক পরিণতি এই যে, মানুষ আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তি ও তৌহীদে বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং মহান পালনকর্তার নামের পবিত্রতা ঘোষণা করবে। সুতরাং হে নবী! আপনি সে পবিত্র নাম নিয়ে ঘোষণা করে দিন যে, কাফের ও মুশরিকরা যেসব দোষত্রুটি, অপূর্ণতা ও দুর্বলতা তাঁর ওপর আরোপ করে তা থেকে পবিত্র এবং কুফর ও শির্কমূলক সমস্ত আকীদা ও আখেরাত অস্বীকারকারীদের প্রতিটি যুক্তি তর্কে যা প্রচ্ছন্ন আছে তা থেকেও মহান আল্লাহ্ সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। [দেখুন, কুরতুবী; ইবন কাসীর]

(২) বাক্যের শুরুতে এখানে একটি لا ব্যবহৃত হয়েছে। যার অর্থ, 'না'। কোন কোন মুফাসসির এটাকে অতিরিক্ত বলেছেন। কিন্তু এ মতটি সঠিক নয়। পবিত্র কুরআনে অতিরিক্ত কিছু নেই। বরং এটি আরবদের একটি সাধারণ বাকপদ্ধতি। যেমন বলা হয় لا والله এরূপ বাকপদ্ধতি আরবদের নিকট সুবিদিত। এরূপ স্থলে لا সম্বোধিত ব্যক্তির ধারণা খণ্ডনের জন্যে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ তোমরা যা মনে করে বসে আছো ব্যাপার তা নয়। কুরআন যে আল্লাহর পক্ষ থেকে সে বিষয়ে কসম খাওয়ার আগে এখানে لا শব্দের ব্যবহার করায় আপনা থেকেই একথা প্রকাশ পায় যে, এই পবিত্র গ্রন্থ সম্পর্কে মানুষ মনগড়া কিছু কথাবার্তা বলছিলো। সেসব কথার প্রতিবাদ করার জন্যই এ কসম খাওয়া হচ্ছে। [ফাতহুল কাদীর; কুরতুবী]

(৩) مواقع শব্দটি موقع এর বহুবচন। এর এক অর্থ তারকারাজি ও গ্রহসমূহের 'অবস্থানস্থল', তাদের মনযিল ও তাদের কক্ষপথসমূহ। অন্য অর্থ নক্ষত্রের অস্তাচল অথবা অস্তের সময়, বা চোখের আড়ালে চলে যাওয়া। [ফাতহুল কাদীর] এ আয়াতে নক্ষত্রের অস্ত যাওয়ার সময়ের শপথ করা হয়েছে; যেমন সূরা নজমেও وَالنَّجْمِ إِذَا هَوٰى বলে তাই করা হয়েছে।

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴿٧٧﴾

৭৭. নিশ্চয় এটা মহিমান্বিত কুরআন[১],

فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ ﴿٧٨﴾

৭৮. যা আছে সুরক্ষিত কিতাবে[২]।

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿٧٩﴾

৭৯. যারা সম্পূর্ণ পবিত্র তারা ছাড়া অন্য কেউ তা স্পর্শ করে না[৩]।

(১) কুরআনের মহা সম্মানিত গ্রন্থ হওয়া সম্পর্কে ঐগুলোর শপথ করার অর্থ হচ্ছে উর্ধ জগতে সৌরজগতের ব্যবস্থাপনা যত সুসংবদ্ধ ও মজবুত এই বাণীও ততটাই সুসংবদ্ধ ও মজবুত। [দেখুন, কুরতুবী]

(২) অর্থাৎ সুরক্ষিত বা গোপন কিতাব। একথা বলে এখানে লাওহে-মাহফুয বোঝানো হয়েছে। এর অর্থ এমন লিখিত বস্তু যা গোপন করে রাখা হয়েছে। অর্থাৎ যা কারো ধরা ছোঁয়ার বাইরে। [কুরতুবী]

(৩) ব্যাকরণিক দিক দিয়ে এই বাক্যের দ্বিবিধ অর্থ হতে পারে। প্রথম এই যে, এটা কিতাব অর্থাৎ 'লওহে-মাহফুযের'ই দ্বিতীয় বিশেষণ এবং لا يَمَسُّه এর সর্বনাম দ্বারা লওহে-মাহফুযই বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, সংরক্ষিত বা গোপন কিতাব অর্থাৎ লওহে-মাহফুযকে সম্পূর্ণ পাক-পবিত্র লোকগণ ব্যতীত কেউ স্পর্শ করতে পারে না। এমতাবস্থায় مطهرون অর্থাৎ পাক-পবিত্র লোকগণ-এর অর্থ ফেরেশতাগণই হতে পারে, যারা 'লওহে-মাহফুয' পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম। ফেরেশতাদের জন্য পবিত্র কথাটি ব্যবহার করার তাৎপর্য হলো মহান আল্লাহ তাদেরকে সব রকমের অপবিত্র আবেগ অনুভূতি এবং ইচ্ছা আকাংখা থেকে পবিত্র রেখেছেন। [কুরতুবী] আয়াতের এ তাফসীরটি সবচেয়ে বেশী গ্রহণযোগ্য; কারণ এর সমর্থনে আমরা অন্যত্র আয়াত দেখতে পাই, যেখানে বলা হয়েছে, "ওটা আছে মর্যাদা সম্পন্ন লিপিসমূহে, যা উন্নত, পবিত্র, মহান, পবিত্র লেখকদের হাতে।" [সুরা আবাসা: ১৩-১৬] এ আয়াতে 'পবিত্র' বলে ফেরেশতাদের বোঝানো হয়েছে বলে সবাই একমত। উপরোক্ত তাফসীর অনুযায়ী কাফেররা কুরআনের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আরোপ করতো এটা তার জবাব হিসেবে বিবেচিত হবে। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গণক আখ্যায়িত করে বলতো, জিন ও শয়তানরা তাকে এসব কথা শিখিয়ে দেয়। কুরআন মজীদের কয়েকটি স্থানে এর জবাব দেয়া হয়েছে। যেমন এক স্থানে বলা হয়েছে, "শয়তানরা এ বাণী নিয়ে আসেনি। এটা তাদের জন্য সাজেও না। আর তারা এটা করতেও পারে না। এ বাণী শোনার সুযোগ থেকেও তাদেরকে দূরে রাখা হয়েছে।" [সূরা আশ-শু'আরা: ২১০-২১২] এ বিষয়টিই এখানে এ ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, "পবিত্র সত্তা ছাড়া কেউ তা স্পর্শ করতে পারে না।"

দ্বিতীয় সম্ভাব্য অর্থ এই যে, ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ এ বাক্যটি ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ﴾ বাক্যের বিশেষণ। এমতাবস্থায় لا يَمَسُّه এর সর্বনাম দ্বারা কুরআন বোঝানো হবে। [কুরতুবী] আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, এটাকে এমন লোক, যারা 'হাদসে-আসগর' ও 'হাদসে-আকবর' থেকে পবিত্র তারা ব্যতীত কেউ যেন স্পর্শ না করে। (বে-ওযু অবস্থাকে

৮০. এটা সৃষ্টিকুলের রবের কাছ থেকে নাযিলকৃত।

تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٠﴾

৮১. তবুও কি তোমরা এ বাণীকে তুচ্ছ গণ্য করছ[১]?

اَفَبِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَنْتُمْ مُّدْهِنُوْنَ ﴿٨١﴾

৮২. আর তোমরা মিথ্যারোপকেই তোমাদের রিযিক করে নিয়েছ[২]!

وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ ﴿٨٢﴾

'হাদসে-আসগর' বলা হয়। ওযু করলে এই অবস্থা দূর হয়ে যায়। পক্ষান্তরে বীর্যস্খলনের কিংবা স্ত্রীসহবাসের পরবর্তী অবস্থা এবং হায়েয এবং নেফাসের অবস্থাকে 'হাদসে-আকবর' বলা হয়।) কিন্তু আয়াত থেকে এর সপক্ষে দলীল নেয়া খুব শক্তিশালী মত নয়। কিন্তু বিভিন্ন হাদীস থেকে এ মতের পক্ষে দলীল পাওয়া যায়। যেমন, "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআন সাথে নিয়ে কাফের দেশে সফর করতে নিষেধ করেছেন; যাতে তা কাফেরদের হাতে না পড়ে।" [বুখারী: ২৯৯০, মুসলিম: ১৮৬৯] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমর ইবনে হাযমের কাছে লিখে পাঠিয়েছিলেন যে, "কুরআনকে যেন পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কেউ স্পর্শ না করে।" [মুয়াত্তা মালেক: ১/২৯৯, মুহাদ্দিসগণ আবু বকর ইবনে হাযমের কাছে লিখা চিঠিটি বিশুদ্ধ বলে মত প্রকাশ করেছেন। দেখুন, আলবানী: ইরওয়াউল গালীল, ১২২] তাছাড়া এ ব্যাপারে আলেমগণ একমত যে, 'হাদসে আকবর' অবস্থায় কোনভাবেই কুরআন স্পর্শ করা যাবে না। তবে 'হাদসে আসগর' অবস্থায় কোন কোন আলেমের মতে স্পর্শ করা জায়েয আছে। তারা এ আয়াতে বর্ণিত مُطَهَّرُوْنَ দ্বারা ফেরেশতা উদ্দেশ্য নিয়েছেন। আর উপরোক্ত প্রথম হাদীসের নিষেধাজ্ঞার কারণ হিসেবে বলেছেন যে, কাফেরদের হাতে পড়লে কুরআনের অবমাননার সম্ভাবনা থাকায় নিষেধ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় হাদীসটি তাদের নিকট বিশুদ্ধ বলে প্রমাণিত হয়নি। তাছাড়া কোন কোন আলেম এ আয়াত থেকে তৃতীয় আরেকটি অর্থ নিয়েছেন। তাদের মতে এখানে مس শব্দ দ্বারা উপকৃত হওয়া বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এ কুরআন থেকে কেবল ঐ সমস্ত লোকরাই উপকৃত হতে পারে যাদের অন্তর পবিত্র। [দেখুন, কুরতুবী]

(১) আয়াতে مُدْهِنُوْنَ শব্দটি শৈথিল্য প্রদর্শন করা ও কপটতা করা, তুচ্ছ জ্ঞান করা, খোশামোদ ও তোয়াজ করার নীতি গ্রহণ করা, গুরুত্ব না দেয়া এবং যথাযোগ্য মনোযোগের উপযুক্ত মনে না করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানেও কুরআনী আয়াতের ব্যাপারে কপটতা, মিথ্যারোপ, গুরুত্বহীন ও তুচ্ছ জ্ঞান করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। [কুরতুবী]

(২) অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নেয়ামতকে দেখেও তোমরা সেগুলোকে অস্বীকার করে যাচ্ছ।

৮৩. সুতরাং কেন নয়---প্রাণ যখন কণ্ঠাগত হয়[১]

فَلَوْلَآ إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ ﴿٨٣﴾

৮৪. এবং তখন তোমরা তাকিয়ে থাক

وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ ﴿٨٤﴾

৮৫. আর আমরা তোমাদের চেয়ে তার কাছাকাছি, কিন্তু তোমরা দেখতে পাও না[২]।

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ ﴿٨٥﴾

তোমরা কৃতজ্ঞ হওয়ার পরিবর্তে কৃতঘ্ন হচ্ছ। তোমরা আল্লাহ্‌র নেয়ামতকে অন্যের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করছ। তোমরা শুকরিয়া আদায়ের জায়গায় কুফরী করছ।[ফাতহুল কাদীর] হাদীসে এসেছে, যায়েদ ইবন খালেদ আল-জুহানী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে হুদাইবিয়াতে ফজরের সালাত আদায় করেন। তার আগের রাত্রিতে বৃষ্টি হয়েছিল। সালাত শেষ করে রাসূল মানুষের দিকে ফিরে বললেন, তোমরা কি জান তোমাদের রব কি বলেছেন? সাহাবাগণ বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ভাল জানেন। তিনি বললেন, আল্লাহ্ বলেছেন, আমার বান্দাদের মধ্যে কেউ ঈমানদার আর কেউ কাফের এ দু'ভাগ হয়ে গেছে। যারা বলেছে আমরা আল্লাহ্‌র রহমতে বৃষ্টি লাভ করেছি তারা আমার উপর ঈমান এনেছে নক্ষত্রপুঞ্জের প্রভাব অস্বীকার করেছে। আর যারা বলেছে আমরা ওমুক ওমুক নক্ষত্রের নিকটবর্তী হওয়ার কারণে বৃষ্টি লাভ করেছি তারা আমার সাথে কুফরী করেছে এবং নক্ষত্রপুঞ্জের উপর ঈমান এনেছে। [বুখারী: ১০৩৮, মুসলিম: ৭১]

(১) অর্থাৎ যদি তোমরা নিজেদেরকে সর্বেসর্বা মনে করে থাক তবে কেন পার না তোমাদের প্রাণকে তোমাদের শরীরে রেখে দিতে? [ফাতহুল কাদীর]

(২) অর্থাৎ এমতাবস্থায়ও আমরা আমাদের ফেরেশতাদের নিয়ে তোমাদের নিকটেই থাকি। এখানে ফেরেশতাগণ বান্দার নিকটে থাকার কথা বলা হয়েছে। এ মতটিই সবচেয়ে সঠিক মত। ইবনে কাসীর এটাই গ্রহণ করেছেন। তিনি এর প্রমাণস্বরূপ বলছেন যে, এর পরে বলা হয়েছে, 'কিন্তু তোমরা দেখতে পাও না'। কারণ, ফেরেশতাদেরকে দেখতে পাওয়া যায় না। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ۞ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ ۚ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ﴾ "তিনিই স্বীয় বান্দাদের উপর পরাক্রমশালী এবং তিনিই রক্ষক পাঠান। অবশেষে যখন তোমাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন আমার পাঠানোরা তার মৃত্যু ঘটায় এবং তারা কোন ভুল করে না। তারপর তাদের প্রকৃত প্রতিপালক আল্লাহ্‌র দিকে তারা ফিরে আসে। দেখুন, কর্তৃত্ব তো তাঁরই এবং হিসেব গ্রহনে তিনিই সবচেয়ে তৎপর।" [সূরা আল-আন'আম: ৬১-৬২] সেখানে যেভাবে ফেরেশতা পাঠানোর কথা বলা হয়েছে এখানেও এটাই উদ্দেশ্য। [ইবন কাসীর]

৮৬. অতঃপর যদি তোমরা হিসাব নিকাশ ও প্রতিফলের সম্মুখীন না হও[১],

فَلَوْلَآ إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِيْنِيْنَ ﴿٨٦﴾

৮৭. তবে তোমরা ওটা[২] ফিরাও না কেন? যদি তোমরা সত্যবাদী হও!

تَرْجِعُوْنَهَآ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٨٧﴾

৮৮. অতঃপর যদি সে নৈকট্যপ্রাপ্তদের একজন হয়,

فَأَمَّآ إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ﴿٨٨﴾

৮৯. তবে তার জন্য রয়েছে আরাম, উত্তম জীবনোপকরণ ও সুখদ উদ্যান[৩],

فَرَوْحٌ وَّرَيْحَانٌ ۙ وَّجَنَّتُ نَعِيْمٍ ﴿٨٩﴾

৯০. আর যদি সে ডান দিকের একজন হয়,

وَأَمَّآ إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ﴿٩٠﴾

৯১. তবে তাকে বলা হবে, তোমাকে সালাম যেহেতু তুমি ডান দিকের একজন।'

فَسَلٰمٌ لَّكَ مِنْ أَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ﴿٩١﴾

৯২. কিন্তু সে যদি হয় মিথ্যারোপকারী, বিভ্রান্তদের একজন,

وَأَمَّآ إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِيْنَ الضَّآلِّيْنَ ﴿٩٢﴾

---

(১) مَدِيْنِيْنَ শব্দের এক অর্থ, হিসাব নিকাশের অধীন। কারণ, তারা মৃত্যুর পর হিসাব দেয়ার বিষয়টি অস্বীকার করত। [তাবারী] অপর অর্থ, পুনরুত্থিত হওয়া। যদি তোমরা পুনরুত্থিত না হওয়ার থাক, তবে রূহ ফেরত নিয়ে আস না কেন? [তাবারী] অপর অর্থ, প্রতিফল দেয়া। অর্থাৎ যদি তোমাদেরকে তোমাদের কাজের প্রতিফল না দিতে হয়, তবে তোমাদের রূহকে ফিরিয়ে নিয়ে আস না কেন? এ অর্থকে ইমাম তাবারী প্রাধান্য দিয়েছেন। কারও অধীন থাকা। অর্থাৎ যদি তোমরা কারও অধীন না থাক, কারও কর্তৃত্ব যদি তোমাদের উপর কার্যকর না থাকে, তবে তোমরা কেন তোমাদের রূহকে দেহে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হও না? [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(২) অর্থাৎ আত্মা কণ্ঠাগত হওয়ার পর তোমরা যখন দেখতে পাচ্ছ যে, তোমাদের সেখানে কোনও করণীয় নেই, তখন তোমাদের জন্য উচিত হবে ঈমান আনা। কিন্তু যদি তা না কর, তাহলে যুক্তির কথা হচ্ছে, তোমরা রূহটাকে ফেরৎ নিয়ে আস, যেন মৃত্যুই না আসে। কিন্তু তোমরা সেটাকে ফেরৎ আনতে সমর্থ নও। [জালালাইন; সা'দী; মুয়াসসার]

(৩) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'মুমিনের প্রাণ তো জান্নাতের গাছে পাখির আকারে থাকবে, পুনরুত্থান দিবসে তার প্রাণকে তার শরীরে ফেরৎ দেয়া পর্যন্ত এভাবেই সে থাকবে'। [মুসনাদে আহমাদ: ৩/৪৫৫, ইবনে মাজাহ: ৪২৭১, মুয়াত্তা ইমাম মালেক: ৪৯]

৯৩. তবে তার আপ্যায়ন হবে অতি উষ্ণ পানির, فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ ﴿٩٣﴾

৯৪. এবং দহন জাহান্নামের; وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ ﴿٩٤﴾

৯৫. নিশ্চয় এটা সুনিশ্চিত সত্য । إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ﴿٩٥﴾

৯৬. অতএব আপনি আপনার মহান রবের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন(১) । فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٩٦﴾

---

(১) সুরার উপসংহারে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলা হয়েছে যে, আপনি আপনার মহান পালনকর্তার নামে পবিত্রতা ঘোষণা করুন । এতে সালাতের ভিতরে ও বাইরের সব তাসবীহ দাখিল রয়েছে । খোদ সালাতকেও মাঝে মাঝে তসবীহ বলে ব্যক্ত করা হয় । এমতাবস্থায় এটা সালাতের প্রতি গুরুত্বদানেরও আদেশ হয়ে যাবে । তাসবীহ পাঠের বিভিন্ন ফযীলত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে । এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “যদি কেউ বলে 'সুবহানাল্লাহিল 'আজিম ওয়া বিহামদিহী” জান্নাতে তার জন্য একটি খেজুর গাছ রোপন করা হয় ।” [তিরমিযী: ৩৪৬৪, ৩৪৬৫] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “দু'টি এমন বাক্য রয়েছে যা জিহ্বার উপর হাল্কা, মীযানের পাল্লায় ভারী, রাহমানের নিকট প্রিয়, তা হচ্ছে, “সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী, সুবহানাল্লাহিল 'আযীম'” । [বুখারী: ৬৪০৬, ৬৬৮২, ৭৫৬৩, মুসলিম: ২৬৯৪]

৫৭- সূরা আল-হাদীদ
২৯ আয়াত, মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ①

১. আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে[১]। আর তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়[২]।

لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ②

২. আসমানসমূহ ও যমীনের সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁরই; তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান; আর তিনিই সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ③

৩. তিনিই প্রথম ও শেষ; প্রকাশ্য (উপরে) ও গোপন (নিকটে) আর তিনি সবকিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত[৩]।

---

(১) অর্থাৎ বিশ্ব-জাহানের প্রত্যেকটি বস্তু সদা সর্বদা এ সত্য প্রকাশ এবং ঘোষণা করে চলেছে যে, এ বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা ও পালনকর্তা সব রকম দোষ-ত্রুটি, অপূর্ণতা, দুর্বলতা, ভুল ভ্রান্তি ও অকল্যাণ থেকে পবিত্র। তাঁর ব্যক্তি সত্তা পবিত্র, তাঁর গুণাবলী পবিত্র, তাঁর কাজকর্ম পবিত্র এবং তাঁর সমস্ত সৃষ্টিমূলক বা শরীয়াতের বিধান সম্পর্কিত নির্দেশাবলীও পবিত্র। [কুরতুবী; সা'দী]

(২) আয়াতে هُوَ العَزِيْزُ الحَكِيْمُ বলা হয়েছে। عزيز শব্দের অর্থ পরাক্রমশালী, শক্তিমান ও অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতার অধিকারী, যাঁর সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন পৃথিবীর কোন শক্তিই রোধ করতে পারে না, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যাঁর আনুগত্য সবাইকে করতে হয়, যাঁর অমান্যকারী কোনভাবেই তাঁর পাকড়াও থেকে রক্ষা পায় না। আর حكيم শব্দের অর্থ হচ্ছে, তিনি যা-ই করেন, জ্ঞান ও যুক্তি বুদ্ধির সাহায্যে করেন। তাঁর সৃষ্টি, তাঁর ব্যবস্থাপনা, তাঁর শাসন, তাঁর আদেশ নিষেধ, তাঁর নির্দেশনা সব কিছুই জ্ঞান ও যুক্তি নির্ভর। তাঁর কোন কাজেই অজ্ঞতা, বোকামি ও মূর্খতার লেশমাত্র নেই। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

(৩) ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ কোন সময় তোমার অন্তরে আল্লাহ তাআলা ও ইসলাম সম্পর্কে শয়তানী কুমন্ত্রণা দেখা দিলে ﴿هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ﴾ আয়াতখানি আস্তে পাঠ করে নাও। [আবু দাউদ: ৫১১০] এই আয়াতের তাফসীর এবং "আউয়াল", "আখের", "যাহের" ও "বাতেন" এ শব্দ চারটির অর্থ সম্পর্কে

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا ۚ وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٤﴾

৪. তিনি ছয় দিনে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন; তারপর তিনি ‘আর্‌শের উপর উঠেছেন। তিনি জানেন যা কিছু যমীনে প্রবেশ করে এবং যা কিছু তা থেকে বের হয়, আর আসমান থেকে যা কিছু অবতীর্ণ হয় এবং তাতে যা কিছু উত্থিত হয়[১]। আর তোমরা যেখানেই থাক না কেন---তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন, আর তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা[২]।

তফসীরবিদগণের বহু উক্তি বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে “আউয়াল” শব্দের অর্থ তো প্রায় নির্দিষ্ট; অর্থাৎ অস্তিত্বের দিক দিয়ে সকল সৃষ্টজগতের অগ্রে ও আদি। কারণ, তিনি ব্যতীত সবকিছু তাঁরই সৃজিত। তাই তিনি সবার আদি। “আখের” এর অর্থ কারও কারও মতে এই যে, সবকিছু বিলীন হয়ে যাওয়ার পরও তিনি বিদ্যমান থাকবেন। [সা’দী] যেমন ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ﴾ [সূরা আল-কাসাস: ৮৮] আয়াতে এর পরিষ্কার উল্লেখ আছে। ইমাম বুখারী বলেন, ‘যাহের’ অর্থ জ্ঞানে তিনি সবকিছুর উপর, অনুরূপ তিনি ‘বাতেন’ অর্থাৎ জ্ঞানে সবকিছুর নিকটে। বিভিন্ন হাদীসে এ আয়াতের তাফসীর এসেছে, এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুমানোর সময় বলতেন, “হে আল্লাহ্! সাত আসমানের রব, মহান আরশের রব, আমাদের রব এবং সবকিছুর রব, তাওরাত, ইঞ্জীল ও ফুরকান নাযিলকারী, দানা ও আঁটি চিরে বৃক্ষের উদ্ভবকারী, আপনি ব্যতীত কোন হক্ক মা’বুদ নেই, যাদের কপাল আপনার নিয়ন্ত্রণে এমন প্রত্যেক বস্তুর অনিষ্ট হতে আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি, আপনি অনাদি, আপনার আগে কিছু নেই, আপনি অনন্ত আপনার পরে কিছুই থাকবে না। আপনি সবকিছুর উপরে, আপনার উপরে কিছুই নেই, আপনি নিকটবর্তী, আপনার চেয়ে নিকটবর্তী কেউ নেই, আমার পক্ষ থেকে আপনি আমার ঋণ পরিশোধ করে দিন এবং আমাকে দারিদ্রতা থেকে মুক্তি দিন।” [মুসলিম: ২৭১৩, মুসনাদে আহমাদ ২/৪০৪]

(১) অন্য কথায় তিনি শুধু সামগ্রিক জ্ঞানের অধিকারী নন, খুঁটি-নাটি বিষয়েও জ্ঞানের অধিকারী। এক একটি শস্যদানা ও বীজ যা মাটির গভীরে প্রবিষ্ট হয়, এক একটি ছোট পাতা ও অংকুর যা মাটি ফুঁড়ে বের হয়, বৃষ্টির এক একটি বিন্দু যা আসমান থেকে পতিত হয় এবং সমুদ্র ও খাল-বিল থেকে যে বাষ্পরাশি আকাশের দিকে উত্থিত হয়, তার প্রতিটি মাত্রা তাঁর জানা আছে। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(২) অর্থাৎ তোমরা কোন জায়গায়ই তাঁর জ্ঞান, তাঁর অসীম ক্ষমতা, তাঁর শাসন কর্তৃত্ব এবং তাঁর ব্যবস্থাপনার আওতা বহির্ভূত নও। মাটিতে, বায়ুতে, পানিতে অথবা কোন

لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿٥﴾

৫. আসমানসমূহ ও যমীনের সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁরই এবং আল্লাহ্‌রই দিকে সব বিষয় প্রত্যাবর্তিত হবে।

يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ ۚ وَهُوَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿٦﴾

৬. তিনিই রাতকে প্রবেশ করান দিনে আর দিনকে প্রবেশ করান রাতে এবং তিনি অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কে সম্যক অবগত।

اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ۚ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿٧﴾

৭. তোমরা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন এবং আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে যা কিছুর উত্তরাধিকারী করেছেন তা হতে ব্যয় কর। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও ব্যয় করে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।

وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ۚ وَالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ لِتُؤْمِنُوْا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ اَخَذَ مِيْثَاقَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٨﴾

৮. আর তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আন না? অথচ রাসূল তোমাদেরকে তোমাদের রবের প্রতি ঈমান আনার জন্য ডাকছেন, অথচ আল্লাহ্‌ তোমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন[১], যদি

নিভৃত কোণে যেখানেই তোমরা থাক না কেন সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ জানেন তোমরা কোথায় আছো। [ইবন কাসীর] ইমাম আহমাদ রাহেমাহুল্লাহ্‌ বলেন, এ আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, 'সম্যক দ্রষ্টা'। যা প্রমাণ করছে যে, আল্লাহ্‌ সৃষ্টিজগতের বাইরে থেকেও সবকিছু দেখছেন। তাই এখানে সঙ্গে থাকার অর্থ, সৃষ্টির সাথে লেগে থাকার অর্থ নয়, বরং এর অর্থ হচ্ছে, তোমরা তাঁর দৃষ্টি ও শক্তির অধীন। তাঁর দৃষ্টি ও শক্তি তোমাদের সঙ্গে আছে। [দেখুন, আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ ওয়ায যানাদিকাহ: ১৫৪-১৫৮]

(১) কিছু সংখ্যক মুফাসসির এ প্রতিশ্রুতি বলতে অর্থ করেছেন আল্লাহর দাসত্ব করার সে প্রতিশ্রুতি যা সৃষ্টির সূচনা পর্বে আদম আলাইহিস সালামের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাঁর সমস্ত সন্তানকে বের করে তাদের সবার নিকট থেকে নেয়া হয়েছিল। কিন্তু অপর কিছু সংখ্যক তাফসীরকারক এর অর্থ করেছেন 'সে প্রতিশ্রুতি যা প্রত্যেক মানুষের প্রকৃতি ও প্রকৃতিগত বিবেক-বুদ্ধিতে আল্লাহর দাসত্বের জন্য বর্তমান।' [কুরতুবী] কিন্তু সঠিক

তোমরা ঈমানদার হও[১]।

هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ⑨

৯. তিনিই তাঁর বান্দার প্রতি সুস্পষ্ট আয়াত নাযিল করেন, তোমাদেরকে অন্ধকার হতে আলোতে আনার জন্য। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি করুণাময়, পরম দয়ালু।

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ

১০. আর তোমাদের কি হলো যে, তোমরা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করছ না? অথচ আসমানসমূহ ও যমীনের মীরাস[২]

কথা হলো, এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের সচেতন প্রতিশ্রুতি, ঈমান গ্রহণ করার মাধ্যমে প্রত্যেক মুসলিম আল্লাহর সাথে যে প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হয়। কুরআন মজীদের অন্য এক স্থানে যে ভাষায় এ প্রতিশ্রুতির উল্লেখ করা হয়েছে তা হচ্ছে, “আল্লাহ তোমাদের যেসব নিয়ামত দান করেছেন সেসব নিয়ামতের কথা মনে কর এবং তোমাদের কাছ থেকে যে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছেন তার কথাও মনে কর। সে সময় তোমরা বলেছিলে, আমরা শুনলাম এবং আনুগত্য করলাম। আর আল্লাহকে ভয় কর আল্লাহ মনের কথাও জানেন।” [সূরা আল-মায়েদাহ: ৭] উবাদা ইবনে সামেত থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের থেকে এই মর্মে বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন যে, আমরা যেন সক্রিয়তা ও নিষ্ক্রিয়তা উভয় অবস্থায় শুনি ও আনুগত্য করে যাই এবং স্বচ্ছলতা ও অস্বচ্ছলতা উভয় অবস্থায় আল্লাহর পথে খরচ করি, ভাল কাজের আদেশ করি এবং মন্দ কাজে নিষেধ করি, আল্লাহ সম্পর্কে সত্য কথা বলি এবং সেজন্য কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় না করি।” [মুসলিম: ১৭০৯, মুসনাদে আহমদ: ৫/৩১৬]।

(১) অর্থাৎ যদি তোমরা মুমিন হও। এখানে প্রশ্ন হয় যে, এ কথাটি সেই কাফেরদেরকে বলা হয়েছে, যাদেরকে মুমিন না হওয়ার কারণে ইতিপূর্বে ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ বলে সতর্ক করা হয়েছে। এমতাবস্থায় ‘তাদেরকে তোমরা যদি মুমিন হও’ বলা কিরূপে সঙ্গত হতে পারে? জওয়াব এই যে, কাফের ও মুশরিকরাও আল্লাহর প্রতি ঈমানের দাবি করত। প্রতিমাদের ব্যাপারে তাদের বক্তব্য ছিল এই যে, ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ﴾ “তাদের ইবাদত তো আমরা কেবল এজন্যই করি যে, এরা আমাদেরকে সুপারিশ করে আল্লাহ্‌র নৈকট্যের অধিকারী করে দিবে”। [সূরা আয-যুমার:৩] অতএব, আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহর প্রতি ঈমানের দাবি যদি সত্য হয়, তবে তার বিশুদ্ধ ও ধর্তব্য পথ অবলম্বন কর। [দেখুন, আততাহরীর ওয়াততানভীর]

(২) ميراث অভিধানে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত মালিকানাকে বলা হয়ে থাকে। এই মালিকানা বাধ্যতামূলক মৃত ব্যক্তি ইচ্ছা করুক বা না করুক, ওয়ারিশ ব্যক্তি আপনাআপনি

مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ ۚ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ⑩

তো আল্লাহ্‌রই। তোমাদের মধ্যে যারা বিজয়ের আগে ব্যয় করেছে(১) ও যুদ্ধ করেছে, তারা (এবং পরবর্তীরা) সমান নয়(২)। তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ

মালিক হয়ে যায়। এখানে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের উপর আল্লাহ তা'আলার সার্বভৌম মালিকানাকে ميراث শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার রহস্য এই যে, তোমরা ইচ্ছা কর বা না কর, তোমরা আজ যে যে জিনিসের মালিক বলে গণ্য হও, সেগুলো অবশেষে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ মালিকানায় চলে যাবে। [সা'দী, কুরতুবী] এক হাদীসে এসেছে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলেন, একদিন আমরা একটি ছাগল যবাই করে তার অধিকাংশ গোশত বন্টন করে দিলাম, শুধু একটি হাত নিজেদের জন্যে রাখলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ বণ্টনের পর এই ছাগলের গোশত কতটুকু রয়ে গেছে? আমি আরয করলামঃ শুধু একটি হাত রয়ে গেছে। তিনি বললেনঃ গোটা ছাগলই রয়ে গেছে। তোমার ধারণা অনুযায়ী কেবল হাতই রয়ে যায়নি। [তিরমিযী:২৪৭০] কেননা, গোটা ছাগলই আল্লাহর পথে ব্যয় হয়েছে। এটা আল্লাহর কাছে তোমার জন্যে থেকে যাবে। যে হাতটি নিজের খাওয়ার জন্যে রেখেছ, আখেরাতে এর কোন প্রতিদান পাবে না। কেননা, এটা এখানেই বিলীন হয়ে যাবে। আয়াতের আরেকটি অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর পথে অর্থ খরচ করতে গিয়ে তোমাদের কোন রকম দারিদ্র বা অস্বচ্ছলতার আশংকা করা উচিত নয়। কেননা, যে আল্লাহর উদ্দেশ্যে তা খরচ করবে তিনি যমীন ও ঊর্ধ জগতের সমস্ত ভাণ্ডারের মালিক। আজ তিনি তোমাদেরকে যা দান করে রেখেছেন তাঁর কাছে দেয়ার শুধু ঐ টুকুই ছিল না। কাল তিনি তোমাদেরকে তার চেয়েও অনেক বেশী দিতে পারেন। [ইবন কাসীর] একথাটাই অন্য একটি স্থানে এভাবে বলা হয়েছে, "হে নবী, তাদের বলুন, আমার রব তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা অঢেল রিযিক দান করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা তা সংকীর্ণ করে দেন। আর তোমরা যা খরচ কর তার পরিবর্তে তিনিই তোমাদেরকে আরও রিযিক দান করেন। তিনি সর্বোত্তম রিযিক দাতা।" [সূরা সাবা:৩৯]

(১) অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে, এখানে মক্কা বিজয় উদ্দেশ্য। [তাবারী; ইবন কাসীর; জালালাইন; মুয়াসসার] তবে কারও কারও মতে, এর দ্বারা হুদায়বিয়ার যুদ্ধ বোঝানো হয়েছে। [সা'দী]

(২) আল্লাহর পথে ব্যয় করার প্রতি জোর দেয়ার পর পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর পথে যা কিছু যে কোন সময় ব্যয় করলে সওয়াব পাওয়া যাবে; কিন্তু ঈমান, আন্তরিকতা ও অগ্রগামিতার পার্থক্যবশত সওয়াবেও পার্থক্য হবে। বলা হয়েছেঃ ﴿لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ﴾ অর্থাৎ যারা আল্লাহর পথে ধনসম্পদ ব্যয় করে তারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। (এক) যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে বিশ্বাস স্থাপন করত

তাদের চেয়ে যারা পরবর্তী কালে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে। তবে আল্লাহ্ উভয়ের জন্যই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন[১]। আর তোমরা যা কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।

দ্বিতীয় রুকূ'

১১. এমন কে আছে যে আল্লাহ্‌কে দেবে উত্তম ঋণ? তাহলে তিনি বহু গুণে এটাকে বৃদ্ধি করবেন তার জন্য। আর তার জন্য রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার[২]।

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ۝١١

আল্লাহর পথে ব্যয় করেছে। (দুই) যারা মক্কা বিজয়ের পর মুমিন হয়ে আল্লাহর পথে ব্যয় করেছে। এই দুই শ্রেণীর লোক আল্লাহর কাছে সমান নয়; বরং মর্যাদায় একশ্রেণী অপর শ্রেণী থেকে শ্রেষ্ঠ। মক্কা বিজয়ের পূর্বে বিশ্বাস স্থাপনকারী, জেহাদকারী ও ব্যয়কারীর মর্যাদা অপর শ্রেণী অপেক্ষা বেশী। কারণ, অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতিতে তারা আল্লাহ তা'আলার জন্য এমন সব বিপদাপদের সম্মুখীন হয়েছিলো যার সম্মুখীন অন্য গোষ্ঠীকে হতে হয়নি। মুফাসসিরদের মধ্যে মুজাহিদ, কাতাদা এবং যায়েদ ইবনে আসলাম বলেনঃ এ আয়াতে বিজয় শব্দটি যে ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে সেটি হচ্ছে মক্কা বিজয়। আমের শা'বী বলেনঃ এর দ্বারা হুদায়বিয়ার সন্ধিকে বুঝানো হয়েছে। অধিকাংশ মুফাসসির প্রথম মতটি গ্রহণ করেছেন। [কুরতুবী; ইবন কাসীর]

(১) অর্থাৎ পারস্পরিক তারতম্য সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা কল্যাণ অর্থাৎ জান্নাত ও মাগফিরাতের ওয়াদা সবার জন্যেই করেছেন। এই ওয়াদা সাহাবায়ে-কেরামের সেই শ্রেণীদ্বয়ের জন্যে, যারা মক্কাবিজয়ের পূর্বে ও পরে আল্লাহর পথে ব্যয় করেছেন এবং ইসলামের শত্রুদের মোকাবিলা করেছেন। এতে সাহাবায়ে-কেরামের প্রায় সমগ্র দলই শামিল আছে। তাই মাগফিরাত ও রহমতের এই কুরআনী ঘোষণা প্রত্যেক সাহাবীকে শামিল করেছে। [সা'দী]
শুধু মাগফিরাতই নয়; ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ [সূরা আত-তাওবাহ: ১০০] বলে তাঁর সন্তুষ্টিরও নিশ্চিত আশ্বাস দান করেছেন।

(২) এটা আল্লাহ তা'আলার চরম উদারতা ও দানশীলতা যে, মানুষ যদি তাঁরই দেয়া সম্পদ তাঁর পথে ব্যয় করে তাহলে তিনি তা নিজের জন্য ঋণ হিসেবে গ্রহণ করেন। অবশ্য শর্ত এই যে, তা "কর্জে হাসানা" (উত্তম ঋণ) হতে হবে। অর্থাৎ খাঁটি নিয়তে

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٢﴾

১২. সেদিন আপনি দেখবেন মুমিন নর-নারীদেরকে তাদের সামনে ও ডানে তাদের নূর ছুটতে থাকবে(১)। বলা হবে, 'আজ তোমাদের জন্য সুসংবাদ জান্নাতের, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তোমরা স্থায়ী হবে, এটাই তো মহাসাফল্য।'

يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴿١٣﴾

১৩. সেদিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীরা যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে বলবে, 'তোমরা আমাদের জন্য একটু থাম, যাতে আমরা তোমাদের নূরের কিছু গ্রহণ করতে পারি।' বলা হবে, 'তোমরা তোমাদের পিছনে ফিরে যাও ও নূরের সন্ধান কর।' তারপর উভয়ের মাঝামাঝি স্থাপিত হবে একটি প্রাচীর যাতে একটি দরজা থাকবে, যার ভিতরে থাকবে রহমত এবং বাইরে থাকবে শাস্তি(২)।

কোন ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য ছাড়াই তা দিতে হবে, তার মধ্যে কোন প্রকার প্রদর্শনীর মনোবৃত্তি, খ্যাতি ও নাম-ধামের আকাংখা থাকবে না, তা দিয়ে কাউকে খোঁটা দেয়া যাবে না, দাতা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই দেবে এবং এছাড়া অন্য কারো প্রতিদান বা সন্তুষ্টি লক্ষ্য হবে না। এ ধরনের ঋণের জন্য আল্লাহর দুইটি প্রতিশ্রুতি আছে। একটি হচ্ছে, তিনি তা কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে ফেরত দেবেন। অপরটি হচ্ছে, এজন্য তিনি নিজের পক্ষ থেকে সর্বোত্তম পুরস্কারও দান করবেন। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে অনেকেই এটাকে বাস্তবে রুপান্তরিত করেছিলেন। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

(১) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, "তাদেরকে তাদের আমল অনুযায়ী নূর দেয়া হবে। তাদের কারও কারও নূর হবে পাহাড়সম। তাদের মধ্যে সবচেয়ে কম নূরের যে অধিকারী হবে তার নূর থাকবে তার বৃদ্ধাঙ্গুলীতে। যা একবার জলবে আরেকবার নিভবে।" [মুস্তাদরাকে হাকিম ২/৪৭৮]

(২) অর্থাৎ সেদিন স্মরণীয়, যেদিন আপনি মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে দেখবেন যে, তাদের নূর তাদের অগ্রে ও ডানদিকে ছুটোছুটি করবে। 'সেদিন' বলে কেয়ামতের দিন বোঝানো হয়েছে। নূর দেয়ার ব্যাপারটি পুলসিরাতে চলার কিছু পূর্বে ঘটবে।

يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ ﴿١٤﴾

১৪. মুনাফিকরা মুমিনদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করবে, 'আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না?' তারা বলবে, 'হ্যাঁ, কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে বিপদগ্রস্ত করেছ। আর তোমরা প্রতীক্ষা

এ আয়াতের একটি তাফসীর আবু উমামা বাহেলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি একদিন দামেশকে এক জানাযায় শরীক হন। জানাযা শেষে উপস্থিত লোকদেরকে মৃত্যু ও আখেরাত স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্যে তিনি মৃত্যু, কবর ও হাশরের কিছু অবস্থা বর্ণনা করেন। নিম্নে তার বক্তব্যের কিছু অংশ পেশ করা হলঃ "অতঃপর তোমরা কবর থেকে হাশরের ময়দানে স্থানান্তরিত হবে। হাশরের বিভিন্ন মনযিল ও স্থান অতিক্রম করতে হবে। এক মনযিলে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে কিছু মুখমণ্ডলকে সাদা ও উজ্জ্বল করে দেয়া হবে এবং কিছু মুখমণ্ডলকে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ করে দেয়া হবে। অপর এক মনযিলে সমবেত সব মুমিন ও কাফেরকে গভীর অন্ধকার আচ্ছন্ন করে ফেলবে। কিছুই দৃষ্টিগোচর হবে না। এরপর নূর বণ্টন করা হবে। প্রত্যেক মুমিনকে নূর দেয়া হবে। মুনাফিক ও কাফেরকে নূর ব্যতীত অন্ধকারেই রেখে দেয়া হবে। আর এ উদাহরণই আল্লাহ্ তাঁর কুরআনে পেশ করেছেন। তিনি বলেছেন, "অথবা তাদের কাজ গভীর সাগরের তলের অন্ধকারের মত, যাকে আচ্ছন্ন করে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, যার ঊর্ধ্বে মেঘপুঞ্জ, অন্ধকারপুঞ্জ স্তরের উপর স্তর, এমনকি সে হাত বের করলে তা আদৌ দেখতে পাবে না। আল্লাহ্ যাকে নূর দান করেন না তার জন্য কোন নূরই নেই।" [সূরা আন-নূর:৪০] অত:পর যেভাবে অন্ধ ব্যক্তি চক্ষুষ্মান ব্যক্তির চোখ দ্বারা দেখতে পায় না তেমনি কাফের ও মুনাফিক ঈমানদারের নূর দ্বারা আলোকিত হতে পারবে না। মুনাফিকরা ঈমানদারদের বলবে, 'তোমরা আমাদের জন্য একটু থাম, যাতে আমরা তোমাদের নূরের কিছু গ্রহণ করতে পারি।' এভাবে আল্লাহ্ মুনাফিকদেরকে ধোঁকাগ্রস্থ করবেন। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন, "তারা আল্লাহকে ধোঁকা দেয় আর আল্লাহ্ তাদেরকে ধোঁকা দিবেন।" [সূরা আন-নিসা: ১৪২] তারপর তারা যেখানে নূর বন্টন হয়েছিল সেখানে ফিরে যাবে, কিন্তু তারা কিছুই পাবেনা ফলে তারা তখন ঈমানদারদের কাছে ফিরে আসবে, ইত্যবসরে উভয়ের মাঝামাঝি স্থাপিত হবে একটি প্রাচীর যাতে একটি দরজা থাকবে, ওটার ভিতরে থাকবে রহমত এবং বাইরে থাকবে শাস্তি। এভাবেই মুনাফিক ধোঁকাগ্রস্ত হতে থাকবে আর মুমিনদের মাঝে নূর বন্টিত হয়ে যাবে। [ইবনে কাসীর]

আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত আছে, প্রত্যেক মুমিনকে তার আমল পরিমাণে নূর দেয়া হবে। ফলে কারও নূর পর্বতসম, কারও খর্জুর বৃক্ষসম এবং কারও মানবদেহসম হবে। সর্বাপেক্ষা কম নূর সেই ব্যক্তির হবে, যার কেবল বৃদ্ধাঙ্গুলিতে নূর থাকবে; তাও আবার কখনও জ্বলে উঠবে এবং কখনও নিভে যাবে- [ইবনে কাসীর]

করেছিলে, সন্দেহ পোষণ করেছিলে এবং অলীক আকাংখা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছিল, অবশেষে আল্লাহ্‌র হুকুম আসল[১]। আর মহাপ্রতারক[২] তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল আল্লাহ্ সম্পর্কে।'

১৫. 'সুতরাং আজ তোমাদের কাছ থেকে কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না এবং যারা কুফরী করেছিল তাদের কাছ থেকেও নয়। জাহান্নামই তোমাদের আবাসস্থল, এটাই তোমাদের যোগ্য[৩]; আর কত নিকৃষ্ট এ প্রত্যাবর্তনস্থল!'

فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَّلَا مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۗ مَأْوٰىكُمُ النَّارُ ۗ هِيَ مَوْلٰىكُمْ ۗ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿١٥﴾

১৬. যারা ঈমান এনেছে তাদের হৃদয় কি আল্লাহ্‌র স্মরণে এবং যে সত্য নাযিল হয়েছে তার জন্য বিগলিত হওয়ার সময় আসেনি[৪]? আর তারা যেন

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ۙ وَلَا يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ

(১) এর দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ হচ্ছে, তোমাদের মৃত্যু এসে গেল এবং তোমরা মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত এ প্রতারণার ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসতে পারনি। আরেকটি অর্থ হচ্ছে, ইসলাম বিজয় লাভ করলো আর তোমরা তামাশার মধ্যেই ডুবে রইলে। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

(২) অর্থাৎ শয়তান। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

(৩) এর দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি হচ্ছে, সেটিই তোমাদের জন্য উপযুক্ত জায়গা। আরেকটি অর্থ হচ্ছে, তোমরা তো আল্লাহকে তোমাদের অভিভাবক বানাওনি যে, তিনি তোমাদের তত্ত্বাবধান করবেন। এখন জাহান্নাম তোমাদের অভিভাবক। সে-ই তোমাদের যথোপযুক্ত তত্ত্বাবধান করবে। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

(৪) অর্থাৎ মুমিনদের জন্যে কি এখনও সময় আসেনি যে, তাদের অন্তর আল্লাহর যিকর এবং যে সত্য নাযিল করা হয়েছে তৎপ্রতি নম্র ও বিগলিত হবে? ﴿تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ﴾ এর অর্থ অন্তর নরম হওয়া, উপদেশ কবুল করা ও আনুগত্য করা। কুরআনের প্রতি অন্তর বিগলিত হওয়ার অর্থ এর বিধান তথা আদেশ ও নিষেধ পুরোপুরি পালন করার জন্যে প্রস্তুত হওয়া এবং এ ব্যাপারে কোন অলসতা বা দুর্বলতাকে প্রশ্রয় না দেয়া [সা'দী]। এটা মুমিনদের জন্যে হুশিয়ারি। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা

قُلُوبُهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَٰسِقُونَ ﴿١٦﴾

তাদের মত না হয় যাদেরকে আগে কিতাব দেয়া হয়েছিল--- অতঃপর বহু কাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর তাদের অন্তরসমূহ কঠিন হয়ে পড়েছিল। আর তাদের অধিকাংশই ফাসিক।

ٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يُحْىِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٧﴾

১৭. জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ই যমীনকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন। আমরা নিদর্শনগুলো তোমাদের জন্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পার[১]।

إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَٰتِ وَأَقْرَضُوا۟ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَٰعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١٨﴾

১৮. নিশ্চয় দানশীল পুরুষগণ ও দানশীল নারীগণ এবং যারা আল্লাহ্কে উত্তম ঋণ দান করে তাদেরকে দেয়া হবে

থেকে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলা কোন কোন মুমিনদের অন্তরে আমলের প্রতি অলসতা ও অনাসক্তি আঁচ করে এই আয়াত নাযিল করেন। ইমাম আ'মাশ বলেনঃ মদীনায় পৌঁছার পর কিছু অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য অর্জিত হওয়ায় কোন কোন সাহাবীর কর্মোদ্দীপনায় কিছুটা শৈথিল্য দেখা দেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর উপরোক্ত বর্ণনায় আরও বলা হয়েছে, এই হুশিয়ারি সংকেত কুরআন অবতরণ শুরু হওয়ার তের বছর পরে নাযিল হয়। ইবনে মসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, আমাদের ইসলাম গ্রহণের চার বছর পর এই আয়াতের মাধ্যমে আমাদেরকে হুশিয়ার করা হয়। [মুসলিম:৩০২৭] মোটকথা, এই হুশিয়ারীর সারমর্ম হচ্ছে মুসলিমদেরকে পুরোপুরি নম্রতা ও সৎ কর্মের জন্যে তৎপর থাকার শিক্ষা দেয়া এবং এ কথা ব্যক্ত করা যে, আন্তরিক নম্রতাই সৎকর্মের ভিত্তি। শাদ্দাদ ইবনে আউস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মানুষের অন্তর থেকে সর্বপ্রথম নম্রতা উঠিয়ে নেয়া হবে। [তাবারী: ২৭/২২৮]

(১) এখানে যে প্রসঙ্গে একথাটি বলা হয়েছে তা ভালভাবে বুঝে নেয়া দরকার। কুরআন মজীদে বেশ কিছু জায়গায় নবুওয়াত ও কিতাব নাযিলকে বৃষ্টির বরকতের সাথে তুলনা করা হয়েছে। কেননা, ভূ-পৃষ্ঠের ওপর বৃষ্টিপাত যে কল্যাণ বয়ে আনে নবুওয়াত এবং কিতাবও মানবজাতির জন্য সে একই রকমের কল্যাণ বয়ে আনে। মৃত ভূ-পৃষ্ঠে যেমন রহমতের বৃষ্টির এক বিন্দু পড়তেই শস্য শ্যামল হয়ে ওঠে। ঠিক তেমনি আল্লাহর রহমতে যে দেশে নবী প্রেরিত হন এবং অহী ও কিতাব নাযিল হওয়া শুরু হয় সেখানে মৃত মানবতা অকস্মাৎ জীবন লাভ করে। [দেখুন, ইবন কাসীর; কুরতুবী]

বহু গুণ বেশী এবং তাদের জন্য রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার।

১৯. আর যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে, তারাই সিদ্দীক[১]।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ

(১) এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, প্রত্যেক মুমিনকে সিদ্দীক ও শহীদ বলা যায়। এই আয়াতের ভিত্তিতে কারও কারও মতে যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন করে, সেই সিদ্দিক ও শহীদ। কিন্তু পবিত্র কুরআনের অন্য একটি আয়াত থেকে বাহ্যতঃ বুঝা যায় যে, প্রত্যেক মুমিন সিদ্দীক ও শহীদ নয়; বরং মুমিনদের একটি উচ্চ শ্রেণীকে সিদ্দীক ও শহীদ বলা হয়। আয়াতটি এই, ﴿وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا﴾ "আর কেউ আল্লাহ্ এবং রাসুলের আনুগত্য করলে সে নবী, সত্যনিষ্ঠ, শহীদ ও সৎকর্মপরায়ণ---যাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন---তাদের সংগী হবে এবং তারা কত উত্তম সংগী!" [সূরা আন-নিসা: ৬৯] এই আয়াতে নবী-রাসূলগণের সাথে মুমিনদের তিনটি শ্রেণী বিশেষভাবে উল্লেখিত হয়েছে যথা, সিদ্দীক, শহীদ ও ছালেহ। বাহ্যতঃ এই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী। নতুবা ভিন্ন ভাবে বলার প্রয়োজন ছিল না। এ কারণেই কেউ কেউ বলেনঃ সিদ্দীক ও শহীদ প্রকৃতপক্ষে মুমিনদের বিশেষ উচ্চশ্রেণীর লোকগণকে বলা হয়, যারা মহান গুণগরিমার অধিকারী। [ইবন কাসীর; কুরতুবী] তাছাড়া কোন কোন হাদীস থেকেও এ তিন শ্রেণীর পার্থক্য ফুটে উঠে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "জান্নাতীরা তাদের উপরস্থিত খাস কামরায় অবস্থানকারীদের এমনভাবে দেখবে যেমন তোমরা পূর্ব বা পশ্চিম থেকে ধ্রুব তারাকে আকাশের প্রান্ত দেশে চলতে দেখতে পাও; দু'দলের মর্যাদাগত পার্থক্যের কারণে। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! তা কি নবীদের স্থান যেখানে অন্য কেউ পৌঁছতে পারবে না? তিনি বললেন, অবশ্যই হ্যাঁ, যার হাতে আমার আত্মা, তারা এমন কিছু লোক যারা আল্লাহ্র উপর ঈমান এনেছে এবং রাসূলদের সত্যায়ন করেছে।" [বুখারী: ৩২৫৬, মুসলিম: ২৮৩১] তবে আলোচ্য আয়াতে সব মুমিনকে সিদ্দীক ও শহীদ বলার তাৎপর্য এই যে, প্রত্যেক মুমিনকেও কোনো না কোনো দিক দিয়ে সিদ্দীক ও শহীদ বলে গণ্য এবং তাদের কাতারভুক্ত মনে করা হবে। কোন কোন মুফাসসির বলেন, আলোচ্য আয়াতে কামেল ও ইবাদতকারী মুমিন অর্থ নেওয়া সঙ্গত। নতুবা যে সব মুমিন অসাবধান ও খেয়ালখুশীতে মগ্ন তাদেরকে সিদ্দীক ও শহীদ বলা যায় না। এক হাদিস থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন "যারা মানুষের প্রতি অভিসম্পাত করে তারা শহীদদের অন্তর্ভুক্ত হবে না।" [মুসলিম: ২৫৯৮] ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু একবার উপস্থিত জনতাকে বললেনঃ তোমাদের কি হলো যে, তোমরা কাউকে অপরের ইযযতের উপর হামলা করতে দেখেও তাকে বাধা দাও না এবং তাকে খারাপ মনে কর না?

الصِّدِّيقُونَ ۖ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿١٩﴾

আর শহীদগণ; তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের কাছে তাদের প্রাপ্য পুরস্কার ও নূর(১)। আর যারা কুফরী করেছে এবং আমাদের নিদর্শনসমূহে মিথ্যারোপ করেছে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী।

তৃতীয় রুকূ'

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ۖ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا ۖ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ ۚ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ

২০. তোমরা জেনে রাখ, নিশ্চয় দুনিয়ার জীবন খেল-তামাশা, ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক গর্ব-অহংকার, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ছাড়া আর কিছু নয়(২)। এর উপমা হলো বৃষ্টি, যার

জনতা আরয করলঃ আমরা কিছু বললে সে আমাদের ইযযতের উপরও হামলা চালাবে এই ভয়ে আমরা কিছু বলি না। ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেনঃ যারা এমন শিথিল, তারা সেই শহীদদের অন্তর্ভুক্ত হবে না, যারা কেয়ামতের দিন পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের উম্মতদের মোকাবেলায় সাক্ষ্য দিবে। কোন কোন মুফাসসির বলেন, আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আমলে যারা ঈমানদার হয়েছে এবং তার পবিত্র সঙ্গলাভে ধন্য হয়েছে, তাদেরকেই বোঝানো হয়েছে।

(১) অর্থাৎ তাদের মধ্য থেকে যে যে মর্যাদার পুরষ্কার ও যে মর্যাদার 'নূরের' উপযুক্ত হবে সে তা পাবে। তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ পুরস্কার ও 'নূর' লাভ করবে। তাদের প্রাপ্য অংশ এখন থেকেই তাদের জন্য সংরক্ষিত আছে। [ইবন কাসীর]

(২) আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া মোটেই ভরসা করার যোগ্য নয়। পার্থিব জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যা কিছু হয় এবং যাতে দুনিয়াদার ব্যক্তি মগ্ন ও আনন্দিত থাকে, প্রথমে সেগুলো ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে পার্থিব জীবনের মোটামুটি বিষয়গুলো যথাক্রমে এইঃ প্রথমে ক্রীড়া, এরপর কৌতুক, এরপর সাজ-সজ্জা, এরপর পারস্পরিক অহমিকা, এরপর ধন ও জনের প্রাচুর্য নিয়ে পারস্পরিক গর্ববোধ। لعب শব্দের অর্থ এমন খেলা, لهو এমন খেলাধুলা, যার আসল লক্ষ্য চিত্তবিনোদন زينة বা অঙ্গ-সজ্জা, পোশাক ইত্যাদির মোহ সর্বজনবিদিত। প্রত্যেক মানুষের জীবনের প্রথম অংশ ক্রীড়া অর্থাৎ لعب এর মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। এরপর لهو শুরু হয়। এরপর সে অঙ্গসজ্জায় ব্যাপৃত

الْغُرُوْرِ ﴿٢٠﴾

উৎপন্ন শস্য-সম্ভার কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, তারপর সেগুলো শুকিয়ে যায়, ফলে আপনি ওগুলো পীতবর্ণ দেখতে পান, অবশেষে সেগুলো খড়-কুটোয় পরিণত হয়। আর আখেরাতে রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। আর দুনিয়ার জীবন প্রতারণার সামগ্রী ছাড়া কিছু নয়[১]।

হয় এবং শেষ বয়সে সমসাময়িক ও সমবয়সীদের সাথে تَفَاخُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ বা প্রতিযোগিতার প্রেরণা সৃষ্টি হয়। উল্লেখিত ধারাবাহিকতায় প্রতিটি অর্থেই মানুষ নিজ অবস্থা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে। কিন্তু কুরআন পাক বলে যে, এই সবই হচ্ছে সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী। [দেখুন, সা'দী, তাবারী]

(১) দুনিয়ায় মানুষের কর্মকাণ্ড বর্ণনার পর পবিত্র কুরআন বর্ণিত বিষয়বস্তুর একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছে, ﴿كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا﴾ এখানে غيث শব্দের অর্থ বৃষ্টি। الكفار শব্দটি মুমিনের বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হলেও এর অপর আভিধানিক অর্থ কৃষকও হয়। আলোচ্য আয়াতে কেউ কেউ এ অর্থই নিয়েছেন। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, বৃষ্টি দ্বারা ফসল ও নানা রকম উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়ে যখন সবুজ ও শ্যামল বর্ণ ধারণ করে, তখন কৃষকের আনন্দের সীমা থাকে না। কোনো কোনো তাফসীরবিদ الكفار শব্দটিকে প্রচলিত অর্থে ধরে বলেছেন যে, এতে কাফেররা আনন্দিত হয়। [কুরতুবী] এখানে প্রশ্ন হয় যে, সবুজ, শ্যামল ফসল দেখে কাফেররাই কেবল আনন্দিত হয় না, মুসলিমরাও হয়। জওয়াব এই যে, মুমিনের আনন্দ ও কাফেরের আনন্দের মধ্যে বিরাট ব্যবধান রয়েছে। ফলে দুনিয়ার অগাধ ধন-রত্ন পেয়েও মুমিন কাফেরের ন্যায় আনন্দিত ও মত্ত হয় না। তাই আয়াতে কাফের আনন্দিত হয় বলা হয়েছে। এরপর এই দৃষ্টান্তের সারসংক্ষেপ এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে যে, ফসল ও অন্যান্য উদ্ভিদ যখন সবুজ শ্যামল হয়ে যায়, তখন দর্শক মাত্রই বিশেষ করে কাফেররা খুবই আনন্দিত ও মত্ত হয়ে উঠে। কিন্তু অবশেষে তা শুষ্ক হতে থাকে। প্রথমে পীতবর্ণ হয়, এরপরে সম্পূর্ণ খড়-কুটায় পরিণত হয়। মানুষও তেমনি প্রথমে তরতাজা ও সুন্দর হয়। শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত এরূপই কাটে। অবশেষে যখন বার্ধক্য আসে, তখন দেহের সজীবতা ও সৌন্দর্য সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যায় এবং সবশেষে মরে মাটি হয়ে যায়। দুনিয়ার ক্ষণভঙ্গুরতা বর্ণনা করার পর আবার আসল উদ্দেশ্য– আখেরাতের চিন্তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য আখেরাতের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে, ﴿وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ﴾ অর্থাৎ আখেরাতে মানুষ এ দু'টি অবস্থার মধ্যে যে কোনো একটির সম্মুখীন হবে। একটি কাফেরদের অবস্থা অর্থাৎ তাদের জন্যে কঠোর

سَابِقُوٓا۟ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿٢١﴾

২১. তোমরা অগ্রণী হও তোমাদের রবের ক্ষমা ও সে জান্নাত লাভের প্রয়াসে, যা প্রশস্ততায় আসমান ও যমীনের প্রশস্ততার মত(১), যা প্রস্তুত করা হয়েছে তাদের জন্য যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনে। এটা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছে তিনি এটা দান করেন(২); আর আল্লাহ্ মহাঅনুগ্রহশীল।

আযাব রয়েছে। অপরটি মুমিনদের অবস্থা; অর্থাৎ তাদের জন্যে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি রয়েছে। এরপর সংক্ষেপে দুনিয়ার স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে, ﴿وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَٰعُ ٱلْغُرُورِ﴾ অর্থাৎ এসব বিষয় দেখা ও অনুধাবন করার পর একজন বুদ্ধিমান ও চক্ষুষ্মান ব্যক্তি এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে পারে যে, দুনিয়া একটি প্রতারণার স্থল। এখানকার সম্পদ, প্রকৃত সম্পদ নয়, যা বিপদমুহূর্তে কাজে আসতে পারে। অতঃপর আখেরাতের আযাব ও সওয়াব এবং দুনিয়ার ক্ষণভঙ্গুরতার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এরূপ হওয়া উচিত যে, মানুষ দুনিয়ার সুখ ও আনন্দে মগ্ন না হয়ে আখেরাতের চিন্তা বেশী করবে। পরবর্তী আয়াতে তাই ব্যক্ত করা হয়েছে। [ইবন কাসীর]

(১) সারমর্ম এই যে, অক্ষমতা ও মৃত্যু আসার আগেই তুমি সৎকাজের পুঁজি সংগ্রহ করে নাও, যাতে জান্নাতে পৌঁছতে পার। অগ্রে ধাবিত হওয়ার দ্বিতীয় অর্থ এই যে, সৎকাজে অপরের অগ্রণী হওয়ার চেষ্টা কর। আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তার উপদেশাবলীতে বলেনঃ তুমি মসজিদে সর্বপ্রথম গমণকারী এবং সর্বশেষ নির্গমণকারী হও। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, সালাতের জামাতে প্রথম তকবিরে উপস্থিত থাকার চেষ্টা কর। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর] জান্নাতের পরিধি প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ এর প্রস্থ আকাশ ও পৃথিবীর সমান। সূরা আলে-ইমরানে এই বিষয়বস্তুর আয়াতে سموات বহুবচন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, সপ্ত আকাশ ও পৃথিবীর বিস্তৃতি একত্রিত করলে জান্নাতের প্রস্থ হবে। বলাবাহুল্য, প্রত্যেক বস্তুর দৈর্ঘ্য প্রস্থ অপেক্ষা বেশী হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, জান্নাতের বিস্তৃতি সপ্ত আকাশ ও পৃথিবীর বিস্তৃতির চাইতে বেশী। তাছাড়া عرض শব্দটি কোনো সময় কেবল বিস্তৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়। তখন দৈর্ঘ্যের বিপরীত অর্থ বোঝানো উদ্দেশ্য থাকে না। উভয় অবস্থাতেই জান্নাতের বিশাল বিস্তৃতিই বোঝা যায়। [দেখুন, কুরতুবী]

(২) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ ও কৃপার বদৌলতেই মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ তোমাদের আমল তোমাদের কাউকে মুক্তি দিতে পারে না। সাহাবায়ে-কেরাম আরয করলেনঃ আপনিও কি তদ্রূপ? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, আমিও আমার আমল দ্বারা জান্নাত লাভ করতে পারি না—আল্লাহ তা'আলার দয়া ও অনুকম্পা হলেই লাভ করতে পারি। [বুখারী: ৫৬৭৩, মুসলিম:

مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ إِلَّا فِي كِتَٰبٖ مِّن قَبۡلِ أَن نَّبۡرَأَهَآۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٞ ﴿٢٢﴾

২২. যমীনে বা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপর্যয়ই আসে তা সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই আমরা তা কিতাবে লিপিবদ্ধ রেখেছি।(১) নিশ্চয় আল্লাহ্‌র পক্ষে এটা খুব সহজ।

২৮১৬] তাছাড়া জান্নাত যেমন একমাত্র আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে লাভ করা যায় তেমনিভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত করার সৌভাগ্য ও আল্লাহ্‌র আনুগত্যে প্রতিযোগিতা করার সামর্থ কেবল তাঁরই অনুগ্রহে লাভ করা যায়। তিনি যাকে এ ব্যাপারে সুযোগ দিবেন তিনিই কেবল তা লাভ করতে পারে। সুতরাং তাঁর কাছেই এ ব্যাপারে সার্বক্ষণিক তৌফিক চাইতে হবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মু'আয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে সালাতের পরে এ কথাটি স্মরণ করে বলার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "হে মু'আয! আমি তোমাকে ভালবাসি, সুতরাং তুমি সালাতের পরে اللّٰهُمَّ أَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ হে আল্লাহ্! আমাকে আপনার যিক্‌র, শুকর এবং সুন্দর পদ্ধতিতে ইবাদত করার তৌফিক দিন।" [আবু দাউদ: ১৫২২] অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট অসচ্ছল সাহাবীগণ এসে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ধনীরা উঁচু মর্যাদা ও স্থায়ী নেয়ামতের অধিকারী হয়ে গেল। রাসূল বললেন, সেটা কি করে? তারা বললেন, আমরা যেমন সালাত আদায় করি তারাও তা করে, আমরা সাওম পালন করি, তারাও করে, অধিকন্তু তারা সাদাকাহ দেয় কিন্তু আমরা তা দিতে পারি না। তারা দাসমুক্ত করে আমরা তা পারি না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমাদেরকে কি আমি এমন বস্তু বলে দিব না যা করলে তোমরা অন্যদের প্রতিযোগিতায় অগ্রণী হয়ে যাবে? কেউ তোমাদের থেকে শ্রেষ্ঠ হতে পারবেনা তবে যদি কেউ তোমাদের মত কাজ করে সেটা ভিন্ন কথা। তোমরা প্রতি সালাতের পরে তেত্রিশ বার করে তাসবীহ, তাকবীর ও তাহমীদ করবে। (সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার ও আলহামদুলিল্লাহ পড়বে)। পরবর্তীতে অসচ্ছল সাহাবাগণ ফিরে এসে বললেন, আমাদের পয়সাওয়ালা ভাইরা আমরা যা করছি তা শুনে ফেলেছে এবং তারাও তা করতে আরম্ভ করেছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "এটা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন"। [বুখারী: ৮৪৩, মুসলিম: ৫৯৫]

(১) আলোচ্য আয়াতসমূহে এ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হচ্ছে, যমীনের বুকে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপদাপদ আসে, তা সবই আমি কিতাবে অর্থাৎ লওহে-মাহফুযে জগত সৃষ্টির পূর্বেই লিখে দিয়েছিলাম। যমীনের বুকে সংঘটিত বিপদাপদ বলে দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, ফসলহানি, বাণিজ্যে ঘাটতি, ধন-সম্পদ বিনষ্ট হওয়া, বন্ধু-বান্ধবের মৃত্যু ইত্যাদি এবং ব্যক্তিগত বিপদাপদ বলে সর্বপ্রকার রোগ-ব্যাধি, ক্ষত, আঘাত ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

لِّكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿٢٣﴾

২৩. এটা এ জন্যে যে, তোমরা যা হারিয়েছ তাতে যেন তোমরা বিমর্ষ না হও এবং যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন তার জন্য আনন্দিত না হও(১)। নিশ্চয় আল্লাহ্ পছন্দ করেন না কোন উদ্ধত-অহংকারীদেরকে---(২)

الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ۗ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٤﴾

২৪. যারা কার্পণ্য করে ও মানুষকে কার্পণ্যের নির্দেশ দেয় এবং যে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে জেনে রাখুক নিশ্চয় আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, চির প্রশংসিত।

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ

২৫. অবশ্যই আমরা আমাদের রাসূলগণকে পাঠিয়েছি স্পষ্ট প্রমাণসহ(৩) এবং

---

(১) আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়াতে মানুষ যা কিছু বিপদ অথবা সুখ, আনন্দ অথবা দুঃখের সম্মুখীন হয়, তা সবই আল্লাহ তা'আলা লাওহে-মাহফুযে মানুষের জন্মের পূর্বেই লিখে রেখেছেন। হাদীসে এসেছে, "আল্লাহ্ তা'আলা আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে যাবতীয় তাকদীর নির্ধারণ করে নিয়েছেন"। [মুসলিম:২৬৫৩] এ বিষয়ের সংবাদ তোমাদেরকে এ জন্য দেয়া হয়েছে, যাতে তোমরা দুনিয়ার ভাল-মন্দ অবস্থা নিয়ে বেশী চিন্তা-ভাবনা না কর। দুনিয়ার কষ্ট ও বিপদাপদ তেমন আক্ষেপ ও পরিতাপের বিষয় নয় এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং অর্থসম্পদ তেমন উল্লসিত ও মত্ত হওয়ার বিষয় নয় যে, এগুলোতে মশগুল হয়ে তোমরা আল্লাহর স্মরণ ও আখেরাত সম্পর্কে গাফেল হয়ে যাবে। প্রত্যেক মানুষ স্বভাবগতভাবে কোনো কোনো বিষয়ের কারণে আনন্দিত এবং কোনো কোনো বিষয়ের কারণে দুঃখিত হয়। কিন্তু যা উচিত তা এই যে, বিপদের সম্মুখীন হলে সবর করে আখেরাতের পুরস্কার ও সওয়াব অর্জন করতে হবে এবং সুখ ও আনন্দের সম্মুখীন হলে কৃতজ্ঞ হয়ে পুরস্কার ও সওয়াব হাসিল করতে হবে। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর; কুরতুবী]

(২) এ আয়াতে সুখ ও ধন-সম্পদের কারণে উদ্ধত্য ও অহংকারীদের নিন্দা করা হয়েছে, বলা হয়েছে, আল্লাহ উদ্ধত্য অহংকারীকে পছন্দ করেন না। উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়ার নেয়ামত পেয়ে যারা অহংকার করে, তারা আল্লাহর কাছে ঘৃণার্হ। [কুরতুবী]

(৩) بينات শব্দের আভিধানিক অর্থ সুস্পষ্ট বিষয়। উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট বিধানাবলীও হতে পারে; তাছাড়া এর উদ্দেশ্য মু'জিযা এবং রেসালতের সুস্পষ্ট প্রমাণাদিও হতে পারে; কারণ পরবর্তী বাক্যে কিতাব নাযিলের আলাদা উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং بينات বলে মু'জিযা ও প্রমাণাদি বোঝানো হয়েছে এবং বিধানাবলীর জন্যে কিতাব নাযিল করার কথা বলা হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর;কুরতুবী]

الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَرُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ ﴿٢٥﴾

তাদের সঙ্গে দিয়েছি কিতাব ও ন্যায়ের পাল্লা, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে(১)। আমরা আরও নাযিল করেছি লোহা যাতে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি এবং রয়েছে মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ(২)। এটা এ জন্যে যে, আল্লাহ্ প্রকাশ করে দেন কে গায়েব অবস্থায়ও তাঁকে ও তাঁর রাসূলগণকে সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহা শক্তিমান, পরাক্রমশালী।

চতুর্থ রুকূ'

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا وَّاِبْرٰهِيْمَ وَجَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ فَمِنْهُمْ مُّهْتَدٍ ۚ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ

২৬. আর অবশ্যই আমরা নূহ এবং ইব্‌রাহীমকে রাসূলরূপে পাঠিয়েছিলাম এবং আমরা তাদের বংশধরগণের

(১) আয়াতে কিতাবের ন্যায় মিযানের বেলায়ও নাযিল করার কথা বলা হয়েছে। কিতাব নাযিল হওয়া এবং ফেরেশতার মাধ্যমে নবী-রাসূলগণ পর্যন্ত পৌঁছা সুবিদিত। কিন্তু মিযান নাযিল করার অর্থ কি? এ সম্পর্কে বিভিন্ন তাফসীরে বিভিন্ন উক্তি এসেছে, কোন কোন মুফাসসির বলেন, মীযান নাযিল করার মানে দাঁড়িপাল্লার ব্যবহার ও ন্যায়বিচার সম্পর্কিত বিধানাবলী নাযিল করা। কারও কারও মতে, প্রকৃতপক্ষে কিতাবই নাযিল করা হয়েছে, কিন্তু এর সাথে দাঁড়িপাল্লা স্থাপন ও আবিষ্কারকে সংযুক্ত করে দেয়া হয়েছে। কাজেই আয়াতের অর্থ যেন এরূপ আমি কিতাব নাযিল করেছি ও দাঁড়িপাল্লা উদ্ভাবন করেছি। তাছাড়া আয়াতে কিতাব ও মিযানের পর লৌহ নাযিল করার কথা বলা হয়েছে। এখানেও নাযিল করার মানে সৃষ্টি করা হতে পারে। পবিত্র কুরআনের এক আয়াতে চতুষ্পদ জন্তুদের বেলায়ও নাযিল করা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। [সূরা আয-যুমার: ৬] অথচ চতুষ্পদ জন্তু আসমান থেকে নাযিল হয় না–পৃথিবীতে জন্মলাভ করে। সেখানেও সৃষ্টি করার অর্থ বোঝানো হয়েছে। তবে সৃষ্টি করাকে নাযিল করা শব্দে ব্যক্ত করার মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, সৃষ্টির বহুপূর্বেই লওহে-মাহফুযে লিখিত ছিল–এ দিক দিয়ে দুনিয়ার সবকিছুই আসমান থেকে অবতীর্ণ। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

(২) এতে আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্যে বহুবিধ কল্যাণ নিহিত রেখেছেন। দুনিয়াতে যত শিল্প-কারখানা ও কলকব্জা আবিস্কৃত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে হবে, সবগুলোর মধ্যে লৌহের ভূমিকা সর্বাধিক। লৌহ ব্যতীত কোনো শিল্প চলতে পারে না। [কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

فٰسِقُوْنَ﴿٢٦﴾

জন্য স্থির করেছিলাম নবুওয়াত ও কিতাব[১], কিন্তু তাদের অল্পই সৎপথ অবলম্বন করেছিল। আর তাদের অধিকাংশই ফাসিক।

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ ۙ وَجَعَلْنَا فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ رَاْفَةً وَّرَحْمَةً ۭ وَرَهْبَانِيَّةَ ِۨ ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ اِلَّا ابْتِغَاۗءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۚ فَاٰتَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْهُمْ

২৭. তারপর আমরা তাদের পিছনে অনুগামী করেছিলাম আমাদের রাসূলগণকে এবং অনুগামী করেছিলাম মার্‌ইয়াম-তনয় ‘ঈসাকে, আর তাকে আমরা দিয়েছিলাম ইঞ্জীল এবং তার অনুসারীদের অন্তরে দিয়েছিলাম করুণা ও দয়া[২]।

---

(১) আলোচ্য আয়াতসমূহে বিশেষ বিশেষ নবী-রাসূলের আলোচনা করা হচ্ছে। প্রথমে নূহ আলাইহিস্ সালাম-এর এবং পরে নবী-রাসূলগণের শ্রদ্ধাভাজন ও মানবমণ্ডলীর ইমাম ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর সাথে ঘোষণা করা হয়েছে যে, ভবিষ্যতে যত নবী-রাসূল ও ঐশী কিতাব দুনিয়াতে আগমন করবে, তারা সব এদের বংশধরের মধ্য থেকে হবে। অর্থাৎ, নুহ আলাইহিস্ সালাম-এর সেই শাখাকে ঐ গৌরব অর্জনের জন্যে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যাতে ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম জন্মগ্রহণ করেছেন। এ কারণেই পরবর্তীকালে যত নবী-রাসূল প্রেরিত হয়েছেন এবং যত কিতাব নাযিল করা হয়েছে, তারা সব ছিলেন ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম-এর বংশধর। এই বিশেষ আলোচনার পর পরবর্তী নবী-রাসূলগণের পরস্পরকে একটি সংক্ষিপ্ত বাক্যে ব্যক্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এরপর তাদের পশ্চাতে একের পর এক আমি আমার নবী-রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি। পরিশেষে বিশেষভাবে বনী-ইসরাঈলের সর্বশেষ রাসূল ঈসা আলাইহিস্ সালাম-এর উল্লেখ করেছেন যিনি শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার শরীয়ত সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বানী করে গেছেন। [ইবন কাসীর]

(২) এখানে ঈসা আলাইহিস্ সালাম-এর প্রতি ঈমান আনয়নকারী হাওয়ারীগণের বিশেষ গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, যারা ঈসা আলাইহিস্ সালাম অথবা ইঞ্জীলের অনুসরণ করেছে, আমি তাদের অন্তরে স্নেহ ও দয়া সৃষ্টি করে দিয়েছি। তারা একে অপরের প্রতি দয়া ও করুণাশীল কিংবা সমগ্র মানবমণ্ডলীর প্রতি তারা অনুগ্রহশীল। এখানে ঈসা আলাইহিস্ সালাম-এর সাহাবী তথা হাওয়ারিগণের দু’টি বিশেষ গুণ উল্লেখ করা হয়েছে; তা হচ্ছে, দয়া ও করুণা। এরপর তাদের আরেকটি অভ্যাস বর্ণিত হয়েছে যা তারা আবিস্কার করে নিয়েছিল। আর যা আল্লাহ্ তাদের উপর আবশ্যিক করে দেন নি। আর সেটা হচ্ছে, সন্যাসবাদ। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُونَ ۝

আর সন্ন্যাসবাদ[১]---এটা তো তারা নিজেরাই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য প্রবর্তন করেছিল। আমরা তাদেরকে

(১) رهبانية শব্দটি رهبان এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত। এর অর্থ যে অতিশয় ভয় করে। বলা হয়ে থাকে যে, ঈসা আলাইহিস্ সালাম-এর পর বনী-ইসরাঈলের মধ্যে পাপাচার ব্যাপকাকারে ছড়িয়ে পড়ে বিশেষতঃ রাজন্যবর্গও শাসকশ্রেণী ইঞ্জীলের বিধানাবলীর প্রতি প্রকাশ্যে বিদ্রোহ শুরু করে দেয়। বনী-ইসরাঈলের মধ্যে কিছু সংখ্যক খাঁটি আলেম ও সৎ কর্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তারা এই প্রবণতাকে রুখে দাঁড়ালে তাদেরকে হত্যা করা হয়। যে কয়েকজন প্রাণে বেঁচে গেলেন তারা দেখলেন যে, মোকাবেলার শক্তি তাঁদের নেই। কিন্তু এদের সাথে মিলে-মিশে থাকলে তাঁদের দ্বীন-ঈমান বরবাদ হয়ে যাবে। তাই তাঁরা স্বতঃ প্রণোদিত হয়ে নিজেদের জন্যে জরুরি করে নিলেন যে, তারা এখন থেকে বৈধ আরাম-আয়েশও বিসর্জন দিবেন, বিবাহ করবেন না, খাওয়া-পরা এবং ভোগ্যবস্তু সংগ্রহ করার চিন্তা করবেন না, বসবাসের জন্য গৃহ নির্মাণে যত্নবান হবেন না, লোকালয় থেকে দূরে কোনো জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ে জীবন অতিবাহিত করবেন অথবা যাযাবরদের ন্যায় ভ্রমণ ও পর্যটনে জীবন কাটিয়ে দিবেন যাতে দ্বীনের বিধি-বিধান স্বাধীন ও মুক্ত পরিবেশে পালন করা যায়। তারা আল্লাহর ভয়ে এই কর্ম পন্থা অবলম্বন করেছিলেন, তাই তারা رهبان তথা সন্ন্যাসী নামে অভিহিত হলো এবং তাদের উদ্ভাবিত মতবাদ رهبانية তথা সন্ন্যাসবাদ নামে খ্যাতি লাভ করে। [কুরতুবী] আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তাদের এ কাজের সমালোচনা করেছে; কারণ তারা নিজেরাই নিজেদের উপর ভোগ বিলাস বিসর্জন দেয়া অপরিহার্য করে নিয়েছিল-আল্লাহর পক্ষ থেকে ফরয করা হয়নি। এভাবে তারা নিজেদেরকে শরীয়ত প্রবর্তকের ভুমিকায় অবতীর্ণ করেছিল। যা স্পষ্টত: পথভ্রষ্টতা। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

মোটকথা: সন্যাসবাদ কখনও আল্লাহ্‌র নৈকট্যের মাধ্যম ছিল না। এটা এ শরীয়তেও জায়েয নেই। হাদীসে এসেছে, একবার উসমান ইবনে মাযউন রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর স্ত্রী খাওলা বিনতে হাকীম আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার কাছে খুব খারাপ বেশে প্রবেশ করলে তিনি বললেন, তোমার এ অবস্থা কেন? তিনি বললেন, আমার স্বামী সারা রাত দাঁড়িয়ে ইবাদত করে আর সারাদিন সাওম পালন করে, ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে প্রবেশ করলে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা রাসূলের কাছে এ ঘটনা বিবৃত করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উসমানের সাথে সাক্ষাত করে তাকে বললেন, হে উসমান! আমাদের উপর সন্যাসবাদ লিখিত হয়নি। তুমি কি আমাকে আদর্শ মনে কর না? আল্লাহ্‌র শপথ আমি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহকে ভয় করি এবং তাঁর শরীয়তের সীমারেখার বেশী হেফাজতকারী। [মুসনাদে আহমাদ: ৬/২২৬]

এটার বিধান দেইনি; অথচ এটাও ওরা যথাযথভাবে পালন করেনি(১) । অতঃপর তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছিল, তাদেরকে আমরা দিয়েছিলাম তাদের পুরস্কার । আর তাদের অধিকাংশই ছিল ফাসিক ।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَءَامِنُوا۟ بِرَسُولِهِۦ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِۦ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِۦ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٨﴾

২৮. হে মুমিনগণ! আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আন । তিনি তাঁর অনুগ্রহে তোমাদেরকে দেবেন দ্বিগুণ পুরস্কার(২) এবং তিনি তোমাদেরকে দেবেন নূর, যার সাহায্যে তোমরা চলবে(৩) এবং

---

(১) অর্থাৎ তারা দ্বিবিধ ভ্রান্তিতে ডুবে আছে । একটি ভ্রান্তি হচ্ছে তারা নিজেদের ওপর এমন সব বাধ্যবাধকতা আরোপ করে নিয়েছিল যা করতে আল্লাহ কোন নির্দেশ দেননি । দ্বিতীয় ভ্রান্তি হচ্ছে নিজেদের ধারণা মতে যেসব বাধ্য বাধকতাকে তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির উপায় বলে মনে করে নিজেদের ওপর আরোপ করে নিয়েছিলো তাঁর হক আদায় করেনি এবং এমন সব আচরণ করেছে যার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টির পরিবর্তে তাঁর গযব খরিদ করে নিয়েছে । [দেখুন, ফাতহুল কাদীর;কুরতুবী]

(২) এই আয়াতে ঈসা আলাইহিস্ সালাম-এর প্রতি ঈমানদার কিতাবী মুমিনগণকে সম্বোধন করা হয়েছে । যদিও ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟﴾ বলে কেবল মুসলিমগণকে সম্বোধন করাই পবিত্র কুরআনের সাধারণ রীতি । কিন্তু আলোচ্য আয়াতে এই সাধারন রীতির বিপরীতে নাসারাদের জন্য ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟﴾শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে । সম্ভবতঃ এর রহস্য এই যে, পরবর্তী বাক্যে তাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি ঈমান আনার আদেশ দেয়া হয়েছে । কারণ, এটাই ঈসা আলাইহিস্ সালাম-এর প্রতি বিশুদ্ধ ঈমানের দাবী । তারা যদি তা করে, তবে তারা উপরোক্ত সম্বোধনের যোগ্য হয়ে যাবে । অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে তাদেরকে দ্বিগুণ পুরস্কার ও সওয়াব দানের ওয়াদা করা হয়েছে । [দেখুন, ফাতহুল কাদীর;কুরতুবী]

(৩) অর্থাৎ পৃথিবীতে জ্ঞান ও দূরদৃষ্টির এমন ‘নূর’ দান করবেন যার আলোতে তোমরা প্রতি পদক্ষেপে স্পষ্ট দেখতে পাবে জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে জাহেলিয়াতের বাঁকা পথ -সমূহের মধ্যে ইসলামের সরল সোজা পথ কোন্‌টি । আর আখেরাতে এমন ‘নূর’ দান করবেন যার মাধ্যমে পুল সিরাতের অন্ধকার রাস্তা পার হয়ে জান্নাতে যেতে পারবে । [দেখুন, কুরতুবী]

তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

২৯. এটা এজন্যে যে, কিতাবীগণ যেন জানতে পারে, আল্লাহ্‌র সামান্যতম অনুগ্রহের উপরও ওদের কোন অধিকার নেই[১]। আর নিশ্চয় অনুগ্রহ আল্লাহ্‌রই ইখ্‌তিয়ারে, যাকে ইচ্ছে তাকে তিনি তা দান করেন। আর আল্লাহ্ মহাঅনুগ্রহশীল।

لِّئَلَّا يَعۡلَمَ أَهۡلُ ٱلۡكِتَٰبِ أَلَّا يَقۡدِرُونَ عَلَىٰ شَيۡءٖ مِّن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلۡفَضۡلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤۡتِيهِ مَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ ذُو ٱلۡفَضۡلِ ٱلۡعَظِيمِ ٢٩

(১) আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, উল্লেখিত বিধানাবলী এজন্যে বর্ণনা করা হলো, যাতে কিতাবধারীরা জেনে নেয় যে, তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি ঈমান না এনে কেবল ঈসা আলাইহিস্ সালাম-এর প্রতি ঈমান স্থাপন করেই আল্লাহ তা'আলার কৃপা লাভের যোগ্য নয়। [দেখুন, মুয়াসসার]

৫৮- সূরা আল-মুজাদালাহ্[১]
২২ আয়াত, মাদানী

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِيْ تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ۖ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ۝

১. আল্লাহ্ অবশ্যই শুনেছেন সে নারীর কথা; যে তার স্বামীর বিষয়ে আপনার সাথে বাদানুবাদ করছে এবং আল্লাহ্‌র কাছেও ফরিয়াদ করছে। আল্লাহ্ তোমাদের কথোপকথন শুনেন; নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা[২]।

---

(১) একটি বিশেষ ঘটনা এই সূরার প্রাথমিক কয়েকটি আয়াত অবতরণের হেতু। আউস ইবন সামেত রাদিয়াল্লাহু 'আনহু একবার তার স্ত্রী খাওলা বিনতে সা'লাবাকে বলে দিলেনঃ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّيْ অর্থাৎ তুমি আমার পক্ষে আমার মাতার পৃষ্ঠদেশের ন্যায়; মানে হারাম। ইসলাম-পূর্বকালে এই বাক্যটি স্ত্রীকে চিরতরে হারাম করার জন্যে বলা হতো, যা ছিল চূড়ান্ত তালাক অপেক্ষাও কঠোরতর। এই ঘটনার পর খাওলা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা এর শরী'আতসম্মত বিধান জানার জন্যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে উপস্থিত হলেন। তখন পর্যন্ত এই বিষয় সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি কোনো ওহি নাযিল হয়নি। তাই তিনি পূর্ব থেকে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী খাওলাকে বলে দিলেন, আমার মতে তুমি তোমার স্বামীর জন্যে হারাম হয়ে গেছ। খাওলা একথা শুনে বিলাপ শুরু করে দিলেন এবং বললেন, আমি আমার যৌবন তার কাছে নিঃশেষ করেছি। এখন বার্ধক্যে সে আমার সাথে এই ব্যবহার করল। আমি কোথায় যাব। আমার ও আমার বাচ্চাদের ভরণ-পোষণ কিরূপে হবে। এক বর্ণনায় খাওলার এ উক্তিও বর্ণিত আছেঃ আমার স্বামী তো তালাক উচ্চারণ করেনি। এমতাবস্থায় তালাক কিরূপে হয়ে গেল? অন্য এক বর্ণনায় আছে, খাওলা আল্লাহ তা'আলার কাছে ফরিয়াদ করলেনঃ আল্লাহ আমি তোমার কাছে অভিযোগ করছি। এক বর্ণনায় আছে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাওলাকে একথা বললেনঃ তোমার মাসআলা সম্পর্কে আমার প্রতি এখন পর্যন্ত কোনো বিধান অবতীর্ণ হয়নি (এসব বর্ণনায় কোনো বৈপরীত্য নেই। সবগুলোই সঠিক হতে পারে)। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে। [ইবনে মাজাহ:২০৬৩, মুস্তাদরাকে হাকিম:২/৪৮১]।

(২) শরী'আতের পরিভাষায় এই বিশেষ মাসআলাটিকে 'যিহার' বলা হয়। এই সূরার প্রাথমিক আয়াতসমূহে যিহারের শরী'আতসম্মত বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। এতে আল্লাহ তা'আলা খাওলা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার ফরিয়াদ শুনে তার জন্য তার সমস্যা সমাধান করে দিয়েছেন। তার খাতিরে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে এসব আয়াত

الَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَآئِهِمْ مَّا هُنَّ اُمَّهٰتِهِمْ ؕ اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ اِلَّا الّٰٓـِٔىْ وَلَدْنَهُمْ ؕ وَاِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ۝

২. তোমাদের মধ্যে যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করে, তারা জেনে রাখুক---তাদের স্ত্রীরা তাদের মা নয়, যারা তাদেরকে জন্ম দান করে শুধু তারাই তাদের মা; তারা তো অসংগত ও অসত্য কথাই বলে[১] । আর নিশ্চয়ই

নাযিল করেছেন । আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলেনঃ সেই সত্তা পবিত্র, যার শোনা সবকিছুকে শামিল করে । যিনি সব আওয়ায ও প্রত্যেকের ফরিয়াদ শুনেন; খাওলা বিনতে সা'লাবাহ যখন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে তার স্বামীর ব্যাপারে অভিযোগ করছিল, তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম । কিন্তু এত নিকটে থাকা সত্ত্বেও আমি তার কোনো কোনো কথা শুনতে পারিনি । অথচ আল্লাহ তা'আলা সব শুনেছেন এবং বলেছেন, ﴿قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِيْ تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيْٓ اِلَى اللّٰهِ﴾ [বুখারী: ৭৩৮৫, নাসায়ী: ৩৪৬০] । তাই সাহাবায়ে কেরাম এই মহিলার প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করতেন । একদিন খলীফা ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু একদল লোকের সাথে গমনরত ছিলেন । পথিমধ্যে এই মহিলা সামনে এসে দণ্ডায়মান হলে তিনি দাঁড়িয়ে তার কথাবার্তা শুনলেন । কেউ কেউ বললঃ আপনি এই বৃদ্ধার খাতিরে এতবড় দলকে পথে আটকিয়ে রাখলেন । খলিফা বললেনঃ জান ইনি কে? এ সেই মহিলা, যার কথা আল্লাহ তা'আলা সপ্ত আকাশের উপরে শুনেছেন । অতএব, আমি কি তার কথা এড়িয়ে যেতে পারি? আল্লাহর কসম, তিনি যদি স্বেচ্ছায় প্রস্থান না করতেন, তবে আমি রাত্রি পর্যন্ত তার সাথে এখানেই দাঁড়িয়ে থাকতাম । [ইবনে কাসীর]

(১) يُظَاهِرُوْنَ শব্দটি ظهار থেকে উদ্ভুত । আরবে অনেক সময় এমন ঘটনা ঘটতো যে, স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া বিবাদ হলে স্বামী ক্রোধান্বিত হয়ে বলত أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّيْ এর আভিধানিক অর্থ হলো, “তুমি আমার জন্য ঠিক আমার মায়ের পিঠের মত” জাহেলী যুগে আরবদের কাছে ‘‘যিহার’’ তালাক বা তার চেয়ে অত্যন্ত কঠোর প্রকৃতির সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা বলে মনে করা হত । কারণ, তাদের দৃষ্টিতে এর অর্থ ছিল এই যে, স্বামী তার স্ত্রীর সাথে দাম্পত্য সম্পর্কই ছিন্ন করছে না বরং তাকে নিজের মায়ের মত হারাম করে নিচ্ছে । এ কারণে আরবদের মতে তালাক দেয়ার পর তা প্রত্যাহার করা যেত । কিন্তু “যিহার” প্রত্যাহার করার কোন সম্ভাবনাই অবশিষ্ট থাকত না । আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে ইসলামী শরী'আত এই প্রথার দ্বিবিধ সংস্কার সাধন করেছে । প্রথমতঃ স্বয়ং প্রথাকেই অবৈধ ও গোনাহ সাব্যস্ত করেছে । কেননা স্ত্রীকে মাতা বলে দেয়া একটা অসার ও মিথ্যা বাক্য । তাদের এই অসার উক্তির কারণে স্ত্রী মা হয়ে যায় না । মা তো সে-ই যার পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছে, তাদের এই উক্তি মিথ্যা এবং পাপও । কারণ, বাস্তব ঘটনার বিপরীতে স্ত্রীকে মাতা বলছে । দ্বিতীয়

আল্লাহ্ অধিক পাপ মোচনকারী ও বড় ক্ষমাশীল।

৩. আর যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করে এবং পরে তাদের উক্তি প্রত্যাহার করে[১], তবে একে অন্যকে স্পর্শ করার আগে একটি দাস মুক্ত করতে হবে, এ দিয়ে তোমাদেরকে উপদেশ দেয়া যাচ্ছে। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত।

وَالَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ۚ ذٰلِكُمْ تُوْعَظُوْنَ بِهٖ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿٣﴾

৪. কিন্তু যার এ সামর্থ্য থাকবে না, একে অন্যকে স্পর্শ করার আগে তাকে একাদিক্রমে দু'মাস সিয়াম পালন করতে হবে; যে তাতেও অসমর্থ, সে ষাটজন মিসকীনকে খাওয়াবে[২]; এটা

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ۚ فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ۚ ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۚ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٤﴾

সংস্কার এই করেছেন যে, যদি কোনো মূর্খ অর্বাচীন ব্যক্তি এরূপ করেই বসে, তবে এই বাক্যের কারণে ইসলামী শরী'আতে স্ত্রী চিরতরে হারাম হবে না। কিন্তু এই বাক্য বলার পর স্ত্রীকে পূর্ববৎ ভোগ করার অধিকারও তাকে দেয়া হবে না। বরং তাকে জরিমানাস্বরূপ কাফফারা আদায় করতে হবে। [দেখুন- ইবন কাসীর]

(১) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা يعودون শব্দের অর্থ করেছেন يندمون অর্থাৎ একথা বলার পর তারা অনুতপ্ত হয় এবং স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করতে চায়। [দেখুন-বাগভী] এই আয়াত থেকে আরও জানা গেল যে, স্ত্রীর সাথে মেলামেশা হালাল হওয়ার উদ্দেশ্যেই কাফফারা ওয়াজিব হয়েছে। খোদ যিহার কাফফারার কারণ নয়। বরং যিহার করা এমন গোনাহ, যার কাফফারা হচ্ছে তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করা। আয়াত শেষে ﴿وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ﴾ বলে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাই কোনো ব্যক্তি যদি যিহার করার পর স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করতে না চায়, তবে কোনো কাফ্ফারা দিতে হবে না। তবে স্ত্রীর অধিকার ক্ষুণ্ন করা না জায়েয। স্ত্রী দাবী করলে কাফ্ফারা আদায় করে মেলামেশা করা অথবা তালাক দিয়ে মুক্ত করা ওয়াজিব। স্বামী স্বেচ্ছায় এরূপ না করলে স্ত্রী আদালতে রুজু হয়ে স্বামীকে এরূপ করতে বাধ্য করতে পারে। [দেখুন- কুরতুবী]

(২) অর্থাৎ যিহাবের কাফ্ফারা এই যে, একজন দাস অথবা দাসীকে মুক্ত করবে। এরূপ করতে সক্ষম না হলে একাদিক্রমে দুই মাস রোযা রাখবে। রোগ-ব্যাধি কিংবা

এ জন্যে যে, তোমরা যেন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আন। আর এগুলো আল্লাহ্‌র নির্ধারিত বিধান; আর কাফিরদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

৫. নিশ্চয় যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারণ করে, তাদেরকে অপদস্থ করা হবে যেমন অপদস্থ করা হয়েছে তাদের পূর্ববর্তীদেরকে[১]; আর আমরা সুস্পষ্ট আয়াত নাযিল করেছি; আর কাফিরদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি--

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۚ
وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ⑤

৬. সে দিন, যেদিন আল্লাহ্ তাদের সবাইকে পুনরুজ্জীবিত করে উঠাবেন অতঃপর তারা যা আমল করেছিল তা তিনি তাদেরকে জানিয়ে দেবেন; আল্লাহ্ তা হিসেব করে রেখেছেন যদিও তারা তা ভুলে গেছে। আর আল্লাহ্ সব কিছুর প্রত্যক্ষদর্শী।

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا ۚ
أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ⑥

দ্বিতীয় রুকূ’

৭. আপনি কি লক্ষ্য করেন না যে, আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে আল্লাহ্ তা জানেন? তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থ জন হিসেবে তিনি থাকেন

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ
مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ
إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ
مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ۖ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ

দুর্বলতাবশতঃ এতগুলো রোযা রাখতেও সক্ষম না হলে ষাট জন মিসকীনকে পেট ভরে আহার করাবে। [ফাতহুল কাদীর]

(১) মূল আয়াতে ব্যবহৃত শব্দটি হচ্ছে كُبِتُوْا। এর অর্থ হচ্ছে লাঞ্ছিত করা, ধ্বংস করা, অভিসম্পাত দেয়া, দরবার থেকে বিতাড়িত করা, ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়া, অপমানিত করা। [ইবন কাসীর,বাগভী]

إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧﴾

না এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্যেও হয় না যাতে ষষ্ঠ জন হিসেবে তিনি থাকেন না। তারা এর চেয়ে কম হোক বা বেশী হোক তিনি তো তাদের সঙ্গেই আছেন তারা যেখানেই থাকুক না কেন[১]। তারপর তারা যা করে, তিনি তাদেরকে কিয়ামতের দিন তা জানিয়ে দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সব কিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ ۚ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا ۖ فَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٨﴾

৮. আপনি কি তাদেরকে লক্ষ্য করেন না, যাদেরকে গোপন পরামর্শ করতে নিষেধ করা হয়েছিল? তারপর তারা যা নিষিদ্ধ তারই পুনরাবৃত্তি করে এবং পাপাচরণ, সীমালঙ্ঘন ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণের জন্য গোপন পরামর্শ

---

(১) তবে মনে রাখতে হবে যে, সাথে থাকার অর্থ এ নয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কোন সৃষ্টির ভিতরে বা সৃষ্টির সাথে লেগে আছেন। বরং এখানে সাথে থাকার অর্থ, জ্ঞানের মাধ্যমে তাদের সাথে থাকা। কারণ, আয়াতের শেষে "নিশ্চয় আল্লাহ্ সব কিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত।" এ কথাটি বলে তা স্পষ্ট বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ্ তাঁর আরশের উপর, তাঁর সৃষ্টি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা অবস্থানে রয়েছেন। স্রষ্টাকে সৃষ্টির সাথে লেগে আছে বা প্রবিষ্ট হয়ে আছে মনে করা শির্ক ও কুফরী। এ তাফসীরের অন্যান্য স্থানেও এ বিষয়টি বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন সূরা ত্বা-হা: ৪৬; সূরা আশ-শু'আরা: ১৫; সূরা আল-হাদীদ:৪। এ সব আয়াতের সব স্থানেই এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞান তাঁর বান্দাকে পরিবেষ্টন করে আছে। তার জ্ঞান ও ক্ষমতার বাইরে কেউ নেই। এরই নাম হচ্ছে, সাধারণভাবে আল্লাহ তাঁর বান্দার সাথে থাকা। তবে এর পাশাপাশি আল্লাহ তা'আলা তার মুমিন বান্দাদের সাথে বিশেষভাবেও সাথে থাকেন। আর সে সাথে থাকা বলতে বুঝায় সাহায্য-সহযোগিতা ও প্রতিষ্ঠা করা। যেমন সূরা আল-বাকারাহ: ১৯৪; সূরা আল-আনফাল:১৯; সূরা আত-তাওবাহ: ৩৬; ১২৩; সূরা আন-নাহল: ১২৮; সূরা আল-আনকাবূত: ৬৯ ও সূরা মুহাম্মাদ: ৩৫ নং আয়াত। এ সব আয়াতে 'সাথে থাকা' সাহায্য-সহযোগিতার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ তিনি সৎ বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক জানেন ও তাদেরকে সাহায্য ও সহযোগিতা করেন।

করে[১]। আর তারা যখন আপনার কাছে আসে তখন তারা আপনাকে এমন কথা দ্বারা অভিবাদন করে যা দ্বারা আল্লাহ্ আপনাকে অভিবাদন করেননি। আর তারা মনে মনে বলে, 'আমরা যা বলি তার জন্য আল্লাহ্ আমাদেরকে শাস্তি দেন না কেন[২]?' জাহান্নামই তাদের জন্য যথেষ্ট, যেখানে তারা দগ্ধ হবে, আর কত নিকৃষ্ট সে গন্তব্যস্থল!

৯. হে মুমিনগণ! তোমরা যখন গোপন পরামর্শ করবে তখন সে গোপন পরামর্শ যেন পাপাচরণ, সীমালঙ্ঘন ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ সম্পর্কে না কর[৩]। আর তোমরা সৎকর্ম ও তাকওয়া অবলম্বনের পরামর্শ করো। আর আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَنَٰجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَٰجَوْاْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَٰجَوْاْ بِٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِىٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٩

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যেখানে তোমরা তিনজন একত্রিত সেখানে দুইজন তৃতীয় জনকে ছেড়ে পরস্পরে কানাকানি ও গোপন কথাবার্তা বলবে না, যে পর্যন্ত আরও লোক না এসে যায়। কারণ, এতে সে মনঃক্ষুণ্ন হবে, সে নিজেকে পর বলে ভাববে এবং তার বিরুদ্ধেই কথাবার্তা হচ্ছে বলে সে সন্দেহ করবে।" [মুসলিম: ২১৮৪]

(২) আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবন আস বলেন, ইয়াহূদীরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে উপস্থিত হলে السَّلَامُ عَلَيْكُمْ বলার পরিবর্তে السَّامُ عَلَيْكُمْ বলত। سَامٌ শব্দের অর্থ মৃত্যু। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়। ইয়াহূদীরা এভাবে সালাম করে চুপিসারে বলত, আমাদের এই গোনাহের কারণে আল্লাহ আমাদেরকে শাস্তি দেন না কেন? [মুসনাদে আহমাদ: ২/১৭০]

(৩) এ ব্যাপারে যে মজলিসী রীতিনীতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিক্ষা দিয়েছেন তা এই যে, "যখন তিন ব্যক্তি এক জায়গায় বসা থাকবে, তখন তাদের মধ্য থেকে দু'জনের তৃতীয় জনকে বাদ দিয়ে গোপন সলা পরামর্শ করা উচিত নয়। কেননা, এটা তৃতীয় ব্যক্তির মনোকষ্টের কারণ হবে।" [বুখারী: ৬২৮৮, মুসলিম: ২১৮৩, মুসনাদে আহমাদ: ১/৩৭৫]

যাঁর কাছে তোমাদেরকে সমবেত করা হবে ।

১০. গোপন পরামর্শ তো কেবল শয়তানের প্ররোচনায় হয় মুমিনদেরকে দুঃখ দেয়ার জন্য । তবে আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া শয়তান তাদের সামান্যতম ক্ষতি সাধনেও সক্ষম নয় । অতএব আল্লাহ্‌র উপরই মুমিনরা যেন নির্ভর করে ।

إِنَّمَا النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٠﴾

১১. হে ঈমানদারগণ! যখন তোমাদেরকে বলা হয়, মজলিসে স্থান প্রশস্ত করে দাও, তখন তোমরা স্থান প্রশস্ত করে দিও, আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্থান প্রশস্ত করে দেবেন[১] । আর যখন

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ

(১) বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মসজিদে মুনাফিকরা মজলিস পূর্ণ করে বসে থাকত । রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে আগন্তুকদের জন্য জায়গা করে দিতে বলতেন কিন্তু তারা নির্বিকার থাকত । তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করে তাদের সাবধান করে দেন । এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের কেউ যেন কাউকে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে না বসে, বরং জায়গা করে দাও, আল্লাহ্ও তোমাদের জন্য তা করে দেবেন ।" [বুখারী: ৬২৭০, মুসলিম: ২১৭৭] ইসলাম মজলিসের সাথে সম্পর্কিত আরও কিছু শিষ্টাচার নির্ধারণ করে দিয়েছেন, যেমন: কেউ কারো জন্য নিজের বসার জায়গা ছেড়ে দিতে হবে না বরং অন্যকে জায়গা করে দিবে । [মুসনাদে আহমাদ: ২/৩৩৮, ৪৮৩] অন্য হাদীসে এসেছে, ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, "কাউকে তার জায়গা থেকে উঠিয়ে সেখানে অপর কাউকে বসাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন । বরং তোমরা প্রশস্ত কর এবং বড় করে নাও" । [বুখারী: ২৬৭০] তাই কোন ব্যক্তি আগমন করলে তার জন্য কি দাঁড়াতে হবে? এ ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে দ্বিমত আছে । কারও কারও মতে, আগমনকারীর জন্য দাঁড়ানোর অনুমতি আছে । তারা তাদের মতের সপক্ষে রাসূলের হাদীস "তোমরা তোমাদের নেতার প্রতি দাঁড়িয়ে যাও" [বুখারী:৩০৪৩, মুসলিম: ১৭৬৮] কিন্তু অধিকাংশ আলেমগণ এটা করতে নিষেধ করেছেন, তাদের দলীল হলো, রাসূলের হাদীস, "কেউ যদি এটা পছন্দ করে যে, মানুষ তার জন্য দাঁড়িয়ে থাকবে, তবে সে যেন জাহান্নামে তার অবস্থান করে

وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ⑪

বলা হয়, 'উঠ', তখন তোমরা উঠে যাবে[১]। তোমাদের মধ্যে যারা

নিল" [তিরমিযী: ২৭৫৫] তারা পূর্ববর্তী হাদীসে উত্তরে বলেন, হাদীসের শব্দ হলো, قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ যার অর্থ, তোমরা দাঁড়িয়ে তোমাদের নেতার প্রতি ধাবিত হও। এর অন্য বর্ণনায় এসেছে, قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ فَأَنْزِلُوه অর্থাৎ "তোমরা তোমাদের নেতার প্রতি ধাবিত হয়ে তাকে নামিয়ে নাও" [মুসনাদে আহমাদ: ৬/১৪১-১৪২] এ বর্ণনা থেকে স্পষ্ট বুঝা গেল যে, এখানে তাকে ঘোড়া থেকে নামিয়ে নেয়ার জন্যই দাঁড়াতে বলা হয়েছে। কারণ; তিনি যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন সে জন্য হাঁটতে অক্ষম ছিলেন। ফলে তাকে বাহন থেকে নামিয়ে নেয়ার প্রয়োজন ছিল। সুতরাং কারো জন্য দাঁড়ানোর পক্ষে শক্তিশালী কোন প্রমাণ নেই। কোন কোন আলেম অবশ্য এ ব্যাপারে বিস্তারিত মতামত দিয়েছেন। তাদের মতে, সাধারণ অবস্থায় যেভাবে মানুষ মানুষকে দাঁড়াতে বাধ্য করে সেভাবে জায়েয নেই, তবে কেউ সফর থেকে আসলে বা কোনো ক্ষমতাশীলের ক্ষমতায় প্রবেশ করলে ক্ষমতাশীলের প্রতি সম্মান করতে ও তার নির্দেশ বাস্তবায়ন ও তার সম্মানের দিকে খেয়াল রেখে দাঁড়িয়ে যাওয়া জায়েয এবং এটা হিকমতেরও চাহিদা। যেমনিভাবে সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম সা'দ ইবনে মু'আয এর জন্য দাঁড়িয়ে তার সম্মান রক্ষা করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন, যাতে করে ইয়াহূদীদের মধ্যে তার নির্দেশ ও ফয়সালা বেশী গ্রহণযোগ্য ও কার্যকর হয়। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় কাউকে দেখলেই দাঁড়াতে হবে এটা শরী'আত সমর্থিত নয়। বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, "সাহাবায়ে কিরামের নিকট রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রিয় ব্যক্তি কেউ ছিলেন না। কিন্তু তিনি যখন মজলিসে আগমন করতেন তখন তারা দাঁড়াতো না, কারণ; তারা জানতো যে, তিনি তা অপছন্দ করেন।" [মুসনাদে আহমাদ: ৩/১৩২, তিরমিযী: ২৭৫৪] এমনকি সাহাবায়ে কিরাম যখনই রাসূলের মজলিসে আসতেন তখনই তারা যেখানে বসা শেষ হয়েছে সেখানে বসতেন। [আবু দাউদ: ৪৮২৫, তিরযিমযী: ২৭২৫] তবে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যারা রাসূলের নৈকট্যপ্রাপ্ত ছিলেন তারা আসলে স্বাভাবিকভাবেই সাহাবায়ে কিরাম তাদের জন্য জায়গা করে দিতেন। আর রাসূলই এ ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, "তোমাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান তারা যেন আমার কাছে থাকে"। [মুসলিম: ৪৩২, আবু দাউদ: ৬৭৪] সে হিসেবে আবু বকর সাধারনত তার ডান পাশে, উমর বাম পাশে, উসমান ও আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম সামনে বসতেন। কারণ: তারা ওহী লিখতেন। তবে কোন ক্রমেই কারও অনুমতি ব্যতীত দু'জনের মাঝখানে বসে দু'জনের মধ্যে পৃথকীকরণ করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "কোন লোকের পক্ষে এটা জায়েয নয় যে, সে দু'জনের মাঝে পৃথকীকরণ করে বসবে তাদের অনুমতি ব্যতীত"। [আবু দাউদ: ৪৮৪৫, তিরমিযী: ২৭৫২, মুসনাদে আহমাদ: ২/২১৩]

(১) মুজাহিদ বলেন, এখানে 'উঠ' বলে যাবতীয় কল্যাণকর কাজ করার জন্য নির্দেশ

ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ্ তাদেরকে মর্যাদায় উন্নত করবেন; আর তোমরা যা কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত(১)।

১২. হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন রাসূলের সাথে চুপি চুপি কথা বলতে চাও, তখন তোমাদের এরূপ কথার

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ

বুঝানো হয়েছে, অর্থাৎ যখনই তোমাদেরকে শত্রুর মোকাবিলায় দাঁড়াতে, অথবা সৎকাজ করতে বা কোন হক আদায় করতে বলা হয় তখনই তোমরা তা করতে সচেষ্ট হবে। কাতাদাহ বলেন, এর অর্থ যখনই তোমাদেরকে কোন কল্যাণকর কাজের আহ্বান জানানো হয় তখনই তোমরা তার প্রতি সাড়া দিও। [কুরতুবী]

(১) অর্থাৎ কাউকে তার বসা থেকে সরে অন্যকে বসার জায়গা করে দেয়া বা রাসূল ও দ্বীনী নেতারা যদি কাউকে বের হতে বলে যদি তোমরা কর তবে এটা মনে করো না যে, এর দ্বারা তোমাদের সম্মানের কোন কমতি করা হচ্ছে বা তোমাদেরকে অবমুল্যায়ণ করা হচ্ছে। বরং আল্লাহ্র নিকট এ নির্দেশ পালনের মধ্যেই সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে। আল্লাহ্ তার এ ত্যাগ কখনো খাটো করে দেখবেন না। তিনি তাকে দুনিয়া ও আখেরাতে পুরস্কৃত করবেন। কেননা; যে কেউ মহান আল্লাহ্র দিক বিবেচনা করে বিনম্র হয় মহান আল্লাহ্ তার মর্যাদা বুলন্দ করে দেন। আর তার স্মরণকে উঁচু করে দেন। আর এ জন্যই পরবর্তী আয়াতাংশে বলা হয়েছে, "তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ্ তাদেরকে মর্যাদায় উন্নত করবেন। আর আল্লাহ্ তোমরা যা কর সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।" তিনি ভাল করেই জানেন কারা উঁচু মর্যাদা পাওয়ার অধিকারী আর কারা নয়। [ইবন কাসীর] আবুত তোফায়েল আমের ইবনে ওয়াসিলা বলেন, উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু নাফে' ইবনে হারেসকে উসফান নামক স্থানে দেখা পেলেন। তিনি তাকে মক্কার গভর্ণর নিযুক্ত করেছিলেন। উমর তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি উপত্যকাবাসী (মক্কা) এর উপর কাকে দায়িত্ব দিয়ে এসেছ? আমের বললেন, আমি ইবনে আবযার উপর তাদের দায়িত্ব দিয়েছি। উমর বললেন, ইবনে আবযা কে? তিনি বললেন, আমাদের এক দাস। উমর বললেন, তাদের উপর তুমি দাসকে দায়িত্বশীল করেছ? তিনি বললেন, হে আমিরুল মুমিনীন! সে আল্লাহ্র কিতাবের একজন সুপাঠক, ফারায়েজ সম্পর্কে পণ্ডিত ও বিচারক। তখন উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, তাহলে শোন, আমি তোমাদের নবীকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ্ এ কুরআন দ্বারা কাউকে উচ্চ মর্যাদায় আসীন করবেন আর কাউকে অধঃপতন ঘটাবেন।" [মুসলিম: ৮১৭]

فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

পূর্বে কিছু সাদাকাহ্ পেশ কর, এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয় ও পরিশোধক[১]; কিন্তু যদি তোমরা অক্ষম হও, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

ءَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقٰتٍ ۚ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَأَطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهٗ ۚ وَاللّٰهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٣﴾

১৩. তোমরা কি চুপি চুপি কথা বলার আগে সাদাকাহ্ প্রদানে ভয় পেয়ে গেলে? যখন তোমরা তা করতে পারলে না, আর আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন, তখন তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। আর তোমরা যা আমল কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত।

তৃতীয় রুকূ'

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ۗ مَا هُمْ

১৪. আপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেননি যারা এমন এক সম্প্রদায়ের সাথে

---

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনশিক্ষা ও জন-সংস্কারের কাজে দিবারাত্র মশগুল থাকতেন। সাধারণ মজলিসসমূহে উপস্থিত লোকজন তাঁর অমিয় বাণী শুনে উপকৃত হতো। এই সুবাদে কিছু লোক তাঁর সাথে আলাদাভাবে গোপন কথাবার্তা বলতে চাইলে তিনি সময় দিতেন। বলাবাহুল্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে আলাদা সময় দেয়া যেমন সময়সাপেক্ষ, তেমনি কষ্টকর ব্যাপার। এতে মুনাফিকদের কিছু দুষ্টামিও শামিল হয়ে গিয়েছিল। তারা খাঁটি মুসলিমদের ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে একান্তে গমন ও গোপন কথা বলার সময় চাইত এবং দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত কথাবার্তা বলত। কিছু অজ্ঞ মুসলিমও স্বভাবগত কারণে কথা লম্বা করে মজলিসকে দীর্ঘায়িত করত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এই বোঝা হালকা করার জন্যে আল্লাহ তা'আলা প্রথমে এই আদেশ অবতীর্ণ করলেন যে, যারা রাসূলের সাথে একান্তে কানকথা বলতে চায়, তারা প্রথমে কিছু সদকা প্রদান করবে। এ নির্দেশের পর অনেকেই কানকথা বলা থেকে বিরত থেকেছিল। এর পরই আল্লাহ্ তা'আলা পরবর্তী আয়াত নাযিল করে মুমিনদেরকে তা থেকে অব্যাহতি দিলেন। ফলে কারা সত্যিকার মুমিন আর কারা কপট তা ধরা পড়ে গেল। [তাবারী]

مِّنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٤﴾

বন্ধুত্ব করে যাদের উপর আল্লাহ্‌ ক্রোধান্বিত হয়েছেন? তারা তোমাদের দলভুক্ত নয় আর তোমরাও তাদের দলভুক্ত নও। আর তারা জেনে শুনে মিথ্যার উপর শপথ করে।

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

১৫. আল্লাহ্‌ তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কঠিন শাস্তি। নিশ্চয় তারা যা করত তা কতই না মন্দ!

اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٦﴾

১৬. তারা তাদের শপথগুলোকে ঢালস্বরূপ গ্রহণ করেছে, অতঃপর তারা আল্লাহ্‌র পথে বাধা প্রদান করেছে; সুতরাং তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

لَّن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٧﴾

১৭. আল্লাহ্‌র শাস্তি মোকাবিলায় তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাদের কোন কাজে আসবে না; তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ ۖ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ ۚ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٨﴾

১৮. যে দিন আল্লাহ্‌ পুনরুত্থিত করবেন তাদের সবাইকে, তখন তারা আল্লাহ্‌র কাছে সেরূপ শপথ করবে যেরূপ শপথ তোমাদের কাছে করে এবং তারা মনে করে যে, এতে তারা ভাল কিছুর উপর রয়েছে। সাবধান! তারাই তো প্রকৃত মিথ্যাবাদী[১]।

(১) কোনো কোনো বর্ণনায় আছে, এই আয়াত এক মুনাফিক সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। একদিন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের সাথে বসা ছিলেন, এমন সময় তিনি বললেনঃ এখন তোমাদের কাছে এক ব্যক্তি আগমন করবে। তার অন্তর নিষ্ঠুর এবং সে শয়তানের চোখে দেখে। এর কিছুক্ষণ পরই এক মুনাফিক আগমন করল। তার চক্ষু ছিল নীলাভ; দেহাবয়ব বেঁটে গোধুম বর্ণ

اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطٰنُ فَاَنْسٰهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ ۗ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ الشَّيْطٰنِ ۗ اَلَآ اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطٰنِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿١٩﴾

১৯. শয়তান তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে; ফলে তাদেরকে ভুলিয়ে দিয়েছে আল্লাহ্‌র স্মরণ। তারাই শয়তানের দল। সাবধান! নিশ্চয় শয়তানের দল ক্ষতিগ্রস্ত(১)।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَآدُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗٓ اُولٰٓئِكَ فِى الْاَذَلِّيْنَ ﴿٢٠﴾

২০. নিশ্চয় যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা হবে চরম লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত।

كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِىْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ قَوِىٌّ عَزِيْزٌ ﴿٢١﴾

২১. আল্লাহ্ লিখে রেখেছেন, 'আমি অবশ্যই বিজয়ী হব এবং আমার রাসূলগণও'। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাশক্তিমান, মহাপরাক্রমশালী।

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْٓا اٰبَآءَهُمْ اَوْ اَبْنَآءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ ۗ اُولٰٓئِكَ كَتَبَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ ۗ وَيُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۗ رَضِىَ اللّٰهُ

২২. আপনি পাবেন না আল্লাহ্ ও আখিরাতের উপর ঈমানদার এমন কোন সম্প্রদায়, যারা ভালবাসে তাদেরকে যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারণ করে--- হোক না এ বিরুদ্ধাচারীরা তাদের পিতা, পুত্র, ভাই অথবা এদের

এবং সে ছিল হালকা শ্মশ্রুমণ্ডিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেনঃ তুমি এবং তোমার সঙ্গীরা আমাকে গালি দেয় কেন? সে শপথ করে বললঃ আমি এরূপ করিনি। এরপর সে তার সঙ্গীদেরকেই ডেকে আনল এবং তারাও মিছেমিছি শপথ করল। আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে তাদের মিথ্যাচার প্রকাশ করে দিয়েছেন। [মুসনাদে আহমাদ: ১/২৪০, ২৬৭, ৩৫০]

(১) মা'দান ইবনে আবি তালহা আল-ইয়া'মুরী বলেন, আমাকে আবুদ্দারদা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, তুমি কোথায় থাক? আমি বললাম, হিমসের নিকটে একটি জনপদে। তখন আবুদ্দারদা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, "কোন জনপদে কিংবা বেদুইনদের তাঁবুতে তিনজন লোক থাকার পরও যদি সেখানে সালাত কায়েম করা না হয় তবে শয়তান সেখানে প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং তুমি জামা'আতের (সালাতের জামা'আতের) সাথে জীবন অতিবাহিত কর। কেননা, নেকড়ে কেবল দলছুটকেই খায়।" [আবু দাউদ: ৫৪৭, মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৪৮২,৪৮৩]

عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٢٢﴾

জ্ঞাতি-গোত্র। এদের অন্তরে আল্লাহ্‌ লিখে দিয়েছেন ঈমান এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর পক্ষ থেকে রূহ দ্বারা[১]। আর তিনি তাদেরকে প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত; সেখানে তারা স্থায়ী হবে; আল্লাহ্‌ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহ্‌র দল। জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্‌র দলই সফলকাম।

(১) এখানে কেউ কেউ রূহ এর তাফসীর করেছেন নূর, যা মুমিন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রাপ্ত হয়। এই নূরই তার সৎকর্ম ও আন্তরিক প্রশান্তির উপায় হয়ে থাকে। বলাবাহুল্য এ প্রশান্তি একটি বিরাট শক্তি। আবার কেউ কেউ রূহ এর তাফসীর করেছেন, কুরআন ও কুরআনের প্রমাণাদি। [বাগভী]

৫৯- সূরা আল-হাশ্‌র[১]
২৪ আয়াত, মাদানী

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ①

১. আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে; আর তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় ।

هُوَ الَّذِىْٓ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ ؕ مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَّخْرُجُوْا وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مَّانِعَتُهُمْ حُصُوْنُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَاَتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ

২. কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফরী করেছিল তিনিই তাদেরকে প্রথম সমাবেশের জন্য তাদের আবাসভূমি থেকে বিতাড়িত করেছিলেন[২] ।

---

(১) এ সূরাকে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা সূরা বনী নাদ্বীর বলতেন । সমগ্র সূরা হাশর ইয়াহূদী বনু-নাদ্বীর গোত্র সম্পর্কে নাযিল হয়েছে বলেও তিনি মন্তব্য করেছেন [বুখারী: ৪৮৮২] ।

(২) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা পৌঁছে রাজনৈতিক দুরদর্শিতার কারণে সর্বপ্রথম মদিনায় ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী ইয়াহূদী গোত্রসমূহের সাথে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেছিলেন । চুক্তিতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, ইয়াহূদীরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবে না এবং কোনো আক্রমণকারীকে সাহায্য করবে না । তারা আক্রান্ত হলে মুসলিমরা তাদেরকে সাহায্য করবে । শান্তিচুক্তিতে আরও অনেক ধারা ছিল । এমনিভাবে বনু-নাদীরসহ ইয়াহূদীদের সকল গোত্র এই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল । মদীনা থেকে দুই মাইল দূরে বনু নাদীরের বসতি, দূর্ভেদ্য দূর্গ্য এবং বাগ-বাগিচা ছিল । ওহুদ যুদ্ধ পর্যন্ত বাহ্যতঃ তাদেরকে এই শান্তিচুক্তির অনুসারী দেখা যায় । কিন্তু ওহুদ যুদ্ধের পরে বিশ্বাসঘাতকতা ও গোপন দুরভিসন্ধি শুরু করে দেয় । এই বিশ্বাসঘাতকার সূচনা এভাবে হয় যে, বনু নাদ্বীরের জনৈক সর্দার কা'ব ইবনে আশরাফ ওহুদ যুদ্ধের পর আরও চল্লিশজন ইয়াহূদীকে সাথে নিয়ে মক্কা পৌঁছে এবং ওহুদ যুদ্ধ ফেরত কুরাইশী কাফেরদের সাথে সাক্ষাৎ করে । দীর্ঘ আলোচনার পর উভয় পক্ষের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার চুক্তি চুড়ান্ত হয় । চুক্তি সম্পাদনের পর কা'ব ইবনে আশরাফ মদীনায় ফিরে এলে জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আদ্যোপান্ত ঘটনা এবং চুক্তির বিবরণ বলে দেন । এরপর বনু নাদ্বীর আরও অনেক চক্রান্ত করতে থাকে । তন্মধ্যে একটি আলোচ্য আয়াতের সাথে সম্পর্কিত যার কারণে

তাদেরকে মদীনা থেকে চলে যেতে হয়। ঘটনাটি হলো, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় আগমন করার পর ইয়াহূদীদের সাথে সম্পাদিত শান্তিচুক্তির একটি শর্ত এই ছিল যে, কারো দ্বারা ভুলবশতঃ হত্যা হয়ে গেলে মুসলিম ও ইয়াহূদী সবাই এর রক্তের বিনিময় পরিশোধ করবে। একবার আমর ইবনে উমাইয়া দমরীর হাতে দু'টি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী এর রক্ত বিনিময় আদায় করা মুসলিম-ইয়াহূদী সকলেরই কর্তব্য ছিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্য মুসলিমদের কাছ থেকে চাঁদা তুললেন। অতঃপর চুক্তি অনুযায়ী ইয়াহূদীদের কাছ থেকেও রক্ত বিনিময়ের অর্থ গ্রহণ করার ইচ্ছা করলেন। সে মতে তিনি বনু-নাদ্বীর গোত্রের কাছে গমন করলেন। তারা দেখল যে, রাসূলকে হত্যা করার এটাই প্রকৃষ্ট সুযোগ। তাই তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে এক জায়গায় বসিয়ে দিয়ে বলল, আপনি এখানে অপেক্ষা করুন। আমরা রক্ত বিনিময়ের অর্থ সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করছি। এরপর এরা গোপনে পরামর্শ করে স্থির করল যে, তিনি যে প্রাচীরের নীচে উপবিষ্ট আছেন, এক ব্যক্তি সেই প্রাচীরের উপরে উঠে একটি বিরাট ও ভারী পাথর তার উপর ছেড়ে দিবে, যাতে তার মৃত্যু ঘটে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তৎক্ষণাৎ ওহির মাধ্যমে এই চক্রান্তের বিষয় অবগত হয়ে গেলেন। তিনি সে স্থান ত্যাগ করে চলে এলেন এবং ইয়াহূদীদেরকে বলে পাঠালেনঃ তোমরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে চুক্তি লঙ্ঘন করেছ। অতএব, তোমাদেরকে দশ দিনের সময় দেয়া হলো। এই সময়ের মধ্যে তোমরা যেখানে ইচ্ছা চলে যাও। এই সময়ের পর কেউ এ স্থানে দৃষ্টিগোচর হলে তার গর্দান উড়িয়ে দেয়া হবে। বনু-নাদ্বীর মদিনা ত্যাগ করে চলে যেতে সম্মত হলে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মুনাফিক তাদেরকে বাধা দিয়ে বললঃ তোমরা এখানেই থাক। অন্যত্র যাওয়ার প্রয়োজন নেই। আমার অধীনে দুই হাজার যোদ্ধার একটি বাহিনী আছে। তারা প্রাণ দিবে, কিন্তু তোমাদের গায়ে একটি আঁচড়ও লাগতে দিবে না। বনু-নাদ্বীর তাদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সদর্পে বলে পাঠালঃ আমরা কোথাও যাব না। আপনি যা করতে পারেন, করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে সাথে নিয়ে বনু-নাদ্বীর গোত্রকে আক্রমণ করলেন। বনু-নাদ্বীর দুর্গের ফটক বন্ধ করে বসে রইল এবং মুনাফিকরাও আত্মগোপন করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে চতুর্দিক থেকে অবরোধ করলেন এবং তাদের খর্জুর বৃক্ষে আগুন ধরিয়ে দিলেন এবং কিছু কর্তন করিয়ে দিলেন। অবশেষে নিরূপায় হয়ে তারা নির্বাসনদণ্ড মেনে নিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই অবস্থায়ও তাদের প্রতি সৌজন্য প্রদর্শন করে আদেশ দিলেন, আসবাবপত্র যে পরিমাণ সঙ্গে নিয়ে যেতে পার, নিয়ে যাও। তবে কোনো অস্ত্র-শস্ত্র সঙ্গে নিতে পারবে না। এগুলো বাজেয়াপ্ত করা হবে। সে মতে বনু-নাদ্বীরের কিছু লোক সিরিয়ায় এবং কিছু লোক খাইবরে চলে গেল। সংসারের প্রতি অসাধারণ মোহের কারণে তারা গৃহের কড়ি-কাঠ, তক্তা ও

حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا وَقَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ بِأَيْدِيْهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِيْنَ فَاعْتَبِرُوْا يٰٓأُولِي الْأَبْصَارِ ②

তোমরা কল্পনাও করনি যে, তারা বেরিয়ে যাবে। আর তারা মনে করেছিল যে, তাদের দুর্গগুলো তাদেরকে রক্ষা করবে আল্লাহ্‌র পাকড়াও থেকে; কিন্তু আল্লাহ্ তাদের কাছে এমনভাবে আসলেন যা তারা কল্পনাও করেনি। আর তিনি তাদের অন্তরে ত্রাসের সঞ্চার করলেন। ফলে তারা ধ্বংস করে ফেলল নিজেদের বাড়ি-ঘর নিজেদের হাতে এবং মুমিনদের হাতেও(১); অতএব হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ! তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

وَلَوْلَآ أَنْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَآءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ③

৩. আর আল্লাহ্ তাদের নির্বাসনদণ্ড লিপিবদ্ধ না করলেও তিনি তাদেরকে দুনিয়াতে (অন্য) শাস্তি দিতেন(২);

কপাট পর্যন্ত উপড়িয়ে নিয়ে গেল। ওহুদ যুদ্ধের পর চতুর্থ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। এরপর উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তার খেলাফতকালে তাদেরকে পুনরায় অন্যান্য ইয়াহূদীদের সাথে খাইবর থেকে সিরিয়ায় নির্বাসিত করেন। এই নির্বাসনদ্বয়ই 'প্রথম সমাবেশ' ও 'দ্বিতীয় সমাবেশ' নামে অভিহিত। প্রথম হাশর রাসূলের যুগে আর দ্বিতীয় হাশর হয়েছিলো উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর সময়ে। উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর সময়ে ইয়াহূদী ও নাসারাদেরকে আরব উপদ্বীপ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। তাদের শেষ হাশর হবে কিয়ামতের দিন। কোন কোন আলেমের মতে এখানে প্রথম হাশর অর্থ প্রথম সমাবেশ। অর্থাৎ বনী নাদ্বীর গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য মুসলিমদের সৈন্য সমাবেশের ঘটনা। তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য মুসলিমরা সবেমাত্র একত্রিত হয়েছিলো। লড়াই ও রক্তপাতের কোন অবকাশই সৃষ্টি হয়নি। ইতিমধ্যেই আল্লাহ তা'আলার কুদরাতে তারা দেশান্তরিত হতে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছে। [দেখুন- ইবন কাসীর,কুরতুবী,ফাতহুল কাদীর]

(১) গৃহের দরজা, কপাট ইত্যাদি নিয়ে যাওয়ার জন্যে তারা নিজেদের হাতে নিজেদের গৃহ ধ্বংস করছিল। পক্ষান্তরে তারা যখন দুর্গের অভ্যন্তরে ছিল, মুসলিমগণ তাদের গৃহ ও গাছপালা ধ্বংস করছিল। [দেখুন-ইবন কাসীর,ফাতহুল কাদীর]

(২) ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, ইয়াহূদীদের মধ্যে বনু নাদ্বীর ও বনু কুরাইযা

আর আখেরাতে তাদের জন্য রয়েছে আগুনের শাস্তি ।

৪. এটা এ জন্যে যে, নিশ্চয় তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল । আর কেউ আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধাচরণ করলে আল্লাহ্ তো শাস্তি দানে কঠোর ।

ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُّوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُۥ ۖ وَمَن يُشَآقِّ اللّٰهَ فَإِنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ④

৫. তোমরা যে খেজুর গাছগুলো কেটেছ এবং যেগুলোকে কাণ্ডের উপর স্থিত রেখে দিয়েছ, তা তো আল্লাহ্‌রই অনুমতিক্রমে[১]; এবং এ জন্যে যে, আল্লাহ্ ফাসিকদেরকে লাঞ্ছিত করবেন ।

مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَآئِمَةً عَلَىٰٓ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِيَ الْفٰسِقِينَ ⑤

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনু নদ্বীরকে দেশত্যাগের নির্দেশ দিলেন, তখন তিনি বনু কুরাইযাকে তাদের স্বস্থানে থাকতে দিয়ে তাদের উপর দয়া দেখালেন । কিন্তু তারাও পরবর্তীতে রাসূলের সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের পুরুষদেরকে হত্যা করলেন, মহিলা ও সন্তান-সন্ততিদেরকে মুসলিমদের মাঝে বন্টন করে দিলেন । তবে তাদের মাঝে কেউ কেউ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ অবলম্বন করলে রাসূল তাদেরকে অভয় দিলেন, পরে তারা ঈমান এনেছিল । তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়াহূদীদের বনু কাইনুকা, বনী হারেসা সহ যাবতীয় গোষ্ঠীকেই মদীনা থেকে তাড়িয়ে দিলেন । [মুসলিম: ১৭৬৬]

(১) বনু নাদ্বীর এর বসতি খেজুর বাগানের ঘেরা ছিল । তারা যখন দুর্গের ভিতরে অবস্থান গ্রহণ করল, তখন কিছু কিছু মুসলিম তাদেরকে উত্তেজিত ও ভীত করার জন্যে তাদের কিছু খেজুর গাছ কর্তন করে অথবা অগ্নিসংযোগ করে খতম করে দিল । অপর কিছু সংখ্যক সাহাবী মনে করলেন, ইনশাআল্লাহ বিজয় তাদের হবে এবং পরিণামে এসব বাগ-বাগিচা মুসলিমদের অধিকারভুক্ত হবে । এই মনে করে তারা বৃক্ষ কর্তনে বিরত রইলেন । এটা ছিল মতের গরমিল । পরে যখন তাদের মধ্যে কথাবার্তা হল, তখন বৃক্ষ কর্তনকারীরা এই মনে করে চিন্তিত হলেন যে, যে বৃক্ষ পরিণামে মুসলিমদের হবে, তা কর্তন করে তারা অন্যায় করেছেন । এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাযিল হল । এতে উভয় দলের কার্যক্রমকে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার অনুকূলে প্রকাশ করা হয়েছে । [তিরমিযী: ৩৩০৩]

৬. আর আল্লাহ্ ইয়াহূদীদের কাছ থেকে তাঁর রাসূলকে যে 'ফায়' দিয়েছেন, তার জন্য তোমরা ঘোড়ায় কিংবা উটে আরোহণ করে যুদ্ধ করনি[১]; বরং আল্লাহ্ যার উপর ইচ্ছে তাঁর রাসূলগণকে কর্তৃত্ব দান করেন; আর আল্লাহ্ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

وَمَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ فَمَآ اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهٗ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۞

৭. আল্লাহ্ জনপদবাসীদের কাছ থেকে তাঁর রাসূলকে 'ফায়' হিসেবে যা কিছু দিয়েছেন তা আল্লাহ্‌র, রাসূলের, রাসূলের স্বজনদের, ইয়াতীমদের, মিসকীন ও পথচারীদের[২], যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান শুধু

مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ ۗ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۚ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۞

(১) আয়াতে বর্ণিত أفاء শব্দটি فيء থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ, প্রত্যাবর্তন করানো। যুদ্ধ ও জিহাদ ব্যতীত কাফেরদের কাছ থেকে অর্জিত সকল প্রকার ধন-সম্পদকেই 'ফায়' বলা হত। [ইবন কাসীর] সে হিসেবে আলোচ্য আয়াতের সারমর্ম এই যে, যে ধন-সম্পদ যুদ্ধ ও জিহাদ ব্যতিরেকে অর্জিত হয়েছে, তা মুজাহিদ ও যোদ্ধাদের মধ্যে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের আইনানুযায়ী বন্টন করা হবে না বরং তা পুরোপুরিভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এখতিয়ারে থাকবে। তিনি যাকে যতটুকু ইচ্ছা করবেন দেবেন, অথবা নিজের জন্যে রাখবেন। উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, "বনু নাদ্বীর এর সম্পদ ছিল এমন সম্পদ যা আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের করায়ত্ব করে দিয়েছিলেন। যাতে মুসলিমদের কোন ঘোড়া বা উটের ব্যবহার লাগেনি। অর্থাৎ যুদ্ধ করতে হয়নি। সুতরাং তা ছিল বিশেষভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্পদ। তিনি এটা থেকে তার পরিবারের বাৎসরিক খোরাকির ব্যবস্থা করতেন। বাকী যা থাকত তা যোদ্ধাস্ত্র ও আল্লাহ্‌র রাস্তায় ওয়াকফ হিসেবে থাকত। [বুখারী: ৪৮৮৫, মুসলিম: ১৭৫৭] অন্য বর্ণনায় এসেছে, উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা 'ফায়' তাঁর রাসূলের হাতে দিয়ে দিয়েছেন। তারপর উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ﴿وَمَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ فَمَآ اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهٗ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ﴾ এ আয়াত পাঠ করে বললেন, এতে 'ফায়' বিশেষভাবে রাসূলকে দিয়ে দেয়া হয়েছে। এরপর উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, তবে তোমাদেরকে বাদ দিয়ে তিনি নিজে সেটা নিয়ে নেননি। তোমাদের উপর নিজেকে প্রাধান্য দেননি। [বুখারী: ৩০৯৩]

(২) أهل القرى বলে এ আয়াতে বনু নাদ্বীর ও বনু কুরাইযা ইত্যাদি গোত্রকে বোঝানো হয়েছে। [কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর]

তাদের মধ্যেই ঐশ্বর্য আবর্তন না করে। রাসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাক[১] এবং তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর; নিশ্চয় আল্লাহ্‌ শাস্তি দানে কঠোর।

৮. এ সম্পদ নিঃস্ব মুহাজিরদের জন্য যারা নিজেদের বাড়িঘর ও সম্পত্তি হতে উৎখাত হয়েছে। তারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির অন্বেষণ করে এবং আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের সাহায্য করে।

لِلْفُقَرَاۤءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا وَّيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ۚ

(১) এ আয়াত দ্বারা সাহাবায়ে কিরাম সবসময়ই রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত যে অবশ্য পালনীয় তা বর্ণনা করতেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর নিকট এক মহিলা এসে বলল, শুনেছি আপনি উল্কি আঁকা ও পরচুলা ব্যবহার করা থেকে নিষেধ করেন? এটা কি আপনি আল্লাহ্‌র কিতাবে পেয়েছেন? নাকি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসে পেয়েছেন? তিনি বললেন, অবশ্যই হ্যাঁ, আমি সেটা আল্লাহ্‌র কিতাব এবং রাসূলের সুন্নাত সব জায়গায়ই পেয়েছি। মহিলা বলল, আমি তো আল্লাহ্‌র কিতাব ঘেটে শেষ করেছি কিন্তু কোথাও পাইনি। তিনি বললেন, তবে কি তুমি তাতে ﴿وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۚ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا﴾ "রাসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাক" এটা পাওনি? সে বলল: হ্যাঁ, তারপর ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, পরচুলা ব্যবহারকারিনী, উল্কি অংকনকারীনী, ভ্রু প্লাককারীনীর প্রতি আল্লাহ্‌ লা'নত করেছেন। [দেখুন, বুখারী: ৪৮৮৬, ৪৮৮৭, মুসলিম: ২১২৫, আবুদাউদ: ৪১৬৯, তিরমিযী: ২৭৮২, নাসায়ী: ৫০৯৯, ইবনে মাজাহ: ১৯৮৯, মুসনাদে আহমাদ: ১/৪৩২] অনুরূপভাবে ইবনে উমর ও ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম বলেন যে, "তারা সাক্ষ্য দিচ্ছেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুব্বা, হানতাম, নাকীর ও মুযাফফাত, (এগুলো জাহেলী যুগের বিভিন্নপ্রকার মদ তৈরী করার পাত্র বিশেষ) এ কয়েক প্রকার পাত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই তিলাওয়াত করলেন, ﴿وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۚ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا﴾ "[মুসলিম: ১৯৯৭, আবু দাউদ: ৩৬৯০, নাসায়ী: ৫৬৪৩]

এরাই তো সত্যাশ্রয়ী[১]।

৯. আর তাদের জন্যও, মুহাজিরদের আগমনের আগে যারা এ নগরীকে নিবাস হিসেবে গ্রহণ করেছে ও ঈমান গ্রহণ করেছে, তারা তাদের কাছে যারা হিজরত করে এসেছে তাদের ভালবাসে এবং মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে তার জন্য তারা তাদের অন্তরে কোন (না পাওয়া জনিত) হিংসা অনুভব করে না, আর তারা তাদেরকে নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও[২]। বস্তুতঃ

وَالَّذِيْنَ تَبَوَّءُو الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّاۤ اُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۗ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۚ﴿۹﴾

(১) এ আয়াতে মুহাজিরদের বিশেষ বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে। তাদের প্রথম গুণ এই যে, তারা স্বদেশ ও সহায়সম্পত্তি থেকে বহিস্কৃত হয়েছেন। তারা মুসলিম এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমর্থক ও সাহায্যকারী- শুধু এই অপরাধে মক্কার কাফেররা তাদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালায়। শেষ পর্যন্ত তারা মাতৃভুমি ধন-সম্পদ ও বাস্তু-ভিটা ছেড়ে হিজরত করতে বাধ্য হন। তাদের কেউ কেউ ক্ষুধার তাড়নায় অতিষ্ঠ হয়ে পেটে পাথর বেধে নিতেন এবং কেউ কেউ শীতে বস্ত্রের অভাবে গর্ত খনন করে শীতের তীব্রতা থেকে আত্মরক্ষা করতেন।
তাদের দ্বিতীয় গুণ হল, তারা কোন জাগতিক স্বার্থের বশবর্তী হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেননি এবং দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে হিজরত করে মাতৃভুমি ও ধন-সম্পদ ত্যাগ করেননি; কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র রহমত ও সন্তুষ্টিই তাদের কাম্য ছিল।
মুহাজিরদের তৃতীয় বৈশিষ্ট বা গুণ এই যে, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে সন্তুষ্ট করার জন্যই কেবল উপরোক্ত সব কিছু করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলাকে সাহায্য করা অর্থ তাঁর দ্বীনের সাহায্য করা।
চতুর্থ গুণ হল, তারা কথা ও কাজে সত্যবাদী। [তবারী, ইবন কাসীর, কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর]

(২) এখানে আনসারগণের কিছু বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে। তারা মদীনায় অবস্থান গ্রহণ করেছেন এবং ঈমানে খাটি ও পাকাপোক্ত হয়েছেন। সুতরাং আনসারদের একটি গুণ এই যে, যে শহর আল্লাহ্ তা'আলার কাছে 'দারুল হিজরত' ও 'দারুল ঈমান' হওয়ার ছিল, তাতে তাদের অবস্থান ও বসতি মুহাজিরগণের পূর্বেই ছিল। মুহাজিরগণের এখানে স্থানান্তরিত হওয়ার পূর্বেই তারা ঈমান কবুল করে পাকাপোক্ত হয়ে গিয়েছিলেন।

আনসারদের দ্বিতীয় গুণ বর্ণনা প্রসংগে বলা হয়েছে যে, ‘তারা তাদেরকে ভালবাসে, যারা হিজরত করে তাদের শহরে আগমন করেছেন।’ এটা দুনিয়ার সাধারণ মানুষের রুচির পরিপন্থী। সাধারণত: লোকেরা এহেন ভিটে-মাটিহীন দুর্গত মানুষকে স্থান দেয়া পছন্দ করে না। সর্বত্রই দেশী ও ভিনদেশীর প্রশ্ন উঠে। কিন্তু আনসারগণ কেবল তাদেরকে স্থানই দেননি, বরং নিজ নিজ গৃহে আবাদ করেছেন, নিজেদের ধন-সম্পদে অংশীদার করেছেন এবং অভাবনীয় ইযযত ও সম্ভ্রমের সাথে তাদেরকে স্বাগত জানিয়েছেন। এক একজন মুহাজিরকে জায়গা দেয়ার জন্য কয়েকজন আনসারী আবেদন করেছেন। ফলে শেষ পর্যন্ত লটারীর মাধ্যমে এর নিষ্পত্তি করতে হয়েছে।[দেখুন-ইবন কাসীর,ফাতহুল কাদীর,বাগাভী] হাদীসে এসেছে, আনসারগণ এসে বললেন, আমাদের মধ্যে ও আমাদের মুহাজির ভাইদের মধ্যে খেজুরের বাগানও ভাগ করে দিন। রাসূল বললেন, না, তা করা যাবে না। তখন তারা মুহাজিরগণকে বললেন, তাহলে আপনারা আমাদের খেজুর বাগানের পরিচর্যায় শরীক হোন আমরা আপনাদেরকে ফলনে শরীক করবো, তারা বললেন, হ্যাঁ। আমরা তা শুনলাম ও মেনে নিলাম। [বুখারী: ২৩২৫] অন্য এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা হিজরত করার পর মুহাজিরগণ এসে তাকে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা যাদের কাছে এসেছি তাদের মত আমরা কাউকে দেখিনি। তারা বেশী থাকলে সবচেয়ে বেশী দানশীল আর কম থাকলে তাতে সহানুভূতির সাথে বন্টন করে দেয়। তারা আমাদেরকে খরচের ব্যাপারে যথেষ্ট করে দিয়েছে। তারা তাদের পেশাতেও আমাদেরকে শরীক করে নিয়েছে। আমরা ভয় পাচ্ছি যে, এরা আমাদের সব সওয়াব নিয়ে যাবে। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, “না, যতক্ষণ তোমরা তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দো‘আ করছ এবং তাদের প্রশংসা করছ।” [তিরমিযী: ২৪৮৭, মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৩৬]

আনসারদের তৃতীয় গুণ ﴿وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا﴾ অর্থাৎ ‘মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে তার জন্য তারা তাদের অন্তরে কোন (না পাওয়া জনিত) হিংসা অনুভব করে না’ এই বাক্যের সম্পর্ক একটি বিশেষ ঘটনার সাথে, যা বনু নদ্বীর গোত্রের নির্বাসন এবং তাদের বাগান ও গৃহের উপর মুসলিমদের দখল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় সংঘটিত হয়েছিল। অর্থ এই যে, এ বন্টনে যা কিছু মুহাজিরদেরকে দেয়া হল, মদীনার আনসারগণ সানন্দে তা গ্রহণ করে নিলেন; যেন তাদের এসব জিনিসের প্রয়োজন ছিল না। মুহাজিরগণকে দেয়াটা খারাপ মনে করা অথবা অভিযোগ করার তো সামান্যতম কোন সম্ভাবনাই ছিল না। এর মুকাবিলায় “যখন বাহরাইন বিজিত হল, তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রাপ্ত ধন-সম্পদ সম্পূর্ণই আনসারদের মধ্যে বিলি-বন্টন করে দিতে চাইলেন; কিন্তু তারা তাতে রাযী হলেন না, বরং বললেন, আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত কিছুই গ্রহণ করব না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মুহাজির ভাইগণকেও এই ধন-সম্পদ থেকে অংশ না

যাদেরকে অন্তরের কার্পণ্য থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে, তারাই সফলকাম[১]।

দেয়া হয়।” [বুখারী: ৩৭৯৪]

আনসারগণের চতুর্থ গুণ হচ্ছে, ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ অর্থাৎ আনসারগণ নিজেদের উপর মুহাজিরগণকে অগ্রাধিকার দিতেন। নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর আগে তাদের প্রয়োজন মেটাতেন; যদিও নিজেরা অভাবগ্রস্ত ও দারিদ্রপীড়িত ছিলেন। এটাই মূলত: উত্তম সাদাকাহ। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “সবচেয়ে উত্তম সাদাকাহ হচ্ছে, কষ্টে অর্জিত অল্প সম্পদ থেকে দান করা” [আবু দাউদ: ১৬৭৭, মুসনাদে আহমাদ: ২/৩৫৮, সহীহ ইবনে খুজাইমাহ: ২৪৪৪, ইবনে হিব্বান: ৩৩৪৬, মুস্তাদরাকে হাকিম: ১/৪১৪] যে সম্পদের প্রয়োজন তার নিজের খুব বেশী তা থেকে দান করতে সক্ষম হওয়া খুব উচু মনের অধিকারী ব্যক্তি ব্যতীত আর কারও পক্ষে সম্ভব হয় না। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, “তারা খাবারের মহব্বত থাকা সত্বেও তা অন্যদের খাওয়ায়” [সূরা আল-ইনসান:৮] অন্যত্র আল্লাহ্ আরো বলেছেন, “আর সম্পদের প্রতি মহব্বত থাকা সত্বেও তা দান করা” [সূরা আল-বাকারাহ: ১৭৭] সুতরাং দান বা সাদাকাহ করার সর্বোচ্চ পর্যায় হচ্ছে, নিজের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও নিজের প্রয়োজনের উপর অন্যের প্রয়োজনকে প্রাধান্য দিয়ে তা দান বা সাদাকাহ করা। আনসারগণ ঠিক এ কাজটিই করতেন। হাদীসে এসেছে, এক লোক রাসূলের দরবারে এসে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! ক্ষুধা আমাকে খুব কষ্ট দিচ্ছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের স্ত্রীদের কাছে খাবার চেয়ে পাঠালেন কিন্তু তাদের কাছে কিছুই পেলেন না। তখন তিনি বললেন, এমন কোন লোককি পাওয়া যাবে যে, আজ রাতে এ লোকটিকে মেহমানদারী করবে? আল্লাহ্ তাকে রহমত করবেন। আনসারী এক লোক দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি। লোকটি তার স্ত্রীর নিকট গিয়ে তাকে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মেহমান, সুতরাং কোন কিছু বাকী না রেখে সবকিছু দিয়ে হলেও মেহমানদারী করবে। মহিলা বললেন, আল্লাহ্র শপথ, আমার কাছে তো কেবল বাচ্চার খাবারই অবশিষ্ট আছে। আনসারী বললেন, ঠিক আছে, রাতের খাবারের সময় হলে বাচ্চাকে ঘুম পাড়িয়ে দিও, তারপর আমরা বাতি নিভিয়ে দিব, এ রাতটি আমরা কষ্ট করে না খেয়েই কাটিয়ে দিব, যাতে মেহমান খেতে পারে। কথামত তাই করা হলো, সকালে যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আনসার লোকটি আসলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, “মহান আল্লাহ্ গতরাত্রে তোমাদের কাণ্ড দেখে হেসেছেন। অথবা বলেছেন, আশ্চর্যন্বিত হয়েছেন।” আর তখনই এ আয়াত নাযিল হয়েছিল [বুখারী: ৩৭৯৮, ৪৮৮৯, মুসলিম: ২০৫৪]

(১) আনসারগণের আত্মত্যাগ ও আল্লাহ্ তা'আলার পথে সবকিছু বিসর্জন দেয়ার কথা

وَالَّذِيْنَ جَآءُوْ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝١٠

১০. আর যারা তাদের পরে এসেছে[১], তারা বলে, 'হে আমাদের রব! আমাদেরকে ও ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা করুন এবং যারা ঈমান এনেছিল তাদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের রব! নিশ্চয় আপনি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।'

দ্বিতীয় রুকূ'

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نَافَقُوْا يَقُوْلُوْنَ لِاِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَئِنْ اُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيْعُ فِيْكُمْ اَحَدًا اَبَدًا ۙ وَّاِنْ قُوْتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ ۭ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ۝١١

১১. আপনি কি মুনাফিকদেরকে দেখেননি? তারা কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে তাদের সেসব ভাইকে বলে, 'তোমরা যদি বহিস্কৃত হও, আমরা অবশ্যই তোমাদের সাথে দেশত্যাগী হব এবং আমরা তোমাদের ব্যাপারে কখনো কারো কথা মানবো না এবং যদি তোমরা আক্রান্ত হও আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করব।' আর আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী।

বর্ণনা করার পর সাধারণ বিধি হিসেবে বলা হয়েছে যে, যারা মনের কার্পণ্য থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে, তারাই আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সফলকাম। আয়াতে বর্ণিত شح শব্দের অর্থ কৃপণতা। [বাগভী] কুরআন ও হাদীসে এর নিন্দা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, তোমরা কৃপণতা থেকে বেঁচে থাক; কেননা কৃপণতা তোমাদের পূর্বের লোকদেরকে ধ্বংস করেছিল। তাদেরকে কৃপণতা অন্যায় রক্ত প্রবাহে উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং হারামকে হালাল করতে বাধ্য করেছিল। [মুসলিম: ২৫৭৮] অন্য হাদীসে এসেছে, "ঈমান ও কৃপণতা কোন বান্দার অন্তরে এক সাথে থাকতে পারে না" [মুসনাদে আহমাদ ২/৩৪২]

(১) এই আয়াতের بعد অর্থে সাহাবায়ে কিরাম মুহাজির ও আনসারগণের পরে কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মুসলিম শামিল আছে এবং এ আয়াত তাদের সবাইকে "ফায়" এর মালে হকদার সাব্যস্ত করেছে। [ইবন কাসীর,ফাতহুল কাদীর] তবে ইমাম মালেক বলেন, যারা সাহাবায়ে কিরামের জন্য কোন প্রকার বিদ্বেষ পোষণ করবে বা তাদেরকে গালি দেবে তারা 'ফায়' এর সম্পদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। [বাগভী]

لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ ۚ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ﴿١٢﴾

১২. বস্তুত তারা বহিস্কৃত হলে মুনাফিকরা তাদের সাথে দেশত্যাগ করবে না এবং তারা আক্রান্ত হলে এরা তাদেরকে সাহায্য করবে না এবং এরা সাহায্য করতে আসলেও অবশ্যই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে; তারপর তারা কোন সাহায্যই পাবে না।

لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿١٣﴾

১৩. প্রকৃতপক্ষে এদের অন্তরে আল্লাহ্‌র চেয়ে তোমাদের ভয়ই সবচেয়ে বেশী। এটা এজন্যে যে, এরা এক অবুঝ সম্প্রদায়।

لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ ۚ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ ۚ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٤﴾

১৪. এরা সবাই সংঘবদ্ধভাবেও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সমর্থ হবে না, কিন্তু শুধু সুরক্ষিত জনপদের ভিতরে অথবা দূর্গ-প্রাচীরের আড়ালে থেকে; পরস্পরের মধ্যে তাদের যুদ্ধ প্রচণ্ড। আপনি মনে করেন তারা ঐক্যবদ্ধ, কিন্তু তাদের মনের মিল নেই; এটা এজন্যে যে, এরা এক নির্বোধ সম্প্রদায়।

كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ۖ ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٥﴾

১৫. এরা সে লোকদের মত, যারা এদের অব্যবহিত পূর্বে নিজেদের কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করেছে(১), আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾

১৬. এরা শয়তানের মত, সে মানুষকে বলে, 'কুফরী কর'; তারপর যখন সে কুফরী করে তখন সে বলে, 'তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই,

(১) এখানে কাদের কথা বলা হচ্ছে তা নির্ধারণ করা নিয়ে দু'টি মত রয়েছে। মুজাহিদ বলেন, এরা হচ্ছে বদরের কাফের যোদ্ধা। পক্ষান্তরে ইবনে আব্বাস বলেন, এরা হচ্ছে বনু কাইনুকা' এর ইয়াহূদীরা। [ইবন কাসীর]

নিশ্চয় আমি সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ্‌কে ভয় করি।'

فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَآ أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا ۚ وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٧﴾

১৭. ফলে তাদের দু'জনের পরিণাম এই যে, তারা দু'জনই জাহান্নামী হবে। সেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং এটাই যালিমদের প্রতিদান।

তৃতীয় রুকূ'

يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨﴾

১৮. হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর; এবং প্রত্যেকের উচিত চিন্তা করে দেখা আগামী কালের জন্য সে কী অগ্রিম পাঠিয়েছে[১]। আর তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর; তোমরা যা কর নিশ্চয় আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللّٰهَ فَأَنْسٰىهُمْ أَنْفُسَهُمْ ۚ أُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿١٩﴾

১৯. আর তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা আল্লাহ্‌কে ভুলে গেছে; ফলে আল্লাহ্ তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করেছেন। তারাই তো ফাসিক।

لَا يَسْتَوِيْٓ أَصْحٰبُ النَّارِ وَأَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ أَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ﴿٢٠﴾

২০. জাহান্নামের অধিবাসী এবং জান্নাতের অধিবাসী সমান নয়। জান্নাতবাসীরাই তো সফলকাম।

لَوْ أَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خٰشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ۚ وَتِلْكَ الْأَمْثٰلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١﴾

২১. যদি আমরা এ কুরআন পর্বতের উপর নাযিল করতাম তবে আপনি তাকে আল্লাহ্‌র ভয়ে বিনীত বিদীর্ণ দেখতেন। আর আমরা এসব দৃষ্টান্ত বর্ণনা করি মানুষের জন্য, যাতে তারা

(১) এ আয়াতে কেয়ামত বোঝাতে গিয়ে لغدٍ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ আগামীকাল। [কুরতুবী]

চিন্তা করে।

২২. তিনিই আল্লাহ্, তিনি ছাড়া কোন সত্য ইলাহ্ নেই, তিনি গায়েব ও উপস্থিত বিষয়াদির জ্ঞানী[১]; তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু[২]।

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿٢٢﴾

২৩. তিনিই আল্লাহ্, তিনি ছাড়া কোন সত্য ইলাহ্ নেই। তিনিই অধিপতি, মহাপবিত্র[৩], শান্তি-ত্রুটিমুক্ত, নিরাপত্তা বিধায়ক, রক্ষক, পরাক্রমশালী, প্রবল, অতীব মহিমান্বিত। তারা যা শরীক স্থির করে আল্লাহ্ তা হতে পবিত্র, মহান।

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৪. তিনিই আল্লাহ্ সৃজনকর্তা, উদ্ভাবন কর্তা, রূপদাতা, তাঁরই সকল উত্তম নাম[৪]। আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে, সবকিছুই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ۚ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٤﴾

---

(১) অর্থাৎ সৃষ্টির কাছে যা গোপন ও অজানা তিনি তাও জানেন আর যা তাদের কাছে প্রকাশ্য ও জানা তাও তিনি জানেন। এই বিশ্ব-জাহানের কোন বস্তুই তার জ্ঞানের বাইরে নয়। [ইবন কাসীর,বাগভী]

(২) অর্থাৎ তিনি রহমান ও রহীম বা দাতা ও পরম দয়ালু। একমাত্র তিনিই এমন এক সত্তা যার রহমত অসীম ও অফুরন্ত। সমগ্র বিশ্ব চরাচরব্যাপী পরিব্যপ্ত এবং বিশ্ব-জাহানের প্রতিটি জিনিসই তাঁর বদান্যতা ও অনুগ্রহ লাভ করে থাকে। [ইবন কাসীর]

(৩) মূল ইবারতে القدوس শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যা আধিক্য বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। এর মূল ধাতু قدس। এর অর্থ সবরকম মন্দ বৈশিষ্ট মুক্ত ও পবিত্র হওয়া। [ইবন কাসীর,কুরতুবী]

(৪) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার উত্তম উত্তম নাম আছে। হাদীসে বলা হয়েছে, "আল্লাহ্‌র এমন নিরানব্বইটি নাম রয়েছে যে কেউ এগুলোর (সঠিকভাবে) সংরক্ষণ করবে (হক আদায় করবে) সে জান্নাতে যাবে"। [বুখারী: ২৭৩৬, মুসলিম: ২৬৭৭]

৬০- সূরা আল-মুম্‌তাহিনাহ্‌[১]
১৩ আয়াত, মাদানী

(১) এই সুরার শুরুভাগে কাফের ও মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখতে নিষেধ করা হয়েছে এবং একটি বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই অংশ অবতীর্ণ হয়েছে। ঘটনাটি বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, ঘটনার সার সংক্ষেপ হচ্ছে এই যে, মক্কাবিজয়ের পূর্বে মক্কা থেকে এক গায়িকা নারী মদীনায় আগমন করে। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করেনঃ তুমি কি হিজরত করে মদীনায় এসেছ? সে বললঃ না। আবার জিজ্ঞাসা করা হলঃ তবে কি তুমি মুসলিম হয়ে এসেছ? সে এরও নেতিবাচক উত্তর দিল। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ তা হলে কি উদ্দেশ্যে আগমন করেছ? সে বললঃ আপনারা মক্কার সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক ছিলেন। আপনাদের মধ্য থেকে আমি জীবিকা নির্বাহ করতাম। এখন মক্কার বড় বড় সরদাররা বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছে এবং আপনারা এখানে চলে এসেছেন। ফলে আমার জীবিকা নির্বাহ কঠিন হয়ে গেছে। আমি ঘোর বিপদে পড়ে ও অভাবগ্রস্ত হয়ে আপনাদের কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণের উদ্দেশ্যে এখানে আগমন করেছি। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ তুমি মক্কার পেশাদার গায়িকা। মক্কার সেই যুবকরা কোথায় গেল, যারা তোমার গানে মুগ্ধ হয়ে টাকা-পয়সার বৃষ্টি বর্ষণ করত? সে বললঃ বদর যুদ্ধের পর তাদের উৎসবপর্ব ও গান-বাজনার জৌলুস খতম হয়ে গেছে। এ পর্যন্ত তারা কেউ আমাকে আমন্ত্রণ জানায় নি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবদুল মুত্তালিব বংশের লোকগণকে তাকে সাহায্য করার জন্যে উৎসাহ দিলেন। তারা তাকে নগদ টাকা-পয়সা, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি দিয়ে বিদায় দিল। এটা তখনকার কথা, যখন মক্কার কাফেররা হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করেছিল এবং রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাফেরদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার ইচ্ছায় গোপনে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, এই গোপন তথ্য পূর্বাহ্নে মক্কাবাসীদের কাছে ফাঁস না হোক। এদিকে সর্বপ্রথম হিজরতকারীদের মধ্যে একজন সাহাবী ছিলেন হাতেব ইবনে আবী বালতা'আ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু। তিনি ছিলেন ইয়ামেনী বংশোদ্ভুত এবং মক্কায় এসে বসবাস করেছিলেন। মক্কায় তাঁর স্বগোত্র বলতে কেউ ছিল না। মক্কায় বসবাসকালেই মুসলিম হয়ে মদীনায় হিজরত করেছিলেন। তার স্ত্রী ও সন্তানগণ তখনও মক্কায় ছিল। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও অনেক সাহাবীর হিজরতের পর মক্কায় বসবাসকারী মুসলিমদের ওপর কাফেররা নির্যাতন চালাত এবং তাদেরকে উত্ত্যক্ত করত। যেসব মুহাজিরের আত্মীয়-স্বজন মক্কায় ছিল, তাদের সন্তান-সন্ততিরা কোনরূপে নিরাপদে ছিল। হাতেব চিন্তা করলেন যে, তার সন্তানসন্ততিকে শত্রুর নির্যাতন থেকে বাঁচিয়ে রাখার কেউ নেই। অতএব, মক্কাবাসীদের প্রতি কিছু অনুগ্রহ প্রদর্শন করলে তারা হয়তো তার সন্তানদের ওপর জুলুম করবে না। তাই গায়িকার

মক্কা গমনকে তিনি একটি সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করলেন। হাতেব স্বস্থানে নিশ্চিত বিশ্বাসী ছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আল্লাহ তা'আলা বিজয় দান করবেন। এই তথ্য ফাঁস করে দিলে তার কিংবা ইসলামের কোন ক্ষতি হবে না। তিনি ভাবলেন, আমি যদি পত্র লিখে মক্কার কাফেরদেরকে জানিয়ে দেই যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করার ইচ্ছা রাখেন, তবে আমার ছেলে-সন্তানদের হেফাযত হয়ে যাবে। সুতরাং তিনি মক্কাবাসীদের নামে একটি পত্র লিখে মহিলাটির হাতে সোপর্দ করলেন। এদিকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে ব্যাপারটি জানিয়ে দিলেন। তিনি আরও জানতে পারলেন যে, মহিলাটি এসময়ে রওযায়ে খাক নামক স্থান পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। বিভিন্ন বর্ণনায় আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে, আবু মুরসাদকে ও যুবায়র ইবনে আওয়ামকে আদেশ দিলেন, অশ্বে আরোহণ করে সেই মহিলার পশ্চাদ্ধাবন কর। তোমরা তাকে রওযায়ে খাকে পাবে। তার সাথে মক্কাবাসীদের নামে হাতেব ইবনে আবী বালতা'আর পত্র আছে। তাকে পাকড়াও করে পত্রটি ফিরিয়ে নিয়ে আস। আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ আমরা নির্দেশমত দ্রুতগতিতে তার পশ্চাদ্ধাবন করলাম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে স্থানের কথা বলেছিলেন, ঠিক সে স্থানেই আমরা তাকে উটে সওয়ার হয়ে যেতে দেখলাম এবং তাকে পাকড়াও করলাম। আমরা বললাম পত্রটি বের কর। সে বললঃ আমার কাছে কারও কোন পত্র নেই। আমরা তার উটকে বসিয়ে দিলাম। এরপর তালাশ করে কোন চিঠি পেলাম না। আমরা মনে মনে বললামঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সংবাদ ভ্রান্ত হতে পারে না। নিশ্চয়ই সে পত্রটি কোথাও গোপন করেছে। এবার আমরা তাকে বললামঃ হয় পত্র বের কর, না হয় আমরা তোমাকে বিবস্ত্র করে দিব। অগত্যা সে নিরুপায় হয়ে মাথার চুলের খোপ থেকে পত্র বের করে দিল। আমরা পত্র নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে চলে এলাম। ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ঘটনা শুনা মাত্রই ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে আরয করলেনঃ এই ব্যক্তি আল্লাহ, তার রসূল ও সকল মুসলিমের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সে আমাদের গোপন তথ্য কাফেরদের কাছে লিখে পাঠিয়েছে। অতএব, অনুমতি দিন আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিব। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাতেবকে ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করলেনঃ তোমাকে এই কাণ্ড করতে কিসে উদ্বুদ্ধ করল? হাতেব বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ আমার ঈমানে এখনও কোন তফাত হয়নি। ব্যাপার এই যে, আমি ভাবলাম, আমি যদি মক্কাবাসীদের প্রতি একটু অনুগ্রহ প্রদর্শন করি তবে তারা আমার ছেলে-সন্তানদের কোন ক্ষতি করবে না। আমি ব্যতীত অন্য কোন মুহাজির এরূপ নেই, যার স্বগোত্রের লোক মক্কায় বিদ্যমান নেই। তাদের স্বগোত্রীয়রা তাদের পরিবার-পরিজনের হেফাযত করে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

১. হে ঈমানদারগণ! তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তোমরা কি তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা প্রেরণ করছ, অথচ তারা, তোমাদের কাছে যে সত্য এসেছে, তা প্রত্যাখ্যান করেছে[১], রাসূলকে এবং তোমাদেরকে বহিস্কার করেছে এ কারণে যে, তোমরা তোমাদের রব আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেছ। যদি তোমরা আমার পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে এবং আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য বের হয়ে থাক, তবে কেন তোমরা তাদের সাথে গোপনে বন্ধুত্ব করছ? আর তোমরা যা গোপন কর

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ ۚ يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَاِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ ۗ اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِيْ سَبِيْلِيْ وَابْتِغَآءَ مَرْضَاتِيْ ۖ تُسِرُّوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ۖ وَاَنَا اَعْلَمُ بِمَآ اَخْفَيْتُمْ وَمَآ اَعْلَنْتُمْ ۗ وَمَنْ يَّفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ①

হাতেবের জবানবন্দি শুনে বললেনঃ সে সত্য বলেছে। অতএব, তার ব্যাপারে তোমরা ভাল ছাড়া মন্দ বলো না। ওমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু ঈমানের জোশে নিজ বাক্যের পুনরাবৃত্তি করলেন এবং তাকে হত্যা করার অনুমতি চাইলেন। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ সে কি বদর যোদ্ধাদের একজন নয়? আল্লাহ তা‘আলা বদর যোদ্ধাদেরকে ক্ষমা করার ও তাদের জন্যে জান্নাতের ঘোষণা দিয়েছেন। এ কথা শুনে ওমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু অশ্রুবিগলিত কণ্ঠে আরয করলেনঃ আল্লাহ তা‘আলা ও তার রাসূলই আসল সত্য জানেন। কোন কোন বর্ণনায় হাতেবের এই উক্তিও বর্ণিত আছে যে; আমি একাজ ইসলাম ও মুসলিমদের ক্ষতি করার জন্যে করিনি। কেননা, আমার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ই বিজয়ী হবেন। মক্কাবাসীরা জেনে গেলেও তাতে কোন ক্ষতি হবে না। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সূরা মুমতাহিনার গুরুভাগের আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। এসব আয়াত উপরোক্ত ঘটনার জন্যে হুশিয়ার করা হয় এবং কাফেরদের সাথে মুসলিমদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখা হারাম সাব্যস্ত করা হয়। [আলোচ্য ঘটনাটি বিভিন্নভাবে বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। যেমন, বুখারী: ৩০০৭, মুসলিম, ২৪৯৪, আবু দাউদ: ২৬৫০, তিরমিযী: ৩৩০৫, ওয়াকেদী: আল-মাগাযী: ২/৭৯৭-৭৯৯, ইবনে হিশাম: আস-সীরাতুন নাবওয়ীয়্যাহ, ২/৩৯৮-৩৯৯, তাফসীরে বাগভী: ৪/৩২৮-৩২৯]

(১) এখানে حق বলে কুরআন বোঝানো হয়েছে। [বাগভী]

এবং তোমরা যা প্রকাশ কর তা আমি সম্যক অবগত। তোমাদের মধ্যে যে কেউ এরূপ করে সে তো বিচ্যুত হয় সরল পথ থেকে।

إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ ۝٢

২. তোমাদেরকে কাবু করতে পারলে তারা হবে তোমাদের শত্রু এবং হাত ও জিহ্বা দ্বারা তোমাদের অনিষ্ট সাধন করবে, আর তারা কামনা করে যদি তোমরা কুফরী করতে।

لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ ۚ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝٣

৩. তোমাদের আত্মীয়-স্বজন ও সন্তান-সন্ততি কিয়ামতের দিন কোন উপকার করতে পারবে না। আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন; আর তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা।

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ ۖ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۖ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ۝٤

৪. অবশ্যই তোমাদের জন্য ইব্‌রাহীম ও তার সাথে যারা ছিল তাদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। যখন তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, ‘তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যার ‘ইবাদাত কর তা হতে আমরা সম্পর্কমুক্ত। আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করি। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হল শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য; যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহ্‌তে ঈমান আন[১]।’ তবে ব্যতিক্রম তাঁর

(১) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “আমাকে মানুষের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যেতে বলা হয়েছে যতক্ষণ তারা এ সাক্ষ্য দিবে না যে, “আল্লাহ্ ছাড়া কোন হক ইলাহ নেই, আর মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র

পিতার প্রতি ইব্‌রাহীমের উক্তিঃ ‘আমি অবশ্যই তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব; আর তোমার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র কাছে আমি কোন অধিকার রাখি না[১]।’ ইব্‌রাহীম ও তার অনুসারীগণ বলেছিল, ‘হে আমাদের রব! আমরা আপনারই উপর নির্ভর করেছি, আপনারই অভিমুখী হয়েছি এবং ফিরে যাওয়া তো আপনারই কাছে।

৫. ‘হে আমাদের রব! আপনি আমাদেরকে কাফিরদের ফিতনার পাত্র করবেন না। হে আমাদের রব! আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করুন; নিশ্চয় আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।’

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝٥

৬. যারা আল্লাহ্‌ ও শেষ দিবসের প্রত্যাশা করে অবশ্যই তোমাদের জন্য রয়েছে ওদের মধ্যে[২] উত্তম আদর্শ। আর যে

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ ۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّ فَإِنَّ اللّٰهَ

রাসূল। আর সালাত কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে। তারা এটা করলে আমার হাত থেকে তাদের জান ও মাল নিরাপদ করতে পারবে। তবে ইসলামের কোন হকের কারণে যদি পাকড়াও করা হয় সেটা ভিন্ন কথা। আর তাদের হিসাবের দায়িত্বভার আল্লাহ্‌র উপরই রইল।” [বুখারী: ২৫, মুসলিম: ২২]

(১) মুসলিমদেরকে ইবরাহীম আলাইহিস্‌ সালাম-এর উত্তম আদর্শ ও সুন্নাত অনুসরণ করার জোর আদেশ দেয়ার পর ইবরাহীম আলাইহিস্‌সালাম যে তার মুশরিক পিতার জন্যে ক্ষমাপ্রার্থনা করেছিলেন ইবরাহিমী আদর্শের অনুসরণ থেকে একে ব্যতিক্রম প্রকাশ করে বলা হয়েছে যে, অন্যসব বিষয়ে ইবরাহিমী আদর্শের অনুসরণ জরুরী, কিন্তু তার এই কাজটির অনুসরণ মুসলিমদের জন্যে জায়েয নয়। ইবরাহীম আলাইহিস্‌ সালাম-এর ওযর সূরা আত-তাওবায় বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি পিতার জন্যে মাগফিরাতের দো‘আ নিষেধাজ্ঞার পূর্বে করেছিলেন, অথবা এই ধারণার বশবর্তী হয়ে করেছিলেন যে, তার অন্তরে ঈমান বিদ্যমান আছে, কিন্তু পরে যখন জানলেন যে, সে আল্লাহর দুশমন তখন এ বিষয় থেকেও নিজের বিমুখতা ঘোষণা করলেন। [দেখুন-বাগভী]

(২) অর্থাৎ ইবরাহীম আলাইহিস্‌ সালাম ও তার অনুসারীদের মধ্যে। [কুরতুবী, বাগভী]

هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ⁶

মুখ ফিরিয়ে নেয়, (সে জেনে রাখুক), নিশ্চয় আল্লাহ্‌, তিনি অভাবমুক্ত, সপ্রশংসিত।

দ্বিতীয় রুকূ'

عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً ۚ وَاللَّهُ قَدِيرٌ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ⁷

৭. যাদের সাথে তোমাদের শত্রুতা রয়েছে সম্ভবত আল্লাহ্‌ তাদের ও তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন(১); এবং আল্লাহ্‌ ক্ষমতাবান। আর আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ⁸

৮. দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে বহিস্কার করেনি তাদের প্রতি মহানুভবতা দেখাতে ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ন্যায়পরায়ণদেরকে

---

(১) আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা ইঙ্গিত করেছেন যে, আজ যারা কাফের, ফলে তারা তোমাদের শত্রু ও তোমরা তাদের শত্রু, সত্বরই হয়তো আল্লাহ তা'আলা এই শত্রুতাকে বন্ধুত্বে পর্যবসিত করে দিবেন। অর্থাৎ তাদেরকে ঈমানের তওফীক দিয়ে তোমাদের পারস্পরিক সুসম্পর্ককে নতুন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে দিবেন। এই ভবিষ্যদ্বাণী মক্কাবিজয়ের সময় বাস্তবরূপ লাভ করে। ফলে নিহতদের বাদ দিয়ে অবশিষ্ট সকল কাফের মুসলিম হয়ে যায়। [আল-ওয়াহেদী: আসবাবুন নুযুল, ৪৫০] পবিত্র কুরআনের এক আয়াতে এর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, ﴿وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا﴾ অর্থাৎ "আর আপনি দেখতে পাবেন মানুষদেরকে যে তারা দলে দলে আল্লাহর দ্বীন ইসলামে প্রবেশ করবে" [সূরা আন-নাসর:২] বাস্তবেও তাই হয়েছে। আবু সুফিয়ান (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ইসলামের ভীষণ দুশমন ছিলেন। কিন্তু এ সময়ে আল্লাহ্‌ তা'আলা আবু সুফিয়ানের কন্যা উম্মে হাবীবা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার সাথে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিয়ের ব্যবস্থা করেন। বাদশা নাজাসী তাকে রাসূলের সাথে বিয়ে দিয়ে দেন, ফলে আবু সুফিয়ানের বিরোধিতায় ভাটা পড়ে, তিনি পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেন। তার পুত্র মু'আবিয়া রাদিয়াল্লাহু 'আনহুও ইসলাম গ্রহণ করেন। তারা পরবর্তীতে ইসলামের পক্ষের শক্তি হিসেবে নিজেদের শক্তিকে কাজে লাগান। [দেখুন-কুরতুবী]

ভালবাসেন[১]।

إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَٰتَلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ وَظَٰهَرُوا۟ عَلَىٰٓ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٩﴾

৯. আল্লাহ্‌ শুধু তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে বের করে দিয়েছে এবং তোমাদেরকে বের করাতে সাহায্য করেছে। আর তাদের সাথে যারা বন্ধুত্ব করে তারাই তো যালিম।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٍ

১০. হে ঈমানদারগণ[২]! তোমাদের কাছে

(১) যেসব কাফের মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কারেও অংশগ্রহণ করেনি, আলোচ্য আয়াতে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার ও ইনসাফ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ন্যায় ও সুবিচার তো প্রত্যেক কাফেরের সাথেও জরুরী। এতে যিম্মি কাফের, চুক্তিতে আবদ্ধ কাফের এবং শত্রু কাফের সবাই সমান। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, আসমা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার জননী আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর স্ত্রী 'কুতাইলা' হুদায়বিয়া সন্ধির পর কাফের অবস্থায় মক্কা থেকে মদীনায় পৌঁছেন। তিনি কন্যা আসমার জন্যে কিছু উপঢৌকনও সাথে নিয়ে যান। কিন্তু আসমা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা সেই উপঢৌকন গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন এবং রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে জিজ্ঞাসা করলেনঃ আমার জননী আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন, কিন্তু তিনি কাফের। আমি তার সাথে কিরূপ ব্যবহার করব? রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ জননীর সাথে সদ্ব্যবহার কর। [বুখারী: ২৬২০, ৩১৮৩, মুসলিম: ১০০৩, আবু দাউদ: ১৬৬৮, মুসনাদে আহমাদ: ৬/৩৪৭, ইবনে হিব্বান: ৪৫২]

(২) আলোচ্য আয়াতগুলো একটি বিশেষ ঘটনা অর্থাৎ হুদায়বিয়ার সন্ধির সাথে সম্পর্কযুক্ত। হাদীসে এসেছে, "যখন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সন্ধি চুক্তি শেষ করলেন তখন তিনি সাহাবায়ে কিরামকে বললেন, তোমরা উঠ এবং উটগুলোর 'নাহর' বা রক্ত প্রবাহিত কর তারপর মাথা কামিয়ে ফেল। কিন্তু তাদের কেউই এটা শুনছিল না। শেষপর্যন্ত রাসূল এটা তিনবার বললেন। কিন্তু কেউ না শুনাতে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মে সালামাহ এর কাছে গিয়ে তা বিবৃত করলেন। উম্মে সালামাহ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্‌! আপনি কি এটা বাস্তবে হওয়া চান? তবে আপনি কাউকে কিছু না বলে নিজের উটটি 'নাহর' করুন এবং আপনার মাথা কামানোর জন্য লোক ডেকে তা সম্পাদন করুন। তিনি তাই করলেন। ফলে সবাই তা করতে শুরু করে দিল। আর তখনই

فَامْتَحِنُوْهُنَّ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ فَاِنْ

মুমিন নারীরা হিজরত করে আসলে

কয়েকজন মুমিন নারী এসে উপস্থিত। তখন আল্লাহ্ তা'আলা ﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مُهٰجِرٰتٍ﴾ এই আয়াত নাযিল করলেন।" [বুখারী: ২৩৭২] এর কারণ হলো, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মক্কাবাসীদের মধ্যে অনুষ্ঠিত হুদায়বিয়ার বিখ্যাত শান্তিচুক্তির অন্যতম শর্ত ছিল এই যে, মক্কা থেকে কোন ব্যক্তি মদিনায় চলে গেলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ফেরত পাঠিয়ে দিবেন যদিও সে মুসলিম হয়। কিন্তু মদীনা থেকে কেউ মক্কায় চলে গেলে কোরাইশরা তাকে ফেরত পাঠাবে না। এই শর্তের ভাষা ছিল ব্যাপক, যাতে পুরুষ ও নারী উভয়ই বাহ্যত অন্তর্ভুক্ত ছিল। অর্থাৎ কোন মুসলিম পুরুষ অথবা নারী মক্কা থেকে মদীনায় চলে গেলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ফেরত পাঠাবেন। এই চুক্তি সম্পাদন শেষে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হুদায়বিয়াতেই অবস্থানরত ছিলেন তখন মুসলিমদের জন্যে অগ্নি পরীক্ষাতুল্য একাধিক ঘটনা সংঘটিত হয়ে যায়। তন্মধ্যে একটি ঘটনা হচ্ছে, সুবাই'আ বিনতে হারেস আল-আসলামিয়্যাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহা কাফের সায়ফী ইবনে রাহিবের পত্নী ছিলেন। তখন পর্যন্ত মুসলিম ও কাফেরের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হারাম ছিল না। এই মুসলিম মহিলা মক্কা থেকে পালিয়ে হুদাইবিয়ায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে উপস্থিত হলেন। সাথে সাথে স্বামীও হাযির। সে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে দাবি জানাল যে, আমার স্ত্রীকে আমার কাছে প্রত্যর্পণ করা হোক। কেননা, আপনি এই শর্ত মেনে নিয়েছেন এবং চুক্তিপত্রের কালি এখনও শুকায়নি। [তাফসীরে কুরতুবী: ২০/৪১০] এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে। এসব আয়াতে প্রকৃতপক্ষে মুসলিম ও কাফেরদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ ও হারাম করা হয়েছে। এর পরিণতিতে এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, কোন মুসলিম নারী হিজরত করে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে পৌঁছে গেলে তাকে কাফেরদের হাতে ফেরত দেয়া হবে না সে পূর্ব থেকেই মুসলিম হোক; -যেমন উল্লেখিত ভদ্রমহিলা, অথবা হিজরতের পর তার মুসলিমত্ব প্রমাণিত হোক। তাকে ফেরত না দেয়ার কারণ এই যে, সে তার কাফের স্বামীর জন্যে হালাল নয়। উল্লেখিত আয়াতসমূহ অবতরণের ফলে এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, চুক্তিপত্রের উপরোক্ত শর্তটি ব্যাপক অর্থে প্রযোজ্য নয় যে, এই শর্তটির ব্যাপকতা কেবল পুরুষদের ক্ষেত্রে গ্রহণীয়- নারীদের ক্ষেত্রে নয়। আয়াতের ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুক্তিপত্রের উল্লেখিত এই শর্তের সঠিক মর্ম ব্যাখ্যা করেন এবং তদনুযায়ী সুবাই'আ রাদিয়াল্লাহু 'আনহাকে কাফেরদের কাছে ফেরত প্রেরণে বিরত থাকেন। কোন কোন বর্ণনায় অনুরূপ ঘটনা উম্মে কুলসুম বিনতে-উকবার ক্ষেত্রেও ঘটেছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। [বুখারী: ২৭১১, ২৭১২]

عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۖ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ۚ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ ۖ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

তোমরা তাদেরকে পরীক্ষা করো[১]; আল্লাহ্‌ তাদের ঈমান সম্বন্ধে সম্যক অবগত। অতঃপর যদি তোমরা জানতে পার যে, তারা মুমিন নারী, তবে তাদেরকে কাফিরদের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দিয়ো না। মুমিন নারীগণ কাফিরদের জন্য বৈধ নয় এবং কাফিরগণ মুমিন নারীদের জন্য বৈধ নয়। কাফিররা যা ব্যয় করেছে তা তাদেরকে ফিরিয়ে দিও। তারপর তোমরা তাদেরকে বিয়ে করলে তোমাদের কোন অপরাধ হবে না যদি তোমরা তাদেরকে তাদের মাহর দাও। আর তোমরা কাফির নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখো

(১) আয়াতে মুহাজির নারীকে পরীক্ষা করার কথা বলা হয়েছে। সে পরীক্ষা কি ছিল এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত বর্ণিত আছে, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, মুহাজির নারীকে শপথ করানো হত যে, সে স্বামীর প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণার কারণে আগমন করেনি, মদীনার কোন ব্যক্তির প্রেমে পড়ে আসেনি এবং অন্য কোন পার্থিব স্বার্থের বশবর্তী হয়ে হিজরত করেনি; বরং একান্তভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালবাসা ও সন্তুষ্টি লাভের জন্যে আগমন করেছে। যে নারী এই শপথ করত, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে মদীনায় বসবাসের অনুমতি দিতেন এবং সে তার স্বামীর কাছ থেকে যে মোহরানা ইত্যাদি আদায় করেছিল, তা তার স্বামীকে ফেরত দিয়ে দিতেন। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, পরীক্ষা ছিল, কালেমা শাহাদাত বলা অর্থাৎ আশহাদু আল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ বলা। তবে এখানে গ্রহণযোগ্য মত হলো, যা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নারীদের পরীক্ষার পদ্ধতি ছিল সেই আনুগত্যের শপথ, যা পরবর্তী আয়াতসমূহে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে; ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ۙ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ মুহাজির নারীরা রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাতে আয়াতে বর্ণিত বিষয়সমূহের শপথ করত। [তিরমিযী: ৩৩০৬, অনুরূপ বর্ণনা দেখুন, বুখারী: ৪১৮২, ৪৮৯১, মুসলিম:১৮৬৬, মুসনাদে আহমাদ: ৬/২৭০]

না[১]। তোমরা যা ব্যয় করেছ তা ফেরত চাইবে এবং কাফিররা যা ব্যয় করেছে তা যেন তারা চেয়ে নেয়। এটাই আল্লাহ্‌র বিধান; তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করে থাকেন। আর আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

১১. আর তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যদি কেউ হাতছাড়া হয়ে কাফিরদের মধ্যে রয়ে যায় অতঃপর যদি তোমরা যুদ্ধজয়ী হয়ে গনীমত লাভ কর, তাহলে যাদের স্ত্রীরা হাতছাড়া হয়ে গেছে তাদেরকে, তারা যা ব্যয় করেছে তার সমপরিমাণ প্রদান কর, আর আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর, যাঁর উপর তোমরা ঈমান এনেছ।

وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾

১২. হে নবী! মুমিন নারীগণ যখন আপনার কাছে এসে বাই‘আত করে[২] এ মর্মে

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن

(১) كَوَافِر শব্দটি كَافِرَةٌ এর বহুবচন। এখানে মুশরিক নারী বোঝানো হয়েছে। [বাগভী]

(২) এ আয়াতে মুসলিম নারীদের কাছ থেকে একটি বিস্তারিত আনুগত্যের শপথ নেয়ার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এতে ঈমান ও আকায়েদসহ শরী‘আতের বিধিবিধান পালন করারও অঙ্গীকার রয়েছে। যদিও এই শপথ মুহাজির নারীদের ঈমান পরীক্ষার পরিশিষ্ট হিসেবে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু ভাষার ব্যাপকতার কারণে এটা শুধু তাদের বেলায়ই প্রযোজ্য নয়। বরং সব মুসলিম নারীর জন্যে ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য। বাস্তব ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে শুধু মুহাজির নারীরাই নয়, অন্যান্য নারীরাও শপথ করেছে। উমাইমা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বলেন, “আমি আরও কয়েকজন মহিলাসহ রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে শপথ করেছি। তিনি আমাদের কাছ থেকে শরী‘আতের বিধি-বিধান পালনের অঙ্গীকার নেন এবং সাথে সাথে এই বাক্যও উচ্চারণ করান فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ অর্থাৎ “আমরা এসব বিষয় পালনে অঙ্গীকার করি যে পর্যন্ত আমাদের সাধ্যে কুলায়”। উমাইমা এরপর বলেন, এ থেকে জানা গেল যে, আমাদের প্রতি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর স্নেহ-মমতা আমাদের নিজেদের চাইতেও বেশি ছিল।

لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْـًٔا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَٰنٍ يَفْتَرِينَهُۥ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِى مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

যে, তারা আল্লাহ্‌র সাথে কোন শরীক স্থির করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, তারা সজ্ঞানে কোন অপবাদ রচনা করে রটাবে না এবং সৎকাজে আপনাকে অমান্য করবে না, তখন আপনি তাদের বাই'আত গ্রহণ করুন এবং তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَوَلَّوْا۟ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا۟ مِنَ ٱلْءَاخِرَةِ كَمَا يَئِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلْقُبُورِ ﴿١٣﴾

১৩. হে মুমিনগণ! আল্লাহ্‌ যে সম্প্রদায়ের প্রতি রুষ্ট তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করো না, তারা তো আখিরাত সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়েছে যেমন হতাশ হয়েছে কাফিররা কবরবাসীদের বিষয়ে।

আমরা তো নিঃশর্ত অঙ্গীকারই করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি আমাদেরকে শর্তযুক্ত অঙ্গীকার শিক্ষা দিলেন। ফলে অপারগ অবস্থায় বিরুদ্ধাচরণ হয়ে গেলে তা অঙ্গীকার ভঙ্গের শামিল হবে না।[তিরমিযী: ১৫৯৭, ইবনে মাজাহ:২৮৭৪] আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা এই শপথ সম্পর্কে বলেনঃ মহিলাদের এই শপথ কেবল কথাবার্তার মাধ্যমে হয়েছে- হাতের উপর হাত রেখে শপথ হয়নি, যা পুরুষদের ক্ষেত্রে হত। বস্তুত রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাত কখনও কোন গায়র মাহরাম নারীর হাতকে স্পর্শ করেনি।[বুখারী: ৪৮৯১, মুসলিম: ১৮৬৬] বিভিন্ন হাদীস থেকে প্রমাণিত আছে যে, এই শপথ কেবল হুদায়বিয়ার ঘটনার পরেই নয়; বরং বারবার হয়েছে। মক্কাবিজয়ের দিনও রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদের কাছ থেকে শপথ গ্রহণ করেন। তখন যারা আনুগত্যের শপথ করেছিল, তাদের মধ্যে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দাও ছিল। সে নিজেকে গোপন রাখতে চেয়েছিল, এরপর শপথের কিছু বিবরণ জিজ্ঞাসা করে নিতে বাধ্য হয়েছিল। সে একাধিক প্রশ্নও উত্থাপন করেছিল।[দেখুন, বুখারী: ২২১১, ৭১৮০, মুসলিম: ১৭১৪]

৬১- সূরা আস-সাফ্‌ফ[১]
১৪ আয়াত, মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝١

১. আসমানসমূহে যা কিছু আছে এবং যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। আর তিনি প্রবলপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۝٢

২. হে ঈমানদারগণ! তোমরা যা কর না তা তোমরা কেন বল?

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۝٣

৩. তোমরা যা কর না তোমাদের তা বলা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে খুবই অসন্তোষজনক।

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ ۝٤

৪. নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে সারিবদ্ধভাবে সুদৃঢ় প্রাচীরের মত, আল্লাহ্ তাদেরকে ভালবাসেন।

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ لِمَ تُؤْذُوْنَنِيْ وَقَدْ تَّعْلَمُوْنَ اَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ ۗ فَلَمَّا زَاغُوْٓا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۝٥

৫. আর স্মরণ করুন, যখন মূসা তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, ‘হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে কেন কষ্ট দিচ্ছ অথচ তোমরা জান যে, আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র রাসূল। অতঃপর তারা যখন বাঁকা পথ অবলম্বন করল তখন আল্লাহ্ তাদের হৃদয়কে বাঁকা করে দিলেন। আর আল্লাহ্ ফাসিক সম্প্রদায়কে হেদায়াত করেন না।

---

(১) আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, একদল সাহাবী পরস্পরে আলোচনা করলেন যে, আল্লাহ তা‘আলার কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমল কোনটি আমরা যদি তা জানতে পারতাম, তবে তা বাস্তবায়িত করতাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে সমগ্র সূরা আস-সাফ্‌ফ পাঠ করে শুনিয়ে দিলেন, যা তখনই নাযিল হয়েছিল। [তিরমিযী: ৩৩০৯, সুনান দারমী: ২৩৯০, মুসনাদে আহমদ:৫/৪৫২]

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَٰبَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَىٰةِ وَمُبَشِّرًۢا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنۢ بَعْدِي اسْمُهُۥٓ أَحْمَدُ ۖ فَلَمَّا جَآءَهُم بِالْبَيِّنَٰتِ قَالُوا۟ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٦﴾

৬. আর স্মরণ করুন, যখন মার্‌ইয়াম-পুত্র ‘ঈসা বলেছিলেন, ‘হে বনী ইস্‌রাঈল! নিশ্চয় আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র রাসূল এবং আমার পূর্ব থেকে তোমাদের কাছে যে তাওরাত রয়েছে আমি তার সত্যায়নকারী এবং আমার পরে আহ্‌মাদ নামে(১) যে রাসূল আসবেন আমি তার সুসংবাদদাতা(২)।

(১) এখানে ঈসা আলাইহিস্ সালাম কর্তৃক সুসংবাদ প্রদত্ত সেই রাসূলের নাম বলা হয়েছে আহমদ। আমাদের প্রিয় শেষনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নাম মুহাম্মদ, আহমদ এবং আরও কয়েকটি নাম ছিল। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমার কয়েকটি নাম রয়েছে, আমি ‘মুহাম্মাদ’, আমি ‘আহমাদ’, আমি ‘মাহী’ বা নিশ্চিহ্নকারী; যার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ কুফরী নিশ্চিহ্ন করে দিবেন। আর আমি ‘হাশির’ বা একত্রিতকারী; আমার কদমের কাছে সমস্ত মানুষ জমা হবে। আর আমি ‘আকিব’ বা পরিসমাপ্তিকারী। [বুখারী: ৩৫৩২, ৪৮৯৬, মুসলিম: ২৩৫৪, তিরমিযী: ২৮৪০, মুসনাদে আহমাদ: ৪/৮০, ইবনে হিব্বান: ৬৩১৩] তবে রাসূলের নাম এ কয়টিতে সীমাবদ্ধ নয়। অন্য হাদীসে আরও এসেছে, আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই আমাদেরকে তার নাম উল্লেখ করেছেন, তন্মধ্যে কিছু আমরা মুখস্ত করতে সক্ষম হয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, আমি ‘মুহাম্মাদ’ ‘আহমাদ’, হাশির, মুকাফফি (সর্বশেষে আগমনকারী), নাবিইউত তাওবাহ (তাওবাহর নবী), নাবীইউল মালহামাহ, (সংগ্রামের নবী)। [মুসলিম: ২৩৫৫, মুসনাদে আহমাদ: ৪/৩৯৫, ৪০৪, ৪০৭]

(২) ঈসা আলাইহিস্ সালাম এর সুসংবাদ প্রদানের কথা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীসেও এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ তাকে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদেরকে আপনার নিজের সম্পর্কে কিছু বলুন। জবাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, “আমি আমার পিতা (পিতৃপুরুষ) ইবরাহীম এর দো‘আ, ঈসা এর সুসংবাদ এবং আমার মা যখন আমাকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন তখন তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, তার থেকে একটি আলো বের হয়ে সিরিয়ার বুসরা নগরীর প্রাসাদসমূহ আলোকিত হয়ে গেছে।” [মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৬০০, অনুরূপ বর্ণনা আরও দেখুন, মুসনাদে আহমাদ: ৫/২৬২] এমনকি এ সুসংবাদের কথা হাবশার বাদশাহ নাজাসীও স্বীকার করেছিলেন।[দেখুন, মুসনাদে আহমাদ: ১/৪৬১-৪৬২]

পরে তিনি[১] যখন সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ তাদের কাছে আসলেন তখন তারা বলতে লাগল, এটা তো স্পষ্ট জাদু ।’

৭. আর সে ব্যক্তির চেয়ে বড় যালিম আর কে যে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে? অথচ তাকে ইসলামের দিকে আহ্বান করা হয় । আর আল্লাহ্ যালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না ।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ⑦

৮. তারা আল্লাহ্‌র নূর ফুৎকারে নেভাতে চায়, আর আল্লাহ্, তিনি তাঁর নূর পূর্ণতাদানকারী, যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে ।

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ⑧

৯. তিনিই তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হেদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ সকল দ্বীনের উপর তাকে বিজয়ী করার জন্য, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে ।

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ⑨

দ্বিতীয় রুকূ’

১০. হে ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসার সন্ধান দেব, যা তোমাদেরকে রক্ষা করবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে?

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ⑩

১১. তা এই যে, তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনবে এবং তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ⑪

(১) কারও কারও মতে, এখানে ‘তিনি’ বলে ঈসা আলাইহিস্ সালামকে বোঝানো হয়েছে । সে অনুসারে بينات বা স্পষ্ট প্রমাণাদি দ্বারা ঈসা আলাইহিস্ সালাম এর ইঞ্জীল বোঝানো হবে । তবে অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে, এখানে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বোঝানো হয়েছে । সে হিসেবে بينات বা স্পষ্ট প্রমাণাদি দ্বারা কুরআন বোঝানো হবে । আর এ মতটিই এখানে বেশী প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত । [ফাতহুল কাদীর]

করবে। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা জানতে!

يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ۚ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿١٢﴾

১২. আল্লাহ্ তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, এবং স্থায়ী জান্নাতের উত্তম বাসগৃহে। এটাই মহাসাফল্য।

وَاُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا ۚ نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ ۚ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٣﴾

১৩. এবং (তিনি দান করবেন) আরও একটি অনুগ্রহ, যা তোমরা পছন্দ কর। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সাহায্য ও আসন্ন বিজয়; আর আপনি মুমিনদেরকে সুসংবাদ দিন[১]।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْٓا اَنْصَارَ اللّٰهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيّٖنَ مَنْ اَنْصَارِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ۗ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ فَاٰمَنَتْ طَّاۤىِٕفَةٌ مِّنْ بَنِيْٓ اِسْرَاۤءِيْلَ وَكَفَرَتْ طَّاۤىِٕفَةٌ ۚ فَاَيَّدْنَا الَّذِيْنَ

১৪. হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী হও, যেমন মার্‌ইয়াম-পুত্র ‘ঈসা হাওয়ারীগণকে বলেছিলেন, ‘আল্লাহ্‌র পথে কারা আমার সাহায্যকারী হবে?’ হাওয়ারীগণ

---

(১) আখেরাতের নেয়ামতের সাথে কিছু দুনিয়ার নেয়ামতেরও ওয়াদা করে বলা হয়েছে, ﴿وَاُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ﴾ “এবং তিনি দান করবেন তোমাদের বাঞ্ছিত আরো একটি অনুগ্রহ। আল্লাহ্‌র সাহায্য ও আসন্ন বিজয়; মুমিনদেরকে সুসংবাদ দিন।” অর্থাৎ আখেরাতের নেয়ামত ও বাসগৃহ তো পাওয়া যাবেই; দুনিয়াতেও একটি নগদ নেয়ামত পাওয়া যাবে, তা হচ্ছে আল্লাহর সাহায্য ও আসন্ন বিজয়। এর অর্থ শত্রুদের উপর বিজয় লাভ। এখানে قريب (বা নিকট) শব্দটি আখেরাতের বিপরীতে ধরা হলে ইসলামের সকল বিজয়ই এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আর যদি প্রচলিত قريب (বা আসন্ন) ধরা হয়, তবে এর প্রথম অর্থ হবে খাইবর বিজয় এবং এরপর মক্কা বিজয়। تحبونها অর্থাৎ, তোমরা এই নগদ নেয়ামত খুব পছন্দ কর। কারণ মানুষ স্বভাবগতভাবে নগদকে পছন্দ করে। পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে, ﴿وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُوْلًا﴾ অর্থাৎ, মানুষ তড়িঘড়ি পছন্দ করে। [সূরা আল-ইসরা: ১১] এর অর্থ এই নয় যে, আখেরাতের নেয়ামত তাদের কাছে প্রিয় নয়। বরং অর্থ এই যে, আখেরাতের নেয়ামত তো তাদের প্রিয় কাম্যই, কিন্তু স্বভাবগতভাবে কিছু নগদ নেয়ামতও তারা দুনিয়াতে চায়। তাও দেয়া হবে। [দেখুন-ফাতহুল কাদীর,মুয়াস্‌সার,বাগভী]

اٰمَنُوْا عَلٰى عَدُوِّهِمْ فَاَصْبَحُوْا ظٰهِرِيْنَ ﴿١٤﴾

বলেছিলেন, ‘আমরাই আল্লাহ্‌র পথে সাহায্যকারী[১]।’ তারপর বনী ইস্‌রাঈলের একদল ঈমান আনল এবং একদল কুফরী করল। তখন আমরা যারা ঈমান এনেছিল, তাদের শত্রুদের মুকাবিলায় তাদেরকে শক্তিশালী করলাম, ফলে তারা বিজয়ী হল[২]।

---

(১) حَوَارِيِّيْنَ শব্দটি حَوَارِي এর বহুবচন। এর অর্থ আন্তরিক বন্ধু। ঈসা আলাইহিস্ সালাম-এর অনুসারীদেরকে ‘হাওয়ারী’ বলা হত। [ইবন কাসীর]

(২) এই আয়াতের তাফসীরে আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, ঈসা আলাইহিস্ সালাম আসমানে উত্থিত হওয়ার পর নাসারারা তিন দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদল বলল, তিনি ইলাহ ছিলেন এবং আসমানে চলে গেছেন। দ্বিতীয় দল বলল, তিনি ইলাহ্ ছিলেন না বরং ইলাহ্‌র পুত্র ছিলেন। এখন আল্লাহ তাকে আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন এবং শত্রুদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তৃতীয় দল বিশুদ্ধ ও সত্যকথা বলল। তারা বলল, ‘তিনি ইলাহ্‌ও ছিলেন না, ইলাহ্‌র পুত্রও ছিলেন না; বরং আল্লাহর দাস ও রাসূল ছিলেন। আল্লাহ তা‘আলা তাকে শত্রুদের কবল থেকে হেফাযত ও উচ্চ মর্তবা দান করার জন্যে আকাশে উঠিয়ে নিয়েছেন।’ মূলতঃ এরাই ছিল সত্যিকার ঈমানদার। প্রত্যেক দলের সাথে কিছু কিছু জনসাধারণও যোগদান করে এবং পারস্পরিক কলহ বাড়তে বাড়তে যুদ্ধের উপক্রম হয়। ঘটনাচক্রে উভয় কাফের দল মুমিনদের মোকাবিলায় প্রবল হয়ে ওঠে। অবশেষে আল্লাহ তা‘আলা সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে প্রেরণ করেন। তিনি মুমিন দলকে সমর্থন দেন। এভাবে পরিণামে মুমিন দল যুক্তি প্রমাণের নিরীখে বিজয়ী হয়ে যায়। এই তফসীর অনুযায়ী আয়াতে উল্লেখিত ﴿الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا﴾ বা “যারা ঈমান এনেছে” বলে ঈসা আলাইহিস্‌সালাম-এর উম্মতের মুমিনগণকেই বোঝানো হয়েছে, যারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহায্য ও সমর্থনে বিজয়ের গৌরব অর্জন করবে। সে হিসেবে উম্মতে মুহাম্মদী যারা রাসূলের প্রকৃত অনুসারী তারা সর্বদা বিজয়ী থাকবে। [দেখুনঃ তাফসীরে তাবারীঃ ২৮/৬০, দ্বিয়া আল-মাকদেসীঃ আল-মুখতারাহঃ ১০/৩৭৬-২৭৮, নং ৪০২]

৬২- সূরা আল-জুমু'আহ্[১]
১১ আয়াত, মাদানী

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ①

১. আসমানসমূহে যা আছে এবং যমীনে যা আছে সবই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে, যিনি অধিপতি, মহাপবিত্র, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلٰلٍ مُّبِينٍ ②

২. তিনিই উম্মীদের[২] মধ্যে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন তাদের মধ্য থেকে, যিনি তাদের কাছে তেলাওয়াত করেন তাঁর আয়াতসমূহ; তাদেরকে পবিত্র করেন এবং তাদেরকে শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত[৩]; যদিও ইতোপূর্বে তারা

---

(১) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমু'আর সালাতে সূরা আল-জুমু'আহ এবং আল-মুনাফিকুন পড়তেন। [মুসলিম:৭৭৭, আবুদাউদ: ১১২৪, তিরমিযী: ৫১৯, ইবনে মাজাহ: ১১১৮, মুসনাদে আহমাদ: ২/৪২৯-৪৩০]

(২) أُمِّيٌّ বা 'উম্মী' শব্দটির অর্থ নিরক্ষর। আরবরা এই পদবীতে সুবিদিত। [কুরতুবী, বাগভী]

(৩) নবী-রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর তিনটি গুণ উল্লেখ করা হয়েছে, (এক) কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত। আয়াতে বর্ণিত 'তেলাওয়াত' শব্দের আসল অর্থ অনুসরণ করা। পরিভাষায় শব্দটি কালাম পাঠ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। آيات 'আয়াত' বলে কুরআনের আয়াত বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে প্রেরণ করার এক উদ্দেশ্য এই যে, তিনি মানুষকে কুরআনের আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনাবেন। (দুই) উম্মতকে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সকল প্রকার অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করা, আয়াতে উল্লেখিত يزكيهم শব্দটি 'তাযকিয়াহ' থেকে গৃহীত। 'তাযকিয়াহ' শব্দটি অভ্যন্তরীণ দোষ থেকে পবিত্র করার অর্থে অধিকতর ব্যবহৃত হয়; অর্থাৎ কুফর, শিরক ও কুচরিত্রতা থেকে পবিত্র করা। কোন সময় বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সর্বপ্রকার পবিত্রতার জন্যেও ব্যবহৃত হয়। এখানে এই ব্যাপক অর্থই উদ্দেশ্য। (তিন) কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়া। এখানে 'কিতাব' বলে পবিত্র কুরআন এবং 'হিকমত' বলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত উক্তিগত ও কর্মগত শিক্ষাসমূহ বোঝানো হয়েছে।

ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে;

৩. এবং তাদের মধ্য হতে অন্যান্যদের জন্যও যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি[১]। আর আল্লাহ্

وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ ۗ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

তাই অধিকাংশ তফসীরকারক এখানে হিকমতের তাফসীর করেছেন সুন্নাহ্ ।[ফাতহুল কাদীর]

(১) আয়াতে বর্ণিত آخرين এর শাব্দিক অর্থ 'অন্য লোক'। আর ﴿لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ﴾ এর অর্থ যারা এখন পর্যন্ত তাদের অর্থাৎ, নিরক্ষরদের সাথে মিলিত হয়নি। কিন্তু এরা কারা যাদেরকে আয়াতে "অন্য লোক" বলা হয়েছে? এ ব্যাপারে তিনটি প্রসিদ্ধ মত রয়েছে। এক. এখানে কেয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মুসলিমকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ রাসূলকে আল্লাহ্ তা'আলা পরবর্তী সমস্ত মানুষদের জন্যও রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কেয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মুসলিমকে প্রথম কাতারের মুমিন অর্থাৎ সাহাবায়ে-কেরামের সাথে সংযুক্ত মনে করা হবে। এটা নিঃসন্দেহে পরবর্তী মুসলিমদের জন্যে সুসংবাদ। দুই. কেউ কেউ وآخرين শব্দটিকে أُمِّيِّيْنَ এর উপর عطف করেছেন। তখন এ আয়াতের সারমর্ম এই হবে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে নিরক্ষরদের মধ্যে এবং তাদের মধ্যে প্রেরণ করেছেন, যারা এখনও নিরক্ষরদের সাথে মিলিত হয়নি। তিন. কেউ কেউ وآخرين শব্দের عطف মেনেছেন وَيُعَلِّمُهُمْ এর সর্বনামের উপর। আর তখন আয়াতের অর্থ হবে এই যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিক্ষা দেন নিরক্ষরদেরকে এবং তাদেরকে যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি। যারা এখনো নিরক্ষর বা 'উম্মী'দের সাথে মিলিত হয়নি তারা নিঃসন্দেহে কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী বিভিন্ন দেশের মুসলিম। ইকরিমা ও মুজাহিদ থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তারা তাবেয়ী, তাবে তাবেয়ী ও অনাগত আরব অনারব সকল মুসলিম। [কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর] তাছাড়া এক হাদীস থেকেও এ অর্থের সপক্ষে দলীল নেয়া যায়, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আমার উম্মতের পুরুষ ও মহিলাদের বংশধরদের চতুর্থ অধঃস্তনদের থেকেও বিনা হিসেবে জান্নাতে যাবে, তারপর তিনি ﴿وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ ۗ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ﴾ আয়াত পাঠ করলেন"। [ইবনে আবি আসিম: আস-সুন্নাহ: ৩০৯]

কোন কোন মুফাসসির এখানে সুনির্দিষ্টভাবে পারস্যের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। তাদের মতের সপক্ষে তারা দলীল পেশ করে বলেন, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণনা করেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে বসা ছিলাম, এমতাবস্থায় সূরা জুমুআ অবতীর্ণ হয়। তিনি আমাদেরকে তা পাঠ করে শুনান। তিনি ﴿وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ﴾ পাঠ করলে আমরা আরয করলামঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্, এরা কারা? তিনি নিরুত্তর রইলেন। দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার প্রশ্ন করার পর তিনি পার্শ্বে উপবিষ্ট সালমান ফারেসী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর গায়ে হাত

পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝

৪. এটা আল্লাহ্‌রই অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছে তিনি এটা দান করেন। আর আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহের অধিকারী।

مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰىةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا ۭ بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۭ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

৫. যাদেরকে তাওরাতের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছিল, কিন্তু তারা তা বহন করেনি, তারা গাধার মত! যে বহু পুস্তক বহন করে[১]। কত নিকৃষ্ট সে সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত যারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ করে! আর আল্লাহ্ যালিম সম্প্রদায়কে হেদায়াত করেন না।

রাখলেন এবং বললেনঃ যদি ঈমান সুরাইয়া নক্ষত্রের সমান উচ্চতায়ও থাকে, তবে তার সম্প্রদায়ের কিছুলোক সেখান থেকেও ঈমানকে নিয়ে আসবে। [বুখারী: ৪৮৯৭, ৪৮৯৮, মুসলিম: ২৫৪৬, তিরমিযী: ৩৩১০] [বাগভী]

(১) এ আয়াতাংশের দু'টি অর্থ। একটি সাধারণ অর্থ এবং অপরটি বিশেষ অর্থ। সাধারণ অর্থ হলো, যাদের ওপর তাওরাতের জ্ঞান অর্জন, তদনুযায়ী আমল এবং তাওরাত অনুসারে দুনিয়াকে পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল, তারা তাদের এ দায়িত্ব বুঝেনি এবং তার হকও আদায় করেনি। বিশেষ অর্থ হলো, তাওরাতের ধারক ও বাহক গোষ্ঠী হওয়ার কারণে যাদের কাজ ছিল সবার আগে অগ্রসর হয়ে সেই রাসূলকে সাহায্য-সহযোগিতা করা যার আগমনের সুসংবাদ তাওরাতে স্পষ্ট ভাষায় দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তারাই তার সবচেয়ে বেশী শত্রুতা ও বিরোধিতা করেছে এবং তাওরাতের শিক্ষার দাবী পূরণ করেনি। পার্থিব জাঁকজমক ও ধনৈশ্বর্য তাদেরকে তাওরাত থেকে বিমুখ করে রেখেছে। ফলে তারা তাওরাতের পণ্ডিত হওয়া সত্বেও তাওরাতের নির্দেশাবলী বাস্তবায়নের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ মূর্খ ও অনভিজ্ঞের পর্যায়ে চলে এসেছে। আলোচ্য আয়াতে তাদের নিন্দা করে বলা হয়েছে যে, তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে গর্দভ, যার পিঠে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বৃহদাকার গ্রন্থ চাপিয়ে দেয়া হয়। এই গর্দভ সেই বোঝা বহন তো করে, কিন্তু তার বিষয়বস্তুর কোন খবর রাখে না এবং তাতে তার কোন উপকার হয় না। ইয়াহূদীদের অবস্থাও তদ্রূপ। তারা পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অর্জনের জন্যে তাওরাতকে বহন করে এবং এর মাধ্যমে জনগণের মধ্যে জাঁকজমক ও প্রতিপত্তি লাভ করতে চায়, কিন্তু এর দিকনির্দেশ দ্বারা কোন উপকার লাভ করে না। [দেখুন-ইবন কাসীর,কুরতুবী,ফাতহুল কাদীর]

৬. বলুন, 'হে ইয়াহূদী হয়ে যাওয়া লোকরা! যদি তোমরা মনে কর যে, তোমরাই আল্লাহ্‌র বন্ধু, অন্য লোকেরা নয়(১); তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।'

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُوٓا۟ إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَآءُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا۟ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٦﴾

৭. কিন্তু তারা তাদের হাত যা আগে পাঠিয়েছে তার কারণে কখনো মৃত্যু কামনা করবে না। আর আল্লাহ্ যালিমদের সম্পর্কে সম্যক অবগত(২)।

وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُۥٓ أَبَدًۢا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٧﴾

৮. বলুন, 'তোমরা যে মৃত্যু হতে পলায়ন কর সে মৃত্যু তোমাদের সাথে অবশ্যই সাক্ষাত করবে। তারপর তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে গায়েব ও প্রকাশ্যের

قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِى تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُۥ مُلَٰقِيكُمْ ۖ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

(১) কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে তাদের এই দাবী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন, তারা বলত: "ইয়াহূদীরা ছাড়া কেউই জান্নাতে যাবে না" [সূরা আল-বাকারাহ: ১১১]। "জাহান্নামের আগুন আমাদের কখনো স্পর্শ করবে না। আর আমাদেরকে যদি নিতান্তই শাস্তি দেয়া হয় তাহলে মাত্র কয়েক দিনের জন্য দেয়া হবে" [সূরা আল-বাকারাহ: ৮০, সূরা আলে ইমরান, ২৪]। "আমরা আল্লাহর বেটা এবং তাঁর প্রিয়পাত্র" [সূরা আল-মায়েদাহ: ১৮]।

(২) এখানে আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহূদীদের আসল চরিত্র তুলে ধরছেন। তা হচ্ছে, ইয়াহূদীরা কখনও মৃত্যু কামনা করবে না। কারণ, তারা আখেরাতের জন্যে কুফর, শিরক ও কুকর্ম ব্যতীত আর কিছুই পাঠায়নি। অতএব তারা ভালরূপে জানে যে, আখেরাতে তাদের জন্যে জাহান্নামের শাস্তিই অবধারিত রয়েছে। তারা আল্লাহর প্রিয়জন হওয়ার যে দাবি করে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। এটা স্বয়ং তাদের অজানা নেই। তবে দুনিয়ার উপকারিতা লাভ করার জন্যে তারা এ ধরনের দাবি করে। তারা আরও জানে যে, যদি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কথায় তারা মৃত্যু কামনা করে তবে তা অবশ্যই কবুল হবে এবং তারা মরে যাবে। তাই বলা হয়েছে, ইয়াহূদীরা মৃত্যু কামনা করতেই পারে না। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যদি সে সময় তাদের কেউ মৃত্যু কামনা করত, তবে তারা তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হত। [মুসনাদে আহমাদ: ১/২৪৮, মুসনাদে বাযযার: ২১৮৯ (কাশফুল আসতার), আস-সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ী: ১১০৬১, মুসনাদে আবি ইয়া'লা: ২৬০৪]

জ্ঞানী আল্লাহ্‌র কাছে অতঃপর তোমরা যা আমল করতে সে সম্পর্কে তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন।'

দ্বিতীয় রুকূ'

৯. হে ঈমানদারগণ! জুমু'আর দিনে[১]

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ

(১) এই দিনটি মুসলিমদের সমাবেশের দিন। তাই এই দিনকে 'ইয়াওমুল জুম'আ' বলা হয়। এই দিনের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন হাদীসে এসেছে; যেমন, "আল্লাহ তা'আলা নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও সমস্ত জগৎকে ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন। এই ছয়দিনের শেষদিন ছিল জুম'আর দিন।"[মুসলিম: ২৭৮৯] আরও এসেছে, "যে দিনগুলোতে সূর্য উদিত হয় তন্মধ্যে সবচেয়ে উত্তম দিন হচ্ছে, জুম'আর দিন। এই দিনেই আদম আলাইহিস্ সালাম সৃজিত হন, এই দিনেই তাকে জান্নাতে দাখিল করা হয় এবং এই দিনেই জান্নাত থেকে পৃথিবীতে নামানো হয়। আর কেয়ামত এই দিনেই সংঘটিত হবে।" [মুসলিম: ৮৫৪] আরও এসেছে, "এই দিনে এমন একটি মুহূর্ত আছে, যাতে মানুষ যে দো'আই করে, তাই কবুল হয়।"[বুখারী: ৯৩৫, মুসলিম: ৮৫২] আল্লাহ তা'আলা প্রতি সপ্তাহে মানবজাতির সমাবেশ ও ঈদের জন্যে এই দিন রেখেছিলেন। কিন্তু পূর্ববর্তী উম্মতরা তা পালন করতে ব্যর্থ হয়। ইয়াহূদীরা 'ইয়াওমুস সাব্‌ত' তথা শনিবারকে নিজেদের সমাবেশের দিন নির্ধারিত করে নেয় এবং নাসারারা রবিবারকে। আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতকে তওফীক দিয়েছেন যে, তারা শুক্রবারকে মনোনীত করেছে। অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আমরা সবশেষে এসেও কিয়ামতের দিন অগ্রণী হব। আমরাই প্রথম জান্নাতে প্রবেশ করব। যদিও তাদেরকে আমাদের আগে কিতাব দেয়া হয়েছিল, আর আমাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের পরে। কিন্তু তারা এতে মতভেদে লিপ্ত হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ্ আমাদেরকে তাদের মতভেদপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পথ দিয়েছেন। এই যে দিনটি, তারা এতে মতভেদ করেছে। অত:পর আল্লাহ্ আমাদেরকে এ দিনের সঠিক হেদায়াত করেছেন। তা হলো, জুম'আর দিন। সুতরাং আজ আমাদের, কাল ইয়াহূদীদের। আর পরশু নাসারাদের।" [বুখারী: ৮৭৬, মুসলিম: ৮৫৫] সম্ভবত ইয়াহূদীদের আলোচনার পর পবিত্র কুরআনের জুম'আর আলোচনার কারণ এটাই যে, তাদের ইবাদতের যুগ শেষ হয়ে যাওয়ায় এখন কেবলমাত্র মুসলিমদের ইবাদতের দিনের প্রতি গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। আর তা হচ্ছে জুম'আর দিন। মূর্খতাযুগে শুক্রবারকে 'ইয়াওমে আরূবা' বলা হত। বলা হয়ে থাকে যে, আরবে কা'ব ইবনে লুয়াই সর্বপ্রথম এর নাম 'ইয়াওমুল জুমু'আ' রাখেন। কারণ, জুম'আ শব্দটির অর্থ একত্রিত করা। এই দিনে কুরাইশদের সমাবেশ হত এবং কাব ইবনে লুয়াই ভাষণ দিতেন। সারকথা এই যে, ইসলাম পূর্বকালেও কা'ব ইবনে লুয়াই-এর আমলে শুক্রবার দিনকে গুরুত্ব দান করা হত। তিনিই এই দিনের নাম জুমআর দিন রেখেছিলেন। কিন্তু সহীহ

الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ⑨

যখন সালাতের জন্য ডাকা হয়[১] তখন তোমরা আল্লাহ্‌র স্মরণে ধাবিত হও [২]এবং কেনা-বেচা ত্যাগ কর,

হাদীসে পাওয়া যায় যে, "আদম আলাইহিস্ সালামের সৃষ্টিকে এই দিন একত্রিত করা হয়েছিল বলেই এই দিনকে জুম'আ নামকরণ করা হয়েছে।" [মুস্তাদরাকে হাকিম: ১/৪১২, নং: ১০২৮, সহীহ ইবনে খুযাইমাহ্ ৩/১১৮, নং: ১৭৩২, ত্বাবরানী: মু'জামুল কাবীর ৬/২৩৭ নং ৬০৯২, মু'জামুল আওসাত্ব: ১/২৫০, নং ৮২১, মাজমাউয যাওয়ায়িদ: ২/৩৯০]

(১) نودي অর্থ যখন ডাকা হয়। এখানে খোতবার আযান বোঝানো হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর,বাগভী] সায়েব ইবনে ইয়াযীদ বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগ, আবু বকর এবং উমরের যুগে জুম'আর দিনে ইমাম যখন মিম্বরে বসত তখন প্রথম আযান দেয়া হত। তারপর যখন উসমান রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর যুগ আসল এবং মানুষ বেড়ে গেল তখন তৃতীয় আহ্বানটি তিনি বাড়িয়ে দেন" [বুখারী: ৯১২]

(২) আয়াতে বর্ণিত فَاسْعَوْا শব্দের এক অর্থ দৌড়ানো এবং অপর অর্থ কোন কাজ গুরুত্ব সহকারে করা। এখানে এই অর্থ উদ্দেশ্য। কারণ, সালাতের জন্যে দৌড়ে আসতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, "প্রশান্তি ও গাম্ভীর্য সহকারে সালাতের জন্যে গমন কর।" [বুখারী: ৬৩৬, মুসলিম: ৬০২] আয়াতের অর্থ এই যে, জুমআর দিনে জুমআর আযান দেয়া হলে আল্লাহর যিকিরের দিকে গুরুত্বসহকারে যাও। অর্থাৎ সালাত ও খোতবার জন্যে মসজিদে যেতে যত্নবান হও। যে ব্যক্তি দৌড় দেয়, সে যেমন অন্য কোন কাজের প্রতি মনোযোগ দেয় না, তোমরাও তেমনি আযানের পর সালাত ও খোতবা ব্যতীত অন্য কাজের দিকে মনোযোগ দিও না। এখানে 'যিক্‌র' বলে জুম'আর সালাত এবং এই সালাতের অন্যতম শর্ত খোতবাও বোঝানো হয়েছে। বহু হাদীসে জুম'আর দিনে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মসজিদে হাযির হওয়ার গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যে জুম'আর দিনে জানাবত তথা অপবিত্র অবস্থা থেকে পবিত্র হওয়ার মত গোসল করবে, তারপর (প্রথম ঘণ্টায়) মসজিদে হাজির হবে সে যেন একটি উট কুরবানী করল। আর যে ব্যক্তি দ্বিতীয় ঘণ্টায় গেল সে যেন গরু কুরবানী করল। যে তৃতীয় ঘন্টায় গেল সে যেন শিংওয়ালা ছাগল কুরবানী করল। যে চতুর্থ ঘন্টায় গেল সে যেন মুরগী উৎসর্গ করল। যে পঞ্চম ঘন্টায় গেল সে যেন ডিম উৎসর্গ করল। তারপর যখন ইমাম বের হয়ে যায় তখন ফেরেশতারা (লিখা বন্ধ করে) ইমামের কাছে হাযির হয়ে যিকর (খুতবা) শুনতে থাকে।" [বুখারী: ৮৮১] তাছাড়া এটা অনেকের নিকট দো'আ কবুল হওয়ার সময়। এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "জুম'আর দিনে এমন একটি সময় আছে কোন মুসলিম যদি সে সময়ে আল্লাহ্‌র কাছে কোন কল্যাণ চায় তবে অবশ্যই তিনি তাকে সেটা দিবেন"। [বুখারী: ৬৪০০]

এটাই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম, যদি তোমরা জানতে।

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوٰةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

১০. অতঃপর সালাত শেষ হলে তোমরা যমীনে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সন্ধান কর ও আল্লাহ্‌কে খুব বেশী স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ۚ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۚ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿١١﴾

১১. আর যখন তারা দেখে ব্যবসা অথবা ক্রীড়া-কৌতুক তখন তারা আপনাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে সেদিকে ছুটে যায়[১]। বলুন, 'আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে তা খেল-তামাশা ও ব্যবসার চেয়ে উৎকৃষ্ট।' আর আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা।

---

(১) এই আয়াতে তাদেরকে হুশিয়ার করা হয়েছে, যারা জুম'আর খোতবা ছেড়ে দিয়ে ব্যবসায়িক কাজ-কারবারে মনোযোগ দিয়েছিল। এক জুমআর দিনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযান্তে খোতবা দিচ্ছিলেন এমন সময় একটি বাণিজ্যিক কাফেলা মদীনার বাজারে উপস্থিত হয়। ফলে অনেক মুসল্লী খোতবা ছেড়ে বাজারে চলে যায় এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কেবল বার জন সাহাবী অবশিষ্ট ছিলেন। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। [বুখারী: ৯৩৬, ২০৫৮, ৪৮৯৯, মুসলিম: ৮৬৩]

৬৩- সূরা আল-মুনাফিকূন
১১ আয়াত, মাদানী

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِذَا جَآءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ ۘ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ ۗ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ ۚ﴿١﴾

১. যখন মুনাফিকরা আপনার কাছে আসে তখন তারা বলে, 'আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চয় আল্লাহ্‌র রাসূল।' আর আল্লাহ্ জানেন যে, আপনি নিশ্চয় তাঁর রাসূল এবং আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী[১]।

(১) কোন কোন বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, এ ঘটনাটি তাবুক যুদ্ধের পরে সংঘটিত হয়েছিল। [আস-সুনানুল কুবরা, নাসায়ী:১১৫৯৭ তিরমিযী: ৩৩১৪] কিন্তু বিশিষ্ট ঐতিহাসিকদের বর্ণনা অনুযায়ী পঞ্চম হিজরীতে 'বনী-মুস্তালিক' যুদ্ধের সময় এ আয়াত সংক্রান্ত ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল। [তিরমিযী: ৩৩১৫, মুসনাদে আহমাদ ৩/৩৯২, ইবনে হাজার: মুকাদ্দিমাহ ফাতহুল বারী ১/২৯৫, ৬/৫৪৭, ইবনে সা'দ: তাবাকাতুল কুবরা: ৪/৩৪৯] আর এটাই সবচেয়ে বিশুদ্ধ মত। কারণ, ঘটনায় বর্ণিত আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে বিরত ছিল। ঘটনাটির সার সংক্ষেপ হল, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনী মুস্তালিক যুদ্ধে বের হওয়ার পর সাহাবায়ে কিরাম পানির ব্যাপারে কষ্ট পাচ্ছিলেন। এরপর যখন মুসলিম মুজাহিদ বাহিনী একটি কূপের কাছে সমবেত ছিল, তখন একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেল। একজন মুহাজির ও একজন আনসারীর মধ্যে পানি ব্যবহার নিয়ে ঝগড়া শুরু হয়ে হাতাহাতির সীমা অতিক্রম করে পারস্পরিক সংঘর্ষের পর্যায়ে পৌঁছে গেল। মুহাজির ব্যক্তি সাহায্যের জন্যে মুহাজিরগণকে এবং আনসারী ব্যক্তি আনসার সম্প্রদায়কে ডাক দিল। উভয়ের সাহায্যার্থে কিছু লোক তৎপরও হয়ে উঠল। এভাবে ব্যাপারটি মুসলিমদের পারস্পরিক সংঘর্ষের কাছাকাছি পৌঁছে গেল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংবাদ পেয়ে অনতিবিলম্বে ঘটনাস্থলে পৌঁছে গেলেন এবং ভীষণ রুষ্ট হয়ে বললেন, مَا بَالُ دَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ অর্থাৎ 'এ কি মূর্খতাযুগের আহ্বান।' দেশ ও বংশগত জাতীয়তাকে ভিত্তি করে সাহায্য ও সহযোগিতার আয়োজন হচ্ছে কেন? তিনি আরও বললেন, دَعُوْهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ 'এই স্লোগান বন্ধ কর। এটা দুর্গন্ধময় স্লোগান।' অর্থাৎ এই দেশ ও বংশগত জাতীয়তা একটা মূর্খতাসুলভ দুর্গন্ধময় স্লোগান। এর ফল জঞ্জাল বাড়ানো ছাড়া কিছুই হয় না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এই উপদেশবাণী শোনামাত্রই ঝগড়া মিটে গেল। এ ব্যাপারে মুহাজির জাহ্জাহ ইবনে সা'দ আল-গিফারী এর বাড়াবাড়ি প্রমাণিত হল। তার হাতে সিনান ইবনে

২. তারা তাদের শপথগুলোকে ঢালরূপে | اِتَّخَذُوْٓا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

ওবরা আল-জুহানী আল-আনসারী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু আহত হয়েছিলেন। ওবাদা ইবনে সামেত রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তাকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে মাফ করিয়ে নিলেন। ফলে ঝগড়াকারী জালেম ও মজলুম উভয়ই পুনরায় ভাই ভাই হয়ে গেল।

মুনাফিকদের যে দলটি যুদ্ধলব্ধ সম্পদের লালসায় মুসলিমদের সাথে আগমন করেছিল। তাদের নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই যখন মুহাজির ও আনসারীর পারস্পরিক সংঘর্ষের খবর পেল, তখন সে একে মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার একটি সুবর্ণ সুযোগ মনে করে নিল। সে মুনাফিকদের এক মজলিসে, যাতে মুমিনদের মধ্যে কেবল যায়েদ ইবনে আরকাম উপস্থিত ছিলেন, আনসারকে মুহাজিরগণের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার উদ্দেশ্যে বলল, তোমরা মুহাজিরদেরকে দেশে ডেকে এনে মাথায় চড়িয়েছ, নিজেদের ধন-সম্পদ ও সহায়-সম্পত্তি তাদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছ। তারা তোমাদের রুটি খেয়ে লালিত হয়ে এখন তোমাদেরই ঘাড় মটকাচ্ছে। যদি তোমাদের এখনও জ্ঞান ফিরে না আসে, তবে পরিণামে এরা তোমাদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলবে। কাজেই তোমরা ভবিষ্যতে টাকা-পয়সা দিয়ে তাদেরকে সাহায্য করো না। এতে তারা আপনা-আপনি ছত্রভঙ্গ হয়ে চলে যাবে। এখন তোমাদের কর্তব্য এই যে, মদীনায় ফিরে গিয়ে সম্মানীরা বহিরাগত এসব বাজে লোকদের বহিষ্কার করে দিবে। সম্মানী বলে তার উদ্দেশ্য ছিল নিজের দল ও আনসার এবং বাজে লোক বলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুহাজির সাহাবায়ে কেরাম। যায়েদ ইবনে আরকাম রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এ কথা শোনা মাত্রই বলে উঠলেনঃ আল্লাহর কসম, তুই-ই বাজেলোক লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত। পক্ষান্তরে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ প্রদত্ত শক্তিবলে এবং মুসলিমদের ভালবাসার জোরে মহাসম্মানী।

যায়েদ ইবনে আরকাম রাদিয়াল্লাহু 'আনহু মজলিস থেকে উঠে সোজা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে গেলেন এবং আদ্যোপান্ত ঘটনা তাকে বলে শোনালেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে সংবাদটি খুবই গুরুতর মনে হল। মুখমণ্ডলে পরিবর্তনের রেখা ফুটে উঠল। যায়েদ ইবনে আরকাম রাদিয়াল্লাহু 'আনহু অল্পবয়স্ক সাহাবী ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেনঃ বৎস দেখ, তুমি মিথ্যা বলছ না তো? যায়েদ কসম খেয়ে বললেনঃ না আমি নিজ কানে এসব কথা শুনেছি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার বললেনঃ তোমার কোনরূপ বিভ্রান্তি হয় নি তো? যায়েদ উত্তরে পূর্বের কথাই বললেন। এরপর মুনাফিক সরদারের এই কথা গোটা মুসলিম বাহিনীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। তাদের মধ্যে এছাড়া আর কোন আলোচনাই রইল না। এদিকে সব আনসার যায়েদ ইবনে আরকাম রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-কে তিরস্কার করতে লাগলেন যে, তুমি সম্প্রদায়ের নেতার বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করেছ এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করেছ। যায়েদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেনঃ

ব্যবহার করে, ফলে তারা আল্লাহ্‌র পথ	إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

আল্লাহর কসম, সমগ্র খাযরাজ গোত্রের মধ্যে আমার কাছে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই অপেক্ষা অধিক প্রিয় কেউ নেই। কিন্তু যখন সে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিরুদ্ধে এসব কথাবার্তা বলেছে, তখন আমি সহ্য করতে পারিনি। যদি আমার পিতাও এমন কথা বলত তবে আমি তাও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর গোচরীভূত করতাম।

অপরদিকে ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এসে আরয করলেনঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমাকে অনুমতি দিন আমি এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেই। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এ কথা বলেছিলেনঃ আপনি আব্বাদ ইবনে বিশরকে আদেশ করুন, সে তার মস্তক কেটে আপনার সামনে উপস্থিত করুক। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ ওমর, এর কি প্রতিকার যে, মানুষের মধ্যে খ্যাত হয়ে যাবে আমি আমার সাহাবীকে হত্যা করি। অতঃপর তিনি ইবনে উবাইকে হত্যা করতে বারণ করে দিলেন। এই ঘটনার পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণ অভ্যাসের বিপরীতে অসময়ে সফর শুরু করার কথা ঘোষণা করে দিলেন এবং নিজে 'কাসওয়া' উষ্ট্রীর পিঠে সওয়ার হয়ে গেলেন। যখন সাহাবায়ে কেরাম রওয়ানা হয়ে গেলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে ডেকে এনে বললেনঃ তুমি কি বাস্তবিকই এরূপ কথা বলেছ? সে অনেক কসম খেয়ে বললঃ আমি কখনও এরূপ কথা বলিনি। এই বালক (যায়েদ ইবনে আরকাম) মিথ্যাবাদী। স্বগোত্রে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। তারা সবাই স্থির করল যে, সম্ভবতঃ যায়েদ ইবনে আরকাম রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ভুল বুঝেছে। আসলে ইবনে উবাই এ কথা বলেনি।

মোটকথা, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের কসম ও ওযর কবুল করে নিলেন। এদিকে জনগণের মধ্যে যায়েদ ইবনে আরকাম রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর বিরুদ্ধে ক্রোধ ও তিরষ্কার আরও তীব্র হয়ে গেল। তিনি এই অপমানের ভয়ে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে লাগলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমগ্র মুজাহিদ বাহিনীসহ সারাদিন ও সারারাত সফর করলেন এবং পরের দিন সকালেও সফর অব্যাহত রাখলেন। অবশেষে যখন সূর্যকিরণ প্রখর হতে লাগল, তখন তিনি কাফেলাকে এক জায়গায় থামিয়ে দিলেন। পূর্ণ একদিন একরাত সফরের ফলে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত সাহাবায়ে কেরাম মনযিলে অবস্থানের সাথে সাথে নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লেন।

বর্ণনাকারী বলেনঃ সাধারণ অভ্যাসের বিপরীতে তাৎক্ষণিক ও অসময়ে সফর করা এবং সুদীর্ঘকাল সফর অব্যাহত রাখার পিছনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উদ্দেশ্য ছিল আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের ঘটনা থকে উদ্ভূত জল্পনা-কল্পনা হতে মুজাহিদদের দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে নেয়া, যাতে এ সম্পর্কিত চর্চার

থেকে মানুষকে নিবৃত্ত করে। তারা যা করে, নিশ্চয় তা কতই না মন্দ!

৩. এটা এজন্য যে, তারা ঈমান আনার পর কুফরী করেছে। ফলে তাদের হৃদয় মোহর করে দেয়া হয়েছে; তাই

ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا فَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ﴿٣﴾

অবসান ঘটে।

এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুণরায় সফর শুরু করলেন। ইতোমধ্যে উবাদা ইবনে সামেত রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে উপদেশচ্ছলে বললেনঃ তুমি এক কাজ কর। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে উপস্থিত হয়ে অপরাধ স্বীকার করে নাও। তিনি তোমার জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করবেন। এতে তোমার মুক্তি হয়ে যেতে পারে। ইবনে উবাই এই উপদেশ শুনে মাথা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল। ওবাদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তখনই বললেনঃ আমার মনে হয়, তোমার এই বিমুখতা সম্পর্কে অবশ্যই কুরআনের আয়াত নাযিল হবে।

এদিকে সফর চলাকালে যায়েদ ইবনে আরকাম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বার বার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে আসতেন। তার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, এই মুনাফিক লোকটি আমাকে মিথ্যাবাদী বলে গোটা সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্ন করেছেন। অতএব আমার সত্যায়ন ও এই ব্যক্তির মিথ্যার মুখোশ উন্মোচন সম্পর্কে অবশ্যই কুরআন নাযিল হবে। হঠাৎ যায়েদ ইবনে আরকাম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু দেখলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মধ্যে ওহী অবতরণকালীন লক্ষণাদি ফুটে উঠছে। তার শ্বাস ফুলে উঠছে, কপাল ঘর্মাক্ত হয়ে যাচ্ছে এবং তার উষ্ট্রী বোঝার ভারে নুয়ে পড়ছে। যায়েদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু আশাবাদী হলেন যে, এখন এ সম্পর্কে কোন ওহী নাযিল হবে। অবশেষে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই অবস্থা দূর হয়ে গেল। যায়েদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেনঃ আমার সওয়ারী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছ ঘেঁষে যাচ্ছিল। তিনি নিজের সওয়ারীর উপর থেকে আমার কান ধরলেন এবং বললেন, “হে বালক, আল্লাহ তা'আলা তোমার কথার সত্যায়ন করেছেন”। আর সম্পূর্ণ সূরা আল-মুনাফিকুন আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের ঘটনা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। [পুরো ঘটনাটি কোথাও একত্রে বর্ণিত হয়নি। ভিন্ন ভিন্ন অংশ হিসেবে নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহ দেখা যেতে পারে। বুখারী: ৪৯০০, ৪৯০২, ৪৯০৫, মুসলিম: ২৫৮৪, ২৭৭২, নাসায়ী, ৯৭৭, তিরমিযী: ৩৩১২, ৩৩১৩, ৩৩১৪, ৩৩১৫, মুসনাদে আবি ইয়া'লা: ১৮২৪, মুসনাদে আহমাদ: ৩/৩৩৮, ৪/৩৬৮,৩৭৩, ইবনে হিব্বান: ৫৯৯০, দালায়েলুন নাবুওয়ত লিল বাইহাকী: ৪/৫৩-৫৫, সীরাতে ইবনে হিশাম: ৩/৬৯, সীরাতে ইবনে কাসীর: ৩/১০৩]

তারা বুঝতে পারছে না ।

وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون ④

৪. আর আপনি যখন তাদের দিকে তাকান তাদের দেহের আকৃতি আপনার কাছে প্রীতিকর মনে হবে এবং তারা যখন কথা বলে, আপনি আগ্রহের সাথে তাদের কথা শুনে থাকেন । তারা দেয়ালে ঠেকান কাঠের খুঁটির মতই; তারা যে কোন আওয়াজকেই তাদের বিরুদ্ধে মনে করে । তারাই শত্রু, অতএব তাদের সম্পর্কে সতর্ক হোন; আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করুন! তাদেরকে কোথায় ফিরানো হচ্ছে!

وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رءوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون ⑤

৫. আর যখন তাদেরকে বলা হয়, ‘তোমরা আস, আল্লাহ্‌র রাসূল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন’ তখন তারা মাথা নেড়ে অস্বীকৃতি জানায়, আর আপনি তাদেরকে দেখতে পাবেন, অহংকারবশত ফিরে যেতে ।

سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين ⑥

৬. আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন বা না করুন, উভয়ই তাদের জন্য সমান । আল্লাহ্ তাদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না । নিশ্চয় আল্লাহ্ ফাসিক সম্প্রদায়কে হেদায়াত দেন না ।

هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون ⑦

৭. তারাই বলে, ‘তোমরা আল্লাহ্‌র রাসূলের সহচরদের জন্য ব্যয় করো না, যাতে তারা সরে পড়ে ।’ অথচ আসমানসমূহ ও যমীনের ধন-ভাণ্ডার তো আল্লাহ্‌রই; কিন্তু মুনাফিকরা তা

বুঝে না[১]।

৮. তারা বলে, 'আমরা মদীনায় ফিরে আসলে সেখান থেকে শক্তিশালীরা অবশ্যই দুর্বলদেরকে বের করে দেবে[২]।' অথচ শক্তি-সম্মান তো আল্লাহ্‌রই, আর তাঁর রাসূল ও মুমিনদের। কিন্তু মুনাফিকরা এটা জানে না।

يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَآ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَّ ۚ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِۦ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٨﴾

দ্বিতীয় রুকূ'

৯. 'হে মুমিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র স্মরণে উদাসীন না করে। আর যারা এরূপ উদাসীন হবে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত[৩]।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَٰلُكُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ ﴿٩﴾

(১) মুহাজির জাহ্‌জাহ্ ইবনে সা'দ আল-গিফারী ও আনসারী সিনান ইবনে ওবরাহ্‌র ঝগড়ার সময় আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-ই এ কথা বলেছিল। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এর জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, নির্বোধরা মনে করে মুহাজিরগণ তাদের দান-খয়রাতের মুখাপেক্ষী এবং ওরাই তাদের অন্ন যোগায়। অথচ সমগ্র নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের ধন-ভাণ্ডার আল্লাহর হাতে। তিনি ইচ্ছা করলে মুহাজিরগণকে তোমাদের কোন সাহায্য ছাড়াই সবকিছু দিতে পারেন। ইবনে উবাইয়ের এরূপ মনে করা নির্বুদ্ধিতা ও বোকামীর পরিচায়ক। তাই আল্লাহ্ তা'আলা এ স্থলে "তারা বোঝেনা" বলে বুঝিয়েছেন যে, যে এরূপ মনে করে, সে বেওকুফ ও নির্বোধ। [দেখুন- কুরতুবী,ফাতহুল কাদীর]

(২) এটাও ইবনে উবাইয়ের উক্তি। [কুরতুবী,ফাতহুল কাদীর]

(৩) এখানে আল্লাহ্ তা'আলা খাঁটি মুমিনদেরকে সম্বোধন করে সতর্ক করছেন যে, তোমরা মুনাফিকদের ন্যায় দুনিয়ার মহব্বতে মগ্ন হয়ে যেয়ো না। যেসব বিষয় মানুষকে দুনিয়াতে আল্লাহ থেকে গাফেল করে, তন্মধ্যে দুটি সর্ববৃহৎ-ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি। তাই এই দুটির নাম উল্লেখ করা হয়েছে। নতুবা দুনিয়ার যাবতীয় ভোগ-সম্ভারই উদ্দেশ্য। আয়াতের সারমর্ম এই যে, ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততির মহব্বত সর্বাবস্থায় নিন্দনীয় নয়। কিন্তু সর্বদা এই সীমানার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে যে, এসব বস্তু যেন মানুষকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল না করে দেয়। এখানে 'আল্লাহর স্মরণের' অর্থ কোন কোন তফসীরবিদের মতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, কারও মতে হজ ও যাকাত

وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠﴾

১০. আর আমরা তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তোমরা তা থেকে ব্যয় করবে তোমাদের কারও মৃত্যু আসার আগে। (অন্যথায় মৃত্যু আসলে সে বলবে,) 'হে আমার রব! আমাকে আরো কিছু কালের জন্য অবকাশ দিলে আমি সাদাকাহ্ দিতাম ও সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হতাম![1]'

وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١١﴾

১১. আর যখন কারো নির্ধারিত কাল উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ্ তাকে কিছুতেই অবকাশ দেবেন না। তোমরা যা আমল কর আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

এবং কারও মতে কুরআন। হাসান বসরী রাহেমাহুল্লাহ বলেনঃ স্মরণের অর্থ এখানে যাবতীয় আনুগত্য ও ইবাদত। [কুরতুবী,ফাতহুল কাদীর]

(১) এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করল, 'কোন সদকায় সর্বাধিক সওয়াব পাওয়া যায়? তিনি বললেনঃ "যে সদকা সুস্থ অবস্থায় এবং ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য করে- অর্থ ব্যয় করে ফেললে নিজেই দরিদ্র হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকা অবস্থায় করা হয়।" তিনি আরও বললেনঃ "আল্লাহর পথে ব্যয় করাকে সেই সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করো না যখন আত্মা তোমার কণ্ঠনালীতে এসে যায় এবং তুমি মরতে থাক আর বলঃ এই পরিমাণ অর্থ অমুককে দিয়ে দাও, এই পরিমাণ অর্থ অমুক কাজে ব্যয় কর।" [বুখারীঃ ১৩৫৩, মুসলিমঃ ১০৩২, মুসনাদে আহমাদঃ ১/৩৯৬]

৬৪- সূরা আত-তাগাবুন
১৮ আয়াত, মাদানী

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্র নামে ।।

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۖ لَهُ ٱلۡمُلۡكُ وَلَهُ ٱلۡحَمۡدُۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ ①

১. আসমানসমূহে যা কিছু আছে এবং যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে, আধিপত্য তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই; আর তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمۡ فَمِنكُمۡ كَافِرٞ وَمِنكُم مُّؤۡمِنٞۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٌ ②

২. তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ হয় কাফির এবং তোমাদের মধ্যে কেউ হয় মুমিন[১]। আর তোমরা যে আমল কর আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা।

خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ بِٱلۡحَقِّ وَصَوَّرَكُمۡ فَأَحۡسَنَ صُوَرَكُمۡۖ وَإِلَيۡهِ ٱلۡمَصِيرُ ③

৩. তিনি সৃষ্টি করেছেন আসমানসমূহ ও যমীন যথাযথভাবে এবং তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর তোমাদের আকৃতি করেছেন সুশোভন[২]। আর ফিরে যাওয়া তো তাঁরই কাছে।

يَعۡلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَيَعۡلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعۡلِنُونَۚ وَٱللَّهُ عَلِيمُۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ④

৪. আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে সমস্তই তিনি জানেন এবং তিনি জানেন তোমরা যা গোপন কর ও তোমরা যা প্রকাশ কর। আর আল্লাহ্

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রতিটি মানুষই সেটার উপরই পুনরুত্থিত হবে, যার উপর তার মৃত্যু হয়। [মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৪৯০]

(২) যেমন অন্য আয়াতে এসেছে,“হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহান রব সম্পর্কে বিভ্রান্ত করল? যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুঠাম করেছেন এবং সুসামঞ্জস্য করেছেন, যে আকৃতিতে চেয়েছেন, তিনি তোমাকে গঠন করেছেন।” [সূরা আল-ইনফিতার: ৬-৮]

অন্তরসমূহে যা কিছু আছে সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানী ।

৫. ইতোপূর্বে যারা কুফরী করেছে তাদের বৃত্তান্ত কি তোমাদের কাছে পৌঁছেনি? অতঃপর তারা তাদের কাজের মন্দ ফল আস্বাদন করেছিল । আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ।

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝٥

৬. তা এজন্য যে, তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ আসত তখন তারা বলত, 'মানুষই কি আমাদেরকে পথের সন্ধান দেবে?' অতঃপর তারা কুফরী করল ও মুখ ফিরিয়ে নিল । আল্লাহ্ও (তাদের ঈমানের ব্যাপারে) ভ্রুক্ষেপহীন হলেন; আর আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, সপ্রশংসিত ।

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوا ۚ وَّاسْتَغْنَى اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝٦

৭. কাফিররা ধারণা করে যে, তাদেরকে কখনো পুনরুত্থিত করা হবে না । বলুন, 'অবশ্যই হ্যাঁ, আমার রবের শপথ! তোমাদেরকে অবশ্যই পুনরুত্থিত করা হবে । তারপর তোমরা যা করতে সে সম্বন্ধে তোমাদেরকে অবশ্যই অবহিত করা হবে । আর এটা আল্লাহ্‌র পক্ষে সহজ ।'

زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا ۚ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ۚ وَذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝٧

৮. অতএব তোমরা আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও যে নূর আমরা নাযিল করেছি তাতে ঈমান আন[১] । আর তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত ।

فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝٨

(১) এখানে নূর বা জ্যোতি বলে কুরআনকে বোঝানো হয়েছে । [কুরতুবী]

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ۗ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۗ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٩﴾

৯. স্মরণ করুন, যেদিন তিনি তোমাদেরকে সমবেত করবেন সমাবেশ দিনে সেদিন হবে লোকসানের দিন[১]। আর যে আল্লাহর উপর ঈমান রাখে এবং সৎকাজ করে তিনি তার পাপসমূহ মোচন করবেন এবং তাকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতসমূহে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা হবে চিরস্থায়ী। এটাই মহাসাফল্য।

---

(১) যেদিন আল্লাহ তোমাদেরকে একত্রিত করবেন একত্রিত করার দিবসে। এই দিনটি হবে লোকসানের। ﴿لِيَوْمِ الْجَمْعِ﴾ বা একত্রিত হওয়ার দিবস ও ﴿يَوْمُ التَّغَابُنِ﴾ লোকসানের দিবস- এই উভয়টি কেয়ামতের নাম। একত্রিত হওয়ার দিন এ কারণে যে, সেদিন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল জিন এবং মানবকে হিসাব-নিকাশের জন্যে একত্রিত করা হবে। [ইবন কাসীর] পক্ষান্তরে التغابن শব্দটি غبن থেকে উৎপন্ন। এর অর্থ লোকসান। আর্থিক লোকসান এবং মত ও বুদ্ধির লোকসান উভয়কে غبن বলা হয়। تغابن শব্দটি আভিধানিক দিক দিয়ে দুই তরফা কাজের জন্যে বলা হয়, অর্থাৎ একজন অন্যজনের এবং অন্যজন তার লোকসান করবে, অথবা তার লোকসান প্রকাশ করবে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ "যে ব্যক্তির কাছে কারও কোন পাওনা থাকে, তার উচিত দুনিয়াতেই তা পরিশোধ করে অথবা মাফ করিয়ে নিয়ে মুক্ত হয়ে যাওয়া। নতুবা কেয়ামতের দিন দিরহাম ও দীনার থাকবে না। কারও কোন দাবি থাকলে তা সে ব্যক্তির সৎকর্ম দিয়ে পরিশোধ করা হবে। সৎকর্ম শেষ হয়ে গেলে পাওনাদারের গোনাহ প্রাপ্য পরিমাণে তার ওপর চাপিয়ে দেয়া হবে।" [বুখারী: ২৪৪৯] ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা ও অন্যান্য তফসীরবিদ কেয়ামতকে লোকসানের দিবস বলার উপরোক্ত কারণই বর্ণনা করেছেন। আবার অনেকের মতে সেদিন কেবল কাফের, পাপাচারী ও হতভাগাই লোকসান অনুভব করবে না; বরং সৎকর্মপরায়ণ মুমিনগণও এভাবে লোকসান অনুভব করবে যে, হায়! আমরা যদি আরও বেশি সৎকর্ম করতাম, তবে জান্নাতের সুউচ্চ মর্তবা লাভ করতাম। সেদিন প্রত্যেকেই জীবনের সেই সময়ের জন্যে পরিতাপ করবে; যা অযথা ব্যয় করেছে। হাদীসে আছে, "যে ব্যক্তি কোন মজলিসে বসে এবং সমগ্র মজলিসে আল্লাহকে স্মরণ না করে, কেয়ামতের দিন সেই মজলিস তার জন্য পরিতাপের কারণ হবে।" [৪৮৫৮] অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে, "কোন জান্নাতী জান্নাতে প্রবেশের পর তাকে জাহান্নামে তার জন্য যে জায়গা রাখা হয়েছিল তা দেখানো হবে ফলে তার কৃতজ্ঞতা বেড়ে যাবে, পক্ষান্তরে কোন জাহান্নামী জাহান্নামে প্রবেশ করলে তাকে জান্নাতে তার জন্য যে স্থান ছিল তা দেখানো হবে, ফলে তার আফসোস বেড়ে যাবে।" [বুখারী: ৬৫৬৯]

১০. কিন্তু যারা কুফরী করে এবং আমাদের (আয়াত) নিদর্শনসমূহে মিথ্যারোপ করে তারাই আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। কত মন্দ সে ফিরে যাওয়ার স্থান!

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٠﴾

দ্বিতীয় রুকূ'

১১. আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া কোন বিপদই আপতিত হয় না এবং কেউ আল্লাহ্‌র উপর ঈমান রাখলে তিনি তার অন্তরকে সুপথে পরিচালিত করেন। আর আল্লাহ্ সবকিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত।

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾

১২. আর তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর; অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে আমাদের রাসূলের দায়িত্ব শুধু স্পষ্টভাবে প্রচার করা।

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿١٢﴾

১৩. আল্লাহ্, তিনি ছাড়া কোন সত্য ইলাহ্ নেই; আর আল্লাহ্‌র উপরই মুমিনগণ যেন তাওয়াক্কুল করে।

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٣﴾

১৪. 'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের স্ত্রী-স্বামী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু; অতএব তাদের সম্পর্কে তোমরা সতর্ক থেকো[১]।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ۚ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤﴾

---

(১) বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে যে, এই আয়াত সেই মুসলিমদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা হিজরতের পর মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে হিজরত করে চলে যেতে মনস্থ করে, কিন্তু তাদের পরিবার-পরিজনরা তাদেরকে হিজরত করতে বাধা দেয়। তারপর তারা যখন হিজরত করে মদীনা আসে তখন দেখতে পায় যে, লোকেরা তাদের আগেই দ্বীনের ফিকহ শিক্ষায় অগ্রণী হয়ে গেছে। তখন তাদের খুব আফসোস হয়। [তিরমিযী: ৩৩১৭] তাছাড়া

আর যদি তোমরা তাদেরকে মার্জনা কর, তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা কর এবং তাদেরকে ক্ষমা কর, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ।

إِنَّمَآ أَمۡوَٰلُكُمۡ وَأَوۡلَٰدُكُمۡ فِتۡنَةٞۚ وَٱللَّهُ عِندَهُۥٓ أَجۡرٌ عَظِيمٞ ١٥

১৫. তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো পরীক্ষা বিশেষ; আর আল্লাহ্, তাঁরই কাছে রয়েছে মহাপুরস্কার ।

فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ وَٱسۡمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيۡرٗا لِّأَنفُسِكُمۡۗ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفۡسِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ١٦

১৬. সুতরাং তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বন কর, শ্রবণ কর, আনুগত্য কর এবং ব্যয় কর তোমাদের নিজেদেরই কল্যাণের জন্য; আর যাদেরকে অন্তরের কার্পণ্য হতে রক্ষা করা হয়; তারাই তো সফলকাম ।

إِن تُقۡرِضُواْ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنٗا يُضَٰعِفۡهُ لَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡۚ وَٱللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ١٧

১৭. যদি তোমরা আল্লাহ্কে উত্তম ঋণ দান কর তিনি তোমাদের জন্য তা বহু গুণ বৃদ্ধি করবেন এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন । আর আল্লাহ্ গুণগ্রাহী, পরম সহিষ্ণু ।

عَٰلِمُ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ١٨

১৮. তিনি গায়েব ও উপস্থিত যাবতীয় বিষয়ের জ্ঞানী, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় ।

সন্তান-সন্ততির কারণে মানুষ অনেক মহৎ কাজ থেকেও বিরত হতে বাধ্য হয় । হাদীসে এসেছে, বুরাইদা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুৎবা দিচ্ছিলেন, ইত্যবসরে হাসান ও হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা) সেখানে উপস্থিত হলেন, তাদের গায়ে দুটি লাল রংয়ের কাপড় ছিল । তারা হাঁটছিলেন আর হোঁচট খেয়ে পড়ছিলেন । রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের এ অবস্থা দেখে মিম্বর থেকে নেমে এসে তাদেরকে তার সামনে বসালেন তারপর বললেন, আল্লাহ্ সত্য বলেছেন, "তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো পরীক্ষা বিশেষ" । এ বাচ্চা দু'টিকে হাঁটার সময় হোঁচট খেতে দেখে আমি স্থির থাকতে পারলাম না । ফলে আমি আমার কথা বন্ধ করে তাদেরকে উঠিয়ে নিলাম ।" [তিরমিযী: ৩৭৭৪, ইবনে মাজাহ, ৩৬০০]

৬৫- সূরা আত-তালাক
১২ আয়াত, মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

يَٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْرًا ①

১. হে নবী! তোমরা যখন তোমাদের স্ত্রীগণকে তালাক দিতে ইচ্ছে কর তাদেরকে তালাক দিও ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে[১] এবং তোমরা ইদ্দতের হিসেব রেখো। আর তোমাদের রব আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন করো। তোমরা তাদেরকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে বহিস্কার করো না[২] এবং তারাও বের হবে না, যদি না তারা লিপ্ত হয় স্পষ্ট অশ্লীলতায়[৩]। আর এগুলো

(১) আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বর্ণনা করেন যে, তিনি তার স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দিয়েছিলেন। ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এ কথা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর গোচরীভূত করলে তিনি খুব নারায হয়ে বললেনঃ তার উচিত হায়েয অবস্থায় তালাক প্রত্যাহার করে নেয়া এবং স্ত্রীকে বিবাহে রেখে দেয়া। (তালাকটি রাজ'য়ী তালাক ছিল, যাতে প্রত্যাহারের সুযোগ থাকে) এই হায়েয থেকে পবিত্র হওয়ার পর আবার যখন স্ত্রীর হায়েয হবে এবং তা থেকে পবিত্র হবে, তখন যদি তালাক দিতেই চায়, তবে সহবাসের পূর্বে পবিত্র অবস্থায় তালাক দিবে। এই ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে তালাক প্রদানের আদেশই আল্লাহ তা'আলা (আলোচ্য) আয়াতে দিয়েছেন। [বুখারী: ৫২৫১, মুসলিম: ১৪৭১]

(২) এখানে ইদ্দত অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে কি ব্যবহার করতে হবে তা জানিয়ে দেয়া হচ্ছে, বলা হচ্ছে, স্ত্রীদেরকে তাদের গৃহ থেকে বহিষ্কার করো না। এখানে তাদের গৃহ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যে পর্যন্ত তাদের বসবাসের হক পুরুষের দায়িত্বে থাকে, সেই পর্যন্ত গৃহে তাদের অধিকার আছে। [দেখুন-ইবন কাসীর]

(৩) প্রকাশ্য নির্লজ্জ কাজ বলে কি বোঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে তিন প্রকার উক্তি বর্ণিত আছে। (এক) নির্লজ্জ কাজ বলে খোদ গৃহ থেকে বের হয়ে যাওয়াই বোঝানো হয়েছে। এমতাবস্থায় এটা দৃশ্যত ব্যতিক্রম, যার উদ্দেশ্য গৃহ থেকে বের হওয়ার অনুমতি দেয়া নয়; বরং নিষেধাজ্ঞাকে আরও জোরদার করা। অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীরা তাদের স্বামীর গৃহ থেকে বের হবে না, কিন্তু যদি তারা অশ্লীলতায়ই মেতে উঠে ও বের হয়ে পড়ে তবে সে গুণাহগার হবে। সুতরাং এর অর্থ বের হয়ে যাওয়ার

আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা; যে আল্লাহ্‌র সীমা লঙ্ঘন করে সে নিজেরই উপর অত্যাচার করে। আপনি জানেন না, হয়ত আল্লাহ্ এর পর কোন উপায় করে দেবেন।

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

২. অতঃপর তাদের ইদ্দত পূরণের কাল আসন্ন হলে তোমরা হয় যথাবিধি তাদেরকে রেখে দেবে, না হয় তাদেরকে যথাবিধি পরিত্যাগ করবে এবং তোমাদের মধ্য থেকে দুজন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে; আর তোমরা আল্লাহ্‌র জন্য সঠিক সাক্ষ্য দেবে। এ দ্বারা তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের উপর ঈমান রাখে তাকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে। আর যে কেউ আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন করে আল্লাহ্ তার জন্য (উত্তরণের) পথ করে দেবেন,

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٣﴾

৩. এবং তিনি তাকে তার ধারণাতীত উৎস হতে দান করবেন রিযিক। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল করে তার জন্য আল্লাহ্‌ই

বৈধতা নয়; বরং আরও বেশি নিন্দা ও নিষিদ্ধতা প্রমাণ করা। (দুই) নির্লজ্জ কাজ বলে ব্যভিচার বোঝানো হয়েছে। এমতাবস্থায় ব্যতিক্রম যথার্থ অর্থেই বুঝতে হবে। অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী ব্যভিচার করলে এবং অপরাধ প্রমাণিত হলে তার প্রতি শরী'আতের শাস্তি প্রয়োগ করার জন্যে অবশ্যই তাকে ইদ্দতের গৃহ থেকে বের করা হবে। (তিন) নির্লজ্জ কাজ বলে কটু কথাবার্তা, ঝগড়া-বিবাদ বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ হবে এই যে, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদেরকে তাদের গৃহ থেকে বহিষ্কার করা জায়েয নয়। কিন্তু যদি যারা কটুভাষিণী ও ঝগড়াটে হয় এবং স্বামীর আপনজনদের সাথে দুর্ব্যবহার করে, তবে তাদেরকে ইদ্দতের গৃহ থেকে বহিষ্কার করা যাবে। [দেখুন-কুরতুবী,বাগভী]

যথেষ্ট[১]। আল্লাহ্ তাঁর ইচ্ছে পূরণ করবেনই; অবশ্যই আল্লাহ্ সবকিছুর জন্য স্থির করেছেন সুনির্দিষ্ট মাত্রা।

৪. তোমাদের যে সব স্ত্রী আর ঋতুবর্তী হওয়ার আশা নেই[২] তাদের ইদ্দত সম্পর্কে তোমরা সন্দেহ করলে তাদের ইদ্দতকাল হবে তিন মাস এবং যারা এখনো ঋতুর বয়সে পৌঁছেনি তাদেরও; আর গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত। আর যে আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন করে আল্লাহ্ তার জন্য তার কাজকে সহজ করে দেন।

وَالّٰٓـِٔيْ يَىِٕسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَآىِٕكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ ۙ وَّالّٰٓـِٔيْ لَمْ يَحِضْنَ ؕ وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ؕ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا ④

৫. এটা আল্লাহ্‌র বিধান যা তিনি তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন। আর যে আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন করে

ذٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ اَنْزَلَهٗۤ اِلَيْكُمْ ؕ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُعْظِمْ لَهٗۤ اَجْرًا ⑤

(১) তিরমিযী ও ইবনে মাজায় বর্ণিত ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যদি তোমরা আল্লাহর ওপর যথাযথ ভরসা করতে, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে পাখির ন্যায় রিযিক দান করতেন। পাখি সকাল বেলায় ক্ষুধার্ত অবস্থায় বাসা থেকে বের হয়ে যায় এবং সন্ধ্যায় উদরপূর্তি করে ফিরে আসে।" [মুসনাদে আহমাদ: ১/৩০, তিরমিযী: ২৩৪৪, ইবনে মাজাহ: ৪১৬৪] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেনঃ আমার উম্মত থেকে সত্তর হাজার লোক বিনাহিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের অন্যতম গুণ এই যে, তারা আল্লাহর ওপর ভরসা করবে। [বুখারী: ৫৭০৫, মুসলিম: ২১৮, মুসনাদে আহমা: ১/৪০১]

(২) এ আয়াতে তালাকে ইদ্দতের আরও কিছু অবস্থা ও তার হুকুম আহকাম বর্ণিত হচ্ছে, সাধারণ অবস্থায় তালাকের ইদ্দত পূর্ণ তিন হায়েয। কিন্তু যেসব মহিলার বয়োঃবৃদ্ধি অথবা কোন রোগ ইত্যাদির কারণে হায়েয আসা বন্ধ হয়ে গেছে, এমনিভাবে যেসব মহিলার বয়স না হওয়ার কারণে এখনও হায়েয আসা শুরু হয়নি তাদের ইদ্দত আলোচ্য আয়াতে তিন হায়েযের পরিবর্তে তিন মাস নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং গর্ভবতী স্ত্রীদের ইদ্দত সন্তানপ্রসব সাব্যস্ত করা হয়েছে, তা যতদিনেই হোক। [ফাতহুল কাদীর]

তিনি তার পাপসমূহ মোচন করে দেন এবং তাকে দেবেন মহাপুরস্কার ।

৬. তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেরূপ ঘরে তোমরা বাস কর তাদেরকেও সেরূপ ঘরে বাস করতে দেবে; তাদেরকে উত্ত্যক্ত করবে না সংকটে ফেলার জন্য; আর তারা গর্ভবতী হয়ে থাকলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাদের জন্য ব্যয় করবে । অতঃপর যদি তারা তোমাদের সন্তানদেরকে স্তন্য দান করে তবে তাদেরকে পারিশ্রমিক দেবে এবং (সন্তানের কল্যাণ সম্পর্কে) তোমরা সংগতভাবে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ কর । আর তোমরা যদি নিজ নিজ দাবীতে অনমনীয় হও তাহলে অন্য নারী পিতার পক্ষে স্তন্য দান করবে ।

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ
وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ
فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن
تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ ٦

৭. বিত্তবান নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে এবং যার জীবনোপকরণ সীমিত সে আল্লাহ্ যা দান করেছেন তা থেকে ব্যয় করবে । আল্লাহ্ যাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন তার চেয়ে গুরুতর বোঝা তিনি তার উপর চাপান না । অবশ্যই আল্লাহ্ কষ্টের পর দেবেন স্বস্তি ।

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ
فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ٧

দ্বিতীয় রুকূ’

৮. আর বহু জনপদ তাদের রব ও তাঁর রাসূলগণের নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল । ফলে আমরা তাদের কাছ থেকে কঠোর হিসেব নিয়েছিলাম এবং তাদেরকে দিয়েছিলাম কঠিন শাস্তি ।

وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا
حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُّكْرًا ٨

৯. ফলে তারা তাদের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করল; আর ক্ষতিই ছিল তাদের কাজের পরিণাম।

فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ﴿٩﴾

১০. আল্লাহ্ তাদের জন্য কঠোর শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর, হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! যারা ঈমান এনেছ। অবশ্যই আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন এক উপদেশ---

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ۚ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿١٠﴾

১১. এক রাসূল, যে তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করে, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করে তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোতে বের করে আনার জন্য। আর যে কেউ আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনবে এবং সৎকাজ করবে তিনি তাকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে; আল্লাহ্ তো তাকে উত্তম রিযিক দেবেন।

رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا ﴿١١﴾

১২. তিনি আল্লাহ্, যিনি সৃষ্টি করেছেন সাত আসমান এবং অনুরূপ যমীন, তাদের মধ্যে নেমে আসে তাঁর নির্দেশ; যাতে তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ্ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান এবং জ্ঞানে আল্লাহ্ সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন।

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿١٢﴾

৬৬- সূরা আত-তাহ্‌রীম
১২ আয়াত, মাদানী

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. হে নবী! আল্লাহ্ আপনার জন্য যা বৈধ করেছেন আপনি তা নিষিদ্ধ করছেন কেন? আপনি আপনার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি চাচ্ছেন(১); আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ।

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ ۚ تَبْتَغِيْ مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ①

২. অবশ্যই আল্লাহ্ তোমাদের কসম হতে মুক্তি লাভের ব্যবস্থা করেছেন । আর আল্লাহ্ তোমাদের অভিভাবক এবং তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় ।

قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ ۚ وَاللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ②

---

(১) বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যহ নিয়মিতভাবে আসরের পর দাঁড়ানো অবস্থায়ই সকল স্ত্রীর কাছে কুশল জিজ্ঞাসার জন্যে গমন করতেন । একদিন যয়নব রাদিয়াল্লাহু 'আনহার কাছে একটু বেশি সময় অতিবাহিত করলেন এবং মধু পান করলেন । এতে আমার মনে ঈর্ষা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল এবং আমি হাফসা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার সাথে পরামর্শ করে স্থির করলাম যে, তিনি আমাদের মধ্যে যার কাছে আসবেন, সেই বলবেঃ আপনি "মাগাফীর" পান করেছেন । (মাগাফীর এক প্রকার বিশেষ দুর্গন্ধযুক্ত আঠাকে বলা হয় ।) সেমতে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হল । রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ না, আমি তো মধু-পান করেছি । সেই বিবি বললেনঃ সম্ভবত কোন মৌমাছি 'মাগাফীর' বৃক্ষে বসে তার রস চুষেছিল । এ কারণেই মধু দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে গেছে । রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু থেকে সযত্নে বেঁচে থাকতেন । তাই অতঃপর মধু খাবেন না বলে কসম খেলেন । যয়নব রাদিয়াল্লাহু 'আনহা মনঃক্ষুণ্ণ হবেন চিন্তা করে তিনি বিষয়টি প্রকাশ না করার জন্যেও বলে দিলেন । কিন্তু সেই স্ত্রী বিষয়টি অন্য স্ত্রীর গোচরীভূত করে দিল । ফলে এ আয়াত নাযিল হয় । [বুখারী: ৪৯১২, ৫২৬৭, ৬৬৯১, মুসলিম: ১৪৭৪] কোন কোন বর্ণনায় আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন দাসীর সাথে থাকতেন বিধায় আয়েশা ও হাফসা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা রাসূলকে এমনভাবে কথাবার্তা বললেন যে, রাসূল সে দাসীর কাছে যাওয়া থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, ফলে এ আয়াত নাযিল হয় । [নাসায়ী: ৭/৭১,৭২, নং ৩৯৫৯, দ্বিয়া আল-মাকদেসী: আল-আহাদিসুল মুখতারাহ: ১৬৯৪, মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৪৯৩]

وَ إِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا ۚ فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ ۖ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَٰذَا ۖ قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ﴿٣﴾

৩. আর স্মরণ করুন--- যখন নবী তার স্ত্রীদের একজনকে গোপনে একটি কথা বলেছিলেন। অতঃপর যখন সে তা অন্যকে জানিয়ে দিয়েছিল এবং আল্লাহ্ নবীর কাছে তা প্রকাশ করে দিলেন, তখন নবী এ বিষয়ে কিছু ব্যক্ত করলেন এবং কিছু এড়িয়ে গেলেন[১]। অতঃপর যখন নবী তা তার সে স্ত্রীকে জানালেন তখন সে বলল, 'কে আপনাকে এটা জানাল?' নবী বললেন, 'আমাকে জানিয়েছেন তিনি, যিনি সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত।'

إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ۖ وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَٰلِكَ ظَهِيرٌ ﴿٤﴾

৪. যদি তোমরা উভয়ে আল্লাহ্‌র কাছে তাওবাহ্ কর (তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর), কারণ তোমাদের হৃদয় তো ঝুঁকে পড়েছে। কিন্তু তোমরা

(১) অর্থাৎ সেই স্ত্রী যখন গোপন কথাটি অন্য স্ত্রীর গোচরীভূত করে দিলেন এবং আল্লাহ তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ সম্পর্কে অবহিত করে দিলেন, তখন তিনি সেই স্ত্রীর কাছে গোপনে কথা ফাঁস করে দেয়ার অভিযোগ করলেন, কিন্তু পূর্ণ কথা বললেন না। এটা ছিল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ভদ্রতা। তিনি দেখলেন সম্পূর্ণ কথা বললে সে অধিক লজ্জিত হবে। কোন স্ত্রীর কাছের গোপন কথা বলা হয়েছিল এবং কার কাছে ফাঁস করা হয়েছিল, পবিত্র কুরআনে তার বর্ণনা আসেনি। অধিকাংশ বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, হাফসা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার কাছে গোপন কথা বলা হয়েছিল। তিনি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার কাছে তা ফাঁস করে দেন। [দেখুন, বুখারী: ৪৯১৩, মুসলিম: ১৪৭৯] কোন কোন বর্ণনায় আছে, গোপন কথা ফাঁস করে দেয়ার কারণে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাফসা রাদিয়াল্লাহু 'আনহাকে তালাক দেয়ার ইচ্ছা করেন; কিন্তু আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈল আলাইহিস্ সালামকে প্রেরণ করে তাকে তালাক থেকে বিরত রাখেন এবং বলে দেন যে, হাফসা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা অনেক সালাত আদায় করে এবং অনেক সাওম পালন করে। তার নাম জান্নাতে আপনার স্ত্রীগণের তালিকায় লিখিত আছে। [মুস্তাদরাকে হাকিম: ৪/১৬, ৬৭৫৩, ৪/১৭, ৬৭৫৪, আত-তাবকাতুল কুবরা লি ইবনে সা'দ: ৮/৮৪, তাবরানী: ১৮/৩৬৫, ৯৩৪, বুগইয়াতুল বাহিস: ২/৯১৪]

যদি নবীর বিরুদ্ধে একে অন্যের পোষকতা কর[১] তবে জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ তার সাহায্যকারী এবং জিবরীল ও সৎকর্মশীল মুমিনরাও। তাছাড়া অন্যান্য ফেরেশ্‌তাগণও তার সহযোগিতাকারী[২]।

৫. যদি নবী তোমাদের সকলকে তালাক দেয় তবে তার রব সম্ভবত তোমাদের স্থলে তাকে দেবেন তোমাদের চেয়ে উৎকৃষ্টতর স্ত্রী[৩]---যারা হবে মুসলিম, মুমিন[৪], অনুগত, তাওবাকারী, ‘ইবাদাতকারী, সিয়াম পালনকারী, অকুমারী এবং কুমারী।

عَسٰى رَبُّهٗٓ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُّبْدِلَهٗٓ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ مُسْلِمٰتٍ مُّؤْمِنٰتٍ قٰنِتٰتٍ تٰٓئِبٰتٍ عٰبِدٰتٍ سٰٓئِحٰتٍ ثَيِّبٰتٍ وَّاَبْكَارًا ۝٥

(১) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা বলেন, আমি উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতে চাইলাম। আমি তাকে বললামঃ ‘কোন সে দুই নারী, যারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে একে অন্যের পোষকতা করেছে?’ আমার কথা শেষ হতে না হতেই তিনি বললেন: ‘তারা হল আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা) ও হাফসা (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা)।’ [বুখারী: ৪৯১৪]

(২) অর্থাৎ যদি তোমরা অবস্থানে অনড় থাক, তবে আল্লাহ্, তিনি তো তার বন্ধু ও সাহায্যকারী, অনুরূপভাবে জিবরীল ও সৎকর্মশীল মুমিনরাও। আল্লাহ্ নিজে তার সাহায্য করবেন, অনুরূপভাবে জিবরীল ও আল্লাহ্‌র ঈমানদার নেক বান্দারাও তাকে সাহায্য করবেন। তাকে সাহায্য না করার কেউ থাকবে না। আর আল্লাহ্, জিবরীল ও সৎবান্দাদের সাহায্যের পরে ফেরেশতারাও তার সাহায্যকারী। তারা তাকে সাহায্য করবেন। [ফাতহুল কাদীর]

(৩) বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, “উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণ রাসূলের উপর অভিমান করে তার বিরুদ্ধে একজোট হয়ে পড়ে। তখন আমি তাদেরকে বললাম, এমনও হতে পারে যে, রাসূল যদি তোমাদেরকে তালাক দেন তবে তার রব তাকে তোমাদের পরিবর্তে উত্তম স্ত্রীসমূহ দান করবেন” তখনই এ আয়াত নাযিল হয়। [বুখারী: ৪৯১৬]

(৪) মুসলিম এবং মুমিন শব্দ এক সাথে ব্যবহৃত হলে মুসলিম শব্দের অর্থ হয় কার্যত আল্লাহর হুকুম আহকাম অনুযায়ী আমলকারী ব্যক্তি এবং মুমিন অর্থ হয় এমন ব্যক্তি যে সরল মনে ইসলামী আকীদা বিশ্বাসকে গ্রহণ করেছে। [দেখুন-বাগভী;কুরতুবী]

৬. হে ঈমানদারগণ[১]! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা কর আগুন থেকে[২],

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ

(১) এই আয়াতে সাধারণ মুসলিমদেরকে বলা হয়েছে, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা কর। অতঃপর জাহান্নামের অগ্নির ভয়াবহতা উল্লেখ করে অবশেষে এ কথাও বলা হয়েছে যে, যারা জাহান্নামের যোগ্য পাত্র হবে, তারা কোন শক্তি, দলবল, খোশামোদ অথবা ঘুষের মাধ্যমে জাহান্নামে নিয়োজিত কঠোরপ্রাণ ফেরেশতাদের কবল থেকে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হবে না। এই ফেরেশতাদের নাম 'যাবানিয়া'। এ আয়াত থেকে প্রকাশ পায় যে, আল্লাহর আযাব থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য প্রচেষ্টা চালানোর মধ্যেই কোন মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য সীমাবদ্ধ নয়। বরং যে পরিবারটির নেতৃত্বের বোঝা তার কাঁধে স্থাপন করেছে তার সদস্যরা যাতে আল্লাহর প্রিয় মানুষরূপে গড়ে উঠতে পারে সাধ্যমত সে শিক্ষা দেয়াও তার কাজ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমরা প্রত্যেকেই রাখাল বা দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তার অধীনস্ত লোকদের সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। শাসকও রাখাল বা দায়িত্বশীল, তাকে তার অধীনস্ত লোকদের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে। নারী তার স্বামীর বাড়ী এবং তার সন্তান-সন্ততির তত্ত্বাবধায়িকা, তাকে তাদের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে।" [বুখারী: ৮৯৩, ৫১৮৮]

(২) এর উপায় এই যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যেসব কাজ করতে নিষেধ করেছেন, তোমরা তাদেরকে সেসব কাজ করতে নিষেধ কর এবং যেসব কাজ করতে আদেশ করেছেন, তোমরা পরিবার-পরিজনকেও সেগুলো করতে আদেশ কর। এই কর্মপন্থা তাদেরকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা করতে পারবে। [ইবন কাসীর] হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আল্লাহ্ ঐ ব্যক্তিকে রহমত করুন, যে নিজে রাতে সালাত আদায় করতে দাঁড়িয়েছে, এবং তার স্ত্রীকে জাগিয়েছে, সে যদি দাঁড়াতে অস্বীকার করে তার মুখে পানি ছিটিয়েছে। আল্লাহ্ ঐ মহিলাকেও রহমত করুন যে, নিজে রাতে সালাত আদায় করতে দাঁড়িয়েছে এবং তার স্বামীকে জাগিয়েছে, যদি সে দাঁড়াতে অস্বীকার করে তার মুখে পানি ছিটিয়েছে।" [আবু দাউদ: ১৪৫০, ইবনে মাজাহ: ১৩৩৬] হাদীসে আরও এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে সালাতের জন্য সাত বছর বয়সে পৌঁছলেই নির্দেশ দাও, আর তাদেরকে দশ বছর হলে এর জন্য দণ্ড দাও। আর তাদের শোয়ার জায়গা পৃথক করে দাও। [আবু দাউদ: ৪৯৫, মুসনাদে আহমাদ: ২/১৮০] অনুরূপভাবে পরিবার পরিজনকে সালাতের সময়, সাওমের সময় হলে স্মরণ করিয়ে দেয়াও এর অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই বিতর পড়তেন তখনি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহাকে ডাকতেন এবং বলতেন, "হে আয়েশা! দাঁড়াও এবং বিতর আদায় কর।" [সহীহ মুসলিম, ৭৪৪, মুসনাদে আহমাদ: ৬/১৫২]

شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ۝

যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে নির্মম, কঠোরস্বভাব ফেরেশ্‌তাগণ, যারা অমান্য করে না তা, যা আল্লাহ্‌ তাদেরকে আদেশ করেন। আর তারা যা করতে আদেশপ্রাপ্ত হয় তা-ই করে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ ۗ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

৭. হে কাফিরগণ! আজ তোমরা ওজর পেশ করার চেষ্টা করো না। তোমরা যা করতে তোমাদেরকে তার প্রতিফলই তো দেয়া হচ্ছে।

দ্বিতীয় রুকূ’

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ۭ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللّٰهُ النَّبِيَّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۚ نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۚ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

৮. হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে তাওবা কর---বিশুদ্ধ তাওবা[১]; সম্ভবত তোমাদের রব তোমাদের পাপসমূহ মোচন করে দেবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেদিন আল্লাহ্‌ লাঞ্ছিত করবেন না নবীকে এবং তার সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে। তাদের নূর তাদের সামনে

(১) তাওবার শাব্দিক অর্থ ফিরে আসা। উদ্দেশ্য গোনাহ থেকে ফিরে আসা। কুরআন ও সুন্নাহর পরিভাষায় তওবার অর্থ বিগত গোনাহের জন্যে অনুতপ্ত হওয়া এবং ভবিষ্যতে তার ধারে কাছে না যাওয়ার দৃঢ়সংকল্প করা। আয়াতে বর্ণিত نصوح শব্দটির বিভিন্ন অর্থ হয়ে থাকে। এক. যদি نصحة থেকে উদ্ভূত ধরা হয়, তবে এর অর্থ খাঁটি করা। আর যদি نصاحة থেকে উদ্ভূত ধরা হয়, তবে এর অর্থ বস্ত্র সেলাই করা ও তালি দেয়া। প্রথম অর্থের দিক দিয়ে “তাওবাতুন নাসূহ” এর অর্থ এমন তাওবা, যা রিয়া ও নাম-যশ থেকে খাঁটি-কেবল আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন ও আযাবের ভয়ে ভীত হয়ে এবং গোনাহের কারণে অনুতপ্ত হয়ে গোনাহ পরিত্যাগ করা। দ্বিতীয় অর্থের দিক দিয়ে “তাওবাতুন নাসূহ” শব্দটি এই উদ্দেশ্য ব্যক্ত করার জন্যে হবে যে, গোনাহের কারণে সৎকর্মের ছিন্নবস্ত্রে তাওবা তালি সংযুক্ত করে। কোন কোন তাফসীরবিদ বলেনঃ “তাওবাতুন নাসূহ” হল মুখে ক্ষমাপ্রার্থনা করা, অন্তরে অনুশোচনা করা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ভবিষ্যতে সেই গোনাহ থেকে দূরে রাখা। [দেখুন-কুরতুবী]

ও ডানে ধাবিত হবে। তারা বলবে, ‘হে আমাদের রব! আমাদের জন্য আমাদের নূরকে পূর্ণতা দান করুন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন, নিশ্চয় আপনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।’

৯. হে নবী! কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন। আর তাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম এবং তা কত নিকৃষ্ট ফিরে যাওয়ার স্থান!

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿٩﴾

১০. যারা কুফরী করে, আল্লাহ্ তাদের জন্য দৃষ্টান্ত পেশ করছেন নূহের স্ত্রী ও লূতের স্ত্রীর, তারা ছিল আমাদের বান্দাদের মধ্যে দুই সৎকর্মপরায়ণ বান্দার অধীন। কিন্তু তারা তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। ফলে নূহ ও লূত তাদেরকে আল্লাহ্‌র শাস্তি হতে রক্ষা করতে পারলেন না এবং তাদেরকে বলা হল, ‘তোমরা উভয়ে প্রবেশকারীদের সাথে জাহান্নামে প্রবেশ কর।’

ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱمْرَأَتَ نُوحٍ وَٱمْرَأَتَ لُوطٍ ۖ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَٰلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّٰخِلِينَ ﴿١٠﴾

১১. আর যারা ঈমান আনে, আল্লাহ্ তাদের জন্য পেশ করেন ফির‘আউনের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত, যখন সে এ বলে প্রার্থনা করেছিল, ‘হে আমার রব! আপনার সন্নিধানে জান্নাতে আমার জন্য একটি ঘর নির্মাণ করুন এবং আমাকে উদ্ধার করুন ফির‘আউন ও তার দুষ্কৃতি হতে এবং আমাকে উদ্ধার করুন যালিম সম্প্রদায় হতে।’

وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ٱبْنِ لِى عِندَكَ بَيْتًا فِى ٱلْجَنَّةِ وَنَجِّنِى مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِۦ وَنَجِّنِى مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١١﴾

১২. আরও দৃষ্টান্ত পেশ করেন 'ইমরান-কন্যা মার্‌ইয়ামের--- যে তার লজ্জাস্থানের পবিত্রতা রক্ষা করেছিল, ফলে আমরা তার মধ্যে ফুঁকে দিয়েছিলাম আমাদের রূহ হতে। আর সে তার রবের বাণী ও তাঁর কিতাবসমূহ সত্য বলে গ্রহণ করেছিল এবং সে ছিল অনুগতদের অন্যতম[১]।

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرٰنَ الَّتِيْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهٖ وَكَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ ﴿١٢﴾

(১) এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ "পুরুষদের মধ্যে অনেকেই কামেল বা পরিপূর্ণ হয়েছেন, কিন্তু নারীদের মধ্যে কেবল ফির'আউন-পত্নী আসিয়া ও ইমরান তনয়া মারইয়াম পরিপূর্নতা লাভ করেছেন।" [বুখারী: ৩৪১১, মুসলিম: ২৪৩১]

৬৭- সূরা আল-মুল্‌ক[১]
৩০ আয়াত, মক্কী

বِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

تَبٰرَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ ﴿١﴾

১. বরকতময় তিনি, সর্বময় কর্তৃত্ব[২] যাঁর হাতে; আর তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۭ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ﴿٢﴾

২. যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য--- কে তোমাদের মধ্যে আমলের দিক থেকে উত্তম? তিনি পরক্রমশালী, ক্ষমাশীল।

الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ۭ مَا تَرٰى فِيْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ۭ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۙ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ﴿٣﴾

৩. যিনি সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে সাত আসমান। রহমানের সৃষ্টিতে আপনি কোন খুঁত দেখতে পাবেন না; আপনি আবার তাকিয়ে দেখুন, কোন ত্রুটি দেখতে পান কি[৩]?

---

(১) এই সূরাকে হাদিসে "মানি'আ" বা প্রতিরোধকারী নামকরণ করা হয়েছে। [মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৪৯৮, আবুস শাইখ: তাবাকাতুল ইসফাহানীয়্যিন: ২৬৪] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা'আলার কিতাবে একটি সূরা আছে, যার আয়াত তো মাত্র তিরিশটি কিন্তু কেয়ামতের দিন এই সূরা এক এক ব্যক্তির পক্ষে সুপারিশ করবে এবং তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে দাখিল করবে; সেটা সূরা মুলক। [আবুদাউদ: ১৪০০, তিরমিযী: ২৮৯১, নাসায়ী: আলকুবরা ৭১০, ইবনে মাজাহ: ৩৭৮৬, মুসনাদে আহমাদ: ২/২৯৯, ৩২১] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'আলিফ লাম তানযীল' (সূরা আস-সাজদাহ) এবং 'তাবারাকাল্লাযী বি ইয়াদিহিল মুলক' (সূরা আল-মুলক) সূরাদ্বয় না পড়ে ঘুমাতেন না"। [তিরমিযী: ২৮৯৭, দারমী: ৩৪১১, মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৪৪৬, (৩৫৪৫)]

(২) এখানে রাজত্ব বলে আকাশ ও পৃথিবী এবং দুনিয়া ও আখেরাতের সার্বিক কর্তৃত্ব বোঝানো হয়েছে। [কুরতুবী]

(৩) মূল ব্যবহৃত শব্দটি হলো فطور যার অর্থ ফাটল, ছিদ্র,ছেঁড়া, ভাঙা-চোরা। [কুরতুবী]

ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ ۝

৪. তারপর আপনি দ্বিতীয়বার দৃষ্টি ফেরান, সে দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে আপনার দিকে ফিরে আসবে।

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا لِّلشَّيٰطِيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيْرِ ۝

৫. আর অবশ্যই আমরা নিকটবর্তী আসমানকে সুশোভিত করেছি প্রদীপমালা দ্বারা(১) এবং সেগুলোকে করেছি শয়তানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি।

وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝

৬. আর যারা তাদের রবকে অস্বীকার করে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি; এবং তা কত মন্দ ফিরে যাওয়ার স্থান!

إِذَا أُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا وَّهِيَ تَفُوْرُ ۝

৭. যখন তাদেরকে সেখানে নিক্ষেপ করা হবে তখন তারা জাহান্নামের বিকট শব্দ শুনবে(২), আর তা হবে উদ্বেলিত।

تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ۖ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيْهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيْرٌ ۝

৮. রোষে জাহান্নাম যেন ফেটে পড়বে, যখনই তাতে কোন দলকে নিক্ষেপ করা হবে, তাদেরকে রক্ষীরা জিজ্ঞেস করবে, 'তোমাদের কাছে কি কোন সতর্ককারী আসেনি?'

---

(১) مصابيح শব্দের অর্থ প্রদীপমালা। এখানে নক্ষত্ররাজি বোঝানো হয়েছে। [বাগভী; ফাতহুল কাদীর]

(২) মূল ইবারতে شهيق শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যা গাধার ডাকের মত আওয়াজ বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। এ বাক্যের অর্থ এও হতে পারে যে, এটা খোদ জাহান্নামের শব্দ। [ফাতহুল কাদীর, কুরতুবী] যেমন পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে, "জাহান্নামের দিকে যাওয়ার পথে এসব লোক দূরে থেকেই তার ক্রোধ ও প্রচণ্ড উত্তেজনার শব্দ শুনতে পাবে।" [সূরা আল-ফুরকান: ১২] আবার এও হতে পারে যে, জাহান্নাম থেকে এ শব্দ আসতে থাকবে, ইতিমধ্যেই যেসব লোককে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছে তারা জোরে জোরে চিৎকার করতে থাকবে। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে, "এ জাহান্নামীরা জাহান্নামের মধ্যে হাঁপাতে, গোঙ্গাতে এবং হাসফাস করতে থাকবে।" [সূরা হূদ: ১০৬]

৯. তারা বলবে, 'হ্যাঁ, অবশ্যই আমাদের কাছে সতর্ককারী এসেছিল, তখন আমরা মিথ্যারোপ করেছিলাম এবং বলেছিলাম, 'আল্লাহ্ কিছুই নাযিল করেননি, তোমরা তো মহাবিভ্রান্তিতে রয়েছ।'

قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ﴿٩﴾

১০. আর তারা বলবে, 'যদি আমরা শুনতাম অথবা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করতাম, তাহলে আমরা জ্বলন্ত আগুনের অধিবাসী হতাম না[১]।'

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿١٠﴾

১১. অতঃপর তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে। সুতরাং ধ্বংস জ্বলন্ত আগুনের অধিবাসীদের জন্য!

فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿١١﴾

১২. নিশ্চয় যারা গায়েব অবস্থায় তাদের রবকে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿١٢﴾

১৩. আর তোমরা তোমাদের কথা গোপনেই বল অথবা প্রকাশ্যে বল, তিনি তো অন্তরসমূহে যা আছে তা সম্পর্কে সম্যক অবগত।

وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ ۖ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١٣﴾

১৪. যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানেন না? অথচ তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবহিত।

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٤﴾

---

(১) অর্থাৎ আমরা যদি সত্যানুসন্ধিৎসু হয়ে নবীদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতাম অথবা নবীগণ আমাদের সামনে যা পেশ করেছেন তা আসলে কি বুদ্ধি-বিবেক খাটিয়ে তা বুঝার চেষ্টা করতাম। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ তাদের অপরাধের ব্যাপারে নিজেদের উপর দোষ স্বীকার করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের ব্যাপারে চুড়ান্ত ফয়সালা করা হবে না।" [আবু দাউদ: ৪৩৪৭, মুসনাদে আহমাদ: ৫/২৯৩]

দ্বিতীয় রুকূ’

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۖ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

১৫. তিনিই তো তোমাদের জন্য যমীনকে সুগম করে দিয়েছেন; অতএব তোমরা এর দিক-দিগন্তে বিচরণ কর এবং তাঁর দেয়া রিযিক থেকে তোমরা আহার কর; আর পুনরুত্থান তো তাঁরই কাছে।

أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ﴿١٦﴾

১৬. তোমরা কি এ থেকে নির্ভয় হয়েছ যে, যিনি আসমানে রয়েছেন[১] তিনি তোমাদেরকে সহ যমীনকে ধ্বসিয়ে দেবেন, অতঃপর তা হঠাৎ করেই থর থর করে কাঁপতে থাকবে?

أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۖ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴿١٧﴾

১৭. অথবা তোমরা কি এ থেকে নির্ভয় হয়েছ যে, আসমানে যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদের উপর কংকরবর্ষী ঝঞ্ঝা পাঠাবেন? তখন তোমরা জানতে পারবে কিরূপ ছিল আমার সতর্কবাণী[২]!

---

(১) এর দ্বারা একথা বুঝায় যে, আল্লাহ উপরে থাকেন। এর সপক্ষে হাজারেরও বেশী দলীল-প্রমাণাদি রয়েছে। মু'আবিয়া ইবন হাকাম আস-সুলামী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এক দাসীকে খুব জোরে চড় মেরেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাজটাকে নেহায়েত বড় অন্যায় হয়েছে বলে প্রকাশ করলেন, তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি তাকে স্বাধীন করে দেব না? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাকে আমার কাছে নিয়ে এস। আমি দাসীটিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিয়ে আসলে তিনি দাসীকে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ কোথায়? সে বলল, আসমানে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার জিজ্ঞেস করলেন, আমি কে? সে বলল, আপনি আল্লাহর রাসূল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, একে মুক্ত করে দাও, এ ঈমানদার। [আবু দাউদ:৩২৮২]

(২) সাবধানবাণী মানে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বুঝানো হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর]

وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ⑱

১৮. আর এদের পূর্ববর্তীগণও মিথ্যারোপ করেছিল; ফলে কিরূপ হয়েছিল আমার প্রত্যাখ্যান (শাস্তি) ।

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَٰنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ⑲

১৯. তারা কি লক্ষ্য করে না তাদের উপরে পাখিদের প্রতি, যারা পাখা বিস্তার করে ও সংকুচিত করে? দয়াময় আল্লাহ্‌ই তাদেরকে স্থির রাখেন । নিশ্চয় তিনি সবকিছুর সম্যক দ্রষ্টা ।

أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَٰنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ⑳

২০. দয়াময় আল্লাহ্‌ ছাড়া তোমাদের এমন কোন সৈন্যবাহিনী আছে কি, যারা তোমাদেরকে সাহায্য করবে? কাফিররা তো রয়েছে প্রবঞ্চনার মধ্যে ।

أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ㉑

২১. এমন কে আছে, যে তোমাদেরকে রিযিক দান করবে, যদি তিনি তাঁর রিযিক বন্ধ করে দেন? বরং তারা অবাধ্যতা ও সত্য বিমুখতায় অবিচল রয়েছে ।

أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ㉒

২২. যে ব্যক্তি ঝুঁকে মুখে ভর দিয়ে চলে, সে-ই কি ঠিক পথে চলে, না কি সে ব্যক্তি যে সোজা হয়ে সরল পথে চলে[১]?

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ㉓

২৩. বলুন, 'তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তঃকরণ । তোমরা খুব অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর ।'

---

(১) এখানে কেয়ামতের মাঠে কাফের ও মুমিনের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, কেয়ামতের মাঠে কাফেররা উপুড় হয়ে মস্তকের উপর ভর দিয়ে চলবে । [ইবন কাসীর,বাগভী] হাদীসে এসেছে যে, সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, কাফেররা মুখে ভর দিয়ে কিরূপে চলবে? রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ যে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পায়ে ভর দিয়ে চালনা করেছেন, তিনি কি মুখমণ্ডল ও মস্তকের ওপর ভর দিয়ে চালাতে সক্ষম নন? [বুখারী: ৪৭৬০, মুসলিম: ২৮০৬]

২৪. বলুন, 'তিনিই যমীনে তোমাদেরকে সৃষ্টি করে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাঁরই কাছে তোমাদেরকে সমবেত করা হবে।'

قُلْ هُوَ الَّذِىْ ذَرَاَكُمْ فِى الْاَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٢٤﴾

২৫. আর তারা বলে, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল, এ প্রতিশ্রুতি কখন বাস্তবায়িত হবে?'

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٥﴾

২৬. বলুন, 'এর জ্ঞান শুধু আল্লাহ্‌রই কাছে আছে, আর আমি তো স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।'

قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ ۖ وَاِنَّمَاۤ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٢٦﴾

২৭. অতঃপর তারা যখন তা আসন্ন দেখবে তখন কাফিরদের চেহারা ম্লান হয়ে পড়বে এবং বলা হবে, 'এটাই হল তা, যা তোমরা দাবী করেছিলে।'

فَلَمَّا رَاَوْهُ زُلْفَةً سِيْٓـَٔتْ وُجُوْهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقِيْلَ هٰذَا الَّذِىْ كُنْتُمْ بِهٖ تَدَّعُوْنَ ﴿٢٧﴾

২৮. বলুন, 'তোমরা আমাকে জানাও--- যদি আল্লাহ্ আমাকে ও আমার সঙ্গীদেরকে ধ্বংস করেন অথবা আমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন, তবে কাফিরদেরকে কে রক্ষা করবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে?

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَهْلَكَنِىَ اللّٰهُ وَمَنْ مَّعِىَ اَوْ رَحِمَنَا ۙ فَمَنْ يُّجِيْرُ الْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٢٨﴾

২৯. বলুন, 'তিনিই রহমান, আমরা তাঁর উপর ঈমান এনেছি এবং তাঁরই উপর তাওয়াক্কুল করেছি। অতঃপর অচিরেই তোমরা জানতে পারবে কে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে।'

قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِهٖ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۚ فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢٩﴾

৩০. বলুন, 'তোমরা আমাকে জানাও, যদি পানি ভূগর্ভে তোমাদের নাগালের বাইরে চলে যায়, তখন কে তোমাদেরকে এনে দেবে প্রবাহমান পানি?'

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَآءٍ مَّعِيْنٍ ﴿٣٠﴾

৬৮- সূরা আল-কালাম
৫২ আয়াত, মক্কী

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. নূন---শপথ কলমের(১) এবং তারা যা লিপিবদ্ধ করে তার,

نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ ①

২. আপনার রবের অনুগ্রহে আপনি উন্মাদ নন ।

مَآ اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ ②

৩. আর নিশ্চয় আপনার জন্য রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার,

وَاِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ ③

৪. আর নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের উপর রয়েছেন(২) ।

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ④

---

(১) মুজাহিদ বলেন, কলম মানে যে কলম দিয়ে যিক্‌র অর্থাৎ কুরআন মজীদ লেখা হচ্ছিলো ।[কুরতুবী] কলম সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-বলেন, “সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলা কলম সৃষ্টি করে তাকে লেখার আদেশ করেন । কলম বলল, কি লিখব? তখন আল্লাহ্ বললেন, যা হয়েছে এবং যা হবে তা সবই লিখ । কলম আদেশ অনুযায়ী অনন্তকাল পর্যন্ত সম্ভাব্য সকল ঘটনা ও অবস্থা লিখে দিল ।” [মুসনাদে আহমাদ: ৫/৩১৭] অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “আল্লাহ তা'আলা সমগ্র সৃষ্টির তাকদীর আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে লিখে দিয়েছিলেন ।” [মুসলিম: ২৬৫৩, তিরমিযী: ২১৫৬, মুসনাদে আহমাদ: ২/১৬৯] কুরআনের অন্যত্রও এ কলমের উল্লেখ করা হয়েছে । বলা হয়েছে, “তিনি (আল্লাহ্) কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন” । [সূরা আল-আলাক: ৪] ।

(২) আয়াতে উল্লেখিত, “মহৎ চরিত্র” এর অর্থ নির্ধারণে কয়েকটি মত বর্ণিত আছে । ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, মহৎ চরিত্রের অর্থ মহৎ দ্বীন । কেননা, আল্লাহ তা'আলার কাছে ইসলাম অপেক্ষা অধিক প্রিয় কোনো দ্বীন নেই । আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলেন, স্বয়ং কুরআন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর “মহৎ চরিত্র” । অর্থাৎ কুরআন পাক যেসব উত্তম কর্ম ও চরিত্র শিক্ষা দেয়, তিনি সেসবের বাস্তব নমুনা । আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, “মহৎ চরিত্র” বলে কুরআনের শিষ্টাচার বোঝানো হয়েছে; অর্থাৎ যেসব শিষ্টাচার কুরআন শিক্ষা দিয়েছে । [কুরতুবী]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নৈতিক চরিত্রের সর্বোত্তম সংজ্ঞা দিয়েছেন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা । তিনি বলেছেন, কুরআনই ছিলো তার

৫. অতঃপর অচিরেই আপনি দেখবেন এবং তারাও দেখবে---

فَسَتُبۡصِرُ وَيُبۡصِرُوۡنَ ۝٥

৬. তোমাদের মধ্যে কে বিকারগ্রস্ত[১]।

بِاَىيِّكُمُ الۡمَفۡتُوۡنُ ۝٦

৭. নিশ্চয় আপনার রব সম্যক অবগত আছেন কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনি সম্যক জানেন তাদেরকে, যারা হিদায়াতপ্রাপ্ত।

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعۡلَمُ بِمَنۡ ضَلَّ عَنۡ سَبِيۡلِهٖ ۖ وَهُوَ اَعۡلَمُ بِالۡمُهۡتَدِيۡنَ ۝٧

৮. কাজেই আপনি মিথ্যারোপকারীদের আনুগত্য করবেন না।

فَلَا تُطِعِ الۡمُكَذِّبِيۡنَ ۝٨

৯. তারা কামনা করে যে, আপনি আপোষকামী হোন, তাহলে তারাও আপোষকামী হবে,

وَدُّوۡا لَوۡ تُدۡهِنُ فَيُدۡهِنُوۡنَ ۝٩

১০. আর আপনি আনুগত্য করবেন না প্রত্যেক এমন ব্যক্তির যে অধিক শপথ কারী, লাঞ্ছিত,

وَلَا تُطِعۡ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيۡنٍ ۝١٠

১১. পিছনে নিন্দাকারী, যে একের কথা অন্যের কাছে লাগিয়ে বেড়ায়[২],

هَمَّازٍ مَّشَّآءٍ ۢ بِنَمِيۡمٍ ۝١١

চরিত্র। [মুসনাদে আহমাদ: ৬/৯১] আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বর্ণনা করেছেন, “আমি দশ বছর যাবত রাসূলুল্লাহ্‌র খেদমতে নিয়োজিত ছিলাম। আমার কোন কাজ সম্পর্কে তিনি কখনো উহ! শব্দ পর্যন্ত উচ্চারণ করেননি। আমার কোন কাজ দেখে কখনো বলেননি, তুমি এ কাজ করলে কেন? কিংবা কোন কাজ না করলে কখনো বলেননি, তুমি এ কাজ করলে না কেন? [বুখারী:৬০৩৮, মুসলিম: ২৩০৯] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সত্তায় আল্লাহ তা‘আলা যাবতীয় উত্তম চরিত্র পূর্ণমাত্রায় সন্নিবেশিত করে দিয়েছিলেন। তিনি নিজেই বলেন, “আমি উত্তম চরিত্রকে পূর্ণতা দান করার জন্যই প্রেরিত হয়েছি।”[মুসনাদে আহমাদ:২/৩৮১, মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৬৭০]

(১) مفتون শব্দের অর্থ এস্থলে বিকারগ্রস্ত পাগল। [বাগভী]

(২) কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন স্থানে যারা “পিছনে নিন্দাকারী, যে একের কথা অন্যের কাছে লাগিয়ে বেড়ায়” তাদের নিন্দা করা হয়েছে। তাদের সম্পর্কে কঠিন সাবধানবাণী শোনানো হয়েছে। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

১২. কল্যাণের কাজে বাধা দানকারী, সীমালঙ্ঘনকারী, পাপিষ্ঠ,

مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿١٢﴾

১৩. রূঢ় স্বভাব[১] এবং তদুপরি কুখ্যাত[২];

عُتُلٍّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ ﴿١٣﴾

১৪. এজন্যে যে, সে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে সমৃদ্ধশালী ।

أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ﴿١٤﴾

১৫. যখন তার কাছে আমাদের আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হয় তখন সে বলে, 'এ তো পূর্ববর্তীদের কল্প-কাহিনী মাত্র ।'

إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٥﴾

১৬. আমরা অবশ্যই তার শুঁড় দাগিয়ে দেব ।

سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ ﴿١٦﴾

১৭. আমরা তো তাদেরকে পরীক্ষা করেছি[৩], যেভাবে পরীক্ষা করেছিলাম উদ্যান-অধিপতিদেরকে, যখন তারা শপথ করেছিল যে, তারা প্রত্যূষে আহরণ করবে বাগানের ফল,

إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿١٧﴾

১৮. এবং তারা 'ইন্‌শাআল্লাহ্' বলেনি ।

وَلَا يَسْتَثْنُونَ ﴿١٨﴾

"কাত্তাত (যে একের কথা অন্যের কাছে লাগিয়ে বেড়ায় সে) জান্নাতে প্রবেশ করবে না ।" [বুখারী: ৬০৫৬]

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতবাসীদের স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে জানাব না? প্রতিটি দূর্বল, যাকে লোকেরা দূর্বল করে রাখে বা দূর্বল হিসেবে চলে নিজের শক্তিমত্তার অহংকারে মত্ত হয় না, সে যদি কোন ব্যাপারে আল্লাহ্‌র কাছে শপথ করে বসে আল্লাহ্ সেটা পূর্ণ করে দেন । আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামবাসীদের চরিত্র সম্পর্কে জানাব না? প্রতিটি রূঢ় স্বভাববিশিষ্ট মানুষ, প্রচণ্ড কৃপন, অহংকারী ।" [বুখারী: ৪৯১৮]

(২) কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, زنيم বলে এমন লোক উদ্দেশ্য যার কানের অনেকাংশ কেটে লটকে রাখা হয়েছে যেমন কোন কোন ছাগলের কানের কর্তিত অংশ লটকে থাকে । [বুখারী: ৪৯১৭]

(৩) অর্থাৎ আমি মক্কাবাসীদের পরীক্ষায় ফেলেছি । [কুরতুবী]

১৯. অতঃপর আপনার রবের কাছ থেকে এক বিপর্যয় হানা দিল সে উদ্যানে, যখন তারা ছিল ঘুমন্ত।

فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَآئِمُونَ ⑲

২০. ফলে তা পুড়ে গিয়ে কালোবর্ণ ধারণ করল।

فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ⑳

২১. প্রত্যূষে তারা একে অন্যকে ডেকে বলল,

فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ ㉑

২২. 'তোমরা যদি ফল আহরণ করতে চাও তবে সকাল সকাল তোমাদের বাগানে চল।'

أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ ㉒

২৩. তারপর তারা চলল নিম্নস্বরে কথা বলতে বলতে,

فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ ㉓

২৪. 'আজ সেখানে যেন তোমাদের কাছে কোন মিসকীন প্রবেশ করতে না পারে।'

أَن لَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ ㉔

২৫. আর তারা নিবৃত্ত করতে সক্ষম---এ বিশ্বাস নিয়ে বাগানে যাত্রা করল।

وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ ㉕

২৬. অতঃপর তারা যখন বাগানের অবস্থা দেখতে পেল, তখন বলল, 'নিশ্চয় আমরা পথ হারিয়ে ফেলেছি।'

فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ ㉖

২৭. 'বরং আমরা তো বঞ্চিত।'

بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ㉗

২৮. তাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলল, 'আমি কি তোমাদেরকে বলিনি, এখনো তোমরা আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছ না কেন?'

قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ㉘

২৯. তারা বলল, 'আমরা আমাদের রবের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি, আমরা তো যালিম ছিলাম।'

قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ㉙

فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ ﴿٣٠﴾

৩০. তারপর তারা একে অন্যের প্রতি দোষারোপ করতে লাগল ।

قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ ﴿٣١﴾

৩১. তারা বলল, 'হায়, দুর্ভোগ আমাদের! আমরা তো ছিলাম সীমালঙ্ঘনকারী ।

عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ ﴿٣٢﴾

৩২. সম্ভবতঃ আমাদের রব এ থেকে উৎকৃষ্টতর বিনিময় দেবেন; নিশ্চয় আমরা আমাদের রবের অভিমুখী হলাম ।'

كَذَٰلِكَ الْعَذَابُ ۖ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾

৩৩. শাস্তি এরূপই হয়ে থাকে এবং আখিরাতের শাস্তি কঠিনতর । যদি তারা জানত[১]!

দ্বিতীয় রুকূ'

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٣٤﴾

৩৪. নিশ্চয় মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে নেয়ামতপূর্ণ জান্নাত তাদের রবের কাছে ।

أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴿٣٥﴾

৩৫. তবে কি আমরা মুসলিমদেরকে (অনুগতদেরকে) অপরাধীদের সমান গণ্য করব?

مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٣٦﴾

৩৬. তোমাদের কী হয়েছে, তোমরা এ কেমন সিদ্ধান্ত দিচ্ছ?

أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿٣٧﴾

৩৭. তোমাদের কাছে কি কোন কিতাব আছে যাতে তোমরা অধ্যয়ন কর---

إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ﴿٣٨﴾

৩৮. যে, নিশ্চয় তোমাদের জন্য তাতে রয়েছে যা তোমরা পছন্দ কর?

---

(১) মক্কাবাসিদের ওপর দুর্ভিক্ষরূপী আযাবের সংক্ষিপ্ত এবং উদ্যান মালিকদের ক্ষেত জ্বলে যাওয়ার বিস্তারিত বর্ণনার পর সাধারণ বিধি বর্ণনা করা হয়েছে যে, যখন আল্লাহর আযাব আসে, তখন এভাবেই আসে । দুনিয়ার এই আযাব আসার পরও তাদের আখেরাতের আযাব দূর হয়ে যায় না; বরং আখেরাতের আযাব ভিন্ন এবং তদপেক্ষা কঠোর হয়ে থাকে । [দেখুন-কুরতুবী]

৩৯. অথবা তোমাদের কি আমাদের সাথে কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ এমন কোন অঙ্গীকার রয়েছে যে, তোমরা নিজেদের জন্য যা স্থির করবে তাই পাবে?

أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۙ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ﴿٣٩﴾

৪০. আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন তাদের মধ্যে এ দাবির যিম্মাদার কে?

سَلْهُمْ أَيُّهُم بِذَٰلِكَ زَعِيمٌ ﴿٤٠﴾

৪১. অথবা তাদের কি (আল্লাহ্‌র সাথে) অনেক শরীক আছে? থাকলে তারা তাদের শরীকগুলোকে উপস্থিত করুক---যদি তারা সত্যবাদী হয়।

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِن كَانُوا صَادِقِينَ ﴿٤١﴾

৪২. স্মরণ করুন, সে দিনের কথা যেদিন পায়ের গোছা উন্মোচিত করা হবে[১], সেদিন তাদেরকে ডাকা হবে সিজ্‌দা করার জন্য, কিন্তু তারা সক্ষম হবে না;

يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٤٢﴾

৪৩. তাদের দৃষ্টি অবনত, হীনতা তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে অথচ যখন তারা নিরাপদ ছিল তখন তো তাদেরকে ডাকা হত সিজ্‌দা করতে।

خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۖ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ﴿٤٣﴾

---

(১) আয়াতে বলা হয়েছে, "যেদিন পায়ের গোছা উম্মোচিত করা হবে"। পায়ের গোছা উম্মোচিত করার এক অর্থ অবস্থা কঠিন হওয়াও হয়। আর তখন অর্থ হবে, যেদিন মানুষের অবস্থা অত্যন্ত কঠিন হবে। [বাগভী;ফাতহুল কাদীর] কিন্তু এ আয়াতের তাফসীরে সহীহ হাদীসে স্পষ্ট এসেছে যে, এখানে মহান আল্লাহ্‌র "পায়ের গোছা" বোঝানো হয়েছে। আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আমাদের রব তাঁর পায়ের গোছা" অনাবৃত করবেন, ফলে প্রতিটি মুমিন নর ও নারী তাঁর জন্য সিজদাহ করবেন। পক্ষান্তরে যারা দুনিয়াতে প্রদর্শনেচ্ছা কিংবা শুনানোর উদ্দেশ্যে সিজদাহ করেছিল, তারা সিজদাহ করতে সক্ষম হবে না। তারা সিজদাহ করতে যাবে কিন্তু তাদের পিঠ বাঁকা হবে না।" [বুখারী: ৪৯১৯]

فَذَرْنِي وَمَنْ يُّكَذِّبُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ ۭ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

৪৪. অতএব ছেড়ে দিন আমাকে এবং যারা এ বাণীতে মিথ্যারোপ করে তাদেরকে, আমরা তাদেরকে ক্রমে ক্রমে ধরব এমনভাবে যে, তারা জানতে পারবে না।

وَاُمْلِيْ لَهُمْ ۭ اِنَّ كَيْدِيْ مَتِيْنٌ ۝

৪৫. আর আমি তাদেরকে সময় দিয়ে থাকি, নিশ্চয় আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ।

اَمْ تَسْـَٔلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُوْنَ ۝

৪৬. আপনি কি তাদের কাছে পারিশ্রমিক চাচ্ছেন যে, তা তাদের কাছে দুর্বহ দণ্ড মনে হয়?

اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُوْنَ ۝

৪৭. নাকি তাদের কাছে গায়েবের জ্ঞান আছে যে, তারা তা লিখে রাখে!

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ ۘ اِذْ نَادٰى وَهُوَ مَكْظُوْمٌ ۝

৪৮. অতএব আপনি ধৈর্য ধারণ করুন আপনার রবের নির্দেশের অপেক্ষায়, আর আপনি মাছওয়ালার ন্যায় হবেন না, যখন তিনি বিষাদ আচ্ছন্ন অবস্থায় আহ্বান করেছিলেন[১]।

لَوْلَآ اَنْ تَدٰرَكَهٗ نِعْمَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ لَنُبِذَ بِالْعَرَاۤءِ وَهُوَ مَذْمُوْمٌ ۝

৪৯. যদি তার রবের অনুগ্রহ তার কাছে না পৌঁছত তবে তিনি লাঞ্ছিত অবস্থায় নিক্ষিপ্ত হতেন উন্মুক্ত প্রান্তরে।

فَاجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَجَعَلَهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

৫০. অতঃপর তার রব তাকে মনোনীত করে তাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করলেন।

---

(১) পবিত্র কুরআনের অন্যত্র এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, মাছের পেটের এবং সাগরের পানির অন্ধকারে ইউনুস আলাইহিস সালাম উচ্চস্বরে এ বলে প্রার্থনা করলেনঃ তোমার পবিত্র সত্তা ছাড়া আর কোন সত্য ইলাহ নেই। আসলে আমি অপরাধী। আল্লাহ তা'আলা তার ফরিয়াদ গ্রহণ করলেন এবং তাকে এ দুঃখ ও মুসিবত থেকে মুক্তি দান করলেন। [সূরা আম্বিয়া: ৮৭-৮৮]

৫১. আর কাফিররা যখন কুরআন শোনে তখন তারা যেন তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দ্বারা আপনাকে আছড়ে ফেলবে এবং বলে, 'এ তো এক পাগল।'

وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ﴿٥١﴾

৫২. অথচ তা[১] তো কেবল সৃষ্টিকুলের জন্য উপদেশ।

وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٥٢﴾

(১) এখানে 'তা' বলে অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে কুরআন বোঝানো হয়েছে। তবে কোন কোন মুফাসসির বলেন, এখানে 'তা' বলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বোঝানো হয়েছে। অথচ দু'টি অর্থই এখানে হতে পারে। কুরআন যেমন সমস্ত সৃষ্টিজগতের জন্য উপদেশ তেমনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও সমস্ত সৃষ্টিজগতের জন্য উপদেশ ও সম্মানের পাত্র। [কুরতুবী]

৬৯- সূরা আল-হাক্কাহ্[১]
৫২ আয়াত, মক্কী

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. সে অবশ্যম্ভাবী ঘটনা,

اَلْحَاۤقَّةُ ۝١

২. কী সে অবশ্যম্ভাবী ঘটনা?

مَا الْحَاۤقَّةُ ۝٢

৩. আর কিসে আপনাকে জানাবে সে অবশ্যম্ভাবী ঘটনা কী?

وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الْحَاۤقَّةُ ۝٣

৪. সামূদ ও 'আদ সম্প্রদায় মিথ্যারোপ করেছিল ভীতিপ্রদ মহাবিপদ সম্পর্কে[২]।

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ ۝٤

৫. অতঃপর সামূদ সম্প্রদায়, তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রলয়ংকর বিপর্যয়কারী প্রচণ্ড চীৎকার দ্বারা।

فَاَمَّا ثَمُوْدُ فَاُهْلِكُوْا بِالطَّاغِيَةِ ۝٥

৬. আর 'আদ সম্প্রদায়, তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা[৩],

وَاَمَّا عَادٌ فَاُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۝٦

৭. যা তিনি তাদের উপর প্রবাহিত করেছিলেন সাতরাত ও আটদিন বিরামহীনভাবে; তখন আপনি উক্ত সম্প্রদায়কে দেখতেন--- তারা

سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَّثَمٰنِيَةَ اَيَّامٍ حُسُوْمًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعٰى كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ۝٧

---

(১) الحاقة শব্দ দ্বারা কিয়ামতকে বুঝানো হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর,বাগভী]

(২) القارعة শব্দটি قرع শব্দ থেকে উৎপন্ন। قرع শব্দের অর্থ আরবী ভাষায় খট্‌খট শব্দ করা, হাতুড়ি পিটিয়ে শব্দ করা, কড়া নেড়ে শব্দ করা এবং একটি জিনিসকে আরেকটি জিনিস দিয়ে আঘাত করা বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। কিয়ামতের ভয়াবহতা সম্পর্কে ধারণা দেয়ার জন্য এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। কেয়ামত যেহেতু সব মানুষকে অস্থির ও ব্যাকুল করে দেবে এবং সমগ্র আকাশ ও পৃথিবীকে ছিন্ন-বিছিন্ন করে দেবে, তাই একে قارعة বলা হয়েছে। তাছাড়া কিয়ামতের পূর্বাহ্নে যে মহাশব্দের মধ্যে তার সুত্রপাত হবে এখানে সেদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে। [দেখুন-কুরতুবী]

(৩) ريح صرصر এর অর্থ অত্যধিক শৈত্যসম্পন্ন প্রচন্ড বাতাস। [মুয়াসাসার]

সেখানে লুটিয়ে পড়ে আছে সারশূন্য খেজুর কাণ্ডের ন্যায়।

৮. অতঃপর তাদের কাউকেও আপনি বিদ্যমান দেখতে পান কি?

فَهَلْ تَرٰى لَهُمْ مِّنْۢ بَاقِيَةٍ ۝٨

৯. আর ফির‘আউন, তার পূর্ববর্তীরা এবং উল্টিয়ে দেয়া জনপদ পাপাচারে লিপ্ত ছিল[১]।

وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهٗ وَالْمُؤْتَفِكٰتُ بِالْخَاطِئَةِ ۝٩

১০. অতঃপর তারা তাদের রবের রাসূলকে অমান্য করেছিল, ফলে তিনি তাদেরকে পাকড়াও করলেন ---কঠোর পাকড়াও।

فَعَصَوْا رَسُوْلَ رَبِّهِمْ فَاَخَذَهُمْ اَخْذَةً رَّابِيَةً ۝١٠

১১. যখন জলোচ্ছ্বাস হয়েছিল নিশ্চয় তখন আমরা তোমাদেরকে আরোহণ করিয়েছিলাম নৌযানে,

اِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَآءُ حَمَلْنٰكُمْ فِى الْجَارِيَةِ ۝١١

১২. আমরা এটা করেছিলাম তোমাদের শিক্ষার জন্য এবং এজন্যে যে, যাতে শ্রুতিধর কান এটা সংরক্ষণ করে।

لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَّتَعِيَهَآ اُذُنٌ وَّاعِيَةٌ ۝١٢

১৩. অতঃপর যখন শিংগায়[২] ফুঁক দেয়া হবে---একটি মাত্র ফুঁক[৩],

فَاِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ نَفْخَةٌ وَّاحِدَةٌ ۝١٣

---

(১) مؤتفكات এর এক অর্থ উল্টে দেয়া, যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। অন্য অর্থ পরস্পরের মিশ্রিত ও মিলিত। লুত আলাইহিস্ সালাম এর সম্প্রদায়ের বস্তিসমূহকে مؤتفكات বলা হয়েছে। [কুরতুবী]

(২) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো যে, صور কী? জবাবে তিনি বললেন, “শিং এর আকারে কোন বস্তুকে বলা হয় যাতে ফুঁক দেয়া হবে।” [তিরমিযী: ২৪৩০, আবু দাউদ: ৪৭৪২]

(৩) পবিত্র কুরআনের কোথাও কোথাও এ দুই শিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার কথা ভিন্নভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় ফুৎকারের সময় গোটা বিশ্ব-জাহানের লণ্ডভণ্ড হয়ে যাওয়ার যে অবস্থা সূরা আল-হাজ্জের ১ ও ২ আয়াতে, সূরা ইয়াসীনের ৪৯ ও ৫০ আয়াতে এবং সূরা আত-তাকভীরের ১ থেকে ৬ পর্যন্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে তা তাদের চোখের

১৪. আর পর্বতমালা সহ পৃথিবী উৎক্ষিপ্ত হবে এবং মাত্র এক ধাক্কায় ওরা চুর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে যাবে।

وَّحُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً ﴿١٤﴾

১৫. ফলে সেদিন সংঘটিত হবে মহাঘটনা,

فَيَوْمَئِذٍ وَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿١٥﴾

১৬. আর আসমান বিদীর্ণ হয়ে যাবে ফলে সেদিন তা দুর্বল-বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে।

وَانْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَّاهِيَةٌ ﴿١٦﴾

১৭. আর ফেরেশ্‌তাগণ আসমানের প্রান্ত দেশে থাকবে এবং সেদিন আটজন ফিরিশ্‌তা আপনার রবের 'আর্‌শকে ধারণ করবে তাদের উপরে।

وَّالْمَلَكُ عَلٰٓى اَرْجَآئِهَا ۗ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمٰنِيَةٌ ﴿١٧﴾

১৮. সেদিন উপস্থিত করা হবে তোমাদেরকে এবং তোমাদের কোন গোপনই আর গোপন থাকবে না।

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُوْنَ لَا تَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ﴿١٨﴾

১৯. তখন যাকে তার 'আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে, সে বলবে, 'লও, আমার 'আমলনামা পড়ে দেখ(১);

فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ ۙ فَيَقُوْلُ هَآؤُمُ اقْرَءُوْا كِتٰبِيَهْ ﴿١٩﴾

২০. 'আমি দৃঢ়বিশ্বাস করতাম যে, আমাকে আমার হিসেবের সম্মুখীন হতে হবে।'

اِنِّيْ ظَنَنْتُ اَنِّيْ مُلٰقٍ حِسَابِيَهْ ﴿٢٠﴾

সামনে ঘটতে থাকবে। পক্ষান্তরে সূরা ত্বা-হার ১০২ থেকে ১১২ আয়াত, সূরা আল-আম্বিয়ার ১০১ থেকে ১০৩ আয়াত, সূরা ইয়াসীনের ৫১ থেকে ৫৩ আয়াত এবং সূরা ক্বাফ এর ২০ থেকে ২২ আয়াতে শুধু শিংগায় দ্বিতীয়বার ফুৎকারের কথা উল্লেখিত হয়েছে।

(১) هاؤم শব্দের এক অর্থ, আস। অন্য অর্থ, লও। উদ্দেশ্য এই যে, আমলনামা ডানহাতে পাওয়ার সাথে সাথেই তারা আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠবে এবং নিজের বন্ধু-বান্ধবদের তা দেখাবে। সে আহলাদে আটখানা হয়ে আশেপাশের লোকজনকে বলবে, লও আমার আমলনামা পাঠ করে দেখ। কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে যে, "সে আনন্দচিত্তে আপনজনদের কাছে ফিরে যাবে" [সূরা আল-ইনশিকাক: ৯]

২১. কাজেই সে যাপন করবে সন্তোষজনক জীবন;	فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴿٢١﴾
২২. সুউচ্চ জান্নাতে	فِيْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿٢٢﴾
২৩. যার ফলরাশি অবনমিত থাকবে নাগালের মধ্যে ।	قُطُوْفُهَا دَانِيَةٌ ﴿٢٣﴾
২৪. বলা হবে, ‘পানাহার কর তৃপ্তির সাথে, তোমরা অতীত দিনে যা করেছিলে তার বিনিময়ে ।’	كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓـًٔا بِمَآ اَسْلَفْتُمْ فِي الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴿٢٤﴾
২৫. কিন্তু যার ‘আমলনামা তার বাম হাতে দেয়া হবে, সে বলবে, ‘হায়! আমাকে যদি দেয়াই না হত আমার ‘আমলনামা,	وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِشِمَالِهٖ ۙ فَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ لَمْ اُوْتَ كِتٰبِيَهْ ﴿٢٥﴾
২৬. আর আমি যদি না জানতাম আমার হিসেব!	وَلَمْ اَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ﴿٢٦﴾
২৭. ‘হায়! আমার মৃত্যুই যদি আমার শেষ হত!	يٰلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ﴿٢٧﴾
২৮. ‘আমার ধন-সম্পদ আমার কোন কাজেই আসল না ।	مَآ اَغْنٰى عَنِّيْ مَالِيَهْ ﴿٢٨﴾
২৯. ‘আমার ক্ষমতাও বিনষ্ট হয়েছে ।’	هَلَكَ عَنِّيْ سُلْطٰنِيَهْ ﴿٢٩﴾
৩০. ফেরেশ্‌তাদেরকে বলা হবে, ‘ধর তাকে, তার গলায় বেড়ী পরিয়ে দাও ।	خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ ﴿٣٠﴾
৩১. ‘তারপর তোমরা তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করিয়ে দগ্ধ কর ।	ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ ﴿٣١﴾
৩২. ‘তারপর তাকে শৃংখলিত কর এমন এক শেকলে যার দৈর্ঘ্য হবে সত্তর হাত’[১],	ثُمَّ فِيْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ ﴿٣٢﴾

(১) অর্থাৎ ফেরেশতাদেরকে আদেশ করা হবে, এই অপরাধীকে ধর এবং তার গলায় বেড়ি পরিয়ে দাও । অতঃপর তাকে সত্তর গজ দীর্ঘ এক শিকলে গ্রথিত করে দাও । এ শিকল সংক্রান্ত এক বর্ণনা হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

৩৩. নিশ্চয় সে মহান আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানদার ছিল না,

إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ﴿٣٣﴾

৩৪. আর মিসকীনকে অন্নদানে উৎসাহিত করত না,

وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٣٤﴾

৩৫. অতএব এ দিন তার কোন সুহৃদ থাকবে না,

فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ ﴿٣٥﴾

৩৬. আর কোন খাদ্য থাকবে না ক্ষত নিঃসৃত স্রাব ছাড়া,

وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ ﴿٣٦﴾

৩৭. যা অপরাধী ছাড়া কেউ খাবে না।

لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ ﴿٣٧﴾

দ্বিতীয় রুকূ'

৩৮. অতএব আমি কসম করছি তার, যা তোমরা দেখতে পাও,

فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ﴿٣٨﴾

৩৯. এবং যা তোমরা দেখতে পাও না তারও;

وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ﴿٣٩﴾

৪০. নিশ্চয় এ কুরআন এক সম্মানিত রাসূলের (বাহিত) বাণী[১]।

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿٤٠﴾

৪১. আর এটা কোন কবির কথা নয়; তোমরা খুব অল্পই ঈমান পোষণ করে থাক,

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ۚ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ ﴿٤١﴾

৪২. এটা কোন গণকের কথাও নয়, তোমরা অল্পই উপদেশ গ্রহণ কর।

وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ۚ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ﴿٤٢﴾

বলেন, "যদি এ শিকলের একটি গ্রন্থি আসমান থেকে দুনিয়াতে পাঠানো হয় তবে (অতি ভারী হওয়ার কারণে) রাতের আগেই যমীনে এসে পড়বে। যদিও আসমান ও যমীনের মাঝের দূরত্ব পাঁচশত বছরের পথ। আর সেটা যদি শিকলের মাথার অংশ হয় (অর্থাৎ আরো বড় ও ভারী হয়) তারপর যদি তা জাহান্নামে ফেলা হয় তবে সেটা তার নিম্নভাগে পৌঁছতে চল্লিশ বছর লাগবে"। [তিরমিযী: ২৫৮৮, মুসনাদে আহমাদ: ২/১৯৭]

(১) এখানে সম্মানিত রাসূল মানে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। [কুরতুবী]

৪৩. এটা সৃষ্টিকুলের রবের কাছ থেকে নাযিলকৃত ।

تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٣﴾

৪৪. তিনি যদি আমাদের নামে কোন কথা রচনা করে চালাতে চেষ্টা করতেন,

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ ﴿٤٤﴾

৪৫. তবে অবশ্যই আমরা তাকে পাকড়াও করতাম ডান হাত দিয়ে[১],

لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ﴿٤٥﴾

৪৬. তারপর অবশ্যই আমরা কেটে দিতাম তার হৃদপিণ্ডের শিরা,

ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ ﴿٤٦﴾

৪৭. অতঃপর তোমাদের মধ্যে এমন কেউই নেই, যে তাঁকে রক্ষা করতে পারে ।

فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حٰجِزِيْنَ ﴿٤٧﴾

৪৮. আর এ কুরআন মুত্তাকীদের জন্য অবশ্যই এক উপদেশ ।

وَاِنَّهٗ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٨﴾

৪৯. আর আমরা অবশ্যই জানি যে, তোমাদের মধ্যে মিথ্যা আরোপকারী রয়েছে ।

وَاِنَّا لَنَعْلَمُ اَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِيْنَ ﴿٤٩﴾

৫০. আর এ কুরআন নিশ্চয়ই কাফিরদের অনুশোচনার কারণ হবে,

وَاِنَّهٗ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٥٠﴾

৫১. আর নিশ্চয় এটা সুনিশ্চিত সত্য ।

وَاِنَّهٗ لَحَقُّ الْيَقِيْنِ ﴿٥١﴾

৫২. অতএব আপনি আপনার মহান রবের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন ।

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ﴿٥٢﴾

---

(১) উপরোক্ত অর্থ অনুসারে এটি সিফাতের আয়াত । অর্থাৎ এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র ডান হাত সাব্যস্ত হচ্ছে । [ইবন তাইমিয়্যাহ, বায়ানু তালবীসুল জাহমিয়্যাহ ৩/৩৩৮] আয়াতের অন্য অর্থ হচ্ছে, আমরা তার ডান হাত পাকড়াও করতাম । উভয় অর্থই ইবন কাসীর উল্লেখ করেছেন । এ অর্থটি এদিক দিয়ে শুদ্ধ যে, সাধারণত কাউকে অপমান করতে হলে তার ডান হাত ধরে তার উপর আক্রমন করা হয় । [ইবন তাইমিয়্যাহ, আন-নুবুওয়াত: ২/৮৯৮] অপর অর্থ হচ্ছে, তাকে আমরা আমাদের ক্ষমতা দ্বারা পাকড়াও করতাম । [সা'দী; জালালাইন; আর দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, আস-সারেমুল মাসলূল আলা শাতিমির রাসূল: ১৭] এটি শুদ্ধ হলেও আল্লাহ্‌র হাত অস্বীকার করার কোন উপায় নেই । যা অন্যান্য আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত ।

৭০- সূরা আল-মা'আরিজ
৪৪ আয়াত, মক্কী

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. এক ব্যক্তি চাইল, সংঘটিত হোক শাস্তি যা অবধারিত(১)---

سَاَلَ سَآئِلٌۢ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ ۝١

২. কাফিরদের জন্য, এটাকে প্রতিরোধ করার কেউ নেই(২) ।

لِّلْكٰفِرِيْنَ لَيْسَ لَهٗ دَافِعٌ ۝٢

৩. এটা আসবে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে, যিনি ঊর্ধ্বারোহনের সোপানসমূহের অধিকারী(৩) ।

مِّنَ اللّٰهِ ذِى الْمَعَارِجِ ۝٣

---

(১) سأل শব্দটি কখনও তথ্যানুসন্ধান ও জিজ্ঞেস করার অর্থে আসে । তখন আরবী ভাষায় এর সাথে عن অব্যয় ব্যবহৃত হয় । সে অনুসারে আয়াতের অর্থ হলো একজন জিজ্ঞেসকারী জানতে চেয়েছে যে, তাদেরকে যে আযাব সম্পর্কে অবহিত করা হচ্ছে তা কার ওপর আপতিত হবে? আল্লাহ তা'আলা এ প্রশ্নের জওয়াব দিয়েছেন এই বলে যে, তা কাফেরদের ওপর পতিত হবেই । আবার কখনও এ শব্দটি আবেদন ও কোন কিছু চাওয়া বা দাবী করার অর্থে আসে । আয়াতে এই অর্থে আসার কারণে এর সাথে باء অব্যয় ব্যবহৃত হয়েছে । [দেখুন: ফাতহুল কাদীর] অধিকাংশ মুফাস্‌সির এ অর্থই গ্রহণ করেছেন । বিভিন্ন বর্ণনায় ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে এসেছে, নদর ইবনে হারেস এই আযাব চেয়েছিল । [নাসায়ী: তাফসীর ২/৪৬৩, নং ৬৪০, মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৫০২] সে কুরআন ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি মিথ্যারোপ করতে গিয়ে ধৃষ্টতাসহকারে আল্লাহ তা'আলার কাছে আযাব চেয়েছিল । এটি ছাড়াও কুরআন মজীদের আরো অনেক স্থানে মক্কার কাফেরদের এ চ্যালেঞ্জেরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, আপনি আমাদের যে আযাবের ভয় দেখাচ্ছেন তা নিয়ে আসছেন না কেন? যেমন, সূরা ইউনুস: ৪৬-৪৮; সূরা আল-আম্বিয়া: ৩৬-৪১; সূরা আন-নামল: ৬৭-৭২; সূরা সাবা: ২৬-৩০; ইয়াসীন: ৪৫-৫২ এবং সূরা আল-মূলক: ২৪-২৭ ।

(২) এখানে কাফেরদের উপর আযাব আসার কিছু স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, এই আযাব কাফেরদের জন্যে দুনিয়াতে কিংবা আখেরাতে কিংবা উভয় জাহানে অবধারিত । একে প্রতিহত করার সাধ্য কারও নেই । এ আযাব আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আসবে যিনি অবস্থান, সম্মান ও ক্ষমতা সর্বদিক থেকেই সবার উপরে । [সা'দী]

(৩) আয়াতে আল্লাহ তা'আলার বিশেষণ ﴿ذِى الْمَعَارِجِ﴾ অর্থ যিনি সুউচ্চ স্থানে আরশের

تَعْرُجُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ اِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ ۚ

৪. ফেরেশ্‌তা এবং রূহ আল্লাহ্‌র দিকে ঊর্ধ্বগামী হয়[১] এমন এক দিনে, যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর[২]।

উপর আছেন; উচ্চতার অধিকারী, আবার ক্ষমতা, সম্মতি প্রতিপত্তির দিক দিয়েও তিনি সবার উপরে। তার কাছে কোন কিছু পৌঁছার জন্য উপরের দিকেই যায়। [সা'দী]

(১) অর্থাৎ উপরে নীচে স্তরে স্তরে সাজানো এই ঊর্ধ্বারোহনের সোপানসমূহের মধ্যে ফেরেশতাগণ ও রুহুল আমীন অর্থাৎ জিবরাঈল আরোহন করেন। [মুয়াস্‌সার]

(২) আয়াতের অর্থ নির্ধারণে কয়েকটি মত রয়েছে। এক. মুজাহিদ বলেন, এখানে পঞ্চাশ হাজার বছর বলে আরশ থেকে সর্বনিম্ন যমীনের দূরত্ব বোঝানো হয়েছে, কিয়ামতের দিনের পরিমাণ বোঝানো হয়নি। দুই. ইকরিমা বলেন, এখানে দুনিয়ার জীবনের পরিমাণ বোঝানো উদ্দেশ্য। তিন. মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব বলেন, এখানে দুনিয়া ও আখেরাতের মধ্যবর্তী সময় বোঝানো উদ্দেশ্য। চার. অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে, এখানে কিয়ামত দিবসের পরিমাণই উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। অর্থাৎ উল্লেখিত আযাব সেই দিন সংঘটিত হবে, যে দিনের পরিমান পঞ্চাশ হাজার বছর। আর এ মতটির পক্ষে বিভিন্ন হাদীসও প্রমাণবহ। বিভিন্ন হাদীসেও কিয়ামত দিবসের পরিমাণকে পঞ্চাশ হাজার বছর বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন, যাকাত না প্রদানকারীকে শাস্তির মেয়াদ বর্ণনার হাদীসে বলা হয়েছে যে, "তার এ শাস্তি চলতে থাকবে এমন এক দিনে যার পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছর, তারপর তার ভাগ্য নির্ধারণ হবে হয় জান্নাতের দিকে না হয় জাহান্নামের দিকে"। [মুসলিম: ৯৮৭, আবু দাউদ: ১৬৫৮, নাসায়ী: ২৪৪২, মুসনাদে আহমাদ: ২/৩৮৩] [কুরতুবী] তাছাড়া অন্য হাদীসে ﴿يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ﴾ "যে দিন দাঁড়াবে সমস্ত মানুষ সৃষ্টিকুলের রবের সামনে!" [সূরা আল-মুতাফফিফীন:৬] এ আয়াতের তাফসীরে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "তা হবে এমন একদিনে যার পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছর, তারা তাদের কান পর্যন্ত ঘামে ডুবে থাকবে"। [মুসনাদে আহমাদ:২/১১২] সুতরাং এখানে কিয়ামত দিবসের পরিমাণই বর্ণনা করা হয়েছে। তবে তা লোকভেদে ভিন্ন ভিন্ন বোধ হবে। কাফেরদের নিকট পঞ্চাশ হাজার বছর বলে মনে হবে। কিন্তু ঈমানদারের জন্য তা এত দীর্ঘ হবে না। হাদীসে এসেছে, সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই দিনের দৈর্ঘ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেনঃ "আমার প্রান যে সত্তার হাতে, তার শপথ করে বলছি এই দিনটি মুমিনের জন্য একটি ফরয সালাত আদায়ের সময়ের চেয়েও কম হবে।" [মুসনাদে আহমাদ: ৩/৭৫] অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে "এই দিনটি মুমিনদের জন্যে যোহর ও আছরের মধ্যবর্তী সময়ের মত হবে।" [মুস্তাদরাকে হাকিম: ১/১৫৮, নং ২৮৩]

কেয়ামত দিবসের দৈর্ঘ্য এক হাজার বছর, না পঞ্চাশ হাজার বছর? আলোচ্য আয়াতে কেয়ামত দিবসের পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর অথচ

فَاصۡبِرۡ صَبۡرًا جَمِيۡلًا ۝

৫. কাজেই আপনি ধৈর্য ধারণ করুন পরম ধৈর্য।

اِنَّهُمۡ يَرَوۡنَهٗ بَعِيۡدًا ۝

৬. তারা ঐ দিনকে মনে করে সুদূর,

وَّنَرٰىهُ قَرِيۡبًا ۝

৭. কিন্তু আমরা দেখছি তা আসন্ন[১]।

يَوۡمَ تَكُوۡنُ السَّمَآءُ كَالۡمُهۡلِ ۝

৮. সেদিন আকাশ হবে গলিত ধাতুর মত

অন্য আয়াতে এক হাজার বছর বলা হয়েছে। আয়াতটি এই ﴿يُدَبِّرُ الۡاَمۡرَ مِنَ السَّمَآءِ اِلَى الۡاَرۡضِ ثُمَّ يَعۡرُجُ اِلَيۡهِ فِىۡ يَوۡمٍ كَانَ مِقۡدَارُهٗۤ اَلۡفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوۡنَ﴾ "আল্লাহ তা'আলা কাজ-কর্ম পরিচালনা করে আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত অতঃপর তাঁর দিকে ঊর্ধ্বগমন করেন এমন এক দিনে যা তোমাদের হিসাব অনুযায়ী এক হাজার বছরের সমান।" [সূরা আস-সাজদাহ:৫] বাহ্যত উভয় আয়াতের মধ্যে বৈপরিত্য আছে। উপরোক্ত হাদীস দৃষ্টে এর জওয়াব হয়ে গেছে যে, সেই দিনের দৈর্ঘ্য বিভিন্ন দলের দিক দিয়ে বিভিন্ন রূপ হবে। কাফেরদের জন্যে পঞ্চাশ হাজার বছর এবং মুমিনদের জন্যে এক সালাতের ওয়াক্তের সমান হবে। তাদের মাঝখানে কাফেরদের বিভিন্ন দল থাকবে। অস্থিরতা ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে সময় দীর্ঘ ও খাট হওয়া প্রসিদ্ধ ও সুবিধিত। অস্থিরতা ও কষ্টের এক ঘন্টা মাঝে মাঝে মানুষের কাছে এক দিন বরং এক সপ্তাহের চেয়েও বেশী মনে হয় এবং সুখ ও আরামের দীর্ঘতর সময়ও সংক্ষিপ্ত অনুভূত হয়। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর] তাছাড়া যে আয়াতে এক হাজার বছরের কথা আছে, সেই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কোন কোন মুফাসসির বলেন, সেই আয়াতে পার্থিব একদিন বোঝানো হয়েছে। এই দিনে জিবরাঈল ও ফেরেশতাগণ আকাশ থেকে পৃথিবীতে এবং পৃথিবী থেকে আকাশে যাতায়াত করে এত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেন যা মানুষ অতিক্রম করলে এক হাজার বছর লাগত। ফেরেশতাগণ এই দূরত্ব খুবই সংক্ষিপ্ত সময়ে অতিক্রম করেন। সে হিসেবে বলা যায় যে, সূরা আল-মা'আরিজে বর্ণিত পঞ্চাশ হাজার বছর সময় কিয়ামতের দিনের সাথে সংশ্লিষ্ট, যা পার্থিব দিন অপেক্ষা অনেক বড়। এর দৈর্ঘ্য ও সংক্ষিপ্ততা বিভিন্ন লোকের জন্যে তাদের অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্নরূপ অনুভূত হবে। আর সূরা আস-সাজদাহ বর্ণিত এক হাজার বছর সময় আসমান ও যমীনের মধ্যকার চলাচলের সময় বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং আয়াতদ্বয়ে কোন বৈপরিত্ব নেই। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর, সূরা আস-সাজদা, আয়াত নং ৫; তাবারী, সূরা আস-সাজদা, আয়াত নং ৫]

(১) কারও কারও মতে এখানে স্থান ও কালের দিক দিয়ে দূর ও নিকট বোঝানো হয়নি; সম্ভাব্যতার ও বাস্তবতার দূরবর্তীতা বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে তারা কেয়ামতের বাস্তবতা বরং সম্ভাব্যতাকেও সুদূর পরাহত মনে করে আর আমি দেখছি যে, এটা নিশ্চিত। [দেখুন, কুরতুবী]

وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ۝٩

৯. এবং পর্বতসমূহ হবে রঙ্গীন পশমের মত,

وَلَا يَسْـَٔلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ۝١٠

১০. এবং সুহৃদ সুহৃদের খোঁজ নেবে না,

يُبَصَّرُونَهُمْ ۚ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ ۝١١

১১. তাদেরকে করা হবে একে অপরের দৃষ্টিগোচর। অপরাধী সেদিনের শাস্তির বদলে দিতে চাইবে তার সন্তান-সন্ততিকে,

وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ۝١٢

১২. আর তার স্ত্রী ও ভাইকে,

وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ ۝١٣

১৩. আর তার জ্ঞাতি-গোষ্ঠীকে, যারা তাকে আশ্রয় দিত,

وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ ۝١٤

১৪. আর যমীনে যারা আছে তাদের সবাইকে, তারপর যাতে এটি তাকে মুক্তি দেয়।

كَلَّا ۖ إِنَّهَا لَظَىٰ ۝١٥

১৫. কখনই নয়, নিশ্চয় এটা লেলিহান আগুন,

نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ ۝١٦

১৬. যা মাথার চামড়া খসিয়ে দেবে(১)।

تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ ۝١٧

১৭. জাহান্নাম সে ব্যক্তিকে ডাকবে, যে সত্যের প্রতি পিঠ দেখিয়েছিল এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।

وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ ۝١٨

১৮. আর যে সম্পদ পুঞ্জীভূত করেছিল অতঃপর সংরক্ষিত করে রেখেছিল(২)।

---

(১) لظى শব্দের অর্থ অগ্নির লেলিহান শিখা। شوى শব্দটি شواة এর বহুবচন। অর্থ মাথার চামড়া। এর আরেকটি অর্থ হতে পারে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। অর্থাৎ জাহান্নামের অগ্নি একটি প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা, যা মস্তিস্ক বা হাত পায়ের চামড়া খুলে ফেলবে। [ইবন কাসীর, মুয়াসসার]

(২) এই অগ্নি নিজে সেই ব্যক্তিকে ডাকবে যে সত্যের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে অস্বীকার করে; তা কাজে পরিণত করা থেকে বিরত থাকে এবং ধন-সম্পদ সংগ্রহ করে তা পুঞ্জীভূত করে আগলিয়ে রাখে। পুঞ্জীভূত করার এবং আগলিয়ে রাখার অর্থ ফরয ও ওয়াজিব হক আদায় না করা। [ইবন কাসীর]

إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿١٩﴾

১৯. নিশ্চয় মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে অতিশয় অস্থিরচিত্তরূপে[১]।

إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴿٢٠﴾

২০. যখন বিপদ তাকে স্পর্শ করে সে হয় হা-হুতাশকারী।

وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿٢١﴾

২১. আর যখন কল্যাণ তাকে স্পর্শ করে সে হয় অতি কৃপণ;

إِلَّا الْمُصَلِّينَ ﴿٢٢﴾

২২. তবে সালাত আদায়কারীগণ ছাড়া[২],

الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴿٢٣﴾

২৩. যারা তাদের সালাতে সর্বদা প্রতিষ্ঠিত[৩],

---

(১) هلوع এর শাব্দিক অর্থ ভীষণ লোভী ও অতি ভীরু ব্যক্তি। [কুরতুবী] ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা এখানে অর্থ নিয়েছেন সেই ব্যক্তি, যে হারাম ধন-সম্পদ লোভ করে। সাঈদ ইবনে জুবাইর রাহেমাহুল্লাহ বলেন, এর অর্থ কৃপণ। মুকাতিল বলেন, এর অর্থ সংকীর্ণমনা ব্যক্তি। এসব অর্থ কাছাকাছি। স্বয়ং আল্লাহ্ই কুরআনে এর পরবর্তী দু' আয়াতে এ শব্দের ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। [বাগাভী] এখানে মানুষের খারাপ কর্মকাণ্ড ও স্বভাব উল্লেখ করে বলেন যে, সে "যখন দুঃখ কষ্ট সম্মুখীন হয়, তখন হা-হুতাশ শুরু করে দেয়। পক্ষান্তরে কোন সুখ শান্তি ও আরাম লাভ করে, তখন কৃপণ হয়ে যায়।" । অতঃপর সাধারণ মানুষদের এই বদ-অভ্যাস থেকে সৎকর্মী সালাত আদায়কারী মুমিনদের ব্যতিক্রম প্রকাশ করে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ যারা এরূপ সৎকর্ম করে, তারা অতিশয় ভীরু ও লোভী নয়। [তাবারী]

(২) আয়াতে সালাত আদায়কারীদের গুণাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, যে সালাত আদায়কারী সর্বদা সালাত প্রতিষ্ঠাকারী। এখানে সালাত প্রতিষ্ঠার অর্থ ইবনে মাসউদ, মাসরুক ও ইবরাহীম নাখ'য়ী এর মতে, সালাতকে তার ওয়াক্তে ফরয-ওয়াজিব খেয়াল রেখে আদায় করা। কোন কোন মুফাসসিরের মতে এখানে সালাত প্রতিষ্ঠার অর্থ, সমগ্র সালাতেই সালাতের দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ রাখা; এদিক সেদিক না তাকানো। সাহাবী ওকবা ইবনে আমের বলেন, উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সালাতের দিকেই নিবিষ্ট থাকে এবং ডানে বামে ও আগে পিছে তাকায় না। [ইবন কাসীর]

(৩) আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কাছে প্রবেশ করে এক মহিলা দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এ মহিলা কে? তিনি বললেন, অমুক (অন্য বর্ণনায় এসেছে, তার নাম ছিল হাওলা বিনতে তুয়াইত) তারপর তিনি তার প্রচুর সালাত আদায়ের কথা বলছিলেন - তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, থাম, তোমরা যা (সব সময়) করতে সক্ষম হবে

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾

২৪. আর যাদের সম্পদে নির্ধারিত হক রয়েছে

لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾

২৫. যাচঞাকারী ও বঞ্চিতের,

وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿٢٦﴾

২৬. আর যারা প্রতিদান দিবসকে সত্য বলে বিশ্বাস করে ।

وَالَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ﴿٢٧﴾

২৭. আর যারা তাদের রবের শাস্তি সম্পর্কে ভীত-সন্ত্রস্ত---

إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ ﴿٢٨﴾

২৮. নিশ্চয় তাদের রবের শাস্তি হতে নিঃশঙ্ক থাকা যায় না;

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٢٩﴾

২৯. আর যারা নিজেদের যৌনাঙ্গসমূহের হিফাযতকারী[১],

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٣٠﴾

৩০. তাদের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসী ছাড়া, এতে তারা নিন্দনীয় হবে না---

---

ততটুকুই নিজের উপর ঠিক করে নিবে । আল্লাহ্র শপথ, যতক্ষণ তোমরা নিজেরা ক্লান্ত হবে না ততক্ষণ আল্লাহ্ও দিতে ক্ষান্ত হবেন না ।” আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সেই কাজটি সবচেয়ে প্রিয় ছিল যা কেউ সব সময় করে । [বুখারী: ৪৩, মুসলিম: ৭৮৫, মুসনাদে আহমাদ: ৬/৫১, ২৩১] অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শা'বান মাস ব্যতীত আর কোন মাসে এত বেশী সাওম পালন করতেন না । তিনি পুরো শা'বান মাসই সাওম পালন করতেন । তিনি বলতেন, “তোমরা যে কাজ (সর্বদা) করতে সক্ষম হবে তাই করবে; কেননা, তোমরা বিরক্ত হলেও আল্লাহ্ (প্রতিদান প্রদানে) ক্ষান্ত হন না ।” (অথবা হাদীসের অর্থ, তোমরা বিরক্ত না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ বিরক্ত হন না । তখন বিরক্ত হওয়া আল্লাহর একটি গুণ হিসেবে বিবেচিত হবে, তবে যেভাবে তা তাঁর সম্মানের সাথে উপযোগী সেভাবে তা সাব্যস্ত করতে হবে । [মাজুমূ' ফাতাওয়া ইবন উসাইমীন: ১/১৭৪]) আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সে সালাতই সবচেয়ে প্রিয় ছিল যার আদায়কারী তা সর্বক্ষণ করতে থাকত । যদিও তার পরিমাণ কম হয় । তিনি নিজেও কোন কাজ করলে সেটা সব সময় করতেন ।” [বুখারী: ১৯৭০]

(১) লজ্জাস্থানের হিফাযতের অর্থ ব্যভিচার না করা এবং উলঙ্গপনা থেকেও দূরে থাকা, অনুরূপ যাবতীয় বেহায়াপনাও এর অন্তর্ভুক্ত । [দেখুন: সা'দী]

৩১. তবে কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা হবে সীমালজ্ঘনকারী---

فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ۟

৩২. আর যারা তাদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী[১],

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ۟

৩৩. আর যারা তাদের সাক্ষ্যসমূহে অটল[২],

وَالَّذِيْنَ هُمْ بِشَهٰدٰتِهِمْ قَآئِمُوْنَ ۟

৩৪. আর যারা তাদের সালাতের হিফাযত করে---[৩]

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ۟

(১) আমানত কেবল সে অর্থকেই বলে না যা কেউ কারো হাতে সোপর্দ করে, বরং যেসব ওয়াজিব হক আদায় করা দায়িত্ব ফরয, সেগুলো সবই আমানত; এগুলোতে ত্রুটি করা খিয়ানত। এতে সালাত, সাওম, হজ, যাকাত ইত্যাদি আল্লাহ তা'আলার হকও দাখিল আছে এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বান্দার যেসব হক ওয়াজিব করা হয়েছে অথবা কোন লেনদেন ও চুক্তির মাধ্যমে যেসব হক নিজের উপর কেউ ওয়াজিব করে নিয়েছে সেগুলোও শামিল রয়েছে। এগুলো আদায় করা ফরয এবং এতে ত্রুটি করা খিয়ানতের অর্ন্তভুক্ত। অনুরূপভাবে عهدهم বা চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি মানে বান্দা আল্লাহর সাথে যে চুক্তি বা প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হয় এবং মানুষ পরস্পরের সাথে যেসব চুক্তি ও প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হয় এ উভয় প্রকার চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি। এ উভয় প্রকার আমানত এবং উভয় প্রকার চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা একজন মুমিনের চরিত্রের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। [দেখুন: তাবারী]

(২) অর্থাৎ, তারা যা জানে তাই সাক্ষ্য দেয়, কোন প্রকার পরিবর্ধন-পরিমার্জন বা পরিবর্তন ব্যতীত সাক্ষ্য দেয়; আর এ সাক্ষ্য দানের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন থাকে তার লক্ষ্য। [সা'দী]

(৩) এ থেকে সালাতের গুরুত্ব বুঝা যায়। যে ধরনের উন্নত চরিত্র ও মহৎ কর্মশীল লোক জান্নাতের উপযুক্ত তাদের গুণাবলী উল্লেখ করতে গিয়ে সালাত দিয়ে শুরু করা হয়েছে এবং সালাত দিয়েই শেষ করা হয়েছে। [ইবন কাসীর] তাদের প্রথম গুণ হলো, তারা হবে সালাত আদায়কারী। দ্বিতীয় গুণ হলো তারা হবে সালাতের প্রতি নিষ্ঠাবান এবং সর্বশেষ গুণ হলো, তারা সালাতের হিফাযত করবে। সালাতের হিফাযতের অর্থ অনেক কিছু। যথা সময়ে সালাত পড়া, দেহ ও পোশাক-পরিচ্ছদ পাক-পবিত্র আছে কিনা সালাতের পূর্বেই সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া, অযু থাকা এবং অযু করার সময় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো ভালভাবে ধোয়া, সালাতের ফরয, ওয়াজিব ও মুস্তাহাবগুলো ঠিকমত আদায় করা, সালাতের নিয়ম-কানুন পুরোপুরি মেনে চলা, আল্লাহর নাফরমানী করে সালাতকে ধ্বংস না করা, এসব বিষয়ও সালাতের হিফাযতের অন্তর্ভুক্ত। [কুরতুবী]

৩৫. তারাই সম্মানিত হবে জান্নাতসমূহে।

أُولَٰٓئِكَ فِي جَنّٰتٍ مُّكْرَمُونَ ﴿٣٥﴾

দ্বিতীয় রুকূ'

৩৬. কাফিরদের হল কি যে, তারা আপনার দিকে ছুটে আসছে,

فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ﴿٣٦﴾

৩৭. ডান ও বাম দিক থেকে, দলে দলে।

عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ ﴿٣٧﴾

৩৮. তাদের প্রত্যেকে কি এ প্রত্যাশা করে যে, তাকে প্রবেশ করানো হবে প্রাচুর্যময় জান্নাতে?

أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ ﴿٣٨﴾

৩৯. কখনো নয়[১], আমরা তাদেরকে যা থেকে সৃষ্টি করেছি তা তারা জানে[২]।

كَلَّا ۖ إِنَّا خَلَقْنٰهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾

৪০. অতএব আমি শপথ করছি উদয়াচলসমূহ এবং অস্তাচলসমূহের রবের– অবশ্যই আমরা সক্ষম[৩]

فَلَآ أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشٰرِقِ وَالْمَغٰرِبِ إِنَّا لَقٰدِرُونَ ﴿٤٠﴾

---

(১) অর্থাৎ তারা যা মনে করে, যা ইচ্ছা করে, ব্যাপার আসলে তা নয়। [সা'দী]

(২) বুসর ইবনে জাহহাস আল-কুরাশী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ﴿فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ * عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ * أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ * كَلَّا ۖ إِنَّا خَلَقْنٰهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ﴾ এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন, তারপর তার হাতের তালুতে থুথু ফেলে বললেন, আল্লাহ্ বলেন, হে আদম সন্তান! কিভাবে তুমি আমাকে অপারগ করবে? অথচ তোমাকে আমি এর (থুথুর) মত বস্তু থেকে সৃষ্টি করেছি। তারপর যখন তোমাকে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সুন্দর অবয়ব দান করে সৃষ্টি করেছি তখন তুমি দুটি দামী মূল্যবান চাদরে নিজেকে জড়িয়ে যমীনের উপর এমনভাবে চলাফেরা করেছ যে, যমীন কম্পিত হয়েছে, তারপর তুমি সম্পদ জমা করেছ, তা থেকে দিতে নিষেধ করেছ। শেষ পর্যন্ত যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হয়েছে তখন বল, আমি দান-সদকা করব! তখন কি আর সদকার সময় বাকী আছে?! [ইবনে মাজাহ: ২৭০৭, মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৫০২]

(৩) এখানে মহান আল্লাহ নিজেই নিজের সত্তার শপথ করেছেন। "উদয়াচলসমূহ ও অস্তাচলসমূহ" এ শব্দ ব্যবহারের কারণ হলো, গোটা বছরের আবর্তন কালে সূর্য প্রতিদিনই একটি নতুন কোণ থেকে উদিত হয় এবং একটি নতুন কোণে অস্ত যায়। তাছাড়াও ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশে সূর্য ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ক্রমাগত উদিত ও অস্তমিত হতে থাকে। এ হিসেবে সূর্যের উদয় হওয়ার ও অস্ত যাওয়ার স্থান একটি নয়,

৪১. তাদের চেয়ে উৎকৃষ্টদেরকে তাদের স্থলবর্তী করতে এবং এতে আমরা অক্ষম নই।

عَلَىٰٓ أَن نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٤١﴾

৪২. অতএব তাদেরকে বাক-বিতণ্ডা ও খেল-তামাশায় মত্ত থাকতে দিন– যে দিনের প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দেয়া হয় তার সম্মুখীন হওয়ার আগ পর্যন্ত।

فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا۟ وَيَلْعَبُوا۟ حَتَّىٰ يُلَٰقُوا۟ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى يُوعَدُونَ ﴿٤٢﴾

৪৩. সেদিন তারা কবর থেকে বের হবে দ্রুতবেগে, মনে হবে তারা কোন লক্ষ্যস্থলের দিকে ধাবিত হচ্ছে

يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ ﴿٤٣﴾

৪৪. অবনত নেত্রে; হীনতা তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে; এটাই সে দিন, যার বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছিল তাদেরকে।

خَٰشِعَةً أَبْصَٰرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِى كَانُوا۟ يُوعَدُونَ ﴿٤٤﴾

অনেক। আরেক হিসেবে উত্তর ও দক্ষিণ দিকের তুলনায় একটি দিক হলো পুর্ব এবং আরেকটি দিক হলো পশ্চিম। তাই কোন কোন আয়াতে مشرق ও مغرب শব্দ একবচন ব্যবহৃত হয়েছে। [সূরা আশ- শু'আরা: ২৮, ও সূরা আল-মুয্‌যাম্মিল:১৯] আরেক বিচারে পৃথিবীর দু'টি উদয়াচল এবং দু'টি অস্তাচল আছে। কারণ পৃথিবীর এক গোলার্ধে যখন সূর্য অস্ত যায় তখন অপর গোলার্ধে উদিত হয়। এ কারণে কোন কোন আয়াতে বলা হয়েছে مشرقين ও مغربين [সূরা আর-রাহমান:১৭] [দেখুন: আদ্‌ওয়াউল বায়ান]

৭১- সূরা নূহ্
২৮ আয়াত, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

إِنَّآ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلٰى قَوْمِهِۦٓ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ①

১. নিশ্চয় আমরা নূহ্‌কে পাঠিয়েছিলাম তার সম্প্রদায়ের প্রতি এ নির্দেশসহ যে, আপনি আপনার সম্প্রদায়কে সতর্ক করুন তাদের প্রতি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আসার আগে ।

قَالَ يٰقَوْمِ إِنِّى لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ②

২. তিনি বললেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী---

أَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ③

৩. 'এ বিষয়ে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত কর এবং তাঁর তাকওয়া অবলম্বন কর, আর আমার আনুগত্য কর[১];

يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلٰٓى أَجَلٍ

৪. 'তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন[২] এবং

(১) নূহ আলাইহিস সালাম তার রিসালাতের দায়িত্ব পালনের শুরুতেই তার জাতির সামনে তিনটি বিষয় পেশ করেছিলেন । এক, আল্লাহর দাসত্ব, দুই, তাকওয়া বা আল্লাহভীতি এবং তিন, রাসূলের আনুগত্য ।প্রথমেই ছিল আল্লাহর অবাধ্যতা না করার আহ্বান,কারণ তাঁর অবাধ্য হলে আযাব অনিবার্য । তারপর তাকওয়ার আহ্বান । যার মাধ্যমে রাসূলকে মেনে নিয়ে একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করার আহ্বান রয়েছে । তারপর রয়েছে রাসূলের আনুগত্যের আহ্বান । তিনি যা করতে আদেশ করেন তাই করা যাবে আর যা করতে নিষেধ করেন তা-ই ত্যাগ করতে হবে । [মুয়াসসার]

(২) مِن অব্যয়টি প্রায়শঃ কতক অর্থ জ্ঞাপন করার জন্যে ব্যবহৃত হয় । এই অর্থে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, ঈমান আনলে তোমাদের কতক গোনাহ মাফ হয়ে যাবে । কোন কোন মুফাসসির বলেন, এর অর্থ আল্লাহ তা'আলার হক সম্পর্কিত গোনাহ্ মাফ হয়ে যাবে । কেননা বান্দার হক মাফ হওয়ার জন্যে ঈমান আনার পরও একটি শর্ত আছে । তা এই যে হকটি আদায়যোগ্য হলে তা আদায় করতে হবে; যেমন আর্থিক দায় দেনা এবং আদায় যোগ্য না হলে তা মাফ নিতে হবে যেমন মুখে কিংবা হাতে কাউকে কষ্ট

مُّسَمًّى ۚ إِنَّ أَجَلَ اللّٰهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخَّرُ ۘ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ④

তোমাদেরকে অবকাশ দেবেন এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত(১)। নিশ্চয় আল্লাহ্ কর্তৃক নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হলে তা বিলম্বিত করা হয় না; যদি তোমরা এটা জানতে!'

قَالَ رَبِّ إِنِّيْ دَعَوْتُ قَوْمِيْ لَيْلًا وَّنَهَارًا ⑤

৫. তিনি বললেন, 'হে আমার রব! আমি তো আমার সম্প্রদায়কে দিনরাত ডেকেছি,

فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَآءِيْٓ إِلَّا فِرَارًا ⑥

৬. 'কিন্তু আমার ডাক তাদের পলায়ন প্রবণতাই বৃদ্ধি করেছে।

وَإِنِّيْ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوْٓا أَصَابِعَهُمْ فِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوْا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ⑦

৭. 'আমি যখনই তাদেরকে ডাকি যাতে আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, তারা নিজেদের কানে আঙ্গুল দিয়েছে, কাপড় দ্বারা ঢেকে দিয়েছে নিজেদেরকে(২) এবং জেদ করতে থেকেছে, আর খুবই ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছে।

দেয়া। কোন কোন তফসীরবিদ বলেনঃ আয়াতে من অব্যয়টি বর্ণনাসূচক। উদ্দেশ্য এই যে, ঈমান আনলে তোমাদের সব গোনাহ্ মাফ হয়ে যাবে। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

(১) উদ্দেশ্য এই যে তোমরা ঈমান আনলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিবেন। বয়সের নির্দিষ্ট মেয়াদের পূর্বে তোমাদেরকে কোন আযাবে ধ্বংস করবেন না। [সা'দী]

(২) মুখ ঢাকার একটি কারণ হতে পারে, তারা নূহ আলাইহিস সালামের বক্তব্য শোনা তো দূরের কথা তার চেহারা দেখাও পছন্দ করতো না। [মুয়াসসার] আরেকটি কারণ হতে পারে, তারা তার সম্মুখ দিয়ে যাওয়ার সময় মুখ ঢেকে চলে যেতো যাতে তিনি তাদের চিনে কথা বলার কোন সুযোগ আদৌ না পান। [ইবন কাসীর] মক্কার কাফেররা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যে ধরনের আচরণ করছিলো সেটিও ছিল অনুরূপ একটি আচরণ। পবিত্র কুরআনের অন্যত্র তাদের এ আচরণের উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে "দেখ, এসব লোক তাদের বক্ষ ঘুরিয়ে নেয় যাতে তারা রাসূলের চোখের আড়ালে থাকতে পারে। সাবধান! যখন এরা কাপড় দ্বারা নিজেদেরকে ঢেকে আড়াল করে তখন আল্লাহ তাদের প্রকাশ্য বিষয়গুলোও জানেন এবং গোপন বিষয়গুলোও জানেন। তিনি তো মনের মধ্যকার গোপন কথাও জানেন।" [সূরা হূদ: ৫]

ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ﴿٨﴾

৮. ‘তারপর আমি তাদেরকে ডেকেছি প্রকাশ্যে

ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ﴿٩﴾

৯. ‘পরে আমি তাদের জন্য উচ্চস্বরে প্রচার করেছি ও উপদেশ দিয়েছি অতি গোপনে ।’

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿١٠﴾

১০. অতঃপর বলেছি, ‘তোমাদের রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয় তিনি মহাক্ষমাশীল,

يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا ﴿١١﴾

১১. ‘তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত করবেন,

وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا ﴿١٢﴾

১২. ‘এবং তিনি তোমাদেরকে সমৃদ্ধ করবেন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে এবং তোমাদের জন্য স্থাপন করবেন উদ্যান ও প্রবাহিত করবেন নদী-নালা[১] ।

---

(১) একথাটি পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে যে, আল্লাহদ্রোহিতার আচরণ মানুষের জীবনকে শুধু আখেরাতেই নয় দুনিয়াতেও সংকীর্ণ করে দেয় । অপর পক্ষে কোন জাতি যদি অবাধ্যতার বদলে ঈমান, তাকওয়া এবং আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলার পথ অনুসরণ করে তাহলে তা শুধু আখেরাতের জন্যই কল্যাণকর হয় না, দুনিয়াতেও তার ওপর আল্লাহর অশেষ নিয়ামত বর্ষিত হতে থাকে । অন্যত্র বলা হয়েছে, “আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে তার দুনিয়ার জীবন হবে সংকীর্ণ । আর কিয়ামতের দিন আমি তাকে অন্ধ করে উঠাবো ।” [সূরা ত্বা-হা ১২৪] আরও বলা হয়েছে, “আহলে কিতাব যদি তাদের কাছে তাদের রবের পক্ষ থেকে প্রেরিত ‘তাওরাত’, ইঞ্জীল’ ও অন্যান্য আসমানী কিতাবের বিধানাবলী মেনে চলতো তাহলে তাদের জন্য ওপর থেকেও রিযিক বর্ষিত হতো এবং নীচ থেকেও ফুটে বের হতো ।” [সূরা আল-মায়েদাহ: ৬৬] আরও বলা হয়েছেঃ “জনপদসমূহের অধিবাসীরা যদি ঈমান আনতো এবং তাকওয়ার নীতি অনুসরণ করতো তাহলে আমি তাদের জন্য আসমান ও যমীনের বরকতের দরজাসমূহ খুলে দিতাম । [সূরা আল-আ‘রাফ: ৯৬] অনুরূপভাবে হূদ আলাইহিস সালাম তার কওমের লোকদের বললেন, “হে আমার কওমের লোকেরা, তোমরা তোমাদের প্রভুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, তার দিকে ফিরে যাও । তিনি তোমাদের ওপর আসমান থেকে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন এবং তোমাদের শক্তি ও ক্ষমতা আরো বাড়িয়ে দেবেন ।” [সূরা হূদ: ৫২]

১৩. ‘তোমাদের কী হল যে, তোমরা আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্বের পরওয়া করছ না[১]!	مَا لَكُمْ لَا تَرْجُوْنَ لِلّٰهِ وَقَارًا ﴿١٣﴾
১৪. ‘অথচ তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন পর্যায়ক্রমে[২],	وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا ﴿١٤﴾

খোদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দিয়ে মক্কার লোকদের সম্বোধন করে সেখানে আরও বলা হয়েছে “আর তোমরা যদি তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং তাঁর দিকে ফিরে আস তাহলে তিনি একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদের উত্তম জীবনোপকরণ দান করবেন।” [সূরা হূদ:৩] এ থেকে আলেমগণ বলেন যে, গোনাহ্ থেকে তাওবাহ ও ইস্তেগফার করলে আল্লাহ্ তা‘আলা যথাস্থানে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, দুর্ভিক্ষ হতে দেন না। এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে বরকত হয়। বিভিন্ন হাদীস থেকে এর সপক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়। সালফে সালেহীনও বৃষ্টির জন্য সালাতের সময় এ পদ্ধতির প্রতি জোর দিতেন। কুরআন মজীদের এ নির্দেশনা অনুসারে কাজ করতে গিয়ে একবার দুর্ভিক্ষের সময় উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বৃষ্টির জন্য দো‘আ করতে বের হলেন এবং শুধু ইসতিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করেই শেষ করলেন। সবাই বললো, ‘হে আমীরুল মু’মিনীন! আপনি তো আদৌ দো‘আ করলেন না। তিনি বললেন, আমি আসমানের ঐ সব দরজায় করাঘাত করেছি যেখানে থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয়। একথা বলেই তিনি সূরা নূহের এ আয়াতগুলো তাদের পাঠ করে শুনালেন। অনুরূপ একবার এক ব্যক্তি হাসান বাসরীর মজলিসে অনাবৃষ্টির অভিযোগ করলে তিনি বললেন, আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। অপর এক ব্যক্তি দারিদ্রের অভিযোগ করলো। তৃতীয় এক ব্যক্তি বললো, আমার কোন ছেলেমেয়ে নেই। চতুর্থ এক ব্যক্তি বললো, আমার ফসলের মাঠে ফলন খুব কম হচ্ছে। তিনি সবাইকে একই জবাব দিলেন। অর্থাৎ আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। লোকেরা বললো, কি ব্যাপার যে, আপনি প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন অভিযোগের একই প্রতিকার বলে দিচ্ছেন? তখন তিনি সূরা নূহের এ আয়াতগুলো পাঠ করে শুনালেন। [দেখুন, ইবন কাসীর; কুরতুবী]

(১) অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্‌র মর্যাদা ও সম্মানে পরোয়া করছ না, তবুও তাঁকে তোমরা এতটুকু ভয়ও করো না যে, এ জন্য তিনি তোমাদের শাস্তি দিবেন। [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ সৃষ্টিকর্মের বিভিন্ন পর্যায় ও স্তর অতিক্রম করে তোমাদের বর্তমান অবস্থায় পৌঁছানো হয়েছে। প্রথমে বীর্য আকারে, মাতৃগর্ভে, দুগ্ধপানরত অবস্থায়, অবশেষে তোমরা যৌবন ও প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হয়েছ। এসব পর্যায় প্রতিটিই মহান আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। যিনি এগুলো সৃষ্টি করেন, তিনিই একমাত্র ইবাদতের যোগ্য। আর তিনিই মৃত্যুর পর তাদেরকে পনরুত্থিত করতে সক্ষম। [সা‘দী]

১৫. 'তোমরা কি লক্ষ্য করনি আল্লাহ্‌ কিভাবে সৃষ্টি করেছেন সাত আসমান স্তরে স্তরে বিন্যস্ত করে?

أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ طِبَاقًا ﴿١٥﴾

১৬. 'আর সেখানে চাঁদকে স্থাপন করেছেন আলোকরূপে ও সূর্যকে স্থাপন করেছেন প্রদীপরূপে;

وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ﴿١٦﴾

১৭. 'তিনি তোমাদেরকে উদ্ভূত করেছেন মাটি হতে[১]

وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿١٧﴾

১৮. 'তারপর তাতে তিনি তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেবেন এবং পরে নিশ্চিতভাবে বের করে নিবেন,

ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿١٨﴾

১৯. 'আর আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য যমীনকে করেছেন বিস্তৃত---

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿١٩﴾

২০. 'যাতে তোমরা সেখানে চলাফেরা করতে পার প্রশস্ত পথে।'

لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿٢٠﴾

দ্বিতীয় রুকূ'

২১. নূহ্‌ বলেছিলেন, 'হে আমার রব! আমার সম্প্রদায় তো আমাকে অমান্য করেছে এবং অনুসরণ করেছে এমন লোকের যার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তার ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করেনি[২]।'

قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا ﴿٢١﴾

২২. আর তারা ভয়ানক ষড়যন্ত্র করেছে[৩];

وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا ﴿٢٢﴾

---

(১) অর্থাৎ মাটিতে উদ্ভিদ উৎপন্ন হওয়ার মত তোমাদেরকে মাটির উপাদান থেকে উৎপন্ন ও উদ্ভুত করেছেন। [কুরতুবী]

(২) অর্থাৎ তারা আমার অবাধ্য হয়েছে। তারা সমাজের ধনী ও নেতৃস্থানীয় লোকদের অনুসরণ করেছে। অথচ এ সমস্ত লোকদের ধন-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি, সন্তান-সন্ততি তাদের ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করবে না। [কুরতুবী]

(৩) ষড়যন্ত্রের অর্থ হলো জাতির লোকদের সাথে নেতাদের ধোঁকাবাজি ও প্রতারণা।

وَقَالُوْا لَا تَذَرُنَّ اٰلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَّلَا سُوَاعًا ۙ وَّلَا يَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا ﴿٢٣﴾

২৩. এবং বলেছে, 'তোমরা কখনো পরিত্যাগ করো না তোমাদের উপাস্যদেরকে; পরিত্যাগ করো না ওয়াদ্, সুওয়া'আ, ইয়াগূছ, ইয়া'উক ও নাস্‌রকে[১]।

নেতারা জাতির লোকদের নূহ আলাইহিস সালামের শিক্ষার বিরুদ্ধে বিভ্রান্ত ও প্রতারিত করার চেষ্টা করতো। যেমন, তারা বলতো "তোমরা কি আশ্চর্য হচ্ছো যে, তোমাদের মতই একজন মানুষের নিকট তোমাদের রবের কাছ থেকে বাণী এসেছে?" [সূরা আল-আ'রাফ: ৬৩] "আমাদের নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা না বুঝে শুনে নূহের আনুগত্য করছে। তার কথা যদি সত্যিই মূল্যবান হতো তাহলে জাতির নেতা ও জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিবর্গ তার প্রতি বিশ্বাস পোষণ করতো।" [হূদ-২৭] "আল্লাহ যদি পাঠাতেই চাইতেন তাহলে কোন ফেরেশতা পাঠাতেন।" [সূরা আল-মু'মিনূন, ২৪] এ ব্যক্তি যদি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল হতেন, তাহলে তার কাছে সবকিছুর ভাণ্ডার থাকতো, তিনি অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে জানতেন এবং ফেরেশতাদের মত সব রকম মানবীয় প্রয়োজন ও অভাব থেকে মুক্ত হতেন। [সূরা হূদ, ৩১] নূহ এবং তার অনুসারীদের এমন কি অলৌকিকত্ব আছে যার জন্য তাদের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিতে হবে? এ ব্যক্তি আসলে তোমাদের মধ্যে তার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। [সূরা আল-মুমিনূন, ২৫] প্রায় এ রকম কথা বলেই কুরাইশ নেতারা লোকদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে বিভ্রান্ত করতো।

(১) সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে গিয়ে নূহ্ আলাইহিস্‌সালাম আরও বললেন, তারা ভয়ানক ষড়যন্ত্র করেছে। তারা নিজেরা তো উৎপীড়ন করতই, উপরন্তু জনপদের গুণ্ডা ও দুষ্ট লোকদেরকেও নূহ্ আলাইহিস্ সালাম এর পিছনে লেলিয়ে দিত। তারা পরস্পর এই চুক্তিতেও উপনীত হয়েছিল যে, আমরা আমদের দেব-দেবীর বিশেষত: এই পাঁচ জনের উপাসনা পরিত্যাগ করব না। আয়াতে উল্লেখিত শব্দগুলো পাঁচটি মূর্তির নাম। হাদীসে এসেছে, এই পাঁচ জন প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলার নেক ও সৎকর্মপরায়ণ বান্দা ছিলেন। তাদের সময়কালে ছিল আদম ও নূহ্ আলাইহিস্ সালাম এর আমলের মাঝামাঝি। তাদের নেক ভক্ত ও অনুসারী ছিল। তাদের ওফাতের পর ভক্তরা সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত ও বিধি বিধানের প্রতি আনুগত্য অব্যাহত রাখে। কিছুদিন পর শয়তান তাদেরকে এই বলে প্ররোচিত করলঃ তোমরা যেসব মহাপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ করে উপাসনা কর যদি তাদের মূর্তি তৈরী করে সমানে রেখে দাও তবে তোমাদের উপাসনা পূর্ণতা লাভ করবে এবং বিনয় ও একাগ্রতা অর্জিত হবে। তারা শয়তানের ধোঁকা বুঝতে না পেরে মহাপুরুষের প্রতিকৃতি তৈরী করে উপাসনালয়ে স্থাপন করল এবং সমপূর্ণ নতুন এক বংশধর তাদের স্থলাভিষিক্ত হল। এবার শয়তান এসে তাদেরকে বোঝাল, তোমাদের

وَقَدْ اَضَلُّوْا كَثِيْرًا ۚ وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا ضَلٰلًا ﴿٢٤﴾

২৪. 'বস্তুত তারা অনেককে বিভ্রান্ত করেছে; কাজেই আপনি যালিমদের বিভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করবেন না(১) ।'

مِمَّا خَطِيْٓـٰٔتِهِمْ اُغْرِقُوْا فَاُدْخِلُوْا نَارًا ۙ فَلَمْ يَجِدُوْا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْصَارًا ﴿٢٥﴾

২৫. তাদের অপরাধের জন্য তাদেরকে নিমজ্জিত করা হয়েছিল এবং পরে তাদেরকে প্রবেশ করানো হয়েছিল আগুনে, অতঃপর তারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকেও সাহায্যকারী পায়নি ।

পূর্বপুরুষের ইলাহ্ ও উপাস্য মুর্তিই ছিল । তারা এই মূর্তিগুলোই উপাসনা করত । এখান থেকে প্রতিমা-পূজার সূচনা হয়ে গেল । [বুখারী: ৪৯২০] উপরোক্ত পাঁচটি মূর্তির মাহাত্ম্য তাদের অন্তরে সর্বাধিক প্রতিষ্ঠিত ছিল বিধায় তাদের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে । [ফাতহুল কাদীর]

নূহের কওমের উপাস্যদের দেবীদের মধ্য থেকে এখানে সেসব দেব-দেবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে পরবর্তীকালে মক্কাবাসীরা যাদের পূজা করতে শুরু করেছিল এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগে আরবের বিভিন্ন স্থানে তাদের মন্দিরও বর্তমান ছিল । এটা অসম্ভব নয় যে; মহা প্লাবনে যেসব লোক রক্ষা পেয়েছিল পরবর্তী বংশধরগণ তাদের মুখ থেকে নূহ্ এর জাতির প্রাচীন উপাস্য দেব-দেবীদের নাম শুনেছিল এবং পরে তাদের বংশধরদের নতুন করে জাহেলিয়াত ছড়িয়ে পড়লে তারা সেসব দেব-দেবীর প্রতিমা তৈরী করে তাদের পূজা অর্চনা শুরু করেছিল । [দেখুন, আত-তাহরীর ওয়াত-তানওয়ীর] 'ওয়াদ্দ' ছিল 'কুদা'আ গোত্রের 'বনী কালব' শাখার উপাস্য দেবতা । 'দাওমাতুল জান্দাল' নামক স্থানে তারা এর বেদী নির্মাণ করে রেখেছিল । 'সুওয়া' ছিল হুযাইল গোত্রের দেবী । 'ইয়াগুস' ছিল সাবার নিকট জুরুফ নামক স্থানে বনী গাতীফ -এর উপাস্য । 'ইয়াউক' ইয়ামানের হামদান গোত্রের উপাস্য দেবতা ছিল । 'নাসর' ছিল হিমইয়ার অঞ্চলের হিমইয়ার গোত্রের 'আলে যু-কিলা' শাখার দেবতা । [ইবন কাসীর]

(১) অর্থাৎ এই যালেমদের পথভ্রষ্টতা আরও বাড়িয়ে দিন । এখানে প্রশ্ন হয় যে জাতিকে সৎপথ প্রদর্শন করা রাসূলগণের কর্তব্য । নূহ্ আলাইহিস্ সালাম তাদের পথভ্রষ্টতার দো'আ করলেন কিভাবে? জওয়াব এই যে, প্রকৃতপক্ষে নূহ্ আলাইহিস্ সালাম দীর্ঘকাল তাদের মাঝে থেকে বুঝে গিয়েছিলেন যে, এখন তাদের মধ্যে কেউ ঈমান আনবে না । সেমতে পথভ্রষ্টতা ও কুফরের উপর তাদের মৃত্যু নিশ্চিত ছিল । নূহ্ আলাইহিস্ সালাম তাদের পথভ্রষ্টতা বাড়িয়ে দেয়ার দো'আ করলেন যাতে সত্বরই তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় । [দেখুন, আয়সারুত তাফাসীর]

وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا ﴿٢٦﴾

২৬. নূহ্‌ আরও বলেছিলেন, 'হে আমার রব! যমীনের কাফিরদের মধ্য থেকে কোন গৃহবাসীকে অব্যাহতি দেবেন না[১]।

إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْٓا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿٢٧﴾

২৭. 'আপনি তাদেরকে অব্যাহতি দিলে তারা আপনার বান্দাদেরকে বিভ্রান্ত করবে এবং জন্ম দিতে থাকবে শুধু দুস্কৃতিকারী ও কাফির।

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَّلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ۖ وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ إِلَّا تَبَارًا ﴿٢٨﴾

২৮. 'হে আমার রব! আপনি ক্ষমা করুন আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং যারা মুমিন হয়ে আমার ঘরে প্রবেশ করে তাদেরকে এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে; আর যালিমদের শুধু ধ্বংসই বৃদ্ধি করুন।'

---

(১) আয়াতটির এক অর্থ হচ্ছে, যমীনে বিচরণকারী কাফেরদের কাউকে রেহাই দিবেন না। [মুয়াসসার] অপর অর্থ আপনি যমীনের বুকে কোন গৃহবাসী কাফেরকে অবশিষ্ট রাখবেন না। [জালালাইন] কাতাদাহ রাহেমাহুল্লাহ বলেন, তিনি ঐ সময় পর্যন্ত তাদের উপর বদদো'আ করেননি যতক্ষণ তার কাছে ﴿أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ "যারা ঈমান এনেছে তারা ছাড়া আপনার সম্প্রদায়ের অন্য কেউ কখনো ঈমান আনবে না। কাজেই তারা যা করে তার জন্য আপনি দুঃখিত হবেন না।" [সূরা হূদঃ ৩৬] এ বাণী তাকে শুনিয়ে দেয়া হয়েছে। যখন তিনি স্পষ্টই জানতে পারলেন যে, তারা আর ঈমান আনবে না তখন তিনি এ দো'আ করেছিলেন। [কুরতুবী]

٧٢- سُورَةُ الجِنِّ

৭২- সূরা আল-জিন্
২৮ আয়াত, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا

১. বলুন(১), 'আমার প্রতি ওহী নাযিল হয়েছে যে, জিন্‌দের(২) একটি দল

---

(১) হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থে এসেছে যে, এই ঘটনা তখনকার যখন শয়তানদেরকে আকাশে খবর শোনা থেকে উল্কাপিণ্ডের মাধ্যমে প্রতিহত করা হয়েছিল। এ সময়ে জিনরা পরস্পরে পরামর্শ করল যে আকাশের খবরাদি শোনার ব্যাপারে বাধাদানের এই ব্যাপারটি কোন আকস্মিক ঘটনা মনে হয় না। পৃথিবীতে অবশ্যই কোন নতুন ব্যাপার সংঘটিত হয়েছে। অতঃপর তারা স্থির করল যে, পৃথিবীর পূর্ব পশ্চিম ও আনাচে-কানাচে জিনদের প্রতিনিধিদল প্রেরণ করতে হবে। যথাযথ খোঁজাখুঁজি করে এই নতুন ব্যাপারটি কি তা জেনে আসবে। হেজাযে প্রেরিত তাদের প্রতিনিধিদল যখন 'নাখলাহ' নামক স্থানে উপস্থিত হল, তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণকে সাথে নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করছিলেন। জিনদের এই প্রতিনিধিদল সালাতে কুরআন পাঠ শুনে পরস্পরে শপথ করে বলতে লাগলঃ এই কালামই আমাদের ও আকাশের খবরাদির মধ্যে অন্তরায় হয়েছে। তারা সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে স্বজাতির কাছে ঘটনা বিবৃত করল। আল্লাহ্ তা'আলা এসব আয়াতে সমস্ত ঘটনা সম্পর্কে তাঁর রাসূলকে অবহিত করেছেন। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বর্ণনা করেন এই ঘটনায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিনদেরকে ইচ্ছাকৃতভাবে কুরআন শোনাননি এবং তিনি তাদেরকে দর্শনও করেন নি। বরং তার কাছে জিনদের কথা ওহী করে শোনানো হয়েছিল মাত্র।" [বুখারী: ৪৯২১, মুসলিম: ৪৪৯]

(২) জিন আল্লাহ্ তা'আলার এক প্রকার শরীরী আত্মাধারী ও মানুষের ন্যায় জ্ঞান এবং চেতনাশীল সৃষ্টজীব। জিন এর শাব্দিক অর্থ গুপ্ত। তারা মানুষের দৃষ্টিগোচর নয়। এ কারণেই তাদেরকে জিন বলা হয়। জিন ও ফেরেশতাদের অস্তিত্ব কুরআন ও সুন্নাহর অকাট্য বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত। এটা অস্বীকার করা কুফর। মানব সৃষ্টির প্রধান উপকরন যেমন মৃত্তিকা তেমনি জিন সৃষ্টির প্রধান উপকরণ অগ্নি। এই জাতির মধ্যেও মানুষের ন্যায় নর ও নারী আছে এবং সন্তান প্রজননের ধারা বিদ্যমান আছে। পবিত্র কুরআনে যাদেরকে শয়তান বলা হয়েছে, তারা জিনদের দুষ্ট শ্রেনীর নাম। অধিকাংশ আলেমের মতে, সমস্ত জিনই শয়তানের বংশধর। তাদের মধ্যে কাফের ও মুমিন দু'শ্রেণী বিদ্যমান। যারা ঈমানদার তাদেরকে জিন বলা হলেও তাদের মধ্যে যারা কাফির তাদেরকে শয়তান বলা হয়। তবে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে যে, জিনেরা ভিন্ন প্রজাতি, তারা শয়তানের বংশধর নয়। তারা

سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا ۙ﴿١﴾

মনোযোগের সাথে শুনেছে[১] অতঃপর বলেছে, 'আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি[২],

يَّهْدِيْۤ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ ۭ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَاۤ اَحَدًا ۙ﴿٢﴾

২. 'যা সত্যের দিকে হেদায়াত করে; ফলে আমরা এতে ঈমান এনেছি। আর আমরা কখনো আমাদের রবের সাথে কাউকে শরীক করব না,

وَّاَنَّهٗ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا ۙ﴿٣﴾

৩. 'আর নিশ্চয়ই আমাদের রবের মর্যাদা সমুচ্চ[৩]; তিনি গ্রহণ করেননি কোন সঙ্গিনী এবং না কোন সন্তান।

وَّاَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا ۙ﴿٤﴾

৪. 'এও যে, আমাদের মধ্যকার নির্বোধেরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে খুবই অবান্তর উক্তি করত[৪]।

মারা যায়। তাদের মধ্যে ঈমানদার ও কাফির দু শ্রেণী রয়েছে। পক্ষান্তরে ইবলীসের সন্তানদেরকে শয়তান বলা হয়, তারা ইবলীসের সাথেই মারা যাবে, তার আগে নয়। [দেখুন, কুরতুবী; ড. উমর সুলাইমান আল-আশকার: আলামুল জিন ওয়াশ-শায়াতিন]

(১) এ থেকে জানা যায় যে; রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে সময় জিনদের দেখতে পাচ্ছিলেন না এবং তারা যে কুরআন শুনছে একথাও তার জানা ছিল না। পরবর্তী সময়ে আল্লাহ তা'আলা তাকে অহীর মাধ্যমে এ ঘটনা জানিয়ে দিয়েছেন। এ ঘটনাটি বর্ণনা প্রসংগে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস স্পষ্টভাবে বলেছেন যে; সে সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিনদের উদ্দেশ্যে কুরআন পাঠ করেননি এবং তিনি তাদের দেখেনওনি। [মুসলিম, ৪৪৯, সহীহ ইবনে হিব্বান: ৬৫২৬, তিরমিযী: ৩৩২৩, মুসনাদে আহমাদ: ১/২৫২]

(২) জিনদের উক্তির অর্থ হলো, আমরা এমন একটি বাণী শুনে এসেছি যা ভাষাগত উৎকর্ষতা, বিষয়বস্তু, প্রজ্ঞা, জ্ঞান, বিধান ইত্যাদিতে বিস্ময়কর ও অতুলনীয়। [মুয়াসসার]

(৩) جدّ শব্দের অর্থ শান অবস্থা, মান-মর্যাদা। আল্লাহ্ তা'আলার জন্যে বলা হয় وتعالى جدّه অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার শান, মান-মর্যাদা, অনেক ঊর্ধ্বে। [কুরতুবী]

(৪) شطط শব্দের অর্থ অবান্তর কথা, অতি-অন্যায় ও যুলুম। উদ্দেশ্য এই যে মুমিন জিনরা এ পর্যন্ত কুফর ও শির্কে লিপ্ত থাকার অজুহাত বর্ণনা করে বলেছে, আমাদের

৫. ‘অথচ আমরা মনে করতাম মানুষ এবং জিন আল্লাহ্ সম্পর্কে কখনো মিথ্যা বলবে না ।

وَّاَنَّا ظَنَنَّآ اَنْ لَّنْ تَقُوْلَ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۝٥

৬. ‘এও যে, কিছু কিছু মানুষ কিছু জিনের আশ্রয় নিত, ফলে তারা জিনদের আত্মম্ভরিতা বাড়িয়ে দিয়েছিল(১) ।’

وَّاَنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا ۝٦

৭. ‘এও যে, তারা ধারণা করেছিল যেমন তোমরা ধারণা কর(২) যে, আল্লাহ্ কাউকেও কখনো পুনরুত্থিত করবেন না(৩) ।’

وَّاَنَّهُمْ ظَنُّوْا كَمَا ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا ۝٧

৮. ‘এও যে, আমরা চেয়েছিলাম আকাশের তথ্য সংগ্রহ করতে কিন্তু আমরা দেখতে

وَّاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَآءَ فَوَجَدْنٰهَا مُلِئَتْ

সম্প্রদায়ের নির্বোধ লোকেরা আল্লাহ্ তা‘আলার শানে অবান্তর কথাবার্তা বলত । অথচ আমরা মনে করতাম না যে কোন মানব অথবা জিন আল্লাহ্ তা‘আলা সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলতে পারে । তাই বোকাদের কথায় আমরা আজ পর্যন্ত কুফর ও শির্কে লিপ্ত ছিলাম । এখন কুরআন শুনে আমাদের চক্ষু খুলেছে । [ফাতহুল কাদীর]

(১) জাহেলী যুগে আরবরা যখন কোন জনহীন প্রান্তরে রাত্রি যাপন করতো তখন উচ্চস্বরে বলতো, ‘আমরা এ প্রান্তরের অধিপতি জিনের আশ্রয় প্রার্থনা করছি’ । এভাবে ভয় পেলে মানুষরা জিনের আশ্রয় নেয়ার চেষ্টা করত । ফলে জিনের আত্মম্ভরিতা বেড়ে যায় । আয়াতটির আরেকটি অর্থও হতে পারে, এভাবে আশ্রয়-গ্রহণের চেষ্টা করার পরও জিনরা মানুষদের উল্টো ভয় দেখাত । [সা‘দী]

(২) আয়াতাংশের দু’টি অর্থ হতে পারে । এক. ‘মানুষেরা ধারণা করেছিল, যেমন হে জিন সম্প্রদায় তোমরা ধারণা করেছিলে’ । [মুয়াসসার] দুই. জিনরা ধারণা করেছিল, যেমন হে মানব সম্প্রদায় তোমরা ধারণা করেছিলে । [কুরতুবী] উভয় অর্থের মূল কথা হলো, মানুষ ও জিন উভয় সম্প্রদায়ের পথভ্রষ্টদের ধারণার বিপরীতে এ কুরআন এক স্বচ্ছ হিদায়াত নিয়ে এসেছে ।

(৩) এ আয়াতাংশের দু’টি অর্থ হতে পারে । একটি হলো, “মৃত্যুর পর আল্লাহ তা‘আলা কাউকে আর জীবিত করে উঠাবেন না ।” যা উপরে বর্ণিত হয়েছে । অপরটি হলো, ‘আল্লাহ কাউকে রাসূল বানিয়ে পাঠাবেন না ।’ [কুরতুবী] যেহেতু কথাটি ব্যাপক অর্থবোধক তাই তার এ অর্থও গ্রহণ করা যেতে পারে যে, মানুষের মত জিনদের মধ্যে একদল আখেরাতকে অস্বীকার করতো । কিন্তু পরবর্তী বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যের দিক থেকে দ্বিতীয় অর্থটিই অধিক অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য ।

حَرَسًا شَدِيدًا وَّشُهُبًا ﴿٨﴾

পেলাম কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিণ্ড দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ;

وَّأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ۖ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا ﴿٩﴾

৯. ‘এও যে, আমরা আগে আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শুনার জন্য বসতাম[১] কিন্তু এখন কেউ সংবাদ শুনতে চাইলে সে তার উপর নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত জলন্ত উল্কাপিণ্ডের সম্মুখীন হয় ।

وَّأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿١٠﴾

১০. ‘এও যে, আমরা জানি না যমীনের অধিবাসীদের অমঙ্গলই অভিপ্রেত, না তাদের রব তাদের মঙ্গল চান[২] ।

---

(১) জিনরা আসমানের সংবাদ শোনার জন্যে উপরের দিকে যেত । হাদীসে এসেছে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহ্ তা‘আলা যখন আকাশে কোন হুকুম জারি করেন তখন সব ফেরেশতা আনুগত্যসূচক পাখা নাড়া দেয় । এরপর তারা পরস্পর সে বিষয়ে আলোচনা করে । শয়তানরা এখান থেকে এগুলো চুরি করে অতীন্দ্রিয়বাদীদের কাছে পৌছিয়ে দেয় এবং তাতে নিজেদের পক্ষ থেকে শত শত মিথ্যা বিষয় সংযোজন করে দেয় ।” [বুখারী: ৪৭০১,৪৮০০]

সার কথা: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবুওয়াত লাভের পূর্বে আকাশের খবর চুরির ধারা বিনা বাধায় অব্যাহত ছিল । শয়তানরা নির্বিঘ্নে উপরে আরোহন করে ফেরেশতাগণের কাছে শুনে নিত । কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবুওয়াত লাভের সময় তার ওহীর হেফাযতের উদ্দেশ্যে চুরির সুযোগ বন্ধ করে দেয়া হল এবং কোন শয়তান খবর চুরির জন্য উপরে গেলে তাকে লক্ষ্য করে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড নিক্ষিপ্ত হতে লাগল । চোর বিতাড়নের এই নতুন উদ্যোগ দেখেই শয়তান ও জিনরা চিন্তিত হয়ে পড়ে; কারণ অনুসন্ধানের জন্যে পৃথিবীর কোণে কোণে সন্ধানকারী দল প্রেরণ করেছিল, অতঃপর ‘নাখলাহ্’ নামক স্থানে একদল জিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে কুরআন শুনে ইসলাম গ্রহণ করেছিল যা আলোচ্য সূরায় বর্ণিত হয়েছে । [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

(২) বলা হয়েছে, ‘আমরা জানি না জগদ্বাসীর অমংগলই অভিপ্রেত, না তাদের রব তাদের মংগল চান’ । এ আয়াতে একটি বিষয় লক্ষণীয়, তা হলো, যখন অকল্যাণের কথা বলা হয়েছে তখন তার সম্পর্ক সরাসরি আল্লাহ্‌র দিকে করা হয় নি, পক্ষান্তরে যখন

وَّاَنَّا مِنَّا الصّٰلِحُوْنَ وَمِنَّا دُوْنَ ذٰلِكَ ؕ كُنَّا طَرَآئِقَ قِدَدًا ﴿١١﴾

১১. ‘এও যে, আমাদের কিছু সংখ্যক সৎকর্মপরায়ণ এবং কিছু সংখ্যক এর ব্যতিক্রম, আমরা ছিলাম বিভিন্ন পথের অনুসারী(১);

وَّاَنَّا ظَنَنَّاۤ اَنْ لَّنْ نُّعْجِزَ اللّٰهَ فِى الْاَرْضِ وَلَنْ نُّعْجِزَهٗ هَرَبًا ﴿١٢﴾

১২. ‘এও যে, আমরা বুঝেছি, আমরা যমীনে আল্লাহ্কে পরাভূত করতে পারব না এবং পালিয়েও তাঁকে ব্যর্থ করতে পারব না।

وَّاَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدٰۤى اٰمَنَّا بِهٖ ؕ فَمَنْ يُّؤْمِنْۢ بِرَبِّهٖ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَّلَا رَهَقًا ﴿١٣﴾

১৩. ‘এও যে, আমরা যখন হিদায়াতের বাণী শুনলাম তাতে ঈমান আনলাম। সুতরাং যে ব্যক্তি তার রবের প্রতি ঈমান আনে তার কোন ক্ষতি ও কোন অন্যায়ের আশংকা থাকবে না(২)।

وَّاَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُوْنَ وَمِنَّا الْقٰسِطُوْنَ ؕ فَمَنْ اَسْلَمَ فَاُولٰٓئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ﴿١٤﴾

১৪. ‘এও যে, আমাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক আছে মুসলিম আর কিছু সংখ্যক আছে সীমালঙ্ঘনকারী; অতঃপর যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তারা সুচিন্তিতভাবে সত্য পথ বেছে নিয়েছে।

কল্যাণের কথা বলা হয়েছে তখন তার সম্পর্ক করা হয়েছে সরাসরি আল্লাহ্র সাথে। এর কারণ হচ্ছে, খারাপ ও অমঙ্গলের সম্পর্ক আল্লাহ্র দিকে করা বেআদবী। অকল্যাণ আল্লাহ্র সৃষ্ট বিষয় হলেও তা মানুষের হাতের অর্জন। আর যত কল্যাণ তা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নিছক অনুগ্রহ। হাদীসেও বলা হয়েছে, “আর যাবতীয় কল্যাণ সবই আপনার হাতে পক্ষান্তরে কোন অকল্যাণকেই আপনার দিকে সম্পর্কযুক্ত করা যায় না”। [মুসলিম: ৭৭১] [ইবন কাসীর]

(১) অর্থাৎ আমাদের মধ্যে নৈতিক চরিত্রের দিক থেকেও ভাল ও মন্দ দু’ প্রকারের জিন আছে এবং আকীদা-বিশ্বাসের দিক থেকেও মত ও পথ একটি নয়। এ ক্ষেত্রেও আমরা বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত। [সা‘দী]

(২) بخس শব্দের অর্থ প্রাপ্য অপেক্ষা কম দেয়া এবং رهق শব্দের অর্থ যুলুম করা, অত্যাচার করা। উদ্দেশ্য এই যে মুমিনের প্রতিদান কম দেয়া হবে না এবং আখেরাতে তার উপর যুলুম করে কিছু বাড়িয়ে দেওয়াও হবে না। [ইবন কাসীর]

وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿١٥﴾

১৫. 'আর যারা সীমালঙ্ঘনকারী তারা তো হয়েছে জাহান্নামের ইন্ধন।'

وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا ﴿١٦﴾

১৬. আর তারা যদি সত্য পথে প্রতিষ্ঠিত থাকত তবে অবশ্যই তাদেরকে আমরা প্রচুর বারি বর্ষণে সিক্ত করতাম,

لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿١٧﴾

১৭. যা দ্বারা আমরা তাদেরকে পরীক্ষা করতে পারি। আর যে ব্যক্তি তার রবের স্মরণ হতে বিমুখ হয় তিনি তাকে দুঃসহ শাস্তিতে প্রবেশ করাবেন।

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴿١٨﴾

১৮. আর নিশ্চয় মসজিদসমূহ আল্লাহ্‌রই জন্য। কাজেই আল্লাহ্‌র সাথে তোমরা অন্য কাউকে ডেকো না[১]।

وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴿١٩﴾

১৯. আর নিশ্চয় যখন আল্লাহ্‌র বান্দা[২] তাঁকে ডাকার জন্য দাঁড়াল, তখন তারা তার কাছে ভিড় জমাল।

---

(১) مساجد শব্দটি مسجد এর বহুবচন। মুফাস্‌সিরগণ শব্দটি সাধারণভাবে ইবাদাতখানা বা উপাসনালয় অর্থে গ্রহণ করেছেন। তখন আয়াতের এক অর্থ এই যে, মাসজিদসমূহ কেবল আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতের জন্যে নির্মিত হয়েছে। অতএব, তোমরা মসজিদে গিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কাউকে সাহায্যের জন্যে ডেকো না। সেগুলোতে আল্লাহর ইবাদাতের সাথে সাথে আর কারো ইবাদাত করো না। যেমন ইহুদী ও নাসারারা তাদের উপাসনালয়সমূহে এ ধরনের শির্ক করে থাকে। অনুরূপভাবে মসজিদসমূহকে ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস ও মিথ্যা কর্মকাণ্ড থেকেও পবিত্র রাখতে হবে। হাসান বাস্‌রী বলেন, সমস্ত পৃথিবীটাই ইবাদাতখানা বা উপাসনালয়। তাই আয়াতটির মূল বক্তব্য হলো আল্লাহর এ পৃথিবীতে কোথাও যেন শির্‌ক করা না হয়। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বাণী থেকে প্রমাণ পেশ করেছেন, তিনি বলেছেন, "আমার জন্য সমগ্র পৃথিবীকে ইবাদাতের স্থান এবং পবিত্রতা অর্জনের উপায় বানিয়ে দেয়া হয়েছে।" [বুখারী: ৩৩৫, তিরমিযী:৩১৭] সাঈদ ইবনে জুবাইর এর মতে, মসজিদ বলতে যেসব অংগ-প্রত্যংগের সাহায্যে মানুষ সিজদা করে সেগুলো অর্থাৎ হাত, হাঁটু, পা ও কপাল বুঝানো হয়েছে। এ ব্যাখ্যা অনুসারে আয়াতটির অর্থ হলো, সমস্ত অংগ-প্রত্যংগ আল্লাহর তৈরী। এগুলোর সাহায্যে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে সিজদা করা যাবে না। [কুরতুবী]

(২) এখানে 'আল্লাহর বান্দা' বলতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। [সা'দী]

দ্বিতীয় রুকূ’

২০. বলুন, ‘আমি তো কেবল আমার রবকেই ডাকি এবং তাঁর সঙ্গে কাউকেও শরীক করি না।’

قُلْ إِنَّمَآ أَدْعُوا۟ رَبِّى وَلَآ أُشْرِكُ بِهِۦٓ أَحَدًا ﴿٢٠﴾

২১. বলুন, ‘নিশ্চয় আমি তোমাদের কোন ক্ষতি বা কল্যাণের মালিক নই।’

قُلْ إِنِّى لَآ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ﴿٢١﴾

২২. বলুন, ‘আল্লাহ্‌র পাকড়াও হতে কেউই আমাকে রক্ষা করতে পারবে না এবং আল্লাহ্ ছাড়া আমি কখনও কোন আশ্রয় পাব না(১),

قُلْ إِنِّى لَن يُجِيرَنِى مِنَ ٱللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِۦ مُلْتَحَدًا ﴿٢٢﴾

২৩. ‘শুধু আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পৌঁছানো এবং তাঁর রিসালতের বাণী প্রচারই আমার দায়িত্ব। আর যে-কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করে তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে(২)।’

إِلَّا بَلَٰغًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَٰلَٰتِهِۦ ۚ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَإِنَّ لَهُۥ نَارَ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ﴿٢٣﴾

২৪. অবশেষে যখন তারা যা প্রতিশ্রুত তা প্রত্যক্ষ করবে, তখন তারা জানতে

حَتَّىٰٓ إِذَا رَأَوْا۟ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ

(১) অর্থাৎ আমি কখনো এ দাবী করি না যে; আল্লাহর প্রভুত্বে আমার কোন দখলদারী বা কর্তৃত্ব আছে, কিংবা মানুষের ভাগ্য ভাঙা বা গড়ার ব্যাপারে আমার কোন ক্ষমতা আছে। আমি তো আল্লাহর একজন রাসূল মাত্র। আমার ওপর যে কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে তা তোমাদের কাছে আল্লাহ তা‘আলার বাণী পৌঁছিয়ে দেয়ার অধিক আর কিছুই নয়। আল্লাহর ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের ব্যাপার তো পুরোপুরি আল্লাহরই করায়ত্ব। আমি যদি তাঁর নাফরমানি করি তবে তাঁর শাস্তির ভয় আমি করি। [সা‘দী, ইবন কাসীর]

(২) এর অর্থ এই নয় যে, প্রতিটি গোনাহ ও অপরাধের শাস্তিই হচ্ছে চিরস্থায়ী জাহান্নাম। বরং যে প্রসঙ্গে একথাটি বলা হয়েছে তার আলোকে আয়াতের অর্থ হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে তাওহীদের যে আহ্বান জানানো হয়েছে তা যে ব্যক্তি মানবে না এবং শির্ককেও বর্জন করবে না আর কুফরী করবে, তার জন্য অবধারিত আছে জাহান্নামের চিরস্থায়ী শাস্তি। [দেখুন, সা‘দী]

أَضْعَفُ نَاصِرًا وَّأَقَلُّ عَدَدًا ﴿٢٤﴾

পারবে কে সাহায্যকারী হিসেবে অধিকতর দুর্বল এবং সংখ্যায় স্বল্প।

قُلْ إِنْ أَدْرِيٓ أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُۥ رَبِّيٓ أَمَدًا ﴿٢٥﴾

২৫. বলুন, 'আমি জানি না তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা কি আসন্ন, না আমার রব এর জন্য কোন দীর্ঘ মেয়াদ স্থির করবেন।'

عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِۦٓ أَحَدًا ﴿٢٦﴾

২৬. তিনিই গায়েবী বিষয়ের জ্ঞানী, তিনি তাঁর গায়েবের জ্ঞান কারও কাছে প্রকাশ করেন না[১],

إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُۥ يَسْلُكُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِۦ رَصَدًا ﴿٢٧﴾

২৭. তাঁর মনোনীত রাসূল ছাড়া। সে ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের সামনে এবং পিছনে প্রহরী নিয়োজিত করেন[২],

لِّيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا۟ رِسَٰلَٰتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَىْءٍ عَدَدًۢا ﴿٢٨﴾

২৮. যাতে তিনি প্রকাশ করেন যে, অবশ্যই তারা তাদের রবের রিসালাত পৌঁছে দিয়েছেন[৩]। আর তাদের কাছে যা আছে তা তিনি জ্ঞানে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং তিনি প্রতিটি বস্তু গণনা

(১) এখানে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলকে আদেশ করেছেন যে, যেসব অবিশ্বাসী আপনাকে কেয়ামতের নির্দিষ্ট দিন তারিখ বলে দেয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করে তাদেরকে বলে দিন, কেয়ামতের আগমন ও হিসাব নিকাশ নিশ্চিত; কিন্তু তার নির্দিষ্ট দিন তারিখ আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে বলেন নি। তাই আমি জানি না কেয়ামতের দিন আসন্ন, না আমার রব এর জন্যে দীর্ঘ মেয়াদ নির্দিষ্ট করে দিবেন। [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যখন অহীর মাধ্যমে গায়েবী বিষয়ের কোন জ্ঞান তাঁর হেকমত অনুসারে তাঁর রাসূলের কাছে পাঠান তখন তার রক্ষণাবেক্ষণ ও পাহারাদারীর জন্য চারপাশে প্রহরী মোতায়েন করেন। [সা'দী] আর এখানে প্রহরী বলতে ফেরেশ্তা উদ্দেশ্য। [ইবন কাসীর]

(৩) এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। এক, রাসূল নিশ্চিতভাবে জানবেন যে, ফেরেশতারা তাঁর কাছে আল্লাহ তা'আলার বাণীসমূহ ঠিক ঠিক পৌঁছিয়ে দিয়েছে। দুই, আল্লাহ তা'আলা জানবেন যে, রাসূলগণ তাঁদের রবের বাণীসমূহ তাঁর বান্দাদের কাছে ঠিকমত পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। [ইবন কাসীর] আয়াতটির শব্দমালা সবগুলো অর্থেরই ধারক।

করে হিসেব রেখেছেন[১]।

(১) অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুর পরিসংখ্যান আল্লাহ্ তা'আলারই গোচরীভুত। তিনি প্রত্যেকটি বস্তু বিস্তারিতভাবে জানেন, আর সব কিছুই তিনি হিসেব করে রেখেছেন, কোন কিছুই তার অজানা নয়। [মুয়াস্‌সার, কুরতুবী]

৭৩- সূরা আল-মুয্‌যাম্মিল
২০ আয়াত, মক্কী

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. হে বস্ত্রাবৃত!

يٰۤاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ①

২. রাতে সালাতে দাঁড়ান(১), কিছু অংশ ছাড়া,

قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا ②

৩. আধা-রাত বা তার চেয়েও কিছু কম ।

نِّصْفَهٗۤ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا ③

৪. অথবা তার চেয়েও একটু বাড়ান। আর কুরআন তিলাওয়াত করুন ধীরে ধীরে সুস্পষ্টভাবে(২);

اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ④

---

(১) এখানে বিশেষভঙ্গিতে সম্বোধন করে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে তাহাজ্জুদের আদেশ করা হয়েছে। বিভিন্ন বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, আলোচ্য আয়াতসমূহ ইসলামের শুরুতে এবং কুরআন অবতরণের প্রাথমিক যুগে অবতীর্ণ হয়েছে। তখন পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয ছিল না। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত মে'রাজের রাত্রিতে ফরয হয়েছিল। এই আয়াতে তাহাজ্জুদের সালাত কেবল ফরযই করা হয়নি; বরং তাতে রাত্রির কমপক্ষে এক চতুর্থাংশ মশগুল থাকাও ফরয করা হয়েছে। আয়াতের মূল আদেশ হচ্ছে কিছু অংশ বাদে সমস্ত রাত্রি সালাতে মশগুল থাকা। এই আদেশ পালনার্থে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম অধিকাংশ রাত্রি তাহাজ্জুদের সালাতে ব্যয় করতেন। ফলে তাদের পদদ্বয় ফুলে যায় এবং আদেশটি বেশ কষ্টসাধ্য প্রতীয়মান হয়। পূর্ণ এক বছর পর এই সূরার শেষাংশ ﴿فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾ অবতীর্ণ হলে দীর্ঘক্ষণ সালাতে দন্ডায়মান থাকার বাধ্যবাধকতা রহিত করে দেয়া হয় এবং বিষয়টি ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিয়ে ব্যক্ত করা হয় যে, যতক্ষণ সালাত আদায় করা সহজ মনে হয়, ততক্ষণ সালাত আদায় করাই তাহাজ্জুদের জন্যে যথেষ্ট। [ইমাম মুসলিম এই বিষয়বস্তু আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণনা করেন, হাদীস নং: ৭৪৬]

(২) এখানে বলা হয়েছে যে, তারতীল সহকারে পড়তে হবে। ترتيل বলে উদ্দেশ্য হলো ধীরে ধীরে সঠিকভাবে বাক্য উচ্চারণ করা। অর্থাৎ কুরআনের শব্দগুলো ধীরে ধীরে মুখে উচ্চারণ করার সাথে সাথে তা উপলব্ধি করার জন্য গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনাও করতে হবে। [ইবন কাসীর] আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কুরআন পাঠের নিয়ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন,

৫. নিশ্চয় আমরা আপনার প্রতি নাযিল করছি গুরুভার বাণী[১]।

إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ۝

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, শব্দগুলোকে টেনে টেনে পড়তেন। উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পড়ে বললেন যে, তিনি আল্লাহ, রাহমান এবং রাহীম শব্দকে মদ্দ করে বা টেনে পড়তেন।" [বুখারী:৫০৪৬] উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু 'আনহাকে একই প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক একটি আয়াত আলাদা আলাদা করে পড়তেন এবং প্রতিটি আয়াত পড়ে থামতেন। তিনি 'আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' বলে থামতেন। তারপর 'আর-রাহমানির রাহীম' বলে থামতেন। তারপর 'মালিকি ইয়াওমিদ্দীন' বলে থামতেন। [মুসনাদে আহমাদ:৬/৩০২, আবু দাউদ:১৪৬৬, তিরমিযী:২৯২৭] হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণনা করেন, একদিন রাতে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সালাত পড়তে দাঁড়ালাম। আমি দেখলাম, তিনি এমনভাবে কুরআন তেলাওয়াত করছেন যে, যেখানে তাসবীহের বিষয় আসছে সেখানে তিনি তাসবীহ পড়ছেন, যেখানে দো'আর বিষয় আসছে সেখানে দো'আ করছেন এবং যেখানে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনার বিষয় আসছে সেখানে তিনি আশ্রয় প্রার্থনা করছেন। [মুসলিম:৭৭২] আবু যার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণনা করেন, একবার রাতের সালাতে কুরআন তেলাওয়াত করতে করতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এ আয়াতটির কাছে পৌঁছলেন "আপনি যদি তাদের শাস্তি দেন, তবে তারা আপনারই বান্দা। আর যদি আপনি তাদের ক্ষমা করে দেন, তাহলে আপনি পরাক্রমশালী ও বিজ্ঞ" তখন তিনি বার বার এ আয়াতটিই পড়তে থাকলেন এবং এভাবে ভোর হয়ে গেল।[মুসনাদে আহমাদ:৫/১৪৯] সাহাবী ও তাবেয়ীগণেরও এই অভ্যাস ছিল। তাছাড়া, যথাসম্ভব সুললিত স্বরে তিলাওয়াত করাও তারতীলের অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে নবী সশব্দে সুললিত স্বরে তেলাওয়াত করেন, তার কেরাআতের মত অন্য কারও কেরাআত আল্লাহ্ তা'আলা শুনেন না। [বুখারী: ৫০২৩, ৫০২৪] তবে পরিস্কার ও বিশুদ্ধ উচ্চারণসহ শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থ চিন্তা করে তদ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়াই আসল তারতীল। অনুরূপভাবে সুন্দর করে পড়াও এর অংশ। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যে কুরআনকে সুন্দর স্বরে পড়ে না সে আমার দলভুক্ত নয়।" [বুখারী: ৭৫২৭] অন্য হাদীসে এসেছে, "তোমরা কুরআনকে তোমাদের সুর দিয়ে সৌন্দর্যমণ্ডিত কর" [ইবনে মাজাহ: ১৩৪২] আবু মুসা আল-আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু সুমিষ্ট স্বরে কুরআন পাঠ করতেন বিধায় রাসূল তার প্রশংসা করে বলেছিলেন, "তোমাকে দাউদ পরিবারের সুর দেয়া হয়েছে"। [বুখারী: ৫০৪৮, মুসলিম: ৭৯৩] তাছাড়া হাদীসে আরও এসেছে, "কিয়ামতের দিন কুরআনের অধিকারীকে বলা হবে, তুমি পড় এবং আরোহন করতে থাক। সেখানেই তোমার স্থান হবে যেখানে তোমার কুরআন পড়ার আয়াতটি শেষ হবে।" [আবু দাউদ: ১৪৬৪, তিরমিযী: ২৯১৪]

(১) এখানে ভারী বা গুরুতর বাণী বলে পবিত্র কুরআন বোঝানো হয়েছে। গুরুভার

৬. নিশ্চয় রাতের বেলার উঠা[১] প্রবৃত্তি দলনে প্রবলতর[২] এবং বাকস্ফুরণে অধিক উপযোগী[৩]।

إِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْـًٔا وَأَقْوَمُ قِيلًا ۝٦

বাণী বলার কারণ হলো, তার নির্দেশ অনুসারে কাজ করা অনেক বেশী কঠিন ও গুরুতর কাজ। তাছাড়া এ জন্যও একে গুরুভার ও কঠিন বাণী বলা হয়েছে যে, তার অবতরণের ভার বহন করা অত্যন্ত কঠিন কাজ ছিল। যায়েদ ইবনে সাবেত রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণনা করেছেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অহী নাযিল হওয়ার সময় তিনি আমার উরুর ওপর তাঁর উরু ঠেকিয়ে বসেছিলেন। আমার উরুর ওপর তখন এমন চাপ পড়ছিলো যে, মনে হচ্ছিলো তা এখনই ভেঙে যাবে। [বুখারীঃ ৭৭৫, ৫০৪৩] আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বর্ণনা করেন, আমি প্রচণ্ড শীতের দিনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অহী নাযিল হতে দেখেছি। সে সময়ও তাঁর কপাল থেকে ঘাম ঝরতে থাকতো। [বুখারীঃ ২] অন্য বর্ণনায় আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলেছেন, উটনীর ওপর সওয়ার থাকা অবস্থায় যখনই তার ওপর অহী নাযিল হতো উটনী তখন তার বুক মাটিতে ঠেকিয়ে দিতো। অহী নাযিল শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে নড়াচড়া পর্যন্ত করতে পারতো না। [মুসনাদে আহমাদঃ ৬/১১৮, মুস্তাদরাকে হাকিমঃ ২/৫০৫] [ইবন কাসীর]

(১) ناشئة শব্দের ব্যাখ্যায় কয়েকটি মত আছে। একটি মত হলো, এর মানে রাতের বেলা শয্যা ত্যাগকারী ব্যক্তি। দ্বিতীয় মতটি হলো এর অর্থ রাত্রিকালীন সময়। [ইবন কাসীর]

(২) আয়াতে وطأً শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ এতো ব্যাপক যে, একটি মাত্র বাক্যে তা বুঝানো সম্ভব নয়। এর একটি অর্থ হলো, রাতের বেলা ইবাদাত-বন্দেগীর জন্য শয্যা ত্যাগ করে ওঠা এবং দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকা যেহেতু মানুষের স্বভাব-বিরুদ্ধ কাজ, মানুষের মন ও প্রবৃত্তি এ সময় আরাম কামনা করে, তাই এটি এমন একটি কাজ ও চেষ্টা-সাধনা যা প্রবৃত্তির জন্য অত্যন্ত কঠিন। দ্বিতীয় অর্থ হলো, রাত্রিবেলার সালাত দিনের সালাত অপেক্ষা অধিক স্থায়ী ও ফলপ্রসু। কেননা, দিনের বেলা মানুষের চিন্তা-চেতনা বিভিন্ন বিষয়ে ব্যস্ত থাকে, কিন্তু রাত্রিবেলা তা থেকে মুক্ত হয়। আরেকটি অর্থ হলো, ইবাদতকারী ব্যক্তিকে সক্রিয় রাখার পন্থা, কেননা রাত্রিবেলা বিভিন্ন চিন্তা-চেতনা ও কাজ থেকে মুক্ত হওয়ায় সে সময়ে ইবাদতে নিবিষ্ট হওয়া যায়। [কুরতুবী]

(৩) أقوم শব্দের অর্থ অধিক সঠিক। আর قيلاً শব্দের অর্থ কথা। তাই এর আভিধানিক অর্থ হলো, 'কথাকে আরো বেশী যথার্থ ও সঠিক বানায়।' অর্থাৎ রাত্রিবেলায় কুরআন তেলাওয়াত অধিক শুদ্ধতা ও স্থিরতা সহকারে হতে পারে। এর মূল বক্তব্য হলো, সে সময় মানুষ আরো বেশী প্রশান্তি, তৃপ্তি ও মনোযোগ সহকারে বুঝে কুরআন শরীফ পড়তে পারে। কারণ, তখন বিভিন্ন প্রকার ধ্বনি ও হট্টগোল দ্বারা অন্তর ও মস্তিস্ক ব্যাকুল হয় না। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর] ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা এর

إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ⑦

৭. নিশ্চয় দিনের বেলায় আপনার জন্য রয়েছে দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা(১) ।

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ⑧

৮. আর আপনি আপনার রবের নাম স্মরণ করুন এবং তাঁর প্রতি মগ্ন হোন একনিষ্ঠভাবে(২) ।

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ⑨

৯. তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের রব, তিনি ছাড়া কোন সত্য ইলাহ্ নেই; অতএব তাঁকেই আপনি গ্রহণ করুন কর্মবিধায়করূপে ।

ব্যাখ্যা করেছেন “গভীর চিন্তা-ভাবনা ও মনোনিবেশসহ কুরআন পাঠের জন্য এটা একটা অপেক্ষাকৃত উপযুক্ত সময় ।” [আবু দাউদ:১৩০৪]

(১) سبحاً শব্দের অর্থ প্রবাহিত হওয়া ও ঘোরাফেরা করা । এ কারণেই সাঁতার কাটাকে سباحة বলা হয় । এখানে এর অর্থ দিনমানের কর্মব্যস্ততা ও জীবিকার জন্য ঘোরাঘুরির কারণে অন্তরের ব্যস্ততা । দিনের কর্মব্যস্ততার কারণে একাগ্রচিত্তে ইবাদতে মনোনিবেশ করা কঠিন হয়ে পড়ে । [দেখুন, করতুবী; সা'দী]

(২) অর্থাৎ আপনি সমগ্র সৃষ্টি থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিবিধানে ও ইবাদতে মগ্ন হোন । এর সাধারণ অর্থে ইবাদতে শির্ক না করাও দাখিল এবং নিজের সমস্ত কর্মকাণ্ডে তথা উঠাবসায়, চলাফেরায় দৃষ্টি ও ভরসা আল্লাহ্‌র প্রতি নিবদ্ধ রাখা এবং অপরকে লাভ-লোকসান ও বিপদাপদ থেকে উদ্ধারকারী মনে না করাও দাখিল । দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছুকে পরিত্যাগ করে আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে তৎপ্রতি মনোনিবেশ করাও এর অর্থের অন্তর্গত । কিন্তু এই تبتل তথা দুনিয়ার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ সেই رهبانية তথা বৈরাগ্য থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন কুরআনে যার নিন্দা করা হয়েছে এবং হাদীসে তা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে । কেননা, শরীয়াতের পরিভাষায় رهبانية বা বৈরাগ্য এর অর্থ দুনিয়ার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা এবং ভোগ সামগ্রী ও হালাল বস্তুসমূহকে ইবাদতের নিয়তে পরিত্যাগ করা । পক্ষান্তরে এখানে যে সম্পর্কচ্ছেদের আদেশ করা হয়েছে, তা এই যে, বিশ্বাসগতভাবে অথবা কার্যগতভাবে আল্লাহ্‌র সম্পর্কের উপর কোন সৃষ্টির সম্পর্ককে প্রবল হতে না দেয়া । এ ধরণের সম্পর্কচ্ছেদ বিবাহ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ইত্যাদি যাবতীয় সাংসারিক কাজ-কারবারের পরিপন্থী নয়; বরং এগুলোর সাথে জড়িত থেকেও এটা সম্ভবপর । রাসূলগণের সুন্নত; বিশেষতঃ রাসূলকুল শিরোমণি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সমগ্র জীবন ও আচারাদি এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয় । আয়াতে تبتل শব্দ দ্বারা যে অর্থ ব্যক্ত করা হয়েছে, মূলত তা হলো সকল ইবাদত একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌র জন্য করা এবং এর মাধ্যমে একমাত্র তাঁরই মুখাপেক্ষী হওয়া । [দেখুন, কুরতুবী]

১০. আর লোকে যা বলে, তাতে আপনি ধৈর্য ধারণ করুন এবং সৌজন্যের সাথে তাদেরকে পরিহার করে চলুন(১)।

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ﴿١٠﴾

১১. আর ছেড়ে দিন আমাকে ও বিলাস সামগ্রীর অধিকারী মিথ্যারোপকারীদেরকে(২); এবং কিছু কালের জন্য তাদেরকে অবকাশ দিন,

وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا ﴿١١﴾

১২. নিশ্চয় আমাদের কাছে আছে শৃংখলসমূহ ও প্রজ্বলিত আগুন,

إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا ﴿١٢﴾

১৩. আর আছে এমন খাদ্য, যা গলায় আটকে যায় এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি(৩)।

وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٣﴾

১৪. সেদিন যমীন ও পর্বতমালা প্রকম্পিত হবে এবং পর্বতসমূহ বিক্ষিপ্ত বহমান

يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ

---

(১) এর শাব্দিক অর্থ কোন কিছুকে ত্যাগ করা বা পরিহার করা। অর্থাৎ মিথ্যারোপকারী কাফেররা আপনাকে যেসব পীড়াদায়ক কথাবার্তা বলে, আপনি সেসবের প্রতিশোধ নিবেন না ঠিক, কিন্তু তাদের সাথে সম্পর্কও রাখবেন না। বরং সৌজন্যের সাথে তাদের পরিহার করে চলুন। কোন কোন তফসীরবিদ বলেনঃ পরবর্তীতে অবতীর্ণ জিহাদের আদেশ সম্বলিত আয়াত দ্বারা এই আয়াতের নির্দেশ রহিত হয়ে গেছে। [কুরতুবী]

(২) এতে কাফেরদেরকে ﴿أُولِي النَّعْمَةِ﴾ বলা হয়েছে। نَعْمَة শব্দের অর্থ ভোগ-বিলাস, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্য। [ফাতহুল কাদীর]

(৩) অতঃপর আখেরাতের কঠিনতম শাস্তির বর্ণনা প্রসঙ্গে أنكال শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থ আটকাবস্থা ও শিকল। এরপর জাহান্নামের উল্লেখ করে জাহান্নামীদের ভয়াবহ খাদ্যের কথা বলা হয়েছে। ﴿وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ﴾ এর অর্থ গলগ্রহ খাদ্য। অর্থাৎ যে খাদ্য গলায় এমনভাবে আটকে যায় যে, গলধঃকরণও করা যায় না এবং উদগীরণও করা যায় না। জাহান্নামীদের খাদ্য ضريع , غسلين ও زقوم এর অবস্থা তাই হবে। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, তাতে আগুনের কাঁটা থাকবে; যা গলায় আটকে যাবে। [কুরতুবী] শেষে বলা হয়েছেঃ ﴿وَعَذَابًا أَلِيمًا﴾ নির্দিষ্ট আযাব উল্লেখ করার পর একথা বলে এর আরও অধিক অন্যান্য শাস্তির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর]

كَثِيبًا مَّهِيلًا ﴿١٤﴾

বালুকারাশিতে পরিণত হবে[১]।

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

১৫. নিশ্চয় আমরা তোমাদের কাছে পাঠিয়েছি এক রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ যেমন রাসূল পাঠিয়েছিলাম ফির‘আউনের কাছে,

فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا ﴿١٦﴾

১৬. কিন্তু ফির‘আউন সে রাসূলকে অমান্য করেছিল, ফলে আমরা তাকে অত্যন্ত শক্তভাবে পাকড়াও করেছিলাম।

فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ﴿١٧﴾

১৭. অতএব যদি তোমরা কুফরী কর, তবে কি করে আত্মরক্ষা করবে সেদিন যে দিনটি কিশোরদেরকে পরিণত করবে বৃদ্ধে,

السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ ۚ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ﴿١٨﴾

১৮. সে-দিন আসমান হবে বিদীর্ণ[২]। তাঁর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।

إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ ۖ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿١٩﴾

১৯. নিশ্চয় এটা এক উপদেশ, অতএব যে চায় সে তার রবের দিকে পথ অবলম্বন করুক!

---

(১) সে সময় অতি শক্ত-মজবুত পাহাড়সমূহ দূর্বল হয়ে পড়বে, তাই প্রথমে তা মিহি বিক্ষিপ্ত বালুর স্তুপে পরিণত হবে। অতঃপর বালুর এ স্তূপ বিক্ষিপ্ত হয়ে উড়ে যাবে। [সা‘দী] এরপর গোটা ভূপৃষ্ঠ একটা বিশাল প্রান্তরে রূপান্তরিত হবে। এ অবস্থার একটি চিত্র অন্যত্র এভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে, “লোকেরা আপনাকে এসব পাহাড়ের অবস্থা কি হবে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলুন, আমার রব পাহাড়সমূহকে ধুলির মত করে ওড়াবেন এবং ভূপৃষ্ঠকে এমন সমতল বিশাল প্রান্তরে রূপান্তরিত করবেন যে, তুমি সেখানে উঁচু নীচু বা ভাঁজ দেখতে পাবে না।” [সূরা ত্বা-হা:১০৫-১০৭]

(২) এখানে به শব্দের অর্থ করা হয়েছে, فيه বা ‘সে দিন’। তাছাড়া এর আরেকটি অর্থ হচ্ছে, بسببه বা ‘এর কারণে’ বা له বা ‘যে জন্য’। প্রতিটি অর্থই উদ্দেশ্য হতে পারে। তবে প্রথমটিই বিশুদ্ধ। অর্থাৎ সেদিনের ভয়াবহতা এমন যে, তাতে আসমান ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। [কুরতুবী]

দ্বিতীয় রুকূ’

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۙ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۙ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

২০. নিশ্চয় আপনার রব জানেন যে, আপনি সালাতে দাঁড়ান কখনও রাতের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ, কখনও অর্ধাংশ এবং কখনও এক-তৃতীয়াংশ এবং দাঁড়ায় আপনার সঙ্গে যারা আছে তাদের একটি দলও। আর আল্লাহ্‌ই নির্ধারণ করেন দিন ও রাতের পরিমাণ[১]। তিনি জানেন যে, তোমরা এটা পুরোপুরি পালন করতে পারবে না[২], তাই আল্লাহ্

(১) সূরার শুরুতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সকল মুসলিমের উপর তাহাজ্জুদ ফরয করা হয়েছিল এবং এই সালাত অর্ধরাত্রির কিছু বেশী এবং কমপক্ষে এক তৃতীয়াংশ রাত্রি পর্যন্ত দীর্ঘ হওয়াও ফরয ছিল। আল্লাহ্‌র জ্ঞান অনুযায়ী যখন এর উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে গেল, তখন তাহাজ্জুদের ফরয রহিত করে সে নির্দেশ শিথিল ও সহজ করে দেয়া হলো। [দেখুন, কুরতুবী]

(২) تحصوه এর মূল হলো إحصاء যার অর্থ গণনা করা। যেমন, পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে, ﴿وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا﴾ “আর তিনি (আল্লাহ্) সবকিছু সংখ্যায় গণনা করে রেখেছেন” [সূরা আল-জিন:২৮] অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলা জানেন যে, তোমরা এর গণনা করতে পারবে না। তাহাজ্জুদের সালাতে আল্লাহ্ তা‘আলা রাত্রির এক-তৃতীয়াংশ থেকে দুই-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত সময় নির্ধারণ করেছিলেন। কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের পক্ষে এই সালাতে মশগুল থাকা অবস্থায় রাত্র কতটুকু হয়েছে, তা জানা কঠিন ছিল। [দেখুন: কুরতুবী; সা‘দী] আবার কোন কোন তাফসীরবিদ বলেন, إحصاء অর্থ কোন কিছু যথানিয়মে কাজে লাগানো বা সক্ষম হওয়া। সে হিসেবে এখানে ﴿لَّن تُحْصُوهُ﴾ শব্দের অর্থ দীর্ঘ সময় এবং নিদ্রার সময়ে প্রত্যেকে যথারীতি সালাত পড়তে সক্ষম না হওয়া। [তাবারী] এ অর্থে শব্দটির ব্যবহার এসেছে, যেমন হাদীসে আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ সম্পর্কে বলা হয়েছে, من أحصاها دخل الجنة অর্থাৎ “যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নামসমূহকে কর্মের ভিতর দিয়ে পুরোপুরি ফুটিয়ে তোলে সে জান্নাতে দাখিল হবে।” [বুখারী: ৬৪১০, মুসলিম: ২৬৭৭]। এ অর্থের জন্য দেখুন, শারহুস সুন্নাহ লিল বাগভী: ৫/৩১; আল-আসমা ওয়াস সিফাত লিল বাইহাকী: ১/২৭; কাশফুল মুশকিল মিন হাদীসিস সাহীহাইন লি ইবনিল জাওযী: ৩/৪৩৫; তারহুত তাসরীব লিল ইরাকী: ৭/১৫৪; ফাতহুল বারী লি ইবন হাজার: ১/১০৬; সুবুলুস সালাম লিস সান‘আনী: ২/৫৫৬।

وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠﴾

তোমাদের ক্ষমা করলেন[১]। কাজেই কুরআন থেকে যতটুকু সহজ ততটুকু পড়, আল্লাহ্ জানেন যে, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে, আর কেউ কেউ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সন্ধানে দেশ ভ্রমন করবে এবং কেউ কেউ আল্লাহ্‌র পথে লড়াইয়ে লিপ্ত হবে। কাজেই তোমরা কুরআন হতে যতটুকু সহজসাধ্য ততটুকু পড়। আর তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর[২] এবং আল্লাহ্‌কে দাও উত্তম ঋণ[৩]। তোমরা তোমাদের নিজেদের জন্য ভাল যা কিছু অগ্রিম পাঠাবে তোমরা তা পাবে আল্লাহ্‌র কাছে[৪]। তা উৎকৃষ্টতর এবং পুরস্কার

---

(১) تاب শব্দের আসল অর্থ প্রত্যাবর্তন করা। গোনাহের তাওবাকেও এ কারণে তাওবা বলা হয় যে, মানুষ এতে পূর্বের গোনাহ থেকে প্রত্যাবর্তন করে। কেউ কেউ বলেন, এখানে কেবল প্রত্যাহার বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ফরয তাহাজ্জুদের আদেশ প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। [কুরতুবী]

(২) প্রসিদ্ধ এই যে, যাকাত হিজরতের দ্বিতীয় বর্ষে ফরয হয়েছে এই আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। এ কারণে কোন কোন তাফসীরবিদ বিশেষভাবে এই আয়াতটিকে মদীনায় অবতীর্ণ বলেছেন। কিন্তু সঠিক মত হলো, যাকাত মক্কায় ইসলামের প্রাথমিক যুগেই ফরয হয়েছিল, কিন্তু তার নেসাব ও পরিমাণের বিস্তারিত বিবরণ মদীনায় হিজরতের দ্বিতীয় বর্ষে বর্ণিত হয়েছে, এমতাবস্থায় আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হলেও ফরয যাকাত বোঝানো যেতে পারে। [দেখুন, ইবন কাসীর]

(৩) মূলত এখানে ফরয ও নফল দান-খায়রাত ও কার্যাদি বোঝানো হয়েছে। [সা'দী] আল্লাহর পথে ব্যয় করাকে এমনভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যেন ব্যয়কারী আল্লাহকে ঋণ দিচ্ছে। কেউ কেউ এর অর্থ এই নিয়েছেন যে, যাকাত ছাড়াও অনেক আর্থিক ওয়াজিব পাওনা মানুষের উপর বর্তে; যেমনঃ স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির ভরণ-পোষণ ইত্যাদি। [কুরতুবী]

(৪) এর অর্থ হলো, আখেরাতের জন্য যা কিছু তোমরা আগেই পাঠিয়ে দিয়েছো তা তোমাদের ঐ সব জিনিসের চেয়ে অনেক বেশী উপকারী যা তোমরা দুনিয়াতেই রেখে

হিসেবে মহত্তর। আর তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর আল্লাহ্‌র কাছে; নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

দিয়েছো এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের নিমিত্ত কোন কল্যাণকর কাজে ব্যয় করোনি। হাদীসে উল্লেখ আছে, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাদের এমন কেউ আছে যার নিজের অর্থ-সম্পদ তার উত্তরাধিকারীর অর্থ-সম্পদের চেয়ে তার কাছে বেশী প্রিয়? জবাবে লোকেরা বললো, "হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের মধ্যে কেউ-ই এমন নেই যার নিজের অর্থ-সম্পদ তাঁর কাছে তার উত্তরাধিকারীর অর্থ-সম্পদ থেকে বেশী প্রিয় নয়।" তখন তিনি বললেনঃ 'তোমরা কি বলছো তা ভেবে দেখো।' লোকেরা বললো, হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের অবস্থা আসলেই এরূপ। একথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমাদের নিজের অর্থ-সম্পদ তো সেইগুলো যা তোমরা আখেরাতের জন্য অগ্রিম পাঠিয়ে দিয়েছো। আর যা তোমরা রেখে দিয়েছো সেগুলো ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারীদের অর্থ-সম্পদ। [বুখারী:৬৪৪২] [ইবন কাসীর]

৭৪- সূরা আল-মুদ্দাস্‌সির[১]
৫৬ আয়াত, মক্কী

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰٓاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ①

১. হে বস্ত্রাচ্ছাদিত![২]

قُمْ فَاَنْذِرْ ②

২. উঠুন, অতঃপর সতর্ক করুন[৩],

وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ③

৩. আর আপনার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন।

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ④

৪. আর আপনার পরিচ্ছদ পবিত্র

---

(১) সূরা আল-মুদ্দাস্‌সির সম্পূর্ণ প্রাথমিক যুগে অবতীর্ণ সূরাসমূহের অন্যতম। এ কারণেই কেউ কেউ একে সর্বপ্রথম অবতীর্ণ সুরাও বলেছেন। কিন্তু সহীহ্ বর্ণনা অনুযায়ী সর্বপ্রথম সূরা আল-আলাকের প্রাথমিক আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। [ইবন কাসীর]

(২) হাদীসে এসেছে, সর্ব প্রথম হেরা গিরি গুহায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ফেরেশতা জিবরাইল আগমন করে ইকরা সূরার প্রাথমিক আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনান। ফেরেশতার এই অবতরণ ও ওহীর তীব্রতা প্রথম পর্যায়ে ছিল। ফলে এর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাদিজা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার নিকট গমন করলেন এবং তার কাছে বিস্তারিত ঘটনা বর্ণনা করলেন। এরপর বেশ কিছুদিন পর্যন্ত ওহীর আগমন বন্ধ থাকে। বিরতির এই সময়কালকে "ফাতরাতুল ওহী" বলা হয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীসে এই সময়কালের উল্লেখ করে বলেন, একদিন আমি পথ চলা অবস্থায় হঠাৎ একটি আওয়াজ শুনে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি, হেরা গিরিগুহার সেই ফেরেশতা আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে এক জায়গায় একটি ঝুলন্ত চেয়ারে উপবিষ্ট রয়েছেন। তাকে এই আকৃতিতে দেখে আমি প্রথম সাক্ষাতের ন্যায় আবার ভীত ও আতংকিত হয়ে পড়লাম। আমি গৃহে ফিরে এলাম এবং গৃহের লোকজনকে বললাম, আমাকে বস্ত্রাবৃত করে দাও। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাযিল হল। [বুখারী:৪, মুসলিম: ১৬১]

(৩) এখানে সর্বপ্রথম নির্দেশ হচ্ছে, قُمْ অর্থাৎ উঠুন। এর আক্ষরিক অর্থ 'দাঁড়ান'ও হতে পারে। অর্থাৎ আপনি বস্ত্রাচ্ছাদন পরিত্যাগ করে দন্ডায়মান হোন। এখানে কাজের জন্যে প্রস্তুত হওয়ার অর্থ নেয়াও অবান্তর নয়। উদ্দেশ্য এই যে, এখন আপনি সাহস করে জনশুদ্ধির দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হন। أنذر শব্দটি إنذار থেকে উদ্ভুত। অর্থ সতর্ক করা। এখানে মক্কার কাফেরদেরকে সতর্ক করতে বলা হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর]

করুন(১),

৫. আর শির্ক পরিহার করে চলুন(২), وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۝٥

৬. আর বেশী পাওয়ার প্রত্যাশায় দান করবেন না(৩) । وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ۝٦

(১) এখানে বর্ণিত ثياب শব্দটি ثوب এর বহুবচন । এর আসল ও আক্ষরিক অর্থ কাপড় । কখনও কখনও অন্তর, মন, চরিত্র ও কর্মকেও বলা হয় । এটি একটি ব্যাপক অর্থবোধক কথা । এর একটি অর্থ হল, আপনি আপনার পোশাক-পরিচ্ছদ নাপাক বস্তু থেকে পবিত্র রাখুন । কারণ শরীর ও পোশাক-পরিচ্ছদের পবিত্রতা এবং 'রূহ' বা আত্মার পবিত্রতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত । [সা'দী] একথাটির আরেকটি অর্থ হলো, নিজের পোশাক পরিচ্ছদ নৈতিক দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র রাখুন । নিজেকে পবিত্র রাখুন । অন্য কথায় এর অর্থ হলো নৈতিক দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র থাকা এবং উত্তম নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হওয়া । অর্থাৎ নিজের নৈতিক চরিত্রকে পবিত্র রাখুন এবং সব রকমের দোষ-ত্রুটি থেকে দূরে থাকুন । [কুরতুবী] সুতরাং নির্দেশের অর্থ হবে এই যে, আপন পোশাক ও দেহকে বাহ্যিক অপবিত্রতা থেকে পবিত্র রাখুন এবং অন্তর ও মনকে ভ্রান্ত বিশ্বাস ও চিন্তাধারা থেকে এবং কুচরিত্র থেকে মুক্ত রাখুন । আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্রতা পছন্দ করেন । এক আয়াতে আছে, ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [সূরা আল-বাকারাহ: ২২২] তাছাড়া হাদীসে 'পবিত্রতাকে ঈমানের অর্ধাংশ' [মুসলিম: ২২৩] বলা হয়েছে । তাই মুসলিমকে সর্বাবস্থায় শরীর, স্থান ও পোশাককে বাহ্যিক নাপাকী থেকে এবং অন্তরকে আভ্যন্তরীণ অশুচি, যেমন লোক-দেখানো, অহংকার ইত্যাদি থেকে পবিত্র রাখার প্রতি সচেষ্ট হতে হবে । [সা'দী]

(২) আয়াতে উল্লেখিত الرجز শব্দের এক অর্থ, শাস্তি । অর্থাৎ শাস্তিযোগ্য কাজ । [ফাতহুল কাদীর] এখানে এর অর্থ হতে পারে, পৌত্তলিকতা ও প্রতিমা পূজা । তাছাড়া সাধারণভাবে সকল গোনাহ ও অপরাধ বোঝানোর জন্যও শব্দটি ব্যবহৃত হতে পারে । তাই আয়াতের অর্থ এই যে, প্রতিমা পূজা, শাস্তিযোগ্য কর্মকাণ্ড অথবা গোনাহ্ পরিত্যাগ করুন । সকল প্রকার ছোট ও বড় অন্যায় ও গুনাহের কাজ পরিত্যাগ করুন । [সা'দী]

(৩) এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে । একটি অর্থ হলো, আপনি যার প্রতিই ইহ্‌সান বা অনুগ্রহ করবেন, নিঃস্বার্থভাবে করবেন । আপনার অনুগ্রহ ও বদান্যতা এবং দানশীলতা ও উত্তম আচরণ হবে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে । ইহ্‌সান বা মহানুভবতার বিনিময়ে কোন প্রকার পার্থিব স্বার্থ লাভের বিন্দুমাত্র আকাঙ্খাও করবেন না; বেশি পাওয়ার আশায়ও ইহসান করবেন না । দ্বিতীয় অর্থ হলো, নবুওয়াতের যে দায়িত্ব আপনি পালন করছেন এবং এর বিনিময়ে কোন প্রকার ব্যক্তি স্বার্থ উদ্ধার করবেন না; যদিও অনেক বড় ও মহান একটি কাজ করে চলেছেন কিন্তু নিজের দৃষ্টিতে নিজের কাজকে বড় কাজ বলে কখনো মনে করবেন না এবং কোন সময় এ চিন্তাও যেন

৭. আর আপনার রবের জন্যেই ধৈর্য ধারণ করুন।

وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ۝٧

৮. অতঃপর যখন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে[১]

فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ۝٨

৯. সেদিন হবে এক সংকটের দিন–

فَذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ ۝٩

১০. যা কাফিরদের জন্য সহজ নয়[২]।

عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ۝١٠

১১. ছেড়ে দিন আমাকে ও যাকে আমি সৃষ্টি করেছি একাকী[৩]।

ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ۝١١

১২. আর আমি তাকে দিয়েছি বিপুল ধন-সম্পদ[৪]

وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُودًا ۝١٢

আপনার মনে উদিত না হয় যে, নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করে আর এ কাজে প্রাণপণ চেষ্টা-সাধনা করে আপনি আপনার রবের প্রতি কোন অনুগ্রহ করছেন। [দেখুন: কুরতুবী]

(১) ناقور শব্দের অর্থ শিংগা এবং نُقِرَ বলে শিংগায় ফুঁ দিয়ে আওয়াজ বের করা বোঝানো হয়েছে। এখানে শিঙ্গার দ্বিতীয় ফুঁ তথা কবর থেকে উঠে হাশরের ময়দানে জড়ো হওয়ার জন্য যে ফুঁক দেয়া হবে তা উদ্দেশ্য। [বাগভী, সা'দী]

(২) এ বাক্যটি থেকে স্বতঃই প্রতিভাত হয় যে, সেদিনটি ঈমানদারদের জন্য হবে খুবই সহজ এবং এর সবটুকু কঠোরতা সত্যকে অমান্যকারীদের জন্য নির্দিষ্ট হবে। [সা'দী]

(৩) একথাটির দু'টি অর্থ হতে পারে এবং দু'টি অর্থই সঠিক। এক, আমি যখন তাকে সৃষ্টি করেছিলাম সে সময় সে কোন প্রকার ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি এবং মর্যাদা ও নেতৃত্বের অধিকারী ছিল না, সে একা ছিল। আমি তাকে সেসব দান করেছি। দুই, একমাত্র আমিই তার সৃষ্টিকর্তা। অন্য যেসব উপাস্যের প্রভুত্ব কায়েম রাখার জন্য সে আপনার দেয়া তাওহীদের দাওয়াতের বিরোধিতায় এত তৎপর, তাদের কেউই তাকে সৃষ্টি করার ব্যাপারে আমার সাথে শরীক ছিল না। [কুরতুবী]

(৪) কেয়ামত দিবস সকল কাফেরের জন্যেই কঠিন হবে-একথা বর্ণনা করার পর জনৈক দুষ্টমতি কাফেরের অবস্থা ও তার কঠোর শাস্তি বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, তার নাম ওলীদ ইবনে মুগীরা। তার দশ বারটি পুত্র সন্তান ছিল। তাদের মধ্যে খালেদ ইবনে ওয়ালীদ ইতিহাসে অনেক বেশী প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্য দান করেছিলেন। [ইবন কাসীর] ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমার ভাষায়, তার ফসলের ক্ষেত ও বাগ-বাগিচা

১৩. এবং নিত্যসঙ্গী পুত্রগণ(১), وَّبَنِيْنَ شُهُوْدًا ﴿١٣﴾

১৪. আর তাকে দিয়েছি স্বাচ্ছন্দ জীবনের প্রচুর উপকরণ– وَّمَهَّدْتُّ لَهٗ تَمْهِيْدًا ﴿١٤﴾

১৫. এর পরও সে কামনা করে যে, আমি তাকে আরও বেশী দেই(২)! ثُمَّ يَطْمَعُ اَنْ اَزِيْدَ ﴿١٥﴾

১৬. কখনো নয়, সে তো আমাদের নিদর্শনসমূহের বিরুদ্ধাচারী। كَلَّا ؕ اِنَّهٗ كَانَ لِاٰيٰتِنَا عَنِيْدًا ﴿١٦﴾

১৭. অচিরেই আমি তাকে চড়ার(৩) শাস্তি سَاُرْهِقُهٗ صَعُوْدًا ﴿١٧﴾

মক্কা থেকে তায়েফ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এমনকি তার ক্ষেতের ফসল ও বাগানের আমদানী সারা বছর তথা শীত ও গ্রীষ্ম সব ঋতুতে অব্যাহত থাকত। তাকে আরবের সরদার গণ্য করা হত। জনসাধারণের মধ্যে তার বিশেষ বিশেষ উপাধি ছিল। সে গর্ব ও অহংকারবশতঃ নিজেকে ওহীদ ইবনুল-ওহীদ অর্থাৎ এককের পুত্র একক বলত। তার দাবী ছিল এই যে, সম্প্রদায়ের মধ্যে সেও তার পিতা মুগীরা অদ্বিতীয়। [কুরতুবী, বাগভী]

(১) এসব পুত্র সন্তানদের জন্য شهود শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। এক, রুযী রোজগারের জন্য তাদের দৌড় ঝাপ করতে বা সর্বক্ষণ ব্যস্ত থাকতে কিংবা বিদেশ যাত্রা করতে হয় না। তাদের বাড়ীতে এত খাদ্য মজুদ আছে যে, তারা সর্বক্ষণ বাপের কাছে উপস্থিত থাকে বরং তাকে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত থাকে। [ইবন কাসীর] দুই, তার সবগুলো সন্তানই নামকরা এবং প্রভাবশালী, তারা বাপের সাথে দরবার ও সভা-সমিতিতে উপস্থিত থাকে। [কুরতুবী]

(২) একথার একটি অর্থ হলো, এসব সত্বেও তার লালসা ও আকাঙ্খার শেষ নেই। এত কিছু লাভ করার পরও সে সর্বক্ষণ এ চিন্তায় বিভোর যে, দুনিয়ার সব নিয়ামত ও ভোগের উপকরণ সে কিভাবে লাভ করতে পারবে। দুই, হাসান বাসরী ও আরো কয়েকজন মনীষী বর্ণনা করেছেন যে, সে বলত, মুহাম্মাদের একথা যদি সত্য হয়ে থাকে যে, মৃত্যুর পর আরো একটি জীবন আছে এবং সেখানে জান্নাত বলেও কিছু একটা থাকবে তাহলে সে জান্নাত আমার জন্যই তৈরী করা হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর]

(৩) আল্লাহ্ তা'আলা সে পাপিষ্ঠকে কি শাস্তি দিবেন আয়াতে তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, তাকে ক্লান্ত-ক্লিষ্ট করা হবে চড়ার শাস্তি দানের মাধ্যমে। কিন্তু কোথায় চড়ানো হবে? বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, তাকে আগুনের পাহাড়ে চড়তে বাধ্য করা হবে, তারপর সেখান থেকে নীচের দিকে নিক্ষিপ্ত হতে থাকবে। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, তাকে পিচ্ছিল এক পাহাড়ে চড়তে বাধ্য করা হবে। কোন

দিয়ে কষ্ট-ক্লান্ত করব।

إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ﴿١٨﴾

১৮. সে তো চিন্তা করল এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল।

فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿١٩﴾

১৯. সুতরাং ধ্বংস হোক সে! কেমন করে সে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল!

ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿٢٠﴾

২০. তারপরও ধ্বংস হোক সে! কেমন করে সে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হল!

ثُمَّ نَظَرَ ﴿٢١﴾

২১. তারপর সে তাকাল।

ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ﴿٢٢﴾

২২. তারপর সে ভ্রূকুঞ্চিত করল ও মুখ বিকৃত করল।

ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ﴿٢٣﴾

২৩. তারপর সে পিছন ফিরল এবং অহংকার করল।

فَقَالَ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ ﴿٢٤﴾

২৪. অতঃপর সে বলল, 'এ তো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত জাদু ভিন্ন আর কিছু নয়(১),

إِنْ هَٰذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ﴿٢٥﴾

২৫. 'এ তো মানুষেরই কথা।'

سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ﴿٢٦﴾

২৬. অচিরেই আমি তাকে দগ্ধ করব 'সাকার' এ

وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ ﴿٢٧﴾

২৭. আর আপনাকে কিসে জানাবে 'সাকার' কী?

কোন বর্ণনায় এসেছে যে, সে পাহাড়টিতে হাত রাখা মাত্রই তা গলতে আরম্ভ করবে, এভাবে প্রতি পদে পদে পা ডুবে যাবে। মূলত শান্তিবিহীন অতি কষ্টের শাস্তি তাকে দেওয়া হবে। [ইবন কাসীর; কুরতুবী]

(১) উদ্দেশ্য এই যে, এই হতভাগা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুওয়ত অস্বীকার করার জন্য অনেক চিন্তা-ভাবনার পর প্রস্তাব করল, তাকে জাদুকর বলা হোক। এই ঘৃণ্য প্রস্তাবের কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে তার প্রতি বার বার অভিসম্পাত করেছেন। [ইবন কাসীর]

لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ ﴿٢٨﴾

২৮. এটা অবশিষ্ট রাখবে না এবং ছেড়েও দেবে না[১]।

لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ ﴿٢٩﴾

২৯. এটা তো শরীরের চামড়া পুড়িয়ে কালো করে দেবে,

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴿٣٠﴾

৩০. 'সাকার'-এর তত্ত্বাবধানে রয়েছে ঊনিশজন প্রহরী।

وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً ۙ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا ۙ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ ۙ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۚ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ۚ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ ﴿٣١﴾

৩১. আর আমরা তো জাহান্নামের প্রহরী কেবল ফেরেশ্‌তাদেরকেই করেছি[২]; কাফিরদের পরীক্ষাস্বরূপই আমরা তাদের এ সংখ্যা উল্লেখ করেছি যাতে কিতাবপ্রাপ্তদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে, আর যারা ঈমান এনেছে তাদের ঈমান বেড়ে যায়। আর কিতাবপ্রাপ্তরা ও মুমিনরা সন্দেহ পোষণ না করে। আর যেন এর ফলে যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা ও কাফিররা বলে, আল্লাহ্

---

(১) এর দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ হলো, যাকেই এর মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে তাকেই সে জ্বালিয়ে ছাই করে দেবে। কিন্তু জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়েও সে রক্ষা পাবে না। বরং আবার তাকে জীবিত করা হবে এবং আবার জ্বালানো হবে। [ইবন কাসীর] আরেক জায়গায় বলা হয়েছেঃ 'সেখানে সে মরে নিঃশেষ হয়েও যাবে না আবার বেঁচেও থাকবে না' [সূরা আল-আ'লা: ১৩]।

(২) এখান থেকে "আপনার রবের বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন" পর্যন্ত বাক্যগুলোতে একটি ভিন্ন প্রসংগ আলোচিত হয়েছে। "জাহান্নামের কর্মচারীর সংখ্যা শুধু উনিশ জন হবে" একথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখে শুনে যারা সমালোচনামুখর হয়ে উঠেছিল এবং কথাটা নিয়ে হাসি ঠাট্টা করতে শুরু করেছিল, তাই প্রাসঙ্গিক বক্তব্যের মাঝখানে বক্তব্যের ধারাবাহিকতায় ছেদ টেনে তাদের কথার জবাব দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ মানুষের দৈহিক শক্তির সাথে তুলনা করে তাদের শক্তি সম্পর্কে অনুমান করা তোমাদের বোকামী ও নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। তারা মানুষ নয়, বরং ফেরেশতা। তোমাদের পক্ষে অনুমান করাও সম্ভব নয় যে, কি সাঙ্ঘাতিক শক্তিধর ফেরেশতা আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন। [দেখুন, ইবন কাসীর]

এ (সংখ্যার) উপমা[১] (উল্লেখ করা) দ্বারা কি ইচ্ছা করেছেন?’ এভাবে আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছে পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছে হেদায়াত করেন। আর আপনার রবের বাহিনী সম্পর্কে তিনি ছাড়া কেউ জানে না। আর জাহান্নামের এ বর্ণনা তো মানুষের জন্য এক উপদেশ মাত্র।

দ্বিতীয় রুকূ’

كَلَّا وَالْقَمَرِ ﴿٣٢﴾

৩২. কখনোই না[২], চাঁদের শপথ,

وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ ﴿٣٣﴾

৩৩. শপথ রাতের, যখন তার অবসান ঘটে,

وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ ﴿٣٤﴾

৩৪. শপথ প্রভাতকালের, যখন তা আলোকোজ্জ্বল হয়–

إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ ﴿٣٥﴾

৩৫. নিশ্চয় জাহান্নাম ভয়াবহ বিপদসমূহের অন্যতম,

نَذِيرًا لِّلْبَشَرِ ﴿٣٦﴾

৩৬. মানুষের জন্য সতর্ককারীস্বরূপ–

لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ﴿٣٧﴾

৩৭. তোমাদের মধ্যে যে অগ্রসর হতে চায় কিংবা যে পিছিয়ে পড়তে চায় তার জন্য[৩]।

---

(১) ‘উপমা’ বলে এখানে আল্লাহ্‌ তা‘আলা যে উনিশ সংখ্যক প্রহরীর কথা বলেছেন সে কথাটিই উদ্দেশ্য। তারা বলছিল, এ সংখ্যা উল্লেখ করার কী হেকমত ছিল? [ইবন কাসীর, কুরতুবী]

(২) অর্থাৎ এটা কোন ভিত্তিহীন কথা নয় যে তা নিয়ে এভাবে হাসি তামাসা বা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা যাবে। [দেখুন, তাবারী]

(৩) এখানে অগ্রে যাওয়ার অর্থ ঈমান ও আনুগত্যের দিকে অগ্রণী হওয়া। আর পশ্চাতে থাকার অর্থ ঈমান ও আনুগত্য থেকে পশ্চাতে থাকা। উদ্দেশ্য এই যে, জাহান্নামের শাস্তি থেকে সতর্ক করা সব মানুষের জন্যে ব্যাপক। অতঃপর এই সতর্কবাণী শুনে কেউ ঈমান ও আনুগত্যের প্রতি অগ্রণী হয় এবং কোন কোন হতভাগা এরপরও পশ্চাতে থেকে যায়। [সা‘দী]

৩৮. প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ[১],	كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ۝٣٨
৩৯. তবে ডানপন্থীরা নয়,	إِلَّآ أَصْحَـٰبَ ٱلْيَمِينِ ۝٣٩
৪০. বাগ-বাগিচার মধ্যে তারা একে অপরকে জিজ্ঞেস করবে–	فِى جَنَّـٰتٍ يَتَسَآءَلُونَ ۝٤٠
৪১. অপরাধীদের সম্পর্কে,	عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ ۝٤١
৪২. 'তোমাদেরকে কিসে 'সাকার'-এ নিক্ষেপ করেছে?'	مَا سَلَكَكُمْ فِى سَقَرَ ۝٤٢
৪৩. তারা বলবে, 'আমরা সালাত আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না[২],	قَالُوا۟ لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ۝٤٣
৪৪. আর আমরা অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দান করতাম না[৩],	وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ۝٤٤
৪৫. এবং আমরা অনর্থক আলাপকারীদের সাথে বেহুদা আলাপে মগ্ন থাকতাম।	وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَآئِضِينَ ۝٤٥
৪৬. 'আর আমরা প্রতিদান দিবসে মিথ্যারোপ করতাম,	وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ۝٤٦
৪৭. 'অবশেষে আমাদের কাছে মৃত্যু	حَتَّىٰٓ أَتَىٰنَا ٱلْيَقِينُ ۝٤٧

(১) رَهِينَةٌ এর অর্থ এখানে প্রত্যেকের আটক ও বন্দী হওয়া। ঋণের পরিবর্তে বন্ধকী দ্রব্য যেমন মহাজনের হাতে আটক থাকে-মালিক তাকে কোন কাজে লাগাতে পারে না, তেমনি কেয়ামতের দিন প্রত্যেকেই তার গোনাহের বিনিময়ে আটক ও বন্দী থাকবে। কিন্তু, আসহাবুল-ইয়ামীন' তথা ডানদিকের সৎলোকগণ এ থেকে মুক্ত থাকবে। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

(২) এর অর্থ হলো, যেসব মানুষ আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে সালাত ঠিকমত আদায় করেছে আমরা তাদের মধ্যে অন্তরভুক্ত ছিলাম না। [কুরতুবী]

(৩) এ থেকে জানা যায় কোন অভাবী মানুষকে সামর্থ থাকা সত্বেও খাবার না দেয়া বা সাহায্য না করা মানুষের দোযখে যাওয়ার কারণসমূহের মধ্যে একটা কারণ। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর, কুরতুবী]

আগমন করে[১]।’

৪৮. ফলে সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোন উপকার করবে না[২]।

فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشّٰفِعِيْنَ ﴿٤٨﴾

৪৯. অতঃপর তাদের কী হয়েছে যে, তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় উপদেশ হতে?

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِيْنَ ﴿٤٩﴾

৫০. তারা যেন ভীত-ত্রস্ত হয়ে পলায়নরত একপাল গাধা–

كَاَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ ﴿٥٠﴾

৫১. যারা সিংহের ভয়ে পলায়ন করেছে[৩]।

فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ﴿٥١﴾

৫২. বরং তাদের মধ্যকার প্রত্যেকেই কামনা করে যে, তাকে একটি উন্মুক্ত

بَلْ يُرِيْدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُّؤْتٰى صُحُفًا

(১) অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত আমরা এ নীতি ও কর্মপন্থা অনুসরণ করেছি। শেষ পর্যন্ত নিশ্চিত বিষয় তথা মৃত্যু আমাদের সামনে এসে হাজির হয়েছে; তখন আমাদের সব আশা-কৌশলের সমাপ্তি হয়। [সা’দী]

(২) এখানে هُم সর্বনাম দ্বারা সেসব অপরাধীকে বোঝানো হয়েছে, পূর্বের আয়াতে যারা তাদের চারটি অপরাধ স্বীকার করেছে- (১) তারা সালাত আদায় করত না, (২) তারা কোন অভাবগ্রস্ত ফকীরকে আহার্য দিত না; অর্থাৎ দরিদ্রদের প্রয়োজনে ব্যয় করত না, (৩) ভ্রান্ত লোকেরা ইসলাম ও ঈমানের বিরুদ্ধে যেসব কথাবার্তা বলত অথবা গোনাহ ও অশ্লীল কাজে লিপ্ত হত, তারাও তাদের সাথে তাতে লিপ্ত হত এবং সম্পর্কহীনতা প্রকাশ করত না, (৪) তারা কেয়ামত অস্বীকার করত। এর দ্বারা প্রমাণিত হল যে, যেসব অপরাধী এসব গোনাহ করে এবং কেয়ামত অস্বীকার করার মত কুফরী করে, তাদের জন্যে কারও সুপারিশ উপকারী হবে না। কেননা, তারা কাফের। কাফেরদের জন্যে সুপারিশ করার অনুমতি কাউকে দেয়া হবে না। কেউ করলে গ্রহনীয় হবে না। [দেখুন: ইবন কাসীর; বাগভী; বাদা’ই‘উত তাফসীর] কুরআনের অন্যান্য আয়াত ও অনেক সহীহ্ হাদীসে প্রমাণিত আছে যে, নবী-রাসূলগণ, শহীদগণ এবং সৎকর্মপরায়ণগণ-এমন কি সাধারণ মুমিনগণও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অনুমতি প্রাপ্তির পর অন্যান্য মুমিনদের জন্যে সুপারিশ করবেন এবং তা কবুলও হবে। তবে কাফের মুশরিকদের কারও জন্য কোন সুপারিশ কাজে আসবে না।

(৩) ﴿حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ﴾ অর্থ বন্য গাধা। আর قسورة এর অর্থ সিংহ বা তীরান্দাজ শিকারী। এ স্থলে উভয় অর্থ বর্ণিত আছে। [ফাতহুল কাদীর]

مُّنَشَّرَةً ﴿٥٢﴾

গ্রন্থ দেয়া হোক[১]।

كَلَّا ۖ بَل لَّا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ ﴿٥٣﴾

৫৩. কখনো নয়[২]; বরং তারা আখেরাতকে ভয় করে না[৩]।

كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ ﴿٥٤﴾

৫৪. নিশ্চয় এ কুরআন তো সকলের জন্য উপদেশবাণী[৪]।

فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ ﴿٥٥﴾

৫৫. অতএব যার ইচ্ছে সে তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করুক।

وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ۚ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ﴿٥٦﴾

৫৬. আর আল্লাহ্‌র ইচ্ছে ছাড়া কেউ উপদেশ গ্রহণ করতে পারে না; তিনিই যোগ্য যে, একমাত্র তাঁরই তাকওয়া অবলম্বন করা হবে, আর তিনিই ক্ষমা করার অধিকারী [৫]।

---

(১) অর্থাৎ তারা চায় যে, আল্লাহ তা'আলা যদি সত্যি সত্যিই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নবী হিসেবে পাঠিয়ে থাকেন তাহলে তিনি মক্কার প্রত্যেক নেতা ও সমাজপতিদের কাছে যেন একখানা করে পত্র লিখে পাঠান যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্যিই আমার নবী, তোমরা তাঁর আনুগত্য করো। [ফাতহুল কাদীর] কুরআন মজীদের অন্য এক জায়গায় মক্কার কাফেরদের এ উক্তিরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, "আল্লাহর রাসূলদের যা দেয়া হয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত তা আমাদের দেয়া না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা মেনে নেব না।" [সূরা আল-আন'আম: ২৪] অন্য এক জায়গায় তাদের এ দাবীও উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, "আপনি আমাদের চোখের সামনে আসমানে উঠে যান এবং সেখান থেকে লিখিত কিতাব নিয়ে আসেন, আমরা তা পড়ে দেখবো।" [সূরা আল-ইসরা: ৯৩]

(২) অর্থাৎ তাদের এ ধরনের কোন দাবী কক্ষনো পূরণ করা হবে না। [কুরতুবী]

(৩) অর্থাৎ এদের ঈমান না আনার আসল কারণ এটা নয় যে, তাদের এ দাবী পূরণ করা হচ্ছে না। বরং এর আসল কারণ হলো এরা আখেরাতের ব্যাপারে বেপরোয়া ও নির্ভীক। [ফাতহুল কাদীর] এরা এ পৃথিবীকেই পরম পাওয়া মনে করে নিয়েছে। [কুরতুবী]

(৪) এখানে تذكرة তথা 'উপদেশ' বলে কুরআন মজীদ বোঝানো হয়েছে। কেননা, এর শাব্দিক অর্থ স্মারক। [ইবন কাসীর]

(৫) আল্লাহ্ তা'আলা ﴿أَهْلُ التَّقْوَىٰ﴾ এই অর্থে যে, একমাত্র তারই তাকওয়া অবলম্বন করা যায়। তিনি ব্যতীত আর কারও তাকওয়া অবলম্বন করতে বলা যায় না।

একমাত্র তাঁকেই ভয় করা এবং তাঁর নাফরমানী থেকেই বেঁচে থাকা জরুরী। আর ﴿وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ﴾ হওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, তিনিই অপরাধী গোনাহ্‌গারের অপরাধ ও গোনাহ্ যখন ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন। অন্য কেউ এরূপ উচ্চমনা হতে পারে না। [দেখুন, ইবন কাসীর]

৭৫- সূরা আল-কিয়ামাহ
৪০ আয়াত, মক্কী

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لَآ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ ①

১. আমি শপথ করছি কিয়ামতের দিনের(১),

وَلَآ أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ②

২. আমি আরও শপথ করছি ভর্ৎসনাকারী আত্মার(২)।

---

(১) কারও বিরোধী মনোভাব খন্ডন করার জন্যে শপথ করা হলে শপথের পূর্বে لا ব্যবহৃত হয়। আরবী বাক-পদ্ধতিতে এই ব্যবহার প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। এ শব্দ দ্বারা বক্তব্য শুরু করাই প্রমাণ করে যে, আগে থেকে কোন বিষয়ে আলোচনা চলছিল যার প্রতিবাদ করার জন্য এ সূরা নাযিল হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা যা বলছো তা ঠিক নয়। আমি কসম করে বলছি, প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এটি । অর্থাৎ কেয়ামত অবশ্যম্ভাবী। [দেখুন, ইবন কাসীর]

(২) لوامة শব্দটি لوم থেকে উদ্ভুত। অর্থ তিরস্কার ও ধিক্কার দেয়া। 'নাফসে লাওয়ামা' বলে এমন নফস বোঝানো হয়েছে, যে নিজের কাজকর্মের হিসাব নিয়ে নিজেকে ধিক্কার দেয়। অর্থাৎ কৃত গোনাহ অথবা ওয়াজিব কর্মে ত্রুটির কারণে নিজেকে ভর্ৎসনা করে বলে যে, তুই এমন করলি কেন? সৎকর্ম সম্পর্কেও নিজেকে এই বলে তিরস্কার করে যে, আরও বেশী সৎকাজ সম্পাদন করে উচ্চমর্যাদা লাভ করলে না কেন? সারকথা, কামেল মুমিন ব্যক্তি সর্বদাই তার প্রত্যেক সৎ ও অসৎ কাজের জন্যে নিজেকে তিরস্কারই করে। গোনাহ্ অথবা ওয়াজিব কর্মে ত্রুটির কারণে তিরস্কার করার হেতু স্পষ্ট। সৎকাজে তিরস্কার করার কারণ এই যে, নফস ইচ্ছা করলে আরও বেশী সৎকাজ করতে পারত। সে বেশী সৎকাজ করল না কেন? এই অর্থের ভিত্তিতেই হাসান বাসরী রাহেমাহুল্লাহ নাফসে-লাওয়ামার তফসীর করেছেন 'নফসে-মুমিনাহ।' তিনি বলেছেনঃ আল্লাহ্‌র কসম, মুমিন তো সর্বদা সর্বাবস্থায় নিজেকে ধিক্কারই দেয়। সৎকর্মসমুহেও সে আল্লাহ্‌র শানের মোকাবেলায় আপন কর্মে অভাব ও ত্রুটি অনুভব করে। [কুরতুবী] কেননা, আল্লাহ্‌র শানের হক পুরোপুরি আদায় করা সাধ্যাতীত ব্যাপার। ফলে তার দৃষ্টিতে ত্রুটি থাকে এবং তজ্জন্যে নিজেকে ধিক্কার দেয়। পক্ষান্তরে অসৎ কাজ হলে মুমিনের কাছে এটা অত্যন্ত কঠোর হয়ে দেখা দেয় ফলে সে নিজেকে ধিক্কার দেয়। [বাগভী] মূলতঃ নাফস তিনটি গুণে গুণান্বিত হয়। নফসে আম্মারা, লাওয়ামা ও মুতমায়িন্নাহ। সাধারণত নাফসে আম্মারা বা খারাপ কাজে উদগ্রীবকারী আত্মা প্রতিটি মানুষেরই মজ্জাগত ও স্বভাবগত। সে মানুষকে মন্দ কাজে লিপ্ত হতে জোরদার আদেশ করে। কিন্তু ঈমান, সৎকর্ম ও

৩. মানুষ কি মনে করে যে, আমরা কখনোই তার অস্থিসমূহ একত্র করতে পারব না?	اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَهٗ ؕ﴿۳﴾
৪. অবশ্যই হ্যাঁ, আমরা তার আঙ্গুলের আগা পর্যন্ত পুনর্বিন্যস্ত করতে সক্ষম[১]।	بَلٰى قٰدِرِيْنَ عَلٰٓى اَنْ نُّسَوِّيَ بَنَانَهٗ ﴿۴﴾
৫. বরং মানুষ তার ভবিষ্যতেও পাপাচার করতে চায়[২]।	بَلْ يُرِيْدُ الْاِنْسَانُ لِيَفْجُرَ اَمَامَهٗ ۚ﴿۵﴾

সাধনার বলে সে নফসে-লাওয়ামা হয়ে যায় এবং মন্দ কাজ ও ত্রুটির কারণে অনুতপ্ত হতে শুরু করে। এটাকেই অনেকে বিবেক বলে। কিন্তু মন্দ কাজ থেকে সে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয় না। অতঃপর সৎকর্মে উন্নতি ও আল্লাহ্‌র নৈকট্যলাভে চেষ্টা করতে করতে যাখন শরীয়তের আদেশ-নিষেধ প্রতিপালন তার মজ্জাগত ব্যাপার হয়ে যায় এবং শরীয়তবিরোধী কাজের প্রতি স্বভাবগত ঘৃণা অনুভব করতে থাকে, তখন এই নফসই মুতমায়িন্নাহ বা সন্তুষ্টচিত্ত উপাধি প্রাপ্ত হয়। এ ধরনের নাফস যাদের অর্জিত হয় তারা দ্বীনী ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহ বা প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে মুক্ত হয়ে 'কালবে সালীম' বা সুস্থ হৃদয়ের অধিকারী হয়। আর এ সমস্ত লোকদের প্রশংসায় আল্লাহ্ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেছেন, 'যে দিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবে না; 'সে দিন উপকৃত হবে শুধু সে, যে আল্লাহ্‌র কাছে আসবে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ নিয়ে।" [সূরা আশ-শু'আরা: ৮৮-৮৯]

(১) অর্থাৎ বড় বড় হাড়গুলো একত্রিত করে পুনরায় তোমার দেহের কাঠামো প্রস্তুত করা এমন কিছুই নয়। আমি তো তোমার দেহের সূক্ষ্মতম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এমনকি তোমার আঙ্গুলের জোড়গুলোও পুনরায় ঠিক তেমন করে বানাতে সক্ষম যেমন তা এর আগে ছিল, তবে তোমাদের পুনরুত্থিত করতে অসক্ষম হওয়ার কোন কারণ নেই। [কুরতুবী]

(২) তারা যে কিয়ামত ও আখেরাতকে অস্বীকার করে তার মূল কারণ হলো, তারা চায় আজ পর্যন্ত তারা পৃথিবীতে যেরূপ লাগামহীন জীবন যাপন করে এসেছে ভবিষ্যতেও ঠিক তেমনি করতে পারে। আজ পর্যন্ত তারা যে ধরনের জুলুম-অত্যাচার, বেঈমানী, পাপাচার ও দুষ্কর্ম করে এসেছে ভবিষ্যতেও তা করার অবাধ স্বাধীনতা যেন তাদের থাকে। এভাবে সে অসৎকাজ করতেই থাকে, সৎপথে ফিরে আসতে চায় না। [মুয়াসসার, ফাতহুল কাদীর] কোন কোন মুফাসসির বলেন, আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে, "বরং সে তার সম্মুখস্থ বস্তু অর্থাৎ কিয়ামতকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করতে চায়।" কারণ, এর পরই বলা হয়েছে, "সে প্রশ্ন করে কখন কিয়ামত আসবে"। এ তাফসীরটি ইবনে কাসীর প্রাধান্য দিয়েছেন।

يَسۡـَٔلُ اَيَّانَ يَوۡمُ الۡقِيٰمَةِ ۝٦

৬. সে প্রশ্ন করে, 'কখন কিয়ামতের দিন আসবে?'

فَاِذَا بَرِقَ الۡبَصَرُ ۝٧

৭. যখন চোখ স্থির হয়ে যাবে[১],

وَخَسَفَ الۡقَمَرُ ۝٨

৮. এবং চাঁদ হয়ে পড়বে কিরণহীন[২],

وَجُمِعَ الشَّمۡسُ وَالۡقَمَرُ ۝٩

৯. আর যখন সূর্য ও চাঁদকে একত্র করা হবে[৩]–

يَقُوۡلُ الۡاِنۡسَانُ يَوۡمَئِذٍ اَيۡنَ الۡمَفَرُّ ۝١٠

১০. সে-দিন মানুষ বলবে, 'আজ পালাবার স্থান কোথায়?'

كَلَّا لَا وَزَرَ ۝١١

১১. কখনোই নয়, কোন আশ্রয়স্থল নেই।

اِلٰى رَبِّكَ يَوۡمَئِذِ ۣالۡمُسۡتَقَرُّ ۝١٢

১২. সেদিন ঠাঁই হবে আপনার রবেরই কাছে।

يُنَبَّؤُا الۡاِنۡسَانُ يَوۡمَئِذٍۭ بِمَا قَدَّمَ وَاَخَّرَ ۝١٣

১৩. সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে সে কী আগে পাঠিয়েছে ও কী পিছনে রেখে গেছে[৪]।

---

(১) برق এর আভিধানিক অর্থ হলো বিদ্যুতের ঝলকে চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়া। কিন্তু প্রচলিত আরবী বাকরীতিতে কথাটি শুধু এ একটি অর্থ জ্ঞাপকই নয়। বরং ভীতি-বিহবলতা, বিস্ময় অথবা কোন দুর্ঘটনার আকস্মিকতায় যদি কেউ হতবুদ্ধি হয়ে যায় এবং সে ভীতিকর দৃশ্যের প্রতি তার চক্ষু স্থির-নিবদ্ধ হয়ে যায় যা সে দেখতে পাচ্ছে তাহলে এ অবস্থা বুঝাতেও একথাটি বলা হয়ে থাকে। [দেখুন, ইবন কাসীর] একথাটিই কুরআন মাজীদের আরেক জায়গায় এভাবে বলা হয়েছে, "আল্লাহ তো তাদের অবকাশ দিচ্ছেন সেদিন পর্যন্ত যেদিন চক্ষুসমূহ স্থির হয়ে যাবে।"

(২) এখানে কেয়ামতের পরিস্থিতি বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ যখন চক্ষুতে ধাঁধা লেগে গেল– কেয়ামতের দিন সবার দৃষ্টিতে ধাঁধা লেগে যাবে। ফলে চক্ষু স্থির কোন বস্তু দেখতে পারবে না এবং চন্দ্র জ্যোতিহীন হয়ে যাবে। [ইবন কাসীর] তাছাড়া আরেকটি অনুবাদ হচ্ছে, চন্দ্র গায়েব হয়ে যাবে, চন্দ্র বলতে কিছু আর থাকবে না। [কুরতুবী]

(৩) চাঁদের আলোহীন হয়ে যাওয়া এবং চাঁদ ও সূর্যের পরস্পর একাকার হয়ে যাওয়ার অর্থ, মুজাহিদ বলেন, দু'টিকে একত্রে পেঁচানো হবে। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(৪) মূল বাক্যটি হলো ﴿بِمَا قَدَّمَ وَاَخَّرَ﴾ অর্থাৎ মানুষকে সেদিন অবহিত করা হবে যা সে অগ্রে প্রেরণ করেছে ও পশ্চাতে ছেড়ে এসেছে। এটা একটা ব্যাপক অর্থব্যঞ্জক

১৪. বরং মানুষ নিজের সম্পর্কে সম্যক অবগত[১], | بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ﴿١٤﴾

১৫. যদিও সে নানা অজুহাতের অবতারণা করে। | وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ ﴿١٥﴾

বাক্য। এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে এবং সম্ভবত সবগুলোই এখানে প্রযোজ্য। এর একটি অর্থ হলো, দুনিয়ার জীবনে মানুষ মৃত্যুর পূর্বে কি কি নেক কাজ বা বদ কাজ করে আখেরাতের জন্য অগ্রিম পাঠিয়ে দিয়েছিল সেদিন তাকে তা জানিয়ে দেয়া হবে। আর দুনিয়াতে সে নিজের ভাল এবং মন্দ কাজের কি ধরনের প্রভাব সৃষ্টি করে এসেছিল যা তার দুনিয়া ছেড়ে চলে আসার পরও পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত চলেছিল সে হিসেবও তার সামনে পেশ করা হবে। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম বলেন, মানুষ মৃত্যুর পূর্বে যে সৎকাজ করে নেয়, তা সে অগ্রে প্রেরণ করে এবং যে সৎ অথবা অসৎ, উপকারী অথবা অপকারী কাজ ও প্রথা এমন ছেড়ে যায়, যা তার মৃত্যুর পর মানুষ বাস্তবায়িত করে, তা সে পশ্চাতে রেখে আসে। (এর সওয়াব অথবা শাস্তি সে পেতে থাকবে।) [দেখুন, বাগাভী; কুরতুবী] দ্বিতীয় অর্থ হলো, যেসব কাজ সে আগে করেছে এবং যেসব কাজ সে পরে করেছে দিন তারিখ সহ তার পুরো হিসেব তার সামনে পেশ করা হবে। কাতাদা রাহেমাহুল্লাহ বলেন, قدّم বলে এমন সৎকাজ বোঝানো হয়েছে, যা মানুষ জীবদ্দশায় করে নেয় এবং أخّر বলে এমন সৎকাজ বোঝানো হয়েছে, যা সে করতে পারত, কিন্তু করেনি এবং সুযোগ নষ্ট করে দিয়েছে। [কুরতুবী]

(১) আয়াতে بصيرة শব্দটির অর্থ যদি 'চক্ষুষ্মান' ধরা হয়, তখন আয়াতের অর্থ এই যে, যদিও ন্যায়বিচারের বিধি অনুযায়ী মানুষকে তার প্রত্যেকটি কর্ম সম্পর্কে হাশরের মাঠে অবহিত করা হবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর প্রয়োজন নেই। কেননা, মানুষ তার কর্ম সম্পর্কে খুব জ্ঞাত। সে কি করেছে, তা সে নিজেই জানে। তাই আখেরাতের আদালতে হাজির করার সময় প্রত্যেক কাফের, মুনাফিক, পাপী ও অপরাধী নিজেই বুঝতে পারবে যে, সে কি কাজ করে এসেছে এবং কোন অবস্থায় নিজ প্রভুর সামনে দাঁড়িয়ে আছে; সে যতই অস্বীকার করুক বা ওযর পেশ করুক। [ইবন কাসীর] এছাড়া হাশরের মাঠে প্রত্যেকে তার সৎ কর্ম স্বচক্ষে দেখতেও পাবে। অন্য আয়াতে আছে ﴿وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا﴾ অর্থাৎ "দুনিয়াতে মানুষ যা করেছে, হাশরের মাঠে তাকে উপস্থিত পাবে" [সূরা আল-কাহাফ: ৪৯] সুতরাং তারা তা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করবে। এখানে মানুষকে নিজের সম্পর্কে চক্ষুষ্মান বলার অর্থ তাই।

পক্ষান্তরে যদি بصيرة শব্দের অর্থ 'প্রমাণ' হয় তখন আয়াতের অর্থ হবে এই যে, মানুষ নিজেই নিজের সম্পর্কে প্রমাণস্বরূপ হবে। সে অস্বীকার করলেও তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বীকার করবে। [দেখুন, কুরতুবী]

১৬. তাড়াতাড়ি ওহী আয়ত্ত করার জন্য আপনি তা নিয়ে আপনার জিহ্‌বাকে দ্রুত সঞ্চালন করবেন না।

لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ ﴿١٦﴾

১৭. নিশ্চয় এর সংরক্ষণ ও পাঠ করাবার দায়িত্ব আমাদেরই।

اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ ﴿١٧﴾

১৮. কাজেই যখন আমরা তা পাঠ করি আপনি সে পাঠের অনুসরণ করুন,

فَاِذَا قَرَاْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ ﴿١٨﴾

১৯. তারপর তার বর্ণনার দায়িত্ব নিশ্চিতভাবে আমাদেরই[১]।

ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهٗ ﴿١٩﴾

---

(১) এ আয়াতসমূহে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে একটি বিশেষ নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যা ওহী নাযিল হওয়ার সময় অবতীর্ণ আয়াতগুলো সম্পর্কিত। নির্দেশ এই যে, যখন জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম কুরআনের কিছু আয়াত নিয়ে আগমন করতেন, তখন তা পাঠ করার সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বিবিধ চিন্তায় জড়িত হয়ে পড়তেন যেন কোথায়ও এর শ্রবণ ও তদনুযায়ী পাঠে কোন পার্থক্য না হয়ে যায় বা কোথাও এর কোন অংশ, কোন বাক্য স্মৃতি থেকে উধাও না হয়ে যায়। এই চিন্তার কারণে যখন জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম কোন আয়াত শোনাতেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাথে সাথে পাঠ করতেন এবং জিহবা নেড়ে দ্রুত আবৃত্তি করতেন, যাতে বার বার পড়ে তা মুখস্থ করে নেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এই পরিশ্রম ও কষ্ট দূর করার উদ্দেশ্যে এ আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা কুরআন পাঠ করানো, মুখস্থ করানো ও মুসলিমদের কাছে হুবহু পেশ করানোর দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–কে বলে দিয়েছেন যে, আপনি এই উদ্দেশ্যে জিহবাকে দ্রুত নাড়া দেয়ার কষ্ট করবেন না। আয়াতসমুহকে আপনার অন্তরে সংরক্ষণ করা এবং হুবহু আপনার দ্বারা পাঠ করিয়ে দেয়া আমার দায়িত্ব। কাজেই আপনি এ চিন্তা পরিত্যাগ করুন। সুতরাং যখন আমি অর্থাৎ আমার পক্ষ থেকে জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম কুরআন পাঠ করে, তখন আপনি সাথে সাথে পাঠ করবেন না; বরং চুপ করে শুনবেন এবং আমার পাঠের পর পাঠ করবেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাই করতেন। তিনি জিবরাঈল থেকে শুনতেন তারপর জিবরাঈল চলে গেলে তা অনুরূপ পড়তেন যেমন জিবরাঈল পড়েছেন। [দেখুন, বুখারী: ৫, মুসলিম, ৪৪৮] এখানে কুরআন অনুসরণ করান মানে চুপ করে জিবরাঈলের পাঠ শ্রবণ করা। অবশেষে বলা হয়েছে আপনি এ চিন্তাও করবেন না যে, অবতীর্ণ আয়াতসমূহের সঠিক মর্ম ও উদ্দেশ্য কি? এটা বুঝিয়ে দেয়াও আমার দায়িত্ব। আমি কুরআনের প্রতিটি শব্দ ও তার উদ্দেশ্য আপনার কাছে ফুটিয়ে তুলব। [দেখুন, ইবন কাসীর]

كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ﴿٢٠﴾

২০. কখনো না, বরং তোমরা দুনিয়ার জীবনকে ভালবাস;

وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ﴿٢١﴾

২১. আর তোমরা আখেরাতকে উপেক্ষা কর[১] ।

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ﴿٢٢﴾

২২. সেদিন কোন কোন মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে,

إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾

২৩. তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে[২] ।

---

(১) অর্থাৎ মানুষ আখেরাত অস্বীকার করে কারণ তারা সংকীর্ণমনা ও স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন; তাই তাদের দৃষ্টি কেবল এ দুনিয়ার ফলাফলের প্রতি নিবদ্ধ থাকে । আর আখেরাতে যে ফলাফলের প্রকাশ ঘটবে তাকে তারা আদৌ কোন গুরুত্ব দেয় না । তারা মনে করে, যে স্বার্থ বা ভোগের উপকরণ বা আনন্দ এখানে লাভ করা সম্ভব তারই অন্বেষণে সবটুকু পরিশ্রম করা এবং প্রচেষ্টা চালানো উচিত, এভাবে তারা দুনিয়াকে চিরস্থায়ী মনে করে । [ইবন কাসীর; মুয়াস্‌সার]

(২) অর্থাৎ সেদিন কিছু মুখমন্ডল হাসি-খুশী ও সজীব হবে এবং তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে । এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আখেরাতে জান্নাতীগণ স্বচক্ষে আল্লাহ তা'আলার দীদার (দর্শন) লাভ করবে । আহলে সুন্নাত-ওয়াল-জামা'আতের সকল আলেম ও ফেকাহবিদ এ বিষয়ে একমত । বহু সংখ্যক হাদীসে এর যে ব্যাখ্যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে তাহলো, আখেরাতে আল্লাহর নেক্‌কার বান্দাদের আল্লাহর সাক্ষাত লাভের সৌভাগ্য হবে । এক হাদীসে এসেছে, "তোমরা প্রকাশ্যে সুস্পষ্টভাবে তোমাদের রবকে দেখতে পাবে" [বুখারী: ৭৪৩৫, ৫৫৪, ৪৭৩, ৪৮৫১,৭৪৩৪,৭৪৩৬] অন্য হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বেহশতবাসীরা বেহেশতে প্রবেশ করার পর আল্লাহ তা'আলা তাদের জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা কি চাও যে, আমি তোমাদের আরো কিছু দান করি? তারা আরয করবে, আপনি কি আমাদের চেহারা দীপ্তিময় করেননি? আপনি কি আমাদের জান্নাতে প্রবেশ করাননি এবং জাহান্নাম থেকে রক্ষা করেননি? তখন আল্লাহ তা'আলা পর্দা সরিয়ে দেবেন । ইতিপুর্বে তারা যেসব পুরস্কার লাভ করেছে তার কোনটিই তাদের কাছে তাদের 'রবের' সাক্ষাতলাভের সম্মান ও সৌভাগ্য থেকে অধিক প্রিয় হবে না । এটিই হচ্ছে সে অতিরিক্ত পুরস্কার যার কথা কুরআনে এভাবে বলা হয়েছে, অর্থাৎ "যারা নেক কাজ করেছে তাদের জন্য উত্তম পুরস্কার রয়েছে । আর এ ছাড়া অতিরিক্ত পুরস্কারও রয়েছে ।" (সূরা ইউনুস: ২৬) [মুসলিম: ১৮১, তিরমিযী: ২৫৫২, মুসনাদে আহমাদ: ৪/৩৩৩] অন্য হাদীসে এসেছে, সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা কি কিয়ামতের দিন আমাদের রবকে

وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ﴿٢٤﴾

২৪. আর কোন কোন মুখমণ্ডল হয়ে পড়বে বিবর্ণ,

تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴿٢٥﴾

২৫. আশংকা করবে যে, এক ধ্বংসকারী বিপর্যয় তাদের উপর আপতিত হবে।

كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ﴿٢٦﴾

২৬. অবশ্যই[১], যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হবে,

وَقِيلَ مَنْ ۜ رَاقٍ ﴿٢٧﴾

২৭. এবং বলা হবে, 'কে তাকে রক্ষা করবে?'

وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ﴿٢٨﴾

২৮. তখন তার প্রত্যয় হবে যে, এটা বিদায়ক্ষণ।

وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿٢٩﴾

২৯. আর পায়ের গোছার সঙ্গে পায়ের গোছা জড়িয়ে যাবে[২]।

দেখতে পাবো? জবাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যখন মেঘের আড়াল থাকে না তখন সূর্য ও চাঁদকে দেখতে তোমাদের কি কোন কষ্ট হয়? সবাই বলল, না। তিনি বললেন, তোমরা তোমাদের রবকে এরকমই স্পষ্ট দেখতে পাবে। [বুখারী: ৭৪৩৭, মুসলিম: ১৮২] এ সমস্ত হাদীস এবং অন্য আরো বহু হাদীসের ভিত্তিতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অনুসারীগণ প্রায় সর্বসম্মতভাবেই এ আয়াতের যে অর্থ করেন তাহলো, জান্নাতবাসীগণ আখেরাতে মহান আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হবে। কুরআন মজীদের এ আয়াত থেকেও তার সমর্থন পাওয়া যায়। "কক্ষনো নয়, তারা (অর্থাৎ পাপীগণ)" সেদিন তাদের রবের সাক্ষাৎ থেকে বঞ্চিত হবে। [সূরা আল-মুতাফ্‌ফিফীন: ১৫] এ থেকে স্বতই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, এ বঞ্চনা হবে পাপীদের জন্য নেক্‌কারদের জন্য নয়। [দেখুন, ইবন কাসীর]

(১) এখানে كلا শব্দ দ্বারা 'অবশ্যই' অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে। [মুয়াস্‌সার]

(২) ساق এর প্রসিদ্ধ অর্থ পায়ের গোছা। গোছার সাথে জড়িয়ে পড়ার এক অর্থ এই যে, তখন অস্থিরতার কারণে এক গোছা দ্বারা অন্য গোছার উপর আঘাত করবে। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, দুর্বলতার আতিশয্যে এক পা অপর পায়ের উপর থাকলে তা সরাতে চাইলেও সক্ষম হবে না। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, তখন হবে দুনিয়ার শেষ দিন এবং আখেরাতের প্রথম দিনের সম্মিলন। তাই মানুষ দুনিয়ার শেষ দিন এবং আখেরাতের বিরহ-বেদনা এবং আখেরাতে কি হবে না হবে তার চিন্তায় পেরেশান থাকবে। অর্থাৎ সে সময় দু'টি বিপদ একসাথে এসে হাজির হবে। একটি এ পৃথিবী এবং এর সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার বিপদ। আরেকটি, একজন

৩০. সেদিন আপনার রবের কাছেই সকলকে হাঁকিয়ে নেয়া হবে।

إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ۝٣٠

দ্বিতীয় রুকূ'

৩১. সুতরাং সে বিশ্বাস করে নি এবং সালাতও আদায় করে নি।

فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ ۝٣١

৩২. বরং সে মিথ্যারোপ করেছিল এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।

وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۝٣٢

৩৩. তারপর সে তার পরিবার পরিজনের কাছে চলে গিয়েছিল অহংকার করে,

ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ ۝٣٣

৩৪. দুর্ভোগ তোমার জন্য, দুর্ভোগ!

أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ۝٣٤

৩৫. আবার দুর্ভোগ তোমার জন্য, দুর্ভোগ[১]!

ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ۝٣٥

৩৬. মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে[২]?

أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى ۝٣٦

অপরাধী হিসেবে গ্রেফতার হয়ে আখেরাতের জীবনে যাওয়ার বিপদ যার মুখোমুখি হতে হবে প্রত্যেক কাফের মুনাফিক এবং পাপীকে। [দেখুন, ইবন কাসীর]

(১) أولى অর্থ ধ্বংস, দুর্ভোগ। সর্বনাশ হোক তোমার! মন্দ, ধ্বংস এবং দুর্ভাগ্য হোক তোমার! এখানে কাফিরদেরকে খুবই মারাত্মকভাবে সাবধান করে দেয়া হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর] ইবন কাসীর বলেন: এটি একটি শ্লেষ বাক্যও হতে পারে। কুরআন মজীদের আরো এক জায়াগায় এ ধরনের বাক্য প্রয়োগ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, জাহান্নামে আযাব দেয়ার সময় পাপী লোকদের বলা হবেঃ "নাও, এর মজা আস্বাধন করে নাও। তুমি অতি বড় সম্মানী মানুষ কিনা।" [সূরা আদ-দুখান: ৪৯]

(২) আয়াতের অর্থ হলো, মানুষ কি নিজেকে মনে করে যে তার স্রষ্টা তাকে এ পৃথিবীতে দায়িত্বহীন করে ছেড়ে দিয়েছেন? এ-কথাটিই কুরআন মজীদের অন্য একস্থানে এভাবে বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের বলবেন, "তোমরা কি মনে করেছো যে, আমি তোমাদের অনর্থক সৃষ্টি করেছি? তোমাদেরকে কখনো আমার কাছে ফিরে আসতে হবে না?" [সূরা আল মুমিনূন: ১১৫] এ দু'টি স্থানে মৃত্যুর পরের জীবনের অনিবার্যতার প্রমাণ প্রশ্নের আকারে পেশ করা হয়েছে। প্রশ্নের তাৎপর্য হলো আখেরাত যে অবশ্যই হবে তার প্রমাণ। [দেখুন, ইবন কাসীর]

৩৭. সে কি বীর্যের স্খলিত শুক্রবিন্দু ছিল না?

أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ﴿٣٧﴾

৩৮. তারপর সে 'আলাকা'য় পরিণত হয়। অতঃপর আল্লাহ্ তাকে সৃষ্টি করেন এবং সুঠাম করেন।

ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴿٣٨﴾

৩৯. অতঃপর তিনি তা থেকে সৃষ্টি করেন যুগল---নর ও নারী।

فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٣٩﴾

৪০. তবুও কি সে স্রষ্টা মৃতকে পুনর্জীবিত করতে সক্ষম নন[১]?

أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ﴿٤٠﴾

---

(১) এক বর্ণনায় এসেছে, সাহাবীগণের একজন তার ঘরের ছাদে সালাত আদায় করত; যখনই সূরা আল-কিয়ামাহ এর এ আয়াতে পৌঁছত তখনই সে বলত: "পবিত্র ও মহান তুমি, অবশ্যই হ্যাঁ", লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে তা শুনেছি।" [আবু দাউদ: ৮৮৪]

৭৬- সূরা আদ-দাহ্‌র[১]
৩১ আয়াত, মাদানী, মতান্তরে মক্কী

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

১. কালপ্রবাহে মানুষের উপর কি এমন এক সময় আসে নি[২] যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না[৩]?

هَلۡ أَتَىٰ عَلَى ٱلۡإِنسَٰنِ حِينٞ مِّنَ ٱلدَّهۡرِ لَمۡ يَكُن شَيۡـٔٗا مَّذۡكُورًا ١

২. আমরা তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্রবিন্দু থেকে[৪], আমরা

إِنَّا خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ مِن نُّطۡفَةٍ أَمۡشَاجٖ نَّبۡتَلِيهِ

(১) সূরা 'আল-ইনসান' এর অপর নাম সূরা আদ্‌-দাহর। সাহাবায়ে কিরাম সূরাটিকে সূরা 'হাল আতা আলাল ইনসান' বলতেন। [দেখুন, বুখারী: ৮৮০; মুসলিম: ৮৭৯] এতে মানব সৃষ্টির আদি-অন্ত, কর্মের প্রতিদান ও শাস্তি, কেয়ামত জান্নাত ও জাহান্নামের বিশেষ বিশেষ অবস্থার উপর বিশুদ্ধ ও সাবলীল ভঙ্গিতে আলোকপাত করা হয়েছে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুক্রবার দিন ফজরের সালাতে "সূরা আলিফ লাম মীম তানযীল আস-সাজদাহ" এবং "হাল আতা আলাল ইনসান" সূরা পড়তেন। [বুখারী: ৮৯১, মুসলিম: ৮৮০, ৮৭৯]

(২) هل অব্যয়টি আসলে প্রশ্নবোধকরূপে ব্যবহৃত হয়। মাঝে মাঝে কোন জাজ্বল্যমান ও প্রকাশ্য বিষয়কে প্রশ্নের আকারে ব্যক্ত করা যায়, যাতে তার প্রকাশ্যতা আরও জোরদার হয়ে যায়। [ফাতহুল কাদীর] উদ্দেশ্য এই যে, যাকেই জিজ্ঞাসা করবে, সে এ উত্তরই দিবে, অপর কোন সম্ভাবনাই নেই।

(৩) আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের উপর এমন দীর্ঘ এক সময় অতিবাহিত হয়েছে, যখন পৃথিবীতে তার নাম-নিশানা এমন কি, আলোচনা পর্যন্ত ছিল না। আয়াতে বর্ণিত "যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না" এর অর্থ বর্ণনায় কয়েকটি মত রয়েছে, এক. এখানে মানবসৃষ্টির পূর্বের অবস্থা ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ এ অন্তহীন মহাকালের মধ্যে একটি দীর্ঘ সময় তো এমন অতিবাহিত হয়েছে যখন মানব প্রজাতির আদৌ কোন অস্তিত্ব ছিল না। তারপর মহাকাল প্রবাহে এমন একটি সময় আসল যখন মানুষ নামের একটি প্রজাতির সূচনা করা হল। [কুরতুবী] দুই. সে একটি ধড় ছিল যার কোন নাম-নিশানা ছিল না। পরবর্তীতে রূহ এর মাধ্যমে তাকে স্মরণীয় করা হয়েছে। [বাগভী; কুরতুবী]

(৪) এখানে মানব সৃষ্টির সূচনা এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, আমি মানুষকে মিশ্র বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছি। বলাবাহুল্য এখানে নর ও নারীর মিশ্র বীর্য বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ মানুষের সৃষ্টি পুরুষ ও নারীর দু'টি আলাদা বীর্য দ্বারা হয়নি। বরং দু'টি বীর্য সংমিশ্রিত হয়ে যখন একটি হয়ে গিয়েছে তখন সে সংমিশ্রিত বীর্য থেকে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে।

তাকে পরীক্ষা করব[১]; তাই আমরা তাকে করেছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন[২] ।

فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ۝٢

৩. নিশ্চয় আমরা তাকে পথ নির্দেশ দিয়েছি, হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় সে অকৃতজ্ঞ হবে[৩] ।

اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا ۝٣

৪. নিশ্চয় আমরা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি শেকল, গলার বেড়ি ও লেলিহান আগুন[৪] ।

اِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَلٰسِلَاۡ وَاَغْلٰلًا وَّسَعِيْرًا ۝٤

অধিকাংশ তফসীরবিদ তাই বলেছেন। [বাগভী; কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(১) এই বাক্যে মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও রহস্য বিধৃত হয়েছে। অর্থাৎ মানুষকে এভাবে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য তাকে পরীক্ষা করা। [কুরতুবী] এটাই হলো দুনিয়ায় মানুষের এবং মানুষের জন্য দুনিয়ার প্রকৃত অবস্থান ও মর্যাদা।

(২) বলা হয়েছে ‘আমরা তাকে বানিয়েছি শ্রবণশক্তি ও ‘দৃষ্টিশক্তির অধিকারী’ । বিবেকবুদ্ধির অধিকারী করেছি বললে এর সঠিক অর্থ প্রকাশ পায়। আল্লাহ্ তা‘আলা তাকে জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধির শক্তি দিয়েছেন যাতে সে পরীক্ষা দেয়ার উপযুক্ত হতে পারে। [কুরতুবী]

(৩) এ আয়াত পূর্বের আয়াতে বর্ণিত পরীক্ষার ফলে মানুষের কি অবস্থা হয়েছে তা বিধৃত হয়েছে। বলা হয়েছে, আমি রাসূল ও আসমানী গ্রন্থের মাধ্যমে তাকে পথ বলে দিয়েছি যে, এই পথ জান্নাতের দিকে এবং ঐ পথ জাহান্নামের দিকে যায়। এরপর তাকে ক্ষমতা দিয়েছি যে কোন পথ অবলম্বন করার। সুতরাং আমি তাকে শুধু জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধি দিয়েই ছেড়ে দেইনি। বরং এগুলো দেয়ার সাথে সাথে তাকে পথও দেখিয়েছি যাতে সে জানতে পারে শোকরিয়ার পথ কোন্‌টি এবং কুফরীর পথ কোন্‌টি। এরপর যে পথই সে অবলম্বন করুক না কেন তার জন্য সে নিজেই দায়ী। এ বিষয়টিই অন্যত্র এভাবে বলা হয়েছে, “আমরা তাকে দু’টি পথ (অর্থাৎ ভাল ও মন্দ পথ) স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিয়েছি।” [সূরা আল-বালাদ: ১০] অন্যত্র বলা হয়েছে এভাবে, “শপথ (মানুষের) প্রবৃত্তির আর সে সত্তার যিনি তাকে (সব রকম বাহ্যিক) ও আভ্যন্তরীণ শক্তি দিয়ে শক্তিশালী করেছেন। আর পাপাচার ও তাকওয়া-পরহেজগারীর অনুভূতি দু’টোই তার ওপর ইলহাম করেছেন।” [সূরা আশ-শামস: ৭-৮]

(৪) এখান থেকে উপরোক্ত আয়াতসমূহে বর্ণিত দু’টি শ্রেণীর প্রতিফল ও পরিণাম উল্লেখ

৫. নিশ্চয় সৎকর্মশীলেরা[১] পান করবে এমন পূর্ণপাত্র-পানীয় থেকে যার মিশ্রণ হবে কাফূর[২]---

إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴿٥﴾

৬. এমন একটি প্রস্রবণ যা থেকে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ[৩] পান করবে, তারা এ প্রস্রবণকে যথেচ্ছা প্রবাহিত করবে[৪] ।

عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴿٦﴾

৭. তারা মানত পূর্ণ করে[৫] এবং সে

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ

করা হয়েছে যে, তাদের মধ্যকার কাফেরদের জন্যে রয়েছে শিকল, বেড়ি ও জাহান্নাম । আর ঈমান ও ইবাদত পালনকারীদের জন্যে রয়েছে অফুরন্ত নেয়ামত । [কুরতুবী]

(১) তারা এমন সব মানুষ যারা পুরোপুরি তাদের রবের আনুগত্য করেছে, তাঁর পক্ষ থেকে অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ পালন করেছে এবং তাঁর পক্ষ থেকে নিষিদ্ধ কাজসমূহ থেকে বিরত রয়েছে । [কুরতুবী]

(২) সর্বপ্রথম পানীয় বস্তুর উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাদেরকে এমন শরাবের পাত্র দেয়া হবে, যাতে কাফুরের মিশ্রণ থাকবে । অর্থাৎ তা হবে এমন একটি প্রাকৃতিক ঝর্ণাধারা যার পানি হবে স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন এবং শীতল আর তার খোশবু হবে অনেকটা কর্পূরের মত । কোন কোন তফসীরকারক বলেনঃ কাফুর জান্নাতের একটি ঝরণার নাম । এই শরাবের স্বাদ ও গুণ বৃদ্ধি করার জন্যে তাতে এই ঝরণার পানি মিলানো হবে । যদি কাফুরের প্রসিদ্ধ অর্থ নেয়া হয়, তবে জরুরী নয় যে, জান্নাতের কাফুর দুনিয়ার কাফুরের ন্যায় অখাদ্য হবে । বরং সেই কাফুরের বৈশিষ্ট্য ভিন্ন হবে ।[দেখুন, কুরতুবী; ইবন কাসীর]

(৩) 'আল্লাহর বান্দাগণ' কিংবা 'রাহমানের বান্দাগণ' শব্দগুলো আভিধানিক অর্থে সমস্ত মানুষের জন্যই ব্যবহৃত হতে পারে । কারণ সবাই আল্লাহর বান্দা । কিন্তু তা সত্ত্বেও কুরআন মজীদে যেখানেই এ ধরনের শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তার দ্বারা আল্লাহর নেক্‌কার বান্দাগণকেই বুঝানো হয়েছে । অসৎলোক, যারা নিজেরাই নিজেদেরকে আল্লাহর বন্দেগী তথা দাসত্বের বাইরে রেখেছে, তারা যেন এর যোগ্য-ই নয় যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে নিজের মহান নামের সাথে যুক্ত করে অথবা এর মত সম্মানিত উপাধিতে ভূষিত করবেন ।

(৪) অর্থাৎ জান্নাতের মধ্যে যেখানেই তারা চাইবে সেখানেই এ ঝর্ণা বইতে থাকবে । এ জন্য তাদের নির্দেশ বা ইংগিতই যথেষ্ট হবে । [ইবন কাসীর]

(৫) এতে বিধৃত হয়েছে যে, সৎকর্মশীল বান্দাগণকে এসব নেয়ামত কিসের ভিত্তিতে

مُسْتَطِيْرًا ۝

দিনের ভয় করে, যে দিনের অকল্যাণ হবে ব্যাপক।

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا ۝

৮. আর তারা মহব্বত থাকা সাপেক্ষে[১] অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীকে[২] খাবার দান করে[৩],

---

দেয়া হবে। অর্থাৎ তারা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে যে কাজের মানত করে, তা পূর্ণ করে। 'মানত' বলা হয় নিজের জন্যে এমন কোন কাজ ওয়াজিব করে নেয়া, যা শরীয়তের তরফ থেকে তার দায়িত্বে ওয়াজিব নয়। এরূপ মানত পূর্ণ করা শরীয়তের আইনে ওয়াজিব। [কুরতুবী] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "তোমাদের কেউ যদি আল্লাহ্‌র আনুগত্য করার মানত করে সে যেন তা পূর্ণ করে, আর কেউ যদি নাফরমানির মানত করে সে যেন নাফরমানি না করে।" [বুখারী: ৬৭০০] এখানে মানত পূর্ণ করাকে জান্নাতীদের মহান প্রতিদান ও অফুরন্ত নেয়ামত লাভের কারণ সাব্যস্ত করা হয়েছে। তবে কাতাদাহ রাহেমাহুল্লাহ বলেন, এখানে نذر শব্দ দ্বারা 'কর্তব্য' বোঝানো হয়েছে। তখন অর্থ হবে, তারাই জান্নাতের অধিকারী হবে যারা নিজেদের কর্তব্য যেমন সালাত, সাওম, হজ, উমরা ইত্যাদি যথাযথভাবে পালন করেছে। [কুরতুবী; ইবন কাসীর]

(১) অর্থাৎ জান্নাতীদের এসব নেয়ামত এ কারণেও যে, তারা দুনিয়াতে অভাবগ্রস্ত, এতীম ও বন্দীদেরকে আহার্য দান করত। অধিকাংশ তাফসীরকারকের মতে, এখানে حبه এর সর্বনাম দ্বারা طعام বা খাবার উদ্দেশ্য। অর্থাৎ খাদ্য অত্যন্ত প্রিয় ও আকর্ষণীয় হওয়া সত্ত্বেও এবং নিজেরাই খাদ্যের মুখাপেক্ষী হওয়া সত্ত্বেও নেক্‌কার লোকেরা তা অন্যদেরকে খাওয়ান। আবু সুলাইমান আদ-দারানী বলেন, حبه এর সর্বনাম দ্বারা الله তা'আলাকেই উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। অর্থাৎ তারা আল্লাহ তা'আলার মহব্বতে এরূপ করে থাকে। পরবর্তী আয়াতাংশ 'আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যেই তোমাদের খাওয়াচ্ছি' এ অর্থকেই সমর্থন করে। [কুরতুবী; ইবন কাসীর]

(২) এ আয়াতে বন্দী বলতে কাফের হোক বা মুসলিম, যুদ্ধবন্দী হোক বা অপরাধের কারণে বন্দী হোক সব রকম বন্দীকে বুঝানো হয়েছে। বন্দী অবস্থায় তাদেরকে খাদ্য দেয়া, মুসলিম কিংবা অমুসলিম, সর্বাবস্থায় একজন অসহায় মানুষকে -যে তার খাবার সংগ্রহের জন্য নিজে কোন চেষ্টা করতে পারে না- খাবার দেয়া অতি বড় সওয়াবের কাজ। [দেখুন, কুরতুবী]

(৩) কোন গরীবকে খেতে দেয়া যদিও বড় নেকীর কাজ, কিন্তু কোন অভাবী মানুষের অন্যান্য অভাব পূরণ করাও একজন ক্ষুধার্ত মানুষকে খেতে দেয়ার মতই নেক কাজ। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "তোমরা কয়েদি মুক্ত কর, ক্ষুধার্তকে খাওয়াও এবং অসুস্থদের সুশ্রুষা কর"। [বুখারী: ৩০৪৬]

৯. এবং বলে, 'শুধু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদেরকে খাবার দান করি, আমরা তোমাদের কাছ থেকে প্রতিদান চাই না, কৃতজ্ঞতাও নয়(১)।

إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَآءً وَلَا شُكُورًا ⑨

১০. 'নিশ্চয় আমরা আশংকা করি আমাদের রবের কাছ থেকে এক ভীতিপ্রদ ভয়ংকর দিনের।'

إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ⑩

১১. পরিণামে আল্লাহ্‌ তাদেরকে রক্ষা করবেন সে দিনের অনিষ্ট হতে এবং তাদেরকে প্রদান করবেন হাস্যোজ্জ্বলতা ও উৎফুল্লতা(২)।

فَوَقَىٰهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّىٰهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ⑪

১২. আর তাদের সবরের(৩) পুরস্কারস্বরূপ

وَجَزَىٰهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ⑫

(১) গরীবদের খাবার দেয়ার সময় মুখে একথা বলতে হবে এমনটা জরুরী নয়। মনে মনেও একথা বলা যেতে পারে। আল্লাহর কাছে মুখে বলার যে মর্যাদা অন্তরে বলারও সে একই মর্যাদা। তবে একথা মুখে বলার উল্লেখ করা হয়েছে এ জন্য যে, যাকে সাহায্য করা হবে তাকে যেন নিশ্চিত করা যায় যে, আমরা তার কাছে কোন প্রকার কৃতজ্ঞতা অথবা বিনিময় চাই না, যাতে সে চিন্তামুক্ত হয়ে খাবার গ্রহণ করতে পারে। [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ চেহারার সজীবতা ও মনের আনন্দ। অন্য কথায় কিয়ামতের দিনের সমস্ত কঠোরতা ও ভয়াবহতা শুধু কাফেরদের জন্যই নির্দিষ্ট হবে। নেক্‌কার লোকেরা সেদিন কিয়ামতের সব রকম দুঃখ-কষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবে এবং আনন্দিত ও উৎফুল্ল হবে। একথাটিই অন্যত্র এভাবে বলা হয়েছে; "চরম হতবুদ্ধিকর সে অবস্থা তাদেরকে অস্থির ও বিহ্বল করবে না। ফেরেশতারা অগ্রসর হয়ে অত্যন্ত সম্মানের সাথে তাদের গ্রহণ করবে এবং বলবে এটা তোমাদের সেদিন যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেয়া হতো।" [সূরা আল-আম্বিয়া :১০৩] এ বিষয়টিই আরেক জায়গায় আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, "যে ব্যক্তি সৎকাজ নিয়ে আসবে সে তার তুলনায় অধিক উত্তম প্রতিদান লাভ করবে। এসব লোক সেদিনের ভয়াবহতা থেকেও নিরাপদ থাকবে।" [সূরা আন-নামল: ৮৯]

(৩) এখানে 'সবর' শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বরং প্রকৃতপক্ষে সৎকর্মশীল ঈমানদারগণের গোটা পার্থিব জীবনকেই 'সবর' বা ধৈর্যের জীবন বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। জ্ঞান হওয়ার বা ঈমান আনার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কোন

তিনি তাদেরকে প্রদান করবেন উদ্যান ও রেশমী বস্ত্র ।

১৩. সেখানে তারা হেলান দিয়ে আসীন থাকবে সুসজ্জিত আসনে, তারা সেখানে খুব গরম অথবা খুব শীত দেখবে না[১] ।

مُّتَّكِـِٔينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ ۖ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ﴿١٣﴾

১৪. আর তাদের উপর সন্নিহিত থাকবে গাছের ছায়া এবং তার ফলমূলের থোকাসমূহ সম্পূর্ণরূপে তাদের আয়ত্তাধীন করা হবে ।

وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَـٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا ﴿١٤﴾

১৫. আর তাদের উপর ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করা হবে রৌপ্যপাত্রে[২] এবং স্ফটিক-স্বচ্ছ পানপাত্রে---

وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِـَٔانِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا۠ ﴿١٥﴾

ব্যক্তির নিজের অবৈধ আশা আকাংখাকে অবদমিত করা, আল্লাহর নির্দিষ্ট সীমাসমূহ মেনে চলা, আল্লাহর নির্ধারিত ফরযসমূহ পালন করা, হারাম পন্থায় লাভ করা যায় এরূপ প্রতিটি স্বার্থ ও ভোগের উপকরণ পরিত্যাগ করা, ন্যায় ও সত্যপ্রীতির কারণে যে ক্ষতি মর্মবেদনা ও দুঃখ-কষ্ট এসে ঘিরে ধরে তা বরদাশত করা-এসবই আল্লাহর এ ওয়াদার ওপর আস্থা রেখে করা যে, এ সদাচরণের সুফল এ পৃথিবীতে নয় বরং মৃত্যুর পরে আরেকটি জীবনে পাওয়া যাবে । এটা এমন একটা কর্মপন্থা যা মুমিনের গোটা জীবনকেই সবরের জীবনে রূপান্তরিত করে । এটা সার্বক্ষণিক সবর, স্থায়ী সবর, সর্বাত্মক সবর এবং জীবনব্যাপী সবর । [দেখুন, সা'দী]

(১) কারণ খুব গরম ও খুব শীত তো জাহান্নাম থেকে নির্গত হয় । জান্নাতবাসীরা সেটা কোনক্রমেই পাবে না । হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "জাহান্নাম তার রবের কাছে অভিযোগ করল যে, হে রব! আমার একাংশ (গরম অংশ) অপর অংশ (ঠাণ্ডা অংশ)কে শেষ করে দিল । তখন তাকে দু'টি নিঃশ্বাস ফেলার অনুমতি দেয়া হলো । একটি শীতকালে অপরটি গ্রীষ্মকালে । সেটাই তা তোমরা কঠিন গরম আকারে গ্রীষ্মকালে পাও এবং কঠিন শীত আকারে শীতকালে অনুভব কর ।" [বুখারী: ৩২৬০, মুসলিম: ৬১৭]

(২) পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে যে, "তাদের সামনে সবসময় স্বর্ণপাত্রসমূহ পরিবেশিত হতে থাকবে ।" [সূরা আয-যুখরুফ: ৭১] এ থেকে জানা গেল যে, সেখানে কোন সময় স্বর্ণপাত্র এবং কোন সময় রৌপ্য পাত্র ব্যবহার করা হবে ।

১৬. রূপার স্ফটিক পাত্রে[১], তারা তা পরিমাণ করবে সম্পূর্ণ-পরিমিতভাবে[২] ।

قَوَارِيْرَاۡ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا ۝١٦

১৭. আর সেখানে তাদেরকে পান করানো হবে যান্‌জাবীল মিশ্রিত পূর্ণপাত্র-পানীয়[৩]

وَيُسْقَوْنَ فِيْهَا كَاْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيْلًا ۝١٧

১৮. জান্নাতের এমন এক প্রস্রবণের, যার নাম হবে সালসাবীল[৪] ।

عَيْنًا فِيْهَا تُسَمّٰى سَلْسَبِيْلًا ۝١٨

---

(১) দুনিয়ার রৌপ্য-পাত্র গাঢ় ও মোটা হয়ে থাকে-আয়নার মত স্বচ্ছ হয় না । পক্ষান্তরে কাঁচ নির্মিত পাত্র রৌপ্যের মত শুভ্র হয় না । উভয়ের মধ্যে বৈপরীত্য আছে, কিন্তু জান্নাতের বৈশিষ্ট্য এই যে, সেখানকার রৌপ্য আয়নার মত স্বচ্ছ হবে । ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ জান্নাতের সব বস্তুর নজীর দুনিয়াতেও পাওয়া যায় । তবে দুনিয়ার রৌপ্য নির্মিত গ্লাস ও পাত্রঃ জান্নাতের পাত্রের ন্যায় স্বচ্ছ নয় । [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার চাহিদা অনুপাতে পানপাত্র ভরে ভরে দেয়া হবে । তা তাদের চাহিদার চেয়ে কম হবে না আবার বেশীও হবে না । অন্য কথায়, জান্নাতের খাদেমরা এত সতর্ক এবং সুবিবেচক হবে যে, যাকে তারা পানপাত্র পরিবেশন করবে সে কি পরিমাণ শরাব পান করতে চায় সে সম্পর্কে তারা পুরোপুরি আন্দাজ করতে পারবে । এর আরেক অর্থ হতে পারে, জান্নাতীরা নিজেরাই তাদের ইচ্ছানুসারে যথাযথ পরিমাণ নির্ধারণ করে নিবে । [সা'দী]

(৩) যানজাবিল এর প্রসিদ্ধ অর্থ শুকনা আদা । কাতাদা বলেন, যানজাবিল বা আদা মিশ্রিত হবে । [আত-তাফসীরুস সহীহ] আরবরা শরাবে এর মিশ্রণ পছন্দ করত । তাই জান্নাতেও একে পছন্দ করা হয়েছে । মূলতঃ জান্নাতের বস্তু ও দুনিয়ার বস্তু নামেই কেবল অভিন্ন । বৈশিষ্ট্যে উভয়ের মধ্যে অনেক ব্যবধান । তাই দুনিয়ার আদার আলোকে জান্নাতের আদাকে বোঝার উপায় নেই । [ফাতহুল কাদীর] তবে মুজাহিদ বলেন, এখানে যানজাবিল বলে একটি ঝর্ণাধারাকেই বুঝানো হয়েছে, যা থেকে 'মুকাররাবীন' বা নৈকট্যবান ব্যক্তিগণ পান করবে । [ফাতহুল কাদীর]

(৪) অর্থাৎ তা হবে একটা প্রাকৃতিক ঝর্ণাধারা যার নাম হবে 'সালসাবীল' । এক হাদীসে এসেছে, জনৈক ইয়াহূদী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করল, যখন এ যমীন ও আসমান অন্য কোন যমীন ও আসমান দিয়ে পরিবর্তিত হবে তখন মানুষ কোথায় থাকবে? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তারা পুলসিরাতের নিকটে অন্ধকারে থাকবে । ইয়াহূদী আবার বলল, কারা সর্বপ্রথম পার হবে? রাসূল বললেন, দরিদ্র মুহাজিরগণ । ইয়াহূদী বলল, জান্নাতে প্রবেশের সময় তাদের উপঢৌকন কি? রাসূল বললেন, মাছের পেটের কলিজা, ইয়াহূদী বলল,

১৯. আর তাদের উপর প্রদক্ষিণ করবে চির কিশোরগণ, যখন আপনি তাদেরকে দেখবেন তখন মনে করবেন তারা যেন বিক্ষিপ্ত মুক্তা।

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ ۚ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا ﴿١٩﴾

২০. আর আপনি যখন সেখানে দেখবেন, দেখতে পাবেন স্বাচ্ছন্দ্য এবং বিশাল রাজ্য।

وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴿٢٠﴾

২১. তাদের আবরণ হবে সূক্ষ্ম সবুজ রেশম ও স্থূল রেশম, আর তারা অলংকৃত হবে রৌপ্য নির্মিত কংকনে[১], আর তাদের রব তাদেরকে পান করাবেন পবিত্র পানীয়।

عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ ۖ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴿٢١﴾

২২. 'নিশ্চয় এটা তোমাদের পুরস্কার; আর তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা ছিল প্রসংশাযোগ্য।

إِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا ﴿٢٢﴾

দ্বিতীয় রুকূ'

২৩. নিশ্চয় আমরা আপনার প্রতি কুরআন নাযিল করেছি ক্রমে ক্রমে।

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا ﴿٢٣﴾

২৪. কাজেই আপনি ধৈর্যের সাথে আপনার রবের নির্দেশের প্রতীক্ষা করুন এবং

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴿٢٤﴾

এরপর কি খাওয়ানো হবে? রাসূল বললেন, জান্নাতের একটি ষাঁড় তাদের জন্য জবাই করা হবে তারা তার অংশ থেকে খাবে। ইয়াহূদী বলল, তাদের পানীয় কি হবে? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, একটি ঝর্ণাধারা থেকে যার নাম হবে সালসাবীল"। [মুসলিম: ৩১৫]

(১) আয়াতে ব্যবহৃত أساور শব্দটি سوار এর বহুবচন অর্থ কংকন যা হাতে পরিধান করার অলংকারবিশেষ। এই আয়াতে রূপার কংকন এবং অন্য কয়েক আয়াতে স্বর্ণের কংকন উল্লেখ করা হয়েছে [যেমন সূরা আল-কাহফ: ৩১, আল-হাজ্জ:২৩, ফাতির: ৩৩]। উভয়ের মধ্যে বিরোধ নেই। কেননা কোন সময় রূপার এবং কোন সময় স্বর্ণের কংকন ব্যবহৃত হতে পারে। অথবা মনমতো কেউ রূপার এবং কেউ স্বর্ণের ব্যবহার করতে পারে। [ফাতহুল কাদীর]

তাদের মধ্য থেকে কোন পাপিষ্ঠ বা ঘোর অকৃতজ্ঞ কাফিরের আনুগত্য করবেন না ।

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ﴿٢٥﴾

২৫. আর আপনার রবের নাম স্মরণ করুন সকালে ও সন্ধ্যায় ।

وَمِنَ الَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهٗ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيْلًا ﴿٢٦﴾

২৬. আর রাতের কিছু অংশে তাঁর প্রতি সিজ্‌দাবনত হোন আর রাতের দীর্ঘ সময় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন ।

اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ يُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُوْنَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيْلًا ﴿٢٧﴾

২৭. নিশ্চয় তারা ভালোবাসে দুনিয়ার জীবনকে আর তারা তাদের সামনের কঠিন দিনকে উপেক্ষা করে চলে(১) ।

نَحْنُ خَلَقْنٰهُمْ وَشَدَدْنَآ اَسْرَهُمْ ۚ وَاِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَآ اَمْثَالَهُمْ تَبْدِيْلًا ﴿٢٨﴾

২৮. আমরা তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং তাদের গঠন সুদৃঢ় করেছি। আর আমরা যখন ইচ্ছে করব তাদের স্থানে তাদের মত (কাউকে) দিয়ে পরিবর্তন করে দেব(২) ।

اِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ ۚ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ﴿٢٩﴾

২৯. নিশ্চয় এটা এক উপদেশ, অতএব যে ইচ্ছে করে সে যেন তার রবের দিকে একটি পথ গ্রহণ করে ।

---

(১) অর্থাৎ মক্কার কাফেররা যে কারণে আখলাক ও আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে গোমরাহীকে আঁকড়ে ধরে থাকতে আগ্রহী এবং তাদের কান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যের আহ্বানের প্রতি অমনযোগী, প্রকৃতপক্ষে সে কারণ হলো, তাদের দুনিয়া-পূজা এবং আখেরাত সম্পর্কে নিরুদ্বিগ্নতা, উদাসীনতা ও বেপরোয়া ভাব । [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

(২) এ আয়াতাংশের কয়েকটি অর্থ হতে পারে । একটি অর্থ হতে পারে, যখনই ইচ্ছা আমি তাদের ধ্বংস করে তাদের স্থলে অন্য মানুষদের নিয়ে আসতে পারি, যারা তাদের কাজ-কর্ম ও আচার-আচরণে এদের থেকে ভিন্ন প্রকৃতির হবে । এর দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে, যখনই ইচ্ছা আমি এদের আকার-আকৃতি ও গুণাবলি নিকৃষ্টরূপে পরিবর্তন করে দিতে পারি । [কুরতুবী]

وَمَا تَشَآءُوۡنَ اِلَّآ اَنۡ یَّشَآءَ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ کَانَ عَلِیۡمًا حَکِیۡمًا ﴿٣٠﴾

৩০. আর তোমরা ইচ্ছে করতে সক্ষম হবে না যদি না আল্লাহ্ ইচ্ছে করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

یُّدۡخِلُ مَنۡ یَّشَآءُ فِیۡ رَحۡمَتِهٖ ؕ وَ الظّٰلِمِیۡنَ اَعَدَّ لَهُمۡ عَذَابًا اَلِیۡمًا ﴿٣١﴾

৩১. তিনি যাকে ইচ্ছে তাঁর অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করেন, কিন্তু যালেমরা– তাদের জন্য তিনি প্রস্তুত রেখেছেন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

৭৭- সূরা আল-মুর্‌সালাত[১]
৫০ আয়াত, মক্কী

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. শপথ কল্যাণস্বরূপ প্রেরিত বায়ুর,
وَالْمُرْسَلٰتِ عُرْفًا ①

২. অতঃপর প্রলয়ংকরী ঝটিকার,
فَالْعٰصِفٰتِ عَصْفًا ②

৩. শপথ প্রচণ্ড সঞ্চালনকারীর,
وَّالنّٰشِرٰتِ نَشْرًا ③

৪. অতঃপর সুস্পষ্টরূপে পার্থক্যকারীর,
فَالْفٰرِقٰتِ فَرْقًا ④

৫. অতঃপর তাদের, যারা মানুষের অন্তরে পৌঁছে দেয় উপদেশ---[২]
فَالْمُلْقِيٰتِ ذِكْرًا ⑤

---

(১) আবদুল্লাহ্ ইবনে-মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, আমরা এক গুহায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে উপস্থিত ছিলাম। ইত্যবসরে সূরা মুরাসালাত অবতীর্ণ হল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরাটি আবৃত্তি করলেন আর আমি তা শুনে মুখস্থ করলাম। সূরার মিষ্টতায় তার মুখমন্ডল সতেজ দেখাচ্ছিল। হঠাৎ একটি সাপ আমাদের উপর আক্রমণোদ্যত হলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে হত্যা করার আদেশ দিলেন। আমরা সাপের দিকে অগ্রসর হলাম, কিন্তু তা পালিয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা যেমন তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ হয়েছ, তেমনি সেও তোমাদের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ হয়েছে। [বুখারী: ৩৩১৭, মুসলিম: ২২৩৪]

(২) এই সূরার প্রথমে আল্লাহ্ তা'আলা পাঁচটি বস্তুর শপথ করে কেয়ামতের নিশ্চিত আগমনের কথা ব্যক্ত করেছেন। যে পাঁচটি জিনিসের শপথ করা হয়েছে কুরআনুল কারীম সেগুলোকে স্পষ্ট করে উল্লেখ করেনি, বরং সেগুলোর নামের পরিবর্তে পাঁচটি বিশেষণ উল্লেখ করেছে। যেমন বলা হয়েছে, (এক) একের পর এক প্রেরিত বা কল্যাণ হিসেবে প্রেরিত, (দুই) অত্যন্ত দ্রুত এবং প্রচন্ডবেগে প্রবাহিত, (তিন) ভালভাবে বিক্ষিপ্তকারী, (চার) ভালভাবে বিচ্ছিন্নকারী এবং (পাঁচ) স্মরণকে জাগ্রতকারী। লক্ষণীয় যে, এগুলো কোন প্রাণী বা বস্তুর বিশেষণ, নাম নয়। কিন্তু এগুলো কার বিশেষণ তা পুরোপুরি নির্দিষ্ট করা হয় নি। তাই এ সম্পর্কে বিভিন্নরূপে তাফসীর বর্ণিত আছে। এক দল বলেন, প্রথম তিনটি দ্বারা বাতাস এবং পরের দু'টি দ্বারা ফেরেশতা বুঝানো হয়েছে। [ইবন কাসীর, ফাতহুল কাদীর] অপর এক দল বলেন, প্রথম দু'টি দ্বারা বাতাস এবং পরের তিনটি দ্বারা ফেরেশতা বুঝানো হয়েছে। [মুয়াসসার] তৃতীয় এক দল বলেন, প্রথম তিনটি বিশেষণ দ্বারা বাতাস, চতুর্থটি দ্বারা কুরআন এবং পঞ্চমটি দ্বারা ফেরেশ্‌তা বুঝানো হয়েছে। [জালালাইন, আয়সারুত তাফাসীর] কেউ কেউ বলেন যে প্রতিটি

৬. ওযর-আপত্তি রহিতকরণ ও সতর্ক করার জন্য[১]	عُذۡرًا اَوۡ نُذۡرًا ۙ﴿۶﴾
৭. নিশ্চয় তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা অবশ্যম্ভাবী।	اِنَّمَا تُوۡعَدُوۡنَ لَوَاقِعٌ ؕ﴿۷﴾
৮. যখন নক্ষত্ররাজির আলো নির্বাপিত করা হবে,	فَاِذَا النُّجُوۡمُ طُمِسَتۡ ۙ﴿۸﴾
৯. আর যখন আকাশ বিদীর্ণ করা হবে,	وَ اِذَا السَّمَآءُ فُرِجَتۡ ۙ﴿۹﴾
১০. আর যখন পর্বতমালা চূর্ণবিচূর্ণ করা হবে,	وَ اِذَا الۡجِبَالُ نُسِفَتۡ ۙ﴿۱۰﴾
১১. আর যখন রাসূলগণকে নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত করা হবে[২],	وَ اِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتۡ ﴿ؕ۱۱﴾

বিশেষণ দ্বারা ফেরেশতাদের বুঝানো হয়েছে। সম্ভবত ফেরেশতাগণের বিভিন্ন দল এসব বিভিন্ন বিশেষণে বিশেষিত। [দেখুন, কুরতুবী] তবে ইমাম তাবারী বলেন, প্রথম আয়াত দ্বারা ফেরেশ্‌তা বা বাতাস– দুটিই উদ্দেশ্য হতে পারে। দ্বিতীয় আয়তটি দ্বারা প্রবাহিত বাতাস; আর তৃতীয় আয়াতটির মাধ্যমে বাতাস, বৃষ্টি বা ফেরেশ্‌তা সবই উদ্দেশ্য হতে পারে। চতুর্থটি দ্বারা যেকোনো সত্য-মিথ্যা পার্থক্যকারী উদ্দেশ্য হতে পারে, চাই তা ফেরেশ্‌তা হোক বা কুরআন হোক, বা অন্য কিছু হোক। আর পঞ্চমটির মাধ্যমে ফেরেশতাদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

(১) এ আয়াতটি আগের আয়াতের সাথে সম্পৃক্ত। বলা হয়েছে, যে ফেরেশতারা যে উপদেশ ও ওহী নিয়ে আসে তার মাধ্যমে সৃষ্টির পক্ষ থেকে ওজর পেশ করার সুযোগ বন্ধ করা এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে আযাবের ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্য থাকে। ফাররা বলেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে যে উপদেশ-বাণী বা ওহী আসে তা মুমিনদের জন্যে ওযর-আপত্তি রহিত করার কারণ হয় এবং কাফেরদের জন্যে সতর্ককারী হয়ে যায়। [ফাতহুল কাদীর]

(২) এখানে আল্লাহ্‌ তা'আলার ওয়াদা বা ভীতিপ্রদ বিষয়সমূহ বাস্তবায়ন মুহূর্তের কতিপয় ভয়ানক অবস্থা বর্ণনা করে বলেন যে, প্রথমে সব নক্ষত্র জ্যোতিহীন হয়ে যাবে এবং ঝরে যাবে। দ্বিতীয় অবস্থা এই যে, আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাবে। তৃতীয় অবস্থা এই যে, পর্বতসমূহ চূর্ণ হয়ে বিক্ষিপ্ত ধূলি-কণা হওয়ার পর নাই হয়ে যাবে। চতুর্থ অবস্থা হলো, নবী-রাসূলগণের জন্যে তাদের ও তাদের উম্মতের মাঝে বিচারের জন্য উপস্থিত হওয়ার যে সময় নিরূপিত হয়েছিল, তারা যখন সে সময়ে পৌঁছে যাবেন এবং তাদেরকে জড়ো করা হবে। [মুয়াসসার, সা'দী]

১২. এ-সব স্থগিত রাখা হয়েছে কোন্ দিনের জন্য? لِاَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ ﴿١٢﴾

১৩. বিচার দিনের জন্য। لِيَوْمِ الْفَصْلِ ﴿١٣﴾

১৪. আর আপনাকে কিসে জানাবে বিচার দিন কী? وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ﴿١٤﴾

১৫. সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের জন্য[১]। وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿١٥﴾

১৬. আমরা কি পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করিনি? اَلَمْ نُهْلِكِ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٦﴾

১৭. তারপর আমরা পরবর্তীদেরকে তাদের অনুগামী করব[২]। ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْاٰخِرِيْنَ ﴿١٧﴾

১৮. অপরাধীদের প্রতি আমরা এরূপই করে থাকি। كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ﴿١٨﴾

১৯. সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের জন্য। وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿١٩﴾

২০. আমরা কি তোমাদেরকে তুচ্ছ পানি হতে সৃষ্টি করিনি? اَلَمْ نَخْلُقْكُّمْ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ﴿٢٠﴾

২১. তারপর আমরা তা রেখেছি নিরাপদ فَجَعَلْنٰهُ فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ﴿٢١﴾

---

(১) ويل দ্বারা উদ্দেশ্য ধ্বংস, দুর্ভোগ। অর্থাৎ কতই না দুর্ভোগ ও ধ্বংস রয়েছে সেসব লোকের জন্য, যারা সেদিনের আগমনের খবরকে মিথ্যা বলে মনে করেছিল। আল্লাহ্ তাদেরকে শপথ করে বলেছেন, কিন্তু তারা তা বিশ্বাস করে নি। ফলে তারা কঠোর ও কঠিন শাস্তির যোগ্য হয়ে উঠল। [সা'দী]

(২) এটা আখেরাতের স্বপক্ষে ঐতিহাসিক প্রমাণ। এতে বর্তমান লোকদেরকে অতীত লোকদের অবস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। আদ, সামুদ, কাওমে-লূত, কাওমে-ফির'আউন ইত্যাদিকে আল্লাহ ধ্বংস করেছেন। সে ধারাবাহিকতায় মক্কার কাফেরদেরকেও তিনি ধ্বংস করবেন। [দেখুন, তাবারী; ফাতহুল কাদীর] এই আযাব বদর, ওহুদ প্রভৃতি যুদ্ধে তাদের উপর পতিত হয়েছে। আর যদি দুনিয়াতে সে আযাব নাও আসে, আখেরাতে তা অবশ্যই আসবে। [ফাতহুল কাদীর]

আধারে[১],

২২. এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত,

إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴿٢٢﴾

২৩. অতঃপর আমরা পরিমাপ করেছি, সুতরাং আমরা কত নিপুণ পরিমাপকারী[২]!

فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ ﴿٢٣﴾

২৪. সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের জন্য[৩]।

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٤﴾

২৫. আমরা কি যমীনকে সৃষ্টি করিনি ধারণকারীরূপে,

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿٢٥﴾

২৬. জীবিত ও মৃতের জন্য[৪]?

أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا ﴿٢٦﴾

২৭. আর আমরা তাতে স্থাপন করেছি সুদৃঢ় উচ্চ পর্বতমালা এবং তোমাদেরকে

وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم

(১) অর্থাৎ মায়ের গর্ভস্থল। একে মহান আল্লাহ তা'আলা মুক্ত বাতাস থেকেও সংরক্ষণ করেছেন। [তাতিম্মাতু আদ্ওয়াউল বায়ান]

(২) এটা মৃত্যুর পরের জীবনের সম্ভাব্যতার স্পষ্ট প্রমাণ। আল্লাহ তা'আলার এ বাণীর অর্থ হলো, যখন আমি নগণ্য এক ফোটা বীর্য থেকে সূচনা করে তোমাকে পূর্ণাঙ্গ একজন মানুষ বানাতে সক্ষম হয়েছি তখন পুনরায় তোমাদের অন্য কোনভাবে সৃষ্টি করতে সক্ষম হবো না কেন? আমার যে সৃষ্টি কর্মের ফলশ্রুতিতে তুমি আজ জীবিত ও বর্তমান তা একথা প্রমাণ করে যে, আমি অসীম ক্ষমতার অধিকারী। আমি এমন অক্ষম নই যে, একবার সৃষ্টি করার পর তোমাদেরকে পুনরায় আর সৃষ্টি করতে পারবো না। [আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

(৩) এখানে এ আয়াতাংশ যে অর্থ প্রকাশ করছে তা হলো, মৃত্যুর পরের জীবনের সম্ভাব্যতার এ স্পষ্ট প্রমাণ সামনে থাকা সত্ত্বেও যারা তা অস্বীকার করছে তাদের জন্য ধ্বংস অনিবার্য। [দেখুন, সা'দী] সুতরাং তারা আখেরাত ও পুনরুত্থান নিয়ে যত ইচ্ছা হাসি রঙ-তামাসা ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করুক এবং এর ওপর বিশ্বাস স্থাপনকারী লোকদের তারা যত ইচ্ছা 'সেকেলে' অন্ধবিশ্বাসী এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলতে থাকুক। যে দিনকে এরা মিথ্যা বলছে যখন সেদিনটি আসবে তখন তারা জানতে পারবে, সেটিই তাদের জন্য ধ্বংসের দিন।

(৪) অর্থাৎ ভূমি জীবিত মানুষকে তার পৃষ্ঠে এবং সকল মৃতকে তার পেটে ধারণ করে। [সা'দী; মুয়াসসার]

مَّآءً فُرَاتًا ﴿٢٧﴾

পান করিয়েছি সুপেয় পানি(১)।

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٢٨﴾

২৮. সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের জন্য(২)।

اِنْطَلِقُوْٓا اِلٰى مَا كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ﴿٢٩﴾

২৯. তোমরা যাতে মিথ্যারোপ করতে, চল তারই দিকে।

اِنْطَلِقُوْٓا اِلٰى ظِلٍّ ذِىْ ثَلٰثِ شُعَبٍ ﴿٣٠﴾

৩০. চল তিন শাখাবিশিষ্ট আগুনের ছায়ার দিকে,

لَّا ظَلِيْلٍ وَّلَا يُغْنِىْ مِنَ اللَّهَبِ ﴿٣١﴾

৩১. যে ছায়া শীতল নয় এবং যা রক্ষা করে না অগ্নিশিখা হতে,

اِنَّهَا تَرْمِىْ بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ﴿٣٢﴾

৩২. নিশ্চয় জাহান্নাম উৎক্ষেপন করবে বৃহৎ স্ফুলিংগ অট্টালিকাতুল্য,

كَاَنَّهٗ جِمٰلَتٌ صُفْرٌ ﴿٣٣﴾

৩৩. তা যেন পীতবর্ণ উটের শ্রেণী(৩),

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٣٤﴾

৩৪. সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের জন্য।

---

(১) অর্থাৎ এ পৃথিবীর অভ্যন্তরে সুপেয় পানি সৃষ্টি করা হয়েছে। এর পৃষ্ঠদেশের উপরেও সুপেয় পানির নদী ও খাল প্রবাহিত করা হয়েছে। যেমন অন্য আয়াতে বলেছেন, "তোমরা যে পানি পান কর তা সম্পর্কে আমাকে জানাও তোমরা কি সেটা মেঘ হতে নামিয়ে আন, না আমরা সেটা বর্ষণ করি? আমরা ইচ্ছে করলে তা লবণাক্ত করে দিতে পারি। তবুও কেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না ?" [সূরা আল-ওয়াকি'আহ: ৬৮-৭০]

(২) এখানে এ আয়াতাংশ এ অর্থে বলা হয়েছে যে যেসব লোক আল্লাহ তা'আলার কুদরত ও কর্মকৌশলের এ বিস্ময়কর নমুনা দেখেও আখেরাতের সম্ভাব্যতা ও যৌক্তিকতা অস্বীকার করছে এবং এ দুনিয়ার ধ্বংসের পর আল্লাহ তা'আলা আরো একটি দুনিয়া সৃষ্টি করবেন এবং সেখানে মানুষের কাছ থেকে তার কাজের হিসেব গ্রহণ করবেন এ বিষয়টিকেও যারা মিথ্যা মনে করছে, তারা তাদের এ খামখেয়ালীতে মগ্ন থাকতে চাইলে থাকুক। তাদের ধারণা ও বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিপরীত এসব কিছু যেদিন বাস্তব হয়ে দেখা দেবে, সেদিন তারা বুঝতে পারবে যে, এ বোকামির মাধ্যমে তারা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংসের ব্যবস্থা করেছে মাত্র।

(৩) অর্থাৎ জাহান্নামের প্রত্যেকটি স্ফূলিঙ্গ প্রাসাদের মত বড় হবে। আর যখন এসব বড় বড় স্ফূলিঙ্গ উত্থিত হয়ে ছড়িয়ে পড়বে এবং চারদিকে উড়তে থাকবে তখন মনে হবে যেন কালো কিছুটা হলুদ বর্ণের উটসমূহ লম্ফ ঝম্ফ করছে। [মুয়াসসার]

৩৫. এটা এমন এক দিন যেদিন না তারা কথা বলবে[১],

هٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৬. আর না তাদেরকে অনুমতি দেয়া হবে ওযর পেশ করার।

وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُوْنَ ﴿٣٦﴾

৩৭. সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের জন্য।

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٣٧﴾

৩৮. 'এটাই ফয়সালার দিন, আমরা একত্র করেছি তোমাদেরকে এবং পূর্ববর্তীদেরকে।'

هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنٰكُمْ وَالْاَوَّلِيْنَ ﴿٣٨﴾

৩৯. অতঃপর তোমাদের কোন কৌশল থাকলে তা প্রয়োগ কর আমার বিরুদ্ধে[২]।

فَاِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيْدُوْنِ ﴿٣٩﴾

৪০. সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের জন্য।

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٤٠﴾

দ্বিতীয় রুকূ'

৪১. নিশ্চয় মুত্তাকীরা[৩] থাকবে ছায়ায় ও

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ ظِلٰلٍ وَّعُيُوْنٍ ﴿٤١﴾

(১) অর্থাৎ সেদিন কেউ কথা বলতে পারবে না এবং কাউকে কৃতকর্মের ওযর পেশ করার অনুমতি দেয়া হবে না। অন্যান্য আয়াতে কাফেরদের কথা বলা এবং ওযর পেশ করার কথা রয়েছে। সেটা এর পরিপন্থী নয়। কেননা, হাশরের ময়দানে বিভিন্ন স্থান আসবে। কোন স্থানে ওযর পেশ করা নিষিদ্ধ থাকবে এবং কোন স্থানে অনুমতি দেয়া হবে। [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ দুনিয়ায় তো তোমরা অনেক কৌশল ও চাতুর্যের আশ্রয় নিতে। এখন এখানে কোন কৌশল বা আশ্রয় নিয়ে আমার পাকড়াও থেকে বাঁচতে পারলে তা একটু করে দেখাও। কিন্তু আজ তোমাদের কোন কৌশল কাজে আসবে না। আজ তোমরা পাকড়াও থেকে বাঁচতে পারবে না। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, "হে জিন ও মানব সম্প্রদায়! আসমানসমূহ ও যমীনের সীমা তোমরা যদি অতিক্রম করতে পার অতিক্রম কর, কিন্তু তোমরা অতিক্রম করতে পারবে না সনদ ছাড়া।" [সূরা আর-রহমান: ৩৩] [সা'দী]

(৩) মুত্তাকী শব্দ বলে এখানে সেসব লোকদের বুঝানো হয়েছে যারা আখেরাতকে মিথ্যা বলে অস্বীকার করা থেকে বিরত থেকেছে এবং আখেরাতকে মেনে নিয়ে এ বিশ্বাসে

প্রস্রবণ বহুল স্থানে,

৪২. আর তাদের বাঞ্ছিত ফলমূলের প্রাচুর্যের মধ্যে।

وَّفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُوْنَ ﴿٤٢﴾

৪৩. 'তোমাদের কর্মের পুরস্কারস্বরূপ তোমরা তৃপ্তির সাথে পানাহার কর।'

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓـًٔا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٤٣﴾

৪৪. এভাবে আমরা মুহসিনদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি।

اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٤٤﴾

৪৫. সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের জন্য।

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٤٥﴾

৪৬. তোমরা খাও এবং ভোগ করে নাও অল্প কিছুদিন, তোমরা তো অপরাধী[১]।

كُلُوْا وَتَمَتَّعُوْا قَلِيْلًا اِنَّكُمْ مُّجْرِمُوْنَ ﴿٤٦﴾

৪৭. সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের জন্য।

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٤٧﴾

৪৮. যখন তাদেরকে বলা হয়, রুকু কর তখন তারা রুকু করে না[২]।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ ارْكَعُوْا لَا يَرْكَعُوْنَ ﴿٤٨﴾

৪৯. সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের জন্য।

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٤٩﴾

জীবন যাপন করেছে যে, আখেরাতে আমাদেরকে নিজেদের কথাবার্তা, কাজ-কর্ম এবং স্বভাব চরিত্র ও কর্মকাণ্ডের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। তাই কথাবার্তা, কাজ-কর্মে সত্যবাদিতার প্রমাণ রেখেছে এবং তারা ফরয ও ওয়াজিব সঠিক মত আদায় করেছে। [দেখুন, সা'দী]

(১) অর্থাৎ কিছুদিন খেয়ে-দেয়ে নাও এবং আরাম করে নাও। তোমরা তো অপরাধী; অবশেষে কঠোর আযাব ভোগ করতে হবে। নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে একথা দুনিয়াতে মিথ্যারোপকারীদেরকে বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, ক্ষণস্থায়ী আরাম-আয়েশের পর তোমাদের কপালে আযাবই আযাব রয়েছে। [দেখুন, সা'দী]

(২) এখানে অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে রুকুর পারিভাষিক অর্থই উদ্দেশ্য। অর্থ এই যে, যখন তাদেরকে সালাতের দিকে আহ্বান করা হত, তখন তারা সালাত পড়ত না। কাজেই আয়াতে রুকু বলে পুরো সালাত বোঝানো হয়েছে। [বাগভী; ইবন কাসীর; সা'দী]

৫০. কাজেই তারা কুরআনের পরিবর্তে আর কোন্ কথায় ঈমান আনবে[১]!

فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُۥ يُؤْمِنُونَ ۝٥٠

(১) অর্থাৎ মানুষকে হক ও বাতিলের পার্থক্য বুঝিয়ে দেয়ার এবং হিদায়াতের পথ দেখানোর জন্য সবচেয়ে বড় জিনিস যা হতে পারতো তা কুরআন আকারে নাযিল করা হয়েছে। তারা যখন কুরআনের মত অপূর্ব, অলংকারপূর্ণ, তত্ত্বপূর্ণ ও সুস্পষ্ট প্রমাণাদিমণ্ডিত কিতাবে ঈমান আনল না, তখন এরপর আর কোন্ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবে? এ কুরআন পড়ে বা শুনেও যদি একে বাদ দিয়ে আর অন্য কোন জিনিসের দিকে ধাবিত হয় তবে তাদের মত দুর্ভাগা আর কে হতে পারে? [দেখুন, সা'দী]

৭৮- সূরা আন-নাবা’
৪০ আয়াত, মক্কী

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

عَمَّ یَتَسَآءَلُوۡنَ ۚ﴿۱﴾

১. তারা একে অন্যের কাছে কী বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে?

عَنِ النَّبَاِ الۡعَظِیۡمِ ۙ﴿۲﴾

২. মহাসংবাদটির বিষয়ে(১),

الَّذِیۡ هُمۡ فِیۡهِ مُخۡتَلِفُوۡنَ ؕ﴿۳﴾

৩. যে বিষয়ে তারা মতানৈক্য করছে(২)।

كَلَّا سَیَعۡلَمُوۡنَ ۙ﴿۴﴾

৪. কখনো না(৩), তারা অচিরেই জানতে পারবে;

ثُمَّ كَلَّا سَیَعۡلَمُوۡنَ ﴿۵﴾

৫. তারপর বলি কখনো না, তারা অচিরেই জানতে পারবে।

اَلَمۡ نَجۡعَلِ الۡاَرۡضَ مِهٰدًا ۙ﴿۶﴾

৬. আমরা কি করিনি যমীনকে শয্যা

---

(১) অর্থাৎ তারা কি বিষয়ে পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করছে? অতঃপর আল্লাহ্ নিজেই উত্তর দিয়েছেন যে, মহাখবর সম্পর্কে। তাফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন, এখানে মহাখবর বলে কুরআনকে উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। কাতাদাহ বলেন, এখানে মহাখবর বলে কেয়ামত বোঝানো হয়েছে। এখানে এটাই প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত। [ইবন কাসীর]

(২) আয়াতের আরেকটি অর্থ হচ্ছেঃ “এ ব্যাপারে তারা নানা ধরনের কথা বলছে ও ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে ফিরছে।” অন্য অর্থ এও হতে পারে, দুনিয়ার পরিণাম সম্পর্কে তারা নিজেরাও কোন একটি অভিন্ন আকীদা পোষণ করে না বরং “তাদের মধ্যে এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত পাওয়া যায়।” কেউ কেউ আবার আখেরাত পুরোপুরি অস্বীকার করতো না, তবে তা ঘটতে পারে কিনা, এ ব্যাপারে তাদের সন্দেহ ছিল। কুরআন মজীদে এ ধরনের লোকদের এ উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে, “আমরা তো মাত্র একটি ধারণাই পোষণ করি, আমাদের কোন নিশ্চিত বিশ্বাস নেই।” [সূরা আল-জাসিয়াহ, ৩২] আবার কেউ কেউ একদম পরিষ্কার বলতো, “আমাদের এ দুনিয়ার জীবনটিই সবকিছু এবং মরার পর আমাদের আর কখনো দ্বিতীয়বার উঠানো হবে না।” [সূরা আল-আন‘আম: ২৯]; “আমাদের এই দুনিয়ার জীবনটিই সব কিছু। এখানেই আমরা মরি, এখানেই জীবন লাভ করি এবং সময়ের চক্র ছাড়া আর কিছুই নেই যা আমাদের ধ্বংস করে।” [সূরা আল-জাসিয়াহ্: ২৪] [ফাতহুল কাদীর]

(৩) অর্থাৎ আখেরাত সম্পর্কে যেসব কথা এরা বলে যাচ্ছে এগুলো সবই ভুল। এরা যা কিছু মনে করেছে ও বুঝেছে তা কোনক্রমেই সঠিক নয়। [মুয়াসসার]

৭. আর পর্বতসমূহকে পেরেক?	وَّالْجِبَالَ اَوْتَادًا ۙ﴿۷﴾
৮. আর আমরা সৃষ্টি করেছি তোমাদেরকে জোড়ায় জোড়ায়,	وَّخَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا ۙ﴿۸﴾
৯. আর তোমাদের ঘুমকে করেছি বিশ্রাম[১],	وَّجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۙ﴿۹﴾
১০. আর করেছি রাতকে আবরণ,	وَّجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا ۙ﴿۱۰﴾
১১. আর করেছি দিনকে জীবিকা আহরণের সময়,	وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۙ﴿۱۱﴾
১২. আর আমরা নির্মাণ করেছি তোমাদের উপরে সুদৃঢ় সাত আকাশ[২]	وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ۙ﴿۱۲﴾
১৩. আর আমরা সৃষ্টি করেছি প্রোজ্জ্বল দীপ[৩]।	وَّجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا ۙ﴿۱۳﴾
১৪. আর আমরা বর্ষণ করেছি মেঘমালা হতে প্রচুর বারি[৪],	وَّاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ مَآءً ثَجَّاجًا ۙ﴿۱۴﴾
১৫. যাতে তা দ্বারা আমরা উৎপন্ন করি শস্য, উদ্ভিদ,	لِّنُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا وَّنَبَاتًا ۙ﴿۱۵﴾
১৬. ও ঘন সন্নিবিষ্ট উদ্যান।	وَّجَنّٰتٍ اَلْفَافًا ؕ﴿۱۶﴾
১৭. নিশ্চয় নির্ধারিত আছে বিচার দিন[৫];	اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا ۙ﴿۱۷﴾

(১) মানুষকে দুনিয়ায় কাজ করার যোগ্য করার জন্য মহান আল্লাহ অত্যন্ত কর্মকুশলতা সহকারে তার প্রকৃতিতে ঘুমের এক চাহিদা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। কর্মের ক্লান্তির পর ঘুম তাকে স্বস্তি, আরাম ও শান্তি দান করে। [সা'দী]

(২) সুস্থিত ও মজবুত বলা হয়েছে এ অর্থে যে, আকাশ তৈরি হয়েছে অত্যন্ত দৃঢ়-সংঘবদ্ধভাবে, তার মধ্যে সামান্যতম পরিবর্তনও কখনো হয় না, ধ্বংস হয় না, ফেটে যায় না। [তাবারী]

(৩) এখানে সূর্যকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যা সমগ্র পৃথিবীর মানুষের জন্য প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ। [ইবন কাসীর]

(৪) معصرات শব্দটি معصرة এর বহুবচন। এর অর্থ জলে পরিপূর্ণ মেঘমালা। [তাবারী]

(৫) অর্থাৎ যে দিন মহান আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির মাঝে বিচার-মীমাংসা করবেন সে দিন তথা কেয়ামত নির্দিষ্ট সময়েই আসবে। [মুয়াসসার]

يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ فَتَأْتُوْنَ أَفْوَاجًا ﴿١٨﴾

১৮. সেদিন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে তখন তোমরা দলে দলে আসবে[১],

وَّفُتِحَتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ﴿١٩﴾

১৯. আর আকাশ উন্মুক্ত করা হবে, ফলে তা হবে বহু দ্বারবিশিষ্ট[২] ।

وَّسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴿٢٠﴾

২০. আর চলমান করা হবে পর্বতসমূহকে, ফলে সেগুলো হয়ে যাবে মরীচিকা[৩],

إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿٢١﴾

২১. নিশ্চয় জাহান্নাম ওৎ পেতে অপেক্ষমান;

لِّلطَّٰغِينَ مَـَٔابًا ﴿٢٢﴾

২২. সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য প্রত্যাবর্তনস্থল ।

لَّٰبِثِينَ فِيهَآ أَحْقَابًا ﴿٢٣﴾

২৩. সেখানে তারা যুগ যুগ ধরে অবস্থান করবে[৪],

---

(১) অন্যান্য আয়াত থেকে জানা যায় যে, দু'বার শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে । প্রথম ফুৎকারের সাথে সাথে সমগ্র বিশ্ব ধ্বংস প্রাপ্ত হবে এবং দ্বিতীয় ফুৎকারের সাথে সাথে পুনরায় জীবিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে । এ সময় বিশ্বের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব মনুষ দলে দলে আল্লাহ্‌র কাছে উপস্থিত হবে । এ স্থানে শিংগার দ্বিতীয় ফুঁকের কথা বলা হয়েছে । এর আওয়াজ বুলন্দ হবার সাথে সাথেই প্রথম থেকে শেষ– সমস্ত মরা মানুষ অকস্মাৎ জেগে উঠবে । [ফাতহুল কাদীর]

(২) "আকাশ খুলে দেয়া হবে" এর মানে এটাও হতে পারে যে, উর্ধজগতে কোন বাধা ও বন্ধন থাকবে না । আসমানে বিভিন্ন দরজা তৈরি হয়ে সেগুলো হতে সবদিক থেকে ফেরেশতারা নেমে আসতে থাকবে । [ইবন কাসীর]

(৩) পাহাড়ের চলার ও মরীচিকায় পরিণত হবার মানে হচ্ছে, দেখতে দেখতে মুহূর্তের মধ্যে পর্বতমালা স্থানচ্যুত হয়ে যাবে । তারপর ভেঙ্গে চুর্ণবিচূর্ণ হয়ে এমনভাবে মরীচিকার মতো ছড়িয়ে পড়বে যে, মনে হবে সেখানে কিছু আছে, কিন্তু কিছু নেই । এর পরই যেখানে একটু আগে বিশাল পর্বত ছিল সেখানে আর কিছুই থাকবে না । এ অবস্থাকে অন্যত্র বলা হয়েছেঃ "এরা আপনাকে জিজ্ঞেস করছে, সেদিন এ পাহাড় কোথায় চলে যাবে? এদের বলে দিন, আমার রব তাদেরকে ধূলোয় পরিণত করে বাতাসে উড়িয়ে দেবেন এবং যমীনকে এমন একটি সমতল প্রান্তরে পরিণত করে দেবেন যে, তার মধ্যে কোথাও একটুও অসমতল ও উঁচুনীচু জায়গা এবং সামন্যতম ভাঁজও দেখতে পাবে না ।" [সূরা ত্বা-হা: ১০৫-১০৭] [ইবন কাসীর]

(৪) অর্থাৎ তারা সেখানে অবস্থানকারী হবে সুদীর্ঘ বছর । আয়াতে ব্যবহৃত أحقاب শব্দটি

২৪. সেখানে তারা আস্বাদন করবে না শীতলতা, না কোন পানীয়---

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ﴿٢٤﴾

২৫. ফুটন্ত পানি ও পুঁজ ছাড়া [১];

إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ﴿٢٥﴾

২৬. এটাই উপযুক্ত প্রতিফল[২]।

جَزَاءً وِفَاقًا ﴿٢٦﴾

২৭. নিশ্চয় তারা কখনো হিসেবের আশা করত না,

إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿٢٧﴾

২৮. আর তারা আমাদের নিদর্শনাবলীতে কঠোরভাবে মিথ্যারোপ করেছিল[৩]।

وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا ﴿٢٨﴾

حقب এর বহুবচন। এর অর্থ নির্ধারণ নিয়ে মতপার্থক্য থাকলেও স্বাভাবিকভাবে বলা যায় যে, এর দ্বারা 'সুদীর্ঘ সময়' উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। সুতরাং أحقاب দ্বারা তখন কোন সুনির্দিষ্ট সময় বোঝা উচিত হবে না। তাই উপরে এর অনুবাদ করা হয়েছে, 'যুগ যুগ ধরে'। এর মানে হচ্ছে, একের পর এক আগমনকারী দীর্ঘ সময় তারা সেখানে অবস্থান করবে। এমন একটি ধারাবাহিক যুগ যে, একটি যুগ শেষ হবার পর আর একটি যুগ শুরু হয়ে যায়। একের পর এক আসতেই থাকবে এবং এমন কোন যুগ হবে না যার পর আর কোন যুগ আসবে না। [দেখুন: ইবন কাসীর] কুরআনের ৩৪ জায়গায় জাহান্নামবাসীদের জন্য 'খুলুদ' (চিরন্তন) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। তিন জায়গায় কেবল 'খুলুদ' বলেই শেষ করা হয়নি বরং তার সাথে "আবাদান" (চিরকাল) শব্দও বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এক জায়গায় পরিষ্কার বলা হয়েছে, "তারা চাইবে জাহান্নাম থেকে বের হয়ে যেতে। কিন্তু তারা কখনো সেখান থেকে বের হতে পারবে না এবং তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী আযাব।" [সূরা আল-মায়েদাহ: ৩৭]

(১) মূলে গাস্সাক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হয়ঃ পুঁজ, রক্ত, পুঁজ মেশানো রক্ত এবং চোখ ও গায়ের চামড়া থেকে বিভিন্ন ধরনের কঠোর দৈহিক নির্যাতনের ফলে যেসব রস বের হয়, যা প্রচণ্ড দুর্গন্ধযুক্ত। [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ জাহান্নামে তাদেরকে যে শাস্তি দেয়া হবে, তা ন্যায় ও ইনসাফের দৃষ্টিতে তাদের বাতিল বিশ্বাস ও কুকর্মের অনুরূপ হবে। এতে কোন বাড়াবাড়ি হবে না। [মুয়াসসার, সা'দী]

(৩) এ হচ্ছে তাদের জাহান্নামের ভয়াবহ আযাব ভোগ করার কারণ। তারা আল্লাহর সামনে হাজির হয়ে নিজেদের আসনের হিসেব পেশ করার সময়ের কোন আশা করত না। দ্বিতীয়ত, আল্লাহ্ যেসব আয়াত পাঠিয়েছিলেন সেগুলো মেনে নিতে তারা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করত এবং সেগুলোকে মিথ্য বলে প্রত্যাখ্যান করত। [ফাতহুল কাদীর]

وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَٰهُ كِتَٰبًا ۝٢٩

২৯. আর সবকিছুই আমরা সংরক্ষণ করেছি লিখিতভাবে ।

فَذُوقُوا۟ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ۝٣٠

৩০. অতঃপর তোমরা আস্বাদ গ্রহণ কর, আমরা তো তোমাদের শাস্তিই শুধু বৃদ্ধি করব ।

দ্বিতীয় রুকূ'

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ۝٣١

৩১. নিশ্চয় মুত্তাকীদের জন্য আছে সাফল্য,

حَدَآئِقَ وَأَعْنَٰبًا ۝٣٢

৩২. উদ্যানসমূহ, আঙ্গুরসমূহ,

وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ۝٣٣

৩৩. আর সমবয়স্কা[১] উদ্ভিন্ন যৌবনা তরুণী

وَكَأْسًا دِهَاقًا ۝٣٤

৩৪. এবং পরিপূর্ণ পানপাত্র ।

لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّٰبًا ۝٣٥

৩৫. সেখানে তারা শুনবে না কোন অসার ও মিথ্যা বাক্য[২];

جَزَآءً مِّن رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا ۝٣٦

৩৬. আপনার রবের পক্ষ থেকে পুরস্কার, যথোচিত দানস্বরূপ[৩],

---

(১) এর অর্থ এও হতে পারে যে, তারা পরস্পর সমবয়স্কা হবে। [মুয়াসসার, সা'দী]

(২) জান্নাতে কোন কটুকথা ও আজেবাজে গল্পগুজব হবে না। কেউ কারো সাথে মিথ্যা বলবে না এবং কারো কথাকে মিথ্যাও বলবে না। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এ বিষয়টিকে জান্নাতের বিরাট নিয়ামত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। [সা'দী]

(৩) লক্ষণীয় যে, এসব নেয়ামত বর্ণনা করে বলা হয়েছে, জান্নাতের এসব নেয়ামত মুমিনদের প্রতিদান এবং আপনার রবের পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত দান। এখানে জান্নাতের নেয়ামতসমূহকে প্রথমে কর্মের প্রতিদান ও পরে আল্লাহ্‌র দান বলা হয়েছে। প্রতিদান শব্দের পরে আবার যথেষ্ট পুরস্কার দেবার কথা বলার অর্থ এ দাঁড়ায় যে, তারা নিজেদের সৎকাজের বিনিময়ে যে প্রতিদান লাভের অধিকারী হবে কেবলমাত্র ততটুকুই তাদেরকে দেয়া হবে না বরং তার ওপর অতিরিক্ত পুরস্কার এবং অনেক বেশী পুরস্কার দেয়া হবে। বিপরীত পক্ষে জাহান্নামবাসীদের জন্য কেবলমাত্র এতটুকুই বলা হয়েছে যে, তাদেরকে তাদের কাজের পূর্ণ প্রতিফল দেয়া হবে। অর্থাৎ তাদের যে পরিমাণ অপরাধ তার চেয়ে বেশী শাস্তি দেয়া হবে না এবং কমও দেয়া হবে না। [দেখুন, তাতিম্মাতু আদ্‌ওয়াউল বায়ান] কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে একথা

رَّبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمٰنِ لَا يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿٣٧﴾

৩৭. যিনি আসমানসমূহ, যমীন ও এ দু'য়ের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর রব, দয়াময়; তাঁর কাছে আবেদন-নিবেদনের শক্তি তাদের থাকবে না(১) ।

يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰٓئِكَةُ صَفًّا ۖ لَّا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿٣٨﴾

৩৮. সেদিন রূহ্ ও ফেরেশ্তাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে(২); সেদিন কেউ কথা বলবে না, তবে 'রহমান' যাকে অনুমতি দেবেন সে ছাড়া, এবং সে সঠিক কথা বলবে(৩) ।

ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ مَاٰبًا ﴿٣٩﴾

৩৯. এ দিনটি সত্য; অতএব যার ইচ্ছে সে তার রবের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করুক ।

اِنَّآ اَنْذَرْنٰكُمْ عَذَابًا قَرِيْبًا ۚ يَّوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ

৪০. নিশ্চয় আমরা তোমাদেরকে আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করলাম; যেদিন

সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে । যেমন সূরা ইউসুস ২৬-২৭ আয়াত, আন নাম্ল ৮৯-৯০ আয়াত, আল কাসাস ৮৪ আয়াত, সাবা ৩৩ আয়াত এবং আল মু'মিন ৪০ আয়াত ।

(১) এই বাক্যটি পূর্বের বাক্যের সাথে সর্ম্পকযুক্ত । এর অর্থ এই হবে যে, এটি সে-রবের পক্ষ থেকে প্রতিদান, যিনি আসমান ও যমীনের রব; তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে কেয়ামতের ময়দানে কারও কথা বলার ক্ষমতা হবে না; যদি-না তিনি অনুমতি দেন । [মুয়াসসার]

(২) অধিকাংশ তাফসীরকারগণের মতে 'রূহ' বলে এখানে জিবরাঈল আলাইহিস্ সালামকে বোঝানো হয়েছে । [মুয়াসসার, সা'দী] ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে যে, রূহ দ্বারা আল্লাহ তা'আলার এক বড় আকৃতির ফেরেশতাকে বোঝানো হয়েছে । কাতাদাহ বলেন, এখানে রূহ বলে আদম সন্তানদেরকে বোঝানো হয়েছে । শেষোক্ত দু'টি তাফসীর অনুযায়ী দুটি সারি হবে- একটি রূহের ও অপরটি ফেরেশতাগণের । [আত-তাফসীর আস-সাহীহ]

(৩) এখানে কথা বলা মানে শাফা'আত করা বলা হয়েছে । শাফা'আত করতে হলে যে ব্যক্তিকে যে গুনাহগারের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে শাফা'আত করার অনুমতি দেয়া হবে একমাত্র সে-ই তার জন্য শাফা'আত করতে পারবে । আর শাফা'আতকারীকে সঠিক ও যথার্থ সত্য কথা বলতে হবে । অন্যায় সুপারিশ করতে পারবে না । [দেখুন, কুরতুবী]

مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا ۝

মানুষ তার কৃতকর্ম দেখতে পাবে এবং কাফির বলবে, 'হায়! আমি যদি মাটি হতাম[১]!'

(১) আবদুল্লাহ ইবনে আমর, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম থেকে বর্ণিত আছে, কেয়ামতের দিন সমগ্র ভূপৃষ্ঠ এক সমতল ভূমি হয়ে যাবে। এতে মানব জিন, গৃহপালিত জন্তু এবং বন্য জন্তু সবাইকে একত্রিত করা হবে। জন্তুদের মধ্য কেউ দুনিয়াতে অন্য জন্তুর উপর জুলুম করে থাকলে তার কাছ থেকে প্রতিশোধ নেয়া হবে। এমন কি কোন শিংবিশিষ্ট ছাগল কোন শিংবিহীন ছাগলকে মেরে থাকলে সেদিন তার প্রতিশোধ নেয়া হবে। এই কর্ম সমাপ্ত হলে সব জন্তুকে আদেশ করা হবেঃ মাটি হয়ে যাও। তখন সব মাটি হয়ে যাবে। এই দৃশ্য দেখে কাফেররা আকাঙ্ক্ষা করবে - হায়। আমরাও যদি মাটি হয়ে যেতাম। এরূপ হলে আমরা হিসাব-নিকাশ ও জাহান্নামের আযাব থেকে বেঁচে যেতাম। [মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৩৪৫ ৪/৫৭৫, মুসনাদে ইসহাক ইবনে রাহওয়াই: ৩২২, সিলসিলা সহীহা: ১৯৬৬]

৭৯- সূরা আন-নাযি'আত
৪৬ আয়াত, মক্কী

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. শপথ(১) নির্মমভাবে উৎপাটনকারীদের(২),

وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا ①

২. আর মৃদুভাবে বন্ধনমুক্তকারীদের(৩)

وَّالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا ②

৩. আর তীব্র গতিতে সন্তরণকারীদের(৪),

وَّالسّٰبِحٰتِ سَبْحًا ③

(১) এ সূরার শুরুতে কতিপয় গুণ ও অবস্থা বর্ণনা করে তাদের শপথ করা হয়েছে। এ পাঁচটি গুণাবলী কোন কোন সত্তার সাথে জড়িত, একথাও এখানে পরিস্কার করে বলা হয়নি। কিন্তু বিপুল সংখ্যক সাহাবী ও তাবেঈন এবং অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে এখানে ফেরেশতাদের কথা বলা হয়েছে। তাছাড়া শপথের জওয়াবও উহ্য রাখা হয়েছে। মূলত কেয়ামত ও হাশর-নশর অবশ্যই হবে এবং সেগুলো নিঃসন্দেহে সত্য, একথার ওপরই এখানে কসম খাওয়া হয়েছে। [কুরতুবী] অথবা কসম ও কসমের কারণ এক হতে পারে, কেননা ফেরেশ্‌তাদের প্রতি ঈমান আনা ঈমানের স্তম্ভসমূহের মধ্যে অন্যতম। [সা'দী]

(২) বলা হয়েছে, যারা নির্মমভাবে টেনে আত্মা উৎপাটন করে। এটা যাদের শপথ করা হয়েছে সে ফেরেশতাগণের প্রথম বিশেষণ। অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ী বলেন, ডুব দিয়ে টানা এবং আস্তে আস্তে বের করে আনা এমন সব ফেরেশতার কাজ যারা মৃত্যুকালে মানুষের শরীরে গভীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তার প্রতিটি শিরা উপশিরা থেকে তার প্রাণ বায়ু টেনে বের করে আনে। এখানে আযাবের, সেসব ফেরেশতা বোঝানো হয়েছে, যারা কাফেরের আত্মা নির্মমভাবে বের করে। [ফাতহুল কাদীর]

(৩) এটা যাদের শপথ করা হয়েছে সে ফেরেশতাগণের দ্বিতীয় বিশেষণ। বলা হয়েছে যে, যে ফেরেশতা মুমিনের রূহ কবজ করার কাজে নিয়োজিত আছে, সে আনায়াসে রূহ কবজ করে- কঠোরতা করে না। প্রকৃত কারণ এই যে কাফেরের আত্মা বের করার সময় থেকেই বরযখের আযাব সামনে এসে যায়। এতে তার আত্মা অস্থির হয়ে দেহে আত্মাগোপন করতে চায়। ফেরেশতা জোরে-জবরে টানা-হেঁচড়া করে তাকে বের করে। পক্ষান্তরে মুমিনের রূহের সামনে বরযখের সওয়াব নেয়ামত ও সুসংবাদ ভেসে উঠে। ফলে সে দ্রুতবেগে সেদিকে যেতে চায়। [কুরতুবী]

(৪) এটা তাদের তৃতীয় বিশেষণ। سابحات এর আভিধানিক অর্থ সাঁতার কাটা। এই সাঁতারু বিশেষণটিও মৃত্যুর ফেরেশতাগণের সাথে সম্পর্কযুক্ত। মানুষের রূহ কবজ করার পর তারা দ্রুতগতিতে আকাশের দিকে নিয়ে যায়। [কুরতুবী]

৪. আর দ্রুতবেগে অগ্রসরমানদের(১), فَالسّٰبِقٰتِ سَبۡقًا ۙ﴿۴﴾

৫. অতঃপর সব কাজ নির্বাহকারীদের(২) । فَالۡمُدَبِّرٰتِ اَمۡرًا ۘ﴿۵﴾

৬. সেদিন প্রকম্পিতকারী প্রকম্পিত করবে, یَوۡمَ تَرۡجُفُ الرَّاجِفَۃُ ۙ﴿۶﴾

৭. তাকে অনুসরণ করবে পরবর্তী কম্পনকারী(৩), تَتۡبَعُهَا الرَّادِفَۃُ ؕ﴿۷﴾

---

(১) এটা তাদের চর্তুথ বিশেষণ। উদ্দেশ্য এই যে, যে আত্মা ফেরেশতাগণের হস্তগত হয় তাকে ভাল অথবা মন্দ ঠিকানায় পৌছানোর কাজে তারা দ্রুততায় একে অপরকে ডিঙ্গিয়ে যায়। তারা মুমিনের আত্মাকে জান্নাতের আবহাওয়ায় ও নেয়ামতের জায়গায় এবং কাফেরের আত্মাকে জাহান্নামের আবহাওয়ায় ও আযাবের জায়গায় পৌছিয়ে দেয়। [ফাতহুল কাদীর]

(২) পঞ্চম বিশেষণ। অর্থাৎ মৃত্যুর ফেরেশতাদের সর্বশেষ কাজ এই যে, তারা আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে দুনিয়ার বিভিন্ন কাজ নির্বাহের ব্যবস্থা করে। [সা'দী]

(৩) প্রথম প্রকম্পনকারী বলতে এমন প্রকম্পন বুঝানো হয়েছে, যা পৃথিবী ও তার মধ্যকার সমস্ত জিনিস ধ্বংস করে দেবে। আর দ্বিতীয় প্রকম্পন বলতে যে কম্পনে সমস্ত মৃতরা জীবিত হয়ে যমীনের মধ্য থেকে বের হয়ে আসবে তাকে বুঝানো হয়েছে। [মুয়াস্‌সার] অন্যত্র এ অবস্থাটি নিম্নোক্তভাবে বর্ণিত হয়েছেঃ "আর শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে। তখন পৃথিবী ও আকাশসমূহে যা কিছু আছে সব মরে পড়ে যাবে, তবে কেবলমাত্র তারাই জীবিত থাকবে যাদের আল্লাহ (জীবিত রাখতে) চাইবেন। তারপর দ্বিতীয়বার ফুঁক দেয়া হবে। তখন তারা সবাই আবার হঠাৎ উঠে দেখতে থাকবে।" [সূরা আয-যুমারঃ ৬৮] এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাত্রির দুই তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হলে দাঁড়িয়ে বলতেন, হে মানুষ! তোমরা আল্লাহ্র যিকর কর, তোমরা আল্লাহ্র যিকর কর। 'রাজেফাহ' (প্রকম্পণকারী) তো এসেই গেল (প্রায়), তার পিছনে আসবে 'রাদেফাহ' (পশ্চাতে আগমনকারী), মৃত্যু তার কাছে যা আছে তা নিয়ে হাজির, মৃত্যু তার কাছে যা আছে তা নিয়ে হাজির। সাহাবী উবাই ইবনে কা'ব বলেন, আমি বললাম হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি আপনার উপর বেশী বেশী সালাত (দরুদ) পাঠ করি। এ সালাত পাঠের পরিমান কেমন হওয়া উচিত? তিনি বললেন, তোমার যা ইচ্ছা। আমি বললাম, (আমার যাবতীয় দো'আর) এক চতুর্থাংশ? তিনি বললেন, যা তোমার ইচ্ছা। তবে যদি এর থেকেও বেশী কর তবে সেটা তোমার জন্য কল্যাণকর হবে। আমি বললাম, অর্ধেকাংশ? তিনি বললেন, যা তোমার ইচ্ছা। তবে যদি এর থেকেও বেশী কর তবে সেটা তোমার জন্য কল্যাণকর হবে। আমি বললাম, দুই তৃতীয়াংশ? তিনি বললেন, যা তোমার ইচ্ছা। তবে যদি এর থেকেও বেশী কর তবে সেটা তোমার জন্য কল্যাণকর হবে।

৮. অনেক হৃদয় সেদিন সন্ত্রস্ত হবে[১], قُلُوْبٌ يَّوْمَىِٕذٍ وَّاجِفَةٌ ۙ﴿٨﴾

৯. তাদের দৃষ্টিসমূহ ভীতি-বিহ্বলতায় নত হবে। اَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ۘ﴿٩﴾

১০. তারা বলে, 'আমরা কি আগের অবস্থায় ফিরে যাবই--- يَقُوْلُوْنَ ءَاِنَّا لَمَرْدُوْدُوْنَ فِى الْحَافِرَةِ ؕ﴿١٠﴾

১১. চূর্ণবিচূর্ণ অস্থিতে পরিণত হওয়ার পরও?' ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ؕ﴿١١﴾

১২. তারা বলে, 'তাই যদি হয় তবে তো এটা এক সর্বনাশা প্রত্যাবর্তন।' قَالُوْا تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ۘ﴿١٢﴾

১৩. এ তো শুধু এক বিকট আওয়াজ[২], فَاِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ ۙ﴿١٣﴾

১৪. তখনই ময়দানে[৩] তাদের আবির্ভাব হবে। فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ؕ﴿١٤﴾

১৫. আপনার কাছে মূসার বৃত্তান্ত পৌঁছেছে هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى ۘ﴿١٥﴾

আমি বললাম, তাহলে আমি আপনার জন্য আমার সালাতের সবটুকুই নির্ধারণ করব, (অর্থাৎ আমার যাবতীয় দো'আ হবে আপনার উপর সালাত বা দরুদ প্রেরণ) তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাহলে তা তোমার যাবতীয় চিন্তা দূর করে দিবে এবং তোমার গোনাহ ক্ষমা করে দিবে।" [তিরমিযী: ২৪৫৭, মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৫১৩, দ্বিয়া: আলমুখতারাহ: ৩/৩৮৮, ৩৯০]

(১) "কতক হৃদয়" বলতে কাফের ও নাফরমানদের বোঝানো হয়েছে। কিয়ামতের দিন তারা ভীত ও আতঙ্কিত হবে। [মুয়াস্সার] সৎ মু'মিন বান্দাদের ওপর এ ভীতি প্রভাব বিস্তার করবে না। অন্যত্র তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ "সেই চরম ভীতি ও আতংকের দিনে তারা একটুও পেরেশান হবে না এবং ফেরেশতারা এগিয়ে এসে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাবে। তারা বলতে থাকবে, তোমাদের সাথে এ দিনটিরই ওয়াদা করা হয়েছিল।" [সূরা আল-আম্বিয়া:১০৩]

(২) অর্থাৎ আল্লাহর জন্য এটা কোন কঠিন কাজ নয়। এ কাজটি করতে তাঁকে কোন বড় রকমের প্রস্তুতি নিতে হবে না। এর জন্য শুধুমাত্র একটি ধমক বা আওয়াজই যথেষ্ট। এরপরই তোমরা সমতল ময়দানে আবির্ভূত হবে। [ইবন কাসীর]

(৩) আয়াতে বর্ণিত ساهرة শব্দের অর্থ সমতল ময়দান। কেয়ামতে পূনরায় যে ভূপৃষ্ঠ সৃষ্টি করা হবে, তা সমতল হবে। একেই আয়াতে ساهرة বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। এর অর্থ জমিনের উপরিভাগও হতে পারে। [ইবন কাসীর]

কি[১]?

১৬. যখন তাঁর রব পবিত্র উপত্যকা 'তুওয়া'য় তাঁকে ডেকে বলেছিলেন,

إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٦﴾

১৭. 'ফির'আউনের কাছে যান, সে তো সীমালজ্ঘন করেছে,'

اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴿١٧﴾

১৮. অতঃপর বলুন, 'তোমার কি আগ্রহ আছে যে, তুমি পবিত্র হও—

فَقُلْ هَل لَّكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ ﴿١٨﴾

১৯. 'আর আমি তোমাকে তোমার রবের দিকে পথপ্রদর্শন করি, যাতে তুমি তাঁকে ভয় কর?'

وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ ﴿١٩﴾

২০. অতঃপর তিনি তাকে মহানিদর্শন দেখালেন[২]।

فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ ﴿٢٠﴾

২১. কিন্তু সে মিথ্যারোপ করল এবং অবাধ্য হল।

فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ﴿٢١﴾

২২. তারপর সে পিছনে ফিরে প্রতিবিধানে সচেষ্ট হল[৩]।

ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ ﴿٢٢﴾

২৩. অতঃপর সে সকলকে সমবেত করে ঘোষণা দিল,

فَحَشَرَ فَنَادَىٰ ﴿٢٣﴾

২৪. অতঃপর বলল, 'আমিই তোমাদের সর্বোচ্চ রব।'

فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ ﴿٢٤﴾

---

(১) কাফেরদের অবিশ্বাস, হটকারিতা ও শত্রুতার ফলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে মর্মপীড়া অনুভব করতেন, তা দূর করার উদ্দেশ্যে মূসা আলাইহিস্ সালাম ও ফির'আউনের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, শত্রুরা কেবল আপনাকেই কষ্ট দেয়নি, পূর্ববর্তী সকল রাসূলকেও কষ্ট দিয়েছে, কিন্তু তাদের পরিণতি হয়েছে ভয়াবহ। সুতরাং আপনিও সবর করুন। [দেখুন, কুরতুবী]

(২) বড় নিদর্শন বলতে সবগুলো মুজিযা উদ্দেশ্য হতে পারে। আবার লাঠির অজগর হয়ে যাওয়া এবং হাত শুভ্র হওয়ার কথাও বুঝানো হতে পারে। [কুরতুবী, মুয়াসসার]

(৩) অর্থাৎ হককে বাতিল দ্বারা প্রতিহত করতে চেষ্টা করতে লাগল। [ইবন কাসীর]

২৫. অতঃপর আল্লাহ্ তাকে আখেরাতে ও দুনিয়ায় কঠিন শাস্তিতে পাকড়াও করলেন[১]।

فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى ﴿٢٥﴾

২৬. নিশ্চয় যে ভয় করে তার জন্য তো এতে শিক্ষা রয়েছে।

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ﴿٢٦﴾

দ্বিতীয় রুকূ’

২৭. তোমাদেরকে[২] সৃষ্টি করা কঠিন, না আসমান সৃষ্টি? তিনিই তা নির্মাণ করেছেন[৩];

ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَآءُ ۚ بَنٰىهَا ﴿٢٧﴾

২৮. তিনি এর ছাদকে সুউচ্চ করেছেন ও সুবিন্যস্ত করেছেন।

رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰىهَا ﴿٢٨﴾

২৯. আর তিনি এর রাতকে করেছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং প্রকাশ করেছেন এর সূর্যালোক;

وَاَغْطَشَ لَيْلَهَا وَاَخْرَجَ ضُحٰىهَا ﴿٢٩﴾

৩০. আর যমীনকে এর পর বিস্তৃত

وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰىهَا ﴿٣٠﴾

(১) نكال শব্দের অর্থ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, যা দেখে অন্যরাও আতঙ্কিত হয়ে যায় এবং শিক্ষা পায়। [কুরতুবী]

(২) কিয়ামত ও মৃত্যুর পরের জীবন যে সম্ভব এবং তা যে সৃষ্টি জগতের পরিবেশ পরিস্থিতির যুক্তিসংগত দাবী একথার যৌক্তিকতা এখানে পেশ করা হয়েছে। [ইবন কাসীর]

(৩) এখানে মরে মাটিতে পরিণত হওয়ার পর পুনরুজ্জীবন কিরূপে হবে, কাফেরদের এই বিস্ময়ের জওয়াব দেওয়া হয়েছে। এখানে সৃষ্টি করা মানে দ্বিতীয়বার মানুষ সৃষ্টি করা। মৃত্যুর পরের জীবন সম্পর্কে এই যুক্তিটিই কুরআনের বিভিন্ন স্থানে পেশ করা হয়েছে। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছেঃ “আর যিনি আকাশ ও পৃথিবী তৈরি করেছেন, তিনি কি এই ধরনের জিনিসগুলোকে (পুনর্বার) সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেন না? কেন নয়? তিনি তো মহাপরাক্রমশালী স্রষ্টা। সৃষ্টি করার কাজ তিনি খুব ভালো করেই জানেন।” [সূরা ইয়াসীন: ৮১] অন্যত্র আরও বলা হয়েছেঃ “অবশ্যি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করা মানুষ সৃষ্টির চাইতে অনেক বেশী বড় কাজ। কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না। [সূরা গাফির: ৫৭ আয়াত] [ইবন কাসীর]

করেছেন[১]।

৩১. তিনি তা থেকে বের করেছেন তার পানি ও তৃণভূমি,

أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ۝٣١

৩২. আর পর্বতকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করেছেন;

وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا ۝٣٢

৩৩. এসব তোমাদের ও তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুগুলোর ভোগের জন্য।

مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ۝٣٣

৩৪. অতঃপর যখন মহাসংকট উপস্থিত হবে[২]

فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ ۝٣٤

৩৫. মানুষ যা করেছে তা সে সেদিন স্মরণ করবে,

يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ ۝٣٥

৩৬. আর প্রকাশ করা হবে জাহান্নাম দর্শকদের জন্য,

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ ۝٣٦

৩৭. সুতরাং যে সীমালঙ্ঘন করে,

فَأَمَّا مَن طَغَىٰ ۝٣٧

৩৮. এবং দুনিয়ার জীবনকে অগ্রাধিকার দেয়।

وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۝٣٨

---

(১) "এরপর তিনি যমীনকে বিছিয়েছেন"-এর অর্থ এ নয় যে, আকাশ সৃষ্টি করার পরই আল্লাহ পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। কেননা, কুরআনে কোথাও পৃথিবী সৃষ্টির ব্যাপারটি আগে এবং আকাশ সৃষ্টির ব্যাপারটি পরে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন সূরা আল-বাকারার ২৯ নং আয়াতে। কিন্তু এ আয়াতে আকাশ সৃষ্টির ব্যাপারটি আগে এবং পৃথিবী সৃষ্টির ব্যাপারটি পরে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি আসলে কোন বিপরীতধর্মী বক্তব্য নয়। কেননা, পৃথিবী সৃষ্টি আকাশ সৃষ্টির পূর্বে হলেও পৃথিবী বিস্তৃতকরণ, পানি ও তৃণ বের করা, পাহাড় স্থাপন ইত্যাদি করা হয়েছে আকাশ সৃষ্টির পর।[ইবন কাসীর]

(২) এই মহাসংকট ও বিপর্যয় হচ্ছে কিয়ামত। এ-জন্য এখানে "আত-তাম্মাতুল কুবরা" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। "তাম্মাহ্‌" বলতে এমন ধরনের মহাবিপদ, বিপর্যয় ও সংকট বুঝায় যা সবকিছুর উপর ছেয়ে যায়। এরপর আবার তার সাথে "কুবরা" (মহা) শব্দ ব্যবহার করে একথা প্রকাশ করা হয়েছে যে সেই বিপদ, সংকট ও বিপর্যয় হবে অতি ভয়াবহ ও ব্যাপক।[দেখুন, কুরতুবী]

فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴿٣٩﴾

৩৯. জাহান্নামই হবে তার আবাস[১]।

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٤٠﴾

৪০. আর যে তার রবের অবস্থানকে[২] ভয় করে এবং কুপ্রবৃত্তি হতে নিজকে বিরত রাখে,

فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴿٤١﴾

৪১. জান্নাতই হবে তার আবাস।

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ﴿٤٢﴾

৪২. তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে, ‘কিয়ামত সম্পর্কে, তা কখন ঘটবে?’

فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا ﴿٤٣﴾

৪৩. তা আলোচনার কি জ্ঞান আপনার আছে?

إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا ﴿٤٤﴾

৪৪. এর পরম জ্ঞান আপনার রবেরই কাছে[৩];

---

(১) এ আয়াতে জাহান্নামীদের কথা বর্ণনা করা হয়েছে: যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা‘আলা ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করবে, আর পার্থিব জীবনকে আখেরাতের উপর অগ্রাধিকার দেবে অর্থাৎ আখেরাতের কাজ ভুলে গিয়ে দুনিয়ার সুখ ও আনন্দকেই অগ্রাধিকার দিবে; তার সম্পর্কে বলা হয়েছে, জাহান্নামই তার আবাস বা ঠিকানা। [সা‘দী]

(২) রবের অবস্থানের দু’টি অর্থ হতে পারে, এক. রবের সামনে হাজির হয়ে হিসাব নিকাশের সম্মুখীন হতে হবে– এ বিশ্বাস করে প্রবৃত্তির অনুসরণ হতে যে নিজেকে হেফাযত করেছে তার জন্য রয়েছে জান্নাত। দুই. রবের যে সুমহান মর্যাদা তাঁর এ উচ্চ মর্তবার কথা স্মরণ করে অন্যায় অশ্লিল কাজ এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে বিরত থেকেছে সে জান্নাতে যাবে। উভয় অর্থই এখানে সঠিক। [বাদা’ই‘উত তাফসীর]

(৩) এ সম্পর্কে অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, “তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে কিয়ামত কখন ঘটবে। বলুন, ‘এ বিষয়ের জ্ঞান শুধু আমার প্রতিপালকেরই আছে। শুধু তিনিই যথাসময়ে উহার প্রকাশ ঘটাবেন; ওটা আকাশমন্ডলী ও যমীনে একটি ভয়ংকর ঘটনা হবে। হঠাৎ করেই উহা তোমাদের উপর আসবে।’ আপনি এ বিষয়ে সবিশেষ জ্ঞাত মনে করে তারা আপনাকে প্রশ্ন করে। বলুন, ‘এ বিষয়ের জ্ঞান শুধু আল্লাহ্‌রই আছে, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না।’[সূরা আল-আরাফ: ১৮৭] এখানে ঠিক এটাকে বলা হয়েছে যে, এর পরম জ্ঞান রয়েছে আপনার রবের কাছেই। হাদীসে জিবরাঈল নামক প্রসিদ্ধ হাদীসেও জিবরাঈলের প্রশ্নের উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একই উত্তর দিয়ে বলেছিলেন, “যাকে প্রশ্ন করা হয়েছে সে প্রশ্নকারীর চেয়ে বেশী জানে না”। [বুখারী: ৫০]

৪৫. যে এটার ভয় রাখে আপনি শুধু তার সতর্ককারী।

إِنَّمَآ أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخۡشَىٰهَا ﴿٤٥﴾

৪৬. যেদিন তারা তা দেখতে পাবে সেদিন তাদের মনে হবে যেন তারা দুনিয়ায় মাত্র এক সন্ধ্যা অথবা এক প্রভাত অবস্থান করেছে[১]!

كَأَنَّهُمۡ يَوۡمَ يَرَوۡنَهَا لَمۡ يَلۡبَثُوٓاْ إِلَّا عَشِيَّةً أَوۡ ضُحَىٰهَا ﴿٤٦﴾

---

(১) দুনিয়ার জীবনের স্বল্পতার বিষয়বস্তুটি পবিত্র কুরআনের অন্যান্য স্থানেও বর্ণিত হয়েছে। যেমন, সূরা ইউনুস, আল-ইসরা, ত্বা-হা, আল-মুমিনূন, আর-রূম, ইয়াসীন ও আহকাফে এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৮০- সূরা 'আবাসা[১]
৪২ আয়াত, ১ রুকূ', মক্কী

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

১. তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন[২],

عَبَسَ وَتَوَلَّىٰٓ ①

২. কারণ তাঁর কাছে অন্ধ লোকটি আসল।

أَن جَآءَهُ ٱلۡأَعۡمَىٰ ②

৩. আর কিসে আপনাকে জানাবে যে, ---সে হয়ত পরিশুদ্ধ হত,

وَمَا يُدۡرِيكَ لَعَلَّهُۥ يَزَّكَّىٰٓ ③

---

(১) এ সূরাটি সাহাবী আবদুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাকতুম রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এর সাথে বিশেষভাবে জড়িত। তাঁর মা উম্মে মাকতুম ছিলেন খাদীজা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার পিতা খুওয়াইলিদের সহোদর বোন। তিনি ছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শ্যালক। বংশ মর্যাদার দিক দিয়ে সমাজের সাধারণ শ্রেণীভুক্ত নন বরং অভিজাত বংশীয় ছিলেন। আবদুল্লাহ্ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু অন্ধ হওয়ার কারণে জানতে পারেননি যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যের সাথে আলোচনারত আছেন। তিনি মজলিসে প্রবেশ করেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আওয়াজ দিতে শুরু করেন এবং বার বার আওয়াজ দেন। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কুরআন এর একটি আয়াতের পাঠ জিজ্ঞাসা করেন এবং সাথে সাথে জওয়াব দিতে পীড়াপীড়ি করেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন মক্কার কাফের নেতৃবর্গের সাথে আলোচনায় মশগুল ছিলেন। এই নেতৃবর্গ ছিলেন ওতবা ইবনে রবীয়া, আবু জাহল ইবনে হিশাম এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিতৃব্য আব্বাস। তিনি তখনও মুসলিম হননি। এরূপ ক্ষেত্রে আবদুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাকতুম রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এর এভাবে কথা বলা এবং মামুলী প্রশ্ন নিয়ে তাৎক্ষনিক জওয়াবের জন্য পীড়াপীড়ি করা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে বিরক্তিকর ঠেকে। এই বিরক্তির প্রধান কারণ ছিল এই যে, আবদুল্লাহ্ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু পাক্কা মুসলিম ছিলেন এবং সদা সর্বদা মজলিসে উপস্থিত থাকতেন। তিনি এই প্রশ্ন অন্য সময়ও রাখতে পারতেন। তাঁর জওয়াব বিলম্বিত করার মধ্যে কোন ধর্মীয় ক্ষতির আশংকা ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা নবীর এ বিরক্তি প্রকাশ পছন্দ করলেন না। তিনি আয়াত নাযিল করে তার প্রতিকার করেন। [দেখুন: তিরমিযী: ৩৩২৮, ৩৩৩১, মুয়াত্তা মালেক: ১/২০৩]

(২) عبس শব্দের অর্থ রুষ্টতা অবলম্বন করা এবং চোখে মুখে বিরক্তি প্রকাশ করা। تولى শব্দের অর্থ মুখ ফিরিয়ে নেয়া। [জালালাইন]

৪.	অথবা উপদেশ গ্রহণ করত, ফলে সে উপদেশ তার উপকারে আসত[১] ।	أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَىٰ ۝٤
৫.	আর যে পরোয়া করে না,	أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ ۝٥
৬.	আপনি তার প্রতি মনোযোগ দিয়েছেন ।	فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ ۝٦
৭.	অথচ সে নিজে পরিশুদ্ধ না হলে আপনার কোন দায়িত্ব নেই,	وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ ۝٧
৮.	অপরদিকে যে আপনার কাছে ছুটে এলো,	وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ ۝٨
৯.	আর সে সশঙ্কচিত্ত,	وَهُوَ يَخْشَىٰ ۝٩
১০.	আপনি তার থেকে উদাসীন হলেন;	فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ ۝١٠
১১.	কখনো নয়, এটা তো উপদেশ বাণী[২],	كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۝١١
১২.	কাজেই যে ইচ্ছে করবে সে এটা স্মরণ রাখবে,	فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ ۝١٢
১৩.	এটা আছে মর্যাদা সম্পন্ন লিপিসমূহে	فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ ۝١٣
১৪.	যা উন্নত, পবিত্র[৩],	مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ ۝١٤

(১) অর্থাৎ আপনি কি জানেন এই সাহাবী যা জিজ্ঞেস করেছিল তা তাকে শিক্ষা দিলে সে তা দ্বারা পরিশুদ্ধ হতে পারত কিংবা কমপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলাকে স্মরণ করে উপকার লাভ করতে পারত । [দেখুন, মুয়াসসার; সা'দী]

(২) অর্থাৎ এমনটি কখনো করবেন না । যে সব লোক আল্লাহকে ভুলে আছে এবং যারা নিজেদের দুনিয়াবী সহায়-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তির অহংকারে মত্ত হয়ে আছে, তাদেরকে অযথা গুরুত্ব দিবেন না । ইসলাম, অহি বা কুরআন এমন কিছু নয় যে, যে ব্যক্তি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে তার সামনে নতজানু হয়ে তা পেশ করতে হবে । বরং সে সত্যের যতটা মুখাপেক্ষী নয় সত্যও তার ততটা মুখাপেক্ষী নয় । বরং তাদেরই ইসলামের মহত্তের সামনে নতজানু হতে হবে । [তাতিম্মাতু আদ্ওয়াউল বায়ান]

(৩) مكرمة অর্থ সম্মানিত, মর্যাদাসম্পন্ন । مرفوعة বলে এর মর্যাদা অনেক উচ্চ–তা বোঝানো হয়েছে । [ইবন কাসীর] আর مطهرة বলে বোঝানো হয়েছে হাসান বসরীর

بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ﴿١٥﴾

১৫. লেখক বা দূতদের হাতে[১]।

كِرَامٍ بَرَرَةٍ ﴿١٦﴾

১৬. (যারা) মহাসম্মানিত ও নেককার।

قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ﴿١٧﴾

১৭. মানুষ ধ্বংস হোক! সে কত অকৃতজ্ঞ[২]!

مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴿١٨﴾

১৮. তিনি তাকে কোন বস্তু থেকে সৃষ্টি করেছেন?

مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ﴿١٩﴾

১৯. শুক্রবিন্দু থেকে, তিনি তাকে সৃষ্টি করেন, পরে তার পরিমিত বিকাশ সাধন করেন[৩],

---

মতে, যাবতীয় নাপাক থেকে পবিত্র। সুদ্দী বলেন, এর অর্থ কাফেররা এটা পাওয়ার অধিকারী নয়। তাদের হাত থেকে পবিত্র। হাসান থেকে অপর বর্ণনায় বলা হয়েছে, এর অর্থ মুশরিকদের উপর নাযিল হওয়া থেকে পবিত্র। [কুরতুবী] ইবন কাসীর বলেন, এর অর্থ এটি বাড়তি-কমতি ও অপবিত্রতা থেকে পবিত্র ও মুক্ত।

(১) سفرة শব্দটি سافر এর বহুবচন হতে পারে। তখন অর্থ হবে লিপিকার বা লেখক। আর যদি سفرة শব্দটি سفارة থেকে আসে, তখন এর অর্থ দূতগণ। এই শব্দ দ্বারা ফেরেশতা উদ্দেশ্য হতে পারে, আবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদেরও উদ্দেশ্য হতে পারে। প্রথমটিই অধিক শুদ্ধ। সহীহ হাদীসে এ السَّفَرَةُ الكِرَامُ الْبَرَرَةُ এর তাফসীর ফেরেশতাদেরই উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 'কেরাআতে বিশেষজ্ঞ কুরআন পাঠক সম্মানিত নেককার দূতদের (ফেরেশতাদের) সাথে থাকবে আর যে ব্যক্তি বিশেষজ্ঞ নয় কিন্তু কষ্টে সৃষ্টে পড়ে সে দ্বিগুণ সওয়াব পাবে। [বুখারী: ৪৯৩৭, মুসলিম: ৭৯৮] [ইবন কাসীর]

(২) এর অর্থ, সে কত বড় সত্য-অস্বীকারকারী। তাছাড়া এ আয়াতের আর একটি অর্থ হতে পারে। অর্থাৎ "কোন জিনিসটি তাকে সত্য অস্বীকার করতে উদ্বুদ্ধ করেছে?" [তাবারী]

(৩) قدّره অর্থাৎ সুপরিমিত করেছেন, তার গঠন-প্রকৃতি, আকার-আকৃতি সুপরিমিতভাবে সৃষ্টি করেছেন। قدّره শব্দের এরূপ অর্থও হতে পারে যে, মানুষ যখন মাতৃগর্ভে সৃষ্টি হতে থাকে তখন আল্লাহ্ তা'আলা তার কাজ, বয়স, রিযিক, ভাগ্য ইত্যাদি তকদীর নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তাছাড়া পূর্ব থেকেই প্রতিটি মানুষের জন্য নির্দিষ্ট করা আছে তার গায়ের রং কি হবে, সে কতটুকু উঁচু হবে, তার দেহ কতটুকু কি পরিমাণ মোটা ও পরিপুষ্ট হবে। এত সব সত্ত্বেও সে তার রবের সাথে কুফরী করে। [দেখুন, কুরতুবী]

ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ ۙ﴿٢٠﴾	২০. তারপর তার জন্য পথ সহজ করে দেন[১];
ثُمَّ اَمَاتَهٗ فَاَقْبَرَهٗ ۙ﴿٢١﴾	২১. এরপর তার মৃত্যু ঘটান এবং তাকে কবরস্থ করেন ।
ثُمَّ اِذَا شَآءَ اَنْشَرَهٗ ؕ﴿٢٢﴾	২২. এরপর যখন ইচ্ছে তিনি তাকে পুনর্জীবিত করবেন[২] ।
كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَآ اَمَرَهٗ ؕ﴿٢٣﴾	২৩. কখনো নয়, তিনি তাকে যা আদেশ করেছেন, সে এখনো তা পূর্ণ করেনি ।
فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰى طَعَامِهٖۤ ۙ﴿٢٤﴾	২৪. অতঃপর মানুষ যেন তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করে[৩]!

(১) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় ক্ষমতা-বলে মাতৃগর্ভে মানুষকে সৃষ্টি করেন । তারপর তিনিই তার অপার শক্তির মাধ্যমে মাতৃগর্ভ থেকে জীবিত ও পুর্ণাঙ্গ মানুষের বাইরে আসার পথ সহজ করে দেয় । ফলে দেহটি সহী-সালামতে বাইরে চলে আসে এবং মায়েরও এতে তেমন কোন দৈহিক ক্ষতি হয় না । এছাড়া আয়াতের আরেকটি অর্থ হচ্ছে, দুনিয়ায় তিনি তার জন্য নিজের জন্য ভালো বা মন্দ, কৃতজ্ঞতা বা অকৃতজ্ঞতা আনুগত্য বা অবাধ্যতার মধ্যে সে কোন পথ চায় তা তার সামনে খুলে রেখে দিয়েছেন এবং পথ তার জন্য সহজ করে দিয়েছেন । ফলে সে শুকরিয়া আদায় করে সৎপথ গ্রহণ করতে পারে, আবার কুফরী করে বিপথে যেতে পারে । [দেখুন, ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ মৃত্যুর পর আল্লাহ্ তা'আলাই মানুষকে পুনরুজ্জীবিত করবেন । একমাত্র তিনিই এগুলো করার ক্ষমতা রাখেন । তারপরও মানুষ তাঁকে অস্বীকার করে, তাঁর হক আদায় করে না । [সা'দী] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দুই ফুৎকারের মধ্যবর্তী সময় হবে চল্লিশ । আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর সাথীরা বলল, চল্লিশ দিন? আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, আমি এটা বলতে অস্বীকার করছি, তারা বলল, চল্লিশ বছর? তিনি বললেন, আমি এটা বলতেও অস্বীকার করছি । তারা বলল, তাহলে কি চল্লিশ মাস? তিনি বললেন, আমি এটাও বলতে অস্বীকার করছি । তবে মানুষের সবকিছু পঁচে যায় একমাত্র মেরুদণ্ডের নিম্নভাগের একটি ছোট্ট কোষ ব্যতীত । তার উপরই আবার সৃষ্টি জড়ো হবে ।" [বুখারী: ৪৮১৪, মুসলিম: ২৯৫৫]

(৩) মানবসৃষ্টির সূচনা উল্লেখ করার পর মানুষ যে খাদ্যের নেয়ামত ভোগ করে, এখানে সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে । অর্থাৎ খাদ্য সম্পর্কে তার একবার চিন্তা

২৫. নিশ্চয় আমরা প্রচুর বারি বর্ষণ করি,	أَنَّا صَبَبْنَا الْمَآءَ صَبًّا ﴿٢٥﴾
২৬. তারপর আমরা যমীনকে যথাযথভাবে বিদীর্ণ করি;	ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ﴿٢٦﴾
২৭. অতঃপর তাতে আমরা উৎপন্ন করি শস্য;	فَأَنۢبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ﴿٢٧﴾
২৮. আঙ্গুর, শাক-সব্জি,	وَّعِنَبًا وَّقَضْبًا ﴿٢٨﴾
২৯. যায়তূন, খেজুরগাছ,	وَّزَيْتُونًا وَّنَخْلًا ﴿٢٩﴾
৩০. অনেক গাছবিশিষ্ট উদ্যান,	وَّحَدَآئِقَ غُلْبًا ﴿٣٠﴾
৩১. ফল এবং গবাদি খাদ্য(১),	وَّفَاكِهَةً وَّأَبًّا ﴿٣١﴾
৩২. এগুলো তোমাদের ও তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুদের ভোগের জন্য(২) ।	مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ﴿٣٢﴾
৩৩. অতঃপর যখন তীক্ষ্ণ আওয়াজ আসবে(৩),	فَإِذَا جَآءَتِ الصَّآخَّةُ ﴿٣٣﴾
৩৪. সেদিন মানুষ পালিয়ে যাবে তার ভাইয়ের কাছ থেকে,	يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿٣٤﴾

করা প্রয়োজন– কিভাবে এই খাদ্য উৎপন্ন হয়। আল্লাহ যদি এর উপকরণগুলো সরবরাহ না করতেন তাহলে কি জমি থেকে এই খাদ্য উৎপন্ন করার ক্ষমতা মানুষের ছিল? এসব নেয়ামতসমূহ তিনি মানুষকে দিয়েছেন যাতে মানুষ কিয়ামতের প্রস্তুতির জন্য এর সাহায্যে আল্লাহ্‌র ইবাদত করে । [কুরতুবী]

(১) أَبّ শব্দটির উপরোক্ত অর্থ ইবনে আব্বাস ও উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম থেকে সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। [সহীহ ইবনে খুযাইমাহ: ২১৭২]

(২) অর্থাৎ কেবল তোমাদের জন্যই নয়, তোমাদের যেসব গবাদি-গৃহপালিত পশু রয়েছে, তাদের জন্যও। এসব নেয়ামতের দিকে দৃষ্টিপাত করলে মহান আল্লাহ্‌র ইবাদত, তার প্রতি শুকরিয়া আদায় করা ও তার নির্দেশাবলি মেনে চলার প্রয়োজনীয়তা ফুটে ওঠে।

(৩) আয়াতে বর্ণিত الصاخة শব্দটির মূল অর্থ হলো, 'এমন কঠোর ডাক যার ফলে মানুষ শ্রবণশক্তি হারিয়ে ফেলে।' এখানে কিয়ামতের দ্বিতীয় শিংগাধ্বনির কথা বলা হয়েছে। যা পুনরুত্থানের শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া বোঝায়। এই বিকট আওয়ায বুলন্দ হবার সাথে সাথেই মরা মানুষেরা জীবিত হয়ে উঠবে এবং কেয়ামতের মাঠে উপস্থিত হবে। [মুয়াসসার, জালালাইন]

وَأُمِّهِۦ وَأَبِيهِ ﴿٣٥﴾

৩৫. এবং তার মাতা, তার পিতা,

وَصَٰحِبَتِهِۦ وَبَنِيهِ ﴿٣٦﴾

৩৬. তার পত্নী ও তার সন্তান থেকে[১],

لِكُلِّ ٱمْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴿٣٧﴾

৩৭. সেদিন তাদের প্রত্যেকের হবে এমন গুরুতর অবস্থা যা তাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যস্ত রাখবে[২]।

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ﴿٣٨﴾

৩৮. অনেক চেহারা সেদিন হবে উজ্জ্বল,

ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ﴿٣٩﴾

৩৯. সহাস্য ও প্রফুল্ল,

وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿٤٠﴾

৪০. আর অনেক চেহারা সেদিন হবে ধূলিধূসর

تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ﴿٤١﴾

৪১. সেগুলোকে আচ্ছন্ন করবে কালিমা।

أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَفَرَةُ ٱلْفَجَرَةُ ﴿٤٢﴾

৪২. এরাই কাফির ও পাপাচারী।

---

(১) এখানে হাশরের ময়দানে সকলের সমাবেশের দিন বোঝানো হয়েছে, সেদিন প্রত্যেক মানুষ আপন চিন্তায় বিভোর হবে। সেদিন মানুষ তার অতি-নিকটাত্মীয়কে দেখলেও মুখ লুকাবে এবং পালিয়ে বেড়াবে। [ইবন কাসীর] প্রায় এই একই ধরনের বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে সূরা মা'আরিজের ১০ থেকে ১৪ পর্যন্ত আয়াতে।

(২) প্রত্যেক মানুষ তার ভ্রাতার কাছ থেকে এবং পিতা মাতা স্ত্রী এবং সন্তানদের কাছ থেকে সেদিন মুখ লুকিয়ে ফিরবে। দুনিয়াতে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা ভ্রাতাদের মধ্যে হয়। এর চেয়ে বেশী পিতা-মাতাকে সাহায্য করার চিন্তা করা হয় এবং স্বভাবগত কারণে এর চেয়েও বেশী স্ত্রী এবং সন্তানদের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আয়াতে নীচ থেকে উপরের সম্পর্ক যথাক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে। [কাতাদা: দেখুন, ইবন কাসীর] হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষ একেবারেই উলংগ হয়ে উঠবে। একথা শুনে তার পবিত্র স্ত্রীদের মধ্য থেকে কোন একজন ঘাবড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের লজ্জাস্থান কি সেদিন সবার সামনে খোলা থাকবে? জবাবে রাসূলুল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই আয়াতটি তেলাওয়াত করে বলেন, সেদিন অন্যের দিকে তাকাবার মতো হুঁশ ও চেতনা কারো থাকবে না। [নাসাঈ:২০৮৩, তিরমিযী: ৩৩৩২, ইবনে মাজাহ: ৪২৭৬, মুসনাদে আহমাদ: ৬/৮৯]।

৮১- সূরা আত-তাকভীর[১]
২৯ আয়াত, মক্কী

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

১. সূর্যকে যখন নিষ্প্রভ করা হবে[২], إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴿١﴾

২. আর যখন নক্ষত্ররাজি খসে পড়বে[৩], وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ ﴿٢﴾

---

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে কেউ কেয়ামতকে প্রত্যক্ষ দেখতে চায় সে যেন সূরা 'ইযাস সামছু কুওয়িরাত, ইযাস সামায়ুন ফাতারাত ও ইযাস সামায়ূন সাক্কাত' পড়ে। [তিরমিযী: ৩৩৩৩, মুসনাদে আহমাদ: ২/২৭, ৩৬, ১০০, মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৫১৫] এখানে প্রথম ছয়টি আয়াতের ভাষ্য কিয়ামতের প্রথম অংশ অর্থাৎ শিঙ্গায় প্রথমবার যে ফুৎকার দেয়া হবে তার সাথে সংশ্লিষ্ট। উবাই ইবন কাব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, 'কেয়ামতের পূর্বে ছয়টি নিদর্শন রয়েছে। মানুষ যখন হাটে-বাজারে থাকবে, তখন হঠাৎ সূর্যের আলো চলে যাবে এবং তারকারাজি দেখা যাবে; ফলে তারা আশ্চর্য হবে। তারা তাকিয়ে দেখার সময়েই হঠাৎ করে তারাগুলো খসে পড়বে। এরপর পাহাড়গুলো মাটির উপর পড়বে, নড়া-চড়া করবে এবং পুড়ে যাবে; ফলে বিক্ষিপ্ত ধুলোর মত হয়ে যাবে। তখন মানুষ জিনের কাছে এবং জিন মানুষের কাছে ছুটে আসবে। জন্তু-জানোয়ার-পাখি সব মিশে যাবে এবং একে অপরের সাথে একত্রিত হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "আর যখন বন্য পশুগুলোকে একত্র করা হবে" [সূরা তাকভীর: ৫] তারপর জিন মানুষদের বলবে, আমরা তোমাদের নিকট সংবাদ নিয়ে আসছি। তারা যখন সাগরের নিকট যাবে তখন দেখবে তাতে আগুন জ্বলছে। এ সময়ে সপ্ত যমীন পর্যন্ত এবং সপ্ত আসমান পর্যন্ত এক ফাটল ধরবে। এরপর এক বায়ু এসে তাদেরকে মৃত্যুবরণ করাবে।' [তাবারী]

(২) আরবী ভাষায় তাকভীর মানে হচ্ছে গুটিয়ে নেয়া। মাথায় পাগড়ী বাঁধার জন্য "তাকভীরুল 'ইমামাহ" বলা হয়ে থাকে। কারণ ইমামা তথা পাগড়ী লম্বা কাপড়ের হয়ে থাকে এবং মাথার চারদিকে তা জড়িয়ে নিতে হয়। এই সাদৃশ্য ও সম্পর্কের কারণে সূর্য থেকে যে আলোক রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়ে সমগ্র সৌরজগতে ছড়িয়ে পড়ে তাকে পাগড়ীর সাথে তুলনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, কিয়ামতের দিন এই সূর্যকে গুটিয়ে নেয়া হবে। অর্থাৎ তার আলোক বিচ্ছুরণ বন্ধ হয়ে যাবে। তাছাড়া كُوِّرَتْ এর অপর অর্থ নিক্ষেপ করাও হয়ে থাকে। হাদীসে এসেছে, "চাঁদ ও সূর্যকে কিয়ামতের দিন পেঁচিয়ে রাখা হবে।" [বুখারী: ৩২০০] [ইবন কাসীর]

(৩) অর্থাৎ যে বাঁধনের কারণে তারা নিজেদের কক্ষপথে ও নিজেদের জায়গায় বাঁধা আছে তা খুলে যাবে এবং সমস্ত গ্রহ-তারকা বিশ্ব-জাহানের চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে। এ ছাড়াও তারা শুধু ছড়িয়েই পড়বে না বরং এই সঙ্গে আলোহীন হয়ে অন্ধকারও হয়ে যাবে। [সাদী]

৩. আর পর্বতসমূহকে যখন চলমান করা হবে[১], وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ۝

৪. আর যখন পূর্ণগর্ভা মাদী উট উপেক্ষিত হবে[২], وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ۝

৫. আর যখন বন্য পশুগুলো একত্র করা হবে, وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ۝

৬. আর যখন সাগরকে অগ্নিউত্তাল করা হবে[৩], وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۝

৭. আর যখন আত্মাগুলোকে সমগোত্রীয়দের সাথে মিলিয়ে দেয়া হবে[৪], وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ۝

---

(১) পাহাড়সমূহকে কয়েকটি পর্যায়ে চলমান করা হবে। প্রথমে তা বিক্ষিপ্ত বালুরাশির মত হবে, তারপর তা ধূনিত পশমের মত হবে, সবশেষে তা উৎক্ষিপ্ত ধুলিকণা হয়ে যাবে এবং তার জায়গায় আর অবস্থিত থাকবে না। [সাদী]

(২) আরবদেরকে কিয়ামতের ভায়াবহ অবস্থা বুঝাবার জন্য এটি ছিল একটি চমৎকার বর্ণনা পদ্ধতি। কেননা কুরআন আরবদেরই সম্বোধন করা হয়েছে। আরবদের কাছে গর্ভবর্তী মাদী উট, যার প্রসবের সময় অতি নিকটে, তার চাইতে বেশী মূল্যবান আর কোন সম্পদই ছিল না । এ সময় তার হেফাজত ও দেখাশুনার জন্য সবচেয়ে বেশী যত্ন নেয়া হতো। এই ধরনের উষ্ট্রীদের থেকে লোকদের গাফেল হয়ে যাওয়ার মানে এই দাঁড়ায় যে, তখন নিশ্চয়ই এমন কোন কঠিন বিপদ লোকদের ওপর এসে পড়বে যার ফলে তাদের নিজেদের এই সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ সংরক্ষণের কথা তাদের খেয়ালই থাকবে না। [ইবন কাসীর, সাদী]

(৩) এর কয়েকটি অর্থ রয়েছে। একটি অর্থ হল অগ্নিসংযোগ করা ও প্রজ্জ্বলিত করা। কেউ কেউ বলেন, সমুদ্রগুলোকে স্ফীত করা হবে। কেউ কেউ এর অর্থ নিয়েছেন, পানি পূর্ণ করা হবে। অন্য কেউ অর্থ নিয়েছেন মিশ্রিত করা অর্থাৎ সমস্ত সমুদ্র এক করে দেয়া হবে, ফলে লবনাক্ত ও সুমিষ্ট পানি একাকার হয়ে যাবে। হাসান ও কাতাদাহ রাহেমাহুমাল্লাহ বলেন, এর অর্থ তার পানিসমূহ নিঃশেষ হয়ে যাবে ফলে তাতে এক ফোটা পানিও থাকবে না। [কুরতুবী]

(৪) এর অর্থ হচ্ছে, যখন মানুষকে জোড়া জোড়া করা হবে। অর্থাৎ মানুষের আমল অনুসারে তাদের শ্রেণীবিভাগ করা হবে। যখন হাশরে সমবেত লোকদেরকে বিভিন্ন দলে দলবদ্ধ করে দেয়া হবে। এই দলবদ্ধকরণ ঈমান ও কর্মের দিক দিয়ে করা

৮. আর যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে[১] জিজ্ঞেস করা হবে, — وَإِذَا الْمَوْءُۥدَةُ سُئِلَتْ ۝٨

৯. কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল[২]? — بِأَىِّ ذَنۢبٍ قُتِلَتْ ۝٩

১০. আর যখন আমলনামাগুলো উন্মোচিত করা হবে, — وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ۝١٠

১১. আর যখন আসমানের আবরণ অপসারিত করা হবে[৩], — وَإِذَا السَّمَآءُ كُشِطَتْ ۝١١

হবে। কাফের এক জায়গায় ও মুমিন এক জায়গায়। কাফের এবং মুমিনের মধ্যেও কর্ম এবং অভ্যাসের পার্থক্য থাকে। এদিকে দিয়ে কাফেরদেরও বিভিন্ন প্রকার দল হবে আর মুমিনদেরও বিশ্বাস এবং কর্মের ভিত্তিতে দল হবে। যারা ভাল হোক মন্দ হোক একই প্রকার কর্ম করবে তাদেরকে এক জায়গায় জড়ো করা হবে। উদাহরণত ইহুদীরা ইহুদীদের সাথে, নাসারারা নাসারাদের সাথে, মুনাফিকরা মুনাফিকদের সাথে এক জায়গায় সমবেত হবে। মূলত হাশরে লোকদের তিনটি প্রধান দল হবে- ১। পূর্ববর্তী সৎকর্মী লোকদের ২। আসহাবুল ইয়ামীনের এবং ৩। আসহাবুশ শিমালের দল। প্রথমোক্ত দুই দল মুক্তি পাবে এবং তৃতীয় দলটি হবে কাফের পাপাচারীদের। তারা মুক্তি পাবে না। [তাবারী, কুরতুবী] এ আয়াতের আরেকটি অর্থও হতে পারে। আর তা হল, 'যখন আত্মাকে দেহের সাথে পুনঃমিলিত করা হবে'। কেয়ামতের সময়ে সকলকে জীবিত করার জন্য প্রথমে দেহকে পুনরায় সৃষ্টি করা হবে। অতঃপর আত্মাকে দেহের সাথে সংযোজন করা হবে। [কুরতুবী, ইবন কাসীর] এ আয়াত এবং এর পূর্ববর্তী আয়াত থেকে কিয়ামতের দ্বিতীয় অংশের আলোচনা শুরু হচ্ছে।

(১) الْمَوْءُوْدَةُ শব্দের অর্থ জীবন্ত প্রোথিত কন্যা। জাহেলিয়াত যুগের কোন কোন আরব গোত্র কন্যা সন্তানকে লজ্জাকর মনে করত এবং জীবন্তই মাটিতে প্রোথিত করে দিত। [ইবন কাসীর, কুরতুবী] পরবর্তীতে ইসলাম এই কুপ্রথার মূলোৎপাটন করে।

(২) কোন কোন মুফাসসির বলেন, এই আয়াতের বর্ণনাভঙ্গীতে মারাত্মক ধরনের ক্রোধের প্রকাশ দেখা যায়। যে পিতা বা মাতা তাদের মেয়েকে জীবিত পুঁতে ফেলেছে আল্লাহর কাছে তারা এত বেশী ঘৃণিত হবে যে, তাদেরকে সম্বোধন করে একথা জিজ্ঞেস করা হবে না, তোমরা এই নিষ্পাপ শিশুটিকে হত্যা করেছিলে কোন অপরাধে? বরং তাদের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে ছোট্ট নিরপরাধ মেয়েকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাকে কোন অপরাধে মেরে ফেলা হয়েছিল? [ইবন কাসীর]

(৩) كشطت এর আভিধানিক অর্থ জন্তুর চামড়া খসানো। [কুরতুবী] এর অর্থ অপসারণ করা, সরিয়ে নেয়া। এ হিসেবে আয়াতের অর্থ এই যে, যখন মাথার উপর ছাদের ন্যায় বিস্তৃত এই আকাশকে অপসারিত করা হবে। [মুয়াসসার, সাদী]

١٢. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ

১২. আর যখন জাহান্নামকে ভীষণভাবে প্রজ্জ্বলিত করা হবে,

١٣. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ

১৩. আর যখন জান্নাত নিকটবর্তী করা হবে,

١٤. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ

১৪. তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই জানবে সে কি উপস্থিত করেছে[১]।

١٥. فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ

১৫. সুতরাং আমি শপথ করছি পশ্চাদপসরণকারী নক্ষত্রের,

١٦. الْجَوَارِ الْكُنَّسِ

১৬. যা চলমান, অপসৃয়মাণ,

١٧. وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ

১৭. শপথ রাতের যখন তা শেষ হয়,[২]

١٨. وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ

১৮. শপথ প্রভাতের যখন তার আবির্ভাব হয়,

١٩. إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ

১৯. নিশ্চয়ই এ কুরআন সম্মানিত রাসূলের আনীত বাণী[৩]

---

(১) অর্থাৎ কেয়ামতের উপরোক্ত পরিস্থিতিতে প্রত্যেকই জেনে নিবে সে কি নিয়ে এসেছে। অর্থাৎ সৎকর্ম কিংবা অসৎকর্ম সব তার দৃষ্টির সামনে এসে যাবে। [মুয়াসসার]

(২) عَسْعَسَ শব্দটির দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি উপরে আছে, তা হচ্ছে বিদায় নেয়া, শেষ হওয়া। অপর অর্থ হল আগমন করা, প্রবেশ করা। তখন আয়াতটির অর্থ হয়, শপথ রাতের, যখন তা আগমন করে। [ইবন কাসীর]

(৩) এখানে সম্মানিত বাণীবাহক ﴿رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ বলতে অহী আনার কাজে লিপ্ত ফেরেশতা জিবরাঈল আলাইহিস্ সালামকে বোঝানো হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে এ-কথাটি আরো সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে। নবী-রাসূলগণের মতো ফেরেশতাগণের বেলায়ও রাসূল শব্দ ব্যবহৃত হয়। উল্লেখিত সবগুলো বিশেষণ জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম এর জন্যে বিনা দ্বিধায় প্রযোজ্য। তিনি যে শক্তিশালী, তা অন্যত্রও বলা হয়েছে, ﴿عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ﴾ "তাঁকে শিক্ষা দান করে শক্তিশালী" [সূরা আন-নাজম:৫]। তিনি যে আরশ ও আকাশবাসী ফেরেশতাগণের মান্যবর তা মি'রাজের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে; তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাথে নিয়ে আকাশে পৌছলে তাঁর আদেশে ফেরেশতারা আকাশের দরজাসমূহ খুলে দেয়। তিনি যে أمين তথা বিশ্বাসভাজন তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না; আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই তার আমানত বা বিশ্বস্ততার ঘোষণা দিয়েছেন, তাকে অহীর আমানত দিয়েছেন। [ইবন কাসীর, কুরতুবী]

২০. যে সামর্থ্যশালী, আরশের মালিকের কাছে মর্যাদা সম্পন্ন,

ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿٢٠﴾

২১. সে মান্য সেখানে, বিশ্বাসভাজন(১)।

مُّطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ﴿٢١﴾

২২. আর তোমাদের সাথী উন্মাদ নন(২),

وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ ﴿٢٢﴾

২৩. তিনি তো তাকে স্পষ্ট দিগন্তে দেখেছেন(৩),

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ ﴿٢٣﴾

আর কুরআনকে "বাণীবাহকের বাণী" বলার অর্থ এই নয় যে, এটি ঐ সংশ্লিষ্ট ফেরেশতার নিজের কথা। বরং "বাণীবাহকের বাণী" শব্দ দু'টিই একথা প্রকাশ করছে যে, এটি সেই সত্তার বাণী যিনি তাকে বাণীবাহক করে পাঠিয়েছেন। সূরা 'আল-হাক্কা'র ৪০ আয়াতে এভাবে কুরআনকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী বলা হয়েছে। সেখানেও এর অর্থ এই নয় যে, এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের রচনা। বরং একে "রাসূলে করীমের" বাণী বলে একথা সুস্পষ্ট করা হয়েছে যে, আল্লাহর রাসূল হিসেবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটি পেশ করছেন, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ হিসেবে নয়। উভয় স্থানে বাণীকে ফেরেশতা ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে সম্পর্কিত করার কারণ হচ্ছে এই যে, আল্লাহর বাণী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে বাণীবহনকারী ফেরেশতার মুখ থেকে এবং লোকদের সামনে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে উচ্চারিত হচ্ছিল। [বাদায়িউত তাফসীর]

(১) অর্থাৎ এই কুরআন একজন সম্মানিত দূতের আনীত কালাম। তিনি শক্তিশালী, আরশের অধিপতির কাছে মর্যাদাশীল। তিনি ফেরেশতাদের নিকট মান্য। সমস্ত ফেরেশতা তাকে মান্য করে। তিনি আল্লাহ্র বিশ্বাসভাজন; পয়গাম আনা নেয়ার কাজে তার তরফ থেকে বিশ্বাসভঙ্গ ও কম বেশী করার সম্ভাবনা নেই। নিজের পক্ষ থেকে তিনি কোন কথা আল্লাহর অহীর সাথে মিশিয়ে দেবেন না। বরং তিনি এমন পর্যায়ের আমানতদার যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কিছু বলা হয় সেগুলো তিনি হুবহু পৌঁছিয়ে দেন। [মুয়াসসার, সাদী]

(২) এখানে সাথী বলতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বুঝানো হয়েছে। যারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে উম্মাদ বলত এতে তাদেরকে জওয়াব দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের এ ধারণা ঠিক নয় যে, কুরআনে যা কিছু বর্ণনা করা হচ্ছে এগুলো কোন পাগলের প্রলাপ বা শয়তানের বক্তব্য। [কুরতুবী]

(৩) অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরাঈল আলাইহিস্ সালামকে প্রকাশ্য দিগন্তে, মূল আকৃতিতে দেখেছেন। অন্যত্র বলা হয়েছে, ﴿فَاسْتَوَىٰ ۝ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ﴾ "সে নিজ আকৃতিতে স্থির হয়েছিল, তখন সে ঊর্ধ্বদিগন্তে" [সূরা আন-নাজম:৬-৭] [ইবন কাসীর] এই দেখার কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, তিনি ওহী নিয়ে আগমনকারী

২৪. তিনি গায়েবী বিষয় সম্পর্কে কৃপণ নয়(১) ।	وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ۝٢٤
২৫. আর এটা কোন অভিশপ্ত শয়তানের বাক্য নয় ।	وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَٰنٍ رَّجِيمٍ ۝٢٥
২৬. কাজেই তোমরা কোথায় যাচ্ছ?!	فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ۝٢٦
২৭. এ তো শুধু সৃষ্টিকুলের জন্য উপদেশ,	إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَٰلَمِينَ ۝٢٧
২৮. তোমাদের মধ্যে যে সরল পথে চলতে চায়, তার জন্য(২) ।	لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ۝٢٨
২৯. আর তোমরা ইচ্ছে করতে পার না, যদি না সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ্ ইচ্ছে করেন(৩) ।	وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ ۝٢٩

জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম এর সাথে পরিচিত ছিলেন। তাকে আসল আকার আকৃতিতেও দেখেছিলেন। তাই এই ওহীতে কোনরূপ সন্দেহ সংশয়ের অবকাশ নেই।

(১) অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের কাছ থেকে কোন কথা গোপন রাখেন না। গায়েব থেকে তার কাছে যে-সব তথ্য বা অহী আসে তা সবই তিনি একটুও কমবেশী না করে তোমাদের কাছে বর্ণনা করেন। [সা'দী]

(২) অন্য কথায় বলা যায়, এ বাণীটি তো সারা দুনিয়ার মানুষের জন্য উপদেশ একথা ঠিক, কিন্তু এর থেকে ফায়দা একমাত্র সেই ব্যক্তি হাসিল করতে পারে যে নিজে সত্য-সরল পথে চলতে চায়। এ উপদেশ থেকে উপকৃত হবার জন্য মানুষের সত্য-সন্ধানী ও সত্য প্রিয় হওয়া প্রথম শর্ত। [বাদায়িউত তাফসীর]

(৩) অর্থাৎ তোমরা সরল পথে চলতে চাইলে এবং আল্লাহ্র দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে চাইলেই থাকতে পারবে না যতক্ষণ আল্লাহ্ ইচ্ছা না করবেন। সুতরাং তাঁর কাছেই তাওফীক কামনা করো। তবে এটা সত্য যে, কেউ যদি আল্লাহ্র পথে চলতে ইচ্ছে করে তবে আল্লাহ্ও তাকে সেদিকে চলতে সহযোগিতা করেন। মূলত আল্লাহ্র ইচ্ছা হওয়ার পরই বান্দার সে পথে চলার তাওফীক হয়। বান্দার ইচ্ছা আল্লাহ্র ইচ্ছা অনুসারেই হয়। তবে যদি ভাল কাজ হয় তাতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি থাকে, এটাকে বলা হয় 'আল্লাহ্র শরীয়তগত ইচ্ছা'। পক্ষান্তরে খারাপ কাজ হলে আল্লাহ্র ইচ্ছায় সংঘটিত হলেও তাতে তাঁর সন্তুষ্টি থাকে না। এটাকে বলা হয় 'আল্লাহ্র প্রাকৃতিক ইচ্ছা'। এ দু' ধরনের ইচ্ছার মধ্যে পার্থক্য না করার কারণে অতীতে ও বর্তমানে অনেক দল ও ফের্কার উদ্ভব ঘটেছে। [দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, আল-ইস্তেকামাহ: ১/৪৩৩; মিনহাজুস সুন্নাহ: ৩/১৬৪]

৮২- সূরা আল-ইন্‌ফিতার
১৯ আয়াত, মক্কী

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. যখন আসমান বিদীর্ণ হবে,

إِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ ①

২. আর যখন নক্ষত্রমণ্ডলী বিক্ষিপ্তভাবে ঝরে পড়বে,

وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ②

৩. আর যখন সাগরগুলো বিস্ফোরিত করা হবে,

وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ③

৪. আর যখন কবরসমূহ উন্মোচিত হবে(১),

وَإِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ ④

৫. তখন প্রত্যেকে জানবে, সে কী আগে পাঠিয়েছে ও কী পিছনে রেখে গিয়েছে(২) ।

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ⑤

---

(১) প্রথম তিনটি আয়াতে কিয়ামতের প্রথম পর্বের উল্লেখ করা হয়েছে এবং এই আয়াতে দ্বিতীয় পর্বের কথা বলা হয়েছে। কবর খুলে ফেলার মানে হচ্ছে, তা খুলে তা থেকে মানুষকে আবার নতুন করে জীবিত করে উঠানো। [কুরতুবী]

(২) অর্থাৎ আকাশ বিদীর্ণ হওয়া, নক্ষত্রসমূহ ঝরে পড়া, সমুদ্র একাকার হয়ে যাওয়া, কবর থেকে মৃতদের বের হয়ে আসা ইত্যাকার কেয়ামতের ঘটনা যখন ঘটে যাবে, তখন প্রত্যেকেই জেনে নিবে সে কি অগ্রে প্রেরণ করেছে এবং কি পশ্চাতে ছেড়েছে। মূলে বলা হয়েছে, ﴿مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ﴾। এ শব্দগুলোর কয়েকটি অর্থ হতে পারে এবং সবগুলো অর্থই এখানে প্রযোজ্য। এক. যে ভালো ও মন্দ কাজ করে মানুষ আগে পাঠিয়ে দিয়েছে তাকে مَا قَدَّمَتْ এবং যেগুলো করতে সে বিরত থেকেছে তাকে مَا أَخَّرَتْ বলা যায়। সুতরাং কেয়ামতের দিনে প্রত্যেকেই জেনে নিবে সে সৎ অসৎ কি কর্ম করেছে এবং কি সৎ অসৎ কর্ম করেনি। [তাবারী] দুই. যা কিছু প্রথমে করেছে তা ﴿مَّا قَدَّمَتْ﴾ এবং যা কিছু পরে করেছে তা مَا أَخَّرَتْ এর অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ সম্পাদনের ধারাবাহিকতা ও তারিখ অনুসারে মানুষের প্রত্যেকটি কাজের হিসেব সম্বলিত আমলনামা তার সামনে এসে যাবে। [মুয়াসসার] তিন. যেসব ভালো বা মন্দ কাজ মানুষ তার জীবনে করেছে সেগুলো ﴿مَّا قَدَّمَتْ﴾ এর অন্তরভুক্ত। এ মানুষের সমাজে এসব কাজের যে প্রভাব ও ফলাফল সে নিজের পেছনে রেখে এসেছে সেগুলো مَا أَخَّرَتْ এর অন্তর্ভুক্ত। কাজটি সৎ হলে তার সওয়াব সে পেতে থাকবে এবং অসৎ হলে তার গোনাহ

৬. হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহান রব সম্পর্কে বিভ্রান্ত করল?

يَاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ۙ﴿٦﴾

৭. যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুঠাম করেছেন এবং সুসামঞ্জস্য করেছেন[১],

الَّذِيْ خَلَقَكَ فَسَوّٰىكَ فَعَدَلَكَ ۙ﴿٧﴾

৮. যে আকৃতিতে চেয়েছেন, তিনি তোমাকে গঠন করেছেন[২]।

فِيْٓ اَيِّ صُوْرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ۙ﴿٨﴾

৯. কখনো নয়, তোমরা তো প্রতিদান দিবসে মিথ্যারোপ করে থাক[৩];

كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُوْنَ بِالدِّيْنِ ۙ﴿٩﴾

১০. আর নিশ্চয় নিয়োজিত আছেন তোমাদের উপর সংরক্ষকদল;

وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ ۙ﴿١٠﴾

আমলানামায় লিখিত হতে থাকবে। হাদীসে আছে "যে ব্যক্তি ইসলামে কোন উত্তম সুন্নত ও নিয়ম চালু করে সে তার সওয়াব সবসময় পেতে থাকবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন কুপ্রথা অথবা পাপ কাজ চালু করে যতদিন মানুষ এই পাপ কাজ করবে ততদিন তার আমলনামায় এর গোনাহ লিখিত হতে থাকবে।" [তিরমিযী: ২৬৭৫, ইবনে মাজাহ: ২০৭, মুসনাদে আহমাদ: ২/৫০৪] [আত-তাফসীরুস্‌সহীহ]

(১) অর্থাৎ মহান আল্লাহ তোমাকে এই পূর্ণাঙ্গ মানবিক আকৃতি দান করেছেন। তোমার সামনে সব রকমের প্রাণী রয়েছে, তাদের মোকাবিলায় তোমার সবচেয়ে সুন্দর শারীরিক কাঠামো এবং শ্রেষ্ঠ ও উন্নত শক্তি একেবারেই সুস্পষ্ট। অন্যত্র বলা হয়েছে, " অবশ্যই আমরা সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে"। [আদওয়াউল বায়ান]

(২) এখানে মানুষ সৃষ্টির প্রারম্ভিক পর্যায় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তদুপরি তোমার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে সুবিন্যস্ত করেছেন। এরপর বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা সব মানুষকে, যাকে যেরূপে ইচ্ছা সে আকার-আকৃতিতে সৃষ্টি করতে পারেন। তিনি কোটি কোটি মানুষের আকার আকৃতি এমনভাবে গঠন করেছেন যে, পরস্পরের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। আর তা আল্লাহ্ তা'আলার এক বড় নিদর্শন। [আদওয়াউল বায়ান]

(৩) অর্থাৎ যে জিনিসটি তোমাদেরকে ধোঁকায় ফেলে দিয়েছে, তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছে তা হল এই ধারণা যে, দুনিয়ার এই কর্মজগতের পরে আর কোন কর্মফল, প্রতিদান ও বিচারের জগত নেই। এ বিভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন ধারণাই তোমাকে আল্লাহ থেকে গাফেল করে দিয়েছে, মহান আল্লাহ সম্পর্কে বিভ্রান্তিতে ফেলেছে। [ইবন কাসীর]

كِرَامًا كَاتِبِينَ ⑪

১১. সম্মানিত লেখকবৃন্দ;

يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ⑫

১২. তারা জানে তোমরা যা কর[১]।

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ⑬

১৩. পুণ্যবানেরা তো থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে[২];

وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ⑭

১৪. আর পাপাচারীরা তো থাকবে জাহান্নামে[৩];

(১) অর্থাৎ ফেরেশতারা প্রত্যেক ব্যক্তির প্রত্যেকটি কাজ সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত। সব জায়গায় সব অবস্থায় সকল ব্যক্তির সাথে তারা এমনভাবে লেগে আছে যে, তারা জানতেই পারছে না যে, কেউ তাদের কাজ পরিদর্শন করছে। কোন ব্যক্তি কোন নিয়তে কি কাজ করেছে তাও তারা জানতে পারে। তাই তাদের তৈরি করা রেকর্ড একটি পুর্ণাঙ্গ রেকর্ড। এই রেকর্ডের বাইরে কোন কথা নেই। এ সম্পর্কেই সূরা কাহাফের ৪৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে: "কিয়ামতের দিন অপরাধীরা অবাক হয়ে দেখবে তাদের সামনে যে আমলনামা পেশ করা হচ্ছে তার মধ্যে তাদের ছোট বড় কোন একটি কাজও অলিখিত থেকে যায়নি। যা কিছু তারা করেছিল সব হুবহু ঠিক তেমনিভাবেই তাদের সামনে আনা হয়েছে"। [কুরতুবী]

(২) পূণ্যবানেরা কি কি নেয়ামতে থাকবে সেটা জানতে হলে আমাদেরকে পবিত্র কুরআনের অন্যত্র একটু দেখতে হবে। অন্যত্র এসেছে, "অবশ্যই পূণ্যবানদের 'আমলনামা 'ইল্লিয়্যীনে, 'ইল্লিয়্যীন সম্পর্কে আপনি কী জানেন? ওটা চিহ্নিত 'আমলনামা। যারা আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যপ্রাপ্ত তারা তা দেখে। পূণ্যবানগণ তো থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে, তারা সুসজ্জিত আসনে বসে অবলোকন করবে। আপনি তাদের মুখমণ্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের দীপ্তি দেখতে পাবেন। তাদেরকে মোহর করা বিশুদ্ধ পানীয় হতে পান করান হবে; ওটার মোহর মিস্‌কের, এ বিষয়ে প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করুক। ওটার মিশ্রণ হবে তাস্‌নীমের; তা একটা প্রস্রবণ, যা থেকে সান্নিধ্যপ্রাপ্তরা পান করে। [সূরা আল-মুতাফফিফীন: ১৮-২৮]

(৩) পাপাচারীরা কি কঠিন শাস্তিতে থাকবে সেটা জানতেও আমাদেরকে পবিত্র কুরআনের অন্যত্র দেখতে হবে, সেখানে বলা হয়েছে, "কখনো না, পাপাচারীদের 'আমলনামা তো সিজ্জীনে আছে। সিজ্জীন সম্পর্কে আপনি কী জানেন? ওটা চিহ্নিত 'আমলনামা। সেদিন দুর্ভোগ হবে অস্বীকারকারীদের, যারা কর্মফল দিনকে অস্বীকার করে, শুধু প্রত্যেক পাপিষ্ঠ সীমালংঘনকারী এটাকে অস্বীকার করে; তার কাছে আমাদের আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হলে সে বলে, 'এটা পূর্ববর্তীদের উপকথা।' কখনো নয়; বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের হৃদয়ে জঙ্‌ ধরিয়েছে। না, অবশ্যই সেদিন তারা তাদের প্রতিপালক হতে অন্তরিত থাকবে; তারপর তারা তো জাহান্নামে প্রবেশ করবে; তারপর বলা হবে, 'এটাই তা যাকে তোমরা অস্বীকার করতে।" [সূরা আল-মুতাফফিফীন: ৭-১৭]

১৫. তারা প্রতিদান দিবসে তাতে দগ্ধ হবে;

يَّصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّيْنِ ﴿١٥﴾

১৬. আর তারা সেখান থেকে অন্তর্হিত হতে পারবে না[১]।

وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآئِبِيْنَ ﴿١٦﴾

১৭. আর কিসে আপনাকে জানাবে : প্রতিদান দিবস কী?

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ﴿١٧﴾

১৮. তারপর বলি, কিসে আপনাকে জানাবে : প্রতিদান দিবস কী?

ثُمَّ مَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ﴿١٨﴾

১৯. সেদিন কেউ কারও জন্য কিছু করার মালিক হবে না; আর সেদিন সব বিষয়ের কর্তৃত্ব হবে আল্লাহ্‌র[২]।

يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْـًٔا ؕ وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ﴿١٩﴾

(১) জাহান্নামীরা কোন সময় জাহান্নাম থেকে পৃথক হবে না, অনুপস্থিত থাকতে পারবে না; মৃত্যুর মাধ্যমেও নয়, বের হওয়ার মাধ্যমেও নয়। সেখানে তাদের জন্যে চিরকালীন আযাবের নির্দেশ আছে। [মুয়াসসার, সা'দী]

(২) অর্থাৎ হাশরের ময়দানে কোন ব্যক্তি নিজ ইচ্ছায় অন্যের কোন উপকার করতে পারবে না এবং কারও কষ্ট লাঘবও করতে পারবে না; অপর ব্যক্তি তার যত প্রিয় ও কাছের মানুষ-ই হোক না কেন। অনুরূপভাবে সুপারিশও কারও নিজ ইচ্ছার উপর হবে না, যে পর্যন্ত আল্লাহ কাউকে কারও জন্যে সুপারিশ করার অনুমতি না দেন। একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই সকল আদেশের মালিক। তিনি স্বীয় কৃপায় কাউকে সুপারিশের অনুমতি দিলে এবং তা কবুল করলে তাও তাঁরই আদেশ হবে। [ইবন কাসীর, সা'দী]।

৮৩- সূরা আল-মুতাফ্‌ফিফীন[১]
৩৬ আয়াত, মক্কী

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ①

১. দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়[২],

---

(১) বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনায় তশরীফ আনেন, তখন মদীনাবাসীদের সাধারণ কাজ কারবার 'কাইল' তথা মাপের মাধ্যমে সম্পন্ন হত। তারা এ ব্যাপারে চুরি করা ও কম মাপায় খুবই অভ্যস্ত ছিল। এর প্রেক্ষিতে সূরা আল-মুতাফফেফীন নাযিল হয়। এই সূরা নাযিল হওয়ার পর তারা এই বদ-আভ্যাস থেকে বিরত হয় এবং এমন বিরত হয় যে, আজ পর্যন্ত তাদের সুখ্যাতি সর্বজনবিদিত। [নাসায়ী: আস-সুনানুল কুবরা: ১১৫৯০, ইবনে মাজাহ: ২২২৩]

(২) تَطْفِيْفٌ এর অর্থ মাপে কম করা। যে এরূপ করে তাকে বলা হয় مُطَفِّف। [কুরতুবী] কুরআনের এই আয়াত ও বিভিন্ন হাদীসে মাপ ও ওজনে কম করাকে হারাম করা হয়েছে এবং সঠিকভাবে ওজন ও পরিমাপ করার জন্য কড়া তাগিদ করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে: "ইনসাফ সহকারে পুরো ওজন ও পরিমাপ করো। আমি কাউকে তার সামর্থের চাইতে বেশীর জন্য দায়িত্বশীল করি না।" [সূরা আল-আন'আম:১৫২] আরও বলা হয়েছে: "মাপার সময় পুরো মাপবে এবং সঠিক পাল্লা দিয়ে ওজন করবে।" [সূরা আল-ইসরা: ৩৫] অন্যত্র তাকীদ করা হয়েছে: "ওজনে বাড়াবাড়ি করো না, ঠিক ঠিকভাবে ইনসাফের সাথে ওজন করো এবং পাল্লায় কম করে দিয়ো না। [সূরা আর-রহমান: ৮-৯] শু'আইব আলাইহিস্ সালামের সম্প্রদায়ের ওপর এ অপরাধের কারণে আযাব নাযিল হয় যে, তাদের মধ্যে ওজনে ও মাপে কম দেওয়ার রোগ সাধারণভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং শু'আইব আলাইহিস্ সালাম এর বারবার নসীহত করা সত্ত্বেও এ সম্প্রদায়টি এ অপরাধমূলক কাজটি থেকে বিরত থাকেনি। তবে আয়াতে উল্লেখিত تطفيف শুধু মাপ ও ওজনের মধ্যেই সীমিত থাকবে না; বরং মাপ ও ওজনের মাধ্যমে হোক, গণনার মাধ্যমে হোক অথবা অন্য কোন পন্থায় প্রাপককে তার প্রাপ্য কম দিলে তা تطفيف এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে হারাম হবে। সুতরাং প্রত্যেক প্রাপকের প্রাপ্য পূর্ণমাত্রায় দেয়াই যে আয়াতের উদ্দেশ্য এ কথা বলাই বাহুল্য। উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু জনৈক ব্যক্তিকে আসরের সালাতে না দেখে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। সে একটি ওজর পেশ করল। তখন তিনি তাকে বললেন, طَفَّفت অর্থাৎ 'তুমি আল্লাহ্‌র প্রাপ্য আদায়ে কমতি করেছ।' এই উক্তি উদ্ধৃত করে ইমাম মালেক রাহেমাহুল্লাহ বলেন, 'প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় দেয়া ও কম করা আছে [মুয়াত্তা মালেক: ১/১২, নং ২২]। তাছাড়া ঝগড়া-বিবাদের

২. যারা লোকদের কাছ থেকে মেপে নেয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে,	الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ۟ۖ
৩. আর যখন তাদেরকে মেপে দেয় অথবা ওজন করে দেয়, তখন কম দেয়।	وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ۟ؕ
৪. তারা কি বিশ্বাস করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে	اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓىِٕكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ ۟ۙ
৫. মহাদিনে?	لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ ۟ۙ
৬. যেদিন দাঁড়াবে সমস্ত মানুষ সৃষ্টিকুলের রবের সামনে![1]	يَّوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۟ؕ
৭. কখনো না, পাপাচারীদের আমলনামা তো সিজ্জীনে[2] আছে।	كَلَّاۤ اِنَّ كِتٰبَ الْفُجَّارِ لَفِيْ سِجِّيْنٍ ۟ؕ
৮. আর কিসে আপনাকে জানাবে 'সিজ্জীন' কী?	وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا سِجِّيْنٌ ۟ؕ

সময় নিজের দলীল-প্রমাণাদি পেশ করার পর প্রতিপক্ষের দলীল-প্রমাণাদি পেশ করার সুযোগ দেয়াও এর অন্তর্ভুক্ত। [সা'দী]

(১) ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: 'যেদিন সমস্ত মানুষ জগতসমূহের রবের সামনে দাঁড়াবে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ তাদের কানের মধ্যভাগ পর্যন্ত ঘামে ডুবে থাকবে।' [বুখারী: ৬৫৩১, মুসলিম: ২৮৬২] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: 'কিয়ামতের দিন সূর্যকে সৃষ্টির এত নিকটে আনা হবে যে, তাদের মধ্যে দুরত্ব হবে এক 'মাইল'। বর্ণনাকারী বলেন: আমি জানি না এখানে মাইল বলে পরিচিত এক মাইল না সুরমাদানি (যা আরবিতে মাইল বলা হয় তা) বুঝানো হয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'মানুষ তাদের স্বীয় আমল অনুযায়ী ঘামের মধ্যে নিমজ্জিত থাকবে। কারও ঘাম হবে গোড়ালি পর্যন্ত, কারও হবে হাঁটু পর্যন্ত। আবার কারও ঘাম হবে কোমর পর্যন্ত; কারও ঘাম মুখের লাগামের মত হবে।' তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মুখের দিকে ইশারা করেন। [মুসলিম: ২৮৬৪]

(২) سجين শব্দটি سجن থেকে গৃহীত। سجن এর অর্থ সংকীর্ণ জায়গায় বন্দী করা। [ইবন কাসীর] আর سجّين এর অর্থ চিরস্থায়ী কয়েদ। [মুয়াসসার] এটি একটি বিশেষ স্থানের নাম। যেখানে কাফেরদের রূহ অবস্থান করে। অথবা এখানেই তাদের আমলনামা থাকে। [জালালাইন]

৯. চিহ্নিত আমলনামা[১] ।

كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ۝

১০. সেদিন দুর্ভোগ হবে মিথ্যারোপকারীদের,

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝

১১. যারা প্রতিদান দিবসে মিথ্যারোপ করে,

الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ۝

১২. আর শুধু প্রত্যেক পাপিষ্ঠ সীমালংঘনকারীই এতে মিথ্যারোপ করে;

وَمَا يُكَذِّبُ بِهٖٓ اِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ ۝

১৩. যখন তার কাছে আমাদের আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হয় তখন সে বলে, (এ তো) 'পূর্ববর্তীদের উপকথা ।'

اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ۝

১৪. কখনো নয়; বরং তারা যা অর্জন করেছে তা-ই তাদের হৃদয়ে জঙ্ ধরিয়েছে[২] ।

كَلَّا بَلْ ۜ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝

(১) مرقوم শব্দের কয়েকটি অর্থ আছে, লিখিত, চিহ্নিত এবং মোহরাঙ্কিত । [কুরতুবী] অর্থাৎ কিতাবটি লিখা শেষ হওয়ার পর তাতে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে ফলে তাতে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটবে না । আর কিতাব বলতে, আমলনামা বোঝানো হয়েছে । ইবনে কাসীর বলেন, এটা সিজ্জীনের তাফসীর নয়; বরং পূর্ববর্তী ﴿كِتٰبَ الْفُجَّارِ﴾ এর বর্ণনা । অর্থ এই যে, কাফের ও পাপাচারীদের আমলনামা মোহর লাগিয়ে সংরক্ষিত করা হবে । ফলে এতে হ্রাস-বৃদ্ধি ও পরিবর্তনের সম্ভাবনা থাকবে না । এই সংরক্ষণের স্থান হবে সিজ্জীন । এর প্রমাণ আমরা বারা ইবনে আযিব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণিত হাদীসে দেখতে পাই । সেখানে বলা হয়েছে, মহান আল্লাহ্ কাফেরদের রূহ হরণ হওয়ার পর বলবেন, اكْتُبُوْا كِتَابَه فِي سِجِّيْنٍ فِي الأَرْضِ السُّفْلَى "তার কিতাবকে সর্বনিম্ন যমীনে সিজ্জীনে লিখে রাখ" । [মুসনাদে আহমাদ: ৪/২৮৭]

(২) ران শব্দটি رين থেকে উদ্ভূত । অর্থ প্রাধান্য বিস্তার করা । [কুরতুবী] ঢেকে ফেলা । [তাতিম্মাতু আদওয়াইল বায়ান] যাজ্জাজ বলেন, মরিচা ও ময়লা । [কুরতুবী] অর্থাৎ শাস্তি ও পুরস্কারকে গল্প বা উপকথা গণ্য করার কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই । কিন্তু যে কারণে তারা একে গল্প বলছে তা হচ্ছে এই যে, এরা যেসব গোনাহে লিপ্ত রয়েছে তাদের অন্তরে মরিচা ধরেছে । মরিচা যেমন লোহাকে খেয়ে মাটিতে পরিণত করে দেয়, তেমনি তাদের পাপের মরিচা তাদের অন্তরের যোগ্যতা নিঃশেষ করে দিয়েছে । ফলে তারা ভাল ও মন্দের পার্থক্য বোঝে না । ফলে পুরোপুরি যুক্তিসংগত কথাও এদের কাছে গল্প বলে মন হচ্ছে । [ইবন কাসীর] এই জং ও মরীচার ব্যাখ্যায়

كَلَّآ إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ﴿١٥﴾

১৫. কখনো নয়; নিশ্চয় সেদিন তারা তাদের রব হতে অন্তরিত থাকবে(১);

ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا۟ ٱلْجَحِيمِ ﴿١٦﴾

১৬. তারপর নিশ্চয় তারা জাহান্নামে দগ্ধ হবে;

ثُمَّ يُقَالُ هَٰذَا ٱلَّذِى كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ ﴿١٧﴾

১৭. তারপর বলা হবে, 'এটাই তা যাতে তোমরা মিথ্যারোপ করতে।'

كَلَّآ إِنَّ كِتَٰبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِى عِلِّيِّينَ ﴿١٨﴾

১৮. কখনো নয়, নিশ্চয় পূণ্যবানদের আমলনামা 'ইল্লিয়্যীনে'(২),

وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا عِلِّيُّونَ ﴿١٩﴾

১৯. আর কিসে আপনাকে জানাবে 'ইল্লিয়্যীন' কী?

كِتَٰبٌ مَّرْقُومٌ ﴿٢٠﴾

২০. চিহ্নিত আমলনামা(৩)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: বান্দা যখন কোন গোনাহ করে, তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। সে তওবা করলে দাগটি উঠে যায়। কিন্তু যদি সে গোনাহ করে যেতেই থাকে তাহলে সমগ্র দিলের ওপর তা ছেয়ে যায়। [তিরমিযী: ৩৩৩৪ ইবনে মজাহ: ৪২৪৪]

(১) অর্থাৎ কেয়ামতের দিন এই কাফেররা তাদের রবের দীদার বা দর্শন ও যেয়ারত থেকে বঞ্চিত থাকবে এবং পর্দার আড়ালে অবস্থান করবে। এই আয়াত থেকে জানা যায় যে, সেদিন মুমিনগণ আল্লাহ্ তা'আলার দীদার ও যেয়ারত লাভে ধন্য হবে। নতুবা কাফেরদেরকে পর্দার অন্তরালে রাখার কোন উপকারিতা নেই। [ইবন কাসীর]

(২) কারও কারও মতে عِلِّيِّيْنَ শব্দটি علوّ এর বহুবচন। উদ্দেশ্য উচ্চতা। [ইবন কাসীর] আবার কেউ কেউ বলেন, এটা জায়গার নাম- বহুবচন নয়। [কুরতুবী; ইবন কাসীর] বারা ইবনে আযেব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর হাদীসে এসেছে যে, ফেরশেতাগণ রূহ নিয়ে উঠতেই থাকবেন حَتَّى يُنْتَهٰى بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ اكْتُبُوا كِتَابَ عَبْدِي فِي عِلِّيِّينَ "শেষ পর্যন্ত সপ্তম আসমানে উঠবেন তখন মহান আল্লাহ্ বলবেন, আমার বান্দার কিতাব ইল্লিয়্যীনে লিখে নাও" [মুসনাদে আহমাদ:৪/২৮৭]। এ থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ইল্লিয়্যীন সপ্তম আকাশে আরশের কাছে এক স্থানের নাম। এতে মুমিনদের রূহ ও আমলনামা রাখা হয়। [ইবন কাসীর ইবন আব্বাস থেকে]

(৩) এখানেও এটাই সঠিক যে, এটা 'ইল্লীয়্যীন' এর কোন বিশেষণ নয়, বরং পূর্বে উল্লেখিত ﴿كِتَٰبَ ٱلْأَبْرَارِ﴾ এর বিশেষণ। [দেখুন, কুরতুবী; ইবন কাসীর] এর প্রমাণ উপরোক্ত বারা ইবনে আযেব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণিত হাদীসে এসেছে, فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ اكْتُبُوا كِتَابَ عَبْدِي فِي عِلِّيِّينَ "অতঃপর মহান আল্লাহ্ বলবেন, আমার বান্দার আমলনামা

২১. (আল্লাহ্‌র) সান্নিধ্যপ্রাপ্তরাই তা অবলোকন করে[১] ।	يَّشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُوْنَ ﴿٢١﴾
২২. নিশ্চয় পুণ্যবানগণ থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে,	اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ ﴿٢٢﴾
২৩. সুসজ্জিত আসনে বসে তারা দেখতে থাকবে ।	عَلَى الْاَرَآئِكِ يَنْظُرُوْنَ ﴿٢٣﴾
২৪. আপনি তাদের মুখমণ্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের দীপ্তি দেখতে পাবেন,	تَعْرِفُ فِيْ وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيْمِ ﴿٢٤﴾

ইল্লিয়্যীনে লিখে রাখ” । সুতরাং ইল্লিয়্যীন কিতাব নয় বরং আমলনামা বা কিতাব কপি করে রাখার স্থান ।

(১) يشهد শব্দটি شهود থেকে উদ্ভূত । شهود এর এক অর্থ প্রত্যক্ষ করা, তত্ত্বাবধান করা । তখন আয়াতের উদ্দেশ্য হবে এই যে, সৎকর্মশীলদের আমলনামার প্রতি আসমানের নৈকট্যশীল ফেরেশতাগণ দেখবে অর্থাৎ তত্ত্বাবধান ও হেফাযত করবে । [ইবন কাসীর] তাছাড়া شهود এর আরেক অর্থ উপস্থিত হওয়া । [উসাইমীন, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম] তখন يشهده এর সর্বনাম দ্বারা ইল্লিয়্যীন বোঝানো হবে । আর এর অর্থ হবে, প্রতি আসমানের নৈকট্যপ্রাপ্তগণ সেখানে হাজির হবেন এবং সেটাকে হেফাযত করবেন; কেননা এটা নেক আমলকারীর জন্য জাহান্নাম থেকে নিরাপত্তা পত্র এবং জান্নাতে যাওয়ার সফলতার গ্যারান্টি । [আইসারুত তাফাসীর] এটা ঐ সময়ই হবে, যখন ইল্লিয়্যীন দ্বারা আমলনামা বোঝানো হবে । আর যদি ইল্লিয়্যীন দ্বারা নৈকট্যপ্রাপ্তদের রূহের স্থান ধরা হয়, তখন আয়াতের অর্থ হবে, নৈকট্যশীলগণের রূহ্ এই ইল্লিয়্যীন নামক স্থানে উপস্থিত হবে । সে হিসেবে ইল্লিয়্যীন ঈমানদারদের রুহের আবাসস্থল; যেমন সিজ্জীন কাফেরদের রূহের আবাসস্থল । এর স্বপক্ষে একটি হাদীস থেকে ধারণা পাওয়া যায়, আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বর্ণিত একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “শহীদগণের রূহ আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে সবুজ পাখিদের মধ্যে থাকবে এবং জান্নাতের বাগ-বাগিচা ও নহরসমূহে ভ্রমণ করবে । তাদের বাসস্থানে আরশের নিচে ঝুলন্ত প্রদীপ থাকবে ।” [মুসলিম: ১৮৮৭] এ থেকে বোঝা গেল যে, শহীদগণের রূহ আরশের নিচে থাকবে এবং জান্নাতে ভ্রমণ করতে পারবে । তাছাড়া পবিত্র কুরআনের অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, ﴿عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى ۞ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى﴾ এ থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, জান্নাত সিদরাতুল মুন্‌তাহার সন্নিকটে । সিদরাতুল মুনতাহা যে সপ্তম আকাশে, এ কথা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত । তাই আত্মার স্থান ইল্লিয়্যীন জান্নাতের সংলগ্ন এবং আত্মাসমূহ জান্নাতের বাগিচায় ভ্রমণ করে । অতএব, আত্মার স্থান জান্নাতও বলা যায় । তাই কোন কোন মুফাসসির ইল্লিয়্যীন এর ব্যাখ্যা করেছেন জান্নাত । [সা‘দী]

২৫. তাদেরকে মোহর করা বিশুদ্ধ পানীয় হতে পান করান হবে;

يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ ﴿٢٥﴾

২৬. যার মোহর হবে মিস্‌কের[১], আর এ বিষয়ে প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করুক[২] ।

خِتٰمُهٗ مِسْكٌ ؕ وَفِيْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنٰفِسُوْنَ ﴿٢٦﴾

২৭. আর তার মিশ্রণ হবে তাস্‌নীমের[৩],

وَمِزَاجُهٗ مِنْ تَسْنِيْمٍ ﴿٢٧﴾

২৮. এটা এক প্রস্রবণ, যা থেকে সান্নিধ্যপ্রাপ্তরা পান করে ।

عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ ﴿٢٨﴾

২৯. নিশ্চয় যারা অপরাধ করেছে তারা মুমিনদেরকে উপহাস করত,[৪]

اِنَّ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَضْحَكُوْنَ ﴿٢٩﴾

---

(১) মূলে “খিতামুহু মিস্‌ক বলা হয়েছে । এর একটি অর্থ হচ্ছে, যেসব পাত্রে এই শরাব রাখা হবে তার ওপর মাটি বা মোমের পরিবর্তে মিশকের মোহর লাগানো থাকবে । এ অর্থের দিক দিয়ে আয়াতের অর্থ হয়: এটি হবে উন্নত পর্যায়ের পরিচ্ছন্ন শরাব । এর দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে: এই শরাব যখন পানকারীদের গলা থেকে নামবে তখন শেষের দিকে তারা মিশকের খুশবু পাবে । [ফাতহুল কাদীর] এই অবস্থাটি দুনিয়ার শরাবের সম্পূর্ণ বিপরীত । এখানে শরাবের বোতল খোলার সাথে সাথেই একটি বোটকা গন্ধ নাকে লাগে । পান করার সময়ও এর দুর্গন্ধ অনুভূত হতে থাকে এবং গলা দিয়ে নামবার সময় মস্তিষ্কের অভ্যন্তরেও পচা গন্ধ পৌঁছে যায় । এর ফলে শরাবীর চেহারায় বিস্বাদের একটা ভাব জেগে ওঠে ।

(২) কোন বিশেষ পছন্দনীয় জিনিস অর্জন করার জন্যে কয়েকজনের ধাবিত হওয়া ও দৌড়া, যাতে অপরের আগে সে তা অর্জন করতে সক্ষম হয় এর নাম تنافس । এখানে জান্নাতের নেয়ামতরাজি উল্লেখ করার পর আল্লাহ্ তা'আলা গাফেল মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন, আজ তোমরা যেসব বস্তুকে প্রিয় ও কাম্য মনে করে সেগুলো অর্জন করার জন্যে অগ্রে চলে যাওয়ার চেষ্টায় রত আছ, সেগুলো অসম্পূর্ণ ও ধ্বংসশীল নেয়ামত । এসব নেয়ামত প্রতিযোগিতার যোগ্য নয় । এসব ক্ষণস্থায়ী সুখের সামগ্রী হাতছাড়া হয়ে গেলেও তেমন দুঃখের কারণ নয় । হ্যাঁ, জান্নাতের নেয়ামতরাজির জন্যই প্রতিযোগিতা করা উচিত । এগুলো সব দিক দিয়ে সম্পূর্ণ চিরস্থায়ী ।

(৩) তাসনীম মানে উন্নত ও উঁচু । [ফাতহুল কাদীর] কোন কোন মুফাসসির বলেন, কোন ঝরণাকে তাসনীম বলার মানে হচ্ছে এই যে, তা উঁচু থেকে প্রবাহিত হয়ে নীচের দিকে আসে । [ফাতহুল কাদীর]

(৪) অর্থাৎ একথা ভাবতে ভাবতে ঘরের দিকে ফিরতো: আজ তো বড়ই মজা । ওমুক মুসলিমকে বিদ্রুপ করে, তাকে চোখা চোখা বাক্যবাণে বিদ্ধ করে বড়ই মজা পাওয়া

وَإِذَا مَرُّوا۟ بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ۝٣٠

৩০. আর যখন তারা মুমিনদের কাছ দিয়ে যেত তখন তারা চোখ টিপে বিদ্রূপ করত ।

وَإِذَا ٱنقَلَبُوٓا۟ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُوا۟ فَكِهِينَ ۝٣١

৩১. আর যখন তাদের আপনজনের কাছে ফিরে আসত তখন তারা ফিরত উৎফুল্ল হয়ে,

وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوٓا۟ إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ لَضَآلُّونَ ۝٣٢

৩২. আর যখন মুমিনদেরকে দেখত তখন বলত, 'নিশ্চয় এরা পথভ্রষ্ট[১] ।'

وَمَآ أُرْسِلُوا۟ عَلَيْهِمْ حَٰفِظِينَ ۝٣٣

৩৩. অথচ তাদেরকে মুমিনদের তত্ত্বাবধায়ক করে পাঠানো হয়নি[২] ।

গেছে এবং সাধারণ মানুষের সামনে তাকে চরমভাবে অপদস্থ করা গেছে । মোটকথাঃ তারা মু'মিনদের নিয়ে অপমানজনক কথা-বার্তা, আচার আচরণ, ইশারা-ইঙ্গিত করত । আর মজা লাভ করত । [ফাতহুল কাদীর]

(১) অর্থাৎ এরা বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে গেছে । মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এদেরকে জান্নাত ও জাহান্নামের চক্করে ফেলে দিয়েছেন । ফলে এরা নিজেরা নিজেদেরকে দুনিয়ার লাভ, স্বার্থ ও ভোগ-বিলাসিতা থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে এবং সব রকমের আশংকা ও বিপদ আপদের মুখোমুখি হয়েছে । [ফাতহুল কাদীর] যা কিছু এদের সামনে উপস্থিত আছে তা কেবল এ অনিশ্চিত আশায় ত্যাগ করছে যে, এদের সাথে মৃত্যুর পরে কি এক জান্নাত দেবার ওয়াদা করা হয়েছে, আর পরবর্তী জগতে নাকি কোন জাহান্নাম হবে, এদেরকে তার আযাবের ভয় দেখানো হয়েছে এবং তার ফলেই এরা আজ এ দুনিয়ায় সবকিছু কষ্ট বরদাশত করে যাচ্ছে । এভাবে যুগে যুগে মুমিনদেরকে অপমানজনক কথা সহ্য করতে হয়েছে । বর্তমানেও কেউ দ্বীনদার হলে তার সম্পর্কে বিদ্রূপ মন্তব্য করতে শোনা যায় । [উসাইমীন, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম]

(২) এই ছোট বাক্যটিতে বিদ্রূপকারীদের জন্য বড়ই শিক্ষাপ্রদ হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে অর্থাৎ ধরে নেয়া যাক মুসলিমরা যা কিছুর প্রতি ঈমান এনেছে সবকিছুই ভুল । কিন্তু তাতে তারা তোমাদের তো কোন ক্ষতি করছে না । যে জিনিসকে তারা সত্য মনে করেছে সেই অনুযায়ী তারা নিজেরাই আমল করছে । তোমরা তাদের সমালোচনা করছ কেন? আল্লাহ কি তোমাদেরকে এই দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন? মুমিনদের কর্মকাণ্ড হেফাযত করার দায়িত্ব তো তোমাদেরকে দেয়া হয়নি । তাহলে সেটা করতে যাবে কেন? এটাকেই তোমাদের উদ্দেশ্য বানিয়েছ কেন? [দেখুন, ইবন কাসীর]

৩৪. অতএব আজ মুমিনগণ উপহাস করবে কাফিরদেরকে,

فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَ ﴿٣٤﴾

৩৫. সুসজ্জিত আসনে বসে তারা দেখতে থাকবে।

عَلَى الْاَرَآئِكِ يَنْظُرُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৬. কাফিররা তাদের কৃতকর্মের ফল পেল তো?

هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿٣٦﴾

৮৪- সূরা আল-ইন্‌শিকাক্‌
২৫ আয়াত, মক্কী

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে(১),

إِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ ﴿١﴾

২. আর তার রবের আদেশ পালন করবে এবং এটাই তার করণীয়(২) ।

وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿٢﴾

৩. আর যখন যমীনকে সম্প্রসারিত করা হবে(৩) ।

وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ﴿٣﴾

---

(১) আর সেটা হবে কিয়ামতের দিন । [ইবন কাসীর]

(২) এখানে কেয়ামতের দিন আকাশ ও পৃথিবীর উপর আল্লাহ্ তা'আলার কর্তৃত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে, ﴿وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ﴾ এর মধ্যে أذنت অর্থ শুনেছে তথা আদেশ পালন করেছে । সে হিসেবে ﴿وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا﴾ এর শাব্দিক অর্থ হয়, "সে নিজের রবের হুকুম শুনবে ।" এর মানে শুধুমাত্র হুকুম শুনা নয় বরং এর মানে সে হুকুম শুনে একজন অনুগতের ন্যায় নির্দেশ পালন করেছে এবং একটুও অবাধ্যতা প্রকাশ করেনি । [সা'দী] আর حُقَّت এর অর্থ 'আদেশ পালন করাই তার ওয়াজিব কর্তব্য ছিল' । কারণ সে একজন মহান বাদশার কর্তৃত্বাধীন ও পরিচালনাধীন । যাদের নির্দেশ অমান্য করা যায় না, আর তার হুকুমের বিপরীত করা যায় না । [ইবন কাসীর; সা'দী]

(৩) مُدَّت এর অর্থ টেনে লম্বা করা, ছড়িয়ে দেয়া । [ইবন কাসীর] পৃথিবীকে ছড়িয়ে দেবার মানে হচ্ছে, সাগর নদী ও সমস্ত জলাশয় ভরে দেয়া হবে । পাহাড়গুলো চুর্ণবিচূর্ণ করে চারিদিকে ছড়িয়ে দেয়া হবে । পৃথিবীর সমস্ত উঁচু নীচু জায়গা সমান করে সমগ্র পৃথিবীটাকে একটি সমতল প্রান্তরে পরিণত করা হবে । কুরআনের অন্যত্র এই অবস্থাটিকে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, মহান আল্লাহ "তাকে একটা সমতল প্রান্তরে পরিণত করে দেবেন । সেখানে তোমরা কোন উঁচু জায়গা ও ভাঁজ দেখতে পাবে না ।" [সূরা ত্ব-হা: ১০৬-১০৭] হাদীসে এসেছে, 'কেয়ামতের দিন পৃথিবীকে চামড়ার ন্যায় টেনে সম্প্রসারিত করা হবে । তারপর মানুষের জন্য সেখানে কেবলমাত্র পা রাখার জায়গাই থাকবে ।" [মুস্তাদরাকে হাকিম: ৪/৫৭১] একথা একাটি ভালোভাবে বুঝে নেয়ার জন্য এ বিষয়টিও সামনে রাখতে হবে যে, সেদিন সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষের জন্ম হয়েছে ও হবে সবাইকে একই সংগে জীবিত করে আল্লাহর আদালতে পেশ করা হবে । এ বিরাট জনগোষ্ঠীকে এক জায়গায় দাঁড় করাবার জন্য সমস্ত সাগর, নদী, জলাশয়, পাহাড়, পর্বত, উপত্যকা, মালভূমি, তথা উঁচু-নীচু সব জায়গা ভেঙ্গে-চুরে ভরাট করে সারা দুনিয়াটাকে একটি বিস্তীর্ণ প্রান্তরে পরিণত করা হবে । [দেখুন, ফাতহুল কাদীর; সা'দী]

৪. আর যমীন তার অভ্যন্তরে যা আছে তা বাইরে নিক্ষেপ করবে ও শূন্যগর্ভ হবে(১)।

وَاَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ ۝٤

৫. এবং তার রবের আদেশ পালন করবে এটাই তার করণীয়(২)।

وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۝٥

৬. হে মানুষ! তুমি তোমার রবের কাছে পৌঁছা পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করতে হবে, অতঃপর তুমি তাঁর সাক্ষাত লাভ করবে(৩)।

يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلٰقِيْهِ ۝٦

---

(১) অর্থাৎ পৃথিবী তার গর্ভস্থিত সবকিছু উদগিরণ করে একেবারে শূন্যগর্ভ হয়ে যাবে। পৃথিবীর গর্ভে গুপ্ত ধন-ভাণ্ডার, খনি এবং সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত মৃত মানুষের দেহকণা ইত্যাদি রয়েছে। যমীন এসব বস্তু আপন গর্ভ থেকে বাইরে নিক্ষেপ করবে। অনুরূপভাবে যত মৃত মানুষ তার মধ্যে রয়েছে সবাইকে ঠেলে বাইরে বের করে দেবে। [ফাতহুল কাদীর; সা'দী]

(২) যখন এসব ঘটনাবলী ঘটবে তখন কি হবে, একথা পরিষ্কার করে বলা হয়নি। কারণ এ পরবর্তী বক্তব্যগুলো নিজে নিজেই তা প্রকাশ করে দিচ্ছে। এ বক্তব্যগুলোতে বলা হচ্ছে: হে মানুষ! তুমি তোমার রবের দিকে এগিয়ে চলছো। শীঘ্র তাঁর সামনে হাযির হয়ে যাবে। তখন তোমার আমলনামা তোমার হাতে দেয়া হবে। আর তোমার আমলনামা অনুযায়ী তোমাকে পুরস্কার দেয়া হবে। [কুরতুবী] সুতরাং উপরোক্ত ঘটনাবলী ঘটলে কি হবে তা সহজেই বুঝা যায় যে, মানুষ তখন পুনরুত্থিত হবে। তখন পুনরুত্থানের ব্যাপারে কেউ সন্দেহ পোষণ করবে না। কারণ বাস্তবতা যখন এসে যাবে তখন সন্দেহ করার আর সুযোগ কোথায়?

(৩) كدح এর অর্থ কোন কাজে পূর্ণ চেষ্টা ও শক্তি ব্যয় করা। [ফাতহুল কাদীর] মানুষের প্রত্যেক চেষ্টা ও অধ্যবসায় আল্লাহ্‌র দিকে চূড়ান্ত হবে। অর্থাৎ মানুষ দুনিয়ায় যা কিছু কষ্ট-সাধনা প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে সে সম্পর্কে সে মনে করতে পারে যে তা কেবল দুনিয়ার জীবন পর্যন্তই সীমাবদ্ধ এবং দুনিয়াবী স্বার্থ লাভ করাই এর উদ্দেশ্য। কিন্তু আসলে সে সচেতন বা অচেতনভাবে নিজের রবের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে এবং অবশেষে তাকে তাঁর কাছেই পৌঁছতে হবে। মানুষ এখানে যে চেষ্টা-চরিত্র করছে, পরিশেষে তার পালনকর্তার কাছে পৌঁছে এর সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটবে এবং এর শুভ অথবা অশুভ পরিণতি সামনে এসে যাবে। অথবা এর অর্থ প্রত্যেক মানুষ আখেরাতে তার পালনকর্তার সাথে সাক্ষাৎ করবে এবং হিসাবের জন্যে তাঁর সামনে উপস্থিত হবে। [দেখুন, কুরতুবী] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাক্ষাত করতে চায়, আল্লাহ্‌ও তার সাক্ষাত করতে পছন্দ করেন।

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ ۝٧

৭. অতঃপর যাকে তার ‘আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে

فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ۝٨

৮. তার হিসেব-নিকেশ সহজেই নেয়া হবে[১]

আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাক্ষাত করতে চায় না, আল্লাহ্‌ও তার সাথে সাক্ষাত করতে অপছন্দ করেন।’ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা -অথবা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্য কোন স্ত্রী- বলেন, ‘আমরা তো মৃত্যুকে অপছন্দ করি।’ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘তা নয়। কিন্তু মুমিন ব্যক্তির যখন মৃত্যু ঘণিয়ে আসে, তখন তাকে আল্লাহ্ তা‘আলার সন্তুষ্টি ও সম্মানের সুসংবাদ দেওয়া হয়। তখন তার কাছে মৃত্যু অপেক্ষা অন্য কিছু প্রিয় হতে পারে না। এভাবে সে আল্লাহ্‌র সাক্ষাত করতে পছন্দ করে, তাই আল্লাহ্ তা‘আলাও তার সাথে সাক্ষাত করতে পছন্দ করেন। আর কাফির ব্যক্তিকে মৃত্যুর সময় আল্লাহ্‌র আযাব ও শাস্তির সংবাদ দেওয়া হয়, তখন মৃত্যু অপেক্ষা অপ্রিয় আর কিছু থাকে না। সে আল্লাহ্‌র সাক্ষাত অপছন্দ করে বিধায় আল্লাহ্ তা‘আলা তার সাথে সাক্ষাত অপছন্দ করেন’। [বুখারী: ৬৫০৭, মুসলিম: ২৬৮৩]

(১) এতে মুমিনদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদের আমলনামা ডান হাতে আসবে এবং তাদের সহজ হিসাব নিয়ে জান্নাতের সুসংবাদ দান করা হবে। তারা তাদের পরিবার-পরিজনের কাছে হৃষ্টচিত্তে ফিরে যাবে। তার হিসেব নেয়ার ব্যাপারে কড়াকড়ি করা হবে না। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে না, ওমুক ওমুক কাজ তুমি কেন করেছিলে? ঐসব কাজ করার ব্যাপারে তোমার কাছে কি কি ওযর আছে? নেকীর সাথে সাথে গোনাহও তার আমলনামায় অবশ্যি লেখা থাকবে। কিন্তু গোনাহের তুলনায় নেকীর পরিমাণ বেশী হবার কারণে তার অপরাধগুলো উপেক্ষা করা হবে এবং সেগুলো মাফ করে দেয়া হবে। কুরআন মজিদে অসৎকর্মশীল লোকদের কঠিন হিসেব-নিকেশের জন্য “সু-উল হিসাব” (খারাপভাবে হিসেব নেয়া) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। [সূরা আর-রা‘দ ১৮] সৎলোকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে: “এরা এমন লোক যাদের সৎকাজগুলো আমি গ্রহণ করে নেবো এবং অসৎকাজগুলো মাফ করে দেবো।” [সূরা আল-আহকাফ ১৬] আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, কেয়ামতের দিন যার হিসাব নেয়া হবে, সে আযাব থেকে রক্ষা পাবে না। এ কথা শুনে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা প্রশ্ন করলেন, কুরআনে কি ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾ বলা হয়নি? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এই আয়াতে যাকে সহজ হিসাব বলা হয়েছে, সেটা প্রকৃতপক্ষে পরিপূর্ণ হিসাব নয়; বরং কেবল আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সামনে পেশ করা। যে ব্যক্তির কাছ থেকে তার কাজকর্মের পুরোপুরি হিসাব নেয়া হবে, সে আযাব থেকে কিছুতেই রক্ষা পাবে না। [বুখারী: ৪৯৩৯, মুসলিম: ২৮৭৬]

৯. এবং সে তার স্বজনদের কাছে[১] প্রফুল্লচিত্তে ফিরে যাবে;	وَّيَنْقَلِبُ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ مَسْرُورًا ۝٩
১০. আর যাকে তার 'আমলনামা তার পিঠের পিছনদিক থেকে দেয়া হবে,	وَأَمَّا مَنْ أُوتِىَ كِتَٰبَهُۥ وَرَآءَ ظَهْرِهِۦ ۝١٠
১১. সে অবশ্যই তার ধ্বংস ডাকবে;	فَسَوْفَ يَدْعُوا۟ ثُبُورًا ۝١١
১২. এবং জ্বলন্ত আগুনে দগ্ধ হবে;	وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ۝١٢
১৩. নিশ্চয় সে তার স্বজনদের মধ্যে আনন্দে ছিল,	إِنَّهُۥ كَانَ فِىٓ أَهْلِهِۦ مَسْرُورًا ۝١٣
১৪. সে তো ভাবত যে, সে কখনই ফিরে যাবে না[২];	إِنَّهُۥ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ ۝١٤
১৫. হ্যাঁ,[৩] নিশ্চয় তার রব তার উপর সম্যক দৃষ্টি দানকারী।	بَلَىٰٓ إِنَّ رَبَّهُۥ كَانَ بِهِۦ بَصِيرًا ۝١٥
১৬. অতঃপর আমি শপথ করছি[৪] পশ্চিম	فَلَآ أُقْسِمُ بِٱلشَّفَقِ ۝١٦

(১) কোন কোন মুফাসসির বলেন, নিজের লোকজন বলতে পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ও সাথী-সহযোগীদের কথা বুঝানো হয়েছে। তাদেরকেও একইভাবে মাফ করে দেয়া হয়ে থাকবে। কাতাদাহ বলেন, এখানে পরিবার বলে জান্নাতে তার যে পরিবার থাকবে তাদের বোঝানো হয়েছে। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

(২) অর্থাৎ যার আমলনামা তার পিঠের দিক থেকে বাম হাতে আসবে, সে মরে মাটি হয়ে যাওয়ার আকাঙ্খা করবে, যাতে আযাব থেকে বেঁচে যায়। কিন্তু সেখানে তা সম্ভবপর হবে না। তাকে জাহান্নামে দাখিল করা হবে। এর এক কারণ এই বলা হয়েছে যে, সে দুনিয়াতে তার পরিবার-পরিজনের মধ্যে আখেরাতের প্রতি উদাসীন হয়ে আনন্দ-উল্লাসে দিন যাপন করত। সে তার রবের কাছে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে বিশ্বাসী ছিল না। হিসাব-নিকাশের জন্য পুনরুত্থিত হবে না। কারণ সে পুনরুত্থানে ও আখেরাতে মিথ্যারোপ করত। [ফাতহুল কাদীর]

(৩) অর্থাৎ সে যা মনে করেছে তা ঠিক নয়। সে অবশ্যই তার রবের কাছে ফিরে যাবে। অবশ্যই সে পুনরুত্থিত হবে। [ফাতহুল কাদীর]

(৪) এখানে আল্লাহ্ তা'আলা তিনটি বস্তুর শপথ করে মানুষকে আবার ﴿إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ﴾ আয়াতে বর্ণিত বিষয়ের প্রতি মনোযোগী করেছেন। শপথের জওয়াবে বলা হয়েছে যে, মানুষ এক অবস্থার উপর স্থিতিশীল থাকে না বরং তার অবস্থা প্রতিনিয়তই পরিবর্তিত হতে থাকে। যৌবন থেকে বার্ধক্য, বার্ধক্য থেকে মৃত্যু, মৃত্যু থেকে বরযখ

আকাশের

১৭. আর শপথ রাতের এবং তা যা কিছুর সমাবেশ ঘটায় তার,

وَالَّيۡلِ وَمَا وَسَقَ ﴿١٧﴾

১৮. এবং শপথ চাঁদের, যখন তা পূর্ণ হয়;

وَالۡقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَ ﴿١٨﴾

১৯. অবশ্যই তোমরা এক স্তর থেকে অন্য স্তরে আরোহণ করবে(১)।

لَتَرۡكَبُنَّ طَبَقًا عَنۡ طَبَقٍ ﴿١٩﴾

(মৃত্যু ও কিয়ামতের মাঝখানের জীবন), বরযখ থেকে পুনরুজ্জীবন, পুনরুজ্জীবন থেকে হাশরের ময়দান তারপর হিসেব-নিকেশ এবং শাস্তি ও পুরস্কারের অসংখ্য মনযিল মানুষকে অতিক্রম করতে হবে। এ বিভিন্ন পর্যায় প্রমাণ করছে যে, একমাত্র আল্লাহই তার মা'বুদ, তিনি বান্দাদের কর্মকাণ্ড নিজস্ব প্রজ্ঞা ও রহমতে নিয়ন্ত্রণ করেন। আর বান্দা মুখাপেক্ষী, অপারগ, মহান প্রবল পরাক্রমশালী দয়ালু আল্লাহর কর্তৃত্বাধীন। [বাদায়ে'উত তাফসীর; ফাতহুল কাদীর; সা'দী]

(১) اتسق শব্দটি وسق থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ একত্রিত করা, পূর্ণ করা। চন্দ্রের একত্রিত করার অর্থ তার আলোকে একত্রিত করা। এটা চৌদ্দ তারিখের রাত্রিতে হয়, যখন চন্দ্র পূর্ণ হয়ে যায়। [ইবন কাসীর]এখানে চন্দ্রের বিভিন্ন অবস্থার দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। চন্দ্র প্রথমে খুবই সরু ধনুকের মতো দেখা যায়। এরপর প্রত্যহ এর আলো বৃদ্ধি পেতে পেতে পূর্ণিমার চাঁদ হয়ে যায়। অবিরাম ও উপর্যুপরি পরিবর্তনের সাক্ষ্যদাতা উপরোক্ত বস্তুগুলোর শপথ করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "অবশ্যই তোমরা ধাপে ধাপে আরোহণ করবে"। طبق এর অর্থ অবস্থা, স্তর, পর্যায় ইত্যাদি [ইবন কাসীর] تَرْكَبُنَّ শব্দটি ركوب থেকে। এর অর্থ আরোহণ করা। অর্থ এই যে, হে মানুষ, তোমরা সর্বদাই এক স্তর থেকে অন্য স্তরে আরোহণ করতে থাকবে। উদ্দেশ্য এই যে, সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত মানুষ কোন সময় এক অবস্থায় স্থির থাকে না, বরং তার ওপর পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন আসতে থাকে। স্বাভাবিকভাবে যে সমস্ত পরিবর্তন হয় তা তো লক্ষণীয়। তাছাড়া মানুষ নিজেও আল্লাহ্‌র দেয়া সহজ-সরল দ্বীন থেকে বিমুখ হয়ে অন্যান্য বাতিল দ্বীনের অনুসরণে প্রবৃত্ত হয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "তোমরা তোমাদের পূর্বের লোকদের হাতে হাতে বিঘতে বিঘতে অনুসরণ করতে থাকবে, এমনকি তারা যদি ষাণ্ডার গর্তে ঢুকে থাকে তোমরাও তাদের অনুসরণ করে তাতে ঢুকবে" সাহাবায়ে কিরাম বললেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ইয়াহূদ ও নাসারা? তিনি বললেন, "তারা নয়তো কারা?" [বুখারী: ৭৩২০, মুসলিম: ২৬৬৯] [ইবন কাসীর] এখানে ইবন জারীর আত-তাবারীর মত হচ্ছে, মানুষকে অবশ্যই কঠিন থেকে কঠিন পর্যায় অতিক্রম করতে হবে। আখেরাতের পর্যায়গুলোও উদ্দেশ্য হতে পারে। [তাবারী; ইবন কাসীর]

২০. অতঃপর তাদের কি হল যে, তারা ঈমান আনে না?

فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝٢٠

২১. আর যখন তাদের কাছে কুরআন পাঠ করা হলে তখন তারা সিজ্‌দা করে না[১]?

وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ۩ ۝٢١

২২. বরং কাফিররা মিথ্যারোপ করে।

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ ۝٢٢

২৩. আর তারা যা পোষণ করে আল্লাহ্‌ তা সবিশেষ অবগত।

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ۝٢٣

২৪. কাজেই আপনি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দিন;

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝٢٤

২৫. কিন্তু যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তাদের জন্য রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝٢٥

---

(১) অর্থাৎ যখন তাদের সামনে সুস্পষ্ট হেদায়েত পরিপূর্ণ কুরআন পাঠ করা হয়, তখনও তারা আল্লাহ্‌র দিকে নত হয় না। سجود এর আভিধানিক অর্থ নত হওয়া, আনুগত্য করা। বলাবাহুল্য, এখানে পারিভাষিক সাজদার পাশাপাশি আল্লাহ্‌র সামনে আনুগত্য সহকারে নত হওয়া তথা বিনীত হওয়াও উদ্দেশ্য। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু এ সূরা পড়ে সাজদাহ করলেন, তারপর লোকদের দিকে ফিরে জানালেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং এ সূরা পড়ার পরে সাজদাহ করেছেন। [মুসলিম: ৫৭৮] অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি এশার সালাতে এ সূরা পাঠের পর সাজদাহ করলেন, এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হওয়ার পর বললেন, আমি আবুল কাসেম (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পিছনে সাজদাহ করেছি, সুতরাং তার সাথে মিলিত হওয়ার আগ পর্যন্ত সাজদাহ করবই।” [বুখারী: ১০৭৮, মুসলিম: ৫৭৮]

৮৫- সূরা আল-বুরূজ
২২ আয়াত, মক্কী

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

১. শপথ বুরূজবিশিষ্ট[১] আসমানের,

وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلۡبُرُوجِ ١

২. আর প্রতিশ্রুত দিনের,

وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡمَوۡعُودِ ٢

৩. এবং দ্রষ্টা ও দৃষ্টের[২]---

وَشَاهِدٖ وَمَشۡهُودٖ ٣

৪. অভিশপ্ত হয়েছিল[৩] কুণ্ডের

قُتِلَ أَصۡحَٰبُ ٱلۡأُخۡدُودِ ٤

---

(১) بُرُوْجٌ শব্দটি بُرْجٌ এর বহুবচন। অর্থ বড় প্রাসাদ ও দুর্গ। অন্য আয়াতে আছে, ﴿وَلَوۡ كُنتُمۡ فِي بُرُوجٖ مُّشَيَّدَةٖۗ﴾ এখানে এই অর্থই বোঝানো হয়েছে। [কুরতুবী] অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে আলোচ্য আয়াতে بُرُوْجٌ এর অর্থ বড় বড় গ্রহ-নক্ষত্র। কয়েকজন তাফসীরবিদ এ স্থলে অর্থ নিয়েছেন প্রাসাদ। অর্থাৎ সেসব গৃহ, যা আকাশে প্রহরী ও তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতাদের জন্যে নির্ধারিত। আবার কারও কারও মতে, এ অর্থ সুন্দর সৃষ্টি। অর্থাৎ সুন্দর সৃষ্টি আসমানের শপথ। তবে ইমাম ইবন জারীর আত-তাবারীর মত হচ্ছে, এখানে সূর্য ও চন্দ্রের অবস্থানস্থলসমূহ। আর তার সংখ্যা বারটি। সূর্য তার প্রতিটিতে একমাস চলে। আর চন্দ্র এর প্রতিটিতে দুইদিন ও একদিনের তিনভাগের এক অংশ সময় চলে। এতে করে চাঁদের আটাশটি অবস্থান হয়। তারপর সে দু'দিন গোপন থাকে। এই বারটির প্রত্যেকটি একেকটি بُرْجٌ। চন্দ্র ও সূর্য আকাশের গতিতে গতিশীল হয়ে এসব بُرْجٌ এর মধ্যে অবতরণ করে। [ইবন কাসীর] তাই আয়াতের অর্থ হবে, সেই আসমানের শপথ, যাতে রয়েছে চাঁদ ও সূর্যের অবতরণস্থানসমূহ, অনুরূপ তাতে রয়েছে সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্রের অবতরনস্থলসমূহ, যেগুলো নিয়ম মেনে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে চলছে। এ সুন্দর চলন ও সুন্দর নিয়মই আল্লাহর অপার শক্তি, রহমত, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রমাণ বহন করছে। [সা'দী]

(২) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "﴿وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡمَوۡعُودِ﴾ বা প্রতিশ্রুত দিনের অর্থ কেয়ামতের দিন। আর مشهود এর অর্থ আরাফার দিন এবং شاهد এর অর্থ শুক্রবার দিন। জুম'আর দিনের চেয়ে উত্তম কোন দিনে কোন সূর্য উদিত হয়নি এবং ডুবেওনি। সেদিন এমন একটি সময় আছে, কোন মুমিন বান্দা যখনই কোন কল্যাণের দো'আ করে তখনই তার দো'আ কবুল করা হয়। অথবা যদি কোন অকল্যাণ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয় তখনই তাকে আল্লাহ্ তা থেকে আশ্রয় দেয়।" [তিরমিযী: ৩৩৩৯]

(৩) এখানে আল্লাহ্ তা'আলা চারটি বস্তুর শপথ করার পর মূল কথা বর্ণনা করেছেন। (এক) বুরূজবিশিষ্ট আকাশের; (দুই) কেয়ামত দিবসের; (তিন) আরাফার দিনের

অধিপতিরা---[১]

৫. যে কুণ্ডে ছিল ইন্ধনপূর্ণ আগুন,

النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ۝

৬. যখন তারা এর পাশে উপবিষ্ট ছিল;

إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ۝

এবং (চার) শুক্রবারের। এসব শপথের সম্পর্ক এই যে, এগুলো আল্লাহ্ তা'আলার পরিপূর্ণ শক্তি, কেয়ামতের হিসাব-নিকাশ এবং শাস্তি ও প্রতিদানের দলীল। শুক্রবার ও আরাফার দিন মুসলিমদের জন্যে আখেরাতের পুঁজি সংগ্রহের পবিত্র দিন।

(১) যারা বড় বড় গর্তের মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে ঈমানদারদেরকে তার মধ্যে ফেলে দিয়েছিল এবং তাদের জ্বলে পুড়ে মরার বীভৎস দৃশ্য নিজেদের চোখে দেখেছিল তাদেরকে এখানে গর্তওয়ালা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, তাদের ওপর আল্লাহর লা'নত পড়েছিল এবং তারা আল্লাহর আযাবের অধিকারী হয়েছিল। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] এর আরেক অর্থ ধ্বংস হয়েছিল। [সা'দী]

গর্তে আগুন জ্বালিয়ে ঈমানদারদেরকে তার মধ্যে নিক্ষেপ করার ঘটনা সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। সুহাইব রুমী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। এক বাদশার কাছে একজন যাদুকর ছিল। বৃদ্ধ বয়সে সে বাদশাহকে বললো, একটি ছেলেকে আমার কাছে নিযুক্ত করো, সে আমার কাছ থেকে এ জাদু শিখে নেবে । বাদশাহ জাদু শেখার জন্য জাদুকরের কাছে একটি ছেলেকে নিযুক্ত করলো। কিন্তু সেই ছেলেটি জাদুকরের কাছে আসা যাওয়ার পথে একজন রাহেবের (যিনি সম্ভবত ঈসা আলাইহিস সালামের দ্বীনের অনুসারী একজন সাধক ছিলেন) সাক্ষাত গুণে সে অলৌকিক শক্তির অধিকারীও হয়ে গেলো। সে অন্ধদের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতে এবং কুষ্ঠরোগ নিরাময় করতে লাগলো। ছেলেটি তাওহীদের প্রতি ঈমান এনেছে, একথা জানতে পেরে বাদশাহ প্রথমে রাহেবকে হত্যা করলো তারপর ছেলেটিকে হত্যা করতে চাইলো। কিন্তু কোন অস্ত্র দিয়েই এবং কোনভাবেই তাকে হত্যা করতে পারলো না। শেষে ছেলেটি বললো, যদি তুমি আমাকে হত্যা করতে চাও তাহলে প্রকাশ্য জনসমাবেশে "বিস্মি রাব্বিল গুলাম" (অর্থাৎ এই ছেলেটির রবের নামে) বাক্য উচ্চারণ করে আমাকে তীর মারো, তাতেই আমি মারা যাবো। বাদশাহ তাই করলো। ফলে ছেলেটি মারা গেলো। এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করে লোকেরা চিৎকার করে উঠলো, আমরা এই ছেলেটির রবের প্রতি ঈমান আনলাম। বাদশাহর সভাসদরা তাকে বললো, এখন তো তাই হয়ে গেলো যা থেকে আপনি বাঁচতে চাচ্ছিলেন। লোকেরা আপনার ধর্ম ত্যাগ করে এ ছেলেটির ধর্মগ্রহণ করেছে। এ অবস্থা দেখে বাদশাহ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলো। সে রাস্তার পাশে গর্ত খনন করালো। তাতে আগুন জ্বালালো। যারা ঈমান ত্যাগ করতে রাজী হলো না তাদের সবাইকে তার মধ্যে নিক্ষেপ করলো । [মুসলিম: ৩০০৫ তিরমিযী:৩৩৪০]।

وَّهُمْ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدٌ ۝٧

৭. এবং তারা মুমিনদের সাথে যা করছিল তা প্রত্যক্ষ করছিল ।

وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّآ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۝٨

৮. আর তারা তাদেরকে নির্যাতন করেছিল শুধু এ কারণে যে, তারা ঈমান এনেছিল পরাক্রমশালী ও প্রশংসার যোগ্য আল্লাহ্‌র উপর ---

الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ۝٩

৯. আসমানসমূহ ও যমীনের সর্বময় কর্তৃত্ব যাঁর; আর আল্লাহ্‌ সবকিছুর প্রত্যক্ষদর্শী ।

اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ ۝١٠

১০. নিশ্চয় যারা মুমিন নরনারীকে বিপদাপন্ন করেছে(১) তারপর তাওবা করেনি(২) তাদের জন্য আছে জাহান্নামের শাস্তি, আর তাদের জন্য রয়েছে দহন যন্ত্রণা(৩) ।

---

(১) فتنوا শব্দের এক অর্থ হচ্ছে, أحرقوا বা জ্বালিয়েছিল । অপর অর্থ পরীক্ষা করা । বিপদে ফেলা । [ফাতহুল কাদীর]

(২) কাফেরদের জাহান্নামের আযাব ও দহন যন্ত্রণার খবর দেয়ার সাথে সাথে কুরআন বলছে যে, এই আযাব তাদের ওপর পতিত হবে, যারা এই দুষ্কর্মের কারণে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করেনি । এতে তাদেরকে তাওবার দাওয়াত দেয়া হয়েছে । হাসান বসরী বলেন: বাস্তবিকই আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও কৃপার কোন তুলনা নেই । তারা তো আল্লাহ্‌র নেক বান্দাদেরকে জীবিত দগ্ধ করে তামাশা দেখছে, আল্লাহ্‌ তা'আলা এরপরও তাদেরকে তওবা ও মাগফিরাতের দাওয়াত দিচ্ছেন । [ইবনুল কাইয়্যেম, বাদায়ে'উস তাফসীর; ইবন কাসীর]

(৩) এখানে অত্যাচারী কাফেরদের শাস্তি বর্ণিত হয়েছে, যারা মুমিনদেরকে কেবল ঈমানের কারণে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিল । শাস্তি প্রসঙ্গে দুটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে– (এক) তাদের জন্যে আখেরাতে জাহান্নামের আযাব রয়েছে, (দুই) তাদের জন্যে দহন যন্ত্রণা রয়েছে । এখানে দ্বিতীয়টি প্রথমটিরই বর্ণনা ও তাকীদ হতে পারে । অর্থাৎ জাহান্নামে গিয়ে তারা চিরকাল দহন যন্ত্রণা ভোগ করবে । এটাও সম্ভবপর যে, দ্বিতীয় বাক্যে দুনিয়ার শাস্তি বর্ণিত হয়েছে । প্রখ্যাত আলেম রবী ইবনে আনাস বলেন, মুমিনদেরকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করার পর অগ্নি স্পর্শ করার পূর্বেই আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের রূহ্‌ কবজ করে নেন । এভাবে তিনি তাদেরকে দহন যন্ত্রণা থেকে রক্ষা করেন । ফলে তাদের মৃতদেহই কেবল অগ্নিতে দগ্ধ হয় । অতঃপর এই অগ্নি

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ﴿١١﴾

১১. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; এটাই মহাসাফল্য।

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴿١٢﴾

১২. নিশ্চয় আপনার রবের পাকড়াও বড়ই কঠিন।

إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ ﴿١٣﴾

১৩. তিনিই অস্তিত্ব দান করেন ও পুনরাবর্তন ঘটান,

وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ﴿١٤﴾

১৪. এবং তিনি ক্ষমাশীল, অতিস্নেহময়[১],

ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴿١٥﴾

১৫. 'আরশের অধিকারী ও সম্মানিত।

فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٦﴾

১৬. তিনি যা ইচ্ছে তা-ই করেন[২]।

আরও বেশি প্রজ্বলিত হয়ে তার লেলিহান শিখা শহরে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে যারা মুসলিমদের অগ্নি দগ্ধ হওয়ার তামাশা দেখছিল, তারাও এই আগুনে পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়। [ফাতহুল কাদীর]

(১) الودود শব্দটির কয়েকটি অর্থ বর্ণিত আছে। কারও কারও মতে, 'ওয়াদূদ' বলা হয় তাকে যার কোন সন্তান নেই। অর্থাৎ যার এমন কেউ নেই যার প্রতি মন টানতে থাকবে। [ফাতহুল কাদীর] তবে অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে এর অর্থ, প্রিয় বা প্রিয়পাত্র। [ইবন কাসীর] যার ভালবাসায় কোন খাদ নেই। যারা তাঁকে ভালবাসেন তিনিও তাদেরকে ভালবাসেন। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'তিনি তাদেরকে ভালবাসেন আর তারাও তাঁকে ভালবাসে'। [সূরা আল-মায়েদাহ: ৫৪] তিনি এমন সত্তা যাঁকে তার ভালবাসার পাত্ররা এমন ভালবাসে যে ভালবাসার কোন উদাহরণ দেয়া সম্ভব হয় না। যার কোন তুলনা নেই। তাঁর খালেস বান্দাদের অন্তরে তাঁর যে ভালবাসা রয়েছে সেটার তুলনা কোন ভালবাসা দিয়ে দেয়া যাবে না। আর এজন্যই ভালবাসা হচ্ছে আল্লাহর দাসত্বের মূল কথা। যে ভালবাসার কারণে যাবতীয় ভালবাসার পাত্রের উপর সেটা স্থান করে নেয়। অন্য ভালবাসা যদি আল্লাহর ভালবাসার অনুগামী না হয় তবে সেটা বান্দার জন্য বিপদ ও শাস্তির কারণ হয়। [সা'দী]

(২) "তিনি ক্ষমাশীল" বলে এই মর্মে আশান্বিত করা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি গোনাহ করা থেকে বিরত হয়ে যদি তাওবা করে তাহলে সে আল্লাহর রহমত লাভ করতে পারে। তিনি গোনাহগারদের প্রতি এতই ক্ষমাশীল যে, তাদেরকে লজ্জা দেন না। আর তাঁর আনুগত্যকারী বন্ধুদেরকে অতিশয় ভালবাসেন। [ফাতহুল কাদীর] "অতিস্নেহময়" বলে الودود শব্দের পূর্ণ অর্থ প্রকাশ পায় না। কারণ, স্নেহ ও ভালবাসার মধ্যে খাটি

১৭. আপনার কাছে কি পৌঁছেছে সৈন্যবাহিনীর বৃত্তান্ত---

هَلْ أَتٰىكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ﴿١٧﴾

১৮. ফির'আউন ও সামূদের?

فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ﴿١٨﴾

১৯. তবু কাফিররা মিথ্যারোপ করায় রত;

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ﴿١٩﴾

২০. আর আল্লাহ্ সবদিক থেকে তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন।

وَاللّٰهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ ﴿٢٠﴾

২১. বস্তুত এটা সম্মানিত কুরআন,

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ ﴿٢١﴾

২২. সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ।

فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ ﴿٢٢﴾

হলেই তবে তাকে 'ওয়াদূদ' বলা যাবে। তিনি নিজের সৃষ্টিকে অত্যধিক ভালোবাসেন। তাকে তিনি কেবল তখনই শাস্তি দেন যখন সে বিদ্রোহাত্মক আচরণ করা থেকে বিরত হয় না। এখানে غَفُوْر বা ক্ষমাকারী বলার পরে وَدُوْدٌ বা অতি স্নেহময় বলে এটাই বুঝাচ্ছেন যে, যারা অন্যায় করে তারপর তাওবাহ করবে, তাদেরকে তিনি শুধু ক্ষমাই করবেন না বরং নিখাদভাবে ভালও বাসবেন। [সা'দী] "আরশের মালিক" বলে মানুষের মধ্যে এ অনুভূতি জাগানো হয়েছে যে তিনি যেহেতু আরশের মালিক। আর আরশ সবকিছুর উপরে। তাই তিনিও সবকিছুর উপরে। [ইবন কাসীর] সবকিছু মহান আল্লাহ্র আরশের সামনে অতি নগন্য। বরং সমস্ত আসমান, যমীন ও কুরসী সবগুলোকেই আরশ শামিল করে। [সা'দী] কাজেই তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে কেউ তাঁর হাত থেকে নিস্তার পেতে পারে না। "শ্রেষ্ঠ সম্মানিত" বলে এ ধরনের বিপুল মর্যাদাসম্পন্ন সত্তার প্রতি অশোভন আচরণ করার হীন মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে মানুষকে সতর্ক করা হয়েছে। তাছাড়া এটি আরশের গুণও হতে পারে। [ইবন কাসীর] তাঁর শেষ গুণটি বর্ণনা করে বলা হয়েছে, "তিনি যা চান তাই করেন।" অর্থাৎ আল্লাহ যে কাজটি করতে চান তাতে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা এ সমগ্র সৃষ্টিকুলের কারো নেই। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মৃত্যু শয্যায় কেউ জিজ্ঞেস করেছিলেন,আপনাকে কি কোন ডাক্তার দেখেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তারা বললেন,ডাক্তার কী বলেছেন? তিনি বললেন, ডাক্তার আমাকে বলেছেন, আমি যা ইচ্ছা তাই করি। [ইবন কাসীর]

৮৬- সূরা আত-তারিক
১৭ আয়াত, মক্কী

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. শপথ আসমানের এবং রাতে যা আবির্ভূত হয় তার;

وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ ①

২. আর কিসে আপনাকে জানাবে ‘রাতে যা আবির্ভূত হয়’ তা কী?

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الطَّارِقُ ②

৩. উজ্জ্বল নক্ষত্র(১) ।

النَّجْمُ الثَّاقِبُ ③

৪. প্রত্যেক জীবের উপরই তত্ত্বাবধায়ক রয়েছে(২) ।

اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ④

(১) প্রথম শপথে আকাশের সাথে والطارق শব্দ যোগ করা হয়েছে। এর অর্থ রাত্রিতে আগমনকারী। নক্ষত্র দিনের বেলায় লুক্কায়িত থাকে এবং রাতে প্রকাশ পায়, এজন্যে নক্ষত্রকে الطارق বলা হয়েছে। [ইবন কাসীর] কুরআন এ সম্পর্কে প্রশ্ন রেখে নিজেই জওয়াব দিয়েছে ﴿النَّجْمُ الثَّاقِبُ﴾ অর্থাৎ উজ্জ্বল নক্ষত্র। আয়াতে কোন নক্ষত্রকে নির্দিষ্ট করা হয়নি। তাই যে কোন উজ্জ্বল নক্ষত্রকে বোঝানো যায়। [সা'দী] কোন কোন তাফসীরবিদ এর অর্থ নিয়েছেন বিশেষ করে নক্ষত্র ‘সুরাইয়া’; যা সপ্তর্ষিমণ্ডলস্থ একটি নক্ষত্র কিংবা ‘শনি গ্রহ’। আরবী ভাষায় সুরাইয়া ও শনি গ্রহ উভয়কেই نجم বলা হয়ে থাকে। [ফাতহুল কাদীর] ইবনুল কাইয়েম বলেন, যদি উজ্জ্বল নক্ষত্রের উদাহরণ হিসেবে এ দু'টি তারকাকে উল্লেখ করা হয়, তবে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু এ দু'টিকে উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে এমন কিছু নির্দিষ্ট করে বলা যাবে না। [আত-তিবইয়ান ফী আকসামিল কুরআন: ১০০]

(২) এটা শপথের জওয়াব। حافظ শব্দের অর্থ তত্ত্বাবধায়ক। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা আকাশ ও নক্ষত্রের শপথ করে বলেছেন, প্রত্যেক মানুষের ওপর তত্ত্বাবধায়ক বা আমলনামা লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছে। সে তার সমস্ত কাজকর্ম ও নড়াচড়া দেখে, জানে। [ফাতহুল কাদীর] এর পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের চিন্তা করা উচিত যে, সে দুনিয়াতে যা কিছু করছে, তা সবই কেয়ামতের দিন হিসাব-নিকাশের জন্যে আল্লাহ্‌র কাছে সংরক্ষিত রয়েছে। তাই কোন সময় আখেরাত ও কেয়ামতের চিন্তা থেকে গাফেল হওয়া অনুচিত। এখানে حافظ শব্দ একবচনে উল্লেখ করা হলেও তারা যে একাধিক তা অন্য আয়াত থেকে জানা যায়। অন্য আয়াতে আছে ﴿وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ ۝ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ﴾ “নিশ্চয় তোমাদের উপর নিয়োজিত রয়েছে তত্ত্বাবধায়করা, সম্মানিত লেখকরা” [সূরা আল-ইনফিতার: ১০-১১]

৫. অতএব মানুষ যেন চিন্তা করে দেখে তাকে কী থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে(১)!

فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۝٥

৬. তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে স্খলিত পানি হতে(২),

خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ ۝٦

৭. এটা নির্গত হয় মেরুদণ্ড ও পঞ্জরাস্থির মধ্য থেকে(৩) ।

يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ۝٧

তাছাড়া حافظ এর অপর অর্থ আপদ-বিপদ থেকে হেফাযতকারীও হয়ে থাকে। [ইবন কাসীর] আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক মানুষের হেফাযতের জন্যে ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন। তারা দিন-রাত মানুষের হেফাযতে নিয়োজিত থাকে। তবে আল্লাহ্ তা'আলা যার জন্যে যে বিপদ অবধারিত করে দিয়েছেন, তারা সে বিপদ থেকে হেফাযত করে না। অন্য এক আয়াতে একথা পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে, ﴿لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾ অর্থাৎ মানুষের জন্যে পালাক্রমে আগমনকারী পাহারাদার ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছে। তারা আল্লাহ্র আদেশে সামনে ও পেছনে থেকে তার হেফাযত করে। [সূরা আর-রা'দ: ১১]
অথবা হেফাযতকারী বলতে এখানে আল্লাহকেই বুঝানো হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর] তিনি আকাশ ও পৃথিবীর ছোট বড় সকল সৃষ্টির দেখাশুনা, তত্ত্বাবধান ও হেফাযত করছেন। তিনিই সব জিনিসকে অস্তিত্ব দান করেছেন তিনিই সবকিছুকে টিকিয়ে রেখেছেন। তিনি সব জিনিসকে ধারণ করেছেন বলেই প্রত্যেকটি জিনিস তার নিজের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত আছে। তিনি সব জিনিসকে তার যাবতীয় প্রায়োজন পূর্ণ করার এবং তাকে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত বিপদমুক্ত রাখার দায়িত্ব নিয়েছেন। এ বিষয়টির জন্য আকাশের ও রাতের অন্ধকারে আত্মপ্রকাশকারী প্রত্যেকটি গ্রহ ও তারকার কসম খাওয়া হয়েছে।

(১) এখানে আল্লাহ তা'আলা যে মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম তার ওপর মানুষেরই নিজের সত্ত্বা থেকে প্রমাণাদি উপস্থাপন করছেন। মানুষ তার নিজের সম্পর্কে একটু চিন্তা করে দেখুক। তাকে কিভাবে কোত্থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে? তাকে অত্যন্ত দুর্বল বস্তু হতে সৃষ্টি করা হয়েছে। যিনি প্রথমবার তাকে সৃষ্টি করতে পারেন তিনি অবশ্যই দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করতে সক্ষম। যেমন অন্য আয়াতে বলেছেন, "তিনিই প্রথম সৃষ্টি করেন, পরে আবার তিনি তা করবেন, আর এটা তো তার জন্য সহজতর"। [সূরা আর-রূম: ২৭] [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ বীর্য থেকে। যা পুরুষ ও নারী থেকে সবেগে বের হয়। যা থেকে আল্লাহর হুকুমে সন্তান জন্মলাভ করে। [ইবন কাসীর]

(৩) ইবন আব্বাস বলেন, পুরুষের মেরুদণ্ড ও নারীর পঞ্জরাস্থির পানি হলদে ও তরল। সে দু'টো থেকেই সন্তান হয়। [ইবন কাসীর]

৮. নিশ্চয় তিনি তাকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম(১)।

إِنَّهُۥ عَلَىٰ رَجۡعِهِۦ لَقَادِرٞ ٨

৯. যেদিন গোপন বিষয় পরীক্ষিত হবে(২)

يَوۡمَ تُبۡلَى ٱلسَّرَآئِرُ ٩

১০. সেদিন তার কোন সামর্থ্য থাকবে না, এবং সাহায্যকারীও নয়।

فَمَا لَهُۥ مِن قُوَّةٖ وَلَا نَاصِرٖ ١٠

১১. শপথ আসমানের, যা ধারণ করে বৃষ্টি(৩),

وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلرَّجۡعِ ١١

---

(১) উদ্দেশ্য এই যে, যিনি প্রথমবার মানুষকে বীর্য থেকে প্রথম সৃষ্টিতে একজন জীবিত, শ্রোতা ও দ্রষ্টা মানব সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাকে পুনরায় ফিরিয়ে দিতে অর্থাৎ মৃত্যুর পর জীবিত করতে আরও ভালরূপে সক্ষম। [ইবন কাসীর] যদি তিনি প্রথমটির ক্ষমতা রেখে থাকেন এবং তারই বদৌলতে মানুষ দুনিয়ায় জীবন ধারণ করছে, তাহলে তিনি দ্বিতীয়টির ক্ষমতা রাখেন না, এ ধারণা পোষণ করার পেছনে এমন কি শক্তিশালী যুক্তি পেশ করা যেতে পারে?

(২) গোপন রহস্য বলতে মানুষের যেসব বিশ্বাস ও সংকল্প অন্তরে লুক্কায়িত ছিল, দুনিয়াতে কেউ জানত না এবং যেসব কাজকর্ম সে গোপনে করেছিল, কেয়ামতের দিন সে সবগুলোই পরীক্ষিত হবে। বা প্রকাশ করে দেয়া হবে। অর্থাৎ তাদের আমলনামা পেশ করা হবে, আর তখন ভাল-মন্দ, উত্তম-অনুত্তম সবই স্পষ্ট হয়ে যাবে। [ফাতহুল কাদীর] আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “কেয়ামতের দিন প্রত্যেক গাদ্দারের পিছনে একটি পতাকা লাগানো হবে যাতে থাকবে, এটা অমুকের পুত্র অমুকের গাদ্দারী” [বুখারী: ৬১৭৮, মুসলিম: ১৭৩৫] সুতরাং সেদিন মানুষের সব গোপন ভেদ খুলে যাবে। প্রত্যেক ভাল-মন্দ বিশ্বাস ও কর্মের আলামত মানুষের মুখমণ্ডলে শোভা পাবে।

(৩) আকাশের জন্য (বৃষ্টি বর্ষণকারী) বিশেষণটি ব্যবহার করা হয়েছে। ‘রাজ‘আ’ শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, ফিরে আসা। তবে পরোক্ষভাবে আরবী ভাষায় এ শব্দটি বৃষ্টির জন্য ব্যবহার করা হয়। কারণ বৃষ্টি মাত্র একবার বর্ষিত হয়েই খতম হয়ে যায় না বরং একই মওসূমে বারবার এবং কখনো মওসূম ছাড়াই একাধিকবার ফিরে আসে এবং যখন তখন বর্ষিত হয়। সুতরাং এর অর্থ পর পর বর্ষিত বৃষ্টি। [ফাতহুল কাদীর] কাতাদাহ বলেন, এর অর্থ, আকাশের বৃষ্টি প্রতিবছর মানুষের রিযিক নিয়ে আসে। যদি তা নিয়ে না আসত তবে মানুষ ও জীব-জানোয়ারের ধ্বংস অনিবার্য হতো। [ইবন কাসীর] বৃষ্টিকে প্রত্যাবর্তনকারী বলার আর একটি কারণ এটাও হতে পারে পৃথিবীর সমুদ্রগুলো থেকে পানি বাষ্পের আকারে উঠে যায়। আবার এই বাষ্পই পানির আকারে পৃথিবীতে বর্ষিত হয়। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

১২. এবং শপথ যমীনের, যা বিদীর্ণ হয়(১),

وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ﴿١٢﴾

১৩. নিশ্চয় আল-কুরআন মীমাংসাকারী বাণী।

إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ﴿١٣﴾

১৪. এবং এটা নিরর্থক নয়(২)।

وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ﴿١٤﴾

১৫. তারা ভীষণ ষড়যন্ত্র করে(৩),

إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴿١٥﴾

১৬. এবং আমিও ভীষণ কৌশল করি(৪)।

وَأَكِيدُ كَيْدًا ﴿١٦﴾

১৭. অতএব কাফিরদেরকে অবকাশ দিন; তাদেরকে অবকাশ দিন কিছু কালের জন্য(৫)।

فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ﴿١٧﴾

---

(১) যমীন বিদীর্ণ হওয়ার অর্থ উদ্ভিদ উৎপন্ন হওয়া। [ইবন কাসীর; সা'দী] মুজাহিদ বলেন, পথবিশিষ্ট যমীন যা পানি দ্বারা বিদীর্ণ হয়। অথবা যমীন যা বিদীর্ণ হয়ে মৃতরা পুনরুত্থানের জন্য বের হবে। [ফাতহুল কাদীর; সা'দী] তবে প্রথম তাফসীরটিই বেশী প্রসিদ্ধ।

(২) আসমান ও যমীনের শপথ করে যে কথাটি বলা সেটা হচ্ছে, কুরআনের সত্যতা প্রমাণ করা। [ফাতহুল কাদীর] বলা হয়েছে, এ কুরআন হক ও সত্য বাণী। [ইবন কাসীর] অথবা বলা হয়েছে, কুরআন সত্য ও মিথ্যার ফয়সালা কারী। [ফাতহুল কাদীর] এ কুরআন হাসি-তামাশার জন্য আসে নি। এটা বাস্তব সত্য। [ফাতহুল কাদীর] যা কিছু এতে বিবৃত হয়েছে তা বাস্তব সত্য, যা অবশ্যই সংঘটিত হবে। সুতরাং কুরআন হক আর তার শিক্ষাও হক।

(৩) অর্থাৎ কাফেররা কুরআনের দাওয়াতকে ব্যর্থ করার জন্য নানা ধরণের অপকৌশলের আশ্রয় নিচ্ছে। কুরআনের পথ থেকে মানুষদেরকে দূরে রাখতে চাচ্ছে। কুরআনের আহ্বানের বিপরীতে চলার জন্য ষড়যন্ত্র করছে। [ইবন কাসীর] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে হক দ্বীন নিয়ে এসেছেন তারা তা ব্যর্থ করে দিতে ষড়যন্ত্র করছে। [ফাতহুল কাদীর]

(৪) অর্থাৎ এদের কোন অপকৌশল লাভে কামিয়াব না হয় এবং অবশেষে এরা ব্যর্থ হয়ে যায় সে জন্য আমিও কৌশল করছি। আমি তাদেরকে এমনভাবে ছাড় দিচ্ছি যে তারা বুঝতেই পারছে না। [ফাতহুল কাদীর]

(৫) অর্থাৎ এদেরকে ছেড়ে দিন, তাদের ধ্বংসের ব্যাপারে তাড়াতাড়ি করবেন না। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] তাদেরকে অল্প কিছু দিন অবকাশ দিন। দেখুন তাদের শাস্তি, আযাব ও ধ্বংস কিভাবে তাদের উপর আপতিত হয়। [ইবন কাসীর] যেমন অন্য আয়াতেও আল্লাহ বলেছেন, "তাদেরকে আমরা অল্পকিছু উপভোগ করতে দেব, তারপর আমরা তাদেরকে কঠিন শাস্তির দিকে যেতে বাধ্য করব।" [সূরা লুকমান: ২৪]

৮৭- সূরা আল-আ'লা[১]
১৯ আয়াত, মক্কী

سُورَةُ الأَعْلَى

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

(১) এ সূরা মক্কায় নাযিল হওয়া প্রাচীন সূরাসমূহের অন্যতম। বারা ইবনে আযিব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের মধ্যে সর্বপ্রথম মুস'আব ইবনে উমায়ের এবং আব্দুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাকতুমই মদীনায় হিজরত করে আসেন। তারা দু'জনই আমাদেরকে কুরআন পড়ে শোনাতেন। তারপর আম্মার, বিলাল ও সা'দ আসলেন। তারপর উমর ইবনুল খাত্তাব আসলেন বিশজনকে সাথে নিয়ে। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসলেন, মদীনাবাসীগণ তার আগমনে যে রকম খুশী হয়েছিলেন তেমন আর কারও আগমনে খুশী হননি। এমনকি আমি ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদেরকে একথা বলতে শুনেছি যে, এই হলো আল্লাহ্‌র রাসূল। তিনি আমাদের মাঝে তাশরীফ রেখেছেন। তিনি আসার আগেই আমি 'সাব্বিহিস্‌মা রাব্বিকাল আ'লা' এবং এ ধরনের আরও কিছু সূরা পড়ে নিয়েছিলাম।" [বুখারী: ৪৯৪১, ৩৯২৪, ৩৯২৫, ৪৯৯৫] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মু'আয রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে বললেন, "তুমি কেন 'সাব্বিহিস্‌মা রাব্বিকাল আ'লা, ওয়াস শামছি ওয়া দুহাহা, ওয়াল্লাইলে ইযা ইয়াগসা" এ সূরাগুলো দিয়ে সালাত পড়ালে না?" [বুখারী: ৭০৫, মুসলিম: ৪৬৫] অন্য হাদীসে এসেছে, "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই ঈদের সালাতে 'সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা এবং হাল আতাকা হাদীসুল গাশীয়াহ' পড়তেন। আর যদি জুম'আর দিনে ঈদ হতো তবে তিনি দুটাতেই এ সূরা দুটি দিয়ে সালাত পড়াতেন।" [মুসনাদে আহমাদ: ৪/২৭৭] কোন কোন হাদীসে এসেছে যে, "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুম'আ ও দুই ঈদের সালাতে 'সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা এবং হাল আতাকা হাদীসুল গাশীয়াহ' দিয়ে সালাত পড়াতেন। এমনকি কখনো যদি জুম'আ ও ঈদের সালাতও একই দিনে অনুষ্ঠিত হয়ে যেত তখন তিনি উভয় সালাতে এ দু' সূরাই পড়তেন। [মুসলিম: ৮৭৮, আবুদাউদ: ১১২২, তিরমিযী: ৫৩৩, নাসায়ী: ১৪২৪, ১৫৬৮, ১৫৯০, ইবনে মাজাহ: ১২৮১] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিতরের সালাতে 'সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা, কুল ইয়া আইয়ুহাল কাফিরূন এবং কুল হুয়াল্লাহু আহাদ, পড়তেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে অপর বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি এর সাথে 'কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক ও কুল আউযু বিরাব্বিন নাস'ও পড়তেন। [মুসনাদে আহমাদ: ৩/৪০৬, ৫/১২৩, আবু দাউদ: ১৪২৪, মুস্তাদরাকে হাকিম: ১/৩০৫] ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই এ আয়াত পড়তেন তখন বলতেন, 'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা'। [আবু দাউদ: ৮৮৩, মুসনাদে আহমাদ: ১/২৩২, মুস্তাদরাকে হাকিম:১/২৬৩]

১. আপনি আপনার সুমহান রবের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন(১),	سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴿١﴾
২. যিনি(২) সৃষ্টি করেন(৩) অতঃপর সুঠাম করেন(৪) ।	الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ﴿٢﴾
৩. আর যিনি নির্ধারণ করেন(৫) অতঃপর পথনির্দেশ করেন(৬),	وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ﴿٣﴾

(১) আল্লাহ তা'আলা বান্দাদেরকে তাঁর তাসবীহ বা পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করার নির্দেশ দিচ্ছেন। যে পবিত্রতা ঘোষণার মাধ্যমে আল্লাহর যিক্‌র, ইবাদাত, তাঁর মাহাত্মের জন্য বিনয়, দৈন্যদশা ও হীনাবস্থা প্রকাশ পায়। আর তাঁর তাসবীহ যেন তাঁর সত্তার মাহাত্ম উপযোগী হয়। যেন তাঁকে তাঁর সুন্দর সুন্দর নামসমূহ দিয়েই সেগুলোর মহান অর্থের প্রতি লক্ষ্য রেখেই কেবল আহ্বান করা হয়। [সা'দী]

(২) এখানে মূলত: আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার কারণ ও হেতুসমূহ বর্ণনা করা হচ্ছে। এ আয়াত এবং এর পরবর্তী কয়েকটি আয়াতে জগৎ সৃষ্টিতে আল্লাহ্‌র অপার রহস্য ও শক্তি সম্পর্কিত কতিপয় কর্মগত গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে।

(৩) অর্থাৎ সৃষ্টি করেছেন। কোন কিছুকে নাস্তি থেকে আস্তিতে আনয়ন করেছেন। কোন সৃষ্টির এ কাজ করার সাধ্য নেই; একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার অপার কুদরতই কোন পূর্ব-নমুনা ব্যতিরেকে যখন ইচ্ছা, যাকে ইচ্ছা নাস্তি থেকে আস্তিতে আনয়ন করে।

(৪) অর্থ সামঞ্জস্যপূর্ণ, মজবুত ও সুন্দর করেছেন। [সা'দী]। অর্থাৎ তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। আর যে জিনিসটিই সৃষ্টি করেছেন তাকে সঠিক ও সুঠাম দেহসৌষ্ঠব দান করেছেন তার মধ্যে ভারসাম্য ও শক্তির অনুপাত সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাকে এমন আকৃতি দান করেছেন যে, তার জন্য এর চেয়ে ভালো আকৃতির কল্পনাই করা যেতে পারে না। একথাটিকে অন্যত্র বলা হয়েছে, "তিনি প্রত্যেকটি জিনিসকে চমৎকার তৈরি করেছেন।" [সুরা আস-সাজদাহ:৭]

(৫) অর্থাৎ প্রতিটি বস্তুকে তাকদীর নির্ধারণ করেছেন। প্রতিটি জিনিস সে তাকদীর অনুসরণ করছে। [সা'দী]

(৬) অর্থাৎ স্রষ্টা যে কাজের জন্যে যাকে সৃষ্টি করেছেন, তাকে সে কাজের পথনির্দেশও দিয়েছেন। সত্যিকারভাবে এ পথনির্দেশে আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় সৃষ্টিই অন্তর্ভুক্ত আছে। কেননা, এক বিশেষ ধরনের বুদ্ধি ও চেতনা আল্লাহ্ তা'আলা সবাইকে দিয়েছেন, যদিও তা মানুষের বুদ্ধি ও চেতনা থেকে নিম্নস্তরের। অন্য আয়াতে আছে: ﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ "তিনি বললেন, 'আমাদের প্রতিপালক তিনি, যিনি প্রত্যেক বস্তুর জন্য তাকদীর নির্ধারণ করেছেন, তারপর পথনির্দেশ করেছেন।" [সূরা ত্বাহা: ৫০] এ হিসেবে আলোচ্য আয়াতের অর্থ, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুকে সৃষ্টি

৪. আর যিনি তৃণাদি উৎপন্ন করেন[১], وَالَّذِيٓ اَخۡرَجَ الۡمَرۡعٰى ۙ۝٤

৫. পরে তা ধূসর আবর্জনায় পরিণত করেন। فَجَعَلَهٗ غُثَآءً اَحۡوٰى ؕ۝٥

৬. শীঘ্রই আমরা আপনাকে পাঠ করাব, ফলে আপনি ভুলবেন না[২], سَنُقۡرِئُكَ فَلَا تَنۡسٰٓى ۙ۝٦

৭. আল্লাহ্ যা ইচ্ছে করেন তা ছাড়া[৩]। اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ اِنَّهٗ يَعۡلَمُ الۡجَهۡرَ وَمَا يَخۡفٰى ؕ۝٧

করে এর জন্য তাকদীর নির্ধারণ করেছেন। তারপর সে তাকদীর নির্ধারিত বিষয়ের দিকে মানুষকে পরিচালিত করছেন। মুজাহিদ বলেন, মানুষকে সৌভাগ্য কিংবা দুর্ভাগ্যের পথ দেখিয়েছেন। আর জীব-জন্তুকে তাদের চারণভূমির পথ দেখিয়েছেন। [ইবন কাসীর]

(১) তিনি চারণভূমির ব্যবস্থা করেছেন। যাবতীয় উদ্ভিদ ও ক্ষেত-খামার। [ইবন কাসীর] غثاء শব্দের অর্থ খড়-কুটো, আবর্জনা; যা বন্যার পানির উপর ভাসমান থাকে। [ফাতহুল কাদীর] أحوى শব্দের অর্থ কৃষ্ণাভ গাঢ় সবুজ রং। [ফাতহুল কাদীর] এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা উদ্ভিদ সম্পর্কিত স্বীয় কুদরত ও হেকমত বর্ণনা করেছেন। তিনি ভূমি থেকে সবুজ-শ্যামল ঘাস উৎপন্ন করেছেন, অতঃপর একে শুকিয়ে কাল রং-এ পরিণত করেছেন এবং সবুজতা বিলীন করে দিয়েছেন। এতে দুনিয়ার চাকচিক্য যে ক্ষণস্থায়ী সেদিকে ইঙ্গিত করেছেন। [কুরতুবী]

(২) পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের জন্য তাঁর যে সমস্ত দুনিয়াবী নেয়ামত প্রদান করেছেন সেগুলোর কিছু বর্ণনার পর এখন কিছু দ্বীনী নেয়ামত বর্ণনা করছেন। তন্মধ্যে প্রথমেই হচ্ছে কুরআন। [সা'দী] এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সুসংবাদ জানানো হচ্ছে যে, আল্লাহ তাকে এমন জ্ঞান দান করবেন যে, তিনি কুরআনের কোন আয়াত বিস্মৃত হবেন না। আপনার কাছে কিতাবের যে ওহী আমরা পাঠিয়েছি আমরা সেটার হিফাযত করব, আপনার অন্তরে সেটা গেঁথে দেব, ফলে তা ভুলে যাবেন না। [ইবন কাসীর;সা'দী]

(৩) এই বাক্যটির কয়েকটি অর্থ হতে পারে। এক, কুরআনের কিছু আয়াত রহিত করার এক সুবিদিত পদ্ধতি হচ্ছে প্রথম আদেশের বিপরীতে পরিষ্কার দ্বিতীয় আদেশ নাযিল করা। এর আরেকটি পদ্ধতি হলো সংশ্লিষ্ট আয়াতটিই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সকল মুসলিমের স্মৃতি থেকে মুছে দেয়া। এ সম্পর্কে এক আয়াতে আছে, ﴿مَا نَنۡسَخۡ مِنۡ اٰيَةٍ اَوۡ نُنۡسِهَا﴾ অর্থাৎ 'আমরা কোন আয়াত রহিত করি অথবা আপনার স্মৃতি থেকে উধাও করে দেই'। [সূরা আল-বাকারাহ:১০৬] তাই 'আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ছাড়া' বলে রহিত আয়াতগুলোর কথা বলা হয়েছে। দুই. অথবা আয়াতের উদ্দেশ্য, কখনো সাময়িকভাবে আপনার ভুলে যাওয়া এবং কোন আয়াত বা শব্দ

নিশ্চয় তিনি জানেন যা প্রকাশ্য ও যা গোপনীয় ।

وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ﴿٨﴾

৮. আর আমরা আপনার জন্য সুগম করে দেব সহজ পথ[১] ।

فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ ﴿٩﴾

৯. অতঃপর উপদেশ যদি ফলপ্রসূ হয় তবে উপদেশ দিন[২];

سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ ﴿١٠﴾

১০. যে ভয় করে সেই উপদেশ গ্রহণ করবে[৩] ।

আপনার কোন সময় ভুলে যাওয়া এই ওয়াদার ব্যতিক্রম । যে ব্যাপারে ওয়াদা করা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, আপনি স্থায়ীভাবে কুরআনের কোন শব্দ ভুলে যাবেন না । হাদীসে আছে, একদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন একটি সূরা তেলাওয়াত করলেন এবং মাঝখান থেকে একটি আয়াত বাদ পড়ল । ওহী লেখক উবাই ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু মনে করলেন যে, আয়াতটি বোধ হয় মনসুখ হয়ে গেছে । কিন্তু জিজ্ঞাসার জওয়াবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: মনসুখ হয়নি, আমিই ভুলক্রমে পাঠ করিনি । [মুসনাদে আহমাদ:৩/৪০৭] অন্য হাদীসে এসেছে, একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক সাহাবীকে কোন আয়াত পড়তে শোনে বললেন, আল্লাহ্ তাকে রহমত করুন, আমাকে এ আয়াতটি ভুলিয়ে দেয়া হয়েছিল এখন মনে পড়েছে । [মুসলিম: ৭৮৮] অতএব, উল্লিখিত ব্যতিক্রমের সারমর্ম এই যে, সাময়িকভাবে কোন আয়াত ভুলে যাওয়া অতঃপর তা স্মরণে আসা বর্ণিত প্রতিশ্রুতির পরিপন্থী নয় । [দেখুন, কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

(১) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা আপনার জন্য সহজ সরল শরী'আত প্রদান করবেন । যাতে কোন বক্রতা থাকবে না । [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ যেখানে স্মরণ করিয়ে দিলে কাজে লাগে সেখানে স্মরণ করিয়ে দিবেন । এর দ্বারা জ্ঞান দেয়ার আদব ও নিয়ম নীতি বোঝা যায় । সুতরাং যারা জ্ঞান গ্রহণ করার উপযুক্ত নয়, তাদের কাছে সেটা না দেয়া । যেমন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'তুমি যদি এমন কওমের কাছে কোন কথা বল যা তাদের বিবেকে ঢুকবে না, তাহলে সেটা তাদের কারও কারও জন্য বিপদের কারণ হবে । তারপর তিনি বললেন, মানুষ যা চিনে তা-ই শুধু তাদেরকে জানাও, তুমি কি চাও যে লোকেরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর মিথ্যারোপ করুক? [ইবন কাসীর]

(৩) অর্থাৎ যে ব্যক্তির মনে আল্লাহর ভয় এবং তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে হবে এমন ধারণা কাজ করে সে অবশ্যই আপনার উপদেশ মনোযোগ সহকারে শুনবে । [ইবন কাসীর]

১১. আর তা উপেক্ষা করবে যে নিতান্ত হতভাগ্য,

وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى ۝١١

১২. যে ভয়াবহ আগুনে দগ্ধ হবে,

الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ۝١٢

১৩. তারপর সেখানে সে মরবেও না বাঁচবেও না(১) ।

ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى ۝١٣

১৪. অবশ্যই সাফল্য লাভ করবে যে পরিশুদ্ধ হয়(২) ।

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۝١٤

১৫. এবং তার রবের নাম স্মরণ করে ও

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ۝١٥

(১) অর্থাৎ তার মৃত্যু হবে না । যার ফলে আযাব থেকে রেহাই পাবে না । আবার বাঁচার মতো বাঁচবেও না । যার ফলে জীবনের কোন স্বাদ-আহলাদও পাবে না । [ইবন কাসীর] হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আর যারা জাহান্নামী; তারা সেখানে মরবেও না, বাঁচবেও না । তবে এমন কিছু লোক হবে যারা গোনাহ করেছিল (কিন্তু মুমিন ছিল) তারা সেখানে মরে যাবে । তারপর যখন তারা কয়লায় পরিণত হবে তখন তাদের জন্য সুপারিশের অনুমতি দেয়া হবে; ফলে তাদেরকে টুকরা টুকরা অবস্থায় নিয়ে এসে জান্নাতের নালাসমূহে প্রসারিত করে রাখা হবে । তারপর বলা হবে, হে জান্নাতীরা তোমরা এদেরকে সিক্ত কর । এতে তারা বন্যায় ভেসে আসা বীজের ন্যায় আবার উৎপন্ন হবে ।" [মুসলিম: ১৮৫] এ হাদীস থেকে বোঝা গেল যে, আলোচ্য আয়াতে শুধু কাফের-মুশরিকদের ক্ষেত্রেই বলা হয়েছে যে, তারা বাঁচবেও না আবার মরবেও না । অর্থাৎ তারা আরামের বাঁচা বাঁচবে না । আবার মৃত্যুও হবে না যে, তারা আযাব থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে । পক্ষান্তরে ঈমানদারদের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ ভিন্ন । তারা জাহান্নামে গেলে সেখানে তাদের গোনাহ পরিমাণ শাস্তি ভোগ করার পর মৃত্যু প্রাপ্ত হবে, ফলে তারা অতিরিক্ত শাস্তি ভোগ থেকে মুক্তি পাবে । এরপর সুপারিশের মাধ্যমে সেখান থেকে বেরিয়ে আসবে ।

(২) এখানে পরিশুদ্ধ বা পবিত্রতার অর্থ কুফর ও শির্ক ত্যাগ করে ঈমান আনা, অসৎ আচার-আচরণ ত্যাগ করে সদাচার অবলম্বন করা এবং অসৎকাজ ত্যাগ করে সৎকাজ করা । আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যা নাযিল হয়েছে তার অনুসরণ করা । আয়াতের আরেক অর্থ, ধনসম্পদের যাকাত প্রদান করা । তবে যাকাতকেও এ কারণে যাকাত বলা হয় যে, তা ধন-সম্পদকে পরিশুদ্ধ করে । এখানে تزكى শব্দের অর্থ ব্যাপক হতে পারে । ফলে ঈমানগত ও চরিত্রগত পরিশুদ্ধি এবং আর্থিক যাকাত প্রদান সবই এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে । [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

সালাত কায়েম করে[১]।

১৬. কিন্তু তোমরা দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দাও, — بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۝١٦

১৭. অথচ আখিরাতই উৎকৃষ্ট[২] ও স্থায়ী[৩]। — وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ۝١٧

১৮. নিশ্চয় এটা আছে পূর্ববর্তী সহীফাসমূহে--- — اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ۝١٨

১৯. ইব্‌রাহীম ও মূসার সহীফাসমূহে[৪]। — صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى ۝١٩

---

(১) কেউ কেউ অর্থ করেছেন, তারা তাদের রবের নাম স্মরণ করে এবং সালাত আদায় করে। বাহ্যতঃ এতে ফরয ও নফল সবরকম সালাত অন্তর্ভুক্ত। কেউ কেউ ঈদের সালাত দ্বারা এর তাফসীর করে বলেছেন যে, যে যাকাতুল ফিতর এবং ঈদের সালাত আদায় করে। কোন কোন মুফাসসির বলেন, 'নাম স্মরণ করা' বলতে আল্লাহকে মনে মনে স্মরণ করা এবং মুখে তা উচ্চারণ করাও উদ্দেশ্য হতে পারে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌কে মনে মনে বা মুখে উচ্চারণ করে স্মরণ করেছে, তারপর সালাত আদায় করেছে। সে শুধু আল্লাহ্‌র স্মরণ করেই ক্ষান্ত থাকেনি। বরং নিয়মিত সালাত আদায়ে ব্যাপৃত ছিল। মূলতঃ এ সবই আয়াতের অর্থ হতে কোন বাধা নেই। [ফাতহুল কাদীর]

(২) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আখেরাতের তুলনায় দুনিয়া তো শুধু এমন যেন তোমাদের কেউ সমূদ্রে তার আঙ্গুল ডুবিয়েছে। তারপর সে যেন দেখে নেয় সে আঙ্গুল কি নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে?" [মুসলিম: ২৮৫৮]

(৩) অর্থাৎ আখেরাত দু'দিক দিয়ে দুনিয়ার মোকাবিলায় অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। প্রথমত তার সুখ, স্বাচ্ছন্দ, আরাম-আয়েশ দুনিয়ার সমস্ত নিয়ামতের চাইতে আনেক বেশী ও অনেক উচ্চ পর্যায়ের। দ্বিতীয়ত দুনিয়া ধ্বংসশীল এবং আখেরাত চিরস্থায়ী। [ইবন কাসীর]

(৪) অর্থাৎ এই সূরার সব বিষয়বস্তু অথবা সর্বশেষ বিষয়বস্তু (আখেরাত উৎকৃষ্ট ও চিরস্থায়ী হওয়া) পূর্ববর্তী ইবরাহীম ও মূসা আলাইহিস্ সালাম-এর সহীফাসমূহে লিখিত আছে। [ইবন কাসীর]

৮৮- সূরা আল-গাশিয়াহ[১]
২৬ আয়াত, মক্কী

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আপনার কাছে কি আচ্ছন্নকারীর (কিয়ামতের) সংবাদ এসেছে?

هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ ﴿١﴾

২. সেদিন অনেক চেহারা হবে অবনত[২],

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ﴿٢﴾

৩. ক্লিষ্ট, ক্লান্ত[৩],

عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ﴿٣﴾

---

(১) ‘গাশিয়াহ’ বলে কিয়ামতকে বোঝানো হয়েছে। এটি কিয়ামতেরই একটি নাম। [ইবন কাসীর] এর আক্ষরিক অনুবাদ হচ্ছে, ‘আচ্ছন্নকারী’। অর্থাৎ যে বিপদটা সারা সৃষ্টিকুলকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। [ফাতহুল কাদীর] সেদিনের ঘটনা মানুষের যাবতীয় দুঃখকে যেমন আচ্ছন্ন করে ফেলবে, তেমনি যাবতীয় আনন্দকে মাটি করে দিয়ে চিন্তাক্লিষ্ট করে দিবে। কোন কোন মুফাসসির ‘গাশিয়াহ’ এর অনুবাদ করেছেন জাহান্নামের আগুন। কেননা, জাহান্নামের আগুন সবকিছুকে আচ্ছন্ন করে রাখবে। তার প্রতাপে সবকিছু ঢেকে যাবে। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, ﴿وَتَغْشٰى وُجُوْهَهُمُ النَّارُ﴾ “আর আগুন আচ্ছন্ন করবে তাদের মুখমন্ডল” [সূরা ইবরাহীম: ৫০] আবার কোন কোন মুফাসসিরের মতে, ‘গাশিয়াহ’ বলে জাহান্নামবাসীদের বোঝানো হয়েছে। কারণ, তারা জাহান্নামকে আচ্ছন্ন করে রাখবে। সেখানে যেতে ও আযাব ভোগ করতে তাদের বাধ্য করা হবে। তন্মধ্যে প্রথম অর্থটি সবচেয়ে বেশী প্রসিদ্ধ। [ফাতহুল কাদীর]

(২) কেয়ামতে মুমিন ও কাফের আলাদা আলাদা বিভক্ত দু দল হবে এবং মুখমণ্ডল দ্বারা পৃথকভাবে পরিচিত হবে। এই আয়াতে কাফেরদের মুখমণ্ডলের এক অবস্থা এই বর্ণিত হয়েছে যে, তা خاشعة অর্থাৎ হেয় হবে। خشوع শব্দের অর্থ নত হওয়া ও লাঞ্ছিত হওয়া। [ইবন কাসীর]

(৩) দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থা হবে ﴿عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ﴾ বাকপদ্ধতিতে অবিরাম কর্মের কারণে পরিশ্রান্ত ব্যক্তিকে عَامِلَةٌ এবং ক্লান্ত ও ক্লিষ্ট ব্যক্তিকে বলা হয় نَاصِبَةٌ। [ফাতহুল কাদীর] কাফেরদের এ অবস্থা কখন হবে? এ নিয়ে কয়েকটি মত রয়েছে। কোন কোন মুফাসসিরের মতে, কাফেরদের এ দুরাবস্থা দুনিয়াতেই হবে। কেননা, আখেরাতে কোন কর্ম ও মেহনত নেই। [ফাতহুল কাদীর] কেননা, অনেক কাফের দুনিয়াতে মুশরিকসুলভ ইবাদত এবং বাতিল পন্থায় অধ্যবসায় ও সাধনা করে থকে। হিন্দু যোগী ও নাসারা পাদ্রী অনেক এমন আছে, যারা আন্তরিকতা সহকারে আল্লাহ্ তা‘আলারই

৪. তারা প্রবেশ করবে জ্বলন্ত আগুনে(১); تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً ۟ۙ

৫. তাদেরকে অত্যন্ত উষ্ণ প্রস্রবণ থেকে পান করানো হবে; تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ ۟ؕ

৬. তাদের জন্য খাদ্য থাকবে না কাঁটাযুক্ত لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ ۟ۙ

সন্তুষ্টির জন্যে দুনিয়াতে ইবাদত ও সাধনা করে থকে এবং এতে অসাধারণ পরিশ্রম স্বীকার করে। কিন্তু এসব ইবাদত মুশরিকসুলভ ও বাতিল পন্থায় হওয়ার কারণে আল্লাহ্‌র কাছে সওয়াব ও পুরস্কার লাভের যোগ্য হয় না। অতএব, তাদের মুখমণ্ডল দুনিয়াতেও ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত রইল এবং আখেরাতে তাদেরকে লাঞ্ছনা ও অপমানের অন্ধকার আচ্ছন্ন করে রাখবে। খলীফা ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু যখন শাম সফর করেন তখন জনৈক নাসারা বৃদ্ধ পাদ্রী তাঁর কাছ দিয়ে যেতে দেখলেন। সে তাঁর ধর্মীয় ইবাদত সাধনা ও মোজাহাদায় এত বেশী আত্মনিয়োগ করেছিল যে, অতিরিক্ত পরিশ্রমের কারণে চেহারা বিকৃত এবং দেহ শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। তার পোশাকের মধ্যেও কোন শ্রী ছিল না। খলীফা তাকে দেখে অশ্রু সংবরণ করতে পারলেন না। ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বললেন: এই বৃদ্ধার করুণ অবস্থা দেখে আমি ক্রন্দন করতে বাধ্য হয়েছি। বেচারী স্বীয় লক্ষ্য অর্জনের জন্যে জীবনপণ পরিশ্রম ও সাধনা করেছে কিন্তু সে তার লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে এবং আল্লাহর সন্তুটি অর্জন করতে পারেনি। তারপর তিনি এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন। [ইবন কাসীর]

কাতাদাহ রাহেমাহুল্লাহর মতে, তাদের অবিরাম কষ্ট ও ক্লান্তি দু'টোই আখেরাতে হবে। সে হিসেবে আয়াতের অর্থ, যারা দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে অহংকার করেছিল তাদেরকে সেদিন কর্মে খাটানো হবে এবং তাদেরকে জাহান্নামে প্রতিষ্ঠিত করা হবে; এমতাবস্থায় যে তারা তাদের ভারী জিঞ্জির ও ভারী বোঝাসমূহ বহন করতে থাকবে। অনুরূপভাবে তারা হাশরের মাঠের সে বিপদসংকুল সময়ে নগ্ন পা ও শরীর নিয়ে কঠিন অবস্থায় অবস্থান করতে থাকবে, যার পরিমান হবে পঞ্চাশ হাজার বছর। হাসান বসরী ও সাঈদ ইবনে জুবাইর রাহেমাহুমাল্লাহ বলেন, তারা যেহেতু দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র জন্য কোন নেক আমল করেনি, সেহেতু সেখানে তারা জাহান্নামে কঠিন খাটুনি ও কষ্ট করবে। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, তাদেরকে কঠিন কঠিন পাহাড়ে ওঠা-নামার কাজে লাগানো হবে। পরে কষ্ট ও ক্লান্তি উভয়টিরই সম্মুখীন হবে। [ফাতহুল কাদীর]

(১) শব্দের অর্থ গরম উত্তপ্ত। অগ্নি স্বাভাবতই উত্তপ্ত। এর সাথে উত্তপ্ত বিশেষণ যুক্ত করা এ কথা বলার জন্যে যে, এই অগ্নির উত্তাপ দুনিয়ার অগ্নির ন্যায় কোন সময় কম অথবা নিঃশেষ হয় না বরং এটা চিরন্তন উত্তপ্ত। সে আগুন তাদেরকে সবদিক থেকে ঘিরে ধরবে। [সা'দী]

গুল্ম ছাড়া[১],

৭. যা তাদেরকে পুষ্ট করবে না এবং তাদের ক্ষুধা নিবৃত্ত করবে না। لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ ۞

৮. অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে আনন্দোজ্জ্বল, وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ۞

৯. নিজেদের কাজের সাফল্যে পরিতৃপ্ত[২], لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ۞

১০. সুউচ্চ জান্নাতে--- فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۞

১১. সেখানে তারা অসার বাক্য শুনবে না[৩], لَّا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً ۞

---

(১) ضَرِيْعٌ শব্দের অর্থ করা হয়েছে, কাঁটাযুক্ত গুল্ম। অর্থাৎ জাহান্নামীরা কোন খাদ্য পাবে না কেবল এক প্রকার কন্টকবিশিষ্ট ঘাস। পৃথিবীর মাটিতে এ ধরনের গুল্ম ছড়ায়। দুর্গন্ধযুক্ত বিষাক্ত কাঁটার কারণে জন্তু-জানোয়ার এর ধারে কাছেও যায় না। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত যে, ضَرِيْعٌ হচ্ছে জাহান্নামের একটি গাছ। যা খেয়ে কেউ মোটা তাজা হবে না এবং এতে ক্ষুধা থেকেও মুক্তি পাওয়া যাবে না। [ফাতহুল কাদীর]

লক্ষণীয় যে, কুরআন মজীদে কোথাও বলা হয়েছে, জাহান্নামের অধিবাসীদের খাবার জন্য “যাককুম” দেয়া হবে। কোথাও বলা হয়েছে, “গিসলীন” (ক্ষতস্থান থেকে ঝরে পড়া তরল পদার্থ) ছাড়া তাদের আর কোন খাবার থাকবে না। আর এখানে বলা হচ্ছে, তারা খাবার জন্য কাঁটাওয়ালা শুকনো ঘাস ছাড়া আর কিছুই পাবে না। এ বর্ণনাগুলোর মধ্যে মূলত কোন বৈপরীত্য নেই । এর অর্থ এও হতে পারে যে, জাহান্নামের অনেকগুলো পর্যায় থাকবে। বিভিন্ন অপরাধীকে তাদের অপরাধ অনুযায়ী সেই সব পর্যায়ে রাখা হবে। তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের আযাব দেয়া হবে। আবার এর অর্থ এও হতে পারে যে, তারা “যাককুম” খেতে না চাইলে “গিসলীন” পাবে এবং তা খেতে অস্বীকার করলে কাঁটাওয়ালা ঘাস ছাড়া আর কিছুই পাবে না। মোটকথা, তারা কোন মনের মতো খাবার পাবে না। [কুরতুবী]

(২) অর্থাৎ দুনিয়ায় তারা যেসব প্রচেষ্টা চালিয়ে ও কাজ করে এসেছে আখেরাতে তার চমৎকার ফল দেখে তারা আনন্দিত হবে। [ফাতহুল কাদীর] এটা তাদের প্রচেষ্টার কারণেই সম্ভব হয়েছে। [ইবন কাসীর]

(৩) অর্থাৎ জান্নাতে জান্নাতীরা কোন অসার ও মর্মন্তুদ কথাবার্তা শুনতে পাবে না। মিথ্যা, কুফরী কথাবার্তা, গালিগালাজ, অপবাদ ও পীড়াদায়ক কথাবার্তা সবই এর

১২. সেখানে থাকবে বহমান প্রস্রবণ,

فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ﴿١٢﴾

১৩. সেখানে থাকবে উন্নত[১] শয্যাসমূহ,

فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ ﴿١٣﴾

১৪. আর প্রস্তুত থাকবে পানপাত্র,

وَّأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ ﴿١٤﴾

১৫. সারি সারি উপাধান,

وَّنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ﴿١٥﴾

১৬. এবং বিছানা গালিচা;

وَّزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ ﴿١٦﴾

১৭. তবে কি তারা তাকিয়ে দেখে না উটের দিকে, কিভাবে তা সৃষ্টি করা হয়েছে?

أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿١٧﴾

১৮. এবং আসমানের দিকে, কিভাবে তা ঊর্ধ্বে স্থাপন করা হয়েছে?

وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿١٨﴾

১৯. এবং পর্বতমালার দিকে, কিভাবে তা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে?

وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿١٩﴾

২০. এবং ভূতলের দিকে, কিভাবে তা বিস্তৃত করা হয়েছে[২]?

وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿٢٠﴾

অন্তর্ভুক্ত। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, ﴿لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا ۖ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ "সেখানে তারা 'শান্তি' ছাড়া কোন অসার বাক্য শুনবে না এবং সেখানে সকাল-সন্ধ্যা তাদের জন্য থাকবে জীবনোপকরণ।" [সূরা মারইয়াম:৬২] আরও এসেছে, ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا﴾ "সেখানে তারা শুনবে না কোন অসার বা পাপবাক্য," [সূরা আল-ওয়াকি'আহ:২৫] আরও বলা হয়েছে, ﴿لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا﴾ "সেখানে তারা শুনবে না অসার ও মিথ্যা বাক্য" [সূরা আন-নাবা:৩৫] এ থেকে জানা গেল যে, দোষারোপ ও অশালীন কথাবার্তা খুবই পীড়াদায়ক। তাই জান্নাতীদের অবস্থায় একে গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করা হয়েছে।

(১) এ উন্নত অবস্থা সার্বিক দিকেই হবে। এ সমস্ত শয্যা অবস্থান, মর্যাদা ও স্থান সবদিক থেকেই উন্নত। সাধারণত মানুষ এ ধরনের শয্যা পছন্দ করে থাকে। আল্লাহর বন্ধুরা যখন এ সমস্ত শয্যায় বসতে চাইবে, তখনি সেগুলো তাদের জন্য নিচু হয়ে আসবে। [ইবন কাসীর]

(২) কেয়ামতের অবস্থা এবং মুমিন ও কাফেরের প্রতিদান এবং শাস্তি বর্ণনা করার পর কেয়ামতে অবিশ্বাসী হঠকারীদের পথ প্রদর্শনের জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কুদরতের কয়েকটি নিদর্শন সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করার কথা বলেছেন। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন আকাশ ও পৃথিবীতে অসংখ্য। এখানে মরুচারী

২১. অতএব আপনি উপদেশ দিন; আপনি তো কেবল একজন উপদেশদাতা(১), فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ ﴿٢١﴾

২২. আপনি তাদের উপর শক্তি প্রয়োগকারী নন। لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ﴿٢٢﴾

২৩. তবে কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে ও কুফরী করলে إِلَّا مَن تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ ﴿٢٣﴾

২৪. আল্লাহ্ তাদেরকে দেবেন মহাশাস্তি(২)। فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ﴿٢٤﴾

২৫. নিশ্চয় তাদের ফিরে আসা আমাদেরই কাছে; إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ﴿٢٥﴾

২৬. তারপর তাদের হিসেব-নিকেশ আমাদেরই কাজ। ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ﴿٢٦﴾

আরবদের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যশীল চারটি নিদর্শনের উল্লেখ করা হয়েছে। আরবরা উটে সওয়ার হয়ে দূর-দূরান্তের সফর করে। তখন তাদের সর্বাধিক নিকটে থাকে উট, উপরে আকাশ, নিচে ভূপৃষ্ঠ এবং অগ্র-পশ্চাতে সারি সারি পর্বতমালা। এই চারটি বস্তু সম্পর্কেই তাদেরকে চিন্তা-ভাবনা করার আদেশ দেয়া হয়েছে। [কুরতুবী]

(১) এখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সান্ত্বনার জন্যে বলা হয়েছে, আপনার বর্ণিত ন্যায়সংগত যুক্তি মানতে যদি কোন ব্যক্তি প্রস্তুত না হয়, তাহলে মানা না মানা তার ইচ্ছা। আপনি তাদের শাসক নন যে, তাদেরকে মুমিন করতেই হবে। আপনার কাজ শুধু প্রচার করা ও উপদেশ দেয়া। লোকদেরকে ভুল ও সঠিক এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য জানিয়ে দেয়া। তাদেরকে ভুল পথে চলার পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করা। কাজেই এ দায়িত্ব আপনি পালন করে যেতে থাকুন। এতটুকু করেই আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। তাদের হিসাব-নিকাশ, শাস্তি ও প্রতিদান আমার কাজ। [দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(২) আবু উমামাহ্ আল বাহেলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু খালেদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে মু'আবিয়ার নিকট গমন করলে খালেদ তাকে জিজ্ঞেস করল, আপনি সবচেয়ে নরম বা আশাব্যঞ্জক কোন বাণী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছেন? তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, "মনে রেখ! তোমাদের সবাই জান্নাতে প্রবেশ করবে, তবে ঐ ব্যক্তি ব্যতীত যে মালিক থেকে পলায়ণপর উটের মত পালিয়ে বেড়ায়"। [মুসনাদে আহমাদ: ৫/২৮৫, মুস্তাদরাকে হাকিম: ১/৫৫]

৮৯- সূরা আল-ফাজ্‌র[১]
৩০ আয়াত, মক্কী

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. শপথ ফজরের[২],

وَالْفَجْرِ ①

২. শপথ দশ রাতের[৩],

وَلَيَالٍ عَشْرٍ ②

(১) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মু'আয রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে বলেছেন, মু'আয তুমি কেন সূরা 'সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা', 'ওয়াস শামছি ওয়া দুহাহা', 'ওয়াল ফাজর' আর 'ওয়াললাইলি ইযা ইয়াগশা' দিয়ে সালাত পড়ো না? [সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ী: ১১৬৭৩]

(২) শপথের পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে প্রথম বিষয় হচ্ছে ফজর অর্থাৎ সোবহে-সাদেকের সময়, যা ঊষা নামে খ্যাত। এখানে কোন 'ফজর' উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে এ ব্যাপারে কয়েকটি মত রয়েছে। এক. প্রত্যেক দিনের প্রভাতকাল উদ্দেশ্য। কারণ, প্রভাতকাল বিশ্বে এক মহাবিপ্লব আনয়ন করে এবং আল্লাহ্‌ তা'আলার অপার কুদরতের দিকে পথ প্রদর্শন করে। দুই. এখানে বিশেষ দিনের প্রভাতকাল বোঝানো হয়েছে। সে হিসেবে কারো কারো মতে এর দ্বারা মহররম মাসের প্রথম তারিখের প্রভাতকাল উদ্দেশ্য; কারণ এ দিনটি ইসলামী চান্দ্র বছরের সূচনা। কেউ কেউ এর অর্থ নিয়েছেন, যিলহজ্ব মাসের দশম তারিখের প্রভাতকাল। [ফাতহুল কাদীর]

(৩) শপথের দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে দশ রাত্রি। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু, কাতাদা ও মুজাহিদ প্রমুখ তাফসীরবিদদের মতে এতে যিলহজের দশ দিন বোঝানো হয়েছে। [ইবন কাসীর] যা সর্বোত্তম দিন বলে বিভিন্ন হাদীসে স্বীকৃত। হাদীসে এসেছে, "এদিনগুলোতে নেক আমল করার চেয়ে অন্য কোন দিন নেক আমল করা আল্লাহ্‌র নিকট এত উত্তম নয়, অর্থাৎ জ্বিলহজের দশ দিন। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্‌র পথে জিহাদও নয়? রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহ্‌র পথে জিহাদও নয় তবে সে ব্যক্তির কথা ভিন্ন যে নিজের জান ও মাল নিয়ে জিহাদে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি"। [বুখারী: ৯৬৯, আবুদাউদ:২৩৪৮, তিরমিযী: ৭৫৭, ইবনে মাজাহ: ১৭২৭, মুসনাদে আহমাদ:১/২২৪] তাছাড়া এই দশ দিনের তাফসীরে জাবের রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "নিশ্চয় দশ হচ্ছে কোরবানীর মাসের দশদিন, বেজোড় হচ্ছে আরাফার দিন আর জোড় হচ্ছে কোরবানীর দিন" [মুসনাদে আহমাদ: ৩/৩২৭, মুস্তাদরাকে হাকিম: ৪/২২০, আস-সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ী: ৪০৮৬, ১১৬০৭,১১৬০৮] সুতরাং এখানে দশ রাত্রি বলে যিলহজের দশ দিন বোঝানো হয়েছে। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন : মূসা আলাইহিস্‌ সালাম-এর কাহিনীতে ﴿وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ﴾ বলে এই দশ রাত্রিকেই বোঝানো হয়েছে।

৩. শপথ জোড় ও বেজোড়ের[১]

وَّالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۝

৪. শপথ রাতের যখন তা গত হয়ে থাকে-[২]--

وَالَّيْلِ اِذَا يَسْرِ ۝

৫. নিশ্চয়ই এর মধ্যে শপথ রয়েছে বোধসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য[৩]।

هَلْ فِيْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِيْ حِجْرٍ ۝

কুরতুবী বলেন, জাবের রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর হাদীস থেকে জানা গেল যে, যিলহজ্বের দশ দিন সর্বোত্তম দিন এবং এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, মূসা আলাইহিস্ সালাম-এর জন্যেও এ দশ দিনই নির্ধারিত করা হয়েছিল।

(১) এ দুটি শব্দের আভিধানিক অর্থ যথাক্রমে 'জোড়' ও 'বিজোড়'। এই জোড় ও বিজোড় বলে আসলে কি বোঝানো হয়েছে, আয়াত থেকে নির্দিষ্টভাবে তা জানা যায় না। তাই এ ব্যাপারে তাফসীরকারগণের উক্তি অসংখ্য। কিন্তু জাবের রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "বেজোড় এর অর্থ আরাফা দিবস (যিলহজ্বের নবম তারিখ) এবং জোড় এর অর্থ ইয়াওমুন্নাহ্র (যিলহজ্বের দশম তারিখ)"। [মুসনাদে আহমাদ:৩/৩২৭] কোন কোন তাফসীরবিদ বলেন, জোড় বলে যাবতীয় সালাত আর বেজোড় বলে বিতর ও মাগরিবের সালাত বোঝানো হয়েছে। কোন কোন তাফসীরবিদ বলেন, জোড় বলে সমগ্র সৃষ্টজগৎ বোঝানো হয়েছে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টিকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেন, ﴿وَّخَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا﴾ অর্থাৎ আমি সবকিছু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি। [সূরা আন-নাবা:৮] যথা: কুফর ও ঈমান, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য, আলো ও অন্ধকার, রাত্রি ও দিন, শীত-গ্রীষ্ম, আকাশ ও পৃথিবী, জিন ও মানব এবং নর ও নারী। এগুলোর বিপরীতে বিজোড় একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] তবে যেহেতু জাবের রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণিত হাদীসে এর একটি তাফসীর এসেছে সেহেতু সে তাফসীরটি বেশী অগ্রগণ্য।

(২) يسري অর্থ রাত্রিতে চলা। অর্থাৎ রাত্রির শপথ, যখন সে চলতে থাকে তথা খতম হতে থাকে। [ইবন কাসীর]

(৩) উপরোক্ত পাঁচটি শপথ উল্লেখ করার পর আল্লাহ্ তা'আলা গাফেল মানুষকে চিন্তাভাবনা করার জন্যে বলেছেন, "এতে কি বিবেকবানরা শপথ নেয়ার মত গুরুত্ব খুঁজে পায়? মূলত: حجر এর শাব্দিক অর্থ বাধা দেয়া। মানুষের বিবেক মানুষকে মন্দ ও ক্ষতিকর বিষয়াদি থেকে বাধাদান করে। তাই حجر এর অর্থ বিবেকও হয়ে থাকে। এখানে তাই বোঝানো হয়েছে। [ইবন কাসীর] আয়াতের অর্থ এই যে, বিবেকবানের জন্যে এসব শপথও যথেষ্ট কিনা? এই প্রশ্ন প্রকৃতপক্ষে মানুষকে গাফলত থেকে জাগ্রত করার একটি কৌশল। পরবর্তী আয়াতসমূহে কাফেরদের ওপর আযাব আসার কথা বর্ণনা করেও এ কথা ব্যক্ত করা হয়েছে যে, কুফর ও গোনাহের শাস্তি আখেরাতে হওয়া তো

৬. আপনি দেখেননি আপনার রব কি (আচরণ) করেছিলেন 'আদ বংশের---	أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۝
৭. ইরাম গোত্রের প্রতি(১)---যারা অধিকারী ছিল সুউচ্চ প্রাসাদের?---	إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۝
৮. যার সমতুল্য কোন দেশে সৃষ্টি করা হয়নি(২);	الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ۝

স্থিরীকৃত বিষয়ই। মাঝে মাঝে দুনিয়াতেও তাদের প্রতি আযাব প্রেরণ করা হয়। এ ক্ষেত্রে তিনটি জাতির আযাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে–(এক) 'আদ বংশ, (দুই) সামূদ গোত্র এবং (তিন) ফির'আউন সম্প্রদায়।

(১) 'আদ ও সামুদ জাতিদ্বয়ের বংশলতিকা উপরের দিকে ইরামে গিয়ে এক হয়ে যায়। তাই আয়াতে বর্ণিত ইরাম শব্দটি 'আদ ও সামূদ উভয়ের বেলায় প্রযোজ্য। এখানে ইরাম শব্দ ব্যবহার করে 'আদ-গোত্রের পূর্ববর্তী বংশধর তথা প্রথম 'আদকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তারা দ্বিতীয় 'আদের তুলনায় 'আদের পূর্বপুরুষ ইরামের নিকটতম বিধায় তাদেরকে عاد إرم 'আদে-ইরাম শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে এবং সূরা আন-নাজমে ﴿عَادًا الْأُولَىٰ﴾ শব্দ দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর]

এখানে তাদের বিশেষণে বলা হয়েছে ذات العماد মূলত: عماد শব্দের অর্থ স্তম্ভ। তারা অত্যন্ত দীর্ঘকায় জাতি ছিল বিধায় তাদের ﴿ذَاتِ الْعِمَادِ﴾ বলা হয়েছে। অপর কারো কারো মতে তারা যেহেতু অট্টালিকায় বাস করত সেহেতু তাদেরকে ﴿ذَاتِ الْعِمَادِ﴾ বলা হয়েছে। কারণ অট্টালিকা নির্মাণ করতে স্তম্ভ নির্মানের প্রয়োজন হয়। তারা সর্বপ্রথম এ জাতীয় অট্টালিকা নির্মাণ করে। দুনিয়ায় তারাই সর্বপ্রথম উঁচু উঁচু স্তম্ভের ওপর ইমারত নির্মাণ করার কাজ শুরু করে। কুরআন মজীদের অন্য জায়গায় তাদের এই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়েছে: হূদ আলাইহিস্ সালাম তাদেরকে বললেন,"তোমাদের এ কেমন অবস্থা, প্রত্যেক উঁচু জায়াগায় অনর্থক একটি স্মৃতিগৃহ তৈরি করছো এবং বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করছো, যেন তোমনা চিরকাল এখানে থাকবে।" [সূরা আশ শু'আরা: ১২৮-১২৯] অন্য আয়াতে আছে, ﴿وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ﴾ "আর তারা পাহাড় কেটে ঘর নির্মাণ করত নিরাপদ বাসের জন্য। [সূরা আল-হিজর: ৮২]

(২) অর্থাৎ 'আদ জাতি দৈহিক গঠন ও শক্তি-সাহসে অন্য সব জাতি থেকে স্বতন্ত্র ছিল। কুরআনের অন্যান্য স্থানে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, "দৈহিক গঠনের দিক দিয়ে তোমাদের অবয়বকে অত্যন্ত সমৃদ্ধ করেছেন।" [সূরা আল আরাফ, ৬৯] আল্লাহ্ অন্যত্র আরো বলেছেন, "আর তাদের ব্যাপারে বলতে গেলে বলতে হয়, তারা কোন অধিকার ছাড়াই পৃথিবীর বুকে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের অহংকার করেছে। তারা বলেছে,

৯. এবং সামূদের প্রতি ?- যারা উপত্যকায়[১] পাথর কেটে ঘর নির্মাণ করেছিল;

وَثَمُوْدَ الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۝

১০. এবং কীলকওয়ালা ফির‘আউনের প্রতি[২] ?

وَفِرْعَوْنَ ذِى الْاَوْتَادِ ۝

১১. যারা দেশে সীমালংঘন করেছিল,

الَّذِيْنَ طَغَوْا فِى الْبِلَادِ ۝

১২. অতঃপর সেখানে অশান্তি বৃদ্ধি করেছিল।

فَاَكْثَرُوْا فِيْهَا الْفَسَادَ ۝

১৩. ফলে আপনার রব তাদের উপর শাস্তির কশাঘাত হানলেন।

فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ۝

১৪. নিশ্চয় আপনার রব সতর্ক দৃষ্টি

اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ۝

কে আছে আমাদের চাই তে বেশী শক্তিশালী ?” [সূরা হা-মীম আস সাজদাহ, ১৫] আরও বলেছেন, “আর তোমরা যখন কারো ওপর হাত উঠিয়েছো প্রবল পরাক্রান্ত হয়েই উঠিয়েছো।” [সূরা আশ শু‘আরা, ১৩০]

(১) উপত্যকা বলতে ‘আলকুরা’ উপত্যকা বুঝানো হয়েছে। সামূদ জাতির লোকেরা সেখানে পাথর কেটে কেটে তার মধ্যে এভাবে ইমারত নির্মাণের রীতি প্রচলন করেছিল। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(২) أوتاد শব্দটি وتد এর বহুবচন। এর অর্থ কীলক। ফির‘আউনের জন্য ‘যুল আউতাদ’ (কীলকধারী) শব্দ এর আগে সূরা সাদের ১২ আয়াতেও ব্যবহার করা হয়েছে। ফির‘আউনকে কীলকওয়ালা বলার বিভিন্ন কারণ তাফসীরবিদগণ বর্ণনা করেছেন। কারও কারও মতে এর দ্বারা যুলুম নিপীড়ন বোঝানোই উদ্দেশ্য। কারণ, ফির‘আউন যার উপর ক্রোধান্বিত হত, তার হাত-পা চারটি পেরেকে বেঁধে অথবা চার হাত-পায়ে পেরেক মেরে রৌদ্রে শুইয়ে রাখত। বা কোন গাছের সাথে পেরেক মেরে রাখত। অথবা পেরেক মেরে দেহের উপর সাপ-বিচ্ছু ছেড়ে দিত। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, এখানে তার সেনাবাহিনীকেই কীলকের সাথে তুলনা করা হয়েছে এবং সেই অর্থে কীলকধারী মানে সেনাবাহিনীর অধিকারী। কারণ তাদেরই বদৌলতে তার রাজত্ব এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল যেমন কীলকের সাহায্যে তাবু মজবুতভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে। তাছাড়া এর অর্থ সেনা দলের সংখ্যাধিক্যও হতে পারে। এক্ষেত্রে এর অর্থ হবে, তার সেনাদল যেখানে গিয়ে তাবু গাঁড়তো সেখানেই চারদিকে শুধু তাঁবুর কীলকই পোঁতা দেখা যেতো। কারও কারও মতে, এর দ্বারা ফির‘আউনের প্রাসাদ-অট্টালিকা বোঝানো হয়েছে। এসবের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। ফির‘আউন মূলত: এসবেরই অধিকারী ছিল। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

রাখেন[১]।

১৫. মানুষ তো এরূপ যে, তার রব যখন তাকে পরীক্ষা করেন সম্মান ও অনুগ্রহ দান করে, তখন সে বলে, 'আমার রব আমাকে সম্মানিত করেছেন[২]।'

فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ﴿١٥﴾

১৬. আর যখন তাকে পরীক্ষা করেন তার রিয্‌ক সংকুচিত করে, তখন সে বলে, 'আমার রব আমাকে হীন করেছেন।'

وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ﴿١٦﴾

১৭. কখনো নয়[৩]। বরং[৪] তোমরা

كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ﴿١٧﴾

(১) এ সূরায় পাঁচটি বস্তুর শপথ করে ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ﴾ আয়াতে বর্ণিত বিষয়বস্তুকে জোরদার করা হয়েছে। অর্থাৎ এ দুনিয়াতে তোমরা যাকিছু করছ, তার শাস্তি ও প্রতিদান অপরিহার্য ও নিশ্চিত। তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের যাবতীয় কাজকর্ম ও গতিবিধির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন এবং সবাইকে প্রতিদান ও শাস্তি দেবেন। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(২) আল্লাহ্ তা'আলা যখন কাউকে জীবনোপকরণে সমৃদ্ধি ও স্বাচ্ছন্দ্য, ধন-সম্পদ ও সুস্বাস্থ্য দান করেন, তখন শয়তান তাকে বিভিন্ন ভাবে ভ্রান্ত ধারণায় লিপ্ত করে- সে মনে করতে থাকে যে, এটা আমার ব্যক্তিগত প্রতিভা, গুণ-গরিমা ও কর্ম প্রচেষ্টারই অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি, যা আমার লাভ করাই সঙ্গত। আমি এর যোগ্য পাত্র। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] সে আরও মনে করে যে, আমি আল্লাহ্‌র কাছেও প্রিয় পাত্র। যদি প্রত্যাখ্যাত হতাম, তবে তিনি আমাকে এসব নেয়ামত দান করতেন না। এমনিভাবে কেউ অভাব-অনটন ও দারিদ্রের সম্মুখীন হলে একে আল্লাহ্‌র কাছে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার দলীল মনে করে।

(৩) পূর্ববর্তী ধারণা খণ্ডানোর জন্যই মহান আল্লাহ্ এ আয়াতে বলছেন যে, তোমাদের পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত ধারণাসমূহ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন। দুনিয়াতে জীবনোপকরণের স্বাচ্ছন্দ সৎ ও আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র হওয়ার আলামত নয়, তেমনি অভাব-অনটন ও দারিদ্র প্রত্যাখ্যাত ও লাঞ্ছিত হওয়ার দলীল নয়। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যাপার সম্পূর্ণ উল্টো হয়ে থাকে। কোন কোন নবী-রাসূল কঠিন কষ্ট ভোগ করেছেন আবার কোনও কোনও আল্লাহ্‌দ্রোহী আরাম-আয়েশে জীবন অতিবাহিত করে দিয়েছেন। [দেখুন, ইবন কাসীর]

(৪) এখানে কাফের ও তাদের অনুসারী ফাসিকদের কয়েকটি মন্দ অভ্যাস সম্পর্কে সাবধান করা হচ্ছে। প্রথমেই বলা হয়েছে যে, তোমরা ইয়াতীমকে সম্মান কর না। এখানে আসলে বলার উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা ইয়াতীমদের প্রাপ্য আদায় কর না এবং

ইয়াতীমকে সম্মান কর না,

১৮. এবং তোমরা মিসকীনকে খাদ্যদানে পরস্পরকে উৎসাহিত কর না[১],

وَلَا تَحٰٓضُّوْنَ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۟

১৯. আর তোমরা উত্তরাধিকারের সম্পদ সম্পূর্ণরূপে খেয়ে ফেল[২],

وَتَاْكُلُوْنَ التُّرَاثَ اَكْلًا لَّمًّا ۟

২০. আর তোমরা ধন-সম্পদ খুবই ভালবাস[৩];

وَّتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ۟

২১. কখনো নয়[৪]। যখন যমীনকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হবে[৫],

كَلَّآ اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا دَكًّا ۟

২২. আর যখন আপনার রব আগমন করবেন ও সারিবদ্ধভাবে ফেরেশ্‌তাগণও[৬],

وَّجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۟

তাদের প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার গ্রহণ করো না। [ফাতহুল কাদীর] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “জান্নাতে আমি ও ইয়াতীমের তত্ত্বাবধানকারী এভাবে থাকবে” এটা বলে তিনি তার মধ্যমা ও তর্জনী আংগুলদ্বয় একসাথ করে দেখালেন। [বুখারী: ৬০০৫]

(১) এখানে তাদের দ্বিতীয় মন্দ অভ্যাস বর্ণনা করা হয়েছে যে, তোমরা নিজেরা তো গরীব-মিসকীনকে খাবার দাওই না, পরন্তু অপরকেও এ কাজে উৎসাহিত কর না।

(২) এখানে তাদের তৃতীয় মন্দ অভ্যাস বর্ণনা করা হয়েছে যে, তোমরা হালাল ও সব রকম ওয়ারিশী সম্পত্তি একত্রিত করে খেয়ে ফেল [ইবন কাসীর]

(৩) এখানে চতুর্থ মন্দ অভ্যাস বর্ণনা করা হয়েছে যে, তোমরা ধন-সম্পদকে অত্যাধিক ভালবাস। [ইবন কাসীর]

(৪) অর্থাৎ তোমাদের কাজ এরকম হওয়া উচিত নয়। [ফাতহুল কাদীর]

(৫) কাফেরদের মন্দ অভ্যাসসমূহ বর্ণনার পর আবার আখেরাতের আলোচনা করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে যে, যখন ভুকম্পনের মত হয় সবকিছু ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে; তখন কার কি অবস্থা হবে একটু চিন্তা করা দরকার।

(৬) মূলে বলা হয়েছে ﴿وَّجَآءَ رَبُّكَ﴾ এর শাব্দিক অনুবাদ হচ্ছে, “আপনার রব আসবেন।” এখানে ‘হাশরের মাঠে আল্লাহর আগমন’ সাব্যস্ত করা হয়েছে। তিনি (আল্লাহ্) অবশ্যই হাশরের মাঠে বিচার ফয়সালা করার জন্য স্বয়ং আসবেন। [ইবন কাসীর] আল্লাহ্ তা‘আলা হাশরের মাঠে আগমন করবেন এটা সত্য। যেভাবে আসা তাঁর জন্য উপযুক্ত তিনি সেভাবে আসবেন। এই আগমনের অর্থ আমরা বুঝি কিন্তু তিনি

২৩. আর সেদিন জাহান্নামকে আনা হবে[১], সেদিন মানুষ স্মরণ করবে, তখন এ স্মরণ তার কি কাজে আসবে[২]?

وَجِايْٓءَ يَوْمَئِذٍۭ بِجَهَنَّمَ ۙ يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى ۝٢٣

২৪. সে বলবে, 'হায়! আমার এ জীবনের জন্য আমি যদি কিছু অগ্রিম পাঠাতাম?'

يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِيْ ۝٢٤

২৫. সেদিন তাঁর শাস্তির মত শাস্তি কেউ দিতে পারবে না,

فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهٗۤ اَحَدٌ ۝٢٥

২৬. এবং তাঁর বাঁধার মত বাঁধতে কেউ পারবে না।

وَّلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهٗۤ اَحَدٌ ۝٢٦

২৭. হে প্রশান্ত আত্মা!

يٰۤاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝٢٧

২৮. তুমি তোমার রবের কাছে ফিরে আস সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে[৩],

ارْجِعِيْۤ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۝٢٨

কিভাবে আগমন করবেন তা তিনি ব্যতীত কেউ জানে না। এটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আলেমদের বিশ্বাস। দুনিয়ায় কোন বাদশাহর সমগ্র সেনাদল এবং তার মন্ত্রণাপরিষদ ও সভাসদদের আগমনে ঠিক ততটা প্রভাব ও প্রতাপ সৃষ্টি হয় না যতটা বাদশাহর নিজের দরবারে আগমনে সৃষ্টি হয়। এই বিষয়টিই এখানে বুঝানো হয়েছে।

(১) অর্থাৎ সেদিন জাহান্নামকে আনা হবে বা সামনে উপস্থিত করা হবে। হাদীসে এসেছে, "জাহান্নামকে ফেরেশতারা টেনে নিয়ে আসবে, সেদিন জাহান্নামের সত্তর হাজার লাগাম হবে, প্রতি লাগামে সত্তর হাজার ফেরেশতা থাকবে।" [মুসলিম: ২৮৪২, তিরমিযী:২৫৭৩]

(২) মূলে বলা হয়েছে يَتَذَكَّرُ এর দু'টি অর্থ হতে পারে। এক. يَتَذَكَّرُ এর অর্থ এখানে বুঝে আসা। সুতরাং সেদিন মানুষ সচেতন হবে। সে উপদেশ গ্রহণ করবে। সে বুঝতে পারবে, নবীগণ তাকে যা কিছু বলেছিলেন তাই ছিল সঠিক এবং তাদের কথা না মেনে সে বোকামি করেছে। কিন্তু সে সময় সচেতন হওয়া, উপদেশ গ্রহণ করা এবং নিজের ভুল বুঝতে পারায় কী লাভ? [দেখুন, ফাতহুল কাদীর] দুই. অথবা يَتَذَكَّرُ অর্থ স্মরণ করা। অর্থাৎ সেদিন মানুষ দুনিয়ায় যা কিছু করে এসেছে তা স্মরণ করবে এবং সেজন্য লজ্জিত হবে। কিন্তু তখন স্মরণ করায় এবং লজ্জিত হওয়ায় কোন লাভ হবে না। [দেখুন, ইবন কাসীর]

(৩) এখানে মুমিনদের রূহকে 'আন-নাফসুল মুতমায়িন্নাহ' বা প্রশান্ত আত্মা বলে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ এ আত্মা আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট এবং আল্লাহ্ তা'আলাও তার

২৯. অতঃপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও[১], — فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ﴿٢٩﴾

৩০. আর আমার জান্নাতে প্রবেশ কর। — وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴿٣٠﴾

প্রতি সন্তুষ্ট। কেননা, বান্দার সন্তুষ্টির দ্বারাই বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ তার প্রতি সন্তুষ্ট। আল্লাহ্ বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট না হলে বান্দা আল্লাহ্‌র ফয়সালায় সন্তুষ্ট হওয়ার তাওফীকই পায় না। এমনি আত্মা মৃত্যুকালে মৃত্যুতেও সন্তুষ্ট ও আনন্দিত হয়।

এখন প্রশ্ন হলো, একথা তাকে কখন বলা হবে? বলা হয় মৃত্যুকালে বলা হবে; অথবা, যখন কিয়ামতের দিন পুনরায় জীবিত হয়ে হাশরের ময়দানের দিকে যেতে থাকবে সে সময়ও বলা হবে এবং আল্লাহর আদালতে পেশ করার সময়ও তাকে একথা বলা হবে। প্রতিটি পর্যায়ে তাকে এই মর্মে নিশ্চয়তা দান করা হবে যে, সে আল্লাহর রহমতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। [দেখুন, ইবন কাসীর]

(১) প্রশান্ত আত্মাকে সম্বোধন করে বলা হবে, আমার বিশেষ বান্দাদের কাতারভুক্ত হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর। এ আদেশ হতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, জান্নাতে প্রবেশ করা নেককার সৎ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ওপর নির্ভরশীল। তাদের সাথেই জান্নাতে প্রবেশ করা যাবে। এ কারণেই সুলাইমান আলাইহিস্ সালাম দো'আ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, ﴿وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ﴾ "এবং আপনার অনুগ্রহে আমাকে আপনার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের শামিল করুন।" [সূরা আন-নামল:১৯] অনুরূপভাবে ইউসুফ আলাইহিস্ সালামও দো'আ করতে গিয়ে বলেছিলেন, ﴿وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾ "আর আমাকে সৎকর্মপরায়ণদের সাথে মিলিয়ে দিন" [সূরা ইউসুফ: ১০১] এমনকি ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামও দো'আ করে বলেছিলেন, ﴿رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾ "হে আমার রব! আমাকে প্রজ্ঞা দান করুন এবং আমাকে সৎকর্মপরায়ণদের সাথে মিলিয়ে দিন"। [সূরা আশ-শু'আরা: ৮৩] এতে বোঝা গেল, সৎসংসর্গ একটি মহা নেয়ামত, যা নবী-রাসূলগণও উপেক্ষা করতে পারেন না।

৯০- সূরা আল-বালাদ
২০ আয়াত, মক্কী

سُورَةُ البَلَد

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আমি(১) শপথ করছি এ নগরের,(২)

لَآ أُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ①

২. আর আপনি এ নগরের অধিবাসী(৩),

وَأَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ ②

(১) এ সূরার প্রথমেই বলা হয়েছে, لا শব্দটির অর্থ, না। কিন্তু এখানে لا শব্দটি কি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এ ব্যাপারে দু'টি মত রয়েছে। এক. এখানে لا শব্দটি অতিরিক্ত এবং আরবী বাকপদ্ধতিতে এর অতিরিক্ত ব্যবহার সুবিদিত। তবে বিশুদ্ধ উক্তি এই যে, প্রতিপক্ষের ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করার জন্যে এই لا শব্দটি শপথ বাক্যের শুরুতে ব্যবহৃত হয়। উদ্দেশ্য এই যে, এটা কেবল আপনার ধারণা নয়; বরং আমি শপথ সহকারে যা বলছি, তাই বাস্তব সত্য। অথবা অমুক অমুক জিনিসের কসম খেয়ে বলছি আসল ব্যাপার হচ্ছে এই। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর]

(২) البلد বা নগরী বলে এখানে মক্কা নগরীকে বোঝানো হয়েছে। [ইবন কাসীর] সূরা আত-ত্বীনেও এমনিভাবে মক্কা নগরীর শপথ করা হয়েছে এবং তদসঙ্গে أمين বিশেষণও উল্লেখ করা হয়েছে।

(৩) حلٌّ শব্দের দুটি অর্থ হতে পারে (এক) এটা حلول থেকে উদ্ভূত। অর্থ কোন কিছুতে অবস্থান নেয়া, থাকা ও অবতরণ করা। সে হিসেবে আয়াতের মর্মার্থ এই যে, মক্কা নগরী নিজেও সম্মানিত ও পবিত্র, বিশেষত আপনিও এ নগরীতে বসবাস করেন। বসবাসকারীর শ্রেষ্ঠত্বের দরুনও বাসস্থানের শ্রেষ্ঠত্ব বেড়ে যায়। কাজেই আপনার বসবাসের কারণে এ নগরীর মাহাত্ম্য ও সম্মান দ্বিগুণ হয়ে গেছে। [ফাতহুল কাদীর] (দুই) এটা حلال থেকে উদ্ভূত। অর্থ হালাল হওয়া। এদিক দিয়ে এক অর্থ এই যে, আপনাকে মক্কার কাফেররা হালাল মনে করে রেখেছে এবং আপনাকে হত্যা করার ফিকিরে রয়েছে; অথচ তারা নিজেরাও মক্কা নগরীতে কোন শিকারকেই হালাল মনে করে না। এমতাবস্থায় তাদের যুলুম ও অবাধ্যতা কতটুকু যে, তারা আল্লাহ্‌র রাসূলের হত্যাকে হালাল মনে করে নিয়েছে। অপর অর্থ এই যে, আপনার জন্যে মক্কার হারামে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হালাল করে দেওয়া হবে। [ইবন কাসীর] বস্তুত মক্কা বিজয়ের সময় একদিনের জন্যেই তাই করা হয়েছিল। আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন মাথায় শিরস্ত্রাণ পরিধান করে মক্কায় প্রবেশ করলেন, তারপর যখন তিনি তা খুললেন, এক লোক এসে তাকে বলল যে, ইবনে খাতল কা'বার পর্দা ধরে আছে। তিনি বললেন, 'তাকে হত্যা কর'। [বুখারী: ১৮৪৬, মুসলিম: ৪৫০] কারণ, পূর্ব থেকেই তার মৃতুদণ্ডের ঘোষণা রাসূল দিয়েছিলেন।

৩. শপথ জন্মদাতার ও যা সে জন্ম দিয়েছে[১] ।	وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ ۟
৪. নিঃসন্দেহে আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি কষ্ট-ক্লেশের মধ্যে[২] ।	لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِیْ كَبَدٍ ۟
৫. সে কি মনে করে যে, কখনো তার উপর কেউ ক্ষমতাবান হবে না?	اَیَحْسَبُ اَنْ لَّنْ یَّقْدِرَ عَلَیْهِ اَحَدٌ ۟
৬. সে বলে, 'আমি প্রচুর অর্থ নিঃশেষ করেছি[৩] ।'	یَقُوْلُ اَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا ۟
৭. সে কি মনে করে যে, তাকে কেউ দেখেনি?	اَیَحْسَبُ اَنْ لَّمْ یَرَهٗۤ اَحَدٌ ۟
৮. আমরা কি তার জন্য সৃষ্টি করিনি দুচোখ?	اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَیْنَیْنِ ۟

(১) যেহেতু বাপ ও তার ঔরসে জন্ম গ্রহণকারী সন্তানদের ব্যাপারে ব্যপক অর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এবং সামনের দিকে মানুষের কথা বলা হয়েছে, তাই বাপ মানে আদম আলাইহিসসালামই হতে পারেন। আর তাঁর ঔরসে জন্ম গ্রহণকারী সন্তান বলতে দুনিয়ায় বর্তমানে যত মানুষ পাওয়া যায়, যত মানুষ অতীতে পাওয়া গেছে এবং ভবিষ্যতেও পাওয়া যাবে সবাইকে বুঝানো হয়েছে। এভাবে এতে আদম ও দুনিয়ার আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সব বনী-আদমের শপথ করা হয়েছে। অথবা وَالِدٌ বলে প্রত্যেক জম্মদানকারী পিতা আর وَلَدَ বলে প্রত্যেক সন্তানকে বোঝানো হয়েছে। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(২) এখানে পূর্ববর্তী শপথসমূহের জওয়াবে বলা হয়েছে যে, ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِیْ كَبَدٍ﴾ আয়াতে বর্ণিত كبد এর শাব্দিক অর্থ শ্রম ও কষ্ট। অর্থাৎ মানুষ সৃষ্টিগতভাবে আজীবন শ্রম ও কষ্টের মধ্যে থাকে। [ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(৩) বলা হয়েছে সে বলে "আমি প্রচুর ধন-সম্পদ উড়িয়ে দিয়েছি। এই শব্দগুলোই প্রকাশ করে, বক্তা তার ধন-সম্পদের প্রাচুর্যে কী পরিমাণ গর্বিত। যে বিপুল পরিমাণ ধন সে খরচ করেছে নিজের সামগ্রিক সম্পদের তুলনায় তার কাছে তার পরিমাণ এত সামান্য ছিল যে, তা উড়িয়ে বা ফুঁকিয়ে দেবার কোন পরোয়াই সে করেনি। আর এই সম্পদ সে কোন কাজে উড়িয়েছে? কোন প্রকৃত নেকীর কাজে নয়, যেমন সামনের আয়াতগুলো থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। বরং এই সম্পদ সে উড়িয়েছে নিজের ধনাঢ্যতার প্রদর্শনী এবং নিজের অহংকার ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করার জন্য।

৯. আর জিহ্‌বা ও দুই ঠোঁট? — وَلِسَانًا وَّشَفَتَيْنِ ۝٩

১০. আর আমরা তাকে দেখিয়েছি(১) দু'টি পথ(২)। — وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ ۝١٠

১১. তবে সে তো বন্ধুর গিরিপথে(৩) প্রবেশ করেনি। — فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۝١١

১২. আর কিসে আপনাকে জানাবে--- বন্ধুর গিরিপথ কী? — وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْعَقَبَةُ ۝١٢

---

(১) অর্থাৎ ভাল ও মন্দ দু'টি পথের দিশাই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাকে দিয়েছেন। শুধুমাত্র বুদ্ধি ও চিন্তার শক্তি দান করে তাকে নিজের পথ নিজে খুঁজে নেবার জন্য ছেড়ে দেননি। বরং তাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। তার সামনে ভালো ও মন্দ এবং নেকী ও গোনাহের দু'টি পথ সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। ভালোভাবে চিন্তা-ভাবনা করে তার মধ্য থেকে নিজ দায়িত্বে যে পথটি ইচ্ছা সে গ্রহণ করতে পারে। পবিত্র কুরআনের অন্যত্রও এই একই কথা বলা হয়েছে, সেখানে এসেছে, "আমি মানুষকে একটি মিশ্রিত বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছি, যাতে তার পরীক্ষা নেয়া যায় এবং এ উদ্দেশ্যে আমি তাকে শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টিশক্তির অধিকারী করেছি। আমি তাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছি, চাইলে সে শোকরকারী হতে পারে বা কুফরকারী।" [সূরা আল-ইনসান: ২-৩]

(২) نَجْدَيْنِ শব্দটি نَجْدٌ এর দ্বিবচন। এর শাব্দিক অর্থ উর্ধ্বগামী পথ। [ফাতহুল কাদীর] এখানে প্রকাশ্য পথ বোঝানো হয়েছে। এপথ দুটির একটি হচ্ছে সৌভাগ্য ও সাফল্যের পথ এবং অপরটি হচ্ছে অনিষ্ট ও ধ্বংসের পথ। এ পথ দু'টির একটি গেছে ওপরের দিকে। কিন্তু সেখানে যেতে হলে খুব কষ্ট ও পরিশ্রম করতে হয়। সে পথটি বড়ই দুর্গম। সে পথে যেতে হলে মানুষকে নিজের প্রবৃত্তি ও তার আকাংখা এবং শয়তানের প্ররোচনার সাথে লড়াই করে এগিয়ে যেতে হয়। আর দ্বিতীয় পথটি বড়ই সহজ। এটি খাদের মধ্যে নেমে গেছে। এই পথ দিয়ে নীচের দিকে নেমে যাবার জন্য কোন পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না। বরং এ জন্য শুধুমাত্র নিজের প্রবৃত্তির বছাধনটা একটু আলগা করে দেয়াই যথেষ্ট। তারপর মানুষ আপনা আপনি গড়িয়ে যেতে থাকে। এখন এই যে ব্যক্তিকে আমি দু'টি পথই দেখিয়ে দিয়েছিলাম সে ঐ দু'টি পথের মধ্য থেকে নীচের দিকে নেমে যাবার পথটি গ্রহণ করে নিয়েছে এবং ওপরের দিকে যে পথটি গিয়েছে সেটি পরিত্যাগ করেছে।

(৩) عقبة বলা হয় পাহাড়ের বিরাট প্রস্তর খণ্ডকে এবং দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী গিরিপথকে। [ফাতহুল কাদীর]

১৩. এটা হচ্ছেঃ দাসমুক্তি(১)

فَكُّ رَقَبَةٍ ۝١٣

১৪. অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে খাদ্যদান(২)--

أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ۝١٤

১৫. ইয়াতীম আত্মীয়কে(৩),

يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۝١٥

১৬. অথবা দারিদ্র-নিষ্পেষিত নিঃস্বকে,

أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۝١٦

১৭. তদুপরি সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় যারা ঈমান এনেছে এবং পরস্পরকে উপদেশ দিয়েছে ধৈর্য ধারণের, আর পরস্পর উপদেশ দিয়েছে দয়া-অনুগ্রহের(৪);

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ۝١٧

---

(১) এসব সৎকর্মের মধ্যে প্রথমে দাসমুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। এটা খুব বড় ইবাদত এবং একজন মানুষের জীবন সুসংহত করার নামান্তর। বিভিন্ন হাদীসে এর অনেক সওয়াবের উল্লেখ এসেছে। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যে কেউ কোন দাসকে মুক্ত করবে সেটা তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তিপণ হিসেবে বিবেচিত হবে"। [মুসনাদে আহমাদ: ৪/১৪৭, ১৫০]

(২) দ্বিতীয় সৎকর্ম হচ্ছে ক্ষুধার্তকে অন্নদান। যে কাউকে অন্নদান করলে তা আরও বিরাট সওয়াবের কাজ হয়ে যায়। তাই বলা হয়েছে, বিশেষভাবে যদি আত্মীয় ইয়াতীমকে অন্নদান করা হয়, তবে তাতে দ্বিগুণ সওয়াব হয়। (এক) ক্ষুধার্তের ক্ষুধা দূর করার সওয়াব এবং (দুই) আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা ও তার হক আদায় করার সওয়াব। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "কোন মুসলিম ক্ষুধার্তকে অন্নদান ক্ষমাকে অবশ্যম্ভাবী করে"। [মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৫২৪]

(৩) এ ধরনের ইয়াতীমের হক সবচেয়ে বেশী। একদিকে সে ইয়াতীম, দ্বিতীয়ত সে তার নিকটাত্মীয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'মিসকীনকে দান করা নিঃসন্দেহে একটি দান কিন্তু আত্মীয়দের দান করা দু'টি। দান ও আত্মীয়তার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা। [মুসনাদে আহমাদ: ৪/২১৪, তিরমিযী: ৬৫৩]

(৪) এ আয়াতে ঈমানের পর মুমিনের এই কর্তব্য ব্যক্ত করা হয়েছে যে, সে অপরাপর মুসলিম ভাইকে সবর ও অনুকম্পার উপদেশ দেবে। সবরের অর্থ নিজেকে মন্দ কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখা ও সৎকর্ম সম্পাদন করা। مرحمة এর অর্থ অপরের প্রতি দয়ার্দ্র হওয়া। অপরের কষ্টকে নিজের কষ্ট মনে করে তাকে কষ্টদান ও যুলুম করা থেকে বিরত হওয়া। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের উম্মতের মধ্যে এই রহম ও করুণাবৃত্তিটির মতো উন্নত নৈতিক বৃত্তিটিকেই সবচেয়ে বেশী প্রসারিত ও বিকশিত করতে চেয়েছেন। হাদীসে এসেছে, "যে মানুষের প্রতি রহমত

أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ﴿١٨﴾

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ﴿١٩﴾

عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ ﴿٢٠﴾

১৮. তারাই সৌভাগ্যশালী।

১৯. আর যারা আমাদের আয়াতসমূহে কুফরী করেছে, তারাই হতভাগ্য।

২০. তারা পরিবেষ্টিত হবে অবরুদ্ধ আগুনে।

করে না আল্লাহ্ তার প্রতি রহমত করেন না"। [বুখারী: ৭৩৭৬, মুসলিম: ৩১৯, মুসনাদে আহমাদ:৪/৫৬২] অন্য হাদীসে এসেছে, "যে আমাদের ছোটদের রহমত করে না এবং বড়দের সম্মান পাওয়ার অধিকারের প্রতি খেয়াল রাখে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়"। [আবুদাউদ: ৪৯৪৩, তিরমিযী: ১৯২০] আরও বলা হয়েছে, "যারা রহমতের অধিকারী (দয়া করে) তাদেরকে রহমান রহমত করেন, তোমরা যমীনের অধিবাসীদের প্রতি রহমত কর তবে আসমানের উপর যিনি আছেন (আল্লাহ্) তিনিও তোমাদেরকে রহমত করবেন।" [আবু দাউদ: ৪৯৪১, তিরমিযী: ১৯২৪]

৯১- সূরা আশ-শাম্‌স[১]
১৫ আয়াত, মক্কী

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. শপথ সূর্যের এবং তার কিরণের[২],

وَالشَّمْسِ وَضُحٰىهَا ①

২. শপথ চাঁদের, যখন তা সূর্যের পর আবির্ভূত হয়[৩],

وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰىهَا ②

৩. শপথ দিনের, যখন সে সূর্যকে প্রকাশ করে[৪],

وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰىهَا ③

৪. শপথ রাতের, যখন সে সূর্যকে আচ্ছাদিত করে[৫],

وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰىهَا ④

৫. শপথ আসমানের এবং যিনি তা নির্মাণ করেছেন তাঁর[৬],

وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنٰىهَا ⑤

---

(১) এ সূরা দিয়ে সালাত আদায় করার কথাও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মু'আয রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে বলেছিলেন। [বুখারী:৭০৫, মুসলিম: ৪৬৫]

(২) এখানে ضحى শব্দটি شمس এর বিশেষণ। এ শব্দের কয়েকটি অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ হলো দিন, দিনের প্রথমভাগ। [মুয়াসসার, তাবারী] এর আরেকটি অর্থ হতে পারে, তা হলো, আর শপথ সূর্যের কিরণ বা আলোর। [সা'দী, জালালাইন]

(৩) অর্থাৎ শপথ চন্দ্রের যখন তা সূর্যের অনুসরণ করে, সূর্যের পর আসে। এর অর্থ এই হতে পারে যে, যখন চন্দ্র সূর্যাস্তের পরপরেই উদিত হয়। মাসের মধ্যভাগে এরূপ হয়। তখন চন্দ্র প্রায় পরিপূর্ণ অবস্থায় থাকে। [কুরতুবী]

(৪) এখানে جلاها এর সর্বনাম দ্বারা সূর্যও উদ্দেশ্য হতে পারে, আবার অন্ধকার বা আঁধার দূর করাও বোঝানো যেতে পারে। অর্থাৎ শপথ দিবসের, যখন তা সূর্যকে প্রকাশ করে। অথবা যখন তা অন্ধকারকে আলোকিত করে দুনিয়াকে প্রকাশ করে। [কুরতুবী] এর তৃতীয় অর্থ হতে পারে, শপথ সূর্যের, যখন তা পৃথিবীকে প্রকাশিত করে। [ইবন কাসীর]

(৫) অর্থাৎ শপথ রাত্রির যখন সে সূর্যকে আচ্ছাদিত করে। এর অর্থ, সূর্যের কিরণকে ঢেকে দেয়। এর আরেকটি অর্থ হতে পারে, আর তা হলো, শপথ রাত্রির, যখন তা পৃথিবীকে আচ্ছাদিত করে; ফলে পৃথিবী অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়। [কুরতুবী]

(৬) অর্থাৎ শপথ আকাশের ও যিনি তা নির্মাণ করেছেন তাঁর। এ-অর্থানুসারে ما কে من এর অর্থে নিতে হবে। [তাবারী] আয়াতের আরেক অর্থ হচ্ছে, শপথ আকাশের এবং

৬. শপথ জমিনের এবং যিনি তা বিস্তৃত করেছেন তাঁর[১], وَالْأَرْضِ وَمَا طَحٰهَا ۝

৭. শপথ নফ্‌সের[২] এবং যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন তাঁর [৩], وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا ۝

৮. তারপর তাকে তার সৎকাজের এবং তার অসৎ-কাজের জ্ঞান দান করেছেন[৪]– فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا ۝

তা নির্মাণের। এ অবস্থায় ما কে مصدرية এর অর্থে নিতে হবে। [কুরতুবী]

(১) এর এক অর্থ, শপথ পৃথিবীর এবং যিনি তাকে বিস্তৃত করেছেন। অপর অর্থ হচ্ছে, শপথ পৃথিবীর এবং একে বিস্তৃত করার। [তাবারী]

(২) এখানে মূলে نفس শব্দটি বলা হয়েছে। নফস শব্দটি দ্বারা যেকোনো প্রাণীর নফস বা আত্মা উদ্দেশ্য হতে পারে, আবার জবাবদিহি করতে বাধ্য মানুষের নফসও উদ্দেশ্য হতে পারে। [সা'দী]

(৩) এখানেও দু রকম অর্থ হতে পারে। একটি হলো, শপথ নফসের এবং তাঁর, যিনি সেটাকে সুবিন্যস্ত করেছেন। আরেকটি হলো, শপথ মানুষের প্রাণের এবং তা সুবিন্যস্ত করার। এখানে سواها মানে হচ্ছে, নফসকে তিনি সুপরিকল্পিতভাবে ও সুবিন্যস্তভাবে তৈরি করেছেন। [কুরতুবী] এছাড়া "সুবিন্যস্ত করার" মধ্যে এ অর্থও রয়েছে যে, তাকে জন্মগতভাবে সহজ সরল প্রকৃতির উপর সৃষ্টি করেছেন। [ইবন কাসীর]

(৪) এর অর্থ, আল্লাহ্ তার নফসের মধ্যে নেকি ও গুনাহ উভয়টি স্পষ্ট করেছেন এবং চিনিয়ে দিয়েছেন। তিনি প্রত্যেক নফসেরই ভালো ও মন্দ কাজ করার কথা রেখে দিয়েছেন; এবং যা তাকদীরে লেখা রয়েছে তা সহজ করে দিয়েছেন। [ইবন কাসীর] একথাটিই অন্যত্র এভাবে বলা হয়েছে, "আর আমরা ভালো ও মন্দ উভয় পথ তার জন্য সুস্পষ্ট করে রেখে দিয়েছি।" [সূরা আল-বালাদ:১০] আবার কোথাও বলা হয়েছে, "আমরা তাদেরকে পথ দেখিয়ে দিয়েছি, চাইলে তারা কৃতজ্ঞ হতে পারে আবার চাইলে হতে পারে অস্বীকারকারী।" [সূরা আল-ইনসান:৩] একথাটিই অন্যত্র বলা হয়েছে এভাবে, "অবশ্যই আমি শপথ করছি নাফস আল-লাওয়ামার" [সূরা আল-কিয়ামাহ: ২] সুতরাং মানুষের মধ্যে একটি নাফসে লাওয়ামাহ্ (বিবেক) আছে। সে অসৎকাজ করলে তাকে তিরস্কার করে। আরও এসেছে, "আর প্রত্যেক ব্যক্তি সে যতই ওজর পেশ করুক না কেন সে কি তা সে খুব ভালো করেই জানে।" [সূরা আল-কিয়ামাহ্: ১৪-১৫] এই তাফসীর অনুযায়ী এরূপ প্রশ্ন তোলার অবকাশ নেই যে, মানুষের সৃষ্টির মধ্যেই যখন পাপ ও ইবাদত নিহিত আছে, তখন সে তা করতে বাধ্য। এর জন্যে সে কোন সওয়াব অথবা আযাবের যোগ্য হবে না। একটি

৯. সে-ই সফলকাম হয়েছে, যে নিজেকে পবিত্র করেছে ।

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ﴿٩﴾

হাদীস থেকে এই তাফসীর গৃহীত হয়েছে । তাকদীর সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জওয়াবে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন । [মুসলিম: ২৬৫০, মুসনাদে আহমাদ: ৪/৪৩৮] এ থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা মানুষের মধ্যে গোনাহ্‌ ও ইবাদতের যোগ্যতা গচ্ছিত রেখেছেন, কিন্তু তাকে কোন একটি করতে বাধ্য করেননি; বরং তাকে উভয়ের মধ্য থেকে যে কোন একটি করার ক্ষমতা দান করেছেন । হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দো'আ করতেন, اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِيْ تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا অর্থাৎ "হে আল্লাহ্‌ আমাকে তাকওয়ার তওফীক দান করুন এবং নাফসকে পবিত্র করুন, আপানিই তো উত্তম পবিত্রকারী । আর আপনিই আমার নাফসের মুরুব্বী ও পৃষ্ঠপোষক ।" [মুসলিম: ২৭২২] তাকওয়া যেভাবে ইল্‌হাম হয়, তেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা কোন কোন মানুষের পাপের কারণে তাদের অন্তরে পাপেরও ইল্‌হাম করেন । [উসাইমীন: তাফসীর জুয আম্মা] যদি আল্লাহ্‌ কারও প্রতি সদয় হন তবে তাকে ভাল কাজের প্রতি ইলহাম করেন । সুতরাং যে ব্যক্তি কোন ভাল কাজ করতে সমর্থ হয় সে যেন আল্লাহ্‌র শোকরিয়া আদায় করে । আর যদি সে খারাপ কাজ করে তবে তাওবা করে আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে আসা উচিত । আল্লাহ্‌ কেন তাকে দিয়ে এটা করালেন, বা এ গোনাহ তার দ্বারা কেন হতে দিলেন, এ ধরনের যুক্তি দাঁড় করানোর মাধ্যমে নিজেকে আল্লাহ্‌র রহমত থেকে দূরে সরিয়েই রাখা যায়, কোন সমাধানে পৌঁছা যাবে না । কারণ; রহমতের তিনিই মালিক; তিনি যদি তার রহমত কারও প্রতি উজাড় করে দেন তবে সেটা তার মালিকানা থেকে তিনি খরচ করলেন পক্ষান্তরে যদি তিনি তার রহমত কাউকে না দেন তবে কারও এ ব্যাপারে কোন আপত্তি তোলার অধিকার নেই । যদি আপত্তি না তোলে তাওবাহ করে নিজের কোন ত্রুটির প্রতি দিক নির্দেশ করে আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে আসে তবে হয়ত আল্লাহ্‌ তাকে পরবর্তীতে সঠিক পথের দিশা দিবেন এবং তাঁর রহমত দিয়ে ঢেকে দিবেন এবং তাকওয়ার অধিকারী করবেন । ঐ ব্যক্তির ধ্বংস অনিবার্য যে আল্লাহ্‌র কর্মকাণ্ডে আপত্তি তোলতে তোলতে নিজের সময় নষ্ট করার পাশাপাশি তাকদীর নিয়ে বাড়াবাড়ি করে ভাল আমল পরিত্যাগ করে তাকদীরের দোষ দিয়ে বসে থাকে । হ্যাঁ, যদি কোন বিপদাপদ এসে যায় তখন শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র তাকদীরে সন্তুষ্টি প্রকাশের খাতিরে তাকদীরের কথা বলে শোকরিয়া আদায় করতে হবে । পক্ষান্তরে গোনাহের সময় কোনভাবেই তাকদীরের দোহাই দেয়া যাবে না । বরং নিজের দোষ স্বীকার করে আল্লাহ্‌র কাছে তাওবাহ করে ভবিষ্যতের জন্য তাওফীক কামনা করতে হবে । এজন্যই বলা হয় যে, 'গোনাহের সময় তাকদীরের দোহাই দেয়া যাবে না, তবে বিপদাপদের সময় তাকদীরের দোহাই দেয়া যাবে ।' [দেখুন, উসাইমীন, আল-কাওলুল মুফীদ শারহু কিতাবুত তাওহীদ: ২/৩৯৬-৪০২]

১০. আর সে-ই ব্যর্থ হয়েছে, যে নিজেকে কলুষিত করেছে[১] ।	وَقَدۡ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا ۝١٠
১১. সামূদ সম্প্রদায় অবাধ্যতাবশত[২] মিথ্যারোপ করেছিল ।	كَذَّبَتۡ ثَمُودُ بِطَغۡوَىٰهَآ ۝١١
১২. তাদের মধ্যে যে সর্বাধিক হতভাগ্য, সে যখন তৎপর হয়ে উঠল,	إِذِ ٱنۢبَعَثَ أَشۡقَىٰهَا ۝١٢
১৩. তখন আল্লাহ্‌র রাসূল তাদেরকে বললেন, 'আল্লাহ্‌র উষ্ট্রী ও তাকে পানি পান করানোর বিষয়ে সাবধান হও[৩] ।'	فَقَالَ لَهُمۡ رَسُولُ ٱللَّهِ نَاقَةَ ٱللَّهِ وَسُقۡيَٰهَا ۝١٣

(১) পূর্বোক্ত শপথগুলোর জওয়াবে এ আয়াতগুলোয় উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমে বলা হয়েছে, ﴿قَدۡ أَفۡلَحَ مَن زَكَّىٰهَا﴾ এখানে, زكاها শব্দটি تزكية থেকে। এর প্রকৃত অর্থ পরিশুদ্ধতা; বৃদ্ধি বা উন্নতি। বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি নিজের নফস্ ও প্রবৃত্তিকে দুস্কৃতি থেকে পাক-পবিত্র করে, তাকে সৎকাজ ও নেকির মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ ও উন্নত করে পবিত্রতা অর্জন করে, সে সফলকাম হয়েছে। এর মোকাবেলায় বলা হয়েছে, دَسَّاهَا এর শব্দমূল হচ্ছে تَدْسِيسٌ। যার মানে হচ্ছে দাবিয়ে দেয়া, লুকিয়ে ফেলা; পথভ্রষ্ট করা। পূর্বাপর সম্পর্কের ভিত্তিতে এর অর্থও এখানে সুস্পষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ সেই ব্যক্তিই ব্যর্থ, যে নিজের নফসকে নেকী ও সৎকর্মের মাধ্যমে পরিশুদ্ধ ও উন্নত করার পরিবর্তে দাবিয়ে দেয়, তাকে বিভ্রান্ত করে অসৎপ্রবণতার দিকে নিয়ে যায়। [ফাতহুল কাদীর] কোন কোন মুফাস্‌সির আয়াত দুটির আরেকটি অর্থ করেছেন, সে ব্যক্তি সফলকাম হয়; যাকে আল্লাহ্ পরিশুদ্ধ করেন এবং সে ব্যক্তি ব্যর্থ, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা গোনাহে ডুবিয়ে দেন। [ইবন কাসীর, তাবারী]

(২) অর্থাৎ তারা সালেহ্ আলাইহিস্‌সালামের নবুওয়াতকে মিথ্যা গণ্য করলো। তাদেরকে হেদায়াত করার জন্যে সালেহকে পাঠানো হয়েছিল। যে দুস্কৃতিতে তারা লিপ্ত হয়েছিল তা ত্যাগ করতে তারা প্রস্তুত ছিল না এবং সালেহ আলাইহিস্ সালাম যে তাকওয়ার দিকে তাদেরকে দাওয়াত দিচ্ছিলেন তা গ্রহণ করতেও তারা চাইছিল না। নিজেদের এই বিদ্রোহী মনোভাব ও কার্যক্রমের কারণে তাই তারা তার নবুওয়াতকে মিথ্যা বলছিল। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন সূরা আল-আ'রাফ ৭৩-৭৬, হুদ ৬১-৬২, আশ শু'আরা ১৪১-১৫৩, আন-নামল ৪৫-৪৯, আল-ক্বামার ২৩-২৫।

(৩) কুরআন মজীদের অন্যান্য স্থানে এর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, সামূদ জাতির লোকেরা সালেহ আলাইহিস সালামকে বলে দিয়েছিল যে, যদি তুমি

১৪. কিন্তু তারা তার প্রতি মিথ্যারোপ করল এবং উষ্ট্রীকে জবাই করল(১)। ফলে তাদের পাপের জন্য তাদের রব তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে একাকার করে দিলেন(২)।

فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوّٰىهَا ﴿١٤﴾

১৫. আর তিনি এর পরিণামকে ভয় করেন না(৩)।

وَلَا يَخَافُ عُقْبٰهَا ﴿١٥﴾

সত্যবাদী হও তাহলে কোন নিশানী (মু'জিযা) পেশ করো। একথায় সালেহ আলাইহিস্ সালাম মু'জিযা হিসেবে একটি উটনী তাদের সামনে হাযির করেন, তিনি বলেন: এটি আল্লাহর উটনী। যমীনের যেখানে ইচ্ছা সে চরে বেড়াবে। একদিন সে একা সমস্ত পানি পান করবে এবং অন্যদিন তোমরা সবাই ও তোমাদের পশুরা পানি পান করবে। যদি তোমরা তার গায়ে হাত লাগাও তাহলে মনে রেখো তোমাদের ওপর কঠিন আযাব বর্ষিত হবে। একথায় তারা কিছুদিন পর্যন্ত ভয় করতে থাকলো। তারপর তারা তাদের সবচেয়ে হতভাগা লোককে ডেকে একমত হলো এবং বলল, এই উটনীটিকে শেষ করে দাও। সে এই কাজের দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে এলো। [দেখুন: সূরা আল-আ'রাফ ৭৩, আশ-শু'আরা ১৫৪-১৫৬ এবং আল-ক্বামার ২৯]

(১) পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে, উটনীকে হত্যা করার পর সামুদের লোকেরা সালেহ আলাইহিস সালামকে বললো, "তুমি আমাদের যে আযাবের ভয় দেখাতে এখন সেই আযাব আনো।" [সূরা আল-আ'রাফ: ৭৭] তখন "সালেহ আলাইহিস্ সালাম তাদেরকে বললেন, তিনদিন পর্যন্ত নিজেদের গৃহে আরো আয়েশ করে নাও, তারপর আযাব এসে যাবে এবং এটি এমন একটি সতর্কবাণী যা মিথ্যা প্রমাণিত হবে না।" [সূরা হূদ: ৬৫]

(২) আয়াতে উল্লেখিত دَمْدَمَ শব্দটি এমন কঠোর শাস্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, যা বার বার কোন ব্যক্তি অথবা জাতির ওপর পতিত হয়ে তাকে সম্পূর্ণ নাস্তানাবুদ করে দেয়। [কুরতুবী] এখানে سواها এর দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, এ আযাব জাতির আবাল বৃদ্ধ বনিতা সবাইকে বেষ্টন করে নিয়েছিল। [ইবন কাসীর]

(৩) অর্থাৎ তাদের প্রতি যে আযাব নাযিল করেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা এর কোন পরিণামের ভয় করেন না। কেননা, তিনি সবার উপর কর্তৃত্বশালী, সর্ব-নিয়ন্ত্রণকারী ও একচ্ছত্র অধিপতি। তাঁর আধিপত্য, কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার বাইরে কোন কিছুই হতে পারে না। তাঁর হুকুম-নির্দেশ তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞারই নিদর্শন। [সা'দী]

৯২- সূরা আল-লাইল[১]
২১ আয়াত, মক্কী

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. শপথ রাতের, যখন সে আচ্ছন্ন করে, — وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى ①

২. শপথ দিনের, যখন তা উদ্ভাসিত হয় — وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى ②

৩. শপথ তাঁর, যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন– — وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰٓى ③

৪. নিশ্চয় তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা বিভিন্ন প্রকৃতির[২] । — اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى ④

৫. কাজেই[৩] কেউ দান করলে, তাকওয়া অবলম্বন করলে, — فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى ⑤

৬. এবং যা উত্তম তা সত্য বলে গ্রহণ করলে, — وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى ⑥

---

(১) এ সূরা দিয়ে সালাত আদায় করার কথাও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মু'আয রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে বলেছিলেন । [বুখারী:৭০৫, মুসলিম: ৪৬৫]

(২) এ কথার জন্যই রাত ও দিন এবং নারী ও পুরুষের জন্মের কসম খাওয়া হয়েছে । এর তাৎপর্য এই হতে পারে যে, যেভাবে রাত ও দিন এবং পুরুষ ও নারী পরস্পর থেকে ভিন্ন ও বিপরীত ঠিক তেমনই তোমরা যেসব কর্মপ্রচেষ্টা চালাচ্ছো সেগুলোও বিভিন্ন ধরনের এবং বিপরীত । কেউ ভালো কাজ করে, আবার কেউ খারাপ কাজ করে । [ইবন কাসীর] হাদীসে আছে, “প্রত্যেক মানুষ সকাল বেলায় উঠে নিজেকে ব্যবসায়ে নিয়োজিত করে । অতঃপর কেউ এই ব্যবসায়ে সফলতা অর্জন করে এবং নিজেকে আখেরাতের আযাব থেকে মুক্ত করে; আবার কেউ নিজেকে ধ্বংস করে ।” [মুসলিম: ২২৩]

(৩) আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে কর্ম প্রচেষ্টার ভিত্তিতে মানুষকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন এবং প্রত্যেকের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন । প্রথমে বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ যা নির্দেশ দিয়েছেন তা একমাত্র তাঁরই পথে ব্যয় করে, আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন করে আল্লাহ্ তা'আলা যা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন তা থেকে দূরে থাকে এবং উত্তম কলেমাকে সত্য মনে করে । এখানে 'উত্তম কলেমা'কে বিশ্বাস করা বলতে কলেমায়ে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' এবং কালেমা থেকে প্রাপ্ত আকীদা-বিশ্বাস ও এর উপর আরোপিত পুরস্কার-তিরস্কারকে বিশ্বাস করা বুঝায় । [সা'দী]

فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى ۞

৭. আমরা তার জন্য সুগম করে দেব সহজ পথ[১]।

وَاَمَّا مَنْۢ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى ۞

৮. আর[২] কেউ কার্পণ্য করলে এবং নিজকে অমুখাপেক্ষী মনে করলে,

وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى ۞

৯. আর যা উত্তম তাতে মিথ্যারোপ করলে,

فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى ۞

১০. তার জন্য আমরা সুগম করে দেব কঠোর পথ[৩]।

---

(১) এটি হচ্ছে উপরোক্ত প্রচেষ্টার ফল। যে ব্যক্তি উক্ত বিষয়গুলো সঠিকভাবে করে, তার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তার সব উত্তম কাজ করা ও উত্তম কাজের উপায় সহজ করে দেন, আর খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকা সহজ করে দেন। [সা'দী]

(২) এটি দ্বিতীয় ধরনের মানসিক প্রচেষ্টা। মহান আল্লাহ্ এখানে তাদের তিনটি কর্ম উল্লেখ করে বলেছেন, যে আল্লাহ্ যা নির্দেশ দিয়েছেন তা তাঁর পথে ব্যয় করার ব্যাপারে কৃপণতা করে তথা ফরয-ওয়াজিব-মুস্তাহাব কোন প্রকার সদকা দেয় না, আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বনের পরিবর্তে, তাঁর প্রতি ইবাদত করার পরিবর্তে বিমুখ হয়ে নিজেকে অমুখাপেক্ষী মনে করে এবং উত্তম কলেমা তথা ঈমানের যাবতীয় বিষয়কে মিথ্যা মনে করে; তার জন্য কঠিন পথে চলা সহজ করে দিব। এখানে কঠিন পথ অর্থ কঠিন ও নিন্দনীয় অবস্থা তথা খারাপ কাজকে সহজ করে দেয়ার কথা বলা হয়েছে। [সা'দী] প্রথম ধরনের প্রচেষ্টাটির সাথে প্রতি পদে পদে রয়েছে এর অমিল। কৃপণতা মানে শুধুমাত্র প্রচলিত অর্থে যাকে কৃপণতা বলা হয় তা নয়, বরং এখানে কৃপণতা বলতে আল্লাহর ও বান্দার হকে সামান্য কিছু হলেও ব্যয় না করা বুঝাচ্ছে। আর বেপরোয়া হয়ে যাওয়া ও অমুখাপেক্ষী মনে করা হলো তাকওয়া অবলম্বনের সম্পূর্ণ বিপরীত স্তর। তাকওয়া অবলম্বনের কারণে মানুষ তার নিজের দূর্বলতা এবং তার স্রষ্টার প্রতি মুখাপেক্ষীতার মর্ম বুঝতে পারে। এ-জন্য আল্লাহ্ তা'আলা অখুশি হন এমন কোন বিষয়ের ধারে কাছেও যায় না, আর যাতে খুশি হন তা করার সর্বপ্রচেষ্টা চালায়। আর যে ব্যক্তি নিজেকে তার রবের অমুখাপেক্ষী মনে করে, সে বেপরোয়া হয়ে যায় এবং আল্লাহ্ তা'আলা কোন কাজে খুশি হন আর কোন কাজে নাখোশ হন তার কোন তোয়াক্কা করে না। তাই তার কাজকর্ম কখনো মুত্তাকীর কর্মপ্রচেষ্টার সমপর্যায়ের হতে পারে না। উত্তম কালমায় মিথারোপ করা অর্থ ঈমানী শক্তিকে নষ্ট করে দিয়ে ঈমানের কালিমা ও আখেরাতের কথা মিথ্যা গণ্য করা। [দেখুন: বাদা'ই'উত তাফসীর]

(৩) অর্থ এই যে, যারা তাদের প্রচেষ্টা ও শ্রম প্রথমোক্ত তিন কাজে নিয়োজিত করে, (অর্থাৎ আল্লাহ্র পথে দান করা, আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বন করা এবং ঈমানকে সত্য

وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ ﴿١١﴾

১১. আর তার সম্পদ তার কোন কাজে আসবে না, যখন সে ধ্বংস হবে[১]।

إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ﴿١٢﴾

১২. নিশ্চয় আমাদের কাজ শুধু পথনির্দেশ করা[২],

وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ ﴿١٣﴾

১৩. আর আমরাই তো মালিক আখেরাতের ও প্রথমটির (দুনিয়ার)[৩]।

মনে করা) তাদেরকে আমি সৎ ও উত্তম কাজের জন্যে সহজ করে দেই। পক্ষান্তরে যারা তাদের প্রচেষ্টা ও শ্রমকে শেষোক্ত তিন কাজে নিয়োজিত করে, আমি তাদেরকে খারাপ ও দুর্ভাগ্যের কাজের জন্য সহজ করে দেই। [মুয়াসসার] এ আয়াতগুলোতে তাকদীরের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেয়া আছে। হাদীসে এসেছে, আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, আমরা বাকী আল-গারকাদে এক জানাযায় এসেছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও সেখানে আসলেন, তিনি বসলে আমরাও বসে গেলাম। তার হাতে ছিল একটি ছড়ি। তিনি সেটি দিয়ে মাটিতে খোচা দিচ্ছিলেন। তারপর বললেন, 'তোমাদের প্রত্যেকের এমনকি প্রতিটি আত্মারই স্থান জান্নাত কিংবা জাহান্নাম নির্ধারিত হয়ে গেছে। প্রত্যেকের ব্যাপারেই সৌভাগ্যশালী কিংবা দূর্ভাগা লিখে দেয়া হয়েছে। তখন একজন বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা কি আমাদের লিখা গ্রন্থের উপর নির্ভর করে কাজ-কর্ম ছেড়ে দেব না? কারণ, যারা সৌভাগ্যশালী তারা তো অচিরেই সৌভাগ্যের দিকে ধাবিত হবে, আর যারা দূর্ভাগা তারা দূর্ভাগ্যের দিকে ধাবিত হবে। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যারা সৌভাগ্যশালী তাদের জন্য সৌভাগ্যপূর্ণ কাজ করা সহজ করে দেয়া হবে, পক্ষান্তরে যারা দূর্ভাগা তাদের জন্য দূর্ভাগ্যপূর্ণ কাজ করা সহজ করে দেয়া হবে। তারপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন।" [বুখারী: ৪৯৪৮, মুসলিম: ২৬৪৭] [বাদা'ই'উত তাফসীর]

(১) تردى এর শাব্দিক অর্থ অধঃপতিত হওয়া ও ধ্বংস হওয়া। অর্থাৎ একদিন তাকে অবশ্যি মরতে হবে। তখন দুনিয়াতে যেসব ধন-সম্পদে কৃপণতা করেছিল তা তার কোনও কাজে আসবে না। [মুয়াসসার]

(২) অর্থাৎ হেদায়াত ও প্রদর্শিত সরল পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'আলার। এ আয়াতের আরেকটি অর্থ হতে পারে, আর তা হলো, হেদায়াতপূর্ণ সরল পথ আল্লাহ্ তা'আলার সান্নিধ্যে পৌছে দেয়, যেমনিভাবে ভ্রষ্টপথ জাহান্নামে পৌছে দেয়। পবিত্র কুরআনে অন্যত্র আল্লাহ্ বলেছেন, "আর সোজা পথ (দেখাবার দায়িত্ব) আল্লাহরই ওপর বার্তায় যখন বাঁকা পথও রয়েছে।" [সূরা আন-নাহল: ৯] [তাবারী, সা'দী]

(৩) এ বক্তব্যটির অর্থ, দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানের মালিক আল্লাহ্ তা'আলাই। উভয় জাহানেই আল্লাহ্ তা'আলার পূর্ণ মালিকানা ও ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত। তিনি যাকে

১৪. অতঃপর আমি তোমাদেরকে লেলিহান আগুন[১] সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছি।

فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ ﴿١٤﴾

১৫. তাতে প্রবেশ করবে সে-ই, যে নিতান্ত হতভাগ্য,

لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ﴿١٥﴾

১৬. যে মিথ্যারোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়[২]।

الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿١٦﴾

১৭. আর তা থেকে দূরে রাখা হবে পরম মুত্তাকীকে,

وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ﴿١٧﴾

১৮. যে স্বীয় সম্পদ দান করে আত্মশুদ্ধির জন্য[৩],

الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ ﴿١٨﴾

১৯. এবং তার প্রতি কারও এমন কোন অনুগ্রহ নেই যার প্রতিদান দিতে

وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ ﴿١٩﴾

ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন করে দুনিয়া ও আখিরাতে সাফল্য প্রদান করেন, আর যাকে ইচ্ছা তিনি সৎপথ থেকে বঞ্চিত করেন। তাই একমাত্র তাঁরই নিকটে হওয়া উচিৎ সকলের চাওয়া-পাওয়া, অন্য কোন সৃষ্টির নিকট নয়। [তাবারী, সা'দী]

(১) এ লেলিহান আগুনের ভয়াবহতা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "কিয়ামতের দিন যে জাহান্নামীর সবচেয়ে হাল্কা আযাব হবে তার অবস্থা হচ্ছে এই যে, তার পায়ের নীচে আগুনের কয়লা রাখা হবে এতেই তার ঘিলু উৎরাতে থাকবে"। [বুখারী: ৬৫৬১, মুসলিম: ২১৩]

(২) অর্থাৎ এই জাহান্নামে নিতান্ত হতভাগা ব্যক্তিই দাখিল হবে, যে আল্লাহ্র আয়াতসমূহের প্রতি মিথ্যারোপ করে এবং তাঁদের আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,"প্রত্যেক উম্মতই জান্নাতে যাবে তবে যে অস্বীকার করবে।" সাহাবায়ে কিরাম বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কে অস্বীকার করবে? তিনি বললেন, "যে আমার অনুসরণ করবে সে জান্নাতে যাবে, আর যে আমার অবাধ্য হবে সেই আমাকে অস্বীকার করল।" [বুখারী: ৭২৮০]

(৩) এতে সৌভাগ্যশালী মুত্তাকীদের প্রতিদান বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র তাক্বওয়া শক্তভাবে অবলম্বন করে এবং একমাত্র আল্লাহ্র পথে নিজের গোনাহ্ থেকে বিশুদ্ধ হওয়ার উদ্দেশ্যে ব্যয় করে, তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে দূরে রাখা হবে। [সা'দী]

হবে[১],

২০. শুধু তার মহান রবের সন্তুষ্টির প্রত্যাশায়;

إِلَّا ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿٢٠﴾

২১. আর অচিরেই সে সন্তুষ্ট হবে[২] ।

وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ﴿٢١﴾

---

(১) এখানে সেই মুত্তাকী ব্যক্তির আরো বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে । সে যে নিজের অর্থ যাদের জন্য ব্যয় করে, আগে থেকেই তার কোন অনুগ্রহ তার ওপর ছিল না, যার প্রতিদান বা পুরস্কার দিচ্ছে অথবা ভবিষ্যতে তাদের থেকে কোন স্বার্থ উদ্ধারের অপেক্ষায় তাদেরকে উপহার-উপঢৌকন ইত্যাদি দিয়ে ব্যয় করছে; বরং সে নিজের মহান ও সর্বশক্তিমান রবের সন্তুষ্টিলাভের জন্যই এমন-সব লোককে সাহায্য করছে, যারা ইতোপূর্বে তার কোন উপকার করে নি এবং ভবিষ্যতেও তাদের উপকার পাওয়ার আশা নেই । [তাবারী] বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, এ আয়াতটি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর শানে নাযিল হয়েছে ।[মুসনাদে বাযযার (আল-বাহরুয যাখখার) : ৬/১৬৮, ২২০৯] আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু মক্কা মু'আযযমার যে অসহায় গোলাম ও বাঁদীরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং এই অপরাধে তাদের মালিকরা তাদের ওপর চরম অকথ্য নির্যাতন ও নিপীড়ন চালাচ্ছিল তাদেরকে মালিকদের যুলুম থেকে বাঁচাবার জন্য কিনে নিয়ে আযাদ করে দিচ্ছিলেন । যেসব দাসকে আবুবকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু প্রচুর অর্থ দিয়ে ক্রয় করে মুক্ত করে দেন, তাদের কোন সাবেক অনুগ্রহও তাঁর উপর ছিল না, যার প্রতিদানে এরূপ করা যেত; বরং তার লক্ষ্য মহান আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি অন্বেষণ ব্যতীত কিছুই ছিল না ।এ ধরনের মুসলিম সাধারণ দুর্বল ও শক্তিহীন হত । একদিন তার পিতা আবু কোহাফা বললেন: তুমি যখন গোলামদেরকে মুক্তই করে দাও, তখন শক্তিশালী ও সাহসী গোলাম দেখেই মুক্ত করো, যাতে ভবিষ্যতে সে শত্রুর হাত থেকে তোমাকে রক্ষা করতে পারে । আবুবকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন: কোন মুক্ত-করা মুসলিম থেকে উপকার লাভ করা আমার লক্ষ্য নয় । আমি তো কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্যেই তাদেরকে মুক্ত করি । [মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৫৭২, নং ৩৯৪২]

(২) বলা হয়েছে, শীঘ্রই আল্লাহ এ ব্যক্তিকে এত-কিছু দেবেন যার ফলে সে খুশী হয়ে যাবে । অর্থাৎ যে ব্যক্তি কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যেই দুনিয়াতে তার ধনসম্পদ ব্যয় করেছে এবং কষ্ট করেছে, আল্লাহ্ তা'আলাও আখেরাতে তাকে সন্তুষ্ট করবেন এবং জান্নাতের মহা নেয়ামত তাকে দান করবেন ।[তাবারী] এই শেষ বাক্যটি মুত্তাকীদের জন্য, বিশেষ করে আবুবকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর জন্যে একটি বিরাট সুসংবাদ । আল্লাহ্ তাকে সন্তুষ্ট করবেন—এ সংবাদ এখানে তাকে শোনানো হয়েছে । [আদ্ওয়াউল বায়ান]

৯৩- সূরা আদ-দুহা[১]
১১ আয়াত, মক্কী

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. শপথ পূর্বাহ্নের,

وَالضُّحٰى ①

২. শপথ রাতের যখন তা হয় নিঝুম[২]–

وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى ②

৩. আপনার রব আপনাকে পরিত্যাগ করেন নি[৩] এবং শত্রুতাও করেন নি।

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى ③

৪. আর অবশ্যই আপনার জন্য পরবর্তী সময় পূর্ববর্তী সময়ের চেয়ে শ্রেয়[৪]।

وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى ④

---

(১) এই সূরা অবতরণের কারণ সম্পর্কে হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার অসুস্থ হলেন ফলে তিনি একরাত বা দু'রাত সালাত আদায়ের জন্য বের হলেন না। তখন এক মহিলা এসে বলল, মুহাম্মাদ আমি তো দেখছি তোমার শয়তান তোমাকে ত্যাগ করেছে, এক রাত বা দু'রাত তো তোমার কাছেও আসেনি। এরই পরিপ্রেক্ষিতে উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়। [বুখারী: ৪৯৫০, ৪৯৫১, ৪৯৮৩] অন্য বর্ণনায় এসেছে, একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ওহী আসতে বিলম্ব হয়, এতে করে মুশরিকরা বলতে শুরু করে যে, মুহাম্মদকে তার আল্লাহ্ পরিত্যাগ করেছেন ও তার প্রতি রুষ্ট হয়েছেন। এরই প্রেক্ষিতে সূরা আদ-দ্বোহা অবতীর্ণ হয়। [মুসলিম: ১৭৯৭]

(২) এখানে سجى এর আরেকটি অর্থ হতে পারে। আর তা হলো, অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়া। এখানে দিনের আলো ও রাতের নীরবতা বা অন্ধকারের কসম খেয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হয়েছে, আপনার রব আপনাকে বিদায় দেন নি এবং আপনার প্রতি শত্রুতাও পোষণ করেন নি। একথার জন্য যে সম্বন্ধের ভিত্তিতে এই দু'টি জিনিসের কসম খাওয়া হয়েছে তা সম্ভবত এই যে, রাতের নিঝুমতা ও অন্ধকারাচ্ছন্নতার পর দিনের আলোকমালায় উদ্ভাসিত হওয়ার মতই যেন বিরতির অন্ধকারের পর অহী আগমনের আলো উদ্ভাসিত হয়েছে। [বাদা'ই'উত তাফসীর]

(৩) এ অনুবাদটি অনেক মুফাসসির করেছেন। [মুয়াসসার, জালালাইন] এখানে ودع এর আরেকটি অর্থ হতে পারে, আর তা হলো, বিদায় দেয়া। [ফাতহুল কাদীর, আদ্ওয়াউল বায়ান]

(৪) এখানে الآخرة এবং الأولى শব্দদ্বয়ের প্রসিদ্ধ অর্থ আখেরাত ও দুনিয়া নেয়া হলে এর ব্যাখ্যা হবে যে, আমি আপনাকে আখেরাতে নেয়ামত দান করারও ওয়াদা দিচ্ছি। সেখানে আপনাকে দুনিয়া অপেক্ষা অনেক বেশী নেয়ামত দান করা হবে। [ইবন কাসীর]

৫. আর অচিরেই আপনার রব আপনাকে অনুগ্রহ দান করবেন, ফলে আপনি সন্তুষ্ট হবেন(১) ।

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۝٥

৬. তিনি কি আপনাকে ইয়াতীম অবস্থায় পান নি? অতঃপর তিনি আশ্রয়

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ۝٦

তাছাড়া الآخرة কে শাব্দিক অর্থে নেয়াও অসম্ভব নয়। অতএব, এর অর্থ পরবর্তী অবস্থা; যেমন الأولى শব্দের অর্থ প্রথম অবস্থা। তখন আয়াতের অর্থ এই যে, আপনার প্রতি আল্লাহর নেয়ামত দিন দিন বেড়েই যাবে এবং প্রত্যেক প্রথম অবস্থা থেকে পরবর্তী অবস্থা উত্তম ও শ্রেয় হবে। এতে জ্ঞানগরিমা ও আল্লাহ্‌র নৈকট্যে উন্নতিলাভসহ জীবিকা এবং পার্থিব প্রভাব-প্রতিপত্তি ইত্যাদি সব অবস্থাই অন্তর্ভুক্ত। আর আপনার জন্য আখেরাত তো দুনিয়া থেকে অনেক, অনেক বেশি উত্তম হবে। [সা'দী] আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি ছাটাইতে শোয়ার কারণে তার পার্শ্বদেশে দাগ পড়ে গেল। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার পিতা মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক, আমাদেরকে অনুমতি দিলে আমরা আপনার জন্য একটি কিছু তৈরী করে দিতাম যা আপনাকে এরূপ কষ্ট দেয়া থেকে হেফাজত করত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "আমার আর এ দুনিয়ার ব্যাপারটি কি? আমি ও দুনিয়ার উদাহরণ তো এমন যেমন কোন সওয়ারী কোন গাছের নীচে বিশ্রামের জন্য আশ্রয় নিল তারপর সেটা ছেড়ে চলে গেল।" [ইবনে মাজাহ: ৪১০৯, মুসনাদে আহমাদ: ১/৩৯১]

(১) অর্থাৎ আপনার পালনকর্তা আপনাকে এত প্রাচুর্য দেবেন যে, আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। এতে কি দিবেন, তা নির্দিষ্ট করা হয়নি। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, প্রত্যেক কাম্যবস্তুই প্রচুর পরিমাণে দেবেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাম্যবস্তুসমূহের মধ্যে ছিল ইসলামের ও কুরআনের উন্নতি, সারা বিশ্বে হিদায়াতের প্রসার, শত্রুর বিরুদ্ধে তার বিজয়লাভ, শত্রুদেশে ইসলামের কলেমা সমুন্নত করা ইত্যাদি। আর তার মৃত্যুর পর হাশরের ময়দানে ও জান্নাতেও তাকে আল্লাহ্ তা'আলা অনেক অনুগ্রহ দান করবেন। [বাদা'ই'উত তাফসীর] হাদীসে আছে, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পরবর্তীতে যে সমস্ত জনপদ বিজিত হবে তা একটি একটি করে পেশ করা হচ্ছিল। এতে তিনি খুশী হলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা "অচিরেই আপনার রব আপনাকে এমন দান করবেন যে আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন" এ আয়াত নাযিল করলেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জান্নাতে হাজার প্রাসাদের মালিক বানালেন। প্রতিটি প্রাসাদে থাকবে প্রাসাদ উপযোগী খাদেম ও ছোট ছোট বাচ্চারা। [মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৫২৬]

দিয়েছেন[১];

৭. আর তিনি আপনাকে পেলেন পথ সম্পর্কে অনবহিত, অতঃপর তিনি পথের নির্দেশ দিলেন[২]।

وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى ﴿٧﴾

৮. আর তিনি আপনাকে পেলেন নিঃস্ব অবস্থায়, অতঃপর অভাবমুক্ত করলেন[৩]।

وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَاَغْنٰى ﴿٨﴾

৯. কাজেই আপনি ইয়াতীমের প্রতি কঠোর হবেন না[৪]।

فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ ﴿٩﴾

(১) এখানে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি কিছু নেয়ামতের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করেন। প্রথম নেয়ামত হচ্ছে, আমি আপনাকে পিতৃহীন পেয়েছি। আপনার জন্মের পূর্বেই পিতা ইন্তেকাল করেছিল এবং ছোট থাকতেই মা মারা যায়। অতঃপর আমি আপনাকে আশ্রয় দিয়েছি। অর্থাৎ প্রথমে পিতামহ আবদুল মুত্তালিব,পরবর্তীতে পিতৃব্য আবু তালেব যত্নসহকারে আপনাকে লালন-পালন করতেন। [সা'দী]

(২) দ্বিতীয় নেয়ামত হচ্ছে, আপনাকে ضال পেয়েছি। এ শব্দটির অর্থ পথভ্রষ্টও হয় এবং অনভিজ্ঞ, অনবহিত বা গাফেলও হয়। এখানে দ্বিতীয় অর্থই উদ্দেশ্য। নবুওয়ত লাভের পূর্বে তিনি আল্লাহ্র বিধি-বিধান সম্পর্কে, ঈমান সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন। অতঃপর নবুওয়তের পদ দান করে তাকে পথনির্দেশ দেয়া হয়, যা তিনি জানতেন না তা জানানো হয়; সর্বোত্তম আমলের তৌফিক দেওয়া হয়। [কুরতুবী, মুয়াসসার]

(৩) তৃতীয় নেয়ামত হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে নিঃস্ব ও রিক্তহস্ত পেয়েছেন; অতঃপর আপনাকে অভাবমুক্ত করেছেন এবং ধৈর্যশীল ও সন্তুষ্ট করেছেন। এখানে أغنى বলতে দুটি অর্থ হতে পারে। এক অর্থ, তিনি আপনাকে ধনশালী করেছেন। অপর অর্থ, তিনি আপনাকে তাঁর নেয়ামতে সন্তুষ্ট করেছেন। [দেখুন: ইবন কাসীর, মুয়াসসার]

(৪) এ নেয়ামতগুলো উল্লেখ করার পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে এর কৃতজ্ঞতাস্বরূপ কয়েকটি বিষয়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রথম নির্দেশ হচ্ছে, ইয়াতিমের সাথে কঠোর ব্যবহার করবেন না। অর্থাৎ আপনি কোন পিতৃহীনকে অসহায় ও বেওয়ারিশ মনে করে তার ধন-সম্পদ জবরদস্তিমূলকভাবে নিজ অধিকারভুক্ত করে নেবেন না। এর মাধ্যমে সকল উম্মতকেই ইয়াতীমের সাথে সহৃদয় ব্যবহার করার জোর আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং বেদনাদায়ক ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছেন। [বাদা'ই'উত তাফসীর]

১০. আর প্রার্থীকে ভর্ৎসনা করবেন না[১]।

وَاَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنۡهَرۡ ۞

১১. আর আপনি আপনার রবের অনুগ্রহের কথা জানিয়ে দিন[২]।

وَاَمَّا بِنِعۡمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثۡ ۞

---

(১) দ্বিতীয় নির্দেশ হচ্ছে, অর্থগত ও জ্ঞানগত প্রার্থীকে ধমক বা ভৎর্সনা করতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে নিষেধ করা হয়েছে। যদি ‘প্রার্থী’ বলে এখানে সাহায্য প্রার্থনাকারী অভাবী ধরা হয় তাহলে এর অর্থ হয়, তাকে সাহায্য করতে পারলে করুন আর না করতে পারলে কোমল স্বরে তাকে নিজের অক্ষমতা বুঝিয়ে দিন। কিন্তু কোনক্রমে তার সাথে রূঢ় ব্যবহার করবেন না। এই অর্থের দিক দিয়ে এই নির্দেশটিকে আল্লাহর সেই অনুগ্রহের জবাবে দেয়া হয়েছে, যাতে বলা হয়েছে “আপনি অভাবী ছিলেন তারপর আল্লাহ আপনাকে ধনী করে দিয়েছেন।” আর যদি ‘প্রার্থী’কে জিজ্ঞেসকারী অর্থাৎ দ্বীনের কোন বিষয় বা বিধান জিজ্ঞেসকারী অর্থে ধরা হয় তাহলে এর অর্থ হয়, এই ধরনের লোক যতই মূর্খ ও অজ্ঞ হোক না কেন এবং যতই অযৌক্তিক পদ্ধতিতে সে প্রশ্ন করুক বা নিজের মানসিক সংকট উপস্থাপন করুক না কেন, সকল অবস্থায়ই স্নেহশীলতা ও কোমলতা সহকারে তাকে জবাব দিন এবং ধমক দিয়ে বা কড়া কথা বলে তাদেরকে তাড়িয়ে দিবেন না। এই অর্থের দিক দিয়ে এই বাণীটিকে আল্লাহর সেই অনুগ্রহের জবাবে দেয়া হয়েছে, যাতে বলা হয়েছে “আপনি পথের খোঁজ জানতেন না তারপর তিনিই আপনাকে পথনির্দেশনা দিয়েছেন।” আয়াত থেকে বোঝা গেল যে, সাহায্য প্রার্থীকে কিছু দিয়ে বিদায় করা এবং দিতে না পারলে নরম ভাষায় অক্ষমতা প্রকাশ করা উচিত। এমনিভাবে যে ব্যক্তি কোন শিক্ষণীয় বিষয় জানতে চায় তার জওয়াবেও কঠোরতা ও দুর্ব্যবহার করা নিষেধ। [দেখুন, সা'দী; আদ্ওয়াউল বায়ান]

(২) তৃতীয় নির্দেশ হচ্ছে, মানুষের সামনে আল্লাহর নেয়ামতসমূহ বর্ণনা করুন, স্মরণ করুন। নিয়ামত শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। এর অর্থ দুনিয়ার নিয়ামতও হতে পারে আবার এমন-সব নিয়ামতও হতে পারে যা আল্লাহ্ তা'আলা আখেরাতে দান করবেন। [সা'দী] এ নিয়ামত প্রকাশ করার পদ্ধতি বিভিন্ন হতে পারে। সামগ্রিকভাবে সমস্ত নিয়ামত প্রকাশের পদ্ধতি হলো আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, স্বীকৃতি দেয়া যে, আমি যেসব নিয়ামত লাভ করেছি সবই আল্লাহর মেহেরবানী ও অনুগ্রহের ফল। নবুওয়াতের এবং অহীর নিয়ামত প্রকাশ করা যেতে পারে দ্বীনের প্রচার ও প্রসার করার মাধ্যমে। এ-ছাড়া, একজন অন্যজনের প্রতি যে অনুগ্রহ করে, তার শোকর আদায় করাও আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এক পন্থা। হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি অপরের অনুগ্রহের শোকর আদায় করে না, সে আল্লাহ তা'আলারও শোকর আদায় করে না। [আবুদাউদ: ৪৮১১, তিরমিযী: ১৯৫৫, মুসনাদে আহমাদ: ২/৫৮] [কুরতুবী]

৯৪- সূরা আল-ইনশিরাহ্[১]
৮ আয়াত, মক্কী

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ①

১. আমরা কি আপনার বক্ষ আপনার কল্যাণে প্রশস্ত করে দেইনি[২]?

وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ②

২. আর আমরা অপসারণ করেছি আপনার ভার,

الَّذِيْٓ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ③

৩. যা আপনার পিঠ ভেঙ্গে দিচ্ছিল[৩]।

---

(১) সূরা আল-ইনশিরাহে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে প্রদত্ত বিশেষ বিশেষ অনুগ্রহ বর্ণিত হয়েছে। বর্ণনায় এ সূরার সাথে সূরা আদ-দোহার অর্থগত সম্পর্ক রয়েছে। [আদ্ওয়াউল বায়ান]

(২) شرح শব্দের অর্থ উন্মুক্ত করা। কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্ষদেশ উন্মুক্ত করে দেবার শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কোথাও বলা হয়েছে, "কাজেই যে ব্যক্তিকে আল্লাহ হেদায়াত দান করার ইচ্ছা করেন তার বক্ষদেশ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন।" [সূরা আল-আন'আম: ১২৫] আবার কোথাও বলা হয়েছে, "আল্লাহ্ ইসলামের জন্য যার বক্ষ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন এবং যে তার রবের দেয়া আলোতে রয়েছে, সে কি তার সমান যে এরূপ নয়? দুর্ভোগ সে কঠোর হৃদয় ব্যক্তিদের জন্য যারা আল্লাহ্‌র স্মরণে পরাঙ্মুখ! তারা স্পষ্ট বিভ্রান্তি তে আছে।" [সূরা আয-যুমার: ২২] এই উভয় স্থানে বক্ষদেশ উন্মুক্ত করার অর্থই হচ্ছে, সব রকমের মানসিক অশান্তি ও সংশয়মুক্ত হওয়া, জ্ঞান ও সত্য উপলব্ধি করার উপযুক্ত করা এবং বক্ষকে প্রজ্ঞার আধার করার জন্য প্রস্তুত করা। জ্ঞান, তত্ত্বকথা ও উত্তম চরিত্রের জন্যে তার বক্ষকে প্রশস্ত করে দেয়া হয়েছে। কোন কোন তাফসীরবিদ এস্থলে বক্ষ উন্মুক্ত করার অর্থ সে বক্ষ বিদারণই নিয়েছেন। হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, ফেরেশতাগণ আল্লাহর আদেশে বাহ্যত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্ষ বিদারণ করে তাকে যাবতীয় পঙ্কিলতা থেকে পরিষ্কার করে তাতে জ্ঞান ও তত্ত্বকথা দিয়ে পূর্ণ করে দিয়েছিলেন। [মুসলিম: ১৬৪, তিরমিযী: ৩৩৪৬] উপরোক্ত সব কয়টি অর্থই এ আয়াতে হওয়া সম্ভব, আর একটি অপরটির পরিপূরক। [আদ্ওয়াউল বায়ান]

(৩) وزر এর শাব্দিক অর্থ বোঝা, আর نقض ظهر এর শাব্দিক অর্থ কোমর বা পিঠ ভারী করে দেয়া। অর্থাৎ কোমরকে নুইয়ে দেয়া। কোন বড় বোঝা কারও মাথায় তুলে দিলে যেমন তার কোমর নুয়ে পড়ে, তেমনি আয়াতে বলা হয়েছে যে, যে বোঝা আপনার কোমরকে নুইয়ে দিয়েছিল, আমরা তাকে আপনার উপর থেকে অপসারিত করে

৪. আর আমরা আপনার (মর্যাদা বৃদ্ধির) জন্য আপনার স্মরণকে সমুন্নত করেছি[১]।

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۝٤

৫. সুতরাং কষ্টের সাথেই তো স্বস্তি আছে,

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝٥

৬. নিশ্চয় কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে[২]।

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝٦

৭. অতএব আপনি যখনই অবসর পান তখনই কঠোর ইবাদাতে রত হোন

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ۝٧

দিয়েছি। সে বোঝা কি ছিল, তার ব্যাখ্যায় কোন কোন তাফসীরবিদ বলেছেন যে, নবুওয়তের গুরুভার তার অন্তর থেকে সরিয়ে দেয়া ও তা সহজ করে দেয়ার সুসংবাদ এ আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে। [আদ্‌ওয়াউল বায়ান]

(১) অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনেক সম্মানিত করা হয়েছে; কোন সৃষ্টিকে তার মত প্রশংসনীয় করা হয় নি। এমনকি আযান, ইকামত, খুতবা, ইত্যাদির ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ্‌র নামের সাথেও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম স্মরণ করা হয়। এভাবে তার মর্যাদা ও স্মরণ সমুন্নত করা হয়েছে। এ-ছাড়াও তার উম্মত ও অনুসারীদের নিকট তার সম-মর্যাদার আর কেউ নেই। [সা'দী]

(২) আরবী ভাষার একটি নীতি এই যে, আলিফ ও লামযুক্ত শব্দকে যদি পুনরায় আলিফ ও লাম সহকারে উল্লেখ করা হয়, তবে উভয় জায়গায় একই বস্তুসত্তা অর্থ হয়ে থাকে এবং আলিফ ও লাম ব্যতিরেকে পুনরায় উল্লেখ করা হলে উভয় জায়গায় পৃথক পৃথক বস্তুসত্তা বোঝানো হয়ে থাকে। আলোচ্য আয়াতে العسر শব্দটি যখন পুনরায় العسر উল্লেখিত হয়েছে, তখন বোঝা গেল যে, উভয় জায়গায় একই عسر অর্থাৎ কষ্ট বোঝানো হয়েছে। পক্ষান্তরে يسر শব্দটি উভয় জায়গায় আলিফ ও লাম ব্যতিরেকে উল্লেখিত হয়েছে। এতে নিয়মানুযায়ী বোঝা যায় যে, দ্বিতীয় يسر তথা স্বস্তি প্রথম يسر তথা স্বস্তি থেকে ভিন্ন। অতএব আয়াতে ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ এর পুনরুল্লেখ থেকে জানা গেল যে, একই কষ্টের জন্যে দু'টি স্বস্তির ওয়াদা করা হয়েছে। দু'এর উদ্দেশ্যও এখানে বিশেষ দু'এর সংখ্যা নয়; বরং উদ্দেশ্য অনেক। অতএব সারকথা এই যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর একটি কষ্টের সাথে তাকে অনেক স্বস্তি দান করা হবে। হাদীসে এসেছে, "নিশ্চয় বিপদের সাথে মুক্তি আছে, আর নিশ্চয় কষ্টের সাথে আছে স্বস্তি"। [মুসনাদ আহমাদ: ১/৩০৭] হাসান বসরী ও কাতাদাহ্ বলেন, 'এক কষ্ট দুই স্বস্তির উপর প্রবল হতে পারে না।' [ফাতহুল কাদীর, তাবারী]

৮. আর আপনার রবের প্রতি গভীর মনোযোগী হোন[১]। | وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَٱرْغَبْ ۝٨

---

(১) النصب অর্থ কঠোর প্রচেষ্টার পর ক্লান্ত হওয়া। এ প্রচেষ্টাটি দুনিয়ার কাজেও হতে পারে, আবার আখেরাতের কাজেও হতে পারে। এখানে কী উদ্দেশ্য তা নিয়ে কয়েকটি মত পাওয়া যায়। সবগুলো মতই গ্রহণযোগ্য হতে পারে। কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ সালাতের পর দু'আয় রত হওয়া। কেউ কেউ বলেন, ফরযের পর নফল ইবাদতে রত হওয়া। মূলত এখানে উদ্দেশ্য দুনিয়ার কাজ থেকে খালি হওয়ার পর আখিরাতের কাজে রত হওয়াই উদ্দেশ্য। শেষ আয়াতে বলা হয়েছে, একমাত্র আল্লাহ্‌রই নিকট মনোযোগী হয়ে সকল ইবাদত যেন তিনি কবুল করে নেন, এ আশা করো। এ আয়াতে মুমিনদের জীবনে বেকারত্বের কোন স্থান দেওয়া হয় নি। হয় সে দুনিয়ার কাজে ব্যস্ত থাকবে, নয় আখেরাতের কাজে। [আদ্ওয়াউল বায়ান, সা'দী]

৯৫- সূরা আত-তীন(১)
৮ আয়াত, মক্কী

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. শপথ 'তীন' ও 'যায়তূন'(২) -এর,

وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ ①

২. শপথ 'তূরে সীনীন'(৩)-এর,

وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ ②

৩. শপথ এই নিরাপদ নগরীর(৪)–

وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ ③

(১) বারা ইবনে আযেব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার সফরে দু'রাকা'আতের যে কোন রাকা'আতে সূরা আত-তীন পড়লেন। আমি তার মত সুন্দর স্বর ও পড়া আর কোন দিন শুনিনি।" [বুখারী: ৭৬৭, ৬৭৯, ৪৯৫২, মুসলিম: ৪৬৪, আবু দাউদ: ১২২১, তিরমিযী: ৩১০]

(২) এর ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যায়। হাসান বসরী, ইকরামাহ, আতা ইবনে আবী রাবাহ, জাবের ইবনে যায়েদ, মুজাহিদ ও ইবরাহীম নাখ'য়ী রাহেমাহুমুল্লাহ বলেন, তীন বা আঞ্জির (গোল হালকা কালচে বর্ণের এক রকম মিষ্টি ফল) বলতে এই সাধারণ তীনকে বুঝানো হয়েছে, যা লোকেরা খায়। আর যায়তুন বলতেও এই যায়তূনই বুঝানো হয়েছে, যা থেকে তেল বের করা হয়। [কুরতুবী, তাবারী] কোন কোন মুফাসসির বলেন তীন ও যায়তূন শব্দের অর্থ এই ফল দু'টি উৎপাদনের সমগ্র এলাকা হতে পারে। আর এটি হচ্ছে সিরিয়া ও ফিলিস্তীন এলাকা। কারণ সে যুগের আরবে তীন ও যায়তূন উৎপাদনের জন্য এ দু'টি এলাকাই পরিচিত ছিল। ইবনে তাইমিয়া ও ইবনুল কাইয়েম রাহেমাহুমুল্লাহ এই ব্যাখ্যা অবলম্বন করেছেন। অন্যদিকে ইবনে জারীর প্রথম বক্তব্যটিকে অগ্রাধিকার দিলেও একথা মেনে নিয়েছেন যে, তীন ও যায়তূন দ্বারা এই ফল দু'টি উৎপাদনের এলাকা উদ্দেশ্য হতে পারে।

(৩) বলা হয়েছে "তূরে সীনীন"। এর অর্থ, সীনীন অঞ্চলের তূর পর্বত। এ পাহাড়ে আল্লাহ্ তা'আলা মূসা আলাইহিস সালামের সাথে কথা বলেছিলেন। [মুয়াসসার] এ পাহাড় সীনীন উপত্যকায় অবস্থিত, যার অপর নাম সাইনা। আর সাইনা বা সিনাই মিসর ও ফিলিস্তিন দেশের মধ্যে একটি মরুভূমি। [আত-তাহরীর ওয়াত-তানওয়ীর]

(৪) এ সূরায় কয়েকটি বস্তুর শপথ করা হয়েছে। (এক) তীন অর্থাৎ আঞ্জির বা ডুমুর এবং যয়তুন। (দুই) সিনাই প্রান্তরস্থ তূর পর্বত। (তিন) নিরাপদ শহর তথা মক্কা মোকাররমা। এই বিশেষ শপথের কারণ এই হতে পারে যে, তূর পর্বত ও মক্কা নগরীর ন্যায় ডুমুর ও যয়তুন বৃক্ষও বিপুল উপকারী বস্তু। অথবা এটাও সম্ভবপর যে, এখানে তীন ও যয়তুন উল্লেখ করে সে স্থানকে বোঝানো হয়েছে, যেখানে এ বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। আর সে স্থান হচ্ছে সিরিয়া ও ফিলিস্তিন

৪. অবশ্যই আমরা সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে[১],

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيْٓ أَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ۝٤

৫. তারপর আমরা তাকে হীনতাগ্রস্তদের হীনতমে পরিণত করি–[২]

ثُمَّ رَدَدْنٰهُ أَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ ۝٥

৬. কিন্তু তাদেরকে নয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে; এদের জন্য তো আছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার[৩] ।

إِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ۝٦

অঞ্চল, যা অগণিত রাসূলগণের আবাসভূমি। বিশেষ করে তা ঈসা আলাইহিস সালামের নবুয়ত-প্রাপ্তিস্থান। আর তূর পর্বত মূসা আলাইহিস্ সালাম-এর আল্লাহর সাথে বাক্যালাপের স্থান। সিনীন অথবা সীনা– তূর পর্বতের অবস্থানস্থলের নাম। পরবর্তীতে উল্লেখ করা নিরাপদ শহর হল পবিত্র মক্কা; যা শেষনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মস্থান ও নবুয়ত প্রাপ্তিস্থান। [বাদাইউত তাফসীর, ইবন কাসীর]

(১) তীন ও যায়তূন বা এগুলো উৎপন্ন হওয়ার এলাকা- অর্থাৎ সিরিয়া ও ফিলিস্তীন; তূর পর্বত এবং নিরাপদ শহর তথা মক্কার কসম এ কথাটির উপরই করা হয়েছে। বল হয়েছে, মানুষকে সর্বোত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করা হয়েছে। একথার মানে হচ্ছে এই যে, তাকে এমন উন্নত পর্যায়ের দৈহিক সৌষ্ঠব দান করা হয়েছে যা অন্য কোন প্রাণীকে দেয়া হয়নি। আয়াতে বর্ণিত تَقْوِيْم এর অর্থ কোন কিছুর অবয়ব ও ভিত্তিকে যেরূপ করা উচিৎ, সে-রকমভাবে পরিপূর্ণ আকারে গঠন করা। তা দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে দৈহিক অবয়ব এবং আকার-আকৃতি ও আচার-ব্যবহার ও মানুষ্যত্বের মাধ্যমে অন্যান্য সব প্রাণী অপেক্ষা সুন্দরতম করেছেন। [বাদা'ই'উত তাফসীর, আদ্ওয়াউল বায়ান] আকার আকৃতির বাইরেও আল্লাহ তা'আলা তাকে জ্ঞানী, শক্তিবান, বক্তা, শ্রোতা, স্রষ্টা, কুশলী এবং প্রজ্ঞাবান করেছেন। [ফাতহুল কাদীর]

(২) মুফাসসিরগণ সাধারণত এর দু'টি অর্থ বর্ণনা করেছেন। এক, আমি তাকে যৌবনের পর বার্ধক্যের এমন এক অবস্থার দিকে ফিরিয়ে দিয়েছি যেখানে সে কিছু চিন্তা করার, বুঝার ও কাজ করার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে; ছোট শিশুর মত হয়ে যায়।। দুই. আয়াতের দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, আমি তাকে জাহান্নামের সর্বনিম্ন পর্যায়ের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছি। সর্বোত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করার পর যখন মানুষ নিজের দৈহিক ও মানসিক শক্তিগুলোকে দুস্কৃতির পথে ব্যবহার করে তখন আল্লাহ তাকে এর উপযুক্ত প্রতিদান হিসেবে জাহান্নামকে তার আবাসস্থল বানিয়ে দেন। [কুরতুবী]

(৩) এ আয়াতে মুমিন সৎকর্মশীলগণ এর ব্যতিক্রম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যেসব মুফাসসির "আসফালা সাফেলীন" এর অর্থ করেছেন, বার্ধক্যের এমন একটি অবস্থা

৭. কাজেই (হে মানুষ!) এরপর কিসে তোমাকে কর্মফল দিন সম্পর্কে অবিশ্বাসী করে[১]?

فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ ۞

৮. আল্লাহ্ কি বিচারকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ ۞

যখন মানুষ নিজের চেতনা ও স্বাভাবিক জ্ঞান-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে, তারা এই আয়াতের অর্থ এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, বয়সের এই পর্যায়েও তারা ঐ ধরনের সৎকাজগুলো করেনি বলে তাদের ভালো প্রতিদান দেবার ক্ষেত্রে কোন হেরফের হবে না, কমতি হবে না। বার্ধক্যজনিত বেকারত্ব ও কর্ম হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও তাদের আমলানামায় সেসব কর্ম লিখিত হয়, যা তারা শক্তিমান অবস্থায় করত। [তাবারী] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "কোন মুসলিম অসুস্থ হয়ে পড়লে অথবা মুসাফির হলে আল্লাহ তা'আলা আমল লেখক ফেরেশতাগণকে আদেশ দেন, সুস্থ অবস্থায় সে যেসব সৎকর্ম করত, সেগুলো তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করতে থাক।" [বুখারী:২৯৯৬, মুসনাদে আহমাদ: ২/১৯৪, ৩/২৫৮] পক্ষান্তরে যেসব মুফাসসির 'ফিরিয়ে দেবার' অর্থ 'জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে নিক্ষেপ করা' করেছেন তাদের মতে, মহান আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে সুন্দর গঠনে সৃষ্টি করে তাকে অনেক নেয়ামত দান করেছেন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে দুনিয়ায় খেল-তামাশায় মত্ত হয়ে যায়। এই অকৃতজ্ঞতার শাস্তি হিসেবে তাদেরকে জাহান্নামের হীনতম ও নিম্নতম পর্যায়ে পৌঁছে দেয়া হবে। কিন্তু যারা মুমিন ও সৎকর্মী, তাদেরকে নিকৃষ্টতম পর্যায়ে পৌঁছানো হবে না; বরং তারা জান্নাতে এমন পুরস্কার পাবে যার ধারাবাহিকতা কোনদিন শেষ হবে না, যে পুরষ্কারের কোন কমতি হবে না। [বাদা'ই'উত তাফসীর, সা'দী]

(১) এতে কেয়ামতে অবিশ্বাসীদেরকে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, আল্লাহ্র কুদরতের উপরোক্ত দৃশ্য ও পরিবর্তন দেখার পরও তোমাদের জন্যে আখেরাত ও কেয়ামতকে মিথ্যা মনে করার কি অবকাশ থাকতে পারে? তোমাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন, তিনি ইচ্ছা করলে হীনতম ও নিম্নতম পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারেন, তারপরও কেন তোমরা তা অস্বীকার করবে? এর আরেকটি অনুবাদ এও হতে পারে, এসব প্রমাণের পর (হে রাসূল) শাস্তি ও পুরষ্কারের ব্যাপারে কে আপনাকে মিথ্যা বলতে পারে? [কুরতুবী] এই কথাটিকেই কুরআনের অন্যান্য স্থানে এভাবে বলা হয়েছে, "আমি কি অনুগতদেরকে অপরাধীদের মতো করে দেবো? তোমাদের কি হয়ে গেছে? তোমরা কেমন ফয়সালা করছো? [সূরা আল-কলম: ৩৫-৩৬] আরো এসেছে, "দুষ্কৃতকারীরা কি একথা মনে করেছে, আমি তাদেরকে এমন লোকদের মতো করে দেবো যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে? উভয়ের জীবন ও মৃত্যু এক রকম হবে? খুবই খারাপ সিদ্ধান্ত যা এরা করছে।" [সূরা আল-জাসিয়াহ: ২১]

বিচারক নন[১]?

---

(১) আল্লাহ তা'আলা কি সব বিচারকের মহাবিচারক নন? তিনি কি সকল শাসকবর্গের মধ্যে সর্বোত্তম শাসক নন? এই ন্যায় বিচারের অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল প্রত্যেক অপরাধীকে তার শাস্তি ও প্রত্যেক সৎকর্মীকে তার উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করা। বিচারকদের শ্রেষ্ঠবিচারক আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে উপনীত করেছেন পরিপূর্ণ ন্যায় ও প্রজ্ঞার সাথে; তবুও কি তিনি মানুষের কৃতকর্মের উপযুক্ত প্রতিদানও দেবেন না? [বাদা'ই'উত তাফসীর]

৯৬- সূরা আল-'আলাক[১]
১৯ আয়াত, মক্কী

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ ①

১. পড়ুন আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন[২]-

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ②

২. সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক' হতে[৩]।

اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ③

৩. পড়ুন, আর আপনার রব মহামহিমান্বিত[৪]

---

(১) নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে প্রমাণিত রয়েছে যে, সূরা আলাক থেকেই ওহীর সূচনা হয় এবং এ সূরার প্রথম পাঁচটি আয়াত ﴿مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ পর্যন্ত সর্ব প্রথম নাযিল হয়। [দেখুন, বুখারীঃ ৬৯৮২, মুসলিম:১৬০] অধিকাংশ আলেম এ বিষয়ে একমত। কেউ কেউ সূরা আল-মুদ্দাসসিরকে প্রথম সূরা এবং কেউ সূরা ফাতেহাকে সর্বপ্রথম সূরা বলে অভিহিত করেছেন। তবে প্রথমোক্ত মতটিই বিশুদ্ধ। [আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন: ১/৯৩]

(২) শুধু বলা হয়েছে, "সৃষ্টি করেছেন।" কাকে সৃষ্টি করেছেন তা বলা হয়নি। এ থেকে আপনা আপনিই এ অর্থ বের হয়ে আসে, সেই রবের নাম নিয়ে পড় যিনি স্রষ্টা সমগ্র বিশ্ব-জাহানের, সমগ্র সৃষ্টিজগতের। [আদ্‌ওয়াউল বায়ান]

(৩) পূর্বের আয়াতে সমগ্র সৃষ্টিজগত সৃষ্টির বর্ণনা ছিল। এ আয়াতে সৃষ্টিজগতের মধ্য থেকে বিশেষ করে মানব সৃষ্টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেছেন, মানুষকে 'আলাক' থেকে সৃষ্টি করেছেন। 'আলাক' হচ্ছে 'আলাকাহ' শব্দের বহুবচন। এর মানে জমাট বাঁধা রক্ত। সাধারণভাবে বিশ্ব-জাহানের সৃষ্টির কথা বলার পর বিশেষ করে মানুষের কথা বলা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ কেমন হীন অবস্থা থেকে তার সৃষ্টিপর্ব শুরু করে তাকে পূর্ণাংগ মানুষে রূপান্তরিত করেছেন। [কুরতুবী]

(৪) এখানে পড়ার আদেশের পুনরুল্লেখ করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, প্রথম আদেশটি নিজে পাঠ করার আদেশ, আর দ্বিতীয়টি অন্যকে পাঠ করানো বা অন্যের নিকট প্রচারের নির্দেশ। [ফাতহুল কাদীর] অতঃপর মহান রব আল্লাহ্‌র সাথে الأكرم বিশেষণ যোগ করার মধ্যে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, মানুষ সৃষ্টি করা এবং তাদের শিক্ষাদান করার নেয়ামতের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার নিজের কোন স্বার্থ ও লাভ নেই; বরং এগুলো তাঁরই অনুগ্রহ, তাঁরই দান। তিনি সর্বমহান দানশীল ও মহামহিমান্বিত। [আদ্‌ওয়াউল বায়ান, মুয়াস্‌সার]

৪. যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন(১)–

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾

৫. শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না(২)।

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾

৬. বাস্তবেই(৩), মানুষ সীমালঙ্ঘনই করে থাকে,

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَىٰ ﴿٦﴾

৭. কারণ সে নিজকে অমুখাপেক্ষী মনে করে(৪)।

أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَىٰ ﴿٧﴾

---

(১) মানব সৃষ্টির কথা বর্ণনার পর এখানে মানুষের শিক্ষার প্রসঙ্গটি উল্লেখিত হয়েছে। মহান আল্লাহ্র অশেষ মেহেরবানী যে, তিনি মানুষকে কলমের মাধ্যমে তথা লেখার শিক্ষা দান করেছেন। তা না হলে মানুষের মধ্যে জ্ঞানের উন্নতি, বংশানুক্রমিক ক্রমবিকাশ সম্ভব হত না। জ্ঞান, প্রজ্ঞা, পূর্ববর্তীদের জীবন-কাহিনী, আসমানী-কিতাব সব কিছুই সংরক্ষিত হয়েছে লেখনির মাধ্যমে। কলম না থাকলে, দ্বীন এবং দুনিয়ার কোন কিছুই পূর্ণরূপে গড়ে উঠত না। [ফাতহুল কাদীর] হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আল্লাহ তা'আলা যখন প্রথম সবকিছু সৃষ্টি করেন, তখন আরশে তাঁর কাছে রক্ষিত কিতাবে একথা লিপিবদ্ধ করেন যে, আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর প্রবল থাকবে।" [বুখারী: ৩১৯৪, ৭৫৫৩, মুসলিম: ২৭৫১] হাদীসে আরও বলা হয়েছে, "আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেন এবং তাকে লেখার নির্দেশ দেন। সেমতে কলম কেয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হবে, সব লিখে ফেলে।" [মুসনাদে আহমাদ: ৫/৩১৭]

(২) পূর্বের আয়াতে ছিল কলমের সাহায্যে শিক্ষা দানের বর্ণনা। এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রকৃত শিক্ষাদাতা আল্লাহ তা'আলা। মানুষ আসলে ছিল সম্পূর্ণ জ্ঞানহীন। আল্লাহর কাছ থেকেই সে যা কিছু জ্ঞান লাভ করেছে। [সা'দী] কলমের সাহায্যে যা শিক্ষা দেয়া হয়েছে, তার ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, তিনি এমন সব বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন, যা মানুষ জানত না। কেউ কেউ বলেন, এখানে মানুষ বলে আদম আলাইহিস্ সালামকে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বিভিন্ন বস্তুর নাম ও গুণাগুণ শিক্ষা দিয়েছেন। যেমনটি সূরা আল-বাকারায় বর্ণনা করা হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর]

(৩) كلا বলতে এখানে বুঝানো হয়েছে, حقا বা বাস্তবেই, অবশ্যই হয় এমন। [মুয়াসসার, তাফসীরুল কুরআন লিল উসাইমীন: ১/২৬১]

(৪) অর্থাৎ দুনিয়ায় ধন-দৌলত, সম্মান-প্রতিপত্তি যা কিছু সে চাইতো তার সবই সে লাভ করেছে এ দৃশ্য দেখে সে কৃতজ্ঞ হবার পরিবর্তে বরং বিদ্রোহের পথ অবলম্বন করেছে

৮. নিশ্চয় আপনার রবের কাছেই ফিরে | إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ ۝

এবং সীমালঙ্ঘন করতে শুরু করেছে। [সা'দী] বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, একবার আবু জাহল বলল, যদি মুহাম্মাদকে কিবলার দিকে ফিরে সালাত আদায় করতে দেখি তবে আমি অবশ্যই তাকে হত্যা করব। তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত আদায় করতে আসলে আবু জাহল তাকে বলল, তোমাকে কি আমি সালাত আদায় করতে নিষেধ করিনি? তোমাকে কি আমি এটা থেকে নিষেধ করিনি? রাসূল তার কাছ থেকে ফিরে আসলেন, আবু জাহলের সাথে তার বিতণ্ডা হলো, তখন আবু জাহল বলল, আমার চেয়ে বড় সভাসদের অধিকারী কি কেউ আছে? তখন আল্লাহ্ এ আয়াত নাযিল করলেন যে, "সে যেন তার সভাসদদের ডাকে, আমরাও অচিরেই যাবানিয়াদের ডাকব"। ইবনে আব্বাস বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ, যদি সে তার সভাসদদের ডাকত তবে অবশ্যই তাকে আল্লাহ্‌র যাবানিয়া পাকড়াও করত। [বুখারী: ৪৯৫৮, তিরমিযী: ৩৩৪৯, মুসনাদে আহমাদ: ১/২৫৬, ৩২৯, ৩৬৮] কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, আবু জাহল বলেছিল, মুহাম্মাদ কি তোমাদের সামনে মাটিতে মুখ ঘসে? তাকে বলা হল যে, হ্যাঁ, তখন সে বলল, লাত ও উযযার শপথ! যদি আমি তাকে তা করতে দেখি তবে অবশ্যই আমি তার ঘাড় পা দিয়ে দাবিয়ে দিব, অথবা তার মুখ মাটিতে মিশিয়ে দেব। অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসল, তিনি তখন সালাত আদায় করছিলেন। সে তার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, তার ধারণা অনুসারে সে তার মাথা গুড়িয়ে দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু কাছে যাওয়ার পর সে পিছনের দিকে ফিরে আসতে বাধ্য হলো এবং হাত দিয়ে বাধা দিচ্ছিল। তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে সে বলল, আমার ও তার মাঝে আগুনের একটি খন্দক দেখতে পেলাম এবং ভীতিপ্রদ ও ডানাবিশিষ্টদের দেখতে পেয়েছি। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যদি সে নিকটবর্তী হতো তবে ফেরেশতাগণ তাকে টুকরা টুকরা করে ছিঁড়ে ফেলত। তখন আল্লাহ্ নাযিল করেন, "কখনও নয়, মানুষ তো সীমালঙ্ঘন করে থাকে, যখন সে নিজেকে অমুখাপেক্ষী দেখতে পায়..." [মুসলিম: ২৭৯৭]

আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শনকারী আবু জাহলকে লক্ষ্য করে বক্তব্য রাখা হলেও ব্যাপক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। এতে সাধারণ মানুষের একটি নৈতিক দুর্বলতা বিধৃত হয়েছে। মানুষ যতদিন নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও অমুখাপেক্ষী মনে না করে, ততদিন সে সীমালঙ্ঘন করে না। কিন্তু যখন সে মনে করতে থাকে যে, সে কারও মুখাপেক্ষী নয়, তখন তার মধ্যে অবাধ্যতা এবং সীমালঙ্ঘন প্রবণতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। অথচ আল্লাহ্ তা'আলাই তাকে সৃষ্টি করেছেন রক্তপিণ্ড থেকে, তাকে তার মায়ের গর্ভে যত্নে রেখেছেন, বেড়ে ওঠার যাবতীয় উপায়-পদ্ধতির ব্যবস্থা করে দেন; তারপরেও যখনই সে নিজেকে ধন-সম্পদ বা ক্ষমতার অধিকারী মনে করা শুরু করে, তখনই সে এমনকি তার রবের সাথেও সীমালঙ্ঘন করে। [আদ্‌ওয়াউল বায়ান]

যাওয়া[১]।

৯. আমাকে জানাও (এবং আশ্চর্য হও) তার সম্পর্কে, যে বাধা দেয়,

أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يَنْهَىٰ ۝٩

১০. এক বান্দাকে[২]– যখন তিনি সালাত আদায় করেন।

عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰٓ ۝١٠

১১. আমাকে বল! যদি তিনি হিদায়াতের উপর থাকেন,

أَرَءَيْتَ إِن كَانَ عَلَى ٱلْهُدَىٰٓ ۝١١

১২. অথবা তাক্ওয়ার নির্দেশ দেন; (তারপরও সে কিভাবে বাধা দেয়?!)

أَوْ أَمَرَ بِٱلتَّقْوَىٰٓ ۝١٢

১৩. আমাকে বল! যদি সে (নিষেধকারী) মিথ্যারোপ করে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়,

أَرَءَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰٓ ۝١٣

১৪. সে কি জানে না যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ দেখেন[৩]?!

أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ ٱللَّهَ يَرَىٰ ۝١٤

১৫. কখনো নয়, সে যদি বিরত না হয় তবে আমরা তাকে অবশ্যই হেঁচড়ে

كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًۢا بِٱلنَّاصِيَةِ ۝١٥

(১) অর্থাৎ দুনিয়ায় সে যাই কিছু অর্জন করে থাকুক না কেন এবং তার ভিত্তিতে অহংকার ও বিদ্রোহ করতে থাকুক না কেন, অবশেষে তাকে আপনার রবের কাছেই ফিরে যেতে হবে। সেখানে সে অবাধ্যতার কুপরিণাম তখন স্বচক্ষে দেখে নেবে। [মুয়াসসার, সাদী]

(২) বান্দা বলতে এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বুঝানো হয়েছে। [কুরতুবী] এ পদ্ধতিতে কুরআনের কয়েক জায়গায় তার উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন "পবিত্র সেই সত্তা যিনি তাঁর বান্দাকে নিয়ে গিয়েছেন এক রাতে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসার দিকে।" [সূরা আল-ইসরা: ১]। আরও এসেছে, "সমস্ত প্রশংসা সেই সত্তার যিনি তাঁর বান্দার ওপর নাযিল করেছেন কিতাব।" [সূরা আল-কাহফ: ১] আরও বলা হয়েছে, "আর আল্লাহর বান্দা যখন তাঁকে ডাকার জন্য দাঁড়ালো তখন লোকেরা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তৈরি হলো।" [সূরা আল-জিন: ১৯]

(৩) এখানে আশ্চর্যবোধক এবং তিরস্কারসূচক প্রশ্ন করা হয়েছে যে, সে কি জানে না যে, আল্লাহ দেখছেন; তার এ কাজ-কর্মের প্রতিদান দেবেন? তবুও সে অবাধ্যতা করছে ও সৎকাজে বাধা প্রদান করছে কেন? [কুরতুবী]

নিয়ে যাব, মাথার সামনের চুলের গুচ্ছ ধরে[১]---

১৬. মিথ্যাচারী, পাপিষ্ঠ সম্মুখ-চুলের-গুচ্ছ। نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴿١٦﴾

১৭. অতএব সে তার পারিষদকে ডেকে আনুক! فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ﴿١٧﴾

১৮. শীঘ্রই আমরা ডেকে আনব যাবানিয়াদেরকে[২]। سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ﴿١٨﴾

১৯. কখনো নয়! আপনি তার অনুসরণ করবেন না। আর আপনি সিজ্‌দা করুন এবং নিকটবর্তী হোন[৩]। كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۩ ﴿١٩﴾

---

(১) سفع এর অর্থ কোন কিছু ধরে কঠোরভাবে হেঁচড়ানো। আর ناصية শব্দের অর্থ কপালের উপরিভাগের কেশগুচ্ছ। আরবদের মধ্যে রীতি ছিল যে, কারও অতি অসম্মান করার জন্য এই কেশগুচ্ছ মুঠোর ভেতরে নেয়া হত। [কুরতুবী]

(২) এখানে যাবানিয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, জাহান্নামের প্রহরী কঠোর ফেরেশ্‌তাগণ। কাতাদাহ বলেন, আরবী ভাষায় 'যাবানিয়াহ' শব্দের অর্থই হলো প্রহরী পুলিশ। এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী এটি আরবী ভাষায় বিশেষ বাহিনীর প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আর 'যাবান' শব্দের আসল মানে হচ্ছে, ধাক্কা দেয়া। সে হিসেবে 'যাবানিয়াহ' এর অন্য অর্থ, প্রচণ্ডভাবে পাকড়াওকারী, প্রচণ্ডভাবে ধাক্কা দিয়ে নিক্ষেপকারী। [ফাতহুল কাদীর]

(৩) এতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- কে আদেশ করা হয়েছে যে, আবু জাহলের কথায় কর্ণপাত করবেন না এবং সেজদা ও সালাতে মশগুল থাকুন। সিজদা করা মানে সালাত আদায় করা। অর্থাৎ হে নবী! আপনি নির্ভয়ে আগের মতো সালাত আদায় করতে থাকুন। এর মাধ্যমে নিজের রবের নৈকট্য লাভ করুন। কারণ, এটাই আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জনের উপায়। [কুরতুবী] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "বান্দা যখন সেজদায় থাকে, তখন তার পালনকর্তার অধিক নিকটবর্তী হয়। তাই তোমরা সেজদায় বেশী পরিমাণে দো'আ কর।" [মুসলিম: ৪৮২, আবু দাউদ: ৮৭৫, নাসায়ী: ২/২২৬, মুসনাদে আহমাদ: ২/৩৭০] অন্য এক হাদীসে আরও বলা হয়েছে, "সেজদার অবস্থায় কৃত দো'আ কবুল হওয়ার যোগ্য"। [মুসলিম: ৪৭৯, আবু দাউদ: ৮৭৬, নাসায়ী: ২/১৮৯, মুসনাদে আহমাদ:১/২১৯]

৯৭- সূরা আল-কাদ্‌র[১]
৫ আয়াত, মক্কী

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِنَّآ أَنزَلۡنَٰهُ فِي لَيۡلَةِ ٱلۡقَدۡرِ ١

১. নিশ্চয় আমরা কুরআন নাযিল করেছি[২] 'লাইলাতুল কদরে'[৩];

---

(১) কদরের এক অর্থ মাহাত্ম্য ও সম্মান। কেউ কেউ এ-স্থলে এ অর্থই নিয়েছেন। এর মাহাত্ম্য ও সম্মানের কারণে একে 'লাইলাতুল-কদর' তথা মহিমান্বিত রাত বলা হয়। কদরের আরেক অর্থ তাকদীর এবং আদেশও হয়ে থাকে। এ রাত্রিতে পরবর্তী এক বছরের অবধারিত ও বিধিলিপি ব্যবস্থাপক ও প্রয়োগকারী ফেরেশতাগণের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এতে প্রত্যেক মানুষের বয়স, মৃত্যু, রিযিক, বৃষ্টি ইত্যাদির পরিমাণ নির্দিষ্ট ফেরেশতাগণকে লিখে দেয়া হয়। [সা'দী] পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে, ﴿فِيهَا يُفۡرَقُ كُلُّ أَمۡرٍ حَكِيمٍ﴾ [সূরা আদ-দোখান:৪] এ আয়াতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, পবিত্র রাত্রে তাকদীর সংক্রান্ত সব ফয়সালা লিপিবদ্ধ করা হয়। এই রাত্রিতে তাকদীর সংক্রান্ত বিষয়াদি নিষ্পন্ন হওয়ার অর্থ এ বছর যেসব বিষয় প্রয়োগ করা হবে, সেগুলো লওহে মাহফুয থেকে নকল করে ফেরেশতাগণের কাছে সোপর্দ করা। নতুবা আসল বিধি-লিপি আদিকালেই লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে। [ইমাম নববী: শারহু সহীহ মুসলিম, ৮/৫৭]

(২) এখানে বলা হয়েছে, আমি কদরের রাতে কুরআন নাযিল করেছি। আবার অন্যত্র বলা হয়েছে, "রমযান মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে।" [সূরা আল-বাকারাহ: ১৮৫] এ থেকে জানা যায়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হেরা গুহায় যে রাতে আল্লাহর ফেরেশতা অহী নিয়ে এসেছিলেন সেটি ছিল রামাদান মাসের একটি রাত। এই রাতকে এখানে কদরের রাত বলা হয়েছে। সূরা দোখানে এটাকে মুবারক রাত বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, "অবশ্যি আমরা একে একটি বরকতপূর্ণ রাতে নাযিল করেছি।" [সূরা আদ-দোখান: ৩] এ আয়াত থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, কুরআন পাক লাইলাতুল-কদরে অবতীর্ণ হয়েছে। এর এক অর্থ এই যে, সমগ্র কুরআন লওহে মাহফুয থেকে লাইলাতুল-কদরে অবতীর্ণ করা হয়েছে, অতঃপর জিবরাঈল একে ধীরে ধীরে তেইশ বছর ধরে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে পৌঁছাতে থাকেন। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, এ রাতে কয়েকটি আয়াত অবতরণের মাধ্যমে কুরআন অবতরণের ধারাবাহিকতা সূচনা হয়ে যায়। এরপর অবশিষ্ট কুরআন পরবর্তী সময়ে ধাপে ধাপে পূর্ণ তেইশ বছরে নাযিল করা হয়। [আদ্‌ওয়াউল বায়ান]

(৩) কুরআন পাকের সুস্পষ্ট বর্ণনা দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, লাইলাতুল-কদর রামাদান মাসে। কিন্তু সঠিক তারিখ সম্পর্কে আলেমগণের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে যা সংখ্যায় চল্লিশ পর্যন্ত পৌঁছে। এ-সব উক্তির নির্ভুল তথ্য এই যে, লাইলাতুল-কদর রামাদান

২. আর আপনাকে কিসে জানাবে 'লাইলাতুল কদর' কী?	وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ۝٢
৩. 'লাইলাতুল কদর হাজার মাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ[১] ।	لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝٣
৪. সে রাতে ফিরিশ্‌তাগণ ও রূহ্‌ নাযিল হয়[২] তাদের রবের অনুমতিক্রমে	تَنَزَّلُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن

মাসের শেষ দশ দিনের মধ্যে আসে; কিন্তু এরও কোন তারিখ নির্দিষ্ট নেই; বরং যে কোন রাত্রিতে হতে পারে। আবার প্রত্যেক রামাদানে তা পরিবর্তিতও হতে পারে। সহীহ হাদীসদৃষ্টে এই দশ দিনের বেজোড় রাত্রিগুলোতে লাইলাতুল-কদর হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "রামাদানের শেষ দশকে লাইলাতুল-কদর অন্বেষণ কর।" [বুখারী: ২০২১] অন্য বর্ণনায় আছে- "তোমরা তা শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিগুলোতে তালাশ কর।" [বুখারী: ২০২০, মুসলিম:১১৬৯, তিরমিযী: ৭৯২] সুতরাং যদি লাইলাতুল-কদরকে রামাদানের শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিগুলোতে ঘূর্ণায়মান এবং প্রতি রামাদানে পরিবর্তনশীল মেনে নেয়া যায়, তবে লাইলাতুল-কদরের দিন-তারিখ সম্পর্কিত হাদীসসমূহের মধ্যে কোন বিরোধ অবশিষ্ট থাকে না। এটিই প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত। [ইবন হাজার: ফাতহুল বারী, ৪/২৬২-২৬৬]

(১) মুফাসসিরগণ এর অর্থ করেছেন, এ রাতের সৎকাজ কদরের রাত নেই এমন হাজার মাসের সৎকাজের চেয়ে ভালো। [মুয়াসসার] এ শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীসেও বিস্তারিত বলা হয়েছে। হাদীসে এসেছে, রামাদান আগমনকালে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "তোমাদের নিকট রামাদান আসন্ন। মুবারক মাস। আল্লাহ্‌ এর সাওম ফরয করেছেন। এতে জান্নাতের দরজাসমূহ খোলা হয়ে থাকে এবং জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়। শয়তানগুলোকে বেঁধে রাখা হয়। এতে এমন এক রাত রয়েছে যা হাজার মাস থেকেও উত্তম। যে ব্যক্তি এ রাত্রির কল্যান থেকে বঞ্চিত হয়েছে সে তো যাবতীয় কল্যান থেকে বঞ্চিত হলো।" [নাসায়ী: ৪/১২৯, মুসনাদে আহমাদ: ২/২৩০, ৪২৫] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে কেউ ঈমান ও সওয়াবের আশায় লাইলাতুল কদর রাত্রিতে সালাত আদায় করতে দাঁড়াবে তার পূর্ববর্তী সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" [বুখারী: ১০৯১, মুসলিম: ৭৬০, আবুদাউদ: ১৩৭২, নাসায়ী: ৮/১১২, তিরমিযী: ৮০৮, মুসনাদে আহমাদ: ২/৫২৯]

(২) الروح বলে কি বুঝানো হয়েছে মতপার্থক্য থাকলেও প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত হলো এর দ্বারা জিবরাঈলকে বোঝানো হয়েছে। জিবরাঈল আলাইহিস সালামের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার কারণে সমস্ত ফেরেশতা থেকে আলাদা করে তাঁর উল্লেখ করা হয়েছে। জিবরাঈলের

كُلِّ اَمۡرٍ ۛ

সকল সিদ্ধান্ত[১] নিয়ে।

سَلٰمٌ ۛ هِیَ حَتّٰی مَطۡلَعِ الۡفَجۡرِ ۟

৫. শান্তিময়[২] সে রাত, ফজরের আবির্ভাব পর্যন্ত[৩]।

সাথে ফেরেশতারাও সে রাত্রিতে অবতরণ করে। [ফাতহুল কাদীর] হাদীসে আছে, "লাইলাতুল-কদরের রাত্রিতে পৃথিবীতে ফেরেশতারা এত বেশী অবতরণ করে যে, তাদের সংখ্যা পাথরকুচির চেয়েও বেশী।" [মুসনাদে আহমাদঃ ২/৫১৯, মুসনাদে তায়ালাসী: ২৫৪৫]

(১) সকল সিদ্ধান্ত বা প্রত্যেক হুকুম বলতে অন্যত্র বর্ণিত "আমরে হাকীম" (বিজ্ঞতাপূর্ণ কাজ) [সূরা আদ-দোখান:৪] বলতে যা বুঝনো হয়েছে তার কথাই এখানে বলা হয়েছে। অর্থাৎ ফেরেশতাগণ শবে-কদরে সারা বছরের অবধারিত ঘটনাবলী নিয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করে। কোন কোন তাফসীরবিদ একে سلام এর সাথে সম্পর্কযুক্ত করে এ অর্থ করেছেন যে, এ রাত্রিটি যাবতীয় অনিষ্ট ও বিপদাপদ থেকে শান্তিস্বরূপ। [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত সারাটা রাত শুধু শান্তিই শান্তি, মঙ্গলই মঙ্গল তথা কল্যাণে পরিপূর্ণ। সে রাত্র সর্বপ্রকার অনিষ্ট থেকে মুক্ত। [তাবারী]

(৩) অর্থাৎ লাইলাতুল-কদরের এই বরকত রাত্রির শুরু অর্থাৎ সূর্যাস্তের পর হতে ফজরের উদয় পর্যন্ত বিস্তৃত। [সা'দী]

৯৮- সূরা আল-বায়্যিনাহ[১]
৮ আয়াত, মাদানী

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

لَمۡ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ وَٱلۡمُشۡرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأۡتِيَهُمُ ٱلۡبَيِّنَةُ ١

১. আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা কুফরি করেছে এবং মুশরিকরা[২], তারা নিবৃত্ত হবে না যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসবে[৩]--

---

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উবাই ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে বললেন, আল্লাহ্ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমি তোমাকে "লাম ইয়াকুনিল্লাযিনা কাফারু" (সূরা) পড়ে শোনাই। উবাই ইবনে কা'ব বললেন, আমার নাম নিয়ে আপনাকে বলেছে? রাসূল বললেন, হ্যাঁ। উবাই ইবনে কা'ব তখন (খুশিতে) কেঁদে ফেললেন"। [বুখারী: ৩৮০৮, ৪৯৫৯, মুসলিম: ৭৯৯, মুসনাদে আহমাদ: ৩/২৭৩]

(২) আহলি কিতাব ও মুশরিক উভয় দলই কুফরী কর্মকাণ্ডে জড়িত হলেও দু'দলকে দু'টি পৃথক নাম দেয়া হয়েছে। যাদের কাছে আগের নবীদের আনা কোন আসমানী কিতাব ছিল, তা যত বিকৃত আকারেই থাক না কেন, তারা তা মেনে চলতো, তাদেরকে বলা হয় আহলি কিতাব; আর তারা হল ইয়াহুদী ও নাসারাগণ। আর যারা মূর্তি-পূজারী বা অগ্নি-পূজারী, তারা-ই মুশরিক। [ইবন কাসীর]

(৩) অর্থাৎ তারা তাদের কুফরী থেকে নিবৃত্ত হবে না যতক্ষণ না একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ এসে তাদেরকে কুফরীর প্রতিটি গলদ ও সত্য বিরোধী বিষয় বুঝাবে এবং যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে সুস্পষ্ট পদ্ধতিতে সত্য সঠিক পথ তাদের সামনে পেশ করবে, এর মাধ্যমে তারা কুফরী থেকে বের হতে পারবে। এর মানে এ নয় যে, এই সুস্পষ্ট প্রমাণটি এসে যাবার পর তারা সাবাই কুফরী পরিত্যাগ করবে। তবে তার আসার পরও তাদের মধ্য থেকে যারা নিজেদের কুফরীর ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তার দায়িত্ব তাদের ওপরই বর্তায়। এরপর তারা আল্লাহর কাছে অভিযোগ করতে পারবে না যে, আপনি আমাদের হেদায়াতের কোন ব্যবস্থা করেননি। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, "অনেক রাসূল পাঠিয়েছি যাদের কথা আগে আমি আপনাকে বলেছি এবং অনেক রাসূল, যাদের কথা আপনাকে বলিনি। এবং মূসার সাথে আল্লাহ্ সাক্ষাত কথা বলেছিলেন। এই রাসূলদেরকে সুসংবাদদানকারী ও সতর্ককারী করা হয়েছে যাতে রাসূলদের পর লোকদের জন্য আল্লাহর বিরুদ্ধে কোন যুক্তি না থাকে।" [সূরা আন-নিসা: ১৬৪-১৬৫] আরও বলেন, "হে আহলি কিতাব! রাসূলদের সিলসিলা দীর্ঘকাল বন্ধ থাকার পর প্রকৃত সত্যকে সুস্পষ্ট করার জন্য তোমাদের কাছে আমার রাসূল এসেছে। যাতে তোমরা বলতে না পারো আমাদের কাছে না কোন সুসংবাদদানকারী এসেছিল, না

২. আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এক রাসূল, যিনি তেলাওয়াত করেন পবিত্র পত্রসমূহ(১),

رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۝

৩. যাতে আছে সঠিক বিধিবদ্ধ বিধান(২)।

فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ۝

৪. আর যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তারা তো বিভক্ত হল তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পর(৩)।

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ۝

৫. আর তাদেরকে কেবল এ নির্দেশই প্রদান করা হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহ্‌র ইবাদত করে তাঁরই জন্য দ্বীনকে একনিষ্ঠ করে এবং সালাত কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে।

وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۙ حُنَفَآءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ۝

এসেছিল কোন সতর্ককারী। কাজেই নাও, এখন তোমাদের কাছে সুসংবাদদানকারী এসে গেছে এবং সতর্ককারীও।" [সূরা আল-মায়েদাহ: ১৯]

(১) صحف শব্দটি صحيفة এর বহুবচন। আভিধানিক অর্থে 'সহীফা' বলা হয় লেখার জন্য প্রস্তুত, কিংবা লিখিত পাতাকে, এখানে পবিত্র সহীফা মানে হচ্ছে এমন সব সহীফা যার মধ্যে কোন প্রকার বাতিল, কোন ধরনের গোমরাহী ও ভ্রষ্টতা নেই এবং শয়তান যার নিকটে আসে না। এখনে পবিত্র সহীফা তেলাওয়াত করে শুনানো অর্থ তিনি সেসব বিধান শুনাতেন, যা পরে সহীফার মাধ্যমে সংরক্ষিত করা হয়। কেননা, প্রথমে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন সহীফা থেকে নয় স্মৃতি থেকে পাঠ করে শুনাতেন। [ফাতহুল কাদীর] অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, ﴿فِيْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ۝ مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۝ بِاَيْدِيْ سَفَرَةٍ ۝ كِرَامٍۢ بَرَرَةٍ﴾ "ওটা আছে মর্যাদা সম্পন্ন লিপিসমূহে, যা উন্নত, পবিত্র, মহান, পূত-চরিত্র লেখকের হাতে লিখিত।" [সূরা আবাসা:১৩-১৬]

(২) বলা হয়েছে যে, সে সমস্ত লিখিত লিপিসমূহ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এসেছে, তা সত্য, ইনসাফপূর্ণ ও সরল-সহজ। এ বিধি-বিধানই মানুষকে সরল পথের সন্ধান দেয়। এ প্রমাণ থাকলেই প্রমাণিত হয় কে প্রকৃত সত্যসন্ধানী। [সা'দী]

(৩) আহলে-কিতাবদের নিকটেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুণাবলী, পরিচিতি ইত্যাদি জ্ঞান ছিল, তাই আয়াতে তাদের কথাই বলা হয়েছে– মুশরেকদের উল্লেখ করা হয়নি। আহলে কিতাবরা সত্যকে জানার পরও অনেকে তা অস্বীকার করেছিল। কিন্তু প্রথম ব্যাপারে উভয় দলই শরীক ছিল, তাই প্রথম আয়াতে উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ﴾ বলা হয়েছে। [আদ্‌ওয়াউল বায়ান]

আর এটাই সঠিক দ্বীন[১]।

৬. নিশ্চয় কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফরি করেছে তারা এবং মুশরিকরা জাহান্নামের আগুনে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে; তারাই সৃষ্টির অধম[২]।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَٰبِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ أُولَٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۝٦

৭. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তারাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ।

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحَٰتِ أُولَٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۝٧

৮. তাদের রবের কাছে আছে তাদের পুরস্কার : স্থায়ী জান্নাত, যার নিচে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট[৩] এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট।

جَزَآؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۖ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُۥ ۝٨

---

(১) অর্থাৎ আহলে-কিতাবদেরকে তাদের কিতাবে আদেশ করা হয়েছিল খাঁটি মনে ও একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করতে, সালাত কায়েম করতে ও যাকাত দিতে। এরপর বলা হয়েছে, এ নির্দেশটি শুধুমাত্র বর্তমান আহলে কিতাবদের জন্য নয়; বরং সঠিক মিল্লাতের অথবা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সমস্ত কিতাবের তরীকাও তাই। [সা'দী]

(২) অর্থাৎ আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে তাদের চেয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টি আর নেই। এমন কি তারা পশুরও অধম। কারণ পশুর বুদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তা ও কর্মশক্তি নেই। কিন্তু এরা বুদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তা ও কর্মশক্তি সত্ত্বেও সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। [আদ্ওয়াউল বায়ান]

(৩) এ আয়াতে জান্নাতীদের প্রতি সর্ববৃহৎ নেয়ামত আল্লাহর সন্তুষ্টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আল্লাহ তা'আলা জান্নাতীদেরকে উদ্দেশ্য করে বলবেন, হে জান্নাতীগণ! তখন তারা জওয়াব দেবে, হে আমাদের রব! আমরা উপস্থিত এবং আপনার আনুগত্যের জন্যে প্রস্তুত। সমস্ত কল্যাণ আপনারই হাতে। অতঃপর আল্লাহ বলবেন, তোমরা কি সন্তুষ্ট? তারা জওয়াব দেবে, হে আমাদের রব! এখনও সন্তুষ্ট না হওয়ার কি সম্ভাবনা? আপনি তো আমাদেরকে এত সব দিয়েছেন, যা অন্য কোন সৃষ্টি পায়নি। আল্লাহ বলবেন, আমি তোমাদেরকে আরও উত্তম নেয়ামত দিচ্ছি। আমি তোমাদের প্রতি আমার সন্তুষ্টি নাযিল করছি। অতঃপর কখনও তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হব না।" [বুখারী: ৬৫৪৯,৭৫১৮, মুসলিম: ২৮২৯]

এটি তার জন্য, যে তার রবকে ভয় করে[১]।

(১) অন্য কথায় যে ব্যক্তি আল্লাহর ব্যাপারে নির্ভীক এবং তাঁর মোকাবিলায় দুঃসাহসী ও বেপরোয়া হয়ে জীবন যাপন করে না। বরং দুনিয়ায় প্রতি পদে পদে আল্লাহকে ভয় করে জীবন যাপন করে; তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলে তাকওয়া অবলম্বন করে। তার জন্যই আল্লাহর কাছে রয়েছে এই প্রতিদান ও পুরস্কার। [তাবারী]

৯৯- সূরা আয-যিলযাল
৮ আয়াত, মাদানী

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. যখন প্রবল কম্পনে যমীন প্রকম্পিত করা হবে[১],

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ①

২. আর যমীন তার ভার বের করে দেবে[২],

وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ②

---

(১) 'যালযালাহু' মানে হচ্ছে, প্রচণ্ডভাবে জোরে জোরে ঝাড়া দেয়া, ভূকম্পিত হওয়া।

(২) এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। এক, মরা মানুষ মাটির বুকে যেখানে যে অবস্থায় যে আকৃতিতে আছে দ্বিতীয় ফুঁৎকারের পরে তাদের সবাইকে বের করে এনে সে বাইরে ফেলে দেবে এবং যাবতীয় মৃতকে বের করে হাশরের মাঠের দিকে চালিত করবে। মানুষের শরীরের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অংশগুলো এক জায়গায় জমা হয়ে নতুন করে আবার সেই একই আকৃতি সহকারে জীবিত হয়ে উঠবে যেমন সে তার প্রথম জীবনের অবস্থায় ছিল। এই বিষয়টি অন্যত্র এভাবে বলা হয়েছে, "হে মানুষ! তোমাদের রবের তাকওয়া অবলম্বন কর; কিয়ামতের প্রকম্পন এক ভয়ংকর ব্যাপার!" [সূরা আল-হাজ্জ:১] আরও এসেছে, "আর পৃথিবীকে যখন সম্প্রসারিত করা হবে এবং পৃথিবী তার অভ্যন্তরে যা আছে তা বাইরে নিক্ষেপ করবে ও শূন্যগর্ভ হবে।"[সূরা আল-ইনশিকাক:৩-৪] দুই, এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, কেবলমাত্র মরা মানুষদেরকে সে বাইরে নিক্ষেপ করে ক্ষান্ত হবে না বরং তাদের প্রথম জীবনের সমস্ত কথা ও কাজ এবং যাবতীয় আচার-আচরণের রেকর্ড ও সাক্ষ্য-প্রমাণের যে স্তূপ তার গর্ভে চাপা পড়ে আছে সেগুলোকেও বের করে বাইরে ফেলে দেবে। পরবর্তী বাক্যটিতে একথারই প্রকাশ ঘটেছে। তাতে বলা হয়েছে, যমীন তার ওপর যা কিছু ঘটেছে তা বর্ণনা করবে। তিন, কোন কোন মুফাসসির এর তৃতীয় একটি অর্থও বর্ণনা করেছেন। সেটি হচ্ছে, সোনা, রূপা, হীরা, মণি-মাণিক্য এবং অন্যান্য যেসব মূল্যবান সম্পদ ভূ-গর্ভে সঞ্চিত রয়েছে সেগুলোর বিশাল বিশাল স্তূপও সেদিন যমীন উগলে দেবে। [দেখুন: আদ্‌ওয়াউল বায়ান] আর যদি দুনিয়ার জীবনের শেষভাগে কিয়ামতের আলামত হিসেবে এ সম্পদ বের করা বোঝায় তবে এতদসংক্রান্ত একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,"পৃথিবী তার কলিজার টুকরা বিশালাকার স্বর্ণ খণ্ডের আকারে উদগীরণ করে দেবে। তখন যে ব্যক্তি ধন-সম্পদের জন্যে কাউকে হত্যা করেছিল, সে তা দেখে বলবে, এর জন্যেই কি আমি এতবড় অপরাধ করেছিলাম? যে ব্যক্তি অর্থের কারণে আত্মীয়দের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেছিল, সে বলবে, এর জন্যেই কি আমি এ কাণ্ড করেছিলাম? চুরির কারণে যার হাত কাটা হয়েছিল, সে বলবে, এর জন্যেই কি আমি নিজের হাত হারিয়েছিলাম? অতঃপর কেউ এসব স্বর্ণখণ্ডের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করবে না। [মুসলিম:১০১৩]

৩. আর মানুষ বলবে, 'এর কী হল[১]?'

وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ۝٣

৪. সেদিন যমীন তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে[২],

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۝٤

৫. কারণ আপনার রব তাকে নির্দেশ দিয়েছেন,

بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ۝٥

৬. সেদিন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে বের হবে[৩], যাতে তাদেরকে তাদের

يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا ۙ لِيُرَوْا

(১) মানুষ অর্থ প্রত্যেকটি মানুষ হতে পারে। কারণ পুনরায় জীবন লাভ করে চেতনা ফিরে পাবার সাথে সাথেই প্রত্যেক ব্যক্তির প্রথম প্রতিক্রিয়া এটিই হবে যে, এসব কি হচ্ছে? এটা যে হাশরের দিন একথা সে পরে বুঝতে পারবে। আবার মানুষ অর্থ আখেরাত অস্বীকারকারী মানুষও হতে পারে। কারণ যে বিষয়কে অসম্ভব মনে করতো তা তার সামনে ঘটে যেতে থাকবে এবং সে এসব দেখে অবাক ও পেরেশান হবে। তবে ঈমানদারদের মনে এ ধরনের বিস্ময় ও পেরেশানি থাকবে না। কারণ তখন তাদের আকীদা-বিশ্বাস ও প্রত্যয় অনুযায়ীই সবকিছু হতে থাকবে। পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে সে সময় আখেরাত অস্বীকারকারীরা বলবে, "কে আমাদের শয়নাগার থেকে আমাদের উঠালো?" এর জবাব আসবে, "এটি সেই জিনিস যার ওয়াদা করুণাময় করেছিলেন এবং আল্লাহর পাঠানো রাসূলগণ সত্য বলেছিলেন।" [সূরা ইয়াসিন: ৫২] [আদ্‌ওয়াউল বায়ান]

(২) যমীন কি জানিয়ে দেবে এ নিয়ে মুফাসসেরীনদের মধ্যে কয়েকটি মত রয়েছে। সম্ভবত সব কয়টি মতই এখানে উদ্দেশ্য হতে পারে। এক. ইয়াহইয়া ইবনে সালাম বলেন, এর অর্থ, যমীন তার থেকে যা যা বের করে দিল (সম্পদরাজি) তা জানিয়ে দিবে। এর সমর্থনে একটি হাদীসে এসেছে, "কোন মানুষের জীবন যদি কোন সুনির্দিষ্ট স্থানে অবসান হওয়ার কথা থাকে তখন আল্লাহ্ তার জন্য সেখানে যাওয়ার একটি প্রয়োজন তৈরী করে দেন। তারপর যখন সে স্থানে পৌঁছে তখন তাকে মৃত্যু দেয়া হয়। তারপর যমীন কিয়ামতের দিন বলবে, হে রব! এটা তুমি আমার কাছে আমানত রেখেছিলে।" [ইবনে মাজাহ:৪২৬৩] দুই. ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, এ আয়াতের অর্থ, আগের আয়াতে যে বলা হয়েছে মানুষ প্রশ্ন করবে, 'যমীনের কি হল'? এর জওয়াব যমীনই দিবে যে, কিয়ামত অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। তিন. আবু হুরায়ারা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, এর অর্থ, যমীন তার মধ্যে কৃত ভাল-মন্দ যাবতীয় কর্মকাণ্ডের হিসাব দাখিল করবে। যমীনের ওপর যা কিছু ঘটে গেছে তার সবকিছু সে কিয়ামতের দিন বলে দেবে। [কুরতুবী]

(৩) এর অর্থ, মানুষ সেদিন হাশরের মাঠ থেকে তাদের আমল অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে যাবে; তাদের কেউ জান্নাতে যাবে, কেউ যাবে জাহান্নামে। [জালালাইন,

أَعْمَالَهُمْ ۝٦

কৃতকর্ম দেখান যায়[১],

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝٧

৭. কেউ অণু পরিমাণ সৎকাজ করলে সে তা দেখবে[২]।

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۝٨

৮. আর কেউ অণু পরিমাণ অসৎকাজ করলে সে তাও দেখবে[৩]।

মুয়াসসার, সা'দী] এর দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে, বিগত হাজার হাজার বছরে সমস্ত মানুষ যে যেখানে মরেছিল সেখান থেকে অর্থাৎ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে থেকে দলে দলে চলে আসতে থাকবে। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে, "যে দিন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, তোমরা দলে দলে এসে যাবে। [সূরা আন-নাবা: ১৮] [ফাতহুল কাদীর]

(১) অর্থাৎ তাদের আমল তাদেরকে দেখানো হবে। প্রত্যেকে দুনিয়ায় কি কাজ করে এসেছে তা তাকে বলা হবে। কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে একথা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, কাফের মুমিন, সৎকর্মশীল ও ফাসেক, আল্লাহর হুকুমের অনুগত ও নাফরমান সবাইকে অবশ্যি তাদের আমলনামা দেয়া হবে। [দেখুন, সূরা আল-হাক্কার ১৯ ও ২৫, সূরা আল-ইনশিকাকের ৭-১০]

(২) এ আয়াতে خير বলে শরীয়তসম্মত সৎকর্ম বোঝানো হয়েছে; যা ঈমানের সাথে সম্পাদিত হয়ে থাকে। কেননা, ঈমান ব্যতীত কোন সৎকর্মই আল্লাহর কাছে সৎকর্ম নয়। কুফর অবস্থায় কৃত সৎকর্ম আখেরাতে ধর্তব্য হবে না যদিও দুনিয়াতে তার প্রতিদান দেয়া হয়। তাই এ আয়াতকে এ বিষয়ের প্রমাণস্বরূপ পেশ করা হয় যে, যার মধ্যে অণু পরিমাণ ঈমান থাকবে, তাকে অবশেষে জাহান্নাম থেকে বের করে নেয়া হবে। কেননা, এ আয়াতের ওয়াদা অনুযায়ী প্রত্যেকের সৎকর্মের ফল আখেরাতে পাওয়া জরুরী। কোন সৎকর্ম না থাকলেও স্বয়ং ঈমানই একটি বিরাট সৎকর্ম বলে বিবেচিত হবে। ফলে মুমিন ব্যক্তি যতবড় গোনাহগারই হোক, চিরকাল জাহান্নামে থাকবে না। কিন্তু কাফের ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন সৎকর্ম করে থাকলে ঈমানের অভাবে তা পণ্ডশ্রম মাত্র। তাই আখেরাতে তার কোন সৎকামই থাকবে না।

(৩) প্রত্যেকটি সামান্যতম ও নগণ্যতম সৎকাজেরও একটি ওজন ও মূল্য রয়েছে এবং অনুরূপ অবস্থা অসৎকাজেরও। অসৎকাজ যত ছোটই হোক না কেন অবশ্যি তার হিসেব হবে এবং তা কোনক্রমেই উপেক্ষা করার মতো নয়। তাই কোন ছোট সৎকাজকে ছোট মনে করে ত্যাগ করা উচিত নয়। কারণ এই ধরনের অনেক সৎকাজ মিলে আল্লাহর কাছে একটি অনেক বড় সৎকাজ গণ্য হতে পারে। অনুরূপভাবে কোন ছোট ও নগণ্য অসৎকাজও না করা উচিত; কারণ এই ধরনের অনেকগুলো ছোট গোনাহ একত্র হয়ে একটি বিরাট গোনাহের স্তূপ জমে উঠতে পারে। [দেখুন; কুরতুবী, সা'দী] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচো-তা এক টুকরা খেজুর দান করার বা একটি ভালো কথা বলার

বিনিময়েই হোক না কেন” [বুখারী: ৬৫৪০] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন: “কোন সৎকাজকেও সামান্য ও নগণ্য মনে করো না, যদিও তা কোন পানি পানেচ্ছু ব্যক্তির পাত্রে এক মগ পানি ঢেলে দেয়াই হয় অথবা তোমার কোন ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাত করাই হয়।”[মুসনাদে আহমাদ:৫/৬৩] অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মেয়েদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন, “হে মুসলিম মেয়েরা! কোন প্রতিবেশী তার প্রতিবেশিনীর বাড়িতে কোন জিনিস পাঠানোকে সামান্য ও নগণ্য মনে করো না, তা ছাগলের পায়ের একটি খুর হলেও।” [বুখারী: ৬০১৭, মুসলিম: ১০৩০] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যত্র বলেন, “হে আয়েশা! যেসব গোনাহকে ছোট মনে করা হয় সেগুলো থেকে দূরে থাকো। কারণ আল্লাহর দরবারে সেগুলো সম্পর্কেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।” [মুসনাদে আহমাদ:৬/৭০,৫/১৩৩, ইবনে মাজাহ:৪২৪৩] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন: “সাবধান, ছোট গোনাহসমূহ থেকে নিজেকে রক্ষা করো। কারণ সেগুলো সব মানুষের ওপর একত্র হয়ে তাকে ধ্বংস করে দেবে।” [মুসনাদে আহমাদ:১/৪০২] [ইবন কাসীর]

১০০- সূরা আল-'আদিয়াত[১]
১১ আয়াত, মক্কী

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. শপথ ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান অশ্বরাজির[২],

وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا ①

২. অতঃপর যারা ক্ষুরের আঘাতে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত করে[৩],

فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا ②

(১) এ সূরায় আল্লাহ তা'আলা সামরিক অশ্বের কতিপয় বিশেষ অবস্থা বর্ণনা করেছেন এবং তাদের শপথ করে বলেছেন যে, মানুষ তার পালনকর্তার প্রতি খুবই অকৃতজ্ঞ। একথা বার বার বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা তার সৃষ্টির মধ্য থেকে বিভিন্ন বস্তুর শপথ করে বিশেষ ঘটনাবলী ও বিধানাবলী বর্ণনা করেন। এটা আল্লাহ তা'আলারই বৈশিষ্ট্য। মানুষের জন্য কোনো সৃষ্টবস্তুর শপথ করা বৈধ নয়। শপথ করা বাক্য নিজের বক্তব্যকে বাস্তবসম্মত ও নিশ্চিত প্রকাশ করা। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে যে বস্তুর শপথ করে কোন বিষয় বর্ণনা করে, বর্ণিত বিষয় সপ্রমাণে সে বস্তুর গভীর প্রভাব থাকে। এমনকি, সে বস্তু যেন সে বিষয়ের পক্ষে সাক্ষ্যদান করে। এখানে সামরিক অশ্বের কঠোর কর্তব্যনিষ্ঠার উল্লেখ যেন মানুষের অকৃতজ্ঞতার সাক্ষ্যস্বরূপ করা হয়েছে। এর ব্যাখ্যা এই যে, অশ্ব বিশেষতঃ সামরিক অশ্ব যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের জীবন বিপন্ন করে মানুষের আদেশ ও ইঙ্গিতের অনুসারী হয়ে কত কঠোর খেদমতই না আনজাম দিয়ে থাকে। অথচ এসব অশ্ব মানুষ সৃষ্টি করেনি। তাদেরকে যে ঘাস-পানি মানুষ দেয়, তাও তার সৃজিত নয়। আল্লাহর সৃষ্টি করা জীবনোপকরণকে মানুষ তাদের কাছে পৌঁছে দেয় মাত্র। এখন অশ্বকে দেখুন, সে মানুষের এতটুকু অনুগ্রহকে কিভাবে চিনে এবং স্বীকার করে। তার সামান্য ইশারায় সে তার জীবনকে সাক্ষাৎ বিপদের মুখে ঠেলে দেয়, কঠোরতর কষ্ট সহ্য করে। পক্ষান্তরে মানুষের প্রতি লক্ষ্য করুন, আল্লাহ তা'আলা তাকে এক ফোঁটা তুচ্ছ বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন, বিভিন্ন কাজের শক্তি দিয়েছেন, বুদ্ধি ও চেতনা দান করেছেন, তার পানাহারের সামগ্রী সৃষ্টি করেছেন এবং সমস্ত প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সহজলভ্য করে তার কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। কিন্তু সে এতসব উচ্চস্তরের অনুগ্রহেরও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না।

(২) العاديات শব্দটি عدو থেকে উদ্ভূত। অর্থ দৌড়ানো। ضبح বলা হয় ঘোড়ার দৌড় দেয়ার সময় তার বক্ষ থেকে নির্গত আওয়াজকে। কোন কোন গবেষকের মতে এখানে দৌড়ায় শব্দের মাধ্যমে ঘোড়া বা উট অথবা উভয়টিও উদ্দেশ্য হতে পারে। তবে ইমাম কুরতুবী ঘোড়াকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

(৩) موريات শব্দটি إيراء থেকে উদ্ভূত। অর্থ অগ্নি নির্গত করা। যেমন চকমকি পাথর ঘষে

৩. অতঃপর যারা অভিযান করে প্রভাতকালে[১],	فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا ۙ﴿۳﴾
৪. ফলে তারা তা দ্বারা ধূলি উৎক্ষিপ্ত করে[২];	فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا ۙ﴿۴﴾
৫. অতঃপর তা দ্বারা শত্রু দলের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে[৩] ।	فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا ۙ﴿۵﴾
৬. নিশ্চয় মানুষ তার রবের প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ[৪]	اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ ۚ﴿۶﴾

ঘষে অথবা দিয়াশলাই ঘষা দিয়ে অগ্নি নির্গত করা হয় । قدح এর অর্থ আঘাত করা, ঘর্ষন করা; যার কারণে আগুন তৈরী হয় । লৌহনাল পরিহিত অবস্থায় ঘোড়া যখন প্রস্তরময় মাটিতে ক্ষুরাঘাত করে দৌড় দেয় তখন অগ্নিস্ফূলিঙ্গ নির্গত হয় ।[ফাতহুল কাদীর]

(১) مغيرات শব্দটি إغارة থেকে উদ্ভূত । অর্থ হামলা করা, হানা দেয়া । صبحاً বা 'ভোর বেলায়' বলে আরবদের অভ্যাস হিসেবে প্রভাতকালের উল্লেখ করা হয়েছে । কোন কোন মুফাসসির বলেন, আরববাসীদের নিয়ম ছিল, কোন জনপদে অতর্কিত আক্রমণ করতে হলে তারা রাতের আঁধারে বের হয়ে পড়তো ।এর ফলে শত্রুপক্ষ পূর্বাহ্নে সতর্ক হতে পারতো না । এভাবে একেবারে খুব সকালে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তো । প্রভাতে আলো যেটুকু ছড়িয়ে পড়তো তাতে তারা সবকিছু দেখতে পেতো । আবার দিনের আলো খুব বেশী উজ্জ্বল না হবার কারণে প্রতিপক্ষ দূর থেকে তাদের আগমন দেখতে পেতো না ।ফলে তারা মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতিও গ্রহণ করতে পারতো না । [দেখুন: কুরতুবী] এখানে অবশ্য জিহাদে আল্লাহ্‌র পথে ব্যবহৃত ঘোড়সওয়ারদের বুঝানো হয়েছে ।[ইবন কাসীর]

(২) أثرن শব্দটি إثارة থেকে উৎপন্ন । অর্থ ধূলি উড়ানো । نقع ধূলিকে বলা হয় । আর به শব্দের অর্থ, সে সময়ে বা শত্রুদের সে স্থানে । অর্থাৎ অশ্বসমূহ যুদ্ধক্ষেত্রে এত দ্রুত ধাবমান হয় যে, তাদের ক্ষুর থেকে ধূলি উড়ে চতুর্দিক আচ্ছন্ন করে ফেলে । [আদওয়াউল বায়ান]

(৩) وسطن শব্দটির অর্থ কোন কিছুর মধ্যভাগে পৌঁছে যাওয়া । جمعاً অর্থ, দল বা গোষ্ঠী । আর به অর্থ, তা দ্বারা । এখানে তা বলতে আরোহীদের দ্বারা বুঝানো হয়েছে । অর্থাৎ অশ্বসমূহ ধূলিকণা উড়িয়ে তাদের আরোহীদের নিয়ে শত্রুদের মধ্যভাগে পৌঁছে যায় । [তাবারী]

(৪) এত বড় শপথ করার পরে এখানে যে উদ্দেশ্যে শপথ করা হয়েছে : তা বর্ণনা করা হয়েছে । শপথের মূলকথা হচ্ছে এটা বর্ণনা করা যে, মানুষ তার প্রভুর অকৃতজ্ঞতাই

৭. আর নিশ্চয় সে এ বিষয়ে সাক্ষী(১), | وَاِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ ۚ

৮. আর নিশ্চয় সে ধন-সম্পদের আসক্তিতে প্রবল(২)। | وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ ؕ

৯. তবে কি সে জানে না যখন কবরে যা আছে তা উত্থিত হবে, | اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِى الْقُبُوْرِ ۙ

১০. আর অন্তরে যা আছে তা প্রকাশ করা হবে(৩)? | وَحُصِّلَ مَا فِى الصُّدُوْرِ ۙ

১১. নিশ্চয় তাদের রব সেদিন তাদের ব্যাপারে সবিশেষ অবহিত(৪)। | اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيْرٌ ࣖ

প্রকাশ করে থাকে। كنود বলতে এখানে মূলত বোঝানো হয়েছে যে, মানুষ তার রবের নেয়ামতের প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ। হাসান বসরী বলেন, كنود এর অর্থ সে ব্যক্তি, যে বিপদ স্মরণ রাখে এবং নেয়ামত ভুলে যায়। [ইবন কাসীর]

(১) এখানে 'সে' বলে বোঝানো হচ্ছে, মানুষ নিজেই এ বিষয়ে সাক্ষী। এ সাক্ষ্য নিজ মুখেই প্রকাশ করতে পারে, আবার কাজ-কর্ম ও অবস্থার মাধ্যমেও প্রকাশিত হতে পারে। এর আরেকটি অর্থ হতে পারে যে,আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের এ অকৃতজ্ঞতার ব্যাপারে সাক্ষী। [ইবন কাসীর]

(২) خير এর শাব্দিক অর্থ মঙ্গল। এখানে ব্যাপক অর্থ ত্যাগ করে আরবের বাকপদ্ধতি অনুযায়ী এ আয়াত ধন-সম্পদকে خير বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। যেমন, অন্য এক আয়াতে আছে ﴿ اِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۚ﴾ "যদি কোন সম্পদ ত্যাগ করে যায়" [সূরা আল-বাকারাহ:১৮০] এ আয়াতটির অর্থও দু রকম হতে পারে। এক. সে সম্পদের আসক্তির কারণে প্রচণ্ড কৃপণ; দুই. সম্পদের প্রতি তার আসক্তি অত্যন্ত প্রবল। দ্বিতীয় অর্থটির মধ্যেই মূলত প্রথমটি চলে আসে; কেননা সম্পদের প্রতি প্রচণ্ড আসক্তিই কৃপণতার কারণ। [আদওয়াউল বায়ান]

(৩) অর্থাৎ অন্তরের ভালো-মন্দ পৃথক করে প্রকাশ করে দেওয়া হবে। ফলে গোপনগুলো প্রকাশ হয়ে পড়বে; মানুষের কর্মফল তাদের চেহারায় ফুটে উঠবে। [সা'দী] এ-বক্তব্যটিই অন্যত্র আল্লাহ্ বলেছেন, "যেদিন গোপন রহস্য যাচাই বাছাই করা হবে।" [সূরা আত-তারিক:৯] এ দু আয়াতে বলা হয়েছে আল্লাহ্ তা'আলা কবর থেকে উত্থিত করে, গোপন বিষয় প্রকাশ করার পর যে বিচার ও প্রতিদান প্রদান করা হবে, মানুষ কি তা জানে না? [মুয়াসসার]

(৪) অর্থাৎ তাদের রব তাদের ব্যাপারে অবশ্যই যথেষ্ট অবহিত, তাদের কোন কাজই তার নিকট গোপন নয়। তাদের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য বা গোপন সব কাজ-কর্মই তিনি জানেন। তিনি তাদেরকে এগুলোর উপযুক্ত প্রতিদানও দেবেন। আল্লাহ্ তা'আলা সমসবময়েই

তাদের ব্যাপারে জানা সত্ত্বেও এখানে শুধুমাত্র হাশরের দিন তাদের ব্যাপারে অবহিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে এ কারণে যে, এ-দিন তার জ্ঞানের মাধ্যমেই তিনি সকল গোপন প্রকাশ করে দেবেন, কাফেরদের শাস্তি দেবেন, কাজকর্মের প্রতিদান দেবেন। [সা'দী, ফাতহুল কাদীর, আদ্‌ওয়াউল বায়ান]

১০১- সূরা আল-কারি'আহ্
১১ আয়াত, মক্কী

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. ভীতিপ্রদ মহা বিপদ[১]

اَلْقَارِعَةُ ①

২. ভীতিপ্রদ মহা বিপদ কী?

مَا الْقَارِعَةُ ②

৩. আর ভীতিপ্রদ মহা বিপদ সম্পর্কে আপনাকে কিসে জানাবে?

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْقَارِعَةُ ③

৪. সেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত,[২]

يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ④

৫. আর পর্বতসমূহ হবে ধুনিত রঙ্গিন পশমের মত[৩]।

وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ⑤

---

(১) কুরআনের মূল শব্দ হচ্ছে "কারি'আহ" এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে, মহাবিপদ। কারা'আ মানে কোন জিনিসকে কোন জিনিসের ওপর এমন জোরে মারা যার ফলে তা থেকে প্রচণ্ড আওয়াজ হয়। এই শাব্দিক অর্থের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ও বড় রকমের মারাত্মক বিপদের ক্ষেত্রে "কারি'আহ" শব্দ বলা হয়ে থাকে। [মুজামুল ওয়াসীত] এখানে "আল-কারি'আহ" শব্দটি কিয়ামতের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। আবার সূরা আল-হাক্কায় কিয়ামতকে এই শব্দটি দিয়েই চিহ্নিত করা হয়েছে। [আয়াত:৪] সুতরাং আল-কারি'আহ শব্দটি কিয়ামতের একটি নাম। যেমনিভাবে আল-হাক্কাহ, আত-ত্বাম্মাহ, আস-সাখখাহ, আল-গাশিয়াহ, ইত্যাদিও কিয়ামতের নাম। [আদওয়াউল বায়ান]

(২) অর্থাৎ মানুষ সেদিনের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের বিক্ষিপ্ততা, আনা-গোনা ইত্যাদিতে উদ্ভ্রান্তের মত থাকবে। মনে হবে যেন তারা বিক্ষিপ্ত পতঙ্গ। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, "মনে হবে যেন তারা বিক্ষিপ্ত পঙ্গপাল"। [সূরা আল-কামার:৭] আগুন জ্বালানোর পর পতংগ যেমন দিক-বিদিক থেকে হন্য হয়ে আগুনের দিকে ছুটে আসে সেদিন মানুষ তেমনিভাবে হাশরের মাঠের দিকে ছুটে আসবে। [ইবন কাসীর, কুরতুবী]

(৩) অর্থাৎ যখন মহাদুর্ঘটনা ঘটে যাবে। আর এর ফলে সারা দুনিয়ার ব্যবস্থাপনা ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে, লোকেরা আতংকগ্রস্ত হয়ে এদিক ওদিক দৌড়াদৌড়ি করতে থাকবে যেমন আলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া পতংগরা চারদিকে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। পাহাড়গুলো ধূনা পশমের মত হবে, যা হাল্কা বাতাসে উড়ে যাবে। [সা'দী]

৬. অতঃপর যার পাল্লাসমূহ[১] ভারী হবে[২],

فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ﴿٦﴾

(১) এ সূরায় আমলের ওজন ও তার হালকা এবং ভারী হওয়ার প্রেক্ষিতে জাহান্নাম অথবা জান্নাত লাভের বিষয় আলোচিত হয়েছে। মূলে 'মাওয়াযীন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। শব্দটি বহুবচন। এর কারণ হয়ত মীযানগুলো কয়েকটি হবে; অথবা যে আমলগুলো ওজন করা হবে, সেগুলো বিভিন্ন প্রকারের হবে। [কুরতুবী] তাছাড়া বান্দার আমলের ওজন হওয়া যেমন সত্য তেমনি আমলকারীর ওজন হওয়াও সত্য। অনুরূপভাবে আমলনামারও ওজন করা হবে।[শরহুত তাহাবীয়া লিবনি আবিল ইয্য: ৪১৯] এক্ষেত্রে একথা স্মর্তব্য যে, কেয়ামতে মানুষের আমল ওজন করা হবে-গণনা হবে না। আমলের ওজন ইখলাস তথা আন্তরিকতা ও সুন্নতের সাথে সামঞ্জস্যের কারণে বেড়ে যায়। যার আমল আন্তরিকতাপূর্ণ ও সুন্নতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, সংখ্যায় কম হলেও তার আমলের ওজন বেশী হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সংখ্যায় তো সালাত, সাওম, দান-সদকা, হজ-ওমরা অনেক করে, কিন্তু আন্তরিকতা ও সুন্নাতের সাথে সামঞ্জস্য কম, তার আমলের ওজন কম হবে। মানুষ আমলের যে পুঁজি নিয়ে আল্লাহর আদালতে আসবে তা ভারী না হালকা, অথবা মানুষের নেকী তার পাপের চেয়ে ওজনে বেশী না কম-এরি ভিত্তিতে সেখানে ফায়সালা অনুষ্ঠিত হবে। [দেখুন: মাজমূ ফাতাওয়া শাইখিল ইসলাম ইব্ন তাইমিয়্যাহ: ১০/৭৩৫-৭৩৬] এ বিষয়টি কুরআনের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখিত হয়েছে। কোথাও বলা হয়েছে: "আর ওজন হবে সেদিন সত্য। তারপর যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই সফলকাম হবে। আর যাদের পাল্লা হালকা হবে তারাই নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।" [সূরা আল-আ'রাফ: ৮-৯] আবার কোথাও বলা হয়েছে, "হে নবী! বলে দিন, আমি কি তোমাদের জানাবো নিজেদের আমলের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী ব্যর্থ কারা? তারাই ব্যর্থ যাদের দুনিয়ার জীবনে সমস্ত আমল নষ্ট হয়ে গেছে। কিয়ামতের দিন আমি তাদের কোন ওজন দেবো না।" [সূরা আল-কাহাফ: ১০৪-১০৫] অন্যত্র বলা হয়েছে, "কিয়ামতের দিন আমি যথাযথ ওজন করার দাঁড়িপাল্লা রেখে দেবো। তারপর কারো ওপর অণু পরিমাণও যুলুম হবে না। যার সরিষার দানার পরিমাণও কোন কাজ থাকবে তাও আমি সামনে আনবো এবং হিসেব করার জন্য আমি যথেষ্ট।" [সূরা আল-আম্বিয়া: ৪৭] এই আয়াতগুলো থেকে জানা যায়, কুফরী করা বৃহত্তম অসৎকাজ। গুনাহের পাল্লা তাতে অনিবার্যভাবে ভারী হয়ে যায়। ফলে আর কাফেরের এমন কোন নেকী হবে না নেকীর পাল্লায় যার কোন ওজন ধরা পড়ে এবং তার ফলে পাল্লা ঝুঁকে পড়তে পারে; কারণ তার ঈমান নেই। [সা'দী, সূরা কাহ্ফ: আয়াত-১০৫]

(২) বলা হয়েছে, যার পাল্লাসমূহ ভারী হবে সে থাকবে সন্তোষজনক জীবনে। পাল্লাভারী হওয়ার অর্থ সৎকর্মের পাল্লা অসৎকর্ম থেকে ভারী হওয়া। [সা'দী]

৭. সে তো থাকবে সন্তোষজনক জীবনে । فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۝

৮. আর যার পাল্লাসমূহ হাল্কা হবে(১) وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ ۝

৯. তার স্থান হবে ‘হাওয়িয়াহ্’(২) । فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ ۝

১০. আর আপনাকে কিসে জানাবে সেটা কী? وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا هِيَهْ ۝

১১. অত্যন্ত উত্তপ্ত আগুন(৩) । نَارٌ حَامِيَةٌ ۝

---

(১) অর্থাৎ যাদের অসৎকর্মের পাল্লা সৎকর্ম থেকে ভারী হবে । [মুয়াসসার, সা‘দী]

(২) মূল আরবী শব্দে أمه বলা হয়েছে । أم শব্দের অর্থ স্থান বা ঠিকানাও হয়, যেমনটি উপরে অর্থের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে । তাছাড়া আয়াতের আরেক অর্থ হলো, সে জাহান্নামের আগুনে অধোমুখে মাথার মগজসহ পতিত হবে । তাছাড়া যদি أم শব্দটির বিখ্যাত অর্থ গ্রহণ করা হয় তাহলে তার অর্থ হবে, মা । সে হিসেবে আয়াতের অর্থ হচ্ছে, তার মা হবে জাহান্নাম । মায়ের কোল যেমন শিশুর অবস্থান হয় তেমনি জাহান্নামবাসীদের জন্য জাহান্নাম ছাড়া আর কোন অবস্থান হবে না । আয়াতে উল্লেখিত ‘হাওয়িয়াহ’ শব্দটি জাহান্নামের একটি নাম । শব্দটি এসেছে ‘হাওয়া’ থেকে । এর অর্থ হচ্ছে উঁচু জায়গা থেকে নীচুতে পড়ে যাওয়া । আর যে গভীর গর্তে কোন জিনিস পড়ে যায় তাকে হাওয়িয়া বলে । জাহান্নামকে হাওয়িয়া বলার কারণ হচ্ছে এই যে, জাহান্নাম হবে অত্যন্ত গভীর এবং জাহান্নামবাসীদেরকে তার মধ্যে ওপর থেকে নিক্ষেপ করা হবে । [কুরতুবী]

(৩) এখানে حامية বলে বুঝানো হয়েছে, আগুনটি হবে অত্যন্ত উত্তপ্ত ও লেলিহান । [ইবন কাসীর] হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “আদম সন্তান যে আগুন ব্যবহার করে সেটি জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের একভাগ উত্তপ্ততা সম্পন্ন, সাহাবায়ে কিরাম বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, এটাই তো শাস্তির জন্যে যথেষ্ট, তিনি বললেন, জাহান্নামের আগুন তার থেকে উনসত্তর গুণ বেশী উত্তপ্ত” । [বুখারী: ৩২৬৫] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “তোমাদের এ আগুন জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের একভাগ । তারপরও তাকে দু’বার সমুদ্রের মাধ্যমে ঠাণ্ডা করা হয়েছে, নতুবা এর দ্বারা কেউই উপকৃত হতে পারত না ।” [মুসনাদে আহমাদ: ২/২৪৪] অন্য হাদীসে এসেছে, “কিয়ামতের দিন সবচেয়ে হাল্কা আযাব ঐ ব্যক্তির হবে যাকে আগুনের জুতা পরিয়ে দেয়া হয়েছে ফলে তার কারণে তার মগজ উৎরাতে থাকবে ।” [মুসনাদে আহমাদ: ২/৪৩২] হাদীসে আরও এসেছে, “জাহান্নাম তার রবের কাছে অভিযোগ দিল যে, আমার একাংশ আরেক অংশকে খেয়ে ফেলছে । তখন তাকে দু’টি নিঃশ্বাস ফেলার অনুমতি দেয়া হলো, একটি শীতকালে অপরটি

গ্রীষ্মকালে। সুতরাং যত বেশী শীত পাও সেটা জাহান্নামের ঠাণ্ডা থেকে আর যতি বেশী গরম অনুভব কর সেটাও জাহান্নামের উত্তপ্ততা থেকে।” [বুখারী: ৫৩৭, ৩২৬০, মুসলিম: ৬১৭] অন্য হাদীসে এসেছে, “তোমরা যখন দেখবে যে, গ্রীষ্মের উত্তপ্ততা বেশী হয়ে গেছে তখন তোমরা সালাত ঠাণ্ডা করে পড়ো; কেননা, কঠিন উত্তপ্ততা জাহান্নামের লাভা থেকে এসেছে।” [বুখারী: ৪৩৬, মুসলিম: ৬১৫]

১০২- সূরা আত-তাকাছুর[১]
৮ আয়াত, মক্কী

سُوْرَةُ التَّكَاثُرِ

। । রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে । ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْهٰىكُمُ التَّكَاثُرُ ۝١

১. তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন রাখে[২] প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা[৩]

---

(১) تكاثر শব্দটি كثرة থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ, পরস্পর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়া। এখানে উদ্দেশ্য, প্রাচুর্য লাভ করার জন্য মানুষের পরস্পরের অগ্রবর্তী হওয়ার চেষ্টা করা ও প্রতিযোগিতা করা; লোকদের অন্যের তুলনায় বেশী প্রাচুর্য লাভ করার কথা নিয়ে পরস্পরের মোকাবেলায় বড়াই করে বেড়ানো। [ইবন কাসীর, ফাতহুল কাদীর] এখানে কী বিষয়ে প্রতিযোগিতা তা বল হয় নি। মূলত দুনিয়ার ধন-সম্পদ, পুত্র-পরিবার, বংশ, সম্মান-মর্যাদা, শক্তি ও কর্তৃত্বের উপকরণ এবং যেসব বিষয়ে এরূপ প্রতিযোগিতা হয় তার সবই উদ্দেশ্য। [সা'দী]

(২) ألهى 'আলহা' শব্দটির মূলে রয়েছে لهو বা 'লাহও'। এর আসল অর্থ গাফলতিতে নিমজ্জিত করা, ভুলিয়ে দেয়া। [কুরতুবী] যেসব কাজের প্রতি মানুষের আগ্রহ ও আকর্ষণ এত বেশী বেড়ে যায় যে সে তার মধ্যে মগ্ন হয়ে অন্য অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ জিনিস থেকে গাফেল হয়ে পড়ে সেই ধরনের প্রত্যেকটি কাজের জন্য আরবী ভাষায় এ শব্দটি বলা হয়ে থাকে। ['উদ্দাতুস সাবেরীন: পৃ.১৭১] অর্থাৎ 'তাকাসুর' তোমাদেরকে তার নিজের মধ্যে এমনভাবে মশগুল করে নিয়েছে, যার ফলে তার প্রতি মোহাচ্ছন্নতা তোমাদের তার চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আখেরাত ও তার জন্য প্রস্তুতি থেকে গাফেল করে দিয়েছে। তার মোহ তোমাদেরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তারই চিন্তায় তোমরা নিমগ্ন। আর এই মোহ ও নিমগ্নতা তোমাদেরকে একেবারে গাফেল করে দিয়েছে। আয়াতে এর জন্য কঠোর সাবধানবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। [উদ্দাতুস সাবেরীন: ১৮৩-১৮৪]

(৩) কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, আয়াতটি ঐ যুগের সুনির্দিষ্ট কোন কোন গোত্র বা নেতৃস্থানীয় লোকদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। [দেখুন, কুরতুবী] তবে এখানে একটি বিষয় পরিস্কার হওয়া দরকার যে, আয়াতে 'তোমাদেরকে' বলে শুধু সে যুগের লোকদের বুঝানো হয়নি। বরং প্রত্যেক যুগের লোকেরা ব্যক্তিগত পর্যায়ে ও সামগ্রিকভাবে এ সম্বোধনের আওতাভুক্ত হয়েছে। [কুরতুবী] এর অর্থ দাঁড়ায়, বেশী বেশী বৈষয়িক স্বার্থ অর্জন করা, তার মধ্যে একে অন্যের অগ্রবর্তী হওয়া এবং অন্যের মোকাবেলায় তা নিয়ে গর্ব করার মোহ যেমন ব্যক্তিকে আচ্ছন্ন করে তেমনি আচ্ছন্ন করে গোত্র ও জাতিকেও। তাছাড়া আয়াতে একথা সুস্পষ্ট করে বলা হয়নি যে, প্রাচুর্য লোকদেরকে কোন জিনিস থেকে গাফেল করে দিয়েছে। কারণ, যে জিনিস থেকে তারা গাফেল হয়েছে তা অত্যন্ত ব্যাপক। [সা'দী] এর দ্বারা সবকিছুই উদ্দেশ্য যা

২. যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও(১) ।

حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝

কিছুর প্রাচুর্যের জন্য মানুষ সাধারণত চেষ্টা করে থাকে এবং অহংকার করে থাকে। হতে পারে সেটা ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, সাহায্য-সহযোগিতাকারী, সৈন্য-সামন্ত, দাস-দাসী, মান-মর্যাদা ইত্যাদি যা-ই মানুষ বেশী পেতে চায় এবং অপরের উপর প্রাধান্য নেয়ার চেষ্টা করে। আর যা দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য থাকেনা [সা'দী] এভাবে মানুষ আল্লাহ থেকে, তাঁর মা'রিফাত থেকে, তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন থেকে, তাঁর ভালবাসাকে সবকিছুর ভালবাসার উপর স্থান দেয়া থেকে, যার ইবাদতের জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সেটা থেকে গাফেল হয়ে গেছে। [সা'দী] অনুরূপভাবে তারা আখেরাত থেকে গাফেল হয়ে গেছে। [বাদায়ে'উস তাফাসীর]

(১) এখানে বলা হয়েছে, যতক্ষণ না তোমরা করবস্থান যেয়ারত কর। এখানে যেয়ারত করার অর্থ মরে গিয়ে কবরে পৌঁছানো। কাতাদাহ বলেন, তারা বলত, আমরা অমুক বংশের লোক, আমরা অমুক গোত্রের চেয়ে বেশী, আমাদের সংখ্যা অনেক। এভাবে বলতেই থাকল অথচ তারা কমতে কমতে সবাই কবরবাসী হয়ে গেল। অতএব, আয়াতের মর্মার্থ এই যে, বলা হয়েছে, যারা ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির ভালবাসা অথবা অপরের সাথে বড়াই করায় এমন মত্ত হয়ে পড়ে যে, পরিণাম চিন্তা করার ফুরসতই পায় না। [ইবন কাসীর] এখানে যেয়ারত শব্দটি আরও থেকে বুঝা যায়, কবরেও কেউ চিরকাল থাকবে না, এই দুনিয়া-কবর সবই ক্ষণস্থায়ী; এগুলো যেয়ারত শেষ হলে জান্নাত বা জাহান্নাম চিরস্থায়ী বাসভূমিতে যেতে হবে। [কুরতুবী] আবদুল্লাহ ইবনে শিখখীর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট পৌঁছে দেখলাম তিনি ﴿أَلْهَىٰكُمُ التَّكَاثُرُ﴾ তেলাওয়াত করে বলছিলেন, "মানুষ বলে, আমার ধন! আমার ধন! অথচ তোমার অংশ তো ততটুকুই যতটুকু তুমি খেয়ে শেষ করে ফেল, অথবা পরিধান করে ছিন্ন করে দাও, অথবা সদকা করে সম্মুখে পাঠিয়ে দাও। এছাড়া যা আছে, তা তোমার হাত থেকে চলে যাবে– তুমি অপরের জন্যে তা ছেড়ে যাবে।" [মুসলিম: ২৯৫৮, তিরমিযী: ২৩৪২, মুসনাদে আহমদ: ৪/২৪] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আদম সন্তানের যদি স্বর্ণে পরিপূর্ণ একটি উপত্যকা থাকে, তবে সে (তাতেই সন্তুষ্ট হবে না; বরং) দুটি উপত্যকা কামনা করবে। তার মুখ তো (কবরের) মাটি ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা ভর্তি করা সম্ভব নয়। যে আল্লাহর দিকে রুজু করে, আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন।" [বুখারী: ৬৪৩৯,৬৪৪০] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আমি তোমাদের জন্য দারিদ্র্যতার ভয় করছি না। বরং তোমাদের জন্য প্রাচুর্যের ভয় করছি। অনুরূপভাবে আমি তোমাদের জন্যে ভুল-ভ্রান্তি হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে ভয় করছি না, বরং ভয় করছি ইচ্ছাকৃত অন্যায়ের।"। [মুসনাদে আহমাদ: ২/৩০৮]

৩. কখনো নয়, তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে(১);	كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣﴾
৪. তারপর, কখনো নয়, তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে;	ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٤﴾
৫. কখনো নয়! যদি তোমরা নিশ্চিত জ্ঞানে জ্ঞানী হতে---(২)	كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ﴿٥﴾
৬. অবশ্যই তোমরা জাহান্নাম দেখবে;	لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ﴿٦﴾
৭. তারপর অবশ্যই তোমরা তা দেখবে চাক্ষুষ প্রত্যয়ে(৩),	ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ﴿٧﴾
৮. তারপর অবশ্যই সেদিন তোমাদেরকে নেয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে(৪) ।	ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴿٨﴾

(১) অর্থাৎ তোমরা ভুল ধারণার শিকার হয়েছ। বৈষয়িক সম্পদের এ প্রাচুর্য এবং এর মধ্যে পরস্পর থেকে অগ্রবর্তী হয়ে যাওয়াকেই তোমরা উন্নতি ও সাফল্য মনে করে নিয়েছো। অথচ এটা মোটেই উন্নতি ও সাফল্য নয়। অবশ্যই অতি শীঘ্রই তোমরা এর অশুভ পরিণতি জানতে পারবে। [ইবন কাসীর, আদওয়াউল বায়ান]

(২) এখানে لو বা 'যদি' শব্দের জওয়াব উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ لَمَا أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা যদি কেয়ামতের হিসাব-নিকাশে নিশ্চিত বিশ্বাসী হতে, তবে কখনও প্রাচুর্যের বড়াই করতে না এবং উদাসীন হতে না। [সা'দী]

(৩) উপরে বলা হয়েছে ﴿عَيْنَ الْيَقِينِ﴾ এর অর্থ সে প্রত্যয়, যা চাক্ষুষ দর্শন থেকে অর্জিত হয়। [আদওয়াউল বায়ান] ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, খবর কোনদিন চাক্ষুষ দেখার মত নয়। মূসা আলাইহিস্ সালাম যখন তূর পর্বতে অবস্থান করছিলেন এবং তার অনুপস্থিতিতে তার সম্প্রদায় গোবৎসের পূজা করতে শুরু করেছিল, তখন আল্লাহ তা'আলা তূর পর্বতেই তাকে অবহিত করেছিলেন যে, বনী ইসরাঈলরা গোবৎসের পূজায় লিপ্ত হয়েছে। কিন্তু মূসা আলাইহিস্ সালাম এর মধ্যে এর তেমন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়নি, যেমন ফিরে আসার পর স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার ফলে দেখা দিয়েছিল; তিনি ক্রোধে আত্মহারা হয়ে তাওরাতের তক্তিগুলো হাত থেকে ছেড়ে দিয়েছিলেন, ফলে সেগুলো ভেঙ্গে যায়। [মুসনাদে আহমাদ: ১/২৭১]

(৪) অর্থাৎ তোমরা সবাই কেয়ামতের দিন আল্লাহ-প্রদত্ত নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে যে, সেগুলোর শোকর আদায় করেছ কি না, সেগুলোতে আল্লাহ্‌র হক আদায় করেছ কি না; নাকি পাপকাজে ব্যয় করেছ? [সা'দী] এতে সকল প্রকার নেয়ামত এসে যায়।

কুরআন ও হাদীসের অন্যত্র এরকম কিছু নেয়ামতের উদাহরণ দেয়া হয়েছে। অন্য আয়াতে এভাবে করা হয়েছে, ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ "কান, চোখ, হৃদয়- এদের প্রত্যেকটি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে।" [সূরা আল-ইসরা:৩৬] এতে মানুষের শ্রবণশক্তি দৃষ্টিশক্তি ও হৃদয় সম্পর্কিত লাখো নেয়ামত অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, যেগুলো সে প্রতি মুহূর্তে ব্যবহার করে। বিভিন্ন হাদীসেও নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হওয়ার কথা স্পষ্টভাবে এসেছে। যেমন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "দু'টি নেয়ামত এমন আছে যাতে অধিকাংশ মানুষই ঠক খায়। তার একটি হলো, স্বাস্থ্য অপরটি হচ্ছে অবসর সময়।" [বুখারী: ৬৪১২] অন্য বর্ণনায় এসেছে, একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্ষুধায় কাতর হয়ে বের হলেন, পথে আবুবকর ও উমরও বের হলেন, তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কেন বের হয়েছ? তারা বলল, ক্ষুধা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যার হাতে আমার নফস তার শপথ, আমিও সে কারণেই বের হয়েছি। তারপর তিনি বললেন, চল। তারা সবাই এক আনসারীর বাড়ীতে আগমন করলেন। আনসারী লোকটির স্ত্রী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সঙ্গিদ্বয়কে দেখে যার-পর-নাই খুশী হয়ে শুভেচ্ছা ও স্বাগতম জানানোর মাধ্যমে আমন্ত্রণ জানালেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, অমুক কোথায়? স্ত্রী জানালো যে, সে সুপেয় পানির ব্যবস্থা করতে গেছে। ইত্যবসরে আনসারী লোকটি এসে তাদেরকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে বললেন, আলহামদুলিল্লাহ! আজ কেউ আমার মত মেহমান পাবে না। তারা বসলে তিনি তাদের জন্য এক কাঁদি খেজুর নিয়ে আসলেন যাতে কাঁচা-পাকা, আধাপাকা, ভাল-মন্দ সব ধরণের খেজুর ছিল। তারপর আনসারী লোকটি ছুরি নিয়ে দৌড়াল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সাবধান! দুধ দেয় এমন ছাগল যবাই করো না। আনসারী তাদের জন্য যবাই করলে তারা ছাগলের গোস্ত খেল, খেজুর গ্রহণ করল, পানি পান করল। তারপর যখন তৃপ্ত হলো তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকর ও উমরকে বললেন, "তোমরা কিয়ামতের দিন এ সমস্ত নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। তোমাদেরকে ক্ষুধা তোমাদের ঘর থেকে বের করল, তারপর তোমরা এমন নেয়ামত ভোগ করার পর ফিরে গেলে"। [মুসলিম: ২০৩৮] অন্য বর্ণনায় এসেছে, এ আয়াত নাযিল হলে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা কোন নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হব? এটা তো শুধু (আসওয়াদান বা দুই কালো জিনিস) খেজুর ও পানি । রাসূল বললেন, "অবশ্যই তা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।" [তিরমিযী: ৫/৪৪৮, ইবনে মাজাহ:৪১৫৮, মুসনাদে আহমাদ: ৩/২৪] অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "কিয়ামতের দিন প্রথম যে নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে তা হচ্ছে, আমি কি তোমাকে শারীরিকভাবে সুস্থ করিনি? আমি কি তোমাকে সুপেয় পানি পান করাইনি?" [তিরমিযী: ৩৩৫৮] অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আল্লাহ্

তা'আলা কিয়ামতের দিন বলবেন, আদম সন্তান! তোমাকে ঘোড়া ও উটে বহন করিয়েছি, তোমাকে স্ত্রীর ব্যবস্থা করে দিয়েছি, তোমাকে ঘুরাপিরা ও নেতৃত্ব করার সুযোগ দিয়েছি, এগুলোর কৃতজ্ঞতা কোথায়?" [মুসলিম: ২৯৬৮, মুসনাদে আহমাদ: ২/৪৯২] এই হাদীসগুলো থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, জিজ্ঞাসাবাদ কেবল কাফেরদেরকে করা হবে না, সৎ মুমিনদেরকেও করা হবে। আর আল্লাহ মানুষকে যে নিয়ামতগুলো দান করেছেন সেগুলো সীমা সংখ্যাহীন। সেগুলো গণনা করা সম্ভব নয়। বরং এমন অনেক নিয়ামতও আছে যেগুলোর মানুষ কোন খবরই রাখে না। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে, "যদি তোমরা আল্লাহর নিয়ামতগুলো গণনা করতে থাকো তাহলে সেগুলো পুরোপুরি গণনা করতেও পারবে না।" [সূরা ইবরাহীম: ৩৪] [আদওয়াউল বায়ান, আত-তাফসীরুসসহীহ]

১০৩- সূরা আল-'আস্‌র[১]
৩ আয়াত, মক্কী

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

১. সময়ের শপথ[২],

وَٱلۡعَصۡرِ ١

২. নিশ্চয় মানুষ[৩] ক্ষতির মাঝে

إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَفِي خُسۡرٍ ٢

(১) আবদুল্লাহ ইবনে হিসন আবু মদীনাহ বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবীগণের মধ্যে দু ব্যক্তি ছিল, তারা পরস্পর মিলে একজন অন্যজনকে সূরা আছর পাঠ করে না শুনানো পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হতেন না। [তাবরানী, মু'জামুল আওসাতঃ ৫১২০, মু'জামুল কাবীরঃ ২০/৭০, বাইহাকী, শু'আবুল ঈমানঃ ৯০৫৭, মাজমাউয যাওয়ায়েদঃ ১০/২৩৩, ৩০৭]
এ সুরায় একথার ওপর সময়ের শপথ খাওয়া হয়েছে যে, মানুষ বড়ই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে এবং এই ক্ষতি থেকে একমাত্র তারাই রক্ষা পেয়েছে যারা চারটি গুণাবলীর অধিকারীঃ (১) ঈমান, (২) সৎকাজ (৩) পরস্পরকে হকের উপদেশ দেয়া এবং (৪) একে অন্যকে সবর করার উপদেশ দেয়া। ইমাম শাফে'য়ী রাহেমাহুল্লাহ বলেন, যদি মানুষ এ সূরা সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করত তবে তা তাদের জন্য যথেষ্ট হতো। সূরা আছর কুরআন পাকের একটি সংক্ষিপ্ত সূরা, কিন্তু এমন অর্থপূর্ণ সূরা যে, ইমাম শাফেয়ী রাহেমাহুল্লাহ-এর ভাষায় মানুষ এ সুরাটিকেই চিন্তা ভাবনা সহকারে পাঠ করলে তাদের দুনিয়া ও আখেরাত সংশোধনের জন্যে যথেষ্ট হয়ে যায়। [বাদায়ি'উত তাফসীর]

(২) আয়াতের প্রথমেই সময় বা যুগের শপথ করা হয়েছে। এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, বিষয়বস্তুর সাথে সময় বা যুগের কি সম্পর্ক, যার কসম করা হয়েছে? কসম ও কসমের জওয়াবের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়। অধিকাংশ তাফসীরবিদ বলেন, মানুষের সব কর্ম, গতিবিধি, উঠাবসা ইত্যাদি সব যুগের মধ্যে সংঘটিত হয়। সূরায় যেসব কর্মের নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেগুলোও এই যুগ-কালেরই দিবা-রাত্রিতে সংঘটিত হবে। এরই প্রেক্ষিতে যুগের শপথ করা হয়েছে। [সাদী, ইবন কাসীর] কোন কোন আলেম বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার মহত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, প্রজ্ঞা ও কুদরতের প্রমাণ-নিদর্শন সময় বা যুগেই রয়েছে; তাই এখানে সময়ের শপথ করা হয়েছে। [মুয়াসসার, বাদায়িউত তাফসীর]

(৩) মানুষ শব্দটি একবচন। এখানে মানুষ বলে সমস্ত মানুষই উদ্দেশ্য। কারণ, পরের বাক্যে চারটি গুণ সম্পন্ন লোকদেরকে তার থেকে আলাদা করে নেয়া হয়েছে। তাই এটা অবশ্যি মানতে হবে যে, এখানে মানুষ শব্দটিতে দুনিয়ার সমস্ত মানুষ সমানভাবে শামিল। কাজেই উপরোল্লিখিত চারটি গুণাবলী কোন ব্যক্তি, জাতি বা সারা দুনিয়ার সমস্ত মানুষ যার-ই মধ্যে থাকবে না সেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে, এই বিধানটি সর্বাবস্থায় সত্য

নিপতিত(১),

৩. কিন্তু তারা নয়(২), যারা ঈমান এনেছে(৩) এবং সৎকাজ

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

প্রমাণিত হবে। [আদ্‌ওয়াউল বায়ান, ফাতহুল কাদীর]

(১) আভিধানিক অর্থে ক্ষতি হচ্ছে লাভের বিপরীত শব্দ। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এ শব্দটির ব্যবহার এমন সময় হয় যখন কোন একটি সওদায় লোকসান হয়, পুরো ব্যবসাটায় যখন লোকসান হতে থাকে। আবার সমস্ত পুঁজি লোকসান দিয়ে যখন কোন ব্যবসায়ী দেউলিয়া হয়ে যায় তখনো এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। [ফাতহুল কাদীর]

(২) এখানে পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত মানবজাতি যে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ততার মধ্যে আছে তার থেকে উত্তরণের পথ বলে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, এই ক্ষতির কবল থেকে কেবল তারাই মুক্ত, যারা চারটি বিষয় নিষ্ঠার সাথে পালন করে-- ঈমান, সৎকর্ম, অপরকে সত্যের উপদেশ এবং সবরের উপদেশদান। দ্বীন ও দুনিয়ার ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার এবং মহা উপকার লাভ করার চার বিষয় সম্বলিত এ ব্যবস্থাপত্রের প্রথম দুটি বিষয় আত্মসংশোধন সম্পর্কিত এবং দ্বিতীয় দুটি বিষয় অপর মুসলিমদের হেদায়েত ও সংশোধন সম্পর্কিত। [সাদী]

(৩) এই সূরার দৃষ্টিতে যে চারটি গুণাবলীর উপস্থিতিতে মানুষ ক্ষতিমুক্ত অবস্থায় থাকতে পারে তন্মধ্যে প্রথম গুণটি হচ্ছে ঈমান। ঈমান শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে স্বীকৃতি দেয়া। আর শরীয়তের পরিভাষায় এর অর্থ অন্তরে বিশ্বাস, মুখে স্বীকার এবং কাজ-কর্মে বাস্তবায়ন। [মাজমূ 'ফাতাওয়া ৭/৬৩৮] এখন প্রশ্ন দেখা দেয়, ঈমান আনা বলতে কিসের ওপর ঈমান আনা বুঝাচ্ছে? এর জবাবে বলা যায়, কুরআন মজীদে একথাটি একবারে সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমত আল্লাহকে মানা। নিছক তাঁর অস্তিত্ব মেনে নেয়া নয়। বরং তাকে এমনভাবে মানা যাতে বুঝা যায় যে, তিনি একমাত্র প্রভূ ও ইলাহ। তাঁর সর্বময় কর্তৃত্বে কোন অংশীদার নেই। একমাত্র তিনিই মানুষের ইবাদাত, বন্দেগী ও আনুগত্য লাভের অধিকারী। তিনিই ভাগ্য গড়েন ও ভাঙ্গেন। বান্দার একমাত্র তাঁরই কাছে প্রার্থনা এবং তাঁরই ওপর নির্ভর করা উচিত। তিনিই হুকুম দেন ও তিনিই নিষেধ করেন। তিনি যে কাজের হুকুম দেন তা করা ও যে কাজ থেকে বিরত রাখতে চান তা না করা বান্দার ওপর ফরয। তিনি সবকিছু দেখেন ও শোনেন। মানুষের কোন কাজ তাঁর দৃষ্টির আড়ালে থাকা তো দুরের কথা, যে উদ্দেশ্য ও নিয়তের ভিত্তিতে মানুষ কাজটি করে তাও তাঁর অগোচরে থাকে না। দ্বিতীয়ত রাসূলকে মানা। তাঁকে আল্লাহর নিযুক্ত পথপ্রদর্শক ও নেতৃত্বদানকারী হিসেবে মানা। তিনি যা কিছু শিক্ষা দিয়েছেন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দিয়েছেন, তা সবই সত্য এবং অবশ্যি গ্রহণযোগ্য বলে মেনে নেয়া। সাথে সাথে এটার স্বীকৃতি দেয়া যে, আল্লাহ্ তা'আলা যুগে যুগে অনেক রাসূল ও নবী পাঠিয়েছেন। কিন্তু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশেষ নবী ও রাসূল। তার পরে আর

وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝٣

করেছে[১] আর পরস্পরকে উপদেশ দিয়েছে হকের[২] এবং উপদেশ

কোন নবী বা রাসূল কেউ আসবে না। তৃতীয়ত ফেরেশতাদের উপর ঈমান। চতুর্থত আল্লাহর কিতাবসমমূহের উপর ঈমান, বিশেষ করে পবিত্র কুরআনের উপর ঈমান আনা ও কুরআনের নির্দেশ বাস্তবায়নে সদা সচেষ্ট থাকা। পঞ্চমত আখেরাতকে মানা। মানুষের এই বর্তমান জীবনটিই প্রথম ও শেষ নয়, বরং মৃত্যুর পর মানুষকে পুনরায় জীবিত হয়ে উঠতে হবে, নিজের এই দুনিয়ার জীবনে সে যা কিছু কাজ করেছে আল্লাহর সামনে তার জবাবদিহি করতে হবে এবং হিসেব-নিকেশে যেসব লোক সৎ গণ্য হবে তাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে এবং যারা অসৎ গণ্য হবে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে, এই অর্থে আখেরাতকে মেনে নেয়া। ষষ্ঠত তাকদীরের ভাল বা মন্দ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্ধারিত থাকার বিষয়টি মেনে নেয়া। মূলত ঈমানের এই ছয়টি অঙ্গ যে কোন লোকের নৈতিক চরিত্র ও তার জীবনের সমগ্র কর্মকাণ্ডের জন্য অতীব জরুরি। যেখানে ঈমানের অস্তিত্ব নেই সেখানে মানুষের জীবন যতই সৌন্দর্য বিভূষিত হোক না কেন তা আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। [বিস্তারিত দেখুন, ড.আবদুল আযীয আল-কারী; তাফসীর সূরাতিল আসর; ড. সুলাইমান আল-লাহিম, রিবহু আইয়ামিল উমর ফী তাদাব্বুরি সূরাতিল আসর]

(১) ঈমানের পরে মানুষকে ক্ষতি থেকে বাঁচাবার জন্য দ্বিতীয় যে গুণটি অপরিহার্য সেটি হচ্ছে সৎকাজ। কুরআনের পরিভাষায় একে বলা হয় আ'মাল সালেহা। সমস্ত সৎকাজ এর অন্তর্ভুক্ত। কোন ধরনের সৎকাজ ও সৎবৃত্তি এর বাইরে থাকে না। কিন্তু কুরআনের দৃষ্টিতে যে কাজের মূলে ঈমান নেই এবং যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল প্রদত্ত হেদায়াতের ভিত্তিতে সম্পাদিত হয়নি তা কখনো সৎকাজের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। তাই কুরআন মজীদের সর্বত্র সৎকাজের আগে ঈমানের কথা বলা হয়েছে এবং এই সূরায়ও ঈমানের পরেই এর কথা বলা হয়েছে।

(২) হক শব্দের কয়েকটি অর্থ বর্ণিত হয়েছে। ইবন আব্বাসের মতে, ঈমান ও তাওহীদ [বাগভী; কুরতুবী] কাতাদা বলেন, কুরআন। [কুরতুবী] সুদ্দী বলেন, এখানে হক্ক বলে আল্লাহকেই উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। [কুরতুবী] কোন কোন মুফাসসিরের মতে, এখানে হক বলে "শরী'আত নির্দেশিত কাজগুলো করা এবং শরী'আত নিষিদ্ধ কাজগুলো পরিত্যাগ করা বোঝানো হয়েছে। [ইবন কাসীর] কারও কারও মতে, হক বলে এমন কাজ বোঝানো হয়েছে যা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। আর তা হচ্ছে যাবতীয় কল্যাণমূলক কাজ। সেটা তাওহীদ, শরী'আতের আনুগত্য, আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ, দুনিয়াবিমুখ ও আখেরাতমুখী হওয়া সবই বোঝায়। [কাশশাফ] বস্তুত: হকের আদেশের প্রতি অসিয়ত করার বিষয়টি ওয়াজিব হক ও নফল হক উভয়টিকেই শামিল করে। [আত-তিবইয়ান ফী আকসামিল কুরআন ৮৩-৮৮] তাই সার্বিকভাবে আয়াতের অর্থ হচ্ছে: সঠিক, নির্ভুল, সত্য, ন্যায় ও ইনসাফ অনুসারী

দিয়েছে ধৈর্যের[১]।

এবং আকীদা ও ঈমান বা পার্থিব বিষয়াদির সাথে সম্পর্কিত প্রকৃত সত্য অনুসারী কথা বলতে হবে। আর এটা না করলে অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বরং আল্লাহর লা'নতে পতিত হবে। একথাটিই পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে, "দাউদ ও ঈসা ইবনে মারইয়ামের মুখ দিয়ে বনি ইসরাঈলদের ওপর লা'নত করা হয়েছে। কারণ এই যে, তাদের সমাজে গোনাহ ও যুলুম ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং লোকেরা পরস্পরকে খারাপ কাজে বাধা দেয়া থেকে বিরত থেকেছিল [সূরা আল-মায়িদাহ:৭৮-৭৯] আবার একথাটি অন্যত্র এভাবে বলা হয়েছে, "বনী ইসরাঈলরা যখন প্রকাশ্যে শনিবারের বিধান অমান্য করে মাছ ধরতে শুরু করে তখন তাদের ওপর আযাব নাযিল করা হয় এবং সেই আযাব থেকে একমাত্র তাদেরকেই বাঁচানো হয় যারা লোকদেরকে এই গোনাহর কাজে বাধা দেবার চেষ্টা করতো। [সূরা আল-আ'রাফ: ১৬৩-১৬৬] অন্য সূরায় আবার একথাটি এভাবে বলা হয়েছে, "সেই ফিতনাটি থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করো যার ক্ষতিকর প্রভাব বিশেষভাবে শুধুমাত্র সেসব লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না যারা তোমাদের মধ্যে গোনাহ করেছে। [সূরা আল-আনফাল:২৫] সুতরাং এ সূরায় মুসলিমদের প্রতি একটি বড় নির্দেশ এই যে, নিজেদের দ্বীনকে কুরআন ও সুন্নাহর অনুসারী করে নেয়া যতটুকু গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি, ততটুকুই জরুরি অন্য মুসলিমদেরকেও ঈমান ও সৎকর্মের প্রতি আহ্বান করার সাধ্যমতো চেষ্টা করা। এ কারণেই কুরআন ও হাদীসে প্রত্যেক মুসলিমের প্রতি সাধ্যমতো সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ ফরয বা দায়িত্ব ও কর্তব্য গণ্য করা হয়েছে। [দেখুন, সূরা আলে ইমরান: ১০৪] আর সেই উম্মতকে সর্বোত্তম উম্মাত বলা হয়েছে, যারা এই দায়িত্ব পালন করে। [দেখুন, সূরা আলে ইমরান ১১০]

(১) 'সবর' শব্দের আক্ষরিক অর্থ নিজেকে বাধা দেয়া ও অনুবর্তী করা। এখানে কয়েকটি অর্থ হতে পারে। এক. যাবতীয় গোনাহের কাজ থেকে বেঁচে থাকা। দুই. সৎকাজ করা এবং এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা। তিন. বিপদাপদে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা। [মাদারেজুস সালেকীন ২/১৫৬] সুতরাং সৎকর্ম সম্পাদন, গোনাহ থেকে আত্মরক্ষা এবং এতদসংক্রান্ত বিপদাপদ মোকাবেলা করা সবই 'সবর' এর শামিল। সুতরাং আয়াতের অর্থ হচ্ছে, হকের নসিহত করার সাথে সাথে দ্বিতীয় যে জিনিসটি ঈমানদারগণকে ও তাদের সমাজকে ক্ষতি থেকে বাঁচাবে তা হচ্ছে এই যে, এই সমাজের ব্যক্তিবর্গ পরস্পরকে সবর করার উপদেশ দিতে থাকবে। হককে সমর্থন করতে ও তার অনুসারী হতে গিয়ে যেসব সমস্যা ও বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয় এবং এপথে যেসব কষ্ট, পরিশ্রম, বিপদ-আপদ, ক্ষতি ও বঞ্চনা মানুষকে নিরন্তর পীড়িত করে তার মোকাবেলায় তারা পরস্পর অবিচল ও দৃঢ়পদ থাকার উপদেশ দিতে থাকবে। সবরের সাথে এসব কিছু বরদাশত করার জন্য তাদের প্রত্যেক ব্যক্তি অন্যকে সাহস যোগাতে থাকবে। [ড. কারী, তাফসীর সূরাতিল আসর পৃ. ৬২-৬৩]

১০৪- সূরা আল-হুমাযাহ্
৯ আয়াত, মক্কী

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পিছনে ও সামনে লোকের নিন্দা করে(১),

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝١

২. যে সম্পদ জমায় ও তা বার বার গণনা করে(২);

الَّذِيْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ ۝٢

---

(১) আয়াতে 'হুমাযাহ' ও 'লুমাযাহ' দু'টি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে همز এর অর্থ গীবত অর্থাৎ পশ্চাতে পরনিন্দা করা এবং لمز এর অর্থ সামনাসামনি দোষারোপ করা ও মন্দ বলা। এ দুটি কাজই জঘন্য গোনাহ। [আদওয়াউল বায়ান] তাফসীরকারগণ এ শব্দ দু'টির আরও অর্থ বর্ণনা করেছেন। তাদের বর্ণিত তাফসীর অনুসারে উভয় শব্দ মিলে এখানে যে অর্থ দাঁড়ায় তা হচ্ছে: সে কাউকে লাঞ্ছিত ও তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে। কারোর প্রতি তাচ্ছিল্য ভরে অংগুলি নির্দেশ করে। চোখের ইশারায় কাউকে ব্যঙ্গ করে কারো বংশের নিন্দা করে। কারো ব্যক্তি সত্তার বিরূপ সমালোচনা করে। কারো মুখের ওপর তার বিরুদ্ধে মন্তব্য করে। কারো পেছনে তার দোষ বলে বেড়ায়। কোথাও এর কথা ওর কানে লাগিয়ে বন্ধুদেরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়। কোথাও ভাইদের পারস্পরিক ঐক্যে ফাটল ধরায়। কোথাও লোকদের নাম বিকৃত করে খারাপ নামে অভিহিত করে। কোথাও কথার খোঁচায় কাউকে আহত করে এবং কাউকে দোষারোপ করে। এসব তার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। অথচ এসবই মারাত্মক গোনাহ। [পশ্চাতে পরনিন্দার শাস্তির কথা কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এর কারণ এরূপ হতে পারে যে, এ গোনাহে মশগুল হওয়ার পথে সামনে কোন বাধা থাকে না। যে এতে মশগুল হয়, সে কেবল এগিয়েই চলে। ফলে গোনাহ বৃহৎ থেকে বৃহত্তর ও অধিকতর হতে থাকে। সম্মুখের নিন্দা এরূপ নয়। এতে প্রতিপক্ষও বাধা দিতে প্রস্তুত থাকে। ফলে গোনাহ দীর্ঘ হয় না। এছাড়া কারও পশ্চাতে নিন্দা করা এ কারণেও বড় অন্যায় যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি জানতেও পারে না যে, তার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ উত্থাপন করা হচ্ছে। ফলে সে সাফাই পেশ করার সুযোগ পায় না। আবার একদিক দিয়ে لمز তথা সম্মুখের নিন্দা গুরুতর। যার মুখোমুখি নিন্দা করা হয়, তাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করা হয়। এর কষ্টও বেশি, ফলে শাস্তিও গুরুতর। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে নিকৃষ্টতম তারা, যারা পরোক্ষ নিন্দা করে, বন্ধুদের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে এবং নিরপরাধ লোকদের দোষ খুঁজে ফিরে।" [মুসনাদে আহমাদ: ৪/২২৭] [দেখুন, কুরতুবী]

(২) অর্থাৎ নিজের অগাধ ধনদৌলতের অহংকারে সে মানুষকে এভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে। যেসব বদভ্যাসের কারণে আয়াতে শাস্তির কথা উচ্চারণ করা হয়েছে,

৩. সে ধারণা করে যে, তার অর্থ তাকে অমর করে রাখবে(১); — يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗۤ اَخْلَدَهٗ ۝

৪. কখনও না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে(২) হুতামায়(৩); — كَلَّا لَيُنْۢبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۝

৫. আর আপনাকে কিসে জানাবে হুতামা কী? — وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ ۝

তন্মধ্যে এটি হচ্ছে তৃতীয়। যার মূল কথা হচ্ছে অর্থলিপ্সা। আয়াতে একে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে-- অর্থলিপ্সার কারণে সে তা বার বার গণনা করে। গুণে গুণে রাখা বাক্য থেকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কার্পণ্য ও অর্থ লালসার ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তবে অন্যান্য আয়াত ও হাদীস সাক্ষ্য দেয় যে, অর্থ সঞ্চয় করা সর্বাবস্থায় হারাম ও গোনাহ নয়। তাই এখানেও উদ্দেশ্য সেই সঞ্চয় হবে, যাতে জরুরি হক আদায় করা হয় না, কিংবা গর্ব ও অহমিকা লক্ষ্য হয় কিংবা লালসার কারণে দ্বীনের জরুরি কাজ বিঘ্নিত হয়। [আদওয়াউল বায়ান]

(১) এর অর্থ হচ্ছে এই যে, সে মনে করে তার অর্থ-সম্পদ তাকে চিরন্তন জীবন দান করবে। অর্থাৎ অর্থ জমা করার এবং তা গুণে রেখে দেবার কাজে সে এত বেশী মশগুল যে নিজের মৃত্যুর কথা তার মনে নেই। তার মনে কখনো এ চিন্তার উদয় হয় না যে, এক সময় তাকে এসব কিছু ছেড়ে দিয়ে খালি হাতে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হবে। তাছাড়া তাকে এ সম্পদের হিসাবও দিতে হবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কিয়ামতের দিন কোন বান্দার দু'পা সামনে অগ্রসর হতে পারবে না যতক্ষণ না তাকে নিম্নোক্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করা না হয়, তার জীবনকে কিসে নি:শেষ করেছে; তার জ্ঞান দ্বারা সে কী করেছে; তার সম্পদ কোত্থেকে আহরণ করেছে ও কিসে ব্যয় করেছে এবং তার শরীর কিসে খাটিয়েছে।' [তিরমিযী: ২৪১৭] [আত-তাফসীরুস সাহীহ]

(২) আরবী ভাষায় কোন জিনিসকে তুচ্ছ মনে করে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া অর্থে 'নবয' نبذ শব্দটি ব্যবহার করা হয়। [কুরতুবী, তাহরীর ওয়াত-তানওয়ীর] এ থেকে আপনা-আপনি এই ইংগিত সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, নিজের ধনশালী হওয়ার কারণে সে দুনিয়ায় নিজেকে অনেক বড় কিছু মনে করে। কিন্তু কিয়ামতের দিন তাকে ঘৃণাভরে জাহান্নামে ছুঁড়ে দেয়া হবে।

(৩) হুতামা শব্দটির মূল হচ্ছে, হাতম। হাতম মানে ভেঙ্গে ফেলা, পিষে ফেলা ও টুকরা করে ফেলা। জাহান্নামকে হাতম নামে অভিহিত করার কারণ হচ্ছে এই যে, তার মধ্যে যা কিছু ফেলে দেয়া হবে তাকে সে নিজের গভীরতা ও আগুনের কারণে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে রেখে দেবে। [কুরতুবী]

৬. এটা আল্লাহ্‌র প্রজ্বলিত আগুন[১], نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ۙ

৭. যা হৃদয়কে গ্রাস করবে[২]; الَّتِيْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ ۗ

৮. নিশ্চয় এটা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখবে[৩] اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ۙ

৯. দীর্ঘায়িত স্তম্ভসমূহে[৪] । فِيْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۠

---

(১) এখানে موقدة অর্থ অত্যন্ত লেলিহান শিখাযুক্ত প্রজ্বলিত আগুন। [মুয়াসসার] এখানে এই আগুনকে আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত করার মাধ্যমে কেবলমাত্র এর প্রচণ্ডতা ও ভয়াবহতা প্রকাশ পাচ্ছে।[রূহুল মা'আনী, ফাতহুল কাদীর]

(২) 'তাত্তালিউ' শব্দটির মূলে হচ্ছে ইত্তিলা। আর 'ইত্তিলা' শব্দটির অর্থ হচ্ছে চড়া, আরোহণ করা ও ওপরে পৌঁছে যাওয়া। [জালালাইন] 'আফইদাহ' শব্দটি হচ্ছে বহুবচন। এর একবচন হচ্ছে 'ফুওয়াদ'। এর মানে হৃদয়। অর্থাৎ জাহান্নামের এই আগুন হৃদয়কে পর্যন্ত গ্রাস করবে। হৃদয় পর্যন্ত এই আগুন পৌঁছাবার একটি অর্থ হচ্ছে এই যে, এই আগুন এমন জায়গায় পৌঁছে যাবে যেখানে মানুষের অসৎচিন্তা, ভুল আকীদা-বিশ্বাস, অপবিত্র ইচ্ছা, বাসনা, প্রবৃত্তি, আবেগ এবং দুষ্ট সংকল্প ও নিয়তের কেন্দ্র।[ফাতহুল কাদীর] এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর এই আগুন দুনিয়ার আগুনের মতো অন্ধ হবে না। সে দোষী ও নির্দোষ সবাইকে জ্বালিয়ে দেবে না। বরং প্রত্যেক অপরাধীর হৃদয় অভ্যন্তরে পৌঁছে সে তার অপরাধের প্রকৃতি নির্ধারণ করবে এবং প্রত্যেককে তার দোষ ও অপরাধ অনুযায়ী আযাব দেবে। এর তৃতীয় অর্থ হচ্ছে, দুনিয়ার আগুন মানুষের দেহে লাগলে হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছার আগেই মৃত্যু হয়ে যায়। জাহান্নামে মৃত্যু নেই। কাজেই জীবিত অবস্থাতেই হৃদয় পর্যন্ত অগ্নি পৌঁছবে এবং হৃদয়-দহনের তীব্র কষ্ট জীবদ্দশাতেই মানুষ অনুভব করবে।[কুরতুবী]

(৩) অর্থাৎ অপরাধীদেরকে জাহান্নামের মধ্যে নিক্ষেপ করে ওপর থেকে তা বন্ধ করে দেয়া হবে। কোন দরজা তো দুরের কথা তার কোন একটি ছিদ্রও খোলা থাকবে না।[ইবন কাসীর]

(৪) ফি আমাদিম মুমাদ্দাদাহ এর একাধিক অর্থ হতে পারে। যেমন এর একটি অর্থ হচ্ছে, জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দিয়ে তার ওপর উঁচু উঁচু থাম গেঁড়ে দেয়া হবে। এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, এই অপরাধীরা উঁচু উঁচু থামের গায়ে বাঁধা থাকবে। এর তৃতীয় অর্থ হল এরূপ স্তম্ভসমূহ বা থাম দিয়ে জাহান্নামীদের শাস্তি প্রদান করা হবে। এ-শাস্তি সম্পর্কে বিস্তারিত কোন কথা আল্লাহ জানাননি। এ মতটি ইমাম তাবারী গ্রহণ করেছেন।[তাবারী, ইবন কাসীর]

১০৫- সূরা আল-ফীল[1]
৫ আয়াত, মক্কী

بِسْــــــــمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ۝١

১. আপনি কি দেখেন নি[2] আপনার রব হাতির অধিপতিদের প্রতি কী করেছিলেন?

اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ ۝٢

২. তিনি কি তাদের কৌশল ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে দেননি?

---

(১) এ সূরায় হস্তীবাহিনীর ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। তারা কাবা গৃহকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে হস্তীবাহিনী নিয়ে মক্কায় অভিযান পরিচালনা করেছিল। আল্লাহ তা'আলা নগণ্য পক্ষীকুলের মাধ্যমে তাদের বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে তাদের কুমতলবকে ধূলায় মিশিয়ে দেন। মক্কা মুকাররমায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মের বছর হস্তীবাহিনীর ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। হাদীসবিদগণ এ ঘটনাকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এক প্রকার নবুওয়াতের ভুমিকাস্বরূপ সাব্যস্ত করেছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুওয়ত এমনকি জন্মেরও পূর্বে এ ধরনের আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল। হস্তী-বাহিনীকে আসমানী আযাব দ্বারা প্রতিহত করাও এসবের অন্যতম।

(২) এখানে ألم تر 'আপনি কি দেখেননি' বলা হয়েছে। বাহ্যত এর দ্বারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে, অথচ এটা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্মের কিছুদিন পূর্বেকার ঘটনা। কোন কোন মুফাসসির এর সমাধানে বলেন, এখানে শুধু কুরাইশদেরকেই নয় বরং সমগ্র আরববাসীকেই সম্বোধন করা হয়েছে। তারা এই সমগ্র ঘটনা সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত ছিল। কুরআন মজিদের বহু স্থানে 'আলাম তারা' বা আপনি কি দেখেননি? শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নয় বরং সাধারণ লোকদেরকে সম্বোধন করাই উদ্দেশ্য। [কুরতুবী] অপর কোন কোন তাফসিরবিদ বলেন, যে ঘটনা এরূপ নিশ্চিত যে, তা ব্যাপকভাবে প্রত্যক্ষ করা হয়, সে ঘটনার জ্ঞানকেও দেখা বলে ব্যক্ত করা হয়; যেন এটা চাক্ষুষ ঘটনা। তাছাড়া, এক পর্যায়ে দেখাও প্রমাণিত আছে; যেমন কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, আয়েশা ও আসমা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা দুজন হস্তীচালককে অন্ধ, বিকলাঙ্গ ও ভিক্ষুকরূপে দেখেছিলেন। [বাইহাকী: দালায়েলুন নাবুওয়াহ, ১/৫২] [আত-তাহরীর ওয়াত-তানওয়ীর]

৩. আর[১] তাদের বিরুদ্ধে তিনি ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি পাঠান[২]

وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ۙ﴿٣﴾

৪. যারা তাদের উপর শক্ত পোড়ামাটির কঙ্কর নিক্ষেপ করে[৩] ।

تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ۙ﴿٤﴾

৫. অতঃপর তিনি তাদেরকে ভক্ষিত তৃণ-সদৃশ করেন[৪] ।

فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُوْلٍ ࣖ﴿٥﴾

---

(১) যদি আয়াতটিকে পূর্বের আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট ধরা হয়, তখন এ আয়াতটির অর্থ হয়, 'তিনি কি তাদের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি পাঠান নি?' পক্ষান্তরে যদি আয়াতটিকে প্রথম আয়াতটির সাথে সম্পৃক্ত করা হয়, তখন এর অর্থ হবে, 'আপনি কি দেখেন নি, তিনি তাঁদের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি পাঠিয়েছিলেন?' [আত-তাহরীর ওয়াত-তানওয়ীর]

(২) أبابيل শব্দের অনুবাদ করা হয়েছে, ঝাঁকে ঝাঁকে, যা একটার পর একটা আসে। কারও কারও মতে, শব্দটি বহুবচন। অর্থ পাখির ঝাঁক-কোন বিশেষ প্রাণীর নাম নয়। [তাবারী] বলা হয়ে থাকে যে, এ জাতীয় পাখি পূর্বে কখনও দেখা যায়নি। [কুরতুবী]

(৩) উপরে سجيل এর অর্থ করা হয়েছে, পোঁড়া মাটির কঙ্কর। [মুয়াসসার] কারও কারও মতে, ভেজা মাটি আগুনে পুড়ে শক্ত হয়ে যে কংকর তৈরি হয়, সে কংকরকে سجيل বলা হয়ে থাকে। [জালালাইন] আবার কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ অতি শক্ত পাথরের কঙ্কর। [আদওয়াউল বায়ান]

(৪) عصف এর অর্থ শুষ্ক তৃণ-লতা, শুকনো খড়কুটো। কঙ্কর নিক্ষিপ্ত হওয়ার ফলে আবরাহার সেনাবাহিনীর অবস্থা শুষ্ক তৃণ ভক্ষিত হওয়ার পর যা হয়, তদ্রূপই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। [তাবারী, ইবন কাসীর]

১০৬- সূরা কুরাইশ[১]
৪ আয়াত, মক্কী

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ①

১. কুরাইশে[২]র আসক্তির কারণে[৩],

---

(১) এ ব্যাপারে অধিকাংশ তাফসীরকারক বলেছেন যে, অর্থ ও বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে এই সূরা সূরা-ফীলের সাথেই সম্পৃক্ত। সম্ভবত এ কারণেই কোন কোন মাসহাফে দুটিকে একই সূরারূপে লেখা হয়েছিল। কিন্তু উসমান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু যখন তাঁর খেলাফতকালে কুরআনের সব মাসহাফ একত্রিত করে একটি কপিতে সংযোজিত করান এবং সাহাবায়ে-কেরামের তাতে ইজমা হয়, তখন তাতে এ দুটি সূরাকে স্বতন্ত্র দুটি সূরারূপে সন্নিবেশিত করা হয়। উসমান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর তৈরি এ কপিকে 'ইমাম' বলা হয়। [কুরতুবী]

(২) কুরাইশ একটি গোত্রের নাম। নদর ইবন কিনানার সন্তানদেরকে কুরাইশ বলা হয়। যারাই নদর ইবন কিনানাহ এর বংশধর তারাই কুরাইশ নামে অভিহিত। কারও কারও মতে, ফিহ্‌র ইবন মালিক ইবন নাদর ইবন কিনানাহ এর বংশধরদেরকে কুরাইশ বলা হয়। তবে প্রথম মতটি বেশী শুদ্ধ। [কুরতুবী] হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ তা'আলা ইসমাঈলের বংশধর থেকে কিনানাহকে, কিনানাহর বংশধর থেকে কুরাইশকে, কুরাইশ তেকে বনী হাশেমকে, বনী হাশেম থেকে আমাকে পছন্দ করেছেন।" [মুসলিম: ২২৭৬]
কুরাইশকে কুরাইশ নামকরণ করার কারণ কারও কারও মতে, কুরাইশ শব্দটি تقريش থেকে উদ্ভুত। যার অর্থ কামাই-রোযগার করা। তারা যেহেতু ব্যবসা করে কামাই-রোযগার করে জীবিকা নির্বাহ করত, তাই তাদের এ নাম হয়েছে। কারও কারও মতে, এর অর্থ জমায়েত করা বা একত্রিত করা। কারণ, তারা বিভিন্ন দিকে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল, সর্বপ্রথম কুসাই ইবন কিলাব তাদেরকে হারামের চারপাশে জড়ো করেন, ফলে তাদেরকে কুরাইশ বলা হয়েছে। কারও কারও মতে, তা এসেছে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা থেকে। কারণ, তারা হাজীদেরকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করত। কোন কোন মতে, সাগরের এক বড় মাছের নামকরণে তাদের নাম হয়েছে। যে মাছ অন্য মাছের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে। তেমনিভাবে কুরাইশ অন্য সব গোত্রের উপর প্রাধান্য পেয়ে থাকে। [কুরতুবী]

(৩) মূল শব্দ হচ্ছে إيلاف। এ শব্দটির দু'টি অর্থ করা হয়ে থাকে। এক. শব্দটি تأليف থেকে এসেছে। তখন অর্থ হবে, মিল-মহব্বত থাকা, একত্রিত থাকা। অর্থাৎ কুরাইশদেরকে একত্রিত রাখা, বিচ্ছেদের পর মিলিত হওয়া এবং তাদের সাথে মানুষের সম্পর্ক ঠিক রাখা। দুই. শব্দটি এসেছে ইলফ শব্দ থেকে। এর অর্থ হয় অভ্যস্ত হওয়া, পরিচিত হওয়া এবং কোন জিনিসের অভ্যাস গড়ে তোলা। [আদওয়াউল বায়ান] উভয় প্রকার

অর্থই এখানে হতে পারে। উপরে অর্থ করা হয়েছে, আসক্তি ও অভ্যস্ত হওয়া। বলা হয়েছে, কুরাইশদের আসক্তির কারণে। কিন্তু আসক্তির কারণে কি হয়েছে? এ কথা উহ্য আছে। কেউ কেউ বলেন যে, এখানে উহ্য বাক্য হচ্ছে, আমি হস্তীবাহিনীকে এজন্যে ধ্বংস করেছি কিংবা আমি তাদেরকে ভক্ষিত তৃণের সদৃশ এজন্যে করেছি, যাতে কোরাইশদের শীত ও গ্রীষ্মকালীন দুই সফরের পথে কোন বাধাবিপত্তি না থাকে এবং সবার অন্তরে তাদের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। [তাবারী, ফাতহুল কাদীর] কেউ কেউ বলেছেন যে, এখানে উহ্য বাক্য হচ্ছে اعجبوا অর্থাৎ তোমরা কোরাইশদের ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ কর, তারা কিভাবে শীত ও গ্রীষ্মের সফর নিরাপদে নির্বিবাদে করে, তবুও তারা এ ঘরের রবের ইবাদত করে না! এ মতটি ইমাম তাবারী গ্রহন করেছেন। [তাবারী, মুয়াসসার] কেউ কেউ বলেন, এর সম্পর্ক পরবর্তী বাক্য فَلْيَعْبُدُوْا এর সাথে। অর্থাৎ এই নেয়ামতের কারণে কোরাইশদের কৃতজ্ঞ হওয়া ও আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে আত্মনিয়োগ করা উচিত। [ফাতহুল কাদীর, কাশশাফ] কারও কারও মতে, আয়াতের উদ্দেশ্য, এমনিতেই তো কুরাইশদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামত সীমা-সংখ্যাহীন, কিন্তু অন্য কোন নিয়ামতের ভিত্তিতে না হলেও আল্লাহর অনুগ্রহের কারণে তারা এই বাণিজ্য সফরে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে, অন্তত এই একটি নিয়ামতের কারণে তাদের আল্লাহর বন্দেগী করা উটিত। কারণ এটা মূলত তাদের প্রতি একটা বিরাট অনুগ্রহ। [কুরতুবী, আদওয়াউল বায়ান]

সারকথা, এই সূরার বক্তব্য এই যে, কোরাইশরা যেহেতু শীতকালে ইয়ামেনের ও গ্রীষ্মকালে সিরিয়ার সফরে অভ্যস্ত ছিল এবং এ দুটি সফরের ওপরই তাদের জীবিকা নির্ভরশীল ছিল এবং তারা ঐশ্বর্যশালীরূপে পরিচিত ছিল, তাই আল্লাহ তা'আলা তাদের শত্রু হস্তীবাহিনীকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ে মানুষের অন্তরে তাদের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন। তারা যেকোন দেশে গমন করে, সকলেই তাদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। সুতরাং তাদের উচিত এ ঘর 'কাবার' রবের ইবাদত করা। [ইবন কাসীর; সা'দী]

এ কথা সুবিদিত যে, মক্কা শহর যে স্থলে অবস্থিত সেখানে কোন চাষাবাদ হয় না, বাগবাগিচাও নেই; যা থেকে ফলমূল পাওয়া যেতে পারে। তাই বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে সফর ও বিদেশ থেকে প্রয়োজনীয় জীবনোপকরণ সংগ্রহ করার ওপরই মক্কাবাসীদের জীবিকা নির্ভরশীল ছিল। মূলতঃ মক্কাবাসীরা খুব দারিদ্র্য ও কষ্টে দিনাতিপাত করত। [জালালাইন] অবশেষে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রপিতামহ হাশেম কোরাইশকে ভিনদেশে গিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে উদ্বুদ্ধ করেন। [কুরতুবী] সিরিয়া ছিল ঠাণ্ডা দেশ। তাই গ্রীষ্মকালে তারা সিরিয়া সফর করত। পক্ষান্তরে ইয়ামেন গরম দেশ ছিল বিধায় তারা শীতকালে সেখানে বাণিজ্যিক সফর করত এবং মুনাফা অর্জন করত। বায়তুল্লাহর খাদেম হওয়ার কারণে সমগ্র আরবে তারা ছিল সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র। ফলে পথের বিপদাপদ থেকে তারা সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিল। [ফাতহুল কাদীর] আলোচ্য সূরাতে আল্লাহ

২. তাদের আসক্তি আছে শীত ও গ্রীষ্মে সফরের[১]

إِۦلَٰفِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ ﴿٢﴾

৩. অতএব, তারা ‘ইবাদাত করুক এ ঘরের রবের[২],

فَلْيَعْبُدُوا۟ رَبَّ هَٰذَا ٱلْبَيْتِ ﴿٣﴾

৪. যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় খাদ্য দিয়েছেন[৩]

ٱلَّذِىٓ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍۭ ﴿٤﴾

তা‘আলা মক্কাবাসীদের প্রতি তাঁর এসব অনুগ্রহ ও নেয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করে তাদেরকে ঈমান ও তাওহীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন ।

(১) শীত ও গ্রীষ্মের সফরের অর্থ হচ্ছে গ্রীষ্মকালে কুরাইশরা সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের দিকে বাণিজ্য সফর করতো । কারণ এ দু’টি শীত প্রধান দেশ । আর শীতকালে সফর করতো দক্ষিণ আরব তথা ইয়েমেনের দিকে । কারণ সেটি গ্রীষ্ম প্রধান এলাকা । [কুরতুবী; সা‘দী]

(২) ‘এ ঘর’ অর্থ কা‘বা শরীফ । বলা হয়েছে, এ ঘরের রব -এর ইবাদত কর । এখানে ঘরটিকে আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কযুক্ত করার মাধ্যমে ঘরকে সম্মানিত করাই উদ্দেশ্য । [সা’দী] আর এই গৃহই যেহেতু তাদের সব শ্রেষ্ঠত্ব ও কল্যাণের উৎস ছিল, তাই বিশেষভাবে এই গৃহের মৌলিক গুণটি উল্লেখ করা হয়েছে । আর তা হচ্ছে, এটি মহান রবের ঘর । অর্থাৎ এ ঘরের বদৌলতেই কুরাইশরা এই নিয়ামতের অধিকারী হয়েছে । একমাত্র আল্লাহই যার রব । তিনিই আসহাবে ফীলের আক্রমণ থেকে তাদেরকে বাঁচিয়েছেন । আবরাহার সেনাবাহিনীর মোকাবিলায় সাহায্য করার জন্য তাঁর কাছেই তারা আবেদন জানিয়েছিল । তাঁর ঘরের আশ্রয় লাভ করার আগে যখন তারা আরবের চারদিকে ছড়িয়ে ছিল তখন তাদের কোন মর্যাদাই ছিল না । আরবের অন্যান্য গোত্রের ন্যায় তারাও একটি বংশধারার বিক্ষিপ্ত দল ছিল মাত্র । কিন্তু মক্কায় এই ঘরের চারদিকে একত্র হবার এবং এর সেবকের দায়িত্ব পালন করতে থাকার পর সমগ্র আরবে তারা মর্যাদাশালী হয়ে উঠেছে । সবদিকে তাদের বাণিজ্য কাফেলা নির্ভয়ে যাওয়া আসা করছে । তারা যা কিছুই লাভ করেছে এ ঘরের রবের বদৌলতেই লাভ করেছে । কাজেই তাদের একমাত্র সেই রবেরই ইবাদত করা উচিত । [দেখুন: মুয়াসসার, কুরতুবী]

(৩) মক্কায় আসার পুর্বে কুরাইশরা যখন আরবের চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল তখন তারা অনাহারে মরতে বসেছিল । এখানে আসার পর তাদের জন্য রিযিকের দরজাগুলো খুলে যেতে থাকে । তাদের সপক্ষে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এই বলে দোয়া করেছিলেন ‘হে আল্লাহ! আমি তোমার মর্যাদাশালী ঘরের কাছে একটি পানি ও শস্যহীন উপত্যকায় আমার সন্তানদের একটি অংশের বসতি স্থাপন করিয়েছি, যাতে তারা সালাত কায়েম করতে পারে । কাজেই আপনি লোকদের হৃদয়কে তাদের অনুরাগী করে দিন, তাদের খাবার জন্য ফলমূল দান করুন ।” [সূরা ইবরাহীম ৩৭] তার এই দো‘আ অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয় । [তাবারী, আদওয়াউল বায়ান]

এবং ভীতি থেকে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন[১] ।

(১) অর্থাৎ যে ভীতি থেকে আরব দেশে কেউ নিরাপদ নয়, তা থেকে তারা নিরাপদ রয়েছে। সে যুগে আরবের অবস্থা এমন ছিল যে, সারা দেশে এমন কোন জনপদ ছিল না যেখানে লোকেরা রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারতো। কারণ সবসময় তারা আশংকা করতো, এই বুঝি কোন লুটেরা দল রাতের অন্ধকারে হঠাৎ তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং তাদের সবকিছু লুট করে নিয়ে গেলো। কিন্তু কুরাইশরা মক্কায় সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিল। তাদের নিজেদের ওপর কোন শত্রুর আক্রমণের ভয় ছিল না। তাদের ছোট বড় সব রকমের কাফেলা দেশের প্রত্যেক এলাকায় যাওয়া আসা করতো। হারাম শরীফের খাদেমদের কাফেলা, একথা জানার পর কেউ তাদের ওপর আক্রমণ করার সাহস করতো না। [কুরতুবী, তাবারী]

এখানে লক্ষণীয় যে, সুখী জীবনের জন্যে যা যা দরকার তা সমস্তই এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা কোরাইশকে এগুলো দান করেছিলেন। ﴿أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ﴾ বলে পানাহারের যাবতীয় সাজসরঞ্জাম বোঝানো হয়েছে এবং ﴿وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ﴾ বাক্যে দস্যু ও শত্রুদের থেকে এবং যাবতীয় ভয়-ভীতি থেকে নিরাপত্তা বোঝানো হয়েছে। [তাবারী, আদওয়াউল বায়ান] এভাবে তাদের কাছে জিনিসপত্র সহজলভ্য হওয়া ও নিরাপত্তা বিস্তৃত থাকা একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়েছে। সুতরাং শুধু তাঁরই ইবাদত করা দরকার। তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করা উচিত। তাঁর জন্য কোন অংশীদার, শির্ক ইত্যাদি সাব্যস্ত করা থেকে দুরে থাকা কর্তব্য। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা যারাই একমাত্র তাঁর ইবাদত করেছে শির্ক থেকে দুরে থেকে তাঁর দেয়া নে'আমতের শুকরিয়া আদায় করেছে তাদের জন্য নিরাপত্তা ও পানাহার এ দুটি বিষয়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন কিন্তু যখনই তারা আল্লাহর সাথে শির্ক করেছে তখনই তা উঠিয়ে নিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, "আর আল্লাহ্ দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন এক জনপদের যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত, যেখানে আসত সবদিক থেকে তার প্রচুর জীবনোপকরণ। তারপর সে আল্লাহ্র অনুগ্রহ অস্বীকার করল,ফলে তারা যা করত সে জন্য আল্লাহ্ সেটাকে আস্বাদ গ্রহণ করালেন ক্ষুধা ও ভীতির আচ্ছাদনের।" [সূরা আন-নাহল:১১২] [ইবন কাসীর]

১০৭- সূরা আল-মা'উন[১]
৭ আয়াত, মক্কী

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আপনি কি দেখেছেন[২] তাকে, যে দ্বীনকে[৩] অস্বীকার করে?

اَرَءَيْتَ الَّذِيْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ①

২. সে তো সে-ই, যে ইয়াতীমকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয়[৪]

فَذٰلِكَ الَّذِيْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ②

৩. আর সে উদ্বুদ্ধ করে না[৫] মিসকীনদের

وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ③

---

(১) এ সূরায় বেশ কয়েকটি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। এতিম ও মিসকিনদেরকে খাদ্য দানে উৎসাহিত করা হয়েছে; সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে গুরুত্ব ও মনোযোগ দিতে বলা হয়েছে; ইখলাসের সাথে সালাত ও অন্যান্য ইবাদত পালনের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে; ছোট-খাটো জিনিস ধার দেয়ার মাধ্যমে মানুষের উপকার করার কথা বলা হয়েছে। কেননা, যারা এগুলো করে না, এ-সূরায় তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা তিরস্কৃত করেছেন। [সাদী]

(২) এখানে বাহ্যত সম্বোধন করা হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে। কিন্তু কুরআনে বর্ণনাভঙ্গী অনুযায়ী দেখা যায়, এসব ক্ষেত্রে সাধারণত প্রত্যেক জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচার-বিবেচনা সম্পন্ন লোকদেরকেই এ সম্বোধন করা হয়ে থাকে। আর দেখা মানে চোখ দিয়ে দেখাও হয়। কারণ সামনে দিকে লোকদের যে অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে তা প্রত্যেক প্রত্যক্ষকারী স্বচক্ষে দেখে নিতে পারে। আবার এর মানে জানা, বুঝা ও চিন্তা-ভাবনা করাও হতে পারে। [ফাতহুল কাদীর]

(৩) এ আয়াতে "আদ-দীন" শব্দটির অর্থ আখেরাতে কর্মফল দান এবং বিচার। অধিকাংশ মুফাসসিররা এমতটিই গ্রহণ করেছেন। [ইবন কাসীর, কুরতুবী, মুয়াসসার]

(৪) এখানে يدعُّ বলা হয়েছে। এর অর্থ, রূঢ়ভাবে তাড়ানো, কঠোরভাবে দূর করে দেয়া। এতিমদের প্রতি অসদাচরণ করা, তাদের প্রতি দয়া না করে কঠোরভাবে ধিক্কার ও যুলুম করা, তাদেরকে খাদ্য দান না করা এবং তাদের হক আদায় না করাই এখানে উদ্দেশ্য। [মুয়াসসার, ইবন কাসীর, তাবারী] জাহিলিয়াতের যুগে এতিম ও নারীদের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হত আর বলা হত, যারা তীর-বর্শা নিক্ষেপ করে এবং তরবারী দিয়ে যুদ্ধ করে তারাই শুধু সম্পত্তি পাবে। কিন্তু পরবর্তীতে ইসলাম এ ধরনের প্রথা বাতিল করে দিয়েছে। [কুরতুবী]

(৫) لا يحضُّ শব্দের মানে হচ্ছে, সে নিজেকে উদ্বুদ্ধ করে না, নিজের পরিবারের লোকদেরকেও মিসকিনের খাবার দিতে উদ্বুদ্ধ করে না এবং অন্যদেরকেও এ ব্যাপারে উৎসাহিত

খাদ্য দানে ।

৪. কাজেই দুর্ভোগ সে সালাত আদায়কারীদের, — فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ﴿٤﴾

৫. যারা তাদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন, — الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ﴿٥﴾

৬. যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে[১], — الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ﴿٦﴾

৭. এবং মা'উন[২] প্রদান করতে বিরত থাকে । — وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ﴿٧﴾

করে না যে, সমাজে যেসব গরীব ও অভাবী লোক অনাহারে মারা যাচ্ছে তাদের হক আদায় করো এবং তাদের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য কিছু করো । কারণ তারা কৃপণ এবং আখেরাতে অবিশ্বাসী । [ফাতহুল কাদীর]

(১) এটা মুনাফিকদের অবস্থা । তারা লোক দেখানোর জন্যে এবং মুসলিম হওয়ার দাবী সপ্রমাণ করার জন্য সালাত পড়ে । কিন্তু সালাত যে ফরয, এ বিষয়ে তারা বিশ্বাসী নয় । ফলে সময়ের প্রতিও লক্ষ্য রাখে না এবং আসল সালাতেরও খেয়াল রাখে না । লোক দেখানোর জায়গা হলে পড়ে, নতুবা ছেড়ে দেয় । আর সালাত আদায় করলেও এর ওয়াজিবসমূহ, শর্ত ইত্যাদি পূর্ণ করে না । আসল সালাতের প্রতিই ভ্রুক্ষেপ না করা মুনাফিকদের অভ্যাস এবং ساهون শব্দের আসল অর্থ তাই । সালাতের মধ্যে কিছু ভুল-ভ্রান্তি হয়ে যাওয়ার কথা এখানে বোঝানো হয়নি । কেননা, এজন্যে জাহান্নামের শাস্তি হতে পারে না । এটা উদ্দেশ্য হলে ﴿عَنْ صَلَاتِهِمْ﴾ এর পরিবর্তে ﴿فِيْ صَلَاتِهِمْ﴾ বলা হত । সহীহ হাদীসসমূহে প্রমাণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবনেও একাধিকবার সালাতের মধ্যে ভুলচুক হয়ে গিয়েছিল । [কুরতুবী, ইবন কাসীর]

(২) ماعون শব্দের অর্থ অধিকাংশ মুফাসসিরদের নিকট যৎকিঞ্চিৎ ও সামান্য উপকারী বস্তু । মূলত: মাউন ছোট ও সামান্য পরিমাণ জিনিসকে বলা হয় । এমন ধরনের জিনিস যা লোকদের কোন কাজে লাগে বা এর থেকে তারা ফায়দা অর্জন করতে পারে । অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে, সাধারণত প্রতিবেশীরা একজন আর একজনের কাছ থেকে দৈনন্দিন যেসব জিনিস চেয়ে নিয়ে থাকে, যেগুলোর পারস্পরিক লেন-দেন সাধারণ মানবতারূপে গণ্য হয়; যথা কুড়াল, কোদাল অথবা রান্না-বান্নার পাত্র এ সবই মাউনের অন্তরভুক্ত । প্রয়োজনে এসব জিনিস প্রতিবেশীর কাছ থেকে চেয়ে নেয়া দোষণীয় মনে করা হয় না । কেউ এগুলো দিতে অস্বীকৃত হলে তাকে বড় কৃপণ ও নীচ মনে করা হয় । আবার কারও কারও মতে আলোচ্য আয়াতে ماعون বলে

যাকাত বোঝানো হয়েছে। যাকাতকে ماعون বলার কারণ সম্ভবত এই যে, যাকাত পরিমাণে আসল অর্থের তুলনায় খুবই কম -অর্থাৎ চল্লিশ ভাগের এক ভাগ-হয়ে থাকে। ব্যবহার্য জিনিসপত্র অপরকে দেয়া খুব সওয়াবের কাজ এবং মানবতার দিক দিয়ে জরুরি। কোন কোন হাদীসে ماعون এর তাফসীর ব্যবহার্য জিনিস, যেমন: বালতি, পাত্র ইত্যাদি করা হয়েছে। [আবু দাউদ: ১৬৫৭] [আদওয়াউল বায়ান, মুয়াসসার, ফাতহুল কাদীর]

১০৮- সূরা আল-কাউছার[১]
৩ আয়াত, মক্কী

سُورَةُ الكَوْثَرِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

১. নিশ্চয় আমরা আপনাকে কাউছার[২]

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ①

(১) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, 'কাউসার' সেই অজস্র কল্যাণ যা আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দান করেছেন। ইকরিমা বলেন, এটা নবুওয়ত, কুরআন ও আখেরাতের সওয়াব। অনুরূপভাবে, কাউসার জান্নাতের একটি প্রস্রবনের নাম। এ তাফসীরসমূহে কোন বিরোধ নেই; কারণ, কাউসার নামক প্রস্রবনটি অজস্র কল্যাণের একটি। আসলে কাউসার শব্দটি এখানে যেভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তাতে এক শব্দে এর পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এ শব্দটি মূলে কাসরাত كثرة থেকে বিপুল ও অত্যধিক পরিমাণ বুঝাবার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, সীমাহীন আধিক্য। কিন্তু যে অবস্থায় ও পরিবেশে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তাতে শুধুমাত্র আধিক্য নয় বরং কল্যাণ ও নিয়ামতের আধিক্য এবং এমন ধরনের আধিক্যের ধারণা পাওয়া যায় যা বাহুল্য ও প্রাচুর্যের সীমান্তে পৌঁছে গেছে। আর এর অর্থ কোন একটি কল্যাণ বা নিয়ামত নয় বরং অসংখ্য কল্যাণ ও নিয়ামতের আধিক্য, যার মধ্যে একটি হল জান্নাতের প্রস্রবন। [ইবন কাসীর]

(২) বিভিন্ন হাদীসে কাউসার ঝর্ণাধারার কথা বর্ণিত হয়েছে। আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে আমাদের সামনে উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎ তার মধ্যে তন্দ্রা অথবা এক প্রকার অচেতনতার ভাব দেখা দিল। অতঃপর তিনি হাসিমুখে মাথা উঠালেন। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আপনার হাসির কারণ কি? তিনি বললেন, এই মুহূর্তে আমার নিকট একটি সূরা নাযিল হয়েছে। অতঃপর তিনি বিসমিল্লাহ সহ সূরা আল-কাউসার পাঠ করলেন এবং বললেন, তোমরা জান, কাউসার কি? আমরা বললাম, আল্লাহ্ তা'আলা ও তার রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন, এটা জান্নাতের একটি নহর। আমার রব আমাকে এটা দেবেন বলে ওয়াদা করেছেন। এতে অজস্র কল্যাণ আছে এবং এই হাউযে কেয়ামতের দিন আমার উম্মত পানি পান করতে যাবে। এর পানি পান করার পাত্র সংখ্যা আকাশের তারকাসম হবে। তখন কতক লোককে ফেরেশতাগণ হাউয থেকে হটিয়ে দিবে। আমি বলব, হে রব! সে তো আমার উম্মত। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, আপনি জানেন না, আপনার পরে তারা নতুন মত ও পথ অবলম্বন করেছিল।" [মুসলিম:৪০০, মুসনাদে আহমাদ:৩/১০২] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "ইসরা ও মিরাজের রাত্রিতে আমাকে এক প্রস্রবনের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো যার দু'তীর ছিল মুক্তার খালি গম্বুজে

পরিপূর্ণ, আমি বললাম, জিবরাঈল এটা কি? তিনি বললেন, এটাই কাউসার” [বুখারী: ৪৯৬৪] অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “আমাকে কাউসার দান করা হয়েছে, সেটা হচ্ছে, প্রবাহিত একটি নহর। যা কোন খোদাই করা বা ফাটিয়ে বের করা হয়নি। আর তার দুই তীর মুক্তার খালি গম্বুজ। আমি তার মাটিতে আমার দু'হাত মারলাম, দেখলাম তা সুগন্ধি মিস্‌ক আর তার পাথরকুচি মুক্তোর।” [মুসনাদে আহমাদ: ৩/১৫২] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন, “কাউসার হচ্ছে এমন একটি নহর যা আল্লাহ্ আমাকে জান্নাতে দান করেছেন, তার মাটি মিসকের, দুধের চেয়েও সাদা, মধুর চেয়েও সুমিষ্ট, এতে এমন এমন পাখি নামবে যেগুলোর ঘাড় উটের ঘাড়ের মত। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এগুলো তো খুব সুস্বাদু নিশ্চয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যারা এগুলো খাবে তারা আরও কোমল মানুষ”। [তাবারী: ৩৮১৭৪, মুসনাদে আহমাদ: ৩/২২১, তবে মুসনাদে আহমাদে আবুবকরের পরিবর্তে উমরের কথা এসেছে। অন্য বর্ণনায় এসেছে, “তার পেয়ালাগুলোর সংখ্যা আকাশের তারকাদের সংখ্যার অনুরূপ”। [বুখারী: ৪৯৬৫] মোটকথা: হাউযের অস্তিত্ব ও বাস্তবতা অনেক সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। কোন কোন অভিজ্ঞ আলেম উল্লেখ করেছেন যে, এ হাদীসগুলো মুতাওয়াতির। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে ত্রিশ জনের বেশী সাহাবী এ সমস্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

তবে এখানে এটা জানা আবশ্যক যে, কাউসার ও হাউয একই বস্তু নয়। হাউযের অবস্থান হাশরের মাঠে, যার পানি কাউসার থেকে সরবরাহ করা হবে। আর কাউসারের অবস্থান হলো জান্নাতে। হাশরের ময়দানের হাউয সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জান্নাতের কাউসার ঝর্ণাধারা থেকে পানি এনে হাউযে ঢালা হবে। এক হাদীসে বলা হয়েছে, “জান্নাত থেকে দু'টি খাল কেটে এনে তাতে ফেলা হবে এবং এর সাহায্যে সেখান থেকে তাতে পানি সরবরাহ হবে।” [মুসলিম:২৩০০, মুসনাদে আহমাদ: ৪/৪২৪, ৫/১৫৯,২৮০,২৮১,২৮২,২৮৩] সুতরাং হাউয হলো এমন এক বিরাট পানির ধারা যা আল্লাহ আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হাশরের মাঠে দান করেছেন। যা দুধের চেয়েও শুভ্র, বরফের চেয়েও ঠাণ্ডা, মধুর চেয়েও মিষ্টি, মিসকের চেয়েও অধিক সুঘ্রাণ সম্পন্ন। যা অনেক প্রশস্ত, দৈর্ঘ ও প্রস্থে সমান, তার কোণ সমূহের প্রত্যেক কোণ এক মাসের রাস্তা, তার পানির মূল উৎস হলো জান্নাত। জান্নাত থেকে এমন দু'টি নলের মাধ্যমে তার সরবরাহ কাজ সমাধা হয়ে থাকে যার একটি স্বর্ণের অপরটি রৌপ্যের। তার পেয়ালা সমূহের সংখ্যা আকাশের তারকারাজীর মত। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “আমার হাউযের আয়তন হচ্ছে ‘আইলা’ (বায়তুল মুকাদ্দাস) থেকে সান‘আ পর্যন্ত, আর সেখানে পেয়ালার সংখ্যা আকাশের তারকার মত এত বেশী”। [বুখারী: ৬৫৮০, মুসলিম: ২৩০৩] রাসূলুল্লাহ

দান করেছি।

২. কাজেই আপনি আপনার রবের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করুন এবং কুরবানী করুন(১)।

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝٢

৩. নিশ্চয় আপনার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীই তো নির্বংশ(২)।

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۝٣

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন, "আমার হাউয এক মাসের রাস্তা, তার কোণসমূহ একই সমান, তার পানি দুধের চেয়েও সাদা, তার ঘ্রাণ মিসকের চেয়েও বেশী উত্তম, তার পেয়ালাসমূহ আকাশের তারকা মত বেশী ও উজ্জ্বল, যে তা থেকে পান করবে সে আর কখনো পিপাসার্ত হবেনা"। [বুখারী: ৬৫৭৯, মুসলিম: ২২৯২] মোটকথা: কাউসারের মূল উৎস হলো জান্নাতে। তা থেকেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আরেকটি হাউযে পানি আসবে। সেখানে তার উম্মতকে তিনি পানি পান করাবেন। তাছাড়া সমস্ত নবীর হাউযের পানির উৎসও এ কাউসারই।

(১) نحر শব্দের অর্থ উট কুরবানী করা। এর প্রচলিত পদ্ধতি হচ্ছে হাত-পা বেঁধে কণ্ঠনালীতে বর্শা অথবা ছুরি দিয়ে আঘাত করা এবং রক্ত বের করে দেয়া। গরু-ছাগল ইত্যাদির কুরবানীর পদ্ধতি যবাই করা। অর্থাৎ জন্তুকে শুইয়ে কণ্ঠনালিতে ছুরি চালিয়ে রক্ত প্রবাহিত করা। আরবে সাধারণতঃ উট কুরবানী করা হতো। তাই কুরবানী বোঝাবার জন্য এখানে نحر শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। মাঝে মাঝে এ শব্দটি যে কোন কুরবানীর অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এ আয়াতে পূর্ববর্তী আয়াতে প্রদত্ত কাউসারের কারণে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ দু'টি কাজ করতে বলা হয়েছে। এক. একমাত্র আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সালাত আদায়, দুই. তাঁরই উদ্দেশ্যে কুরবানী করা ও যবাই করা। [আদওয়াউল বায়ান] কেননা, সালাত শারিরীক ইবাদতসমূহের মধ্যে সর্ববৃহৎ এবং কুরবানী আর্থিক ইবাদতসমূহের মধ্যে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য ও গুরুত্বের অধিকারী। [বাদায়ি'উত তাফসীর]

(২) সাধারণতঃ যে ব্যক্তির পুত্র সন্তান মারা যায়, আরবে তাকে أبتر বা নির্বংশ বলা হত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পুত্র কাসেম অথবা ইবরাহীম যখন শৈশবেই মারা গেলেন, তখন কাফেররা তাকে নির্বংশ বলে উপহাস করত। একবার কা'ব ইবনে আশরাফ ইয়াহূদী সর্দার মক্কায় আগমন করল। কুরাইশের নেতারা তাকে বলল, আপনি কি মদীনাবাসীদের উত্তম ব্যক্তি ও নেতা? সে বলল, হ্যাঁ, তখন তারা বলল, আপনি কি দেখেন না এই লোকটি যে তার জাতির মধ্যে নির্বংশ সে মনে করে সে আমাদের থেকে উত্তম? অথচ আমরা, হজ ও কাবাঘরের সেবায়েত। তখন কা'ব ইবনে আশরাফ বলল, তোমরা তার থেকে উত্তম। তখন এ আয়াত নাযিল হয়, এতে বলা হয়, "নিশ্চয় আপনার শত্রুরাই তো নির্বংশ।" আরও নাযিল হয়,

আপনি কি দেখেননা তাদেরকে যাদের কিতাবের কিছু অংশ দেয়া হয়েছিল, তারা মূর্তি ও তাগুতের উপর ঈমান রাখে...” । [সূরা আন-নিসাঃ ৫১,৫২, হাদীসটি বর্ণনা করেন, নাসায়ী, কিতাবুত-তাফসীর, ২/৫৬০, নং ৭২৭, ইবনে হিব্বান, ৬৫৭২] এ আয়াতের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি নির্বংশ বলে যে দোষারোপ করা হতো তার জওয়াব দেয়া হয়েছে । শুধু পুত্রসন্তান না থাকার কারণে যারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্বংশ বলে বা তার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করে, তারা তার প্রকৃত মর্যাদা সম্পর্কে বেখবর । রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশগত সন্তান-সন্ততিও কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, যদিও তা কন্যা-সন্তানের তরফ থেকে হয় । তাছাড়া নবীর আধ্যাত্মিক সন্তান অর্থাৎ উম্মত তো এত অধিকসংখ্যক হবে যে, পূর্ববর্তী সকল নবীর উম্মতের সমষ্টি অপেক্ষাও বেশী হবে । এছাড়া এ সূরায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে প্রিয় ও সম্মানিত তাও বিবৃত হয়েছে । [আদওয়াউল বায়ান]

১০৯- সূরা আল-কাফিরূন(১)
৬ আয়াত, মক্কী

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. বলুন, 'হে কাফিররা!

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۙ﴿۱﴾

২. 'আমি তার 'ইবাদাত করি না যার 'ইবাদাত তোমরা কর,(২)

لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۙ﴿۲﴾

৩. 'এবং তোমরাও তাঁর 'ইবাদাতকারী নও যাঁর 'ইবাদাত আমি করি(৩),

وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۚ﴿۳﴾

---

(১) বিভিন্ন হাদীসে এ সূরার বেশ কিছু ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। জাবের রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাওয়াফের দু' রাকা'আত সালাতে 'কুল ইয়া আইয়ুহাল কাফিরুন ও কুল হুয়াল্লাহু আহাদ' পড়তেন।" [মুসলিম: ১২১৮] অন্য হাদীসে এসেছে, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দু'টি সূরা দিয়ে ফজরের সুন্নাত সালাত আদায় করেছেন"। [মুসলিম: ৭২৬] ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ফজরের পূর্বের দু' রাকা'আতে এবং মাগরিবের পরের দু'রাকা'আতে এ দু' সূরা পড়তে বিশোর্ধ বার বা দশোর্ধ বার শুনেছি।" [মুসনাদে আহমাদ:২/২৪] অন্য বর্ণনায় এসেছে, "চব্বিশোর্ধ অথবা পঁচিশোর্ধবার শুনেছি"। [মুসনাদে আহমাদ:২/৯৫] ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এক মাস পর্যবেক্ষণ করে দেখেছি তিনি ফজরের পূর্বের দু' রাকা'আতে এ দু'সূরা পড়তেন।" [তিরমিযী: ৪১৭, ইবনে মাজাহ: ১১৪৯, মুসনাদে আহমাদ: ২/৯৪] তাছাড়া জনৈক সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে আরয করলেন, আমাকে নিদ্রার পূর্বে পাঠ করার জন্যে কোন দো'আ বলে দিন। "তিনি সূরা কাফিরূন পাঠ করতে আদেশ দিলেন এবং বললেন এটা শির্ক থেকে মুক্তিপত্র।" [আবু দাউদ:৫০৫৫, সুনান দারমী:২/৪৫৯, মুস্তাদরাকে হাকিম:২/৫৩৮] অন্য হাদীসে এসেছে, "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সূরা 'কুল ইয়া আইয়ুহাল কাফিরুন' কুরআনের এক চতুর্থাংশ"।[তিরমিযী: ২৮৯৩, ২৮৯৫]

(২) সারা দুনিয়ার কাফের মুশরিকরা যেসব বাতিল উপাস্যের উপাসনা, আরাধনা ও পূজা করত বা করে– সবই এর অন্তর্ভুক্ত। [মুয়াসসার]

(৩) এ সুরায় কয়েকটি বাক্য পুনঃপুনঃ উল্লিখিত হওয়ায় স্বভাবত প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। এ ধরনের আপত্তি দূর করার জন্যে বুখারী অনেক তাফসীরবিদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একই বাক্য একবার বর্তমানকালের জন্যে এবং একবার ভবিষ্যৎকালের জন্যে

৪. ‘এবং আমি ‘ইবাদাতকারী নই তার যার ‘ইবাদাত তোমরা করে আসছ।

وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ﴿٤﴾

উল্লেখ করা হয়েছে।[ফাতহুল বারী] অর্থাৎ আমি এক্ষণে কার্যত তোমাদের উপাস্যদের ইবাদত করি না এবং তোমরা আমার উপাস্যের ইবাদত কর না এবং ভবিষ্যতেও এরূপ হতে পারে না। ইমাম তাবারীও এ মতটি বর্ণনা করেছেন। ইবনে কাসীর এখানে অন্য একটি তাফসীর অবলম্বন করেছেন। তিনি প্রথম জায়গায় আয়াতের অর্থ করেছেন এই যে, তোমরা যেসব উপাস্যের ইবাদত কর, আমি তাদের ইবাদত করি না এবং আমি যে উপাস্যের ইবাদত করি তোমরা তার ইবাদত কর না। আর দ্বিতীয় জায়গায় আয়াতের অর্থ করেছেন এই যে, আমার ও তোমাদের ইবাদতের পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন। আমি তোমাদের মত ইবাদত করতে পারি না এবং বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত তোমরাও আমার মত ইবাদত করতে পার না। এভাবে প্রথম জায়গায় উপাস্যদের বিভিন্নতা এবং দ্বিতীয় জায়গায় ইবাদত পদ্ধতির বিভিন্নতা বিধৃত হয়েছে। [ইবন কাসীর] সারকথা এই যে, তোমাদের মধ্যে ও আমার মধ্যে উপাস্যের ক্ষেত্রেও অভিন্নতা নেই এবং ইবাদত-পদ্ধতির ক্ষেত্রেও নেই। এভাবে পুনঃপুনঃ উল্লেখের আপত্তি দূর হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলিমদের ইবাদতপদ্ধতি তাই; যা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে বলে দেয়া হয়েছে। আর মুশরিকদের ইবাদত পদ্ধতি স্বকল্পিত। ইবনে-কাসীর এই তাফসীরের পক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ কলেমার অর্থ তাই হয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোন হক্ক উপাস্য নেই। ইবাদত-পদ্ধতি তা-ই গ্রহণযোগ্য, যা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। কোন কোন অভিজ্ঞ আলেম বলেন, ২ নং আয়াতের অর্থ, আমি তোমাদের উপাস্যদের ইবাদত কখনো করবো না। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় আয়াতের অর্থ, আমি এ ইবাদতটা কখনো, কিছুতেই গ্রহণ করবো না। অর্থাৎ তোমাদের উপাস্যদের ইবাদত করা আমার দ্বারা কখনো ঘটবে না অনুরূপভাবে তা শরীয়তেও এটা হওয়া সম্ভব নয়। [মাজমূ' ফাতাওয়া শাইখিল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, ১৬/৫৪৭-৫৬৭; ইবন কাসীর]

এর আরেকটি তাফসীরও হতে পারে। আর তা হলো, প্রথমত ২নং আয়াত ﴿لَآ اَعۡبُدُ مَا تَعۡبُدُوۡنَ﴾ অর্থ ‘আমি বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে তার ইবাদত করি না, তোমরা যার ইবাদত কর’। এর পরে এসেছে, ﴿وَلَآ اَنۡتُمۡ عٰبِدُوۡنَ مَآ اَعۡبُدُ﴾ অর্থাৎ তোমরাও বর্তমানে ও ভবিষ্যতে ইবাদতকারী নও। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে, ﴿وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدۡتُّمۡ﴾ অর্থাৎ অতীতে আমার পক্ষ থেকে এরূপ কিছু ঘটেনি। অতীত বোঝানোর জন্য عَبَدْتُّمْ অতীতকালীন ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে। আর এর পরে এসেছে, ﴿وَلَآ اَنۡتُمۡ عٰبِدُوۡنَ مَآ اَعۡبُدُ﴾ অর্থাৎ তোমরাও অতীতে তার ইবাদত করতে না, যার ইবাদত আমি সবসময় করি। ইবনুল কায়্যিম এ মতটি গ্রহণ করেছেন। [বাদায়ি'উল ফাওয়ায়িদ, ১/১২৩-১৫২]

৫. ‘এবং তোমরাও তাঁর ‘ইবাদাতকারী হবে না যাঁর ‘ইবাদাত আমি করি,

وَلَآ أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ۝٥

৬. ‘তোমাদের দ্বীন তোমাদের, আর আমার দ্বীন আমার[১]।’

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِىَ دِينِ ۝٦

(১) এর তাফসীর প্রসঙ্গে ইবনে-কাসীর বলেন, এ বাক্যটি তেমনি যেমন অন্য আয়াতে আছে, ﴿وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّى عَمَلِى وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ﴾ “আর তারা যদি আপনার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তবে আপনি বলবেন, ‘আমার কাজের দায়িত্ব আমার এবং তোমাদের কাজের দায়িত্ব তোমাদের।” [সূরা ইউনুস: ৪১] অন্য আয়াতে এসেছে, ﴿لَنَآ أَعْمَٰلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَٰلُكُمْ﴾ “আমাদের কাজের ফল আমাদের জন্য এবং তোমাদের কাজের ফল তোমাদের জন্য” [সূরা আল-কাসাস:৫৫, আশ-শুরা:১৫]। এর সারমর্ম এই যে, ইবনে-কাসীর دين শব্দকে দ্বীনী ক্রিয়াকর্মের অর্থে নিয়েছেন। যার অর্থ, প্রত্যেককে নিজ নিজ কর্মের প্রতিদান ও শাস্তি ভোগ করতে হবে। অর্থাৎ আমার দ্বীন আলাদা এবং তোমাদের দ্বীন আলাদা। আমি তোমাদের মাবুদদের পূজা-উপাসনা-বন্দেগী করি না এবং তোমরাও আমার মাবুদের পূজা-উপাসনা করো না। আমি তোমাদের মাবুদদের বন্দেগী করতে পারি না এবং তোমরা আমার মাবুদের বন্দেগী করতে প্রস্তুত নও। তাই আমার ও তোমাদের পথ কখনো এক হতে পারে না।

বর্তমান কালের কোন কোন জ্ঞানপাপী মনে করে থাকে যে, এখানে কাফেরদেরকে তাদের দ্বীনের উপর থাকার স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। তারা এটাকে ইসলামের উদারনীতির প্রমাণ হিসেবে পেশ করে থাকেন। নিঃসন্দেহে ইসলাম উদার। ইসলাম কাউকে অযথা হত্যা বা ক্ষতিগ্রস্ত করতে অনুমতি দেয় না। কিন্তু তাই বলে তাদেরকে কুফরী থেকে মুক্তি দিতে তাদের মধ্যে দাওয়াত ও দ্বীনের প্রচার-প্রসার ঘটানো থেকে বিরত থাকতে বলেনি। ইসলাম চায় প্রত্যেকটি কাফের ও মুশরিক ইসলামের ছায়াতলে এসে শান্তির বার্তা গ্রহণ করুক। আর এ জন্য ইসলাম প্রজ্ঞা, উত্তম উপদেশবাণী, উত্তম পদ্ধতিতে তর্ক-বিতর্ক ইত্যাদির মাধ্যমে আল্লাহ্‌র পথে আহ্বান করাকে প্রত্যেক মুসলিমের অবশ্য করণীয় বিষয় হিসেবে ঘোষণা করেছে। [দেখুন, সূরা আন-নাহল:১২৫] মূলত: এ সমস্ত জ্ঞানপাপীরা এ বিষয়টিকেই সহ্য করতে চায় না। তারা এখানে আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য করে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ নামক কুফরী মতবাদকে জায়েয প্রমাণ করা। এটা নিঃসন্দেহে ঈমান আনার পরে কুফরী করার শামিল, যা মূলত কাফেরদের প্রতি উদারনীতি নয় বরং তারা কাফের থাকা অবস্থায় চিরকালের জন্য তাদের ব্যাপারে দায়মুক্তি, সম্পর্কহীনতা ও অসন্তোষের ঘোষণাবাণী।

আর এ সূরায় কাফেরদের দ্বীনের কোন প্রকার স্বীকৃতিও দেয়া হয়নি। মূলত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি যারা ঈমান এনেছে তারা দ্বীনের ব্যাপারে কখনো তাদের সাথে সমঝোতা করবে না– এ ব্যাপারে তাদেরকে সর্বশেষ ও চূড়ান্তভাবে নিরাশ

করে দেয়া; আর তাদের সাথে সম্পর্কহীনতার ঘোষণাই এ সূরার উদ্দেশ্য। এ সূরার পরে নাযিল হওয়া কয়েকটি মক্কী সূরাতে কাফেরদের সাথে এ দায়মুক্তি, সম্পর্কহীনতা ও অসন্তোষ প্রকাশের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, "হে নবী! বলে দিন হে লোকেরা, যদি তোমরা আমার দ্বীনের ব্যাপারে (এখানে) কোন রকম সন্দেহের মধ্যে থাকো তাহলে (শুনে রাখো), আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদের বন্দেগী করছো আমি তাদের বন্দেগী করি না বরং আমি শুধুমাত্র সেই আল্লাহর বন্দেগী করি যার কর্তৃত্বাধীনে রয়েছে তোমাদের মৃত্যু।" [সূরা ইউনুস: ১০৪] অন্য সূরায় আল্লাহ্ আরও বলেন, "হে নবী! যদি এরা এখন আপনার কথা না মানে তাহলে বলে দিন, তোমরা যা কিছু করছো তা থেকে আমি দায়মুক্ত"। [সূরা আশ-শু'আরা: ২১৬] অন্যত্র বলা হয়েছে, "এদেরকে বলুন, আমাদের ক্রটির জন্য তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না এবং তোমরা যা কিছু করে যাচ্ছো সে জন্য আমাদের জবাবদিহি করতে হবে না। বলুন, আমাদের রব একই সময় আমাদের ও তোমাদের একত্র করবেন এবং আমাদের মধ্যে ঠিকমতো ফায়সালা করবেন।" [সূরা সাবা:২৫-২৬] অন্য সূরায় এসেছে, "এদেরকে বলুন হে আমার জাতির লোকেরা তোমরা নিজেদের জায়গায় কাজ করে যাও। আমি আমার কাজ করে যেতে থাকবো। শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে কার ওপর আসছে লাঞ্ছনাকর আযাব এবং কে এমন শাস্তি লাভ করছে যা অটল।" [সূরা আয-যুমার:৩৯-৪০]। আবার মদীনা তাইয়েবার সমস্ত মুসলিমকেও এই একই শিক্ষা দেয়া হয়। তাদেরকে বলা হয়েছে, "তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তার সাথীদের মধ্যে রয়েছে একটি উত্তম আদর্শ। (সেটি হচ্ছে) তারা নিজেদের জাতিকে পরিষ্কার বলে দিয়েছে, আমরা তোমাদের থেকে ও তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যেসব মাবুদদের পূজা করো তাদের থেকে পুরোপুরি সম্পর্কহীন। আমরা তোমাদের কুফরী করি ও অস্বীকৃতি জানাই এবং যতক্ষণ তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান না আনো ততক্ষণ আমাদের ও তোমাদের মধ্যে চিরকালীন শত্রুতা সৃষ্টি হয়ে গেছে।" [সূরা আল-মুমতাহিনাহ: ৪] কুরআন মজীদের একের পর এক এসব সুস্পষ্ট বক্তব্যের পর তোমরা তোমাদের ধর্ম মেনে চলো এবং আমাকে আমার ধর্ম মেনে চলতে দাও-"লাকুম দীনুকুম ওয়ালিয়াদীন" এর এ ধরনের কোন অর্থের অবকাশই থাকে না। বরং সূরা আয-যুমার এ যে কথা বলা হয়েছে, একে ঠিক সেই পর্যায়ে রাখা যায় যেখানে বলা হয়েছে: "হে নবী! এদেরকে বলে দিন, আমি তো আমার দ্বীনকে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করে তাঁরই ইবাদাত করবো। তোমরা তাঁকে বাদ দিয়ে যার যার বন্দেগী করতে চাও করতে থাক না কেন।"[১৪]। সুতরাং এটাই এ আয়াতের মূল ভাষ্য যে, এখানে কাফেরদের সাথে সম্পর্কচ্যুতি ঘোষণা করা হয়েছে। তবে এটাও লক্ষণীয় যে, পবিত্র কুরআনে একথাও আছে, "কাফেররা সন্ধি করতে চাইলে তোমরাও সন্ধি কর।" [সূরা আল-আনফাল:৬১] তাছাড়া মদীনায় হিজরত করার পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম- তার ও ইয়াহূদীদের সাথে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। তাই সম্পর্কচ্যুতির অর্থ এ নয় যে, তাদের সাথে প্রয়োজনে সন্ধিচুক্তি করা যাবে না। মূলত সন্ধির বৈধতা ও অবৈধতার আসল কারণ হচ্ছে স্থান-কাল-পাত্র এবং সন্ধির শর্তাবলি। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ফয়সালা দিতে গিয়ে বলেছেন- "সে সন্ধি অবৈধ, যা কোন হারামকে হালাল কিংবা হালালকে হারাম করে।" [আবুদাউদ:৩৫৯৪, তিরমিযী:১৩৫২, ইবনে মাজাহ:২৫৫৩] ইয়াহূদীদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিতে ইসলামের মূলনীতিবিরুদ্ধ কোন বিষয় ছিল না। উদারতা, সদ্ব্যবহার ও শান্তি অন্বেষায় ইসলামের সাথে কোন ধর্মের তুলনা হয় না। কিন্তু এরূপ শান্তিচুক্তি মানবিক অধিকারের ব্যাপারে হয়ে থাকে– আল্লাহ তা'আলার আইন ও দ্বীনের মূলনীতিতে কোন প্রকার দরকষাকষির অবকাশ নেই। [দেখুন, ইবন্ তাইমিয়্যাহ্, আল-জাওয়াবুস সহীহ, ৩/৫৯-৬২; ইবনুল কাইয়্যিম, বাদায়ি'উল ফাওয়ায়িদ, ১/২৪৬-২৪৭]

১১০- সূরা আন-নাস্‌র[১]
৩ আয়াত, মাদানী

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. যখন আসবে আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয়[২]

إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ①

২. আর আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহ্‌র দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন,[৩]

وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ أَفْوَاجًا ②

(১) আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, যখন এ সূরা নাযিল হলো তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরাটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়লেন এবং বললেন, "মক্কা বিজয়ের পর আর কোন হিজরত নেই।" [মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/২৫৭] এ সূরায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওফাত নিকটবর্তী হওয়ার ইঙ্গিত আছে। এক বর্ণনায় আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা উবায়দুল্লাহ্ ইবনে উতবাকে প্রশ্ন করে বলেন, কোন্ পূর্ণাঙ্গ সূরা সবশেষে নাযিল হয়েছে? উবায়দুল্লাহ্ বলেন, আমি বললাম: 'ইযা জাআ নাসরুল্লাহি ওয়াল ফাতহ'। তিনি বললেন, সত্য বলেছ। [মুসলিম: ৩০২৪] ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, সূরা আন-নাসর বিদায় হজে অবতীর্ণ হয়েছে। এরপর ﴿ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ ﴾ [সূরা আল-মায়িদাহ:৩] আয়াত অবতীর্ণ হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাত্র আশি দিন জীবিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবনের যখন মাত্র পঞ্চাশ দিন বাকি ছিল, তখন কালালাহ্ সংক্রান্ত [সূরা আন-নিসা:১৭৬] আয়াত অবতীর্ণ হয়। অতঃপর পঁয়ত্রিশ দিন বাকী থাকার সময় ﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴾ আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং একুশ দিন বাকি থাকার সময় ﴿ وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴾ [সূরা আল-বাকারাহ: ২৮১] আয়াত অবতীর্ণ হয়।

(২) এ ব্যাপারে প্রায় সকলেই একমত যে, এখানে বিজয় বলে মক্কা বিজয় বোঝানো হয়েছে। [মুয়াসসার, ইবন কাসীর] আর বিজয় মানে কোন একটি সাধারণ যুদ্ধে বিজয় নয়। বরং এর মানে হচ্ছে এমন একটি চূড়ান্ত বিজয় যার পরে ইসলামের সাথে সংঘর্ষ করার মতো আর কোন শক্তির অস্তিত্ব দেশের বুকে থাকবে না এবং একথাও সুস্পষ্ট হয়ে যাবে যে, বর্তমানে আরবে এ দ্বীনটিই প্রাধান্য বিস্তার করবে। [দেখুন, আদওয়াউল বায়ান]

(৩) অর্থাৎ লোকদের একজন দু'জন করে ইসলাম গ্রহণ করার যুগ শেষ হয় যাবে। তখন এমন এক যুগের সূচনা হবে যখন একটি গোত্রের সবাই এবং এক একটি

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴿٣﴾

৩. তখন আপনি আপনার রবের প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন, নিশ্চয় তিনি তাওবা কবুলকারী[১]।

বড় বড় এলাকার সমস্ত অধিবাসী কোন প্রকার যুদ্ধ-বিগ্রহ ও চাপ প্রয়োগ ছাড়াই স্বতস্ফূর্তভাবে মুসলিম হয়ে যেতে থাকবে। মক্কা বিজয়ের পূর্বে এমন লোকদের সংখ্যাও প্রচুর ছিল, যারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রেসালত ও ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাসের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু কুরাইশদের ভয়ে অথবা অন্য কোন কারণে তারা ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত ছিল। মক্কাবিজয় তাদের সেই বাধা দূর করে দেয়। সেমতে তারা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতে শুরু করে। সাধারণ আরবরাও এমনিভাবে দলে দলে ইসলামে দাখিল হয়। আমর ইবনে সালামাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, "মক্কা বিজয়ের পরে প্রতিটি গোত্রই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে ঈমান আনার ব্যাপারে প্রতিযোগিতা শুরু করে। মক্কা বিজয়ের আগে এ সমস্ত গোত্রগুলো ঈমান আনার ব্যাপারে দ্বিধা করত। তারা বলত, তার ও তার গোত্রের অবস্থা পর্যবেক্ষণ কর। যদি সে তার গোত্রের উপর জয়লাভ করতে পারে তবে সে নবী হিসেবে বিবেচিত হবে"। [বুখারী: ৪৩০২] [বাগাবী]

(১) একাধিক হাদীস ও সাহাবীর উক্তিতে আছে যে, এ সূরায় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওফাত নিকটবর্তী হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত আছে। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু আমাকে বদরী সাহাবীগণের সাথে তার কাছে প্রবেশাধিকার দিয়েছিলেন। তারা এটাকে মনে-প্রাণে মেনে নিতে পারছিলেন না। তারা বলেই ফেলল, একে আবার আমাদের সাথে কেন? আমাদের কাছে তার সমবয়সী সন্তান-সন্ততি রয়েছে। তখন উমর বললেন, তোমরা তো জান সে কোত্থেকে এসেছে। তারপর একদিন তিনি তাদের মজলিসে তাকে ডেকে পাঠালেন। আমি বুঝতে পারলাম যে, তিনি আমাকে তাদের মাঝে ডেকে আমাকে তাদের সাথে রাখার ব্যাপারটি স্পষ্ট করারই ইচ্ছা পোষণ করেছেন। অতঃপর উমর বললেন, তোমরা মহান আল্লাহ্‌র বাণী, "ইযা জাআ নাসরুল্লাহি ওয়াল ফাতহ" সম্পর্কে কি বল? তাদের কেউ বলল, আমাদের বিজয় লাভ হলে যেন আমরা আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও তাঁর কাছে ক্ষমা চাই তা-ই বলা হয়েছে। আবার তাদের অনেকেই কিছু না বলে চুপ ছিল। তখন তিনি আমাকে বললেন, হে ইবনে আব্বাস! তুমি কি অনুরূপ বল? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তাহলে কি বল? আমি বললাম, এটা তো রাসূলের মৃত্যুর সময়, যা তাকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন, "যখন আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয় এসে যাবে", আর এটাই হবে আপনার জীবন শেষ হয়ে

যাওয়ার আলামত, “সুতরাং আপনি আপনার রবের সপ্রশংস তাসবীহ্ পাঠ করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা চান; কেননা তিনিই তো তাওবা কবুলকারী”। তখন উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, তুমি যা বললে তা ছাড়া এ সূরা সম্পর্কে আর কিছু আমি জানি না।” [বুখারী: ৪৯৭০] সুতরাং সূরার অর্থ হচ্ছে, আপনার দুনিয়াতে অবস্থান করার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে গেছে, তাবলীগ তথা পৌছে দেওয়ার দায়িত্ব পালিত হয়েছে। অতএব, আপনি তাসবীহ ও ইস্তেগফারে মনোনিবেশ করুন। [ইবনুল কায়্যিম: ইলামুল মুয়াক্কিয়ীন, ১/৪৩৬] আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বলেন: এই সূরা নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক সালাতের পর এই দো‘আ পাঠ করতেন سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ [বুখারী: ৭৯৪, ৮১৭, ৪২৯৩, ৪৯৬৭, মুসলিম: ৪৮৪, আবু দাউদ: ৮৭৭, ইবনে মাজাহ: ৮৮৯] অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষ বয়সে বেশী বেশী আগত দো‘আ পাঠ করতেন: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ [মুসলিম: ৪৮৪, মুসনাদে আহমাদ: ৬/৩৫] অনুরূপভাবে উম্মে সালামাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বলেন, এই সূরা নাযিল হওয়ার পর তিনি উঠাবসা, চলাফেরা তথা সর্বাবস্থায় سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ এই দো‘আ পাঠ করতেন। তিনি বলতেন, আমাকে এর আদেশ করা হয়েছে। অতঃপর প্রমাণস্বরূপ সূরাটি তেলাওয়াত করতেন। [তাবারী: ৩৮২৪৮]

১১১- সূরা তাব্বাত[১]
৫ আয়াত, মক্কী

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

১. ধ্বংস হোক আবু লাহাবের[২]

تَبَّتۡ يَدَآ أَبِي لَهَبٖ وَتَبَّ ①

(১) হাদীসে এসেছে, আল্লাহ্‌র বাণী ﴿وَأَنذِرۡ عَشِيرَتَكَ ٱلۡأَقۡرَبِينَ﴾ "আর আপনি আপনার গোত্রের নিকটাত্মীয়দেরকে ভীতি প্রদর্শন করুন" [সূরা আশ-শু'আরা:২১৪] এ আয়াতটি অবতীর্ণ হলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাফা পর্বতে আরোহণ করে কোরাইশ গোত্রের উদ্দেশ্যে وَا صَبَاحَاه ('হায়! সকাল বেলার বিপদ') বলে অথবা আবদে মানাফ ও আবদুল মোত্তালিব ইত্যাদি নাম সহকারে ডাক দিলেন। (এভাবে ডাক দেয়া তখন আরবে বিপদাশঙ্কার লক্ষণরূপে বিবেচিত হত) ডাক শুনে কোরাইশ গোত্র পর্বতের পাদদেশে একত্রিত হল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: যদি আমি বলি যে, একটি শত্রুদল ক্রমশই এগিয়ে আসছে এবং সকাল বিকাল যে কোন সময় তোমাদের ওপর ঝাপিয়ে পড়বে, তবে তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে কি? সবাই একবাক্যে বলে উঠল: হ্যাঁ, অবশ্যই বিশ্বাস করব। অতঃপর তিনি বললেন: আমি (শিরক ও কুফরের কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত) এক ভীষণ আযাব সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করছি। এ কথা শুনে আবু লাহাব বলল, تَبًّا لَكَ أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا؟ 'ধ্বংস হও তুমি, এজন্যেই কি আমাদেরকে একত্রিত করেছ'? অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে পাথর মারতে উদ্যত হল। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সূরা লাহাব অবতীর্ণ হয়। [বুখারী: ৪৯৭১,৪৯৭২, মুসলিম:২০৮]

(২) আবু লাহাবের আসল নাম ছিল আবদুল উয্‌যা। সে ছিল আবদুল মুত্তালিবের অন্যতম সন্তান। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা। গৌরবর্ণের কারণে তার ডাক নাম হয়ে যায় আবু লাহাব। কারণ, 'লাহাব' বলা হয় আগুণের লেলিহান শিখাকে। লেলিহান শিখার রং হচ্ছে গৌরবর্ণ। সে অনুসারে আবু লাহাব অর্থ, গৌরবর্ণবিশিষ্ট। পবিত্র কুরআন তার আসল নাম বর্জন করেছে। কারণ, সেটা মুশরিকসুলভ। এছাড়া আবু লাহাব ডাক নামের মধ্যে জাহান্নামের সাথে বেশ মিলও রয়েছে। কারণ, জাহান্নামের অগ্নির লেলিহান শিখা তাকে পাকড়াও করবে। সে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কট্টর শত্রু ও ইসলামের ঘোর বিরোধী ছিল। সে নানাভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে কষ্ট দেয়ার প্রয়াস পেত। তিনি যখন মানুষকে ঈমানের দাওয়াত দিতেন, তখন সে সাথে সাথে গিয়ে তাকে মিথ্যাবাদী বলে প্রচার করত। রবী'আ ইবনে আব্বাদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জাহিলিয়াতের (অন্ধকার) যুগে যুল-মাজায বাজারে দেখলাম, তিনি বলছিলেন, "হে মানব সম্প্রদায়! তোমরা

দু'হাত(১) এবং ধ্বংস হয়েছে সে

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বল, সফলকাম হবে"। আর মানুষ তার চতুষ্পার্শে ভীড় জমাচ্ছিল। তার পিছনে এক গৌরবর্ণ টেরা চোখবিশিষ্ট সুন্দর চেহারার লোক বলছিল, এ লোকটি ধর্মত্যাগী, মিথ্যাবাদী। এ লোকটি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিছনে পিছনে যেখানে তিনি যেতেন সেখানেই যেত। তারপর আমি লোকদেরকে এ লোকটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। লোকেরা বলল, এটি তারই চাচা আবু লাহাব।" [মুসনাদে আহমাদঃ ৪/৩৪১] অন্য বর্ণনায়, রবী'আ ইবনে আব্বাদ বলেন, আমি আমার পিতার সাথে ছিলাম। আমি যেন দেখতে পাচ্ছি কিভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন গোত্রের কাছে নিজেকে পেশ করে বলছিলেন, "হে অমুক বংশ! আমি তোমাদের সবার নিকট আল্লাহ্র রাসূল। তোমাদেরকে আল্লাহ্র ইবাদত করতে এবং তার সাথে কাউকে শরীক না করতে নির্দেশ দিচ্ছি। আর আমি এটাও চাই যেন তোমরা সত্য বলে বিশ্বাস কর এবং আমার পক্ষ থেকে প্রতিরোধ কর, যাতে করে আমি আমার আল্লাহ্র কাছ থেকে যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি তা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে পারি।" যখনই তিনি এ কথাগুলো বলে শেষ করতেন তখনই তার পিছন থেকে এক লোক বলতঃ হে অমুক বংশ! সে তোমাদেরকে লাত ও উযযা থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চায়– সে নতুন কথা চালু করেছে, সে ভ্রষ্টতা নিয়ে এসেছে। সুতরাং তোমরা তার কথা শোনবে না এবং তার অনুসরণ করবে না। তখন আমি আমার পিতাকে বললাম, এ লোকটি কে? তিনি বললেন, ঐ লোকটির চাচা আবু লাহাব। [মুসনাদে আহমাদঃ ৩/৪৯২] [ফাতহুল কাদীর, ইবন কাসীর]

(১) يد শব্দের অর্থ হাত। মানুষের সব কাজে হাতের প্রভাবই বেশি, তাই কোন ব্যক্তির সত্তাকে হাত বলেই ব্যক্ত করে দেয়া হয়; যেমন কুরআনের অন্যত্র ﴿بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ﴾ বলা হয়েছে। ﴿تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ﴾ এর অর্থ কোন তাফসীরকার করেছেন, "ভেঙে যাক আবু লাহাবের হাত'' এবং وتبّ শব্দের মানে করেছেন, "সে ধ্বংস হয়ে যাক" অথবা "সে ধ্বংস হয়ে গেছে।" কোন কোন তাফসীরকার বলেন, এটা আবু লাহাবের প্রতি একটি ভবিষ্যদ্বাণী। এখানে ভবিষ্যতে যে ঘটনাটি ঘটবে তাকে অতীত কালের অর্থ প্রকাশক শব্দের সাহায্যে বর্ণনা করা হয়েছে। এর মানে, তার হওয়াটা যেন এত বেশী নিশ্চিত যেমন তা হয়ে গেছে। আর যা এ সূরায় কয়েক বছর আগে বর্ণনা করা হয়েছিল, শেষ পর্যন্ত তাই সত্য হলো। এখানে হাত ভেঙে যাওয়ার মানে শুধু শরীরের একটি অংগ যে হাত সেটি ভেঙে যাওয়াই নয়। বরং কোন ব্যক্তি যে উদ্দেশ্য সম্পন্ন করার জন্য তার সর্বশক্তি নিয়োগ করে তাতে পুরোপুরি ও চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়ে যাওয়াই এখানে বুঝানো হয়েছে। [কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর] আর আবু লাহাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দাওয়াতকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য যথার্থই নিজের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল। কিন্তু এ সূরাটি নাযিল হবার মাত্র সাত আট বছর পরেই বদরের যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। এ যুদ্ধে কুরাইশদের অধিকাংশ বড় বড় সরদার নিহত হয়। তারা সবাই ইসলাম বিরোধিতা ও ইসলামের প্রতি শত্রুতার

নিজেও।

২. তার ধন-সম্পদ ও তার উপার্জন(১) তার কোন কাজে আসে নি।

مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُۥ وَمَا كَسَبَ ۝٢

৩. অচিরে সে দগ্ধ হবে লেলিহান আগুনে,(২)

سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝٣

৪. আর তার স্ত্রীও(৩)– যে ইন্ধন বহন

وَٱمْرَأَتُهُۥ حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ ۝٤

ক্ষেত্রে আবু লাহাবের সহযোগী ছিল। এ পরাজয়ের খবর মক্কায় পৌঁছার পর সে যত বেশী মর্মাহত হয় যে, এরপর সে সাত দিনের বেশী জীবিত থাকতে পারেনি। যে দ্বীনের অগ্রগতির পথ রোধ করার জন্য সে তার সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল তার সন্তানদের সেই দ্বীন গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে তার আরো বেশী ও পূর্ণ পরাজয় সম্পন্ন হয়। সর্বপ্রথম তার মেয়ে দাররা হিজরত করে মক্কা থেকে মদীনায় চলে যান এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। আর মক্কা বিজয়ের পর তার দুই ছেলে উতবা ও মু'আত্তাব রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সামনে হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তার হাতে বাইআত করেন। [রুহুল মা'আনী]

(১) كسب এর অর্থ ধন-সম্পদ দ্বারা অর্জিত মুনাফা ইত্যাদি। এর অর্থ সন্তান-সন্ততিও হতে পারে। কেননা, সন্তান-সন্ততিকেও মানুষের উপার্জন বলা হয়। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাহু আলাইহিস ওয়াসাল্লাম বলেন, 'মানুষ যা খায়, তন্মধ্যে তার উপার্জিত বস্তুই সর্বাধিক হালাল ও পবিত্র, আর তার সন্তান সন্ততিও তার উপার্জিত বস্তুর মধ্যে দাখিল।' [নাসায়ী: ৪৪৪৯; আবু দাউদ: ৩৫২৮] অর্থাৎ সন্তানের উপার্জন খাওয়াও নিজের উপার্জন খাওয়ারই নামান্তর। এ কারণে কয়েকজন তাফসীরবিদ এস্থলে كَسَبَ এর অর্থ করেছেন সন্তান-সন্ততি। [কুরতুবী, ইবন কাসীর] আল্লাহ তা'আলা আবু লাহাবকে যেমন দিয়েছিলেন অগাধ ধন-সম্পদ, তেমনি দিয়েছিলেন অনেক সন্তান-সন্ততি। অকৃতজ্ঞতার কারণে এ দু'টি বস্তুই তার গর্ব, অহমিকা ও শাস্তির কারণ হয়ে যায়।

(২) অর্থাৎ কেয়ামতে অথবা মৃত্যুর পর কবরেই সে এক লেলিহান অগ্নিতে প্রবেশ করবে। তার নামের সাথে মিল রেখে অগ্নির বিশেষণ ﴿ذَاتَ لَهَبٍ﴾ বলার মধ্যে বিশেষ অলংকার রয়েছে। [আততাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

(৩) আবু লাহাবের স্ত্রীর নাম ছিল "আরওয়া"। সে ছিল আবু সুফিয়ানের বোন ও হরব ইবনে উমাইয়্যার কন্যা। তাকে "উম্মে জামীল" বলা হত। আবু লাহাবের ন্যায় তার স্ত্রীও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি বিদ্বেষী ছিল। সে এ ব্যাপারে তার স্বামীকে সাহায্য করত। আয়াতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এই হতভাগিনীও তার স্বামীর সাথে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এক বর্ণনায় এসেছে, এ মহিলা

করে[১],

যখন শুনতে পেল যে, আল্লাহ্ তা'আলা তার ও তার স্বামীর ব্যাপারে আয়াত নাযিল করে অপমানিত করেছেন সে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বসা ছিলেন। তার সাথে ছিলেন আবু বকর। তখন আবু বকর বললেন, আপনি যদি একটু সরে যেতেন তা হলে ভাল হতো যাতে করে এ মহিলা আপনাকে কোন কষ্ট না দিতে পারে। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমার ও তার মাঝে বাধার সৃষ্টি করা হবে। ইত্যবসরে মহিলা এসে আবু বকরকে জিজ্ঞেস করল, আবু বকর! তোমার সাথী আমাদের বদনামী করে কবিতা বলেছে? তিনি জবাবে বললেন, এ ঘরের (কাবার) রবের শপথ, তিনি কোন কবিতা বলেননি এবং তার মুখ দিয়ে তা বেরও হয়নি। তখন মহিলা বলল, তুমি সত্য বলেছ। তারপর মহিলা চলে গেলে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, সে কি আপনাকে দেখেনি? রাসূল বললেন, মহিলা ফিরে যাওয়া পর্যন্ত একজন ফেরেশতা আমাকে তার থেকে আড়াল করে রাখছিল। [মুসনাদে আবি ইয়া'লা: ২৫, ২৩৫৮, মুসনাদে বাযযার: ২৯৪] [ইবন কাসীর]

(১) এখানে আবু জাহলের স্ত্রী উম্মে জামীলের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে ﴿حَمَّالَةَ الْحَطَبِ﴾ বলা হয়েছে। এর শাব্দিক অর্থ শুষ্ককাঠ বহনকারিণী। আরবের বাকপদ্ধতিতে পশ্চাতে নিন্দাকারীকে 'খড়ি-বাহক' বলা হত। শুষ্ককাঠ একত্রিত করে যেমন কেউ অগ্নি সংযোগের ব্যবস্থা করে, পরোক্ষে নিন্দাকার্যটিও তেমনি। এর মাধ্যমে সে ব্যক্তিবর্গ ও পরিবারের মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামকে কষ্ট দেয়ার জন্যে আবু লাহাব পত্নী পরোক্ষে নিন্দাকার্যের সাথেও জড়িত ছিল। অধিকাংশ তাফসীরবিদ এখানে এ তাফসীরই করেছেন। অপরপক্ষে কোন কোন তাফসীরবিদগণ একে আক্ষরিক অর্থেই রেখেছেন এবং কারণ এই বর্ণনা করেছেন যে, এই নারী বন থেকে কন্টকযুক্ত লাকড়ি চয়ন করে আনত এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দেয়ার জন্যে তার পথে বিছিয়ে রাখত। তার এই নীচ ও হীন কাণ্ডকে কুরআন ﴿حَمَّالَةَ الْحَطَبِ﴾ বলে ব্যক্ত করেছে। ইমাম তাবারী এ উক্তিটি গ্রহণ করেছেন। কেউ কেউ বলেন যে, তার এই অবস্থাটি হবে জাহান্নামে। সে জাহান্নামে লাকড়ি এনে জাহান্নামে তার স্বামীর উপর নিক্ষেপ করবে, যাতে অগ্নি আরও প্রজ্বলিত হয়ে উঠে, যেমন দুনিয়াতেও সে স্বামীকে সাহায্য করে তার কুফর ও জুলুম বাড়িয়ে দিত। কোন কোন মুফাসসির বলেন, সে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দরিদ্র বলে উপহাস করত। পরিণামে আল্লাহ্ এ মহিলাকে লাকড়ি আহরণকারী বলে অপমানজনক উপাধী দিয়ে উপহাস করেছেন। আবার সাঈদ ইবনে জুবাইর বলেন, আয়াতের অর্থ "গোনাহের বোঝা বহনকারিনী"। [কুরতুবী, ইবন কাসীর]

৫. তার গলায়[১] পাকানো রশি[২]। | فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۝

(১) তার গলার জন্য 'জীদ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী ভাষায় গলাকে জীদ বলা হয়। পরবর্তীতে যে গলায় অলংকার পরানো হয়েছে তার জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। [আত-তাহরীর ওয়াত-তানওয়ীর] সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব্ বলেন, সে একটি অতি মূল্যবান হার গলায় পরতো এবং বলতো, লাত ও উয্যার কসম, এ হার বিক্রি করে আমি এর মূল্য বাবদ পাওয়া সমস্ত অর্থ মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক কাজ করার জন্য ব্যয় করবো। [ইবন কাসীর] এ কারনে জীদ শব্দটি এখানে ব্যবহার করা হয়েছে ব্যাঙ্গার্থে। অর্থাৎ এ অলংকার পরিহিত সুসজ্জিত গলায়, যেখানে পরিহিত হার নিয়ে সে গর্ব করে বেড়ায়, কিয়ামতের দিন সেখানে রশি বাঁধা হবে। [তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

(২) বলা হয়েছে, তার গলায় বাঁধা রশিটি 'মাসাদ' ধরনের। 'মাসাদ' এর অর্থ নির্ণয়ে কয়েকটি মত রয়েছে। তার একটি হচ্ছে, খুব মজবুত করে পাকানো রশিকে 'মাসাদ' বলা হয়। [বাগাওয়ী] দ্বিতীয় বক্তব্য হচ্ছে, খেজুর গাছের (ডালের) ছাল/আঁশ থেকে তৈরি শক্ত পাকানো খসখসে রশি 'মাসাদ' নামে পরিচিত। [মুয়াস্সার] এর আরেকটি অর্থ, খেজুরের ডালের গোড়ার দিকের মোটা অংশ থেঁতলে যে সরু আঁশ পাওয়া যায় তা দিয়ে পাকানো রশি অথবা উটের চামড়া বা পশম দিয়ে তৈরি রশি। [কুরতুবী] মুজাহিদ রাহেমাহুল্লাহ বলেন, এর অর্থ লোহার তারের পাকানো রশি বা লোহার বেড়ি। কোন কোন মুফাসসির বলেন, তার গলায় আগুনের রশি পরানো হবে। তা তাকে তুলে আগুনের প্রান্তে উঠাবে আবার তাকে এর গর্তদেশে নিক্ষেপ করবে। এভাবে তার শাস্তি চলতে থাকবে। [ইবন কাসীর]

১১২- সূরা আল-ইখ্‌লাস্[১]
৪ আয়াত, মক্কী

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(১) এ সূরার বহু ফযীলত রয়েছে। তন্মধ্যে নিম্নে কয়েকটির উল্লেখ করা হলোঃ
এক. এর ভালবাসা জান্নাতে যাওয়ার কারণ; হাদীসে এসেছে, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এসে আরয করল: আমি এই সূরাটি খুব ভালবাসি। তিনি বললেন: এর ভালবাসা তোমাকে জান্নাতে দাখিল করবে। [মুসনাদে আহমাদ: ৩/১৪১, ১৫০]
দুই. এটি কুরআনের এক তৃতীয়াংশ। হাদীসে এসেছে, একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: তোমরা সবাই একত্রিত হয়ে যাও। আমি তোমাদেরকে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ শুনাব। অতঃপর যাদের পক্ষে সম্ভব ছিল, তারা একত্রিত হয়ে গেলে তিনি আগমন করলেন এবং সূরা এখলাস পাঠ করে শুনালেন। তিনি আরও বললেন, এই সূরাটি কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান। [মুসলিম: ৮১২, তিরমিযী: ২৯০০] এ অর্থে হাদীসের সংখ্যা অসংখ্য।
তিন. বিপদাপদে উপকারী। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি সকাল-বিকাল সূরা এখলাস, ফালাক ও নাস পাঠ করে তা তাকে বালা-মুসীবত থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে যথেষ্ট হয়। [আবু দাউদ: ৫০৮২, তিরমিযী: ৩৫৭৫, নাসায়ী: ৭৮৫২]
চার. ঘুমানোর আগে পড়ার উপর গুরুত্ব। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, হে উকবা ইবনে আমের আমি কি তোমাকে এমন তিনটি উত্তম সূরা শিক্ষা দিব না যার মত কিছু তাওরাত, ইঞ্জীল, যাবূর এবং কুরআনেও নাযিল হয়নি। উকবা বললেন, আমি বললাম, অবশ্যই হ্যাঁ, আল্লাহ্ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন। উকবা বলেন, তারপর রাসূল আমাকে 'কুল হুয়াল্লাহু আহাদ, কুল আ'উযু বিরাব্বিল ফালাক, কুল আ'উযু বিরাব্বিন নাস' এ সূরাগুলো পড়ালেন, তারপর বললেন, হে উকবা! রাত্রিতে তুমি ততক্ষণ নিদ্রা যেয়ো না, যতক্ষণ সূরা এখলাস, ফালাক ও নাস না পাঠ কর। উকবা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন: সেদিন থেকে আমি কখনও এই আমল ছাড়িনি। [মুসনাদে আহমাদ: ৪/১৪৮, ১৫৮-১৫৯]
পাঁচ. এ সূরা পড়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিয়মিত আমল ছিল। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বিছানায় ঘুমানোর জন্য যেতেন তখন তিনি তার দু হাতের তালু একত্রিত করতেন তারপর সেখানে কুল হুয়াল্লাহু আহাদ, কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক এবং কুল আউযু বিরাব্বিন নাস' এ তিন সূরা পড়ে ফুঁ দিতেন, তারপর এ দু' হাতের তালু দিয়ে তার শরীরের যতটুকু সম্ভব মসেহ করতেন। তার মাথা ও মুখ থেকে শুরু করে শরীরের সামনের অংশে তা করতেন। এমনটি রাসূল তিনবার করতেন। [বুখারী: ৫০১৭, আবু দাউদ: ৫০৫৬, তিরমিযী: ৩৪০২]

১. বলুন(১), 'তিনি আল্লাহ্, এক-অদ্বিতীয়(২), قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ﴿١﴾

২. 'আল্লাহ্ হচ্ছেন 'সামাদ'(৩) (তিনি اَللّٰهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾

(১) বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে যে, মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ্ তা'আলার বংশপরিচয় জিজ্ঞেস করেছিল, যার জওয়াবে এই সূরা নাযিল হয়। [তিরমিযী: ৩৩৬৪, মুসনাদে আহমাদ: ৫/১৩৪, মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৫৪০] কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, মুশরিকরা আরও প্রশ্ন করেছিল– আল্লাহ তা'আলা কিসের তৈরী, স্বর্ণরৌপ্য অথবা অন্য কিছুর? এর জওয়াবে সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছে। [আস-সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ী: ৬/৩৭০, তাবরানী: মু'জামুল আওসাত: ৩/৯৬, মুসনাদে আবি ইয়া'লা: ৬/১৮৩, নং-৩৪৬৮, আদ-দিনাওয়ারী: আল-মুজালাসা ও জাওয়াহিরুল ইলম, ৩/৫২৮, নং ১১৪৫] এখানে 'বলুন' শব্দটির মাধ্যমে প্রথমত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে। কারণ তাকেই প্রশ্ন করা হয়েছিল আপনার রব কে? তিনি কেমন? আবার তাকেই হুকুম দেয়া হয়েছিল, প্রশ্নের জবাবে আপনি একথা বলুন। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তিরোধানের পর এ সম্বোধনটি প্রত্যেক মুমিনের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে কথা বলার হুকুম দেয়া হয়েছিল এখন সে কথা প্রত্যেক মুমিনকেই বলতে হবে।

(২) এ বাক্যটির অর্থ হচ্ছে, তিনি (যাঁর সম্পর্কে তোমরা প্রশ্ন করছো) আল্লাহ, একক-অদ্বিতীয়। তাঁর কোন সমকক্ষ, সদৃশ, স্ত্রী, সন্তান, অংশীদার কিছুই নেই। একত্ব তাঁরই মাঝে নিহিত। তাই তিনি পূর্ণতার অধিকারী, অদ্বিতীয়-এক। সুন্দর নামসমূহ, পূর্ণ শ্রেষ্ঠ গুণাবলী এককভাবে শুধুমাত্র তাঁরই। [কুরতুবী, সা'দী] আর أحد শব্দটি একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কারও ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, কেননা তিনিই গুণাবলী ও কার্যাবলীতে একমাত্র পরিপূর্ণ সত্তা। [ইবন কাছীর] মোটকথা, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর সত্তা ও গুণাবলীতে একক, তার কোন সমকক্ষ, শরীক নেই। এ সূরার শেষ আয়াত "আর তাঁর সমতূল্য কেউ নেই" দ্বারা তিনি এর ব্যাখ্যা করেছেন। মূলত সমগ্র কুরআন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত এমনকি সকল নবী-রাসূলদের রিসালাতের আগমন হয়েছিলো এ একত্ব ঘোষণা ও প্রতিষ্ঠার জন্যই। আল্লাহ ব্যতীত কোন হক মাবুদ বা ইলাহ নেই- সমগ্র সৃষ্টিজগতেই রয়েছে এর পরিচয়, আল্লাহ্র একত্বের পরিচয়। কুরআনে অগণিত আয়াতে এ কথাটির প্রমাণ ও যুক্তি রয়েছে। [আদ্‌ওয়াউল বায়ান]

(৩) صمد শব্দের অর্থ সম্পর্কে তাফসীরবিদগণের অনেক উক্তি আছে। আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু, ইকরামা বলেছেন: সামাদ হচ্ছেন এমন এক সত্তা যাঁর কাছে সবাই তাদের প্রয়োজন পূরণের জন্য পেশ করে থাকে। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও আবু ওয়ায়েল শাকীক ইবনে সালামাহ বলেছেন, তিনি এমন সরদার, নেতা, যাঁর নেতৃত্ব পূর্ণতা লাভ

করেছে এবং চুড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, যে সরদার তার নেতৃত্ব, মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব, ধৈর্য, সংযম, জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা তথা শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার সমস্ত গুণাবলিতে সম্পূর্ণ পূর্ণতার অধিকারী তিনি সামাদ। যায়েদ ইবন আসলাম বলেন, এর অর্থ, নেতা। হাসান ও কাতাদা বলেন, এর অর্থ, যিনি তার সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে গেলেও অবশিষ্ট থাকবেন। হাসান থেকে অন্য বর্ণনায়, তিনি ঐ সত্বা, যিনি চিরঞ্জীব ও সবকিছুর ধারক, যার কোন পতন নেই। অন্য বর্ণনায় ইকরিমা বলেন, যার থেকে কোন কিছু বের হয়নি এবং যিনি খাবার গ্রহণ করেন না। রবী ইবন আনাস বলেন, যিনি জন্ম গ্রহণ করেননি এবং জন্ম দেননি। সম্ভবত তিনি পরবর্তী আয়াতকে এ আয়াতের তাফসীর হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। তবে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব, মুজাহিদ, ইবন বুরাইদা, আতা, দাহহাক সহ আরো অনেকে এর অর্থ বলেছেন, যার কোন উদর নেই। শা'বী বলেন, এর অর্থ যিনি খাবার খান না এবং পানীয় গ্রহণ করেন না। আব্দুল্লাহ ইবন বুরাইদাহ বলেন, এর অর্থ, যিনি এমন আলো যা চকচক করে। এ বর্ণনাগুলো ইমাম ইবন জারীর আত-তাবারী, ইবন আবী হাতেম, বাইহাকী, তাবারানী প্রমূখগণ সনদসহ বর্ণনা করেছেন। [দেখুন, তাবারী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

বস্তুত: উপরে বর্ণিত অর্থগুলোর সবই নির্ভুল। এর মানে হচ্ছে, আসল ও প্রকৃত সামাদ হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ। সৃষ্টি যদি কোন দিক দিয়ে সামাদ হয়ে থাকে তাহলে অন্য দিক দিয়ে তা সামাদ নয় কারণ তা অবিনশ্বর নয় একদিন তার বিনাশ হবে। কোন কোন সৃষ্টি তার মুখাপেক্ষী হলেও সে নিজেও আবার কারো মুখাপেক্ষী। তার নেতৃত্ব আপেক্ষিক, নিরংকুশ নয়। কারো তুলনায় সে শ্রেষ্ঠতম হলেও তার তুলনায় আবার অন্য কেউ আছে শ্রেষ্ঠতম। কিছু সৃষ্টির কিছু প্রয়োজন সে পূর্ণ করতে পারে কিন্তু সবার সমস্ত প্রয়োজন পূর্ণ করার ক্ষমতা কোন সৃষ্টির নেই। বিপরীতপক্ষে আল্লাহর সামাদ হবার গুণ অর্থাৎ তাঁর মুখাপেক্ষীহীনতার গুণ সবদিক দিয়েই পরিপূর্ণ। সারা দুনিয়া তাঁর মুখাপেক্ষী তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। দুনিয়ার প্রত্যেকটি জিনিস নিজের অস্তিত্ব, স্থায়ীত্ব এবং প্রয়োজন ও অভাব পূরণের জন্য সচেতন ও অবচেতনভাবে তাঁরই শরণাপন্ন হয়। তিনিই তাদের সবার প্রয়োজন পূর্ণ করেন। তিনি অমর, অজয়, অক্ষয়। তিনি রিযিক দেন, নেন না। সমগ্র বিশ্ব জাহানের ওপর তাঁর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ। তাই তিনি "আস-সামাদ।" অর্থাৎ তিনিই একমাত্র সত্তা যিনি অমুখাপেক্ষিতার গুণাবলীর সাথে পুরোপুরি সংযুক্ত। আবার যেহেতু তিনি "আস-সামাদ" তাই তাঁর একাকী ও স্বজনবিহীন হওয়া অপরিহার্য। কারণ এ ধরনের সত্তা একজনই হতে পারেন, যিনি কারো কাছে নিজের অভাব পূরণের জন্য হাত পাতেন না, বরং সবাই নিজেদের অভাব পূরণের জন্য তাঁর মুখাপেক্ষী হয়। দুই বা তার চেয়ে বেশী সত্তা সবার প্রতি অমুখাপেক্ষী ও অনির্ভরশীল এবং সবার প্রয়োজন পূরণকারী হতে পারে না। তাছাড়া তাঁর "আস-সামাদ" হবার কারণে তাঁর একক মাবুদ হবার

কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী);

৩. 'তিনি কাউকেও জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি[১],

لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝

৪. 'এবং তাঁর সমতুল্য কেউই নেই[২] ।'

وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝

ব্যাপারটিও অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কারণ মানুষ যার মুখাপেক্ষী হয় তারই ইবাদাত করে। আবার তিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই, "আস-সামাদ" হবার কারণে এটাও অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কারণ, যে প্রয়োজন পূরণ করার ক্ষমতা ও সামর্থই রাখে না, কোন সচেতন ব্যক্তি তার ইবাদাত করতে পারে না। এভাবে আমরা উপরোক্ত অর্থগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে পারি।

(১) যারা আল্লাহর বংশ পরিচয় জিজ্ঞেস করেছিল, এটা তাদের জওয়াব। সন্তান প্রজনন সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য– স্রষ্টার নয়। অতএব, তিনি কারও সন্তান নন এবং তাঁর কোন সন্তান নেই। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহ্ বলেন, "আদম সন্তান আমার উপর মিথ্যারোপ করে অথচ এটা তার জন্য উচিত নয়। আর আমাকে গালি দেয়, এটাও তার জন্য উচিত নয়। তার মিথ্যারোপ হচ্ছে, সে বলে আমাকে যেভাবে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন সেভাবে তিনি কখনও আমাকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন না। অথচ দ্বিতীয় সৃষ্টি প্রথম সৃষ্টির চেয়ে কোনভাবেই কঠিন নয়। আর আমাকে গালি দেয়ার ব্যাপারটি হলো, সে বলে আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন অথচ আমি একক, সামাদ, জন্মগ্রহণ করিনি এবং কাউকে জন্মও দেইনি। আর কেউই আমার সমকক্ষ নেই।" [বুখারী: ৪৯৭৪]

(২) মূলে বলা হয়েছে 'কুফূ'। এর মানে হচ্ছে, নজীর, সদৃশ, সমান, সমমর্যাদা সম্পন্ন ও সমতুল্য। আয়াতের মানে হচ্ছে, সারা বিশ্ব-জাহানে আল্লাহর সমকক্ষ অথবা তাঁর সমমর্যদাসম্পন্ন কিংবা নিজের গুণাবলী, কর্ম ও ক্ষমতার ব্যাপারে তাঁর সমান পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে এমন কেউ কোন দিন ছিল না এবং কোন দিন হতেও পারবে না এবং আকার-আকৃতিতেও কেউ তাঁর সাথে সামঞ্জস্য রাখে না। এক হাদীসে এসেছে, বুরাইদাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মসজিদে প্রবেশ করে দেখলেন এক লোক সালাত আদায় করছে এবং বলছে, اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ بِأَنِّيْ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، الأَحَدُ الصَّمَدُ، الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ এটা শুনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ করে বলছি, এ লোকটি আল্লাহকে তাঁর এমন মহান নামে ডাকল যার অসীলায় চাইলে তিনি প্রদান করেন। আর যার দ্বারা দো'আ করলে তিনি কবুল করেন" [আবু দাউদ: ১৪৯৩, তিরমিযী: ৩৪৭৫, ইবনে মাজাহ: ৩৮৫৭, মুসনাদে আহমাদ: ৫/৩৫০] মুশরিকরা প্রতি যুগে মাবুদদের ব্যাপারে এ ধারণা পোষণ

করে এসেছে যে, মানুষের মতো তাদেরও একটি জাতি বা শ্রেণী আছে। তার সদস্য সংখ্যাও অনেক। তাদের মধ্যে বিয়ে-শাদী এবং বংশ বিস্তারের কাজও চলে। তারা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকেও এ জাহেলী ধারণা মুক্ত রাখেনি। তাঁর জন্য সন্তান সন্ততিও ঠিক করে নিয়েছে। তারা ফেরেশতাদেরকে মহান আল্লাহর কন্যা গণ্য করতো। যদিও তাদের কেউ কাউকে আল্লাহর পিতা গণ্য করার সাহস করেনি। কিন্তু তারা তাদের কোন কোন ব্যক্তি বা নবীকে আল্লাহ্‌র সন্তান মনে করতে দ্বিধা করেনি। এ সবের উত্তরেই এ সূরায় বলা হয়েছে, তিনি কাউকে জন্ম দেননি আর তাকেও কেউ জন্ম দেয়নি। যদিও মহান আল্লাহকে “আহাদ” ও “আস-সামাদ” বললে এসব উদ্ভট ধারণা–কল্পনার মুলে কুঠারাঘাত করা হয়, তবুও এরপর “না তাঁর কোন সন্তান আছে, না তিনি কারো সন্তান” একথা বলায় এ ব্যাপারে আর কোন প্রকার সংশয় সন্দেহের অবকাশই থাকে না। তারপর যেহেতু আল্লাহর মহান সত্তা সম্পর্কে এ ধরনের ধারণা-কল্পনা শিরকের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলোর অন্তর্ভুক্ত, তাই মহান আল্লাহ শুধুমাত্র সূরা ইখলাসেই এগুলোর দ্ব্যর্থহীন ও চূড়ান্ত প্রতিবাদ করেই ক্ষান্ত হননি, বরং বিভিন্ন জায়গায় এ বিষয়টিকে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন। এভাবে লোকেরা সত্যকে পুরোপুরি বুঝতে সক্ষম হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ নীচের আয়াতগুলো পর্যালোচনা করা যেতে পারে, “আল্লাহ ই হচ্ছেন একমাত্র ইলাহ। কেউ তাঁর পুত্র হবে, এ অবস্থা থেকে তিনি মুক্ত-পাক-পবিত্র। যা কিছু, আকাশসমূহের মধ্যে এবং যা কিছু যমীনের মধ্যে আছে, সবই তার মালিকানাধীন।” [সূরা আন-নিসা: ১৭১] “জেনে রাখো, এরা যে বলছে আল্লাহর সন্তান আছে, এটা এদের নিজেদের মনগড়া কথা। আসলে এটি একটি ডাহা মিথ্যা কথা।” [সূরা আস-সাফ্‌ফাত: ১৫১-১৫২] “তারা আল্লাহ ও ফেরেশতাদের মধ্যে বংশীয় সম্পর্কে তৈরি করে নিয়েছে অথচ ফেরেশতারা ভালো করেই জানে এরা (অপরাধী হিসেবে) উপস্থাপিত হবে।” [সূরা আস-সাফফাত: ১৮৫] “লোকেরা তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে কাউকে তাঁর অংশ বনিয়ে ফেলেছে। আসলে মানুষ স্পষ্ট অকৃতজ্ঞ।” [সূরা আয-যুখরুফ: ১৫] “আর লোকেরা জিনদেরকে আল্লাহর শরীক বানিয়েছে। অথচ তিনি তাদের স্রষ্টা। আর তারা না জেনে বুঝে তাঁর জন্য পুত্র-কণ্যা বানিয়ে নিয়েছে। অথচ তারা যে সমস্ত কথা বলে তা থেকে তিনি মুক্ত ও পবিত্র এবং তার উর্ধে তিনি অবস্থান করছেন। তিনি তো আকাশসমূহ ও পৃথিবীর নির্মাতা। তাঁর পুত্র কেমন করে হতে পারে যখন তাঁর কোন সঙ্গিনী নেই? তিনি প্রত্যেকটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন।” [সূরা আল-আন‘আম: ১০০-১০১] “আর তারা বললো, দয়াময় আল্লাহ কাউকে পুত্র বানিয়েছেন। তিনি পাক-পবিত্র। বরং (যাদেরকে এরা তাঁর সন্তান বলছে) তারা এমন সব বান্দা যাদেরকে মর্যদা দান করা হয়েছে।” [সূরা আল-আম্বিয়া: ২৬] “লোকেরা বলে দিয়েছে, আল্লাহ কাউকে পুত্র বানিয়েছেন আল্লাহ পাক-পবিত্র! তিনি তো অমুখাপেক্ষী। আকাশসমূহে ও যমীনে যা কিছু আছে সবই তাঁর মালিকানাধীন। এ বক্তব্যের সপক্ষে তোমাদের প্রমাণ কি? তোমরা কি আল্লাহর

সম্পর্কে এমন সব কথা বলছো, যা তোমরা জানো না?" [সূরা ইউনুস: ৬৮] "আর হে নবী! বলে দিন সেই আল্লাহর জন্য সব প্রশংসা যিনি না কাউকে পুত্র বানিয়েছেন না বাদশাহীতে কেউ তাঁর শরীক আর না তিনি অক্ষম, যার ফলে কেউ হবে তাঁর পৃষ্ঠপোষক।" [সূরা আল-ইসরা: **১১১**] যারা আল্লাহর জন্য সন্তান গ্রহণ করার কথা বলে, এ আয়াতগুলোতে সর্বতোভাবে তাদের এহেন আকীদা-বিশ্বাসের প্রতিবাদ করা হয়েছে। এ আয়াতগুলো এবং এ বিষয়বস্তু সম্বলিত অন্য যে সমস্ত আয়াত কুরআনের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যায়, সেগুলো সূরা ইখলাসের অতি চমৎকার ব্যাখ্যা।

১১৩- সূরা আল-ফালাক(১)
৫ আয়াত, মাদানী

(১) সূরা ফালাক ও পরবর্তী সূরা নাস একই সাথে একই ঘটনায় অবতীর্ণ হয়েছে। ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম রাহেমাহুল্লাহ উভয় সূরার তাফসীর একত্রে লিখেছেন। তাতে বলেছেন যে, এ সূরাদ্বয়ের উপকারিতা ও কল্যাণ অপরিসীম এবং মানুষের জন্যে এ দু'টি সূরার প্রয়োজন অত্যধিক। বদনজর এবং সমস্ত দৈহিক ও আত্মিক অনিষ্ট দূর করায় এ সূরাদ্বয়ের কার্যকারিতা অনেক। বলতে গেলে মানুষের জন্যে শ্বাস-প্রশ্বাস, পানাহার ও পোষাক-পরিচ্ছদ যতটুকু প্রয়োজনীয়, এ সূরাদ্বয় তার চেয়ে বেশী প্রয়োজনীয়। সূরা ফালাক-এ দুনিয়াবী বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে। পক্ষান্তরে সূরা আন-নাসে আখেরাতের আপদ ও মুসীবত থেকে আশ্রয় প্রার্থনার প্রতি জোর দেয়া হয়েছে। নির্ভরযোগ্য হাদীসসমূহে এ সূরা এবং সূরা আন-নাস উভয় সূরার অনেক ফযীলত ও বরকত বর্ণিত আছে। উকবা ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমরা লক্ষ্য করেছ কি, অদ্য রাত্রিতে আল্লাহ তা'আলা আমার প্রতি এমন আয়াত নাযিল করেছেন, যার সমতুল্য আয়াত দেখা যায় না; অর্থাৎ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ ও ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ আয়াতসমূহ। [মুসলিম: ৮১৪] অন্য বর্ণনায় আছে, তাওরাত, ইঞ্জীল, যবূর এবং কুরআনেও অনুরূপ অন্য কোন সূরা নেই। [মুসনাদে আহমাদ: ৪/১৪৮, ১৫৮-১৫৯] এক সফরে রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওকবা ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-কে সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করালেন, অতঃপর মাগরিবের সালাতে এ সূরাদ্বয়ই তেলাওয়াত করে বললেন: এই সূরাদ্বয় নিদ্রা যাওয়ার সময় এবং নিদ্রা থেকে গাত্রোত্থানের সময়ও পাঠ করো। [আবু দাউদ: ১৪৬২, মুসনাদে আহমাদ: ৪/১৪৮] অন্য হাদীসে তিনি প্রত্যেক সালাতের পর সূরাদ্বয় পাঠ করার আদেশ করেছেন। [আবু দাউদ:১৫২৩ তিরমিযী: ২৯০৩, নাসায়ী: ১৩৩৬, মুসনাদে আহমাদ:৪/১৫৫] আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলেন, রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন রোগে আক্রান্ত হলে এই সূরাদ্বয় পাঠ করে হাতে ফুঁক দিয়ে সর্বাঙ্গে বুলিয়ে দিতেন। ইন্তেকালের পূর্বে যখন তাঁর রোগযন্ত্রণা বৃদ্ধি পায়, তখন আমি এই সূরাদ্বয় পাঠ করে তাঁর হাতে ফুঁক দিতাম। অতঃপর তিনি নিজে তা সর্বাঙ্গে বুলিয়ে নিতেন। আমার হাত তাঁর পবিত্র হাতের বিকল্প হতে পারতনা। তাই আমি এরূপ করতাম। [বুখারী: ৫০১৬, মুসলিম: ২১৯২] উকবা ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি কি সূরা ইউসুফ ও সূরা হূদ থেকে পড়ব? তিনি বললেন, 'বরং তুমি কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক দিয়ে পড়। কেননা, তুমি এর চেয়ে আল্লাহ্র নিকট প্রিয় ও অধিক অর্থপূর্ণ আর কোন সূরা পড়তে পারবে না। যদি তুমি পার, তবে এ সূরা যেন তোমার থেকে কখনো ছুটে না যায়' [মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৫৪০] সারকথা এই যে, যাবতীয় বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকার জন্যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম এই সূরাদ্বয়ের আমল করতেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۙ﴿١﴾

১. বলুন[১], 'আমি আশ্রয় প্রার্থনা

(১) জনৈক ইয়াহূদী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর জাদু করেছিল। ফলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। জিবরাঈল আগমন করে সংবাদ দিলেন যে, জনৈক ইয়াহূদী জাদু করেছে এবং যে জিনিসে জাদু করা হয়েছে, তা অমুক কূপের মধ্যে আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোক পাঠিয়ে সেই জিনিস কূপ থেকে উদ্ধার করে আনলেন। তাতে কয়েকটি গ্রন্থি ছিল। তিনি গ্রন্থিগুলো খুলে দেয়ার সাথে সাথে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে শয্যা ত্যাগ করেন। জিবরাঈল ইয়াহুদীর নাম বলে দিয়েছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে চিনতেন। কিন্তু তিনি আজীবন এই ইয়াহুদীকে কিছু বলেননি, এমনকি তার উপস্থিতিতে মুখমণ্ডল কোনরূপ অভিযোগের চিহ্নও প্রকাশ করেননি। কপটবিশ্বাসী হওয়ার কারণে ইয়াহূদী রীতিমত দরবারে হাযির হত। [নাসায়ী: আল-কুবরা, ৩৫৪৩, মুসনাদে আহমাদ: ৪/৩৬৭] আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর জনৈক ইয়াহূদী জাদু করলে তার প্রভাবে তিনি মাঝে মাঝে দিশেহারা হয়ে পড়তেন এবং যে কাজটি করেননি, তাও করেছেন বলে অনুভব করতেন। একদিন তিনি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহাকে বললেন, আমার রোগটা কি, আল্লাহ তা'আলা তা আমাকে বলে দিয়েছেন। (স্বপ্নে) দুব্যক্তি আমার কাছে আসল; একজন শিয়রের কাছে এবং অন্যজন পায়ের কাছে বসল। শিয়রের কাছে উপবিষ্ট ব্যক্তি অন্য জনকে বলল, তার অসুখটা কি? অন্যজন বললঃ ইনি জাদুগ্রস্ত। প্রথম ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল: কে জাদু করল? অন্যজন বলল, লাবীদ ইব্‌ন আ'সাম (বনু যুরাইকের এক ইহুদী মুনাফিক ব্যক্তি)। আবার প্রশ্ন হল: কি বস্তুতে জাদু করেছে? উত্তর হল, একটি চিরুনীতে। আবার প্রশ্ন হল, তা কোথায়? উত্তর হল, খেজুর ফলের আবরণীতে 'যরওয়ান' কূপে একটি পাথরের নীচে চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে কূপে গেলেন এবং বললেন, স্বপ্নে আমাকে সেই কূপই দেখানো হয়েছে। অতঃপর বস্তুটি সেখান থেকে বের করে আনলেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বললেন, আপনি ঘোষণা করলেন না কেন? (যে, অমুক ব্যক্তি আমার উপর জাদু করেছে) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে রোগমুক্ত করেছেন। আর মানুষের মাঝে প্রতিক্রিয়া হোক, তা আমি চাইনি। [বুখারী: ৫৭৬৫] তবে এটা মনে রাখা জরুরী যে, জাদুগ্রস্ত হওয়া নবুওয়তের পরিপন্থী নয়। যারা জাদুর স্বরূপ সম্পর্কে অবগত নয়, তারা বিস্মিত হয় যে, আল্লাহর রাসূলের উপর জাদু কিরূপে ক্রিয়াশীল হতে পারে। এখানে এতটুকু জানা জরুরী যে, জাদুর ক্রিয়াও অগ্নি, পানি ইত্যাদি স্বাভাবিক কারণাদির ক্রিয়ার ন্যায়। অগ্নি দহন করে অথবা উত্তপ্ত করে, পানি ঠাণ্ডা করে এবং কোন কোন কারণের পরিপ্রেক্ষিতে জ্বর আনে। এগুলো

করছি[১] ....

সবই স্বাভাবিক ব্যাপার। রাসূলগণ এগুলোর ঊর্ধ্বে নন। জাদুর প্রতিক্রিয়াও এমনি ধরনের একটি ব্যাপার। কাজেই তাদের জাদুগ্রস্ত হওয়া অবাস্তব নয়। [আদ্ওয়াউল বায়ান]

(১) মুমিন ব্যক্তি কোন জিনিসের ভীতি অনুভব করলে তার অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করে। মারইয়াম সম্পর্কে বলা হয়েছে, যখন অকস্মাৎ নির্জনে আল্লাহর ফেরেশতা একজন মানুষের বেশ ধরে তার কাছে এলেন (তিনি তাকে আল্লাহর ফেরেশতা বলে জানতেন না) তখন তিনি বললেন, "যদি তোমার আল্লাহর ভয় থাকে, তাহলে আমি দয়াময় আল্লাহর আশ্রয় চাচ্ছি।" [সূরা মারইয়াম:১৮] নূহ আলাইহিস্ সালাম আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে আবেদন জানালেন, "হে আমার রব! যে জিনিস সম্পর্কে আমার জ্ঞান নেই তেমন কোন জিনিস আপনার কাছে চাওয়া থেকে আমি আপনার পানাহ চাই।" [সূরা হূদ:৪৭] মূসা আলাইহিস্ সালাম যখন বনী ইসরাঈলদের গাভী যবেহ করার হুকুম দিলেন এবং তারা বলল, আপনি কি আমাদের সাথে ঠাট্টা করছেন? তখন তিনি তাদের জবাবে বললেন, "আমি মূর্খ-অজ্ঞদের মতো কথা বলা থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাচ্ছি।" [সূরা আল-বাকারাহ:৬৭] হাদীস গ্রন্থগুলোতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যেসব "তাআউউয" উদ্ধৃত হয়েছে সবগুলো তাও অনুরূপ আল্লাহ্‌র কাছে চাওয়া হয়েছে। যেমন, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দো'আর সময় বলতেন, হে আল্লাহ! আমি যেসব কাজ করেছি এবং যেসব কাজ করিনি তার অনিষ্ট থেকে তোমার পানাহ চাচ্ছি। [মুসলিম: ২৭১৬] অর্থাৎ কোন খারাপ কাজ করে থাকলে তার খারাপ ফল থেকে পানাহ চাই এবং কোন কাজ করা উচিত ছিল কিন্তু তা আমি করিনি, যদি এমন ব্যাপার ঘটে থাকে তাহলে তার অনিষ্ট থেকেও তোমার পানাহ চাই। অথবা যে কাজ করা উচিত নয় কিন্তু তা আমি কখনো করে ফেলবো, এমন সম্ভবনা থাকলে তা থেকেও তোমার আশ্রয় চাই। অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি দো'আ ছিল, "হে আল্লাহ! তোমার যে নিয়ামত আমি লাভ করেছি তা যাতে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে না নেয়া হয়, তোমার কাছ থেকে যে নিরাপত্তা আমি লাভ করেছি তা থেকে যাতে আমাকে বঞ্চিত না করা হয়, তোমার গযব যাতে অকস্মাৎ আমার ওপর আপতিত না হয় সে জন্য এবং তোমার সব ধরনের অসন্তুষ্টি থেকে আমি তোমার আশ্রয় চাচ্ছি"। [মুসলিম: ২৭৩৯] অনুরূপভাবে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলতেন, "যে ইলম উপকারী নয়, যে হৃদয় তোমার ভয়ে ভীত নয়, যে নফস কখনো তৃপ্তি লাভ করে না এবং যে দো'আ কবুল করা হয় না, আমি সেসব থেকে তোমার আশ্রয় চাচ্ছি"। [মুসলিম : ২৭২২] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর কাছে যেভাবে আশ্রয় প্রার্থনা করেছিলেন তা থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে, প্রতিটি বিপদ-

উষার রবের[১]

২. 'তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে[২], مِنۡ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ﴿۲﴾

আপদ ও অনিষ্টকারিতার মোকাবিলায় আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়াটাই মুমিনের কাজ, অন্য কারো কাছে নয়। তাছাড়া আল্লাহর প্রতি বিমুখ ও অনির্ভর হয়ে নিজের ওপর ভরসা করাও তার কাজ নয়।

(১) "ফালাক" শব্দের আসল অর্থ হচ্ছে ফাটানো, চিরে ফেলা বা ভেদ করা। অন্য এক আয়াতে আল্লাহর গুণ ﴿فَالِقُ الْإِصْبَاحِ﴾ [সূরা আল-আন'আম:৯৬] বর্ণনা করা হয়েছে। এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। একটি হল, প্রভাত; রাতের অন্ধকার চিরে প্রভাতের শুভ্রতা বেরিয়ে আসার কারণে এরূপ নামকরণ। কুরআন ব্যাখ্যাদাতাদের বিপুল সংখ্যক অংশ শব্দটির এ অর্থই গ্রহণ করেছেন। ইবনে কাসীর বলেন, এটিই বিশুদ্ধমত, ইমাম বুখারী এ মতটি অবলম্বন করেছেন। "ফালাক" শব্দের আরেকটি অর্থ হচ্ছে সৃষ্টি। [ইবন কাছীর, তাবারী] আবার কোন কোন মুফাসসিরগণ বলেন, এখানে ফালাক বলতে আল্লাহ্ যেসব বস্তু একটি অপরটি থেকে চিরে বা ভেদ করে বের করেছেন, তা সবই উদ্দেশ্য। যেমন, দিবস বের হয় রাতের আবরণ চিরে; বীজের বুক চিরে সব ধরনের গাছ ও উদ্ভিদের অংকুর বের হয়; জমীন থেকে তরু-লতা, ফসল ইত্যাদি বের করা হয়; সব ধরনের প্রাণী মায়ের গর্ভাশয় চিরে অথবা ডিম ফুটে কিংবা অন্য কোন আবরণ ভেদ করে বের হয়; বৃষ্টির ধারা মেঘের স্তর ভেদ করে পৃথিবীতে নামে। ইমাম তাবারী বলেন, আল্লাহ এখানে আয়াতকে অনির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, নির্দিষ্ট কোন অর্থে বেধে দেননি। তাই এখানে ফালাক বলতে যা বুঝায় তার সবই উদ্দেশ্য হবে। [আদ্ওয়াউল বায়ান, তাবারী]

(২) আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম রাহেমাহুল্লাহ বলেন, شر শব্দটি দু'প্রকার বিষয়বস্তুকে শামিল করে– (এক) প্রত্যক্ষ অনিষ্ট ও বিপদ, যা দ্বারা মানুষ সরাসরি কষ্ট পায়, (দুই) যা মুসীবত ও বিপদাপদের কারণ হয়ে থাকে, যেমন কুফর ও শির্ক। কুরআন ও হাদীসে যেসব বস্তু থেকে আশ্রয় চাওয়ার কথা আছে, সেগুলো এই প্রকারদ্বয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সেগুলো হয় নিজেই বিপদ, না হয় কোন বিপদের কারণ।

এখানে লক্ষণীয় যে, আয়াতে বলা হয়েছে, "তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে আল্লাহ্র আশ্রয় চাচ্ছি।" এ বাক্যে অনিষ্টকারিতা সৃষ্টির ব্যাপারটিকে আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত করা হয়নি। বরং সৃষ্টিজগতের সৃষ্টিকে আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে। আর অনিষ্টকারিতাকে সম্পর্কিত করা হয়েছে সৃষ্টির সাথে। অর্থাৎ একথা বলা হয়নি যে, আল্লাহ যে অনিষ্টকারিতাসমূহ সৃষ্টি করেছেন সেগুলো থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। এ থেকে জানা যায়, মহান আল্লাহ কোন সৃষ্টিকে অনিষ্টকারিতার জন্য সৃষ্টি করেননি। বরং তাঁর প্রত্যেকটি কাজ কল্যাণকর এবং কোন না কোন কল্যাণমূলক প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্যই হয়ে থাকে। তবে সৃষ্টির মধ্যে তিনি

৩. ‘আর অনিষ্ট হতে রাতের অন্ধকারের, যখন তা গভীর হয়,[১]

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿٣﴾

৪. ‘আর অনিষ্ট হতে সমস্ত নারীদের, যারা গিরায় ফুঁক দেয়,[২]

وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ ﴿٤﴾

যেসব গুণ সমাহিত করে রেখেছেন, যেগুলো তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজন, সেগুলো থেকে অনেক সময় এবং অনেক ধরনের সৃষ্টি থেকে প্রায়ই অনিষ্টকারিতার প্রকাশ ঘটে। [বাদায়ে‘উল ফাওয়ায়িদ: ২/৪৩৬]

(১) পূর্বোক্ত আয়াতের ভাষায় সমগ্র সৃষ্টির অনিষ্টই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কাজেই আশ্রয় গ্রহণের জন্যে এ বাক্যটিই যথেষ্ট ছিল, কিন্তু এস্থলে আরও তিনটি বিষয় আলাদা করে উল্লেখ করা হয়েছে, যা প্রায়ই বিপদ ও মুসীবতের কারণ হয়ে থাকে। প্রথমে বলা হয়েছে, ﴿وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ﴾ এখানে غسق শব্দের অর্থ অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়া। কোন কোন মুফাসসির এর অর্থ নিয়েছেন রাত্রি। وقب এর অর্থ অন্ধকার পূর্ণরূপে বৃদ্ধি পাওয়া বা ছেয়ে যাওয়া। আয়াতের অর্থ এই যে, আমি আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাই রাত্রির অনিষ্ট থেকে, যখন তার অন্ধকার গভীর হয়। রাতের অন্ধকারের অনিষ্টকারিতা থেকে বিশেষ করে পানাহ চাওয়ার নির্দেশ দেবার কারণ হচ্ছে এই যে, রাত্রিবেলায় জিন, শয়তান, ইতরপ্রাণী কীট-পতঙ্গ ও চোর-ডাকাত বিচরণ করে এবং অপকার করতে পারে। তাই রাতের বেলা যেসব অনিষ্টকারিতা ও বিপদ-আপদ নাযিল হয় সেগুলো থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়ার হুকুম দেয়া হয়েছে। [আদ্‌ওয়াউল বায়ান, সা’দী] সহীহ হাদীসে এসেছে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বলেন, এক রাতে আকাশে চাঁদ ঝলমল করছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার হাত ধরে তার দিকে ইশারা করে বললেন, আল্লাহর কাছে পানাহ চাও: هٰذَا الغَاسِقُ إِذَا وَقَبَ অর্থাৎ এ হচ্ছে সেই গাসেক ইযা ওয়াকাব [মুসনাদে আহমাদ: ৬/৬১, তিরমিযী: ৩৩৬৬]। চাঁদের উদয় যেহেতু রাতের বেলায়ই হয়ে থাকে এবং দিনের বেলা চাঁদ আকাশের গায়ে থাকলেও উজ্জ্বল থাকে না, তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উক্তির অর্থ হচ্ছে এর (অর্থাৎ চাঁদের) আগমনের সময় অর্থাৎ রাত থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাও [ইবন কাছীর]। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “যখন সূর্য ডুবে যায়, তখন শয়তানরা সবদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কাজেই শিশুদেরকে তখন ঘরের মধ্যে রাখো এবং নিজেদের গৃহপালিত পশুগুলোও বেঁধে রাখো যতক্ষণ রাতের আঁধার খতম না হয়ে যায়।” [বুখারী: ৩২৮০, ৩৩১৬, মুসলিম: ২০১২]।

(২) দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে, ﴿وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ﴾ এখানে نفث এর অর্থ ফুঁ দেয়া। عُقَد শব্দটি عقدة এর বহুবচন। অর্থ গ্রন্থি। যারা জাদু করে, তারা ডোর ইত্যাদিতে গিরা লাগিয়ে তাতে জাদুর মন্ত্র পড়ে ফুঁ দেয়। এখানে نَفَّاثَاتِ স্ত্রী লিঙ্গ ব্যবহার করা হয়েছে। বাহ্যত এটি নারীর বিশেষণ। এটি খারাপ আত্মাকেও বুঝাতে পারে। তখন অর্থ হবে ফুঁকদানকারী খারাপ আত্মা থেকে আমি আশ্রয় চাচ্ছি। আবার এটা ফুঁ দানকারীদের সমষ্টিকেও

৫. ‘আর অনিষ্ট হতে হিংসুকের(১), যখন সে হিংসা করে(২) ।’

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۝٥

নির্দেশ করতে পারে, যাতে পুরুষ ও নারী উভয়ই দাখিল আছে ।[আদওয়াউল বায়ান, ফাতহুল কাদীর]

(১) তৃতীয় বিষয় হচ্ছে, حسد যার শাব্দিক অর্থ হিংসা । হিংসার মানে হচ্ছে, কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ যে অনুগ্রহ, শ্রেষ্ঠত্ব বা গুণাবলী দান করেছে তা দেখে কোন ব্যাক্তি নিজের মধ্যে জ্বালা অনুভব করে এবং তার থেকে ওগুলো ছিনিয়ে নিয়ে এ দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দেয়া হোক, অথবা কমপক্ষে তার থেকে সেগুলো অবশ্যি ছিনিয়ে নেয়া হোক- এ আশা করা । তবে কোন ব্যক্তি যদি আশা করে অন্যের প্রতি যে অনুগ্রহ করা হয়েছে তার প্রতিও তাই করা হোক, তাহলে এটাকে হিংসার সংজ্ঞায় ফেলা যায় না । সুতরাং, হিংসার মূল হলো, কারও নেয়ামত ও সুখ দেখে দগ্ধ হওয়া ও সে নেয়ামতের অবসান কামনা করা । হিংসার কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর ইহুদীরা জাদু করেছিল, হত্যার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল । তাছাড়া ইহুদী, মুশরিক ও মুনাফিকরা মুসলিমদের ইসলামের নেয়ামত পাওয়া দেখে হিংসার অনলে দগ্ধ হত । তাই এ সূরা যেন কুরআনের শেষের দিকে এসেছে মুসলমানদেরকে তাদের নেয়ামত এবং এ নেয়ামতের কারণে তাদের প্রতি হিংসুকদের হিংসা করার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্যেই এসেছে । [আদ্ওয়াউল বায়ান] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি হিংসা পোষনকারীর সংখ্যা জগতে অনেক । এ কারণেও বিশেষভাবে হিংসা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ ব্যাপারে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে । [তাবারী] এই হিংসা হারাম ও মহাপাপ । এটাই আকাশে কৃত সর্বপ্রথম গোনাহ এবং এটাই পৃথিবীতে কৃত সর্বপ্রথম গোনাহ । আকাশে ইবলীস আদম আলাইহিস্ সালাম এর প্রতি এবং পৃথিবীতে আদমপুত্র তার ভাইয়ের প্রতি হিংসা করেছিল । [কুরতুবী]

(২) এখানে বলা হয়েছে, ‘হিংসুক যখন হিংসা করে’ অর্থাৎ তার মনের আগুন নিভাবার জন্য নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে কোন পদক্ষেপ নেয়, তার হিংসাকে প্রকাশ করে, সেই অবস্থায় তার অনিষ্টকারিতা থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া হয়েছে । [ফাতহুল কাদীর]

১১৪- সূরা আন-নাস
৬ আয়াত, মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

।। **রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে** ।।

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ﴿١﴾

১. বলুন, 'আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি মানুষের রবের,

مَلِكِ النَّاسِ ۙ﴿٢﴾

২. 'মানুষের অধিপতির,

اِلٰهِ النَّاسِ ۙ﴿٣﴾

৩. 'মানুষের ইলাহের কাছে,(১)

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ۙ﴿٤﴾

৪. আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার(২) অনিষ্ট হতে,

الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۙ﴿٥﴾

৫. 'যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে,

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿٦﴾

৬. 'জিনের মধ্য থেকে এবং মানুষের মধ্য থেকে(৩) ।'

---

(১) এখানে রব, মালিক এবং ইলাহ এ তিনটি গুণের অধিকারীর নিকট আশ্রয় চাওয়া হয়েছে। আল্লাহ রব, মালিক বা অধিপতি, মাবুদ সবই। সব কিছুই তাঁর সৃষ্টি, তাঁর মালিকানাধীন, তাঁর বান্দা। তাই আশ্রয়প্রার্থনকারীকে এ তিনটি গুণে গুণান্বিত মহান আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। [ইবন কাসীর]

(২) এখানে কুমন্ত্রণাদাতা বলতে মানুষের সাথে নিয়োগকৃত শয়তানের কথা বলা হয়েছে, যে সঙ্গী তাকে খারাপ কাজ করাতে চেষ্টার ত্রুটি রাখে না। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের প্রত্যেকের সাথেই একজন শয়তান সঙ্গী নিয়োগ করা হয়েছে। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার সাথেও? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তবে আল্লাহ আমাকে তার উপর নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করেছেন ফলে তার থেকে আমি নিরাপদ হয়েছি এবং সে আমাকে শুধুমাত্র ভাল কাজের কথাই বলে।" [মুসলিম: ২৮১৪]।

(৩) এখানে দুটি অর্থ হতে পারে। প্রথমটি হল, শয়তান জিন ও মানুষ-উভয় প্রকার মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়। এ অর্থে এখানে ناس বলে জিন ও মানুষ সকলকে বুঝানো হয়েছে। দ্বিতীয় মতটি হল: কুমন্ত্রণাদাতা শয়তান জিনদের মধ্য থেকেও হয়, মানুষের মধ্য থেকেও হয়। এ মতটিই শক্তিশালী। [ইবন কাছীর] অতএব সারমর্ম এই দাঁড়াল যে, আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলকে তাঁর আশ্রয় প্রার্থনার শিক্ষা দিয়েছেন জিন-শয়তানের অনিষ্ট থেকে এবং মানুষ-শয়তানের অনিষ্ট থেকে। জিন-শয়তানের কুমন্ত্রণা হল অলক্ষ্যে থেকে মানুষের অন্তরে কোন কথা রাখা। শয়তান যেমন মানুষের

মনে কুমন্ত্রণা দেয়, তেমনিভাবে মানুষের নফসও মানুষকে কুমন্ত্রণা দিয়ে থাকে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপন নফসের অনিষ্ট থেকেও আশ্রয় প্রার্থনা শিক্ষা দিয়েছেন। হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "হে আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় চাই, আমার নফসের অনিষ্ট থেকে, শয়তানের অনিষ্ট থেকেও এবং তার শির্ক (বা জাল) থেকেও।" [আবু দাউদ: ৫০৬৭, তিরমিযী: ৩৩৯২, মুসনাদে আহমাদ: ১/৯]

فهرس بأسماء السور وبيان المكي والمدني منها

মাক্কী ও মাদানীর বর্ণনাসহ সূরাসমূহের নামের তালিকা

ক্রমিক নং	সূরার নাম	পৃষ্ঠা নং		السورة
১৭	সূরা বনী-ইসরাঈল	১৪৬৫	মাক্কী	سورة بني إسرائيل
১৮	সূরা আল-কাহ্ফ	১৫৩৭	মাক্কী	سورة الكهف
১৯	সূরা মার্ইয়াম	১৫৯৭	মাক্কী	سورة مريم
২০	সূরা ত্বা-হা	১৬৩৫	মাক্কী	سورة طه
২১	সূরা আল-আম্বিয়া’	১৬৮৯	মাক্কী	سورة الأنبياء
২২	সূরা আল-হাজ্জ	১৭৩৭	মাদানী	سورة الحج
২৩	সূরা আল-মুমিনূন	১৮০৩	মাক্কী	سورة المؤمنون
২৪	সূরা আন্-নূর	১৮৪৬	মাদানী	سورة النور
২৫	সূরা আল-ফুরকান	১৯০৩	মাক্কী	سورة الفرقان
২৬	সূরা আশ-শু‘আরা’	১৯২৫	মাক্কী	سورة الشعراء
২৭	সূরা আন-নাম্ল	১৯৫৫	মাক্কী	سورة النمل
২৮	সূরা আল-কাসাস	২০০৪	মাক্কী	سورة القصص
২৯	সূরা আল-‘আনকাবূত	২০৪৩	মাক্কী	سورة العنكبوت
৩০	সূরা আর-রূম	২০৮৩	মাক্কী	سورة الروم
৩১	সূরা লুকমান	২১০৮	মাক্কী	سورة لقمان
৩২	সূরা আস-সাজ্দাহ	২১২৯	মাক্কী	سورة السجدة
৩৩	সূরা আল-আহ্যাব	২১৩৯	মাদানী	سورة الأحزاب
৩৪	সূরা সাবা	২১৭৪	মাক্কী	سورة سبإ
৩৫	সূরা ফাতির	২১৯৩	মাক্কী	سورة فاطر
৩৬	সূরা ইয়াসীন	২২১৩	মাক্কী	سورة يس
৩৭	সূরা আস-সাফ্ফাত	২২৩৬	মাক্কী	سورة الصافات
৩৮	সূরা সোয়াদ	২২৬০	মাক্কী	سورة ص
৩৯	সূরা আয-যুমার	২২৮২	মাক্কী	سورة الزمر
৪০	সূরা আল-মু’মিন	২৩০৬	মাক্কী	سورة المؤمن
৪১	সূরা হা-মীম আস-সাজদাহ্	২৩৩০	মাক্কী	سورة حم السجدة
৪২	সূরা আশ-শূরা	২৩৫০	মাক্কী	سورة الشورى
৪৩	সূরা আয-যুখ্রুফ	২৩৬৯	মাক্কী	سورة الزخرف

ক্রমিক নং	সূরার নাম	পৃষ্ঠা নং		السورة
৪৪	সূরা আদ-দুখান	২৩৮৬	মাক্কী	سورة الدخان
৪৫	সূরা আল-জাসিয়াহ	২৩৯৭	মাক্কী	سورة الجاثية
৪৬	সূরা আল-আহ্কাফ	২৪০৬	মাক্কী	سورة الأحقاف
৪৭	সূরা মুহাম্মাদ	২৪২১	মাদানী	سورة محمد
৪৮	সূরা আল-ফাত্হ্	২৪৩৩	মাদানী	سورة الفتح
৪৯	সূরা আল-হুজুরাত	২৪৪৭	মাদানী	سورة الحجرات
৫০	সূরা ক্বাফ্	২৪৫৮	মাক্কী	سورة ق
৫১	সূরা আয-যারিয়াত	২৪৬৯	মাক্কী	سورة الذاريات
৫২	সূরা আত-তূর	২৪৮২	মাক্কী	سورة الطور
৫৩	সূরা আন-নাজ্ম	২৪৯৩	মাক্কী	سورة النجم
৫৪	সূরা আল-কামার	২৫১০	মাক্কী	سورة القمر
৫৫	সূরা আর-রাহ্মান	২৫২৪	মাদানী	سورة الرحمن
৫৬	সূরা আল-ওয়াকি‘আহ্	২৫৪২	মাক্কী	سورة الواقعة
৫৭	সূরা আল-হাদীদ	২৫৬৮	মাদানী	سورة الحديد
৫৮	সূরা আল-মুজাদালাহ্	২৫৮৯	মাদানী	سورة المجادلة
৫৯	সূরা আল-হাশ্র	২৬০২	মাদানী	سورة الحشر
৬০	সূরা আল-মুম্তাহিনাহ্	২৬১৫	মাদানী	سورة الممتحنة
৬১	সূরা আস-সাফ্ফ	২৬২৬	মাদানী	سورة الصف
৬২	সূরা আল-জুমু‘আহ্	২৬৩১	মাদানী	سورة الجمعة
৬৩	সূরা আল-মুনাফিকূন	২৬৩৮	মাদানী	سورة المنافقون
৬৪	সূরা আত-তাগাবুন	২৬৪৫	মাদানী	سورة التغابن
৬৫	সূরা আত-তালাক	২৬৫০	মাদানী	سورة الطلاق
৬৬	সূরা আত-তাহ্রীম	২৬৫৫	মাদানী	سورة التحريم
৬৭	সূরা আল-মুল্ক	২৬৬২	মাক্কী	سورة الملك
৬৮	সূরা আল-কালাম	২৬৬৮	মাক্কী	سورة القلم
৬৯	সূরা আল-হাক্কাহ্	২৬৭৬	মাক্কী	سورة الحاقة
৭০	সূরা আল-মা‘আরিজ	২৬৮২	মাক্কী	سورة المعارج
৭১	সূরা নূহ্	২৬৯১	মাক্কী	سورة نوح
৭২	সূরা আল-জিন্	২৬৯৯	মাক্কী	سورة الجن

ক্রমিক নং	সূরার নাম	পৃষ্ঠা নং		السورة
৭৩	সূরা আল-মুয্যাম্মিল	২৭০৮	মাক্কী	سورة المزمل
৭৪	সূরা আল-মুদ্দাস্সির	২৭১৭	মাক্কী	سورة المدثر
৭৫	সূরা আল-কিয়ামাহ	২৭২৮	মাক্কী	سورة القيامة
৭৬	সূরা আদ-দাহ্র	২৭৩৭	মাদানী	سورة الدهر
৭৭	সূরা আল-মুর্সালাত	২৭৪৭	মাক্কী	سورة المرسلات
৭৮	সূরা আন-নাবা’	২৭৫৫	মাক্কী	سورة النبإ
৭৯	সূরা আন-নাযি‘আত	২৭৬২	মাক্কী	سورة النازعات
৮০	সূরা ‘আবাসা	২৭৭০	মাক্কী	سورة عبس
৮১	সূরা আত-তাকভীর	২৭৭৬	মাক্কী	سورة التكوير
৮২	সূরা আল-ইন্ফিতার	২৭৮২	মাক্কী	سورة الانفطار
৮৩	সূরা আল-মুতাফ্ফিফীন	২৭৮৬	মাক্কী	سورة المطففين
৮৪	সূরা আল-ইন্শিকাক্	২৭৯৪	মাক্কী	سورة الانشقاق
৮৫	সূরা আল-বুরূজ	২৮০০	মাক্কী	سورة البروج
৮৬	সূরা আত-তারিক	২৮০৫	মাক্কী	سورة الطارق
৮৭	সূরা আল-আ‘লা	২৮০৯	মাক্কী	سورة الأعلى
৮৮	সূরা আল-গাশিয়াহ	২৮১৫	মাক্কী	سورة الغاشية
৮৯	সূরা আল-ফাজ্র	২৮২০	মাক্কী	سورة الفجر
৯০	সূরা আল-বালাদ	২৮২৮	মাক্কী	سورة البلد
৯১	সূরা আশ-শাম্স	২৮৩৩	মাক্কী	سورة الشمس
৯২	সূরা আল-লাইল	২৮৩৮	মাক্কী	سورة الليل
৯৩	সূরা আদ-দুহা	২৮৪৩	মাক্কী	سورة الضحى
৯৪	সূরা আল-ইনশিরাহ্	২৮৪৭	মাক্কী	سورة الشرح
৯৫	সূরা আত-তীন	২৮৫০	মাক্কী	سورة التين
৯৬	সূরা আল-‘আলাক	২৮৫৪	মাক্কী	سورة العلق
৯৭	সূরা আল-কাদ্র	২৮৫৯	মাক্কী	سورة القدر
৯৮	সূরা আল-বায়্যিনাহ	২৮৬২	মাদানী	سورة البينة
৯৯	সূরা আয-যিলযাল	২৮৬৬	মাদানী	سورة الزلزال
১০০	সূরা আল-‘আদিয়াত	২৮৭০	মাক্কী	سورة العاديات
১০১	সূরা আল-কারি‘আহ্	২৮৭৪	মাক্কী	سورة القارعة

ক্রমিক নং	সূরার নাম	পৃষ্ঠা নং		السورة
১০২	সূরা আত-তাকাছুর	২৮৭৮	মাক্কী	سورة التكاثر
১০৩	সূরা আল-‘আস্‌র	২৮৮৩	মাক্কী	سورة العصر
১০৪	সূরা আল-হুমাযাহ্‌	২৮৮৭	মাক্কী	سورة الهمزة
১০৫	সূরা আল-ফীল	২৮৯০	মাক্কী	سورة الفيل
১০৬	সূরা কুরাইশ	২৮৯২	মাক্কী	سورة قريش
১০৭	সূরা আল-মা‘উন	২৮৯৬	মাক্কী	سورة الماعون
১০৮	সূরা আল-কাউছার	২৮৯৯	মাক্কী	سورة الكوثر
১০৯	সূরা আল-কাফিরূন	২৯০৩	মাক্কী	سورة الكافرون
১১০	সূরা আন-নাস্‌র	২৯০৮	মাদানী	سورة النصر
১১১	সূরা তাব্বাত	২৯১১	মাক্কী	سورة تبت
১১২	সূরা আল-ইখ্‌লাস্‌	২৯১৬	মাক্কী	سورة الإخلاص
১১৩	সূরা আল-ফালাক	২৯২২	মাক্কী	سورة الفلق
১১৪	সূরা আন-নাস	২৯২৮	মাক্কী	سورة الناس

إنّ وزارة الشؤون الإسلاميّة والدّعوة والإرشاد

في المملكة العربيّة السّعوديّة

المشرفة على مجمّع الملك فهد

لطباعة المصحف الشّريف في المدينة المنوّرة

إذ يسرُّها أن يُصدر المجمّعُ هذه الطّبعة من القرآن الكريم

وترجمة معانيه وتفسيره إلى اللّغة البنغاليّة

تسأل الله أن ينفع بها النّاس

وأن يجزي

خادم الحرمين الشّريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أحسن الجزاء على جهوده العظيمة في نشر كتاب الله الكريم

والله وليّ التّوفيق

রাজকীয় সৌদি সরকারের দাওয়াহ্, ইর্শাদ, ও
ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত মদীনা
মুনাওয়ারাস্থ বাদশাহ্ ফাহ্দ কুরআন মুদ্রণ কমপ্লেক্স
পবিত্র কুরআনুল কারীমের এই বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত
তাফসীর প্রকাশ করতে পেরে আনন্দবোধ করছে।
মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তিনি এর দ্বারা সবাইকে
উপকৃত করুন এবং আল্লাহর পবিত্র কালাম প্রচারে
খাদেমুল হারামাইন আশ্-শারীফাইন বাদশাহ সালমান
ইবন আব্দুল আযীয আলে সাউদ-এর এই বৃহৎ প্রচেষ্টার
জন্য তাঁকে সর্বোত্তম প্রতিদান দান করুন, আর আল্লাহ্ই
একমাত্র তাওফীক দাতা।

ص.ب ٦٢٦٢ - المدينة المنورة

www.qurancomplex.gov.sa
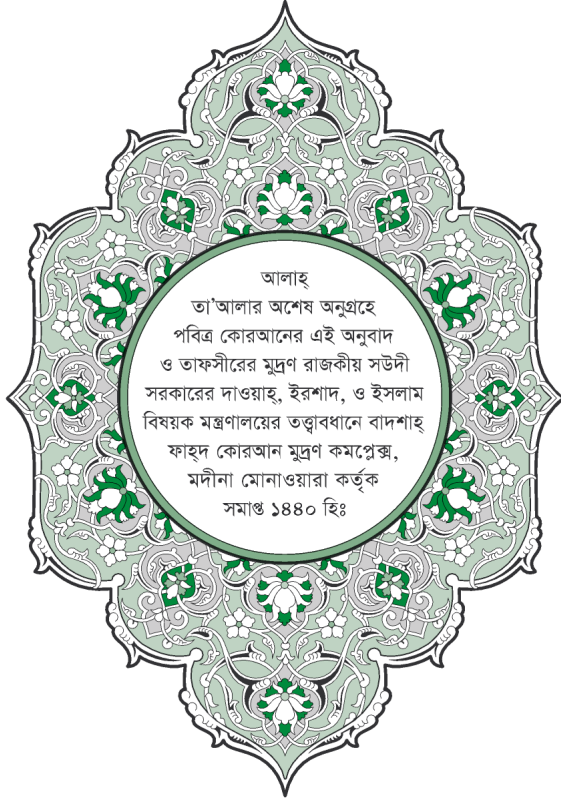
contact@qurancomplex.gov.sa

---

www.qurancomplex.gov.sa

contact@qurancomplex.gov.sa

ⓗ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ١٤٤٠هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

القرآن الكريم وترجمة معانيه وتفسيره إلى اللغة البنغالية.

مجمـع الملـك فهـد لطباعـة المصحـف الشريـف - المدينـة المنـورة، ١٤٤٠هـ

٢مج

١٤٨٨ص؛ ١٤×٢١سم

ردمك: ٦-٥٨-٨١٨٧-٦٠٣-٩٧٨ (مجموعة)

٩-٦٠-٨١٨٧-٦٠٣-٩٧٨ (ج٢)

١- القرآن - ترجمة - اللغة البنغالية ٢- القرآن - تفسير أ.العنوان

ديوي ٢٢١,٤٩١٤٤ ١٤٤٠/٧٤٩

رقم الإيداع: ١٤٤٠/٧٤٩

ردمك: ٦-٥٨-٨١٨٧-٦٠٣-٩٧٨ (مجموعة)

٩-٦٠-٨١٨٧-٦٠٣-٩٧٨ (ج٢)